প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

৩৮শ ভাগ, প্রথম খণ্ড

বৈশাখ—আশ্বিন

১৩৪৫

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"

৩৮-শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৪৫

১ম সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

[আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত]

ওঁ

কলিকাতা

প্রিয়বরেষু

বলেন্দ্রনাথ ও আমার পুত্র রথীর রোগপরিচর্য্যার জন্য আমাকে হঠাৎ কলিকাতায় আসিতে হইয়াছে—প্রায় পনেরো দিন এইখানেই কাটিয়াছে, আরও দিন পাঁচ সাত কাটিতে পারে। নিজেও সুস্থ নহি।

এদিকে অকালবর্ষা নামিয়াছে—ঠিক শ্রাবণ মাসের মত। ইহাতে আমার কোন আপত্তি ছিল না, শঙ্কা হয় পাছে প্রকৃতি শ্রাবণ মাসে ফাঁকি দিয়া বসেন। দার্জ্জিলিঙেও যদি এখানকার স্বরূপ বর্ষার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে তবে আপনার সৌভাগ্য আমি ঈর্ষা করি না। পাহাড়ের বর্ষা আমাদের বাঙ্গালীর কান্নার মত একঘেয়ে এবং অবিশ্রাম। তবু একবার আপনাদের শৈলনীড়ের মধ্যে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু অবকাশ এবং পাখা না থাকায় সে দুরাশা মনে স্থান দিই না। রোগতাপের মধ্যে লেখাপড়া বন্ধ আছে—সুযোগের অপেক্ষা করিতেছি—এক এক বার ভাবি সুযোগও হয়ত আমার অপেক্ষা করিতেছে—জোর করিয়া মনটাকে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া একবার লিখিতে বসিলেই হয়—কিন্তু সে জোরটুকু সম্প্রতি পাইতেছি না।

কতকগুলি পৌরাণিক গল্প আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে—যেমন করিয়া হৌক্ তাহাদের একটা গতি করিতে হইবে—তাহারা আমার কন্যাদায়ের মত—পাত্রিকের সহিত তাহাদের পরিণয় সাধন করিতে না পারিলে তাহারা অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিবে—কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধেও বাল্যবিবাহটা ভাল নয়—উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত ইহাদের কলরব ও উপদ্রব আমাকে সহ্য করিতেই হইবে। শরীর আজ পীড়িত আছে—এইখানেই বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইতি ১৩ই জ্যৈষ্ঠ। ১৩০৬

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ

কুমারখালি

E. B. S. Ry.

প্রিয়বরেষু

দার্জ্জিলিঙের ঠিকানায় আমি আপনার পত্রের উত্তর

দিয়াছিলাম, পাইয়াছেন কি না জানি না। আপনার পত্রে দার্জ্জিলিং ছাড়া আর কোন প্রকার বিশেষ ঠিকানা লিখিত ছিল না। এ পত্র কলিকাতার ঠিকানায় লিখিলাম।

যেরূপ প্রবল বর্ষা পড়িয়াছে এখন বোধ করি নদী-নির্ঝর ও সঙ্গে সঙ্গে বহুতর ভূখণ্ড শিলাখণ্ড পাহাড় ছাড়িয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে—আপনারা কি শিখরদেশেই অটল হইয়া থাকিবেন? যদি নামেন ত এই পদ্মা নদীর পথটা কি অনুসরণ করিতে পারেন না? এখন আকাশ মেঘে, নদী জলে, এবং পৃথিবী শস্যে পরিপূর্ণ। ঘরের বাহির হওয়া শক্ত কিন্তু জানালা আছে কি করিতে? আপনাদের বাইসিক্‌ল্‌ চলিবার মত একটা পথ গড়িয়া লওয়া গেছে।

আত্মীয়দের পীড়া লইয়া প্রায় এক মাস কলিকাতায় ছিলাম—সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়া আপনাদের সেই অর্দ্ধক্রত গল্পটিতে হাত দিয়াছি। মাসিক পত্রিকার তাড়া নাই—আপন মনে আস্তে আস্তে লিখি। কোন একদিন সায়াহ্নে আপনাদের সেই কোণের ঘরে বসিয়া বোধ করি পড়িয়া শুনাইবার অবকাশ পাইব। ইতি ৪ঠা আষাঢ়। ১৩০৬

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কলিকাতা

বন্ধু

কিছুকাল থেকে সাংসারিক নানা কাজে আমাকে কলকাতায় বদ্ধ থাকতে হয়েচে। কিন্তু কলকাতায় আমার সুখ নেই। পূর্ব্বে এখানে যখন আসতুম তোমাদের ওখানেই সর্ব্বপ্রথমে ছুটে যেতুম, এবারে সে-রকম আগ্রহের সঙ্গে কোনখানে যাবার নেই। আজ প্রভাতেই তোমার চিঠিখানি পেয়ে তোমারি সঙ্গে আবার দেখা হল—তোমার সেই ছোট ঘরটি থেকে তোমার আলাপগুঞ্জন যেমন আমি হৃদয়ে পূর্ণ করে নিয়ে আসতুম নিজেকে আজও সেই রকম পূর্ণ বোধ করচি। এক এক সময় সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাটে হৃদয় অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, কাজ করবার শক্তি শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তোমার সঙ্গে আলাপ করে এলে কর্ত্তব্যের গৌরব পুনর্ব্বার নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করতে পারি—সংসারের সমস্ত জটিল বাধা তুচ্ছ করবার মত বল মনের মধ্যে সঞ্চয় করি। তোমার চিঠিতেও আজ অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও আমার সংসারবন্ধন লঘু হল।

ত্রিপুরার মহারাজ এখন কলকাতায়। তোমার সফলতায় তিনি যে কি রকম আন্তরিক আনন্দ অনুভব করেন তা তোমাকে আর কি বল্‌ব! বাস্তবিক তিনি যে হৃদয়ের সঙ্গে তোমাকে শ্রদ্ধা করেন এতেই তিনি বিশেষরূপে আমার হৃদয় আকর্ষণ করেচেন। আজ তোমার চিঠি নিয়ে তাঁর ওখানে যাব—তিনি খুব খুসি হবেন। তুমি তাঁকে অল্পদিন হল যে চিঠি লিখেছিলে সেখানি পেয়ে তিনি যেন বিশেষ সম্মানিত হয়ে উঠেছিলেন এমনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন। কোনরূপে তোমাকে সহায়তা করবার জন্যে তিনি যেন ব্যগ্র হয়ে আছেন।

লোকেনকে আমার গল্প তর্জ্জমার জন্যে ধরেছি—কিন্তু সে নিতান্ত কুঁড়ে এবং নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাসহীন। সেই জন্যে তাকে কোন কাজে প্রবৃত্ত করাতে পারি নে। সে এখন আমার কাব্য নির্ব্বাচনে ব্যস্ত আছে। তার সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে তাকে পরাস্ত করেছি—তার অনেকগুলি সখের কবিতা এই Selection থেকে নির্ব্বাসিত করে বইটাকে সর্ব্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তোলা গেছে—এখনো দুই এক জায়গায় একটু আধটু কণ্টক লুকিয়ে আছে—সে আর পারা গেল না।

আমি আজকাল নানা গোলমালের মধ্যে "নৈবেদ্য" বলে এক একটি কবিতা প্রত্যহ আমার কোন এক অবসরে লিখে ফেলে আমার অন্তর্য্যামীকে নিবেদন করে দিই। আমার জীবনের সমস্ত কৃত কর্ম্মের সমস্ত চিন্তিত সংকল্পের সমস্ত দুঃখসুখের কেন্দ্রস্থলে যিনি ধ্রুব নিশ্চলভাবে বিরাজ করচেন এবং সেই সঙ্গে সমস্ত অণুপরমাণু সমস্ত বিরাট জগৎমণ্ডলের যিনি একটিমাত্র ঐক্যস্থল—তাঁর কাছে

নির্জ্জনে গোপনে প্রত্যহ জীবনের একটি একটি দিন সমর্পণ করে দিচ্চি। সে দিনগুলিকে যদি কর্ম্মের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিতে পারতুম তাহলেই ভাল হত কিন্তু অন্ততঃ তাতে পত্রপুটে ফুলের মত একটি করে গান সাজিয়ে আমার জীবনের নদীর ঘাটে সেই সমুদ্রের উদ্দেশে ভাসিয়ে দিয়েও সুখ আছে। শীঘ্রই এগুলো ছাপ্‌তে দেব—বোধ হয় তুমি ইংলণ্ডে থাক্‌তে থাক্‌তেই পাবে। কিন্তু সেখানকার কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষের নির্জ্জন দেবালয়ের এই গানগুলি ঠিক সুরে বাজ্‌বে কি না জানি নে—এর আনন্দ এবং বিষাদ এবং শান্তি সেখানে কি রকম শোনাবে?

মহারাজের সঙ্গে দেখা করে এলুম—তাঁকে তোমার চিঠি শোনালুম—তিনি ভারি খুসি হলেন। আচ্ছা, তুমি এদেশে থেকেই যদি কাজ করতে চাও তোমাকে কি আমরা সকলে মিলে স্বাধীন করে দিতে পারি নে? কাজ করে তুমি সামান্য যে টাকাটা পাও সেটা যদি আমরা পুরিয়ে দিতে না পারি তা হলে আমাদের ধিক্‌। কিন্তু তুমি সাহস করে এ প্রস্তাব কি গ্রহণ করবে? পায়ে বন্ধন জড়িয়ে পদে পদে লাঞ্ছনা সহ্য করে তুমি কাজ করতে পারবে কেন? আমরা তোমাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছা করি—সেটা সাধন করা আমাদের পক্ষে যে দুরূহ হবে তা আমি মনে করি নে। তুমি কি বল?

অনেক দিন বিরহী আছি—শিলাইদহের নীড়টির জন্যে প্রাণ কাঁদচে। ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩০৭

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

আগরতলা
কার্ত্তিক ১৩০৮

বন্ধু

আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি। এইখানে মহারাজের অতিথি হইয়া কয়েক দিন আছি। তোমার প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা তাহা ত জানই—সুতরাং তাঁহার কাছে আমার প্রার্থনা জানাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিতে হয় নাই। তিনি শীঘ্রই বোধ হয় দুই এক মেলের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। সে-টাকা আমার নামেই তোমাকে পাঠাইব। এই বৎসরের মধ্যেই তিনি আরো দশ হাজার পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ করি তুমি বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে আপাতত উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। প্রাসাদ নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহুব্যয়সাধ্য কার্য্যে সম্প্রতি মহারাজ জড়িত আছেন নতুবা তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তোমাকে পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে পারিতেন। তাঁহার এই উৎসাহে তিনি আমার হৃদয় আরো দৃঢ়তররূপে আকর্ষণ করিয়াছেন—স্বাভাবিক ঔদার্য্যের এমন উজ্জ্বল আদর্শ আমি আর দেখি নাই। তুমি অবসাদ হইতে নিজেকে রক্ষা কর। ফললাভ করিতে তোমার যতই বিলম্ব হউক আমাদের শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক প্রীতি সর্ব্বদাই ধৈর্য্য সহকারে তোমার পার্শ্বচর হইয়া থাকিবে। তোমাকে আমরা লেশমাত্র তাড়া দিতেছি না; যাহাতে কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিবার জন্য তুমি যথোচিত বিলম্ব করিতে পার আমরা তাহারই সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি—আমাদের প্রতি সেই আস্থা তুমি দৃঢ় রাখিয়ো। তোমার কাছে আমরা আরো কত দাবী করিব? তুমি যাহা করিয়াছ তাহার জন্যই যদি আমরা কৃতজ্ঞ না হইতে পারি তবে আমাদিগকে ধিক্‌। তুমি যাহা করিয়াছ আমরা তাহার উপযুক্ত প্রতিদান কিছুই দিতে পারি না। আমি যে চেষ্টা করিতেছি তাহা কতটুকু এবং তাহার মূল্যই বা কি? এইটুকু দিয়া তোমার উপরে দাবী চালাইতে পারি না। তোমাকে হৃদয়ের গভীর প্রীতি ছাড়া আর কিছুই দিই নাই জানিবে; সে-প্রীতি ধৈর্য্য ধরিতে জানে এবং প্রীতি ছাড়া আর কিছুই ফিরিয়া চাহে না। মহারাজের সম্বন্ধে এটুকু নিশ্চয় জানিয়ো তিনি তোমাকে ঋণী করিবার জন্য অর্থসাহায্য করেন নাই তিনি তোমার ঋণ পরিশোধ করিতেছেন। যিনি তোমাকে প্রতিভা দান করিয়াছেন তিনিই তোমাকে উদ্যম ও আশা প্রেরণ করিয়া সেই প্রতিভাকে সার্থক করুন!

তোমার
রবি

আর্থিক পরিকল্পনা

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন দেশের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমার এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে ভিন্ন ভিন্ন আবেষ্টনে যেমন প্রগতির জন্ম আর্থিক ও সামাজিক পরিকল্পনার প্রয়োজন, তেমনি ঐ পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিবার জন্ম কার্য্যদক্ষ ও বিশেষজ্ঞেরও প্রয়োজন। আমেরিকা, জার্ম্মেনী, রুশিয়া ও ইতালীতে প্রগতির পরিকল্পনা আজ গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগকে প্রেরণা দিতেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষজ্ঞ ও কৌশলী সেক্রেটারিয়াট অধিকার করিয়া প্রগতির কল্পনাকে কার্য্যকরী করিতেছে।

জগতের প্রায় সব দেশ—এমন কি অধিকাংশ কৃষিপ্রধান দেশও অনতিবিলম্বে ব্যবসামান্দ্য হইতে আত্মরক্ষা করিয়া এখন আর্থিক উন্নতির পথে চলিয়াছে। ভারতবর্ষে যে আপেক্ষিক আর্থিক মান্দ্যের লক্ষণ এখনও সুস্পষ্ট রহিয়াছে তাহার প্রধান কারণ বর্ষক্রমে কোন আর্থিক পরিকল্পনাই গবর্ণমেণ্টকে পরিচালনা করে নাই, বিশেষজ্ঞের হাতে না পড়িয়া আমলাতন্ত্রের হাতে কল্পনাগুলি হয় অতি-পঙ্গু না-হয় অতি-মনোজ্ঞ হইয়াছে, বাস্তবে পরিণত হয় নাই।

প্রথমে রুশিয়ার কথা ধরা যাউক, যেখান হইতে গবর্ণমেণ্টের আর্থিক পরিকল্পনার আদর্শ জগৎকে বিস্মিত করিয়াছে। এখানে জনশিক্ষা ও সমাজসংস্কারের কি বিপুল আয়োজন, গবর্ণমেণ্টের কি তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ, জনগণের কি আগ্রহ ও অধ্যবসায়,—সব দিক হইতে রুশিয়ায় জনসমাজের একটা অদ্ভুত জাগরণ লক্ষিত হয়। অথচ সত্য সত্যই রুশিয়ার কৃষকের সঙ্গে ভারতবর্ষের কৃষকের কিছু দিন পূর্ব্বে কোন প্রভেদই ছিল না। তেমনি অশিক্ষা, অবিজ্ঞান ও বিশৃঙ্খলা রুশিয়াতেও ছিল। সব ক্ষেত্রে যৌথভাবে কার্য্যকরণ, সহযোগের দ্বারা শক্তি কৌশল ও শৃঙ্খলা অর্জ্জন একটা বিরাট সামাজিক পরিকল্পনা ও আদর্শের অঙ্গীভূত হইয়া রুশিয়াকে রূপান্তরিত করিয়াছে। রুশিয়ার পল্লী-অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়া বুঝিতে পারিলাম সমূহতন্ত্র যে এত শীঘ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ শুধু সামাজিক ন্যায়-পরায়ণতার দাবি ও বিজ্ঞাপন নহে, সমূহের দ্বারা সমাজের আর্থিক সুবিধা বিধান এই রূপান্তরের বিশেষ কারণ। ভারতবর্ষের মতই চাষী সেখানে দুর্ব্বল, ঋণভারগ্রস্ত, সহায়সম্বলহীন। কিন্তু যেই যৌথ প্রতিষ্ঠিত হইল, অমনি ক্ষেতে ক্ষেতে বৈজ্ঞানিক সার ও কৃষিযন্ত্র আসিল, গ্রামে গ্রামে স্কুল ও হাসপাতাল আসিল, পণ্যসরবরাহ ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবধানেরও সুযোগ পৌছিল।

সমবায় আন্দোলনের সাহায্যে, গ্রাম-পঞ্চায়েতের পুনরুদ্বোধনে পল্লীসংস্কার ভারতবর্ষে কার্য্যকরী হয় নাই, কার্য্যকরী হইবেও না, কারণ গবর্ণমেণ্ট কৃষকের দ্বারা, কৃষকের জন্ম অনুমোদিত নহে; জমিদার, বণিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বহুকাল ধরিয়া এখনও গবর্ণমেণ্টকে পরিচালিত করিবে। গত এক শত বৎসরের মধ্যে ভূমিস্বত্ব লইয়া ভারতবর্ষে বিনা-রক্তপাতে এক নীরব বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, এই বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের অভ্যুত্থান, মহাজনের প্রতিপত্তি, পল্লীসমাজের অবনতি, গোচারণভূমি ও বনানী নাশ ও কৃষকের অধোগতি। জমিদারী প্রথার আমূল শোধন অথবা বর্জ্জন ছাড়া এখন কৃষির উন্নতির পরিকল্পনার গত্যন্তর নাই। পরিবর্ত্তন করিতে হইলে মুসোলিনীর ইতালীর মত প্রজা ও জমিদারের মধ্যে কৃষির উন্নতিবিধায়ক পরস্পরের প্রতিপালনীয় ফসল উৎপাদন ও বাঁটোয়ারার বিধিনিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। নচেৎ হিটলারের জার্ম্মেনীর মত পঞ্চাশ বা পঁচাত্তর বৎসর ধরিয়া বন্ধকী ডিবেঞ্চার

জমিদারকে দিয়া প্রজাকে ভূম্যধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলায় বা অযোধ্যায় লোকে যে মনে করে গবর্ণমেণ্টের অর্থাভাবে এরূপ ব্যবস্থা জল্পনা-কল্পনামাত্র, তাহা একবারেই অমূলক। বার্লিনের ভূমি-লেন-দেন ব্যাঙ্কে গিয়া জার্ম্মেনীর বিভিন্ন প্রদেশে জমিদারী-ক্রয়ের ব্যবস্থা দেখিয়া আমার ধারণা নিশ্চিত ও পরিষ্কার হইয়াছে যে, কায়েমী বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তনকল্পে এরূপ বিধিপ্রবর্ত্তন ভারতবর্ষেও সহজসাধ্য।

জার্ম্মেনীতে কৃষিরক্ষাকল্পে ভূমির ভাগবিলি ও উত্তরাধিকারসূত্রে বাঁটোয়ারা নিষিদ্ধ। হয় জ্যেষ্ঠ, না-হয় কনিষ্ঠ পুত্র অবিভক্ত জমির অধিকার লাভ করে। অন্য পুত্রেরা কিছু অর্থ ক্ষতিপূরণস্বরূপ কয়েক বৎসর হিসাবে পাইয়া থাকে। লোকসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য ভারতবর্ষে অধিকাংশ কৃষকের জমি অতি ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত টুক্‌রায় পরিণত হইয়াছে। তাহাতে কৃষির দ্বারা পরিবারের ভরণপোষণ দুঃসাধ্য। হিটলারের পদ্ধতি অনুযায়ী অতিবৃহৎ জমিদারী ছেদ ও অতিক্ষুদ্র জমির আকার বৃদ্ধি ভারতবর্ষের কৃষির উন্নতির একমাত্র পন্থা।

ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলন কোন উন্নতিই দেখাইতে পারিবে না যত দিন আমরা ভূমিস্বত্বের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে ভয় পাই, চাষের জমির উত্তরোত্তর বিভাগ ও হ্রাস সম্বন্ধে উদাসীন থাকি। দুই তিন বিঘা জমিতে চাষের কাজ পরিবারের প্রয়োজন মিটাইতে পারে না, বংশপরম্পরাক্রমে সশ্রম কারাগারের মত ক্ষুদ্রায়তন ক্ষেত কৃষককে আজ বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। এ নিদারুণ বিধির পরিবর্ত্তন না আনিলে কৃষকের জীবনে সফলতা ও তাহার মনের প্রসার অসম্ভব।

ইউরোপের প্রায় সব দেশেই এখন জমির আকার বৃদ্ধি ও হ্রাস লইয়া ব্যস্ত। আমেরিকার নূতন উপনিবেশে এ বালাই নাই। সেখানে বনানী রক্ষা, বন্যানিবারণ, নদী-নিয়ন্ত্রণ ও ভূমির উৎপাদনশক্তি রক্ষণ রুজভেলটের নূতন সংস্কারের প্রধান অঙ্গ। প্রত্যেক বিষয়েই আমেরিকার সংস্কারবিধি হইতে ভারতবর্ষের অনেক শিখিবার আছে। অরণ্য রক্ষা ও রোপণই হউক, নদীসংস্কার ও বন্যানিরোধই হউক, প্রত্যেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রদেশের সহযোগ বাধ্য করিয়াছে। ফলে পূর্ব্বে যে-সকল প্রাকৃতিক উপদ্রবের প্রতিকার ছিল না, তাহা এখন বিরাট সংস্কার-পরিকল্পনার অন্তর্গত হইয়া রাষ্ট্রিক ও প্রাদেশিক কৌশলীর সমবায়ে পরাহত হইতেছে। যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যার প্রাদেশিক রাষ্ট্রের সমবেত উদ্যোগে বনানীর উন্নতিসাধন বন্যানিবারণ ও নদী-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির প্রবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজনীয়।

ব-প্রদেশ বলিয়া বাংলার নদীরক্ষা-সমস্যা অন্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক গুরুতর, অথচ নদীরক্ষা অসম্ভব যদি অন্যান্য গাঙ্গেয় প্রদেশ বনানী রোপণ, মৃত্তিকারক্ষা পূর্ত্তবিস্তার, বন্যানিবারণ সম্বন্ধে একযোগে সমানভাবে ন ব্রতী হয়। আমেরিকার নূতন আর্থিক পরিকল্পনা ও কার্য্যক্রম হইতে তাই বাংলা দেশের এঞ্জিনিয়ারগণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিখিবার আছে। যেভাবে মিসিসিপি ও অহাইও নদী লইয়া আমেরিকার বিশেষজ্ঞগণ কার্য্যক্ষম হইয়াছে, তাহাতে তিস্তা ও যমুনা এবং মধ্য- ও পশ্চিম-বঙ্গের নদী-নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কার যে কঠিন নহে তাহা বেশ বুঝা যায়, শুধু চাই কার্য্যকৌশল, দূরদর্শন ও সাহসিক পরিকল্পনা।

বাংলার তিন ভাগের দুই ভাগে মরা নদী মাঠে ঘাটে মানুষের বসবাসে ও বাঙালীর আশা-ভরসায় মৃত্যু আনিয়া দিয়াছে। এ মৃত্যু অনিবার্য্য নহে; প্রকৃতিকে পরাস্ত করা যায়, বিজ্ঞানের দ্বারা, বর্ষক্রমের এঞ্জিনিয়ারিং পরিকল্পনার দ্বারা। যেমন প্রকৃতিকে পরাস্ত হইতে হইতেছে মুসোলিনীর ইতালীতে। ১৯২৮ সালের মুসোলিনি আইন অনুসারে ৭,০০০ মিলিয়ন লিরা খরচ করিয়া ১৬ বৎসরের মধ্যে ইতালীর এক-সপ্তম অংশে জলাভূমি ও ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত মাঠঘাট সংস্কৃত করিবার এক বিপুল আয়োজন চলিতেছে। ১৯৩৫ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়ার গ্রাস হইতে ১৫০,০০০ একর জমি উদ্ধার হইয়াছে পন্তিনে জলাভূমিতে ২৭,০০০ নূতন বাড়ী উঠিয়াছে এবং চারটি নূতন শহরের পত্তন হইয়াছে—লিটোরিয়া, সাবাউদিয়া, এপ্রিলিয়া ও পন্তিনিয়া। ঐ অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া মুসোলিনীর ম্যালেরিয়া-বিতাড়ন ও লোকবহুল জনপদ হইতে পন্তিনে ভূমিতে লোকসংগ্রহ দেখিয়া মধ্য-

ও পশ্চিম-বঙ্গ সম্বন্ধে নূতন আশায় আশান্বিত হইয়াছি। দিকে দিকে শুধু জঙ্গল পরিষ্কার, জলাভূমি-সংস্কার, রাস্তা ও মানুষের বসবাস নির্ম্মাণ নহে, জলের প্রপাতের সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উদ্ভব ও গ্রাম্যশিল্পের উদ্যোগও চলিতেছে। আমেরিকা, জার্ম্মেনী ও ইতালীতে আর্থিক পরিকল্পনা ও গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত বিবিধ অনুষ্ঠান বেকারের সংখ্যা লাঘব করিয়াছে, নানা দিক হইতে লোকসাধারণের কল্যাণ আনিয়াছে। ভারতবর্ষের অভাবগ্রস্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি যদি আর্থিক উন্নতিবিধানের জন্য উৎপাদনশীল কর্জ্জ অবাধে গ্রহণ করে এবং উহার দ্বারা নানাবিধ ধনোৎপাদক প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তন করে, তাহা হইলে জনসাধারণের আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বও ক্রমে বাড়িতে পারে। ইতালীতে কতকগুলি ইনশিওরেন্স কোম্পানী ও ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয় ভূমিসংস্কার সমিতির কাগজের চলতি ডিসকাউণ্টের দ্বারা সাহায্য করিয়া রাষ্ট্রের ব্যয়-ভার লাঘব করিয়াছে, ত্রিশ বৎসর ধরিয়া রাষ্ট্র বাজেটে সুদের দরুন কিছু টাকা ধার্য্য রাখিয়া বিপুল কল্যাণ-প্রতিষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছে। বাংলা দেশেও এই প্রকারের অর্থাগমের ব্যবস্থা হইতে পারে। রাষ্ট্রের আয়ব্যয় সম্বন্ধে বিপুল পরিকল্পনা ও বিচক্ষণ বিষয়বুদ্ধির প্রয়োজন, তবে দেশ রক্ষা পাইবে।

পাশ্চাত্য জগতের অনেক দেশে আর্থিক পরিকল্পনার বিধি ও ব্যবস্থা বিজ্ঞানের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। যেমন রুশিয়ায়, তেমনি ইতালী ও আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে সুধীমণ্ডল রাষ্ট্রের আর্থিক ব্যবস্থায় পরামর্শ দেয়, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে। এসব দেশে আমলাতন্ত্রের আর আধিপত্য নাই। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সুধীগণের গবেষণা চলিতেছে। যেমন যেমন কোন স্কীম অগ্রসর হইতে থাকে তেমনি তাহার বিচার ও বিশ্লেষণও চলিতে থাকে আর্থিক গবেষণার সাহায্যে। কোন বিষয়েই কোন স্কীম লইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট বিধি ও ধারা পালনের ব্যবস্থা নাই।

ভারতবর্ষের আমলাতন্ত্রের যেমন কল্পনা ক্ষুদ্র, তেমনি তাহার বিধিব্যবস্থাও নির্দ্দিষ্ট ও অলঙ্ঘ্য। আমলাতন্ত্রের কাছে আমরা পাই হয় অতিক্ষুদ্র সংকীর্ণ উন্নতি ও সংস্কারের বিধি, না-হয় অতিমনোরম আকাশকুসুম। দেশ ইহাতে ক্রমশঃ হীন, দরিদ্র ও নিরাশ হইয়া চলিয়াছে। আমলাতন্ত্রের স্বার্থ ও মনোবৃত্তির সঙ্গে জনসাধারণের কল্যাণ ও আদর্শের ব্যবধানও বাড়িয়া চলিয়াছে। আশা হয়, কংগ্রেস শাসনের ভার লইয়া আকাশকুসুমের পশ্চা-দ্ধাবন করিয়া দেশকে নিরাশ করিবে না, বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুধী- ও বিশেষজ্ঞ- মণ্ডলের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে, দৃঢ় বিশ্বাসে প্রগতির পরিকল্পনা আশ্রয় করিবে, এবং সমগ্র জাতির বেদনাময় অন্তর হইতে ভাবুকতা সঞ্চয় করিয়া বিপুল উদ্যমে তাহা কার্য্যকরী করিবে।

প্যারিস
অক্টোবর, ১৯৩৭

বঙ্কিমচন্দ্র ও সাহিত্যের আদর্শবাদ

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের ভিতরে ক্রমেই একটি মতবাদ গড়িয়া উঠিতেছে যে, তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টি অনেকখানি সংস্কৃত সাহিত্যের ভট্টিকাব্যেরই সহোদর না হইলেও জ্ঞাতি-ভাই; অনেকখানিই যেন নীতি-উপদেশের কুইনাইনকে সাহিত্যরসে মাধুর্য-মণ্ডিত করিয়া সাধারণের সম্মুখে আনিয়া ধরা,—উদ্দেশ্য মনুষ্য-সমাজের সর্ববিধ অমঙ্গল-রোগের নাশ। সাহিত্য-সমালোচনা করিতে বসিয়া এবং সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া একথা বঙ্কিমচন্দ্র বার-বার অতি স্পষ্ট ভাষায় এবং দৃঢ়তার সহিতই বলিয়াছেন যে, সাহিত্য সত্য, শিব এবং সুন্দর এই তিনেরই উপাসক; ইহার ভিতরে সুন্দরের স্থানই উর্ধ্বে হইলেও সত্য এবং শিবকে বাদ দিয়া সাহিত্য কখনও সম্পূর্ণ নহে। মঙ্গলের আদর্শ হইতে বিচ্যুত যে সাহিত্যসৃষ্টি তাহাকে তিনি পাপ মনে করিতেন। সাহিত্য সম্বন্ধে এই জাতীয় একটি মতবাদ আজিকার দিনে আমাদের সৌন্দর্যবোধকে স্বভাবতই একটু ক্ষুব্ধ করে এবং আমরা ইতিমধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের রসবোধের গভীরতা এবং সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে নানা প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

সাহিত্যের স্বরূপ-লক্ষণ কি এবং নীতিজ্ঞান বা মঙ্গলের আদর্শের সহিত তাহার সম্পর্ক কোথায় এবং কতটুকু, সাহিত্যের আদিম জন্ম-লগ্ন হইতে আজ পর্যন্ত এ সমস্যাটি সাহিত্যের পিছনে লাগিয়াই আছে; এবং এ আশা আমরা কোন দিনই করিতে পারি না যে সাহিত্যরূপ একটি পদার্থের অস্তিত্ববোধ হইতে এই উপসর্গটিকে অনাগত কোন কালেও যে একেবারে মুছিয়া ফেলা যাইবে। সুতরাং সাহিত্যের স্বরূপ-লক্ষণ বা মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতামতের মহাভারত সংকলন করিয়া লাভ নাই। এখানে শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে সাহিত্যের তরফ হইতে প্রধান অভিযোগটি কি এবং সেই অভিযোগের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষ হইতেই বা কি জবাব দেওয়া যাইতে পারে তাহাই বিচার্য।

আজকাল বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অভিযোগ এই, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের ভিতরে আদর্শবাদের অনধিকার প্রবেশ করাইয়া সাহিত্যের সৌন্দর্য ও রসের স্বরূপকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন; এবং তিনি শুধু যে যুক্তিতর্ক দ্বারাই সাহিত্যের স্বরূপ-বৈলক্ষণ্য জন্মাইয়াছেন তাহা নহে; তিনি তাঁহার সমগ্র কাব্যসৃষ্টির ভিতরেই এই আদর্শবাদের নীতিকে অনুসরণ করিয়াছেন,—ফলে তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির শিল্প-মাধুর্য পদে পদে তাঁহার নীতি-জ্ঞানের অভিভাবকত্বে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতরে আর্টের যে অপমান তাহা তাঁহার অক্ষমতার জন্য নহে;—তাহা নৈতিক চর্চার বাড়াবাড়িতে অনেকখানিই স্বেচ্ছাকৃত। সাহিত্যের যে-আদর্শটিকে মাথায় করিয়া আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটি দায়ের করিতেছি, সে-আদর্শটি হইতেছে,—'Art for Art's sake' বা 'আর্টের জন্যই আর্ট' এই মতবাদ। কিন্তু এই 'আর্টের জন্যই আর্ট' ব্যাপারটি যে কি বস্তু, সেই কথাটিই স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া উঠা যাইতেছে না। ইহাকে নৈয়ায়িক-পন্থায় বিচার করিলে দাঁড়ায় এই যে আমাদের সৌন্দর্যবোধের সত্তাটি অপর সকল বোধ-নিরপেক্ষ একটি স্বতন্ত্র বস্তু;—সে আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ। কিন্তু সৌন্দর্যবোধের এই স্বাতন্ত্র্য এবং আত্ম-পরিপূর্ণত্ব বলিতে আমরা কি বুঝি? তাহার অর্থ যদি এই হয় যে সে তাহার আত্মপ্রকাশের জন্য অন্য কোন জাতীয় বোধেরই কোনও অপেক্ষা রাখে না, তবে সাহিত্যের সেই নিরপেক্ষ তুরীয়স্বরূপের ভিতরে আমরা মনস্তত্ত্বের দিক হইতে বৃহত্তর সমস্যার ভিতরে পড়িয়া যাই।

সৌন্দর্যানুভূতিকে যাঁহারা সকল-বোধ-নিরপেক্ষ একটি অতীন্দ্রিয় অনুভূতি মাত্র মনে করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, সৌন্দর্যরসকে বা শিল্প-রসকে আমরা যেখানে এই জাতীয় একটি নিরপেক্ষ অতীন্দ্রিয় অনুভূতি মাত্র মনে করি, সেখানে সে নিরুপাধিক এবং এই অতীন্দ্রিয় নিরুপাধিক আনন্দানুভূতিকে তখন আর বিশেষ করিয়া সৌন্দর্যের আনন্দ বা রসানুভূতি বলিয়া চিনিয়া লইতে পারা যায় না। সে জাতীয় একটি আনন্দানুভূতির সহিত ধর্মের আনন্দ বা নীতি বা পরম মঙ্গলের আনন্দের কোনও ভেদ করা যায় না। সুতরাং সৌন্দর্যানুভূতিকে সৌন্দর্যানুভূতি বলিয়া চিনিতে এবং বিচার-বিশ্লেষণ করিতে আমাদিগের আরও অনেক নিম্নে নামিয়া আসা দরকার। মোট কথা, কোনও অনুভূতিকে সৌন্দর্যানুভূতি বলিয়া চিনিয়া লইতে আমাদিগকে বিকল্পাত্মক মনের রাজ্যেই ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু সেখানে আসিয়া দেখিতে পাই সেখানে একান্ত নিরপেক্ষ কোন বোধশক্তি নাই;—সকলেই পরস্পরের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে। যাহাকে আমরা নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য বলিয়া ভুল করিতেছি তাহা আপেক্ষিক প্রাধান্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমাদের মনোরাজ্যটি বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব সেখানে প্রত্যেকটি বোধ প্রত্যেকটি বোধের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত হইয়া আছে। তাই 'আর্টের জন্যই আর্ট' কথাটি মূলতই ভুল। আমাদের মনের মধ্যে এমন কোনও ব্যবস্থা নাই যে আমাদের রসবোধ বা সৌন্দর্যানুভূতি যখন সম্রাটের বেশে বাহির হইলেন, তখন অন্য সকল বোধগুলিকে একেবারে নিঃশেষে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য অন্ধকার গারদে পুরিয়া রাখি। রসবোধ যখন রাজার ন্যায় রাজপথে বাহির হয় তখন তাহার আগে-পিছে বহু জাতীয় বহু বোধের শোভাযাত্রা চলিতে থাকে; সেখানকার মন্ত্রী, সেনাপতি এবং সৈন্যসামন্ত সকলের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়া, বা সকলকে বিদ্রোহী করিয়া রাজা একেবারে অচল।

সর্বক্ষেত্রেই মনের বৃত্তিগুলির ভিতরে একটা সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য একান্তই প্রয়োজন, নতুবা মনের মধ্যে একটা বেসুরের বেদনা আমাদের কোন বোধকেই সম্পূর্ণ এবং স্পষ্ট হইতে দেয় না। আর্টের ক্ষেত্রেও নীতির সহিত চাই একটি সূক্ষ্ম সঙ্গতি,—নতুবা অসঙ্গতির বেদনা লইয়া সে সুন্দর হইয়া উঠিতেই পারে না। সত্য সত্যই আমরা আজকাল যেখানে আর্ট ও নীতিজ্ঞানকে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ ক্ষেত্রে রাখিয়া সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস পাইতেছি, এবং বাস্তব কলুষ এবং বীভৎসতাকেও আর্টের মোহিনীস্পর্শে সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করিতেছি, সেখানকার প্রকৃত সত্যটি এই যে, আর্ট সেখানে আমাদের বর্তমান নীতিজ্ঞানে বাস্তবেও কলুষিত বা বীভৎস নহে; সেখানে বুঝিতে হইবে, আমাদের নীতিজ্ঞানই অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে,—ফলে আর্টের সহিত নীতিজ্ঞানের সঙ্গতি হইয়াছে, এবং এই জন্যই সে আমাদের নিকট সুন্দর। পতিতালয়ের কাহিনী দিয়া আমরা যেখানে আর্টের আসর জমাইয়া তুলিতেছি, সেখানে বুঝিতে হইবে পতিতার জীবন সম্বন্ধেই আমাদের পূব ধারণা অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে; পতিতা সেখানে ঘৃণ্য, কদর্য হইয়া উঠে নাই,—সে আমাদের কৃপার পাত্র, আন্তরিক সহানুভূতির আস্পদ হইয়া উঠিয়াছে,—এবং এই জন্যই তাহার জীবন আমাদের আর্টেও সুন্দর হইয়া উঠিতে পারিতেছে। সাহিত্যে যে আজকাল সমাজের বিরুদ্ধে নানা প্রকারের অভিযান তাহা যে নিতান্তই আর্টের খাতিরে তাহা নহে,—তাহার পশ্চাতে আছে বাস্তবের চাহিদা। কোনও দৃশ্য বা ঘটনা যদি আমাদের নিকটে সত্য সত্যই বাস্তবে জঘন্য বা বীভৎস হইয়া উঠিয়া থাকে, আর্টের গঙ্গাজল ছিটাইয়াই তাহাকে সুন্দরের কোঠায় কিছুতেই পৌঁছাইয়া দিতে পারি না। তাই মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আমাদের আর্ট সম্বন্ধে যে মতবাদের অমিল রহিয়াছে, তাহার কারণ অনেকখানি রহিয়াছে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের নীতিবোধ এবং আধুনিক যুগের নীতিবোধের সহিত বৈষম্যে। শরৎচন্দ্রের নীতিবোধ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবোধ যদি একই থাকিত, তবে 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্রের নিকট কিছুতেই সুন্দর হইয়া উঠিতে পারিত না।

বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেমন সর্বদাই সাম্যের গান সামঞ্জস্যের গান গাহিয়া গিয়াছেন, আর্টের ক্ষেত্রেও তিনি সেই সামঞ্জস্যবাদেরই প্রচারক ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, আর্ট হইতে নীতিজ্ঞানকে বা নীতিজ্ঞান হইতে আর্টকে কখনই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না,—তাই উভয়েরই স্ফুরণের জন্য এবং পূর্ণ পরিণতির জন্য উভয়ের ভিতরেই চাই সঙ্গতি; তাই বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটে আর্ট শুধু সুন্দর নহে,—সত্য ও শিবের সহিত তাহার গূঢ় যোগসূত্র অচ্ছেদ্য।

সাহিত্যসৃষ্টির ভিতর দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনেক স্থলেই শাসক এবং প্রচারকের রূপ গ্রহণ করিয়াছেন, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না; এবং এখানেই বাস্তববাদীদের অগ্রগতি। কিন্তু বাস্তববাদ কথাটিতে যে সত্য কি বুঝায় সেই কথাটিই বুঝিয়া উঠা ভার। বাস্তববাদ বলিতে যদি আমরা ইহাই বুঝি যে সাহিত্যের কাজ হইতেছে বাহিরের বস্তুকেই একেবারে যথাযথ আনিয়া অক্ষরের মারফতে সকলের সম্মুখে ধরা, তবে একথা বলা যাইতে পারে যে সে-কাজটি একটি জীবন্ত মানুষ অপেক্ষা একখানি ফোটোগ্রাফের প্লেটই সবচেয়ে বেশী এবং নিখুঁতভাবে করিতে পারে; তবে আর সাহিত্যসৃষ্টির জন্য একটা বিরাট জীবন্ত প্রতিভার প্রয়োজন কোথায়? নিজের মনের রং তাহার সৃষ্টির ভিতরে মাখিয়া দেওয়াই যদি সাহিত্যিকের একটা দুরপনেয় কলঙ্ক হয়, তবে আর্ট বস্তুটিই যে দাঁড়াইতে পারে না; কারণ আর্টের যে সত্য সে শিল্প-স্রষ্টার মনোরাজ্যের সত্য,—এবং সাহিত্যের মাপ-কাঠিতে এই মনোরাজ্যের সত্যটিই বাস্তব সত্য হইতে অনেক বড়।

আমরা যখন কোনও সৃষ্টি-কার্য করি, তখন সেই শিল্প-সৃষ্টির ভিতরেই আমাদের নীতিজ্ঞান, ধর্মজ্ঞান প্রভৃতি অচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া থাকে। অল্পের ভিতরে হয়ত তাহাকে ধরা যায় না, কিন্তু আর্ট-সৃষ্টির ক্ষেত্র একটু প্রসার লাভ করিলেই এ-জিনিষটি স্পষ্ট ধরা পড়ে।

আর্টের মধুর রসে সিক্ত করিয়া মানুষের জীবনের নীতি সম্বন্ধে অনেক সাহিত্যিক আমাদিগকে অনেক কথা শুনাইয়াছেন, অনেক কথা বুঝাইয়াছেন, মানুষের জীবন সম্বন্ধে তাঁহারা আমাদের একটি নূতন অন্তর্দৃষ্টি দান করিয়াছেন। ইহাই ত নীতি-শিক্ষা;—'সদা সত্য কথা কহিবে' এই নীতি-শিক্ষা অপেক্ষা জীবনের মূল-নীতির পরিবর্তন, তাহার গভীর গহনে আলোকপাত এবং সত্যের আবিষ্কার—ইহা যে আরও গভীর নীতি-শিক্ষা। সাহিত্যের মারফতে এই নীতি-শিক্ষা—এই প্রচারকার্যকে আমরা রসবোধের অনুরোধে যে বরদাস্ত করি নাই তাহা নহে; আর শুধু যে কোনও রূপে নাক-মুখ বুজিয়া বরদাস্তই করিয়া গিয়াছি তাহাও নহে, আমরা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সাদর অভিনন্দনে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি। তাই শরৎচন্দ্র আজ আমাদের নিকটে শুধু নিপুণ কলাবিৎ রূপে পূজ্য নন—তিনি সংস্কারক রূপেও আমাদের শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। তাই দেখিতে পাই,—শরৎ-চন্দ্র সম্বন্ধে যত সাহিত্যিক সমালোচনাই হইয়াছে সেখানে তাঁহার আর্টের সহিত তাহার সমাজ-সংস্কার ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া আছে,—আর্ট এবং নীতি সেখানে একেবারে হরিহরাত্মা।

সুতরাং, বঙ্কিমচন্দ্র আর্টের ভিতর দিয়া নীতি প্রচার করিয়াছেন, অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টি আর নিকৃষ্ট না হইয়া যায় না—এ-কথা অযৌক্তিক এবং অশ্রদ্ধেয়। আসল কথা হইল এই, প্রত্যেক বড় সাহিত্যিকেরই জীবন সম্বন্ধে একটি নিজস্ব রূপ এবং দর্শন আছে। ইহার কতকটা তাঁহার অন্তর ধাতুর মধ্যেই অনুস্যূত,—কতকটা তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ। জীবন সম্বন্ধে এই ভাবদৃষ্টি ব্যতীত কখনও আর্ট সৃষ্টি হইতে পারে না,—আর জীবনের এই ভাবদৃষ্টির ভিতরেই জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে মিশিয়া থাকে আমাদের শ্রেয়োবোধের অসংখ্য আলোকচ্ছটা। এই ভাবেই আমাদের সৌন্দর্যবোধ আমাদের প্রেয়োবোধ এবং শ্রেয়োবোধের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আছে। আমরা বাহির হইতে তাহাদের ভিতরে যে অহিনকুলের সম্পর্ক স্থাপন করিতেছি, উহা একান্তই কাল্পনিক।

কিন্তু সমস্যা এই, আর্টের ভিতরে এই নীতি-প্রচারের স্থান কতটুকু এবং তাহার সীমা কোথায়। ভারতীয়

আলঙ্কারিকগণ সাহিত্যের লক্ষণের ভিতরে সর্বদাই 'উদ্দেশ্য'কে স্বীকার করিয়াছেন এবং সংস্কৃত আলঙ্কারিক গ্রন্থে অনেক স্থলেই সাহিত্যের ফলশ্রুতির ভিতরে চতুর্বর্গের লোভ দেখান হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যের ভিতরে এই উদ্দেশ্যের স্থান কোথায় এবং কতটুকু, সে সম্বন্ধে 'সাহিত্য-প্রকাশ'-কার মম্মট ভট্টই একটি অতি গভীর কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—সাহিত্যের ভিতরে যে উপদেশ থাকিবে তাহা 'কান্তাসম্মিত,'—'কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে'—অর্থাৎ স্বামী-সোহাগিনী নারী যেমন তাহার সমস্ত সৌন্দর্য এবং প্রেম-মাধুর্যদ্বারাই স্বামীর চিত্তকে জয় করিয়া লয় এবং প্রেমবশবর্তী স্বামীকে তাঁহার জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে নিজের অভিপ্রায়োন্মুখী করিয়া তোলে, আর্টও তেমনই তাহার সৌন্দর্য ও রস-মাধুর্যের দ্বারাই আমাদের চিত্ত জয় করিয়া জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমাদিগকে মঙ্গলের পথে চালিত করিবে। এই প্রসঙ্গে 'সাহিত্য-প্রকাশে'র টীকায় শব্দকে ত্রিবিধ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা, প্রভুসম্মিত, সুহৃৎসম্মিত এবং কান্তাসম্মিত। প্রভুসম্মিত বাক্য প্রভুর ন্যায় দণ্ড ধরিয়া আমাদিগকে মঙ্গলের পথে চালিত করে; যেমন, বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি। কিন্তু এই শাসকের ন্যায় দণ্ড ধরিয়া কর্তব্যকর্মে নিয়োগ করা সাহিত্যের কাজ নহে। সুতরাং নিছক 'গুরুমশায়গিরি'র হাত হইতে সাহিত্য নিষ্কৃতি পাইল। তার পরে সুহৃৎসম্মিত; সুহৃৎ কোনও কর্তব্যের আদেশ দেয় না,—শুধু বলিয়া দেয়, ইহা করিলে মঙ্গল হয়, আর ইহা করিলে অমঙ্গল হয়। ইতিহাস-পুরাণাদি এই সুহৃৎসম্মিত বাক্যের বক্তা; সুতরাং কি করিলে ভাল হয়, কি করিলে মন্দ হয়, সুহৃদের মত স্পষ্ট করিয়া সে-কথাও সাহিত্য বলিবে না। সাহিত্য শুধু যাহা মঙ্গল তাহা তাহার অন্তরের গভীর প্রদেশে লুকাইয়া রাখিবে,—তাহার প্রিয়তম পাঠককে তাহা পূর্বাহ্ণে জানিতেও দিবে না; শুধু সৌন্দর্য এবং রসের ভিতর দিয়া, শুধু তাহার লোকোত্তর রমণীয়তার ভিতর দিয়া পাঠকের চিত্তকে সম্পূর্ণ জয় করিয়া লইয়া মনের অজ্ঞাতসারে তাহাকে মঙ্গলের আলোকে লইয়া চলিবে।

এইখানে কথা উঠিতে পারে, এই সৌন্দর্য এবং রসমাধুর্য দিয়া সাহিত্য আমাদিগকে মঙ্গলের পথে লইতে যাইবে কেন,—সৌন্দর্য এবং রস-মাধুর্যকেই কি সাহিত্যের পরম সার্থকতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না? নতুবা সাহিত্যের ভিতরে সৌন্দর্য এবং রস-মাধুর্য যেন অনেকখানিই গৌণ হইয়া যায়,—তাহারা যেন আপনাতে আপনারা কিছুই নহে,—একটি মঙ্গলময় উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়-স্বরূপেই যেন তাহাদের সকল মূল্য। এ-কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এই যে আমাদের মনের মধ্যে শ্রেয়োবোধ ইহা যদি চিরাচরিত সংস্কারমাত্র না হইয়া আমাদের অন্তরের ভূমিতে অন্তরের আলো-হাওয়া এবং রসসম্ভার লইয়া ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়া থাকে, তবে সে আমাদের সকল বোধের শ্রেষ্ঠ, এবং আমাদের সকল মানসিক বৃত্তি এবং বিকাশের ভিতরে সে তাহার ছাপ রাখিয়া দিবেই। এ-কথার আভাস আমি পূর্বেই দিতে চেষ্টা করিয়াছি যে আজকাল আমরা আমাদের যে-সকল সাহিত্য-সৃষ্টিকে এই মঙ্গলবোধের বালাই হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে আপন গৌরবেই সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছি, একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব যে সেখানেও আমাদের শ্রেয়োবোধ লুপ্ত হয় নাই। সকল আর্টের সৃষ্টি জড়াইয়া একটা কিছু কথা বলা হইয়াছেই,—এবং সেই কথাটির ভিতরেই সূক্ষ্মভাবে মিশিয়া আছে আমাদের শ্রেয়োবোধ। তবে আমাদের শ্রেয়োবোধটি কোনও একটি চিরন্তন স্থবির পদার্থ নহে; কালের পক্ষ বিস্তার করিয়া সেও মানুষের জীবনধারার সহিতই ছুটিয়া চলিয়াছে। এই নিরন্তর পরিবর্তনের ভিতরে জীবনের অনেক ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা সম্বন্ধেই আমাদের শ্রেয়োবোধ হয়ত প্রায় সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে, বাল্মীকির এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িয়া হয়ত বুঝিয়াছিলাম,—রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন তু রাবণাদিবৎ; মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' পড়িয়া হয়ত বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি যে রাবণাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন তু রামাদিবৎ,—কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্য হইতে যে শ্রেয়োবোধের কথা লোপ পাইতে বসিয়াছে তাহা নহে। বস্তুত আজকাল আমাদের সাহিত্য-রচনায় প্রচলিত

সমাজ ও নীতির বিরুদ্ধে আমরা সচরাচর যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া থাকি, তাহা যে শুধু আর্টের মুখ চাহিয়াই তাহা নহে,—তাহার পশ্চাতেও অনেকখানি রহিয়াছে আমাদের শ্রেয়োবোধের তাগিদ। মঙ্গলের প্রচলিত আদর্শ হইতে আমাদের মঙ্গলের অত্যাধুনিক আদর্শ অনেক ক্ষেত্রেই পৃথক্, এবং পৃথক্ বলিয়াই আমরা সাহিত্যের মারফতে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমাদের সেই নব্য শ্রেয়োবোধটিকে পাঠকসমাজে পেশ করিতেছি। সত্যকার ব্যাপার এই, ইহার ভিতরে আমাদের চিরাচরিত সংস্কারে যেখানে আঘাত লাগিয়া অশ্লীলতা-দোষ উৎপন্ন হইতেছে আধুনিকতা-বাদীদের মনের বিচারে তাহা ততখানি অশ্লীল নহে, এবং তাঁহাদের শ্রেয়োবোধের নিকট তাহা সত্যকার অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট নহে; অথচ এই সরল সত্যটিকেই আমরা চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছি আর্টের নানা কৈবল্য রূপের লক্ষণ ফাঁদিয়া।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এ-কথাও অস্বীকার করা যায় না যে তাঁহার সাহিত্যের উপদেশ সর্বদাই কান্তাসম্মিত নহে। তিনি স্থানে স্থানে প্রকাশ্যে প্রভুসম্মিত এবং সুহৃৎসম্মিত অনেক কথাও বলিয়াছেন,—এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে আর্টের তরফ হইতে আমাদের সত্যকার আপত্তি। তাঁহার সৃষ্ট উপন্যাসের ঘটনাস্রোতের মধ্যে যবনিকান্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তিনি স্বমুখে অনেক উপদেশ দিয়াছেন,—যেখানেই এইরূপ হইয়াছে সেইখানেই আর আমাদের মন সায় দিতে পারে না। যেখানে যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র যবনিকান্তরাল হইতে বাহির হইয়া নিজেকেই পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, সেইখানেই যে ইহার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল তাহাও মনে হয় না। 'বিষবৃক্ষে'র উপসংহারে লেখক যখন যবনিকান্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন,—"আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।"—তখন মনে হয়, এই জাতীয় পুরাণ-মাহাত্ম্যের ন্যায় বিষবৃক্ষ-মাহাত্ম্য বর্ণনের বেশ কোনও প্রয়োজন ছিল না। 'বিষবৃক্ষে'র এ ফলশ্রুতি মিলিয়া আছে সমগ্র ঘটনার প্রবাহে এবং পরিণতিতে, সকল চরিত্রাঙ্কনে—তাহাদের জীবনের জীবন্ত বেদে; সেই কান্তাসম্মিত বচনকে আবার প্রকাশ্যে প্রভুসম্মিত বা সুহৃৎসম্মিত করিয়া তুলিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। এইখানে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সীমা একটু লঙ্ঘন করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। বয়োবৃদ্ধির সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের এই শাসক বা প্রকাশ্য প্রচারক বা সংস্কারক রূপটি ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। 'রাজসিংহে'র ভূমিকায় তিনি স্পষ্টই বলিয়া লইয়াছেন যে, প্রাচীন হিন্দুগণ যে শৌর্যে-বীর্যে কোন জাতি অপেক্ষাই হীন ছিল না তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্তই তিনি রাজসিংহ রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার 'দেবীচৌধুরাণী' কোঁতের পজিটিভিজ্ম্ ও গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শে জাত অনুশীলন-ধর্ম প্রচারেরই যেন অনেকখানি অবলম্বন মাত্র; তাঁহার 'সীতারাম' গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শকে ললাট-টীকা করিয়াই আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, এ সকল স্থলে বঙ্কিমচন্দ্রও খুব সম্ভব বুঝিতে পারিতেছিলেন যে তিনি আর্টের ক্ষেত্রে ক্রমেই সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন এবং এই জন্তই বোধ হয় 'সীতারাম' রচনার পরে তিনি আর সৃষ্টিকার্যে হাত দেন নাই।

কিন্তু শেষ বয়সের লিখিত উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে আমাদের এই অভিযোগ এবং সমালোচনা প্রযোজ্য হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বয়সের লিখিত উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে এই জাতীয় অভিযোগ এবং সমালোচনা বিশেষ প্রযোজ্য নহে। যদিও আমরা দেখিতে পাই যে এ সকল উপন্যাসেও স্থানে স্থানে তিনি যবনিকান্তরাল হইতে নিজ মূর্তিতেই বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছেন, তথাপি এ-কথা বলা যাইতে পারে যে সাহিত্যের দিক হইতে বিচার করিলে এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের আর্ট আদর্শবাদের দ্বারা খুব বেশী ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আলোচনার সুবিধার জন্ম বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র কথাই ধরা যাক্। বঙ্কিমচন্দ্রের এই তিনখানি উপন্যাস সম্বন্ধেই এই অভিযোগ শুনা যায় যে, আদর্শবাদই এখানকার ঘটনাগুলিকে পরিণতি দান করিয়াছে, আর্টের স্বচ্ছন্দ গতি নহে। 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিমচন্দ্র দাম্পত্য জীবনের পবিত্র আদর্শ স্থাপনের জন্ম কুন্দকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছেন,—

'চন্দ্রশেখরে' এই সামাজিক মঙ্গলের অনুরোধেই তিনি প্রতাপকে মারিয়াছেন,—সমাজের সম্মুখে পবিত্র প্রেমের আদর্শ স্থাপন করিতেই কলঙ্কিনী রোহিণীকে গুলি করিয়া মারিয়াছেন। সমাজ ইহাকে যতই হাসিমুখে বরণ করিয়া লউক না কেন,—আর্টের পক্ষে এতখানি দৌরাত্ম্য একেবারে অসহ্য!

কিন্তু আমার মনে হয়, আদর্শের দিকে লক্ষ্য না রাখিলে এই উপন্যাসগুলির ঘটনা-প্রবাহ অন্য দিকে বহিতে পারিত বটে; কিন্তু সে স্রোত অন্য দিকে না বহিয়া আদর্শের অনুরোধে যেদিকে বহিয়াছে তাহাতে আর্টের প্রাণবস্তুটি সর্বত্রই পিষিয়া মরিয়া যায় নাই। এই আদর্শবাদ সত্ত্বেও যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আর্টকে অনেকখানিই বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহার একমাত্র কারণ যে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরের ভিতরে বাস করিতেন সত্যকারের কবি—সত্যকারের একটি দরদী এবং রসিক শিল্পী। এই কবিচিত্তের গভীর পরিচয় মহামানবের সহিত একাত্মবোধে, অসীম প্রেমে, নিবিড় সহানুভূতিতে। কবির মুক্তপ্রাণের স্পন্দনে বিশ্বসৃষ্টি ধরা দেয় তাহার স্বাধীন স্বচ্ছন্দ রূপে,—কবির সহিত এ-বিশ্বসৃষ্টির যোগ এই স্বাধীন প্রাণের খেলাতেই। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এই জাতীয় একজন মহাকবি—অন্তরে তাঁহার দরদ ছিল অতলস্পর্শী। মানুষের বাঁধা-ধরা সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ-জীবনের সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া তিনি দেখিতে পারিয়াছিলেন, হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন—এই সংসারের আইনকানুনের নীচে কত অসহায় নিরীহ প্রাণ নিয়ত পিষিয়া মরিতেছে। আমরা যাহাকে তাহার পাপ বলিয়া তাহাকে অভিশপ্ত করিয়া রাখিয়াছি, সে নিজে তাহার কতটুকুর জন্য সত্যকার দায়ী? আমাদের পাপের ফল আমাদিগকে কড়ায়-ক্রান্তিতে ভোগ না করিলে চলিবে না; কিন্তু তাহার কতটুকুর উপর আমার সত্যকার হাত রহিয়াছে? যৌবনের প্রেম-মধু বুকে চাপিয়া ঐ যে বর্ণে গন্ধে 'অনবদ্য হইয়া শুভ্র শীতল কুন্দ ফুলটির'* ন্যায় কুন্দনন্দিনী ধরণীর এক প্রান্তে ফুটিয়া উঠিল, সে যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট কবিচিত্তটিকে একেবারে মথিত করিয়া দিল। কুন্দ ধীরে ধীরে নগেন্দ্রকে ভালবাসিল,—কুন্দের কতটুকু অপরাধ? বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রেমকে হৃদয়হীন শাসকের নিষ্ঠুর পীড়নে পদদলিত করিতে পারেন নাই, ধরণীর একটি কানন-প্রান্তে আপনা-আপনি ফুটিয়া-উঠা একটি কুন্দকুসুমের বুকের মধুসৌরভের মতই কুন্দের প্রেম বঙ্কিমচন্দ্রকে বিহ্বল করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু হায়! অসহায় মানুষ—এ ফুল ঝরিয়া পড়ে অনাদরে, উপেক্ষায়, শত লাঞ্ছনায় অপমানে। বঙ্কিমচন্দ্রও কুন্দকে অকালে ঝরাইয়াছেন—কিন্তু চোখের জল মুছিতে মুছিতে, বেদনা-ব্যথিত হৃদয়ের অস্ফুট দীর্ঘনিশ্বাসে! এই যে মানুষের জীবনের সত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, নিবিড় দরদবোধ, অসীম করুণা,—এইখানেই ত কবিচিত্তের গভীর পরিচয়! বঙ্কিম কুন্দকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছেন,—ইহা কুন্দের প্রেমের শাস্তি নহে—প্রেমের পুরস্কার। সূর্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের মিলন তিনি ঘটাইয়াছিলেন অবশ্য দাম্পত্য-প্রেমের আদর্শকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে; কিন্তু কুন্দকে তিনি মারিয়াছিলেন তাহার প্রেমকে বৃহত্তর লাঞ্ছনা ও অপমানের হাত হইতে মুক্তি দিবার জন্য। মৃত্যুর ভিতর দিয়াই কুন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতি অধিকার করিয়া গেল অনেক বেশী। কুন্দের মৃত্যুতে আমাদের রসিক-চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠে না এই জন্য যে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে তাঁহার আদর্শ দ্বারা মানুষের জীবনকে, তাহার সত্যকে অস্বীকার করেন নাই, অবমাননা করেন নাই,—বরঞ্চ জীবনের এই সত্যকে তিনি সমগ্র হৃদয় দিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহার বৈচিত্র্যে এবং সূক্ষ্ম সৌকুমার্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। জীবনের যে-আদর্শ আমাদের সত্যকার জীবনকে পদে পদে অস্বীকার করে সে-আদর্শ জীবনের একটা কেন্দ্রীভূত লাঞ্ছনা মাত্র। সংসারের স্রোত কুন্দের জন্য যত লাঞ্ছনা এবং অপমানই বহিয়া আনুক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্র যে কুন্দকে ঘৃণায় ঠেলিয়া ফেলিতে পারেন নাই—লোকজগতের অন্তরালে যে তিনি কুন্দের জন্য অন্তরে একটি করুণ কোমল স্থান বিছাইয়া দিয়াছিলেন—এই সহৃদয়তা, এই মহানুভবতা দ্বারাই বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের চিত্ত জয় করিয়া লইয়াছিলেন। এই যে ব্যষ্টি এবং বিশিষ্ট সমাজের

সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া একটা মহামানবতার দৃষ্টি—এইখানেই তাঁহার মহত্ব। দেশকালভেদে বিশেষ বিশেষ জাতি বা সমাজেরও যেমন একটা ধর্ম আছে, তেমনই এই সকল জাতি এবং সমাজের পশ্চাতে একটা মহামানবেরও প্রাণধর্ম রহিয়াছে,—তাই বঙ্কিমচন্দ্রের বাহিরে রহিয়াছে একটা সামাজিক বুদ্ধি, কিন্তু অন্তরে তাঁহার সেই মানবতার প্রাণধর্ম। এই মানবতার দৃষ্টিতেই তিনি 'চন্দ্রশেখরে' প্রতাপ এবং শৈবলিনীর প্রেমকে প্রকাশ্যে স্পষ্টতঃ অভিশাপ দিতে পারেন নাই। শৈবলিনীর ভিতরে রহিয়াছে যে উদ্দাম প্রাণস্পন্দন,—তাহাকে ধারণ করিয়া রাখিবার, তাহার যথার্থ অবলম্বন হইয়া থাকিবার শক্তি সংসার-ভোলা, আত্ম-ভোলা গ্রন্থানুরাগী চন্দ্রশেখরের ছিল না,—সে পৌরুষ-বীর্য ছিল প্রতাপের। জল তাই তাহার স্বাভাবিক গতিতেই চলিয়াছে,—শৈবলিনী প্রতাপের অনুরক্ত হইয়াছে। এই অনুরাগ-সংঘটনেও বঙ্কিমের কত সূক্ষ্ম নৈপুণ্য,—প্রতাপ ও শৈবলিনীর শৈশব-স্মৃতির অরুণ-রাঙা পটভূমির উপরে—এ অনুরাগ কত মধুর, কত সার্থক! কিন্তু সংসার বহিয়া আনিল সে প্রেমের জন্য তীব্র অভিশাপ—জীবনে আসিল ব্যর্থ-নৈরাশ্য। প্রতাপ সমাজদ্রোহের প্রায়শ্চিত্ত করিল—সে মরিল; কিন্তু প্রতাপের কি সত্যই প্রায়শ্চিত্ত করিবার মত পাপ সঞ্চিত হইয়াছিল? কবি বঙ্কিম এ প্রশ্নের জবাবে নিরুত্তরে শুধু ভাবিয়াছেন,—নিষ্ঠুর সমাধান দেন নাই। মৃত্যুর পূর্বে প্রতাপ বলিল, "আমার মৃত্যু ভিন্ন ইহার উপায় নাই—এই জন্য মরিলাম। আপনি এই গুপ্ত তত্ত্ব শুনিলেন—আপনি জ্ঞানী, আপনি শাস্ত্রদর্শী, আপনি বলুন, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত? আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী?" রামানন্দ স্বামী এ-প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নাই; তিনি বলিলেন, "মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ,—শাস্ত্র এখানে মূক।" প্রতাপের এই প্রশ্ন শুধুই প্রতাপের ব্যক্তিগত প্রশ্ন নহে—এ প্রশ্ন এই বিশ্বের সম্মিলিত মানবাত্মার চিরন্তন প্রশ্ন—হৃদয়ভরা যে এত প্রেম তাহা যদি কোথাও দান করিয়া থাকি—সমাজের কাছে সেখানে অপরাধী হইলেও, জগদীশ্বরের কাছেও কি অপরাধী হইয়াছি? মানুষের নীতিজ্ঞান এখানে স্তব্ধ,—এক দিকে সমাজধর্ম, অন্য দিকে মানবধর্ম—বঙ্কিমচন্দ্র তাই নীরব হইয়া রহিলেন,—শুধু একটা মঙ্গলের উজ্জ্বল আলোকে প্রতাপের মৃত্যুকে মহীয়ান্ করিয়া তুলিলেন,—নিজে মঙ্গল-প্রদীপ হাতে করিয়া প্রতাপকে পথ দেখাইয়া বলিলেন,—'তবে যাও প্রতাপ, অনন্তধামে! যাও যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও! যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত—সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও!"

কিন্তু প্রতাপের বেলায় বঙ্কিমচন্দ্র যে কবি-হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন, শৈবলিনীর বেলায় সেই সহৃদয়তার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, অভাগিনী শৈবলিনীর প্রতি কবি অনেকখানি নিষ্ঠুর অবিচার করিয়াছেন। প্রতাপের যাহা শেষ-প্রশ্ন ছিল, শৈবলিনীর জীবনেও অনেকখানি সেই প্রশ্ন। সে যে অন্তরে অন্তরে সত্য সত্যই প্রতাপকে ভালবাসিয়াছিল, এজন্য সে সমাজের কাছে অপরাধী সন্দেহ নাই, কিন্তু জগদীশ্বরের পায়েও কি তাহার অপরাধ সমান? পূর্বেই দেখিয়াছি কবি বঙ্কিমচন্দ্র ঐ-প্রশ্নের উত্তরে নীরব রহিয়াছেন; কিন্তু তবে তিনি শৈবলিনীকে দিয়া এমন নিষ্ঠুর প্রায়শ্চিত্ত করাইলেন কেন? এখানে তাঁহার প্রাণ-ধর্ম সমাজধর্মের নিকটে যেন অতিমাত্রায় লাঞ্ছিত,—আমাদের হৃদয়েও তাই এইখানেই বেদনা এবং বিদ্রোহ। সমাজের বিরুদ্ধে শৈবলিনী যে অপরাধ করিয়াছিল, সমাজ তাহার শাস্তিবিধান করিয়াছিল। যে স্বভাবের হাতে ক্রীড়নক হইয়া শৈবলিনী স্বামী ছাড়িয়া প্রতাপের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল, সেই স্বভাবধর্মই তাহাকে পাগল করিয়া শাস্তি দিয়াছিল। এ-শাস্তির বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ নাই। কিন্তু লেখক যেখানে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে আনিয়া শৈবলিনীর আবার বার বৎসর কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিলেন, মনে হইল লেখক তখন সাহিত্যের পথ ছাড়িয়া স্মার্তপথ অবলম্বন করিয়াছেন।

আর একটি প্রকাণ্ড মতভেদ রহিয়াছে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীকে লইয়া। আমার মনে হয়, রোহিণীর

উপরে বঙ্কিমচন্দ্র তেমন কোনও অবিচার করেন নাই। অবশ্য, গোবিন্দলালের প্রমোদ-উদ্যানের মন্দির তুলিয়া সেখানে ভ্রমরের স্বর্ণ-প্রতিমা স্থাপন সাহিত্যের দিক হইতে একটু বাহুল্য মনে হয় বটে; কিন্তু ঘটনা-স্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহে কোথাও নীতির জোর-জবরদস্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। সৌন্দর্যের প্রতিমা বিধবা রোহিণী অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের বিদ্যুৎ চাপিয়া রাখিয়া হরলালকে বা গোবিন্দলালকে অবলম্বন করিয়া মনের নিভৃত কোণে যেদিন নূতন করিয়া ঘর-সংসার পাতিবার স্বপ্ন দেখিতেছিল, লেখক রোহিণীর মানস-গগনের সেই সপ্তরঙের ইন্দ্রধনুকে কোনও নিষ্ঠুর আঘাতে ভাঙিয়া ফেলেন নাই; কত করুণা—কত সহানুভূতি! যেদিন অশোকের শাখে বসন্তের কোকিল ডাকিয়াছিল 'কুহু', আর কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া সরোবরের সোপানে বসিয়া রোহিণী কাঁদিতে বসিল,—রোহিণীর সে অশ্রুবিন্দু বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়কেও সিক্ত করিয়াছিল। কিন্তু প্রসাদপুরের কুঠীতে গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে যে রোহিণীর মৃত্যু হইল, উহা নিতান্তই একটা ঘটনাবিশেষ—উহা রোহিণীর স্বৈরাচারের একটা আকস্মিক পরিণতি; সে একান্ত আকস্মিক হইলেও একান্ত অস্বাভাবিক নহে। কুন্দের মৃত্যু বা প্রতাপের মৃত্যুর ন্যায় রোহিণীর মৃত্যু আমাদের হৃদয়েও গভীর সহানুভূতি উদ্রেক করে না; কারণ কুন্দ বা প্রতাপের মত তাহার প্রেম নাই, মহিমা নাই। ঘটনার ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া যেদিন প্রকাশ পাইল যে গোবিন্দলাল রোহিণীর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে, গোবিন্দলালের জন্য তাহার আন্তরিক প্রেম নাই, রহিয়াছে শুধু উদগ্র ভোগবাসনা—যাহা হরলালকে দিয়া চরিতার্থ হইতে পারে, গোবিন্দলালকে দিয়া হইতে পারে, নিশাকরকে দিয়াও হইতে পারে—অন্য কাহার দ্বারাও হইতে পারিত। এই যে জীবনের সকল মাহাত্ম্যবর্জিত নিছক ভোগস্পৃহা, ইহার জন্যই রোহিণী পরিশেষে আর আমাদের সহানুভূতি উদ্রেক করিতে পারে নাই।

কোনও লেখকের সৃষ্টির ভিতরে এই জাতীয় সুবিচার বা অবিচার পরীক্ষা করিতে হইলে, তাহার একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, কোনও ঘটনার বা চরিত্রের পরিণতির ভিতরে একটা অনিবার্যতা—একটা অবশ্যম্ভাবিত্ব আছে কি না। কোনও একটি ঘটনা-স্রোতকে লেখক খেয়ালের বশে যখন ইচ্ছা তখনই, যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই, যে-ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবেই পরিণতি দান করিতে পারেন না,—সমগ্রের সহিত তাহার একটি অখণ্ড সঙ্গতি চাই—নতুবা পাঠক তাহাকে অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে না; তেমনই কোনও চরিত্রকে কোনও পরিণতি দান করিতে হইলে হেতু-প্রত্যয় যোগে তাহাকে তাহার সমগ্রের সহিত মিলাইয়া দিবে। গাছের শাখা-প্রশাখায় যে-ফুল, যে-ফল ভরিয়া উঠিবে তাহার বীজের ভিতরে সেই সম্ভাবনা চাই—তাহার ভূমির ভিতরে তাহার রস-সত্তা চাই—তাহার জল-বায়ু-আলোকের মধ্যে তাহার পোষকতা চাই। এই সকল হেতু-প্রত্যয়-যোগে যে-ঘটনা, যে-চরিত্র গড়িয়া উঠিবে তাহাই হইবে সত্য। এই সমগ্রতাকে অপেক্ষা না-করিয়া যে-কোনও ঘটনা খাপছাড়া ভাবে আপনার অস্তিত্বকে জাহির করিয়া বসিবে পাঠকের মনে সেই আনিবে বিদ্রোহ—সে-খাপছাড়া সৃষ্টির পশ্চাতে সুনীতিই থাক আর দুর্নীতিই থাক। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টির ভিতরে দেখিতে পাই, তিনি তাঁহার আদর্শকে অতি কৌশলে অতি নিপুণ ভাবে জীবনের সহজ স্রোতের সহিত অনেক স্থানেই অতি স্বাভাবিক ভাবে মিলাইয়া দিয়াছেন। যেখানে তিনি তাহা করিতে পারেন নাই, সেখানেই রহিয়াছে অসঙ্গতির বেদনা। কিন্তু এ-কাজ তাঁহার সৃষ্টির ভিতরে অনেক স্থানেই তিনি করিতে পারিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব—এইখানেই তাঁহার প্রতিভার অনন্যসাধারণত্ব!

কোনও সাহিত্যকে বিচার করিতে গেলে আমাদের আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ এই—সে তাহার ফলশ্রুতি দ্বারা আমাদের ব্যক্তি-জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমাকে মুছিয়া ফেলিয়া বিশ্ব-জীবনের সহিত আমাদের অন্তরের নিবিড় যোগ স্থাপন করিয়া দেয়। এই যে বিশ্ব-জীবনের সহিত একাত্মতা এবং তাহার ভিতর দিয়া অন্তরের অসীম প্রসার—সাহিত্যের ইহা অপেক্ষা আর পরম উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। অভিনব গুপ্ত তাঁহার রসের আলোচনায় বলিয়াছেন, রসের সিঞ্চনে আমাদের চিত্তের আবরণ ঘুচিয়া যায়। এই যে চিত্তের নিরাবরণ নিঃসীমতা, এইখানেই কাব্যকলার চরম সার্থকতা। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টির ভিতরেই আমরা প্রথম লাভ করিয়াছিলাম রসের আবেদনে চিত্তের প্রসার—ব্যক্তি-জীবনের পাষাণ-ঘেরা প্রাচীরের ভিতরে আসিয়াছিল অসীম মানব-প্রীতি—তাহার ভিতরেই আমরা প্রথম পাইয়াছিলাম মুক্তির নবতম আস্বাদ।

চৌকিদার

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ছিপছিপে লম্বা চেহারা, মাথায় বাবরী চুল, মুখে চোখে বেশ একটি নম্র ভাব, হাত ও বুকের পেশীগুলি বেশ সুপুষ্ট, প্রত্যেকটি পেশী দৃঢ় মোটা দড়ির মত চামড়ার অন্তরালে সুস্পষ্ট দেখা যায়; প্রেসিডেণ্ট-বাবুর লোকটাকে বেশ পছন্দ হইল। তিনি তবুও প্রশ্ন করিলেন—

—কি নাম বল্লি তোর?

হাতজোড় করিয়া বনোয়ারী বলিল, আজ্ঞে ব্যানো।

—ব্যানো? ব্যানো কি? ব্যানো কি মানুষের নাম হয়?

—আজ্ঞে হুজুর, বনোয়ারী বাগ্দী! বনোয়ারী আপন অজ্ঞতায় অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

প্রেসিডেণ্ট-বাবু বলিলেন, দেখ তুই পারবি তো? লোকজনের বাড়ীঘর জীবন সুদ্ধ পাহারার ভার তোর হাতে!

কথাটায় বনোয়ারী ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল; বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। কেমন একটা ভয় তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

বনোয়ারী জোড়হাতে প্রেসিডেণ্ট-বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, চোখের দৃষ্টি তাহার কেমন বিহ্বল, একটা শঙ্কিত ছায়া যেন সেখানে ঘনাইয়া উঠিয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট-বাবু আবার বলিলেন, দেখ পারবি তো?

উত্তর দিল নোটন চৌকিদার, তা পারবে বৈ কি বাবু, ভর্তি জোয়ান মরদ, বাগ্দীর ছেলে পারবে না আবার কেনে?

মাখন চৌকিদার সায় দিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ,—তা ছাড়া ব্যানোর আমাদের ক্যামতাও বেশ, লাঠিও ধরতে পারে, কাজ উ আজ্ঞে ভালই করবে।

প্রেসিডেণ্ট-বাবু আর প্রশ্ন করিলেন না, নীল রঙের কোর্তা, নীল রঙের পাগড়ি, ঝুলি ও পিতলের তকমা-আঁটা চামড়ার পেটি বনোয়ারীকে দিয়া তাহার হাতের টিপ লইয়া তাহাকে চিতুরা গ্রামের চৌকিদার নিযুক্ত করিয়া ফেলিলেন।

তার পর বলিলেন, থানায় হাজরে দিতে হবে তোকে সপ্তাহে দু-দিন, এখানে ইউনিয়ন বোর্ডে দু-দিন, বুঝলি? আর রাত্রে গাঁয়ে রোঁদ দিতে হবে রোজ দু-বার ক'রে। ঠিক বারোটা সাড়ে-বারোটার সময় একবার, আর একবার ভোরবেলায়—এই দুটো সময়েই মানুষের ঘুম চাপে, বুঝলি?

বনোয়ারী এতক্ষণে বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বোর্ড-অফিস হইতে বাহির হইয়া বনোয়ারী নীরবেই চলিয়াছিল। পুরাতন চৌকিদার কয়জন সদ্য-নিযুক্ত বনোয়ারীকে নানা উপদেশ দিয়া উপকৃত করিতে আরম্ভ করিল।

নোটন বলিল, হ্যাঁ, দু-বার ক'রে রোঁদ দিবি। ক্ষেপেছিস যেমন তুই—ওই শোবার আগে একবার হুই-হাই ক'রে হাঁক দিয়ে ঘরে এসে শুবি।

মাখন সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন লোক সে বলিল, এই দেখ, থানার কাজটি ভাল ক'রে করবি, দারোগা-বাবুর মন জুগিয়ে চলবি ব্যস্—কোনও মামু কিছু করতে লারবে। আর তোর সায়েব-সুবো এলে খাড়া হাজির থাকবি। চাকরি তোর মারে কে?

নোটন বলিল, বোর্ডের কেরানি-বাবু বলে, মাখন ঘরে শুয়ে জানলা থেকে হাঁক দেয়!—বলিয়া সে হিহি করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

মাখন এবার উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল, আর আগেকার 'পেসিডেন'-বাবু যে বলত, নোটা হাঁক দিতে

বেরোয় আর নোটার পরিবার নোটার পেছু পেছু যায় নোটাকে সাহস দিতে। সে মিছে কথা নাকি? উ করার চেয়ে জানলা থেকে হাঁক মারা ভাল।

নোটন কিন্তু রাগ করিল না, সে হাসিতে হাসিতে বলিল, তাও কি না দিতাম রে! দিতাম। একদিন জমাদার-বাবুর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। সেই হ'তে তো জমাদার-বাবু নাম দিয়ে দিলে 'পুরনো পাপী'! আমরা হলাম পুরনো পাপী।—বলিয়া সে আবার প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিল। মাখনও সে হাসিতে যোগ না দিয়া পারিল না।

বেহারী-ডোম নোটন ও মাখনের অপেক্ষা অল্পবয়সী, সে এবার বলিল, আমাদের ভীম কি কম নাকি, উ বাবা সবারই উপর টেক্কা দেয়। সেবারে পেসিডেন-বাবুর বাগান খুঁড়তে খুঁড়তে তলে তলে তিনটে গাছের শেকড় কেটে সেরে দিয়েছিল। বলবি, আর বাগান খুঁড়তে বলবি?

আবার একবার বর্দ্ধিত কৌতুকে হাসির উচ্ছ্বাসে জোয়ার ধরিয়া গেল। হাসির কলরোলের মধ্যেই গ্রামখানা পার হইয়া সকলে গ্রামের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইবার সব দল ভাঙিয়া আপন আপন গ্রামের পথ ধরিবে।

মাখন বলিল, লেগে তো গেলি মা কালী ব'লে! মাকে পুজো দিস পাঁচ আনা! আর আমাদিগকে এক হাঁড়ি মদ।

বনোয়ারী এইবার বলিল, সে আমি নিশ্চয় দোব! মাইনে যেদিন পাব সেই দিনই দোব।

নোটন বলিল, হ্যাঁ এই দেখ, সেক্রেটারী-বাবু বলবে, আমাকে কিছু দে। তুই 'দোব না' বলিস না, মুখে বলবি দোব, কিন্তু ফি মাসেই বলবি, আসছে-মাসে দোব। বুঝলি! আর আজ বিকেলেই থানাতে গিয়ে দারোগা-বাবুকে সেলাম দিয়ে আসবি। ডিম-টিম গণ্ডা দুই নিয়ে যাস বরং।

মাখন খুব গম্ভীরভাবে বলিল, আর একটি কথা শিখিয়ে দিই,—এই দরোগা-বাবুর কাছে গিয়ে পেসিডেন-বাবুর নিন্দে করবি, আর পেসিডেন-বাবুর কাছে দরোগা-বাবুর নিন্দে করবি। একে বলবি—উ ভারী বদলোক মাশায়, ওকে বলবি—উ ভারী বদনোক হুজুর! ব্যাস, দুজনাই তোকে ভালবাসবে।

বনোয়ারী একাই এবার মাঠের খাল-পথ ধরিয়া আপন গ্রামের দিকে চলিল। মনটা তাহার আজ কেমন হইয়া গেছে। মাসিক সাত টাকা বেতন, সরকার, তবুও আনন্দটা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে না।

রাত্রির অন্ধকারে চোর-ডাকাত কে কোথায় লুকাইয়া থাকিবে কে জানে? চোর-ডাকাতকেও পার আছে, তাহারা নিজেই হয়তো সম্মুখে আসিবে না, কিন্তু সাপ? হেঁড়োল—সেই নেকড়ে বাঘগুলা? ভাবিতে ভাবিতে বনোয়ারী আপন হাতের লাঠিটা সজোরে ধরিয়া শূন্যে আস্ফালন করিয়া আপন্ মনেই বলিয়া উঠিল, এক লাঠি বসাতে পেলে তো হয়! তাহার মনের শঙ্কিত অবসাদ যেন অনেকটা কাটিয়া গেল।

গ্রাম ঢুকিবার আগেই সে নূতন কোর্ত্তাটা গায়ে দিল, পাগড়িটা মাথায় বাঁধিল, তার পর কোমরে পেটী আঁটিয়া পদক্ষেপের মধ্যে বেশ একটু গুরুত্ব ফুটাইয়া গ্রামে প্রবেশ করিল। কোন প্রয়োজন ছিল না, এদিকে জলখাবার বেলাও গড়াইয়া গেছে, তবুও সে সমস্ত গ্রামটা একবার ঘুরিয়া তবে বাড়ী ফিরিল। তাহার স্ত্রী কমলি তখন বাহিরের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া রান্না করিতেছিল। বনোয়ারীর মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল—সেও কমলির দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিকৃত কণ্ঠে কহিল, ব্যানো কোথা গিয়েছে?

কমলি চকিত হইয়া ঘুরিয়া বক্তার দিকে চাহিল, তার পর আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া মৃদুস্বরে বলিল, দারোগা-বাবু না পেসিডেন-বাবুর বাড়ী গিয়েছে!

বনোয়ারী বলিল, দারোগা-বাবু হুকুম দিয়েছে, ঘর খানাতল্লাস করব আমি। দেখব চোরাই মাল-টাল আছে না কি?

কমলি এবার চমকিয়া উঠিল, অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে লোকটার দিকে সবিস্ময়ে এবং সভয়ে দৃষ্টিপাত না করিয়া পারিল না। পরক্ষণেই সে দাওয়ার উপর হইতে উঠানে একরূপ ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া বনোয়ারীকে

পিছন হইতে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল, আগে চোরকে দড়ি দিয়ে বাঁধি, দাঁড়াও!

বনোয়ারী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কমলি বলিল, হাসলে হবে না, কই নাও, ছাড়াও দেখি, দেখি কেমন চৌকিদার!

বনোয়ারী বলিল, ছাড়—ছাড়। হার মানছি আমি, ছাড়!

কমলি তবু ছাড়িল না, বলিল, না, তা বললে শুনব না, ছাড়াতে হবে। বনোয়ারী এবার শক্তি প্রয়োগ করিল, কিন্তু কমলির হাত দুখানা যেন লোহার শিকলের মত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। সে প্রাণপণে শক্তি প্রয়োগ করিয়া একটা ঝটকা মারিল। সঙ্গে সঙ্গে এবার কমলির হাতের বাঁধন খুলিয়া গেল, কমলি ছিটকাইয়া গিয়া উঠানের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। বনোয়ারী অপ্রতিভ এবং শঙ্কিত হইয়া ডাকিল, কমলি, কমলি।

কমলি হাসিতে হাসিতেই উঠিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, না বাপু, পারবে চৌকিদারী করতে!

তার পর আবার বলিল, পোষাক করে তোমাকে বেশ লাগছে কিন্তুক!

* * *

থানার দারোগা-বাবু পাকা লোক, এ্যাসিষ্টাণ্ট সাব-ইনস্পেক্টারিতে পনের বৎসর কাটাইয়া এখন অস্থায়ী ভাবে সাবইনস্পেক্টার হইয়াছেন—ভড়কালো গোঁফজোড়াটায় পাক ধরিয়াছে। তিনি বনোয়ারীর আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া বলিলেন, চুরি-টুরি করেছিস কখনও?

বনোয়ারীর মুখ শুকাইয়া গেল, বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল, তবুও সে কোনরূপে আত্মসম্বরণ করিয়া করজোড়ে বলিল, আজ্ঞে না, হুজুর।

দারোগা-বাবু ব্যঙ্গভরে বলিলেন, না হুজুর! তা হ'লে তুই চোর ধরবি কি ক'রে?

বনোয়ারী বিস্ময়ে হতবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, এ কথার উত্তর সে খুঁজিয়া পাইল না।

দারোগা-বাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, তুই বৈঠোর বিয়ে হয়েছে?

সলজ্জভাবে বনোয়ারী উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হুঁ! পরিবারকে ভালবাসিস কেমন?

এবার লজ্জায় বনোয়ারীর মাথাটা হেঁট হইয়া পড়িল, সে বিনা কারণে পায়ের বুড়া আঙুলটায় মোচড় দিতে আরম্ভ করিল।

দারোগা-বাবু অত্যন্ত কর্কশস্বরে ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, বলি, পরিবারকে একা ফেলে হাঁক দিতে বেরুবে, না ঘরে বসেই হাঁক মেরে মাইনে নেবে?

বনোয়ারী হাতজোড় করিয়া আবার বলিল, আজ্ঞে না।

—দেখিস!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হ্যাঁ। নইলে কিন্তু পিঠের চামড়া তুলে দোব তোমার। গারদ-ঘর দেখেছিস? গারদে পুরব বেটাকে!

এ কথার কোন জবাব বনোয়ারী দিল না, কাজ সে ভাল করিয়াই করিবে।

প্রেসিডেণ্ট-বাবুর কথা এখনও যেন তাহার কানের কাছে বাজিতেছে "লোকজনের জীবন সুদ্ধ পাহারার ভার তোর হাতে।"

দারোগা-বাবু বলিলেন, প্রেসিডেণ্ট-বাবুকে ক-টাকা দিলি চাকরির জন্যে?

বনোয়ারী আশ্চর্য্য হইয়া গেল—সে হাতজোড় করিয়া অসঙ্কোচে বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে না। তিনি হুজুর—।

সঙ্গে সঙ্গে মাখনের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল—"দারোগাবাবুর কাছে পেসিডেন-বাবুর নিন্দে করবি।" বক্তব্যটুকু আর শেষ করিতে তাহার আর সাহস হইল না।

—তবে কি? একটা পাঁঠা না কি?

—আজ্ঞে না!

—বাঃ বেটা, মিথ্যেবাদী! এই দেখ ওসব করলে চলবে না বাবা, চাকর তুমি থানার। পেসিডেণ্ট ফেসিডেণ্ট ভুয়ো, আজ আছে কাল নাই। তার পর অকস্মাৎ কঠোর স্বরে বলিলেন, আগে থানার কাজ, বুঝলি!

বনোয়ারী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে-কথা সে

বুঝিয়াছে। দারোগা-বাবু বলিলেন, হ্যাঁ। যা ছোটবাবুর কাছে গাঁয়ের দাগীদের নাম জেনে নে গিয়ে। আর রাত্রে, মানে লোকজন সব শোবার পর রাস্তায় যাকে দেখবি—তার নাম ধাম সকালে থানাতে জানাবি।

—আজ্ঞে দাগীদের ?

—ওরে বেটা, না। দাগীরা তো রাত্রে বেরুতেই পারে না। এ যে-কেউ হোক—ভদ্রলোক ছোটলোক সব।

* * *

জন্ম-মৃত্যুর হিসাবের খাতা, রোঁদ-দেওয়ার সার্টিফিকেট বই এবং দাগীদের নাম জানিয়া লইয়া বনোয়ারী বাড়ী ফিরিল। কমলি আজ ঘটা করিয়া সাজসজ্জা করিয়া বসিয়া আছে। বেশ যত্ন করিয়া সে চুল বাঁধিয়াছে, কালো কপালে রাঙা ডগডগে সিন্দুরের টিপ, তাহার উপর গাঢ় হলুদ রঙের একখানা নূতন রঙীন শাড়ী পরিয়া একখানা বস্তা পাতিয়া জাঁকজমক করিয়া বসিয়া আছে। বনোয়ারীকে দেখিয়াই সে ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। বনোয়ারীর এটুকু বড় ভাল লাগিল, সে রসিকতা করিয়া বলিল, ওরে বাবাঃ! চোখে যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না গো!

কমলি এতটা বুঝিতে পারিল না, সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল—তাড়াতাড়ি আসন ছাড়িয়া কাছে আসিয়া বলিল, কি হ'ল ? চোখে কুটো পড়ল বুঝি ?

বনোয়ারী অভিনয় করিয়াই আবার বলিল, না—না—ছটা ছটা!

—ছটা ? ছটা কি গো ? ছটা কোথা পেলে ?

বনোয়ারী এবার তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া আদর করিয়া বলিল, তোর রূপের ছটা গো। তোর রূপের ছটাতে চোখ আমার ঝলসে গেল।

আশ্চর্য্য! কমলি কিন্তু ইহাতেও রাগ করিল না—সে দুই হাতে স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, তা আমি কি 'যেনা-তেনা' লোক না কি ? চাকরি হ'ল তোমার, আমি সাজ করব না। ইয়েরই মধ্যে পাড়ার লোকে বলছে—থানদারের বৌ!

পরম পরিতৃপ্ত হইয়া বনোয়ারী বলিল, বলছে ?

—হ্যাঁ, দু-তিন জনা বলে গেল। নতুন কাপড় বেচতে এসেছিল, টাকা ছিল না—তা বাউড়ী দিদি নিজে থেকে টাকা ধার দিলে। হুঁ হুঁ, তোমার চেয়ে আমার খাতির বেশী।

বনোয়ারী চকিত হইয়া উঠিল, বলিল, টাকা ধার করলি ?

কমলি ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, ওঃ, মোটে তো 'ড্যারটি' টাকা ধার—তা সে তোমাকে লাগবে না বাপু!

বনোয়ারী বলিল, না, না—

কমলি কথা কাড়িয়া বলিয়া উঠিল, আর 'না-না' য়ে কাজ নাই তোমার। লোকে বললে—থানদারের বৌ হয়েছিস—তুই একখানা কাপড় নিবি না! তখন না নিলে আমার মানটি কোথা থাকত ?

বনোয়ারী এবার বলিল, তা বেশ করেছিস। কাপড়টিতে কিন্তুক মানিয়েছে তোকে বড় ভাল। আসছে মাসে আর একখানা কিনে দোব।

কমলি পরিতুষ্ট হইয়া বলিল, এবার কিন্তু লাল রঙের!

—তা বেশ। এখন রান্না চাপিয়ে দে দেখি সকাল করে। সন্ঝেতে খেয়ে নিয়েই এক ঘুম দিয়ে নোব। ঠিক দোপরের সময় উঠতে হবে হাঁক দিতে।...তুই একা থাকতে পারবি তো ঘরে ? ভয় লাগবে না ?

কমলি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তোমার রোঁদ দিতে বেরুতে ভয় লাগে তো আমি তোমাকে দাঁড়িয়ে আসব চল। ঘর তো ঘর, আমি বলে তিনখানা গাঁ পার হয়ে চলে যাই।

সে আজ কয় বৎসরের কথা—কমলি প্রথম শ্বশুর-বাড়ী আসিয়া একদিন রাত্রে উঠিয়া বাপের বাড়ী পলাইয়া গিয়াছিল। কমল তখন এগার বছরের মেয়ে।

কথাটা মনে পড়িয়া বনোয়ারীও হাসিল, হাসিয়া বলিল, তা বটে, তা তুমি পার।

কমলি শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, তা আর পারি না বাপু। কেমন ক'রে যে গিয়েছিলাম, ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয় আমার।

মাঝ-উঠানে দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বানোয়ারী বলিল, হ্যাঁ, রাত দোপর হয়েছে ; আকাশে হুই দেখ—মুনি ঋষি তারাগুলা ক্ষোথা গিয়েছে।

কমলি বলিল, রাতের সনসনানি দেখেছ ?

বনোয়ারী হাসিয়া বলিল, না, উটো তোর বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে।

কমল বলিল, যাঃ, বাতাসে বুঝি গাছের পাতা নড়ে ? রেতে গাছেরা জীবন পায় কি না—উ ওরা কথা কয়। গাছে পাতা নড়ে, তাতেই বাতাস দেয়।

কথাটা বনোয়ারীর মনে ধরিল, কিন্তু তাহা লইয়া কথা বলিবার অবসর ছিল না। তাহাকে রোঁদে বাহির হইতে হইবে। ক্ষণিকের জন্য নীরব থাকিয়া সে বলিল, লে—দুয়োর দে ভাল ক'রে—আমি এসে দু-তিন ডাক দোব—তবে দুয়োর খুলে দিবি। আচমকা এক ডাকেই যেন উঠে দুয়োর খুলিস না।

কমলি মৃদুস্বরে বলিল, এই দেখ, সাবধানে পথ দেখে চ'ল বাপু!

অল্পখানিকটা পথ চলিতেই বনোয়ারীর চোখের সম্মুখে অন্ধকার যেন ঈষৎ হাসিয়া উঠিল—পথঘাট বাড়ী-ঘর সবই চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল, পথের সাদা ধূলা, পাশের জমির ঘাসগুলি পর্য্যন্ত। দুই পাশের বাড়ীগুলি নিস্তব্ধ, দুয়ারগুলি সব বন্ধ, নিস্তব্ধ নিঝুম পুরীর মত বাড়ীগুলার দিকে চাহিয়া শরীর যেন কেমন ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠে! গাছগুলার পাতা-নড়া দেখিয়া মনে তবু সাহস জাগে। কমলি মিথ্যা বলে নাই—রাত্রে গাছে জীবন পায়। কোন মুনির শাপে ওরা আর কথা কহিতে পারে না, নতুবা আগে গাছেরা কথা কহিত, এখান হইতে ওখানে উড়িয়া চলিয়া যাইত, উহাদের নাকি পাখা—কে ? ও কে ?. ভটচাজদের প'ড়ো বাড়ীটার জঙ্গলের মধ্যে সাদা রঙের ওটা কি ?

বনোয়ারীর বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল—না, ওটা কারও গরু, রাত্রে পলাইয়া আসিয়াছে।

সে আশ্বস্ত হইয়া একটা হাঁক মারিল, এ, হৈঁ!—এ—!

রাত্রির অন্ধকারে কত যে উপদ্রব, শুধু কি মানুষ! ভূত-প্রেত-ডাকিনী-যোগিনী কত যে—! বনোয়ারী গ্রামের মাথার উপর দৃষ্টি তুলিয়া খুঁজিতেছিল—কোথায় বাড়ীর পুকুরে পাড়ের উপর শিমুলগাছটা!

কি ? কে ?

পাশেই কিসের একটা শব্দ শুনিয়া নীচে দৃষ্টি নামাইয়াই শিহরিয়া উঠিয়া বনোয়ারী দশ পা হটিয়া আসিল। অন্ধকারের মধ্যে ঘাসের উপর দিয়া সাদা মোটা দড়ির মত একটা কি চলিয়াছে। সাপ—'জাত' নিশ্চয়, এতটা মোটা গোখরো ছাড়া তো অন্য সাপ হয় না। বনোয়ারী লাঠিটা বাগাইয়া ধরিয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু সাঁপটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। বনোয়ারী সন্তর্পণে স্থানটা পার হইতে হইতে বলিল, যা বাবা, চলে যা। তোকে আমি কিছু বলি নাই—তুই যেন কিছু বলিস না।

রায়দের বাড়ীর কাছে আসিয়া পথের বাঁক ফিরিয়াই আবার বনোয়ারীকে থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল। একটি শ্বেতবস্ত্রাবৃতা স্ত্রী-মূর্ত্তি ওর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

বনোয়ারী প্রশ্ন করিল, কে ? কে গো আপুনি ?

স্ত্রী-মূর্ত্তি মাথার অবগুণ্ঠন আরও বাড়াইয়া দিয়া নীরবে আরও একটু সরিয়া দাঁড়াইল, যেন বনোয়ারীকে চলিয়া যাইতেই নির্দ্দেশ দিল।

বনোয়ারী দ্বিধায় পড়িল ; ভদ্রঘরের মেয়ে নিশ্চয় ; কিন্তু দারোগাবাবু যে বলিয়াছেন—যে কেউ হউক, রাত্রে পথে দেখিলেই তাহার পরিচয় জানিতেই হইবে! সে আবার প্রশ্ন করিল, কে গো আপুনি ?

এবার মৃদুস্বরে উত্তর আসিল, আমি বাবা রায়েদের। ওষুধ আনতে গিয়েছিলাম—ছেলের অসুখ।

বনোয়ারী সসম্ভ্রমে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। ওই অসহায় বিধবাটির জন্য করুণার আর সীমা রহিল না। এইবার সে চিনিয়াছে—মেয়েটি কে! দুইটি শিশু-সন্তান লইয়া অসহায়া বিধবাটির দুঃখের আর সীমা নাই।

এইবার এই পাড়াটা পার হইয়াই হাড়ীপাড়া। ওই পাড়াতেই তিন জন দাগী আছে। আঃ, এই কুকুরগুলাই

বড় জ্বালাতন করে। চোর কি চৌকিদার উহারা চিনিতে পারে না, মানুষ দেখিলেই বেটারা চীৎকার করিবে। কয়টা কুকুর চীৎকার করিতে করিতে বনোয়ারীর পিছন ধরিয়াছে। পাড়ার সীমা শেষ করিয়া বনোয়ারী আরও খানিকটা অগ্রসর হইলে তবে তাহারা ফিরিল।

আর চীৎকার করিতেছে ঝিঁঝিঁপোকাগুলা, উহাদের চীৎকারের আর বিরাম নাই! বনোয়ারী হাড়ী-পাড়ার নিশি হাড়ীর বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া হাঁকিল, নিশি—নিশি!

ঘরের ভিতর হইতে স্ত্রীকণ্ঠে উত্তর দিল, কে গো?

—আমি চৌকিদার—ব্যানো বাগ্দী। নিশি কই?

—অ, তুমি বুঝি নতুন থানদার হইছ; আহা, তা বেশ।

বনোয়ারী একটু খুশী হইল, হাসিমুখেই বলিল, তা নিশি কই! ডেকে দাও নিশিকে।

—আ বাপু, এমন জ্বর আইচে ব্যাভোল হয়ে পড়ে আছে মানুষ। তা ডাকি।…বলি ওগো, শুনছ! ওঠ একবার, ওই দেখ থানদার ডাকছে।

কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। নিশির স্ত্রী হতাশ হইয়া বলিল, না বাপু, এ কি করব আমি বল দেখি, মানুষের 'হাঁ'ও নাই 'না'ও নাই। গায়ে ধান দিলে খৈ হচ্ছে জ্বরে। হ্যাঁ গো থানদার, তুমি বাপু ওষুধ-টষুদ কিছু জান?

বনোয়ারীর মন সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। হতভাগিনী মেয়েটার অদৃষ্ট বটে! নিশি সারাজীবন উহাকে দুঃখই দিল। এক একবার নিশি জেল যায়, মেয়েটা পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। আবার এই রাত্রে ওই হতভাগার শিয়রে জাগিয়া বসিয়া আছে!

বনোয়ারী ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, মুখে চোখে জল দিয়ে বাতাস কর, করলেই হুঁস হবে।

বনোয়ারী ওই মেয়েটার কথা ভাবিতে ভাবিতেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইল।

আবার শেষরাত্রে রোঁদে বাহির হইয়া সে ডাকিল, বলি হাড়ী-বৌ, নিশি কেমন রয়েছে?

নিশির তখন বোধ হয় চেতনা হইয়াছে, কারণ হাড়ী-বৌয়ের বদলে সেই ক্ষীণস্বরে উত্তর দিল, না, এখনও ছাড়ে নাই, তবে কমেছে খানিক।

বনোয়ারী বলিল, কাল ডাক্তার দেখাস নিশি।

নিশি জবাব দিল, তুমি বুঝি নতুন থানদার হ'লে? তা বেশ! তা তামুক খাবে আগুন করব?

—না না। তোর জ্বর—থাকুক তামুক।

নিশি বলিল, তা হোক, করি কষ্ট ক'রে। আমারও ভারী মনে হচ্ছে খেতে।

নিশি গায়ে কাপড়চোপড় দিয়া বাহিরে আসিয়া বসিল।

নিশি লোক বড় ভাল—প্রাণখোলা লোক, এমন লোক যে কেমন করিয়া চোর হইল, কে জানে!

পরদিনই বেলা দশটার সময় একজন কনেষ্টবল আসিয়া হাজির হইল। বনোয়ারীকে ডাকিয়া লইয়া বলিল, চল, নিশিকে পাকড়নে হোগা। থানামে তলব আছে। দেবীপুরে চুরী হইয়েছে।

নিশি বলিল, আজ্ঞে মাশায় সারারাত কাল আমার বেধড়ক জ্বর, বিশ্বেস না হয়, শুধোন থানদারকে!

কনষ্টেবল হাসিয়া বলিল, হাঁ হাঁ, উ বাৎ দরোগা-বাবুকো পাশ বোল না। ডাগদার-লোক হ্যায়, উনি বেমার দেখে গা-দাওয়াই ভি বাতলায়ে গা। চল।

নিশির স্ত্রী তার পরে চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল।

নিশি দারোগা-বাবুকেও সেই এক কথাই বলিল, কাল সারারাত জ্বরে আমার চেতন ছিল না হুজুর শুধোন আপনার থানদারকে।

বনোয়ারীর অন্তর করুণায় আলোড়িত হইতেছিল, তাহার হৃদয়ের সত্য নির্ভয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়া নির্দোষকে লাঞ্ছনা হইতে ত্রাণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। নিশির কথা শেষ হইবামাত্রই সে আপনা হইতেই করজোড়ে বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, আমি পত্যক্ষ দেখেছি।

দারোগা-বাবু অকস্মাৎ বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন, ওরে হারামজাদা শূয়ার-কি-বাচ্চা, পত্যক্ষওয়ালা তোকে কে জিজ্ঞেসা ক'রেছে শুনি? কে তোকে কথা বলতে বলেছে?

সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে এমন দুর্দ্দান্ত রোষ বনোয়ারীর কল্পনাতীত, সে আতঙ্কে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, ভয়ে মুখ শুকাইয়া গেল। বিহ্বল দৃষ্টিতে সে দারোগা-বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দারোগা-বাবু আবার কৈফিয়ৎ দাবী করিলেন, এ্যাও শুয়ার-কি-বাচ্চা, কে তোকে কথা বলতে বলেছে?

বিহ্বল ভাবেই বনোয়ারী বলিল, আজ্ঞে—।

মাখন চৌকীদার আসিয়া তাহাকে ত্রাণ করিল। সে তাহাকে একটা ধাক্কা মারিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল, ভাগ বেটা, বেকুব কোথাকার? বড়লোকের কথার মাঝখানে তুই কথা বলিস কেনে? আবাঙ আনাড়ী, চল এখান থেকে সরে চল!

সরিয়া আসিয়া বনোয়ারী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, কিন্তু তাহার বুকের অস্বাভাবিক কম্পন তখনও শান্ত হয় নাই। মাখন বলিল, বেকুব কোথাকার, অমন ক'রে কথা কয়? এ হ'ল পুলিশের চাকরি; কানে শুনবি, চোখে দেখবি কিন্তুক মুখে ফ্রুকুরবি না। পেটকে করতে হবে লোহার সিন্দুক।

বনোয়ারী এবার অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিল, আমি কাল নিজে দেখেছিলাম কি না!

বাধা দিয়া মাখন বলিল, চোখে তো দেখছিস—ওই পথ দিয়ে কত নোক চলছে। কে চোর কে সাধু চিনতে পারিস? মানুষের পেট যেমন ময়লায় ভর্ত্তি মনেও তেমনি সবাই বাবা হুঁ-হুঁ, ও তোর নিশিকে দোষ দোব কি!—সবাই চোর। কার মনে পাপ নাই বল? রোঁদ দিতে দিতে আমার মন তো ভাই হাঁকপাক করে, আমরা নিলে তো আর।—সে হিহি করিয়া হাসিতে লাগিল।

বনোয়ারী শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বনোয়ারী তিরস্কৃত হইল সত্য, কিন্তু দারোগা-বাবু তাহার কথা উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, নিশিকে খানিকটা লাঞ্ছনা দিয়াই ছাড়িয়া দিলেন। নিশি ও বনোয়ারী এক সঙ্গেই বাড়ী ফিরিতেছিল, থানার গ্রাম পার হইয়াই নিশি হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল, অঃ, খুব এড়াইছি বাবা; কানের পাশ দিয়ে তীর ডেকে গেল। তুই না বললে নি-য়ে-ছি-ল আমাকে।—বলিয়াই সে কোঁচড় হইতে বিড়ি-দেশলাই বাহির করিয়া বলিল, লে বিড়ি খা। আর হনজে বেলাতে যাস, মদ খাওয়াব তোকে।

অত্যন্ত রূঢ় স্বরে বনোয়ারী বলিল, না।

নিশি নিজে বিড়িটা ধরাইয়া বলিল, তা বেশ, নোক-জানাজানি হবে। তার চেয়ে তোকে একটা টাকা দোব আমি। হিত করলে আমরাও ভুলি না রে!

বনোয়ারী এবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তা হ'লে কাল তোর জ্বরের কথা মিছে? বৌ তোর মিছে কথা বলেছে আমাকে?

নিশি হি-হি করিয়া হাসিয়া গেল, তারপর বলিল, যা, তাই ব'লে আয় দারোগা-বাবুকে, বকশিশ পাবা মোটা।

বনোয়ারী চুপ করিয়া গেল। নিশি পরম পুলকে বেতালে বেসুরে গান ধরিয়া ছিল—'যমুনাকে যাব কি সই ননদিনী পাহারা।'

বনোয়ারী মনের মধ্যে গুমরাইতে গুমরাইতে বাড়ী ফিরিল। কমলি তাহার মুখ দেখিয়া হাসিয়া বলিল, অঃ থানদার থানদার লাগছে বাপু—মুখ দেখেই ভয় লাগছে।

বনোয়ারী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, হুঁ।

এবার শঙ্কিত হইয়া কমলি বলিল, কি, হইছে কি গো?

বনোয়ারী বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া তামাক সাজিতে বসিল।

কমলি বলিল, সর—আমি সেজে দি।

বনোয়ারী বলিল, না।

* * *

অন্ধকার রাত্রে আমবাগানের ঘনপল্লবতলের গাঢ়তর অন্ধকারের নিঃশব্দে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—থানার জমাদার-বাবু, দফাদার ও বনোয়ারী। অল্প দূরেই নিশি হাড়ীর বাড়ী। কথাবার্ত্তা তেমন স্পষ্ট শোনা যায় না, কিন্তু বাড়ীর হাবভাব অনেকটা বুঝা যায়। নিশির বাড়ীতে বেশ একটি গোপন সমারোহ চলিতেছে। মাছ-ভাজার গন্ধে বনোয়ারীর জিভটা যেন সরস হইয়া

উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দমকা এক এক ঝলক মদের গন্ধও ভাসিয়া আসিতেছে। কখনও কখনও অস্ফুট গুঞ্জন স্পষ্ট হাস্যরোলে ফাটিয়া পড়িতেছে। উনানের আগুনের আলোয় বনোয়ারী বেশ দেখিতেছে নিশির—স্ত্রীর পরনে নূতন রঙীন শাড়ি।

জমাদার-বাবু অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিলেন, দেখলি বেটা হাঁদারাম বাগ্দী?

বনোয়ারী নতশিরে অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল। জমাদার-বাবু বলিলেন, আয় এখন। এ গাঁ সেরে আবার আমাকে দেবীপুর যেতে হবে।

অত্যন্ত সন্তর্পণে বাগান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তিনি আবার বলিলেন, এ রাতে আর নিশিকে ডাকবি না আজ—শেষ রাতে ডাকবি। যেন জানতে না পারে এসব আমরা দেখেছি। দিন দশেক পর বেটার ঘর খানাতল্লাস করব। বেটা নিশ্চিন্ত হয়ে মাল ঘরে আনুক।

আজ ঠিক মধ্যরাত্রি নয়, মধ্যরাত্রি হইতে খানিকটা বিলম্ব আছে। আজ সাপটার সঙ্গে দেখা হইল নির্দ্দিষ্ট স্থানটার খানিকটা আগেই সে ওই স্থান অভিমুখের চলিয়াছে। বনোয়ারী থমকিয়া দাঁড়াইল, পিছনে জমাদার-বাবুও দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, কি?

—সাপ।

হাতের টর্চ্চ জ্বালিয়া জমাদার শিহরিয়া বলিলেন, আরে বাপ! ভীষণ গোখরো।

—মার মার।

বনোয়ারী ইতস্তত করিয়া বলিল, আজ্ঞে, রোজই দেখা হয় আমার সঙ্গে, কিছু বলে না।

—কিছু বলে না! সাপকে বিশ্বাস আছে? মার মার! দফাদার ততক্ষণে একলাঠি বসাইয়া দিয়াছে। সাপটা ভীষণ গর্জ্জনে মাথা তুলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। এবার বনোয়ারীও আর দ্বিধা করিল না; উপর্য্যুপরি কয়েকবার ক্ষিপ্র কঠিন আঘাত করিয়া সাপটাকে তাহারা শেষ করিয়া দিল। পাশের প'ড়ো জমিতে সাপটাকে ফেলিয়া দিয়া আবার তাহারা অগ্রসর হইল।

জমাদার-বাবু বলিলেন, লাঠিটা ধুয়ে নিবি পুকুর পেলেই।

দফাদার বলিল, ওর বিষ বড় সাংঘাতিক!

—কে? কে? জমাদার-বাবুর হাতে টর্চ্চটার শিখা তীরের মত ছুটিয়া গিয়া একটা বাড়ীর দরজায় আবদ্ধ হইল। বনোয়ারী আপনার লাঠিটার দিকে চাহিয়াছিল—সে পলকে দৃষ্টি তুলিয়া দেখিল—রায়দের বাড়ীর দরজা দুই পাটি বন্ধ হইয়া যাইতেছে, তবুও শ্বেতবস্ত্রাবৃতা দীর্ঘ মূর্ত্তির একাংশ যেন সে বেশ দেখিল।

জমাদার-বাবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, স্ত্রীলোক।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বনোয়ারী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

জমাদার প্রশ্ন করিলেন, কার বাড়ী রে?

—আজ্ঞে রায়দের।

—হুঁ।...আচ্ছা, আয়।

তারপর চলিতে চলিতে অল্প হাসিয়া বলিলেন, সংসারে দোষ আর দেব কাকে? চোর-বদমাস সবাই। কেউ ভয়ে চুপ ক'রে থাকে—কেউ অসুবিধেয়। ও তুমি-আমি বাদ কেউ পড়ি না।

বনোয়ারী নতশিরে নীরবেই হাঁটিয়া চলিয়াছিল, জমাদার-বাবুর কথার সূত্র ধরিয়া কথা বলিল দফাদার, এই যে একটি ঠাঁই দেখছেন হুজুর, এই হ'ল বদলোকের এক চিরকেলে আড্ডা।

হাসিয়া জমাদার বলিলেন, অ, এইটাই সেই ভূতুড়ে শিমুলতলা বুঝি?

বনোয়ারী মাথা তুলিয়া দেখিল—বাড়ীর পুকুরের পাড়ের উপর প্রকাণ্ড শিমুলগাছটা অন্ধকারে দৈত্যের দাঁড়াইয়া মত আছে।

দফাদার বলিল, লাঠিগাছটা ধুয়ে নি আয় বনোয়ারী, মাঠের মধ্যে আর পুকুর পাব না আবার।

লাঠি ধুইয়া লইয়া বনোয়ারী এইবার ফিরিল। জমাদার-বাবু ও দফাদার দেবীপুরের পথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

বনোয়ারীর মনটা কেমন হইয়া গেছে! কেমন উদাস, অথচ কি যেন একটা চিন্তার পীড়নে পীড়িত। অকস্মাৎ সে পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া গেল।

আচ্ছা, সে চুরি করিলে কি হয়? কেউ তাহাকে

প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

৩৮শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড

কার্ত্তিক—চৈত্র

১৩৪৫

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

সন্দেহ করিবে না! সঙ্গে সঙ্গে বনোয়ারী শিহরিয়া উঠিল, দ্রুত পদক্ষেপে সে বাড়ীর দিকে একরূপ পলাইয়া আসিল। বাড়ীর অতি নিকটে আসিয়া তবে সে দাঁড়াইল। আঃ!

—কমলি!

কমলি জাগিয়াই ছিল, সে সাড়া দিল, যাই। বাবাঃ, ফিরে আসতে পারলে? গিয়েছ সেই কখন!

বনোয়ারী বিরক্ত হইয়া বলিল, তা জেগে ব'সে কি করছিস তু?

কমলি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, আমার একঘুম সারা হয়ে গেল, জেগে দেখলাম তুমি এখনও ফের নাই—সেই কখন গিয়েছ! একা মেয়েলোক আমি, ভয় লাগে না আমার?

এবার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বনোয়ারী বলিয়া উঠিল, এই দেখ ন্যাকামী করিস না বাপু—হ্যাঁ!

কমলি অবাক হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে সে অত্যন্ত রূঢ় আঘাত পাইয়াছিল, চোখ তাহার ছল ছল করিয়া উঠিল।

বনোয়ারী আপন মনেই গজগজ করিতে লাগিল, বলে—এগারো বছর বয়সে যে মেয়ে তিনখানা গাঁ পার হয়ে রেতে রেতে চলে যায়, তার আবার ভয় লাগে! হুঁঃ, যত সব হুঁঃ!

কমলি অভিমান করিয়া নীরবেই বিছানায় শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পর বনোয়ারী বলিল, কাল একবার রায়েদের বউ ঠাকরুণের কাছে যাবি তো! শুধিয়ে আসবি—এত রেতে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল কেনে? বলবি, জমাদার-বাবু শুধিয়েছে।

কমলি উত্তর দিল না। বনোয়ারী তিক্তস্বরেই আবার বলিল, শুনছিস?

কমলি মৃদুস্বরে বলিল, হুঁ।

* * *

অন্ধকার রাত্রি। বনোয়ারী অত্যন্ত সন্তর্পণে চোরের মত আসিয়া রায়েদের বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইল। দুয়ার বন্ধ—বনোয়ারী বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল, হ্যাঁ, ভিতর হইতে বন্ধই বটে! তবুও সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পাশের দেওয়ালের গায়ে একরূপ মিশিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভিতর হইতে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

বনোয়ারী একটু হাসিয়া আপন মনেই বলিল, ঠাকরুণ এইবার 'সতর' হইছে!

কমলি উত্তর আনিয়াছিল, কিন্তু সে বনোয়ারীর বিশ্বাস হয় নাই। ছেলের অসুখ না-হয় সত্য কিন্তু ছেলের ঘুম হয় নাই বলিয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া ছেলে-ঘুম-পাড়ান এ যে চালুনিতে সরিষা রাখার মতই একটা হাস্যকর অজুহাত!

রায়েদের বউ বলিয়াছিল, মা, ছোট ছেলেটির আমার গ্রহণী হয়েছে। রাতে পেটের যাতনা বাড়ে মা, ঘুমোয় না, কাঁদে, কত অনাছিষ্টি বায়না, কাল গরমে বলে—আমি পথের ওপর খেলা কবব! তাই নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। যে খাঁচার মত বাড়ী, পথে এসে কান্নাও থামল, বাতাস পেয়ে ঘুমিয়েও পড়ল।

কথাটা শুনিয়া বনোয়ারী হাসিয়াছিল, সে হাসি এমন অর্থপূর্ণ যে কমলির চোখেও অত্যন্ত কদর্য্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। সে একটু তিক্ত স্বরেই প্রশ্ন করিয়াছিল, হাসছ যে!

—হাসছি ঠাকরুণের কথা শুনে।

—না না, আমি নিজে দেখে এসেছি এই দশা ছেলের, বাঁচে এমন তো আমার মনে লেয় না।

—মরে তো ওই মায়ের পাপেই মরবে।

কমলি শিহরিয়া উঠিয়া বলিয়াছিল, এই দেখ, ওকথা বলো না। বামুন দেবতা—তার ওপর ঠাকরুণের মত নোক হয় না।

অকস্মাৎ মুখ ভ্যাংচাইয়া বনোয়ারী বলিয়াছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, আর বকিস না বাপু,—ঠাকরুণ ভাল, আমিও ভাল, নিশেও ভাল, নিশের বউও ভাল, সংসারে ভাল সবাই।

ধ্বনির উত্তরে প্রতিধ্বনির মতই কমলির মনেও কয়দিন হইতেই বেসুর জমিয়া উঠিতেছিল। এ কথার উত্তরে কমলি যেন অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া একটা তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছিল। বনোয়ারী প্রহার করিতেও ছাড়ে নাই।

কমলি বলিয়াছে, মুখে তোর পোকা পড়বে। ছাই সারকুড়ে ফেলে বলে আঙরা ফেলিস না। ঘরসুদ্ধ জলে যাবে।

কমলি আজ আসিবার সময় উঠে নাই পর্য্যন্ত। ঘরে ও বাহিরের দরজায় তাহাকে শিকল দিয়া আসিতে হইয়াছে। কমলির আগুনের কথাটা মনে করিয়া বনোয়ারী এই অন্ধকারের মধ্যেও তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল। সে নিজে তো চৌকিদার, সে যদি চুরি করে, তবে কে তাহাকে সন্দেহ করিবে?

এক জানিতে পারিত ওই গাছগুলা,—সমস্ত রাত্রি উহাদের ঘুম নাই! রাত্রে উহারা জীবন পায়—পাতা নাড়িয়া খস খস বুলিতে কি কথা যে বলে! উহারা সাক্ষ্য দিলে ঠিক কথা জানা যাইত! মনের কথা উহারাই বা কি করিয়া জানিবে!

অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে, গুমোট গরমে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে, গাছের পাতা অতি মৃদু ভাবে নড়িতেছে। তালগাছের পাতার শীষগুলি দেখিয়া শুধু বুঝা যায় যে গাছগুলা আজও কথা কহিতেছে! তালগাছের মাথার দিকে চাহিয়া বনোয়ারী একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিল, উঃ, আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেছে! হয়তো ঝড় উঠিবে, বৃষ্টি নামিবে। সে রোঁদ না সারিয়াই দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে ফিরিল।

কিন্তু নিশি হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয় আজ এই সুযোগে বাহির হইবে। এমনি রাত্রিই তো চোরের পক্ষে প্রশস্ত! শুধু চোর নয়, অন্ধকার ঘন হইলেই মানুষের মনের পাপ যেন সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া বাহির হইয়া আসে! সে আপনার বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িল।—ও কি? কে এক জন গলিপথে দ্রুত চলিয়া যায় নয়? আবছা দেখা যাইতেছে! হুঁ! একটা দারুণ সন্দেহে তাহার মন আলোড়িত হইয়া উঠিল। দ্রুততর গতিতে আপনার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দুয়ারে হাত দিল। এ কি—শিকল কেন? দারুণ উত্তেজনার মধ্যে তাহার সমস্ত গোলমাল হইয়া যাইতেছে। তাহার ফিরিতে দেরি আছে জানিয়া কমলিই তবে দুয়ারে শিকল দিয়া বাহির হইয়া গেল! চোখের সম্মুখে গলির ও-প্রান্তে তখনও কমলিকে দেখা যাইতেছে। ওই যাইতেছে।—বনোয়ারীর চোখ বাঘের মতই জ্বলিয়া উঠিল। সে শিকারী পশুর মত নিঃশব্দ ক্ষিপ্রগতিতে গলিপথটা পার হইয়া সদর রাস্তায় গিয়া পড়িল। ওই চলিয়াছে! গতি দেখিয়া মনে হয় বাড়ীর পুকুরের দিকেই কমলি চলিয়াছে! হুঁ—ভূত আছে—ভূত! শুধু ভূত নয়, প্রেতিনীও চলিয়াছে তাণ্ডবে মাতিতে। বনোয়ারী এবার সন্তর্পণে ছুটিতে আরম্ভ করিল। সদর রাস্তা হইতে আবার অলি-গলি ধরিয়া আসিয়া বনোয়ারী দেখিল—অনুমান তাহার সত্য; কমলি গাছের তলস্থ উন্মত্তের মতই ছুটিয়া চলিল। কিন্তু কি দ্রুতগতি কমলির! সে যেন বাতাসে ভর দিয়া চলিয়াছে!

উঃ!—একটা কাঁটা-গাছের গোড়ায় বনোয়ারী প্রচণ্ড ঠোক্কর খাইয়া সবেগে ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল—একটা সেয়া-কুলের গুল্মের উপর। সর্ব্বাঙ্গ কাঁটায় বিঁধিয়া গেল, তবুও সে প্রাণপণে উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কোনরূপে মাথা তুলিয়া দেখিল—কমলি নাই—মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে মাটি পর্য্যন্ত পৃথিবীর বুকজোড়া অন্ধকারের মধ্যে কমলি কোথায় হারাইয়া গেছে! এতক্ষণে তাহার চোখে জল আসিল, কমলি তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল! কমলি!

বাতাস তখন ঈষৎ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে—ভুতুড়ে শিমুলগাছটার পাতলা পাতাগুলি সশব্দে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে—যেন গাছটাই খল্ খল্ করিয়া হাসিতেছে।

ওদিকে প্রায় শেষ রাত্রে বনোয়ারীর বাড়ীর ধারে দাঁড়াইয়া কয়জন ভদ্রলোক ডাকিতেছিল—থানদার—থানদার! বনোয়ারী!

জানালা হইতে কমলি কাতর স্বরে বলিল, মাশায়, রোঁদে বেরিয়ে এখনও ফেরে নাই—কি যে হ'ল মানুষের! মেঘ আইছে—ঝড় উঠল!

তাহার কান্না পাইতেছিল, কিন্তু লজ্জায় সে কান্না কোনরূপে সে রোধ করিল।

সে কথার উত্তর কেহ দিল না, তবে বলিল, এলে পাঠিয়ে দিও। বাঁশ কাটতে হবে রায়েদের বৌয়ের ছেলেটি মারা গেছে!

কমলি আবার অনুনয় করিয়া বলিল, আজ্ঞে, আমাদের দুয়োরের শেকলটি খুলে দিয়ে যান মাশায়। শেকল দিয়ে গিয়েছে। কাউকে ডেকে দেখি—সে কোথা রইল!

* * *

পরদিনই বনোয়ারী কমলিকে পরিত্যাগ করিল।

কমলি শুধু একটি প্রশ্ন করিল—তুমি নিজে দোরে শেকল দিয়ে যাও নাই? মনে কর দেখি!

দৃঢ়স্বরে বনোয়ারী বলিল, না।

আশ্চর্য্য! সে-কথা তাহার কিছুতেই মনে পড়িল না। ভূত সে মানে না, ভ্রম সে বুঝে না। গত রাত্রির স্মৃতির মধ্যে শুধু সেই গাঢ় অন্ধকার আর সে অন্ধকারের মধ্যে কমলির আবছায়া মূর্ত্তি বাতাসে ভর দিয়া চলিয়া যাইতেছে! কখন সে শিকল দিল! আবার সে দৃঢ়স্বরে বলিল, না।

সেকালের বিবাহ

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমার প্রবন্ধের নাম শুনিয়াই হয়ত অনেকে বলিবেন—"বিবাহে আবার সেকাল-একাল কি? সেই বৈদিক মন্ত্র, সেই স্ত্রী-আচার, সেই বাসর, সেই কুশণ্ডিকা, সেই ফুলশয্যা—সেকালে যাহা ছিল, একালেও তাহাই আছে, তবে সেকালের বিবাহ নাম দিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিবার প্রয়োজন কি?"

প্রয়োজন আছে। কারণ, আমরা সেকালে, অর্থাৎ আমাদের বাল্যকালে বা যৌবনে, বিবাহের ক্রিয়াকর্ম্ম যেরূপ দেখিয়াছি, একালে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমার মনে হয় যে, আর পচিশ-ত্রিশ বৎসর পরে ভাবী তরুণ-তরুণীরা কল্পনাও করিতে পারিবেন না যে, তাঁহাদেরই পিতামহ প্রপিতামহের বিবাহ কিরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি, আমি যাহাকে 'সেকালের বিবাহ' বলিতেছি, তাহা কলিকাতা অঞ্চলে ও মফস্বলের অনেক শহরে সেকালের তালিকাভুক্ত হইলেও এখনও পল্লীগ্রামের বহু স্থানে 'একাল' হইয়াই আছে, অর্থাৎ আমরা পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বা শহর অঞ্চলে বিবাহের যে-সকল আচার-অনুষ্ঠান ও পদ্ধতি দেখিয়াছি, মফস্বলের বহু স্থানে তাহা এখনও বিদ্যমান আছে, সুতরাং সেই সকল গ্রামের অধিবাসীরা আমার এই প্রবন্ধে নূতন কিছু দেখিতে পাইবেন না; বরং তাঁহাদের জন্য "একালের বিবাহ" নাম দিয়া প্রবন্ধ লিখিলে হয়ত সেই প্রবন্ধে তাঁহারা অনেক নূতন বিষয় দেখিতে পাইবেন।

বিবাহে এমন অনেক আচার-অনুষ্ঠান আছে, যাহা সকল জেলায় সমান নহে। জেলাভেদে অনুষ্ঠানের পার্থক্য ত আছেই, অনেক আচার ও অনুষ্ঠান গ্রামভেদে, এমন কি পরিবারভেদে পৃথকরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আমি যখন 'হিতবাদী'তে কার্য্য করিতাম, সেই সময় আমার কোন পুত্রের বিবাহের পূর্ব্বে 'হিতবাদী'র ভূতপূর্ব্ব প্রুফ-রীডার, বিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত ধীরানন্দ কাব্যনিধি মহাশয়কে গাত্রহরিদ্রার জন্য একটা শুভদিন দেখিতে অনুরোধ করিলে 'হিতবাদী'র তদানীন্তন সম্পাদক পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিলেন, "বিবাহের পূর্ব্বে পৃথক একটা দিনে গাত্রহরিদ্রা আমাদের দেশে নাই, ওটা পশ্চিম-বঙ্গেই প্রচলিত দেখিতে পাই।" আমি বলিলাম—"কিন্তু পঞ্জিকাতে ত গাত্রহরিদ্রার দিন শুভকর্ম্মের তালিকায় লেখা থাকে।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "অধিকাংশ পঞ্জিকাই পশ্চিম-বঙ্গে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়, সেই জন্যই পশ্চিম-বঙ্গে প্রচলিত গাত্রহরিদ্রার দিনও পঞ্জিকাতে লিখিত হয়। আমাদের ত্রিপুরায়, বিবাহের পূর্ব্বে এক দিন 'অভিষেক' হয়, আপনাদের দেশে অভিষেক বলিয়া কিছু হয় না।" এইরূপ অনেক ব্যাপার, অনেক ক্ষেত্রে একই স্থানে এক পরিবারে অনুষ্ঠিত হয়, অন্য পরিবারে অনুষ্ঠিত হয় না। আমি পশ্চিম-বঙ্গ (হুগলী জেলা) নিবাসী নিকষ কুলীন সন্তান, সুতরাং আমার এই প্রবন্ধে পশ্চিম-বঙ্গের ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের কথাই অধিক থাকিবে।

সেকালে আমাদের ব্রাহ্মণ সমাজে, ঘটকের সাহায্য ব্যতীত কোন বিবাহই হইত না। অমৃতলাল বসুর বিবাহবিভ্রাট প্রহসনে ঘটক বলিতেছেন, "আমি ঘটক, প্রজাপতির পাখ্‌না।" অর্থাৎ পক্ষ না থাকিলে কোন পতঙ্গ যেরূপ অচল হইয়া থাকে, ঘটক না থাকিলে সেইরূপ বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রজাপতিও অচল অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। সেকালে অনেক দেশবিখ্যাত বড় বড় ঘটক ছিলেন, তাঁহাদের চতুষ্পাঠী থাকিত, সেই চতুষ্পাঠীতে ঘটকালি শিক্ষার্থী ছাত্র থাকিত। ঘটকেরা ব্রাহ্মণদিগের কুলের সংবাদ রাখিতেন বলিয়া, জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা

যেরূপ গ্রহাচার্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, ঘটকেরা সেইরূপ কুলাচার্য্য নামে খ্যাত ছিলেন। সেকালে অধিকাংশ ঘটকেরই "চূড়ামণি" উপাধি ছিল।

পাত্র বা পাত্রীর পিতা অথবা অভিভাবকেরা ঘটকের নিকটে গিয়া সংবাদ লইতেন যে, তাঁহাদের সমকক্ষ কৌলীন্যমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ কোথায় আছেন। যিনি সংবাদ লইতে যাইতেন, অগ্রে তিনি নিজের বংশ-পরিচয় ঘটকের নিকটে বর্ণনা করিতেন। সেই বর্ণনা শুনিয়া তবে ঘটক-মহাশয় তাঁহাকে বলিতেন যে, কোন্ গ্রামে তাঁহার সমকক্ষ ব্রাহ্মণ আছেন। একালে যাঁহারা ঘটকালি করেন, তাঁহারা পাত্র বা পাত্রীর সন্ধান বলিয়া দেন, সেকালের ঘটকেরা পাত্র-পাত্রীর সংবাদ বড় রাখিতেন না, তাঁহারা বলিয়া দিতেন—"অমুক স্থানে আপনার সমকক্ষ তিন-চারি ঘর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের কাহারও বিবাহযোগ্য পুত্রকন্যা আছে কি না, গিয়া সংবাদ লইতে পারেন।" ঘটকেরা এই সকল সংবাদ বিনা-পারিশ্রমিকে সরবরাহ করিতেন না, কিঞ্চিৎ দর্শনী লইতেন। তাঁহারা পাথেয় এবং পারিশ্রমিক পাইলে স্বয়ং গিয়া পাত্র-পাত্রীর সংবাদ লইয়া আসিতেন।

সেকালে কন্যাদায়গ্রস্ত কুলীন ব্রাহ্মণেরা পাত্রের বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ, স্বভাব, চরিত্র বা বয়স ও বিষয়সম্পত্তি অপেক্ষা কৌলীন্যমর্য্যাদাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য থাকিত, কৌলীন্যমর্য্যাদার প্রতি। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, চরিত্রে বা বিষয়সম্পত্তিতে হাজার উৎকৃষ্ট হইলেও যদি পাত্রের কৌলীন্যমর্য্যাদায় বিন্দু মাত্র কলঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে সে পাত্র কন্যাদায়গ্রস্ত কুলীনের নিকট অচল। তিনি যদি কোন সূত্রে জানিতে পারিতেন যে, তাঁহার মনোনীত পাত্রের পিতার, পিতামহর বা প্রপিতামহের ভগিনীর যে-পরিবারে বিবাহ হইয়াছিল, সেই পরিবারের "কেশরকুনি" বা "বীরভদ্রী" অথবা ঐরূপ কিছু একটা দোষ আছে, তাহা হইলে আর সেই পাত্রের সহিত বিবাহ হইত না। কারণ, রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণদিগের কন্যা-গত-কুল ; অর্থাৎ কন্যার যদি অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে বিবাহ হয়, তাহা হইলে সেই কন্যার পিতা এবং তাঁহার অধস্তন সন্তানসন্ততি সকলেই সেই নিম্নস্তরের দোষ প্রাপ্ত হন। সুতরাং পাত্রের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কাহারও কন্যা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে বিবাহিতা হইয়াছিলেন কি না, তাহা জানিবার জন্যই ঘটকের সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য্য ছিল। সেকালে কৌলীন্য-মর্য্যাদা থাকিলে অপর সমস্ত দোষ উপেক্ষিত হইত, তাহা স্বর্গীয় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় "লীলাবতী" নাটকে নদেরচাঁদের বিবাহ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। নদেরচাঁদ মূর্খ, অসভ্য, অশিক্ষিত, সকল প্রকার মাদক দ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত, হীনচরিত্র এবং অতি কদাকার, তথাপি এক জন ধনবান জমিদার তাঁহার একমাত্র কন্যা রূপে গুণে অতুলনীয়া লীলাবতীকে সেই নদেরচাঁদের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত, কারণ নদেরচাঁদ তাঁহার অপেক্ষা কুলে শ্রেষ্ঠ। আমরা শুনিয়াছি, আমাদের এক জন নিকষ কুলীন প্রতিবেশীর বাঁয়া-তবলা বাজাইবার খুব সখ ছিল, কিন্তু সে গণ্ডমূর্খ এবং মধ্যে মধ্যে চুরি করিয়া লাঞ্ছিতও হইয়াছিল। একবার সে কোন বিবাহে বরযাত্রী হইয়া গিয়াছিল ; সেখানে—কন্যা-কর্ত্তার বাড়ীতে, এক জোড়া খুব সুন্দর বাঁয়া-তবলা দেখিয়া সে লোভ সংবরণ করিতে পারিল না, চুরি করিল, কিন্তু শেষে ধরা পড়িয়াছিল। কন্যাপক্ষের কয়েক জন লোক যখন তাহাকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিবার পরামর্শ করিতেছিল, তখন কন্যাকর্ত্তা কোন সূত্রে জানিতে পারিলেন যে, সেই চোর নিকষ কুলীন, তখন তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, চোর যদি তাঁহার অন্য এক কন্যাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে তিনি আর পুলিস ডাকিয়া কোন গোলমাল করিতে দিবেন না। চোর জেলে যাওয়া অপেক্ষা বিবাহ করা শ্রেয়ঃ মনে করিয়া কন্যাকর্ত্তার প্রস্তাবে সম্মত হইলে কন্যাকর্ত্তা সেই রাত্রেই তাঁহার প্রথমা কন্যাকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পাত্রে এবং দ্বিতীয়া কন্যাকে সেই চোরের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বীয় বংশমর্য্যাদা উজ্জ্বল করিলেন। এইরূপ জানিয়া শুনিয়া, হীনচরিত্র, মূর্খ মদ্যপ কুলীনসন্তানকে জামাতৃপদে বরণ সেকালে বিরল ছিল না।

আমাদের পরিচিত এক জন কুলীন ব্রাহ্মণের দুইটি কন্যা ছিল, পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার কিছু জমিজমা

ছিল এবং সাত-আট হাজার টাকা নগদ ছিল। তিনি তাঁহার প্রথমা কন্যার সমান ঘরে অর্থাৎ কুলীনের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন, দ্বিতীয়া কন্যা অবিবাহিতা ছিল, তাহার জন্য তিনি পাত্র অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তাঁহার নগদ টাকা তিনি কোথায় লুকাইয়া রাখিতেন, তাহা তাঁহার পত্নী ব্যতীত আর কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কোনরূপে পিতার গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়া তাহা নিজ স্বামীকে বলিলে তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া সেই টাকা অপহরণ করিল। কয়েক দিন পরে সেই ব্রাহ্মণ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার সমস্ত নগদ টাকা তাঁহারই কন্যা ও জামাতার দ্বারা অপহৃত হইয়াছে। তখন তিনি জামাতার বাড়ীতে গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহার অবিবাহিতা কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, সেই জন্য তিনি তাঁহার টাকার কিয়দংশ জামাতার নিকট দাবি করিলেন। তাহা শুনিয়া তাঁহার জামাতা বলিল, "আপনার অবর্ত্তমানে আপনার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আপনার এই দুইটি কন্যাই পাইবে, তা আপনি যদি এক কাজ করেন, তাহা হইলে সকল গোলমাল মিটিয়া যায়। আপনার দ্বিতীয়া কন্যাকে আমার হস্তেই সম্প্রদান করুন; আমি যদি আপনার দুইটি কন্যাকে বিবাহ করি, তাহা হইলে আপনার সম্পত্তি লইয়া কাহারও সহিত ভাগ-বাঁটোয়ারা করিতে হইবে না, আপনিও কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইবেন।" শ্বশুরমহাশয় দেখিলেন, এই প্রস্তাব অতি সমীচীন; তিনি জামাতার প্রস্তাবে আনন্দ সহকারে সম্মত হইয়া তাহারই সহিত দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ দিলেন। সেই শ্বশুরমহাশয় অনেক দিন হইল লোকান্তরে—সম্ভবতঃ কৌলীন্যলোকে—গমন করিয়াছেন, আর তাঁহার জামাতা শ্বশুরের টাকা চুরি করিয়া এখন গ্রামের মধ্যে এক জন গণ্যমান্য মাতব্বর হইয়াছে।

এস্থলে একটা বিষয়ের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অনেকেরই ধারণা আছে যে, সেকালের নিকষ কুলীনেরা বহু বিবাহ করিতেন। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। বহু বিবাহকারীরা সকল পত্নীকে ও তাঁহাদের গর্ভজাত পুত্রকন্যাদিগের ভরণপোষণ করিতেন না, সাধারণতঃ তাঁহারা একটি বা দুটি পত্নীকে লইয়াই "ঘর" করিতেন; অনেকে কলহ বিবাদ ও পারিবারিক অশান্তির ভয়ে একাধিক পত্নীকে বাড়ীতে রাখিতেন না, কেহবা পর্য্যায়ক্রমে দুইটি বা তিনটি স্ত্রীকে বাড়ীতে রাখিতেন, অবশিষ্ট সকল পত্নীই চিরকাল পিতা বা ভ্রাতার সংসারে বিনা-বেতনে পাচিকা ও দাসীরূপে কালযাপন করিতেন। বৎসরের মধ্যে এক দিন বা দুই দিন যদি তাঁহারা পতিসেবার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের গর্ভে যে-সকল পুত্রকন্যা জন্মিত, তাহারা চিরকাল মাতুলালয়ে বাস করিত, মাতুলেরাই তাহাদের ভরণপোষণ, শিক্ষা এবং বিবাহের ভার লইতেন, ভাগিনেয়ীর বিবাহ মাতুলেরাই দিতেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণের কন্যাগত কুল অর্থাৎ কন্যা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কুলে বা 'দোষ'গ্রস্ত কুলে বিবাহিতা হইলে কন্যার পিতার এবং তাঁহার অধস্তন বংশাবলীর কুল চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত হইয়া যায়। সেই কারণে কুলীন ব্রাহ্মণেরা কন্যার বিবাহের সময়, যাহাতে নিজের কুলমর্য্যাদায় কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ না করে, সেজন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতেন। কোন কুলীন ব্রাহ্মণ যদি তাঁহার ভাগিনেয় বা দৌহিত্রীকে নিকৃষ্ট-বংশীয় পাত্রের হস্তে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের কুলের কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু কন্যার পিতার কুল নষ্ট হয়। ভাগিনেয়ী বা দৌহিত্রীর বিবাহকালে কন্যার মাতুল বা মাতামহ পাত্রের কুলশীলের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিতেন না, যাহাকে হউক পাত্রীকে সম্প্রদান করিয়া দায় হইতে উদ্ধার লাভ করিতেন। নিকষ কুলীনের সন্তান বহুবিবাহ করিলে পাছে তাঁহার কোন কন্যা নিকৃষ্ট ঘরে বিবাহিতা হইয়া তাঁহার কুল নষ্ট করে, সেই ভয়েই তাঁহারা বহুবিবাহ করিতে পারিতেন না। বহুবিবাহ করিতেন ভঙ্গ কুলীনেরা। তাঁহারা একবার অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ঘরে বিবাহ করাতে তাঁহাদের কুল ভঙ্গ হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের আর কুল ভাঙ্গিবার ভয় ছিল না, তাঁহারা যেখানে ইচ্ছা ও যত ইচ্ছা বিবাহ করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বহুবিবাহ" নামক পুস্তকে সেকালের বহুবিবাহ-কারীদের নামের একটি সুদীর্ঘ তালিকা আছে। ঘটক-মহাশয়দের মতে, সেই তালিকায় দুই-এক জন ব্যতীত

কোন নিকষ কুলীনের নাম নাই। যে দুই-এক জনের নাম আছে, তাঁহারাও তিনটি বা চারিটির অধিক বিবাহ করেন নাই।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, যাঁহাদের কুল ভাঙ্গিয়াছে অর্থাৎ ভঙ্গ কুলীনগণের মধ্যে সেকালে অবাধে বিবাহ হইত; কিন্তু তাহা নহে। যিনি নিম্নস্তরে বিবাহ করিয়া কুল ভঙ্গ করিতেন, লোকে তাঁহাকে বলিত "স্বকৃত ভঙ্গ"। তাঁহার পুত্র "দুই পুরুষে", পৌত্র "তিন পুরুষে", প্রপৌত্র "চার পুরুষে" নামে অভিহিত হইতেন। এইরূপে সাত পুরুষ হইয়া গেলে "বংশজ" অভিধানে অভিহিত করা হইত। যিনি "তিন পুরুষে" তিনি নিজ কন্যার বিবাহের জন্য "দুই পুরুষে" পাত্রের সন্ধান করিতেন, সহজে "চার পুরুষে" বা "পাঁচ পুরুষে" পাত্রে কন্যাদান করিতে সম্মত হইতেন না। সুতরাং কুল ভাঙ্গিলেই যে কৌলীন্যের জঞ্জাল মিটিয়া যাইত, তাহা নহে। তাহার উপর কুলীন ব্রাহ্মণগণ "ফুলিয়া" "খড়দহ" "বল্লভী" "সর্ব্বানন্দী" প্রভৃতি নানা "মেলে" বিভক্ত, তন্মধ্যে ঘটকদিগের মতে উল্লিখিত চারিটি মেলই শ্রেষ্ঠ। এক মেলের ব্রাহ্মণ অন্য মেলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে সম্মত হইতেন না। ভঙ্গ কুলীনেরাও কিছুতেই "মেলান্তর" হইতে সম্মত হইতেন না। ঘটকদিগের মতে—"ফুলিয়া খড়দহ নাস্তি বিশেষ" অর্থাৎ ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য না-থাকাতে পশ্চিম-বঙ্গের অনেক স্থানে ঐ দুই মেলের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। শুনিয়াছি পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও কেহ মেলান্তর স্বীকার করেন না।

ব্রাহ্মণের বিবাহে, সেকালে ঠিকুজি কোষ্ঠীর কথা প্রায় উঠিত না, কারণ এই কুলশীলের হাঙ্গামার পর যদি বা একটি পাত্রী বা পাত্র পাওয়া যাইত, তাহাদের কোষ্ঠী বিচার করিতে গেলে আর বিবাহ দেওয়া চলিত না। অনেক সময় বিবাহের "শুভদিন" পর্য্যন্ত দেখা হইত না, পাত্র মনোনীত হইলে কন্যার পিতা অনেক সময় যে-কোন দিনে কন্যার বিবাহ দিতেন। আমরা বাল্যকালে আমাদের পাড়ায় এক বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা দেখিয়াছি। শুনিয়াছি, তাঁহাদের বিবাহ নাকি ভাদ্র মাসের অমাবস্যাতে হইয়াছিল, অথচ ভাদ্র মাসে বিবাহ বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে নিষিদ্ধ। সেকালের অনেক ব্রাহ্মণই এইরূপ "মাকড় মারলে ধোকড় হয়" নীতি অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

একটা বিষয়ে সেকালের বিবাহ একালে আদর্শস্থানীয় হইতে পারে। সেকালে কোন কন্যার পিতাকেই অর্থাভাবের জন্য "কন্যাদায়গ্রস্ত" হইতে হইত না। কোন পাত্রের পিতাই পুত্রের বিবাহকালে কন্যার পিতার গলায় ছুরি দিতেন না। সেকালের ধনশালী ব্রাহ্মণেরা কন্যার বিবাহে যে যৌতুক ও বরাভরণ দিতেন, একালে সেরূপ ব্যবস্থা হইলে অতি দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিও বাঁচিয়া যান। কুলীনের সন্তান, বিবাহকালে কন্যার পিতার নিকটে কৌলীন্যমর্য্যাদাস্বরূপ মাত্র ষোল টাকা দাবি করিতে পারিতেন, ইহার অধিক দাবি তিনি করিতে পারিতেন না। এই কৌলীন্যমর্য্যাদার ষোল টাকা এখন ষোল শতে পরিণত হইয়াছে। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, মধ্যবিত্তশালী ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহে, বরাভরণ, অলঙ্কার, দানসামগ্রী প্রভৃতিতে মোট দেড় শত বা দুই শত টাকা ব্যয় হইত। এখন সেইরূপ মধ্যবিত্ত কোন ব্রাহ্মণ যদি দুই হাজার টাকা ব্যয় করিয়া কন্যার বিবাহ দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করেন। গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বরের মূল্য যেরূপ দ্রুত চড়িয়া গিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বরের এই মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ভোজ উপলক্ষ্যে অর্থব্যয় বিস্ময়কর রূপে বাড়িয়া গিয়াছে। সেকালে—যে সময় আমাদের বিবাহ হইয়াছিল, সে সময় "পাকা দেখা" বলিয়া কিছু ছিল না। বিবাহের পূর্ব্বে এক দিন কন্যার পিতা বরকে এবং অন্য এক দিন বরের পিতা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইতেন। প্রথমে ধান, দূর্ব্বা ও চন্দন দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিয়া পরে রৌপ্যমুদ্রা বা ধনবান হইলে স্বর্ণমুদ্রা দিয়া আশীর্ব্বাদ করা হইত। আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য কন্যাকর্ত্তা বা বরকর্ত্তা একাকী না গিয়া দুই চারি জন আত্মীয়বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন, যাঁহার বাড়ীতে আশীর্ব্বাদ হইত তাঁহারও দুই চারি জন আত্মীয় বা প্রতিবেশী তথায় উপস্থিত থাকিতেন, আশীর্ব্বাদের পর সকলকেই একটু "মিষ্টমুখ" করান হইত। সেই "মিষ্টমুখের"

জন্য বাজার হইতে তিন-চারি প্রকার মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া আনা হইত। এই আশীর্ব্বাদ আজকাল কলিকাতা অঞ্চলে "পাকা-দেখা" রূপে পরিণত হইয়া, অপব্যয় যে কতরূপে হইতে পারে, তাহারই উদাহরণস্বরূপ হইয়াছে। গত বৎসর কলিকাতায় আমার কোন বন্ধুর পুত্রের বিবাহে পাকা-দেখাতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া লুচি ও পোলাও ছাড়া মাছ, মাংস, আমিষ, নিরামিষ তরকারি এবং চাটনি, মিষ্টান্ন, দধি, রাবড়ী প্রভৃতিতে চল্লিশ প্রকার ভোজ্যের আয়োজন দেখিয়া আসিয়াছি। পরে শুনিলাম যে, কন্যাকর্ত্তাও হারিবার পাত্র নহেন, তিনি তাঁহার কন্যার পাকা দেখার দিন পাত্রের পিতা এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে, শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথের সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া অর্থাৎ বাহান্ন প্রকার ভোজ্যের আস্বাদ গ্রহণ করাইয়াছিলেন। এই পাত্রপক্ষ বা পাত্রীপক্ষ বিশেষ ধনশালী নহেন, মধ্যবিত্তশালী গৃহস্থ। আমরা সেকালের বৃদ্ধগণ যখন আজকালকার পাকা-দেখা উপলক্ষে বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার অর্থের অপব্যবহার দেখি, তখন মনে হয় যে, পাত্রের পিতা ও কন্যার পিতা উভয়ের মধ্যে যে কত অধিক নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে পারেন, তাহা লইয়া যেন ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছে। বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, আজকাল পাকা-দেখা অথবা অনুরূপ কোন কার্য্য উপলক্ষে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের পাত্রে যে-সকল ভোজ্যদ্রব্য পরিবেশন করা হয়, কোন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি তাহার চতুর্থাংশও ভোজন করেন না বা ভোজন করিতে পারেন না। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যের বার আনা নষ্ট হয়। অনেকে বলিতে পারেন যে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের পাত্রে যে-সকল ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য পড়িয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে তাহা নষ্ট হয় না, পরে সেই সকল খাদ্য দরিদ্র কাঙালীদিগের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তাহারা ঐ সকল দেব-দুর্লভ খাদ্য কিনিয়া খাইতে পারে না, গৃহস্থের বাড়ীতে ভোজ উপলক্ষে সেই সকল খাদ্য তাহারা ভোজন করিতে পায়। কিন্তু এই যুক্তি নিতান্ত অসার। যে-ভোজে চারি শত টাকা ব্যয় হয়, তাহার চতুর্থাংশ মাত্র নিমন্ত্রিতগণ ভোজন করিলে প্রায় তিন শত টাকার আহার্য্য কাঙালীরা খায় সত্য, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কোন উপকার হয় কি? সেই তিন শত টাকায় অন্যরূপে কোন উপকার করিতে পারা যায় না কি? এক দিন তাহারা আধখানা চপ, একখানা পেস্তার বরফী বা একখানা শোণপাপড়ি খাইয়া চতুর্ভুজ হয় না। যাক, এ অর্থনীতির আলোচনার প্রয়োজন নাই।

আজকাল বিবাহ উপলক্ষে, বরযাত্রীর সংখ্যা সেকাল অপেক্ষা অনেক অধিক হয়। সেকালে যেরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পুত্রের বিবাহে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন বরযাত্রী হইত, আজকাল সেইরূপ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ পুত্রের বিবাহে এক শত বা দেড় শত বরযাত্রী হয়। সেকালের লোকে বোধ হয় এইরূপ মনে করিতেন যে, আমার পুত্রের বিবাহে, যাহারা আমার আত্মীয়বন্ধু, আমার পুত্রের বন্ধুবান্ধব বা আমার প্রতিবেশী, তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হইলে আমার বাড়ীতে খাওয়াইব, কন্যাদায়গ্রস্ত অপর এক জন ভদ্রলোকের স্কন্ধে তাঁহাদের ভার চাপাইব কোন্ অধিকারে? সেই জন্য যাঁহারা পুত্রের বিবাহে, পাত্রহরিদ্রা বা পাকস্পর্শ উপলক্ষে তিন-চারি শত লোককে নিমন্ত্রণ করিতেন, তাঁহারাও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনের অধিক বরযাত্রী লইয়া যাইতেন না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, আমার সুপরিচিত কোন যুবকের বিবাহে, বরযাত্রীর সংখ্যা এক শতের কিছু অধিক হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রায় আশী জন বরের সতীর্থ ও বন্ধু। সেই বিবাহে পাত্রীর পিতাকে সামান্য অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই। পাত্রীর পিতা কলিকাতাবাসী, কলিকাতার সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীর ন্যায় তাঁহার বাড়ীতে একান্ত স্থানাভাব, বোধ হয় কুড়ি জন লোককে বসাইয়া খাওয়াইবার স্থান তাঁহার বাটীতে নাই। ইহা জানিয়াও পাত্রপক্ষ এক শতের অধিক বরযাত্রী আনিয়াছিলেন।

সেকালে বরযাত্রীর দলে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের সংখ্যা অধিক থাকিত, যুবক ও বালকের সংখ্যা খুব অল্প হইত। একালে ঠিক তাহার বিপরীত হইয়াছে। সেকালে বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদের মধ্যে যেন একটা বিরোধ ভাব দেখা যাইত। উভয় পক্ষ পরস্পরকে ঠকাইবার বা জব্দ করিবার জন্য যেন পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকিত। ইহার ফলে

অনেক ক্ষেত্রে বচসা হইতে অবশেষে মারামারি পর্য্যন্ত হইত এবং সেটা অধিক সময়ে বালক ও যুবকগণের মধ্যেই হইত। তবে অনেক ক্ষেত্রে, সেই বিবাদে প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত জড়াইয়া পড়িতেন। এই কলহ-বিবাদের ফলে অনেক স্থলে বিবাহ পর্য্যন্ত হইত না, বরের অভিভাবক বিবাহের পূর্ব্বেই বরকে লইয়া প্রস্থান করিতেন। সেরূপ ঘটনায় কন্যার পিতা, সেই রাত্রেই প্রতিবেশী বা গ্রামবাসীদের মধ্য হইতে এক জন পাত্রের সন্ধান করিয়া তাহারই সহিত কন্যার বিবাহ দিতেন। কারণ, সেই রাত্রেই কন্যার বিবাহ দিতে না পারিলে কন্যার পিতাকে সমাজচ্যুত হইতে হইত, পরে সেই কন্যার বিবাহ বড়ই কঠিন হইত। এই কারণে অনেক সময় অযোগ্য পরিণয় হইত। হয়ত কন্যার সমবয়স্ক অথবা তাহা অপেক্ষা দুই-তিন বৎসরের বড় পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ হইত, অথবা বিগত-যৌবন, কৃতদার কোন ব্যক্তিকে অনুরোধ, উপরোধ, অনুনয়-বিনয় করিয়া বা অর্থের লোভ দেখাইয়া তাহারই হস্তে কন্যা সম্প্রদান করা হইত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সেকালের পাত্রের বিদ্যা-বুদ্ধি বা স্বভাব-চরিত্র অপেক্ষা তাহার কৌলীন্য-মর্য্যাদার প্রতিই সমধিক দৃষ্টি রাখা হইত। সুতরাং কোন বিবাহ-বিভ্রাট উপস্থিত হইলে, পাত্রীর পিতা স্ব-ঘরের অর্থাৎ নিজের মত কৌলীন্যমর্য্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তিরই অনুসন্ধান করিতেন, তা সে পাত্র বিবাহিত কি অবিবাহিত, বৃদ্ধ কি প্রৌঢ়, তাহা দেখিবার প্রয়োজন হইত না। আমরা বাল্যকালে আমাদের প্রতিবেশী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিয়াছি, তাঁহার বিবাহ নাকি ঐরূপ অকস্মাৎ হইয়াছিল। তিনি গল্প করিতেন—"রাত্রিতে আহারাদি করিয়া শুইয়া আছি, রাত্রি প্রায় দুইটার সময় আমার পিতার ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙিয়া গেল; ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—'ওঠ, শীঘ্র কাপড় বদলাইয়া আমার সঙ্গে চল, তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে;—মুখুজ্যের কন্যার বিবাহ-সভা হইতে বর উঠিয়া গিয়াছে, তুমি সেই কন্যাকে বিবাহ করিবে, নচেৎ সে ব্রাহ্মণের জাতি নষ্ট হয়।' কোথায় বা আশীর্ব্বাদ আর কোথায় বা গাত্রহরিদ্রা! আমি বাবার সঙ্গে প্রায় আধ ক্রোশ পথ চলিয়া গিয়া কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। সেই রাত্রেই আমার বিবাহ হইয়া গেল।" এরূপ বিবাহ সেকালে বিরল ছিল না।

সেকালে যে-সকল যুবক ও বালক বরযাত্রী হইয়া যাইত, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কন্যাপক্ষের অনিষ্ট করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে সঙ্কল্প যেন করিয়া যাইত। অনেকে ছুরি বা কাঁচি পকেটে করিয়া লইয়া যাইত, বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদিগের উপবেশনের জন্য যে-সকল আসন পাতা হইত, অনেকে সেই আসন, জাজিম বা চাদর কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিত। কেহ বা ভোজনকালে পাত হইতে লুচি ও মিষ্টান্ন লইয়া জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিত। এই সকল অন্যায় কার্য্য করা অনেকে বিশেষ বাহাদুরি বলিয়া মনে করিত এবং বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বন্ধু-বান্ধবের নিকট গর্ব্বভরে গল্প করিত। প্রধানতঃ ঐ সকল কার্য্য করিবার সময় কেহ ধরা পড়িলেই কলহ বিবাদ ও মারামারি হইত। সুখের বিষয়, ঐরূপ অশিষ্টতা ও অন্যায় একালে বড় দেখা যায় না।

সেকালে বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীরা পরস্পরকে কথায় ঠকাইবার জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিত না। এ সম্বন্ধে অনেক গল্প আমরা বাল্যকালে শুনিতাম। দুই-একটা গল্পের উদাহরণ বোধ হয় এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সেকালে হুগলী জেলায় গঙ্গার তীরে অবস্থিত গুপ্তিপাড়া এবং গঙ্গার অপর পারে নদীয়া জেলার উলা বা বীরনগর গ্রামের মধ্যে নানা বিষয়ে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত। গুপ্তিপাড়া অঞ্চলে হনুমানের অত্যন্ত উপদ্রব ছিল। ঐ অঞ্চলে যত অধিকসংখ্যক হনুমান ছিল এবং এখনও আছে, হুগলী জেলার অন্য কোন স্থানে সেরূপ নাই। সেই জন্য উলা বা শান্তিপুরের লোক রহস্য করিয়া গুপ্তিপাড়ার অধিবাসীদিগকে পাকেপ্রকারে হনুমান বলিয়া আমোদ উপভোগ করিত। একবার গুপ্তিপাড়ার একটি পাত্রের সহিত উলার একটি কন্যার বিবাহ হয়। সেই বিবাহে কন্যাপক্ষ বরযাত্রীদিগকে আহ্বান করিবার জন্য একটা হনুমান ধরিয়া কন্যার বাড়ীর দ্বারে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। ঐরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, গুপ্তিপাড়া হইতে এক দল হনুমান

বরযাত্রী হইয়া আসিতেছে, সুতরাং একটা হনুমানই কন্যাপক্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ তাহাদের অভ্যর্থনা করুক। বরযাত্রীরা বর লইয়া কন্যার বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইবামাত্র সেই হনুমানটাকে দেখিতে পাইল এবং কন্যাপক্ষের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। তখন বরযাত্রীদের মধ্যে এক জন প্রৌঢ় অগ্রসর হইয়া হনুমানের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং হনুমানের গালে একটা চড় বসাইয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া কন্যাপক্ষের এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া হনুমানকে চড় মারিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই প্রৌঢ় বরযাত্রী তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া হনুমানকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বেহায়া, দেশে থাকিয়া কি খাইতে পাইতিস না, তাই এই শ্বশুরবাড়ীতে ঘরজামাই হইয়া দ্বারবানগিরি করিতেছিস?"

আর একবার গুপ্তিপাড়ায় এক দল বরযাত্রী শান্তিপুরে বিবাহ দিতে গিয়াছিলেন। কন্যাকর্ত্তার বাড়ীর দ্বারদেশে কন্যাকর্ত্তার ভাগিনেয় বরযাত্রীদিগের অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান ছিল। সেই যুবক প্রত্যেক বরযাত্রীকে "আসুন, আসুন, আসিতে আজ্ঞা হউক" বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছিল—"মহাশয়, লঙ্কার সংবাদ কি?" রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, রামচন্দ্র সীতার সংবাদ জানিবার জন্য হনুমানকে লঙ্কায় প্রেরণ করিয়া আগ্রহ সহকারে তাহার প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তাই ঐ যুবক প্রত্যেক বরযাত্রীকে লঙ্কার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকারান্তরে তাঁহাদিগকে হনুমান বলিতেছিল। বালক ও যুবক বরযাত্রীরা তাহার কথার কোন উত্তর দিল না। অবশেষে বরের পিতৃস্থানীয় এক বৃদ্ধকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "তুমিই? তা বেশ হইয়াছে, আমাকে আর অধিক অনুসন্ধান করিতে হইল না; আমার সঙ্গে এস, আমি একটু বিশ্রাম করিয়া ধূমপানের পর সব কথা বলিতেছি।" এই বলিয়া তিনি গম্ভীর ভাবে সভামধ্যে গিয়া উপবেশন করিলেন। যাহারা ঐ প্রশ্ন এবং বৃদ্ধের কথা শুনিয়াছিল, তাহারা, বৃদ্ধ কি উত্তর দেন শুনিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া সভায় গিয়া উপবেশন করিল। বৃদ্ধের ধূমপান শেষ হইলে সেই যুবা আবার তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়, লঙ্কার সংবাদ কি বলুন।" তখন বৃদ্ধ বলিলেন, "লঙ্কার সংবাদ জানিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইবারই কথা। আমিও এইমাত্র লঙ্কা হইতেই আসিতেছি। লঙ্কার সংবাদ বড় ভাল নহে। লঙ্কাতে গিয়া দেখিলাম, তথায় অনেক গৃহ দগ্ধ ও বিধ্বস্ত হইয়াছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য আমি রাবণ রাজার সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, সাগরপার হইতে একটা হনুমান আসিয়া তাঁহার সুবর্ণপুরী লঙ্কার এই দশা করিয়াছে, তিনি প্রতিশোধ লইবার জন্য হনুমানটাকে ধরিয়া তাহাকে বন্ধনপূর্ব্বক সমুদ্রতীরে পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং অনুচরদিগকে আদেশ দিয়াছেন যে, হনুমানটাকে যেন জীবিত অবস্থায় দগ্ধ করা হয়। রাজার মুখে ঐ কথা শুনিয়া আমি তখনই সমুদ্রতীরে গিয়া দেখিলাম, একটা বীর-হনুমান রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় সমুদ্রতীরে পড়িয়া আছে, রাজার অনুচরেরা দূরে চিতাসজ্জা করিতেছে। আমি হনুমানের কাছে যাইবা মাত্র সে আমাকে দেখিয়া কাতর স্বরে বলিল, 'আপনাকে দেখিয়া বাঙ্গালী বলিয়া মনে হইতেছে। যদি আমার এই আসন্ন মৃত্যুকালে একটি উপকার করেন, তাহা হইলে বড়ই বাধিত হইব।' আমি তাঁহার উপকারে সম্মত হইলে সে বলিল 'আমার পুত্রকে আমার এই বিপদের কথা জানাইয়া তাহাকে অবিলম্বে এখানে আসিতে বলিবেন।' আমি বলিলাম—'আমি ত তোমার পুত্রকে চিনি না, কোথায় তাহার সাক্ষাৎ পাইব?' তাহাতে সে বলিল, 'আমার পুত্র শান্তিপুরে আছে। আমি লঙ্কায় আসিয়াছি সে জানে। অনেক দিন আমার সংবাদ না পাইয়া সে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। সে যাহাকে দেখিতেছে, তাহাকেই লঙ্কার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছে।' যাহা হউক, সহজেই তোমার সহিত দেখা হইল, আমাকে অধিক অনুসন্ধান করিতে হইল না। এখন ত লঙ্কার সকল সংবাদ শুনিলে, যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।" এইরূপ বাক্যুদ্ধ সেকালে বিবাহ-সভায় বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদের মধ্যে সর্ব্বদাই হইত।

সেকালে, বিবাহরাত্রিতে, বিবাহকার্য্য শেষ না হইলে বরযাত্রী বা কন্যাযাত্রী কাহাকেও খাওয়ান হইত না।

বোধ হয় কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহ পণ্ড হইত বলিয়াই ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল। তবে যদি অধিক রাত্রিতে বা শেষরাত্রিতে বিবাহের লগ্ন থাকিত, তাহা হইলে এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হইত, বিবাহের পূর্ব্বেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে খাওয়ান হইত। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বরযাত্রীদিগকে অগ্রে খাওয়াইয়া তাহার পর কন্যাযাত্রীদিগকে খাওয়ান হইত, ইহাতে কন্যাযাত্রীরা কোন আপত্তি করিতেন না। বোধ হয়, বরযাত্রীরা অভ্যাগত, সেই জন্য কন্যাযাত্রীরা তাঁহাদিগকে অতিথি মনে করিয়াই অগ্রে তাঁহাদিগের ভোজনে কোন আপত্তি করিতেন না। বরযাত্রীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রে ভোজন-স্থানে লইয়া গিয়া বসান হইত, তাঁহারা ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে তবে শূদ্র বরযাত্রীদিগকে ভোজন-স্থানে লইয়া যাওয়া হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে বরপক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয় উভয় পক্ষীয় ব্রাহ্মণদিগকে একসঙ্গেই ভোজন করান হইত, কারণ তাহা না করিলে শূদ্র বরযাত্রীরা বলিতেন, "যে-বাড়ীতে কোন ব্রাহ্মণ অভুক্ত থাকেন, সে বাড়ীতে আমরা অগ্রে কিরূপে ভোজন করিব?" সেই জন্য উভয় পক্ষের ব্রাহ্মণগণকে একযোগেই খাওয়ান হইত। তবে কন্যাযাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহাদিগকে ট্রেন ধরিবার জন্য ষ্টেশনে যাইতে হইত, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলের অগ্রে খাওয়ান হইত। তখন আর সামাজিক বিধি-নিষেধের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইত না। সেকালের ভোজে আমিষের কোন সংস্রব থাকিত না, সমস্ত ব্যঞ্জনই নিরামিষ হইত। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতির বাড়ীতে ভোজে ব্যঞ্জনে লবণ দেওয়া হইত না, কারণ, ব্যঞ্জনে লবণ দিলেই তাহা "শকড়ি" হয়। স্বজাতীয় ভিন্ন অন্য কোন জাতি সেরূপ শকড়ি ব্যঞ্জন ভোজন করিতেন না। আমি যৌবনকালে কোন বন্ধুর বিবাহে বরযাত্রী হইয়া হাওড়াতে গিয়াছিলাম। আমার বন্ধুটি শূদ্র। সেই বিবাহ-বাটীতে প্রথম দেখিলাম যে, লুচির সঙ্গে ছোলার ডাল দেওয়া হইল, তাহার পূর্ব্বে কোন শূদ্রের বাড়ীর ভোজে ছোলার ডাল দেখি নাই। বলা বাহুল্য যে, সেই ডাল ও অন্যান্য ব্যঞ্জনে লবণ ছিল না। আমরা তখন "ছেলে ছোকরা", সুতরাং আমরা বিনা-আপত্তিতে সেই ডাল ভোজন করিলাম। কিন্তু গোল বাধাইলেন এক জন বৃদ্ধ তিলি। তাঁহার পাতে ডাল দিবা-মাত্র তিনি ভোজনে বিরত হইয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "ব্রাহ্মণ এবং আমার স্বজাতি ছাড়া অন্য শূদ্রের বাড়ীতে ডাল খাইব কিরূপে? যদি ডাল খাইলাম, তাহা হইলে ভাত খাইতে আপত্তি কি? ডাল ভাত একই কথা।" তখন তাঁহার সেই ডালস্পৃষ্ট ভোজনপাত্র সরাইয়া আবার নূতন করিয়া পাতা দেওয়া হইলে তিনি ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেকালে বিবাহের প্রধান অনুষ্ঠান স্ত্রী-আচারের সময় অনেক ক্ষেত্রেই বর বেচারাকে নানারূপ শারীরিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত। শ্যালিকা, শ্যালকজায়া বা 'ঠানদিদি' প্রভৃতি মহিলাদিগের সুকোমল করস্পর্শে বরের কর্ণ অনেক সময় রক্তাক্ত হইত, বর প্রতিবাদ করিলেই সে বেরসিক বলিয়া গণ্য হইত। "ছাদনাতলা"য় যখন বরবধূকে বরণ করা হইত, তখন অনেক সময় বরের পৃষ্ঠদেশ আজ-কালকার পুলিসের মৃদু যষ্টি চালনার ন্যায় কোমল মুষ্ট্যা-ঘাতে জর্জ্জর হইত। ছাদনাতলায় বরকে যে পীঠ বা পিঁড়ার উপর দাঁড়াইতে হয়, অনেক সময় কোন কোন সুরসিকা সেই পিঁড়ার তলায় পাঁচ-সাতটা সুপারি দিয়া রাখিতেন, উদ্দেশ্য যে বর পিঁড়ার উপর দাঁড়াইবা মাত্র পিঁড়া সরিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বরও পড়িয়া যাইবে। এই অদ্ভুত রসিকতার জন্য কোন কোন বরকে গুরুতররূপে আহত হইয়া শয্যাগত হইতে হইত। সেই জন্য, বিবাহে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে বরের বাড়ীর গৃহিণীরা বরকে সাবধান করিয়া বলিয়া দিতেন, "ছাদনাতলায় পিঁড়ায় দাঁড়াইবার পূর্ব্বে পায়ে ক'রে পিঁড়াটা ঠেলিয়া দেখিও তাহার তলায় সুপারি আছে কি না।" এই ছাদনাতলাতেই বরকন্যার "শুভদৃষ্টি" হয়, অর্থাৎ বর বধূকে এবং বধূ বরকে প্রথম দর্শন করে। শুভদৃষ্টির পূর্ব্বে বরবধূর পরস্পরকে দেখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। বরের অভিভাবকগণ কন্যা দেখিয়া পছন্দ করিতেন, কন্যার অভিভাবক বরকে দেখিয়া আসিতেন। শুনিয়াছি, সেকালে (অর্থাৎ আমাদের

পিতৃপিতামহর আমলে) নিকষ কুলীনের বিবাহে অনেক ক্ষেত্রে, বিবাহের পূর্ব্বে বর বা কন্যাকে দেখিবারও প্রয়োজন হইত না, ঘটকের দ্বারাই সমস্ত কার্য্য সমাধা হইত, বিবাহের দিন স্থির হইলে বর বিবাহ করিতে যাইত, তখন সকলে বরকে প্রথম দেখিত। বিবাহের পর কন্যা শ্বশুরালয়ে গেলে, লোকে কন্যা দেখিত এবং তখন তাহার রূপের সমালোচনা হইত।

ছাঁদনাতলায় অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই বর বেচারা নিষ্কৃতি পাইত না, তাহার কঠোরতর অগ্নিপরীক্ষা হইত বাসরঘরে। বর বাসরঘরে গিয়া উপবেশন করিলে প্রথমেই সমাগত স্ত্রীলোকগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কন্যা পছন্দ হইয়াছে কি?" যেন পছন্দ না হইলে তাঁহারা কোন প্রতিকার করিতে পারেন। তাহার পর বরকে গান গাহিবার জন্য অনুরোধ। বর যত ক্ষণ গান না করিত, তত ক্ষণ তাহার উপর জুলুম চলিত। বাসরঘরেও বরের কর্ণমর্দ্দন প্রভৃতি শারীরিক দণ্ডের অভাব হইত না। বাসরঘরে সমবেত মহিলারা অনেক সময় বরের সহিত এরূপ প্রাকটিক্যাল জোক করিতেন যে, বরের প্রাণ লইয়া টানাটানি হইত। তাম্বূলের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে চূণ বা লঙ্কাবীজ দিয়া বরকে খাইতে দেওয়া হইত। আমরা বাল্যকালে গল্প শুনিয়াছি যে, এক বর সুদূর পল্লীগ্রামে বিবাহ করিতে গিয়াছিল, বাসরে তাহার গ্রীষ্ম বোধ হওয়াতে সে একখানা পাখা চাহিয়াছিল। তাহা শুনিয়া বাসরে সমাগত স্ত্রীলোকেরা বলে, "আমাদের দেশে গরম বোধ হ'লে লেপ গায়ে দিতে হয়।" এই বলিয়া একখানা লেপ বরের উপর চাপা দিয়া তাহাকে এমন চাপিয়া ধরিয়াছিল যে, শ্বাস রুদ্ধ হইয়া বরের মৃত্যু হয়। এই গল্প অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু সেকালে পল্লীগ্রামে অশিক্ষিতা রমণী সমাজে রসিকতাজ্ঞান কিরূপ ছিল, তাহা এই গল্প হইতে অনুমান করা যাইতে পারে।

আমাদের সময়ে বিবাহের বয়স, পাত্রপক্ষে পনর-ষোল হইতে কুড়ি-একুশ এবং পাত্রীপক্ষে নয় হইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমার এবং আমার সতীর্থগণের মধ্যে অনেকেরই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার দুই-এক বৎসর পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়াছিল। সেকালে এগার-বার বৎসর বয়সে বালিকাদের বিবাহ না হইলে তাহার অভিভাবকবর্গের আর দুশ্চিন্তায় রাত্রিতে নিদ্রা হইত না। কুমারী কন্যার বয়স বার বৎসর উত্তীর্ণ হইলে তাহার জনকজননীর, বিশেষতঃ জননীর পাড়ায় মুখ দেখান ভার হইত। ইহার ব্যতিক্রম হইত কুলীন কুমারীর বেলা। স্বঘরে পাত্র অন্বেষণ করিতে করিতে অনেক সময় কুলীন কুমারীর বয়স সতর, আঠার এমন কি কুড়ি বৎসরও পার হইয়া যাইত, অনেকের একেবারেই বিবাহ হইত না। আমি ঐরূপ দুইটি কুমারীকে দেখিয়াছি। আমার কোন বন্ধুর বিবাহ উপলক্ষ্যে, হালিশহরে বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহাদের সাক্ষাৎ লাভ করি। তাঁহারা দুইটি সহোদরা, উভয়েরই মাথার চুল পাকিয়াছে, দাঁত পড়িয়াছে। তাঁহারা সধবার মত শাড়ী ও অলঙ্কার পরিয়াছিলেন, কিন্তু মাথায় সিন্দুর ছিল না দেখিয়া বিস্মিত হইয়া আমার বন্ধুকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "উঁহারা প্রাতঃস্মরণীয় ৺দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভগিনী। উঁহারা বড় কুলীন, উঁহাদের সমান ঘর এ অঞ্চলে না-থাকাতে উঁহাদের বিবাহ হয় নাই।" সেই কুমারীদ্বয়ার বয়স তখন বোধ হয় ষাট হইতে সত্তর বৎসর হইবে। সেকালে বালিকাদের অল্প বয়সে বিবাহ হইত বলিয়া বালিকারা অল্প বয়সেই সন্তানের জননী হইত। অনেকে বার-তের বৎসর বয়সেই মাতৃত্ব লাভ করিত।

আধুনিক ফটোগ্রাফি

শ্রীকানাইলাল মণ্ডল, এম. এস্‌সি.

গত বিশ বৎসরের গবেষণার ফলে ফটোগ্রাফি চারুশিল্প-জগতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পার হইয়া ব্যবহারিক জগতে ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক দূর প্রসারলাভ করিয়াছে। বিষয়বস্তুকে রূপ দিবার প্রণালী উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর শিল্প হিসাবেও ফটোগ্রাফির আদর বাড়িয়াছে। বিংশ শতাব্দীর ও তৎপূর্ব্ব কালের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে প্রভেদ অনেক। বৈচিত্র্যের দিক দিয়াও ফটোগ্রাফির সর্ব্বতোমুখী উৎকর্ষলাভের উপর নির্ভর করিয়া চিত্রশিল্প উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। অন্য দিকে বিজ্ঞান-জগতে জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, প্রাণী- ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের গবেষণায় ফটোগ্রাফির সাহায্য অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কারই ফটোগ্রাফির উপর নির্ভর করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এঞ্জিনিয়ার, ধাতুবিদ্যাবিদ্‌ এবং আরও অনেককে রেকর্ডিং, জরিপ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি কাজে সুবিধার জন্য ফটোগ্রাফির আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

ফটোগ্রাফির বর্ত্তমান পরিণতির পরিচয় লাভ করিতে হইলে এইটুকু জানা আবশ্যক যে আলোক বিশ্বব্যাপী ইথার-সমুদ্রের কম্পন মাত্র। সমুদ্রে যেমন ছোট-বড় নানা রকমের ঢেউ উঠে, ইথার-সাগরেও তেমনি নানা আকারের তরঙ্গ উঠিয়া থাকে। ইথার-তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্যের বিভিন্নতা হইতেই নানা প্রকার রশ্মির জন্ম। রামধনুর সপ্তবর্ণের আলোকের মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ইহা দৈর্ঘ্যে তিন ইঞ্চির লক্ষ ভাগের এক ভাগ। বেগুনী রঙের আলোক-তরঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা ছোট এবং দীর্ঘতায় লোহিতালোক-তরঙ্গের প্রায় অর্দ্ধেক। অবশিষ্টগুলি এই দুই সীমার মধ্যে অবস্থিত। এই সাতটি মূল আলোর মিলনে সূর্য্যালোকের ন্যায় সাদা আলোক উৎপন্ন হয়। সূর্য্যালোক প্রিস্‌ম বা ত্রিফলা কাচের ভিতর দিয়া চলিলে উহা ভাঙিয়া যে দৃশ্য স্পেক্‌ট্রাম বা বর্ণছত্র সৃষ্ট হয় তাহার এক প্রান্তে থাকে লোহিতালোক, অপর প্রান্তে বেগুনী আলোক। অপর পাঁচটি বর্ণ মধ্যস্থল অধিকার করে। বর্ণছত্রের উভয় দিকে লাল ও বেগুনী অতিক্রম করিয়া আরও রশ্মি বর্ত্তমান থাকে। এইগুলি চোখে দেখা যায় না। লাল বর্ণের প্রান্তে যে অদৃশ্য ইন্‌ফ্রা-রেড বা অতিলোহিত রশ্মি থাকে তাহার তরঙ্গ লোহিতালোক-তরঙ্গ অপেক্ষা দীর্ঘতর। এই দিকে যে অতি দীর্ঘ তরঙ্গের সহিত আমাদের পরিচয় আছে তাহা রেডিও-তরঙ্গ। অতি-লোহিত আলোক উত্তাপ প্রদানে সমর্থ। তবে ফটো-গ্রাফের সাধারণ প্লেটে উহার কোন ক্রিয়া নাই। অন্য দিকে, বেগুনী আলোর পারে অবস্থিত অতি-বেগুনী আলোক রাসায়নিক ভাবে শক্তিসম্পন্ন। ফটোগ্রাফের প্লেটে উহা খুব বেশী ক্রিয়া করে। অতিলোহিত আলোক-তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে বেগুনী আলোকের তরঙ্গ অপেক্ষা ছোট। খুব ছোট তরঙ্গের পরিচিত রশ্মির নাম একস্‌-রে। নবাবিষ্কৃত ব্যোম-রশ্মির (cosmic rays) অংশ-বিশেষের তরঙ্গকে আমরা এ-পর্য্যন্ত ক্ষুদ্রতম বলিয়া জানি। রশ্মি-গুলি সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টি অতি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ। বর্ণছত্রকে যদি স্বরসপ্তকের সহিত তুলনা করা যায় তবে মানুষের কান-দুইটিকে তাহার চক্ষুদ্বয় অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী বলিতে হয়। কারণ কানে তবু এগারটি সপ্তক প্রবেশ করে; চক্ষু মাত্র একটি সপ্তক দেখিতে পায়। বৈজ্ঞানিকের চৌষট্টি সপ্তকের রশ্মির অস্তিত্ব অবগত হইবার উপায় আছে এবং সেগুলি লইয়া তাঁহারা পরীক্ষাও করিতে পারেন।

ফটোগ্রাফির দিক হইতে বর্ণছত্রের নীল ও বেগুনী অংশ বেশী ক্রিয়াশীল হওয়ায় প্রথমকার প্লেটে যে ছবি উঠিত তাহাতে এক দিকের উপর বেশী জোর পড়িত।

পরে প্লেটের জিলেটিন ও সিলভার সল্টের মিশ্রণের সহিত রং মিশাইয়া উহাকে বর্ণছত্রের সমস্ত অংশের পক্ষে সমান সুগ্রাহী করা হয়। এই প্লেটগুলি এখন আইসোক্রোমেটিক, অর্থোক্রোমেটিক, প্যানক্রোমেটিক প্রভৃতি নামে বাজারে পাওয়া যায়। শুষ্ক প্লেটের প্রবর্ত্তনের পর এইগুলির ব্যবহার ফটোগ্রাফির উন্নতিতে প্রধান সোপানস্বরূপ হইয়াছে। একই দৃশ্য সাধারণ ও প্যান্‌ক্রোমেটিক দুই রকমের প্লেটে কিরূপ ভিন্ন ভাবে উঠিয়াছে, ১ নং ও ২ নং ছবিতে তাহা স্পষ্ট দেখা যাইবে। প্রথমটিতে কতকগুলি উজ্জ্বল বর্ণের ফুল কালো হইয়া গিয়াছে এবং কতকগুলিকে কৃষ্ণবর্ণের ভূমির উপর প্রায় দেখা যাইতেছে না। দ্বিতীয়টিতে পাপড়ির দাগগুলি পর্য্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। লেন্স ও প্লেটের মধ্যে ব্যবহৃত আলোক বাছিয়া লইবার ছাঁকনির (light filters) সহিত রং মিশাইলেও কাজ চলিতে পারে। বিশেষ কতকগুলি রঙের ব্যবহার করিয়া পরে অদৃশ্য অতিলোহিত রশ্মির সাহায্যে ফটো তোলা (Infra-red photography) সম্ভবপর হইয়াছে। ১৯৩০ সালে আরও কতকগুলি রঙের প্রবর্ত্তন হওয়ায় অতিলোহিতের দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত ক্ষেত্রের অদৃশ্য রশ্মি ফটোগ্রাফিতে প্রযুক্ত হইতেছে। আধুনিক ফটোগ্রাফির দিক হইতে অতি-বেগুনী রশ্মির ক্ষেত্রও একই ভাবে বিস্তার লাভ করিতেছে। বিগত দশ বৎসরের গবেষণায় এই বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এক্‌স্‌-রে নেগেটিভ তৈয়ারী করাও পূর্ব্বের ন্যায় কঠিন নহে। বিভিন্ন বর্ণের আলোক-ছাঁকনি ব্যবহার করিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে বর্ণ ফটোগ্রাফিকে (colour photography) সম্পূর্ণতা দিবার চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। গতিশীল জিনিষের ফটো লওয়ার পদ্ধতি কতখানি অগ্রসর হইয়াছে, তাহার ধারণা করা যাইবে শুধু ইহা হইতে যে বর্ত্তমানে এক সেকেণ্ডের লক্ষ ভাগ সময়ের জন্য আলোক পড়িতে (exposure) দিয়াও ফিল্মের উপর নিখুঁত ছবি তোলা যায়। শক্তিশালী লেন্সের সাহায্যে রাত্রিকালে এখন সহজে নির্দ্দোষ ছবি উঠে। কাজেই নৈশ ফটোগ্রাফি ক্রমে সাধারণ জিনিষ হইয়া পড়িতেছে। অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, স্পেক্‌ট্রোস্কোপ এবং রঞ্জন-রশ্মির সহিত ফটোগ্রাফি জড়িত হওয়ায় ফটো-মাইক্রোগ্রাফি, আকাশ-ফটোগ্রাফি, স্পেক্‌ট্রোগ্রাফি ও রেডিওগ্রাফির উদ্ভব হইয়াছে।

চলচ্চিত্রের মধ্যে নির্ব্বাক ফিল্মে সাধারণতঃ এক সেকেণ্ডে ১৬টি ফটো লওয়া হয় এবং ঐ হারে দর্শকদিগকেও উহা দেখান হয়। সবাক্ চিত্রে ছবি তোলা ও ফেলার হার সেকেণ্ডে ২৪টি। স-বর্ণ চলচ্চিত্রে আরও তাড়াতাড়ি ছবি তোলার প্রয়োজন হয়। ছবিতে গতি-

৩। নৃত্য-গতির ফটোগ্রাফ—রাত্রিকালে গৃহীত

বেগ আনিবার পক্ষেও আধুনিক ফটোগ্রাফির সার্থকতা আছে। পূর্ব্বযুগে শুধু দক্ষ চিত্রশিল্পী অঙ্কিত চিত্রে গতিবেগ দিতে পারিতেন। বর্ত্তমানে চলন্ত অবস্থায় ফটো তুলিয়া ছবিতে গতির ভাব সহজে আনা যায়। সম্প্রতি কোন কোন ফটোগ্রাফার স্থির অবস্থায় বিশেষ ভঙ্গীর ছবি না-তুলিয়া গতিশীল বিশিষ্ট ভঙ্গীকে আধুনিক ফটোগ্রাফিতে ধরিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন। ঐরূপ ছবিতে সময়ে সময়ে কিছু অস্পষ্টতা থাকিলেও গতির ব্যঞ্জনার জন্য উহা মনকে মুগ্ধ করে। ৩ নং ফটোগ্রাফ এই ভাবে তোলা। বিপরীত পক্ষে গতি যেখানে খুব

৪। মহাশ্বেতার জাগরণ

ধীর সেরূপ স্থানে অনেকখানি সময় পর-পর ফটো লইয়া পর্দ্দায় বেগ বাড়াইয়া দিলে অবস্থা-বিশেষে খুব সুন্দর ফল পাওয়া যায়। শুঁয়াপোকার প্রজাপতির রূপ ধারণ, উদ্ভিদের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি, ফুলের প্রস্ফুটন প্রভৃতি সিনেমা ছবিতে এই কৌশল অবলম্বন করা হয়। মহাশ্বেতা-জাতীয় একটি পুষ্পকোরকের বিকাশকালীন ১৬টি অবস্থা ৪ নং ছবিতে দেখান হইল। এক সেকেণ্ডের মধ্যে ঐগুলি একের পর একটি পর্দ্দার উপর ফেলিয়া ফুলের

স্বাভাবিক বর্ণে ফটো তুলিবার কোন প্রণালী এ-পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই। তবে রং ও রঙীন কাচ ব্যবহার করিয়া ফটোগ্রাফের সাহায্যে কোন বস্তু বা দৃশ্যের বর্ণ অনেকটা অনুকরণ করা চলে। লাল, সবুজ ও নীল এই তিন বর্ণের মিশ্রণে রঙের যে-কোন আভা উৎপন্ন হইতে পারে। ত্রিবর্ণ মুদ্রণে মূলবর্ণ প্রায় আসে। আধুনিক স-বর্ণ সিনেমায় প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি সঠিক না-উঠিলেও বেশ মনোরম ভাবেই চোখে পড়ে। ফটো তুলিবার সময় লাল ও সবুজ রং মাত্র ব্যবহার করা হইলেও ছবিতে নীলাংশ একেবারে বাদ পড়ে না। সূর্য্যোদয়ে ও দিবাবসানে এদেশের আকাশে রঙের বিচিত্র খেলা চলে। আধুনিক ফটোগ্রাফে উহা ধরিয়া লইয়া পর্দ্দার উপরেও উষার অরুণ-প্রকাশ এবং সূর্য্যাস্তের সোনার উৎসব ঘটান যায়।

ইন্‌ফ্রা-রেড বা অতিলোহিত ফটোগ্রাফি একটি প্রয়োজনীয় আধুনিক আবিষ্কার। অদৃশ্য অতিলোহিত রশ্মিতে ক্রিয়া হইতে পারে ফটোগ্রাফের এরূপ প্লেট প্রস্তুত করা গিয়াছে বলিয়া পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বায়ু-মণ্ডলের আব্‌ছায়ার মধ্যে দূরের ফটো তুলিবার জন্য সাধারণ আলোক অপেক্ষা অতিলোহিত রশ্মি অনেক বেশী উপযোগী। কুয়াশার সময় বায়ুর মধ্যে ভাসমান বস্তুকণা-সমূহ আলোককে বিক্ষিপ্ত করে। ঐ আলোক প্রায়ই নীলাভ হয় এবং উহাতে অতিলোহিত রশ্মি কম থাকে। ফিলটারের সাহায্যে নীল আলোককে বাদ দিয়া লোহিতাংশের আলোকের দ্বারা ইন্‌ফ্রা-রেড প্লেটে ছবি তুলিলে উহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। সাধারণ আলোক ও অতিলোহিত রশ্মির দ্বারা পৃথক্ ভাবে দূরের দৃশ্য তুলিলে উভয়ের মধ্যে কিরূপ পার্থক্য হয়, ৫ নং ও ৬ নং ছবিতে তাহা দেখা যাইবে। ৪০০ ডিগ্রী উত্তাপ মাত্রায় এক খণ্ড লোহ হইতে কোনরূপ আলোক বাহির হয় না এবং অন্ধকারের মধ্যেও উহা দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবলমাত্র আপনা হইতে বিকীর্ণ রশ্মির দ্বারা উহার কিরূপ ফটো উঠিতে পারে, ৭ নং ছবিতে তাহা দেখান হইয়াছে। মানবচক্ষু যেখানে অন্ধ-ফটোগ্রাফের প্লেট সেখানে

৫। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার একটি দ্বীপের ফটোগ্রাফ—সাধারণ আলোকে গৃহীত

৬। অতিলোহিত রশ্মিতে গৃহীত একই দ্বীপের ফটোগ্রাফ

ইন্‌ফ্রা-রেড রশ্মির আবছায়া ভেদ করিবার শক্তি থাকায় উহার দ্বারা ঝাপসা দিনেও যেমন ছবি তোলা চলে, তেমনি চোখে যাহা লক্ষ্য হয় না সেরূপ জিনিষের অস্তিত্বের বিষয়ও উহার সাহায্যে অবগত হওয়া যায়। যুদ্ধের ব্যাপারে ও জরিপ-কার্য্যে আকাশ হইতে ফটো তোলা, কুয়াশার মধ্যে সমুদ্রে জাহাজ চালান প্রভৃতি বর্ত্তমান সময়ের ফটোগ্রাফিতে রক্ত রশ্মির ও অতিলোহিত রশ্মির প্রয়োগ হইতে সম্ভবপর হইয়াছে। সম্প্রতি উত্তর-আটলাণ্টিকযাত্রী জাহাজের নাবিকেরা কাছাকাছি স্থানে বরফ-শৈলের অস্তিত্বের বিষয় জানিবার কাজে দৃষ্টিশক্তির

৭। ৪০০ ডিগ্রী তাপমাত্রায় লৌহখণ্ড হইতে বিকীর্ণ রশ্মিতে গৃহীত উক্ত লৌহখণ্ডের ফটোগ্রাফ

ক্ষীণতা ইন্‌ফ্রা-রেড প্লেট দ্বারা শোধরাইয়া লইতেছে। গত মহাযুদ্ধে প্রত্যেক জাতির সামরিক বিভাগ প্রতি দিন আকাশ হইতে হাজার হাজার শত্রু-লাইনের ফটো লইয়াছিল। ভবিষ্যতের যুদ্ধে মেঘলা দিনে অথবা ঘন কুয়াশার কালও ঐ ভাবে খুব সহজে আকাশ হইতে ফটো তোলার কাজ চলিবে।

সম্ভবপর হইতেছে। সম্প্রতি ৭২,৩৯৫ ফুট উপর হইতে ছবি গ্রহণ করা গিয়াছে। বিশেষভাবে তৈয়ারী একখানি ক্যামেরায় ঊর্দ্ধাকাশ হইতে ৩৩০ মাইল দূরস্থ ভূপৃষ্ঠের যে ছবি উঠিয়াছে তাহাতে পৃথিবীর বক্রতা ধরা গিয়াছে। পৃথিবীর গোল আকার সম্বন্ধে অতিআধুনিক প্রমাণ এইভাবে ইন্‌ফ্রা-রেড ফটোগ্রাফি হইতে মিলিয়াছে। জলা, জঙ্গল অথবা পার্ব্বত্য অঞ্চল জরিপ করিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় ঐরূপ ফটোগ্রাফির প্রচলন বর্ত্তমানে খুব বেশী। সাইবিরিয়া, কানাডা প্রভৃতি স্থানের জরিপদারগণ আকাশ হইতে ফটো তুলিয়া অতি সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ভূমি, হ্রদ, বন ইত্যাদি প্রায়ই পরিমাপ করিয়া থাকে। ইহাতে কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যয়ের দশমাংশ মাত্র খরচ হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাঁচটি লেন্সযুক্ত একটি ক্যামেরায় ১৫ হাজার ফুট উপর হইতে এক মিনিট অন্তর ফটো লইয়া ৪ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে সমস্ত মাসাচুসেটস্ রাজ্য জরিপ করা গিয়াছে। ১৯৩০ সালে সর্ হিউবার্ট উইলকিন্স দক্ষিণ ভূমণ্ডলে ৬৬½° ডিগ্রী ল্যাটিচুডের কাছাকাছি তুষারাস্তীর্ণ সাগরে গ্রেহামল্যাণ্ডকে এরোপ্লেন হইতে পরিমাপ করিয়াছেন।

বিজ্ঞানের অনেক বিভাগ এখন ফটোগ্রাফির সাহায্য লইতেছে। সে সকলের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানে উহার প্রয়োগ বেশী হইতেছে। পৃথিবীর সকল বৃহৎ মানমন্দিরে এখন শক্তিশালী দূরবীক্ষণ রাখা হয়। স্বাভাবিক

অপেক্ষা বহু বহু গুণ গভীর আকাশ ভেদ করিতে পারে, সকলেই একথা জানেন। আধুনিক ফটোগ্রাফির বিশেষত্ব এই যে, ঐ যন্ত্রগুলির ভিতর দিয়াও দৃষ্টিগোচর হয় না এমন ক্ষীণজ্যোতি বস্তুপিণ্ডের পর্য্যন্ত ফটো তোলা যায়। সুগ্রাহী ফটোপ্লেটে ঐরূপ বস্তু হইতে দীর্ঘকাল আলোক পড়িতে দিলে আলোকের ক্রিয়ার ফল প্লেটের উপর ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হয় এবং শেষে বস্তুটির ছবি প্লেটে ফুটিয়া উঠে। ১১ নং ছবিটি মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরে গৃহীত কুণ্ডলিত নীহারিকার একটি সুন্দর ফটোগ্রাফ। উহার আলোকপাত কাল ৪½ ঘণ্টা। আলোকসম্পাত কাল সুদীর্ঘ করিয়া বহুসংখ্যক ছোট ছোট গ্রহ, ধূমকেতু, নক্ষত্র, নীহারিকাদি এ-পর্য্যন্ত আবিষ্কার করা গিয়াছে। আকাশমার্গের অনেক জ্যোতিবিশিষ্ট বস্তুপিণ্ডের সন্ধান আকাশেও করা হয় না, ফটোগ্রাফের প্লেটে করা হয়। আকাশের কোন্ স্থানে ঐগুলি থাকা সম্ভবপর, তাহা হিসাব করিয়া সেই বিশেষ স্থানটির ফটো লওয়া হয়। পরে প্লেটের উপর খোঁজ করিয়া সেইগুলি বাহির করা হয়। মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের শত ইঞ্চি প্রতিফলকযুক্ত পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীক্ষণ বহির্জগতের ক্ষীণ নীহারিকাদির ফটো তুলিবার কাজে বিখ্যাত।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আলোকে ফটো গ্রহণ করিবার প্রণালীর আবির্ভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় এক রূপ নূতনত্ব আসিয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে ইহা ধারণা করা সহজ হইবে। ১২ নং ও ১৩ নং চিত্র দুইটি আলট্রা-ভায়োলেট ও ইন্‌ফ্রা-রেড—এই দুই প্রকার আলোকে মঙ্গলগ্রহের রূপ। রাইট্ কর্ত্তৃক লিক্ মানমন্দিরে ফটো দুইটি গৃহীত হইয়াছে। উভয়ের দুই অর্দ্ধাংশ যোগ করিলে ১৪ নং ছবিটি পাওয়া যায়। আলট্রা-ভায়োলেটের ছবিটি স্পষ্টতঃ ইন্‌ফ্রা-রেডের ছবি অপেক্ষা আকারে বড়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রমাণ করিতেছে পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডলের ন্যায় একটি বাষ্পমণ্ডল মঙ্গলগ্রহকে ঘিরিয়া আছে। ১৫ নং ও ১৬ নং ছবি-দুইটি রস্ কর্ত্তৃক একই ভাবে গৃহীত বুধগ্রহের ফটোগ্রাফ। উভয়ের মধ্যে আসলে কোন পার্থক্য নাই। আলট্রা-ভায়োলেটের ছবিতে যে-কয়েকটি কালো রেখা দেখা যাইতেছে সেগুলি স্থায়ী নয়। ঐগুলি খুব সম্ভবতঃ ঘন কুয়াশা অথবা মেঘের দরুন উৎপন্ন হইয়াছে। গ্রহের পৃষ্ঠদেশের কোন রূপ লক্ষণ হইলে ঐগুলি ইন্‌ফ্রা-রেডের ছবিতেই ভাল ভাবে উঠিত। বুধগ্রহ সম্পূর্ণভাবে মেঘের জালে আবৃত—ফটোগ্রাফ দুইটি এই পরিচয় দিতেছে। মেঘগুলি এত ঘন এবং এরূপ সতত স্থায়ী যে ইন্‌ফ্রা-রেড রশ্মি ঐগুলি ভেদ করিতে পারে না। কাজেই বুধগ্রহের স্বরূপ কোন দিনই আমরা অবগত হইতে পারিব না মনে হয়। বৃহস্পতি-গ্রহের ফটোগ্রাফ লইয়া জানা গিয়াছে উহাও আশ্চর্য্য রকমের পরিবর্ত্তনশীল গাঢ় মেঘে সম্পূর্ণ ভাবে আবৃত। ইন্‌ফ্রা-রেড রশ্মি ঐ মেঘ ভেদ করিয়া বেশী দূর ভিতরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না।

১২ ১৩ ১৪

১২। আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মিতে গৃহীত মঙ্গলগ্রহের ফটোগ্রাফ
১৩। ইন্‌ফ্রা-রেড রশ্মিতে গৃহীত মঙ্গলগ্রহের ফটোগ্রাফ
১৪। আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মিতে গৃহীত ছবির অর্দ্ধাংশ ও ইন্‌ফ্রা-রশ্মিতে গৃহীত ছবির অর্দ্ধাংশ—আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মিতে গৃহীত ছবিটি যে বড় তাহা এই ছবি দেখিলে বুঝা যায়।

সূর্য্যের কত যে ফটোগ্রাফ এ-পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্ব্বত্র লওয়া হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এক মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরেই সূর্য্যের অর্দ্ধ লক্ষ ফটো গ্রহণ করা হইয়াছে। গ্রহণের সময় সূর্য্যের ফটোগ্রাফ লওয়ার কথা অনেকেই অবগত আছেন। ১৭ নং ছবিটি সৌররশ্মি-মণ্ডলের (করোনা) গ্রহণকালের

১৫। আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মিতে গৃহীত বুধগ্রহের ফটোগ্রাফ
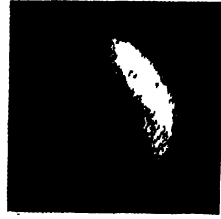
১৬। ইনফ্রা-রেড রশ্মিতে গৃহীত বুধগ্রহের ফটোগ্রাফ

ফটোগ্রাফ। এখন অবশ্য কেবল মাত্র গ্রহণের সময়ে ঐরূপ ছবি তোলা হয় না। পূর্ণ আলোকের মধ্যেও যে-কোন সময় ফটো তোলা যায়।

আলোকের প্রাচুর্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের রশ্মিতে সূর্য্যের উপরিভাগের ছবি গ্রহগণের অপেক্ষা অনেক সহজে তোলা যায়। সূর্য্যের মিশ্রিত আলোককে স্পেক্‌ট্রোস্কোপে ভাঙিয়া লইয়া যেরূপ আলোক বিশিষ্ট প্রকার পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন, মাত্র তাহাই ক্যামেরায় পাঠান হয়। সূর্য্যের পরীক্ষার জন্য স্পেক্‌ট্রোহেলিয়োগ্রাফ নামক যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া হেল্‌ ও ডেস্‌ল্যাণ্ডার্স ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আলোকে সূর্য্যের ফটোগ্রাফ লইয়াছেন। এই ভাবে হাইড্রোজেন, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি মূল পদার্থ সূর্য্যের মধ্যে কেমন ভাবে বর্ত্তমান আছে, তাহার সন্ধান মিলিয়াছে। এক প্রকার লোহিত হাইড্রোজেন আলোয় গৃহীত সৌর ফটোগ্রাফের পরীক্ষায় জানা যায় যে হাইড্রোজেন সূর্য্যের মধ্যে সমানভাবে ছড়াইয়া নাই, পৃথিবীর আকাশের মেঘের মত স্তূপে স্তূপে বর্ত্তমান আছে। ক্যালসিয়াম আলোয় (H_2.) গৃহীত এইরূপ ফটোগ্রাফে ক্যাল-সিয়ামের উজ্জ্বল স্তূপও হাইড্রোজেনের ন্যায় একই ভাবে সূর্য্যমণ্ডলে বর্ত্তমান আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরে লাল হাইড্রোজেন-রেখায় ফটোগ্রাফ লইয়া ডক্টর হেল হাইড্রোজেন-স্তূপের উচ্চস্তরে বিরাট সাইক্লোন আবিষ্কার করিয়াছেন। সূর্য্যের মধ্যস্থিত প্রতি মূলপদার্থজাত আলোক আত্মকাহিনী প্রকাশ করে, কিন্তু সূর্য্যের মিশ্রিত আলোকের ফটোগ্রাফে সৌরকলঙ্ক-গুলি (sun-spots) ছাড়া কিছু ধরা যায় না। পৃথিবী অপেক্ষাও বৃহৎ হাইড্রোজেনের স্তূপ সৌরকলঙ্কের দিকে ছুটিয়া গিয়াছে, তাহার ছবি পর্য্যন্ত স্পেক্‌ট্রোহেলিয়ো-গ্রাফে উঠিয়াছে।

স্পেক্‌ট্রাম্‌ বা রশ্মিলেখা হইতেও আকাশের অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে ফটোগ্রাফি চাক্ষুষ পরীক্ষার স্থান সম্পূর্ণ ভাবে অধিকার করিয়াছে। ফটো-গ্রাফের প্লেটে প্রয়োগের জন্য নানা প্রকার রঙের আবিষ্কার না হইলে ছোট ও বড় তরঙ্গের রশ্মির স্পেক্‌ট্রাম লইয়া কোনরূপ পরীক্ষা চলিতে পারিত না। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আইসোসিয়ানিন ও কার্ব্বোসিয়ানিন রঙের আবিষ্কার হইতে স্পেক্‌ট্রামের সমস্ত দৃশ্য অংশের ফটো লওয়া সম্ভবপর হয়। ডাইসিয়ানিন, ক্রিপ্টোসিয়ানিন, নিওসিয়ানিন প্রভৃতি রং পরে পরে আসে। ঐগুলির দ্বারা লোহিতের দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত স্পেক্‌ট্রাম গ্রহণ করা যায়। প্লেটে জিলেটিন কম করিয়া দিয়া বেগুনীর দিকে স্পেক্‌ট্রামের ক্ষেত্র একই ভাবে বর্দ্ধিত করা হয়। কিছু দিন হইল, দীপ্তি-বিকীরক (fluorescent) দ্রব্যের ব্যবহার দ্বারা স্পেক্‌ট্রোগ্রাফে এই দিকের ছবি ভালই উঠিতেছে। স্পেক্‌ট্রাম-বিশ্লেষণের মূলকথা এই যে এক এক প্রকার মূল পদার্থের পরমাণু প্রদীপ্ত হইলে স্পেক্‌ট্রোগ্রাফে এক-এক প্রকার রেখাসমষ্টি প্রদান করে এবং রেখাগুলি উহাতে বিশেষ বিশেষ স্থান অধিকার করে। যেমন, সোডিয়াম হইতে নিঃসৃত আলোকের স্পেক্‌ট্রামে অত্যুজ্জ্বল দুইটি হলদে রেখা পাশাপাশি থাকে। যত দূর হইতেই আলোক আসুক, স্পেক্‌ট্রামে ঐরূপ রেখা দেখা গেলে আলোকের উৎসমূলে সোডিয়াম আছে বলিয়া বোঝা যায়। আবার উত্তপ্ত জিনিষের পরমাণু
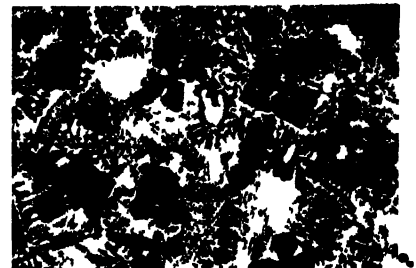
১৮। এক প্রকার মিশ্র ধাতুর ফটোমাইক্রোগ্রাফ
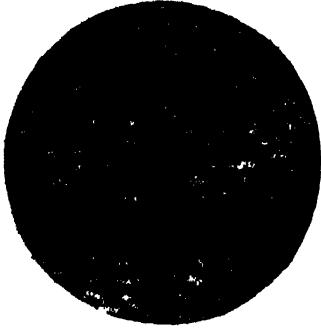
১৯। মাছির পাখার উপরের রোম—২৪৩ গুণ পরিবর্দ্ধিত

হইতে বিচ্ছুরিত আলোক অপেক্ষাকৃত কম তপ্ত পরমাণুর ভিতর দিয়া বহিয়া গেলে ঐ আলোক শোষিত হয়। সূর্য্যের সম্বন্ধে দেখা যায় যে উহার অতিতপ্ত অন্তর্দ্দেশ হইতে নির্গত আলোক উপরের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বাষ্পের মধ্য দিয়া চলিবার কালে পূর্ণদেহে বাহির হইতে পারে না। সূর্য্যের চারি দিকের বাষ্প আলোকের জন্য এমনই ক্ষুধিত হইয়া থাকে যে উহা মিশ্রিত সূর্য্যালোকের কতকাংশ গ্রাস করে। সেই হরণতত্ত্ব অবশ্য গোপন থাকে না। রশ্মি-রেখার চিত্রে যে কৃষ্ণ (dark lines and bands) ফুটিয়া উঠে তাহাতেই আলোক-চোরার পরিচয় দিলে। সূর্য্যের বহির্ভাগের উপাদান বিষয়ে জ্ঞান এই ভাবে লাভ হয়। সূর্য্য নিজে নক্ষত্রদলের একটি। উহা আমাদের অনেক কাছে—নক্ষত্রের সহিত এইটুকুমাত্র প্রভেদ। সুতরাং সৌরগবেষণার ফটোগ্রাফির প্রণালী নক্ষত্রকুলের প্রতিও অনেকাংশে প্রযোজ্য। সূর্য্যের এবং আকাশের অন্য জ্যোতির্ম্ময় বস্তুপিণ্ডের রশ্মি-রেখার অবস্থান গতির জন্য "পরিবর্ত্তিত" হয়। বস্তুর পশ্চাদ্‌গতির জন্য রেখা লোহিতের দিকে সরিয়া যায়। রশ্মি-রেখার অপসারণের পরিমাপ হইতে গতিবেগ নির্দ্ধারণ করা যায়। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের একটা সূত্রমূলক সিদ্ধান্ত—নীহারিকাদের পশ্চাদ্গতি। উহাদের স্পেক্‌ট্রামের ফটোগ্রাফে লোহিতাপসরণের (red-shift) উক্তরূপ গতির বিষয়ে প্রমাণ দিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিকতাবাদ ও "বর্দ্ধমান বিশ্বের" ধারণা সমর্থন করিতেছে। সূর্য্য, নক্ষত্র, নীহারিকাদের উপাদান, অবস্থা, তাপমাত্রা, দূরত্ব
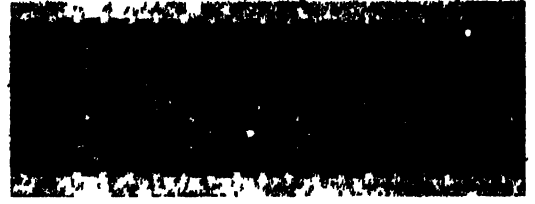
২০। এক প্রকার বীজাণুর (trypanosomes) সিনেমাটোগ্রাফের একাংশ

গৃহীত অসংখ্য ফটোগ্রাফ হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে। আকাশমার্গের বিভিন্ন অবস্থা তুলনা করার পক্ষে ফটোগ্রাফের রেকর্ড অমূল্য। নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে আকাশের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গৃহীত অসংখ্য প্লেট হইতে নিরূপণ করা যায়। বহুসংখ্যক ফটোগ্রাফের প্লেট একত্র করিয়া আকাশকে সমগ্রভাবেও দেখা চলে।

অণুবীক্ষণের পরীক্ষায় ফটোগ্রাফির প্রয়োগ এখন বিস্তৃত ভাবেই হইতেছে। ফটোমাইক্রোগ্রাফির কাজে ছোট একটি ক্যামেরা সাধারণ মাইক্রোস্কোপে লাগাইয়া ব্যবহার করা হয়। উহাতে বহুগুণ পরিবর্দ্ধিত অবস্থায় ছবি উঠে। ধাতুর নমুনা পরীক্ষায় ফটোমাইক্রোগ্রাফি বর্ত্তমানে
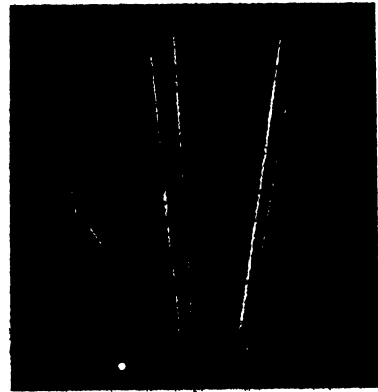
২১। নাইট্রোজেনের মধ্যে আল্‌ফা-কণিকার গমনপথের ফটোগ্রাফ

রাসায়নিক বিশ্লেষণের সহিত সমান ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতেছে। জীবাণুর পরীক্ষায়ও উহার প্রয়োগ হইতেছে। ২০ নং চিত্রে সিনেমা-ফিল্মের একাংশ। উহাতে

১। সাধারণ প্লেটে তোলা ফটোগ্রাফ

২। প্যান্‌ক্রোমাটিক প্লেটে তোলা একই দৃশ্যের ফটোগ্রাফ

৮। ইম্‌ফ্রা-রেড রশ্মিতে গৃহীত আলুর পাতার ছবি। কালো দাগগুলি ধসা রোগের চিহ্ন।
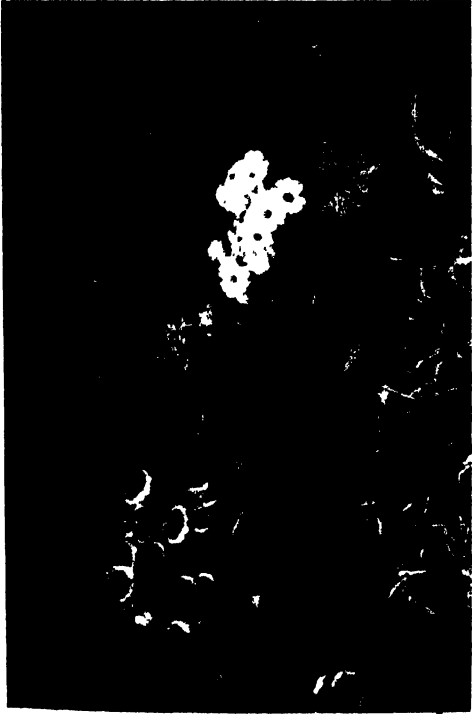
৯। সাধারণ আলোকে গৃহীত একই পাতার ছবি—রোগের চিহ্ন ইহাতে ধরা পড়ে নাই।
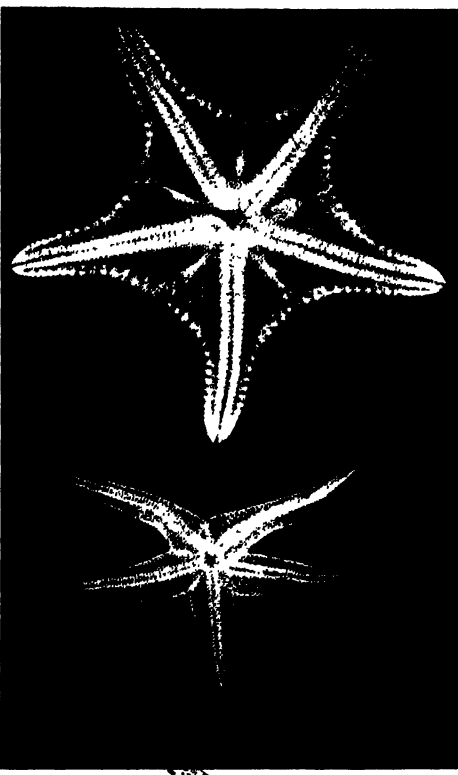
২২। তারা-মাছের একস্‌-রে ছবি

১০। মাউন্ট উইল্‌সন মানমন্দিরের ফটোগ্রাফ—এরোপ্লেন হইতে গৃহীত
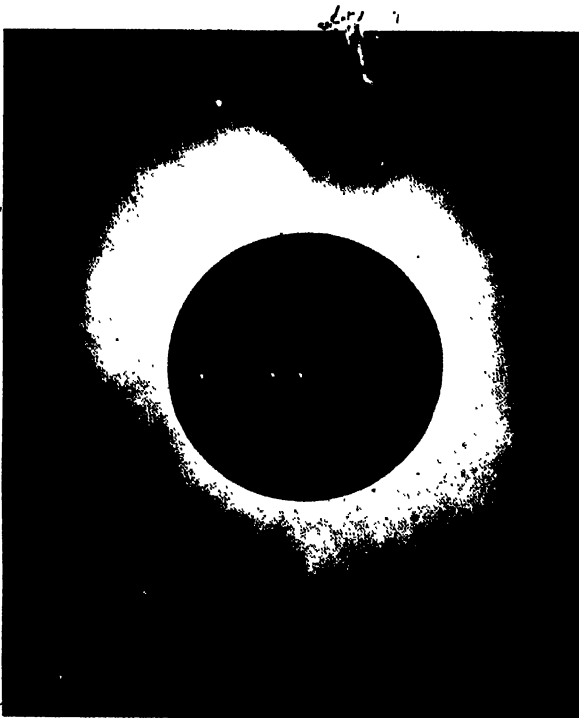
১২। সূর্য্যগ্রহণের সময়ে গৃহীত সৌররশ্মিমণ্ডলের ফটোগ্রাফ
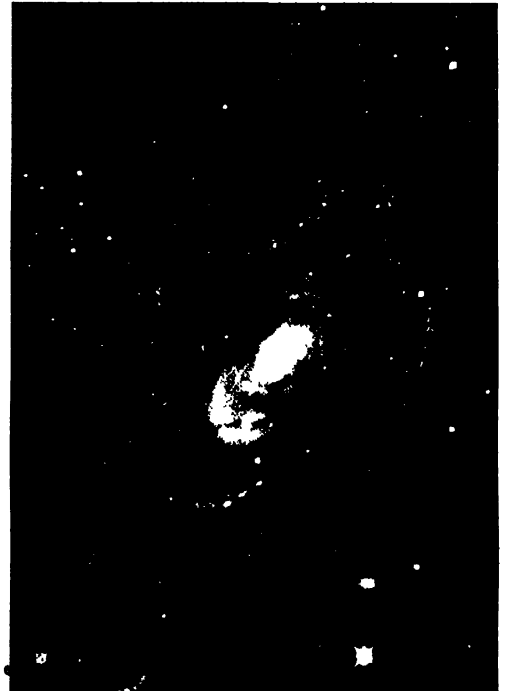
১১। কুণ্ডলিত নীহারিকার ফটোগ্রাফ—মাউন্ট উইল্‌সন মানমন্দিরে গৃহীত

বিষয়-সূচী

বিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। আরও ৬০ গুণ বর্দ্ধিত করিয়া উহাকে পর্দ্দার উপর ফেলা যায়। সুতরাং সিনেমায় বীজাণুগুলি ২৪ হাজার গুণ বর্দ্ধিত অবস্থায় দেখা যায়। স-বর্ণ মাইক্রোফটোগ্রাফিরও প্রচলন হইয়াছে।

পদার্থবিদ্যার গবেষণায় ফটোগ্রাফির সাহায্যে পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গিয়াছে। যদিও আধুনিক শক্তিসম্পন্ন অণুবীক্ষণে দ্রব্যের পরিবর্দ্ধন ৭ হাজার গুণ পর্য্যন্ত হইতে পারে, তবু উহা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণুকে দৃষ্টির গোচরে আনিবার ধার দিয়াও যায় না। বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক সি. আর উইলসন পরমাণুর চলার পথ ফটোগ্রাফে তুলিবার উপায় বাহির করিয়াছেন। রেডিয়াম হইতে বহির্গত আলফা-কণিকা অথবা প্রোটন-পরমাণু ভাঙার কাজে ব্যবহৃত হইয়া ধূলিমুক্ত ও জলীয় বাষ্প সম্পৃক্ত উইলসন-চেম্বারের ভিতর দিয়া সেকেণ্ডে দশ হাজার মাইল বেগে চলিবার কালে নিজে তড়িৎবিশিষ্ট থাকায় ছোট ছোট জলকণাসমূহ উৎপাদন করে এবং গতিপথে কুয়াশাময় দাগ রাখিয়া আপন অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়। ঐ পথের ফটোগ্রাফ লইয়া পরমাণু-সংক্রান্ত আধুনিক ধারণায় আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে। এই ভাবে তোলা ফটোগ্রাফে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ কণিকার গমনপথ সম্পূর্ণ সোজা। কেবল দুই-একটি কণিকা হঠাৎ বক্র পথে চলে। রেডিয়াম হইতে স্বতঃ নির্গত কণিকাগুলির অবিশ্রাম বর্ষণের সাহায্যে পরমাণু ভাঙার চেষ্টায় এই তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় যে বেশীর ভাগ কণিকা পরমাণুর মধ্যস্থিত মূলবস্তুকে আঘাত না করিয়া উহার চারি পাশের বিরাট ফাঁক দিয়া সোজা চলিয়া যায় এবং অতি অল্পসংখ্যক মাত্র কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াসে ধাক্কা খাইয়া বাঁকিয়া পড়ে। ২১ নং চিত্রে কোন কোন গতিপথের দ্বিধাবিভাগ লক্ষ্য করা যাইবে। নাইট্রোজেন-পরমাণুর সহিত আলফা-কণিকার প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলে যে প্রোটন নির্গত হইয়াছে, তাহা ঐ ভাগ-দুইটির সরুটি ধরিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং নাইট্রোজেন-পরমাণু ও আলফা-কণিকা মিলিত হইয়া মোটা রাস্তাটি ধরিয়া চলিয়াছে। অধ্যাপক ব্ল্যাকেট উক্তরূপ অনেক ফটোগ্রাফ তুলিয়া পরমাণুর গঠননির্ণয়-কার্য্যে বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

চিকিৎসার সম্পর্কে এক্স্-রে প্রথম ব্যবহৃত হইলেও এখন পৃথিবীতে যত এক্স্-রে নেগেটিভ তোলা হয়, তাহাদের সংখ্যা, জগতের লোকে সাধারণ ষ্টুডিওতে বর্ত্তমানে নিজেদের যত ফটো তোলায় সে-সমুদয় অপেক্ষা কম হইবে না। প্রথমে বস্তুদানার (crystal) ও পরে ফটোগ্রাফের প্লেটে রঞ্জন-রশ্মি পাঠাইলে উহাতে সমভাবের যে দাগ পড়ে তাহা হইতে বস্তুদানার মধ্যে পরমাণুর সজ্জার আভাস পাওয়া যায়।

ফটো তুলিবার উন্নততর প্রণালীর আবিষ্কারে সুন্দর শিল্প হিসাবে সাধারণ ফটোগ্রাফের মর্য্যাদা বাড়ে নাই বটে, তবে সুসম্পূর্ণ যন্ত্র ও উৎকৃষ্ট উপাদানের সাহায্য পাইয়া সুন্দরকে বুঝিবার ও রূপ দিবার মত প্রতিভা আছে—এমন দুই-এক জন শিল্পী মাঝে মাঝে প্রমাণ করিয়া দিতেছেন যে চারুকলার জগতে অঙ্কিত চিত্রের পাশে ফটোগ্রাফকে স্থান দিলে সত্যকার রসানুভূতিতে বাধা হইবে না।

আসামের বাঙালী-বিদ্বেষ-সমস্যা

শ্রীসান্ত্বনাকুমার দাস, এম-এ

আসাম প্রদেশের প্রবাসী বাঙালী অধিবাসিগণ যে ইদানীং অসমীয়া অধিবাসীদিগের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছেন, তাহা বাহিরেও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান বিদ্বেষের বিস্তার ও ইহার প্রকৃত রূপ হয়ত আজ পর্য্যন্ত বাহিরের লোক অল্পই জানিতে পারিয়াছেন। আসামের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ সংশ্লিষ্ট অসমীয়া স্বার্থরক্ষার ক্রমবর্দ্ধমান আন্দোলনের সহিত জড়িত এই বাঙালী-বিদ্বেষের ইতিহাস জানিতে হইলে এই প্রদেশের মোটামুটি ভৌগোলিক তথ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংবাদ রাখা আবশ্যক।

আসাম প্রদেশ দুইটি উপত্যকায় বিভক্ত। সুরমা উপত্যকার সহিত পার্ব্বত্য অঞ্চল এক বিভাগে ও আসাম উপত্যকা অন্য বিভাগে অবস্থিত। সুরমা উপত্যকার সমুদয় হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীরাই বাংলা-ভাষাভাষী; পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদিগের বিভিন্ন প্রকারের নিজস্ব ভাষা আছে এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা অসমীয়া-ভাষাভাষী তাঁহাদের জনসংখ্যা মাত্র ১৯,৭৫,০০০। ইহার মধ্যে ১৫৭২৭১৯ জন হিন্দু এবং অবশিষ্ট মুসলমান। সমগ্র আসাম প্রদেশের মোট জনসংখ্যাই ৯২ লক্ষের অধিক নহে। ঠিক্ সংখ্যা ৯২,৪৭,৮৫৭। ইহার মধ্যে বাংলা-ভাষাভাষী ৩৯,৬০,৭১২; অসমীয়া ভাষাভাষী ১৯,৯২,৮৪৬।

পূর্ব্বোক্ত সাড়ে পনর লক্ষ অসমীয়া হিন্দু অধিবাসীই আসামের অনসমীয়া স্থায়ী অধিবাসীদিগের উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অধুনা তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপ্রচারে মনোযোগী হইয়াছেন। প্রবাসী বাঙালীরাই ইঁহাদিগের বিদ্বেষ-যজ্ঞের প্রথম ও প্রধান আহুতি। ইঁহাদিগের দলীয় ব্যক্তিরাই তেজপুরের প্রকাশ্য রাজপথে 'বাঙালী খেদাও'-চিহ্নিত পতাকাহস্তে শোভাযাত্রা করিয়া থাকেন; গৌহাটীতে সভা আহ্বান করিয়া "প্রবাসী", "মডার্ণ রিভিউ", "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি পত্রিকা বর্জ্জন ও দাহ করিবার পরামর্শ দেন, ধুবড়ীর "ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েসনে"র পক্ষ হইতে দরবার করিয়া, অসমীয়া মন্ত্রীর সাহায্যে, প্রবাসী বাঙালীকে স্থায়ীভাবে নিয়োগের পরেও চাকুরী হইতে বিতাড়িত করিয়া অসমীয়া স্বার্থ সংরক্ষণের জয়ডঙ্কা বাজাইয়া থাকেন। অথচ সমগ্র আসাম প্রদেশে বঙ্গভাষাভাষীর সংখ্যা অন্য প্রত্যেক ভাষাভাষী অপেক্ষা অধিক। সংখ্যা-গরিষ্ঠদিগকে উপদ্রুত করিবার এরূপ অদ্ভুত চেষ্টা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না।

অসমীয়া মুসলমানেরা বাঙালী-বিদ্বেষপ্রচারে অগ্রণী নহেন। তাহার কারণ এই যে প্রাদেশিক সকল ব্যাপারেই হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ বিভিন্ন; তদুপরি মুসলমানদিগের মধ্যে অসমীয়া-অনসমীয়া বিভিন্নতা কোন দিনই প্রবল হইয়া উঠে নাই। অন্য দিকে বাঙালী মুসলমানদিগের সহযোগিতা ভিন্ন আসামের কোন বৃহত্তর মুস্‌লিম স্বার্থ-সম্পর্কিত প্রশ্নের সু-সমাধান হইতে পারেনা। এই শেষোক্ত কারণে এবং বর্ত্তমানে "লাইন প্রথা"র সমর্থনের প্রয়োজনীয়তায় আসামের মুসলমানদিগকে মুস্‌লিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হইতে হইয়াছে।

অসমীয়া হিন্দুদিগের প্রবাসী বাঙালীদিগের বিরুদ্ধে নালিশ এই যে তাঁহারা নাকি (১) অসমীয়া সংস্কৃতি ও সভ্যতা ধ্বংস করিতেছেন; (২) সামাজিক ব্যাপারে প্রবাসী বাঙালীরা বিবাহাদি দ্বারা আসামে আত্মীয়তা স্থাপন করেন না; (৩) ভাষার ব্যবহার সম্পর্কেও প্রবাসী বাঙালীরা না কি অসমীয়া ভাষা গ্রহণ করেন নাই; (৪) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে প্রবাসী বাঙালীরা না কি, কি শহরে বসবাসের জন্য, কি গ্রামে কৃষিকার্য্যের জন্য, সর্ব্বত্র জমি ক্রয় করিয়া লইতেছেন এবং উন্নততর শিক্ষার সুযোগে তাঁহারা অসমীয়াদিগের প্রাপ্য চাকুরী-সমূহও নিজেরাই করায়ত্ত করিয়া লইতেছেন।

এখন অসমীয়াদিগের বাঙালী-বিদ্বেষের উক্ত কারণ

সমূহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে যে উহার মধ্যে যৌক্তিকতা আছে কি না। (১) প্রাচীন অসমীয়া সংস্কৃতি ও সভ্যতা নামীয় কোন বিশেষ বস্তু কোন দিন ছিল বলিয়া আমরা জানি না*; যদি কিছু থাকে প্রবাসী বাঙালীরা পরোক্ষ প্রভাব দ্বারাও উহাকে ধ্বংস করিতে পারেন এইরূপ ভাবিয়া লইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। উপরন্তু, কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য একবার গড়িয়া উঠিলে তাহা বাহিরের প্রভাবে শীঘ্র নির্ম্মূল হইতেও পারে না। (২) সামাজিক ব্যাপারে অসমীয়া-বাঙালীর আত্মীয়তার দৃষ্টান্ত এখনও আছে এবং ক্রমেই বাড়িতেছে। গৌহাটী ল-কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ জে. বরুয়ার সহিত ঠাকুর-পরিবারের আত্মীয়তা আসামে সর্ব্বজনবিদিত দৃষ্টান্ত। অল্প দিন হইল জোড়হাটের চলিহা-পরিবারের সহিত শিলচরের এক সম্রান্ত বাঙালী-পরিবারের আত্মীয়তা-সংযোগ ঘটিয়াছে। অসমীয়াদিগের মধ্যে যুগোপযোগী শিক্ষার বিস্তার ঘটিলে এবং তাঁহাদিগের মানসিক সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী বাঙালীদিগের সহিত ইঁহাদিগের নিকটতা ক্রমে সামাজিক আত্মীয়তায় পর্য্যবসিত হইবে ইহা নিশ্চিত। কিন্তু বাঙালী-বিদ্বেষ প্রচার দ্বারা এই কার্য্যে কিছুমাত্র সাহায্য করা হইতেছে না। (৩) প্রবাসী বাঙালীরা অসমীয়া ভাষা গ্রহণ করেন নাই এমন কথা প্রচার করিলে মিথ্যা বলা হইবে। একমাত্র গোয়ালপাড়া জেলা ব্যতীত আসাম উপত্যকার সর্ব্বত্রই প্রবাসী বাঙালীরা দৈনন্দিন কার্য্যে অসমীয়া ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। আবার বাঙালী-প্রধান গোয়ালপাড়া জেলায় গায়ের জোরে অসমীয়া ভাষা প্রচলনের চেষ্টাও কিছুমাত্র প্রশংসার যোগ্য নহে। প্রবাসী বাঙালীরা যে তাঁহাদের মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে অসমীয়া ভাষা গ্রহণ করেন নাই সেই বিষয়ে যদি অসমীয়ারা নালিশ করেন তবে তাহারও উত্তর আছে। যেদিন অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী হইবে, সেই দিন প্রবাসী বাঙালীদের অসমীয়া ভাষা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া চলিতে পারে, কিন্তু আজ নহে। অসমীয়া সাহিত্যিকদিগের উচিত তাঁহাদের ভাষাকে সর্ব্বজন-সমাদরযোগ্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অনুমান ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্তও আসামের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বাংলা ভাষায় শিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা পরিচালিত হইত ইহার পর অসমীয়া ভাষা প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে থাকে।* (৪) প্রবাসী বাঙালীদিগের বিরুদ্ধে অসমীয়াদিগের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নালিশের উত্তরে একটু ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন হইবে। বর্ত্তমান বিষয়টিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (ক) প্রবাসী বাঙালীদিগের আসামের বিভিন্ন শহরে বাসোপযোগী জমি ক্রয় সম্বন্ধীয় সমস্যা ইহার মধ্যে একটি। স্থায়ী ভাবে বাস করিবার জন্য প্রবাসী বাঙালীরা যদি শহরে জমি ক্রয়ে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, সম্ভব হইলে তাঁহাদের উদ্যমে সাহায্য করাই অসমীয়া অধিবাসীদিগের কর্ত্তব্য। কারণ কেহ কোন শহরে জমি ক্রয় করিয়া স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া পড়িলে, তাঁহার শীঘ্র সেই স্থান হইতে

* "...As a mater of fact, neither the Assam Valley nor the Surma Valley now contains any people who can claim to be indigenous." "Prativa", Anglo Assamese Weekly, 30-10-37.) আসামের বর্ত্তমান অধিবাসিগণ সকলেই যদি ঔপনিবেশিক হন তাহা হইলে ইহাদের কোন প্রকার প্রাচীন সংস্কৃতি বা সভ্যতা থাকা সম্ভব নহে।

* "Everyone knows that when we assumed lordship in the hills and valleys of Assam in the early part of the 19th century, we brought with us officials from Bengal, and all those years, the Assamese language was not officially recognised. It was only when the Province was regularly formed about 1873-74, that the Assamese language began to be taught in the Primary Schools. It then took another quarter of a century before it reached the High Schools." (Speech by His Excellency the Governor of Assam Late Sir Michael Keane at the opening ceremony of the Silver Jubilee Anglo-Bengali High School, Gauhati.)

আসামের বাঙালী-বিদ্বেষ-সমস্যা

শ্রীসান্ত্বনাকুমার দাস, এম-এ

আসাম প্রদেশের প্রবাসী বাঙালী অধিবাসিগণ যে ইদানীং অসমীয়া অধিবাসীদিগের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছেন, তাহা বাহিরেও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান বিদ্বেষের বিস্তার ও ইহার প্রকৃত রূপ হয়ত আজ পর্য্যন্ত বাহিরের লোক অল্পই জানিতে পারিয়াছেন। আসামের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ সংশ্লিষ্ট অসমীয়া স্বার্থরক্ষার ক্রমবর্দ্ধমান আন্দোলনের সহিত জড়িত এই বাঙালী-বিদ্বেষের ইতিহাস জানিতে হইলে এই প্রদেশের মোটামুটি ভৌগোলিক তথ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংবাদ রাখা আবশ্যক।

আসাম প্রদেশ দুইটি উপত্যকায় বিভক্ত। সুরমা উপত্যকার সহিত পার্ব্বত্য অঞ্চল এক বিভাগে ও আসাম উপত্যকা অন্য বিভাগে অবস্থিত। সুরমা উপত্যকার সমুদয় হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীরাই বাংলা-ভাষাভাষী; পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদিগের বিভিন্ন প্রকারের নিজস্ব ভাষা আছে এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অধিবাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা অসমীয়া-ভাষাভাষী তাঁহাদের জনসংখ্যা মাত্র ১৯,৯৫,০০০। ইহার মধ্যে ১৫৬২৭১৯ জন হিন্দু এবং অবশিষ্ট মুসলমান। সমগ্র আসাম প্রদেশের মোট জনসংখ্যাই ৯২ লক্ষের অধিক নহে। ঠিক্ সংখ্যা ৯২,৪৭,৮৫৭। ইহার মধ্যে বাংলা-ভাষাভাষী ৩৯,৬০,৭১২; অসমীয়া ভাষাভাষী ১৯,৯২,৮৪৬।

পূর্ব্বোক্ত সাড়ে পনর লক্ষ অসমীয়া হিন্দু অধিবাসীই আসামের অনসমীয়া স্থায়ী অধিবাসীদিগের উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অধুনা তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপ্রচারে মনোযোগী হইয়াছেন। প্রবাসী বাঙালীরাই ইঁহাদিগের বিদ্বেষ-যজ্ঞের প্রথম ও প্রধান আহুতি। ইঁহাদিগের দলীয় ব্যক্তিরাই তেজপুরের প্রকাশ্য রাজপথে 'বাঙালী খেদাও'-চিহ্নিত পতাকাহস্তে শোভাযাত্রা করিয়া থাকেন; গৌহাটীতে সভা আহ্বান করিয়া "প্রবাসী", "মডার্ণ রিভিউ", "ভারতবর্ষ" প্রভৃতি পত্রিকা বর্জ্জন ও দাহ করিবার পরামর্শ দেন, ধুবড়ীর "ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েসনে"র পক্ষ হইতে দরবার করিয়া, অসমীয়া মন্ত্রীর সাহায্যে, প্রবাসী বাঙালীকে স্থায়ীভাবে নিয়োগের পরেও চাকুরী হইতে বিতাড়িত করিয়া অসমীয়া স্বার্থ সংরক্ষণের জয়ডঙ্কা বাজাইয়া থাকেন। অথচ সমগ্র আসাম প্রদেশে বঙ্গভাষাভাষীর সংখ্যা অন্য প্রত্যেক ভাষাভাষী অপেক্ষা অধিক। সংখ্যা-গরিষ্ঠদিগকে উপক্রুত করিবার এরূপ অদ্ভুত চেষ্টা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না।

অসমীয়া মুসলমানেরা বাঙালী-বিদ্বেষপ্রচারে অগ্রণী নহেন। তাহার কারণ এই যে প্রাদেশিক সকল ব্যাপারেই হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ বিভিন্ন; তদুপরি মুসলমানদিগের মধ্যে অসমীয়া-অনসমীয়া বিভিন্নতা কোন দিনই প্রবল হইয়া উঠে নাই। অন্য দিকে বাঙালী মুসলমানদিগের সহযোগিতা ভিন্ন আসামের কোন বৃহত্তর মুস্লিম স্বার্থ-সম্পর্কিত প্রশ্নের সু-সমাধান হইতে পারেনা। এই শেষোক্ত কারণে এবং বর্ত্তমানে "লাইন প্রথা"র সমর্থনের প্রয়োজনীয়তায় আসামের মুসলমানদিগকে মুস্লিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হইতে হইয়াছে।

অসমীয়া হিন্দুদিগের প্রবাসী বাঙালীদিগের বিরুদ্ধে নালিশ এই যে তাঁহারা নাকি (১) অসমীয়া সংস্কৃতি ও সভ্যতা ধ্বংস করিতেছেন; (২) সামাজিক ব্যাপারে প্রবাসী বাঙালীরা বিবাহাদি দ্বারা আসামে আত্মীয়তা স্থাপন করেন না; (৩) ভাষার ব্যবহার সম্পর্কেও প্রবাসী বাঙালীরা না কি অসমীয়া ভাষা গ্রহণ করেন নাই; (৪) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে প্রবাসী বাঙালীরা না কি, কি শহরে বসবাসের জন্য, কি গ্রামে কৃষিকার্য্যের জন্য, সর্ব্বত্র জমি ক্রয় করিয়া লইতেছেন এবং উন্নততর শিক্ষার সুযোগে তাঁহারা অসমীয়াদিগের প্রাপ্য চাকুরী-সমূহও নিজেরাই করায়ত্ত করিয়া লইতেছেন।

এখন অসমীয়াদিগের বাঙালী-বিদ্বেষের উক্ত কারণ-

বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে যে উহার মধ্যে যৌক্তিকতা আছে কি না। (১) প্রাচীন অসমীয়া সংস্কৃতি ও সভ্যতা নামীয় কোন বিশেষ বস্তু কোন দিন ছিল বলিয়া আমরা জানি না*; যদি কিছু থাকে প্রবাসী বাঙালীরা পরোক্ষ প্রভাব দ্বারাও উহাকে ধ্বংস করিতে পারেন এইরূপ ভাবিয়া লইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। উপরন্তু, কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য একবার গড়িয়া উঠিলে তাহা বাহিরের প্রভাবে শীঘ্র নির্মূল হইতেও পারে না। (২) সামাজিক ব্যাপারে অসমীয়া-বাঙালীর আত্মীয়তার দৃষ্টান্ত এখনও আছে এবং ক্রমেই বাড়িতেছে। গৌহাটী ল-কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ জে. বরুয়ার সহিত ঠাকুর-পরিবারের আত্মীয়তা আসামে সর্ব্বজনবিদিত দৃষ্টান্ত। অল্প দিন হইল জোড়হাটের চলিহা-পরিবারের সহিত শিলচরের এক সম্রান্ত বাঙালী-পরিবারের আত্মীয়তা-সংযোগ ঘটিয়াছে। অসমীয়াদিগের মধ্যে যুগোপযোগী শিক্ষার বিস্তার ঘটিলে এবং তাঁহাদিগের মানসিক সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী বাঙালীদিগের সহিত ইঁহাদিগের নিকটতা ক্রমে সামাজিক আত্মীয়তায় পর্য্যবসিত হইবে ইহা নিশ্চিত। কিন্তু বাঙালী-বিদ্বেষ প্রচার দ্বারা এই কার্য্যে কিছুমাত্র সাহায্য করা হইতেছে না। (৩) প্রবাসী বাঙালীরা অসমীয়া ভাষা গ্রহণ করেন নাই এমন কথা প্রচার করিলে মিথ্যা বলা হইবে। একমাত্র গোয়ালপাড়া জেলা ব্যতীত আসাম উপত্যকার সর্ব্বত্রই প্রবাসী বাঙালীরা দৈনন্দিন কার্য্যে অসমীয়া ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। আবার বাঙালী-প্রধান গোয়ালপাড়া জেলায় গায়ের জোরে অসমীয়া ভাষা প্রচলনের চেষ্টাও কিছুমাত্র প্রশংসার যোগ্য নহে। প্রবাসী বাঙালীরা যে তাঁহাদের মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে অসমীয়া ভাষা গ্রহণ করেন নাই সেই বিষয়ে যদি অসমীয়ারা নালিশ করেন তবে তাহারও উত্তর আছে। যেদিন অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্থায় সমৃদ্ধিশালী হইবে, সেই দিন প্রবাসী বাঙালীদের অসমীয়া ভাষা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া চলিতে পারে, কিন্তু আজ নহে। অসমীয়া সাহিত্যিকদিগের উচিত তাঁহাদের ভাষাকে সর্ব্বজন-সমাদরযোগ্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অনুমান ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্তও আসামের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বাংলা ভাষায় শিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা পরিচালিত হইত ইহার পর অসমীয়া ভাষা প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে থাকে।* (৪) প্রবাসী বাঙালীদিগের বিরুদ্ধে অসমীয়াদিগের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নালিশের উত্তরে একটু ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন হইবে। বর্ত্তমান বিষয়টিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (ক) প্রবাসী বাঙালীদিগের আসামের বিভিন্ন শহরে বাসোপযোগী জমি ক্রয় সম্বন্ধীয় সমস্যা ইহার মধ্যে একটি। স্থায়ী ভাবে বাস করিবার জন্য প্রবাসী বাঙালীরা যদি শহরে জমি ক্রয়ে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, সম্ভব হইলে তাঁহাদের উদ্যমে সাহায্য করাই অসমীয়া অধিবাসীদিগের কর্ত্তব্য। কারণ কেহ কোন শহরে জমি ক্রয় করিয়া স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া পড়িলে, তাঁহার শীঘ্র সেই স্থান হইতে

---

* "...As a mater of fact, neither the Assam Valley nor the Surma Valley now contains any people who can claim to be indigenous." ("Prativa", Anglo Assamese Weekly, 30-10-37.) আসামের বর্ত্তমান অধিবাসিগণ সকলেই যদি ঔপনিবেশিক হন তাহা হইলে ইহাদের কোন প্রকার প্রাচীন সংস্কৃতি বা সভ্যতা থাকা সম্ভব নহে।

* "Everyone knows that when we assumed lordship in the hills and valleys of Assam in the early part of the 19th century, we brought with us officials from Bengal, and all those years, the Assamese language was not officially recognised. It was only when the Province was regularly formed about 1873-74, that the Assamese language began to be taught in the Primary Schools. It then took another quarter of a century before it reached the High Schools." (Speech by His Excellency the Governor of Assam Late Sir Michael Keane at the opening ceremony of the Silver Jubilee Anglo-Bengali High School, Gauhati.)

চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা না-থাকায় ক্রমে ক্রমে স্থানীয় স্বার্থের সহিত তাঁহার সংযোগ ও ঘনিষ্ঠতা বাড়িবার কথা। অন্য পক্ষে কেহ কোন শহরে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে যদি অনেক দিনও অবস্থান করেন তথাপি তাঁহার সেই স্থানের উপর কোন বিশেষ আকর্ষণ না-হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং যে-সকল প্রবাসী বাঙালী আসামে আছেন তাঁহাদের স্থায়ী হইবার সুযোগ দেওয়াই অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত। এতৎসত্ত্বেও বড়পেটা ও অন্যান্য অনেক শহরে অতিপুরাতন প্রবাসী বাঙালীদিগকেও মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী জমি দেওয়া হইতেছে না। (খ) এই সম্পর্কের দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে কৃষিকার্য্যোপযোগী জমি ক্রয়-বিষয়ক। 'লাইন প্রথা' প্রবর্ত্তন ও অন্যান্য সরকারী নির্দ্দেশের ফলে বাঙালী কৃষকদিগের পক্ষে কৃষিকার্য্যের জন্য জমির পত্তন পাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। আসামের বর্ত্তমান কৃষি-উন্নতির মূলে যদিও বাঙালী কৃষকদিগের কৃতিত্বের অংশ শতকরা নব্বই ভাগের কম হইবে না, তথাপি অসমীয়া স্বার্থ-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নূতন করিয়া জমি পত্তন দেওয়া পরোক্ষভাবে বন্ধ করা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞদিগের মতানুযায়ী যদি বাঙালী কৃষকদিগকে আসামে আসিতে দেওয়া আসামের বৃহত্তর স্বার্থের বিরোধী বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে বিশেষজ্ঞদিগের পরামর্শ অনুসরণ করা অবশ্য সমীচীন হইবে। কিন্তু অসমীয়া অধিবাসীদিগের বাঙালী-বিদ্বেষ যদি ইতিমধ্যে প্রশমিত না হয় এবং বর্ত্তমানের স্থায়ী বাসিন্দা বাঙালীদিগের জমি ক্রয়, চাকুরীতে নিয়োগ, মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাব্যবস্থা ও অন্যান্য আরও অনেক ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকার যদি কার্য্যতঃ অসমীয়া ও বাঙালীদের সমতুল্য বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে প্রবাসী বাঙালীরা আসামে অধিক সংখ্যায় বাঙালীর আগমন তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার অনুকূল বলিয়াই মনে করিবেন। (গ) অসমীয়া-বাঙালী বিরোধের আর একটি কারণ নিহিত রহিয়াছে চাকুরীর ব্যাপারে। আসামে বাঙালীর চাকুরী-সমস্যার দুইটি অঙ্গ আছে। প্রথমতঃ, সুরমা-উপত্যকার বাঙালীদিগের চাকুরীর কথাই ধরা যাউক। আসামের সমস্ত সরকারী চাকুরীতে দুই উপত্যকার হিন্দু প্রার্থী নির্ব্বাচনে প্রায় আধাআধি ভাগ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে অধিক ক্ষেত্রেই শ্রীহট্ট জেলার যুবকেরা ভাগ্যপরীক্ষায় জয়লাভ করিয়া থাকেন। অতএব যত দিন শ্রীহট্ট জেলা আসাম প্রদেশের মধ্যে থাকিবে কিংবা যত দিন আসামের রাজনৈতিক ব্যাপারে শ্রীহট্টের প্রভাব বর্ত্তমানের ন্যায় অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তত দিন অসমীয়া যুবকেরা শ্রীহট্টের মেধাবান্ যুবকদিগের সহিত প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা করা অপেক্ষা শতকরা মাত্র পঞ্চাশটি চাকুরী লইয়াই অধিকতর সন্তুষ্ট থাকিবেন। (ঘ) দ্বিতীয়তঃ, চাকুরী ব্যাপারে অসমীয়া যুবকদিগের আর এক সংঘাত ঘটে আসাম-উপত্যকার বাঙালী প্রার্থীদিগের সহিত। এই স্থানে বলিয়া রাখা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আসাম উপত্যকার অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালী হিন্দু অধিবাসীদিগের জনসংখ্যা ৫,৮২,৫২৬। অসমীয়া হিন্দুদিগের সংখ্যা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রবাসী বাঙালী চাকুরী প্রার্থীদিগের সহিত অসমীয়া প্রার্থীরা সকল ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে সাহস করেন না, আবার তাঁহাদিগের জন্য (বিহারের ন্যায়) জনসংখ্যার অনুপাতে চাকুরী পাইবার ধরাবাঁধা নিয়ম করিয়া দিতেও অসমীয়া ঔদার্য্যে কুলাইয়া উঠে না। সুতরাং সমস্যাও অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। কিন্তু এইরূপে প্রবাসী বাঙালীদিগের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া রাখা অসমীয়াদিগের পক্ষে অন্যায় হইতেছে।*

আসামের সরকারী নীতি অনুযায়ী "ডমিসাইল সার্টিফিকেট" প্রাপ্ত অনসমীয়া ও অসমীয়া ব্যক্তির মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ থাকিবার কথা নহে। কিন্তু কার্য্যতঃ অসমীয়া স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন ব্যাপারেই বর্ত্তমানে এই সরকারী নীতি অনুসৃত হইতে দেখা যায় না। চাকুরী-

* "There are a million people in the Valley whose tongue is Bengali. This great, clever, and advanced community, rightly proud of their culture and their position, cannot be treated as lepers and untouchables and be ignored by a Government which is the Government of the whole Province." (*Ibid.*)

প্রদানকারী বিভাগীয় নিয়োগকর্ত্তাগণ যে অপেক্ষাকৃত নির্গুণ অসমীয়া প্রার্থীকেও অতিরিক্ত সুবিধা দিয়া থাকেন, ইহা অবিসম্বাদী সত্য। শিক্ষা-বিভাগের বৃত্তি-বিতরণে, এমন কি গৌহাটী কলেজে ও ডিব্রুগড় মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তির ব্যাপারেও অসমীয়া-স্বার্থ যে প্রবাসী বাঙালীদিগের স্বার্থ হইতে পৃথক্ ইহা সংশ্লিষ্ট পদস্থ কর্ম্মচারী বা মন্ত্রিগণ কোনমতেই ভুলিতে পারেন না। বিশেষতঃ আসামের মাধ্যমিক শিক্ষা-বিভাগে, অসমীয়া স্বার্থসংরক্ষণের অজুহাতে, যে বাঙালী-বিদ্বেষী অনাচার চলিতেছে তাহার আর তুলনা নাই।

আসামের যুক্তিহীন বাঙালী-বিদ্বেষের যে ধূয়া নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের পরোক্ষ প্রভাবে বিস্তার লাভ করিতেছে, তাহার ব্যাপক আক্রমণ হইতে প্রবাসী-বাঙালীদিগের আত্মরক্ষা করিতেই হইবে। ইহার জন্য প্রবাসী বাঙালীদিগকে হয় অদূর ভবিষ্যতে সমবেত ভাবে শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলাসহ বাংলা দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে, কিংবা আসামে থাকিতে হইলে এই প্রদেশের সমস্ত প্রবাসী বাঙালীদিগের সংগঠন দ্বারা অসমীয়া বিরোধিতার প্রতিরোধকার্য্যে মনোযোগী হইতে হইবে।

কিন্তু ইহারও পূর্ব্বে অসমীয়া-বাঙালী ঐক্যবিস্তারের শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি? গৌহাটীর প্রবীণ ও জ্ঞানবৃদ্ধ, শ্রদ্ধার্হ রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে আসাম সমবাস সম্প্রদায়ের যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া ইহার মুখপত্রস্বরূপ একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ দ্বারা বাঙালী-অসমীয়া স্বার্থের পার্থক্য হ্রাস করিবার চেষ্টা চলিতে পারে। ইহা ব্যতীত আসামের নেতৃস্থানীয় প্রবাসী বাঙালীদিগের সহিত ব্যক্তিগত আলোচনার সাহায্যেও অসমীয়া নেতারা এই সমস্যা-সমাধানে সচেষ্ট হইতে পারেন। আসামের বৃহত্তর স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্যই যে অদূর ভবিষ্যতে এইরূপ সহযোগিতার প্রয়োজন হইবে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

জাগ্রত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

হও জাগ্রত মন্ত্রিত মুক্তপথে,
তব দুর্জ্জয় দুর্বার শক্তিস্রোতে,
ঘন দুর্ভেদ দুশ্ছেদ বন্ধ যত
কর ঝঞ্ঝাবিমর্দ্দিত খণ্ড শত;

বজ্রসম তব কণ্ঠ উঠুক গর্জ্জি,
প্রলয়ধার সহ অগ্নিশিখা বর্জ্জি'
বাজে শঙ্খ শত দুন্দুভি সাথে'
প্রলয়ের ঘন বাদ্য,
রুদ্র ছাড়িছে হুঙ্কার ঘোর
পিশাচ করিছে শ্রাদ্ধ।

তবু উন্নত রহ উন্নত রহ
উদ্যত কর শির,
শত শঙ্কাতে ডঙ্কা বাজাও
স্পর্দ্ধিত রহ বীর।

অম্বর ভেদি উল্কা উঠিল জ্বলি,
গ্রহতারাদল নিমেষে পড়িছে খলি,
ডম্বরু তব বাজাও,
জটাবন্ধন সাজাও,
বিশ্বভুবনে একেলা দাঁড়াও বলী!

কর দুঃখবাঁধন ছিন্ন,
কর মোহকবাট দীর্ণ,
কোটি ভুজঙ্গ অঙ্গনে কর নৃত্য,
রঙ্গ-লহরে সঙ্গবিহীন
জাগুক তোমার চিত্ত;
হও বন্দিত শুভমন্ত্রিত দূর যাত্রাপথে,
অতি দুঃসহ তব দুর্জ্জয় নব স্বর্গরথে।

১৮৫৪ সনে যখন এই স্থানের রেভেনিউ সার্ভে হয় এবং মানচিত্র প্রস্তুত হয়, তখন ভাগীরথীর মূল প্রবাহ বামুন-পুকুরের অব্যবহিত উত্তর দিয়া প্রবাহিত হইত। (মানচিত্রের প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য)। ভাগীরথীর প্রবাহ বর্ত্তমানে এই খাত হইতে সরিয়া গিয়াছে। (আধুনিক মানচিত্র দ্রষ্টব্য) সেন-আমলে এই খাতেই ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। গঙ্গাপ্রবাহের যথা-সম্ভব নিকটবর্ত্তী থাকাই গঙ্গাতীরে রাজধানী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল। এই অনুমান সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে সেন-রাজধানী নদীয়া নগরী গঙ্গার দক্ষিণ তীর জুড়িয়া সেই আমলে অবস্থিত ছিল। মিন্‌হাজের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিগুলি বিচার্য্য।

"The fame of the intrepidity, gallantry and victories of Muhammad-i-Bakhtiyar had also reached Rai Lakhmaniya, *whose seat of Government was the city of Nudiah.*" Raverty. P. 554.

"Muhammad-i-Bakhtiyar suddenly appeared before the *city of Nudiah.*" *Ibid.* P. 557.

"Most of the Brahmins and inhabitants of that place (*i. e.*, Nudiah) left and retired into the province Sonkanat, the cities and towns of Bang and towards Kamrud." *Ibid.* P. 557.

এই সমস্ত হইতেই নদীয়া যে বড় শহর ছিল এবং ইখ্‌তিয়ারুদ্দিনের আক্রমণের সময় রাজা তথায় বাস করিতেছিলেন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নহে। গঙ্গার দক্ষিণ পার হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে চারি-পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত এই শহর বিস্তৃত ছিল। মনে রাখিতে হইবে, এই সময় জলঙ্গী নদী এই স্থানে ছিল না; কাজেই গঙ্গার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব তীর জুড়িয়া বেশ জমাট শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিক্রমপুরে সেন-রাজগণের সরকারী রাজধানী ছিল, নদীয়া এবং লক্ষ্মণাবতীতে অপর দুই রাজধানী ছিল। সেন-রাজগণের সর্ব্বপ্রাচীন রাজধানী নদীয়াতেই ছিল, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে।

বাংলার ইতিহাস যাঁহারা কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, সেন-বংশের সৌভাগ্যের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মণ সেনের পিতামহ বিজয় সেন। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ীর পবনদূতে দক্ষিণ দিক হইতে আগত পবনকে কবি ত্রিবেণীর পরেই, স্কন্ধাবার এবং রাজধানী বিজয়পুরে, যাইতে বলিয়াছেন। সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাই বোধ হয় যে ইহা নদীয়া নগরীস্থিত সেন-রাজধানী ভিন্ন অন্য কোন স্থান হইতে পারে না। ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামের উত্তরে অবস্থিত, বল্লাল-দীঘি এবং বল্লাল-ঢিবি চিহ্নিত, প্রাচীন সেন-রাজধানী নদীয়া নগরীকে অতিক্রম করিয়া অন্য কোন অজ্ঞাত অখ্যাত স্থানে বিজয়পুর অবস্থিত ছিল,—এই কল্পনার সার্থকতা দেখি না। এই বিচারে নদীয়ারই প্রাচীন নাম বিজয়পুর ছিল—এই সম্ভাবনাই স্পষ্টীকৃত হয়।* কাজেই সেন-বংশের প্রথম বিখ্যাত রাজা বিজয় সেনের নামানুসারে কৃতনামা রাজধানী বিজয়পুর সেন-বংশের প্রাচীনতম রাজধানী ছিল। বিক্রমপুর পরে বিজিত হয় এবং যে কারণে জাহাঙ্গীরের সুবাদার ইস্‌লাম খাঁ বাংলার রাজধানী রাজমহল হইতে পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকায় স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হন, সেই কারণেই বাংলার সরকারী রাজধানী সেন-যুগে নদীয়া-বিজয়পুর হইতে বিক্রমপুরে স্থানান্তরিত হইয়া থাকিবে। উত্তরবঙ্গ এবং বিহার হইতে পাল-বংশের রাজত্ব নিঃশেষে লুপ্ত হইলে পাল-রাজধানী রামাবতী ও মদনাবতী লক্ষ্মণাবতী নামে বিখ্যাত হইয়া উঠে। সুলতানী আমলে লক্ষ্মণাবতীতেই সুলতানগণের রাজধানী ছিল। লক্ষ্মণাবতীর "গৌড়" নাম অপেক্ষাকৃত আধুনিক। হুমায়ুন এই নগরের নাম রাখেন জান্নতাবাদ। আইন-ই-আকবরীতে আবুলফজল্ লিখিয়াছেন—

"জান্নতাবাদ একটি প্রাচীন শহর। কিছুকাল ইহা বাংলার রাজধানী ছিল এবং লক্ষ্মণাবতী নামে বিখ্যাত ছিল। কিছুদিন ইহা গৌড় নামেও পরিচিত ছিল।" (Trans. Jarret. II. P. 122)

গোর (কবর) শব্দের সহিত গৌড়ের ধ্বনিসাদৃশ্য হুমায়ুনের ভাল লাগিল না, তিনি গৌড় নাম বদলাইয়া জান্নতাবাদ করিলেন।

মুগিসুদ্দিন যুজবকের ৬৫৩ হিজরিতে লক্ষ্মণাবতী

* পবনদূতের সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম-এ, মহাশয় পবনদূতের ভূমিকায়, পৃ. ২৫-২৬, অনুরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন।

চৈতন্যের নগর-সঙ্কীর্তনের পথানুসরণ

বিষয়-সূচী

KISHENAGUR

Santipour

Barnaddi

Bannerpara

Narzingpour

Ghyaspour

টাকশালে মুদ্রিত মুদ্রায় নদীয়ার নাম দেখিয়া রাখালবাবু যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যে ঐ বৎসরই নদীয়া বিজিত হয়, তাহার পূর্ব্বে নহে,—এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করা যায় না। প্রথম কথা এই যে, বাংলায় মুসলমান-প্রতিষ্ঠিত আদি রাজ্য প্রায় শতাব্দ পর্য্যন্ত গঙ্গার উত্তরে মালদহ ও দিনাজপুর জেলা এবং গঙ্গার দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার উত্তরাংশে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রবল উড়িষ্যা-রাজগণের প্রতিবন্ধকতায় দক্ষিণ দিকে উহা বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই। সেনরাজগণ পূর্ব্ববঙ্গে প্রস্থান করিলে, নদীয়া অঞ্চল করতলগত রাখার মত বল আদি মুসলমান সুলতানগণের ছিল কিনা সন্দেহ। কাজেই নদীয়া প্রথমে বিজিত হইয়া থাকিলেও রাজনৈতিক কারণে পরিত্যক্ত এবং ৬৫৩=১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্ব্বিজিত হওয়া অসম্ভব নহে। দ্বিতীয় কথা এই যে, বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির ১৯২২ সনের পত্রিকায় ৪১০ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন সাহেব দেখাইয়াছেন যে, মুঘিসুদ্দিনের মুদ্রায় যেমন "মিন্ খরাজ নদীয়া" অর্থাৎ "নদীয়ার রাজস্ব হইতে" এই কথা কয়টি আছে, পরবর্তী সুলতান রুকনুদ্দিনের ৬৯০ হিজরির মুদ্রায় আছে—"মিন্ খরাজ বঙ্গ" এবং সুলতান জলালুদ্দিনের ৭০৯ হিজরির মুদ্রায়ও আছে "মিন্ খরাজ বঙ্গ"। রাখালবাবুর যুক্তি মানিতে হইলে স্বীকার করিতে হয়, এক সুলতান বঙ্গ, অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গ জয় সমাপ্ত করিবার কয়েক বৎসর পরেই আবার অপর সুলতানকে বঙ্গ জয় করিতে হইয়াছিল। কাজেই এই যুক্তি ঘাতসহ নহে। নদীয়ায় যে অন্যতম সেন-রাজধানী ছিল এবং ইখ্‌তিয়ারুদ্দিন মুহম্মদ খলজি এই রাজধানীই আক্রমণ করিয়াছিলেন, প্রায় সমসাময়িক ঐতিহাসিকের লিখিত এই বিবরণে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বল্লাল-ঢিবি খুঁড়িলে সেন-রাজত্বের অনেক স্পষ্টতর চিহ্ন আবিষ্কৃত হইতে পারে। ভারতীয় প্রত্নবিভাগ বাংলা দেশকে অতিমাত্রায় অবহেলা করিয়া আসিতেছেন। পাহাড়পুর-খননের ফলে দেখা গিয়াছে, বাংলা দেশের ঢিবিসমূহ উপেক্ষার বস্তু নহে। প্রত্ন-বিভাগের পূর্ব্বচক্রের অধ্যক্ষ প্রত্নপ্রেমিক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের দৃষ্টি আমরা সানুনয়ে বল্লাল-ঢিবির প্রতি আকৃষ্ট করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতেছি।

দ্বিতীয় সমস্যা

দ্বিতীয় সমস্যা, নদীয়া শহরের পরবর্তী ইতিহাস এবং চৈতন্যের জন্মকালীন নদীয়ার অবস্থিতি নির্ণয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, মিন্‌হাজ বলিয়াছেন যে মুসলমান আক্রমণের ভয়ে নদীয়ার বহু অধিবাসী জগন্নাথ (উড়িষ্যা) বঙ্গ ও কামরূপে পলাইয়া গিয়াছিল। মিন্‌হাজ বলেন, "মুহম্মদ-ই-বক্তিয়ার নদীয়াকে জনশূন্য অবস্থায় ফেলিয়া লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী স্থাপিত করিলেন।" (Raverty, p. 558.) এই বিধ্বস্ত নদীয়া নিশ্চয়ই বহুদিন পর্য্যন্ত জনহীন অবস্থায় পড়িয়া ছিল। মুসলমান আধিপত্য মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের উত্তরাংশে সীমাবদ্ধ হইলে ধীরে ধীরে লোকজন আবার নিজ নিজ বাড়ী-ঘরে ফিরিতে লাগিল। এই সম্পর্কে বাংলার বিনষ্ট নগরীগুলির বর্ত্তমান অবস্থার পর্য্যালোচনা শিক্ষাপ্রদ হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের বিনষ্ট নগরীগুলির সহিত আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আছি। ঢাকা জেলায় মুন্সীগঞ্জ মহকুমাস্থ গৌরবময়ী সেন-রাজধানী বিক্রমপুর নগরী অধুনা রামপাল নামে পরিচিত। প্রাচীন রাজধানী প্রায় ৫×৫ মাইল স্থান জুড়িয়া অবস্থিত ছিল।* এই প্রকাণ্ড নগরের শেষ চিহ্ন আজ নগরের কেন্দ্রে স্থিত পরিখাবেষ্টিত বল্লাল-বাড়ী এবং নগরের সীমার মধ্যে অবস্থিত অনেকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আর তাহাদের তীরে তীরে "দেউল" নামে পরিচিত বহুসংখ্যক দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। প্রাচীন নগর এখন প্রায় পঞ্চাশটি গ্রামে বিভক্ত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রাচীন রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমাংশ অদ্যাপি নগর-কস্‌বা নামে পরিচিত। অনেকেই জানেন, কস্‌বা একটি পারসী শব্দ এবং উহা "নগর" শব্দের সমানার্থক। এই নগর-কসবা অদ্যাপি ধনী বণিকগণের আবাসস্থল এবং সৌধ-প্রাচুর্য্যে নগরভ্রান্তি আনয়ন করে। বিক্রমপুর নগরের

* প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪৪, সংখ্যায় মুদ্রিত মদীয় "প্রাচীন বঙ্গে দারু-ভাস্কর্য" প্রবন্ধে প্রকাশিত শ্রীবিক্রমপুর নগরীর মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

অবশেষ যে বর্ত্তমান নগর-কস্‌বা, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই এই কথা স্বীকার করিবেন। ঢাকা জেলায় প্রাচীনতর একটি নগর সাভারে অবস্থিত ছিল। তথায়ও ধনী বণিকগণের বাসভূমি, সৌধপ্রাচুর্য্যে নগরভ্রান্তি-আনয়নকারী অনুরূপ অবশেষ অদ্যাপি রহিয়া গিয়াছে। ঢাকা জেলার অন্যতম প্রাচীন নগর সুবর্ণগ্রাম সম্বন্ধেও অবিকল সেই কথাই প্রযোজ্য—তথায়ও অনুরূপ অবশেষ পানাম নামে পরিচিত এবং ধনী বণিকগণের আবাসস্থল। বর্ত্তমানে ফরিদপুর জেলার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত শ্রীপুর নগরেরও কেদারপুর নামে পরিচিত অনুরূপ অবশেষ বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত প্রাচীন নগরেরই এইরূপ অবশেষ শত শত বৎসর পরেও বর্ত্তমান থাকিতে দেখিয়া মনে হয়, বিধ্বস্ত নবদ্বীপেরও অনুরূপ অবশেষ বর্ত্তমান রহিয়া গিয়াছিল। চৈতন্যের নগর-ভ্রমণের এবং নগর-সঙ্কীর্ত্তনের বিবরণে বৃন্দাবনদাস নবদ্বীপের পাড়াগুলির যে পরিচয় লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন,* তাহাতে দেখা যায়, সমস্ত প্রাচীন নগরীর মত,—এমন কি ইংরেজ রাজধানী কলিকাতারও মত, নবদ্বীপ নগরে শাঁখারীপাড়া, তাঁতীপাড়া, গোয়ালপাড়া, বানিয়াপাড়া, মালীপাড়া, তাম্বুলীপাড়া ইত্যাদি বর্ত্তমান ছিল। মধ্যখণ্ডের ২৩শ অধ্যায় হইতে বুঝা যায়, শিমলিয়া গ্রামে কাজিপাড়ার দক্ষিণে, ঐ আমলের অবশেষ নবদ্বীপ নগরীর পূর্ব্বাংশে, শাঁখারীপাড়া, তাঁতীপাড়া ইত্যাদি অবস্থিত ছিল। গঙ্গার তীরে তীরে ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান ছিল। ঢাকা জেলায় শ্রীবিক্রমপুর নগরীর আয়তন যেমন কতকগুলি গ্রামে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, নবদ্বীপের আয়তনও তেমনি অনেকগুলি পাড়ায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। নগরের অবশেষ গঙ্গাতীর-সংলগ্ন হইয়াছিল।

ইহা সর্ব্বজনস্বীকৃত যে বর্ত্তমান কালে গঙ্গা আধুনিক নবদ্বীপের পূর্ব্বভাগ দিয়া প্রবাহিত বটে, কিন্তু পূর্ব্বে উহা নবদ্বীপের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইত। বঙ্গের প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য মানচিত্র ভেন্‌ডেন্‌ব্রুকের মানচিত্র ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত হইয়াছিল। (Hunter's *Statistical Account of the 24 Parganas and Sundarbans.* Dr. Blochmann's *Note in the Appendix*. P. 361.) এই মানচিত্র হইতে আবশ্যক অংশের বর্দ্ধিতায়ন চিত্র এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে দেখা যাইবে, এই সময় নবদ্বীপের পশ্চিম দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। ইহার কিঞ্চিদধিক শতাব্দ পরে অঙ্কিত (১৭৬৪ খ্রীঃ) রেণেল সাহেবের মানচিত্রের সহিত ব্রুকের মানচিত্র মিলাইলেই দেখা যাইবে যে, নবদ্বীপের পশ্চিমস্থ গঙ্গাপ্রবাহ তখন পর্য্যন্ত অঙ্কনযোগ্য ও সচল আছে বটে, কিন্তু গঙ্গার প্রধান স্রোত নবদ্বীপের উত্তর দিয়া নবদ্বীপের পূর্ব্ববাহিনী হইয়া দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। নবদ্বীপের পশ্চিমস্থ ভাগীরথীর এই প্রাচীন খাত বর্ষায় আজিও সচল হয়। পূর্ব বর্ষাকালে আমি ইহার উপরে নৌকাযোগে ভ্রমণ করিয়া ইহার খাতের পরিসর প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সরকারী সার্ভে-বিভাগের আধুনিকতম মানচিত্র এই সঙ্গে প্রকাশিত হইতেছে। দেখা যাইবে যে, অদ্যাপি এই খাত মানচিত্রে অঙ্কিত হয় এবং অদ্যাপি উহাই নদীয়া ও বর্দ্ধমান জেলার সীমানা, নদীয়ার পূর্ব্বস্থ আধুনিক প্রবাহটি নহে।

এই প্রাচীন খাতের পূর্ব্বতীরেই চৈতন্যের আমলের নবদ্বীপের ব্রাহ্মণপল্লী অবস্থিত ছিল, চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা হইতে ইহাই বুঝা যায়। মানচিত্রে চৈতন্যের নগরকীর্ত্তনের পথ অনুধাবন করিলে এই বিষয়ে সন্দেহ মাত্র থাকে না।

শতবার-উক্ত কথার পুনরুক্তি অনাবশ্যক, আমি অতি সংক্ষেপে বিষয়টির অবতারণা করিতেছি।

চৈতন্যভাগবতে আছে, চৈতন্য গঙ্গাতীরের পথ ধরিয়া আপনার বাড়ীর ঘাটে আগে বহু নৃত্য করিয়া মাধাইয়ের ঘাটে গেলেন। পরে বারকোণা ঘাট ও নাগরিয়া ঘাট দিয়া গঙ্গানগর গ্রাম হইয়া শিমুলিয়া গেলেন। তথায় কাজির ঘরদুয়ার ভাঙিয়া কাজিকে দণ্ড করিলেন। শিমুলিয়া গ্রাম বর্ত্তমানে বামুনপুকুর নামে পরিচিত, তথায়ই অদ্যাপি এই চৈতন্য-দণ্ডিত এবং সেই কারণে বৈষ্ণবগণের শ্রদ্ধেয় কাজির কবর বিদ্যমান আছে। চৈতন্যের নিজের ঘাট, মাধাইয়ের ঘাট, বারকোণা ঘাট,

* চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়। মধ্যখণ্ড ২৩শ অধ্যায়। অমৃতবাজার পত্রিকা আপিস হইতে প্রকাশিত সংস্করণ।

খাতে প্রবাহিত ছিল না। রুকের মানচিত্র দেখিলেই উহার সেই সময়কার খাতের অবস্থান বুঝা যাইবে। রুকের মানচিত্রে এই স্থানে একটু নামের গোলমাল আছে। রুক আম্বোয়া উত্তরে এবং আম্বোক অর্থাৎ অম্বিকা=কালনা দক্ষিণে দেখাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বিপরীত হইবে। কাজেই রুকের ম্যাপে যথায় আম্বোয়া চিহ্নিত আছে, উহা প্রকৃতপক্ষে অম্বিকা-কালনা। উহারই বিপরীত দিকে অর্থাৎ শান্তিপুরের অব্যবহিত উত্তরে জলঙ্গী আসিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে। চৈতন্য যখন ফুলিয়ায় আসিয়াছিলেন, তখন এই নদীরই খেয়াঘাটে নবদ্বীপ-বাসীর ভিড় হইয়াছিল। এই নদীর খাত অদ্যাপি স্পষ্ট বিদ্যমান এবং আধুনিকতম মানচিত্রগুলিতেও উহা স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। থানা কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরের মানচিত্র দ্রষ্টব্য। রুক এই নদীর নাম লিখিয়াছেন জলগাছি (Galgatese) নদী। ইহা জলঙ্গী ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন-সম্পাদিত এবং কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত গোবিন্দদাসের করচার প্রথম পৃষ্ঠায় শান্তিপুর-নিবাসী সুকবি শ্রীযুক্ত মোজাম্মেল হক সাহেব-লিখিত একটি পাদটীকা আছে। উহাতে জলঙ্গীর এই প্রাচীন খাতটির সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া আছে, যথা :—

"বর্ত্তমান নবদ্বীপের অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে, গঙ্গানদীর পূর্ব্বপারে এবং প্রাচীন নবদ্বীপের অর্থাৎ মেয়াপুর ও বামনপুকুরিয়া পল্লীদ্বয়ের দেড় মাইল দক্ষিণে খড়িয়া বা জলঙ্গী নদীর দক্ষিণ ধারে মহেশগঞ্জ গ্রাম আছে। মহেশগঞ্জের দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ করিয়া একটি প্রাচীন জলপ্রবাহের খাত টেংরা, আমঘাটা, গঙ্গাবাস, উশিদপুর, ভালুকা, কুঁদপাড়া, শিঙ্গাডাঙ্গা, কুশি, টেরাবালি, গোয়ালপাড়া কুলে, হিজুলী বাঁকীপুর প্রভৃতি গ্রামের পার্শ্ব দিয়া প্রায় পাচ ছয় মাইল চলিয়া আসিয়া বাগ্‌আঁচড়া গ্রামে বাগ্‌দেবীর খালের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ খাতটির স্থানে স্থানে কালের গতিতে মাটি ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং ইহা স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, যেমন অলকার বিল, গোপেশ্বর বিল এবং বাগ্‌দেবীর খাল, ইত্যাদি। বাগ্‌দেবীর খাল বাগ্‌আঁচড়া গ্রামের উত্তর দিয়া গঙ্গানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বর্ষাকালে গঙ্গার জল এই খালে প্রবেশ করিয়া থাকে। প্রাচীনকালে ইহা যে একটি জলপ্রবাহে পরিণত ছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়া থাকে।"

ইহাই জলঙ্গীর প্রাচীন প্রবাহের খাত। রুক ইহারই খাত তাঁহার মানচিত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রুকের মানচিত্র অঙ্কনের কালে জলঙ্গী যে এই খাতে প্রবাহিত ছিল, তাহার উপর একটি সমসাময়িক প্রমাণও আছে। হেজেস্-এর ডায়েরীর প্রথম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ১৬৮২ সনের অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে ঢাকা যাইবার পথে হেজেস্ ফুলিয়ায় নৌকা রাখিয়া প্রকাণ্ড একটি গাছের ছায়ায় ভোজন সমাপ্ত করেন। ১৫ই এবং ১৬ই অক্টোবরের ডায়েরী এই অঞ্চলের ইতিহাসের পক্ষে বড়ই প্রয়োজনীয়, তাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

October 15.—Being Sunday, we dined ashore at Pulia, under a great shady tree near Santapore, where all our Saltpetre boats are ordered to stop, till we can have assurance from Parmesuradass, that we shall receive and send it on our sloops, after entrys were made of it. At this place, Mr. Wood who has charge of ye Petre boats came to me. I gave him a letter to Mr. Beard to be sent by an express to Hugly and proceeded on our voyage.

October 16.—Early in the morning, we passed by a village called SINADGHUR and by 5 o'clock this afternoon, we got as far as Rewee, a small village belonging to Wooderay, a Jemadar that has all the country on that side of the water almost as far as over against Hugly. It is reported by the country people that he pays more than twenty Lack of rupees per annum to the King, rent for what he possesses, and that about two years since, he presented above a lack of rupees to the Mogull and his favourites to divert his intention of hunting and hawking in this country, for fear of his tenants being ruined and plundered by the emperor's lawless and unruly followers. This is a fine pleasant situation, full of great shady trees, most of them tamarins well-stored with peacocks and spotted deer, like our fallow-deer: we saw 2 of them near the riverside at our first landing."

আকবর ও জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক মহারাজ ভবানন্দের প্রপৌত্র মহারাজ রুদ্রই যে এই বর্ণনায় Wooderay বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হেজেসের বর্ণনায় মহারাজ রুদ্র রায়ের যে প্রজাবৎসল

মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, কৃষ্ণনগর-রাজের প্রজাগণের তাহা চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয়। হেজেস বলিয়াছেন, ফুলিয়ায় ডিনার সমাপ্ত করিয়া চিঠিপত্র লিখিয়া তিনি নৌকা ছাড়িয়াছিলেন। রাত্রে সম্ভবতঃ শান্তিপুরের নিকটে কোথাও নৌকা ছিল। তিনি খুব প্রাতে SINADGHUR নামক স্থান অতিক্রম করেন এবং অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় রেউই অর্থাৎ কৃষ্ণনগরে উপনীত হন। কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর ও নবদ্বীপ থানার আধুনিকতম মানচিত্র দেখুন। প্রাতে ৬টা হইতে বৈকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত ১১ ঘণ্টা হইতে মধ্যাহ্ন আহারাদির জন্য এক ঘণ্টা বাদ দিয়া দশ ঘণ্টা নৌকা চলিয়াছিল ধরিয়া হিসাব করিতেছি। নৌকা উজাইয়া চলিয়াছিল। এ অবস্থায় ঘণ্টায় দুই মাইলের বেশী যাওয়া নৌকার পক্ষে অসাধ্য ছিল। কাজেই জলপথে সিনাদঘার কৃষ্ণনগর হইতে কুড়ি মাইলের বেশী দূরে হইতে পারে না। ফুলিয়া হইতে গঙ্গা ও জলঙ্গীর বর্ত্তমান খাতের পারে পারে সিনাদঘার এই ধ্বনিসাদৃশ্যের একটি গ্রামের নামও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।* আমার মনে হয়, জলঙ্গীর প্রাচীন খাতের উপর অবস্থিত শিঙ্গাডাঙ্গাই বিদেশীর কর্ণে "সিনাদঘার"-এ পরিণত হইয়াছিল। এই প্রাচীন খাতের পথে শিঙ্গা-ডাঙ্গা হইতে কৃষ্ণনগর সতের মাইল দূর।

তৃতীয় সমস্যা

আর একটি সমস্যার আলোচনা করিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। আমাদের দেশের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে একটি বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার মোগলপক্ষে যোগ দিয়া মানসিংহকে সাহায্য করিয়া প্রতাপাদিত্যের পতন ঘটাইয়া বড় হইয়াছিলেন। এই অভিযোগে ভবানন্দ বেচারীর প্রেতাত্মাকে বহু নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নাট্যকারও ভবানন্দের লাঞ্ছনার ত্রুটি করেন নাই। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় নদীয়া-কাহিনী লিখিতে বসিয়া ঐ প্রচলিত কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র।

১৩৩৯ সনের ফাল্গুন মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় "প্রতাপাদিত্যের কথা" নামক প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি যে ভবানন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগের সপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। আমাদের দেশের শিথিল ইতিহাস-আলোচনা-পদ্ধতির ফলেই ইতিহাসক্ষেত্রে এই ভিত্তিহীন অভিযোগের এত দিন টিকিয়া থাকা সম্ভব হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধে মূল কথা কয়টার পুনরুক্তি এই স্থানে করিতেছি :

১। প্রতাপাদিত্য স্বদেশ উদ্ধারকামী বীর ছিলেন না, প্রকৃতপক্ষে তিনি মোগল-পক্ষের অনুগত লোক ছিলেন। তাঁহার সহিত মোগলগণের অবিশ্রাম যুদ্ধের কাহিনী একেবারেই মিথ্যা।

২। তাঁহার পতন মানসিংহের হস্তে ঘটে নাই, বাহার-ই-স্তানের আবিষ্কারে এই সত্য স্পষ্ট হইয়াছে—রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্রেও মানসিংহের সহিত তাঁহার সখ্যের কথাই আছে। কাজেই প্রতাপাদিত্যের পতনে মানসিংহকে সাহায্য করিয়া ভবানন্দের জমিদারী লাভের কথা মিথ্যা।

৩। ইসলাম খাঁর আমলে সুবাদার ইসলাম খাঁকে যথোচিত সাহায্য না করাতে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হয়। সেই অভিযান জলপথে ভবানন্দের জমিদারীর উপর দিয়া দক্ষিণে অগ্রসর হয়। তখন অনুগত জমিদার ভবানন্দ এই অভিযানকে সাহায্য করিয়া থাকিবেন, যদিও বাহার-ই-স্তানের বিস্তৃত বিবরণেও ভবানন্দের নামোল্লেখ অথবা ভবানন্দের সাহায্যের কোন উল্লেখ নাই।

৪। কৃষ্ণনগর-রাজগণের জমিদারীর মূল দলিল দুইখানি,—প্রথমখানি জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরের=১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের ফর্ম্মাণ। দ্বিতীয়খানি

* শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় তাঁহার নদীয়া কাহিনীতে SINADGHUR-কে Sreenagar-এ পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। মূলগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিবার কালে এ রকম ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত অসঙ্গত। মল্লিক-মহাশয় এই শ্রীনগর কোথায় তাহার নির্ণয়ে কোন যত্ন করেন নাই। কৃষ্ণনগর-রাজগণের প্রাচীন রাজধানী শ্রীনগরের নাম স্মরণে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই রাজধানী শ্রীনগর রাণাঘাটের বারো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে চাকদহ থানার এক প্রান্তে অবস্থিত।

১০২২ হিজরী=১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দের। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ কেহই এই দলিল দুইখানি যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করেন নাই। এমন কি দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় পর্য্যন্ত তাঁহার ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতে লিখিয়া গিয়াছেন যে প্রথম দলিলখানি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি উভয় দলিলেরই ফটো লইয়া উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা অনুবাদ করাইয়াছি। উভয় দলিলই বেশ অক্ষত ও স্পষ্ট আছে। প্রথম দলিলে দেখা যায়, রাজা ভবানন্দ তাঁহার দুই ভাই রাজা বসন্ত ও দুর্গাদাসকে দিল্লী পাঠাইয়া এই ফর্ম্মাণ আনাইয়াছিলেন। ভবানন্দ পূর্ব্ব হইতেই বাগোয়ান, মাটিয়ারী ও নদীয়া, এই তিন পরগণার অধিকারী ছিলেন। প্রথম ফর্ম্মাণখানির দ্বারা মানসিংহের অনুরোধে তাঁহাকে অধিকন্ত মহৎপুর পরগণা ১২০০০৲ টাকা বার্ষিক রাজস্বে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ফর্ম্মাণ দ্বারা পূর্ব্ব চারি পরগণার উপরও আরও সাত পরগণা দেওয়া হয়। দুই ফর্ম্মাণের এক ফর্ম্মাণেও প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সাহায্যের কোন উল্লেখ নাই। এই ফর্ম্মাণ দুইখানি সানুবাদ এবং সটীক আমি অন্যত্র শীঘ্রই প্রকাশিত করিব। ভবানন্দের বিরুদ্ধে যে যুগ যুগ ধরিয়া মিথ্যা অভিযোগ সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে তাহা দূর করিতে পারিয়া থাকিলে চেষ্টা সার্থক মনে করিব।*

চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত অংশে ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়কে ডক্টর ভাণ্ডারকরের ছাত্র বলা হইয়াছে। ইহা সত্য নহে বলিয়া ডক্টর রায়চৌধুরী আমাকে জানাইয়াছেন।

ইতিহাসক্ষেত্রে কর্ম্মিগণের কর্ম্মের পরিচয় দিতে গিয়া অনেক কর্ম্মীর নাম বাদ পড়িয়াছে,—ইহার জন্যও আমি অত্যন্ত দুঃখিত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ডক্টর শ্রীযুক্ত অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হারীতকৃষ্ণ দেব, মুদ্রাতত্ত্ববিৎ ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী, প্রত্নলিপিতত্ত্ববিৎ ডক্টর শ্রীযুক্ত নিরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুবিমল সরকার, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর দত্ত, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ডক্টর শ্রীযুক্ত নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার, ডক্টর শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডক্টর শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতী, শ্রীমান্ অদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি বহু কর্ম্মীর কর্ম্মের কোন পরিচয় আমি দিতে পারি নাই। আজ ইঁহাদের নাম স্মরণ করিয়া এবং ইতিহাসক্ষেত্রে বাংলা দেশে কর্ম্মীর অভাব নাই, গর্ব্বের সহিত এই কথা উপলব্ধি করিয়া মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। স্থানীয় ইতিহাসক্ষেত্রে ৺সতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত যশোর-খুলনার ইতিহাস এবং শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেনের বগুড়ার ইতিহাসের স্থান অতি উচ্চে। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয়ের নদীয়া-কাহিনী, এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত হিজলির মসনদ্-ই-আলা এই ক্ষেত্রে দুইখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

—লেখক

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের একবিংশ কৃষ্ণনগর অধিবেশনে ইতিহাস শাখায় সভাপতির অভিভাষণের শেষাংশ।

স্বরলিপি

গান

একদিন চিনে নেবে তারে,
তারে চিনে নেবে
অনাদরে যে রয়েছে কুণ্ঠিতা।
সরে যাবে নবারুণ আলোকে
এই কালো অবগুণ্ঠন,
ঢেকে র'বে না র'বে না মায়াকুহেলির
মলিন আবরণ,
তারে চিনে নেবে।
আজ গাঁথুক মালা সে গাঁথুক মালা
তার দুঃখরজনীর অশ্রুমালা।
কখন দুয়ারে অতিথি আসিবে,
লবে তুলি' মালাখানি ললাটে,
আজি জ্বালুক প্রদীপ চির অপরিচিতা
'পূর্ণ প্রকাশের লগন লাগি—
তারে চিনে নেবে ॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II { র্সা -া র্সা । -া র্সা -া I র্সা -া র্সা । -া না -া I ধা -না -র্সনা । ধপা -া -া I
এ ক্ দি ন্ চি ০ নে ০ নে ০ বে ০ তা ০ ০০ রে ০ ০

I -া -া -া । পা পা -ক্ষা I গা -ক্ষা গা । -পা ক্ষা -া I গা -া (-া । -া -া -া) } I
০ ০ ০ তা রে ০ চি ০ নে ০ নে ০ বে ০ ০ ০ ০ ০

গা । -া গা -রা I গা -পা পা । -া পা -া I গা -া রসা । -া রা -া I গা -া -পা ।
অ ০ না ০ দ ০ রে ০ যে ০ র ০ য়ে ০ ছে ০ কু ০ ন্

। গা -া -রা I সা -া -া । -া -া -া II
ঠি ০ ০ তা ০ ০ ০ ০ ০

-া । পা পা -া II { পা -া পা । -া গা -া I পা -ক্ষা ধা । -পা ধা -া I ধা -া -র্সা ।
০ স রে ০ যা ০ বে ০ ন ০ বা ০ রু ০ ণ্ ০ আ ০ ০

। র্সা -া -না I র্রর্সা -া -া । র্সা -া -া I পর্সা -া র্সা । -া র্সা -া I র্সা -র্না -া ।
লো ০ ০ কে ০ ০ এ ই ০ কা ০ লো ০ অ ০ ব ০ ০

। ধা -না -র্সনা I ধপা -া -া । (পা পা -া) } I পা পা -হ্মা I পা -র্সা র্সা ।
শু ০ ন্ ঠ ০ ন্ গ রে ে ঢে কে ০ র ০ বে

। -না না -ধা I ধা -া ধা । -পা পা -া I পা -হ্মা পহ্মা । -ধা পা -হ্মা I গহ্মা -া -গা ।
০ না ০ র ০ বে ০ না ০ মা ০ য়া ০ কু ০ হে ০ ০

। গা -া -া I গা -পা পা । -া পরা -া I গা -া -া । রা -া -রগা I সা -া -া ।
লি ০ র্ ম ০ লি ০ ন ০ আ ০ ০ ব ০ ০০ র ণ ০

। সা সা -রা I গা -া গা । -া রা -া I সা -া -া । -া -া -া II
তা রে ০ চি ০ নে ০ নে ০ বে ০ ০ ০ ০ ০

-া । সা -া -া II ধ্সা -া সা । -া সা -া I সা -া -া । সা -া -রা I গা -া গা ।
০ আ ০ জ্ গাঁ ০ থু ক্ মা ০ লা ০ ০ সে ০ ০ গাঁ ০ থু

। -পা পা -হ্মা I পা -া -া । পা -া -া I পা -া পা । -হ্মা গহ্মগা -া I
ক্ মা ০ লা ০ ০ তা ০ র্ দু ০ খ ০ র ০

I গা -া -না । না -া -ধা I পা -া হ্মা । -গা মা -া I গা -া -া । (রা -া -সা)} I
জ ০ ০ নী ০ র্ অ ০ শ্রু ০ মা ০ লা ০ ০ আ ০ জ্

I পা পা -া I পা -া পা । -া গা -া I পা -হ্মা ধা । -পা ধা -া I ধা -া -র্সা ।
ক খ ন্ দু ০ য়া ০ রে ০ অ ০ তি ০ থি ০ আ ০ ০

। র্সা -া -না I র্রর্সা -া -া । র্সা র্সা -া I পর্সা -া র্সা । -া র্সা -া I র্সা -া র্সা ।
সি ০ ০ বে ০ ০ ল বে ০ তু ০ লি ০ মা ০ লা ০ খা

। -া র্সা -না I ধা -া -না । র্সা -া -র্সনা I ধপা -া -া । (পা পা -া)}I
০ নি ০ ল ০ ০ লা ০ ০ টে ০ ০ ক খ ন্

I পা পা -হ্মা I পা -না না । -া না -ধা I ধা -পা পা । -া পা -া I
আ জি ০ জ্বা ০ লু ক্ প্র ০ দী প্ চি ০ র ০

I পা -হ্মা পহ্মা । -ধা পা -হ্মা I গহ্মা -া -গা । গা -া -া I গা -না না । -া না -ধা I
অ ০ শে ০ রি ০ চি ০ ০ তা ০ ০ পূ র্ ন ০ প্র ০

I ধা -পা পা । -হ্মা হ্মা -গা I গা -া গা । -পা পা -া I গা -া -রা ।
কা ০ শে ০ র ০ ল ০ গ ০ ন ০ লা ০ ০

। সা -া -রা I গা -া রগা । -া গরা -া I সা -া -া । -া -া -া II II
গি ০ ০ চি ০ নে ০ নে ০ বে ০ ০ ০ ০ ০

বিবিধ প্রসঙ্গ

আরণ্যক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১০

প্রকৃতি তাঁর নিজের ভক্তদের যা দেন, তা অতি অমূল্য দান। অনেক দিন ধরিয়া প্রকৃতির সেবা না করিলে কিন্তু সে দান মেলে না। আর কি ঈর্ষ্যার স্বভাব প্রকৃতিরাণীর—প্রকৃতিকে যখন চাহিব, তখন প্রকৃতিকে লইয়াই থাকিতে হইবে, অন্য কোন দিকে মন দিয়াছি যদি, অভিমানিনী কিছুতেই তাঁর অবগুণ্ঠন খুলিবেন না।

কিন্তু অনন্যমনা হইয়া প্রকৃতিকে লইয়া ডুবিয়া থাকো, তাঁর সর্ব্ববিধ আনন্দের বর, সৌন্দর্য্যের বর, অপূর্ব্ব শান্তির বর তোমার উপর অজস্রধারে এত বর্ষিত হইবে, তুমি দেখিয়া পাগল হইয়া উঠিবে, দিনরাত মোহিনী প্রকৃতিরাণী তোমাকে শতরূপে মুগ্ধ করিবেন, নূতন দৃষ্টি জাগ্রত করিয়া তুলিবেন, মনের আয়ু বাড়াইয়া দিবেন, অমরলোকের আভাসে অমরত্বের প্রান্তে উপনীত করাইবেন।

এ-ব্যাপার যে কতবার প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছি!

কয়েক বারের কথা বলি। সে অমূল্য অনুভূতি-রাজির কথা বলিতে গেলে লিখিয়া পাতার পর পাতা ফুরাইয়া যায়, কিন্তু তবু বলা শেষ হয় না, যা বলিতে চাহিতেছি তাহার অনেকখানিই বাকী থাকিয়া যায়। এসব শুনিবার লোকও সংখ্যায় অত্যন্ত কম, ক'জন মনেপ্রাণে প্রকৃতিকে ভালবাসে?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অত বড় বিস্তীর্ণ অরণ্য-প্রান্তরে বসন্ত নামিবার কোন চিহ্ন দেখি নাই কোন বৎসরই, ওখানে এমন কোন গাছ নাই, প্রথম ফাল্গুনে যাতে ফুল ফোটে, নূতন পাতা গজায়,—এমন কোন পাখী নাই যা বসন্তের আগমন ঘোষণা করে। কাশ আর বনঝাউ বনে নূতন পাতা গজায় না, গায়ক-পাখীরা আসে না। কেবল মাঠে মাঠে দুধলি ঘাসের ফুল ফুটাইয়া জানাইয়া দেয় যে বসন্ত পড়িয়াছে। সে ফুলও বড় সুন্দর, দেখিতে নক্ষত্রের মত আকৃতি, রং হলদে, লম্বা লম্বা সরু লতার মত ঘাসের ডাঁটাটা অনেকখানি জমি জুড়িয়া মাটি আঁকড়াইয়া থাকে, নক্ষত্রাকৃতি হলদে ফুল ধরে তার গাঁটে গাঁটে। ভোরে মাঠ পথের ধার সর্ব্বত্র আলো করিয়া ফুটিয়া থাকে—কিন্তু সূর্য্যের তেজ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সব ফুল কুঁকড়াইয়া পুনরায় কুঁড়ির আকার ধারণ করিত—পরদিন সকালে আবার সেই কুঁড়িগুলিই দেখিতাম ফুটিয়া আছে।

রক্তপলাশের বাহার আছে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্টে ও আমাদের সীমানার বাহিরের জঙ্গলে কিংবা মহালিখা-রূপের শৈলসানুপ্রদেশে। আমাদের মহাল হইতে সে-সব স্থান অনেক দূরে, ঘোড়ায় তিন-চার ঘণ্টা লাগে। সে-সব জায়গার চিত্রে শালমঞ্জরীর সুবাসে বাতাস মাতাইয়া রাখে, শিমুল বনে দিগন্তরেখা রাঙাইয়া দেয়, কিন্তু কোকিল দোয়েল বৌ-কথা-কও প্রভৃতি গায়কপাখীরা ডাকে না, এসব জনহীন অরণ্য প্রান্তরের যে ছন্নছাড়া রূপ, বোধ হয় তাহারা তাহা পছন্দ করে না।

এক-এক দিন বাংলা দেশে ফিরিবার জন্য মন হাঁপাইয়া উঠিত, বাংলা দেশের পল্লীর সে সুমধুর বসন্ত কল্পনায় দেখিতাম, মনে পড়িত বাঁধান পুকুরঘাটে স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে গমনরতা কোন তরুণী বধূর ছবি, মাঠের ধারে ফুলফোটা ঘেঁটুবন, বাতাবী লেবুফুলের সুগন্ধে মোহময় ঘন ছায়া-ভরা অপরাহ্ন। দেশকে কি ভাল করিয়াই চিনিলাম বিদেশে গিয়া! দেশের জন্য এই মনোবেদনা দেশে থাকিতে কখনও অনুভব করি নাই, জীবনে এ একটা বড় অনুভূতি, যে ইহার আস্বাদ না পাইল, সে হতভাগ্য একটা শ্রেষ্ঠ অনুভূতির সহিত অপরিচিত রহিয়া গেল।

কিন্তু যে-কথাটা বার বার নানা ভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোন বারই ঠিকমত বুঝাইতে পারিতেছি না, সেটা হইতেছে এই প্রকৃতির একটা রহস্যময় অসীমতার,

দুরধিগম্যতার, বিরাটত্বের ও ভয়াল গা-ছম্‌-ছম্‌-করানো সৌন্দর্য্যের দিকটা। না দেখিলে কি করিয়া বুঝাইব সে কি জিনিষ?

জনশূন্য বিশাল লবটুলিয়া বইহারে দিগন্তব্যাপী দীর্ঘ বনঝাউ ও কাশের বনে নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে একা ঘোড়ার উপর বসিয়া এখানকার প্রকৃতির এই রূপ আমার সারা মনকে অসীম রহস্যানুভূতিতে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে, কখনও তাহা আসিয়াছে ভয়ের রূপে, কখনও আসিয়াছে একটা নিস্পৃহ, উদাস, গম্ভীর মনোভাবের রূপে, কখনও আসিয়াছে কত মধুময় স্বপ্ন, দেশ-বিদেশের নরনারীর বেদনার রূপে। সে যেন খুব উচ্চদরের নীরব সঙ্গীত—নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোর তালে, জ্যোৎস্নারাত্রের অবাস্তবতায়, ঝিল্লীর তানে, ধাবমান উল্কার অগ্নিপুচ্ছের জ্যোতিতে তার লয়-সঙ্গতি।

সে-রূপ তাহার না-দেখাই ভাল, যাহাকে ঘরদুয়ার বাঁধিয়া সংসার করিতে হইবে। প্রকৃতির সে মোহিনী-রূপের মায়া মানুষকে ঘরছাড়া করে, উদাসীন ছন্নছাড়া, ভবঘুরে হ্যারি জন্‌ষ্টন্‌, মার্কো পোলো, হাড্‌সন, শ্যাকলটন করিয়া তোলে—গৃহস্থ সাজিয়া ঘরকন্না করিতে দেয় না—অসম্ভব তাহার পক্ষে ঘরকন্না করা একবার সে-ডাক যে শুনিয়াছে, সে অনবগুণ্ঠিতা মোহিনীকে একবার যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

গভীর রাত্রে ঘরের বাহিরে একা আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি অন্ধকার প্রান্তরের অথবা ছায়াহীন ধূধূ জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রির রূপ। তার সৌন্দর্য্যে পাগল হইতে হয়—একটুও বাড়াইয়া বলিতেছি না—আমার মনে হয় দুর্ব্বল-চিত্ত মানুষ যাহারা, তাহাদের পক্ষে সে-রূপ না দেখাই ভাল, সর্ব্বনাশী রূপ সে, সকলের পক্ষে তার টাল সামলানো বড় কঠিন।

তবে একথাও ঠিক, প্রকৃতিকে সে-রূপে দেখাও ভাগ্যের ব্যাপার। এমন বিজন, বিশাল উন্মুক্ত আরণ্য প্রান্তর, শৈল-মালা, বনঝাউ আর কাশের বন কোথায় যেখানে সেখানে? তার সঙ্গে যোগ চাই গভীর নিশীথিনীর নীরবতার ও তার অন্ধকার বা জ্যোৎস্নার—এত যোগাযোগ সুলভ হইলে পৃথিবীতে, কবি আর পাগলে দেশ ছাইয়া যাইত না?

এক দিন এইরূপ কি ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সে-ঘটনা বলি।

পূর্ণিয়া হইতে উকিলের তার পাইলাম পরদিন সকাল দশটার মধ্যে আমায় সেখানে হাজির হইতে হইবে। অন্যথায় ষ্টেটের একটা বড় মোকদ্দমায় আমাদের হার সুনিশ্চিত।

আমাদের মহাল হইতে পূর্ণিয়া পঞ্চান্ন মাইল দূরে: রাত্রের ট্রেন মাত্র একখানি, যখন তার হস্তগত হইল তখন সতর মাইল দূরবর্ত্তী কাটারিয়া ষ্টেশনে গিয়া সে-ট্রেন ধরা অসম্ভব।

ঠিক হইল এখনই ঘোড়ায় রওনা হইতে হইবে।

কিন্তু পথ সুদীর্ঘ বটে, বিপৎসঙ্কুলও বটে, বিশেষ করিয়া এই রাত্রিকালে, এই আরণ্য অঞ্চলে। সুতরাং তহশীলদার সুজন সিং আমার সঙ্গে যাইবে ইহাও ঠিক হইল।

সন্ধ্যায় দু-জনে ঘোড়া ছাড়িলাম। কাছারি ছাড়িয়া জঙ্গলে পড়িতেই কিছু পরেই কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদ উঠিল। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় বনপ্রান্তর আরও অদ্ভুত দেখাইতেছে। পাশাপাশি দু-জনে চলিয়াছি—আমি আর সুজন সিং। পথ কখনও উঁচু, কখনও নীচু, সাদা বালির উপর জ্যোৎস্না পড়িয়া চক্‌ চক্‌ করিতেছে। ঝোপঝাপ মাঝে মাঝে, আর শুধু কাশ আর ঝাউবন চলিয়াছে, সুজন সিং গল্প করিতেছে। জ্যোৎস্না ক্রমেই ফুটিতেছে—বনজঙ্গল, বালুচর, ক্রমশ স্পষ্টতর হইতেছে। বহুদূর পর্য্যন্ত নীচু জঙ্গলের শীর্ষদেশ একটানা সরলরেখায় চলিয়া গিয়াছে, যত দূর দৃষ্টি যায় ধূ ধূ প্রান্তর এক দিকে, এক দিকে জঙ্গল। বাঁ দিকে দূরে অনুচ্চ শৈলমালা। নির্জ্জন, নীরব, মানুষের বসতি কুত্রাপি নাই, সাড়া নাই, শব্দ নাই, যেন অন্য কোন অজানা গ্রহের মধ্যে নির্জ্জন বনপথে দুটি মাত্র প্রাণী আমরা।

এক জায়গায় সুজন সিং ঘোড়া হঠাৎ থামাইল। ব্যাপার কি? পাশের জঙ্গল হইতে একটি ধাড়ী বন্যশূকর এক দল ছানাপোনা লইয়া আমাদের পথ পার হইয়া বাঁ দিকের জঙ্গলে ঢুকিতেছে। সুজন সিং বলিল—তবুও ভাল হুজুর, ভেবেছিলাম বুনো মহিষ। মোহনপুরা জঙ্গলের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি, বুনো মহিষের ভয়

এখানে খুব। সেদিনও একজন লোক মারিয়াছে মহিষে।

আরও কিছু দূর গিয়া জ্যোৎস্নায় দূর হইতে কালোমত সত্যই কি-একটা দেখা গেল।

সুজন বলিল—ঘোড়া ভয় পাবে হুজুর, ঘোড়া রুখুন।

শেষে দেখা গেল সেটা নড়েও না চড়েও না। একটু একটু করিয়া কাছে গিয়া দেখা গেল সেটা একটা কাশের খুপড়ী। আবার ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম। মাঠ, ঘাট, বন, ধূ ধূ জ্যোৎস্নাভরা বিশ্ব—কি একটা সঙ্গীহারা পাখী আকাশের গায়ে কি বনের মধ্যে কোথায় ডাকিতেছে *টি-টি-টি-টি*—ঘোড়ার খুরে বড্ড বালি উড়িতেছে, ঘোড়া এক মুহূর্ত্ত থামাইবার উপায় নাই—উড়াও, উড়াও—

অনেকক্ষণ একভাবে বসিয়া পিঠ টন টন করিতেছে, জিনের বসিবার জায়গাটা গরম হইয়া উঠিয়াছে, ঘোড়া ছাড়তোক ভাঙিয়া দুলকি চাল ধরিয়াছে, আমার ঘোড়াটা আবার বড্ড ভয় খায় এজন্য সতর্কতার সঙ্গে সামনের পথে অনেক দূর পর্য্যন্ত নজর রাখিয়া চলিয়াছি—হঠাৎ থমকিয়া ঘোড়া দাঁড়াইয়া গেলে ঘোড়া হইতে ছিটকাইয়া পড়া অনিবার্য্য।

কাশের মাথায় ঝুঁটি বাঁধিয়া জঙ্গলে পথ ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, রাস্তা বলিয়া কিছু নাই, এই কাশের ঝুঁটি দেখিয়া এই গভীর জঙ্গলে পথ ঠিক করিয়া লইতে হয়। একবার সুজন সিং বলিল—হুজুর, এ-পথটা যেন নয়, পথ ভুলেছি আমরা।

আমি সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখিয়া ধ্রুবতারা ঠিক করিলাম—পূর্ণিয়া আমাদের মহাল হইতে খাড়া উত্তর, তবে ঠিকই আছি, সুজনকে বুঝাইয়া বলিলাম।

সুজন বলিল—না হুজুর, কুশীনদীর খেয়া পেরতে হবে যে, খেয়া পার হয়ে তবে সোজা উত্তর যেতে হয়। এখন উত্তর-পূব কোণ কেটে বেরুতে হবে।

অবশেষে পথ মিলিল।

জ্যোৎস্না আরও ফুটিয়াছে—সে কি জ্যোৎস্না! কি রূপ রাত্রির! নির্জ্জন বালুর চরে, দীর্ঘ বনঝাউয়ের জঙ্গলের পাশের পথে জ্যোৎস্না যাহারা কখনও দেখে নাই, তাহারা বুঝিবে না এ জ্যোৎস্নার কি চেহারা! এমন উন্মুক্ত আকাশ-তলে—ছায়াহীন, উদাস জ্যোৎস্নাভরা গভীর রাত্রিতে, বনপাহাড় প্রান্তরের পথের জ্যোৎস্না, বালুচরের জ্যোৎস্না—ক'জন দেখিয়াছে? উঃ সে কি ছুট! পাশাপাশি চলিতে চলিতে দুটো ঘোড়াই হাঁপাইতেছে, শীতেও ঘাম দেখা দিয়াছে আমাদের গায়ে।

এক জায়গায় বনের মধ্যে একটা শিমুল গাছের তলায় আমরা ঘোড়া থামাইয়া একটু বিশ্রাম করি, সামান্য মিনিট দশেক। একটা ছোট নদী বহিয়া গিয়া অদূরে কুশীনদীর সঙ্গে মিশিয়াছে, শিমুল গাছটাতে ফুল ফুটিয়াছে, বনটা সেখানে চারি ধার হইতে আসিয়া আমাদের এমন ঘিরিয়াছে যে পথের চিহ্নমাত্র নাই, অথচ খাটো খাটো গাছপালার বন, শিমুল গাছটাই সেখানে খুব উঁচু, বনের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুজনেরই জল পিপাসা পাইয়াছে দারুণ।

চন্দ্র অস্ত গেল। অন্ধকার বনপথ, পশ্চিম দিগন্তের দূর শৈলমালার পিছনে শেষ-রাত্রির চন্দ্র ঢলিয়া পড়িয়াছে। ছায়া দীর্ঘ হইয়া আসিল, পাখী-পাখালির শব্দ নাই কোন দিকে, শুধু ছায়া, ছায়া, অন্ধকার মাঠ, অন্ধকার বন। শেষ-রাত্রির বাতাস বেশ ঠাণ্ডা হইয়া উঠিল। ঘড়িতে রাত সাড়ে তিনটা। ভয় হয়, শেষ-রাত্রের অন্ধকারে বুনো হাতীর দল সামনে না-আসে? মধুবনীর জঙ্গলে এক পাল বুনো হাতীও আছে।

এবার আশেপাশে ছোট ছোট পাহাড়, তার মধ্য দিয়া পথ, পাহাড়ের মাথায় নিষ্পত্র শুভ্রকাণ্ড গোল গোলি ফুলের গাছ, কোথাও রক্ত পলাশের বন। শেষ-রাত্রের চাঁদ-ডোবা অন্ধকারে বন-পাহাড় অদ্ভুত দেখায়...পূর্ব্ব দিকে ফর্সা হইয়া আসিল...ভোরের হাওয়া বহিতেছে, পাখীর ডাক কানে গেল। ঘোড়ার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া দর দর ধারে ঘাম ছুটিতেছে, ছুট, ছুট, খুব ভাল ঘোড়া তাই এই পথে সমানে এত ছুটিতে পারে। সন্ধ্যায় কাছারি ছাড়িয়াছি—আর ভোর হইয়া গেল। সম্মুখে এখনও যেন পথের শেষ নাই, সেই একঘেয়ে বন, পাহাড়।

সামনের পাহাড়ের পিছন থেকে টকটকে লাল সিঁদুরের গোলার মত সূর্য্য উঠিতেছে। পথের ধারে এক গ্রামে ঘোড়া থামাইয়া কিছু দুধ কিনিয়া দুজনে খাইলাম। পরে আরও ঘণ্টা দুই চলিয়াই পূর্ণিয়া শহর।

পূর্ণিয়ায় ষ্টেটের কাজ ত শেষ করিলাম, সে যেন নিতান্ত অন্যমনস্কতার সহিত, মন পড়িয়া রহিল পথের দিকে। আমার সঙ্গীর ইচ্ছা, কাজ শেষ করিয়াই বাহির হইয়া পড়ে—আমি তাহাকে বাধা দিলাম জ্যোৎস্না রাত্রে এতটা পথ অশ্বারোহণে যাইবার বিচিত্র সৌন্দর্য্যের পুনরাস্বাদনের লোভে।

গেলামও তাই। পরদিন চাঁদ একটু দেরিতে উঠিলেও ভোর পর্য্যন্ত জ্যোৎস্না পাওয়া গেল, আর কি সে জ্যোৎস্না! কৃষ্ণপক্ষের স্তিমিতালোক চন্দ্রের জ্যোৎস্না বনে পাহাড়ে যেন এক শান্ত, স্নিগ্ধ, অথচ এক আশ্চর্য্যরূপে অপরিচিত স্বপ্নজগতের রচনা করিয়াছে—সেই খাটো খাটো কাশ জঙ্গল, সেই পাহাড়ের সানুদেশে পীতবর্ণ গোলগোলি ফুল, সেই উঁচুনীচু পথ—সব মিলিয়া যেন কোন বহুদূরের নক্ষত্রলোক—মৃত্যুর পরে অজানা কোন্ অদৃশ্য লোকে অশরীরী হইয়া উড়িয়া চলিয়াছি—ভগবান বুদ্ধের সেই নির্ব্বাণ-লোকে, যেখানে চন্দ্র উদয় হয় না, অথচ অন্ধকারও যেখানে নাই।

অনেক দিন পরে যখন এই মুক্ত জীবন ত্যাগ করিয়া সংসারে প্রবেশ করি, তখন কলিকাতা শহরের ক্ষুদ্র গলির বাসাবাড়ীতে বসিয়া স্ত্রীর সেলাইয়ের কল চালনার শব্দ শুনিতে শুনিতে 'অবসর-দিনের দুপুরে কতবার এই রাত্রির কথা, এই অপূর্ব্ব আনন্দের কথা, এই জ্যোৎস্নামাখা রহস্যময় বনশ্রীর কথা, শেষ রাত্রের চাঁদডোবা অন্ধকারে পাহাড়ের ওপর শুভ্রকাণ্ড গোলগোলি গাছের কথা, শুকনো কাশজঙ্গলের সোঁদা সোঁদা তাজা গন্ধের কথা কতবার ভাবিয়াছি—কল্পনায় আবার ঘোড়ায় চড়িয়া জ্যোৎস্না রাত্রে পূর্ণিয়া গিয়াছি—সব স্বপ্ন বলিয়া মনে হইয়াছে।

চৈত্রমাসের মাঝামাঝি এক দিন খবর পাইলাম সীতাপুর গ্রামে রাখালবাবু নামে এক জন বাঙালী ডাক্তার ছিলেন, তিনি কাল রাতে হঠাৎ মারা গিয়াছেন।

ইঁহার নাম পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। তিনি যে ওখানে ছিলেন, তাহা জানিতাম না। শুনিলাম আজ বিশ-বাইশ বৎসর তিনি যেখানে ছিলেন। ও-অঞ্চলে তাঁহার পসার ছিল, ঘরবাড়ীও নাকি করিয়াছিলেন ঐ গ্রামেই। তাঁহার স্ত্রীপুত্র সেখানেই থাকে।

এই অবাঙালীর দেশে এক জন বাঙালী ভদ্রলোক মারা গিয়াছেন হঠাৎ, তাঁহার স্ত্রীপুত্রের কি দশা হইতেছে, কে তাদের দেখাশুনা করিতেছে, তাঁহার সৎকার বা শ্রাদ্ধশান্তির কি ব্যবস্থা হইতেছে, এসব জানিবার জন্য মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, আমার প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে সেখানে গিয়া সেই শোকসন্তপ্ত পরিবারের খোঁজ-খবর লওয়া।

খবর লইয়া জানিলাম গ্রামটি এখান হইতে মাইল-কুড়ি দূরে, কড়ারী খাসমহালের সীমানায়। বৈকালের দিকে সেখানে গিয়া পৌঁছিলাম। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাখাল বাবুর বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিলাম। দু-খানা বড় বড় খোলার ঘর, খান-তিনেক ছোট ছোট ঘর। বাহিরে এ-দেশের ধরণে একখানা বসিবার ঘর, তার তিন দিকে দেওয়াল নাই। বাঙালীর বাড়ী বলিয়া চিনিবার কোনও উপায় নাই, বসিবার ঘরে দড়ির চারপাই হইতে উঠানের হনুমানধ্বজাটি পর্য্যন্ত সব এদেশী।

আমার ডাকে একটি বার-তের বছরের ছেলে বাহির হইয়া আসিল। আমায় দেখিয়া ঠেঁট্ হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল—কাকে খুঁজছেন?

তাহার চেহারা দেখিয়া মনে হয় না যে সে বাঙালীর ছেলে। মাথায় লম্বা টিকি, গলায় অবশ্য বর্ত্তমানে কাছা—সবই বুঝিলাম, কিন্তু মুখের ভাব পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানী বালকের মত কি করিয়া হয়?

আমার পরিচয় দিয়া বলিলাম—তোমাদের বাড়ীতে এখন বড় লোক কে আছেন, তাঁকে ডাক।

ছেলেটি বলিল, সে-ই বড় ছেলে। তার বড় বোন ছিল, বিবাহের পর সে মারা যায়। তার আর দুটি ছোট ভাই আছে। বাড়ীতে আর কোন অভিভাবক নাই।

বলিলাম—তোমার মায়ের সঙ্গে আমি একবার কথা কইতে চাই। জিজ্ঞেস করে এস।

খানিকটা পরে ছেলেটি আসিয়া আমায় বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। রাখালবাবুর স্ত্রীকে দেখিয়া মনে হইল

বয়স অল্প, ত্রিশের মধ্যে, সদ্যবিধবার বেশ, কাঁদিয়া চক্ষু ফুলিয়াছে। ঘরের আসবাবপত্র নিতান্ত দরিদ্রের গৃহস্থালীর মত। এক দিকে একটা ছোট গোলা, ঘরের দাওয়ায় খান-দুই চারপাই, ছেঁড়া লেপ-কাঁথা, এদেশী পিতলের ঘয়লা, একটা গুড়গুড়ি, পুরানো টিনের তোরঙ্গ। বলিলাম—আমি বাঙালী, আপনার প্রতিবেশী। আমার কানে গেল রাখালবাবুর কথা, তাই এলাম। আমার এখানে একটা কর্ত্তব্য আছে ব'লে মনে করি। আমার কোনো সাহায্য যদি দরকার হয়, নিঃসঙ্কোচে বলুন। রাখালবাবুর স্ত্রী কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বুঝাইয়া শান্ত করিয়া পুনরায় আমার আসিবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলাম। রাখাল-বাবুর স্ত্রী আমার সামনে বাহির হইলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—আপনি আমার দাদার মত, আমি ছোট বোন। এদেশে বাঙালীর মুখ দেখি নি কত কাল। আমাদের এই ঘোর বিপদের সময় ভগবান আপনাকে পাঠিয়েছেন।

ক্রমে কথায় কথায় জানা গেল এই বাঙালী পরিবার সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও অসহায় এই ঘোর বিদেশে। রাখালবাবু গত বৎসরের উপর শয্যাগত ছিলেন। তাঁর চিকিৎসা ও সংসার-খরচে সঞ্চিত অর্থ সব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে—রাখালবাবুর স্ত্রীর গায়ের গহনা পর্য্যন্ত। এখন এমন উপায় নাই যে তাঁর শ্রাদ্ধের যোগাড় হয়। এর পর যে কি হইবে, তাহা ভাবিবার এখন অবসর নাই, আপাততঃ নাবালক পুত্র দুটি কি করিয়া পিতৃদায় হইতে উদ্ধার হইবে—সেই দাঁড়াইয়াছে প্রধান সমস্যা।

জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা রাখালবাবু ত অনেক দিন ধরে এ অঞ্চলে আছেন, কিছু করতে পারেন নি?

রাখালবাবুর স্ত্রীর সঙ্কোচ ও লজ্জা অনেকটা দূর হইয়াছিল। তিনি যেন এই প্রবাসে এই দুর্দ্দিনে এক জন বাঙালীর মুখ দেখিয়া অকূলে কূল পাইয়াছেন, মুখের ভাবে মনে হইল।

বলিলেন—আগে কি রোজগার করতেন জানি নে। আমার বিয়ে হয়ে ছিল এই পনর বছর—আমার সতীন মারা যেতে আমায় বিয়ে করেন কি না? আমি এসে পর্য্যন্ত দেখছি কোনো রকমে সংসার চলে। এখানে ভিজিটে টাকা বড় একটা দেয় না, গম দেয়, মকাই দেয়। তাই দিয়ে এক রকম দিন-আনি দিন-খাই অবস্থায় সংসার চলত। ধার-দেনাও কিছু আছে। তাতেও অচল হয় নি, যেত এক রকম চলে। গত বছর মাঘ মাসে উনি অসুখে পড়লেন, সেই থেকে আর একটি পয়সা আয় ছিল না। তবে এদেশের লোক খারাপ নয়, তারা উপকার করেছে অনেক। যার কাছে যা পাওনা ছিল, বাড়ী বয়ে সে সব গম মকাই কলাই দিয়ে গিয়েছে। তাই চলেছে, নয় ত না খেয়ে মরত সবাই।

—আপনার বাপের বাড়ী কোথায়? সেখানে খবর দেওয়া হয়েছে?

রাখালবাবুর স্ত্রী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—খবর দেবার কিছু নেই। আমার বাপের বাড়ী কখনও দেখি নি। শুনেছিলুম, ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়। ছেলে-বেলা থেকে আমি সায়েবগঞ্জে ভগ্নীপতির বাড়ীতে মানুষ। মা বাবা কেউ ছিলেন না। আমার সে-দিদি আমার বিয়ের পর মারা যান। ভগ্নীপতি আবার বিয়ে করেছেন। তাঁর সঙ্গে আর আমার সম্পর্ক কি?

—রাখালবাবুর কোন আত্মীয়স্বজন কোথাও নেই?

—দেশে জ্ঞাতি ভাইয়েরা আছেন শুনতাম বটে; কিন্তু তারা কখনও সংবাদ নেয় নি, উনিও দেশে যাতায়াত করতেন না। তাদের সঙ্গে সদ্ভাবও নেই; তাছাড়া, তারা নিজেরাই গরিব। তাদের খবর দেওয়া-না-দেওয়া সমান। আমি আর কোন আত্মীয় বা জ্ঞাতির কথা জানি নে, এক মামাশ্বশুর আছেন আমার শুনতাম কাশীতে। তা-ও তাঁর ঠিকানা জানি নে।

কি ভয়ানক অসহায় অবস্থা! আপনার জন কেহ নাই, এই বন্ধুহীন বিদেশে দুই-তিনটি নাবালক ছেলে লইয়া সহায়সম্পদশূন্য বিধবা মহিলাটির দশা ভাবিয়া মন রীতিমত দমিয়া গেল। তখনকার মত যাহা করা উচিত করিয়া আমি কাছারিতে ফিরিয়া আসিলাম, সদরে লিখিয়া ষ্টেট্ হইতে আপাততঃ এক শত টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখালবাবুর শ্রাদ্ধও কোন রকমে শেষ করিয়া দিলাম।

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

চিত্র-সূচী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কালী

শ্রীচিন্তামণি কর

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৮শ ভাগ
২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩৪৫

১ম সংখ্যা

জানা-অজানা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই ঘরে আগে পাছে
বোবা কালা বস্তু যত আছে
দলবাঁধা এখানে সেখানে,
কিছু চোখে পড়ে কিছু পড়ে না মনের অবধানে।
পিতলের ফুলদানিটাকে
বহে নিয়ে টিপাইটা এক কোণে গা-ঢেকে সে থাকে।
ক্যাবিনেটে কী যে আছে কত,
না জানারি মতো।
পর্দায় পড়েছে ঢাকা সার্সির দুখানা কাঁচ ভাঙা,
আজ চেয়ে অকস্মাৎ দেখা গেল পর্দাখানা রাঙা।
চোখে পড়ে পড়েও না,
জাজিমেতে আঁকে আলপনা
সাতটা বেলার আলো, সকালে রোদ্দুরে।
সবুজ একটি সাড়ি ডুরে
ঢেকে আছে ডেস্কোখানা; কবে তারে নিয়েছিনু বেছে,
রং তার চোখে উঠেছিল নেচে,
আজ যেন সে রঙের আগুনেতে পড়ে গেছে ছাই,
আছে তবু নাই।

থাকে থাকে দেরাজের
এলোমেলো ভরা আছে ঢের
কাগজ পত্তর নানামতো,
ফেলে দিতে ভুলে যাই কত,
জানি নে কী জানি কোন্ আছে দরকার।
টেবিলে হেলানো ক্যালেণ্ডার,
হঠাৎ ঠাহর হোলো আটই তারিখ। ল্যাভেণ্ডার
শিশিভরা রোদ্দুরের রঙে। দিনরাত
টিক্ টিক্ করে ঘড়ি, চেয়ে দেখি কখনো দৈবাৎ।
দেয়ালের কাছে
আলমারি-ভরা বই আছে
ওরা বারো আনা
পরিচয় অপেক্ষায় রয়েছে অজানা।
ওই যে দেয়ালে
ছবিগুলো হেথা হোথা, দেখেছি তা কোনো এককালে ;
আজ তারা ভুলে-যাওয়া,
যেন ভূতে-পাওয়া।
কার্পেটের ডিজাইন
স্পষ্ট ভাষা বলেছিল একদিন,
আজ অন্যরূপ,
একেবারে চুপ।
আগেকার দিন আর আজিকার দিন
পড়ে আছে হেথা হোথা ছড়াছড়ি সম্বন্ধ বিহীন।

এইটুকু ঘর।
কিছু বা আপন তার অনেক কিছুই তার পর।
টেবিলের ধারে তাই
চোখ-বোজা অভ্যাসের পথ দিয়ে যাই।
দেখি যাহা অনেকটা স্পষ্ট দেখি নাকো।
জানা-অজানার মাঝে সরু এক চৈতন্যের সাঁকো,
ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনা
তারি পরে করে আনাগোনা।

আয়না-ফ্রেমের তলে ছেলেবেলাকার ফোটোগ্রাফ
কে রেখেছে, হলদে হয়ে গেছে তার ছাপ।
পাশাপাশি ছায়া আর ছবি—
মনে ভাবি এই সেই রবি,
স্পষ্ট আর অস্পষ্টের আসবাবে ঠাসা
ঘরের মতন। ঝাপসা-রঙা পুরাতন ভাষা
মাঝে মাঝে জেগে আছে। সব কিছু আছে অন্যমনে।
সামনে রয়েছে কিছু কত হারিয়েছে কোণে কোণে।
যাহা ফেলিবার
ফেলে দিতে মনে নেই। ক্ষয় হয়ে আসে অর্থ তার
যাহা আছে জমে।
ক্রমে ক্রমে
অতীতের দিনগুলি
অস্তিত্ব আঁকড়ি থেকে তবু যায় ভুলি
অস্তিত্বের অধিকার। ছায়া তারা
নূতনের মাঝে পথহারা;
যে অক্ষরে লিপি তারা লিখিয়া পাঠায় বর্ত্তমানে
সে কেহ পড়িতে নাহি জানে,
তাহাতে আভাসে থাকে চরমের কথা,
অস্ত গিরি শিখরের নক্ষত্রের রহস্য বারতা॥

১১।৯।৩৮
উদয়ন, শান্তিনিকেতন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গসাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা,
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যূষের বিভা,
বঙ্গভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টিকা।
রুদ্ধভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,
হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে
নব উদ্বোধনগাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্যগঙ্গাস্নানে তাহা শুচি।
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি;
ভারতীর পূজা তরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি' প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে।

২৪ ভাদ্র ১৩৪৫

[মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসংরক্ষণ-সমিতির অধিবেশনে পঠিত]

প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষের ধারা

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ, এম্-এ, পিএইচ্-ডি

হিন্দুদিগের প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা তাঁহাদিগের ধর্মানুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহারা পরমাপ্রকৃতির উপাসক ছিলেন; এই পরমা-প্রকৃতির উপাসনা করিতে করিতে তাঁহারা আকাশস্থ জ্যোতিষ্কপদার্থের মধ্যে পরমসুন্দর দেবতগণের দর্শন পাইতেন এবং মনে করিতেন যে এই জ্যোতিষ্কদিগের গতিবিধি সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত হইতে না পারিলে দেবতাদিগের উপাসনা সম্পূর্ণ হইবে না। সুতরাং এই দেবতাদিগের পূজার জন্ত তাঁহারা বেদে যে মন্ত্রাদি রচনা এবং পরে ব্রাহ্মণভাগে যে বিধি ও ক্রিয়াকলাপের উপদেশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে জ্যোতিষসম্বন্ধীয় বা পঞ্জিকা-সম্বন্ধীয় এমন অনেক বিষয় উল্লিখিত আছে যাহার দ্বারা

আমরা পৃথিবীর আকার-প্রকার, আকাশীয় পদার্থের গতিবিধি, কালের গণনা প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত হইতে পারি। তবে বেদের মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহাকে জ্যোতিষীয় গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। জ্যোতিষ শিক্ষা দেওয়া বেদের উদ্দেশ্যও ছিল না, কেবল ধর্মানুষ্ঠানের সম্পর্কে যেটুকু জ্যোতিষিক গণনার প্রয়োজন হইত, তাহারই উল্লেখ বেদে আছে।

বৈদিক জ্যোতিষ

বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় রচিত হইয়াছিল। সংহিতায় জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় যে মত পাওয়া যায়, তাহা ব্রাহ্মণভাগের মতের সহিত কতকাংশে ভিন্ন। সংহিতাভাগের কথাগুলি পদ্যে রূপকভাবে বর্ণিত, ইহার ভাবার্থ গ্রহণ করা সময়ে সময়ে দুষ্কর; ব্রাহ্মণভাগের কথাগুলি সুস্পষ্ট এবং তাহার মধ্যে কোন দ্বিভাব নাই। সুতরাং সংহিতাভাগের বাক্যগুলি যথাযথ বুঝিতে হইলে ব্রাহ্মণভাগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এই পৃথিবী একটি গোলক (sphere), আকাশে নিরাধার শূন্যে অবস্থিত এবং সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, ইহা বৈদিক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। বেদে এই ব্রহ্মাণ্ডকে তিন ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে, যথা :—ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক। ইহা দ্বারা অন্তরীক্ষ যে বর্ত্তমান তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অন্তরীক্ষ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ঋগ্বেদের কতক মন্ত্রে অন্তরীক্ষকে উর্দ্ধ ও অধঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; পৃথিবীর উর্দ্ধে যে অন্তরীক্ষ তাহাকে উর্দ্ধ অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবীর নিম্নে যে অন্তরীক্ষ তাহাকে অধঃ অন্তরীক্ষ বলা হইয়াছে। এই অধঃ অন্তরীক্ষ দিয়া সূর্য্য রাত্রিকালে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে গমন করেন। ঋগ্বেদ-সংহিতা হইতে ইহাও পাওয়া যায় যে, সূর্য্যের কোন একটি রশ্মিকলা হইতে বিনির্গত অমৃত দ্বারা সোম (চন্দ্র) ক্রমশঃ পরিপূরিত হইয়া শুক্লপক্ষে দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন এবং কৃষ্ণপক্ষে তৃষ্ণার্ত্ত দেবতারা এই অমৃত পান করিয়া ফেলেন বলিয়া চন্দ্র ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যান। বৈদিক দেবতাদিগের মধ্যে যম একটি চান্দ্র দেবতা, বৃহস্পতিও একটি চান্দ্র দেবতা, বরুণ একটি চান্দ্র দেবতা; মিত্রাবরুণ বলিতে সূর্য্য চন্দ্রকে বুঝাইতেছে। বৈদিক যুগে সম্ভবতঃ পঞ্চগ্রহের বিষয় জানা ছিল না, তাহা হইলে অবশ্যই ব্রাহ্মণভাগে রূপক ছন্দে পঞ্চ সংখ্যার উল্লেখ থাকিত। কিন্তু অধ্যাপক হিলব্রাণ্ট বলেন যে, বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টারা পঞ্চগ্রহের বিষয় অবগত ছিলেন; ঋগ্বেদ-সংহিতার "অধ্বর্য্যুভিঃ পঞ্চভিঃ সপ্তবিপ্রাঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে (৩, ৭, ৭) অধ্যাপক হিলব্রাণ্ট বলেন যে সপ্ত বিপ্রা অর্থে সপ্তর্ষি আর পঞ্চ অধ্বর্য্যু শব্দে পঞ্চগ্রহ বুঝাইতেছে। খুব সম্ভব এই অর্থই ঠিক।

সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগে পুনঃ পুনঃ অচল নক্ষত্রের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। রবিমার্গের (ecliptic) নিকটে যে-সকল উজ্জ্বল নক্ষত্র অবস্থিত, তাহাদেরই বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই রবিমার্গস্থ নক্ষত্র ভিন্ন অতি অল্প সংখ্যক নক্ষত্রপুঞ্জেরই নামকরণ হইয়াছিল। বৈদিক গ্রন্থে ২৭টি নক্ষত্রের উল্লেখ প্রায় সর্ব্বত্রই আছে; তবে তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে ২৮টি নক্ষত্রের (অভিজিৎকে ধরিয়া) কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যেহেতু চন্দ্রের ভগণকাল ঠিক ২৭ দিনে হয় না, ২৭⅓ দিনে হইয়া থাকে, সেই কারণে অভিজিৎ নক্ষত্রকে ধরা হইয়াছে; এইখানে চন্দ্র ⅓ দিন অবস্থান করেন। প্রত্যেক দিনে চন্দ্র মহাবৃত্তপরিধির $\frac{1}{27}$ অংশ পরিভ্রমণ করেন; এই $\frac{1}{27}$ অংশের যে নক্ষত্র উজ্জ্বল তাহাকেই সেই অংশের প্রধান নক্ষত্র বলিয়া প্রায় ধরা হইয়াছে। বেদে নক্ষত্রগুলির নামকরণ কৃত্তিকাকে প্রথম নক্ষত্র ধরিয়া করা হইয়াছে। মহাবিষুব বিন্দু (vernal equinox) হইতেই নক্ষত্রগুলির আরম্ভ ধরা হইয়া থাকে, কারণ গণনা মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতেই আরম্ভ হয়। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে, বেদের সময়ে কৃত্তিকানক্ষত্রে মহাবিষুব-সংক্রান্তি হইত। গণনা করিয়া জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর অন্ততঃ ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা সম্ভব হইয়াছিল, সুতরাং বৈদিক যুগের জ্যোতিষ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর অন্ততঃ ২০০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী।

বেদাঙ্গ জ্যোতিষ

হিন্দুদিগের প্রাচীনতম জ্যোতিষ-গ্রন্থ বেদাঙ্গ জ্যোতিষ।

ইহা বেদের অঙ্গস্বরূপ পরিশিষ্ট গ্রন্থ। পঞ্চবৎসরাত্মক যুগের কথা বেদাঙ্গ জ্যোতিষের মূলকথা। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌষ মাসের অমাবস্যাতে উক্ত যুগের শেষ হইয়া থাকে। ৩৬৬ সৌর দিনে, বা ছয় ঋতুতে, বা দুই অয়নে, বা বার সৌর মাসে এক বৎসর হয়। এই প্রকার পাঁচ বৎসরে এক যুগ হয়। এই যুগকে আরও পাঁচটি চান্দ্র বৎসরে বিভাগ করা হইয়াছে। এই পাঁচটি চান্দ্র বৎসরের মধ্যে তিনটি চান্দ্র বৎসরের প্রত্যেকটিতে বারটি চান্দ্র মাস এবং বাকী দুইটি বৎসরের প্রত্যেকটিতে তেরটি চান্দ্র মাস ধরা হইয়াছে। এক যুগে ৬২টি চান্দ্র মাস, আর ৬০টি সৌর মাস, সুতরাং দুইটি চান্দ্র মাস মলমাস ধরা হইয়াছে।

বেদাঙ্গ জ্যোতিষ অনেক স্থলে অতি দুরূহ, উহার অর্থ সহজে বুঝা যায় না। উহার এক স্থলে উল্লিখিত আছে, "শ্রবিষ্ঠার প্রারম্ভে সূর্য্য এবং চন্দ্র উত্তর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু অশ্লেষার অর্দ্ধভাগেই সূর্য্য দক্ষিণ দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই উত্তর দিকে ও দক্ষিণ দিকে প্রত্যাবর্ত্তন মাঘ ও শ্রাবণ মাসে হইয়া থাকে।" এই শ্লোক হইতে অধ্যাপক প্র্যাট্ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই প্রকার উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১২০০ সালেই সম্ভব হইত। সুতরাং ইহা হইতে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১২০০ সালে রচিত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

জৈন জ্যোতিষ

বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অল্প পরেই জৈনদিগের জ্যোতিষের আরম্ভকাল। জৈনদিগের তিন খানি জ্যোতিষ-গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়:—সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি, চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি ও ভদ্রবাহবীয় সংহিতা। সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি পুথির আকারে মুদ্রিত পাওয়া যায়, চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তির একখানি পুথি বোম্বাইয়ে ভাণ্ডারকর ইনষ্টিটিউটে সংরক্ষিত আছে, কিন্তু ভদ্রবাহবীয় সংহিতা এখন দুষ্প্রাপ্য। জৈন বর্দ্ধমান মহাবীর সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তির রচয়িতা বলিয়া খ্যাত; মহাবীরের মৃত্যুকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫২৭ সাল, সুতরাং সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তির রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫০০ সাল হওয়াই সম্ভব। জৈনদিগের ধারণা ছিল যে, গ্রহনক্ষত্রের উদয় ও অস্তের কারণ সুমেরু পর্ব্বত সুতরাং তাঁহারা কল্পনা করিলেন যে, দুইটি সূর্য্য, চন্দ্র দুইটি করিয়া প্রতিগ্রহ ও দুইটি করিয়া প্রত্যেক নক্ষত্রপুঞ্জ জম্বুদ্বীপে অবস্থিত এবং ইহারা ক্রমান্বয়ে মেরুর উত্তর ও দক্ষিণে দৃষ্ট হইয়া থাকে; ইহাতেই উদয়াস্তের অবতারণা। জৈন জ্যোতিষেও বেদাঙ্গ জ্যোতিষের মতই পঞ্চবৎসরাত্মক যুগের কল্পনা। অথচ প্রভেদ এই যে, বেদাঙ্গ জ্যোতিষে দক্ষিণায়নের অমাবস্যা হইতে যুগের আরম্ভ কল্পিত হইয়াছে, জৈন জ্যোতিষে উত্তরায়ণের পূর্ণিমা হইতে যুগারম্ভের কল্পনা করা হইয়াছে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের অনেক পরবর্ত্তী হইলেও জৈন জ্যোতিষে অনেক অবৈজ্ঞানিক তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, হিন্দু জ্যোতিষের ক্রমিক উন্নতির ধারার সহিত জৈন জ্যোতিষের কোনও সম্পর্ক নাই, ইহা যেন কতকটা খাপছাড়াভাবে মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে।

জ্যোতিষ-সংহিতা ও প্রাচীন জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত

হিন্দুদিগের জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাসে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫০০ সাল হইতে খ্রীষ্টাব্দ ৫০০ সাল পর্য্যন্ত কালকে অন্ধকার-যুগ বলা যাইতে পারে। কারণ, সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তির রচনাকাল হইতে আর্য্যভটের গ্রন্থপ্রণয়নের সময় পর্য্যন্ত যে এক হাজার বৎসরের ব্যবধান আছে, সে সময়ের কোনও জ্যোতিষিক গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। অথচ ইহাও মনে হয় না যে, এত কাল হিন্দুজ্যোতিষের উন্নতির গতি স্থগিত ছিল। এই সময়কার জ্যোতিষিক জ্ঞানের পরিচয় তৎকালীন সাহিত্য ও দর্শনগ্রন্থে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং ইহাই সম্ভব যে, এই এক হাজার বৎসরের মধ্যে জ্যোতিষ-সংহিতাগুলি ও প্রাচীন জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তগুলি রচিত হইয়াছিল। জ্যোতিষ-সংহিতাগুলি এখন একেবারে দুষ্প্রাপ্য; শোনা যায়, ডক্টর কার্ণ গর্গসংহিতার একখানি ছিন্ন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তবে সংহিতাগুলিতে কি কি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায় পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদগণের রচনায় উঁহাদের উল্লেখ

হইতে। পরবর্ত্তী সময়ের জ্যোতিষগ্রন্থে সাধারণতঃ গর্গসংহিতা ও পরাশরসংহিতার নামোল্লেখ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। গর্গ ও পরাশর খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫০০ শতকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর দুইটি সংহিতার উল্লেখ পাওয়া যায় বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায়, সে দুইটি দেবল ও কাশ্যপ রচিত; কিন্তু এগুলি গর্গসংহিতা ও পরাশরসংহিতার অনেক পরবর্ত্তী রচনা। সংহিতা-যুগের পরেই রচিত হইয়াছিল প্রাচীন জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তগুলি। আবুলফজল-কৃত আইন-ই-আক্‌বরী গ্রন্থে এই কয়টি সিদ্ধান্তগ্রন্থের উল্লেখ আছে,—(১) ব্রহ্ম, (২) সূর্য্য, (৩) সোম, (৪) বৃহস্পতি, (৫) গর্গ, (৬) নারদ, (৭) পরাশর, (৮) পুলস্ত্য, (৯) বশিষ্ঠ, (১০) ব্যাস, (১১) অত্রি, (১২) কাশ্যপ, (১৩) মরীচি, (১৪) মনু, (১৫) অঙ্গিরস্‌, (১৬) লোমশ, (১৭) পুলিশ, (১৮) যবন, (১৯) ভৃগু, ও (২০) চ্যবন। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, এবং তাহাদের মূলসূত্রগুলিই পরবর্ত্তী কালে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তগুলিও প্রায় দুষ্প্রাপ্য। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পুরাণে অংশস্বরূপ সন্নিবিষ্ট আছে, ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই পরবর্ত্তী কালে ব্রহ্মগুপ্ত তাঁহার ব্রাহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্ত রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে বরাহমিহির তদ্‌রচিত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা নামক সংকলনগ্রন্থে এই পাঁচটি সিদ্ধান্তগ্রন্থ সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন—পৈতামহ (ব্রহ্ম), বশিষ্ঠ, রোমক, পৌলিশ ও সৌর। ইহাদিগের মধ্যে সৌরসিদ্ধান্তকেই তিনি প্রথম স্থান দিয়াছেন। বর্ত্তমান সূর্য্যসিদ্ধান্তও এই সৌরসিদ্ধান্তের মূলসূত্র লইয়া রচিত। রোমক সিদ্ধান্তটি গ্রীস অথবা রোম দেশের জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে গৃহীত, ইহার আলোচনা-পদ্ধতির সহিত হিন্দুজ্যোতিষ-গ্রন্থের আলোচনা-পদ্ধতির অনেক প্রভেদ এবং ইহা হিন্দুদিগের নিকট আদৌ প্রশংসালাভ করিতে পারে নাই।

বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষ

কিন্তু হিন্দুদিগের বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষ আরম্ভ হইল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে আর্য্যভটের আবির্ভাবের সময় হইতে। আর্য্যভট দুইখানি জ্যোতিষ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেবল আর্য্যভটীয় খানি এখন পাওয়া যায়। আর্য্যভট সূর্য্যসিদ্ধান্তকে ভিত্তি করিয়াই তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আর্য্যভট ভূভ্রমবাদ বিশ্বাস করিতেন, তিনিই নীচোচ্চবৃত্ত ও প্রতিবৃত্তের সাহায্যে গ্রহদিগের গতির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং দেখাইয়াছিলেন যে গ্রহদিগের গতিপথ ঠিক বৃত্তাকার নহে, উহা অনেকটা বৃত্তাভাসের (ellipse) আকৃতিবিশিষ্ট। আর্য্যভটের পরেই আবির্ভূত হইলেন বরাহমিহির ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে। তিনি ছিলেন প্রধানতঃ সংকলন-কর্ত্তা। তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—বৃহৎসংহিতা ও পঞ্চসিদ্ধান্তিকা; প্রথমখানি ফলিত জ্যোতিষ ও গণিত জ্যোতিষ দুই বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছে এবং প্রাচীন সংহিতাগ্রন্থকে ভিত্তি করিয়াই রচিত; দ্বিতীয়খানি একটি করণ-গ্রন্থ অর্থাৎ সিদ্ধান্তগুলির ন্যায় উহা নিয়মপদ্ধতিগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করে নাই, কেবল গণনার সুবিধার জন্য সংক্ষেপে নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছে। বরাহমিহিরের একটা বড় কৃতিত্ব বর্ষারম্ভকে পরিবর্ত্তিত করা। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময়ে দক্ষিণায়নে বর্ষ আরম্ভ হইত, কিন্তু মেষক্রান্তিবিন্দুর অয়নচলনের নিমিত্ত বরাহমিহিরের সময়ে উহাতে ভুল হইত, সুতরাং বরাহমিহির বর্ষারম্ভ-নির্দ্ধারণে একটি পরিবর্ত্তন প্রচলিত করিলেন। তিনি নক্ষত্রতালিকার আরম্ভ করিলেন অশ্বিনী হইতে, ইহার পূর্ব্বে উহার আরম্ভ ছিল কৃত্তিকা হইতে। বরাহমিহির কর্ত্তৃক এই পরিবর্ত্তিত বর্ষারম্ভ-পদ্ধতি এখনও চলিয়া আসিতেছে। বরাহমিহিরের সমসাময়িক ছিলেন জ্যোতিষী লল্লাচার্য্য। তিনি আর্য্যভটের রচনাকে ভিত্তি করিয়া শিষ্যধীবৃদ্ধিদ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। আপনাকে আর্য্যভটের শিষ্য বলিয়া প্রচারিত করিলেও তিনি গুরুর ভূভ্রমবাদ বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলিতেন, পৃথিবী যদি এত দ্রুতবেগে পরিভ্রমণ করিতে থাকে, তাহা হইলে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত পদার্থ প্রক্ষেপস্থানের পশ্চিমে পতিত হয় না কেন, মেঘ সকল কেবল পশ্চিমেই যায় না কেন?

বরাহমিহিরের প্রায় সমসাময়িক এক জ্যোতিষী ছিলেন, তাঁহার নাম ভাস্কর। ইনি সিদ্ধান্তশিরোমণির

রচয়িতা প্রসিদ্ধ ভাস্করাচার্য্য নহেন; ইনি আর্য্যভটের রচনাকে ভিত্তি করিয়া বৃহৎভাস্করীয় ও লঘুভাস্করীয় নামে দুইখানি জ্যোতিষ-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। আনুমানিক ৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহার পরে জ্যোতির্ব্বিদ হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ব্রাহ্মস্ফুটগ্রন্থ-প্রণেতা বিখ্যাত জ্যোতিষী ব্রহ্মগুপ্ত। তিনি ত্রিশ বৎসর বয়সে ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত সমগ্র এশিয়াখণ্ডে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল; ৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ বিন ইব্রাহিম আল ফাজারি আরবী ভাষায় উহার অনুবাদ করিয়াছিলেন, এই অনুবাদ সিন্দহিন্দ নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মগুপ্ত-রচিত আর একখানি গ্রন্থ—খণ্ডখাদ্যক নামে করণ-গ্রন্থও আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, এই অনুবাদ অলর্কন্দ নামে খ্যাত। ব্রহ্মগুপ্তও ভূভ্রমবাদের অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে তাঁহার এত অধিক প্রসিদ্ধি ছিল যে কোন জ্যোতিষী আর্য্যভটের ভূভ্রমবাদ অনুমোদন করিতে সাহস পাইতেন না।

ব্রহ্মগুপ্তের পরে কিছু কাল প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদের অভাব লক্ষিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত হইলেন 'লঘুমানস' নামক করণগ্রন্থ-প্রণেতা মুঞ্জাল। তিনি নিশ্চিতই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, কারণ অয়নাংশ বাহির করিবার যে নিয়মপদ্ধতি তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবরেণ্য জ্যোতির্ব্বিদ ভাস্করাচার্য্যও গ্রহণ করিয়া মুঞ্জালের ঋণ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী জ্যোতিষী ছিলেন শ্রীপতি। তিনি ধীকোটি নামে একটি করণগ্রন্থ এবং সিদ্ধান্তশেখর নামে একটি সিদ্ধান্তগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী লেখক ধারারাজ ভোজ। তিনি রাজমৃগাঙ্ক নামে একটি করণগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্ শতানন্দ পঞ্জিকাকারগণের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'ভাস্বতী' সূর্য্যসিদ্ধান্তের মূলসূত্রগুলিকে ভিত্তি করিয়া রচিত এবং পঞ্জিকা-প্রণয়নের বিশেষ উপযোগী; পঞ্জিকাকারগণ "ভাস্বতীগ্রহণে ধন্যা" বলিয়া ইহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। শতানন্দের ভাস্বতী ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

এইবার ভারতের জ্যোতিষক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন ভারত-জ্যোতিষের মুকুটমণি ভাস্করাচার্য্য; তিনি ৩৬ বৎসর বয়সে ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সিদ্ধান্ত-শিরোমণি রচনা করিয়াছিলেন। উহা দুই ভাগে বিভক্ত—গোলাধ্যায় ও গ্রহগণিতাধ্যায়। ইহার অনেক পরে ৬৯ বৎসর বয়সে তিনি করণকুতূহল নামে একখানি করণগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্যের প্রতিভা বিশ্ববিশ্রুত। তিনি গণিত-জ্যোতিষের সকল দিক্ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতিষগ্রন্থে উল্লিখিত অধিকাংশ বিষয়ের আলোচনা আমরা সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে দেখিতে পাই, গ্রহগতি-মীমাংসা, অয়নাংশনির্দ্ধারণ, লম্বনির্ণয় (parallax), গ্রহ-যুতি (conjunction of planets), বলনমীমাংসা, গ্রহণ-গণনা প্রভৃতি জ্যোতিষশাস্ত্রের দুরূহ আলোচনাগুলি এমন সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, তাহা পাঠকমাত্রের গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক না করিয়া পারে না। কিন্তু এইখানেই হিন্দুজ্যোতিষের উন্নতির ইতিহাসে যবনিকাপতন। দীপনির্ব্বাণের পূর্ব্বে যেমন অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখা দেয়, ভাস্করাচার্য্যও ছিলেন ভারতীয় জ্যোতিষ-ক্ষেত্রে সেইরূপ শেষ প্রদীপ্ত শিখা। ইহার পরেই ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গণিত-জ্যোতিষের গবেষণা পরিসমাপ্ত হইল।

ডেভিড হেয়ারের ও রামমোহন রায়ের স্কুল ; বালিকা-বিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ

১৫

স্কুল-বুক সোসাইটি ও স্কুল সোসাইটি ; ডেভিড হেয়ারের স্কুল (১৮১৭-১৮৩০) ; বালিকা-বিদ্যালয় (১৮১৯-১৮৪৯) ; মেডিকেল কলেজ (১৮৩৫)

বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার বিষয়ক যে-সকল কার্য্যের সহিত ডেভিড হেয়ারের নাম যুক্ত, তন্মধ্যে আমাদিগকে স্কুল-বুক সোসাইটি ও স্কুল সোসাইটি (Calcutta School-Book Society and Calcutta School Society)—এই দুইটির বিষয়ে এই প্রস্তাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইবে।

১৮১৭ সালে ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্ববিধ পুস্তকের রচনা, মুদ্রণ, প্রকাশ, এবং সম্ভব হইলে অল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে বিতরণ,—এই কয়টি উদ্দেশ্য লইয়া 'কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি' স্থাপিত হয়। এই সোসাইটির সংশ্রবে প্রথমতঃ একাদশ প্রস্তাবে উল্লিখিত মে (May) সাহেব ও শ্রীরামপুরের মিশনরী কেরী সাহেব, এবং ক্রমে অন্যান্য কয়েক জন মিশনরী, নানা পুস্তক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সোসাইটিতে য়ুরোপীয়, হিন্দু ও মুসলমান, তিন শ্রেণীর সভ্যই ছিলেন ; এবং সকলেই অতিশয় উৎসাহের সহিত ও পরস্পর সদ্ভাবের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। ডেভিড হেয়ার দরিদ্র হইলেও এই সোসাইটিতে বার্ষিক এক শত টাকা সাহায্য করিতেন। বহু বৎসর এই সোসাইটি গভর্ণমেন্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইত। আমরা বাল্যকালে এই সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত কোন কোন পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়াছি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ১৮১৩ সালের নূতন চার্টারের পর কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত গভর্ণমেন্ট শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই। ইহাও বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক বে-সরকারী স্কুল ও পাঠশালার অভ্যুদয় হয়। কিন্তু সে-সকল বিদ্যালয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে চলিত ; এক নিয়মে ও এক শৃঙ্খলায় পরিচালিত হইত না। যাহাতে এই সকল বিদ্যালয় কিঞ্চিৎ নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল ভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, এই উদ্দেশ্যে কলিকাতার টাউন হলে ১৮১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পূর্ব্বোক্ত স্কুল-বুক সোসাইটির প্রধান পুরুষগণই এই নূতন সমিতির উদ্যোক্তা ছিলেন ; ডেভিড হেয়ার তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। এই সমিতির নিম্নোক্ত তিনটি উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য তিনটি সব্‌কমিটি নিযুক্ত করা হয় :—(১) নূতন স্কুল স্থাপন ; (২) পূর্ব্বেই যে-সকল স্কুল ও পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের উন্নতিসাধন ও অর্থানুকূল্য ; (৩) প্রতিভাসম্পন্ন কতিপয় ছাত্রকে বৃত্তি দিয়া ইংরেজী শিক্ষার ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষার সহায়তা করা।

প্রথম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঠন্‌ঠনিয়া ও চাঁপাতলায় দুইটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। ১৮৩৪ সালের শেষ ভাগে এই দুইটি স্কুল মিশিয়া পটলডাঙ্গায় যায়। স্কুল সোসাইটির এই স্কুলকে সাধারণ লোকে 'ডেভিড হেয়ারের স্কুল' বলিত।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সোসাইটি কলিকাতায় বিদ্যালয়গুলির বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখা গেল যে এই সময়ে কলিকাতায় ১৯০টি বাঙ্গালা পাঠশালা রহিয়াছে ; তাহাতে মোট ৪১৮০ জন ছাত্র পাঠ করিতেছে। এই সোসাইটির পক্ষ হইতে দুর্গাচরণ দত্ত,

রামচন্দ্র ঘোষ, উমানন্দ ঠাকুর এবং রাধাকান্ত দেব তন্মধ্যে ১৬৬টির পরিদর্শনের ভার গ্রহণ করিলেন।[৭৬]

তৃতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'ডেভিড হেয়ারের স্কুলে'র ত্রিশটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বালককে প্রতি বৎসর উক্ত সমিতির ফণ্ড হইতে বৃত্তি দিয়া হিন্দু কলেজে অবৈতনিক ছাত্ররূপে পড়িতে পাঠান হইত। এই অবৈতনিক ছাত্রদিগকে হিন্দু কলেজের বড় লোকের ছেলেরা, (যাহারা বেতন দিয়া পড়িত), নানা ভাবে বিদ্রূপ করিত। তাহারা কখনও ইহাদিগকে 'হেয়ার সাহেবের পোষ্যপুত্র', কখনও বা 'ব'ড়ে' বলিত। 'ব'ড়ে' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, দাবাখেলার নানা প্রকার গুটির মধ্যে যেমন ব'ড়েগুলি সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীস্থ, তেমনই হেয়ারের প্রেরিত এই ছাত্রগণ হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র ও হীনশ্রেণীভুক্ত; এবং যেন ব'ড়েরই মত তাহাদের সম্পূর্ণ দলটিকে এক বিদ্যালয় হইতে অন্য বিদ্যালয়ে 'চালাইয়া' আনা হইয়াছে। কিন্তু ধনীপুত্রদের এই অবজ্ঞাসত্ত্বেও সাধারণতঃ হেয়ার সাহেবের ছাত্রগণই হিন্দু কলেজের পরীক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী ছাত্র রূপে পরিগণিত হইতেন। স্বয়ং হেয়ার সাহেব নিজের এই ছাত্রগুলিকে পুত্রনির্ব্বিশেষে যত্ন করিতেন।

ঠনঠনিয়া ও চাঁপাতলার পূর্ব্বোক্ত স্কুলবিদ্যালয়টি ব্যতীত কিছুকালের জন্য 'আরপুলি' নামক অঞ্চলে 'আরপুলি পাঠশালা' নামে একটি বিদ্যালয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরকালে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই পাঠশালায় কলাপাতার ক্লাসে[৭৭] লিখিতে শিক্ষা করেন। ক্রমে এই পাঠশালার নিকটে হেয়ার সাহেব একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন; তাহাকে লোকে বলিত 'আরপুলি স্কুল'। তখন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সেই স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হন। এই স্কুলের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার হেয়ার সাহেব নিজে বহন করিতেন,[৭৮] এবং তাঁহার যত্নে ইহার ইংরেজী বিভাগ ও বাঙ্গালা বিভাগ উভয়ই অতিশয় দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইত। ১৮২৮ সাল পর্য্যন্ত এই 'আরপুলি স্কুল' এবং পটলডাঙ্গায় (অর্থাৎ কলেজ স্কোয়ারে) অবস্থিত 'স্কুল সোসাইটির স্কুল', উভয়ই চলিতেছিল। ক্রমে এই দুইটি মিশিয়া গিয়া বর্ত্তমান হেয়ার স্কুলে পরিণত হইয়াছে।

অতঃপর আমরা এই যুগে বঙ্গদেশে বালিকা-বিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব।

"১৮১৭ সালে স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হওয়া অবধি এই প্রশ্ন উঠে যে, বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগকেও শিক্ষা দেওয়া হইবে কি না? এই বিষয় লইয়া সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। রাধাকান্ত দেব উক্ত সোসাইটির অন্যতর সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন; এবং স্কুল সোসাইটির অধীনস্থ কোন কোনও পাঠশালাতে বালকদিগের সহিত বালিকাদিগকেও শিক্ষা দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করেন। সম্বৎসর পরে তাঁহার ভবনে স্কুল সোসাইটির পাঠশালা-সকলের বালকদিগের যখন পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণ হইত, তখন বালকদিগের সহিত বালিকারাও আসিয়া পুরস্কার লইয়া যাইত।

এইরূপ কয়েক বৎসর যায়। কিন্তু বালকদিগের সহিত বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া অনেক সভ্যের অভিপ্রেত হইল না। এই বিষয়ে যে বিচার উপস্থিত হইল, তাহার ফলস্বরূপ ১৮১৯ সালে স্থাপিত মিশন সোসাইটির এক জন সভ্য ভারতীয় নারীগণের দুর্দ্দশা ও শিক্ষার আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া এক নিবেদন-পত্র বাহির করিলেন। সেই নিবেদন-পত্রের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া Mr. Lawson and Pearce's Seminary নামক তৎকাল-প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের মহিলাগণ একত্র হইয়া ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য এক সভা স্থাপন করিলেন; তাহার নাম হইল 'Female Juvenile Society'। এই সভার মহিলা-সভ্যগণ কলিকাতার নানা স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাধাকান্ত দেব ইঁহাদের উৎসাহদাতা হইলেন এবং নিজে 'স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক' নামে একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়া তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসর কার্য্য চলিল। ১৮২১ সালে স্কুল সোসাইটির কতিপয় মহিলা-সভ্যের প্ররোচনায় ইংলণ্ডের British and Foreign School Societyর সভ্যগণ কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া কুমারী কুক (Miss Cooke)

নাম্নী এক শিক্ষিতা মহিলাকে এদেশে প্রেরণ করিলেন। কুমারী কুক ১৮২১ সালে নবেম্বর মাসে এদেশে উপস্থিত হইলেন। ... চার্চ্চ মিশনরী সোসাইটির সভ্যগণ ... কুমারী কুকের ভার গ্রহণ করিলেন। উক্ত মিশনের অধীন থাকিয়া তিনি উৎসাহের সহিত ... বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষাতে মনোনিবেশ করিলেন।

এক দিন তিনি শিশুদের বাঙ্গালা শুনিবার জন্য স্কুল সোসাইটির স্থাপিত কোনও পাঠশালাতে গিয়া দেখেন, একটি বালিকা পাঠশালার দ্বারে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে; গুরুমহাশয় তাহাকে বালকদিগের সহিত পড়িতে দিবেন না। অনুসন্ধানে জানিলেন, সেই বালিকাটির ভ্রাতা ঐ পাঠশালে পড়ে; শিশু বালিকাটি স্বীয় ভ্রাতার সহিত পড়িবার জন্য গুরুমহাশয়কে মাসাধিক কাল বিরক্ত করিতেছে। কুমারী কুক সেই বালিকার মাতার ও অপরাপর মহিলাদিগের সহিত দেখা করিলেন। অনেক কথোপকথনের পর সেই পাড়াতে বালিকা-বিদ্যালয় খোলা স্থির হইল। অল্প দিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দশটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, এবং ন্যূনাধিক ২৭৭টি বালিকা শিক্ষা করিতে লাগিল।

কুমারী কুক দুই বৎসর এই ভাবে কাজ করিলেন। অবশেষে তিনি (Mr. Wilson) উইল্‌সন্ নামক এক জন মিশনরী সাহেবের সহিত পরিণীতা হইলেন। বিবাহের পরেও তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে রত রহিলেন বটে, কিন্তু আর পূর্ব্বের ন্যায় সময় দিতে পারিতেন না। এই অভাব দূর করিবার জন্য কলিকাতার কতিপয় ভদ্র ইংরাজ মহিলা সমবেত হইয়া তদানীন্তন গবর্ণর-জেনেরাল লর্ড আমহার্ষ্টের পত্নী লেডী আমহার্ষ্টকে আপনাদের অভিনেত্রী করিয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধানার্থ বেঙ্গল লেডীস্ সোসাইটি (Bengal Ladies' Society) নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। এই সভার মহিলা-সভ্যগণের উৎসাহে ও যত্নে নানা স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইতে লাগিল। অল্প কালের মধ্যেই ইঁহারা শহরের মধ্যস্থলে একটি প্রশস্ত স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।...ঐ গৃহনির্ম্মাণকার্য্যের সাহায্যার্থ রাজা বৈদ্যনাথ বিংশতি সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। ... বেঙ্গল লেডীস্ সোসাইটি (Bengal Ladies' Society) বহু বৎসর জীবিত থাকিয়া কার্য্য করিয়াছিল। এমন কি, ... আডাম সাহেব বঙ্গদেশের শিক্ষার অবস্থা বিষয়ে যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহাতে কলিকাতা ব্যতীত শ্রীরামপুর, বর্দ্ধমান, কাল্‌না, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম প্রভৃতি স্থানে ১৯টি বালিকা-বিদ্যালয় ও প্রায় ৪১০টি বালিকার উল্লেখ দেখা যায়; এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ের অনেকগুলি Ladies' Society-র সভ্য-মহোদয়াগণের উৎসাহে স্থাপিত বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু এই সকল বালিকা-বিদ্যালয়ের অধিকাংশ খ্রীষ্টীয় মহিলাদিগের স্থাপিত ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের অঙ্গীভূত ছিল।

সাম্প্রদায়িক-ধর্ম্ম-শিক্ষাবিহীন শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন বীটন্ সাহেব সর্ব্বপ্রথমে করেন। সে কার্য্যের প্রতিষ্ঠা ১৮৪৯ সালে হয়।"[১৭]

মেডিকেল কলেজ ইহার অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাহারও কিঞ্চিৎ বিবরণ এই প্রস্তাবে প্রদান করা যাইতেছে।

"অগ্রে এদেশীয়দিগকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ আয়োজন ছিল না। ইংরাজ ডাক্তারগণের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় হস্পিটাল এসিষ্টাণ্ট প্রেরণ করা আবশ্যক হইত। তাই এক দল এদেশীয় হস্পিটাল এসিষ্টাণ্ট প্রস্তুত করিবার জন্য 'মেডিকেল ইনষ্টিটিউশন' নামে একটি সামান্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। সেখানে হিন্দুস্থানী ভাষাতে ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্রের কতকগুলি ঔষধ ও তাহার গুণাবলী বিষয়ে সপ্তাহের মধ্যে কয়েক দিন উপদেশ দেওয়া হইত মাত্র। ডাক্তার টাইটলার (Dr. Tytler) ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৩৪ সালে ... ডাক্তার রস্ (Dr. Ross) ঐ বিদ্যালয়ে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার উপদেষ্টা ছিলেন। ছাত্রদিগকে তিনি যে উপদেশ দিতেন, তাহাতে সোডার গুণ সর্ব্বদাই ব্যাখ্যা করিতেন। ... সোডার মহিমা শুনিয়া শুনিয়া ছাত্রেরা এমন বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল যে তাহারা তাঁহার নাম 'সোডা' রাখিয়াছিল! ... কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে প্রকাশ্য সংবাদপত্রে 'শ্রীযুক্ত সোডা এবং তাঁহার ছাত্রবৃন্দ' (Soda and his Pupils) এই শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। Dr. Tytler একজন প্রাচ্যপক্ষপাতী ও উৎকেন্দ্র লোক ছিলেন। এদেশীয়দিগকে ইংরাজী ভাষাতে চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

এই কারণে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সময় তিনি বড় বাধা দিয়াছিলেন।...

সংস্কৃত কালেজে চরক ও সুশ্রুতের শ্রেণী এবং মাদ্রাসাতে আবিসেন্নার শ্রেণী খুলিয়া দেশীয় বৈদ্যক-শাস্ত্র শিক্ষা দিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছিল। মেডিকেল কালেজ স্থাপন পর্য্যন্ত এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল। কিন্তু ইংরাজ-রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী প্রণালীতে শিক্ষিত চিকিৎসকের প্রয়োজন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিলাত হইতে বহু অর্থ দিয়া এত ডাক্তার আনা কঠিন বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ এদেশীয়দিগকে ইংরাজী প্রণালীতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতে লাগিলেন।...

১৮৩৪ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক দেশীয় চিকিৎসা-বিদ্যার অবস্থা অবগত হইবার জন্য সেই সময়ের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া এক কমিশন নিয়োগ করিলেন। সুবিখ্যাত রামকমল সেন মহাশয় ঐ কমিশনের এক জন সভ্য ছিলেন। সভ্যগণ নানা জনের সাক্ষ্য লইয়া ও নানা স্থান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, এ দেশীয়দিগকে ইউরোপীয় প্রণালীতে ইউরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য একটি মেডিকেল কালেজ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। তদনুসারে ১৮৩৫ সালের জুন মাসে মেডিকেল কালেজ খোলা হয়। ডাক্তার ব্রাম্‌লি (Dr. Bramley) ইহার প্রথম অধ্যক্ষ হন। তাঁহার মৃত্যু হইলে ১৮৩৭ সালে মহামতি হেয়ার ইহার সম্পাদক হন। তাঁহারই প্ররোচনাতে তাঁহার ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত সর্ব্ব প্রথমে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিবার জন্য অগ্রসর হন। সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি, এই মৃতদেহব্যবচ্ছেদ লইয়া সে-সময়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।"৮০

১৬

রামমোহন রায়ের ইংরেজী স্কুল ও বেদ-বিদ্যালয় (১৮১৭-১৮৩০)

হিন্দু কলেজ কমিটির সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবার পর রামমোহন রায় (১৮১৬ কিংবা ১৮১৭ সালে) নিজ ব্যয়ে কলিকাতার শুঁড়িপাড়া-অঞ্চলে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ইহাই এ দেশীয় লোকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম স্বাধীন বিদ্যালয়। ইহার ছাত্রসংখ্যা ২০০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এই স্কুলে সাধারণ শিক্ষার সহিত ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ নানা সময়ে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এবং রেভারেণ্ড উইলিয়ম এডামকে এই কার্য্যের ভার প্রদান করা হইয়াছিল। অতঃপর রামমোহন রায় এই স্কুলের সংশ্রবে তাঁহার মাণিকতলার বাগান-বাড়ীতে একটি ইংরেজী ক্লাস খুলিলেন; তাহাতে ঐ স্কুলের শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণ পড়িতে লাগিল; এবং তিনি মোর্‌ক্রফ্‌ট্ (Morecroft) নামক এক জন ইংরেজকে মাসিক ১০০৲ বেতনে তাহার কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করিলেন। কিছুকাল পরে যখন হেদুয়া পুষ্করিণীর চারি ধারে 'কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ার' (Cornwallis Square) নামক উদ্যান প্রস্তুত হইতেছিল, তখন রামমোহন রায় তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া, ১৮২২ সালে তাহার উপরে নিজ স্কুলের জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। স্কুলটির নাম ছিল 'এংলো-হিন্দু-স্কুল' (Anglo-Hindu School); ইহা অবৈতনিক স্কুল ছিল। ইহার ব্যয়ভারের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে রামমোহন রায়ের কাছে ছিল; কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণও কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। উত্তরকালে য়ুনিটেরিয়ান মিশনরী রেভারেণ্ড উইলিয়ম এডামকে রামমোহন রায় এই স্কুলের পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণট সাহেব (Sandford Arnot, যিনি 'ক্যালকাটা জর্ণাল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, এবং রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড প্রবাসকালে তাঁহার সেক্রেটারীর কার্য্য করিতেন) এই স্কুলের এক জন শিক্ষক ছিলেন।৮১

নিজ স্কুলে সাধারণ শিক্ষার সহিত ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াও রামমোহন রায় তৃপ্ত হইলেন না। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সাহায্যে বয়স্কদিগের জন্য একটি ধর্ম্ম-শিক্ষালয়ও তিনি স্থাপন করিলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহিত রামমোহন রায়ের যোগের বৃত্তান্ত এই। রামমোহন রায়ের বন্ধু হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী নিজ ভ্রাতা রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে রামমোহন রায়ের হস্তে অর্পণ করেন। রামমোহন রায় রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে নিজ পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মিশ্রের নিকট উপনিষদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে আদেশ করেন। যখন রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ঐ দুই শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া 'বিদ্যাবাগীশ' উপাধিতে ভূষিত হইলেন, তখন (১৮২৬) রামমোহন রায় তাঁহাকে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া একটি 'বেদ-বিদ্যালয়' বা 'Vedanta College' প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই বিদ্যালয়ও হেদুয়ার ধারে বসিত।[৮২] এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, রামমোহন রায়ের নব-নির্ম্মিত ইংরেজী স্কুল-গৃহেই ইহা (সেই স্কুলের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে) বসিত। এই বিদ্যালয়ে উপনিষদ্ ও বেদান্তাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ অধ্যাপনা ও ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। এইরূপে রামমোহন রায় তাঁহার ইংরেজী স্কুলটির সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত করিয়া একটি ধর্ম্মশিক্ষালয়ও স্থাপন করিলেন। কিন্তু এই 'বেদ-বিদ্যালয়' অধিক দিন জীবিত থাকে নাই।

১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে রামমোহন রায় ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। তখন তাঁহার ইংরেজী স্কুলটির প্রধান শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র মিত্রের উপরে সেই স্কুল পরিচালনের সম্পূর্ণ ভার পতিত হইল। সে-সময় হইতে কিছু কাল তাহা 'পূর্ণ মিত্রের স্কুল' নামে পরিচিত হইয়াছিল। ১৮৩৪ সালের জানুয়ারী মাস হইতে স্কুলটির নাম হইল 'ইণ্ডিয়ান একাডেমী'। সুপ্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই ইণ্ডিয়ান একাডেমীর ছাত্র ছিলেন।

১৮২৮ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে বেঙ্গল হরকরা পত্রিকার অফিসে এক বার রামমোহন রায়ের এংলো-হিন্দু স্কুলের ছাত্রগণের পরীক্ষা হয়। সে-সময়ে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার দিনে স্কুল-কমিটির সভ্যগণকে, ছাত্রদিগের অভিভাবকগণকে, এবং নগরবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রণ করা হইত; এবং সর্ব্বসমক্ষে ছাত্রগণের পরীক্ষা লওয়া হইত। ছাত্রগণ কর্ত্তৃক সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ স্থান হইতে আবৃত্তি, দুরূহ প্রশ্নের সমাধান, প্রভৃতি উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী বিশেষ কৌতূহলের সহিত শ্রবণ ও দর্শন করিতেন, এবং কৃতী ছাত্রগণকে পুরস্কার দান করিয়া উৎসাহিত করিতেন। রামমোহন রায়ের স্কুলের ঐ দিনের পরীক্ষার বিবরণ ১০ই জানুয়ারী ১৮২৮ তারিখের বেঙ্গল হরকরা পত্রিকায় মুদ্রিত আছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন একাদশ বর্ষ বয়স্ক বালক। তিনি রামমোহন রায়ের স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার ঐ পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত থাকিবার কথা।[৮৩]

স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু রামমোহন রায়ের স্কুল সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "এই স্কুলে ইতিহাসাদি সহ বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতির শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহার এক পরিদর্শক, আদম সাহেব, ১৮২৭ অব্দে ... লিখিয়াছিলেন :—

Two teachers are employed, one at a salary of Rs. 150 per month, and the other at a salary of Rs. 70 per month; and from 60 to 80 Hindu boys are instructed in the English language. The doctrines of Christianity are not inculcated, but the duties of morality are carefully enjoined, and the *facts* belonging to the history of Christianity are taught to those pupils who are capable of understanding general history."[৮৪]

রামমোহন রায়ের এংলো-হিন্দু স্কুলের প্রথম ছাত্রদলের মধ্যে নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ দে প্রভৃতি ছিলেন।

রামমোহন রায় যখন বিলাত গমনের উদ্যোগ করেন, তখন তাঁহার পরামর্শ অনুসারেই তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজ ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার সতীর্থ নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতিও হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিলেন।

১৭

হিন্দু কলেজের ধর্ম্মহীন শিক্ষার প্রতি রামমোহনের অনাস্থা ; এডাম এবং হেয়ার সাহেব সর্ব্ববিষয়ে রামমোহনের সঙ্গী হন নাই

বিগত প্রস্তাবে আমরা দেখিয়াছি যে, রামমোহন রায় নিজে স্বাধীন ভাবে যে স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহাতে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করা তাঁহার বিশেষ আগ্রহের বিষয় হইল। হিন্দু কলেজের উদ্যোক্তাগণ হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী

মনে করিয়া রামমোহন রায়কে দূরে ফেলিলেন। ফেলিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহারা কিরূপ বিপন্ন হইতে লাগিলেন, তাহা আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব। রামমোহন রায় কলেজের কর্ণধার থাকিলে হয়তো কলেজটি এত অধিক ধর্ম্মস্পর্শবিহীন হইতে পারিত না। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা ইহা দেখিতে পাইব যে, তৎকালে রামমোহন রায়ের মনের সকল ভাব বুঝিতে সমর্থ মানুষ প্রায় কেহই ছিলেন না। রামমোহনের জীবদ্দশাতেই হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের আচরণে ধর্ম্মহীনতার ফলস্বরূপ নানা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে। সেই ছাত্রগণের অনেকে সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন; তথাপি রামমোহন তাঁহাদের কার্য্যের সমর্থন করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের ধর্ম্মহীনতার তিনি গভীর মর্ম্মবেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় উত্তরকালে ইংলণ্ডে অবস্থিতি সময়ে এই উচ্ছৃঙ্খল দল সম্বন্ধে নিজের মনের ভাব যেরূপে ব্যক্ত করিতেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার একজন চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন,

"He often deplored the existence of a party which had sprung up in Calcutta, composed principally of imprudent young men, some of them possessing talent, who had avowed themselves sceptics in the widest sense of the term. He described it as partly composed of East Indians, partly of the Hindu youths who, from education, had learnt to reject their own faith without substituting any other. These he thought more debased than the most bigoted Hindu, and their principles the bane of all morality.[৮৫]

একটি প্রচলিত গল্প হইতেও এই উচ্ছৃঙ্খল দল সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের মনের ভাব বুঝিতে পারা যায়। গল্পটি এই: রামমোহন রায়ের কাছে কেহ আসিয়া বলিয়াছিল, "মহাশয়, অমুক আগে ছিল polytheist, তাহার পর হইল deist, এখন সে হইয়াছে atheist।" রামমোহন রায় হাসিয়া বলিলেন, "ইহার পরে সে হয়তো হইবে beast।"

*রামমোহন রায়ের মৃত্যুর ৭ বৎসর পরে (১৮৪০ সালে) তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরের চেষ্টায় হিন্দু কলেজে ধর্ম ও নীতি শিক্ষার কথঞ্চিৎ আয়োজন-স্বরূপ 'কলেজ পাঠশালা' নামে একটি (attached) পাঠশালা যুক্ত হয়। যদিও তাহা অনেক পরবর্ত্তী কালের ঘটনা, তথাপি এখানেই তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

রামমোহন রায়ের ন্যায় দ্বারকানাথ ঠাকুরও হিন্দু কলেজের ধর্ম্মহীন শিক্ষায় অসন্তুষ্ট ছিলেন। উক্ত কলেজের নিয়মাবলী ও উদ্দেশ্যের ভিতরে ধর্ম্মশিক্ষার কোনও স্থান রাখা হইল না,—ইহা দেখিয়া রামমোহন রায় অতীব ব্যথিত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনি ইহার পরিচালকমণ্ডলীর বহির্ভূত বলিয়া কিছু প্রতীকার করিতে সমর্থ হন নাই। ১৮৪০ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়া, হিন্দু কলেজে প্রদত্ত সাধারণ শিক্ষার সহিত সংস্কৃত ভাষার ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন কথঞ্চিৎ পরিমাণে যুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে, ঐ কলেজের অধীনে অথচ উহার সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা হইতে পৃথক রাখিয়া, 'কলেজ পাঠশালা' নামে একটি পাঠশালা স্থাপন করিলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইহার প্রধান শিক্ষক হইলেন। ইহার নাম পাঠশালা হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহা একটি উচ্চাঙ্গের চতুষ্পাঠী হইল। প্রসন্নকুমার ও দ্বারকানাথের এই আয়োজনকে রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ১৮২৬ সালে স্থাপিত (এবং তৎকালে লুপ্ত; বিগত প্রস্তাব দ্রষ্টব্য) বেদ-বিদ্যালয়ের (বা Vedanta Collegeএর) পুনঃপ্রতিষ্ঠা বলা যাইতে পারে।

ধর্ম্মশিক্ষার সহায়তার জন্য রামমোহন রায় নিজ স্কুলে তাঁহার বন্ধু ও অনুবর্ত্তী এডাম সাহেবের সাহায্য লইতেন বটে; কিন্তু এডাম সাহেবও রামমোহন রায়ের মনের সকল ভাব বুঝিতে পারিতেন না। রামমোহন রায়ের সংস্পর্শে আসিয়া এডাম সাহেব প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের ত্রীশ্বরবাদ পরিত্যাগ করিলেন বটে; কিন্তু ভারতবর্ষের ধর্ম্মভাব বুঝিতে পারা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল না। তিনি মনে করিতেন, রামমোহন রায়ও বুঝি তাঁহার মতন, কেবল খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব-বর্জ্জিত খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন; এবং আশা করিতেন যে রামমোহন রায় এই ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাবৎ কর্ম্ম করিবেন। ধর্ম্মবিষয়ে এডাম সাহেবের চিন্তার ও বুদ্ধির পরিসর

এরূপ সঙ্কীর্ণ ছিল বলিয়া রামমোহন রায় তাঁহাকে নিজ প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করিতেন বটে, কিন্তু কোন বিষয়ে তাঁহাকে কর্তৃত্ব করিতে দিতেন না; সর্ব্ববিষয়ের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নিজ হাতেই রাখিতেন।৮৬ এডাম সাহেব এই কথা তাঁহার কোন কোন পত্রে কিঞ্চিৎ ক্ষোভের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন।

এক দিকে প্রাচীন-পন্থী গোঁড়া হিন্দুর দল; আর এক দিকে উচ্ছৃঙ্খল, হিন্দুধর্ম ও হিন্দু রীতির অবজ্ঞাকারী হিন্দু কলেজের নব্য ছাত্রদল; তৃতীয় আর এক দিকে খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারকগণ, যাঁহাদের ব্যগ্রতার বিষয় কেবল এই যে, কিরূপে এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার হয়। রামমোহন রায় ইঁহাদের সকল দলের সহিতই যোগ রক্ষা করিয়াছেন, যাহার নিকট হইতে যে সাহায্য লওয়া সম্ভব তাহা লইয়াছেন, সকলেরই কল্যাণ-চেষ্টায় সাহায্য করিয়াছেন; কিন্তু নিজ লক্ষ্য কখনও বিস্মৃত হন নাই।

পাঠক এখন হয়তো বুঝিতে পারিতেছেন যে রামমোহন রায় কেন দেবেন্দ্রনাথের বাল্যবয়সে তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি না করিয়া তাঁহার নিজের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে ভর্ত্তি করিবার জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

হিন্দু কলেজের প্রথম ছাত্রদল তাঁহাদের সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের এই অনাস্থার বিষয় অবগত হইয়াও রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে কখনও কিছু বলেন নাই। রামমোহন রায় তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক অধিকবয়স্ক ছিলেন, এবং রামমোহন রায়ের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত রাখিত। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত মধ্যে মধ্যে এই ছাত্রদলের সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। কিন্তু দ্বারকানাথও (রামমোহন রায়ের ন্যায়) সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা প্রতিবাদীর চিত্ত জয় করিতে জানিতেন। তাই তাঁহার প্রতি তাঁহাদের সেই বিরুদ্ধতা অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই।৮৭

রামমোহন রায়ের পরম বন্ধু ডেভিড হেয়ারও যে রামমোহন রায়ের মনের সব ভাব বুঝিতেন, তাহা নয়। বিদ্যালয়ে সাধারণ বিদ্যার সহিত ধর্ম ও নীতি শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা ডেভিড হেয়ার অনুভব করিতেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ বিষয়ে রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার প্রকৃতির গুরুতর পার্থক্য ছিল; অথচ উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা চিরকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৮১৮ সালে, যখন ডেভিড হেয়ার স্কুল সোসাইটির স্কুল ও পাঠশালা লইয়া ব্যস্ত, সেই সময়ে রামমোহন রায় স্বীয় 'আত্মীয় সভা'র দ্বারা এবং 'Abridgment of the Vedant' নামক ইংরেজী গ্রন্থের দ্বারা দেশ-বিদেশে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন; শেষোক্ত গ্রন্থের একটি সংস্করণ ইংলণ্ডেও মুদ্রিত হইয়াছে। যে পরিমাণে তিনি য়ুরোপীয়গণের ও এদেশের সংস্কারপ্রিয় লোকদের দ্বারা আদৃত হইতে লাগিলেন, সেই পরিমাণে তিনি রক্ষণশীল লোকদের নিকটে অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। ডেভিড হেয়ার নিজ বন্ধুর এই খ্যাতি-প্রতিপত্তি দেখিয়া তাঁহাকে স্কুল সোসাইটির পরিচালকমণ্ডলীতে গ্রহণ করিতে অতিশয় ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু সেরূপ করিলে পাছে স্কুলগুলি হিন্দু সাধারণের নিকটে অপ্রিয় হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় তাহা করিতে পারিলেন না। রামমোহন রায় স্কুল সোসাইটির বাহিরে থাকিয়াও যথাসম্ভব পরামর্শাদির দ্বারা বন্ধুর কল্যাণকর্ম্মের সহায়তা করিতে লাগিলেন।

মন্তব্য

(৭৬) *David Hare*, pp. 49, 50.

(৭৭) পাঠশালায় তালপাতার ক্লাস, কলাপাতার ক্লাস ও কাগজের ক্লাস বিষয়ে প্রবাসীর বিগত শ্রাবণ সংখ্যার ৪৮২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে রাজনারায়ণ বসু কৃত বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

(৭৮) *David Hare*, p. 52.

(৭৯) রামতনু, ১৮৭—১৮৯; *David Hare*, pp. 52-57.

(৮০) রামতনু, ১৫৭, ১৫৮; *David Hare*, pp. 11, 45.

(৮১) এই স্কুল দর্শন করিয়া তদানীন্তন *Calcutta Times* পত্রিকার সম্পাদক M. Dacosta ফ্রান্সে Bishop Abbe Gregoireকে যে মন্তব্য লিখিয়া পাঠান, তাহা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত একটি ইংরেজী প্রবন্ধে (*Journal of Bihar and Orissa Research Society*র June 1930 সংখ্যার 161 পৃষ্ঠাতে) মুদ্রিত আছে।

(৮২) "ব্রাহ্মসমাজের প্রথম উপাসনাপদ্ধতি, ব্যাখ্যান ও সঙ্গীত," শ্রীঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৮৯৭; ১১৩ পৃষ্ঠা। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ৭৪ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটের ভূমিতে এই বাড়ী ছিল।

(৮৩) রামমোহন রায়ের Anglo-Hindu School সম্বন্ধে এই সকল তথ্যের অধিকাংশ শ্রীযুক্ত অমল হোম সম্পাদিত Rammohun Roy, the Man and His Work পুস্তক (F. M. I., II. 44) হইতে গ্রহণ করা হইল। ৭ই জানুয়ারীর পরীক্ষার সমগ্র বৃত্তান্ত ঐ পুস্তকে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় সংগৃহীত বিবরণে প্রদত্ত আছে।

ফারসী 'হর্-কারহ্' শব্দের অর্থ man of all work বা errand-boy; তাহাই বর্ত্তমান বাংলা ভাষায় বিকৃত হইয়া 'হরকরা' হইয়াছে। সে যুগে অ-কারকে u অক্ষরের দ্বারা এবং আ-কারকে a অক্ষরের দ্বারা transliterate করা হইত; তাই 'হর-কারহ্' শব্দের ইংরেজী রূপ *Hurkaru* হইয়াছিল।

(৮৪) ঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত 'শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের জীবনবৃত্তান্তের স্বল্প পরিচয়,' ১৯০২; ১১ পৃঃ। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত ইংরেজী প্রবন্ধ, p. 163.

(৮৫) *Biography of Raja Ram Mohan Roy*: London 1833-34. এই স্থলে East Indian বলিতে রামমোহন রায় প্রধানতঃ ডিরোজিওর কথাই মনে করিয়াছিলেন। ডিরোজিও ১৭ বৎসর বয়সে ১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৮৬) Life and Letters of Raja Ram Mohun Roy by Collet and Sarkar. Calcutta, 1913. Pp. 106, 107, 128, 134.

(৮৭) Kissory Chand Mitra প্রণীত *Memoir of Dwarkanath Tagore*, p. 11, এবং শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মণ কাণ্ডের ষষ্ঠ অংশ" (পীরালী ব্রাহ্মণ বিবরণের ১ম খণ্ড, ১৩১১ বঙ্গাব্দ, চৈত্র --নামক পুস্তকের ৩৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিস্মৃতি ও স্মৃতি

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছে।

খুব জোরে ঝম্ ঝম্ করিয়া নহে, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি। সন্ধ্যার সময় একা একা বাড়ীর মধ্যে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে না, কিন্তু উপায় নাই।

শ্রাবণ মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; ক্যালেণ্ডারের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সাতাশে।

মনে হইল, আজ কত বৎসর ধরিয়া শ্রাবণের শেষ দিকে মনে হইয়াছে, বোধ হয় আজই শেষ বর্ষণ, ভাদ্র মাস আসিলেই শরৎকাল, কাশফুলে ভরা, শিউলির রঙে রাঙা শরৎ। কিন্তু পঞ্জিকায় ভাদ্র মাস হইতে শরৎ আরম্ভ হইলেও প্রকৃত শরৎ আসিতে গোটা ভাদ্র কাটিয়া যায়। তাহার পর সহসা এক দিন আবিষ্কার করি, শরৎ আসিয়াছে, অবিরাম অশ্রুবর্ষণের পরে আকাশের চোখে হাসি ফুটিয়াছে।

আমার ষাট বৎসর বয়স হইয়াছে, ত্রিশ বৎসর আগে যৌবন পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। তবু এমনি দিনে মনটা কেমন আনন্দে ভরিয়া যায়, শহরে থাকিয়াও মনে হয় কল্পনার চোখে আমি শুভ্র কাশফুলের গুচ্ছ দেখিতে পাইতেছি, ষ্টেশন হইতে মেঠো রাস্তা ধরিয়া পূজার দিন-কয়েক আগে গ্রামে আসিতেছি, পল্লী-প্রকৃতি তাহার বর্ণবৈচিত্র্যের সম্ভার লইয়া আমাকে সাদরে ডাকিয়া লইতেছে।

অবশ্য বুঝি, পঁয়ত্রিশ বছর আগে যে-চোখ দিয়া শরতের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, সে-দৃষ্টির আর কণামাত্রও অবশিষ্ট নাই। আমার যৌবন বহু—বহু দূরের অতীতে বিলীন হইয়াছে, আমি এ-জীবনের খেয়াপার হইবার রাস্তা ধরিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ক্রমাগত পিছনে ফিরিয়া দেখিতেছি, কিন্তু ঝাপসা দৃষ্টি আর বেশী দূর পৌঁছিতেছে না।

ক-টা দিনই বা আর বাকী! বাঙালীর জীবনে ষাট বৎসর বয়স বার্দ্ধক্যের প্রায় শেষ ধাপ, আর গুটিকয়েক ধাপ কোনও রকমে পার হইতে পারিলেই দীঘির শীতল

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কোণারকের পথে

শ্রীকিঙ্কর বেইজ

কালো কাকচক্ষু জলে চিরদিনের মত বিশ্রাম লইতে পারিব। মৃত্যুর পশ্চাতে অন্ধকার ছাড়া আর কি আছে?

কিছুই নাই।

বাহিরে তাকাইলাম। সন্ধ্যা ধীরে ধীরে রজনীতে পরিণত হইতেছে, বৃষ্টি থামিবার কোনও লক্ষণ নাই। বিরক্ত হইয়া ক্যালেণ্ডারের দিকে আবার তাকাইলাম, যেন আমার দৃষ্টির ফলেই বর্ষা অবিলম্বে শরতে পরিণত হইবে!

সাতাশে শ্রাবণ।

ঠিক এক মাস আগে আমার ষাট বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সহসা মনে হইল, আজিকার দিনটিরও যেন আমার জীবনে কি বিশেষত্ব রহিয়াছে। মনে করিতে পারিলাম না, অনেক চেষ্টা করিয়াও না।

ষাট বৎসর এক মাস আগে এক পল্লীর নিভৃত কুঁড়েঘরে পৃথিবীর আলো অথবা কুঁড়েঘরের অন্ধকার, দেখিয়াছিলাম। তাহার পরে এত দিন পৃথিবীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ভিক্টোরীয় যুগ ছাড়াইয়া ষষ্ঠ জর্জের যুগে পড়িয়াছি। ডাঙায় রেলগাড়ী যে-সময়ে অবাক হওয়ার বিষয় ছিল, সে-সময় কাটিয়া এরোপ্লেনের যুগ আসিয়াছে। আর আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুর কথা যদি সত্য হয়, তবে আর কিছু দিনের মধ্যেই বায়ুমণ্ডলের উচ্চতম স্তরের মধ্য দিয়া আকাশযান ছুটিবে, সমস্ত পৃথিবীটাকে নব্য মানবের হাতের মধ্যে আনিয়া।

কিন্তু, কিন্তু আমার জীবনে সাতাশে শ্রাবণ কি শুভদিন আনিয়াছিল? ঠিক এমনি মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, ছায়াচ্ছন্ন ধরণী, এমনি টিপ্‌ টিপ্‌ বর্ষণ, এমনি একটি দিনে আমার জীবনে কি ঘটিয়াছিল?

বুঝিলাম, ষাট বৎসর বয়সকে অবহেলা করা চলে না। আমার স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছে। মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল।

আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তবে ত অনেক জিনিষই ভুলিয়া যাওয়া উচিত। চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, অতি শিশুকালে যে-সব কবিতা পড়িয়াছিলাম, তাহার অধিকাংশই অবিকল মনে রহিয়াছে। ছাত্রজীবনের অনেক আনন্দ, অনেক ব্যথা, তাহার খুব অল্প অংশই ভুলিয়াছি। তাহা ছাড়া, জীবনের কতকগুলি ঘটনা, যাহাদের নিঃশেষে ভুলিতে পারিলে বিনিময়ে আমার জীবনের দশটা বৎসর অক্লেশে ছাড়িয়া দিতে পারিতাম, এসবও মনে আছে; শুধু মনে আছে নয়, কারণে অকারণে, সময়ে অসময়ে কাঁটার মত বিঁধিয়া আমার বার্দ্ধক্যের শান্তিময় জীবনকে অসহনীয় করিয়া তোলে।

চাকর আসিয়া তামাক দিয়া গেল। তামাক টানিতে টানিতে অন্যমনস্কভাবে নানা কথা ভাবিতে লাগিলাম। আমার ষাট বৎসর বয়স হইয়াছে, পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে বিবাহ করিয়াছি; ছেলেটির বিবাহ দিয়াছি, তাহারও ছেলেমেয়ে হইয়াছে। বড় মেয়েটির ত প্রায় নিজেরই ঠাকুরমা হওয়ার বয়স হইল। দুই বছর আগে ছোট মেয়েরও বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি; চিন্তা করিবার মত বিশেষ কোনো বিষয় আর অবশিষ্ট নাই।

গৃহিণীর পঞ্চাশ বৎসর উৎরাইয়া গিয়াছে, এখন তাঁহার দিনরাত্রির চিন্তা ধর্ম্ম, ঈশ্বর ও পরকাল। আমার দিকে নজর দিবার সময়ও বোধ হয় আর বেশী নাই। প্রয়োজন নাই একথা বলিলে অবশ্য মিথ্যা কথা বলা হয়। কারণ বৃদ্ধবয়স মানুষের দ্বিতীয় শিশুকাল; এক জন অভিভাবক না থাকিলে পদে পদে অস্বস্তি বোধ হয়।

অবশ্য, গৃহিণী আমার জন্য এক জন অভিভাবক ঠিক করিয়া দিয়াছেন। চাকর উমেশ আমার ওঠা, বসা, খাওয়া, ঘুমানো, বেড়ানো, সমস্ত জিনিষের তদ্বির করে, এবং এসব সে বোঝেও ভাল। যদিও সমস্ত বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হওয়ার মত বৃদ্ধ আমি এখনও হই নাই।

বৈজ্ঞানিক বন্ধু আসিলেন। উমেশ আর একটি গড়গড়া দিয়া গেল।

বন্ধু কলিকাতার এক বে-সরকারী কলেজের পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক। তিনি জগৎকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, এবং গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার বাহিরে কোনও কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। সঙ্গদোষে আমিও আমার অবৈজ্ঞানিক মনকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছি। বর্ষার আকাশের দিকে তাকাইয়া

কোন নিবিড়কুন্তলা তরুণীর কথা মনে হইলে মনকে চোখ রাঙাই, শীতের শিশির যখন পত্রহীন গাছের ডালে ডালে মুক্তাহার সৃষ্টি করে, তখন বন্ধুর কথা মনে করিয়া সারফেস্ টেন্‌সন্ দিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করি।

অবশ্য, সব সময়ে যে সফল হই, তাহা নহে। কারণ আমার মনের মধ্যে কোনও অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক লুকাইয়া নাই। সাদা চোখে যাহা দেখি, তাহাকে কল্পনার রঙে রাঙাইয়া সুন্দর করিয়া তোলা আমার পক্ষে সহজ এবং স্বাভাবিক। তাই এত শিক্ষা সত্ত্বেও পদ্ম দেখিলে প্রভাতরবির প্রিয়া বলিয়াই মনে হয়, গোলাপের রক্তরূপ রূপসীর ওষ্ঠাধরকেই স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহাদের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ করিবার কথা মনে আসে না।

বন্ধু আমাকে কৃপার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু আমি জানি আমাদের পথ ভিন্ন, এবং আমার পথই বৃহত্তর সফলতার পথ, বিজ্ঞানের নানা কূট তর্কের অলিগলিপূর্ণ গোলকধাঁধা নয়।

বলিলাম, "আমার স্মৃতিবিভ্রম হয়েছে।"

আমার মুখে এত বড় সংস্কৃত কথা শোনা বোধ হয় বন্ধুবরের অভ্যাস ছিল না, তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া বলিলেন, "এত বড় কথাটা মনে রাখতে পারা ত স্মৃতিবিভ্রমের লক্ষণ নয়! তার চেয়ে সোজা কথায় বল, মাথার দোষ দেখা দিয়েছে।"

সবিনয়ে জানাইলাম, যে, সে-রকম কোনও অঘটন যদি ঘটিয়া থাকে, তবে সম্পূর্ণ আমার অজ্ঞাতে। আপাততঃ এই সাতাশে শ্রাবণ তারিখের রহস্যটা উদ্ঘাটন করিতে না-পারায় যে সামান্য একটু মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্য।

বন্ধু কহিলেন, "কাব্য পড়া ছাড়, সব ঠিক হয়ে যাবে। একটু থার্মোডিনামিক্‌স্ শিখবে?"

সভয়ে কহিলাম, "না না, আজ থাক, আর এক দিন হবে।" তা ছাড়া স্মৃতিভ্রংশই যখন হইয়াছে, তখন মিছিমিছি পড়িয়া লাভ কি?

আমার ঘরে ও বাহিরে দুই দিকেই সমান বিপদ। গীতা, চণ্ডী, মোহমুদ্গর, প্রভৃতি আত্মার উন্নতিকর গ্রন্থাবলীর দিকে আমার রুচি না-থাকায় গৃহিণী বিরূপ এবং ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি প্রভৃতি আধিভৌতিক ভোজবাজীর বিদ্যায় রুচিহীনতার জন্য বন্ধু বিরূপ। বন্ধু ও গৃহিণীর পাঠ্য-গ্রন্থাবলীর মধ্যে কোনও রকম বন্ধুত্ব সম্বন্ধ নাই; বন্ধু নাস্তিক, গৃহিণী পরম আস্তিক। শুধু এক জায়গায় তাঁহারা একমত, কাব্য ও কবিতার অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে।

আমার সাহিত্যিক রুচি শুধু আমার ছোট মেয়ে শীলার প্রীতিকর। কিন্তু সে এখন অনুপস্থিত, এবং আমি আমার শিবিরে শত্রুবেষ্টিত।

অথচ গৃহিণী চিরকাল এরূপ ছিলেন না। তিনি শিক্ষিত ঘরের মেয়ে, ইংরেজী বিশেষ না-জানিলেও সংস্কৃত-জ্ঞান বোধ হয় আমার চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। কিন্তু তাঁহার বয়স এখন পঞ্চাশ, যে-বয়সে মেঘদূতের চেয়ে মোহমুদ্গর অধিকতর প্রীতিপ্রদ, অভিজ্ঞান শকুন্তলমের চেয়ে গীতাভাষ্য অনেক বেশী মধুর।

বন্ধু কহিলেন, "কই দেখি, তোমার মেমারি কি রকম খারাপ হয়েছে; জিওমেট্রির উনত্রিশের থিওরেমটা বল ত!"

মনে হইল, স্মৃতিভ্রংশের এর চেয়ে ভাল প্রমাণ আর পাইব না। কারণ উনত্রিশের থিওরেম যে মনে নাই, সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলাম।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আরম্ভ করিবামাত্র সমস্ত প্যারাগ্রাফটা গড় গড় করিয়া বাহির হইয়া আসিল; কোথাও বাধিল না, কমা-সেমিকোলন পর্য্যন্ত না। স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

বন্ধু খুশী হইয়া গড়গড়ার নলটা মাটিতে ফেলিয়া কহিলেন, "এক্সেলেণ্ট! কোন্ হতভাগা বলে তোমার স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে? তুমি ঠিক আছ।"

কিন্তু সত্যই কি ঠিক আছি? মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলাম, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল ঠিক মনে আছে। পৃথিবীর পরিধি পঁচিশ হাজার মাইল, তবে উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা, তাহাও মনে রহিয়াছে। এমন কি সূর্য্যের নিকটতম

গ্রহ বুধ, এবং দূরতম গ্রহ নেপচুন, ইহাতেও ভুল হয় নাই।

তবে যত গোল কি ঐ সাতাশে শ্রাবণ লইয়া?

চাকর উমেশ আসিয়া কহিল, "বাবু, আজ মা বলেছিলেন আপনাকে বেড়িয়ে ফেরার পথে একটা ফুলদানী আনতে; এনেছেন কিনা জিগ্যেস করছেন।"

বাহির হইতেই পারিলাম না, তার ফুলদানী! কিন্তু এইখানেই আর একটা স্মৃতিবিভ্রমের কথা মনে পড়িল। ফুলদানীর কথা একেবারে মনে ছিল না।

কহিলাম, "কেন ফুলদানী ত একটা রয়েছে, সেটা কি হ'ল?"

সপ্রতিভভাবে উমেশ কহিল, "সেটা কাল আমার হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেছে।"

চটিয়া কহিলাম, "তবে আর কি, আমাকে উদ্ধার করেছ! তোমার মাইনে থেকে ও-ফুলদানীর দাম কাটা যাবে।"

উমেশ হাসিয়া চলিয়া গেল। ও জানে আমার যত তেজ সব মুখে; বাড়ীর সমস্ত বাসনপত্র ভাঙিয়া অণু-পরমাণুতে পরিণত করিলেও তাহার বেতন হইতে এক পয়সাও কাটিবার সাহস আমার নাই।

কিন্তু গৃহিণীর আজই ফুলদানীর কি প্রয়োজন পড়িল? এবং বিশেষ করিয়া আজই আমার স্মৃতিবিভ্রম আরম্ভ হইল কেন?

উপায়ান্তর না দেখিয়া তামাক টানিতে আরম্ভ করিলাম।

আর একবার অভয় দিয়া বন্ধু বিদায় লইলেন।

"বৃদ্ধ হইয়াছি" এ-কথাটা বোধ হয় কোন বৃদ্ধেরই প্রীতিপ্রদ নয়। অন্ততঃ বার্দ্ধক্যের প্রথম অবস্থায় নহে। হইতে পারে আশী পার হইয়া লোকে নিজের বয়স লইয়া গর্ব্ব অনুভব করে, এবং সম্ভব হইলে আসল বয়সের সহিত গোটাকয়েক বৎসর বাড়াইয়াও দেয়। কিন্তু আমার বার্দ্ধক্যের মাত্র আরম্ভের যুগ। পারতপক্ষে নিজের বয়সের কথা ভাবি না, তাই সহসা যে-বিস্মৃতির নিদর্শন আমার মনটাকে নাড়া দিয়া গেল, সেই কথা ভাবিয়া অকারণে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম।

যেন বয়সের কথা ভুলিয়া থাকিলেই বয়সও আমাকে ভুলিয়া থাকিবে; আমার মাথার চুল বরফের মত সাদা হইতে বিরত থাকিবে, আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইবে না, আমার মসৃণ মুখে কোনও রেখাপাত হইবে না। আশ্চর্য্য এই দুর্ব্বলতা!

এ বয়সের পরমতম আনন্দ ও চরম দুঃখ নিজের যৌবনের কথা চিন্তা করা। কিন্তু যে আনন্দের সহিত দুঃখের সংমিশ্রণ নাই, তাহা আনন্দই নহে, অন্ততঃ মানুষের পক্ষে নহে। একা একা বসিয়া জানালার বাহির দিয়া বৃষ্টির ক্ষীণ ফোঁটাগুলির দিকে তাকাইয়া পঁয়ত্রিশ বৎসর আগের কথা ভাবিতে লাগিলাম।

সেই তিন যুগ আগে যে তন্বী ষোড়শীকে ঘরে আনিয়াছিলাম, আজ সে বৃদ্ধা, তাহার বড় মেয়েরই প্রায় মাতামহী হওয়ার সময় হইয়াছে। আজ তাহাকে দেখিলে কেহ বলিবে না যে, এক দিন এই লোলচর্ম্মা, অস্থিমাত্র সম্বল, বৃদ্ধা ষোড়শী কিশোরী ছিল, তাহার রূপের আলোয় একটি পল্লী-কুটীর আলো হইয়াছিল।

আয়নার দিকে তাকাইলে আমিই কি মনে করিতে পারি, আমার এক দিন পঁচিশ বৎসর বয়স ছিল, চুলের রং ছিল ভ্রমরকৃষ্ণ, মনে ছিল অফুরন্ত তারুণ্য? আমার পেশীবহুল দেহ শিথিল হইয়াছে, ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে আমি সামান্য একটু বৃষ্টির জন্য এই সন্ধ্যা একা বসিয়া ঘরে কাটাইতেছি!

১৯০৩ সাল ও ১৯৩৮ সালের ব্যবধান ত কম নহে!

আচ্ছা, এমন যদি সম্ভব হইত যে বিজ্ঞানের প্রভাবে গোটাকয়েক বছর আগের যুগে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যাইত! বেশী দিনের ব্যবধানে নহে, কালিদাসের যুগে উজ্জয়িনীতে যাওয়ার বাসনা আমার নাই, আমাকে শুধু ১৯০৩ সাল ফিরাইয়া দাও, আমার পঁচিশ বৎসর বয়স।

আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধু শুনিলে পুনরায় আমার মস্তিষ্ক-বিকৃতির সম্ভাবনা সন্দেহ করিতেন। কিন্তু বন্ধু, তোমরা বিজ্ঞানের বলে সমস্ত দুনিয়া হাতের মুঠার মধ্যে আনিয়াছ, দূর দেশের দূরত্ব নিশ্চিহ্ন করিয়াছ। বিজ্ঞানের বলে তোমরা আকাশের বিদ্যুৎকে ক্রীতদাস করিয়াছ, প্রকৃতির সহিত মানবের মাতাপুত্র সম্বন্ধ নষ্ট করিয়া প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ

স্থাপন করিয়াছ। বৈজ্ঞানিক, তোমার শক্তি কতটুকু? অণুবীক্ষণের সাহায্যে অণুপরমাণুর রূপ দর্শনই কি তোমার বৃহত্তম জয়? না দূরবীক্ষণ দিয়া দূর আকাশের তারা দেখিয়া নানারূপ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লেখাই তোমার চরম সাফল্য?

আমি রাত্রির আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশে মণিমাণিক্যের মেলা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, তুমি আমার অজ্ঞতায় কৃপার হাসি হাসিয়া জানাইয়াছ, যাহাদের মণিমাণিক্য বলিয়া ভুল করিতেছি তাহারা সূর্য্য, আমাদের সূর্য্যের চেয়ে অনেক বড়, অনেক উজ্জ্বল। শরৎ-রজনীতে পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়া আমার প্রেয়সীর মুখ মনে পড়িয়াছে, জ্যোৎস্না-ধবল ধরণীর রূপ দেখিয়া আমি বিস্ময়ে আনন্দে আকুল হইয়াছি, তুমি চোখে আঙুল দিয়া জানাইয়াছ চাঁদ জীবিত নহে, কোন রূপসী তরুণীর সহিত তাহার কোন সাদৃশ্য নাই, চাঁদ শুধু কতকগুলি আগ্নেয়গিরির সমষ্টি, মৃত, শুষ্ক, বায়ুহীন। সূর্য্যের কাছে ধার করিয়া তাহার আলোর রূপ, নিজে সে অন্ধকার, কুশ্রী।

বৈজ্ঞানিক, তুমি আমার কাব্যের জগৎ, রূপের জগৎ, রূপহীন করিয়াছ, রূপকথার জগতে অবিশ্বাস আনিয়াছ। আর কোনও দিন দূর তেপান্তরের মাঠে অচিন দেশের রাজপুত্র রূপকথার রাজকন্যার সন্ধানে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিবে না, তোমার এক মুহূর্তের ক্রূর অবিশ্বাসের হাসিতে তুমি অকাতরে তাহার মৃত্যু আনিয়াছ। নিদ্রিত মণিহর্ম্যে রাজকন্যার ঘুম কোনও দিন ভাঙিবে না, সোনার কাঠি রূপার কাঠি অনাদৃত পালঙ্কের এক কোণে পড়িয়া রহিবে। তুমি জীবন আনিতে পার নাই, আনিয়াছ মৃত্যু; কল্পনা আনিতে পার নাই, আনিয়াছ বাস্তব।

কিন্তু শক্তিহীন বৈজ্ঞানিক, আমিও তোমাকে কৃপার পাত্র ভাবিতে পারি। তুমি দূরবীক্ষণের সাহায্যে দূরের নক্ষত্র দেখিতেছ, অচিন্তনীয় দূরদেশে অদৃশ্য নীহারিকা-পুঞ্জ আবিষ্কার করিতেছ; কিন্তু পার তুমি, তোমার প্রাণহীন বিজ্ঞানের পুঁথির শুষ্ক হিসাবের অঙ্ক লইয়া ঐ সব জ্যোতিষ্কের যাত্রী হইতে? কোন দিনও না, তুমি শুধু দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে, আর নিজের অক্ষমতার কথা ভাবিয়া লজ্জা পাইবে।

আমি আমার কল্পনার আরোহী হইয়া রাত্রির আকাশের তারার তীর্থযাত্রী হইয়া ঘুরিয়া আসিয়াছি; ছায়াপথের ধারে ধারে কালপুরুষ, সপ্তর্ষিমণ্ডল পার হইয়া ধ্রুবতারার গণ্ডি ছাড়াইয়া বহু দূরে, যেখানে তোমার দূরবীক্ষণের দৃষ্টি পৌঁছায় না, সেই সব পথের পথিক হইয়াছি। পূর্ণিমার রাত্রিতে ডায়ানার সহিত ওরায়নের মিলন দেখিয়াছি, চুপি চুপি অলক্ষ্যে তাহাদের প্রণয়বাণী শুনিয়াছি।

সেই কল্পনাই আমাকে আমার যৌবন ফিরাইয়া দিয়াছে। বর্ষণব্যাকুল ধরণীর অশ্রু মুছাইয়া শরৎ যখন পল্লীতে পল্লীতে নিজের আগমনবার্ত্তা জানাইয়াছে, এমনি সময় আমার গ্রামে ফিরিয়াছি।

ধানক্ষেতের মাঝে আল বাহিয়া আমি চলিয়াছি বাড়ীর পথে। ষষ্ঠীর প্রভাত। রাত্রি সবে শেষ হইয়াছে। বনপথের মধ্যে গাছ হইতে বড় বড় শিশিরের ফোঁটা আমাকে ভিজাইয়া দিল, প্রবাসী সন্তানের গৃহাগমনে পল্লীমায়ের আনন্দাশ্রু। পূব আকাশে সূর্য্য উঠিতেছে, সোনার রঙে চারি দিক্ রাঙা হইয়া উঠিল, আসন্ন পূজার আনন্দে আমার মনকেও উতলা করিয়া।

বাড়ীর বাহিরের পুকুরঘাটের পাশ দিয়া চলিতেছি; ওপারের কয়েক জনকে দেখা যাইতেছে। পথে লোক দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া ভাবিতেছে "কে আসিল!"

সানাইয়ের শব্দ শোনা যাইতেছে। আমি বাড়ী আসিয়া পৌঁছিয়াছি, আমার সাতপুরুষের ভিটা, আমার তীর্থ!

কিন্তু এ ত পঁচিশ বৎসরের যুবকের চিন্তা। আমি যদি আজ ষাট বৎসর বয়সে সেখানে যাই, আমার চোখে এসব কেমন লাগিবে?

আমি জানি, আমার এ-চিন্তা অপরিবর্ত্তনীয়। এক ষষ্ঠীর প্রভাতে আমার গ্রাম যাহাকে সমাদরে কোলে টানিয়া লইবে, সে ষাট বৎসরের বৃদ্ধ নয়, পঁচিশ বৎসরের যুবক এবং সে-যুবক আমি। বাহির হইতে তোমরা দেখিবে এক শুভ্রকেশ বৃদ্ধ, বয়সের ভারে ক্লান্ত। কিন্তু

এক মুহূর্ত্তের কল্পনায় তাহার কেশ ভ্রমরকৃষ্ণ হইয়াছে, জরাজীর্ণ দেহ তাহার পঁয়ত্রিশ বৎসর আগের পেশীসবল সামর্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছে।

শুধু একটি দিনের জন্য যে-ভগবানকে কোন দিন মানি নাই, তাঁহারই কাছে প্রার্থনা জানাইয়া রাখি। এক এক পা করিয়া যে শেষের দিনটি আগাইয়া আসিতেছে, সে যখন অবশেষে আসিয়া পৌঁছিবে, তখন যেন এই গ্রামেরই ভৈরবের পারে আমার পূর্ব্বপুরুষদের শ্মশানে, যে-দেহটাকে এত দিন ধরিয়া নানা অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া ভালবাসিয়াছি, চিতার আগুনে তাহার শেষ হয়। অন্তিম দিনে এই হইবে আমার শেষ ইচ্ছা।

একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। উমেশের ডাকে জাগিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ?"

উমেশ সবিনয়ে জানাইল, "মা বললেন, আজ রাত্রে খেতে একটু দেরি হবে।"

আশ্চর্য্য, রাগ করিতে পারিলাম না। যদিও ঘড়িতে নয়টার বেশীই হইয়াছে, এবং আমার নয়টার মধ্যেই খাওয়া অভ্যাস, তবু কেন যেন মনে হইল, ইহার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। সংক্ষেপে বলিলাম, "আচ্ছা।"

উমেশ একটু অবাক হইয়া চলিয়া গেল।

বোধ হয় আজকের দিনটারই কোনও গুণ রহিয়াছে। না হইলে আমি এতক্ষণ বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছি, প্রথম যৌবনের স্মৃতি বেদনা অপেক্ষা আনন্দ বেশী দিল কি করিয়া? আর যে-বয়সে মৃত্যুর চিন্তার মধ্যে একটা অজ্ঞাতের আশঙ্কা ছাড়া কিছুই নাই, সেই বয়সে অনায়াসে কোন্ শ্মশানে পুড়িয়া ছাই হইব, তাহা পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া ফেলিলাম কি করিয়া?

হয়ত বৈজ্ঞানিক বন্ধুর সন্দেহই ঠিক; আমার বোধ হয় মাথার দোষ দেখা দিয়াছে। আচ্ছা তাই যদি হয়, তাহাতে আপত্তির কারণ কি আছে? প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আমি যে-সব চিন্তায় অথবা ঘটনায় শুধু রাগ করিয়া বা ভয় পাইয়া থাকি, আমার এ-ধরণের অবস্থায় যদি তাহা শুধু আনন্দ ও তৃপ্তি দিতে পারে, ভালই ত!

কিন্তু সাতাশে শ্রাবণের রহস্য ভেদ করার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। গৃহিণী হয়ত বলিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে আমার স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা হইল কোথায়? তাহা ছাড়া, হয়ত গৃহিণী এখন কোন্ নূতন সংস্করণের গীতা, অথবা চণ্ডী, অথবা ঐ ধরণের কোন বইয়ে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া আছেন। আমার অনধিকারপ্রবেশে খুব খুশী না হওয়াই সম্ভব।

বাহিরে এখনও একই ভাবে বৃষ্টি পড়িতেছে।

বাড়ীতে নাতি-নাতনীদের কেহ উপস্থিত থাকিলে এতটা একা একা লাগিত না। কিন্তু ছেলে এলাহাবাদে, এবং মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী এবং আমি এই বাড়ীতে একা, যদিও গৃহিণীও উপস্থিত আছেন।

কিন্তু যে সময় একা মালতী থাকিলেই নির্জ্জনতার সমস্ত শূন্যতা ভরিয়া যাইত, সে সময় আর নাই। এখন হয়ত মালতী বলিয়া ডাকিলেও কেহ ডাক শুনিবে না, কারণ সেদিনের মালতীর আজ একান্ন বৎসর বয়স, তাহার সঙ্গী গীতা প্রভৃতি আত্মার উন্নতিকর গ্রন্থ।

পণ্ডিতেরা নাকি বলিয়াছেন, ধর্ম্মাচরণ সস্ত্রীক করাই কর্ত্তব্য। এ-ক্ষেত্রে স্বামীর যখন ধর্ম্মের বালাই নাই, এবং স্ত্রীর যখন ইহকাল অপেক্ষা পরকালের চিন্তাই প্রধান, তখন বাধ্য হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য তাঁহার একাই সম্পাদন করিতে হয়, এবং রবীন্দ্রনাথ, শেলী এবং কালিদাস ইহাদের সাহচর্য্যে দিন কাটান ছাড়া আমার উপায় নাই।

অথচ যখন সাতাশ বৎসর বয়সে এই মালতীকে লইয়াই উত্তর-কলিকাতার এক সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে দুইখানি ঘর লইয়া সামান্য বেতন সম্বল করিয়া নীড় বাঁধিয়াছিলাম, তখনকার মালতী কেমন ছিল? সারা দিনের পরিশ্রমের পর যে-মুখখানি দেখিয়া সমস্ত ক্লান্তি ভুলিয়া যাইতাম, এই কয় বৎসরে তাহার এমন পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া ঘটিল?

আজ আমি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অবসর লইয়াছি, আমার অফুরন্ত সময়, সপ্তাহের সাতটি

দিনই রবিবার। এমনিধারা ছুটি আর কয়টি বৎসর আগে পাইলে কাহার কি আসিয়া যাইত?

কিন্তু আজ আর সে-কথা ভাবিয়া লাভ নাই। রূপ-কথার রাজকন্যার সোনার কাঠির স্পর্শে ঘুম ভাঙিয়াছিল, অচিন দেশের রাজপুত্রের সহিত সুখে-স্বচ্ছন্দে তাহার দিন কাটিয়াছিল। রূপকথার এইখানেই শেষ। আমার রাজকন্যার গল্পের শেষ এইখানেই নয়। রাজকন্যার বয়স বাড়িয়াছে, তরুণী রাজকন্যা বৃদ্ধা হইয়াছে। রাজ-পুত্রের ভ্রমরকৃষ্ণ চুল সাদা হইয়াছে, কাহারও যৌবনের কণামাত্রও অবশিষ্ট নাই।

এ-রূপকথারও কিন্তু এখানে শেষ নয়। ইহার পরেও তাহার উপসংহার আছে, সে উপসংহার পুঁথির পাতায় নহে, ভৈরবনদের তীরে ক্ষুদ্র একটি শ্মশানঘাটে। কিন্তু তাহা হইলে রূপকথার সমাপ্তি হইল বিয়োগে, মিলনান্ত আর রহিল না।

আশ্চর্য্য, সামান্য একটা কথা মনে করিতে না পারায় অবান্তর কত কথাই যে মনে আসিতেছে! যেন ষাট বৎসরেই মানুষের জীবনের শেষ, সিঁড়ির শেষ ধাপ, সামনে যেন কালো জল ছাড়া আর কিছুই নাই! বন্ধুর কথামতই কাজ করিব, থার্মোডিন্যামিক্‌স্ পড়া ধরিব। তাহাতে জীবন-মৃত্যুর কথা নাই, সুখ-দুঃখের সমস্যা নাই, বিগত যুগের প্রেম, মান-অভিমান কিছুরই অস্তিত্ব নাই।

কিন্তু সে না-হয় বন্ধু আসিলে চলিতে পারে; এখন রাত প্রায় দশটার কাছাকাছি, ঘুম আসিতেছে, অথচ গৃহিণী, অথবা উমেশ, কাহারও দেখা নাই। ভাবিতেছি, উঠিয়া গৃহিণীর ঠাকুরঘরে অনত্যন্ত প্রবেশ করিয়া কারণটা জিজ্ঞাসা করিয়া লইব কিনা। সাহস হইতেছে না।

একটু ঝিমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা পায়ের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল, চাহিয়া দেখিলাম, গৃহিণী।

গল্পে পড়িয়াছি, ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ড-স্পর্শে মরুভূমি সহসা উদ্যানে পরিণত হইয়াছে, লোলচর্ম্মা বৃদ্ধা তন্বী তরুণীর রূপ পাইয়াছে। আজ দেখিলাম, কিসের গুণে যেন গৃহিণীর অত্যন্ত গম্ভীর মুখে হাসি ফুটিয়াছে, হাতে জপের মালা নাই, আছে ফুলের মালা। এক মুহূর্ত্তের মায়ায় তাঁহার বয়স কমে নাই, কিন্তু প্রফুল্লতার ঔজ্জ্বল্যে তাঁহাকে সুন্দরী করিয়াছে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, "ব্যাপার কি?"

উত্তরে গৃহিণী ফুলের মালাটি আমার গলায় পরাইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সলজ্জ হাসিয়া কহিলেন, "ভুলে গেছ? আজ সাতাশে শ্রাবণ।"

আবার সেই সাতাশে শ্রাবণ! কহিলাম, "সাতাশে শ্রাবণ কি?"

গৃহিণীর প্রফুল্ল মুখ গম্ভীর হইল। অভিমানের স্বরে কহিলেন, "সাতাশে শ্রাবণ দশটা পনর মিনিটের লগ্নে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। অবশ্য, তোমার যদি মনে না থাকে, তবে মনে করিয়ে দিয়ে আর কি হবে?"

সমস্যার এতক্ষণে সমাধান হইল। তাড়াতাড়ি কহিলাম, "হাঁ নিশ্চয়, মনে ছিল বইকি, খুব মনে ছিল দাঁড়াও দাঁড়াও, মালাটা তোমার গলায় পরিয়ে দিই।"

গৃহিণীর অন্ধকার মুখে আবার হাসি ফুটিল। ঘড়িতে দশটা বাজিয়া ষোল মিনিট হইয়াছে।

রূপকথার রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়াছে। কল্পনার সোনার কাঠির ছোঁয়ায় আমি আমার তিন যুগ আগের মালতীকে ফিরিয়া পাইয়াছি, বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান যাহা কোনও দিনও দিতে পারে নাই, সাতাশে শ্রাবণের মায়ায় তাহা পাইয়াছি।

গৃহিণীর স্মিতমুখের দিকে চাহিয়া কহিলাম,

'যঃ দূরমপি গচ্ছন্তী হৃদয়ং ন জহাসি মে।
দিনাবসানে ছায়েব তরোর্মূলং ন মুঞ্চসি।'

গৃহিণী হাসিয়া আমার চাদরের মধ্যে মুখ লুকাইলেন।

আশ্চর্য্য, এই দিনটির কথাই ভুলিতে বসিয়াছিলাম!

মজা নদীর কথা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৩

শ্যামবাজার হইতে শিয়ালদহ পায়ে হাঁটিয়া আসা পয়সা হাতে থাকিলে কষ্টকরই মনে হয়। অমিয়র হাতে পয়সা ছিল না এবং পথের দু-ধারে বৈচিত্র্য কম, কাজেই ঠিক দশটায় সে আপিসে হাজিরা দিল।

আসিয়া দেখে খগেনবাবু হাজিরা-খাতা টেবিলে রাখিয়া লাল কালির কলমটি উঁচাইয়া বসিয়া আছেন। আর দশ মিনিট হইলেই ক্রতকরে তিনি লাল কালির লাইন টানিতে আরম্ভ করিবেন।

অমিয়কে দেখিয়া তিনি আপন স্বভাবসুলভ কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "এই যে ছোকরা, ঠিক সময়ে এসেছ। নাও, সই কর।"

অমিয় স্বাক্ষর করিলে বলিলেন, "কোত্থেকে আসছ? শ্যামবাজার? হুঁ, তা পাসটাস কিছু করেছ, না বড়বাবুর রেকমেণ্ডেসন্?"

অমিয় মুখ লাল করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

খগেনবাবু আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "বাইরে প্রচার আজকাল বড়বাবুদের কোন হাত নেই। ওটা নিছক মিথ্যা কথা। হাত আবার নেই? খোঁচা দেবার বেলায় তো দেখি রাবণ রাজার তুল্যমূল্য! একটু পরেই দেখবে টেবিলের তলা ওপর তিল ধারণের স্থান নেই।" বলিয়া কর্কশ হাসি হাসিলেন। পরে কলম নাচাইতে নাচাইতে বলিলেন, "নূতন লোক, ভারি আশ্চর্য্য হচ্ছ, নয়? বলি ছোকরা, সাবধান। দেশে যদি পাটালি গুড় থাকে, ব'লো, পাওয়া যায় না। আম গাছ, কাঁঠাল গাছ, নারকেল গাছ থাকলে বলবে, গাছ আছে বটে, ফল হয় না। হয়ত খবর নেবে, তোমাদের গোয়ালে মৌচাক হয়েছে কি না, স্রেফ জবাব দেবে, না তো! তার পরে দুধ, মাছ, চাল, ডাল, মায় তেল নুন পর্য্যন্ত একবার দিয়েছ কি বার্ষিক বন্দোবস্ত! বলি জমিদারের বার্ষিক খাজনা বোঝ তো? এও তাই।" বলিয়া হো হো করিয়া হাসিলেন, চারি পাশের লোকগুলিও কৌতুকে ফাটিয়া পড়িল।

কে এক জন বলিল, "ওঁকে অত ক'রে বলছেন কেন খগেনবাবু। ও বেচারী সবে কাল এসেছে, কি-ই বা বোঝে?"

খগেনবাবু বলিলেন, "তাই তো হালচাল বাৎলে দিচ্ছি। ওরাই তো শিকারের জিনিষ, মিষ্টি কথায় ওদেরকে ভোলান খুবই সোজা।"

"তা যা বলেছেন। এই দেখুন না, সাত সকালে নাকে মুখে গুঁজে ছুটতে ছুটতে আসছি। আর মজাসে বাবু আসবেন বারটায়। যাদের মাইনে বেশী, সুখও তাদের বেশী।"

খগেনবাবু ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিলেন, "আর এক মিনিট—যে আসুন না-আসুন লাইন টানব কিন্তু।"

"তা টানুন, তবে কিনা মরতে আমরাই মরি। বড়দের তো ভুলচুকও নেই, লেটও নেই। দিব্যি আছেন।"

খগেনবাবু বলিলেন, "আমি কি আপনাদের বাঁচাতে পারি নে? পারি। দশ-বিশ মিনিট পরে লাইন টানলে কি আর মহাভারত অশুদ্ধ হয়, বলুন? কিন্তু আপনারাই তখন আমার নামে লাগাবেন। বলবেন, বড়বাবু, খগেনবাবু আজ দশটা কুড়িতে লাইন টেনেছেন। দশটা উনিশে এসে কন্দী বাঁচলে, আর দু-মিনিটের জন্মে আমার হল লেট্!"

"তাই কি বলেছি কোনদিন?"

"আপনি না বলুন, আর কেউ বলবেন! কান ভারী করবার লোকের অভাব নেই তো। ঐ দেখুন!" বলিয়া খগেনবাবু এক জন নবাগতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। লোকটি খর্ব্বকার, পরনে ময়লা ধুতি, জামা

এবং ততোধিক ময়লা এক খানা চাদর কাঁধে ঝুলিতেছে। মাথার চুল দেখিয়া অনুমান হয় মাসাবধি সেখানে তৈল বা জলবিন্দু পড়ে নাই। পায়ের রং তামাটে, হাতে একটি মাঝারিবৃহৎ পুঁটুলি। তিনি ত্রস্তপদে ঘরে ঢুকিলেন।

খগেনবাবু কর্কশ হাস্যদ্বারা অভ্যর্থনা করিলেন, "এই যে ফণীবাবু, আসুন, আসুন। আপনার জন্মে কলম ধরে ব'সে আছি।"

ফণীবাবু বিনাবাক্যব্যয়ে হাজিরা সহি করিলেন।

খগেনবাবু বলিলেন, "বলি এতে কি? ধান না চাল?"

ফণীবাবু পুঁটুলিটি বড়বাবুর টেবিলের তলায় রাখিতে রাখিতে বলিলেন, "ধানই বটে। লক্ষ্মীপূজোর ধান।"

খগেনবাবু বলিলেন, "তা বটে, ধান তো কলকাতায় পাওয়া যায় না—"

ফণীবাবু বলিলেন, "এ ধান কলকাতায় কোথা পাবেন? এ একেবারে টাটকা জমি থেকে আনা, এখনও গোলাজাত হয় নি।"

খগেনবাবু সব্যঙ্গ-হাস্যে বলিলেন, "আমরা সব কিনি বাসি ধান—পচা পুরনো জিনিষ। কি করি বলুন, আপনারা ত দয়া করেন না। যাঁর লক্ষ্মীশ্রী বেশী, তাঁকে সাহায্য করবার লোকাভাব হয় না।"

ফণীবাবু বলিলেন, "কেন, আমায় বললেই ত পারতেন।"

খগেনবাবু বলিলেন, "আমায় ধান জুগিয়ে পুরো জিনিষটাই ত লোকসানের খাতায় জমা হ'ত আপনার। চাই নি, সে ত ভালই হয়েছে।"

ওধার হইতে কে এক জন বলিল, "আপনাকে দিলে পুরো লোকসান নাও হ'তে পারে। ওঁর পরেই ত সিংহাসন আপনার। ফণীবাবু বেহিসাবী নন, চিরকালই গোড়া বেঁধে কাজ করেন।"

আবার একটা হাস্যধ্বনি উঠিল।

ফণীবাবু তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় গিয়া বসিলেন।

বিনয় খগেনবাবুর নিকটে আসিয়া বলিল, "আজ ফণী সব কথা বড়বাবুর কাছে লাগাবে নিশ্চয়।"

খগেনবাবু নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন, "লাগাক গে। যার যা কাজ সে তা করবে না? ওতেই ওদের অন্ন, ওতেই ওদের জীবন।"

বিনয় বলিল, "আচ্ছা, ফণীবাবুকে জার্মান ওয়ারে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়?"

"ভালই হয়। গুপ্তচরের কাজটা ওর জন্মগত বিদ্যা কিনা, ভালই পারবে।"

বিনয় উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিতেই কারণ না বুঝিয়াই সারা আপিস হাসিয়া উঠিল।

অমলবাবু ওরফে দাদা সেদিন আপিসে আসেন নাই। মাসের মধ্যে তিনি আট-দশ দিন কামাই করেন এবং বছরের মধ্যে লম্বা ছুটি লইলে মাস-পাঁচেকের কম ডাক্তারি সার্টিফিকেট দেন না। সকলে বলে, কাজের একটু চাপ পড়িলেই দাদার শরীর অসুস্থ হয়। তিনি আসেন নাই বলিয়া সকালের মজলিসটা আজ ভাল করিয়া জমিল না।

বিশ্বজিৎ আসিয়া অমিয়র চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, "কেমন লাগছে অমিয় বাবু?"

অমিয় বলিল, "রোজই এ রকম চলে?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "বড়বাবু উপস্থিত না থাকলেই চলে। আজ যা হ'ল এ ত যৎসামান্য; অপেক্ষা করুন আরও দেখবেন।"

অমিয় বলিল, "পরস্পরকে আঘাত ক'রে এঁরা আনন্দ পান কেন?"

বিশ্বজিৎ বলিল, "আর কিসে আনন্দ পাওয়া যায় তা এঁরা জানেন না বলেই। আমার যা আছে—আপনার তা না থাকলেই—আপনি আঘাত দিয়ে সেই লোভকে প্রকাশ করবেন বইকি।"

অমিয় বলিল, "এ রকম আলোচনায় মানুষ নীচু হয়ে যায় না কি?"

বিশ্বজিৎ হাসিল, "চাকরির ক্ষেত্রে যাদের আয় কম, অভাব ষোল আনা, তাদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমরা যে স্তরের, সেই আলোচনাই আমাদের শোভা পায়।"

অমিয় অধীর কণ্ঠে বলিল, "এ আপনি শুধু তর্কের খাতিরে নীচু হচ্ছেন। সত্যকার আন্তরিক কথা এ নয়।

দারিদ্র্য মনুষ্যত্ববিকাশে বাধা দেয়, এ-কথা দুর্ব্বল লোকেরাই মেনে নেয়।"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলিল, "এবং দরিদ্র লোক মাত্রই দুর্ব্বল লোক এ-কথাও সর্ব্ববাদিসম্মত।"

"না।" টেবিলে মৃদু চাপড় মারিয়া অমিয় বলিল, "যারা দারিদ্র্যকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করতে না পারে সেই সব মেরুদণ্ডহীন মানুষের কথা এসব। দুঃখের মধ্যেও মাথা উঁচু ক'রে ও সম্মান বজায় রেখে চলার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।"

বিশ্বজিৎ হাসি না-থামাইয়া বলিল,"আগে অন্ন-সমস্যা, না আগে সম্মান-সমস্যা, অমিয় বাবু? আপনার জীবনের থেকে মানুষের প্রিয়তর কিছু জগতে আছে? বলুন।"

অমিয় বলিল, "এক কথায় এর কি উত্তর দেব? যদি বলি, সম্মান বড়, আপনি বলবেন নাটকের ভাষা।"

বিশ্বজিৎ বলিল, "বলবই ত। যাঁরা দু-মুঠো খেয়ে সভ্য সমাজে লজ্জা বাঁচিয়ে চলতে পারেন, তাঁরাই ত সৃষ্টি করেছেন ঐ নাটকের ভাষা। মুখে কথা ফোটবার আগে যেমন বাক্‌পটুত্বের মূল্য, অন্ন-সমস্যার আগে তেমনই সম্মান-সমস্যা! আপনি ভাবতে পারেন, অমিয়বাবু, যখন আমরা আর্য্যমাত্র ছিলাম—বল্কলে লজ্জা বাঁচত, অর্দ্ধদগ্ধ মৃগমাংসে উদর পূর্ত্তি হ'ত, গুহায় ছিল বাসগৃহ, গোষ্ঠীতে ছিল না সামাজিক প্রথা, তখন আমাদের সম্মান আজকের দিনের এই পালিশ-করা সম্মানের মতই ছিল কি না? আমরা যাযাবর-বৃত্তি ছেড়ে যেই মাত্র জমি ভাগ ক'রে সমাজ বাঁধলাম, সঙ্গে সঙ্গে এল অনেক উপসর্গ। মৃগমাংস ছেড়ে অন্নে আমাদের রুচি এল, ধনুর্ব্বাণ ফেলে লাঙল ধরলাম। গুহায় কদর্য্যতায় মন খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল, কুটীর তৈরি করলাম এবং জমি ভাগের মত স্ত্রীসম্পত্তিও ভাগ ক'রে নিলাম। যা ছিল সর্ব্বসাধারণের, তাই হ'ল ব্যক্তিবিশেষের। কাজেই ব্যক্তিগত রুচি নিয়ে আমরা এক একটি পৃথক্ পরিবার গ'ড়ে তুললাম। বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যার মূলে সেই প্রথম সভ্যতার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই বর্ত্তমান।"

অমিয় বলিল, "দাঁড়ান, আপনার তর্ক ঠিক যুক্তি-সহ নয়।"

বিশ্বজিৎ হাসিয়া বলিল, "আমার যুক্তি নয়, অনুমান। কল্পনায় আমি অনেক কিছু ভাবি, যখনই এই আপিসের কথা ভাবি, তখন মানব-সভ্যতার গোড়ার ইতিহাস ভাবতে ইচ্ছে করে। আমার কাছে সে ইতিহাস অসম্পূর্ণ; যতটুকু জানি—তার ওপর যতটুকু জানি না তারই রং মেশাই বেশী করে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা যা সৃষ্টি ক'রে গেছেন, আমরা শক্তি হারিয়ে তার ফল ভোগ করছি। আবার আমরা যে-স্বপ্নে জীবন কাটাচ্ছি তার ফল ভোগ করতে দিয়ে যাব আমাদের মেরুদণ্ডহীন বংশধরদের।" একটু থামিয়া বলিল, "দুঃখের মধ্যে জীবন কাটিয়ে অভাবকে প্রতিনিয়ত সম্মুখে রেখে যিনি সত্যকারের বড় হয়েছেন তিনি নিঃসন্দেহ প্রতিভাবান, তাঁর দেবদত্ত ক্ষমতা, দৈব না মেনেও আমরা স্বীকার করতে পারি। কিন্তু অমিয় বাবু, আপনি, আমি, আরও লক্ষ কোটী মানুষ এই দুঃখদৈন্যের অতল সাগরে যে তলিয়ে গেলাম, তার কি! আমরা তলিয়েই যাচ্ছি, টেনে তোলবার কেউ নেই।"

"টেনে কেউ তুলবে না, আমাদের নিজের চেষ্টাতেই—"

"তাও জানি। যাস কাবার হোক, আপনিও তা বুঝবেন।"

"কি হে বিশ্বজিৎ, নূতন ভদ্রলোককে কি লেকচার দিচ্ছ? হাতে কাজ কিছু কম আছে বুঝি?"

খগেনবাবুর উচ্চ কণ্ঠস্বরে বিশ্বজিৎ মুখ ফিরাইয়া হাসিল, "হাতের কাজ মুখে পুষিয়ে নিচ্ছি, খগেনবাবু। ঐটুকুই তো আমাদের সম্বল।"

"তাহলে কণীর পথ ধর, উপকার পাবে।"

বড়বাবুর প্রবেশ-ক্ষণটিতে আপিসের চেহারা একদম বদলাইয়া গেল। প্রবল বর্ষণের পর শান্তিময় বিরতি—আকাশ এবং পৃথিবী কোমল কিরণ স্নাত হইয়া হাসিয়া উঠিল। অন্ততঃ অমিয় নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাই ভাবিল।

বড়বাবুর গাম্ভীর্য্য অসাধারণ; যখন হাসেন, সে হাসি অপরিমিত, এবং গম্ভীর হইলে সে গাম্ভীর্য্য ভেদ করিবার শক্তি কাহারও নাই। ফুলকাটা চেয়ারে পুরু একটি গদি আঁটা—গদি মুড়িয়া পরিষ্কার একখানি ঝাড়ন

পাতা।৹ নূতন ব্লটিং পেপারে সম্মুখের প্যাডটি ঝকঝক করিতেছে,—প্যাডের সম্মুখ এবং পশ্চাৎ ভাগের বর্ডারে কালীমাতার জয়কীর্তন। বনাত-মোড়া টেবিলে কোথাও ধুলার বিন্দুটি নাই, কাগজ বা ফাইল পাশের সুদৃশ্য বেতের ট্রেতে সাজান, সেখানে এক পয়সার কালীমূর্ত্তি, কেবল সিন্দুরচর্চ্চিত ললাটে টেবিলের একধারে দণ্ডায়মানা হইয়া ভক্তপ্রবরের মনে সাহস ও লেখনীতে শক্তির প্রেরণা দিতেছেন। মাথা নীচু করিয়া সর্ব্বপ্রথম বড়বাবু তাঁহাকে বন্দনা করিয়া আসন (অর্থাৎ চেয়ার) গ্রহণ করিলেন। চেয়ার গ্রহণ করিয়া কয়েক মিনিট স্তিমিত চক্ষে নিস্তব্ধ থাকিয়া কালীমূর্ত্তি স্মরণ, প্যাডের বর্ডারে কালীমাতার জয়ধ্বনি পাঠ ইত্যাদি ভক্তজনোচিত কর্ত্তব্য পালন করতঃ টানা ড্রয়ার হইতে একখানি খাতা বাহির করিলেন। খাতার প্রথম পৃষ্ঠাতেই আঁকা—জ্যোতির্ম্ময়ী কালীমাতার অভয়হাস্য-রঞ্জিত মুখমণ্ডল ও ঈষৎ উত্তোলিত বরাভয়যুক্ত শ্রীকর—এবং অসুর-রক্ত-রঞ্জিত শ্রীচরণের প্রতি গভীর মনঃসংযোগ-পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া বড়বাবু ধীরে ধীরে সেই বরদায়িনী দেবীমূর্ত্তি-সম্বলিত খাতাখানি ললাট স্পর্শ করিলেন—সেই অবস্থায় পাঁচ মিনিট কাটিল—সমাধির পূর্ব্ব অবস্থা আর কি! অতঃপর প্রণাম-পর্ব্ব শেষ করিয়া অর্থাৎ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া লাল কালির কলম বাহির করিলেন। খাতার পৃষ্ঠা উল্টাইয়া আরও পাঁচ মিনিট ধরিয়া 'জয় কালীমাতার জয়' এক শত আটবার লিখিয়া লেখনীরও শক্তি সঞ্চয় করিলেন—অর্থাৎ অতঃপর যে হুকুমনামাই লিখুন না কেন—কাহারও অনিষ্ট হইলে কালীনাম লেখার পুণ্য সলিলে সেটুকু ধুইয়া মুছিয়া যাইবে—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন।

অমিয় কলেজ হইতে আপিসে ঢুকিয়াছে বলিয়া এই ভক্তি-নিবেদন ও কালীনাম-লিখন নূতন বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু চাকরি মাত্র ভরসা করিয়া যাঁহারা বৃহৎ সংসারের হিসাব রাখেন, তাঁহাদের কাছে এই ভক্তি-নিবেদনের মূল্য অকিঞ্চিৎকর নহে। একমাত্র ভক্তির জোরে কত মহাপাপীর মহাপাপ যে খণ্ডন হইয়া যায় তাহা ভক্তিমান না হইলে কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। ভক্তির অনুশীলনে ভক্তের পরকাল এবং ইহকাল দুই-ই সম্পদযুক্ত হয়। চাকুরীয়ার পক্ষে ভক্তি জিনিষটা অমূল্য রত্ন বিশেষ। যে হতভাগ্য এই ভক্তির ধার দিয়াও ঘেঁষিতে চাহে না, তাহার দুর্গতি দেবদেবী তো তুচ্ছ, স্বয়ং বড়বাবুও দূর করিতে পারেন না।

বড়বাবুর প্রণামপর্ব্ব নূতন না হইলেও অনেকে আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সে পর্ব্ব শেষ হইবামাত্র ফণীবাবু আসিয়া টেবিলের সামনে দাঁড়াইলেন। বড়বাবু স্মিতহাস্যে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "ভাল তো?"

ফণীবাবু কৃতকৃতার্থ হইয়া আনন্দগদ্গদ্ স্বরে বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। ধান এনেছি।"

বড়বাবুর প্রসন্নমুখে জ্যোতি খেলিয়া গেল, কহিলেন, "এনেছ, বেশ, বেশ। যদিও লক্ষ্মীপুজোর দেরি আছে—তবু আগে আনিয়ে রাখা গেল। দু-একটা নারকেল পাওয়া যাবে তো?"

"আজ্ঞে, তা এক কুড়ি দিতে পারবো বোধ হয়।" বলিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি কহিলেন।

বড়বাবুর প্রফুল্ল মুখে অকস্মাৎ মেঘ নামিল, অস্ফুট কণ্ঠে শুধু কহিলেন, "হুঁ।"

ফণীবাবু টেবিল ত্যাগ করিতে না-করিতে হরেন আসিল। মিনিট পাঁচ-ছয় তাহার সঙ্গে অস্ফুটস্বরে বড়বাবুর আলাপ আলোচনা চলিল। সে আলাপের মুহূর্ত্তে কখনও তাঁহার মুখে মেঘ নামিল, কখনও বা সূর্য্য-কিরণ ফুটিল এবং হরেন টেবিল ত্যাগ করিবামাত্র অনাদি আসিল। এইরূপে একে একে অনেকেই আসিল, অনেকেই চলিয়া গেল।

একটার সময় বড়বাবু শম্ভুচন্দ্রকে ডাকিলেন।

শম্ভুচন্দ্র আসিতেই বলিলেন, "নতুন ছোকরা কাজ করছে কেমন?"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "ছোকরা ইন্‌টেলিজেন্ট আছে, পারবে।"

শুনিয়া বড়বাবু বিশেষ খুশী হইলেন না; মন্তব্য করিলেন, "ইন্‌টেলিজেন্ট নিয়ে তো আপিস চলে না,

তাতে গোলই বাধে। আমি চাই কর্ম্মী লোক। যারা অনেক জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামায় না, একটি জিনিষই বোঝে। যা হোক, আপিস সম্বন্ধে ছোকরা কোন মন্তব্য করেছে ?

শম্ভুচন্দ্র মৃদুস্বরে বলিলেন, "না, নেহাৎ ভালমানুষ।"

বড়বাবু বলিলেন, "নজর রেখ, খগেনের দলে যেন মেশে না। লোক বিগড়াবার উনি একটি যন্ত্র-বিশেষ।"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "না, না, ছোকরা ভাল।"

বড়বাবু ঈষৎ রুষ্ট কণ্ঠে কহিলেন, "বাইরের ভাল-মন্দয় আমার দরকার নেই। ওরা বিদ্বান, বুদ্ধিমানও বলছ—ওরা একবার কোন জিনিষ বুঝলে সহজে ভোলে না। শান্তির কথা জান তো ? আমিই আনলুম, চাকরিতে উন্নতি হ'ল, এখন আমার নামেই ওপরে দরখাস্ত পাঠায়। নেমকহারাম সব !"

শম্ভুচন্দ্র বড়বাবুর উত্তেজনার মুহূর্ত্তে চুপ করিয়াই থাকেন—আজও কথা কহিলেন না।

বড়বাবু একটু শান্ত হইলে শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "আমার কিছু আশা আছে কি ?"

"কিসের ?"

শম্ভুচন্দ্র একটু থামিয়া সঙ্কোচজড়িত কণ্ঠে কহিলেন, "গ্রেড সম্বন্ধে।"

"ও, হ্যাঁ",—বলিয়া বড়বাবু কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নামাইয়া বলিলেন, "দাদা রয়েছে তোমার সিনিয়র, ওকে ডিঙিয়ে কি ক'রে দেওয়া যায় তাই ভাবছি। আগের দিনে হ'লে ভাবতুম না। যা করেছি সাহেব চোখ বুজে সই করেছেন। এখন নানান রকম আইনকানুন—।"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "এফিসিয়েন্সির দিক দিয়েও সুবিধে হয় না ?"

বড়বাবু বলিলেন, "সেই কথাই কদিন ধরে ভাবছি। কাজে কর্ম্মে দাদার অবশ্য ত্রুটি কম,—কিন্তু একটা উপায় আছে।"

শম্ভুচন্দ্র আগ্রহোত্তেজিত চক্ষে বড়বাবুর পানে চাহিলেন।

"উপায় হচ্ছে এই, ওর কামাই বড্ড বেশী। ছুটি নিয়ে রেকর্ড খুবই খারাপ ক'রে রেখেছে। আইন বাঁচিয়ে তোমার আর দাদার দু-জনের নামই প্রপোজ করব। সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের সার্ভিসটাও রেকর্ড করা থাকবে। তোমার নামে থাকবে রেকমেণ্ডেসন্—দাদার নামে থাকবে ছুটির অঙ্কটা, অর্থাৎ ইরেগুলার অ্যাটেন্‌ডেন্স, যাও, যাও, মা কালীর পূজোর ব্যবস্থা কর গে। আর ভাল কথা, এ সংবাদ যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়।"

সে কথা শম্ভুচন্দ্রকে বলাই বাহুল্য। নিজের ভাল যে না বুঝিবে তাহার কেরানীগিরি করিতে আসা বিড়ম্বনা নহে তো কি !

আশ্চর্য্যের কথা, আপিসের দেওয়ালগুলিরও শ্রবণ-শক্তি আছে—বড়বাবুর গোপন অভিলাষটি কি করিয়া খগেনবাবুর কানে গেল। তিনি জ্যা-মুক্ত ধনুকের মত লাফাইয়া উঠিলেন।

দাঁতে দাঁত রাখিয়া তিনি আপন মনেই খানিকটা বকিয়া গেলেন, অবশ্য সে বক্তৃতা বড়বাবুর অনুপস্থিত মুহূর্ত্তে আর সকলকে উদ্দেশ করিয়াই দিলেন। দাদা আসিলে তিনি যে এই ষড়যন্ত্রজাল ছিঁড়িয়া দিবেন ও বড়বাবুকে অপমানিত করিবেন সে ভয়ও দেখাইলেন।

সুতরাং পরদণ্ডেই বড়বাবু খগেনবাবুর শাসনবাক্য অন্যের মারফৎ শুনিলেন। শুনিবামাত্রই তাঁহার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "খগেন।"

খগেনবাবু সম্মুখে আসিবামাত্র তিনি উষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, "কি সব ছোটলোকমি হচ্ছে ?"

চক্ষু পাকাইয়া খগেনবাবু কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "কিসের ছোটলোকমি ?"

বড়বাবু বলিয়া চলিলেন, "একসঙ্গে থিয়েটার যাত্রা করেছি, আড্ডা ইয়ার্কি দিয়েছি, বন্ধুত্ব করেছি কিনা, তাই তোমার বড় বাড় হয়েছে। ভাব পুরাতন বন্ধুত্বের খাতিরে তোমার কিছুই করতে পারি না ?"

"পার না আবার ? যা করেছ তারই ঠেলায় মরে আছি—আবার করবে কি ? তোমার মাইনে আর আমার মাইনে ছিল সমান সমান। আজ তুমি আমার তিন গুণ পাচ্ছ, আমায় সেই গর্ত্তেই রেখেছ ফেলে। নিজে কলম উঁচিয়ে ব'সে ব'সে পান চিবুচ্ছ আর গল্প করছ, আর আমার তিন দিন অন্তর নিব বদলাতে হচ্ছে—

সব কাজ দিয়েছ চাপিয়ে। একটি ভুল পেয়েছ কি গলা কাটবার ব্যবস্থারও ত্রুটি হচ্ছে না। তোমার অক্কেল বইটা খোল ত ভাই; কারণনামটা ওতে বেশী ক'রে লেখা আছে, দেখি।"—বলিয়া হো হো করিয়া কর্কশ হাসি হাসিলেন।

বড়বাবু ঈষৎ দমিয়া গিয়া বলিলেন, "ভুল করলে সায়েব কি সন্দেশ খাওয়াবেন তোমাকে?"

খগেনবাবু কর্কশ হাস্যে বলিলেন, "সন্দেশ কেন, দিব্যি রাজভোগ তো খাওয়াচ্ছ। ভুল হবে না? যে কাজ করে তারই ভুল হয়—যে ব'সে থাকে তার আবার ভুল কি।"

"কাজ তুমিই কর—আর কেউ করে না, না?"

"ভুল কি তাদেরই হয় না?"

"না, তোমার মত হয় না।"

"আমার মত হয় না, কেন না তারা ভুল কাটাবার ফন্দিফিকির জানে, আমি জানি নে। জিনিষ বয়ে তাদের হাত ব্যথা, কাঁধ ব্যথা, ট্যাঁক খালি—অনেক কিছুই হয়,—আমরা ত ওসব খোসামোদের তোয়াক্কা রাখি নে, কাজেই ভুলটা আমার বেশীই হয়।"

বড়বাবু মুখ লাল করিয়া বলিলেন, "যান্, যান্, সিটে গিয়ে বসুন। মেলা গোলমাল করবেন না।"

সত্য কথা বলিতে কি, বড়বাবু আপিসের মধ্যে একমাত্র খগেনবাবুকেই ভয় করেন।

৪

পরদিন টিফিনের সময় অমিয় একমনে কাজ করিতেছে, এমন সময় কালো, রোগামত একটি ছেলে আসিয়া নিঃশব্দে তাহার পাশে দাঁড়াইল। এক মিনিট দাঁড়াইয়া, একটু কাশিয়া সে অমিয়র মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া কহিল, "আপনার নাম বুঝি অমিয়বাবু?"

অমিয় ঘাড় নাড়িল।

"আপনি ত বি-এ পাস?"

অদ্ভুত প্রশ্ন! অমিয় আশ্চর্য্য চোখে তাহার পানে চাহিল।

সে একটু হাসিয়া বলিল, "সত্যি বি-এ পাস হ'লে আমাদের সঙ্গে কথা কবেন কি না ভাবছি! আমাদের দৌড় তো ফোর্থ ক্লাস, ফিফ্‌থ ক্লাস পর্য্যন্ত।"

অমিয়র ওষ্ঠপ্রান্তে কৌতুক হাস্য ভাসিয়া উঠিল, সে বলিল, "গ্রাজুয়েটরা ফোর্থ ক্লাস পড়িয়েদের সঙ্গে কথা বলে না, এ ধারণা আপনার হ'ল কেন? তারা কি আলাদা জীব?"

ছোকরা অমিয়র হাসি দেখিয়া সহজ কণ্ঠে জবাব দিল, "এই সেক্‌শনের অনন্তবাবুকে চেনেন না বোধ হয়? ওই যে কালো মত, বেঁটে মত, মাথায় অল্প টাক—ও-ঘরে ব'সে হাত নেড়ে আর মাথা নেড়ে গল্প করছেন, উনিও বি-এ পাস কি না—আমাদের দরখাস্ত—ভুলের কৈফিয়ৎ সবই উনি লিখে দেন। মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলেন যা আমরা বুঝতে পারি না।"

"বটে! তা হ'লে ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে হবে তো।"

"উনি কি বলেন জানেন? বলেন—অনেক পয়সা খরচ ক'রে তেল পুড়িয়ে তবে লেখাপড়া শিখতে হয়েছে। প্রথমটা দরখাস্ত লেখাতে গেলেই অনেক কথা শুনিয়ে দেন—তার পর অবশ্য—"

"তা আপনার কি কিছু লেখাবার দরকার আছে?"

"না, না, আমার নয়—খগেনবাবু একবার আপনাকে ডাকছেন।"

"খগেন বাবু! কেন?"

"কি জানি কি লিখেছেন—আপনাকে দিয়ে কারেক্ট করিয়ে নেবেন।"

অমিয় মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিল। ওই রাশভারী লোকটির সম্বন্ধে ধারণা তাহার ভালভাবে গড়িয়া উঠে নাই। তাহার মনে হইয়াছে, উঁহার চরিত্রে প্রচুর পরিমাণে পরশ্রীকাতরতা বিদ্যমান। কেহ কেহ বলেন, উনি স্পষ্ট বক্তা, ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। তথাপি উঁহার ভদ্রতালেশহীন উক্তিগুলি অন্তরকে পীড়িত করিয়া তুলে। নিজের পুরুষকারের অভাবে উন্নতি করিতে পারেন নাই বলিয়া অন্যকে অভদ্রভাবে প্রতিনিয়ত আক্রমণ করিয়া থাকেন। নিজে বক্তিতের দলে না-পড়িয়া, নিজের স্বার্থকে সম্মুখে না-রাখিয়া যদি

অন্তের যথার্থ চোহারাটি দেখাইবার সৎসাহস তাঁহার থাকিত তো কেহই তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিতে সাহস পাইত না। কাল দাদাকে উপলক্ষ্য করিয়া যে ব্যাপার ঘটিয়া গেল, তাহাতে বড়বাবুর চেয়ে খগেনবাবুর লজ্জাটাই বেশী হওয়া উচিত।

অমিয়কে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া ছোকরা বলিল, "বড়বাবু তো সিটে নেই, আসুন না একবার?"

অমিয় সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না।

খগেনবাবু মিষ্ট হাস্যে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন ও পাশের টুলে তাহাকে বসাইয়া বলিলেন, "কিছু মনে না-করেন যদি আপনাকে গুটিকয়েক কথা বলব?"

"বেশ ত বলুন না?"

"বড়বাবুর থ্রু দিয়ে আসেন নি নিশ্চয়ই, তা হ'লে আপনাকে ডাকতাম না। আপনারা শিক্ষিত মানুষ, নিজের বিদ্যের জোরে হাজার হাজার লোককে হটিয়ে চাকরি পেয়েছেন, আপনারা খোসামোদ করতে যাবেন কি দুঃখে?"

অমিয় চুপ করিয়া রহিল।

খগেনবাবু এক মুহূর্ত্ত থামিয়া বলিলেন, "এসেছেন আজ দু-তিন দিন, এর মধ্যে দেখছেন তো এখানকার হালচাল। সাজিয়ে রেখেছে, মশাই, সাজিয়ে রেখেছে। সব আত্মীয়গোষ্ঠীতে ভরা; আপনি জোরে হেঁচেছেন কি বড়বাবুর কানে সে হাঁচির কথা উঠবে। আমি খোসামোদের ধার ধারি না কিনা, তাই আমি পরম শত্রু।" আর-এক মুহূর্ত্ত থামিয়া বলিলেন, "চাকরি যখন পেয়েছেন ক্রমে ক্রমে সবই জানবেন। আপনারা বুদ্ধিমান, বিদ্বান্, আপনাদের বুঝিয়ে বলাই বাহুল্য। শুনলেন তো, নিজের আত্মীয়টিকে গ্রেড দেবার জন্য কি ভাবে ষড়যন্ত্র চলছে। ওরা দু-মুখো ছুরি—যখন যেদিকে সুবিধা সেই দিকেই কাটতে থাকে। যখন সিনিয়রিটিতে পায় তখন এফিসিয়েন্সির কোশ্চেন উঠায় না, আবার সিনিয়রিটি টপকাতে এফিসিয়েন্সির কলকাঠি টেপে।"

এতক্ষণে অমিয় কথা কহিল। বিস্ময়মাখা স্বরে বলিল, "উপরের অফিসাররা কিছু দেখেন না?"

খগেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তা হ'লে আর আমাদের এত দুঃখ কেন? ওঁরা কি দেখেন, জানেন? ডাইরেক্ট ইন্‌চার্জ্জ অর্থাৎ বড়বাবু কি রিমার্ক দিয়েছেন। কাউকে ডাকিয়ে পরীক্ষা করে ওঁদের অমূল্য সময় ওঁরা নষ্ট করতে চান না।"

"তা হ'লে তো বড়বাবুদের প্রতিপত্তি যথেষ্ট।"

"যথেষ্টই তো? আজকাল বাইরের খোঁচা খেয়ে খেয়ে কিছু কমেছে সে প্রতিপত্তি। আমাদের এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েসন্ আছে, জানেন তো? তাদের ঠেলায় প'ড়ে সিলেক্সন কমিটি হয়েছে, সিনিয়রিটি বা এফিসিয়েন্সি রেকর্ডেড্ হচ্ছে। কোম্পানীর আমলের স্বেচ্ছাচার অনেক কমে গেছে। এই যে আপনাকে হার্ড-কম্পিটিসনে চাকরি লাভ করতে হ'ল, আগেকার দিনে, ধরুন বছর-দশেক আগে হ'লে কি হ'ত জানেন, অন্য কোন কোয়ালিফিকেসন্ দরকার হ'ত না—স্রেফ বড়দের সঙ্গে কুটুম্বিতা ছাড়া।"

অমিয় হাসিল।

খগেনবাবু ড্রয়ার টানিয়া এক গোছা কাগজ বাহির করিলেন। সেগুলি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন, "একখানা দরখাস্ত লিখেছি, আপনাকে কাটকুট ক'রে এটা দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। পড়ুন না, পড়লেই বুঝবেন কি সম্বন্ধে।"

দরখাস্তখানা পড়িয়া অমিয় চিন্তাযুক্ত হইল।

খগেনবাবু বলিলেন, "দাদাকে ওরা কন্‌ডেম্ করতে চায় এফিসিয়েন্সির পাথর চাপিয়ে—আমরা সেই ক্লিক ভাঙবো, অমিয়বাবু।"

অমিয় শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "কিন্তু আমি তো আপিসের কায়দা-কানুন জানি না, আমার লেখা সুবিধা হবে কি?"

খগেনবাবু বলিলেন, "পড়লেন তো ভাবার্থটা। সবটা না লেখেন কিছু সংশোধন করে দিন ওই লেখাটাই।"

অমিয় ঘামিয়া উঠিল। এত শীঘ্র যে তাহার নির্লিপ্ততা নষ্ট হইয়া যাইবে তাহা সে ভাবিতেই পারে নাই। মাত্র দুই দিন সে 'আপিসে' আসিয়াছে, কয়েক জন ছাড়া অধিকাংশের সঙ্গে আলাপ তো দূরের কথা চাক্ষুষ দেখাই

কেউ ছুটো পান আমার টেবিলে রাখলে ওর চোখ টাটায়। সে যাই হোক, ওকে ভয় আমি করি না, ভয় করলে বড়বাবু হ'তে পারতুম না। আমি যা করব তা ধর্ম্ম বজায় রেখেই করব—এতে কেউ চটেন, নিরুপায়।"

বলিয়া কালী-নামাঙ্কিত প্যাডের বর্ডারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন।

"তারা, তারা," বলিয়া বড়বাবু পুনরায় অমিয়র পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

"অনেক সহ্ করেছি, অমিয়বাবু। কাল শনিবার, কাল থাকুক, সোমবারে এর একটা হেস্তনেস্ত হবে। আপনাকে সব সত্য কথা বলতে হবে। পারবেন না বলতে সত্য কথা?"

অমিয় বিশেষ উৎসাহ বোধ করিল না। সব সময়ে সত্য বলায় নিছক আনন্দ লাভ হয় না। বিশেষতঃ এমন একটা বিশ্রী ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে জড়াইতে সে একান্ত অনিচ্ছুক। হায় রে চাকরি! হায় রে নির্লিপ্ত থাকার বাসনা!

কোনমতে বড়বাবুকে নমস্কার করিয়া সে পথে বাহির হইল।

অপরাহ্ণের বাতাস পথের ধুলা উড়াইয়া একটানা বহিয়া চলিয়াছে। অন্য সময় হইলে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সে নাকে কাপড় তুলিয়া দিত, আজ নির্ভীক চিত্তে সেই ধূলি-প্রবাহকে সে নাসিকা-পথে গ্রহণ করিল। মন্দ কি। অস্বাস্থ্যের ভিতর দিয়া যদি অসুখই করে, সে অসুখ তাহার পক্ষে আশীর্ব্বাদ। কিন্তু ত্রিশ টাকার চাকরির এতই কি মমতা! কঠিন প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হইয়া এই অমূল্য রত্ন লাভ না করিলেই বা কি এমন ক্ষতি হইত? লাভ এবং ক্ষতির অঙ্ক কষিতে কষিতে সে শ্যামবাজারের পথে অগ্রসর হইল। পথের দু-ধারে দেখিবার কিছু ছিল না, অথচ আজ মনে হইল এই সব নিত্যদেখা বস্তুগুলিকে সে তুচ্ছ মনে করিত কোন্ হিসাবে? যে-বাড়ী রোজই চোখে পড়ে, তাহার শিল্পনৈপুণ্য যেমন বিশেষ দৃষ্টির দ্বারা পরীক্ষিত হয় না, এই সার্কুলার রোডের দু-ধারে যাহারা আছে তাহারাও পথিকের চোখে অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। পথের এক ধারে প্রাসাদ, আর এক ধারে বস্তি। এক দিকে অপচয়, আর এক দিকে অভাব। ধনীর দুয়ারে ডাষ্টবিন-গুলিতে যাহা উদ্বৃত্ত হইয়া আশ্রয় লাভ করে, গরীবের ভাঙা চালায় সে-জিনিষ কল্পনাতীত। প্রতিযোগিতা কি এখানেও চলিতেছে না? ফুটপাথে ময়লা মাদুর বিছাইয়া বস্তির অধিবাসী কোন বৃদ্ধ আরামে তামাক টানিতেছে, কোন বৃদ্ধা হয়ত কোন বালিকার দ্বারা মাথার উকুন বাছাইতেছে, কেহ শুইয়া শুইয়া গল্প করিতেছে আর হাসিতেছে, কেহ ডাল ঝাড়িতেছে, কেহ ছেঁড়া চটে বিড়ির মশলা বিছাইয়া দিয়াছে।

ইহাদের পোষাক-পরিচ্ছদে সুপরিস্ফুট দৈন্য, মুখে হাসি আনন্দের বিরাম নাই। যাহারা ত্রিতল চারি তল প্রাসাদে বিজলীবাতি জ্বালাইয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় দেহ রাখিয়া পরম আলস্যে পড়া কিংবা গল্প করিয়া জীবন উপভোগ করিতেছে তাহারা, এবং ফুটপাথে মাদুর বিছাইয়া খোলা হাওয়া ও ধুলার মধ্যে স্বচ্ছন্দভাবে শত দিকে সুপ্রকটিত দৈন্যকে অবহেলা করিয়া আমৃত্যু উদ্দাম বাতাসের মত বহিয়া চলিয়াছে ইহারা—কাহারও মুখে তো পরাধীনতার বেদনা ঘনাইয়া উঠে নাই! অন্ন ইহাদের ব্যক্তিগত সমস্যাকে সঙ্গীন করিতে পারে নাই; প্রতিযোগিতা হয়ত আছে, কিন্তু সে প্রতিযোগিতা আলোর সঙ্গে ফুলের বিকাশের প্রতিযোগিতার মত স্বতঃস্ফূর্ত্ত। মধ্যবিত্তের মত সংসারে ক্ষুধা এবং সম্ভ্রম দুই তীক্ষ্ণমুখী তীরের আঘাতে উহাদের জর্জ্জরিত করিয়া তোলে না। একটি মানুষের উপার্জ্জনের উপর বৃহৎ সংসারের মরণ-বাঁচনের সমস্যা তো নাই! তাই চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও ইহারা পরম অসুখী নহে। ইহারা আকাশ-বিচ্যুত বারিধারার মত—উপরের বিন্দু নীচে পড়িয়া ভাঙিয়া যাইতেছে প্রতিমুহূর্ত্তে—কিন্তু যে ক্ষেত্রটিতে পড়িয়া বিন্দু-লীলা সংবরণ করিতেছে সেটি উষর মরুভূমি নহে, কাজেই নদীরূপে না হউক, নালারূপেও কিছু দিন তার অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে।

বেশ আছে ইহারা; আপিস নাই এবং আবর্ত্ত নাই। সত্যকারের সুখ নাই এবং সত্যকারের দুঃখও নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি গলায় ঝুলাইয়া অমিয় আজ এতটুকু সৎসাহস তো দেখাইতে পারিল না! বর্ষার দিনে এঁটেল মেঠো পথে কাদা বাঁচাইয়া কে চলিতে পারে? ক্রমশঃ

চোরের ঘটকালি

শ্রীসীতা দেবী

বুড়ী জগন্মোহিনী দেবীর বয়সের গাছ-পাথর ছিল না। তিনি আত্মীয়স্বজন কাহারও গলগ্রহ ছিলেন না, তবু এমনিই মানুষের মন, কেহ তাঁহার এতকাল বাঁচিয়া থাকাটাকে ভাল চক্ষে দেখিত না। আড়ালে বলাবলি করিত, "বুড়ী মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু নিয়ে এসেছে, এর আর মরণ নেই।"

তাঁহার নিজের ছেলেমেয়ে হয় নাই। কাছে থাকিত একটি ষোল-সতেরো বৎসরের মেয়ে, নাম রত্নমালা। এটি বৃদ্ধার পরলোকগতা ভগিনীর নাতনী। আরও আত্মীয় তাঁহার ছিল, তবে বুড়ীর মুখের দৌড়ে কেহ তাঁহার কাছে ঘেঁসিত না। দোতলা বাড়ীখানা তাঁহার নিজের, আরও একখানা বাড়ী তাঁহার আছে, তাহাতে ভাড়াটিয়া বসাইয়াছেন। এ-বাড়ীরও একতলাটা সম্প্রতি ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। এতকাল নীচের তলাটায় যত মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো আত্মীয়-জ্ঞাতিদের আড্ডা ছিল। মুখের কথায় তাহারা বিদায় হয় না, কাজেই অসুবিধা স্বীকার করিয়াও জগন্মোহিনী এবার ঘর-তিনখানা ভাড়া দিয়া দিয়াছেন।

উপর তলায় তাঁহারা তিনটি প্রাণী এখন বাস করেন। দিদিমা, নাতনী, আর পুরাতন চাকর ছেদী। ছেদী জাতিতে হিন্দুস্থানী, তবে বালক বয়স হইতে কলিকাতায় বাস করিয়া সে এখন বাঙালীই হইয়া গিয়াছে। কথাবার্ত্তা বাঙালীরই মতন বলে। মাথার চুলে তাহারও পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বাড়ীর সব কাজ ছেদীই করে, তবে রান্নাটা রত্নমালার ভাগে। ছেদী জাতে কাহার, তাহার দ্বারা রান্নাঘরের কাজ চলে না। বৃদ্ধার যত বয়স বাড়িতেছে, টাকার প্রতি টানও ততই বাড়িতেছে। টাকা লইয়া কি যে হইবে তাহার ঠিকানা নাই। নাতনীর প্রতি খুব যে একটা অন্তরের টান আছে তাঁহার, তাহাও মনে হয় না। বয়স এত হইল, বিবাহ দিবার নাম নাই। বিবাহের নামেই বুড়ী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া ওঠে। বলে, "বিধবা মানুষ আমি, কি ক'রে ওর বিয়ে দেব? মা-বাপ-খেকো মেয়ে, দুটো পয়সা দিয়েও কেউ সাহায্যি করবে না। দু-হাত এক করা অমনি সোজা কথা কি না? আর এত তাড়া-ই বা কিসের? মেয়ের বয়স ত বারো পেরয় নি।"

বলা বাহুল্য, গত পাঁচ বৎসরের ভিতর রত্নমালার বয়স বাড়ে নাই। নিতান্ত কলিকাতা শহর এবং বুড়ীর টাকাকড়ি আছে, তাই রক্ষা, না হইলে কথার চোটে এত দিনে দিদিমা, নাতনী দুইজনেরই কানে তালা লাগিয়া যাইত।

রত্নমালা দেখিতে ভাল, তবে রং খুব ফরসা নয়। বাড়ন্ত গড়ন, পিঠ ছাইয়া চুলের রাশ হাঁটুর কাছে গড়াইয়া পড়িয়াছে। লেখাপড়া পয়সা খরচ করিয়া কেহ শিখায় নাই, নিজের চেষ্টায় বাংলা লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছে। ঘরকরণার কাজ সবই জানে, কারণ ইহা লইয়াই তাহাকে দিন কাটাইতে হয়।

আত্মীয়বন্ধুজ্ঞাতি কিছুরই অভাব নাই। তবে বৃদ্ধার ধারণা সকলেই তাহার মরণের জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, তাহা হইলে বাড়ী দুইখানা, আর টাকা ক'টা হাত করিতে পারে। এইজন্য কাহাকেও তিনি আমল দিতে চান না। তবে বাপের বাড়ীর সম্পর্কের লোক যাহারা, তাহারা হাল না ছাড়িয়া যাওয়া-আসা করিতেই থাকে। শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কিত যাহারা, তাহারা দূরে বসিয়া গাল দেয়, পারতপক্ষে বুড়ীর ছায়া মাড়ায় না।

নীচের তলায় ভাড়াটে বসানর প্রস্তাবে অনেকে

আসিয়া অযাচিত উপদেশ দিয়া গিয়াছে। "কাজ কি বাপু? তোমার টাকার অভাব ত নেই? কে আসবে তা কে জানে?"

কেহ বা বলিয়াছে, "সোমত্ত মেয়ে নিয়ে ঘর কর, হট্ ক'রে বাইরের লোক ঢুকোলেই হ'ল? তার চেয়ে এরা আপনার জন ছিল, না-হয় পয়সা না-ই দিচ্ছিল? বিপদে আপদে কত কাজে আসত।"

জগন্মোহিনী কাহারও ছেঁদো কথা শুনিবার পাত্রী নহেন। রীতিমত নোটিস লট্‌কাইয়া, বাংলা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া, তিনি ভাড়াটে জুটাইয়া আনিয়াছেন। বাঙালী হিন্দু গৃহস্থ হইলেই হইল। বাজে ভয় পাইবার মানুষ তিনি নন। নীচের তলাটা খালি ফেলিয়া রাখিতেও তাঁহার আপত্তি ছিল না, যদি ঐ হাড়-জ্বালানে আত্মীয়গুলি দূর হইয়া যাইত। কিন্তু তাহাদের ত বিদায় করার আর কোনও উপায় পাওয়া গেল না? তা ছাড়া বৃদ্ধা সংসারী মানুষ, টাকাকড়ি দু-চারিটা নাড়িতে চাড়িতে হয়, ঘরে দুই-দশটা মানুষ থাকাই ভাল। চোর-ডাকাতের উৎপাত আর কোন্ জায়গায় নাই বল?

তা টাকাপয়সা তিনি ভালমতেই নাড়িতেন-চাড়িতেন। পাড়াপ্রতিবেশীকে চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া তাঁহার বহুকালের অভ্যাস। তবে বুড়ী সাবধান খুব, কখনও বিনা বন্ধকে কাহাকেও কিছু দিতেন না। সুতরাং একটি পয়সা কখনও তাঁহার মারা যায় নাই। উপর তলার সব চেয়ে বড় ঘরটি জগন্মোহিনীর শুইবার ঘর, তাহার ভিতর একটি লোহার সিন্দুক, দুইটি খুব মজবুত ষ্টীল ট্রাঙ্ক ও একটি বড় ভারি খাট। ষ্টীল ট্রাঙ্ক দুটি লোহার শিকল দিয়া পরস্পরের সঙ্গে ও খাটের খুরার সহিত বাঁধা। শেষ গ্রন্থিটিতে বড় লোহার তালা লাগানো।

এ-ঘরে রত্নমালা ছাড়া আর কাহারও ঢুকিবার অধিকার নাই। এমন কি ছেদীও এ-ঘরে কোনও দিন ঢুকিতে পায় নাই। যতদিন বৃদ্ধার হাতে পায়ে শক্তি ছিল, ততদিন এই ঘরটি তিনি নিজেই ঝাড়িতেন-মুছিতেন। এখন আর হাত চলে না, চোখেও ভাল দেখেন না, তাই রত্নমালাই ঘর পরিষ্কার করে। দ্বিতীয় ঘরখানিতে সে নিজে থাকে, আত্মীয়বন্ধু কেহ দেখা করিতে আসিলে এ-ঘরেই বসে। তৃতীয় ঘরখানিতে খাওয়া-দাওয়া হয়, বাসন-কোসন ভাঁড়ার থাকে। রাত্রে ছেদী এই ঘরে শুইয়া জিনিষপত্রের তত্ত্বাবধান করে। বাড়ীর দোতলার সিঁড়ির মুখে 'কোলাপ্সিব্‌ল' লোহার দরজা বসান। সাবধানতার অভাব কোথাও দেখা যায় না। বাড়ীতে একটা বুলডগ রাখিতে তাঁহার এক নাতি উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু তিনি হিন্দু বিধবা এমন "ম্লেচ্ছ কাণ্ড" করেন কি করিয়া? তাই কুকুর আর আনা হয় নাই। তাহা ছাড়া হতভাগা জীবের যা খাদ্য-তালিকা তিনি শুনিলেন, তাহাতেই তাঁহার মন আরও বিমুখ হইয়া গেল। নামে কুকুর, খোরাক ত হাতীর মতন। বাড়ীতে তাঁহারা তিনটি প্রাণী থাকেন, খাওয়া-দাওয়া, কাঠ, কয়লা, কেরোসিন সব লইয়াও তাঁহার পনর-ষোল টাকার বেশী খরচ হয় না। হ্যাঁ, তা যদি মিষ্টি বা দুধ সখ করিয়া কেনেন, ত সে আলাদা খরচ। কিন্তু এই কুকুরটা রাখিলেই তাঁহার আরও ছয়-সাতটা টাকা নিশ্চিত খরচ হইয়া যাইত। মাংস দাও, দুধ দাও, হাজাম কত।

চাকরটা তাঁহার ভাল, মাছমাংস খাওয়ার দাবী কোনও দিন করে নাই, ওদের দেশে এসব আপদ্ নাই। রত্নীকেও তিনি ভাল শিক্ষা দিয়াছেন, গরীব ঘরের অনাথ মেয়ে, খাওয়া-দাওয়ার পিট্‌পিটানি নাই। যাহা পায়, তাহাই খায়। তিনি নিজে বিধবা মানুষ একাহারী, রাত্রে যা হোক একটু কিছু মুখে দেন। বুড়ী হইয়া এখন তবু কিছু ভালমন্দ খাওয়ার সখ হইয়াছে, আগে তাহাও ছিল না। রোজ দুধ লওয়া হয় না, তবে পাশের বাড়ীতে গোয়ালা রোজ দুধ দেয়, এখন প্রায়ই তাহার নিকট নগদ পয়সা দিয়া দুধ কেনা হয়। রত্নমালা ঘরেই পায়েস, ক্ষীর, পিঠা প্রভৃতি তৈয়ার করে। দিদিমা খাইয়া সবটা শেষ করিতে না পারিলে তাহারও ভাগ্যে সুখাদ্য একটু আধটু জুটিয়া যায়। তবে এমন অঘটন বড় বেশী ঘটে না।

ভাড়াটে আসিয়া গিয়াছে পাঁচ-ছয় দিন হইল, তবে এখনও তাহারা গুছাইয়া বসে নাই। নীচে সারাদিন হট্টগোল লাগিয়া আছে, জিনিষপত্র এ-ঘর হইতে ও-ঘরে টানিয়া লওয়া হইতেছে, দমাদ্দম হাতুড়ি পিটাইয়া

দেওয়ালের গায়ে পেরেক মারা হইতেছে, তাহার উপর মানুষের গলার কলরব ত আছেই। জগন্মোহিনী চোখে এখন অত্যন্তই কম দেখেন, কাজেই ভরসা করিয়া নীচে নামেন না, তবে কান ত ঠিক আছে, এত গোলমালে তিনি একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। ভাড়াটে রাখিলে কত উৎপাতই না সহ্য করিতে হয়। হতভাগারা কতদিনে একটু সুস্থির হইয়া বসিবে? তিনখানা ঘর ত ভাড়া লইয়াছে, গুছাইতে যেন তাহাদের বছর ঘুরিয়া গেল। কি এত আসবাব আনিয়াছে নবাবের নাতিরা?

নাতনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁলা রত্নী, বলি নীচে মানুষ কতগুলো এসেছে রে? এ যে কান পাতবার জো নেই?"

রত্নমালা বলিল, "তেমন বেশী আর কই? গিন্নি একজন, তাঁর ছোট ছোট দুটো মেয়ে আর তার ভাই বুঝি একজন। পুরুষমানুষ ত ঐ এক জনই দেখলাম।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "দুড়ুম দুড়ুম করছে দেখ। বুড়ো মানুষ, দুপুর বেলা একটু ঘুমব, তার জো কি? এমন জানলে কে সাধ ক'রে এ আপদ্ ডেকে আনত?"

নাতনী বলিল, "গোছগাছ প্রায় হয়ে এসেছে, বড়-জোর আজকের দিনটা, তার পর চুপচাপ হয়ে যাবে, দেখো এখন। বাবুটি কোথায় আপিসে কাজ করে, সে দশটা বাজতে না-বাজতে বেরিয়ে যাবে। মেয়ে-দুটোও এই পাড়ার ইস্কুলে পড়ে, তারাও থাকবে না। নিশ্চিন্ত হয়ে কত ঘুমবে, ঘুমিও না?"

বৃদ্ধা একটু সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, "এত খবর তোকে কে দিল লা? হটহট ক'রে অমনি বুঝি গিয়ে জুটেছিলি? আমি যেমন চোখের মাথা খেয়ে ব'সে আছি, তাই তোর খুব বাড় বেড়েছে না? সোমত্ত মেয়ে, যার তার ঘরে গিয়ে ঢুকিস্ কেন? কে কেমন রীত-চরিত্তিরের মানুষ সব তুই জানিস নাকি?"

নাতনী সুন্দর মুখখানা ঘুরাইয়া বলিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি ত সারাদিন আমাকে খালি পাড়া বেড়াতেই দেখছ। তাহলে তোমার ঘরের এত করণা করে কে? নীচে যেতে হয় না আমাকে? চান করতে, পা ধুতে সারাক্ষণই ত যাচ্ছি? তোমার মত ত তোলা জলে আমার কাজ চলে না? তা মেয়ে-দুটো নিজে এগিয়ে এসে কথা বলে, উত্তর দেব না নাকি? তাদের মুখেই শুনলাম সব। মানুষ ভাল ওরা, তুমি দেখো, উৎপাত করবে না।"

জগন্মোহিনী বলিলেন, "ছুঁড়িদের বিয়ে হয় নি? কত বড়? তোর মত হবে?"

রত্নমালা বলিল, "কোথায় আমার মত? এইটুকু টুকু, ছোটটা ত এখনও ফ্রক পরে। বড়টা বড়-জোর বছর বারোর হবে।"

বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ ঝাঁঝিয়া উঠিলেন, "আর তোমার একেবারে বয়সের গাছ-পাথর নেই, না? তোর কত বয়স হ'ল শুনি? সবে ত বারোয় পা দিয়েছিস? নিজেই রটাবে তা লোকে বলবে না কেন? বুদ্ধিশুদ্ধি যদি ঘটে একটু আছে। বড় বিয়ের সাধ হয়েছে, না? ভাবছ বুঝি বয়সটা ব'লে করে বাড়িয়ে দিলেই অমনি বিয়ে হয়ে যাবে? সে গুড়ে বালি লো। অত পয়সা কার কাঁদছে? বিনা পয়সায় কে বা তোকে ঘরে নিচ্ছে?"

রত্নমালা রাগিয়া বলিল, "আ মর, শুধু শুধু ঝগড়া বাধায় দেখ। বুড়ীর যেন খেয়ে কর্ম্মে কাজ নেই। আমি বিয়ে করলে তোমার পিণ্ডি রাঁধবে কে?" বলিয়া দুম দুম করিয়া পা ফেলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

আসলে বৃদ্ধার মন সারাক্ষণ ভয়ে আকুল হইয়া আছে। এই নাতনীটিকে না হইলে তাঁহার চলে না। এমন সুন্দর রান্নার হাত, এত সেবাযত্ন করে। এমন কি আর মাইনে-করা লোকের কাছে পাওয়া যাইবে? আর কোন্ সাহসেই বা তিনি সে-সব শহরে ডাকিনীদের ঘরে ঢুকিতে দিবেন? কোন্‌দিন গলাটা টিপিয়া দিয়া যথাসর্ব্বস্ব লইয়া সরিয়া পড়িবে ত? ছেদীটা মানুষ ভাল, অনেক দিনের লোক। কিন্তু হইলে কি হয়? একে পুরুষ মানুষ, তায় জাতিতে কাহার। জল তোলা আর বাসন মাজা ছাড়া আর কোন্ কাজটা তাহাকে দিয়া হয়? যদি সুবিধা থাকিত, তাহা হইলে কি আর নাতনীর বিবাহ তিনি দিতেন না? শত্রুর মুখে ছাই দিয়া তাঁহার যাহা আছে, তাহাতে একটা কেন, দশটা নাতনীর বিবাহ খুব ঘটা করিয়া হইয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার নিজের দিন কাটে কি

প্রকারে? যাক্, কুলীন,ব্রাহ্মণকন্যা, বেশী দিন যদি কুমারী থাকেই তাহাতে বা কি আসে যায়? হাড়জ্বালানীরা বলে, বিবাহ দিয়া ঘরে ঘরজামাই রাখ। তা সে ঘরজামাই বা কেমন হইবে কে জানে।' ভাল স্বভাবচরিত্র যাহার, সে ঘরজামাই হইতে আসিবে কেন? ভালমন্দ বাছিয়াই বা তাঁহাকে দিবে কে? তিনি নিজে ত চোখের মাথা খাইয়া বসিয়া আছেন। আর চারিদিকে তাঁহার জ্ঞাতিশত্রু। তাহারা একবার একটা অনিষ্ট করিবার সুযোগ পাইলে হয়। বাহিরের চোরকে পারা যায়, কিন্তু ঘরের চোরকে পারা যায় না।

বেলা গড়াইয়া আসিতেছে। মেঝেতে শীতলপাটি পাতিয়া নানা ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধা কোন এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িলেন। নীচের কোলাহল তখন কিছু কমিয়া আসিয়াছে।

রত্নমালার দিনে ঘুমানো অভ্যাস নাই। দুপুরে একটু শেলাই-ফোঁড়াই বা পড়াশুনা করা তাহার অভ্যাস। আজ রাগের মাথায় পড়িতেও তাহার ভাল লাগিল না। দিদিমা বুড়ী এমনিতে মানুষ যে খুব খারাপ তাহা নয়, কিন্তু যত দিন যাইতেছে, তত যেন তাঁহাকে ভীমরতিতে ধরিতেছে। কথাবার্ত্তার কিবা ছিরি। শুনিলে হাড় জ্বলিয়া যায়। রত্নমালা যেন বিবাহ করিবার জন্য মরিয়া যাইতেছে। অবশ্য, বিবাহ করিতে যে তাহার কিছু আপত্তি আছে তাহা নয়। ঐ ত পালদের করুণা তাহারই বয়সী, দু-বছর আগে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কেমন সুখে সে ঘরসংসার করিতেছে। পাশের বাড়ীর ছোট বউটাও বেশ আছে, মুখে তাহার সর্ব্বদাই হাসি। স্বামীটা তাহাকে খুব ভালবাসে। অবশ্য, বিবাহ করিয়া অসুখীও অনেকে হয়, তাহারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই, ঘরে ঘরেই পাওয়া যায়। রত্নমালা বিবাহ করিলে তাহার ভাগ্যে কি জুটিত তাহা কে জানে? কিন্তু তাহার মন বলে, সে সুখেই থাকিত। এইভাবে বুড়ী দিদিমার ভাত রাঁধিয়া কতদিন কাটিবে কে জানে? তাহার দিনগুলা যেন কাটিতে আর চায় না। সঙ্গী নাই, সাথী নাই, এমন করিয়া কি মানুষের প্রাণ বাঁচে? বুড়ীর ভয়ে বাড়ীতে কেহ আসেও না, রত্নমালারও কাহারও বাড়ী যাইবার উপায় নাই। এক জান্‌লায় জান্‌লায় পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে যা কথাবার্ত্তা হয়।

কয়দিন হইল একটা ব্লাউস কাটা আছে, শেলাই করিলে হয়। দুই-চার ফোঁড় তুলিয়াই তাহাও আর রত্নমালার ভাল লাগিল না। রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার বেশী হাঙ্গাম নাই। বুড়ী আজ দই-চিঁড়া খাইবে। ও-বেলার তরকারি ডাল আছে, তাহাতেই রত্নমালা আর ছেদীর চলিয়া যাইবে। দইও অনেকটা বসানো হইয়াছে, হয়ত দিদিমা সবটা খাইয়া উঠিতে পারিবে না।

রত্নমালা আয়না-চিরুণী আনিয়া চুল বাঁধিতে বসিল। যা এক রাশ চুল, ভাল করিয়া বাঁধিতে সময় লাগে। বসিয়া বসিয়া চ্যাটাল বিনুনী করিয়া রত্নমালা মস্ত একটা খোঁপা গড়িয়া তুলিল। গা'টা ধুইয়া আসা যাক, নীচের কলের ঘরে এতক্ষণ জল আসিয়া গিয়াছে। কলঘর একটিই ছিল, এখন ভাড়াটে আসাতে খোলা চৌবাচ্চার চারিদিক্ টিন দিয়া ঘিরিয়া তাহাদের জন্য আর-একটা স্নানের ঘর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পুরনো কলঘর বাড়ীওয়ালীর ভাগেই আছে।

শাড়ী সেমিজ গামছা লইয়া রত্নমালা নামিয়া চলিল। লাল ডুরে শাড়ীখানা ছিঁড়িয়া আসিল প্রায়। ডুরে, চৌখুপি শাড়ীগুলি বেশ দেখিতে। সাদা কাপড় রত্নমালার বিশেষ পছন্দ নয়। তাঁতিনী বুড়ী কবে আসিবে কে জানে? ধনেখালীর একজোড়া ডুরে শাড়ী তাহার আনিবার কথা। তাঁতিনী শাড়ীগুলি ভালই আনে, বৃদ্ধা জগন্মোহিনী তাহাকে কিছু কম সুদে টাকা ধার দেন, সেও খুব বেশী লাভ না রাখিয়া তাঁহাকে ধুতি, শাড়ী, গামছা, যখন যাহা দরকার জোগায়। নাতনীকে কাপড়চোপড় দিতে বৃদ্ধা কার্পণ্য করেন না। তাই বলিয়া কি আর রোজ বেনারসী, ঢাকাই কিনিয়া দিতেছেন, তাহা নয়। বলিলে বলেন, "আইবুড় মেয়ের অত কাপুড়ে বিবি হয়ে কাজ নেই, সেই ত দিতেই হবে সব বিয়ের সময়।"

নীচে নামিয়া রত্নমালা সিঁড়ির মুখে থমকিয়া দাঁড়াইল। ভাড়াটে ভদ্রলোক খালি গা'য় বসিয়া জল

বহন করিয়া আনিতেছেন, ভিতরে তিন মায়ে ঝিয়ে মিলিয়া মহা জলপ্লাবন বাধাইয়া ঘর ধোওয়া হইতেছে। জিনিষ গোছানো শেষ হইল বোধ হয়। দিদিমা বুড়ী ইহার পর নিশ্চিন্তে ঘুমাইবে। কিন্তু কি পালোয়ানের মত চেহারা ভদ্রলোকের। বাঙালীর ঘরে এমনটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

ভদ্রলোক তাহাকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভ ভাবে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। রত্নমালাও স্নানের ঘরে ঢুকিয়া গেল। তাহার তাড়া নাই। ধীরে সুস্থে গা ধুইয়া, কাপড় কাচিয়া সে যখন বাহির হইল, তখন নীচের তলা ধোওয়া-মোছা শেষ হইয়া গিয়াছে। দুই মেয়ে নুকু আর টুকু বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া আছে। দুই জনেরই হাতে মুখে কাপড়ে জল-কাদার দাগ, পরিশ্রমে মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

নুকু বলিল, "দিদি, তোমাদের কলঘরে আমরা ঢুকে একটু হাত-মুখ ধুয়ে নেব? আমাদের ঘরটায় মামা ঢুকেছেন, তাঁর চান ক'রে বেরোতে একটি ঘণ্টা পুরো। অত ক্ষণ ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছে না।"

রত্নমালা বলিল, "যাও না। আমাদের আর ত কেউ এ-ঘরে চান করে না, আমি একা। তোমাদের ঘর-দোর ধোওয়া হচ্ছিল বুঝি?"

টুকু বলিল, "ও ত আমাদের নিত্যি লেগে আছে। ঘর ধোওয়া, আর কাপড় কাচা মায়ের এক বাতিক। এইজন্যে কখনও আমরা দোতলা ঘর ভাড়া নিই না, মা বলেন দোতলায় মোটে জল পাওয়া যায় না।"

রত্নমালা হাসিয়া উপরে চলিয়া আসিল, মেয়ে-দুটি হাত মুখ ধুইতে ঢুকিল।

ছাদে কাপড় মেলিয়া দিতে গিয়া রত্নমালা দেখিল ছেদী খুব ঘটা করিয়া উনুন ধরাইতেছে। তাহাদের রান্নাঘর এখন ছাদের চিলের কোঠায়। নীচের বড় রান্নাঘরটা ভাড়াটিয়ার দখলে গিয়াছে। তা ইহাতে রত্নমালার আপত্তি নাই, তারি ত তাহাদের রান্না। যা কিছু কষ্ট তাহা ছেদীর, তাহাকে নীচে হইতে জল টানিয়া তুলিতে হয়।

আলিশার উপর ভিজা শাড়ী মেলিয়া দিতে দিতে সে বলিল, "এখনি উনুন ধরাচ্ছিস্ কেন রে? হবে ত শুধু চারটে ভাত। এখন থেকে রেঁধে রাখলে খাবার বেলা জুড়িয়ে যাবে।"

ছেদী বলিল, "দু-পয়সার চিংড়ি মাছ এনেছি দিদিমণি, একটু চচ্চড়ি ক'রে নাও।"

রত্নমালা বলিল, "পয়সা কোথায় পেলি?"

ছেদী বলিল, "কাঠ-ঘুঁটের পয়সা থেকে দুটা সরিয়ে রেখেছি, দিদিমা ধরতে পারে নি।"

রত্নমালা আসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল। দিদিমা চোখে প্রায় আর দেখিতে পান না, তাই একটু আধটু লুকোচুরি এখন চলে, আগে এ-সবের উপায় ছিল না। তা মাঝে মাঝে একটু আঁশমুখ করিতে রত্নমালার ভালই লাগে। আনাজের ডালা টানিয়া লইয়া সে আলু-পেঁয়াজ কুটিতে বসিল। উপরে রান্নাঘর হইয়া একটা সুবিধা হইয়াছে, হাওয়াতে বসিয়া কাজ করা যায়, দিব্য খোলা ছাদ সামনে। নীচের রান্নাঘরটায় বড় গরমে কষ্ট পাইতে হইত।

রান্নাবান্না সারিতে তাহার ঘণ্টাখানিকের বেশী সময় লাগিল না। উনুনের ছাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া, ভাত-তরকারি সব তাহার পাশে সাজাইয়া রাখিয়া রত্নমালা বাহির হইয়া আসিল। আর এখন তাহার বিশেষ কোনও কাজ নাই। দিদিমার ঘর সকালে খুব ভাল করিয়া ঝাঁট দিয়া মুছিয়া ফেলা হয়, বিকালে সব দিন আর রত্নমালা ঘর ঝাঁট দেয় না। ঘর নোংরা হইবার কোনও কারণ নাই। এখন পর্য্যন্ত তকতক্ করিতেছে। দিদিমাকে সন্ধ্যার সময় জলখাবার গুছাইয়া দিলেই রত্নমালার দিনের কাজ শেষ হইল। নিজের খাওয়া-দাওয়া সে যখন খুশী করে। বুড়ীর বিছানা পাতা, মশারি ঝাড়িয়া দেওয়াও আছে, তা সে রাত দশটার কথা, আর এগুলিকে রত্নমালা কাজের মধ্যে গণ্যই করে না। সন্ধ্যাটা তাহার ছাদেই কাটে। আশেপাশের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে গল্পেরও এই সময়।

ছোট বউও ছাদে আসিয়াছে। এতক্ষণে তাহার কাপড় কাচা হইল বোধ হয়, হাতে ভিজা শাড়ী। রত্নমালা ডাকিয়া বলিল, "আজ এত দেরি কেন গো?"

বউটি মুচকি হাসি হাসিয়া বলিল, "শনিবার দিন উনি তিনটের ফেরেন কি না ভাই, তাই তাঁকে চা জল-খাবার দিতে দেরি হয়ে গেল।"

বেশ ইহাদের জীবনটা৭ রত্নমালার মনের ভিতরটা কেমন যেন মুষড়িয়া গেল।

ছোট বউ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের নূতন ভাড়াটেরা মানুষ কেমন ভাই? ভাব-সাব হয়েছে?"

রত্নমালা বলিল, "ভালই হবে বোধ হয়। গিন্নির সঙ্গে এখনও কথা হয় নি, মেয়ে-দুটি বেশ, তারা নিজেই এসে ভাব করেছে।"

ছোট বউ বলিল, "গিন্নিটি বিধবা, না? আমাদের ঝি বলছিল। সঙ্গের ভদ্রলোক ওঁর ছোট ভাই বুঝি?"

রত্নমালা বলিল, "তোমাদের ঝি দেখি সব খবর রাখে।"

ছোট বউ বলিল, "ওর বোন ওখানে কাজে লেগেছে কিনা, তাই যাওয়া-আসা আছে। বলে, খুব নাকি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; টেবিলে খায়। গিন্নিও নাকি ইংরেজী বই পড়ে। ব্রহ্মজ্ঞানী নাকি?"

রত্নমালা বলিল, "অতশত জানি না বাপু, তাদের ঘরে এখন অবধি ঢুকিই নি মোটে। মেয়েদুটোকে সিঁড়ির মুখে, বারাণ্ডায় দেখেছি এই পর্য্যন্ত।"

ছোট বউ মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "সকলের সঙ্গেই চেনা-জানা হবে এর পর, এক বাড়ীতে যখন রয়েছ। ভদ্রলোক ত বিয়ে করেন নি শুনলাম।" বলিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

রত্নমালার মুখ লাল হইয়া উঠিল, কান দুটা ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। ছোট বউ এমনিতে বেশ কিন্তু বড় বেশী ঠাট্টা-তামাশার পক্ষপাতী। রত্নমালার এত বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই, তাই তাহাকে লইয়া রসিকতা করা ছোট বউয়ের একটা নিত্যকর্ম্মের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। ভদ্রলোক বিবাহ করেন নাই ত তাহার কি? তিনি ত আর রত্নমালাকেই বিবাহ করিবার জন্য এতদিন কুমার থাকেন নাই? রত্নমালার মুখটা ক্রমেই বেশী করিয়া লাল হইতে লাগিল।

আর এক দিকের ছাদ হইতে ভূপতিবাবুর নাতনী বেলারাণী ডাকিয়া বলিল, "কি হচ্ছে গো মনের কথা?"

রত্নমালা বলিল, "হবে আর কি? একলা একলা ঘুরছি।"

বেলা আলিশার ধারে আসিয়া ফিশ ফিশ করিয়া বলিল, "একটা দোকলা জোটা না ভাই? তোর এমন রূপ।"

রত্নমালা বলিল, "দোক্‌লা কি আকাশ থেকে পড়বে নাকি?"

বেলা বলিল, "আকাশ থেকে না-ই পড়ল, পাতাল থেকে ত উঠতে পারে? তারই চেষ্টা দেখ্‌ না?"

"তুই দেখ্‌ গে, তোর যদি এত দরকার হয়ে থাকে," বলিয়া রত্নমালা রাগ করিয়া নীচে নামিয়া গেল। সবাই মিলিয়া আরম্ভ করিয়াছে কি? এর চেয়ে দিদিমা নীচের তলা ভাড়া না দিলেই ছিল ভাল। যদিও তখনও যত জ্ঞাতিগুষ্টীর সঙ্গে দিদিমার ঝগড়ার চোটে কান পাতা যাইত না। পৃথিবীতে বাঁচিয়া মানুষের সুখ নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, এখন আলো জ্বালিতে পারা যায়। বুড়ী আগে ঘড়ি ধরিয়া বাতি জ্বালাইতেন এবং হতচ্ছাড়া আত্মীয়দের জব্দ করিবার জন্য সাড়ে ন'টা বাজিতে না-বাজিতে মেন্ সুইচ বন্ধ করিয়া সারা বাড়ী অন্ধকার করিয়া দিতেন। এখন আর সেটা চলে না, নীচে ভাড়াটে আসিয়াছে, তাহারা যত রাত খুশী আলো জ্বালিবে। তা তাহারা নিজের পয়সা খরচ করিয়া যত খুশী আলো জ্বালুক না, তাহাতে জগন্মোহিনীর কি? নিজে চোখে এখন সন্ধ্যার পর প্রায় কিছুই দেখেন না, কাজেই দু-চার মিনিট আগে আলো জ্বালিলে এখন আর কিছুই বলেন না।

রত্নমালা সিঁড়ির মুখের আলো জ্বালিল, তাহার পর খাইবার ঘরের আলো জ্বালিয়া দিদিমার ভিজানো চিঁড়া চটকাইতে বসিল। বুড়ীর দাঁত একটাও নাই, তাহার উপযুক্ত করিয়া ত চটকাইতে হইবে? খানিক সময় গেল ইহাতে। তাহার পর দই, চিনি, পাকা মর্ত্তমান কলা—সব বাহির করিয়া সে যথাস্থানে সাজাইল। আসন পাতিয়া, জল গড়াইয়া রাখিয়া সে দিদিমাকে হাত ধরিয়া আনিয়া খাইতে বসাইল।

বৃদ্ধা যথাশক্তি খাইয়া অবশেষে হাত গুটাইতে বাধ্য হইলেন। বলিলেন, "ওটুকু আর আদায় করতে পারলাম না ভাই। দই অনেকটা রইল নাকি ?"

রত্নমালা দেখিল পাথর বাটিতে প্রায় এক পোওয়া দই রহিয়াছে। সে বলিল, "না, ঐ ফোঁটা-খানেক আছে।"

"তা ওটুকু তুই ভাতে মেখে খাস," বলিয়া বৃদ্ধা উঠিয়া পড়িলেন। রত্নমালা বারাণ্ডায় লইয়া গিয়া তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিল, গামছা অগ্রসর করিয়া দিল, আবার হাতে ধরিয়া শুইবার ঘরে রাখিয়া আসিল। এখন বুড়ী ঘুমাইবে না। পাড়ার কায়েৎ-ঠাকরুণ আসিবেন, তাঁহার সঙ্গে পুরাদম গল্প, পরনিন্দা করিয়া পেটের খাবার হজম হইলে পর ঘুমাইবার পালা।

রত্নমালা তাঁহাকে মাদুর পাতিয়া বসাইয়া দিয়া বলিল, "আমি খেয়ে আসি, তোমার ঘরের আলো জ্বালা থাক্ ?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই, জ্বালাই থাক্, নইলে অন্ধকারে বড় গা ছম্‌ছম্ করে।"

রত্নমালা খাইতে চলিয়া গেল। ছেদীও বাহিরে বারাণ্ডায় খাইতে বসিল। ইহার ভিতর কায়েৎ-ঠাকরুণও আসিয়া জুটিলেন। তাহার পর এঁটো বাসন কুড়াইয়া, ঘর পরিষ্কার করিয়া ছেদী নীচে বাসন মাজিতে চলিল। রত্নমালাও নীচে চলিল, ভাল করিয়া হাত মুখ ধুইবার জন্য।

নীচের ভদ্রলোকের ঘরে আলো জ্বলিতেছে, দরজা জানালা সব খোলা। ভিতরে বসিয়া কে একজন সুন্দর সেতার বাজাইতেছে। ইহার অনেক গুণ দেখি। রত্নমালার ইচ্ছা করিতে লাগিল সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া একটু বাজনা শোনে, কিন্তু পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে, সেই লজ্জায় সে দাঁড়াইল না। কলঘরে ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুইতে লাগিল।

মুকু হঠাৎ বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "দিদি, তুমি আমাদের ঘরে এক বার আসবে না ?"

রত্নমালা সিঁড়িতে পা দিয়া বলিল, "রাত হয়ে গিয়েছে যে ?"

টুকু পিছন পিছন আসিয়া জুটিয়াছিল, সে বলিল, "তা হ'লেই বা ? এ ত আর অন্য বাড়ী নয় ? আচ্ছা দিদি, তোমার নাম কি ?"

রত্নমালা নাম বলিল। মুকু বলিল, "বাবাঃ, মস্ত নাম, ও ব'লে ডাকা যায় না। তোমার ডাক-নাম নেই ?"

রত্নমালা বলিল, "সে বিচ্ছিরি।" টুকু মুকু একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "ডাক-নাম ত বিচ্ছিরিই হয় ভাই, আমাদের মামার ডাক-নাম কি জান ? বুড়ো।"

ইহার পর রত্নমালার আর নিজের ডাক-নাম কিছুতেই বলা চলিল না। কারণ তাহার ডাক-নাম বুড়ী।

কথা ঘুরাইবার জন্য সে তাড়াতাড়ি বলিল, "চল তোমাদের ঘর দে'খে আসি, কাল দুপুরে এসে অনেকক্ষণ গল্প করব।"

ঘর তিনখানাই খুব ফিটফাট গোছানো। আসবাব বা গৃহসজ্জা যে খুব বেশী আছে তাহা নয়, তবে সবগুলিই সুন্দর। গৃহিণী বলিলেন, "এস মা বোস, তুমি এ ক'দিন আস নি কেন ? তুমি ত আমার মেয়েদেরই প্রায় বয়সী, দু-চার বছরের বড়তে কিছু এসে যায় না। তুমি সর্ব্বদা আসবে যাবে, ওদের সঙ্গে গল্প করবে, খেলবে।"

রত্নমালার হাসি পাইল। খেলিবারই বয়স বটে তার। দেয়ালের কোণে দাঁড় করানো একটা এস্রাজ দেখাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কে বাজায় ?"

গৃহিণী বলিলেন, "দুই মেয়েই বাজায়। ওদের মামার কাছে শেখে। তুমি কি বাজাও ?"

রত্নমালা লজ্জিতভাবে বলিল, "আমি এখনও কিছু শিখি নি।"

মুকু বলিল, "তুমি যদি একটা এস্রাজ কেন তা হ'লে আমাদের সঙ্গেই শিখতে পার।"

রত্নমালা কি যেন উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময়, "মেজদি আমার নূতন মেজ্‌রাপটা কি হল ?" বলিয়া টুকুর মামা ঘরের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রত্নমালা পারিলে তখনই পলায়ন করিত, কিন্তু দরজা জুড়িয়া ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে ঠেলিয়া ত পার হইয়া যাওয়া যায় না ?

টুকু-মুকুর মা বলিলেন, "এই আমার ছোট ভাই নিশীথ, আর এইটি উপরের বুড়ো-ঠাকরুণের নাতনী।"

ভদ্রলোক তাহাকে নমস্কার করিলেন। রত্নমালা এমন অপ্রস্তুত হইয়া গেল যে ফিরিয়া একটা নমস্কারও করিতে পারিল না। দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল।

নিশীথচন্দ্র বলিলেন, "আমরা ক'দিন যা গোলমাল করেছি, আপনাদের নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হয়েছে ?"

রত্নমালা অস্ফুট স্বরে বলিল, "না।"

টুকু ইতিমধ্যে ছোটবাবার মেজ রাপ খুঁজিয়া পাওয়ায় তিনি সেটা লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। কায়েৎ-ঠাকরুণের আড্ডাও কি জানি কেন আজ সকাল সকাল ভাঙিয়া গেল, তিনি বাড়ী ফিরিয়া চলিয়াছেন দেখা গেল। রত্নমালা তাড়াতাড়ি বলিল, "যাই এখন আমি, দিদিমাকে শোওয়াতে হবে।" বলিয়াই সে উপরে পলাইয়া আসিল।

দিদিমাকে যথানিয়মে শোওয়াইয়া আসিয়া সে নিজে বিছানা করিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু অনেক রাত পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহার ঘুম হইল না। মাথার ভিতরে কত যে আজগুবি চিন্তা পাক খাইয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহার ঠিকানা নাই। অনেক রাত্রে শ্রান্ত হইয়া তবে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ক'-ঘণ্টা সে ঘুমাইয়াছিল তাহার ঠিক নাই। হঠাৎ পাশের ঘর হইতে বুড়ী দিদিমা বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া ওঠাতে, রত্নমালার ঘুম দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। দুই ঘরের মাঝের দরজা খোলাই থাকিত। রত্নমালা তড়াক্ করিয়া তক্তপোষ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, জগন্মোহিনীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা উঠিয়া বসিয়া তখনও প্রাণপণে চেঁচাইতেছেন। আর-এক ঘর হইতে, "আরে কি হ'ল দিদিমা ?" বলিতে বলিতে ছেদীও আসিয়া জুটিল।

ঘরের আলো জ্বালিয়া, মশারি তুলিয়া রত্নমালা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে দিদিমা ?"

দিদিমা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "জল দে।"

এক গেলাস জল খাইয়া তিনি বলিলেন, "চোর এসেছে রে।"

রত্নমালা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ? গেটে ত তালা বন্ধ, চোর আসবে কি ক'রে ?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "আহা, তারা গেট দিয়েই আসে কিনা ? চারদিকে গায়ে গায়ে লাগানো ছাদ, আসতে যেন আর পারে না ? ঐ বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে জান্‌লা দিয়ে টর্চ্চবাতি ফে'লে দেখছিল, আমার চোখে আলো লাগল, তাই ত জেগে গেলাম।"

ছেদী বলিল, "দরজা খুলে ওদিকে গিয়ে দেখব দিদিমা ?"

বৃদ্ধা চেঁচাইয়া বলিলেন, "খবরদার। খোঁড়া ঠ্যাং, হাড়-জিরজিরে দেহ নিয়ে বীরত্ব কত হতভাগার, তোকে ত একটা চড় মারলে ঘুরে পড়বি।"

ছেদীকে বীরপুরুষ অন্ততঃ চেহারা দেখিলে কেহই বলিবে না। তাড়া খাইয়া সে চুপ করিয়া গেল।

বৃদ্ধা আবার আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, ঐ শোন পায়ের শব্দ, সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। ও মা কি হবে গো! ও ছেদী, পুলিস ডাক। ও মা, কেন আমি ঘর ভাড়া দিতে গেলাম গো। মুখপোড়ারা তবু আমাকে আগ্‌লে রেখেছিল।"

রত্নমালা দরজার কাছে আসিয়া ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিয়া বলিল, "আঃ, কি শুধু শুধু চেঁচাচ্ছ দিদিমা। ও চোর নয়, নীচের তলার ভদ্রলোক, গোলমাল শুনে উঠে এসেছেন। ছেদী যা, বাবু কি বলছেন শোন্।"

ছেদী তাড়াতাড়ি লোহার গেটের কাছে গিয়া নিশীথের প্রশ্নের উত্তর দিতে বসিল।

সে-রাত্রে দিদিমা নিজেও আর ঘুমাইলেন না, নাতনীকেও ঘুমাইতে দিলেন না। ছেদী নিজের ঘরে গিয়া খানিক এ-পাশ ও-পাশ করিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে উঠিয়া জানা গেল চোর সত্যই আসিয়াছিল। উপরের রান্নাঘরের দরজার তালা ভাঙা, ভিতরে মাত্র একটা কড়া আর ডেক্‌চি ছিল, চোর তাহাই লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। সে যে পাশের বাড়ীর ছাদ দিয়াই আসিয়াছিল, তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল।

সারাদিন জগন্মোহিনীর বিলাপ আর আর্ত্তনাদে বাড়ী-সুদ্ধ নাওয়া-খাওয়া ঘুরিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

রত্নমালা রাগ করিয়া বলিল, "কি জালা রে বাবা, ছটো পুরনো কড়া-হাঁড়ির জন্যে এমন করছ কেন? বেচলে ত তার আট আনাও দাম হবে না?"

বৃদ্ধা রাগিয়া বলিলেন, "দূর হ মুখপুড়ী, ঘটে যদি কিছু বুদ্ধি আছে। ওলো এই ত কলির আরম্ভ? এর পর রোজ আসবে লো, রোজ আসবে। আমাদের গলা টিপে মেরে, যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে তবে ক্ষ্যান্ত দেবে। ওরা হ'ল খুনে ডাকাত। ওমা কোথায় যাব মা?"

রত্নমালাও ভয় পাইয়া গেল। বলিল, "দিদিমা, একটা দরোয়ান রাখলে হয় না?"

দিদিমা বলিলেন, "দূর হ আবাগীর বেটী, ওরাই ত চোরের সর্দ্দার সব। নূতন লোক কখনও ঘরে ঢুকতে দিতে আছে?"

রত্নমালা অগত্যা রান্না করিতে চলিয়া গেল। কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া তাহারও বুকটা ভয়ে ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইতেই জগন্মোহিনী মড়া কান্না জুড়িয়া দিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস রাত্রে সেই চোরটা দলবলসহ আসিয়া তাঁহাকে একেবারে শেষ করিয়া যাইবে। কাহারও কোনও সান্ত্বনায় তিনি কান দিলেন না, তাঁহার স্বর ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। আশে-পাশের বাড়ী হইতে লোকজন আসিয়া জুটিতে আরম্ভ হইল।

একতলা হইতে খুকুর মা আসিয়া বলিলেন, "এত ভয়ের কিছু নেই মা, অমন দু-চারটে কোন বাড়ীতে না আসে? তোমাদের বেশী ভয় করে ত নীচে চল, আমার ঘরে সবাই একসঙ্গে শোব।"

বৃদ্ধা সে প্রস্তাব কানেই তুলিলেন না, বলিলেন, "ওমা তা কি ক'রে হবে? আমার যথাসর্ব্বস্ব এই ঘরে।"

খুকুর মা বলিলেন, "তবে আমিই না-হয় মেয়েদের নিয়ে উপরে এসে শুই?"

জগন্মোহিনী বলিলেন, "তাতে কি হবে বাছা? চোর-ডাকাতে কি মেয়েমানুষকে ভয় পায়? ব্যাটা ছেলে হ'ত তবে না?"

খুকুর মা বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু বেটাছেলে এসে শোবে কোথায়? আর তো ঘর নেই?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তা বটে!" কল্পনা জল্পনা করিয়া রাত কাটিয়া গেল। উপরে কেহ শুইতে আসিল না বটে, তবে দিদিমা নিজেও ঘুমাইলেন না, নাতনীকেও ঘুমাইতে দিলেন না। অনিদ্রা আর উদ্বেগের ধাক্কায় পরদিন জগন্মোহিনী একেবারে শয্যাগ্রহণ করিলেন।

রত্নমালা নীচে গিয়া বলিল, "কি করি বলুন ত? দিদিমাকে নিয়ে ত মহা মুস্কিলে পড়লাম।"

খুকুর মা বলিলেন, "সত্যি, ছেলেমানুষ তুমি ক'দিক্ সামলাবে? আচ্ছা, তুমি দিদিমার সঙ্গে শোও, নিশীথ না-হয় পাশের ঘরে শুক্ দু-চার দিন।"

রত্নমালা সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া গেল। বলিল, "তাঁর কষ্ট হবে।"

খুকুর মা বলিলেন, "কষ্ট হবে কেন? উপরের দিব্যি ঘর, ও এই-সব কাজই ভালবাসে। যে-পাড়ায় আগে ছিলাম, সবাই ওকে কি, ভালই বাসত। চ'লে আসছি শুনে কেঁদেই ফেল্‌ল কতজন।"

শোনা গেল, গত রাত্রে পাড়ার আর-এক বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াছে। জগন্মোহিনীর নাড়ী প্রায় ছাড়িয়া গিয়াছিল, নিশীথ রাত্রে উপরে শুইবে শুনিয়া সে-যাত্রা তিনি প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন।

নিশীথের কোনও আপত্তি দেখা গেল না। রত্নমালা ছেদীকে দিয়া তাহার বিছানা উপরে আনিয়া পরিপাটি করিয়া পাতিয়া রাখিল। কুঁজায় খাইবার জল, গেলাস সব সাজাইয়া রাখিল। একখানা ভাল হাত-পাখাও আনিয়া রাখিল।

নিশীথ খাইয়া দাইয়া উপরে আসিয়া বলিল, "আপনি আবার অত কষ্ট করতে গেলেন কেন? বিছানাটা আমিই ত ঘাড়ে ক'রে আনতে পারতাম।" রত্নমালা লজ্জায় লাল হইয়া পলাইয়া গেল।

সে রাত্রে জগন্মোহিনী আরাম করিয়া ঘুমাইলেন, তাঁহার নাতনীর কিন্তু ভাল ঘুম হইল না।

সকালে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটি চ'লে গেছে রে?"

রত্নমালা সংক্ষেপে বলিল, "হঁ।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "আজ দুটো টাকা দিয়ে ছেদীকে বাজার পাঠা দিকি। পাঁচটা ভাল-মন্দ রাঁধ্, আমি ছেলেটিকে খেতে বলি, আজ রবিবার আছে। আহা, দিব্যি ছেলে, কেমন বুকের পাটা, চোরের সাধ্যি কি তার কাছে এগোয়।"

দিদিমার এ হেন বদান্যতায় চমৎকৃত হইয়া রত্নমালা ছেদীকে টাকা দিতে চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য, সে-দিন আহার-নিদ্রা দুইই নিশীথের উপরের তলায় সম্পন্ন হইল।

দুই-তিন দিন পরে নিশীথ বলিল, "আর ত চোর ছ্যাচড়ের কথা শোনা যাচ্ছে না দিদিমা, এবার আমি যথাস্থানে ফিরে যাই?"

জগন্মোহিনী কাঁদকাঁদ হইয়া বলিলেন, "ওরা ত এই সুযোগেরই অপিক্ষের আছে দাদা, তুমি নীচে নামলেই এসে গলায় ছুরি দেবে।"

নিশীথ বলিল, "কিসের? ছুরি দেওয়া অমনি সস্তা কি না? আমি আজ নীচেই শুই দিদিমা। নইলে লোকে কি বলবে বলুন ত?"

জগন্মোহিনী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কোন্ মুখপোড়া মুখপুড়ীর সাধ্যি আছে কথা বলবার? আমি কারও খাই না পরি? আমি তোমায় নাতজামাই করব, তখন দেখি কে কি বলে? তুমিও ত বামুনের ছেলে ভাই।"

"কি যে বলেন," বলিয়া নিশীথ লজ্জিত ভাবে নীচে নামিয়া আসিল। রত্নমালা পাশের ঘরে কি করিতেছিল, সে আরক্তমুখে, স্পন্দিতবক্ষে উপরে ছুটিয়া পালাইল।

স্নানের সময় নীচে নামিতেই টুকু-মুকু তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। মুকু বলিল, "আর তোমায় দিদি বলব না গো।"

টুকুও সুর ধরিল, "এবার কি বলব জান? মামী।"

রত্নমালা তাড়াতাড়ি তাহার মুখে চাপা দিয়া বলিল, "এই চুপ। কি যে ফাজলামি করে।"

কিন্তু বেচারী ক'জনের মুখে হাত চাপা দিবে? দু-ঘণ্টা যাইতে না-যাইতে পাড়াময় কথা রাষ্ট্র হইয়া গেল, জগন্মোহিনী নাকি নিজে নীচে গিয়া নিশীথের সঙ্গে রত্নমালার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া আসিয়াছেন। বলিয়াছেন, বিবাহ করিয়া এই বাড়ীতে যদি নিশীথ থাকে তাহা হইলে বাড়ীখানি তিনি নাতনীর নামে লিখিয়া দিবেন। এমন কি অন্য বাড়ীখানিও লিখিয়া দিতে পারেন, যদি নাতনী-নাতজামাই তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখাশোনা করে।

নিশীথও কম ছেলে নয়। সে নাকি মত দিয়া বসিয়াছে।

পত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু *

গল্পের প্লট অলস সময়ের সৃষ্টি, মনের কোণে মাকড়সার জাল রচনা। এই ব্যস্ততার দিনে সে সমস্তই ছিঁড়ে সাফ হয়ে গেছে—মাকড়সাটা সুদ্ধ ভেগেছে। এক সময় কোণগুলো তারা দখল ক'রে ছিল। এখন মগজের মধ্যে ঝাঁটিয়ে ·‚গছে কাজের কথা, ভারি ভারি বিষয়—তারা যে-রাস্তা দিয়ে রথ হাঁকিয়ে চলে সে-রাস্তায় উদ্বৃত্ত সৃষ্টির কণামাত্র খুঁটে পাবার জো নেই। আবার যদি এই অকেজো বুদ্ধি নিয়ে জন্মাই অকেজো সময়ে, তখন গল্পের প্লটের দাবী যদি জানাও হয়তো পেতে দেরি হবে না। এখন দিন ফুরিয়েছে। ব্যস্ত আছি ক্লান্ত আছি এবং নিষ্কৃতির সম্বন্ধে হতাশ হয়ে আছি। ইতি ৩১।৮।৩৮

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* উপন্যাসের প্লট প্রার্থনার উত্তরে শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা।

আরণ্যক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬

লবটুলিয়া হইতে কাছারি ফিরিতেছি, জঙ্গলের মধ্যে কুণ্ডীর ধারে বাংলা কথাবার্ত্তায় ও হাসির শব্দে ঘোড়া থামাইলাম। যত কাছে যাই, ততই আশ্চর্য্য হই। মেয়েদের গলাও শোনা যাইতেছে—ব্যাপার কি? জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া ঢুকাইয়া কুণ্ডীর ধারে লইয়া গিয়া দেখি বনঝাউয়ের ঝোপের ধারে সতরঞ্চি পাতিয়া আট-দশটি বাঙালী ভদ্রলোক বসিয়া গল্পগুজব করিতেছে, পাঁচ-ছয়টি মেয়ে কাছেই রান্না করিতেছে, ছ-সাতটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কোথা হইতে এতগুলি মেয়েপুরুষ এই ঘোর জঙ্গলে ছেলেপুলে লইয়া পিক্‌নিক্ করিতে আসিল বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছি এমন সময় সকলেরই চোখ আমার দিকে পড়িল—এক জন বাংলায় বলিল—এ ছাতুটা আবার কোথা থেকে এসে জুটল এ জঙ্গলে? আম্‌ব্রেলু? আমি ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহাদের কাছে যাইতে যাইতে বলিলাম—আপনারা বাঙালী দেখচি—এখানে কোথা থেকে এলেন?

তারা খুব আশ্চর্য্য হইল, অপ্রতিভও হইল। বলিল—? মশায়, বাঙালী? হেঁ-হেঁ কিছু মনে করবেন না, আমরা ভেবেছি—হেঁ-হেঁ—

বলিলাম—না না, মনে করবার আছে কি? তা আপনারা কোথা থেকে আসছেন, বিশেষ মেয়েদের নয়ে—

আলাপ জমিয়া গেল। এই দলের মধ্যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি একজন রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর। বাকী সকলে তাঁর ছেলে, ভাইপো, ভাইঝি, মেয়ে, নাৎনী, জামাই, জামাইয়ের বন্ধু ইত্যাদি। রায় বাহাদুর কলিকাতায় থাকিতে একখানি বই পড়িয়া জানিতে পারেন পূর্ণিয়া জেলায় খুব শিকার মেলে, তাই শিকার করিবার কোন সুবিধা হয় কিনা দেখিবার জন্য পূর্ণিয়ায় তাঁর ভাই মুন্সেফ, সেখানেই আসিয়াছিলেন। আজ সকালে সেখান হইতে ট্রেনে চাপিয়া বেলা দশটার সময় কাটারিয়া পৌছেন। সেখান হইতে নৌকা করিয়া কুশী নদী বাহিয়া এখানে পিক্‌নিক্ করিতে আসিয়াছেন—কারণ সকলের মুখেই নাকি শুনিয়াছেন লবটুলিয়া, বোমাইবুরু ও ফুলকিয়া বইহারের জঙ্গল না দেখিয়া গেলে জঙ্গল দেখাই হইল না। পিক্‌নিক্ সারিয়াই চার মাইল হাঁটিয়া মোহনপুরা জঙ্গলের নীচে কুশী নদীতে গিয়া নৌকা ধরিবেন—ধরিয়া আজ রাত্রেই কাটারিয়া ফিরিয়া যাইবেন।

আমি সত্যই অবাক হইয়া গেলাম। সকলের মধ্যে দেখিলাম ইহাদের সঙ্গে আছে একটা দোনলা শট্-গান্—ইহাই ভরসা করিয়া এ ভীষণ জঙ্গলে ইহারা ছেলেমেয়ে লইয়া পিক্‌নিক্ করিতে আসিয়াছে! অবশ্য, সাহস আছে অস্বীকার করিব না, কিন্তু অভিজ্ঞ রায় বাহাদুরের আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। মোহনপুরা জঙ্গলের নিকট দিয়া এদেশের জংলী লোকেই সন্ধ্যার পূর্ব্বে যাইতে সাহস করে না বন্য মহিষের ভয়ে। বাঘ বার হওয়া আশ্চর্য্য নয়। বুনো শুয়োর আর সাপের তো কথাই নাই। ছেলেমেয়ে লইয়া পিক্‌নিক্ করিতে আসিবার জায়গা নয় এটা।

রায় বাহাদুর আমাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না। বসিতে হইবে, চা খাইতে হইবে। আমি এ জঙ্গলে কি করি, কি বৃত্তান্ত। আমি কি কাঠের ব্যবসা করি? নিজের ইতিহাস বলিবার পরে তাঁহাদিগকে সবসুদ্ধ কাছারিতে রাত্রিযাপন করিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তাঁহারা রাজী হইলেন না। রাত্রি দশটার ট্রেনে কাটারিয়াতে উঠিয়া পূর্ণিয়া আজই রাত বারোটায় পৌছিতে হইবে। না ফিরিলে বাড়ীতে সকলে ভাবিবে, কাজেই থাকিতে অপারগ ইত্যাদি।

জঙ্গলের মধ্যে ইহারা এত দূর কেন পিক্‌নিক্‌ করিতে আসিয়াছে তাহা বুঝিলাম না। লবটুলিয়া বইহারের উন্মুক্ত প্রান্তর বনানী ও দূরের পাহাড়শ্রেণীর শোভা, সূর্য্যাস্তের রং, পাখীর ডাক, দশ হাত দূরে বনের মধ্যে ঝোপের মাথায় মাথায় এই বসন্তকালে কত চমৎকার ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে—এসবের দিকে ইহাদের নজর নাই দেখিলাম। ইহারা কেবল চীৎকার করিতেছে, গান গাহিতেছে, ছুটাছুটি করিতেছে, খাওয়ার ভবিষৎ কিসে হয় সে-ব্যবস্থা করিতেছে। মেয়েদের মধ্যে দুটি কলিকাতায় কলেজে পড়ে, বাকী দু-তিনটি স্কুলে পড়ে। ছেলেগুলির মধ্যে এক জন মেডিকেল কলেজের ছাত্র, বাকীগুলি কলিকাতায় বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পড়ে। কিন্তু প্রকৃতির এই অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যময় রাজ্যে দৈবাৎ যদি আসিয়াই পড়িয়াছে, দেখিবার চোখ নাই আদৌ। প্রকৃতপক্ষে ইহারা আসিয়াছিল শিকার করিতে—খরগোস, পাখী, হরিণ পথের ধারে যেন ইহাদের বন্দুকের গুলি খাইবার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

যে মেয়েগুলি আসিয়াছে, এমন কল্পনার লেশ পরিশূন্য মেয়ে যদি কখনও দেখিয়াছি! তাহারা ছুটাছুটি করিতেছে, বনের ধার হইতে রান্নার জন্য কাঠ কুড়াইয়া আনিতেছে, মুখে বকুনির বিরাম নাই—কিন্তু এক বার কেহ চারি ধারে চাহিয়া দেখিল না যে কোথায় বসিয়া তাহারা খিচুড়ি রাঁধিতেছে, কোন্‌ নিবিড় সৌন্দর্য্যভরা বনানীপ্রান্তে।

একটি মেয়ে বলিল—'টিন-কাটার্' ঠুক্‌বার বড্ড সুবিধে এখানে না? কত পাথরের নুড়ি?

আর একটি মেয়ে বলিল—উঃ কি জায়গা! ভাল চাল কোথাও পাবার যো নেই—কাল সারা টাউন খুঁজে বেড়িয়েছি—কি বিশ্রী মোটা চাল—তোমরা আবার বলছিলে পোলাও হবে!

ইহারা কি জানে যেখানে বসিয়া তারা রান্না করিতেছে, তার দশ-বিশ হাতের মধ্যে রাত্রের জ্যোৎস্নায় পরীরা খেলা করিয়া বেড়ায়?

ইহারা সিনেমার গল্প সুরু করিয়াছে। পূর্ণিমায় আজও রাত্রে তাহারা সিনেমা দেখিয়াছে, তা নাকি যৎপরোনাস্তি বাজে। এই সব গল্প। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার সিনেমার সঙ্গে তাহার তুলনা করিতেছে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, কথা মিথ্যা নয়। বৈকাল পাঁচটার সময় ইহারা চলিয়া গেল।

যাইবার সময় কতকগুলা খালি জমাট দুধের ও জ্যামের টিন ফেলিয়া রাখিয়া গেল। লবটুলিয়া জঙ্গলের গাছপালার তলায় সেগুলি আমার কাছে কি খাপছাড়াই দেখাইতেছিল!

বসন্ত শেষ হইতেই এবার লবটুলিয়া বইহারের গম পাকিয়া উঠিল। আমাদের মহালে রাই-সরিষার চাষ ছিল গত বৎসর খুব বেশী। এবার অনেক জমিতে গমের আবাদ, সুতরাং এ বছর এখানে কাটুনী মেলার সময় পড়িল বৈশাখের প্রথমেই।

কাটুনী মজুরদের মাথায় যেন টনক আছে, তাদের দল এবার শীতের শেষে আসে নাই, এ সময় দলে দলে আসিয়া জঙ্গলের ধারে, মাঠের মধ্যে সর্ব্বত্র খুপ্‌ড়ি বাঁধিয়া বাস করিতে সুরু করিয়াছে। দুই-তিন হাজার বিঘা জমির ফসল কাটা হইবে, সুতরাং মজুরও আসিয়াছে প্রায় তিন চার হাজারের কম নয়। আরও শুনিলাম আসিতেছে।

জেলায় লিখিয়া সকলকে টীকা দিবার ব্যবস্থা করিলাম। এতগুলি লোকের টীকা দেওয়া এক-আধ দিনের কর্ম্ম নয়, টীকাদার ও তাহার সহকারিগণ মহালে আসিয়া তাঁবু ফেলিয়া কাজ আরম্ভ করিল।

ফসল কাটার কাজ আরম্ভ হইয়া গেল, আমার দায়িত্ব বাড়িয়া গেল দ্বিগুণ, এতগুলি লোকের মঙ্গলামঙ্গল আমার উপর নির্ভর করিতেছে, আমি সকাল হইলেই ঘোড়ায় বাহির হই, সন্ধ্যায় ঘোড়ার পিঠ হইতে নামি। কত নূতন ধরণের লোক আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহাদের মধ্যে কত বদমাইস্‌ গুণ্ডা, চোর, রোগগ্রস্ত—সকলের উপর নজর না রাখিলে এসব পুলিসবিহীন স্থানে একটা দুর্ঘটনা যখন-তখন ঘটিতে পারে।

দু-একটি ঘটনা বলি।

এক দিন দেখি এক জায়গায় দুটি বালক ও একটি বালিকা রাস্তার ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে।

ঘোড়া হইতে নামিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে তোমাদের?

উত্তরে যাহা বলিল উহার মর্ম্ম এইরূপ। উহাদের বাড়ী আমাদের মহালে নয়, সেই যে নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা আমায় বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া তাহার ভ্রাতার চাকুরীর জন্যে ঘুষ দিতে চাহিয়াছিল, তাহার গ্রামে। উহারা সহোদর ভাই বোন, এখানে কাটুনী মেলা দেখিতে আসিয়াছিল। কারণ এখানকার মত এত জমির ফসলও এ অঞ্চলে কোথাও কাটা হয় না, এত বড় মেলাও সুতরাং কোথাও হয় না।

উহারা আজই পৌঁছিয়াছে, এবং কোথায় নাকি লাঠি ও দড়ির ফাঁসের জুয়াখেলা হইতেছিল, বড় ছেলেটি সেখানে জুয়া খেলিতে আরম্ভ করে। একটা লাঠির যে-দিকটা মাটিতে ঠেকিয়া আছে, সেই প্রান্তটা দড়ি দিয়া জড়াইয়া দিতে হয়, যদি দড়ি খুলিতে খুলিতে লাঠির আগায় ফাঁস জড়াইয়া যায়, তবে খেলাওয়ালা খেলুড়েকে এক পয়সায় চার পয়সা হিসাবে দেয়।

বড় ভাইয়ের কাছে ছিল দশ আনা পয়সা, সে একবারও লাঠিতে ফাঁস বাধাইতে পারে নাই, সব পয়সা হারিয়া ছোট ভাইয়ের আট আনা ও পরিশেষে ছোট বোনের চার আনা পয়সা পর্য্যন্ত লইয়া বাজি ধরিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। এখন উহাদের খাইবার পয়সা নাই, কিছু কেনা বা দেখাশোনা তো দূরের কথা। বড় ভাইটির বয়স বছর চোদ্দ কি পনর, ছোট ভাইয়ের বছর তের, বোনটির বছর দশ।

আমি তাহাদের কাঁদিতে বারণ করিয়া তাহাদিগকে লইয়া জুয়াখেলার অনুষ্ঠানের দিকে চলিলাম। প্রথমে তাহারা জায়গাই স্থির করিতে পারে না, পরে একটা হরীতকী গাছ দেখাইয়া বলিল—এরই তলায় খেলা হচ্ছিল। জনপ্রাণী নাই সেখানে। কাছারির রূপসিং জমাদারের ভাই সঙ্গে ছিল, সে বলিল—জুয়োচোরেরা কি এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকে হুজুর? লম্বা দিয়েছে কোন্ দিকে। ছেলেমেয়ে কয়টি নিতান্ত গ্রাম্য ও সরল, কিছুই বোঝে না। নতুবা এমন খেলা খেলিতেই বা যাইবে কেন? কেবল মাত্র এই ভরসা পাইলাম যে ইহারা সকলেই আমায় আশ্বাস দিল যে সেই লোকটিকে যদি ইহারা কোথাও আবার দেখে, তবে তখনি চিনিতে পারিবে। এ বিষয়ে কোন ভুল নাই।

বিকালের দিকে জুয়াড়ী ধরা পড়িল। সে মাইল তিন দূরে একটি বস্তিতে জুয়া খেলিতেছিল, আমার সিপাহীরা দেখিতে পাইয়া তাহাকে আমার নিকট হাজির করিল। ছেলেমেয়েগুলিও তাহাকে দেখিয়াই চিনিল।

লোকটা প্রথমে পয়সা ফেরৎ দিতে চায় না। বলে, সে তো জোর করিয়া কাড়িয়া লয় নাই, উহারা স্বেচ্ছায় খেলিয়া পয়সা হারিয়াছে, ইহাতে তাহার দোষ কি? অবশেষে তাহাকে ছেলেমেয়েদের সব পয়সা তো ফেরৎ দিতেই হইল—আমি তাহাকে পুলিসে দিবার আদেশ দিলাম।

সে হাতে পায়ে ধরিতে লাগিল। বলিলাম—তোমার বাড়ী কোথায়?

—বালিয়া জেলা, বাবুজী।

—এ রকম করে লোকে ঠকাও কেন? কত পয়সা ঠকিয়েছ লোকজনের?

—গরীব লোক, হুজুর। আমায় ছেড়ে দিন এবার। তিন দিনে মোটে দু-টাকা তিন আনা রোজগার—

—তিন দিনে খুব বেশী রোজগার হয়েছে মজুরদের তুলনায়।

—হুজুর, সারা বছরে এরকম রোজগার ক'বার হয়? বছরে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা আয়।

লোকটাকে সেদিন ছাড়িয়া দিয়াছিলাম—কিন্তু আমার মহাল ছাড়িয়া সেদিনই চলিয়া যাইবার করারে। আর তাকে কোনদিন কেউ আমাদের মহালের সীমানার মধ্যে দেখেও নাই।

এবার মঞ্চীকে কাটুনী মজুরদের মধ্যে না দেখিয়া উদ্বেগ ও বিস্ময় দুইই অনুভব করিলাম। সে বারবার বলিয়াছিল গম কাটিবার সময়ে নিশ্চয়ই আমাদের মহালে আসিবে। ফসল কাটার মেলা আসিল, চলিয়াও গেল—কেন যে সে আসিল না, কিছুই বুঝিলাম না।

অন্যান্য মজুরদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সন্ধান মিলিল না। মনে-ভাবিলাম, এত বিস্তীর্ণ ফসলের

মহাল কাছাকাছির মধ্যে আর কোথাও নাই, এক কুশী-নদীর দক্ষিণে ইসমাইলপুরের দিয়ারা মহাল ছাড়া। কিন্তু সেখানে কেন সে যাইবে, অত দূরে, যখন মজুরি উভয় স্থানেই একই।

অবশেষে ফসলের মেলার শেষ দিকে জনৈক গাঙ্গোতা মজুরের মুখে মঞ্চীর সংবাদ পাওয়া গেল। সে মঞ্চীকে ও তাহার স্বামী নকছেদী ভকৎকে চেনে। একসঙ্গে বহু জায়গায় কাজ করিয়াছে নাকি। তাহারই মুখে শুনিলাম গত ফাল্গুন মাসে সে উহাদের আকবরপুর গবর্ণমেণ্ট খাসমহালে ফসল কাটিতে দেখিয়াছে। তাহার পর তাহারা যে কোথায় গেল, সে জানে না।

ফসলের মেলা শেষ হইয়া গেল, জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি, এমন সময় একদিন সদর কাছারির প্রাঙ্গণে নকছেদী ভকৎকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। নকছেদী আমার পা জড়াইয়া হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আরও বিস্মিত হইয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিলাম—কি ব্যাপার? তোমরা এবার ফসলের সময় আস নি কেন? মঞ্চী ভাল আছে তো? কোথায় সে?

উত্তরে নকছেদী যাহা বলিল তাহার মোট মর্ম্ম এই, মঞ্চী কোথায় তাহা সে জানে না। খাসমহালে কাজ করিবার সময়েই মঞ্চী তাহাদের ফেলিয়া কোথায় পালাইয়া গিয়াছে। অনেক খোঁজ করিয়াও তাহার পাত্তা পাওয়া যায় নাই।

বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। কিন্তু দেখিলাম বৃদ্ধ নকছেদী ভকতের প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নাই, যা কিছু ভাবনা সবই সেই বন্য মেয়েটির জন্য। কোথায় সে গেল, কে তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গেল, কি অবস্থায় কোথায় বা সে আছে। সস্তা বিলাসদ্রব্যের প্রতি তাহার যে-রকম আসক্তি লক্ষ্য করিয়াছি সে-সবের লোভ দেখাইয়া তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া যাওয়াও কষ্টকর নয়। তাহাই ঘটিয়াছে নিশ্চয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—তার ছেলে কোথায়?

—সে নেই। সে বসন্ত হয়ে মারা গিয়েছে মাঘ মাসে।

অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম শুনিয়া। বেচারী পুত্রহারা তরুণী জননী! পুত্রশোকেই উদাসী হইয়া যেদিকে দু-চোখ যায়, চলিয়া গিয়াছে নিশ্চয়ই। কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম—তুলসী কোথায়?

—সে এখানেই এসেছে। আমার সঙ্গেই আছে। আমার কিছু জমি ছিল, হুজুর। নইলে আমরা বুড়োবুড়ী ফসল কেটে আর চলে না। মঞ্চী ছিল, তার জোরে আমরা বেড়াতাম। সে আমার হাত-পা ভেঙে দিয়ে গিয়েছে।

সন্ধ্যার সময় নকছেদীর খুপরিতে গিয়া দেখিলাম তুলসী তাহার ছেলেমেয়ে লইয়া চীনার দানা ছাড়াইতেছে। আমায় দেখিয়া তুলসী কাঁদিয়া উঠিল। দেখিলাম মঞ্চী চলিয়া যাওয়াতে সেও যথেষ্ট দুঃখিত। বলিল—হুজুর, সব ঐ বুড়োর দোষ। গোরমিণ্টের লোক মাঠে সব টীকে দিতে এল, বুড়ো তাকে চার আনা পয়সা ঘুষ দিয়ে তাড়ালে। কাউকে টীকে নিতে দিলে না। বললে টীকে নিলে বসন্ত হবে। হুজুর, তিন দিন গেল না, মঞ্চীর ছেলেটার বসন্ত হ'ল, মারাও গেল। তার শোকে সে পাগলের মত হয়ে গেল—খায় না, দায় না, শুধু কাঁদে।

—তার পর?

—তার পর, হুজুর, খাসমহল থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিলে। বললে—বসন্তে তোমাদের লোক মারা গিয়েছে, এখানে থাকতে দেবো না। এক ছোকরা রাজপুত মঞ্চীর দিকে নজর দিত। যেদিন আমরা খাসমহাল থেকে চলে এলাম, সেই রাত্রেই মঞ্চী নিরুদ্দেশ হ'ল। আমি সেদিন সকালে ঐ ছোকরাকে খুপরির কাছে ঘুরতে দেখেছি। ঠিক তার কাজ, হুজুর। ইদানীং মঞ্চী বড় কলকাতা দেখব, কলকাতা দেখব, করত। তখনই জানি একটা কিছু ঘটবে।

আমারও মনে পড়িল মঞ্চী আর বছর কলিকাতা দেখিবার যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়াছিল বটে। আশ্চর্য্য নয়, ধূর্ত্ত রাজপুত যুবক সরলা বন্য মেয়েটিকে কলিকাতা দেখাইবার লোভ দেখাইয়া ভুলাইয়া লইয়া যাইবে।

আমি জানি এ অবস্থায় এদেশের মেয়েদের শেষ পরিণতি হয় আসামের চা-বাগানে কুলীগিরিতে। মঞ্চীর অদৃষ্টে কি শেষকালে নির্ব্বান্ধব আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে দাসত্ব ও নির্ব্বাসন লেখা আছে?

বৃদ্ধ নক্‌ছেদীর উপর খুব রাগ হইল। এই লোকটা যত নষ্টের মূল। বৃদ্ধ বয়সে মঞ্চীকে বিবাহ করিতে গিয়াছিল কেন? দ্বিতীয়, গবর্ণমেণ্টের টীকাদারকে ঘুষ দিয়া বিদায় করিয়াছিল কেন? যদি উহাকে জমি দিই, সে ওর জন্ত নয়, উহার প্রৌঢ়া স্ত্রী তুলসী ও ছেলে-মেয়েগুলির মুখের দিকে চাহিয়াই দিব।

দিলামও তাই। নাঢ়া বইহারে শীঘ্র প্রজা বসাইতে হইবে, সদর আপিসের হুকুম আসিয়াছে প্রথম প্রজা বসাইলাম নক্‌ছেদীকে।

নাঢ়া বইহারে ঘোর জঙ্গল। মাত্র দু-চার ঘর প্রজা সামান্ত সামান্ত জঙ্গল কাটিয়া খুপরি বাঁধিতে সুরু করিয়াছে। নক্‌ছেদী প্রথমে জঙ্গল দেখিয়া পিছাইয়া গিয়াছিল, বলিল—হুজুর, দিনমানেই বাঘে খেয়ে ফেলে দেবে ওখানে—কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর করি?

তাহাকে স্পষ্ট বলিয়া দিলাম তাহার পছন্দ না হয়, সে অন্তত্র চেষ্টা দেখুক।

নিরুপায় হইয়া নক্‌ছেদী নাঢ়া বইহারের জঙ্গলেই জমি লইল।

সে এখানে আসা পর্য্যন্ত আমি কখনও তাহার খুপরিতে যাই নাই। তবে সেদিন সন্ধ্যার সময় নাঢ়া বইহারের জঙ্গলের মধ্য দিয়া আসিতে দেখি ঘন জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গা—নিকটে কাশের দুটি ছোট খুপরি। একটার ভিতর হইতে আলো বাহির হইতেছে।

সেইটাই যে নক্‌ছেদীর তা আমি জানিতাম না, ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিয়া যে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি খুপরির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—দেখিলাম সে তুলসী।

—তোমরা এখানে জমি নিয়েছ? নক্‌ছেদী কোথায়?

তুলসী আমায় দেখিয়া থতমত খাইয়া গিয়াছে। ব্যস্তসমস্ত হইয়া সে গমের ভুষি-ভরা একটা চটের গদি পাতিয়া দিয়া বলিল—নামুন বাবুজী—বসুন একটু। ও গিয়েছে লবটুলিয়া তেল নুন কিনে আনতে দোকানে। বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে।

—তুমি একা এই ঘন-বনের মধ্যে আছ?

—ও-সব সয়ে গিয়েছে, বাবুজী। ভয়ডর করলে কি আমাদের গরীবদের চলে? একা তো থাকতে হ'ত না—কিন্তু অদৃষ্ট যে খারাপ। মঞ্চী যত দিন ছিল, জলে জঙ্গলে কোথাও ভয় ছিল না। কি সাহস, তেজ ছিল তার, বাবুজী!

তুলসী তাহার তরুণী সপত্নীকে ভালবাসিত। তুলসী ইহাও জানে এই বাঙালী বাবু মঞ্চীর কথা শুনিতে পাইলে খুশী হইবে।

তুলসীর মেয়ে সুরতিয়া বলিল—বাবুজী, একটা নীলগাইয়ের বাচ্চা ধরে রেখেছি, দেখবেন? সেদিন আমাদের খুপরির পেছনের জঙ্গলে এসে বিকেলবেলা খস্‌খস্ করছিল—আমি আর ছনিয়া গিয়ে ধরে ফেলেছি। বড় ভাল বাচ্চা।

বলিলাম—কি খায় রে?

সুরতিয়া বলিল—শুধু চীনের দানার ভুষি আর গাছের কচি পাতা। আমি কচি কেঁদ পাতা তুলে এনে দিই।

তুলসী বলিল—দেখা না বাবুজীকে—

সুরতিয়া ক্ষিপ্রপদে হরিণীর মত ছুটিয়া খুপরির পিছন দিকে অদৃশ্য হইল। একটু পরে তাহার বালিকা-কণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল—আরে নীলগাইয়া তো ভাগলুয়া হৈ রে ছনিয়া—উধার-ইধার-জল্‌দি পাকড়া—

দুই বোনে হুটাপুটি করিয়া নীলগাইয়ের বাচ্চা পাকড়াও করিয়া ফেলিল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাসিমুখে আমার সামনে আনিয়া হাজির করিল।

অন্ধকারে আমার দেখিবার সুবিধার জন্ত তুলসী একখানা জলন্ত কাঠ উঁচু করিয়া ধরিল। সুরতিয়া বলি—কেমন, ভাল না বাবুজী? একে খাবার জন্তে কাল রাত্রে ভালুক এসেছিল। ওই মহুয়া-গাছে কাল ভালুক উঠেছিল মহুয়া-ফুল খেতে—তখন অনেক রাত—বাপ মা ঘুমোয়, আমি সব টের পাই—তারপর গাছ থেকে নেমে আমাদের খুপরির পেছনে এসে দাঁড়াল। আমি একে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে শুই রাতে—ভালুকের পায়ের শব্দ পেয়ে ওর মুখ হাত দিয়ে জোর করে চেপে আরও জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলুম—

—ভয় করল না, তোর সুরতিয়া?

—ইস্! ভয় বই কি! ভয় আমি করি নে। কাঠ কুড়ুতে গিয়ে জঙ্গল কত ভালুকঝোড় দেখি—তাতেও ভয় করি নে। ভয় করলে চলে বাবুজী?

সুরতিয়া বিজ্ঞের মত মুখখানা করিল।

বড় বড় কলের চিমনির মত লম্বা, কালো কেঁদ গাছের গুঁড়ি ঠেলিয়া আকাশে উঠিয়াছে খুপ্রির চারিধারে, যেন কালিফোর্ণিয়ার রেডউড্ গাছের জঙ্গল। বাদুড় ও নিশাচর কাক পাখীর ডানা-ঝটাপটি, ডালে ডালে, ঝোপে ঝোপে, অন্ধকারে জোনাকির ঝাঁক জ্বলিতেছে, খুপরির পিছনের বনেই শিয়াল ডাকিতেছে—এই কয়টি ছোট ছেলেমেয়ে লইয়া উহাদের মা যে কেমন করিয়া এই নির্জ্জন বনে প্রান্তরে থাকে, সত্যই তাহা বুঝিয়া ওঠা কঠিন। হে বিজ্ঞ, রহস্যময় অরণ্য, হে বিরাট, আশ্রিত জনের প্রতি তোমার সত্যই বড় কৃপা।

কথায় কথায় বলিলাম—মঞ্চী নিজের জিনিস সব নিয়ে গিয়েছে?

সুরতিয়া বলিল—ছোটমা কোন জিনিষ নিয়ে যায় নি। ওর সে বাক্সটা সেবার দেখেছিলেন—ফেলেই রেখে গিয়েছে। দেখবেন? আনছি।

বাক্সটা আনিয়া সে আমার সামনে খুলিল। চিরুণী, ছোট্ট আয়না, পুঁতির মালা, একখানা সবুজ রঙের খেলো রুমাল—ঠিক যেন ছোট খুকীর পুতুল-খেলার বাক্স! সেই হিংলাজের মালাছড়াটা কিন্তু নাই, সেবার লবটুলিয়া খামারের মেলায় সেই যেটা কিনিয়াছিল।

কোথায় চলিয়া গেল নিজের ঘর-সংসার ছাড়িয়া কে বলিবে? ইহারা তো জমি লইয়া এত দিন পরে গৃহস্থালী পাতাইয়া বসবাস সুরু করিয়াছে, ইহাদের দলের মধ্যে সেই কেবল যে ভবঘুরে, সেই ভবঘুরেই রহিয়া গেল।

ঘোড়ায় উঠিবার সময় সুরতিয়া বলিল—আর এক দিন আসবেন বাবুজী—আমরা পাখী ধরি ফাঁদ পেতে। নূতন ফাঁদ বুনেছি। একটা ডাহুক আর একটা গুড়গুড়ি পাখী পুষেছি। এরা ডাকলে বনের পাখী এসে ফাঁদে পড়ে—আজ আর বেলা নেই—নইলে ধরে দেখাতাম—

নাঢ়া বইহারের বন-প্রান্তরের পথে এত রাত্রে আসিতে ভয় ভয় করে। ধারে ছোট একটি পাহাড়ী ঝরণার জলস্রোত কুলকুল করিয়া বহিতেছে, কোথায় কি বনের ফুল ফুটিয়াছে, গন্ধে ভরা অন্ধকার এক-এক জায়গায় এত নিবিড় যে ঘোড়ার ঘাড়ের লোম দেখা যায় না, আবার কোথাও নক্ষত্রালোকে পাতলা।

নাঢ়া বইহার নানাপ্রকার বৃক্ষলতা, বন্য জন্তু ও পাখীদের আশ্রয়স্থান—প্রকৃতি ইহার বনভূমি ও প্রান্তরকে অজস্র সম্পদে সাজাইয়াছে, সরস্বতী কুণ্ডী এই নাঢ়া বইহারেরই উত্তর সীমানায়। প্রাচীন জরিপের থাক্ নক্সায় দেখা যায় সেখানে কুশীনদীর প্রাচীন খাত ছিল—এখন মজিয়া মাত্র ঐ জলটুকু অবশিষ্ট আছে—অন্য দিকে সেই প্রাচীন খাতই ঘন অরণ্যে পরিণত—

পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাম্

কি অবর্ণনীয় শোভা দেখিলাম এই বনভূমির সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে! কিন্তু মন খারাপ হইয়া গেল যখন বেশ বুঝিলাম নাঢ়া বইহারের এ বন আর বেশী দিন নয়। এত ভালবাসি ইহাকে অথচ আমার হাতেই ইহা বিনষ্ট হইল। দু-বৎসরের মধ্যেই সমগ্র মহালটি প্রজাবিলি হইয়া কুশ্রী টোলা ও নোংরা বস্তিতে ছাইয়া ফেলিল বলিয়া। প্রকৃতির নিজের হাতে সাজানো তার শত বৎসরের সাধনার ফল এই নাঢ়া বইহার ইহার অতুলনীয় বন্য সৌন্দর্য্য ও দূরবিসর্পী প্রান্তর লইয়া বেমালুম অন্তর্হিত হইবে। অথচ কি পাওয়া যাইবে তাহার বদলে?

কতকগুলি খোলার চালের বিশ্রী ঘর, গোয়াল, মকাই-জনারের ক্ষেত, শোনের গাদা, দড়ির চারপাই, হনুমানজীর ধ্বজা, ফণিমনসার গাছ, যথেষ্ট দোক্তা, যথেষ্ট খৈনী, যথেষ্ট কলেরা ও বসন্তের মড়ক।

হে অরণ্য, হে সুপ্রাচীন, আমায় ক্ষমা করিও।

আর একদিন গেলাম সুরতিয়াদের পাখী-ধরা দেখিতে।

সুরতিয়া ও ছনিয়া দুটি খাঁচা লইয়া আমার সঙ্গে নাঢ়া বইহারের জঙ্গলের বাহিরে মুক্ত প্রান্তরের দিকে চলিল।

বৈকাল বেলা, নাঢ়া বইহারের মাঠে সুদীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া সূর্য্য পাহাড়ের আড়ালে নামিয়া পড়িয়াছে।

একটা শিমুলচারার তলায় ঘাসের ওপর খাঁচা দুটি াইল। একটিতে একটি বড় ডাহুক, অন্যটিতে একটা ুগুড়ি। এ দুটি শিক্ষিত পাখী, বন্য পাখীকে আকৃষ্ট বার জন্য ডাহুকটি অমনি ডাকিতে আরম্ভ করিল।

গুড়গুড়িটা প্রথমতঃ ডাকে নাই।

সুরতিয়া শিস্ দিয়া তুড়ি দিয়া বলিল—বোলো রে েনিয়া—তোহর্ কির্—

গুড়গুড়ি অমনি ডাকিয়া উঠিল—গুড়-ড়-ড়-ড়—

নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে বিস্তীর্ণ মাঠের নির্জ্জনতার মধ্যে সে ়ত স্বর শুধুই মনে আনিয়া দেয় এমনি দিগন্তহারা ীর্ণতার ছবি, এমনি মুক্ত দিকচক্রবালের স্বপ্ন, ছায়াহীন ্যাংস্নালোক। নিকটেই ঘাসের মধ্যে যেখানে রাশি শি হলুদ রঙের দুধ্‌লি ফুল ফুটিয়া আছে তারই উপর নয়া ফাঁদ পাতিল—যেন পাখীর খাঁচার বেড়ার মত, ্শের তৈরি। সেই বেড়া ক'খানা দিয়া গুড়গুড়ি পাখীর চাটা ঢাকিয়া রাখিয়া দিল।

সুরতিয়া বলিল-চলুন বাবুজী, লুকিয়ে বসি গে াপের আড়ালে। মানুষ দেখলে চিড়িয়া ভাগবে। াই মিলিয়া আমরা শাল-চারার আড়ালে কতক্ষণ ঘাপটি রিয়া বসিয়া রহিলাম।

ডাহুকটি মাঝে মাঝে থামিতেছে···গুড়গুড়ির কিন্তু বর বিরাম নাই—একটানা ডাকিয়াই চলিয়াছে—গুড়-ড়্-ড়্—

সে কি মধুর অপার্থিব রব! বলিলাম—সুরতিয়া, াদের গুড়গুড়িটা বিক্রী করবি? আমি কিনব। কত ।?

সুরতিয়া বলিল—চুপ চুপ বাবুজী, কথা বলবেন না—শুনুন, বুনো পাখী আসছে—

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পরে অন্য একটি মাঠের উত্তর দিকে বনপ্রান্তর হইতে ভাসিয়া িল—গুড়্-ড়্-ড়্-ড়্

আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল। বনের পাখী খাঁচার ীর স্বরে সাড়া দিয়াছে!

ক্রমে সে-স্বর খাঁচার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ ধরিয়া দুইটি পাখীর রব পাশাপাশি শোনা যাইতেছিল, ক্রমে দুইটি স্বর যেন মিশিয়া এক হইয়া গেল···হঠাৎ আবার একটা স্বর···একটা পাখীই ডাকিতেছে···খাঁচার পাখীটা।

ছনিয়া ও সুরতিয়া ছুটিয়া গেল, ফাঁদে পাখী পড়িয়াছে! আমিও ছুটিয়া গেলাম।

ফাঁসে পা বাধাইয়া পাখীটা ঝট্‌পট্ করিতেছে। ফাঁদে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাক বন্ধ হইয়া গিয়াছে—কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! চোখকে যেন বিশ্বাস করা শক্ত।

সুরতিয়া পাখীটা হাতে তুলিয়া দেখাইল—দেখুন, বাবুজী, কেমন ফাঁদে পা আটকেছে। দেখলেন?

সুরতিয়াকে বলিলাম—পাখী তোরা কি করিস্?

সে বলিল—বাবা তিরাশি-রতনগঞ্জের হাটে বিক্রী করে আসে। এক একটা গুড়গুড়ি দু'পয়সা—একটা ডাহুক সাত পয়সা।

বলিলাম—আমাকে বিক্রী কর, দাম দেব।

সুরতিয়া গুড়গুড়িটা আমায় এমনিই দিয়া দিল—কিছুতেই তাহাকে পয়সা লওয়াইতে পারিলাম না।

আশ্বিন মাস। এই সময় একদিন সকালে পত্র পাইলাম রাজা দোবরু পান্না মারা গিয়াছেন, এবং রাজ-পরিবার খুব বিপন্ন—আমি সময় পাইলে যেন যাই। পত্র দিয়াছে জগরু পান্না, ভানুমতীর দাদা।

তখনি রওনা হইয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে চকমকিটোলা পৌঁছিয়া গেলাম। রাজার বড় ছেলে ও নাতি আমাকে আগাইয়া লইয়া গেল। শুনিলাম রাজা দোবরু গরু চরাইতে চরাইতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া হাঁটুতে আঘাত প্রাপ্ত হন, শেষ পর্য্যন্ত হাঁটুর সেই আঘাতই তাঁর মৃত্যুর কারণ ঘটে।

রাজাকে পাহাড়ের উপরে সমাধি-স্থানে সমাধিস্থ করার পরে রাজপরিবারের সকলে বাড়ী ফিরিয়া দেখে মহাজন আসিয়া উহাদের গরু-মহিষ কয়টি আটক করিয়াছে। মহাজন জাতিতে রাজপুত, দশ মাইল দূরের একটি গ্রামে থাকে, রাজা দোবরু তাহার নিকট বছর কয়েক পূর্ব্বে পনেরোটি টাকা ধার করিয়াছিলেন নাতি জগরুর বিবাহের ব্যয়ের জন্য। সুদে আসলে ঐ পনের

টাকা বর্ত্তমানে নাকি পঁচাত্তর টাকায় দাঁড়াইয়াছে। তাই রাজার মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া মাত্র মহাজন আসিয়া গরু-মহিষ বাঁধিয়া রাখিয়াছে। টাকা না পাইলে সে গরু-মহিষ ছাড়িবে না। এদিকে বিপদের উপর বিপদ, নূতন রাজার অভিষেক-উৎসব আগামী কল্য সম্পন্ন হইবে। তাহাতেও কিছু খরচ আছে। কিন্তু সে-টাকা কোথায়? তা ছাড়া গরু-মহিষ মহাজনে যদি লইয়া যায়, তবে রাজপরিবারের অবস্থা খুবই হীন হইয়া পড়িবে—ঐ দুধের ঘি বিক্রয় করিয়া রাজার সংসারের অর্দ্ধেক খরচ চলিত—এখন তাহাদের না খাইয়া মরিতে হইবে।

শুনিয়া আমি মহাজনকে ডাকাইলাম। তার নাম বীরবল সিং। আমার কোন কথাই সে দেখিলাম শুনিতে প্রস্তুত নয়। টাকা না পাইলে কিছুতেই সে গরু-মহিষ ছাড়িবে না। লোকটা ভাল নয় দেখিলাম।

ভানুমতী আসিয়া কাঁদিতে লাগিল সে তাহার জ্যাঠামশায় অর্থাৎ প্রপিতামহকে বড়ই ভালবাসিত—জ্যাঠামশায় থাকিতে তাহারা যেন পাহাড়ের আড়ালে ছিল, যেমনি তিনি চোখ বুজিয়াছেন, আর অমনি এই সব গোলমাল। এই সব কথা বলিতে বলিতে ভানুমতীর চোখের জল কিছুতেই থামে না। বলিল—চলুন, বাবুজী, আমার সঙ্গে—জ্যাঠামশায়ের গোর আপনাকে দেখিয়ে আনি পাহাড়ের উপর থেকে। আমার কিছু ভাল লাগছে না বাবুজী, কেবল ইচ্ছে হচ্ছে ওঁর কবরের কাছে ব'সে থাকি।

বলিলাম—দাঁড়াও, মহাজনের একটা কি ব্যবস্থা করা যায় দেখি। তারপর যাব—কিন্তু মহাজনের কোন ব্যবস্থা করা আপাততঃ সম্ভব হইল না। দুর্দ্দান্ত রাজপুত মহাজন কারও অনুরোধ উপরোধ শুনিবার পাত্র নয়। তবে সামান্য একটু খাতির করিয়া আপাততঃ গরু-মহিষগুলি এখানেই বাঁধিয়া রাখিতে সম্মত হইল মাত্র, তবে দুধ এক ফোঁটাও লইতে দিবে না।

ভানুমতী দেখি একা ওদের বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া। বলিল—বিকেল হয়ে গিয়েছে, এর পর যাওয়া যাবে না, চলুন কবর দেখতে।

ভানুমতী একা যে আমার সঙ্গে পাহাড়ে চলিল ইহাতে বুঝিলাম সরলা পর্ব্বতবালা এখন আমাকে তাহার পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরমাত্মীয় মনে করে। এই পাহাড়ী বালিকার সরল ব্যবহার ও বন্ধুত্ব আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

বৈকালের ছায়া নামিয়াছে সেই বড় উপত্যকাটায়।

শরতের প্রথম, শুধু পিয়ালফুল ছাড়া বনে অন্য কোন রকম ফুল ফুটে নাই, কিন্তু পাহাড়ের অনেকখানি উপরে উঠিবার পরে হঠাৎ ঘন, মিষ্ট, তীব্র ছাতিমফুলের গন্ধে মন আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

ভানুমতী বড় তড়বড় করিয়া চলে, ত্রস্তা হরিণীর মত। বলিলাম—শোন ভানুমতী, একটু আস্তে চল, এখানে ছাতিমফুলের গাছ কোথায় আছে?

ভানুমতীদের দেশে ছাতিমফুলের নাম সম্পূর্ণ আলাদা। ঠিকমত তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না। পাহাড়ের উপরে উঠিতে উঠিতে অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখ যাইতেছিল। নীল ধনুঝরি শৈলমালা ভানুমতীদের দেশকে, রাজ্যহীন রাজা দোবরু পান্নার রাজ্যকে মেখলাকারে ঘেরিয়া আছে, বহুদূর হইতে হু হু খোলা হাওয়া বহিয়া আসিতেছে।

ভানুমতী চলিতে চলিতে থামিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল—বাবুজী উঠতে কষ্ট হচ্ছে?

—কিছু না। একটু আস্তে চল কেবল—কষ্ট কি?

আর খানিকটা চলিয়া সে বলিল—জ্যাঠামশায় চ'লে গেল, সংসারে আমার আর কেউ রইল না, বাবুজী—

ভানুমতী ছেলেমানুষের মত কাঁদ কাঁদ হইয়া কথাটা বলিল।

উহার কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইল। বৃদ্ধ প্রপিতামহই না হয় মারা গিয়াছে, মাও নাই, নতুবা উহার বাবা, ভাই, ঠাকুরমা, ঠাকুরদা সবাই বাঁচিয়া, চারি দিকে জাজ্বল্যমান সংসার। হাজার হোক ভানুমতী স্ত্রীলোক এবং বালিকা, পুরুষের একটু সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার ও মেয়েলি আদর কাড়ানোর প্রবৃত্তি তার পক্ষে স্বাভাবিক।

ভানুমতীকে সান্ত্বনা দিলাম।

ভানুমতী বলিল—আপনি মাঝে মাঝে আসবেন বাবুজী আমাদের দেখাশুনো করবেন—ভুলে যাবেন না বলুন-

নারী সব জায়গায় সব অবস্থাতেই সমান! বন্য বালিকা ভানুমতীও সেই একই ধাতুতে গড়া।

বলিলাম—কেন ভুলে যাব? মাঝে মাঝে আসব নিশ্চয়ই—

ভানুমতী কেমন এক রকম অভিমানের সুরে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—হাঁ, বাংলা দেশে গেলে, কলকাতা শহরে গেলে আপনার আবার মনে থাকবে এ পাহাড় জংলী দেশের কথা—একটু থামিয়া বলিল—আমাদের কথা—আমার কথা—

সস্নেহ সুরে বলিলাম—কেন মনে ছিল না ভানুমতী? আয়নাখানা পাওনি? মনে ছিল কি ছিল না ভাব—

ভানুমতী উজ্জ্বল মুখে বলিল—উঃ বাবুজী, বড় চমৎকার আয়না—সত্যি, সে-কথা আপনাকে জানাতে ভুলেই গিয়েছি।

সমাধি-স্থানের সেই বটগাছের তলায় যখন গিয়া দাঁড়াইলাম, তখন বেলা আর নাই বলিলেও হয়, দূর পাহাড়শ্রেণীর আড়ালে সূর্য্য লাল হইয়া চলিয়া পড়িতেছে, কখন ক্ষীণাঙ্গ চাঁদ উঠিয়া বটতলার অপরাহ্ণের এই ঘন ছায়া ও সম্মুখবর্ত্তী প্রদোষের গভীর অন্ধকার দূর করিবে, স্থানটি যেন তাহারই স্তব্ধ প্রতীক্ষায় নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

ভানুমতীকে কিছু বনের ফুল কুড়াইয়া আনিতে বলিলাম উহার ঠাকুরদাদার কবরের পাথরে ছড়াইবার জন্য। সমাধির উপর ফুল ছড়ানো প্রথা এদের দেশে জানা নাই, আমার উৎসাহে সে নিকটের একটা বুনো শিউলি গাছের তলা হইতে কিছু ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিল। তাহার পর ভানুমতী ও আমি দুজনেই ফুল ছড়াইয়া দিলাম এই সমগ্র বন্য রাজ্যের অধিপতির বর্ত্তমান বংশধর, সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা রাজা দোবরু পান্নার সমাধির উপরে। বোধ হয় আর্য্যজাতির বংশধরের এই প্রথম সম্মান বিজিত অনার্য্য জাতির রাজসমাধির উদ্দেশ্যে। ঠিক সেই সময় ডানা ঝটপট্ করিয়া একদল সিল্লি ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল বটগাছের মগডাল হইতে—যেন ভানুমতী ও রাজার দোবরুর সমস্ত অবহেলিত, অত্যাচারিত, হাজার হাজার বছরের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণ আমার কাজে তৃপ্তিলাভ করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—সাধু! সাধু!

ক্রমশঃ

হাঙ্গেরীর পথে ঘাটে

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক

ডানিয়ুব ইউরোপের গঙ্গা। এর তীরবর্ত্তী দিগন্তব্যাপী শস্যশ্যামল প্রান্তরে কত জাতির উত্থান-পতন। কত আর্য্য অনার্য্য, কত খৃষ্টান মুসলমান সম্প্রদায়ের সংগ্রাম ও সংমিশ্রণ, কত সভ্যতার উদয়াস্ত, কত শহর বন্দর গ্রামের অভ্যুত্থান ও বিলোপ, মধ্য-ইউরোপের বক্ষভেদী এই নদীটিকে করেছে মহামানবের একটি পরম তীর্থক্ষেত্র। তাই কবিরা এর পঙ্কিল খরস্রোতের মধ্যে দেখেছেন অনন্ত সিন্ধুর রং, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় যন্ত্রীরা বিলিয়ে দিয়েছেন এর চলার ছন্দের উচ্ছৃঙ্খল মাদকতা। ষ্ট্রাউসের (Strauss) অমর ভালৎসেরে (Volzer) তাই আজও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ডানিয়ুবের ক্ষিপ্র স্রোত, মানবের ইতিহাসে যে প্লাবন এনে দিয়েছিল তার স্মৃতি। কিন্তু ডানিয়ুব শুধু অতীতের স্মৃতি নিয়েই বেঁচে থাকে নি, বর্ত্তমানের গর্ব্বে ও ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষায় এর বক্ষ ক্রমশই স্ফীত হয়ে উঠেছে; ডানিয়ুব ইউরোপের বিচারশালায় এক জন প্রধান সাক্ষী। গঙ্গার মত ডানিয়ুব যাঁর জটাজাল অবলম্বন ক'রে পৃথিবীতে নেমেছে, তিনিও ত্রিকালজ্ঞ সন্ন্যাসী।

এই তরুণীর পরিচ্ছদে মোরগ-পুচ্ছের অনুকৃতি লক্ষ্যণীয়

বিচিত্র পরিচ্ছদে কলচ অঞ্চলের তরুণী

ইউরোপীয় সভ্যতার উষাকালে ডানিয়ুব দাঁড়িয়েছিল এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গমস্থলে, দুটি বিভিন্ন সভ্যতার সীমান্ত-প্রদেশে। এরই তটভূমিতে প্রথম সুরু হয় এশিয়া ও ইউরোপের বিরোধ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংগ্রাম; ক্রমশঃ সে বিরোধ সমাজ থেকে জাতীয়তায় এবং জাতীয়তা থেকে ধর্ম্মে গিয়ে পৌঁছয়। দু'টি বিভিন্ন সভ্যতার এই রীতি যে তারা মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালে যুদ্ধ করতে চায়, একে অপরকে জয় করতে চায়, মেনে নিতে চায় না। ডানিয়ুবের তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান হাঙ্গেরী প্রদেশে মাজ্যর (Magyar) নামে যে আদিম সম্প্রদায়টি বিগত তিন হাজার বছর ধ'রে বসবাস ক'রে আসছে, তার ইতিহাসই মধ্য-ডানিয়ুবের তীরে সভ্যতা-সংগ্রামের ইতিহাস। এশিয়মুখি হাঙ্গেরী আজ ভৌগোলিক সংজ্ঞায় ইউরোপের অন্তর্গত; আধুনিক হাঙ্গেরীবাসীদের সমাজ এবং রাষ্ট্র ইউরোপীয় সভ্যতার উপাদানে তৈরি; তাই বাইরে থেকে দেখতে গেলে মনে হবে যে ইউরোপের সভ্যতা মাজ্যরদের জয় করেছে। একথা ঠিক যে পুরাকালে রোমানরা এখানে রাজত্ব স্থাপন করেছিল এবং আধুনিক কালে টিউটনিক জাতিদের সঙ্গে হাঙ্গেরীর রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা মাজ্যরদিগকে উত্তর-ইউরোপীয় সভ্যতার আওতায় নিয়ে এসেছে; কিন্তু মাজ্যরদের প্রাণে তাদের প্রথম জন্মদিনের স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে আধুনিক হাঙ্গেরীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ইউরোপীয় হ'লেও, হাঙ্গেরীর গ্রাম্য অঞ্চলে চাষী ও শিল্পিগণ এখনও তাদের রূপকথার অমূল্য সম্পদ ভুলতে পারে নি। তাই পুস্‌ত'র (Puszta) মেষপালক এবং বালাটন্ (Balaton) হ্রদের জেলের চরিত্রে দেখেছি এশিয়ার উত্তরাধিকার; হাঙ্গেরীর গ্রাম্য চারু-শিল্পে দেখেছি এশিয়ার রুচি, আর মাজ্যর-

সান্নিধ্যে দেখেছি একটি অসীম বীরত্ব-বিলাসী ভাব-প্রবণতা। আধুনিক হাঙ্গেরীর সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করলে তাই দেখতে পাওয়া যাবে এর মধ্যে একাধিক ভিন্নমুখী সভ্যতার সমাবেশ। মাজ্যরদের নিজস্ব একটা আধ্যাত্মিক শক্তি আছে; তাই হাজার বছর ধ'রে দু'টি প্রবল এবং দিগ্বিজয়ী জাতীয় শক্তির মধ্যবর্ত্তী হয়েও এরা আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। মাজ্যরদের এক দিকে স্লাভ এবং অন্য দিকে টিউটনিক জাতি, কিন্তু মাজ্যররা টিউটনিক-দের সঙ্গেই বরাবর সহযোগিতা ক'রে এসেছে; কোন স্লাভ-বংশ এখনও বুডাপেষ্টে রাজত্ব ক'রে যেতে পারে নি; কিন্তু দক্ষিণ থেকে তুর্কীরা এসে প্রায় দেড়-শ বছর সেণ্ট ষ্টিফেনের সিংহাসন কলুষিত ক'রে গেছে। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরী তুর্কী শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে। বর্ত্তমান হাঙ্গেরীবাসীরা মুসলমান-বিদ্বেষী, কিন্তু মুসলমান-দের প্রভাব হাঙ্গেরীর ভাষায়, বেশভূষায় এখনও বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর যুগ্ম-রাজত্বের কালে হাঙ্গেরীর অধীনে কতকগুলি স্লাভ জাতি পর্য্যন্ত আসতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু মহাযুদ্ধের বিপুল রাষ্ট্র-বিপ্লবের অবসরে তারা বুডাপেষ্টের শাসন-জাল থেকে নিজেদের মুক্ত ক'রে নিয়েছে।

কলচ অঞ্চলের বেশভূষা

হাঙ্গেরীতে রাজনীতি আর পল্লীজীবনের মধ্যে অসীম ব্যবধান। মধ্য-ইউরোপে আজ যে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য চলেছে, তার মধ্যে হাঙ্গেরীর একটি বিশেষ রকমের দায়িত্ব আছে। বুডাপেষ্টের একটি প্রধান স্কোয়ারে (Liberty Square) চার দিকে চারটি স্মৃতি-স্তম্ভ আছে; ঐ স্তম্ভ ক'টিকে বলা হয় হাঙ্গেরীর আলসাস্-লোরেন্ (Alsasce-Lorraine); অর্থাৎ ট্রিয়াননের সন্ধিতে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম সকল দিক্ থেকেই হাঙ্গেরী যে-সব প্রদেশ হারিয়েছে তার করুণ স্মৃতি জীবন্ত রাখবার প্রেরণা ঐ স্তম্ভ ক'টিতে। চেকোস্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও রুমানিয়া সকলেই ভাগ পেয়েছে হাঙ্গেরীর অঙ্গচ্ছেদের; কিন্তু হাঙ্গেরীর সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে ট্রান্সিল্ভানিয়া রুমানিয়ার হাতে চ'লে যাওয়াতে; কারণ এই জনপদটিতেই ছিল হাঙ্গেরীর অধিকাংশ আর্থিক সম্পদ্। আজ ট্রান্সিল্ভানিয়ার কাঠ, লোহার ও কয়লার খনি ও অন্যান্য খনিজ ধাতুর মালিক রুমানিয়া। হাঙ্গেরী তাই ট্রিয়াননের সন্ধির পর থেকেই স্বপ্ন দেখে আসছে ওর লুপ্ত রাজ্যের পুনরুদ্ধার করবার। কিন্তু এই পুনরুদ্ধার-পদ্ধতির (irredentism) সাফল্যের জন্য যে ধরণের রাজনৈতিক মৈত্রীর প্রয়োজন হাঙ্গেরীর তা নেই। কিছু দিন ইতালী এই পদ্ধতির সাপক্ষে ছিল, আজও বাহ্যিকভাবে আছে; কিন্তু সে শুধু মৌখিক বন্ধুত্ব।* হাঙ্গেরীর লুপ্ত রাজ্যের উদ্ধারের জন্য ইতালী লিট্ল্ আঁতাতের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। কিন্তু হাঙ্গেরীর কৃষি-জাত মালের উপর ইতালীর নজর আছে। হাঙ্গেরীর শক্তিকে যারা খর্ব্ব করেছে, অর্থাৎ ফরাসী ও ইংরেজ, তাদেরও প্রতিপত্তি মধ্য-ইউরোপে কম নয়; হাঙ্গেরী

* এজন্য বুডাপেষ্টে হাঙ্গেরীয়ানরা একটি প্রধান স্কোয়ারের নাম দিয়েছে "মুসোলিনী স্কোয়ার"।

হাই টাট্রাস অঞ্চলের একটি সুরম্য হ্রদ

। কথা ভুলতে পারে না; তাই হাঙ্গেরীর পররাষ্ট্র-হ্নীতিতে ক্রমশই জার্ম্মান-প্রীতি প্রকট হয়ে উঠছে।

এ সব কথা বুডাপেষ্টে আলোচনা হয়ে থাকে, কিন্তু াঙ্গেরীর পল্লীগ্রামে রাজনীতির আলোচনা এক প্রকার াই বললেই চলে। শুধু বুডাপেষ্ট দেখে আসল ঙ্গেরীর অন্তরের পরিচয় কিছু পাওয়া যায় ব'লে মনে য় না। বুডাপেষ্ট অন্য যে-কোন ইউরোপীয় রাজধানীর তই একটি আন্তর্জাতিক শহর, এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক হর ব'লে, হাঙ্গেরীর জাতীয় প্রতিভার বিশেষ কোন াপ এতে দেখতে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। অবশ্য ডাপেষ্টে ডানিয়ুবের একটি বিশেষত্ব আছে; প্রকৃতির াবেষ্টনের জন্যই হউক, আর ইতিহাস এবং স্থাপত্যের র্শ আছে ব'লেই হউক, বুডাপেষ্টে ডানিয়ুবের শোভা তুলনীয়। অধিক রাত্রে বুডাপেষ্টের উজ্জ্বল সেতুগুলির উপর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে ডানিয়ুবের স্রোত-চঞ্চল বক্ষে অসংখ্য আলোকমালার নৃত্য-কম্পন দেখে মনে সংশয় হয়েছে ও ছদ্মবেশী পদ্মা নয় ত! ওর স্মৃতিমুখর উদ্দাম স্রোতের মধ্যে মনে হয় শুনতে পেয়েছি কীর্ত্তিনাশার অস্পষ্ট কলধ্বনি, যেন ভগীরথের সময়কার একটা অস্ফুট কোলাহল ছিল ওর ঢেউয়ের স্তরে স্তরে, নিরন্তর একটি প্রকাশের ভাষা খুঁজে মরছে।

হাঙ্গেরীর পল্লীজীবন এখনও রূপকথার ইন্দ্রজালে সমাচ্ছন্ন রাজনীতির কলুষস্পর্শ তার আদিম মাধুর্য্যকে খর্ব্ব করতে পারে নি। কোন্ বিস্মৃত অতীতে মেন্‌রট রাজার দুই ছেলে, হুনর ও মাজ্যর, মধ্য-এশিয়ার উর্ব্বর মরুপ্রদেশ থেকে এক মায়ামৃগের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে ডানিয়ুবের প্রান্তে এসে এখানকার রাজকন্যাদের দেখে মুগ্ধ হয়ে যান, আর তাদের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এখানে ঘর বাঁধেন, সেই ইতিহাসের স্মৃতি এখনও দেখতে পাওয়া যায় হাঙ্গেরীর চারুশিল্পে, কখনও শাড়ীর আঁচলে, কখনও তরুণীদের ওড়নায়। মায়ামৃগের উপকথার মত অসংখ্য উপকথা হাঙ্গেরীর পল্লীজীবনকে মোহময় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। মাজ্যরদের গোপনতম অন্তরে যে একটি প্যাগান অনুভূতি এখনও লুকিয়ে আছে, একথা অস্বীকার করা কঠিন। এদের দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃতিপূজার যে সমারোহ আজও বিদ্যমান "অর্তবাজী" সমতল-প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে নিয়তির অবশ্যম্ভাবিত্বে যে দৃঢ় বিশ্বাস, জিপ্‌সী সঙ্গীতের উচ্ছৃঙ্খল ভাববিলাসের প্রতি এঁদের যে আকর্ষণ, সকলই হাঙ্গেরীয়দের প্যাগান অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ট্রান্‌সিলভানিয়ায় এবং অন্যান্য অঞ্চলে সম্প্রতি অসংখ্য প্যাগান সমাধির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। হাঙ্গেরীর গ্রাম্য অঞ্চলে শুধু যে ভূতের ভয়ই খুব আছে তা নয়, বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন সাজ ধরে, ভূত যে গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে বিচরণ করে, এ ধারণা কোথাও কোথাও একেবারে বদ্ধমূল দেখেছি।

উদাহরণ-স্বরূপ একটি কাহিনী শুধু এখানে বলবার স্থান আছে। বলোটন্ হ্রদ ইউরোপের মধ্যে একটি অতি প্রসিদ্ধ প্রমোদ-উদ্যান; অনেকেই এর নাম শুনে থাকবেন। এই বলোটন্ অঞ্চলে "তিহনী প্রতিধ্বনির" (Echo of Tihany) একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

রাতের বুডাপেষ্ট

ওখানকার অধিবাসীরা এতে বিশ্বাস করে এবং এখনও এর গল্প ক'রে থাকে। গল্পটি এই:—এই হ্রদের পার্শ্ববর্ত্তী একটি রাজপ্রাসাদে এক সুন্দরী রাজকন্যা বাস করত। তার কাজ ছিল এক দল স্বর্ণ-মেষ প্রতিপালন করা। সে ছিল অত্যন্ত গর্ব্বিতা, তাই তার মধুময় কণ্ঠস্বর কোনও মানুষের উপভোগ্য নয় বিবেচনা ক'রে সে কখনও কথা বলত না কারও সঙ্গে। কিন্তু এক দিন নিজেকে একান্ত নিঃসঙ্গ মনে হওয়াতে আপন মনে গাইতে সুরু করল। এদিকে বলোটন রাজার ছেলে সেই গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যায় এবং ঐ রাজকন্যার প্রেমে পড়ে। গর্ব্বিতা রাজকন্যা তার সন্ধান পেয়েই গান বন্ধ ক'রে দেয়, কিন্তু রাজপুত্র পুনরায় রাজকন্যার গান শুনবার জন্যে হ্রদের ঢেউয়ের উপরে বসে অপেক্ষা করতে থাকে। শেষে এক দিন মারা যায়। পুত্রের মৃত্যুতে বলোটন ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে হ্রদে এক তুমুল ঝড় তোলে যাতে রাজকন্যার স্বর্ণমেষ-গুলি ধুয়ে নিয়ে যায়, আর রাজকন্যা স্বয়ং তিহনী গুহায় বন্দী হয়ে থাকে, এই শাপ নিয়ে যে, যদি কেউ তাকে ডাকে তবে তার উত্তর দিতে হবে। এখনও নাকি ঝড়ের পরে বলোটনের তীরে স্বর্ণমেষের খুর উৎক্ষিপ্ত হয়, আর রাজকন্যার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।
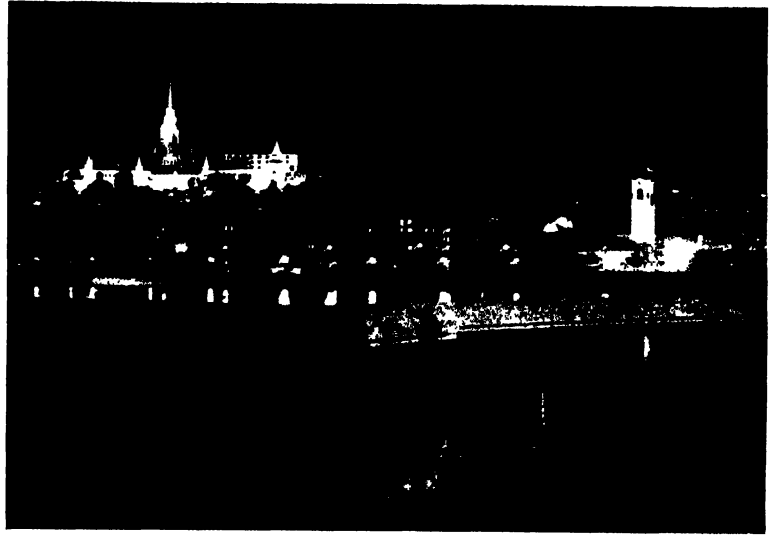
হাঙ্গেরীর গ্রামবাসীরা মাটিকে খুব ভালবাসে, তাদের মাটির প্রতি এ আকর্ষণ শুধু পিতৃপুরুষের বাসস্থান কিংবা আধুনিক ন্যাশনালিজমের জাতীয় অহঙ্কারকে আশ্রয় ক'রে গড়ে ওঠে নি, আদিম মানবের প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরের যে যোগাযোগ তার অনুভূতি এখনও মাজ্যর চাষীর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। এ হিসেবে হাঙ্গেরীর চাষী এখনও প্রিমিটিভ্ এবং এশিয়ার চাষীর সমকক্ষ। উত্তর-ইউরোপের চাষীর মত মাটিকে তারা অন্ন-সংস্থানের যন্ত্র ব'লে বিবেচনা করে না, চীনের চাষীর মত মাটিকে তারা মাতৃপূজার পবিত্রতার মধ্য দিয়ে স্পর্শ করে। ইংলণ্ডের চাষী প্রকৃতিকে মনে করে মানুষের সেবিকা, কিন্তু এশিয়ার চাষী প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করে মায়ের মতন। তাই ইংলণ্ডে তেমন কোন বিশিষ্ট গ্রাম্য-শিল্প বিদ্যমান নেই; কারখানার ধোঁয়ার মধ্যে তাদের আদিম শিল্পাদর্শ কেমন ক'রে রূপান্তরিত হয়ে যেন উত্তর-সাগরের কুয়াশার সঙ্গে মিশে গেছে। হাঙ্গেরীতে চারু-শিল্পের উদ্ভব হয়েছে মাটি থেকে, তাই তার রচনা-বিন্যাসে দেখতে পাই ফল-ফুল ও পশু-পক্ষীর প্রাদুর্ভাব। হাঙ্গেরীর চারু-শিল্পে কোন স্বপ্ন-বিলাস নেই, আছে নিয়তি-নিষ্ঠ প্রকৃতিপূজার একটি অদ্ভুত প্রতিভা। বর্ণ-সামঞ্জস্যের আদর্শেও হাঙ্গেরীর চারুশিল্পকে দীপ্ত করেছে এশিয়ার রুচি। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের মত রঙের সঙ্গে রং মিলিয়ে এরা কেশ-প্রসাধন করে না; বিপরীত রঙের কঠিন আঘাতে একটি বিশিষ্ট সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করে। উত্তর-ভারতের গ্রাম্য-মেলায় বর্ণ-সম্পদ দেখেছি তোকাই পাহাড়ের চাষী মেয়েদের বেশভূষায়। তোকাই (Tokaji) হাঙ্গেরীর সবচেয়ে বিখ্যাত সুরা, সমস্ত ইউরোপে এর সমাদর আছে। অক্টোবর মাসে

বুডাপেষ্ট রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষ

লোকালয় দেখতে পাওয়া যায় না; শুধু পুস্‌তার তৃণউর্ব্বর প্রদেশগুলিতে কখনও অশ্ব ও মেষপাল নজরে পড়ে। রূপকথায় পুস্‌তার মেষপালকের সঙ্গে চারদাস্‌ নৃত্যের যোগাযোগ আছে। সে-কথাটাই বলি। পুস্‌তার মেষপালক একটি অসাধারণ রকমের মানুষ। মাটি আর লতাপাতা দিয়ে সে পুস্‌তার ঘর বাঁধে, কিন্তু গ্রীষ্মের রাতে সে ঘরে ঘুমোয় না; তারায় ভরা নীল আকাশের নীচে তার নিশীথ-শয্যা রচনা করে। একাকীত্বের জন্য মন যদি কখনও উদাস হয়ে ওঠে তবে বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করে। তার মেষপালকে পাহারা দিতে হবে, তাই চলে যাবার উপায় নেই। কিন্তু শীতের সময় সমস্ত পুস্‌তার বুকের উপর দিয়ে বইতে থাকে ভীষণ কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া; তাই মেষপালকের আর বাইরে থাকা হয় না। মাটির ঘরের মধ্যে শীতের দীর্ঘ রাত্রি আর কাটতে চায় না; নির্জ্জনতা যখন অসহ্য হয়ে ওঠে তখন পুস্‌তার অন্য প্রান্তে জিপসীদের পান্থশালাটির কথা মনে হয়, মনে লোভ জাগে সেখানকার আমোদ-প্রমোদের ছবি কল্পনা করে। শেষ পর্য্যন্ত প্রলোভনই তাকে জয় করে; সে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় পান্থশালার দিকে, আর সেখানে গিয়ে গুলাস্‌ (হাঙ্গেরীর ব্যঞ্জনবিশেষ)এর সহযোগে সুরা পান ক'রে দেহের থেকে শীতের অসাড়তা ঝেড়ে ফেলে দেয়। ঠিক এমনি সময়ে জিপ্‌সীরা বাজনা সুরু ক'রে আর তারই ছন্দে "চারদাস্‌" নৃত্য আরম্ভ হয়। নৃত্যোৎসবের পরে মেষপালক আবার পুস্‌তায় তার মাটির ঘরে ফিরে এসে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু যাপন করে।

হেমন্তের কুয়াশাচ্ছন্ন উপত্যকায় তোকাই অঞ্চলের মেয়েরা যখন দ্রাক্ষা-চয়নে ব্যস্ত থাকে, তখন তাদের বিভিন্ন রঙের শিরস্ত্রাণ ও বস্ত্রসজ্জার দেখে মনে হয় পারস্যের গোলাপ-বাগের কথা। তেমনি বলোটন্‌ অঞ্চলের দ্রাক্ষা-চয়নের সময়ে সারারাত্রি ধরে জিপসী সঙ্গীতের উন্মাদনায় যে "চারদাস্‌" (Csardas) নৃত্যাভিনয় চলতে থাকে, তার মধ্যে দেখতে পেয়েছি, দু-হাজার বছর আগে মধ্য-এশিয়ার মাজ্যর রাজপুত্র যেদিন দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন তার অনুবর্ত্তী সৈন্যদলের জয়োল্লাস। ফসল-কাটার শেষে হাঙ্গেরীর সর্ব্বত্রই এ ধরণের নৃত্যোৎসব হয়ে থাকে। ফসলকে ওরা আহরণ করে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত, তাই নিজেদের আনন্দোল্লাসে ছড়িয়ে দেয় বসুন্ধরার প্রতি কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি।

"চারদাস্‌" নৃত্যটি হাঙ্গেরীর নিজস্ব। এর উৎপত্তি জিপ্‌সীদের উচ্ছৃঙ্খল মাদকতাময় সঙ্গীতপ্রিয় প্রাণে। মাজ্যর ভাষায় 'চারদাস্‌' কথাটার অর্থ পান্থশালা, এবং এ নৃত্যের জন্ম পুস্‌তার পান্থশালাতেই হয়েছিল, হাঙ্গেরীর রূপকথায় এইরূপ বিশ্বাস আছে। পুস্‌তা অঞ্চলটির একটি বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য ও মোহ আছে। দিগন্ত-ব্যাপী প্রান্তর, ধূ ধূ করে মাঠ, কিন্তু গাছপালাশূন্য। ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম ক'রে গেলেও কোথাও একটি

ইউরোপের প্রায় সব দেশেরই পল্লীগ্রামে অনেক ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি; ইংলণ্ড ও ফ্রান্স, ইতালী ও জার্ম্মানী,

উপরে : হাঙ্গেরীতে বসন্ত। তরুণীদের পুষ্পচয়ন
নীচে : হাঙ্গেরীর গ্রামে খোলা-মাঠে প্রার্থনা

উপরে : ছেগেড অঞ্চলের পোষাকে হাঙ্গেরীর কৃষক-শিশু
নীচে : হাঙ্গেরীর গ্রামের বর্ষীয়সী গ্রামনেত্রীগণ

উপরে : হাঙ্গেরীতে গ্রীষ্ম। দ্রাক্ষাচয়নের উৎসব
নীচে : হাঙ্গেরীর এরসেকচনাদের বালকবালিকা

উপরে : পুস্তার বংশীবাদক
নীচে : হাঙ্গেরীর চাষী-পরিবারের মা ও মেয়ে

উপরে : বুডা হইতে ডানিয়ুব ও পেস্টের দৃশ্য। মধ্যে ও নীচে : রাতের ডানিয়ুব

দানিয়ুবের উপর কুইন এলিজাবেথ সেতু
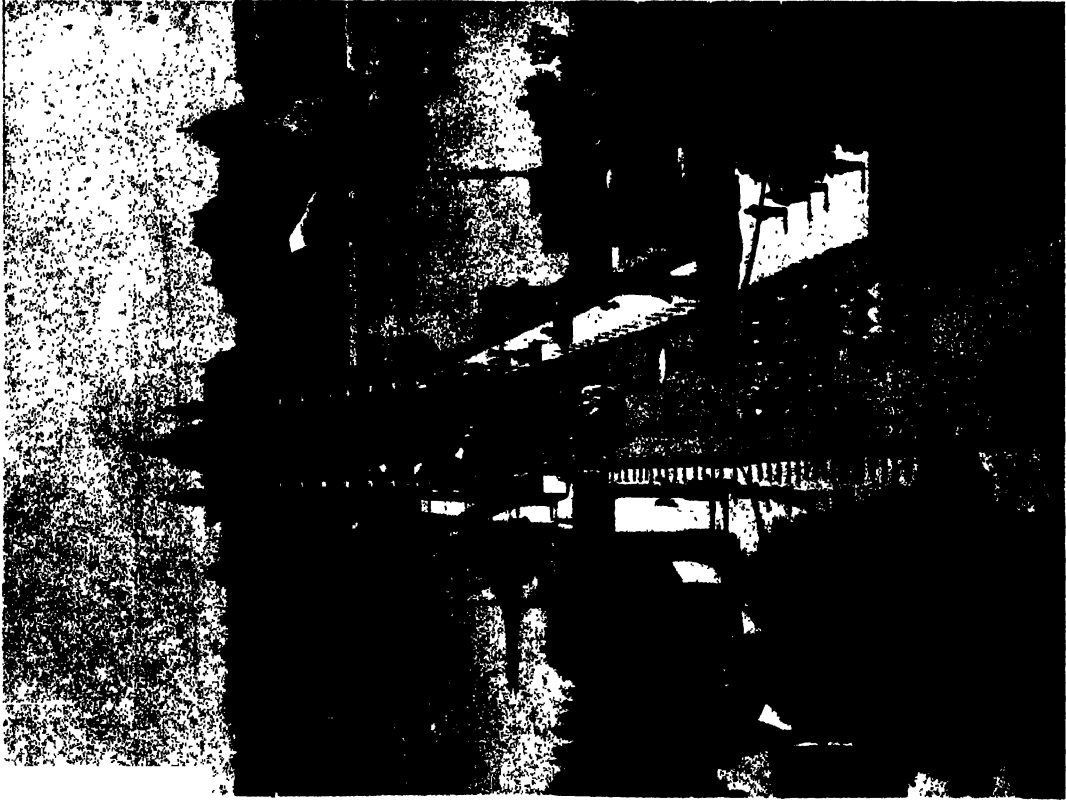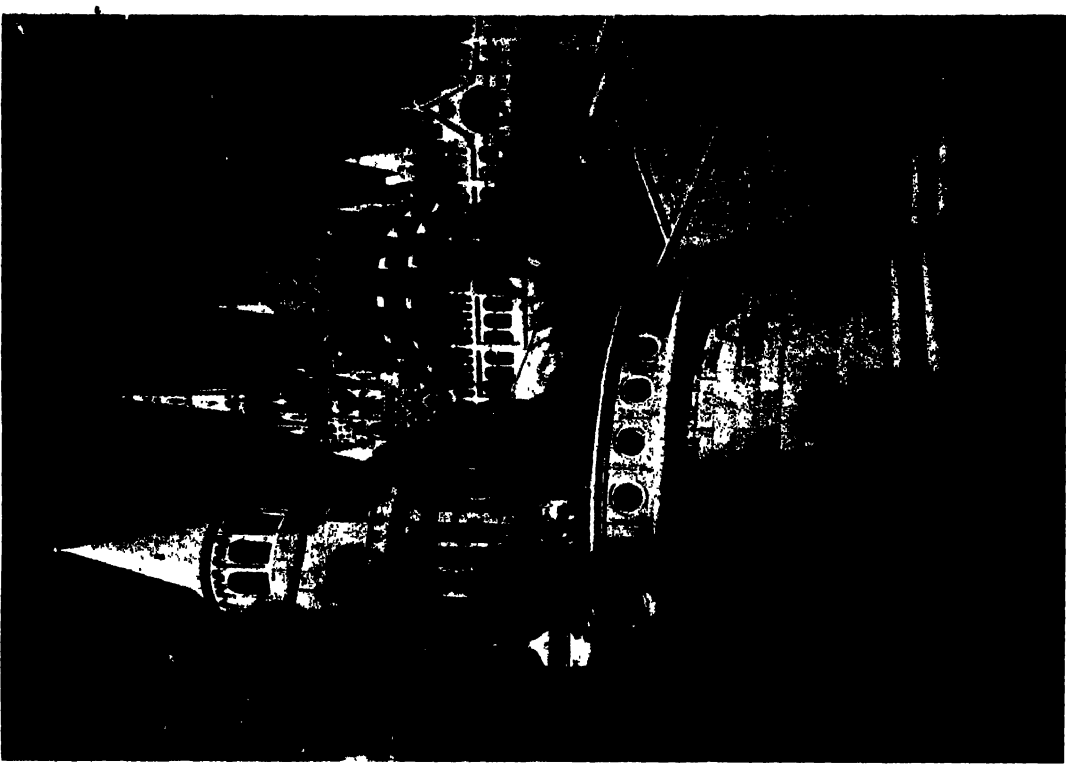
হাঙ্গেরীর বিখ্যাত ‘জেলেদের কেল্লা’—পিছনে করোনেশন গীর্জার চূড়া

নরওয়ে ও সুইডেন, অষ্ট্রিয়া ও বোহেমিয়া, সর্ব্বত্রই পল্লী-জীবনের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছে; কোথাও কোথাও চাষীদের অন্তরের পরিচয় পাই নি এমন নয়; কিন্তু একমাত্র হাঙ্গেরীর কৃষকদের মধ্যেই নিজেকে বিদেশী ব'লে মনে হয় নি; তাদের অপ্রগল্‌ভ আন্তরিকতায়, সুরসিক আপ্যায়নে এবং অদৃষ্টবাদী বীরধর্ম্মে প্রবাসের অনুভূতি ভুলে গিয়েছি, মনে হয়েছে হিন্দুস্থানের পল্লীগ্রামের কথা। শুধু জিপ্‌সী সঙ্গীত আর তোকাইয়ের আস্বাদনের জন্যই যারা হাঙ্গেরীকে ভালবাসে তারা জানে না এ আপন-ভোলা মাজ্যর-সম্প্রদায়টির প্রাণে এখনও সেই পুরনো দ্বন্দ্বটি চলেছে—এশিয়া আর ইউরোপের দ্বন্দ্ব। এ যুদ্ধে ইউরোপেরই জয় হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু হাঙ্গেরীর পথে ঘাটে অপ্রত্যাশিতভাবে দু-একটি শুধু চাউনি আর অবোধ্য হাসির অন্তরালে যে অন্তরঙ্গতার পরিচয় পেয়েছি তাতে আকাঙ্ক্ষা হয়েছে এশিয়ারই জয় হোক্।

দুরাকাঙ্ক্ষা

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

সুন্দর তুমি কর নি কর নি ভুল
বেদনা গুমরে গোপন মর্ম্মময়
যদিও অঙ্গ কণ্টক-সমাকুল।
যদিও জোছনা নামে নি এখনো
হৃদয়প্রান্ত ছেয়ে
তৃষিত আমার চিত্ত রয়েছে চেয়ে।
বর্ষা আসিলে কদম্ব ওঠে ফুটে
লক্ষ কলির গোপন বন্ধ টুটে
তবুও দীঘির ধারে
রুক্ষ কেতকী বিকশিছে আপনারে—
বদ্ধ তাহার নবযৌবনরূপ
দেহ হ'তে ফিরে অন্তরে জ্বালে ধূপ।
সেই সুগন্ধ দূর দিগন্ত ছায়
ধন্য সে আপনায়—
অঙ্গে আমার কণ্টক বিঁধে আছে
তবু আমি নয় সিক্ত কেতকী ফুল
ভেদিয়া আমার মর্ম্মের গূঢ় মূল
যতটুকু ওঠে সুধা
তা নিয়ে মেটে না বিশ্বজনের ক্ষুধা।

আমি রহিয়াছি পথবর্ত্তিনী,
প্রত্যহ পথপাশে
যত ম্লান ছায়া আসে
কুরূপ কুশ্রীতায়
প্রতিদিন মোর বদ্ধ হৃদয় জীর্ণ করিতে চায়।
তবুও যে দেখি প্রদোষ-আলোতে
প্রভাতের ঊষালোকে
প্রতিদিন মম চিরসুন্দর দাঁড়ায়েছ চোখে চোখে।
বায়ুমর্ম্মরে বাণী
শুভ্র মেঘেতে দূর নীলিমায়
লিখেছ যে লিপিখানি।
করেছ শোভন করুণ নয়ন পাত
পোহাবে না তাতে দারুণ দুঃখ-রাত।
সব মিটিবে না সাধ
জীবন ঘেরিয়া তুচ্ছ আর্ত্তনাদ।
লিপিখানি তব লেখে নি চরম লিখা
তীব্র প্রেমের জ্বলে নি দীপ্ত শিখা
তবু এতটুকু ক্ষুদ্র প্রদীপ দিয়া
এতটুকু আলো হেসে ওঠে বিকশিয়া
তবু প্রতিদিন প্রভাত-আলোর ভাষা—
জাগ্রত করে আশাতীত মম আশা।

পূর্ণিয়ায় ষ্টেটের কাজ ত শেষ করিলাম, সে যেন নিতান্ত অন্যমনস্কতার সহিত, মন পড়িয়া রহিল পথের দিকে। আমার সঙ্গীর ইচ্ছা, কাজ শেষ করিয়াই বাহির হইয়া পড়ে—আমি তাহাকে বাধা দিলাম জ্যোৎস্না রাত্রে এতটা পথ অশ্বারোহণে যাইবার বিচিত্র সৌন্দর্য্যের পুনরাস্বাদনের লোভে।

গেলামও তাই। পরদিন চাঁদ একটু দেরিতে উঠিলেও ভোর পর্য্যন্ত জ্যোৎস্না পাওয়া গেল, আর কি সে জ্যোৎস্না! কৃষ্ণপক্ষের স্তিমিতালোক চন্দ্রের জ্যোৎস্না বনে পাহাড়ে যেন এক শান্ত, স্নিগ্ধ, অথচ এক আশ্চর্য্যরূপে অপরিচিত স্বপ্নজগতের রচনা করিয়াছে—সেই খাটো খাটো কাশ জঙ্গল, সেই পাহাড়ের সানুদেশে পীতবর্ণ গোলগোলি ফুল, সেই উঁচুনীচু পথ—সব মিলিয়া যেন কোন বহুদূরের নক্ষত্রলোক—মৃত্যুর পরে অজানা কোন্ অদৃশ্য লোকে অশরীরী হইয়া উড়িয়া চলিয়াছি—ভগবান বুদ্ধের সেই নির্ব্বাণ-লোকে, যেখানে চন্দ্র উদয় হয় না, অথচ অন্ধকারও যেখানে নাই।

অনেক দিন পরে যখন এই মুক্ত জীবন ত্যাগ করিয়া সংসারে প্রবেশ করি, তখন কলিকাতা শহরের ক্ষুদ্র গলির বাসাবাড়ীতে বসিয়া স্ত্রীর সেলাইয়ের কল চালনার শব্দ শুনিতে শুনিতে অবসর-দিনের দুপুরে কতবার এই রাত্রির কথা, এই অপূর্ব্ব আনন্দের কথা, এই জ্যোৎস্নামাখা রহস্যময় বনশ্রীর কথা, শেষ রাত্রের চাঁদডোবা অন্ধকারে পাহাড়ের ওপর শুভ্রকাণ্ড গোলগোলি গাছের কথা, শুক্‌নো কাশজঙ্গলের সোঁদা সোঁদা তাজা গন্ধের কথা কতবার ভাবিয়াছি—কল্পনায় আবার ঘোড়ায় চড়িয়া জ্যোৎস্না রাত্রে পূর্ণিয়া গিয়াছি—সব স্বপ্ন বলিয়া মনে হইয়াছে।

চৈত্রমাসের মাঝামাঝি এক দিন খবর পাইলাম সীতাপুর গ্রামে রাখালবাবু নামে এক জন বাঙালী ডাক্তার ছিলেন, তিনি কাল রাতে হঠাৎ মারা গিয়াছেন।

ইঁহার নাম পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। তিনি যে ওখানে ছিলেন, তাহা জানিতাম না। শুনিলাম আজ বিশ-বাইশ বৎসর তিনি যেখানে ছিলেন। ও-অঞ্চলে তাঁহার পসার ছিল, ঘরবাড়ীও নাকি করিয়াছিলেন ঐ গ্রামেই। তাঁহার স্ত্রীপুত্র সেখানেই থাকে।

এই অবাঙালীর দেশে এক জন বাঙালী ভদ্রলোক মারা গিয়াছেন হঠাৎ, তাঁহার স্ত্রীপুত্রের কি দশা হইতেছে, কে তাদের দেখাশুনা করিতেছে, তাঁহার সৎকার বা শ্রাদ্ধশান্তির কি ব্যবস্থা হইতেছে, এসব জানিবার জন্য মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, আমার প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে সেখানে গিয়া সেই শোকসন্তপ্ত পরিবারের খোঁজ-খবর লওয়া।

খবর লইয়া জানিলাম গ্রামটি এখান হইতে মাইল-কুড়ি দূরে, কড়ারী খাসমহালের সীমানায়। বৈকালের দিকে সেখানে গিয়া পৌঁছিলাম। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাখাল বাবুর বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিলাম। দু-খানা বড় বড় খোলার ঘর, খান-তিনেক ছোট ছোট ঘর। বাহিরে এ-দেশের ধরণে একখানা বসিবার ঘর, তার তিন দিকে দেওয়াল নাই। বাঙালীর বাড়ী বলিয়া চিনিবার কোনও উপায় নাই, বসিবার ঘরে দড়ির চারপাই হইতে উঠানের হনুমানধ্বজাটি পর্য্যন্ত সব এদেশী।

আমার ডাকে একটি বার-তের বছরের ছেলে বাহির হইয়া আসিল। আমায় দেখিয়া ঠেট্ হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল—কাকে খুঁজছেন?

তাহার চেহারা দেখিয়া মনে হয় না যে সে বাঙালীর ছেলে। মাথায় লম্বা টিকি, গলায় অবশ্য বর্ত্তমানে কাছা—সবই বুঝিলাম, কিন্তু মুখের ভাব পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানী বালকের মত কি করিয়া হয়?

আমার পরিচয় দিয়া বলিলাম—তোমাদের বাড়ীতে এখন বড় লোক কে আছেন, তাঁকে ডাক।

ছেলেটি বলিল, সে-ই বড় ছেলে। তার বড় বোন ছিল, বিবাহের পর সে মারা যায়। তার আর দুটি ছোট ভাই আছে। বাড়ীতে আর কোন অভিভাবক নাই।

বলিলাম—তোমার মায়ের সঙ্গে আমি একবার কথা কইতে চাই। জিজ্ঞেস করে এস।

খানিকটা পরে ছেলেটি আসিয়া আমায় বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। রাখালবাবুর স্ত্রীকে দেখিয়া মনে হইল

বয়স অল্প, ত্রিশের মধ্যে, সদ্যবিধবার বেশ, কাঁদিয়া চক্ষু ফুলিয়াছে। ঘরের আসবাবপত্র নিতান্ত দরিদ্রের গৃহস্থালীর মত। এক দিকে একটা ছোট গোলা, ঘরের দাওয়ায় খান-দুই চারপাই, ছেঁড়া লেপ-কাঁথা, এদেশী পিতলের ঘয়লা, একটা গুড়গুড়ি, পুরানো টিনের তোরঙ্গ। বলিলাম—আমি বাঙালী, আপনার প্রতিবেশী। আমার কানে গেল রাখালবাবুর কথা, তাই এলাম। আমার এখানে একটা কর্ত্তব্য আছে ব'লে মনে করি। আমার কোনো সাহায্য যদি দরকার হয়, নিঃসঙ্কোচে বলুন। রাখালবাবুর স্ত্রী কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বুঝাইয়া শান্ত করিয়া পুনরায় আমার আসিবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলাম। রাখাল-বাবুর স্ত্রী আমার সামনে বাহির হইলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—আপনি আমার দাদার মত, আমি ছোট বোন। এদেশে বাঙালীর মুখ দেখি নি কত কাল। আমাদের এই ঘোর বিপদের সময় ভগবান আপনাকে পাঠিয়েছেন।

ক্রমে কথায় কথায় জানা গেল এই বাঙালী পরিবার সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও অসহায় এই ঘোর বিদেশে। রাখালবাবু গত বৎসরের উপর শয্যাগত ছিলেন। তাঁর চিকিৎসা ও সংসার-খরচে সঞ্চিত অর্থ সব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে—রাখালবাবুর স্ত্রীর গায়ের গহনা পর্য্যন্ত। এখন এমন উপায় নাই যে তাঁর শ্রাদ্ধের যোগাড় হয়। এর পর যে কি হইবে, তাহা ভাবিবার এখন অবসর নাই, আপাততঃ নাবালক পুত্র দুটি কি করিয়া পিতৃদায় হইতে উদ্ধার হইবে—সেই দাঁড়াইয়াছে প্রধান সমস্যা।

জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা রাখালবাবু ত অনেক দিন ধরে এ অঞ্চলে আছেন, কিছু করতে পারেন নি?

রাখালবাবুর স্ত্রীর সঙ্কোচ ও লজ্জা অনেকটা দূর হইয়াছিল। তিনি যেন এই প্রবাসে এই দুর্দ্দিনে এক জন বাঙালীর মুখ দেখিয়া অকূলে কূল পাইয়াছেন, মুখের ভাবে মনে হইল।

বলিলেন—আগে কি রোজগার করতেন জানি নে। আমার বিয়ে হয়ে ছিল এই পনর বছর—আমার সতীন মারা যেতে আমায় বিয়ে করেন কি না? আমি এসে পর্য্যন্ত দেখছি কোনো রকমে সংসার চলে। এখানে ভিজিটে টাকা বড় একটা দেয় না, গম দেয়, মকাই দেয়। তাই দিয়ে এক রকম দিন-আনি দিন-খাই অবস্থায় সংসার চলত। ধার-দেনাও কিছু আছে। তাতেও অচল হয় নি, যেত এক রকম চলে। গত বছর মাঘ মাসে উনি অসুখে পড়লেন, সেই থেকে আর একটি পয়সা আয় ছিল না। তবে এদেশের লোক খারাপ নয়, তারা উপকার করেছে অনেক। যার কাছে যা পাওনা ছিল, বাড়ী বয়ে সে সব গম মকাই কলাই দিয়ে গিয়েছে। তাই চলেছে, নয় ত না খেয়ে মরত সবাই।

—আপনার বাপের বাড়ী কোথায়? সেখানে খবর দেওয়া হয়েছে?

রাখালবাবুর স্ত্রী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—খবর দেবার কিছু নেই। আমার বাপের বাড়ী কখনও দেখি নি। শুনেছিলুম, ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়। ছেলে-বেলা থেকে আমি সায়েবগঞ্জে ভগ্নীপতির বাড়ীতে মানুষ। মা বাবা কেউ ছিলেন না। আমার সে-দিদি আমার বিয়ের পর মারা যান। ভগ্নীপতি আবার বিয়ে করেছেন। তাঁর সঙ্গে আর আমার সম্পর্ক কি?

—রাখালবাবুর কোন আত্মীয়স্বজন কোথাও নেই?

—দেশে জ্ঞাতি ভাইয়েরা আছেন শুনতাম বটে; কিন্তু তারা কখনও সংবাদ নেয় নি, উনিও দেশে যাতায়াত করতেন না। তাদের সঙ্গে সদ্ভাবও নেই; তাছাড়া, তারা নিজেরাই গরিব। তাদের খবর দেওয়া-না-দেওয়া সমান। আমি আর কোন আত্মীয় বা জ্ঞাতির কথা জানি নে, এক মামাশ্বশুর আছেন আমার শুনতাম কাশীতে। তা-ও তাঁর ঠিকানা জানি নে।

কি ভয়ানক অসহায় অবস্থা! আপনার জন কেহ নাই, এই বন্ধুহীন বিদেশে দুই-তিনটি নাবালক ছেলে লইয়া সহায়সম্পদশূন্য বিধবা মহিলাটির দশা ভাবিয়া মন রীতিমত দমিয়া গেল। তখনকার মত যাহা করা উচিত করিয়া আমি কাছারিতে ফিরিয়া আসিলাম, সদরে লিখিয়া ষ্টেট্ হইতে আপাততঃ এক শত টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখালবাবুর শ্রাদ্ধও কোন রকমে শেষ করিয়া দিলাম।

শ্রাদ্ধাদি শেষ করিয়া গোটা ত্রিশেক টাকা অবশিষ্ট ছিল। টাকা কয়টি রাখালবাবুর স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিলাম—দিদি, এতে এখন যত দিন হয় চালিয়ে নিন্। তার পর আমি দেখছি কি করা যায়।

তিনি ত কাঁদিয়াই আকুল। অনেক করিয়া বুঝাইয়া শান্ত করিয়া চলিয়া আসিলাম। ইহার পর আরও বার কয়েক রাখালবাবুর বাড়ী গিয়াছিলাম। ষ্টেট হইতে মাসে দশটি টাকা সাহায্য মঞ্জুর করাইয়া লইয়া প্রথম বারের টাকাটা নিজেই দিতে গিয়াছিলাম। দিদি খুব যত্ন করিতেন, অনেক স্নেহ-আত্মীয়তার কথা বলিতেন। সেই বিদেশে তাঁর স্নেহযত্ন আমার বড় ভাল লাগিত। তারই লোভে অবসর পাইলেই সেখানে যাইতাম।

লবটুলিয়ার উত্তর প্রান্ত খুব বড় একটা হ্রদের মত। এরকম জলাশয়কে এদেশে বলে কুণ্ডী। এই হ্রদটার নাম সরস্বতী কুণ্ডী।

সরস্বতী কুণ্ডীর পারের তিন দিকে নিবিড় বন। এ ধরণের বন আমাদের মহলে বা লবটুলিয়াতে নাই। এ বনে বড় বড় বনস্পতিদের নিবিড় সমাগম—জলের সান্নিধ্য বশতঃ হোক্ বা যে-জন্যই হোক, বনের তলদেশে নানা বিচিত্র লতাপাতা, বন্যপুষ্পের ভিড়। এই বন বিশাল সরস্বতী কুণ্ডীর নীল জলকে তিন দিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, একদিকে ফাঁকা—সেখান হইতে পূর্ব্ব-দিকের বহুদূর প্রসারিত নীল আকাশ ও দূরের শৈলমালা চোখে পড়ে। সুতরাং পূর্ব্ব-পশ্চিম কোণের তীরের কোন এক জায়গায় বসিয়া দক্ষিণ ও বাম দিকে চাহিয়া দেখিলে সরস্বতী কুণ্ডীর সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্বতা ঠিক বোঝা যায়। বামে চাহিলে গভীর হইতে গভীরতর বনের মধ্যে দৃষ্টি চলিয়া গিয়া ঘন নিবিড় শ্যামলতার মধ্যে নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলে, দক্ষিণে চাহিলে স্বচ্ছ, নীল জলের ওপারে সুদূরবিসর্পী আকাশ ও অস্পষ্ট শৈলমালার ছবি মনকে বেলুনের মত ফুলাইয়া পৃথিবীর মাটি হইতে উড়াইয়া লইয়া চলে।

এখানে একখানা শিলাখণ্ডের উপর কত দিন গিয়া একা বসিয়া থাকিতাম। যখনও বনের মধ্যে দুপুরবেলা আপন মনে বেড়াইতাম। কত বড় বড় গাছের ছায়ায় বসিয়া পাখীর কূজন শুনিতাম। মাঝে মাঝে গাছপালা, বন্যলতার ফুল সংগ্রহ করিতাম। এখানে যত রকমের পাখীর ডাক শোনা যায়, আমাদের মহলে অত পাখী নাই। নানা রকমের বন্য ফল খাইতে পায় বলিয়া এবং সম্ভবতঃ উচ্চ বনস্পতিশিরে বাসা বাঁধিবার সুযোগ ঘটে বলিয়া সরস্বতী কুণ্ডীর তীরের বনে পাখীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। বনে ফুলও অনেক রকমের ফোটে।

হ্রদের তীরের নিবিড় বন প্রায় তিন মাইলের ওপর লম্বা। গভীরতায় প্রায় দেড় মাইল। জলের ধার দিয়া বনের মধ্যে গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় একটা সুঁড়ি পথ বনের সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত আসিয়াছে—এই পথ ধরিয়া বেড়াইতাম। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে সরস্বতীর নীল জল, তার উপর উপুড়-হইয়া-পড়া দূরের আকাশটা এবং দিগন্তলীন শৈলশ্রেণী চোখে পড়িত। ঝিরঝির করিয়া স্নিগ্ধ হাওয়া বহিত, পাখী গান গাহিত, বন্য ফুলের সুগন্ধ পাওয়া যাইত।

এক দিন একটা গাছের ডালে উঠিয়া বসিলাম। সে-আনন্দের তুলনা হয় না। আমার মাথার উপরে বিশাল বনস্পতিদলের ঘন সবুজ পাতার রাশি, তার ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের টুকরা চোখে পড়ে। প্রকাণ্ড একটা লতায় থোকা থোকা ফুল দুলিতেছে। পায়ের দিকে অনেক নীচে ভিজা মাটিতে বড় বড় ব্যাঙের ছাতা গজাইয়াছে। এখানে আসিয়াই বসিয়া শুধু ভাবিতে ইচ্ছা হয়। মনের মধ্যে চিন্তার ভাষা জোগায়—কত ধরণের, কত নব অনুভূতি মনে আসিয়া জোটে। এক প্রকার অতল সমাহিত অতি-মানস চেতনা ধীরে ধীরে গভীর অন্তস্তল হইতে বাহিরের মনে ছুটিয়া উঠিতে থাকে। এ আসে গভীর আনন্দের মূর্ত্তি ধরিয়া। প্রত্যেক বৃক্ষলতার হৃৎস্পন্দন যেন নিজের বুকের রক্তের শান্ত স্পন্দনের মধ্যে অনুভব করা যায়।

আমাদের যেখানে মহল, সেখানে পাখীর বৈচিত্র্য নাই। কারণ বড় বড় গাছ নাই, শুধু বনঝাউ, কাশ, ছোট ছোট ঝোপ ও লতাগুল্ম। যেখানে থাকি সেখানটা যেন অন্য জগৎ, তার গাছপালা, জীবজন্তু অন্য ধরণের। পরিচিত

জগতে বসন্ত যখন দেখা দিয়াছে, লবটুলিয়ায় তখন একটা কোকিলের ডাক নাই, একটা পরিচিত বসন্তের ফুল নাই। সে যেন রুক্ষ, কর্কশ ভৈরবী মূর্ত্তি; সৌম্য, সুন্দর বটে, কিন্তু মাধুর্য্যহীন—মনকে অভিভূত করে ইহার বিশালতায়, রুক্ষতায়। কোমল-বর্জ্জিত খাড়ব সুর মালকোষ কিংবা চৌতালের ধ্রুপদ, মিষ্টত্বের কোন পর্দ্দার ধার মাড়াইয়া চলে না—সুরের গম্ভীর উদাত্ত রূপে মনকে অন্য এক স্তরে লইয়া পৌছাইয়া দেয়।

সরস্বতী কুণ্ডী সেখানে ঠুংরী, সুমিষ্ট সুরের মধুর ও কোমল বিলাসিতায় মনকে আর্দ্র ও স্বপ্নময় করিয়া তোলে। শুষ্ক দুপুরে ফাল্গুন চৈত্র মাসে এখানে তীরতরুর ছায়ায় বসিয়া পাখীর কূজন শুনিতে শুনিতে মন কত দূরে কোথায় চলিয়া যাইত, বন্য নিমগাছের সুগন্ধ নিমফুলের সুবাস ছড়াইত বাতাসে, জলে জলজ লিলির দল ফুটিত। কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সন্ধ্যার পর সেখান হইতে উঠিয়া আসিতাম।

নাঢ়া বইহার জরীপ হইতেছে, প্রজাদের মধ্যে বিলির জন্য, আমীনদের কাজ দেখিবার জন্য প্রায়ই সেখানে যাইতে হয়। ফিরিবার পথে মাইল দুই পূব-দক্ষিণ দিকে একটু ঘুরিয়া যাই, শুধু সরস্বতী কুণ্ডীর এই বনভূমিতে ঢুকিয়া বনের ছায়ায় ছায়ায় খানিকটা বেড়াইবার লোভে।

সেদিন ফিরিতেছিলাম বেলা তিনটার সময়। খর রৌদ্রে বিস্তীর্ণ রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর পার হইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বনের মধ্যে ঢুকিয়া ঘন ছায়ায় ছায়ায় জলের ধার পর্য্যন্ত গেলাম—প্রান্তরসীমা হইতে জলের কিনারা প্রায় দেড় মাইলের কম নয়, কোন কোন স্থানে আরও বেশী। একটা গাছের ডালে ঘোড়া বাঁধিয়া নিবিড় ঝোপের তলায় একখানা অয়েলক্লথ পাতিয়া একেবারে শুইয়া পড়িলাম। ঘন ঝোপের ডালপালা চারি ধার হইতে এমন ভাবে আমায় ঢাকিয়াছে যে বাহির হইতে আমায় কেউ দেখিতে পাইবে না। হাত-দুই উপরেই গাছপালা, মোটা মোটা কাঠের মত শক্ত গুঁড়িওয়ালা কি এক প্রকার বন্যলতা জড়াজড়ি করিয়া ছাদ রচনা করিয়াছে—একটা কি গাছ হইতে হাতখানেক লম্বা বড় বড় বনসিমের মত সবুজ সবুজ ফল আমার প্রায় বুকের উপর দুলিতেছে। আর একটা কি গাছ, তার ডালপালা প্রায় অর্দ্ধেক ঝোপটা জুড়িয়া, তাহাতে কুচো কুচো ফুল ধরিয়াছে, ফুলগুলি এত ছোট যে কাছে না গেলে চোখে পড়ে না—কিন্তু কি ঘন, নিবিড়, সুবাস সে-ফুলের! ঝোপের নিভৃত তল ভারাক্রান্ত সেই অজানা বনপুষ্পের সুবাসে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সরস্বতী কুণ্ডীর বন পাখীর আড্ডা। এত পাখীও আছে এখানকার বনে, কত ধরণের, কত রং-বেরঙের পাখী—শ্যামা, শালিখ, হরটিট্, বনটিয়া, ফেজাণ্ট-ক্রো, চড়াই, ছাতারে, ঘুঘু, হরিয়াল। উঁচু গাছের মাথায় বাজবৌরী, চিল, কুল্লো,—সরস্বতীর নীল জলে বক, সিল্লী, রাঙা হাঁস, মাণিক-পাখী, কাঁক প্রভৃতি জলচর পাখী—পাখীর কাকলীতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে ঝোপের উপরটা, বিরক্তই করে তারা, তাদের উল্লাস-ভরা অবাধ কূজনে কান পাতা দায়। অনেক সময় মানুষকে গ্রাহ্যই করে না, আমি শুইয়া আছি দেখিতেছে, আমার চারি পাশে হাত দেড় দুই দূরে তারা ঝুলন্ত ডালপালায় লতায় বসিয়া কিচ্ কিচ্ করিতেছে—আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই।

পাখীদের এই অসঙ্কোচ সঞ্চরণ আমার বড় ভাল লাগিল। উঠিয়া বসিয়াও দেখিয়াছি তাহারা ভয় করে না, একটু হয়ত উড়িয়া গেল, কিন্তু একেবারে দেশছাড়া হইয়া পালায় না। খানিক পরে নাচিতে নাচিতে বকিতে বকিতে আবার অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়ে।

এখানেই এদিন প্রথম বন্য হরিণ দেখিলাম। জানিতাম বন্য হরিণ আমাদের মহলের জঙ্গলে আছে, কিন্তু এর আগে কখনও চোখে পড়ে নাই। শুইয়া আছি—হঠাৎ কিসের পায়ের শব্দে উঠিয়া বসিয়া মাথার শিয়রের দিকে চাহিয়া দেখি ঝোপের নিভৃততর, দুর্গমতর অঞ্চলে নিবিড় লতাপাতায় জড়াজড়ির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একটা হরিণ। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি বড় হরিণ নয়, হরিণ-শাবক। সে আমায় দেখিতে পাইয়া অবোধ বিস্ময়ে বড় বড় চোখে আমার দিকে চাহিয়া আছে—ভাবিতেছে, এ আবার কোন্ অদ্ভুত জীব!

খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল, দুজনেই নির্ব্বাক, নিস্পন্দ।

আধ মিনিট পরে হরিণ-শিশুটা যেন ভাল করিয়া দেখিবার জন্য আবার একটু আগাইয়া আসিল। তার চোখে ঠিক যেন মনুষ্যশিশুর মত আগ্রহ কৌতূহলের দৃষ্টি। আরও কাছে আসিত কি না জানি না, আমার ঘোড়াটা সে-সময় হঠাৎ পা নাড়িয়া গা-ঝাড়া দিয়া ওঠাতে হরিণ-শিশু চকিত ও সন্ত্রস্ত ভাবে ঝোপের মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া তাহার মায়ের কাছে সংবাদটা দিতে গেল।

তার পর কতক্ষণ ঝোপের তলায় বসিয়া রহিলাম। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে সরস্বতী কুণ্ডীর নীল জল অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দূর শৈলমালার পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত, আকাশ নীল, মেঘের লেশ নাই কোন দিকে— কুণ্ডীর জলে জলচর পাখীর দল ঝগড়া, কলরব, তুমুল দাঙ্গা সুরু করিয়াছে—একটা গম্ভীর ও প্রবীণ মাণিক-পাখী তীরবর্ত্তী এক উচ্চ বনস্পতির শীর্ষে বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া তাহার বিরক্তি জ্ঞাপন করিতেছে। জলের ধারে ধারে বড় বড় গাছের মাথায় বকের দল এমন ঝাঁক বাঁধিয়া বসিয়া আছে, দূর হইতে মনে হয় যেন সাদা সাদা থোকা থোকা ফুল ফুটিয়াছে।

রোদ ক্রমশঃ রাঙা হইয়া আসিল।

ওপারে শৈলচূড়ায় যেন তামার রং ধরিয়াছে। বকের দল ডানা মেলিয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। গাছপালার মগডালে রোদ উঠিয়া গেল।

পাখীর কূজন বাড়িল আর বাড়িল অজানা বনকুসুমের সেই সুঘ্রাণটা। অপরাহ্নের ছায়ায় গন্ধটা যেন আরও ঘন, আরও সুমিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটা বেঁজি খানিকদূর হইতে মাথা উঁচু করিয়া আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছে।

কি নিভৃত শান্তি! কি অদ্ভুত নির্জ্জনতা! এতক্ষণ ত এখানে আছি, সাড়ে তিন ঘণ্টার কম নয়—বন্য পক্ষীর কাকলী ছাড়া অন্য কোন শব্দ শুনি নাই আর পাখীদের পায়ে পায়ে ডালপাতার মচমচানি, শুষ্কপত্র বা লতার টুকরা পতনের শব্দ। মানুষের চিহ্ন নাই কোন দিকে।

নানা বিচিত্র ও বিভিন্ন গড়ন বনস্পতিদের শীর্ষদেশের। এই সন্ধ্যার সময় রাঙা রোদ পড়িয়া তাদের শোভা হইয়াছে অদ্ভুত। তাদের কত গাছের মগডাল জড়াইয়া লতা উঠিয়াছে, এক ধরণের লতাকে এদেশে বলে ভিঁয়োরা লতা—আমি তাহার নাম দিয়াছি ভোমরা লতা—যে লতা যে গাছের মাথায় উঠিবে, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে। এই সময় ভোমরা লতায় ফুল ফুটে—ছোট ছোট বনযুঁইয়ের মত সাদা সাদা ফুলে কত বড় বড় গাছের মাথা আলো করিয়া রাখিয়াছে। অতি চমৎকার সুঘ্রাণ, অনেকটা যেন প্রস্ফুটিত সর্ষে ফুলের মত—তবে অতটা উগ্র নয়।

সরস্বতী কুণ্ডীর বনে কত বন্য শিউলি গাছ—শিউলি গাছের প্রাচুর্য্য এক এক জায়গায় এত বেশী যেন মনে হয় শিউলির বন। বড় বড় শিলাখণ্ডের ওপর শরতের প্রথমে সকালবেলা রাশি রাশি শিউলি ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছিল—দীর্ঘ এক রকম কর্কশ ঘাস সেই সব পাথরের আশেপাশে—বড় বড় ময়না-কাঁটার গাছ তার সঙ্গে জড়াইয়াছে—কাঁটা, ঘাস, শিলাখণ্ড সব তাতেই রাশি রাশি শিউলি ফুল—আর্দ্র, ছায়াগহন স্থান, তাই সকালের ফুল এখনও শুকাইয়া যায় নাই।

সরস্বতী হ্রদকে কত রূপেই দেখিলাম! লোক বলে সরস্বতী কুণ্ডীর জঙ্গলে বাঘ আছে, জ্যোৎস্না-রাত্রে সরস্বতীর বিস্তৃত জলরাশির কৌমুদীস্নাত শোভা দেখিবার লোভে রাসপূর্ণিমার দিন তহশীলদার বনোয়ারীলালের চোখে ধূলা দিয়া আজমাবাদের সদর কাছারি আসিবার ছুতায় লবটুলিয়া ডিহি কাছারি হইতে লুকাইয়া একা ঘোড়ায় এখানে আসিয়াছি।

বাঘ দেখি নাই বটে কিন্তু সেদিন আমার সত্যই মনে হইয়াছিল এখানে মায়াবিনী বনদেবীরা গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নাস্নাত হ্রদের জলে জলকেলি করিতে নামে। চারি ধার নীরব নিস্তব্ধ—পূর্ব্ব তীরের ঘন বনে কেবল শৃগালের ডাক শোনা যাইতেছিল—দূরের শৈলমালা ও বনশীর্ষ অস্পষ্ট দেখাইতেছে—জ্যোৎস্নার হিম বাতাসে গাছপালা ও ভোমরা লতার নৈশপুষ্পের মৃদু সুবাস...আমার সামনে বন- ও পাহাড়- বেষ্টিত নিস্তরঙ্গ বিস্তীর্ণ হ্রদের বুকে হৈমন্তী পূর্ণিমার থৈ থৈ জ্যোৎস্না...পরিপূর্ণ, ছায়াহীন জলের

উপর-পড়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় প্রতিফলিত হওয়া অপার্থিব দেবলোকের জ্যোৎস্না···ভোমরা লতার সাদা ফুলে-ছাওয়া বড় বড় বনস্পতিশীর্ষে জ্যোৎস্না পড়িয়া মনে হইতেছে গাছে গাছে পরীদের শুভ্র বস্ত্র উড়িতেছে···

আর এক ধরণের পোকা একঘেয়ে ডাকিতেছিল··· ঝিঁঝিঁ পোকার মতই। দু-একটা পত্র পতনের শব্দ বা খস্ খস্ করিয়া শুষ্ক পত্ররাশির উপর দিয়া বন্য জন্তুর পলায়নের শব্দ···

বনদেবীরা আমরা থাকিতে তো আর আসে না? কত গভীর রাত্রে আসে, কে জানে! আমি বেশী রাত পর্য্যন্ত হিম সহ্য করিতে পারি নাই। ঘণ্টাখানেক থাকিয়াই ফিরি।

সরস্বতী কুণ্ডীর এই পরীদের প্রবাদ এখানেই শুনিয়াছিলাম।

শ্রাবণ মাসে এক দিন আমাকে উত্তর সীমানার জরিপের ক্যাম্পে রাত্রি যাপন করিতে হয়। আমার সঙ্গে ছিল আমীন রঘুবর প্রসাদ। সে আগে গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিয়াছে, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্টে ও এ-অঞ্চলের বনের সঙ্গে তার পঁচিশ-ত্রিশ বছরের পরিচয়।

তাহার কাছে সরস্বতী কুণ্ডীর কথা তুলিতেই সে বলিল—হুজুর, ও মায়ার কুণ্ডী, ওখানে রাত্রে হুরী-পরীরা নামে। জ্যোৎস্না রাত্রে তারা কাপড় খুলে রাখে ডাঙায় ঐ সব পাথরের ওপর, রেখে জলে নামে। সে-সময় যে তাদের দেখতে পায়, তাকে ভুলিয়ে জলে নামিয়ে ডুবিয়ে মারে। জ্যোৎস্নার মধ্যে দেখা যায় মাঝে মাঝে পরীদের মুখ জলের উপরে পদ্মফুলের মত জেগে আছে। আমি দেখি নি কখনও, আমার হেড সার্ভেয়ার ফতে সিং একদিন দেখেছিলেন। একদিন তার পর তিনি গভীর রাত্রে একা যখন ওই হ্রদের ধারে বনের মধ্যে দিয়ে—পরদিন সকালে তাঁর লাস কুণ্ডীর জলে ভাসতে দেখা যায়। বড় মাছে তাঁর একটা কান খেয়ে ফেলেছিল হুজুর। ওখানে আপনি ও-রকম যাবেন না।

এই সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে একদিন দুপুরে এক অদ্ভুত লোকের সন্ধান পাইলাম।

সার্ভে-ক্যাম্প হইতে ফিরিবার পথে একদিন হ্রদের তীরের বনপথ দিয়া আস্তে আস্তে আসিতেছি, বনের মধ্যে দেখি একটি লোক মাটি খুঁড়িয়া কি যেন করিতেছে। প্রথমে ভাবিলাম লোকটা ভুঁই-কুমড়া তুলিতে আসিয়াছে, ভুঁই-কুমড়া লতাজাতীয় উদ্ভিদ, মাটির মধ্যে লতার নীচে চালকুমড়ার আকারের প্রকাণ্ড কন্দ জন্মায়—উপর হইতে বোঝাও যায় না। কবিরাজী ঔষধে লাগে বলিয়া বেশ দামে বিক্রয় হয়। কৌতূহল বশতঃ ঘোড়া হইতে নামিয়া কাছে গেলাম, দেখি ভুঁই-কুমড়া নয়, কিছু নয়, লোকটা কিসের যেন বীজ পুঁতিয়া দিতেছে।

আমায় দেখিয়া সে থতমত খাইয়া অপরাধীর অপ্রতিভ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল। বয়স হইয়াছে, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। সঙ্গে একটা চটের থলে, তার ভিতর হইতে ছোট একখানা কোদালের আগাটুকু দেখা যাইতেছে, একটা শাবল পাশে পড়িয়া, ইতস্ততঃ কতকগুলি কাগজের মোড়ক ছড়ান।

বলিলাম—তুমি কে? এখানে কি করছ?

সে বলিল, হুজুর কি ম্যানেজার বাবু?

—হ্যাঁ। তুমি কে?

—নমস্কার। আমার নাম যুগলপ্রসাদ। আমি আপনাদের লবটুলিয়ার পাটোয়ারী বনোয়ারীলালের চাচাতো ভাই।

তখন আমার মনে পড়িল, বনোয়ারী পাটোয়ারী একবার কথায় কথায় তাহার চাচাতো ভাইয়ের কথা তুলিয়াছিল। উঠাইবার কারণ, আজমাবাদের সদর কাছারিতে—অর্থাৎ আমি যেখানে থাকি—সেখানে একজন মুহুরীর পদ খালি ছিল। বলিয়াছিলাম একটা ভাল লোক দেখিয়া দিতে। বনোয়ারী দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, লোক ত তাহার সাক্ষাৎ চাচাতো ভাইই ছিল, কিন্তু লোকটা অদ্ভুত মেজাজের, এক রকম খামখেয়ালী উদাসীন ধরণের। নইলে কায়েমী হিন্দীতে অমন হস্তাক্ষর, অমন পড়ালেখার এলেম্, এ-অঞ্চলের বেশী লোকের নাই।

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কেন, সে কি করে?

বনোয়ারী বলিয়াছিল—তার নানা বাতিক হুজুর। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো এক বাতিক। কিছু করে না, বিয়ে-সাদি করেছে, সংসার দেখে না, বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, অথচ সাধু-সন্নিসিও নয়, ঐ এক ধরণের মানুষ।

এই তাহা হইলে বনোয়ারীলালের সেই চাচাতো ভাই!

কৌতূহল বাড়িল, বলিলাম—ও কি পুঁতছ ওখানে?

লোকটা বোধ হয় গোপনে কাজটা করিতেছিল, যেন ধরা পড়িয়া লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছে এমন স্বরে বলিল—কিছু না, এই—একটা গাছের বীজ—

আমি আশ্চর্য্য হইলাম। কি গাছের বীজ? ওর নিজের জমি নয়, এই ঘোর জঙ্গল, ইহার মাটিতে কি গাছের বীজ ছড়াইতেছে—তাহার সার্থকতাই বা কি? কথাটা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

বলিল—অনেক রকম বীজ আছে, হুজুর। পূর্ণিয়ায় দেখেছিলাম একটা সাহেবের বাগানে ভারী চমৎকার বিলিতি লতা—বেশ রাঙা রাঙা ফুল। তারই বীজ, আরও অনেক রকম বনের ফুলের বীজ আছে, দূর দূর থেকে সংগ্রহ করে এনেছি, এখানকার জঙ্গলে ও-সব লতা-ফুল নেই। তাই পুঁতে দিচ্ছি, গাছ হয়ে দু-বছরের মধ্যে ঝাড় বেঁধে যাবে, বেশ দেখাবে।

লোকটার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাহার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। লোকটা সম্পূর্ণ বিনা-স্বার্থে একটা বিস্তৃত বনভূমির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করিতেছে, যে বনে তাহার নিজের ভূস্বত্ব কিছুই নাই—কি অদ্ভুত লোকটা!

যুগলপ্রসাদকে ডাকিয়া এক গাছের তলায় দু-জনে বসিলাম। সে বলিল—আমি এর আগেও এ কাজ করেছি, হুজুর। লবটুলিয়াতে যে যত বনের ফুল দেখেন, ফুলের লতা দেখেন, ও-সব আমি আজ দশ-বারো বছর আগে কতক পূর্ণিয়ার বন থেকে, কতক দক্ষিণ ভাগলপুরের লছমী ষ্টেটের পাহাড়ী জঙ্গল থেকে এনে লাগিয়ে ছিলাম। এখন একেবারে ও-সব ফুলের জঙ্গল বেঁধে গিয়েছে।

—তোমার কি এ কাজ খুব ভাল লাগে?

লবটুলিয়া বইহারের জঙ্গলটা ভারী চমৎকার জায়গা—ওই সব ছোটখাটো পাহাড়ের গায়ে কি এখানকার বনে ঝোপে নতুন নতুন ফুল ফোটাব এ আমার বহুদিনের সখ।

—কি ফুল নিয়ে আসতে?

—কি ক'রে আমার এদিকে মন গেল, তা একটু আগে হুজুরকে বলি। আমার বাড়ী ধরমপুর অঞ্চলে। আমাদের দেশে বুনো ভাণ্ডীর ফুল একেবারেই ছিল না। আমি মহিষ চরিয়ে বেড়াতাম ছেলেবেলায় কুশীনদীর ধারে ধারে, আমার গাঁ থেকে দশ-পনেরো কোশ দূরে। সেখানে দেখতাম বনে জঙ্গলে, মাঠে বুনো ভাণ্ডীর ফুলের বড় শোভা। সেখান থেকে বীজ নিয়ে গিয়ে দেশে লাগাই, এখন আমাদের অঞ্চলের পথের ধারে বনঝোপে কি লোকের বাড়ীর পেছনে পোড়ো জমিতে ভাণ্ডীর ফুলের একেবারে জঙ্গল। সেই থেকে আমার এই দিকে মাথা গেল। যেখানে যে ফুল নেই, সেখানে সেই ফুল, গাছ, লতা নিয়ে পুঁতব, এই আমার সখ। সারাজীবন ওই করে ঘুরেছি। এখন আমি ও কাজে ঘুণ হয়ে গেছি।

যুগলপ্রসাদ দেখিলাম এদেশের বহু বনের ফুল ও সুদৃশ্য বৃক্ষলতার খবর রাখে। এ বিষয়ে সে যে একজন বিশেষজ্ঞ, তাহাতে আমার কোনো সন্দেহ রহিল না। বলিলাম—তুমি এরিষ্টলোকিয়া লতা চেন?

তাহাকে ফুলের গড়ন বলিতেই সে বলিল, হংস লতা? হাঁসের মত চেহারা ফুল হয় তো? ও তো এ দেশের গাছ নয়। পাটনায় দেখেছি বাবুদের বাগানে।

তাহার জ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। নিছক সৌন্দর্য্যের এমন পূজারীই বা ক'টা দেখিয়াছি? বনে বনে ভাল ফুল ও লতার বীজ ছড়াইয়া তাহার কোন স্বার্থ নাই, এক পয়সা আয় নাই, নিজে সে নিতান্তই গরীব, অথচ শুধু বনের সৌন্দর্য্য-সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টায় তার এ অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্বেগ।

আমায় বলিল—সরস্বতী কুণ্ডীর মত চমৎকার বন

এ অঞ্চলে কোথাও নেই বাবুজী। কত গাছপালা যে আছে, আর কি দেখেছেন জলের শোভা? আচ্ছা, আপনি কি বিবেচনা করেন এতে পদ্ম হবে পুঁতে দিলে? ধরমপুরের পাড়াগাঁ অঞ্চলে পদ্ম আছে অনেক পুকুরে। ভাবছিলাম গেঁড় এনে পুঁতে দেব।

আমি তাহাকে সাহায্য করিতে মনে মনে সংকল্প করিলাম। দু-জনে মিলিয়া এ বনকে নানা নতুন বনের ফুলে, লতায়, গাছে সাজাইব, সেদিন হইতে ইহা আমাকে যেন একটা নেশার মত পাইয়া বসিল। যুগলপ্রসাদ খাইতে পায় না, সংসারের বড় কষ্ট, ইহা আমি জানিতাম। সদরে লিখিয়া তাহাকে দশ টাকা বেতনে একটা মুহুরীর চাকুরী দিলাম আজমাবাদ কাছারিতে। সে চাকুরীর অবসরে একটা বড় খাতা নতুন নতুন বনের গাছ ও ফুলের তালিকায় ভর্ত্তি করিয়া ফেলিয়াছে, একদিন দেখাইল।

সেই বছরে আমি কলিকাতা হইতে সাটনের বিদেশী বন্য পুষ্পের বীজ আনিয়া ও ডুয়ার্সের পাহাড় হইতে বন্য যুঁইয়ের লতার কাটিং আনিয়া যথেষ্ট পরিমাণে রোপণ করিলাম সরস্বতী হ্রদের বনভূমিতে। কি আহ্লাদ ও উৎসাহ যুগলপ্রসাদের! আমি তাহাকে শিখাইয়া দিলাম এ উৎসাহ ও আনন্দ যেন সে কাছারির লোকের কাছে প্রকাশ না করে। তাহাকে তো লোকে পাগল ভাবিবেই, সেই সঙ্গে আমাকেও বাদ দিবে না। পর বৎসর বর্ষার জলে আমাদের রোপিত গাছ ও লতার ঝাড় অদ্ভুত ভাবে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। হ্রদের তীরের জমি অত্যন্ত উর্ব্বর, গাছপালাগুলিও যাহা পুঁতিয়াছিলাম, এদেশের আবহাওয়ার উপযোগী। কেবল সাটনের বীজের প্যাকেট লইয়া গোলমাল বাধিয়াছিল। প্রত্যেক প্যাকেটের উপর তাহারা ফুলের নাম ও কোন কোন স্থলে এক লাইনে ফুলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দিয়াছিল। ভাল রং ও চেহারা বাছিয়া বাছিয়া যে বীজগুলি লাগাইলাম, তাহার মধ্যে 'হোয়াইট বিম', ও 'রেড ক্যাম্পিয়ন্' এবং 'ষ্টিচওয়ার্ট' অসাধারণ উন্নতি দেখাইল। 'ফক্সগ্লাভ' ও 'উড্ অ্যানিমোন্' মন্দ হইল না। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও 'ডগ রোজ' বা 'হনিসাকল্'-এর চারা বাঁচাইতে পারা গেল না।

হলদে ধুতুরা জাতীয় এক প্রকার গাছ হ্রদের ধারে ধারে পুঁতিয়াছিলাম। খুব শীঘ্রই তাহার ফুল ফুটিল। যুগলপ্রসাদ পুর্ণিয়ার জঙ্গল হইতে বন্য বয়ড়া লতার বীজ আনিয়াছিল, চারা বাহির হইবার সাত মাসের মধ্যেই দেখি কাছাকাছি অনেক ঝোপের মাথা বয়ড়া লতায় ছাইয়া যাইতেছে। বয়ড়া লতার ফুল যেমনি সুদৃশ্য, তেমনি তাহার মৃদু সুবাস।

হেমন্তের প্রথমে একদিন দেখিলাম বয়ড়া লতায় অজস্র কুঁড়ি ধরিয়াছে।

যুগলপ্রসাদকে খবরটা দিতেই সে কলম ফেলিয়া আজমাবাদ কাছারি হইতে সাত মাইল দূরবর্ত্তী সরস্বতী হ্রদের তীরে প্রায় দৌড়িতে দৌড়িতেই আসিল।

আমায় বলিল—লোকে বলেছিল হুজুর, বয়ড়া লতা জন্মাবে, বাড়বেও বটে, কিন্তু ওর ফুল ধরবে না। সব লতায় নাকি ফুল ধরে না। দেখুন কেমন কুঁড়ি এসেছে!

হ্রদের জলে 'ওয়াটার ক্রোফুট' বলিয়া এক প্রকার জলজ ফুলের গেঁড় পুঁতিয়াছিলাম। সে গাছ হু হু করিয়া এত বাড়িতে লাগিল যে যুগলপ্রসাদের ভয় হইল জলে পদ্মের স্থান বুঝি ইহারা বেদখল করিয়া ফেলে!

বোগেনভিলিয়া লতা লাগাইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু শহরের সৌখীন পার্ক বা উদ্যানের সঙ্গে এতই ওর সম্পর্কটা জড়ানো যে আমার ভয় হইল সরস্বতী কুণ্ডীর বনে ফুলে-ভরা বোগেনভিলিয়ার ঝোপ ইহার বন্য আকৃতি নষ্ট করিয়া ফেলিবে। যুগলপ্রসাদেরও এসব বিষয়ে মত আমারই ধরণের। সেও বারণ করিল।

অর্থব্যয়ও কম করি নাই। একদিন গনোরী তেওয়ারীর মুখে শুনিলাম কারো নদীর ওপারে জয়ন্তী পাহাড়ের জঙ্গলে এক প্রকার অদ্ভুত ধরণের বন্য পুষ্প হয়—ওদেশে তার নাম দুধিয়া ফুল। হলুদ গাছের মত পাতা, অত বড়ই গাছ—খুব লম্বা একটা ডাঁটা ঠেলিয়া উঁচুদিকে তিন-চার হাত ওঠে। একটা গাছে চার-পাঁচটা ডাঁটা হয় প্রত্যেক ডাঁটায় চারটি করিয়া হলদে রঙের ফুল ধরে—দেখিতে খুব ভাল তো বটেই, ভারী সুন্দর তার সুবাস। রাত্রে অনেক দূর পর্য্যন্ত সুগন্ধ ছড়ায়। সে ফুলের একটা গাছ যেখানে একবার জন্মায় দেখিতে দেখিতে এত হু হু বংশবৃদ্ধি হয় যে দু-তিন বছরে রীতিমত জঙ্গল বাঁধিয়া যায়।

শুনিয়া পর্য্যন্ত আমার মনের শান্তি নষ্ট হইল। ঐ ফুল আনিতেই হইবে। গনোরী বলিল, বর্ষাকাল ভিন্ন হইবে না, গাছের গেঁড় আনিয়া পুঁতিতে হয়—জল না পাইলে মরিয়া যাইবে।

পয়সাকড়ি দিয়া যুগলপ্রসাদকে পাঠাইলাম। সে বহু অনুসন্ধানে জয়ন্তী পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গল হইতে দশ-বারো গণ্ডা গেঁড় যোগাড় করিয়া আনিল। ক্রমশঃ

বাংলার চিত্রশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র নিয়োগী

১

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়েষু
সবিনয় নিবেদন,

কিছুদিন পূর্ব্বে কোনও পত্রিকায় আপনি "ভারতীয়" পদ্ধতির নবীন শিল্পীদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের নামের যে তালিকা দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শিল্পী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের নাম দেখিলাম। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গুপ্তের বহু চিত্র একত্রে দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। এই ছবিগুলি দেখিয়া মনে হইতেছে যে "নব্য বাংলা" পদ্ধতিতে ভারতীয় শিল্পের প্রভাব ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে এবং ভবিষ্যতে হয়ত একেবারেই থাকিবে না। শিল্পীর য়ুরোপীয় ধরণে অঙ্কিত ছবির সংখ্যাই সম্ভবত বেশী এবং এগুলি যে তুলি-চালনার স্বাচ্ছন্দ্যে, রঙের সংযমে ও ইঙ্গিতময়তায় তাঁহার "ভারতীয়" ধরণে অঙ্কিত চিত্রগুলি হইতে উৎকৃষ্টতর তাহাই মনে হয়। এই ধরণের চিত্রে শিল্পী প্রকৃতির যে সরসতা ও সজীবতা দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার "ভারতীয়" পদ্ধতিতে অঙ্কিত ছবিগুলিতে নাই। ইহা ছাড়া শেষোক্ত ছবিগুলিও য়ুরোপীয় প্রভাবে নিতান্ত প্রভাবান্বিত। এগুলিতে ভারতীয় বিষয়বস্তু ছাড়া ভারতীয়ত্ব অতি সামান্যই আছে মনে হয়।

এই সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই, যে, আধুনিক কালে ভারতীয় পদ্ধতির অধিকাংশ শিল্পী নিজেদের চিত্রে ভারতীয়ত্ব ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলিতেছেন এবং হয় নানা দেশের নানা যুগের নানা রীতির জোড়াতাড়ার সাহায্যে বিসদৃশ ভঙ্গিতে ছবি আঁকিতেছেন (ইহাকে কেন যে Pastiche বলা হয় না জানি না); আর নয়ত এক রীতি হইতে অন্য রীতিতে দিশাহারা হইয়া ছুটাছুটি করিতেছেন। এই শেষোক্ত অস্থিরতা, আধুনিক কালে, এমন কি শিল্পী-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের কাজেও দেখা যায়! তাঁহার আগেকার কাজে যে ভারতীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বজায় ছিল, তাহা এখন আর যেন পাওয়া যায় না। এখানে অনেকে হয়ত বলিবেন যে এ-যুগে বিদেশী প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করা অসম্ভব। কিন্তু প্রভাব থাকা, আর সম্পূর্ণ বিদেশী পদ্ধতি গ্রহণ করা এক কথা কি? বসু-মহাশয়ের আধুনিক ছবিতে দেখি কখনও অজন্টা, কখনও বাংলার পট, কখনও বা সম্পূর্ণ চীনা ধরণ। আবার এক বৎসর পূর্ব্বে ফাইন আর্টস অ্যাকাডেমীর প্রদর্শনীতে তাঁহার "রাধার বিরহ" শীর্ষক ছবিখানি ইজিপশীয় শিল্পের কথা স্মরণ করাইয়াছিল। ইহা হইতে বোধ হয় মনে করা স্বাভাবিক যে ভারতীয় পদ্ধতি আধুনিক কালের রূপতৃষ্ণা সম্পূর্ণ ভাবে মিটাইতে সমর্থ নয়। যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহারা বলিতে পারেন যে, সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে আধুনিক রুচি অনুসারে দৃশ্যচিত্রাদি অঙ্কন সম্ভব নহে। ইহা ছাড়া "নব্য বাংলা"র শিল্পে প্রচুর বিদেশী প্রভাব আছে, অথচ প্রকৃতি ও আধুনিক জীবনের প্রভাব অতি সামান্য। এই সকল কারণে, এবং আধুনিক শিল্পীদের নানা রীতি পরীক্ষার ছলে, "ভাঙিবার" উৎসাহ প্রবল হওয়াতে, "নব্য বাংলা" পদ্ধতির দীর্ঘায়ু সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে। এই সন্দেহ অমূলক কি না সে-সম্বন্ধে অনুগ্রহপূর্ব্বক সামান্য কিছু লিখিলে বাধিত হইব। ইতি

বিনীত
পৃথ্বীশচন্দ্র নিয়োগী

২

শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র নিয়োগী সমীপেষু
সবিনয় নিবেদন,

আপনি আপনার সুচিন্তিত ও সুলিখিত পত্রে যে-সব প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহার সঠিক উত্তর দেওয়া দুঃসাধ্য। যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেছি।

আমাদের দেশে চিত্র বুঝিবার ও সমালোচনার আদর্শ ও মাপকাঠি এখনও গড়িয়া উঠে নাই। চিত্র-রচনাকে আমরা এখনও জীবন-যাত্রার ব্যাপারে সম্মানের স্থান দিতে পারি নাই। চিত্রচর্চ্চার তুলনায়, সঙ্গীতকে আমরা অনেক উচ্চ স্থান দিয়া, জীবন-যাত্রার গম্ভীর কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছি। সমাজে সঙ্গীতের জয় হউক, আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। প্রায় ছয় বৎসর পরিশ্রম করিয়া, আমি সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছি। সুতরাং, সঙ্গীত-চর্চ্চার উপর আমার কোনও বিমুখী ভাব নাই। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতীয় সঙ্গীত সমাজে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, বহুল পরিমাণে সঙ্গীতের চর্চ্চার ফলে, সঙ্গীতের বহু-বিস্তৃত সমালোচনার একটা সমতল ভূমিতে আমরা উপস্থিত হইয়াছি,—যে-স্থানে অনেকের দৃষ্টি-স্থান ও বিচার-বুদ্ধির একটা সাম্য ও ঐক্য আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে, ক্লাসিকাল বা ওস্তাদী সঙ্গীতের প্রতি অনেকের মনে একটা বিরোধের ভাব ছিল। এখন, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত

মার্গ-সঙ্গীত কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়া ঐ জাতীয় প্রাচীন পদ্ধতির ওস্তাদী সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচীন পদ্ধতির ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শকে সাধারণে অনেকটা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, এবং প্রাচীন ওস্তাদ-পরম্পরায় রক্ষিত ও সাধিত মার্গ-সঙ্গীতে প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত-সাধনার রূপ ও রস কি ছিল, আমরা অনেকটা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি। চিত্রের জগতে ইহার অনুরূপ কিছুই ঘটে নাই।

চিত্রশিল্পের দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রাচীন ভারতের চিত্রচর্চ্চার পদ্ধতি, রূপ, রস ও আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের চেতনা ও বিচার-বুদ্ধি এখনও জাগ্রত হয় নাই। আমরা চিত্র-বিচার করিবার সময় "অজন্তা", "রাজপুত," "মুঘল" ইত্যাদি পদ্ধতির নাম ব্যবহার করি বটে, কিন্তু কোনও পদ্ধতির চিত্রের স্বরূপ ও স্বকীয় রস সম্বন্ধে অনেক সমালোচকের ত দূরের কথা, দু-চার জন ছাড়া, আধুনিক চিত্রশিল্পীদেরও কাহারও সম্যক্ অনুভূতি নাই। পশ্চিম দেশের অতি-আধুনিক শিল্পীরাও য়ুরোপের সকল যুগের (Old Master) ওল্ড মাষ্টারদের চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া, গভীর অনুশীলন দ্বারা, প্রাচীন ওস্তাদ-কলমের পদ্ধতি ও রস সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত করেন। প্রাচীন পদ্ধতির নানা যুগের ওল্ড মাষ্টারদের চিত্রের গভীর পরিচয় ও পর্য্যালোচনা, য়ুরোপের সমস্ত শিল্প-বিদ্যার্থীর অবশ্যপঠনীয় অ-আ-ক-খ। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল যে-পরিমাণে ভারতের ওল্ড মাষ্টারদের অনুশীলন করিয়াছেন এবং প্রাচীন ওস্তাদগণের পদ্ধতি ও রসানুভূতির মূলসূত্রগুলি পরিপাক ও আয়ত্ত করিয়া লইয়া প্রাচীন পদ্ধতির ধারার সহিত নিজের চিত্র-বুদ্ধিকে যুক্ত করিয়া চলিয়াছেন (শ্রদ্ধেয় শিল্পী যামিনী রায় মহাশয় ব্যতীত) আর কেহ ঐ প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারার সহিত সেরূপ যোগ রক্ষা করিয়া চলিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রপদ্ধতি দেশীয় ভাব, দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করিবার একটা শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। এই শক্তিশালী ভাষাকে ত্যাগ করিয়া, সমস্ত ঐতিহ্যকে অস্বীকার ও অপমান করিয়া, এক শ্রেণীর দাম্ভিক ও শক্তিহীন শিল্পী একটা নূতন পদ্ধতির "ভারতীয়" চিত্রের ভাষা সৃষ্টির অক্ষম চেষ্টা করিতেছেন। আপনাদের সমালোচনা এই শ্রেণীর তথাকথিত "ভারতীয় পদ্ধতি" যা তথাকথিত "ওরিয়েন্টাল আর্টে"র পক্ষে বিশেষ ভাবে সত্য। তাঁহারা নামে, জাতিতে ও বিষয়বস্তুতে "ভারতীয়" হইতে পারেন, কিন্তু আদর্শে, রেখা-রীতিতে, রস-বুদ্ধিতে "ভারতীয়" নহেন। সরোজিনী নাইডুর ইংরেজী কবিতায় যে "ভারতীয়" ভাব ও রস আছে, অনেক অজন্তার অনুকারী চিত্রকরের চিত্রে সেই ভারতীয় সৌরভ ও স্বাদের একান্ত অভাব। অনেকের পক্ষে, ভারতীয় রস ও রীতির প্রকাশ-চেষ্টা একটা কষ্টকল্পনা মাত্র—এবং অধিকাংশ স্থলে এই ব্যর্থ চেষ্টা প্রাচীন পদ্ধতির মুদ্রাদোষ ও ভঙ্গীর অক্ষম অনুকরণ মাত্র। ভারতীয় চিত্রপদ্ধতির অক্ষর-পরিচয় অনেকেরই হয় না। ভাল ভাল ওস্তাদ-কলমের ছবি হয় তাঁরা দেখিতে পান না, কিংবা দেখা বা অনুশীলন করা আবশ্যক মনে করেন না। এইরূপে নন্দলাল ও অবনীন্দ্রনাথের 'নাতি'-শিষ্য ও উপ-শিষ্যদের মধ্যে, ভারতীয় চিত্রের মূলসূত্রের কোনও পরিচয় পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে আজকালকার অনেক বাঙালী চিত্রকরদের চিত্রে ভারতীয়তার স্বাদ ও গন্ধ সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছে। সুতরাং আপনার অভিযোগ সত্য যে, অতি-আধুনিক নয়া বাংলার পদ্ধতিতে ভারতীয় শিল্পের ধারা ও প্রভাব ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে এবং ভবিষ্যতে হয়ত একবারেই থাকিবে না। অন্য দিক্ হইতে বলা যায়, যে নূতন পদ্ধতির ভারতীয় চিত্রপদ্ধতির প্রথম যুগে, শিল্পীরা প্রাচীন পদ্ধতির ঐতিহ্যের সহিত যে যোগ রাখিয়া, অজন্তা, রাজপুত, মুঘল বা গৌড়ীয় রীতি-পদ্ধতির যে অনুসরণ করিয়া, তাঁহাদের শিল্প-রীতির স্বাজাত্য বাঁচাইয়া চলিতেছিলেন, বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত এই "ছুঁৎমার্গ" পরিত্যাগ করাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। গাছ বড় হইলে আর বেড়ার আবশ্যক হয় না। নয়া বাংলা, বা নয়া ভারতের শিল্পী তাঁহার সৌন্দর্য্যবুদ্ধি যে-রীতিতে অকপটে প্রকাশ করিতেছেন, সেটা যদি তাঁহার চিত্তের ও সাধনার অকৃত্রিম, স্বাভাবিক স্বতঃপ্রকাশ হয়,—অর্থাৎ যদি সেই রীতি একটা pose, অভিনয়, বা ভান মাত্র না-হয়, তাহা হইলে সেই রীতিকেই আজিকার ভারতের ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতি ও রীতি বলিয়া আমাদের মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, তাহাতে অজন্তার 'স্বাদ' বা রাজপুতের 'গন্ধে'র যতই অভাব হউক না কেন, আমাদের অভিযোগ করিবার ন্যায্য কারণ থাকিতে পারে না। আবার অনেকে বলেন যে শিল্প ও সঙ্গীত এমন একটি বিশিষ্টরূপে জাতীয় রক্ত ও বৈশিষ্ট্যের আত্মপ্রকাশ, যাহাতে জাতীয় স্বকীয়তা ও নিজস্ব আত্মার চিত্র ফুটিয়া উঠা অবশ্যম্ভাবী। যে-শিল্পে জাতীয়তার এই স্বচ্ছ-প্রকাশ নাই, সে-শিল্প একটা নকল শিল্প, শিল্পের ভান মাত্র, আসল বস্তু নহে। উদাহরণ-স্বরূপ দুইটি প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে। অতি-আধুনিক জাপানী শিল্পেও প্রাচীন জাপানী শিল্প-রীতির

ঐতিহ্য ও ভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছে। য়ুরোপের আধুনিক (modernistic) শিল্পের নানা নূতন চক্রে ও নব্য "বাদে" (isms-এ), ঐ জাতীয়তার রূপ উঁকি মারিয়া থাকে। এই রক্তের প্রভাব, এই সংস্কারের স্বকীয়তা বলপূর্ব্বক দমন করা যায় না, কৃত্রিমতার 'মুখোস পরিয়া ঢাকা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সত্যের পথে, সরল পথে, আন্তরিকতার পথে, তাহা অতিক্রম করা যায় না। কেবল প্রাচীনতার রীতি-পদ্ধতির নিগড় হইতে মুক্তি পাইলেই, আত্মার স্বকীয়তা হইতে, জাতীয় রক্তের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না। নিজস্বতার স্বচ্ছন্দ স্বতঃপ্রকাশ, সাহিত্য অপেক্ষা শিল্পক্ষেত্রে অধিক থাকা বাঞ্ছনীয়, এবং এই জাতীয় রক্তের সঠিক প্রকাশেই, শিল্পীর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণেই শিল্পের শিল্পত্ব। চিত্রের মধ্যে, মূর্ত্তির মধ্যে, নিজের আত্মাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করাই শিল্পের চরম আদর্শ। অবশ্য, সভ্যতা-বিকাশের একটা চরম উদ্দেশ্য দার্শনিকরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সেটা এই, যে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন মানুষের 'গণ' ও 'গোষ্ঠী', নানা পথে, নানা রীতিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া, ক্রমশঃ ভেদ ভাঙিয়া, জাতীয়তা মুছিয়া, একটা অন্তর্জ্জাতিক একতায় উপস্থিত হইবে—যেখানে মানুষের চিন্তায়, ভাবে, ভঙ্গীতে, ব্যবহারে, শিল্পে, সাহিত্যে ও সঙ্গীতে, সমস্ত ভেদের রেখা, সমস্ত স্বকীয়তার চিহ্ন লুপ্ত হইয়া যাইবে, ঘটাকাশ পটাকাশে মিশিয়া একটা মহামানবিকতার সাম্যে এক হইয়া সার্থক হইয়া উঠিবে। আজিকার কোনও বাঙালী সাহিত্যিক বা শিল্পী এই রক্তের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে ঘুচাইয়া, জাতীয়তার বেড়া লঙ্ঘন করিয়া, আন্তর্জাতিকতার চরম সোপানে উপস্থিত হইয়া এস্‌পেরেন্টোর ভাষায় কবিতা লিখিতেছেন, বা ফিউচারিষ্ট পদ্ধতিতে ছবিতা লিখিতেছেন, কোনও সাহসী পুরুষ এখনও এমন দাবি করিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতের ভারত-শিল্পের ললাটে "things to come" কি লেখা আছে জানি না। কিন্তু আজিকার দিনে কোনও বাঙালী চিত্রকরের চিত্রে যদি কোনও সরস য়ুরোপীয়তার গন্ধ পাই, তাহা হইলে বুঝিব তিনি কোন য়ুরোপীয় চিত্র হইতে ভাব ও ভঙ্গী, রীতি ও পদ্ধতি নকল করিয়াছেন। এক শতাব্দী পরেও য়ুরোপীয় সংস্কৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ কোলাকুলির পরেও, আমরা য়ুরোপীয় সংস্কৃতি ও ভাব-ধারার শতাংশের একাংশও আপনার করিয়া লইতে পারি নাই, নিজস্ব প্রতিভার সহিত 'জোড়-কলম' বাঁধিতে পারি নাই, আন্তর্জাতীয়তার দিকে এক পদও অগ্রসর হইতে পারি নাই—এই আমার বিশ্বাস। আন্তর্জাতীয়তার বেচাকেনার হাটে নিজের কিছু মূলধন চাই। আমাদের শিক্ষামন্দিরে আমাদের জাতীয় বিদ্যা, জ্ঞান ও সংস্কৃতির সহিত সাধারণ বিদ্যার্থীর পরিচয় লাভের কোনও সুযোগ নাই। য়ুরোপের ধার-করা জ্ঞান-বিজ্ঞানই আমাদের বিদ্যাপীঠে সরবরাহ করা হয়, আমাদের জাতীয় মূলধন হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়া শিক্ষিত হই। এই ধার-করা মূলধন লইয়া আন্তর্জাতিক কারবার করা চলে না। ইতালীর চিত্রশিল্প যে-পরিমাণে আজ আমাদের নাগালের বাহিরে, অজন্তা ও রাজপুত চিত্র-পদ্ধতি আমাদের নূতন বিদ্যার্থীর পক্ষে ঠিক সেই রূপই অপরিচিত। অনেক সময় দেখা যায় যে, পশ্চিম দেশের চিত্রপদ্ধতির রীতি অনুসরণ ও পরিপাক করিবার যে সুযোগ আছে—ভারতীয় রীতি-পদ্ধতি অনুশীলন করিবার সে-সুযোগ ও প্রবৃত্তি আমাদের অনেক নবীন শিল্পীর থাকে না। ভারতীয় চিত্রশিল্পের রীতি-পদ্ধতির অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করিবার জন্য উপযুক্ত সাধন, উপাদান ও অনুশীলনীয় নিদর্শন আমাদের শিল্পবিদ্যার্থীর পক্ষে পাওয়া অনেক সময় দুষ্কর। আমাদের অধিকাংশ শিল্প-বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পরিমাণে সাধন ও উপকরণের একান্ত অভাব। অবশ্য, কলিকাতা শহরে অনেক সরকারী ও বে-সরকারী শিল্প-সংগ্রহে ভারতীয় চিত্রশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন আছে—কিন্তু বিদ্যার্থীদের সহিত এই সব অবশ্য-অনুশীলনীয় নিদর্শনের বিশেষ যোগ-সংস্থানের বিশেষ সুযোগ হয় না। ভারতের প্রাচীন ওস্তাদ-কলমের চিত্র হইতে আজিকার শিল্পীরা কিছুই শিখিতে পারেন না বা শিখিতে চান না। সুতরাং ভারতীয় চিত্রের প্রভাব যে আধুনিক চিত্রশিল্পীর চিত্র হইতে অন্তর্হিত হইবে, এটা আশ্চর্য্যের কথা নয়। নানা কারণে, আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ যে-শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সে-পদ্ধতি সম্পূর্ণ-রূপে ও যথাযোগ্যরূপে অনুসৃত হইবার নানা বাধা উপস্থিত হইয়াছে। ভারতীয় চিত্র-বিজ্ঞানের মূল রীতি ও পদ্ধতির সহিত মিতালি পাতান ও তাহার ধারা রক্ষা করিয়া চলা, বেশীর ভাগ আধুনিক বাংলার শিল্পীদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং যাহা হাতের কাছে পান, তাহাই অবিচারে অনুসরণ করেন, জাতীয় রীতিনীতির সহিত যোগ রক্ষা হইল কি না ভাবিয়া দেখেন না। এইরূপ নানা কারণে অনেক সময় দেশী রীতি বর্জ্জন করিয়া, সম্পূর্ণ বিদেশী পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হয়। নিজের কিছু পুঁজি না-থাকিলে ধার-করা মূলধন লইয়া ব্যবসায় চালাইতে

হয়। অবশ্য, নন্দলাল বসুর চিত্ররচনা সম্বন্ধে এ-কথা মোটেই খাটে না। এক "কিরাত-নৃত্যের" বৃহৎ তৈল-চিত্র ছাড়া বসু-মহাশয় কখনও বিলাতী পদ্ধতি স্বেচ্ছায় অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার কোনও চিত্রে বিদেশী পদ্ধতির প্রভাব আমার নজরে ঠেকে নাই। ফাইন্ আর্টস্ অ্যাকাডেমীর প্রদর্শনীতে নন্দলালের 'রাধার বিরহ' চিত্রে আপনি যে-রীতিকে ঈজিপ্শীয় রীতি বলিয়াছেন তাহা বাস্তবিক রাজপুত রীতির অনুসরণ, বর্ণ-পদ্ধতিতে (অর্থাৎ দুই-তিনটি বর্ণে নিবদ্ধ রীতিতে) যে ঈজিপ্শীয় বর্ণ-রীতির সহিত কিছু বাহিক সাদৃশ্য আছে, তাহা প্রায় সমস্ত যুগের ভারতীয় "প্রিমিটিভ" চিত্র-রীতির পরিচিত পদ্ধতি। দৃষ্টান্তস্বরূপ উড়িষ্যার চিত্ররীতি ও পনর শতকের রাজপুত-রীতির রাগিণী-চিত্রের নাম করা যাইতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে বসু-মহাশয় যে মিশর দেশের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, এ-কথা বলা যায় না। বিশেষতঃ পরিপ্রেক্ষণার কল্পনায়, তিনি যে-রীতি ঐ চিত্রে অনুসরণ করিয়াছেন, তাহার আদর্শ কাংড়া-পদ্ধতির চিত্রে ও এক শ্রেণীর চৈনিক চিত্র-পদ্ধতিতে ও তাহার অনুকরণে, পারস্য-চিত্রে বহুল অনুসৃত হইয়াছে। আপনি অভিযোগ করিয়াছেন যে বসু-মহাশয়ের আধুনিক ছবিতে কখনও অজন্তা, কখনও বাংলার পট, কখনও বা সম্পূর্ণ চীনা ধরণ। শিল্পীর ব্যক্তিগত চিন্তাভঙ্গীর বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে কোন্ পথে চলিবার পিপাসা জাগে, শিল্পী নিজেই তাহার জবাবদিহি করিতে পারেন কি না সন্দেহ। অন্য লোকের পক্ষে তাহার কারণ দেখান অনেক সময় অসম্ভব। আমার মনে হয়, বসু-মহাশয়কে এই যে নানা ভাষায় চিত্র লিখিতে হয়—তাহা শিক্ষা দিবার গরজে। বিদ্যার্থীদের হাতে-কলমে দেখাইতে হয় যে অজন্তা-রীতির পদ্ধতি আয়ত্ত ও পরিপাক করিতে পারিলে আধুনিক চিত্রশিল্পীর কলমে তাহা কি রূপ লইয়া ফুটিতে পারে,—তাহারই একটা দৃষ্টান্ত দেখান। বিভিন্ন পদ্ধতির পরিপাক-রীতি (assimilation)—উদাহরণ দিয়া হাতে-কলমে দেখান,—এগুলি শিল্পীর নিজের কথা, নিজের ভাষায় প্রকাশ করা নিজস্ব নিবন্ধ নহে। ভারতের, তথা এশিয়ার বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন রীতির চিত্রপদ্ধতি আধুনিক কালে, আধুনিক রীতিতে, আমরা কোন্ পথে প্রয়োগ করিতে পারি, তাহারই দৃষ্টান্ত দেখান, এই শ্রেণীর নানা ভাষায় লিখিত চিত্রের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। নন্দলাল বসু মহাশয়ের নিজস্ব রীতি-পদ্ধতি কি, অনেক চিত্রে তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ এইরূপ প্রতিভাশালী ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীকে অর্ব্বাচীনদের শিল্পবিদ্যার অ-আ-ক-খ শিখাইবার মজুরির লাঙ্গলে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এক কালে স্বর্গীয় সর্ জগদীশ বসু মহাশয়কে প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্ব্বাচীনদের প্রাথমিক বিজ্ঞানের শিক্ষা দিবার জন্য ক্লাস-লেক্‌চারের গাধার খাটুনি খাটিতে হইত, তাঁহার নিজের সাধনা ও গবেষণার সময় মিলিত না। তথাপি তাঁহাকে টেলিফোনের তার খাটাইতে সিঁড়িতে চড়িতে হয় নাই। কিন্তু ভারতের শিল্পীর ভাগ্যে ইহার অনুরূপ অপমান ঘটিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী হরিপুর কংগ্রেসের বাঁশদড়ির পর্ণশালার পরিকল্পনায় বসু-মহাশয়কে জুড়িয়া দিয়া, একই ভাবে ভারতের শিল্প ও ভারতের আধুনিক শিল্প-প্রতিভার অপমান করিতেছেন! শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, কংগ্রেসী কর্ম্মবীরের মধ্যে এমন এক জনও চক্ষুমান্ নাই যিনি নন্দলালের তুলিকার দানের মূল্য কি তাহা বুঝিবার বা বিচার করিবার শক্তির দাবি করিতে পারেন। শিল্পের জগতে আমাদের অশিক্ষিত চক্ষে মুড়ি-মিছরির এক দর। সাহিত্য-জগতে এ-দেশে যে বিচার-শক্তি, যে সমালোচনার শক্তি ফুটিয়াছে, শিল্পের জগতে সে-শক্তির একান্ত অভাব। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট দায়িত্ব ও যথাযোগ্যতার বিচার শক্তি আছে,—নতুবা কংগ্রেসের পাবলিসিটি আপিসে, রবীন্দ্রনাথের না হউক, অন্ততঃ বারাণসীর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র ইংরেজী প্রফেসারের ডাক পড়িত। শিল্পের ক্ষেত্রে কোনও অবিচার-অত্যাচারই আমাদের জাতীয় জীবনে বিসদৃশ ঠেকে না, সুতরাং কংগ্রেসের রাংচিত্তিরের বেড়া চিত্রিত করিবার মজুরিতে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প-প্রতিভাকে জুড়িয়া দিতে আমাদের বিবেকবুদ্ধিতে বাধে না। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, নন্দলাল বসু যদি তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান না দিয়া থাকেন, তাহার জন্য দায়ী কে? দেশের শিল্পপ্রতিভাকে আমরা আত্মপ্রকাশের অবসর বা ছুটি দিয়াছি কই? কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যদি পাঠশালার গুরুমহাশয়ের আসনে বসিয়া দিনের পর দিন বর্ণ-পরিচয় পড়াইতে হইত, তাহা হইলে তাঁহার অদ্বিতীয় কবিপ্রতিভা ফুটিবার ফুরসৎ পাইত কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমরা যাহা অর্জ্জন করি, তাহাই পাই। শিল্পের তালি এক হাতে বাজে না। অতি বড় দরদী ও সমজ্‌দার সমাজ না থাকিলে, শিল্পের ফুল ফোটে না। আজ আমাদের বাংলার শিল্পের গাছে ফুল যদি বিরল ও মলিন হইয়া

থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে যথাযোগ্য সার ও জলের অভাব হইয়াছে। সমালোচকের ধমকে গাছের ফুল ফোটে না। বর্ত্তমান কালে বাঙালীর সমাজ কবে, কোন্ দিনে, বাংলার শিল্পকে—বাংলার শিল্পীকে আদর করিয়াছে, আহার দিয়াছে, সম্মান দিয়াছে—তাহার মনের রসের খোরাক জোগাইয়াছে—কবে তাহার উপর বড় দাবি করিয়াছে? বড় দাবি না করিলে বড় জিনিষ পাওয়া যায় না। দুর্ভাগ্য বাঙালী শিল্পীর বরাতে টাকাটা-সিকেটার চেয়ে লাথিঝাঁটাই (more kicks than ha' pennies) মিলিয়াছে বেশী। ভারতীয় নবীন চিত্রপদ্ধতির উন্মেষের প্রথম যুগে ভারতশিল্পীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কয়েক জন সমজ্দার ইংরেজ—সর্ জন উড্রফ, নর্মান ব্লাউন্ট, থর্ন্টন প্রভৃতি। দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত কোন শ্রেণীর লোকই আজও পর্য্যন্ত দেশের চিত্রশিল্পকে কখনও আদর করে নাই। বিরোধ, বিদ্বেষ ও উপহাসের অপমানের মধ্যেই নন্দলাল ও তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যরা গড়িয়া উঠিয়াছেন। দেশের চিত্তের সহিত মিতালি পাতাইবার কোনও সুযোগ বা সুবিধা কোনও দিনই দেশের দিগ্গজেরা দেশের শিল্পীদের দেন নাই। কংগ্রেসের বংশের বেড়া চিত্রিত করিবার ডাক—দেশের শিল্পীর উপর দেশবাসীর চরম পেট্রনেজ! কংগ্রেসের কণ্ট্রাক্টর যেদিন এই ওস্তাদ-কলমের চিত্রিত বাঁখারিগুলি চার পয়সায় নিলাম করিবে, তার অনেক আগে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা যে যার বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন, স্মারকচিহ্ন বলিয়াও এর এক খণ্ড আনিবার অবসর পাইবেন না—হরিপুরের চাষাদের 'চুলি'র চিতায় চড়িয়া নন্দলালের চিত্রাবলী নির্ব্বাণ লাভ করিবে।

কংগ্রেসের সভাপতি মহাশয় এবং অন্যান্য বরেণ্য ও গণ্যমান্য সভাসদ ও প্রতিনিধিগণের বাণী সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে স্পষ্টাক্ষরে প্রতিধ্বনিত হইলে, কিন্তু নন্দলালের চিত্র-পরিকল্পনা কোনও পত্রিকায় একটা কালিমাখা, ঝাপ্সা হাপটোনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে কিনা সন্দেহ।

আপনার চিত্ত শিল্পরস-পিপাসী। আপনি ব্যক্তিগত-ভাবে আধুনিক শিল্পীদের উপর অনেক দাবি করিয়াছেন,—এত বেশী চাহিয়াছেন যে আপনার আশার ডালি নিরাশার পসরা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তবে 'ডাকার মত না ডাকতে পারলে' শিল্পীর সাড়া পাওয়া যায় না। সমালোচকের তিরস্কারে শিল্পের বাগিচায় ফুল ফোটে না। শাজাহানের ফরমাইজেই তাজ গড়িয়া উঠে। সাধক-ভজকদের দৌরাত্ম্যে এক দিন বাংলা দেশের ধীমান্ ও বীতপাল গড়িয়া উঠিয়াছিলেন। বয়নশিল্পীদের উপর আজ দুই দিন দাবি আসিয়াছে—এরই মধ্যে অনেক উচ্চ অঙ্গের সূক্ষ্মসূতার খাদি দেশভক্তির সৌরভ লইয়া তাহারা বুনিয়া দিতেছে। যেদিন চিত্রশিল্পীদের উপর এইরূপ ডাক আসিবে, সেদিন দেশের শিল্পী কায়মনোবাক্যে সাড়া দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। মাসিকপত্রের মুখপত্রের জন্য একখানা যেমন-তেমন ত্রিবর্ণে মুদ্রিত চলনসই চিত্রের দাবি দেশের শিল্পীর মন আলোড়িত করিয়া উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না। ইহার অপেক্ষা ঢের বড় দাবি চাই। বড় দাবি করিতে শিখিলেই, বড় দান পাইবার অধিকারী হইব। আবার বড় দানের মূল্য কি বুঝিবার চক্ষু অর্জ্জন করিলে, তবে বড় দানের মহিমা কি তাহা চিনিতে পারিব। ইতিমধ্যে আমাদের দেশের আধুনিক শিল্পীরা অনেক উৎকৃষ্ট রীতির চিত্র লিখিয়াছেন—আমাদের অশিক্ষিত অন্ধ চক্ষুতে কোনও গুণই, কোনও রসই এই সব চিত্রে আমরা খুঁজিয়া পাই না।

আপনি অভিযোগ করিয়াছেন যে ভারতীয় পদ্ধতি আধুনিক কালের রূপতৃষ্ণা মিটাইতে সমর্থ নহে। দেশে রূপপিপাসী লোক কোথায় আছে তাহার সন্ধান করিয়া বেড়ান আমার একটা রোগ আছে। অনেক ঘুরিয়া দেখিয়াছি—"লাখে না মিলল এক"। সুতরাং এদেশে রূপতৃষ্ণা জাগিয়াছে ইহা আমাদের কাছে একটি নূতন খবর। সম্প্রতি এক জন জর্মন চিত্র-শিল্পী কলিকাতায় ইস্লামিয়া কলেজে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ছবির ও ছবির অতি উৎকৃষ্ট প্রতিলিপির প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন। অন্য দর্শকদের কথাই নাই, ঐ কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই তাঁহার প্রদর্শনী দেখিতে আসেন নাই। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, "শুনেছিলাম কলকাতা শহর চিত্রপিপাসুর কেন্দ্রস্থল, পরখ ক'রে দেখলাম এদেশে রূপতৃষ্ণা এখনও জাগে নাই।" তৃষ্ণা যখন জাগে তখন 'দেনো ও বিলিতী'র বিচার থাকে না। ঘোড়াকে জলের কাছে লইয়া যাইতে পারি, কিন্তু তৃষ্ণা না থাকিলে তাহাকে জল খাওয়াইতে পারি না। নবীন শিল্পীদের উপর অভিযোগ করিয়া আমি তাহাদের প্রায়ই বলি, "তোমরা ভাল ছবি লিখতে পার না—তাই রূপ-রসের তৃষ্ণা জাগাতে পারছ না। রবীন্দ্রনাথ সুমহান্ কবিতা লিখে দেশে কবিতা-রসের সুমহান্ তৃষ্ণা জাগিয়েছেন।" তাহার উত্তরে তাহারা বলে, "এক দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত মাতব্বরগণ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কোনও বস্তু খুঁজে পান নি—সুতরাং তাঁর কবিতা পাঠ্য-তালিকায় স্থান দিতে সেদিন

মাতব্বরদের মাথা অস্বীকারে নড়ে উঠেছিল। নোবেল প্রাইজের টিকিট কেনবার পর, কবির রচনা দেশের লোকের আদরের গণ্ডীর ভিতর ঢুকতে পেরেছে। ১৯১৪ সালে প্যারিসের শিল্পরসিকদের সার্টিফিকেট পাবার পর, অবনীন্দ্রনাথের 'লতান আঙ্গুলে'র নীচে দেশের মুরুব্বিরা মাথা নত করেছেন, তার পূর্ব্বে নয়। এই আদর, এই সম্মান—ভয়ে ভক্তি, জ্ঞানের ভক্তি নহে, রসবোধের পরিচায়ক নয়।"

আপনি লিখিয়াছেন যে অনেকে বলিবেন যে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে দৃশ্যচিত্রাদি অঙ্কন সম্ভব নয়। বহু পূর্ব্বে অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় পদ্ধতিতে অনেকগুলি দৃশ্যচিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছেন যে ব্যাপারটা অসম্ভব নহে। নন্দলালের "বাংলার কুটীর" (*Golden Book of Tagore* : Colour Plate "Village Huts", p. 32)—ভারতীয় দৃশ্যচিত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। লক্ষ্ণৌর বীরেশ্বর সেন, কলিকাতার সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র এবং নন্দলালের একাধিক ছাত্র এই শ্রেণীর দৃশ্যচিত্রে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। গত বৎসর সুধাংশু বসু রায় চৌধুরী নামক এক জন অল্পবয়সী বাঙালী শিল্পী বাংলা দেশের পল্লীর নানা উৎকৃষ্ট ছোট ছোট চিত্র লিখিয়া ওয়াই. এম. সি. এ. প্রদর্শনীতে দেখাইয়াছেন। তাহার একখানি আমি কুমারস্বামীকে নববর্ষের উপহার পাঠাই। আমেরিকায় তাঁহার অনেক বন্ধু এই চিত্রের বহুল প্রশংসা করিয়াছেন। প্রাকৃতিক পরিবেশের এবং আধুনিক জীবনের প্রভাব, আধুনিক শিল্পীদের উপর অতি সামান্য, এ-কথা আমি খুব স্বীকার করি। প্রকৃতি ও সংস্কৃতির ধারা (Nature and Tradition) এই দুইটিকেই আজিকার বাংলার শিল্পীরা অনেকেই এড়াইয়া চলিয়াছে। তাহার কিছু কিছু কারণ উপরে আমি ইঙ্গিত করিয়াছি। বর্ত্তমান কালে, সমাজের কোনও ক্ষেত্রে গৃহস্বামীরা বা সমাজের মুরুব্বিরা শিল্পীদের স্থান দেন না, সুতরাং আধুনিক জীবনের পরিবেশ হইতে দেশের শিল্পীরা জাতে ঠেলা হইয়া আছে। বাড়ী বানাইতে আমরা মিস্ত্রী ডাকি, কিন্তু শিল্পীকে ডাকি না। যে শিল্পীকুল সমাজের চিত্তভূমিতে শিকড় নামাইবার সুযোগ পায় না, সমাজের মাতব্বররা যাহাদের ডাল-ভাতের যোগান দিতে নারাজ, তাহারা যে অল্পায়ুর দুর্ভাগ্য লইয়া জন্মিয়াছে, এ-কথা আমি বিশ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছি। নানা রীতির পরীক্ষা, নয়া বাংলার চিত্রপদ্ধতির অবনতির হেতু নহে। সর্ব্বক্ষেত্রেই, বাঙালী জাতির একনিষ্ঠতার ও সাধনার অভাব। বেশীর ভাগ শিল্পী আপনার স্বকীয় সাধনার পথ স্থির করিয়া লইতে পারে না, এবং আপনার প্রতিভার উপযোগী পথে দীর্ঘকাল সাধনার অধ্যবসায় ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারে না, গাছের এ-ডাল আর ও-ডাল ধরিয়া চঞ্চল মনে ঘুরিয়া বেড়ায়,—আপনার নিজস্ব প্রতিভার সম্যক স্ফুরণের সুযোগ দিবার ধৈর্য্য নাই। অনেক কলেজের কৃতবিদ্য ছেলেরা ছোট একটি দোকান করিয়া রাতারাতি বিরলার ক্রোর টাকার সমৃদ্ধি না পাইয়া চাকরিতে আবার ঢোকে, আবার চাকরি ছাড়িয়া ডাক্তারি পড়ে, ডাক্তারিতে একবার ফেল করিয়া আইন পড়িতে যায়, এবং আধা পথে ঠিকাদারের কাজে লাগিয়া যায়। জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই আপনাকে খুঁজিয়া পায় না, সারাজীবন ঘুরিয়া মরে, নয় অবসাদের নিরাশায় কেরানী-গিরির চরম সমাধিতে নির্ব্বাণ লাভ করে। বাংলার শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে যে অবসাদ আসিয়াছে, তাহার জন্য কেবল শিল্পীদেরই দোষী করিলে অবিচার করা হইবে,—কারণ এ-ক্ষেত্রে সমাজের মুরুব্বিদের কিছু দায়িত্ব আছে কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখিবার কথা। বক্তৃতা-মঞ্চে (যথা ভবানীপুর Y. M. C. A. মন্দির, "Whither Indian Art ?"—*Hindusthan Standard*, 10th Oct. 1937), সাহিত্য-সম্মেলনে (যথা. পাটলিপুত্রে ডাঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ, 'অমৃত-বাজার পত্রিকা', ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৭), ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় দেশের শিল্পীদের উপর মাঝে মাঝে গর্জ্জন ও গালিবর্ষণ হয়, কিন্তু শিল্পীর শূন্য পেট ভরাইবার উপযোগী সুধাবর্ষণ ত দূরের কথা মুষ্টিভিক্ষার ব্যবস্থা হয় না।

আমাদের দেশের শিল্পী ও শিল্প-সাধনার জন্য বড় বেশী লোক ভাবে না। আপনি নয়া বাংলার শিল্পী ও শিল্প-পদ্ধতির পরিণাম সম্বন্ধে অনেক ভাবিয়াছেন। দেশের শিল্প-সাধনা সম্বন্ধে আপনার সহৃদয় বিবেক-বুদ্ধি আছে। আজিকার শিক্ষিত বাঙালী সমাজে এই বিবেক-বুদ্ধির অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। সুতরাং, আশা করি, আপনার এই পত্র সমাজের সমস্ত শিক্ষিত মানুষের মনে দায়িত্ববোধ জাগাইয়া তুলিবে এবং বাংলার শিল্পীদের ও বাংলার শিল্প-সাধনাকে অপমৃত্যুর শোচনীয় পরিণাম হইতে রক্ষা করিবে। আপনার সদিচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের হৃদয়ের সহিত যুক্ত হইয়া, শিল্পীদের শীর্ণ দেহে ও শুষ্ক চিত্তে সুধা বর্ষণ করুক। বাংলার শিল্প আবার জাগিয়া উঠুক। ভারতের সাধনা বাঙালী শিল্পীদের তুলিকা-শিখায় আবার উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠুক!

ভবদীয়
শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

গগন সেন

শ্রীবিজয় গুপ্ত

মিষ্টার সেনকে দেখে তাঁর বয়স আন্দাজ করা সবচেয়ে কঠিন। অবশ্য, এ নিয়ে তর্কবিতর্ক বা রহস্যালাপ করবার সময়ও তাঁর নেই। তবু কখনও মিটিঙের পর চায়ের টেবিলে যদি কেউ অনুমান করবার চেষ্টা করে ত, তিনি বাধা দেন না,—শুনতে তাঁর মজাই লাগে।

কেউ বলে, 'কত আর হবে—বড় জোর পঞ্চাশ?'

কেউ বা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মুখের প্রতিটি রেখার 'পরে বিশদভাবে চোখ বুলিয়ে বলে, 'না-হয় পঞ্চান্নতে পৌঁছেছেন'—আরও কত জনে কত কি বলে। বলবার অবশ্য কারণ আছে। আজও তাঁর চুলে পাক ধরে নি, স্বাস্থ্যের এতটুকু অপচয় ঘটে নি। শরীরটি যেন তাঁর গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ; বয়স হয়েছে তবু বার্দ্ধক্যের ছায়া পড়ে নি। তাই ওদের মন্তব্য আর বয়স অনুমানের শক্তি দেখে চায়ে চুমুক দিতে দিতে হয়ত তিনি একটু হাসেন—খুব মৃদু, যৎসামান্য।

চিবুকের 'পরে হাসির আভাস লক্ষ্য ক'রে সবাই কৌতূহলী হয়ে ওঠে, বলে, 'কত বলুন ত, তারও বেশী নাকি?'

'সিক্সটিওয়ান।' খুব সহজ ভাবেই মিষ্টার সেন কথাটা উচ্চারণ করেন।

কিন্তু উপস্থিত সকলের ললাট ও ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠে, বিস্ময়ের দাপটে সমস্বরে বলে, 'সিক্সটিওয়ান!'

বিস্ময় ওদের হ'তেই পারে। পঞ্চাশের কাছাকাছি গিয়েই ওদের চুলে পাক ধরেছে; কানের পাশ থেকে সুরু করে সমস্ত মাথাটিতে ধীরে ধীরে শুভ্রতা দেখা দিচ্ছে। অজীর্ণ, ব্লাডপ্রেসার, ডায়বিটিস···কোন্‌টা বাদ আছে! কিন্তু ওদের বিস্ময় ও কৌতূহল উপলক্ষ্য ক'রে আত্মপ্রসাদ উপভোগের সময় মিষ্টার সেনের নেই। প্রতিটি মুহূর্ত্ত ভারাক্রান্ত। দায়িত্বের চাপে আর কর্ম্মব্যস্ততার বেগবান স্রোতে প্রশংসা-সঞ্চয়ের লোভ গেছে মরে, মনের স্বাভাবিক বিলাস গেছে ভেসে। জামার হাতটা আঙুল দিয়ে টেনে ধরে ঘড়িটার দিকে চেয়েই তিনি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠেন; ছ-টা তেতাল্লিশ! ডবলিউ ফিন্‌লের সঙ্গে যে সাতটায় দেখা করবার কথা! কোন দিনের কোনও কাজেই তিনি এতটুকু অবহেলা দেখান নি। দেরি করা তাঁর স্বভাবের বাইরে। এ তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। এই সময়ানুবর্ত্তিতা রক্ষার জন্য একদিন তাঁকে বেগ পেতে হয়েছে। আজ আর কষ্ট হয় না; দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে আজ এ-সব তাঁর কাছে শুধু সহজ নয়, অত্যাজ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

মিষ্টার সেন যাবার জন্য প্রস্তুত হন। ব্যস্ততার প্রকোপে হয়ত বিদায় নিতেও ভুলে যান। সৌখীন সৌজন্য ও জোলো ভদ্রতা দেখাবার সময় কই তাঁর?

তার পর মিষ্টার সেনকে নিয়ে মোটর ছোটে আলিপুরের দিকে। কলকাতার রাজপথে তখন আলোর পর আলো জলে উঠেছে। এসপ্লানেডের মোড়ে গোধূলির সংস্পর্শই নেই। কেবল দূরের দিগন্ত-রেখার পানে লক্ষ্য করলে প্রদোষের ধূসরতা দৃষ্টিগোচর হয়। আর খানিক পরেই আকাশের গায়ে তারার পর তারা ফুটে উঠবে, ছেয়ে যাবে রাত্রির সুবিস্তৃত নভপট। ওই দিগন্তছোঁয়া আকাশের দিকে চেয়ে মিষ্টার সেন কিন্তু তারার কথা ভাবছেন না। তাঁর মাথায় ঘুরছে নতুন একটা কল্পনা। তেলের কোম্পানী 'ফ্লোট' করার জন্যে আজ একটা পরামর্শ আছে। ফিন্‌লে লোকটা অভিজ্ঞ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। ওর হিসেব আর ভবিষ্যৎদৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দেখে এক এক সময় উনি অবাক হয়ে যান। এতখানি বয়স হ'ল, এমন ব্যবসাবুদ্ধি উনি খুব কম কেন, দেখেন নি বললেই হয়। মিষ্টার সেন মনে মনে

রুমানিয়ান্ পেট্রোল আর কেরোসিনের হিসেব কষেন।... টাকা কিছু বের করতেই হবে। হয়ত ধারও করতে হবে। তাতে ভয় করলে চল্‌বে কেন? টাকাতেই টাকা আসে, জলেই জল বাঁধে। বর্ম্মা-শেল, ষ্ট্যাণ্ডার্ড, আই-বি-পি, এরা সব বড় বড় কোম্পানী। অনেক টাকা ফেলে তবে এরা কায়েমী ভাবে বাজারে বসেছে। ওদের বাজার থেকে হঠানো বড় সোজা কথা নয়। লড়তে যদি হয় ত অমনি প্রবল পক্ষের সঙ্গেই লড়তে হবে। যারা এক ফুঁয়ে উড়ে যাবে তাদের সঙ্গে লড়ে লাভ কি?... লোকনাথ জ্যেঠিয়ার পয়সা আছে, ছোটখাট একটি কুবের বললেই হয়। সেদিনের মিটিঙে সে ত স্পষ্ট বলেছে, দশ লক্ষ টাকা সে দেবে, কেবল মিষ্টার সেন রাজি হ'লেই হয়।

মিষ্টার সেন মনে মনে উচ্চারণ করলেন, 'দ-শ লক্ষ... ব্যবসা ওরাই বোঝে।' ধার যদি করতেই হয় ত লোক-নাথকে বলবেন। মিষ্টার সেনের উপর লোকনাথের শ্রদ্ধা আছে; বিশ্বাসও করে অগাধ। তার পর শেয়ারের দরটা একটু চড়লেই সুদসমেত সব টাকাটা শোধ করে দেবেন। লোকনাথ হয়ত সুদ নিতে রাজি হবেন না। কিন্তু রাজি না-হ'লে তিনি শুনবেন কেন? সুদের টাকাটা জোর ক'রেই দিয়ে দেবেন।

গাড়ীর গতিবেগ কমে আসতেই মিষ্টার সেন সামনের দিকে চাইলেন। মোটর তখন ফিন্‌লের গেটের মধ্যে ঢুকছে। অভ্যাসমত মিষ্টার সেন ঘড়িটার দিকে দৃষ্টি দিলেন,—সাতটা বাজতে তিন মিনিট। ভেবেছিলেন গাড়ীর মধ্যেই মিনিট খানেক অপেক্ষা ক'রে যাবেন, কিন্তু ফিন্‌লের বেয়ারাকে এই দিকে আসতে দেখে সে সংকল্প ত্যাগ করতে হ'ল।

তার পর পুরো দুটি ঘণ্টা ধরে পরামর্শ চলল। তেল আমদানী করবার জন্য ফিন্‌লে রুমানিয়ার রাজার কাছ থেকে ছাড়পত্র পর্য্যন্ত সংগ্রহ করেছে। লোকটা যেমন সন্ধানী তেমনি কর্ম্মঠ। সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে মিষ্টার সেন ওর মুখের দিকে তাকান।

ষ্টোরেজের জন্য গঙ্গার ধারে একটা জায়গা নিতে হবে। বর্ম্মা-শেল, ষ্ট্যাণ্ডার্ড, আই-বি-পি, ওদের সকলের ষ্টোরেজ হচ্ছে বজবজ। ওরই কাছাকাছি একটা জায়গা বন্দোবস্ত করতে হবে। লীজ নয়, একেবারে কায়েমী ভাবে। স্থান নির্ব্বাচন করার ভারটা ফিন্‌লে ওঁর পরেই দিতে চায়। উনি রাজীও হয়েছেন।

যাবতীয় পরামর্শ শেষ ক'রে মিষ্টার সেন যখন উঠলেন, তখন ন-টা বেজে দু-মিনিট। ওঁকে গাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে গিয়ে ফিন্‌লে বলে, 'চলুন না, যাই—প্লাজায় রোমিও জুলিয়েট আছে—চমৎকার ছবি।'

'ছবি!' বিস্মিত কণ্ঠে মিষ্টার সেন বলেন, 'সিনেমায়? ...না সময় হবে না, দুঃখিত।' গাড়ীখানা ফিন্‌লের গেট পার হ'তেই তাঁর হাসি পায়। সিনেমা! মিষ্টার সেন মনে মনে হিসেব করেন,—বোধ হয় উনিশ-শ-বিশ হবে; সে আজ ষোল-সতর বছর আগের কথা। অন্নপূর্ণা ঝোঁক ধরলে উনি না নিয়ে গেলে সে কিছুতেই যাবে না। মায়ের কড়া হুকুম ও নিরন্তর তাগিদেও ছেলেরা তাঁর কাছে অগ্রসর হ'তে সাহস পায় নি। অবশেষে অন্নপূর্ণা নিজেই এল। মিষ্টার সেন তখন দায় উদ্ধারের মত খবরের কাগজের বড় বড় অক্ষরগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। শেয়ার মার্কেট ও বাজার-দরের পাতাটা তখনও খোলাই হয় নি। অন্নপূর্ণার পায়ের শব্দে মিষ্টার সেন একবার চোখ তুলে চেয়েছিলেন বোধ হয়।

চেয়ারের হাতলে হাত রেখে অন্নপূর্ণা বললে, 'আমাদের আজ বায়স্কোপ নিয়ে চল—নতুন বই এসেছে, জিগোমার।'

ক-দিন হতেই এ-সংবাদের অস্পষ্ট সূচনা তাঁর কানে আসছিল। গ্রাহ্য তিনি করেন নি, আর এত তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামানো তাঁর স্বভাবও নয়। তবু তাঁকে মাথা ঘামাতে হ'ল।

কাগজ থেকে চোখ না-তুলেই তিনি জবাব দিলেন, 'আমার সময় কই, কত কাজ!'

'অবসর যখন নেই, তখন কাজ কামাই ক'রেই নিয়ে যেতে হবে।'

মিষ্টার সেন অবাক হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়েছিলেন। আশ্চর্য্য! তাঁর মত লোককে কাজ

কামাই করবার কথা কেউ বলতে পারে? হঠাৎ একটু রাগও হয়েছিল। কিন্তু বহু দিনের সংযম ও দৃঢ়তার ফলে মুখের 'পরে এতটুকু ছায়াও পড়ে নি, কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র আভাসও প্রকাশ পায় নি।

অন্নপূর্ণা আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গায়ে হাত রেখে বলেছিল, 'কই, চল না আমাদের নিয়ে?'

গায়ে হাত রাখাটা মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে না স্বীকারোক্তি পাবার আশায় তা আজ আর ভাল ক'রে মনে পড়ে না। অবশেষে মিষ্টার সেনের মত লোককেও জবাব দিতে হয়েছিল, 'তার জন্যে এখন থেকে তাগাদা কেন, সে ত সেই সন্ধ্যের সময়!'

'সুমিত্রা এসেছে, বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিকনিক করবে বলছে।'

'তা বেশ ত, কর না, আমার কোন আপত্তি নেই।'

ওরা যেন মিষ্টার সেনের অনুমতির অপেক্ষায় আছে, এখনি ভাবে উনি জবাব দিলেন।

'বা রে, তাই বুঝি হয়?' পিছন থেকে সুমিত্রা জবাব দিলে, সে বোধ হয় দোরের আড়ালেই ছিল। সুমিত্রা অন্নপূর্ণার ছোট বোন, পূজোর সময় দিন-দুইয়ের জন্য এখানে বেড়াতে এসেছে।

মিষ্টার সেন একটু বিপন্ন বোধ করলেন।

অন্নপূর্ণা বললে, 'আমাদের পিকনিকে তুমিও যাবে।'

'আমি? কাজ কামাই করে?' বিস্ময়ের ভারে বিস্তৃত ললাটে রেখার পর রেখা জেগে উঠল।

'একদিনে আর কি ক্ষতি হবে!'

কি ক্ষতি হবে? মিষ্টার সেন অবাক হয়ে যান। নিজেকে বুঝতে নিজেরই যেন কষ্ট হয়। এদের দুঃসাহস দেখে তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে। সুমিত্রার সামনে অন্নপূর্ণার উপর রাগ করতে তাঁর লজ্জা হয়। এই বোধ হয় জীবনে প্রথম, নতুবা ওসব বালাই তাঁর নেই।

অতঃপর তাঁকে সম্মতি দিতে হয়। অন্নপূর্ণার জিদ, সুমিত্রার অনুরোধ।

ওদের সঙ্গে পিকনিকে যাবার আগে আপিসের ম্যানেজারকে টেলিফোনে ডেকে জানিয়ে দেন যে, আজ তিনি যেতে পারবেন না।

ম্যানেজার অবাক হয়ে যায়, দীর্ঘ দশ বছরের মধ্যে একটি দিনের জন্যও মিষ্টার সেন আপিসে আসা বন্ধ করেন নি।

চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে ম্যানেজার জিজ্ঞেস করে, 'শরীরটা সুস্থ নেই বোধ হয়?'

মিষ্টার সেন লজ্জিত হন, আসল কথাটা বলতে তাঁর যেন মাথা কাটা যায়। বলেন, 'হুঁ, শরীরটা ক-দিন ধরেই ভাল বোধ হচ্ছে না।'

এইবার হয়ত খোসামোদ করার জন্য ম্যানেজার শহরের সেরা ডাক্তারের পরামর্শ নিতে বলবে, বিনিয়ে বিনিয়ে অনুরোধ করবে। সে আরও অসহ্য। মিষ্টার সেন তাড়াতাড়ি টেলিফোনটা ছেড়ে দিলেন। এ-সব দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কি?

ইস্, গা-ভাসানোর কি নেশা! তাঁর মত লোককে নিয়ে সারাদিন এরা ছিনিমিনি খেললে। সকালটা গেল পিকনিকে, দুপুরটা গেল চিড়িয়াখানায়, সন্ধ্যেটা গেল সিনেমায়।

কি ক্ষতিই না হয়েছিল পরের দিন! শেয়ার-মার্কেটের অমন একটা লাভজনক 'ফ্লাকচ্যুয়েশন' তাকে হারাতে হ'ল। মথুরালাল কাবরা অপেক্ষা করে করে ফিরে গেল, বিশ্বনাথ গোয়েঙ্কা একটা ফরেন্ অর্ডারের খবর দিতে এসে দেখা পেলে না,—সেটাও হাতছাড়া হয়ে গেল। তাছাড়া কেরানীরাও এই সুযোগে খানিকটা ফাঁকি দিয়ে নিলে। তিনি এ-সব ক্ষতির জন্য কারও কাছে কোন অভিযোগ করেন নি, শুধু সেদিনকার ক্ষতির পরিমাণ অন্নপূর্ণা হয়ত বুঝেছিল। মিষ্টার সেন ভাবেন, ভালই হয়েছে—এক দিনের ক্ষতি স্বীকার করে সারা জীবনের অনেক ক্ষতি থেকেই তিনি নিষ্কৃতি লাভ করেছেন।—সেই যা হয়ে গেছে, ও-সব দুর্ব্বলতা আর তাঁর নেই। এই দীর্ঘ সতর বছরেও আর ব্যতিক্রম ঘটে নি। যাক্ না ওরা—বেড়িয়ে আসুক, পিকনিক করুক, অবসর সময়ে ছবি দেখে আনন্দ করুক, এতে তাঁর একটুও আপত্তি নেই। আর মিষ্টার সেন থাকুন নিজের

কাজ নিয়ে, আপিস নিয়ে—তাঁকে কেউ যেন না বিরক্ত করে। সহজ বিলাসে ব্যয় করবার মত সময় তাঁর কই?

মোটর থেকে নেমে বাইরের ঘরে ঢুকে তিনি অবাক্ হয়ে গেলেন। অভ্যাসমত ঘড়ির দিকে চাইতেই চোখে পড়ল, ন-টা পঁচিশ। বল্লভের আসবার কথা ছিল সওয়া ন-টায়। তাঁর অবশ্য একটু দেরি হয়েছে; কিন্তু তাই বলে ন-টা পঁচিশ পর্য্যন্ত সে আসবে না? অমার্জ্জনীয় অপরাধ; মিষ্টার সেন পায়চারি করতে লাগলেন। নাঃ, সময়ের মূল্য কিছুতেই এঁরা বুঝবে না। যদিও এখন তাঁর কোন কাজ নেই এবং বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই দু-দশ মিনিট তিনি অপেক্ষা করতে পারেন—তবু তাঁর অসহ্য মনে হ'তে লাগল। নিদারুণ বিরক্তিকর এই অপেক্ষা করা। মিষ্টার সেন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন, যদি গেটের কাছে বল্লভকে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল, কে একজন জিজ্ঞাসা করছে বেয়ারাকে, 'গগনবাবু বাড়ী আছেন?''

গগনবাবু! বল্লভ কি আড়ালে তাঁকে গগনবাবু বলে না কি?

একটু পরেই একটা চিরকুট নিয়ে বেয়ারা ঢুকল। স্লিপে লেখা আছে, 'রমেন্দ্রনাথ সেন।' অনুমতি পেয়ে বেয়ারা যুবককে পৌঁছে দিয়ে গেল।

'যদি অনুগ্রহ করে একটি চাকরি ক'রে দেন'—নমস্কার ক'রে যুবক সামনে এসে দাঁড়াল।

খালি পা, গলায় উত্তরীয়, বিশুষ্ক, দারিদ্র্যপীড়িত মুখ। মিষ্টার সেন একবার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিলেন। যুবকের অশৌচ অবস্থা বোধ হয়।

'ছোট ছোট ভাই বোন আর মাকে আমার হাতে দিয়ে বাবা আজ চার দিন হ'ল মারা গেছেন।'

যুবকের কণ্ঠস্বর থর থর করে কেঁপে উঠল। করুণা ও সহানুভূতি পাবার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট। কিন্তু মিষ্টার সেন ও-কথাটার জবাব দিলেন না; সশব্দে চেয়ারখানাকে ঠেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'গগনবাবু? কেন মিষ্টার সেন বলতে পার না? এটুকু শিক্ষা তোমার হয় নি, অথচ তুমি এসেছ চাকরি চাইতে? বাপ মরার কথা ব'লে সহানুভূতির দাবি করতে চাও?'

এত দিনের সংযমও বুঝি ভেসে যায়, মিষ্টার সেনের সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শ্লেষের সীমা অতিক্রম করে ক্রোধের পর্য্যায়ে পৌঁছচ্ছে।

একজন সম্ভ্রান্ত যুবকের পক্ষে এই-ই যথেষ্ট। দারিদ্র্য বোধ হয় আত্মসম্মানকে গ্রাস করে নি। ঘাড় নীচু করে ধীর মন্থর পদে যুবক ঘর হ'তে বেরিয়ে গেল! পিতৃবিয়োগ-ব্যথার চেয়ে অপমানটা বোধ হয় বেশী ক'রে বেজেছিল, চোখদুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল।

মিষ্টার সেন চেয়ারে এসে বসলেন। এমন কত অপরিচিত যুবক তাঁর কাছে চাকরির জন্য আসে। তিনি ক'রেও দিয়েছেন অনেকের; এরও হয়ত ক'রে দিতেন। কিন্তু, কেমন অপমানজনক বোধ হ'ল ওই 'গগনবাবু' সম্বোধনটা। কান তাঁর ত্রিশ বছর ধরে শুনে আসছে, হয় মিষ্টার সেন, নয় সেন সাহেব। সই করেন তিনি জি. সেন বলে। গগন নামটা তিনি ভুলেই গেছেন। আর ঐ নামে ডাকবার সাহসই বা হবে কার?

দোরের কাছে জুতোর শব্দ শোনা গেল, বল্লভ এসেছে। অনেক কষ্টে এনেছে ভীষণ এক গুপ্ত খবর। রাত্রেই পাট কেনা চাই, যত গাঁট ইচ্ছে, কালই বাজার চড়ে যাবে। অন্ততঃ গাঁট পিছু দেড় টাকা। বল্লভ আজ পর্য্যন্ত কখনও বাজে খবর দেয় নি, ওর ওপর বিশ্বাস আছে। মিষ্টার সেন উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

'চল, এখনই যাওয়া যাক্।'

ঝুঁকে পড়ে, গলার স্বরটা একটু নীচু ক'রে বল্লভ বলে, 'এক জায়গা থেকে কিনলে ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে যাবে—কম কম ক'রে কিনতে হবে, জানতে না পারে। আজ ফাট্‌কা বাজার বন্ধ হয়েছে একচল্লিশ টাকা দু-আনা।'

মিষ্টার সেন বল্লভকে নিয়ে মোটরে উঠলেন।

বল্লভ ঠিকই বলেছিল, পরদিন অপ্রত্যাশিতভাবে লাভ হ'ল পাটের বাজারে। বেলা চারটের পরে পাটের

কি চমৎকার নাম! আবৃত্তি করলে ঘুম পায়, চোখদুটি নিদ্রা-মদির আলস্যে আপনি বুজে আসে। অন্যমনস্ক হয়ে মিষ্টার সেন কয়েক পা এগিয়ে গেলেন, আবার কি ভেবে ফিরে এলেন সেইখানে। আবছা, আঁধারে সেই নুয়ে-পড়া সজনে-ডালের তলায় দাঁড়িয়ে তিনি চোখ বুজে আবৃত্তি করলেন, 'সাগর, সাগর!' মিষ্টার সেন মনে মনে ভাবেন, ছেলেবেলায় তিনিও হয়ত অমনি ছিলেন,—অমনি ময়লা-ময়লা রং, গোলগাল চেহারা, হৃষ্টপুষ্ট শরীর। কালো রঙের একটি প্যাণ্ট পরে অমনি করে দিদিকে ফাঁকি দিয়ে তিনিও বোধ হয় পালিয়ে বেড়াতেন। ছেলেবেলার ফটো তাঁর নেই,—যাঁদের স্মৃতির পাতায় সে ছবির ছাপ ছিল তাঁরা কেউই আজ নেই।

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল ঝম্ ঝম্ করে।

মিষ্টার সেনের ভ্রূক্ষেপ নেই। ভিজতে ভিজতে মন্থরপদে গলি পার হয়ে তিনি বড় রাস্তায় উঠলেন। সোফার দ্রুতপদে এসে তাঁর মাথায় ছাতা ধরলে, অপরাধীর মত মোটরের দরজা খুলে কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়াল। গাড়ীতে উঠে মাথাটি কাত করে শরীরটাকে তিনি এলিয়ে দিলেন। গাড়ী ছুটল কলকাতার দিকে। গত ত্রিশ বছরের মধ্যে একটা দিনও মিষ্টার সেন ক্লান্তি অনুভব করেন নি। কিন্তু আজ, যেন এতদিনের সঞ্চিত সমস্ত শ্রান্তি-ক্লান্তি এক সঙ্গে নেমে এসেছে তাঁর দেহে, মনে, উৎসাহে। মিটিং? কি হবে মিটিঙে গিয়ে? দেরি হয়ে গেছে? যাক্। চিরকালই ত সময়ে হাজির হয়েছেন, আজ না-হয় একটু ব্যতিক্রম ঘটল, দেরিই হ'ল। মিষ্টার সেন চোখ বুজে শুনতে লাগলেন বৃষ্টিধারার ঝমঝম শব্দ। সেই অবিশ্রান্ত বারিপাতের শব্দ ছাপিয়ে শোনা যায় অস্পষ্ট ডাক, বহুদূর হতে কে যেন ডাকছে, 'সাগর, সাগর!'

বৃষ্টির ছাটে মিষ্টার সেনের সমস্ত মাথাটা ভিজে যায়, চুলের ডগা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে জল ঝরে পড়ে। বিস্মৃতির অস্পষ্ট ছায়াচ্ছন্ন স্বপ্নরাজ্য থেকে গীতিকবিতার মত সুললিত ছন্দে তাঁরই ডাকনাম ধরে কে যেন ডাকে, বলে, 'সাগর, আয় না ভাই, সন্ধ্যে হয়ে গেল যে!'

শুনতে শুনতে তাঁর ঘুম আসে। মোটরের দুর্জ্জয় গতি, দুঃসহ বারিবর্ষণ, ভয়াবহ বিদ্যুৎবিকাশ—এ সমস্ত উপেক্ষা করে গভীর প্রশান্তিতে, মিষ্টার সেন চলন্ত মোটরে শুয়েও ঘুমিয়ে পড়েন। ত্রিশ বছরের কর্ম্মব্যস্ত জীবনে আজ ক্লান্তি এসেছে, এত বড় সুবিস্তৃত জগৎ তাঁর কাছে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

দুপুরে

শ্রীফাল্গুনী রায়

মদির দুপুরে অধীর ঘুঘুর করুণ মিনতি ভাসে,
নদীর বাতাস ছাড়ে প্রশ্বাস কাপাস-বনের ফাঁকে,
মেঘলেশহীন রুক্ষ আকাশ হাহা ক'রে যেন হাসে,
—কাহার নূপুর রণিয়া রণিয়া বাজিছে পথের বাঁকে!
বালির চরেতে শালিখের মেলা—মালিক তাহার নাই,
শুষ্ক মরুতে তাহারা স্নিগ্ধ কালো মেঘ এক ফালি,
যখন স্বপন নয়ন টুটিয়া ছুটিয়া যায় গো ভাই
বুলায় কে-যেন স্বপন-কাজল তাতল চোখেতে খালি!
ফলসার বনে জলসা বসেছে ক্লান্ত কাকের দলে,
বালকেরা খেলে বনের আড়ালে, বাড়ীতে,
থাকে না কেউ,
দীঘির তীরেতে তিতির পাখীরা পাখা ঝাড়ে পলে পলে,
চাতকেরা মরে চীৎকার ক'রে—গায়ে ঝলে রোদ-ঢেউ!
ঝিলের ওধারে বিলের ওপারে চিলের পরাণ কাঁদে,
সঙ্গী তাহার কোথায় গিয়াছে, কত দূর নাহি জানা,
একেলা একেলা খুঁজিয়া ফিরিছে কেহ নাই তার সাথে
আর না পারে সে, কান্না-বিবশ অবশ তাহার ডানা!
কামারশালাতে লোহা ও হাপরে চলিছে কাজের খেলা—
আমার হেথায় কাজ নাই হায়—লাজ লাগে শুধু তাই,
কি যে করি আজ এমন মদির অলস দুপুর বেলা—
জানি না নিজেই, জানি নাকো হায়, কি যে আমি
আজ চাই!

উদ্ভিদের পরাগনিষেক-প্রক্রিয়ার কৃত্রিম উপায়

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রজনন-ব্যাপারে উদ্ভিদ ও প্রাণী সাধারণতঃ একই নিয়মে পরিচালিত হইয়া থাকে। ফুলই উদ্ভিদের প্রজনন-যন্ত্র। ফুলের আকৃতি- ও প্রকৃতি- গত পার্থক্য হইতেই উদ্ভিদের স্ত্রীপুরুষ নির্ণীত হইয়া থাকে। প্রাণিজগতের ন্যায় উদ্ভিদজগতেও স্ত্রী ও পুং প্রজনন-কোষ সাধারণতঃ বিভিন্ন গাছে অথবা একই গাছে বিভিন্ন ফুলে পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে একই ফুলের ভিতর বিভিন্ন অঙ্গে স্ত্রী ও পুং প্রজনন-কোষ পৃথক ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। তাল, পেঁপে প্রভৃতি ফলের স্ত্রী ও পুরুষ গাছ সম্পূর্ণ পৃথক। ইহাদের পুরুষ-গাছে পুং-পুষ্প এবং স্ত্রী-গাছে স্ত্রী-পুষ্পই ফুটিয়া থাকে। কখনও কখনও ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলেও তাহা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ছাড়া আর কিছুই নহে। এক জাতের তাল গাছ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে তাল ফলে না, কেবল কতকগুলি জটা বাহির হয়। এই জটার গায়ে ক্ষুদ্রাকৃতি অসংখ্য ফুল ফুটিয়া থাকে। ইহারাই তালের পুং-পুষ্প। যে-গাছে তালের কাঁদি নামে তাহাই স্ত্রীজাতীয় গাছ। পুং-পুষ্প না থাকিলে তালগাছে তাল ফলিত না। ঝিঙে, পটলেরও সাধারণতঃ স্ত্রীপুরুষজাতীয় বিভিন্ন উদ্ভিদ দেখা যায়; অবশ্য, অনেক সময় ইহার ব্যতিক্রমও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। লাউ, কুমড়া প্রভৃতি ফলের স্ত্রী ও পুং পুষ্প একই গাছে বিভিন্ন অঙ্গে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। গাছের গোড়ার দিকে প্রত্যেক পত্রগ্রন্থি হইতে প্রথমে এক-একটি পুং-পুষ্প বাহির হয়, পরে ডগার দিক হইতে স্ত্রী-পুষ্প আত্মপ্রকাশ করে। আনারস, বেগুন, কলা প্রভৃতির স্ত্রী ও পুং কোষ একই ফুলে সম্মিলিত ভাবে জন্মিয়া থাকে। পুরুষ-ফুলের অভ্যন্তরস্থ এক বা একাধিক বোঁটা বা শুঁয়োর আকার দণ্ডের অগ্রভাগে অতি সূক্ষ্ম চা-খড়ি বা হলুদ-চূর্ণের মত এক প্রকার পদার্থ লাগিয়া থাকিতে দেখা যায়। ইহাদিগকে ফুলের রেণু বা পরাগ বলে। ইহারাই ফুলের পুং-প্রজনন কোষ। পুং-পুষ্পের অভ্যন্তরস্থ বোঁটা বা শুঁয়োর আকৃতিবিশিষ্ট যন্ত্রগুলিকে পরাগকেশর এবং স্ত্রীপুষ্পের অভ্যন্তরস্থ দণ্ডগুলিকে গর্ভ-কেশর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। বিভিন্ন জাতীয় স্ত্রী-পুষ্পের অভ্যন্তরে বিভিন্ন আকারের গর্ভকেশর থাকে। পুরুষ-ফুলের রেণু কোন গতিকে উহার উপর পড়িলে এক প্রকার আঠালো পদার্থের সাহায্যে তাহার গায়ে আটকাইয়া যায়। ইহাই ফুলের পরাগনিষেক প্রক্রিয়া। স্বাভাবিক ভাবে বিভিন্ন উপায়ে এই পরাগনিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। জল, বাতাস, পিপীলিকা মৌমাছি প্রভৃতির সাহায্যে বৃক্ষের পরাগনিষেক-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। পরাগনিষেক প্রক্রিয়ায় প্রাণীদের সাহায্য লইবার উদ্দেশ্য হইতেই না কি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফুলের মধু, ফুলের বাহার ও বৈচিত্র্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক নির্বাচনে অভিব্যক্তির ধারানুযায়ী আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সে যাহাই হউক, প্রজাপতি, মৌমাছি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয়

কুমড়ার স্ত্রীপুষ্প। পুষ্পের পাপড়িগুলি অর্দ্ধেক ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে। মধ্যস্থানের কালো রঙের পিণ্ডগুলি গর্ভকেশর। ইহাদের গায়েই পুং-পুষ্পের রেণুগুলি লাগিয়া থাকে।

কুমড়া-ফুলে পরাগ নিষেক করিবার কৃত্রিম উপায়। বামদিকে "প" চিহ্নিত পুং-পুষ্পের বোঁটা। পুং-পুষ্পের পাপড়িগুলি ছিঁড়িয়া হলুদে রঙের পরাগ-কোষটি ধীরে ধীরে স্ত্রীপুষ্পের মধ্যস্থিত লাল পিণ্ডগুলির গায়ে লাগাইয়া দিতে হয়।

দক্ষিণেরটি পুরুষ-পুষ্প। বামের স্ত্রীপুষ্পটিকে প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে কৃত্রিম উপায়ে পরাগ নিষেক করা হইয়াছে।

কৃত্রিম উপায়ে পরাগ নিষেক করিবার প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার পর ফলের বোঁটাটি নীচের দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে।

কীটপতঙ্গ মধুর লোভে ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়ায়। মধু আহরণ করিবার সময় পুং-পুষ্পের রেণু তাহাদের গায়ে লাগিয়া যায়। সেই অবস্থায় ইহারা যখন স্ত্রী-ফুলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন আঠালো পদার্থ সংযুক্ত পিণ্ডাকৃতি গর্ভকেশরে রেণু সংলগ্ন হইয়া যায়। সেই সব ফুলের মধ্য হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয় বা যাহাতে মধু নাই সেই সব ফুলে সাধারণতঃ বাতাসের সাহায্যে পরাগনিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিভিন্ন জাতীয় জলজ উদ্ভিদের স্ত্রী ও পুং পুষ্প একই সময়ে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং জলের ঠিক উপরিভাগে কতকটা অর্দ্ধনিমজ্জিত ভাবে প্রস্ফুটিত হয়। তখন পুং-পুষ্পের রেণু জলে ভাসিয়া স্ত্রী-পুষ্পের গাত্রসংলগ্ন হইয়া থাকে।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, গাছে যথেষ্ট পরিমাণ ফল ধরা সত্ত্বেও তাহারা পরিপুষ্ট হয় না অথবা অকালে ঝরিয়া পড়ে। স্বাভাবিক ভাবে পরাগনিষিক্ত না হওয়ার ফলেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। আনারস ও কাঁঠালের কোষসমূহ এবং লাউ, কুমড়া, শশা, বেগুন প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের স্ত্রীজাতীয় স্ত্রী-পুষ্প যথোপযুক্ত ভাবে পরাগনিষিক্ত না হইলে কোন কোন অংশ পরিপুষ্ট এবং কোন কোন অংশ অপরিপুষ্ট থাকিয়া যায়; তাহাতে গঠনসৌষ্ঠব লক্ষিত হয় না। কৃত্রিম উপায়ে পরাগ নিষেক করিলে অনেক স্থলেই সুফল পাওয়া যাইতে পারে. নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়া ও কৃত্রিম উপায়ে পরাগ-সঙ্গম ঘটাইয়া প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ-যাদুকর লুথার বার্ব্বাঙ্ক উদ্ভিদজগতে যে কি অঘটন ঘটাইয়াছেন, তাহা উদ্ভিদ- ও কৃষি-বিজ্ঞানে অনুরাগী ব্যক্তি-মাত্রই অবগত আছেন। ব্যাপকভাবে না হউক, অন্তত খণ্ড খণ্ড ভাবেও এই প্রণালী অনুসরণ করিলে আমাদের দেশে কৃষিকার্য্যে যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হইত।

গাছে ফল ধরিলে কি উপায়ে তাহাকে অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়া পরিপুষ্ট করিয়া তোলা যাইতে পারে, এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

লাউ, কুমড়া প্রভৃতি গাছ লইয়াই প্রথমে কাজ আরম্ভ করা সুবিধাজনক; কারণ ইহাদের ফুলগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের হইয়া থাকে। বিশেষতঃ স্ত্রী ও পুং পুষ্পের পার্থক্যও অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কুমড়াগাছে প্রথম যে ফুল ফুটিতে আরম্ভ করে, সেগুলি পুং-পুষ্প। পুং-পুষ্প সরু লম্বা বোঁটার ডগায় কলকের মত ফুটিয়া থাকে। ফুলের অভ্যন্তরে প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা হলদে রঙের একটি দণ্ড থাকে। তাহার গায়ে হাত দিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, হলদে রঙের এক প্রকার মিহি চূর্ণ হাতের সঙ্গে লাগিয়া আছে। ইহাই কুমড়া-ফুলের রেণু বা পরাগ। স্ত্রী-পুষ্পের আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং বোঁটা অনেক ছোট কিন্তু মোটা। বোঁটার প্রান্তভাগে ছোট একটি কুমড়া লইয়াই ফুল বাহির হয়। এই ছোট কুমড়াটির শেষ প্রান্তেই স্ত্রী-পুষ্প ফুটিয়া থাকে। স্ত্রী-পুষ্পের অভ্যন্তরে হলদে অথবা লাল রঙের মোটা মোটা কয়েকটি পিণ্ডাকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। পিণ্ডগুলির গায়ে হাত দিলেই বুঝা যাইবে ইহারা এক প্রকার

কাঁঠালগাছের ফুল ও ফল। বোঁটার উপরে দক্ষিণ দিকেরটি পুং-পুষ্প। কাঁঠালের গায়ের প্রত্যেকটি কাঁটাব মাথায় অতিক্ষুদ্রাকার এক-একটি স্ত্রী-পুষ্প ফুটিয়া থাকে।

কলার ফুল। মোচার উপরেব দিকে সজ্জিত অপরিপুষ্ট কলার মাথায় দিয়াশলাইয়ের কাঠির মত এক-একটি গর্ভকেশর বাহির হইয়া আছে। উহাদের গোড়ার দিকে রেণুসমন্বিত পুংকেশর ঢাকনায় আবৃত।

চট্‌চটে আঠালো পদার্থে আবৃত। যে-কোন গাছ হইতে একটি পুং-পুষ্প বোঁটাসমেত ছিঁড়িয়া লইয়া ফুলের পাপড়িগুলি ফেলিয়া ভিতরের হলুদে দণ্ডটি বোঁটার সঙ্গেই রাখিয়া বোঁটায় ধরিয়া অতি ধীরে ধীরে স্ত্রী-পুষ্পের অভ্যন্তরস্থ পিণ্ডাকৃতি স্থানগুলিতে ছোঁয়াইয়া দিলেই ঐ রেণু তাহাদের গাত্রসংলগ্ন হইয়া যাইবেই। ইহাই পরাগসঙ্গম-প্রক্রিয়া। কুমড়া-ফুল প্রাতঃকালে ফুটিয়া থাকে এবং প্রায় তিন-চার ঘণ্টা পর্য্যন্ত সতেজ থাকে, দিবালোকের প্রখরতা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা ক্রমে মুদিত হইয়া পড়ে। কাজেই নিস্তেজ হইয়া ঢলিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই পরাগনিষেক করিতে হয়। ফুল ফুটিবার পর প্রায় ঘণ্টাখানেক সময়ের মধ্যে এইরূপে পরাগসঙ্গম করাইয়া দিলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সুফল লাভ হইবে। স্ত্রী-পুরুষ উভয় পুষ্পই ফুটিবার সময় ঊর্দ্ধমুখী হইয়া থাকে। পরাগ-সঙ্গমের পর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিলে দেখা যাইবে মুদিত ফুল-সমেত ছোট কুমড়াটি ক্রমেই যেন নীচের দিকে বাঁকিয়া আসিতেছে। প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা পরে বোঁটাসমেত ফলটিকে পরিষ্কার ভাবে নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িতে দেখা যাইবে। রেণু লাগাইয়া দিবার পর ফলটি এরূপে নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে—যথাযথ ভাবেই পরাগ নিষিক্ত হইয়াছে, এবং ফল অতি দ্রুতগতিতে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে। ফুল না ছিঁড়িয়াও পাখীর পালক বা কোমল তুলি দিয়া পুং-পুষ্প হইতে রেণু তুলিয়া স্ত্রী-পুষ্পে লাগাইয়া দিলেও কাজ চলিবে।

একবার বিক্রমপুর অঞ্চলে এক কৃষকের কৃষিক্ষেত্র দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন শীতের মধ্যভাগ। কিছু দিন ধরিয়া রোজই সকালবেলা কুয়াশা হইতেছিল। দেখিলাম অন্যান্য শাক-সব্জী ব্যতিরেকে প্রায় ত্রিশ হাত লম্বা ও প্রায় পনর হাত চওড়া এক খণ্ড জমিতে অনেক কুমড়াগাছ জন্মিয়াছে। এই জমিখণ্ডে কেবল কুমড়াগাছই রোপণ করা হইয়াছিল। প্রত্যেক গাছই সবল ও পরিপুষ্ট এবং লতাপাতা বিস্তার করিয়া সমগ্র ক্ষেত্রখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। কুমড়াসহ স্ত্রী-পুষ্প এবং অজস্র পুং-পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। কিন্তু জমির মালিক বলিল, ফুল ফুটিলে কি হইবে—এপর্য্যন্ত একটা কুমড়াও ধরে নাই, সবই অকালে ঝরিয়া পড়িতেছে। তখন সমস্ত খবর লইয়া বুঝিলাম—যে-সময় ফুল ফোটে সেই সময় এবং তাহার পর অনেক ক্ষণ অবধি কুয়াশা থাকায় একটাও মৌমাছি বা অন্য কোন কীটপতঙ্গ বাহির

হয় না। আরও অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, অনেক বেলায় মৌমাছিরা ফুলের মধু খাইতে আসে—তখন ফুলের সতেজ অবস্থা থাকে না। তখন আমি কতকগুলি স্ত্রী-পুষ্প চিহ্নিত করিয়া তাহাতে পুং-পুষ্পের রেণু লাগাইয়া দিলাম। পরদিন গিয়া দেখিলাম সকলগুলি ঘুরিয়া মাটির দিকে নামিয়াছে। তার পর তাহাকে রেণু প্রয়োগ করিবার প্রণালী দেখাইয়া দিয়া আসিলাম। কিছু দিন বাদে গিয়া শুনিলাম কৃত্রিম উপায়ে পরাগনিষেক করিয়া সে অতি আশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়াছে। প্রত্যেকটি গাছে দুই-একটি ব্যতীত প্রায় অধিকাংশ কুমড়াই বেশ বড় হইয়াছে।

কলার ফুল উভলিঙ্গ, স্ত্রী ও পুং পুষ্প একই সঙ্গে থাকে। স্ত্রী-গর্ভকেশর দিয়াশলাইয়ের কাঠির মত। মাথায় ছোট্ট একটি গোলাকার পদার্থ আছে তাহা এক প্রকার আঠালো পদার্থে আবৃত। পুংকেশরের রেণু, ফলের শেষ প্রান্তে, একটি ক্ষুদ্র খোলায় আবৃত থাকে। রেণু পরিপক্ব হইলে আপনা আপনি নীচের দিকে ঝরিয়া পড়িবার সময় গর্ভকেশরের আঠালো পদার্থে লাগিয়া যায়। অনেক সময় বোলতা বা মৌমাছিদের দ্বারাও পরাগসঙ্গম ঘটিয়া থাকে।

কাঁঠালের স্ত্রী ও পুং পুষ্প একটু অদ্ভুত ধরণের। যন্ত্রসাহায্য-ব্যতিরেকে ইহাদের ফুল মোটেই দৃষ্টিগোচর হয় না। যে ফলগুলি বেশ বড় বড় আকারের ও প্রায়শই গাছের নীচের দিকে ফলিয়া থাকে, উহারাই স্ত্রীপুষ্পসমন্বিত কাঁঠাল। উহাদের গায়ের কাঁটাগুলি বেশ উন্নত ও সুতীক্ষ্ণ। বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখিলে প্রত্যেকটি কাঁটার মাথায় সূক্ষ্ম শুঁয়োর মত এক-একটি ফিকে সবুজ রঙের তন্তু দেখা যাইবে। ইহারাই কাঁঠালের গর্ভ-কেশর। প্রত্যেকটি কাঁটাই এক-একটি আলাদা আলাদা ফুলের অংশবিশেষ। সাধারণতঃ গাছের অনেক উপরের অথবা স্ত্রী-পুষ্পের বোঁটার উপরের দিকে ভিন্ন রকমের এক প্রকার সরু বোঁটা-সংযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁঠাল দেখা যায়। ইহাদের গায়ের কাঁটাগুলি উন্নত নহে, অপেক্ষাকৃত মসৃণ। ইহারাই কাঁঠালের পুং-পুষ্প। ইহাদের গায়ে ফিকে হলুদে রঙের এক প্রকার মিহি চূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলিই পুং-পুষ্পের রেণু। রেণু পরিপক্ব হইলেই ঝরিয়া নীচে পড়ে এবং নিম্নস্থিত স্ত্রী-পুষ্পে সংলগ্ন হইয়া পরাগসঙ্গম হইয়া থাকে। পুং-পুষ্পগুলি ছিঁড়িয়া লইয়া রেণুগুলি স্ত্রী-পুষ্পের গায়ে ঝাড়িয়া দিলে সকল কোষগুলিই সমান ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

আনারসের গায়ে যে অসংখ্য কাঁটা থাকে তাহার মধ্যে ছোট ছোট নীল রঙের ফুল ফুটিয়া থাকে। ফুলগুলি উভলিঙ্গ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক জাতীয় পিপীলিকা মধুর লোভে আনারসের গায়ের উপর ঘোরাফেরা করে। রেণু তাহাদের গাত্রসংলগ্ন হইয়া ফুলের গর্ভ-কেশরে লাগিয়া যায় এবং প্রত্যেকটি কাঁটার চতুর্দ্দিকস্থ স্থানগুলি পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

[প্রবন্ধের চিত্রগুলি লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত]

মেলার দৃশ্যাবলী

শ্রীশৈলেশ দেববর্ম্মা

ফলতা বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে ষ্ট্রবেরির চাষ

অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র নাগ

ষ্ট্রবেরি সাধারণতঃ শীতপ্রধান দেশের ফল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলেও উহার ফলন দেখা যায়। ভারতবর্ষে দেরাদুন, মসুরী এবং অন্যান্য পার্ব্বত্য অঞ্চলে উহা পাওয়া যায়। মনে আছে, প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মাবকাশের পর, জুন মাসের শেষভাগে মসুরী হইতে ফিরিবার সময় লেডী অবলা বসু ষ্ট্রবেরি হইতে প্রস্তুত আধ মণ খাদ্য সঙ্গে লইয়া আসেন।

ষ্ট্রবেরি খাইতে বেশ সুস্বাদু। এক কলিকাতা শহরেই বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকার ষ্ট্রবেরি টিনের কৌটায় করিয়া বিদেশ হইতে আমদানি হয়। সাধারণের বিশ্বাস, কলিকাতায় বা তাহার উপকণ্ঠে ষ্ট্রবেরি জন্মায় না। অনেক সময় মনে হইয়াছে, কলিকাতায় ষ্ট্রবেরির চাষ করিয়া দেখিলে হয়। কথায় কথায় বন্ধুদের সঙ্গে আলাপে এ-কথার উত্থাপন হইলেও কখনও কাহারও আশাপ্রদ উৎসাহ অনুভব করি নাই। অথচ মনে হইয়াছে, হয়ত বহু বিফলতার ভিতর দিয়াই এক দিন সফলতা আসিতে পারে। তাই ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নবেম্বর দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিবার সময় বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের মায়াপুরীস্থিত "বাজাজ"-শাখা হইতে ২৭টি ষ্ট্রবেরি চারা-গাছ লইয়া রওনা হই এবং পরদিন সেগুলি কলিকাতা বসু-বিজ্ঞান-মন্দির হইতে প্রায় ৩২ মাইল দূরবর্ত্তী ফলতা-শাখার জমিতে রোপণ করি। এই চারাগুলি ছিল দার্জ্জিলিং ঘুম্ হ্রদের পার্শ্বস্থিত জঙ্গলী ষ্ট্রবেরি। এই জাতীয় ষ্ট্রবেরি সাধারণতঃ আকৃতিতে গোল এবং আকারে ছোট। এন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায় এই জাতীয় ষ্ট্রবেরির আকৃতি এবং আকার চিত্রিত আছে। তৎসঙ্গে ষ্ট্রবেরি গাছের প্রকৃতি ইত্যাদি আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে।

ফলতা বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে গবেষক-নিবাস

ফলতায় ১৯৩৭ সালে রোপিত বন্য ষ্ট্রবেরি

ঠিক দেড় মাস পরে ডিসেম্বর মাসের ২০শে তারিখে প্রথম ছয়টি পরিপক্ব ফল আনিয়া আচার্য্য বসু ও লেডী বসুর নিকট উপস্থিত করি। ফল কয়টি দেখিতে সুন্দর হইলেও আকারে ছোট বলিয়া আমার আশানুরূপ হয় নাই। তথাপি লেডী বসু সম্ভবত আমাকে উৎসাহিত

ফলতার পরীক্ষণ-মন্দির

করিবার জন্যই একটি ফল তৎক্ষণাৎ মুখে দিয়া বলিলেন, "বাঃ বেশ সুস্বাদু ত।" পরে জানিয়াছিলাম, আচার্য্য বসুও তাহার কয়েকটি আস্বাদ করিয়াছিলেন। ইহার পর আরও দু-চার বার পাঁচ-ছয়টি করিয়া ফল আনিয়া দিয়াছি। শীতপ্রধান দেশে জুন মাসেই ষ্ট্রবেরি ফল পাকিয়া থাকে। ফলতায় দেখিলাম বৎসরে দুই বার ফলন হইল; অন্ততঃ গত বৎসরে তাহাই হইয়াছে। প্রথম বার ডিসেম্বর হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এবং পরে আবার জুন-জুলাই মাসে।

ঐ ষ্ট্রবেরি ফল ও ফলন আমার আশানুরূপ না-হওয়ায় আমি আমার দার্জ্জিলিং টাউনএণ্ড-প্রবাসী বন্ধু ও বহু বিষয়ে সহায়ক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়কে জার্ম্মেনী হইতে ভাল বীজ আনাইতে অনুরোধ করি। তদনুসারে তিনি মায়াপুরী বাগানে জার্ম্মেন বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করেন। তাহার কতক চারা গত ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের ১৫ই তারিখে দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় আনিয়া ১৬ই তারিখে ফলতায় রোপণ করি।

উক্ত জার্ম্মেন-জাতীয় চারাগুলি নবেম্বর মাসের শেষ ভাগেই ফলপ্রসূ হয়। এই ফলগুলি একটু লম্বাটে-ধরণের এবং দেখিতে অতিশয় মনোরম হইলেও আকারে পূর্ব্ব-বৎসরের দার্জ্জিলিং-ফলতার ফলের মতই ছোট। গাছের পাতার রঙ কিছু হাল্কা সবুজ। মার্চ্চ মাস পর্য্যন্তও ফল ও ফুল হইতেছে এবং ফলন হিসাবেও সন্তোষজনক।

ইতিমধ্যে পূর্ব্ব-বৎসরের দার্জ্জিলিঙের চারাগুলি ফলতার গ্রীষ্ম ও অতিবৃষ্টি কাটাইয়া উঠিয়া বেশ সতেজ গাঢ় সবুজ এবং বাড়ন্ত দেখাইতেছিল। অধিকন্তু এই এক বৎসরে ধাবক বা লতানিয়া ডগা হইতে ১৮টি নূতন চারার উদ্ভব হইয়াছে দেখা গেল। নবেম্বর মাসে যখন জার্ম্মেন-চারাগুলি পরিপক্ব ফল দিতেছিল, তখন পর্য্যন্ত দার্জ্জিলিং-চারার পুষ্পোদ্গম হয় নাই। ডিসেম্বরের শেষের দিকে, এমন কি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে ফুল ও ফলগুলি যেন অতি ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতেছিল। যাহা হউক, এবারের ফুল ও ফল বেশ বড় বড় এবং যথেষ্ট পরিমাণে হইতেছিল। ক্রমে গত বৎসরের তুলনায় ফলগুলি আকারে এবং ওজনে পাঁচ হইতে সাড়ে সাত গুণ বেশী দেখা যায়। গত বৎসর সাধারণতঃ এক-একটি ফলের ওজন এক তোলার এক-দশমাংশের বেশী হইত না। এবারে কিন্তু একটি ফল এক তোলার সাত-দশমাংশেরও বেশী দেখা গিয়াছে। এক-একটি চারাতে কুড়ি হইতে চল্লিশ-পঞ্চাশ কি তাহারও বেশী ফল দিতেছে।

উৎসাহান্বিত হইয়া এক দিন ফলতা হইতে ফিরিবার পথে কলিকাতা রয়্যাল এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির সেক্রেটরী ল্যাঙ্ক্যাষ্টার সাহেবকে কয়েকটি ষ্ট্রবেরি (ও সাদা তুঁত) ফল দেখাই। তিনি ফলগুলি দেখিয়া খুব প্রশংসা করেন এবং ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারির পুষ্প-প্রদর্শনীতে দুই-চারিটি ফুল ও ফলসহ ষ্ট্রবেরির চারা দিতে অনুরোধ করেন। আমি তদনুযায়ী ১৮ই ফেব্রুয়ারির পূর্ব্বাহ্ণে একটি ফুলফলসহ জার্ম্মেন চারা এবং আরও দুইটি বিভিন্ন পাত্রে তিনটি দার্জ্জিলিং-ফলতার চারা (এক-একটি চারাতে প্রায় ৪০-৫০টি করিয়া ফুল) ও ফল দিয়া আসি। ল্যাঙ্ক্যাষ্টার সাহেব সেগুলি পাইয়া এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ সেগুলি নিজের আপিস-ঘরে লইয়া যাইতে আদেশ দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মালীদের সতর্ক করিয়া দেন যেন সেগুলি কোনরূপে নষ্ট না হয়।

তাহার পরের ঘটনা ল্যাঙ্ক্যাষ্টার সাহেবের চিঠি হইতে বুঝা যাইবে।

The Royal
Agricultural & Horticultural Society of India.
Calcutta, 21st Feb. 1938.

Dear Professor Nag,

In spite of all the care taken of your Exhibits I am sorry to report that some vandal thief, taking advantage of the closing of the Show, pulled two of your Strawberry plants out by the roots. There was no sense in robbing material which could not be eaten and would not survive but it shows the mentality of some people.

I am very sorry about the matter and trust you will not be very angry at my failure to keep thieving hands from the strawberries.

Yours sincerely,
S. Percy Lancaster

আসল কথা, জার্মেন বীজের চারাটি এবং অন্য তিনটির দুইটি চারা ফলফুলসহ চুরি গিয়াছে। তাহাতে আমি দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, বুঝিতে পারিতেছি কোন সমজদার লোক বা লোকেরা লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। যে-চারাটি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার উপরেও হস্তক্ষেপ হইয়াছিল, কিন্তু সময়ের সঙ্কীর্ণতায় সম্ভবতঃ তাহা

কলিকাতা প্রদর্শনী হইতে ষ্ট্রবেরি গাছ চুরি যায়, শুধু এই গাছটি অবশিষ্ট থাকে তবে এটিরও ফল-ফুল কিছুই বিশেষ বাকী নাই।

রহিয়া গিয়াছে। যেটি রহিয়া গিয়াছে তাহার আলোক-চিত্র হইতে উহার ও অন্তর্হিত চারাগুলির অবস্থা অনুমেয়। আমার বিশ্বাস (এ-বিষয়ে আমি ল্যাঙ্ক্যাষ্টার সাহেবের সহিত একমত হইতে পারি নাই) যে-চারাগুলি অন্তর্ধান করিয়াছে তাহারা এখনও জীবিত এবং বিশেষ যত্নে সংরক্ষিত আছে, নতুবা শত শত প্রদর্শিত জিনিষের মধ্যে বাছাই করিয়া ঐ তিনটি কেন চুরি যাইবে? ল্যাঙ্ক্যাষ্টার সাহেবকে আমি জানাইয়াছি, "আমি কেবল যে দুঃখিত নহি তাহা নহে, কিন্তু বাস্তবিকই আহ্লাদিত যে আমার প্রদর্শিত চারাগুলি কার্য্যতঃ এরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে।"

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের পূর্ব্বাহ্নে ফলতায় সংগৃহীত পরিপক্ক ফলের একটি তিন-রঙা ছবি দেওয়া হইল। ইহার ফলগুলি আকারে আসল ফলের আকার হইতে এক-ষোড়শাংশ ছোট। চিত্রের ব্লকটির বিশেষত্ব এই যে, ইহা আসল ফল হইতে প্রস্তুত—কোন অঙ্কিত চিত্র হইতে নহে। ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানী আমারই নির্দ্দেশ অনুসারে এই ব্লকগুলি সাক্ষাৎভাবে ফল হইতে প্রস্তুত করিয়াছেন।

কলিকাতার কোন সংরক্ষিত ফল আদি বিক্রয়ের দোকানের ম্যানেজারের কাছে খোঁজ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি ফলতার ষ্ট্রবেরি আস্বাদন করিয়া এবং তাহার আকার দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেইখানে একটি ইংরেজ মহিলাও এই ষ্ট্রবেরি আস্বাদন করিয়া বলিলেন, "You don't mean to say that these were grown here?" "আপনারা নিশ্চয়ই বলিতে চান না যে, এগুলি এখানে উৎপাদিত হইয়াছে?" তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল হয়ত কোনও বরফ দ্বারা রক্ষিত ফলের ভাণ্ডারে অন্য দেশ হইতে আনাইয়া তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চনা করা হইতেছে।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের গবেষণার ফলে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। কৃষির উন্নতিসম্পর্কেও অধুনা গবেষণা চলিতেছে। কোন কোন কার্য্যে সফলতার আভাস পাওয়া যাইতেছে। যথোপযুক্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কোন কোন অনুর্ব্বর জমি উর্ব্বর

করা হইতেছে। কাবুলী ছোলা, বড় মটর, সয়া শিম, বিলাতী বেগুন ইত্যাদির ফলন দেখিলে আনন্দিত হইতে হয়। গত আগষ্ট মাসে কুমিল্লা হইতে আনীত আনারসের চারা এই কয় মাসের মধ্যেই ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ফলতায় বিলাতী বেগুনের ক্ষেত

যাহা হউক, আমি ফলতায় ষ্ট্রবেরি সম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বন করিয়াছি, তাহার আভাস দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট এবং প্রস্থে তিন ফুট জমিতে ২৭টি চারা রোপণ করি। জমিটির মাটি বেশ ঝুরঝুরে করিয়া লওয়া হইয়াছিল। জমিটি প্রাতঃসূর্য্যের আলোক ও রৌদ্র পায়। মধ্যাহ্নকালে উহা খর রৌদ্রতাপ হইতে অন্য বড় বড় বৃক্ষের ছায়া দ্বারা রক্ষিত হইয়াছে। জমি সর্ব্বদাই একটু একটু ভিজা রাখা হয়। সার-হিসাবে কাঁচা গোবর, জলের সঙ্গে অতীব পাতলা করিয়া মাঝে মাঝে (মাসে এক বার কি দুই বার ফুলোদ্গমের সময়) দেওয়া হইয়াছে। ফুল ও ফল হইবার সময় এবারে ক্যালসিয়ম ফস্ফেট ও পোট্যাসিয়ম সল্ট তিন চামচ করিয়া অনেকটা জলে মিশাইয়া চারার শ্রেণীবিভাগের মধ্যে মধ্যে দুই বার দেওয়া হইয়াছে। এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া আশাপ্রদ ফল পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা দেশের কৃষির উন্নতিকল্পে ব্রতী আছেন, তাঁহারা ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন এবং উত্তরোত্তর আরও উন্নতি সাধন করিতে পারেন।

ফলতায় সয়া শিমের ক্ষেত
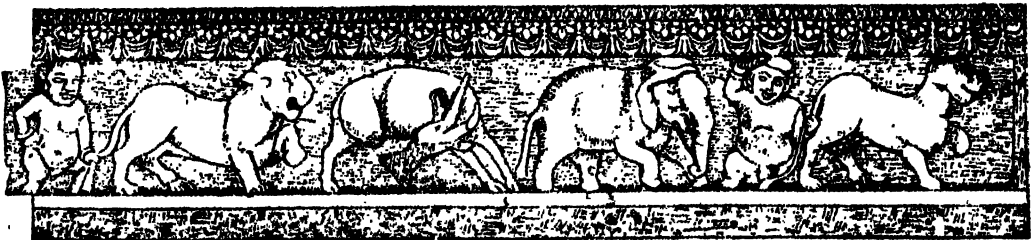
মাটির বাসা

শ্রীসীতা দেবী

১৭

মল্লিক-গৃহিণীর চিঠি লেখার খরচ সম্প্রতি বাড়িয়া গিয়াছে। আগে আগে বাপের বাড়ীতে মাসে খান-দুই, এবং মিনুর কাছে সপ্তাহে একখানা এই ছিল তাঁহার চিঠি লেখার সীমানা। এখন বড় ননদ গিরিজার কাছে, মৃগাঙ্ক-মোহনের কাছে অনেকবার চিঠি লেখা হইতেছে। মৃণাল লিখিয়াছিল, টেষ্ট পরীক্ষা দিবার পরই ঠাণ্ডা লাগিয়া তাহার জ্বর হইয়াছিল, সুতরাং তাহার খবরও এখন সপ্তাহে তিন-চার বার লইতে হয়।

গিরিজা মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের গৃহিণী, ছেলেমেয়ে অনেকগুলি, কুপোষ্যও দু-চারটি আছে, সুতরাং সংসারটি মস্তবড়। তবে বিষয়-সম্পত্তি কিছু আছে, এবং স্বামীও মাঝারিগোছের উপার্জ্জন করিতেন, কাজেই পাড়া-গাঁয়ের মানুষের কাছে তাঁহারা সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তবে মাঝে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহার স্বামী কিছুকালের মত ছুটি লইতে বাধ্য হন, ইহাতে সংসারে একটু টানাটানি পড়ে। এই সময় মৃণালের বিবাহের সম্পর্কে অর্থসাহায্য চাওয়ায় গিরিজা বিপন্ন হইয়া ভাইকে জানাইয়াছিলেন যে সম্প্রতি কিছুই তিনি করিতে পারিবেন না। রুগ্ন স্বামী টাকার নাম শুনিলেই এখন চটিয়া উঠেন, এক্ষেত্রে নিজের বোনঝির জন্য টাকা চাহিতে গিরিজা কোন্ সাহসে অগ্রসর হইবেন?

কিন্তু তাহার পর আবার সুদিন আসিয়াছে। গিরিজার স্বামী আবার কাজে যোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের বড় ছেলেটিও চাকরিতে ঢুকিয়াছে। এ-সকল খবর মল্লিক-গৃহিণী রাখেন। বাপের বাড়ী, শ্বশুরবাড়ী দুই-পক্ষের যত আত্মীয়-কুটুম্ব আছে, সকলেরই তিনি মোটামুটি সংবাদ রাখেন। তাই এবার চিঠি লেখার ভার স্বামীর উপর না ছাড়িয়া দিয়া নিজে গ্রহণ করিয়াছেন। সংসারের কথা মেয়েরা যেমন গুছাইয়া লিখিবে পুরুষমানুষ কি তাহা পারে? তাঁহার নিজের স্বামী গ্রামের মধ্যে কর্ম্মিষ্ঠ মানুষ বলিয়া বিখ্যাত হইলেও, তাঁহার সাংসারিক বুদ্ধির উপর মল্লিক-গৃহিণীর খুব বেশী আস্থা নাই। গিরিজা মা-মরা বোনঝিটিকে খুবই স্নেহ করেন। এমন কি মৃণালের মা মারা যাইবার পর তিনিই তাহার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মল্লিক-গৃহিণীর আগ্রহে মৃণাল তাঁহার ঘরেই রহিয়া গেল। এবার ভাজের প্রথম চিঠি পাইয়া গিরিজা জানাইলেন মৃণালের বিবাহে সাহায্য তিনি করিতে ত খুবই ইচ্ছুক, তবে নগদ টাকা ত এখন হাতে কিছুই নাই। আচ্ছা, কথাবার্ত্তা চলিতে থাকুক, তিনিও ইতিমধ্যে চেষ্টায় থাকিবেন। মল্লিক-গৃহিণী এ-রকম জবাবে সন্তুষ্ট থাকিবার পাত্রী নহেন, তিনি চিঠির উপর চিঠি ছাড়িয়া চলিলেন। মা-মরা মেয়ে, সবাই মিলিয়া না-সাহায্য করিলে চলে কখনও? তাহার নিজের মেয়ে হইলে কি আর তিনি বড় ঠাকুরঝিকে এমন ভাবে বিরক্ত করিতেন? তাহার বাপের যেমন ক্ষমতা সেইমত বিবাহ হইত। কিন্তু মাতৃহীনা মৃণাল অর্থাভাবে একটা কুপাত্রে না পড়ে সেটা ত দেখিতে হইবে? নগদ টাকা না হোক, অন্য ভাবেও ত সাহায্য করা যায়?

গিরিজা ভাজের মনোগত ইচ্ছা বুঝিলেন। ঐ চিঠি-খানি পাইবার দিন-তিন পরে ইন্‌শিওর্ড পার্সেলে মল্লিক-গৃহিণী বেশ ভারী একখানা গহনা পাইলেন। মল্লিক মহাশয় কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পাঠালে গিরিজা?"

তাঁহার পত্নী বলিলেন, "এই দেখ না?" তিনি পাকা

সোনার একটি মোটা হাঁসুলি তুলিয়া দেখাইলেন। এখনও সোনার রং কি! যেন আলো ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। বলিলেন, "এ বোধ হয় তার দিদি-শাশুড়ীর আমলের। অনেক পুরনো গহনা বড় ঠাকুরঝি পেয়েছিলেন যে, বাড়ীর প্রথম নাতবৌ ব'লে। তা কোন্ ছ-সাত ভরি না হবে ওজনে?"

মল্লিক মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "তুমি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বেশ দামী জিনিষ আদায় করে নিলে যে? এখন কিছু মনে না করলে হয়।"

গৃহিণী বলিলেন, "মনে আবার কি করবে? এ কি আমি নিজে খাবার পরবার জন্যে নিচ্ছি? বড় ঠাকুরঝির গহনার অভাব কি? বাক্স বোঝাই হয়ে আছে, দিলেই বা একখানা মা-মরা বোনঝিকে?"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "মৃগাঙ্ক চিঠির জবাব দেয় নি?"

গৃহিণী বলিলেন, "কালই ত তার পোষ্টকার্ড এল, দেখ নি? তার শরীর ভারি কাহিল লিখেছে। কাছারি থেকে ছুটি নিয়েছে মাস দুইয়ের জন্যে। এমনি ভাবে চললে নাকি আর উঠতে হবে না। এখন ভালয় ভালয় মেয়েটার বিয়েটা হয়ে গেলে বাঁচি বাপু। মানুষের জীবনের কথা বলা ত যায় না?"

তাঁহার স্বামী বলিলেন, "তা ত ঠিক। মানুষের শরীরের ভালমন্দ হতে কতক্ষণ? মস্তবড় মেয়ে, আরও যে দু-দশ বছর বসিয়ে রাখব তার জো নেই। এতদিন পড়লই যখন তখন পরীক্ষাটা দিয়ে নিক, এই জন্যে না দেরি করা, না হ'লে আর একদিনও দেরি করার আমার ইচ্ছে নেই। যেমন হোক একটা পাত্রেরও যখন সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুড়োর কাছে গিয়েছিলে আর? কথাবার্ত্তা কিছু এগোল?"

কর্ত্তা বলিলেন, "কাল বিকেলে গিয়েছিলাম একবার, তখন বুড়ো বাড়ী ছিল না। আজ আবার যাব।"

গৃহিণী বলিলেন, "আরও দু-একটা জায়গায় দেখ, শুধু এক জায়গায় নজর রেখে ব'সে থেক না। ওখানে সুবিধে নাও ত হ'তে পারে?"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "এ-গাঁয়ে এখন 'ও চলনসই-মত পাত্রও আর একটাও দেখি না। আশেপাশে ঘুরলে চোখে পড়তে পারে। আজ গিয়ে দেখি চক্রবর্ত্তী-বুড়ো কি বলে, তার পর না-হয় দু-চার জায়গায় চিঠি লিখব।"

গৃহিণী গহনাখানা নিজের বড় ট্রাঙ্কে তুলিয়া রাখিতে রাখিতে বলিলেন, "গেল বছর ঐ রায়দের নিবারণের বিয়ে হয়ে গেল। বেশ ছেলেটি, তখন যে মৃগাঙ্কও গা করল না, তুমিও কিছু বললে না। ওরা বেশী টাকার দাবীও করে নি, মেয়ের বাপের কাছে শ-পাঁচ টাকা বিয়ের খরচ ব'লে খালি নিয়েছিল।"

কর্ত্তা বলিলেন, "সে ত যা হবার হয়ে গেছে, এখন ওকথা ভেবে আর কি হবে? মিনুর চিঠি পেলে আর?"

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "কই না, মেয়েটা কেমন আছে কে জানে? পড়া তার এক বাতিক, এখন আনতে চাইলেও আসবে না, না হ'লে নিয়ে আসতাম। তার ধারণা এখানে এলেই পড়াশুনো কিছু তার হবে না, সে পরীক্ষায় ফেল হয়ে যাবে।"

তাঁহার স্বামী বলিলেন, "যাক্ গে, একেবারেই আসবে এখন পরীক্ষা দিয়ে। ক'দিনের জন্যে আর কেন টানাটানি। বীরেনের আর দু-চার দিনের মধ্যেই ফিরবার কথা, সে নিশ্চয়ই মিনুকে দেখে আসবে, তারই কাছে খবর পাওয়া যাবে।"

গৃহিণী নিজের কাজে চলিয়া গেলেন, তাঁহার উনানের আঁচ বহিয়া যাইতেছিল, টিনি, চিনি স্নান করিতে গিয়াছিল, খোকা কি জানি কি মনে করিয়া অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

মল্লিক মহাশয়ও কাজে বাহির হইয়া গেলেন। বাড়ী ফিরিয়া স্নানাহার করিবেন, খানিক বিশ্রাম করিবেন, তাহার পর যাইবেন চক্রবর্ত্তী-বুড়ার সহিত কথা কহিতে। মৃগাঙ্কমোহনের অসুখের সংবাদে তাঁহার চিন্তা বাড়িয়া গিয়াছে, মৃণালের বিবাহ অবিলম্বে দিয়া ফেলিতে তিনি ব্যস্ত।

পঞ্চাননদের বসতবাড়ীটি দালান নয়, মাটির ঘরই, খড়ের চাল। তবে ভাঙাচোরা নয়, বছর বছর খড়

বদলানো হয়, দেওয়ালে গোবর-মাটির প্রলেপ পড়ে। ঘর সংখ্যায় পাঁচ-ছয়খানা, কারণ সংসারে মানুষ অনেকগুলি। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের সংস্থান আছে, তবে নগদ টাকার অভাবে মাঝে মাঝে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। পঞ্চানন কলেজে পড়ে, তাহার জেঠার এক ছেলেও কলেজে পড়ে, সে হোষ্টেলে থাকে। কাজেই খরচ আছে বই কি? বড় ছেলে শ্বশুরের ফরশা বউ আনিবার জেদে তিনি পাওনাগণ্ডার দিকে বেশী নজর দিতে পারেন নাই। আশা আছে পঞ্চানন এবং কমললোচনের বিবাহে সে-ত্রুটি ভালমতে সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন। বধূরা মসীনিন্দিতবর্ণা হইলেও এবার আপত্তি নাই। গৃহিণীও ফরশা বৌয়ের দেমাকে বেশী খুশী হন নাই, তিনিও এবার গায়ের রং লইয়া কিছু জেদাজেদি করিবেন না।

শীতকালের বেলা শীঘ্র শীঘ্র গড়াইয়া আসিতেছে। বাহিরের ঘরে তক্তপোষের উপর দোলাই গায়ে বসিয়া বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী তামাক টানিতেছেন। চেহারাটি বেশ মোটাসোটা, মাথায় বড় একটি টিকি, তাহা ছাড়া চুল বড় বেশী নাই। রং শ্যামবর্ণ, তৈলচিক্কণ। ঘরের আর এক কোণে বছর দশের একটি ছেলে ভাঙা বেঞ্চির উপর বসিয়া ব্যাকরণ মুখস্থ করার ভান করিতেছে। এটি তাঁহার মাতৃহীন দৌহিত্র সুবল।

মল্লিক মহাশয় বাহির হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঘরে নাকি?"

সুবল লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "দাদু এই যে এখানেই ব'সে আছেন।"

চক্রবর্ত্তীর চোখ দুটি আরামে প্রায় বুজিয়া আসিয়াছিল। তিনিও চমকিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "এস ভায়া, ভিতরে এস।"

সুবল এই সুযোগে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। দাদুর এখন তাহার পড়াশুনা তদারক করিবার সময় নিশ্চয়ই হইবে না।

মল্লিক মহাশয় তক্তপোষের এক কোণে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরীরগতিক ভাল ত?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "এই কেমন দেখছ। শীতকালটায় বাতের ব্যথা বড় বেড়ে যায়, নইলে অমনিতে ত ভাল আছি। তবে সংসারী মানুষের হাঙ্গামের অন্ত নেই, জানই ত?"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "সে ত রয়েইছে। তা পঞ্চাননের বিয়ের কথাটা ভেবে দেখেছেন কি?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "এ আর ভাবাভাবি কি? ছেলের বিয়ের বয়স হয়েছে, এখন যত শীগগির বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায় ততই লাভ। তোমার ভাগ্নীটি সকল দিক্ দিয়েই পাত্রীহিসাবে ভাল। গিন্নী বলছিলেন বয়স একটু বেশী, তা তাতে আটকাবে না। আর তোমাকে জন্মকাল থেকে দেখছি, তোমার সঙ্গে একটা কুটুম্বিতা হলে কত আনন্দের বিষয় হবে। তবে কি জান, দেশাচার যা তা ত মেনে চলতে হবে? বরপণ যখন চলন আছে, তখন সেটা ছাড়া যায় না। এটা যদি না থাকত, তাহলে সব ছেলের দর এক হয়ে যেত। তাহলে কুলশীলেরও মর্য্যাদা থাকত না, ছেলের রূপগুণ বিদ্যেরও মান থাকত না। যার যেমন যোগ্যতা, তার তেমন পাওনা হওয়া উচিত বই কি?"

মল্লিক মহাশয় এই অপূর্ব্ব যুক্তির কোনও উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আমার সাধ্য কতটুকু তা ত সেবার বলেইছি। মৃণালের বাপও বড় পীড়িত এখন, তার উপর জোর করা চলে না। মেয়েটিকে আমরাই পালন করেছি, তাকে যথাসাধ্য আমরা দেব, এ আর আপনাকে ব'লে বোঝাতে হবে না।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "হ্যা তা বটেই ত, তবে কি না এই হাজার টাকাটা এখন আমার একান্ত দরকার। বিয়ের খরচটরচ আছে, তা ছাড়া এধার-ওধার কিছু টাকা আমাকে এ বছরের মধ্যে দিতেই হবে। তা অন্য দিকে তোমরা ধুমধাম কিছু না কর তাতে আমি কিছু বলব না। তবে খালি গায়ে ত কন্যা সম্প্রদান করা চলে না, ভরি কুড়ির সোনার গহনা দিতে হবে বইকি, আর ছেলেরও বরাভরণ চাই।"

মল্লিক মহাশয় ভাবিয়াই পাইলেন না, সবই যদি চাই তাহা হইলে ধুমধামটা কোন্ দিক্ দিয়া কম হইবে। একটু ভাবিয়া বলিলেন, "বিশ ভরির গহনা দিলে শ-পাঁচের

বেশী পণ যে দিতে পারব তা ত মনে হয় না, আপনি যদি দয়া ক'রে এতেই রাজী হন, তা হ'লে আমি নিষ্কৃতি পাই।"

চক্রবর্ত্তী ঠোঁট দুইটা কুঞ্চিত করিয়া কয়েক মিনিট' ভাবিয়া লইলেন, তাহার পর বলিলেন, "দেখি ভেবে, বাড়ীর ওরা আবার গহনাগাঁঠির ভারি ভক্ত কি না, এর কমে রাজী হবে ব'লে বোধ হয় না। আচ্ছা ব'লে দেখি।"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "আজ তবে উঠি, দিন চার পরে আবার খোঁজ নেব।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ এস তবে। আমি ওদের ভাল ক'রে বুঝিয়েই বলব, এখন তারা বুঝলেই হয়।"

মল্লিক মহাশয় বাহির হইয়া যাইতে যাইতে মনে মনে বলিলেন, "তুমি যা বোঝাবে তা ত দেখাই যাচ্ছে।"

বাহিরে আরও দু-একটা কাজ ছিল, সব সারিয়া সন্ধ্যার মুখে তিনি বাড়ী গিয়া পৌঁছিলেন। ঘরে তখন সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া গিয়াছে, তাঁহার বড় ছেলে বারাণ্ডায় হারিকেন জ্বালাইয়া পড়িতে বসিয়াছে। ছোট খোকার সাড়া পাওয়া গেল না, সে ইহারই ভিতর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে বোধ হয়। চিনি, টিনি রান্নাঘরের দরজার ধারে বসিয়া নাকে কাঁদিতেছে, তাহাদের বুঝি ঘুম পায় না, ক্ষুধা পায় না, মায়ের শাসন বড় কড়া, না হইলে ঘরে ঢুকিয়া ভাতের হাঁড়ি ধরিয়া টান দিতেও তাহাদের আপত্তি ছিল না।

গৃহিণী বোধ হয় আজকার কথাবার্ত্তার ফলাফল জানিতে একটু বেশী ব্যস্তই ছিলেন। উনানের উপর হইতে কড়াটা দুম্ করিয়া নামাইয়া রাখিয়া তিনি দরজার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিয়েছিলে বুড়োর ওখানে ?"

মল্লিক মহাশয় তাঁহার সামনের ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া পা ধুইতে ধুইতে বলিলেন, "গিয়ে ত ছিলাম। কাজ সেরে এস, ত বলছি।"

"আমার কাজ হয়ে গেছে। মেয়ে দুটোকে ভাত বেড়ে দিয়ে আসছি", বলিয়া গৃহিণী কড়া হইতে ঝোল কাঁসিতে ঢালিয়া ফেলিলেন। চিনি, টিনিকে এ বেলা রান্নাঘরের বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া খাইতে হয়, দুপুরে অবশ্য ঠিক স্নানের পরে খায় বলিয়া তাহাদের রান্নাঘরে ঢুকিতে দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পর এত ঘুম পায় যে তেজও তাহাদের কমিয়া আসে। মারামারি গালাগালি না করিয়া নীরবে যাহা পারে তাহা খাইয়া তাহারা উঠিয়া পড়ে। কনকনে ঠাণ্ডা জলে হাত পা মুখ ধোয়াইয়া, কাপড় ছাড়াইয়া মা তাহাদের অবিলম্বে বিছানায় চালান করিয়া দেন।

দুই জনকে ভাত বাড়িয়া দিয়া আর সামনে পিতলের পিলসুজে প্রদীপ রাখিয়া দিয়া মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "দেখ্, গোলমাল না ক'রে খেয়ে নিবি। তোদের কাচা কাপড় এই পিঁড়ির উপর রইল, হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে গিয়ে চুপ ক'রে শুবি। খোকাকে খবরদার জাগাবি না, তাহলে আর আস্ত রাখব না।"

টিনি, চিনি ঢুলিতে ঢুলিতে বলিল, "হুঁ।" তাহার পর ঝোল দিয়া ভাত মাখিয়া বড় বড় গ্রাস মুখে তুলিতে লাগিল।

মল্লিক-গৃহিণী স্বামীর কাছে গিয়া তক্তপোষের এক পাশে বসিয়া বলিলেন, "কি বললে বুড়ো ?"

মল্লিক মহাশয় হাতের হুঁকাটা নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "দর ত কিছুতেই কমে না। হাজার টাকা পণ ত চাই-ই, তার উপর বিশ ভরির সোনার গহনা।"

গৃহিণী বলিলেন, "এত খাঁই কেন বাপু ? হাজার টাকা তাঁদের ছেলে সারাজন্মে রোজগার করলে বাঁচি। এইবার পরীক্ষা দিয়ে পাস হোক ফেল হোক আর পড়বে না শুনছি। এই বিদ্যে নিয়ে কি এমন জজ-ম্যাজিষ্টেরি জুটবে তাও ত জানি না। ঘরে ধান-চাল আছে বটে, তা খাবার মুখ ত ক্রমে বাড়ছে, তাতে আর কতদিন চলবে ? নিজেদের যে-সব মেয়ের বিয়ে দিয়েছে তাতে কত ক'রে পণ দিয়েছে হাড়কিপ্পন মিন্‌সে ?"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "তারা যেমন বিয়ে দিয়েছে অমন বিয়ের আমাদের মেয়ের কাজ নেই। পয়সা বাঁচিয়েছে বটে, মেয়েগুলোকে ত বাঁচাতে পারে নি ?"

গৃহিণী বলিলেন, "তা বটে, বড়টা ত ম'রে বাঁচল,

মেজোটা এখন লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরছে। তা অত আমরা কোথায় পাব বাপু? তুমি না-হয় অন্য ছেলে দেখ। এখানে হলে অবিশ্যি খুবই ভাল হত, আমাদের চোখের উপর থাকত। তা অসম্ভব দর হাঁকলে পারব কি ক'রে?"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "দেখি, দিন চার পরে আর একবার যাব শেষ চেষ্টা করতে, তখনও যদি দর না কমে তাহলে অন্য ব্যবস্থাই করতে হবে। বীরেন আসবে কাল, তার সঙ্গেও কথা ব'লে দেখব। তার একটি ভাগ্নের নাকি বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে।"

১৮

বীরেনবাবু কলিকাতায় আসিয়াছিলেন নানা উদ্দেশ্যে। মায়ের তীর্থদর্শন, গঙ্গাস্নান, ব্রত উদ্‌যাপন, নিজের কলিকাতা দেখা, এবং উভয়েরই রোগের চিকিৎসা করা। সব কাজ সারিতে মাস দেড়েক তাঁহার কাটিয়া গেল। আর কতদিনই বা মাসতুতো বোনের বাড়ী বসিয়া থাকা যায়? তাঁহারা সকলেই অবশ্য আদরযত্ন যথাসাধ্য করিতেছেন, তবু নিজেদেরও ত কাণ্ডজ্ঞান থাকা উচিত?

তাই এই সপ্তাহের শেষেই মাতা ও পুত্র দেশে ফিরিবেন স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। বৃদ্ধার কলিকাতা যে খুব ভাল লাগিতেছিল না তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি নিজের পল্লী-মাতার কোলে ফিরিতে বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বহুদিন পরে বোনঝির সঙ্গে দেখা, সে আবার আদর-আপ্যায়নও খুব করিল এবার, তাহাকে বারবার নিমন্ত্রণ করিতেছিলেন, "চল্ না মা ক'টা দিন আমার কাছে থেকে আসবি, দেশ-গাঁ যে তোরা একেবারে ছেড়ে দিলি?"

সুরবালা হাসিয়া বলিলেন, "দেখছ ত মাসীমা, একলার সংসার। আর শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে ছোট-খাটোও নয়। কার হাতে এসব ফে'লে যাব? ছেলে-মেয়েরা পড়ছে, ওঁর আপিস, নিশ্বেস ফেলবারও উপায় নেই।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তোমাদের এক কথা মা, ঘরকন্না কে না করছে বল? তাই ব'লে কি একবার বাপের ঘরও যাবে না?"

সুরবালা বলিলেন, "এই আসছে গরমের বন্ধে দেশে একবার যেতেই হবে, উনিও ছুটি নেবেন। তখন গিয়ে তোমার ওখানে দিনকতক নিশ্চয় থেকে আসব।"

বীরেনবাবু নিকটে বসিয়া চা খাইতে খাইতে মাসী-বোনঝির কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "তাই যেও, সবাই তোমায় দে'খে কত খুশী হবে। সেই কোন্ ছেলেবেলায় গিয়েছ। তা মা আজ মিনুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ ত বিকেলে? আমি বিমলকে আসতে ব'লে দিয়েছি।"

তাঁহার মা বলিলেন, "যাব বই কি? না হলে ওর মামা-মামী বলবে কি? তা বিমলকে আবার কেন? ও ভাববে খালি আমার সময় নষ্ট করাচ্ছে এরা পরীক্ষার বছর। তুই ত ক'বার গেলি, রাস্তা চিনিস্ না?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "রাস্তা চিনলে কি হবে বাপু, ওদের সব বোর্ডিঙের নিয়মকানুন আমি কিছু বুঝি না। এদিকে যাও, ওদিকে যেও না, আজ এস ত কাল এস না। বিমল শহুরে ছেলে, ও সব ঠিকঠাক ক'রে দেয়।"

সুরবালা বলিলেন, "বেশ ছেলেটি। তোমাদের মিনুর সঙ্গে মানায় ভাল।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "বেশ ছেলে হলে কি হবে? ঘরে যে ধানচালও নেই, পরের উপর নির্ভর ক'রে পড়ছে। আজকাল যা চাকরির বাজার, ত্রিশটা টাকা আনতে পারলেই সব বি-এ পাস বাবুরা বর্ত্তে যায়। মল্লিক-দাদা আবার এসব দিকে বড় কড়া। বাপের টাকা উড়িয়ে কলকাতায় থেকে ছেলেরা সব পাস দেন, চা-সিগারেট খেতে শেখেন, তার পর দুটো পয়সা আনতে সব জিব বের ক'রে ব'সে পড়েন। তার চেয়ে পাড়াগাঁয়ের ছেলে তিনি পছন্দ করেন, যদি ধান-চাল থাকে, ঘরবাড়ী থাকে। এই জন্যেই ত পঞ্চাননের সঙ্গে সম্বন্ধ এনেছেন।"

সুরবালার মেয়ে রেবা নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "ম্যাগো:, বিচ্ছিরি মোট্‌কা, মাথায় একটা দেড় হাত টিকি!"

গৃহিণী ধমক দিয়া বলিলেন, "দূর হ, মেয়ের কথার ছিরি দেখ, যা পড়া করগে যা।"

বীরেনবাবু চায়ের পেয়ালা খালি করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। অন্যরাও যে-যার কাজে চলিয়া গেল।

বিমলের টেষ্ট পরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল। ফল

আশানুরূপ ভাল হয় নাই। তাই সে এখন উদয়াস্ত খাটিয়া 'ফাইন্যাল্' পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিল। বীরেনবাবুকে আজকাল সে আর বড় ধরা-ছোঁওয়া দেয় না, দশ বার ডাকিলে একবার যায়। তবে আজ বিকালে সে আসিতে রাজী হইয়াছিল, কারণ তাহাকে যে বোর্ডিং-যাত্রার গাইড হইতে হইবে তাহা সে আন্দাজেই বুঝিয়াছিল। যেখানে নিজেরও মনের টান আছে সেখানে যাওয়ার জন্ত ঘণ্টা দুই সময় নষ্ট করিতে তাহার মন বিশেষ বাধা দিল না।

বিকালবেলা সে যথাসময়েই আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা ট্রামে চড়িতে নারাজ, ও গাড়ীতে কি মেয়েমানুষ চড়ে? উঠিতে-না-উঠিতে ছাড়িয়া দেয়, ধাক্কাধাক্কির ব্যাপার, মুচী মুদ্দফরাশ যাহার খুশী উঠিতেছে নামিতেছে। অগত্যা পয়সার মায়া ত্যাগ করিয়া বীরেনবাবুকে একখানা গাড়ী ভাড়া করিতে হইল।

বোর্ডিঙে পৌছিয়া আবার সেই চিঠি লেখালিখির ব্যাপার, আজও দেখা করিবার দিন নয়। চিঠিটা এবারেও বিমলকে লিখিতে হইল, এবং খানিক পরে তাহারা প্রবেশাধিকার পাইল।

বৃদ্ধা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "বাবা কি কাণ্ড, নিজেদের মেয়ের সঙ্গে দেখা করব, তাও চিঠি লেখ রে, এত্তালা দাও রে, কত কারখানা। আমাদের দেশে এসব নেই বাপু।"

মৃণাল আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "কি দেশে নেই ঠাকুরমা?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "এই সব তোদের বোর্ডিঙের নিয়ম-কানুন বাছা। আমাদের গাঁয়ে যখন যার বাড়ী খুশী চ'লে যাব, কেউ রসি বামনিকে 'না' বলবে না।"

মৃণাল হাসিয়া বলিল, "যেখানকার যা নিয়ম ঠাকুরমা, দেশে থাকলে আমার কাছে আসতেই কি আর তোমাকে এত হাঙ্গাম পোয়াতে হত? তা তোমরা এবার নিতান্তই চললে বুঝি?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "হ্যাঁ, পরশু যাব সকালের গাড়ীতে। বাবা, মানে-মানে দেশে পৌছলে বাঁচি। যা ক'রে এসেছি, বুড়ো হাড়ে আর এসব পোষায় না।"

মৃণাল বলিল, "আমার ত যেতে এখনও দুমাসের ওপর। তোমরা ছিলে তবু মাঝে মাঝে দেশের খবর পাচ্ছিলাম।"

বীরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, চিঠিপত্র পাও না?"

মৃণাল বলিল, "হ্যাঁ, মামীমা প্রায়ই চিঠি লেখেন, তা চিঠিতে ক'টা কথাই বা থাকে?"

বিমল এতক্ষণে কথা বলিল, "আপনার কলকাতা ভাল লাগে না বুঝি?"

মৃণাল বলিল, "না, আমি পাড়াগাঁয়ের মানুষ, আমার পাড়াগাঁই ভাল লাগে।"

মৃণাল জ্বরে ভুগিয়া, পরীক্ষার পড়ার চাপে আরও যেন রোগা হইয়া গিয়াছে। বিমলের চোখে তাহার মুখখানি আরও যেন করুণ আর সুন্দর দেখাইতেছিল। সে আবার বলিল, "এখানে যত ছেলেমেয়ে পড়ে তার অনেকেই ত পাড়াগাঁয়ের মানুষ, কিন্তু শহরে এসে তারা বনিয়াদী শহুরে হয়ে যায়, কখনও যে কলকাতা ছাড়া আর কিছু চোখে দেখেছে তা মনেই হয় না।"

বৃদ্ধা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "পঙ্কু আমাদের কিন্তু তেমন ছেলে নয়। নিজের ধর্ম্ম কেমন বজায় রেখেছে।"

মৃণালের মুখ লাল হইয়া উঠিল বিরক্তিতে এবং লজ্জায়। হঠাৎ পঙ্কুর কথা তুলিবার প্রয়োজন ছিল কি?

বিমল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ধর্ম্ম মনের জিনিষ, সেটা হয়ত অনেকেই রেখেছে, যদিও সকলের মাথায় টিকি নেই।"

বৃদ্ধা চটিয়া বলিলেন, "তোমাদের বাপু সবতাতে ঠাট্টা, টিকি-পৈতে এসব হ'ল বামুনের লক্ষণ, এসব না থাকলে লোকে মানবে কেন?"

মৃণাল তাড়াতাড়ি কথাটা ফিরাইয়া দিল। বলিল, "মামীমাকে ব'লো আমি এখন বেশ ভালই আছি। মাঝে জ্বর হয়েছিল ব'লে তিনি বারবার ব্যস্ত হয়ে চিঠি লিখছেন। নিয়ে যেতেও চান, তা আবার ক'দিনের জন্যে যাওয়া কেন? একেবারে পরীক্ষার পরে যাব।"

বিমল বলিল, "পড়াশুনা কেমন হ'ল?"

মৃণাল বলিল, "নেহাৎ মন্দ হয় নি। আপনি খুব পড়ছেন বুঝি?"

বিমল বলিল, "খুব না পড়লে আর চলে কই? আগে আগে ত খালি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়েছি।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "তবে উঠি মা এখন। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হলেই তোমাদের কলকাতার গাড়োয়ানদের মেজাজ বিগড়ে যায়, তাঁরা পয়সা পয়সা ক'রে হাড় জালিয়ে তোলেন। এঁর সঙ্গে কথা আছে যে আধঘণ্টা দাঁড়াবে, তা আধঘণ্টা হয়ে এল বলে।"

আরও দুচার কথার পর তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিমল সোজা নিজের মেসে চলিয়া গেল। ট্রামে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, পঞ্চাননের নাম হইবামাত্র মৃণাল অমন মুখ লাল করিল কেন? লজ্জা, না বিরক্তি, না অন্য কিছু?

বীরেনবাবুর মা পরদিন হইতেই বাক্স ডেস্ক গুছাইয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন দেশে বিস্তর, সকলের জন্যই উপহারস্বরূপ তিনি কিছু-না-কিছু জিনিষ সংগ্রহ করিয়াছেন। কাজেই আসিবার সময় লটবহর যাহা ছিল, এখন তাহার দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে।

বীরেনবাবু দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "মা, করেছ কি? এত সব নিয়ে গাড়ীতে উঠতে পারবে? অর্দ্ধেক হয়ত ষ্টেশনে প'ড়ে খোওয়া যাবে।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তা বললে কি হয় বাছা? গিয়ে দাঁড়াতেই সব চারধার-থেকে ছেঁকে ধরবে না? তখন কি খালি হাত নেড়ে দেখাব যে কারও জন্যে কিছু আনি নি? সে আমার কম্ম নয় বাপু।"

বীরেনবাবু গজ গজ করিতে লাগিলেন, "সেবার তবু ছোকরা দুটো সঙ্গে ছিল, খানিক সাহায্যি হয়েছে। এবার এই পাহাড়প্রমাণ মাল নিয়ে আমি ভরাডুবি হই আর কি?"

বৃদ্ধা পরম নিশ্চিন্ত, বলিলেন, "তা ওদের ডেকে পাঠালেই হবে, ইষ্টিশানে তুলে দেবে এখন।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "হ্যাঃ, ওরা তোমার মাইনে-করা চাকর কি না, তু করে ডাকলেই এসে হাজির হবে। যত সব কাণ্ড!" বলিয়া তিনি চটিয়া একেবারে বাহিরের ঘরে চলিয়া গেলেন।

কার্য্যকালে দেখা গেল কিন্তু যে বৃদ্ধাই মানবচরিত্র বোঝেন বেশী। না ডাকিতেই পঞ্চানন এবং বিমল দুজনেই ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। জিনিষপত্র সত্য সত্যই তাহারা বেশ গুছাইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিল, বীরেনবাবুকে কিছু বেগ পাইতে হইল না। তিনি ভীতু মানুষ, কাজেই যথাসময়ের অনেকটা আগেই ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াও দেখা গেল তখনও ট্রেন ছাড়িতে প্রায় কুড়ি মিনিট সময় বাকি আছে।

বিমল বৃদ্ধাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "তবে আসি ঠাকুরমা, একেবারে ভুলে যাবেন না যেন।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "ভুলব কেন ভাই? পাশের গাঁয়েই ত ঘর? নাতবৌ আসবার সময় খবর দিলেই গিয়ে হাজির হব। আমি না গান গাইলে তোমার বাসর জমবে কেন?"

বিমল একটু লজ্জিত ভাবে হাসিয়া বলিল, "তা হ'লেই হয়েছে ঠাকুরমা। এ জন্মে তা হ'লে আর দেখা হবে না।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "বালাই ষাট্ দেখা হবে না কেন? এই পাসটা দিয়ে নাও, দেখো এখন তখন কেমন কাড়াকাড়ি প'ড়ে যায়।"

বিমল বলিল, "অত কপাল নিয়ে আমি জন্মাই নি ঠাকুরমা। আমাকে সবাই ডাণ্ডা মেরে হাঁকিয়ে দেবে। কাড়াকাড়ি পড়বে এই পঞ্চুমামার মত রাজপুত্তুরদের নিয়ে।"

পঞ্চানন অল্প একটু দূরে দাঁড়াইয়া বীরেনবাবুর সঙ্গে কথা বলিতেছিল। বিমলের কথাটা বোধ হয় তাহার কানে গেল। মুখটা তাহার বিনা চেষ্টায়ই বেশ স্মিত হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "বিমলের মতলব কাউকে খেতে না দেওয়া। তাই অত বিনয় করছে।"

বীরেনবাবু এই সময় আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। কাজেই যুবকদের রসিকতা এইখানেই থামিয়া গেল। আরও দুই-চারটা কথার পর ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

বিকাল হইতে-না-হইতে, তাঁহারা গ্রামে পৌছিয়া

গেলেন। তাঁহাদের বাড়ী ষ্টেশনের বেশ কাছে, কাজেই আধঘণ্টার মধ্যেই তাঁহারা হাতমুখ ধুইয়া বিশ্রাম করিতে বসিয়া গেলেন। বৃদ্ধা অবশ্য হাতমুখ ধুইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন না, স্নানের চেষ্টায় গামছা লইয়া পুকুরে চলিলেন। বীরেনবাবু ক্ষুধায় কাতর ছিলেন, তিনি গুড় দিয়া হাতগড়া রুটি খাইতে বসিলেন।

তাঁহার ছোট ছেলে আসিয়া খবর দিল, "বাবা, বাইরে মল্লিক-জ্যাঠা বসে আছেন।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "এই যে আসি। ততক্ষণ তামাক খেতে বল্ না। তোর মাকে বল্ আমায় আর একখানা রুটি দিতে।"

পেট ঠাণ্ডা করিয়া তিনি ধীরেসুস্থে বৈঠকখানা ঘরে গিয়া হাজির হইলেন। মল্লিক মহাশয় বসিয়াছিলেন, তবে তামাক খান নাই। বীরেনকে দেখিয়া বলিলেন, "কি হে, ভাল ছিলে ত?"

বীরেনবাবু মল্লিক মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভাল আর তেমন কই? টাকা ত ঢের খরচ ক'রে এলাম, কিন্তু দাদা, ডাক্তারে আর ওষুধে কি আর পরমায়ু দিতে পারে? জলহাওয়া মোটে ভাল না, এত ক'টি ভাত খেয়েছি কি যন্ত্রণার শেষ নেই, কিছুতে হজম হবে না। তাই ব্যবস্থাপত্র নিয়ে যেখানকার মানুষ মানে-মানে সেখানে ফিরে এলাম।"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "সে ত ঠিকই, শহরে কি আর স্বাস্থ্য টেঁকে? তা আমাদের মিনিকে আসবার সময় দে'খে এসেছ ত? কেমন আছে সে? মাঝে সর্দিজ্বর হয়েছিল শুনে তার মামী বড় ব্যস্ত হয়েছে।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "দেখে এসেছি বই কি? প্রায়ই দেখা হ'ত। একদিন বাড়ীতে নিয়েও এসেছিলাম মায়ের ব্রত উদ্‌যাপনের সময়। তার রান্না খেয়ে সবাই কত সুখ্যাত করলে। জ্বর হয়েছিল বটে। তা এখন ভাল আছে। পাসের পড়া পড়ছে খুব, তাতেই একটু কাহিল হয়ে পড়েছে। মেয়েছেলেদের ওসব সয় না।"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "সয় না ত কারোই। তবে বেটাছেলেদের ত উপায় নেই, ক'রে খেতে হবে ত? মেয়েদের অবশ্য বিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত। তা মিনুকেও আর পড়ানো আমাদের কারও মত নয়। পরীক্ষা হয়ে গেলেই বাড়ী নিয়ে আসব। পাত্রও দেখছি। তবে জান ত তারা কন্যাদায় কি জিনিষ? এক কাঁড়ি টাকা বার করতে না পারলে নিষ্কৃতি পাওয়াই শক্ত।"

বীরেনবাবুর বড় মেয়ের বিবাহ দিতে জমিজমা অনেক বন্ধক পড়িয়াছিল। এখনও তাহার জের মিটে নাই। তিনি বলিলেন, "জানি আবার না। ও কাঁটা একবার যার গলায় ফুটেছে, তাকে আর কোনও দিন ভুলতে হবে না। তা তোমার ত আবার উড়ো আপদ, নিজের মেয়েও নয়। মৃগাঙ্ক খরচাটা দেবে না?"

মল্লিক মহাশয় একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সবটা দিতে আর পারছে কই, কিছু দিয়েছে। শরীর নাকি তার একেবারে ভেঙে পড়েছে, সেইজন্যে আমার চিন্তা আরও বেশী। সে থাকতে থাকতে হয়ে যায় ত ভাল। চক্রবর্ত্তীর কাছে ঘোরাঘুরি ত খুব করছি, কিন্তু দর হাঁকছে বড় বেশী। হাজার টাকা পণ, বিশ ভরি সোনা চায়।"

বীরেনবাবু বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "তবেই ত ঠেকালে। নিজের মেয়ে নয় যে ভিটেমাটি বেচে বিয়ে দেবে। তুমিও ত ছা-পোষা মানুষ। একেবারে এই শেষ কথা নাকি? ছেলে অবিশ্যি মন্দ নয়, স্বাস্থ্য বেশ, স্বভাবচরিত্তির ভাল। খেতে পরতেও এক রকম দিতে পারবে। তবে হ্যাঁ দালানকোঠা দিতে পারবে না, গাড়ীঘোড়া হাঁকাবে না। তা সে আর গাঁয়ে বসে পাবছে কে? দেখ ব'লে কয়ে দু-চার শ যদি কমাতে পার।"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "কাল আবার যাব। কিন্তু ধর যদি দরে শেষ অবধি না-ই বনে, তা হ'লে অন্য পাত্র দেখতে হবে ত? মেয়ের বিয়ে এই বৈশাখ মাসে দিতেই হবে। তোমার একটি ভাগ্নে বিবাহযোগ্য হয়েছে না?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "হয়েছে বটে, তবে ছেলে মাত্র ম্যাট্রিক পাস। তোমাদের মেয়ের পাশে তেমন মানাবে না। অবস্থাও চক্রবর্ত্তীদের মত তত ভাল নয়।"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "তবু দেখা ভাল একবার। তুমি তাদের একখানা চিঠি লেখ দিকি, পাওনা-থোওনা কি রকম আশা করে একটু বোঝা যাক। তার পর এটা হয় ভাল, না হয় অন্যত্রই দিতে হবে ত?" [ক্রমশঃ]

নারা উদ্যানের বিরাট ঘণ্টা

পানী মন্দিরের কার্ণি   গালা ও কাঠখোদাই মূর্ত্তি

নারা—অমিতাভ

নারা—মঞ্জুশ্রী

নারার কাঠের মূর্ত্তি

নারা—বুদ্ধ অবতার

মিউজিয়মের ছবি

বুদ্ধ

জাপান ভ্রমণ

শ্রীশান্তা দেবী

ট্রাম থেকে ষ্টেশনের কাছে নামবার সময় একটা বেশ মজা হয়েছিল। আমার স্বামী সর্ব্বাগ্রে নেমে পড়লেন, তার পর আমার বালিকা কন্যা, সব শেষে আমি। যখন নামছি তখন ড্রাইভারটা আমায় কি যেন একটা বলল। আমি কিছুই বুঝতে না পেরে হাত নেড়ে 'বুঝি না' বলে নেমে পড়লাম। খানিকটা হেঁটে ষ্টেশনে যখন ঢুকে পড়েছি, অকস্মাৎ দেখি সে এসে আমার কোট ধরে টানছে। আমি ত অত্যন্ত অবাক হয়ে গেলাম। মনে হল সে কেবলি বলছে 'ছিয়া'। তার যে কি অর্থ জানি না, বুঝলাম কিছু একটা চায়। খুব চেঁচিয়ে ডাকতে আমার স্বামী ফিরলেন। অনেক কষ্টে বোঝা গেল সে টিকিট চায় এবং সেই জন্যই গাড়ী দাঁড় করিয়ে নেমে এসেছে। টিকিটগুলো যে ফিরে যেতে হয় তা আমি জানতাম না; শেষ মানুষই সেগুলো দেয়। ভাগ্যে তখনও টিকিটগুলো ফুটপাথের উপর পড়েছিল, তাই তাকে দিয়ে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল।

ষ্টেশনটা মস্ত বড়। কত যে মানুষ সেখানে তার ঠিক নেই। পুরুষ স্ত্রীলোক, ছেলেপিলেতে একেবারে গিজ গিজ করছে। এই প্রথম একসঙ্গে এত জাপানী মানুষ দেখলাম। আমি ত ভারতবর্ষের বাহিরে ইতিপূর্ব্বে কখনও যাই নি, কাজেই ষ্টেশনে এত মেয়ে কখনও দেখি নি। বোম্বাইয়ের দিকে মেয়েদের একটু বেশী দেখা যায় বটে, বিশেষ ক'রে ইলেকট্রিক ট্রেনে যাওয়া-আসার সময়। কিন্তু জাপানের ষ্টেশনের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। মেয়েতে অর্দ্ধেক ষ্টেশন যেন ভরে গিয়েছে। আর তাদের পোষাকের কি ঘটা! কে যে রাজকন্যা আর কে যে ভিখারিণী নূতন মানুষের পক্ষে বোঝা শক্ত। দারুণ শীতে গাছপালায়

নারা উদ্যানের পুষ্করিণী

তখন একটা ফুল নেই, কিন্তু মেয়েদের কিমোনো আর ওবিতে যেন চিরবসন্ত বিরাজ করছে। কত অসংখ্য রং নক্সা, ও ফুলপাতার যে বাহার পোষাকে পোষাকে তা বলা যায় না। চোখ বেশ জুড়িয়ে আসে সেদিকে তাকালে। শীতের দিনের কিমোনো মোটা বটে, কিন্তু সবই ত রেশমের দেখলাম। মেয়েরা বোধ হয় জাপানী পোষাক ফ্লানেল দিয়ে কখনও করে না। শীতকালে কিমোনোর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, আর কিমোনো-জাতীয়ই একরকম সিল্ক কি মখমলের কোট মেয়েরা কেউ দুটো কেউ তিনটে করে পরে, সেগুলোর ভিতরে তুলো ভরা থাকে শুনেছি। বাহিরের পরিচ্ছদের মধ্যে একটা গরম কিংবা ভেলভেটের কিংবা লোমের স্কার্ফ আর হাতে দস্তানা ছাড়া মেয়েদের পোষাকে শীতের কোন চিহ্ন নবাগতের চোখে পড়ে না।

পুরুষরা আধাআধি পরে বিলাতী কোট প্যাণ্ট ওভার-কোট ইত্যাদি, আর বাকি অর্দ্ধেক পরে কিমোনোর উপর কেপ-দেওয়া একটা লামাদের ধরণের ওভার-কোট। এই দ্বিতীয় অর্দ্ধেকের পায়ের জুতা মোজাও জাপানী ধরণের, কিন্তু মাথার টুপিটা সকলেরই বিলাতী ফেল্ট হ্যাট। আমাদের দেশে যেমন ধুতির সঙ্গে সার্ট আর কোট চলেছে ওদের দেশে তেমনি চলেছে এই হ্যাটটা। আমাদের চোখে ভারী হাস্যকর দেখায়। পুরুষদের স্বদেশী এবং বিদেশী দুই রকম পোষাকই শীতকালে কালো দেখলাম। পুরুষদের কিমোনো পরা দেখতে বেশ ভালই লাগে বটে, কিন্তু তার উপর ওই ভারী শীত-আবরণটি এবং হ্যাটটি চড়ানোতে সব জড়িয়ে দেখতে বড় বিশ্রী লাগত।

জাপানী মেয়েরা শুধু যে নিজেরাই পথেঘাটে খুব বেরোয় তা নয়, তাদের ছেলেপিলেরাও সব সঙ্গে বেরোয়। এত দলে দলে গালফোলা মোটাসোটা ছেলে-মেয়ে আমি কখনও কোথাও দেখি নি। তাদের গাল দিয়ে যেন রক্ত ফেটে পড়ছে। কেউ চলেছে মায়ের হাত ধরে, কেউ চলেছে মায়ের পিঠে চড়ে। কেউ একলাই মা-মাসির পিছনে ছুটেছে। প্রথম দিন থেকেই খোকা-খুকীদের দেখলে আমি ভাব করতে চেষ্টা করতাম। তারা কথা অবশ্য বলতে পারত না, কিন্তু হেসে নমস্কার করে নানা রকমে বন্ধুত্ব পাতাত। এক এক জন যাবার সময়

তোডাই-জি মন্দির—নারা

যত দূর পর্য্যন্ত আমাদের দেখা যেত, তত দূর পিছন ফিরে নমস্কার করতে করতে যেত।

জাপানী মেয়েরা খুব পরিশ্রমী এবং মিতব্যয়ী বলে বোধ হয় সংসারের কাজকর্ম্ম সেরে ছোট ছেলেপিলে নিয়েই বাইরে বেরোয়। যারা ঝি রাখে, তারাও সচরাচর সব কাজের জন্য একজন লোকই রাখে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যখন তারা পথে বেরোয় তখন মা মেয়ে ছেলে কারুর সাজপোষাকে কিছু ক্রটি দেখা যায় না। লিপষ্টিক, রুজ পাউডার, চুল পালিশ সব ঠিক। ছেলেদের নাক দিয়ে পোঁটা গড়ায় না, তবে অনেকের নাকে ঠুলি বাঁধা থাকে বটে ইনফ্লুয়েঞ্জার ভয়ে।

এই ষ্টেশনটা এবং এখানকার আরও অনেক বড় ষ্টেশনই খুব আধুনিক ধরণের। জাপান পাহাড়ে দেশ, তাছাড়া এখানে মাটির তলায় ঘর, মাটির নীচে রেলপথ, ইত্যাদি আছে বলে সমস্ত ষ্টেশনটা এক সমতলক্ষেত্রে হয় না। খানিক খুব উঁচু, খানিক অনেক ধাপ নীচে। হাকিউ ষ্টেশনে উপর দিকে যাবার জন্যে সব চলন্ত সিঁড়ি আছে। তাতে চড়ে দাঁড়ালে আর সিঁড়ি ভাঙতে হয় না, আপনি উপরে উঠে যাওয়া যায়। যারা খুব দ্রুত যেতে চায় অথবা যাদের দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগে না তারা আবার এর উপরেই ছুটতে থাকে। সিঁড়িগুলো একটার ভিতর দিয়ে আর একটা এত তাড়াতাড়ি বেরোয় যে অনেক সময় আমি একসঙ্গেই দুই ধাপে পা দিয়ে ফেলতাম। বৃদ্ধ বৃদ্ধা কিংবা অক্ষম মানুষদের এই সিঁড়িতে তুলে দেবার জন্যে সিঁড়ির গোড়ায় একজন করে মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই মেয়েটির কাজ দেখলে আমার বড়ই কষ্ট হ'ত। বেচারী ওই অসংখ্য মানুষকে ক্রমাগত জাপানী কায়দায় হেঁট হয়ে নমস্কার করছে আর অনর্গল হাত দেখিয়ে কি একটা বলছে। বোধ হয় 'এই পথে আসুন' ধরণের কিছু হবে। অতি ভদ্র হ'তে হ'লে মানুষকে বড় দুর্ভোগ ভুগতে হয়। রেলের যাত্রী নিজের কাজে যাচ্ছে, তার সঙ্গেও ভদ্রতা আর নমস্কার। অবশ্য আমাদের দেশের তরুণ সম্প্রদায় যেমন গুরুজনকেও নমস্কার প্রণাম করতে ভুলে যাচ্ছেন তার চেয়ে এটা ভাল। মানুষ অনাবশ্যক কারণে অভদ্র হওয়ার চেয়ে আবশ্যকের বেশী ভদ্র হওয়া ভাল। আজ-

কালকার অনেক শহুরে ছেলেমেয়ের কারুর সামনে হাতদুটো জোড় করতে কিংবা মাথাটা নামাতে মাথা কাটা যায়। তারা বোধ হয় মনে করে লোকের সামনে গিয়ে সঙীনের মত দাঁড়িয়ে থাকলেই তাদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

হাস্কিউ ষ্টেশনে আমাদের বন্ধু ও পথপ্রদর্শক দাস মহাশয়ের দেখা পেয়ে আমরা টিকিট কেটে গাড়ী ধরতে চললাম। ওসাকা ষ্টেশনে নেমে ট্যাক্সি করে কিছু পথ গিয়ে আবার আমাদের অন্য ট্রেন ধরতে হবে। এখানকার এই বৈদ্যুতিক ট্রেনে কি ভীড়! ছুটে না উঠতে পারলে বসতে পাওয়া যায় না। দুই সারি মানুষ বসবার পর দুই সারি মানুষ হাতল ধরে ঝোলে। আমার কপালে যেদিন দাঁড়িয়ে থাকার পালা পড়ত সেদিন বড়ই বিপদ বোধ করতাম। পাহাড়ে পথে কখনও গাড়ী হুড় হুড় করে নীচে নামে কখনও বা উপর দিকে উঠে যায়। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হত এইবার ঠিক পড়ে যাব।

জাপানীরা অনেক বিষয়ে আশ্চর্য্য ভদ্র, কিন্তু এ একটা জায়গায় একেবারেই ভদ্র নয়। স্বদেশী বিদেশী স্ত্রীপুরুষ ছোট বড় কারুর জন্যে আমি তাদের কখনও জায়গা ছেড়ে দিতে দেখি নি। ছাড়া ত দূরের কথা, না বললে একটু সরে ব'সেও জায়গা করে দেয় না। ওদের দেশের মেয়েরা এতে কিছুই গ্রাহ্য করে না, কিন্তু আমাদের চোখে এটা অদ্ভুত লাগে। যদি সারা গাড়ী-বোঝাই পুরুষ ব'সে থাকে আর একটি মাত্র মেয়ে থাকে দাঁড়িয়ে, তাহলেও তাকে কেউ বসতে বলে না এবং সেও বসবার জন্য মোটেই ব্যগ্র হয় না।

ওসাকা ষ্টেশনে ভীষণ ভীড়। ষ্টেশনটাও খুব সুন্দর, ঝকঝকে, তকতকে প্রকাণ্ড। ইউনিফর্ম্ম পরা জমাদাররা সেখানে প্রত্যেক পাঁচ-দশ মিনিট অন্তর কাঠের গুঁড়ো আর জল ছিটিয়ে ব্রশ দিয়ে ঝাঁট দিচ্ছে, কোনোখানে এককণা ধুলা-ময়লা পড়ে থাকবার জো নেই। এটা টাকার শহর, ব্যবসা-বাণিজ্যের লক্ষপতিদের আড্ডা, ঘরবাড়ী, পথঘাট সব সেই রকম। এখানে ষ্টেশনে মেয়ের ভীড় মারাত্মক। পথে, হোটেলে, বাসে প্রায় সর্ব্বত্রই যত পুরুষ তত মেয়ে, ষ্টেশনে এক এক সময় মনে হত যেন মেয়েরা পুরুষের চেয়ে বেশী। তাদের সাজও তেমনি।

আজকাল সিনেমার কল্যাণে বড় বড় শহরের মেয়েরা ঠিক সিনেমা-ষ্টারদের মত 'মেক-অপ' করতে শিখেছে। তাদের কারুর কারুর চুল কোঁকড়ান, কেউ বা বব কি শিঙ্গল করে চুল ছেঁটেছে, অধিকাংশই অবশ্য বাঙালী মেয়েদের মত মাঝে সিঁথি কেটে পিছনে একটা হাত-জড়ানো খোঁপা বেঁধে রাখে। আজকাল কিমোনোর সঙ্গে স্কার্ফের চলন সর্ব্বত্র দেখলাম। ফুল আঁকা ছাড়া চওড়া চওড়া ডোরার কিমোনোও ফ্যাশন হয়েছে। দূর থেকে অনেক সময় মনে হয় যেন মেয়েরা শাড়ী পরে যাচ্ছে। শীতের সময় পিঠের ওবিটা ঢাকা থাকে ব'লে এটা আরও মনে হয়। ফ্যাশনেবল মেয়েদের পায়ের জুতাও ঠিক আগের মত নেই। যদিও তারা আমাদের দেশের মেয়েদের মত দিশী পোষাকের সঙ্গে বিলাতী জুতা পরে না, তবু তাদের আঙুল-চেরা মোজার সঙ্গের কাঠের জুতা অনেকটা বিলাতী ভাবাপন্ন হয়ে এসেছে। পায়ের তলায় পিড়ির মত একটা তক্তার নীচে সোজা দুটো তক্তা খাড়া করা জুতা সবচেয়ে সাধারণ। আজকাল বাহারের জুতার তলা হিল-দেওয়া জুতার মত করে কাটে। তার কোনটাতে কাঠের উপর বেতের কাজ, কোনটায় কাঠের উপর গালার কাজ, কোনটা সিল্ক কি চামড়া দিয়ে মোড়া, বিনা হিলে প্যাডের মত উঁচু মোটা জুতাও আছে। বেশী আওয়াজ না-হওয়ার জন্য এবং জোলো পথে সুবিধাজনক বলে অনেক জুতার তলা বোধ হয় রবার দিয়ে ঢাকা।

ট্রেনে চড়েই জাপানের গ্রাম্য দৃশ্য অনেকটা চোখে পড়ে। যদিও কোবে থেকে ওসাকা পর্য্যন্ত জাপানে গ্রাম নামক পদার্থ লোপ পেয়ে গিয়েছে মনে হয়, কারণ এই অংশে জাপানটা ইলেকট্রিক থাম, তার, কারখানা, আর ছোট বড় ঘরবাড়ী দিয়ে যেন মোড়া। আমি জীবনে এত তার এবং লোহার থাম কোথাও দেখি নি। তবু নারা যাবার পথে গ্রাম্য ছবি অনেক দেখা যায়। বড় বড় তরকারির ক্ষেতে কত যে সবজী চাষ হয়েছে বলা যায় না, আমাদের দেশের অসংখ্য পোড়ো জমিতে

নারা মিউজিয়মের ছবি- বোধিসত্ত্ব

নারা [illegible] মূর্তি

এমন ক'রে চাষ করতে পারলে দেশ বাজা হয়ে যেত। ধানের ক্ষেতে আমাদের দেশেরই মত করে খড়ের গাদা, খড়ের আঁটি সাজান রয়েছে, কচিৎ দুই-এক জায়গায় মাথায় রুমাল বেঁধে মেয়েরা কাজ করছে। ক্ষেতে কর্ম্মরত মানুষ কেন জানি না খুবই কম দেখলাম। বড় বড় ক্ষেতের মধ্যেই ছোট ছোট গ্রাম্য বাড়ী বাগান দিয়ে ঘেরা, তার কাছেই পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ, পাথরে তোরণ ও আলো দিয়ে সাজান ছোট একটি সমাধিভূমি। সেটাও দেখতে বেশ ছবির মত। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড উঠানওয়ালা সুন্দর স্কুলের বাড়ীতে ছেলেরা খেলা করছে। শুনেছি এদেশে গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে ভাল বাড়ী হয় স্কুলের। বাড়ীগুলির পাশে বাগানে ঘন সবুজ বেড়া। এ-সময় ফল বেশী দেখা যায় না। কিন্তু অনেক গাছে সবুজ পাতার ভিতর থোকা থোকা কমলা লেবু ঠিক ফলের মতই দেখায়। এই দিকে একটি বিদ্যালয়ের এত বড় জমি বাগান পুকুর দেখলাম যে তাকে রাজপ্রাসাদ বললে অত্যুক্তি হত না।

ওসাকায় নেমে দ্বিতীয় ট্রেনে চড়ে আর একটা ষ্টেশনে নেমে ট্যাক্সি করে আমরা 'নারা' গেলাম। এই নারা ৭১০ থেকে ৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাপানের রাজধানী ছিল। প্রাচীন রাজধানী বলে এর প্রাচীন রূপ চোখে ভারি

সুন্দর লাগে। কিন্তু নারা ধ্বংসস্তূপ নয়। এখানকার মন্দির, বাগান, পাথর দেওয়া পথঘাট খুব সুরক্ষিত।

জাপানের দ্রষ্টব্য জিনিষের মধ্যে নারার এই প্রকাণ্ড বাগানটি খুব উল্লেখযোগ্য। হেঁটে একে শেষ করা শক্ত, গাড়ী করে বেড়ান সহজ। এটি পুরোহিতদের রাজ্য, এখানে অনেক মন্দির। আমি জাপানী নাম মনে রাখতে পারি না, কাজেই মন্দিরের নাম বলা সহজ হবে না।

আমরা প্রথম যে মন্দিরটিতে ঢুকলাম, তাতে দেখলাম পুরোহিতরা সব নীরবে 'হিবাচি'তে আগুন জেলে কোলের কাছে সেগুলি টেনে নিয়ে বসে আছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আকাশস্পর্শী সবুজ পাইন ও ফর গাছের মাঝে মন্দির, গায়ে ঝুর ঝুর করে বরফ পড়ছে, মন্দিরে একটাও শব্দ নেই, বিরাট স্বর্ণকান্তি তিনটি বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে ; পাশে বিকট মুখভঙ্গী করে বলদর্পে দর্পিত কাঠের ভৈরব কিম্বা দ্বারপাল দাঁড়িয়ে, সারি সারি তাকে কাঠের উপর খোদাই করা কোন্ মান্ধাতার আমলের সব পুঁথি ; সাদা পর্দ্দায় ঘেরা মন্দির জীর্ণ হয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে, মনে হচ্ছিল আমরা বর্ত্তমান যুগে নেই, কি করে হাজার বছর পিছনে ফিরে গিয়েছি। পাণ্ডাদের মত হৈ হৈ করে চেঁচাবার লোক যদি থাকত তাহলে এমন প্রাচীন যুগে প্রয়াণের ভাব মনে আসত না। মুণ্ডিত-কেশ পুরোহিতরা সবাই যেন অর্দ্ধ ধ্যানস্থ, কেউ বিশেষ কিছু বলে না। দাস মহাশয় বলে দেওয়াতে আমরা মন্দিরে ৫০ সেন অর্থাৎ ২৫ পয়সা দিলাম। একজন পুরোহিত ঘুরে ঘুরে আমাদের সব দেখালো, কিন্তু তার কথা কিছুই বুঝতে পারলাম না।

এখান থেকে গেলাম নারা মিউজিয়ম দেখতে। সুন্দর প্রকাণ্ড একটা পাকা বাড়ী, মস্ত মস্ত কাচের দরজা জানালা আগাগোড়া বন্ধ। ১৪টি বড় বড় ঘরে জিনিষ-পত্র সাজানো। প্রত্যেক ঘরে নীরব প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে, যাত্রীদের পিছন পিছন ঘুরছে কিন্তু কোন কথা বলছে না।

অধিকাংশ জিনিষই ১৪০০ বৎসর আগের নারা যুগের। কাঠের উপর সোনার জল ও অন্যান্য রংকরা অনেক মূর্ত্তি, অধিকাংশের রং প্রায় লোপ পেয়ে গিয়েছে, কিন্তু যা আছে বিনা রঙেও সেগুলি অপূর্ব্ব। প্রাচীন মূর্ত্তিগুলি সব কাচের আলমারীতে বন্ধ। কাঠের উপর গালার কাজ অথবা শুধু গালায় গড়া অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তিও আছে। এগুলি আকৃতিতে ছোটখাট নয়, কোনটা এক-মানুষ কোনটা দেড়মানুষ উঁচু। বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, Deva king, ক্ষিতিগর্ভ ইত্যাদির মূর্ত্তি, সোনালী রঙের বিভিন্ন মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধ মূর্ত্তি অনেক। বিমলকান্তি, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, শক্র ইত্যাদির মূর্ত্তির নীচে ইংরেজীতে নাম লেখা আছে। জাপানের বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধমূর্ত্তির গড়ন ও মুদ্রা সমস্তই আমাদের ভারতবর্ষের কাছ থেকে ধার করা, বোধিসত্ত্ব-দের ধুতিচাদর পরা সবই দিশী কায়দায়, এবং অনেক দেবদেবীর নামও ভারতীয় বলে আমাদের চোখে এদের নূতন কিছু লাগে না। আমরা আমাদের দেশের যাদু-ঘরে পাথরে খোদাই যে-সব পদ্মাসনে উপবিষ্ট কি দণ্ডায়মান মূর্ত্তি দেখি, মনে হয় তাদেরই অনেকে যেন কাঠে গালায় সোনার জলে রূপান্তরিত হয়ে দেখা দিয়েছে। তবে জাপানী শিল্পীর হাতে তার অবশ্য অনেক জাপান দেশীয় শিল্প সৌন্দর্য্য ফুটেছে যা আমাদের দেশের মূর্ত্তিতে সেই ভাবে নেই। এই সব কারণেই জাপানের মিউজিয়মে বুদ্ধমূর্ত্তির চেয়ে ভৈরব, দানব, মার, দ্বারপাল ইত্যাদির মূর্ত্তি আমার ভাল লাগত। তাদের উৎকট মুখভঙ্গী, বিকট হাস্য, যোদ্ধবেশ, বলদর্পিত পদবিন্যাসে জাপানী শিল্পীরা যা প্রকাশ করেছেন সেগুলো মনে হয় খাঁটি জাপানী। ধ্যানী বুদ্ধ ত আমাদের ভারতের জিনিষ।

পুঁথির একটা ঘরে লম্বা তুলোট কাগজে লেখা কুষ্ঠির মত জড়ানো অনেক পুঁথি রয়েছে। সেগুলি কাচের বাক্সে কিছুটা খুলে রাখা হয়েছে, দুই-একটা পুঁথির উল্টা পিঠে সোনালী কাজ। অক্ষরগুলি এরা তুলি দিয়ে এত যত্ন করে এবং এমন নিপুণ টান দিয়ে লেখে যে অনেক ছবির চেয়ে তা মূল্যবান মনে হয়। রেশমের উপর ছবি আঁকা জাপানের প্রাচীন শিল্প, এগুলির অনেকগুলিই মন্দির কি প্রাসাদগাত্রের পর্দ্দা ছিল বোধ হয়। দাড়িওয়ালা প্রাচীন রাজা রাজদরবারে জাপানী কায়দায় বসে আছেন দেখতে বেশ লাগে। কোন

ছবিতে বুদ্ধদেব কিংখাপের মত কাজ করা স্বর্ণচেলি পরে ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিক্ষায় চলেছেন। কোথাও বা জগদ্ধাত্রীর মত সিংহবাহিনী দেবীমূর্ত্তি ভারতীয় মুদ্রা ও ভঙ্গীতে উপবিষ্ট। গরুড়াকৃতি মূর্ত্তিরও অভাব নেই। মুখ গরুড়ের, শরীর মানুষের।

আমাদের কৌতূহল উদ্দীপিত করে প্রাচীন সামুরাই-দের যুদ্ধের পরিচ্ছদ, বর্ম্ম ইত্যাদি। যুদ্ধের বর্ম্ম বটে, কিন্তু তাতে কারুকার্য্যের অভাব কিছু নেই, সেগুলিও এক একটি শিল্পসৃষ্টি। জাপান পূর্ব্বপুরুষ-পূজার দেশ এবং বুদ্ধের স্মৃতিকণা রাখাও সে-দেশে গৌরবের জিনিষ, কাজেই এদেশে স্মৃতিচিহ্ন (বোধ হয় ভস্ম, নখকণা, চুল ইত্যাদি) রাখবার আধারগুলি শিল্পীরা বহু যত্নে তৈরি করেন। স্বর্ণপদ্মের থাক থাক পাপড়ির উপর স্ফটিকের আধার, মন্দির কি প্রাসাদের আকৃতির আধার অনেক-গুলিই দেখলাম। ছোট হ'লেও তাদের কারুকার্য্য ও পরিকল্পনায় কোন খুঁৎ নেই।

এই মিউজিয়মে যত জিনিষ আছে তার অধিকাংশেরই নামধাম বৃত্তান্ত সব জাপানী ভাষায় লেখা, তা বুঝিয়ে দেবার মত লোক সেখানে কেউ আছে বলে মনে হ'ল না। ছবিগুলির তলায় একটা ইংরেজী অক্ষরও নেই। মূর্ত্তিগুলির নীচে তবু 'নারাযুগ, উপকরণ কাঠ, সময় ৫৬১ খৃষ্টাব্দ ইত্যাদি' কিছু কিছু কথা ইংরেজীতে লেখা আছে। কয়েকটি মূর্ত্তির নামও ইংরেজীতে লেখা।

কতকগুলি মহেঞ্জোদাড়োর পুতুল ও মূর্ত্তির মত অতি প্রাচীন ঘোড়া, ঘর, হাঁস, মানুষ ইত্যাদির রাঙা মাটির মূর্ত্তি দেখলাম; এগুলি খুব সম্ভব প্রাগৈতিহাসিক যুগের জিনিষ। এদের তলায় excavated from—বলে জায়গার নাম লেখা আছে, কিন্তু কোনও যুগের উল্লেখ নেই, অন্তত আমি দেখি নি। জাপানী শিল্পীদের মত নিপুণ কোন কাজের চিহ্ন তাতে নেই, কিন্তু তাদের প্রাচীনতা এবং ছেলেমানুষের হাতের গড়ার মত ভাবটাই তার মূল্য। বহু যত্নে তারা রয়েছে।

বাইরে তখন ঝুপ ঝুপ করে বরফ পড়ছিল, কিন্তু মিউজিয়মের ঘরে কোনদিন রোদ-হাওয়া ঢোকে না ব'লে বাহিরের চেয়ে ভিতরে মনে হচ্ছিল শীতের প্রকোপ বেশী। মিউজিয়মটি নারা উদ্যানেরই সংলগ্ন। সুতরাং ঘরের ভিতর থেকেই জানালার কাচ দিয়ে বাহিরের প্রাচীন মহীরুহদের কাঁটাপাতার মাথায় ও ফাঁকে ফাঁকে বরফ পড়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

নারার বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি

এদেশে মেয়েরাই অধিকাংশ সাধারণ কাজ করে, কাজেই মিউজিয়মে টিকিট বেচা, লাঠি জমা রাখা, বাহিরে কার্ড ক্যাটলগ বিক্রী করা সবই তারা করছে। এসব জায়গায় অসংখ্য বিদেশী লোক আসে, আমেরিকানরা ত খুবই। কিন্তু এই মেয়েগুলি এক অক্ষরও ইংরেজী না-ব'লেও তাদের কাজ চালায়। আমরা ভারতবাসী শুনে এরা খুব খুশী হয়েছে বললে। যত্ন ক'রে অনেক ছবি দেখাল এবং সকলে এগিয়ে আমাদের দেখতে এল। হয়ত এখনও জাপানের কোন কোন স্থানে বুদ্ধের জন্মভূমির প্রতি একটু টান আছে।

নারা উদ্যান বহু প্রাচীন। ইহার অনেক গাছেরও বয়স ১২০০ বৎসর হয়ে গিয়েছে। এর অধিবাসী মানুষের চেয়ে হরিণ বেশী। মোটা মোটা হরিণ চারি

দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দর্শক ও রক্ষকদের হাতে খাবার জন্য ভীড় করে যাচ্ছে।

৩রা ফেব্রুয়ারী বোধ হয় জাপানী শাস্ত্রমতে বসন্তের আবির্ভাবের দিন ছিল। সেদিন মন্দিরে মন্দিরে আলো জ্বেলে বসন্তের আগমনী ঘোষণা করা হয়। তা ছাড়া দিনের বেলা পুরোহিতেরা সাদা পোষাক ও কালো টুপি পরে এবং লাল পতাকা বহন ক'রে মিছিল ক'রে বাগানে বেরোন। বাহিরে যান কিনা বলতে পারি না। দেখলাম পুরোহিতের দল এই ভাবে চলেছেন, সঙ্গে দেবমন্দিরের অনেক পবিত্র জিনিষ চতুর্দ্দোলায় বাহিত হয়ে চলেছে। এই পুরোহিতদের ছাড়া জাপানের আর সকলের মাথায়ই আজকাল বিলাতী হ্যাট দেখি। এঁরাই শুধু প্রাচীন টুপিটা বজায় রেখেছেন। সাদা পোষাকও এঁদের ছাড়া শীতকালে কাউকে পরতে দেখি নি।

এই নারা উদ্যানেরই সংলগ্ন বিরাট এক মন্দিরে জাপানের বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তির স্থান। শুধু মন্দিরটিরই উচ্চতা ১৬০ ফুট ৭ ইঞ্চি। মন্দিরটি প্রাচ্য অন্যান্য মন্দিরের মত মস্ত এলাকা নিয়ে তৈরি। মন্দিরের চারি পাশে অনেকখানি জায়গা দেয়াল দিয়ে ঘেরা, সেই সব দেয়ালের গায়ে গায়ে অনেক বাড়ী। বোধ হয় এগুলি পুরোহিতদের থাকবার এবং অন্যান্য কাজের জায়গা। আসল মন্দিরের সামনে খানিকটা বাগান, তাতে হরিৎবর্ণ গাছ দেখা যায়, কিন্তু শীতে সব ফুলহীন। একেবারে সম্মুখে বিরাট সিংহদ্বার, সেও একটা মন্দিরেরই মত। এই বুদ্ধের চেয়ে বড় বুদ্ধ জাপানে এবং সম্ভবত পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তির উচ্চতা ৫৩ ফিট, মুখ লম্বায় ষোল ফিট, চওড়ায় সাড়ে-নয় ফিট। বুদ্ধ মূর্ত্তির কান বড় বড় হয়, কাজেই ষোল-ফিট মুখে কান সাড়ে-আট ফিট। ইহার পদ্মাসনে ছাপান্নটি পাপড়ি, তাদের উচ্চতা দশ ফিট করে অর্থাৎ দুই মানুষের সমান। এই পদ্মটির ব্যাস আটষট্টি ফিট।

বুদ্ধমূর্ত্তিকে ঘিরে যে স্বর্ণকিরণচ্ছটা গঠিত তা গোল নয়, ঘটাকৃতি। সুতরাং বুদ্ধের জটামুকুট থেকে আসন পর্য্যন্ত এটি বেশ সুবিন্যস্ত ভাবে নেমে এসেছে। এই কিরণমালার ভিতর পনর কি ষোলটি স্বর্ণময় বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি উপবিষ্ট। সেই মূর্ত্তিগুলিও এক একটি আট-নয় ফুট উচ্চ।

বিরাট বুদ্ধের পদতলে দাঁড়িয়ে মুখের দিকে চাইলে বিস্মিত হ'য়ে যেতে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য শিল্পীদের মহিমা! এত বড় মূর্ত্তি এমন ভাবে তারা গড়েছে যে তার বিশালতা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক কিংবা অমানবোচিত মনে হয় না। উপবিষ্ট মূর্ত্তিই যখন তিপান্ন ফুট, দাঁড়ালে ত সাধারণ মানুষের শতগুণ উঁচু হবার কথা। কিন্তু নীচে দাঁড়িয়ে আমার মনে হচ্ছিল না যে আমরা শত গুণ বিশাল মূর্ত্তির পায়ের কাছে দাঁড়িয়েছি।

প্রধান মূর্ত্তিটির দুই পাশে দুইটি সোনার পাতে মোড়া বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি উপবিষ্ট, মূর্ত্তির সামনে ব্রঞ্জ-জাতীয় ধাতুর ফুলদানিতে সেই ধাতুরই তৈয়ারী পদ্মফুল ও পাতা সাজান, তার উপর ধাতুনির্ম্মিত প্রজাপতি উড়ছে। সবই যখন বিরাট আকৃতি, তখন দুই হাত লম্বা প্রজাপতিও কিছু বে-মানান দেখায় না।

এই বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তির বয়স প্রায় বার-শত বৎসর। জাপানের উপর প্রকৃতির অত্যাচার কম হয় না, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড এ-দেশে নিত্যই লেগে আছে। তার ফলে সব প্রাচীন মন্দিরই কয়েক শত বৎসরের মধ্যে আগাগোড়া বদলে যায়। সমস্ত মন্দির ও তার এলাকা পুড়ে গেলেও আবার সেই ছাঁচে মন্দির তৈয়ারী হয়। নারার বিরাট বুদ্ধের মন্দিরও পুড়ে গিয়েছিল কয়েক শত বৎসর আগে। তবু এখনকারটিও কম প্রাচীন নয়। ভিতরের মূর্ত্তিটি যদিও কালের প্রকোপে একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে, তবু আর কোন পরিবর্ত্তন তার হয় নি।

জাপানের নারা যুগে অর্থাৎ যে সময় নারা শহরে জাপানের রাজধানী ছিল সেই সময় (৫৯২-৭৭০) ষোল জন রাজত্ব করেছিলেন। এই ষোল জনের ভিতর আট জনই নাকি ছিলেন সম্রাজ্ঞী। সুতরাং এ যুগে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে এবং সেই সূত্রে দেশের শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য ইত্যাদির অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপনে ধর্ম্মপ্রাণা সম্রাজ্ঞীরা অনেক অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করেছিলেন। এই সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল, সম্রাজ্ঞীরা তাঁদের সাহিত্য ও শিল্পে

অধিকারের জন্ম বিখ্যাত ছিলেন। সপ্তম ও অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের যে এমন আশ্চর্য্য প্রসার ও উন্নতি হয়েছিল ঐতিহাসিকেরা বলেন তা ধর্ম্মপ্রাণা কোকেন বেন্নো এবং তাঁহার কীর্ত্তিমতী মাতা কোমিয়ো কোগো প্রভৃতি সম্রাজ্ঞীদের প্রভাবেই অনেকখানি।

নারার এই বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি সম্রাজ্ঞী কোমিয়ো কোগোর বিশেষ ইচ্ছাতেই গঠিত হয়েছিল বলা যেতে পারে। এই সময় মঠে বহু সন্ন্যাসিনী থাকতেন বলে প্রত্যেক মঠের সঙ্গে সন্ন্যাসিনীদের আশ্রম স্থাপনও সম্রাজ্ঞী কোমিয়ো প্রচলিত করেন।

জাপানে পুরাকালে প্রত্যেক রাজার রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী পরিবর্ত্তিত হওয়া নিয়ম ছিল। নারাতে প্রথম স্থায়ী রাজধানী স্থাপিত হয় ৭১০ খ্রীষ্টাব্দে। এই খানেই বার বার বিফল হয়ে শিল্পীরা ৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি গঠন শেষ করেন। কথিত আছে, জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হবার পর এক সময় খুব মহামারী ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপদ ঘটে। তাতে মানুষের মনে ধারণা হয় জাপানের প্রাচীন সূর্য্যদেবী (?) ক্রুদ্ধ হয়ে এই সব বিপদ ঘটাচ্ছেন। দেবীর রাগ দূর করবার জন্য তাঁকে একটা বিরাট পূজা দেবার ব্যবস্থা হয়। এই বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি নাকি ছদ্মবেশে সেই দেবীরই মূর্ত্তি। ইঁহারই অন্তরালে দেবীকে স্মরণ ক'রে মানুষ পূজা দিয়েছে।

নারার রাজধানী গঠনের সময় কোরিয়া ও চীন দেশ থেকে বহু শিল্পী জাপানে এসেছিলেন। নারার স্থাপত্যে ও কাঠ-খোদাই কাজে চীনা ও কোরীয় ছুতার ও রাজ-মিস্ত্রীর কাজ অমর হয়ে আছে।

মন্দিরে ঢুকে প্রথমেই পয়সা দিয়ে ধূপ কিনে ধূপ-দানিতে দিতে হয়; সকলেই দিচ্ছে, আমরাও দিলাম। মন্দিরের বারান্দায় প্রকাণ্ড একটি সহাস্য কাঠের মূর্ত্তি বসে আছে, দেখে মনে হয় যেন মানুষকে অভ্যর্থনা করে মন্দিরে ডাক দিচ্ছে। ভিতরের বিরাট মূর্ত্তি দর্শন করে আমরা মূর্ত্তি প্রদক্ষিণ করে যখন বাইরে আসছি তখন দেখলাম এক পাশে ভগ্নমূর্ত্তির হাত পা মাথা সব আলাদা আলাদা সাজান রয়েছে। বোধ হয় কোন ভূমিকম্পের সময় এগুলি ভেঙে গিয়েছিল। ভাঙা অংশগুলিও সুন্দর।

বেরোবার পথে দরজার কাছে বই-খাতা নিয়ে কয়েক জন পুরোহিত বসে আছে, তারা চেঁচামেচি ক'রে কিছু বলছে না। তাদের মাথার কাছে কাঠের ফলকে ইংরেজীতে লেখা আছে—তোমার এখানে আসার কথা স্মরণে রাখবার জন্য আমরা লিখে রাখি। ঠিক কথাগুলি আমার মনে নেই, ভাবার্থ এই রকম। খাতায় পৃথিবীর নানা দেশের বিখ্যাত ও অখ্যাত লোকের নাম রয়েছে। আমরা এক ইয়েন দিয়ে নাম ও ঠিকানা লিখলাম। আমার দশ বছরের মেয়েকে দিয়েও নাম লেখালাম। জাপানে বিরাট বুদ্ধের পদতলে সে আর কোনো দিন আসবে কি না কে জানে? পুরোহিতরা তা দেখে খুব হাসতে লাগল, বলল, "তোমাকেও মনে রাখা হবে।" আমরা ভারতবাসী শুনে তারা বললে, "তোমরা আমাদেরই ত জাত-ভাই।"

মন্দির ছাড়িয়ে বাগানের ভিতর বহুদূর পর্য্যন্ত পথের ধারে ধারে কালীঘাটের মত ছোটখাট জিনিষের নীচু নীচু অনেক দোকান। দোকানগুলি বাগানের ভিতরে এবং জাপানীরা রং খুব ভালবাসে বলে কালীঘাটের দোকানের চেয়ে এগুলির চটক অনেক বেশী। খেলনা বাসন খাবার কত কি বিক্রী হচ্ছে। তীর্থযাত্রিণী মেয়েরা পিঠে ছেলে নিয়ে জিনিষ কিন্‌ছে। সকলের সাজপোষাকে রঙের ফোয়ারা। বর্ষীয়সীদের পোষাক প্রায় কালো, মধ্য-বয়স্কাদেরও পোষাকের রং অত ঝলমলে নয়। আমাদের দেশের মত এদেশেও তীর্থে মেয়েদের ভীড়ই বেশী, তবে এ-ভীড় দেখে তীর্থের ভীড় মনে হয় না। মনে হয় যেন এরা বাগানে হাওয়া খেতে এসেছে। অনেকে হরিণদের খেতে দিচ্ছে, কেউ কেউ মন্দিরে প্রণাম করছে।

নারার বাগানে কোথাও ফুল দেখলাম না। তবে প্রাচীন গাছ, শেওলা-ঢাকা পাথর আর ঘাসের জমি সবেতে সবুজ রংটা অন্তত চোখে দেখা গেল। বরফ পড়লেও কোথাও সাদা হয়ে নেই।

প্রাচীন জাপানে পুরোহিতদের এলাকা এক একটা বিরাট জমিদারীর মত ছিল, এখনও তার চিহ্ন বোঝা

যায় অনেক জিনিষে। জাপানের অনেক স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পুরোহিতদের ভাণ্ডার থেকে চলে, তাদেরই তত্ত্বাবধানে। সুতরাং এঁদের সন্ন্যাস-আশ্রমও একটা সংসার। তাই মন্দির-প্রাঙ্গণে থাকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধানের গোলা। নারায় দেখলাম এক-একটা বাড়ীর মত ধানের গোলা বাগানে সাজানো রয়েছে। তাতে এখনও ধান আছে কি না জানি না।

অন্নপূর্ণার মন্দিরের ঘণ্টার মত এখানে প্রকাণ্ড একটি ঘণ্টা। সে-ঘণ্টাটাও প্রায় একটা বাড়ীর সমান। সে ঘণ্টা যে বাজায় তাকে নাকি আবার নারায় আসতে হয়। আমরা বাজাই নি, বাজালে হয়ত আবার জাপান দর্শন হ'ত।

জাপানে ভাল খাদ্যের অভাব কোথাও দেখি নি। গিয়েছিলাম তীর্থ দর্শন করতে। সকালে সেই জাহাজের পরিজ আর গুঁড়ো দুধের সরবৎ খেয়ে বেরিয়েছি, এখন আবার সেখানে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। বাগানের বাইরেই একটা গাছ-ঢাকা কুঞ্জের ভিতর ছোট একটি ভোজনাগার। তাতে লেখা আছে Dining Hall। সেইখানে আমরা ট্যাক্সি থেকে নেমে খেতে ঢুকলাম। নীল নীল ফ্রকের উপর সাদা এপ্রন পরে একদল অল্পবয়স্কা জাপানী মেয়ে আমাদের দেখে হেসে ছুটে এল। তারা এখানে কাজ করে। আমার পোষাক দেখে তাদের মহা কৌতূহল হ'ল। সবাই কাছে এগিয়ে এল। আমরা ত জাপানী জানি না, কাজেই কথা বলতে পারলাম না। দাস মহাশয় খাবার আনতে বললেন। খাবারের আগে ছোট ছোট বেতের টুকরীতে করে গরম জলে ফোটান তোয়ালে এল—শীতে হাত পা জমে গিয়ে থাকলে হাত গরম করে নাও। পুরুষরা হাত মুখ দুই মোছে; মেয়েদের মুখে সেদেশে এত রুজ লিপষ্টিক ও পাউডারের ঘটা যে মুখে তোয়ালে ঘসা আর হয় না। ভাত মাছভাজা ইত্যাদি বিলাতী কায়দায় পরিবেশন করল। যারা জাপানী মতে খেতে চায় তাদের জন্য সে ব্যবস্থাও আছে। বাইরে কোন কৌতূহলের কারণ ঘটলেই পরিবেশনকারিণীরা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে সেইদিকে, ঠিক ইস্কুলের মেয়ের মত। দেখে মনে হয় না যে এরা পরের চাকরি করে। মহা ফূর্ত্তিতে আছে যেন। অবশ্য, বড় শহরের হোটেলের মেয়েরা এতটা ছেলেমানুষি করে না দেখেছি। অনেক কেতাদুরস্ত তারা।

এবার কাজ সেরে আবার ট্রেনে চড়ে কোবে ফিরতে হবে। ট্রেনে তেমনি লোকের ভীড়, কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বসে। কথা সবাই কম বলে, সুতরাং অধিকাংশ পুরুষই সারাপথ ঘুমোয়। ষ্টেশনে ষ্টেশনে ট্রেন-বয় চীৎকার করে তাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, তাকের উপর থেকে জিনিষ নামিয়ে দেয়, নইলে অনেকেই হয়ত নিজেদের গন্তব্য স্থান ছাড়িয়ে চলে যেত। যে মেয়েদের সঙ্গে ছেলেপিলে থাকে তারা ত তাদের নিয়েই ব্যস্ত, কেউ লেবু খাওয়াচ্ছে, কেউ চা খাওয়াচ্ছে, কেউ শুধু তদারক করছে। যাদের সঙ্গে কুচোকাচা নেই তারাও নিজেদের পোটলা-পুঁটলি সামলে বসে থাকে, ঘুমোতে বড় দেখি নি। স্ত্রীপুরুষ একত্রে গেলে দেখা যায়, পোটলা এবং ছেলেপিলে সবই মেয়েরা বইছে, পুরুষ নিষ্কণ্টক। এ-বিষয়ে জাপানীরা আমাদের চেয়েও প্রাচ্য। ঘরে-বাইরের সব বোঝা স্ত্রীলোকের কাঁধে চাপিয়ে দিতে পারলে তারা খুব আনন্দে থাকে। আমরা বাংলা দেশের মানুষ, তবুও আমার চোখে এতটা দারুণ প্রাচ্য ভাব ভাল লাগত না। জাপানে এক মাসের মধ্যে কোন পুরুষ স্ত্রীলোককে কিছুমাত্র সাহায্য করছে দেখতে পাই নি। উল্টোটা বরং অনেক দেখেছি। ওদেশে আট-নয় বৎসর পর্য্যন্ত ছোট ছেলে-মেয়েদের ট্রেনভাড়া লাগে না বলে শুনেছি। তাই বোধ হয় পথে ঘাটে ট্রেনে ছোট ছেলেপিলের এত ছড়াছড়ি। প্রায় সব বয়স্কা মেয়ের পিছনেই দুটি-একটি করে ছোট ছেলেমেয়ে। অতি বৃদ্ধাদের সঙ্গেও নাতি-নাতনী থাকে। মেয়েরা ছেলেপিলে নিয়ে ট্রেনে বেড়ায়, দোকানে যায়, রেস্তোরাঁয় খায়, কাজেই বাড়ীতে ছেলে ফেলে আসার দুর্ভাবনা তাদের বিশেষ থাকে না এবং ছেলেদের পিতারা বেশ নির্ঝঞ্ঝাট থাকে।

ক্রমশঃ

আলোচনা

ভাষা-রহস্য

শ্রীবীরেশ্বর সেন

গত আষাঢ়ের প্রবাসীতে প্রকাশিত উক্ত শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম যে শ্রীহট্টে 'এই'-কে 'ঐ' এবং 'ঐ'-কে 'এই' এবং মাংসের কালিয়াকে মোরব্বা বলে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার পাল চৌধুরী ইহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন যে শ্রীহট্টে সেরূপ বলে না। কৈফিয়ৎ-স্বরূপ আমার বক্তব্য এই যে, পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টনিবাসী প্যারীমোহন চাঁদ যখন তেজপুরে পুলিস ইনস্পেক্টর ছিলেন তখন আমি তাঁহাকে 'এই' স্থানে 'ঐ' এবং 'ঐ' স্থানে 'এই' বলিতে শুনিয়াছি। এইরূপ প্রয়োগ শুনিয়া কয়েক জন শ্রোতা যে হাসিয়াছিলেন তাহাও মনে আছে। তাহার কয়েক বৎসর পরে আমি নিজেই শ্রীহট্টে গিয়া স্থানীয় একটি বালক-ভৃত্যের মুখে বহুবার 'এই' স্থানে 'ঐ' এবং 'ঐ' স্থানে 'এই' প্রয়োগ শুনিয়াছি। শ্রীহট্টনিবাসী শরাফৎ আলী চৌধুরী এবং আর এক জন যখন ডিব্রুগড়ে পুলিস সাব-ইনস্পেকটর ছিলেন এবং যাঁহারা উভয়েই পরে বুদ্ধিমত্তা এবং কার্য্যকুশলতার জন্য উচ্চপদ এবং খাঁ-বাহাদুর উপাধি পাইয়াছিলেন তাঁহাদের উভয়ের মুখেই কালিয়াকে মোরব্বা বলিতে শুনিয়াছি।

অতঃপর মূল কথারই অনুসরণ করিতেছি।

প্রথম প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি যে বাংলায় বহু শব্দ আমরা ভুল অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকি। কেন এইরূপ করি তাহা বোধ হয় সর্ব্বস্থানে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। চওড়া অর্থে প্রস্থত না বলিয়া প্রশস্ত বলি তাহার কারণ অনুমান করা কঠিন নহে। কিন্তু দুইটি শব্দের ভুল প্রয়োগের কারণ আমরা পাই এক অপ্রত্যাশিত স্থানে। শব্দ দুইটা 'রাগ' এবং 'সম্বন্ধী' এবং অপ্রত্যাশিত স্থান ভগবদ্গীতা। রাগ শব্দের প্রকৃত অর্থ ভালবাসা অথচ আমরা তাহার বিপরীত ক্রোধ অর্থে শব্দটা প্রয়োগ করি এবং পুত্র বা কন্যার শ্বশুরের প্রতি প্রযোজ্য 'সম্বন্ধী' শব্দ শ্যালকের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করি। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধকালে যাহাদিগকে দেখিয়া অর্জ্জুনের বৈরাগ্য হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে শ্যালাসম্বন্ধিনস্তথা ছিলেন এবং রাগদ্বেষ বর্জ্জন করার উপদেশ গীতার বহু স্থানে আছে। এই জন্য আমরা শ্যালক এবং সম্বন্ধীকে একত্রাবস্থান করিতে দেখিয়া উভয় শব্দ একার্থক বলিয়া মনে করি এবং রাগদ্বেষকেও এক স্থানে দেখিয়া সেই দুইটাকেও একার্থক মনে করি। কেন না বাংলার বহু স্থানে আমরা একার্থ-বোধক দুই শব্দ জোড়া দিয়া বলিয়া থাকি। যেমন মানসম্ভ্রম, মানমর্য্যাদা, আত্মীয়স্বজন, মানইজ্জৎ, সতীসাধ্বী, মামলামকদ্দমা ইত্যাদি বহু জোড়া শব্দ।

এখানে অবান্তর ভাবে বলিতে ইচ্ছা হয় যে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে প্রেমার্থক 'রাগ' শব্দটা বর্জ্জন করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ইহা অতিশয় বিস্ময়কর।

সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে নবাবিষ্কৃত সত্য প্রকাশ করিতে হইলে নূতন আবেষ্টন বা অবস্থায় উপনীত হইলে মানুষের ভাষার বিস্তার অর্থাৎ ভাষাতে পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন এবং পরিবর্জ্জন, হইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেক সময়েই নূতন শব্দের সৃষ্টি হয় না। বহু স্থলে প্রচলিত শব্দে নূতন অর্থ আরোপিত হয়। রামায়ণে সত্য' শব্দের অর্থ truth নহে কিন্তু promise বা প্রতিশ্রুতি। দশরথ কৈকেয়ীর পিতার নিকটে সত্য করিয়াছিলেন যে কৈকেয়ীর গর্ভজাত পুত্রই রাজা হইবেন। এস্থলে 'সত্য' শব্দের অর্থ প্রতিশ্রুতি, ইহা ঠিক বাংলা সত্ত্ব এবং পারসী শর্ত্ত শব্দের মত। আবার কালিদাসের মেঘদূতে বহুবার 'কুশল' শব্দের প্রয়োগ আছে। সর্ব্বত্রই তাহার অর্থ মঙ্গল নহে, কিন্তু মঙ্গল সমাচার।

কখনও কখনও অতি স্পষ্টরূপে কোনও কিছু উক্ত হইলেও পণ্ডিতেরাও তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন না। সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্—এই বাক্যটির অর্থ করিতে অনেক শিক্ষিত লোককেও গলদঘর্ম্ম হইতে দেখিয়াছি। বাক্যটার কর্ত্তৃপদ যে কি তাহাই তাঁহারা খুঁজিয়া পান না। পাঠক যদি কৌতুক দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে কয়েকটি সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্রকে দিয়া আমার এই কথাটা পরীক্ষা করিবেন। প্রথমেই যেন তাহাদিগকে বাক্যটার অনুবাদ লিখিতে বলেন।

স্বয়ংবর

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

শিবপুরের ষ্টীমার-ঘাট। জেটির কাছে ঘাসের উপর সব বসিয়া আছে,—গন্‌শা, ঘোঁৎনা, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ আর রাজেন। ত্রিলোচন উপস্থিত নাই, শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে।

ছয়টা বাহান্নর ষ্টীমার আসিয়া লাগিল। আর সব প্যাসেঞ্জার বাহির হইয়া গেলে ছোটখাট একটি পশ্চিমা বরযাত্রীর দল নামিল, বোধ হয় তক্তাঘাট হইতে আসিয়াছে। বরের কানে দুইটা বড় বড় কুণ্ডল, গায়ে ফিনফিনে সবুজ সিল্কের পাঞ্জাবী, গলায় আরও মিহি জাপানী সিল্কের গোলাপী রঙের চাদর। মাথায় প্রচুর তেল এবং চোখে প্রচুর কাজল। জেটি হইতে বাহির হইয়া বোধ হয় নিজের বিশিষ্টতাকে আরও ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সে চোখে কেমিকেলের ফ্রেমের চশমা আঁটিয়া একটা হাওয়াগাড়ী সিগারেট ধরাইল।

ষ্টীমার ছাড়িয়া গেলে গন্‌শারা সব আসিয়া জেটির রেলিঙে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। খানিকক্ষণ চুপচাপের পর রাজেন বলিল—"এদের খুব ছেলেবেলায়ই দিব্যি বিয়ে হয়ে যায়, নিশ্চিন্দি।"

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে ঘোঁৎনা জিজ্ঞাসা করিল—"গণৎকারের কাছে তো গেছলি গন্‌শা; কি বললে র‍্যা?"

গন্‌শার মুখটা একটু কুঞ্চিত হইল মাত্র, কোন উত্তর না দিয়া দূরে হাওড়ার পুলের দিকে চাহিয়া রহিল। গোরাচাঁদ বলিল—"আম্মো তো সঙ্গে ছেলাম। বললে, বউ তো ওদিকে ডাগোরডোগোরটি হয়ে তোয়ের রয়েছে, কিন্তু গন্‌শার আজন্মের একটা দোষ আছে, সেটা না খণ্ডালে তো বিয়ে হতে পারে না। তাতে কম করে সারতে গেলেও সওয়া পাঁচ টাকা লাগবে।...না গেলেই ছেল ভাল,—ওর মামা অত টাকা বের করবে না, মাঝে প'ড়ে বউ কোথায় ডাগর হয়ে উঠছে শুনে ভাবনায় ও বেচারীর মনটা..."

রাজেন বলিল—"ধ্যা ধ্যাঃ, ওসব ধাপ্পাবাজি, বিশ্বাস করি না।"

গন্‌শা হাওড়ার পুল হইতে দৃষ্টি সরাইয়া অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিল—"তু-তুই কি ব'লতে চাস এখনও হা-হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে?"

রাজেন বলিল—"না, তোর বউয়ের কথা বলছি না, সে তো ডাগরটি হবেই শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে। বলছি এই গণৎকারদের কথা—তুই বিশ্বাস করিস? এই দোষ খণ্ডানোর কথা?"

গন্‌শা কোন উত্তর দিল না। ঘোঁৎনা বলিল—"বিশ্বাস না ক'রে কি করবে? শানাপাড়ায় 'কায়েৎ মহারাজ' বলে এক সাধু এসেছেন। বলেছেন নাকি এত দিন আত্মবিস্মৃত হয়ে ছিলেন, হঠাৎ যোগনিদ্রায় স্বপ্ন দেখেছেন তিনি আসলে চিত্রগুপ্তের নাতজামাই। মন বড্ড উতলা হয়ে উঠেছে। শীগ্‌গিরই দেহত্যাগ করবেন। সেখানে গিয়ে চিত্রগুপ্তের খাতা থেকে নাম কাটিয়ে দেবেন ব'লে, যে-সব পুরনো পাপী হাতে পায়ে ধরছে তাদের নামধাম একটা খেরোর খাতায় লিখে নিচ্ছেন; পনর টাকা ফি—বলেন, দাদাশ্বশুরের একটা মন্দিরের ব্যবস্থা করেই দেহ রাখবেন—উকিল, ব্যারিষ্টার, এটর্ণির ভীড় লেগে গেছে। বল,—তারা ঠকবার লোক!"

গোরাচাঁদ বলিল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আগে আমিও কয়েক দিন গেছলাম—যা খেতে চাইবে মুঠো খুলে হাতে দিয়ে দিত। এখন শুনছি আর সময় পায় না। আর এখন গেলে কেমন যেন গা ছম্ ছম্ করে লোকটাকে দেখে। ওর দাদাশ্বশুর যমের পাশেই ব'সে খাতা লেখে কি না।"

গন্‌শা একটা বিড়ি ধরাইয়া নীরবে টানিতে লাগিল। রাজেন বলিল—"সত্যিই যদি আর জন্মের কোন দোষে বিয়ে হচ্ছে না, তো কাটাবার কি আর উপায় নেই? তীর্থ-টির্থ করা, গঙ্গাস্নান করা...আর বিড়ি সিগারেট-গুলোও ছাড়্ গন্‌শা—নেশাও একটা পাপ তো?"

কে. গুপ্ত বলিল—"গঙ্গাস্নানের তো একটা মস্তবড় যোগও আসছে—দশহরা..."

ঘোঁৎনা—"ঠিক হয়েছে রে!" বলিয়া এ-ধারের রেলিং থেকে ও-ধারের রেলিঙে গিয়া গন্‌শার মুখোমুখি হইয়া বলিল—"সেদিনকার গঙ্গার ঘাটের মেলার জন্যে

বাজেশিবপুর থেকেও এবার ভলণ্টিয়ার দল গড়ছে। চল্ না, গঙ্গাস্নানও হবে, লোকসেবাও হবে; যদি সত্যিই কিছু দোষটোষ থাকেই তো একসঙ্গে দুটো পুণ্যির ধাক্কায়...”

গোরাচাঁদ বলিল—“আর ওদের বেশ থ্যাটের বন্দোবস্তও আছে, শিবপুরের দলের সঙ্গে ওরা টেক্কা দিচ্ছে কি না...”

রাজেন বলিল—“তাহলে দেখ্ না গন্‌শা, তর্কলঙ্কার মশাই বলছিলেন—এর পরেই উপরো-উপরি তিনটে ভাল লগ্ন রয়েছে, যদি সত্যিই কেটে যায় দোষটা... অন্ততঃ গণৎকারের কথাটা হাতে হাতে মিলিয়ে দেখবার মস্ত একটা সুবিধে।”

গন্‌শা বোধ হয় পুণ্য অর্জ্জনের হাতে খড়ি হিসাবে অর্দ্ধদগ্ধ বিড়িটা গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল—“নে-য়েবে ভলণ্টিয়ার? যাই তো কিন্তু সবাই যাব।”

ঘোঁৎনা বলিল—“লুফে নেবে গণেশের দল শুনলে। শিবপুরের দলের এরাই তো কতবার বলেছে আমায়—ঘোঁতন, তোমাদের সবাই এস না; একটা সৎ কাজ। তখন গা করি নি। অবিশ্যি এখন আর ওরা নিচ্ছে না, বন্ধ ক'রে দিয়েছে।”

২

পরের দিন সকালে ছয় জনে স্বেচ্ছাসেবকদলে ভর্ত্তি হইবার জন্য বাহির হইল। রাত্রে ত্রিলোচন আসিয়াছে। তাহার শ্বশুরবাড়ীর গল্প শুনিতে সকলে চৌধুরী-পাড়ার রাস্তা ধরিয়া বাজেশিবপুরের দিকে অগ্রসর হইল এবং এ-গলি সে-গলি করিয়া একটা দোতলা বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। রেলিং-দিয়া ঘেরা সামনে ছটাক-খানেক বাগান। ঘোঁৎনা বলিল—“এই তো সতের নম্বর।”

গন্‌শা জিজ্ঞাসা করিল—“এই বাড়ীটাই? লোকজন কাউকে তো দেখছি না!”

ঘোঁৎনা উত্তর করিল—“নম্বর তো সতের ঠিকই রয়েছে। আয় না দেখাই যাক্।” বলিয়া ভেজানো ফটক ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ইতস্ততঃ করিতে করিতে একে একে সবাই অনুসরণ করিল—শুধু গোরাচাঁদ সব পেছনে ফটকের একটা পাল্লা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাড়ীটার গম্ভীর আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া সবাই একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল।

ত্রিলোচন বলিল—“একটা হাঁক দে না ঘোঁৎনা।”

ঘোঁৎনা তাহার দিকে ঘুরিয়া বলিল—“তুই দে না। ঘোঁৎনা পথ দেখিয়ে নিয়েও আসবে, ডেকেও দেবে, তার পর বলবি গাড়ী ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে চল্... আবদার!”

গন্‌শা চটিয়া উঠিয়া বলিল—“প-প্রথ দেখিয়ে কোন চুলোয় নিয়ে এলি আগে তাই বল তো।”

এমন সময় উপরের বারান্দায় কালো মোটাগোছের একটি মাঝবয়সী লোক বাহির হইয়া প্রশ্ন করিল—“কি চাই আপনাদের?”

সকলে পরস্পরের মুখের দিকে একবার চাহিল। ঘোঁৎনা বলিল—“আজ্ঞে চাই না কিছু।”

“তবে?”

“একবার নীচে আসবেন?”

গোরাচাঁদ নিঃসাড়ে ফটকের বাহির হইয়া দাঁতে একটা ঘাস চিবাইতে চিবাইতে রাস্তায় পায়চারি করিতে লাগিল। উপর হইতে রুক্ষস্বরে উত্তর হইল—“কিছু চাই না, অথচ নীচে আসতে হবে—মানে?”

রাজেন ঘোঁৎনাকে ফিস ফিস করিয়া বলিল—“গুছিয়ে বল্ না, চটিয়ে তুলছিস যে।”

নিজেই সামনে একটু আগাইয়া গিয়া বলিল—“আজ্ঞে নামতে হবে না আপনাকে কষ্ট ক'রে,—বলছিলাম গঙ্গাস্নানের মেলা হবে তাই ভলণ্টিয়ার...”

আরও রুক্ষস্বর এবং বিকৃতভঙ্গিতে উত্তর হইল—“তাই আমায় ভলণ্টিয়ারি করতে হবে...? তা রাজি আছি—বল তো নেমে একটু শক্তির পরিচয়ও দিই গিয়ে।”

গোরাচাঁদ বাড়ীর সুমুখ হইতে সরিয়া গিয়া স্যাণ্ডাল জোড়াটা হাতে তুলিয়া লইয়া এবং মাথা নীচু করিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁতে বুড়া আঙুলের নখ খুঁটিতে লাগিল।

গন্‌শা ঘোঁৎনার পিছনে নিজের জায়গায় সরিয়া আসিয়া বলিল—“আজ্ঞে না ইয়ে...ভ-ভলণ্টিয়ার তো আমরা...দশহরার মেলায়...গঙ্গার ঘাটে...”

“বাড়ীটাতে গঙ্গার ঘাট বলে ভুল করবার মত কিছু পাচ্ছ কি সব?” গলা আরও কর্কশ হইয়া উঠিল—“ভজুয়া!...”

রাজেন গন্‌শার জামার খুঁটে টান দিয়া নিম্নস্বরেই বলিল—“চল্, বুঝতেই পারা যাচ্ছে এ বাড়ী নয়।” সব কথার উল্টা মানে করছে...”

গোরাচাঁদের সহিত এদের দেখা হইল অনেকটা

দূরে গলির একটা মোড়ের অন্তরালে। সে স্যাণ্ডালে পা সাঁদ করাইতে করাইতে একটু অপ্রতিভ হইয়া প্রশ্ন করিল—"ভজুয়া বেটা বেরিয়েছিল নাকি?"

গন্‌শা ভেঙচাইয়া বলিল—"তুই আর কথা কস্‌ নি গোরে; ঘেন্না ধরালি।...পা-প্লালালি কি বলে র‍্যা? এদিকে ভলণ্টিয়ারি করবার সখও আছে!"

গোরাচাঁদ পূর্ব্বে পূর্ব্বে এর প্রতিবাদ করিত, আজকাল তাহার এ-দুর্ব্বলতাটুকুর প্রমাণের সংখ্যা নিয়তই বৃদ্ধি পাওয়ায় চুপ করিয়া থাকে, সে দলের মাঝখানে একটি নির্ব্বিঘ্ন জায়গা করিয়া লইয়া চলিতে লাগিল। সবাই মন-মরা হইয়া গিয়াছে; কিছুক্ষণ কেহ কোন কথাই কহিল না। শেষে ঘোঁৎনা 'নিতান্ত যেন মৌনতার অস্বস্তিটা এড়াইবার জন্য বলিল—"কেন যে এমনটা হ'ল ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।"

কে গুপ্ত বলিল—"আপনি বোধ হয় ঠিকানাটা ভুল শুনেছিলেন।"

ঘোঁৎনা বিরক্তির সহিত বলিল—"আপনি কি বলতে চান ওটা সতের নম্বর ছিল না? একের পিঠে সাত তাহ'লে কি হয় বলুন তো শুনি?—তৈষট্টি?"

কে. গুপ্ত একটু থতমত খাইয়া বলিল—"না সে কথা বলছি না, বলছি বোধ হয় অন্য কোন নম্বর বলেছিল।"

"অন্য নম্বর বললে আমি সতের বলতে যাব কেন মশাই? আমাকে বলেছিল ছিয়ানব্বই, আমি এসে বল্‌লাম সতের?...আপনাকে কেউ যদি বলে গন্‌শাকে একবার ডেকে দিন, আপনি ত্রিলোচনকে ধবে নিয়ে আসবেন?"

কে. গুপ্তেব প্রশ্নটা সকলেরই মনে জাগিয়াছিল; কিন্তু ঘোঁৎনার তর্কের ভাষা ও ভঙ্গি দেখিয়া কেহ আর তাহার উত্থাপন করিল না।

কে গুপ্ত স্বভাবতই একটু মোটাবুদ্ধি, পেঁচালো তর্কের ধাঁধায় পড়িয়া চুপ করিয়া গেল এবং কি ভাবে তাহার মনেব কথাটা গুছাইয়া বলা চলে ভাবিতে লাগিল।

ত্রিলোচন গন্‌শাকে বলিল—"তোর বোধ হয় বিয়ের ফুলটা এগনও ফোটে নি গণেশ, নইলে..."

গন্‌শার মনটা অত্যন্ত খিঁচ্‌ড়াইয়াই ছিল, উষ্মার সহিত বলিল—"ন-নৈলে ঐ কেলে যমদূতটা ভলণ্টিয়ারিতে নাম লিখে নিত? তোর বিয়ের ফুলই ফুটেছে তিলে, বু-বুদ্ধির ফুল কিন্তু শুকিয়ে আসছে..."

কে. গুপ্ত একটু ভয়ে ভয়ে ঘোঁৎনাকে বলিল—"না, আমি সে-কথা বলছি না; বলছিলাম—ধরুন, যাকে আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন সেও ত ভুল বলতে পারে..."

ঘোঁৎনা আবার একটু ধমকের স্বরে বলিল—"পৃথিবীতে এত লোক থাকতে আমি বেছে বেছে এমন লোককেই জিজ্ঞেস করতে যাব কেন শুনি? আর তার নিজেরই যদি সন্দেহ থাকবে তো বলতেই বা যাবে কেন?"

কে গুপ্ত আবার চুপ করিয়া গেল এবং একটু পরে বাঁ-হাতের বুড়া আঙুলের ডগা দাঁতে চাপিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

গোরাচাঁদ বলিল—"তা হ'লে শুধু গঙ্গাস্নানই ক'রে নে গন্‌শা। ভোর থেকে এসে সব গঙ্গায় পড়ে থাকা যাবে এখন। মা গঙ্গা যদি মুখ তুলে চান তো পুণ্যির একটু ব্যবস্থা ক'রে দেবেন না?—দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেও একটা-আধটা অ্যাক্‌সিডেণ্ট হবে না?—অত বুড়ী-টুড়ী, কচি ছেলেমেয়ে সব আসবে। আমার হাতের কাছে যেটা পড়বে সেটা তোকেই দিয়ে দেব।"

রাজেন বলিল—"হ্যাঁ, সেবা করা নিয়ে বিষয়, ভলণ্টিয়ার হয়েই যে সেবা করতে হবে শাস্ত্রে এমন কথা তো ধরে লিখে দেয় নি?"

ত্রিলোচন বলিল—"স্ত্রী স্বামীর সেবা করবে কি ক'রে! সে ত আর ভলণ্টিয়ার নয়?"

গন্‌শার মাথায় মা-গঙ্গার মুখ তুলে চাওয়ার কথাটা ঘুরিতেছিল; বিরক্ত ভাবে বলিল—"ধ্যাৎ, আর ঠা-ঠাকুর দেবতার উপর বিশ্বাস চলে যাচ্ছে। যদি দ-দয়াই হবে ত আজ ছ-বছর থেকে ভোগা দিচ্ছে কেন?"

গোরাচাঁদ পাঞ্জাবীর পকেটে দুইটি হাত সাঁদ করাইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় কে. গুপ্ত বলিয়া উঠিল—"নিন ঘোঁতন বাবু, এবার কি বলবেন বলুন।"

আর সবার কাছে একটু অপ্রতিভ হইয়া ঘোঁৎনা কে. গুপ্তকে মাঝে মাঝে থাবা দিয়া একটা আমোদ এবং সান্ত্বনা পাইতেছিল, বলিল—"কি শুনতে চান বলুন?"

"আপনি বাড়ীটা রাধানাথ মিত্তিরের গলিতে বলেছিলেন না?"

"এখনও তো বলছি মশাই, কারুর ভয় না কি?"

"ঐ দেখুন।"

কয়েক পা সামনে গলিটা মোড় ফিরিয়াছে, আর

সেই মোড়ে অন্য দিক দিয়া একটা সরু গলি বাহির হইয়াছে। সেই মোড়ে একটা জরা-জীর্ণ কাঠের ফলকে গলিটার নাম লেখা রহিয়াছে। পাশের দেওয়ালের পিছন থেকে একটা পেঁপের ডাল ভাঙিয়া পড়িয়াছে বলিয়া ফলকটা ভাল করিয়া দেখা যায় না; ক্রমাগত ঠকিয়া কে. গুপ্তের নজর ঐদিকে ছিল বলিয়া সে দেখিতে পাইয়াছে—সকলে পড়িল, 'রাধানাথ ঘোষ লেন।'

সকলে একটু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘোঁৎনার মনে হইতেছিল কে. গুপ্তকে চিবাইয়া খায়। নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলিল—"তাই ত দেখছি, একটু যেন ভুল হয়ে গেছে।"

গনশা অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিল। মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল—"তুই কি ভেবেছিলি যখন ঘোষ-মিত্তির দুই-ই কু-কুলীন কায়েৎ তখন গলিতে বেশী তফাৎ হবে না।"

দলের মধ্যে ঘোঁৎনাই এক গন্‌শাকে সব সময় খাতির করে না, রাগিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল এমন সময় ত্রিলোচন দু-জনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিল—"একটা শুভ কাজে নেমে তোরা ঝগড়া করতে লাগলি। আমার একটা মতলব এসেছে—থাম্ দিকিন তোরা।"

সকলে উদ্‌গ্রীব ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। ত্রিলোচন বলিল—"এই কইপুকুরের কাছাকাছি তর্কলঙ্কার মশায় থাকেন। তাঁকে খুঁজে বের করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—পুরুতমানুষ, শিবপুর-বাজেশিবপুরের অলিগলি নখদর্পণে।"

গোরাচাঁদ একটু উৎসাহিত হইল, বোধ হয় পুরোহিত-বাড়ীর সন্দেশ কলা নারকেল-নাড়ুর কথা মনে পড়িল। বলিল—"মন্দ নয়, জলতেষ্টাও পেয়েছে বেজায়।"

রাজেন বলিল—"তাহ'লে সামনে কেমন দিন-টিন আছে সেটাও একবার দেখিয়ে নেওয়া যায়।"

গন্‌শার মেজাজটা ঠিক হয় নাই। রুক্ষস্বরে বলিল—"খুব মতলব খাড়া করেছিস্—সতর নম্বর বাড়ীর জন্যে তর্কলঙ্কার মশায়ের বাড়ী খোঁজ, ত-তর্কলঙ্কার মশায়ের বাড়ী খোঁজবার জন্য তার শিষ্যিদের বাড়ী খোঁজ, তা-তাদের বাড়ী খোঁজবার জন্যে···"

এমন সময় রাজেন, ত্রিলোচন, কে. গুপ্ত তিন জনে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওই তর্কলঙ্কার মশাই আসছেন!—নাম করতেই!"

৩

সত্যই দেখা গেল, তালতলার চটি পায়ে নামাবলী গায়ে তর্কালঙ্কার মহাশয় সামনের একটা বাড়ীর বারান্দা হইতে নামিতেছেন। সবাই যেন হাতে স্বর্গ পাইল, অবশ্য এক গোরাচাঁদ ভিন্ন। ঘোঁৎনা অগ্রসর হইয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কানের উপযোগী আওয়াজ করিয়া বলিল—"প্রণাম হই তর্কলঙ্কার মশাই।"

সবাই ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

তর্কালঙ্কার মহাশয় ডান কানটা আগাইয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি বলছ?"

ঘোঁৎনা বলিল—"প্রণাম হই, প্রণাম।"

আরও কাছে কানটা আনিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন—"ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না, কাল উপবাস ছিল কি না, কাহিল হয়ে রয়েছি ব'লে কানটা একটু···"

গন্‌শা বলিল—"ক-কপালে হাত ঠেকিয়ে বল না বাপু।···'কাহিল হয়ে রয়েছি!'···কবে যে কাহিল কম তা তো বুঝি না।"

রাজেন বলিল—"পেন্নামের হাঙ্গামটা তুলে দিয়ে কাজের কথাটাই পাড় না একেবারে—তোরও যেন ভক্তির রোখ চেপে গেছে।"

গোরাচাঁদ বলিল—"তার চেয়ে ওঁর বাড়ীই নিয়ে চল ওঁকে; মাঝরাস্তায় চেঁচামেচি করার চেয়ে বরং··· একে তো এমনিই গলা শুকিয়ে কাঠ···"

ঘোঁৎনা কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বলিল—"এই প্রণাম করছি!"

"দীর্ঘজীবী হও, রাজরাজেশ্বর হও, তা কোথায় এসেছ তোমরা? রোদে ঘুরে ঘুরে মুখ যে রাঙা হয়ে গেছে!··· গণেশ···?"

গন্‌শা বাজে কথার দিকে গেল না, চেঁচাইয়া বলিল—"রাধানাথ মিত্তিরের গলি জানেন? ঘোঁৎনা বে-বেশী ওস্তাদি করতে গিয়ে রাধানাথ ঘোষের গলিতে এনে চ-চড়কি ঘোরাচ্ছে।"

ঘোঁৎনা বিরক্ত ভাবে মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

তর্কালঙ্কার মহাশয় হাসিয়া রাজেনের দিকে চাহিলেন। সে আরও চেঁচাইয়া বলিল—"জিজ্ঞেস করছে—রাধানাথ মিত্তিরের গলি চেনেন?"

"খুব চিনতুম, সে ত মারা গেছে।"

রাজেন নিরাশ ভাবে একটু এলাইয়া পড়িয়া বলিল—

"এ এক দোসরা ফেসাদে পড়া গেল।—'রাধানাথের গলি' চেনেন ?—না,—'সে ত মারা গেছে !"

এমন অবস্থায় তর্কালঙ্কার মহাশয় কখন কখন চটিয়াও যান আবার।

সেই দিকটা সামলাইয়া ত্রিলোচন বলিল—"মারা গেছেন শুনে বড় কষ্ট হ'ল। তাঁর গলিটা চেনেন ?" রাস্তাটার উপর ইসারায় হাতটা চালাইয়া বলিল—"গলি—গলি !"

"ও বুঝেছি, সে ত এখানে নয়। আমার সঙ্গে এস; ওই দিক হয়েই না-হয় চৌধুরীদের বাড়ী চলে যাব। তারু চৌধুরীর খুড়ীর বড় কঠিন পীড়া শুনছি, চান্দ্রায়ণ করবার জন্যে। একবার বলে দেখি।...এই তো গোরাচাঁদ, তোমাদেরই তো পাড়ার; কেমন আছে বলতে পার যদুনাথের পরিবার ? আহা যদু চৌধুরী ছিল..."

গোরাচাঁদের মুখটা যেন শুকাইয়া গেল, সহজ ভাব দেখাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"আজ্ঞে, তিনি তো দিব্যি সেরে উঠেছেন। কাল গেছলাম—ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে কত জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আপনি কষ্ট ক'রে আর যাবেন না; বুড়োমানুষ,—এই কাটফাটা রোদ্দুর। আমাদের গলিটা দেখিয়ে ফিরে আসুন।"

পিছনে সরিয়া আসিয়া অত্যন্ত চটিয়া হাত-পা নাড়িয়া গনশাকে বলিল—"দেখ্ ত বে-আক্কেলপনা !—সে ধুঁকছে—এখন-তখন—সঙ্গে কেত্তনপার্টি বেরুবে, সব ঠিকঠাক্ করছি—কদ্দিনকার একটা আশা—ওর মাঝে পড়ে আবার তাকে চন্দ্রায়ণ ক'রে চাঙ্গা ক'রে তোলবার চেষ্টা। এ কি শত্রুতা বল দিকিন !...এর ওপরও যদি যেতে চায় তো বলব পাঁচটা সায়েব ডাক্তারে ঘেরে আছে...তাদের কুকুর নিয়ে—বাজে লোককে ভিড়তে দিচ্ছে না—বিশেষ ক'রে পুরুতদের।...কদ্দিন পরে একটা চান্স !—শুনছি নাকি আবার বৃষোৎসর্গ করবে।"

গনশা ব্যঙ্গ-হাসিতে ঠোঁট দুইটা একটু কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"তুই বোকা-বুঝিস না। ও চন্দ্রায়ণ করলে আরও শীগ্গির টেঁসে যাবে বরং। একে বদ্ধ কালা হয়ে গেছে, তায় আবার ভয়ঙ্কর ভুলো মন, একটা বিম্নিটিম্নি হবেই, ভ-ভগবান না করুন।"

গোরাচাঁদের মুখটা আবার পরিষ্কার হইল। তবুও একটু সন্দিগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল—"যাঃ, ঠাট্টা করচিস। ওদিকে এক জন মরতে বসেছে আর গনশার যেন ফুর্তি বেড়ে গেছে। যাঃ..."

গনশা ভারিক্কে হইয়া বলিল—"গ-গনশা সব কথা নিয়ে ঠাট্টা করে না।"

রাস্তার ডান দিকে একটা গলি আরম্ভ হইয়াছে, তর্কালঙ্কার মহাশয় দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন—এই রাধু মিত্তিরের গলি, আমি তা হ'লে চললাম। তা হ'লে যদুনাথের পরিবার ভালই আছে বলছ গোরাচাঁদ ? শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। আজ আর হ'ল না, অপর এক দিন দেখে আসব'খন।"

গনশার অভিমতটা শুনিয়া গোরাচাঁদের মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল। সে চিন্তিত ভাবে নিজের দলের সঙ্গে খানিকটা অগ্রসর হইল, তাহার পর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া দাঁতে বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটিল এবং আর দ্বিধা না-করিয়া দ্রুতপদে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পাশে গিয়া বলিল—"একটা কথা ভুলে যাচ্ছিলাম তর্কলঙ্কার মশাই, দরকারী কথা—ভাগ্যিস্ মনে পড়ে গেল ! ওই যে বললাম কিনা—যদু চৌধুরীর স্ত্রী—চৌধুরী-জেঠাইমা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে কত কথা জিজ্ঞেস করলেন ?—সে সময় একটা কথা ব'লে দিয়েছিলেন—মাথার দিব্যি দিয়ে—বল্লেন—'গোরে, বাবা, ওদিকে যখন যাবি একবার তর্কলঙ্কার ঠাকুরকে ডেকে দিস্; সেরে ত উঠলাম, কিন্তু কবে আছি কবে নেই—তাঁর দয়ার শরীর; একবারটি বললেই আসবেন। কুলের পুরুত দেবতার সমান কিনা।...তাহলে না-হয় এখুনি হয়ে আসবেন একবার—ঠাণ্ডা থাকতে থাকতে ?"

৪

গঙ্গা দশহরা। এবার যোগটা বিশেষ গোছের; অত্যন্ত ভিড় হইয়াছে। একে ভিড় তায় ছোটবড় অনেকগুলি ভলন্টিয়ারের দল; রেষারেষির ঝোঁকে তাহারা প্রায় বাড়ী হইতেই সেবার জন্য পেছনে লাগিয়াছে। সমস্ত যাত্রীর—বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদের এবং তাহার মধ্যেও আবার বিশেষ করিয়া বৃদ্ধাদের—মনটা প্রায়ই বড় খিচড়াইয়া রহিয়াছে।

ভলন্টিয়ারদের সকলেরই চেষ্টা অণুমাত্র ত্রুটি হইতে দিবে না। ঘাটের কাছে বাঁশ দিয়া মেয়েপুরুষের রাস্তা আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে প্রবেশপথের মুখে, বাছাইয়ের জন্য ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। এসব মেলায় একটু ষাঁড়-গরুর আমদানি হয়। অন্যান্য বার

তাহাদের অগ্রাহ্য করা হইত, এবার তাহাদের গতি-বিধিতেও ভেদাভেদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করায় গোলমাল বাড়িয়াছে। একটা ষাঁড় মেয়েদের নির্দ্দিষ্ট পথে কোন্ দিক দিয়া প্রবেশ করিয়া ফেলিয়াছিল। সে গরু নয়, বলিয়া তাহাকে বাহির করিতে সবাই লাগিয়া যায়। সেও বাঁশের বেড়া ভাঙিয়া, যাত্রী ভলণ্টিয়ার মর্দ্দিত করিয়া জানাইয়া গেল—সে সত্যই গরু নয়।

লোকে—বিশেষ করিয়া বৃদ্ধারা—স্নান করিয়া যেটুকু পুণ্য অর্জ্জন করিতেছে, সেটুকু অভিশাপে সদ্য সদ্য ব্যয়িত করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে।

বাজেশিবপুরের দল তেমন জমে নাই—তেমন কেন, মোটেই জমে নাই বলা চলে। ওরা শিবপুরের সঙ্গে টেক্কা দিয়া কেতাদুরস্তভাবে গঠনকার্য্য করিতে চাহিয়াছিল। সকালে বিকালে মিলাইয়া ঝাড়া পাঁচ ঘণ্টা ড্রিল, তার পর সামনের ধোপাপুকুরে সাঁতার। যাহারা সাঁতার জানিত তাহাদের অনেকের সর্দ্দিগর্মি হওয়ায় ছাড়িয়া দেয়। যাহাদের হাতেখড়ি হইতেছিল তাহাদেরও বেশীর ভাগ সাজিমাটি-গোলা পানাপুকুরের জল উদরস্থ করিয়া পীড়িত হইয়া পড়ে। এখন কয়েক জন ব্যাজ লাগাইয়া মনমরা হইয়া কাশিতে কাশিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শত্রুপক্ষের ভলণ্টিয়াররা রটাইতেছে—'কাশি-ই ওদের ব্যাজ।'

গন্‌শা প্রভৃতি পুণ্যার্জ্জনের পূর্ব্বে প্রায়শ্চিত্তের বহর দেখিয়া ছাড়িবে ছাড়িবে করিতেছিল এমন সময় খবর পাইল সমস্ত ভলণ্টিয়ারের মধ্যে সাহস এবং কার্য্যকুশলতার জন্য কয়েকটি স্বর্ণপদক দেওয়া হইবে বলিয়া কে এক জন নাম গোপন করিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

রাজেন কবি, বলিল—"মেডেল পেলে আবার অনেক সময় প্রেমও হয়ে যায় গন্‌শা; ধর্ কোন বড়-লোকের মেয়ে যদি ভালবেসে ফেললে তখন তোর মামাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পারবি।"

মেডেলের লোভেও, আবার অন্য কোন কাজের অভাবেও ছাড়া হয় নাই।

গন্‌শা, ঘোঁৎনা আর রাজেন জেটির ওপর দাঁড়াইয়া আছে। উপকারের সুবিধাও হইতেছে এবং কি ভাবে করিতে হয় জানাও নাই। মোটামুটি একটা ধারণা ছিল এমন বড় বড় যোগে লোকে খুব ডুবিয়া মরে; কিন্তু যাহাকেই ডুব দিতে দেখিতেছে তাহারই মাথা, আবার জল ফুঁড়িয়া উঠিতে দেখিয়া বেজায় নিরাশ হইয়া পড়িতেছে। শেষ পর্য্যন্ত এমন দাঁড়াইয়াছে যে পুণ্য-অর্জ্জনে হতাশ হইয়া মনে হইতেছে এক-একটা মাথা জলে টিপিয়া ধরিতে পারিলে গায়ের জ্বালা মেটে। দু-বার আক্রোশের দাঁত কড়মড়ানি শোনা গেল; কার ঠিক ধরা গেল না—সম্ভবত গন্‌শা কিংবা ঘোঁৎনার।

গোরাচাঁদ, কে. গুপ্ত এবং ত্রিলোচন এখানে নাই; তাহারা তিন জনে দুর্ঘটনার প্রত্যাশায় ভিড়ের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু কোন দুর্ঘটনাই তাহাদের হাতে ধরা পড়িতেছে না। অথচ দুর্ঘটনার যে নিতান্ত দুর্ভিক্ষ পড়িয়াছে এমন নয়।—একটি বৃদ্ধা কি রকম ভাবে হঠাৎ উঁচুনীচুতে পা মচকাইয়া বেসামাল হইয়া পড়িয়া যায়; প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল, শিবপুরের দল সন্ধান পাইয়া এম্বুলেন্স খাটে করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল; একটা গুণ্ডা একটি ছোট মেয়ের কানের দুল ছিঁড়িয়া লইয়া পলাইতেছিল, শিবপুরের ব্যাজ-পরা একটি ভলণ্টিয়ার ধরিল; এমন কি একটি স্ত্রীলোক স্নান করিতে করিতে মৃগী-রোগাক্রান্ত হইয়া প্রায় সাবাড় হইবার দাখিল হইয়াছিল, যেন পাতাল ফুঁড়িয়া কোথা হইতে শিবপুরের একটি ভলণ্টিয়ার তাহাকে বাঁচাইল এবং বেশ ঘটা করিয়াই তাহাকে ক্যাম্পে লইয়া গেল।

গোরাচাঁদ বলিল—"এরা বেশ কপাল ক'রে নেমেছে, টপাটপ কেমন পেয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের পোড়া অদৃষ্টে..."

ত্রিলোচন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"গন্‌শাটার জন্যেই কষ্ট হচ্ছে। নিজে না পা'ক, যদি আমরাও একটা হাতে তুলে দিতে পারতাম তবুও ষোল আনা না-হোক কতকটা পুণ্যি হ'ল মনে ক'রে বুক বাঁধতে পারত। এ যেন দেখছি একেবারে মুষড়ে পড়বে বেচারা।"

গোরাচাঁদও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে যাইতেছিল, মাঝপথে থামিয়া সম্মুখে এক স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল এবং ত্রিলোচনের কাঁধে হাত দিয়া উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল—"তিলে দেখেছিস?"

ত্রিলোচন গলাটা উঁচু করিয়া সামনে দেখিল, কিন্তু কিছু বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল—"কি র‍্যা?"

"ওই যে মেয়েটা—?"

"হুঁ; তা কি?"

"ইডিয়ট।—দেখতে পাচ্ছিস্ না?—নিশ্চয় কোন অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে, না হ'লে ওরকম ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চারি দিকে চাইবে কেন?"

"তাহ'লে নিয়ে আসব গন্‌শাদের ডেকে ?"

"হ্যাঁ, এমন না হ'লে আর বুদ্ধি! আমরা ডাকতে যাই আর সেই তালে শিবপুর এসে কেল্লা ফতে ক'রে নিক। ওকে হাত ক'রে বরঞ্চ গন্‌শার কাছে নিয়ে যাওয়া যাক্।"

গোরাচাঁদ পা বাড়াইল, ত্রিলোচনও অগ্রসর হইল এবং শ্যেনদৃষ্টি শিবপুরের দলের ভয়ে, কাহারও ঘাড়ের উপর দিয়া, কাহারও কাঁকালের নীচে দিয়া, ঠেলিয়া, মাড়াইয়া দুই জনে লক্ষ্যস্থলে এক রকম ছুটিয়াই চলিল—কেহ গাল দিল, কেহ বা রাগের চোটে গালাগাল খুঁজিয়া না পাইয়াই উগ্র বিষাক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল,—দু-জনের মধ্যে কেহই সেদিকে দৃক্‌পাত করিল না।

একটি ফুটফুটে বছর-পাঁচেকের মেয়ে জল থেকে খানিকটা দূরে, ইটের গাঁথুনি যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে একটা শুক্‌নো কাপড়, নামাবলী আর ঘটি কোলের কাছে করিয়া বসিয়াছিল। গোরাচাঁদ উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করিল—"কি হয়েছে তোমার খুকী ?"

মেয়েটি ভ্যাবাচাকা খাইয়া দু-জনের মুখের দিকে চাহিল।

গোরাচাঁদ বলিল—"বল, কি হয়েছে তোমার, কিছু ভয় নেই।"

একটি পশ্চিমা স্ত্রীলোক স্নান সারিয়া মাথা ঝাড়িতেছিল, তাহার পাশ দিয়া সামনে আসিয়া ত্রিলোচন বলিল—"ভয় কি ? আমরা ভলন্টিয়ার, এই দেখ।" বলিয়া বুকে পিন্-আঁটা রেশমের ফুলটা দেখাইয়া দিল।

মেয়েটি শুক্‌নো মুখে ব্যাজটার দিকে চাহিয়া রহিল।

গোরাচাঁদ বলিল—"তুমি কার সঙ্গে এসেছিলে বল তো খুকুমণি ?"

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল—"মার সঙ্গে ?...বাবার সঙ্গে ? ...ঠাকুমার সঙ্গে ?"

মেয়েটি মুখ চুণ করিয়া একটু রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"না, দিদিমার সঙ্গে।"

মেলার ব্যাপার, ততক্ষণে ছেলেয়, মেয়েয়, বুড়োয় অনেকগুলি লোক ইহাদের ঘেরিয়া লইয়াছে, এক জন প্রশ্ন করিল—"কি হয়েছে মেয়েটির ?"

গোরাচাঁদ বলিল—"ওর দিদিমার সঙ্গে এসেছিল, সে ডুবে গেছে। ...তুমি কেঁদ না খুকু। আমরা তোমায় তোমার মার কাছে রেখে আসব।"

কে. গুপ্ত সান্ত্বনা দিবার জন্য বুদ্ধি করিয়া বলিল—"আর দিদিমা তো বুড়োও হয়ে গিয়েছিল খুকুমণি..."

একটি নিম্নশ্রেণীর লোক উৎসুকভাবে শুনিতেছিল; বলিল—"সে কথা কইলে কি ছেলেমানুষ শোনে বাবু—তা ছাড়া দিদিমা আর কার নবযুবতী হয়ে থাকে বলুন না ?"

মেয়েটি এতক্ষণে কোন রকমে সামলাইয়া ছিল, এবার "ও দিদিমা গো!" বলিয়া একেবারে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। আরও লোক জমা হইয়া গেল এবং মাঝখানে পড়িয়া নানাবিধ প্রশ্নের আবর্তে মেয়েটি ক্রমেই আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। উত্তর আর দিবে কি; অঝোর ঝোরে কান্নার মধ্যে তাহার কেবলই এক কথা—"দিদিমাকে এনে দাও...দিদিমার কাছে যাব!..."

খাটি, দুর্লভ অ্যাক্সিডেণ্ট! আবিষ্কার করার জন্য গোরাচাঁদ আর ত্রিলোচন ভিতরে ভিতরে ফুলিতেছিল, সবার মোড়লিতে একটু বিরক্তও যে না হইতেছিল এমন নয়। ত্রিলোচন বলিল—"আপনারা যে যার কাজে যান না মশাই। বাজেশিবপুর সেবক-সঙ্ঘের হাতে পড়েছে, ওর আর কোন ভয় নেই।...কোন্‌খানে তোমার দিদিমা ডুবেছিল, খুকু!"

মেয়েটি একদিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইতে সেখানে ভিড়টা পৃথক হইয়া গেল, গঙ্গার উপর নজর পড়ায় মেয়েটি আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—"ওই খানটায়...ওগো দিদিমা গো!"

বৃত্তটা আবার জুটিয়া গিয়া মেয়েটাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। এক জন আধবয়সী নিম্নশ্রেণীর লোক বলিল—"ওখানে ত জল বেশী নয়, তবে..."

এক জন বয়স্থগোছের লোক বলিল—"কাল পূর্ণ হ'লে বলে গোষ্পদেই ডুবে মরে, ওখানে তবুও তো এক কোমর জল রয়েছে..."

শিবপুরের হাতের জলে ডোবার কেসটা দেখিয়া ত্রিলোচনের হিংসা লাগিয়াছিল; বলিল—"মিরগি ছিল সে বুড়ীর, না হ'লে কখনও কি আর অতটুকু জলে ডোবে!"

এক জন পরামর্শ দিল—"তা হ'লে জাল ফেলে জায়গাটা একবার ছেঁকে ফেলা দরকার, পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে ?"

ত্রিলোচন বিরক্তভাবে বক্তার দিকে চাহিয়া বলিল—"পুলিসে জাল ফেলার কি জানে মশাই, জালফেলা কাকে বলে যদি দেখতে চান তো একটু দাঁড়ান।" কে. গুপ্তর পানে চাহিয়া বলিল—"যান ত, গন্‌শাকে ডেকে নিয়ে আসুন তো, আর তার আগে আমাদের ক্যাম্পে (ভিড়ের দিকে চাহিয়া) বাজেশিবপুর সেবা-সংঘ ক্যাম্পে

ব'লে যান যে শীগগির একটা জালের বন্দোবস্ত ক'রে পাঠিয়ে দিক।"

কে এক জন বলিল—"তবেই হয়েছে! ওনাদের গণেশঠাকুর আর জাল এসতেঁ এসতে বুড়ী ত্যাতক্ষণ উলুবেড়েয় ঠেলে উঠবে। আর তানারে ক্লেশ দেওয়া কেন বাপু, তিনি তো মা-গঙ্গার কিরপেয় দিব্যি গিয়েছে, এখন মেয়েটারে ঘরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন, বেজায় কাঁদতেছে।"

ত্রিলোচন গনশার অবর্ত্তমানে বড় অস্বস্তি বোধ করিতেছিল; অনেক কষ্টে পাওয়া কেস, কি করিতে হইবে ঠিকমত জানা নাই, তাহা ভিন্ন শিবপুরের দল হাঁ করিয়া আছে, পুলিস আছে। বলিল—"তবে গনশাকেই শীগ্‌গির ডেকে আনুন। আর মিরগি রুগী, বাঁচিয়েই বা কি হবে? আজ বাঁচাও, কাল আবার জল ঘুলিয়ে মরবে—মেহনৎই সার···চুপ কর খুকু তুমি, এক্ষুনি তোমার মার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

গোরাচাদ বলিল—"হ্যা, মাঝে পড়ে সে বেচারীর বুড়ো বয়সে দু-বার মরবার কষ্ট, একে ত একবার মরতেই লোকের কণ্ঠাগত প্রাণ।"

গোরাচাদ অগ্রসর হইবে এমন সময় সামনে ভিড়ের প্রান্ত হইতে প্রশ্ন হইল—"এখানে কি র‍্যা গোরে?"

গনশার আওয়াজ, মুহূর্ত্তেই সে ভিড় চিরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, পেছনে বাকী দুই জন।

ত্রিলোচন, গোরাচাদ একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—"একটা পেয়েছি গনশা!"

গোরাচাদ বলিল—"তোকে ডাকতে যাচ্ছিলাম।"

রাজেন উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল—"কাদের মেয়ে?"

গোরাচাদ ফূর্ত্তির চোটে বিশেষ ভাবিয়া না দেখিয়া উত্তর করিল—"ওর দিদিমার। মিরগি রুগী, ডুবে মরেছে।"

"ডু-ড্ডুবে মরেছে! কোন্ খানে?"

ভিড়ের মধ্য থেকে কয়েক জন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল—"ওই ওখানে বলছে খুকী।"

"একটা জাল নিয়ে আসুন না মশাই।"

"এরা তো তখন থেকে শুধু জল্পনাই করছে।"

"ভারী আমার চোটের—ভলন্টিয়ার সব!"

গনশা বলিল—"একমুঠো তি-তিল ছুঁড়লে এখন একটাও জলে পড়বে না এমন ভিড়, জাল ফেলবেন কোথায় মশাই? আর সে কি ততক্ষণ জা-জালের ভরসায় ব'সে থাকবে? চল্ ঘোৎনা—"

ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইতে হইতে বলিল—"আর তোরা দু-জন মেয়েটাকে আগলা, তিলে আর গোরা।"

ইটের গাঁথুনির পরই ভয়ানক কাদা, পেছল, ভিড়। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে জেটির পণ্টুনের কাছে জল। টলিতে টলিতে সামলাইতে সামলাইতে চার জনে অগ্রসর হইল। ভিড়ের মধ্য হইতে কয়েক জন সঙ্গ লইল; তাহাদের কথাবার্ত্তায় দু-চার জন করিয়া আরও লোক জমিতে লাগিল। জলের ধারে আসিয়া গনশা পিছন ফিরিয়া জামা খুলিতে খুলিতে চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিল—"এইখানে তিলে?"

এদিকে ত্রিলোচনদের, ওদিকে গনশাদের ঘেরিয়া দু'টা ভিড় জমিয়া গিয়াছে, অত দূরে দেখা যায় না। ত্রিলোচন শব্দ লক্ষ্য করিয়া উত্তর দিল। এমন অপ্রত্যাশিত সাফল্যে একটু ইংরেজীর লোভ সামলাইতে পারিল না, ভিড়ের মধ্য হইতে হাত তুলিয়া গলাটা উঁচু করিয়া বলিল—"ইয়েস, দেয়ার।"

ঘোৎনা, কে. গুপ্তও জামা খুলিল, রাজেন সাঁতার জানে না, সে জামা ধরিবে।

বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। গনশা আবার গঙ্গা-মুখো হইতেই একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক প্রশ্ন করিল—"ওখানে ভিড় কিসের বাছা?" স্নান করিয়া উঠিয়াছে, বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হইবে। দীর্ঘাকার, পুরুষালি ছাঁদের চেহারা, গলার স্বর ভাঙা কাঁসির মত ঝনঝনে, হাতে একটি পিতলের কমণ্ডলু, সের-তিনেক জল ধরে।

গনশা, শুধু গনশা কেন, সকলেই একটু থতমত খাইয়া গিয়াছিল। স্ত্রীলোকটি শঙ্কিতভাবে প্রশ্ন করিল—"একটি মেয়ে বসেছিল—কিছু হয় নি তো তার?"

কে গুপ্ত অবস্থাটা চট্ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তাহা ভিন্ন একটু ছাপরেয়ে-গোছের চেহারা দেখিলে খুশী হয়, একটু আলাপ করিতে চায়; অগ্রসর হইয়া বলিল—"আজ্ঞে, সে ত বেশ আছে—আমাদের হেফাজতে; তার দিদিমা মিরগি রুগী, ডুবে মরেছে! শুনে পর্য্যন্ত আমাদের মনটা···"

"কে ডুবে মরেছে!!"—এক মুহূর্ত্তে মূর্ত্তি আর স্বরে যে পরিবর্ত্তন হইল তা সেই জাতীয় স্ত্রীলোকেই সম্ভব। কমণ্ডলুর ডাণ্ডির ওপর মুঠাটা কড় কড় করিয়া উঠিল:—

সকলে, এমন কি, কে গুপ্ত পর্য্যন্ত শঙ্কিতভাবে দুই-পা পিছাইয়া গেল।

"বলি কে ডুবে মরেছে? খেন্তীর দিদিমা? তাই বুঝি বলিয়েছিস তাকে দিয়ে? ভলেণ্টিয়ার সব, না?— উপ্‌গার হচ্ছে? খেন্তীর দিদিমা যদি মরে থাকে, অমর্ত-বামনীর মরা যদি এতই সহজ তো আমি কে র‍্যা ড্যাক্‌রা? এই কে তোর মুণ্ডপাত করছে?"

বাঁ-হাতটা বাঘের পাঞ্জার মত কে. গুপ্তর মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। ফুটবলের দাঁওপ্যাচে অভ্যস্ত থাকায় একটা গোঁত্তা মারিয়া সে নিজেকে বাঁচাইয়া লইতেই থাবাটা কে. গুপ্তর পিছনেই রাজেনের উপর গিয়া পড়িল। সে কবি বলিয়া বাবরি রাখে, মুঠাটা কড়াক্কড় করিয়া জমিয়া বসিল।

"ঠিক ধরেছি—এ-ই সর্দ্দার! বল্ মেয়েটাকে কোথায় রেখেছিস?"

রাজেন ঝাঁকানির মধ্যে আর্ত্তভাবে ডাকিল—"গন্‌শা! গণেশ!!"

গন্‌শা জলে নামিয়া পড়িয়াছিল—তিন জনেই উত্তর করিল—"এক খাবলা পাঁক তুলে মাথায় দে রাজেন।"

স্ত্রীলোকটা মুঠা এবং ঝাঁকানি ঠিক রাখিয়া, বরং উগ্রতর করিয়া মাথা ঘুরাইয়া বলিল—"বটে! পাঁক দিয়ে আমার মাথা ঠাণ্ডা করবে—নাতনী চুরি ক'রে? মিরগি রুগী ক'রে? মাথা গরমের এখন দেখেছ কি?— তুই আয় না র‍্যা অলপ্পেয়ে, তুই আয় না উঠে, দেখি কত পাঁক বইতে পারিস।"

সেই নিম্নশ্রেণীর লোকটি অগ্রসর হইয়া আসিল, সভয় ভক্তির সহিত যুক্ত কর মাথায় ঠেকাইয়া বলিল—"আজ্ঞে মাঠান, দা'ঠাউর ওন্নাকে নিজের মাথায় পাঁক দিতে বলতেছে আর কি, এঁটেল মাটির পাঁক—পেছল কিনা।..."

"কে তুই? তুই নিজে এসে দে না। আয়। কই, এগুচ্ছিস্ না যে?"

লোকটা তাড়াতাড়ি পিছনের ভিড়ে একটা চাপ দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

তাহার দিকে মনটা যাওয়ায় মুষ্টিটা বোধ হয় একটু আলগা হইয়া গিয়া থাকিবে, রাজেন একটা মরি-কি-বাঁচি গোছের ঝাঁকানি দিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইল; কিন্তু পিছল, আর গঙ্গার ঢালুর জন্য আর সামলাইতে পারিল না, ওলট-পালট খাইয়া, কাহারও হাতের ঘটি ফেলিয়া, কাহারও আহ্নিক নষ্ট করিয়া গঙ্গার গর্ভে গিয়া পড়িল এবং প্রচণ্ড হুঙ্কারের সহিত অমর্ত-বামনীকে ঘুরিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া একটা ডুব-সাঁতার দিয়া বহুদূরে গিয়া ফুঁড়িয়া উঠিল এবং দৈবক্রমে সেখানে আবার একটি স্ত্রীলোকের একেবারে সামনাসামনি হইয়া উঠায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা ডুব দিয়া একেবারে মাঝগঙ্গামুখো হইল। ততক্ষণে চারি দিকে বেশ একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। কেহ বলিতেছে খুন হইয়াছে, কেহ বলিতেছে ষাঁড় ক্ষেপিয়াছে, কেহ বলিতেছে বান ডাকিবে; কেহ অনেকটা কাছাকাছি আন্দাজ করিয়া বলিতেছে কচি মেয়ের গলার হার চুরি। উহারই মধ্যে গন্‌শা একবার জাহাজের জেটির উপর উঠিয়া এক রকম তীব্র সাঙ্কেতিক চীৎকারে ত্রিলোচনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

ত্রিলোচন মুঠোটা বাঁশীর মত করিয়া তার মধ্য দিয়া তারস্বরে প্রশ্ন করিল—"ডেড্ উওম্যান গট্?"

গন্‌শা উত্তর করিল—"নট্ ডেড; ডা-ড্ডাইং রাজেন; —রাজেনকে মেরে ফেল্‌ছে, চুলের মুঠি ধ'রে তো-তোরা সেইখানে চলে আয়—মেয়েটাকে ছেড়ে দি, নো মিরগি। ম্যান-ট্রেডমার্ক ওয়োম্যান।—একেবারে বেটাছেলে-মার্কা!..."

* * *

শিবপুর ঘাট থেকে অনেকটা উত্তরে। ভাঁটার জন্য জলের কাছাকাছি একটা মাঝারি-সাইজের গাধা-বোট কাৎ হইয়া আছে। লোক নাই, অর্থাৎ গাধা-বোটের লোক নাই, আছে গন্‌শা, ঘোঁৎনা, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ। হঠাৎ দেখিলে কিন্তু কাহাকেও চিনিবার উপায় নাই— আর কেহ চেনে উহারাও সেজন্য ব্যস্ত নয়। ভলণ্টিয়ারের ব্যাজ নাই এবং ব্যাজ আঁটিবার জামাও নাই গায়ে। গোরাচাঁদ একটা কামিজ পরিয়া আছে, যথাস্থানে নয়, কোমরের নীচে। বাঁধিবার কিছু না-থাকায়, কামিজের গলাটার এক জায়গায় ছিঁড়িয়া ফাঁদটা বড় করিয়া নাভিকুণ্ডলের কাছে বোতামটা আঁটিয়া দিয়াছে। হাঁটুর কাছে কামিজের হাতা দুইটা লট্‌পট্ করিতেছে। কেহ বিশেষ কথা বলিতেছে না।

রাজেন আর ত্রিলোচন নাই। রাজেন একটু দূরে গঙ্গায় আবক্ষ ডুবিয়া যেন কিছুই হয় নাই এই ভাবে কুলকুচি করিবার চেষ্টা করিতেছে। ত্রিলোচন না-আসিলে উঠিবে না।— উঠিবার জো নাই।

ত্রিলোচন সবার জন্য কাপড় আনিতে গিয়াছে।

বিশ্বপরিচয়—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৩৪৪। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

এই পুস্তকখানি প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসে, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় পরবর্তী পৌষে, এবং দ্বিতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ হইয়াছে এক মাস পরে মাঘে। বাংলা দেশে বৈজ্ঞানিক বইর এরূপ আদর বিরল বা অভূতপূর্ব।

"শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই, বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ" করাইবার নিমিত্ত পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন মনে করেন, তাঁহারাও ইহা অভিনিবেশপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে আলোক ও আনন্দ পাইবেন।

রবীন্দ্রনাথ ইহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যগুলি অবশ্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের নানা গ্রন্থ হইতে আহরণ করিয়াছেন। কিন্তু সেগুলিকে তিনি দেখিয়াছেন নিজের মানসচক্ষু দিয়া এবং সজ্জা ও রূপ দিয়াছেন নিজের প্রতিভা দ্বারা। তাঁহার শেষ সিদ্ধান্তটিও তাঁহার নিজের। এই কারণে, পদ্যে ও গদ্যে লিখিত তাঁহার কাব্যগুলি যেমন সাহিত্যিক সৃষ্টি, এই বইখানিও সেইরূপ সাহিত্যিক সৃষ্টি। যে সিদ্ধান্তে পুস্তকখানির সমাপ্তি হইয়াছে, এবং সম্ভবতঃ যাহা ধারণার আকারে থাকিয়া তাঁহাকে ইহা রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল, তাহা ইহার শেষ কয়টি বাক্যে প্রকাশ পাইয়াছে। যথা

"আমরা জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের মূলগত ঐক্য কল্পনা করতে পারি সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃ পদার্থের মধ্যে। অনেক কাল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে আপাতদৃষ্টিতে যে সকল স্থূল পদার্থ জ্যোতির্হীন, তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকারে নিত্যই জ্যোতির ক্রিয়া চলছে। এই মহাজ্যোতিরই সূক্ষ্ম বিকাশ প্রাণে এবং আরো সূক্ষ্মতর বিকাশ চৈতন্যে ও মনে। বিশ্বসৃষ্টির আদিতে মহাজ্যোতি ছাড়া আর কিছুই যখন পাওয়া যায় না, তখন বলা যেতে পারে চৈতন্যে তারই প্রকাশ। জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলেছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি সৃষ্টির শেষ পরিণাম।"

চৈতন্যের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় পৃথিবীতে মানুষের মধ্যেই—"যদিও প্রমাণ নেই, এবং প্রমাণ পাওয়া আপাততঃ অসম্ভব, তবুও একথা মানতে মন যায় না যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই জীবধারণ-যোগ্য চৈতন্যপ্রকাশক অবস্থা একমাত্র এই পৃথিবীতেই ঘটেছে, যে, এই হিসাবে পৃথিবী সমস্ত জগৎধারার একমাত্র ব্যতিক্রম।"

পুস্তকখানি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রধান ভাষায় অনুবাদিত হওয়া উচিত, এবং ইহাতে কবির প্রতিভার ও মননশক্তির পরিচয় আছে বলিয়া ইহার ইংরেজী অনুবাদও আবশ্যক।

ড.

বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী—সাহিত্য। সম্পাদক-সঙ্ঘ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ সমিতির পক্ষে রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ সমিতির সভাপতি মেদিনীপুর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর-শাখার জয়ন্তী-উৎসবে বিদ্যাসাগর দিবসে গত ১৬ই ফাল্গুন যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলেন :—

"২৯শে জুলাই ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪৪ বীরসিংহে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুবার্ষিকী সভায় আমি যোগদান করিয়াছিলাম এবং স্মৃতিরক্ষার্থে আহূত একটি সাধারণ সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলাম। সেই সভায় বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার জন্য যথাকর্ত্তব্য ও উপায় নির্দ্ধারণার্থ জেলার প্রধান অধিবাসিগণকে লইয়া এক কমিটি গঠিত হয়।

"বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সমিতি নিম্নলিখিত কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন :—

"(১) যে স্থানে বিদ্যাসাগরের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ আছে সেই স্থানে একটি মর্ম্মর কিম্বা "ব্রঞ্জে"র আবক্ষ-মূর্ত্তি স্থাপন করা এবং বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক তদীয় মাতার স্মৃতিরক্ষার্থে স্থাপিত ভগবতী বিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটি "হল" নির্ম্মাণ করা। এই নির্ম্মাণকার্য্যের আনুমানিক ব্যয় ৪০০০৲। "হল" গৃহে একটি পুস্তকাগার থাকিবে এবং স্মরণচিহ্নাদি সংগৃহীত থাকিবে।

"(২) ক্ষীরপাই হইতে বীরসিংহ গ্রাম পর্য্যন্ত রাস্তাটি ১০,০০০৲ ব্যয়ে পাকা করিয়া দেওয়া।

"(৩) "বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির" নামে মেদিনীপুর সহরে একটি "হল" নির্ম্মাণ করা। ইহাতে স্থানীয় "টাউন হলে"র উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। ইহার আনুমানিক ব্যয় ৩০,০০০৲।

"(৪) ৪০০০৲ ব্যয় করিয়া প্রতি বৎসর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গবেষককে স্বর্ণপদক উপহার দিবার ব্যবস্থা করা।

"(৫) ভাষা ও সাহিত্যের বিচারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে সকল রচনার চিরস্থায়ী মূল্য আছে, সেগুলির প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করা।

"অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, উপরিলিখিত প্রস্তাবের অনেকগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সেগুলি শীঘ্রই সম্পন্ন হইয়া যাইবে।"

শীঘ্র যে সম্পন্ন হইয়া যাইবে, তাহার জন্য মহিষাদলের রাণী ও রাজা, ঝাড়গ্রামের রাজা, মেদিনীপুর জেলা বোর্ড এবং বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ সমিতির সভাপতি ও সদস্যগণ ধন্যবাদার্হ।

শ্রাবণ মাসে কার্য্যতালিকা স্থির হইল এবং ফাল্গুনেই বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর সাহিত্য-খণ্ড সুসম্পাদিত ও সুমুদ্রিত হইয়া বাহির হইয়া গেল, এই তৎপরতার জন্য সাধারণভাবে সমিতি প্রশংসাভাজন এবং বিশেষ করিয়া প্রশংসাভাজন সম্পাদকসঙ্ঘ। ঝাড়গ্রামের রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব, বি-এ, মহাশয়ের ব্যয়ে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত।

হইয়াছে। সাহিত্যানুরাগী বাঙালী মাত্রেই তাঁহার প্রতি এই কারণে কৃতজ্ঞতা অনুভব করিবেন।

বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী চারি খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। সাহিত্য-খণ্ডটি প্রথম খণ্ড। ইহার পৃষ্ঠার আকার প্রবাসীর সমান, অক্ষর প্রবাসীর সাধারণ অক্ষর অপেক্ষা কিছু বড়। মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫০৪। পুরু এণ্টিক কাগজে বহিখানি মুদ্রিত হইয়াছে। শক্ত মলাটের উপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি ছবি আছে। তাহা তাঁহার চরিত্রদ্যোতক; ইহা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে রক্ষিত তৈলচিত্রের প্রতিলিপি। এই ছবিটি বহির ভিতরেও আছে। তদ্ভিন্ন, কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারে তাঁহার মর্ম্মর-মূর্ত্তির ছবি, তাঁহার পিতামাতার নিজের ও পত্নীর ছবি, এবং শ্মশানে তাঁহার ও আত্মীয়দের ছবি আছে।

পুস্তকখানিতে আছে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সংরক্ষণ সমিতির সম্পাদকত্রয়ের বিবৃতি, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ভূমিকা, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত বিদ্যাসাগর-গ্রন্থপঞ্জী, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত আটখানি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পুস্তক।, যথা বেতালপঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, মহাভারত (উপক্রমণিকা ভাগ), সীতার বনবাস, প্রভাবতীসম্ভাষণ, রামের রাজ্যাভিষেক, ভ্রান্তিবিলাস, বিদ্যাসাগরচরিত (স্বরচিত)।

ভূমিকাটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় মানুষটি কত বড় ছিলেন, অল্প কথায় তাহা বলা যায় না। অল্প কথায় যতটুকু বলা যায়, সুনীতিবাবু রবীন্দ্রনাথকৃত সুপরিচিত প্রশস্তির পুনরাবৃত্তি করিয়া তাহা বলিয়াছেন। গদ্য-রচনায় বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব কিরূপ অসাধারণ তাহাও "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন," রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির রবীন্দ্রনাথেরই ব্যাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া, এবং নিজেও কিছু লিখিয়া, সুনীতিবাবু তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"বিভিন্ন বাঙ্গালা শব্দের পরস্পর সমাবেশে অভিধানগত অর্থব্যতিরেকেও যে আর একটি অবর্ণনীয় রসের সৃষ্টি হইতে পারে, এই অপূর্ব্ব সত্য তিনিই সর্ব্বপ্রথম মনে মনে অনুভব করিয়া, লেখনীমুখে তাহার সম্ভাবনাও তাঁহার স্বদেশবাসীকে দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং তাহার ফলেই শতাব্দীপাদের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এবং অর্ধশতাব্দীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে।

"ভাষা-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও গতানুগতিক ও প্রাচীনপন্থী ছিলেন না, বরং ভাষা সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রগতিশীল বলা যাইতে পারে। সময় ও শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুবিধা পাইলেই ভাষার পরিবর্ত্তন ও মার্জ্জনা সাধন করিতেন। তাঁহার জীবিত-কালেই তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির প্রায় প্রত্যেকটির অনেকগুলি করিয়া সংস্করণ হয়। প্রত্যেক সংস্করণে তিনি কিছু-না-কিছু সংস্কার করিয়াছেন। তাঁহার এই সংস্কারকামী মনের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার বিরাম-চিহ্ন প্রয়োগের ক্রম-বাহুল্য দেখিয়া।"

"বিদ্যাসাগর-গ্রন্থপঞ্জী" রচনায় ব্রজেন্দ্র বাবুকে যেরূপ পরিশ্রম ও সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তাহা উহা দেখিলেই বুঝা যায়। এ বিষয়ে তাঁহার দক্ষতা ও যশ শিক্ষিত বাঙালীসমাজে সুবিদিত। তিনি গ্রন্থপঞ্জীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিছু অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পুস্তক ও রচনারও সংবাদ দিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলীর সাহিত্য খণ্ডে মুদ্রিত পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে "প্রভাবতীসম্ভাষণ" ও "বিদ্যাসাগরচরিত (স্বরচিত) পূর্ব্বতন কোন রচনা বা পুস্তক অবলম্বনে লিখিত নহে। অন্যগুলি পূর্ব্বতন হিন্দী, সংস্কৃত বা ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত। এই জন্য সাধারণতঃ তাঁহাকে সাহিত্যিক প্রতিভা ও মৌলিকত্বের প্রশংসা হইতে বঞ্চিত করা হয়। ইহা অন্যায় ও অযৌক্তিক। এই বহিগুলির কোনটিই ঠিক অনুবাদ নহে। তদ্ভিন্ন, ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত নাটকের গল্পাংশ লইয়া গল্পের আকারে লিখিত, এবং ভ্রান্তিবিলাস শেক্সপিয়রের ইংরেজী কমেডি অব্ এরার্স নাটকের গল্পটি লইয়া গল্পের আকারে লিখিত। গল্প ও উপন্যাসকে নাটকে এবং নাটককে মনোজ্ঞ গল্পে রূপান্তরিত করা যাহার তাহার কর্ম্ম নয়।

পুরাতন গল্প, মহাকাব্য বা নাটক কাজে লাগাইলেই যে তাহা প্রতিভাহীনতার পরিচায়ক নহে, শেক্সপিয়র তাহার প্রসিদ্ধতম দৃষ্টান্ত। তাঁহার সম্বন্ধে এমার্সন লিখিয়াছেন :-

"In point of fact, Shakespeare did owe debts in all directions, and was able to use whatever he found ; and the amount of indebtedness may be inferred from Malone's laborious computations in regard to the First, Second and Third Parts of Henry VI, in which "out of 6043 lines, 1771 were written by some author preceding Shakespeare, 2373 by him, on the foundation laid by his predecessors ; and 1899 were entirely his own. And the preceding investigation hardly leaves a single drama of his absolute invention." (*Representative Men.* Shakespeare, or the Poet.)

তাৎপর্য্য। শেক্সপিয়র চারিদিকেই ঋণী ছিলেন, এবং যাহা কিছু পাইতেন, তাহাই কাজে লাগাইতে পারিতেন। (তাঁহার ভাষ্যকার মেলোনের তৎপ্রণীত ষষ্ঠ হেনরি নাটকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড সম্বন্ধে বহুশ্রমসাধ্য গণনা হইতে তাঁহার ঋণিত্বের পরিমাণ অনুমান করা যাইতে পারে। ঐ নাটকের ৬০৪৩টি পংক্তির মধ্যে ১৭৭১টি কোন পূর্ব্বতন লেখকের রচিত, ২৩৭৩টি শেক্সপিয়ার অন্যান্য লেখকের ভিত্তি অবলম্বন করিয়া লেখেন, এবং ১৮৯৯টি সম্পূর্ণ তাঁহার নিজের লেখা। মেলোনের উক্ত গবেষণার ফলে শেক্সপিয়রের একটি নাটকও সম্পূর্ণ তাঁহার উদ্ভাবিত বলা দুষ্কর।

ইংরেজ কবি চসার সম্বন্ধেও এমার্সন এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

বীর আশানন্দ—পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। সচিত্র। শ্রীচণ্ডীচরণ দে। নিউবুক ষ্টল, ৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

আশানন্দ ঢেঁকি নামে পরিচিত শান্তিপুরের বলবান মানুষ পরলোকগত আশানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে অনেকগুলি গল্প ইহাতে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য সংকলিত হইয়াছে। গল্পগুলি সবই উপভোগ্য। ঢেঁকি পদবী তিনি কেমন করিয়া পাইয়াছিলেন, তাহা প্রথমে বলা হইয়াছে। মুখে মুখে বহুকাল ধরিয়া যে-সকল গল্প চলিয়া আসে তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হইলেও অমূলক নহে। এই পুস্তকের গল্পগুলি হইতে এই সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বীর আশানন্দ অসাধারণ বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করিতেন দুষ্টের দমনে ও বিপন্নের সাহায্যকল্পে—কখন কখন কেবল খেলার ছলে, মজা দেখিবার জন্যও।

এরূপ মানুষের সম্বন্ধে গল্প পড়িতে ছেলেমেয়েদের ভাল লাগিবে ও তাহাদের উপকার হইবে।

স্বর্গের ঠিকানা—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। নবজীবন সংঘ, ৪ নং স্বায়রত্ন লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের এই বইখানি নাম আমাদিগকে বহু খ্রীষ্টিয়ানের এই বিশ্বাস মনে পড়াইয়া দিয়াছে, যে, খ্রীষ্ট তাঁহার অন্যতম শিষ্য পীটরকে স্বর্গের চাবি দিয়া গিয়াছিলেন। বিজয় বাবুর কাছে অবশ্য ঐ চাবিটি নাই। তিনি কেবল স্বর্গের ঠিকানা জানাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই পুস্তকটিতে 'স্বর্গের ঠিকানা', ''শক্তির মন', 'ট্রাজেডি ভালোবাসি কেন', 'ঘর না কবর?', 'জীবন ও সাহিত্য', 'বিষ্ণুপ্রিয়া,' 'রক্তের মূল্য', এবং 'সঙ্গে কেউ তো যাবে না', এই কয়টি প্রবন্ধ আছে। সবগুলিরই ভাষা জোরাল ও কবিত্বপূর্ণ বক্তার ভাষা। লেখকের চিন্তার, ভাবের ও প্রকাশভঙ্গির স্বাধীন সচল করিতে সমর্থ। পুস্তকটি আমরা অল্প সময়ের মধ্যে আগ্রহের সহিত পড়িয়া ফেলিয়াছি। তাঁহার লিখিত প্রত্যেকটি কথায় অবশ্য সায় দিতে পারি নাই বেশী জায়গায় যে মতভেদ হইয়াছে তাহাও নয়। বইখানি পড়িয়া মোটের উপর মানসিক প্রতিকূলতার উদ্রেক হয় নাই, সমর্থনের ইচ্ছাই হইয়াছে।

স্বর্গ বলিতে লেখক কি বাঞ্ছনীয় মনোভাব, ধারণা, অবস্থা, আচরণ...বুঝেন, তাহা 'বিষ্ণুপ্রিয়া' ভিন্ন অন্য সব লেখাগুলিতেই বুঝা যায়। কেবল 'বিষ্ণুপ্রিয়া'য় ঠিক বুঝা যায় না, অনুমান করাও সহজ নহে। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত একাধারে ধর্মগ্রন্থ, ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও কাব্য। আমাদের দেশে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' যত নারী আছেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার কাহিনী তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা কম করুণ ও মর্মস্পর্শী নহে। ''বিষ্ণুপ্রিয়ার মত এত বড় দুঃখিনী নারী বুঝি আর কেউ নেই।" তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সহধর্মিণী করেন নাই। তথাপি তিনি কি পতির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া তাহাতে কোন তৃপ্তি, কোন আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন? করিয়া থাকিলে, তাহাতেই হয়ত স্বর্গের আভাস ছিল। কিন্তু এই চিন্তায় মন সান্ত্বনা পায় না, এই বিষয়সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যের প্রতি মনের বিদ্রোহিতা মাথা নত করে না।

বঙ্গীয় মহাকোষ—অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক বহু যোগ্য সহকারীর সাহায্যে সম্পাদিত। বিংশ সংখ্যা।

ইহা পূর্ব্ববৎ সুসম্পাদিত হইতেছে। সম্পূর্ণ হইলে ইহা বঙ্গীয় সংস্কৃতির একটি উজ্জ্বল নিদর্শন হইবে।

বাঙলায় ভ্রমণ—ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে। মূল্য আট আনা।

এই সুমুদ্রিত, চিত্রবহুল পুস্তকখানি বঙ্গে ভ্রমণকালে পর্য্যটকের কাজে লাগিবে। কেহ ভ্রমণ না করিলেও তাহার শুধু পড়িতে ভাল লাগিবে, এবং হয়ত ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হইবে। ইহাতে বর্দ্ধমান ও চট্টগ্রাম বিভাগের এবং প্রকৃত বাংলার মানভূম প্রভৃতি যে-সকল অঞ্চলকে বিহারে ফেলা হইয়াছে, তৎসমুদয়ের বৃত্তান্ত নাই। ইহা বইখানির একটি অসম্পূর্ণতা। প্রকাশকদিগের সহিত আমরাও "আশা করি, পরে একদিন অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেলওয়ের চেষ্টায় সমগ্র বঙ্গের একখানি সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিচয়-পুস্তক সঙ্কলিত হইবে।"

হিন্দুস্থান বার্ষিক বহি—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, কলিকাতা। মূল্য বার আনা। পৃ. ১৮৭।

ইংরেজীতে যে-সব 'ইয়ার-বুক' প্রকাশিত হয় সেগুলিতে ভারতবর্ষের ও ভারতীয় পাঠক ও সাংবাদিকদের পক্ষে বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য যথেষ্ট প্রকাশিত হয় না বলিয়া, কয়েক বৎসর যাবৎ ইংরেজীতে 'হিন্দুস্থান ইয়ার-বুক' প্রকাশিত ও সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে তাহার একটি বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে সাধারণ পাঠকের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও সাংবাদিকদের পক্ষে নিত্যব্যবহার্য্য বহু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

গীতা—মূল সহ বঙ্গানুবাদ। শ্রীব্যোমব্রহ্ম গীতাধ্যায়ী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

ইহাতে বাংলা পদ্যে গীতার প্রতি শ্লোকের মর্ম দেওয়া হইয়াছে, ভাষা প্রাঞ্জল; বইখানি পড়িয়া পাঠকেরা আনন্দিত হইবেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র রায়

আবর্ত্ত—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্পসংগ্রহ। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহন বাগান রো, কলিকাতা। ১৭৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকার সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহাদের নিকট রামপদ বাবুর পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না। আবর্ত্ত তাঁহার প্রথম পুস্তক হইলেও রামপদ বাবু ইতিমধ্যেই প্রতিভাবান্ গল্পলেখক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। অনেক দিন হইতে আমরা সাগ্রহে তাঁহার গল্পগুলি পুস্তকাকারে পাইবার প্রত্যাশা করিয়াছি। রামপদ বাবুর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে—অনাড়ম্বর সহজ জীবনের প্রাত্যহিক খুঁটিনাটির মধ্য হইতে তিনি গল্প আবিষ্কার করিয়া থাকেন। পুরাতন ও সহজ তাঁহার লেখনীর স্পর্শে নবীন ও বিচিত্র হইয়া উঠে। তাহার উপর, তাঁহার ভাষা মনোরম অথচ সহজ ও সরল, ভঙ্গির মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ গতিবেগ আছে যাহার প্রভাবে গল্পগুলি সহজেই অখণ্ড সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। আবর্ত্তে সাতটি গল্প আছে—চন্দ্রোদয়, কুজ্ঝটিকা ও কিরণ, আবর্ত্ত, স্কুলের ছেলে, অপূর্ণ, মৃত্যুউৎসব, মণ্ডলবাড়ী। প্রত্যেকটি গল্পই সুলিখিত—বিশেষ করিয়া চন্দ্রোদয়; আবর্ত্ত, ও মণ্ডলবাড়ী আমাদের ভাল লাগিয়াছে। এরূপ সুন্দর গল্পসংগ্রহের আদর হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝর্ণাধারা—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বি-এ, বিদ্যাভূষণ। বিজলী পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। পৃ. ৬৬। মূল্য এক টাকা।

কবিতার বই। লেখকের কান আছে, শব্দচয়ন কটু হয় নাই। মধ্যে মধ্যে অপরিণত মস্তিষ্কের নিদর্শনস্বরূপ খেয়ালী ভাব থাকিলেও কয়েকটি কবিতা পড়িতে মন্দ লাগে না।

শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

জেনি

শ্রীক্ষিতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

তখন রাত্রি। গৃহটি অতি সাধারণ হইলেও উষ্ণতা-রক্ষণের উপযোগী, বেশ আরামপ্রদ। আলো-আঁধারিতে গৃহ পূর্ণ, উনানের আগুনে ছাদের কাঠগুলিতে খানিকটা আলো প্রতিফলিত হইতেছিল; আর তাহারই জন্য গৃহের আভ্যন্তরীণ দ্রব্যাদি অস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছিল। জেলের জাল দেয়ালে ঝুলানো রহিয়াছে, এক কোণে একটি অতি সাধারণ তাকের উপরে ক-টি থালাবাটি সাজানো, সুদীর্ঘ পর্দ্দাবৃত বড় একটি বিছানার পাশে খান-কয়েক বেঞ্চির উপরে মাদুর বিছানো, পাঁচটি শিশু নিদ্রিত। তাহারই পাশে লেপে মাথা ঠেকাইয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে—তাদেরই মা। বেচারী একা। বাহিরে নীল সমুদ্র ঝড় বিদ্যুতে ভয়ানক গর্জ্জন করিতেছিল—আর ইহারই মধ্যে তাহার স্বামী তখন সমুদ্রে একা মাছ ধরিতেছিল।

ছোটবেলা হইতেই তাহার স্বামী মাছ ধরে। সমুদ্রের সহিত রোজই তাহার যুদ্ধ করিবার পালা। ছেলেমেয়েদের আহারটাও ত রোজ দরকার—তাই বৃষ্টি বাতাস, ঝড়—যাহাই থাকুক না কেন ডিঙি লইয়া তাহাকে মাছ ধরিতে যাইতেই হয়। যখন চার-পাল-ওয়ালা ডিঙি করিয়া সমুদ্রে সে একা তাহার কাজ করিয়া যায়, তখন গৃহে বসিয়া তাহার স্ত্রী পালে তালি লাগায়, পুরাতন জাল মেরামত করিয়া রাখে, কাঠিগুলি ঠিকঠাক্ করিয়া দেয় অথবা মাছের ঝোল রান্না করিবার সময় উনানের আঁচের প্রতি লক্ষ্য রাখে। তাহার পাঁচটি সন্তান ঘুমাইবার পরেই সে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া ভগবানের নিকট অন্ধকার সমুদ্রে ভাসমান তাহার স্বামীর জন্য প্রার্থনা করে। সত্যই তাহার স্বামীর জীবনটা বড় কষ্টের। তীরের উপর যে বড় বড় ঢেউগুলি পতিত হয়, সাধারণতঃ সেই সব বড়-বড় ঢেউগুলিতেই মাছ থাকে—মাছের থাকিবার স্থান বড়ই অনিশ্চিত, নির্ণয় করা বড়ই দুরূহ। এই চঞ্চল মরুভূমিতে তাহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। তাহা শীত কুয়াশা ও ঝড়ের মধ্যে একমাত্র স্রোত ও বায়ুর অভিজ্ঞতা হইতে ঠিক করিতে হয়। সমুদ্রের তরঙ্গ মুক্তাশোভিত সাপের মত বহিয়া চলিয়াছে। রাত্রির অন্ধকার কালি লেপিয়া দিয়াছে। বরফের মত জমাট সমুদ্রে বসিয়া সে জেনির কথা ভাবিতেছে—আর গৃহে বসিয়া সাশ্রুনেত্রে জেনিও তাহারই কথা ভাবিতেছে।

জেনি তাহারই কথা ভাবিতেছে, তাহারই জন্য প্রার্থনা করিতেছে। সাগর-শকুনের কর্কশ আর্ত্তনাদ তাহার চিত্তকে পীড়িত করিয়া তুলিল—সমুদ্রের গর্জ্জন তাহার হৃদয়কে শঙ্কায় পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। অন্যান্য চিন্তাও সে করিতেছিল—ভাবিতেছিল তাহাদেরই দারিদ্র্যের কথা। কি শীত কি গ্রীষ্ম তাহাদের ছেলেমেয়েরা খালিপায়েই থাকে—জুতা পরিবার সৌভাগ্য তাহাদের নাই, ভাল সুস্বাদু রুটির মুখ তাহারা এ-জীবনে দেখিল না। বাহিরে হাপরের শব্দের মত বাতাসের গর্জ্জন হইতেছিল, জেনি কাঁদিতেছিল—কাঁপিতেছিল। দুর্ভাগা তাহারা যাহাদের স্বামী সমুদ্রের সহচর। পিতা অথবা প্রিয়তম, ভাই বা ছেলে বা কোন প্রিয়জন সমুদ্রে ঝড়ে পড়িয়াছে কল্পনা করিতে কতই না ব্যথা! জেনির ভাগ্য আরও খারাপ। তাহার স্বামী সম্পূর্ণ একাকী—এ ভীষণ রাত্রিতে সাহায্য করিবার মত কোন লোক তাহার নাই। বেচারী মা! সে চাহে তাহার সন্তানেরা যদি বড় হইয়া উঠিত!—তাহাদের বাবাকে যদি সাহায্য করিতে পারিত! ভুল! ভুল তার স্বপ্ন! অনাগত দিনে এই সন্তানেরাই যখন তাহাদের পিতার সঙ্গে ঝড়ে পড়িবে তখন কাঁদিয়া সে ভাবিবে—তাহার ছেলেরা যদি বড় না-হইত!

২

জেনি তাহার ওভারকোট ও লণ্ঠন লইল, মনে মনে

কহিল—"একবার দেখা দরকার সে আসছে কি না, সমুদ্র শান্ত হ'ল কি না, সিগন্যালে আলো জ্বলছে কি না।" জেনি বাহির হইল। দিগন্তে সাদা রেখা ভিন্ন কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ভীষণ অন্ধকার। বৃষ্টি পড়িতেছে—ভোরের ঠাণ্ডা বৃষ্টি। কোন ঘরের জানলাতেই আলো দেখা যায় না।

হঠাৎ একটি জীর্ণ কুটীর তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সেই কুটীরে আলো অথবা উনানের আগুন কোন কিছুরই বালাই ছিল না। দরজা বাতাসে দুলিতেছে। বিধ্বস্ত দেয়াল অদ্ভুত ছাদকে যেন আর বহন করিতে পারে না। তাহার উপরেই ভীষণ বাতাস বহিতেছে।

জেনি ভাবিল—"ঐ যাঃ, অনাথা বিধবাটির কথা ত আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, আমার স্বামী সেদিন দেখে গেল তার অসুখ। আহা বেচারী একা, কেউ দেখবার লোক নেই। সে কেমন আছে আমার খোঁজ নেওয়া উচিত।"

জেনি দরজায় আঘাত করিয়া কান পাতিয়া রহিল। কোন উত্তর নাই। সমুদ্রের কন্‌কনে হাওয়ায় জেনি কাঁপিতেছে।

"বেচারীর অসুখ—আহা তার ছেলেমেয়ে দুটি না জানি কি অবস্থায়ই আছে! বড় গরিব এরা—তায় আবার বিধবা, স্বামী নেই।"

আবার দরজায় জেনি আঘাত করিল—নাম ধরিয়া ডাকিল; কিন্তু ভিতর হইতে কোন সাড়াই আসিল না।

"বাপ রে, কি ঘুম! এত শব্দেও ঘুম ভাঙে না!"

সেই মুহূর্ত্তে আপনা হইতেই দরজা খুলিয়া গেল। জেনি ঘরে প্রবেশ করিল। লণ্ঠনের আলোয় দেখিল ছাদ দিয়া ঝরণার মত জল পড়িতেছে। ঘরের প্রান্তে কি একটা পড়িয়া আছে। নগ্নপদ দৃষ্টিহীন-চক্ষু একটি মহিলা স্থির ভাবে পড়িয়া আছে, তাহার সাদা ঠাণ্ডা হাত খড়ের উপর শিথিলভাবে ন্যস্ত। সে আর জীবিত নাই, এক সময়ে তাহার ছিল সুখের সংসার, সে ছিল আনন্দময়ী জননী—আজ জগতের সহিত দীর্ঘ সংগ্রামের পর প্রাণহীন দেহ লইয়া সে পড়িয়া আছে। মা'র বিছানার পাশে দুটি ছেলে মেয়ে একসঙ্গে দোলনায় ঘুমাইতেছে—স্বপ্নে হাসিতেছে। তাহাদের মা যখন বুঝিল যে তাহার অন্তিমকাল উপস্থিত, তখন নিজের ওভারকোটটা দিয়া তাহাদের ঢাকিয়া দিল—তাহারা যেন উষ্ণ থাকে—নিজে ঠাণ্ডা হইয়া গেল তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

জীর্ণ দোলনায় শিশু দুইটি গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। এই দুইটি অনাথকে জাগাইবার শক্তি যেন কোন কিছুরই নাই। বৃষ্টি সব ভাসাইয়া লইয়া চলিল—সমুদ্রের গর্জ্জন যেন অজানা কোন বিপদের সাবধানী সঙ্কেত। ছাদ হইতে এক ফোঁটা জল মৃতদেহের মুখে পতিত হইল—মনে হইল, বুঝি চোখের কোণে অশ্রু জমিয়া আছে।

৩

মৃত বৃদ্ধার গৃহে জেনি কি করিতে গিয়াছে? তাহার ওভারকোট দিয়া ঢাকিয়া সে কি লইয়া চলিল? তাহার বুক কেন কাঁপিতেছে? ত্রস্তপদে সে নিজের গৃহেই ফিরিয়া আসিল কেন? পশ্চাতে চাহিয়া দেখিতে সে কেন ভয় পাইতেছে? পর্দ্দার অন্তরালে সে কি ঢাকিয়া রাখিল? আজ তাহার আচরণ চোরের মত কেন?

সে যখন গৃহে পৌঁছিল তখন পাহাড় আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল। বিছানার পাশে একটি চেয়ারে জেনি তাহার দেহ এলাইয়া দিল। তাহার মুখ অত্যন্ত মলিন। মনে হয় সে যেন কিসের জন্য অনুতপ্ত। তাহার ললাট বালিশে ঠেকানো রহিয়াছে। মাঝে মাঝে সে বিড় বিড় করিয়া ওঠে—বাহিরে সমুদ্র গর্জ্জন করে।

"হা ভগবান, ও এসে আমাকে কি বলবে! কত কষ্টে তার দিন চলছে—আর আমি এ কি করলাম। এমনিই ত আমাদের পাঁচটি সন্তান। তাদের বাপ খেটেই চলেছে—কেউ বুঝতে পারে না তার কোন চিন্তা আছে কি না। আমিই এখন হয়ত তাকে উদ্বেগ-কাতর ক'রে তুলব। ওই ত সে আসছে, না? না, সত্যি আমার অন্যায় হয়েছে। এ অবস্থায় সে যদি আমায় মারে ত তার কোন দোষ নেই। কে আসছে? এ কি সে? না। যাক্‌... এ কি দোর ন'ড়ে উঠল যে! কে ভেতরে,

আসছে ? না, সে আসছে একথা ভাবতেও আমার আজ ভয় করছে।”

নানা চিন্তায় সে মগ্ন। শীতে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে। বাহিরের কোন শব্দের প্রতি আর তাহার মন নাই। ঝড়জলের শব্দও তাহার কানে যায় না।

হঠাৎ দরজা খুলিয়া গেল। ভোরের আলোয় গৃহ পরিপূর্ণ হইল, জেলে জাল গুটাইয়া উৎফুল্ল মনে উপস্থিত হইল, “নেভি এসেছে।”

“তুমি এসেছ”, প্রেমিকার মত সে তাহার স্বামীকে জড়াইয়া ধরিল—স্বামীর পোযাকে নিজের মুখ লুকাইল।

তাহার স্বামী বলিতে লাগিল—“ভাগ্য ছিল আমার নেহাৎ খারাপ…”

“হাওয়া কি রকম ছিল ?”

“ওঃ ভয়ঙ্কর !”

“মাচ কি রকম ধরলে ?”

“কিছুই নয়। কিন্তু তুমি কিছু ভেব না--তোমাকে যে আবার আলিঙ্গন করতে পারছি তাতেই আমি সুখী, আজ প্রায় কিছুই ধরতে পারি নি—অথচ জালটাকে ছিঁড়ে এনেছি। আজ বাতাসে যেন শয়তান ভর করেছিল। একবার মনে হ'ল যে ডিঙি বুঝি ডুবল—দড়ি গেল ছিঁড়ে। যাক্, এত ক্ষণ তুমি কি করছিলে বল ত ?”

অন্ধকারে জেনি একবার কাঁপিয়া উঠিল।

“আমি…আমি !” জেনি একটু বিপদে পড়িল, “আমি রোজকার মত সেলাই করছিলাম। সমুদ্রের গর্জ্জন শুনে বড় ভয় করছিল।”

“হ্যাঁ, শীতকালটা একটু কষ্টেরই ; যাক্ ভয়ের কিছু নেই।”

তার পর জেনি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, যেন কি অপরাধের কথাই সে বলিতে চলিয়াছে, “জান, আমাদের পাশের বাড়ীর বুড়ীটি মারা গেছে। কাল রাত্তিরে তুমি বেরিয়ে যাবার একটু পরেই বোধ হয় সে মারা গেছে—রেখে গেছে একটি ছেলে, একটি মেয়ে—উইলিয়ম আর মেডেলিন। ছেলেটি হাঁটতে পারে, মেয়েটি এখনও কথা বলতে শেখে নি। আহা বুড়ীর কি কষ্টেই দিন চলত !”

জেলে গম্ভীর হইয়া পড়িল। ঝড়ে সিক্ত ফারের টুপিটি এক কোণে ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিল, “আমাদের পাচটি সন্তান ছিল—এখন হ'ল সাত। এই ঝড় বাতাসে খাওয়া-দাওয়া না ক'রেই বেরুতে হ'ল দেখছি। কি যে করি ! আমি আর কি করব ? সবই ভগবানের হাত। আমার পক্ষে এ ভাঁর কষ্টকর হবে সত্যি। ভগবান কেন তাদের মাকে ডেকে নিলেন ? কি জানি, এসব কি আর আমরা বুঝতে পারি ! জ্ঞানী লোক ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না, কিন্তু ওরা দু-জনে জেগে উঠে যদি দেখে তাদের মা ম'রে আছে,—ভীষণ ভয় পাবে ওরা, যাই এখুনি তাদের নিয়ে আসি গে। আমাদের পাচটি ছেলেমেয়ের নতুন ভাইবোন হ'ল। ভগবান যখন দেখবেন যে আমাদের পাচটি ছেলেমেয়ে ছাড়া এই ছোট ছেলেমেয়ে দুটিকেও আমাদের খাওয়াতে হবে—ভগবান নিশ্চয়ই আমাদের বেশী ক'রে মাছ পাইয়ে দেবেন। আমি ? আমি জল খেয়েই থাকতে পারি। দ্বিগুণ পরিশ্রম করব। কোন ভাবনার দরকার নেই…কিন্তু তোমার কি হ'ল বল ত ? রাগ করলে নাকি ? তোমাকেও ত এমন কখনও দেখি নি।”

পর্দ্দা সরাইয়া জেনি কহিল, “একবার চেয়ে দেখ ত !”

*ভিক্টর হুগোর 'জেনি' গল্পের অনুবাদ

পাগান, ম্যেবন্‌থা মন্দিরের প্রাচীর-চিত্র। আনুমানিক দ্বাদশ শতক।

পাগানের প্রাচীর-চিত্রাবলী

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস রচনার সময় এখনও হয় নি। ইতস্তত দু-চার জন রসজ্ঞ পণ্ডিত এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন সত্য, এবং তাতে আমাদের জ্ঞানের পরিধিও বেড়েছে, কিন্তু সমগ্রভাবে আমাদের সুবিস্তৃত অতীতের সমস্ত মাল-মশলা সংগ্রহ ক'রে, বিচিত্র শিল্পশাস্ত্রের মর্ম উদ্‌ঘাটন ক'রে কোন সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস রচনার চেষ্টা এ-পর্যন্ত হয় নি। বোধ হয়, খুব অদূর ভবিষ্যতে তা' সম্ভবও নয়। আনন্দ কুমারস্বামী, গ্রিফিথ্‌স, হ্যারিংহাম, ব্রাউন, ইয়াজ্‌দানী, মার্শাল, ষ্টেলা ক্রামরিশ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অর্দ্ধেন্দ্রকুমার প্রমুখ দেশী ও বিদেশী মনীষীরা যদিও বহুদিন থেকে এ-বিষয়ে চর্চা করে আসছেন, এবং নূতন তথ্য ও তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করেছেন, তবু এ-কথা স্বীকার করতেই হয়, এখনও অনেক সুবিস্তৃত শতাব্দীর মালমশলার সন্ধানই আমরা জানি না, অনেক আঙ্গিক ও ধারা আমাদের কাছে আজও অজ্ঞাত, এবং বহু শিল্পশাস্ত্র এখনও আমাদের কাছে তাদের রহস্য প্রকাশ করে নি; এখনও অনেক শিল্পশাস্ত্র আমাদের অজ্ঞাত। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস এক প্রকার অজন্টা, বাঘ ও সিগিরিয়ার গুহা-চিত্রাবলী, নেপাল ও বাঙলা দেশের হাতের লেখা পুঁথির চিত্র, মধ্য-এশিয়ার দণ্ডন উলিক্‌ প্রভৃতি পর্বতগুহার প্রাচীর-চিত্র, দক্ষিণ-ভারতের সিত্তনবসল, বাদামী, ও এলোরার কৈলাসনাথ মন্দিরের প্রাচীর-চিত্র ইত্যাদি নিয়েই গড়ে উঠেছে, এবং এখনও পর্যন্ত অনেক বিশেষজ্ঞও এর বাইরে অন্য চিত্রশৈলী অথবা অন্য চিত্রাভিজ্ঞানের সন্ধান বিশেষ জানেন না, কিংবা জানলেও তাদের চর্চা বিশেষ কিছু হয় নি। মধ্যযুগের চিত্রকলার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা যতটা অগ্রসর হয়েছে, প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ নিয়ে ততটা হয় নি। মুঘল এবং বিভিন্ন রাজপুত ও পাহাড়ী চিত্রশৈলী এবং পশ্চিম-ভারতীয় তথাকথিত জৈন চিত্রশৈলী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এখন অনেকটা স্পষ্ট হয়ে এসেছে, এবং কিছু দিন হ'ল শ্রীমতী ষ্টেলা ক্রামরিশ দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে-সব চিত্র-নিদর্শনের সন্ধান পেয়েছেন; তা'তে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতক থেকে আরম্ভ ক'রে উনবিংশ শতক পর্যন্ত দক্ষিণ-ভারতে ভারতীয় চিত্রকলার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার পথ খুব সুগম হয়েছে ব'লে ভরসা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই শ্রীমতী ক্রামরিশ তাঁর *A Survey of Painting in the Deccan* (India Society, London, 1937) নামক সুলিখিত গ্রন্থে এই ভবিষ্যৎ ইতিহাসের সূচনা প্রদান করেছেন। পশ্চিম-ভারতীয় জৈন চিত্রশৈলী সম্বন্ধেও নূতন কিছু কিছু মালমশলা পাওয়া যাচ্ছে। কিছু দিন আগে বন্ধু শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সুন্দরবন

মিন্‌পাগান, নাগায়োন্‌ মন্দিরের প্রাচীর-চিত্র। একাদশ শতকের অন্তকাল।

থেকে যে-তাম্রলেখ উদ্ধার করেছেন তার উলটো পিঠে গরুড়বাহন লীলাসনোপবিষ্ট এক বিষ্ণুমূর্তি উৎকীর্ণ আছে। এই মূর্তির রেখাঙ্কনরীতি দেখে একথা নিশ্চিত অনুমান করা যেতে পারে যে, যে-চিত্রশৈলী এত দিন জৈন শৈলী ব'লে পরিচিত ছিল, তা শুধু জৈন শিল্পীদের ভিতরেই, কিংবা কেবল পশ্চিম-ভারতেই আবদ্ধ ছিল না। ভারতের অন্যান্য স্থানেও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী শিল্পীরা এই শৈলী অনুসরণ করতেন। পাগানের প্রাচীর-চিত্র থেকেও এ-কথার সত্যতা প্রমাণ করা কঠিন হবে না।

আমাদের দেশের সাধারণ শিল্প-বিদগ্ধ পাঠকের কাছে এ-কথা অজ্ঞাত নয় যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকেই ভারতীয় চিত্রশৈলী ও আঙ্গিক মধ্য-এশিয়ায় প্রচার লাভ করেছিল, এবং সেখান থেকে ক্রমশঃ চৈনিক শিল্পীদেরও কতকটা প্রভাবান্বিত করেছিল। অজন্টার শিল্পধারা শতাব্দীর শিল্পাভ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে বাঙ্‌লা দেশে, নেপাল ও তিব্বতে নূতন প্রকাশ লাভ করেছিল, এ-কথাও অজ্ঞাত নয়। কিন্তু পূর্বদক্ষিণ এশিয়ায় যে-সব দেশ ও দ্বীপগুলিতে বৃহত্তর ভারত রচিত হয়েছিল, সে-সব জায়গায় ভারতীয় চিত্রশৈলী কত দূর প্রসার লাভ করেছিল, এ-সম্বন্ধে আমরা এখনও পর্যন্ত কিছু জানি নে বললেই চলে। চম্পা ও কম্বোজের, সুমাত্রা-যব-বলি-বোর্ণিয়ো দ্বীপপুঞ্জের, সিয়ামের মূর্তি, স্থাপত্য ও মণ্ডনশিল্প প্রভৃতি নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে, এবং ভারতীয় সংস্কৃতির ও শিল্প-রীতির প্রভাবও আমাদের গোচর হয়েছে; কিন্তু এ-সব দেশ ও দ্বীপপুঞ্জের চিত্রকলার ইতিহাস এখনও অজ্ঞাত বললেই চলে। ইন্দোচীন (চম্পা-কম্বোজ) এবং ইন্দোনেশিয়ার (যব-সুমাত্রা-বলি-বোর্ণিয়ো দ্বীপপুঞ্জ) কোনও চিত্রাভিজ্ঞান এখন পর্যন্ত বিশেষজ্ঞদের আলোচনা-গোচর হয় নি; সিয়াম দেশের চিত্রশিল্পের অভিজ্ঞান কিছু কিছু অনেকেরই জানা আছে, এবং তার স্বল্প আলোচনাও হয়েছে; তবে ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসের দিক্‌ থেকে তার মূল্য খুব বেশী নয়, এবং সেদিক থেকে তার ভিতর নূতন কিছু আলোকের সন্ধানও আমরা পাই না।

পাগান, মোবনথা মন্দিরের প্রাচীর-চিত্র। আনুমানিক দ্বাদশ শতক।

আজ কয়েক বৎসর ধরে ব্রহ্মদেশের সরকারী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের চেষ্টায় প্রাচীন পাগান নগরীর চিত্রকলাভ্যাসের প্রচুর নিদর্শন বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আনন্দ কুমারস্বামী তাঁর *History of Fine Arts in India and Indonesia* গ্রন্থে পাগান মন্দিরসমূহের প্রাচীর-চিত্রের কথা স্বল্প উল্লেখ করেছেন, এবং মাঝে মাঝে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের বার্ষিক বিবরণীতেও কিছু কিছু উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া আর কোথাও এ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়েছে ব'লে আমি জানি নে। এ-বিষয়ে আমাদের ঔদাসীন্য দেখে মনে হয়, আমরা এই চিত্রাভিজ্ঞানগুলির ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট সজাগ হই নি। অবশ্য, এ-কথা সত্য যে, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের দিক্ থেকে, ভারতীয় সংস্কৃতির দিক্ থেকে সাধারণ ভাবে ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধেই আমরা এত কাল উদাসীন ছিলাম; ইদানীং এদিকে আমাদের দৃষ্টি কিছু কিছু আকৃষ্ট হচ্ছে। সেজন্য, আশা হয় ভারতীয় চিত্রকলার এই অমূল্য নিদর্শনগুলোর দিকেও ক্রমশঃ আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। পাগানের প্রাচীর-চিত্রাভিজ্ঞানগুলি দেখলেই অনুমান করা কঠিন হবে না যে এগুলি ভারতীয় চিত্রকলা-ইতিহাসেরই একটি অপরিচিত অধ্যায়ের মালমশলা। ভারতীয় শিল্পরীতি ও আঙ্গিক এবং বিভিন্ন শৈলী কি ক'রে শতাব্দীর শিল্পাভ্যাসে রূপান্তর লাভ করেছে, এবং ভিন্ন দেশে ভিন্ন আবহাওয়ার ভিতর কি ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছে, তার প্রমাণ এবং পরিচয়ও এদের ভিতর পাওয়া যাবে। নেপালে, তিব্বতে ও বাঙলা দেশে হাতের লেখা পুঁথিতে এবং প্রাচীন পটে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতকের চিত্র-নিদর্শন অপ্রতুল নয়, কিন্তু দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক-

মিন্‌নানথ্র, নন্দমাএল মন্দিরে গর্ভ-বেদীর উপরকার ছাতে চিত্রালঙ্কার।
ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ।
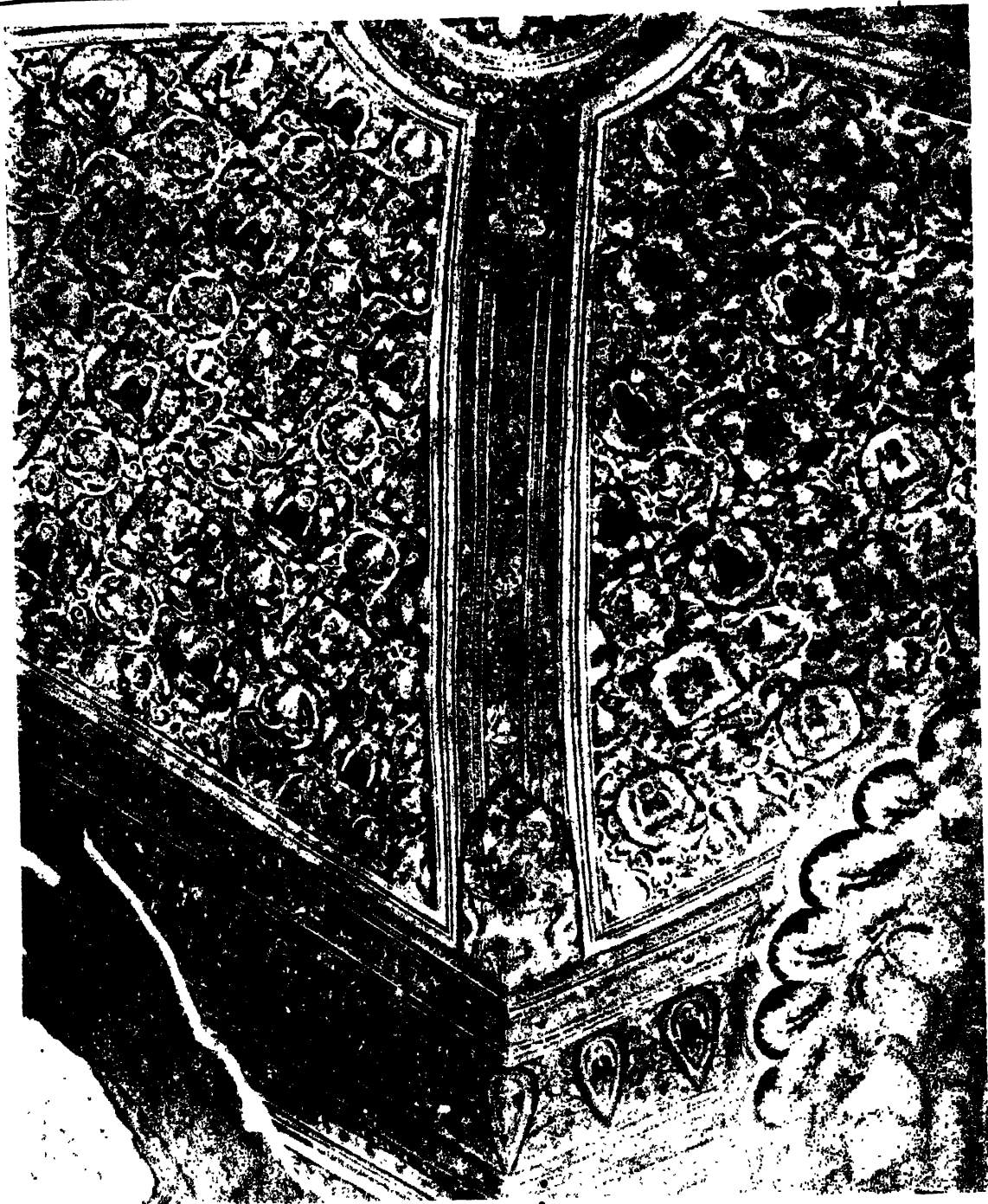
মিন্‌নান্‌থু, নন্দমাঞা মন্দিরের প্রাচীর-চিত্র।
বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ।

মিন্‌নান্‌থ, পায়াথন্‌জু মন্দিরের প্রাচীর-চিত্র।
আনুমানিক চতুর্দশ শতক।

স্ত ভারতবর্ষে প্রাচীর-চিত্রনিদর্শন কিছু নেই বললেই শ। এদিক থেকেও পাগানের প্রাচীর-চিত্রগুলির মূল্য কম নয়। তা ছাড়া, আমাদের পরিচিত চিত্রশৈলীগুলির বিবর্তন ও পরিবর্তনের দিক্ থেকেও এই প্রাচীর-চিত্রগুলির মূল্য যথেষ্ট।

আমাদের দেশে ভুবনেশ্বর বা খজুরাহোর মন্দির-নগরীর ধ্বংসাবশেষ যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা পাগানের মন্দির-নগরীর ধ্বংসাবশেষ কতকটা কল্পনা করতে পারবেন। আড়াই-শ তিন-শ বছর ধরে পাগানের রাজারা কেবল

মিন্‌নান্‌থ, এক ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের প্রাচীর-চিত্র। আনুমানিক চতুর্দশ শতক।

মন্দিরের পর মন্দির নির্মাণ করেছেন, নানা রীতির, নানা ভঙ্গীর, নানা আকারের; তার ফলে আজ ইরাবতীর তীরে প্রায় এক শত বর্গমাইল জুড়ে দেখতে পাওয়া যায় শুধু মন্দির আর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের বিচিত্র স্তূপ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইট আর চুণ-বালির স্তূপ। পাগানের এই মন্দিরগুলি বহুদিন ধরে বাস্তুবিশারদ পণ্ডিতদের গবেষণার উপাদান এবং রসিক দর্শক-জনের আনন্দের সামগ্রী হয়ে আছে। আমি যত দূর দেখেছি, ভারতবর্ষেও কোথাও এত সুবিস্তীর্ণ মন্দির-নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখি নি; মন্দিরশিল্পের এত বিচিত্র রূপ একত্র কোথাও দেখি নি; এবং কোন নগরীর ধ্বংসারণ্যই আমার চিত্তে এমন মায়া বিস্তার করে নি। কিন্তু এই মন্দিরগুলির স্থাপত্যরীতিই এদের একমাত্র পরিচয় নয়; এদের অবলম্বন ক'রে পাগানে পাথর ও ব্রোঞ্জের মূর্তিও কম গড়ে ওঠে নি। ধ্বংসস্তূপ ও মন্দিরাবশেষের ভিতর থেকে অসংখ্য ভাস্কর্য-নিদর্শন ক্রমেই আবিষ্কৃত হচ্ছে, এবং তা' নিয়ে আলোচনাও কিছু কিছু হয়েছে। কয়েক বৎসর আগে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্টসের ষাণ্মাসিক পত্রিকায় আমি এ-সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ সুচিত্রিত আলোচনা প্রকাশ করেছিলাম। তা'তে আমি সহজেই প্রমাণ করেছিলাম পাগানের ভাস্কর্য-রীতি. বাঙ্‌লা ও বিহারের পাল ও সেন আমলের ভাস্কর্য-রীতিরই রূপান্তর মাত্র (Sculptures and Bronzes from Pagan, *Journal of the Indian Society of Oriental Arts*, Dec., 1934)। কিন্তু এই মন্দিরগুলির সর্বপ্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে তাদের প্রাচীর-চিত্রাবলী। প্রতি বৎসরই অনুসন্ধানের ফলে এমন দু-চারটি মন্দির প্রকাশগোচর হচ্ছে যার প্রাচীর-গাত্র চিত্রে আচ্ছাদিত। পাগানে এমন মন্দির এত আছে যে তার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন; আমি যত দূর হিসেব নিতে পেরেছি এবং নিজে দেখেছি, তাতে মনে হয়, আনন্দ, থাব্বিঞ্ঞু প্রভৃতি বড় বড় মন্দির ছাড়া, প্রায় প্রত্যেক ছোট ছোট মন্দিরের প্রাচীরগাত্রই চিত্র-সুশোভিত ছিল। অনেক মন্দিরেরই চুণবালির আস্তরণ খ'সে প'ড়ে যাওয়াতে ছবিগুলিও তার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়েছে; অনেক মন্দির কালের প্রভাবে জীর্ণ হয়ে এসেছে এবং প্রাচীর-চিত্রগুলিও স্থানে স্থানে খ'সে প'ড়ে গেছে অথবা অত্যন্ত মলিন ও অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। সরকারী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ আজকাল এগুলির রক্ষণে যত্নবান হয়েছেন, এবং হয়ত তার ফলে আরও কিছু কাল এদের বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হবেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই বহু মূল্যবান তথ্য কালের কুক্ষিগত হয়েছে, এবং ক্রমশ আরও হবে ব'লে ভয় হয়। আশ্চর্যের বিষয়, পাগানের বাইরে এই চিত্রশিল্পের নিদর্শন ব্রহ্মদেশের আর কোথাও নেই। তার একটা প্রধান কারণ এই, দুই-তিন শত বৎসর পাগানই ব্রহ্মদেশের রাজশক্তির কেন্দ্র ছিল, এবং রাজকীয় ঐশ্বর্য, রাজকীয় গর্ব ও অহঙ্কার, রাজকীয় প্রতাপ ও প্রভুত্ব পাগানকে কেন্দ্র করেই আত্মপ্রকাশ করেছিল ব্রহ্মদেশের তদানীন্তন সংস্কৃতির যা-কিছু নিদর্শন পাগানের বাইরে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না।

পাগানের প্রাচীর চিত্রগুলির বিষয়বস্তু প্রধানত বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয়, যদিও কোন কোন মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবদেবীও দেখতে পাওয়া যায়, তবে সংখ্যায় তাঁরা নিতান্ত অল্প, এবং পদমর্যাদায়

পাগান, লকহ্‌তাইক মন্দিরের প্রাচীর-চিত্র ; বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ। আনুমানিক ত্রয়োদশ শতক।
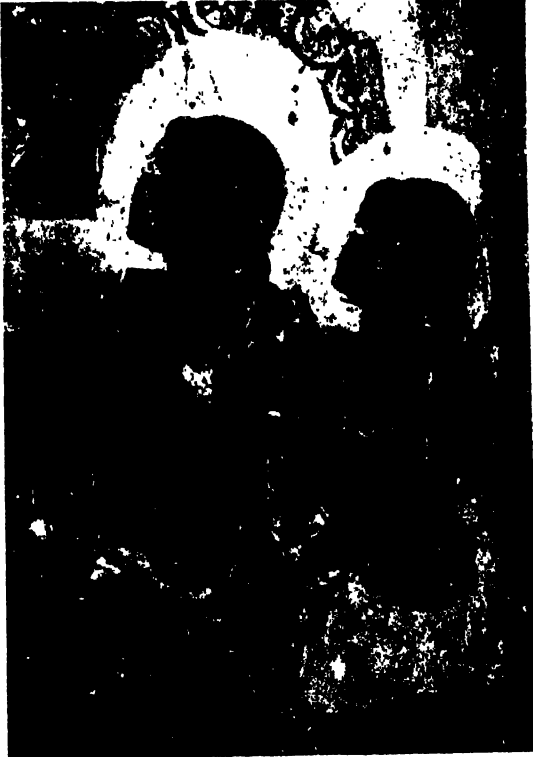
মিন্‌পাগান্‌, কুবাউচ্চি মন্দিরের প্রাচীর-চিত্র। একাদশ শতক।

মিন্‌নানথু, নন্দমাঞা মন্দিরের প্রাচীর-চিত্র। বোধিসত্ত্ব ও শক্তি, মিথুনমূর্তি। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ।

মিন্-নান্থ, নন্দমাঞ্জ মন্দিরের প্রাচীর-চিত্র ; বুদ্ধের মহাভিনিষ্ক্রমণ (?)। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ।

মিন্‌পাগান, অবেয়্‌দান মন্দিরের প্রাচীর-চিত্র ; বোধিসত্ত্ব লোকনাথ। একাদশ শতকের শেষ পাদ
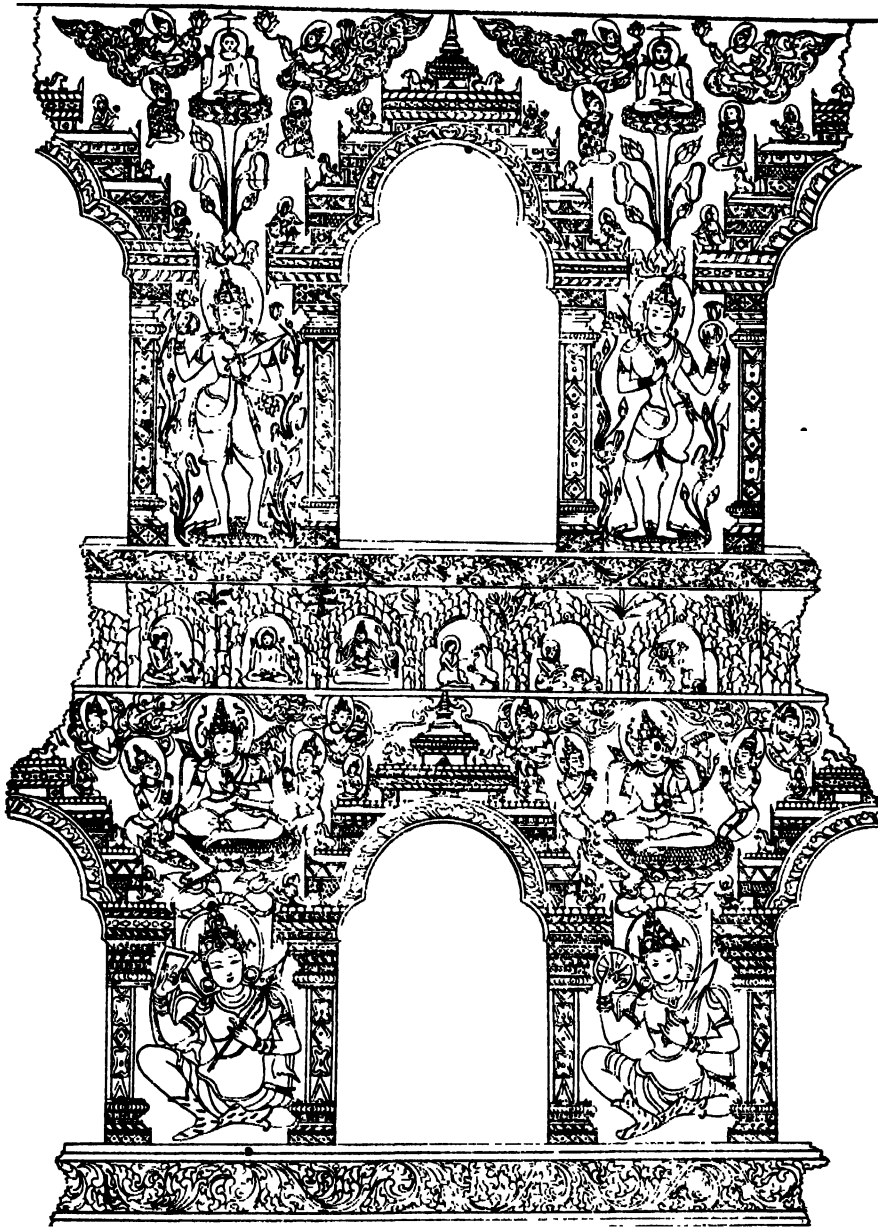
মিন্‌-পাগান, অবেয়্‌দান্‌ মন্দিরের প্রাচীরচিত্রের রেখার অনুকৃতি।
একাদশ শতকের মধ্যভাগ।

তাঁরা বৌদ্ধ দেবদেবীদের সঙ্গে একাসনে স্থান পান নি। কিন্তু বিষয়বস্তু প্রধানত বৌদ্ধধর্মীয় হ'লেও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের স্থান এই প্রাচীর-চিত্রগুলিতে নেই বললেই চলতে পারে। মন্দির-বেদীতে ধ্যানাসনে অথবা ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি প্রায় সব মন্দিরেই আছে, প্রাচীর-চিত্রেও সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্তি অঙ্কিত

দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁকে কেন্দ্র ক'রে ছাদ ও প্রাচীর-গাত্রে যে-সব দেবদেবী ও কাহিনী রঙে ও রেখায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে তা অধিকাংশই মহাযান, বজ্রযান ও মন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মীয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত *Sanskrit Buddhism in Burma* নামক গ্রন্থে (১৯৩৬) আমি এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি; সুতরাং এখানে তা পুনরুক্তি করবার কোন প্রয়োজন নেই। এটা ভাবতে একটু আশ্চর্য বোধ হয় এই আড়াই-শ তিন-শ বছর ধরে যে-সব রাজা পাগানের এই অপূর্ব মন্দিরগুলো তৈরি করিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন থেরবাদী বৌদ্ধ, এবং এই ধর্মই ছিল পাগানের, তথা উত্তর ও দক্ষিণব্রহ্মের রাষ্ট্র- ও জন-ধর্ম। কি ক'রে এই আপাতবিরোধী আদর্শ ও অভ্যাসের সমন্বয় সাধিত হয়েছিল, কারা এই মহাযান-বজ্রযানীয় বৌদ্ধধর্ম পাগানে নিয়ে এসেছিলেন, এই সব প্রাচীর-চিত্র কোন্ দেশীয় চিত্রীদের দ্বারা রূপায়িত হয়েছিল তার আলোচনাও উল্লিখিত পুঁথিতে করা হয়েছে।

পাগানে এই সব প্রাচীর-চিত্র বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা ক'রে দেখে আমার মনে হয়েছে, যে-সব মন্দিরে এই চিত্রগুলি দেখতে পাওয়া যায় তাদের মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতকের যে-মন্দিরগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে, (যথা, কুবাউচ্চি, নাগায়োন, ম্যেবন্থা, পাটোথাম্মা) তাদের প্রাচীর-চিত্রগুলি কতকটা একই শৈলী ও আঙ্গিকে রচিত, তাদের বর্ণ এবং রচনাবিন্যাসও একই প্রকারের। কিন্তু দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের মন্দিরগুলির প্রাচীর-চিত্র, (যথা, নন্দমাঞ্ঞা, পায়াথনজু, থম্বুলা) আবার অন্য শৈলী ও আঙ্গিকে রচিত, বর্ণ এবং রচনাবিন্যাসও অন্য প্রকার। প্রথমোক্ত মন্দিরগুলির স্থাপত্য-রীতির সঙ্গে শেষোক্ত মন্দিরগুলির স্থাপত্য-রীতিরও একটু পার্থক্য আছে; এবং আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রথমোক্ত মন্দিরগুলির অনেক প্রাচীর-চিত্রের নীচে তেলাইং অক্ষরে লেখা পরিচয় আছে, শেষোক্ত মন্দিরগুলির প্রাচীর-চিত্রের পরিচয় প্রাচীন ব্রহ্মলিপিতে লেখা।

অবেয়্দান মন্দিরের প্রাচীর চিত্রের যে-দুটি নিদর্শন এই প্রবন্ধের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে, সে-দুটি একটু পর্যালোচনা করে দেখলেই বিশেষজ্ঞদের বুঝতে কঠিন হবে না যে এই চিত্র-শৈলী ও আঙ্গিকের সঙ্গে বাংলা দেশের সমসাময়িক (পাল যুগের) হাতের লেখা পুঁথির miniature চিত্রশৈলী ও আঙ্গিকের একটা খুব নিবিড় সম্পর্ক আছে। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নির্মিত এই মন্দিরের বোধিসত্ত্ব লোকনাথের মূর্তির অঙ্কনরীতি, রঙ্ ও রেখার বিন্যাস, মূর্তিভঙ্গী ইত্যাদি সমস্তই যেন বাংলা দেশের তদানীন্তন miniature চিত্রের অনুরূপ। আনুমানিক দ্বাদশ শতকের ম্যেবন্থা মন্দিরের প্রাচীন চিত্রগুলি সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা যেতে পারে। এ-গুলির সঙ্গে সমসাময়িক নেপালী চিত্রাঙ্কন-রীতিরও কতকটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়; তার প্রধান কারণ, একাদশ ও দ্বাদশ শতকের বাংলা ও নেপালী চিত্ররীতির মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই; দুই দেশেই একই শিল্প-ধারা ও আদর্শ চিত্রীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। পাগানের প্রাচীর-চিত্রগুলি থেকে এ-কথা অনুমান করা যেতে পারে। বাংলা দেশ এবং নেপালেও এই সময়ে প্রাচীর-চিত্র রচনা হয়ত প্রচলিত ছিল; কিন্তু যেহেতু তদানীন্তন কোন মন্দিরই এখন আর আমাদের গোচর নয়, সেই হেতু তাদের প্রাচীর-চিত্র-নিদর্শনও কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি না; শুধু, হাতের লেখা পুঁথিতে অথবা পটে তার কিছু কিছু আভাস মাত্র পাচ্ছি। আমি অন্যত্র প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পণ্ডিত বাংলা ও বিহার থেকে পাগানে এবং উত্তর-ব্রহ্মের নানাস্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন; তাঁরাই মহাযানীয়-বজ্রযানীয় বৌদ্ধধর্ম উত্তর-ব্রহ্মে প্রচার করেছিলেন, এবং এটা অনুমান করা খুব স্বাভাবিক যে তাঁরাই এই প্রাচীর-চিত্রগুলির শিল্পী। বাংলা দেশের সঙ্গে যে পাগান-রাজবংশের সামাজিক সম্পর্ক ছিল, এবং ধর্মকর্মের নানা সূত্রে দুই দেশে নিবিড় সম্বন্ধ বিরাজ করত তাও আমি একাধিক বার একাধিক পুস্তকে ও নানা ইংরেজী প্রবন্ধে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি।

এই সব পূর্ব-ভারতীয় শিল্পীদলই যদি পাগানের অবেয়্দান প্রভৃতি মন্দিরের প্রাচীর-চিত্রগুলির অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকেন, তা'হলে একথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে, এঁরা যখন দেশে ছিলেন, তখন এঁরা শুধু হাতের লেখা পুঁথিতে ছোট ছোট খণ্ড ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হন নি, বড় বড় বিস্তৃত মন্দিরপ্রাচীর-গাত্রেও হয়ত তুলি চালনা করেছিলেন।

কুবাউচ্চি ও নাগায়োন মন্দিরের প্রাচীর-চিত্রগুলির যে দু'টি নিদর্শন এই প্রবন্ধের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে তাদের সঙ্গে অজণ্টার চিত্রশৈলীর নিকট সম্পর্কও বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়; বৈষম্য যতটুকু লক্ষ্য করা যায়, তা শুধু শতাব্দীর চিত্রাভ্যাসের রূপান্তর মাত্র। অবশ্য, এ-কথা ঠিক, পাগানের এই প্রাচীর-চিত্র শিল্প-সৌন্দর্যে এবং ভাবৈশ্বর্যে অজণ্টার নিকটবর্তী হবারও দাবি করতে পারে না, তবু, বিচার ক'রে দেখলে মনে হয় এদের শিল্পরীতি এবং অজণ্টার শিল্পরীতি, বর্ণবিন্যাসে এবং ভাবরূপে একই গোত্রীয়—দেশান্তরিত হ'লেও গোত্রান্তরিত হয় নি, শুধু দেশভেদে এবং কালভেদে কতকটা রূপান্তরিত হয়েছে মাত্র। কুবাউচ্চি মন্দিরের চিত্রটি ত দর্শনমাত্র অজণ্টার সুপরিচিত "মাতা ও পুত্র" চিত্রখণ্ডের কথা মনে করিয়ে দেয়।

নন্দমাঞ্জা ও পায়াথনজু মন্দিরের চিত্রগুলি আবার একেবারে অন্য শিল্পরীতির; এদের আঙ্গিক, রেখা- ও বর্ণ-বিন্যাসের সঙ্গে অজণ্টার কিংবা পরবর্তী যুগের বাংলার পুঁথিচিত্রের বিশেষ সম্বন্ধ নেই। এই চিত্রগুলির রেখার গতি, নরনারীর ও দেবদেবীর মুখাবয়বের গড়ন, নাক ও চোখের বঙ্কিম রেখাভঙ্গী, বসনালঙ্কার, স্থিতি ও গতিভঙ্গী, ইত্যাদির সঙ্গে প্রাচীন গুজরাতী জৈন পুঁথিচিত্রের এবং পরবর্তী যুগের নেপালী চিত্রের সাদৃশ্য সহজেই ধরা পড়ে, বর্ণবিন্যাস এবং রচনাবিন্যাসের অদ্ভুত সাদৃশ্যও লক্ষ্য না করে পারা যায় না। পায়াথনজু মন্দিরে বোধিসত্ত্ব ও দুই শক্তির মিথুনলীলার যে প্রাচীন চিত্র আছে তা' ত একেবারে গুজরাতী জৈন চিত্রের অনুরূপ, এবং একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, সুন্দরবনে প্রাপ্ত তাম্রলেখের উলটো পিঠে উৎকীর্ণ গরুড়বাহন বিষ্ণুমূর্তির সঙ্গেও শিল্পরীতির দিক থেকে তার নিকট সম্পর্ক আছে। নন্দমাঞ্জা মন্দিরের মিথুনমূর্তিও সম্বন্ধে একথা অল্পবিস্তর প্রযোজ্য।

নন্দমাঞ্জা মন্দিরের প্রাচীর-চিত্রগুলি ত্রয়োদশ শতকের চিত্র-নিদর্শন। এই মন্দিরের বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের চিত্রটি দেখলেই বোঝা যাবে, এই সময়েও ব্রহ্মদেশে ভারতীয় চিত্রকলা তার আপন বিশুদ্ধ ভাববৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। এই চিত্রটির রেখার বিশুদ্ধ গতি, বর্ণবিন্যাসের সংযম ও চাতুর্য, মুখাবয়বের ভাবগাম্ভীর্য, এই সময়ের ভারতীয় চিত্র-শিল্পে বিরল বললে খুব অত্যুক্তি করা হয় না। ভারতীয় চিত্রকলার দুই বিভিন্ন ধারা এই চিত্রটিতে অপূর্ব কৌশলে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। এই মন্দিরেরই গর্ভবেদীর ছাদে যে চিত্রালঙ্কার আছে তাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। এমন সুন্দর লীলায়িত ও সুপরিচ্ছন্ন চিত্রালঙ্কার ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে খুব বেশী দেখা যায় না।

পাগানের এই প্রাচীর-চিত্রগুলিকে অজণ্টার মত ফ্রেস্কো-চিত্র বলে মনে করলে ভুল করা হবে। যদিও ঠিক কি পদ্ধতিতে এই চিত্রগুলি আঁকা হয়েছিল তা বলা কঠিন, তবু, মনে হয়, চূণবালির আস্তরণটা শুকিয়ে যাবার পর শিল্পী তার রেখাগুলি টেনে নিতেন, এবং তার পর যথাযথ রঙ্ দিয়ে রেখার ভিতরের স্থানগুলি পূর্ণ করতেন। যে-সব রঙ্ এই প্রাচীর-চিত্রগুলিতে ব্যবহার করা হয়েছে, তার মধ্যে কালো, সাদা, হলদে এবং লালই প্রধান; মাঝে মাঝে নীল এবং সবুজ রঙ্ও ব্যবহার করা হয়েছে। রঙ্ ও রেখা স্থায়ী করবার জন্য নিম গাছের এক প্রকার আঠা ব্যবহৃত হ'ত; কালো রঙের ক্ষেত্রে কেউ কেউ এক প্রকার মাছের অন্ত্ররসও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতেন, এবং তার সঙ্গে প্রদীপের কালো ঝুল মিশিয়ে নিতেন। রঙের সঙ্গে জল ত মেশাতেই হ'ত, এবং কোন-না-কোন প্রকারের আঠাও মেশাতে হ'ত; কাজেই এই চিত্রগুলিকে ফ্রেস্কো-চিত্র না বলে টেম্পেরা-চিত্র বা *al secco* পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্র বলাই ঠিক্। রেখাগুলি সাধারণতঃ কালো অথবা লাল রঙে টানা হ'ত; এবং একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শিল্পী তুলির এক টানেই রেখাগুলি ফুটিয়ে তুলতেন, সে-রেখা ঋজুই হোক আর বঙ্কিমই হোক।

[এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত চিত্রগুলি ব্রহ্মদেশের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত হইল]।

বহির্জগৎ

শ্রীগোপাল হালদার

১

মানুষের মন স্পেনে, চীনে, রুশিয়ায় বহু দিকের নানা অভূতপূর্ব্ব ঘটনায় নাড়া খাইতে খাইতে প্রায় অসাড় হইয়া আসিয়াছে। তথাপি অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা-বিলোপ তাহাকেও খানিক ক্ষণের মত চমকাইয়া দেয়। হিট্‌লারের ক্রিয়াকলাপে সত্যই নূতনত্ব আছে।

বলা যাইতে পারে, ইতিহাসের একটি পরিচ্ছেদ এবার তাহার নির্দ্দিষ্ট পরিণতিতে আসিয়া পৌছিয়াছে। কারণ, অষ্ট্রিয়াবাসীরা জাতিতে ও ভাষায় জর্ম্মান। অবশ্য, ভিয়েনা পুরাতন এক ধ্বংসোন্মুখ সাম্রাজ্যের হৃৎকেন্দ্র হিসাবে সঙ্গীতাদি সুকুমার শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের তীর্থক্ষেত্রস্বরূপ ছিল, তাহার আঁকাশে বাতাসে পুরাতন আভিজাত্যের কোমল আমেজ লাগিয়া আছে। তাই ইহার সুর যেন জার্ম্মেনীর অতিগম্ভীর ও অতিগভীর সুর হইতে একটু স্বতন্ত্র—আরও একটু বেশী পরিশীলন-কুশল, শালীনতায় সুন্দর। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের পর ক্ষুদ্রায়তন অষ্ট্রিয়া রাজ্যের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক যে দুর্দ্দশা হয় তাহাতে ভিয়েনার মত নগরীকে পোষণ করাই তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। তাই স্বাধীন অষ্ট্রিয়ার এই অপমৃত্যু অষ্ট্রিয়াবাসীদের নিকট নূতন জীবনের সূচনা বলিয়াও বোধ হইতে পারে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, নাৎসী-আগমনে অষ্ট্রিয়ায় উদ্বেল আনন্দের ঢেউ বহিয়া গিয়াছে। সে-আনন্দ ভয়ে না নির্ভয়ে ফুটিয়াছে, তাহা বলা শক্ত। তবু, এই 'হাইল হিটলারে'র জয়ধ্বনির তলে চাপা পড়ে নাই মন্দভাগ্য পূর্ব্বতন স্বাতন্ত্র্যবাদীদের মৃত্যুকাতরতা, সমাজতান্ত্রিক ও য়িহুদীদের আর্ত্তস্বর। বহু শত লোকের তথাকথিত আত্মহত্যা, অশীতিপর বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডক্টর ফ্রয়েড, নয়ম্যান প্রমুখ মনীষীদের গ্রেপ্তার নাৎসী-জয়ের চিহ্নমাত্র।

২

অষ্ট্রিয়ার পরে মধ্য-ইউরোপের উপরে হিটলারের পদার্পণ প্রায় সুনিশ্চিত। লিট্‌ল আঁতাত ও বল্‌কান আঁতাতের শক্তিরা ক্রমশই ফ্রান্সকে ছাড়িয়া একনেতৃত্ব-পন্থী ফাসিস্তদের দিকে ঝুঁকিয়াছে—কারণ তাহারাই আজ ইউরোপের রাষ্ট্র-ভাগ্যবিধাতা। ফ্রান্সের দিকে চাহিয়া আছে একমাত্র চেকোস্লোভাকিয়া। এই রাজ্যটি এই মুহূর্ত্তে জর্ম্মান-বিভীষিকায় কাতর। দেশটি কৃষিসমৃদ্ধ। তাহা ছাড়া অষ্ট্রিয়ার পূর্ব্ব সাম্রাজ্যের শতকরা ৮৫ ভাগ কয়লা ও লিগ্‌নাইট, ৳ অংশ লৌহ ও ইস্পাত, ৬০ ভাগ এঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, ৭৫ ভাগ বয়নশিল্প, ও ৯৩ ভাগ চিনির কারখানা এখন এই চেকোস্লোভাকিয়ার অধিকৃত—ইহাতেই বুঝা যাইবে হিটলারের চোখে ইহার মূল্য কি। যুদ্ধশেষের ভাগ-বাঁটোয়ারায় ম্যাসারিক, বেনেশ এই দুই মহামনীষী নিজেদের অংশটিকে ফাঁপাইয়া তুলিতে গিয়া জর্ম্মানীর একটি অংশ গ্রাস করিয়া বসেন; পঁয়ত্রিশ লক্ষ জর্ম্মান এই সুদেতেন জর্ম্মান-অঞ্চলে এত দিন বহু দুঃখও ভোগ করিয়াছে। হিটলারের অভ্যুদয়ের পরে তাহারা প্রথম আশায় বলীয়ান হয়; আজ মনে হয় তাহারা উগ্র ঔদ্ধত্যে দৃপ্ত। এত দিন প্রধান মন্ত্রী হোজ্জা জর্ম্মান সংখ্যাল্পদের সহকারিতায় তাহাদের অভাব-অভিযোগ মিটাইতেছিলেন, এখন সেই অ্যাকৃটিভিষ্ট দল আর সহযোগিতা করিবে না। উগ্রপন্থী হেন্‌লাইনের সুদেতেন-ডয়েট্‌শ দল এত দিন চাহিত এক যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে জাতিগত সমাধিকার—অবশ্য, 'যুক্ত-রাষ্ট্রের' যে পরিকল্পনা তাহাদের ছিল তাহাতেও সেই রাষ্ট্রে জর্ম্মানদেরই ক্ষমতা সমধিক হইত। এখন তাহাদের দাবি স্বাতন্ত্র্য। এই ধুয়া সবে উঠিয়াছে। ইহার পরে কি হইবে অষ্ট্রিয়াই তাহার নির্দ্দেশ দিতেছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে কি একবার শক্তিপরীক্ষা হইবে না? চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা-রক্ষার ভার ব্রিটেন নূতন করিয়া অঙ্গীকার করিয়া লইতে রাজী হয় নাই। কিন্তু ফ্রান্স ও রুশিয়া তাহাদের পূর্ব্বের প্রতিশ্রুতি পালন করিবে, ভরসা দিয়াছে—চেকোস্লোভাকিয়া বা ইহারা কেহ এক জন আক্রান্ত হইলে অন্যে নিশ্চেষ্ট থাকিবে না। অতএব, যত দিন ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতি আরও ঘোলাইয়া না-উঠে,—

রুশিয়া সাইবেরিয়ার জাপানকে লইয়া বিব্রত হইয়া না-পড়ে বা ফ্রান্স ফাসিস্ত শক্তিগুলির চাপে ও মুদ্রাসমস্যায় বিভ্রান্ত না হয়,—তত দিন হিটলার অপেক্ষা করিবেন। অবশ্য যদি হিট্‌লার জাপান ও ইতালীকে একসঙ্গে লইতে পারেন—তাহাতেও কিছু দেরি আছে—তবে প্রাগের দিকে পা বাড়াইতেও তাঁহার দ্বিধা থাকিবে না, উক্রেইন্, জর্জ্জিয়ায় উপস্থিত হইতেও তাঁহার দেরি হইবে না।

৩

হিট্‌লারের অষ্ট্রিয়া-অধিকারের ফলে ইউরোপীয় পররাষ্ট্রনীতিতে সাড়া পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু তেমন পরিবর্ত্তন কিছু হয় নাই। হিট্‌লারের যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রান্স মঃ ব্লুমকে প্রধান মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়া ব্রিটেন ও ইতালীকে আহ্বান করেন—পূর্ব্ব চুক্তিমত অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা তাহারা কি অক্ষুণ্ণ রাখিবে না? ইতালীর জবাব অচিরেই পাওয়া গেল, ব্রিটেনের উত্তর দেরিতে আসিল কিন্তু তাহাও অস্বীকৃতিমাত্র। আর একটি আহ্বান আসিল সোভিয়েট পররাষ্ট্র-সচিব লিট্‌ভিনফের নিকট হইতে—শান্তিকামী শক্তিদের সম্মিলিত আলোচনার জন্য। উহাতেও কেহ সাড়া দিল না। দিবার কারণও নাই। সোভিয়েট আপনার ঘরেই নেতৃ-মেধ উৎসবে এখন মাতিয়া আছে। পৃথিবীর অন্য শক্তিরা এই কথাটি ঠিক বুঝিয়াছে যে, তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা খুব সুবিধার নয়। বুঝা যাইতেছে, যাঁহারা বিপ্লবের আগুন লইয়া খেলিতেই অভ্যস্ত ষ্টালিনের মত গৃহাগ্নির উপাসনা তাঁহাদের চরিত্রবিরোধী। অতএব, ষ্টালিন যখন রুশিয়ার ঘর গুছাইবেন, উঁহারা বলিবেন—বিপ্লবের প্রতি এ বিশ্বাসঘাতকতা। তখন আজন্মের স্বপ্ন সেই বিপ্লবাদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা সবই করিতে পারেন—সাম্যবাদীর নীতিতে তাহা বাধে না। কিন্তু তাই বলিয়া ১৯২৩-২৪ (?) হইতেই ট্রট্‌স্কি রায়কভাস্ক ব্রিটেনের গুপ্তচর, বুখারিন লেনিনকে হত্যা করিতে সচেষ্ট, ট্রট্‌স্কি সেই যুগ হইতেই সোভিয়েটের শত্রু লেনিন-ষ্টালিনের হত্যার চক্রান্তে লিপ্ত; য়িগোদা ও লেভিন ঔষধ প্রয়োগে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত গোর্কিকে মারিয়াছেন—এই সব কথা পরিপাক করা একটু দুঃসাধ্য। অতএব, এই আভ্যন্তরীণ অবস্থায় সোভিয়েট রুশিয়ার বহুবিশ্রুত সমরশক্তি কতটা কার্য্যকরী হইবে তাহা পরীক্ষা না হইলে বুঝা যাইবে না। জারের রুশিয়ার অপেক্ষা ষ্টালিনের রুশিয়া সত্যকার চরিত্রবলে ও সংগঠনে কতটা উন্নত হইয়াছে তাহা তখনই বলা সম্ভব হইবে।

নানা কারণেই ব্রিটেন সোভিয়েট আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নাই। ব্রিটেনের বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল সাধারণভাবে ফাসিস্ত শক্তিদের সঙ্গে একটা মিত্রতা স্থাপন করিতে চায়—ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী, জর্ম্মেনী, এই চতুঃশক্তির একটা বুঝাপড়া হইলেই ব্রিটেন ইউরোপ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে। সুদূর প্রাচ্যের বিভীষিকা তাহার চক্ষুর সম্মুখে রহিয়াছে; তাহা ছাড়া, ভূমধ্যসাগরের বিপন্ন সাম্রাজ্য-পথও তাহার বিশেষ দুর্ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্যই মুসোলিনীর সহিত সে আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করে। কিন্তু ভাগ্য যেন কেবলই তাহার বিপক্ষে যাইতেছে, তাহা না হইলে এই মুহূর্ত্তে স্পেনে ফ্রাঙ্কোর জয়-সম্ভাবনা এমন স্পষ্ট হইয়া উঠিবে কেন?

ফ্রাঙ্কো জয়লাভ করিলে মুসোলিনী তাঁহার বন্ধুত্বের দামটা আরও একটু চড়াইয়া দিবেন, হয়ত ব্রিটেনের পথে ভূমধ্যসাগরে ইতালীর সমকর্ত্তৃত্ব বা কার্য্যত পুরা কর্ত্তৃত্বই মানিয়া লইতে হইবে। কারণ, ফ্রাঙ্কোর বেনামীতে মুসোলিনীই প্রকৃতপক্ষে স্পেনের উপকূল শাসন করিবেন—প্রকাশ্যে ব্রিটেনই বা তাহাতে কি আপত্তি করিতে পারে?

৪

চারি দিক্‌কার এই সমাসন্ন দুর্য্যোগে পৃথিবীর ছোট-বড় সকল জাতিই একটি বিষয়ে সাধ্যাতীত আয়োজন করিতে উদ্যত—কি করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যবল বাড়াইয়া আত্মরক্ষা করা যায়। উন্মাদের পৃথিবীতে এই বলবৃদ্ধি আর একটি উন্মত্ততার লক্ষণের মতই ঠেকে। সব দেশই কলকারখানার মজুরদের শ্রমের পরিমাণ বাড়াইয়াও যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতের চেষ্টা করিতেছে। ফ্রান্স সমরায়োজনে দুর্ব্বল নয়। তাহার পশ্চিম-সীমান্তের গুপ্ত দুর্গমালা অজেয়। তথাপি হিট্‌লার অষ্ট্রিয়া দখল করিবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দল মিলিয়া এক বিপুল অস্ত্রশস্ত্রের পরিকল্পনা স্থির করিয়া ফেলিল—২০ হাজার মিলিয়ন ফ্রাঁ ঋণ করিয়া এই খরচ জোগাড় করিতে হইবে। অথচ ফ্রান্সের পুঁজিপতিরা এমনি নাকি বিমুখ যে আজ তাহার আর্থিক অবস্থা প্রায় অচল। জার্ম্মেনী, ইতালী, জাপান ও সোভিয়েট রুশিয়া—ইহাদের রণায়োজনের ত কথাই নাই। মুসোলিনী সেদিন 'রণরাজ্ঞী কামানে'র গুণগান করিয়া জানাইলেন জলে স্থলে আকাশে ইতালীর সমরায়োজন কত

চমৎকার, ইতালীর 'তৃতীয় যুদ্ধের জন্ত' তাঁহার দায়িত্ব তিনি স্বীকার করিয়া লইলেন। এখনও লিবিয়ায়, ইরিত্রিয়ায়, আবিসিনিয়ায় লক্ষ লক্ষ ইতালীয় সৈন্ত রহিয়াছে; ১৯৪১ সনে ৪ খানা নূতন ব্যাটল-শিপ লইয়া ইতালীর মোট ৮ খানা ব্যাটল-শিপ হইবে; ২০ হাজার হইতে ৩০ হাজার পাইলট্ ইতালীর সহস্র সহস্র রণবিমান চালনায় শিক্ষিত হইয়াছে। জার্ম্মেনীর সমরায়োজনের হিসাব আরও চমকপ্রদ—কারণ, সমস্ত জার্ম্মেনীর শিল্প-বাণিজ্য, কল-কারখানা ঐ এক উদ্দেশ্যেই পরিচালিত। তাহা ছাড়া সমরায়োজনে জার্ম্মেনীর অতীত ঐতিহ্যও আছে। রুশিয়া ও জাপানে প্রকৃতপক্ষে যোদ্ধাদেরই রাজত্ব—সমরায়োজনই তাহাদের প্রধান কাজ। যুদ্ধ-নিযুক্ত জাপান তাহার সমস্ত কলকারখানাকে ও আর্থিক জীবনকে যুদ্ধোপযোগী রূপ দিবার জন্য একটি আইন পাস করিয়া লইয়াছে। নৌশক্তিতে ব্রিটেন ও আমেরিকার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার মত অবসর এই মুহূর্ত্তে তাহার নাই; হয়ত ৩৫ হাজার টনের বেশী বড় জাহাজও সে নির্ম্মাণ করিবে না, কিন্তু, তাহার নৌশক্তি প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছে, তাহা সকলেই বুঝে। সেই ভয়ে প্রমাদ গণিয়া চিরদিনের শান্তিপ্রিয় ওলন্দাজগণ পর্য্যন্ত জাভায় আপনাদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তৎপর হইতেছেন। এদিকে প্রশান্ত-মহাসাগরের অন্য পারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র শুধু নৌ-বলেই এই বৎসর খরচ করিতেছেন ১০০ শত কোটি ডলার (প্রায় ২৬৭ কোটি টাকার মত)। ব্রিটেনের সমরায়োজনও ইহার সমতুল্য—৮ কোটি ৫৩ লক্ষ পাউণ্ড এবার এই উদ্দেশ্যে খরচ ধার্য্য হইয়াছে। ইহাতে রেগুলার আর্ম্মির ব্যয় ২ কোটি ১১ লক্ষ পাউণ্ড ধরা হয় নাই—তাহা ধরিলে মোট খরচ দাঁড়াইবে ১০ কোটি ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড। অর্থাৎ গত বৎসর অপেক্ষাও এ-বৎসর ২ কোটি ২২ লক্ষ পাউণ্ড বেশী খরচ হইতেছে। বিমানে, যুদ্ধজাহাজে, মোটর বাহিনীতে ও ট্যাঙ্ক (mechanisation) ও নৌ-বলে যে বিপুল আয়োজন চলিতেছে—ইহা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। আমরা জানি, ভারতবর্ষের সৈন্য-বিভাগে পর্য্যন্ত ইহার ধাক্কা আসিয়া লাগিয়াছে,—সিংহলে বিমান-ঘাঁটি নির্ম্মিত হইবে, সিঙ্গাপুরের পথে নূতন নূতন উন্নতি সাধিত হইবে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে,—উঠিয়াছেও,—ব্রিটেনের এই সমরায়োজন,—অন্তত উহার যে অংশ ভারতবর্ষকে আশ্রয় করিয়া—স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী তাহা কি দৃষ্টিতে দেখিবে? ব্রিটেনের ভাবী শত্রু কে, হয়ত প্রশ্নটির উত্তর তাহার উপর নির্ভর করে,—কেহ কেহ এই রূপ বলিবেন। যাঁহারা ভারতীয় স্বাধীনতার সহায়ক হইবেন এমন কোন শক্তির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, এই সমরায়োজন নিশ্চয়ই কার্য্যতঃ ভারতবাসীরই বিপক্ষে—ইহা সকলেই মানিবে। তাহা ছাড়া যাহারই বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হউক, আমাদের জাতীয় বাহিনী যখন নাই, ভারতীয় সৈনিক যখন সর্ব্বাংশেই শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিমকের দাস, এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে যখন জাতীয় বাহিনীতে পরিণত করিতেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দিবে না, তখন সর্ব্বতোভাবে এই সমরায়োজনের বিরোধিতা করাই ভারতবর্ষের কর্ত্তব্য। মনে রাখা উচিত এবার চীনে ভারতীয় বাহিনী প্রেরণকালে কংগ্রেস নেতৃগণ যেরূপ জানিয়া না-জানিয়া ভুল করিয়াছেন তাহা প্রশংসার কথা নয়। কার্য্যত অবশ্য আমাদের বিরোধিতা এখন নিষ্ফল। কিন্তু আমাদের বিরোধিতা যদি খাঁটি হয় তাহা হইলে যুদ্ধে সত্যসত্যই নামিতে হইলে ব্রিটেনকে অনেক ভাবনা ভাবিতে হইবে, আমাদেরও তখন নিজেদের মত কতটা খাঁটি তাহার পরীক্ষা দিতে হইবে, তাহা জানা থাকা উচিত।

৫

এক জন বিশেষজ্ঞ হিসাব করিয়া বলিতেছেন, পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ অর্থই আজ সমরায়োজনে ব্যয়িত হইতেছে। কথাটা ভাবিবার মত; কারণ এই অর্থে যে-রণসম্ভার প্রস্তুত হইতেছে তাহা মানুষের ভোগে আসিবে না। অর্থনৈতিক মতে, এই উৎপাদন ফলপ্রসূ নয়—নন্-প্রডাকটিভ; ইহাতে ক্ষয় আছে, পুনরুদ্ভব নাই। আপাতত কলকারখানায় মজুরদের কাজ ইহাতে জুটিয়াছে বটে, ব্যবসায়ের মন্দাও ঘুচিয়াছে; কিন্তু যে উপাদানে ও পরিশ্রমে সমাজ-জীবনের আর্থিক চক্র যথানিয়মে আবর্ত্তিত হয়, তাহার সদ্ব্যবহার এই উপায়ে হয় নাই, অতএব, আবার অর্থনৈতিক সঙ্কট অনিবার্য্য। মাস সাত-আট ধরিয়া পাশ্চাত্য ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে একটা ছোট-খাট মন্দার সূচনা হইয়াছে। মার্কিণ মুলুকেই জিনিষটা বেশী দেখা দেয়—তাহার কারণও অনেক। রুজভেল্টের 'নূতন হাল' কৃষক ও মজুররা যেমন উৎসাহে প্রচলিত করিতে চায়, মার্কিণ পুঁজিপতিরা তেমনি তাহার বিরোধিতা করিতে বদ্ধপরিকর। ইহাদের শক্তি অতুলনীয়। তবু পদে পদে বাধা দিয়াও মোটের উপর ইহারা আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু এই বাধা-বিপত্তিতে ও সরকারী ভুলচুকে মার্কিণ সমাজ আর্থিক শ্রীসম্পদ সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া পায় নাই। যাহা পাইয়াছে তাহাতেই কিন্তু আবার ইতিমধ্যে অতি-উৎপাদনের দোষ দেখা দিল—মাল জমিতে লাগিল। অতএব, আবার দেখা দিয়াছে বাজার মন্দা, আবার উৎপাদন সঙ্কোচন চলিয়াছে। ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের হিসাব অনুসারে

দেখা যায় গত শীতের শিল্প উৎপন্ন দ্রব্যের সূচীসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৭৫ এ, তৎপূর্ব্ব বৎসরে এ সময়ে এ সংখ্যা ছিল ১১৫। ১৯৩১-এ গড়ে এ সংখ্যা ছিল ৮১, ১৯৩২এ—৬৩; ১৯৩৩-এ—৭৫, ১৯৩৪-এ—৭৮, ১৯৩৬-এ—১০৫, ১৯৩৭-এ উঠিয়াছিল ১০৯। অতএব, শিল্পজাতের হিসাবে আমেরিকা প্রায় গত সঙ্কট কালের অবস্থায় আসিয়াছে (দ্রঃ 'ইকনমিষ্ট'; ১২ই মার্চ্চ, ১৯৩৮, পৃ. ৫৫৬)।

ব্যবসায়ের এই নিম্ন গতি (recession) সব দেশেই কমবেশী স্পষ্ট। এখন প্রশ্ন এই, ইহা কি আর এক আর্থিক সঙ্কটের আরম্ভ? বিলাতের রাষ্ট্রবিদ্‌গণ বলিতেছেন—না, তেমন কিছু নয়। সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিজ্ঞ কিন্‌স্ কিছু দিন পূর্ব্বে একটি বক্তৃতায় বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যে ইহার মূলে আছে বিনিময়ের ভুলচুক। ১৯৩৭ সনের প্রথম দিকে গিল্‌ট-এজেড্‌ সিক্যুরিটির দাম কমে, তাহার কারণ বিলাতী এক্সচেঞ্জ ইকোয়ালিজেশন ফণ্ড তখন ট্রেজারি বিল দিয়া স্বর্ণ ক্রয় করে নাই, দেশের ক্রেডিট্‌কেই সঙ্কুচিত করিয়া দিয়াছে। এখন তাহারা ধরিয়াছে তাহার উল্টা পথ। তাহাতে ক্রেডিট্ প্রসার ঘটিয়াছে।

ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। বারে বারে ইন্‌ফ্লেশান্ বা মুদ্রা-পরিমাণ প্রসারিত করিয়াও কোন সুবিধা হইতেছে না—ব্যবসায়ে খাটাইবার টাকা তথাপি সুলভ হয় নাই। ইহার কারণ কি? বিলাতী 'ইকনমিষ্ট' পত্রে (৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮) দেখিতে পাই—মজুরদের মজুরি বাড়ানতে, পরিশ্রমকাল সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টায় কমানতে, ও বৃদ্ধ বয়সের বীমা মঞ্জুর করায়, ফরাসী পুঁজিদারেরা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। পুঁজি বরং ভয়ে দেশান্তরে ঠাঁই লইতে চায়—তাই, বলা হয় এটা 'পুঁজিদারের ধর্ম্মঘট'; এদিকে মজুরি যে পরিমাণে বাড়িয়াছে জিনিষ-পত্রের দামও সেই হারেই বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৫ সনের আগষ্ট মাসে খাদ্যদ্রব্যের সূচীমূল্য (index-price) ছিল ডিসেম্বর মাসে ২১৫, ১৯৩৬ সনের ডিসেম্বরে ২৫০; ১৯৩৮ সনের জানুয়ারীতে প্রায় ৩১৫। অতএব, মজুর মোটেই সুবিধা পায় নাই, তাহা স্পষ্ট। কিন্তু সরকারী ঘাটতি যে পরিমাণে বাড়িতেছে দেশে শিল্প-বাণিজ্যে সেই পরিমাণে নাকি উদ্বৃত্তও (savings) জমিতেছে না—তাই ফ্রান্সে কয় বৎসর যাবৎ শিল্প-উৎপাদনে খাটাইবার মত টাকাই নাকি পাওয়া যায় না। 'ইকনমিষ্টে'র লেখক ইহার কয়েকটি প্রতিকারের উপায় বলিয়াছেন—মুদ্রা-বিনিময়ে বাধা সৃষ্টি করা, পুঁজির দেশান্তরীকরণ বন্ধ করার জন্য ফ্রাঁ'র মূল্য-হ্রাস, বাজেট ঠিক করা। কিন্তু তাঁহার মতে, ফ্রান্সে ও আমেরিকায় সমস্যা একই—কি করিয়া পুঁজিদারের ত্রাস সঞ্চার না করিয়া দেশে মজুর-সাধারণের হিতকর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা যায়।

ফাসিস্ত দেশগুলি একনায়কত্বের জোরে আর্থিক গোলমালের যেমন হোক একটা ব্যবস্থা করিতে পারে। হিট্‌লার ত জোর করিয়াই বলেন—জার্ম্মেনী পাঁচ বৎসরের নাৎসী-শাসনে শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। কথাটা মিথ্যা নয়—কিন্তু এই শ্রীবৃদ্ধি তুলনায় কি দাঁড়ায়, তাহা দেখা যাইতে পারে। ১৯৩২-এর তুলনায় জার্ম্মেনীতে ১৯৩৭ সনে মজুর খাটিতেছে শতকরা ৪৮ জন বেশী, সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমিয়াছে শতকরা ৫৫ টাকা বেশী, শিল্প-উৎপাদন হইয়াছে দ্বিগুণের বেশী। কিন্তু ১৯২৯ সনের তুলনায় এই বৃদ্ধি কতটুকু?—ব্রিটেন ও জার্ম্মেনীর তুলনা করা যাক্—জার্ম্মেনীতে শতকরা মাত্র ৬০ জন মজুর বেশী কাজ পাইয়াছে, ব্রিটেনে পাইয়াছে ১২ জন; জার্ম্মেনীতে উৎপাদনের সূচী শতকরা ২৪, ব্রিটেনে ২৬; জর্ম্মান লৌহ-শিল্প বাড়িয়াছে শতকরা ৬½ হারে, ব্রিটেনে ৩৪½ হারে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যদি মনে রাখা যায় যে, জার্ম্মেনীর প্রায় সমস্ত ব্যবসায়ের বৃদ্ধিই যুদ্ধদ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য, আর জর্ম্মান মজুরের খাটুনি আজ, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, ক্রীতদাসের তুল্য, তাহা হইলেই ভাল হয়।

ইতালীর আর্থিক অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। ধারের পর ধার করিয়া মুসোলিনী ইতালীকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছেন। আবিসিনিয়া-যুদ্ধকালে কোটি কোটি লিরা দেখিতে দেখিতে উড়িয়া গিয়াছে—যুদ্ধশেষে এখন আসিয়াছে সেই দেশে টাকা ঢালিয়া ইতালীয়-সাম্রাজ্য পত্তন করার, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাইয়া ইতালীয় নূতন শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান গড়ার সময়। ইহাতে টাকা খরচ হইতেছে,—আরও

বহু দিন খরচ করিতে হইবে, তবে মুনাফার অঙ্ক দেখা দিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে অন্যান্য জাতির সঙ্গে তাল ঠুকিয়া ইতালীকেও যুদ্ধোপকরণ তৈয়ারী করিতে হইতেছে। এত টাকা আসিবে কোথা হইতে?—ইহাই ইতালী ও ব্রিটেনের বর্ত্তমান আলাপ-আলোচনার কারণ, উহার অন্যতম বিষয়। একটা বড় রকমের ধার বিলাতের বাজারে না-পাইলে ফাসিস্ত-সাম্রাজ্যের বিপুল ঠাট বজায় রাখাই দায়। এই ধার ইতালী পাইবে—কারণ মুসোলিনীর বন্ধুত্ব ইংরেজের কাম্য, ইংরেজ পুঁজিদারও ফাসিস্ত রাজ্যে টাকা খাটাইবার পক্ষপাতী।

যে-অবস্থা ইতালীর, অদূর ভবিষ্যতে সে অবস্থাই কি জাপানের হইবে না? তাহারও আজ চীন-যুদ্ধে কোটি কোটি ইয়েন খরচ হইতেছে, সমস্ত ব্যবসায় ও কারখানা যুদ্ধোপকরণ-নির্ম্মাণে নিযুক্ত; তাই আমদানিও কমিয়াছে, রপ্তানিও কমিয়াছে ভয়ানক রূপে। আমাদের বাজার হইতেই জাপান তুলা লইত কোটি কোটি টাকার, আর এই বাজারে বিক্রয় করিত তেমনি বহু কোটি টাকার বস্ত্র। এখন দুই কাজই করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাই এক দিকে তুলার চাষীর ঘরে মাল জমিতেছে, অন্য দিকে বোম্বাইয়ের কলওয়ালা সস্তা দরে তুলা কিনিয়া জাপানী বস্ত্রের অভাবে দেশে বিদেশে ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানি করিয়া মুনাফা করিতেছে বেশী। তাহার লাভ দুই দিকেই—সেই তুলনায় ক্রেতা-সাধারণ বা মজুরেরা কি লাভ পাইতেছে?—এদিকে জাপান করিতেছে কি? 'কন্‌টেম্পরারি জাপান'-পত্রে তাহার এক জন অর্থনায়ক বলিতেছেন—জাপান প্রত্যেক যুদ্ধের অবসরেই নিজের সৌভাগ্য গড়িয়াছে—রুশ-জাপান যুদ্ধের মধ্যে তাহার শিল্প-বিপ্লব পত্তন হয়, মহাযুদ্ধের মধ্যে তাহার শিল্প-বাণিজ্য প্রসারিত হয়, তাহার পরে র‍্যাশনালিজেশনের ফলে সে আজ জগতে অগ্রগণ্য, ১৯২৯-৩১এর মন্দায় তাহার কিছুই হয় নাই,—তাহার সৌভাগ্য বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই বর্ত্তমান যুদ্ধের সময়েও জাপান তেমনি আর এক পদ অগ্রসর হইবে।—কি উপায়ে? তাঁহার মতে জাপান পশম, বস্ত্র প্রভৃতির জন্য বিদেশের দ্বারস্থ না হইয়া উহার 'বদলী জিনিষ' বাহির করিবে, ফলে জাপান স্বনির্ভর হইবে। পৃথিবীব্যাপী সব জাতিই এই চেষ্টা করিতেছে—ইতালী আবিসিনিয়ার যুদ্ধের কালে এরূপ অনেক আবিষ্কার কাজে খাটাইয়াছিল, জার্ম্মেনী ভাবী যুদ্ধের ভয়ে এখনি এইরূপ বদলী উপকরণের খোঁজে তৎপর; জাপানও কত দূর কি বাহির করে তাহা দ্রষ্টব্য। তবে জাপানের সুবিধা এই যে, তাহার পরিশ্রমী স্বল্পসন্তুষ্ট শ্রমিক আছে, ব্যক্তির ও সমষ্টির জীবনে একটা অদ্ভুত শৃঙ্খলাবোধ আছে, ব্যবসা-বাণিজ্যে আছে বিস্ময়কর নিপুণতা ও কর্ম্মিষ্ঠতা।

জাপানের জীবনে এখনও যে পাশ্চাত্য শিল্পজীবনের কঠিন ও অবশ্যম্ভাবী শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষ আত্মপ্রকাশ করে নাই তাহার কারণ জাপানের এইজাতীয় বৈশিষ্ট্য, এই অতি-পাশ্চাত্য শিল্প-জীবনের পিছনেও অতি-প্রাচীন সামন্ত-সমাজের নিয়মানুবর্ত্তিতা, ক্ষাত্র সমাজের আত্মত্যাগ। যত দিন ইহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তত দিন আর্থিক দুর্বিপাকেও জাপান ভাঙিয়া পড়িবে না। ঠিক এই রূপ ত্যাগ ও ভাবাবেগের জোরেই সমস্ত আর্থিক ঝঞ্ঝা অতিক্রম করিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার গণসাধারণ আত্মরক্ষা করিয়াছে, আজও ইতালী ও জার্ম্মেনীর জন-সমাজ আধপেটা খাইয়া 'মেশিন-গানের গান' শুনিতে উৎসাহী, 'মাখনের বদলে রাইফেল' পাইতে ইচ্ছুক। যাঁহারা অর্থনীতিকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন,—মনে করেন, অর্থনৈতিক সংঘাতে রাষ্ট্রমাত্রই ভাঙিয়া পড়িতে বাধ্য,—তাঁহারা ভুলিয়া যান রাষ্ট্রে জনসাধারণ যদি সত্যমিথ্যা কোন একটা আদর্শের উন্মাদনায় একবার মাতিয়া উঠে, তাহা হইলে তাহারা অনেক দুঃখ বরণ করিয়া লয়, বরং দুঃখে উল্লসিত হইয়া উঠে, সহজে আর্থিক দুর্য্যোগের নিকটে মাথা নোয়ায় না। কিন্তু খুব দীর্ঘদিন এইরূপ ভাবে মাতিয়া থাকা ও ক্রমান্বয়ে অভাবে নিষ্পেষিত হওয়া কোনও জাতিই সহ্য করে না—অর্থনীতিজ্ঞদের কথা এই হিসাবে সত্য।

বর্ত্তমান কালে বহু দেশ ও জাতি ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাষ্ট্রীয় উন্মত্ততায় আর্থিক ঘূর্ণাবর্ত্তে পাক খাইতেছে—কত দিন তাহাদের এই ভাবে চলিবে, না সত্যই এই ঘূর্ণাবর্ত্তে পৃথিবীর বর্ত্তমান সভ্যতাই উড়িয়া যাইবে, তাহাই মনস্বীদের ভাবাইয়া তুলিতেছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাল্যবিবাহ-নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন

য়েক বৎসর হইল আজমীরের প্রসিদ্ধ হিন্দুহিতৈষী, হিন্দু শ্রেষ্ঠত্ব" ("Hindu Superiority") ও রাণা ম্ভের জীবনচরিত প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা, দেওয়ান াহাদুর হরবিলাস সারদা* মহাশয়ের উদ্যোগিতায় াল্যবিবাহ-নিয়ন্ত্রণ আইন পাস হয়। সমাজসংস্কারক-াগের চেষ্টায় হিন্দুসমাজের শিক্ষিত কতকগুলি লোক ার আগে হইতেই বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। ালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার যাঁহারা পক্ষপাতী, তাঁহারাও াগে হইতেই বালিকাদের বিবাহ অল্প বয়সে দিতেন না। শিক্ষিত যুবকেরা অনেকেই নিরক্ষর ও নিতান্ত অল্প-বয়স্ক বালিকাদিগকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হওয়াতেও বালিকাদের বিবাহের বয়স বাড়িয়া গিয়াছিল। বরপণ-প্রথা প্রচলিত থাকায় এবং অধিকাংশ লোকেরই আর্থিক অবস্থা ভাল না-হওয়ায় অনেক প্রাপ্তযৌবনা কন্যার বিবাহ হইতেছিল না। বাল্যবিবাহ-নিয়ন্ত্রণ আইন পাস হওয়ায়, এই সকল কারণে যাঁহারা অল্প বয়সে কন্যাদের বিবাহ দিতে পারিতেছিলেন না, কন্যাদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া রাখিবার তাঁহাদের আর একটা কারণ জুটিল ও সুবিধা হইল; অধিকন্তু আইনের ভয়েও আরও কতকগুলি লোক কন্যাদের চৌদ্দ বৎসর বয়স পূর্ণ না-হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের বিবাহ স্থগিত রাখিলেন।

কিন্তু দরিদ্র ও অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে—বিশেষতঃ পল্লীগ্রামসমূহে, বাল্যবিবাহ প্রায় আগেকার মতই চলিতে লাগিল। সঙ্গতিপন্ন ও শিক্ষিত অনেক লোকও আইনটাকে ফাঁকি দিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ফরাসী বা পোর্ত্তুগীজ অধিকৃত ভারতে বা কোন নিকটবর্ত্তী দেশী রাজ্যে গিয়া অল্পবয়স্ক সন্তানদের বিবাহ দিতে লাগিলেন।

* তাঁহার নাম বঙ্গে অনেকে 'সর্দা' লেখেন। ইহা ভুল—যেমন ালবীয়কে মালব্য লেখা, গোখলেকে গোখেল লেখা ভুল।

বাল্যবিবাহ-বিরোধী পুরুষ ও মহিলারা সারদা আইন দ্বারা বাল্যবিবাহ বন্ধ হইতেছে না দেখিয়া, উহা কঠোরতর করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহাদেরই মধ্যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য, উড়িষ্যার শ্রীযুক্ত ভবানন্দ দাস, আইনটি সংশোধন করাইবার চেষ্টা করিলেন। গবর্মেণ্টের ও কংগ্রেসী দলের সহযোগিতায় তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে।

—

বাল্যবিবাহ-নিবারণ-সম্ভূত সমস্যা

আমরা বাল্যবিবাহের বিরোধী; কিন্তু বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাইতেছে ও কালক্রমে উঠিয়া যাইবে, শুধু ইহা ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না।

যে-সব দেশে ও সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই, তাহাদের সামাজিক প্রথা ও শিক্ষার ব্যবস্থা এরূপ আছে যাহাতে অনূঢ়া প্রাপ্তবয়স্কা কন্যাদের অনিষ্ট সহজে না-হইতে পারে। আমাদের দেশে সেরূপ সামাজিক ব্যবস্থা ও শিক্ষার ব্যবস্থা সামান্যই আছে। উভয় ব্যবস্থাই গড়িয়া তুলিতে হইবে।

শহরের শিক্ষিত সমাজের লোকদিগকে ও অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন লোকদিগকে বাল্যবিবাহ-নিবারণ-সম্ভূত কোন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় নাই বা হইবে না, এমন নয়; তাঁহাদেরও সমস্যা আছে। কিন্তু পল্লীগ্রামের লোকদের এবং দরিদ্র ও অশিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের সমস্যাই গুরুতর। তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। এই সব সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে বা হইবে বলিয়া, বাল্যবিবাহ বজায় রাখা উচিত বা তাহাই সুবিধাজনক, এরূপ কোন তর্ক করিবার নিমিত্ত আমরা কোন সমস্যার উল্লেখ করিতেছি না। বাল্যবিবাহ নিশ্চয়ই উঠিয়া যাওয়া উচিত, সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বাল্যবিবাহ থাকিলে বা থাকায় দেশের সামাজিক ব্যবস্থা ও শিক্ষার ব্যবস্থা (বা অব্যবস্থা) যাহা ছিল বা আছে, বাল্যবিবাহ উঠিয়া গেলে

তাহার পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক, নতুবা বালিকাদের ও সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইবে ;—ইহাই আমাদের বক্তব্য।

কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের চেষ্টার ফলে যখন বাল্য-বিবাহ ব্রাহ্মসমাজ হইতে উঠিয়া যায়, তাহার পরোক্ষ প্রভাব হিন্দুসমাজে কিয়ৎপরিমাণে অনুভূত হইয়া থাকিলেও, বাল্যবিবাহ কোন সমাজ হইতে উঠিয়া গেলে তাহার সামাজিক ও অন্যান্য ব্যবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে তাহা হিন্দুসমাজের নেতাদের চিন্তার বিষয় হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাওয়ায় কেবল ব্রাহ্ম নেতারা নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সারদা আইন ও উহার সংশোধন সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জন্য, উহা সকলকেই মানিতে হইবে। মৌলানা শৌকৎ আলী বলিয়াছেন বটে যে, মুসলমান সম্প্রদায়কে উহার অধীনতা হইতে বাদ দিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় একটি বিল উপস্থাপিত করা হইবে। তাহা যদি হয় এবং যদি ঐ বিল আইনে পরিণত হয়, তখন মুসলমানরা নিজেদের কর্ত্তব্য চিন্তা করিবেন, এবং অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও নূতন করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য চিন্তা করিবেন। এখন সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায়েব লোককেই উক্ত আইন দুটি হইতে উদ্ভূত সমস্যার বিষয় ভাবিতে হইবে।

অনূঢ়া প্রাপ্তবয়স্কা কন্যাদিগকে পিতৃগৃহে অশিক্ষিত রাখা চলিবে না। আগে অল্পবয়সে তাহাদিগের বিবাহ দিয়া শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইত। তাহাতে তাহাদের মনটা জীবনের একটা প্রধান বিষয়ে বাল্যকালেই একমুখো হইত। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকায় এখন তাহাদের মনের বাল্যেই এই একমুখত্ব জন্মিবে না। সেই জন্য তাহাদের মনকে এমন করিয়া গঠিত করিতে হইবে, যাহাতে উহার স্বৈরতা না জন্মে। তাহার নিমিত্ত সৎশিক্ষা আবশ্যক। শুধু লিখিতে পড়িতে পারা ও কিছু ইতিহাস-ভূগোল-গণিত জানা এই শিক্ষা নহে—যদিও এইগুলি অত্যাবশ্যক। চারিত্রিক শিক্ষা, সংযম শিক্ষা, দৈহিক শুচিতা ও একনিষ্ঠতা না থাকিলে নারীর কিরূপ দুষ্প্রতিকার্য্য অকল্যাণ ঘটে তদ্বিষয়ক শিক্ষা আবশ্যক। এই শেষোক্ত শিক্ষা পিতামহী মাতামহী মাতা প্রভৃতি আত্মীয়ারা দিতে পারিলেই খুব ভাল হয়। তজ্জন্য তাঁহাদেরও এ-বিষয়ে শিক্ষিতা হওয়া আবশ্যক।

অতএব, দেশের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামসমূহে, বালিকাদের সুশিক্ষার সুব্যবস্থা হওয়া একান্ত আবশ্যক।

নারীদের অবরোধ-প্রথা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে ছিল না ; বঙ্গে, বিশেষতঃ শহরে ও অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন লোকদের মধ্যে, ছিল। এখন তাহাও ক্রমশঃ ভাঙিয়া যাইতেছে। মুসলমানদের মধ্যেও অল্প পরিমাণে উহা ভাঙিতেছে। কোন সমাজেই উহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যাইবে না ; নারীদের ও সমগ্র সমাজের কল্যাণার্থ উহা উঠিয়া যাওয়া আবশ্যক ছিল। প্রধানতঃ মুসলমানদের অধ্যুষিত এবং মুসলমানশাসিত স্বাধীন দেশ-সকলেও অবরোধ-প্রথা উঠিয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। তুরস্কে উহা এখন নাই, ইরানে দ্রুত লোপ পাইতেছে।

বঙ্গে যখন অবরোধ-প্রথার প্রভাব খুব ছিল, তখনও পল্লীগ্রামে উহা তত ছিল না, যত শহরে। এখন শহর ও পল্লীগ্রাম উভয়ত্রই নারীদের গতিবিধি পূর্ব্বাপেক্ষা অবাধ হইতেছে, পরে আরও হইবে। অবরোধ-প্রথা নাই, বাল্যবিবাহ নাই, এরূপ সমাজের শিষ্টাচার ও অন্যান্য নিয়মাবলী অবরোধ-প্রথাবিশিষ্ট ও আচরণে বাল্যবিবাহের সমর্থক সমাজের নরনারীর শিষ্টাচার ও অন্যান্য নিয়মাবলী হইতে কিছু পৃথক হওয়া অনিবার্য্য। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ইউরোপের সকল দেশে তাহাদের অবস্থা অনুসারে নরনারীর, বিবাহিত ও অবিবাহিতদের, মেলামেশা সম্বন্ধে যে-সব নিয়ম ও আদবকায়দা ছিল, যুদ্ধের সময়ে ও তাহার পরে তাহাতে শিথিলতা আসিয়া থাকিলেও, এখনও সেগুলি লোপ পায় নাই। আমাদের দেশে এ-বিষয়ে কিরূপ রীতিনীতি রক্ষিত ও প্রবর্ত্তিত হওয়া চাই, তাহা সকল সমাজের নেতাদের চিন্তনীয়। তাঁহারা সকলে মিলিয়া একটা সামাজিক আইন বানাইবেন, এরূপ প্রস্তাব করিতেছি না। সমাজধর্ম্ম প্রধানতঃ "আপনি আচরি" অপরকে শিখাইতে হইবে।

শুধু নারীদিগেরই, কন্যাদিগেরই, সুশিক্ষার প্রয়োজন,

তাহা নহে; পুরুষদের, বালক ও যুবকদের সুশিক্ষা আরও আবশ্যক। কারণ, কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইলে আততায়িতা পুরুষেরাই করে।

যে-সমাজে অবরোধ-প্রথা আছে ও বাল্যবিবাহ আছে, সে-সমাজ অপেক্ষা, যে-সমাজে অবরোধ-প্রথা নাই ও বাল্যবিবাহ নাই, তাহাতে সংযম ও শুচিতার প্রতি খরতর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক—বিশেষতঃ পরিবর্ত্তনের যুগে।

এই বিষয়ে আগে হইতে যথোচিত সাবধানতা অবলম্বিত না হইলে পারিবারিক ও সামাজিক কদাচার ও দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়িবে।

বাল্যবিবাহহীন ও অবরোধপ্রথাশূন্য সমাজ পুরুষদের পৌরুষের কঠোর পরীক্ষক। কোন নারীর অনিষ্টচিন্তা ও অনিষ্ট না করিলে পরীক্ষার প্রথম অংশে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ইহার জন্য শুচিতা ও সংযম আবশ্যক। অন্য কোন পুরুষ কোন নারীর অনিষ্ট করিতে উদ্যত হইলে, আততায়ীর ও নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সেই দুর্ব্বৃত্তকে বাধা দানে প্রবৃত্ত হওয়া পরীক্ষার দ্বিতীয় অংশ। জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে নারী মাত্রেরই মর্য্যাদা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করিলে এবং সাহস থাকিলে পরীক্ষার এই অংশে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

বাল্যবিবাহ ও অবরোধ-প্রথা যে-সমাজে নাই, তাহা নারীত্বেরও যে কঠোর পরীক্ষক, তাহাও বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমরা পুরুষজাতীয় বলিয়া নিজেদের পরীক্ষার কথাই আগে লিখিলাম। নারীদের নিকট আমাদের নিবেদন, তাঁহারা নিজ নিজ এবং সমাজস্থ অন্য নারীদের নারীত্বের মর্য্যাদা প্রাণপণে রক্ষা করুন। ইহা দেশকে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা হইতে মুক্ত করা অপেক্ষা বড় কাজ। ইহা সমাজরক্ষার একটি প্রাথমিক কাজ। স্বাধীন পরাধীন সকল দেশেই ইহা একান্ত আবশ্যক। নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষিত না হইলে কোন সমাজের শ্রেয় নাই, কোন সমাজ টিকিতে পারে না।

বঙ্গের পুরুষদের পরীক্ষা অনেক দিন হইতে হইয়া আসিতেছে। এখন তাহা কঠোরতর হইতে চলিল। আমরা বার বার অনুত্তীর্ণ হইয়াছি। কিন্তু যত দিন ব্যক্তিগত ভাবে ও সমষ্টিগত ভাবে দেশের লোকেরা বাঁচিয়া আছেন, তত দিন তাঁহাদের নিষ্কৃতি নাই, বার বার তাঁহাদিগকে পরীক্ষা দিতে হইবে।

প্রাতঃকৃত্য ও স্নানআদি দৈনিক অন্যান্য শারীরিক কৃত্য সমাপনের ও বস্ত্রপরিবর্ত্তনের ব্যবস্থার যথোচিত পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ইহার জন্য পুরুষজাতীয় লোকদের ও নারীজাতীয়াদের পৃথক পৃথক ঘাট ও স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিলে ভাল হয়। যে-সকল গৃহস্থ নিজ নিজ গৃহেই ইহার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, তাঁহাদের নিজ নিজ পরিবার সম্বন্ধে ভাবিতে হইবে না বটে, কিন্তু অন্য যাঁহারা তাহা করিতে পারিবেন না, তাঁহাদের জন্য ব্যবস্থা বিষয়ে উদ্যোগিতা ও সহকারিতা সমাজ তাঁহাদের নিকট হইতেও দাবী করে।

সব কথা বলা হইল না, যাহা বলিলাম তাহাও বেশ খুলিয়া বলিলাম না। আর একটি কথা বলিয়া শেষ করি।

কন্যাদিগকে কৈশোরের পরও অবিবাহিত রাখিয়া শিক্ষা দিতে গেলে, বিশেষতঃ উচ্চ শিক্ষা দিতে গেলে, তাহারা কেহ কেহ কোন-না-কোন যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। এই জন্য তাহাদের বিবাহ দিবার সময় পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকেরা যথাসম্ভব তাহাদের সম্মতিক্রমে বিবাহ দিবেন। "যথাসম্ভব" লেখায় অনেক তরুণ-তরুণী আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু অনেক সময় বিবাহার্থীরা কেবল হৃদয়ের ভাব ও রূপজ মোহের বশবর্ত্তী হন বলিয়া অভিভাবকদের বক্তব্যও বিবেচ্য।

নারী-ধর্ষক কয়েদীর অকাল-মুক্তি

মধ্যপ্রদেশে খান্ সাহেব জাফর হুসেন নামক এক জন স্কুল ইন্‌স্পেক্টর একটি হিন্দু বালিকাকে বলাৎকার করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। নিম্ন আদালতের বিচারে তাহার কারাদণ্ড হয়। সে সেস্তন্স জজের কাছে আপীল করে। তাহাতে তাহার দণ্ড বহাল থাকে। সে তাহার পরে হাইকোর্টে আপীল করে। হাইকোর্টও দণ্ড বহাল রাখেন এবং অধিকন্তু বলেন যে, তাহার শাস্তি লঘু

হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের আইন ও বিচার বিভাগের মন্ত্রী মিঃ য়ুসুফ শরীফ এই ব্যক্তিকে তাহার কারাদণ্ডের মিয়াদ শেষ হইবার বহু পূর্ব্বে, অন্য মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া, খালাস দেন, এবং সে নিকটবর্ত্তী একটি দেশী রাজ্যে গিয়া শিক্ষা-বিভাগে কাজ পায়। ইহাতে মধ্যপ্রদেশে এরূপ খালাস দেওয়ার বিরুদ্ধে খুব আন্দোলন হইয়াছে—বিশেষতঃ মহিলাদের মধ্যে। মিঃ শরীফ ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন ও ইস্তফা দিয়াছেন। অন্য মন্ত্রীরা ও মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সদস্যেরা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং মিঃ শরীফের ইস্তফা গ্রহণ করেন নাই।

বিবেচনার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমীটির নিকট এই ব্যাপারটি উপস্থাপিত হয়। তাঁহারা বলিয়াছেন, উক্ত কয়েদীকে খালাস দেওয়াটাতে শুধু বিবেচনার ভুল (error of judgment) হইয়াছে, না ন্যায়বিচার হইতে স্খলিত্য (miscarriage of justice) হইয়াছে, তাহা স্থির করিবার পক্ষে তাঁহাদের নিকট যথেষ্ট সামগ্রী বা উপকরণ (materials) নাই। অতএব তাঁহারা ব্যাপারটা এক জন বড় আইনজ্ঞের নিকট পেশ করিবেন এবং তাঁহার রিপোর্ট পাইলে নিজেদের "নিগ্রহ বা অনুগ্রহ নিরপেক্ষ" (without fear or favour) সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবেন। তত দিন পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে এবং ব্যাপারটাকে সাম্প্রদায়িক রং না-দিতে। তথাস্তু। কিন্তু তাঁহারা error of judgment এবং miscarriage of justiceএর মধ্যে যে সূক্ষ্ম প্রভেদটি বুঝিতে চাহিয়াছেন, সেই চুলচেরা চাওয়াটাই আমাদের বোধগম্য হইতেছে না। অধিকন্তু, তিন তিনটা আদালতের বিচারে যে মামলায় শাস্তি হইয়াছে, তাহার উপর এক জন মাত্র অপ্রকাশিতনামা আইনজীবীর রিপোর্ট কেন চাওয়া হইল, বুঝিতে পারিলাম না।

বোম্বাইয়ের দুখানি প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিকে দেখিয়াছি, মিঃ শরীফ নিম্নলিখিত কারণসমূহের জন্য জাফর হুসেনকে অকালে মুক্তি দিয়াছেন। যথা—জেলে তাহার মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা যাইতেছিল, জঘন্য অপরাধে স্বামীর দণ্ড হওয়ায় তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়, এবং তজ্জন্য ও তাহার চাকরী যাওয়ায় তাহার সন্তানগুলিকে দেখিবার শুনিবার কেহ ছিল না ও তাহাদের ভরণপোষণেরও কোন উপায় ছিল না।

জাফর হুসেনের মস্তিষ্কবিকৃতি সত্য না ভান তাহা নির্ণয়ের জন্য তাহাকে যোগ্য ডাক্তারের পর্য্যবেক্ষণে রাখা উচিত ছিল এবং সত্য হইলে তাহাকে পাগলা-গারদে পাঠান উচিত ছিল। সে খালাস পাইবামাত্র নিকটস্থ একটা দেশী রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগে চাকরীর যোগাড় করিতে পারিল (ধন্য এই দেশী রাজ্যের নৈতিক আদর্শ), ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, যে, উন্মাদ লক্ষণটা ভান। তাহার সাধ্বী স্ত্রীর নিদারুণ মর্ম্মব্যথায় মৃত্যু তাহার অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধিই করিয়াছে—সে কেবল নারীধর্ষক নহে, পত্নীহন্তাও তাহাকে বলা যায়। তাহার চাকরী গিয়াছিল বটে, কিন্তু হাজার হাজার লোকের ত চাকরীই নাই, ত চাকরী যাইবে কি? মন্ত্রী মিঃ শরীফ নিজে বা বন্ধুদের সাহায্যে তাহার সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের নিমিত্ত উপযুক্ত লোক নিয়োগ ও মাসিক অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। জাফর হুসেনকে অকালে মুক্তি দিবার পক্ষে একটা কারণও যথেষ্ট নহে। মিঃ শরীফ সম্ভবতঃ বুঝিয়াছিলেন, কাজটা ঠিক হইতেছে না, এই জন্য অন্য মন্ত্রীদিগকে না-জানাইয়া তাহা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ভগিনী বা কন্যা ধর্ষিতা হইলে তিনি কি করিতেন, তাঁহার ভাবা উচিত ছিল। তিনি তাহা ভাবেন নাই।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার খান্ সাহেব। সেখানে একটি গবর্মেণ্ট স্কুলের আবদুল্লা শাহ নামক এক জন শিক্ষকের এই অপরাধে কারাদণ্ড হয়, যে, সে একটি অপহৃতা হিন্দু বালিকাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এই ব্যক্তি খালাস্ পাইবার পর তাহাকে পূর্ব্বের চাকরীতে আবার নিযুক্ত করা হইয়াছে। এরূপ কাজের কৈফিয়ৎ প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার খান্ সাহেব এই দিয়াছেন যে, লোকটা কেবল পরোক্ষ ভাবে ঐ অপরাধে জড়িত ছিল; এবং ব্যাপারটা লইয়া বড় সাম্প্রদায়িক মন-কষাকষি হওয়ায় তাহার অবসান-সাধন-কল্পে লোকটাকে আবার চাকরী দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু লোকটা পরোক্ষ ভাবে

বা অন্ত কি ভাবে অপরাধে জড়িত ছিল, তাহাও বিবেচনা করিয়া ত আদালত তাহাকে শাস্তি দিয়াছিল। সুতরাং লোকটা যে দুর্নীতিমূলক কিছু করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাকে শিক্ষকের কাজে আবার বহাল করা অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হইয়াছে। তাহাকে পুনর্নিযুক্ত করায় সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত মুসলমানেরা খুশি হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু ও শিখেরা সন্তুষ্ট হয় নাই। সুতরাং সাম্প্রদায়িক মন-কষাকষি কমে নাই।

এই ব্যাপারটাও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমীটির বিচারাধীন আছে। তাঁহারা ডাক্তার খান সাহেবের নিকট হইতে রিপোর্ট চাহিয়াছেন।

এই দুটা ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের নৈতিক আদর্শের যে-আভাস পাওয়া যাইতেছে, তাহা সভ্যজগতে গৃহীত আদর্শ হইতে হীন। ভারতবর্ষের মহিলারাও যদি প্রতিকারচেষ্টা না-করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত।

—

"বস্তুতান্ত্রিক" সাহিত্য সম্বন্ধে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মত

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় দীর্ঘ কাল সরকারী শিক্ষা-বিভাগে অধ্যাপক ও বিদ্যালয়-পরিদর্শকের কাজ করিয়া এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকতা করিতেছেন। তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও তাহার রসগ্রাহী। সুতরাং তাঁহাকে কেহ সাহিত্য সম্বন্ধে অরসিক বলিলে তাঁহার নিজেরই রসবোধের অভাব সূচিত হইবে। তিনি দেখিতে কাঁচা হইলেও নিঃসন্দেহ বেশ পরিপক্কবুদ্ধি। অতএব তিনি ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মেলনে আধুনিক বস্তুতান্ত্রিকাখ্য সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তরুণদেরও তাহা শুনিতে আপত্তি না-হইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন:—

> কেহ হয়ত মনে করেন যে আমাদের সাহিত্য আজকাল বস্তুতান্ত্রিক হইয়াছে। সত্যকে যথাযথ রূপে দেখিতে পারাই বর্ত্তমান সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। সামাজিক এবং নৈতিক আদর্শের কুহেলিকা ভেদ করিয়া সত্যের নগ্ন রূপ প্রকটিত করাই আজকালকার সাহিত্যের উদ্দেশ্য। সেই জন্য মানুষের যৌন দিকটা হয়ত বর্ত্তমান সাহিত্যে কিঞ্চিৎ উগ্রভাবে দেখা দিতেছে। কিন্তু ইহা যে সত্যেরই একটি অবিসংবাদিত রূপ, সে সম্বন্ধে কাহারও মনে সন্দেহ নাই; এবং এই সত্য নির্ভয়ে ও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা নবযুগের সাহিত্য-সাধনার একটি বিশিষ্ট রূপ। অনেকের মনে এমনও ধারণা হয়ত আছে যে, ইহাই প্রগতির একটি অভ্রান্ত লক্ষণ। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, অনেক পুরাণে কি ইহা অপেক্ষা আরও নগ্নভাবে যৌন ব্যাপার বর্ণিত হয় নাই? সংস্কৃত সাহিত্যকে আমরা এ বিষয়ে কি পশ্চাতে ফেলিতে সমর্থ হইয়াছি? বড়ু চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত কৃষ্ণকীর্ত্তন এই যৌন সাহিত্যের কি প্রকৃষ্ট উদাহরণ নহে? বিদ্যাসুন্দর কি এক্ষণে একান্তই দুষ্প্রাপ্য? প্রাচীনের নিকট প্রগতির এই নূতনত্ব হার মানিতে বাধ্য। সুতরাং অকুণ্ঠিত ভাবে যৌন সম্বন্ধের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া প্রকাশ্য সভাস্থলে কুরুকুললক্ষ্মী শুদ্ধান্তচারিণী দ্রৌপদীর ন্যায় দাঁড় করাইলেই যে সাহিত্য-সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ হইল তাহা বলা চলে না; দুঃশাসনের দল যাহাই বলুন।
>
> সাহিত্য-সৃষ্টি হৃদয়ের যে-সমগ্র প্রেরণা হইতে হয়, সে সমগ্রতার অভাব ঘটিয়াছে। যে-সকল সুন্দর আদর্শ মানবসমাজে চিরদিন পূজা পাইয়া আসিয়াছে, তাহাতে অনাদর ঘটিতেছে। যে মুক্ত হাওয়ার মত আবার আনন্দ হইতে সাহিত্য মানবের কল্যাণের জন্য যুগে যুগে দেশে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া মানবকে ধন্য করে, সে আনন্দ কোথায়? যে শ্রদ্ধার ঐকান্তিকতা হইতে মহৎ কিছু জন্মিতে পারে, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। কাজেই সাহিত্য বলিতে আমরা যে আনন্দের খনি, কল্যাণের প্রস্রবণ, প্রাণের পরিপূর্ণ সচ্ছলতা বুঝি তাহা আর হইতেছে না। সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য আবার নূতন করিয়া সাধনা করিতে হইবে, আবার পূজায় বসিতে হইবে বাগ্‌দেবীর প্রতিষ্ঠা আবার নূতন করিয়া করিতে হইবে।

—

বড় ও অন্য কতিপয় লাটের ছুটির কারণ

বড়লাট এবং কতিপয় প্রাদেশিক লাট ছুটি লইয়া ইংলণ্ড যাইবেন। বড়লাট আগামী জুলাই মাসে বিলাত পৌঁছিবেন। বঙ্গের লাট তাঁহার ছুটির সময় একটিনি করিবেন। অন্য কোন কোন প্রদেশেও এইরূপ একটিনির বন্দোবস্ত হইতেছে।

এতগুলি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর যুগপৎ অসুস্থ হওয়া, বা ভারতবর্ষের গ্রীষ্ম অসহ্য বোধ করা, বা পারিবারিক প্রয়োজনে স্বদেশযাত্রার প্রয়োজন অনুভব করা, অসম্ভব নহে। কিন্তু এরূপ যৌগপত্য সাধারণতঃ হয় না। এই জন্য মনে হয়, কোন রাষ্ট্রীয় জরুরি ডাকে ইঁহারা বাড়ী যাইতেছেন। ফেডারেশ্যন সম্বন্ধে কি করা উচিত;

ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট বোধ হয় ইহাদের সহিত সে বিষয়ে পরামর্শ করিবেন। কারণ, কংগ্রেস ভারতশাসন-অনুযায়ী ফেডারেশুনের বিরোধী, পুনঃ পুনঃ তাহা ঘোষিত হইতেছে, এবং কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলি একে একে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের ব্যবস্থানুযায়ী ফেডারেশুনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব ধার্য্য করিতেছেন।

মস্‌লেম লীগও ঐরূপ ফেডারেশুনের বিরোধিতা করিতেছেন। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট যেমন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় ব্রিটিশশাসিত ভারতের ভাগের সদস্য-পদগুলির এক-তৃতীয়াংশ মুসলমানদিগকে দিয়াছেন, যদি দেশী রাজ্যের ভাগের সদস্য-পদগুলিরও সেইরূপ এক-তৃতীয়াংশ তাহাদিগকে দিতে পারেন, তাহা হইলে মস্‌লেম লীগকে গবর্ন্মেণ্ট হাত করিতে পারেন। কিন্তু ভারতশাসন-আইন অনুসারে গবর্ন্মেণ্টের এরূপ কোন ক্ষমতা নাই। এখন উক্ত এক-তৃতীয়াংশ মুসলমানদিগকে দিবার দুটি মাত্র উপায় আছে। প্রথম, পার্লেমেণ্টে ভারতশাসন-আইন সংশোধন করিয়া উহা দেওয়া; দ্বিতীয়, গোপনে দেশী রাজ্যগুলির প্রভু মহারাজা রাজা নবাব প্রভৃতিকে ধমক দিয়া মুসলমানদিগকে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য-পদ দেওয়া। কিন্তু যে-উপায়ই অবলম্বন করা হউক, তাহাতে দেশী রাজ্যগুলির শাসকেরা তাহাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করায় অসন্তুষ্ট হইবেন, হিন্দুপ্রধান দেশী রাজ্যগুলিতে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হইবে, এবং সব দেশী রাজ্যের হিন্দু ও শিখ প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হইবে। বলা বাহুল্য, কংগ্রেস ত আরও অসন্তুষ্ট হইবেই। হিন্দু মহাসভা মন্দের ভাল হিসাবে ভারতশাসন-অনুযায়ী ফেডারেশুনেও রাজী আছে। হিন্দুমহাসভাও চটিয়া যাইবে। ভারতীয় জাতীয় উদারনৈতিক সংঘের সন্তোষ অসন্তোষকে গবর্ন্মেণ্ট যদিও অধুনা গ্রাহ্য করেন না, তথাপি তাহার অসন্তোষও বোঝার উপর শাক আঁটিটি হইবে। কিন্তু সরকারী দাঁড়িপাল্লায় এই সব পুঞ্জীভূত অসন্তোষের ওজনের চেয়ে মুসলমান সমাজের সন্তোষের ওজন বেশী হইতে পারে।

আর একটা কথা বিবেচ্য। অল্লাধিক বিলম্বে ব্রিটেনকে বড় একটা যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইতে পারে। তখন ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ভারতীয় সৈন্যদল ব্যবহার করিবেন, যে-সকল দেশী রাজ্যের সৈন্য আছে, তাহাদের সৈন্যও ব্যবহার করিবেন। তদ্ভিন্ন, দেশী রাজ্যের নরেশদের নিকট হইতে আর্থিক "ঋণ" "উপহার" আদি এবং যুদ্ধসম্ভারও লইতে হইবে। হায়দরাবাদের নিজামের সৈন্য অনেক আছে, টাকাও অন্য প্রত্যেক নরেশের চেয়ে বেশী আছে। কিন্তু সমষ্টি ধরিতে গেলে মোটের উপর হিন্দু ও শিখ নরেশগণ ব্রিটেনকে যত টাকা, যুদ্ধসম্ভার ও লোক দিতে পারিবেন, মুসলমান নরেশগণ তত পারিবেন না।

ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট হয়ত ইহাও বিবেচনা করিবেন।

—

"বিদ্যামন্দির"

মধ্যপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী তথায় শিক্ষাবিস্তারের নিমিত্ত এমন একটি স্কীম প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহা সুফলপ্রদ হইবে বলিয়া আশা হয়। এই স্কীম-অনুযায়ী বিদ্যালয়-গুলিকে তিনি বিদ্যামন্দির নাম দিয়াছেন। তাহাতে তত্রত্য মুসলমানেরা আপত্তি করায় তিনি আশ্বাস দিয়াছেন যে, উর্দ্দু বিদ্যালয়গুলিকে বিদ্যামন্দির বলা হইবে না। অবশ্য, সেগুলি অবিদ্যামন্দির হইবে, এরূপ কোন ইঙ্গিত করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। মুসলমানদের আপত্তির কারণ এই, যে, হিন্দুদের দেবালয়কে মন্দির বলে ও তাহাতে দেবমূর্ত্তি রক্ষিত ও পূজিত হয়। কলিকাতার "আজাদ" কাগজও এইরূপ আপত্তি করিয়াছেন। তাহাতে আজাদ-সম্পাদকের এক জন মুসলমান সমালোচক উক্ত সম্পাদকের একটি লেখায় "সেবামন্দির" শব্দের প্রয়োগ দেখাইয়াছেন।

আমাদের বোধ হয়, কোন মুসলমান এরূপ আপত্তি না করিলে ভাল হইত। মন্দিরের একটি অর্থ হিন্দুদের দেবালয় বটে, কিন্তু উহা ব্যাপক সাধারণ অর্থে ভবন বুঝাইতেও ব্যবহৃত হয়। উহার রূপক প্রয়োগও ঐ অর্থে হয়। যেমন অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ প্রথম ভাগে আছে, 'কোন্

দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া পাপ রূপ পিশাচ মনোমন্দিরে প্রবেশ করিবে, কে বলিতে পারে?" এখানে গ্রন্থকার দেবালয় অর্থে মন্দির শব্দের প্রয়োগ করেন নাই, গৃহ অর্থে করিয়াছেন। এবং তিনি সাকারবাদী হিন্দু ছিলেন না।

আপত্তিকারী মুসলমানদের ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়গুলিকে ব্রহ্মমন্দির বলা হয়। সেখানে কোন মূর্ত্তি রাখা হয় না। আর্য্যসমাজীদের উপাসনালয়গুলিকেও অনেক জায়গায় মন্দির বলা হয়। সেখানেও মূর্ত্তি রাখা হয় না।

মুসলমানেরা অনেকে হিন্দুদিগকে ইহা দেখাইতে অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যগ্র যে, তাঁহাদের (মুসলমানদের) ধর্ম্ম সম্পূর্ণ জড়ভক্তিবর্জ্জিত এবং খাঁটি একেশ্বরবাদ। বাস্তবিক কিন্তু উহা তাহা নহে।

কংগ্রেস ও অন্য রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল

নূতন ভারতশাসন-আইন অনুসারে যখন প্রদেশগুলির রাষ্ট্রীয় কাজ আরম্ভ হয়, তখন ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয়। তাহার পর আরও একটি প্রদেশ কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। সিন্ধুদেশে পুরাতন মন্ত্রিমণ্ডলের পরিবর্ত্তে নূতন যে মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে, তাহা কংগ্রেসী না-হইলেও সিন্ধুর এই মন্ত্রিরা তত দিন তথাকার ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সদস্যদের সমর্থন পাইবেন যত দিন তাঁহারা কংগ্রেসের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতির বিরুদ্ধ কিছু করিবেন না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমীটি আসাম ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সদস্যদিগকে অপর কোন কোন দলের সহযোগে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের অনুমতি এই সর্ত্তে দিয়াছেন যে, এই মন্ত্রিমণ্ডলকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়সমূহে কংগ্রেসের নীতি অনুসারে চলিতে হইবে। শুনা যায়, ওয়ার্কিং কমীটি বঙ্গেও ঐরূপ সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে সম্মতি দিয়াছেন—যদিও এই গুজবের চুলচেরা আক্ষরিক প্রতিবাদ মৌলানা আবুল কলাম আজাদ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্ত উদ্যোগী বৃহত্তম শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। ইহা এই অর্থে অসাম্প্রদায়িকও বটে যে, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকই ইহার সভ্য হইতে পারে। ভারতবর্ষের ধনিক, শ্রমিক, জমিদার, কৃষক, অভিজাত, সাধারণ—যে কোন শ্রেণীর লোক ইহার সভ্য হইতে পারে। এই অর্থে ইহা গণতান্ত্রিক। মোটের উপর কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের দ্বারা সমুদয় প্রদেশ শাসিত হইলে, অন্য কোন মন্ত্রিমণ্ডল দ্বারা শাসিত হওয়া অপেক্ষা তাহা দেশের পক্ষে হিতকর হইবে। এই জন্য, আসাম ও বঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডল কংগ্রেসী প্রভাব অনুসারে পুনর্গঠিত হইলে আমরা তাহা সন্তোষের বিষয় মনে করিব।

মিঃ জিন্নার একুশ দফা দাবী

মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরুর সহিত, কংগ্রেস ও মস্লেম লীগের মিলন সম্বন্ধে মিঃ জিন্নার চিঠি-লেখালেখি হইয়াছে। শুনা যায়, তাঁহার একুশ দফা দাবীতে কংগ্রেস রাজী হইলে তিনি ও মস্লেম লীগ কংগ্রেসের সহিত মিতালি করিবেন বলিয়াছেন। তাঁহার চিঠি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার দাবীগুলি দেখি নাই। আগে তাঁহার সর্ত্ত ছিল চৌদ্দটি, এখন হইয়াছে একুশ। দাঁড়ি যে পড়িয়াছে, ইহাই সন্তোষের বিষয়। একুশের পরিবর্ত্তে এক শত একের পর দাঁড়ি পড়িলেও সন্তোষের বিষয় হইত। কারণ, সর্ত্তগুলার সংখ্যার অবিরাম ক্রমবৃদ্ধি বিপজ্জনক।

কংগ্রেস মিঃ জিন্নার সর্ত্তসমূহ মানিয়া লইবেন কিনা, জানি না। সর্ত্তগুলির ন্যায্যতা-অন্যায্যতার বিচার না করিয়া (তাহা করিবার উপায়ও এখন নাই), সেগুলি মানিয়া লওয়া ও না-লওয়া উভয় পন্থার সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কংগ্রেস যদি একুশটি সর্ত্ত মানিয়া লয়েন, তাহার সুবিধা এই যে, মিঃ জিন্না আর নূতন সর্ত্ত জুড়িতে পারিবেন না—চৌদ্দর জায়গায় যেমন একুশ হইয়াছে সেই রূপ একুশের জায়গায় পরে সাড়ে একত্রিশ হইতে পারিবে না—অবশ্য যদি তিনি পরে থুড়ি দিয়া পুনশ্চ বলিয়া আরও সর্ত্ত যোগ না-করেন। তাঁহার বর্ত্তমান একুশটি সর্ত্ত মানিয়া না-লওয়ার অসুবিধা এই যে, এখন তাহা মানিয়া না-লইলে

কালক্রমে সেগুলি সাড়ে একত্রিশ, এমন কি সাড়ে বত্রিশও হইতে পারে।

মানিয়া লওয়ারও কিন্তু একটি বিপদ আছে। মিঃ জিন্না মুসলমান সমাজের একমাত্র নেতা নহেন। মুসলমানেরা ও তাঁহাদের অন্য নেতা বা নেতারা যদি বুঝিতে পারেন, যে, চাপ বা মোচড় দিলেই কংগ্রেসের নিকট হইতে কিছু সুবিধা আদায় হয়, তাহা হইলে মিঃ জিন্না অপেক্ষাও জবরদস্ত নেতার আবির্ভাব ও এই নূতন নেতার অনুগত দলের প্রভাবাধিক্য অসম্ভব হইবে না। তাঁহারা একুশের উপর আরও সর্ত্ত চাপাইবেন।

ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে বাদ দিয়া এত ক্ষণ আলোচনা চালাইতেছিলাম। কিন্তু তাঁহারা নিরপেক্ষ নির্বিকার দর্শক থাকিবেন না। কংগ্রেস মিঃ জিন্নার সর্ত্তগুলি গ্রহণ করিলে ঐ গবর্মেণ্ট মুসলমানদিগকে আরও কিছু দিবেন। তখন মুসলমানেরা ঐ গবর্মেণ্টকেই মানিবেন, মিঃ জিন্নাকে বা কংগ্রেসকে নহে।

—

গান্ধী-নেহরু-জিন্না-সংবাদ সম্বন্ধে ডাক্তার মুঞ্জে

কংগ্রেস-নেতারা হিন্দু মহাসভাকে কখনও আমল দেন নাই—অন্ততঃ মসলেম লীগকে যতটা আমল দিয়াছেন ততটা দেন নাই। তা না দিন। কিন্তু মসলেম লীগের সহিত মিতালি-সর্ত্ত আলোচনা উপলক্ষ্যে হিন্দু মহাসভাকে উপেক্ষা করাটা ভুল হইতেছে। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নহে। ইহা হিন্দু মুসলমান ও অন্য সব সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধিত্বের দাবী করেন। তাহা সত্ত্বেও যখন ইহা মসলেম লীগ রূপ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সহিত মিতালির সর্ত্ত আলোচনা করিতেছেন, তখন হিন্দু মহাসভা রূপ অন্য পক্ষের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানকে কেন মন্ত্রণা-পরামর্শ-আলোচনার মধ্যে লইতেছেন না? মিঃ জিন্না ত বলিয়াছেন—ঠিক্ই বলিয়াছেন—যে, কংগ্রেস যাহাই মানিয়া লউন, হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় তাহা মানিয়া না-লইলে তাহা সন্তোষজনক হইবে না। (মালবীয়জী যে হিন্দু মহাসভার একমাত্র প্রতিনিধি বা মুখপাত্র, ইহা ঠিক নহে।)

কংগ্রেস হয়ত মনে করেন, হিন্দু মহাসভার সভ্য যত হিন্দু, তাহা অপেক্ষা বেশী হিন্দু কংগ্রেসের সভ্য; অতএব কংগ্রেস যাহা করিবেন তাহা হিন্দুদের অনুমোদিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যত মুসলমান মসলেম লীগের সভ্য তাহার চেয়ে বেশী মুসলমান কংগ্রেসের সভ্য, পণ্ডিত জওআহরলাল ইহা বলিয়াছেন; অতএব, কংগ্রেস স্বয়ং কিছু মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত করিয়া বলুন না কেন, ইহাকেই মুসলমানদের অনুমোদিত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে?

এইরূপ তর্ক আমরা আগেও করিয়াছিলাম। সম্প্রতি গান্ধী-নেহরু-জিন্না-সংবাদ উপলক্ষ্যে ডাক্তার মুঞ্জে এই প্রকার তর্ক করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেস মিঃ জিন্নার সহিত যেরূপ চুক্তিই করুন না কেন, হিন্দু মহাসভার সম্মতি ব্যতিরেকে হিন্দুরা তাহাতে সায় দিবে না।

ডাক্তার মুঞ্জে বিশাল হিন্দুসমাজের উপর হিন্দু মহাসভার হয়ত যতটা প্রভাব আছে মনে করেন, আমরা তা করি না। কিন্তু বিস্তর হিন্দুর উপর নিশ্চয়ই ইহার প্রভাব আছে, এবং তাহা তাহাদের উপর কংগ্রেসের প্রভাব অপেক্ষা বেশী। ইহাও সত্য, যে, অনেক কংগ্রেসী হিন্দু কোন কোন বিষয়ে কংগ্রেসের চেয়ে হিন্দু মহাসভার মতকে ঠিক্ মনে করেন। কিন্তু হিন্দু মহাসভা সমগ্র হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি নহেন। অন্য দিকে তেমনই কংগ্রেসও সমগ্র হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি নহেন—যদিও সম্ভবতঃ ইহা রাজনৈতিক-মতি-বিশিষ্ট স্বাধীনতাকামী বৃহৎ এক শ্রেণীর হিন্দুর প্রতিনিধি।

—

সংখ্যালঘিষ্ঠদের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সাবরকরের মত

বহুবৎসরব্যাপী নির্ব্বাসন-দণ্ড ভুগিবার পর মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যারিষ্টর শ্রীযুক্ত সাবরকর এখন হিন্দু মহাসভার সভাপতি। তিনি সম্প্রতি লক্ষ্ণৌতে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, দেশকে স্বাধীন করিতে হইলে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক, ইহা মনে করিলে ও বলিলে সংখ্যালঘিষ্ঠেরা তাহাদের সহযোগিতার মূল্য দাবী করে এবং তাহা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। এরূপ কথা আমরাও

অনেক বার বলিয়াছি। আমরা মনে করি, সংখ্যালঘিষ্ঠেরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের সহিত সহযোগিতা করিলে স্বাধীনতালাভ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠেরা সহযোগিতা না-করিলে সংখ্যাগরিষ্ঠেরা নিজেদের চেষ্টাতেই দেশকে স্বাধীন করিতে পারিবে না, আমরা এরূপ মনে করি না। সহযোগিতা করিবার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠেরা সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের প্রত্যেককে সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রত্যেকের সমনাগরিক রূপে আহ্বান করুন। তাঁহারা যোগ দেন, ভাল; যোগ না-দেন, ক্ষতি তাঁহাদেরই বেশী। কিন্তু তাহাতে স্বাধীনতা-সংগ্রাম বন্ধ থাকিবে না, থাকা উচিত নয়।

শ্রীযুক্ত সাবরকর আরও, এই মর্ম্মের কথা, বলিয়াছেন, "হিন্দু মহাসভা যত দিন ভারতের পূর্ণস্বাধীনতাকামী থাকিবে তত দিন উহার সহিত যুক্ত থাকিব।" করাচীর শেষ কংগ্রেসের ঠিক্ আগে নিউ দিল্লীতে শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লার ভবনে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রভৃতি সভ্যের অনুমোদনক্রমে হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমীটি মহাসভার যে ম্যানিফেষ্টো বাহির করেন, তাহা ভারতবর্ষের পূর্ণস্বাধীনতাকে লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া লিখিত হয়। উহা হিন্দু মহাসভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে অনুমোদিত হয়। পরে কখনও প্রত্যাহৃত হয় নাই। কংগ্রেসের ও হিন্দু মহাসভার রাষ্ট্রনৈতিক লক্ষ্য এক।

শ্রীযুক্ত সাবরকর বলিয়াছেন, "সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের আপন আপন ভাষা, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সকল অধিকার সংরক্ষিত থাকিবে; তাঁহাদের সংখ্যা-অনুযায়ী প্রতিনিধিও তাঁহারা পাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্থলাভিষিক্ত হইবেন, এরূপ হইতে পারে না। হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া তাহাদের নিজেদের অধিকার ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে।" ঠিক্ কথা।

—

বসু বিজ্ঞানমন্দিরের পরিচালক

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার নামে পরিচিত বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং যত দিন জীবিত ছিলেন তাহার পরিচালক ছিলেন। এক্ষণে সম্প্রতি অধ্যাপক ডক্টর দেবেন্দ্র মোহন বসু এই বিজ্ঞানমন্দিরের পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। অধ্যাপক বসু কলিকাতা, কেম্ব্রিজ, লণ্ডন, ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন। কেম্ব্রিজের বিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরীতে অধ্যাপক জে জে টমসনের অধীনে বহু গবেষণা করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্তির পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি ১৯১৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। সেখানে তিনি বহু গবেষণা করেন, এবং গবেষণার দ্বারা তথাকার ডক্টরেট পদবী প্রাপ্ত হন। তাঁহার গবেষণার ফলে পদার্থবিজ্ঞানের দুইটি উপপত্তি অংশতঃ তাঁহার নামে বোস-ষ্টোনর উপপত্তি (Bose-Stoner theory) ও সিজউইক-বোস উপপত্তি (Sidgwick-Bose theory) বলিয়া পরিচিত। তাঁহার সমুদয় গবেষণা সংক্ষেপে সহজে বাংলায় বুঝান দুঃসাধ্য। একটি, "চুম্বকত্বের সহায়তায় পদার্থের গঠনমূলক গবেষণা ও তৎসম্পর্কিত বিভিন্ন অভিনব আবিষ্কার।" তিনি বহু বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপকের কাজ ও পদার্থবিজ্ঞান-বিভাগের অধ্যক্ষতা যোগ্যতার সহিত করিয়াছেন। ইটালীর সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ভোণ্টার শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে তিনি ভারতবর্ষের অন্যতম প্রতিনিধি হইয়া সেই দেশে গিয়াছিলেন। বিলাতেও একবার ফ্যারাডে সোসাইটীর আহ্বানে ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১৯২৭ সালের অধিবেশনে তিনি গণিত ও পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ শিক্ষাদাতা এবং গবেষণার নিপুণ পরিচালক। আমরা বিশ্বাস করি তাঁহার মত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধীর ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির নেতৃত্বে বসু বিজ্ঞানমন্দিরে গবেষণার ভিন্ন ভিন্ন ধারা সুপরিচালিত হইবে।

বসু বিজ্ঞানমন্দিরের কর্ম্মীরা বাংলায় তাঁহাকে গত মাসে যে-অভিনন্দন-পত্র দিয়া সম্মানিত করেন, তিনি তাহার যে উত্তর দেন, তাহা হইতে আমরা জানিতে

পারি, যে, তিনি বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান-লাভের ও গবেষণার প্রেরণা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট হইতে বহু বৎসর পূর্ব্বে পাইয়াছিলেন, এবং জীববিজ্ঞানের কিছু তথ্যানুসন্ধানও তখন করিয়াছিলেন। এখন সেই প্রেরণা তাঁহাকে বসু বিজ্ঞানমন্দিরেরই সেবার অভিমুখে আনিয়া তাহাতে নিযুক্ত করিল, ইহা আনন্দের বিষয়।

তিনি নীরবে বহু বৎসর বিশ্বভারতীর মধ্য দিয়া দেশের সেবা করিয়াছেন।

—

"বঙ্গীয় শব্দকোষ"

প্রবাসীতে এই বৃহৎ অভিধানখানির সপ্রশংস বিস্তারিত পরিচয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পূর্ব্বে দিয়াছেন, আমরাও মধ্যে মধ্যে ইহার ক্রমশঃ-প্রকাশের সংবাদ দিয়াছি।

ইহা সম্পূর্ণ হইলে বাংলা ভাষার বৃহত্তম অভিধান হইবে। এ-পর্য্যন্ত ইহার পঞ্চাশ খণ্ড বা সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। পৃষ্ঠার সংখ্যা এ-পর্য্যন্ত ১৫৮৮ হইয়াছে। যত দূর ছাপা হইয়াছে, তাহার শেষ শব্দ "ধর্ম্ম্য"।

কোন বিত্তশালী পুস্তক-প্রকাশক, বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন বিদ্বৎপ্রতিষ্ঠান, কিংবা কোন বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তি এই বৃহৎ অভিধানটির মুদ্রণ-ব্যয় সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে বহন করিতেছেন না। কোষকার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে নিজের অতি সামান্য পুঁজী ও অভিধানখানির বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে কষ্টে এই ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহার অধ্যবসায় ও কৃতিত্ব বিস্ময় উৎপাদন করে। বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় দুটির, বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের (কারণ তথায় বাংলাও পড়ান হয়), বাংলা দেশ ও আসামের কলেজগুলির, এবং বঙ্গের সমুদয় উচ্চ বিদ্যালয়ের লাইব্রেরির জন্য এবং বঙ্গের অন্য সকল অপেক্ষাকৃত বৃহৎ লাইব্রেরির জন্য এই অভিধান ক্রীত হওয়া উচিত। পণ্ডিত মহাশয়ের ঠিকানা শান্তিনিকেতন। অভিধানখানির এক এক সংখ্যার মূল্য আট আনা৹ও ডাকমাশুল এক আনা।

—

চীন-জাপান যুদ্ধ

চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের লোকেরা তাহাদের বহু লক্ষ সৈন্য হত ও আহত হওয়া সত্ত্বেও, অসাধারণ সাহস, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সহিত জাপানীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছে। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় জাপানীরা যেমন সহজে চৈনিকদিগকে পরাস্ত করিয়া চীনের অনেক অংশ দখল করিয়াছিল, এখন তাহা করিতে পারিতেছে না। অধিকন্তু এখন জাপানীরা আগেকার চেয়ে বহু বার পরাস্ত হইতেছে এবং তাহাদের হাজার হাজার সৈন্য নিহত হইতেছে।

ধন্য চীনের স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা!

জাপানীরা সম্পূর্ণ পরাস্ত হইলে তাহা শুধু চীনের পক্ষে নহে, পরন্তু এশিয়ার পক্ষে এবং আমেরিকা ও ইউরোপের পক্ষেও কল্যাণকর হইবে।

—

জার্মেনীর অষ্ট্রিয়া গ্রাস

পরস্পরসংলগ্ন যে-সকল ভূখণ্ডের অধিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি এক এবং যাহারা মানবজাতির একই কোন অংশ হইতে উদ্ভূত, তাহারা যদি স্বেচ্ছায় একরাষ্ট্রভুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে আপত্তির কারণ ত কিছু থাকিতেই পারে না, বরং তাহাতে অনেক সুবিধা আছে। জার্মেনী ও অষ্ট্রিয়া এই প্রকারের দুটি পরস্পর-সন্নিহিত দেশ। কিন্তু তাহাদের একীভবন অষ্ট্রিয়ার সম্মতিক্রমে হয় নাই। জার্মেনী তাহার প্রভূত সামরিক শক্তির ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক অষ্ট্রিয়াকে অভিভূত করিয়া তাহাকে স্বাধিকারভুক্ত করিয়াছে।

জার্মেনী যুদ্ধ করে নাই বটে, কিন্তু অষ্ট্রিয়ার অনেকে কারারুদ্ধ হইয়াছে, অনেকে "আত্মহত্যা" করিয়াছে বলিয়া রটিয়াছে (সবই প্রকৃত আত্মহত্যা কিনা বলা যায় না), এবং বিস্তর লোক তথা হইতে পলায়ন করিয়াছে। এই প্রকার দুঃখ ও বিপদ ইহুদীদের অধিক হইয়াছে। কারণ, জার্মেনদের স্বৈরীনেতা হিটলর জার্মেনীর মত অষ্ট্রিয়াতেও ইহুদী নির্যাতন ও বিতাড়ন পূর্ণ মাত্রায় চালাইতেছে।

যে-সকল ইহুদী স্বদেশ হইতে পলায়ন করিয়াছে, আগেকার দিন হইলে তাহারা ইংলণ্ডে আশ্রয় পাইত।

ইংলণ্ড অন্য সব দেশের রাজনৈতিক পলাতকদের আশ্রয়-স্থল ছিল। এখন তাহার সে গৌরব নাই। ইংলণ্ড এখন ইহুদীদিগকে আশ্রয় দিতেছে না। বোধ হয় ইংরেজ জাতি জার্মেনীকে অসন্তুষ্ট করিতে এখনও সাহস পাইতেছে না। সমরসজ্জা ব্রিটেনের চেয়ে জার্মেনীর এখন বেশী ভয়াবহ। ইংরেজরা খুব দ্রুত এরোপ্লেন নির্ম্মাণ করিতেছে এবং অন্তবিধ সমরায়োজনও করিতেছে বটে, কিন্তু জার্মেনীও বসিয়া নাই।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ

কিছু দিন হইতে সেনাপতি ফ্রাঙ্কো দ্বারা পরিচালিত বিদ্রোহীদের পুনঃ পুনঃ জয়লাভের ও স্পেনের নূতন নূতন স্থান অধিকারের সংবাদ আসিতেছে। এরূপ সংবাদও আসিয়াছে যে, স্পেনের অধিকাংশ প্রদেশ সেনাপতি ফ্রাঙ্কোর দখলে আসিয়াছে। কিন্তু স্পেনের গবর্মেণ্টের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, বিদ্রোহীদের অগ্রগতির শেষ সংবাদ সত্য নহে। তিনি এখনও জয়ের আশা ত্যাগ করেন নাই।

তিনি ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকে অনুরোধ জানাইয়াছেন, যে, তাঁহাকে যেন অস্ত্রশস্ত্রাদি যুদ্ধসম্ভার কিনিবার সুবিধা দেওয়া হয়; সেরূপ সুবিধা ইটালী ও জার্মেনীর মারফতে বিদ্রোহীরা বরাবরই পাইয়া আসিতেছে। তাহারা বিস্তর সৈন্যও ইটালী ও জার্মেনী হইতে—বিশেষতঃ ইটালী হইতে—পাইয়া আসিতেছে। এই জন্যই তাহারা জয়লাভ করিতেছে।

কিন্তু নন্-ইণ্টারভেন্শ্যনের অর্থাৎ স্পেনের গৃহবিবাদে হস্তক্ষেপ না-করিবার ও নিরপেক্ষ থাকিবার বাহানায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এ-পর্য্যন্ত স্পেনের গবর্মেণ্টকে যুদ্ধসম্ভার-সংগ্রহের সুবিধা দেয় নাই, পরেও যে দিবে তাহার সম্ভাবনা অল্প। তাহারা ইটালী ও জার্মেনীকে চটাইতে চায় না—পাছে শেষোক্তেরা যুদ্ধ বাধাইয়া বসে। কিন্তু শেষোক্তেরা ক্রমেই প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। ইংলণ্ড নিজের যুদ্ধসজ্জা বাড়াইতেছে বটে, কিন্তু ইটালী ও জার্মেনীকে ক্ষিপ্রকারিতায় অতিক্রম করিতে পারিতেছে না।

জার্মেনী ও চেকোস্লোভাকিয়া

অষ্ট্রিয়া জার্ম্যানভাষাভাষী। জার্মেনী তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। চেকোস্লোভাকিয়াতেও অনেক জার্ম্যান-ভাষী লোক আছে। তাহাদের সংখ্যা ৩২ লক্ষেরও উপর। তাহারা আগন্তুক নহে, নিজ বাসভূমিতেই বাস করে। তাহা পূর্ব্বে অষ্ট্রোহাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অষ্ট্রিয়ার লোকসংখ্যা ৬৭ লক্ষেরও উপর। এই ৬৭ লক্ষ লোক ও তাহাদের বাসভূমি জার্মেনীর অধিকারে আসিয়াছে। চেকোস্লোভাকিয়ার বত্রিশ লক্ষাধিক জার্মেন ও তাহাদের বাসভূমিও হিটলরের লইবার ইচ্ছা। কিন্তু ফ্রান্স তাহাতে বাধা দিবে বলিতেছে। রাশিয়া আগেই তাহা বলিয়াছে। তাহারা জার্মেনীকে ইউরোপ-মহাদেশে নিঃসন্দেহে প্রবলতম দেশ হইতে দিতে চায় না। না-চাওয়াই স্বাভাবিক।

ব্রিটেন ও ইটালী

ব্রিটেন ইটালীর আবিসীনিয়া জয় মানিয়া লইবে এবং লীগ অব্ নেশ্যন্সের দ্বারাও তাহা মানিয়া লওয়াইবে বলিয়াছে, লোহিত সাগরে ব্রিটেন ও ইটালীর প্রভাবের অঞ্চল নির্দ্দেশ করিয়া দিবে বলিয়াছে, সুয়েজ খাল দিয়া শান্তি ও যুদ্ধের সময় সকল দেশের জাহাজ যাতায়াতের অধিকার স্বীকার করিবে বলিয়াছে, ইত্যাদি।

ব্রিটেন ইটালীকে খুশি করিতে ও শান্তিরক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু যাহারা শান্তি চায় না, যুদ্ধ দ্বারা বা অন্য উপায়ে ক্রমাগত সাম্রাজ্যবৃদ্ধি করিতে চায়, তাহাদিগকে প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে দেওয়া শান্তিরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় নহে।

ভারতবর্ষের উভয়সঙ্কট

সাম্রাজ্যোপাসক ব্রিটেন প্রবলতর হয়, ইহা আমরা চাই না। কারণ, ব্রিটেন যত প্রবল হইবে, ভারতবর্ষকে স্বাধীন হইতে দিতে তত কম চাহিবে। অন্য দিকে, ব্রিটেন অন্য কোন প্রবল জাতি দ্বারা পরাস্ত হয়, তাহাও আমাদের

পক্ষে বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। কারণ, সেই প্রবল জাতি ব্রিটেনকে পরাজিত করিয়া ভারতকে নিজেদের অধীন করিতে পারে; তাহাতে বাধা দিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা ইংরেজদের অধীনতার পরিবর্ত্তে অন্য কাহারও অধীনতা চাই না। তাহা কাম্য নহে।

গোরুর কাঁধের পুরাতন জোয়ালের ঘা শুকাইয়া উপরে শক্ত মোটা চামড়া জন্মে। তাহার বেদনা-অনুভব-শক্তি কম। কিন্তু নূতন জোয়ালে নূতন ঘা হয়। তাহার যন্ত্রণা সহ্য করা কঠিনতর।

ভারতের উভয়সঙ্কট।

—

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির নিমিত্ত গান্ধীজীর চেষ্টা

মহাত্মা গান্ধী. স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল না-থাকা সত্ত্বেও, কলিকাতায় থাকিয়া রাজনৈতিক কারণে বিনা-বিচারে আটক বা বন্দী এবং রাজনৈতিক অপরাধে বিচারান্তে বন্দী ব্যক্তিদিগের মুক্তির নিমিত্ত বঙ্গের গবর্ণর, বঙ্গের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী, ও বন্দীদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিতেছেন। তন্নিমিত্ত তিনি দেশের সমুদয় লোকের, বিশেষতঃ বন্দীদের ও তাহাদের পরিবারের লোকদের, কৃতজ্ঞতাভাজন। আজ ২৬শে চৈত্র পর্য্যন্ত তাঁহার এই সব সাক্ষাৎকারের কোন ফল জানা যায় নাই।

যাহাদিগকে বিনা-বিচারে আটক বা বন্দী করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, ইহা বার বার বলা হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে বার বার দাবী সত্ত্বেও যে বিচারার্থ তাহাদিগকে আদালতে হাজির করা হয় নাই, ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, তাহারা কোন অপরাধ করে নাই। রাজনৈতিক যত রকম অপরাধ আছে, তাহার মধ্যে কোন-না-কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া বিচারান্তে যাহাদের কারাদণ্ড হইয়াছিল, তাহারা অনেকে নির্দ্দিষ্ট সময় জেলে থাকিয়া খালাস পাইয়াছে। অথচ যাহারা ঠিক্ ঐ সময়ে বা তাহার পূর্ব্বেও ঐ ঐ অজুহাতে বিনা বিচারে স্বাধীনতায় বঞ্চিত হইয়াছিল, তাহারা এখনও স্বাধীনতা লাভ করে নাই। অর্থাৎ যাহারা অপরাধ করিয়াছে বলিয়া আদালতের বিচারে প্রমাণিত হইয়াছিল তাহাদের শাস্তির সীমা ছিল এবং তাহাদের শাস্তির অবসান হইয়াছে, কিন্তু যাহাদের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ প্রমাণিত হয় নাই, তাহাদের শাস্তি চলিতেছে—তাহার সীমা নাই!

বিচারান্তে বন্দী বঙ্গে যাহারা আছে, তাহাদেরই মত রাজনৈতিক অপরাধে বিচারান্তে বন্দী অন্যান্য প্রদেশে যাহারা হইয়াছিল—যেমন বিহারে, যুক্তপ্রদেশে, মধ্য-প্রদেশে, তাহারা কারাদণ্ডের কাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই খালাস পাইয়াছে। কিন্তু বঙ্গের বন্দীরা মুক্তি পাইতেছে না। তাহারা যাহা করিয়াছিল, আইনের চক্ষে তাহা অপরাধ নহে বলিতেছি না। কিন্তু অপরাধ তাহারা সমগ্রভারতের ভাল হইবে ভাবিয়া বুদ্ধির দোষে করিয়াছিল। ভারতের অন্য কোন কোন অংশের মন্ত্রীরা তাঁহাদের প্রদেশের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দান প্রশ্ন সম্পর্কে ইস্তফা দিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গের বন্দীদের জন্য তাঁহারা কিছুই করিলেন না। কংগ্রেসও কিছুই করিলেন না। অথচ কংগ্রেস সমগ্র-ভারতের প্রতিষ্ঠান, এবং বঙ্গের বন্দীরা সমগ্র-ভারতের জন্যই দুঃখভাগী হইয়াছে।

—

বঙ্গের কারাগারসমূহের অবস্থা

বঙ্গের কারাগারসমূহ সম্বন্ধে কিছু দিন হইল ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় যে-সব কথা বলেন, তাহা হইতে খবরের কাগজের পাঠকেরা জেলের অবস্থা অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হরিপদ বাবু আমাদিগকে নিজের দুর্ব্বিষহ অভিজ্ঞতা হইতে যাহা বলিয়াছিলেন, তিনি না-বলিলে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। মানুষকে জেলে পাঠাইবার উদ্দেশ্য কি, সে-বিষয়ে জগতের শ্রেষ্ঠতম দণ্ডনীতিজ্ঞদিগের (penologistsদের) মত আমাদের দেশের মন্ত্রীদের এবং জেল-বিভাগের বড় বড় কর্ম্মচারীদের জানা ও তাহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহারা জানিলে ও তদনুসারে কাজ করিতে প্রস্তুত হইলেই তাহা যথেষ্ট হইবে না। কয়েদীদের সহিত সংস্পর্শ বড় কর্ম্মচারীদের বেশী হয় না। সংস্পর্শ বেশী হয়

ওআর্ডারদের (রক্ষীদের) সহিত। অনেক স্থলে, কয়েদীদিগকে অপমান করা ও তাহাদের সহিত রূঢ়—এমন কি নিষ্ঠুর আচরণ করাও—তাহারা স্বাভাবিক মনে করে। তাহাদের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কয়েদীরাও যে ঠিক্ আমাদেরই মত মানুষ এবং মানুষের মত ব্যবহার পাইবার অধিকারী, এই বিশ্বাস জন্মান একান্ত আবশ্যক।

—

লবণশুল্ক

কাগজে এই সংবাদ বাহির হইয়াছে, যে, বিদেশ হইতে আমদানী লবণের উপর শুল্ক বসাইবার যে আইন আছে তাহার মিয়াদ ৩০শে এপ্রিল শেষ হইবার পর ভারত-গবর্মেণ্ট আর ঐ শুল্ক বসাইবার আইন পুনর্ব্বার প্রণয়ন বা জারি করিবেন না। ইহাতে বাংলা দেশেরই ক্ষতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে। এখানেই বিদেশী লবণ বেশী আসে। বঙ্গে যে-কয়টি লবণ-প্রস্তুতির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, বিদেশী লবণের উপর শুল্ক না-বসাইলে সেগুলি টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। অতএব, লবণশুল্ক আইনের মিয়াদ আরও কয়েক বৎসরের জন্য বাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেই হইবে।

—

স্কটিশ চর্চ কলেজে বিক্ষোভ

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু স্কটিশ চর্চ কলেজের এক জন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র। তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ায় ঐ কলেজের ছাত্রেরা তাঁহাকে কলেজে আনিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে চায়। ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু উহার বর্ত্তমান প্রিন্সিপ্যাল মিঃ ক্যামেরন কলেজে তাহা করিতে দিতে অস্বীকার করেন। তাঁহার মতে তাহা করিলে কলেজকে সুভাষ বাবুর রাজনৈতিক মতের অনুমোদক মনে করিবার কারণ দেওয়া হইবে। তাহাই যদি তাঁহার আপত্তির কারণ, তাহা হইলে তিনি ছাত্রদিগকে ইহা বলিলেই ত কোন গোলযোগ হইত না যে, "তোমরা তাঁহাকে এরূপ অভিনন্দন-পত্র দিও যাহাতে ইহা না-বুঝায় যে কলেজ তাঁহার রাজনৈতিক মতে সমবিশ্বাসী।" তাহা হইলে ছাত্রেরা ধর্ম্মঘট করিত না। এখন ছাত্রদের সহিত কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের যে মিটমাট হইয়াছে, তাহা সারতঃ ঐরূপ সর্ত্তেই হইয়াছে। আর্কার্ট সাহেবের আমলে স্কটিশ চর্চ কলেজে সুভাষ বাবু যে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে ত কেহ মনে করে নাই যে, স্কটিশ চর্চ কলেজ সুভাষ বাবুর মতাবলম্বী। তাঁহার মত তখন যাহা ছিল, এখন তাহাই আছে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরুকে একাধিক বার উপযুক্ত সম্মান দিয়াছে। তাহাতে কেহ মনে করে নাই যে, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কংগ্রেসী, সমাজতন্ত্রবাদী, বা কম্যুনিষ্ট বনিয়া গিয়াছে।

কাগজে দেখিয়াছি, ক্যামেরন সাহেব বলিয়াছিলেন, ছাত্রেরা সুভাষ বাবুর সম্বর্দ্ধনা করিলে মুসলমান ছাত্রেরা মিঃ ফজলল হকের সম্বর্দ্ধনা করিতে চাহিবে। কিন্তু মিঃ ফজলল হক ত স্কটিশ চর্চ কলেজের ছাত্র নহেন, সেখানে মুসলমান ছাত্রেরা কেন তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে চাহিবে? আর যদি করেই, তাহাতেই বা কলেজের কি ক্ষতি?

কাগজে দেখিয়াছিলাম, স্কটিশ চর্চ কলেজের ধর্ম্মঘটী অনেক ছাত্র কলেজের ফাটকে, "ক্যামেরন নিপাত যাও," এই মর্ম্মের চীৎকার করিয়াছিলেন। তাহা করিয়া থাকিলে তাঁহারা গর্হিত কাজ করিয়াছিলেন। অশিষ্টতা স্বাধীনতাপ্রিয়তার, পৌরুষের বা সাহসের লক্ষণ নহে;—শিক্ষাগুরুর প্রতি অশিষ্টতা ত নহেই। কাগজে এরূপ খবরও বাহির হইয়াছিল, যে, ছাত্রেরা বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংকল্প সিদ্ধি না-হইলে তাঁহারা প্রায়োপবেশন (hunger-strike) করিবেন। তাঁহারা তাহা বলিয়া থাকিলে মাত্রাজ্ঞানের অভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন।

—

বিহারে ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

বিহারে ছাত্রদের বিরুদ্ধে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, তাহাদের নিয়মানুগত্য (discipline) নাই। সেই জন্য ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট উহার সীণ্ডিকেটকে নিয়মভঙ্গকারী বা কদাচারী ছাত্রদের সম্বন্ধে নিয়মানুবর্ত্তিতাবিধায়ক (disciplinary) ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। ছাত্রদের প্রতিনিধিরা শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মাহ্‌মুদকে আপনাদের বক্তব্য বলিয়াছেন। তিনি তাহা ধৈর্য্যের সহিত শুনিয়া বিবেচনা করিবেন বলিয়াছেন। কাগজে দেখিলাম, তথাকার রাজনৈতিক নেতারা ছাত্রদিগকে যে-সব রাজনৈতিক কাজ করিতে বলিয়া আসিতেছেন, তাহা তাঁহারা করিয়া আসিতেছেন; এখন সেইগুলাকেই তাহাদের অপরাধ বলা হইতেছে। ইহা সত্য কিনা জানি না। তবে কোথাও কোথাও ছাত্রদের মধ্যে স্বৈরতা আসিয়াছে মনে হয়। কানপুরে তাহারা বিশেষ রকম গোলমাল ও ছাত্রীদের প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিল। লক্ষ্ণৌতে একবার পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরুর পরামর্শ পর্য্যন্ত তাহারা উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করে।

কিন্তু ইহাও সত্য, যে, কোন কোন রাজনৈতিক নেতা বিক্ষোভ প্রদর্শন, নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন

প্রভৃতি অনেক কিছু ছাত্রদিগের দ্বারা করান যাহা শিক্ষাকর্তৃপক্ষের চক্ষে দোষ বলিয়া বিবেচিত হয়।

ছাত্রদের ন্যায্য ও স্বাভাবিক স্বাধীনচিত্ততাকে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবাধ্যতা মনে করা যেমন বয়োবৃদ্ধদের উচিত নহে, তদ্রূপ রূঢ়তা, অশিষ্টতা, অবিনয়, বা নিয়মলঙ্ঘনকে পৌরুষ ও স্বাধীনতার লক্ষণ মনে করা ছাত্রদের উচিত নয়।

—

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার শতবার্ষিকী

"সদ্ভাবশতক"-প্রণেতা কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সেনহাটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার স্বগ্রামবাসীরা গত মাসে তাঁহার জন্মের শতবার্ষিক উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন বাংলা ১২৪১ সালে। সুতরাং উৎসব ঠিক্ শত বর্ষ পরে না-হইয়া ১০৩ বৎসর পরে হইয়াছে। তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। উৎসবের প্রধান উদ্যোগকর্ত্রী ছিলেন সেনহাটীর মহিলা-সমিতির নেত্রী শ্রীমতী লীলা দাশগুপ্তা। তাঁহার এবং মহিলা-সমিতির আন্তরিক উৎসাহ ও পরিশ্রম অতীব প্রশংসনীয়। সেনহাটীর লোকেরা কৃষ্ণচন্দ্রের একটি স্মৃতিস্তম্ভ ভৈরব নদের তীরে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উৎসবের দিন তাহা পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হয়। সভাস্থলে কবির একটি আলেখ্যের আবরণ উন্মোচিত হয়, কয়েকটি কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত হয়, এবং সভাপতির ও অন্য বক্তৃতা হয়।

আমরা বাল্যকালে, বোধ হয় দশ বৎসর বয়সে, "সদ্ভাবশতক" পড়িয়াছিলাম। তাহার কতকগুলি কবিতা এখনও আমাদের মনে আছে। যেমন—"একদা ছিল না 'জুতো' চরণযুগলে", "চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন", "যে-জন দিবসে মনের হরষে"। "কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ"। কৃষ্ণচন্দ্রের "সদ্ভাবশতক" পারসীক কবি হাফেজের কবিতাবলীর অনুবাদ নহে; ইহার কতকগুলি কবিতা হাফেজের কবিতার ভাব লইয়া রচিত, কতকগুলি অন্য কবিদের রচনার ভাব লইয়া রচিত, কতকগুলি সম্পূর্ণ কৃষ্ণচন্দ্রের নিজ প্রতিভার ফল। তিনি মহাকবি না-হইলেও নিশ্চয়ই চিরস্মরণীয় কবি। তদ্ভিন্ন, মানুষ হিসাবেও তিনি চিরস্মরণীয়। তাঁহার মত সত্যসন্ধ, নির্লোভ, স্বাধীনচিত্ত, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও ভক্ত মানুষ বিরল। শিক্ষাদান তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। মাসিক ৮।৶৫ পেন্সন পাইবার পরও তিনি বিনা-পারিশ্রমিকে বহু ছাত্রকে প্রতিদিন নিয়মিত রূপে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

দৌলতপুরের কলেজের কয়েক জন অধ্যাপক ও অন্য কেহ কেহ বাহির হইতে আসিয়া এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

ভারতীয়দের সামরিক শিক্ষা

গত মাসে নাসিকে মহারাজা সিন্ধিয়া ভোঁসলা সামরিক বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। উহাতে তাঁহার এক লক্ষ টাকা দান তখন ঘোষিত হয়। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত প্রতাপ শেঠ এক লক্ষ ও অন্য কেহ কেহ অল্লাধিক টাকা দিয়াছিলেন।

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, এখানেও দেওয়া হইবে। কাজ কত দূর হইতেছে, তাহার সংবাদ জানি না। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌতে ও পাটনায় কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দ্বারা ঘোষিত হইয়াছে যে, যুক্তপ্রদেশে ও বিহারে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইবে।

এই সকল ব্যবস্থা অন্ততঃ ৫০ বৎসর আগে হইলে ভাল হইত। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট হইতে দিতেন না, ইহাও নিশ্চিত। তাঁহাদের ভয়, আমরা পাছে যুদ্ধ করিতে শিখিয়া বিদ্রোহী হই ও সিদ্ধকাম হই। সে-ভয় তাঁহাদের এখনও আছে। সেই জন্য আমাদের ইংরেজের অধীনতার পাশ, আমাদের শৌর্য্য দ্বারা নহে, অন্য কোন আকস্মিক কারণে ছিন্ন হইলেও, অন্য কোন জাতির অধীনতা তাহার স্থান অধিকার করিতে পারে।

—

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার আয়ু বৃদ্ধি

বর্ত্তমান ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার আয়ু আরও এক বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইল। এই তিন বার ইহার আয়ু বাড়িল। বার বার তিন বার। এইবার আয়ু বাড়ানতে অনুমান করা হইতেছে যে, কর্ত্তৃপক্ষ যখন ফেডারেশ্যন চালাইতে পারিবেন মনে করিয়াছিলেন, তখন পারিবেন না।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সদস্যেরা, অন্য কোন কোন সদস্যদের সহযোগিতায়, যাহা কিছু করিতে চাহেন ও পারেন, তাহা এই অবসরে করিয়া লউন। ফেডার‍্যাল ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহারা দলে এতটা পুরু না-হইতেও পারেন।

—

লবঙ্গ-বয়কট

জাঞ্জিবরে ভারতীয় লবঙ্গ-ব্যবসায়ীদের পক্ষে ক্ষতিকর ব্যবস্থা হওয়ায় এবং লবঙ্গের ব্যবসায় কার্য্যতঃ তাহাদের হাত হইতে চলিয়া যাওয়ায়, তথা হইতে ভারতে রপ্তানী লবঙ্গ বয়কট করিবার প্রস্তাব ও সংকল্প হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও কলিকাতা ও বোম্বাই বন্দরে লবঙ্গ আসিতেছে। একটি ছবিতে দেখিলাম, বোম্বাই বন্দরে জাহাজ হইতে নামান কয়েক গাঁট লবঙ্গ রহিয়াছে,

ও একটা গাঁটের উপর একটি তরুণী দেশসেবিকা বসিয়া পিকেট করিতেছেন। তিনি কোনও ভারতীয় বণিককে গাঁটগুলি লইয়া যাইতে দিবেন না। এরূপ কাজে খুব দৃঢ়তার আবশ্যক। "লবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়-সমীরে," কল্পনা-লোকে, যাঁহারা বাস করেন, লবঙ্গ-বয়কট সেই সকল মহিলাদিগের দ্বারা হইবার নয়।

—

নাগরী অক্ষরে বাংলা বহি ছাপাইবার প্রস্তাব

হিন্দীকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা এবং নাগরীকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রলিপি যাঁহারা করিতে চান, শ্রীযুক্ত কাকা কলেলকর তাঁহাদের মধ্যে এক জন প্রধান। তিনি সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে গিয়া হিন্দী প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। শ্রোতারা সকলেই তাঁহার মতের সমর্থন করিয়াছিলেন কিনা, সংক্ষিপ্ত সংবাদে তাহা লিখিত ছিল না। তিনি বাংলা ভাল ভাল বহি নাগরীতে ছাপিবার পরামর্শ দিয়াছেন। বলিয়াছেন তাহা হইলে ঐ সকল বহির অনেক অবাঙালী পাঠক জুটিবে। ইহাও বলিয়াছেন যে, তিনি রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার সকল বহি নাগরীতে ছাপাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র "একলিপিবিস্তারপরিষদ" প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং তাহার একটি পত্রিকা বাহির করিয়া সর্ব্বত্র নাগরী চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সম্ভবতঃ অর্থনাশও কিছু হইয়াছিল। এখন হিন্দী-প্রচার ও নাগরী-প্রচারের সহিত কংগ্রেসের রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টার যোগ হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রচারের ও সমাজসংস্কারের অঙ্গীভূত বলিয়া মানুষ যাহার অনুসরণ করিতে চায় না, তাহা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত হইলে অনেকে তাহা গ্রহণ করে। ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদ (caste) ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল না হইলেও তাহার বিরোধী ও নিন্দক যত লোকে হইয়াছিলেন, কংগ্রেসের সমর্থিত অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন প্রচেষ্টার (মৌখিক) বিরোধী ও নিন্দক তত জন হন নাই—যদিও অস্পৃশ্যতা জাতিভেদেরই একটা নিকৃষ্টতম ও বিষাক্ততম ফল। ব্রাহ্মসমাজ অবরোধপ্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল না-হইলেও তাহার জন্য ব্রাহ্মসমাজের মিথ্যা কুৎসাকারী অনেকে হইয়াছিল। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের হিড়িকে বহু অন্তঃপুরচারিণী অবাধে অবরোধ ভাঙিয়াছেন, এবং এখন অবরোধ ভাঙার নিন্দা পূর্ব্বতম কুৎসাকারীরাও করেন না।

এই দুই দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয়, সারদাচরণ মিত্র মহাশয় শুধু সাহিত্য, ভাষা ও লিপির দিক্ হইতে যাহা করিতে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন, রাষ্ট্রনীতির পক্ষ হইতে সমর্থন পাইয়া সে কাজ অধিকতর অগ্রসর হইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের বহি নাগরী অক্ষরে ছাপিবার প্রস্তাব একটা কথা মনে পড়াইয়া দিল। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস যখন তাঁহার বাংলা বহিগুলির প্রকাশক ছিল, তখন বাংলা গীতাঞ্জলির নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত একটি সংস্করণ ঐ প্রেস বাহির করিয়াছিল স্মরণ হইতেছে। উহার বিক্রী কিরূপ হইয়াছিল জানি না। মনে পড়িতেছে, শুনিয়াছিলাম বিশেষ কিছু হয় নাই। তাহা গীতাঞ্জলির দোষে নহে। হয় নাই দুটি কারণে, অনুমান করি। এক, বাংলা জানে ও পড়িতে চায় এরূপ হিন্দী-ভাষী লোকের সংখ্যা কম। দুই, বাঙালীর রুচি, সংস্কৃতি ও মনের ভাবের সহিত হিন্দীভাষীদের রুচি, সংস্কৃতি ও মনের ভাবের পার্থক্য আছে। এরূপ অনুমান করিবার একটা কারণ বলি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে তাঁহার বাংলা বহিগুলির হিন্দী অনুবাদ প্রকাশ করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের ও উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশও করা হইয়াছিল। অনুবাদ ভালই হইয়াছিল। কিন্তু বৎসরে ন্যূনাধিক দুই শত চল্লিশ টাকার বিজ্ঞাপন দিয়াও বহিগুলির বিক্রী যত হইত তাহাতে কবির (বা আমাদের) মুনফার পরিমাণ দুই শত চল্লিশ টাকা হইত না। তাহার কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও উপন্যাস উৎকৃষ্ট হইলেও হিন্দীভাষীদের রুচি, সংস্কৃতি ও মনের ভাব বাঙালীদের রুচি, সংস্কৃতি ও মনের ভাব হইতে অনেকটা ভিন্ন।

সেই জন্য কাকা কলেলকরের প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, তিনি যদি হিন্দী-প্রচারের ও নাগরী-প্রচারের অঙ্গস্বরূপ এবং ঐ প্রচেষ্টার ফণ্ড হইতে ভাল ভাল বাংলা বহি নাগরীতে ছাপাইতে চান, তাহা হইলে তাহাতে কোন আপত্তি হওয়া উচিত নয়; কিন্তু কোন বাঙালী গ্রন্থকার বা প্রকাশক ইহা নিজ ব্যয়ে করিলে তাহার আর্থিক ক্ষতি হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

—

জমিদার ও রায়ত

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে জীবিকার জন্য নির্ভর করে কৃষির উপর। রায়তেরা প্রায় সম্পূর্ণ রূপেই নির্ভর করে কৃষির উপর। কেহ কেহ কোন কোন্ কুটীরশিল্পের উপরেও কিছু নির্ভর করে।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ রায়তের অবস্থা সচ্ছল নহে। অনেকে খুব ঋণগ্রস্ত। রায়তদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারও সামান্যই হইয়াছে।

অন্য দিকে, বঙ্গে বিহারে উড়িষ্যায় আগ্রা-অযোধ্যায় যাঁহারা জমিদার বা তালুকদার নামে পরিচিত, তাঁহাদের ও ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সমশ্রেণীস্থ লোকদের অবস্থা রায়তদের চেয়ে সচ্ছল, এবং জমিদার ও তালুকদার প্রভৃতি ও তাঁহাদের পুত্রকন্যারা যদি অশিক্ষিত থাকেন, তাহা সুযোগের, অবসরের বা অর্থের অভাবে নহে। জমিদারদের অনেকের অবস্থা এখন ভাল নয়, তাঁহারা অনেকে প্রভূত ঋণগ্রস্ত, জানি। কিন্তু ইহার কারণ এ নয়, যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের যথেষ্ট আয় ছিল না। কারণ অন্যরূপ। তাহা বলা অনাবশ্যক। ইহা সত্য যে, গত কয়েক বৎসর হইতে খাজনা-অনাদায় হেতু অনেক জমিদার বিপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু জমিদার-বংশ সকলের সঞ্চয়ের অভ্যাস ও সঞ্চিত অর্থ শিল্পবাণিজ্যাদিতে খাটাইয়া ধনলাভের সামর্থ্য ও অভ্যাস থাকিলে তাঁহাদের বর্ত্তমান দুর্দশা ঘটিত না।

তথাপি তাঁহারা সহানুভূতির পাত্র।

কিন্তু অধিকতর সহানুভূতির পাত্র রায়তেরা। তাহারা বরাবরই জমিদারের চেয়ে অনেক অধিক পরিশ্রম করিয়াছে এবং কঠোর পরিশ্রম করিয়াছে, কিন্তু তদ্দারা উৎপাদিত ধনের যথোচিত ন্যায্য অংশ তাহারা পায় নাই। তাহাদের দুর্দশার ও ঋণগ্রস্ততার ইহা প্রধান কারণ। কিন্তু একমাত্র কারণ নহে। তাহারাও কখন কখন অমিতব্যয়ী হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে তাহারা অমিতব্যয়ী নহে—তাহা হইবার তাহাদের সঙ্গতি কোথায়? তাহাদের অমিতব্যয়িতা নৈমিত্তিক—বিবাহ শ্রাদ্ধআদি অনুষ্ঠানের সময় তাহারা অমিতব্যয়ী হয়। তাহাদের অ-শিক্ষা ও কুশিক্ষা এবং দেশাচার ইহার কারণ। তাহাদের প্রাত্যহিক জীবনের কঠোরতা ও আরামশূন্যতাও এই সকল অনুষ্ঠানের সময় তাহাদিগকে পরোক্ষ ভাবে অমিতব্যয়প্রবণ করিয়া থাকে। কদাচার তাহাদের মধ্যেও আছে।

মোটের উপর ইহা সত্য যে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা রায়তদের কাছেই অপরাধী, জমিদারদের কাছে নহে! অন্ততঃ ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা রায়তদিগকে যত অসুবিধায় ফেলিয়াছে, জমিদারদিগকে তত নহে। তবে, তাহা জমিদারদিগকে অলস করিয়াছে বটে।

এই জন্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র রায়তদের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা আবশ্যক ও অনেক প্রদেশে তাহা হইতেছে। জমিদাররাও মানুষ, তাহাদিগের পক্ষেও সচ্ছল অবস্থায় বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক, ইহা মনে রাখিয়া আইনের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। জমিদারী প্রথার সৃষ্টিকর্ত্তা জমিদারেরা—অন্ততঃ বর্ত্তমান জমিদারেরা, নহে; সুতরাং তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইলে চলিবে না। জমিদারপক্ষের সমর্থকদিগের কেবল ইহা বলিলেই চলিবে না যে, আইন তাহাদিগকে অমুক অমুক অধিকার দিয়াছিল; অধিকারগুলি যে ন্যায্য তাহা দেখাইতে হইবে। আইন যত পুরাতনই হউক, তাহা ন্যায়ের ভিত্তির উপর স্থাপিত না-হইলে তাহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

—

বঙ্গে ভূ-কর সম্বন্ধীয় বন্দোবস্তের তদন্ত

বঙ্গে জমির খাজনা সম্পর্কীয় তাবৎ ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট দিবার নিমিত্ত বাংলা-গবর্মেণ্ট (অর্থাৎ মন্ত্রীরা) একটি কমিশন বসাইতেছেন। জমিসম্বন্ধীয় আইনের সংশোধক আইন পাস করিয়া তাহার পর কমিশন বসান, রোগীর জন্য ঔষধের প্রেস্ক্রিপ্‌শ্যন লিখিয়া ও রোগীকে ঔষধ গিলাইয়া তাহার পর রোগের ডায়াগ্নোসিস বা নিদানের ব্যবস্থা করার সমতুল্য! কিন্তু বোধ হয় মন্ত্রীরা আইনটা আগেই পাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন আপনাদিগকে রায়ত-দরদী প্রমাণ করিবার নিমিত্ত; নতুবা বহুৎ ভোট বেহাত হইয়া যায়।

কমিশনের সভ্যদের নাম এখনও প্রকাশিত হয় নাই। সভাপতির নাম প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি এক জন ইংরেজ, কানাডা-প্রবাসী। এক জন ইংরেজকে সভাপতি করায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহার প্রতিবাদ ও তজ্জনিত তর্কবিতর্ক হয়। মৌলবী ফজলল হকের এবং বোধ হয়, অন্য মন্ত্রীদেরও, কৈফিয়ৎ এই যে, হিন্দু বা মুসলমান কেহই নিরপেক্ষ হইবে না, অতএব এক জন বাহিরের লোক, শ্বেত এবং খ্রীষ্টিয়ান, আনা চাই। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এত বড় ভারতবর্ষে, বঙ্গে বা বঙ্গের বাহিরে, এক জনও যোগ্য নিরপেক্ষ ভারতীয় পাওয়া যায় না, মন্ত্রীরা এইরূপ মনে করেন। বাংলায় হিন্দু বা মুসলমান যোগ্য কেহ না থাকিলে, বাঙালী খ্রীষ্টিয়ানও কি নাই? বঙ্গে কেহ যোগ্য ও নিরপেক্ষ না থাকিলে বঙ্গের বাহিরেও নাই? বঙ্গের বাহিরে যোগ্য ও নিরপেক্ষ হিন্দু বা মুসলমান কেহ না থাকিলে, ভারতীয় খ্রীষ্টিয়ান, ভারতীয় পারসী, ভারতীয় বৌদ্ধ, ভারতীয় শিখ, ভারতীয় ইহুদীদের মধ্যেও কোন যোগ্য ও নিরপেক্ষ লোক নাই?

মনোনীত ইংরেজটি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ও বঙ্গের জমিসংক্রান্ত বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। ইহাই বোধ করি তাঁহার নিরপেক্ষতার প্রমাণ। কথিত আছে,

একবার এক জেস্যুইট পাদরী বলিয়াছিলেন যে, তিনি কার্লাইল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য (unbiassed)। তাহার প্রমাণ চাওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন, কার্লাইলের লেখার এক পংক্তিও তিনি পড়েন নাই! যাহা হউক, মনোনীত ইংরেজটির অজ্ঞতা দূর করিবার নিমিত্ত এক জন ইংরেজ সিবিলিয়ানকে আগে হইতে তাঁহার নিকট পাঠান হইবে, শুনা যাইতেছে। তখন তিনি জমিদার-পক্ষ বা রায়ত-পক্ষ অবলম্বন যদি নাই-করেন, সাম্রাজ্যোপাসনার পক্ষটা অবলম্বন করিতে পারিবেন।

—

শ্রেণীহীন সমাজ

ইউরোপে মুটে মজুর, কারিগর, কারখানার ও খনির মজুর, ভূমিশূন্য ক্ষেতখামারের মজুর, ইত্যাদি সমাজের নিম্নস্তরের, নিম্নশ্রেণীর, মানুষ। তাহার উপরের শ্রেণী ক্ষেত-খামারের মালিক কৃষিজীবীদিগকে লইয়া গঠিত। এইরূপ ছোটখাট দোকান ব্যবসার মালিক আর এক শ্রেণী আছে। ডাক্তার, শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী, বড় কেরানী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর লোক। সম্ভ্রান্ত অভিজাত লর্ডেরা আর এক শ্রেণীর। যে-যে দেশে এখনও নৃপতি আছে, তথাকার রাজবংশীয়েরা আবার একটু স্বতন্ত্র শ্রেণীর।

ইউরোপের সমাজতন্ত্রবাদীরা (সোশ্যালিষ্টরা) ও সাম্যবাদীরা (কম্যুনিষ্টরা) সমাজে এত শ্রেণী রাখিতে চান না, বিশেষতঃ অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাখিতে ত চানই না, এবং বলাই বাহুল্য যে, রাজারাজড়ার তিরোভাব চান। ভারতবর্ষেও সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদী আছেন। তাহারাও শ্রেণীহীন সমাজ চান। এখানে কিন্তু কতকটা পাশ্চাত্য ধাঁচের শ্রেণী ছাড়া জা'ত (caste) অনুসারে শ্রেণী আছে। ধনী বৈশ্য মাড়োয়ারী বণিক পেশা ও আয় হিসাবে পাশ্চাত্য মতে তাঁহার ব্রাহ্মণ দারোয়ানের চেয়ে উচ্চ শ্রেণীর মানুষ, কিন্তু জা'ত হিসাবে ভারতীয় হিন্দুমতে তিনি দারোয়ানের নিম্নশ্রেণীস্থ। এদেশে কাঞ্চনকৌলীন্য ছাড়া এখনও বংশগত জা'তের কৌলীন্য আছে।

এই জন্য আমাদের দেশের সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদীরা যদি লোককে বিশ্বাস করাইতে চান যে, তাঁহারা বাস্তবিকই শ্রেণীহীন সমাজ চান, তাহা হইলে এক দিকে তাঁহাদিগকে যেমন পাশ্চাত্য ধাঁচের শ্রেণী-বিভাগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিতে হইবে এবং স্বয়ং শ্রেণীহীনতাসংগত জীবন যাপন করিতে হইবে, তেমনই অন্য দিকে তাঁহাদিগকে জা'তের (casteএর) বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে হইবে, তাঁহারা দ্বিজ কোন জা'তের হইলে উপবীত ফেলিয়া দিতে হইবে, এবং নিজের বা পুত্রকন্যার বিবাহে জা'ত ভাঙিতে হইবে। আমরা অবশ্য তাঁহাদিগকে জা'ত ভাঙিতে কোনই অনুরোধ করিতেছি না। আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি, জা'তও রাখিব অথচ শ্রেণীহীন সমাজও চাহিব—এটি চলিবে না। যদি সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদীরা জা'ত রাখিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদের সমাজ-তন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ খাঁটি জিনিষ নহে বুঝিতে হইবে।

—

নূতন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমীটি

নূতন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমীটির প্রধান একটি বিশেষত্ব এই যে, এইবার প্রথম ইহার সম্পাদক হইলেন এক জন মুসলমান কংগ্রেসওআলা। ইনি কুমিল্লার মৌলবী আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী। ইনি কংগ্রেসের নীতি অনুসারে কাজ করিতে গিয়া একাধিক বার কারারুদ্ধ হইয়াছেন এবং সেই জন্য তাঁহাকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদপ্রার্থী হইতে দেওয়া হয় নাই। তাঁহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হওয়া সন্তোষের বিষয়।

—

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার মত এক জন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিজ্ঞান-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ বঙ্গের পক্ষে আহ্লাদের বিষয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু খুব ক্ষতিগ্রস্ত হইল। এলাহাবাদের লীডার কাগজে কেহ কেহ তাঁহার এলাহাবাদ ত্যাগে দুঃখ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া চিঠি লিখিয়াছেন।

—

চিকিৎসা-বিভাগে মুসলমানদিগের নিয়োগ

বঙ্গের সরকারী চিকিৎসা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ নৌশের আলী ভিন্ন ভিন্ন পদে ডাক্তার নিয়োগ গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে না করিয়া যোগ্যতর অ-মুসলমান ডাক্তার থাকা সত্ত্বেও যোগ্যতায় নিকৃষ্ট মুসলমান ডাক্তার অধিকাংশ স্থলে নিযুক্ত করিতেছেন; তিনি পব্লিক সার্বিস কমিশনের এবং কর্ণেল বড়ির সুপারিশ অগ্রাহ্য করিতেছেন—এইরূপ অনেক অভিযোগ এক জন চিকিৎসাব্যবসায়ী গত ৮ই এপ্রেলের অমৃতবাজার পত্রিকায় তাহার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় বহু দৃষ্টান্ত সহ প্রকাশ করিয়াছেন। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, চিকিৎসা-বিদ্যাশিক্ষায় বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গে মুসলমানদের প্রাধান্য থাকা দূরে থাকুক, তাঁহারা এ-বিষয়ে সাতিশয় পশ্চাদ্বর্ত্তী। তথাপি, মানুষের জীবনমরণ যাহার উপর নির্ভর করে,

সেই চিকিৎসাক্ষেত্রেও কেবল সাম্প্রদায়িক কারণে লোক নিযুক্ত হইতেছে। যোগ্যতার প্রতিযোগিতায় যে-কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক যে-কোন পদ লাভ করুন, তাহাতে কোন আপত্তি হইতে পারে না, বরং তাহা সন্তোষেরই বিষয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক কারণে নিগ্রহ-অনুগ্রহ সাতিশয় নিন্দনীয়।

বঙ্গের সরকারী শিক্ষা-বিভাগে সাম্প্রদায়িক অনুগ্রহ বিতরণের প্রভাবে তাহার কার্য্যকারিতা কমিয়াছে। চিকিৎসা-বিভাগেরও সেই দশা হইতেছে।

—

সংবাদপত্রসমূহকে ধমকানি

কোন কোন বা অনেক সংবাদপত্রে বঙ্গের মন্ত্রীদের কার্য্যকলাপ প্রভৃতি সম্বন্ধে মিথ্যা বা আধা-সত্য প্রচার করিয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা উৎপন্ন করা হয় ও তাঁহাদিগকে লোকচক্ষে হেয় করা হয়, এই অজুহাতে সংবাদপত্রসমূহকে আরও বেশী করিয়া শৃঙ্খলিত করা হইবে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীদের পক্ষ হইতে এইরূপ কথা বলা হইয়াছে। সংবাদপত্রে যাহা লেখা হয়, তাহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, সরকারী মতে যদি তাহা রাজদ্রোহসূচক বা রাজদ্রোহ-উত্তেজক হয়, কিংবা যদি তাহার দ্বারা গবর্মেণ্টকে অবজ্ঞাভাজন বা বিদ্বেষভাজন করা হয়, বা তাহার ফলে শান্তি-ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সেরূপ লেখার জন্য জমানতের টাকা লওয়া ও বাজেয়াপ্ত করা, জরিমানা করা ও জেলে পাঠানর ব্যবস্থা ত রহিয়াছেই। নিগ্রহ ও অনুগ্রহ, বিজ্ঞাপন না-দিয়া বা দিয়া, করিবার বন্দোবস্তও আছে। অসাবধানতা বা অজ্ঞতা বশতঃ অ-যথার্থ কিছু খবরের কাগজে বাহির হইলে তাহার প্রতিবাদ ও সংশোধনের জন্য সরকারী বৃহৎ পব্লিসিটি-বিভাগ রহিয়াছে। মন্ত্রীদের কোন ব্যক্তিগত কুৎসা বা মানহানি কোন কাগজ করিলে, অন্য লোকদের আত্মরক্ষার জন্য যেমন তাঁহাদের জন্যও তেমনই লাইবেলের আইন রহিয়াছে। এ অবস্থায় আরও কিছু ক্ষমতা চাওয়াটা তাঁহাদের দুর্ব্বলতারই লক্ষণ। আমরা সবাই সব সময়ে সম্পূর্ণ সত্য কথাই লিখি, এরূপ দাবী করি না। খুব শিষ্ট ও ভদ্রভাষা আমরা সব সময়ে সকলেই প্রয়োগ করি, তাহাও বলি না। সর্ব্বদাই ভদ্র ও সত্যভাষী হওয়াই উচিত, তাহাও স্বীকার্য্য। কিন্তু আইন করিয়া যেমন অন্য সব লোককে—মন্ত্রীদিগকেও—সত্যবাদী ও শিষ্টাচারী করা যায় না, তেমনি সাংবাদিকদিগকেও করা যায় না। এরূপ চেষ্টা ব্যর্থ হইবেই।

মন্ত্রীদের নিজেদের পক্ষের কাগজগুলির সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হইবে?

—

বিহার প্রদেশে ও আসাম প্রদেশে বাঙালী

গুজরাট মহারাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি দেশ বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত। অন্ধ্র, তামিল-নাদ, কর্ণাটক, প্রভৃতি কয়েকটি দেশ মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত। কিন্তু এই দেশগুলির কোন দেশের লোকেরাই বলেন না, "আমরা খাঁটি ও আসল ও পহেলা নম্বরের বোম্বাইয়া," বা, "আমরা খাঁটি, আসল ও পহেলা নম্বরের মান্দ্রাজী," এবং বাকী সবাই আগন্তুক ও বিদেশী। তাঁহারা সবাই সমান বোম্বাইয়া বা মান্দ্রাজী।

কিন্তু বিহার প্রদেশে যদিও বিহার দেশ, ঝাড়খণ্ড (ছোটনাগপুর) ও খাস্ বাংলার কোন কোন অংশ আছে, তথাপি খাস্ বিহারীরা মনে করেন, তাঁহারাই আদি ও অকৃত্রিম ও পহেলা নম্বরের বিহারপ্রদেশী আর বাকী সবাই আগন্তুক ও বিদেশী। ইহা ভুল। খাস্ বিহারের কায়স্থেরা দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে আগ্রা-অযোধ্যা হইতে বিহারে আসেন, ইহা তাঁহাদেরই স্বজাতি হাইকোর্টের জজ সর্ জোআলাপ্রসাদ তাঁহার একটি রায়ে বলিয়া গিয়াছেন। বেহার হেরাল্ডে ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র ঘোষ এই রায় হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার ও ১২৫ খানি গ্রামের অন্য অনেক বিহারনিবাসী বাঙালীদের পূর্ব্বপুরুষেরা চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বিহারে বসবাস করেন। অথচ বাঙালী বলিয়াই ইঁহারা বিদেশী, এবং বিহারের লালা কায়স্থেরা বিহারী!

বিহারে বাঙালীরা শুধু যে অবাধে যোগ্যতা অনুসারে চাকরী পায় না তাহা নহে, বাঙালী ছাত্রেরা খুব ভাল হইলেও বৃত্তি না পাইতে পারে, কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে না পাইতে পারে, এমন কি পীড়িত হইলে হাসপাতালে স্থান না-পাইতেও পারে। বাঙালী ঠিকাদার ও বাঙালী ব্যবসাদারদিগকে কার্য্যতঃ বয়কট করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

বিহারী-বাঙালী সমস্যা সমাধানের ভার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমীটি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপর দিয়াছেন। তিনি বিবেচক ও নির্ভরযোগ্য উপযুক্ত ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে এক জন বিহারের বাঙালী—যেমন প্রফুল্লরঞ্জন দাস মহাশয়—ও এক জন যোগ্য অ-বাঙালী অ-বিহারীকে দিলে ভাল হইত, এবং তাঁহার পক্ষেও কাজটি সহজ হইত।

আসাম প্রদেশের বাঙালীদের অবস্থা আরও বিচিত্র।

খাস আসাম, শ্রীহট্ট গোয়ালপাড়া প্রভৃতি বঙ্গের কয়েকটি অঞ্চল, এবং নাগা কুকি লুসাই খাসিয়া প্রভৃতি আদিম জাতিদের দেশ লইয়া আসাম প্রদেশ গঠিত। এই প্রদেশে বাংলাভাষাভাষী লোকদের সংখ্যা অন্য যে-কোন ভাষাভাষী লোকদের চেয়ে বেশী—অসমীয়াভাষী-দের চেয়েও বেশী। অথচ, যেহেতু প্রদেশটির নাম দেওয়া হইয়াছে আসাম, সেই জন্য অসমীয়াভাষীরা (এবং গবর্মেণ্টও) মনে করেন তাঁহারাই পহেলা নম্বরের আসামপ্রদেশী, এবং বাঙালীরা বিদেশী!

—

ভাষা অনুসারে প্রদেশ

কথায় গবর্মেণ্ট বলেন, কংগ্রেসও বলেন, ভাষা অনুসারে প্রদেশ গঠিত হওয়া উচিত। বঙ্গের সাবেক অঙ্গচ্ছেদ রদ করিয়া যখন আবার আরও চাতুরী সহকারে ২ নং বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ১৯১২ সালে হইয়াছিল এবং বঙ্গের এক টুকরা বিহারের ও এক টুকরা আসামের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, তখন ইহার প্রতিকার একটা সীমা-কমিশন বসাইয়া করা হইবে, এইরূপ একটা সরকারী অঙ্গীকার দেওয়া হইয়াছিল। সাইমন কমিশনের রিপোর্টেও সেই প্রতিশ্রুতি সমর্থিত হয়। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত সেই সরকারী অঙ্গীকার পালিত হয় নাই। উড়িষ্যা প্রদেশ ভাষা অনুসারে গঠিত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গের সম্বন্ধে সেরূপ বিবেচনা করা হয় নাই।

কংগ্রেস স্বতন্ত্র অন্ধ্র প্রদেশের পক্ষে, স্বতন্ত্র কর্ণাটক প্রদেশের পক্ষে। মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী গবর্মেণ্ট অর্থাৎ মন্ত্রীরা ইহাতে রাজী আছেন। কলিকাতায় নিখিলভারতকংগ্রেস কমীটির অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বিহার প্রদেশের বাংলাভাষী অংশগুলি বঙ্গের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হউক। কিন্তু বিহারের কংগ্রেসীরা ও কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বলিয়াছেন, ইহা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের আছে! তাহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু যেমন বোম্বাই ও মান্দ্রাজের কংগ্রেসী গবর্মেণ্ট ভাষা অনুসারে অন্ধ্র ও কর্ণাটক প্রদেশ গঠনের সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনই বিহারের কংগ্রেসী গবর্মেণ্টও ভাষা অনুসারে বাংলা প্রদেশ ও বিহার প্রদেশ গঠনের পক্ষে মত প্রকাশ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইলে খনিজসম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী বঙ্গের কয়েকটি অঞ্চল ও অনেক রাজস্ব যে বিহারের হাতছাড়া হইয়া যায়!

এদিকে, বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভা ও মন্ত্রিসভা বিহার প্রদেশের ও আসাম প্রদেশের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি ফিরিয়া পাইবার দাবী করেন নাই, ইহাও মনে রাখা ও দরকা কর্ত্তব্য।

ভারতশাসন-আইনের নানা ব্যবস্থাই এরূপ যে, বাংলা দেশই বাংলা দেশের মিত্র নহে, এবং বঙ্গের বাহিরের প্রদেশগুলিও বঙ্গের মিত্র নহে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যেরূপই হউক, আমাদের সমুদয় সামাজিক, সাহিত্যিক ও অন্য সাংস্কৃতিক সমুদয় সভা-সমিতি ও প্রতিষ্ঠান বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের সমুদয় বাঙালীকে লইয়া যাহাতে হয়, সেই চেষ্টা আমাদিগকে সর্ব্বদাই করিতে হইবে। বঙ্গ ও "বৃহত্তর বঙ্গ" অন্তরে একটি অখণ্ড সত্তা থাকুক ও হউক।

—

ভাষা অনুসারে প্রদেশ গঠনের অন্য দিক

ভারতবর্ষে নানা ভাষা প্রচলিত। সমগ্রভারতের একটি কোন রাষ্ট্রভাষা হইলেও প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলি ও সাহিত্যগুলি থাকিবে। ইহা সত্ত্বেও এবং ইহা মানিয়া লইয়াও আমাদিগকে এক মহাজাতি বা নেশ্যন হইতে হইবে। এক-একটি প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চল থাকিলে এই মহাজাতি গঠনের প্রস্তুতি ও সাহায্য হয়। এক-একটি ভাষা অনুসারে এক-একটি প্রদেশ গঠিত হইলে ইহাতে বাধা ঘটে?

কিন্তু বহুভাষাভাষী কোন কোন প্রদেশের কোন কোন ভাষাভাষী লোকসমষ্টির প্রাদেশিক-সংকীর্ণতা-বশতঃ এক এক ভাষা অনুসারে প্রদেশ গঠন আবশ্যক হইয়াছে। অবাঙালীরা যাহাই মনে করুন বা বলুন, বাঙালীরা এইরূপ প্রাদেশিকতার দৃষ্টান্ত প্রথম দেখায় নাই, এই প্রাদেশিকতা তাহাদের মধ্যেই সর্ব্বাধিক নহে।

—

লেখিকা ও লেখকদিগের প্রতি অনুরোধ

বাংলা দেশের সাধারণ মাসিকপত্রগুলিতে বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ এবং তদ্ভিন্ন কবিতা, গল্প ও উপন্যাস ছাপিতে হয়। এইরূপে নানা প্রকার পাঠিকা ও পাঠকদের রুচি অনুযায়ী রচনা প্রকাশিত করিলে তবে মাসিক পত্রিকা চালান সম্ভব হয়। বৈচিত্র্যসম্পাদনের নিমিত্ত কোন বিষয়ের রচনার জন্যই বেশী জায়গা দিতে পারা যায় না। দীর্ঘ প্রবন্ধ ও ও গল্প ছাপিলে তাহাদের সংখ্যা কম হয়, সুতরাং বৈচিত্র্য যথেষ্ট হয় না। এই জন্য লেখিকা ও লেখকদিগের নিকট অনুরোধ, তাঁহারা যেন প্রবন্ধ, গল্প, ও উপন্যাসের এক একটি কিস্তি অতিরিক্ত দীর্ঘ না করেন। প্রবন্ধ প্রবাসীর পাচ ছয় পৃষ্ঠায়, এবং উপন্যাসের এক এক কিস্তি ও গল্প আট পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ হইলেই ভাল হয়। আমরা দীর্ঘতর প্রবন্ধাদি ছাপিয়াছি বটে, কিন্তু আমরা যাহা চাই তাহা লিখিলাম।

দেশ-বিদেশের কথা

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ রাষ্ট্রীয় কর্মীরূপে সুপরিচিতা। সম্প্রতি তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটার সহকারী সভাপতির পদে নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন।

শ্রীমতী শান্তিসুধা ঘোষ বরিশাল মিউনিসিপালিটির কমিশনার নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন।

শ্রীমতী কমলা রায় ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের পত্নী। ১৯৩৬ সালে তিনি ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; উদ্ভিদবিদ্যা তাঁহার প্রধান অধীতব্য বিষয় ছিল। অতঃপর চীন ও জাপান ভ্রমণান্তে তিনি প্যারিসে যান ও সুবিখ্যাত ন্যাচারাল হিষ্ট্রি মিউজিয়মের অন্তর্গত অপুষ্পক-উদ্ভিদ-পরীক্ষাগারের অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে, শৈবাল সম্বন্ধে গবেষণা করেন। এই গবেষণা দ্বারা তিনি সম্প্রতি ডক্টরেট উপাধি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমতী কমলা দেবী "বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-শিক্ষা" সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বসন্ত স্বর্ণপদক" লাভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "মোক্ষদাসুন্দরী স্বর্ণপদক" লাভ করিয়াছেন। এই প্রতিযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা-গ্রাজুয়েটগণ যোগ দিতে পারেন।

শ্রীমতী চিত্রলেখা গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্গীয় সঙ্গীত-সমিতির দ্বারা পরিচালিত নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় খেয়াল, ঠুংরি, ভজন, গজল ও নোটেশনের প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া সব কয়টি বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১৯৩৮ সালের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী বলিয়া নির্ণীত হন। গত চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায়ও তিনি খেয়াল ও ঠুংরি গানে প্রথম স্থান অধিকার করেন। শ্রীমতী চিত্রলেখা রামপুরের প্রসিদ্ধ ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁ সাহেবের ছাত্রী।

রসায়নবিদের বিদেশ-যাত্রা

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানীর অন্যতম ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মৈত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মৈত্র সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রাধিকামোহন-বৃত্তি লাভ করিয়া রসায়ন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুশীলন ও বিভিন্ন রাসায়নিক কারখানার কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য বিদেশযাত্রা করিয়াছেন। তিনি এ-বিষয়ে সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলে ক্যালকাটা কেমিক্যাল বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইবে।

গত শরতে মুসোলিনীর জার্ম্মেনী-পরিদর্শনের সময় নাৎসী ও ফাসিষ্ট সম্মিলনে আনন্দ প্রকাশের শোভাযাত্রায় মুসোলিনী ও হিট্লার

চীন-জাপান যুদ্ধে বাধা দিবার জন্য ব্রিটেন আমেরিকাকে অগ্রসর করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে—"তুমি এগিয়ে যাও, আমরা তো পিছনে আছিই।"
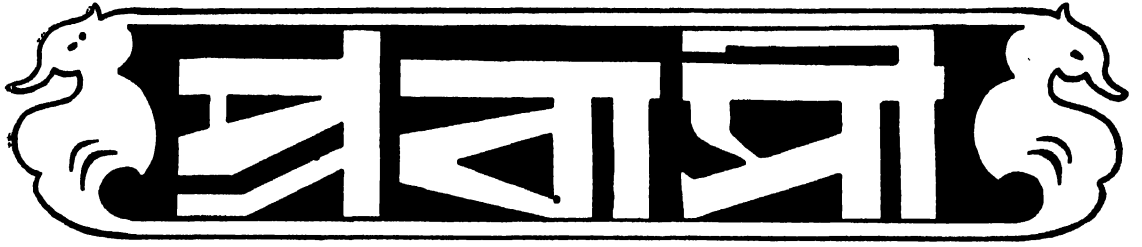
"সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৮-শ ভাগ ১ম খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫ | ২য় সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

[আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত]

৬ই আষাঢ় ১৩০৯
শান্তিনিকেতন
বোলপুর

বন্ধু

আষাঢ় আসিয়াছে কিন্তু আষাঢ়ের সেই চিরন্তন নব ঘনঘটা এবার এখনো দেখা দিল না। আমরা সেই জন্য হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি। এখানে চারিদিকে অবারিত প্রান্তর—কোথাও দৃষ্টির কোন বাধা নাই—মেঘের লীলাস্থল এমন আর নাই—এইখানেই জয়দেব বিপুলচ্ছন্দে তমালবনে বর্ষারাত্রির বর্ণনা লিখিয়াছিলেন। এখান হইতে জয়দেবের জন্মভূমি ছয় ক্রোশ—চণ্ডীদাসের জন্মভূমিও অধিক দূর নহে। এই জায়গায় ঘন বর্ষার সময় একবার তোমাকে গ্রেফ্‌তার করিতে পারিলে চমৎকার হয়। এক এক সময় বিদ্যুতের মত আমার মনে হয় যে-সব কাজকে আমরা অত্যন্ত বেশি মনে করি—বক্তৃতা করি, লিখি, হাঁসফাঁস করিয়া বেড়াই, দেশ উদ্ধার করিবার ফিকির করি—এ সমস্তই বাজে কাজ। জীবনটা ইহাতে কেবল খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ হইয়া যায়। প্রেমই নিত্য, শান্তিই চিরন্তন—দুঃখ এই যে, মানুষকে ক্ষণিক ক্ষোভ সাময়িক শ্রান্তি কাটাইয়া এই নিত্য পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। এমনি করিতে করিতেই জীবনটা কাটিয়া যায়—তখন কোথায় তুমি কোথায় আমি! সম্পূর্ণতার ছবি কেবল মরীচিকার মত আগে আগে চলে তাহার পথের আর শেষ নাই। এমন করিয়া কে আমাদিগকে কেবলি টানিয়া চলিয়াছে? এক একবার ইচ্ছা করে বিদ্রোহ করি—সব কাজকর্ম্ম ফেলিয়া মুখামুখি করিয়া বসি—হৃদয়টাকে পূর্ণ করিয়া তুলি। কিন্তু পথের আহ্বান যখন আসে তখন লক্ষ্মীছাড়া আর বসিয়া থাকিতে পারে না—আবার দৌড়, আবার দৌড়! একটা পাকের মধ্যে পড়িয়া গেছি, সমস্ত বিশ্বজগৎটা একটা পাক—কেবলি ঘুরিতেছে—ঘোরাই যেন তাহার পরিণাম—মানবলোকও একটা পাক—কেবলি ঘুরিয়া চলিতেছে তাহার পরিণাম কোথায়? এই জন্যই ভগবান বুদ্ধ ব্যাকুল হইয়া এই পাক হইতে কোন মতে বাহির হইবার জন্য এত চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমস্ত মানুষ বাহির না হইলে একজনের বাহির হইবার জো নাই। জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া এই মানুষঘুর্ণীতে ঘুরিয়া মরিতে হয়। তোমাদের বিজ্ঞানের মতে

আকাশের এক জায়গায় পাক খাইয়া জগৎ অগণ্য গ্রহ-তারায় ঝলকিয়া উঠিয়াছে—কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ বলে না? এই পাকের মধ্যে অগণ্য চক্র—নক্ষত্রচক্র, সৌরচক্র, গ্রহচক্র, জীবচক্র—এই পাকের বাহিরেই স্থির শান্তি। প্রাণটা সেইখানকার জন্য দুই হাত বাড়ায়, কিন্তু ভীষণ জগতের টান তাহাকে আপনার অনন্ত ঘূর্ণায় বার বার টানিয়া লয়। প্রেমে যেন এই পাকের মধ্যেও একটুখানি স্থিতি ও পরিপূর্ণতার আভাস পাওয়া যায়। দুইটি হৃদয় মুখামুখি করিয়া বসিলে জগৎচক্রের ঘর্ঘরশব্দ কিছুক্ষণের জন্য যেন শোনা যায় না—তখন লাভক্ষতি সুখদুঃখ পাপপুণ্য জয়পরাজয়ের তোলাপাড়া কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া থাকা যায়। কিন্তু তোমার বিজ্ঞানদিগ্বিজয়-যাত্রার সময় 'এই' সকল কবির ক্রন্দন ঠিক নহে, এখন জয়ভেরীর বাদ্যই বাদ্য, এখন হৃদয়ের কথা হৃদয়ের মধ্যেই থাক্।

তুমি জর্মনি আমেরিকায় তোমার জয়পতাকা নিখাত করিয়া আসিয়ো। তাড়াতাড়ি করিয়ো না। আমি বোধ হয় দুই এক মাসের মধ্যেই তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারিব—তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। এখন আমরা তোমাকে কাছে ডাকিব না। আগে তোমার কাজ সারিয়া আইস—তাহার পরে দীর্ঘ সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়া কেদারা টানিয়া বসা যাইবে।

আমার শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে একটি জাপানী ছাত্র সংস্কৃত শিখিবার জন্য আসিয়াছে। ছেলেটি বড় ভাল। সে বেশ আমাদের আপনার লোক হইয়া আসিয়াছে।...

তোমার রবি

ওঁ

Thomson House

১৫ই আষাঢ় ১৩১০

বন্ধু

*   *   *

...বিদ্যালয়ের জন্য আমার উদ্বেগের সীমা নাই। এখান হইতে তাহার সংস্কার সম্প্রতি করিব এমন্ উপায় মাত্র নাই—সমস্তই অব্যবস্থার মুখে ফেলিয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছে—কবে যাইতে পারিব তাহার কোন ঠিকানা নাই। কি আর বলিব। তুমি মোহিতবাবু ও রমণীকে লইয়া বিদ্যালয়কে দাঁড় করাইয়া দাও—ইহাকে তোমাদের জিনিষ বলিয়াই মনে করিয়ো। আমি নিতান্ত একলা হওয়াতেই এত বিঘ্ন হইতেছে—তোমরা আমার সঙ্গে যোগ না দিলে আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে। নূতন যে-সকল অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দাও—ছেলেদের খাওয়া-দাওয়া এবং চরিত্র পরিদর্শনের যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দাও—অধ্যয়ন-অধ্যাপনের নিয়ম বাঁধিয়া দাও—নহিলে এই সময়ে মাঝপথে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলে আর শৃঙ্খলা স্থাপনা কঠিন হইবে—বিদ্যালয়ের বদনাম হইবে এবং বর্ত্তমান অরাজকতার অবস্থায় এমন সকল কুনীতি কুশিক্ষা কুদৃষ্টান্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে যে ভবিষ্যতে কেবল মাত্র অনুতাপ করিয়া তাহার সংশোধন হইতে পারিবে না। কুঞ্জবাবু সপরিবারে আছেন, দিনরাত্রি ছেলেদের উপর দৃষ্টি রাখা তাঁহার দ্বারা সম্ভবপর নহে—অনেক নূতন ছেলে আসিয়াছে তাহাদের চরিত্র ও আচরণ কিরূপ ঠিক জানি না—তাহারা বিদ্যালয়ে যদি কোন কলুষ আনয়ন করে তবে আক্ষেপের সীমা থাকিবে না। তুমি আর লেশমাত্র বিলম্ব করিয়ো না। মোহিতবাবু বিদ্যালয়ের সমস্ত অবস্থা দেখিয়া জানিয়া আসিয়াছেন তাঁহাকে সত্বর ডাকাইয়া আমার এই চিঠি দেখাইয়া একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়ো।...চিঠি লিখিবার সময় অত্যন্ত অল্প—এই জন্য মোহিতবাবুকে চিঠি লিখিতে পারিলাম না। তুমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক উদ্বেগ জানাইলে তিনি কখনই উদাসীন থাকিবেন না—তাঁহাকে অনেক খাটাইয়াছি আরো অনেক খাটাইব। এ বিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ তোমাদের নিজের করিতে হইবে। যতক্ষণ লিখিতেছি ততক্ষণ আমার ঘুমানো উচিত ছিল কিন্তু বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অব্যবস্থায় আমাকে বিশ্রাম করিতে দিতেছে না। ছুটি কবে পাইব?

তোমার রবি

ওঁ

শিলাইদহ

বন্ধু

তোমার চিঠি পাইয়া বিশেষ সান্ত্বনা অনুভব করিয়াছি। আমাদের চারিদিকেই এত দুঃখ এত অভাব এত অপমান পড়িয়া আছে যে নিজের শোক লইয়া অভিভূত হইয়া এবং নিজেকেই বিশেষরূপ দুর্ভাগ্য কল্পনা করিয়া পড়িয়া থাকিতে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমি যখনই আমাদের দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া দেখি তখনি আমাকে আমার নিজের দুঃখতাপ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনে। আমাদের অসহ্য দুর্দ্দশার মূর্ত্তি ঘরে ও বাহিরে আজকাল এমনি সুপরিস্ফুট হইয়া দেখা দিয়াছে যে নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতি লইয়া পড়িয়া থাকিবার সময় আমাদের আর নাই।

এবারকার কন্‌গ্রেসের যজ্ঞভঙ্গের কথা ত শুনিয়াছই—তাহার পর হইতে দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে দিনরাত্রি নিযুক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ বিচ্ছেদের কাটা ঘায়ের উপর দুই দলে মিলিয়াই নুনের ছিটা লাগাইতে ব্যস্ত হইয়াছে। কেহ ভুলিবে না, কেহ ক্ষমা করিবে না—আত্মীয়কে পর করিয়া তুলিবার যতগুলি উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিবে। কিছু দিন হইতে গবর্মেণ্টের হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে—এখন আর সিডিশনের সময় নাই—যেটুকু উত্তাপ এত দিন আমাদের মধ্যে জমিয়াছিল তাহা নিজেদের ঘরে আগুন দিতেই নিযুক্ত হইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া "বন্দে মাতরম্" কাগজে স্বাধীনতার অভয়মন্ত্রপূর্ণ কোনো উদার কথা আর পড়িতে পাই না, এখন কেবলি অন্য পক্ষের সঙ্গে তাহার কলহ চলিতেছে। এখন দেশে দুই পক্ষ হইতে তিন পক্ষ দাঁড়াইয়াছে—চরমপন্থী, মধ্যমপন্থী এবং মুসলমান—চতুর্থ পক্ষটি গবর্ণমেণ্টের প্রাসাদ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া মুচ্‌কি হাসিতেছে। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানেই বয়। আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য আর কারো প্রয়োজন হইবে না—মর্লিরও নয় কিচেনারেরও নয়—আমরা নিজেরাই পারিব। আমরা "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিতে করিতে পরস্পরকে ভূমিসাৎ করিতে পারিব।

শরৎ বহু দিনের পর তোমাদের ওখানে দিশি রান্না খাইয়া এবং বৌঠাকুরাণীর শাড়িপরা স্নিগ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া ভারি খুশি হইয়া বেলাকে চিঠি লিখিয়াছে।

কারখানা ঘরের কাজ চালাইবার উপযুক্ত Engine lathe প্রভৃতির কথা তোমার চিঠিতে পড়িয়া বিশেষ লোভ জন্মিতেছে। আমি যেমন করিয়া পারি বোলপুরে টেক্‌নিকাল বিভাগ খুলিব। ধর্ম্মপাল আমাকে গোটাকতক কল দিতে স্বীকার করিয়াছে। তাহার কতকগুলি কৃষি-ব্যাপারের যন্ত্র আছে, একটা কাপড় কাচিবার আমেরিকান কল আছে। সে বলে আমি যদি টেক্‌নিকাল বিভাগ খুলি তাহা হইলে আমাকে সাহায্য জোগাড় করিয়া দিবে। কিন্তু তাহার condition এই যে এই টেকনিকাল বিভাগের নাম রাখিতে হইবে Indo-American Industrial School। আমি তাহাকে লিখিয়াছি সাহায্যের পরিমাণ যদি যথেষ্ট এবং যদি যথার্থ কাজের হয় তাহা হইলে আমেরিকার ঋণ স্বীকার করিতে আপত্তি করিব না। আচ্ছা, তোমাকে যদি হাজার খানেক টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাই তবে সুরেশকে দিয়া আমার Workshopএর মালমসলা কিনাইয়া পাঠাইয়া দিতে পারিবে কি? এ-সম্বন্ধে তোমার উত্তর পাইলে টাকা জোগাড়ের চেষ্টা দেখিব।

রথীর চিঠি প্রায়ই পাই। তাহারা সেখানে আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে পড়াশোনা করিতেছে। বলা বাহুল্য তুমি আমেরিকায় গেলে তাহাদের অত্যন্ত আনন্দ হইবে—নিশ্চয়ই তাহারা তোমাকে তাহাদের কলেজে টানিয়া লইয়া যাইবে। তোমার সঙ্গে আমিও জুটিতে পারিলে কত খুশি হইতাম। বৌঠাকরুণকে আমার কথাটা স্মরণ করাইয়া দিয়ো—সমুদ্রের এপারের কালো বন্ধুদের ভাগে হৃদয়ের একটা অংশ রাখিয়া দেন যেন। ইতি ২৩শে পৌষ ১৩১৪।

তোমার রবি

নববর্ষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রতিদিনই প্রভাত আমাদের কাছে একটি যবনিকা তুলে ধরে; সে কেবল আঁধারের যবনিকা নয়—সমস্ত দিন-রাত্রির অবসাদ মলিনতা ঘুচিয়ে প্রভাতকাল আমাদের কাছে বিশ্বের চিরকালের নবীন রূপ প্রকাশ করে। প্রতিদিন সকালে পাখির গানে পাই বারে বারে নূতনকে পাওয়ার আনন্দ। যা কিছু চিরকালের সামগ্রী তার উপরে যে জীর্ণতার আবরণ পড়ে তা যে সত্য নয় প্রভাত আনে এই বার্তা।

আমাদের যে-সংকল্প ব্যবহারের দ্বারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আমাদের যে-বিশ্বাসের ধারা কর্মকে বেগ জোগায় তা যখন দৈনিক অন্ধ অভ্যাসের বাধায় স্রোত হারিয়ে ফেলে তখন এই সকল জরার তামসিকতা সরিয়ে দিয়ে সত্যের প্রথমতম নবীনতার সঙ্গে নূতন পরিচয়ের প্রয়োজন হয়, নইলে জীবনের উপর কেবলি ম্লানতার স্তর বিস্তীর্ণ হ'তে থাকে। আমাদের কর্মসাধনার অন্তর্নিহিত সত্যের ধূলিমুক্ত উজ্জ্বল রূপ দেখবার জন্যে আমরা বৎসরে বৎসরে এই আশ্রমে নববর্ষের উৎসব করে থাকি। যে উৎসাহের উৎস আমাদের উদ্যমের মূলে তার গতিপথে কালের আবর্জনা যা কিছু জমে ওঠে এই উপলক্ষ্যে তাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করি।

আমার দিক থেকে এবার এই উৎসবের সঙ্গে অন্যবারের উৎসবের একটু প্রভেদ আছে। তোমরা জানো, কিছুকাল পূর্বে আমি মৃত্যুগুহা থেকে জীবন-লোকে ফিরে এসেছি। যে-মূলধন নিয়ে সংসারে এসেছিলাম, কর্মপরিচালনার জন্য শরীর মনের যে শক্তির আবশ্যক তা যেন আজ পূর্ণ পরিমাণে নেই, অনেকটা তার লুপ্ত হয়েছে অতলস্পর্শে। এই অবস্থায় উৎসবে তোমাদের সকলের সঙ্গে সম্মিলনের বাণী আমার কণ্ঠে ঠিক না ফুটতে পারে। তোমাদের জীবনে এখনো নূতন অধ্যায়ের রচনা হবে, নূতন সাধক এসে এখানকার সত্য লক্ষ্য ঘোষণা করবেন, তোমরা সকলে মিলে কর্ম-ব্রতে নূতন পর্যায় আরম্ভ করবে। আমার নিজের কাছে আমার প্রশ্ন এই, জীবনে এই যে রিক্ততার পর্ব নিয়ে এসেছি এ কি একটা নূতন পূর্ণতার ভূমিকা? যে-জীবনকে নানা দিক থেকে নানা অভিজ্ঞতায় বিচিত্র ক'রে সার্থক করেছি, যাত্রার শেষ প্রান্তে সে আমাকে সহসা একান্ত শূন্যতার মধ্যে পৌঁছিয়ে দিয়ে তার সমস্ত উপলব্ধিকে নিঃশেষে ব্যর্থ করে মিলিয়ে যাবে এ কথা ধারণা করা যায় না। আমার মনে হয় ক্রমে ক্রমে এই বোঝা ঘুচিয়ে দেবার রিক্ততাই সব চেয়ে আশ্বাসের বিষয়।

কিছুকাল হ'ল আমার ঘরের সামনে দেখা গেল শিমুল গাছ তার সব পাতা ঝরিয়ে দিলে, যেন সন্ন্যাস গ্রহণ করলে। তার যে পল্লবঘন স্নিগ্ধ শ্যামলতায় চোখ জুড়িয়ে দিয়েছে তার মমতা ঘুচিয়ে দিলে; চোখে দেখে মনে হয় এ বুঝি একান্ত অবসানের লীলা। কিন্তু যখন সম্পূর্ণ ভার লাঘব হ'ল, দেখতে দেখতে এল ফুলের ঐশ্বর্য, অবারিত দাক্ষিণ্যে আমন্ত্রণ করল দূর দেশ থেকে মধু-পিপাসীদের। জড়জগতে ক্ষয় যা তা ক্ষয়ই থেকে যায়—প্রাণজগতে দেখতে পাই এক জাতের ক্ষতি আর এক জাতের পূর্ণতাকে স্থান ছেড়ে দেয়। জীবের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় এক একটা পর্ব অবসান হয়ে নূতন যে পর্ব আসে তা অভাবনীয়, যেন তা অতীতের প্রতিবাদ। প্রাণলক্ষ্মী পৃথিবীতে তাঁর প্রথম জীবলীলা সুরু করলেন বিরাটকায়া বিকটমূর্তি জন্তু নিয়ে। প্রবল তাদের ক্ষুধা, বিপুল তাদের অস্থিমাংস, তাদের বর্ম, তাদের লাঙ্গুল। তারা ক্রমে পড়ল আড়ালে। জীবনের অদ্ভুত অতিশয়োক্তি কমে গিয়ে পরিমিত আকার ধারণ করল।

বিশুদ্ধ প্রাণের ধর্মে একটা দ্বন্দ্ববিরোধের নিরন্তর উদ্যম আছে। নিষ্ঠুর হিংস্রতার দ্বারা প্রাণীকে সংসারে

নিজের স্থান অধিকার করে নিতে হয়। যে প্রাণী দুর্বলতর প্রাণীকে ঠেলে সরিয়ে দিতে না পারে সে নিজেই সরে যায়। এই দ্বন্দ্ব নিয়েই জীবন চলছে, প্রাণপ্রকৃতি জয়যাত্রায় এগোয় নির্মম দস্যুবৃত্তির সহায়তায়।

মানুষ যেই জীবলোকে এল বোঝা গেল এইবার হ'ল বিপরীত লীলার সূচনা। কোথায় তার দেহের প্রকাণ্ডতা, তার চর্মাবরণের স্থূল কাঠিন্য, কোথায় তার দন্তনখরের ভীষণ অস্ত্রসজ্জা; এই কোমলচর্ম নিঃসহায় দুর্বলকে দানবজন্তুদের রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে যে ছেড়ে দেওয়া হ'ল কোন্ অভূতপূর্ব নতুন পালা সুরু করবার জন্যে।

সেই আরম্ভকালে মানুষের মধ্যেও প্রবল ছিল প্রাণলোকের প্রেরণা; আহার-ব্যবহারে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ধ্বংস ক'রে আমি আধিপত্য লাভ করব এই উৎসাহ তার মধ্যে একান্ত ছিল। কিন্তু এরই ফাঁকে ফাঁকে রচনা চলেছে নূতন অধ্যায়ের। মানুষ জন্তুর সঙ্গে সঙ্গে এল তার প্রধান ধর্ম যাকে আমরা বলি মনুষ্যত্ব। এটা সম্পূর্ণ নূতন, কোনো জন্তু এর অর্থ কল্পনাই করতে পারবে না। বুদ্ধির ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণ জন্তুর চেয়ে ভয়ানক জন্তু, সে বাঘের চেয়ে দারুণতর বাঘ, সাপের চেয়ে ক্রূরতর সাপ। কিন্তু এই বিরুদ্ধতার মধ্যেই তার মানবধর্ম বার বার মার খেয়েও আপন সম্মান ঘোষণা করছে। দেখা গেল মানুষ জন্তু হয়ে প্রবল হয় কিন্তু রক্ষা পায় না। অদ্ভুত ব্যাপার এই ঘটে যে পাশব মানুষ উপস্থিতমতো সিদ্ধি লাভ করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচে না।

মধ্যযুগে মধ্য-এশিয়ার তাতারদের কথা মনে করা যাক। অহৈতুক হিংস্রবৃত্তি করবার জন্য তারা নরমুণ্ডের স্তূপ বানিয়ে তুলেছে। সর্বনাশের জয়ধ্বজা উড়িয়েছে দেশে দেশে। কিন্তু মনুষ্যলোকে পশুর জিৎ উজ্জ্বল হয়ে টিকল না।

আজকের দিনে মানুষের যে সভ্যতা দেখছি সে কি এই হিংস্র তাতারদের? মানুষের মধ্যে প্রাণধর্ম ছাড়া আরো কিছু ছিল যেজন্য সে পরের জন্য আত্মত্যাগ করেছে, ভাবী কালের জন্য বর্তমানের সুখকে বিসর্জন করেছে—পশু তো তা পারে না। এমনি করেই জীবনে নূতন পর্ব আসে, মানুষের মহিমা পশুত্বকে অতিক্রম করে। বিপুল হত্যাকাণ্ডকে শৌ আমরা মনুষ্যত্ব বলি না। মানুষের মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে যা হিংসা নিবারণের দিকেই কাজ করে, তা যদি ক্ষুদ্রও হয় তবু ভয় নেই—

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

এই হিংস্রতাই বুঝি শেষ, এই কলুষেরই বুঝি জয় হবে—এই হচ্ছে আমাদের ভয়—কিন্তু ধর্ম স্বল্পপরিমাণে বিদ্যমান থাকলেও তা আমাদের আনন্দিত করে—ভয় নেই, মনুষ্যত্বেরই জয় হবে।

জন্তুদের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক যে-সব বৃত্তি আছে তা তারা আপনিই লাভ করে, সেজন্য তাদের শিখতে হয় না। সামান্য উইপোকা, তার চক্ষু নেই কানে শুনতে পায় না—তবু আশ্চর্য তাদের নির্মাণশক্তি। এজন্য তাদের কোনো সাধনা করতে হয় নি—জন্মাবধিই তারা শক্তি পেয়েছে। উইদের মধ্যে যারা কর্মী, তারা জন্ম থেকেই কর্মী, যারা রাণী তারা জন্ম থেকেই রাণী—এজন্য কোনো ইস্কুলে তাদের পড়তে হয় নি। মানুষকে শিখতে হয়, সাধনা করতে হয়। যে হেতু পশুদের মতো মানুষের বংশানুস্মৃতি নয় সেই জন্যেই অশ্রদ্ধেয় এই কথা যে কেবলমাত্র অন্ধ প্রজনন ধারাতেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ হবার জন্য মানুষকে আধ্যাত্মিক সাধনা করতে হয়। প্রত্যেক মানুষকেই আপনার শক্তি উদ্ভাবন ক'রে নিতে হয়। মানুষের শক্তির উৎকর্ষ দেখতে হ'লে সে দেখা যায় একক ভাবে বিশেষ মানুষের মধ্যে। সেই মানুষকে দেখব কোথায়। সেই মানুষ হয়তো জন্মেছে অন্ত্যজের গৃহে, তবু হয়তো সে ব্রাহ্মণের চেয়ে বড়ো, আত্মার তেজে পূর্বপুরুষের সমস্ত সংস্কারকে ছাড়িয়ে এসেছে। এমন মানুষ পশু-ধর্মকে সহজে ত্যাগ করেছে, নিশ্চয়ই তার চেয়ে বড়ো সম্বল সে খুঁজে পেয়েছে; এমন লোককে দেখলে বুঝতে পারি জীবনে নূতন পর্বের সূচনার কথা।

জীবনে অনেক কর্ম করেছি সুখদুঃখভোগ অনেক হয়েছে; এখন যদি ইন্দ্রিয়শক্তি ক্লান্ত হয়ে থাকে তবে অধ্যাত্মলোক

বাকি আছে; আমাদের যে-শক্তি ক্ষুধাতৃষ্ণার দিকে আসক্তির দিকে আমাদের গুহাবাসী জন্তুটাকে তাড়না করে তা যদি ম্লান হয় তবেই আশা করি অন্তরের দিক থেকে মনুষ্যত্বের সিংহদ্বার খোলা সহজ হবে। রিক্ততার পথ দিয়েই পূর্ণতার মধ্যে পৌঁছানো যাবে। বোঁটার বাঁধন থেকে ফল খসে যায়, তাতে তাদের ভয় নেই, তাই শাখার আসক্তি তাদের পিছনের দিকে টানে না, নবজীবনের নব পর্যায়ে তাদের বন্ধন মোচন হয়। তেমনি দেহতন্ত্রে প্রাণের আসক্তি যদি শিথিল হয় তবে তাকে নবজীবনের ভূমিকা ব'লেই জানব।

পশু জন্মায় আর মরে, তার মধ্যে মৃত্যুর অতীত কোনো উপলব্ধি নেই। মানুষের ভিতরে ভিতরে সেই উপলব্ধি আছে এবং তার পরিপূর্ণতা দেখা যায় মহাপুরুষদের মধ্যে, সে যে জীবলীলাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল নিরস্ত্র হয়ে, তার শেষ অর্থ বুঝতে পারি। মানুষই মৃত্যুকে অগ্রাহ্য ক'রে বলতে পারে যা সত্য তা প্রাণের চেয়ে বেশি। সত্য মানুষ কখনো মরে না, মরে পশু। পশুর মরা তার স্বভাবধর্ম, তার বেশি তার কিছু নেই; মানুষ যখন পশুর সামিল হয়ে দাঁড়ায় তখনই মৃত্যুতে তার মহতী বিনষ্টি। আমরা সেই জীবনধর্মকে বরণ করব যা মরে না, মানুষের আত্মার ধর্ম,—সেখানে ন জরা, ন মৃত্যু র্ন শোকঃ। সেই চরম জীবনের উপলব্ধিতেই আজ নববর্ষ আমাদের প্রবৃত্ত করুক।

আমাদের শাস্ত্রে বলেন, পঞ্চাশের পরে বনে যাবে। যখন কর্মে ক্ষীণ হয় আসক্তির প্রবলতা, তখন সেই সুযোগকে সার্থক করবার উপদেশ দিয়েছেন আমাদের গুরুরা। শুধু পঞ্চাশোর্দ্ধং নয়, প্রতিদিনের কার্যের মধ্য দিয়ে অজর অমর অশোকের উপলব্ধির জন্য আমাদের প্রস্তুত হ'তে হবে, নববর্ষের দিনে এই আমাদের সংকল্প।

১ বৈশাখ, ১৩৪৫

[শান্তিনিকেতনে নববর্ষ-উৎসবে আচার্যের উপদেশ]

ঘোড়সওয়ার

শ্রীমণীশ ঘটক

কসাও চাবুক, কসাও ঘোড়সওয়ার
হাতে থাক ধরা নাঙ্গা সে তলোয়ার,
বিজলী-চমক ঝলসাক্ ইস্পাতে
চিরে, ছিঁড়ে যাক্ কালো রাত সাথে সাথে।

সবল পেশী কি গাহিয়া ওঠে না গাথা?
আগুন জলে না শুষ্ক আঁখির কোণে?
কলিজার খুনে ফোয়ারার হাহাকার?
কসাও চাবুক, কসাও ঘোড়সওয়ার,
পাছ-টান আজ কেন রবে তব মনে,
দুষমনে ভরা দুনিয়ার তুমি ত্রাতা!

হায় বেদুইন, জীবনের মরুপথে
নীল আকাশের হাতছানি জেগে রয়,
মরুমরীচির মায়া শেষ হ'তে হ'তে
তারার ইসারা সঙ্কেতে কি যে কয়!

প্রাচীন কলিঙ্গের একটি গ্রাম

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

কয়েক দিন আগে পুরীর নিকট ডেলাং গ্রামে গান্ধী-সেবা-সংঘের বাৎসরিক অধিবেশন দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে গান্ধীজীর একটি বক্তৃতা বড় ভাল লাগিয়াছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাসিগণের মধ্যে প্রাদেশিক সংকীর্ণতার বিষয়ে তিনি অনেক কথা বলিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে ইহাও বলিলেন যে যদি আমরা নিজেদের মধ্যে অহিংসার ভাব পোষণ করিতে না পারি তবে সেই ক্ষীণবীর্য্য অহিংসার সাহায্যে দেশে স্বরাজ আনিবার কল্পনাই বা কেমন করিয়া করি? গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় গান্ধী-সেবা-সংঘ এ-বৎসর সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে হৃদ্যতার ভাব বর্দ্ধিত করা।

পুরাতন মন্দিরের সন্ধানে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। পঞ্জাব, রাজপুতানা, বোম্বাই, কর্ণাটক প্রভৃতি প্রদেশে গিয়া সর্ব্বদাই একটি জিনিষ নজরে পড়িত। দেখিতাম যে সেই প্রদেশের লোকে কি খায়, কেমন ভাবে কাপড় পরে, কিরূপ ঘরে থাকে, ঘোড়ার গাড়ীতে না গরুর গাড়ীতে চড়ে, সবই আমার চোখে নূতন ঠেকিতেছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় অত্যধিক ইংরেজী নাটক-নভেল পড়ার ফলেই বোধ হয় রাশিয়া অথবা নরওয়ের সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার সম্বন্ধে আমি অনেক বেশী সংবাদ রাখি। ইউরোপের ছবির বই খুঁজিয়া খুঁজিয়া পড়িয়াছি, ফলতঃ সে-দেশের গ্রাম্য অধিবাসীর পোষাক-পরিচ্ছদ, আনন্দ-উৎসব, দেশের ঐতিহাসিক স্থান অথবা রমণীয় দৃশ্য সমূহ আমার কাছে খুব পরিচিত হইয়া গিয়াছে। অথচ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের খাওয়া-পরা, আচার-ব্যবহার আমার কাছে তেমন সুপরিচিত নয়।

গান্ধীজীর বক্তৃতাকালে এই কথাটি বার-বার মনে হইতেছিল। মনে হইতে লাগিল যে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার বোধ হয়ত দুই ভাবে কমান যাইতে পারে। এক, যদি পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা থাকে, পরস্পরের জীবনের সম্বন্ধে কৌতূহল সজাগ থাকে, পরস্পরকে জানিবার ও বুঝিবার ইচ্ছা থাকে তবে ইহা হ্রাস পায়। আর দ্বিতীয়, যদি অর্থনৈতিক ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে সাহচর্য্য থাকে, অর্থাৎ যদি খাওয়া-পরা ব্যবসায়-বাণিজ্য সকল বিষয়ে এক প্রদেশ অপর প্রদেশের উপর নির্ভরশীল হয়, উভয়ের উন্নতির জন্য সম্মিলিত আর্থিক চেষ্টার প্রয়োজন হয়, তবেই প্রাদেশিকতার পরিবর্ত্তে আরও উচ্চতর কোনও আদর্শ সুচারুভাবে দেশময় প্রবর্ত্তিত হইতে পারে।

আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম তখন তৃতীয় ভাগের "সুশীল ও সুবোধ বালক" হইতে শিক্ষা পাইয়াছিলাম। সেরূপ বালক "যাহা পায় তাহা খায় এবং কখনও গুরুজনের অবাধ্য হয় না।" কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বদেশী আন্দোলন হইতে আজ পর্য্যন্ত যে-সকল প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলন দেশে বহিয়া যাইতেছে, তাহার ফলে সুশীল ও সুবোধ বালকের আদর্শটি বাংলার ছাত্রমহলে বড় ধাক্কা খাইয়াছে এবং হয়ত এখন পর্য্যন্ত সেই ভাঙার পালাই চলিতেছে। তাহার পরিবর্ত্তে কোনও প্রাণবান ও শুভ আদর্শ সম্যক্‌ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু এই অরাজক অবস্থার মধ্যে একটি লক্ষণ দেখিয়া বড় ভাল লাগে, মনে হয় আমাদের জাতীয় তামসিকতা কাটিয়া কোনও রাজসিক শক্তি জাগিয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশে সম্প্রতি ভ্রমণের স্পৃহা বাড়িয়া গিয়াছে। কেহ সাইক্লে, কেহ পদব্রজে সারা ভারত অথবা সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণের সঙ্কল্প লইয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে। আমাদের দেশে বরাবর

তীর্থযাত্রার রীতি প্রবর্ত্তিত থাকিলেও তাহা অধুনা-শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিশেষ স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিন্তু এবারকার নূতন তীর্থযাত্রার আহ্বান প্রধানতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ইহা আশা এবং আনন্দের কথা। যদি শুধু ভ্রমণের সঙ্কল্প লইয়াও আমরা সর্ব্ববিধ অসুবিধা সহিয়া গ্রামে গ্রামে বেড়াইতে থাকি তবে হয়ত আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যাইবে এবং ক্রমশঃ আমরা ভারতের অশিক্ষিত, অনাদৃত গ্রামবাসী কৃষককুলকে নিজের জন বলিয়া ভাবিতে পারিব। তাহাদের সুখে সুখী হইব, তাহাদের দুঃখে নিজের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া কর্ম্মতৎপর হইব।

কলিঙ্গ দেশটি প্রাচীন। কিন্তু তাহার বিস্তার ঠিক কোন্‌খান হইতে কত দূর পর্য্যন্ত ছিল তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। বিভিন্ন যুগেও কলিঙ্গের সীমার ইতরবিশেষ হইয়াছে। সে-সকল মতামতে আমাদের কিছু আসিয়া যায় না। তবে ভিজাগাপট্টম্ জেলায় অবস্থিত নগরকটকম্, মোখলিঙ্গম্ এবং দন্তাভুরম্ নামক পাশাপাশি তিনটি স্থান যে প্রাচীন কাল হইতে কলিঙ্গের অন্তঃপাতী ছিল ইহা জানিয়া রাখাই আমাদের কাছে যথেষ্ট। বস্তুতঃ এক জন পণ্ডিত সম্প্রতি প্রমাণ করিয়াছেন যে প্রাচীন কলিঙ্গ নগর এক সময়ে এইখানে অবস্থিত ছিল এবং মোখলিঙ্গমের মন্দির পূর্ব্বে মধুকেশ্বর নামে সুপরিচিত ছিল।* গত জানুয়ারি মাসে আমি এই স্থানের পুরাতন মন্দির দেখিতে এবং তাহার বিভিন্ন অঙ্গের মাপ লইতে যাই। সেই সময় স্থানীয় গ্রাম্য জীবনের কিছু কিছু ছবি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। তাহারই কথা আজ বলিব।

মোখলিঙ্গম্ গ্রামটি আগে গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত ছিল। প্রায় দুই বৎসর হইল তাহা ভিজাগাপট্টম্ জেলার অধীন করা হইয়াছে। মাদ্রাজ লাইনে চিকাকোল রোড অথবা তিলারু নামক দুইটি রেলষ্টেশন হইতে মোখলিঙ্গম্ যাওয়া যায়। রেলষ্টেশন হইতে ইহা আনুমানিক চৌদ্দ-পনর মাইল দূরে অবস্থিত। আমি চিকাকোল রোড হইতে তথায় গিয়াছিলাম এবং তিলারুর পথে ফিরিয়া আসি। প্রথম রাস্তায় অনেক দূর মোটর চলাচল আছে, সেই পথ হইতে মাত্র দুই তিন মাইল হাঁটিয়াই মন্দিরে পৌঁছান যায়। কিন্তু হাঁটাপথের মধ্যে একটি নদী পড়ে। তিলারুর পথে নদী পার হইতে হয় না, সাইকল থাকিলে বরাবর শুকনা ডাঙায় মোখলিঙ্গম্ পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, তবে সে-পথে মোটরের সুবিধা মেলে না।

যাহাই হউক, মোখলিঙ্গমের মন্দিরে পৌঁছিয়া দেখি গ্রামটি ছোট হইলেও বেশ প্রাচীন। বংশধারা নামে এক নদীর ধারে তিনটি পুরাতন মন্দির আছে, তাহা ছাড়া যত্র তত্র ভাঙা মূর্ত্তি, পুরাতন শিবলিঙ্গ অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। যে-কয়টি মন্দির বর্ত্তমান তাহার কারুকার্য্যও সুন্দর, গড়নও চমৎকার। মন্দিরের মধ্যে সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হইল যে পূজারীরা ব্রাহ্মণ নহে। ইহাদের জাতীয় নাম কালিঙ্গী এবং ইহারা বর্ণে শূদ্র। শুধু মোখলিঙ্গমে নহে, এবার উড়িষ্যায় মহানদীর উপত্যকায় বহু প্রাচীন মন্দিরে দেখিলাম পূজারা "মালি" নামধারী শূদ্রবর্ণের ব্যক্তি। তাহারা মহাদেবের পূজা করে এবং সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে উপবীত ধারণও করে। এই সকল মন্দিরে অন্নপ্রসাদেরও ব্যবস্থা আছে এবং সর্ব্ববর্ণের লোকই নির্ব্বিচারে তাহা আহার করিয়া থাকে। প্রথমে আমার ধারণা ছিল, হয়ত শুধু পুরীর জগন্নাথক্ষেত্রেই বুঝি অন্ন মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এবার দেখিলাম, শুধু জগন্নাথে নয়, কলিঙ্গের বহু স্থানে এই রীতি প্রচলিত আছে। শাস্ত্রের দৃষ্টিতে ইহা আচার কি অনাচার জানি না, তবে ইহাতে যাত্রীগণের যথেষ্ট সুবিধা হইয়া থাকে। যেখানেই বড় মন্দির আছে সেখানেই পাঁচ পয়সা অথবা দুই আনা খরচ করিলে প্রচুর পরিমাণে আহার্য্য সামগ্রী মিলিয়া যায়। উড়িষ্যার বহু স্থানে মন্দিরই হইল তীর্থযাত্রীর আহার এবং বিশ্রামের স্থল।

কিন্তু তেলুগু-ভাষাভাষী কলিঙ্গ দেশে আরও একটি সুবিধার ব্যবস্থা আছে। বহু গ্রামে দেখিয়াছি ছোটখাট হোটেল আছে। এগুলিতে সচরাচর "কফি ক্লাব" বা "ব্রাহ্মণ কফি ক্লাব" লেখা থাকে। অন্ধ্র দেশের লোকে

---

* Bhabaraj V. Krishnarao: The Identification of Kalinganagara. JBORS. Vol. XV, p. 105.

সিমাচলমের পথে গ্রামের দৃশ্য

বংশধারা নদী

সিমাচলমে কয়েকজন স্ত্রীলোক চাল গুঁড়া করিতেছে

চামরধারিণী, মোখলিঙ্গম

দুর্গা মহিষাসুরমর্দ্দিনী, মোখলিঙ্গম্

নন্দী, মোখলিঙ্গম

শিবের তাণ্ডব নৃত্য, মোখলিঙ্গম্

দিয়া তরকারি বাঁধিয়া দেয়। রাত্রে আহার করিতে বসিয়া দেখি পাতে তরকারির মধ্যে "অষ্টগণ্ডা" না-হইলেও দুই গণ্ডার অধিক লঙ্কা পড়িয়াছে। আমার অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় হোটেলওয়ালার করুণার উদ্রেক হইল। সে বলিল লঙ্কা ত একেবারেই পড়ে নাই, শুধু আমাদের জন্য যতটুকু না-হইলে নয় ততটুকু মাত্র দিয়াছে। সে ইহাও শপথ করিল যে কাল আর একটিও লঙ্কার যোড়ন দিবে না। যাহাই হউক, কিছু দিন ঘোরাঘুরি করার ফলে এ-হেন লঙ্কাও আমার সহিয়া গেল এবং প্রায় প্রতি বৃহৎ গ্রামেই হোটেল থাকায় বেশ নিশ্চিন্ত মনে আমি দেশময় ঘোরাফেরা করিতে লাগিলাম।

চারিনিস নোড, প্যালচেয়ার

এই সকল তথাকথিত ক্লাবে খুব খাওয়া-দাওয়া করে। বিশেষ করিয়া সকালের আহার এইখানেই সমাপন করিয়া লয়। সকালে কফি এবং ওপ্‌মা ও ইড্‌লি নামক দুইটি পদার্থের খুব প্রচলন দেখিলাম। ওপ্‌মা আমাদের সুজির মোহনভোগের মত দেখিতে, কিন্তু ইহা সুজির পরিবর্ত্তে চালের গুঁড়া দিয়া তৈয়ারী এবং চিনির বদলে নুন, কাঁচা লঙ্কা ও পেঁয়াজ দিয়া পাক করা হইয়া থাকে। ইড্‌লি আস্কে পিঠার মত জিনিষ, কিন্তু আকারে মাঝারি ধরণের বিলাতী কেকের মত জিনিস। ইহার একটি খাইলেই পেট ভরিয়া যায়, দামেও খুব সস্তা।

অন্ধ্র দেশের লোকে খুব মিতব্যয়ী, পরিশ্রমও যথেষ্ট করে। তাহারা তরিতরকারি বেশী খায় না, ফলের মধ্যে নারিকেল ও কদলী প্রচুর ব্যবহার করে। রন্ধনে তিলের তেল অথবা ঘৃত প্রচলিত আছে। গব্য ঘৃত অপেক্ষা মহিষ- ও ছাগ-দুগ্ধের ঘৃত বেশী পাওয়া যায়। তরকারিতে লঙ্কা এবং তেঁতুল খুব ব্যবহৃত হয়। দু-এক দিন কফি ক্লাবের লঙ্কায় নাকাল হইয়া এক দিন পুরুষোত্তমপুর নামক একটি গ্রামে দোকানের মালিককে বলিলাম আমার জন্য যেন পুরী এবং একেবারে লঙ্কা না-

সেড়ার পাশ

অন্ধ্র দেশে একটি জিনিষ আমার বেশ ভাল লাগিয়াছিল। উড়িষ্যার গ্রামে লোকে বড় বেলায় উঠে। অন্ধ্রদেশীয়েরা কিন্তু অপেক্ষাকৃত সকালে উঠিয়া নদীতে স্নান করিতে যায়। মেয়েরা মাথায় ও কোমরে ঘড়া লইয়া সারবন্দী হইয়া নদীর ধার হইতে রঙীন শাড়ী পরিয়া যখন ফিরিয়া আসে তখন তাহাদের বড় সুন্দর,

টাণ্ডায় জল তোলার অভিনব রীতি

দেখায়। তাহারা হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত খাটো করিয়া কাপড় পরে, মাথায় ঘোমটা দেয় না এবং খোঁপা বাঁধিয়া তাহাতে ফুল-পাতা গুঁজিয়া রাখে। স্নানের পর মেয়েরা বাড়ীর দাওয়া নিকাইয়া প্রত্যহ প্রত্যুষে শুক্‌না চালের গুঁড়া দিয়া ঘরের সামনে রাস্তার উপর আলপনা দেয়। প্রতিদিন ঘরদোর নিকানো হয় বলিয়া বাড়ীগুলি পরিষ্কার থাকে, কিন্তু গ্রামের পথঘাট তত পরিষ্কার নয়। ছোট ছেলেরা পথের ধারে যত্রতত্র নোংরা করিয়া রাখে, তাহাদের পিতামাতারাও যে গ্রামের মাঠঘাট খুব পরিষ্কৃত রাখে এ-কথা বলা চলে না। আশ্চর্য্যের বিষয়, শুধু এখানে নয়, বাংলা দেশে, উড়িষ্যায়, বিহারে সর্ব্বত্র দেখিয়াছি লোকে নিজের ঘরবাড়ী পরিষ্কার রাখিতে চেষ্টা করে, কিন্তু যত আবর্জ্জনা সব নির্ব্বিচারে গ্রামের রাস্তায় ঢালিয়া দেয়। সমষ্টির প্রতি কাহারও দরদ নাই, গ্রামেরও যে একটা সত্তা আছে ইহা যেন কেহ স্বীকার করে না। সংঘ বা সমাজ নাই, কেবল ব্যক্তি ও পরিবার বাঁচিয়া আছে, এইরূপ বোধ সর্ব্বদাই গ্রাম্যজীবন দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে। অথচ গ্রাম মরিলে অবশেষে

কচুর ক্ষেতে জল দেওয়া

যে গ্রামবাসীও মরিবে; সমাজ না-বাঁচিলে, সমষ্টি সুস্থ না-থাকিলে যে শেষ পর্য্যন্ত ব্যষ্টিও মারা পড়িবে, এ বোধ আজ আর দেশে নাই। সেই জন্যই ত নূতন সমাজ গড়িয়া তোলা, নূতন রাষ্ট্র সৃজন করার আজ এত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

মোখলিঙ্গমে থাকিবার সময়ে দেখিতাম দরিদ্র অন্ধ্রদেশীয় স্ত্রীলোকেরা প্রাতঃকাল হইতে ক্ষেতে স্বামীর সহিত কিছু কিছু কাজ করিত, নয়ত গ্রামের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া শুকনা পাতা কুড়াইয়া আনিত। অন্ধ্র চাষীরা খুব পরিশ্রমী। বংশধারা নদীর দুই পাড়ের মাটি খুব ভাল। কিন্তু মাটিতে প্রচুর সেচন না করিলে ত রবিশস্য ভাল জন্মায় না। এদেশে কুয়ার প্রচলন আছে। কুয়া হইতে অথবা নদী নালা হইতে জলসেচন করিবার জন্য টাণ্ডা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এই টাণ্ডা আমাদের দেশের টাণ্ডা অথবা বিহারের লাঠা হইতে কিছু স্বতন্ত্র ধরণের। ভিজাগাপট্টম্‌ জেলায় বাঁশ কম, তালগাছ ও কেয়ার ঝোপ খুব বেশী। টাণ্ডা তাল-গাছের বা অন্য কোনও কাঠের হইয়া থাকে। সেই জন্য তাহাকে ওঠানো-নামানো এক বৃহৎ ব্যাপার। ইহাকে সহজসাধ্য করিবার জন্য সর্ব্বত্র একটি চমৎকার কৌশল দেখিলাম। এক জন লোক লোহার বালতি হইতে জল ক্ষেতে ঢালিয়া দেয় এবং টাণ্ডার উপরে এক বা দুই জন লোক চড়িয়া অনবরত এপাশ-ওপাশ হাঁটাহাঁটি করিতে থাকে। তাহাদের সুবিধার জন্য টাণ্ডার পাশে আরও

ওয়ালটেয়ারের নিকটে একটি গ্রাম। ঘরগুলি গোল বা চতুষ্কোণ, ছাদ তাঁবুর মত।

একটি দণ্ড পোঁতা থাকে, উপরের লোকেরা হাঁটিবার সময়ে তাহা ধরিয়া চলাফেরা করে। প্রতি টাঙায় এই ভাবে দুই বা তিন জন লোক কাজ করিয়া থাকে। সেই লোকেদের ভারপরিবর্ত্তনের ফলে টাঙা খুব দ্রুতবেগে ওঠা-নামা করে এবং জলসেচের কাজও সত্বর সম্পন্ন হয়।

ইহা এদেশের একটি আশ্চয্য রীতি। দেখিয়া মনে হয়, অন্ধ্রদেশে কুলির মজুরি কম হইবে। হয়ত কর্ম্মীর বাহুল্য আছে, কর্ম্মের নাই। সম্ভবতঃ সেই জন্যই ভিজাগাপট্টমের নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক কুলি সমুদ্রযোগে রেঙ্গুন যাত্রা করিয়া থাকে। বারুভা নামে একটি ছোট বন্দরের নিকট ট্রেন হইতে অনেক তেলুগু কুলীদের মোটঘাট লইয়া নামিতে দেখিলাম। শুনিলাম তাহারা সকলে রেঙ্গুনে কুলির কাজ করে, বাড়ী আসিয়াছিল, এবার কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যাইতেছে। আসকা নামে একটি শহরের নিকট এক জন চাষীর সহিত আলাপ করিয়া জানিয়াছিলাম যে এখানে যাহারা ভাগে চাষ করে তাহারা ফসলের ৯ ভাগ এবং জমিদার ১১ ভাগ পাইয়া থাকে। হাল ও বলদ চাষীর, সার উভয়ে অর্দ্ধেক করিয়া দেয়। যদি জমিদারের বলদ ও লাঙল হয় তবে সে চাষীর ৯ অংশের আরও অর্দ্ধেক লইয়া থাকে। অর্থাৎ তখন জমিদার ১৫।৷৹ ও চাষী ৪।৷৹ ভাগ পায়। এই চাষীর দুই ভাই রেঙ্গুনে মজুরি করে বলিয়া ইহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু সে বলিল যে চাষে পেট ভরে না, উপায় থাকিলে সে অন্যত্র চলিয়া যাইত। চাষীটিকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহাকে বলিলাম, যদি জমিদারের পরিবর্ত্তে সব জমি গবর্ণমেণ্টের হইয়া যায় এবং গবর্ণমেণ্ট যদি তোমার নিকট ৫ ভাগ লইয়া ১৫ ভাগ তোমায় দেয়, তুমি কি চাকরির জন্য অন্যত্র যাইবে? প্রস্তাব শুনিয়া সে ত আমাকে কংগ্রেসের লোক ভাবিয়া পরম উৎসাহিত হইয়া উঠিল এবং ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, সত্যই কি এ-রকম হইবে?

বস্তুতঃ তাহার সহিত অনেক ক্ষণ আলাপ করিয়া আমার ইহাই ধারণা হইয়াছিল যে চাষীর সমস্যা নিরাকরণের জন্য ভাল বীজ, উন্নত লাঙ্গল এবং লিনলিথগো সাহেবের উন্নততর বলীবর্দ্দের প্রয়োজন তত নাই, যত আছে জমির বিলিব্যবস্থা-পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। বাংলা দেশেও চাষীদের বলিতে শুনিয়াছি যে জমিদারকে প্রদত্ত টাকা যখন জমিদার সেচের জন্য, সারের জন্য, ভাল বীজের জন্য কিছুতেই খরচ করে না; অথবা গ্রামে চিকিৎসা বা শিক্ষাবিস্তারের জন্যও ব্যয় করে না; জমিদার যখন সে টাকা সমস্ত নিজের ভোগবিলাসের জন্যই ব্যয় করেন, তখন আর চাষী কি সুখে চাষ করিবে? কামার, কুমার, সেকরা, মালাকর, ধোপা, মুচি সকলের কারিগরি যাইতে বসিয়াছে। তাহারাও চাষী হইয়া বসিয়াছে, এবং জমিদার সর্ব্বদা নূতন লোকের সঙ্গে সস্তায় বন্দোবস্ত করিয়া নিজের লাভের ভাগ বাড়াইতে ব্যস্ত থাকে। এই ভাবে নিজেদেরই অর্থনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাবে আমরা নিজেদের সর্ব্বনাশ করিতেছি।

অন্ধ্রদেশের পরিশ্রমী, কিন্তু ক্ষীণকায়, অশিক্ষিত চাষীদের দেখিয়া নানা কথা মনে হইত। হয়ত তাহাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিলে, উন্নত চাষের একটু

একটি বালিকা সকালবেলা আলপনা দেওয়া সারিয়া দাড়াইয়া আছে

ঘর নিকানো

স্থবিধা করিয়া দিলে তাহারা আবার সমৃদ্ধিশালী ও স্থখী হইতে পারিবে। শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদিগকে নিজের জন বলিয়া ভাবিলে, তাহাদের দুঃখ নিবৃত্তির জন্য তপস্যার আয়োজন করিলে সমাজ আবার বাঁচিয়া উঠিবে এবং ব্যক্তির জীবনও সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণতা লাভ করিবে।

অন্ধ্রদেশের পথঘাট ভাল। বাংলা দেশের চেয়ে লোকজন চলাফেরা বেশী করে। এখানে গরুর গাড়ীর চাকা খুব বড় এবং বাংলা বা বিহারের চাকা অপেক্ষা হালকা গড়নের। ঐরূপ হালকা চাকা উড়িষ্যাতেও চলিত আছে। অনধ্রদেশে দুইটি মোষের গাড়ীতে মাল বহন করে বটে, কিন্তু যাতায়াতের জন্য একটি বলদে টানা হালকা এক রকম গাড়ী প্রচলিত আছে। ইহা বিহারের একা গাড়ীর মত খুব ব্যবহৃত হয়। ইহাকে বাণ্ডি বলে। বাণ্ডি ঘোড়ায়ও টানে, তখন তাহাকে ঝট্‌কা বলে। সম্প্রতি দেখিতেছি গ্রামে গ্রামে বাইসাইক্লের খুব চলন হইয়াছে এবং রেলষ্টেশন হইতে বহুদূরবর্তী গ্রামেও সাইক্ল-মেরামতের দোকান পাওয়া যায়।

অনধ্রদেশে আর একটি জিনিষ বড় ভাল লাগিয়াছিল। এখানে পথের ধারে দূরত্বজ্ঞাপক পাথরে শুধু মাইলের

কেয়ার ঝোপ

সংখ্যা লেখা থাকে না। ঐ রাস্তায় প্রধান প্রধান স্থানের নাম ও তাহার দূরত্ব পরিষ্কার অক্ষরে বড় বড় করিয়া লেখা থাকে। এবং সর্ব্বদা এইরূপ মাইলের নির্দ্দেশক প্রস্তর

চোখের সামনে রহিয়াছে বলিয়া গ্রামের লোককে পথের দূরত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা ডাল-ভাঙা-কোশের হিসাব না দিয়া ঠিক কত মাইল কত ফার্লং তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারে। পথিকের নিকট কোনও স্থানের প্রকৃত দূরত্ব যে কত তাহা ঠিকমত জানা খুব লাভের বিষয়।

এদেশের গ্রামের মধ্যে একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলাম। বাংলা দেশের গ্রামে ঘরবাড়ী যে যাহার নিজের সুবিধা মত করিয়া লয়, গ্রাম্য রাস্তাও এলোমেলো ভাবে আঁকিয়া বাঁকিয়া যায়। কিন্তু উড়িষ্যায় প্রতি গ্রামের মধ্য দিয়া একটি বড় ও প্রশস্ত রাস্তা থাকে, গ্রামের সমস্ত বাড়ী তাহার দুই পাশে গায়ে গায়ে ঠেকাইয়া নির্ম্মাণ করা হয়। প্রতি কুটীর আয়ত-আকারবিশিষ্ট এবং দোচালা খড়ের ছাত দিয়া ঢাকা থাকে। এইরূপ ঘর উড়িষ্যার বাহিরে বংশধারা নদীর উত্তর কূল পর্য্যন্ত মোটামুটি দেখা যায়। তাহার পর হইতে নূতন এক প্রকার গ্রাম ও কুটীর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আসন (ground-plan) গোলাকার বা চতুষ্কোণ এবং ছাতা তালপাতায় ছাওয়া হইয়া থাকে। ছাতের গড়ন গোলাকার তাঁবুর মত, অবশেষে সূচ্যগ্রে পরিণত হয়। ভিজাগাপট্টমের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে আর বংশধারার উত্তরবর্ত্তী আয়ত গৃহ ও দোচালা আদৌ দেখা যায় না।
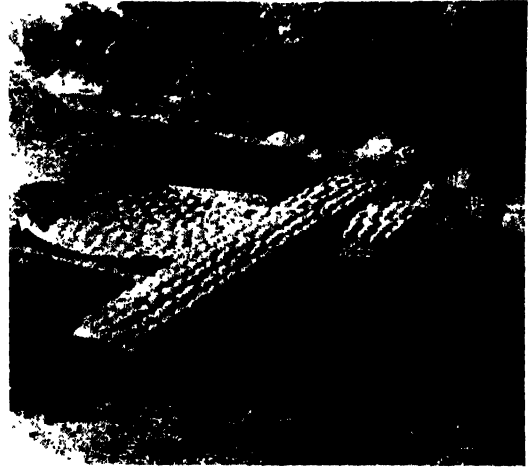
বড়ি ও ঘুঁটে শুকাইতেছে

ছায়া দীর্ঘ হ'ল

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নবীন ইঙ্গিতে আজি
বনানীর ক্লান্ত ধূসরতা
দেখিছে স্বপন :
মুহূর্ত্তের কত হাসি
বারে বারে মনে পড়ে,
মনে পড়ে সুরের মতন।
দগ্ধ বালুকার 'পরে
ওখানেতে কিছু দূরে
বন্ধ্যা কাঁটা-গাছ,
অনাগত মঞ্জরীর
স্বপন দেখিছে বুঝি
ক্লান্ত সাঁঝে আজ!

কত মধুচ্ছন্দা রাতি
ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে
অতীতের রুক্ষ কারাগারে,
আমার প্রতীক্ষমান
উষ্ণ দেহখানি
বারে বারে চেয়েছিল তারে।
সে তো ফিরে আসিল না,
সরে গেল আরো দূরে,
প্রতীক্ষায় দিন ক্ষয়ে এল—
পশ্চিমের রক্তাভ সন্ধ্যায়
ক্লান্ত কালো ছায়া
দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর হ'ল।

কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে যখন রবীন্দ্রনাথের কবি-খ্যাতি সমস্ত বঙ্গদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তাঁহার নিন্দা করা ছিল একটা ফ্যাশান। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল যে তিনি সুমিষ্ট সুললিত ভাষার মোহ বিস্তার করিয়া পাঠকের ও শ্রোতার মনোহরণ করেন, কিন্তু তাঁহার কবিতা পাখীর মধুর কাকলীর মতনই অর্থহীন। এই অভিযোগের উত্তর কবি নিজেই তাঁহার পঞ্চভূত নামক পুস্তকে কাব্যের তাৎপর্য্য ও প্রাঞ্জলতা নামক প্রবন্ধদ্বয়ের মধ্যে দিয়াছেন—

"লেখার দোষ থাকাও যেমন আশ্চর্য্য নহে, তেমনি পাঠকের কাব্যবোধশক্তির খর্বতাও নিতান্ত অসম্ভব বলিতে পারি না।" "সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা। সেই আনন্দটি গ্রহণ করাও নিতান্ত সহজ কাজ নহে—তাহার জন্যও বিবিধ প্রকার শিক্ষা এবং সাহায্যের প্রয়োজন। যদি কেহ অভিমান করিয়া বলেন, যাহা বিনা শিক্ষায় না-জানা যায় তাহা বিজ্ঞান নহে, যাহা বিনা চেষ্টায় না-বোঝা যায় তাহা দর্শন নহে, এবং যাহা বিনা সাধনায় আনন্দ দান না-করে তাহা সাহিত্য নহে, তবে কেবল খনার বচন, প্রবাদ বাক্য, এবং পাঁচালি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে।"

ইহার পর কবি যেই ইউরোপের সাহিত্য-রসিক সমাজের বিচারে অগ্রগণ্য কবি বলিয়া বিবেচিত হইলেন, নোবেল পুরস্কার লাভ করিলেন, অমনি হাওয়া বদ্‌লাইয়া গেল,—কবির সুখ্যাতি করা, তাঁহাকে বিশ্বকবি বলিয়া বরণ করা ও বড়াই করা ফ্যাশান হইয়া উঠিল।

এই দুই অবস্থা কাটাইয়া উঠিয়া রবীন্দ্রনাথের দানমর্য্যাদার প্রকৃত নিরিখ নির্ণয় করার সময় আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে কিরূপ নব নব উন্মেষশালিনী, তিনি যে কী সম্পদ আমাদের সাহিত্যে দান করিয়াছেন, এবং তাঁহার দানে আমাদের ভাষা ও জীবন যে কী অমূল্য সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার একটা সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন পরিচয় লওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-নির্ঝরিণী তাঁহার বাল্যকালেই সমস্ত সংকীর্ণ গতানুগতিক পথ ছাড়িয়া শত মুখে শত দিকে অনন্তের অভিমুখে অভিসারে যাত্রা করিয়া চলিয়াছে। তিনি একাই সাহিত্যের সাত-মহলা ভবনের শত কক্ষের দ্বার সোনার চাবি দিয়া উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কবিতা, গান, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রহসন, প্রবন্ধ, সমালোচনা, যে দিকেই তিনি তাঁহার প্রভাস্বর প্রতিভাজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন, সেই দিকটাই সমুদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, যেমনটি এদেশে আর কাহারও দ্বারা হয় নাই, আর অন্য দেশেও একাধারে এত বিচিত্র শক্তির পরিচয় কোনও কবি বা লেখক দিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

কবি কবিতাকে এখনও নব নব রূপ দান করিতে করিতে চলিয়াছেন—তিনি নিজের সৃষ্টিকে নিজেই অতিক্রম করিয়া নূতন রূপ সৃষ্টি করিতে এখনও বিরত হন নাই। কবি নব নব ছন্দ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার বাগ্‌বৈভবে ও প্রকাশ-ভঙ্গিমায় কবিমানসের যে একটি অভিনব রূপ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতীব বিস্ময়কর।

রবীন্দ্রনাথ এক দিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্য্যরাশি, অপর দিকে ইউরোপীয় সাহিত্যের ভাবৈশ্বর্য্য একত্র সমাহৃত করিয়া নিজের প্রতিভার অপূর্ব্ব ছাঁচে ফেলিয়া যে ললিত-ললামশালিনী তিলোত্তমা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে, তাই তিনি কবি-সার্বভৌম বা কবি-সম্রাট্ নামে সম্মানিত হইতেছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন যে তাঁহার কাব্য-সাধনার ধারা বা উদ্দেশ্য আগাগোড়া একটি মাত্র—

"আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য-রচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে—সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা।"

বাস্তবিক লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এই একটি বিষয়ই কবির সমস্ত কবিতায় অন্তর্নিহিত ভাব বলিয়া বুঝিতে

পারা যায়। কিন্তু রূপদক্ষ, ছন্দের যাদুকর, সুললিত প্রকাশ-ভঙ্গিমার ওস্তাদ কবি একই জিনিস বার বার এমনই নূতন রূপে নূতন ঢঙে সাজাইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন যে কবির এই প্রতারণা আমরা ধরিতেই পারি না, বরং একই ভাবের বহু বিচিত্রতার কৌশলে মুগ্ধ হইয়া বিস্ময়মগ্ন হইয়া থাকি।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে "জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই নাম ভালবাসা; প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ!" এই দুই প্রকারের অনুভবই যে তিনি পূর্ণ মাত্রায় লাভ করিয়াছেন তাহার সাক্ষ্য দিতেছে তাঁহার রচিত সাহিত্য, এবং তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব পূর্ণ জীবন্ত। জীবনের লক্ষণ হইতেছে নিত্য নিরন্তর পরিবর্তন। যাহা জড়ধর্মী তাহারই পরিবর্তন থাকে না। তাই ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁ জীবনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—পরিবর্তন, পরিবর্তন, ক্রমাগতই নিরন্তর পরিবর্তনই জীবন এবং তাহাই সত্য। কবির প্রতিভা-নির্ঝরিণীর যে-দিন স্বপ্ন-ভঙ্গ হইয়াছিল তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত তিনি 'অকারণ অবারণ চলার' আবেগে নিজে সমস্ত সংকীর্ণতা সমস্ত বদ্ধ গুহা ও সকল প্রাকার উল্লঙ্ঘন করিয়া অনন্তের অভিসারে অগ্রসর হইয়া চলিতেছেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মানব-সমাজকে চলিতে আহ্বান করিতেছেন—

আগে চল্ আগে চল্ ভাই!
প'ড়ে থাকা পিছে, ম'রে থাকা মিছে,
বেঁচে ম'রে কিবা ফল ভাই।

বৈদিক যুগে ইতরার পুত্র মহীদাস যেমন তূর্যকণ্ঠে আহ্বান করিয়াছিলেন—চরৈবেতি, চরৈবেতি,—চলো, চলো,—তেমনি আমাদের রবীন্দ্রনাথও আমাদের সকলকে ক্রমাগত সীমা অতিক্রম করিয়া সকল বাধা উত্তীর্ণ হইয়া সুদূরের পিয়াসী হইয়া অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছেন।—

প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়,
দিন ক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়।

তাই তিনি পাঁজি-পুঁথির বিধি নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া "মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া" করিতে বলিতেছেন। কবি নিজেকে যাত্রী বলিয়াছেন—

যাত্রী আমি ওরে।
পারবে না কেউ রাখ্‌তে আমায় ধ'রে।
— গীতাঞ্জলি ১১৮ নম্বর।

কবি পথিক—

পথের নেশা আমায় লেগেছিল,
পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।

কবির যাত্রা "নিরুদ্দেশ যাত্রা", মনোহরণ কালোর বাঁশী তাঁহাকে ঘর ছাড়াইয়া উদাসী করিতে চায় (জাপান-যাত্রী, ৪০-৪১ পৃষ্ঠা)। উচ্ছল নির্ঝর ও চঞ্চলা বৈরাগিণী নদী তাঁহার গতি-উন্মুখ চিত্তের প্রতীক, বলাকা তাঁহার সহধর্মী; সেই বলাকার পক্ষধ্বনির মধ্যে কবি এই বাণী ধ্বনিত শুনিয়াছেন—"হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোনখানে।"

কবি রবীন্দ্রনাথ গতিধর্মী বলিয়া তিনি যেমন অনন্তের সুদূরের পিয়াসী, তিনি এই চির জনমের ভিটাতে এ-সাতমহলা ভবনে বসুন্ধরার বুকে প্রবাসী হইয়া থাকিতে চাহেন না, তেমনি কবি অন্তরের অন্তরে অনুভব করেন যে—"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া!"

কবির আকাঙ্ক্ষা—"ছোট-বড়-হীন সবার মাঝারে করি চিত্তের স্থাপনা।"—প্রবাসী, উৎসর্গ। জগতে ছোট তুচ্ছ বলিয়া কিছু নাই। সীমাকে লইয়াই অসীম, সীমাকে ছাড়িয়া দিলে অসীম শূন্যতা।

অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমা রূপ ধরি'।
যাহা কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি,
বালুকার কণা, সেও অসীম অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—
কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে?
বড় ছোট কিছু নাই, সকলি মহৎ!
প্রকৃতির পরিশোধ, ১০ম দৃশ্য

তাই তিনি কবি—সাধক দাদুর ন্যায় দেখিয়াছেন যে—

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া॥

অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা ॥
—উৎসর্গ, আবর্তন।

ছোটকেও তুচ্ছকেও কবি অসামান্য অসীম রহস্যময় বলিয়া জানিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সর্বানুভূতি ও একাত্মতা এত প্রবল হইতে পারিয়াছে। তিনি 'বসুন্ধরা'র সর্বদেশে সর্ব জীবের জীবনলীলা উপভোগ করিতে উৎসুক। কবি যে ঘর বাঁধিয়াছেন তাহা 'অবারিত'—

এরে কে বেঁধেছে হাটের মাঝে,
আনাগোনার পথে।
— খেয়া, অবারিত।

কবির 'পুরাতন ভৃত্য' অতিপ্রশান্ত কৃষ্ণকান্ত, রাজা ও রাণী নাটকের ভৃত্য শঙ্কর, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন গল্পের ভৃত্য রামচরণ, কবির নিজের ভৃত্য মোমিন মিঞা (চৈতালি, কর্ম; ছিন্নপত্র ৩৩৮ পৃষ্ঠা, সাহিত্যতত্ত্ব, প্রবাসী ১৩৪১ বৈশাখ, ১২ পৃষ্ঠা), পশ্চিমা মজুরের মেয়ে নেড়া-মাথা ভাইয়ের 'দিদি' (চৈতালি), দুই বিঘা জমির উচ্ছিন্ন মালিক উপেন, দেবতার গ্রাস হইতে রাখালকে রক্ষা করিতে প্রয়াসী মৈত্র মহাশয়, একবস্ত্রা অতিদীনা ভিখারিণী রমণীর 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', সকলেই কবির মনকে স্পর্শ করিয়াছে, কেহই তাঁহার কাছে তুচ্ছ বা পর নহে। এইরূপে কবি তাঁহার গদ্যগল্পে ও পদ্যগল্পে ও কবিতার মধ্যে কত নগণ্য মানব-হৃদয়ের তুচ্ছ বলিয়া সাধারণের চক্ষে উপেক্ষিত সুখ-দুঃখ, তুচ্ছ মানবের মহত্ত্ব, এবং মানব-চিত্তের বিচিত্রতা দেখাইয়াছেন তাহার সংখ্যা নির্দেশ করিয়া দেখানো সহজ কাজ নহে। মানব-জীবনের সুখ-দুঃখের মরমী দরদী কবি 'পলাতকা' কাব্যের প্রায় সমস্ত কবিতায় তাঁহার নিপুণ সূক্ষ্ম দৃষ্টির ও অসামান্য সুন্দর সৃষ্টির পরিচয় দিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন।

কবির সূক্ষ্মদৃষ্টির আরও পরিচয় পাই কণিকার কবিতা-কণাগুলির মধ্যে, কবি দিব্য দৃষ্টি দিয়া সামান্যের মধ্যেও অপরূপের ও মহৎ সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। সামান্য ঘটনার মধ্যে যে কী গভীরতা নিহিত থাকে, তাহা তিনি 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির মধ্যে বিশেষ ভাবে দেখাইয়াছেন। কবির দার্শনিক মন আপাত-দৃষ্টির অন্তরালে মহৎ তত্ত্ব সহজেই আবিষ্কার করিতে পারে।

কবির জীবনের উদ্দেশ্য বা মিশন যে কি তাহা তিনি বহু প্রকারে বহু স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন। শৈশব-রচনা কবিকাহিনীর মধ্যে কাব্যের নায়ক 'কবি'র চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে শান্তিময় বিশ্বপ্রেমই মানুষের জীবনের কাম্য বস্তু। তার পরে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের লেখা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় তিনি দেখাইয়াছেন যে মহাসাগরের সহিত মিলিত হইতে পারাতেই জীবন-নদীর সার্থকতা। স্রোত নামক কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—

জগৎ-স্রোতে ভেসে চলো যে যেথা আছ ভাই,
চলেছে যেথা রবি-শশী চলো রে সেথা যাই।
* * *
জগৎ-পানে যাবিনে রে, আপনা পানে যাবি।
সে যে রে মহা মরুভূমি, কি জানি কি যে পাবি!
* * *
জগৎ হয়ে রব আমি, একেলা রহিব না।
মরিয়া যাব একা হলে একটি জলকণা!
আমার নাহি সুখ দুখ, পরের পানে চাই,
যাহার পানে চেয়ে দেখি তাহাই হয়ে যাই!
* * *
মায়ের প্রাণে স্নেহ হয়ে শিশুর পানে ধাই,
দুখীর সাথে কাঁদি আমি, সুখীর সাথে গাই!
সবার সাথে আছি আমি, আমার সাথে নাই।
জগৎ-স্রোতে দিবানিশি ভাসিয়া চলে যাই!

প্রভাত-উৎসব নামক কবিতাতেও কবি বলিয়াছেন—

জগৎ আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
জগতে প্রাণে মিলি' গাহিছে একি গান।
* * *
ধূলির ধূলি আমি, রয়েছি ধূলি পরে,
জেনেছি ভাই বলে জগৎ-চরাচরে।

কবি বিশ্বসোহাগিনী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকে অথবা জীবন-দেবতাকে 'আবেদন' জানাইয়া বলিয়াছেন—

আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

পুরস্কার কবিতায় কবি কবির মিশনের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

অন্তর হতে আহরি' বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,

গীতরসধারা করি সিঞ্চন
　　সংসার-ধূলিজালে।

না পারে বুঝাতে, আপনি না বুঝে,
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কুজে,
　　মাগিছে তেমনি সুর।
ঘুচাইব কিছু সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু-চারটি কথা
　　রেখে যাব সুমধুর।

ঠিক এই কথাই তিনি কবি-চরিত কবিতার মধ্যেও বলিয়াছেন—

আমি সেই এই মানবের লোকালয়ে
বাজিয়া উঠেছি সুখে দুখে লাজে ভয়ে,
গরজি' ছুটিয়া ধাই জয়ে পরাজয়ে
　　বিপুল ছন্দে উদার মন্দ্রে মাতিয়া।
যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বুকের কাছে,
ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে,
শারদ-ধান্যে যে আভা আভাসে নাচে
　　কিরণে কিরণে হসিত হিরণে হরিতে,
সেই গন্ধই গড়েছে আমার কায়া,
সে গান আমাতে রচিছে নূতন মায়া,
সে আভা আমার নয়নে ফেলেছে ছায়া,—
　　আমার মাঝারে আমারে কে পারে ধরিতে।
　　　*　　*　　*
তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যবে,
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীতরবে,
লাজুক হৃদয় যে-কথাটি নাহি কবে,
　　সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।

কবি সকলেরই মুখপাত্র। এইজন্য কবির কোনো নির্দিষ্ট বয়স নাই, কবি বলেন—

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,
　　তাহার পানে নজর এত কেন?
পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
　　সবার আমি এক-বয়সী জেনো।

তাই কবি শিশু-ভোলানাথের সহিত অহেতুক আনন্দে ছেলেখেলা করিতেও পারেন, এবং প্রবীণ পাকা যাহারা জগৎ মিথ্যা মনে করিয়া পরকালের ডাক শুনিতেই ব্যস্ত তাহাদের জন্য নৈবেদ্যও সাজাইয়া দেন, খেয়ারও জোগাড় করেন, গীতাঞ্জলি রচনা করেন, গীতিমাল্য গাঁথিয়া তুলেন।

কবির কোনো বয়স নাই বলিয়া তিনি চিরনবীন, চিরযুবা, তিনি সবুজের অভিযানে 'অগ্নেবাতে যাত্রা ক'রে শুষ্ক পালের পরে লাগান ঝড়ো হাওয়া'। ফাল্গুনী নাটকের সমস্তটাই তো নবীনতার জয়গান। সেখানে যুবকদল জোর গলায় বলিয়াছে—

আমাদের পাক্‌বে না চুল গো,—মোদের
　　পাক্‌বে না চুল।

চিরযুবা কবি কর্তব্যে নিরলস, তিনি কেবল Lotus-eater নন, তিনি কর্মীশ্রেষ্ঠ। তাঁহার কাছে নানা দিক্ হইতে কর্তব্যের আহ্বানের পরে 'আবার আহ্বান' আসে, এবং সে আহ্বান 'অশেষ'। তিনি কর্তব্যের 'শঙ্খ' ধূলায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কখনো স্থির থাকিতে পারেন না, আরাম-বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া অশেষের আহ্বানে রজনীগন্ধার মালা ফেলিয়া রক্তজবার মালা গাঁথিতে প্রবৃত্ত হন। 'বর্ষশেষ' তাঁহার কাছে নূতনেরই বার্তা বহন করিয়া আনে, তিনি উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেন—

চাবো না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
　　হেরিব না দিক্,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
　　উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
　　উপকণ্ঠ ভরি
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্‌কার লাঞ্ছনা
　　উৎসর্জন করি'।

কবির কাছে দুঃখরাতের রাজা যখন হঠাৎ ঝড়ের সাথে আসিয়া অভ্যর্থনা দাবী করেন, তখন তিনি তাঁহাকে বিমুখ করেন না, তিনি আপনাকে ডাক দিয়া বলেন—

ওরে দুয়ার খুলে দে রে, বাজা শঙ্খ বাজা,
গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা।
　　বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
　　বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে আঙিনা তোর সাজা,
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এলো দুঃখরাতের রাজা।
　　　—খেয়া, আগমন, ১০ পৃষ্ঠা।

'দুঃসময়' যখন আসে তখনও কবি নির্ভয়, যদি কোনো আশ্রয় নাই থাকে, যদি কোনো আশা নাই থাকে, তথাপি কর্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে চলিবে না, যাত্রা থামাইলে চলিবে না।—

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জাগিছে মৌন মন্তরে,
দিগ্‌ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।
কল্পনা, দুঃসময়।

জগন্নাথের বিজয়-রথ যখন বাহির হয় তখন তাহার রশি টানিবার জন্ম সকলের কাছে আহ্বান আসে, সকলে শুনিতে পায় না, শুনিতে পান কবি। তাই তাঁহার আহ্বান ধ্বনিত হইতে শুনি—

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ঐ যে তিনি, ঐ যে বাহির পথে।
আয় রে ছুটে, টানতে হবে রশি,
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি'
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে গিয়ে
ঠাঁই ক'রে তুই নে রে কোনো মতে।
—গীতাঞ্জলি, ১১১ নম্বর।

কবির এই কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে কথা কাব্যের 'পণরক্ষা' ও 'পূজারিণী' নামক দুইটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যাপার লইয়া লিখিত কবিতায়।

চিরযুবা কবি দুঃখকে জয় করিয়া দুঃখের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন।—

কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের লাগি' দীর্ঘশ্বাস?
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
রিক্ত যারা সর্বহারা, সর্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

তিনি দেবী অলক্ষ্মীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে।
ভাঙা কুলোয় করুক পাখা তোমার যত ভৃত্যগণে।
দগ্ধভালে প্রলয়শিখা দিক্ মা এঁকে তোমার টীকা,
পরাও সজ্জা লজ্জাহারা জীর্ণ কন্থা ছিন্নবাস,
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
—কল্পনা, হতভাগ্যের গান।

কবি সকলকে 'শুধু অকারণ পুলকে ক্ষণিকের গান' গাহিয়া নদীজলে-পড়া আলোর মতন ঝলমল ও শিরীষ ফুলের অলকে দোদুল্যমান শিশিরকণার মতন শিথিল-বাঁধন জীবন যাপন করিতে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

ওরে থাক থাক কাঁদনি।
দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দে রে
নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনি।
—ক্ষণিকা, উদ্বোধন।

ভাগ্য যবে কৃপণ হয়ে আসে,
বিশ্ব যবে নিঃস্ব তিলে তিলে,
মিষ্ট মুখে ভুবন-ভরা হাসি
ওষ্ঠে শেষে গুঞ্জন-স্বরে মিলে।—

তখনও কবি আনন্দ করিয়াই বিশ্বকে অবজ্ঞা করিতেই বলিয়াছেন। দেবতা যখন দুঃখমূর্তি ধরিয়া মালার বদলে ভীষণ তরবারি উপহার দিয়া কবিকে সম্মানিত করেন, তখনও কবি বলিতে পারেন—

দুখের বেশে এসেছ ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেথায় ব্যথা সেথায় তোমা নিবিড় ক'রে ধরিব হে।
—খেয়া, দুঃখমূর্তি ও দান।

কবি আত্মত্রাণ চাহেন না, তাঁহার প্রার্থনা কেবল এই—

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে,
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি,
লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।
—গীতাঞ্জলি, ৪ নম্বর।

কবি পরাজয়কেও ভয় করেন না, তিনি মুক্তকণ্ঠে বিধাতাকে বলিতে পারিয়াছেন—

হারের খেলাই খেলব মোরা,
বসাও যদি হারের দলে।

* * *

হেরে তোমার করব সাধন,
ক্ষতির ক্ষুরে কাটব বাঁধন,
শেষ দানেতে তোমার কাছে
বিকিয়ে দেবো আপনারে।
—খেয়া, হার।

কারণ, কবি জানেন যে বিফলতা সফলতারই সোপান-পরম্পরা মাত্র।—

জীবনে যত পূজা হ'লো না সারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

এবং—

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে।
—গীতাঞ্জলি ও গীতালি।

কবি দুঃখকে জয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু সুখে দুঃখকে একেবারে অস্বীকার করেন না, সুখকে পুষিয়া দুঃখকে ভুলিয়া থাকিতে চাহেন না, আবার দুঃখের মধ্যে সুখকেও বিস্মৃত হন না।

Shakespear যেমন বলিয়াছেন যে—The fire in the flint shows not till it be struck. তেমনি আমাদের কবিও বলিয়াছেন—

আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না সে তো আলো।
হৃদয়ে মোর তীব্র দাহন জ্বালো।

তাই কবি জানেন যে—

হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ
—রাজা।

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে?
দেখিস্‌নে কি শুক্‌নো পাতা ঝরাফুলের খেলা রে?
—রাজা।

"আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার একপিঠে নূতন, একপিঠে পুরাতন। যখন উল্টে পরেন তখন দেখি শুকানো পাতা ঝরা ফুল; আবার যখন পাল্টে নেন, তখন সকাল-বেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী,—তখন ফাগুনের আম্রমঞ্জরী, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ নূতন-পুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি ক'রে বেড়াচ্ছেন।" —ঋতু-উৎসব, বসন্ত।

আমাদের কবি সত্য শিব সুন্দরের পূজারী। সত্য কঠোরমূর্তি, কড়া মনিব, তাহাকে যে অর্ঘ্য দিতে হয় তাহা দুঃখেরই অর্ঘ্য। এইজন্য তিনি ভগবানের প্রতিনিধি-রূপে 'ন্যায়দণ্ড' ধারণ করিবার যে 'দীক্ষা' প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা বীরের যোগ্য সংগ্রামের দীক্ষা, এই দুর্ভাগ্য দেশের জন্যও তিনি যে 'ত্রাণ' প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা অশান্তির পরপারে যে শান্তি আছে তাহাই। (নৈবেদ্য) নিরবচ্ছিন্ন শান্তি তো জড়ত্ব, অশান্তির মধ্য দিয়া যে শান্তি উপার্জন করিয়া লইতে হয় তাহাই বীরের কাম্য। কবি অত্যন্ত সহজ ভাবেই বলিয়াছেন—

আরাম হতে ছিন্ন ক'রে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান্‌।

কবি সত্যসন্ধ, তাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

মনেরে আজ কহ যে,
ভালো-মন্দ যাহাই আসুক,
সত্যেরে লও সহজে।
ক্ষণিকা।

কবি ন্যায়ধর্মের সমর্থক, অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদী, ইহা তিনি তাঁহার জীবনে ও রচনায় দেখাইয়াছেন;—'গান্ধারীর আবেদনে' এই ন্যায়নিষ্ঠা সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

যিনি শিব, তিনি তো কেবল আরামের দেবতা নহেন, তিনি আবার রুদ্র। এই রুদ্রকে স্বীকার করিয়াই শিবের আরাধনা করিতে হইবে।

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে, আরেক হাতে হার।
- গীতালি

কবি বীরধর্মী, তাই তিনি সর্বক্ষেত্রে কাপুরুষতাকে, সঙ্কীর্ণতাকে ধিক্কার দিয়াছেন, 'ক্ষুদ্রতা' হইতে মুক্ত হইবার জন্য তীব্র আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের এই নিশ্চেষ্ট জীবনে কবি ধিক্কার দিয়া বলিয়াছেন—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন!' একদিকে সকল সংস্কার হইতে মুক্তিলাভের জন্য যেমন তাঁহার "দুরন্ত আশা" দেখা যায়, তেমনি আবার কাপুরুষতাকে তিনি বিদ্রূপে বিদ্ধ করিয়াছেন; একদিকে 'হিং টিং ছট্‌' বলিয়া কুসংস্কারকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, অপর দিকে নিরীহ ধর্মপ্রচারক ক্রিশ্চান পাদরীর মাথায় রক্তপাত করিয়া দেওয়ার কাপুরুষতাকে ধিক্কার দিয়াছেন—

"তবে রে লাগাও লাটি,
কোমরে কাপড় আঁটি,
হিন্দুধর্ম হউক রক্ষা খৃষ্টানী হোক মাটি।
• • •
পুলিশ আসিছে গুঁতা উঁচাইয়া, এই বেলা দাও দৌড়।
ধন্য হইল আর্যধর্ম, ধন্য হইল গৌড়।"

—মানসী, ধর্মপ্রচার।

রবীন্দ্রনাথের সব চেয়ে বড় দান আমি মনে করি আমাদের বুদ্ধিকে সকল সংস্কার ও বন্ধন হইতে মুক্তি দেওয়া। এই কথা তিনি বিসর্জন নাটকে প্রথাগতপ্রাণ গতানুগতিক রঘুপতির জবানী জয়সিংহকে বলিয়াছেন—"আপন বুদ্ধিরে করিলি সকল হতে বড়।" দুঃখ-ভয় ও মৃত্যু-ভয় হইতে আমাদের মনকে মুক্তি দিবার প্রয়াসও কবির মহৎ দান।

কবির দেশানুরাগ আবাল্য যে কিরূপ প্রবল তাহা তাঁহার জীবনস্মৃতি ও সমস্ত কাব্য সাক্ষ্য দিতেছে। কবি কল্পনা-বিলাস ছাড়িয়া কর্মজীবন বরণ করিতে ব্যগ্র হইয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"এবার ফিরাও মোরে"। তাঁহার স্বজাতিপ্রীতি ও মানব-প্রীতি যে কিরূপ প্রবল তাহার সাক্ষী এই কবিতাগুলি—বঙ্গমাতা, স্নেহগ্রাস, ভারততীর্থ, অপমানিত, প্রাচীন ভারত, শিক্ষা, কথা-কাব্যের সমস্ত কবিতা, এবং জাতীয় সঙ্গীতগুলি। কবি "দীনের সঙ্গী" হইয়া "ধূলামন্দিরে" দেবতার আরাধনা করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন—

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্র-জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে,
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি'
আয় রে ধূলার 'পরে।

—গীতাঞ্জলি।

বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

কবি অনুভব করেন যে—

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন,
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে,
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।

—গীতাঞ্জলি।

কবি দেশের অতি সামান্য লোকের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের আত্মীয় হইতে ইচ্ছা করেন—

ওদের সাথে মেলাও, যারা চরায় তোমার ধেনু।

—গীতিমাল্য।

কবির কাছে এই ধরণী তীর্থদেবতার মন্দির-প্রাঙ্গণ (গীতালি), আবার তাঁহার স্বদেশ মহামানবের সাগর-তীর বলিয়া ভারত-তীর্থ (গীতাঞ্জলি)। কবি তাঁহার স্বদেশকে বিশ্বদেবের প্রতিমূর্তি মনে করেন—

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে?
দেখিনু তোমারে পূর্ব-গগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।

—উৎসর্গ।

বিশ্বের মধ্যে কবি বিশ্বেশ্বরকে উপলব্ধি করেন বলিয়া বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহার কাছে জড় মাত্র নহে। প্রকৃতি তাঁহার কাছে সৌন্দর্যলক্ষ্মী, বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী, চিত্রা,—তিনি প্রকৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে—

বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী বালা,
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা।

—চিত্রা, জ্যোৎস্না রাত্রে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানব-মনের আনন্দের সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথই প্রথম বঙ্গসাহিত্যে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বগামী কবিরা এতদিন কেবল মাত্র প্রকৃতির বাহ্য দৃশ্য বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু তিনিই নববর্ষার সমারোহ দেখিয়া বলিতে পারিয়াছেন—

হৃদয় আমা'র নাচে রে আজিকে,
ময়ূরের মতো নাচে রে।

কবি যখন শৈশবে ভৃত্যরাজকতন্ত্রের শাসনে একটি ঘরের মধ্যে খড়ির গণ্ডিতে বন্দী হইয়া ছিলেন, তখন অতি দুর্লভ বলিয়া প্রকৃতির সহিত ফাঁকে ফুকারে যে চোরা চাহনির বিনিময় হইয়াছিল, সেই গুপ্তপ্রণয় কবি জীবনে ভুলিতে পারেন নাই।

প্রকৃতির দুই রূপ,—রুদ্র আর শান্ত,—দুই রূপই কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। কালবৈশাখীর ঝড়, সিন্ধুতরঙ্গ, বর্ষশেষের ঝড়, কবিকে যেমন মুগ্ধ করিয়াছে, তেমনি আবার শরৎ বসন্ত বর্ষা ঋতুর শান্ত সৌন্দর্যও তাঁহাকে মুগ্ধ

করিয়াছে'। তাই কবি বলিয়াছেন—'আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে!' মানবের মনে প্রকৃতির সৌন্দর্য-সঞ্জাত আনন্দ, ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে মানবের মনন মিলাইয়া কবি উভয়ের ভেদ-রেখা লুপ্ত করিয়া আনিয়াছেন। কুটীরবাসী পাখী, নীলমণি লতা, আশ্রম-বৃক্ষ, কেহই তাঁহার সমাদর হইতে বঞ্চিত হয় নাই (বনবাণী)। কবির বৃক্ষবন্দনা যেন বৈদিক ঋষির সূক্তের ন্যায় উদাত্ত গম্ভীর মনোহর।—

আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে,
চলেছে গরজি, চলেছে নিবিড় সাজে।
গীতাঞ্জলি।

পূর্বেই কবির মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে তিনি বলেন—"জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই নাম ভালবাসা; প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করারই নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ।" এই জন্য কবি নর-নারীর প্রেমকে আধ্যাত্মিক সাধনা মনে করেন, তাহা ইহজীবনের ভোগেই পরিসমাপ্ত বা পর্যবসিত হয় না, তাহা জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ধন। তাই কবির কাছে নর-নারীর প্রেম নির্মল, প্রশান্ত, বিক্ষোভবিহীন। অনন্ত প্রেম, সুরদাসের প্রার্থনা, প্রেমের অভিষেক, পরিশোধ প্রভৃতি কবিতায় কবির মত পরিব্যক্ত হইয়াছে। দাম্পত্যপ্রেমের আদর্শ যে কি তাহা তিনি দেখাইয়াছেন মহুয়ার 'নির্ভয়' নামক কবিতায়—

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে,
মুগ্ধ ললিত অশ্রু-গলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী দিয়ে
বাসর-রাত্রি রচিব না মোরা, প্রিয়ে।
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয় তুমি আছ, আমি আছি।

কবির কাছে নারীপ্রেমে ইন্দ্রিয়সম্ভোগ একান্ত হইয়া উঠে নাই, 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় (মানসী) যুবা কবি বলিয়াছেন—'আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।' অতএব 'নিবাও বাসনা-বহ্নি নয়নের নীরে!'

নর-নারী যখন 'দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' এবং 'নিমেষে শতেক যুগ দূর হেন মানে' তখন তাহারা অনেক সময়ে কামনার কলুষে প্রিয়তমকে কলঙ্কিত করে, তাই কবি তাহাদিগকে বলিতেছেন—

যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস,
যারে ভালবাস তারে করিছ বিনাশ।
—কড়ি ও কোমল, পবিত্র প্রেম।

যখন মানব-চিত্ত পূর্ণ মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রিয়ের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে প্রিয়কে বিলীন করিয়া দিতে চাহে অথচ পারে না, তখন তাহাদের সেই ব্যর্থতাকে দেখিয়া কবি বলিয়াছেন—

এ কি দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্ খানে।
—কড়ি ও কোমল, পূর্ণ মিলন।

কবি রবীন্দ্রনাথ নারীকে দুই রূপে দেখিয়াছেন, একটি তাহার ভোগের রূপ, অপরটি তাহার কল্যাণীরূপ। 'রাত্রে ও প্রভাতে' এবং 'দুই নারী' নামক কবিতাদ্বয়ে তাঁহার এই অভিমত পরিব্যক্ত হইয়াছে। নারী একদিকে যেমন রাত্রির নর্মসখী উর্বশী, অপর দিকে সে তেমনি প্রভাতের লক্ষ্মী কল্যাণী। এই কল্যাণী মূর্তিকে বন্দনা করিয়া কবি বলিয়াছেন—'সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে!' (ক্ষণিকা)।

নারী কবির কাছে অবলা মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যে আত্মশক্তির অমিত সম্ভাবনা নিহিত হইয়া আছে, তাহার সম্বন্ধে সে অচেতন বলিয়াই সে অবলা হইয়া অবহেলিত ও নির্য্যাতিত হয়। তাই তো কবি সাধারণ মেয়েকে সম্বোধন করিয়া দুঃখ করিয়াছেন—

হায় রে সামান্য মেয়ে,
হায় রে বিধাতার শক্তির অপব্যয়।

তাই তিনি সকল নারীকে বিধাতার শক্তির অপব্যয় হইয়া না থাকিয়া 'সবলা' হইতে আহ্বান করিয়াছেন—

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার,
হে বিধাতা!

*   *   *

যাব না বাসর-কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।
বীর-হস্তে বরমাল্য লব একদিন,
সে লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে।
কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা।

বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার,
ফেলে দেবো আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।
*   *   *
হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা,
রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।
উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের 'পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে
নির্বারিত স্রোতে।
যাহা মোর অনির্বচনীয়
তারে যেন চিত্ত-মাঝে পায় মোর প্রিয়।
—মহুয়া, সবলা।

সকল নারীর আদর্শরূপে চিত্রাঙ্গদাও এই কথা অর্জুনকে বলিয়াছিলেন—

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি' রাখিবে মাথায় সেও আমি
নই; অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। পার্শ্বে যদি রাখো
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি করো
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে করো সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।
—চিত্রাঙ্গদা, শেষ দৃশ্য।

নারীর নারীত্ব যে সর্বাবস্থাতেই অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা অবস্থা ও সময় বিশেষে সুপ্ত থাকে মাত্র, এই কথা কবি প্রচার করিয়া নারীর মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। পতিতা নারীর মধ্যেও তাহার হৃদয়ের মাধুর্য ও মাহাত্ম্য দেখিয়া তাহাকে কবি সম্মান দেখাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। পতিতা নারীকে দিয়া তিনি বলাইয়াছেন—

নাহিক করম, লজ্জাসরম,
জানিনে জনমে সতীর প্রথা,
তা ব'লে নারীর নারীত্বটুকু
ভুলে যাওয়া সে কি কথার কথা?
—কাহিনী, পতিতা।

পতিতার হৃদয়-মাহাত্ম্য দেখাইয়া কবি দুটি সনেট লিখিয়াছেন, তাহার একটির নাম 'করুণা' ও অপরটির নাম 'সতী' (চৈতালি)।—

অপরাহ্নে ধূলিচ্ছন্ন নগরীর পথে
বিষম লোকের ভিড়; কর্মশালা হতে
ফিরে চলিয়াছে ঘরে পরিশ্রান্ত জন
বাঁধমুক্ত তটিনীর স্রোতের মতন।
ঊর্ধ্বশ্বাসে রথ-অশ্ব চলিয়াছে ধেয়ে
ক্ষুধা আর সারথির কষাঘাত খেয়ে।
হেনকালে দোকানীর খেলামুগ্ধ ছেলে
কাটা ঘুড়ি ধরিবারে ছুটে বাহু মেলে।
অকস্মাৎ শকটের তলে গেল পড়ি',
পাষাণ-কঠিন পথ উঠিল শিহরি'।
সহসা উঠিল শূন্যে বিলাপ কাহার।
স্বর্গে যেন দয়াদেবী করে হাহাকার।
ঊর্ধ্বপানে চেয়ে দেখি স্খলিত-বসনা
লুটায়ে লুটায়ে ভূমে কাঁদে বারাঙ্গনা।

পতিতার মনে প্রকৃত প্রেমের স্পর্শে এক নিমেষেই যেমন

জননীর স্নেহ, রমণীর দয়া,
কুমারীর নব নীরব প্রীতি
আমার হৃদয়-বীণার তন্ত্রে
বাজায়ে তুলিল মিলিত গীতি।

তেমনি সামাজিক বিচারে কলঙ্কিনী নারীও প্রেমের একনিষ্ঠতা ও প্রেমের জন্য দুঃখ-বরণের দ্বারা সতীত্বের মর্যাদা পাইবার যোগ্যা হইয়া উঠে—

সতীলোকে বসি' আছে কত পতিব্রতা
পুরাণে উজ্জ্বল আছে যাহাদের কথা।
আরো আছে শত লক্ষ অজ্ঞাত-নামিনী
খ্যাতিহীনা কীর্তিহীনা কত না কামিনী,
*   *   *
শুধু প্রীতি ঢালি' দিয়া মুছি' লয়ে নাম
চলিয়া এসেছে তারা ছাড়ি মর্তধাম।
তারি মাঝে ব'সি আছে পতিতা রমণী,
মর্তে কলঙ্কিনী, স্বর্গে সতীশিরোমণি।
—চৈতালি, সতী।

কবি রবীন্দ্রনাথ মানব-প্রকৃতি ও বিশ্ব-প্রকৃতি উভয়ের মধ্যেই অনন্তেরই লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কাছে কিছুই তুচ্ছ নয়, কিছুই ক্ষুদ্র নয়, তিনি বলিয়াছেন—'ছোট-বড়-হীন সবার মাঝারে করি চিত্তের স্থাপনা!' এই চিত্ত-স্থাপনার ফলে তিনি বিশ্বরূপের মধ্যে বিশ্বেশ্বরের লীলা অতি সহজেই অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার এই আধ্যাত্মিকতা তাঁহার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণতা দান করিয়াছে। নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, ব্রহ্মসঙ্গীত প্রভৃতির মধ্যে কবির

আধ্যাত্মিকতার ক্রম-পরিণতির ও নিবিড়তরতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবির ভগবান্ কখনো প্রভু, কখনো বন্ধু, কখনো বা প্রিয় বা প্রিয়া, কখনো বা কেবলমাত্র তুমি বা তিনি, কখনো বা একেবারে নির্ব্যক্তিক। মধ্য-যুগের ভারতীয় সাধক কবীর দাদূ নানক রজ্জবজী মালিক মহম্মদ জায়সী প্রভৃতি, এবং সুফী সাধকেরা ভগবান্‌কে লইয়া সাম্প্রদায়িকতার টানাটানি ও বিরোধ দেখিয়া ভগবান্‌কে কোনো বিশেষ নামে অভিহিত করেন নাই। যিনি সকল নাম-রূপের অতীত তাঁহাকে কোনো একটি বিশেষ নামে অভিহিত করিলেই তাঁহাকে সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলা হয়। এইজন্য আমাদের দেশের বাউল ও ভাটিয়াল গানে ভগবান্ কখনো দরদী, কখনো সাঁই, কখনো বন্ধু, কখনো বা কেবল মাত্র সর্বনাম অর্থাৎ যাহা সকলেরই নাম। রবীন্দ্রনাথের ভগবান্ কোনো বিশেষ নামে চিহ্নিত হন নাই বলিয়াই তাঁহার গীতাঞ্জলি প্রভৃতি ভক্তিরসাত্মক কাব্য সর্বধর্মের সাধকদের সমাদরের সামগ্রী হইতে পারিয়াছে। কবির আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তি কেবল মাত্র হৃদয়ের আ-বেগ বা e-motion নয়, তাহা যুক্তির ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত, অপ্রমত্ত, বলিষ্ঠ, আত্মনির্ভর। এইজন্য কবি প্রার্থনা করিয়াছেন—

> যে ভক্তি তোমারে ল'য়ে ধৈর্য নাহি মানে,
> মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্য-গীত-গানে
> ভাবোন্মাদ-মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
> উদভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন ভক্তি-মদধারা
> নাহি চাহি নাথ। দাও ভক্তি শান্তি-রস,
> স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি' মঙ্গল-কলস
> সংসার-ভবন-দ্বারে। যে ভক্তি-অমৃত
> সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত,
> নিগূঢ় গভীর, সর্ব কর্মে দিবে বল,
> ব্যর্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল
> আনন্দে কল্যাণে। সর্বপ্রেমে দিবে তৃপ্তি,
> সব দুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্ব সুখে দীপ্তি
> দাহহীন। সম্বরিয়া ভাব-অশ্রুনীর
> চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গভীর।
>
> —নৈবেদ্য, অপ্রমত্ত।

অথচ কবির এই আধ্যাত্মিকতা কেবল মাত্র শুষ্ক জ্ঞান ও বুদ্ধির বিচার-বিতর্ক নহে,—এই আধ্যাত্মিকতায় সরস প্রেম-মধুর আত্ম-নিবেদনের ও প্রিয়-মিলন-সঞ্জাত আনন্দেরও অভাব নাই।

কবি আনন্দময়েরই উপাসক, তাঁহার কাছে—'আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের!'—চৈতালি, অভয়। কবির কাছে 'যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা!'—চৈতালি, পুণ্যের হিসাব। কারণ 'আর পাবো কোথা, দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা!'—সোনার তরী, বৈষ্ণব কবিতা। কবি জানেন—

> নিত্যকাল মহাপ্রেমে বসি বিশ্বভূপ
> তোমা-মাঝে হেরিছেন আত্ম-প্রতিরূপ।
>
> —চৈতালী, ধ্যান।

আনন্দবাদী কবি শুনিতে পান—'জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ-গান বাজে!' এবং তিনি জানেন—'জগতে আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।' কবি বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

> আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান,
> দাঁড় ধ'রে আজ বস্ রে সবাই, টান্ রে সবাই টান্।
>
> —গীতাঞ্জলি।

কবির দেবতা কখনো রাজার দুলাল হইয়া দ্বারে উপনীত হন হৃদয়ের মণিহার উপহার পাইবার জন্য, কখনো তাঁহার বর ও বঁধু রূপে মনোহরণ করেন। কবি নামরূপহীন অপরূপের প্রেমে মগ্ন। কবির এই মিষ্টিসিজম্ সলোমনের সাম, ডেভিডের গীতি, সেণ্ট-ফ্রান্সিস অফ অ্যাসিসি, টমাস্ এ কেম্পিস প্রভৃতি ও সুফী কবিদের ভক্তির উক্তি স্মরণ করাইয়া দেয়। ভগবান্‌কে বর-রূপে বা বধূ-রূপে বোধ করা বৈষ্ণব ভাব-সাধনার একটা অঙ্গ। বৃন্দাবনে এক মাত্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, আর সবাই গোপী। তাই চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থের রচয়িতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

> অন্যের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
> মনে বনে এক করি' জানি।
> তাহা তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়,
> তবে তোমার পূর্ণকৃপা মানি॥
> প্রাণনাথ। শুন মোর সত্য নিবেদন।—চৈ, চ, মধ্য ১৩.

ইংরেজ কবিরাও ভগবান্‌কে বর ও বঁধু রূপে অনুভব করিয়াছেন

> What if this Friend happen to be—God
>
> —Browning, Fears & Scruples.

For me the Heavenly Bridegroom waits.
—Tennyson, St. Augustine's Eve.
The bridegroom of my soul I seek,
Oh, when will he appear!
—Cowper.

কবি রবীন্দ্রনাথের স্বর্গ কোনো বিশেষ সুখময় প্রলোভনময় স্থান মাত্র নহে। কবি কল্পিত স্বর্গ হইতে এই মাটির ধরণীকে অধিক মমতাময়ী পুণ্যময়ী মনে করেন, তাই তিনি 'স্বর্গ হইতে বিদায়' লইয়া চলিয়া আসিবার সময় কিছু মাত্র বেদনা তো অনুভব করেনই নাই, বরং আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। এই স্বর্গ ভগবানের রচনা নহে, তিনি ইহা রচনা করিবার ভার সকল মানবের উপরে দিয়া রাখিয়াছেন—

তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।
—বলাকা, ২৮ নম্বর।

কবি স্বর্গ সম্বন্ধে কি মনে করেন তাহা তাঁহার বলাকার একটি কবিতায় সুস্পষ্ট হইয়াছে।

স্বর্গ কোথায় জানিস কি তা ভাই।
তার ঠিক-ঠিকানা নাই।
তার আরম্ভ নাই, নাই রে তাহার শেষ,
ওরে নাই রে তাহার দেশ,
ওরে নাই রে তাহার দিশা,
ওরে নাইরে দিবস, নাই রে, তাহার নিশা।
ফিরেছি সেই স্বর্গে শূন্যে শূন্যে
ফাঁকির ফাঁকা ফানুষ।
কত যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির পরে ধূলা-মাটির মানুষ।
স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমার দেহে,
আমার প্রেমে, আমার স্নেহে,
আমার ব্যাকুল বুকে,
আমার লজ্জা, আমার সজ্জা, আমার দুঃখে সুখে।
আমার জন্ম-মৃত্যুরি তরঙ্গে
নিত্য নবীন রঙের ছটায় খেলায় সে যে রঙ্গে।

* * *

স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটিমায়ের কোলে।
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দ-কল্লোলে।

স্বর্গ যদি এই মাটির ধরণীর বুকে আমার মধ্যে আমার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে এখান হইতে মুক্তি আমরা পাইতে পারি না; তাই কবি মুক্তি চাহেন না। কেবল মাত্র মুক্তি তো অর্থশূন্য, বন্ধন যদি নাই থাকে তবে মুক্তি হইবে কিসের হইতে। বন্ধন স্বীকার করিলেই তো মুক্তি পাওয়া যাইবে। তাই কবি বলিয়াছেন—

বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।
—নৈবেদ্য, মুক্তি।

কবি বলেন—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

তাই ভগবানের কাছে তাঁহার প্রার্থনা উত্থিত হইয়াছে—

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ।

কবি সকলের সহিত অনাসক্ত হইয়া যুক্ত থাকিতে চাহেন পদ্মপত্রম্ ইবাম্ভসা।

আনন্দবাদী কবি মৃত্যুভয় জয় করিয়াছেন, তিনি মনে করেন মৃত্যু এই জীবনেরই একটি অবস্থা; ফুলের যেমন পরিণতি ফলে, মানুষের যেমন বাল্য যৌবন বার্ধক্য, তেমনি জীবনের শেষ পরিণতি মৃত্যুতে—

ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা,
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।
—গীতাঞ্জলি।

এই জন্যই কবি কিশোর বয়সেই বলিতে পারিয়াছিলেন—

মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।
—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।

মৃত্যু কবির কাছে ঝুলন-খেলা, তাহা ইহ-জীবন ও পর-জীবনের মধ্যে দোল খাওয়া। কবীর সাহেব ও সিদ্ধ সাধক কবি বেকস যেমন বলিয়াছিলেন যে মৃত্যু হইতেছে ঝুলন বা দোলা বা ইহলোকে ও পরলোকে বল্-লোফালুফি খেলা, তেমনি কবিও জানেন যে মরণই জীবনের শেষ নহে, কবি জানেন যে শেষের মধ্যে অশেষ আছে!'*

* কবীর মরণকে ঝুলনের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—
জনম-মরণ-বীচ দেখ অন্তর নহী—
দাচ্ছ ঔর বাম যুঁ এক আহী।
জনম-মরণ জহাঁ তারী পরত হৈ,
হোত আনন্দ তঁহ গগন গাজৈ।

প্রথম মিলন ভীতি ভেঙেছে বধূর,
তোমার বিরাট্ মূর্তি নিরখি' মধুর।
সর্বত্র বিবাহ-বাঁশী উঠিতেছে বাজি',
সর্বত্র তোমার ক্রোড় হেরিতেছি আজি।

ইহলোকে যে জীবনদেবতা অন্তর্যামী আমাকে সার্থকতা দান করেন, তিনিই মরণ-'সিন্ধুপারে' অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দেখা দেন, তখন বিস্ময়-স্তম্ভিত হৃদয়ে মানুষ বলিয়া উঠে—'এখানেও তুমি জীবনদেবতা!'

কবি মৃত্যুকে মাতৃপাণির ন্যায় পরম নির্ভরযোগ্য মনে করিয়াছেন—

সে যে মাতৃপাণি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি'।

*　　*　　*

উঠত ঝনকার তহঁ নাদ অনহদ ঘুরৈ,
তিরলোক-মহলকে প্রেম বাজৈ।
চন্দ্র তপন কোটি দীপ বরত হৈ,
তুর বাজে তহাঁ সন্ত ঝুলৈ।
প্যার ঝনকার তহঁ, নূর বরষত রহৈ,
রস পীবৈ তহঁ ভক্ত ভুলৈ।

সিন্ধুদেশের ভক্ত বেকস মাত্র ২২ বৎসর বয়সে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মারা যান। তিনি মৃত্যুর সময়ে মাতাকে প্রবোধ দিয়ে জন্ম ও মৃত্যুকে জগজ্জননী ও পার্থিব জননীর মধ্যে বল্ লোফালুফি খেলার সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

উভয় মাতু বীচ খেল চলে—
গেঁদ জ্যু মোকো দেই লেঈ।
তেই ত জনম মোকো মরণ হৈ,
খেলু আজ মোকু দেঈ।

—শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের সংগ্রহ।

ইউরোপীয় লেখকেরাও মৃত্যুকে অমৃতের সেতু বলিয়াছেন—

Our life is a succession of deaths and resurrections;
we die, Christopher, to be born again.—Romain Rolland.

...and still depart
From death to death thro' life and life, and find
Nearer and nearer Him, who wrought
Not matter, nor the finite-infinite,
—Robert Browning

Earth knows no desolation.
She smells regeneration
In the moist breath of decay.
—Meredith

স্তন হতে তুলে নিলে শিশু কাঁদে ডরে
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।
—নৈবেদ্য।

কবীর যেমন মৃত্যুকে তাঁহার জীবনের বর বলিয়া আনন্দে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, আমাদের কবির কাছেও মৃত্যু সেইরূপ, গৌরীর কাছে বিলোচনের তুল্য।

ভগবান্ তো মানুষের "এই জীবনে ঘটালে মোর জন্মজন্মান্তর!" অতএব মৃত্যু যে-জন্মান্তরের সূচনা করিতেছে তাহাকে ভয় কি! এই জন্য কবি নিজেকে বলিয়াছেন তিনি মৃত্যুঞ্জয়—

আমি মৃত্যু চেয়ে বড়—এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চ'লে।
—পরিশেষ, মৃত্যুঞ্জয়।

এবং সর্বশেষে কবি এই বলিয়া মনকে অভয় দিয়াছেন—

নব নব মৃত্যু-পথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।

আর—

যাবার দিনে এই কথাটি ব'লে যেন যাই,
যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই।

এবং—

অবশেষে বুক ফেটে শুধু বলি আসি'—
হে চিরসুন্দর, আমি তোরে ভালবাসি।
—চৈতালি।

কিন্তু কবি চিরন্তন, তাঁহার তো মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই।

এই সকল কারণে কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের সকলের হৃদয়ের কবি, আমাদের মুখপাত্র, আমাদের মনের অস্ফুট কথাগুলিকে তিনি আকার দিয়াছেন, যে-কথা আমরা বলিতে চাই বলিতে পারি না অথবা বলিতে জানিও না, সেই সব কথা তিনি আমাদের হইয়া বলিয়া দিয়াছেন, তাই তিনি আমাদের সকলের এত প্রিয় কবি। তিনি দুঃখে সান্ত্বনা-দাতা, আনন্দের সঙ্গী, অবসাদে উৎসাহ-দাতা, কুসংস্কার হইতে উদ্ধারকর্তা, বুদ্ধির মুক্তিদাতা। এই কবির আবির্ভাবে বিশ্ববাসী যে কত দিকে কত লাভবান্ হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা দুঃসাধ্য।

আরণ্যক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১১

প্রায় তিন বছর কাটিয়া গিয়াছে।

এই তিন বছরে আমার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। লবটুলিয়া ও আজমাবাদের বন্য প্রকৃতি কি মায়াকাজল লাগাইয়া দিয়াছে আমার চোখে—শহরকে এক রকম ভুলিয়া গিয়াছি, বিরাট মুক্ত দূরবিসর্পী বন-প্রান্তরের মোহ, নির্জ্জনতার মোহ, নক্ষত্রভরা উদার আকাশের মোহ আমাকে এমনি পাইয়া বসিয়াছে যে মধ্যে একবার কয়েকদিনের জন্যে পাটনায় গিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম কবে পিচ্‌ঢালা বাঁধাধরা রাস্তার গণ্ডি এড়াইয়া চলিয়া যাইব লবটুলিয়া বইহারে,—পেয়ালার মত উপুড়-করা নীল আকাশের তলে মাঠের পর মাঠ, অরণ্যের পর অরণ্য, যেখানে তৈরি রাজপথ নাই, ইটের ঘরবাড়ী নাই, মোটর-হর্ণের আওয়াজ নাই, ঘন ঘুমের ফাঁকে যেখানে কেবল দূর অন্ধকার বনে শেয়ালের দলের প্রহর-ঘোষণা শোনা যায় নয় তো ধাবমান নীলগাইয়ের দলের সম্মিলিত পদধ্বনি, নয় তো বন্য মহিষের গম্ভীর আওয়াজ।

আমার উপরওয়ালারা ক্রমাগত আমাকে চিঠি লিখিয়া তাগাদা করিতে লাগিলেন, কেন আমি এখানকার জমি প্রজাবিলি করিতেছি না। আমি জানি আমার তাহাই একটি প্রধান কাজ বটে, কিন্তু এখানে প্রজা বসাইয়া প্রকৃতির এমন নিভৃত কুঞ্জবনকে নষ্ট করিতে মন সরে না। যাহারা জমি ইজারা লইবে, তাহারা তো জমিতে গাছপালা বনঝোপ সাজাইয়া রাখিবার জন্য কিনিবে না—কিনিয়াই তাহারা জমি সাফ করিয়া ফেলিবে, ফসল রোপণ করিবে, ঘরবাড়ী বাঁধিয়া বসবাস সুরু করিবে—এই নির্জ্জন শোভাময় বন্য প্রান্তর অরণ্য, কুণ্ডী, শৈলমালা জনপদে পরিণত হইবে, লোকের ভিড়ে ভয় পাইয়া বনলক্ষ্মীরা ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাইবেন—মানুষ ঢুকিয়া এই মায়াকাননের মায়াও দূর করিবে, সৌন্দর্য্যও ঘুচাইয়া দিবে।

সে জনপদ আমি মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পাই।

পাটনায়, পূর্ণিয়া কি মুঙ্গের যাইতে তেমন জনপদ এদেশের সর্ব্বত্র। গায়ে গায়ে কুশ্রী, বেঢপ খোলার একতলা কি দোতলা মাঠকোঠা, চালে চালে বাতি, ফণিমনসার ঝাড়, গোবরস্তূপের আবর্জ্জনার মাঝখানে গরু-মহিষের গোয়াল—ইঁদারা হইতে রহট্ দ্বারা জল উঠানো হইতেছে, ময়লা কাপড় পরা নরনারীর ভিড়, হনুমানজীর মন্দিরে ধ্বজা উড়িতেছে, রূপার হাঁসুলি গলায় উলঙ্গ বালকবালিকার দল ধুলা মাখিয়া রাস্তার উপর খেলা করিতেছে।

কিসের বদলে কি পাওয়া যাইবে!

এমন বিশাল ছেদহীন, বাধাবন্ধহীন উদ্দাম সৌন্দর্য্যময়ী আরণ্যভূমি দেশের একটা বড় সম্পদ—অন্য কোন দেশে হইলে আইন করিয়া এখানে ন্যাশনাল পার্ক করিয়া রাখিত। কর্ম্মক্লান্ত শহরের মানুষের মাঝে মাঝে এখানে আসিয়া প্রকৃতির সাহচর্য্যে নিজেদের অবসন্ন মনকে তাজা করিয়া লইয়া ফিরিত। তাহা হইবার যো নাই, যাহার জমি, সে প্রজাবিলি না করিয়া জমি ফেলিয়া রাখিবে কেন?

আমি প্রজা বসাইবার ভার লইয়া এখানে আসিয়াছিলাম—এই আরণ্য প্রকৃতিকে ধ্বংস করিতে আসিয়া এই অপূর্ব্ব সুন্দরী বন্য নায়িকার প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি। এখন আমি ক্রমশঃ সে-দিন পিছাইয়া দিতেছি—যখন ঘোড়ায় চড়িয়া ছায়াগহন বৈকালে কিংবা মুক্তাশুভ্র জ্যোৎস্নারাত্রে একা বাহির হই তখন চারি দিকে চাহিয়া মনে মনে ভাবি, আমার হাতেই ইহা নষ্ট হইবে? জ্যোৎস্নালোকে উদাস, আত্মহারা, শিলাস্তৃত ধূ ধূ নির্জ্জন বন্যপ্রান্তর! কি করিয়াই আমার মন ভুলাইয়াছে চতুরা সুন্দরী!

কিন্তু কাজ যখন করিতে আসিয়াছি, করিতেই হইবে। মাঘমাসের শেষে পাটনা হইতে ছটু সিং নামে এক রাজপুত আসিয়া হাজার বিঘা জমি বন্দোবস্ত লইতে চাহিলে দরখাস্ত দিতেই আমি বিষম চিন্তায় পড়িলাম— হাজার বিঘা জমি দিলে ত অনেকটা জায়গাই নষ্ট হইয়া যাইবে—কত সুন্দর বনঝোপ, লতাবিতান নির্ম্মমভাবে কাটা পড়িবে যে!

ছটু সিং ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল—আমি তাহার দরখাস্ত সদরে পাঠাইয়া দিয়া ধ্বংসলীলাকে কিছু বিলম্বিত করিবার চেষ্টা করিলাম।

এক দিন লবটুলিয়া জঙ্গলের উত্তরে নাঢ়া বইহারের মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়া দুপুরের পরে আসিতেছি— দেখিলাম একখানা পাথরের উপর কে বসিয়া আছে পথের ধারে।

তাহার কাছে আসিয়া ঘোড়া থামাইলাম। লোকটির বয়স ষাটের কম নয়, পরনে ময়লা কাপড়, একটা ছেঁড়া চাদর গায়ে।

এ জনশূন্য প্রান্তরে লোকটা কি করিতেছে একা বসিয়া?

সে বলিল—আপনি কে বাবু?

বলিলাম—আমি এখানকার কাছারির কর্ম্মচারী।

—আপনি কি ম্যানেজার বাবু?

—কেন বল ত? তোমার কোন দরকার আছে? হাঁ, আমিই ম্যানেজার। লোকটা উঠিয়া আমার দিকে আশীর্ব্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলিল। বলিল—হুজুর আমার নাম মটুকনাথ পাঁড়ে। ব্রাহ্মণ, আপনার কাছেই যাচ্ছি।

—কেন?

—হুজুর, আমি বড় গরীব। অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছি হুজুরের নাম শুনে। তিন দিন থেকে হাঁটছি পথে পথে। যদি আপনার কাছে চলাচলতির কোন একটা উপায় হয়—

আমার কৌতূহল হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম—এ ক'দিন জঙ্গলের পথে তুমি কি খেয়ে আছ?

মটুকনাথ তাহার মলিন চাদরের একপ্রান্তে বাঁধা পোয়াটাক কলাইয়ের ছাতু দেখাইয়া বলিল— সেরখানেক ছাতু ছিল এতে বাঁধা, এই নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে ছিলাম। তাই ক'দিন খাচ্ছি। রোজগারের চেষ্টায় বেড়াচ্ছি, হুজুর—আজ ছাতু ফুরিয়ে এসেছে, ভগবান জুটিয়ে দেবেন আবার।

আজমাবাদ ও নাঢ়া বইহারের এই জনশূন্য বনপ্রান্তরে উড়ানির খুঁটে ছাতু বাঁধিয়া লোকটা কি রোজগারের প্রত্যাশায় আসিয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম— বড় বড় শহর ভাগলপুর পূর্ণিয়া, পাটনা, মুঙ্গের ছেড়ে এ জঙ্গলের মধ্যে এলে কেন পাঁড়েজী? এখানে কি হবে? লোক কোথায় এখানে? তোমাকে দেবে কে?

মটুকনাথ আমার মুখের দিকে নৈরাশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—এখানে কিছু রোজগার হবে না বাবু? তবে আমি কোথায় যাব? ও-সব বড় শহরে আমি কাউকে চিনি নে, রাস্তাঘাট চিনি নে, আমার ভয় করে। তাই এখানে যাচ্ছিলাম—

লোকটাকে বড় অসহায়, দুঃখী ও ভালমানুষ বলিয়া মনে হইল। সঙ্গে করিয়া কাছারিতে লইয়া আসিলাম।

কয়েক দিন চলিয়া গেল। মটুকনাথকে কোন কাজ করিয়া দিতে পারিলাম না—দেখিলাম সে কোন কাজ জানে না—কিছু সংস্কৃত পড়িয়াছে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কাজ করিতে পারে, টোলে ছাত্র পড়াইত, আমার কাছে বসিয়া সময়ে অসময়ে উদ্ভট শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বোধ হয় আমার অবসরবিনোদনের চেষ্টা করে।

একদিন আমায় বলিল—আমায় কাছারির পাশে একটু জমি দিয়ে একটা টোল খুলিয়ে দিন হুজুর।

বলিলাম—কে পড়বে টোলে পণ্ডিতজী, বুনো মহিষ ও নীলগাইয়ের দল কি ভট্টি বা রঘুবংশ বুঝবে?

মটুকনাথ নিপাট ভালমানুষ—বোধ হয় কিছু না ভাবিয়া দেখিয়াই টোল খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। ভাবিলাম, বুঝিয়া এবার সে নিরস্ত হইবে। কিন্তু দিন-কতক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার সে কথাটা পাড়িল।

বলিল—দিন্ দয়া করে একটা টোল আমায় খুলে।

দেখি না চেষ্টা ক'রে কি হয়। নয় ত আর যাব কোথায় হুজুর?

ভাল বিপদে পড়িয়াছি, লোকটা কি পাগল! ওর মুখের দিকে চাহিলেও দয়া হয়, সংসারের ঘুরপেঁচ বোঝে না, নিতান্ত সরল, নির্ব্বোধ ধরণের মানুষ—অথচ একরাশ নির্ভর ও ভরসা লইয়া আসিয়াছে—কাহার উপর কে জানে?

তাহাকে কত বুঝাইলাম, আমি জমি দিতে রাজি আছি, সে চাষবাস করুক, যেমন বৈকুণ্ঠ পাড়ে করিতেছে। মটুকনাথ বিনতি করিয়া বলিল, তাহারা বংশানুক্রমে শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, চাষকাজের সে কিছুই জানে না, জমি লইয়া কি করিবে?

তাহাকে বলিতে পারিতাম শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত-মানুষ এখানে মরিতে আসিয়াছ কেন, কিন্তু কোন কঠিন কথা বলিতে মন সরিল না। লোকটাকে বড় ভাল লাগিয়াছিল। অবশেষে তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে একটা ঘর বাঁধিয়া দিয়া বলিলাম—এই তোমার টোল, এখন ছাত্র জোগাড় হয় কি না দেখ।

মটুকনাথ পূজার্চ্চনা করিয়া দু-তিনটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া টোল প্রতিষ্ঠা করিল। এ জঙ্গলে কিছুই মেলে না, সে নিজের হাতে মকাইয়ের আটার মোটা মোটা পুরী ভাজিল এবং জংলী ধুঁধুলের তরকারী। বাথান হইতে মহিষের দুধ আনাইয়া দই পাতিয়া রাখিয়াছিল। নিমন্ত্রিতের দলে অবশ্য আমিও ছিলাম।

টোল খুলিয়া কিছুদিন মটুকনাথ বড় মজা করিতে লাগিল।

পৃথিবীতে এমন মানুষও সব থাকে!

সকালে স্নানাহ্নিক সারিয়া সে টোলঘরে একখানা বন্যখেজুর পাতায় বোনা আসনের উপর গিয়া বসে এবং সম্মুখে মুগ্ধবোধ খুলিয়া সূত্র আবৃত্তি করে ঠিক যেন কাহাকে পড়াইতেছে। এমন চেঁচাইয়া পড়ে যে আমি আমার আপিস-ঘরে বসিয়া কাজ করিতে করিতে শুনিতে পাই।

তহশিলদার রামবিরিজ সিং বলে—পণ্ডিতজী লোকটা বদ্ধ পাগল। কি করছে দেখুন হুজুর।

মাস দুই এভাবে কাটে। শূন্য ঘরে মটুকনাথ সমান উৎসাহে টোল করিয়া চলিয়াছে। একবার সকালে, একবার বৈকালে। ইতিমধ্যে সরস্বতী পূজা পড়িল। কাছারিতে দোয়াত-পূজার দ্বারা বাগ্দেবীর অর্চ্চনা নিষ্পন্ন করা হয় প্রতি বৎসর, এ জঙ্গলে প্রতিমা কোথায় গড়ান হইবে? মটুকনাথ তার টোলে শুনিলাম আলাদা পূজা করিবে, নিজের হাতে নাকি প্রতিমা গড়িবে।

ষাট বছরের বৃদ্ধের কি ভরসা, কি উৎসাহ!

নিজের হাতে ছোট্ট প্রতিমা গড়িল মটুকনাথ। টোলে আলাদা পূজা হইল।

বৃদ্ধ হাসিমুখে বলিল—বাবুজী, এ আমাদের পৈতৃক পূজো। আমার বাবা চিরকাল তাঁর টোলে প্রতিমা গড়িয়ে পূজো করে এসেছেন, ছেলেবেলায় দেখেছি। এখন আবার আমার টোলে—

কিন্তু টোল কই?

মটুকনাথকে একথা বলি নাই অবশ্য।

সরস্বতী পূজার দিন দশ বারো পরে মটুকনাথ পণ্ডিত আমাকে আসিয়া জানাইল তাহার টোলে একজন ছাত্র আসিয়া ভর্ত্তি হইয়াছে। আজই সে নাকি কোথা হইতে আসিয়া পৌছিয়াছে।

মটুকনাথ ছাত্রটিকে আমার সামনে হাজির করাইল। চোদ্দ-পনেরো বছরের কালো, শীর্ণকায় বালক, মৈথিলী ব্রাহ্মণ, নিতান্ত গরীব, পরনের কাপড়খানি ছাড়া দ্বিতীয় বস্ত্র পর্য্যন্ত নাই।

মটুকনাথের উৎসাহ দেখে কে! নিজে খাইতে পায় না, সেই মুহূর্ত্তে সে ছাত্রটির ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিয়া বসিল। ইহাই তাহার কুলপ্রথা, টোলের ছাত্রের সকল প্রকার অভাব-অনটন এতদিন তাহাদের টোল হইতে নির্ব্বাহ হইয়া আসিয়াছে, বিদ্যা শিখিবার আশায় যে আসিয়াছে, তাহাকে সে ফিরাইতে পারিবে না।

মাস দুইয়ের মধ্যে দেখিলাম আরও দু-তিনটি ছাত্র জুটিল টোলে। ইহারা এক বেলা খায়, এক বেলা খায় না। সিপাহীরা চাঁদা করিয়া মকাইয়ের ছাতু, আটা, চীনার দানা দেয়, কাছারি হইতে আমিও কিছু সাহায্য করি। জঙ্গল হইতে বাথুয়া শাক তুলিয়া আনে ছাত্রেরা—

তাহাই সিদ্ধ করিয়া খাইয়া হয়ত একবেলা কাটাইয়া দেয়। মটুকনাথেরও সেই ব্যবস্থা।

রাত দশটা-এগারোটা পর্য্যন্ত মটুকনাথ শুনি ছাত্র পড়াইতেছে টোল ঘরের সামনে একটা হরিতকী গাছের তলায়। অন্ধকারেই অথবা জ্যোৎস্নালোকে—কারণ আলো জ্বালাইবার তেল জোটে না।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। মটুকনাথ টোলঘরের জন্য জমি ও ঘর বাঁধিয়া দেওয়ার প্রার্থনা ছাড়া আমার কাছে কোন দিন কোন আর্থিক সাহায্য চায় নাই। কোন দিন বলে নাই আমার চলে না, একটা উপায় করুন। কাহাকেও সে কিছু জানায় না, সিপাহীরা নিজের ইচ্ছায় যা দেয়।

বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাসের মধ্যে মটুকনাথের টোলের ছাত্রসংখ্যা বেশ বাড়িল। দশ-বারোটি বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো গরীব বালক বিনা পয়সায় অন্ন আয়াসে খাইতে পাইবার লোভে নানা জায়গা হইতে আসিয়া জুটিয়াছে। কারণ এ-সব দেশে কাকের মুখে একথা ছড়ায়। ছাত্রগুলিকে দেখিয়া মনে হইল ইহারা পূর্ব্বে মহিষ চরাইত। কারও মধ্যে এতটুকু বুদ্ধির উজ্জ্বলতা নাই—ইহারা পড়িবে কাব্য-ব্যাকরণ? মটুকনাথকে নিরীহ মানুষ পাইয়া পড়িবার ছুতায় তাহার ঘাড়ে বসিয়া খাইতে আসিয়াছে। কিন্তু মটুকনাথের এসব দিকে খেয়াল নাই, সে ছাত্র পাইয়া মহা খুশী।

একদিন শুনিলাম টোলের ছাত্রগণ কিছু খাইতে না পাইয়া উপবাস করিয়া আছে। সেই সঙ্গে মটুকনাথও।

মটুকনাথকে ডাকাইয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলাম।

কথাটা ঠিকই। সিপাহীরা চাঁদা করিয়া যে আটা ও ছাতু দিয়াছিল, তাহা ফুরাইয়াছে, কয়েক দিন রাত্রে শুধু বাথুয়া শাক সিদ্ধ আহার করিয়া চলিতেছিল, আজ তাহাও পাওয়া যায় নাই। তাহা ছাড়া উহা খাইয়া অনেকের অসুখ হওয়াতে কেহ খাইতে চাহিতেছে না।

—তা এখন কি করবে পণ্ডিতজী?

—কিছু ত ভেবে পাচ্ছি নে হুজুর। ছোট ছোট ছেলেগুলো না খেয়ে থাকবে—

আমি উহাদের সকলের জন্য সিধা বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলাম। দু-তিন দিনের উপযুক্ত চাল ডাল, ঘি, আটা। বলিলাম—টোল কি করে চালাবে, পণ্ডিতজী? ও উঠিয়ে দাও। খাবে কি, খাওয়াবে কি?

মটুকনাথ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল।

দেখিলাম, আমার কথায় সে আঘাত পাইয়াছে। বলিল—তাও কি হয় হুজুর? তৈরি টোল কি ছাড়তে পারি? ঐ আমার পৈতৃক ব্যবসায়।

মটুকনাথ সদানন্দ লোক। তাহাকে এ-সব বুঝাইয়া ফল নাই। সে ছাত্র কয়টি লইয়া বেশ মনের সুখেই আছে দেখিলাম।

আমার এই বনভূমির একপ্রান্ত যেন সেকালের ঋষিদের আশ্রম হইয়া উঠিয়াছে মটুকনাথের কৃপায়। টোলের ছাত্ররা কলরব করিয়া পড়াশুনা করে, মুগ্ধবোধের সূত্র আওড়ায়, কাছারির লাউ-কুমড়ার মাচা হইতে ফল চুরি করে, ফুলগাছের ডালপাতা ভাঙিয়া ফুল লইয়া যায়, এমন কি মাঝে মাঝে কাছারির লোকজনের জিনিসপত্র চুরি যাইতেও লাগিল—সিপাহীরা বলাবলি করিতে লাগিল, টোলের ছাত্রদেরই কাজ।

একদিন নায়েবের ক্যাশবাক্স খোলা অবস্থায় তাহার ঘরে পড়িয়া ছিল। কে তাহার মধ্য হইতে কয়েকটি টাকা ও নায়েবের একটি ঘষা মরা সোনার আংটি চুরি করিল। তাহা লইয়া খুব হৈ হৈ করিল সিপাহীরা। মটুকনাথের এক ছাত্রের কাছে কয়েক দিন পরে আংটিটা পাওয়া গেল। সে কোমরের ঘুনসিতে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, কে দেখিতে পাইয়া কাছারিতে আসিয়া বলিয়া দিল। ছাত্র বামাল শুদ্ধ ধরা পড়িল।

আমি মটুকনাথকে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। সে সত্যই নিরীহ লোক, তাহার ভালমানুষীর সুযোগ গ্রহণ করিয়া দুর্দ্দান্ত ছাত্রেরা যাহা খুসি করিতেছে। টোল ভাঙিবার দরকার নাই, অন্ততঃ কয়েকজন ছাত্রকে তাড়াইতেই হইবে। বাকী যাহারা থাকিতে চায়, আমি জমি দিতেছি, উহারা নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জমিতে কিছু কিছু মকাই, চীনাঘাস ও তরকারির চাষ করুক। খাদ্য শস্য যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহাতেই উহাদের চলিবে।

মটুকনাথ এ-প্রস্তাব ছাত্রদের কাছে করিল। বারো জন ছাত্রের মধ্যে আটজন শুনিবা মাত্র পালাইল। চার জন রহিয়া গেল, তাও আমার মনে হয় বিদ্যানুরাগের জন্য নয়, নিতান্ত কোথাও উপায় নাই বলিয়া। পূর্ব্বে মহিষ চরাইত, এখন না-হয় চাষ করিবে। সেই হইতে মটুকনাথের টোল চলিতেছে মন্দ নয়।

ছটু সিং ও অন্যান্য প্রজাদের জমি বিলি হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দেড় হাজার বিঘা জমি। নাঢ়া বইহারের জমি অত্যন্ত উর্ব্বর বলিয়া ঐ অংশেই দেড় হাজার বিঘা জমি এক সঙ্গে উহাদের দিতে হইয়াছে। সেখানকার প্রান্তরসীমার বনানী অতি শোভাময়ী, কতদিন সন্ধ্যাবেলা ঘোড়ায় আসিবার সময়ে সে বন দেখিয়া মনে হইয়াছে জগতের মধ্যে নাঢ়া বইহারের এই বন একটা বিউটি স্পট—গেল সে বিউটি স্পট!

দূর হইতে দেখিতাম বনে আগুন দিয়াছে, খানিকটা পোড়াইয়া না ফেলিলে ঘন দুর্ভেদ্য জঙ্গল কাটা যায় না। কিন্তু সব জায়গায় ত বন নাই, দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের ধারে ধারে নিবিড় বন, হয়ত প্রান্তরের মাঝে মাঝে বন-ঝোপ, কত কি লতা, কত কি বনকুসুম।...

চট্ চট্ শব্দ করিয়া বন পুড়িতেছে, দূর হইতে শুনি—কত শোভাময় লতাবিতান ধ্বংস হইয়া গেল, বসিয়া বসিয়া ভাবি। কেমন একটা কষ্ট হয় বলিয়া ওদিকে যাই না। দেশের একটা এত বড় সম্পদ, মানুষের মনে যাহা চিরদিন শান্তি ও আনন্দ পরিবেশন করিতে পারিত—এক মুষ্টি গমের বিনিময়ে তাহা বিসর্জ্জন দিতে হইল।

কার্ত্তিক মাসের প্রথমে একদিন জায়গাটা দেখিতে গেলাম। সমস্ত মাঠটাতে সরিষা বপন করা হইয়াছে—মাঝে মাঝে লোকজনেরা ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে, ইহার মধ্যেই গরু-মহিষ, স্ত্রীপুত্র আনিয়া গ্রাম বসাইয়া ফেলিয়াছে।

শীতকালের মাঝামাঝি যখন সর্ষেক্ষেত হলুদ ফুলে আলো করিয়াছে, তখন যে দৃশ্য চোখের সম্মুখে উন্মুক্ত হইল, তাহার তুলনা নাই। দেড় হাজার বিঘা ব্যাপী একটা বিরাট প্রান্তর দূর দিগ্বলয়সীমা পর্য্যন্ত হলুদ রঙের গালিচায় ঢাকা—এর মধ্যে ছেদ নাই, বিরাম নাই—উপরে নীল আকাশ, ইন্দ্রনীল মণির মত নীল—তার তলায় হলুদ—হলুদ রঙের ধরণী, যত দূর দৃষ্টি যায়। ভাবিলাম, এও একরকম মন্দ নয়।

একদিন নূতন গ্রামগুলি পরিদর্শন করিতে গেলাম। ছটু সিং বাদে সকলেই গরীব প্রজা। তাহাদের জন্য একটি নৈশ স্কুল করিয়া দিব ভাবিলাম—অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে সর্ষেক্ষেতের ধারে ধারে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতে দেখিয়া আমার নৈশ স্কুলের কথা আগে মনে পড়িল।

গনোরী তেওয়ারি স্কুলমাষ্টারকে ডাকাইয়া কাছারিতে আনাইয়া তাহাকে নাঢ়া বইহারে নৈশ বিদ্যালয়ের ভার লইতে হইবে বলিলাম। সে ইতিমধ্যে বিবাহ করিয়া এগারো ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটা গ্রামে পাঠশালা খুলিয়া দিন গুজরান করিতেছিল। আমি তাহাদের স্বামী-স্ত্রীর বাসের জন্য কাছারির পাশে মটুকনাথের টোলের নিকটে দুখানা ছোট ছোট খড়ের ঘর তৈরি করাইলাম। গনোরী তেওয়ারী দিন পনের পরে স্ত্রীকে লইয়া আসিল এবং নাঢ়া বইহারের নবাগত বালকবালিকাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিল।

কিন্তু শীঘ্রই নূতন প্রজারা ভয়ানক গোলমাল বাধাইল। দেখিলাম ইহারা মোটেই শান্তিপ্রিয় নয়। একদিন কাছারিতে বসিয়া আছি, খবর আসিল নাঢ়া বইহারের প্রজারা নিজেদের মধ্যে ভয়ানক দাঙ্গা সুরু করিয়াছে। জমির আল নির্দ্দিষ্ট কিছু না-থাকাতেই এই গোলমাল বাধিয়াছে, যাহার পাঁচ বিঘা জমি সে দশ বিঘা জমির ফসল দখল করিতে বসিয়াছে। আরও শুনিলাম সর্ষে পাকিবার কিছুদিন আগে ছটু সিং নিজের দেশ হইতে বহু রাজপুত লাঠিয়াল ও সড়্কিওয়ালা গোপনে আনিয়া রাখিয়াছিল তাহার আসল উদ্দেশ্য এখন বোঝা যাইতেছে নিজের তিন-চার শ বিঘা আবাদী জমির ফসল বাদে সে লাঠির জোরে সমস্ত নাঢ়া বইহারের দেড় হাজার বিঘা (বা যতটা পারে) জমির ফসল দখল করিতে চায়।

কাছারির আমলারা বলিল—এ-দেশের এই নিয়ম হুজুর। লাঠি যার ফসল তার।

যাহাদের লাঠির জোর নাই, তাহারা কাছারিতে আসিয়া আমার কাছে কাঁদিয়া পড়িল। তাহারা নিরীহ গরীব গাঙ্গোতা প্রজা—সামান্য দু-দশ বিঘা জমি জঙ্গল কাটিয়া চাষ করিয়াছিল, স্ত্রীপুত্র আনিয়া জমির ধারেই ঘরবাড়ী তৈরি করিয়া বাস করিতেছিল—এখন সারা বছরের পরিশ্রমের ও আশার সামগ্রী প্রবলের অত্যাচারে যাইতে বসিয়াছে!

কাছারির দুইজন সিপাহীকে ঘটনাস্থলে পাঠাইয়া-দিলাম ব্যাপার কি দেখিতে। তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া জানাইল—ভীমদাস টোলার উত্তর সীমায় ভয়ানক দাঙ্গা বাধিয়াছে।

তখনই তহসিলদার সজ্জন সিং ও কাছারির সমস্ত সিপাইদের লইয়া ঘোড়ায় করিয়া ঘটনাস্থলে রওনা হইলাম। দূর হইতেই একটা হৈ হৈ গোলমাল কানে আসিল। নাঢ়া বইহারের মাঝখান দিয়া একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী বহিয়া গিয়াছে—গোলমালটা যেন সেদিকেই বেশী।

নদীর ধারে গিয়া দেখি নদীর দুপারেই লোক জড় হইয়াছে—প্রায় ষাট-সত্তর জন এপারে, ওপারে ত্রিশ-চল্লিশ জন ছট্টু সিংএর রাজপুত লাঠিয়াল। ওপারের লোক এপারে আসিতে চায়, এপারের লোকেরা বাধা দিতে দাঁড়াইয়াছে। ইতিমধ্যে জন-দুই লোক জখমও হইয়াছে—তাহারা এপারের দলের। জখম হইয়া নদীর জলে পড়িয়াছিল, সেই সময় ছট্টু সিংএর লোকেরা টাঙি দিয়া একজনের মাথা কাটিতে চেষ্টা করে—এ-পক্ষ ছিনাইয়া নদী হইতে উঠাইয়া আনিয়াছে। নদীতে অবশ্য পা ডোবে না এমনি জল, পাহাড়ী নদী, তার উপর শীতের শেষ।

কাছারির লোকজন দেখিয়া উভয় পক্ষ দাঙ্গা থামাইয়া আমার কাছে আসিল। প্রত্যেক পক্ষ নিজেদের যুধিষ্ঠির এবং অপরপক্ষকে দুর্য্যোধন বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিল। সে হৈ হৈ কলরবের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়। উভয় পক্ষকে কাছারিতে আসিতে বলিলাম। আহত লোক দুটির সামান্য লাঠির চোট লাগিয়াছিল, এমন গুরুতর জখম কিছু নয়। তাহাদেরও কাছারিতে লইয়া আসিলাম।

ছট্টু সিংএর লোকেরা বলিল দুপুরের পরে তাহারা কাছারিতে আসিয়া দেখা করিবে। ভাবিলাম, সব মিটিয়া গেল। কিন্তু তখনও আমি এদেশের লোক চিনি নাই। দুপুরের অল্প পরেই আবার খবর আসিল নাঢ়া বইহারে ঘোর দাঙ্গা বাধিয়াছে। আমি পুনরায় লোক-জন লইয়া ছুটিলাম। একজন ঘোড়সওয়ার পনের মাইল দূরবর্ত্তী নউগছিয়া থানায় রওনা করিয়া দিলাম। গিয়া দেখি ঠিক ও-বেলার মতই ব্যাপার। ছট্টু সিং এবেলা আরও অনেক লোক জড় করিয়া আনিয়াছে। শুনিলাম রাসবিহারী সিং রাজপুত ও নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা ছট্টু সিংকে সাহায্য করিতেছে। ছট্টু সিং ঘটনাস্থলে ছিল না, তার ভাই গজাধর সিং ঘোড়ায় চাপিয়া কিছুদূরে দাঁড়াইয়াছিল—আমায় আসিতে দেখিয়া সরিয়া পড়িল। এবার দেখিলাম রাজপুত-দলের দুজনের হাতে বন্দুক রহিয়াছে।

ওপার হইতে রাজপুতেরা হাঁকিয়া বলিল—হুজুর, সরে যান আপনি, আমরা একবার এই বাঁদীর বাচ্চা গাঙ্গোতাদের দেখে নি।

আমার দলবল গিয়া আমার হুকুমে উভয় দলের মাঝখানে দাঁড়াইল। আমি তাহাদিগকে জানাইলাম নউগাছিয়া থানায় খবর গিয়াছে, এতক্ষণ পুলিস অর্দ্ধেক রাস্তা আসিয়া পড়িল। ও-সব বন্দুক কার নামে? বন্দুকের আওয়াজ করিলে তার জেল অনিবার্য্য। আইন ভয়ানক কড়া।

বন্দুকধারী লোক দুজন একটু পিছাইয়া পড়িল।

আমি এপারের গাঙ্গোতা প্রজাদের ডাকিয়া বলিলাম—তাহাদের দাঙ্গা করিবার কোনো দরকার নাই। তাহারা যে যার জায়গায় চলিয়া যাক। আমি এখানে আছি। আমার সমস্ত আমলা ও সিপাহীরা আছে। ফসল লুঠ হয় আমি দায়ী।

গাঙ্গোতা-দলের সর্দ্দার আমার কথার উপর নির্ভর করিয়া নিজের লোকজন হঠাইয়া কিছু দূরে একটা বকাইন গাছের তলায় দাঁড়াইল। আমি বলিলাম—ওখানেও না। একেবারে সোজা বাড়ী গিয়ে ওঠো। পুলিস আসছে।

রাজপুতেরা অত সহজে দমিবার পাত্রই নয়। তাহারা ওপারে দাঁড়াইয়া নিজেদের মধ্যে কি পরামর্শ করিতে লাগিল। তহসিলদার সজ্জন সিংকে জিজ্ঞাসা করিলাম কি ব্যাপার সজ্জন সিং? আমাদের উপর চড়াও হবে না কি?

তহসিলদার বলিল হুজুর, ওই যে নন্দলাল বা গোলাওয়ালা জুটেছে, ওকেই ভয় হয়। ও বদমাইসটা আস্ত ডাকাত।

—তাহ'লে তৈরি হয়ে থাকো। নদী পার কাউকে হতে দেবে না। ঘণ্টা দুই সামলে রাখো, তার পরই পুলিস এসে পড়বে।

রাজপুতেরা পরামর্শ করিয়া কি ঠিক করিল জানি না, একদল আগাইয়া আসিয়া বলিল—হুজুর আমরা ওপারে যাব।

বলিলাম, কেন?

—আমাদের কি ওপারে জমি নেই?

—পুলিসের সামনে সে কথা বোলো। পুলিস তো এসে পড়ল। আমি তোমাদের এপারে আসতে দিতে পারি নে।

—কাছারিতে এক রাশ টাকা সেলামী দিয়ে জমি বন্দোবস্ত নিয়েছি কি ফসল লোকসান করবার জন্যে? এ আপনার অন্যায় জুলুম।

—সে কথাও পুলিসের সামনে বোলো।

—আমাদের ওপারে যেতে দেবেন না?

—না। পুলিস আসবার আগে নয়! আমার মহালে আমি দাঙ্গা হতে দেবো না।

ইতিমধ্যে কাছারির আরও লোকজন আসিয়া পড়িল। ইহারা আসিয়া রব উঠাইয়া দিল, পুলিস আসিতেছে। ছটু সিংএর দল ক্রমশঃ দু-এক জন করিয়া সরিয়া পড়িতে লাগিল। তখনকার মত দাঙ্গা বন্ধ হইল বটে, কিন্তু মারপিট, পুলিস-হাঙ্গামা, খুনজখমের সেই যে সূত্রপাত হইল দিন দিন তাহা বাড়িয়া চলিতে লাগিল বই কমিল না। আমি দেখিলাম ছটু সিংএর মত দুর্দ্দান্ত রাজপুতকে এক সঙ্গে অতটা জমি বিলি করিবার ফলেই যত গোলমালের সৃষ্টি। ছটু সিংকে একদিন ডাকাইলাম। সে বলিল এখবরের বিন্দুবিসর্গ সে জানে না। সে অধিকাংশ সময় ছাপরায় থাকে। তার লোকেরা কি করে না-করে তার জন্য সে কি করিয়া দায়ী?

বুঝিলাম লোকটা পাকা ঘুঘু। সোজা কথায় এখানে কাজ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাকে জব্দ করিতে হইলে অন্য পথ দেখিতে হইবে।

সেই হইতে আমি গাঙ্গোতা প্রজা ভিন্ন অন্য কোন লোককে জমি দেওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলাম। কিন্তু যে-ভুল আগেই হইয়া গিয়াছে, তাহার কোন প্রতীকার আর হইল না। নাঢ়া বইহারের শান্তি চিরদিনের জন্য ঘুচিয়া গেল।

আমাদের বারো মাইল দীর্ঘ জংলী মহালের উত্তর অংশে প্রায় পাঁচ ছশ একর জমিতে প্রজা বসিয়া গিয়াছে। পৌষ মাসের শেষে একদিন সেদিকে যাইবার দরকার হইয়াছিল—গিয়া দেখি এরা এ-অঞ্চলের চেহারা বদলাইয়া দিয়াছে।

ফুলকিয়ার জঙ্গল হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া চোখে পড়িল সামনে দিগন্তবিস্তীর্ণ ফুল-ফোটা সর্ষেক্ষেত—যতদূর চোখ যায়, ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে একটানা হলুদে ফুল-তোলা একখানা সুবিশাল গালিচা কে যেন পাতিয়া দিয়াছে—এর কোথাও বাধা নাই, ছেদ নাই জঙ্গলের সীমা হইতে একেবারে বহু বহু দূরের চক্রবালরেখায় নীল শৈলমালার কোলে মিশিয়াছে। মাথার উপরে শীতকালের নির্ম্মেঘ, নীল আকাশ। এই অপরূপ শস্যক্ষেত্রের মাঝে মাঝে প্রজাদের কাশের খুপ্‌ড়ি। স্ত্রীপুত্র লইয়া এই দুরন্ত শীতে কি করিয়া তাহারা যে এই কাশ-ডাঁটার বেড়াঘেরা কুটীরে এই উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে বাস করে!

ফসল পাকিবার সময়ের আর বেশী দেরী নাই। ইহারই মধ্যে কাটুনী মজুরের দল নানাদিক হইতে আসিতে সুরু করিয়াছে। ইহাদের জীবন বড় অদ্ভুত, পূর্ণিয়া, তরাই ও জয়ন্তীর পাহাড়-অঞ্চল হইতে ও উত্তর ভাগলপুর জেলা হইতে স্ত্রীপুত্র লইয়া ফসল পাকিবার সময় ইহারা আসিয়া ছোট ছোট কুঁড়েঘর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে ও জমির ফসল কাটে—ফসলের একটা অংশ

মজুরিস্বরূপ পায়। আবার ফসল কাটা শেষ হইয়া গেলে কুঁড়েঘর ফেলিয়া রাখিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া চলিয়া যায়। আবার আর বছর আসিবে। ইহাদের মধ্যে নানা জাতি আছে—বেশীর ভাগ গাঙ্গোতা কিন্তু ছত্রী, ভূমিহার ব্রাহ্মণ, মৈথিল ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত আছে।

এ-অঞ্চলের নিয়ম, ফসল কাটিবার সময়ে ক্ষেতে বসিয়া খাজানা আদায় করিতে হয়—নয়ত এত গরীব প্রজা, ফসল ক্ষেত হইতে উঠিয়া গেলে আর খাজানা দিতে পারে না। খাজানা আদায় তদারক করিবার জন্য দিন কতক আমাকে ফুলকিয়া বইহারের দিগন্তবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে থাকিবার দরকার হইল।

তহসিলদার বলিল—ওখানে তাহ'লে ছোট তাঁবুটা খাটিয়ে দেব?

—একদিনের মধ্যেই ছোট একটি কাশের খুপ্‌ড়ি ক'রে দাও না?

—এই শীতে তাতে কি থাকতে পারবেন, হুজুর?

—খুব। তুমি তাই কর।

তাহাই হইল। পাশাপাশি তিন-চারটা ছোট ছোট কাশের কুটীর, একটা আমার শয়ন-ঘর, একটা রান্নাঘর, একটাতে দুজন সিপাহী ও পাটোয়ারী থাকিবে। এ-ধরণের ঘরকে এদেশে বলে 'খুপড়ি'—দরজা-জানালার বদলে কাশের বেড়ার খানিকটা করিয়া কাটা—বন্ধ করিবার উপায় নাই—হু হু হিম আসে রাত্রে। এত নীচু যে হামাগুড়ি দিয়া ভিতরে ঢুকিতে হয়। মেজেতে খুব পুরু করিয়া শুকনো কাশ ও বনঝাউয়ের খুঁটি বিছানো—তাহার উপর শতরঞ্চি, তাহার উপর তোষক-চাদর পাতিয়া ফরাস করা। আমার খুপড়িটি দৈর্ঘ্যে সাত হাত প্রস্থে তিন হাত। সোজা হইয়া দাঁড়ানো অসম্ভব ঘরের মধ্যে, কারণ উচ্চতায় মাত্র তিন হাত।

কিন্তু বেশ লাগে এই খুপ্‌ড়ি। এত আরাম ও আনন্দ কলিকাতায় তিন চার তলা বাড়ীতে থাকিয়াও পাই নাই। তবে বোধ হয় আমি দীর্ঘদিন এখানে থাকিবার ফলে বন্য হইয়া যাইতেছিলাম, আমার রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি, ভাল-মন্দ লাগা সবেরই উপর এই মুক্ত আরণ্য প্রকৃতির অল্পবিস্তর প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই এই এমন হইতেছে কিনা কে জানে?

খুপড়িতে ঢুকিয়াই প্রথমেই আমার ভাল লাগিল সদ্য-কাটা কাশডাঁটার তাজা সুগন্ধটা যাহা দিয়া খুপড়ির বেড়া বাঁধা। তাহার পর ভাল লাগিল আমার মাথার কাছেই এক বর্গহাত পরিমিত ঘুলঘুলি-পথে দৃশ্যমান, অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আমার দুটি চোখের দৃষ্টির প্রায় সমতলে অবস্থিত ধূ ধূ বিস্তীর্ণ সর্ষেক্ষেতের হলুদে ফুলরাশি। এ-দৃশ্যটা একেবারে অভিনব, আমি যেন একটা পৃথিবীজোড়া হলুদে কার্পেটের উপরে শুইয়া আছি। হু হু হাওয়ায় তীব্র ঝাঁজালো সর্ষে ফুলের গন্ধ।

শীতও যা পড়িতে হয় পড়িয়াছিল। পশ্চিমা হাওয়ার একদিনও কামাই ছিল না, অমন কড়া রৌদ্র যেন ঠাণ্ডা জল হইয়া যাইত কনকনে পশ্চিম: হাওয়ার প্রাবল্যে। বইহারের বিস্তৃত কুল-জঙ্গলের পাশ দিয়া ঘোড়া করিয়া ফিরিবার সময় দেখিতাম দূরে তিরাশী-চৌকার অস্বচ্ছ নীল পাহাড়শ্রেণীর ওপারে শীতের সূর্য্যাস্ত। সারা পশ্চিম আকাশ অগ্নিকোণ হইতে নৈঋর্ত কোণ পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া যায়, তরল আগুনের সমুদ্র, হু হু করিয়া প্রকাণ্ড অগ্নিগোলকের মত বড় সূর্য্যটা নামিয়া পড়ে—মনে হয় পৃথিবীর আহ্নিক গতি যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি, বিশাল ভূপৃষ্ঠ যেন পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বে ঘুরিয়া আসিতেছে, অনেক ক্ষণ চাহিয়া থাকিলে দৃষ্টিবিভ্রম উপস্থিত হইত, সত্যই মনে হইত যেন পশ্চিম দিকচক্রবাল প্রান্তের ভূপৃষ্ঠ আমার অবস্থিতি বিন্দুর দিকে ঘুরিয়া আসিতেছে।

রোদটুকু মিলাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেজায় শীত পড়িত, আমরাও সারাদিনের গুরুতর পরিশ্রম ও ঘোড়ায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটির পরে সন্ধ্যাবেলা প্রতিদিন আমার খুপড়ির সামনে আগুন জ্বালিয়া বসিতাম।

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারাবৃত বনপ্রান্তরের ঊর্দ্ধ আকাশে অগণ্য নক্ষত্রলোক কত দূরের বিশ্বরাজির জ্যোতির দূতরূপে পৃথিবীর মানুষের চক্ষুর সম্মুখে দেখা দিত। আকাশে নক্ষত্ররাজি জ্বলিত যেন জ্বলজ্বলে বৈদ্যুতিক বাতির মত—বাংলা দেশে অমন কৃত্তিকা, অমন সপ্তর্ষিমণ্ডল কখনও দেখি নাই। দেখিয়া দেখিয়া তাহাদের সঙ্গে

নিবিড় পরিচয় হইয়া গিয়াছিল, নীচে ঘন অন্ধকার, বনানী, নির্জ্জনতা, রহস্যময়ী রাত্রি, মাথার উপরে নিত্যসঙ্গী অগণ্য জ্যোতির্লোক। এক-এক দিন এক ফালি অবাস্তব চাঁদ অন্ধকারের সমুদ্রে সুদূর বাতিঘরের আলোর মত দেখাইত। আর সেই ঘন কৃষ্ণ অন্ধকারকে আগুনের তীক্ষ্ণ তীর দিয়া সোজা কাটিয়া এদিকে ওদিকে উল্কা খসিয়া পড়িতেছে। দক্ষিণে, উত্তরে, ঈশানে, নৈর্ঋতে পূর্ব্বে, পশ্চিমে সব দিকে। এই একটা, ওই একটা, ওই ছুটো, এই আবার একটা, মিনিটে, মিনিটে, সেকেণ্ডে, সেকেণ্ডে।

এক-এক দিন গনোরী তেওয়ারী, ও আরও অনেকে তাঁবুতে আসিয়া জোটে। নানা রকম গল্প হয়। এইখানেই একদিন একটা অদ্ভুত গল্প শুনিলাম। কথায় কথায় সেদিন শিকারের গল্প হইতেছিল। মোহনপুরা জঙ্গলের বন্য মহিষের কথা উঠিল। দশরথ সিং ঝাণ্ডাওয়ালা নামে এক রাজপুত সেদিন লবটুলিয়া কাছারিতে চরির ইজারা ডাকিতে উপস্থিত ছিল। লোকটা এক সময়ে খুব বনে জঙ্গলে ঘুরিয়াছে, দুঁদে শিকারী বলিয়া তার নাম আছে। দশরথ ঝাণ্ডাওয়ালা বলিল—হুজুর ওই মোহনপুরা জঙ্গলে বুনো মহিষ শিকার করতে আমি একবার টাঁড়বারো দেখি।

আমি বলিলাম—টাঁড়বারো? সে কি?

—হুজুর, সে অনেক দিনের কথা। কুশী নদীর পুল তখনও তৈরি হয় নি। কাটাবিয়ায় জোড়া খেয়া ছিল, গাড়ীর প্যাসেঞ্জার খেয়ায় মালশুদ্ধ পারাপার হ'ত। আমরা তখন ঘোড়ার নাচ নিয়ে খুব উন্মত্ত, আমি আর ছাপরার ছটু সিং। ছটু সিং হরিহরছত্র মেলা থেকে ঘোড়া নিয়ে আসত, আমরা দুজন সেই সব ঘোড়াকে নাচ শেখাতাম, তার পর বেশী দামে বিক্রী করতাম। ঘোড়ার নাচ দুরকম, জমৈতি আর ফনৈতি। জমৈতিতে যে সব ঘোড়ার তালিম বেশী, তারা বেশী দামে বিক্রী হয়। ছটু সিং ছিল জমৈতি নাচ শেখাবার ওস্তাদ। দুজনে তিন চার বছরে অনেক টাকা করেছিলাম।

একবার ছটুসিং পরামর্শ দিলে ঢোলবাজ্যা জঙ্গলে লাইসেন্স নিয়ে বুনো মহিষ ধরে ব্যবসা করতে। সব ঠিকঠাক হ'ল, ঢোলবাজ্যা দারভাঙ্গা মহারাজের রিজার্ভ ফরেষ্ট। আমরা কিছু টাকা খাইয়ে বনের আমলাদের কাছ থেকে পোরমিট আনালাম। তার পর ক'দিন ধরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে বুনো মহিষের যাতায়াতের পথের সন্ধান করে বেড়াই। অত বড় বন হুজুর, একটা বুনো মহিষের দেখা যদি কোন দিন মেলে! শেষে এক বুনো সাঁওতাল লাগালাম। সে একটা বাঁশবনের তলা দেখিয়ে বললে, গভীর রাত্রে এই পথ দিয়ে বুনো মহিষের জেরা (দল) জল খেতে যাবে। সেই পথের মধ্যে গভীর খানা কেটে তার ওপর বাঁশ ও মাটি বিছিয়ে ফাঁদ তৈরি করলাম। রাত্রে মহিষের জেরা যেতে গিয়ে গর্ত্তের মধ্যে পড়বে।

সাঁওতালটা দেখে শুনে বললে—কিন্তু সব করছিস বটে তোরা, একটা কথা আছে। ঢোলবাজ্যা জঙ্গলের বুনো মহিষ তোরা মারতে পারবি নে। এখানে টাঁড়বারো আছে।

আমরা ত অবাক। টাঁড়বারো কি?

সাঁওতাল বুড়ো বললে—টাঁড়বারো হ'ল বুনো মহিষের দলের দেবতা। সে একটাও বুনো মহিষের ক্ষতি করতে দেবে না।

ছটু সিং বললে—ওসব ঝুট কথা। আমরা মানি নে। আমরা রাজপুত, সাঁওতাল নই।

তার পর কি হ'ল শুনলে অবাক হয়ে যাবেন হুজুর। এখনও ভাবলে আমার গা কাঁটা দেয়। গহিন রাত্তে আমরা নিকটেই একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি, বুনো মহিষের দলের পায়ের শব্দ শুনলাম, তারা এদিকে আসছে। ক্রমে তারা খুব কাছে এল, গর্ত্তের থেকে পঞ্চাশ হাতের মধ্যে। হঠাৎ দেখি গর্ত্তের ধারে, গর্ত্তের দশ হাত দূরে এক দীর্ঘাকৃতি কালোমত পুরুষ নিঃশব্দে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এত লম্বা সে-মূর্ত্তি, যেন মনে হ'ল বাঁশঝাড়ের আগায় ঠেকেছে। বুনো মহিষের দল তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, তারপরে ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক পালাল, ফাঁদের ত্রিসীমানাতে এল না একটাও। বিশ্বাস করুন আর না করুন, নিজের চোখে দেখা।

তারপর আরও দু-এক জন শিকারীকে কথাটা জিজ্ঞেস

করেছি, তারা আমাদের বললে, ও-জঙ্গলে বুনো মহিষ ধরবার আশা ছাড়। টাঁড়বারো একটা মহিষও মারতে ধরতে দেবে না। আমাদের টাকা দিয়ে পোরমিট্ আনানো সার হ'ল, একটা বুনো মহিষও সেবার ফাঁদে পড়ল না।

দশরথ ঝাণ্ডাওয়ালার গল্প শেষ হইলে লবটুলিয়ার পাটোয়ারীও বলিল—আমরাও ছেলেবেলা থেকে টাঁড়বারোর গল্প শুনে আসছি। টাঁড়বারো বুনো মহিষের দেবতা—বুনো মহিষের দল বেঘোরে প'ড়ে প্রাণ না হারায়, সে দিকে তাঁর সর্ব্বদা দৃষ্টি।

গল্প সত্য কি মিথ্যা আমার সে-সব দেখিবার আবশ্যক ছিল না, আমি গল্প শুনিতে শুনিতে অন্ধকার আকাশে জ্যোতির্ম্ময় খড়্গধারী কালপুরুষের দিকে চাহিতাম, নিস্তব্ধ ঘন বনানীর উপর অন্ধকার আকাশ উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, দূরে কোথায় বনের মধ্যে বন্য কুক্কুট ডাকিয়া উঠিল, অন্ধকার ও নিঃশব্দ আকাশ, অন্ধকার ও নিঃশব্দ পৃথিবী পরস্পরে শীতের রাত্রে কাছাকাছি আসিয়া কি যেন কানাকানি করিতেছে—অনেক দূরে মোহনপুরী অরণ্যের কালো সীমারেখার দিকে চাহিয়া এই অশ্রুতপূর্ব্ব বনদেবতার কথা মনে হইয়া শরীর যেন শিহরিয়া উঠিত। এই সব গল্প শুনিতে ভাল লাগে এই রকম নির্জ্জন অরণ্যের মাঝখানে ঘন শীতের রাত্রে এই রকম আগুনের ধারেই বসিয়া।

(ক্রমশঃ)

শ্মশানেশ্বর

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

গঙ্গার ধারা সরিয়া গিয়াছে ; এধারে শুধুই চর,—
তাহারি কিনারে ঝাউঝাড়ে-ঘেরা পড়ো' মন্দিরঘর !
গর্ভগৃহে কোন্ বিগ্রহ ? আজি তা আছে কি নাই ?
দূর হ'তে তার ধরণ দেখিয়া আশ্বাস নাহি পাই।
চূড়া ভেদ করি' ঊর্দ্ধ আকাশে শাখা বিছায়েছে বট,
চারিধারে মেলি প্রাচীরে ও ভিতে তারই সহস্র জট ;
দ্বার-জানালার চিহ্নটি নাই, খুলিয়া নিয়াছে লোকে,
কোটরের মত ফাঁকগুলা শুধু তাকায় অন্ধ চোখে ;
যে-দেবতা হোথা জাগ্রত ছিল, সে কি আজ বেঁচে নাই ?
বারবার করি' চোখ মুছি আর ঝাপসা নয়নে চাই।

কবে কে তোমায় প্রতিষ্ঠা করি' গেঁথেছিল এই ঘর ?
কত বৎসর—কত-না শতক কেটে গেছে তার পর !
মানুষ গিয়েছে, মানুষের হাতে গড়া যাহা একদিন,
মানুষেরই মত কালের হস্তে হ'ল বুঝি ধূলিলীন !

হায়রে দেবতা ! মানুষের হাতে কেন দিয়েছিলে ধরা—
তারি মত যদি দু'দিন না যেতে তোমারও আসিবে জরা ?
পুত্র তাহার পৌত্র তাহার গেছে তারা আজ চলে',
আধপেটা খেয়ে যে সেবা করিল, তুমি তা নিলে কি বলে' ?
সেই বংশের কেহ যদি আজ তব মন্দিরদ্বারে
উদ্বন্ধনে প্রাণ দেয়—সে কি তোমারে ভুলিতে পারে ?

পুরাণের কথা হয়েছে পুরানো ;—নিজে আসি' নারায়ণ
আপনার হাতে কাটিত যেদিন ভক্তের বন্ধন !
আজিকার দিনে ধর্ম্ম নিজেরে রাখিতে পারে না ধরে',
আমাদেরই মত কর্ম্ম চালায় পায়ে পড়ে', ধার ক'রে ;
যে ধনী তাহার ধন জড়ো করে দরিদ্রগৃহ লুটি',
শক্তিমানের দম্ভ যাহার চারিধারে যায় জুটি' ;
ধর্ম্মকে শত বিলাসের মত আসবাব করি' খাড়া
মন্দিরে মঠে গির্জ্জায় আর মসজিদে রাখে যারা,

মর্ম্ম তাদের তুমি ভাল জান, হও যদি ভগবান,
পাষাণ না হ'লে লজ্জায় কবে হ'তে অন্তর্দ্ধান!

মনুষ্যত্ব মনুষ্যত্ব পুনঃসত্য কথা—
ব্যবচ্ছেদের পরে দেখ তারে—শুধু সে বর্ব্বরতা;
জগৎ জুড়িয়া তান্ত্রিক যত কারণে ও অকারণে
শবসাধনার নূতন তন্ত্রে মাতিয়াছে প্রাণপণে;
কালভৈরবীচক্রের মাঝে মিলি' যত দিক্‌পাল
চোরা কটাক্ষে পরস্পরের বুনিছে মৃত্যুজাল!
মক্ষীর মত মরিছে মানুষ নরঘাতকের হাতে,
কোন প্রতিকার নাই তার, তুমি নিজেই সাক্ষী তা'তে।
বিশ্বম্ভর সেজে ব'সে আছ বিশ্ব-অন্তরালে,
'দুষ্কৃত-নাশ' আশা দিয়ে কথা রাখ না তো কোন কালে!

চিরদিন হ'তে নানা ভক্তের ভক্তি করিয়া জড়ো
রহস্যজাল রচি' চারিধারে হইয়াছ এত বড়;
চুপ ক'রে থাক—কথা কহ না ক, নাহি রাগ, নাহি দ্বেষ,
চোখ থাক্ আর নাই থাক্, তুমি নিলাজ নির্ণিমেষ!
নিজ সৃষ্টিরে এই উপেক্ষা কত যে ভীষণ কথা,
বোঝ না ক তুমি—হেন অভিযোগে মোরা মনে পাই ব্যথা।
মোরা না থাকিলে, কে তোমারে দিত এই মূঢ় সম্মান,—
কে তোমারে আজও বাঁচায়ে রাখিত স'পিয়া মনঃপ্রাণ?

সেই ভক্তির ভাল প্রতিদান পদে-পদে তব পাই,
তবু তুমি কারও ধার না ক ধার, ভ্রূক্ষেপ নাহি তাই।

ক্ষমা কর আজি পাষাণ-দেবতা, পাষাণই যদি-বা হও,
চিরকাল ধরে' পূজাই পেয়েছ, বিদ্রোহ কিছু লও।
এই বিদ্রোহ ভাল চেনো তুমি, সেও যে তোমারি দান,
তুমি ছাড়া আমি সম্ভব নয়, তুমি যে বিশ্বপ্রাণ।
কতদিন বেয়ে কত সেবা খেয়ে ফুলিয়া হয়েছ বড়,
কত দুঃখের অর্ঘ্য কুড়ায়ে তিলে-তিলে করি' জড়ো!
পুরানো পূজার অরুচির রুচি চেখে দেখ আজ মুখে,
নিমের আচার যদি ভাল লাগে ও চিরমিষ্টি মুখে।
নিজেরই গরজে মার খেয়ে লোকে মারই কোল যথা চায়,
তোমারি আঘাতে রক্তকমল তেমনি ফুটে ও পায়।

* * *

গঙ্গার ধারা সরিয়া গিয়াছে মানুষেরও বুক থেকে,
শিবের মাথার জটাগুলো তাই বড় রুখু ছাই মেখে।
চারিধারে শুধু উষর ধূসর জেগে আছে বালুচর—
ফুটে না ক ফুল, ফলে না ক ফল,—দুস্তর প্রান্তর;
তাহারি প্রান্তে পড়ো' মন্দির দুয়ার-জানালা-খোলা,
আশুতোষ-চোখে ফুটি উঠে রোষ, ভোলানাথ পথভোলা!
নূতন যুগের আগাছায় ভরা জীর্ণ প্রাচীরগুলি,
কাঠবিড়ালীরা নাচে তারি গায়ে উচ্চে পুচ্ছ তুলি';
রাত্রি ঘনায়, বাদুড়-পেঁচায় চীৎকার ক'রে যায়,
শিব-বুকে আজ শ্মশান-কালিকা বেদনায় বলি চায়!

নারীর মূল্য

শ্রীআশালতা সিংহ

১

সকালবেলায় সবেমাত্র খবরের কাগজটি টানিয়া লইয়া বসিয়াছি, পাশের প্রতিবেশী-বাড়ী হইতে ঘন ঘন শাঁখ বাজিয়া উঠিল। ব্যাপারটা কি চিন্তা করিয়া বাহির করিবার পূর্ব্বেই সহাস্য মুখে ব্যস্তসমস্ত ভাবে গৃহিণী প্রবেশ করিলেন। করিয়া বলিলেন, "আহা, এত দিন পরে ওদের বাড়ীর নীরজার একটি খোকা হ'ল। বাবাঃ মেয়ের উপর মেয়ে, শাশুড়ীর খোঁটা আর স্বামীর মুখভারের জ্বালাতে নীরজা বেচারা এত দিন যেন চোরের মত থাকত। সব দোষ যেন কেবল তারই। তিন মেয়ের পরে এত দিনে একটি খোকা হয়েছে তার। তাই বেজে উঠেছে শাঁখ, তাই ওদের বাড়ীতে আনন্দের যেন বান ডেকেছে। কাঙালী-বিদেয় হচ্ছে, বামুনদের একখানা ক'রে কাঁসার থালা, পেতলের ঘড়া ও একজোড়া ক'রে কাপড় দান দেওয়া হচ্ছে। গুরুঠাকুরকে একখানা গিনি দিয়ে গিন্নী প্রণাম করলেন। খোকার ষষ্ঠীপূজোর দিনে দেবতা-বামুনের কাছে আরও দানধ্যান করা হবে।"

গৃহিণী এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া প্রতিবেশিনী সখীর আনন্দে ও সৌভাগ্যে আন্দোলিতা হইয়া প্রভাত-বায়ুস্পর্শে প্রফুল্ল হিল্লোলিত লতার মত লঘু চঞ্চল পদে আমার জন্য চা আনিতে প্রস্থান করিলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম।

বাঙালী ঘরে ছেলেতে মেয়েতে এতই পার্থক্য! আকাশপাতাল ব্যবধান। ছেলে হইলে সবারই মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিবে, ঘন ঘন শাঁখ বাজিবে। আর মেয়ে যদি দৈবক্রমে জন্মাইল, জননী নিজেকে মনে করিবেন অপরাধী, পরিজনের কাছে তাঁহার মাথা হেঁট হইবে। নবজাতা অতিথিটির জন্য মানব-সংসারে কোথাও কোন অভ্যর্থনা কোন সম্মানের আয়োজন হইবে না,

হস্তে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা লইয়া গৃহিণী প্রবেশ করিলেন। আমার চিন্তা তাঁহার সরস বচনরাশিতে ছবির মত মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিল। যে-কথা লইয়া চিন্তা করিতেছিলাম, মনের সেই তারেই তিনি ঘা দিলেন। নিকটস্থ চৌকিতে বসিয়া কতকটা আত্মগত ভাবেই কহিতে লাগিলেন, "মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরে মেয়ে হ'লে সে যেন কি একটা বিষাদের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বছর-দেড়েক আগেকার কথা মনে পড়ছে আমার—ঐ নীরজারই তৃতীয় মেয়েটি যখন হয়। দাই বললে তাকে, 'কেমন গোলাপফুলের মত ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে, এক বার চোখ মেলে দেখ বৌমা।' কিন্তু নীরজা সেই যে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল, কিছুতেই আর এদিকে মুখ ফেরালে না। আমিও একবার অনুরোধ করলাম তাকে, 'পাশ ফের্ না ভাই। তোর মেয়েকে যে পিঠ দিয়ে চাপা দিচ্ছিস।' কান্নাভরা সুরে নীরজা বললে, 'পিঠই লাগুক আর পাটই লাগুক, মেয়ের মুখ আর যেন আমাকে দেখতে না-হয়, এই আশীর্ব্বাদ ক'রো দিদি।' কত দুঃখে যে বেচারা সে-প্রার্থনা জানিয়েছে তা বুঝতে পেরে আমি চুপ করে রইলাম।"

আপিসের বেলা হইয়া আসিতেছিল, আমি হঠাৎ বলিলাম, "শোভা-মাকে আমার একবার ডেকে দাও ত, কি করছে সে। তার মাষ্টার এখনও যায় নি?"

শোভা আমাদের একমাত্র দুহিতা। তাহাকে ডাকিবার প্রয়োজন হইল না। একমাথা কোঁকড়া চুল লইয়া সে ঝাঁপাইয়া আসিয়া আমার কোলের উপর পড়িল। খানিকটা আপন মনে হাসিয়া লইয়া বলিতে সুরু করিল, "জান বাবা মাষ্টার মশায় কি বোকা? খরগোসের চোখ যে লাল তা জানেন না, আর কাঠ-বিড়ালীর পিঠে যে রামচন্দ্রের আপন হাতের পাঁচ আঙুলের ছাপ আছে তা কিছুতেই বুঝতে পারেন না

উনি বলছিলেন, 'সেতু বাঁধতে সাহায্য করেছিল ব'লে রাম খুশী হয়ে যে-কাঠবিড়ালীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন, সে ত কোন্ কালে মরে ভূত হয়ে গেছে। তাই বলে সেই হাতের ছাপ কি এখনও এত কাল পরে অন্য সবারই পিঠে থাকবে না কি? এ যে হয় না, হতে পারে না, এ ত অতি সোজা কথা।' সত্যি তাই বুঝি বাবা?"

আমি কোন জবাব দিবার পূর্ব্বেই শোভার মা বলিলেন, "আহা, মুখপোড়া মাষ্টারের কি শিক্ষার ছিরি! এখন থেকে মেয়েটার মাথা খাওয়া হচ্ছে। মেয়েমানুষকে ছোট থেকে শেখাতে হবে: বিশ্বাসে মিলয়ে ভক্তি, তর্কে বহু দূর। তা নয়, যত সব বাজে কুতর্ক করতে শিখিয়ে ওকে বিগড়ে দেবার ফন্দী।"

শোভা মায়ের কাছে কটূক্তি শুনিয়া মুখ ভার করিয়া ছল ছল চোখে তথা হইতে উঠিয়া গেল। আমি ক্লেশ পাইয়া বলিলাম, "দেখ, আমি অন্ততঃ আজ অবধি ছেলেতে মেয়েতে কোন তফাৎ করি নি, আমার যে ছেলে নেই, ঐ একমাত্র মেয়ে, তা নিয়েও কখনও কোন ক্ষোভ করি না, সে কথা ত তুমি জান। তবে কেন ওসব কথা বলে মেয়েটার মনে দুঃখ দিলে?"

গৃহিণী কোন বাদ-প্রতিবাদ করিয়া সময় নষ্ট না করিয়া সংক্ষেপে গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "মা-বাপে মেয়েকে শুধু আদরই দিতে পারে কিন্তু তার ভাগ্য ত আর গড়ে দিতে পারে না। এই কথাটা শুধু মনে রেখ, তাহলেই অনেক কথা, আজও যা বুঝে উঠতে পার নি, বুঝতে পারবে।"

তর্ক করা বৃথা। শোভার মা হয়ত ঠিকই বলিয়াছেন, বাঙালী ঘরের মেয়ের ভাগ্য যে কি হইবে ভবিষ্যতে, তাহা সঠিক করিয়া বলিতে বোধ করিবা স্বয়ং বিধাতাপুরুষও পারেন না। সমস্ত কিছুর জন্যই তাহাকে প্রস্তুত করিয়া রাখা প্রয়োজন।

মেয়ের মাও বোধ করি আপন অজ্ঞাতসারে মনে মনে এই কথাটাই পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। সহসা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "এ ত আর ছেলে নয় যে, জোর খাটবে। যা খুশী করতে পারব। তাই সদাই ভয়ে ভয়ে থাকি। বকলে মনে কষ্টও হয়, অথচ আদর দিতেও ভয়ে বুক কাঁপে। কিন্তু আর না, থাক ওসব বাজে কথা। তোমার যে স্নানের সব তৈরি। নাও ওঠ। ঘড়ির পানে একবার চেয়ে দেখেছ কি কত বেলা হয়েছে।"

২

বিকালের দিকে বাড়ীতে কিঞ্চিৎ অতিথি-সমাগম হইয়াছিল। মিসেস দাস এবং মিসেস গুপ্তা তাঁহাদের স্বামী ও কন্যা সমভিব্যাহারে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। মিসেস গুপ্তার মেয়েটি স্কটিশ চার্চ্চে বি-এ পড়ে এবং মিসেস দাসের কন্যা বেথুনে আই-এ পড়ে। মেয়েরা কিছুক্ষণ গল্পগুজব করিয়া টেনিস খেলিতে উঠিয়া গেল। তাহাদের মায়েরা নিজেদের সুখ-দুঃখের আলোচনায় নিমগ্না হইলেন। মিষ্টার দাস অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, আমি বলিলাম, "আপনাদের সমাজেই দেখছি মেয়েদের যথার্থ সম্মান আছে। বস্তুতঃ পূর্ব্ববঙ্গের ঘরে-ঘরেই দেখি মেয়েরা আই-এ, বি-এ পড়ছে। নিতান্ত তাড়াতাড়ি দায়-সারা-গোছের তাদের একটা বিয়ে দিয়ে দেবার গরজ নেই। এই ত চাই!" আমার এবম্বিধ উচ্ছ্বাসে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হইয়া মিষ্টার দাস একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার স্ত্রী স্বামীর হইয়া জবাব দিলেন, "হায় হায়, আপনার বুঝি এই ধারণা মিষ্টার মুখার্জ্জি? মেয়েদের আমরা দায়ে পড়েই অনেকটা পড়াচ্ছি। ভাল বর কোথা? আমাদের সমাজের অধিকাংশ ভাল ছেলেই আজ জেলে। যারা বাইরে আছে, তাদের মধ্যেও বড় সরকারী চাকুরে খুব কম। কি করব বলুন, বিয়ে দিয়ে তার পরেও ত আর কিছু সারাজীবন ধরে মেয়ের ভার বহন করা যায় না। তার চেয়ে দেখে-শুনে না-হয় দেরি করেই দেওয়া ভাল। এই দেখুন না, আমার রেবার জন্যে কত দিন থেকে বর খুঁজছি। ম্যাট্রিক দিয়ে লম্বা ছুটিটা যে পেলে তার মধ্যে তিন-চার জায়গায় সম্বন্ধ করা হ'ল, কত জায়গা থেকে মেয়ে দেখেও গেল, কিন্তু কোথাও শেষ অবধি আর ঘটে

উঠ্‌ল না।• তার পর এই ত সামনের মাসে আই-এ দিচ্ছে, এবারে পরীক্ষা হয়ে গেলেও ছুটিটার মধ্যে আর একবার চেষ্টাচরিত্র ক'রে দেখতে হবে। দেখা যাক কপালে কি আছে। ছুটির সময়ে ছাড়া অন্য সময়ে এ-সব বিষয় নিয়ে বেশী টানাহেঁচড়া করতে গেলে আবার মেয়েরা রাগ করে। তারা বলে, বিয়ে ত হবেই না, শেষে পরীক্ষাটাও ফেল করব, এও কি তোমরা চাও? হাজার হোক তারা বড় হচ্ছে, তাদের কথা একেবারে ঠেলে ফেলাও যায় না।

মিসেস গুপ্তা সুদীর্ঘতর আর এক নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আমার মাধুরও ত তাই। আই-এ পাস করেও যোগাযোগ হ'ল না, অগত্যা দিলুম বি-এতে ভর্ত্তি করে। সত্যি শুধু চুপ ক'রে ত আর বাড়ীতে ব'সে থাকতে পারে না!"

মেয়েরা টেনিস খেলা সমাপন করিয়া কলরব করিতে করিতে ঘরে ঢুকিল। ঈষৎ বিষাদ এবং অনুকম্পাভরে তাহাদের দিকে চাহিলাম। ঐ রংবেরঙের জর্জ্জেট্ শাড়ী, ঐ বি-এ, আই-এ, পাস, ঐ গান শেখা, এস্রাজ বাজানো, টেনিস খেলা, কিছুই তাহা হইলে অকৃত্রিম নয়। এ শুধু রুদ্ধনিশ্বাসে যোগাসনে বসিয়া বিবাহের সম্ভাবনার প্রতীক্ষা করা। না, বলাটা ভুল হইল, এ সাধনার পালাটা সরব। তপস্যার উৎকণ্ঠা আছে কিন্তু প্রশান্তি ও শুদ্ধতা নাই। মেয়েদের আসিতে দেখিয়া অন্য কথা পাড়া হইল। অতিথিদের চা-পানের আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার জন্য গৃহিণী উঠিয়া অন্যত্র গেলেন।

৩

অন্ধকার রাত্রিতে খোলা ছাদে শুইয়া স্পন্দিত কম্পিত অথচ বিরাট স্তব্ধ প্রশান্ত নক্ষত্রজগতের দিকে চাহিয়া থাকা আমার এক বহু দিনের অভ্যাস। গৃহিণী যে-সময়টা ঘরের মধ্যে রেডিও শোনেন, কিংবা অবাধ্য কণ্ঠযন্ত্রকে কিঞ্চিৎ সঙ্গীতবিদ্যা অর্জ্জন করিবার জন্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত করেন, সেই সন্ধ্যাবেলাটায় আমি কিছুতেই ঘরের মধ্যে বসিতে পারি না। এজন্য আমাকে তিনি প্রায়ই অনুযোগ করেন। বলেন, "কি বেরসিক লোক গো! গান-বাজনায় একটু মন নেই। অন্ধকার ছাদে একলা ভূতের মত ব'সে থাকতে কি যে ভাল লাগে!"

আমি হাসিয়া বলি, "তোমাদেরও আজকালকার আধুনিক বাংলা গানের মর্ম্ম আমি কিছুই বুঝি না। আমার কাছে সমস্তই একাকার মনে হয়। প্রত্যেক গানেই দেখি, দু-চারটা প্রিয় আছে, দক্ষিন সমীরণ আছে, উতলা নিশ্বাস এবং অকারণ আঁখিজল আছে, বলতে কি একটা গান যে কোথায় শেষ হয়, ও আর একটা কোথায় আরম্ভ হয়, তাও ধরতে পারি না।"

শোভার মা আমার কথা শুনিয়া এত রাগিয়া ওঠেন যে, যথোচিত বকুনির ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া তথা হইতে চলিয়া যান।

আজও চিরদিনের অভ্যাসমত ছাদের এক প্রান্তে আরাম-কেদারায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম। সময়টা গ্রীষ্মকাল, দিনান্তরম্য দক্ষিণ বাতাস সত্যই বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। চাকরে পূর্ব্বাহ্ণে ছাদের সানবাঁধানো মেঝে ঠাণ্ডাজল দিয়া ধুইয়া দিয়াছে। টব হইতে রজনীগন্ধা ও যুঁইফুলের মৃদুমিষ্ট সৌরভ আসিতেছে। এমন সময়ে, আঃ কি সর্ব্বনাশ, প্রতিবেশী কোন এক বাড়ীর ছাদ হইতে তরল বালিকা-কণ্ঠের বেসুরো একটা গান হইতে সুরু হইল। ভাবে বোধ হইল বালিকা ছোট বেলা হইতে গান কখনও শেখে নাই, কিন্তু এক দিনেই তানসেন হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা তাহার জাগিয়াছে। রাত যখন দশটা তখনও তাহার গলা অবিশ্রান্ত চলিয়াছে। এত ভুল হইতেছে, এত বেসুরো হইতেছে, তবুও বিরাম নাই। আমি মনে মনে অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতেছিলাম, "হে ভগবান, সঙ্গীতযশপ্রার্থিনী এই মেয়েটিকে এবার থামাইয়া দাও। অন্ততপক্ষে একাদিক্রমে দু-তিন ঘণ্টা গান করিয়া তাহার গলার তেজও কি একটুখানি কমাইয়া দিতে পার না? এ যে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে!" রাত্রি দশটার পরে বাজনা থামিল। আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া যখন ভাবিতেছি, এইবারে খাওয়াদাওয়া সারিয়া আসিয়া ছাদের নির্জ্জনতাটুকু হয়ত অব্যাহত পাইব, ঠিক সেই সময়ে মিনিট-পাচেক

বিশ্রাম করিয়া মেয়েটি আবার গাহিয়া উঠিল,

(যদি) দখিন সমীরণে, বেদনা বাজে মনে
ছল ছল করে আঁখি অকারণ—

বিরক্ত হইয়া সেখান হইতে উঠিব-উঠিব করিতেছি, এমন সময় স্ত্রী আহারের জন্ত ডাকিতে আসিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে ঐ মেয়েটি জান? দেখছি গানের ওপর বেজায় ঝোঁক।"

স্ত্রী প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া বলিলেন, "ঐ ত সেই বোসেদের নিরু গো। বেচারা গান জানে না ব'লে পাত্র-পক্ষেরা আর সব পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও অপছন্দ করলে। তা মেয়েটার অধ্যবসায় দেখ, এই তিন-চার মাসেই উঠে-পড়ে লেগে এমন গান শিখিছে যে, এবারে যদি কেউ দেখতে আসে, গান জানে না ব'লে অপছন্দ করবার আর যো নেই। কিন্তু চল, আর দেরি ক'রো না। তোমার খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

তাঁহাকে অগ্রসর হইতে বলিয়া আমি ধীরে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। অদূরবর্ত্তিনী ঐ মেয়েটির অবিশুদ্ধ সুরতানলয়ের সঙ্গীত অকস্মাৎ আমার কাছে একটি অপূর্ব্ব করুণায় মণ্ডিত হইয়া দেখা দিল। এ শুধু তার কাছে গান নয়, জীবন-মরণের সমস্তা। কোন খেয়ালী বরপক্ষ আবার যদি তাহাকে দেখিতে আসিয়া গান-জানার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে, তখন তাহাকে পিছাইয়া দাঁড়াইলে আর চলিবে না। আমাদের দেশের মেয়েদের ইহার বাড়া সমস্তা আর নাই। তাহার মূল্য যে কতখানি সে কথার চরম বিচার এই কষ্টিপাথরেই যাচাই হইবে। যাচাই হইবার আর কোন উপায়, আর কোন পথ নাই। একটু আগে মনে মনে সে বেচারাকে ঠাট্টা করিয়াছিলাম বলিয়া বিধিমত ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলাম এবং আপন অজ্ঞাতসারেই বোধ করি চক্ষুপ্রান্ত ঈষৎ বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল।

শেষ দান

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৈশাখের সংক্রান্তি এল ব'লে,
হস্তে কুকুরের চাউনির মতো ঘোলাটে আকাশ
কালবৈশাখী এখনো ডানা গুটিয়ে আছে।
বীরভূমের রাগী মূর্তি রাঙামাটির মাঠ;
দিনদুপুরের রোদের নেশায়
দিগন্ত আছে বিহ্বল হয়ে;
একটা ডালসর্বস্ব বাবলা গাছ, যেন তার অশৌচের দশা।
জলে পুড়ে গেছে ঘাস,
দুটো চারটে বেঁটে বুনো খেজুরের ঝোপ,
গরীব ছায়ায় পুঁটুলি।

মহাত্মা গান্ধী

(সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান কলাশালা পরিদর্শন কালে শ্রীসত্তেন্দ্রনাথ বিশী কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব

জন্মোৎসব-উপলক্ষ্যে আশ্রমবাসীর শ্রদ্ধার্ঘ্যদান

[শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বিশী কর্তৃক গৃহীত চিত্র]

সঙ্গীহীন দাঁড়িয়ে আছে একটা আদ্যিকালের তাল
মরুভূমির সেপাই
শূন্য তহবিলের পাহারায়।
তালতড়ির গাঁ পেরিয়ে উত্তর দিকে চলে গেছে
ক্ষিপ্ টে নদী কোপাই ;
রেললাইনের ওপারে ধুধু করছে ন্যাড়া ভুঁই
ভীষণ একঘেয়ে।
রুক্ষ ধরার বুক আঁচড়ে দিয়ে পথ চলেছে এঁকে বেঁকে
লাল কাঁকরের খোয়াইয়ের ধার ঘেঁষে।

দুপুরের তপ্ত হাওয়া ধুঁকছে আকাশে,
হঠাৎ ঘূর্ণি এসে বাজপাখির মতো তাড়িয়ে চলেছে
ধুলোয় ঘেরা শুক্‌নো পাতা।
জনমানব নেই, কেবল ঐ একটি বাগ্‌দি মেয়ে
আঁকড়ে ধরেছে কচি ছেলেটিকে বুকের মধ্যে ;
খাটো কাপড়খানা সামলানো দায়,
তারই খাটো আঁচল দিয়ে ঢেকেছে শিশুকে।
ছেলেটার জিবে নেই রস, গলা গেছে শুকিয়ে,
কাঁদতে বেধে যায়, তাকায় মায়ের দিকে.
মা দেয় শুক্‌নো স্তন মুখে গুঁজে ;
দূরের থেকে দেখে আশ্রমের ছায়াবট ;
যেতে চায় ছুটে, পায়ে ধরে খিল, মাথা যায় ঘুরে
ইচ্ছে হয় ছুঁড়ে ফেলে দেয় ছেলে, পথের ধুলোয় পড়ে শুয়ে ;
মরবার আগে মুহূর্তের আরাম—
শিশু গুমরে ওঠে, আবার ছুটে চলে।

শব্দ পেয়ে দরজা খুলি।
দেখি, মরবার আগে রেখে গেছে নারী
দাওয়ায় তার জীবনের সব শেষের দান—
পিতৃপরিচয়হারা শিশু—
নিজে পড়ে আছে পাশে।
সবার ঘৃণা থেকে বাঁচাল যাকে
প্রাণপণে আগলে ধরে,
অচেনার দুয়োরে তাকে থুয়ে গেল
কালিমাখা ইতিহাস মুছে দিয়ে।

মাটির বাসা

শ্রীসীতা দেবী

১৯

কলিকাতায় একসঙ্গে চৈত্র মাসের উত্তাপ ও পরীক্ষার উৎপাত লাগিয়া গিয়াছে। ছেলেমেয়েদের মন অবসন্ন। বাপমায়ের মেজাজ চড়িয়া উঠিয়াছে। ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া কাজ করিতে গেলে ঢিলা-স্বভাব বাঙালীর, বিশেষ করিয়া মেয়েদের, মেজাজ খারাপ না হইয়াই থাকিতে পারে না। কিন্তু এ ত বিয়ে-বাড়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষা নয় যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে কোনও ঘণ্টায় গিয়া হাজির হইলেই হইবে, এ যে ইংরেজী-ছাঁচে ঢালা য়ুনিভার্সিটি! এখানে পান হইতে চুণ খসিলেই বিপদ। কাজেই যতই স্বভাব-বিরুদ্ধ হউক, নয়টায় ভাত খাওয়াইয়া পরীক্ষার্থী সন্তানকে সাড়ে ন'টায় রওয়ানা করিয়া দিতেই হইতেছে।

মৃণাল অবশ্য বোর্ডিঙে থাকে বলিয়া পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপার লইয়া কিছু গৃহবিপ্লব বাধিয়া যায় নাই। রাঁধুনী, ঝি এবং মাসীমা কিছু বেশী ব্যস্ত, এই পর্য্যন্ত খালি বুঝা যায়। ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া কাজ করা বোর্ডিঙের চির-দিনের নিয়ম, আরও আধঘণ্টা আগাইয়া কাজ করিতে হইতেছে এই পর্য্যন্ত।

কিন্তু মৃণালের মনটা অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মতই মুষড়াইয়া পড়িয়াছে, বরং একটু হয়ত বেশী রকমই। আত্মীয়স্বজন কেহ কাছে নাই যে দুইটা অভয়বাণী শোনায়, সান্ত্বনা দেয়। এই তাহার প্রথম পরীক্ষা, ভয়টা একটু হয়ত বেশীই হইয়াছে। কত মেয়ে হলে ঢুকিবার আগে প্রার্থনা করে, নয় কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়, মৃণাল কাঁদিতে লজ্জা পায়, কাহার কাছে প্রার্থনা করিবে তাহাও ভাবিয়া পায় না। পরীক্ষার ভয়ের বাড়া আরও এক মহা ভয় তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। পরীক্ষা শেষ হইলেই ত তাহাকে চিরদিনের মত বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার পর হইবে পঞ্চাননের কাছে বলিদান!

ভাবিতেই যেন তাহার দেহ-মন আড়ষ্ট হইয়া যায়। বিবাহ যে কি ব্যাপার তাহা বুঝিবার বয়স মৃণালের হইয়াছে। পঞ্চানন মানুষটা তাহার দুই চক্ষের বিষ। তাহাকে দেখিলে মৃণালের হাড় জলিয়া যায়, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিলে কানের ভিতর যেন ছেঁকা দেয়। তাহার স্বভাব কেমন মৃণালের তাহা জানিতে বাকী নাই। একই গ্রামের মানুষ ত দু-জনই? পঞ্চানন এই বয়সেই মস্ত বড় বক্তা, যতদিন গ্রামে থাকে সর্ব্ববিষয়ে নিজের মতামত প্রচার করিয়া গ্রামখানা গরম করিয়া রাখে। বলা বাহুল্য, তাহার কোনও একটা মতের সহিত মৃণালের কোনও একটা মত মেলে না।

এই মানুষ হইবে তাহার সর্ব্বময় অধীশ্বর। শিহরিয়া উঠিয়া মৃণাল যেন নিজের ভিতর নিজেই মিলাইয়া যাইতে চায়। আর কি জগতে মানুষ ছিল না? আর যে কেহ হইলেই যে ইহার চেয়ে ভাল হইত। কিন্তু তাহাও কি ঠিক? মৃণাল সে-কথাও আজকাল নিজের কাছে স্বীকার করিতে পারে না। পঞ্চাননের সম্বন্ধে তাহার মন কেন এমন করিয়া দিনের পর দিন বিমুখ হইতেছে, তাহা কি সে একবারও ভাবিয়া দেখে? অতখানি সাহস তাহার নাই।

সম্প্রতি অঙ্কের পরীক্ষার দিন আজ। সকাল হইতে কতবার যে সে বইয়ের পাতা উল্টাইয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। অঙ্কগুলা চোখের উপর দিয়া নাচিয়া যায়, কিছুই যেন মৃণাল বুঝিতে পারে না। এসব যেন তাহার অপরিচিত। পাঁচ-ছয়টা ঘণ্টা কোনও মতে কাটিয়া গেলে সে যেন বাঁচিয়া যায়।

পাঁচ-ছয় ঘণ্টা অবশেষে কাটিয়াই গেল। পরের দু-দিন মৃণালের ছুটি। ইহার পর যে কয়টি বিষয় আছে, তাহার জন্য মৃণালের তত কিছু ভাবনা নাই। আর

কোনও ভাবনা না থাকিলে আজকার বিকালটা ত সে ফুর্ত্তি করিয়াই কাটাইতে পারিত। কিন্তু তাহার অবস্থা বড় বিষম। প্রাণের আধখানা তাহার চায় কোনওমতে এখানকার মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে, আর আধখানা চায় নিজের বাল্য-নীড়ে ছুটিয়া যাইতে। মৃণালের মন খালি সংশয়ের দোলায় দুলিতে থাকে। ভগবানের কাছে কি প্রার্থনা করিবে সে?

বিকালে মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে এই ভাবনাই সে ভাবিতেছিল। অন্ততঃ আই-এ পর্য্যন্ত যদি সে পড়িতে পাইত। মামাবাবু আর বাবা কি দুইটা বৎসরও আর অপেক্ষা করিতে পারিতেন না? মৃণালের বয়স কিছু বেশী হইয়াছে তাহা ঠিক, কিন্তু ইহার চেয়েও বেশী বয়সের কুমারী কন্যা ত আজকাল কত হিন্দু গৃহস্থের ঘরে ঘরে রহিয়াছে। এমন কিছু অসাধারণ যোগ্য পাত্র তাঁহারা পান নাই যে, সেটিকে অবিলম্বে বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে হইবে। টাকা খরচ করিলে অমন পাত্র ত যে কোনও সময় পাওয়া যাইবে। উহার চেয়ে ভালও পাওয়া যাইতে পারে। সত্য বটে পঞ্চাননের সহিত বিবাহ হইলে মৃণাল চিরদিন মামা-মামীর কাছা-কাছিই বাস করিতে পারিত; ইহা তাহার কামনার জিনিষ সন্দেহ নাই, কিন্তু এত মূল্য দিয়া? না, না।

আশা আসিয়া কানের কাছে বলিয়া গেল, "তোমার 'ভিজিটার' এসেছে, ক্ষণিদি ডাকছেন।"

মৃণাল অবাক্ হইয়া গেল। তাহার আবার কে 'ভিজিটার'? কলিকাতায় ত এখন কেহ নাই? তবে কি মামাবাবু তাহার পরীক্ষার খবর লইতে আসিলেন? না আর কেউ?

ক্ষণিদির কাছে যাইতেই তিনি বলিলেন, "বিমল রায় তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ইনিই ত সেই বীরেনবাবুদের সঙ্গে আসতেন?"

মৃণাল মৃদুকণ্ঠে বলিল, "হাঁ।" বুকের ভিতরটা তাহার তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। বিমল কেন আসিল তাহার সঙ্গে দেখা করিতে?

ক্ষণিদি বলিলেন, "তাহ'লে দেখা কর। ইনি তোমাদের গ্রামেরই লোক ত?"

মৃণাল বলিল, "আমাদের পাশের গাঁয়ে এঁর বাড়ী।"

ক্ষণিদি বলিলেন, "তোমার মামা আপত্তি করবেন কি না তাই বল, বাড়ী যে গাঁয়েই হোক্। একটা নিয়ম মত 'ভিজিটার্স লিষ্ট' ক'রে রাখাই ভাল, তাহ'লে আর অত বাছ-বিচার করতে হয় না।"

মৃণাল বলিল, "আপত্তি করবার কোনও ত কারণ নেই। উনি ত আরও দু-তিন বার এসেছেন।"

ক্ষণিদি বলিলেন, "তবে যাও দেখা কর গিয়ে।" মৃণাল চলিয়া গেল।

বিমলের আসিবার কারণ সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার সঙ্গে কি কথা বলিবে সে? মামাবাবু হয়ত অসন্তুষ্টই হইবেন, কিন্তু সে-কথা কেন মৃণাল ক্ষণিদির কাছে স্বীকার করিতে পারিল না? কেন সে বিমলকে ফিরাইয়া দিতে পারিল না? অতি সনাতন-পন্থী হিন্দুগৃহস্থ ঘরের মেয়ে সে, তাহার এই অনাত্মীয় যুবক সম্বন্ধে মনের এত ঔৎসুক্য কেন? ইহা যে অন্যায় তাহা মৃণালের হৃদয় স্বীকার করে না, কিন্তু অন্য লোকে, বিশেষ করিয়া তাহার আত্মীয়স্বজন, ত ইহাকে অন্যায়ই বলিবে?

বিমল একলা বসিয়া একটা ইংরেজী মাসিকের পাতা উল্টাইতেছিল। মৃণালকে ঢুকিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে নমস্কার করিল। জিজ্ঞাসা করিল "দু-দিন পরীক্ষা হয়ে গেল, না? কেমন দিলেন?"

মৃণাল প্রতিনমস্কার করিয়া বসিয়া বলিল, "খুব ভাল দিই নি। ঠিক বুঝতেই পারি না, এক-একবার মনে হয় মন্দ হয়নি, এক-একবার মনে হয় সবই বুঝি ভুল লিখেছি।"

বিমল মাথা নাড়িয়া বলিল, "প্রথম প্রথম সেই রকমই মনে হয় বটে। আমরা পুরাতন পাপী, আমাদের ভয় অনেকটা কেটে গেছে। যাক্ গে, ব্যাপার ত ভারি, কয়েক বছর পরে সমস্ত ব্যাপারটাকেই একটা বিরাট তামাসা মনে হবে।"

মৃণাল বলিল, "যা চেহারা ক'রে এক একটি মেয়ে হলে ঢোকে তা যদি দেখতেন, তাহলে আর অমন কথা বলতেন না।"

বিমল বলিল, "অমন চেহারা ছেলেদের ভিতরেও ঢের দেখেছি। যাক সে কথা, আপনার শরীর ভাল ত? ট্রেন্ ত যথেষ্টই হ'ল।"

মৃণাল একটু লজ্জিত ভাবে বলিল, "এখন ত ভালই আছি। গরমে যা একটু কষ্ট হয়।"

বিমল বলিল, "গরমকে অত গ্রাহ্য করলে চলবে কেন? গ্রামে ত আরও বেশী গরম। তা ছাড়া সেখানে ফ্যানও পাবেন না, খশখশের পরদাও পাবেন না।"

গ্রামের নাম হইতেই মৃণালের মুখের উপর কিসের যেন ছায়া ঘনাইয়া আসিল। এতক্ষণ সে বেশ সহজ প্রফুল্লতার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল, হঠাৎ এক রাশ সঙ্কোচ আসিয়া তাহার মনকে অধিকার করিয়া বসিল। বিমলের সঙ্গে বাস্তবিক তাহার পরিচয় অতি অল্প দিনের, আত্মীয়তার বন্ধনও কিছু নাই। তাহা সত্ত্বেও সে এমন ভাবে বিমলের সঙ্গে গল্প করিতেছিল, তাহাতে বিমল মৃণালকে বেশী প্রগল্‌ভা মনে করে নাই ত?

বিমল কিন্তু তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়া কথা বলিয়াই চলিল। "আপনি পরীক্ষার পরে ত দেশে চলে যাবেন, না?"

মৃণাল বলিল, "সেই রকমই ত কথা আছে।"

"আর পড়বেন না?"

মৃণাল বলিল, "ঠিক জানি না, না পড়ারই সম্ভাবনা বেশী।"

তাহার মুখ ক্রমেই বিষণ্ণ হইয়া আসিতেছিল, বিমলও সেটা এবার লক্ষ্য না করিয়া পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নিশ্চয়ই বি-এ অবধি পড়বার ইচ্ছে ছিল, না?"

মৃণাল বলিল, "তা ত ছিল, তবে বাবা আর বোধ হয় খরচ দিতে পারবেন না।"

বিমল বলিল, "এই যদি আপনি ছেলে হতেন মেয়ে না হয়ে, তাহলে না খেয়েও আপনার বাবা খরচ দিতেন, আপনার মামাবাবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন পড়াটা যাতে বন্ধ না হয় সে-জন্যে। কিন্তু বাঙালীর মেয়ে, তাদের পড়া খালি বিয়ের বাজারে দর বাড়াবার জন্যে, এই ত সকলের ধারণা।"

বিমলই বা আজ এমন ভাবে কথা বলিতেছে কেন? মৃণালের পারিবারিক অবস্থার কথাই বা সে এত জানিল কি করিয়া? জানিলেও ত এসব বিষয়ে অনাত্মীয় লোক এত আলোচনা করে না? তবে কি সেও এই অল্প কয় দিনের পরিচয়ে নিজেকে আর বহুদূরের মানুষ মনে করে না? মৃণালের বুকের কম্পনটা আরও যেন বাড়িয়া গেল।

খানিক পরে বিমল বলিল, "আপনি আমাকে এত কথা বলতে দে'খে বিরক্ত হচ্ছেন নিশ্চয়। কিন্তু না ব'লে থাকতে পারলাম না। কেন যে আপনি পড়তে পাবেন না তা সবই আমি জানি। আপনি হয়ত আরও বিরক্ত হবেন, তবু এ-কথাটা না বলে পারছি না যে এমন ক'রে আপনার জীবনটা নিয়ে অন্তদের ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া উচিত নয়।"

মৃণাল বলিল, "এই ত আমাদের দেশের চিরদিনের নিয়ম। ছেলেমেয়েদের হাতে ত কেউ তাদের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের ভার দেয় না, গুরুজনেরাই সব ব্যবস্থা ক'রে দেন।"

বিমল বলিল, "চিরকালের নিয়ম ভাঙতেও হয়, আমাদের দেশেও নানা দিক দিয়েই ভাঙছে। আমার মনে হয় আপনার জোর করা উচিত আরও পড়বার জন্যে।"

মৃণাল বলিল, "জোর কার উপর করব? বাবা অতি অসুস্থ, সঙ্গতিও তাঁর কিছু না থাকার মধ্যে। মস্ত বড় পরিবার তাঁর কাঁধে। আর মামাবাবুর উপর জোর আমি করব কি ক'রে? তাঁরা এমনিই যথেষ্ট করেছেন আমার জন্যে, আমার ত কোন দাবি নেই সেখানে?"

বিমল বলিল, "অপনি যদি স্কলারশিপ পান তাহলে ত অনেকটা সুবিধা হয়। সে-ক্ষেত্রেও কি আর পড়বেন না?"

মৃণাল বলিল, "স্কলারশিপ যে একেবারে না পেতে পারি তা নয়, কিন্তু তাতেও আমার মনে হয় না যে ওঁরা আর আমাকে পড়তে পাঠাবেন। ওঁরা এক-একদিকে বড় সাবেকী মতের পক্ষপাতী।"

বিমল হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল, "এমনি

ক'রে নিজেকে বলি দেবেন, একটা অন্ধ দেশাচারের কাছে ?"

মৃণাল স্তব্ধ হইয়া গেল। এমন করিয়া এ মানুষটি সকল দিকের প্রাচীর ভাঙিয়া ভিতরে আসিয়া ঢুকিতে চায় কেন ? কি আসে যায় তাহার মৃণালের ভবিষ্যৎ জীবনে ? মৃণালের কোনও দায় ত ইহার নয়, জোর করিয়া সে পরের বোঝা ঘাড়ে করিতে চায় কেন ?

কিন্তু সত্যই কি সে পর ? মৃণালও যে তাহাকে আর দূরের মানুষ ভাবিতে পারে না। কেমন করিয়া, কিসের জোরে না-জানি এই যুবকটি মৃণালের জীবনের বড় কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। সমাজ, সংস্কার, দেশাচার, মৃণালের চারিদিকে অনেক গণ্ডি টানিয়া দিয়াছিল, কিন্তু ভগবানের দত্ত কোন অস্ত্রের জোরে সকল বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া সে আজ মৃণালের অন্তরলোকে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহা মৃণালও আর অস্বীকার করিতে পারে না। মাথা তাহার নীচু হইয়া পড়িল, দুই চোখে ব্যথায় আনন্দে জল ভরিয়া আসিল, সে যেন আজ বিশ্বের কাছে ধরা পড়িয়া গেল।

অনেকক্ষণ কেহই আর কথা বলিল না। শেষে বিমল বলিল, "আমি যাই তবে এখন। পরীক্ষার মধ্যে এসে আপনাকে এত সব কথা না-বললেই পারতাম, কিন্তু কেন জানি না নিজেকে সামলাতে পারলাম না।"

মৃণাল মুখ তুলিয়া বলিল, "ভালই করেছেন। অন্ততঃ একজনও যে আমার দুঃখটা বুঝছে, এতেও মনে একটু জোর পাওয়া যায়। জানি না ভবিষ্যতে আমার জন্যে কি অপেক্ষা ক'রে আছে, তবু মনে হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করবার শক্তি যেন আমার হবে।"

বিমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সেই প্রার্থনাই করুন। আমি এখন আপনার কোনও কাজেই লাগব না, নিজেই আমি পরের অনুগ্রহপ্রার্থী। কিন্তু দুই-এক বছর পরে হয়ত মানুষের মত মাথা তুলে দাঁড়াতেও পারি। তখন অবস্থা অন্য রকম হবে। ততদিন অন্ততঃ এই উৎপাতটাকে ঠেকিয়ে রাখুন।"

মৃণাল বলিল, "চেষ্টা ত করব, তবে কতদূর পারব জানি না।"

বিমল বলিল, "পারতেই হবে। আপনি যাবার আগে আমি আর একদিন আসব দেখা করতে। আমার পরীক্ষাটা এসে পড়ল বলে। তার পর আমিও গ্রামে যাব। দেখা করা হয়ত একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে। ঠাকুরমা আমাকে বারবার নেমন্তন্ন ক'রে গেছেন, গিয়ে হাজির হ'তেও পারি।"

বোর্ডিঙে দেখা করিতে আসিয়া যতক্ষণ খুশী বসিয়া থাকা চলে না। বিমলকে এবার বিদায় গ্রহণ করিতেই হইল।

মৃণালের যেন এই সামান্যক্ষণের ভিতরেই জন্মান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এমন কি পরীক্ষার ভাবনা ভাবিতেও সে ভুলিয়া গেল। এ তাহার কি হইল ? তাহার জীবনের একটানা স্রোতে এমন তুফান তুলিল কে ? সে যেন আর আগের সেই শান্ত পল্লীবালা নয়। নিজের মনুষ্যত্ব, নিজের নারীত্বের সম্মান রাখিবার জন্য সে আজ সংগ্রাম করিতেও প্রস্তুত। সে নিজেকে এমন করিয়া বিসর্জন দিবে না। তাহার জীবনের মূল্য তাহার নিজের কাছে ত আছেই, অন্য আর একজনের কাছেও আছে।

সন্ধ্যার ছায়া যখন রাত্রির অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল, তখনও মৃণাল মাঠে ঘুরিতে ঘুরিতে এই ভাবনাই ভাবিতেছে। যে-কথা কখনও মুখে আনিতে পারা সম্ভব মনে করে নাই, সে-কথাই তাহাকে মামামামীর সামনে দাঁড়াইয়া বলিতে হইবে। তাঁহারা না-জানি কি মনে করিবেন। গ্রাম জুড়িয়া সমালোচনার বান ডাকিবে। কিন্তু এ-সবই সহিতে আজ সে প্রস্তুত।

২০

পঞ্চাননের পরীক্ষাটাই সকলের আগে হইয়া গিয়াছে। কেমন যে দিল, সে-বিষয়ে তাহার মনে অনেকখানিই সংশয় ছিল, হয়ত পাস না-ও হইতে পারে। পাস হইলেও সুবিধামত পত্নী লাভ না-করিতে পারিলে আর হয়ত পড়া হইবে না। তাহাদের মস্ত সংসার, জ্যাঠামশায় ঋণজালে জড়িত, হয়ত পড়ার খরচ চালাইতে রাজী হইবেন না।

যাহা হউক, ঘরে তাহার খাওয়া-পরা চলিয়া যাইবে। শহরে থাকিবার ইচ্ছা তাহার নাই, গ্রামেই সে ফিরিয়া যাইতে চায়। বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে পারিলে, তাহার মন সেখানে দিব্য টিঁকিবে। জমিজমা দেখাশোনা করার কাজে সে লাগিতে পারিবে, গ্রাম্য সমাজের উন্নতি-সাধন তাহার অতি প্রিয় কাজ, সে-কাজেও লাগিতে পারিবে। নিজেদের গণ্ডি ভাঙিয়া যাহারা উন্মার্গগামী হইতে চায়, পঞ্চানন তাহাদের টানিয়া রাখিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। কাজেই গ্রামে আর যারই অভাব হোক কাজের অভাব তাহার হইবে না।

কিন্তু মন টিঁকিবে কি? এই যে পরীক্ষা হইয়া গেল, ইচ্ছা করিলেই সে দেশে ফিরিয়া যাইতে পারে। কেন গেল না? কলিকাতায় তাহার এমন কিসের আকর্ষণ? বাড়ীর ভাড়া মাসের শেষ পর্য্যন্ত দিতেই হইবে, সুতরাং থাকিয়া গেলেও ক্ষতি নাই, এই ছুতায় সে দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতে লাগিল। মাঝে মাঝে বিমলের খোঁজ করে। বিমল পড়ায় ভয়ানক ব্যস্ত, বসিতেও প্রায় বলে না। মাঝে মাঝে হেদুয়ার ধারে অনেক ক্ষণ ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

মেয়েদের দলের অধিকাংশেরই ম্যাট্রিক পরীক্ষার 'সীট' পড়িয়াছে এইখানেই। সন্ধ্যার পর দলে দলে মেয়ে বাড়ী ফিরিতে থাকে, কেহ হাঁটিয়া, কেহ ট্রামে, কেহ গাড়ী চড়িয়া। ইহাদের মধ্যে অবশ্য পঞ্চানন যাহাকে দেখিতে চায়, তাহাকে দেখিতে পায় না। তবু দাঁড়াইয়া তাকাইয়া থাকিতে ভাল লাগে। মৃণালও পরীক্ষা দিতেছে। কেমন দিতেছে কে জানে? মেয়েদের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি পঞ্চাননের কোনও অনুরাগ নাই, ইহাতেও তাহারা প্রাচীন আদর্শ হইতে চ্যুত হয় এবং তাহাদের অহঙ্কার বাড়ে। তবু পরীক্ষা দিতেছে যখন, তখন কেমন দিতেছে জানিতে পারিলে হইত। কিন্তু কেমন করিয়া বা জানা যায়? নিজে সে মৃণালের সঙ্গে দেখা করিতে পারে না, তাহাদের সমাজে ইহা নিয়ম নয়। আর যদি নিজের মতের বিরোধী আচরণও সে করে, তাহা হইলেও মৃণাল তাহার সঙ্গে দেখা করিবে কি না সন্দেহ। পঞ্চাননের কেমন যেন অস্পষ্ট সন্দেহ হয় যে, মৃণাল তাহাকে ততটা পছন্দ করে না। আচ্ছা, তাহারও দিনকাল পড়িয়া আছে, পঞ্চানন সবুর করিতে জানে। হিন্দু নারীর কাছে পতিই যে দেবতা সে-শিক্ষা আশা করি নিজের স্ত্রীকে সে দিতে পারিবে।

কিন্তু আগে মৃণাল তাহার স্ত্রী হউক ত? বাড়ী হইতে পঞ্চানন কিছুদিন আগেই বৌদিদির শ্রীহস্তে লিখিত একখানি চিঠি পাইয়াছে, তাহাতে একটু যেন নিরাশার স্বরও ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। মৃণালের মামীমার কাছে শ্রীমতী যথাসাধ্য ঠাকুরপোর ওকালতি করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নাকি দেমাক দেখাইয়া কোনও উত্তর না দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। মল্লিক-মহাশয় যাওয়া আসা করিতেছেন বটে, কিন্তু দেনা-পাওনা লইয়া গণ্ডগোল বাধিয়াছে। চক্রবর্ত্তী-মহাশয়ও জেদ ছাড়েন না, মল্লিক-মহাশয়ও আর অগ্রসর হইতে চান না। কয়েক দিন পরে শেষ কথা হইবে, তখন আবার বৌদিদি ঠাকুরপোর কাছে চিঠি লিখিবেন।

পঞ্চাননের ইহাতে যেন আরও লোভ বাড়িয়া গিয়াছে। যাহা পূর্ব্বে কেবল মাত্র আকাঙ্ক্ষার জিনিষ ছিল, এখন তাহা না পাইলে যেন তাহার আর চলিবে না। মৃণালকে তাহার পাইতেই হইবে যেমন করিয়া হোক। জ্যাঠামশায়কে প্রয়োজন হইলে নিজের জেদ ছাড়াইতে হইবে, কিন্তু কি উপায়ে? এ-সকল কথা কাহাকে দিয়া বা বলানো যায়?

সেদিনও নানা চিন্তা করিতে করিতে হেদুয়ার ধারে সে ঘুরিতেছিল। দারুণ গরমের দিন, ইহারই মধ্যে বায়ুসেবনকারী দলে দলে আসিয়া জুটিতেছে। তাহার মত, যাহারা শুধু বায়ু সেবন করিতেই আসে নাই, এমন লোকও বিরল নয়।

হঠাৎ যেন পঞ্চাননের চোখের সামনে সন্ধ্যার ম্লান আলো, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের মত প্রখর হইয়া উঠিল। কে ঐ গেট হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে? বিমল না? সে কি কারণে এখানে আসিয়াছিল? বীরেনবাবু ত এখন কলিকাতায় নাই, গ্রামের আর কেহও আছে বলিয়া পঞ্চানন জানে না, তবে কি হতভাগা একলাই

এই অনাত্মীয়া যুবতীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল? এ সবও তাহা হইলে চলিতেছে? রাগে পঞ্চাননের রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল ছুটিয়া গিয়া এখনই বিমলের গলাটা টিপিয়া ধরিয়া মজাটের পাওয়াইয়া দেয়। কিন্তু মাঝে গোটা দুই ট্রাম আসিয়া দাঁড়াইয়া, কিছুক্ষণের জন্য বিমলকে তাহার ক্রুদ্ধ দৃষ্টির আড়াল করিয়া দিল। ট্রাম যখন সরিয়া গেল, তখন বিমলকে আর দেখা গেল না, পঞ্চাননের রাগের তীব্রতাও ক্রমে যেন জুড়াইয়া আসিতে লাগিল। সে হাঁটিয়া ফিরিয়া চলিল, সারা পথ কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে করিতে।

মেয়েটি কম নয়। শহরে এই সব তরলমতি যুবক-যুবতীদের স্বাধীন ভাবে ছাড়িয়া দিলে এই দশাই ত ঘটিবে? এসব মেমসাহেবী শিক্ষার পরিণাম ভাল কবে হয়? কিন্তু এখনও ইহাকে রক্ষা করিবার সময় হয়ত যায় নাই। পঞ্চাননকেই একাজ করিতে হইবে। একবার যখন এই হতভাগিনীকে সে মনে স্থান দিয়াছে, তখন কুপথ হইতে ইহাকে টানিয়া আনিবার অধিকারও তাহার জন্মিয়াছে।

বাড়ী পৌঁছিয়াও তাহার মন শান্ত হইল না। এখনই একটা কিছু না করিতে পারিলে যেন শান্তি নাই। অন্ততঃ বিমলকে কিছু সত্য কথা শোনানো দরকার। এক গেলাস জল গড়াইয়া খাইয়া এবং উড়ানিখানা রাখিয়া দিয়া পঞ্চানন আবার বাহির হইয়া পড়িল।

বিমলও তখন সবে মেসে ফিরিয়াছে। ঘরে অসহ্য গরম, তাই ছাদে উঠিয়া কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। মন তখনও তাহার অত্যন্ত বিচলিত। মৃণালের কাছে এমন ভাবে নিজেকে ধরা দিয়া ভাল করিল কি মন্দ করিল কে জানে? তাহার নিজের মন্দ ইহাতে কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু মৃণালের অকল্যাণ হইলেও হইতে পারে। সে হয়ত বিমলের কথা কখনও মনে স্থান দেয় নাই, বিমল জোর করিয়া যেন তাহার মনোমন্দিরের দুয়ার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। আর কি সে বিমলকে ভুলিতে পারিবে? আশা বিমলের কানে কানে বলিতে লাগিল, না, মৃণাল আর তাহাকে ভুলিতে পারিবে না। তাহা হইলে কি তাহার চোখের ভাষায়, তাহার মুখের কথায় অত আনন্দের সুর বাজিত? কিন্তু বিমল কবে তাহাকে লাভ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবে? কে জানে?

অতি দরিদ্রের সন্তান সে, বিধবা মা ভিন্ন সংসারে আপন বলিতে তাহার কে বা আছে? বিষয়-আশয় সবই মহাজনের হস্তগত, খড়ের ঘর দুইটিমাত্র তাহার নিজের বলিতে আছে। পরীক্ষায় খুব ভাল করিয়া পাস করিলে তবে আর সে পড়িতে পারে, কিন্তু তত ভাল হওয়ার সম্ভাবনা কম। বি-এ পাস বেকার যুবকে ত দেশ ভরিয়া গেল, সেও তাহাদের দল বৃদ্ধি করিবে হয়ত। এই অবস্থায় কি অন্যের জীবনের সহিত নিজের জীবনকে জড়াইবার চেষ্টা করা উচিত? কাজটা তাহার অন্যায়ই হইল হয়ত। কিন্তু মৃণালকে কিছু না জানাইয়া, একেবারে ভাসিয়া চলিয়া যাইতে দিতে সে পারিল কই? অন্ততঃ একজন যে তাহার ভাবনা ভাবিতেছে এই চিন্তা মৃণালকে শক্তি দিক। হয়ত সে নিজের জোরে নিজের পথ বাছিয়া লইতে পারিবে। ভগবান্ যদি সহায় হন, তাহা হইলে বিমলও হয়ত অদূর ভবিষ্যতে তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। ধনী হইবার, বিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিবার বাসনা তাহাদের দুইজনের একজনেরও নাই, কিন্তু কাহারও কাছে হাত পাতিতে তাহারা পারিবে না, কাহারও কাছে মাথা নীচু করিতেও পারিবে না। বিমলের বাবা যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা যদি থাকিত তাহা হইলে ভাবনা ছিল না। গ্রাম্য গৃহস্থের দিন তাহাতে বেশ চলিয়া যাইত। মৃণালও শহরের মেয়ে নয়, বিমলও পাড়াগাঁয়েই মানুষ, তাহারা রাজধানীতে বাস করিবার জন্য লালায়িত নয়। কিন্তু সবই ত এখন ঋণের দায়ে বাঁধা পড়িয়া আছে। সেগুলি ছাড়াইবার ক্ষমতা বিমলের কতদিনে হইবে কে জানে? ততদিনে নিষ্ঠুর নিয়তি মৃণালকে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইবে, তাহাই বা কে জানে? আর জীবনের সহচরীকেই যদি সে হারায়, তাহা হইলে কাহার জন্য বিমল সংসার পাতিবে?

নীচ হইতে ডাক আসিল, "বিমল বাড়ী আছ?"

পঞ্চাননের গলা বিমল চিনিতে পারিল। কিন্তু সে ত

বরাবর তাহাকে 'তুই' সম্বোধন করে এবং বিমলে বলিয়া ডাকে! হঠাৎ এত সম্মানের ঘটা কেন? সে সিঁড়ির কাছে গিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া উত্তর দিল, "আমি ছাদে আছি, সোজা উপরে চ'লে এস।"

পঞ্চানন চটির শব্দে বাড়ী কাঁপাইয়া উপরে উঠিতে লাগিল। ছাদে আসিয়া বলিল, "কেউ নেই এখানে ভালই হয়েছে।"

বিমল বলিল, "কেন, কেউ থাকলেই বা কি? আর্য্য-নারীরাই ত পর্দ্দানশীন, পুরুষরাও কি এবারে হবেন?"

পঞ্চাননের মুখ আরও ভ্রুকুটি-কুটিল হইয়া উঠিল। ধীরে সুস্থে সে কথাটা পাড়িবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু এই হতভাগাই সর্ব্বাগ্রে কথাটা এক রকম পাড়িয়া বসিল। বেশ, তাহাতে পঞ্চাননের আপত্তি নাই। সে বলিল, "তোমাদের মত ধুরন্ধররা যতদিন বর্ত্তমান আছেন, তত দিন নারী বা পুরুষ কারও পর্দ্দা থাকবার জো কি?"

বিমল বলিল, "কেন, আমার দ্বারা আবার কার পর্দ্দার হানি হ'ল?" ব্যাপারটা যে সে না বুঝিতেছিল এমন নয়, কিন্তু দেখাই যাক পঞ্চুমামার দৌড় কতদূর।

পঞ্চানন বলিল, "এই যে কাণ্ডটি করছ, তার ফল ভাল হবে তুমি মনে কর?" রাগে তাহার গলা কাঁপিতেছিল, রাগটা অবশ্য যথাসম্ভব সে সম্বরণ করিবারই চেষ্টা করিতেছিল।

বিমল বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "আমি ত অনেক কাণ্ডই করি, কিন্তু তার ভাবনা তোমার কেন? তুমি ত আমার অভিভাবক নও? যত দিন তোমার কিছু অনিষ্ট না করছি, তত দিন তুমি নিজের চরকায় তেল দাও না বাপু।"

পঞ্চানন বলিল, "প্রত্যেক মানুষের ইষ্ট-অনিষ্ট অন্য মানুষের ইষ্ট-অনিষ্টের সঙ্গে জড়ানো, বিশেষ ক'রে যারা এক সমাজে বাস করে। তোমাকে দিয়ে যদি আমার সমাজের কোনও স্ত্রীলোক বা পুরুষের ক্ষতি হয়, তাতে আপত্তি জানাবার অধিকার আমার আছে; তার প্রতিকার যথাসাধ্য করবার অধিকারও আমার আছে।"

বিমল বলিল, "এখন ওসব সমাজতত্ত্বের বক্তৃতা রাখ দেখি। ওসব শুনবার আমার সময় নেই। সোজা ভাষায় এবং সংক্ষেপে বল যে আমার দ্বারা তোমার কি অনিষ্ট হয়েছে, তখন আমি তার উত্তর দেব। আর যদি খালি ব্যাজ ব্যাজ করবার ইচ্ছে থাকে ত অন্যত্র যাও, আমার সময়টার এখন একটু দাম বেশী।"

পঞ্চানন বলিল, "সকলের সময়েরই দাম আছে, তুমি কিছু একটা অসাধারণ কথা বললে না। যাক, সোজা কথা শুনতে চাও, সোজা কথাই বলছি। মল্লিক-মশায়ের ভাগ্নীটির সঙ্গে দেখা করতে তুমি তাদের বোর্ডিঙে যাও কি না? আর এরকম অনাত্মীয়া যুবতী মেয়ের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা করলে তার অপকার করা হয় কি না? সে মেমসাহেব নয় তা মনে রেখ, সে পাড়াগাঁয়ের হিন্দু গৃহস্থ ঘরের মেয়ে।"

বিমলের মুখটা রাগে লাল হইয়া উঠিল। কোনওমতে নিজেকে সামলাইবার চেষ্টা করিতে করিতে সে বলিল, "দেখ পঞ্চুমামা, অনধিকারচর্চ্চারও একটা সীমা থাকা উচিত, তা বোধ হয় তোমার মাথায় ঢোকে না। আমি যেখানে যার সঙ্গে দেখা করি না তোমার তাতে কি? মেয়ের মামা বা বাবা যদি এসে একথা বলেন তবে তার একটা মানে হয়। তুমি কে বলবার? সে প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে, আঠারো বছর বয়স তার হয়ে গেছে, কার সঙ্গে দেখা করবে বা না করবে সেটা অন্ততঃ তোমার চেয়ে সে বেশী বুঝবার অধিকারী। তুমি যাও দেখি, এসব ভূতের মুখে রামনাম আমার ভাল লাগে না।"

পঞ্চাননের রাগ একেবারে বোমার মত সশব্দে ফাটিয়া পড়িল। গলা উঁচু করিয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল, "তুই বললেই যাব? তুই ঐ নির্ব্বোধ মেয়েটার কি অনিষ্ট করছিস নিজে বুঝিস না ভণ্ড কোথাকার? ওকে এর পর কে ঘরে নেবে? আমিই ত নেব না যদি এই রকম কাণ্ড আর বেশীদিন চলে। তোর চালচুলো কিছু নেই যে তুই সংসার পাতবি। তোর মতলবখানা কি শুনি?"

বিমলের মুখ একেবারে শাদা হইয়া গেল। পঞ্চাননের খুব কাছে সরিয়া আসিয়া সে বলিল, "দেখ পঞ্চানন, এই মুহূর্ত্তে যদি চুপ না কর, তাহলে গলাটা টিপে একেবারে চিরদিনের মত থামিয়ে দেব। তোমার

আস্পর্দ্ধা দে'খে আমি অবাক্ হয়ে গেছি। আমি কোনও কৈফিয়ৎ তোমাকে দেব না, তোমার যা খুশি করগে। সম্প্রতি এখান থেকে বেরিয়ে যাও ভাল চাও ত, নইলে তোমার কপালে দুঃখ আছে।"

চেঁচামেচি শুনিয়া জনকয়েক ছেলে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছে দেখা গেল। পঞ্চানন বুঝিল এখানে বেশী তেজ ফলাইতে গেলে মার খাওয়াও অসম্ভব নয়। মানে মানে সরিয়া যাওয়াই ভাল। তাহার যা করিবার তাহা সে অন্য ভাবেও করিতে পারিবে। সহায়সম্পদ্‌হীন বিমলের সাধ্য নাই যে সে পঞ্চাননের সঙ্গে পাল্লা দেয়। মৃণাল শহরে যতই স্বাধীনতা দেখাক, গ্রামে গেলে সে একেবারেই মামামামীর হাতের মুঠিতে থাকিবে। যত শীঘ্র তাহাকে এই শহর হইতে সরানো যায় তাহার চেষ্টাই করিতে হইবে।

সে সিঁড়ি দিয়া নামিতে আরম্ভ করিল, বলিল, "বেশ আমি যাচ্ছি। ভূতের মুখে রামনাম শুনবার ইচ্ছা তোমার নেই, আমারও ভূতকে রামনাম শোনাবার ইচ্ছা নেই। কিন্তু আবারও ব'লে রাখছি, তুমি এর ফল পাবে। এখনও জগতে ধর্ম্ম আছে, পাপপুণ্য আছে।"

সে ধপ্ ধপ্ করিয়া নামিয়া গেল। বিমল আবার অস্থিরভাবে ছাদে ঘুরিতে লাগিল। এ কি বিষম সমস্যায় হঠাৎ তাহাকে পড়িতে হইল? পরীক্ষার ভাবনাও যে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম।

তাহার সহপাঠী শীতল উপরে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই ভোর গরমে কি আবার নাটক-টাটক করছিস্ নাকি?"

বিমল বলিল, "নাটক নয়, যাত্রা, একেবারে তিলোত্তমা-সম্ভব।"

শীতল বলিল, "তাই নাকি? রচয়িতা কে? অভিনেতৃবর্গের নাম ত খানিক আন্দাজ করতে পারছি। শেষে মামা-ভাগ্নেয় লেগে গেলে?"

বিমল বলিল, "তোকে রাত্রে আমি সব খুলে বলব। একজন কারও সঙ্গে পরামর্শ করাও দরকার। এখন মনটা বড় উত্তেজিত হয়ে আছে।"

শীতল বলিল, "তা বলিস্, কিন্তু পরীক্ষাটা দিয়ে তার পর এসব সুরু করলে হত না? এই রকম মন নিয়ে ঈশান স্কলারশিপ পাওয়া একটু শক্ত।"

বিমল বলিল, "অথচ এখনই সেটা পাবার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী হয়েছে।"

শীতল বলিল, "জগৎটা এই রকমই। যার যখন যেটা দরকার, সে কখনও সেটা সে সময় পায় না। যাই হোক, চেষ্টার ক্রটি রাখিস্ না। আমি একটু ঘুরে আসি।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বিমল ধীরে ধীরে ছাদ হইতে নামিয়া পড়িল। কে তাহাকে পথ দেখাইবে? মৃণালের সঙ্গে আর একবার যদি ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিত! কিন্তু সে ত সহজে হইবার ব্যাপার নয়। অন্তরের দিক্ দিয়া যত কাছে হউক, বাহিরের জীবনে তাহারা বড় দূরের, মাঝে তাহাদের দুস্তর পারাবার। (ক্রমশঃ)

গবেষণা

ব্রাউনিং হইতে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

"রুগ্ন তুমি" বলে মোরে; কিন্তু কী যে রোগ,
তাই নিয়ে বিসম্বাদ, যত গোলযোগ!
ডাক্তার "ক" বলেন, "ব্যারাম মাথার"।
ডাক্তার "খ"-র মতে, "হৃদ্‌যন্ত্রটার"।
"বিকৃতি যকৃতে" কেহ বলে পেট টুঁসে.
অপরের মতে, "ব্যাধি ধরেছে ফুস্‌ফুসে।"
"রোগ চক্ষে, নিঃসংশয়!" বলে চক্ষুদক্ষ
হা বিধাতঃ, এ সঙ্কটে রক্ষ মাং রক্ষ!

প্রত্যক্ষ এ দেহের ব্যাপারে
অজ্ঞ নর শুধু ঢিল্ মারে
অন্ধকারে। তবু বিজ্ঞপ্রায়,
চাবি-বন্ধ আছে যা তালায়,
সে অজ্ঞেয় আত্মার সম্বন্ধে,
দেয় রায় নির্ভয়ে নির্দ্বন্দ্বে!

আদিম কলিকাতা ও বঙ্গসমাজ

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্‌-এ

[ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাস সম্বন্ধে ছয়টি প্রবন্ধ প্রবাসীতে ছয় মাসে প্রকাশিত হইবে। এটি তাহার প্রথম প্রবন্ধ। ছয়টি প্রবন্ধ উনিশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তাবে সম্পূর্ণ হইবে। যাঁহারা পূর্ব্বাপর যোগ রাখিয়া পড়িতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সুবিধার জন্য প্রস্তাবগুলিতে ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া থাকিবে।]

১

কলিকাতা নগরীর পত্তন

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ হইতে, অর্থাৎ যে-সময়ে ইংরেজগণ এ-দেশে শিক্ষাবিস্তার করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন সেই কাল হইতে, আলোচনা আরম্ভ করা প্রয়োজন। কয়েকটি প্রবন্ধে সেই আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু কলেজের সময় পর্য্যন্ত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। এই সূত্রে ইংরেজ সমাজের ও দেশীয় সমাজের সামাজিক অবস্থা, এবং রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বঙ্গদেশবাসী কতিপয় প্রসিদ্ধ লোকের জীবনের কোন কোন বিষয়ে আলোচনা, এবং ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিওর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃততর আলোচনা করিতে হইবে।

কলিকাতা নগরীর ইতিহাসের সহিত এই শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস বহুল পরিমাণে জড়িত। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বঙ্গদেশে আগমন ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে হয়; ঐ সালে কোম্পানী হুগলীতে একটি কুঠী স্থাপন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কোম্পানীর বঙ্গদেশস্থ যাবতীয় কারবারের প্রধান পুরুষ ছিলেন জব চার্নক (Job Charnock)। তিনি ১৬৮৮ সালে হুগলী হইতে বঙ্গের সুবাদার শায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন। ১৬৯০ সালে তিনি পুনরায় সম্রাট্ অওরঙ্গজেবের নিকট হইতে হুগলীর সমীপবর্ত্তী সুতানুটি নামক গ্রামে কুঠী স্থাপন করিবার অনুমতি লাভ করেন। (এই সুতানুটি গ্রামের উপরেই বর্ত্তমান কলিকাতা নগরীর উত্তরাংশ নির্ম্মিত হইয়াছে।) ১৬৯০ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখে জব চার্নক নিজ কাউন্সিল এবং ত্রিশ জন ইংরেজ সৈনিক সহ সুতানুটিতে আগমন করেন।[১] দিল্লীর সম্রাটের অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার মনে আশঙ্কা ছিল যে বঙ্গের সুবাদার হয়তো তাঁহার বিরুদ্ধতা করিবেন। তাই তিন বৎসর পরে মান্দ্রাজ হইতে সর্ জন্ গোল্ডস্‌বরো (Sir John Goldsborough) আসিয়া কোম্পানীর সুতানুটিস্থ কুঠীটিকে প্রাচীরে বেষ্টিত করিয়া দৃঢ়তর করেন। সাধারণতঃ ১৬৯০ সালকে কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাব্দ, এবং জব চার্নককে কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা বলা হইয়া থাকে।

এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে যে বর্ত্তমান কলিকাতার বৈঠকখানা নামক অঞ্চলে যখন লোকালয় ছিল না, তখন তত্রত্য একটি বড় গাছের তলায় ব্যবসায়িগণের সমাগম হইত। ঐ গাছতলায় গড়গড়া লইয়া জব চার্নক বসিতেন, এবং বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চল হইতে সুন্দরবনের নানা খাল দিয়া যে-সকল নৌকা বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া ভাগীরথী অভিমুখে আসিত, তাহার ব্যাপারীদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন। ব্যবসায়িগণের বৈঠক হইত বলিয়াই ক্রমে ঐ অঞ্চলের নাম 'বৈঠকখানা' হইয়া যায়। এক দিন ঐখানে বসিয়াই নাকি জব চার্নকের মনে স্বপ্নবৎ এই ভবিষ্যৎ চিত্রের উদয় হয় যে এই সুতানুটি ও তৎসন্নিহিত স্থানে ইংরেজদের ভাবী সমৃদ্ধিশালী নগরী প্রতিষ্ঠিত হইবে। চার্নক ১৬৯২ সালে দেহত্যাগ করেন। তখনও সুতানুটির অব্যবহিত দক্ষিণবর্ত্তী 'ডিহি কলিকাতা' নামক গ্রামটি কোম্পানীর হস্তগত হয় নাই; কিন্তু আমরা দেখিতে পাইব যে সুতানুটি গ্রামখানি লইয়া যে-সহরের প্রথম পত্তন হইল, ঘটনাবশে সেই সহরের নাম 'সুতানুটি' না হইয়া 'কলিকাতা' হইয়া গেল।

১৬৯৮ সালের জুলাই মাসে মিষ্টার ওয়াল্‌শ্ (Walsh) নামক কোম্পানীর এক জন কর্ম্মচারী বর্দ্ধমান নগরে গিয়া খোজা ইসরাইল সব্বুহদ্ নামক আর্ম্মেনিয়ান বণিকের সাহায্যে বাদশাহ অওরঙ্গজেবের পৌত্র অজীম-উশ্-শানের সঙ্গে দেখা করেন, ও তাঁহাকে খুসী করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সুতানুটি, ডিহি কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামক গ্রামত্রয়ের ইজারা লন। সম্ভবতঃ ইহার পূর্ব্ব হইতেই কোম্পানীর লোকেরা সুতানুটি গ্রামটি য়ুরোপীয়ানদিগের বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া 'ডিহি কলিকাতা' গ্রামের কোন কোন অংশ তাঁহাদের গোরস্থানরূপে ব্যবহার করিতেছিলেন, ও এক অংশে তাঁহাদের দুর্গও নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমে ইজারার দলিল সম্পাদন করিয়া এই সকল ব্যবস্থা পাকা করিয়া লওয়া হয়। বর্ত্তমান হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের উত্তরে (এখন যেখানে সেণ্ট জন্‌স্ চর্চ্চ অবস্থিত), তাঁহাদের প্রথম গোরস্থান ছিল। সেখানেই চার্নকের সমাধিমন্দির রহিয়াছে; তাহা সম্ভবতঃ ১৬৯৩ সালে নির্ম্মিত হয়। দুর্গ-নির্ম্মাণ সম্ভবতঃ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আরব্ধ হয়।[২] ১৬৯৮ সাল হইতে হিসাব করিলে কলিকাতা নগরীর বয়স এখন (১৯৩৮ সালে) ২৪০ বৎসর; ১৬৯০ হইতে হিসাব করিলে ২৪৮ বৎসর হয়।

বর্ত্তমান চিৎপুরের খাল হইতে অন্ততঃ যোড়াসাঁকো অঞ্চল পর্য্যন্ত 'সুতানুটি,' তাহার দক্ষিণ হইতে (বর্ত্তমান হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের ভূমিস্থিত) একটি খাল পর্য্যন্ত 'ডিহি কলিকাতা,' ও ঐ খালের দক্ষিণ হইতে বর্ত্তমান আদি গঙ্গা (বা Tolly's Nullah) পর্য্যন্ত 'গোবিন্দপুর' গ্রাম বিস্তৃত ছিল।

এই তিনটি গ্রামই তৎকালে যৎপরোনাস্তি অস্বাস্থ্যকর ছিল। ভাগীরথী নদীর সমুদ্রসঙ্গমের নিকটবর্ত্তী শেষাংশ বার বার পলিমাটি জমিয়া জমিয়া মজিয়া যাইতেছে। তাই ভাগীরথীর জল বার বার পুরাতন এক একটি খাত পরিত্যাগ করিয়া নূতন নূতন খাতে প্রবাহিত হইতেছে। সেই সকল পুরাতন পরিত্যক্ত খাত প্রথমতঃ বিল ও জলাভূমির আকার ধারণ করে; ক্রমে তাহার কোন কোন অংশ ভরাট হইয়া মানুষের বাসোপযোগী হয়। মন্থরগতি স্রোতস্বতীতে এইরূপ মজিয়া যাওয়া, জলাভূমি সৃষ্টি হওয়া, চড়া পড়া প্রভৃতি ঘটনা নিত্যই ঘটিতেছে। এখনও কলিকাতা নগরীর পূর্ব্ব দিকে কয়েকটি বৃহৎ লবণাক্ত জলাভূমি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেগুলিকে 'সল্ট লেক্‌স্' (Salt-Lakes) বলা হয়। সেই জলাভূমিগুলি কোনও কালের ভাগীরথীর মজিয়া-যাওয়া খাতের খণ্ড খণ্ড অবশিষ্টাংশ মাত্র।

ডিহি কলিকাতা প্রভৃতি তিনটি গ্রাম যখন ইংরেজেরা ইজারা লইলেন, তখন তত্রত্য ভাগীরথী নদী পূর্ব্ব দিকে বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত ছিল। ঐ নদীর পূর্ব্ব উপকূলের ঢালু অংশ প্রায় বর্ত্তমান ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক পর্য্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছিল; জোয়ারের সময় ঐ পর্য্যন্ত জল আসিত। পরে পোস্তা বাঁধাইয়া ও সেই ঢালু অংশে মাটি ফেলিয়া উঁচু করিয়া বর্ত্তমান ষ্ট্রাণ্ড রোড এবং জেটি প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। তখন তিনটি গ্রামকে কর্ত্তন করিয়া অনেকগুলি খাল পূর্ব্বে সল্ট লেক্‌স্ হইতে পশ্চিমে ভাগীরথী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ক্রমে ক্রমে সেগুলি বুজাইয়া তাহার উপর দিয়া পাকা রাস্তা বাঁধানো হইয়াছে। এই সকল খালের মধ্যে 'ডিঙ্গাভাঙ্গা খাল' (বা The Creek) নামে একটি খাল বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। পরে সেটি বুজাইয়া তাহার উপরে হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, গভর্ণমেণ্ট প্লেস্ নর্থ, ওয়াটার্‌লু ষ্ট্রীট প্রভৃতি রাস্তা তৈয়ারী হইয়াছে। সর্ব্বশেষ অংশের উপরে অবস্থিত 'ক্রীক্ রো' নামক রাস্তাটি সেই খালের নাম এখনও বহন করিতেছে। প্রাচীন কলিকাতার মানচিত্রে দেখা যায়, আদিগঙ্গার পরিসর তখন অনেক অধিক ছিল, এবং আদিগঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে একটি ত্রিকোণাকার চড়া ছিল।

এই স্যাঁৎসেতে জলাভূমির উপরে কলিকাতা নগরীর পত্তন হইল। জব চার্নকের স্বপ্ন সফল হইল বটে; কিন্তু এই নগরীতে বাস করিয়া রোগের প্রকোপে প্রথম প্রথম অগণিত দেশীয় ও য়ুরোপীয়ের প্রাণ গিয়াছে। ক্রমে ক্রমে গৃহনির্ম্মাণসূত্রে চতুর্দ্দিক হইতে কোটি কোটি মণ ইষ্টক ও মৃত্তিকা আনীত হইয়া কলিকাতার জমি কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়াছে। এখন ইহার স্বাস্থ্যের এত অধিক উন্নতি হইয়াছে যে বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে

কেহ ইহার পূর্ব্বের অবস্থাকে কল্পনাতেও আনিতে পারিবেন না।

তিনটি গ্রামের ভিতরে 'ডিহি কলিকাতা' গ্রামটি মধ্য-স্থলে ছিল। তাহার উপরেই ইংরেজদের প্রথম দুর্গ নির্ম্মিত হয়। উহা তৎকালীন ভাগীরথীতীর ঘেঁষিয়া (সম্ভবতঃ বর্ত্তমান জেনারেল পোষ্ট অফিসের ভূমিতে) অবস্থিত ছিল। উহাতেই উত্তরকালে ১৭৫৬ সালের ১৮ই জুন তারিখে 'অন্ধকূপহত্যা' নামে বর্ণিত ঘটনাটি ঘটে। এই দুর্গনির্ম্মাণ শেষ হইলেই (১৭০০ সালে) ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উহার 'ফোর্ট উইলিয়ম' নামকরণ করেন, এবং সেই নামে নূতন স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সী ঘোষণা করেন। কোম্পানীর সরকারী কাগজপত্রে প্রেসিডেন্সী এবং তাহার প্রধান নগর, উভয়ের জন্য কেবল 'ফোর্ট উইলিয়ম' এই নামটি ব্যবহৃত হইত। কিন্তু সেই 'ফোর্ট উইলিয়ম' ডিহি-কলিকাতা নামক স্থানে অবস্থিত ছিল বলিয়া ক্রমে ক্রমে 'ফোর্ট উইলিয়ম' নামের সঙ্গে সঙ্গে, ও অবশেষে 'ফোর্ট উইলিয়ম' নামকে লুপ্ত করিয়া, 'কলিকাতা' নামটিই সহরের নাম রূপে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

এখন আমরা 'গড়ের মাঠে' যে 'ফোর্ট উইলিয়ম' দুর্গ দেখিতে পাই, তাহা অনেক পরে নির্ম্মিত হয়। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর ক্লাইভ পুরাতন দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দপুর অঞ্চলের প্রজাগণের অনেক জমি কিনিয়া লইয়া সেই জমির উপরে বর্ত্তমান 'ফোর্ট উইলিয়ম' দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৭৩ সালে এই দুর্গ-নির্ম্মাণ শেষ হয়।

গোবিন্দপুরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চানন যশোহর হইতে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। গোবিন্দপুরে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে তিনি একা ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'ঠাকুর' বলিয়া ডাকিত; ইহা হইতেই ক্রমে 'ঠাকুর' শব্দটি তাঁহাদের বংশের পদবীতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। কোম্পানী পঞ্চাননের পৌত্রগণের জমি জমা ফোর্ট উইলিয়মের জন্য কিনিয়া লওয়াতে, তাঁহারা কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে একটি, ও পরে যোড়াসাঁকো অঞ্চলে আর একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করেন।

২

কলিকাতা প্রথমতঃ য়ুরোপীয়গণের সহর ছিল, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের সামাজিক রাজধানী হয় নাই

এই ফোর্ট উইলিয়ম বা কলিকাতা নগরী সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। ইহার পত্তন সময়ে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান চিন্তা এই ছিল যে, কিরূপে এই সহর য়ুরোপীয়গণের বসবাসের ও আরামের উপযোগী হইবে। প্রথম অর্দ্ধ শতাব্দীর কলিকাতাকে য়ুরোপীয়দিগের সহর বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। দেশীয় লোকেরা সে যুগে কেবল ইংরেজদের ভৃত্য, বাণিজ্যের সহায় ও প্রজা রূপে এই নগরীতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল।

পোর্ত্তুগীজদিগের বঙ্গে আগমন ইংরেজদের বহু পূর্ব্বে হয়। বাদশাহ হোসেন শাহের রাজত্বকালে (অর্থাৎ চৈতন্যদেবের জীবনকালে, এবং বঙ্গে মোগল অধিকার স্থাপনেরও পূর্ব্বে) পোর্ত্তুগীজেরা বঙ্গদেশে আসিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতা নগরীর পত্তন সময়ে পোর্ত্তুগীজদিগের এবং তাঁহাদের বংশধর য়ুরেশীয়গণের সংখ্যা বঙ্গদেশে ইংরেজদের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। ইংরেজেরা ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথম প্রথম ইঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিতেন। য়ুরেশীয়দিগকে তো সঙ্কর জাতি 'হাফ-কাষ্ট' (half-caste) বলিয়া অবজ্ঞা করিতেনই, খাঁটি পোর্ত্তু-গীজদিগকেও রোমান্ ক্যাথলিক বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পোর্ত্তুগীজ ও য়ুরেশীয়গণ নিরাপদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার আশায় দলে দলে ইংরেজদের আশ্রয়ে তাঁহাদের নূতন সহর কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ১৭৬৩ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতার অধিকাংশ অধিবাসী ছিলেন পোর্ত্তুগীজ ও য়ুরেশীয়গণ। চতুর্থ প্রস্তাবের শেষ ভাগে কিয়ারন্‌ডার (Kiernander) সাহেবের পত্রে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

আর্ম্মেনিয়ানগণও ভারতবর্ষে বহু পূর্ব্ব হইতে আসিয়া-ছিলেন। মোগলদের সময় হইতেই পারস্য দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য তাঁহাদের হাতে ছিল

তাঁহারা পারস্য দেশের গালিচা ও রেশম ভারতবর্ষে আমদানী করিতেন, এবং ভারতবর্ষ হইতে মণিমুক্তা, মসলা ও কার্পাসবস্ত্র পারস্য দেশে রপ্তানী করিতেন। সম্রাট আকবরের মরিয়ম নাম্নী যে খ্রীষ্টিয়ান মহিষী ছিলেন, এখন জানা যাইতেছে যে তিনি আর্ম্মেনিয়ান-বংশীয়া ছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব সময়ে ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেমসের রাজদূত ক্যাপ্টেন উইলিয়ম হকীন্স (Captain William Hawkins) ভারতবর্ষে আসিয়া একটি আর্ম্মেনিয়ান মাহলার পাণিগ্রহণ করেন। পারসীকদিগের ন্যায় আর্ম্মেনিয়ানগণ বাণিজ্যপ্রিয় জাতি; ইংরেজেরা বঙ্গদেশে আসিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা এদেশে বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট অওরঙ্গজেবের নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে সৈয়দাবাদ নামক স্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ডিহি কলিকাতা অঞ্চলে তাঁহারা ইংরেজদের পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন। যে সুকিয়াস (Sookias) সাহেবের নামে কলিকাতার সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট প্রতিষ্ঠিত, তিনি আর্ম্মেনিয়ান ছিলেন। কলিকাতায় আর্ম্মেনিয়ানগণের চর্চ্চ অব্ সেণ্ট্ নসারথে (Church of St. Nazarethএ) তাঁহার পত্নীর যে কবর আছে, তাহার তারিখ ২১শে জুলাই ১৬৩০। (এই গির্জ্জাটি একটি প্রাচীনতর আর্ম্মেনিয়ান গোরস্থানের উপরে ১৭২৪ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল)। কলিকাতা নগরীর আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে আর্ম্মেনিয়ানগণও ছিলেন। ইংরেজেরা মুসলমান সম্রাট ও নবাবদিগের নিকটে দূত পাঠাইবার সময় প্রায়ই ফারসী-ভাষাভিজ্ঞ বলিয়া কোন না কোন আর্ম্মেনিয়ানকে দূতের সঙ্গে পাঠাইতেন।[৪]

ইংরেজগণ ব্যতীত পোর্ত্তুগীজ, য়ুরেশীয়, আর্ম্মেনিয়ান্, ইহুদী, প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরাই কলিকাতার প্রথম অর্দ্ধ-শতাব্দীর প্রধান ও প্রতিপত্তিশালী অধিবাসী ছিলেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই প্রয়োজনবশে বাংলা ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে শিখিতেন। বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে বাণিজ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ধনবৃদ্ধি করিতে ইঁহারা সাহায্য করিতেন। এজন্য ইঁহারাই কলিকাতার প্রথম সমাদৃত অধিবাসী ছিলেন। সমাদৃত অধিবাসীদের দ্বারাই নগরের পরিচয় হয়। এই জন্যই বলিতে হয়, প্রায় প্রথম অর্দ্ধ শতাব্দী কাল (১৬৯০-১৭৪০) পর্য্যন্ত কলিকাতা বাঙ্গালীর নগর ছিল না; ইংরেজ পোর্ত্তুগীজ, য়ুরেশীয় ও আর্ম্মেনিয়ান প্রভৃতিরই নগর ছিল।

এই বিভিন্ন শ্রেণীর বিদেশীয়দিগের মধ্যে অবশ্য ইংরেজগণই প্রধান ছিলেন। নগরটি তাঁহাদিগেরই পরিকল্পিত; তাঁহাদের সুখসুবিধার ব্যবস্থাই ইহার উন্নতির প্রধান হেতু। ইংরেজেরা যেখানেই যান, স্বভাবতঃ ধর্ম্ম, শিক্ষা, রাজনীতি-চর্চ্চা, সামাজিক মিলন ও আমোদ-আহ্লাদ,—এ সমুদয়ের ব্যবস্থা না করিয়া থাকিতে পারেন না। সে-সময়ে ইংলণ্ড হইতে এদেশে যাতায়াত করা অতিশয় কঠিন ছিল; পালের জাহাজে আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরিয়া ছয় মাসে যাওয়া-আসা সম্ভব হইত। স্বদেশের সঙ্গে যোগ রক্ষা করা যখন এইরূপ কঠিন, তখন তাঁহারা এদেশেই যথাসম্ভব মনোমত ভাবে জীবন যাপনের ব্যবস্থা করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। যে সময়ে ইংরেজেরা বণিকমাত্র ছিলেন, তখন হইতেই ইহার উদ্যোগ আরম্ভ হয়; দেওয়ানী প্রাপ্তির পর যখন তাঁহারা এ দেশের শাসনকার্য্যেও ব্রতী হইলেন, তখন এ উদ্যোগ আরও সতেজে চলিল। ইহার ফলে ক্রমে ক্রমে কলিকাতা নগরীতে ইংরেজদের নানা গির্জ্জা, থিয়েটার, সভা-সমিতি, পুস্তকাগার, পত্রিকা, মুদ্রাযন্ত্র, স্কুল প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল। এখন ইংলণ্ড হইতে ভারতে যাতায়াত ও ডাক-চলাচল এত দ্রুত ও এত সহজ হইয়া গিয়াছে যে, ইংরেজগণ কলিকাতায় নিজেদের জন্য তত প্রকার ব্যবস্থা রাখা আর প্রয়োজন মনে করেন না। কিন্তু তখন অন্যরূপ ছিল। তখন দু-এক জন প্রথম শ্রেণীর ইংরেজ সাহিত্যিক, অভিনেতা ও চিত্রশিল্পী কলিকাতায় বর্ত্তমান ছিলেন। কলিকাতার ইংরেজ-পরিচালিত পত্রিকাতে তখন মধ্যে মধ্যে ইংরেজী সাহিত্য হিসাবে প্রথম শ্রেণীতে গণনীয় প্রবন্ধসকলও প্রকাশিত হইত। ইংরেজগণ স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই এই সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহার সুফল আমাদের স্বদেশবাসিগণও ভোগ করিয়াছেন। জ্ঞানের

বিস্তারের দ্বারা, চিন্তার প্রসারের দ্বারা, সর্ব্বোপরি অন্তরে স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শের উদয়ের দ্বারা, আমাদের দেশবাসীরা উপকৃত হইয়াছেন। আমরা দেখিতে পাইব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনের দ্বারা যিনি ভারতে নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই রামমোহন রায় বহুল পরিমাণে এই কলিকাতা নগরীর ইংরেজগণের সহিত সংশ্রবের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

ইহা সত্য বটে, উপরে যে অব্দ-নির্দ্দেশের (১৬৯০-১৭৪০) দ্বারা বঙ্গদেশে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম অর্দ্ধ শতাব্দী কাল সূচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যেই এ-দেশ ইংরেজগণের নিকট হইতে এত প্রকার উপকার লাভ করে নাই। ইহাও সত্য যে, ক্ষণকাল পরেই আমরা আলোচনাসূত্রে কোম্পানীর প্রথম (অন্ধকার) যুগের কর্ম্মচারিগণের চরিত্রের কদর্য্যতা ও অর্থগৃধ্নুতার কথা জানিতে পারিব। তথাপি একটি কথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। জ্ঞানের বিস্তার, চিন্তার প্রসার, স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ,—মানবমনের উপরে এ সকল বস্তুর এমনই এক মোহিনী শক্তি আছে যে, যাহাদের হাত দিয়া এ সকল পরিবেশিত হয়, মানুষ তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়; মানুষ তাহাদের সব দোষ ভুলিয়া যায়,—অন্ততঃ ক্ষমা করিয়া লয়। আমরা বর্ত্তমান যুগের মানুষ। কোম্পানীর ঐ যুগ সম্বন্ধে আমাদের বিচার হয়তো কৃতজ্ঞতার দ্বারা কোমল হইবে না; আমাদের মন হয়তো ঐ যুগের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কেবলই ব্যথায় ও জ্বালায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। কিন্তু অতীত কালে এমন এক দিন গিয়াছে, যখন আমাদের দেশবাসিগণের অন্তর ঐ উপকারের অনুভূতিতেই, ঐ মোহিনী শক্তির ক্রিয়া'তেই, অধিক পূর্ণ থাকিত।

উপরে বলা হইয়াছে, প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পর্য্যন্ত কলিকাতা প্রধানতঃ ইংরেজদের নগর ছিল। ইহার পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে। তাহার ভিতরে অন্ধকূপহত্যা নামে বর্ণিত ব্যাপার, নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত, পলাশীর যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব, প্রভৃতিই ইতিহাসে প্রধান ঘটনা রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। কিন্তু সে সকল আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। ১৭৪০-১৭৯০ এই পঞ্চাশ বৎসরে অনেক বাঙালী নানা ভাবে কোম্পানীর চাকরী করিয়া, কোম্পানীর বাণিজ্যে ব্যবহৃত হইয়া, এবং অবশেষে নবাবদের বিরুদ্ধে কোম্পানীকে সাহায্য করিয়া, ধনী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারাও কলিকাতার সম্মানিত অধিবাসী হইলেন। সে সময়ে সাধারণতঃ য়ুরোপীয়গণ কলিকাতার ভাগীরথী-তীরসংলগ্ন অংশে, (অর্থাৎ নদীতীর হইতে প্রায় চিৎপুর রোড পর্য্যন্ত ভূমিখণ্ডে,) এবং দেশীয়গণ তাহার পূর্ব্ব দিকে বাস করিতেন। দেশীয় ধনবান অধিবাসিগণের মধ্যে রাজা রাজবল্লভ, মহারাজা নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাস, আন্দুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান রামচরণ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, ওয়ারেন হেষ্টিংসের 'বেনিয়ান' কান্তবাবু প্রভৃতি সূতানুটি অঞ্চলে বাস করিতেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আমীর চাঁদের (যাঁহাকে সাধারণ লোকে 'উমিচাঁদ' বলিত) আরও পূর্ব্বাঞ্চলে একটি সুবৃহৎ বাগানবাড়ী ছিল; সেই অঞ্চল এখন 'হালসীবাগান' নামে পরিচিত। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব ওয়ারেন হেষ্টিংসের ফারসী ও বাংলার শিক্ষক ছিলেন; শোভাবাজার অঞ্চলে তাঁহার প্রকাণ্ড দুইটি বাড়ী ছিল।

সে সময়ে বঙ্গদেশের হিন্দুগণের সামাজিক রাজধানী ছিল কৃষ্ণনগর। কলিকাতা অপেক্ষা কৃষ্ণনগরের সম্মান তখন অনেক অধিক ছিল। কথিত আছে যে সাধক রামপ্রসাদ সেন (জন্ম ১৭১৮; মৃত্যু ১৭৭৫) যৌবন কালে কলিকাতায় এক মুরুব্বির বাড়ীতে থাকিয়া এক জমিদারের সেরেস্তায় নকল-নবিশের কর্ম্ম করিতেন। এক দিন দেখা গেল, তিনি জমিদারের হিসাবের খাতায় হিসাব না লিখিয়া তাঁহার সেই প্রসিদ্ধ গানটি "আমায় দাও মা তবিলদারী, আমি নিমক-হারাম নই শঙ্করী" লিখিয়াছেন। জমিদারের নিকট এই সংবাদ গেলে, তিনি রুষ্ট না হইয়া রামপ্রসাদকে বিষয়কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি দিয়া ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত রচনার সুবিধা করিয়া দিতে ব্যগ্র হইলেন, এবং মাসিক ৩০৲ বৃত্তি দিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণনগরের রাজসভায় পাঠাইয়া দিলেন। পরে সেখানেই তিনি প্রসিদ্ধ হন, ও 'কবিরঞ্জন' উপাধি লাভ করেন।

এইরূপে কলিকাতা নগরী সাধক রামপ্রসাদের প্রতিভার ধাত্রী হইবার গৌরব হইতে বঞ্চিত হইল।

নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞানাভিমানী আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ প্রথম যুগের কলিকাতার নব্য ধনীদিগকে প্রসন্ন চক্ষে দর্শন করিতেন না। না করিবার একটি কারণ নিশ্চয়ই ইহা ছিল যে, প্রাচীন হিন্দু সংস্কারে ধনকে, বিশেষতঃ বণিগ্‌বৃত্তি-লব্ধ ধনকে, কখনও অধিক সম্মান দেওয়া হইত না। কথিত আছে, মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর অনেক চেষ্টা করিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে ও অন্যান্য নানা শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত হিন্দুকে কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতে প্ররোচিত করেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ভদ্রবংশজাত প্রায় ৩০০০টি পরিবার মহারাজা নবকৃষ্ণের সময়ের কলিকাতার অধিবাসী হইলেন।[৫] আমরা দেখিতে পাইব, যখন ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা, মুদ্রাযন্ত্র, ও মুদ্রিত পুস্তক পত্রিকাদির প্রচারের দ্বারা কলিকাতা নগরী বঙ্গদেশের জ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিল, তখন ক্রমে ক্রমে আচারনিষ্ঠ হিন্দুগণের কলিকাতার প্রতি বিরাগ চলিয়া গেল।

কিন্তু এই সময়ে কলিকাতার প্রতি তাঁহাদের বিরাগের আর একটি গুরুতর কারণ ছিল। তাহা এই যে, বাণিজ্যের আমলে কোম্পানীর ইংরেজ বণিকদের স্বভাব-চরিত্র রীতিনীতি প্রভৃতি অতি নিকৃষ্ট ছিল। তদুপরি উৎকোচ গ্রহণ ও অসাধু উপায়ে ধনবৃদ্ধি প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। এই ইংরেজগণের সংশ্রবে আসিয়া কলিকাতাস্থ দেশীয় ভদ্র লোকদের মধ্যে অনেকের রীতিনীতি ও স্বভাব-চরিত্র কলুষিত হইয়া যাইতে লাগিল। যে মদ্যপান ও বাই-নাচ প্রভৃতি ব্যাপার শুদ্ধাচারসম্পন্ন দেশীয় মধ্যবিত্ত ভদ্র শ্রেণীর লোকের চক্ষে অত্যন্ত ঘৃণার্হ বলিয়া পরিগণিত হইত, কোম্পানীর ইংরেজগণের দেখাদেখি তাহা কলিকাতার ঐ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেও প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ইহাই কলিকাতার প্রতি আচারনিষ্ঠ হিন্দুগণের অবজ্ঞার বিশেষ কারণ হইয়াছিল।

মন্তব্য

(১) Calcutta *Statesman*, 10th October 1937, p. 20. "Old Fort William" by Mattross. Also, *Parochial Annals of Bengal*: Being a history of the Bengal Ecclesiastical Establishment of the Honourable East India Company in the 17th and 18th Centuries, compiled from original sources. By Henry Barry Hyde, M. A., a Senior Chaplain in Her Majesty's Indian Service. Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1901. *Not for Sale*. Page 15.—অতঃপর এই গ্রন্থকে কেবল 'Hyde' এই নামের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইবে।

(২) The Hindu Rajas westward of the River had rebelled against the Imperial power, and the Nawab of Bengal called upon the English, Dutch and French factories to defend themselves as best they could. The English at once saw their opportunity; the enclosure which Sir John Goldsborough had traced out for a factory they at once began to convert into a fortress of brick. ...This fortified factory ··· was begun in 1696 and completed in three years.···It stood south of Sutanuti and of Calcutta Bazar by the River's edge, and a little north of the burying ground in Dhee Calcutta where so many of the Company's servants ··· had already been laid to rest." —Hyde, pp. 37, 38.

(৩) ১৬১৯ সালে সুরাট আগ্রা আহমদাবাদ ও ব্রোচের চারিটি স্বতন্ত্র ফ্যাক্টরীকে সুরাটের প্রধান কুঠিয়ালের (Chief Factorএর) অধীন করিয়া দেওয়া হয়, এবং তাঁহাকে 'প্রেসিডেণ্ট' এই আখ্যা দেওয়া হয়। তদবধি কোম্পানীর এক এক অঞ্চলের কতকগুলি কুঠীকে এক জন চীফ ফ্যাক্টরের অধীন করিয়া সেই অঞ্চলকে কোম্পানীর একটি 'প্রেসিডেন্সী' বলা হইত। 'প্রেসিডেন্সী অব্ ফোর্ট উইলিয়ম্' ঘোষণার পূর্ব্বে কোম্পানীর বঙ্গদেশস্থ কুঠীগুলি মান্দ্রাজের, অর্থাৎ প্রেসিডেন্সী অব্ ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের অধীন ছিল।

(৪) *The Armenians in India* by Mesrovb Jacob Seth. Calcutta. 1937. Pp. 151, 419, 429.

(৫) Raja Binay Krishna Deb, ***Early History of Calcutta***, pp. 60-66. অতঃপর এই পুস্তক 'Binay Krishna Deb' এইভাবে উল্লিখিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

লাল কাঁকড়া

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

একটা পিণ্ডাকার শরীরের সম্মুখের দিকে পেরিস্কোপের মত দুইটা চোখ, তাহাও আবার ইচ্ছামত উঁচুনীচু করিতে পারে এবং পাঁচ জোড়া পায়ের সাহায্যে অতি দ্রুতগতিতে পাশের দিকে ছুটিয়া চলে—এই সমস্ত অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের জন্ম কাঁকড়ার প্রতি সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কাঁকড়া চিংড়ি-জাতীয় জীব হইলেও আপাতদৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। চিংড়ির দৈহিক গঠন মৎস্যাদি জলচর প্রাণীর মত সুসমঞ্জস কিন্তু কাঁকড়া মস্তকসর্ব্বস্ব। কিন্তু কাঁকড়ার শৈশব ও পরিণত অবস্থায় দৈহিক গঠন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে কাঁকড়া ও চিংড়ি একই গোষ্ঠী হইতে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে রূপান্তর গ্রহণ করিতে করিতে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। চিংড়ি-জাতীয় আদিম জলচর প্রাণীদের কেহ কেহ হয়ত কোন প্রাকৃতিক দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া অপেক্ষাকৃত অল্পপরিসর অগভীর জলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল; কালক্রমে খাদ্য-আহরণের প্রচেষ্টায় স্থলভূমিতে বিচরণ করিবার ফলে ক্রমশঃ রূপান্তর গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, অথবা সমুদ্রজলে খাদ্যাহরণের অসুবিধা ঘটায় ক্রমে ক্রমে স্থলভূমিতে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। ঢেউ অথবা জলস্রোতের সঙ্গে অগণিত কীটাণু ভাসিয়া বেড়ায়। জল নামিয়া গেলে তাহাদের অনেকেই তীরদেশে আটকা পড়িয়া থাকে। চিংড়ি-জাতীয় আদিম জীবেরা বোধ হয় এই সহজলভ্য কীটাণু উদরসাৎ করিবার লোভে স্থলভূমিতে অগ্রসর হইত। উপরে হাঁটিয়া বেড়াইবার সময় চিংড়ি-জাতীয় প্রাণীদের লেজ অত্যন্ত অসুবিধার সৃষ্টি করে। কাজেই স্থলভূমিতে অভিযানকারী সেই আদিম চিংড়ি-জাতীয় জীবেরা তাহাদের লেজ গুটাইয়া বুকের নীচে রাখিবার উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। লেজ গুটাইবার ফলে তাহারা অবাধ গতিতে দ্রুতবেগে চলাফেরা করিয়া এক দিকে খাদ্যসংগ্রহের সুবিধা, অপর দিকে শত্রুর হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিবার সহজ উপায় করিয়া লইয়াছিল।

কাঁকড়ার শৈশব-অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। কাঁকড়া-শিশু দেখিতে প্রায় চিংড়ির মত। এই সময় তাহাদের লেজ প্রসারিত অবস্থায় থাকে এবং উহার সাহায্যেই জলে ভাসিয়া বেড়ায়। পরিণত বয়সে লেজ গুটাইয়া পিণ্ডাকার শরীর ধারণ করিবার পর স্থলে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। অবশ্য, কোন কোন জাতের কাঁকড়া এইরূপ রূপান্তর গ্রহণ করিবার পর আদিম জলচর-অবস্থা পুনরায় আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ কাঁকড়াই উভচর-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে আকৃতি ও প্রকৃতি ভেদে বিভিন্ন জাতের ছোট বড় অসংখ্য কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায়। জাপান-সমুদ্রের এক জাতীয় রাক্ষুসে কাঁকড়াই বোধ হয় আকারে ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার প্রকাণ্ড মস্তক ও লম্বা লম্বা দাড়াগুলি দেখিলে প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। মিউজিয়মে এই জাতীয় একটি প্রকাণ্ড কাঁকড়া সুরক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের দাড়া দুইটি প্রসারিত করিয়া মাপিলে ছয়-সাত হাতেরও বেশী হইবে। গোলাকার মস্তকটি প্রায় দুইটি মনুষ্য-মস্তকের সমান। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় বিচিত্র আকৃতির উভচর কাঁকড়ার সংখ্যাই বেশী। জলচর ও স্থলচর কাঁকড়া ব্যতীত এক জাতীয় গাছ-কাঁকড়া প্রায়শই আহার্য্যের সন্ধানে নারিকেল-জাতীয় গাছে বিচরণ করিয়া থাকে। ইহারা নারিকেলের ছোবড়া কাটিয়া দাড়ার সাহায্যে ভিতরের শাঁস কুরিয়া কুরিয়া খায়।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ পাঁচ-ছয় রকমের কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায়। নোনা জলের ৫।৭ ইঞ্চি চওড়া কাঁকড়াগুলিকে সীলা-কাঁকড়া বলে। চিতি-কাঁকড়া আকারে খুবই ছোট—নোনা জল প্রবেশ করিতে পারে এরূপ খাল-বিলে তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মিঠা জলে হলুদে বা বাদামী রঙের এক জাতীয় কাঁকড় দেখিতে পাওয়া যায়—সেগুলিকে পাতি-কাঁকড়া বলে। রাজ-কাঁকড়া সমুদ্রসন্নিহিত নদনদীতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে জলচর কাঁকড়াই বলিতে পারা যায়। কিন্তু সমুদ্র-সন্নিহিত নদনদীর বালুকাময় তটভূমিতে যে দুই জাতীয় ছোট ছোট কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা প্রধানতঃ স্থলচর। ইহাদের একটি হইল সন্ন্যাসী-কাঁকড়া, ইহারা মাঝে মাঝে জলে থাকিলেও অধিকাংশ সময়ই ডাঙায় বিচরণ করে। আর এক জাতীয় লাল রঙের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁকড়াকে আমরা লাল কাঁকড়া নামেই অভিহিত করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে লাল কাঁকড়ার সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বঙ্গোপসাগরের সন্নিহিত নদীনালার উভয় তীরস্থ বালুকাভূমির উপর কুলপী বরফের চোঙের মত, শামুকের পরিত্যক্ত এক প্রকার খোলা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই পরিত্যক্ত খোলাগুলির মধ্যে কুণ্ডলী-পাকানো কোমলদেহ এক প্রকার অদ্ভুত ধরণের কাঁকড়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঠিক শামুকের মত খোলাটি সমেত বালুকার উপর ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে—ইহারাই সন্ন্যাসী-কাঁকড়া। পসর নদীর একটা খাড়ির ধারে সন্ন্যাসী-কাঁকড়ার

অনুসন্ধানে অবতরণ করিয়াছিলাম। পাড়ে নামিয়া একটু দূরে নজর পড়িতেই দেখি—পালিতা-মাদারের লাল রঙের ফুলের মত অসংখ্য ফুল ভিজা বালুকারাশির উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। উপরের দিকে চাহিয়া গাছে কোন ফুলের চিহ্নই দেখিতে পাইলাম না। তবে এগুলি কি? ভাবিতে ভাবিতে আরও অগ্রসর হইয়া গেলাম। কাছে আসিতেই ফুলগুলি যেন চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল; তখন বুঝিলাম এগুলি ফুল নয় কোন এক প্রকার লাল রঙের ক্ষুদ্রকায় প্রাণী। কিন্তু ওগুলি যে এক জাতের কাঁকড়া তাহা তখনও বুঝিতে পারি নাই। অনেকক্ষণ এক স্থানে নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিবার পর দেখি, তাহারা অতি সন্তর্পণে একে একে গর্ত্তের বাহিরে আসিতে লাগিল। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম—লাল রঙের এক-দাড়াওয়ালা ছোট ছোট এক জাতের কাঁকড়া, টকটকে লাল দাড়াটা কতকটা পালিতা-মাদারের ফুলের মতই দেখায়। আরও কিছুক্ষণ

'জোইয়া'-অবস্থায় কাঁকড়া-শিশু

অপেক্ষা করিবার পর দেখিলাম, ক্রমে ক্রমে প্রায় অধিকাংশ কাঁকড়াই গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু গর্ত্তের প্রায় কাছাকাছিই অনেকে নিশ্চলভাবে দাড়া উঁচু করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, মাঝে মাঝে সামান্য অগ্রসর হয় মাত্র। কিন্তু আমি যে-স্থানটাতে বসিয়াছিলাম, তার আশেপাশে কিছু দূর অবধি কোন কাঁকড়াই দেখিলাম না। ইহাদের দৃষ্টি এত প্রখর যে গর্ত্তের মধ্য হইতেই আমাকে দেখিয়া ভয়ে বাহির হইতেছিল না। অতি সন্তর্পণে উঠিয়া তাহাদের দুই-চারিটিকে ধরিবার মতলবে অগ্রসর হইতে-না-হইতে পূর্ব্বের মতই মুহূর্ত্তের মধ্যে সকলে অদৃশ্য হইয়া গেল—একটা

কাঁকড়াও ধরিতে পারিলাম না, ইহারা এত দ্রুতবেগে পলায়ন করে। কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা করিলেই ইহারা ছুটিয়া গিয়া গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। প্রথমে একটু অবাক হইয়াছিলাম যে, ইহারা যেরূপ দ্রুতবেগে ছুটিয়া গর্ত্তে ঢুকিয়া পড়ে তাহাতে নিজ নিজ গর্ত্ত খুঁজিয়া লয় কি করিয়া? তা ছাড়া নদীর তীরে গর্ত্তও অসংখ্য। নিজ নিজ গর্ত্ত ঠিক করিয়া লওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইল। কিন্তু পরে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলাম ইহারা বাসা ছাড়িয়া বেশী দূর যায় না। গর্ত্তের খুব কাছাকাছিই ঘোরাফেরা করিয়া আহার্য্য বস্তুর সন্ধান করে। কাজেই সহজে নিজ নিজ গর্ত্ত ভুল করে না। কিন্তু হঠাৎ ভয় খাইয়া দিশাহারা হইয়া ছুটিলে অনেক সময় গর্ত্ত ভুল করিয়া অপরের গর্ত্তের মধ্যে গিয়া পড়ে—তখন ভয়ানক লড়াই বাধিয়া যায়। ইহারা বেশী ঝগড়াটে না হইলেও যখন একটি তাহার গর্ত্তে বসিয়া আছে তখন অপর কেহ, ভুল করিয়াই হউক বা ইচ্ছা করিয়াই হউক, তাহাতে ঢুকিয়া

'মেগালোপা'-অবস্থায় কাঁকড়া-শিশু

পড়িলে লড়াই অবধারিত। গর্ত্তের মালিক দুর্ব্বল হইলে হয় তাহাকে প্রাণ দিতে হয়, নচেৎ পলায়ন করিতে হয়—বিজেতা গর্ত্ত দখল করিয়া বসে। আহারান্বেষণ করিবার সময়ও অনেক দুর্ব্বল বা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক কাঁকড়া প্রবলের হাতে প্রাণ দিয়া থাকে। যাহা হউক, কোনক্রমেই তাহাদিগকে ধরিতে না পারিয়া হয়রান হইয়া পড়িলাম। এই কাঁকড়াদের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে মাঝিমাল্লারা দেখিলাম বেশ ওয়াকিবহাল। তাহারা বলিল—এভাবে কিছুতেই উহাদের ধরিতে পারা যাইবে না। হঠাৎ তাড়া দিলে ভয়ে দিশাহারা হইয়া ছুটিতে ছুটিতে ইহারা গর্ত্ত হারাইয়া ফেলে—তখন অনায়াসেই ধরিতে পারা যায়, গর্ত্তে ঢুকিতে পারিলে

বাহির করা ভয়ানক শক্ত। কথাটা সঙ্গত বোধ হইল। কার্য্যতঃ সেরূপ করিয়া দেখিলাম, ছুটিয়া অদৃশ্য হইল বটে, কিন্তু সত্য সত্যই অনেকেই গর্ত্তে ঢুকিতে পারে নাই। কেহ বালির ছোট ছোট স্তূপের আড়ালে, কেহ বা নদীর ধারে লতাপাতা প্রভৃতি আবর্জ্জনারাশির মধ্যে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া ছিল। একটা জঞ্জাল তুলিয়া ধরিতেই প্রায় ১৫।১৬টা কাঁকড়া বাহির হইয়া পড়িল। তখন সহজেই তাহাদিগকে ধরিয়া পাত্র অভাবে পকেটে পুরিয়া মুখটা হাতের মুঠায় চাপিয়া রাখিলাম।

লাল কাঁকড়ারা আকারে অতি ক্ষুদ্র। দেহটি প্রায় গোলাকার। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এক ইঞ্চিরও কম। গায়ের রং সম্পূর্ণ লাল না হইলেও দাড়া ও পায়ের রং টকটকে লাল। অন্যান্য কাঁকড়ার তুলনায় ইহাদের আকৃতি- ও প্রকৃতি- গত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের একটিমাত্র দাড়াই আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এই দাড়াটি শরীরের প্রায় তিন গুণ বা ততোধিক লম্বা ও অত্যন্ত জোরালো। কাঁকড়ার দেহ অপেক্ষা এই দাড়াটিই সর্ব্বাগ্রে নজরে পড়ে। যখন গর্ত্তের বাহিরে বিচরণ করে তখন সর্ব্বদাই এই দাড়া উঁচু করিয়া রাখে। যাঁহারা এই কাঁকড়াকে জীবন্ত অবস্থায় দেখেন নাই তাঁহাদিগকে কাঁকড়া হইতে দাড়াটি পৃথক

লাল কাঁকড়া

করিয়া দেখাইলে কিছুতেই বিশ্বাস করিবেন না যে, এতটুকু কাঁকড়ার এত বড় একটা দাড়া থাকিতে পারে। অপর পার্শ্বস্থ দাড়াটি অতি ক্ষুদ্র, সহসা নজরেই পড়ে না। এই ক্ষুদ্র দাড়ার সাহায্যে তাহারা আহার্য্য পদার্থ মুখে পুরিয়া দেয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষুদ্র দাড়াটি হাতের কাজ করিয়া থাকে। চোখ দুটিও অন্যান্য কাঁকড়ার মত নহে। ইহাদের বোঁটা দুইটি অনেক লম্বা, কতকটা ছোট দেশলাইয়ের কাঠির মত মনে হয়। পেরিস্কোপের মত চোখ দুটিকে উপরে উঠাইয়া দেখাশুনা করে, আবার প্রয়োজন মত মস্তকের সম্মুখস্থিত খাঁজের ভিতর মুড়িয়া রাখে। ইহারা নদী- বা সমুদ্রতীর-স্থ ভিজা বালুকার মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করে। ঢেউ বা জলস্রোতে যখন তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ জলে প্লাবিত হইয়া যায়, তখন ইহারা গর্ত্তের মধ্যে আশ্রয় লয়। জলের ধাক্কায় বালি পড়িয়া গর্ত্তের মুখ বন্ধ হইয়া যায়। জল নামিয়া গেলেই আবার তাহারা গর্ত্তের মুখ পরিষ্কার করিয়া বাহির হইয়া আসে। ঢেউয়ের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিংড়ি বা কাঁকড়ার বাচ্চা অথবা অন্যান্য কীটাণু বালির উপর আটকা পড়িয়া থাকে। ইহারা তাহাই সংগ্রহ করিয়া উদরপূর্ত্তি করে। এই কারণেই বোধ হয় ইহারা জলসন্নিহিত চড়ার উপর বাস করিয়া থাকে।

কাঁকড়ারা মাতৃগর্ভ হইতে পূর্ণাবয়ব কাঁকড়া রূপে ভূমিষ্ঠ হয় না। ফড়িং, প্রজাপতি প্রভৃতি যেমন বিভিন্ন অবস্থায় রূপান্তর পরিগ্রহ করিতে করিতে সর্ব্বশেষে পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে পরিণত হয়, কাঁকড়ার অবস্থাও সেইরূপ। প্রথমে ডিম ফুটিয়া কতকটা চিংড়ির
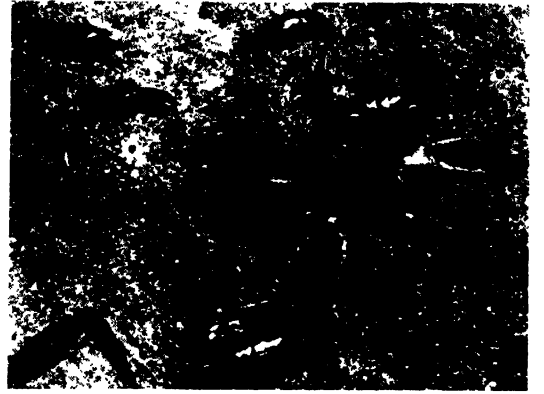
বালুকারাশির উপর লাল কাঁকড়ার দল শিকারান্বেষণে ব্যাপৃত

আকৃতি ক্ষুদ্রকায় বাচ্চা বাহির হয়। মোটামুটি দেখিয়া চিংড়ির বাচ্চা বলিয়া ভ্রম হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। লেজ ও অন্যান্য কয়েকটি উপাঙ্গের সাহায্যে জলে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। এই অবস্থায় কাঁকড়া-শিশুকে 'জোইয়া' নামে অভিহিত করা হয়। ক্রমশঃ খোলস বদলাইয়া ইহাদের আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই 'জোইয়া' আবার আদি, মধ্য ও পূর্ণ জোইয়া নামে তিন অবস্থা অতিক্রম করিবার পর 'মেগালোপা' অবস্থায় উপনীত হয়। এই অবস্থায় কাঁকড়া-শিশুকে ঠিক চিংড়ির মত দেখায়। 'মেগালোপা' অবস্থা হইতে খোলস পরিত্যাগ করিয়া অতি ক্ষুদ্রকায় পূর্ণাঙ্গ কাঁকড়াতে পরিণত হয়। তখন আর পূর্ব্বের ন্যায় লেজটি প্রসারিত অবস্থায় থাকে না, বুকের নীচে গুটাইয়া রাখে। পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পূর্ব্বাবধি ইহারা জলেই বিচরণ করে, তার পর স্থলের দিকে অগ্রসর হয়। কাঁকড়া-শিশুরা সাধারণতঃ এই নিয়মেই স্বাধীনভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু পাতি-কাঁকড়াদের শৈশবাবস্থা মাতৃক্রোড়েই অতিবাহিত হয়। মায়ের উদরদেশের ঢাকনির নীচে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয় এবং সেখানেই শৈশবাবস্থার বিভিন্ন রূপান্তর সংঘটিত হইয়া পূর্ণাঙ্গ

বাচ্চারূপে বাহির হইয়া জলের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে।

লাল কাঁকড়ারা সর্ব্বদাই দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে পাতি- বা চিতি-কাঁকড়ার মত এখানে-সেখানে একক ভাবে থাকে না কাজেই তাহাদের পক্ষে কলহপ্রিয় হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সুযোগ ঘটে না বলিয়াই সহজে কলহ বাধে না। কারণ দুর্ব্বলেরা সবলদিগকে এবং শিশুরা পরিণতবয়স্কদিগকে সর্ব্বদাই যথাসম্ভব এড়াইয়া চলে। খুব সূক্ষ্ম কালো সুতার দুই পার্শ্বে অতি ক্ষুদ্র দুইটি বঁড়শিতে পিঁপড়ের বাচ্চা গাঁথিয়া উহাদের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা কাঁকড়া এক দিকের বঁড়শিটাকে গিলিয়া ফেলিল। সুতাটা অসুবিধা ঘটাইতেছিল বলিয়া দাড়ার সাহায্যে বার বার ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হয় নাই। ঐ অবস্থাতেই গর্ত্তে ঢুকিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ বাদে অপেক্ষাকৃত ছোট আর একটা কাঁকড়া আসিয়া সুতার অপর প্রান্তস্থিত বঁড়শিটাকে টোপ-সমেত গিলিয়া ফেলিল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চলিতে সুরু করিতেই বাধা পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। অনেক কায়দা করিয়াও সুতা ছাড়াইতে না পারিয়া দুই একবার এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতে করিতে বড় কাঁকড়াটার গর্ত্তের কাছে আসিয়া পড়িল। গর্ত্তটার আকার দেখিয়াই হয়ত সে বুঝিতে পারিয়াছিল, কোন প্রবল শত্রু উহার মধ্যে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। তাই যেন ভীতিবিহ্বলের মত গর্ত্তের পার্শ্বস্থিত স্তূপীকৃত বালুকারাশির এক পাশে গিয়া গা-ঢাকা দিয়া রহিল। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট পরে বড় কাঁকড়াটা গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া খানিক দূর অগ্রসর হইতেই সুতায় টান পড়িবার ফলে ছোট কাঁকড়াটা এক দিকে চলিতে সুরু করিল। ইহারা প্রায়ই এক স্থানে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটু একটু করিয়া এদিক-ওদিক হাটিতে থাকে। সুতায় বাঁধা থাকার ফলে উভয়েই কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া দূরে যাইতে পারিতেছিল না। অবশেষে এইরূপ ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করিতে করিতে এক স্থানে উভয়ের দেখা হইয়া যাইতেই বড় কাঁকড়াটা ছোটটাকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিয়া দাড়া দিয়া চাপিয়া মারিয়া ফেলিল। ছোটটা ভয়ে এমন হইয়া গিয়াছিল যে হাত পা গুটাইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ভাবে শত্রুর কবলে আত্মসমর্পণ করিল।

রোমে ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক

গত পাঁচ বৎসর যাবৎ ইতালীয় ও ভারতীয়দের সমবেত প্রচেষ্টায় রোমে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারের দিক হইতে এই কেন্দ্রটির পরিচয় দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করা দরকার।

১৯৩৩ সনের শেষ ভাগে রোমে দুইটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। একটি ইউরোপ-প্রবাসী নিখিল-প্রাচ্য ছাত্র-সম্মিলনী (Confederation of Oriental Students in Europe); দ্বিতীয়টি ইতালীয় মধ্য ও সুদূর প্রাচ্য পরিষদ (Italian Institute for the Middle and Far East)। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানেরই উদ্বোধন করেন স্বয়ং বেনিটো মুসোলিনী। উদ্বোধনী-বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন, পুরাতন রোমান সাম্রাজ্যের সময় এই চিরন্তন নগরীতে একদিন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে-মিলন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল আজ আবার তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। উদ্বোধন-সভার সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু। স্বাস্থ্যান্বেষণে তিনি তখন রোমে অবস্থান করিতেছিলেন।

ছাত্র-সম্মিলনীটি প্রথম দুই-তিন বৎসর বেশ ভাল কাজ করিয়াছিল। ইহার মুখপত্র "ইয়ং এশিয়া" নামক মাসিক সংবাদপত্র ইংরেজী ও ফরাসী এই দুইটি ভাষায় নিয়মিত প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সম্মিলনীর সভাপতি অবশ্য ছিলেন একজন ইরাণী ছাত্র, তবে ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কয়েক জন ভারতীয়, যথা শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ সরকার, ডক্টর প্রমথনাথ রায়, শ্রীযুক্ত দুবাস প্রভৃতি। এই সম্মিলনীর স্থায়ী আপিস ও "ইয়ং এশিয়ার" সম্পাদকীয় বিভাগ ছিল রোমে। এই সঙ্গে নিখিল-ভারতীয় ছাত্র-সম্মিলনীর আপিসও ক্রমশঃ রোমে উঠিয়া আসে, এবং রোমের পথ এশিয়ার যুবক-সম্প্রদায়ের পদধ্বনিতে চঞ্চল হইয়া উঠে। কিন্তু ইথিওপিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে মতদ্বৈধ

উপস্থিত হয়, এবং ইতালীয়ান সরকারের সাহায্যে সম্মিলনীর কাজ নির্ব্বাহ হইত বলিয়া, ইতালীর সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতি অনুমোদন না-করাতে এই সম্মিলনী লোপ প্রাপ্ত হয়। আজ তাহার কোন অস্তিত্বই নাই।

কুমার শুভেন্দ্র এবং কেদার—নাবিক নৃত্য

এক দিকে যেমন ছাত্র-সম্মিলনীগুলি রোম হইতে উঠিয়া গিয়াছে, অপর দিকে তেমনই মধ্য ও সুদূর প্রাচ্য পরিষদটি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। এই পরিষদটির কার্য্যকলাপ পারস্য হইতে আরম্ভ করিয়া জাপান পর্য্যন্ত সমস্ত দেশকেই অঙ্গীভূত করিয়া অগ্রসর হইবার কথা হইলেও, অধ্যাপক তুচ্চির ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আছে বলিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার অন্যান্য সকল দেশের সংস্কৃতি-প্রচার অপেক্ষা দ্রুত গতিতে পরিচালিত হইতেছে। অল্প কয়েকটি উদাহরণ দিলেই ইহা বুঝা যাইবে। গত তিন বৎসরের মধ্যে এই পরিষদ অনেক বিখ্যাত ভারতীয় অধ্যাপক এবং সুধীকে এখানে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। ১৯৩৪ সনে অধ্যাপক মহেন্দ্র সরকার এবং ১৯৩৫ সনে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত রোমে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া গিয়াছিলেন। ১৯৩৬ সনে ইথিওপিয়ার যুদ্ধের জন্য এবং ভারতীয় সাংবাদিক সমাজে ইতালীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারকার্য্য চলায়, এই পরিষদ কাহাকেও আহ্বান করিতে পারেন নাই; কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্রই ভারতীয় সুধীসমাজের সঙ্গে এই

কুমার শুভেন্দ্র—কার্ত্তিকেয় নৃত্য

পরিষদের যোগাযোগ পুনরায় স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৩৭ সনে গৌহাটীর অধ্যাপক ভুঞা এখানে আসামের ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন। এই বৎসর পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বর্ত্তমান

ভারত ও যুবক-আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু বাংলা দেশে সাধারণের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে যে বিশেষ আইনের পরিকল্পনা চলিতেছিল তাহার দায়িত্ব অন্য কাহাকেও সমর্পণ করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি এ-বৎসর আসিতে পারেন নাই।

শ্রীমতী বাণী মজুমদার

খুব সম্ভব আগামী বৎসর মুখোপাধ্যায়-মহাশয় রোমের মধ্য ও সুদূর প্রাচ্য পরিষদে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে এই বৎসর পরিষদ দেওয়ান সর্ টি. বিজয়রাঘবাচারীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি বর্ত্তমানে রোমে বক্তৃতা করিতেছেন। ভারতবর্ষের নূতন রাষ্ট্রীয় কাঠামো; ভারতের কৃষি, ও চাষীদের জীবন; এবং ভারতের রাষ্ট্রে ও সমাজে ধর্ম্মের স্থান, এই তিনটি বিষয় সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ইতালীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের প্রাচীন এবং আধুনিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন। ১৯৩১ সনে রোমের আন্তর্জাতিক লোকবিজ্ঞান-কংগ্রেসে অধ্যাপক সরকার ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসাবে আসিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ কালিদাস নাগও ইতালীতে বক্তৃতা এবং এখানকার সুধীসমাজের সহিত নানাভাবে সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি গত বৎসর মধ্য ও সুদূর প্রাচ্য পরিষদের অবৈতনিক সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

গত তিন বৎসর যাবৎ এই প্রবন্ধের লেখকও বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিবার এবং ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে পুস্তক ও প্রবন্ধ মুদ্রণের সুযোগ পাইয়াছেন। ১৯৩৬ সনে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শবাদ; ১৯৩৭ সনে বৈষ্ণব কবিতায় প্রেমের ব্যাখ্যা; এবং এই বৎসর ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে এই পরিষদে বক্তৃতা করিয়াছেন। সম্প্রতি মিলানে ও আন্‌কোনা হইতে নিমন্ত্রণ আসিয়াছে বর্ত্তমান ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য।

এই পরিষদের সাহায্যে এবং অধ্যাপক তুচ্চির চেষ্টায় রোমে আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির স্থায়ী কেন্দ্র হিসাবে এই অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। গত তিন বৎসর যাবৎ লেখক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যাপনার কাজ করিয়া আসিতেছেন। এই বৎসর হিন্দীর ক্লাসও খোলা হইয়াছে। আশা করা যায় যে আগামী বৎসর হইতে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন বাংলার "রীডার" নিযুক্ত হইবে।

এই সব নীরস ধরণের প্রচারকার্য্য ছাড়াও ভারতীয় শিল্পকলার প্রদর্শনী ইতালীর বিভিন্ন প্রদেশে হইয়া আসিতেছে। উদয়শঙ্কর ইতালীতে যে আদর এবং সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাহা ইউরোপের অন্য কোথাও পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। এই বৎসর শ্রীমতী মেনকার নৃত্যশিল্পীদল রোম, ভেনিস্, নেপ্‌লস্, ফ্লোরেন্স ইত্যাদি শহরে ঘুরিয়া আমাদের দেশের শিল্প-প্রতিভার প্রভূত প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমানে সেরাইকেলার "ছাউ" নৃত্যশিল্পীগণ ইতালীতে ভ্রমণ করিতেছেন। ইঁহারা রোমে প্রায় দশ দিন ছিলেন এবং দুই রাত্রি অভিনয় করিয়াছেন। সেরাইকেলার "ছাউ" নাচ অল্পদিন যাবৎ ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছে, সকলেরই জানা আছে। কলিকাতার বিখ্যাত প্রযোজক শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষ প্রথম এই নাচটিকে উড়িষ্যার বাহিরে

লইয়া আসেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে এই নৃত্যের খুব সমাদর হইলে সেরাইকেলার মহারাজা তাঁহার দলকে শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষের নেতৃত্বে ইউরোপে পাঠাইতে মনস্থ করেন। এই দলে মহারাজার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ শুভেন্দ্রনারায়ণ সিংদেও ও মহারাজার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ হীরেন্দ্রনারায়ণ সিংদেও কতকগুলি প্রধান প্রধান নৃত্য প্রদর্শন করেন। ইউরোপে প্রথম বার আসিয়াছেন বলিয়া এবং ইউরোপীয় জনসাধারণের রুচি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বলিয়া ইঁহাদের প্রথমে কিছু অসুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীযুত ঘোষের নির্দ্দেশমত সেই সব ত্রুটি ক্রমশঃ সংশোধিত হয় এবং রোমে তাঁহারা প্রভূত সাফল্য লাভ করেন। ব্যক্তিগত ভাবেও এই দলের সঙ্গীত- এবং নৃত্য- শিল্পীগণ অসাধারণ সামাজিক লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষ

এখানকার মধ্য ও সুদূর প্রাচ্য পরিষদ "ছাউ" নৃত্য সম্বন্ধে বিশেষ উদ্যোগী হওয়াতেই ইঁহাদের এরূপ অপ্রত্যাশিত সাফল্যলাভ সম্ভব হইয়াছে। প্রথম রাত্রির অভিনয়ে ইতালীর যুবরাজ্ঞী প্রিন্সেস অফ পীড্‌মণ্ট (বেলজিয়মের রাজার ভগ্নী) উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত রয়্যাল একাডেমীর প্রেসিডেণ্ট ফেদেরৎসনি (Federzoni), শিক্ষা-সচিব বত্তাই (Bottai), প্রচার-সচিব আল্‌ফিয়েরী (Alfieri), দার্শনিক জেন্তিলে (Gentile) প্রভৃতি গণ্যমান্য বহু সাহিত্যিক, সাংবাদিক, এবং অধ্যাপকও উপস্থিত ছিলেন। রোমের বিভিন্ন সংবাদপত্রে সেরাইকেলা নাচের প্রচুর প্রশংসাবাদ হইয়াছে। প্রাচ্য পরিষদের তরফ হইতে লেখক প্রথম রাত্রির অভিনয়ের প্রারম্ভে সেরাইকেলার "ছাউ" নৃত্য সম্বন্ধে ইতালীয় ভাষায় একটি ছোট বক্তৃতা করিয়া ইহার উৎকর্ষ বুঝাইয়া দেন।

কুমার শুভেন্দ্র ও কুমার হীরেন্দ্র ছাড়া, কুমারী বাণী মজুমদারের নৃত্যও খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তিনি অল্প দিন যাবৎ সেরাইকেলার নৃত্য শিক্ষা করিতেছেন, তথাপি তাঁহার নৃত্যভঙ্গীতে কোনরূপ জড়িমা কিংবা আড়ষ্ট ভাব প্রকাশ পায় নাই।

রোমে অবস্থানকালে সেরাইকেলার সঙ্গীত- ও নৃত্য-শিল্পীদের এখানকার অভিজাত-সমাজে বিশেষ সমাদর হইয়াছিল। অধ্যাপক তুচ্চির গৃহে ভারতীয় সঙ্গীতের একটি জলসা হয় এবং শ্রীযুত পান্নালাল ঘোষ বাঁশীতে কীর্ত্তনের আলাপ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। মুসোলিনীর প্রথম জীবনী-লেখিকা এবং পুরাতন বান্ধবী সিন্যোরা মারগেরিতা সারফাত্তির (Margherita Sarfatti) গৃহে ও বিখ্যাত ব্যারিষ্টার কাজিনেল্লির (Kasinelli) গৃহে সেরাইকেলা-দলের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক জায়গায় ইঁহাদের আদর-আপ্যায়ন হইয়াছে। সর্ব্বত্রই সমস্বরে "বন্দেমাতরম্" গাহিয়া সভা ভঙ্গ হইয়াছে। ইঁহারা ইতালীতে আরও দুই-তিন জায়গায় অভিনয় করিয়া সুইটজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে যাইবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন। বর্ত্তমানে সন্ রেমো ও মিলানে অভিনয় করিতেছেন। মহারাজার অর্থ ও শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষের উদ্যোগের সমন্বয়ে সেরাইকেলার "ছাউ" নৃত্য ইউরোপে বিশেষ সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

রোমের এই ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রটির প্রতি যদি আমাদের দেশের নেতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তবে মঙ্গলের কথা। এই কেন্দ্রটি যাহাতে জীবিত থাকে তাহার চেষ্টাও করা প্রয়োজন। আগামী বৎসর শান্তিনিকেতনের শিল্পীগণ যাহাতে এখানে আসিতে পারেন সেজন্য প্রাচ্য পরিষদ উদ্যোগী হইয়াছেন।

রোম, ৮ই এপ্রিল, ১৯৩৮

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় রূপ-শিল্পের পরিচয়ের ব্যবস্থা

শ্রীকমলা রায়

আমাদের সরকারী বিদ্যাপীঠে শিক্ষা-ব্যবস্থার নানা দোষ-ত্রুটি আছে—এই অভিযোগ আমরা নিত্যই করি এবং নিত্যই শুনি। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাতন্ত্রের সমালোচকেরা বারংবার এই অনুযোগ করে এসেছেন যে, আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিচক্রের পরিধি অতিমাত্রায় "লিখিং-পড়িং" বিদ্যার দৌরাত্ম্যে পীড়িত, সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠেছে,—যার ফলে অর্থনৈতিক জীবন নানা ত্রুটিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশের কারুশিল্পের যে শোচনীয় পরিণাম আমাদের অর্থনীতিকে পীড়িত করছে—তার একটা কারণ আমাদের সৌন্দর্য্যবুদ্ধির লোপ। পাশ্চাত্য নানা দেশের ও জাপানের শ্রমজাত নানা কারুশিল্পে যে উচ্চ চিন্তা ও সৌন্দর্য্যের ছাপ আছে, যে সৌন্দর্য্যের স্পর্শে প্রাচীন ভারতের কারুশিল্প এক কালে সমস্ত জগতের প্রশংসার বস্তু ছিল, আমাদের আধুনিক কালের শ্রমজাত শিল্পে তার একান্ত অভাব হয়েছে ব'লেই বিশ্বের বাজারে আমাদের পণ্যদ্রব্য, নক্সা ও বর্ণসমাবেশের অক্ষমতায়—অন্য দেশের শ্রমজাত দ্রব্যের সহিত পাল্লা দিতে পারে না। এর প্রধান কারণ জাতীয় শিল্প- ও সৌন্দর্য্য- বুদ্ধির অপচয়। এই রূপ-চর্চ্চার অভাবে আমাদের জীবনের নানা দিক্ নিঃস্ব ও নিষ্ফল হয়ে উঠেছে। অর্থনীতির কথা যদি ছেড়েই দিই, তবুও দেখতে পাই যে কেবল সংস্কৃতির দিক দিয়ে, শিক্ষা-লাভের যে চরম উদ্দেশ্য ও আদর্শ অর্থাৎ মনকে সর্ব্বতো-ভাবে মুক্তি দেবার ও প্রসারিত করবার যে শক্তি শিক্ষা-লাভের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য,—সেই দিক থেকে বিচার করে দেখতে পাই যে, আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্র কেবল সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কথা কেবল অক্ষরে লেখা পুঁথিপত্রে লিপিবদ্ধ নয়; অন্য পথেও তার শ্রেষ্ঠ চিন্তার ফল আত্মপ্রকাশ করেছে। কেবলমাত্র সাহিত্যকে জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভের একমাত্র বাহন ক'রে, আমাদের এক-চোখো শিক্ষাতন্ত্র জ্ঞানের অন্যান্য চক্ষু, অন্যান্য দ্বার রুদ্ধ ক'রে রেখেছে।

ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষা-মনস্তত্ত্বের পণ্ডিতগণ প্রমাণ করেছেন যে কলাশিল্পী ও কারুশিল্পীর নিরক্ষর ভাষায় লেখা শ্রেষ্ঠ রচনা, সাহিত্যের অক্ষরিক ভাষায় লিখিত যে-কোন শ্রেষ্ঠ রচনা হইতে শিক্ষার বাহনরূপে কোনও অংশে হীন নয়। যারা মুক্তিমুখী (liberalizing) উচ্চ আদর্শের শিক্ষার প্রবর্ত্তন করতে চান, জগতের ওস্তাদ শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ চিত্রপটে, শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি, প্রতিমা ও ভাস্কর্য্যে, সৌধশিল্পের ও স্থাপত্যের নানা শ্রেষ্ঠ নিদর্শনে, কারুশিল্পীর হাতে-গড়া উজ্জ্বল ও শক্তিমান কল্পনায় মহীয়ান্ নানা নক্সা ও প্রতীকের, উচ্চশিক্ষার সহায়ক বহুমূল্য যে-উপকরণ ও নিদর্শন নিবদ্ধ রয়েছে, সেগুলিকে উপেক্ষা করবার অধিকার তাদের নেই।

স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবুদ্ধিকে জীবিত, জাগ্রত ও উন্নত করবার সুযোগ যাতে বিদ্যার্থীরা পায়, আমাদের বিদ্যাপীঠে তার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অনুশীলনের সুযোগ না পেলে মানুষের সৌন্দর্য্যবুদ্ধি ও সৃষ্টিশক্তি দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হয়ে ক্রমশঃ লোপ পায়।

শিক্ষা-মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন যে, বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের মননশক্তি কেবলমাত্র কেতাবী বিদ্যায় আবদ্ধ ও অবরুদ্ধ হয়ে থাকলে তারা শব্দ ও শব্দের অর্থবোধে পাকা হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু সেই পরিমাণে রূপবিদ্যার অক্ষর ও অভিধানে তারা

প্রবেশিকা পরীক্ষার শিল্পতত্ত্বের অধ্যয়ন-তালিকাভুক্ত প্রাচ্য মূর্ত্তিকলার দুইটি নিদর্শন

কাঁচা হ'তে থাকে। এটা আমরা নিত্যই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যখন স্কুল-কলেজের সিংহদ্বার অতিক্রম ক'রে বাইরে এসে দাঁড়ান, তখন তাঁদের মধ্যে অনেকেই গান শোনবার কান হারিয়ে বসেছেন, মানুষের শ্রেষ্ঠ রচনার বাণীকে অগ্রাহ্য করতে তাঁরা বেশ পটু হয়েছেন—জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্ত্তির পরিচয় নেবার, গুণ বিচার করবার, রস আস্বাদন করবার, শক্তি একেবারেই হারিয়ে বসেছেন। সুতরাং শিল্পের ভাষা জানতে হ'লে অল্প বয়স থেকেই এ-বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষাতন্ত্রের এই ত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্‌সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থিনী ছাত্রীদের জন্য, শিল্প-পরিচয় ও বিচার-শক্তির সুযোগের জন্য, একটি অনুশীলন-তালিকার প্রবর্ত্তন করেছেন। তিন বৎসর আগে ম্যাট্রিকুলেশন পাঠ্যতালিকার সংশোধনের জন্য একটি সব্‌-কমিটি গঠিত হয়। তার মধ্যে ছিলেন,—রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সর্ চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন, শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। এই সব্‌-কমিটি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় শিল্প-তত্ত্বের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয়ের অনুকূল একটি সিলেবস্ প্রস্তুত করেছেন। সিলেবস্ ও অনুশীলন-পত্রের সারাংশের অনুবাদ দিয়ে দেওয়া হল :—

প্রার্থনারত ম্যাডোনা

সূর্য্যমুখী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় নব-প্রবর্ত্তিতব্য রূপশিল্পের পাঠক্রমের অন্তর্গত চিত্রাবলীর দুইটি নিদর্শন

কুমার হীরেন্দ্র—শবর নৃত্য

শ্রীমতী মেনকার নৃত্যসম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ

শ্রীমতী মেনকা

['রোমে ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

রেখাঙ্কন ও চিত্রবিদ্যার শিক্ষা, অনুশীলন, পরিচয় ও গুণগ্রহণ:
মহিলা-বিদ্যার্থিনীদের জন্য

এই শিক্ষাক্রম দুই ভাগে বিভক্ত হইবে (১) কলিভাগে বা হাতে-কলমে শিক্ষা, (২) তত্ত্বাংশ বা রূপবিদ্যার তত্ত্বের সহিত পরিচয়। পরীক্ষাপত্রে যথাক্রমে ৪০ ও ৬০ নম্বর নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। কলিতাংশে পরীক্ষাপত্রের বিষয় দুইটি (ক) একটি রেখাচিত্রের কোনও বিশিষ্ট মাপে প্রতিলিপি লেখা, (খ) পরিচিত কোনও দ্রব্যাদির মধ্যে একটি দ্রব্যের (না দেখিয়া কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া) চিত্র লেখা। কলিতাংশের অনুশীলন-তালিকা তিন প্রকার রেখা-রচনে আবদ্ধ থাকিবে বোর্ডের উপর খড়ি দিয়া রেখা-অঙ্কন; রুল, কম্পাস ইত্যাদির সাহায্য বিনা রেখা-অঙ্কন এবং (মন হইতে) কোনও আদর্শ সম্মুখে না রাখিয়া চিত্র লেখা।

তত্ত্বাংশের পরীক্ষা, রূপশিল্পের পরিচয় ও গুণ বিচার সম্বন্ধে সহজ প্রশ্নে আবদ্ধ থাকিবে। তাহার মধ্যে চিত্র-শিল্প, ভাস্কর্য্য-শিল্প ও গৃহ-শিল্প বা স্থপতি-শিল্প সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তালিকা-অনুযায়ী বিষয়গুলির সহিত সাধারণ পরিচয় থাকা আবশ্যক হইবে:

স্থপতিশিল্প। স্থাপত্যরূপের অক্ষর-পরিচয়। ক্ষেত্রের নক্সা, গৃহ-নির্ম্মাণের মুখপাতের নক্সা, গৃহ-নির্ম্মাণের সার-রীতির সাধারণ তত্ত্ব অলঙ্কার, স্থাপত্যের ভাস্কর্য্য। এশিয়া ও ইউরোপের স্থপতি-শিল্পের কয়েকটি বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের বিশ্লেষণ ও পরিচয়। ভারতীয় স্থাপত্যরীতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

চিত্রশিল্প। চিত্ররূপের অক্ষর-পরিচয়। নক্সা ও রূপ-রচনার মূলতত্ত্ব। বর্ণবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব। লিপি-লিখন-বিদ্যার অক্ষর-পরিচয়। এশিয়া ও ইউরোপের চিত্রশিল্পের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের বিশ্লেষণ ও পরিচয়। ভারতীয় চিত্র-শিল্পের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ভাস্কর্য্যশিল্প। মূর্ত্তি-গঠনের অক্ষর-পরিচয়। চৌমুখ মূর্ত্তির গঠন-রীতি। একমুখো মূর্ত্তির গঠনরীতি, স্বভাবের রূপের অনুকরণ। আলঙ্কারিক মূর্ত্তি-রীতি। এশিয়া ও ইউরোপের ভাস্কর্য্যশিল্পের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের বিশ্লেষণ ও পরিচয়। ভারতীয় ভাস্কর্য্যশিল্পের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উপরে নির্দ্দিষ্ট অনুশীলন-তালিকার উপযোগী পাঠ্য পুস্তক-পুস্তিকা, ওস্তাদ শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ চিত্রাদির প্রতিলিপির তালিকা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, কলিতাংশের অনুশীলনের উপযোগী আদর্শ চিত্রলিপি-পুস্তক সিন্‌ডিকেট নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

উপরের অনুশীলন-তালিকার উপযোগী চিত্রাদি ও পাঠ্যপুস্তক সিণ্ডিকেট সম্প্রতি নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন। নিম্নে তার তালিকা প্রদত্ত হ'ল:—

রূপ-শিল্প

(১) রেখা ও চিত্র বিদ্যা, এবং রূপ-শিল্পের আস্বাদন ও গুণ বিচারের শিক্ষার উপযোগী নিম্নলিখিত পুস্তিকা ও চিত্রাদি নির্দ্দিষ্ট হইল:—

১। কলিতাংশ অর্থাৎ চিত্র-বিদ্যা শিক্ষার জন্য সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত পুস্তিকা বাঞ্ছনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল:—

(ক) Bengali Students' Drawing Books by E. B. Havell (Parts I., II., and III. Macmillan & Co.)

(খ) রূপাবলী, দ্বিতীয় ভাগ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু (চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি কোং)

(গ) Indian Artistic Anatomy by Dr. A. N. Tagore, C. I. E. (Indian Society of Oriental Arts, Calcutta).

২। অনুশীলন-ক্রমের তত্ত্বাংশের জন্য অর্থাৎ রূপ-শিল্পের আস্বাদন ও পরিচয় লাভের জন্য নিম্নলিখিত চিত্রাদির অনুশীলন নির্দ্দিষ্ট হইল:—

১। চিত্রশিল্প

(a) Colour Post Cards (National Gallery, London. 2d. each.)

No. 1007: Bellini: Portrait of Doge Loredano.
„ 1003: Hobbema: The Avenue.
„ 1072: El Greco: The Agony in the Garden.
„ 1082: Sassaferrato: Madonna in Prayer.
„ 1004: Perugino: The Virgin Adoring.
„ 1024: Rubens: Chapeau de Paille.
„ 1025: Turner: The Flighting Temerraire.
„ 1089: Hogarth: The Shrimp Girl.
„ 1075: Botticelli: Madonna and Child.
„ 1098: Leonardo da Vinci: The Virgin of the Rocks.
„ 1008: Vermeer: A Lady at the Virginals.
„ 1081: Rembrandt: Portrait of F. V. Wasserhoven.
„ 1054: Corot: The Bent Tree.

(b) Colour Post Cards (Medici Society, London. 2d. each.)

No. 14: Fra Angelico: Annunciation.
„ 108: Leonardo da Vinci: Mona Lisa.
„ 2: Leonardo da Vinci: Head of Christ.
„ 129: Raphael: Madonna della Sedia.
„ 105: Fra Lippo Lippi: An Angel Adoring.
„ 101: Holbein: George Gisze.
„ 155: Vermeer: Girl at the Casement.
„ 47: Rossetti: Annunciation.

(c) Colour Post Cards (F. Hodfstaengl, Munich.)

No. 143: Pieta, School of Avignon.
„ 13: Van Gogh: Sunflower.

(d) Colour Post Cards (British Museum. 1s per set.)

1) Set B4: Japanese Colour Prints.
2) Set B46: Mughal Painters of the Early 17th. Century.
3) Set B33: Indian Painting, Buddhist and Rajput Schools.

(e) Hyderabad Archaeological Department Colour Post Cards.

Set D: Ajanta Frescoes. *Price Rs. 2-8.*

২। ভাস্কর্য্য-শিল্প

1) Post Card No. XCVIII: Classical Greek Sculpture. (British Museum. *1 Shilling.*)
2) A Picture Book of Gothic Sculpture (Victoria Albert Museum, London. 6*d.*)
3) A Picture Book of Chinese Pottery Figures (Victoria Albert Museum, 6*d.*)
4) A special set of Post Cards of Indian, Indonesian & Chinese Sculpture (To be issued by Mr. O. C. Gangoly. Price 8 annas.)

এই সব চিত্রাদির অনুশীলন ও রসবোধের জন্য চিত্রের বিষয়, বা রচনাকার বা শিল্পীদের জীবনচরিত জানিবার আবশ্যক হইবে না, চিত্র-হিসাবে, রূপ-রচনা হিসাবে ইহাদের বর্ণ, রচনারীতি, ও রূপ ও রেখার ভঙ্গীর পরিচয় ও আস্বাদন লাভ করাই যথেষ্ট হইবে।

নিম্নলিখিত পুস্তক পঠনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল :—

শিল্প-পরিচয় (যন্ত্রস্থ)—শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলি পাঠ করা বাঞ্ছনীয় :—

১। ভারতের ভাস্কর্য্য—শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
২। রূপ-শিল্প - শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এই শাখার অনুশীলনে উৎসাহদানের জন্য শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করেছেন—

প্রথম পুরস্কার :—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সুবর্ণ-পদক।

দ্বিতীয় পুরস্কার :—কমলা-পুরস্কার—শিল্পবিদ্যা-সম্বন্ধে সচিত্র পুস্তক।

তৃতীয় পুরস্কার :—ওস্তাদ শিল্পীদের কয়েকটি চিত্রের প্রতিলিপি।

শ্রীযুক্ত রতনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সুনয়নী দেবী পদক পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের "বিশ্ব-পরিচয়"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

চতুর্দ্দশ-বর্ষীয় বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁর "কবিকাহিনী"তে এই লাইনটি লিখেছিলেন—

"নিশাই কবিতা আর দিবাই বিজ্ঞান।"

ব্যাখ্যার ছলে বলেছেন, দিবালোকে সবই সুস্পষ্ট, বিশ্লিষ্ট, ফুলের প্রত্যেক কাঁটাটি চোখে পড়ে, মনে হয়

"নিয়মের লৌহচক্র ঘুরিছে ঘর্ঘরি।"

কিন্তু রাত্রির রহস্যঘন অন্ধকারে এই দৃশ্যজগৎ যেন রূপান্তর লাভ করে স্বপ্নচ্ছবিতে। নিশা দেবী তারার পুষ্পহার মাথায় জড়িয়ে বিশ্বের পাতায় পাতায় লেখেন কবিতা।

একই জিনিষকে দুই দিক থেকে দেখা যায়। একটা বিচার-বিশ্লেষণের দিক, আর একটা কল্পনা-অনুভূতির গহন বিপুল রসার্ণবের উদার বিস্তৃতিতে আত্মহারা। বিজ্ঞানও কল্পনা এবং সীমাতীতের নর্ম্মভূমি। কিন্তু সে-কল্পনার ভিত্তি প্রত্যক্ষের বিচারমূলক সিদ্ধান্তের উপরে, তার অসীমতা অনুভূতির সান্দ্ররসে নয়, সীমার পরিধিকে গাণিতিক গবেষণার ভূমায় প্রসারিত ক'রে। কাব্য ও বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এক—জড়জীবময় এই জগৎ, কিন্তু প্রেক্ষাভূমি স্বতন্ত্র, দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যে ভিন্নপথাবলম্বী। বিজ্ঞান যে খনিজ সত্য আবিষ্কার করে, কবি তাকে করেন রসঘন এবং সুন্দর। বিজ্ঞানী কবির বড় একটা তোয়াক্কা রাখেন না, কিন্তু কবির মহাজন বৈজ্ঞানিক, যাঁর আবিষ্কারের আনুকূল্যে ও মালমশলায় কবির সৃজনলীলা ঋদ্ধিমতী হয়। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের তত্ত্ব ও তথ্য কবির বিচিত্র রচনার উপকরণ। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক ও বস্তুতত্ত্ব-সন্ধানী চিত্ত বিজ্ঞানের মূল সত্যগুলির প্রতি আশৈশব কিরূপ আগ্রহান্বিত ছিল, তার কিঞ্চিৎ আভাস "বিশ্বপরিচয়ে"র ভূমিকায় আমাদের দিয়েছেন।

সর্ব্বতোমুখী প্রতিভারও বিশেষ প্রবণতা থাকে কোন একটি বিধিনির্দ্দিষ্ট দিকে। সেই আপেক্ষিক গুরুতর আকর্ষণের টানে রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক না হয়ে হলেন কবি। কিন্তু তাঁর সারা

জীবনব্যাপী সাধনার মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় তাঁর কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধাদিতে সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সীমার মধ্যে সীমাতীতের কবি। পরিধিহীন দেশ ও নিরবধি কালকে ক্রমাপসারিণী তটভূমিতে উত্তীর্ণ করেছে জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্র। বহুর মধ্যে একত্বকে প্রতিপন্ন করেছে বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি। এই সব তথ্য কবির সূক্ষ্মানুভূতিকে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি দান করেছে। তাই তিনি রূপ থেকে অপরূপের ও অরূপের সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং তাঁর অমৃতময় রচনায় সে-অভিজ্ঞতা আমাদের জন্ম লিপিবদ্ধ করেছেন। বিজ্ঞানীর দিদৃক্ষা তার স্থূল চক্ষুর দৃষ্টিকে সুদূরগামিনী করেছে দূরবীক্ষণ আবিষ্কার ক'রে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দর্শন লাভ করেছে অণুবীক্ষণ রচনা করে, স্পেকট্রস্কোপ বা বর্ণ-বিশ্লেষিকা যন্ত্রের উদ্ভাবনা ক'রে সুদূর নক্ষত্রের রাসায়নিক উপাদানের তথ্য সংগ্রহ করেছে, তার গতিবেগের পরিমাপ নির্দ্ধারণ করেছে সেই মাপকাঠিতে, যার এক একটি দাগের দৈর্ঘ্য বলা যেতে পারে কোটিগুণ কোটিরও অধিক! তাই কবি বলেছেন, "প্রকাশ লোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশ লোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ ক'রে বিশ্বব্যাপারের মূল রহস্য কেবলি অবারিত করছে।" এই যবনিকার পর যবনিকার উন্মোচন ত কাল্পনিক নয়; প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ পরীক্ষা ও গণনার অঙ্কফল। বিজ্ঞানের আনন্দ তাঁর লেখনীর স্পর্শে সান্দ্ররসে ঘনীভূত হয়েছে। প্রেমের একটা নিত্য লক্ষণ জিজ্ঞাসা। এই প্রশ্নোত্তরের মালায় বিজ্ঞানী বরণ করেন বিজ্ঞানলক্ষ্মীকে। কবির স্পর্শে সে রত্নমালিকা হয় অম্লাননবীন পুষ্পহার।

পাশ্চাত্য দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সরল সিদ্ধান্তগুলি সাধারণ পাঠকদের নিকট সুপরিচিত হয়েছে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের রচিত সহজপাঠ্য প্রবন্ধ ও পুস্তকাবলীতে। বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্বগুলি জন-সাধারণের কাছে প্রচারিত হওয়ায় এক দিকে যেমন বিজ্ঞান-সাধনায় প্রবর্ত্তনা এনেছে, সেই সঙ্গে আবার এই সকল সত্যের বহুল প্রচার সাহিত্য, শিল্পকলা, ও যন্ত্রসম্পদকে সমৃদ্ধ করেছে। যে-সকল কথা এক দিন ছিল বিশেষবিৎ পণ্ডিতদের পুঁথিপত্রের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, তারা অল্পাধিক পরিমাণে সকলেরই চিন্তা ও ধারণার বিষয়ীভূত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রাক্-পরমাণু লোক থেকে আরম্ভ ক'রে বিশাল বিপুল নাক্ষত্র জগতের ক্রমবিবর্দ্ধমান চক্রবাল পর্য্যন্ত পাঠকের বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছেন।

বলা বাহুল্য, বইখানি জড়বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ নয়। অথচ এতে আছে বিশ্বসৃষ্টির বর্ণপরিচয় থেকে আরম্ভ ক'রে পর্য্যায়ক্রমে নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক ও ভূলোকের কথা। একদা আমরা বিজ্ঞানের কাছে শুনেছিলাম যে, যে-অক্ষরগুলিতে এই বিপুল বিশ্বগ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার ছাপাখানার হরফগুলি স্বতন্ত্র। বিভক্ত করলে বিরানব্বইটি মৌলিক পরমাণুর খোপে খোপে তাদের ফেলা যায়। এই মূল কণাগুলির রাসায়নিক যোজনায় বিচিত্র পদার্থের উদ্ভব। পুরাতন রসায়ন-শাস্ত্র বাতিল হয়ে যায় নি। কিন্তু এই মূল অক্ষরের উপাদানগুলি যে জড়ের চরম অণু নয়, তারা যে প্রত্যেকটি আবার প্রাগাণবিক বৈদ্যুতিক মিথুনের জটলা, রূপকথার মতই কবি জড়তত্ত্বের সেই অতিনিগূঢ় রহস্যের বার্ত্তা আমাদের শুনিয়েছেন। নানা চমৎকার উপমা ও দৃষ্টান্তের আনুকূল্যে তাঁর অপূর্ব্ব বর্ণনা অতি উপাদেয় হয়েছে। যাকে চোখে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, তার অস্তিত্বের প্রমাণ স্বপ্নকল্পনার তুরীয় লোকে নয়; লেবরেটরীতে পরখ ক'রে দেখবার যন্ত্রের সাহায্যে রফা হয়েছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আছে গণিত শাস্ত্রের সেই অকাট্য যুক্তি, যা ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরিয়েছে মানুষের বিচারনিষ্ঠ বুদ্ধির অনপনেয় সিদ্ধান্তে। আদালতের চূড়ান্ত নৈয়ায়িক নিষ্পত্তির চেয়ে এই সব বিজ্ঞানীর রায় বেশী ছাড়া কম প্রামাণ্য নয়। তথাচ এই খানেই ইতি নয়। বিজ্ঞানের এই নেতিত্বের মধ্যেই ত রয়েছে মানবপ্রতিভার ক্রমাভিসারিণী অগ্রগতির প্রেরণা!

—'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনো খানে!'

মণিমুক্তা দিয়ে শিল্পী যেমন একটি কারুচিত্র নিখচিত করে, বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যরত্নের সমাহারে কবি তেমনি এক শত পৃষ্ঠার মধ্যে নিখিল বিশ্বের একটি অপরূপ আলেখ্য আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন। নব বিজ্ঞানের গীতায় এই পুস্তিকাটি যেন 'বিশ্বরূপদর্শন যোগে"র মহিমময় একটি অধ্যায়। কবি আমাদের আহ্বান করে বলছেন,

'ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।'

আমরাও এই বিশ্বরূপকে নমস্কার ক'রে বলি,

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তং
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্।

এই 'দীপ্তানলার্কদ্যুতি'কেই লক্ষ্য ক'রে উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

"আমরা জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের মূলগত ঐক্য কল্পনা করতে পারি সর্ব্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃ পদার্থের মধ্যে। অনেক কাল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে আপাতদৃষ্টিতে সে সকল স্থূল পদার্থ জ্যোতিহীন, তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকারে নিত্যই জ্যোতির ক্রিয়া চলছে। এই মহা জ্যোতিরই সূক্ষ্ম বিকাশ প্রাণে এবং আরও সূক্ষ্মতম বিকাশ চৈতন্যে ও মনে। বিশ্বসৃষ্টির আদিতে মহাজ্যোতি ছাড়া আর কিছুই যখন পাওয়া যায় না, তখন বলা যেতে পারে চৈতন্যে তারই প্রকাশ জড় থেকে জীবে একে একে পর্দ্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহা চৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলেছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি সৃষ্টির শেষ পরিণাম।" (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১০৩-১০৪)

রবীন্দ্রনাথের "বিশ্ব-পরিচয়" কেবল মাত্র জীন্স, এডিংটন প্রভৃতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের তথ্যানুবৃত্তি নয়। বর্ত্তমান সময়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত ইউরোপীয় ও ভারতীয় সংস্কৃতির একটি মহামিলনক্ষেত্র। বিজ্ঞানের যে দীপিকা পশ্চিমের দিগ্‌বধূর হাতে বিধৃত, তার কিরণে আজ পূর্ব্ব-পশ্চিম যুগপৎ আলোকিত। এই তীব্র আলোকে অনেক যুক্তিভিত্তিহীন সংস্কার নির্ব্বিচারে রক্ষিত আবহমান কালের গতানুগতিক মতবাদ অন্তঃসারশূন্য বলে প্রতিপন্ন হয়ে যাচ্ছে, কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে। সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ সত্যগুলি উত্তরোত্তর লাভ করছে অভিনব মূল্য ও মর্য্যাদা। আমাদের অন্তরে মধ্যযুগীয় (medieval) বা পৌরাণিক আদর্শের সঙ্গে নবযুগের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার অহরহ দ্বন্দ্ব। এই ঘাতপ্রতিঘাতের সমন্বয় সাধনে যাঁরা যত্নবান, আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রণী। তাঁর mystical বা অধ্যাত্ম পরিপ্রেক্ষা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে rationalistic বা যুক্তি-স্ফুরণোজ্জ্বল বস্তুতান্ত্রিক পর্য্যবেক্ষণে। এই আপাতবিরুদ্ধ দ্বৈতাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর স্নিগ্ধবিলোকন ফুটেছে রবীন্দ্রনাথের ললাটিক তৃতীয় নেত্রে। এই সুদূরগামিনী দৃষ্টি নব্যভারতের প্রত্যুষে এক দিন ফুটেছিল রামমোহনের নয়নে; তাই তিনি আমাদের জাতীয় শিক্ষা বিভাগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও গণিতচর্চ্চার উদ্বোধন ভিক্ষা করেছিলেন রাজদ্বারে। রবীন্দ্রনাথও "বিশ্ব-পরিচয়ে"র ভূমিকায় বলেছেন,

"যারা এই (বৈজ্ঞানিক) সাধনার শক্তি ও দান থেকে একেবারেই বঞ্চিত হল তারা আধুনিক যুগের প্রত্যন্ত দেশে একঘরে হয়ে রইল।"

প্রাচ্য সংস্কৃতির পাঞ্চজন্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ফুৎকার কি গম্ভীর সুরে উদ্গীরিত হয় তার স্বরলিপি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে আছে।

কঠিন দুর্ব্বোধ্য বিষয় রসাত্মক প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হলেও বিশেষ প্রণিধানের সঙ্গে পড়তে হয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে যাদের কোন পূর্ব্ব-পরিচয় নেই, স্থানে স্থানে তাঁদের হয়ত পূর্ণ উপভোগে বাধা পড়বে। এইজন্যে বইখানি একাধিক বার পড়তে অনুরোধ করি। অস্পষ্ট আবছায়াগুলো যদি সুস্পষ্ট প্রশ্নের আকার ধারণ করে, তাহলেই পাঠ সার্থক হবে। এই জিজ্ঞাসাই জ্ঞাতব্য তথ্য সন্ধানের পথপ্রদর্শক। বিশ্বসৃষ্টিকে যদি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়ে দেখবার শক্তি অর্জ্জন না করি, তবে বর্ত্তমান যুগে আমরা অন্ধ হয়েই থাকব। আমাদের চোখের ছানি কাটাবার যাদুমন্ত্র এই বইটিতে আছে।

রুদ্ধ ঘরের বদ্ধ হাওয়ার থেকে উদার উন্মুক্তির ভিতর একবার দাঁড়ালেও বুঝি মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়। এত বড় বিশ্বে এই পৃথিবীটা যে ধূলিকণার চেয়েও ক্ষুদ্রাণু, ক্ষণকালের জন্যেও এ অনুভূতিতে অভিমান অহংকার ধুয়ে মুছে যায় এবং সেই সঙ্গে অন্তরে জাগে মানবজন্মের আভিজাত্যের নিরভিমান আত্মগৌরব। কী সুন্দর ক'রেই কবি এই কথা আমাদের বলেছেন! উদ্ধৃত করবার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলাম না।

"নাক্ষত্র জগতের দেশকাল পরিমাপ গতিবেগ দূরত্ব ও তার অগ্নি-আবর্ত্তের চিন্তনাতীত প্রচণ্ডতা দেখে যতই বিস্ময় বোধ করি এ কথা মানতে হবে বিশ্বে সব চেয়ে বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মানুষ তাদের জেনেছে, এবং নিজের আশু জীবিকার প্রয়োজন অতিক্রম করে তাদের জানতে চাচ্ছে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর তার দেহ, বিশ্ব-ইতিহাসের কণামাত্র সময়টুকুতে সে বর্তমান বিরাট বিশ্ব-সংস্থিতির অণুমাত্র স্থানে তার অবস্থান, অথচ অসীমের কাছ-ঘেঁষা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের দুষ্পরিমেয় বৃহৎ ও দুর্রধিগম্য সূক্ষ্মের হিসাব সে রাখছে—এর চেয়ে আশ্চর্য্য মহিমা বিশ্বে আর কিছুই নেই, কিংবা বিপুল সৃষ্টিতে নিরবধি কালে কি জানি আর কোনো লোকে আর কোনো চিত্তকে অধিকার ক'রে আর কোনো ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে কি না। কিন্তু একথা মানুষ প্রমাণ করেছে যে, ভূমা বাহিরের আয়তনে নয়, পরিমাণে নয়, আন্তরিক পরিপূর্ণতায়। (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫৮)

[রবিবাসরে পঠিত]

গল্পের দান

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় রায়

তিন মাসের ভাড়া বাকী, অতএব বাড়ীওয়ালার মেজাজ খারাপ হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু তাহার প্রকাশটা হইল সেদিন এত বেশী কর্কশ ও অপমানজনক যে প্রদ্যোতের মত লোকেরও সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা হইল একটা ঘুষি মারিয়া লোকটার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু ঘুষি মারিতে হইলে হাতের মুঠায় শক্তি বা টাকা একটা থাকা আবশ্যক, প্রদ্যোতের দু'টারই সমান অভাব, তাই বাধ্য হইয়াই ইচ্ছাটা দমন করিতে হইল। ব্যাপারটা এমনিতেই তাহার পক্ষে লজ্জাকর তাই লোক জড় হইবার ভয়ে এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, শেষ পর্য্যন্ত দুই-একটা কড়া জবাব না দিয়া সে থাকিতে পারিল না। অপর পক্ষ মাঝে মাঝে এমন ভাবে তর্জ্জন করিয়া উঠিতেছিল, হয়ত বাধা দিবার লোক সামনে থাকিলে ছুটিয়া মারিতে যাইত। এসব ব্যাপারে লোকের উপস্থিতির জন্য অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় না, বাড়ীওয়ালা-ভদ্রলোকের অভদ্রোচিত হাঁক-ডাকে আশেপাশের দু-একটা লোক আসিয়া জুটিল, দু-একটা জানালাও খুলিয়া গেল। এই অপমানজনক ঘটনার মাঝখানে দাঁড়াইয়া থাকা, নিজকে লাঞ্ছিত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রদ্যোত সংক্ষেপে শুধু এই কথাটা জানাইয়া দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল যে কলহ করিতে সে ভয় পায় না—লজ্জা পায়, অতএব না শাসাইয়া বাড়ীওয়ালা কার্য্যতঃ যাহা খুশী করিতে পারে, সে কালকের মধ্যেই বাড়ী ছাড়িয়া দিবে।

একটা ছাড়িতে হইলে অপর একটা ধরিবার ব্যবস্থা করিতে হয়; অনির্দ্দিষ্ট ভাবে প্রদ্যোত এ-রাস্তা ও-রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। একটা থামের গায় একখানা ছাপান 'টু লেট'-এর দিকে দৃষ্টি পড়িতে সে সেটার উপর চোখ বুলাইয়া গেল। 'দু-খানা আলোবাতাসযুক্ত শয়ন-গৃহ—সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা।' প্রদ্যোত এই প্রকার বাড়ীই খুঁজিতেছে, শুধু নিজে আর মা—ইহার অধিক প্রয়োজন তাহার হয় না। এর চাইতে কম হইলেও আবার চলে না; কাহারও সঙ্গে থাকিলে ভাড়ার দিক দিয়া অনেকটা সুবিধা হয় বটে, কিন্তু সে 'এখনও সেটা বরদাস্ত করিতে পারে না। কিছুক্ষণ পূর্ব্বের কলহের মধ্য হইতে বাড়ীওয়ালার একটা কথা তাহার মনে পড়িল,—যাহার ক্ষমতা নাই তাহার অত বড় চাল না দেখাইয়া খোলার ঘরে থাকা উচিত। কথাটা প্রদ্যোত মনের মধ্যে দু-এক বার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। পঁচিশ টাকা মাহিনার টিউশ্যনিটা গিয়াছে—ইংরেজী প্রবাদটাও মনের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল, 'কাট ইওর কোট একর্ডিং টু ইওর ক্লথ।' একটু চিন্তা করিল, মনে হইল প্রবাদ ভুল—কথাটা হওয়া উচিত 'কাট ইওর কোট একর্ডিং টু ইওর সাইজ।' তা ছাড়া অসম্মানের মধ্য দিয়া সম্মান, অভ্যাস ও ঠাট বজায় রাখিবার চেষ্টাই ত বিত্তহীন মধ্যবিত্তের ধর্ম্ম। ঠিকানাটা টুকিয়া লইয়া সে চলিতে সুরু করিল। পর পর দুই তিন স্থানে একই বিজ্ঞাপন দেখিয়া সে থামিল, ভাবিল, এ বাড়ী লওয়া চলিতে পারে না; দুই কামরার জন্য ছাপাইয়া ছড়াইয়া যে এত কাণ্ড করিয়াছে, ভাড়া সম্পর্কে তাহার চাহিদা ও চেতনা নিশ্চয়ই অত্যধিক। হয়ত বলিয়া বসিবে রাজভৃত্য ছাড়া বাড়ী ভাড়া দিবে না, নয়ত কৌতূহলে কনের বাপকেও পশ্চাতে ফেলিয়া আয়ের পন্থা ও পরিমাণ সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিবে। উপস্থিত তাহার পক্ষে বাড়ীর চাইতে বাড়ীওয়ালার ভালত্বটাই বেশী প্রয়োজন।

চলিতে চলিতে প্রদ্যোত শহরের দক্ষিণ প্রান্তে একটা তিনতলা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দোতলার রেলিঙের উপর কয়েকখানা

ভোষক সূর্য্যকিরণে গাত্র বিস্তার করিয়া স্বাস্থ্যোদ্ধার করিতেছে, তাহারই একটার তলা হইতে লম্বা একটা সুতায় বাঁধা ছোট্ট একখানা 'টু লেট' নোলকের মত টুল টুল করিয়া দুলিতেছে। স্থানটা প্রদ্যোতের বেশ ভাল লাগিল, চারি দিক খোলা, নাগরিক কোলাহল হইতেও অনেকটা তফাতে; ভাড়া এদিকটায় কম হইবারই কথা—প্রদ্যোত কড়া নাড়িল। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দরজা খুলিয়া বাহির হইলেন, প্রদ্যোত প্রশ্ন করিল—বাড়ী ভাড়া দেবেন?

—আজ্ঞে হাঁ, দেব বইকি; আসুন ভেতরে আসুন।

ভদ্রলোক অতিশয় ভদ্রতাসহকারে প্রদ্যোতকে লইয়া ঘরের ভিতরে বসাইলেন। ভদ্রলোকের নাম নিখিল। তিনি চিত্রকর, কিন্তু চিত্রাঙ্কন তাঁহার ব্যবসা নহে। কয়েকখানা অসমাপ্ত চিত্র ইজেলের গায় হেলান দিয়া সমাপ্তির অপেক্ষা করিতেছে, ঘরের এখানে-ওখানে রং ও তুলি অগোছালো ভাবে পড়িয়া আছে। একখানা চিত্র প্রদ্যোতের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে সে সেটিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিবার জন্য ইজেলের সন্নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। নিখিলবাবু প্রশ্ন করিলেন—কেমন হবে মনে করেন?

প্রদ্যোত কহিল—আইডিয়াটা বেশ।

নিখিলবাবু উৎসাহিত হইয়া বলিলেন—আইডিয়ার কথা বলছেন, আচ্ছা দেখুন এই ছবিখানা। তাহার পর রঙের কাজ এবং তুলির কাজ দেখাইতে আরও তিন-চার খানা অর্দ্ধসমাপ্ত ছবি তিনি এখান-ওখান হইতে টানিয়া বাহির করিলেন।

প্রদ্যোত হাসিয়া বলিল—একখানা ছবিও শেষ পর্য্যন্ত আঁকেন নি দেখছি!

নিখিলবাবু একটা ক্যাম্প-চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া উদাস ভাবে জবাব দিলেন—কি হবে শেষ করে, কে-ই বা বুঝবে, কে-ই বা তার দাম দেবে, তাই যখন যেটুকু খুশী এঁকে ফেলে রাখি। সত্যিকার ব্রাহ্মণের কদর নেই মশায়, খেয়ে বাঁচতে হ'লে 'যজমানী' হওয়া দরকার।...

আর্ট হইতে সাহিত্য, সাহিত্য হইতে সমাজ, এমনি করিয়া স্বল্প সময়ে উভয়ের মধ্যে অনেক আলোচনাই হইয়া গেল। নিখিলবাবু লোকটি এতটা উদাসীন, সরল ও অমায়িক যে প্রদ্যোতের মনে হইল তাহার পক্ষে এই হইল আদর্শ বাড়ীওয়ালা। কাহাকেও ঠকাইতে সে চাহে না, সে চাহে প্রয়োজনমত কিছু সময় ও ভদ্র ব্যবহার। নিখিলবাবুর নিকট সেটুকু নিঃসন্দেহে আশা করা যাইতে পারে, ইহা স্বল্প আলাপের মধ্য দিয়াই সে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছে। প্রদ্যোত সংবাদ পত্রের আপিসে কাজ করে এবং গল্প লেখে শুনিয়া নিখিলবাবুর আগ্রহ যেন আরও বাড়িয়া গেল, বলিলেন—চলে আসুন মশায়, দু-জনে আলাপ আলোচনা ক'রে বেশ সময় কাটান যাবে।

প্রস্তাবটা প্রদ্যোতেরও ভাল লাগিল, সে বাড়ীটা একবার দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

নিখিলবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, দেখবেন বইকি। এক্ষুনি বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি। আমি আবার এ-সবের কোন খবরই রাখি নে; কোন্‌টায় লোক এল, কোন্‌টা থেকে লোক গেল, কে ভাড়া দিচ্ছে, কে দিচ্ছে না, কোন কিছুর মধ্যেই আমি নেই। হয় ছবি আঁকি, নয়ত চুপ ক'রে বসে ভাবি

প্রদ্যোতের মনটা দমিয়া যায়, উঁহার ভালত্ব তাহা হইলে তাহার কোন কাজেই আসিবে না। সে মনে মনে মানিয়া লয় এ-কথা তাহার পূর্ব্বেই বুঝা উচিত ছিল যে নূতন বাড়ী তৈরি হইতে সুরু করিয়া ভাড়াটে বসান পর্য্যন্ত সবই যখন সঠিক ভাবে চলিতেছে, তখন এই উদাসীন লোকটির পিছনে নিশ্চয়ই সমাসীন রহিয়াছে একটি বাস্তব-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক।

নিখিলবাবু হাঁক দিলেন—পূরবী...পূরবী!

আঠার-উনিশ বছরের একটি মেয়ে আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। গৌরবর্ণ, সুশ্রী চেহারা, লম্বার উপরে একহারা তাহার দেহের গঠন।

নিখিলবাবু কহিলেন—এই আমার বোন, দাঁড়িয়ে মজুর খাটিয়ে বাড়ীও ও-ই তৈরি করিয়েছে, দেখাশোনাও ওই করে। যান, বাড়ী দেখে কথাবার্ত্তা ঠিক ক'রে ফেলুন।

মেয়েটি ভিতর হইতে একগোছা চাবি হাতে ফিরিয়া আসিল; বলিল—আসুন।

প্রদ্যোত মেয়েটির সঙ্গে একা যাইতে দ্বিধা বোধ করিতেছিল, নিখিলবাবুর দিকে তাকাইতে তিনি নড়িবার কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া কহিলেন—যান, দেখে আসুন গে পছন্দ হয় কি না।

নীচের তলায় নিখিলবাবু নিজে থাকেন। রুগ্ন বৃদ্ধ মাতা আর একটি মাত্র বোন, অতগুলা ঘর প্রয়োজনে আসে না, তাই এক পাশের দুটা কামরা লইয়া একটা পৃথক্ ব্যবস্থা করা হইয়াছে ভাড়া দিবার জন্য। প্রদ্যোত ঘুরিয়া-ফিরিয়া বাড়ীটা দেখিতে লাগিল। ঘর দুখানাই ভাল, পিছনের ফুল ও শাকসব্জির দোমিশালী বাগানটাও নেহাৎ মন্দ নয়। রান্নাঘরের খোঁজ করিতে মেয়েটি জানাইল রান্নার জন্য পৃথক্ কোন ঘর নাই, পূর্ব্বে যাঁরা ছিলেন বারান্দার ঐ কোণটা ব্যবহার করিতেন।

প্রদ্যোত হাসিয়া বলিল—ভাড়া জুগিয়ে খাবার মত কিছু যে থাকে না সে খবর আপনারা রাখেন দেখছি, যা থাকে তার জন্যে ঐ কোণটুকুই যথেষ্ট···সেটা ঠিক।

পূরবীও মৃদু হাসিল, কহিল—উপরে বেশ একটা ভাল ফ্ল্যাট আছে, পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া।

—ভাড়া জোগাতেই ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। বাড়ীর যতটা উপরে উঠতে বলেন রাজি আছি, কিন্তু ভাড়ার দিক্ দিয়ে এক তিলও উপরে ওঠবার ক্ষমতা নেই।···এটার জন্যে দিতে হয় কত?

—পঁচিশ।···বলেন ত রান্নাঘর একটা করিয়ে দেব।

'বলেন ত রান্নাঘর একটা করিয়ে দেব', এই কথা কয়টি বলার ভিতর দিয়া তাহার কর্ত্তৃত্বটা যেন স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে! প্রদ্যোতের খেয়াল হয়, রীতিমত ভাড়া না দিতে পারিলে ইহার নিকটই তাহার আবেদন জানাইতে হইবে। স্বল্প ক্ষণের সহজ ভাবটুকু তাহার নষ্ট হইয়া যায়, সে বেশ একটু গম্ভীর হইয়া পড়ে। তাহার মনে হয়, না এ হইতে পারে না; দশ জন পুরুষের সম্মুখে নিজের দৈন্য প্রকাশ হইয়া পড়ুক, এমন কি প্রয়োজন হইলে এক দফা কলহ হইয়া যাক, তেমন আসে যায় না, কিন্তু একটি মেয়ের কাছে তাহার দৈন্য স্বীকার করিতে হইবে ভাবিতেও তাহার পৌরুষে আঘাত লাগিল।

প্রদ্যোতের মুখের দিকে চাহিয়া নিখিলবাবুর মনে হইল বাড়ী তাঁহার পছন্দ হয় নাই, বলিলেন—কি, পছন্দ হ'ল না বুঝি?

পূরবী বলিল—ইনি বলছিলেন একটা রান্নাঘরের কথা—

—বেশ ত একটা করিয়ে দে না। প্রদ্যোতকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আপনি এসে পড়ুন সব ঠিক ক'রে দেবে'খন।"

অনেকটা যেন এড়াইয়া যাইবার জন্যই প্রদ্যোত ভাড়ার কথাটা উল্লেখ করিল, নিখিলবাবু এক কথায় পাঁচ টাকা ভাড়া কমাইয়া বসিলেন।

পূরবী মৃদু আপত্তি জানাইয়া বলিল—রান্নাঘর ছাড়াই যে পঁচিশ পাচ্ছিলাম···

পূরবীর চোখের দিকে তাকাইতেই নিখিলবাবুর খেয়াল হইল তিনি একটা অনধিকারচর্চ্চা করিয়া ফেলিয়াছেন। পাঁচ টাকার ক্ষতিকে হালকা করিবার মত একটা হাসি হাসিয়া কহিলেন—ভারি ত ব্যাপার··· কি হবে টাকা-টাকা করে, কর্ত্তব্যের মধ্যে ত একটি···

সেটির উল্লেখ সম্পর্কে ভগ্নীর আপত্তির মাত্রাটা তাহার সামান্য একটু ভ্রূকুঞ্চন হইতেই উপলব্ধি করিয়া একটু থামিয়া বলিলেন—তা ছাড়া ব'সে দুটো কথা বলবার মত এক জন লোক কাছে পাওয়াটাও যে ভাগ্যের কথা।

ভাড়া কমাইবার জন্য আবেদন প্রদ্যোত নিজেও অনেক জানাইয়াছে, এক্ষেত্রেও হয়ত জানাইত, কিন্তু পূরবীর কাছে তাহার হইয়া অপর এক ব্যক্তির সুপারিশে সে স্বস্তি বোধ করিতেছিল না। শেষ পর্য্যন্ত বিশ টাকায় কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া সে বাহির হইয়া পড়ে। তাহার মনে হয়, এ ভাল হইল না, এ আরও কঠিন স্থান। উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে কুমারদের অক্ষমতা কুমারীরা কতটা অবহেলার চক্ষে দেখে তাহার জানিতে বাকী নাই। বাড়ীওয়ালার মেয়েটি ঘুর ঘুর করিয়া চোখের সামনে ঘুরিয়া বেড়াইত, ভাড়া বাকী পড়িতেই তাহার মুখের উপর ঠাস করিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল—নিছক অপমান করিবার জন্য। এখানেও সে-সবের পুনরভিনয় চলিবে। মা'র অসুস্থতার দরুন কিছু দিন

পূর্ব্বে কিছু টাকা সে অগ্রিম লইয়াছিল, তাই সাপ্তাহিক কাগজের আপিস হইতে পুরা তিরিশটি টাকা তাহার পকেটে আসে না। প্রথম মাসটা এক রকম কাটিবে, দ্বিতীয় মাস হইতে তাগাদা, তৃতীয় মাসে যে-কে-সে।. কিন্তু বাড়ীও যে তাহার একটা আজকের মধ্যেই চাই; দেখিতে দেখিতে প্রদ্যোতের যুক্তির মুখ ঘুরিয়া যায়। সম্মান-অসম্মানের অত সূক্ষ্ম বিচার করিবার মত সময় এখন তাহার নাই; নিখিলবাবু লোক ভাল, পূরবীও আর যাই করুক হল্লা ত বাধাইবে না। কে জানে ইহার মধ্যে একটা ভাল টিউশ্যনিও জুটিয়া যাইতে পারে,—প্রদ্যোত মত স্থির করিয়া ফেলিল।

পরের দিন কাগজে কলমে দেনা স্বীকার করিয়া সে আগের বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া নূতন বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কয়েকটা দিন বেশ কাটিয়া গেল। নিখিলবাবুর আন্তরিকতার অন্ত নাই। প্রদ্যোতের চোখে তাহার ছবি ভাল লাগে বলিয়াই হউক বা আলাপ করিয়া আনন্দ পান বলিয়াই হউক, প্রদ্যোতকে যে তিনি স্নেহের চোখে দেখিতে সুরু করিয়াছেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রদ্যোতের সঙ্গে তক্তপোষ আসিয়াছে একটি, সুতরাং মাতা-পুত্রের এক জনকে মেঝেয় শয্যা পাতিতে হইবে, ইহা খেয়ালে আসা মাত্র তাহার একটি মূল্যবান খাটকে গুঁজিয়া দিবার জন্য জোর করিতে থাকেন, বলেন—ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে যে। আমার ওখানে এমনিই ত পড়ে আছে—

তাহার কথার মাঝখানেই প্রদ্যোত বলিয়া ওঠে—দেখুন নিখিলবাবু, সুখভোগের বাসনাটা নূতন ট্রামের জানলার মত, উপর দিকে ঠেলে তুলতে কোন ল্যাঠাই নেই, নামাবার সময় দু-কান ধরে কষ্ট করে নামাতে হয়, তাও ছাড়লেন কি আটকে গেল। যেটুকু নামানো দরকার তাই যে পেরে উঠছি নে।...

প্রদ্যোত রাজী কিছুতেই হয় না। সে মুখে যাহাই বলুক, জীবনযাত্রার প্রণালীটা উর্দ্ধগামী হইয়া পড়িবার ভয়েই যে প্রত্যাখ্যান করে তাহা নহে; আসলে নিখিলবাবুর কোন সহৃদয়তাকেই সে স্বচ্ছন্দ-চিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না শুধু এই ভাবিয়া যে শেষ পর্য্যন্ত এ-সকলের মর্য্যাদা হয়ত সে রক্ষা করিতে পারিবে না।

সন্ধ্যায় এক কাপ চা উপলক্ষ্য করিয়া দু-জনের গল্প জমিয়া ওঠে। মাঝে মাঝে পূরবীও উপস্থিত থাকিয়া প্রদ্যোতের উৎসাহ বর্দ্ধন করে। সে শুধু উপস্থিতই থাকে, কথাবার্ত্তায় যোগ কখনই দেয় না। প্রদ্যোত এ-পর্য্যন্ত তাহার বড়-একটা কৌতুক বা চমৎকার কোন কথার প্রতিক্রিয়া হিসাবে পূরবীর মুখের উপর শুধু ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছে একটু মৃদু হাসি, সামান্য একটু প্রশংসার ভাব। পূরবী একটু অতিরিক্ত গম্ভীর, এতটা গাম্ভীর্য্য প্রদ্যোতের ভাল লাগে না।

সূর্য্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়া আগে উঠিবার চেষ্টা প্রদ্যোত কোন কালেই করে নাই। সেদিন শেষরাত্রির দিকে কিসের একটা শব্দ শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। শব্দটা হইতেছিল বাহিরে তাহার মাথার দিকের জানালার কাছে। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শয্যা ত্যাগ করিয়া সে গিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল। বাহিরে তখনও আবছা অন্ধকার; পূরবী কোমরে আঁচল জড়াইয়া সেইখানটায় কোদাল দিয়া মাটি খুঁড়িতেছিল, প্রদ্যোতকে দেখিয়া বলিল—ভয় নেই, আমি।

প্রদ্যোত জানালা হইতে সরিয়া যাইতেছিল, পূরবী বলিল—একবার বাইরে আসবেন, পুঁইয়ের মাচাটা একটু ঠিক ক'রে নেব।

মাচার একটা কোণ খুঁটি হইতে সরিয়া গিয়াছে, পূরবী সেইখানটা হাত দিয়া উঁচু করিয়া ধরিল, প্রদ্যোত তাহার নির্দ্দেশ-মত সেটাকে বাঁধিয়া দিল। কাজ শেষ করিয়া প্রদ্যোত কহিল—আপনার বাগানের সখ ত কম নয়, রাত থাকতে উঠে এসেছেন।

পূরবী মুখের উপরকার অসংলগ্ন চুলগুলি হাত দিয়া সরাইয়া দিয়া উত্তর করিল—রোজই ত উঠি। সমস্ত বাগানটা আমার নিজের হাতে করা। আজকে দেখুন না কতটা কুপিয়েছি, ঐখান থেকে আপনার জানালা

পর্য্যন্ত।…গোলাপগাছটায় আজ বড় বড় তিনটে ফুল ফুটেছে…দেখবেন, আসুন!

তর্কে আলোচনায় যোগ পূরবী দেয় না, স্বভাবতই সে স্বল্পভাষী, কিন্তু বাগানের কথায় উৎসাহ যেন তাহার চোখে-মুখে ফুটিয়া ওঠে। শেষরাত্রে ঘুম ফেলিয়া তাহার সঙ্গে ঘুরিয়া বাগান দেখার প্রস্তাবটা প্রদ্যোত সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না, তাই পরে দেখিবে বলিয়া অসমাপ্ত নিদ্রাটা শেষ করিবার নাম করিয়া পুনরায় গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে। কিন্তু ঘুম বড় অভিমানী, একবার অবহেলা করিলে অনেক সাধ্যসাধনায়ও ফিরিতে চাহে না। প্রদ্যোত চক্ষু বুজিয়া পূরবীর বিশেষত্বগুলির কথা চিন্তা করিতে লাগিল। কেমন সহজ ভাবে চোখের দিকে তাকাইয়া মেয়েটি কথা বলে, ঘন ঘন দৃষ্টি নত করিয়া একটা কিছু ঘনাইয়া তুলিবার চেষ্টা সে করে না। তাহার চেহারায় ও চালচলনে আকর্ষণের শক্তি আছে, কিন্তু আবেদনের দৈন্য নাই। ভ্রাতার নির্লিপ্ততার ফাঁকটাকে পূরণ করিতে অত্যন্ত লিপ্ত থাকিতে হয় তাহাকে বাস্তব ব্যাপারে, তাই বোধ হয় মনের আকাশে রং ফলাইবার অবসর সে পায় না। হয়ত ইহাও হইতে পারে বয়স তাহার মনকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আরও কত কি হইতে পারে ভাবিতে গিয়া সাহিত্যিক মন তাহার বহুদূর অগ্রসর হইয়া গেল। চিন্তার জগতে বহু প্রকার ঘটনার মধ্য দিয়া সে এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিল যখন এই পূরবীর মনই বয়সকে পশ্চাতে ফেলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া। ভাবিতে তাহার মন্দ লাগিল না।

বেশী দিন নিরুপদ্রবে দিন কাটানো প্রদ্যোতের পক্ষে সম্ভব হইল না। ইতিমধ্যে পুরাতন পাওনাদার দু-এক জন আসিয়া নূতন বাড়ীতে হানা দিতে লাগিল। নূতন রান্নাঘর তৈরি হইতেছে, পূরবী ঘন ঘন আসে কাজের তদ্বির করিতে। এই ঘরতৈরি ব্যাপারটার উপর সে বেশ সন্তুষ্ট ছিল, কিন্তু সম্প্রতি মনে করিতে লাগিল ইহার উল্লেখ না করিলেই ছিল ভাল। কাজটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই লোকগুলি আসা-যাওয়া সুরু করিয়াছে বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত দোষী করিল সে নিজের ভাগ্যকে।

পাওনাদারকে কিছু না দিয়া বিদায় করা অসম্ভব, আর কিছু না হউক অন্ততঃ তারিখ একটা দিতেই হয়। ঘরে বসিয়া চুপি চুপি বুঝাইয়া শুনাইয়া এক এক জনকে এক-একটি তারিখ দিয়া সে বিদায় করিতে লাগিল। গোপন করিবার গরজ তাহার, পাওনাদারদের মধ্যে অনেকেরই বরং একটা অদ্ভুত অভ্যাস থাকে উচ্চৈঃস্বরে চিন্তা করিবার—যাহা অভিনয়ের বাহিরে আর কোথাও দেখা যায় না; পাওনা-দেনার ইতিহাসটা বলিতে বলিতে চলিতে থাকে। তাই সদর পার না-হওয়া পর্য্যন্ত প্রদ্যোত স্বস্তি বোধ করে না। দারিদ্র্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ সে করে না, কিন্তু ঘটনার দ্বারা কর্কশ-ভাবে দরিদ্র প্রমাণিত হইতে গেলেও তাহার সম্মানে বাধে। অপমানের লজ্জা এড়াইতে গিয়া সে নিজেই নিজের কাছে লজ্জিত হইয়া পড়ে।

এক দিন মুদি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পাওনার মাত্রাটা একটু অধিক তাই বাধ্য হইয়াই প্রদ্যোত সাম্যবাদী হইয়া ওঠে, একটা চেয়ার দেখাইয়া দেয় বসিবার জন্য। লোকটার কথাবার্ত্তা ভারিক্কি ধরণের, ভদ্র হইবার একটা বিশেষ চেষ্টা আছে। বিড়ি টানিতে টানিতে কুশল-প্রশ্ন করিয়া সে কথা আরম্ভ করিল। বলিল—আমার টাকাটার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিন, অনেক দিন হয়ে গেল যে। একবারে না হয়, কিছু কিছু ক'রেও ত দিতে পারেন। আপনি এক জন গ্র্যাজুয়েট, আপনাকে কি আর বলব, বুঝতেই ত পারেন, কতটা অসুবিধায় পড়তে হয় দরকারের সময় টাকা-পয়সা না পেলে।

গ্র্যাজুয়েট কথাটা সে যে ইংরেজী বলিবার জন্যেই স্থানে-অস্থানে ব্যবহার করে প্রদ্যোত তাহা জানে। প্রয়োজন-মত টাকা-পয়সা না পাইলে কতটা অসুবিধায় পড়িতে হয় বুঝিবার জন্য গ্র্যাজুয়েট হইতে হয় না, কিন্তু গ্র্যাজুয়েট হইলে প্রতিপদেই তাহা বুঝিতে হয় সে-কথা সত্য। বক্তার অজ্ঞাতে কথাটার সত্যতা প্রদ্যোত উপলব্ধি করে। ইহাকেও একটা তারিখ দেওয়া দরকার, প্রদ্যোত বলিল—আসছে রোববার এস, সেদিন…

—হ্যাঁ, সেদিন আর ঘোরাবেন না। আমি আবার

পড়েছি এক ফ্যাসাদে, এখন কিছু না পেলে আমার চলবে না। তারিখ ত আপনি···

হঠাৎ কাছেই পূরবীর গলা শুনিয়া প্রদ্যোত অন্য কথা পাড়িবার জন্য প্রশ্ন করিল—কি এক ফ্যাসাদে পড়েছ· বলছিলে ?

লোকটি থামিয়া কহিল—সে আর বলবেন না···ধরুন, আপনি চেক দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা নিলেন, সেই চেক তিন তিন বার ফেরত এল ব্যাঙ্ক থেকে···এটা জোচ্চুরি নয় ?···

লোকটি যে কাহাকেও উপলক্ষ্য না ধরিয়া কথা বলিতে পারে না, এবং এরূপ দ্বিতীয় পুরুষে কথা বলিতে সুরু করিয়া দিবে প্রদ্যোতের জানা ছিল না। অন্যের কথা, তাই গলা খাটো করিবারও প্রয়োজন বোধ করে নাই। টাকার শোকটা নূতন করিয়া অনুভব করিতেই অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ভদ্রলোক হয়ে এত বড় জোচ্চুরি করবেন আর আমি চুপ ক'রে থাকব···গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় করব না···

ফ্যাসাদের খবর লইতে গিয়া প্রদ্যোত নিজেই মস্ত ফ্যাসাদে পড়িল। ব্যাপার কি জানিবার জন্যই বোধ হয় পূরবী দরজার সামনে দিয়া হাঁটিয়া গেল। তাহাকে দেখিবামাত্র প্রদ্যোত ব্যাপারটা যে নিজের সম্বন্ধে নয় বুঝাইয়া দিবার জন্য জোর গলায় বলিয়া উঠিল—লোকটাকে ধরে এনে ইয়ে কর না···

কি করিবে জানিবার জন্য লোকটি প্রদ্যোতের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। প্রদ্যোতের উদ্দেশ্য ভিন্ন, সে কিছু ভাবিয়া বলে নাই ; আচ্ছা করিয়া শিক্ষা দিয়া দিতে বলিয়া কথাটা সে শেষ করিয়া দেয়। মুদি তারিখ লইয়া চলিয়া গেলে সে আসিয়া বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল সদর-দরজায় দাঁড়াইয়া পূরবী লোকটির সঙ্গে কথা বলিতেছে। প্রদ্যোত সরিয়া আসিল। পূরবীর এ-প্রকার কৌতূহল দেখিয়া প্রথমটায় অসন্তুষ্ট হইল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভাড়াটের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে বাড়ীওয়ালার তরফ হইতে খোঁজখবর লওয়াটা সে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারিল না। সেদিন সন্ধ্যায় প্রদ্যোতের কানে যে-কয়টি কথা আসিয়া পৌঁছিল তাহাতে গোপন করা এবং খবর নেওয়া সমস্যাকে চুকাইয়া দিয়া ব্যাপারটা যে চরমে গিয়া পৌঁছিল বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। আপিস-ফেরত সে নিখিলবাবুর ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবে এমন সময় ভূতপূর্ব্ব বাড়ী-ওয়ালার গলা শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সে বলিতেছে—জোচ্চোর মশায়, আমার কতকগুলো টাকা মেরে দিয়ে পালিয়ে এসেছে···

নিখিলবাবু কহিলেন—ভদ্রলোকের সম্বন্ধে ভদ্রভাবে কথা বলুন। দেনা যখন রয়েছে সুবিধা-মত পরিশোধ উনি করবেনই।

—আর করেছে···ভারি একটা কাগজ লিখে দিয়েছে, সে ধুয়ে আমি জল খাব···

—এই না বলছিলেন পালিয়ে এসেছে···

—ঐ-ই হ'ল···

প্রদ্যোত আর দাঁড়াইল না, বরাবর নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া তক্তপোষের উপর হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল।

নিখিলবাবু বা পূরবীর ব্যবহারে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করিবার মত যুক্তিসঙ্গত কারণ যদিও প্রদ্যোত খুঁজিয়া পায় নাই তথাপি সেদিনের পর হইতে সে নিখিলবাবুকে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতে লাগিল। পাছে নিখিলবাবুর সঙ্গে হৃদ্যতাটা তাহার দিক দিয়া পূরবী উদ্দেশ্যমূলক মনে করে, সে-লজ্জায় সান্ধ্য বৈঠকে যোগ দিবার সময়টা সে বাড়ী ফেরাই বন্ধ করিয়া দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে তাহাকে অশেষ চিন্তায় ফেলিয়া মাস শেষ হইয়া গেল। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল এ-মাসের ভাড়াটা যে করিয়াই হউক সময়-মত সংগ্রহ করিবে, কিন্তু দিন-তিন হয় তারিখ পার হইয়া গিয়াছে, আজ পর্য্যন্তও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এদিকে কাগজের সম্পাদক আদেশ করিয়াছেন পরের সংখ্যার জন্য একটা গল্প লিখিয়া ফেলিতে, কিন্তু লিখিবার মত কোন কিছুই তাহার মাথায় আসিতেছিল না। দিনও বেশী নাই, সে কাগজ টানিয়া লিখিতে বসিয়া গেল। কিন্তু বিপদের কথা হইল এই যে, ফাউন্টেন-পেন উপুড়

করিলেই কাঁলি বাহির হয় কিন্তু কাগজের উপর মাথা উপুড় করিলেই গল্পের প্লট বাহির হয় না। কিছু দিন যাবৎ তাহার দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলি তালগোল পাকাইয়া মাথার মধ্যে এমন শক্ত হইয়া বাসা বাঁধিয়াছে যে অন্য কোন চিন্তাই সেখানে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। চিন্তার জগতে নূতন কোন ঘটনার সৃষ্টি করা উপস্থিত তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না বুঝিতে পারিয়া প্রদ্যোত তাহার নিজের ঘটনাগুলিকে অবলম্বন করিয়াই লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

গল্পের নায়ক উৎপল—সে নিজে, নায়িকা মীরা হইল পূরবী। উৎপল বে-হিসাবী আত্মভোলা সাহিত্যিক। যদিও দেনার দায়ে কিনিয়া লইবার মত সম্পত্তি বা ঔষধের দোকানে যেমন-তেমন একটা চাকুরী করিয়া চারি শত টাকা অর্জ্জন করিবার মত বিদেশার্জ্জিত শিক্ষা উৎপলের নাই, তথাপি মস্তবড় বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী মীরা তাহার এই নূতন ভাড়াটিয়াটিকে ভালবাসিয়া ফেলিল। ভালবাসিল অভাবের অন্তরালে তাহার ভাবের আতিশয্য দেখিয়া, ভালবাসিল তাহার নূতন ধরণের কথাবার্ত্তা শুনিয়া।

এটুকুকেই অনেক ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া সে চার-পাঁচ পাতা লিখিয়া ফেলিল। মনের মত ভাবনা আপন ঝোঁকে গড়াইয়া চলে, প্রদ্যোত লিখিয়া চলিল। সে দেখাইল, মীরা অত্যন্ত গম্ভীর ও চাপা-স্বভাবের মেয়ে, উৎপলকে তাহার মনের অবস্থা কিছুতেই টের পাইতে দেয় না। সাহিত্য-সাধনায় বিঘ্ন ঘটায় বলিয়া পাওনাদার-দের গোপনে ডাকিয়া দেনা চুকাইয়া দেয়। এক পাওনাদারের সঙ্গে মীরাকে কথা বলিতে দেখিয়া অসঙ্গত কৌতূহলের জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া উৎপল জানাইয়া দেয় সে বাড়ী ছাড়িয়া দিবে। মীরা জানে উৎপল টাকা দিতে পারিবে না, তাই একটু কৌতুক করিবার জন্য বলিয়া পাঠায় যে ভাড়া না দিলে সে জিনিষ আটক করিবে। অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উৎপল তাহার প্যাকিং বাক্সের-তৈরি আসবাব ফেলিয়া কোথায় যে উধাও হইয়া যায়, দিন দুই-তিন আর তাহার পাত্তাই মেলে না। মীরা অতিমাত্রায় চিন্তিত হইয়া খোঁজ লইতে থাকে। হঠাৎ এক রাত্রে ঘরে আলো দেখিয়া ছুটিয়া সে উৎপলের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। কাগজ-বিছান নড়বড়ে টেবিলটার উপর ঝুঁকিয়া উৎপল গল্প লিখিতেছিল, মীরাকে দেখিয়া বলিয়া ওঠে, আমি পালাই নি, কালকেই আপনার ভাড়া দিয়ে উঠে যাব···ভাবনা নেই। মীরার চোখ সিক্ত হইয়া ওঠে, গোপন করিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া জবাব দেয়, সেটা কি কম ভাবনার কথা হ'ল!···ক'দিন ছিলেন কোথায়? উৎপল রুক্ষস্বরে বলে, ভাড়ার খোঁজ নিতে এসেছেন তাই নিন, আমার খোঁজে কি হবে। মীরা মুখ ফিরাইতেই তাহার চোখের দিকে চাহিয়া উৎপল স্তব্ধ হইয়া যায়; সে-চোখে যে-দাবী ফুটিয়া ওঠে সেটা অর্থের নয়। মীরা চকিতে পিছন ফিরিয়া চলিতে চলিতে বলিয়া যায়, আমার ভাড়ার ভাবনা না ভেবে, নিজের লেখার ভাবনা ভাবুন, কাজে আসবে।···

মা আসিয়া আপিসের সময় সম্বন্ধে স্মরণ করাইয়া দিতেই প্রদ্যোত লেখা বন্ধ করিল। আপিস হইতে আজ কিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্তির আশা আছে, তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। সন্ধ্যায় অর্থের দুশ্চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে গল্পের বাকীটুকু চিন্তা করিতে করিতে সে বাড়ী ফিরিল। এক কাপ চা লইয়া টেবিলের সামনে বসিয়া সে স্থির করিতে চেষ্টা করিল এখন লিখিতে বসা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে কিনা। প্রতি মুহূর্ত্তে সে পূরবীর আগমন আশঙ্কা করিতেছিল। আজ আসিয়া উপস্থিত হইলে কি বলিয়া সে সময় চাহিবে। তাহার সম্পর্কে যে-ইতিহাস উহারা শুনিয়াছে তাহার পরে কোন অজুহাতই মুখরক্ষার পক্ষে কার্য্যকরী হইবে বলিয়া মনে হইল না। অসমাপ্ত গল্পটা টেবিলের উপরেই পড়িয়া ছিল, অন্যমনস্কভাবে সেটাকে টানিতেই তাহার নীচে হইতে এক খণ্ড টিকিট-আঁটা কাগজ বাহির হইয়া পড়িল। উপরকার লেখা পড়িয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, কাগজখানা তাহার গত মাসের প্রাপ্ত ভাড়ার রসিদ। তাহার লেখার তলায় এ রসিদ কে রাখিল··· কেনই বা রাখিল! মা'র কাছ হইতে প্রদ্যোত এইটুকু

মাত্র তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিল যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে পূরবীকে তিনি তাহার ঘরে দেখিয়াছেন।

সম্মুখে টেবিলের উপর লেখাটা পড়িয়া আছে, রসিদটা হাতে লইয়া প্রদ্যোত সেদিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইল গল্পই শেষ পর্য্যন্ত সত্য হইতে চলিয়াছে। গল্পটা পড়িয়া পূরবী কি মনে করিতে পারে সে ভাবিতে চেষ্টা করিল। ভাবিতে গিয়া হঠাৎ মনে হইল এও কি সম্ভব যে এত দিনের ভিতরে সে একটু আভাস পর্য্যন্ত পাইল না। তাহার সম্পর্কে দুর্ব্বলতা যদি পূরবীর থাকিয়াই থাকে, অকস্মাৎ এতটা স্পষ্টভাবে সে যে তাহা স্বীকার করিয়া বসিবে, তাহার মন বিশ্বাস করিতে চাহিল না। হয়ত তাহার এই গল্প পড়িয়া দয়াপরবশ হইয়া পূরবী এটা দান করিয়া গিয়াছে।···অন্যায় স্পর্দ্ধা, এ-দান সে কিছুতেই গ্রহণ করিবে না। তাহার গল্পের নায়ককে সে প্রেমের দানের সম্মুখে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহাকে দিয়া কি করাইবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না; এমন সময় নিজে আসিয়া পড়িল এমন এক দানের সম্মুখে যাহা জটিলতায় গল্পকেও ছাড়াইয়া গেল।···প্রদ্যোত স্থির করিল আজ রাত্রেই সে পূরবীর সঙ্গে দেখা করিবে।

যে ব্যক্তিটিকে লইয়া প্রদ্যোত এতটা দুর্ভাবনায় পড়িয়াছে সেই পূরবীই তাহার চিন্তাধারায় বাধা দিয়া দরজায় দাঁড়াইল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া দ্বিধার সঙ্গে বলিল—বিকেলে এসেছিলাম একবার, আপনাকে পাই নি;···রিসিটটা ফেলে গেছি ভুলে।···ভাড়াটা কি আজ দেবেন?

প্রদ্যোত গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করিল—আছি কি-না জানতে এসে এত বড় একটা ভুল হ'ল কি করে?

পূরবীর চোখে মুখে লজ্জার ভাব এই সে প্রথম দেখিল। পূরবী তাহার দিকে না চাহিয়া অন্য দিকে চোখ রাখিয়াই জবাব দিল—নীচে রেখে গল্পটা পড়ছিলাম···যাবার মুখে···

—কারুর লেখা পড়তে অনুমতির অপেক্ষা রাখা উচিত নয় কি?

—গল্প ত দশ জনে পড়বার জন্যেই লেখা হয়···

—ছাপিয়ে বার করা হয়, লেখা না-ও বা হ'তে পারে।···ভাড়াটা আজই চাই কি?

গল্পটা না পড়িলে হয়ত হইত, কিন্তু এখন প্রদ্যোতের অবস্থার অনুকূল কোন কথাই পূরবীর মুখ দিয়া বাহির হইল না। সে কহিল—কাল ট্যাক্স দেবার শেষ দিন কি না!···

নিজে হাতে লেখা গল্পের শেষ লাইনটা প্রদ্যোতের চোখে পড়িল, "আমার ভাড়ার ভাবনা না ভেবে নিজের লেখার ভাবনা ভাবুন, কাজে আসবে।" প্রদ্যোত দস্তুর-মত লজ্জা ও অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। পূরবী গল্পটা পড়িয়াছে; সে গল্পকে গল্প হিসাবে গ্রহণ না করিয়া হয়ত প্রদ্যোতের মনের সত্যিকারের কামনা হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছে। সে কেমন করিয়া পূরবীকে এখন বুঝাইবে এ তাহার মনের কামনা নহে, চিন্তার বিলাস। কতকগুলি সম্ভাবনাকে পূরবীর মনের সম্মুখে ধরিয়া দিবার উদ্দেশ্য লইয়া এ গল্প সে লিখিতে সুরু করে নাই। প্রদ্যোতের সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল অসমাপ্ত গল্পটার উপর, তাহার ইচ্ছা হইল লেখাটাকে টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে।

ইহার পর ভাড়া চুকাইয়া দেওয়া ছাড়া সে-সম্পর্কে আর কোন কিছু বলাই প্রদ্যোতের কাছে সম্ভবপর বলিয়া মনে হইল না। অফিস হইতে মোট কুড়িটি টাকাই সে আনিয়াছিল, বিনা বাক্যব্যয়ে সবটাই টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। দ্বিধাজড়িত অবস্থায় টাকাটা যখন পূরবী তুলিয়া লয়, প্রদ্যোত হঠাৎ যেন অনুভব করিল একবার বলিয়া ফেলিতে পারিলে কিছু দিন সময় সে অনায়াসেই পাইতে পারিত।

গল্পের মীরা পূরবীর মনে কতটা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে প্রদ্যোত জানে না, কিন্তু ঘর ছাড়িয়া যাইবার মুখে তাহার দৃষ্টি পূরবীর চোখের উপর পড়িতেই পূরবী আজ চোখ নামাইয়া লইল···প্রদ্যোত বুঝিল—এটুকু তাহার গল্পের দান।

লেখাটা প্রদ্যোত ছিঁড়িল না, হাতের কাছে টানিয়া পুনরায় লিখিতে বসিয়া গেল।

আলোচনা

পূর্ণানন্দের জন্মস্থান

১

মাঘ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় তাঁহার "চিন্ময় বঙ্গ" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষাংশে পূর্ণানন্দের জন্মস্থান রাজশাহী জেলায় বলিয়া একটি প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছেন। 'শাক্তক্রম' ও 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি' প্রণেতা পূর্ণানন্দ গিরির বাড়ী ময়মনসিংহ জেলায় নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত কাটিহালী গ্রামে। তাঁহার বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান। 'সৌরভ' পত্রে পূর্ণানন্দের বিস্তৃত জীবনী মুদ্রিত হইয়াছে। কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত ময়মনসিংহ-বিবরণের প্রথম সংস্করণ দেখিলেও পারিবেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার

২

কোনও ভ্রম থাকিলে তাহা শুদ্ধ করাই উচিত। এজন্য যাঁহারা সহায়তা করেন তাঁহারা সকলেই কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাই নরেন্দ্রবাবুকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমার লেখাতে পূর্ব্বে কাটিহালীই ছিল। কারণ বাল্যকাল হইতে আমরা পূর্ণানন্দের জন্মস্থান কাটিহালীই জানি। প্রচলিত সব পুস্তকেও তাহাই পাই। আমরাও জানিতাম রাঢ়ের পাকড়াশী-গ্রামবাসী অনন্তাচার্য্যের বংশধারায় বশিষ্ঠাচার্য্য, বনমালী, চক্রপাণি, শূলপাণি, বাচস্পতি রঘুনাথ, আচার্য্য পুরন্দরের পর জগদানন্দের জন্ম। সিদ্ধিলাভের পর তাঁহার নাম হইল পূর্ণানন্দ।

অনন্তাচার্য্য রাঢ়দেশ হইতে আসিয়া ময়মনসিংহ কাটিহালী গ্রামে বাস করেন। সেই বংশে ষোড়শ শতাব্দীতে জগদানন্দের অথবা পরমহংস পূর্ণানন্দের জন্ম। তাঁহার সময় হইতে এখন বার বা তের পুরুষ হইয়াছে। তাঁহার গুরু ছিলেন পরমহংস ব্রহ্মানন্দ গিরি। তাঁহার সাধনার কথা স্বর্গীয় উডরফ সাহেব তাঁহার 'শক্তি ও শাক্ত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন। শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ও তাঁহার 'শ্রীতত্ত্ব চিন্তামণি'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন, কাটিহালীই তাঁহার জন্মস্থান। গত ১৪ই ভাদ্র তারিখে গৌরীপুরের সংস্কৃতশালার অধ্যাপক, পূর্ণানন্দ-বংশীয় শ্রীযুত হরেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ও দয়া করিয়া আমাকে আরও অনেক খবর দিয়াছেন। তাঁহার মতেও অনন্তাচার্য্য রাঢ় হইতে আসিয়া কাটিহালীতে বাস করেন এবং তাঁহার সপ্তম পুরুষে জগদানন্দ বা পূর্ণানন্দ কাটিহালীতে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি বলেন, ষোড়শ শতাব্দীর "অতি প্রথম ভাগে" পূর্ণানন্দের জন্ম। কিন্তু তাঁহার 'শাক্তক্রম' যদি ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে এবং 'শ্রীতত্ত্ব-চিন্তামণি' যদি ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়া থাকে তবে তাঁহার জন্ম হয়ত আর কিছু পরে হইয়াছে, অথবা রীতিমত বৃদ্ধ বয়সে তিনি ঐ দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বৃহৎ বঙ্গে' পূর্ণানন্দের কোনও উল্লেখ করেন নাই। 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী' গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে (৩৭০ পৃ.) শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ও লিখিয়াছেন যে পূর্ণানন্দ কাটিহালীতে জন্মগ্রহণ করেন।

এই সব কারণে আমি আমার লেখাতে কাটিহালীই তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া প্রথমে লিখি। পরে আমার নজরে পড়িল গোরক্ষপুর "কল্যাণ" কার্য্যালয় হইতে যে "সন্ত সংখ্যা" ১৯৯৪ সংবৎ শ্রাবণ মাসে বাহির হইয়াছে তাহাতে পণ্ডিত শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় "শাক্ত সংত" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "পূর্ণানন্দ রাজসাহী জিলেকে বারীন্দ্র ব্রাহ্মণ থে।" (৫৪১ পৃ. দ্বিতীয় স্তম্ভ)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিক উৎসবের উপলক্ষ্যে যে *Cultural Heritage of India* তিন খণ্ড বাহির হইয়াছে তাহার দ্বিতীয় খণ্ডে Sakti Worship and Sakta Saints প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় বলেন, "He was a Brahman of the Radhiya section and was born in Rajshahi" (p. 294).

পূর্ণানন্দ রাঢ়ীয় কি বারেন্দ্র তাহা লইয়া তাঁহার নিজেরই মতভেদ থাকিলেও রাজসাহী সম্বন্ধে তিনি এক কথাই বলেন। চক্রবর্তী মহাশয় অতিশয় ধীর ও পণ্ডিত বিচারক। তাঁহার এই কথায় আমার সংশয় জন্মিল। আরও ভাবিলাম, যদি তাঁহার কথা আপত্তিকর হয় তবে পূর্ণানন্দ-বংশীয় এত সব কৃতবিদ্য পণ্ডিত লোক তাঁহারা দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখার পরও এত কাল চুপ করিয়া আছেন কেন? তাই আমার লেখা কাগজের "কাটিহালী" কাটিয়া প্রবাসীতে পাঠাইবার সময় "রাজসাহী" করিলাম। ভাবিলাম, যদি ভুল হয় তবে এই সূত্রে কাহারও-না-কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে ক্রমে যাহা ঠিক তাহাই প্রতিষ্ঠিত হইবে। দেখিলাম, হইলও তাই।

আমার বিষয়, বাঙালীর যে-চিন্ময় দান বাংলার সীমা ছাড়াইয়া বাহিরে গিয়াছে তাহার উল্লেখ করা। পূর্ণানন্দ যে-জেলারই হউন, তিনি আমাদের ঘরের মানুষ। তাই আমি শান্তভাবে এই সত্যনির্ণয়ের জন্য প্রতীক্ষা করিতে পারি। তাঁহার বঙ্গীয়ত্ব বিষয়ে ত কোন সংশয় নাই? তবেই হইল। শ্রীমৎ পূর্ণানন্দের বিস্তৃত জীবনী যে বাহির হইতেছে তাহাও নরেন্দ্রবাবুর পত্রে জানিলাম। "চিন্ময় বঙ্গে"র জন্য তাঁহার জন্ম-জেলার সঠিক খবরের প্রয়োজন না-ও থাকিতে পারে, কিন্তু বাঙালীর পক্ষে তাঁহার জীবনী ও সাধনার কথা জানিবার প্রয়োজন আছে।

শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের এই কথাটি যদিবা ঠিক না-ও হয় তবু তাহাতে তাঁহার কাছে আমাদের ঋণ একটুও কমিবে

না। তিনি বাংলার দর্শন ও সংস্কৃত গ্রন্থ, বৈষ্ণব শাস্ত্র ও ভক্ত, তান্ত্রিক শাস্ত্র ও ভক্ত প্রভৃতি বিষয়ে এত সব সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং এত পরিশ্রম ও ধৈর্য্য সহকারে সে-সব রচনা করিয়াছেন যে দুই-একটা ভুল-ভ্রান্তিতে তাহার মূল্য একটুও কমিবে না।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

"ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিকাশ"

গত বর্ষের ফাল্গুন মাসের প্রবাসীর আলোচনা-বিভাগে ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ছয়টি প্রশ্ন উত্থাপিত করা হইয়াছে। সংক্ষেপে সেগুলির উত্তর দেওয়া যাইতেছে।

প্রথম প্রশ্ন—একটা বিশাল সূর্য্য আমাদের সূর্য্যের নিকটে আসিয়া তাহা হইতে একটা পর্ব্বতাকার জড়পিণ্ড টানিয়া বাহির করিতে পারিল, আর সেটাকে লইয়া যাইতে পারিল না ?

পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতাকার জড়পিণ্ডকে আমাদের সূর্য্য ও নবাগত সূর্য্য উভয়েই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। যে-স্থানে নবাগত সূর্য্যের প্রভাব আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা প্রবলতর ঐ জড়পিণ্ড সেখানে গিয়া পড়িলে অবশ্যই নবাগত সৌরপরিবারভুক্ত হইয়া তাহার সহিতই অন্তর্হিত হইত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—সেইরূপ জড়পিণ্ড অন্যের টানে যাহা হইতে বাহির হইল আবার তাহারই চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল, এরূপ কি হইতে পারে ?

শূন্যে অবস্থিত জড়পিণ্ড আমাদের সূর্য্য হইতে বাহির হউক, অথবা নবাগত সূর্য্যেরই বিচ্ছিন্ন অংশ হউক, অথবা দূরাকাশ হইতে আগত পৃথক জড়পদার্থই হউক, গতি-বিজ্ঞান অনুসারে সমস্যা সমাধান করিতে গেলে সে-কথা একেবারে অবান্তর। এক্ষেত্রে মাত্র জানা আবশ্যক—কোনও নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে ঐ জড়পিণ্ডের অবস্থান, গতি ও জড়ত্বের পরিমাণ এবং উহার উপর প্রযুক্ত আকর্ষণের পরিমাণ ও দিক। এক টুকরা পাথরকে যদি দড়ির এক দিকে বাঁধিয়া অপর দিক ধরিয়া ঘুরাই, তখন কি হয় ? দড়িতে টান পড়ে। এক্ষেত্রেও তাহাই—পর্ব্বতাকার জড়পিণ্ডটাই প্রস্তরখণ্ডের স্থান অধিকার করিয়াছে, দড়িটা অদৃশ্য, আর সেই অদৃশ্য রজ্জুর অপর প্রান্ত ধরিয়া রাখিয়াছে আমাদের সূর্য্য। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা আবশ্যক। যদি ঐ বিচ্ছিন্ন অংশ ঠিক ঊর্দ্ধ দিকে অর্থাৎ সূর্য্যপৃষ্ঠের লম্বাভিমুখে উৎক্ষিপ্ত হইত, তবে তাহা আবার পূর্ব্বস্থানেই পতিত হইত, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিত না। ঐ জড়পিণ্ড সূর্য্যপৃষ্ঠ হইতে তির্য্যগ্‌ভাবে নবাগত সূর্য্যের টানে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই আবার সূর্য্যপৃষ্ঠে পতিত হয় নাই, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্ন—যে-টানে বাহির হইল সে-টানটা কি হইল ? তাহার আর কোনও শক্তি থাকিল না কেন ?

দুইটা বস্তুর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের পরিমাণ তাহাদের পরস্পর হইতে দূরত্বের বর্গের বিপরীত অনুপাতে—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। অর্থাৎ দূরত্বটা যদি দ্বিগুণ হয়, তবে আকর্ষণ হইবে এক-চতুর্থাংশ; দূরত্বটা যদি তিন গুণ হয় তবে আকর্ষণটা হইবে এক-নবমাংস; দূরত্বটা যদি চার গুণ হয় তবে আকর্ষণ হইবে এক-ষোড়শাংশ ইত্যাদি। সুতরাং যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে সেই অতীত যুগের আগন্তুক সূর্য্য তৎকালীন দূরত্বের কোটি গুণ দূরে আজ চলিয়া গিয়াছে, তবে যে-টানে পর্ব্বতাকার জড়পিণ্ড বাহির হইয়াছিল তাহা এখন নিজের কোটি অংশের কোটি অংশে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা অনুভবযোগ্য নয়।

পঞ্চম প্রশ্ন—আবার ঐ বিচ্ছিন্ন জড়পিণ্ডটা কাহার মাধ্যাকর্ষণে কিরূপ ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া আমাদের সূর্য্যকেই প্রদক্ষিণ করিতেছে এই বা কি কথা ?

যে-কারণেই হউক সেই জড়পিণ্ড যদি ক্ষুদ্রতর বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়, প্রত্যেক খণ্ডের বেলায় দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে প্রদর্শিত যুক্তি খাটে। আমাদের সূর্য্য অদৃশ্য রজ্জুর এক প্রান্ত ধরিয়া অপর প্রান্তস্থিত ক্ষুদ্রতর খণ্ডটিকে ঘুরাইতেছে। মাধ্যাকর্ষণ বিশ্বব্যাপী। ইহার নিয়ম এই—ব্রহ্মাণ্ডের যে-কোন দুই জড়কণা লওয়া যাউক না কেন, তাহারা পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে আর সেই আকর্ষণের পরিমাণ তাহাদের দূরত্বের বর্গের বিপরীত অনুপাতানুযায়ী। সুতরাং পরমাণুসকল যত নিকটবর্ত্তী হইবে তাহাদের পরস্পরের উপর আকর্ষণও তত বেশী হইবে এবং যত দূরবর্ত্তী হইবে আকর্ষণও তত কম হইবে। এখন ঐ বিচ্ছিন্ন জড়পিণ্ডের উপরিস্থিত কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট অণুর ভাগ্যে কি ঘটিবে দেখা যাউক। ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণুই ঐ নির্দ্দিষ্ট অণুকে আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু যে অণুসমষ্টিতে ঐ বিচ্ছিন্ন জড়পিণ্ড গঠিত, তাহাদের সম্মিলিত আকর্ষণের তুলনায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অণুসমষ্টির আকর্ষণও নগণ্য। সুতরাং কেবলমাত্র ঐ জড়পিণ্ডের মাধ্যাকর্ষণে ঐ নির্দ্দিষ্ট অণুর ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বলা যাইতে পারে—যদিও মাধ্যাকর্ষণ বিশ্বব্যাপী। আবার যদি ঐ অণুর নিকটে যে-কোন কারণেই হউক কতকগুলি অণু ঘনসন্নিবিষ্ট হয়, তবে সংখ্যাধিক্যবশতঃ তাহাদের আকর্ষণও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট অণুকে নিজেদের দলে টানিয়া দলপুষ্টি করিবে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দলের জয়-পরাজয়ের ফলে উক্ত জড়পিণ্ড পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত হইবে। প্রকৃতপক্ষে পারিপার্শ্বিক অণুসমূহের মাধ্যাকর্ষণের তারতম্যজনিত এই অব্যবস্থিত ভাব বা Gravitational instabilityই ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিকাশের মূল কারণ। প্রাথমিক পরমাণুপুঞ্জ হইতে নীহারিকা, নীহারিকা হইতে তারা, তারা হইতে গ্রহ, গ্রহ হইতে উপগ্রহ এইরূপেই সৃষ্ট হইয়াছে।

ষষ্ঠ প্রশ্ন—একটা বিচ্ছিন্ন জড়পিণ্ড সূর্য্য হইতে সমদূরে··· আমাদের সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিতেছে, ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ?

শুধু তত্ত্বের (theory) দিক দিয়া গণিতশাস্ত্রানুসারে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এক বাষ্পীয় সূর্য্যের আকর্ষণে অপর বাষ্পীয় সূর্য্য হইতে জড়পিণ্ড বিচ্ছিন্ন হইতে পারে এবং অবস্থা-বিশেষে ঐ বিচ্ছিন্ন অংশ পুনরায় পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত হয়।

গণিতের এই সমস্যার বিষয়ীভূত জড়পিণ্ডের ঘনত্ব ও উহার অণুসকলের গতিবেগ অসঙ্গতরূপে বেশী বা কম না ধরিয়া পৃথক পৃথক অংশের জড়ত্বের পরিমাণফল নির্ণীত হইয়াছে। উহা আমাদের গ্রহসকলের প্রকৃত জড় পরিমাণের সঙ্গে তুলনীয়। গণিতশাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত 'ইহা কিরূপে সম্ভব হয়' আলোচনা করা যায় না। J. H. Jeans প্রণীত *Problems of Cosmogony and Stellar Dynamics* এবং *Astronomy and Cosmogony* নামক দুইখানি পুস্তকে ইহার আলোচনা আছে।

আলোচনায় উল্লিখিত হইয়াছে গ্রহগুলি পর পর সমদূরে অবস্থিত; বস্তুত তাহা নহে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন হালদার

আনন্দময় জগৎ

শ্রীপরিমল গোস্বামী

পৃথিবীতে দুই দল লোক আছে। এক দল বলে, জগৎটা আনন্দময়, অপর দলের মতে জগৎটা দুঃখে পূর্ণ। কথায়ও বলে, আনন্দবাদী ষ্টীম বয়লার আবিষ্কার করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সেফ্‌টি ভালভ্‌ লাগাইয়াছিল দুঃখবাদী। দল যে দুইটি, ইহা তাহার একটি প্রমাণ।

আমি ছিলাম দুঃখবাদীর দলে। আমার বিশ্বাস ছিল, মানুষ মানুষের ভাল দেখিতে পারে না, ঈর্ষা এবং পরশ্রীকাতরতার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তাহার বাস, সুতরাং মানুষের নিকট হইতে মানুষের কিছু প্রত্যাশা করিবার নাই।

এরূপ ধারণা অবশ্য সুস্থ মনের ধারণা নহে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে আমার মন সুস্থ ছিল না। তাহার কারণ, আমার স্বাস্থ্যটি ছিল বহুদিন হইতেই খারাপ, এবং ঐ সঙ্গে মনও। বলা বাহুল্য, এই জন্যই দুঃখবাদীর যুক্তিটা আমার মনে সহজে স্থান পাইয়াছিল।

তাহা ছাড়া বাহিরের লোকের মধ্যে নিকটতম সম্পর্ক ছিল আমার শুধু এক চিকিৎসকের সঙ্গে। এই চিকিৎসকের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করিয়া মন আরও খারাপ হইয়া যাইত। তিনি চিকিৎসা বিষয়ে অস্থিরচিত্ত ছিলেন, এবং আমার জন্য এমন সব ব্যবস্থা করিতেন যাহা আমার দীর্ঘকালব্যাপী ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার পক্ষে হয়ত কোন প্রয়োজনই ছিল না। তাঁহার ব্যবস্থামত অ্যালোপ্যাথি ঔষধ খাইয়াছি, হোমিওপ্যাথি ঔষধ খাইয়াছি, এবং শেষ পর্য্যন্ত হাইড্রোপ্যাথি মতে জলে বসিয়া প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়াছি, এবং পেটে মাটি মাখিয়াছি। কিন্তু কোনও ফলই হয় নাই। এই ভাবে আমার বহু অর্থ তিনি জীর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কোনও ঔষধ বা পথ্য আমি জীর্ণ করিতে পারি নাই।

আমরণ হয়ত এই ভাবেই চলিত, কিন্তু এই দীর্ঘ স্বাস্থ্য-সাধনার নিষ্ফলতায় মনে আকস্মিকভাবে এক দিন বৈরাগ্যের উদয় হইল। সেই দিনই চিকিৎসককে বিদায় করিয়া দিয়া স্থির করিলাম, জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটা দিন চিকিৎসকের গণ্ডীর বাহিরে কাটাইব।

কিন্তু বাহিরে আসিয়া দেখি, মুক্তি সেখানেও দুর্লভ। কিন্তু দুর্লভ হইলেও বাহিরে আনন্দ আছে। আনন্দ এই জন্য যে বাহিরের প্রত্যেকটি লোকই চিকিৎসক। এই জ্ঞান লাভ করিয়া এক দিক দিয়া আমার উপকারই হইয়াছে; কারণ জগৎ যে আনন্দময় তাহাও এই সময় হইতেই আমার বিশ্বাস হইয়াছে। বিশ্বাস হইয়াছে—মানুষের নিকট হইতে মানুষের যে কিছু প্রত্যাশা করিবার নাই, ইহা সত্য নহে। বরঞ্চ প্রত্যাশার অতিরিক্ত পাওয়া যায়, এবং না-চাহিতে পাওয়া যায়। একবার যদি কেহ জানিতে পারে কাহারও অসুখ করিয়াছে তাহা হইলে অসুস্থ লোকের আর কোন চিন্তা নাই। চারি দিক হইতে অযাচিত প্রেস্‌ক্রুপশন তাহার হাতে আসিয়া পড়িবে, ইহার জন্য কেহ কোনও মূল্য চাহিবে না।

জগৎ মনুষ্যত্বের এই প্রশস্ত ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে।

ভিত্তি প্রশস্ত এবং জগৎ উদার; এই কথাটি বলিবার জন্যই এতখানি ভূমিকার প্রয়োজন হইল।

আমি যে ডিস্‌পেপসিয়ার রোগী, আশা করি এতক্ষণে তাহা বুঝাইতে পারিয়াছি। কিন্তু ইহার উপর সম্প্রতি হঠাৎ সর্দ্দি লাগিয়াছে। ঔষধের জন্ত কাহার পরামর্শ লইব? অথচ সর্দ্দিটা ভয়ানক কষ্ট দিতেছে। মনে পড়িল কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার সর্দ্দি হইয়া সহজে সারিতেছিল না, সেই সময় ডাক্তার দুধের সঙ্গে দুই ফোঁটা করিয়া টিংচার আইওডিন খাইতে দিয়াছিলেন। সুতরাং সেদিন সান্ধ্যভ্রমণ শেষে কিছু টিংচার আইওডিন কিনিয়া ট্রামে বাড়ী ফিরিতেছিলাম। বোধ করি আমার ভিতরেও একটি ডাক্তার অঙ্কুরিত হইতেছিল।

সেদিন সন্ধ্যার প্রথম হাঁচিটি আত্মপ্রকাশ করিল ট্রামের মধ্যে একটি অপরিচিত বৃদ্ধ লোকের পাশে। আমার জীবন-দর্শন পরিবর্ত্তনের ইহাই সূচনা। হাঁচির সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক আমার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া বলিলেন, "এ যে দেখছি একেবারে কাঁচা সর্দ্দি!—তা মশাই যদি কিছু মনে না-করেন—"

উদ্যত আর একটি হাঁচি সংযত করিয়া জলভরা চোখে তাঁহাকে বলিলাম, "মনে করবার কিছু নেই।"

"না, আছে বইকি, অনেকেই আবার অফেন্স নেয় কি না, তাই অযাচিত কিছু বলতে ভয় হয়।"

"না, আপনি নির্ভয়ে বলুন।"

"কাঁচা সর্দ্দিতে খুব ক'সে ঠাণ্ডা জলে স্নান করুন, সর্দ্দির মূলোচ্ছেদ হয়ে যাবে। মশাই, সর্দ্দি বড় ভয়ানক ব্যায়রাম—ওর চেয়ে মশাই দশ দিন জ্বরে অচৈতন্ত হয়ে থাকা ঢের ভাল।"

কথাগুলি সম্মুখের আসনে উপবিষ্ট এক ভদ্রলোকের কানে গিয়া তাঁহার অন্তরস্থ সুপ্ত চিকিৎসককে জাগ্রত করিল। তিনি ঘাড় ফিরাইয়া বলিলেন, "ঠাণ্ডা জলে কিন্তু আবার বিপদও আছে, চট্ ক'রে সর্দ্দি বুকে ব'সে নিউমোনিয়া পর্য্যন্ত হ'তে পারে।—তার চেয়ে গরম জলে পা ডুবিয়ে রাখায় অনেক উপকার।"

তাঁহার পার্শ্বস্থ ভদ্রলোক এ-কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "গরম জল নয় মশাই, ও সব বড়লোকী ব্যবস্থা। আমাদের মত যারা ট্রামে চলাফেরা করে তারা কি গরম জলের হাঁড়ি পায়ে বেঁধে বেড়াবে?"

"তার মানে?"

"তার মানে নস্যি। নস্যিই হচ্ছে কাঁচা সর্দ্দির সেরা ওষুধ।"

আমার পার্শ্বস্থ বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে জোড়হাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার ঘাট হয়েছে ক্ষমা করুন, আমি আর এর মধ্যে নেই। আগেই ভেবেছিলাম কথা থাকবে না, তবু বলতে গেলাম! যত সব—" বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেদিকে কেহই বিশেষ লক্ষ্য করিল না। কারণ ঠিক এই সময় সকলকে অবাক করিয়া ট্রাম কণ্ডাক্টর বলিয়া উঠিল, "বাবু, গরিবের একটা কথা শোনেন ত বলি।" আমরা সকলেই তাহার দিকে চাহিলাম। সে সবগুলি দাঁত বাহির করিয়া উৎসাহিত ভাবে বলিল, "সর্দ্দির ওষুধ হচ্ছে গরম জিলিপি।" দাঁত তাহার বাহির হইয়াই রহিল।

কিন্তু বিস্ময়ের পর বিস্ময়! কণ্ডাক্টরের পাশে ইন্‌স্পেক্টর দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারও খোলস ভেদ করিয়া বৈদ্য বাহির হইয়া আসিল। আমাদের আলোচনা হঠাৎ তাহার অত্যন্ত ভাল লাগিয়া গেল এবং বলিল, "সর্দ্দির ওষুধ হচ্ছে উপোস।"

কথাটা শুনিয়া কণ্ডাক্টর মহা অপরাধীর মত তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

এই সুযোগে আমার পিছন হইতে এক ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, "সর্দ্দিতে কিন্তু নাকের চেয়েও গলার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত বেশী। তার কারণ হচ্ছে, সর্দ্দি নাক দিয়ে গিয়ে গলা আক্রমণ করে এবং ফলে যে কাসি হয় তা সারতে যুগযুগান্তর কেটে যায়।"

এইবার সম্মুখের আসনের পুস্তক-পাঠরত এক ভদ্রলোকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। এবারে যিনি দেখা দিলেন, তিনি বৈদ্য নহেন, বৈদ্য-নাশন। তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে হঠাৎ একবার পিছনে চাহিয়া বলিলেন, "মশাইরা কেন অনর্থক চেঁচাচ্ছেন, সর্দ্দির কোনো ওষুধ নেই··· আর, কোনো কালে ছিল না···আর, কোনো কালে হবে কি না তাও কেউ বলতে পারে না।"

কথাগুলি বলিয়া তিনি পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে পুস্তকের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। আমার নিকটস্থ প্রতিবেশীরা পরস্পর ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিলেন, এবং মুহূর্ত্তে যেন সকলেই সম বিপদে সম দলস্থ হইলেন। ইহাতে উৎসাহ পাইয়া এক জন বলিলেন, "তা হ'লে মশাইয়ের মতে ওষুধ মাত্রেই মায়া?"

পাঠরত ভদ্রলোকটি পুনরায় ঘাড় ফিরাইয়া বিদ্রূপের সুরে বলিলেন, "যে আজ্ঞে।" এবং হঠাৎ বাহিরে তাকাইয়া বুঝিলেন তিনি প্রায় গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে ইন্‌স্‌পেক্টর নামিয়া গিয়াছে; সুতরাং এই ফাঁকে কণ্ডাক্টর ইন্‌স্‌পেক্টরের কাছে আমাদের সম্মুখে নিজের মতবাদ লইয়া যে হীনতা স্বীকার করিয়াছিল, সেই লজ্জা দূর করিবার জন্য মরীয়া হইয়া উঠিল। সে টিকিট বিক্রি বন্ধ রাখিয়া পুনরায় আমাদের কাছে আসিল এবং বলিল, "গরম জিলিপি খেয়ে মশাই তিন পুরুষের সর্দ্দি আমার ভাল হয়ে গেছে, যা-তা বললেই শুনব কেন?—গরিবের কথাটা পরীক্ষা করেই দেখুন না সার্।"

এদিকে ট্রাম-ড্রাইভার ঘণ্টার অভাবে গাড়ী চালাইতে না-পারিয়া কণ্ডাক্টরের উপর মহা খাপ্পা হইয়া উঠিল। একবার নহে, কণ্ডাক্টর বার-বার তাহার কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতেছে! জানালা দিয়া গাড়ীর ভিতরে মাথা গলাইয়া দিয়া সে কণ্ডাক্টরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কণ্ডাক্টর গাড়ী চালাইবার ঘণ্টা দিয়া ড্রাইভারকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিল, মূল কারণ, সর্দ্দি।

সর্দ্দি! প্রতিভাবান ড্রাইভার গাড়ী চালাইতে চালাইতে হঠাৎ সব ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "দাওয়াই হোয় ত কিছু বাতলে দিতে পারি।"

ইতিমধ্যে আমি গন্তব্য স্থানের কাছে আসিয়া পড়িলাম। সুতরাং ড্রাইভারের ব্যবস্থা শুনিবার আর প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু উঠিতে গিয়াও বিপদ! আমার পিছনের ভদ্রলোক আমার জামা টানিয়া ধরিয়া বলিলেন, "মশাই উঠবেন না, মজাটা দেখেই যান না।"

কিন্তু মজা দেখা হইল না। আর একটি গুরুতর মজার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। অর্থাৎ ড্রাইভারের কথা শেষ হইবার মুহূর্ত্ত পরেই চলন্ত ট্রাম হঠাৎ এক ঝাঁকানি দিয়া থামিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে এবং বাহিরে ভয়ানক গোলমাল আরম্ভ হইল। একটা দুর্ঘটনা বাঁচাইতে গিয়া সর্দ্দির ঔষধ-চিন্তায় মগ্ন ড্রাইভার হঠাৎ ট্রাম থামাইয়া দিয়াছে। ফলে বাহিরের দুর্ঘটনা বাঁচিয়া গিয়াছে, কিন্তু ভিতরে একটি নূতন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ভিতরের এক দণ্ডায়মান যাত্রী হঠাৎ ঝাঁকানির টাল সামলাইতে না-পারিয়া পড়িয়া গিয়া আহত হইয়াছেন।

আমারই সর্দ্দি উপলক্ষ করিয়া এমন একটা কাণ্ড ঘটিতে পারে ইহা কল্পনা করিতে পারি নাই। কিন্তু লোকটির আঘাতের দায়িত্ব যে আমারই! তাই তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে তুলিলাম। কিন্তু এ কি! এ যে আমাদেরই সেই বন্ধু, যিনি বলিয়াছিলেন সর্দ্দির কোনও ঔষধ নাই! তাঁহারই হাতের ছাল উঠিয়া গিয়া রক্ত ঝরিতেছে এবং পায়েও এত আঘাত লাগিয়াছে যে উঠিবার শক্তি নাই!

ভদ্রলোককে উঠাইয়া আসনে বসাইয়া দিলাম। কিন্তু সুস্থ হইয়াই তিনি আমাকে কাতরভাবে বলিলেন, "নেমে কোনও ডাক্তারখানায় ঢুকে কিছু ওষুধ লাগান দরকার।"

আমার মনে পড়িল টিংচার আইওডিনের কথা, এক আউন্স পরিমাণ আমার পকেটেই আছে। শিশিটি বাহির করিয়া রুমালের সাহায্যে ছাল-ওঠা জায়গায় লাগাইয়া দিতে লাগিলাম। ভদ্রলোক যন্ত্রণায় প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

ইতিমধ্যে ট্রামের যাত্রীর অদল বদল হইয়াছে। বহু নূতন যাত্রী আমাদের দুই পাশে বসিয়াছে। তাহাদের এক জন ভদ্রলোকের দুর্দ্দশা দেখিয়া বলিল, "মশাই, মেডিকেল কলেজে নিয়ে এমার্জেন্সি ওয়র্ডে অ্যান্টিটিটেনাস সিরাম্ লাগান, আইডিন-ফাইডিন পরে করবেন।"

আর এক জন যাত্রী বলিল, "কিছুই করতে হবে না মশাই, খানিকটা বরফ লাগিয়ে দিন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।"

আর এক জন যাত্রী তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল,—

কিন্তু কি বলিল, তাহা বলিয়া লাভ কি? জগৎটা যে আনন্দময় এ বিশ্বাস আমার দৃঢ় হইয়াছে, সুতরাং আর দুঃখ নাই।

ওসাকা

জাপান ভ্রমণ

শ্রীশান্তা দেবী

আমরা শীতকালে গিয়েছিলাম। পথে প্রায়ই দেখতাম মা'রা তাদের শিশুগুলিকে গোটা-দশেক জামা পরিয়ে পিঠে বেঁধে নিত এবং তার পর ছেলের পিঠের উপর দিয়ে নিজের তুলোভরা জামাটি পরত, কাজেই ছেলে এক দিকে মায়ের পিঠ ও অপর দিকে মায়ের ওভার-কোটের মাঝে বেশ আরামে থাকৃত। জাপানী মেয়েরা পিঠে বালিশের মত উঁচু করে ওবি বাঁধে, সুতরাং তার উপর আবার একটা ছেলে বেঁধে রাখলেও বেশী অস্বাভাবিক দেখায় না, অবশ্য, ছেলের মাথাটা মায়ের জামার ভিতর দিয়ে দেখা যায়।

এদিক ওদিক বেড়াতে যাবার সময় আমরা থার্ড ক্লাসেই বেড়াতাম, কারণ প্রায় সব লোকেই তাই বেড়ায়। দু-তিন বার সেকেণ্ড ক্লাসেও চড়েছি, কিন্তু থার্ড ক্লাস ও সেকেণ্ড ক্লাসে খুব কিছু তফাৎ আমি বুঝতে পারতাম না। দুই ক্লাসেই পাশাপাশি দু-জন ক'রে বসবার মত দুই সারি ক'রে মখমলের গদি দেওয়া বেশ চওড়া আসন, মাঝখান দিয়ে পথ, সেই পথে মধ্যে মধ্যে থুথু সিগারেট ইত্যাদি ফেলবার ফুটো করা জায়গা, মাথার উপর জিনিষ রাখবার স্থান। এই সব গাড়ীতে শোবার জায়গা দেখি নি, তবে দুই-এক জনকে পা গুটিয়ে শুয়ে ঘুমোতে দেখেছি, বাকি সবাই ঘুমোয় বসে বসে। সেকেণ্ড ক্লাসে লোক অনেক কম এবং স্ত্রীলোক পুরুষের তুলনায় খুব কম। সেকেণ্ড ক্লাসের সব পুরুষদের পোষাকই ভাল ইস্ত্রি করা এবং চক্‌চকে, থার্ড ক্লাসে সব রকম পোষাকের লোকই থাকে, এইটুকু মাত্র প্রভেদ বোঝা যায়। তবে পোষাক দেখে এখানেও প্রায় অধিকাংশই এক জাতীয় মনে হয়। আমাদের দেশের দুই ক্লাসের মত আকাশ পাতাল প্রভেদ সহজে চোখে পড়ে না। নোংরা পোষাক-পরা লোক এখানে খুঁজে পাওয়া শক্ত।

শীতে পথে বেড়িয়ে পাগুলো ঠাণ্ডা কন্‌কনে হয়ে গেলে রেলগাড়ীতে বসে বেশ আরাম পাওয়া যায়। সিটের তলায় লম্বা হিটারের নল থাকে, পায়ের পিছনে ফুটো ফুটো ঢাকা, পা একটু পিছনে ঠেলে বসলে গাড়ীতে উঠতে-না-উঠতে সব শরীর গরম হয়ে ওঠে। সমস্ত জানালা সার্সি আঁটা, ঠাণ্ডা হাওয়া আসে না, তবে দীর্ঘ পথে সিগারেটের ধোঁয়ায় আর মানুষের নিশ্বাসে বড় কষ্ট হয়। লম্বা পথে আমি মাঝে মাঝে জানালা খুলে দিতাম।

বোধিসত্ত্ব, মিউজিয়মের ছবি

পিঠে ওভারকোটের ভিতর শিশু লইয়া বরফে হাঁটা

এ-দেশের বৈদ্যাতিক ট্রেনে এবং সম্ভবত অন্য ট্রেনেও গাড়ীর দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ না-হয়ে গেলে গাড়ী চলে না। দরজা বন্ধ হবার সময় গাড়ীর বাঁশী বাজে, কলের সাহায্যে দরজা বন্ধ হয়ে গেলে এবং মাঝের ফাঁকটা সম্পূর্ণ লোপ পেলে তবে চালকের কাছে গাড়ী চালাবার সিগন্যাল জ্বলে উঠে। একটি বাঙালী ছেলের কাছে শুনেছি সে গাড়ী চলবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে দরজার মাঝখানে আটকে গিয়েছিল। সে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'য়ে ভিতর দিকে না-আসা পর্য্যন্ত গাড়ী চলতে পারে নি।

ট্রেনে ছোট ছোট খুকীদের দেখলে আমার মেয়ে তাদের সঙ্গে খুব ভাব করত। ভাষার অভাব দু-পক্ষেরই ছিল, কাজেই কমলা লেবু ও টফি ইত্যাদির আদান-প্রদানে ভাব জমত। বিদায়ের সময় এই ছোট ছোট মেয়েগুলি যতক্ষণ দেখা যায় ফিরে ফিরে তাকিয়ে জাপানী কায়দায় বার বার নমস্কার করত।

কোবেতে ভারতীয়দের একটি ক্লাব আছে, তার নাম ইণ্ডিয়া ক্লাব। এই ক্লাবে যাট জন মহিলা সভ্য আছেন। কিন্তু এঁদের অধিবেশনের দিন পুরুষদের দিন থেকে স্বতন্ত্র। বুধবারে বুধবারে মেয়েরা এখানে আসেন। ৩রা বুধবার ছিল, তাই আমাকেও সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। দোতলার উপরে মস্ত একখানা ঘরে, মিসেস আলি এসে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। ইনিই মহিলাদের মধ্যে অগ্রণী, খুব ভদ্র ও খুব কাজের মেয়ে। কোবের অন্যান্য মহিলা সভাতেও এঁর যাওয়া-আসা আছে; সে সব সভায় ইউরোপীয় এবং জাপানী মহিলারা একত্রে ভারতীয়াদের সঙ্গে যোগ দেন। সম্প্রতি মিসেস আলি সেখানে সরোজিনী নাইডুর একটি কবিতার জীবন্ত চিত্র (tableau) রঙ্গমঞ্চে দেখাবার ব্যবস্থা করেন।

ইণ্ডিয়া ক্লাবে একটি মাত্র বাঙালী মেয়েকে দেখলাম। তিনি পরলোকগত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

জাপানী যুবকেরা ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে নাকে ঠুলি পরেছেন
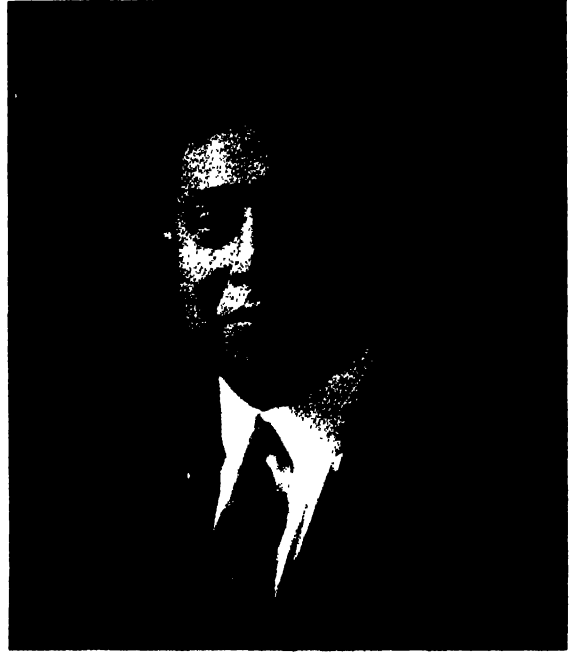
জাপান-প্রবাসী মিঃ এস্, সি, দাস

দৌহিত্রী শ্রীমতী সতী দেবী। আর সকলেই বোধ হয় গুজরাটী, পার্সী ও সিন্ধী। এঁরা সবাই আমাকে যত্ন করে চা খাওয়ালেন এবং অনেক গল্প করলেন। সকলে ইংরেজী বলেন না, অনেকে হিন্দী বলেন। হিন্দু-মুসলমান সব মেয়েরা একত্রে চা খান এবং গানবাজনা, সেলাই, পড়া ও নানারকম খেলায় বন্ধুভাবে যোগ দেন। এক জন মহিলা বললেন, "আমাদের মধ্যে ঝগড়াও হয় বইকি! যেখানেই মেয়ে সেইখানেই ঝগড়া!"

আমি বললাম, "পুরুষরা এক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে কম বলে ত মনে হয় না।"

যাই হোক, এঁদের মধ্যে কয়েকটি বোম্বাই-প্রদেশীয়া মহিলাকে আমার খুব ভাল লাগল। তাঁরা কেউ পাঁচ, কেউ সাত বৎসর দেশের মুখ দেখেন নি বলে দুঃখ করছিলেন। একটি গুজরাটী মহিলা বললেন যে তিনি কুড়ি বৎসর দেশছাড়া। খুব ভাগ্য না থাকলে জাপান থেকে দেশে ফেরা যায় না।

রাত্রে যখন দাস মহাশয়ের বাড়ী আমরা খেতে এলাম তখন ঠাণ্ডায় মাথার হাড়শুদ্ধ ব্যথা করছে। মাথায় শীত করার অভিজ্ঞতা ইতিপূর্ব্বে আমার ছিল না। আগুনের ধারে বসে অনেক চেষ্টা করেও শরীরটাকে গরম করতে পারছিলাম না। দাস মহাশয় বললেন, "টোকিও এখানকার চেয়ে ঠাণ্ডা।" শুনে ভয়ে আমার অবস্থা যা হল তা না বলাই ভাল। এখানে মাথায় শীত করছে, সেখানে কি শেষে চুলে নখেও শীত করবে! তার উপর এই রকম একহারা কাঠ ও কাচের বাড়ীতে থাকতে হলে ত ২৮ দিনে আমাকে আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না। দাস মশায় আমাদের নানারকম বাংলা রান্না খাইয়ে পাঁপড় বড়ি ইত্যাদিও যখন পরিবেশন করলেন তখন আমরা সত্যই বিস্মিত হলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে জাহাজের পথে চললাম। রাত তখন ৯৷৷টা বেজে গিয়েছে। সতী দেবী তাঁর ছোট

মেয়েটিকে নিয়ে একলাই মাটির তলার রেল দিয়ে নিজের বাড়ী চলে গেলেন। এদেশে পথে ঘাটে নাকি কোন ভয় নেই।

পরদিন সকালে উঠে জাহাজে খাওয়া-দাওয়া করে সাড়ে দশটার সময় এন. ওয়াই. কে. জাহাজ কোম্পানীর আপিসে গেলাম, আমাদের ফেরবার ব্যবস্থা কি হবে জানতে। বড় বড় জাহাজে ভীড় বেশী, অন্যান্য অসুবিধাও আছে, কাজেই ঠিক করলাম যে 'আনিও মারু'তে এসেছি, সেই 'আনিও মারু' জাহাজেই যাব। আমাদের অনেক সহযাত্রিণীও এসেছিলেন জাহাজ ঠিক করতে, তাঁরা আমেরিকার টিকিট কেটে আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমার মেয়ের একটি সমবয়স্কা ফরাসী বালিকা বন্ধু ছিল। সে অনেক রকম প্রতিশ্রুতি নিয়ে এবং দিয়ে বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী করবার ব্যবস্থা করে চলে গেল। জাপানী টাইপিষ্ট মেয়েটি একবার ফিরে তাকাল।

পথে বেরিয়ে দেখলাম আজ অনেকটা গরম পড়ে গিয়েছে, এতগুলো কোট, ওভারকোট আর সহ্য হচ্ছে না। পুরোহিতদের বসন্ত-আবাহন তাহলে অনেকটা সার্থক হয়েছে দেখছি। গাছে গাছে ফুল না ফুটুক, মানুষের শরীরে প্রাণটা ফিরে আসছে। পথে সূর্য্যের দিকে মুখ করে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। অনেক লোক ওভারকোট বাদ দিয়ে শুধু গরম সুট প'রে চলেছে। মেয়েদের ভীড়ে পথ ছবির মত দেখাচ্ছে। কাঠের জুতা অর্থাৎ খড়ম খট্ খট্ করে সব কাজে ছুটেছে, অনেকের খড়মের তলায় রবার দেওয়া। এদের মধ্যে চুল ছাঁটা মেয়ে বেশী নেই, অধিকাংশই খোঁপা বাঁধা। আজ শীত কম, তবু কোবের অর্দ্ধেক মানুষের নাকে ঠুলি। এখানে বিদেশী ডাক ও দেশী ডাকের ডাকঘর আলাদা। বিদেশী ডাকঘরে ভারতবর্ষের চিঠিপত্র দিয়ে আমরা স্বদেশী ডাকঘরে গেলাম। ডাকঘরে টাকার ভাঙানি দেওয়ার কথা নয়। কিন্তু এরা আমাদের অতিথির মত যত্ন করে টাকা পয়সা ভাঙিয়ে কিসে কত টিকিট লাগবে বলে চিঠি বন্ধ করে সবই প্রায় নিজেরা করে দিল।

বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীতে মহিলা কণ্ডাক্টার

অতিথিসেবার ধর্ম্মে জাপান খুব অগ্রসর। আমরা ভারতীয়েরা আতিথ্য ভুলে যাচ্ছি, কিন্তু আতিথ্যে ধর্ম্ম ছাড়া অর্থও লাভ হয় এটা বুঝে জাপানীরা সেদিকে খুব ঝোঁক দিয়েছে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জাপানে অলিম্পিক হবে। সেই জন্য এখন থেকে সে দেশে সাড়া পড়ে গিয়েছে। কোবে বন্দরে ভ্রমণকারীরা এক দল প্রথম নামে। তাই কোবেতে হোটেল, সরাই, জাহাজ ও দোকানের কর্ম্মীদের জন্য আতিথ্য শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা হচ্ছে। বিদেশীদের তারা যথেষ্ট যত্ন করে, কারণ যত মানুষ তাদের দেশে যাবে ততই তাদের জাহাজ, রেলপথ, হোটেল, সরাই ও দোকানের লাভের অঙ্ক বাড়তে থাকবে। যাঁরা জাহাজে দেশ-বিদেশে যান তাঁরা সকলেই প্রায় বলেন, 'জাপানী জাহাজের মত যত্ন কোথাও পাওয়া যায় না। ইতালীয়রাও যত্ন করে বটে, কিন্তু জাপানীরা তাদের চেয়ে ভাল।' আমাদের নিজস্ব জাহাজ ও রেলপথ ত নেই, দোকান বাজার আছে। কিন্তু

দোকানে গেলে বিক্রেতারা এমন ব্যবহার করেন যেন তাঁরা নিতান্তই দয়া করে জিনিষগুলো আমাদের দেখাচ্ছেন। দোকানে কি কি জিনিষ যে থাকতে পারে সেটা ধ্যানশক্তি দ্বারা জেনে নেবার কথা আমাদের, তার পর বিক্রেতাদের বললে তারা দয়া করে সেগুলো বার করবে।

কোবের ডাকঘরেও দু-একটি মেয়েকে কাজ করতে দেখলাম। এদেশে বোধ হয় মেয়েরা কোন ক্ষেত্রেই ঢুক্‌তে বাকি রাখে নি।

জাহাজ-কোম্পানী ও ডাকঘরের কাজ সেরে খেতে গেলাম একটা সাততলা বাড়ীর মাথার উপরে। জাপানী মেয়ে লিফ্‌টে করে উপরে পৌছে দিল। মেয়েরাই এখানে লিফ্‌টের কাজ করে। জাপানী বৃদ্ধ সরাইওয়ালা খুব ঘটা করে ভদ্রতা করে ভাল টেবিল দেখিয়ে বসতে দিল। এখানকার পরিবেশনকারিণী মেয়েগুলি বেশ সুন্দরী। দেশে থাকৃতে জাপানী মেয়েদের যেরকম মনে করতাম তার চেয়ে তারা দেখতে অনেক বেশী ভাল এবং সাজসজ্জা খুব ভাল করতে জানে বলে আরোই ভাল মনে হয়। অধিকাংশ রেস্তোরাঁতে এই মেয়েরা ফ্রক পরে, এরা দেখলাম কিমোনোই পরেছে, তার উপর ছোট ছোট লেসের এপ্রন। সেই গরম তোয়ালে সেই বড় বড় চিংড়ি মাছ আর ভাত। খাবার পরে এরা সর্ব্বত্রই কমলা লেবু আর চা কি কফি দেয়। এরা নারার হোটেলের চেয়ে বেশী আদবকায়দা জানে, তাই লিফ্‌ট থেকে বেরোবামাত্র একদল মেয়ে ছুটে এসে সকলের কোট খুলে লাঠি নিয়ে তাতে টিকিট দিয়ে বাইরে টাঙিয়ে রাখে। যাবার সময় আবার টিকিট মিলিয়ে সব ফিরে দেয়। এদের এখানে পুরুষ ওয়েটারও কয়েকজন দেখলাম। সাততলার উপরের সুন্দর ছাদ থেকে সমুদ্র জাহাজঘাট সব স্পষ্ট দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে লোকে এই ছাদে ভীড় করে আসে, এখন কারুর গরজ নেই।

আজ আমাদের ওসাকা শহর দেখবার কথা। আগের দিন ওসাকার ভিতর দিয়ে গিয়েছি, কিন্তু ভাল করে দেখা হয় নি।

কোবে থেকে মাটির তলার ষ্টেশনে ঢুকে ট্রেন ধরতে হবে। সব পথটাই অবশ্য মাটির তলা দিয়ে নয়, কয়েক মাইল যাবার পর সেটা আবার মাটির উপর উঠেছে। ষ্টেশনে ভীষণ ভীড়, এদেশে সর্ব্বত্রই পথের চেয়ে ষ্টেশনে মানুষ বেশী। আমরা বলতাম, "ষ্টেশনে গাড়ী থামলেই মনে হয় ইস্কুলের ছুটি হয়েছে।" যেমন লোক নামার ঘটা, তেমনি ওঠার ঘটা! এই সব মাটির তলার ষ্টেশনে তাই অনেক দোকান, ও দোকানের বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনগুলি ছবি ও অক্ষর নয়, খাটি জিনিষ। বড় বড় কাচের আলমারীতে হট হাউসের ফুল, ভাল ভাল পোষাক, কেক, চকোলেট, মাছ, তরকারি, মাংস, পুতুল, ছাতা, ইত্যাদি হরেক রকম জিনিষ সাজানো রয়েছে। ষ্টেশনের উপরের রেস্তোরাঁতে যেদিন যা রান্না হয় সব এক প্রস্থ করে প্ল্যাটফরমের ধারে আলমারীতে সাজানো থাকে, দেখেই যাতে জিভে জল আসে আর অর্ডার দেওয়া যায়।

কোবে থেকে ওসাকা অনেক দূর নয়, কিন্তু মাঝখানে ছোট ছোট অনেকগুলি ষ্টেশন। মেয়েরা রঙীন রুমালে চৌকো পুঁট্‌লি বেঁধে জিনিষপত্র নিয়ে একলাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা ব্যাগ বেশী ব্যবহার করে না, রেশমী রুমালে পুঁট্‌লি বাঁধাই বেশী চলন। অবশ্য, খুব ফ্যাশনেবল মেয়েদের ছোট হাত-ব্যাগ সঙ্গে থাকে, কিন্তু তাতে ত এত জিনিষ ধরে না। পুঁট্‌লি যত খুশী বড় করা যায়। এই রকম পুঁট্‌লি দুটো তিনটে নিয়েও অনেক মেয়ে বেশ ঘুরে বেড়ায় চট্‌পট করে। বেশ বড় ঘরের ভদ্র মহিলাদেরও দেখেছি গোটা তিন-চার পুঁট্‌লি অনায়াসে নিয়ে চলেছেন। এদেশে সব জিনিষই কাগজ কিংবা কাঠের বাক্স করে বিক্রী হয় বলে পুঁট্‌লিগুলি বেশ সুদৃশ্য চৌকো হয় এবং বাঁধতেও সুবিধা লাগে। তা ছাড়া দোকানের বিক্রেত্রীরা অনেক জিনিষ একসঙ্গে বহন করতে হবে দেখলেই সবগুলিকে বেশ গুছিয়ে একসঙ্গে বেঁধে দেয়। আমরা সেরকম পারি না।

ওসাকা বিরাট শহর, শুনেছি এখানে যাট লক্ষ লোকের বাস, শহর ক্রমেই বেড়ে চলেছে, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। কোবের বন্দরের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ

কিয়োটো মন্দিরের রেখাঙ্কন
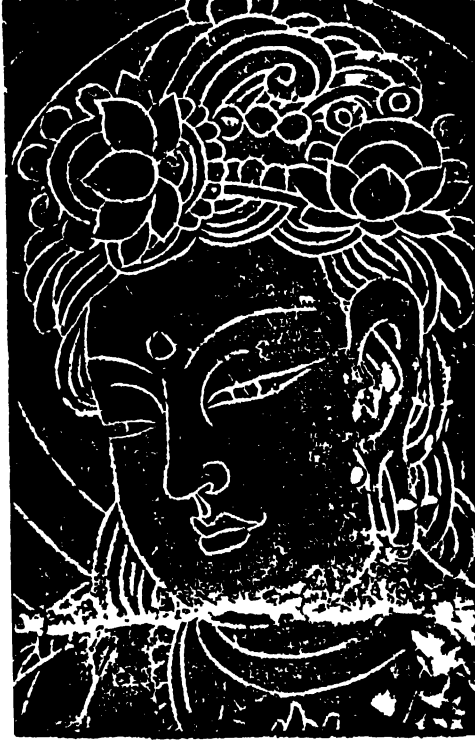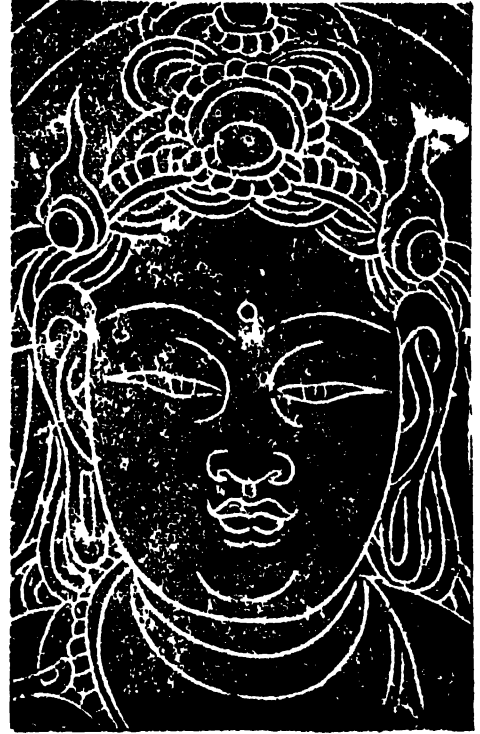
কিয়োটো মন্দিরের রেখাঙ্কন

সম্পর্ক, কোবেতে হয় আমদানি আর রপ্তানি এবং ওসাকাতে হয় সেই সবের ব্যবসায়, আশেপাশে হাজার রকম বড় বড় কারখানা। ওসাকাতেও বন্দর আছে, কিন্তু কোবের বন্দর তার চেয়ে বড় এবং ভারতবর্ষ ও চীন দেশ ইত্যাদির থেকে এই বন্দরই প্রথমে পথে পড়ে।

ওসাকাতে অসংখ্য দোকান, নূতন বাড়ীগুলি সব আমেরিকান ধরণে বারো-চোদ্দ তলা উঁচু, পুরাতন কাঠ ও কালো খোলার বাড়ীর সংখ্যা অন্যান্য শহরের তুলনায় এখানে কম। শুনলাম যেসব কাঠের বাড়ী জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, সেগুলি ভেঙে গেলে সেখানে আর কাঠের বাড়ী করতে দেওয়া হবে না। এর পর থেকে সবই হবে কংক্রিট ইত্যাদির বাড়ী অর্থাৎ ওসাকা আমেরিকা হ'তে বেশী দেরী হবে না।

আমরা শহর দেখবার জন্যে পথে পথে ট্যাক্সিতে করে ও পায়ে হেঁটে খানিকটা ঘুরলাম। ওসাকার বিখ্যাত খালের ধারে দেখলাম জলের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোট ছোট কাঠের বাড়ী, এটা বোধ হয় জাপানী ভেনিস। নৌকারও অভাব নেই। ঘরে ঘরে খুব পায়রা পোষার ধুম; জলের ধারেই জিনিষপত্র সাজানো রয়েছে, কাপড় শুকোচ্ছে।

এখান থেকে আমরা 'ওসাকা মৈনিকি' নামক খবরের কাগজের বিরাট প্রেস দেখতে গেলাম। কাগজ প্যাক করা থেকে আরম্ভ ক'রে ছাপা কম্পোজ করা সবই তারা যত্ন ক'রে দেখালে। বাড়ীটা মস্ত ব্যাপার। এখানেও কোন কোন কাজে মেয়েদের নেওয়া হয়। অক্ষর কম্পোজ করবার ঘরে পুরুষরা কম্পোজ করছে এবং মেয়েরা ব্যবহৃত অক্ষরগুলি আবার যথাস্থানে সাজিয়ে রাখছে। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের কাজটাই শক্ত মনে হ'ল। প্রেসেই টেলিফোটো নিয়ে পনর মিনিটের মধ্যে ব্লক তৈরি করে সঙ্গে সঙ্গে কাগজে ছাপা হচ্ছে। সে-ঘরে

মাথায় রেডিও সেট প'রে লোকেরা কাজ করছে। জাপানী অক্ষর রাখবার বোর্ডগুলি খাড়া ক'রে সাজান, চোখ তুলে চাইলেই সব অক্ষর চোখে পড়ে। ছাপাখানায় ঘণ্টায় সত্তর-আশী হাজার কাগজ ছাপা হয়। বাড়ীটাও যেমন বড়, কাজ করছেও তেমনি অসংখ্য লোক। ইংরেজী ও জাপানী দুই ভাষাতেই কাগজখানি ছাপা হয়।

এটা কাগজের ছাপাখানা হ'লেও এখানে আতিথ্যের ত্রুটি নেই। সব দেখাশুনোর পর আমাদের একটা বসবার ঘরে একটু বস্‌তে বলা হ'ল। তার পর এল চা ও কেক। জাপানে সর্ব্বত্রই চা খাওয়াবার খুব ধুম।

এখান থেকে আমরা ওসাকার প্রাচীন রাজপ্রাসাদ দেখতে গেলাম। সকল দেশের প্রাচীন রাজপ্রাসাদেরই মত চারিদিকে গড় কেটে জল দিয়ে ঘেরা প্রাসাদটি। কেল্লার মত প্রাসাদের দেওয়ালগুলি পাথর দিয়ে গাঁথা। এর মধ্যে এক একটা পাথর বারো-চোদ্দ হাত লম্বা এবং দুই মানুষ উঁচু। এত বড় বড় পাথর প্রাচীন কালে এত দূরে কি করে যে এনেছিল ভেবে পাই না। পাথরগুলির মাপের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা নেই, খুব বড়ও আছে, খুব ছোটও আছে। ফটকটা লোহার। ফটকের ভিতর একটা ছোট ঘরে সিপাহীর মত চৌকিদার বসে আছে, চারটে বেজে গেলে আর কাউকে ঢুকতে দেয় না। আসল প্রাসাদটি পাথরেই গড়া বোধ হয়, তবে তার দুপাশে মাটি দিয়ে প্ল্যাষ্টার করা ও চুণকাম করা, জানালাগুলি ছোট ছোট খোপের মত এবং সব জাপানী প্রাসাদেরই মত এরও কালো টালি দিয়ে ঢাকা চাল। প্রাসাদের চূড়া বহু দূর থেকে দেখা যায়। জাপানীরা নিজেদের দেশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দল বেঁধে দেখতে যায়, কোথাও দর্শকের অভাব নেই।

বিকালে আমরা ওসাকার খুব একটা জমকালো রেস্তোরাঁতে চা খেতে গেলাম। সাত কি আট তলা বাড়ীর মাথার উপরে খাবার ঘর। সবুজ ফ্রকের উপর সাদা এপ্রন পরা মেয়েরা পরিবেশন করছে। খুব চট্‌পটে কাজের মেয়ে। পনর-ষোল বছরের মেয়েরাও একলাই ছয়-সাতটা প্লেট নিয়ে কেমন তাড়াতাড়ি সপ্রতিভ ভাবে পরিবেশন করছে। খাবার ঘরটা খুব দামী আলো ও ভাল আসবাব দিয়ে সাজানো। বাসন-কোশন খুব সুন্দর। এখানে লোকেরও ভীড় খুব। কচি ছেলেপিলে নিয়ে মা বাবা এসেছে, অল্পবয়সীরা দল বেঁধে এসেছে। বুড়োবুড়ীদেরও উৎসাহের ত্রুটি নেই। ছোট ছেলেদের জন্য উঁচু উঁচু চেয়ার, শিশুদের জন্য দোলনা—সবই তাই খাবার ঘরেই রয়েছে। খোকা-খুকীরা কাঁদলে কিংবা মায়ের বেশী অসুবিধা ঘটালে পরিবেশনকারিণীরা এসে তাদের সামলাচ্ছে। আমাদের বিদেশী দেখে আমার কাশ্মীরী শালের সম্বন্ধে খুব কৌতূহল দেখাতে লাগল। ওসাকার এই রেস্তোরাঁতেই বোধ হয় পরিবেশনকারিণীরা বকশিশ ফিরিয়ে দিল। তাদের নেওয়া বারণ।

ওসাকা প্রভৃতি বড় বড় শহরে অনেকে বাড়ীতে খাওয়ার প্রথা তুলেই দিয়েছে। ছেলেবুড়ো সব এসে রেস্তোরাঁতে খেয়ে যায়। প্রতি রাস্তায় অসংখ্য খাবার ঘর। আমরা চা খাবার পর দোকানে জিনিষ কিন্‌তে গেলাম। জিনিষ কিন্‌লাম অতি সামান্য, দেখলাম অনেক বেশী। দোকানেও সব মেয়েদেরই কারবার। পুরুষরা এখানে সামান্যই কাজ করে। বড় বড় ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোর মেয়েদের হাতেই চলছে। প্রত্যেক বিভাগেই মেয়েরা জিনিষ দেখাচ্ছে বেচছে।

পুতুলের বিভাগটি আমাদের চোখে ভারী চমৎকার লাগে। দামী পোষাক পরে নাচের নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে বড় বড় পুতুল। দাম পঁচিশ-ত্রিশ ইয়েন। কাচের বাক্সে এমন করে সাজানো যে দেখলেই নিয়ে আসতে ইচ্ছা করে। দুই-তিন ইয়েনের ছোট ছোট পুতুলও আছে।

দোকানের রাস্তার ধারের কাচের আলমারীতে বড় বড় পুতুল নাচ হচ্ছে দেখলাম, তার উপর কত রকম flood light ফেলার যে ঘটা! সেখানে কচিকাচার ও তাদের বাপমায়ের ভীষণ ভীড়। এরা বিজ্ঞাপন দেবার কত যে ফন্দি জানে! বড় বড় শহর ত রঙীন আলোর বিজ্ঞাপনে রাত্রে ঝল্‌মল্ করে।

এদেশে মেয়েদের জুতা অসংখ্য রকম। জুতার
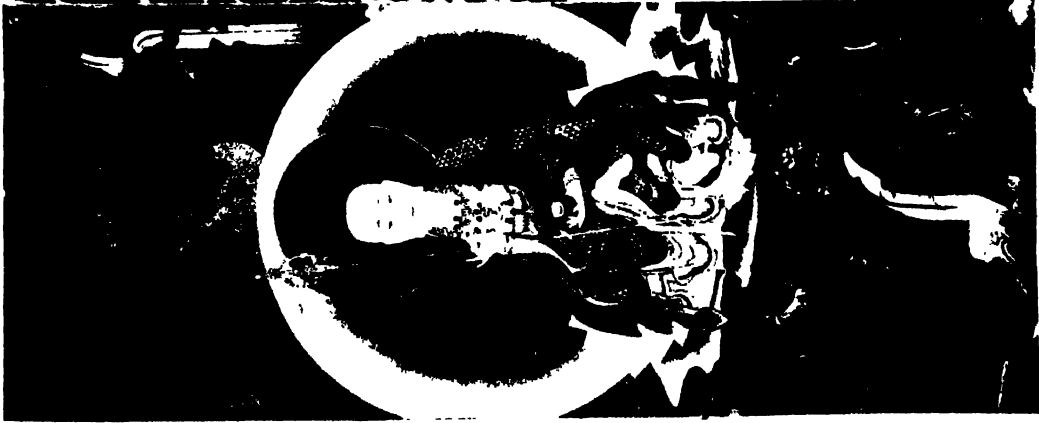
মিউজিয়মের ছবি

মিউজিয়মের দেবমূর্ত্তি

মিউজিয়মের ছবি
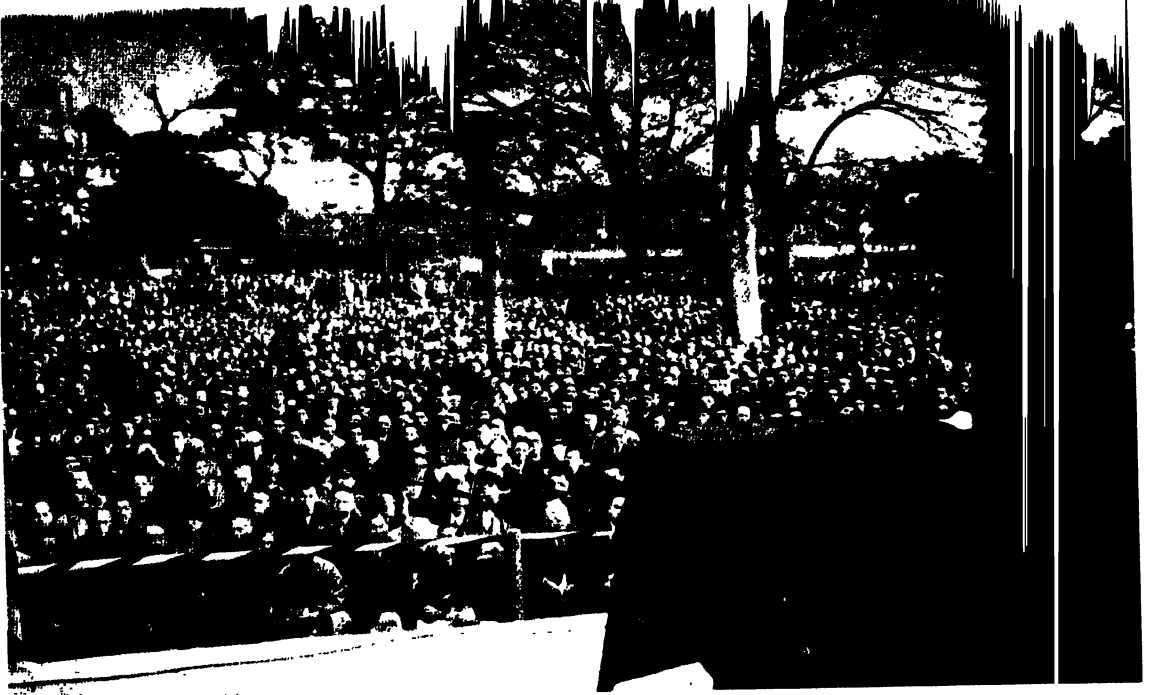
টোকিওতে ব্রিটিশ-বিরোধী জনসভা। ব্রিটেন চীনকে সহায়তা করিতেছে এই কল্পিত অভিযোগ লইয়া জাপানীদের অনেকের মনে ব্রিটেনের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব সঞ্চার হইতেছে।

ওসিগ্‌—সুদেতেন ডয়েটশ, অর্থাৎ চেকোস্লোভাকিয়ার যে অঞ্চলে জার্মানদের বাস, তাহার একটি প্রধান নগর। দূরে জার্মান রাজ্যের সীমা দেখা যাইতেছে।

দোকানে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখা যায়। নকল চুলের খোঁপার দোকানগুলিও খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গহনা ত এ দেশে মেয়েরা পরে না, কাজেই খোঁপার ফুলের রকমারিই বেশী। আজকাল যারা বিলিতী পোষাক পরে, তারা সেই রকম মালাটালাও পরে ব'লে নকল মুক্তা কাচ ও পাথরের মালা কিছু কিছু দেখা যায়।

ওসাকার রাস্তাগুলি ভারী সুন্দর, খুব প্রশস্ত রাস্তার মধ্যে দুসারি করে গাছ। মোটর যাবার পথ আলাদা, সাইকল, ঘোড়ায় টানা মালবাহী গাড়ী ইত্যাদির পথ আলাদা, ফুটপাথও আলাদা, এখানকার পথে গাড়ীর ও মানুষের ভীড় খুব। রাস্তা পার হবার জন্যে মানুষ দল বেঁধে অপেক্ষা করছে দেখেছি।

রাত্রে ট্রেনে করে কোবে ফিরে এলাম। এখানে কোথাও খেয়ে দেয়ে জাহাজে গিয়ে ঘুমোতে হবে।

দাস মহাশয় নিজের বাড়ী ফিরে গিয়েছিলেন। আমরা পথে পথে ঘুরে একটা দোকান আবিষ্কার করলাম সিংহলের মণি-মাণিক্যের (Ceylon Gems)। এখানে নিশ্চয় কোন স্বদেশী মানুষকে পাওয়া যাবে মনে করে দোকানে ঢুকে পড়লাম। সত্য সত্যই এক জনকে পাওয়া গেল। তাঁর সাহায্যে একটা সাদাসিধে দোকানে খেতে গেলাম। এখানে খাবার ঘরের খুব সাজসজ্জা নেই, পরিবেশনকারিণীরাও ফ্রক পরে না, ডোরাকাটা কিমোনোর উপর এপ্রন পরেছে, অল্পস্বল্প ইংরেজীও জানে। কোবেতে এইখানে সর্ব্বদা বিদেশীরা আনাগোনা করে বলে বোধ হয় এরা দুই চার কথা শিখে রাখে। এরা খেতে বসতেই গরম তোয়ালে এনে দিল না।

খাবার পর সিংহলী ভদ্রলোককে বললাম, "আমাদের একটা জাপানী নাচ দেখাও না।" ভদ্রলোক বললেন, "তোমাদের সঙ্গে ছোট মেয়ে রয়েছে, ওসব জায়গায় যেও না, সে সব খুব ভদ্র জায়গা নয়।" তাঁর কথামত আমরা সেদিকে না গিয়ে দোকানের পাড়াতে বেড়াতে লাগলাম। এই সব দোকান ওসাকার দোকানের মত জমকালো নয়, আমেরিকান কায়দাও এখানে নেই। ফুটপাথের ধারে নীচু নীচু ছাউনির তলায় তাকে ও তক্তাপোষে অসংখ্য রঙীন জিনিষ সাজিয়ে বিক্রী করছে। মেলার মত দেখাচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

রবি-রশ্মি—কলিকাতা ও ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভূতপূর্ব্ব উপাধ্যায়, ঢাকার জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক, বিবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ, কর্ত্তৃক বিশ্লেষিত। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৯৩৮। মূল্যের উল্লেখ নাই।

এই পুস্তকখানি প্রায় সাড়ে চারি শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহা "রবি রশ্মি' গ্রন্থের পূর্ব্বভাগ। ইহার এক একটি পৃষ্ঠা দৈর্ঘ্যে প্রবাসীর পৃষ্ঠার সমান, চওড়ায় প্রবাসীর পৃষ্ঠার চেয়ে এক ইঞ্চি কম। ইহা প্রকাশ করিবার ভার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ লওয়ায় গ্রন্থকার তাঁহাদিগকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইয়াছেন। তাঁহারা বাস্তবিক কৃতজ্ঞতার পাত্র। কারণ পুস্তকব্যবসায়ীরা বহুব্যয়সাধ্য গ্রন্থ প্রকাশ করিতে চান না। বহু ছাত্রছাত্রীর নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক ও তৎসমুদয়ের অর্থপুস্তক এবং কোন কোন প্রকার উপন্যাস ব্যতীত অন্যবিধ পুস্তকের বিক্রী কম।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, ইউনিভার্সিটির রেজিষ্ট্রারের এবং ইউনিভার্সিটি প্রেসের পরিচালকের ও প্রুফ পরীক্ষকগণের চেষ্টা ও সাহায্য সত্ত্বেও পাঁচ বৎসরে মাত্র গ্রন্থের এই পূর্ব্বভাগ ছাপা হইয়াছে। "বাকী অর্দ্ধেক আমার জীবদ্দশায় হইবে কি না, বিধাতাই জানেন।" তাহা হইলে, ইউনিভার্সিটি প্রেস মাসে গড়ে আট পৃষ্ঠার বেশী ছাপেন নাই। এই প্রেসের কাজ অবশ্য খুব বেশী, কিন্তু আয়োজনও বৃহৎ। সেই জন্য মনে হয়, মাসে আট পৃষ্ঠা অপেক্ষা কিছু বেশী ছাপা হইতে পারে। যাহা হউক, এইরূপ সারবান্ পুস্তক ধীরে ধীরে ছাপিয়াও যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন।

এই গ্রন্থে গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমূহের ও বহু কবিতার পরিচয় পাঠকদিগকে দিয়াছেন এবং আবশ্যকমত তৎসমুদয়ের সমালোচনাও করিয়াছেন। তিনি এই বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী বহু লেখকের রচনার সাহায্য লইয়াছেন ও তাহা হইতে অনেক প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। "আমার ছাত্রছাত্রীদের রচনা হইতেও আমি বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাঁহাদের রচনা হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া আমার লেখার পরিশ্রম লাঘব করিয়াছি। ইহার জন্য আমি তাঁহাদের নিকটেও ঋণ ও কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রকৃষ্ট ও ব্যাপক অধ্যাপনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আরম্ভ হয়। এই অধ্যাপনায় যাঁহারা ব্রতী ছিলেন বা আছেন সেই সকল সহকর্মীদের নিকটেও আমার অনেক ঋণ আছে, তাঁহাদের সহিত আলোচনাতেও অনেক জটিলতার মীমাংসা হইয়াছে।

"সর্ব্বোপরি আমার অপরিশোধ্য ঋণ স্বয়ং কবিগুরুর কাছে। যখন যেখানে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার গোচর করিয়াছি, এবং তিনি...সংশয় মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।"

গ্রন্থকার প্রথমে রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের উন্মেষের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তাহার পর তাঁহার নিম্নলিখিত কাব্য ও কবিতা সংগ্রহগুলির আলোচনা এবং তৎসমুদয়ের রসের পরিচয় দিয়াছেন ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন:--

বনফুল, কবিকাহিনী, রুদ্রচণ্ড, ভগ্নতরী, ভগ্নহৃদয়, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, বাল্মীকি-প্রতিভা, কাল-মৃগয়া, সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ছবি ও গান, প্রকৃতির প্রতিশোধ, কড়ি ও কোমল, মায়ার খেলা, মানসী, রাজা ও রাণী, বিসর্জ্জন, চিত্রাঙ্গদা, সোনার তরী, বিদায়-অভিশাপ, নদী, চিত্রা, মালিনী, চৈতালী, কণিকা, কথা, কাহিনী, কল্পনা।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন:—"রবি সহস্ররশ্মি। তাঁহার অজস্র রশ্মিচ্ছটার মধ্য হইতে কয়েকটি রশ্মিমাত্র আমার মানসপরকলার সাহায্যে বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ইহাতে যে বর্ণচ্ছত্রের সুষমা প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাতেই বুঝা যাইবে রবির ঐশ্বর্য্য ও মাহাত্ম্য কত বিচিত্র ও কত বৃহৎ।"

ইহা সত্য কথা।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও কবিতাসমূহের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে ও রস আস্বাদন করিতে বঙ্গসাহিত্যানুরাগীদিগকে সমর্থ করিবার নিমিত্ত ইতিপূর্ব্বে আরও অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। অনেকের চেষ্টা সফলও হইয়াছে। চারু বাবুর গ্রন্থখানির বিশেষত্ব এই, যে, তিনি নিজের সমালোচনাদক্ষতা ও রসগ্রাহিতার ফল ত পাঠকদিগকে দিয়াছেনই, অধিকন্তু অন্য অনেকের ঐরূপ শক্তিরও ফলভাগী তাঁহাদিগকে করিয়াছেন, এবং সর্ব্বোপরি বহুস্থলে স্বয়ং কবিরই দ্বারা তাঁহার সৃষ্টির মর্ম্মোদ্ঘাটন করাইয়াছেন।

পুস্তকখানি গ্রন্থকারের বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রমের ফল।

"এই পুস্তকের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি বারো বৎসরের নিরন্তর চেষ্টায়। লিখিতে লাগিয়াছে পুরা এক বৎসর। রবীন্দ্র-কাব্যতীর্থে পরিক্রমণের এই গুরু শ্রম সার্থক হইবে যদি ইহার দ্বারা এক জনও তীর্থযাত্রীর যাত্রা-পথ সুগম করিয়া দিতে পারি।"

আমাদের ধারণা, ইহার দ্বারা শ্রদ্ধাবান্ তীর্থযাত্রীদের যাত্রা-পথ সুগম হইবে, এবং যে-সকল ছাত্রকে রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্য বা কবিতা পড়িতে হয়, ইহার দ্বারা তাঁহাদের রবীন্দ্রসাহিত্যানুশীলন অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে।

বঙ্গীয় মহাকোষ—একবিংশ সংখ্যা। প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা। কলিকাতাস্থিত ১৭০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শীল, এম্ এ, বি এল, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই মহাকোষ বহু শ্রমে ও অর্থব্যয়ে বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সহযোগিতায় প্রকাশিত হইতেছে। আলোচ্য সংখ্যার একটি প্রধান প্রবন্ধ "অজ্ঞেয়তাবাদ"। ইহাতে মেদিনীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত মনীবিনাথ বসু সরস্বতী পাশ্চাত্য ও ভারতীয় বহু দার্শনিক ও দর্শনের অজ্ঞেয়তাবাদ সম্বন্ধে মত সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন।

কোষখানির উৎকর্ষ পূর্ব্বে বহুবার পাঠকদিগকে জানাইয়াছি।

• **বিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, চন্দননগর, ১৩৪৩**—চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের যে বিংশ অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র

দে এই সুমুদ্রিত বিবরণটি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের উদ্বোধনটি আছে এবং মূল সভাপতি ও সমুদয় শাখা-সভাপতির অভিভাষণগুলি আছে। তদ্ভিন্ন বহু শাখায় পঠিত কতকগুলি প্রবন্ধও আছে। অনেকগুলি ছবি আছে।

সম্মিলনের সঙ্গে একটি প্রদর্শনীও হইয়াছিল। তাহার বৃত্তান্ত ও তৎসম্পৃক্ত কতকগুলি ছবি এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে।

পুস্তকখানি যাঁহারা পাইবেন, তাঁহারা রাখিতে ইচ্ছা করিবেন। সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য সমুদয় লাইব্রেরীর কর্ম্মকর্ত্তাগণ ইহা সংগ্রহ করিয়া রাখিলে তাঁহাদের পাঠকেরা প্রীত ও উপকৃত হইবেন।

ড

কুমুদনাথ—শ্রীসরলাবালা সরকার হুগলী, উত্তরপাড়া পোঃ আঃ, ১৬নং বিজয়কিষণ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

এখানি পরলোকগত কুমুদনাথ লাহিড়ীর জীবনচরিত। কুমুদনাথ ছিলেন একাধারে কবি ও কর্ম্মী। তাঁহার কর্ম্ম কবিপ্রাণের প্রেরণায় প্রণোদিত। তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার সমাবেশ ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যে-সকল কর্ম্মী নীরবে দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন, কুমুদনাথ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি দারিদ্র্যকে ভয় না করিয়া সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির আহ্বানে জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। গুরু কর্ম্মভার এবং দারিদ্র্য তাঁহার কাব্যচর্চ্চা ব্যাহত করিতে পারে নাই। ১৩৪০ সালে ৫৪ বৎসর মাত্র বয়সে কুমুদনাথ পরলোকগমন করেন। গ্রন্থকর্ত্রী গ্রন্থে হৃদয়গ্রাহী ভাবে এই অকপট সাধকের জীবনচিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বিবিধ মাসিক পত্রিকায় কুমুদনাথের কবিতা, প্রবন্ধ ও সমালোচনা বাহির হইয়াছে। তিনি কয়েকখানি পুস্তকও প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য-জীবন ও অধ্যাত্মজীবনের বিশদ পরিচয়ে জীবনচরিতখানি সুসম্পূর্ণ হইয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

চণ্ডালিকা-নৃত্যনাট্য—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ হইতে প্রকাশিত।

"রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দ্দূলকর্ণাবদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাই থেকে এই নাটিকার গল্পটি গৃহীত।"

চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি বুদ্ধশিষ্য আনন্দকে তৃষ্ণার্ত্ত দেখে জলদান করেছিল। চণ্ডালিনীর কাছে জল চেয়ে আনন্দ তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন, কোন মানুষই ছোট নয়, "শ্রাবণের কালো মেঘকে চণ্ডাল নাম দিলেই বা কী, তাতে তার জাত বদলায় না, তার জলের ঘোচে না গুণ।" মেয়েটি তাঁর রূপে মুগ্ধ হ'ল। তার মা যাদুবিদ্যা জানত। মেয়ে বললে, যাদুবিদ্যার সাহায্যে আনন্দকে এনে দিতে হবে। মা মন্ত্র পড়ে আনন্দকে এনে দিল, যাদুর শক্তি তিনি রোধ করতে পারলেন না। চণ্ডালীর ঘরে এসে আনন্দের মনে পরিতাপ এল, তিনি পরিত্রাণের প্রার্থনায় কাঁদতে লাগলেন। ভগবান্ বুদ্ধের মন্ত্রে অবশেষে আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।

এই গল্পটি নাট্যাকারে ১৩৪০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমানে নৃত্যাভিনয়ের জন্য এই গল্পটিকে গদ্য ও পদ্য অংশে সুর দিয়ে নৃত্য-নাট্যের রূপ দেওয়া হয়েছে। গানগুলি নূতন। কতক অতি হাল্কা সহজ গদ্যকবিতার মত, কতক প্রাচীনপন্থী গান। কবি বলেছেন, "এই নাটিকা দৃশ্য ও শ্রাব্য, কিন্তু পাঠ্য নয়।" যাঁরা চণ্ডালিকা অভিনয় দেখেছেন, তাঁরা এই উক্তির মূল্য বুঝবেন। যাঁরা দেখেন নি, তাঁরাও বইখানি পড়ে প্রচুর রস সম্ভোগ করতে পারবেন এবং শ্রেয়োলাভে সাহায্য পাবেন।

আজকালকার "হরিজন" আন্দোলনের দিনে 'চণ্ডালিকা'র বহুল প্রচার আশা করা যেতে পারে।

শ.

পূজার ছুটি—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য। আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা ও ঢাকা। পৃ. ৮০। সচিত্র। মূল্য ছয় আনা।

অনিমেষ পল্লীগ্রাম হইতে পূজার ছুটিতে শহরে মামার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছে। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও, সিনেমা, ট্রাম, এরোপ্লেন প্রভৃতি সবই সে এই প্রথম দেখিতেছে ও দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছে। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে এইগুলির কার্য্যপ্রণালী লেখক খুব সরসভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, কলিকাতা। সচিত্র। পৃ. ১০৩। মূল্য বারো আনা।

বিখ্যাত কর্ম্মী সাহিত্যিক কবি প্রভৃতির জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনা ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার ঔৎসুক্য লোকের চিরদিনই আছে। গ্রন্থকার শরৎচন্দ্রের সহিত বিশেষ পরিচয় ও প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি সেই লোকপ্রিয় কথাশিল্পীর জীবনের অনেক ছোট ও বড় ঘটনা ও জ্ঞাতব্য চিত্তাকর্ষক করিয়া লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থে অবশ্য শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ করা হয় নাই, "কারণ শরৎচন্দ্র পরলোকগমন করলেও তাঁর অস্তিত্বের স্মৃতি এখনও আমাদের এত নিকটে আছে যে, সমালোচনা করতে গেলে আমরা হয়ত যথার্থ বিচার করতে পারব না।...সুতরাং ও বিপদের মধ্যে না যাওয়াই সঙ্গত।" শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনসম্বন্ধে অনেক সংবাদ ইহাতে আছে, এবং তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ মধুর একটি পরিচয় এই বইতে পাওয়া যায়।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

শিশুখাদ্য—ডাক্তার শ্রীবিধুভূষণ পাল। মূল্য এক টাকা। ৩১।৫এ গোপালনগর রোড, আলিপুর, কলিকাতা।

গ্রন্থকার ঢাকা মেডিকাল স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। অবসর-কাল আলস্যে বা অর্থচিন্তায় অতিবাহিত না করিয়া তিনি যে বিজ্ঞান-পুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা আনন্দের বিষয়। আরও আনন্দের বিষয়, ভবিষ্য-ভরসাস্থল শিশুর কল্যাণে তাঁহার মনোনিবেশ। প্রথম অধ্যায়ে আছে খাদ্যের সারাংশ সম্বন্ধে 'কয়েকটি মূল কথা।' দ্বিতীয় অধ্যায়ে মাতৃস্তন্যপানের উপকারিতা ও বিধি। তৃতীয় অধ্যায়ে মাতৃস্তন্যের যথোচিত পরিমাণের অভাবে অতিরিক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা। চতুর্থ অধ্যায়ে মাতৃস্তন্যের অভাবে গোদুগ্ধ প্রভৃতি

আহারের ব্যবস্থা দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত। পঞ্চম অধ্যায়ে অপুষ্ট শিশুর খাদ্যবিধি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে গর্ভাবস্থায় শিশু-মাতৃ-মঙ্গল। সপ্তম অধ্যায়ে শিশুর স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়।

গ্রন্থখানি বঙ্গ-জননীদের করকমলে উৎসর্গ করিয়া গ্রন্থকার সেই দেবীর চরণে প্রণাম করিয়াছেন যিনি সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে সংস্থিতা। আশা করি পাঠক এই সুপাঠ্য পুস্তকখানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া নিজ নিজ গৃহলক্ষ্মীদের মধ্যে সেই জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ করিয়া ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লিখিত সেবাধর্ম নিষ্ঠা সহকারে পালন করিবেন এবং শিশুপালন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসঙ্গত উপদেশ পালন করিয়া ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের সহায় হইবেন।

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস

মণিদীপ—নজরুল প্রণীত। প্রকাশক আবদুর রহমান, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, বাঙালী বাজার, ঢাকা। মূল্য ৷৷০ আট আনা।

ছোট গল্পের বই; কিন্তু ছোট গল্প বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, গল্পগুলি সে ধরণের নয়। বনফুল যে ধরণের ছোট গল্প লিখিয়া থাকেন আকারে গল্পগুলি সেই ধরণের, প্রকারে সে উচ্চস্তর এবং সেরূপ রসঘন না হইলেও মোটামুটি ভাল লাগে। কিন্তু 'এলো-মেলো ভাবে ঠ্যাং ফেলা', 'হ্যাংলা দেহ' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ অত্যন্ত দোষের হইয়াছে।

নটী—শ্রীসুবোধ বসু প্রণীত। চিত্রাঙ্গদা পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

সুবোধবাবু পাঠক-সমাজে পরিচিত লেখক। আলোচ্য বইখানিতে একটি গ্রাম্য বালিকা নানা নিষ্ঠুর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া নটীতে পরিণত হইল এবং পরে আত্মহত্যা করিল, সেই করুণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। উপন্যাসের মধ্যে অত্যধিক নাটকীয় ভঙ্গী আসিয়া পড়ায় রসহানি ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। লেখকের ভাষা সরল এবং মিষ্ট। গ্রাম্যসমাজের প্রতিচ্ছবি-অঙ্কনে লেখক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কয়েকটি চরিত্র বেশ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মূর্খ কে?—শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেহারী, উৎকলবাসী, মারোয়াড়ী, কাবুলীওয়ালা প্রভৃতি বিদেশীরগণ কিরূপে বাংলা দেশকে শোষণ করিতেছে, পুস্তকটিতে তাহাই গল্পচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে এবং পদে পদে বাঙালীর মূর্খতার পরিচয় দিয়া লেখক তাহার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু।

লিপি-কৌশল বৈশিষ্ট্য—শ্রীমুকুট রায়। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পুস্তকখানির আয়তন ক্ষুদ্র—তাহারই মধ্যে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের লিপিকৌশলের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে লেখক আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও আমাদের ভাল লাগিয়াছে। সাহিত্য-রসিকগণের নিকট পুস্তকখানি আদৃত হইবে বলিয়াই আশা করি।

মীরা—শ্রীসুরুচিবালা রায়। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। পৃ. ৩৩৬।

উপন্যাসখানি আমাদের ভালই লাগিয়াছে। লেখিকার বর্ণনাভঙ্গী প্রশংসনীয়, রুচি মার্জ্জিত, ভাষা সরল এবং সংযত। স্থানে স্থানে লেখিকা সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, সেই স্থানগুলি মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে।

কালের দাবী—শ্রীসুধীরকুমার সেন। নবজীবন পাব্লিশিং হাউস ১৪৬, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

আভিজাত্য-পদদলিত মানবাত্মা এই যুগে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে, তাহারই ছবি লেখক নাটকের মধ্যে ফুটাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু প্রচারকার্য্যের জন্য চরিত্রগুলির মুখ দিয়া যে বড় বড় বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে রসসৃষ্টিতে বাধা পড়িয়াছে। লেখক আরও সংযত হইলে ভাল করিতেন।

প্রমীলার আত্মকাহিনী—শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য। মূল্য পাঁচ সিকা। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, কলিকাতা।

একটি নির্য্যাতিতা নারীর কাহিনী লইয়া উপন্যাস। লেখকের ভাষা সতেজ এবং দরদ দিয়া লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

যৌন বিজ্ঞান—আবুল হাসানাৎ। ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু, এম-বি, ডি-এস্‌সি, কর্ত্তৃক ভূমিকা সম্বলিত। ষ্ট্যাণ্ডার্ড লাইব্রেরী, নারিন্দিয়া, ঢাকা। সচিত্র। মূল্য ৩৷০।

সমাজ মাত্রই গতিশীল। তাই কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক চিন্তাধারা ও আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে-আলোচনা আমাদের দেশে সভ্য সমাজে দুর্নীতিব্যঞ্জক বলিয়া বিবেচিত হইত, আজ তাহাই সমাজের পক্ষে একান্ত কল্যাণকর বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। যৌনজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচ্য পুস্তকখানি তাহার একটি দৃষ্টান্ত।

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় যৌন জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করাও যে আমাদের পুত্রকন্যাদের আবশ্যক, একথা এখন অধিকাংশ লোকই স্বীকার করিবেন। এ-বিষয়ে শিক্ষাদান কিন্তু অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ কাজ। মৌখিক শিক্ষাদানের পক্ষে পিতামাতাই উপযুক্ত গুরু। এ প্রসঙ্গ উপস্থিত ক্ষেত্রে অবান্তর। বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তক হইতে জ্ঞান আহরণ করিতে হইলে আলোচ্য গ্রন্থখানি সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত।

বাস্তবিক যৌন ব্যাপার সম্বন্ধীয় এমন কোনও জ্ঞাতব্য বিষয় নাই যাহা এই পুস্তকে আলোচিত হয় নাই। যৌনবোধ, যৌনবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ, দাম্পত্যজীবন, প্রজনন, জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। গিরীন্দ্রশেখর ভূমিকায় যথার্থই বলিয়াছেন, পুস্তকখানিকে 'কামসংহিতা' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথ্যসঙ্কলনে লেখক এই বিষয়ের আদিগুরু বাৎসায়ন হইতে আরম্ভ করিয়া বহু আরবী, পারসী ও আধুনিক ইউরোপীয় মনীষিগণের মত সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সেইগুলি উদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, যুক্তিতর্কের দ্বারা পরস্পরবিরোধী মতের মধ্যে নিজস্ব একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সকল বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত হয়ত সকলে মানিবেন না, কিন্তু তাঁহার আলোচনার ধারা যে সর্ব্বত্রই বিজ্ঞানসম্মত একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

লেখকের ভাষা মার্জ্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন। পরিভাষা সর্ব্বত্র সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; যেমন, Fetishism = অত্যনুরাগ, Sexual perversion = যৌন বিকার। একটি বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টি থাকায় গ্রন্থখানি, উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বিদেশীয় মনীষীদিগের প্রামাণিক গ্রন্থ অপেক্ষা আলোচ্য পুস্তকখানি কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে।

অভিভাবকদিগকে, জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিমাত্রকেই পুস্তকখানি নিঃসংকোচে পাঠ করিতে বলা যায়। প্রদর্শিকা ও পরিভাষা সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তকখানির উপকারিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পরিশেষে শুধু একটিমাত্র বিষয়ের উল্লেখ করিব যাহা পুস্তকে স্থান না পাওয়াই উচিত ছিল। পুস্তকের গুরুত্বের সহিত নানা রঙে রঞ্জিত চিত্রগুলির একেবারেই সামঞ্জস্য নাই। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে ঐগুলি পরিত্যক্ত হইবে।

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র

প্রবাসের পত্র (পুত্রের প্রতি পিতার উপদেশ)—শ্রীপাঁচকড়ি সরকার, এম-এ., এল-টি। এস, সি, আঢ্য এণ্ড কোং লিমিটেড, ১২ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৪০।

'পুত্রের প্রতি পিতার উপদেশ' রূপে রচিত এই পত্রগুলির মধ্যে লেখক স্বাস্থ্য, প্রাতঃকৃত্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বন্ধুত্ব, শিষ্টাচার লোকচরিত্র, চিত্তশুদ্ধি, সামাজিক আন্দোলন, বিদ্যাশিক্ষা, আদর্শ প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। বইখানি যে বালকদিগের চরিত্রগঠনে বিশেষ সহায়তা করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভাষা সরল ও স্বচ্ছন্দ।

দৈনিক-উপাসনা (নিত্যপাঠ্য বেদ ও উপনিষৎসহ)—স্বামী সেবানন্দ। প্রকাশক শ্রীভুবনমোহন দাস, এম-এ। ২০ চিৎপুর ব্রিজ এপ্রোচ, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৬৪। মূল্য চারি আনা।

আলোচ্য পুস্তকটি একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ। গ্রন্থকার ভগবদুপাসনা ও স্বাধ্যায়ের সৌকর্য্যার্থে গীতা, বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পাদটীকায় প্রত্যেক শ্লোকের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্ম-পিপাসুদিগের নিকট বইখানি সমাদৃত হইবে আশা করি।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

মাদাম হালিদা এদিবের জীবন-স্মৃতি—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত। প্রকাশক—শ্রীললিতমোহন সিংহ, ২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১০২ পৃ। মূল্য এক টাকা।

এই গ্রন্থে মাদাম হালিদা এদিবের ব্যক্তিগত জীবনের এমন কোনো বিশেষ ঘটনা ব্যক্ত হয় নাই যাহা পাঠক-মনে প্রেরণা সঞ্চার করিতে পারে। এই বিদুষী মহিলার জীবনস্মৃতি উপলক্ষে গ্রন্থখানি তুরস্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ভাষা খুব সুললিত নয়, অনুবাদ অনেক স্থলেই ইংরেজী-গন্ধী। বিশেষ করিয়া কবিতায় ব্যবহার্য্য বহু শব্দ সাধারণ গদ্যে ব্যবহৃত হওয়ায় পড়িতে অসুবিধা হয়। ছাপার ভুল অগণিত।

শ্রীপরিমল গোস্বামী

এ টেল অফ টু সিটিজ—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র। মিত্র এণ্ড ঘোষ, ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

চার্লস্ ডিকেন্সের বিখ্যাত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেদের জন্য লেখা। ভাষা সরল ও মনোরম। গ্রন্থের প্রারম্ভে চার্লস্ ডিকেন্স সম্বন্ধে আলোচনাটি মূল্যবান্।

পৌরাণিক সতীচিত্র—স্বর্গীয়া রত্নবালা বিশ্বাস দি নিউ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং কোং লিঃ, ৪০ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

সতী, সাবিত্রী, শৈব্যা, সীতা, দময়ন্তী, চিন্তা, বেহুলা, গান্ধারী প্রভৃতির চরিতকথা বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। এই সব পুণ্যশীলা, পূতচরিত্রা নারীর চরিতকথা আমাদের মেয়েদের পাঠ করা উচিত। ইহাতে চিত্ত উদার, মন পবিত্র এবং স্বভাব সুন্দর ও সেবাপটু হয়।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

যজুর্ব্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি—শ্রীহেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা। পি. ৬১, ল্যান্সডাউন রোড এক্সটেন্শন, বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সভার কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেনশর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৯৮ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা।

গ্রন্থের বিষয় স্পষ্ট। সাধারণতঃ যাঁহারা বিবাহাদিতে পৌরোহিত্য করেন তাঁহাদের সংস্কৃতের—বিশেষতঃ বৈদিক সংস্কৃতের—জ্ঞান অল্প। এইরূপ একখানা ছাপার বইয়ের সাহায্যে কাজ করাইলে ক্রিয়ার মন্ত্র সম্যক্ প্রযুক্ত হইবে, আশা করা যায়। বিশেষতঃ, গ্রন্থকার সমস্ত মন্ত্রের বাংলা অনুবাদ দিয়া অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

মন্ত্রে ভুল থাকিলে ক্রিয়া পঙ্গু হয়; বৃত্রাসুর যে ইন্দ্রের হনন-কর্ত্তা না হইয়া ইন্দ্রকর্ত্তৃক হত হইয়াছিল, সেটা তাহার পিতার যজ্ঞকালে মন্ত্রোচ্চারণে ত্রুটির জন্য—"স্বরতোঽপরাধাৎ"। আজকাল অবশ্য উচ্চারণে তত জোর দেওয়া সম্ভব নয়; তবে অর্থ বুঝিয়া মন্ত্র প্রয়োগ করা উচিত। হেমবাবুর প্রচেষ্টার ফলে বিবাহের মন্ত্র-প্রয়োগে এই প্রকার মারাত্মক ভুলের সংখ্যা কমিয়া যাইবে, আশা করা যায়।

বইখানার ছাপার ভুল অনেক রহিয়া গিয়াছে; কতক গ্রন্থকার শুদ্ধিপত্রে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু আরও রহিয়া গিয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আবিষ্কার-যাত্রী—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়। প্রকাশক—গোল্ড্‌কুইন এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ৪১টি চিত্র ও মানচিত্র সংবলিত। মূল্য এক টাকা।

পৃথিবীর অজ্ঞাত দেশকে জানিবার জন্য, দুর্গমকে অধিগত করিবার জন্য, চিরকাল এক দল মানুষ প্রাণপণ করিয়া আসিয়াছে, দুঃখ-ব্যাধি-মৃত্যু, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-যন্ত্রণা, কিছুতেই পশ্চাৎপদ হয় নাই; আর ইহাদের দুঃসাহসের ভিত্তির উপরই মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতার অনেক অংশ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দুর্গম পথযাত্রায় অংশ গ্রহণ ত দূরের কথা, এই সকল যাত্রা ও আবিষ্কারের কথা জানিবার যে স্বাভাবিক কৌতূহল তাহাও আমাদের অধিকাংশের মনে জাগ্রত নয়। কৈশোর হইতে এই কৌতূহলবোধ যাহাতে আমাদের মনে জাগ্রত হইতে পারে সেই জন্য প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কালের হেম হেডিন পর্য্যন্ত বহু আবিষ্কার-যাত্রীর বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

আমাদের দেশের শিশুসাহিত্যে আজকাল "রোমাঞ্চকর" নকল অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনীর খুব কদর; তাহার তুলনায় অনেক অধিক শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তহারী এই সত্য অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনীরও যথেষ্ট প্রচার হওয়া উচিত।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

মাঝি

শ্রীসুশীল জানা

…ঠিক এমনি সময়েই ত! স্নিগ্ধ সন্ধ্যা আসছে ঘরমুখো পাখীদের ডানায় ভর ক'রে, নদীর ওপারের গাছপালা ক্রমশঃ হয়ে এল দুনিরীক্ষ্য, জলার ধারে পাশে একটা কাকপক্ষীরও চিহ্ন নেই। ঠিক এই সময়েই ত! ওই ত আখ-ক্ষেতের ওপাশ থেকে বেহায়া সেই মানুষটি চটুল কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে আসছে এদিকে। তার পর পারুলের গায়ে মাথায় গোটাকয়েক ফণীমনসার ফুল এসে পড়ল।

লজ্জা-সরম, ভয়-ভাবনা কিছু নেই ওর—ঘাটের উপরে…কারুর চোখে যদি প'ড়ে যায়…কত হাসাহাসি করবে তারা, সমবয়সীদের ঠাট্টার জ্বালায় আর বাঁচা যাবে না। পারুল কৃত্রিম কোপকটাক্ষে পিছন ফিরে তাকাল স্বামীর দিকে। সুমন্ত্র হাসিমুখে কেবল শেষ লাইনটি গাইছে :

কথা কও না কেন বৌ…কথা কও না কেন বৌ

পারুল হেসে ফেললে শেষকালে। মাথা নেড়ে নেড়ে সুর ক'রে ব'ললে :

কথা কইব কি ছলে, কথা কইতে গা জ্বলে।

তার পর স্বাভাবিক কণ্ঠে ব'ললে, তুমি যাবে এখান থেকে—না গায়ে জল ছিটবো? পালাও বলছি এখান থেকে—ঘাটে কেউ এসে পড়বে।

কিন্তু সুমন্ত্রের চলে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ঘাটের উপরে—পারুলের পাশটিতে এসে নির্ব্বিকার ভাবে ঝুপ ক'রে ব'সে পড়ল, কপাল চাপড়ে বললে—হা রে কপাল! এমন বৌ জুটেছে, ঘর করা আর চলে না।

পারুল ভালমানুষটির মত জিজ্ঞেস করলে—ওই পারুলকে ছাড়া বিয়ে করব না, ওর সঙ্গে বিয়ে না হ'লে খাব না…পালাব—হ্যাঁ গো, এসব কে বলেছিল জান?

সুমন্ত্র দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললে,—লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতেই জীবন গেল আমার—আর এই দেখে এলাম মল্লিকদের। আহা, বুড়োর বয়েস ষাট পেরিয়ে গেল বোধ করি আর তার বৌয়ের বয়েস বোধ করি আদ্ধেকের আদ্ধেক—কিন্তু কি মনের মিল! এক জন চুলের মুঠি ধ'রে হাত-পা ছোঁড়া-ছুঁড়ি করছেন—আর এক জন দিব্যি ঝাঁটা চালিয়ে যাচ্ছেন। ছাড়াতে যেতে আমাকেই দু-জনে পিটতে এল।

—ওমা, বল কি গো? দু-জনেই কবে খুন হয়ে মরবে দেখছি। তা তুমি তাদের ছাড়িয়ে দিয়ে এলে না?

ভয়ে সুমন্ত্র বললে—বাপ্! দু-জনেই যে ভাবে তেড়ে এল—কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। বুড়োমানুষ, বৌকে জব্দ করতে পারে না—তাই সেদিন এসে হাত ধরে বলেছিল, তুই আমার ধম্মের বাপ সুমন্ত্র…রাক্ষসীর হাতদুটো বেঁধে দিতে পারিস, দেখি কি রকম জব্দ হয় না। বাপ রে… আজ যেতেই যে তাড়া—পালিয়ে এসেছি।

—আহা, বীর পুরুষ!…

সুমন্ত্র পেশল হাত দুটো মেলে বললে—দেব ওই জলে ফেলে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে—চল, ঘর-টর নেই নাকি!

পারুল একটুও নড়ল না। স্বামীর জানুর ওপরে চিবুকে ভর দিয়ে অন্ধকার নদীবক্ষের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুমন্ত্র তাড়া দিয়ে বললে—তাড়াতাড়ি দুটি রাঁধবি—চটপট খেয়ে ঘুমব। আবার রাত থাকতে উঠে যেতে হবে। মালবোঝাই হয়ে ঘাটে নৌকো ব'সে আছে।

পারুল অনড় ভাবে জবাব দিলে—কাল আর যেতে

হয় না তোমাকে—তারা অন্য মাঝি দেখে নিক্‌গে। এই ত মাত্র দিন-দুই এলে।

পারুলের চুলগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে সুমন্ত্র বললে—তাই কি হয় গো—মালিক আমাকে কত বিশ্বাস করে। তবুও গঞ্জের হাটে মাল খালাস না দিলে নয়।

নীরবে কেটে গেল কিছুক্ষণ।

সুমন্ত্র ফের একটা তাড়া দিয়ে বললে—ঠাকরুণের ঘরে ফিরতে আর মন নেই না কি? খেয়ে উঠতেই যে রাত শেষ পহর হয়ে যাবে···আর ··

সুমন্ত্রর মুখের দিকে তাকিয়ে পারুল ফিক্‌ ক'রে হেসে পিতলের কলসীটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। সুমন্ত্র ঘাট থেকে উঠে চলে যাচ্ছিল—তাকে ডেকে বললে,—ওগো, দাঁড়াও—একসঙ্গে যাব। বাঁশ-বনটার কাছে আমার ভয় লাগে। ওদিকে মুখ ফিরিয়ে ব'সো, আমি চট ক'রে পা ধুয়ে নি। ঘাটের দিকে কেউ এলে পালাবে ব'লে দিচ্ছি।

পারুলকে লজ্জায় ফেলতে ঘাটে কেউ এল না। তারা একসঙ্গে ঘরে ফিরলে।

পরদিন ভোরে সুমন্ত্র চলে গেল নৌকায়।

কি যে পাগল এই সুমন্ত্র—বলে, ঢেউয়ের দুলুনি না হ'লে নেশা হয় না। কেবল নদী আর নৌকো। ক'দিনই বা আর থাকে ঘরে। কিন্তু যে ক'দিন থাকে তাতে পারুলের অন্তরটি মধুতে ভরে দিয়ে যায়। পারুল হয়ত রান্নায় ব্যস্ত—সুমন্ত্র সহসা উদয় হয়ে বললে, এবার কলতায় ধান বেচতে গিয়ে এ্যায়সা বাঁশী শিখে এসেছি শুনলে মুচ্‌ছা যাবি পারুল।

—এখন দিক ক'রো না বলছি, যাও এখান থেকে।

—তার মানে? শুনবি নে?

—না, শুনব না।

কিন্তু পারুলকে শুনতে বাধ্য হ'তে হয়—তারই শাড়ীর আঁচলে বেচারী বন্দিনী। সুমন্ত্র বাঁধা শেষ ক'রে বলে—এবার শোন।

এ-রকম ভাবে বেশীক্ষণ কিন্তু চলে না। শ্বশ্রূ ভবানীর কণ্ঠস্বরে পারুল ব্যাকুল হয়ে বলে—ওগো, তোমার পায়ে পড়ি—খুলে দাও। ওই মা এসে পড়ল ব'লে। ওগো···

কিন্তু ওগো নির্ব্বিকার। অধিকন্তু গান ধরলে।

এই রকম···এই রকম কত। সুমন্ত্রের অত্যাচার আশীর্ব্বাদের মত স্নিগ্ধ লোভনীয়।

স্বপ্ন এসেছিল, চলে গেল। পিছনে কার পায়ের শব্দ শুনে বিধবা পারুল ভয়ে চম্‌কে উঠে ফিরে তাকাল সত্যিই তার মাঝি এল নাকি! জ্যোৎস্নারাতে অথবা অন্ধকারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে তার মনে হয় স্বামী যেন তার দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এ পদশব্দ তার মাঝির নয়—পারুল ফিরে দেখল, পিছনে অশ্রু-সিক্ত চোখে বৃদ্ধা শ্বশ্রূ দাঁড়িয়ে। শোকাতুরা ভাষাহারা সন্তানহারা জননীর স্নিগ্ধ দৃষ্টির সান্ত্বনায় পারুলের চোখ দুটি অশ্রুভারে টলমল ক'রে উঠল—শূন্য কলসীটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

ভবানী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে—সন্ধ্যে হয়ে গেছে মা, এবার ঘরকে চল। আর কতক্ষণ ব'সে থাকবি একলাটি এখেনে।

কতক্ষণ যে এই হতভাগিনী বিধবা পারুলের একলাটি ঘাটে ব'সে স্বপ্নমধুর আলোয় আলোয় ঘুরে ঘুরে কাটত কে জানে! রোজই তার এমনি—ভবানীকে খোঁজ ক'রে ডেকে নিয়ে যেতে হয়।

পারুল কলসী নিয়ে জলে নামল। ওই জ্যোৎস্না-উজ্জ্বল কাকচক্ষুর মত জল···কত গ্রাম, দেশ-দেশান্তরগামী ঐ গহীন জলের নদীতে তার মাঝি তার নাওর সঙ্গে গিয়েছে হারিয়ে!···নদীর স্রোত দূর দিনের খণ্ড-ছিন্ন বিরহগুলিকে হিমেল হাওয়ায় পারুলের মনে পুঞ্জীভূত ক'রে তোলে।

রাত হয়েছে বেশ। বাবলা-বনের ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার পথে ওরা দু-জনে আনমনে পথ চলছিল। দু-পাশে দিগন্ত-প্রসারী ধানবন—হঠাৎ সেখানে কে যেন পা-ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌ল···তার পর চাপা হাসিতে ফুলে ফুলে উঠল যেন।··· সুমন্ত্র ঠিক্ এমনি ক'রে ভয় দেখাত পারুলকে। পারুল চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ল—ভয়ে পাথরের মূর্ত্তির মত হয়ে গেল।

কিন্তু না, সুমন্ত্র নয়। শরতের উদ্দাম এক ঝলক বাতাস পারুলের আঁচল তোলপাড় ক'রে ধানবনের উপর

দিয়ে সর্ সর্ ক'রে জ্যোৎস্না-বিধৌত দিগন্তের দিকে ছুটে গেল।

ভবানী জিজ্ঞেস করলে—দাঁড়ালি কেন মা?

পারুল মৃদু কণ্ঠে বললে—না মা, চল।

সন্ধ্যে থেকে ঝড় সুরু হয়েছিল। আকাশে জলো মেঘের আবির্ভাবে চাষীদের ভেতরে সাড়া পড়ে গিয়েছে। ছুতোর-মিস্ত্রী রামহরির কাজের অন্ত নেই—আলো জ্বেলে রাত্রিতেও তার লাঙল মেরামত চলছে। এক সময়ে তার আলোও নিবল—নির্জ্জন ঘুমন্ত গ্রাম, কিন্তু ভবানী আর পারুলের চোখে ঘুম নেই। স্মৃতি-কণ্টকিত নিদ্রাহীন তাদের মেঘলা রাত্রি। সুমন্ত্রর কথা বার-বারই তাদের মনে পড়ছে।

এই ঝড় আর এই রাত্রি—সুমন্ত্র যদি এ-সময় দূর নদী-পথে থাকৃত, তাহ'লে এই দুটি নারীর আর উদ্বেগের অন্ত থাকত না। ভবানী ঘর-বার করত আর জিজ্ঞেস করত,—বৌমা, ঝড়টা একটু কমল ব'লে মনে হচ্ছে না? মেঘটাও যেন কেটে যাচ্ছে।

কিন্তু ঝড় আর মেঘ দুই-ই সমান, তবু পারুল বলত—তাই ত মনে হচ্ছে মা।

মনকে এই প্রবোধ দেওয়া কতক্ষণ চলে? পারুল মনে মনে বলত, হে ভগবান, মাঝি যেন ভালয় ভালয় ফিরে আসে···হে ভগবান···কত অনাগত আশঙ্কায় পারুল শেষকালে কেঁদে ফেলত। সন্তানের অমঙ্গল-আশঙ্কায় ভবানী প্রবোধ দিত বৌকে—চোখের জল ফেলা ভাল নয়, কিন্তু সে নিজেই ফেলত কেঁদে। বধির দেবতার কাছে মানসিকের ঋণ বেড়ে উঠ্‌ত ক্রমশঃ। পারুল জানালা খুলে বাইরের অন্ধকারের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকৃত—জলের ছিটায় কাপড় যেত ভিজে—চুল উড়ত মাতাল বাতাসে—ভাবত তার মাঝির বিপদের কথা, এই ঝড়ের মুখে প'ড়ে কি করছে সে। নৌকোটা হয়ত খড়কুটোর মত ভেসে চলেছে—তার মাঝি প্রাণপণে ধরে আছে হাল—তার সুপুষ্ট দেহের সমস্ত পেশীগুলি···দৃঢ়তাব্যঞ্জক নির্ভীক মুখমণ্ডল' তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভাসত। সুমন্ত্র ফিরে এলে এবার আর সে কিছুতেই যেতে দেবে না···পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবে।

ভবানী বলত—বোষ্টমের ছেলে—কোথায় ভগবানের নাম গান ক'রে দিব্যি থাকবি—তা না, মাঝিগিরি। এবার আসুক ও ফিরে। যেতে দিও না ত বৌমা।

চড়্ চড়্ ক'রে বাজ পড়ে। ভবানী ভগবানের নাম করতে গিয়ে ভুলে সুমন্ত্রের নাম করে।

আজকে ঝড়ের রাত্রিতে সে ব্যাকুল ব্যগ্রতা ছিল না বটে, কিন্তু সেইদিনকার স্মৃতিগুলো এই দুটি নারীকে যম-যন্ত্রণা দিচ্ছিল। ভবানী নিজের বিছানায় ছট্‌ফট্ করছে। পারুলের স্মৃতিতে দূর দিনের ছায়া···একটি এমনি ঝড়ের রাত্রির কাহিনী।

···ঝড়ের কাতর গোঙানি···পারুল বিছানায় শুয়ে তার মাঝির কথা ভাবছে—ঘরের দরজা খোলা। ঝঞ্ঝাহত ঝিমকালো আকাশের দিকে পারুল তাকিয়ে···ঝুপ ক'রে কোথায় শব্দ হ'ল, পারুলের সেদিকে কান নেই। এক সময়ে তার দূরচারী দৃষ্টিকে বাধা দিল একটি কালো মূর্ত্তি—পারুল ভয়ে কাঠ হয়ে পড়ে রইল বিছানায়, গলা দিয়ে তার এমন স্বর বেরুল না যাতে পাশের ঘরে শায়িত শাশুড়ীকে সে ডাকে। মূর্ত্তিটা ক্রমশঃ তার ঘরের দিকে এগিয়ে এল···তার পর ঘরে ঢুকল তারই···এগিয়ে আসছে তার দিকে···'মাগো' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠল পারুল। কিন্তু মূর্ত্তিটার সিক্ত বাহুর সুন্দর বেষ্টনে খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠল সে। ভবানী পাশের ঘর থেকে পারুলের আর্ত্ত কণ্ঠস্বর শুনে লণ্ঠন নিয়ে ছুটে এসেছিল—সর্ব্বাঙ্গ-সিক্ত সুমন্ত্রকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে দেখে পিছিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—ঢুকলি কোন্ দিক দিয়ে?

—পাঁচিল টপ্‌কে।

—বলিহারি সাহসকে। এই ঝড়-জলে কোত্থেকে এলি?

—সন্ধ্যের ঘাটে নৌকা ভিড়েছিল।

ভবানী আলো রেখে চলে গেল। পারুল গামছা দিয়ে সুমন্ত্রের গা মুছতে লাগল। কিন্তু কাপড়ের কি হবে? সুমন্ত্রর সব কাপড় নৌকোয় রয়ে গিয়েছে। অগত্যা

পারুলেরই একখানা লাল চওড়া-পাড় শাড়ী পরতে হ'ল তাকে। সুমন্ত্র বললে—খুব ভয় পেয়েছিলি—না?

—ভয় লাগবে না? অমন ক'রে কেউ ঘরে ঢোকে?

সুমন্ত্র হাসতে লাগল।...

পারুলের স্মৃতিবিলাস গেল ভেঙে। ভয়ার্ত্ত চক্ষু মেলে সে দেখলে—অন্ধকারে ঐ চৌকাঠের কাছে মাঝি যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। উজ্জ্বল চোখ দুটো অন্ধকারে জল্ জল্ করছে...ধব্ ধবে দাঁতগুলো...মাঝি তার দিকে এগিয়ে আসছে।...

পারুলের গোঙানি শুনে ভবানী আলো নিয়ে ছুটে এল। চোখে মুখে জলের ছিটে দিতে পারুলের মূর্চ্ছা ভাঙল। ভবানী জিজ্ঞেস করলে—অমন হ'ল কেন মা?

পারুল নির্ব্বোধের মত ভবানীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তার পর পারুলের মুখ থেকে ধীরে ধীরে সমস্ত শুনে বললে—আজ থেকে আর একলা শুয়ে কাজ নেই মা—আমার বিছানাতেই শুবি। হতভাগা আশে-পাশেই ঘোরে—আমিও তাকে দু-এক দিন দেখেছি। আমাদের ছেড়ে সে কি কোথাও যেতে পারে? কাল তারক ওঝার কাছ থেকে একটা মাদুলি এনে দেব এখন।

ভয় করে পারুলের—বাইরের দিকে, দূরের দিকে সে পারত-পক্ষে তাকায় না। বিগত সুন্দর দিনগুলির স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির পর্দ্দায় সুমন্ত্রের মূর্ত্তি ভেসে ওঠে। স্বপ্ন ছুটে যায়—তার মাধুর্য্য ছুটে যায়—অবশিষ্ট থাকে বিভীষিকা।

এই গ্রাম, এই ঘর, এই পথ—এর সবগুলোর সঙ্গে সুমন্ত্র মিশে আছে, তাকে ভোলা যে অসম্ভব; অনুক্ষণ তাই পারুলের দৃষ্টির সীমায় সুমন্ত্রের প্রেতমূর্ত্তি সারা রাত্রি ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। জানালায় খুট্ ক'রে শব্দ হয়, বাতাসে মশারিটা নড়ে, নিজের হাতটাই হয়ত বুকের ওপরে পড়ে থাকে—পারুলের গা ছম্ ছম্ করে।

সুমন্ত্রকে ভয় করে পারুল।

গভীর নির্জ্জন রাত্রিতে যখন খিড়কীর বাঁশবনে বাতাস লাগে—বাঁশগুলো দুলে দুলে করুণ আর্ত্তনাদ করে, ফুটফুটে জ্যোৎস্না জানালার কাছে ছিটকে পড়ে, তখন পারুলের রক্ত জল হয়ে যায়—সর্ব্বাঙ্গ ঝির ঝির ক'রে অবশ হয়ে আসে। পারুল মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে।

ভবানী শেষকালে ওষুধ এনে দিলে।

ওষুধের গুণেই হোক আর দৃঢ় বিশ্বাস বা মনের জোরেই হোক—পারুল দুর্ব্বলতা কাটিয়ে উঠলে। নির্ভয়ে সে বাইরের দিকে তাকায়, দূরের দিকে তাকায়। মুখ নীচু ক'রে অথবা নিজের অঙ্গের দিকে তাকিয়ে অনুক্ষণ ভীত-কণ্টকিত ভাবে আর কাটাতে হয় না। নির্ভয়ে সে চলাফেরা করে।

সুমন্ত্রের বিভীষিকাময় মূর্ত্তি আর পারুলের দৃষ্টির সীমানায় এল না বটে, কিন্তু অতনুর মত গভীর ভাবে অন্তরে করলে অধিষ্ঠান। অমৃতের মত মিষ্টি এ হলাহল—মরণও নেই কিন্তু যন্ত্রণা আছে, আর সে যন্ত্রণার তুলনা হয় না।

গোরস্থানের পাশ দিয়ে পারুল নিত্য জল নিয়ে ফেরে, সন্ধ্যে হয়ে যায়। জ্যোৎস্নায় পথঘাট ঝক্ ঝক্ করে। ঝাঁকড়া পিঠালি গাছটায় জ্যোৎস্না প'ড়ে আগে মনে হ'ত সুমন্ত্র যেন দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আজকাল পারুল খুব ভাল ক'রে দেখে—মাঝি তার সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। পারুল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাশ দিয়ে চলে যায় নির্ভীক ভাবে—সুমন্ত্রের কথা মনে মনে গুঞ্জরণ করে।

ভবানী জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ মা, আজকাল কিছু আর দেখতে পাস?

মৃদুকণ্ঠে পারুল জবাব দেয়—কই, না মা।

কোথায় গেল তার মাঝি? তখন অনুক্ষণ মনে হ'ত, সুমন্ত্র তার চার পাশ ভরে আছে—ভরে আছে তার অন্তর আর বাহির। কিন্তু এখন কোথাও তার চিহ্ন নেই। স্বপ্নও দেখে না পারুল তাকে, মাঝিকে তার স্বপ্ন দেখা—সে দুঃস্বপ্নই হোক আর সুস্বপ্নই হোক। সুমন্ত্রকে স্বপ্ন দেখবার জন্যে কত রকমের প্রক্রিয়া করে পারুল। বিছানা বাঁকা ক'রে পাতে, ঘুমোবার আগে তার মাঝির

কথা ভাবে। কিন্তু ঘুম তার ভারি সুন্দর হয়। পারুলের স্বপ্নশিহরিত রজনীগুলি কোথায় হারাল কে জানে।

মেয়েরা জিজ্ঞেস করে পারুলকে—হ্যাঁ রে, আজকাল আর কিছু দেখিস না?

—না।

জবাবে তারা একটু ক্ষুণ্ণ হয়—পারুলও ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে জবাব দেয়। যে-সুমন্ত্রের ছায়ামূর্ত্তির উপস্থিতি পারুলের মনে পূর্ব্বে ভয়ের সঞ্চার করত, সেই ভয়কেই সে এখন প্রাণ-মন দিয়ে কামনা করে।

নীরব রাত্রি যখন আপন গভীরতায় ঝিম্ ঝিম্ করে, তখন পারুল বিছানায় শুয়ে শুয়ে সুমন্ত্রের উপস্থিতি কল্পনা ক'রে ভয় পাবার চেষ্টা করে। বৃদ্ধা শ্বশুর হাত কখনও তার গায়ের উপর এসে পড়লে সুমন্ত্রের বীভৎস ছায়ামূর্ত্তির হিমশীতল স্পর্শ সে কল্পনা করে। ভয়ে ভয়ে গৃহকোণের অন্ধকারের দিকে তাকায়। কিন্তু না, কোথাও কিছু নেই। রুদ্ধ জানালায় যে টুক্ টুক্ শব্দ করে, গুন্ গুন্ শব্দ করে সে বাতাস, কোণের জমাট অন্ধকারে যে কালো মত জিনিসটা দেখা যায়—সেটা বড় একটা প্যাটরা, জ্যোৎস্নাবিধৌত প্রাঙ্গণে যে কালো ছায়াটা ধীরে ধীরে নড়ে সেটা ঘরের মধ্যে ঝুঁকে-পড়া তেঁতুলগাছের একটা ডালের ছায়া—মাঝি নেই, কোথাও নেই।

পারুল পা টিপে টিপে খিড়কির দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়, মর্ম্মরায়মান বাঁশবনটার দিকে তাকায়—কোথাও কিছু নেই। পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় বহু দূর দেখা যায়···বহু দূর···মাঠের পর মাঠ। মাঠের মাঝখানে সুমন্ত্রের বাঁশীও সে পূর্ব্বের মত আর শোনে না—কোনও ছায়ামূর্ত্তিকেও মাঠের আলিপথ ভেঙে টলতে টলতে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে না—মূচ্ছিতও সে পূর্ব্বের মত আর হয় না। হতাশ হয় পারুল—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার সে ঘরে গিয়ে শোয়।

দিনরজনীর প্রতিটি মুহূর্ত্ত সে সুমন্ত্রকে আশা করে। মনে মনে বলে, ভয় আর সে করবে না। মাঝি তার আসুক—প্রতিটি মুহূর্ত্ত তার উপস্থিতিতে ভ'রে দিক।'

কিছু দিন পরে।

ভবানী ভাবলে, পারুলের দুঃখের গুরু ভার কমেছে। পড়শীরা কেউ ভাবলে, মানুষের শোকের রীতিটা এই রকমই বটে, কালের ঝড়ো হাওয়া তার সমস্ত গুরু ভারকে হালকা পালকের মত কোথায় নিয়ে যায় উঠিয়ে—আবার কেউবা মনে মনে হেসে ভাবলে অন্য রকম।

এখন পারুল আর ভবানীর বিছানা আলাদাই পাতা হয় দুটো বিভিন্ন ঘরে, জল নিয়ে ফিরতে দেরিই করে পারুল, তার সহজ গতির দিকে লক্ষ্য করলে মনেই হয় না যে পূর্ব্বরাত্রির আতঙ্ক তার আর আছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সম্ভব রাত্রিতে পড়শীদের বাড়ীতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় পারুল। ওর বাড়ীতে হঠাৎ উঁকি মেরে বলে, কি হচ্ছে গো?···সেখানে কিছুক্ষণ গল্প করে—তার পর উঠে পড়ে। আবার অন্য এক বাড়ী যায়—সেখানেও দু-দণ্ড গল্প করে। কেউ যদি বলে, চল্—এগিয়ে দিয়ে আসি। পারুল অমনি 'না না' ক'রে একাই বেরিয়ে পড়ে, সকলেই বুঝলে, পূর্ব্বের চঞ্চল পারুল আবার তেমনি স্বভাবটিই পেয়েছে, অত যে ভয় ছিল তাও ভেঙেছে, দুঃখকেও ভুলেছে সে।

বড় কাঁচা বয়সে হতভাগিনী স্বামী হারিয়েছে,—নারী-সুলভ সমবেদনায় ভবানী পারুলের দিকে এক সময়ে তাকাতে পারত না, চোখে জল ভরে আসত। নিজের ব্যথা ত আছেই আবার তার উপরে সমবেদনা—এই দুটোর তীব্র দহনে জলে পুড়ে ভবানী চাইত, আর সহ্য করা যায় না—পারুল মেয়েটার দুঃখ দূর হোক—আহা, বড় কষ্ট পাচ্ছে। তাই সে ওষুধ এনে দিয়েছিল বুড়ো মানুষ চার ক্রোশ পথ হেঁটে। কিন্তু পাঁচ জনের পাঁচ কথা কানে শুনে আর তার সঙ্গে পারুলকে রাত-বিরেতে এখানে-ওখানে নির্ভাবনায় ঘুরতে দেখে মুষড়ে পড়ল ভবানী। অন্ধ মাতৃহৃদয়ের একটা অহেতুক হিংসা অন্তরে তার গভীর রেখাপাত করলে। সে ফিরে চাইলে, পারুল কাঁদুক, পারুল দুঃখ পাক। অমন ছেলে তার সুমন্ত্র—তার দুঃখ পারুল কোন দিনই যেন না কাটিয়ে উঠতে পারে। আলাদা বিছানার জন্যে সে অসন্তুষ্ট হয়েছিল বটে, সাবধানে থাকবার জন্যে একটা আপত্তিও

তুলেছিল বটে, কিন্তু পারুল সে কথা কানে তোলে নি। একলা ঘরে শুয়ে শুয়ে বৃদ্ধা ভাবত, সুময়ের প্রেতমূর্ত্তি ফিরে এসে আবার পূর্ব্বের মত ভয় দেখায় না পারুলকে! হতভাগী কি ক'রে ভোলে তার সুময়কে! পারুলকে দুঃখ দেবার একটা পৈশাচিক আনন্দে বৃদ্ধার মাথা গরম হয়ে ওঠে।

সেদিন এই রকম একটা কুটিল পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ভবানী, এমন সময় খিড়কির দরজা খোলার শব্দ হ'ল। ভবানী নিঃশব্দে কিছুক্ষণ কান পেতে শুনল—তার পর পা টিপে টিপে উঠে বাইরে গেল। দেখ্‌লে পারুল খিড়কির দরজা খুলে অন্ধকারে গোরস্থানের পথটা ধরে কেমন চার দিকে চেয়ে চেয়ে থম্‌কে থম্‌কে এগিয়ে চলেছে। ভবানী আর নিজেকে কোনক্রমেই ধরে রাখতে পারছিল না। নারীসুলভ অদম্য কৌতূহলে সে-ও পিছনে পিছনে চলল।

এক সময়ে ভবানীর পায়ের শব্দে চমকে ফিরে তাকাল পারুল—তার পর একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে কিছু একটা অবলম্বনের জন্যে অসহায় ভাবে হাতটা বাড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ঘৃণায় আর বিদ্বেষে পারুলের প্রতি যে সমবেদনাটুকু ভবানীর অন্তর ভরে ছিল তা তখন একেবারেই ছিল না এবং কিছু দিন থেকে সেটা নষ্ট হ'তে বসেছিল। এই বিশ্রী অবস্থায় লজ্জায় সে কাউকে নাম ধরে ডাকতেও পারলে না।

পরের কথা শুনেই হোক আর নিজের অন্ধ মাতৃহৃদয়ের বিবেচনার উপরে নির্ভর ক'রেই হোক—ভবানী পারুলকে ভুল বুঝেছিল। সে ত জানত না, পারুল তার মাঝিকে দেখবার আগ্রহে কত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল—আর সেই জন্যে সে অন্ধকারে একা একা এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াত, আলাদা বিছানা পেতে শোবার জোগাড় করত এবং আজ যে এই গোরস্থানের পথে একা একা যাওয়া—ভবানী একে যা-ই ভাবুক না কেন, এ যে কত আশা আর আগ্রহে ভরা ব্যর্থ অভিসার পারুলের, সে ঐ পারুল ছাড়া আর কেউ জানে না। ভবানী যখন কুটিল হিংসায় ভাবত—আবার সুময়ের প্রেতমূর্ত্তি পারুলকে ভয় দেখাক, কষ্ট দিক, সে আবার কাঁদুক, তখন পারুলও যে কত অসম্ভব কল্পনায়, আশায় মুহূর্ত্তগুলি কাটাত তা সে জানত না। পারুল ভাবত, আচ্ছা, এমনও ত হ'তে পারে—দিব্যি ভালমানুষের মত মাঝি তার এক দিন ফিরে এল—হয়ত কোন সুদূর দেশে ভেসে গিয়েছে, ফিরবে এক দিন। মাঝি যে তার বাস্তবিকই ফিরেছে—একেই কেন্দ্র ক'রে একটি পরিপূর্ণ সুখের জীবন এঁকে চলত পারুল—আর সচেতন হয়ে কাঁদত। তাকে যেই যা ভাবে ভাবুক, তার মাঝির জন্যে কলঙ্কের কালো ফুলের মালা গলায় পরেও পারুলের সুখ। কিন্তু কোথায় তার মাঝি, সে আবার আসুক—তাকে আর সে ভয় করবে না।

ভুল বোঝার দুঃখ অনেক—এ ক্ষেত্রেও হ'ল তাই। এদের মধ্যে কথা বন্ধ হ'ল। ভবানীকে ইন্ধন জোগালে কয়েকটি মেয়ে, কিন্তু পারুল নির্ব্বিকার।

হাট থেকে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যায় ভবানীর। সে-দিন যখন অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রেও ভবানী এল না, তখন ঘরের চাবি পাশের বাড়ীতে দিয়ে কলসীটা নিয়ে অন্ধকার পথে বেরিয়ে পড়ল পারুল। ভবানীর মনে পারুলের প্রতি যে একটা বিতৃষ্ণার ভাব সম্প্রতি প্রকাশ পাচ্ছে, সেটা পারুল বুঝতে পেরেছিল। ঐ ভবানী পূর্ব্বে হাটে যাওয়ার সময় পারুলের কাছে এক জনকে বসিয়ে যেত—কিন্তু সে-সবের বালাই এখন আর ছিল না। স্নেহটা এমনি জিনিষ যে পূর্ণ জোয়ারের মাঝে একটু ভাটার টান দেখলেই অভিমানক্ষুব্ধ মন আপনা হ'তে হু-হু ক'রে ওঠে। পারুলেরও হ'ল তাই। চোখ মুছতে মুছতে সে অন্ধকার পথে এগিয়ে গেল।

তাড়াতাড়িই সে ফিরল জল নিয়ে—পাছে ভবানী অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু যাওয়ার সময়ে বা আসার সময়ে হাট-ফিরতি ভবানীর সঙ্গে দেখা হ'ল না—পারুল ভাবলে, ভবানী বোধ হয় এখনও ফেরে নি। এখন সাত-তাড়াতাড়ি ফেরবার বোধ করি আর কোন প্রয়োজন নেই।

ঘরের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল পারুল। ভাবলে, ঘরের মধ্যে আলো জাললে কে! ভয়ে তার পা উঠল না। ভাবলে, তার মাঝির প্রেতমূর্ত্তি

আবার উৎপাত সুরু করলে না ত! ইতিমধ্যে ভবানী যদি ফিরত তা হ'লে ত তার সঙ্গে পথেই দেখা হ'ত।

কিছুক্ষণ ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পারুল, তার পর অসীম আগ্রহে ভীত কম্পিত পা ফেলে ফেলে ঘরের দিকে এগিয়ে চলল সে। আলোটা তেমনি জ্বলছে। পারুল রুদ্ধ নিশ্বাসে আঙিনায় কলসীটা নামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, কি করবে ভেবে পেল না। পারুল ভাবলে, ঠিক তার মাঝি।

ভয় আর করবে না, কিন্তু ভয় হয়। সুমন্ত্র পারুলকে ভালবাসত এবং সে যে কি রকম তা পারুলই জানে, আর পারুলের অনির্ব্বাণ আকাঙ্ক্ষার কাছে ভাষা নীরব। কিছু দিন থেকে সুমন্ত্রের ছায়ামূর্ত্তি দেখবার জন্যে পারুল কত যে আগ্রহশীল ছিল, কত যে প্রতিশ্রুতি করেছিল তা সব কোথায় গেল ভেসে। ভালবাসার মাধুর্য্যময় আগল ভেঙে দুর্ব্বার ভয় এসে ঢুকল।

ভয়ে আর আনন্দে এক সময়ে পা টিপে টিপে খোলা জানালাটার দিকে এগিয়ে গেল পারুল—সাগ্রহে উঁকি মারল। তার পর সমস্ত মুখ তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ঝর ঝর ক'রে কয়েক ফোঁটা জল মাটিতে পড়ল। পারুল ব'সে পড়ল সেইখানে।

ঘরের মধ্যে থেকে ভবানী এতক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল; কে যেন এগিয়ে আসছে—ধুপ ক'রে কোথায় শব্দ হ'ল। নিশ্চয়ই সুমন্ত্র—হতভাগা আবার এসেছে। ভয়ে কণ্টকিত হয়ে উঠল সর্ব্বশরীর। আলোটা নিয়ে সে পরম আগ্রহে পায় পায় বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পর পারুলের দিকে নজর পড়ল—পারুলের মতই অসীম হতাশায় সমস্ত মুখ তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল—চোখে নামল জলের ধারা।

ভবানী বললে—বৌমা—তুমি? আমি ভাবলুম…

কে কি ভেবেছিল তা পরস্পর বুঝলে। পারুল বুক-ভাঙা ব্যথায় কেঁপে কেঁপে উঠল। চোখের জল ভবানীর সমস্ত সন্দেহ, সমস্ত ঘৃণা আর বিদ্বেষ কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। পারুলের রুক্ষ চুলে হাত বুলতে বুলতে ভবানী বললে—কাঁদিস নে মা ওঠ। কিন্তু তার নিজেরই চোখের জল মানে না। অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বললে, ডাকাত আমাদের দুঃখ বোঝে না রে…ভগবান…যেদিকে দু-চোখ যায় সেই দিকে পালাই চল।

সেদিন রাত্রে ভবানী ঘুমিয়ে যেতে পারুল খিড়কির দরজা খুলে বাইরে এসে বসল। ওঝার দেওয়া ওষুধটা হাত থেকে ছিঁড়ে বাঁশবনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সুমন্ত্র আসুক—তাকে তার ভয় কি! সমস্ত ভালমন্দ পারুলের সে-ই দেখবে, ওষুধটা মিথ্যে। কিন্তু তবু সুমন্ত্রের ছায়ামূর্ত্তি পারুল দেখল না। গভীর ঘুমে রাত্রিটি সুন্দর কেটে গেল।

ভবানী ভোরে উঠে দেখল—পারুল ঘুমিয়ে আছে চোখের নীচের মাটি খানিকটা ভিজা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের কবি-পরিচয়ই শ্রেষ্ঠ পরিচয় হ'লেও তিনি কাব্য ছাড়া অন্য রকম পুস্তকও লিখেছেন বিস্তর। তাঁর কবিত্বের উন্মেষ হয় প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে, তাঁর শৈশবে বললেও চলে। পদ্যে তিনি যে-সব কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন, তা ছাড়া তাঁর গদ্য কবিতা এবং গদ্য কাব্যও বহুসংখ্যক আছে। তাঁর উপন্যাস, নাটক ও গল্প—সবগুলিই কাব্য।

কাব্য ভিন্ন তিনি ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, দর্শন, ছন্দ, গ্রন্থসমালোচনা, বিদেশ-ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ে এত প্রবন্ধাদি লিখেছেন ও বক্তৃতা ক'রেছেন, যে, অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলির নাম করাও সম্ভব নয়। তা ছাড়া, তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কৌতুক-পরিহাস-আত্মক লেখা আছে, হেঁয়ালি নাট্য আছে, গীতি-নাট্য ও নৃত্যনাট্য আছে, "পঞ্চভূতের ডায়ারী" নামক পুস্তক আছে যাকে কোন শ্রেণীতে ফেলা সুকঠিন। তিনি যেমন প্রাপ্তবয়স্কদের, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের, জন্যে লিখেছেন, তেমনি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যেও গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া—এমন কি বর্ণপরিচয়ের বহিও, লিখেছেন। বৈজ্ঞানিকদের তারই কাছে তাঁরই বিরুদ্ধে একটি নালিশ ছিল, যে, তিনি বৈজ্ঞানিক কিছু লেখেন নি। গত বৎসর "বিশ্বপরিচয়" লিখে তিনি তাঁদের সে ক্ষোভ দূর করেছেন। এসব ছাড়া তাঁর নিজের লেখা ইংরেজী বহিও অনেকগুলি আছে যেগুলি তাঁর বাংলা বহির অনুবাদ নয়। তাঁর বাংলা অনেক বহির অনুবাদ পৃথিবীর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য যত অধিক ভাষায় হয়েছে, ভারতবর্ষের আর কোন লেখকের তা ত হয়ই নাই, অন্য কোন দেশেরও আধুনিক কোনও লেখকের হয়েছে বলে আমি জানি না।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে কবি ও দার্শনিক দুই পৃথক্ শ্রেণীর মানুষ ব'লে পরিগণিত হয়। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে একই মানুষকে কবি ও দার্শনিক রূপে—এমন কি, বৈজ্ঞানিক ও কবি রূপে, দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় সেই প্রাচীন ধারা রক্ষিত হয়েছে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম-ভারতীয়-দার্শনিক-কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় এবং পরে বিলাতে হিবার্ট লেক্‌চ্যার্স্ দিতে আহূত হওয়ায় তাঁর দার্শনিকত্ব প্রকাশ্য ভাবে স্বীকৃত হয়।

তিনি সম্পাদক ও সাংবাদিকের কাজ দীর্ঘকাল অসামান্য প্রতিভা ও দক্ষতার সহিত ক'রেছেন, এবং ভবিষ্যতে-প্রসিদ্ধ অনেক লেখকের লেখা সংশোধন ক'রে তাঁদিকে সাহিত্যিক কৃতিত্ব লাভে সমর্থ ক'রেছেন।

তাঁর বহুমুখী প্রতিভার প্রশংসা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

টেনিসন ভিক্টর হিউগোকে বলেছেন, "Victor in Drama, Victor in Romance, Cloud-weaver of phantasmal hopes and fears", "Lord of human tears," "Child-lover," এবং "Weird Titan by thy winter weight of years as yet unbroken"। আমরা রবীন্দ্রনাথকে এই সব এবং আরও অনেক বিশেষণে ভূষিত ক'রে সত্য বিজয়শ্রীমণ্ডিত ব'লে অনুভব ক'রতে পারি।

তাঁর গান এবং গীতরচনা তাঁর প্রতিভা ও শক্তির আর একটি দিক্। ধর্ম্ম, দেশভক্তি, প্রেম, প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি দু-হাজার বা আরো বেশী বহু ও বিচিত্র ভাবোদ্দীপক গান বেঁধেছেন ও তাতে সুর দিয়েছেন। যুবসকালে তাঁর গলাও ছিল চিত্তহারী, চমৎকার ও বিস্ময়কর। তিনি চলিত অর্থে ওস্তাদ নন্—যদিও ওস্তাদী গানের শিক্ষা তাঁর হয়েছিল ও ওস্তাদী তিনি বুঝেন। গানের কথা সৃষ্টি, সুর সৃষ্টি, এবং কণ্ঠে কথা ও সুরের সাহায্যে বহু বিচিত্র ধ্বনিরূপের সৃষ্টি—এই

ত্রিবিধ কৃতিত্বের সমাবেশে এদেশে তাঁকে অদ্বিতীয় সংগীতস্রষ্টা ব'লে মনে করি।

আমরা অনেকেই কেবল নয়নগোচর রূপ দেখি, রবীন্দ্রনাথ অধিকন্তু শ্রবণগোচর রূপও দেখেন। তাঁর গানগুলির দ্বারা তিনি বাংলা দেশকে গ'ড়ে আসছেন।

তিনি সুনিপুণ অভিনেতা এবং অভিনয়ের সুদক্ষ শিক্ষক। কবিতার আবৃত্তিতে এবং প্রবন্ধ গল্প নাটক ও উপন্যাসের পঠনে তিনি সুদক্ষ। সাধারণ কথাবার্ত্তায় তিনি সুরসিক। ভাব ও চিন্তার ব্যঞ্জক বহুবিধ সুরুচিপূর্ণ কলাসম্মত মনোজ্ঞ নৃত্যের তিনি স্রষ্টা ও শিক্ষক। দৈহিক সামর্থ্য যত দিন ছিল, নিজেও নৃত্যনিপুণ ছিলেন।

প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে তাঁর প্রতিভার একটা নূতন দিক্ খুলে যায়। তা চিত্রাঙ্কন। তাঁর চিত্র পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য কোন শ্রেণীতে পড়ে না, কারো কাছে শেখা নয়। এ তাঁর নিজস্ব। তাঁর চিত্রাবলী সাধারণতঃ কোন গল্প বলে না ব'লে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ও উপভোগ্য না-হ'লেও বিদেশে ও এদেশে সমঝদারেরা এর গুণ মানেন।

বঙ্গের আধুনিক চিত্রকলার উৎপত্তি যে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রাণনা থেকে, সে সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাংলার কবি (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ) আর্টের সূত্রপাত কল্লেন, বাংলার আর্টিষ্ট (অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ) সেই সূত্র ধরে একলা একলা কাজ করে চল্লো কত দিন।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে তিনি যা করেছেন, অন্য কোন লেখক তা করেন নি। তাঁর লেখায় বাংলা সাহিত্য প্রাদেশিকতা ও দেশিকতা অতিক্রম ক'রে সমগ্র বিশ্বের দরবারে পৌঁছেছে। তার মধ্যে সমগ্রজাগতিক ভাব ও চিন্তার ধারা খেলছে, অথচ যা একান্ত বঙ্গের ও ভারতের, তাও তাতে আছে।

যদি কোন বিদেশী কেবল তাঁর লেখা পড়বার জন্যেই বাংলা শেখেন, তা হ'লেও তাঁর শ্রম সার্থক হবে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর স্বদেশী আন্দোলনে তিনি রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে কর্ম্মীরূপে নেমেছিলেন। যখন সন্ত্রাসনবাদ মূর্ত্ত হ'ল, তখন তার প্রকাশ্য প্রতিবাদ ক'রলেন। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে কর্ম্মী তিনি বেশী দিন রইলেন না। কিন্তু অন্যতম চিন্তানায়ক থাক্‌লেন, এবং এখনও আছেন। জালিয়ানওয়ালা-বাগের কাণ্ডের প্রতিবাদ তিনিই প্রথমে করেন ও নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। যে-সব সভায় তাঁর অধিনায়কত্বের প্রয়োজন হয়েছে, তাতে অল্প দিন আগেও তিনি সভাপতি হয়েছেন। এখনও তাঁর বাণী, উপলক্ষ্য ঘটলেই, সকল দেশভক্তকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে।

রাষ্ট্রকে অবস্থাবিশেষে কর দেওয়া বা না-দেওয়ার প্রজাদের অধিকার, এবং স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব ও বন্ধন বরণ এবং তাহার গৌরব ও আনন্দ, তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে প্রথম এবং পরে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে "পরিত্রাণ" নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখে ব্যক্ত করেন।*

"অস্পৃশ্যতা"র বিরুদ্ধে আন্দোলন ব্রাহ্ম সমাজের জাতিভেদ-বিরোধী আন্দোলনের অন্তর্গত। এরই প্রেরণা স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে "গীতাঞ্জলি"র অন্তর্গত ২৮ বৎসর পূর্ব্বে রচিত সেই কবিতায় যার গোড়ায় আছে,

> "হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
> অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান।
> মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
> সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
> অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

রাষ্ট্রশক্তির-সাহায্য-ও-পরিচালনা-নিরপেক্ষ ভাবে দেশের—বিশেষ ক'রে পল্লীর, হিতকর কাজ করবার প্রয়োজন ও পদ্ধতি তিনি অসহযোগ আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে নির্দ্দেশ ক'রে নিজের জমিদারীতে ও সুরুলে তদনুসারে কাজ করিয়ে আস্‌ছেন।

অন্তর্জাতিকতা নামে অভিহিত তাঁর বিশ্বমানবপ্রেমের আভাস তাঁর অনেক আগের রচনাতেও পাওয়া যায়, কিন্তু স্পষ্ট পাওয়া যায় "প্রবাসী"র প্রথম সংখ্যার জন্যে ৩৮ বৎসর আগে লিখিত সেই কবিতায় যার গোড়ায় আছে,

> "সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
> সেই ঘর মরি খুঁজিয়া;
> দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
> সেই দেশ লব যুঝিয়া।"

তিনি তাঁহার "ন্যাশন্যালিজ্‌ম্" নামক ইংরেজী গ্রন্থে

* ইহার দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

সেই স্বাজাতিকতাই গর্হিত বলেছেন যা বিদেশ ও বিজাতির ধন গ্রাস করতে ও তাদের উপর প্রভুত্ব করতে চায়। পরদেশদ্রোহিতা না-ক'রে যে স্বাজাতিকতা স্বদেশের কল্যাণ করতে চায়, কথায়, কাব্যে, বক্তৃতায়, গানে ও কাজে চিরদিনই তিনি তার সমর্থক ও অন্যতম প্রধান অনুপ্রাণক। তাই তিনি ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে "নৈবেদ্যে" প্রার্থনা করতে পেরেছিলেন,

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।"

বাহ্য বন্ধন হ'তে মুক্তি তার স্বাধীনতার আদর্শের নিশ্চয়ই অন্তর্গত; কিন্তু সামাজিক ও আন্তরিক সর্ব্ববিধ দাসত্ব হ'তে মুক্তি এর অস্থিমজ্জা।

ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের যে যে ব্যবহার নিন্দনীয়, তিনি তার তীব্র নিন্দা করেছেন, কিন্তু ইংলণ্ডের ও ইংরেজ জাতির গুণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

সেইরূপ, পাশ্চাত্য দেশসমূহের এবং তাদের রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির নিন্দনীয় দিকগুলির নিন্দা তিনি করেছেন, কিন্তু তাদের বিজ্ঞানের ও জিজ্ঞাসুতার, জনসেবার ও সংস্কৃতির এবং মনুষ্যত্বকে সম্মানদানের যথাযোগ্য গুণগ্রাহীও তিনি।

পাশ্চাত্যের নিকট হ'তে তিনি নিতে রাজী—ভিক্ষুকের মত নয়, কিন্তু মিত্রের মত—ভারতবর্ষ তাদিগকেও কিছু দিতে পারে ব'লে।

তিনি চীন জাপান ভারত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন সম্বন্ধ পুনঃস্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা কায়মনোবাক্যে করেছেন।

অনেক বৎসর আগে তিনি শান্তিনিকেতনে যে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম স্থাপন করেন, তাই পরে বিশ্বভারতীতে পরিণত হ'য়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন আশ্রমসমূহের আদর্শের ভিত্তির উপর এর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। এখানে শিক্ষালাভ আনন্দে হবে; অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা সরল, অনলস, বিলাসিতাবিহীন জীবন যাপন করবেন; অধ্যাপকদের প্রভাব বিদ্যার্থীদের উপর ও বিদ্যার্থীদের প্রভাব অধ্যাপকদের উপর পড়বে; সকল ঋতুতে প্রকৃতির প্রভাব তাঁরা অনুভব করবেন; ভারতের ও অন্য সকল দেশের জ্ঞানের ও ভাবের প্রবাহ এখানে অবাধে প্রবাহিত হবে, সকলে শ্রদ্ধাবান্ ও শুচি থাকবেন এক ও অসীমের কাছে মাথা নত ক'রে; এখানকার শিক্ষা শুধু পণ্ডিত প্রস্তুত করবে না, আত্মনির্ভরশীল উপার্জ্জকও প্রস্তুত করবে; শুধু জ্ঞানের চর্চ্চা এখানে হবে না, সঙ্গীত চিত্রকলা-আদি সুকুমার কলার অনুশীলনও হবে; আবার, বস্ত্রবয়ন-আদি নানাবিধ কারুশিল্প ও কৃষি শিক্ষা দেওয়া হবে এবং গ্রামগুলিকে স্বাস্থ্যে সচ্ছলতায় সৌন্দর্য্যে আবার আনন্দের নিলয় করবার চেষ্টা হবে। অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা কেবল জ্ঞাতা ও জিজ্ঞাসু হবেন না, কর্ম্মী ও স্রষ্টাও হবেন; বিদ্যার্থীরা ব্যষ্টি- ও সমষ্টি-গতভাবে যথাসম্ভব স্বশাসক হবেন;—সংক্ষেপে বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য এইরূপ। এখানে ছাত্রছাত্রীরা পৃথক্ পৃথক্ আবাসে থেকে একত্র শিক্ষা লাভ করেন। ভারতবর্ষের সকল প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংস্কৃতির অনুশীলন এখানে হয়। চীন তিব্বত প্রভৃতি বিদেশের সংস্কৃতির অনুশীলনও হয়। এখানে ছাত্রছাত্রীদের নানা রকম ব্যায়াম ও খেলার ব্যবস্থা আছে, গ্রামসেবার সুযোগ আছে।

কবি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা শুধু এ অর্থে নয়, যে, তিনি এর জন্যে টাকা দিয়েছেন, টাকা সংগ্রহ করেছেন, ঘরবাড়ী বানিয়েছেন; এই অর্থেও যে, তিনি এর জন্যে পরিশ্রম করেছেন—এখনও করেন; স্বয়ং ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে পরম নৈপুণ্য ও ধৈর্য্য সহকারে পড়িয়েছেন; গান, অভিনয়, নৃত্য, শিখিয়েছেন; তাদের সভায় সভাপতিত্ব করেছেন; তাদের গল্প ব'লে চিত্তবিনোদন করেছেন; তাদের সঙ্গে খেলা করেছেন; মন্দিরে উপাসনা ও বাচন দ্বারা অনুপ্রাণনা

দিয়েছেন; তাঁর স্বর্গগতা সহধর্ম্মিণী প্রথম অবস্থায় নিজের অলঙ্কার এই প্রতিষ্ঠানকে দিয়েছেন এবং স্বহস্তে অধ্যাপক ও ছাত্রদেরকে দিনের পর দিন রেঁধে খাইয়েছেন।

কবি দ্বাদশ বার পৃথিবীর নানা দেশে বেড়িয়ে ভারতের সহিত পৃথিবীর যোগ স্থাপন ও বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। তিনি পৃথিবীর জাতিসমূহের অন্যতম আন্তর বন্ধনরজ্জু এবং উদ্যোগী জগৎশান্তিকামী।

তাঁকে সবাই কবি ব'লেই জানে; তিনি যে কিরূপ পণ্ডিত, কত রকমের কত বই তিনি পড়েন, তা লোকে জানে না। কত বিষয়ের বই তিনি শুধু ইংরেজীতেই পড়েছেন ও পড়েন, ইংরেজীতে তার একটা ফর্দ দিচ্ছি।

Farming; philology; history; medicine; astrophysics; geology; bio-chemistry; entomology; co-operative banking; sericulture; indoor decorations; production of hides, manures, sugarcane, and oil; pottery; weaving looms; lacquer work; tractors; village economics; recipes for cooking; lighting; drainage; calligraphy; plant-grafting; meteorology; synthetic dyes; parlour-games; Egyptology; road-making; incubators; woodblocks; elocution; stall-feeding; jiu-jitsu; printing;

ইত্যাদি। তা ছাড়া সাহিত্য বলতে সাধারণতঃ যা বুঝায়, তা ত প'ড়েই থাকেন। ১৯২৬ সালে অক্টোবর মাসে ভিয়েনাতে তিনি যখন পীড়িত ছিলেন, তখন তাঁকে শুয়ে শুয়ে কত বই-ই যে পড়তে দেখেছি, বলতে পারি না।

প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে আমি শান্তিনিকেতনে অনেক সময় থাকতাম। তাঁর বাড়ীর সাম্‌নেই একটা বাড়ীতে থাক্‌তাম—মধ্যেখানে ছিল একটা মাঠ। তিনি এমন পরিশ্রমী যে, একদিনও রাত্রে তাঁর লিখবার পড়বার ঘরের আলো আমার শুতে যাবার আগে নিবতে দেখি নি। প্রত্যূষে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি, হয় তিনি বারাণ্ডায় উপাসনায় বসেছেন নতুবা উপাসনা সেরে লেখা বা পড়ার কাজে লেগে গেছেন। সেকালে দুপুরে খাবার পরও তাঁকে কখনো শুতে বা হেলান দিতে দেখি নি। গ্রীষ্মে কাউকে তাঁকে পাখার বাতাস দিতে বা তাঁকে নিজে হাত-পাখা চালাতে দেখি নি। তখন শান্তিনিকেতনে বৈদ্যুতিক আলো-পাখা ছিল না। বহু বৎসর পরেও তাঁর শ্রমশীলতায় বিস্মিত হয়েছি। এখন বার্দ্ধক্যে ও ভগ্ন স্বাস্থ্যে তিনি ঠিক তেমনটি নাই, কিন্তু এখনও অনেক যুবকের চেয়ে তিনি বেশী খাটেন। তাঁর অসামান্য মেধার ও প্রতিভার পরিচয়ও এখনও পাওয়া যাচ্ছে।

ঋষিদের যে আধ্যাত্মিক সত্য দৃষ্টির শক্তি ছিল ব'লে আমরা পড়েছি, রবীন্দ্রনাথের তা আছে। তাঁর বহু ধর্ম্মোপদেশে, কবিতায় ও সঙ্গীতে তার পরিচয় আছে। বিলাসী তিনি নন, আবার কৃচ্ছ্রসাধকও নন। জীবনকে তিনি ভালবাসেন। তিনি বলেন,

> "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
> মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

কিন্তু মৃত্যুকেও তিনি মাতৃহস্তের মতই স্নেহময় ও নির্ভরযোগ্য মনে করেন; তাই বলেছেন :—

> "সে যে মাতৃপাণি,
> স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি।
> স্তন হতে তুলে নিলে শিশু কাঁদে ডরে
> মুহূর্ত্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।"

ইহলোক ও পরলোক বিশ্বজননীর দুই স্তন। মৃত্যুরূপ হাত দিয়ে তিনি মানুষকে ইহলোক-রূপ এক স্তনের পীযূষের পর পরলোক-রূপ অন্য স্তনের পীযূষ পান করান।

কবি সাধক। কিন্তু তাঁহার সাধনা বৈরাগ্যের পথে নয়। তিনি লিখেছেন :—

> "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
> অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
> মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি' বারংবার
> তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
> নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মত
> সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
> জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
> তোমার মন্দির মাঝে।
>
> ইন্দ্রিয়ের দ্বার
> রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
> যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
> তোমার আনন্দ র'বে তার মাঝখানে।
> মোহ মোর মুক্তি রূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
> প্রেম মোর ভক্তি রূপে রহিবে ফলিয়া।"

[গত ২৫শে বৈশাখ কবির জন্মদিনে কলিকাতায় রেডিয়োতে প্রবাসীর সম্পাদক কর্ত্তৃক কথিত।]

জন্মদিন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ মম জন্মদিন। সদ্যই প্রাণের প্রান্তপথে
ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির অন্ধকার হতে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে। মনে হতেছে কী জানি
পুরাতন বৎসরের গ্রন্থিবাঁধা জীর্ণ মাল্যখানি
সেথা গেছে ছিন্ন হয়ে ; নবসূত্রে পড়ে আজি গাঁথা
নব জন্মদিন। জন্মোৎসবে এই যে আসন পাতা
হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব টিকা
মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে নূতন অরুণলিখা
যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত।

আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে,
দুই আলো মুখোমুখি মিলেছে জীবনপ্রান্তে মম
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারাসম,
এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা।

প্রাচীন অতীত, তুমি
নামাও তোমার অর্ঘ্য ; অরূপ প্রাণের জন্মভূমি
উদয়শিখরে তার দেখ আদি জ্যোতি। করো মোরে
আশীর্ব্বাদ, হে ধরণী, যাক তৃষাতপ্ত দিগন্তরে
মায়াবিনী মরীচিকা। ভরেছিনু আসক্তির ডালি
কাঙালের মতো, অশুচি সঞ্চয়পাত্র করো খালি,
ভিক্ষামুষ্টি ধূলায় ফিরায়ে লও, যাত্রাতরী বেয়ে
পিছু ফিরে আর্ত্ত চক্ষে যেন নাহি দেখি চেয়ে চেয়ে
জীবন-ভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে।

হে বসুধা
নিত্য মোরে পাঠাইছ এই বার্ত্তা,—যে তৃষ্ণা যে ক্ষুধা
তোমার সংসার-রথে সহস্রের সাথে বাঁধি মোরে

টানায়েছে রাত্রি দিন স্থূল সূক্ষ্ম নানাবিধ ডোরে
নানা দিকে নানা পথে, আজ তার অর্থ গেল ক'মে
ছুটির গোধূলিবেলা তন্দ্রালু আলোকে। তাই ক্রমে
ফিরায়ে নিতেছ শক্তি, হে কৃপণা, চক্ষুকর্ণ থেকে
আড়াল করিছ স্বচ্ছ আলো; দিনে দিনে টানিছে কে
নিষ্প্রভ নেপথ্য পানে। আমাতে তোমার প্রয়োজন
শিথিল হয়েছে, তাই মূল্য মোর করিছ হরণ,
দিতেছ ললাটপটে বর্জনের ছাপ। কিন্তু জানি
তোমার অবজ্ঞা মোরে পারে না ফেলিতে দূরে টানি।
তব প্রয়োজন হতে অতিরিক্ত যে মানুষ, তারে
দিতে হবে চরম সম্মান তব শেষ নমস্কারে।
যদি মোরে পঙ্গু করো, যদি মোরে করো অন্ধপ্রায়,
যদি বা প্রচ্ছন্ন করো নিঃশক্তির প্রদোষচ্ছায়ায়
বাঁধো বার্দ্ধক্যের জালে, তবু ভাঙা মন্দিরবেদীতে
প্রতিমা অক্ষুন্ন র'বে সগৌরবে, তারে কেড়ে নিতে
শক্তি নাই তব। ভাঙো ভাঙো, উচ্চ করো ভগ্নস্তূপ,
জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দস্বরূপ
রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে। সুধা তারে দিয়েছিল আনি
প্রতিদিন চতুর্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী,
প্রত্যুত্তরে নানা ছন্দে গেয়েছে সে, ভালোবাসিয়াছি।
সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি
ছাড়ায়ে তোমার অধিকার। আমার সে ভালোবাসা
সব ক্ষয়ক্ষতিশেষে অবশিষ্ট র'বে; তার ভাষা
হয়তো হারাবে দীপ্তি অভ্যাসের ম্লান স্পর্শ লেগে
তবু সে অমৃতরূপ সঙ্গে র'বে যদি উঠি জেগে
মৃত্যু-পরপারে। তারি অঙ্গে এঁকেছিল পত্রলিখা
আম্রমঞ্জরীর রেণু, এঁকেছে পেলব শেফালিকা
সুগন্ধি শিশির-কণিকায়; তারি সূক্ষ্ম উত্তরীতে
গেঁথেছিল শিল্পকারু প্রভাতের দোয়েলের গীতে
চকিত কাকলী সূত্রে; প্রিয়ার বিহ্বল স্পর্শখানি
সৃষ্টি করিয়াছে তার সর্বদেহে রোমাঞ্চিত বাণী,
নিত্য তাহা রয়েছে সঞ্চিত। যেথা তব কর্ম্মশালা

সেথা বাতায়ন হতে কে জানি পরায়ে দিত মালা
আমার ললাট ঘেরি সহসা ক্ষণিক অবকাশে,
সে নহে ভৃত্যের পুরস্কার ; কী ইঙ্গিতে, কী আভাসে
মুহূর্তে জানায়ে চলে যেত, অসীমের আত্মীয়তা
অধরা অদেখা দূত, বলে যেত ভাষাতীত কথা
অপ্রয়োজনের মানুষেরে। সে মানুষ, হে ধরণী
তোমার আশ্রয় ছেড়ে যাবে যবে, নিয়ো তুমি গণি
যা কিছু দিয়েছ তারে, তোমার কর্ম্মীর যত সাজ,
তোমার পথের যে পাথেয়, তাহে সে পাবে না লাজ,
রিক্ততায় দৈন্য নহে। তবু জেনো অবজ্ঞা করি নি
তোমার মাটির দান, আমি সে মাটির কাছে ঋণী—
জানায়েছি বারম্বার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হোতে
অমূর্ত্তের পেয়েছি সন্ধান। যবে আলোতে আলোতে
লীন হোত জড় যবনিকা, পুষ্পে পুষ্পে তৃণে তৃণে
রূপে রসে সেই ক্ষণে যে গূঢ় রহস্য দিনে দিনে
হোত নিঃশ্বসিত, আজি মর্ত্যের অপর তীরে বুঝি
চলিতে ফিরানু মুখ তাহারি চরম অর্থ খুঁজি।
যবে শান্ত নিরাসক্ত গিয়েছি তোমার নিমন্ত্রণে
তোমার অমরাবতী সুপ্রসন্ন সেই শুভক্ষণে
মুক্তদ্বার ; বুভুক্ষুর লালসারে করে সে বঞ্চিত :
তাহার মাটির পাত্রে যে অমৃত রয়েছে সঞ্চিত
নহে তাহা দীন ভিক্ষু লালায়িত লোলুপের লাগি।
ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে, হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান,
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে। ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা,
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তারা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি,
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি। শুনি তাই আজি
মানুষ জন্তুর হুহুঙ্কার দিকে দিকে উঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে

পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে য়াব, বলে যাব, এ প্রহসনের
মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
বলে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।
বৃথা বাক্য থাক। তব দেহলিতে শুনি ঘণ্টা বাজে
শেষ প্রহরের ঘণ্টা; সেই সঙ্গে ক্লান্ত বক্ষোমাঝে
শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে
ধ্বনিতেছে সূর্য্যাস্তের রঙে রাঙা পূরবীর সুরে।
জীবনের স্মৃতিদীপে আজিও দিতেছে যারা জ্যোতি
সেই ক'টি বাতি দিয়ে রচিব তোমার সন্ধ্যারতি
সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে, দিনান্তের শেষ পলে,
র'বে মোর মৌন বীণা মূর্ছিয়া তোমার পদতলে।
আর রবে পশ্চাতে আমার, নাগকেশরের চারা
ফুল যার ধরে নাই, আর রবে খেয়াতরীহারা
এপারের ভালোবাসা, বিরহস্মৃতির অভিমানে
ক্লান্ত হয়ে, রাত্রিশেষে ফিরিবে সে পশ্চাতের পানে

২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৫
গৌরীপুর ভবন, কালিম্পঙ্

[এই কবিতাটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গত ২৫শে বৈশাখ তাঁহার জন্মবাসর উপলক্ষ্যে রেডিয়োতে পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে প্রবাসীতে মুদ্রণের জন্য কবিতাটি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি রেডিয়োতে পঠিত হইবার পর কবিতাটি অসম্পূর্ণ ভাবে কোন কোন সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। এক্ষণে কবি-কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া সম্পূর্ণ কবিতাটি প্রবাসীতে মুদ্রিত হইল।—প্রবাসীর সম্পাদক।

বহির্জগৎ

শ্রীগোপাল হালদার

১

ইউরোপে নাকি একটা কথা চলিত আছে—ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা হইল নীতির অভাব। নীতি কথাটির মানে অবশ্য এখানে পলিসি,—এথিক্‌স্ নয়—সে-জিনিষ পররাষ্ট্রনীতিতে কোনদিনই চলে না, স্বরাষ্ট্র-নীতিতেও চলে তত ক্ষণ যত ক্ষণ শাসকের কোন অসুবিধা না হয়। ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতি কি, ইউরোপের জাতিরা প্রায়ই তাহার দিশা পান না—ইউরোপের জাতিদের এই বক্তব্য, আর তাই তাঁহাদের ব্রিটেন সম্পর্কে এত সন্দেহ। ব্রিটেনের কিন্তু নিজ নীতি সম্বন্ধে কোন দিনই মনে সংশয় নাই। সে-নীতি, বাস্তব অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বেশ সহজ ও যুক্তিযুক্ত পথ অবলম্বন। অর্থাৎ ব্রিটেন মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে জানে; তাই, অনেক ঘুরিয়া, অনেক গুলাইয়াও শেষ পর্য্যন্ত টাল সাম্‌লাইয়া লইতে পারে। কথাটায় সত্য আছে—তাহার সাক্ষ্য দিবে ইতিহাস, তাহার প্রমাণ দেয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। মোটের উপর এই নিজস্ব ধারা অনুসরণ করিয়াই ব্রিটেন আপনাকে গড়িয়াছে, পাইয়াছে পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্য। কিন্তু ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতি যে কি রূপ লইবে তাহা অন্যান্য জাতিরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। হয়ত ব্রিটেন নিজেও সব সময় তাহা স্থির জানে না। এই মুহূর্ত্তের ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির দিকে তাকাইলেই তাহা বুঝা যাইবে। মনে হয়, একই কালে আজ ব্রিটেন দুইটি বিরুদ্ধ পথে পা বাড়াইয়াছে—এক, স্পর্দ্ধিত জাতিদের তৃপ্তিসাধন,—যেমন ইতালী ও জার্ম্মেনীর সঙ্গে সদ্ভাবস্থাপনের চেষ্টা; দুই, যুদ্ধোপকরণ-সম্ভার-বৃদ্ধি,—নিশ্চয়ই তাহার উদ্দেশ্য ঐ সব স্পর্দ্ধিত জাতিদেরই প্রতিরোধ করা। কিন্তু কাজ দুইটি সত্যই বিরোধী কি? চেম্বারলেনপ্রমুখ রাষ্ট্রনীতিকেরা বলিবেন, "মোটেই নয়।" বলীয়ানকে খুশী করিতে হইলে তাহাকে কথা শোনাইবার মত বলও নিজের আয়ত্ত করিতে হয়। অতএব, বিরোধ আসলে নাই—এ শুধু একই পররাষ্ট্র-তূণের দুইটি বাণ—বিভিন্ন, কিন্তু বিরোধী নয়। এই নীতিতে অন্যায়ও নাই, নূতনত্বও নাই; পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরাও এই পথই অবলম্বন করিতেছে।

কিন্তু গত কয়েক বৎসরে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রচিন্তাকে ঠিক এত সুস্থির ও সুনির্দ্দিষ্ট বলিয়া মানিয়া লইতে আমাদের একটু বাধে। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট যাহাই বলুন, একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ক্রমশঃই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তাই আজ ব্রিটেনের রাষ্ট্রচিন্তা সত্য সত্যই বিভিন্নমুখী পথের মুখে পড়িয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে—নূতন কালের নূতন অবস্থার দাবী পুরাতন পরিচিত পথে মিটানো সম্ভব নয়। তাই, যে-রক্ষণশীল দল চিরদিন সাম্রাজ্যের রণ-দামামা বাজাইয়া আসিয়াছে, পৃথিবীর পথে-বিপথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিজয়পতাকা উড়াইয়াছে, আজ তাহারাই হিটলার-মুসোলিনির নিকট সেই সাম্রাজ্যের গরিমা দলিত হইতে দেখিল, উদ্ধত সাম্রাজ্যাকাঙ্ক্ষীদের স্পর্দ্ধা সহ্য করিয়া তাহাদেরই বন্ধুত্ব কামনা করিল, আর এই চিরদিনের জিঙ্গোরাই কিনা বলিল: 'শান্তি চাই, শান্তি,—যে কোন মূল্যে চাই শান্তি।' অথচ এই শান্তিই বা চাই কেন? সমরায়োজন যাহাতে সম্পূর্ণ করিবার মত অবসর মিলে, প্রধানতঃ তাই। অন্য দিকে, ব্রিটিশ শ্রমিক দলও এমনি চিন্তা ও কর্ম্মের বিরোধে বিভ্রান্ত। মতবাদের দিক হইতে শ্রমিক দল চিরদিনই যুদ্ধবিমুখ, নিরস্ত্রীকরণের স্বপক্ষে, সাম্রাজ্যবাদের মোহও তাঁহাদের নাই। কিন্তু, আজ ফাসিস্ত শক্তিদের বিপক্ষে যুদ্ধে নামিবার জন্য কার্য্যতঃ তাহারাই উদ্‌গ্রীব; স্পেনীয় নিরপেক্ষতার ছলনা চুকাইয়া সশস্ত্র প্রয়াসে অগ্রসর হইতে তাহারা অধীর,—যেমন করিয়াই হউক গণতন্ত্রকে বাঁচাইতে

হইবে, ফাসিস্ত প্রতিক্রিয়াকে ঠেকাইতে হইবে। তাহাদের এই সমরাগ্রহ কি তাহাদের আজন্ম-গৃহীত নীতির প্রতিকূলাচরণ? তাহাও নয়—পৃথিবীতে যুদ্ধপিপাসু শক্তিদের অবসান চাহে বলিয়াই ত শ্রমিক দল আজ যুদ্ধ চায়। আবার এইরূপে তাহারাই আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্মান রক্ষায় বাস্তবিক সচেষ্ট। এমনি করিয়াই পুরাতন দলের পুরাতন নীতি আজ বিরুদ্ধ রূপ লইয়া দেখা দিতেছে। তাহারই চাপে দল না-ছাড়িয়াও চার্চ্চিল প্রভৃতি রক্ষণশীল আজ বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের মেরুদণ্ডহীন দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিতে চান না; আর ল্যান্সবোরি, লর্ড স্নেল প্রমুখ শ্রমিক-নায়কেরা শ্রমিকের যুদ্ধ-সম্মতিতে সায় দিতে অক্ষম হইয়া দল ছাড়িয়াছেন।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতি এখন একটা পথ প্রায় বাছিয়া লইয়াছে—যত দিন বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল আছে, তত দিন এই পথেই তাহা পরিচালিত হইবে—ফাসিস্ত-সহযোগিতা আর সবলের তৃপ্তিসাধন ও নিজেদের যুদ্ধায়োজন সম্পূর্ণ করা। মোটের উপর এই পথেই তাহা চলিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাতে যে ব্রিটিশের নীতি ও আচরণের সমস্ত অসামঞ্জস্য ঘুচিয়া যাইতেছে তাহা বলা যায় না। কারণ, সে অসামঞ্জস্য মৌলিক। সম্প্রতি যে ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল, তাহাতেও তাই সেই নীতিহীনতারই লক্ষণ দেখা যায়, তাহারও মধ্যে অসামঞ্জস্য রহিয়া গিয়াছে।

২

ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি যে সম্ভব হইবে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না। এক হিসাবে সে-চুক্তি তখনই চেম্বারলেন মানিয়া লইয়াছেন যখন মুসোলিনির বন্ধুত্ব-কামনায় ইডেনকে বিসর্জ্জন দেন, যখন ইতালীর ধমকের নিকট মাথা হেঁট করেন। উহার পরে চুক্তি তাহাকে করিতেই হইবে, কারণ চুক্তি সম্ভব না হইলে চেম্বারলেনের দাঁড়াইবার ঠাঁই থাকিত না। অবশ্য, এই চুক্তিতে প্রকৃত কৃতিত্ব তাঁহার অল্পই—আসল কৃতিত্ব মুসোলিনির;—তথাপি এই চুক্তিপত্রখানা দেখাইয়া নিজ নীতির সার্থকতা ঘোষণা করিবার একটু সুযোগ অন্ততঃ তাঁহার হইয়াছে। এইটুকু না হইলে ইডেনেরই জয় সম্পূর্ণ হইত।

আজকালকার দিনে প্রত্যেক চুক্তি, কথাবার্ত্তা, সাক্ষাৎকারই নাকি শান্তির পথ সুগম করিয়া তোলে—এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। অথচ, পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় আকাশে তাহাতে মেঘের ভার বাড়িয়াছে বই কমে নাই। অতএব, কোন্ সাক্ষাতে কতটা যে আকাশ পরিচ্ছন্ন হয়, তাহা এই সব কথা হইতে বুঝা যায় না। ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তিও যথারীতি সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে—কাগজ-ওয়ালারা বলিতেছেন, ইউরোপের শান্তি ও নির্ব্বিঘ্নতার পথ নাকি উহা প্রশস্ত করিয়া তুলিবে।

ব্রিটেন ও ইতালীর মধ্যে যে বিরোধিতা বাড়িয়া উঠিতেছিল তাহা দূর হইল কি না জানি না, তবে আপাততঃ দুই পক্ষই তাহা একটু চাপা দিয়া চলিবেন, তাহা ঠিক। ভূমধ্যসাগরের উপকূল লইয়াই দুই পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা; এবার দুই জনেই মানিয়া লইলেন,—উহার পশ্চিম উপকূলে এখনকার অবস্থাই অক্ষুণ্ণ থাকিবে; উহার পূর্ব্ব উপকূলে বা লোহিত সমুদ্রের কাছাকাছি কেহ কোথাও যুদ্ধজাহাজের বা উড়ো-জাহাজের ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিলে তাহা অন্যকে জানাইবেন; এডেন, মিশর, সুদান, ইতালীয় পূর্ব্ব-আফ্রিকা, সোমালিল্যাণ্ড, কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানায়িকা প্রভৃতি অঞ্চলে যাঁহার যেরূপ সৈন্য-সমাবেশ আছে তাহার পরিবর্ত্তন হইলে পরস্পর জানিতে পারিবেন; সুয়েজ-খালের পথ সব সময়ে খোলা থাকিবে; পূর্ব্ব ও উত্তর আফ্রিকায় এই দুই জাতির অধিকৃত ভূমির সীমা-নির্দ্ধারণ কালে মিশরকেও আমন্ত্রণ করা হইবে; সৌদি আরবে কেহ হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং এডেনে ইতালীর কয়েকটি অধিকার স্বীকৃত হইল। এই চুক্তিতে সমধিক উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব কিন্তু দুইটি:—স্পেন হইতে ইতালীয় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী সরাইয়া আনিবার প্রস্তাব ইতালী গ্রহণ করিলেন, যদি স্পেন-যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বে সব স্বেচ্ছাসেবক ফিরাইয়া আনা ঘটিয়া না উঠে তাহা হইলে অন্ততঃ যুদ্ধের শেষে আর স্পেনে ইতালীয় সৈনিক ও যুদ্ধোপকরণ থাকিবে না। অন্য দিকে, স্পেনের এই গোলমাল মীমাংসা হইলেই

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জাতিসঙ্ঘের পরবর্ত্তী সম্মেলনে ইতালীর আবিসিনিয়া-জয় স্বীকার করিয়া লইবার জন্য সঙ্ঘের অনুমতি গ্রহণ করিবেন।—অনেকখানি কমেডি ও অনেকখানি ট্র্যাজেডি এই দুইটি সর্ত্তের পিছনে এখনও উঁকি মারিতেছে। ভূতপূর্ব্ব আবিসিনীয়-সম্রাট এখনও গ্রেট ব্রিটেনে বাস করিতেছেন,—ব্রিটেনই তাঁহার পরম বন্ধু। 'জাতিসঙ্ঘে' তাঁহার বক্তৃতায় ভাবী কালের ইতিহাসের দিকে তাকাইয়া রাজ্যহীন হেইলে সেলেসি এক দিন রাষ্ট্রবিদ্‌দের নিকট শেষ আবেদন করিয়াছিলেন, অথচ আজ সেই আবেদনের শেষ রেশটুকুও সেই রাষ্ট্রনীতিকদের কানে আর পৌঁছিতেছে না। 'এই রাষ্ট্রসঙ্ঘকে' আবিসিনিয়া-ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠার পক্ষাবলম্বনের জন্য ব্রিটেন কম তাড়না দেয় নাই—আর সেই ব্রিটেনই এখন তাহাকে বলিবে 'তোমার পূর্ব্ব প্রস্তাব তেমনি থাক, কিন্তু ইতালীর পূর্ব্ব দৌরাত্ম্যটুকু যে আজ মাহাত্ম্যে পরিণত হইয়াছে, তাহাই মানিয়া লইতে আর বাধা দিও না।'—রাজনীতিতে এই খেলা নূতন নয়, লজ্জাকর হইতে পারে—প্রয়োজনের কাছে রাজনীতিতে লজ্জাকে প্রশ্রয় দিতে নাই। কিন্তু হাস্যকর উহার পূর্ব্বের সর্ত্তটি—ইতালীর স্পেন হইতে সৈনিক অপসারণ। মুসোলিনি বলিতেছেন,—যুদ্ধ শেষ হইলে আর তাহারা থাকিবে না। যুদ্ধ যাহাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয় সেজন্য মুসোলিনির যথেষ্ট আগ্রহ আছে, চেষ্টাও আছে। ঠিক যে-মুহূর্ত্তে এই চুক্তি-স্বাক্ষর চলিতেছিল তখনই যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র তিনি স্পেনে পাঠাইতেছিলেন ও ইতালীয় নূতন নূতন স্বেচ্ছাসেবক দল স্পেনে পৌঁছিতেছিল। তাহার ফলে ফ্রাঙ্কো নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া গণতান্ত্রিকদের হঠাইয়া দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কাজেই এই শোচনীয় অধ্যায়টি শেষ হইতে আর বেশী বাকী নাই—অন্ততঃ মুসোলিনির দিক হইতে উহাতে ত্রুটি হইবে না। আর তার পর? ইতালীয় বাহিনী গৃহে ফিরিবে, এই ত চুক্তি হইল। ইতালী কথা দিয়াছেন—স্পেনের কোনও ভূমি গ্রাস করিবার তাঁহার ইচ্ছা নাই। কথা যখন দিয়াছেন, ইহার পরে আর কথা কি?

৩

কিছু দিন পূর্ব্বে লয়েড জর্জ্জ একটি বক্তৃতায় বলেন,—"নেপোলিয়ন বুঝিয়াছিলেন স্পেনের সামরিক উপযোগিতা কি, কিন্তু আমাদের মন্ত্রিমণ্ডলের নিকট তাহা এখনও অজ্ঞাত।" এই মন্ত্রিমণ্ডলকে এতটা অজ্ঞ না-ভাবাই উচিত; তাঁহারাও বিলক্ষণ বুঝেন স্পেনের মূল্য কি। এক দিক হইতে দেখিলে স্পেন যে অধিকার করিবে, সে আংশিক ভাবে ফরাসী রাজ্যের উপরও তাহার প্রভাব বিস্তার করিবে। আর এই যানবাহন ও যুদ্ধাস্ত্রের উগ্র বাড়াবাড়ির দিনে ব্রিটেনই কি তাহার পক্ষে নাগালের বাহিরে থাকিবে? ফ্রান্সের রাষ্ট্রশক্তি কোন্ রূপ গ্রহণ করে, কোন্ প্রকারের ভাবনায় ও প্রেরণায় দ্বারা চালিত হয় বা প্রভাবান্বিত হয়, ব্রিটেনের পক্ষে তাহা সবচেয়ে বড় কথা। সেই হিসাবেই ফ্রান্সের প্রতিবেশী স্পেনও ব্রিটেনের ভাবনার বস্তু। কিন্তু আর একটি বড় কারণেও স্পেন ব্রিটেনের দৃষ্টি বেশী করিয়া আকর্ষণ করে—ভূমধ্য-সাগরের পশ্চিম তোরণ তাহার দৃষ্টিতলে। তিনটি বৃহৎ মহাদেশের পথ এই ভূমধ্যসাগরের বক্ষ দিয়া—ইহাকে আশ্রয় করিয়াই পাশ্চাত্য জগতের দুই সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। নেপোলিয়ানের ভাগ্যবিপর্য্যয়ও ঘটে এই ভূমধ্যসাগরের উপরে তাঁহার আপন অধিকার স্থাপনের অক্ষমতায়—তাহা নেপোলিয়নও জানিতেন। আজিকার দিনের নূতন রোম সাম্রাজ্যের স্থায়িতার চক্ষেও ভূমধ্যসাগরের মূল্য বেশ পরিষ্কার। সম্প্রতি 'কণ্টিনেণ্টাল রিভিয়্যু' পত্রে অধ্যাপক হল্যাণ্ড রোজ্ এই সব কথা আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, "ইতালী, আমরা যাহার এত দিনের বন্ধু, সেই ইতালী—কি এই ভূমধ্যসাগরে আমাদের দাবী ও প্রয়োজন স্বীকার করিবে না?" কথাটার মধ্যে ভিক্ষার অনুনয় আছে, সাম্রাজ্যবাদীর সবল ধ্বনি নাই। বর্ত্তমান ব্রিটিশ মন্ত্রিসভারও মনোভাব অনেকটা এই ধরণের। ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তির জন্য তাই ব্রিটেন এতটা উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল,—সমুদ্রের পথ, ভারতবর্ষের পথ, আফ্রিকার পথ, নিষ্কণ্টক রাখা চাই। স্পেন সম্বন্ধেও, তাই মনে করিয়াছে, একটা মীমাংসা

দরকার। যে-মীমাংসা হইয়াছে তাহাতে আর আপত্তি চলে না—স্পেনে ইতালীর আত্মপ্রভাব প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য নয়। শুনিতে কথাটা একেবারে সরল; কিন্তু ইতালীয় সৈনিক, উড়ো-জাহাজ, রণদক্ষ পরামর্শ-দাতারা স্পেনে দলে দলে পৌছিতেছেন, ইতালীয় বিমানের নিক্ষিপ্ত ইতালীয় বোমায় বার্সিলোনার শত শত স্পেনীয় নরনারী প্রাণ হারাইতেছে। ফ্রাঙ্কো জয়ের পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন, ভূমধ্যসাগরের কূল পর্য্যন্ত গিয়া পৌছিয়াছেন,—কাটালোনিয়ার পতন দুই এক মাসেই ঘটিতে বাধ্য। তার পর? তার পর ইতালীয় বাহিনী গৃহে ফিরিবে,—মেজোর্কায় কোন আস্তানা গাড়িবে না, বেলিরিজ দ্বীপমালায় ঘাঁটি রাখিবে না? মুসোলিনি আজ যাহা বলেন কাল তাহা রাখিবেন, ইহাই কি প্রধান মন্ত্রী আশা করেন? সম্ভবতঃ তিনি তাহা করেন না। ইহাও তিনি জানেন, প্রকাশ্যে ইতালী স্পেন ছাড়িয়া গেলেও মুসোলিনিই হইবেন স্পেনের মনিব। ফ্রাঙ্কো যতই নিজেকে চতুর মনে করুন, ইতালীয় বা জর্ম্মান ডিক্টেটরের তুলনায় তাঁহার নিজস্ব ব্যক্তিত্বও নাই, তাঁহার তেমন ইস্পাত-কঠিন দলও নাই। তাই এই ক্ষুদে ফাসিষ্ট ফ্রাঙ্কো কিছুতেই ঐ পাকা ফাসিষ্টদের স্পেন হইতে বে-দখল করিতে পারিবেন না। এই নাবালক ফাসিস্তকেও মুসোলিনি নিজের পায়ে দাঁড় করাইয়াই চুপ করিয়া থাকিবেন, এত পরহিতৈষণা তাঁহারও নাই। এই সব কথাই চেম্বারলেন জানেন, তিনিও বুঝেন—ফ্রাঙ্কোকে বেনামদার হিসাবে সম্মুখে রাখিয়া মুসোলিনিই স্পেনের পররাষ্ট্রনীতি, সম্ভবতঃ সমস্ত রাজনীতির উপর, আপনার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। তাহা হইলে চেম্বারলেন এই চুক্তির কথা বিশ্বাস করিলেন কেন? একমাত্র কারণ,—উপায় নাই, না হইলে চুক্তি হয় না, তাই; আর চুক্তির তাহার বড় প্রয়োজন, পূর্ব্বেই তাহা দেখিয়াছি। তাহা ছাড়া, স্পেন সাম্যবাদীর বন্ধু সাধারণ-তন্ত্রীদের হাতে পড়া অপেক্ষা, এই পুঁজিদার দলের মতে, ফাসিস্তদের হাতে পড়াই শ্রেয়ঃ। এইটিই বড় কারণ,—ব্রিটিশ ধনিক ও শাসক সম্প্রদায় ফাসিজমকে ভয় করেন না, হোক্ তাহা গণতন্ত্রের শত্রু; কিন্তু সাধারণতন্ত্র ও সাম্যবাদে তাঁহাদের বড় ভয়—উহা যে তাঁহাদের শ্রেণীগত বনিয়াদই উপড়াইয়া ফেলিবে। এই ভয়ের নিকট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গরিমাও টিকে না। এই কারণেই যখন এবার আয়োজন- ও উপকরণ-হীন স্পেন-সরকার বার বার অস্ত্রশস্ত্র চাহিল, তখনও চেম্বারলেন বলিলেন, স্পেনে নিরপেক্ষতার নীতি বজায় রহিবে। এমন কি, ফরাসী সমাজতান্ত্রিক মন্ত্রী ব্লুঁ্য পর্য্যন্ত নীরব রহিলেন।—তখন ইতালীর কাগজে বড় বড় হরফে লেখা চলিয়াছে স্পেনে ইতালীয় সৈনিকদের নূতন নূতন জয়ের কথা; আর ফরাসী সরকারকে ধম্‌কানো চলিয়াছে—'যদি স্পেন সরকার সাহায্য পায় তাহা হইলে কিন্তু ফ্রান্সের মঙ্গল হইবে না।' ফরাসী ব্রিটেনের মুখাপেক্ষী; আর ব্রিটেন নির্ব্বিকার। অতএব নিরপেক্ষতার দৌলতে ফ্রাঙ্কো বরাবরের মত এবারও সুপ্রচুর সহায়তা পাইলেন, আর সরকার পক্ষ রহিলেন বঞ্চিত। ঠিক যখন ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল তখনও এই অধ্যায়ই চলিয়াছে। তবে অধ্যায় এবার অচিরেই শেষ হইবে, আর তখন ফ্রাঙ্কোকে হাতের পুতুল করিয়া মুসোলিনি এই চুক্তি-অনুযায়ী ইতালীয় সৈনিকদের স্বদেশে ফিরাইয়া আনিতেও পারেন। না আনিলেই বা কি? ফাসিস্ত হিসাবে সে বর্ত্তমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে আঘাত করিতে পারে, কিন্তু সে সাম্রাজ্যের শ্রেণী-বনিয়াদ ভাঙিতে চায় না।

৪

স্পেনে ফ্রাঙ্কোর প্রতিষ্ঠায় বিপদ হইবে ফ্রান্সেরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তিন দিক হইতে এবার তাহাকে ফাসিস্ত শক্তিরা ঘিরিয়া ধরিবে। পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়া প্রভৃতি তাহার পুরাতন বন্ধুরা আজ নাৎসি উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া পড়িতেছে। আর গৃহমধ্যেও তাহার ফাসিস্ত চর ও চক্রান্তের অভাব নাই। 'ক্রোয়া দ্য ফ্যো' আন্দোলন শেষ হইয়াছে, রাজতান্ত্রিক 'অ্যাক্‌শিয়ঁ ফ্রাঁসেজ্' দলেরও প্রভাব ম্লান; তবু কিছু দিন পূর্ব্বে আবিষ্কার হইল ক্যাগুলার দলের গুপ্ত চক্রান্ত। তথাপি সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রীরাই এখন

ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন। কিন্তু বারে বারে আসন তাহাদের টলিতেছে। তাহার কারণও ফরাসী অর্থসঙ্কট ও নাৎসি জার্ম্মেনীর বৈরিতা। নাৎসি-বিভীষিকায় ফ্রান্সের সত্য-সত্যই ত্রস্ত হইবার কথা। জার্ম্মান-বাহিনীর পায়ের তলায় ফরাসী ভূমি আবার গুঁড়াইয়া যাইবে, ১৮৭০ ও ১৯১৪ এর পর কোনও ফরাসী যদি এইরূপ দুঃস্বপ্ন দেখে তবে তাহা কি অন্যায়? হিট্লারের চোখ পূর্ব্ব দিকে; কিন্তু রূঢ়ে, রাইন্ল্যাণ্ডে ফরাসী জাতি যুদ্ধান্তে যে উগ্র দর্প দেখাইয়াছে, সে-সব অঞ্চলের অধিবাসীরাই কি তাহা বিস্মৃত হইয়াছে? ফরাসী বিজয়লক্ষ্মীর সেই ঔদ্ধত্যের প্রতিশোধ গ্রহণ না-করিয়া জার্ম্মান যুদ্ধদেবতা কি শুধু পূর্ব্বমুখেই অভিযান করিবেন? এই জার্ম্মান-বিভীষিকার বশে ফরাসী দুইটি নাৎসি-বিরোধী শক্তির সঙ্গে মিত্রতা-সূত্রে বদ্ধ হইয়াছে;—পরস্পর আক্রান্ত হইলে রুশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও ফ্রান্স পরস্পরকে সাহায্য করিবে। কিন্তু, ইহার অপেক্ষা ফ্রান্সের বেশী আশা ব্রিটেনের নিকট; আর বেশী কামনা ইতালীর মিত্রতা। যখন ব্রিটেন ও ইতালীতে মিত্রতার কথা উঠে তখন সে তাই খুবই উল্লসিত হয়। দুই প্রতিবেশীর এই মিত্রতা ঘটিলে তাহাকে আর উভয় সঙ্কটে পড়িতে হইবে না। ব্রিটেন তাহার মিত্র, ইতালীকেও তো সে মিত্ররূপে পাইতেই চায়—মাঝখানে শুধু ব্রিটেন হইতেছিল অন্তরায়। সে-অন্তরায় এবার সরিয়া গেল—ফরাসী-ইতালীয় চুক্তির কথাবার্ত্তাও ফরাসী পররাষ্ট্র-সচিব অমনি আরম্ভ করিলেন। তাই, পশ্চিম সীমান্তে যখন ইতালীয় ফাসিজম ফ্রাঙ্কোর ধ্বজা উড়াইয়া আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, তখনও ফরাসী সমাজতান্ত্রিক প্রধান মন্ত্রী স্পেন-গণতন্ত্রের শেষ আবেদন প্রত্যাখ্যান করিলেন—চেম্বারলেনের ব্রিটেন যখন সেই মিনতিতে কর্ণপাত করে না, ফরাসীই বা একা কি করিবে? বিশেষত, ইহাতে ইতালীয় বন্ধুত্বের সম্ভাবনা ত ধূলিসাৎ হইবেই, ভাগ্যে জুটিবে ইতালীর বিরোধিতা, ব্রিটেনেরও বন্ধন হইবে শিথিল, আর তাহার ফলে নাৎসি জার্ম্মেনীর বদ্ধমূল আক্রোশ যে কোন্ রূপ লইবে তাহাও অনুমান করা যায়। অতএব, ফ্রান্স নীরব নিশ্চেষ্ট ভাবেই দেখিতেছে তাহার তিন দিকে ফাসিজমের প্রতিষ্ঠা। বরং তাহারও চেষ্টা এই ফাসিজমেরই আদি প্রচারক মুসোলিনির সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করিয়া প্রাগ্ যুদ্ধ যুগের ইঙ্গ-ফরাসী-ইতালীয় মিত্রতার সেই পুরাতন সম্পর্কটি নূতন করিয়া লইতে।

কিন্তু তাহাই কি সম্ভব? ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি ব্রিটেনের যে রাষ্ট্রীয় দলের ও রাষ্ট্রীয় মনের দান, তাহারা নাৎসি জার্ম্মেনীর সঙ্গে এমনি একটা বুঝাপড়ায় পৌঁছাইতে ইচ্ছুক—ফ্রান্সের মত তাহাদের নাৎসি-ভীতি নাই। বরং মুসোলিনির মতই হিটলারও তাহাদের চোখে বিত্তবানের মান-সম্ভ্রম, ক্ষমতা ও সভ্যতার সংরক্ষক—সাম্যবাদের 'প্রলয় পয়োধি জলে ধৃতবান্ খড়্গং'। জার্ম্মেনীর সঙ্গে আপোষ-রফা করিয়া ফেলিলে ইউরোপ সম্বন্ধে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।—আর ফ্রান্স? সেই চতুঃশক্তির বন্ধুর সমাজে ফ্রান্সের আর তখন না-আসিয়া উপায় কি? আসিতেই বা বাধা তাহার কি থাকিবে—যদি সত্যই ফাসিস্ত শক্তিরা এ-ভাবে তাহার নিজ রাজ্য সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দেয়? বাধা থাকে চেকোস্লোভাকিয়া, বাধা থাকে রুশিয়া ইহাদের বাঁধন ছিঁড়িবার জন্য নাৎসি জার্ম্মেনী জেদ করিবে, ইংরেজ ও ইতালীর মারফৎ ফরাসীকে চাপ দিবে,—চেকোস্লোভাকিয়াকে বলিবে সুদেতেন জর্ম্মান অঞ্চল ফিরাইয়া দিতে (এখনি ব্রিটিশ কাগজ সেই ধুয়া ধরিয়াছে, চেক্রাও পণ্ডিত জনের নীতি অনুসরণ করিয়া 'অর্দ্ধং' ত্যাগ করিতে প্রায় স্বীকৃত), ফ্রান্সকে বলিবে সাম্যবাদী রুশিয়াকে পরিত্যাগ করিতে। কিন্তু, এই চালের শেষ যে কি গুরুতর হইতে পারে ফ্রান্সের তাহাও অজানা নাই। অতএব, ব্রিটেনের 'চতুঃশক্তি মিলনে'র পরিকল্পনা কত দূর ঘটিয়া উঠিবে তাহা বলা দুঃসাধ্য। আপাততঃ ফরাসী-ইতালীয় মিত্রতার চেষ্টাই বড় কথা। আর অন্য দিকে বড় কথা—মঃ দালাদিয়ের ও বনের ব্রিটেনে সামরিক সহযোগিতার আলোচনা—দুই দেশের সামরিক কর্ত্তাদের আক্রমণ ও রক্ষা সম্বন্ধে পরস্পরের পরিকল্পনা ও কার্য্যসূচীর বিনিময়। এবার নাকি তাহা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

ইতালীও এদিকে জার্ম্মেনীর বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতেই

উৎসুক। ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি স্বাক্ষর হইতে-না-হইতেই সমস্ত ইতালীয় কাগজ একস্বরে বলিল, 'বার্লিন-রোম-বন্ধন কিন্তু তেমনি দৃঢ় আছে।' দৃঢ় আছে কি? অষ্ট্রিয়ার পতনে তাহাতে একটু টান পড়ে নাই? মনে হয়, হয়ত পড়িয়াছিল। তাই হের হিট্‌লার এখন রোমে আসিয়াছেন, রাজার মত তাঁহার বিপুল সম্বর্দ্ধনা হইয়াছে, দুই একনায়কের ঐক্য বুঝি দৃঢ়তর করা চলিতেছে, আর হয়ত চলিতেছে চেকোস্লোভাক-রুশ-ফরাসী সন্ধির সম্বন্ধে পরস্পরের আলোচনা।

৫

কিন্তু ফরাসীর প্রধান জ্বালা তাহার নিজের ঘর—তাহার অর্থসঙ্কট। অষ্ট্রিয়ার পতনে ব্লুঁ্য তখন-তখনি মন্ত্রী হইলেন বটে, কিন্তু সেই মন্ত্রিত্বের অবসানও ঘটিল দ্রুত।—ফরাসী মন্ত্রিত্বের পক্ষে অকালমৃত্যুই প্রায় স্বাভাবিক। অর্থনৈতিক সঙ্কট দূর করিবার জন্য মঃ ব্লুঁ্য অনেকগুলি অসাধারণ ক্ষমতা দাবী করেন—পুঁজিদারের পুঁজিতে ট্যাক্স বসাইয়া কয়েক বৎসরে তিনি ফরাসীর ঋণ মুছিয়া ফেলিবেন এই ছিল তাঁহার সঙ্কল্প। শ্রমিকদের মজুরীর হার কমাইতে বা শ্রমকাল বাড়াইতে তিনি ছিলেন অনিচ্ছুক। তিনি প্রস্তাব করেন, বিনিময় বোর্ড বসাইয়া ফ্রাঁকে জীয়াইয়া রাখিতে, ফ্রাঁর বহির্গমন বন্ধ করিতে, উহার পরিমাণ ফাঁপাইয়া তুলিতে—না হইলে ফ্রান্সের পথ নাই। কিন্তু উর্দ্ধসভা সেনেট তাহা প্রত্যাখ্যান করায় ব্লুঁ্যর দ্বিতীয় 'ফ্রঁৎ পপুলেরে'র পতন ঘটিল—তখন দেলাদিয়ে হইলেন প্রধান মন্ত্রী। দেলাদিয়ে ইংরেজ-প্রেমিক, এখনি ইডেনের মতই তাঁহার মত—রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও গণতান্ত্রিক মত ও পথ সুরক্ষিত রাখিতে সচেষ্ট। সেদিকে দেলাদিয়ের যে চেষ্টা চলিয়াছে, তাহা দেখিয়াছি। এদিকে মুদ্রানীতিতে তাঁহার প্রধান নির্দ্দেশ জারি হইয়াছে—ফ্রাঁর দর তিনি কমাইয়া পাউণ্ডে ১৭৯ করিয়া বাঁধিয়া দিলেন;—ইহাতেই নাকি ফরাসী মুদ্রা বাঁচিতে পারিবে। ফ্রাঁর এই মূল্যহ্রাসে ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সের সঞ্চিত স্বর্ণের পুনরায় মূল্য স্থির করিতে হইবে। সেই ব্যাঙ্কের কাছে ৪২ হাজার কোটি ফ্রাঁ ছিল ফরাসী সরকারের ধার; এবার এই মূল্যহ্রাসে তাহা লোপ পাইল। এদিকে ফরাসী পুঁজি আবার ঘরমুখো হইয়াছে, ইহাও আশার কথা। দেলাদিয়ে জানাইয়াছেন, 'ফ্রাঁর মূল্যহ্রাসের ফলে ব্যবসায়ীরা যদি জিনিষপত্রের দাম বাড়াইয়া দেয়, সরকার তাহার প্রতিবিধান করিবে; অতএব মজুরের মাহিনার তুলনায় জিনিষপত্র দুর্মূল্য হইবে না। অবশ্য, মজুর আর বেশী মজুরীও আদায় করিতে পাইবে না। তাহা ছাড়া আত্মরক্ষার জন্য ফ্রান্সের এখন চাই বহু কোটি টাকা ঋণগ্রহণ—যেন অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ সুনির্ব্বাহ হয়।—এই মুদ্রা-ব্যবস্থা কত দিন স্থায়ী হইবে, কতটুকু সমস্যা মিটাইতে পারিবে তাহা বলা দুঃসাধ্য। তবে, আপাতত ফরাসী ফ্রাঁ একটু নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইল।

৬

ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তিতে রুষ্ট হইয়াছে মাত্র একটি জাতি—জাপান। তাহার মতে, ইহাতে সাম্যবাদী-বিরোধী রোম-বার্লিন-টোকিও চক্রের শক্তি খর্ব্ব হইয়াছে। কথাটা বুঝা একটু কষ্টকর—কি ক্ষতি, কোথায় হইল। কিন্তু যদি লক্ষ্য করা যায় বুঝা যাইবে—টোকিও নিজের ক্ষতির একটু দূর সম্ভাবনা দেখিতেছে বলিয়াই এই উক্তিটি করিয়াছে। সে এখন 'চীনের ঘটনাটা' চুকাইয়া লইতে চায়। প্রশান্ত-মহাসাগরের তীরে আর যাহাদের স্বার্থ আছে, জাপানী একচ্ছত্রাধিকার চীনে যাহারা চায় না, তাহারা এখন নিজ নিজ গৃহের নিকটে নানা বিপদজালে বিজড়িত—রুশিয়া নিজের দক্ষিণ ও বামমার্গী বিনাশে, ও নাৎসি-আক্রমণের চিন্তায় উদ্বিগ্ন, আমেরিকা নূতন ব্যবসায়-সঙ্কটের সম্মুখীন, ইংরেজ ভূমধ্যসাগরের ভাবনায় কাতর। চমৎকার জাপানের সুযোগ। কিন্তু সম্পূর্ণ সে কাজ গুছাইয়া আনিবার পূর্ব্বেই যদি ব্রিটেন ইউরোপীয় আবর্জ্জনা হইতে উদ্ধার পায় তাহা হইলে প্রশান্ত-মহাসাগরের তীরে নিজের স্বার্থ বুঝিয়া লইবার নামে জাপানী অভ্যুদয়কে সে বাধা দিবে, ইহা নিশ্চয়। মনে করিতে পারি, কেন? বর্ত্তমান ব্রিটিশ ক্যাবিনেট তো ফাসিস্ত-বন্ধু; তবে জাপানী ফাসিজমের সে প্রতিকূল

হইবে কেন, চীনা গণ-জাগরণেরই বা সহায় হইবে কেন? তাহার কারণ, জাপানী উগ্রতায় ও বিজয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় ও ভারতবর্ষে এক সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন হইতে পারে, তাই পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতে হয়। দ্বিতীয়ত, চীনেও ইংরেজের স্বার্থ কম নয়। চীনা জাগরণ যতই গুরুতর হউক, তাহাতে ব্রিটিশ স্বার্থ শীঘ্র বিপন্ন হইবে না। কিন্তু জাপান চীন অধিকার করিলে সে-সব এক ফুংকারে উড়াইয়া দিবে—যেমন মাঞ্চুকুওর তৈলের ব্যবসায়কে দিয়াছে। তবে, প্রবল জাপানী শত্রু যদি চীনের এক খণ্ড লইয়া দূর প্রাচ্যের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বা চীনস্থ ব্রিটিশ স্বার্থের দিকে নজর না দেয়, তাহা হইলে ব্রিটেনের পক্ষে চীনের পরাজয়েও তেমন আপত্তি থাকিবে না। কিন্তু জাপান ভাবিতেছে, 'চীনের ঘটনাটা' না-চুকিতে ব্রিটেন এই দিকে তাকাইবার অবসর পাইলেই বিপদ। বিশেষত, সম্প্রতি জাপানের আবার চীনের হাতেও পরাজয় ঘটিতেছে। এ পরাজয় অবশ্য আবার বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করিলে সহজেই বিজয়ে পরিণত হইবে, কিন্তু বড় দেরি হইয়া যাইতেছে। একে চীন এক বিশালকায় দেশ; তাহাতে এখন তাহার বিচ্ছিন্ন শক্তি ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে; আর চীনা সৈনিকেরা প্রাণ দিবার জন্য ব্যাকুল না-হইয়া এখন গরিলা যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে—তাই জাপানের দেরি হইতেছে আরও বেশী। আর যত বিলম্ব ঘটিতেছে ততই জাপানের ঋণভার বাড়িতেছে, ভাবনা জুটিতেছে—ইউরোপীয় শক্তিরা যদি ইউরোপের কলহ হইতে নিষ্কৃতি পায়, আর সর্ব্বোপরি সোভিয়েট রাশিয়া যদি সত্যই ঘর সামলাইয়া চীনের স্বপক্ষে নামিয়া পড়ে? সম্ভাবনা অবশ্য সুদূর—বেশ সুদূর।

৭

একটি কথা বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে—সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন মোটের উপর গণতান্ত্রিক শক্তিদের মায়া কাটাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইউরোপীয় রাজনীতিতে এখন যে অধ্যায় সুরু হইল—তাহা 'ক্ষমতার রাজনীতি'—'পাওয়ার পলিটিক্স'। আমাদের পক্ষে উহাতে যায় আসে না। বরং যখন গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সহায়ক হিসাবে ব্রিটেন গণতান্ত্রিক জগতের নেতৃত্ব করিতেছিল তখনই আমরা পড়িয়াছিলাম দুশ্চিন্তায়—যদি ফাসিস্তপন্থীদের সঙ্গে গণতান্ত্রিকদের ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধে, আর ইংরেজ থাকে গণতান্ত্রিকদের দলে, তাহা হইলে আমরা করিব কি? তাহা হইলে আমরাও উভয় সঙ্কটে পড়িতাম, নিঃসন্দেহে। বর্ত্তমান ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি ও ভাবী ইঙ্গ-জার্ম্মান চুক্তি আমাদের সমস্যাকে সরল করিয়া দিল—এক ইঙ্গ-জাপান সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা এখনও ঐরূপ সমস্যায় পড়িতে পারি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষ কখনও স্বাধীন ছিল না !

মেজর ইয়েট্‌স্‌-ব্রাউন নামক এক জন ইংরেজ লেখক "বেঙ্গল ল্যান্সার" নামক উপন্যাস লিখিয়া এবং "বেঙ্গলী" নামক চলচ্চিত্রের ফিল্মের গল্পাংশ রচনা করিয়া বিলাতে বিখ্যাত এবং এদেশে কুখ্যাত হইয়াছেন। তিনি গত ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে জার্মেনীর বার্লিন ও মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। দুখানি জার্মেন কাগজ হইতে আমরা বর্তমান মে মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে বক্তৃতা দুইটির ইংরেজী অনুবাদ দিয়াছি। যাঁহারা ইংরেজী জানেন, তাঁহারা ঐ ইংরেজী মাসিকে সে দুটি পড়িতে পারিবেন। তাহাতে উক্ত মেজর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিরূপ ভ্রান্ত ধারণা উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সে বিষয়ে কিছু বলিব।

তাঁহার মতে ভারতবর্ষ বরাবরই বিজেতাদের দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছে, কোন কালেই স্বাধীন ছিল না। যথা—

"He described how India has been continuously ruled by foreigners through the centuries; how the first conquerors, the Aryans, kept themselves aloof from the native population by means of the caste system,......"

তাৎপর্য্য। তিনি বর্ণনা করেন—কেমন করিয়া ভারতবর্ষ ক্রমাগত অবিচ্ছেদে শতাব্দীর পর শতাব্দী বিদেশীদের দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছে; কেমন করিয়া প্রথম বিজেতা, আর্য্যেরা, জাতিভেদ প্রথা দ্বারা আপনাদিগকে নেটিভ অর্থাৎ দেশজ লোকসমূহ হইতে পৃথক্ রাখিয়া আসিয়াছে,....।

তাহার পর বক্তা বলেন, ভারতবর্ষের জলবায়ু আর্য্যদিগকে দুর্ব্বল করে ও তাহারা মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়। সর্ব্বশেষে ইংরেজরা ভারতবর্ষ জয় করিয়া শাসন করিতেছে।

নৃতত্ত্ব অনুসারে "আর্য্য" বলিয়া মানবজাতির স্বতন্ত্র কোন একটা ভাগ নাই। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও, যাহাদিগকে আর্য্য বলা হয়, তাহারা ভারতবর্ষের বাহির হইতেই আসিয়াছিল, না, ভারতবর্ষেরই উত্তর-পশ্চিম অংশেই (অন্ততঃ তাহাদের কিয়দংশ) ছিল, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। সে কথাও ছাড়িয়া দিয়া যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যে, আর্য্যেরা সবাই ভারতবর্ষে বিদেশী বিজেতা রূপেই আসিয়াছিল, তাহা হইলেও কয়েক হাজার বৎসর ধরিয়া এদেশে বাস করা সত্ত্বেও তাহারা বিদেশী ও বিজেতাই রহিয়া গিয়াছিল, এরূপ কথা পাগল কিংবা সেয়ান-পাগল ভিন্ন কেহ বলিতে পারে না।

পৃথিবীর সমুদয় সভ্য দেশেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে নানা বিদেশী বিজেতারা আসিয়াছে এবং সেখানে বাস করিয়া সেই সেই দেশের স্থায়ী অধিবাসী হইয়া গিয়াছে। যে-সব দেশ এইরূপ স্থায়ী অধিবাসীদের দ্বারা শাসিত, তাহাদিগকে কোন ঐতিহাসিক, কোন রাজনৈতিক, বিজেতাদের শাসিত দেশ বলে না। ভারতবর্ষে আর্য্যেরা বিজেতারূপে আসিয়া থাকিলেও তাহারা এখানে ভারতীয়ই হইয়া গিয়াছিল এবং ভারতীয় রূপেই দেশ শাসন করিত। সুতরাং আর্য্য শাসনের অধীন ভারতবর্ষ স্বাধীন ভারতবর্ষই ছিল।

তাহার পর মুসলমান শাসনের কথা। সমগ্র ভারতবর্ষ কোন কালেই কোন মুসলমান নৃপতির অধীন হয় নাই। দক্ষিণ-ভারতবর্ষের অনেক অংশ সম্বন্ধে এই কথা সত্য। দক্ষিণ-ভারতের এই অনেক অংশের অধিবাসীদের অধিকাংশ এখনও আর্য্যবংশোদ্ভূত নহে। তথাকার বিস্তর ব্রাহ্মণকেও নৃতত্ত্ববিদেরা উত্তর-ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এক বৈজ্ঞানিক জাতির মধ্যে ফেলিবেন না। সুতরাং এই সকল অংশ আর্য্যদের দ্বারা বিজিত হয় নাই, মুসলমানদের দ্বারাও বিজিত হয় নাই। ইংরেজদের প্রভুত্ব স্বীকার করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারা স্বাধীন ছিল।

দক্ষিণ-ভারতের কোন কোন অংশ মোগলের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইয়াছিল। ইংরেজের প্রভুত্ব স্বীকার করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারা স্বাধীন

ছিল। উত্তর-ভারতেরও পঞ্জাবের ও অন্য কোন কোন বংশের লোকেরা ইংরেজের শাসনাধীন হইবার পূর্ব্বে মোগলের প্রভুত্বমুক্ত হইয়া স্বাধীন ছিল।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার দুই রকম অর্থ আছে। যদি কোন দেশ সেই দেশেরই কোন বংশ হইতে জাত ও সেই দেশেরই অধিবাসী কোন রাজার দ্বারা শাসিত হয়, এবং যদি সেই রাজা স্বেচ্ছাশাসকও হন, প্রজাদের কোন অধিকার না থাকে, তাহা হইলেও সেই দেশকে একটি অর্থে স্বাধীন বলা যায়; কারণ, সে দেশ বিদেশী কাহারও অধীন নহে। অবশ্য ইহাও উহ্য যে, ঐ রাজা অন্য কোন দেশের রাজাকে কর দেন না, বা প্রভু বলিয়া মানেন না।

স্বাধীনতার দ্বিতীয় অর্থ ও শ্রেষ্ঠ অর্থ অন্য প্রকার। যদি কোন দেশের অধিবাসীরা আপনাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সমুদয় রাষ্ট্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করায়, তাহাদের দ্বারা প্রণীত আইন মানে, তাহাদের দ্বারা নির্দ্ধারিত ট্যাক্স দেয়, ইত্যাদি, তাহা হইলে সেই দেশের শিরোভূষণ স্বরূপ দেশী রাজা (যেমন ব্রিটেনে) বা দেশী নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতি (যেমন আমেরিকায়), যিনিই থাকুন, তাহাকে স্বাধীন বলা যাইতে পারে। ইহাকে (বিশেষতঃ যেখানে নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতি আছেন) গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষের যে-সব অঞ্চলে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সব অঞ্চল যত দিন তথাকার স্থায়ী অধিবাসী মুসলমান রাজবংশের দ্বারা বিদেশী মুসলমান অমাত্য বা সেনানায়কের সাহায্য ব্যতিরেকে শাসিত হইয়াছিল, তত দিন সেইগুলিকে স্বাধীনতার পূর্ব্বোক্ত প্রথম অর্থে স্বাধীন বলা যাইতে পারে। কারণ, বিদেশী মুসলমানেরাও কালক্রমে এদেশী হইয়া গিয়াছিল এবং যে-সব ভারতীয় মানুষ মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা ও তাহাদের বংশধরেরা ত এদেশীই।

—

ইংলণ্ড স্বাধীন নয়, কখন ছিলও না!

মেজর ইয়েট্‌স্-ব্রাউন যে-কারণে বলিয়াছেন,* যে, ভারতবর্ষ বরাবরই বিজেতা বিদেশীদের দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছে, ঠিক সেই কারণেই বলা যাইতে পারে, যে, ইংলণ্ডও বরাবরই এখন পর্য্যন্ত বিজেতা বিদেশীদের দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছে, এবং এখনও স্বাধীন নহে। প্রমাণ দিতেছি।

ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও জানে, যে, রোমানরা যখন ব্রিটেন জয় করে, তখন সেল্ট-জাতীয় ব্রিটনেরা তথাকার অধিবাসী ছিল। কিন্তু এই ব্রিটনরাও ইংলণ্ডের বা ব্রিটেনের আদিম অধিবাসী নয়। তাহারা ব্রিটেন জয় করিয়া সেখানে বসবাস করে। এন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার চতুর্দ্দশ সংস্করণের ৪ ১৫৮-১৫৯ পৃষ্ঠায় আছে, ব্রঞ্জ যুগের শেষ ভাগে সেল্টদের এক উপজাতি এবং লৌহ যুগে সেল্টদের অপর দুই উপজাতি ব্রিটেন আক্রমণ ও জয় করে। রোমান সেনাপতি জুলিয়স সীজরের সময়ে এই সকল সেল্টদের বংশধর ব্রিটনরা ব্রিটেনে বাস করিত।

তাহার পরের ইতিহাস ইস্কুলের ছেলেমেয়েরাও জানে। রোমানরা ব্রিটেন জয় করিল। দীর্ঘকাল পরে যখন রোমানরা নিজেদের দেশ রক্ষা করিবার জন্য ব্রিটেন হইতে চলিয়া গেল, তখন য়্যাংগ্‌ল্, স্যাক্সন ও জুট্ নামক তিনটি টিউটনিক জাতি ব্রিটেনে আসিয়া তাহা জয় করিল। তাহার পরের আক্রমণকারী ও বিজেতা ডেনরা, তৎপরে নরওয়ের লোকেরা, তাহার পর আবার ডেনরা, তাহার পর নর্ম্যানরা। সাক্ষাৎ ভাবে নর্ম্যান-নামধারী কয়েক জন রাজার পর এঞ্জেভিন ও প্লান্টাজেনেট রাজারা রাজত্ব করেন। রাণী এলিজাবেথের পর যে নৃপতি জেমস ইংলণ্ডের রাজা হন, তিনি স্কটল্যাণ্ডের রাজা, সেখান থেকে আমদানী। ইহার কয়েক বংশধরের পর হল্যাণ্ড থেকে ডচ তৃতীয় উইলিয়ম ইংলণ্ডের রাজা হন। প্রথম জর্জ প্রভৃতি ছিলেন জার্মেন। এক জার্মেন রাজকুমার প্রিন্স এলবার্ট রাণী ভিক্টোরিয়াকে বিবাহ করেন। ভিক্টোরিয়ার পরবর্ত্তী ইংলণ্ডের সমুদয় রাজা, বর্ত্তমান রাজা পর্য্যন্ত, সেই জার্মেন রাজকুমারের বংশধর।

মেজর ইয়েট্‌স্-ব্রাউনের মত অনুসরণ করিয়া বলা যায়, যে, যেমন বিজেতা বিদেশী আর্য্যদের বংশধরেরা

বহু শতাব্দী ভারতবর্ষে থাকিলেও তাহারা বিদেশী বিজেতা, মুসলমানরাও বহু শতাব্দী ধরিয়া এদেশী হইলেও বিদেশী, তেমনই ব্রিটন, য়্যাংগ্‌ল্‌, স্যাক্সন, জুট, ডেন, নরুইজিয়ান, নর্ম্যান, প্রভৃতিরাও বহু শতাব্দী ব্রিটেনে থাকিলেও, তাহারা ও তাহাদের বংশের রাজারা বরাবর বিজেতা বিদেশীই ছিল, এখনও আছে; সুতরাং ব্রিটেন কখনও স্বাধীন ছিল না, এখনও নাই!

—

মেজর ইয়েট্‌স্‌-ব্রাউনের আরও দু-একটা কথা

মেজর ইয়েট্‌স্‌-ব্রাউনের বক্তৃতা ছুটার সব মিথ্যা ও আধা-সত্য কথার উল্লেখ এখানে করিব না—তাহা মডার্ণ রিভিয়ুতে আছে। কেবলমাত্র দু-একটা কথার উল্লেখ করিব। তাঁহার মতে,

ভারতবর্ষের লোকেরা ধর্ম্মভেদ ও জাতি-(রেস্‌)ভেদ হইতে উৎপন্ন যে বিদ্বেষের দ্বারা বিভক্ত তাহার পরিবর্ত্তে সদ্ভাব ও মিলন স্থাপন অসম্ভব;

প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলা খুব অত্যাচারী—বিশেষতঃ যেগুলা রাশিয়ার প্রভাবের অধীন (অর্থাৎ কংগ্রেসী!);

বিশ্ববিদ্যালয়গুলা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে;

ধর্ম্মকে গোর দেওয়া হইতেছে;

পারিবারিক জীবনকে উপহাসাস্পদ করা হইতেছে;

মস্কোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শত শত আন্দোলক জনগণের মধ্যে কাজ করিতেছে;

উকীলরা ও মহাজনরা কৃষকদের উপর অত্যাচার করিতেছে;

কোন ভারতীয়ই মানুষের সাম্যে বিশ্বাস করে না;

ভারতবর্ষে কয়েকটা পৃথক্‌ পৃথক্‌ নেশ্যন আছে যাহারা আলাদা আলাদা গবর্মেণ্ট খাড়া করিতে পারে;

যে-সব গণতান্ত্রিক ধারণা ইংলণ্ডে প্রচলিত, ভারতবর্ষীয়েরা কয়েক হাজার বৎসর আগেই সেগুলা বর্জ্জন করিয়াছে;

এ কথা সত্য নহে, যে, ইংরেজরা কেবল তত দিনই ভারতে থাকিবে যত দিন পর্য্যন্ত ভারতীয়েরা স্বশাসন-সমর্থ না হয়; "আমরা (ইংরেজরা) এখানে বরাবর থাকিব—ইংলণ্ড ভারতবর্ষের বাণিজ্য চায় এবং ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের চালকত্ব ("গাইড্যান্স") চায়" (অর্থাৎ চিরকালই চাহিবে)!

এই রকম সব কথা জার্মেনীতে এক জন ইংরেজ গিয়া কেন বলিলেন, তাহার প্রকৃত কারণ জানি না, কিন্তু কিছু অনুমান করা যায়। কোন বিদেশী জাতির ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতি থাকিলেই তাহারা যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন হইতে সাহায্য করিবে, তাহার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। তথাপি, ইংরেজরা ভারত-বর্ষের প্রতি অন্য কোন দেশের সহানুভূতিকে ভয় করে। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি জার্মেন পণ্ডিতদের শ্রদ্ধা আছে, বর্ত্তমান ভারতের প্রতি কোন জার্মেনের শ্রদ্ধা আছে কিনা জানি না। থাকিলে, তাহা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে নষ্ট করা, মেজর ইয়েট্‌স্‌-ব্রাউনের উদ্দেশ্য হইতে পারে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের বর্ত্তমান চেষ্টাটা একটা বাজে ব্যাপার, কারণ চেষ্টা করিবে কে? হিন্দুরা, মুসলমানরা, সবাই ত ভারতের সাবেক বিজেতা ও বিদেশী; ভারতবর্ষটা তাহাদের স্বদেশই নহে; সুতরাং স্ব-রাজ কেমন করিয়া হইবে? এই মর্ম্মের কথা বলা সাম্রাজ্যোপাসক ইংরেজদের পক্ষে অসম্ভব ত নহেই, বরং স্বাভাবিক।

নূতন ভারতশাসন-আইন অনুসারে ভারতীয়েরা যতটুকু ক্ষমতা পাইয়াছে, তাহার ফল হইতেছে প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলির দ্বারা অত্যাচার—এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য ভারতীয়দের অকর্মণ্যতা ও দুর্বৃত্ততা প্রমাণ করা, যাহাতে তাহারা পরে বেশী কিছু বাস্তবিক ক্ষমতা না পায়। কংগ্রেস গবর্মেণ্টগুলির উপরই উল্লিখিত ইংরেজ বক্তার রাগ বেশী—যদিও তাহারাই অত্যাচার দমন করিতে ও দেশের হিত করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করিতেছে।

জার্মেনী রাশিয়ার শত্রু। অতএব ভারতবর্ষে রাশিয়ার মত ধর্ম্মের উচ্ছেদ ও পারিবারিক জীবনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইতেছে এবং এদেশে মস্কোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শত শত লোক আন্দোলনে ব্যাপৃত আছে, এমন কথা জার্মেনীতে বলিলে সেখানকার লোকদের ভারতবর্ষের প্রতি বিরূপতা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে, চতুর সাম্রাজ্যোপাসক ইংরেজ তাহা ভাল করিয়াই বুঝে।

বক্তা ইংরেজ মেজর একটি খাঁটি সত্য কথা বলিয়াছেন—ইংলণ্ড ভারতবর্ষের ব্যবসাটা চায়! সেই জন্য ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব ইংলণ্ড সুদূর ভবিষ্যতেও ছাড়িতে চায় না; কারণ, ভারতবর্ষের বাজারে ইংরেজের আধিপত্য শুধু পণ্যশিল্পদক্ষতা ও বাণিজ্যনৈপুণ্য দ্বারা স্থাপিত হয় নাই ও রক্ষিত হইতেছে না; রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব এই আধিপত্য স্থাপনে ও রক্ষায় ইংলণ্ডকে বহু পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। সেই জন্য সেই প্রভুত্ব ইংরেজ চিরকাল রাখিতে চায়। কিন্তু পৃথিবীতে কোন সাম্রাজ্যই চিরস্থায়ী হয় নাই, কোন জাতিরই অন্য জাতির উপর প্রভুত্ব চিরস্থায়ী হয় নাই।

"সভ্য" জগতে ইহা সুবিদিত, যে, ব্রিটেন বলী ও ধনী ভারতের প্রভু বলিয়া। ইংরেজরা পৃথিবীময় এই মিথ্যা ধারণা জন্মাইয়া বাহবা লইবার চেষ্টা করিয়াছে, যে, নূতন ভারতশাসন-আইনদ্বারা ভারতকে প্রায় স্বরাজ দিয়া ফেলা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ইংরেজদের অনভিপ্রেত অন্য এই একটা ধারণাও "সভ্য" জগতে জন্মিয়া থাকিবে, যে, তাহা হইলে ত ভারত ইংরেজের হাতছাড়া হইতে বসিয়াছে; তাহা যদি হয়, তবে ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি ও সম্পদ কমিবে। এরূপ ধারণা জন্মিলে অন্য প্রবল দেশসমূহ (যেমন ইটালী, জার্মেনী) ইংলণ্ডকে আজকাল যতটা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে তার চেয়েও বেশী করিবে; চাই কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে কোথাও-না-কোথাও —ইংলণ্ডেই—আক্রমণ করিয়া বসিতে পারে। এই সকল কারণে, সাম্রাজ্যোপাসক ইংরেজদের "সভ্য" জগৎকে বুঝান দরকার, যে, ভারতবর্ষ তাহাদের হাতছাড়া হইতে যাইতেছে না, তাহা তাহারা হইতে না-দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প:

কিন্তু স্বরাজও প্রায় দিয়া ফেলিয়াছি এবং ভবিষ্যতে দিব; আবার, প্রভুও চিরকাল থাকিতে চাই;— সাম্রাজ্যোপাসকদের এ দুটা কথাই যে সত্য হইতে পারে না, একটা যে নিশ্চয়ই মিথ্যা!

—

গুজরাটীদের গুজরাটী-সাহিত্য-অনুরাগ

এ পর্য্যন্ত মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকার ৩৭৭টি সংখ্যা বাহির হইয়াছে। ইহার কেবল কয়েকটি সংখ্যায় ভারতীয় কোন ভাষায় লিখিত পুস্তকের সমালোচনা ছিল না। তদ্ভিন্ন গত প্রায় ৩২ বৎসরের সব সংখ্যাতেই কিছু গুজরাটী বহির পরিচয় বাহির হইয়াছে। মোটের উপর বলা যাইতে পারে, ন্যূনকল্পে ৩০ বৎসর ধরিয়া মডার্ণ রিভিয়ু গুজরাটী বহির পরিচয় দিয়াছে, এবং বরাবর সমালোচক আছেন বর্ত্তমানে অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্ট-জজ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মোহনলাল ঝাভেরী। গুজরাটী সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার কথা প্রামাণিক। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ ও নিয়ম-নিষ্ঠা আশ্চর্য্য। মডার্ণ রিভিয়ুর সম্পাদকের ও সহকারী সম্পাদকদের বলিবার জো নাই, "এমাসে আমাদের হাতে কোন গুজরাটী বহির পরিচয় মজুদ নাই।" গুজরাটী লেখক ও প্রকাশকেরাও তাঁহাদের সাহিত্য এত ভালবাসেন, যে, তাঁহাদের পুস্তক বাহির হইবামাত্র মডার্ণ রিভিয়ুতে সমালোচনার জন্য তাহা ঝাভেরী মহাশয়কে পাঠাইয়া দেন।

সম্প্রতি আমাদের নিকট চিঠি আসিয়াছে, যে, ঝাভেরী মহাশয়ের এই ত্রিশ বৎসরের পুস্তকপরিচয়গুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এক জন গুজরাটী সাহিত্যসেবী পুস্তকের আকারে প্রকাশ করিবেন। আমরা আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে অনুমতি দিয়াছি। এই বহি গুজরাটী সাহিত্যের ত্রিশ বৎসরের ইতিহাসের মত হইবে।

প্রথম ষোল মাস মডার্ণ রিভিয়ু এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইত। তাহার পর বরাবর কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহা বাংলা দেশের, বাঙালীর, কাগজ। কিন্তু ইহাতে বাংলা বহির সমালোচনা অল্পই বাহির হয়। তাহার কারণ, খুব কম বাংলা গ্রন্থের লেখক বা প্রকাশক ইহাতে সমালোচনার জন্য বহি পাঠান। সামান্য যে দু-এক জন মডার্ণ রিভিয়ুর নাম স্মরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ প্রবাসীকে একখানি বহি পাঠাইয়া তাহাই মডার্ণ রিভিয়ুতেও সমালোচনা করিতে অনুরোধ করেন! বাঙালীরা গুজরাটীদের চেয়ে ব্যবসা বেশী বুঝেন! সেই জন্য গুজরাটের ভাটিয়ারা কলিকাতার ব্যবসার একটা বড় অংশের মালিক হইতে পারিয়াছেন। বাঙালী গ্রন্থকার ও প্রকাশকেরা যত বহি প্রকাশ করেন, তাহার প্রত্যেকটি

কাপি অবিলম্বে বিক্রী হইয়া যায়; বোধ করি সেই জন্ত তাঁহারা মডার্ণ রিভিয়ুতে বহি পাঠাইতে পারেন না। অবশ্য, মডার্ণ রিভিয়ুতে কোন বাংলা বহির পরিচয় বাহির হইলেই যে তাহার কাটতি হইবে বা বাড়িবে, তাহা বলি না; কিন্তু তাহা হইলে বাংলা-সাহিত্যে যে নূতন নূতন বহি বাহির হইতেছে, তাহা ভারতবর্ষের ও জগতের এমন অনেক লোক জানিতে পারিবে, যাহাদের মডার্ণ রিভিয়ু ভিন্ন অন্ত কোন কাগজ হইতে তাহা জানিবার উপায় নাই। বাংলা-সাহিত্যের বড়াই আমরা করি, অবাঙালীরা যে বাংলা ভাষাকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা করিতে চায় না, তাহাতে বিষম চটি। কিন্তু বাংলা সাহিত্য যে বাঁচিয়া আছে ও বাড়িতেছে, তাহা অবাঙালীরা জানিবে কেমন করিয়া? অবশ্য, কেবল মডার্ণ রিভিয়ুতেই বাংলা বহির পরিচয় বাহির করাইতে হইবে, এমন কথা বলি না। লেখক ও প্রকাশকেরা অন্ত কোন ইংরেজী মাসিক বা সংবাদপত্রে তাঁহাদের বহির সমালোচনা করাইতে পারেন।

—

শিক্ষা-সম্মিলন

কিছু দিন আগে খুলনায় নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সেই সময়েই কলিকাতায় নিখিল বঙ্গীয় অধ্যাপক-সম্মিলনের অধিবেশনও হইয়াছিল। দুইটি সম্মিলনেই বাংলা দেশের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ নানা দিক দিয়া এই প্রদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তবে খুলনা অধিবেশনের বিবরণী পাঠ করিলে মনে হয় শিক্ষকগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার দিকেই নিবদ্ধ ছিল; কলিকাতা সম্মিলন সম্বন্ধেও মনে হয় অধ্যাপকগণ প্রধানতঃ উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষা সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতেছেন। এরূপ সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করিবেন, কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা ভাবিবার আছে। বাংলা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বতন্ত্র সম্মিলন হয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র সম্মিলন করেন, অধ্যাপকগণ উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেন; কিন্তু এই প্রদেশে শিক্ষা বিষয়ে সমগ্রভাবে আলোচনা করিবার কোন প্রতিষ্ঠানই নাই। ইহার কারণ কি আমাদের শিক্ষকগণের জাতিভেদ-বুদ্ধি? না, এই ব্যবস্থার পিছনে অন্ত কোন মনোভাব আছে? কারণ যাহাই হউক না, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, শিক্ষা ব্যাপারকে এরূপ খণ্ডিতভাবে দেখা যায় না, দেখিলে ক্ষতিই হয়।

আমাদের মনে হয়, এখন বাংলা দেশে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে যেখানে শিক্ষাব্রতীগণ মিলিত হইয়া শুধু যে বাদপ্রতিবাদ বা ব্যবসাগত ক্ষুদ্র স্বার্থ সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন তাহা নহে, যেখানে তাঁহারা শিক্ষা বিষয়ে নানারূপ গবেষণার ব্যবস্থা করিবেন এবং শিক্ষাকে সমগ্র-ভাবে দেখিয়া আলাপ-আলোচনা ইত্যাদির দ্বারা দেশবাসীকে শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবেন। ইউরোপে ও আমেরিকায় প্রত্যেক দেশেই এরূপ একাধিক প্রতিষ্ঠান আছে এবং এরূপ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা দেশগুলি যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে। কিছু দিন পূর্বে বেঙ্গল এডুকেশন লীগ ও বেঙ্গল সেকেণ্ডারী এডুকেশন কমীটি নামে দুইটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল; তাহাদের কর্মকর্তাগণ ও বিভিন্ন শিক্ষক- ও অধ্যাপক-সমিতিগুলির কর্মকর্তাগণ যদি এ-বিষয়ে উৎসাহী হন, তবে আমাদের মনে হয় হয়ত অচিরেই এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে।

—

জনশিক্ষা ও ছাত্রসমাজ

কিছু দিন পূর্বেও এদেশে লোকশিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ ঔৎসুক্য দেখা যায় নাই—যদিও আমরা সার্ব্বজনীন শিক্ষার একান্তপ্রয়োজনীয়তার কথা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি। রবীন্দ্রনাথ যখন লোকশিক্ষাসংসদ প্রতিষ্ঠা করেন তখন কাহারও কাহারও দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। অথচ আমাদের বাংলা দেশেই যে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা মাত্র এগার জন সেন্সসের হিসাবে লিটারেট অর্থাৎ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, এটি সকলেই

জানেন এবং জাতীয় জীবন গঠনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলেই বলেন এবং এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। এইখানে এই কথাও বলিয়া রাখা ভাল যে, সেন্সসের হিসাবে যাহারা লিটারেট তাহারা যে সকলেই শিক্ষিত একথা মনে করার কোন যথেষ্ট হেতু নাই। জাতিকে শিক্ষিত করিবার দুইটি উপায় আছে—আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর সচেতন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার সাহায্যে সমগ্র জাতিকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে অন্তত পঁচিশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে; অথচ এখনও বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করা হইয়া উঠিল না। সুতরাং সমগ্র জাতিকে শিক্ষার একমাত্র উপায় বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এ সম্বন্ধে অনেক দিন হইতেই খণ্ডখণ্ড ভাবে চেষ্টা চলিয়াছে; কতকগুলি প্রতিষ্ঠান ভাল কাজও করিয়াছে। কিন্তু এখন এই বিভিন্ন চেষ্টাগুলিকে সংঘবদ্ধ করিয়া একত্রে কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। অন্য কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস-শাসন প্রবর্ত্তনের ফলে নিরক্ষরতা দূর করা সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের কর্মচারীদের ও জনসাধারণের মধ্যে খুব উৎসাহ দেখা গিয়াছে। আমাদের এ প্রদেশে সরকার এ-বিষয়ে বিশেষ কিছু করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। এক্ষেত্রে দেশবাসীর স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করা ছাড়া উপায় নাই। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে কয়েক জন শিক্ষাব্রতী উৎসাহী হইয়া বঙ্গীয় বয়স্কজনশিক্ষা-পরিষদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাহার সভাপতি এবং প্রখ্যাত সরকারী ও বে-সরকারী সকল সম্প্রদায়ের কতিপয় ভদ্রমহিলা ও দেশ-প্রেমিক ভদ্রলোক ইহার কার্য্যনির্বাহক সমিতিতে আছেন। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরদ্বয়, বাংলার শিক্ষামন্ত্রী প্রভৃতি পরিষদের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। কলেজ স্কোয়ার ষ্টুডেন্টস্ হলে পরিষদের আপিস এবং অধ্যাপক বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অনাথনাথ বসু, হুমায়ুন কবীর, বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদের সম্পাদক।

পরিষদের উদ্যোগে অধুনা তিনটি ট্রেনিং ক্লাস খোলা হইয়াছে। একটিতে অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, একটিতে ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্যটিতে কলিকাতার মেয়র জ্যাকেরিয়া সাহেব সভাপতিত্ব করেন। আনন্দের বিষয়, পরিষদের উদ্যোগে তাঁহাদের প্রকাশিত "পড়ার বই" ও কাগজপত্র লইয়া বহু ছাত্র ছুটিতে গ্রাম-বাসীকে শিক্ষাদান ও জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছেন। এ ব্যাপারে সরকারী কর্মচারী, স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহ ও স্থানীয় শিক্ষকমণ্ডলীকে এই ছাত্রদের সাহায্য করিতে, আরও কর্মী সংগ্রহ করিতে ও অন্যভাবে উৎসাহিত করিতে, অনুরোধ করি। সংবাদপত্রে দেখিলাম, বঙ্গীয় ছাত্রসমিতিও জনশিক্ষা-পরিষদের সহযোগে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। ছাত্রসমাজের এ বিষয়ে দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা বহুবার লিখিয়াছি এবং ভরসা করি এবারের চেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে।

—

অবস্থাবিশেষে কর না-দিবার নৈতিক অধিকার

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবাসীর এই সংখ্যায় অন্যত্র যে প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে, যে, রবীন্দ্রনাথ "প্রায়শ্চিত্ত" ও "পরিত্রাণ" নাটক দুটিতে, অবস্থা-বিশেষে প্রজাদের রাজাকে বা রাষ্ট্রকে কর না-দিবার নৈতিক অধিকার ঘোষণা ও সমর্থন করিয়াছেন। এই উক্তির সমর্থক দৃষ্টান্ত দিতেছি।

কবির "প্রায়শ্চিত্ত" নাটক তাঁহার "বৌ ঠাকুরাণীর হাট" নামক আরও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত উপন্যাসের গল্প অবলম্বন করিয়া লিখিত। এই নাটকটির বিজ্ঞাপনের তারিখ ৩১শে বৈশাখ, সন ১৩১৬ সাল। বহিখানি লিখিত হয় উনত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, এবং মুদ্রিতও হয় ঐ সময়ে হিতবাদী প্রেস হইতে ও প্রকাশিত হয় মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক হিতবাদী লাইব্রেরী হইতে। আমরা নীচে যাহা উদ্ধৃত করিব, তাহা "হিতবাদী"র এই পুরাতন সংস্করণ হইতে। নাটকটির কোন্ অঙ্কের কোন্ দৃশ্য হইতে আমরা কি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা বুঝাইয়া বলিবার স্থান নাই। বহিখানি ছোট, পাঠকেরা খুঁজিয়া লইতে পারিবেন।

পথপার্শ্বে ধনঞ্জয় বৈরাগী ও মাধবপুরের এক দল প্রজা।

তৃতীয় প্রজা। বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কি বলব?

ধনঞ্জয়। বল্‌ব, আমরা খাজনা দেব না।

তৃ প্র। যদি শুধোয় কেন দিবি নে?

ধনঞ্জয়। বল্‌ব, ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই, তা হ'লে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয়; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই—কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।

চতুর্থ প্রজা। বাবা. একথা রাজা শুনবে না।

ধনঞ্জয়। তবু শোনাতে হবে। রাজা হয়েছে বলেই কি সে এমন হতভাগা যে ভগবান তাকে সত্য কথা শুনতে দেবেন না। ওরে জোর করে শুনিয়ে আসব।

পঞ্চম প্রজা। ও ঠাকুর, তাঁর জোর যে আমাদের চেয়ে বেশি—তাঁরই জিত হবে।

ধনঞ্জয়। দূর বাঁদর. এই বুঝি তোদের বুদ্ধি! যে হারে তার বুঝি জোর নেই! তার জোর যে একেবারে বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত পৌঁছয় তা জানিস্!

ষষ্ঠ প্রজা। কিন্তু ঠাকুর, আমরা দূরে ছিলুম, লুকিয়ে বাঁচতুম—একেবারে রাজার দরজায় গিয়ে পড়্‌ব, শেষে দায়ে ঠেকলে আর পালাবার পথ থাকবে না।

ধনঞ্জয়। দেখ পাঁচকড়ি, অমন চাপাচুপি দিয়ে রাখলে ভাল হয় না। যত দূর পর্য্যন্ত হবার তা হ'তে দে, নইলে কিছুই শেষ হ'তে চায় না। যখন চূড়ান্ত হয় তখনি শান্তি হয়।

আর এক অঙ্কের আর একটি দৃশ্য থেকে কিছু উদ্ধৃত করি।

প্রতাপাদিত্য। দেখ বৈরাগী, তুমি অমন পাগ্‌লামি ক'রে আমাকে ভোলাতে পারবে না! এখন কাজের কথা হোক্। মাধবপুরের প্রায় দু-বছরের খাজনা বাকি—দেবে কি না বল।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ, দেব না।

প্রতাপ। দেবে না! এত বড় আস্পর্দ্ধা!

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপ। আমার নয়!

ধনঞ্জয়। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর. এ আমি তোমাকে দিই কি ব'লে!

প্রতাপ। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে!

ধনঞ্জয়। হাঁ মহারাজ, আমিই তবারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা ত বোঝে না—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে এমন কাজ কর্‌তে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি—তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস্ নে।

"পরিত্রাণ" নাটকটিও "বৌ ঠাকুরাণীর হাট" উপন্যাসের গল্প অবলম্বন করিয়া লিখিত। উপরে উদ্ধৃত কথাগুলির মত আরো অনেক কথা তাহাতে আছে, স্থানাভাবে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। পাঠকেরা তাহা হইতে সেগুলি সহজেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন।

—

বন্দিত্ব ও বন্ধন বরণের দৃষ্টান্ত

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের যে প্রবন্ধটি অন্য কয়েক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা বলিয়াছি, যে, তাঁহার "প্রায়শ্চিত্ত" ও "পরিত্রাণ" নাটক দুটিতে বন্দিত্ব ও বন্ধন স্বেচ্ছাবরণের গৌরব ও আনন্দের বিবৃতি আছে। উনত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত "প্রায়শ্চিত্ত" হইতে তাহার কিছু দৃষ্টান্ত দিব, স্থানাভাবে "পরিত্রাণ" হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতে পারা যাইবে না।

প্রজার দল খাজনা না-দিবার কথায় যখন ভয় পাইয়াছে, তখন সপ্তম প্রজা বলিল:—

৭। তোরা অত ভয় করচিস কেন? বাবা যখন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন, উনি আমাদের বাঁচিয়ে আনবেন।

ধনঞ্জয়। তোদের এই বাবা যার ভরসায় চলেছে তার নাম কর্। বেটারা কেবল তোরা বাঁচতেই চাস্—পণ করে বসেছিস যে মরবি নে। কেন মরতে দোষ কি হয়েছে! যিনি মারেন তাঁর গুণগান করবি নে বুঝি! ওরে সেই গানটা ধর্।—

(গান)

বল ভাই ধন্য হরি।
বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি।
ধন্য হরি সুখের নাটে,
ধন্য হরি রাজ্যপাটে
ধন্য হরি শ্মশানঘাটে
ধন্য হরি, ধন্য হরি!
সুধা দিয়ে মাতান যখন
ধন্য হরি, ধন্য হরি।
ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন
ধন্য হরি, ধন্য হরি!
আত্মজনের কোলে বুকে—
ধন্য হরি হাসিমুখে,—
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে
ধন্য হরি, ধন্য হরি!
আপনি কাছে আসেন হেসে
ন্য হরি, ধন্য হরি!

খুঁজিয়ে বেড়ান দেশে দেশে
ধন্য হরি, ধন্য হরি!
ধন্য হরি স্থলে জলে
ধন্য হরি ফুলে ফলে—
ধন্য হৃদয়-পদ্ম-দলে
চরণ-আলোয় ধন্য করি।

ধনঞ্জয় বৈরাগী যখন বলিলেন তিনিই প্রজাদিগকে খাজনা দিতে বারণ করিয়াছেন, তখন প্রতাপাদিত্য ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "দেখ ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দুঃখ আছে।" ধনঞ্জয় যথাযোগ্য উত্তর দিবার পর—

প্রতাপ। দেখ বৈরাগী তোমার চাল নেই চুলো নেই—কিন্তু এরা সব গৃহস্থ মানুষ, এদের কেন বিপদে ফেলতে চাচ্ছ? (প্রজাদের প্রতি) দেখ বেটারা, আমি বলচি তোরা সব মাধবপুরে ফিরে যা। বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে।

অর্থাৎ মহারাজা প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে বন্দী করিলেন তাহাতে—

প্রজাগণ। আমাদের প্রাণ থাকতে সে ত হবে না।

ধনঞ্জয়। কেন হবে না রে। তোদের বুদ্ধি এখনো হল না। রাজা বল্লে বৈরাগী তুমি রইলে। তোরা বল্লি না তা হবে না—আর বৈরাগী লক্ষীছাড়াটা কি ভেসে এসেছে? তার থাকা না থাকা কেবল রাজা আর তোরা ঠিক ক'রে দিবি?

(গান)

রইল ব'লে রাখ্‌লে কা'রে
হুকুম তোমার ফলবে কবে?
(তোমার) টানাটানি টিকবে না ভাই
র'বার যেটা সেটাই র'বে।
যা খুশি তা করতে পার—
গায়ের জোরে রাখ মার—
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে,
তিনি যা স'ন, সেটাই স'বে।
অনেক তোমার টাকাকড়ি,
অনেক দড়া অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী,
অনেক তোমার আছে ভবে।
ভাব্‌ছ হবে তুমিই যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে'
হয় না যেটা সেটাও হবে!

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

প্রতাপ। তুমি ঠিক্ সময়েই এসেছ। এই বৈরাগীকে এই খানেই ধরে রেখে দাও। ওকে মাধবপুরে যেতে দেওয়া হবে না।

মন্ত্রী। মহারাজ—

প্রতাপ। কি! হুকুমটা তোমার মনের মত হচ্চে না বুঝি

উদয়াদিত্য। মহারাজ, বৈরাগী ঠাকুর সাধুপুরুষ!

প্রজারা। মহারাজ, এ আমাদের সহ্য হবে না! মহারাজ, অকল্যাণ হবে!

ধনঞ্জয়। আমি বলচি তোরা ফিরে যা। হুকুম হয়েছে আমি দু-দিন রাজার কাছে থাকব, বেটাদের সেটা সহ্য হ'ল না!

প্রজারা। আমরা এই জন্যেই কি দরবার করতে এসেছিলুম? আমরা যুবরাজকেও পাব না তোমাকেও হারাব?

ধনঞ্জয়। দেখ, তোদের কথা শুনলে আমার গা জ্বালা করে। হারাবি কিরে বেটা! আমাকে তোদের গাঁটে বেঁধে রেখেছিলি? তোদের কান্ড হয়ে গেছে. এখন পালা সব পালা।

আগুন লাগিয়া কারাগার ভস্মসাৎ হওয়ায় ধনঞ্জয় বৈরাগী বাহিরে আসিয়াছেন।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

ধনঞ্জয়। জয় হোক্ মহারাজ! আপনি ত আমাকে ছাড়তেই চান না; কিন্তু কোথা থেকে আগুন ছুটির পরোয়ানা নিয়ে হাজির। কিন্তু না বলে যাই কি ক'রে। তাই হুকুম নিতে এলুম।

প্রতাপ। ক'দিন কাট্‌ল কেমন?

ধনঞ্জয়। সুখে কেটেছে—কোন ভাবনা ছিল না। এসব তার লুকোচুরি খেলা—ভেবেছিল গারদে লুকবে, ধরতে পারব না—কিন্তু ধরেছি, চেপে ধরেছি, তার পর খুব হাসি, খুব গান। বড় আনন্দে গেছে—আমার গারদ ভাইকে মনে থাকবে!

(গান)

(ওরে) শিকল, তোমায় কোলে করে
দিয়েছি ঝঙ্কার।
(তুমি) আনন্দে ভাই রেখেছিলে ভেঙে অহঙ্কার।
তোমায় নিয়ে ক'রে খেলা
সুখে দুঃখে কাটল বেলা,
অঙ্গ বেড়ি' দিলে বেড়ি
বিনা দামের অলঙ্কার!
তোমার পরে করি নে রোষ,
দোষ থাকে ত আমারি দোষ,
ভয় যদি রয় আপন মনে
তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর!
অন্ধকারে সারা রাতি
ছিলে আমার সাথের সাথী,
সেই দয়াটি স্মরি তোমায়
করি নমস্কার।

প্রতাপ। বল কি বৈরাগী, গারদে তোমার এত আনন্দ কিসের?

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যে তোমার যেমন আনন্দ, তেমনি আনন্দ, অভাব কিসের? তোমায় সুখ দিতে পারেন, আর আমাকে সুখ দিতে পারেন না?

প্রতাপ। এখন তুমি যাবে কোথায়?

ধনঞ্জয়। রাস্তায়।

প্রতাপ। বৈরাগী, আমার এক এক বার মনে হয় তোমার ঐ রাস্তাই ভাল—আমার এই রাজ্যটা কিছু না।

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যটাও ত রাস্তা। চলতে পারলেই হ'ল। ওটাকে যে পথ ব'লে জানে সেই ত পথিক; আমরা কোথায় লাগি? তা হ'লে অনুমতি যদি হয় ত এবারকার মত বেরিয়ে পড়ি।

প্রতাপ। আচ্ছা. কিন্তু মাধবপুরে যেও না।

ধনঞ্জয়। সে কেমন ক'রে বলি। যখন নিয়ে যাবে তখন কার বাবার সাধ্য বলে যে যাব না?

—

সর্ মোহম্মদ ইকবাল

পরলোকগত ডক্টর সর্ মোহম্মদ ইকবাল ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ উর্দু ও ফারসী কবি ছিলেন। "পারসীক চিন্তার ক্রমবিকাশ" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি জার্মেনীর মিউনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর পদবী লাভ করেন। তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ হইবার পর কিছু দিন লাহোর গবর্মেণ্ট কলেজে ইতিহাস, দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। বিলাত গিয়া তিনি ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন এবং লাহোরে ব্যারিষ্টরী করিতেন। লণ্ডনে থাকিবার সময় তিনি ছয় মাসের জন্ত অস্থায়ী ভাবে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি সাবেক পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন, কিছু কাল মোস্লেম লীগের সভাপতি ছিলেন, এবং গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে "প্রতিনিধি" রূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি কবি ও দার্শনিক বলিয়াই সুবিদিত। তাঁহার অনেক কবিতা ইউরোপের কয়েকটি ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। তাহাতেই বুঝা যায়, যে, তাঁহার ঐ সকল কবিতায় এমন কিছু আছে যাহাতে দেশ ও জাতি নির্বিশেষে সর্ব্বত্র মাহুষের হৃদয় সাড়া দেয়। তিনি "হিন্দুস্তান হমারা" প্রভৃতি কয়েকটি জনপ্রিয় জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত জানিতেন এবং উর্দুতে গায়ত্রীর অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে যোগ দিয়া থাকিলেও সকল মানুষের একত্বে বিশ্বাস করিতেন এবং বিশ্বমানবহৃদয়ের কবি বলিয়াই ভবিষ্যতে বিখ্যাত থাকিবেন বলিয়া মনে করি।

—

অন্ধ্র দেশীয় নেতা নাগেশ্বর রাও

অন্ধ্রদেশের অন্যতম কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত নাগেশ্বর রাও ৭০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ঐ অঞ্চলে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক বলিয়া এবং আধুনিক তেলুগু গদ্যসাহিত্যের জনক বলিয়া যেমন ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত বীরেশলিঙ্গম্ পাণ্টুলু মহাশয়ের প্রসিদ্ধি আছে, তাঁহার কিছু পরবর্ত্তী কালে রাজনৈতিক ও তৎসম্পৃক্ত অন্তবিধ অনেক সার্ব্বজনিক কার্য্যের ক্ষেত্রে পণ্ডিত নাগেশ্বর রাও পাণ্টুলুর সেই প্রকার প্রসিদ্ধি আছে বলিয়া শুনিয়াছি। "অমৃতাঞ্জন" নামক ঔষধের ব্যবসা করিয়া তিনি নিজ আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেন। পরে তিনি এই ব্যবসাটিকে একটি লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করেন। উপার্জ্জিত অর্থ তিনি নানা ভাবে দেশের সেবায় লাগাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মাতৃভাষা তেলুগুতে সাপ্তাহিক ও দৈনিক অন্ধ্র-পত্রিকা চালাইতেন এবং "ভারতী" নামক একটি মাসিকপত্রও চালাইতেন। এগুলি তাঁহার আয়-বৃদ্ধির উপায় না হইয়া ব্যয়-বৃদ্ধিরই উপায় হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। শুনিয়াছি, অন্ধ্র-পত্রিকা যত ছাপা হইত, তাহার অর্দ্ধেকই বিনা মূল্যে বিতরিত হইত। তিনি বহু সাহিত্যিককে অর্থসাহায্য করিতেন, তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নানা দিকে তিনি মুক্তহস্ত পরদুঃখকাতর দাতা ছিলেন। তজ্জন্ত আন্ধ্রেরা তাঁহাকে বিশ্বদাতা উপাধি দিয়াছিলেন। ললিত-কলারও তিনি বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। এই কারণে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "কলাপ্রপূর্ণ" পদবীতে ভূষিত করিয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল। এই কারণে এবং প্রধান প্রধান পত্রিকার পরিচালক বলিয়া তিনি স্বদেশবাসীর নিকট হইতে দেশোদ্ধারক পদবী পাইয়াছিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ

পণ্ডিত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে দেশ এক জন ত্যাগী সত্যনিষ্ঠ সুপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ সেবকের সেবা হইতে বঞ্চিত হইল। তিনি দর্শনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ উপাধি পাইবার পর সিটি কলেজে অধ্যাপকতা করেন, কটকে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার হন, দিল্লীতে হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হন, এবং তাহার পর কিছু দিন পাবনার এড্‌ওআর্ড কলেজে অধ্যাপকতা করেন। তাহার পর তিনি ব্রাহ্মসমাজের কাজে সমস্ত সময় ও শক্তি নিয়োগ করিবেন বলিয়া বৈতনিক কোন কাজ আর করেন নাই। তিনি অনেকগুলি ভাল গ্রন্থের লেখক। কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। মৈত্রী-উপনিষদের সটীক বাংলা অনুবাদ, "ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধনা", ইংরেজীতে "In Search of Jesus Christ" ("খ্রীষ্টের সন্ধানে"), ইংরেজীতে "Theism as life and Philosophy" ("একেশ্বরবাদের জৈবনিক ও দার্শনিক রূপ"), "সংস্কার ও সংরক্ষণ", "মহাপুরুষ প্রসঙ্গ"। যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় তাঁহার বহিটিতে বাইবেলের ও খ্রীষ্টের ঐতিহাসিকত্বের সাতিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা আছে। তিনি মনে করিতেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠ পরিণতি ও রূপ। তিনি দেশভক্ত ও তর্কনিপুণ বাগ্মী ছিলেন। তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক মত অনেকটা চরমপন্থী নামে অভিহিত রাজনীতিকদের মত ছিল।

—

লবঙ্গ বয়কট

মধ্যে একটা খবর আসিয়াছিল যে, জাঞ্জিবারের ভারতীয় লবঙ্গ ব্যবসায়ীদের সহিত তথাকার গবর্মেণ্টের এমন একটা বুঝাপড়া হইয়া গিয়াছে, যাহাতে তাহাদের সব অভিযোগের প্রতিকার হইয়াছে। তাহার পর খবর আসিল, যে, তথাকার গবর্মেণ্টের সর্ত্তগুলা সন্তোষজনক নহে। প্রথম খবরটা আসিয়াছিল বোধ হয় ভারতের লবঙ্গ বয়কটটার উচ্ছেদকল্পে। এই বয়কটের কথা কাগজে অনেক পড়িয়াছি, বোম্বাইয়ের বন্দরে লবঙ্গের গাঁটের উপর উপবিষ্টা বয়কটকারিণী দেশসেবিকাদের ছবিও দেখিয়াছি। কিন্তু বাজারে লবঙ্গ ত পাওয়া যাইতেছে। বড় ও ছোট ভোজের পর উপস্থিত পানমশলাতেও ত লবঙ্গের অভাব দেখি না। ফাঁকিটা কোথায়?

—

জেনিভায় চীনের প্রতিনিধি

লীগ্ অব্ নেশুন্সে চীনের প্রতিনিধি ডাঃ ওএলিংটন কূ লীগের সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে জানাইয়াছেন, যে, জাপান অতঃপর চীন-জাপান যুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করিবে। লীগ ইহার প্রতিকার করুক তিনি ইহাই চান। কিন্তু লীগ পারিবে না, করিবে না। তথাপি "সভ্য জগৎ"কে জানাইয়া রাখা ভাল। চীনে জাপান প্রথম প্রথম খুব জিতিবার পর এখন আর সুবিধা করিতে পারিতেছে না, চীনেরা জিতিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং এখন জাপান শেষ উপায়, পৈশাচিক উপায়, অবলম্বন করিলে তাহা বিস্ময়ের বিষয় হইবে না।

—

আমেরিকার যুদ্ধোদ্যম

আমেরিকা ধমক দিয়াছে, জাপান যদি বাড়াবাড়ি করে, তাহা হইলে আমেরিকা সহিবে না, দেখিয়া লইবে! আমরা দর্শক। দেখি কি হয়।

আমেরিকা বৃহত্তম বহু যুদ্ধজাহাজ বানাইয়া তাহার নৌবহর এরূপ করা স্থির করিয়াছে যাহাতে সমুদ্রে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে। অন্য বড় রাষ্ট্রগুলাও হা'র মানিতে চাহিবে না। সুতরাং যে-সম্পদ মানুষের কল্যাণে ব্যয়িত হইতে পারিত, তাহা বহুপরিমাণে আত্মরক্ষা বা হিংসায় ব্যয়িত হইবে।

—

মধ্য-ইউরোপের অবস্থা

জার্মেনী অষ্ট্রিয়া গ্রাস করায় মধ্য-ইউরোপের রুমানিয়া প্রভৃতি কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোট দেশে চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে—তাহাদের ভাগ্যে কখন কি ঘটে! চেকোস্লোভাকিয়ার জার্মেনরা ত তথাকার গবর্মেণ্টকে শাসাইয়াছে বলিলেও চলে, যে, তাহাদের সব দাবী

না মিটাইলে তাহারা বৃহৎ জার্মেন রাষ্ট্রে যোগ দিবে।

হিট্‌লার ও মুসোলিনি দুই সেয়ান-সাঙাতের কোলা-কুলিতে ইউরোপের ভীতি বাড়িবে বই কমিবে না।

—

ইংলণ্ডে ব্যোমাক্রমণ-ভীতি

আকাশপথে ইংলণ্ড আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা বুঝিবামাত্র লণ্ডনের সব ইস্কুলের ছয় লক্ষ ছেলেমেয়েকে, যাহাতে অবিলম্বে মফঃস্বলে পাঠাইয়া দিতে পারা যায়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া রাখা হইতেছে। গ্রামগুলার উপরও শত্রুর এরোপ্লেন যে শেল্ ও বোমা ফেলিতে পারে না তাহা নয়। কিন্তু তথায় লক্ষ্য স্থির করা কঠিনতর এবং এক একটা বাড়ী বা ইস্কুলে বেশী লোক বা ছেলেমেয়ে থাকে না। কিন্তু লণ্ডনে অল্পপরিসর জায়গায় হাজার, লক্ষ, নিযুত লোক থাকে—এক একটা ইস্কুলেই হাজার ছেলেমেয়ে থাকে। সেখানে বোমা ফেলিলে একসঙ্গে যুগপৎ বৃহৎ হত্যাকাণ্ড ঘটিবে, ও তাহাতে ভীতি ও ভড়কানো বাড়িবে। এই জন্ম ইংরেজ লণ্ডন রক্ষার কথা আগে ভাবিতেছে।

ইংলণ্ডের এরোপ্লেন বাড়াইবার চেষ্টা আগে হইতেই হইয়া আসিতেছে। যুদ্ধের সময় অবরোধ বা অন্য কারণে যাহাতে খাদ্যের অভাব না-ঘটে, তাহার উপায়ও ইংলণ্ড করিতেছে।

অবশ্য, যুদ্ধ না-বাধিলেই ভাল। কিন্তু এই সব বন্দোবস্তের আলোচনায় বুঝা যাইতেছে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা কম নয়।

—

ভারতবর্ষকে খুশি করা

যুদ্ধ বাধিলে ইংরেজকে ভারতবর্ষ হইতে অনেক সিপাহী, অনেক শিবির-অনুচর ও অন্তবিধ মানুষ, খাদ্য-দ্রব্য, বহুৎ টাকা, ও বিস্তর যুদ্ধসম্ভার লইতে হইবে। গত মহাযুদ্ধের সময় যেমন এক সময়ে ভারতে এত কম সৈন্য ছিল যে, ভারতবর্ষের লোকদের ইচ্ছা ও অস্ত্র থাকিলে তাহারা সফল বিদ্রোহ করিতে পারিত, তেমন অবস্থায় ভারতবর্ষকে আর রাখা চলিবে না; কারণ জাপান ওৎ পাতিয়া আছে, অন্য আশঙ্কাও আছে। এই জন্য ভারতবর্ষকে ঠাণ্ডা রাখা চাই। ব্রিটেন ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত যাহা চায় তাহাও যথেষ্ট পরিমাণে পাইতে হইলে ভারতীয়দিগকে খুশি করা চাই। সেই জন্য ব্রিটিশ রাজনীতিকরা ফন্দী আঁটিতেছেন। কয়েক মাস আগে লর্ড লোথিয়ান ও লর্ড সামুয়েল ভারত বেড়াইয়া গিয়াছেন। লর্ড লোথিয়ান আগেই বোলচাল ঝাড়িয়াছেন। এখন লর্ড সামুয়েল বলিতেছেন ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়ন ষ্টেটস দিতে হইবে!

কিন্তু স্তোকবাক্যে কত দিন চলিবে? ইংরেজদেরই মধ্যে একটা কথা চলিত আছে, "তুমি জনগণকে কিছু কাল ঠকাইতে পার, তাহাদের কোন-না-কোন অংশকে বরাবর ঠকাইতে পার, কিন্তু সমগ্র জনমণ্ডলীকে চিরদিন ঠকাইতে পার না।"

—

উড়িষ্যার মন্ত্রীদের জিদ বজায়

উড়িষ্যার গবর্ণর ছুটি লইবেন ও তাঁহার জায়গায় মন্ত্রীদেরই আজ্ঞাকারী এক জন ইংরেজ সিবিলিয়ানকে এক্টিনি করিতে দেওয়া হইবে, অর্থাৎ যিনি তাঁবেদার ছিলেন তাঁহাকে মন্ত্রীদের উপরওআলা করা হইবে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এইরূপ হুকুম করেন। মন্ত্রীরা তাহা হইলে ইস্তফা দিবেন বলিয়াছিলেন। ঠিক্ বলিয়াছিলেন। বেগতিক দেখিয়া, হয়ত উপরওআলার ইঙ্গিতে, উড়িষ্যার গবর্ণর ছুটি লইবেন না বলিয়াছেন। এই প্রকারে এখন ফাঁড়াটা কাটিয়া গিয়াছে। পরে তিনি ছুটি লইলে অন্য কোন প্রদেশের বড় কোন সিবিলিয়ানকে এক্টিনি করিতে দেওয়া হইবে।

আমরা মডার্ণ রিভিয়ুতে লিখিয়াছিলাম, ভারতীয় কোন অভিজ্ঞ ও যোগ্য রাজনীতিককে এই রকম কাজে নিযুক্ত করা উচিত। তাহা কেন করা হয় না? লর্ড সিংহের পর কোন ভারতীয়কেই পাকা গবর্ণর করা হয় নাই। বিলাতী কোন রাজনীতিককে করাও মন্দের ভাল। অবশ্য, ঠিক্ ভাল পূর্ণস্বরাজ।

উড়িষ্যার মন্ত্রীদের জিতে আমরা খুশী।

—

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মহাত্মা গান্ধী

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মহাত্মা গান্ধীর সফর হইতে অনেক সুফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন, সেখানে যত লোক অহিংস হইয়াছে, তত, অন্য কোন প্রদেশে হয় নাই। তাঁহার ধারণা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে সু-খবর। কারণ, পাঠানদের সাহস আছে, অস্ত্র আছে বা জোগাড় করা সোজা। এ রকম লোকদের অহিংসাই অহিংসা নামের যোগ্য। তবে, যত দিন ঐ প্রদেশে মানুষ (হিন্দু পুরুষ বা স্ত্রীলোক) চুরি বন্ধ না হইতেছে, তত দিন বিশ্বাস নাই।

যে-লোকটার রাম কুয়াঁর (রামকুমারী) নাম্নী অপহৃতা বালিকাকে লুকাইয়া রাখার অপরাধে দু-দু বছর করিয়া জেল হইয়াছিল, তাহার মুক্তি ও কয়েদের সময়কার বেতন দানের পর তাহাকে আবার তাহার আগেকার শিক্ষকতা কাজে নিয়োগ—এ ব্যাপারটার তদন্ত বা প্রতিকার গান্ধীজী কি কিছু করিতে পারিয়াছেন ?

পাঠানদের নিয়মানুবর্ত্তিতা খুব চমৎকার। বিশ হাজার লোক নিঃশব্দে অচঞ্চল ভাবে মহাত্মাজীর বক্তৃতা শুনিয়াছিল। বাঙালীরা কখন এইরূপ নিয়মনিষ্ঠ হইবে ?

—

কলিকাতার মেয়র ও ডেপুটি মেয়র

শ্রীযুক্ত এ. কে. এম. জাকারিয়া কলিকাতার নূতন মেয়র ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর কলিকাতার নূতন ডেপুটি মেয়র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উভয়েই যোগ্য এবং মিউনিসিপালিটির কার্য্যে অভিজ্ঞ লোক।

শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরীর এক বৎসরের মেয়রত্ব শেষ হইয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সব দোষ দূর করিতে হইলে যে-রকম ক্ষমতা থাকা দরকার মেয়রের তাহা অল্পই আছে, এবং বহুকালের আবর্জ্জনা ও দোষ-ত্রুটি এক বৎসরে দূর করাও যায় না। সনৎকুমার বাবুর ন্যায্য প্রশংসা এই যে, তিনি সংস্কারের সাধু চেষ্টা সর্ব্বান্তঃকরণে করিয়াছিলেন এবং তাহার কিছু সুফল হইয়াছে।

—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির গৃহবিবাদ নির্মূল না-হইলেও বাহিরে যে সক্রিয় মূর্ত্তিতে এখনও দেখা দেয় নাই, ইহা মন্দের ভাল।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমীটির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ১২৪ জন সভ্যকে লইয়া গঠিত হইয়াছে। এত বড় সমিতির দ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহের চেয়ে হট্টগোলের সুবিধাই বেশী হইতে পারে। কিন্তু সমষ্টিটিকে এত বড় না করিলে হয়ত সব দলের লোককে খুশি করা যাইত না।

ইহাঁরা সকলে ঠিক্ "নির্ব্বাচিত" হন নাই। সুভাষবাবু ১২৪ জনের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। তাহাই সকলে মানিয়া লইয়াছেন। হয়ত এরূপ না করিলে কাজ আগাইত না। কিন্তু ইহা ডিক্টেটরিরই সূত্রপাত, যেমন কলিকাতার মেয়রের পদের আট জন মুসলমান প্রার্থীর মধ্যে এক জনকে যে বাছিয়া দিলেন একা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাহাও ডিক্টেটরির সূত্রপাত।

—

বোম্বাইয়ে কংগ্রেস ওআর্কিং কমীটি

বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের ওআর্কিং কমীটির অধিবেশনের কাজ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই এই জ্যৈষ্ঠের প্রবাসী ছাপা হইয়া যাইবে। উহার সমালোচনা আমরা করিতে পারিব না। খুব কঠিন কাজ কমীটির সম্মুখে রহিয়াছে। কঠিনতম কাজ শ্রী জিন্নার সহিত কথাবার্ত্তা চালাইয়া হিন্দু-মুসলমানের মিলনসাধন। মহাত্মাজী তাহার সহিত আলোচনা করিয়াছেন, সুভাষবাবুও করিবেন। কিন্তু কংগ্রেসপক্ষীয় কেহই যে কংগ্রেসের বাহিরের হিন্দুদিগকে পুঁছিতেছেনই না, ইহাতে মনে হয় না যে, কোন কেজো মীমাংসা হইতে পারিবে।

ওআর্ধায় নারীধর্ষক জাফর হুসেনকে মিয়াদ ফুরাইবার অনেক আগে খালাস দেওয়ার ব্যাপারটাও আছে। সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কিরূপ রায় দিয়াছেন, এখনও জানা যায় নাই।

—

ছাত্র-ধর্ম্মঘট

লক্ষ্ণৌতে কয়েক মাস পূর্ব্বে পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরু (তখন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে তুচ্ছ ব্যাপার ("trifles") লইয়া ধর্ম্মঘট না করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানকার ছাত্রেরা তাঁহার মত সম্মানিত ও রাজনৈতিক বিষয়ে অগ্রসর ব্যক্তিরও অনুরোধ রক্ষা করে নাই। তথাপি তাঁহার অনুরোধ যে ঠিক্ তাহা বিবেচক ব্যক্তিদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য, কালের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা, এবং কোন কোন ছাত্র বা ছাত্রসমষ্টির প্রতি ব্যবহার কখনও কখনও মন্দ হয়, তাহাও, মনে রাখিতে হইবে।

যাহাই হউক, স্কুলেরও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ধর্ম্মঘট

হইতেছে দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতে হয়। শাসন দ্বারা ইহার প্রতিকার হইবে না। অভিভাবক ও শিক্ষকদিগকে এরূপ আচরণ ও ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্ম্মঘট করিবার ইচ্ছাই না-হয়। তাহার অর্থ ইহা নহে, যে, ছাত্রছাত্রীরা যাহা করিতে চাহিবে তাহাই করিতে দিতে হইবে। অভিভাবক ও শিক্ষকদিগকে প্রধানতঃ নিজ নিজ চারিত্রিক প্রভাব দ্বারা কার্য্য সাধন করিতে হইবে।

এ বিষয়ে রাজনৈতিক নেতাদিগকেও বিশেষ বিবেচনার সহিত উপদেশ দিতে ও কাজ করিতে হইবে।

—

ছাত্র-আন্দোলন

দৈনিক কাগজগুলির একটি বিভাগই এখন ছাত্র-সংবাদ। ছাত্রেরা নগণ্য নহেন, তাঁহারা দেশের ভবিষ্যতের আশা। অতএব তাঁহারা রাজনৈতিক ও অন্যান্য সার্ব্বজনিক বিষয়ে জ্ঞানবান হয়েন ও থাকেন, ইহা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ছাত্র থাকিতে থাকিতেই তাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলক ও কর্ম্মী হউন, ইহা আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি না।

কিন্তু তাঁহারা ক্রমশ আন্দোলনের দিকেই ঝুঁকিতেছেন। এখন শুধু কলেজের ছাত্র নহে, স্কুলের ছাত্রেরাও ফেডারেশ্যন ইত্যাদি করিতেছেন। ঠিক্ জানি না, কিন্তু বোধ হয় এই প্রচেষ্টা উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় পর্য্যন্তই আপাততঃ পৌঁছিয়াছে, কিন্তু অচিরে যে মধ্য-ইংরেজী ও মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়, এবং উচ্চ প্রাথমিক ও নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালার ছাত্রছাত্রীরাও—শেষে কিণ্ডারগার্টেনের শিশুরাও—যে ছাত্র-আন্দোলনে যোগ দিবে না, তাহা মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া কোন রাজনৈতিক নেতাই নির্দ্দেশ্ করিয়া দেন নাই।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস-সভাপতি রূপে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে কংগ্রেস কর্ম্মীদের শিক্ষা (training) আবশ্যক বলিয়াছিলেন। পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত সকল স্তরের ছাত্রদের যে শিক্ষালাভই প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা তিনি মনে করেন কি না জানি না।

—

গ্রীষ্মের ছুটিতে ছাত্রদের কর্ত্তব্য

গ্রীষ্মের ছুটিতে ছাত্রেরা নিরক্ষর লোকদিগকে শিক্ষা দিবে, যেখানে জলকষ্ট আছে সেখানে জলকষ্ট নিবারণের চেষ্টা করিবে, সাধারণ লোকদের প্রকৃত অবস্থা জানিতে চেষ্টা করিবে,—আমরা বলিয়াছি আমাদের বিবেচনায় ছাত্রদের কাজ এই প্রকারের হওয়া উচিত। কংগ্রেসের কোন কোন নেতা বলিয়াছেন, দেশের প্রত্যেক বাড়ীতে যেন তাহারা কংগ্রেসের বাণী পৌঁছাইয়া দেয়। ছাত্রাবস্থায় এইরূপ কংগ্রেসকর্ম্মী হওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি না। আমরা সেকেলে বলিয়া আমাদের এই মত যদি নেতারা ও ছাত্রেরা অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে আমাদের আপত্তির আর একটি কারণ বিবেচনা করিতে বলি। বাংলা দেশে যদি কংগ্রেসের গবর্মেণ্ট স্থাপিত হইত, তাহা হইলে কংগ্রেসের বাণীবাহক ছাত্রদিগকে সন্ত্রাসনবাদী কেহ মনে না-করিতেও পারিত। কিন্তু বঙ্গে এখনও পুলিসের ও হাকিমদের সরকারী ধারণা এই, যে, ছাত্রেরা টেররিষ্ট হয়। এই ধারণা প্রযুক্ত যে-সকল ছাত্র আটক-বন্দী হইয়া কষ্ট পাইয়াছে, খালাস পাওয়ার পরেও যাহারা দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহাদের দুঃখমোচনের কোন যথেষ্ট উপায়—এমন কি অধিকাংশ স্থলে কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্যও—কংগ্রেস-পক্ষ হইতে করা সম্ভব হয় নাই, অন্য কেহও বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। এ-অবস্থায় ছাত্রদিগকে আপাততঃ কিছু কাল এরূপ নির্দ্দেশ না-দেওয়া আমরা আবশ্যক মনে করি যাহাতে তাঁহারা পুলিসের সন্দেহভাজন না হন।

বঙ্গের অবস্থা বুঝিয়া ছাত্রদের প্রতি আর একটি অনুরোধ (তাহা যদি অরণ্যে রোদন হয় তাহা হইলেও) করিতেছি, যে, তাঁহারা নিরক্ষর লোকদিগকে শিক্ষা দিবার সময় পরোক্ষভাবেও রাজনৈতিক আন্দোলন যেন না-করেন।

—

মহিলাদের ব্রতচারী শিক্ষা

মহিলাদের ব্রতচারী শিক্ষার ক্লাস গ্রীষ্মের ছুটির জন্য বন্ধ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মেয়েদেরও এই শিক্ষার আয়োজন করিয়া ভাল করিয়াছেন। ক্লাসে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই আছেন। যাহাকে মেয়েদের ব্রতচারী নৃত্য বলা হয়, তাহাতে কুরুচিপূর্ণ কিছু বা হাবভাবের অভিব্যক্তি কিছু নাই। তাহাতে আড়ষ্টতা দূর হয়, স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, এবং দলবদ্ধতা বৃদ্ধি পায়।

—

নববর্ষের কুচ-কাওয়াজ

নববর্ষে, ১লা বৈশাখ, যে কুচ-কাওয়াজের প্রথা চলিত হইতেছে, তাহাতে বালক ও যুবকদের উপকার হইবে।

বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া মেয়েদের জন্যও স্বতন্ত্র এইরূপ কিছু ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিলে তাহা সুফল-প্রদ হইবে।

—

"পল্লী"

বাংলা দেশের ও বিহার প্রদেশের অন্তর্গত মানভূম জেলার ডেপুটি কমিশনার শ্রীযুক্ত নীলমণি সেনাপতি মহাশয় "পল্লী" নামক একটি ছোট মাসিক পত্রের মারফতে গ্রামস্থ লোকদের সর্বাঙ্গীন কুশলের যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা সকল জেলাতেই অনুকরণীয়।

—

উড়িষ্যানিবাসী বাঙালীদের আবেদন

উড়িষ্যানিবাসী বাঙালীরা তথাকার মন্ত্রীদের নিকট এই আবেদন করিয়াছেন, যে, তত্রত্য বাঙালী ছেলেমেয়েরা এ-যাবৎ বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষালাভের যে সুবিধা ভোগ করিয়া আসিয়াছে, ভবিষ্যতেও তাহা যেন করিতে পারে। ইহা ন্যায্য আবেদন। উড়িষ্যার মন্ত্রীরা এ-পর্যান্ত নানা বিষয়ে যেরূপ বিবেচনার সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন, আশা করি এই বিষয়েও সেইরূপ সুবিবেচনা করিবেন।

—

এক জন মুক্ত বন্দীর আত্মহত্যা

রণীন্দ্রনাথ মল্লিক নামক একটি যুবক বিনা বিচারে কয়েক বৎসর বন্দী ছিলেন। কিছু দিন হইল তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়, কিন্তু কাগজে দেখিলাম কোন ভাতা দেওয়া হয় নাই। তিনি কাজকর্ম্মের জোগাড় করিয়া উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু বিফলকাম হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। ইহা মর্ম্মন্তুদ ঘটনা। সাধারণ বেকারদের অবস্থা হইতে খালাসপ্রাপ্ত এইরূপ বন্দীদের অবস্থা বহুপরিমাণে অধিক শোচনীয়। সাধারণ বেকারেরা বরাবর শিক্ষালাভের ও কাজ জুটাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতে পারিতেছেন, তাহারা সন্দেহভাজনও নহেন। কিন্তু মুক্ত বন্দীরা তাহা করিতে পান নাই এবং পুলিস তাঁহাদিগকে দাগী করিয়া দেওয়ায় তাঁহাদের কাজ পাওয়াও দুর্ঘট। অতএব ইঁহাদের সম্বন্ধে গবর্ন্মেণ্টের বিশেষ দায়িত্ব আছে। কাগজে পড়িয়াছিলাম, মন্ত্রীরা এক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে ভাতা দিবেন বলিয়াছিলেন। তাহা দিলে এরূপ হৃদয়ভেদী দুর্ঘটনা ঘটিত না।

—

হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার জন্মস্থান রাজবলহাট-গুলিটায় গত ২রা বৈশাখ স্মৃতিসভার আয়োজন হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, এবং একটি অভিভাষণ পাঠ করেন। এইরূপ সভায় কখন কখন অবিমিশ্র স্তুতিবাদই হইয়া থাকে। যতীন্দ্র বাবুর অভিভাষণটি সে দোষ হইতে মুক্ত। তাহাতে হেমচন্দ্রের কাব্যসমূহের গুণের পরিচয় ঠিক ঠিক দেওয়া হইয়াছিল এবং প্রশংসাও যথেষ্ট ছিল কিন্তু সমস্তই সুবিচারিত।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী

"বাজ রে শিঙা বাজ এই রবে, সবাই জাগ্রত এ বিপুল ভবে,…ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!" হেমচন্দ্র এই ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পর রবীন্দ্রনাথও আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, "দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী, আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি'। দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?"

এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে না পারিলে শতবার্ষিকীতে মন সান্ত্বনা মানে না।

—

বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিকী

নানা স্থানে বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিকী হইয়াছে। ইহার কার্য্যসূচীর প্রধান কোন কোন অংশের অনুষ্ঠান এখনও বাকী আছে। প্রতিভার আন্তরিক পূজায় দেশের কল্যাণ হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ"ই এই উপলক্ষ্যে সর্ব্বত্র বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হইতেছে। এই গ্রন্থখানিকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে স্বাদেশিকতা ও দেশভক্তির

মন্ত্রের ঋষি বলা হইতেছে। কিন্তু তাঁহার উপদেশ পালন না-করিলে তাঁহাকে মুখে ঋষি বলা অশোভন। "আনন্দমঠে"র শেষ পরিচ্ছেদে "চিকিৎসকে"র মুখে বঙ্কিমচন্দ্র উপদেশ দিতেছেন :—

'সত্যানন্দ, কাতর হইও না।··· মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝাইয়াছেন, একথা তোমাকে সেইরূপ বুঝাই, মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক—কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার;—বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতন ধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে, অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না-জানিলে সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে -কাজেই প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক।"

যাহাকে সচরাচর বিজ্ঞান বলা হয়, তাহাই বহির্বিষয়ক জ্ঞান।

তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ এই যে, "প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম" এবং বিজ্ঞান, "দেশ উদ্ধার" করিতে হইলে এই দুটি আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠাতাদিগকে ইহা মনে রাখিয়া তদনুসারে কাজ করিতে হইবে।

—

কৃষক-আন্দোলন

কৃষকদের দুর্দ্দশা দেখিলে—তাহাদের ঘর, তাহাদের ও তাহাদের ছেলেমেয়েদের কাপড়, তাহাদের ও তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, রোগে চিকিৎসার অভাব, এবং তাহাদের সকলের চেহারা দেখিলে—কৃষক-আন্দোলনের একান্ত প্রয়োজন কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। আমরা জমিদারদের উচ্ছেদ চাই না। তাঁহারা সচ্ছল অবস্থার গৃহস্থের মত থাকুন, চাষীদের অবস্থাও সচ্ছল অবস্থার গৃহস্থের মত হউক, আমরা এইরূপ চাই।

চাষীদিগকে এখন আগেকার চেয়ে কত বেশী খাজনা দিতে হয়, তাহা বাঁকুড়া জেলা কৃষক সম্মেলনের সভাপতির বক্তৃতার একটি অংশ হইতেই বুঝা যাইবে।

"৭০ বছর আগে বাঁকুড়া জেলার কৃষকদের দেয় খাজনার মোট পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ টাকা। ১৯৩৬ সালে এই খাজনার পরিমাণ দাঁড়ালো ৪০ লক্ষ টাকায়। বর্গীরা যে আগে চৌথ অর্থাৎ একটা প্রদেশের মোট আয়ের চতুর্থাংশ কেড়ে নিত সেটাকে বলা হতো অত্যাচার।"

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সভাপতি বলেন :—

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শুরু হবার সময় বাঁকুড়া জেলায় ২৬টি বড় বড় জমিদারী তৈরি হয়। তাদের মোট আয়তন হলো ৩৫ লক্ষ বিঘে অর্থাৎ বাঁকুড়া জেলার শতকরা ৯০ ভাগ জমি। একা বর্দ্ধমানের মহারাজারই চারিটি খুব বড় বড় জমিদারী রয়েছে, এবং তার মধ্যে বিষ্ণুপুরের জমিদারিটিই বড়। এই বিষ্ণুপুরের জমিদারী বর্দ্ধমানের মহারাজা ২ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনে নেন। আর আজ এই একটি জমিদারী থেকেই তাঁর আয় হচ্ছে বছরে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা। এরও নাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।"

—

কলিকাতার বড়বাজারে "রাজার কটরা"

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের আয় কিরূপ, তাহার একটু সামান্য পরিচয় উপরে দেওয়া হইয়াছে।

তিনি কলিকাতার বড়বাজারে "রাজার কটরা" নামক দেবোত্তর সম্পত্তির সেবাইতি হিসাবে মালিক। এইখানে কতকগুলি বাঙালীর দোকান দীর্ঘকাল—অন্ততঃ বছর চল্লিশ—অবস্থিত। মহারাজাধিরাজ দোকানগুলির মালিকদিগকে না জানাইয়া এক জন ধনী ব্যক্তিকে কার্য্যতঃ ৮১ বৎসরের ইজারা দিয়াছেন। খুব একটা মোটা সেলামী পাইয়া থাকিবেন। কিন্তু বাঙালী দোকানদারদিগকে বলিলে তাহারাও ত চাঁদা করিয়া সেই টাকাটা দিতে পারিত? এত দিনের প্রজাদিগের কিছু টাকার জন্য উৎখাত হইবার সম্ভাবনা ঘটান কি ধনকুবের মহারাজাধিরাজের উচিত হইয়াছে? অথচ তিনিই কিছু দিন আগে প্রজাদের সহিত জমিদারদিগের পূর্ব্ব সু-সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

—

রবীন্দ্রনাথের "জীবনস্মৃতি"

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের উৎসব এই বৎসর নানা কারণে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার কঠিন পীড়ার পর ইহাই তাঁহার প্রথম জন্মদিনের উৎসব। তিনি এই প্রথম তাঁহার জন্মদিনের উৎসবে তাঁহার নবরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া রেডিয়ো-সহযোগে স্বদেশবাসীকে শুনাইয়াছেন (তাহার সম্পূর্ণ ও কবিকর্ত্তৃক সংশোধিত পাঠ অন্যত্র মুদ্রিত হইল)। এমন সময়ে তাঁহার "জীবনস্মৃতি"র একটি নূতন মুদ্রণ প্রকাশিত হওয়া আনন্দের বিষয় হইয়াছে। ইহা পুস্তক-মুদ্রণের সাধারণ অক্ষর অপেক্ষা কিছু বড় অক্ষরে সুমুদ্রিত হইয়াছে।

সবুজ রঙের কাপড়ের মনোজ্ঞ বাঁধাইটিও যেন গ্রন্থকারের কবিপ্রকৃতির চিরনবীনত্ব সূচনা করিতেছে।

"জীবনস্মৃতি" সম্বন্ধে আমাদের একটি কথা বহিখানি দেখিয়া মনে হইল। এই বহিখানিতে "কড়ি ও কোমল" বহিখানির কথা লিখিয়াই তিনি থামিয়া গিয়াছেন। সে মোটামুটি আধ শতাব্দী আগেকার কথা। অতএব তাঁহার জীবনের অধিক-অংশের কথা তিনি জীবনস্মৃতির আকারে লেখেন নাই। কিন্তু অন্য ভাবে তাহার নিজের জীবনের কথা তিনি কিছু কিছু বলিয়াছেন। যেমন, তাঁহার সপ্ততি-পূর্ত্তির পর তাঁহাকে যত প্রকারে অভিনন্দিত করা হয়, তাহার উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে কিছু জীবনস্মৃতি আছে; চন্দননগরে বিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতেও কিছু জীবনস্মৃতি আছে। এইরূপ ভাষণগুলি সংগ্রহ করিয়া যদি ভবিষ্যতে "জীবনস্মৃতি"র পরিশিষ্ট রূপে প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে পাঠকেরা কবির স্বকথিত জীবনকথা একখানি বহিতে পাইতে পারিবেন।

—

অধ্যাপক ঢোণ্ডো কেশব কার্বে

গত ১৮ই এপ্রিল ভারতবর্ষের অনেক জায়গায়—বিশেষত বোম্বাই প্রদেশে, অধ্যাপক ঢোণ্ডো কেশব কার্বে (Karve) মহাশয়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সভার অনুষ্ঠান হয়। ঐ দিন তাঁহার লোকহিতকর দীর্ঘজীবনের আশী বৎসর পূর্ণ হয়। কলিকাতাতেও একাধিক সভা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন অল-ইণ্ডিয়া রেডিয়োর কর্তৃপক্ষের অনুরোধে প্রবাসীর সম্পাদককে অধ্যাপক মহাশয় সম্বন্ধে রেডিয়োতে কিছু বলিতে হইয়াছিল। তাহাতে অধ্যাপক মহাশয়ের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা ও কাজের বৃত্তান্ত বলা হইয়াছিল। এই ভাষণ মে মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে চিত্রসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

অধ্যাপক মহাশয় প্রধানতঃ পুনার হিন্দু-বিধবা-নিবাস (Hindu Widows' Home) এবং ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, প্রাণস্বরূপ ও প্রধান পরিচালক বলিয়া বিদিত। তদ্ভিন্ন আরও কোন কোন প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপিত করিয়াছেন। সর্ব্বশেষ প্রতিষ্ঠান "মহারাষ্ট্র গ্রামশিক্ষণ মণ্ডল"। এই সমিতির উদ্দেশ্য, মহারাষ্ট্রে যে-সব গ্রামে জেলা-বোর্ড প্রভৃতির বিদ্যালয় নাই, সেখানে বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন। ইতিমধ্যে ২৫টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতিকে অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার মাসিক সত্তর টাকা পেন্স্যন হইতে মাসিক পনর টাকা চাঁদা দেন, এবং আশীর উপর বয়সেও প্রত্যহ পুনার এক একটি পাড়া বাছিয়া লইয়া পদব্রজে তিন ঘণ্টা ধরিয়া এক পয়সা ও তদধিক ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। তিনি এখনও দশ মাইল হাঁটিতে পারেন ও হাঁটেন।

তাঁহার সব প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব এই যে, যদিও সবগুলির জন্যই মাসিক বা বার্ষিক চাঁদা সংগৃহীত হয়, কিন্তু সবগুলিরই বৃহৎ স্থায়ী ফণ্ড তিনি জমা করিতে পারিয়াছেন এবং প্রায় সবগুলিরই নিজের জমির উপর নিজের ঘরবাড়ী আছে।

১৯৩২ সালে বোম্বাইয়ে তাঁহার ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী-সম্মান-বিতরণ-সভায় আমাকে অভিভাষণ পাঠ এবং পদবী-সম্মান বিতরণ করিতে হয়। তখন তাঁহার সহিত চাক্ষুষ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়। পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ভাস্কর কার্বের সহিত পুনা যাই এবং তাঁহাদের বাড়ীতে অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত মাধ্যাহ্নিক আহার করি। মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনাস্থিত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর শ্রীমতী কমলাবাঈ দেশপাণ্ডে (প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের পীএইচ-ডী) ডাল ভাত তরকারি রাঁধিয়া খাওয়ান। কার্বে মহাশয় খাইতে পারেন মন্দ নয়। শ্রীমতী কমলাবাঈ প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রনেতা নরসিংহ চিন্তামন্ কেলকর মহাশয়ের কন্যা।

অধ্যাপক কার্বে এখন যেমন পূর্ব্বেও তেমনি নিজ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য সানন্দে দৈহিক পরিশ্রম পর্য্যন্ত করিতেন। যখন পুনা শহর হইতে চারি মাইল দূরে একটি গ্রামে হিন্দু বিধবা-নিবাস স্থাপিত হয়, তখন পুনা হইতে সেই গ্রামে যাইবার রাস্তা ছিল না, যানবাহন ছিল না, বাজার ছিল না, প্রতিষ্ঠানটির কোন অর্থবলও ছিল না। তখন কার্বে মহাশয় পুনার ফার্গুসন কলেজে অধ্যাপনা করিয়া প্রত্যহ বিকালে হাঁটিয়া সেই গ্রামে যাইতেন ও রাত্রে সেখানে থাকিতেন। কারণ, জনবিরল স্থানে বিধবাগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লোক রাখিবার টাকা ছিল না। গ্রামে খাদ্যদ্রব্য কিনিতে পাওয়া যাইত না। সেই জন্য অধ্যাপক মহাশয় খাদ্য শস্য ও তরকারি আদি প্রত্যহ পুনার বাজার হইতে কিনিয়া নিজে মাথায় ও কাঁধে করিয়া বহিয়া লইয়া যাইতেন। সন্ধ্যার পর ও পরদিন প্রাতে বিধবাদিগকে পড়াইতেন। তাহার পর চারি মাইল হাঁটিয়া পুনায় কলেজে যাইতেন।

এই রকম একটি মানুষ ভারতবর্ষে ও পৃথিবীতে দুর্লভ।

—

শ্রীজিন্না ও শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু সংবাদ

২৮শে বৈশাখ শ্রীজিন্নার সহিত শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর হিন্দু-মুসলমান মিলনের সর্ত্ত সম্বন্ধে কিছু কথাবার্ত্তা হইয়া

গিয়াছে। ২৯শেও কিছু হইবার কথা। কবে শেষ হইবে, সত্ত কিরূপ হইল, ইত্যাদি খবর প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় দিতে পারা গেল না।

—

রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষাসত্র"

রবীন্দ্রনাথের গত জন্মদিন উপলক্ষ্যে রেডিয়োর কর্ত্তৃপক্ষ অনুরোধ করায় যাহা বলিয়াছিলাম তাহা অন্যত্র মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু পনর মিনিটে ত সব কথা সংক্ষেপেও বলা যায় না। তাই বিবিধ প্রসঙ্গের অন্যত্র অধিকন্তু কিছু বলিয়াছি। আর একটা অল্প-জানা কথাও বলি; কারণ কলিকাতার অনেক কাগজওয়ালাই কিছু-না-কিছু বলিতেছেন।

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষাসত্র" নামক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইহার একটি প্রধান মন্ত্র—

"From the start the child enters the Siksha-Satra as an apprentice in handicraft as well as housecraft. In the workshop, as a trained producer and as a potential creator, it will acquire skill and win freedom for its hands: whilst as an inmate of the house which it helps to construct and furnish and maintain, it will gain expanse of spirit and win freedom as a citizen of the small community."

তাৎপর্য। প্রথম হইতেই শিশু কারুশিল্প ও গৃহশিল্প শিক্ষানবীশ রূপে শিক্ষাসত্রে প্রবেশ করিবে। শিল্পশালায় সে শিক্ষিত উৎপাদক ও সম্ভাব্য স্রষ্টারূপে দক্ষতা অর্জন এবং নিজের হাত দুটির স্বাধীনতা লাভ করিবে; আবার, যে বাসগৃহ ও তাহার আসবাব প্রস্তুত করিতে ও তাহার ঘরকন্না চালাইতে সে সাহায্য করিবে, তাহার অধিবাসীরূপে সে চিত্তের প্রসার এবং শিক্ষাসত্ররূপ ক্ষুদ্র পুরীর পৌরজনের অধিকার অর্জন করিবে।

বিশ্বভারতীর ৯-সংখ্যক বুলেটিনে শিক্ষাসত্রের সমুদয় বৃত্তান্ত আছে। তাহাতে দেখা যায়, গৃহকর্ম্ম ও নানাবিধ শিল্পের ভিতর দিয়া বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। ছোট শিশুদিগকে ও অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েদিগকে কি কি শিল্প শিখান যাইতে পারে, তাহার তালিকা আছে। লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থাও অবশ্য আছে। যাঁহারা শিক্ষাসত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চান, তাঁহারা বিশ্বভারতী বুলেটিনের ৯ ও ২১ সংখ্যা দেখিবেন।

বিশ্বভারতীর বুলেটিন দুটিতে, শিক্ষাসত্র স্থাপন কেন করা হইয়াছে, তাহা, এবং ইহার মূলগত শিক্ষানীতি ও

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক গৃহীত চিত্র

শিক্ষাপ্রণালী যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং শিশুস্বভাব, বালস্বভাব ও মানব-মন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে। তাহা সত্ত্বেও এইরূপ প্রতিষ্ঠান দেশের লোকদের ও নেতাদের দৃষ্টি কেন আকর্ষণ করে নাই, কেন ইহার আদর্শ বহু স্থানে অনুসৃত হয় নাই, তাহা চিন্তনীয়। এ বিষয়ে আমাদের দু-একটা অনুমান লিখিতেছি।

প্রথম অনুমান এই, যে, ইহার পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও আন্দোলন এবং বড় কোন রাজনীতিকের নামের প্রভাব নাই,—ইহাতে বলা হয় নাই, যে, শিক্ষাসত্রের অনুযায়ী শিক্ষা দিলে পূর্ণস্বরাজ পাওয়া যাইবে ও দেশ স্বাধীন হইবে। মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পিত ওঅর্ধা স্কীমের উক্ত সুবিধাগুলি আছে—যেমন তাহার চরখা ও খাদি প্রচারের সমর্থক অর্থনৈতিক যুক্তির সঙ্গে চরখা ও

খাদি দ্বারা দেশ স্বাধীন হইবে, এই রাজনৈতিক উক্তিও আছে।

শিক্ষাসত্রের আদর্শের সাফল্যের ও প্রসারের অন্য একটি অনুমিত বাধা বৈয়ক্তিক, বহুমনুষ্যঘটিত। তাহার আলোচনা করিবার মত যথেষ্ট জ্ঞান আমাদের নাই। নিরপেক্ষভাবে তাহা করাও সাতিশয় কঠিন।

—

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ গত মাসে এলাহাবাদে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সেখানে মঠ, সেবাশ্রম ও ঔষধ বিতরণকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অধিকাংশ সময় সেখানেই থাকিতেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের তিনি অন্যতম

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। বেলুড় মঠে যে রামকৃষ্ণ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ তাঁহার নক্সা অনুসারে হইয়াছে। বেলুড় মঠের পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণেও তাঁহার হাত ছিল। গৃহস্থাশ্রমে তিনি এঞ্জিনীয়ার ছিলেন। তিনি বাংলা ও ইংরেজী কয়েকখানি গ্রন্থের লেখক। "জলসরবরাহের কারখানা" ব্যতীত স্বামীজী বাংলায় "এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা" নামক একটি পুস্তকের লেখক। সংস্কৃত "সূর্য্যসিদ্ধান্ত" গ্রন্থের ভূমিকাসহ ইংরেজী অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন। সংস্কৃত বাল্মীকীয় রামায়ণের ইংরেজী অনুবাদ তিনি করিতেছিলেন। তাহা অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ হইয়াছিল। এলাহাবাদে তিনি যখন "জলসরবরাহের কারখানা" ("Water Works") নামক বহুচিত্রসম্বলিত বাংলা বহি লেখেন, তখন আমি সেখানকার সিটি রোডে মিঃ সিম্মিয়নের একটি ছোট বাংলায় ভাড়াটিয়া ছিলাম। অনেক দিন সেখানে এঞ্জিনীয়ারিংএর অনেক ইংরেজী পারিভাষিক শব্দের ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ তাঁহাকে ও আমাকে আবিষ্কার করিতে বা গড়িতে হইয়াছিল। আমরা কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে সহপাঠী ছিলাম। কলেজ ছাড়িবার পর দীর্ঘ কাল তাঁহার কোন খবরই জানিতাম না। এলাহাবাদে যখন তাঁহার সহিত দেখা হইল, তখন তিনি সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে সরকারী পূর্ত্ত-বিভাগে এঞ্জিনীয়ার ছিলেন। আমরা যখন একসঙ্গে কলেজে পড়িতাম, তখন আমরা উভয়েই ক্ষীণকায় ছিলাম। পরে তিনি স্থূলকায় হইয়াছিলেন। তাই যখন বহু বৎসর পরে আমাকে এলাহাবাদে দেখিলেন, তখন আমাকে পূর্ব্ববৎ শীর্ণদেহ দেখিয়া একবার পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনাকে খেটে খেতে হয় তাই আপনি কৃশই আছেন, আমাকে রোজগার করতে হয় না ব'লে আমি মোটা হয়ে গেছি।" তিনি খুব চা খাইতেন ও তাহার সমঝদার ছিলেন। আমি এলাহাবাদ গেলেই তিনি সেখানে থাকিলে দেখা করিতাম। আমি চা খাইতাম না বলিয়া তিনি আমার প্রতি বন্ধুকৃত্য সেইজন্য কেমন করিয়া দেখাইবেন স্থির করিতে না পারায় তাঁহার মঠে গেলে এক পেয়ালা চা খাইতাম। গৃহস্থাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। ব্রাহ্মণোচিত মোদকপ্রিয়তা বোধ হয় তাঁহার ছিল ("ব্রাহ্মণা মোদকপ্রিয়াঃ")।

এলাহাবাদে তাঁহার বন্ধু মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুপণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বসুর ও মেজর বসুর বাড়ীতে তিনি (বা অন্য কেহ) গেলেই সেই বাড়ীর রীতি অনুসারে, দিনরাত্রির যে-কোন সময়েই হউক, মিষ্টান্ন-আদি দেওয়া হইত। জলযোগের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে দিলে স্বামীজী, "খাইব না" না-বলিয়া, ভোজ্যগুলি পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ডে বা কাগজে মুড়িয়া মঠে লইয়া যাইতেন।

এ সমস্তই সামান্য কথা, স্বামীজীর সহপাঠী ছিলাম বলিয়াই বলিলাম। তাঁহার নিকট হইতে গভীর কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা যে করি নাই, তাহা নহে; এক বার করিয়াছিলাম। তাঁহার সাধনভজন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়াছিলাম কিছু লাভের, কিছু স্থির ভূমির সন্ধান পাইবার, আশায়। কিন্তু তিনি বিশেষ কিছুই বলিলেন না। তাহার পর এরূপ কোন প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করি নাই। সহপাঠী ছাত্ররূপে যৌবন কালে তাঁহাকে অন্যায়ের ও অসত্যের প্রতি ক্রোধ-পরায়ণ "চটা মেজাজে"র মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা করিতাম। সেই স্মৃতিই বহন করিব।

—

নির্ম্মলানন্দ স্বামী

নির্ম্মলানন্দ স্বামী

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের মত পরলোকগত নির্ম্মলানন্দ স্বামীও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। গৃহস্থাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল তুলসীচরণ দত্ত। তিনি দীর্ঘকাল হিমালয়ে সাধনা করিয়াছিলেন। আমেরিকায় ধর্ম্মপ্রচারের সময় তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও বাগ্মিতার যশ বিস্তার লাভ করে। দক্ষিণ-ভারতবর্ষই তাঁহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র ছিল এবং সেখানেই তিনি ওটাপলমের শ্রীনিরঞ্জন আশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মান্দ্রাজ প্রদেশে ছাব্বিশটি আশ্রম, বিদ্যালয় প্রভৃতি সেবা, শিক্ষা ও প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৯২৯ সালে যখন কলিকাতায় বিবেকানন্দ মিশন ও রামকৃষ্ণ-সারদা মঠ স্থাপিত হয়, তখন তিনি ইহার সভ্য ও ভক্তদিগের অনুরোধে ইহার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সরলতা, ঔদার্য্য ও অমায়িকতার খ্যাতি তাঁহার যেরূপ ছিল, তদ্রূপ দৃঢ়চিত্ততা, সৎসাহস ও তেজস্বিতার খ্যাতিও ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ হইয়াছিল।

—

মহীশূর রাজ্যে কংগ্রেস-পতাকা

মহীশূর রাজ্যে কংগ্রেস-পতাকা উত্তোলন উপলক্ষ্যে বিদুরাশ্বত্থম্ নামক স্থানে মহীশূর গবর্ন্মেণ্টের লোকেরা গুলী চালানতে অনেকগুলি মানুষ হত ও আহত হইয়াছে। এই কার্য্যের প্রতিবাদ বহু সংবাদপত্রে এবং বহু নেতার দ্বারা হইয়াছে। মহীশূর গবর্ন্মেণ্ট এখন হুকুম দিয়াছেন, যে, কংগ্রেস-পতাকা উত্তোলনে আর আপত্তি করা হইবে না। আগেই এই সুবুদ্ধি হইলে ও তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত করিলে এতগুলি মানুষ খুন জখম হইত না, বিদ্বেষের হলাহলও ছড়াইত না। গুলী-চালান প্রভৃতির তদন্ত হইবে। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের এক জন অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় জজের দ্বারা উহা হইবে।

—

যশোহর জেলায় নমঃশূদ্র-মুসলমান দাঙ্গা

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, যে, যশোহর জেলায় বহু গ্রামে মুসলমানদের দ্বারা নমঃশূদ্রেরা আক্রান্ত ও তাহাদের ঘরবাড়ী লুণ্ঠিত হইয়াছে। এই অরাজকতার আবির্ভাব হওয়াই উচিত ছিল না। আবির্ভাবের পরেও সব জায়গায় অবিলম্বে হাকিমরা ও পুলিস পৌঁছিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এখন দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রায় থামিয়াছে, শুনা যায়।

বাংলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক্ কিছু দিন আগে তাহার এক প্রসিদ্ধ বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—যাহাতে বলিয়াছিলেন মসলেম লীগের প্রত্যেক সভ্য একাধারে সিংহ ও ব্যাঘ্র—যে, কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলিতে দাঙ্গাহাঙ্গামায় মুসলমানরা বিপন্ন, তাহাদের প্রাণ যাইতেছে (যদিও তাহার উল্লিখিত দাঙ্গাগুলিতে হিন্দুই মরিয়াছে বেশী), কিন্তু বাংলা দেশে পরাশান্তি বিরাজ করিতেছে। পরাশান্তি যদিও তাঁহার ঐ বক্তৃতার আগেও বঙ্গে বিরাজ করিতেছিল না, তথাপি বোধ হয় আকস্মিকতার কোন দেবতা (some "god of accidents") তাঁহার ঐ দম্ভের উত্তর দিবার জন্য যশোহরের ঘটনাগুলি ঘটাইয়া থাকিবেন!

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এবং ভাবিবার বিষয়ও বটে, যে, ভারতবর্ষের অধিকাংশ দাঙ্গাহাঙ্গামার এক পক্ষ বা উভয় পক্ষ মুসলমানেরা হইয়া থাকে।

নমঃশূদ্রেরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবার সাহস ও সামর্থ্য রাখে বলিয়া এক্ষেত্রে নিতান্ত নাজেহাল হয় নাই।

বঙ্গের ঋণদান কোম্পানীসমূহ

বঙ্গে আট শতের অধিক ঋণদান কোম্পানী আছে। তাহাদের দ্বারা বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলের কৃষকদের ও অন্য অনেকের চাষবাস ও অন্যান্য কাজ চালাইবার নিমিত্ত যে ঋণগ্রহণের প্রয়োজন হয়, সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। তাহারা বেশী সুদ-খোর গ্রাম্য মহাজনদিগের হাত হইতে চাষীদিগকে গত ৬০।৭০ বৎসর রক্ষা করিয়া আসিতেছে, এবং অনেক গ্রাম্য লোকদের পুঁজিও তাহাদের কাছে গচ্ছিত থাকে। এই কোম্পানীগুলি ব্যবসার মন্দা, কৃষিজাত দ্রব্যসমূহের মূল্য হ্রাস এবং ১৯৩৫ সালের ঋণ সালিসী আইন (বেঙ্গল এগ্রিকাল্‌চারেল ডেটস্‌ এক্ট) অনুসারে স্থাপিত ঋণ সালিসী বোর্ডগুলির (ডেট সেট্‌লমেণ্ট বোর্ডগুলির) কৃপায় বিপন্ন হইয়াছে। এই বোর্ডগুলি স্থাপিত হওয়ায় বহুবিধ অবিচার ও অনাচার হইতেছে। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু একটি পুস্তিকায় ঋণদান কোম্পানীগুলির বিপন্ন অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। পুস্তিকাটি ইংরেজীতে লেখা। শেষে বাংলাতেও চারি পৃষ্ঠা আছে। ইহাতে বর্ণিত অবস্থার প্রতিকার অবিলম্বে গবর্ন্মেণ্টের করা উচিত।

—

ময়মনসিংহের পাটনী-সম্মিলনী

ময়মনসিংহ জেলার পাটনী-সম্মিলনীতে সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত পাটনীদিগকে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বর্দ্ধিষ্ণু হইবার নিমিত্ত যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা অন্য হিন্দুদের ও তাহাদের অবশ্য-পালনীয়। তাহার বক্তব্যের তাৎপর্য্য এই :—

(১) পাটনী সম্প্রদায়ের উপর যে অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার চাপ আছে তাহা দূর করিতে হইবে; (২) তাহাদিগকে শিক্ষিত, স্বাবলম্বী এবং জীবিকার্জ্জনক্ষম করিতে হইবে। (৩) তাহাদিগকে স্বদেশপ্রেমে দীক্ষিত করিতে হইবে এবং (৪) সর্ব্বোপরি তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে।

প্রাচীন হিন্দু ও প্রাচীন গ্রীক জাতি যে বড় হইয়াছিল, মধ্যযুগের আরবেরা যে বড় হইয়াছিল, এবং ইংরেজরা যে বড় হইয়াছে, তাহা বহু পরিমাণে তাহাদের নাবিকদের শক্তি ও সাহসের জোরে। আমরা সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করিয়াছিলাম, এবং নাবিকদিগকে পায়ে ঠেলিয়াছি; পরপদানত হইয়াছি। এখন বঙ্গের নদীগুলির খেয়াঘাটে পর্য্যন্ত অবাঙালী মাঝি বিরাজিত এবং বিদেশী ও দেশী যত ষ্টীমার বঙ্গে চলে, তাহার চালক-কর্ম্মীদের মধ্যে, পাটনী দূরে থাক্, অন্য কোন জাতির হিন্দুও নাই।

—

ঢাকা-ময়মনসিংহ ঋষি-সম্মেলন

ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার, ঋষি-নামধেয় চর্ম্মকার

জাতির সম্মেলনে গত বৈশাখ মাসে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস-গুপ্ত সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। এই কাজের জন্য বর্ণহিন্দুবংশীয় যোগ্যতর ব্যক্তি কেহ নাই। তিনি তাঁহার অভিভাষণের গোড়ায় বলিয়াছেন :—

"আপনাদের নিমন্ত্রণ আমি আগ্রহের সহিত স্বীকার করিয়াছি। আজ কয়েক বৎসর হইতে আমি নিজেকে আপনাদেরই এক জন বলিয়া মানিতে চেষ্টা করিয়াছি। যে বর্ণহিন্দু সমাজ আপনাদিগকে অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনা করিয়া আসিতেছে, আমি সে সমাজকে ন্যায়পরায়ণ হইতে বলিয়া আসিয়াছি এবং সেই সমাজে আপনাদের যতটুকু স্থান তাহার বেশী আমি পাইতে ইচ্ছা করি নাই। আপনারা আজ একতাবদ্ধ হইয়া উন্নতির চেষ্টা করিতে যত্ন করিতেছেন দেখিয়া আমি আনন্দ পাইয়াছি।

বর্ণহিন্দুদের সমাজে আপনাদের কি স্থান তাহা আমি জানি এবং জানি বলিয়াই অতিশয় পীড়া অনুভব করি। আপনাদের বৃত্তিকে আমি মহৎ মনে করি। যে গোমাতার উপর মানুষের কল্যাণ অনেকখানি নির্ভর করে আপনারা তাহার সৎকার করেন। তাহার চামড়ার উপযুক্ত ব্যবহারে আনিবার ব্যবস্থা করেন। আপনারা সমাজের সেবা করেন। চামড়া না হইলে আমাদের চলে না, কীর্ত্তনে খোল চাই, বিবাহে ও উৎসবে বাদ্য চাই, পরিধানে জুতা চাই এ সমস্তেতেই চামড়ার আবশ্যক। চামড়ার সমাজের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেই চামড়া যাহাদের শ্রমে ব্যবহার-উপযোগী হইবে তাহারা অস্পৃশ্য। এই ব্যবস্থায় না আছে ন্যায়, না আছে বিচার।"

অভিভাষণটির অন্যান্য অংশও সারবান্। আর একটি মাত্র অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"সকলেরই শিক্ষালাভ করা উচিত; কিন্তু কেবল ক, খ, শিখিলেই অথবা দুইখানা বাংলা বই পড়িতে পারিলে বা দুই পাতা ইংরেজী পড়িতে শিখিলেই শিক্ষা পাওয়া হইল বলা যায় না। কেবল উহাই শিখিলে শিক্ষা—শিক্ষা ত হয়ই না, বরং কার্য্য করার শক্তি আরও লোপ পায় দেখিয়া দেখিতেছি। লেখাপড়া শিক্ষা যখন কোনও একটা শিল্পকার্য্য অবলম্বন করিয়া হয়, তখন তাহা সার্থক হয়। শিল্পশিক্ষাদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনের সাহায্য হয়, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আবশ্যকীয় জ্ঞানও লাভ হয়। এই ধরুন, মৃতপশুর চামড়া খসাইবার কাজ। এই কাজ করিতে করিতে উপযুক্ত শিক্ষকের হাতে পড়িলে ছেলেরা শরীরতত্ত্ব জ্ঞান পাইতে পারে। শরীরের ভিতরকার কোন্ অংশকে কি বলে, কেমন করিয়া হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস প্লীহা যকৃত ও মূত্রাশয় কাজ করে খাদ্যবস্তু কেমন করিয়া হজম হয়, মাংসপেশীগুলি কোথায় কেমন ভাবে আছে, চক্ষু ও কান, নাক ও কণ্ঠ—এগুলির গঠন ও ক্রিয়া এই সমস্তই ক্রমে ক্রমে শিখিতে পারে এবং ঐ সকল যন্ত্রের যত্ন কেমন করিয়া লইতে হয় অর্থাৎ স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিখিতে পারে। কত রকম হাড় আছে, তাহাদের সংখ্যা কি, কেমন করিয়া নানা অংশ যুক্ত হইয়া আছে—জোড়াই-এর প্রকার ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। শক্তি প্রয়োগ করিতে কেমন করিয়া অংশসকল গঠন করা হয় ও সাজান হয়, এ সকল জ্ঞান পাইয়া তাহা কাজে লাগাইতে পারা যায়। বর্ত্তমান পুঁথি-পড়া শিক্ষা বদলাইয়া এই ধরণের শিক্ষা লইতে সকলকে গান্ধীজী বলিতেছেন। আপনাদের এই শিক্ষা সকলের আগে লইতে হয়, কেন না আপনাদিগকে অতি শীঘ্র সকলের সঙ্গে সমানে চলিতে হইবে এবং সম্ভব হইলে আরও অধিক আগাইয়া যাইতে হইবে।"

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের কবিতা সম্বন্ধে তাঁহার চিঠি

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদিগকে এই চিঠি লিখিয়াছেন :—

"সম্প্রতি আমার নববর্ষের বাচন ও জন্মদিনের কবিতা নিয়ে যে অন্যায় হয়ে গেছে সেটা আমার অজ্ঞাত ও অপ্রত্যাশিত। যখনি প্রথমে আমার নজরে পড়ল আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলুম, কিন্তু আকস্মিক দুর্যোগের ত্রুটি সংশোধনের সময় থাকে না। কবিতাটি অল্প পরিমাণে সংশোধিত হয়ে প্রবাসীতে গেছে—সেইটিকেই আমার অনুমোদিত পাঠ বলে গণ্য করবেন। এই সকল কারণেই মাঝে মাঝে আমার খ্যাতি নিয়ে আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গমালা দেখলে আমি নিরতিশয় কুণ্ঠা বোধ করি।"

এই চিঠিখানি আমরা ১২ই মে ২৯শে বৈশাখ পাইয়াছি।

দেশ-বিদেশের কথা

হাজারিবাগের একটি উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান

শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়

এক ব্যক্তির কর্ম্মোৎসাহে কিরূপে নগরীর জনসাধারণের চিত্তে নরসেবার স্পৃহা জাগ্রত হইয়াছে ও সকলে মিলিয়া দরিদ্র দুর্গতদের সেবার কিরূপ আয়োজন করিয়াছেন তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হাজারিবাগের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাসত্র। এই সত্রের প্রাণস্বরূপ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাশগুপ্ত হাজারিবাগের অস্পৃশ্য জাতিদের উন্নয়ন উদ্দেশ্যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তথায় গমন করেন। তিনি প্রথমতঃ মেথর ও মুচিদিগের আর্থিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি-সাধনে প্রবৃত্ত হন। ১৯৩৪ সনে হাজারিবাগ-শহরে ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে কলেরার ভীষণ প্রকোপ হয়। ফলে তথাকার সরকারী চিকিৎসালয়সমূহ ও মিউনিসিপালিটি অত্যন্ত বিপন্ন হয়। তাহাদের সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াও তাহারা সকল রোগীর ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ হয়। মন্মথবাবু শুধু আত্মিক সেবাতেই পটু নন, তিনি এক জন সুচিকিৎসকও বটেন। তিনি অপর এক জন চিকিৎসকের সহায়তায় দুঃস্থদিগের চিকিৎসা ও ঔষধের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এই সৎকার্য্যে তিনি স্থানীয় সকল দয়াপরায়ণ নরনারীর সাহায্য পাইতে লাগিলেন। মহামারীর অবসান হইলে, হাজারিবাগের জনসাধারণ বুঝিতে পারিল যে তথায় মন্মথবাবুর তত্ত্বাবধানে একটি স্থায়ী দাতব্য চিকিৎসালয় থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ, স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজে রোগীদিগের চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ হইত। পরে রামগড়ের রাজা, মিউনিসিপালিটি ও কয়েক জন ধনী ব্যবসায়ীর অর্থানুকূল্যে ঐ সমাজের প্রাঙ্গণে একটি সুন্দর ইমারত গঠিত হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ-সিংহ উহার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। চিকিৎসালয়টির পরিকল্পনা ও স্থাপত্য কার্য্য অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। আমি দেখিলাম যে এখানে প্রতিদিন ৪০০।৫০০ রোগী ঔষধ পায়। মন্মথবাবু ব্যতীত আরও দুই জন চিকিৎসক আছেন। কেহই কোন প্রকার দর্শনী গ্রহণ করেন না, এমন কি বাহিরে গেলেও নহে। মন্মথবাবুকে এত ব্যস্ত থাকিতে হয় যে সারাদিন তাঁহার সঙ্গে দু-মিনিট স্থির হইয়া—বসিয়া কথা বলিবারও সময় নাই। দিনরাত তাঁহাকে

লোকে ডাকিয়া লইয়া যাইতেছে। ধনী রোগীরা সাধারণতঃ দর্শনীর বদলে চিকিৎসালয়কে অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। এখানে আরও একটি বলিবার কথা এই যে, এই প্রতিষ্ঠান উপলক্ষ্য করিয়া হাজারিবাগে কোন দলাদলি নাই। মন্মথবাবু জনপ্রিয়। আশা করা যায়, তাঁহার চেষ্টায় নগরীতে আরও সুন্দর সুন্দর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাশগুপ্ত

হাজারিবাগের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়

পেগুতে বাঙালীদের বিদ্যালয়

শ্রীসরযূবালা চন্দ, পেগু

রেঙ্গুন, বেসিন ও মৌমিওতে প্রবাসী বাঙালীদের স্কুল আছে বলিয়া 'প্রবাসী'তে পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পেগুতেও গত দশ বৎসর যাবৎ ঐরূপ একটি বাঙালী প্রতিষ্ঠান সাফল্যের সহিত পরিচালিত হইতেছে। পেগুতে প্রায় ৫০০ হিন্দু বাঙালী এবং প্রায় সমসংখ্যক বাঙালী মুসলমান আছেন। ২১টি ছাত্রছাত্রী লইয়া এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার বর্ত্তমান ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা ৭০ জন। গত ১৯৩৬ সালে স্কুলের জন্য একটি সুদৃশ্য গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। মিউনিসিপালিটি হইতে স্কুলটি সাহায্য

-পার। এবার বার্ষিক উৎসব স্কুলের বর্ত্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রীদের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। আবৃত্তি, গীত, এস্‌রাজের ঐকতান বাদন ও কুমারী প্রীতিকণা বসুর নৃত্য এবং রবীন্দ্রনাথের "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" নাটিকাটির অভিনয় হইয়াছিল।

পেগু বাঙালী বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব

জার্ম্মেনী কর্ত্তৃক অষ্ট্রিয়া গ্রাসের পর হিটলারের অষ্ট্রিয়া-ভ্রমণকালে তাঁহার অভ্যর্থনা

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীনারায়ণ নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৮শ ভাগ ১ম খণ্ড } আষাঢ়, ১৩৪৫ { ৩য় সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

[আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত]

C/o Messrs. Thomas Cook & Son.
Ludgate Circus, London.
15 May, 1913.

বন্ধু

তোমার বন্ধু Mrs. Booleএর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। তিনি তোমার সম্বন্ধে বিশেষভাবে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। তাঁহার বয়স আশি পার হইয়া গিয়াছে কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাঁহার বুদ্ধিশক্তির সজীবতা! তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। Miss MacLeod আমাকে তাঁহার ওখানে লইয়া গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তোমার কি এখানে আসিবার সম্ভাবনা আছে? যদি এখানে একসঙ্গে মিলিতে পারিতাম ত সুখের হইত। এদিকে আমার বোধ করি ফিরিবার সময় কাছে আসিতেছে; এখানকার সামাজিকতার ঘূর্ণির টানে পাক খাইয়া আমার শরীর মন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যালয়ের চিন্তাও আমাকে পাইয়া বসিয়াছে—আর অধিক দিন দূরে থাকা হয়ত ক্ষতিকর হইতে পারে।

ইহার মধ্যে একদিন এখানকার সভায় "চিত্রা"র ইংরেজি অনুবাদ পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। এখানকার শ্রোতাদের ভাল লাগিয়াছে। আইরিশ থিয়েটারে আমার ডাকঘর" নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হইতেছে।

তবু এই খ্যাতিপ্রতিপত্তির ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে মন টিঁকিতেছে না। একটুখানি নিভৃতের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা বোধ করিতেছি। হাতের কাজগুলা কোনোমতে শেষ করিতে পারিলেই দৌড় দিব।

গত বারে দেবেনের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া আমি বড় আনন্দিত হইয়াছিলাম।

শুনিয়াছি তোমার কাজ অগ্রসর হইতেছে এবং বাহিরের দিক হইতে তোমার বাধাবিঘ্ন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। ফিরিয়া গিয়া তাহার অনেকটা পরিচয় পাইব এই প্রত্যাশা করিয়া রহিলাম।

তোমার রবি

ওঁ

বন্ধু

তোমার ছুটি যদি এখানে কাটিয়ে যাও তা হলে বোধ হয় তোমার উপকার হয়। আমি ত জ্বর প্রভৃতি নিয়ে এসে এখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছি—ওজনে প্রায় ৩ সের বেড়েছি। তুমি বৌঠাকরুণকে সঙ্গে করে নিয়ে এস—তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। জিনিষপত্র কিছু আনবার চেষ্টা কোরো না। বিছানা যথেষ্ট আছে—কেবল গায়ে দেবার কম্বল এনো। তোমার জন্যে চা চুরুট তামাক প্রভৃতি সমস্ত নেশার জোগাড় করে রেখেছি। পড়বার বই এবং লেখবার অবকাশ এখানে যথেষ্ট পাবে—

বেড়াবার মাঠ এবং সঙ্গীরও অভাব হবে না। আমি আজকাল সকালে তিন ঘণ্টা বেড়াই, এ-কথা চিঠি পড়ে তোমার বিশ্বাস হবে না—এখানে এলেই প্রমাণ হবে।

তুমি যদি সকালের ট্রেনে ছাড় তা হলে সন্ধ্যেবেলায় ঠাণ্ডা লাগ্‌বার আশঙ্কাটা থাকে না। সে গাড়িটা সাতটার সময় ষ্টেশন ছাড়ে। এখানে এসে প্রায় বারোটার সময় পৌঁছয়—বর্দ্ধমানে দশ মিনিট থামে—আগে থাকতে ব্রেকফাষ্ট টেলিগ্রাফ করে দিয়ে ওখান থেকে খাদ্যদ্রব্য গাড়িতে তুলে নিতে পার।

কবে ও কখন ছাড়বে সে-খবরটা আমার চিঠি পেয়েই আমাকে টেলিগ্রাফ করে দিয়ো—তা হলে তোমাদের যান বাহন ঘর প্রভৃতি সমস্ত ঠিক করে রেখে দেব। ইতি বুধবার।

তোমার রবি

বন্ধু

আজ মিস্ নোব্‌লের চিঠিতে তোমার কথা পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছি। আমরা এখন বোলপুরে শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছি। তুমি এখানে কখনো আস নাই। জায়গাটি বড় রমণীয়। আলোকে আকাশে বাতাসে আনন্দে শান্তিতে যেন পরিপূর্ণ। এখানকার আকাশে চলিবার ফিরিবার সময় নিয়ত যেন একটি মঙ্গলের স্পর্শ অনুভব করি। এখানে জীবন বহন করা নিতান্তই সহজ ও সরল। কলিকাতার আবর্ত্তের মধ্যে আমার আর কিছুতেই ফিরিতে ইচ্ছা করে না। এখানে নিভৃতে নির্জ্জনে ধ্যানে ও প্রেমে নিজের জীবনকে ধীরে ধীরে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি এখানে একটি বোর্ডিং বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করিয়াছি। পৌষ মাস হইতে খোলা হইবে। গুটি দশেক ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নির্ম্মল শুচি আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি।

ত্রিপুরার মহারাজ কাল আমার কাছে একটি কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছেন। তোমার সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আর দিন দশ বারো পরে, ত্রিপুরায় গিয়া মহারাজের সঙ্গে দেখা করিব। তোমার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাগুণে মহারাজ আমার হৃদয় দ্বিগুণ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রেণীর লোকের পক্ষে এরূপ বিনীত গুণগ্রাহিতা অত্যন্ত বিরল।

এখন ত তুমি প্রবাসেই থাকিয়া গেলে। দীর্ঘকাল তোমার বিচ্ছেদ বহন করিতে হইবে। বিলাতে যাইবার লোভ এখন আমার মনে নাই—কিন্তু একবার তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিবার জন্য মন প্রায়ই ব্যগ্র হয়। তোমার সার্কুলার রোডের সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি এবং নীচের তলায় মাছের ঝোলের আস্বাদন সর্ব্বদাই মনে পড়ে। এখন যদি ভারতবর্ষে থাকিতে তবে কিছু দিনের জন্যে তোমাকে শান্তিনিকেতনে রাখিয়া নিবিড় আনন্দ লাভ করিতাম। যদি কোন সুযোগ পাই একবার তুমি থাকিতে থাকিতে ইংলণ্ডে যাইবার বিশেষ চেষ্টা করিব। তোমার বন্ধুত্ব যে আমাকে এমন প্রবল ও গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিবে তাহা এক বৎসর পূর্ব্বে জানিতাম না।

তোমার রবি

ঁ

শান্তিনিকেতন

বন্ধু

এখানে এসে কিছু ভালো আছি। কিন্তু চলতে ফিরতে কষ্ট ও ক্লান্তি বোধ হয়। ডাক্তাররা অন্তরে বাইরে উল্টে পাল্টে আমাকে তন্ন তন্ন করে দেখেচে। বলচে কোনও কল একটুও বিগড়োয় নি—নাড়ীতে রক্তস্রোতের ব্যবহার খুবই ভালো। নানা দুশ্চিন্তা ও কাজের তাড়ায় আমাকে জখম করেচে। এখানে সকালে বিকালে খুব অল্প অল্প করে একটু বেড়ানো অভ্যেস করচি—বেশি পারি নে। লিখতে পড়তে একটুও শ্রান্তি বোধ করি নে। নানা লোক এসে নানা বাজে কাজে আমার উপর উৎপাত করে সেইটেতে বড় পীড়ন করে।

রথীদের কাছে তোমার ভিয়েনার সমস্ত খবর শুনে খুব আনন্দ বোধ করেচি। যখন দেখা হবে সব কথা শুনব। আজ আমার এক জন চীনদেশী বন্ধু আসচেন

তাঁর জন্মে ব্যস্ত আছি যখন তাঁদের দেশে গিয়েছিলুম ইনি আমাদের অজস্র আতিথ্য করেচেন। ইতি

৮ অক্টোবর ১৯২৮

তোমার রবি

বৌঠাকরুণকে সাদর অভিবাদন।

ওঁ

বন্ধু

তোমার এই বিষম উদ্বেগের দিনে কিছুই করবার উপায় নেই এই আমার দুঃখ। চলাফেরা আমার পক্ষে কঠিন হয়েছে—চুপ করে বসেই আমাকে কাজ চালাতে হয়। যতটুকু আমার নিজের যথার্থ কাজ তার বেশি কোনো ভার নেওয়া আমার উচিত নয় কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা এসে পড়ে তাকে ঠেলে ফেলা যায় না। শীতকালে আগন্তুক অতিথির সমাগম বাড়তে থাকবে সেইটেতে আমাকে বড় ক্লান্ত করে।

রথীর চিঠিতে শুনেছিলুম সুইজারল্যাণ্ডে তোমার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। আশা করি সেটা এখন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়ে থাকবে।

আগামী গ্রীষ্মে য়ুরোপে গিয়ে আর কিছু না করে একবার শরীরটাকে সারিয়ে নিয়ে আসবার চেষ্টা করব।

তোমার ৭০ বছরের অভিনন্দন-সভায় নিশ্চয়ই আমি যোগ দিতে যাব। তখন শীতের সময় শরীরে এখনকার চেয়ে বল পাব বলে বিশ্বাস করি।

বর্তমান দুর্যোগ উত্তীর্ণ হয়ে তোমার শরীর মন সুস্থ সবল থাক এই আমি একান্ত মনে কামনা করি। ইতি

বিজয়া দশমী ১৩৩৫।

তোমার রবি

গৌড়পাদ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

৪

"নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্।"

'ইহা বুদ্ধ বলেন নাই।'

আগমশাস্ত্রের একবারে শেষের পূর্ব কারিকাটিতে (৪.৯৯) 'ইহা বুদ্ধ বলেন নাই' এই কথাটির তাৎপর্য লইয়া মতভেদ দেখা দিয়াছে, আমি কী বুঝিয়াছি তাহা এখানে একটু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। সমগ্র কারিকাটি এই—

ক্রমতে ন হি বুদ্ধস্য জ্ঞানং ধর্মেষু তায়িনঃ।
সর্বে ধর্মাস্তথা জ্ঞানং নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্।

ইহার আক্ষরিক স্থূল অর্থ এই—

সম্প্রদায়প্রবর্তক[1] বুদ্ধের মতে জ্ঞান ধর্ম-(অর্থাৎ বস্তু-) সমূহে যায় না। ধর্মসমূহ ও জ্ঞান—ইহা বুদ্ধ বলেন নাই।

ইহার প্রথম অংশের ভাব এই যে, বুদ্ধের মতে বস্তু বা বিষয়ের সহিত জ্ঞানের সঙ্গ বা সংসর্গ হয় না, অর্থাৎ জ্ঞান অসঙ্গ। দ্বিতীয় অংশে বলা হইতেছে—বিষয়সমূহ আর (তাহাদের) জ্ঞান এই উভয়ই বুদ্ধ বলেন নাই।

ইহাতে কী বুঝিতে হইবে?

১। মূল তায়ী (অর্থাৎ তায়িন্) শব্দের অর্থ অস্পষ্ট হওয়ায় ইহার স্থানে তাপী ("তাপিনঃ") পাঠ কোন-কোন পুঁথিতে দেখা যায়। পূর্ব পাঠ ত্যাগ করার কোন কারণ নাই। এই শব্দটি প্রধানত বৌদ্ধ (ললিতবিস্তর, পৃ. ৪২১; বোধিচর্যাবতার, ৩.২; সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, পৃপৃ. ২৮, ৫৬, ৬৭, ইত্যাদি) ও জৈন (হেমচন্দ্রের যোগশাস্ত্র, ১ম খণ্ড, পৃপৃ. ১,৪৭; দশবৈকালিক সূত্র, পৃ. ১১৫) গ্রন্থে বহু-বহু স্থানে দেখা যায়। ধর্মকীর্তি স্বকীয় প্রমাণ

বিষয়ের সহিত জ্ঞানের যে সঙ্গ বা সংসর্গ হয় না, অপর কথায় জ্ঞান যে অসঙ্গ একথা পূর্বে বহুবার বলা হইয়াছে।[২] এখানেও ঐ কথাটিকে পুনর্বার সমর্থন করিয়া বা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্বশেষে চতুর্থ প্রকরণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার চরম তত্ত্বটিকে বলিতেছেন—'ধর্মসমূহ ও জ্ঞান—ইহা বুদ্ধ বলেন নাই।' অর্থাৎ চতুর্থ প্রকরণের আরম্ভে বুদ্ধকে এই বলিয়া নমস্কার করা হইয়াছিল যে, তিনি জ্ঞানের দ্বারা ধর্মসমূহকে ভাল করিয়া জানিয়াছিলেন। ইহাই যদি হয় তবে জ্ঞানের সহিত ধর্মসমূহের সংসর্গ বা সঙ্গ হয় বলিতে হইবে, এবং তাহা হইলে জ্ঞানকে যে, অসঙ্গ বা নিঃসঙ্গ (৪.৭৯) বলা হইতেছে, তাহা সঙ্গত হয় না। এই জন্য গ্রন্থকার চরম তত্ত্বটিকে বলিতেছেন যে, ধর্মসমূহ ও (তাহাদের) জ্ঞানের কথা অর্থাৎ জ্ঞান-জ্ঞেয়ের কথা বুদ্ধ বলেন নাই। তিনি এত সব বলিয়াছেন অথচ ইহার কথা বলেন নাই, ইহার তাৎপর্য কী? তাৎপর্য অন্য কিছুই নহে, তিনি কিছুই বলেন নাই। এখানে এই বিষয়টিকে পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে একটু বেশী হইলেও কতকগুলি বচন তুলিতে হইতেছে :—

বার্ত্তিকে (২. ১৪৫) ইহার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকায় (পৃ. ৭৫) প্রজ্ঞাকরমতি তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন—"তায়িনাং স্বাধিগতমার্গদেশকানাম্। যদুক্তং 'তায়ঃ স্বদৃষ্টমার্গোক্তিঃ'।" দ্রষ্টব্য—লেখকের প্রবন্ধ—*The Pramāṇavārttika of Dharmakīrtti*, IHQ, XIII, 1937)। বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্যটীকার দ্বিতীয় শ্লোকের ("অক্ষপাদায় তায়িনে") ব্যাখ্যায় উদয়নাচার্য স্বকীয় তাৎপর্য টীকা পরিশুদ্ধিতে (বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী, পৃ. ৮) ফলত পূর্বোক্ত অর্থই সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন "তায়ী তত্ত্বাধ্যবসায়সংরক্ষণক্ষমসম্প্রদায় প্রবর্ত্তকঃ।" প্রজ্ঞাকরমতি উল্লিখিত স্থানে আর একটি অর্থ দিয়াছেন—"অথবা তায়ঃ সন্তানার্থঃ। আসংসারমপ্রতিষ্ঠিতনির্বাণতয়া অবস্থায়িনাম্।" পূর্বে যেরূপ দেখা গেল তাহাতে তায়ী শব্দের মূল অর্থ 'সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক' ধরিতে পারা যায়। বুদ্ধকে বুঝাইতে তায়িন্ শব্দের প্রয়োগ হয় ইহা পূর্বে দেখা গিয়াছে। কখন-কখন আবার ঐ স্থলে ত্রায়িন্ ('রক্ষক') শব্দও দেখা যায়। তিব্বতীতে বুদ্ধকে বুঝাইতে স্ক্যোব-প শব্দ আছে, ইহার সংস্কৃত ত্রায়িন্ (মহাব্যুৎপত্তি, ১.১৫)। বিশেষ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—JRAS, 1910, p. 140; JPTS, 1891-1893, p. 53; JA, 1912, p. 243; Proceedings and Transactions of the Second Oriental Conference, Calcutta, 1922, pp. 450, ff.

২। ৪.৭২, ৭৯, ৭৬।

নাগার্জুন মধ্যমককারিকায় (২০.২৫) বলিতেছেন—

(১) সর্বোপলম্ভোপশমঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবঃ।
ন ক্বচিৎ কস্যচিৎ কশ্চিদ্ ধর্মো বুদ্ধেন দেশিতঃ॥

এখানে দেখান হইল বুদ্ধ কোন ধর্ম (অর্থাৎ বস্তু) উপদেশ করেন নাই।

এই কারিকারই ব্যাখ্যায় চন্দ্রকীর্ত্তি তথাগতগুহ্যসূত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

(২) যাং চ রাত্রিং তথাগতোঽনুত্তরাং সম্যক্ সম্বোধিমভিসম্বুদ্ধো যাং চ রাত্রিমুপাদায় পরিনির্বাস্যতি অত্রান্তরে তথাগতেন একমপ্যক্ষরং নোদাহৃতং ন ব্যাহৃতং নাপি প্রব্যাহরতি নাপি প্রব্যাহরিষ্যতি।

এখানে বলা হইল বুদ্ধ একটা অক্ষরও বলেন নাই। পরবর্তী বচনসমূহেও ইহাই দেখান হইয়াছে—

লঙ্কাবতার (পৃপৃ. ১৪২-১৪৩)—

(৩) যাং চ রাত্রিং তথাগতোঽভিসম্বুদ্ধো যাং চ রাত্রিং পরিনির্বাস্যতি অত্রান্তরে একমপ্যক্ষরং তথাগতেন নোদাহৃতং ন প্রব্যাহরিষ্যতি। অবচনং বুদ্ধবচনম্।

মধ্যমকবৃত্তি (পৃ. ২৬৪) ও বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকায় (পৃ. ৩৬৫, একটু পাঠভেদ) উদ্ধৃত ভগবদ্-বচন—

(৪) অনক্ষরস্য ধর্মস্য শ্রুতিঃ কা দেশনা চ কা।
শ্রূয়তে দেশ্যতে চাপি সমারোপাদনক্ষরঃ॥

নাগার্জুনের নিরৌপম্যস্তব (১৭)—

(৫) নোদাহৃতং ত্বয়া কিঞ্চিদেকমপ্যক্ষরং বিভো।
কৃৎস্নশ্চ বৈনেয়জনো ধর্মবর্ষেণ তর্পিতঃ।

লঙ্কাবতার, (পৃ. ৪৮)—

(৬) তত্ত্বং হ্যক্ষরবর্জিতম্।

ঐ (পৃ. ১৯০)—

(৭) নিরক্ষরত্বাৎ তত্ত্বস্য।

ঐ (পৃ. ১৩৭)—

(৮) ন মে যানং মহাযানং ন ঘোষো ন চ অক্ষরাঃ।[৩]

বজ্রচ্ছেদিকা (পৃ. ২৪)—

(৯) তৎ কিং মন্যসে সুভূতে অস্তি স কশ্চিদ্ ধর্মো যস্তথাগতেন দেশিতঃ। এবমুক্ত আয়ুষ্মান্ সুভূতির্ভগবন্তমেবমবোচৎ। যথাহং ভগবন্ ভগবতো ভাষিতস্যার্থমাজানামি নাস্তি স কশ্চিদ্ধর্মো যস্তথাগতেনানুত্তরা সম্যক্সম্বোধিরিত্যভিসম্বুদ্ধঃ নাস্তি ধর্মো যস্তথাগতেন দেশিতঃ।

৩। তুলনীয়—আমাদের আগমশাস্ত্র, ৪. ৬০—যত্র বর্ণা ন বর্ত্তন্তে।

ঐ (পৃ. ২৯)—

(১০) তৎ কিং মন্যসে সুভূতে অপি ঘস্তি স কশ্চিদ্ধর্মো যস্তথাগতেন ভাবিতঃ। সুভূতিরাহ। নো হীদং ভগবন্ নাস্তি স কশ্চিদ্ধর্মো যস্তথাগতেন ভাবিতঃ।

লঙ্কাবতার (পৃ. ১৪৪)—

(১১) যস্যাং চ রাত্র্যাং ধিগমো যস্যাং চ পরিনির্বৃতিঃ।
এতস্মিন্নন্তরে নাস্তি ময়া কিঞ্চিৎ প্রকাশিতম্।

মধ্যমকবৃত্তি (পৃ. ৫৩৯)—

(১২) অবাচ্যনক্ষরাঃ সর্ব শূন্যাঃ শান্তাদিনির্মলাঃ।
য এবং জানতি ধর্মান্ কুমারো বুদ্ধ সোচ্যতে ॥৪

পূর্বোক্ত উক্তিসমূহে এই যে বলা হইল বুদ্ধ কিছুই বলেন নাই। ইহার একটি কারণ এই যে, পরমার্থ তত্ত্ব প্রকাশ করা যায় না, ইহা নিজের অন্তরে প্রকাশ পায় ("প্রত্যাত্মধর্মতা"), নিজেই ইহাকে বুঝিতে পারা যায় ("প্রত্যাত্মবেদ্যতা), অন্য ইহা বুঝাইতে পারে না ("অপরপ্রত্যয়")। ইহা কোন অক্ষরে বা শব্দে প্রকাশ করা যায় না। কারণ তত্ত্ব হইতেছে "অক্ষরবর্জিত" বা "অনক্ষর" বা "নিরক্ষর"। মধ্যমকবৃত্তিতে (পৃ. ৫৬) বলা হইয়াছে যে, আর্যগণের নিকট পরমার্থ হইতেছে মৌন।৫ বেদান্তে তো এ কথা খুবই সুপ্রসিদ্ধ।৬ এস্থলে চন্দ্রকীর্তির নিম্নলিখিত কথাটি (মধ্যমকবৃত্তি, পৃ. ৪৯৩) তুলিতে পারা যায়—

সর্ব এবায়মভিধানাভিধেয়জ্ঞানজ্ঞেয়াদিব্যবহারো'শেষো লোকসংবৃতিসত্যমিত্যুচ্যতে। ন হি পরমার্থত এব তৎ সম্ভবতি। কুতস্তত্র পরমার্থে বাচাং প্রবৃত্তিঃ কুতো বা জ্ঞানস্য। স হি পরমার্থোঽপরপ্রত্যয়ঃ শান্তঃ প্রত্যাত্মবেদ্য আর্যাণাং সর্বপ্রপঞ্চাতীতঃ। স নোপদিশ্যতে ন চাপি জ্ঞায়তে।

তাই বুদ্ধ বস্তুত কিছুই বলেন নাই, তবুও লোকে নিজ চিত্তবৃত্তি অনুসারে ভাবে যে তিনি ইহা বা তাহা উপদেশ করিয়াছেন। মধ্যমকবৃত্তিতে (পৃ. ৫৩৯) পূর্বোদ্ধৃত (২) সংখ্যক বচনের ঠিক পরেই তথাগতগুহ্যসূত্র হইতে দেখান হইয়াছে—

অথ চ যথাভিমুক্তাঃ সর্বসত্ত্বা নানাধাত্বাশয়াস্তাং তাং বিবিধাং তথাগতবাচং নিশ্চরন্তীং সংজানন্তি। তেষামেবং পৃথক্ পৃথগ্ ভবতি। অয়ং ভগবানস্মভ্যম্ ইমং ধর্মং দেশয়তি। বয়ং চ তথাগতস্য ধর্মদেশনাং শৃণুমঃ। তত্র তথাগতো ন কল্পয়তি ন বিকল্পয়তি সর্বকল্পবিকল্পজালবাসনাপ্রপঞ্চবিগতো হি শান্তমতে তথাগত ইতি বিস্তরঃ।"

ইহাই যদি হয়, বুদ্ধ যদি কোথাও কোন কিছু উপদেশ না করিয়া থাকেন, তবে বুদ্ধের উপদেশ বলিয়া যে ব্যবহার আছে তাহা কিরূপে হয়? ঐ স্থানেই বলা হইয়াছে—

যদি তর্হ্যেবং [ন] ক্বচি[ৎ কশ্চি]দ্ ধর্মো বুদ্ধেন দেশিতস্তৎ কথামিম এতে বিচিত্রাঃ প্রবচনব্যবহারা জায়ন্তে। উচ্যতে। অবিদ্যানিদ্রামুপগতানাং দেহিনাং স্বপ্নায়মানানামিব স্ববিকল্পাভ্যুদয় এষঃ অয়ং ভগবান্ সকলত্রিভুবনসুরাসুরনরনাথ ইমং ধর্মমস্মভ্যং দেশয়তীতি।

অর্থাৎ স্বপ্নের মত অবিদ্যায় লোকেরা মনে ভাবিয়া থাকে যে, বুদ্ধ ধর্মদেশনা করিয়াছেন।

এ স্থলে নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্‌ক্তিও উদ্ধৃত করিতে পারা যায় (লঙ্কাবতার, পৃঃ ১৯৪)—

ন চ মহামতে তথাগতা অক্ষয়পতিতং ধর্মং দেশয়তি।" পুনর্মহামতে যোঽক্ষরপতিতং ধর্মং দেশয়তি স প্রলপতি। নিরক্ষরত্বাদ্ ধর্মস্য। অত এতস্মাৎ কারণান্মহামতে উক্তং দেশনাপাঠে ময়ান্যৈশ্চ বুদ্ধবোধিসত্ত্বৈর্যদেকমপ্যক্ষরং তথাগতা নোদাহরন্তি ন প্রত্যুদাহরন্তীতি। তৎ কস্য হেতোর্যদুতানক্ষরত্বাদ্ ধর্মাণাম্। ন চ নার্থোপসংহিতমুদাহরন্তি। উদাহরন্ত্যেব বিকল্পমুপাদায়ানুপাদায় মহামতে সর্বধর্মাণাং শাসনলোপঃ স্যাৎ।"

ইহা বলিয়া এখানে দেখান হইয়াছে যে, অর্থকে অনুসরণ করিতে হইবে, ব্যঞ্জন বা অক্ষরকে অনুসরণ করিলে চলিবে না। যে ব্যক্তি ব্যঞ্জনকে অনুসরণ করে সে যে, কেবল নিজেকেই নষ্ট করে তাহা নহে, অন্যের প্রয়োজনকেও বুঝাইতে পারে না। ইহাই বলা হইতেছে—

অর্থপ্রতিশরণেন মহামতে বোধিসত্ত্বেন মহাসত্ত্বেন ভবিতব্যং ন ব্যঞ্জনপ্রতিশরণেন। ব্যঞ্জনানুসারী মহামতে কুলপুত্রো বা কুলদুহিতা বা স্বাত্মানং চ নাশয়তি পরার্থাংশ্চ নাববোধয়তি।

বুদ্ধ যে কিছুই বলেন নাই, এই উক্তির আর একটি কারণ "পৌরাণস্থিতিধর্মতা" অর্থাৎ ধর্ম বা বস্তুসমূহের স্বভাব পূর্ব হইতে একই রূপে থাকে। বুদ্ধ উৎপন্ন হউন বা না হউন বস্তুর প্রকৃতি বরাবর সব সময়ে একই থাকে, বুদ্ধের বলিবার কিছু থাকে না। বুদ্ধের বচন যে বস্তুত

৪। ইহার পরবর্তী সমস্ত অংশ দ্রষ্টব্য।

৫। "পরমার্থো হ্যার্যাণাং তূষ্ণীভাবঃ।

৬। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ (২.৪.১)— যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, ইত্যাদি ইত্যাদি সকলেরই জানা। দ্রষ্টব্য বেদান্তসূত্র, ৩.২.১৭; বর্তমান লেখকের *The Basic Conception of Buddhism*, pp. 19, ff.

বচন নহে ("অবচনং বুদ্ধবচনম্"), তাহার তাৎপর্য্য হইল ইহাই।

পূর্বে বর্ণিত এই দুই কারণকে এক সঙ্গে ধরিয়া লঙ্কাবতারে (পৃপৃ. ১৪৩-১৪৪) বলা হইয়াছে—

যদিদমুক্তং ভগবতা যাং চ রাত্রিং তথাগতোঽভিসম্বুদ্ধো যাং চ রাত্রিং পরিনির্বাস্যতি অত্রান্তরে একমপ্যক্ষরং তথাগতেন নোদাহৃতং ন প্রব্যাহরিষ্যতি অবচনং বুদ্ধবচনমিতি। কিমিদং সন্ধায়োক্তম্।° ভগবানাহ। ধর্মদ্বয়ং মহামতে সন্ধায় ময়ৈতদুক্তম্। কতমদ্ ধর্মদ্বয়ং। যদুত প্রত্যাত্মধর্মতাং চ পৌরাণস্থিতিধর্মতাং চ।° উৎপাদাদ্বা তথাগতানামনুৎপাদাদ্বা তথাগতানাং স্থিতৈবৈষাং ধর্মাণাং ধর্মতা ধর্মনিয়ামতা পৌরাণনগরমহাপথবন্ মহামতে।°

এখানে পুরাতন নগরের মহাপথের উপমা দেওয়া হইয়াছে। উপমাটি হইতেছে এইরূপ—যদি কোন ব্যক্তি বনের মধ্যে পর্য্যটন করিতে-করিতে কোন পুরাতন নগরকে দেখিতে পায় তবে সে তাহাতে প্রবেশ করে, প্রবেশ করিয়া নগরের কাজে সুখ অনুভব করে। ঐ ব্যক্তি যেমন নগরে প্রবেশ করিলেও তাহাতে প্রবেশের পথকে প্রস্তুত করে না, তেমনই পূর্বকাল হইতে যে তত্ত্ব রহিয়াছে বুদ্ধগণ তাহাই লাভ করিয়াছেন মাত্র। ইহা চিরকাল আছে ও থাকিবে। তাঁহাদের জন্ম বা অজন্মের উপর ইহা নির্ভর করে না। এই তত্ত্বটি প্রকাশ করিবারও জন্য বলা হয় বুদ্ধ একটি কথাও বলেন নাই। দ্রষ্টব্য—

তদ্যথা মহামতে কশ্চিদেব পুরুষোঽটব্যাং পর্যটন্ পৌরাণং নগরমনুপশ্যেদবিকলপ্রবেশং। স তং নগরমনুপ্রবিশেৎ। তত্র প্রবিশ্য প্রতিনিবিশ্য নগরং নগরক্রিয়াসুখমনুভবেৎ। তৎ কিং মন্যসে মহামতে অপি নু তেন পুরুষেণ স পন্থা উৎপাদিতো যেন পথা তং নগরমনুপ্রবিষ্টো নগরবৈচিত্র্যং চ। আহ। নো ভগবন্। ভগবানাহ। এবমেব মহামতে যন্ময়া তৈশ্চ তথাগতৈরধিগতং স্থিতৈবৈষা ধর্মতা ধর্মস্থিতিতা ধর্মনিয়ামতা তথতা ভূততা সত্যতা। অত এতস্মাৎ কারণান্ মহামতে ময়েদমুক্তং যাং চ রাত্রিং তথাগতোঽভিসম্বুদ্ধো যাং চ রাত্রিং পরিনির্বাস্যতি অত্রান্তর একমপ্যক্ষরং তথাগতেন নোদাহৃতং নোদাহরিষ্যতি॥

এ স্থলে বজ্রচ্ছেদিকা (পৃ. ২৪) হইতে (পূর্বোল্লিখিত ৮-সংখ্যক বচনের পরে) নিম্নলিখিত বাক্যটি তুলিতে পারা যায়—

তৎ কস্য হেতোঃ। যোঽসৌ তথাগতেন ধর্মোঽভিসম্বুদ্ধো দেশিতো বা অগ্রাহ্যঃ সোঽনভিলপ্যঃ। ন স ধর্মো নাধর্মঃ। তৎ কস্য হেতোঃ। অসংস্কৃতপ্রভাবিতা হ্যার্যপুদ্গলাঃ॥

এইরূপ আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, গৌড়পাদ আলোচ্য চতুর্থ প্রকরণের প্রথমেই বুদ্ধকে নমস্কার করার প্রসঙ্গে ধর্ম ও জ্ঞানের উল্লেখ করিয়া এত দূর যে বিচার করিয়া আসিয়াছেন তাহার শেষে ঐ ধর্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে বুদ্ধের চরম কথাটি প্রকাশ করিয়া ঠিকই করিয়াছেন।

আরণ্যক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১২

পনর দিন এখানে একেবারে বন্য জীবন যাপন করিলাম, যেমন থাকে গাঙোতারা কি গরীব ভূঁইহার বামুনরা। ইচ্ছা করিয়া নয়, অনেকটা বাধ্য হইয়াই থাকিতে হইল এ ভাবে। এই জঙ্গলে কোথা হইতে কি আনাইব? খাই ভাত ও বনধুঁধুলের তরকারি, বনের কাঁকরোল কি মিষ্টি আলু তুলিয়া আনে সিপাহীরা, তাই ভাজা বা সিদ্ধ। মাছ দুধ ঘি—কিছু নাই।

অবশ্য, বনে সিল্লী ও ময়ূরের অভাব ছিল না, কিন্তু পাখী মারিতে তেমন যেন মন সরে না বলিয়া বন্দুক থাকা সত্ত্বেও নিরামিষই খাইতে হইত।

ফুলকিয়া বইহারে বাঘের ভয় আছে। এক দিনের ঘটনা বলি।

হাড়ভাঙা শীত সেদিন। রাত দশটার পরে কাজ-কর্ম্ম মিটাইয়া সকাল সকাল শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। হঠাৎ কত রাত্রে জানি না, লোকজনের চীৎকারে ঘুম ভাঙিল। জঙ্গলের ধারের কোন্ জায়গায় অনেকগুলি লোক জড় হইয়া চীৎকার করিতেছে। উঠিয়া তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিলাম। আমার সিপাহীরা পাশের খুপড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল। সবাই মিলিয়া ভাবিতেছি ব্যাপারটা কি, এমন সময়ে এক জন লোক ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—ম্যানেজার বাবু, বন্দুকটা নিয়ে শীগগির চলুন—বাঘে একটা ছোট ছেলে নিয়ে গিয়েছে খুপড়ি থেকে।

জঙ্গলের ধার হইতে মাত্র দু-শ হাত দূরে ফসলের ক্ষেতের মধ্যে ডোমন বলিয়া এক জন গাঙোতা প্রজার এক খানা খুপড়ি। তাহার স্ত্রী ছ-মাসের শিশু লইয়া খুপড়ির মধ্যে শুইয়া ছিল—অসম্ভব শীতের দরুন খুপড়ির মধ্যেই আগুন জ্বালানো ছিল, এবং ধোঁয়া বাহির করিয়া দিবার জন্য দরজার ঝাঁপটা একটু ফাঁক ছিল। সেই পথে বাঘ ঢুকিয়া ছেলেটিকে লইয়া পলাইয়াছে।

কি করিয়া জানা গেল বাঘ? শিয়ালও তো হইতে পারে। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া আর কোন সন্দেহ রহিল না, ফসলের ক্ষেতের নরম মাটিতে স্পষ্ট বাঘের থাবার দাগ।

আমার পাটোয়ারী ও সিপাহীরা মহালের অপবাদ রটিতে দিতে চায় না, তাহারা জোর গলায় বলিতে লাগিল—এ আমাদের বাঘ নয় হুজুর, এ মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্টের বাঘ। দেখুন না কত বড় থাবা!

যাহাদেরই বাঘ হউক, তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না। বলিলাম, সব লোক জড় কর, মশাল তৈরি কর—চল জঙ্গলের মধ্যে দেখি। সেই রাত্রে অত বড় বাঘের পায়ের সদ্য থাবা দেখিয়া তৎক্ষণ সকলেই ভয়ে কাঁপিতে সুরু করিয়াছে—জঙ্গলের মধ্যে কেহ যাইতে রাজী নয়। ধমক ও গালমন্দ দিয়া জন-দশেক লোক জুটাইয়া মশাল-হাতে টিন পিটাইতে পিটাইতে সবাই মিলিয়া জঙ্গলের নানা স্থানে বৃথা অনুসন্ধান করা গেল।

পরদিন বেলা দশটার সময় মাইল-দুই দূরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে বন জঙ্গলের মধ্যে একটা বড় আসান-গাছের তলায় শিশুটির রক্তাক্ত দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হইল।

কৃষ্ণপক্ষের কি ভীষণ অন্ধকার রাত্রিগুলিই নামিল তাহার পরে!

সদর কাছারি হইতে বাঁকে সিং জমাদারকে আনাইলাম। বাঁকে সিং শিকারী, বাঘের গতিবিধির অভ্যাস তার ভালই জানা। সে বলিল, হুজুর, মানুষ-খেকো বাঘ বড় ধূর্ত্ত হয়। আরও ক'টা লোক মরবে। সাবধান হয়ে থাকতে হবে।

ঠিক তিন দিন পরেই বনের ধারে সন্ধ্যার সময় একটা রাখালকে বাঘে লইয়া গেল।

ইহার পরে লোক ঘুম বন্ধ করিয়া দিল। রাত্রে সে এক অপরূপ ব্যাপার! বিস্তীর্ণ বইহারের বিভিন্ন খুপড়ি হইতে সারা রাত লোক টিনের ক্যানেস্ত্রা পিটাইতেছে, মাঝে মাঝে কাশের ডাঁটার আটি জ্বালাইয়া আগুন করিয়াছে, আমি ও বাঁকে সিং প্রহরে প্রহরে বন্দুকের আওয়াজ করিতেছি। আর শুধুই কি বাঘ? ইহার মধ্যে এক দিন মোহনপুরা ফরেষ্ট হইতে বন্য মহিষের দল বাহির হইয়া অনেকখানি ক্ষেতের ফসল তচ্‌নচ্‌ করিয়া দিল।

আমার কাশের খুপ্‌ড়ির দরজার কাছেই সিপাহীরা খুব আগুন করিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে উঠিয়া তাহাতে কাঠ ফেলিয়া দিই। পাশের খুপ্‌ড়িতে সিপাহীরা কথাবার্ত্তা বলিতেছে—খুপ্‌ড়ির মেজেতেই শুইয়া আছি, মাথার কাছের ঘুলঘুলি দিয়া দেখা যাইতেছে ঘন অন্ধকারে ঘেরা বিস্তীর্ণ প্রান্তর, দূরে ক্ষীণ তারার আলোয় পরিদৃশ্যমান জঙ্গলের আবছায়া সীমারেখা। অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া মনে হইল কন্‌কনে হিম যেন ঐ জনহীন নিষ্ঠুর শূন্য হইতে অঝোর ধারে বর্ষিত হইতেছে, যেন ঐ মৃত নক্ষত্রলোক হইতে তুষারবর্ষী হিমবাতাস তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে পৃথিবীর দিকে—লেপ-তোষক হিমে ঠাণ্ডা জল হইয়া গিয়াছে, আগুন নিবিয়া আসিতেছে, কি দুরন্ত শীত! আর সেই সঙ্গে উন্মুক্ত প্রান্তরের অবাধ হু হু তুষার শীতল-নৈশ হাওয়া!

কিন্তু কি করিয়া থাকে এখানকার লোকেরা এই শীতে, এই আকাশের তলায় সামান্য কাশের খুপ্‌ড়ির ঠাণ্ডা মেজের উপর, কি করিয়া রাত্রি কাটায়? তাহার উপর ফসল চৌকি দিবার এই কষ্ট! বন্য মহিষের উপদ্রব, বন্য শূকরের উপদ্রবও কম নয়—বাঘও আছে। আমাদের বাংলা দেশের চাষারা কি এত কষ্ট করিতে পারে? অত উর্ব্বর জমিতে, অত নিরুপদ্রব গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে ফসল করিয়াও তাহাদের দুঃখ ঘোচে না।

আমার ঘরের দু-তিন-শ হাত দূরে দক্ষিণ-ভাগলপুর হইতে আগত জনকতক কাটুনি মজুর স্ত্রীপুত্র লইয়া ফসল কাটিতে আসিয়াছে। এক দিন সন্ধ্যায় তাহাদের খুপ্‌ড়ির কাছ দিয়া আসিবার সময় দেখি কুঁড়ের সামনে বসিয়া সবাই মিলিয়া আগুন পোহাইতেছে।

এদের জগৎ আমার কাছে অনাবিষ্কৃত, অজ্ঞাত। ভাবিলাম সেটা দেখি না কেমন।

গিয়া বলিলাম—বাবাজী, কি করা হচ্ছে?

এক জন বৃদ্ধ ছিল দলে, তাহাকেই এই সম্বোধন। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমায় সেলাম করিল, বসিয়া আগুন পোহাইতে অনুরোধ করিল। ইহা এদেশের প্রথা। শীতকালে আগুন পোহাইতে আহ্বান করা ভদ্রতার পরিচয়।

গিয়া বসিলাম। খুপ্‌ড়ির মধ্যে উঁকি দিয়া দেখি বিছানা বা আসবাবপত্র বলিতে ইঁহাদের কিছু নাই। কুঁড়েঘরের মেজেতে মাত্র কিছু শুক্‌নো ঘাস বিছানো। বাসনকোসনের মধ্যে খুব বড় একটা কাঁসার জামবাটি আর একটা লোটা। কাপড় যার যা পরনে আছে—আর এক টুকরা বস্ত্রও বাড়তি নাই। কিন্তু তাহা তো হইল, এই নিদারুণ শীতে ইহাদের লেপকাঁথা কই? রাত্রে গায়ে দেয় কি?

কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম।

বৃদ্ধের নাম নক্‌ছেদী ভকত। জাতি গাঙোতা। সে বলিল—কেন, খুপ্‌ড়ির কোণে ঐ যে কলাইয়ের ভুষি দেখছেন না রয়েছে টাল করা?

বুঝিতে পারিলাম না। কলাইয়ের ভুষির আগুন করা হয় রাত্রে?

নক্‌ছেদী আমার অজ্ঞতা দেখিয়া হাসিল।

—তা নয় বাবুজী। কলাইয়ের ভুষির মধ্যে ঢুকে ছেলেপিলেরা শুয়ে থাকে—আমরাও কলাইয়ের ভুষি গায়ে চাপা দিয়ে শুই। দেখছেন না, অন্ততঃ পাঁচ মণ ভুষি মজুত রয়েছে। ভারী ওম্‌ কলাইয়ের ভুষিতে। দুখানা কম্বল গায়ে দিলেও অমন ওম্‌ হয় না। আর আমরা পাবই বা কোথায় কম্বল বলুন না?

বলিতে বলিতে একটা ছোট ছেলেকে ঘুম পাড়াইয়া তাহার মা খুপড়ির কোণের ভুষির গাদার মধ্যে তাহার পা হইতে গলা পর্য্যন্ত ঢুকাইয়া কেবল মাত্র মুখখানা বাহির করিয়া শোয়াইয়া রাখিয়া আসিল। মনে মনে

ভাবিলাম, মানুষে মানুষের খোঁজ রাখে কতটুকু? কখনও কি জানিতাম এসব কথা? আজ যেন সত্যিকার ভারতবর্ষকে চিনিতেছি।

অগ্নিকুণ্ডের অপর পার্শ্বে বসিয়া একটি মেয়ে কি রাঁধিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—ও কি রান্না হচ্ছে?

নক্‌ছেদী বলিল—ঘাটো।

—ঘাটো কি জিনিষ?

এবার বোধ হয় রন্ধনরতা মেয়েটি ভাবিল, এ বাংগালী বাবু সন্ধ্যাবেলা কোথা হইতে আসিয়া জুটিল। এ দেখিতেছি নিতান্ত বাতুল। কিছুই খোঁজ রাখে না দুনিয়ার। সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—ঘাটো জান না বাবুজী? মকাই-সেদ্ধ। যেমন চাল সেদ্ধ হ'লে বলে ভাত, মকাই সেদ্ধ করলে বলে ঘাটো।

মেয়েটি আমার অজ্ঞতার প্রতি কৃপাবশতঃ কাঠের খুন্তির আগায় উক্ত দ্রব্য একটুখানি হাঁড়ি হইতে তুলিয়া দেখাইল।

—কি দিয়ে খায়?

এবার হইতে যত কথাবার্ত্তা মেয়েটিই বলিল। হাসি হাসি মুখে বলিল—নুন দিয়ে, শাক দিয়ে—আবার কি দিয়ে খাবে বল না?

—শাক রান্না হয়েছে?

—ঘাটো নামিয়ে শাক চড়াব। মটরশাক তুলে এনেছি।

মেয়েটি খুবই সপ্রতিভ। জিজ্ঞাসা করিল—কলকাতায় থাক বাবুজী?

—হ্যাঁ।

—কি রকম জায়গা? আচ্ছা, কলকাতায় নাকি গাছ নেই? ওখানকার সব গাছপালা কেটে ফেলেছে?

—কে বললে তোমায়?

—এক জন ওখানে কাজ করে আমাদের দেশের। সে একবার বলেছিল। কি রকম জায়গা দেখতে বাবুজী?

এই সরলা বন্য মেয়েটিকে যত দূর সম্ভব বুঝাইবার চেষ্টা পাইলাম আধুনিক যুগের একটা বড় শহরের ব্যাপার-খানা কি। কত দূর বুঝিল জানি না, বলিল—কল্‌কাত্তা শহর দেখতে ইচ্ছে হয়—কে দেখাবে?

তাহার পর আরও অনেক কথা বলিলাম তাহার সঙ্গে। রাত বাড়িয়া গিয়াছে, অন্ধকার ঘন হইয়া আসিল। উহাদের রান্না শেষ হইয়া গেল। খুপ্‌ড়ির ভিতর হইতে সেই বড় জামবাটিটা আনিয়া তাহাতে ফেন-ভাতের মত জিনিষটা ঢালিল। উপর উপর একটু নুন ছড়াইয়া বাটিটা মাঝখানে রাখিয়া সবাই মিলিয়া চারি দিকে গোল হইয়া বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল।

আমি বলিলাম—তোমরা এখান থেকে বুঝি দেশে ফিরবে?

নক্‌ছেদী বলিল—দেশে এখন ফিরতে অনেক দেরি। এখান থেকে ধরমপুর অঞ্চলে ধান কাটতে যাব—ধান তো এদেশে হয় না—ওখানে হয়। ধান কাটার কাজ শেষ হ'লে আবার যাব গম কাটতে মুঙ্গের জেলায়। গমের কাজ শেষ হ'তে জ্যৈষ্ঠ মাস এসে পড়বে। তখন আবার খেড়ী কাটা সুরু হবে আপনাদেরই এখানে। তার পর কিছু দিন ছুটি। শ্রাবণ-ভাদ্রে আবার মকাই ফসলের সময় আসবে। মকাই শেষ হলেই কলাই এবং ধরমপুর-পূর্ণিয়া অঞ্চলে কার্ত্তিকশাল ধান। আমরা সারা বছর এই রকম দেশে দেশেই ঘুরে বেড়াই। যেখানে যে সময়ে যে ফসল, সেখানে যাই। নইলে খাব কি?

—বাড়ীঘর বলে তোমাদের কিছু নেই?

এবার মেয়েটি কথা বলিল। মেয়েটির বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, খুব স্বাস্থ্যবতী, বার্ণিশ-করা কালো রং, নিটোল গড়ন। কথাবার্ত্তা বেশ বলিতে পারে, আর গলার সুরটা দক্ষিণ-বিহারের দেহাতি হিন্দীতে বড় চমৎকার শোনায়।

বলিল—কেন থাকবে না বাবুজী? সবই আছে। কিন্তু সেখানে থাকলে আমাদের তো চলে না। সেখানে যাব গরমকালের শেষে, শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত থাকব। তার পর আবার বেরুতে হবে বিদেশে। বিদেশেই যখন আমাদের চাকুরী। তা ছাড়া বিদেশে কত কি মজা দেখা যায়—এই দেখবেন ফসল কাটা হয়ে গেলে আপনাদের এখানেই কত দেশ থেকে কত

লোক আসবে। কত বাজিয়ে, গাইয়ে, নাচনেওয়ালী—কত বহুরূপী সং—আপনি বোধ হয় দেখেন নি এসব? কি ক'রে দেখবেন, আপনাদের এ অঞ্চল তো ঘোর জঙ্গল হয়ে প'ড়ে ছিল—সবে এইবার চাষ হয়েছে। এই দেখুন না আসে আর পনর দিনের মধ্যেই। এই তো সবারই রোজগারের সময় আসছে।

চারি দিক নির্জ্জন। দূরের বস্তিতে কারা টিন পিটাইতেছে অন্ধকারের মধ্যে। মনে ভাবিলাম, এই অর্গলহীন কাশডাঁটার বেড়ায় আগড়-দেওয়া কুঁড়েতে ইহারা রাত কাটাইবে এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের ধারে, ছেলেপুলে লইয়া—সাহসও আছে বলিতে হইবে। এই তো মাত্র দিন-কয়েক আগে এদেরই মত আর একটা খুপ্‌ড়ি হইতে বাঘে ছেলে লইয়া গিয়াছে মায়ের কোল হইতে—এদেরই বা ভরসা কিসের? অথচ একটা ব্যাপার দেখিলাম, ইহারা যেন ব্যাপারটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছে না। তত সন্ত্রস্ত ভাবও নাই। এই তো এত রাত পর্য্যন্ত উন্মুক্ত আকাশের তলায় বসিয়া গল্পগুজব রান্নাবান্না করিল। বলিলাম—তোমরা একটু সাবধানে থাকবে। মানুষ-খেকো বাঘ বেরিয়েছে জান তো? মানুষ-খেকো বাঘ বড় ভয়ানক জানোয়ার, আর বড় ধূর্ত্ত। আগুন রাখো খুপ্‌ড়ির সামনে, আর ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়। ঐ তো কাছেই বন, রাত-বেরাতের ব্যাপার—

মেয়েটি বলিল—বাবুজী, ও আমাদের সয়ে গিয়েছে। পূর্ণিয়া জেলায় যেখানে ফি-বছর ধান কাটতে যাই, সেখানে পাহাড় থেকে বুনো হাতী নামে। সে-জঙ্গল আরও ভয়ানক। ধানের সময় বিশেষ ক'রে বুনো হাতীর দল এসে উপদ্রব করে। মেয়েটি আগুনের মধ্যে আর কিছু শুক্‌নো বনঝাউয়ের ডাল ফেলিয়া দিয়া সামনের দিকে সরিয়া আসিয়া বসিল।

বলিল—সেবার আমরা অখিলকুচা পাহাড়ের নীচে ছিলাম। এক দিন রাত্রে একা খুপ্‌ড়ির বাইরে রান্না করছি, চেয়ে দেখি পঞ্চাশ হাত মাত্র দূরে চার-পাঁচটা বুনো হাতী—কালো কালো পাহাড়ের মত দেখাচ্ছে অন্ধকারে—যেন আমাদের খুপ্‌ড়ির দিকেই আসছে। আমি ছোট ছেলেটাকে বুকে নিয়ে বড় মেয়েটার হাত ধরে রান্না ফেলে খুপ্‌ড়ির মধ্যে তাদের রেখে এলাম। কাছে আর কোনো লোকজন নেই, বাইরে এসে দেখি তখন হাতী ক'টা একটু থমকে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে আমার গলা কাঠ হয়ে গিয়েছে। হাতীতে খুব দেখতে পায় না তাই রক্ষে—ওরা বাতাসে গন্ধ পেয়ে দূরের মানুষ বুঝতে পারে। তখন বোধ হয় বাতাস অন্য দিকে বইছিল, যাই হোক, তারা অন্য দিকে চলে গেল। ওঃ, সেখানেও এমনি বাবুজী সারারাত টিন পেটায় আর আলো জালিয়ে রাখে হাতীর ভয়ে। এখানে বুনো মহিষ, সেখানে বুনো হাতী। ওসব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে।

রাত বেশী হওয়াতে নিজের বাসায় ফিরিলাম।

দিন পনরর মধ্যে ফুলকিয়া বইহারের চেহারা বদলাইয়া গেল। সরিষার গাছ শুকাইয়া মাড়িয়া বীজ বাহির করিবার সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে দলে দলে নানা শ্রেণীর লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল। পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, ছাপরা প্রভৃতি স্থান হইতে মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা দাঁড়িপাল্লা ও বস্তা লইয়া আসিল মাল কিনিতে। তাহাদের সঙ্গে কুলির ও গাড়োয়ানের কাজ করিতে আসিল এক দল লোক। হালুইকরেরা আসিয়া অস্থায়ী কাশের ঘর তুলিয়া মিঠাইয়ের দোকান খুলিয়া সতেজে পুরী, কচৌরি, লাড্ডু, কালাকন্দ্‌ বিক্রয় করিতে লাগিল। ফিরিওয়ালারা নানা রকম সস্তা ও খেলো মনোহারী জিনিষ, কাচের বাসন, পুতুল, সিগারেট, ছিটের কাপড়, সাবান ইত্যাদি লইয়া আসিল। এ বাদে আসিল রংতামাশা দেখাইয়া পয়সা রোজগার করিতে কত ধরণের লোক। নাচ দেখাইতে, রামসীতা সাজিয়া ভক্তের পূজা পাইতে, হনুমানজীর সিঁদুরমাখা মূর্ত্তি হাতে পাণ্ডা-ঠাকুর আসিল প্রণামী কুড়াইতে। এ সময় সকলেরই দু-পয়সা রোজগারের সময় এসব অঞ্চলে।

আর বছরও যে জনশূন্য ফুলকিয়া বইহারের প্রান্তর ও জঙ্গল দিয়া বেলা পড়িয়া গেলে ঘোড়ায় যাইতেও ভয় করিত—এ-বছর তাহার আনন্দোৎফুল্ল মূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। চারি দিকে বালক-বালিকার

হাস্যধ্বনি, কলরব, সস্তা টিনের ভেঁপুর পিঁপিঁ বাজনা, ঝুমঝুমির আওয়াজ, নাচিয়েদের ঘুঙুরের ধ্বনি—সমস্ত ফুলকিয়ার বিরাট প্রান্তর জুড়িয়া যেন একটা বিশাল মেলা বসিয়া গিয়াছে।

লোকসংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে অত্যন্ত বেশী। কত নূতন খুপ্‌ড়ি, কাশের লম্বা চালাঘর চারি দিকে রাতারাতি উঠিয়া গেল। ঘর তুলিতে এখানে কোন খরচ নাই, জঙ্গলে আছে কাশ ও বনঝাউ কি কেঁদ-গাছের গুঁড়ি ও ডাল। শুক্‌নো কাশের ডাঁটার খোলা পাকাইয়া এদেশে এক রকম ভারি শক্ত রশি তৈরি করে, আর আছে ওদের নিজেদের শারীরিক পরিশ্রম।

ফুলকিয়ার তহশীলদার আসিয়া জানাইল, এই সব বাহিরের লোক, যাহারা এখানে পয়সা রোজগার করিতে আসিয়াছে, ইহাদের কাছে জমিদারের খাজনা আদায় করিতে হইবে।

বলিল—আপনি রীতিমত কাছারি করুন হুজুর, আমি সব লোক একে একে আপনার কাছে হাজির করাই—আপনি ওদের মাথাপিছু একটা খাজনা ধার্য্য ক'রে দিন।

কত রকমের লোক দেখিবার সুযোগ পাইলাম এই ব্যাপারে!

সকাল হইতে দশটা পর্য্যন্ত কাছারি করিতাম, বৈকালে আবার তিনটার পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।

তহশীলদার বলিল—এরা বেশী দিন এখানে থাকবে না, ফসল মাড়া ও বেচাকেনা শেষ হয়ে গেলেই সব পালাবে। এর আগে এদের পাওনা আদায় ক'রে নিতে হবে।

এক দিন দেখিলাম একটি খামারে মারোয়াড়ী মহাজনেরা মাল মাপিতেছে। আমার মনে হইল ইহারা ওজনে নিরীহ প্রজাদের ঠকাইতেছে। আমার পাটোয়ারী ও তহশীলদারদের বলিলাম সমস্ত ব্যবসায়ীর কাঁটা ও দাঁড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে। দু-চার জন মহাজনকে ধরিয়া মাঝে মাঝে আমার সামনে আনিতে লাগিল—তাহারা ওজনে ঠকাইয়াছে, কাহারও দাঁড়ির মধ্যে জুয়াচুরি আছে। সে-সব লোককে মহাল হইতে বাহির করিয়া দিলাম। প্রজাদের এত কষ্টের ফসল আমার মহালে অন্ততঃ কেহ ফাঁকি দিয়া লইতে পারিবে না।

দেখিলাম শুধু মহাজনে নয়, নানা শ্রেণীর লোকে ইহাদের অর্থের ভার লাঘব করিবার চেষ্টায় ওৎ পাতিয়া রহিয়াছে।

এখানে নগদ পয়সার কারবার খুব বেশী নাই। ফিরিওয়ালাদের কাছে কোন জিনিষ কিনিলে ইহারা পয়সার বদলে সরিষা দেয়। জিনিষের দামের অনুপাতে অনেক বেশী সরিষা দিয়া দেয়—বিশেষতঃ মেয়েরা। তাহারা নিতান্ত নিরীহ ও সরল, যা তা বুঝাইয়া তাহাদের নিকট হইতে ন্যায্য মূল্যের চতুর্গুণ ফসল আদায় করা খুবই সহজ।

পুরুষেরাও বিশেষ বৈষয়িক নয়।

তাহারা বিলাতী সিগারেট কেনে, জুতা-জামা কেনে। ফসলের টাকা ঘরে আসিলে ইহাদের ও বাড়ীর মেয়েদের মাথা ঘুরিয়া যায়—মেয়েরা ফরমাস করে রঙীন কাপড়ের, কাচের ও এনামেলের বাসনের, হালুইকরের দোকান হইতে ঠোঙা ঠোঙা লাড্ডু-কচৌরী আসে, নাচ দেখিয়া, গান শুনিয়াই কত পয়সা উড়াইয়া দেয়। ইহার উপর রামজী, হনুমানজীর প্রণামী ও পূজা তো আছেই। তাহার উপরেও আছে জমিদার ও মহাজনের পাইক-পেয়াদারা। দুর্দ্দান্ত শীতে রাত জাগিয়া বন্য শূকর ও বন্য মহিষের উপদ্রব হইতে কত কষ্টে ফসল বাঁচাইয়া, বাঘের মুখে সাপের মুখে নিজেদের ফেলিতে দ্বিধা না করিয়া সারা বছরের ইহাদের যাহা উপার্জ্জন,—এই পনর দিনের মধ্যে খুশির সহিত তাহা উড়াইয়া দিতে ইহাদের বাধে না দেখিলাম।

কেবল একটা ভালর দিকে দেখা গেল ইহারা কেহ মদ বা তাড়ি খায় না। গাঙোতা বা ভুঁইহার ব্রাহ্মণদের মধ্যে এ-সব নেশার রেওয়াজ নাই—সিদ্ধিটা অনেকে খায়, তাও কিনিতে হয় না, বনসিদ্ধির জঙ্গল হইয়া আছে লবটুলিয়া ও ফুলকিয়ার প্রান্তরে, পাতা ছিঁড়িয়া আনিলেই হইল—কে দেখিতেছে?

এক দিন মুনেশ্বর সিং আসিয়া জানাইল এক জন লোক জমিদারের খাজনা ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছে—হুকুম হয় তো ধরিয়া আনে।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—পালাচ্ছে কি রকম? দৌড়ে পালাচ্ছে?

—ঘোড়ার ... দৌড়ুচ্ছে হুজুর, এতক্ষণে বড় কুণ্ডী পার হয়ে জঙ্গলের ধারে গিয়ে পৌঁছল।

দুর্বৃত্তকে ধরিয়া আনিবার হুকুম দিলাম।

এক ঘণ্টার মধ্যে চার-পাঁচ জন সিপাহী পলাতক আসামীকে আমার সামনে আনিয়া হাজির করিল।

লোকটাকে দেখিয়া আমার মুখে কথা সরিল না। তাহার বয়স ষাটের কম কোনমতেই হইবে বলিয়া আমার ত মনে হইল না—মাথার চুল সাদা, গালের চামড়া কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, চেহারা দেখিয়া মনে হয় সে কতকাল বুভুক্ষু ছিল, এইবার ফুলকিয়া বইহারের খামারে আসিয়া পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়াছে।

শুনিলাম সে নাকি 'ননীচোর নাটুয়া' সাজিয়া আজ কয় দিনে বিস্তর পয়সা রোজগার করিয়াছে, গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটগাছের তলায় একটা খুপড়িতে থাকিত, আজ কয় দিন ধরিয়া সিপাইরা তাহার কাছে খাজনার তাগাদা করিতেছে, কারণ এদিকে ফসলের সময়ও ফুরাইয়া আসিল। আজ তাহার খাজনা মিটাইবার কথা ছিল। হঠাৎ দুপুরের পরে সিপাহীরা খবর পায় সে লোকটা তল্পিতল্পা বাঁধিয়া রওয়ানা হইয়াছে। মুনেশ্বর সিং ব্যাপার কি জানিতে গিয়া দেখে যে আসামী বইহার ছাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে পূর্ণিয়া অভিমুখে—মুনেশ্বরের হাঁক শুনিয়া সে নাকি দৌড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার পরই এই অবস্থা।

সিপাহীদের কথার সত্যতা সম্বন্ধে কিন্তু আমার সন্দেহ জন্মিল। প্রথমতঃ, 'ননীচোর নাটুয়া' মানে যদি বালক শ্রীকৃষ্ণ হয়, তবে ইহার সে সাজিবার বয়স আর আছে কি? দ্বিতীয়তঃ, এ লোকটা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতেছিল, একথাই বা কি করিয়া সম্ভব!

কিন্তু উপস্থিত সকলেই হলফ করিয়া বলিল—উহার কথাই সত্য।

তাহাকে কড়া সুরে বলিলাম—তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন হ'ল, জমিদারের খাজনা দিতে হয় জান না? তোমার নাম কি?

লোকটা ভয়ে বাতাসের মুখে তালপাতার মত কাঁপিতেছিল। আমার সিপাহীরা একে চায় তো আরে পায়, ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে। তাহারা যে এই বৃদ্ধ নটের প্রতি খুব সদয় ও মোলায়েম ব্যবহার করে নাই ইহার অবস্থা দেখিয়া তাহা বুঝিবার দেরি হইল না।

লোকটা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—তাহার নাম দশরথ।

—কি জাত? বাড়ী কোথায়?

—আমরা ভুঁইহার বাভন হুজুর। বাড়ী মুঙ্গের জেলা—সাহেবপুর কামাল।

—পালাচ্ছিলে কেন?

—কই না, পালাব কেন, হুজুর?

—বেশ খাজনা দাও।

—কিছুই পাই নি খাজনা দেব কোথা থেকে? নাচ দেখিয়ে সর্ষে পেয়েছিলাম, তা বেচে ক'দিন পেটে খেয়েছি। হনুমানজীর কিরিয়া।

সিপাহীরা বলিল—সব মিথ্যে কথা। শুনবেন না হুজুর। ও অনেক টাকা রোজগার করেছে। ওর কাছেই আছে। হুকুম করেন ত ওর কাপড়চোপড় সন্ধান করি।

লোকটা ভয়ে হাতজোড় করিয়া বলিল—হুজুর আমি বলছি আমার কাছে কত আছে।

পরে কোমর হইতে একটা গেঁজে বাহির করিয়া উপুড় করিয়া ঢালিয়া বলিল—এই দেখুন হুজুর, তের আনা পয়সা আছে। আমার কেউ নেই, এই বুড়ো বয়েসে কে-ই বা আমায় দেবে? আমি নাচ দেখিয়ে এই ফসলের সময় খামারে খামারে বেড়িয়ে যা রোজগার করি। আবার সেই গমের সময় পর্য্যন্ত এতেই চালাব। তার এখনও তিন মাস দেরি। যা পাই পেটে ছুটো খাই, এই পর্য্যন্ত। সিপাহীরা বলছে আমায় নাকি আট আনা খাজনা দিতে হবে—তা হ'লে আমার আর

রইল মোটে পাঁচ আনা। পাঁচ আনায় তিন মাস কি খাব ?

বলিলাম—তোমার হাতে ও পোঁটলাতে কি আছে ? বার কর।

লোকটা পোঁটলা খুলিয়া দেখাইল তাহাতে আছে ছোট্ট একখানা টিন-মোড়া আর্সি, একটা রাংতার মুকুট, ময়ূরপাখা সমেত, গালে মাখিবার রং, গলায় পরিবার পুঁতির মালা ইত্যাদি কৃষ্ণঠাকুর সাজিবার উপকরণ।

বলিল—দেখুন তবুও বাঁশী নেই হুজুর। একটা টিনের বড় বাঁশী আট আনার কম হবে না। এখানে নলখাগড়ার বাঁশীতে কাজ চালিয়েছি। এরা গাঙোতা জাত, এদের ভোলানো সহজ। কিন্তু আমাদের মুঙ্গের জেলার লোক সব বড় এলেমদার। বাঁশী না হ'লে হাসবে। কেউ পয়সা দেবে না।

আমি বলিলাম—বেশ তুমি খাজনা না দিতে পার, নাচ দেখিয়ে যাও, খাজনার বদলে।

বৃদ্ধ হাতে যেন স্বর্গ পাইয়াছে এমন ভাব দেখাইল। তাহার পর গালে মুখে রং মাখিয়া ময়ূরপাখা মাথায় ঐ বয়সে সে যখন বারো বছরের বালকের ভঙ্গিতে হেলিয়া দুলিয়া হাত নাড়িয়া নাচিতে নাচিতে গান ধরিল—তখন হাসিব কি কাঁদিব স্থির করিতে পারিলাম না।

আমার সিপাহীরা তো মুখে কাপড় দিয়া বিদ্রূপের হাসি চাপিতে প্রাণপণ করিতেছে। তাহাদের পক্ষে ননীচোর নাটুয়ার নাচ এক মারাত্মক ব্যাপারে পরিণত হইল। বেচারীরা ম্যানেজার বাবুর সামনে না পারে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে, না পারে দুর্দ্দমনীয় হাসির বেগ সামলাইতে।

সে-রকম অদ্ভুত নাচ কখনও দেখি নাই, ষাট বছরের বৃদ্ধ কখনও বালকের মত অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া কাল্পনিক জননী যশোদার নিকট হইতে দূরে চলিয়া আসিতেছে, কখনও একগাল হাসিয়া সঙ্গী রাখাল বালকগণের মধ্যে চোরা ননী বিতরণ করিতেছে, যশোদা হাত বাঁধিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া কখনও জোড়হাতে চোখের জল মুছিয়া খুঁৎ খুঁৎ করিয়া বালকের স্বরে কাঁদিতেছে। সমস্ত জিনিষটা দেখিলে হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়। দেখিবার মত বটে। নাচ শেষ হইল। আমি হাততালি দিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম।

বলিলাম—এমন নাচ কখনো দেখি নি, দশরথ। বড় চমৎকার নাচো। আচ্ছা তোমার খাজনা মাপ ক'রে দিলাম—আর আমার নিজে থেকে এই দু-টাকা বখ্‌শিশ দিলাম খুশী হয়ে। ভারী চমৎকার নাচ।

আর দিন-দশ বারোর মধ্যে ফসল কেনাবেচা শেষ হইয়া গেলে বাড়তি লোক সব যে যার দেশে চলিয়া গেল। রহিল মাত্র যাহারা এখানে জমি চষিয়া বাস করিতেছে, তাহারাই। দোকান-পসার উঠিয়া গেল, নাচওয়ালা, ফিরিওয়ালারা অন্যত্র রোজগারের চেষ্টায় গেল। কাটুনি জনমজুরের দল এখনও পর্য্যন্ত ছিল শুধু এই সময়ের আমোদ-তামাশা দেখিবার জন্য—এইবার তাহারাও বাসা উঠাইবার জোগাড় করিতে লাগিল।

একদিন বেড়াইয়া ফিরিবার সময় আমি আমার পরিচিত সেই নক্‌ছেদী ভকতের খুপ্‌ড়িতে দেখা করিতে গেলাম।

সন্ধ্যার বেশী দেরি নাই, দিগন্তব্যাপী ফুলকিয়া বইহারের পশ্চিম প্রান্তে একেবারে সবুজ বনরেখার মধ্যে ডুবিয়া টকটকে রাঙা প্রকাণ্ড বড় সূর্য্যটা অস্ত যাইতেছে। এখানকার এই সূর্য্যাস্তগুলি—বিশেষতঃ এই শীতকালে—এত অদ্ভুত সুন্দর যে এই সময়ে মাঝে মাঝে আমি মহালিখারূপের পাহাড়ে সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে উঠিয়া এই বিস্ময়জনক দৃশ্যের প্রতীক্ষা করি।

নক্‌ছেদী তাড়াতাড়ি উঠিয়া কপালে হাত দিয়া আমায় সেলাম করিল। বলিল—ও মঞ্চী, বাবুজীকে বসবার একটা কিছু পেতে দে।

নক্‌ছেদীর খুপ্‌ড়িতে এক জন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আছে, সে যে নক্‌ছেদীর স্ত্রী তাহা অনুমান করা কিছু শক্ত নয়। কিন্তু সে প্রায়ই বাহিরের কাজকর্ম্ম অর্থাৎ কাঠ-ভাঙা, কাঠকাটা, দূরবর্ত্তী ভীমদাসটোলার পাতকূয়া হইতে জল আনা ইত্যাদি লইয়া থাকে। মঞ্চী সেই

মেয়েটি, যে আমাকে বুনো হাতীর গল্প বলিয়াছিল। সে আসিয়া শুষ্ক কাশের ডাঁটায় বোনা একখানা চেটাই পাতিয়া দিল।

তার সেই দক্ষিণ-বিহারের দেহাতী 'ছিকাছিকি' বুলির সুন্দর টানের সঙ্গে মাথা দুলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—কেমন দেখলেন বাবুজী বইহারের মেলা? বলেছিলাম না, কত নাচ তামাশা আমোদ হবে, কত জিনিষ আসবে, দেখলেন তো? অনেক দিন আসেন নি বাবুজী, বসুন। আমরা যে শীগগির চলে যাচ্ছি।

ওদের খুপ্ড়ির দোরের কাছে লম্বা আধশুক্নো ঘাসের উপর চেটাই পাতিয়া বসিলাম যাহাতে সূর্য্যাস্তটা ঠিক সাম্‌নাসাম্‌নি দেখিতে পাই। চারি দিকের জঙ্গলের গায়ে একটা মৃদু রাঙা আভা পড়িয়াছে, একটা অবর্ণনীয় শান্তি ও নীরবতা বিশাল বইহার জুড়িয়া।

মঞ্চীর কথার উত্তর দিতে বোধ হয় একটু দেরি হইল। সে আবার কি একটা প্রশ্ন করিল, কিন্তু ওর 'ছিকাছিকি' বুলি আমি খুব ভাল বুঝি না, কি বলিল না বুঝিতে পারিয়া অন্য একটা প্রশ্ন দ্বারা সেটা চাপা দিবার জন্য বলিলাম—তোমরা কালই যাবে?

—হাঁ বাবুজী।

—কোথায় যাবে?

—পূর্ণিয়া কিষণগঞ্জ অঞ্চলে যাব।

পরে বলিল—নাচ-তামাশা কেমন দেখলেন বাবু? বেশ ভাল ভাল লোক গাইয়ে এবার এসেছিল। এক দিন ঝল্লুটোলায় বড় বকাইন্ গাছের তলায় একটা লোক মুখে ঢোলক বাজিয়েছিল, শুনেছিলেন? কি চমৎকার বাবুজী! দেখিলাম মঞ্চী নিতান্ত বালিকার মতই নাচ তামাশায় আমোদ পায়। এবার কত রকম কি দেখিয়াছে, মহা উৎসাহ ও খুশীর সুরে তাহারই বর্ণনা করিতে বসিয়া গেল।

নক্‌ছেদী বলিল—নে নে, বাবুজী কলকাতায় থাকেন, তোর চেয়ে অনেক কিছু দেখেছেন। ও সব বড় ভালবাসে বাবুজী, ওরই জন্যে আমরা এত দিন এখানে রয়ে গেলাম। ও বল্লে—না দাঁড়াও খামারের নাচ-তামাশা লোকজন দেখে তবে যাব। বড্ড ছেলেমানুষ এখনও!

মঞ্চী যে নক্‌ছেদীর কে হয় তাহা এত দিন জিজ্ঞাসা করি নাই, যদিও ভাবিতাম বৃদ্ধের মেয়েই হইবে। আজ ওর কথায় আমার আর কোনো সন্দেহ রহিল না।

বলিলাম—তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছ কোথায়?

নক্‌ছেদী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আমার মেয়ে! কোথায় আমার মেয়ে হুজুর?

—কেন, এই মঞ্চী তোমার মেয়ে নয়?

আমার কথায় সকলের আগে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল মঞ্চী। নক্‌ছেদীর প্রৌঢ়া স্ত্রীও মুখে আঁচল চাপা দিয়া খুপ্ড়ির ভিতর ঢুকিল।

নক্‌ছেদী অপমানিত হওয়ার সুরে বলিল—মেয়ে কি হুজুর? ও যে আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী!

বলিলাম—ও!

অতঃপর খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। আমি তো এমন অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম যে কথা খুঁজিয়া পাই না।

মঞ্চী বলিল—আগুন ক'রে দিই, বড্ড শীত।

শীত সত্যই বড় বেশী। সূর্য্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন হিমালয় পাহাড় নামিয়া আসে। পূর্ব্ব-আকাশের নীচের দিকটা সূর্য্যাস্তের আভায় রাঙা, উপরটা কৃষ্ণাভ নীল।

খুপ্ড়ি হইতে কিছুদূরে একটা শুক্‌নো কাশ-ঝাড়ে মঞ্চী আগুন লাগাইয়া দিতে দশ-বারো ফুট দীর্ঘ ঘাস দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আমরা জ্বলন্ত কাশঝোপের কাছে গিয়া বসিলাম।

নক্‌ছেদী বলিল—বাবুজী, এখনও ও ছেলেমানুষ আছে, ওর জিনিষপত্র কেনার দিকে বেজায় ঝোঁক। ধরুন এবার প্রায় আট-দশ মণ সর্ষে মজুরি পাওয়া গিয়েছিল—তার মধ্যে তিন মণ ও খরচ ক'রে ফেলেছে সখের জিনিষপত্র কেনবার জন্যে। আমি বললাম, গতর-খাটানো মজুরির মাল দিয়ে তুই ওসব কেন কিনিস? তা মেয়েমানুষ শোনে না। কাঁদে, চোখের জল ফেলে। বলি, তবে কেন্।

মনে ভাবিলাম, তরুণী স্ত্রীর বৃদ্ধ স্বামী, না বলিয়াই বা আর কি উপায় ছিল?

মঞ্চী বলিল—কেন, তোমায় তো বলেছি, গম-

কাটানোর সময় যখন মেলা হবে, তখন আর কিছু কিনব না। ভাল জিনিষগুলো সস্তায় পাওয়া গেল—

নক্ছেদী রাগিয়া বলিল—সস্তা? বোকা মেয়েমানুষ পেয়ে ঠকিয়ে নিয়েছে কেঁয়ে দোকানদার আর ফিরিওয়ালারা—সস্তা? পাঁচ সের সর্ষে নিয়ে একখানা চিরুণী দিয়েছে, বাবুজী। আর-বছর তিরাশি-রতনগঞ্জের গমের খামারে—

মঞ্চী বলিল—আচ্ছা বাবুজী, নিয়ে আসছি জিনিষ-গুলো, আপনিই বিচার ক'রে বলুন সস্তা কি না—

কথা শেষ করিয়াই মঞ্চী খুপ্‌ড়ির দিকে ছুটিল এবং কাশডাঁটায়-বোনা ডালা-আঁটা একটা ঝাঁপি হাতে করিয়া ফিরিল। তার পর সে ডালা তুলিয়া ঝাঁপির ভিতর হইতে জিনিষগুলি একে একে বাহির করিয়া আমার সামনে সাজাইয়া রাখিতে লাগিল।

—এই দেখুন কত বড় কাঁকই, পাঁচ সের সর্ষের কমে এম্‌নিতরো কাঁকই হয়? দেখেছেন কেমন চমৎকার রং। সৌখীন জিনিষ না? আর এই দেখুন একখানা সাবান, দেখুন কেমন গন্ধ, এও নিয়েছে পাঁচ সের সর্ষে। সস্তা কি না বলুন বাবুজী?

সস্তা মনে করিতে পারিলাম কই? এমন একখানা বাজে সাবানের দাম কলিকাতার বাজারে এক আনার বেশী নয়, পাঁচ সের সর্ষের দাম নয়ালির মুখেও অন্ততঃ সাড়ে সাত আনা। এই সরলা বন্য মেয়েরা জিনিষপত্রের দাম জানে না, খুবই সহজ এদের ঠকানো।

মঞ্চী আরও অনেক জিনিষ দেখাইল। আহ্লাদের সহিত একবার এটা দেখায়, একবার ওটা দেখায়। মাথার কাঁটা, ঝুটো পাথরের আংটি, চীনা মাটির পুতুল, এনামেলের ছোট ডিশ, খানিকটা চওড়া লাল ফিতে—এই সব জিনিষ। দেখিলাম মেয়েদের প্রিয় জিনিষের তালিকা সব দেশেই সব সমাজেই অনেকটা এক। বন্য মেয়ে মঞ্চী ও তাহার শিক্ষিতা ভগ্নীর মধ্যে বেশী তফাৎ নাই। জিনিষপত্র সংগ্রহ ও অধিকার করার প্রবৃত্তি উভয়েরই প্রকৃতিদত্ত। বুড়ো নক্ছেদী রাগিলে কি হইবে?

কিন্তু সবচেয়ে ভাল জিনিষটি মঞ্চী সর্ব্বশেষে দেখাইবে বলিয়া যে চাপিয়া রাখিয়া দিয়াছে তাহা কি তখন জানি!

এইবার সে গর্ব্বমিশ্রিত আনন্দের ও আগ্রহের সহিত সেটা বাহির করিয়া আমার সামনে মেলিয়া ধরিল। এক ছড়া নীল ও হল্‌দে হিংলাজের মালা!

সত্যি, কি খুশি ও গর্ব্বের হাসি দেখিলাম ওর মুখে! ওর সভ্য বোনেদের মত ও মনের ভাব গোপন করিতে তো শেখে নাই, একটি অনাবিল নির্ভেজাল নারী-আত্মা ওর এই সব সামান্য জিনিষের অধিকারের উচ্ছ্বসিত আনন্দের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে! নারী-মনের এমন স্বচ্ছ প্রকাশ দেখিবার সুযোগ আমাদের সভ্য সমাজে বড়-একটা ঘটে না।

—বলুন দিকি কেমন জিনিষ?

—চমৎকার!

—কত দাম হ'তে পারে এর বাবুজী? কলকাতায় আপনারা পরেন তো?

কলিকাতায় আমি হিংলাজের মালা পরি না, আমরা কেহই পরি না তবুও আমার মনে হইল ইহার দাম খুব বেশী হইলেও ছ-আনার বেশী নয়। বলিলাম—কত নিয়েছে বল না?

—সতের সের সর্ষে নিয়েছে। জিতি নি?

বলিয়া লাভ কি যে সে ভীষণ ঠকিয়াছে! এ-সব জায়গায় এ রকম হইবেই। কেন মিথ্যা আমি নক্ছেদীর কাছে বকুনি খাওয়াইয়া ওর মনের এ অপূর্ব্ব আহ্লাদ নষ্ট করিতে যাইব?

আমারই অনভিজ্ঞতার ফলে এ বছর এমন হইতে পারিয়াছে। আমার উচিত ছিল ফিরিওয়ালাদের জিনিষপত্রের দরের উপরে কড়া নজর রাখা। কিন্তু আমি নতুন লোক এখানে, কি করিয়া জানিব এদেশের ব্যাপার? ফসল মাড়িবার সময় মেলা হয় তাহাই তো জানিতাম না। আগামী বৎসর যাহাতে এমনধারা না ঘটে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পরদিন সকালে নক্ছেদী তাহার দুই স্ত্রী ও পুত্রকন্যা লইয়া এখান হইতে চলিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে আমার খুপ্‌ড়িতে নক্ছেদী খাজনা দিতে আসিল, সঙ্গে আসিল মঞ্চী। দেখি মঞ্চী গলায় সেই হিংলাজের মালাছড়াটি পরিয়া আসিয়াছে। হাসিমুখে বলিল—আবার আসব ভাদ্র মাসে মকাই কাটতে। তখন থাকবেন তো বাবুজী? আমরা জংলী হর্ত্তুকির আচার করি শ্রাবণ মাসে—আপনার জন্যে আনব।

মঞ্চীকে বড় ভাল লাগিয়াছিল, চলিয়া গেলে দুঃখিত হইলাম।

ক্রমশঃ

রাষ্ট্র-ভাষা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ভাষা লইয়া ভারতবর্ষের হৃদয়সাগরমন্থনের ফলে অমৃতের সন্ধান হয়ত মিলিতেও পারে, কিন্তু হলাহল যে উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যাপার সামান্য হইলে সে আন্দোলন কোলাহলেই পর্য্যবসিত হইত। কিন্তু ঘটনাটি অসাধারণ। যে প্রাদেশিক মনোভাব বিরাট জাতীয় চৈতন্যের মধ্যে আত্মবিলোপ করিয়া শক্তি ও সংহতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, ভাষাগত বিসম্বাদের ফলে সেই প্রচ্ছন্ন প্রাদেশিক বোধ আবার প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ঈর্ষ্যার উদগ্র বিষে দেশজীবন ক্লিষ্ট। প্রীতি ও ঐক্যের মাধুর্য্য—সন্দেহ ও আশঙ্কায় মলিন। আশঙ্কা অমূলক নহে, সন্দেহের ভিত্তি আছে।

দুই দলে প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। এক পক্ষে স্বভাষার সত্তা ও স্বত্ব সংরক্ষণে ব্রতী পূর্ব্ব ও দক্ষিণের ভাষানুরাগীবৃন্দ, অন্য পক্ষে হিন্দীপ্রচারকবাহিনী;

প্রচার চলিতেছে, বিচার নহে। প্রচারের পিছনে আছে অর্থের সামর্থ্য, দলবদ্ধতার মোহ, প্রতিপত্তির অহঙ্কার এবং অভিনবত্বের অভিমান।

এত দিন রাজনৈতিক আন্দোলন যথাযথ চলিতেছিল, পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় হইতেছিল, জাতীয় মহাসভা বসিতেছিল; ভাষার জন্য ভাবিতে হয় নাই, বক্তা ও বক্তৃতার অভাব হয় নাই, শ্রোতারও অভাব হয় নাই। সম্প্রতি দুই চারি বৎসরের মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, রাষ্ট্রভাষা নহিলে কাজ চলে না, এবং সে ভাষা হিন্দী বা হিন্দুস্থানী না হইয়া উপায় নাই। রাষ্ট্রভাষার ইংরেজী নামকরণ হইয়াছে 'ন্যাশন্যাল ল্যাঙ্গোয়েজ'।

২

রাষ্ট্র ও নেশন এক কি? নেশন কি? রাষ্ট্রই বা কি?

পূর্ব্বপুরুষ অভিন্ন বলিয়া যাহাদের ধারণা, ধর্ম্ম ও ইতিহাস যাহাদের এক, এবং সেই ঐক্যবোধের ফলে যাহাদের আচার ও মতের সাম্য ঘটিয়াছে, এমন একভাষাভাষী বহুতর মানবের সমষ্টিকে 'জাতি' বা people বলা চলে।

বহুসংখ্যক মানব যদি একদেশে অবস্থান করে এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের ইচ্ছা বা অভিপ্রায় অনুসারে সাধারণ কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই একদেশবাসী মানবসঙ্ঘকে 'রাষ্ট্র' বা state নামে অভিহিত করিতে পারা যায়।

রাষ্ট্রে একটি মাত্র জাতি থাকা সম্ভব, আবার বহু-জাতির সম্মিলনেও 'রাষ্ট্র' গঠিত হইতে পারে। ফরাসী রাষ্ট্রে একটি জাতি। রুষ-রাষ্ট্রে বহু জাতি। যেখানে এক জাতি সেখানে এক ভাষা। যেখানে বহু জাতি সেখানে বহু ভাষা। একজাতিত্ব এবং একভাষিত্ব রাষ্ট্রের লক্ষণ নহে। রাষ্ট্রে বহু জাতি এবং বহু ভাষার স্থান আছে। 'পীপ্‌লে'র সহিত সমার্থক হইলেও আজকাল 'নেশন' শব্দটি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। রাষ্ট্রগত জাতি বা জাতিসমষ্টিকে নেশন বলিলে বিশেষ ভুল হইবে না। ভারতবর্ষে বহু জাতিবর্ণ বাস করে, দেশবাসী 'বহু'র ইচ্ছায় কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, কার্য্যের নিয়ন্তা অন্যে। ভারতবর্ষ যদি পরতন্ত্র না হইত তাহা হইলেও বহুজাতিত্ব বা বহুভাষিত্ব হেতু তাহার একরাষ্ট্র হইতে বাধা ছিল না। একভাষিতা বাহ্যিক নিমিত্ত মাত্র, অপরিহার্য্য গুণ নহে; হৃদয়ের মিলনে 'নেশন' গঠিত হয়।

৩

তাহা হইলে রাষ্ট্রভাষা প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য কি?

রাজনীতিচর্চ্চাকল্পে আমরা জাতীয় মহাসভায় মিলিত হই। আমরা স্বরাষ্ট্র চাই। আলোচনা ইংরেজীতে চলে, পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপেই চলিত, এখনও যথেষ্ট পরিমাণে চলে। ইংরেজী বিদেশী ভাষা। বিদেশীর পরিবর্ত্তে দেশের প্রচলিত কোন ভাষা যদি ব্যবহার করি তাহাতে

ক্ষতি কি? পরের কাছে আমাদের মান থাকে, নিজের কাছেও। অথবা কাল যদি আমরা সহসা স্বরাজ লাভ করিয়া ফেলি, বিদেশী ভাষার আশ্রয়ে কি আমরা রাষ্ট্রের কাজ চালাইব? ইহা সেন্টিমেন্টের কথা। জাতিগঠনে সেন্টিমেন্টের মূল্য অল্প নহে।

কিন্তু লক্ষ্যের স্থিরতা থাকা চাই। উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা থাকা চাই। তাহা আছে কি? ভাবী রাষ্ট্রের কার্য্য-সাধন-ব্যপদেশে রাষ্ট্রভাষা প্রবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে, না, দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বাক্যালাপের সুবিধার জন্য এই ভাষার প্রচলনপ্রচেষ্টা? অর্থাৎ ইহা রাষ্ট্রের ভাষা হইবে, না, সাধারণের ভাষা হইবে?

রাষ্ট্রের ভাষা সংস্কৃতির ভাষা, উচ্চ কল্পনা এবং সূক্ষ্ম ভাব বিনিময়ের ভাষা, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং দর্শনের ভাষা। চিন্তাজগতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ সেই ভাষা হইবে তাহার বাহন। সে-ভাষায় বাক্য ও অর্থের গৌরব থাকা চাই।

যাহা সাধারণের ভাষা তাহার ধর্ম্ম সুবোধ্যতা। তাহার মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা হইবার যোগ্যতা না থাকিতেও পারে। তাহা বাজারের ভাষা হইলেও চলে। সে-ভাষার মধ্যে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু আশা করিবার প্রয়োজন নাই।

হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষা প্রচলনের উদ্দেশ্যের মধ্যে এইরূপ একটি অস্পষ্টতা আছে। বেসিক হিন্দী (Basic Hindi) ব্যবহারের কথা এবং দক্ষিণ ভারতের বিদ্যালয়-গুলিতে হিন্দীকে অবশ্য-শিক্ষণীয় করিবার চেষ্টা—উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতার উদাহরণ। রাষ্ট্রের কার্য্যসৌকর্য্যার্থে ভাষার ব্যবহার এক কথা, সাধারণের বোধগম্য ভাষার প্রচলন আর এক কথা।

যেখানে একভাষিত্ব আছে সে-রাষ্ট্রে উভয় উদ্দেশ্য মিলিয়া গিয়াছে, সেখানে জটিলতা নাই। যেখানে ভাষার ঐক্য নাই সেখানে ভাষা-ব্যবহারে বিচারের প্রয়োজন।

কংগ্রেস জাতীয়ভাবাপন্ন মনের মিলনক্ষেত্র। সেখানে কোন্ ভাষা ব্যবহার করিব? আর, আমি যদি প্রয়াগ দিল্লী অথবা লাহোরে বেড়াইতে যাই সেখানেই বা কোন্ ভাষা ব্যবহার করিব? দক্ষিণ ভারতে গেলেই বা কোন্ ভাষায় কথা কহিব?

ভাষার আন্দোলনে হিন্দীপ্রচারকেরা হিন্দুস্থানীর দাবী লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই প্রচারকবাহিনীর নেতা স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী। রাষ্ট্রনৈতিক সংঘটনের সমস্ত যন্ত্র তাঁহার আয়ত্তে। যে যন্ত্র শাসনতন্ত্র অধিকারের উদ্দেশে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়, হিন্দীর দাবী প্রতিষ্ঠা-কল্পে আজ তাহা প্রযুক্ত হইয়াছে। বিচারের বিষয়কে বিধি এবং অনুশাসনের ক্ষেত্রে টানিয়া আনা হইয়াছে। আশঙ্কার কারণ ইহাই।

প্রাচীন ভারতের একটি সমগ্রতা ছিল। তাহা রাজনৈতিক একতা নহে। সে ঐক্য সংস্কৃতিগত। হিন্দু ভারতে সংস্কৃত ছিল রাষ্ট্রভাষা। তাহা ছিল প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা, সাহিত্যের ভাষা, শাস্ত্রের ভাষা, ধর্ম্ম ও দর্শনের ভাষা। রাষ্ট্রনৈতিক কর্ত্তব্য সেই ভাষায় নির্ব্বাহিত হইত। বিভিন্ন প্রদেশের রাজা ও রাজ-পুরুষেরা সেই ভাষায় পরস্পরের সহিত ভাব-বিনিময় করিত। জনসাধারণ বিবিধ প্রকার প্রাকৃতে কথা কহিত। রাজনৈতিক বিভেদ সত্ত্বেও সমগ্র ভারত শাস্ত্র, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বন্ধনে বিধৃত ছিল। সংস্কৃত ছিল সংস্কৃতির ভাষা (language of culture)।

মুসলমান আমলে সংস্কৃতের স্থান ফার্সী বা উর্দ্দু সম্পূর্ণরূপে দখল করিতে পারে নাই।

৫

সার্দ্ধশতাধিক বর্ষ ধরিয়া, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, ইংরেজীকে আমাদের অর্থোপার্জ্জন এবং রাষ্ট্রিক প্রয়োজনের ভাষা রূপে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। শতাব্দী কাল এ-ভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন। বিশ্বের সহিত পরিচয় স্থাপনে এ-ভাষা আমাদের সাহায্য করিয়াছে। জ্ঞানচর্চ্চার ভাষা সংস্কৃত হইতে ইংরেজীতে অন্তরিত হইয়াছে। ইহাতে মঙ্গল বা অমঙ্গল কতটুকু হইয়াছে তাহা বলিতেছি না। ঘটিয়াছে ইহাই।

ইতিমধ্যে কতকটা ইংরেজীর সংস্পর্শে, কতকটা দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণায় বাংলা ভাষায় শতবর্ষের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। সে-সাহিত্য ভাবে, আবেগে, চিন্তায়, কামনায়, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, রসে, কল্পনায়, সন্ধ্যে ও সাধনায় অতুলনীয়। ইংরেজীর পরিবর্ত্তে কোন ভাষা গ্রহণ করিতে হইলে বাংলার শরণাপন্ন হইতে হইবে। শতবর্ষের সাধনার ফলে ভারতের সংস্কৃতি একমাত্র বাংলা ভাষায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

৬

হিন্দী বাজারের ভাষা। ভাঙা হিন্দীতে আমাদের কাজ চলে। হিন্দী জানিলে লেনা-দেনা, কেনা-বেচা কাজ-কারবার প্রভৃতি বিষয়ে কিছু সুবিধা হয়। উত্তর-ভারতভ্রমণে মুসাফিরের সুবিধা হয়। ভাঙা হিন্দীর বদলে ভাল হিন্দী আয়ত্ত করিতে পারিলে ক্ষতি নাই, বরং কিছু লাভ আছে। যাঁহাদের সুযোগ আছে তাঁহাদের পক্ষে খাঁটি হিন্দীতে জ্ঞান লাভ করা সুবিবেচনার কাজ। কোথাকার হিন্দী খাঁটি তাহা এখনও সঠিক নির্দ্ধারিত না হইলেও বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না।

হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইতে চায়। স্পর্দ্ধার কথা বটে। স্বাধীন ভারতবর্ষে সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা ছিল। একদা মৃত্তিকাপ্রোথিত, অতীতের অপূর্ব্ব নিদর্শন, সুবর্ণ-খচিত এক সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিয়া তদুপরি আরোহণের উপক্রম করিলে ভোজরাজকে দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা বার বার প্রশ্ন করিয়াছিল —তাঁহার যোগ্যতা কি? ভোজরাজ যোগ্যতা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। সংস্কৃত ভাষা- ও সাহিত্য-রূপী বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসনে বসিবার যোগ্যতা যদি কাহারও থাকে তাহা বাংলার। অন্তের নাম না-ই করিলাম, বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যে-সাহিত্য কালিদাসের কাব্যে, ভাস-ভবভূতির রচনায়, পাণিনি-ভাস্করাচার্য্যের তথ্য-বিচারে ঐশ্বর্য্যশালী, সেই গৌরবময় সংস্কৃত সাহিত্যের অবিসম্বাদিত উত্তরাধিকারী একমাত্র বাংলা সাহিত্য।

৭

রাষ্ট্রের সহিত সংস্কৃতির মত, ভাষার সহিত সাহিত্যের সম্পর্ক একান্ত ঘনিষ্ট। এই অজাজী সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। সাহিত্যের মধ্য দিয়া ভাষা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। ভাষা উপাদান, সাহিত্য প্রতিমা। রূপ-কে পরিহার করিয়া উপকরণের বিচার বৃথা। যে ভাষা সাহিত্যে সমৃদ্ধ তাহাই-মাত্র রাষ্ট্রভাষা রূপে জগৎসভায় আসন গ্রহণ করিতে পারে।

উদাহরণ লওয়া যাক।

ইংরেজী ভাষার প্রতিপত্তি আজ সর্ব্বাধিক। একদা প্রতীচ্যে ফরাসী ভাষার 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' (lingua franca) রূপে যে গৌরব ছিল ইংরেজী তাহার সে গৌরব হরণ করিয়াছে। রাজনৈতিক প্রভাবের পিছনে ফরাসীর অপূর্ব্ব সাহিত্য একদিন তাহার ভাষাকে আন্তর্জাতিক করিয়া তুলিয়াছিল। ইংরেজের সাম্রাজ্যগরিমার সঙ্গে তাহার বিরাট সাহিত্যমহিমা না থাকিলে ইংরেজীকে আজ shopkeepers' language—নগণ্য ব্যবসায়ীর ভাষা হইয়া থাকিতে হইত।

সকল ভাষার মধ্যেই বিরাট সম্ভাবনা আছে। প্রতিভা সে-সম্ভাবনাকে সার্থক করে। নহিলে অন্তর্নিহিত শক্তি চিরদিন সম্ভাব্যতা রূপেই থাকিয়া যায়। ইংরেজী ভাষার ইতিহাস হইতেই আর একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। অ্যাংলো-স্যাক্সন্ আমলে ইংলণ্ডের ভাষা বহু উপভাষায় (dialect-এ) বিভক্ত ছিল। নর্থাম্বারল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রদেশের লোক উত্তরের ভাষা কহিত, সাসেক্স-এসেক্স-ওয়েসেক্স-এর অধিবাসীরা দক্ষিণের ভাষা বলিত, মধ্যে ছিল মিডল্যাণ্ড কাউন্টি। সেইখানে ছিল রাজধানী লণ্ডন। রাজধানীর ভাষাও সারা দেশে গ্রাহ্য হয় নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সেখানে এক প্রতিভাবান কবি জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি চসার। চসারের ভাষা সমগ্র দেশের ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইল। তাহাই ইংরেজী ভাষা।

জার্ম্মানীর ভাষা নানা রূপে বিভক্ত ছিল। প্রধানতঃ ইহার দুটি ভাগ—হাই জার্ম্মান (High German) আর লো জার্ম্মান (Low German)।

গ্যেটে যে ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিলেন তাহাই হইল জার্মান ভাষা। প্রতিভা হাই জার্মানকে সমগ্র জার্মানীর ভাষায় রূপান্তরিত করিল।

এমনিই হয়।

সোনা-রূপা বাজারে পাওয়া যায়। তাহাদের ধাতু-মূল্য আছে। টাঁকশালের ছাপ খাইয়া সেই সোনা-রূপা মুদ্রা-রূপে পরিগণিত হয়। তখন তাহাদের আদর অন্যরূপ। তখন তাহারা প্রচলিত মুদ্রা—current coin। প্রতিভার ছাপ পাইয়া ভাষাও তেমনি মর্য্যাদা লাভ করে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের রাজকীয় ছাপ বাংলা ভাষাকে current language—পৃথিবীর অন্যতম প্রচলিত ভাষা করিয়া তুলিয়াছে। অবশিষ্ট-ভারত এ ভাষাকে গ্রহণ করিতে না পারিলে সে-দুর্ভাগ্য বাংলার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের।

৮

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত। তাঁহারই সাধনার ফলে স্বদেশী যুগে বঙ্গজীবনের মথিত সাগরে দেশ-জননী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তিনি সুমধুর-ভাষিণী, বাণী বিদ্যাদায়িনী, তিনি কমলদলবিহারিণী, তিনি আবার দশপ্রহরণধারিণী। সেই দেশলক্ষ্মীর বন্দনা-গীতি একদিন দেশে দেশে মন্দ্রিত হইয়াছিল। বাংলার সেই প্রেরণার দিনের অপূর্ব্ব মন্ত্র 'বন্দে মাতরম্' সারা ভারতবর্ষে মাতৃবন্দনার মহামন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল। আজ দেশের সন্তান মাতৃবন্দনা উচ্চারণ করিতে দ্বিধা বোধ করে!

জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে বাংলাকে খর্ব্ব করিবার একটা ধারাবাহিক চেষ্টা চলিয়াছে। দোষ যে সম্পূর্ণই অবশিষ্ট-ভারতের তাহা নহে। ইহার সূচনা বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে। তার পর রাজধানী স্থানান্তরিত করা হইল। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভোগ বাংলাকেই ভুগিতে হইল। চারিদিকে চীৎকার উঠিল—Bihar for Biharis, Assam for the Assamese, Orissa for Oriyas। কিন্তু বাংলা সকলকার—Bengal for all।

"What Bengal thinks today, the rest of India will think tomorrow." বাংলার সে-গৌরবের দিন আর নাই। এখন বাংলা যাহা ভাবে অন্য সকলকে চেষ্টা করিয়া তাহার বিপরীত ভাবিতে হয়।

কথাগুলি বলিবার উদ্দেশ্য এই।—হিন্দীপ্রচার ও 'বন্দে মাতরমে'র বিচার একই মনোভাবপ্রণোদিত—বাংলার সঙ্গীত ও সাহিত্যকে অস্বীকার। বাংলার ভাবধারা হইতে দূরে থাকিতে চায় বলিয়া অবশিষ্ট-ভারত বাংলার সহিত শেষ সংযোগ 'বন্দে মাতরম্'কে ছিন্ন করিল।

আজ বাংলার গৌরবে অবশিষ্ট-ভারত গৌরব অনুভব করে না। বাংলা আজ নির্ব্বান্ধব।

৯

বাংলা ভাষা আমাদের শিখিতেই হইবে। "যে সকল কারণে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর উক্তি বাংলা ভাষাতেই হওয়া কর্ত্তব্য," ১২৭৯ সালে "বঙ্গদর্শনে"র সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বিবৃত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় বলিতে গেলে ইংরেজী ভাষা "অনন্তরত্নপ্রসূতি"। আমরা এখনও স্বরাজ লাভ করি নাই। স্বরাজ লাভ না করা পর্য্যন্ত ইংরেজীর অনুশীলন না করিয়া উপায় নাই।

বাংলা নিজের ভাষা বলিয়া এবং ইংরেজী বিশ্বের ভাষা বলিয়া—এ দুইটি ভাষাই আমাদের শিক্ষণীয়। ইহার উপর তৃতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হইলেই ত ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠে। কোন জাতি দ্বৈভাষিক বা bi-lingual হইতে পারে, ত্রৈভাষিক বা tri-lingual হইতে কাহাকেও দেখি নাই। অতিরিক্ত ভাষা আয়ত্ত করিতে যে-শক্তির অপব্যয় হইবে, সেই শক্তি সুপ্রযুক্ত হইলে অনেক কাজ হইবার সম্ভাবনা।

স্বরাজ পাইলে একটি ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে—তাহারই উদ্যোগ-স্বরূপ হিন্দীপ্রচারের প্রচেষ্টা। চাবুকটির জন্য এখন হইতে এত ভাবনা কেন? ঘোড়া হইলে চাবুক আপনিই আসিবে। যত দিন তাহা না হয় তত দিন বাংলা সাহিত্য না-হয় একটু অনুশীলন করিলে? যে-ভাষায় ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের কাজ চালাইতে অসুবিধা হইবে না।

"বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা?" কথাটি সত্য। সে-আশা পুরাইতে হিন্দুস্থানী সমর্থ নহে। সে-আশা পুরাইতে পারে বাংলা।

নগেন হাড়ীর ঢোল

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ডুম্, ডুম্, ডুম্, ... ডুম্, ডুম্, ডুম্, ... আঃ, কান ঝালাপালা হইয়া গেল। রাত নাই, দিন নাই, কেবলই কি ঢোলের বাজনা ভাল লাগে! সকালে, বিকালে, দুপুরে,—হাটে, বাজারে, পথে সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র কেবল ঢোলের শব্দ! গাঁয়ের লোক অস্থির হইয়া উঠিল। না হয় সারা গাঁয়ের মধ্যে ঐ এক ঢুলী—তাই বলিয়া কি কারো কাজকর্ম্ম নাই—আর নিষ্কর্ম্মা লোকেই এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে সারাদিন বসিয়া তাকে ঢোলের শব্দ শুনিতে হইবে!

সকলে বিরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না—সারা গাঁয়ের মধ্যে ঐ এক ঢুলী—কখন্ কার দরকার হয়!

ব্যাপারখানা এই রকম।

গাঁয়ের নাম জোড়াদীঘি—এক সময়ে মস্ত গ্রাম ছিল—এখন থাকিবার মধ্যে ঐ নামটি আছে। তখনকার কালে আদমশুমারির ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু আদমি এতই ছিল যে উপকথার শিয়ালের কুমীরের ছানা দেখানোর মত এক জনাকে সাত জনা করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন হইত না।

গাঁয়ে জেলে ছিল এমন পঞ্চাশ-ষাট ঘর; নদী মরিয়া গেল, জেলেরা ঘরবাড়ী বেচিয়া বড় নদীর ধারে উঠিয়া গেল; পঞ্চাশ-ষাটখানা শূন্য ভিটা শীতের রোদে নদীর চরে একপাল কাছিমের মত পড়িয়া রহিল।

আট-দশ ঘর ছুতোর ছিল—কতক মরিল, কতক জাতব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া চাষবাস ধরিল, কতক অন্য গাঁয়ে উঠিয়া গেল।

কামার ছিল চার-পাঁচ ঘর—জোড়াদীঘির জাঁতি ও কাটারি এ-অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল। নদী মরিয়া গিয়া ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইলে তারা এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে হাতুড়ি চালাইবার ক্ষমতা আর তাদের রহিল না; প্রথমে হাতুড়ি গেল, তার পরে হাত গেল,—ব্যবসা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল; বোধ হয় এখন তারা গোপনে শুধু সিঁধ কাঠি তৈয়ার করিয়া থাকে—গাঁয়ে বড় সিঁধেল চোরের উপদ্রব।

ধোপা কাপড় কাচা ছাড়িয়া চৌকিদারি চাকুরী লইল; নাপিতের আর জাতব্যবসা করিয়া চলে না—সে বেগুন ও কলার চাষ আরম্ভ করিল; গাঁয়ের লোকে দাম দিতে গোলমাল করে দেখিয়া গোয়ালা ভিন্ গাঁয়ে দই ক্ষীর বেচিতে লাগিল—ইহা দেখিয়া গাঁয়ের কয়েক জন লোক অপমানিত বোধ করিয়া এক দিন রাত্রে তাকে ধরিয়া মারিল—পরের দিন সে ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া নাজিরপুরে চলিয়া গেল।

গ্রামের জমিদারের অবস্থা এক সময়ে ভাল ছিল, কিন্তু নদীর সঙ্গেই সব যোগ—নদী মরিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজা মরিতে লাগিল—জমি পলাতক পড়িতে লাগিল—খাজনা অনাদায় হইল—ক্রমে জমিদারির ক্ষীণ স্রোত শনৈঃ শনৈঃ মহাজনের সিন্দুক-সঙ্গমের অভিমুখে চলিল—এখন তার শুধু নামটা আছে, আর আছে পৈত্রিক প্রকাণ্ড বাড়ী—চূণকামের অভাবে প্রতি বছর তার মুখ আরও একটু করিয়া কালো হইতেছে।

গ্রামের এ অবনতির জন্য দোষ কার?

সকলে একবাক্যে বলে—অদৃষ্ট! কিন্তু পদ্মায় নাকি কোথায় একটা প্রকাণ্ড পুল বাঁধা হইয়াছে—দুই ধারে পাথর ঢালিয়া পাহাড়-প্রমাণ উঁচু করা হইয়াছে, জোড়াদীঘির নদীর মুখ পুলের উজানে—সেখানে মস্ত চড়া পড়িয়া গিয়াছে—দেখিতে দেখিতে পঁচিশ বছরের মধ্যে নদী শুকাইয়া গেল। আমরা জানি গ্রামের ধ্বংসের মূলে ঐ পুল—লোকে বলে অদৃষ্ট—কি জানি হইতেও পারে—এদেশে সবই সম্ভব!

এবার পাঠক বুঝিতে পারিবেন কি জন্য গাঁয়ের

লোক সারাদিন ঢোলের শব্দ সহ্য করে। আগে অনেক ঘর হাড়ী ছিল—তারাই বাজনদারের কাজ করিত। একবার বৈশাখ মাসে কলেরা লাগিল; (পল্লী-অঞ্চলে ছয় ঋতুর প্রভেদ ছয় ব্যাধির দ্বারা বোঝা যায়) হাড়ী-পাড়া সাফ হইয়া গেল—কেবল রমেশ হাড়ীর ছয় বছরের নাবালক ছেলে আর স্ত্রী বাঁচিল। ছেলেকে সঙ্গে করিয়া রমেশের স্ত্রী বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। সে আজ দশ বছরের কথা—এ দশ বছর গাঁয়ে ঢুলী ছিল না—পালপার্ব্বণের সময়ে লোকে বিপদে পড়িত—অনেক বেশী খরচ করিয়া অন্য গ্রাম হইতে ঢুলী আনিতে হইত।

হঠাৎ আজ কয়েক দিন হইল রমেশ হাড়ীর ছেলে নগেন গাঁয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে। মায়ের মৃত্যুর পরে সে আর মামার বাড়ী থাকিতে রাজী হইল না।

প্রথমে প্রতিবেশীরা তাকে চিনিতে পারিল না—তাদের দোষ দেওয়া যায় না, ছয় বছরের ছেলে দশ বছর পরে ফিরিলে চেনা সহজ নয়। নগেন আত্মপরিচয় দিল, প্রতিবেশীদের রমেশকে মনে পড়িয়া গেল—শুধু তাই নয়, সকলেই সহসা নগেনের মুখে, চোখে, হাব-ভাবে, কথাবার্ত্তায় রমেশের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইল। কেহ বলিল—রমেশই যেন ষোল বছরের হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কেহ বলিল—হাজার লোকের মধ্যেও তাকে রমেশের ছেলে বলিয়া চিনিয়া লওয়া যায়। নগেন প্রতিবেশীদের দৃষ্টিশক্তিতে বিস্মিত হইয়াছিল—কন্তু জানিত না আরও বিস্ময় তার জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে।

নগেনের মা জোড়াদীঘি ছাড়িয়া বাপের বাড়ী যাইবার সময়ে কিছু তৈজস, খান-দুই তক্তাপোষ, একটা কাঠের সিন্দুক এবং একটা ঢোল প্রতিবেশীদের বাড়ীতে রাখিয়া গিয়াছিল—নগেন সেই পৈত্রিক সম্পত্তিগুলি দাবি করিতেই প্রতিবেশীদের নানা রকম অনিবার্য্য কাজ মনে পড়িয়া গেল—তারা মূঢ় নগেনকে ফেলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

তার পরে নগেন তাগিদ আরম্ভ করিল,—হাঁটাহাঁটি করিল, কাকুতিমিনতি করিল, কিন্তু নশ্বর তৈজসপত্র আর ফিরিয়া পাইল না। তার সবচেয়ে লোভ ছিল ঐ সিন্দুকটার উপরে—বহুদিন সে মার মুখে পৈত্রিক সিন্দুকের কথা শুনিয়াছে; তার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে সিন্দুকটার মধ্যে তার পিতার সারাজীবনের সঞ্চয় রহিয়াছে—একবার তাহা পাইলে তার আর অভাব-অভিযোগ থাকিবে না।

তিনু ধোপার (এখন সে চৌকিদার) বাড়ীতে সিন্দুকটা ছিল—নগেন দাবি করিতে সে স্পষ্ট বলিয়া দিল—হ্যাঁ একটা কাঠের বাক্স ছিল বটে ওইখানে প'ড়ে—কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না—বোধ হয় উই ইঁদুরে কেটে খেয়ে ফেলেছে। সংসারের কোন বস্তুই যে অবিনশ্বর নয়, এই ঘটনায় নগেন তার প্রথম প্রমাণ পাইল—সে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু সংসারে সবাই অসাধু নয়। মোতি ছুতোর একদিন বিকাল বেলা একটা ঢোলের খোল আনিয়া নগেনকে ফিরাইয়া দিয়া বলিল—তার মা যাইবার সময়ে এই খোলটা তার জিম্মায় রাখিয়া গিয়াছিল—এত দিন সে সযত্নে রক্ষা করিয়াছে; এ দায়িত্ব আর সে বহন করিতে পারে না—যার জিনিষ সে গ্রহণ করুক। এই বলিয়া সে অতি জীর্ণ উইয়ে-কাটা ঢোলের কাষ্ঠগোলকটি নগেনের সম্মুখে স্থাপন করিয়া চলিয়া গেল—নগেন খোলের ফাঁকের ভিতর দিয়া নদীর ওপারের চালু মাঠের বাবলা-বনের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল।

পরের দিন সে খোলটা ঘাড়ে করিয়া জমিদার-বাড়ীতে গিয়া জমিদার তারানাথ বাবুর কাছে আত্মপরিচয় দিল। তারানাথবাবু রমেশকে জানিতেন; নগেন ফিরিয়া আসাতে তাঁর এক ঘর প্রজা বাড়িল, কিছু আয়বৃদ্ধি হইল, মানসাঙ্কে বিদ্যুতের মত ইহা খেলিয়া গেল; তিনি তাকে ঘর তুলিবার জন্য সাহায্য করিলেন—আর ঢোলটা চামড়া দিয়া আচ্ছাদন করিয়া লইবার জন্য নগদ পাঁচ সিকা তার হাতে দিলেন।

নগেন লক্ষ্মীপুরের হাটে গিয়া খোলটাকে পালিশ করিয়া রং করাইয়া লইল; মুচি দিয়া চামড়া লাগাইল—আর পালকের সাজ পরাইয়া ঢোলটাকে একেবারে নূতন করিয়া ফেলিল। তার পরে সগৌরবে সেটাকে গলায় ঝুলাইয়া বাজাইতে বাজাইতে গ্রামে ফিরিয়া

আসিল। গাঁয়ের লোক নগেন হাড়ীর ঢোল দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—যাক এত দিনে গাঁয়ের বাজনার অভাব দূর হইল।

২

নগেন হাড়ীর ঢোলের অবিরাম বাজনায় গাঁয়ের লোকে বিরক্ত হইলেও এই সব নানা কারণে সকলে চুপ করিয়া ছিল, কিন্তু হঠাৎ এক দিন অতি তুচ্ছ কারণে বিবাদ বাধিয়া উঠিল।

হরিচরণ জোড়াদীঘির এক জন জালহীন জেলে, চাষবাস করিয়া খায়। অন্য জেলেরা গ্রাম ছাড়িয়া গেল, হরিচরণ যাইতে পারিল না; লোকের কাছে সে বলিয়া বেড়াইল, সাত পুরুষের ভিটা কি ত্যাগ করা যায়! আসল কথা অন্য রকম: হরিচরণ গাঁজা খায়; জোড়াদীঘি ছাড়া আবগারির দোকান আশপাশের গাঁয়ে নাই, কাজেই সে জোড়াদীঘি ছাড়িতে পারিল না।

প্রতিদিন সন্ধ্যার আগে সে বাজারে আবগারির দোকানের দিকে যায়—ফিরিবার সময়ে তুরীয় অবস্থায় ফেরে; এখন, বাজারের পথের পাশেই নগেন হাড়ীর ঘর। সেদিন সন্ধ্যায় হরিচরণ বাজার হইতে ফিরিতেছে, এমন সময়ে তার কানে গেল—ঢোলের ডুম্, ডুম্, ডুম্। হরিচরণ ঢোলের তালে তালে বলিয়া উঠিল—ডুম, ডুম ডুম; এক বার, দুই বার, তিন বার। নগেন রাগিয়া গিয়া নিষেধ করিল—জেলের পো ঠাট্টা ক'রো না বলছি। জালিক পুত্রের তখন চতুর্থ অবস্থা; সে উচ্চতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ডুম, ডুম, ডুম।

নগেন দাওয়ার উপরে বসিয়া ছিল, নামিয়া আসিয়া ঢোলের কাঠি হাতে তার সম্মুখে দাঁড়াইল, বলিল—ফের ঠাট্টা?

হরিচরণ ঈষৎ রাগিয়া উত্তর দিল—তোর ঢোলে তুই যা খুশী বলিস, আমার মুখে আমি যা খুশী বল্‌ব, ঠেকায় কে!

ঠেকাই আমি—এই বলিয়া ক্রুদ্ধ নগেন ঢোলের কাঠি দিয়া হরিচরণের পিঠে আঘাত করিল। অমনি যায় কোথা—দুই জনে হাতাহাতি বাধিয়া গেল; হরিচরণের বয়স বেশী, তাতে নেশাগ্রস্ত, সে পড়িয়া গিয়া আহত হইল; কিছুক্ষণ পরে প্রতিবেশীরা আসিয়া দুই জনকে নিরস্ত করিল।

পরদিন গাঁয়ের লোকে ঘটনা শুনিয়া রাগিয়া গেল; কেহ বলিল—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা; কেহ বলিল—যত বড় ঢোল নয় তত বড় বোল; হরিচরণ পিঠের আঘাত স্মরণ করিয়া বলিল, যত বড় কাঠি নয় তত বড় ঘা। কিন্তু কেহ নগেনকে কিছু বলিতে সাহস করিল না—সে জমিদারের অনুগৃহীত জীব।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে জমিদারের প্রথম পৌত্রের জন্ম হইল; নগেনের বাজনা এর আগে কেবল দিনে চলিত, এবার অহোরাত্রব্যাপী হইয়া উঠিল। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত—কর্তার নাতির ভাতে বাজাতে হবে না! তাই হাতটা সই ক'রে নিচ্ছি। বড়লোকের ব্যাপার, বাজনা খারাপ হ'লে লোক বলবে কি?

হরিচরণের ঘটনাকেও লোকে প্রয়োজনের আশায় সহ্য করিয়া ছিল, কিন্তু আর একটা ঘটনায় লোকের সে-আশাও ভঙ্গ হইল। রতন মুচির ঘর গাঁয়ের প্রান্তে; লোকটা ভালমানুষ, অর্থাৎ জিনিষ লইয়া নগদ দাম দেয়, এবং জুতা সারিয়া দিয়া পয়সার জন্য তাগিদ করে না। এ হেন রতনের একটি পুত্রসন্তান হইল—গাঁয়ের লোক উল্লসিত হইয়া উঠিল, আশা করিল রতনের অর্থনৈতিক আদর্শ ও ধারা তার পুত্রের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করিবে।

কয়েক দিন পরে রতন নগনের বাড়ীতে গিয়া একটা সিকি তার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল—ভাই একবার আমার বাড়ীতে যেতে হবে, মানে কিনা আজ ষষ্ঠীপুজো একটু বাজিয়ে আসতে হবে।

নগেন তার সিকিটা পা দিয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল—মুচির ছেলের ষষ্ঠীপুজোতে আমার ঢোল বাজে না।

রতন তার যুক্তি না বুঝিতে পারিয়া বলিল—ঢোলের কি আবার জাত আছে নাকি?

—তবে রে জাত তুলে কথা?—নগেন লাফাইয়া উঠিল। রতন সিকিটা কুড়াইয়া লইয়া বাড়ী ফিরিল; পথে সে

একবার বাজারে গিয়া ঘটনাটা সকলকে বলিয়া বুঝাইয়া দিল, গাঁয়ের লোকের আশা সফল হইবার নয়, নগেন সকলের বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্মে ঢোল ঘাড়ে করিয়া যাইবে না!

একজন জিজ্ঞাসা করিল—তবে ওর চলবে কি করে?

রতন বলিল—কেন, জমিদারের নাতির ভাতে সে বাজাবে! সেই জন্যই তো ও দিনরাত হাত তালিম করছে।

কিন্তু তার তো অনেক দেরি।

হরিচরণ কাছেই বসিয়া ছিল; পিঠের ব্যথা তার তখনো যায় নাই; নগেনের ব্যবহারে সে জমিদারের উপরে চটিয়া গিয়াছিল—সে গলা একটু খাটো করিয়া বলিল—ক'দিন সবুর কর না; দেখ কার ভাতে কে ঢোল বাজায়!

সকলে উৎসুক হইয়া উঠিল—ব্যাপার কি?

হরিচরণ আরও গলা খাটো করিয়া বলিল—বেশী দিন আর জমিদারি করতে হবে না। মছলন্দপুরের বাবুরা অনেক টাকার ডিক্রী করেছে—সব গেল ব'লে! তখন দেখা যাবে বেটা কার ভাতে ঢোল বাজায়।

আবগারি-ওয়ালার রসিক বলিয়া খ্যাতি ছিল, সে বলিল—ঢোল বাজাবে বইকি! ভাতে নয়, নীলামে।

ঘটনা সত্য কি মিথ্যা সে প্রশ্ন কেহ করিল না; অন্যের বিপদ যে এত আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতেই সকলে খুশী হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

৩

জমিদার তারানাথবাবুর অবস্থা অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, বাইরের ভানটি শুধু বজায় আছে, কিন্তু তাও বুঝি আর থাকে না; তাঁর অধিকাংশ সম্পত্তি পত্তনী সম্পত্তি; বছর-শেষে মালেক জমিদারকে মোটা টাকা খাজনা দিতে হয়; এর মস্ত অসুবিধাটা এই যে খাজনা চার বছর পর্য্যন্ত বাকি ফেলা চলে, লাটের খাজনার মত কিস্তি কিস্তি শোধ করিতে হয় না। চার বছরের খাজনা সুদে-আসলে দশ-বার হাজার টাকার মত হইল; মালেক জমিদার নালিশ করিল; আদালতের কৌশলে যত দূর ঠেকানো সম্ভব তারানাথবাবু ঠেকাইলেন; কিন্তু আর ঠেকে না; মালেক জমিদার তারানাথবাবুর ভূসম্পত্তি নীলামের জন্য পরোয়ানা বাহির করিল।

ব্যাপারটা গ্রামে চাপা ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে জমিদারের কর্ম্মচারীদেরই মুখরতার অবকাশে প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। কাজেই নগেন যখন জমিদারের পৌত্রের অন্নপ্রাশনে ঢোল বাজাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন অদৃষ্ট নীলামের জন্য ঢোল বাজাইবার একটা কারণ প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিল।

নগেন গ্রামের মধ্যে নিতান্ত একা। বয়স্কদের সঙ্গে তার মেলে না, তারা তাকে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে; হরিচরণ ও রতনের ঘটনার পর হইতে কেহ আর তাকে দেখিতে পারে না। সমবয়স্কদের নগেন এড়াইয়া চলে; তার ধারণা সকলেরই লক্ষ্য তার ঢোলটার উপরে। কথাটা একেবারে মিথ্যাও নয়। প্রথমে তার সমবয়স্ক বালকেরা তার বাড়ীতে আসিত, গল্পগুজবও করিত, এবং মাঝে মাঝে ঢোলটা লইয়া তাতে নানারূপ বোল তুলিবার চেষ্টা করিত। নগেনের ইহা ভাল লাগিত না; প্রথম প্রথম সে মুখে নিষেধ করিত; এক দিন একজনকে কড়া করিয়া বলিল, আর এক দিন আর একজনকে দু-ঘা চড় বসাইয়া দিল; তার পরে ঢোল ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিত; শেষে অবস্থা এমন হইল যে, কেহ তার বাড়ীতে আর আসিত না। নগেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল; সে সারাদিন বসিয়া কখনও ঢোলটাতে নূতন রঙ লাগাইত; কখনও নূতন পালকের সাজ বসাইত; আর জমিদারের নাতি জন্মিবার পর হইতে অদূরবর্ত্তী অন্নপ্রাশনের উৎসবের জন্য ঢোলে নূতন নূতন বোল তুলিতে প্রয়াস করিত; ঢোলের সাহচর্য্যে তার সময় আনন্দে কাটিয়া যাইত, নিঃসঙ্গতা সে অনুভব করিত না।

৪

তারানাথবাবুর নাতির অন্নপ্রাশনের নির্দ্দিষ্ট তারিখের কাছাকাছি একদিন জোড়াদীঘির বাজারে বড় সোরগোল

পড়িয়া গেল। জমিদারপক্ষ হইতে প্রথমে ব্যাপারটা চাপিয়া দিবার চেষ্টা হইল—বেসরকারী ভাবে টাকা দিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিবার, সংক্ষেপে ঘুষ দিবার চেষ্টা হইল, কিন্তু কিছুতেই ফল ফলিল না; ক্রমে ঘটনা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল—মালেক জমিদারের পক্ষ হইতে লোক ও আদালতের পেয়াদা তারানাথবাবুর জমিদারী নীলাম করিতে আসিয়াছে।

তারানাথ বাবু প্রতিপত্তিশালী লোক—সেজন্য অপর পক্ষে আয়োজনের ত্রুটি করে নাই; চার-পাঁচ জন নিজ পক্ষের পাইক; দুই-তিন জন চাপরাশধারী আদালতের পেয়াদা ও নিশানদার সঙ্গে ছিল। তারা বাজারের এক দোকানে ঘাঁটি গাড়িয়া এক জন ঢুলীর সন্ধান করিতে লাগিল।

সকলেই জানেন যে এসব ব্যাপারে ঢুলী ঘটনাস্থলে আসিয়া সংগ্রহ করা হয়, সঙ্গে করিয়া কেহ আনে না; আরও জানা উচিত যে, অধিকাংশ সময়েই ঢুলীর উল্লেখ কাগজেপত্রেই হয়, বাস্তবে তার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অনেক সময়ে, বিশেষ যেখানে অপর পক্ষ প্রবল, পরে মামলা-মোকদ্দমার আশঙ্কা আছে, সে-সময় ঢুলীকে বাস্তব রঙ্গমঞ্চে ডাক পড়ে; ঢুলী আসিয়া নগদ দক্ষিণা লইয়া আদালতের পেয়াদার মন্ত্র-আবৃত্তির সঙ্গে ঢোলে কয়েক ঘা দিয়া যায়।

আদালতের পেয়াদা জিজ্ঞাসা করিল—গাঁয়ে ঢুলী আছে কি না?

সকলে সমস্বরে বলিল—হাঁ! নাম তার নগেন হাড়ী।

তিনু ধোপা (সম্প্রতি সে চৌকিদার) নগেনকে ডাকিতে গেল। যে-জমিদারের নাতির অন্নপ্রাশনে ঢোল বাজাইবার জন্য আজ সে কয়েক মাস হইল প্রস্তুত হইতেছে, তার সম্পত্তি নীলামের জন্য ঢোল বাজাইতে হইবে শুনিয়া নগেন বলিল—তার শরীর ভাল নাই, সে যাইতে পারিবে না।

তিনু ফিরিয়া গেলে অপর পক্ষের কর্ম্মচারী নগেনের বাড়ী আসিল। সে নগেনের সম্মুখে নগদ আড়াইটা টাকা রাখিয়া বলিল—ওহে বাপু একবার চল—বেশী কষ্ট করতে হবে না। ঐ বাজারের মধ্যে দাঁড়িয়ে বার-কয়েক বাজিয়ে দিলেই চলবে।

নগেন টাকা কয়টা ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—যেদিন তোমার জমিদারের সম্পত্তি নীলাম হবে সেদিন ডেকো, বিনা-পয়সায় বাজিয়ে আসব।

অপর পক্ষের লোক রাগিয়া উঠিয়া বলিল—আ মলো যা, ছোঁড়ার যে ভারি তেজ! ভালোয় ভালোয় যাবি ত চল—নইলে আদালতের পেয়াদা এসে ঘাড়ে ধরে নিয়ে যাবে।

নগেন বলিল—যা তোর বাপকে ডেকে আন্।

অপর পক্ষের কর্ম্মচারী ক্রুদ্ধ হইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল—বোধ হয় তার পিতাকে আনিবার জন্যই।

ব্যাপার শুনিয়া আদালতের চাপরাশী লাল হইয়া উঠিল অর্থাৎ লাল পাগড়িটা মাথায় জড়াইয়া লইল—খাকি জামার উপরে চাপরাশটা বাঁধিয়া লইল—এবং ব্রিটিশ আইনের প্রেষ্টিজ রক্ষার জন্যে সকলকে লইয়া নগেনের বাড়ীর দিকে চলিল।

সকলে নগেনের বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল—সে উঠানে দিব্য নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া একখানা সান্‌কিতে করিয়া পান্তাভাত খাইতেছে।

চাপরাশী বলিল—এই বেটা চল্। জানিস কোম্পানীর কাজ!

নগেন শান্ত ভাবে বলিল—চল যাচ্ছি। খেয়ে নি।

সকলে অপেক্ষা করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল—কোম্পানীর কি মহিমা! যে-কাজ নগদ আড়াই টাকায় সম্ভব হয় নাই, তাহা পেয়াদার উপস্থিতি মাত্রেই সম্ভব হইল!

নগেন আহার শেষ করিয়া, হাত-মুখ ধুইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বলিল—চল, কোথায় যেতে হবে।

চাপরাশী গর্জ্জন করিয়া বলিল—নে ঢোল কাঁধে নে।

নগেন অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে বলিল—ঢোল! ঢোল ত আমার নেই।

নাই! লোকটা বলে কি!—সকলে চমকিয়া উঠিল।

তিনু বলিয়া উঠিল—পেয়াদা সাহেব মিথ্যা কথা!

কর্ম্মাবসরে

শ্রীভূপতিনাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ঢোল ছাড়া ও বাঁচবে কি ক'রে? নিশ্চয়ই ওর ঘরের মধ্যে আছে।

পেয়াদার হুকুমে দু-তিন জন তার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল—খুঁজিয়া দেখিতে হইবে, কোথায় ঢোল আছে।

কিন্তু কোথাও ঢোল পাওয়া গেল না। পেয়াদার হুকুমে ঘরের মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল—কোথাও ঢোল নাই।

অবশেষে এক জন মাচার নীচে তাকাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—এই যে! এই যে! পেয়েছি! সে ঢোলটা টানিয়া বাহির করিল। কিন্তু এ কি! সবাই অবাক্ হইয়া গেল। এ যে চামড়া কাটা, খোল ফাটা, পালক-ছেঁড়া, কাঠ, চামড়া আর পালকের একটা স্তূপ। এই কি নগেনের বহু সাধের ঢোল!

পেয়াদা গর্জ্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এই বেটা তোর ঢোল কোথায়?

নগেন হাসিয়া আঙুল দেখাইয়া বলিল—ঐই যে!

তার পরে বলিল—চল কোথায় যেতে হবে।

অপর পক্ষের লোকের আশাভঙ্গ হওয়াতে চটিয়া বলিল—নে, নে, ভাঙা ঢোল নিয়ে আর যেতে হবে না।

নগেন শান্তভাবে হাসিতে হাসিতে বলিল—যে-দিন তোমার জমিদারের সম্পত্তি নীলাম করবার দরকার হবে, সেদিন ডেকো, ভাল ঢোল নিয়ে যাব, পয়সা দিতে হবে না।

রাগে ও অপমানে পেয়াদার লাল পাগড়িটা খসিয়া পড়িয়াছিল, সে সেটাকে বাঁধিতে বাঁধিতে সঙ্গীদের বলিল—চল। নগেনের দিকে ফিরিয়া বলিল—দেখে নেব বেটা তোকে!

নগেন বলিল—আর ঢোল তৈরি করলে তো!

সত্যই তার পর হইতে নগেন ঢুলী হইবার উচ্চাশা পরিত্যাগ করিল।

তস্মৈ দেবায়

শ্রীসুশীলকুমার দে

সুখ-সুষমার দয়িত দেবতা হিমগিরি-শিলা-তলে
হারায় অঙ্গ, ক্ষণ-পতঙ্গ মহাকাল-কোপানলে;
রহে পড়ি শুধু দৃপ্ত দাহের বিজয়-বিভূতি-রেখা;
শুধু, মূরতির রতিরসার্ত্তা কামবধূ কাঁদে একা।

হিম-আকাশের বায়ুমণ্ডল শিহরে-না মধুমাসে,
রুদ্রের শুধু মুদ্রিত চোখে বিদ্রূপ-হাসি ভাসে;
ফুলধনু সাথে ফুলতনু আজ ধূলিতে হয়েছে ধূলি,—
রহে কামনার কণার নীহার বাষ্প-বলয়ে দুলি!

তাই নিরাকার আকারে আকুল দেহের স্নেহটি ঘিরে
বিদেহ-স্মৃতির শ্মশানে প্রীতির প্রেতসম সে ত ফিরে;

আগুনের রাগ রেখে গেছে শুধু দহনের দাগ বুকে,
এঁকে গেছে শুধু অঙ্গারসম হাসির রঙ্গ মুখে!

অরূপ ধরেছে অপরূপ রূপ মরণ-তোরণে পশি—
করে করোটির মধু-করঙ্ক, চোখে কলঙ্ক-মসী,
ভালে আপনার ভস্মের টীকা গরবের গঞ্জনে,
আলাপের সুর বিলাপ-বিধুর অপরাধ-ভঞ্জনে!

দেহ-গেহ-হারা ধরেছে চীবর যৌবন-বন-চর,
সুধার ক্ষুধায় কাতর কণ্ঠ কালকূটে জর্জ্জর;
বিশ্বশাসন বিরচি আসন বাসনার শবাসনে
কামচারী কাম বামমার্গীর মন্ত্র জপিছে মনে।

ধ্যানভঙ্গের লাগি আসি আজ আপনি বসেছে ধ্যানে,
আত্ম-আহুতি দেয় হতাশের হুতাশন জ্বালি প্রাণে;
প্রীতিপারিজাত-পরাগের রাগ ভস্মের ভারে ঢাকি
ধরে সে উরসে উরগের হার মন্দার-মালা রাখি।

প্রিয়ামুখে আর নাহি ছলভরা কলহাস্যের ধ্বনি,
আদর-কাতর অধরে নাহি সে-অমৃত উন্মাদনী;
মনোহারিকার কণ্ঠে কোথায় বন-শারিকার গীতি ?
বরণ-মাধুরী চরণ-চাতুরী রেখে গেছে শুধু স্মৃতি !

কাঁদে কামবধূ যেন রামবধূ বিরহের তপোবনে
মনের সঙ্গে মনের নিশীথে নিরজ নিধুবনে;
রতি নহে, শুধু ভাবের আরতি দেহের দেবতা তরে
রচে বিনিদ্র বিলাপের গীতি বেদনার বেদী'পরে।

বাজে না ত আর শ্যামের বাঁশরী কামের বৃন্দাবনে,
কেলি-কুসুম ধূলায় লুটায়, স্মরণ বিস্মরণে;
চির-বিরহিণী যাপিছে যামিনী রাস-রস-রঙ্গিণী,
প্রাণের প্রেয়সী নহে সে শ্রেয়সী,—কামনা-কলঙ্কিনী।

তাই বুঝি আজ মিলনে মিলায় বিরহের বাঞ্ছিতা ?
যে শুধু ধ্যানের ধন, সে ধরার লালসায় লাঞ্ছিতা !
হিম-মেরু-পথে আঁধার-বিধুর অরোরার আধ-আলো,
স্বপ্ন-বিলীন সুপ্তির চোখে তাই বুঝি লাগে ভালো !

কারে ডাক আজ শ্মশানের মাঝে,—নাহি বর, নাহি বধূ;
খরতাপে ফোটে মরীচিকা-ফুল, নাহি রূপ, নাহি মধু;
নাহি মমতার মিথুন-মূর্ত্তি,—আছে সতী, আর পতি,
দেহহীন দেহে প্রাণহীন প্রাণে কাম-বিরহিত রতি।

জীবনেরে ভুলি মরণেরে তাই মনে হয় মধুময়,
অমানিশীথের হাসিটি ফোটায় কালিমার কুবলয়;
সুখে সুখ নাই, দুখে দুখ নাই,—বুকের পাঁজরে তাই
দুখ হয়ে যায় দুরাশার ধূম, সুখ হয়ে যায় ছাই !

নিন্দিত হয় আনন্দ তাই, ভয় আনে সংশয়,
লজ্জার ঘন সজ্জার ঘটা, কুণ্ঠা গুণ্ঠময়;
ভাবনার ভারে মনের তরণী ধরণীর বালুকায়
আপনা হারায় কল্লোলহীন কামনার সীমানায়।

পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ বাণের উপচার নাহি আনে,
গুণহীন ধনু অতনু-গুণের বৃথা টঙ্কার টানে;
ক্লীবতার আর ক্ষীবতার যূপে যৌবনে দিয়ে বলি
মৃতের মিথ্যা মায়ায় নিজেরে অমৃতের ছলে ছলি।

গৃহ আছে যার সেও গৃহহারা সুদূরের উদ্দেশে;
রূপের রজত কালো হয়, আলো-আঁধারের তলে মেশে;
মনে রাখি, তবু ভুলে যাই; ভালবাসি, তবু ঘৃণা করি;
হেলায় যাহারে দূরে ঠেলি, তবু তারি তরে কেঁদে মরি।

ক্ষণ-উন্মুখী রক্ত কুসুম তপনের তাপে ঝরে;
মেঘের বক্ষে বিজলী মিলায় অসহায় নির্ঝরে;
বাঞ্ছিত যাহা ফুরায় চকিতে বাঞ্ছিত-বাহু-পাশে,—
দেহ-জতুগৃহে ভাব-দাবদাহ নিমেষে নিভিয়া আসে !

কবে অলক্ষ্যে চেপেছে বক্ষে শতযুগ-জরাভার,
মৃত মানবের চিতার ভস্মে চাপাপড়া হাহাকার;
ধরা হল ভরা শিবে আর শবে, ওঠে শুধু উচ্ছ্বাসি
বাঁশরী পাসরি ডমরুর গুরু নিনাদে অট্টহাসি।

অনাবৃষ্টির সৃষ্টির মাঝে উদাসী ও উপবাসী
ঊর্দ্ধ পলকে জাগে অচপল অজানার অভিলাষী;
দেহের মনের বসন্ত গেছে বসন্ত-সখা সাথে,—
মানসের সরে সরে না মরাল-মিথুন শীতের রাতে।

মরণের বরযাত্রী চলেছে অজানা রাত্রিপথে
জন্মজরার মন্থর মৃৎ-শকটিকা দেহ-রথে,
স্বপ্ন-চেতনে কেতনে উড়ায়ে মরু-মরু-মঞ্জরী,
চক্রের তলে চূর্ণি প্রাণের রতনের শতনরী।

কঙ্কালের পূতিপঙ্কের জমায়ে আবর্জনা
বঞ্চনা রচে নব উপচারে মদনের আরাধনা ;
তন্দ্রিত চোখে ছন্দিত করে প্রলাপের প্রেমায়নে
নব প্রশস্তি,—পরম স্বস্তি মৃতকের তর্পণে !

সুন্দরতরে তাই সুকঠিন মর্ম্মের মর্ম্মরে
কবি কামহীন নাম-মমতায় কাম-মমতাজ গড়ে ;
পাথরের ফুল, নয়নের ভুল, মনেরে ভুলায় আঁখি,—
ফাগুনের রাগে নহে হোলিখেলা, কেবল ফাগের ফাঁকি !

হে দুর্নিবার পূর্ণ উদার, হে কাম্য কাম জাগো,
অতনু-তনুর দীপে রুদ্রের বহ্নির কণা মাগো ;
দিব্য দহনে কষিত-কান্তি, সাথে লয়ে এস রতি,—
শ্মশানে ধেয়ানে যোগীর নয়ানে জাগিবে হৈমবতী !

পঞ্চেন্দ্রিয়-পঞ্চপ্রদীপে পঞ্চবাণের শিখা
দেহে-দেহে আর প্রাণে-প্রাণে আজ এঁকে দিক্
জয়লিখা ;
মনের সোনার শ্যামিকা ঘুচায়ে রূপে-রূপে ধর রূপ,
নয়নে-নয়নে জাগায়ে দীপ্তি অবিরহী অপরূপ !

জটাজুট আর কালকূট ধরি ভিখারী দেবতা জাগে,
বিরূপের রূপ রূপলক্ষ্মীর রূপে আসক্ত মাগে ;
নীলকণ্ঠের কণ্ঠ-কপাট যে-রোদনে রাখে রুধি
হোক্ সে মহান্ মর্ম্ম-মরুর অশ্রুর অম্বুধি !

আপনার মাঝে আপনারে লভি আপনার বিস্ময়ে
ভুলিবে আপনা ভুলের রসে সে নিখিলের নিরাময়ে ;
দহন-দীপ্ত কান্তার কামে জাগিবে স্বস্তির রতি,
অতনুর রাগে হবে : তাপসীর তনুটি বেপথুমতী !

দিবা-বিভাবরী চেয়ে আছি তাই উদয়াস্তের পারে
কবে দিয়ে যাবে পাবক-পরশ অঙ্গের অঙ্গারে ;
অনাগত সেই জ্বলনে জ্বলিবে অতীতের তমোরাশি,
যুগ-জঞ্জাল, স্বপ্নের জাল নিশা-পিশাচীর নাশি ।

পুরানো আকাশে আবার নূতন নেহারিব নীহারিকা
নূতন তারার উদয়ে উজল যামিনীর যবনিকা ;
ফুটিবে আবার দেহের পর্ণে বর্ণের সমারোহে
মনো-মেদিনীর মমতা-মুকুল প্রাণরস-মধু-মোহে !

খোসগল্প

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনে এমন সব অদ্ভুত ঘটনা অনেক সময় ঘটে, যা লিখিতে বসিলে যেন গল্পের মত শোনায়।

আমার জীবনে এমনি ধরণের ঘটনা একটি ঘটিয়াছিল, ঘটিয়াছিলই বা কি করিয়া বলি—ঘটিয়াছে বলাই সঙ্গত, কারণ তাহার জের এখনও চলিতেছে। যদিও বাহিরের দিক হইতে তাহার জের কিছুই নাই, যা কিছু ঘটিতেছে সবই আমার ও আর একজনের মনে।

প্রেমের কাহিনী এ নয়, কিসের কাহিনী বলা শক্ত। এত সূক্ষ্ম ও বস্তুবিহীন তার ঘটনা, যেন মাকড়সার জালে বোনা কাপড়—জোর করা চলে না তার উপর—একটু বেশী বা একটু কম কথা বলিলেই ঘটনার সূক্ষ্ম রহস্যটুকু একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তাই খুব সতর্কতার সহিত ব্যাপারটি বলিতে চেষ্টা করিতেছি।

আর ভূমিকা করিব না, এখন গল্পটা বলি।

প্রথমেই আমার একটু পরিচয় দিয়া লই। যাঁহারা এ-গল্প পড়িবেন, তাঁহাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটা লাইনও যেন বাদ দিবেন না—মনে রাখিবেন এর প্রতি লাইনের প্রয়োজনীয়তা আছে, গল্পটিকে সম্যক্ বুঝিতে হইলে।

যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন আমি বিবাহ করি নাই, করিবার ইচ্ছাও ছিল না। কেন কি বৃত্তান্ত সে-সব গল্পের পক্ষে অবান্তর। সুতরাং সে-কথার দরকার নাই।

বিবাহ করি নাই বলিয়া ভবঘুরেও ছিলাম না।

ছোট একটি ব্যবসা ছিল। তাহা হইতে দু-পয়সা রোজগারও হইত। এখন সে-ব্যবসা আরও বাড়িয়াছে। কাজের খাতিরে মাঝে মাঝে দেশ-বিদেশে ঘুরিতে হইত, এখনও হয়। কলিকাতায় বাড়ী এখনও করি নাই, তবে হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধবগণ যেমন ধরিয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে বাড়ী না করিলে আর চলে না—চক্ষুলজ্জার খাতিরেও অন্ততঃ করিতে হইবে। বালিগঞ্জ অঞ্চলে সুবিধামত জমি দেখিতেছি। এই হইতেই আমার মোটামুটি পরিচয় আপনারা পাইলেন।

বর্দ্ধমান জেলায় বনপাশ ষ্টেশনে নামিয়া উত্তর দিকে বাঁধানো সড়ক ধরিয়া সাত আট মাইল গরুর গাড়ী করিয়া গেলে দিয়াখালি বলিয়া একটি গ্রাম পড়ে। এখানে আমার এক সহপাঠীর বাড়ী।

এই অঞ্চলে ব্যবসা উপলক্ষে মাঝে মাঝে যাইতাম। অর্থাৎ আখের গুড় কিনিতে বনপাশ হইতে ছ-মাইল দূরবর্ত্তী জগন্নাথপুরের হাটে আমাকে মাঘ ফাল্গুন মাসে প্রতিবৎসর যাইতে হইত।

যখনই গিয়াছি দিয়াখালি গ্রামে আমার সেই সহপাঠীর বাড়ীতে গিয়া একবার করিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতাম। কলিকাতায় কলেজে একসঙ্গে বি-এ পড়িয়াছিলাম, আমার সে বন্ধুটি বি-এ পাস করিতে পারে নাই, গ্রামেরই মাইনর স্কুলে অনেকদিন হইতেই সে হেডমাষ্টারি করিতেছে।

আমার বন্ধুর স্ত্রী পল্লীগ্রামের বধূ যদিও, আমার সামনে বাহির হইয়া থাকেন তো বটেই, আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের পরিবারেরই একজনের মত।

মেয়েমানুষের যেমন স্বভাব, যখনই যাই, আমার বন্ধুপত্নী আমায় বাঁধা নিয়মে অনুযোগ করিতেন, আমি কেন বিবাহ করিতেছি না। এ-নিয়মের ব্যতিক্রম যত বার সেখানে গিয়াছি, কখনও ঘটিতে দেখি নাই।

—শুনুন, এবার একটি বড়সড় দেখে, এই ফাগুন মাসের মধ্যেই বিয়ে ক'রে ফেলুন। না—শুনুন আমার কথা—এর পরে কে দেখবে শুনবে, সেটাও তো ভাবতে হবে? বিয়ে ক'রে ফেলুন।

এ-ধরণের কথা শুধু আমার বন্ধুপত্নীর মুখ হইতে যদি শুনিতাম, হয়তো আমার মনে একথা কিছু রেখাপাত

করিলেও করিতে পারিত। কিন্তু আমি তো এক দিয়াখালি গ্রামেই ঘুরি না—সারা বাংলা দেশের কত জেলায়, কত গ্রামে, কত শহরে কার্য্যোপলক্ষে ঘুরিতে হয় এবং প্রায় অনেক স্থানেই হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধবের মুখ হইতে ঐ একই কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম।

আমার মাসীমা, পিসিমা এবং অন্যান্য আত্মীয়া-কুটুম্বিনী সমস্ত এ-বিষয়ে যথেষ্ট অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়া আসিতেছিলেন—ঘরে বাহিরে এভাবে অনুরুদ্ধ হওয়ায় জিনিষটা আমার যথেষ্ট গা-সহাগোছের হইয়া পড়ার দরুন কোনো প্রস্তাবই তেমন গায়েও মাখিতাম না বা নূতন কিছু বলিয়া ভাবিতাম না।

এক বার দিয়াখালি গিয়াছি মাঘ মাসে, আমার বন্ধু-পত্নী সেবার যে-কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া রীতিমত কৌতুক অনুভব করিলাম।

বলিলেন—আমি কিন্তু এক জায়গায় আপনার বিয়ে ঠিক ক'রে রেখেছি।

একটু কৌতুক করিয়াই বলিলাম—কি রকম?

—আজ প্রায় ছ-সাত মাস আগে আমাদের এখানে শিবতলায় বারোয়ারি শুনতে গিয়ে একটা মেয়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়। মেয়েটি এ গাঁয়ের নয়—তার দিদিমার সঙ্গে গরুর গাড়ী ক'রে পাশের গাঁ বারোদীঘি থেকে যাত্রা শুনতে এসেছিল। বেশ মেয়েটি, চমৎকার গড়নপিটন, লম্বা, একহারা চেহারা। কেবল রংটি ফর্সা নয়, কালো। খুব কালো না হলেও কালোই মোটের উপর। নামটা ভুলে গেছি—খুব সম্ভব মণিমালা।

উৎসাহ দিবার সুরে বলিলাম—বেশ, তার পর?

—আমি তাকে বললুম আপনার কথা। আপনি কি করেন, কোথায় বাড়ী সব বলবার পরে তাকে বললুম এঁর সঙ্গে কিন্তু তোমার ভাই বিয়ের ঠিক করছি।

এমন কথা কখনও শুনি নাই। অবাক হইয়া বলিলাম—কি ক'রে বললেন? জানা নেই, শোনা নেই, বললেন অমনি বিয়ের কথা?

বন্ধুপত্নী পাড়াগাঁয়ের সহজ সারল্যের মধ্যে মানুষ হওয়ার দরুনই বোধ হয় এই অদ্ভুত আচরণের অদ্ভুতত্ব একেবারেই ধরিতে পারিলেন না। বলিলেন—কেন বলব না? আমার চেয়ে বয়সে যদিও ছোট, তবুও তার সঙ্গে সমবয়সীর মত ভাব হয়ে গেছল। বললুম, ওঁর এক জন বন্ধু আছেন, তিনি মাঝে মাঝে আমাদের এখানে আসেন—আমি তাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ের চেষ্টা করছি। এখন তুমি যদি মত দাও ভাই, তবে আমি ওঁর কাছে কথা পাড়ি।

—মেয়েটি কি বললে? মত দিলে?

—বললে, তিনি এত দিন বিয়ে করেন নি কেন? আমি বললুম খেয়ালী লোক তাই। এবার বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছে, তা ছাড়া তোমার মত মেয়ে পেলে নিশ্চয়ই বিয়ে করবেন। তার পরে মেয়েটি আপনার সম্বন্ধে আরও দু-একটি কথা জিজ্ঞেস করলে। আপনার বয়েস কত, মুখুজ্যে না চাটুজ্যে—কি পাস। কি পাস, এই কথাটা দু-বার ক'রে জিজ্ঞেস করলে। যখন বললুম বি-এ পাস—সে তা তো আবার বোঝে না। বললুম তিনটে পাস। তখন তার মুখ দেখে মনে হ'ল বেশ খুশীই হয়েছে। সুতরাং ও-পক্ষের মত আছে বোঝা গিয়েছে। এখন আপনি মত ক'রে ফেলুন তো ঠাকুরপো। আমি সব ঠিক করি। বাপের নাম-ঠিকানা আমি জেনে নিইছি। ওঁকে দিয়ে চিঠি লেখাই—কেমন তো?

কোনো মতে সেবারের মত কথাটা চাপা দিয়া তো কলিকাতা ফিরিলাম। তাহার পর বছর-খানেক আমার সেখানে আর যাইবার দরকার হয় নাই। পুনরায় সেখানে গেলাম পরের বৎসর মাঘ মাসে।

সন্ধ্যায় বসিয়া গল্প করিতেছি, বন্ধুপত্নী বলিলেন, কথায় কথায়—ঠাকুরপো মনে আছে সেই মণিমালার কথা? এবারও যে শিবতলার বারোয়ারির দিন তার সঙ্গে দেখা হ'ল।

বলিলাম—বেশ কথা।

তিনি বলিলেন—তার বিয়ে এখনও হয় নি। গরিব ঘরের মেয়ে, বাপ থেকেও নেই, কে বিয়ে দিচ্ছে? ঐ দিদিমা ভরসা। ক-জায়গায় সম্বন্ধ হয়েছিল, টাকার বহর শুনে এরা পিছিয়েছে। তার উপর মেয়েটি অন্য দিকে যদিও খুব সুশ্রী, কিন্তু রং তো তেমন ফর্সা নয়। আমি কিন্তু আবার তুলেছিলাম আপনার সঙ্গে বিয়ের

কথা। আহা, করুন না ঠাকুরপো, গরিবের মেয়ের দায় উদ্ধার? এবার সে নিজেই আপনার কথা জিজ্ঞেস করলে।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—কি রকম?

বন্ধুপত্নী বলিলেন—আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছে কি না? আমরা যেখানে বসি সেখানটাতে ব'সে কথা বললে কারও কানে যাবার ভয় নেই।

পরে একটু থামিয়া হাসিমুখে একটু সুর নামাইয়া বলিলেন—এ-কথা সে-কথার পরে আপনার কথা তুললাম। তা বলছে, বি-এ পাস তো চাকুরী না ক'রে ব্যবসা করেন কেন? আমি বললাম—স্বাধীন ব্যবসা ভালবাসেন, টাকাও বেশ রোজগার করেন। আর একটা কথা বলেছে, শুনলে আপনি হাসবেন।

—কি কথা?

—বলছে, আপনি দেখতে কেমন; কালো না ফর্সা।

কৌতুকের সুরে বলিলাম—আপনি কি বললেন?

—বললাম, না কালো, না ফর্সা, মাঝামাঝি।

—এঃ, আপনি আমার বিয়ের চান্সটা এভাবে মাটি ক'রে দিলেন?

বন্ধুপত্নী কৃত্রিম ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন—এর মধ্যে ঠাট্টার কথা কি আছে? না ও হবে না। এই ফাগুন মাসের মধ্যেই বিয়ে করুন—সব ঠিক ক'রে ফেলি।

এ-ধরণের কথা খোসগল্প হিসাবেই শুনিয়া থাকি, এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি এ ধরণের কথায়। কাজেই যখন কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম, তখন বেমালুম সকল কথাই মনের মধ্যে কোথায় তলাইয়া গেল কাজের হুড়াহুড়িতে।

বছর পার হইতেই জীবন অন্য পথে চলিল।

পূর্ব্বের ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া অন্য ব্যবসা খুলিলাম কলিকাতায়। সুতরাং জগন্নাথপুরের হাটে গুড় কিনিতে আর যাই না। ইতিমধ্যে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে বিবাহও করিলাম। মেয়েটি পাইয়াছি ভালই, ভবানীপুর অঞ্চলে বাপের বাড়ী, লেখাপড়া জানে, সুন্দরীও বটে। কিন্তু সবচেয়ে বড় গুণ চমৎকার গান গায়।

বিবাহের পরও দেড় বছর কাটিয়া গিয়াছে। গত মাঘ মাসের কথা, এক দিন ভবানীপুরে শ্বশুরবাড়ী হইতেই ফিরিতেছি। বৈকাল গড়াইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যা হয়-হয়। পশ্চিম আকাশ লাল হইয়া উঠিয়াছে, কোর্টের বেতারের মাস্তুলে লাল আলো জ্বলিয়াছে। বৈদ্যুতিক সংবাদপত্রের উজ্জ্বল অক্ষরে জানাইয়া দিল যে আবিসিনিয়ার সম্রাট্ লীগ অব নেশন্সে পুনরায় দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন এবং মোহনবাগান হকি না ক্রিকেট খেলিতে বোম্বে যাইতেছে।

চৌরঙ্গীর মোড়ে বাস্ হইতে নামিতেই নজর পড়িল আমার সেই দিয়াখালির বন্ধুটি সস্ত্রীক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে সম্ভবতঃ বাসের প্রত্যাশায়। খুশীর সহিত আগাইয়া গেলাম।

—আরে, তুমি কলকাতায় যে! কবে এলে? এই যে নমস্কার, ভাল আছেন? অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি—চিনতে পারেন?

বন্ধুপত্নী বলিলেন—চিনতে কেন পারব না? আপনি ডুমুরের ফুল হয়ে গেলেন তার পর থেকে। আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না।

বন্ধুপত্নীকে মিষ্ট কথায় ঠাণ্ডা করিলাম। বন্ধুটির মুখে শুনিলাম তাহার ছোট শালী চিত্তরঞ্জন-সেবাসদনে চিকিৎসার জন্য আসিয়াছে আজ দিন পনর হইল—মধ্যে অবস্থা খারাপ হওয়াতে পত্র পাইয়া বন্ধুটি সস্ত্রীক শালীকে দেখিতে আসিয়া শ্যামবাজারে এক আত্মীয়-বাড়ী উঠিয়াছে। এখন চিত্তরঞ্জন-সেবাসদন হইতেই ফিরিতেছে। মেট্রো বায়োস্কোপ দেখিবে বলিয়া এখানে নামিয়া পড়িয়াছে।

বন্ধু বলিল—চল না হে তুমিও চল। এ তো কখন ওসব দেখতে পায় না, তাই ভাবলাম ফিরবার পথে মেট্রোতে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে যাব। আর এদিকে শালীটি ত সেরে উঠেছে, কাজেই মনও ভাল। এস আমাদের সঙ্গে।

অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া গেলাম মেট্রোতে। কয় বছর যাই নাই, বন্ধু ও বন্ধুপত্নী সেজন্য যথেষ্ট অনুযোগ করিলেন। কথায় কথায় বন্ধুপত্নী বলিলেন—বিয়ে করেছেন আপনি?

কথার কি উত্তর দিব ভাবিতে না-ভাবিতেই তিনি বলিলেন—করেন নি তা বেশ বুঝতে পারছি। উনিও বলেন সে বিয়ে করলে কি আর আমাদের একখানা নেমন্তন্ন-পত্রও দিত না?...করেন নি—না?

এ-কথার পরে বিবাহ করিয়াছি কথাটা হঠাৎ বলা চলে না। সুতরাং তখনকার মত অর্থবিহীন হাসি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। তবে হাসিটি যত দূর সম্ভব দ্ব্যর্থসূচক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম মনে আছে।

ইণ্টারভ্যাল হইল। বন্ধুটি পান কিনিবার জন্য বাহিরে গেল।

আমার বিবাহের কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতে-ছিলাম, ভাবিলাম এইবার মোলায়েম করিয়া বলিয়া ফেলি বন্ধুপত্নীর নিকট।

কিন্তু বন্ধুপত্নীও যে আর একটি কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, তাহা বুঝি নাই। বলিলেন—জানেন একটা কথা বলি। সেই যে আমাদের দেশের মেয়েটির কথা বলেছিলুম মনে আছে? সেই মণিমালা?

—হ্যাঁ, খুব আছে।

মনে মনে একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম।

—এই গত পৌষ মাসে শিবতলায় আবার তার সঙ্গে দেখা। দু-বছর দেখা হয় নি, কথা আর ফুরুতে চায় না। তার বিয়ে হয় নি এখনও। কেন হয় নি সে-কথা আমি জিজ্ঞেস করি নি, তবে ভাবে বোঝা তো যাচ্ছে ও-রকম গরিব-ঘরের মেয়ের কেন বিয়ে হ'তে দেরি হয়।

আমি কথা বলিবার জন্যই বলিলাম—হ্যাঁ, তা বইকি।

—তার পর শুনুন, কথায় কথায় কলকাতার কথা উঠল। সে কখনও কলকাতা দেখে নি। আমি হেসে বললুম—আচ্ছা, তোমায় শীগ্‌গির কলকাতা দেখাচ্ছি। এ-কথায় মেয়েটি হাসলে। ভারি বুদ্ধিমতী মেয়ে, ও বুঝতে পেরেছে আমি কি বলছি। একটু পরে নিজেই বলছে—আপনাদের বাড়ীতে সেই যে ভদ্রলোক আসতেন, তিনি আর আসেন না? আমি বললাম—অনেক দিন আসেন নি, তার পর হেসে বললাম—তবে একটা কথা জানি, তিনি এখনও বিয়ে করেন নি, তাহলে একখানা নেমন্তন্নের চিঠি অন্ততঃ আমরা পেতাম নিশ্চয়ই। মেয়েটি হেসে চুপ করে রইল। আমার বেশ মনে হয় সে এখনও মনে মনে ভাবে আপনি তাকে বিয়ে করবেন। তার উপর আবার শুনুন, হয়তো আমার উচিত হয় নি এত কথা বলা—আসবার সময় আবার তাকে বললাম—তাহলে কিন্তু এবার কলকাতা দেখার ব্যবস্থা করছি। মেয়েটির লজ্জা হ'ল কিন্তু মুখ দেখে মনে হ'ল ভারি খুশী হয়ে উঠেছে মনে মনে। মুখে কেবল একটা কথা বলেছিল উঠে আসবার সময়। যেন তাচ্ছিল্যের সুরে হঠাৎ বললে—আমার আর অমত কি, তবে তুমি ভাই দিদিমাকে একবার ব'লো। সত্যিই সে আপনার আশায় আশায় রয়েছে, এ আমি জোর ক'রে বলতে পারি। যা বলেছে, মেয়েমানুষ তার চেয়ে আর কি বেশী বলবে? এ দোষ আমারই, সেজন্যে ওঁর সামনে বললাম না। উনি শুনলে রাগ করবেন। আমার অনুরোধ, ঠাকুরপো, দয়া করে গরিব-ঘরের মেয়েটাকে নিয়ে তাদের দায় উদ্ধার করুন। আপনি তাকে নিয়ে জীবনে সুখী হবেন, একথা বলতে পারি। অমন সুশ্রী সরলা, শান্ত মেয়ে পাবেন না—হ'লই বা গরিব?

আমার বন্ধু পান কিনিয়া ফিরিয়া আসাতে কথাটা চাপা পড়িল।

অতঃপর আর আমার বিবাহের কথা ইহাদের নিকট বলিতে পারিলাম না। হয়তো একটু গর্ব্ব করিয়াই বলিতাম আমার স্ত্রী সত্যই সুন্দরী, এমন কি ইহাও ভাবিতেছিলাম এক দিন উভয়কে বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া স্ত্রীর গান শুনাইয়া দিব—কিন্তু বন্ধুপত্নীর সহিত কথাবার্ত্তার পরে আমার মুখ যেন কে চাপিয়া ধরিল।

কেন যে এমন সব ধরণের ব্যাপার ঘটে!

কোথায় কাহাকে কে খোসগল্পের ছলে কি বলিল, তাহাই শুনিয়া একটি সরলা পল্লীবালিকা মনে কি জানি কি সব স্বপ্নজাল বুনিতেছে, এখনও অথচ যাহাকে ঘিরিয়া এ স্বপ্ন রচনা—এ বিষয়ে সে কিছুই জানে না, সে দিব্য আরামে চাল দিয়া কলিকাতায় বেড়াইতেছে, বিয়ে-থাওয়া করিয়া নববধূকে লইয়া মশগুল হইয়া মহাসুখে দিন কাটাইতেছে!

সেই হইতে এই কয় মাস সুদূর রাঢ় অঞ্চলের একটি অদেখা পাড়াগাঁয়ের মেয়ের কথা আমি ক্রমাগত ভুলিবার চেষ্টা করিতেছি।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্ধকার যুগ

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্‌-এ

৩

কোম্পানীর অন্ধকার যুগ; খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাচার্য্যগণের আগমন

দেশীয় লোকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য কোন আয়োজন করিতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম প্রথম আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণের সুদীর্ঘ-কালব্যাপী আন্দোলনের ফলে অবশেষে কোম্পানী এই কার্য্যে ব্রতী হন।

বহু কাল পর্য্যন্ত কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের ধর্ম্ম ও নীতির অবস্থা এতই হীন ছিল যে, এ দেশে শিক্ষাবিস্তার করা দূরে থাকুক, এ দেশের লোকদের কল্যাণের জন্য কোনও চিন্তা তাঁহাদের অন্তরে উদয় হওয়া পর্য্যন্ত অসম্ভব ছিল। খ্রীষ্টীয় পাদরীগণ ও মিশনরীগণ সেই সময়ে কি করিয়াছিলেন, এবং মিশনরীগণ ক্রমশঃ অন্যের সহায়তায় বলশালী হইয়া কিরূপে কোম্পানীকে শিক্ষাদানকার্য্যে ব্রতী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে সেই সকল বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে প্রকাশিত ২ সংখ্যক প্রস্তাবে কলিকাতায় বাঙ্গালীদের বসতি ও প্রতিপত্তির বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় বঙ্গে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম শতাব্দীকে (১৬৯০—১৭৯০) দুই অর্দ্ধশতাব্দীতে ভাগ করিয়া লওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় অর্দ্ধশতাব্দীতে (১৭৪০—১৭৯০) ক্রমে কলিকাতা সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীদের বাসস্থান হইয়া উঠিতে লাগিল, ইহাও বলা হইয়াছিল।

অতঃপর আমাদের আলোচ্য বিষয়সকলকে পরিস্ফুট করিবার জন্য অন্য এক প্রকার কালবিভাগ করিয়া লইতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত এক শতাব্দীর শেষার্দ্ধে অনেক বৃহৎ ব্যাপার ঘটে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ; ১৭৬৫ সালে কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তি; ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট; ১৭৭৪ সালে কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা। এই সকলের ফলে কোম্পানীর কার্য্যে নানা গুরুতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। "১৭৬৫ সাল হইতে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী কার্য্যের ভার ইংরাজদিগের প্রতি অর্পিত হইলে, বহু বৎসর ধরিয়া ফৌজদারী কার্য্যের ভার মুসলমান নবাবের হস্তেই ছিল। ইহাতে রাজকার্য্যের সুশৃঙ্খলা না হইয়া ঘোর বিশৃঙ্খলাই উপস্থিত হয়। ক্রমে সে নিয়ম রহিত হইয়া বিচারকার্য্যের সুশৃঙ্খলা বিধানের জন্য কলিকাতাতে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়, এবং দেওয়ানী আদালতের ন্যায় নানা স্থানে ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হয়।"[৬] এই সকলের দ্বারা অন্ততঃ কলিকাতার ও তৎসন্নিহিত স্থান সকলের[৭] কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের অবস্থা কিঞ্চিৎ উন্নত হয়। কারণ, সুপ্রীম কোর্ট স্থাপনের পর হইতে কোম্পানীর চাকরীসূত্রে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ইংরেজ এ দেশে আসিতে লাগিলেন। তখন হইতে কর্ম্ম ও নীতি হিসাবেও কোম্পানীর শ্রেষ্ঠ কাল আরম্ভ হইল।

আমরা ১৭৭৩ সাল পর্য্যন্ত কালকে কোম্পানীর 'অন্ধকার যুগ' এবং ১৭৭৪ ও তৎপরবর্ত্তী কালকে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করি। বর্ত্তমান প্রবন্ধের তিন খণ্ডে কেবল এই অন্ধকার যুগের বিষয়েই আলোচনা করিতে হইবে।

এই অন্ধকার যুগের মধ্যে কোম্পানী এক বার নব ভাবে গঠিত হইয়া যায়। তাহার বৃত্তান্ত এইরূপ। ১৬০০ সালে রাণী এলিজাবেথ "Governors and Company of Merchants of London trading into the East Indies" এই নামে এক চার্টার প্রদান করেন। তাহাতে এই কোম্পানীকে পূর্ব্বদেশে বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকার দান করা হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে রাজদত্ত এই একচেটিয়া অধিকার না মানিয়া অন্যান্য অনেক বণিক

বে-আইনী ভাবে ব্যবসা করিতে আরম্ভ করে। তৎকালীন অনেক কাগজপত্রে এই সকল লোককে অবজ্ঞাভরে 'ইণ্টারলোপার্স' (interlopers) বলা হইত। ১৬৯৮ সালে ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় উইলিয়ম তাহাদিগকেও অংশী করিয়া লইয়া একটি নূতন কোম্পানী গঠন করিবার জন্ত একটি নূতন চার্টার দান করিলেন। এই নূতন কোম্পানী ১৭০৮ সালে গঠিত হইল। নূতন কোম্পানীর নাম হইল The United Company of Merchants of England trading to the East Indies, অথবা সংক্ষেপে 'New East India Company'. এজন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের কোন কোন উদ্ধৃতোক্তিতে নূতন কোম্পানী (New Company) ও পুরাতন কোম্পানী (Old Company) এই দুই নাম দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এই সকল কোম্পানী যাহাতে তাহাদের অধিকৃত স্থান সকলে কেবল বৈষয়িক কার্য্যের জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত না করেন, ধর্ম্মাচার্য্যও নিযুক্ত করেন, এজন্য ইংলণ্ডের পাদরীগণ প্রথম হইতেই চেষ্টিত ছিলেন।

কোম্পানী প্রথম প্রথম তাহাদের এই অনুরোধে তেমন মনোযোগ প্রদান অথবা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু ক্রমে পাদরীগণের অধ্যবসায়ের সুফল ফলিতে লাগিল। ১৬৭৭/৮ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে[৮] পুরাতন কোম্পানীর ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি লিখিয়া জানাইলেন,[৯] "The East India Company has resolved to endeavour the advance and spreading of the gospel in India;" এবং এ কার্য্যের জন্য উপযুক্ত লোকদিগকে আবেদন করিতে আহ্বান করিলেন। ১৬৭০ সালের ৬ই জুলাই কোর্ট অব ডিরেক্টর্‌স্ বোম্বাই নগরের জন্য এক জন চ্যাপ্‌লেন নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তখনও কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ নিজ পত্নীগণকে ভারতবর্ষে লইয়া আসিতেন না। সুতরাং তাহাদের চ্যাপ্‌লেনকে কেবল রবিবারের উপাসনা এবং কাহারও মৃত্যু হইলে সমাধিকালে উপাসনা (burial service) সম্পন্ন করিতে হইত। নামকরণ (baptism) ও বিবাহাদি অনুষ্ঠানের কার্য্য প্রায় করিতে হইত না। বোম্বাইর চ্যাপ্‌লেনকে এই ভার দেওয়া হইল যে, তিনি যেন ঐ অঞ্চলের পোর্ত্তুগীজদিগকে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম হইতে প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্ম্মে আনয়ন করাও তাঁহার কর্ত্তব্যের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন।

ইহার পর হইতে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত দেখা যায় যে কোম্পানীর নিযুক্ত পাদরীগণ 'প্রচার কার্য্য' (mission work) বলিলে বুঝিতেন কেবল পোর্ত্তুগীজ-বংশীয় য়ুরেশীয়গণকে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট করা। ১৬৯৮ সালের বিবরণের সংশ্রবে Hyde লিখিতেছেন[১০] :—

"Their (Chaplains') duty…was to try and induce the Portuguese half-castes to conform to the Church of England, and after that to propagate the Gospel, if possible, among the natives who had come into the service or under the influence of the Company'

১৭০২ সালেই নূতন কোম্পানীর চার্টার লিখিত হয়। সেই চার্টারে এই তিনটি ধারা যুক্ত করিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক ধর্ম্মাচার্য্য নিয়োগের প্রথাটিকে আরও পাকা করা হইল[১১] :—

"(1) The Company must maintain one Minister in every garrison or superior factory which the same Company shall have in the East Indies."

"(7) All Ministers within a year of their arrival shall learn the Portuguese language,"

"(8) And shall apply themselves to learn the native language of the country where they shall reside, the better to enable them to instruct the Gentons (*alias* Gentoos) ১২ that shall be servants or slaves of the said Company, or of their agents, in the Protestant Religion."

ইহার পর ১৭১৩/৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে কোর্ট অব ডিরেক্টর্‌স্ পুনরায় নূতন কোম্পানীর নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন,[১৩]

"It is proper here to tell you that since the entire union of the two Companys, we act on the fact of the New Company's Charter which directs that the Company shall constantly maintain in every of their Garrison and Superior Factory one Minister, and that all such Ministers …shall be obliged to learn the Portuguese language, and shall apply themselves to learn

the native language of the country where they shall reside, the better to instruct the Gentiles that shall be servants or slaves of the Company and of their agents, in the Protestant Religion."

৪

কোম্পানীর অন্ধকার যুগে কর্ম্মচারিগণের ধর্ম্ম ও নীতির অবস্থা

কোম্পানীর কোর্ট অব্ ডিরেক্টরস্ তো ইংলণ্ড হইতে এই প্রকারে ভারতবর্ষে পাদরী নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু সেই পাদরীগণ ভারতে আসিয়া কি দেখিলেন ও কিরূপ অবস্থার মধ্যে পতিত হইলেন? তাঁহারা আসিয়া অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন যে কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের জীবন অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল ও মলিন। তাঁহারা তাঁহাদের অভ্যস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়িবেন না; তাঁহারা পাদরীগণের উপদেশ ভৎ‌র্সনা কিছুই মানিতে প্রস্তুত নহেন। স্বদেশে থাকিলে তাঁহারা সামাজিক শাসনের দ্বারা সংশোধিত হইতেন; কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁহারা একচ্ছত্র প্রভু। পাদরীদের বেতন কোম্পানীর ভারতীয় অর্থকোষ হইতে দেওয়া হইত বলিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ পাদরীদিগকে স্পর্দ্ধা সহকারে অবজ্ঞা করিতেন। পুরাতন কোম্পানীর জীবনকালের শেষ ভাগে (১৭০১ কিংবা ১৭০২ সালে) রেভারেণ্ড বেঞ্জামিন্ আডাম্‌স্ (Rev. Benjamin Adams, M. A.) নামক একজন নবনিযুক্ত চ্যাপ্‌লেন স্বদেশে যে পত্র লিখেন, নিম্নে তাহার কোন কোন স্থল উদ্ধৃত হইতেছে[১৪] :—

"The Missionary Clergy abroad live under great discouragement and disadvantage . . . For, to say nothing of the ill-treatment they meet with on all hands, resulting sometimes from the opposition of their Chiefs, who have no other notion of Chaplains, but that they are Companye's servants, . . . 'tis observable that it is not in their power to act but by Legal Process upon any emergent occasion when Instances of Notorious Wickedness present themselves. . . . Hence it comes to pass that they must suffer silently, being incapacitated to right themselves upon any Injury or Indignity offered, or (which is much worse) to vindicate the honour of our Holy Religion and Lawes from the encroachments of Libertinism and Prophaneness. . . . Were the Injuryes and Indignities small and trivial, . . . a man would choose to bear them with patience rather than give himself the trouble of representing them to superiors. But notorious crimes had need be notoriously represented, or Infection would grow too strong and Epidemicla" ইহার পর Hyde আবার লিখিতেছেন—After giving "examples of certain of the gross scandals of the time," [the letter] continues,—"Several things of this Nature . . . occur daily, to the great Scandal of our Christian Profession among other Europeans, not to mention how easily the more strict and reserv'd among the Heathens may reproach us in that particular Enormity, which I have been speaking of."

পঞ্চাশ বৎসর পরেও এই অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইল না। ১৭৫২ সালের ৮ই জানুয়ারী তারিখে ইংলণ্ডের কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্‌স্ বিরক্ত হইয়া ফোর্ট উইলিয়মের কাউন্সিলের নিকট এইরূপ পত্র লিখিলেন[১৫] :—

"Much has been reported of the great licentiousness which prevails in your place, which we do not choose particularly to mention, as the same may be evident to every rational mind. The evils resulting therefrom to those there and to the Company cannot but be apparent, and it is high time proper methods be applied for producing such a reformation as comports with Laws of sound Religion and Morality, which are in themselves inseparable. We depend upon you, who are Principals in the management, to set a real good example and to influence others to follow the same, and in such a manner as that Virtue, Decency and Order be well established, and thereby induce the natives around you to entertain the same High Opinion which they formerly had of English honour and integrity: a point of the highest moment to us as to yourselves, and if any are found so bad as not to amend their conduct in such instances as require it, we expect you

do faithfully represent the same to us for our treating them as becomes the welfare of the Company."

এই উপদেশেরও কোনও ফল ফলিল না। কোম্পানীর ভারতবর্ষস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ এই উপদেশের প্রতি বিদ্রূপ করিতে ও ইহা অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। তখন কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্‌স্ ফোর্ট উইলিয়মস্থ গভর্ণর ও কাউন্সিলকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করিতে ও ভয় প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৫৪ সালের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্‌স্ লিখিতেছেন[১৬] :—

"We are well assured that the paragraph in our letter of the 8th January 1752, relating to the prevailing licentiousness of your place, was received by many of our servants' in superior stations with great contempt, and was the subject of much indecent ridicule. But whatever term you may give to our admonitions, call it Preaching or what you please, unless a stop is put to the present licentious career, we can have no dependence upon the integrity of our servants now or in future; for it is too melancholy a truth that the younger class tread too closely upon the heels of their superiors, and as far as their circumstances will admit, and even further, copy bad examples which are continually before their eyes. After what has passed we cannot hope for much success by expostulation. We shall therefore make use of the authority we have over you as masters, that will be observed if you value a continuance in our service; and you are accordingly to comply most punctually with the following commands, viz :—

(1) That the Governor and Council and all the rest of our servants, both Civil and Military, do constantly and regularly attend the Divine Worship in Church every Sunday, unless prevented by sickness or some other cause, and that all the common soldiers who are not on duty or prevented by sickness be all so obliged to attend.

(2) That the Governor and Council do carefully attend to the morals and manner of life of all our servants in general, and reprove and admonish them where and whenever it shall be found necessary.

(3) That all our superior servants do avoid, as much as their several stations will admit of it, an expensive manner of living, and consider that as the Representatives of a body of merchants a decent frugality will be much more in character.

(4) That you take particular care that our young servants do not launch into expense beyound their incomes, especially upon their just arrival. And we here lay it down as a standing and positive command that no writer be allowed to keep a Pallacke,[১৭] Horse, or Chaise during the term of his writership.

(5) That you set apart one day in every quarter of a year, and oftener if you find it necessary, to enquire into the general conduct and behaviour of all our servants before the Council, and enter the result thereof in your diary for our observation.

We do not think it necessary to give such a direction with regard to our servants in Council, because we are, and always can be, well acquainted with their characters without a formal enquiry."

এই পত্রে কোম্পানীর কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্‌স্ কলিকাতাস্থ কাউন্সিলকে স্পষ্টতঃ বলিলেন, "আমরা তোমাদের কর্তৃপক্ষ (masters) রূপে তোমাদিগকে আদেশ (command) করিতেছি যে, আমাদের চাকরীতে বহাল থাকিতে হইলে (if you value a continuance in our service) তোমাদিগকে অমুক অমুক নিয়ম, মান্য করিয়া চলিতে হইবে"। এই দৃঢ় আদেশ-বাক্যের কিঞ্চিৎ ফল ফলিল। ১৭৫৪ সালের ২২শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতাস্থ কাউন্সিলে এই নির্দ্ধারণ গৃহীত হইল[১৮] :—

"Agreed that the servants, Covenanted and Military Officers be advised of the Company's orders with relation to their due attendance at church, and required to give obedience thereto.'

এই নির্দ্ধারণের দ্বারা গির্জ্জার উপাসনায় উপস্থিতি বিষয়ে কোর্ট অব ডিরেক্টর্‌সের আদেশের প্রতি কিঞ্চিৎ সম্মান প্রদর্শিত হইল বটে ; কিন্তু অন্য কোনও বিষয়ে কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের আচরণ ও চরিত্রের

বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল না। যে লঘু আমোদপ্রিয়তা, দুশ্চরিত্রতা, বিলাসিতা ও বহুব্যয়শীলতার বিরুদ্ধে কোর্ট এত কথা লিখিয়াছিলেন, তাহা তেমনই রহিয়া গেল। কর্ম্মচারিগণ মধ্যে মধ্যে এই সকল দোষ অস্বীকার করিয়া পত্র লিখিতেন, কিন্তু কোর্ট তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। ১৭৫৫ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে কোর্ট অব ডিরেক্টর্‌স্ পুনরায় কাউন্সিলকে লিখিতেছেন[১৯] :—

"It was and still continues necessary that you are at all times ready to check and prevent the expensive manner of living and the strong bias to pleasure which notwithstanding what you say to the contrary, we well know too much prevails amongst all ranks and degrees of our servants in Bengal. And we do assure you it will give us great satisfaction to find by your actions that we shall have no further reason to complain on this head."

ইহার অল্প কাল পরেই কোম্পানীর সহিত বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌলার সংঘর্ষণ ঘটে। 'অন্ধকূপ-হত্যা' ও পলাশীর যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। আমাদের এ আলোচনাতে সে সকল প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই।

পলাশীর যুদ্ধের অল্প কাল পরে (১৭৬৫ সালে) বঙ্গদেশের দেওয়ানী কোম্পানীর হাতে আসিল। কর্ম্মচারীদিগকে এক দল বণিকের প্রতিনিধির (Representatives of a body of merchants-এর) অনুরূপ মিতব্যয়িতার (decent frugalityর) সহিত চলিতে বলা তখন আর সমীচীন বোধ হইল না। কোর্ট মনে করিলেন, অতঃপর দেশীয় লোকেরা যাহাতে ইংরেজ সরকারের কর্ম্মচারীদিগকে সম্মানের চক্ষে দর্শন করে, এবং ঐ কর্ম্মচারিগণও যাহাতে উৎকোচ গ্রহণের প্রলোভনে পতিত না হন, এই উভয় উদ্দেশ্যে রাজকর্ম্মচারিগণকে উচ্চ হারে বেতন দিতে হইবে। এই উচ্চ হার এত অধিক উচ্চ হইল যে কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ বাবুগিরিতে মুসলমান আমলের নবাবদেরও ছাড়াইয়া চলিলেন। ভারতবর্ষে গেলেই ধনকুবের হইয়া ফিরিয়া আসা যায়, এই সমাচার ইংলণ্ডে ছড়াইয়া পড়িল। ইংলণ্ড হইতে অর্থগৃধ্নু লোক দলে দলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে চাকরী লইবার আশায় এ দেশে আসিতে লাগিল। কোম্পানীও তাহাদিগকে আবশ্যক ও অনাবশ্যক মোটা বেতনের নানা কাজে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার ফল ভাল হইল না। উৎকোচ-গ্রহণও বন্ধ হইল না; কোম্পানীর কুঠীওয়ালা সাহেবদিগকে (factors) জেলার কালেক্টর নিযুক্ত করার ফলে[২০] এই রাজকর্ম্মচারিগণ প্রলোভনের ঊর্দ্ধেও থাকিতে পারিলেন না। ইংলণ্ডে কোম্পানীর এই কর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন উত্থিত হইতে লাগিল।[২১] এই সময়ে ইংরেজেরা বেতন বাণিজ্য উৎকোচ ও উৎপীড়ন সূত্রে যে পরিমাণ ধন এ দেশ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহার কাহিনী অতীব শোচনীয়। এই সম্পর্কে একটি স্মরণ-যোগ্য ঘটনা এই যে, ক্লাইভ মীর জাফরকে গদিতে বসাইয়া তাঁহার নিকট হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা 'পারিতোষিক' লইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। এমন সময়ে ১৭৬৭ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী কোর্ট অব্ ডিরেক্টরস্ আদেশ দিলেন যে আর নবাবদের নিকট হইতে কেহ কোন 'উপহার' গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তখন সেই পাঁচ লক্ষ টাকার সহিত আরও তিন লক্ষ টাকা যোগ করিয়া যুদ্ধে আহত ইংরেজ সৈনিকগণের জন্য ও যুদ্ধে হত ইংরেজ সৈনিকগণের বিধবাদিগের জন্য 'লর্ড ক্লাইভ্‌স্ ফণ্ড' (Lord Clive's Fund) নামে একটি ফণ্ড সৃষ্টি করা হইল।[২২] কোম্পানী এই সময়ে এ দেশ হইতে এমন নির্ম্মম ভাবে অর্থ শোষণ করিয়াছিলেন যে, যে-বৎসর (১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ১১৭৬ বঙ্গাব্দে) 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে প্রসিদ্ধ দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হয়, সে বৎসরও কোম্পানী নিরন্ন প্রজাদিগের নিকট হইতে সম্পূর্ণ রাজস্ব আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। এই বৎসরের রাজস্ব আদায় যে কোম্পানীর ইতিহাসের দুরপনেয় কলঙ্ক, তাহা ইংরেজেরাও অতিশয় খেদের সহিত স্বীকার করিয়াছেন।[২৩]

এই ইংরেজ রাজকর্ম্মচারিগণ ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া 'নবাব' (Nabob) নামে পরিচিত হইতেন। ইঁহাদের অর্থগৃধ্নুতার ফলে একবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পথে ব

ফেল হইবার উপক্রম হয়; ১৭৭২ সালে কোম্পানীকে দশ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ করিতে হয়। ইহার পরের বৎসরের রেগুলেটিং অ্যাক্টের (Regulating Actএর) দ্বারা কোম্পানী স্বীয় কর্ম্মচারীদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে বশে আনিবার চেষ্টা করেন।

এই কর্ম্মচারিগণের চরিত্রহীনতার কথা উইলিয়ম কেরীর চরিতাখ্যায়ক জর্জ্জ স্মিথ্ (George Smith) অতিশয় দুঃখের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহাদের উপপত্নীগণের গর্ভজাত সন্তানের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইল যে, সিরাজ উদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতার গির্জ্জা ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে টাকা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মুরশিদাবাদ হইতে পাইয়াছিলেন, তাহা দ্বারা নূতন গির্জ্জা নির্ম্মাণের চেষ্টা না করিয়া ঐ সন্তানগণের শিক্ষার জন্যই তাহা ব্যয় করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে ফ্রি স্কুল (Free School) প্রতিষ্ঠিত হইল; বর্ত্তমান 'ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট্' (Free School Street) তাহার নাম বহন করিতেছে। জর্জ্জ স্মিথ বলেন, ভারত-প্রত্যাগত ইংরেজ নবাব (Nabob) গণের দ্বারা সমগ্র ইংলণ্ডের নৈতিক হাওয়া দূষিত হইয়া যাইবে, লোকের মনে এক সময়ে এই আশঙ্কাও হইয়াছিল।[২৪]

এই কালের মধ্যে কোম্পানীর বেতনভোগী যে সকল ইংরেজ ধর্ম্মযাজক এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কি করিতেছিলেন? দুঃখের সহিত বলিতে হয়, তাঁহারা এ দেশের প্রায় কোনও উপকার করেন নাই; এবং তাঁহাদের স্বদেশীয় রাজকর্ম্মচারিগণের চরিত্র সংশোধন বিষয়ে ইচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহারা প্রায় কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অর্থগৃধ্নুতা দোষ তাঁহাদের কাহারও কাহারও মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের (অর্থাৎ মান্দ্রাজের) দ্বিতীয় চ্যাপ্লেন রেভারেণ্ড জন্ ইভান্স্ (Rev. John Evans) ব্যবসা করিয়া, (এমন কি, পূর্ব্বোক্ত অবৈধ বাণিজ্যকারী অর্থাৎ ইণ্টারলোপারদিগের সঙ্গে গোপনে গোপনে বে-আইনী বাণিজ্য লিপ্ত হইয়া) ত্রিশ হাজার পাউণ্ড সম্পত্তি করিয়াছিলেন। কোম্পানী তাঁহার ব্যবসা করার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন নাই; কিন্তু ইণ্টারলোপারদিগের সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে বিরক্ত হইয়াছিলেন।[২৫] পরিশেষে অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, ধর্ম্মযাজকেরাও সব সময়ে সচ্চরিত্র থাকিতে পারিতেন না। ১৭৯৫ সালে গভর্ণর-জেনারেল সর্ জন্ শোর (Sir John Shore) ইংলণ্ডে ডিরেক্টর-গণকে এই কথা লিখিয়া পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।[২৬]

এই সময়ের একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ এই স্থানেই করা আবশ্যক। আমরা আগামী কোন কোন প্রবন্ধে দেখিতে পাইব যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার ও ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার এই উভয় উদ্দেশ্যে এ দেশে আগমনেচ্ছু মিশনরীগণকে কোম্পানী অতিশয় বাধা দিতেছিলেন। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের অল্প কাল পরে (১৭৫৮ সালে) কলিকাতার চ্যাপ্লেন রেভারেণ্ড হেন্‌রী বাট্‌লার সাহেব (Rev. Henry Butler) মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতে মিশনরী কিয়ারন্যাণ্ডার্ সাহেবকে (Rev. John Zachary Kiernander) কলিকাতায় আহ্বান করিয়া লইয়া আসেন। কিয়ারন্যাণ্ডার্ সাহেবের স্বদেশ ছিল সুইডেন; কিন্তু তিনি চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের মিশনরী রূপে মান্দ্রাজের খ্রীষ্টিয় জ্ঞানপ্রচারিণী সভার (Society for the Propagation of Christian Knowledgeএর) সংশ্রবে ইতিপূর্ব্বে ১৮ বৎসর কাজ করিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড বাটলারের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে কলিকাতায় পোর্ত্তুগীজদের ও বাঙ্গালীদের উভয়েরই মধ্যে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্ম প্রচার হয়; এই উদ্দেশ্যে তিনি কিয়ারন্যাণ্ডার সাহেবকে কলিকাতায় আহ্বান করেন। স্বয়ং বাটলার সাহেব কলিকাতার দুই সহস্র ইংরেজের ও তদধিক প্রোটেষ্ট্যাণ্ট য়ুরোপীয়দিগের পৌরোহিত্য করিয়া আর ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য করিবার সময় পাইতেন না। কিয়ারন্যাণ্ডার্ সাহেব বাটলার সাহেবের ব্যবস্থানুসারে কলিকাতার বড় গির্জ্জাতে (Presidency Churchএ) প্রতি রবিবার অপরাহ্নে পোর্ত্তুগীজদিগের জন্য তাহাদের ভাষায় উপাসনা করিতেন। ক্রমে কিয়ারন্যাণ্ডারকে কলিকাতায় একটি মিশন চর্চ্চ (Protestant Mission Church) এবং একটি মিশন্ স্কুল,—এ উভয়ই চালাইতে হইত। মিশন

স্কুলে তিনি নিজে ইংরেজী ও পোর্ত্তুগীজ উভয় ভাষা পড়াইতেন। (তিনি তামিল ভাষা জানিতেন, কিন্তু বাংলা ভাল শিখিতে পারেন নাই)। ১৭৫৯ সালে তাঁহার মিশন স্কুলে ৪৮টি ছাত্র ছিল বলিয়া জানা যায়; তাহার মধ্যে ইংরেজ ২০ জন, পোর্ত্তুগীজ ১৫ জন, আর্ম্মেনিয়ান ৭ জন ও বাঙ্গালী ৬ জন ছিল।[২৭] 'মিশনরী' নামে পরিচিত লোকদের মধ্যে বঙ্গদেশে কিয়ারন্থাণ্ডারই প্রথম; ইনি কেরী প্রভৃতিরও পূর্ব্বের লোক। কিন্তু কেরী প্রভৃতিকে কোম্পানী প্রথম প্রথম যেরূপ বাধা দিয়াছিলেন, ইঁহাকে সেরূপ বাধা দেন নাই। তাহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, প্রধানতঃ এ দেশের লোকের কাছে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার নয়, কিন্তু পোর্ত্তুগীজদিগকে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট করাই ইঁহার 'প্রচার কার্য্য' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। কলিকাতার বর্ত্তমান 'মিশন রো' (Mission Row) নামক রাজপথ কিয়ারন্থাণ্ডার্ সাহেবের সেই মিশন চর্চ্চ এবং মিশন স্কুলের স্মৃতি বহন করিতেছে। ঐ রাজপথস্থ একটি গির্জ্জার দ্বারে "Old Mission Church, Founded 1772", এই খোদিত লিপি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই সময়ে বঙ্গের গভর্ণর ওয়ারেন্ হেষ্টিংস সাহেব বিপত্নীক ছিলেন। তিনি কলিকাতাস্থ ব্যারন্ ইম্হফ্ (Baron Imhoff) নামক এক জন সম্ভ্রান্ত কিন্তু দরিদ্র জর্ম্মানের সুন্দরী পত্নীর প্রতি আসক্ত হন; এবং ইম্হফ্‌কে দেশে ফিরিয়া যাইতে ও তথায় গিয়া স্বীয় পত্নীকে বিবাহচ্ছেদের আদেশ (divorce) প্রেরণ করিতে প্ররোচিত করেন। সেই বিবাহচ্ছেদের আদেশ আসিতে বহু বিলম্ব হয়। অবশেষে ১৭৭৬ সালে, হেষ্টিংস যখন প্রায় হতাশ হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে ডিউক্ অব সাক্সনী (Duke of Saxony) প্রদত্ত জর্ম্মান ভাষায় লিখিত বিবাহচ্ছেদের আদেশপত্র (divorce) আসিল। তখন কিয়ারন্থাণ্ডার্ তাহার ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিয়া কাউণ্টেস্ ইম্হফের সঙ্গে হেষ্টিংসের বিবাহের সুবিধা করিয়া দিলেন।[২৮]

কিয়ারন্থাণ্ডারের একটি পত্র হইতে জানা যায় যে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দেও কলিকাতার অধিকাংশ অধিবাসী পোর্ত্তুগীজ ও য়ুরেশীয় ছিল। তিনি লিখিতেছেন,[২৯]

"The greatest part of the inhabitants of Calcutta being of a Popish persuasion, I have made it my business to give them the necessary instruction."

৫

কোম্পানীর অন্ধকার যুগে বঙ্গদেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস

আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে কোম্পানীর ইংলণ্ডস্থ ডিরেক্টরগণ প্রথম হইতেই ভারতবর্ষস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের ধর্ম্ম ও নীতির প্রতি দৃষ্টি রক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু এ দেশে শিক্ষা বিস্তার এবং এ দেশের লোকের ধর্ম্ম ও নীতির উৎকর্ষ বিষয়ে এ সময়ে তাঁহাদের মনের ভাব কিরূপ ছিল? এ সকল বিষয়ে তাঁহারা একান্ত উদাসীন ছিলেন। ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে; কারণ সে যুগে ইংলণ্ডেও গভর্ণমেণ্ট দেশে শিক্ষাবিস্তার কার্য্য আপন কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন নাই।

আমরা দেখিতে পাইব, ঐ প্রথম যুগ হইতেই ইংলণ্ড হইতে ইংরেজ মিশনরীগণ এ দেশে আসিয়া ভারতবাসী-দিগের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে ও আনুষঙ্গিক রূপে ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতবর্ষস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ এবং ইংলণ্ডস্থ ডিরেক্টরগণ উভয়েই এই প্রয়াসের ঘোরতর বিরুদ্ধতা করিতে লাগিলেন।

এই বিরোধের কারণ নানাবিধ। বিগত প্রস্তাবে উল্লিখিত কিয়ারন্যাণ্ডার্ সাহেব 'মিশনরী' ছিলেন বটে; কিন্তু কলিকাতায় আগমনের পর তাঁহার কাজ ছিল প্রধানতঃ বঙ্গদেশবাসী পোর্ত্তুগীজদিগের মধ্যে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্ম প্রচার করা। সম্ভবতঃ তখন হইতে তাঁহার বৃত্তি কোম্পানীই দান করিতেন। যে-সকল চ্যাপ্লেন বঙ্গদেশে আসিয়া ইংরেজ ও অন্যান্য য়ুরোপীয় ও য়ুরেশীয়দিগের পৌরোহিত্য করিতেন, তাঁহারা কেহই 'মিশনরী' ছিলেন না; তাঁহারা কেহই দেশীয়দিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন না। তাঁহারা সকলেই কোম্পানীর বেতনভোগী ছিলেন; অতএব প্রথম প্রথম স্বাধীনচিত্ত

থাকিলেও, কালক্রমে তাঁহারা সকলেই কোম্পানীর অধীন ও একান্ত নিরীহ মানুষ হইয়া উঠিতেন। কোম্পানী তাঁহাদিগকে ভয় করিতেন না। কিন্তু ইংরেজ 'মিশনরীগণ' এ দেশে আসিলে তাঁহারা তো আর কোম্পানীর অধীন হইবেন না; তাঁহারা কোম্পানীর কার্য্যকলাপ এবং কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের আচরণ দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই স্বাধীন ভাবে এ দেশে ও ইংলণ্ডে স্ব স্ব মতামত ব্যক্ত করিবেন। তাহার ফলে, কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা এত দিন যে-ভাবে চলিতেছিলেন, তাহাতে নানারূপ বাধা জন্মিবার সম্ভাবনা হইবে। কোর্ট অব ডিরেক্টর্স্ ভারতবর্ষস্থ কর্ম্মচারিগণের উপরে নিজেদের শাসন সুদৃঢ় রাখিতে ব্যগ্র ছিলেন বটে; কিন্তু স্বাধীনচিত্ত অন্য এক দল য়ুরোপীয় ভারতে আসিয়া কোম্পানীর কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিবে, ইহা তাহাদেরও মনঃপূত ছিল না।

ইংলণ্ডস্থ মিশনরীগণের একটি বিশেষ আগ্রহের বিষয় ছিল, ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার করা। কিন্তু এই সময়ে কোম্পানীর ভারতীয় কর্ম্মচারিগণের (ও তাহাদের অনুসরণে ইংলণ্ডস্থ ডিরেক্টরগণের) মনের অভিপ্রায় এই ছিল যে এ দেশে যেন শিক্ষার বিস্তার না হয়। বঙ্গদেশের দেওয়ানী প্রাপ্তির পর কোম্পানীকে শাসনকার্য্যেও হাত দিতে হইল বটে; কিন্তু কোম্পানীর প্রধান উদ্দেশ্য তখনও ছিল বাণিজ্য ও অর্থ সঞ্চয়।[৩০] কোম্পানীর তৎকালীন নানাবিধ সরকারী কাগজপত্রে এই ভাবের উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেশীয় লোকেরা যত মূর্খ ও অজ্ঞান অবস্থায় থাকে, কোম্পানীর বাণিজ্যের পক্ষে ও প্রতিপত্তির পক্ষে ততই ভাল। এই সকল উক্তি পাঠ করিলে হৃদয় অতিশয় ক্লিষ্ট হয়।

কোম্পানীর এই কর্ম্মপদ্ধতির (policy-র) ফল অচিরেই ফলিতে লাগিল। ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ৮০,০০০ দেশীয় বিদ্যালয় (টোল, পাঠশালা, মক্তব প্রভৃতি) ছিল; অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক ৪০০ জন অধিবাসীর জন্য একটি করিয়া কোন-না-কোন শ্রেণীর দেশীয় বিদ্যালয় ছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের রাজত্বকালে রাজা, সুবাদার ও বড় বড় ভূস্বামিগণ সর্ব্ববিধ বিদ্যালয় পরিচালন এবং সমুদয় বিশিষ্ট পণ্ডিত ও মৌলবীগণকে বৃত্তিদান প্রভৃতি কার্য্য নিজ নিজ কর্ত্তব্যের অন্তর্গত বলিয়া গণনা করিতেন। কিন্তু কোম্পানীর হাতে দেশের শাসনভার ন্যস্ত হইবার পর কিছু কাল পর্য্যন্ত দ্বিবিধ কারণে বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল, এবং পণ্ডিত ও মৌলবীগণের দুরবস্থা ঘটিতে লাগিল। প্রথমতঃ, রাজা (অর্থাৎ কোম্পানী) শিক্ষাবিস্তারের জন্য এক পয়সাও ব্যয় করিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামক পূর্ব্ব-বর্ণিত দেশব্যাপী অতি দারুণ দুর্ভিক্ষ, এবং তদুপরি কোম্পানী কর্ত্তৃক হৃদয়হীন অর্থশোষণ, এই উভয়ের ফলে দেশের সাধারণ প্রজা ও জমিদার সকলেই ঘোর দারিদ্র্যে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।[৩১]

আমরা ১৭৭৩ সাল পর্য্যন্ত সময়কে কোম্পানীর 'অন্ধকার যুগ' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছি। সত্য বটে, ইহার পরে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাজক এ দেশে আসিতে লাগিলেন; কিন্তু এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে কোম্পানীর 'অন্ধকার যুগ' যেন ইহার পরেও (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত) চলিতে লাগিল। ১৭৮৮ সালের ২০শে জুন তারিখে লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকটে কলিকাতাস্থ ব্লান্‌শার্ড, ওয়েন, কার্, ও ব্রাউন্ নামক (Thos. Blanshard and John Owen, chaplains to the Presidency, Robartes Carr, chaplain to the 4th Brigade, এবং David Brown, chaplain to the garrison of Fort William) চারি জন উদার-মনা চ্যাপ্‌লেন একযোগে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন কোম্পানীর এলাকার মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা দিবার জন্য স্কুল স্থাপন করেন; এইরূপ করিলে এ দেশের লোকেদের ধর্ম্ম ও নীতির উন্নতি, এবং ইংরেজী ভাষার সাহায্যে মামলা-মোকদ্দমা চালাইবার সুবিধা,—এই সমুদয় উপকার হইবে। পত্রখানি ব্যাকুলতায় পূর্ণ। কিন্তু ইহার কোন ফল হইল না; লর্ড কর্ণওয়ালিস্ চ্যাপ্‌লেনদের অনুরোধ রক্ষার জন্য কোন চেষ্টাই করিলেন না।

পত্রখানির কোন কোন স্থান এখানে উদ্ধৃত হইতেছে[৩২]:—

"Amidst the foremost inconveniences the people endure in their subjection to us, we may reckon their ignorance of the language of those who govern them. From this circumstance, the objects, the manners and maxims of Englishmen are very imperfectly comprehended by them, and the difficulty of removing their prejudices in every way increased.

They [Englishmen] who come early in life into this country acquire but to a small extent the language that is most common, and they who come at a more mature age give over the task in despair. It is by means of the English language alone that the people could in their own persons with speed and certainty prefer complaints. . . . The Mahomedans introduced their language with their conquest, and they felt the benefit of it, not only in the immediate intercourse it afforded them with the natives, but as it became the medium of Public Business and of Records.

It would be needless to recount in how many forms the use of our language would prove a bond of Union ; no one can judge better than your Lordship of the various political benefits which would arise from it.

It has been our wish to address you on the subject with a more immediate view to their moral and religious improvement. With whatever partiality the character of this people may have been viewed from a distance, their total want of morals has not been unobserved by those who approach them.···The most detestable vices are practised by them without remorse, and displayed without shame. Our Courts of Justice afford sad proof on what slender temptation they will violate the most sacred obligation of an oath, though administered with the solemn ties of their own religion.···The character of the people in their need of instruction is not to be estimated from a few studious and recluse men among them, or from the truths which may be occasionally found in their writings. The herd are depraved.···

From the consideration of these things it appears to us that the institution of Public Schools in proper situations for the purpose of teaching our language to the natives of these provinces would be ultimately attended with the happiest effects. The great desire they have of learning it in the neighbourhood of Fort William is well known ; and were the means more easy, there is reason to suppose they would not be less so in more distant places. ···

Thus ··· the beneficence of Great Britain would acquire a more glorious Empire over a benighted people than conquest has ever yet bestowed. ···

Of the liberality of the Court of Directors we can entertain no doubt. We have seen them very largely endowing an Institution for the Study of the Arabic Language.৩৩··· All civilized Governments have considered a provision for the instruction of the people as a necessary part of the expenses of the State. The Hindoos···have been profuse in this respect.···The Mahomedans, during their Government, afforded likewise ample Endowments for learning and its Professors; while the country under the Rule of Christians has seen no Institution for the Purest Religion upon earth.···

We wish, however, that the salary annext to the office of schoolmaster may be so moderate as rather to give occasion of zeal than avarice in those who undertake it."

চ্যাপ্‌লেনদের এই পত্রে এত অনুনয়-বিনয় আছে, ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদানের ফলে দেশীয় লোকদের নীতি ও ধর্ম্মের উন্নতির আশার কথা আছে, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের কথা আছে, হিন্দু ও মুসলমান রাজাগণের দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে ; তদুপরি কোর্ট অব ডিরেক্টর্‌সের সাহায্যের আশা, এবং স্বল্প ব্যয়ে মাষ্টার রাখিবার পরামর্শও আছে। কিন্তু কোন কথাই গভর্ণর-জেনারেলের হৃদয় স্পর্শ করিল না!

মন্তব্য

(৬) 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী এম্‌-এ প্রণীত ; তৃতীয় সংস্করণ ; এস্‌, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং, কলিকাতা ; ১১০, ১১১ পৃষ্ঠা। অতঃপর এই পুস্তককে কেবল 'রামতনু' এই ভাবে উল্লেখ করা হইবে।

(৭) "মফস্বলে কোম্পানীর ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু মফস্বলবাসী ইংরাজগণকে তাহার অধীন করা হইল না। তাঁহারা নামতঃ সুপ্রীম কোর্টের এলাকাধীন রহিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ

নিরঙ্কুশ হইয়া রহিলেন।" (রামতনু, ১১১)। অতএব যেমন এক দিকে এ সময়ে কলিকাতার ও সুপ্রীম কোর্টের প্রভাবাধীন স্থান সকলে ইংরেজগণের নৈতিক অবস্থা কিঞ্চিৎ উন্নত হইতে চলিল, তেমনি মফঃসলে অবনতি ঘটিতে লাগিল। উত্তরকালে ইহার ফলে মফঃসলের কুঠীয়াল সাহেবেরা ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। ১৮৫১ সালে 'কালা আইন' নামে পরিচিত চারিটি আইন প্রণয়নের দ্বারা ভারতবন্ধু বীটন সাহেব মফঃসলস্থ কুঠীয়াল সাহেবদিগকে কিঞ্চিৎ শৃঙ্খলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফল হইতে পারেন নাই।

(৮) য়ুরোপে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বড় দিন (Christmas Day) হইতে অর্থাৎ ২৫শে ডিসেম্বর হইতে নববর্ষ গণনা আরম্ভ হইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তৎপরিবর্ত্তে 'লেডী ডে' (Lady Day) অর্থাৎ ২৫শে মার্চ্চ হইতে নববর্ষ গণনা আরম্ভের রীতি হয়। ১লা জানুয়ারী হইতে নববর্ষ গণনার রীতিটি ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর নানা সময়ে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবর্ত্তিত হয়। স্কটলণ্ডে ১৬০০ সালেই ঐ রীতি গৃহীত হইল; কিন্তু ইংলণ্ড ১৭৫২ সালে, জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার (Julian Calendar) পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রেগোরিয়ান ক্যালেণ্ডার (Gregorian Calendar) গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে, ঐ রীতি অবলম্বন করেন। এজন্য ১৬০০ হইতে ১৭৫২ সাল পর্য্যন্ত কালের মধ্যে ইংলণ্ডে ও স্কটলণ্ডে ১লা জানুয়ারী হইতে ২৪শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত তারিখগুলিতে প্রায়ই দুই প্রকার অব্দনির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। উপরে লিখিত ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখটি বর্ত্তমান গণনারীতি অনুসারে ১৬৫৮ সালের তারিখ; কিন্তু প্রাচীন রীতি অনুসারে ১৬৫৭ সালের তারিখ।

(৯) Hyde, p. 46. (১০) Hyde, p. 48.

(১১) Hyde, pp. 39, 40. (১২) অর্থাৎ হিন্দুদিগকে। তখন 'হিন্দু' অর্থে Gentoo শব্দ ব্যবহৃত হইত। (১৩) Hyde, p. 64.

(১৪) Hyde, pp. 45, 46. (১৫) Hyde, pp. 100, 101. (১৬) Hyde, p. 101. (১৭) অর্থাৎ, পালকী। (১৮) Hyde, p. 100. (১৯) Hyde, p. 102. (২০) ৩০ সংখ্যক মন্তব্য দেখুন। (২১) *The History and Constitution of the Courts and Legislative Authorities in India*, by Herbert Cowell. (Tagore Law Lectures). 3rd Edition. Calcutta. Thacker, Spink & Co., 1894, p. 31. অতঃপর এই গ্রন্থ 'Cowell' এই ভাবে উল্লিখিত হইবে। (২২) *The Sunday Statesman*, Calcutta, 20th February 1938, p. 20.

(২৩) W. W. Hunter's *Annals of Rural Bengal*. 6th Edn. Smith, Elder & Co. 1883. Vol. I. pp. 19—64 ; *also*, App., pp. 399—421.

(২৪) George Smith's *Life of William Carey*, p. 68. অতঃপর এই পুস্তক 'George Smith' বলিয়া উল্লিখিত হইবে।

(২৫) Hyde, p. 19. (২৬) George Smith, p. 67.

(২৭) Hyde, pp. 119—129 ; George Smith, pp. 67—69 ; Binay Krishna Deb, pp. 63, 73, 75। শেষোক্ত পুস্তকের শেষোক্ত পৃষ্ঠায় এক স্থানে পোর্ত্তুগীজদিগকে "his race" বলা হইয়াছে; তাহা ভুল। পোর্ত্তুগীজ ভাষা পড়াইলেও কিয়ারন্যাণ্ডার পোর্ত্তুগীজ ছিলেন না; সুইডেনবাসী ছিলেন।

(২৮) Calcutta *Sunday Statesman*, 7th March 1938 p. 15. (২৯) Hyde, p. 130.

(৩০) "১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী যখন দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, তখন রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে লইতে হইল। ফৌজদারি কার্য্যের ভার মুরশিদাবাদের মুসলমান গবর্ণমেণ্টের হস্তেই থাকিল। যখন রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানীর হস্তে আসিল, তখন কোম্পানীর কুঠীওয়ালাগণই কালেক্টর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা জেলায় জেলায় থাকিয়া কোম্পানীর এজেণ্টের ন্যায় সওদাগরির তত্ত্বাবধান করিতেন, সেই সঙ্গে কালেক্টরের কাজও করিতেন। বণিকের ভাব তখনও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিল না। যেরূপে হউক, অর্থসংগ্রহ করিতে হইবে, এই ভাবটা তাঁহাদের মনে প্রবল থাকিল। আমরা দেশের রাজা, প্রজাদিগের সুখদুঃখের জন্য আমরা দায়ী, এ ভাব তাহাদের মনে প্রবেশ করিল না।" —'রামতনু', ৯৬ পৃঃ।

(৩১) B. D. Basu, *Education in India under the E. I. Company*, Modern Review Office, Calcutta, pp. 16, 17 দ্রষ্টব্য। কিন্তু এই গ্রন্থকার ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের উল্লেখ করেন নাই।—অতঃপর এই গ্রন্থকে কেবল 'B. D. Basu' এইরূপে নির্দ্দেশ করা হইবে।

(৩২) Hyde, pp. 215, 216.

(৩৩) ১৭৮০ কিম্বা ১৭৮১ সালে Calcutta Madrassa স্থাপনের দ্বারা। ষষ্ঠ প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

আরাসি-যামা। নদীর ধারে হোটেল

জাপান ভ্রমণ

শ্রীশান্তা দেবী

কোবের বাজারে বেড়াতে বেড়াতে দেখলাম এক জায়গায় এক গরীব পুতুলওয়ালা আমাদের দেশের মত একেবারে ফুটপাথে ব'সে পুতুল বিক্রি করছে। সাজানো দোকানের পুতুলের চেয়ে এগুলি অনেক সস্তা। সিংহলী ভদ্রলোকটি তাকে বললেন, "তোমার পুতুল বোধ হয় খেলো জিনিষ, টিকবে না।" বলবামাত্র বুড়ো জাপানী সেগুলিকে সজোরে মাটিতে আছড়ে দেখিয়ে দিল জিনিষগুলি নিতান্ত ভঙ্গুর নয়। পুতুল কিনে রাত্রে জাহাজে গিয়ে ঘুমোন গেল।

পরদিন সকালে কলকাতার এক বাঙালী ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হ'ল। ইনি বি-আই-এস্-এন্ জাহাজ কোম্পানীর ডাক্তার, তার পরদিনই আবার কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করবেন।

আমরা জাহাজের ব্রেকফাষ্ট খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম ষ্টেশনের উদ্দেশে, সেখানে বৈদ্যুতিক ট্রেন ধরতে হবে। ষ্টেশনে দাস মহাশয়, মিঃ আলি এবং দু-জন সিন্ধী ও গুজরাটী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁরা খুব ভদ্রতা করলেন। ট্রেন এসে পড়তেই দাস মশায়কে পথপ্রদর্শক ক'রে আমরা উঠে পড়লাম। বার বার চার বার ট্রেন বদল ক'রে তবে আমাদের গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছানো গেল। আজ ট্রেন থেকে পথের অনেক গ্রাম্য দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। ছোট ছোট কাঠের বাড়ীর চারি পাশে সবুজ বেড়া দেওয়া বাগান, এ দেশে বাগান না থাকলে বাড়ীর বোধ হয় কোন অর্থ হয় না। শহরের গলির মধ্যেও মানুষ দুই-চার হাত বাগান ক'রে রাখে সর্ব্বত্র, আর গ্রামের ত কথাই নেই। গ্রাম্য বাগানগুলির বেড়ার বাইরেই বড় বড় ক্ষেত। সে সময় অধিকাংশ ক্ষেতেই হয় শাক হচ্ছে, নয় লাইন ক'রে মাটি কাটা রয়েছে। গ্রাম্য বাড়ীর বারান্দার রেলিঙে আমাদের দেশের মতই বিছানার কাপড় শুকোচ্ছে, কিন্তু এত শীতের দেশেও সেগুলি আমাদের দেশের চেয়ে অনেক গুণে পরিষ্কার। গাছে ফুল নেই কিন্তু বিছানার কাপড়ে যেন টাটকা ফোটা
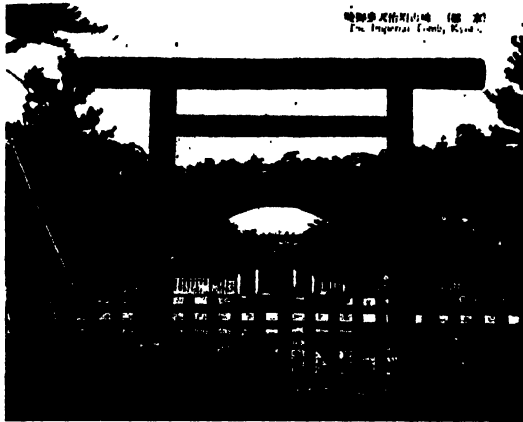
রাজসমাধি। কিয়োটো
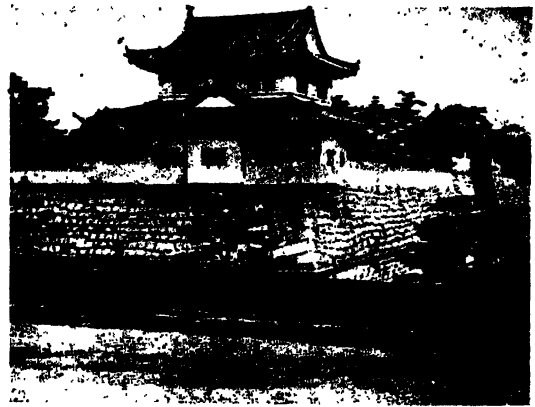
নিজো প্রাসাদ। কিয়োটো

ফুলের বাগান। বেশীর ভাগ বাড়ী কালো টালি দিয়ে ছাওয়া, মাঝে মাঝে অতি প্রাচীন ধরণে খুব পুরু মোটা খড়ের চালও আছে। খড়ের চালে আগুন লাগার সম্ভাবনা বেশী ব'লে দেশের কর্ত্তৃপক্ষ আজকাল খড়ের চাল তুলে দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। ঘরের কাছে দুটি একটি পত্রপুষ্পহীন চেরি গাছ তার শাখার কঙ্কাল মেলে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বা প্লাম গাছে দুটি একটি ফুলের কুঁড়ি দেখা দিয়েছে। এক আধ জায়গায় কচিৎ টিনের ভাঙা ঘরও আছে। কিন্তু জাপানে যত দিন ছিলাম, ভাঙা টিনের চাল এবং কুশ্রী ঘরবাড়ী চোখে প্রায় পড়ে নি। য়্যাকোহামা প্রভৃতি বন্দরের কাছে মালগুদাম ইত্যাদি ছাড়া চক্ষুপীড়াদায়ক ঘরবাড়ী আমি খুব কম দেখেছি।

এই ছোট ছোট গ্রামগুলির পরে ঘন ঘন সবুজ বাঁশবন। সগুলি যে কত মাইল জুড়ে একটানা চলেছে বলা শক্ত। যাই হোক, বৈদ্যুতিক ট্রেনের অত দ্রুত গতির তুলনায়ও তাদের দৈর্ঘ্য কম মনে হ'ল না। এ দেশে বাঁশের জিনিষ এত কেন তা বোঝা গেল।

বার-চারেক ট্রেন বদলে আমরা যে ছোট্ট ষ্টেশনটিতে এসে নামলাম সেটি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত। এর নাম আরাসি-য়ামা। বসন্তে এর সৌন্দর্য্য কিয়োটোর এবং আশপাশের বহু নরনারীকে কাছে টেনে আনে, কিন্তু শীতের দিনেও তার সৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা করা চলে না। ঘন নীল আকাশের গায়ে জলহীন সাদা মেঘ, ঘন পাইন ও সবুজ বনে ঢাকা উঁচু পাহাড়ের মাথা আকাশের বুকে গিয়ে ঠেকেছে, পাহাড়ের পায়ের কাছ দিয়ে উপলবহুল সরু পথ গাছের তলা দিয়ে দিয়ে চলেছে, পথে একটি পাতা কি আবর্জ্জনা নেই, পথের এক দিকে পুষ্পহীন চেরিবাগান আর এক দিকে মরকতের মত নদীর জল চওড়া সিঁড়ির মত থাক থাক হয়ে নেমে গিয়েছে। মাঝে মাঝে বাঁশের বেড়া দিয়ে এক এক জায়গায় জল আটকে গভীর ক'রে রেখেছে, সেই গভীর জলে সুন্দর সুন্দর ছোট নৌকা ভাসছে, ঘাটের কাছে নৌকার মত দেখতে বড় কাঠের বাড়ীতে মাঝিরা থাকে, কুড়ি মিনিটে দর্শকদের নদীতে বেড়িয়ে আনে। নদীটি নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে অনেক খানি জায়গা জুড়ে অতি ধীরগতি ঝরণার মত থাকে থাকে নেমে গিয়েছে। উপরে একটি সুদৃশ্য সেতুর উপর ভীড় ক'রে লোক দাঁড়িয়ে ছোট ছোট মাছ ধরছে। চেরিবাগানে ফুল নেই, কিন্তু মাজাঘষা ঝক্ ঝক্ করছে, ধারে ধারে কত দোকান, হোটেল, বসবার জায়গা—মনে হয় এইমাত্র যেন এখানে বিরাট মেলা বসেছিল, হঠাৎ কে কোথায় সব উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। খাবার হোটেলে জাপানী ও বিলাতী দুই

হোংওয়াং-জি মন্দির

প্রথায় খাওয়া-বসার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রায় জনহীন এই নদীর তীরে এত আয়োজন দেখে সোনার কাঠি রূপার কাঠির গল্প মনে হয়। মনে হয় হয়ত সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, এখনি জেগে উঠে গাছের তলায় তলায় নাচ-গান হাসি-গল্পের ফোয়ারা খুলে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের চূড়া থেকে পা পর্য্যন্ত ফুলে ফুলে ভ'রে উঠবে। বাস্তবিকই পাহাড়ের মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত এবং পথের দুই ধারে এত যে চেরি গাছ বসন্তে সব একসঙ্গে ফুটে ওঠে এবং সমস্ত বনভূমি লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। এখানে ফোটোগ্রাফাররা পয়সা-রোজগারের মতলবে ঘোরে, হঠাৎ এক জন এসে আমাদের ধরল কুড়ি মিনিটে আমাদের ছবি তুলে দেবে। সত্যই কুড়ি মিনিটে সে চারখানা ছবি এনে হাজির করল।

জাপানে এসে আজ প্রথম গাছে ফুল ফোটা দেখলাম। একটি ছোট বাগানে শুক্‌নো গাছে তারার মত ছোট ছোট প্লাম ফুল ফুটে আছে। একটি অতি বৃদ্ধা গাছতলা থেকে বেরিয়ে এসে বললে, "আমার ছেলের হোটেল আছে, তোমরা খাবে এস।" বুড়ী প্রাচীন জাপানী প্রথায় হাত দুটি কিমোনোর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। আগে নাকি মেয়েদের হাত বার করাও লজ্জার বিষয় ছিল। আমরা তখন কিয়োটো যাবার জন্য ব্যস্ত, খাওয়া হ'ল না। একটি ছোট দোকানে মেয়েরা ছোট ছোট সুদৃশ্য জাপানী খেলনা আর ছবি বিক্রি করছিল, কয়েকটা ছবি ও খেলনা কিনে আমরা কিয়োটোর পথে যাত্রা করলাম। এখানে ট্যাক্সিওয়ালারা সর্ব্বদাই হাজির থাকে। একজনের সঙ্গে দরদস্তুর ক'রে ট্যাক্সিতে যাওয়াই ঠিক হ'ল। সেদিন বোধ হয় পথে কোথাও রাস্তা মেরামত হচ্ছিল, তাই আমরা যত গলির পথ ধরলাম। গলিগুলি কাশীর গলির মত সরু আঁকা-বাঁকা, কিন্তু তকতকে পরিষ্কার। কখনও দুই পাশে ঘর-বাড়ী, মাছ তরকারি জুতার দোকান, কখনও দু-পাশে বাগানের মাঝখানে চওড়া আলের মত পথ। দুই-একটি বাগানে টকটকে লাল গোলাপ ফুটে আছে, লাল পাতাবাহারের গাছ এত শীতেও পাতা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরগুলি বাঁশের বেড়ার, গাছের বাকলের, অথবা বাঁশের উপর মাটি লেপা। এরা ঘরবাড়ীতে পয়সা খাটায় না দেখলাম। আসবাবের মধ্যে মাদুর আর বাড়ী তৈরির উপকরণ কাঠ কঞ্চি কাগজ ইত্যাদি। কিন্তু তাইতেই এমন ছবির মত সুন্দর বাড়ীগুলি।

কিয়োটো ৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাপানের রাজধানী ছিল। অনেকে বলেন জাপানের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শিল্পকেন্দ্র এইখানেই। কিয়োটোকে জাপানের কাশীও বলা যেতে পারে। এর অলিতে-গলিতে মন্দির, মঠ ও প্রাচীন শিল্পাদির নমুনা। জাপানের তিনটি বিখ্যাত মিউজিয়মের একটি নারাতে একটি কিয়োটোতে এবং তৃতীয়টি টোকিও শহরে।

পুরাকালে জাপানে রাজার চেয়ে মন্ত্রীদেরই প্রতাপ ছিল বেশী। তাঁদের বলত সোগুন। আমরা সর্ব্বপ্রথমে একটা প্রকাণ্ড পুরানো বাগানে প্রাচীন সোগুনের বাড়ী দেখতে গেলাম। পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা প্রকাণ্ড এলাকা, কত কালের বাগান, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আকাশস্পর্শী মহীরুহ, তাঁর গুঁড়িগুলি ঘন সবুজ শ্যাওলায় ঢেকে গিয়েছে। গাছ ও শ্যাওলার সবুজ রঙে শীতের রিক্ততা কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। দেয়ালগুলির দু-পিঠে সাদা প্ল্যাষ্টার ও চুণকাম, মাথাগুলি কালো টালি দিয়ে ঢাকা। আদত বাড়ীটির ভিতরে জুতো খুলে ঢুকতে হয়। চারি ধারে বারাণ্ডা-ঘেরা জাপানী ধরণের ঘর, মাঝে মাঝে চলন, ঘরের দেয়ালে

জাপানী রেশমী চিকে সুন্দরীদের ছবি এঁকে টাঙানো। এই বাগানটিতে অনেকখানি হাঁটতে হয়। দেখলাম কোথাকার স্কুলের ছেলেমেয়েরা ইউনিফর্ম প'রে দলে দলে শিক্ষকদের সঙ্গে বেড়াতে এসেছে। এই প্রাসাদের একটু দূরে একটি ছোট হ্রদের ভিতর "কিংকা-কু-জি" মন্দির। তাহার অর্থ সুবর্ণ-প্রাসাদ। ইয়োসি মিৎসু নামে এক বিলাসী সোগুন এই মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন। জমকালো প্রাসাদ আর মনোহর উদ্যান রচনায় তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। মন্দিরটি খুব বিরাট নয়, কিন্তু ভারি সুন্দর। পূর্ব্বে এই ছোট প্রাসাদটি ইয়োসি মিৎসু সোগুনের বাগান-বাড়ী ছিল। তিনি জীবনের শেষ অংশ এইখানে নির্জ্জনে বাস করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই ইচ্ছানুসারে তার পুত্র এটিকে একটি বৌদ্ধ মন্দির ক'রে দেন। এখানকার অধিকাংশ ঘরবাড়ী আগুনে পুড়ে গিয়েছে, কিন্তু সুবর্ণমন্দিরটি ও তার আশে-পাশের উদ্যানগুলি এখনও পাঁচ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার নিপুণ শিল্পরচনার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

মন্দিরটি তিন-তলা। একতলায় অমিতাভবুদ্ধ ও সোনালী রঙের দুটি বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি। এই মন্দিরের প্রথম পুরোহিত ও প্রতিষ্ঠাতা সোগুনের দুটি মূর্ত্তিও আছে। দ্বিতলেও বোধিসত্ত্ব ও দিক্‌পালদেব মূর্ত্তি। তিন-তলাটি ছোট, চূড়ার মত দেখায়। ১৮ বর্গ-ফুট ছাদটির সিলিং একখানি কর্পূর কাঠের তক্তায় তৈরি, সেটি সোনার পাতে মোড়া। পুরাকালে তিনতলার সমস্ত ঘরটিই সোনার পাতে মোড়া ছিল, তাই এর নাম সুবর্ণ-মন্দির।

এই বাগানটির নানা জায়গা নানা জিনিষে সাজানো। এক জায়গায় একটি মোটা পাথরের নৌকা রয়েছে, কিছু দূরে একটি শিণ্টো মন্দির, তাতে কোনও মূর্ত্তি নেই, শুধু ফুল ধূপ প্রদীপ ইত্যাদি দিয়ে সাজানো। জাপানের প্রায় সব জায়গাই উঁচুনীচু পাহাড়ে ধরণের। তার জন্য বাগানের চেহারা দেখতে সুন্দর হয়। এই বাগানে ছোট ছোট পাহাড়ের চূড়ায় ছোট ছোট জাপানী বাড়ী অথবা কুটীর মাঝে মাঝে দেখা যায়। আমরা একটি বাড়ীতে ঢুকে দেখলাম। সঙ্গের ট্যাক্সি-চালক বললে

সূত্রপাঠরত বৃদ্ধ সোগুন কয়োটো মিউজিয়ম

"প্রাচীন জাপানী বাড়ী এই রকম হ'ত।" খুব ছোট ছোট ঘর, মাদুর দিয়ে মোড়া, প্রত্যেকটি ঘর এক সমতল ভূমিতে নয়, কোনটি উঁচু, কোনটি নীচু, কোনটি তার চেয়ে নীচু, ঠিক যেখানে যেমন জমি সেই ভাবেই ঘর। বাড়ীটি দেখে মনে হ'ল শান্তিনিকেতনের কোনার্ক ভবনের ছোট ছোট উঁচুনীচু ঘরগুলি রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় এই রকম কোন বাড়ী দেখে করেছিলেন।

কিয়োটোর মত সহস্র মন্দিরের ব্যাপার ত এক দিনে দেখে শেষ করা যায় না, আমরা দুই তিনটি মাত্র জায়গা দেখেই বিদায় নেব ঠিক হ'ল। বাগান থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি চ'ড়ে পুরাতন রাজপ্রাসাদ দেখতে গেলাম। তার বিরাট এলাকা পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। টোকিওর রাজপ্রাসাদেরই মত দেয়াল। এত বড় জমি হেঁটে শেষ করা শক্ত, আমরা গাড়ী ক'রে বাইরে-বাইরে ঘুরে দেখলাম। বাইরের রাস্তাগুলিতেও প্রাচীনতার গাম্ভীর্য্যের ছাপ আছে।

এখান থেকে কিয়োটোর সুবিখ্যাত হোংওয়ান-জি

সামুরাইদের বর্ম—কিয়োটো মিউজিয়ম

জাপানী মুখোস—কিয়োটো মিউজিয়ম

মন্দির দেখতে গেলাম। শুনলাম এখানেই জাপানের রাজাদের অভিষেক হয়। গাড়ী থেকে যখন নাম্‌লাম তখন কনকনে শীত। মনে করলাম মন্দিরের ভিতরে ঢুকে একটু নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। অনেক সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরের সিংহদ্বারে ওঠা গেল। সিংহদরজাই একটি বিরাট মন্দিরের মত, যেমন উঁচু তেমনি চওড়া। তার পর মন্দিরের প্রকাণ্ড উঠান। উঠানের চার পাশে প্রাচীন চকমিলানো বাড়ীর মত দেয়ালের গায়ে গায়ে ঘর। ভিতরের উঠানে সুন্দর উদ্যানের মত পথ ও গাছপালার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা। কিন্তু এত শীতে গাছপালা প্রায় কিছুই নেই, শুধু পরিষ্কার পথগুলি উঠানের বুক দিয়ে চলে গিয়েছে। রাজাদের এবং রাজদূতদের ঢুকবার আলাদা অপরূপ সিংহদ্বার ও উঁচু সেতুর মত পথ, সাধারণ লোকে সেদিক দিয়ে আসে না। এই দরজাটি সোনালী কাজ-করা। এর শিল্পনৈপুণ্য সুপ্রসিদ্ধ। উঠানে ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা তীর্থযাত্রিণী মেয়েদের হাতে খাচ্ছে।

আমরা মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে একবার মন্দিরের চূড়ার দিকে চেয়ে দেখলাম। কি বিরাট মন্দির আর কি সুন্দর গঠন ও রেখাবিন্যাস! আশ্চর্য্য শিল্পসৃষ্টি! মনে আছে পুরীর জগন্নাথের মন্দির প্রথম দেখে অল্প বয়সে এই রকম বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে ছিলাম। কিন্তু সেখানে একটু দূরে দাঁড়িয়ে মন্দিরটি ভাল ক'রে দেখবার উপায় নেই, এত সংকীর্ণ হয়ে এসেছে আশেপাশের জায়গা। এখানে দূরে দাঁড়িয়ে দেখবার যথেষ্ট স্থান আছে। সমস্ত মন্দিরটি কাঠে তৈয়ারী। শুনেছি পৃথিবীতে এত বড় কাঠের বাড়ী নাকি আর নেই। প্রাচীন মন্দিরটি জাপানের অগ্নিদেবতার অত্যাচারে কয়েক বার পুড়ে গিয়েছিল। এটি তার পর তৈরি হয়।

জুতো খুলে মন্দিরে ঢুকলাম। শীত কম লাগবে মনে আশা ছিল। ভিতরে ঢুকে দেখি বরফের মত ঠাণ্ডা আর দারুণ অন্ধকার একটি বিরাট হল। চোখ দুটো একটু অভ্যস্ত হ'লে তবে ভাল ক'রে সব দেখতে পাওয়া যায়। উপাসকমণ্ডলীর বসবার জন্য লেপের চেয়েও অনেক পুরু মোটা মোটা সুচিক্কণ উজ্জ্বল মাদুর পাতা। বাইরে যে পরিমাণ জুতা জমা হয়ে রয়েছে তাতে মনে করেছিলাম ঘরে লোকের ভীড়ে দাঁড়ান যাবে না। দেখলাম ঘরটি
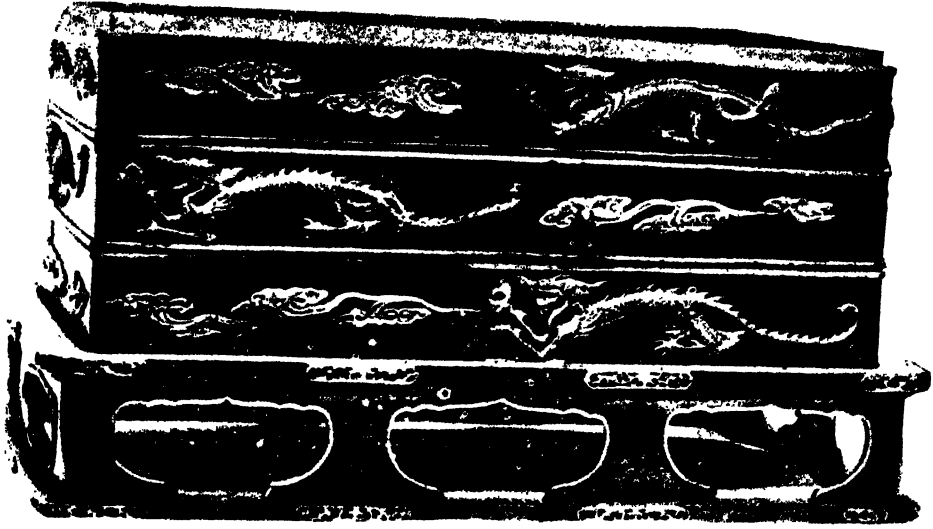
জাপানী গালার কাজ

এতই বড় যে সে সমস্ত মানুষকে মুষ্টিমেয় মনে হচ্ছে। অনেক মেয়েরা এবং কিছু কিছু পুরুষও হাঁটুগেড়ে পূজায় বসেছেন মাথা নত ক'রে, পুরোহিতরা গম্ভীর একটা ছন্দে সুর ক'রে মন্ত্র পড়ছেন, শ্রোতারা নীরব, সকলের দৃষ্টি এক দিকে; আমাদের দেশের মন্দিরের মত নানা দিকে নানা জনে শুয়ে ব'সে নেই, দেখলেই মনে একটা সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার ভাব জেগে ওঠে। মানুষের মাপের কালো একটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে ফুল বাতি ধূপ ইত্যাদি সাজানো বোধ হয় অমিতাভবুদ্ধের মূর্ত্তি।

মূর্ত্তির পিছনে পাতলা দেয়ালে সোনালী জমির উপর
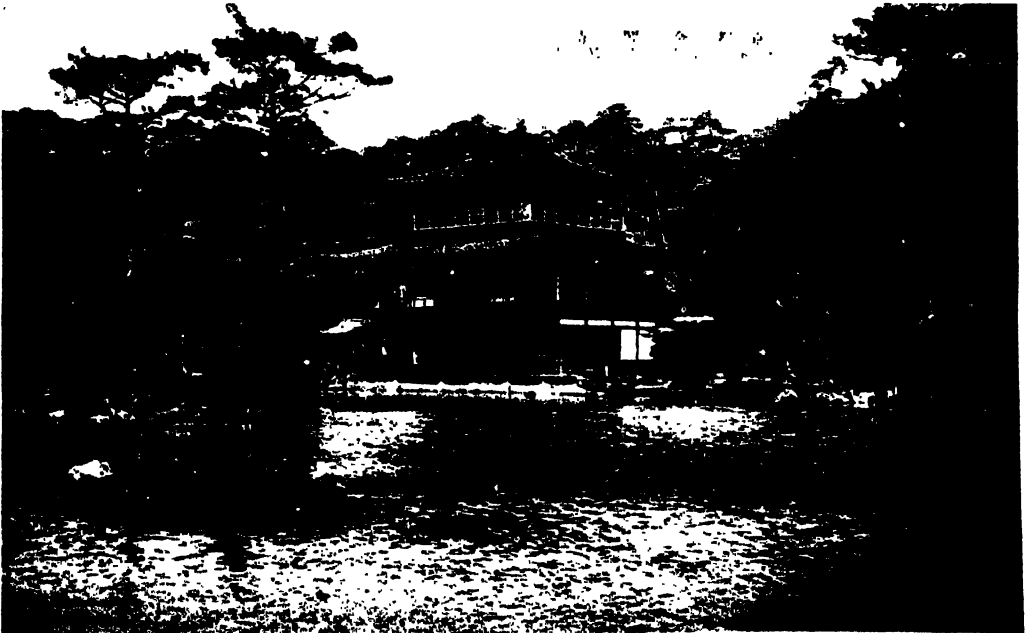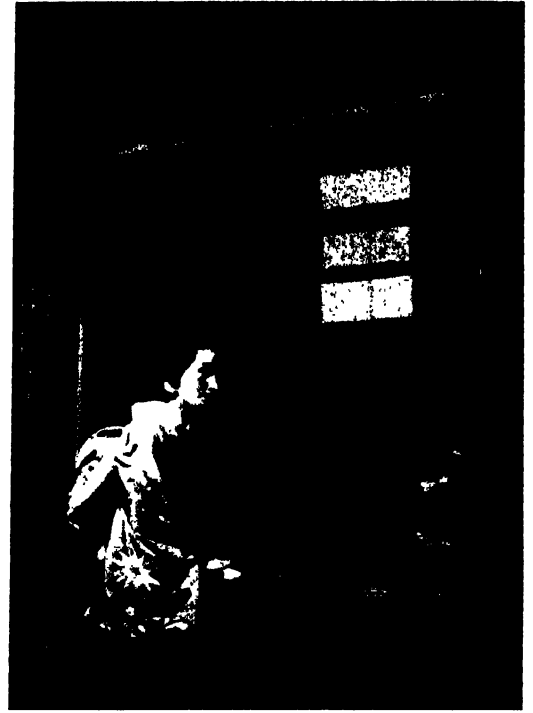
সুবর্ণমন্দির। কিয়োটো

জাপানী কারুকার্য্য

সাদাসিধে জাপানী বাড়ী

সবুজ রঙে অপূর্ব্ব সুদীর্ঘ পদ্মবন আঁকা। সম্মুখে ঝোলানো কাঠের জাফরির মধ্যে গালার সোনালী যক্ষমূর্ত্তি ও লতার আশ্চর্য্য কারুকার্য্য। জাপানের মন্দিরের এই জাফরি ও কার্ণিশের কাজ জগদ্বিখ্যাত। বড় বড় শিল্পীদের হাতের এই সব কাজ।

হলের মাঝে মাঝে সুন্দর কাঠের বেড়া দেওয়া আছে। শ্রোতা, পুরোহিত, দেবতা ইত্যাদির স্থান-নির্দ্দেশের জন্য বোধ হয় এই রকম বেড়া দেওয়া হয়। দেখলে মনে হয় মন্দিরসজ্জার এগুলি একটা অঙ্গ। মন্ত্রপাঠের পর পুরোহিতরা পুঁথি জড়িয়ে বেঁধে রাখলেন।

হোংওয়ান্-জি মঠ শিনস্থ বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদি ভূমি। এই সম্প্রদায়ের পুরোহিতরা কৌমার্য্য ও নিরামিষ ভোজন বর্জ্জন করেছেন। এর প্রতিষ্ঠাতা শিনরান-শোনিন এক প্রাচীন জমিদার-বংশের সন্তান। তিনি রাজার সভাসদ্ ছিলেন। শুনেছি রাজবংশের সঙ্গে এই মঠের পুরোহিতদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রাজার ভগ্নীপতি নাকি প্রধান পুরোহিত। মন্দিরের সিংহদরজায় ও অন্যান্য জায়গায় দেয়ালে বড় বড় রেখাচিত্র আঁকা। ফিরবার সময় আমরা প্রহরী পুরোহিতদের কাছে এই সব ছবির কিছু প্রতিলিপি কিনলাম।

এখান থেকে কিয়োটো মিউজিয়ম দেখব ব'লে বেরলাম। ট্যাক্সিওয়ালাকে বলা হ'ল যে যেখানে প্রাচীন জিনিষ ছবি ইত্যাদি রাখা হয়, আমরা সেইখানে যেতে চাই। সে আমাদের একটা পুরনো ছবি ইত্যাদির দোকানে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। একটা গলির ভিতর ঘরে আশ্চর্য্য সুন্দর সব সূচিশিল্প ও ছবি ইত্যাদির রূপ চোখের সামনে একবার ঝলকে উঠল। তার পরই বিদায় নিতে হ'ল, সময় যে নেই।

মিউজিয়মের রাস্তায় গাড়ী গিয়ে দাঁড়াল। রাস্তার অনেক নীচে বাড়ী। রাস্তার অপর পারে প্রশস্ত প্রকাণ্ড

জাপানের চিত্র-নিদর্শন

জাপানী চিত্র
কিয়োটো মিউজিয়ম

জাপানী বৌদ্ধ চিত্র
কিয়োটো মিউজিয়ম

বুদ্ধের শি   গুন

কুবলাই

সিঁড়ি-দেওয়া সুবিশাল মন্দিরের মত একটি বাড়ী, সিঁড়ির কাছে দলে দলে স্কুলের মেয়েরা ইউনিফর্ম প'রে দাঁড়িয়ে। প্রথমে মনে করেছিলাম এটা বিশ্ববিদ্যালয়গোছের কিছু হবে। চেহারা দেখে অবশ্য রাজপ্রাসাদের চেয়ে অনেক জমকালো মনে হচ্ছিল। শুনলাম এটি সাঞ্জু সাঞ্জেন-ডো মন্দির। এখানে এক হাজার একটি বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি আছে। মেয়েরা মন্দির দেখতে এসেছে।

আমরা নীচের পথে নেমে গেলাম। মিউজিয়মের ষোলটি ঘরে জিনিষ সাজানো। এখানেও বরফের মত ঠাণ্ডা, কোনো দিন ঘরে রোদ-হাওয়া ঢোকে নি বোধ হয়। ঐতিহাসিক ও শিল্পকলা সম্পর্কীয় ভিন্ন ভিন্ন তিনটি ভাগে জিনিষগুলি বিভক্ত। সর্ব্বত্র সব কথা জাপানী ভাষায় লেখা, কেবল 'Smoking prohibited' এই একটি ইংরেজী বচন আছে। এখানকার লোকজনরাও এক অক্ষর ইংরেজী বলে না। এখানে চিত্র ও ভাস্কর্য্যের নানা যুগের নমুনা আছে। মনে হ'ল নারা মিউজিয়মের চেয়ে এখানে রেশমে আঁকা ছবির সংখ্যা বেশী। এখানেও বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব এবং 'নিও' অর্থাৎ ভীষণাকৃতি ভৈরব ও দিক্‌পাল মূর্ত্তির নানা রূপ দেখা যায়। তাদের শিল্পী ও শিল্পরচনা-কাল এবং পদ্ধতি শিল্প-রসিকদের গবেষণার ও চর্চ্চার বিষয়। কিন্তু কোনও বিশেষজ্ঞের সাহায্য না নিয়ে একবার ষোলটি ঘরে ঘুরে এলে চোখের ক্ষণিক আনন্দ ছাড়া আর খুব বেশী কিছু হয় না।

মহিষের উপর আসীন চতুর্ম্মুখ এক দেবমূর্ত্তি দেখে ভারতীয় যমরাজকে মনে হ'ল।

প্রাচীন ছবিগুলিতে স্বর্গলোক থেকে মেঘবাহন স্তূপের পূজা, অগ্নির পূজা, ভারতীয় পরিচ্ছদে দেবতাদের পূজা ইত্যাদি অনেক চিত্তাকর্ষক জিনিষ দেখা যায়। কতকগুলি অতি প্রাচীন ছবি ঠিক অজন্টার ছবির মত, কিছু ছবি পারস্য দেশীয়ের মত। সামুরাইদের বোনা চামড়া ও ধাতব শিকলির বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণগুলি আমাদের চোখে অভিনব ও সুন্দর লাগে। শুধু তুলির টানে কালো কালিতে আঁকা ছবির নৈপুণ্য মনকে মুগ্ধ করে; এত সুন্দর সব ছবি ছেড়ে চলে আসতে ইচ্ছা করে না, এক একটিকে অনেকক্ষণ ধ'রে দেখতে না পেলে মনে হয় বৃথাই

আরাসি-য়ামাতে লেখিকা ও তাঁহার সঙ্গীগণ

দেখা, বিস্মৃতির কোন অতলে এরা সব অল্প দিন পরেই তলিয়ে যাবে।

জাপানী পুঁথিগুলি কাচের বাক্সে খুব সযত্নে রক্ষিত, খানিকটা খোলা থাকে ব'লে কোন কোনটাতে সংস্কৃত বর্ণমালা দেখতে পেলাম।

জাপানী আলেখ্য অঙ্কন-পদ্ধতির অনেক প্রাচীন নমুনা এখানে আছে। তাতে প্রাচীন জাপানী পোষাক-পরিচ্ছদেরও অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। এক জায়গায় অজন্টার ছাদের মত মস্ত একটি পদ্ম দেখলাম। সূচি-শিল্পের ছবি, ভূদৃশ্য, কিংখাবের কিমোনো, গালার ও ধাতুর কাজ, মুখোস, প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র, জাপানী অক্ষরশিল্প—সব কিছুরই পরিচয় এখানে অল্প সময়ে অনেকটা পাওয়া যায়।

একটি ছোট জাপানী ছবিতে তিনটি ঘোমটা-দেওয়া জাপানী মেয়ের ছবি দেখে বিস্মিত হলাম। পরে টোকিও শহরে এক জন সুপণ্ডিত জাপানী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনাদের দেশে মেয়েরা কি কখনও ঘোমটা দিত?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ দিত।"

প্রতিলিপির সাহায্যে আসলের চেহারা ভাল বোঝা

যায় না, তবু কয়েকটি মূর্ত্তি, আলেখ্য, মুখোস, বর্ম ইত্যাদির ছবি ছাপবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

কিয়োটো রাজবিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাতেও একবার ঘুরে এসেছিলাম। অনেকখানি জমিতে দূরে দূরে অনেকগুলি পাশ্চাত্য আধুনিক ধরণের বাড়ী। বোধ হয় তখন ছুটি ছিল। অল্প কয়েক জন ছেলে যাওয়া-আসা করছে দেখলাম। এপ্রন-পরা ঝিরা কলেজের ঘর-বারাণ্ডা ঝাঁট দিচ্ছিল। কার্ড পাঠিয়ে ভিতরে অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে হ'ল।

এখানে শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে মঠ ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের খুব নিকট সম্পর্ক। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বৌদ্ধ কলেজ প্রভৃতিও কিয়োটোতে আছে।

বিকালে কিয়োটোর ষ্টেশনের উপরে একটা হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা কোবে ফিরবার জন্যে ট্রেন ধরলাম। এখানকার এই হোটেলে ওসাকার মত জাঁক-জমক নেই, পরিবেশনে একটু আধটু ভুল হয়, ঘর আসবাবও একটু সাদাসিধা।

এখানেই একটা ছোট দোকানে কিছু সিল্ক কিনলাম। দোকানদার বেশ দরদস্তুর করল। কেনার পরে পাতলা কাগজে কালো রং ও তুলি দিয়ে রসিদ লিখে দিল। কাপড় কেনা এখানে মহা মুস্কিল, সব কাপড়েরই বহর আন্দাজ বার-চৌদ্দ ইঞ্চি। কিমোনো জুড়ে জুড়ে সেলাই করাই প্রথা, কাজেই তাদের কাপড় এই রকম। আমাদের এতে মহামুস্কিলে পড়তে হয়।

হেঁটে আমরা ষ্টেশনে গেলাম। কিয়োটো শহরটা কোবে-ওসাকার তুলনায় অনেকটা খাঁটি জাপানী আছে। ঘরদোর রাস্তা দোকান সবই একটু সেকেলে, আধুনিক পালিশের উগ্রতা অত চোখে পড়ল না এখানে।

রাত্রে কোবে ষ্টেশনের একটা হোটেলে দাস মহাশয়ের আতিথ্য উপভোগ করা গেল। সেখানে তখন ভীষণ ভীড়। এক দল সৈন্য মাঞ্চুকুয়ো যুদ্ধে যাচ্ছে। তাদের বন্ধুবান্ধবেরা বিদায়-অভিনন্দন দিতে এসেছে। সকলের হাতে রঙীন কাগজের নিশান, জাপানী ফানুস, কাগজের খেলনা কত কি। খুব হাসি-গল্প খাওয়া-দাওয়া, সবাই মহা উৎসাহে মেতে আছে।

চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে উপরে লোক আসছে, ছোট ছেলেরা তার উপর চড়ে খেলতে ব্যস্ত, বুড়ো মানুষদের কেউ ধ'রে তুলে দিচ্ছে। এই সব নানা দৃশ্য দেখে আমরা আধঅন্ধকার জেটিতে রাত দশটায় ফিরে এলাম।

(ক্রমশঃ)
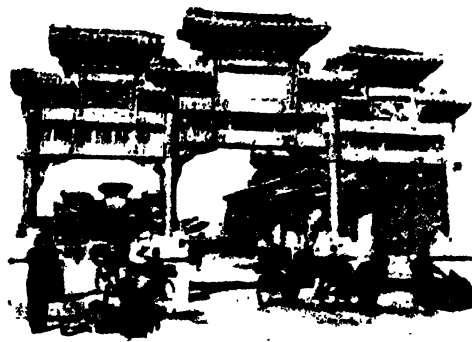
শিকারী মাছ

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বিচিত্র শিকারী মাছ সম্বন্ধে আমরা অনেক অদ্ভুত কাহিনী শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দেশেও যে কত অদ্ভুত রকমের শিকারী মাছ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা খুবই কম খবর রাখি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের দেশের অতি সাধারণ কয়েকটি মাছের শিকার-প্রণালী বিবৃত করিতেছি।

এ দেশের খাল, বিল ও বদ্ধ জলাশয়ে সচরাচর সাত আট ইঞ্চি লম্বা কাঠির মত এক জাতীয় মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সর্ব্বদাই জলের উপরিভাগে ভাসিয়া বেড়ায়। ঠোঁটটি অসম্ভব লম্বা ও ছুঁচালো। উপর ও নীচের ঠোঁটে খাড়া ভাবে কতকগুলি ধারালো দাঁত আছে; দেখিতে অনেকটা কুমীরের মত। ইহারা সাধারণতঃ 'গাংদাড়া' নামে পরিচিত। কেহ কেহ ইহাদিগকে 'কেকলে মাছ'ও বলিয়া থাকেন। নোনা জলেও যথেষ্ট গাংদাড়া দেখিতে পাওয়া যায়; সেগুলি আকারে প্রায় এক ফুট দেড় ফুট লম্বা হয়। ইহাদের ঠোঁটের জোর এমন ভয়ানক যে একবার কামড়াইয়া ধরিলে রক্তপাত না করিয়া ছাড়ে না। শিকার একবার কবলে পড়িলে কিছুতেই নিস্তার নাই। কোন গতিকে শিকার ছুটিয়া পলাইলেও দাঁতের আঘাতে এমন ঘায়েল হইয়া পড়ে যে আর বাঁচিবার আশা থাকে না। ছোট ছোট মাছই ইহাদের খাদ্য। ছোট মাছগুলির শত্রু পদে পদে; কাজেই তাহারা প্রায়ই দল বাঁধিয়া অতি সাবধানে জলাশয়ের ধারে ধারে চলাফেরা করে। গাংদাড়ারা ঘাসপাতার ছায়ার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া অতি সন্তর্পণে দূর হইতে তাহাদিগকে অনুসরণ করে। ইহাদের পিঠের রং হাল্কা সবুজ, প্রায় জলের রঙের সঙ্গে মিশিয়া যায়, কাজেই অতি সহজে ইহারা আত্মগোপন করিতে সমর্থ হয়। ছোট মাছগুলির পিছনে অগ্রসর হইয়া সুযোগ বুঝিলেই এক স্থানে স্থিরভাবে থাকিয়া লেজটাকে দ্রুত গতিতে নাড়িতে থাকে। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিবার পর হঠাৎ মুখ হাঁ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে শিকারের উপর লাফাইয়া পড়ে।

গাংদাড়া মাছ

গাংদাড়ার মতই দেখিতে আর এক প্রকার মাছ কলিকাতার আশেপাশে যথেষ্ট পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের লম্বা ঠোঁট দেখিয়া প্রথমতঃ গাংদাড়ার মত শিকারী মাছ বলিয়াই ধারণা জন্মে। কিন্তু ইহাদের ঠোঁটের গড়ন অতি অদ্ভুত। নীচের দিকে

সুবর্ণরেখা মাছ

কেবল একটি মাত্র লম্বা ঠোঁট এবং উপরের দিকটা সাধারণ মাছের মুখের মত ছুঁচালো। নীচের দিকের একটি মাত্র লম্বা ঠোঁটের সাহায্যে আহার সংগ্রহ করিবার কতটা সুবিধা হয় তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। ইহাদিগকে অনেকে 'সুবর্ণরেখা' বা 'সুবর্ণ-খড়কে' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

বর্ত্তুলের মত এক প্রকার অদ্ভুত মাছ অনেকেই দেখিয়াছেন, জলের উপরে তুলিলেই কট্‌কট্ শব্দ করিয়া পেটটাকে ক্রমাগত ফুলাইতে থাকে। ইহাদের দাঁতে ভয়ানক জোর। দাঁতগুলি চ্যাপ্টা ও ধারালো। কামড়াইয়া ধরিলে চামড়া কাটিয়া ফেলে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ কটকটে মাছ বলে। বোধ হয় কট্‌কট্ শব্দ করে বলিয়াই এই নাম দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে ইহাদিগকে 'পোটকা' মাছ বলে। বদ্ধ জলাশয়ে ও নোনা জলে সর্ব্বত্রই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। নোনা জলের কট্‌কটে মাছের পেটের দিকে ছোট ছোট অসংখ্য কোমল কাঁটা জন্মায়; কিন্তু বদ্ধ জলাশয়ের মাছগুলির শরীর সম্পূর্ণ মসৃণ। জলের নীচে
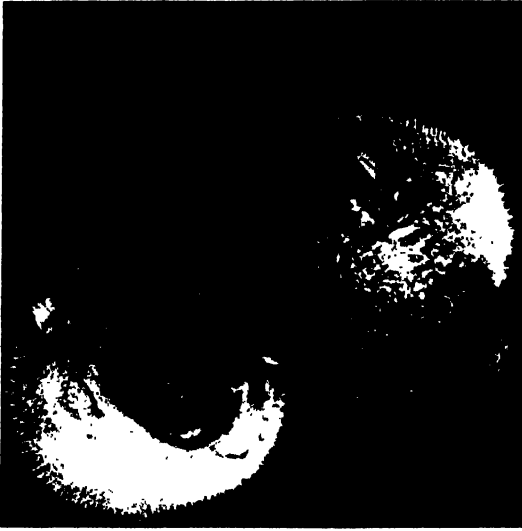
কটকটে মাছ

থাকিবার সময় পেটের দিকটা সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে, তখন মুখখানা কতকটা ব্যাঙের মত দেখায়। গায়ের রংও কোলা ব্যাঙের মত কাল-মিশ্রিত সবুজ; কিন্তু পেটের চামড়াটা ধবধবে সাদা। জল হইতে উত্তোলন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নিটোল বর্তুলাকার ধারণ করে; কিন্তু জলে ছাড়িয়া দিলেই পেটের হাওয়া বাহির করিয়া একছুটে গভীর জলে পলায়ন করে। গায়ের রং ইহাদিগকে আত্ম-গোপন করিয়া শিকার ধরিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। জলজ ঘাসপাতার আড়ালে থাকিলে সহজে ইহাদিগকে নজরে পড়ে না। শিকার নজরে পড়িলেই লেজটাকে এক দিকে বাঁকাইয়া ঠিক বড় একটা ' চিহ্নের মত কিছুক্ষণ এক স্থানে স্থির ভাবে থাকে এবং হঠাৎ শিকারের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে উদরসাৎ করিয়া ফেলে।

আমাদের দেশের পরিচিত শিকারী মাছের মধ্যে বোয়াল মাছই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ প্রকৃতির। আকারেও ইহারা প্রকাণ্ড হইয়া থাকে। ইহাদের মুখের হাঁ-ও যেরূপ বড় পেটের থলিও তদনুরূপ। মুখের উপরে ও নীচে সারিসারি অসংখ্য ক্ষুদ্র ধারালো দাঁত আছে। দাঁতগুলি আবার পিছনের দিকে শুইয়া পড়িতে পারে। কাজেই শিকার একবার মুখে ঢুকিলে আর বাহির হইবার উপায় থাকে না। সুবিধা পাইলে ইহারা ছোটবড় কোন শিকারকে আক্রমণ করিতে ইতস্ততঃ করে না। এইরূপ রাক্ষুসে স্বভাবের জন্য ইহাদের সম্বন্ধে নানারূপ গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে ইহারা নাকি জলচর পাখী, সাপ, ব্যাং প্রভৃতিকেও আক্রমণ করিয়া উদরসাৎ করে। বোয়াল মাছ সাধারণতঃ রাত্রি-

বোয়াল মাছ

বেলাই শিকার-অন্বেষণে বহির্গত হয়। যে সব ছোট ছোট মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে ধরিবার জন্য বোয়াল মাছ এক স্থানে ওৎ পাতিয়া থাকে এবং প্রকাণ্ড মুখ বিস্তার করিয়া অতর্কিত ভাবে তাহাদের মধ্যে লাফাইয়া পড়ে। বোয়াল মাছকে কদাচিৎ বঁড়শিতে ধরা পড়িতে দেখা যায়। কিন্তু লোকে তাহাদের শিকারী-স্বভাবের সুযোগ লইয়া কৌশলক্রমে তাহাদিগকে বড়শিতে গাঁথিয়া থাকে। ছোট একটি জীবন্ত মাছের পিঠে বঁড়শি গাঁথিয়া রাত্রিবেলায় ছিপটাকে একটু হেলান অবস্থায় পুঁতিয়া রাখে। পিঠে বঁড়শি-গাঁথা মাছটি ঠিক জলের উপরিভাগ স্পর্শ করিয়া এদিক-ওদিক নড়াচড়া করিতে থাকে। এরূপ শিকার দেখিতে পাইলেই বোয়াল মাছ লম্ফ দিয়া শিকার-সমেত বঁড়শি গিলিয়া আটকা পড়িয়া যায়।

পূর্ব্ববঙ্গে অনেক বদ্ধ জলাশয়ে ভীষণদর্শন এক প্রকার অদ্ভুত মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ঐ অঞ্চলে 'চ্যাকভ্যাকা' নামে পরিচিত। কেহ কেহ আবার বিকট চেহারার জন্য ইহাদিগকে মাছের ডাইনীবুড়ীও বলিয়া থাকে। চ্যাকভ্যাকা সাধারণতঃ সাত-আট ইঞ্চির বেশী বড় হয় না, মুখটাই যেন ইহাদের সর্ব্বস্ব, মুখখানা উপরে ও নীচে চ্যাপ্টা, কানকোর দুই পাশে দুইটি ও পিঠের উপর একটি বড় কাঁটা আছে। মুখের উপরের দিকটায় গণ্ডারের চামড়ার মত নানা রকমের ভাঁজ দেখা যায়। উপর ও নীচের ঠোঁটে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দাতও আছে। মুখের সম্মুখ দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটা শুঁয়া যেন মাংসপিণ্ডের মত উঁচু হইয়া থাকে। চোখ দুইটি এত ক্ষুদ্র যে সহজে নজরে পড়ে না। সাধারণতঃ ইহাদিগকে খুব শান্ত প্রকৃতির বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহারা তত নিরীহ নহে। সর্ব্বদাই ইহারা জলের নীচে পাঁকের মধ্যেই বাস করিয়া থাকে এবং ক্ষুদ্র মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ধরিয়া খায়। পাঁকের সঙ্গে ইহাদের শরীরটা এমন বেমালুম মিশিয়া থাকে যে সহজে লক্ষ্যই হয় না যে একটা মাছ গুঁড়ি মারিয়া শিকারের সন্ধানে বসিয়া আছে। মাছের ছোট ছোট বাচ্চাগুলিও ভুল করে। তাহারা মাছটাকে আবর্জ্জনা মনে করিয়া তাহার শুঁড় ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

চ্যাকভ্যাকা মাছ

গাং-বাতাসী মাছের মুখ
(বর্দ্ধিত আকারে চিত্র)

খুঁটিতে থাকে। সুযোগ-মত সে তখন প্রকাণ্ড হাঁ করিয়া একসঙ্গে কয়েকটাকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলে। ইহাদিগকে জলের উপর তুলিলেই কান্‌কোর পাশের কাঁটা দুইটি নাড়িয়া এমন বিকট শব্দ করিতে থাকে যে প্রাণে যেন আতঙ্কের সঞ্চার হয়। ইহাদের অদ্ভুত চেহারা ও অদ্ভুত স্বভাবের জন্যই অনেকে ইহাদিগকে ধরিয়া পিঠের কাঁটার সঙ্গে শোলা বাঁধিয়া অথবা মুখের ভিতর লতাপাতা পুরিয়া জলে ছাড়িয়া দেয়। এ-অবস্থায় ইহারা জলের নীচে ডুবিতে পারে না ভাসিয়া থাকে এবং শিকারী পাখীর কবলে পড়িয়া অথবা স্বাভাবিক ভাবে প্রাণ ত্যাগ করে।

গঙ্গার মোহনায়, নোনা জলে ভেরীর বাঁধের মধ্যে সময়ে সময়ে এক রকম অদ্ভুত মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের শরীর আগাগোড়া দুই পাশে চ্যাপ্টা, লেজের প্রান্তভাগ সরু সুতার মত প্রায় পাঁচ-ছয় ইঞ্চি লম্বা, মুখে করাতের দাঁতের মত খাড়া খাড়া ভীষণ ধারালো দাঁত, সম্মুখের দাঁত কয়টি সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও ধারালো। ইহাদিগকে অনেকে 'গাং-বাতাসী', আবার কেহ কেহ 'গাং-তরাসী'ও বলিয়া থাকেন। বড় হইলে ইহাদিগকে সামুদ্রিক সর্প বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নহে—এমনই ভীষণ ইহাদের চেহারা। শিকারোপযোগী মাছ দেখিলে ইহারা তাড়া করিয়া বিদ্যুদ্বেগে তাহার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়ে। কোন রকমে একবার ধরা পড়িলেও ভীষণ দাঁতের কামড় হইতে শিকারের উদ্ধার পাওয়ার কোন উপায়ই থাকে না।

খাল, বিল ও বদ্ধ জলাশয়ে 'বেলে'-জাতীয় এক প্রকার হড়হড়ে মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে সাধারণতঃ 'চাপা-

ভ্যাদস ও চাপাবেলে মাছ
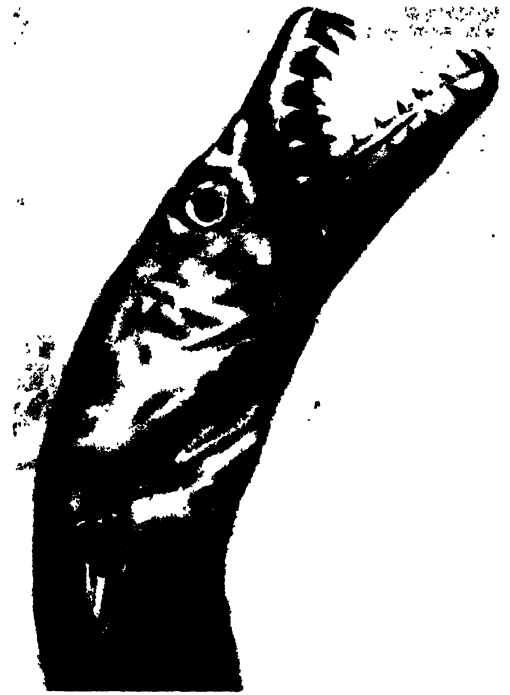
বেলে' নামে অভিহিত করা হয়। ইহাদের কান্‌কোর পাশের পাখনা দুইটি খুব চওড়া ও মাংসল, মুখের উপরে ও নীচে দুই জোড়া শুঁড় আছে। মুখখানা দেখিতে অদ্ভুত। চোখ দুটি সহজে লক্ষ্য হয় না। ইহারা জলের তলায় মাটির উপর আবর্জ্জনার মত পড়িয়া থাকে। ছোট ছোট মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী আবর্জ্জনা মনে করিয়া ইহাদের কাছে আসিবামাত্র মুখ ব্যাদান করিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

ন্যাদস বা বয়না মাছ সর্ব্বজনপরিচিত। ইহারাও ভয়ানক শিকারী। পরিষ্কার জলে থাকিলে ইহাদের গায়ের রং ঈষৎ হলদে হইয়া থাকে, কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে বাস করিলেই ইহাদের রং কালো হইয়া থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া গায়ের রং পরিবর্ত্তিত হইবার ফলে ইহাদের শিকারের যথেষ্ট সুবিধা হইয়া থাকে। সাধারণ ভাবে দেখিলে ইহাকে শিকারী মাছ বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু ঠোঁটের প্রান্তভাগ ধরিয়া একটু টান দিলেই দেখা যাইবে, নাকের ভিতর হইতে পিচ্‌কারির ডাঁটের মত একটা লম্বা কাঠির সঙ্গে চামড়ার মত এক প্রকার স্বচ্ছ পদার্থে ঘেরা একটা প্রকাণ্ড মুখ বাহির হইয়া আসিল। ইহাদের শরীরের প্রায় অর্দ্ধেক আকারের মাছকে অনায়াসে গিলিয়া ফেলে। শিকার গিলিয়া ফেলিবার পর মুখখানাকে আবার গুটাইয়া রাখে। ন্যাদস্‌ মাছের পিচকারির ডাঁটের মত এই লম্বা কাঠির সম্বন্ধে একটা প্রচলিত গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। বৌ-কাট্‌কী শাশুড়ী তার বউয়ের নাকের ভিতর নাকি ভাতের কাঠি গুঁজিয়া দিয়া তাকে জলে ডুবাইয়া দেয়। বৌ ন্যাদস্‌ মাছ হইয়া জলে বাস করিতে থাকে; কিন্তু শাশুড়ীর দেওয়া কাঠি ফেলিয়া দিয়া ত তার অপমান করিতে পারে না। কাজেই নাকের কাঠি তাহার নাকেই রাখিয়া দিল। গুরুজনের প্রতি এই অচলা ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ আজও পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুসমাজে বিবাহের পর নূতন বৌ প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসিবা মাত্রই তাহার হাতে মাছের চুবড়ির মধ্যে ন্যাদস্‌ মাছ দিয়া দেওয়া হয়।

[প্রবন্ধের ছবিগুলি লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত]

সংসার

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃদ্ধ বয়সে দাম্পত্য কলহ কৌতুক এবং হাসির কথা। কিন্তু প্রেমের দেবতা চিরদিনই অবুঝ কিশোর, স্থান-কাল-পাত্র লইয়া কোন বিবেচনা বা বিচার করা তাহার প্রকৃতির বহির্ভূত। পঞ্চান্ন বৎসরের সরকার-গৃহিণী ষাট বৎসরের বৃদ্ধ স্বামীর উপর দুর্জ্জয় অভিমান করিয়া বসিলেন; তাও গোপনে নয়, একেবারে প্রকাশ্যে—উপযুক্ত ছেলে-বউ এবং একঘর নাতি-নাতনীর সমক্ষেই অভিমান ঘোষণা করিয়া গাড়ী আনাইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গেলেন।

ছেলে-বউয়েরা কেহ কিছু বলিতে পারিল না। বড় নাতনী সদ্যবিবাহিতা কমলা কিন্তু থাকিতে পারিল না, সে মুখে কাপড় দিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সরকার-গিন্নী গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিলেন—হাসছিস যে বড়?

কমলা হাসিতে হাসিতেই বলিল—একটা ছড়া মনে পড়ল ঠাকুমা।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গিন্নী বলিলেন—ছড়া?

—হ্যাঁ। শিবদুর্গার সেই ছড়া—সেই যে—

"মর মর মর ভাঙড় বুড়ো তোর চক্ষে পড়ুক ছানি
বাপের বাড়ী চললাম আমি—বলেন দুর্গা রাণী—
কোলে লয়ে কার্ত্তিক, হাটায়ে গণপতি—
রাগ ক'রে চলিলেন অম্বিকে পার্ব্বতী।"

তা বাবাকে কাকাকে নিয়ে যাও!

নাতনীর এ-রহস্য সহাস্যমুখে তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না, বুকে বরং আঘাতই লাগিল। রহস্যের উত্তর পর্য্যন্ত তিনি দিতে পারিলেন না, শুধু কমলার মুখের দিকেই নীরবে চাহিয়া রহিলেন। সে-দৃষ্টির ভাষাতেই কমলা নিজের ভুল বুঝিতে পারিল—সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া একান্ত অনুতপ্ত মিনতিপূর্ণ কণ্ঠেই বলিল—রাগ করলে ঠাকুমা?

ম্লান হাসি হাসিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া গিন্নী

বলিলেন—তোর উপর কি রাগ করতে পারি ভাই?

কমলি আবার রসিকতা করিয়া ফেলিল, চুপিচুপি বলিল—বর অদল-বদল কর ঠাকুমা, আমার সে ভারী অনুগত বর। তুমি খুশী হবে। আমি একবার বুড়োকে দেখি তা হ'লে!

এবার ঠাকুমা হাসিয়া ফেলিলেন, তার পর বলিলেন—তার চেয়ে তুই দুটোই নে ভাই। আমার আর চাই না, আমার অরুচি ধরেছে।

কমলি বলিল—কিন্তু তুমি এমন ক'রে বাপের বাড়ী যেয়ো না ঠাকুমা, লোকে হাসবে।

ঠাকুমা এবার জলিয়া উঠিলেন—তবে ত আমার গায়ে ফোস্কা পড়বে লো হারামজাদী! কেন আমি আমার বাপের বাড়ী যেতে পাব না, ভাই-ভাজ কি সংসারে পর না কি? আয় রে খেঁদী আয়। বলিয়া ছোট নাতনী খেঁদীর হাত ধরিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। ছোট ছেলে অমৃত গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া বলিল—বেশী দিন থেকো না মা, দিন-দশেকের মধ্যেই চলে এস।

গিন্নী বলিলেন—আমি আর আসব না বাবা। তোমার বাপের ও হতচ্ছেদ্দার ভাত আমি খেতে পারব না!

নাতনী খেঁদীও বলিয়া উঠিল—আমিও বাবা—আমিও আর আসব না।

তাহার কথা শেষ না-হইতেই শিহরিয়া উঠিয়া গিন্নী তাহার পিঠে একটা চড় বসাইয়া দিলেন—কি, কি বল্লি হারামজাদী! কি বল্লি?

খেঁদী অপ্রত্যাশিত ভাবে চড় খাইয়া হতভম্বের মত কিছুক্ষণ ঠাকুমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর ক্রুদ্ধ বিড়ালীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিল—

—তুই বললি কেন—তুই?

সে-কথার কোন উত্তর না-দিয়া গিন্নী বলিলেন—বল্, শীগ্‌গির আসব বাবা! বল্!

অমৃত হাসিতে হাসিতেই সেখান হইতে ফিরিল। বলিল, ঐ হয়েছে মা, তুমি বললেই ও এখুনি বলবে।

কারণটা নিতান্তই তুচ্ছ। উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নানে যাওয়া লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে বিরোধ। কর্ত্তা সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নানে যাইবেন। কথাটা মনে-মনেই রাখিয়াছিলেন—প্রকাশ করিলেন যাত্রার পূর্ব্বদিন। শুনিবামাত্র গিন্নী নিজের মোটঘাট বাঁধিতে বসিলেন, কর্ত্তা সবিস্ময়ে বলিলেন—ও কি? তুমি কোথা যাবে?

একটা কৌটায় দোক্তাপাতা পুরিয়া পোট্‌লায় বাঁধিতে বাঁধিতে গিন্নী বলিলেন,—আমিও যাব। সঙ্গে সঙ্গে মেলার পিতল কাঁসা ও পাথরের বাসনের দোকানগুলি সারি সারি কর্ত্তার মনশ্চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। বাসা আর দোকান, দোকান আর বাসা! অন্ততঃ কুড়ি-পচিশ টাকা! কর্ত্তা শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি ঘাড় নাড়িয়া প্রতিবাদ জানাইয়া বলিলেন—উঁহু!

—উঁহু কি? তোমার হুকুমে নাকি?

—তুমি তো এই কার্ত্তিক মাসে গঙ্গাস্নান করে এলে!

—কার্ত্তিক মাসে করেছি তো পোষ মাসে কি? আমি যা—বোই। তুমি সঙ্গে করে আমাকে কোথাও নিয়ে যাও না। ছেলেদের সঙ্গে দাও—আর তারা গিয়েই ধুয়ো ধরবে—টাকা নেই, বাবা বকবে! ও-সব হবে না। এবার আমি ওই চাটুজ্জেদের মত একখানা বড় গামলা আর বাঁড়ুজ্জেদের মত একটা ডেকচি কিনব।

কর্ত্তা আর থাকিতে পারিলেন না। বলিয়া উঠিলেন—তার চেয়ে বল না যে আমাকে অন্তর্জলী করে দিতে যাবে!

মুহূর্ত্তে গিন্নীর সর্ব্ব অবয়ব যেন অসাড় পঙ্গু হইয়া গেল, গ্রন্থিবন্ধনিরত হাত দুইখানি পোঁট্‌লার উপর আড়ষ্ট হইয়া এলাইয়া পড়িল, মুখের চেহারায় নিমেষে সে এক অদ্ভুত রূপান্তর!

কর্ত্তা নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, চট্ করিয়া সংশোধনের একটা উপায় ঠাওরাইয়া তিনি হা হা করিয়া খানিকটা হাসিয়া লইলেন, নিতান্ত প্রাণহীন কাষ্ঠহাসি! হাসিতে হাসিতে বলিলেন—সে পারব না বাপু, এই বুড়ো বয়সে আমি তোমাকে অন্তর্জলী করতে পারব না!

তার পর আবার খানিকটা সেই হাসি—হে-হে-হে-হে!

গিন্নী কোন উত্তর দিলেন না—শুধু একটা সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাটির মেঝের উপরেই শুইয়া পড়িলেন। কর্ত্তা পরম উৎসাহের সহিত বলিলেন—তাই চল; গাঁটছড়া বেঁধে গঙ্গাস্নান করতে হবে কিন্তু! তখন কিন্তু লজ্জা করলে শুনব না! কত বাসনই কেনো তাই আমি একবার দেখব!

তবুও কোন উত্তর নাই। কর্ত্তার বুকের ভিতরটা একটা দারুণ অস্বস্তির উদ্বেগে হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, পা দুইটা যেন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে। —যাই দেখি, তা হ'লে দুখানা গাড়ীই সাজাতে বলি। একখানা গাড়ীতে জিনিষপত্র আসবে। বড় গামলা—ও দুখানা কেনাই ভাল, একখানাতে ডাল একখানাতে ঝোল! তা বটে, বাসন কতকগুলো সত্যিই দরকার! হাঁ—বলিতে বলিতেই তিনি পলাইয়া আসিলেন। খানিকটা পাড়ার চাটুজ্জের সঙ্গে গল্পগুজব করিয়া ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন—গিন্নী পণ করিয়াছেন—এ-বাড়ীর অন্ন আর তিনি গ্রহণ করিবেন না, বাপের বাড়ী যাইবেন। এ-বাড়ীতে থাকিবার দিন তাঁহার নাকি শেষ হইয়াছে।

দাম্পত্য প্রেমে মানুষকে যেমন কাণ্ডজ্ঞানহীন করে এমন আর কিছুতে পারে না, সরকার-কর্ত্তা গম্ভীর প্রকৃতির লোক, গ্রামের মধ্যে মাননীয় ব্যক্তি, সেই কর্ত্তা দাম্পত্য কলহে দিশা হারাইয়া সেই রাত্রে শয়নকক্ষে মুখ ঢাকিয়া একখানা গামছা বাঁধিয়া বসিয়া রহিলেন, মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন—গিন্নী দেখিয়া নাক বাঁকাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি গান ধরিয়া দিবেন—এ পোড়ামুখ হেরবে না ব'লে হে, আমি বিদেশিনী সেজেছি!

হঠাৎ পৌত্রী কমলা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল, তাঁহার এই মূর্ত্তি দেখিয়া সে একটু চকিত হইয়াই বলিল—ও মা গো—ও কি?

কর্ত্তা আজ যেন একেবারে ছেলেমানুষ হইয়া গিয়াছেন —কমলার এই আতঙ্ক দেখিয়া কৌতুকে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন—আমি ভূত!

কমলি সেয়ানা মেয়ে, সে ব্যাপারটা সঠিক না বুঝিলেও আভাসে খানিকটা অনুমান করিয়া লইল—সেও খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—তা ভূত-মশায় আপনি খিল দিয়ে শুয়ে পড়ুন, আপনার পেত্নী আসবেন না, আমার কাছে শুয়েছেন।

কর্ত্তা মুখের গামছাখানা টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া দিশাহারার মত চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনের মধ্যেও দারুণ অস্বস্তি, বুকের ভিতরটা এক অসহনীয় উদ্বেগে অহরহ পীড়িত হইতেছে। সহসা তাঁহার ইচ্ছা হইল—নিজের গালেই তিনি ঠাস ঠাস করিয়া কয়েকটা চড় বসাইয়া দেন। তার পর রাগ হইল গিন্নীর উপর। কি এমন তিনি বলিয়াছেন যে কচি খুকীর মত এমনধারা রাগ করিয়া বসিল বুড়ী! তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, নির্জ্জন ঘরের সুবিধা পাইয়াই বোধ হয় অকস্মাৎ গিন্নীর উদ্দেশ্যে দুই হাত নাড়িয়া মুখ ভেঙাইয়া উঠিলেন—এ্যাই—এ্যাই—এ্যাই! এ্যাঃ—কচি খুকী আমার! গলায় দড়ি দিক গে একগাছা—লজ্জাও নেই! এ্যাঃ!

পরদিনই গিন্নী বাপের বাড়ী রওনা হইয়া গেলেন; ছেলে-বউ নাতি-নাতনী কাহারও কথা শুনিলেন না। কেবল ছোটছেলের মেয়ে গেঁদী কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িল না—গিন্নীও তাহাকে ছাড়া থাকিতে পারেন না, সে-ই সঙ্গে গেল।

বহির্বাটীতে কর্ত্তা তখন বাড়ীর কৃষাণদের সঙ্গে এক তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছেন। রাগে তিনি যেন আগুনের মত জ্বলিতেছিলেন।

• • •

দিন-পাচেক পরেই বৃদ্ধ সরকার-কর্ত্তা শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে গাড়ীতে একগাড়ী বোঝাই করা বাসন।

গিন্নী চলিয়া যাওয়ার পর তিনিও রাগ করিলেন। মনে মনে ঠিক করিলেন গঙ্গাস্নানে যাইবেন এবং আর তিনি ফিরিবেনই না, গঙ্গাতীরেই একখানা কুটীর বাঁধিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ কাটাইয়া দিবেন। পরদিনই তিনি গঙ্গাস্নানে রওনা হইয়া গেলেন, সঙ্গে গোপনে টাকাও লইলেন অনেকগুলি। একখানা বাড়ী, ছোটখাটো যেমনই হউক, কিনিয়া তিনি ফেলিবেনই! কিন্তু সেখানে

নজয়াঃ

প্রসাদ দ্রাচ

প্র, ক
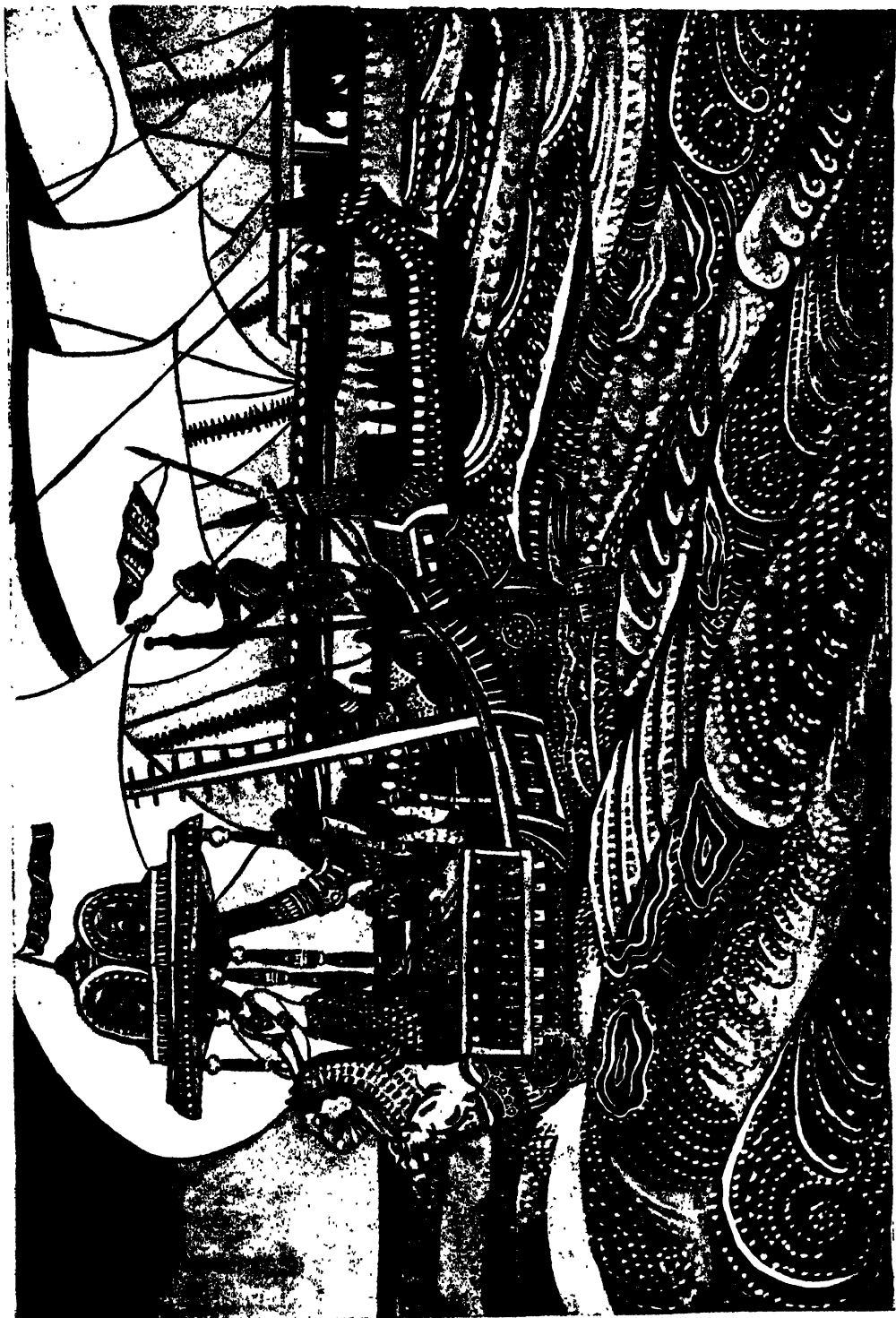
গিয়া বাড়ীর পরিবর্ত্তে এক গাড়ী বাসন কিনিয়া তিনি স্বগৃহের পরিবর্ত্তে শ্বশুরগৃহে আসিয়া উঠিলেন। শ্যালকেরা পরম সমাদরের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। পা-হাত ধুইবার জল, তামাক, জেলে ডাকিবার বন্দোবস্ত—সে অনেক কিছু। হুঁকাতে কয়েকটা নামমাত্র টান দিয়াই সরকার-কর্ত্তা উঠিয়া বলিলেন—চল তোমাদের গিন্নীদের একবার দেখে আসি। শ্বশুরবাড়ীর আনন্দই হ'ল শালী আর শালাজ। চল। বলিয়া নিজেই তিনি অন্দরের পথ ধরিলেন।

একখানা কার্পেটের আসনে মহা সমাদর করিয়া তাঁহাকে বসাইয়া বড় শ্যালকপত্নী প্রণাম করিয়া উঠিয়াই ফিক্ করিয়া একটু হাসিলেন। বলিলেন—তার পর? এলেন?

কর্ত্তাও ঐ হাসিই একটু হাসিয়া বলিলেন—এলাম।

—হু। বলিয়া শ্যালকপত্নী আবার হাসিলেন।

মাথা চুলকাইয়া কর্ত্তা বলিলেন—খেঁদী কই?

—পাখী উড়েছে—দিদি এখানে নেই সরকার মশাই!

—তোমার দিদির কথা আমি জানতে ত চাই নি, খেঁদী কই?

—ঐ হ'ল গো। দিদি তাকে নিয়ে বুড়ো বয়সে গেলেন মামার বাড়ী। এই কাল গিয়েছেন।

মামার বাড়ী? সরকার-কর্ত্তার সর্ব্বাঙ্গ এই মাঘের শীতে যেন জল-সিঞ্চিত হইয়া গেল। শ্যালকপত্নী বৃদ্ধ বয়সেও খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, তার পর ডাকিলেন—ওগো ও দিদি, নেমে এস না ভাই, কর্ত্তার বুকে যে তোমার খিল ধরে গো!

সরকার-গিন্নী সত্যই নামিয়া আসিলেন, কিন্তু কর্ত্তাকে একটি কথাও না বলিয়া ভাজকে বলিলেন—তোমার কি কোন আক্কেল নেই বউ? ছি, উপযুক্ত ছেলে-বউ কি সব ভাবছে বল ত?

ঠিক এই মুহূর্ত্তটিতেই খেঁদী একেবারে লাফ দিতে দিতে আসিয়া বাড়ী ঢুকিল—ওরে বাবা রে! দাদু এক গাড়ী বাসন এনেছে। এই বড় বড় গামলা, এত বড় ডেকচি, গেলাস, বাটি--কত—কত—। সে দাদুর গলা জড়াইয়া পিঠের উপর ঝুলিয়া পড়িল।

শ্যালক-পত্নী বলিলেন—সব তোমার ঠাকুরমায়ের! তোমার জন্তে খটখট লবডঙ্কা!

খেঁদী এবার পিঠ হইতে কোলে আসিয়া বসিয়া বলিল—এঁ্যা আমার কি এনেছ এঁ্যা!

সরকার-কর্ত্তা গিন্নীর দিকে একবার চাহিয়া লইয়া মৃদুস্বরে গান করিয়া বলিলেন—তোমার জন্তে একখানি নয়না এনেছি হে! আর একখানি কিরুণী এনেছি! বলিয়া পকেট হইতে ছোট্ট একখানি আয়না ও চিরুণী বাহির করিয়া দিলেন।

খেঁদী বলিল—যাঃ এ যে আয়না চিরুণী, নয়না কিরুণী কেন হবে?

—ইয়া বড় বড় হ'লেই বলে আয়না চিরুণী, আর এ হ'ল নয়না আর কিরুণী।

—আর আর। না এ ছাই! এ আমি নেব না। ঠাকুরমায়ের জন্তে কত এনেছ তুমি—হঁ্যা।

এবার ঠাকুরমা লজ্জিত হইয়া বলিলেন—এনেছে এনেছে, তোর জন্তে অনেক এনেছে। একটু থাম্, মানুষকে একটু জিরুতে দে!

কর্ত্তা পুলকিত হইয়া বলিলেন--বাক্সটা নামিয়ে আনতে বল—। কথা শেষ না-হইতেই খেঁদী ছুটিল—বাক্স বাক্স!

কর্ত্তা আবার বলিলেন—বাসনগুলো নামাতে বল; গামলা কিনেছি চারখানা—ডেকচি বড় বড় দুটো—

বাধা দিয়া গিন্নী বলিলেন—নামিয়ে আর কি হবে, বাড়ীতেই নামাবে একেবারে। খাওয়া-দাওয়া ক'রেই চলে যাও।

বলিয়াই তিনি উপরে চলিয়া গেলেন। অকূল সমুদ্রে কর্ত্তার হাত হইতে যেন অকস্মাৎলব্ধ কাষ্ঠখণ্ডটি আবার ভাসিয়া গেল। শ্যালক-পত্নী হাসিয়া বলিলেন—কঠিন ব্যাপার সরকার মশাই!

সরকার কাতর স্বরেই বলিলেন—কি করি বল দেখি ভাই?

উপর হইতে প্রশ্ন হইল—বলি, নন্দাইকে জলটল খেতে দাও—না আমোদই করবে?

—ও-মা! বলিয়া জিব কাটিয়া শ্যালকপত্নী ব্যস্ত হইয়া

ডাকিলেন—বৌমা, বৌমা, কি আক্কেল তোমাদের বাপু, ছি!

বৌমার অপরাধ ছিল না, সে প্রস্তুত হইয়াই ছিল, জলখাবারের থালা হাতে সে বাহির হইয়া আসিল। কথাটা চাপা পড়িয়া গেল।

তখনকার মত চাপা পড়িলেও শেষ পর্য্যন্ত শ্যালক-পত্নীই মধ্যস্থ হইয়া স্বামী-স্ত্রীর একটা আপোষ করিয়া দিলেন। সরকার-মহাশয়কে তিনি প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন—দেখুন, কথার খেলাপ করবেন না ত? তিন সত্যি করুন আপনি।

—তিন সত্যিই করছি গো আমি। আনব আনব—এক বছরের মধ্যেই আমি হরিদ্বার পর্য্যন্ত তীর্থ করিয়ে আনব।

সরকার-গিন্নী বলিলেন—যে-কথা তুমি বলেছ আমাকে তার জন্ত আমাকে একশো আটটি সধবা ভোজন করাতে হবে এই এক মাসের মধ্যে।

—বেশ তাই হবে। নতুন বাসনে একটা কাজ হয়ে যাক।

শ্যালক-পত্নী বিনা-বাক্যব্যয়ে এবার হাসিতে হাসিতে সরিয়া পড়িলেন। সরকার-গিন্নী বলিলেন—তুমি সাক্ষী থাক ভাই বউ—, কই বউ—

হাসিয়া সরকার বলিলেন—চলে গিয়েছেন তিনি।

বাহির পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়া সরকার-গিন্নী বলিলেন—বলি, তোমার আক্কেলটা কি রকম শুনি? রাজ্যের বাসন নিয়ে যে একবারে এখানে চলে এলে? এখন সমস্ত ছেলের হাতে আমাকে একটি করে বাটি নয় গেলাস দিতে হবে। ঘেটের কোলে পনর-যোলটি ছেলে! কোন আক্কেল নেই তোমার!

সরকার বলিলেন—বেশ ত গো—আবার তোমাকে কিনে দিলেই ত হ'ল?

পরদিনই সরকার মহাশয় গৃহিণীকে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। গাড়ীতে উঠিবার সময় গিন্নী আবার বলিলেন—দেখ, এক বছরের মধ্যে তুমি নিজে সঙ্গে ক'রে হরিদ্বার পর্য্যন্ত তীর্থ করিয়ে আনবে ত?

আবার সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেন—আনব—আনব—আনব।

*   *   *

কিন্তু আপত্তি তুলিল ছেলেরা। প্রবল আপত্তি করিয়া বড় ছেলে বলিল—বেশ ত যাবেন আর কয়েক বছর পরে। আমরা সব বুঝে সুঝে নিই।

সরকার-কর্ত্তা গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—শোন, পয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের উপযুক্ত ছেলের কথা শোন একবার।

তার পর ছেলেকেই বলিলেন—এই দেখ, আমার তখন পঁচিশ বছর বয়স। পঁচিশ নয়—পুরো চব্বিশ—নামে পঁচিশ, সেই বয়সে আমি বাপ-মাকে কাশীবাস করিয়েছিলাম। দেখলাম বাবার শরীর খারাপ, চিঠি লিখে কাশীতে বাড়ীভাড়া করলাম। বাবা কিছুতেই যাবেন না, আমি জোর ক'রে নিয়ে গেলাম। ভাল স্নান, ভাল খাবেন, ভাল থাকবেন, বিশ্বনাথ দর্শন করবেন! কোথায় এ সংসারপঙ্কে ডুবে এই গোষ্পদে পড়ে থাকবেন! শেষ সময়ে বাবা দু-হাত তুলে আমাকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। আর তোরা এই বলছিস? তাও আমরা চিরদিনের মত যাই নি—এই মাস-দুয়েক পরেই ফিরব!

ছেলে বলিল—ব্যবসার বাজার যা মন্দা পড়েছে তাতে ঝক্কি ঘাড়ে নিতে আমার সাহস হচ্ছে না। তার উপর চাষ জমিদারী, হাইকোর্টে মোকদ্দমা, এ সামলাতে আমরা পারব না।

এবার বিরক্ত হইয়া সরকার-কর্ত্তা বলিলেন—না পারলে হবে কেন? আমরা কি চিরজীবী? আমি এই সংসারের ভার নিয়েছি পঁচিশ বছর বয়সে। তখন ছিল কি? বাবার পৈত্রিক পাঁচ-শ টাকা জমিদারীর আয় আর শ-খানেক বিঘে জমি। বাবা কাশী যাবার পর ব্যবসা আরম্ভ ক'রে এই সব আমি করেছি। বাবা কিছুতেই ব্যবসা করতে দেবেন না, আমিও ছাড়ব না। তাঁকে কাশীতে রেখে এসেই আমি ব্যবসা করেছিলাম। তোদের মত ভয় করলে হ'ত এই সব? না, বাপের আঁচল ধরে বসে থাকলে হ'ত?

ছেলে এবার বাধ্য হইয়া বলিল—তবে যান। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আবার সে বলিয়া উঠিল—কিন্তু—

—আবার কিন্তু তুলিস কেন! কিন্তু কিসের?

—টাকাকড়ির বড় টানাটানি চলছে—কোথা থেকে যে টাকা আপনাদের দেব তাই ভাবছি। মাস তিনেক পরে—

বাধা দিয়া সরকার-কর্ত্তা বলিলেন—টাকাকড়ি কিছু লাগবে না বাবা, তোমাদের টাকা আমি নেব না, তীর্থের টাকা—সে আমার কাছে আছে।

হাসিয়া ছেলে বলিল—আমাদের টাকা? বিষয় সম্পত্তি সংসার আমাদের না আপনার?

এবার সরকার-গিন্নী বলিলেন—আর সংসার তোমাদের বই কি বাবা, ছেলেমেয়ে ঘরদোর সবই এখন তোমাদের। আমরাও এখন তোমাদের ছেলেমেয়ের সামিল।

কর্ত্তা বরং বলিলেন—না না, তা বললে হবে কেন? যত দিন আমরা আছি তত দিন ঝড়ঝাপটা আমাদেরই মাথায় নিতে হবে বই কি। বাপমায়ের আড়াল হ'ল পাহাড়ের আড়াল!

যাক্। ইহার পর আর কোন বাধাই হইল না, উদ্যোগ-আয়োজন করিয়া সরকার-কর্ত্তা শুভদিনে গৃহিণীকে লইয়া তীর্থযাত্রা করিলেন। ট্রেনে উঠিয়া মনটা কেমন করিয়া উঠিল। ছেলেরা, ছোট ছোট নাতি-নাতনীরা প্লাটফর্মের উপর কেমন বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঘর-দ্বার দেখা যায় না কিন্তু গ্রামপ্রান্তের গাছপালাগুলির শ্যামলতার উপরেও কেমন যেন উদাসীনতার ছাপ পড়িয়াছে।

সরকার-গিন্নী জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, বোধ করি সকলকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন—এই ত কটা দিন, দু-মাসে যাট দিন।

কর্ত্তা গম্ভীর ভাবে বলিলেন—খুব হুঁসিয়ার বাবা। যে কাজ করবে বেশ ক'রে ভেবে চিন্তে—বরং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চিঠি লিখে দেবে। আমি যেখানে যাব ঠিক-ঠিকানা আগে থেকে জানাব।

ট্রেনটা ইতিমধ্যেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কর্ত্তা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—না না, এমন ক'রে ট্রেনের সঙ্গে—

ট্রেন গতি সঞ্চয় করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

বড় ছেলে বলিল—একটা কথা—জিজ্ঞেস করতেও পারলাম না ছাই, অথচ—কনিষ্ঠ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল—কি?

—এই কোথায় কি রইল! মানে—

—সবই তোমার বাবার খাতায় আছে। বাবার কাজ বড় পরিষ্কার।

ঠোঁট মচকাইয়া বড় জন কহিল—খাতায় সে নেই, তা হ'লে আমি জানতাম। বাবা মা—দুজনের কাছেই টাকা আছে, সে সব হিসেবের বাইরের পুঁজি। সে দিন বললেন মনে নেই?

ছোট ভাই ভ্রূ তুলিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—হ্যাঁ বটে! কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আবার সে বলিল—মানুষের শরীর!

* * *

প্রথমেই সরকার-দম্পতি কাশীতে নামিলেন। বাসায় উঠিয়া কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন—যাক্ তিন সত্যির দায় থেকে মুক্ত হলাম। বাপ, মুখ ফসকে একটা কথা বলে কি তার প্রাশ্চিত্তির!

গিন্নী বেশ বড় বড় পেয়ারা কিনিয়াছিলেন—ছোট বঁটি পাতিয়া একটা পেয়ারা কাটিতে কাটিতে বলিলেন—প্রাশ্চিত্তি! তীর্থ করার নাম প্রাশ্চিত্তি? আর তোমরা বল মেয়েদের মত সংসারের মায়া আর কোন জাতের নেই! টাকা টাকা আর বিষয় বিষয়, পুরুষের মত নরুকে জাত আবার আছে না কি? আমি ম'লে ঠিক আবার তুমি বিয়ে করবে।

কর্ত্তা বলিলেন—উত্তর দিতাম, কিন্তু কে ফেসাদে পড়ে সে কথা ব'লে! হয়ত এবার সশরীরে স্বর্গ ঘুরিয়ে আনতে সত্যি করতে হবে।

গিন্নী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—আর ত কিছু জান না, শুধু কুট্ কুট্ ক'রে কথা কইতেই জান!…

নাও, এখন মুখে দাও কিছু—বলিয়া শ্বেতপাথরের একখানি রেকাবিতে কিছু ফল ও মিষ্টি সাজাইয়া নামাইয়া দিলেন।

কর্ত্তা বলিলেন—এটা? রেকাবিখানার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—বাড়ী থেকে এনেছ বুঝি? পথে ঘাটে এসব জিনিষ ভেঙে যায়।

বিরক্ত হইয়া গিন্নী বলিলেন—বাড়ী থেকে আনে না কি? কিনলাম এখুনি, বিক্রী করতে এসেছিল। তুমি বাজারে গিয়েছিলে তখনই এসেছিল।

কর্ত্তা এক টুকরা ফল মুখে তুলিয়া বলিলেন—হুঁ।

কিছুক্ষণ পর সহসা তিনি বলিলেন—দেখ, একটা কথা তোমায় বলি। একখানা বাড়ী এখানে ভাড়া করে ফেলি। আর শেষ ক'টা দিন এইখানেই কাটিয়ে দেওয়া যাক। বহুদিন থেকেই এ আমার সঙ্কল্প। তবে যদি বল, কই কখনও ত বল নি, সে বলি নি নানা কারণে, সংসারটা একটু গুছিয়ে ছেলেদের হাতে দিয়ে তার পর যাব এই মনে ছিল। কিন্তু এসেছি যখন, তখন আর নয়, কি বল তুমি?

একদৃষ্টে শূন্যের দিকে যেন ভবিষ্যতের গর্ভের মধ্যে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া গৃহিণী বলিলেন—কথা ত ভালই। কিন্তু ছেলেরা এখনও তেমন সক্ষম হ'ল কই? দেখলে তো আসবার সময় কি কাকুতি বেচারাদের। তার পর সহসা প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া হুড় হুড় করিয়া বলিয়া উঠিলেন—না বাপু, খেঁদীর বিয়ে আর বড় নাতির বিয়ে এ না দেখে সে হবে না।

অতঃপর তর্কবিতর্ক করিয়া স্থির হইল, দুই মাসের স্থলে ছয় মাস অন্ততঃ থাকিতে হইবে। ছয় মাস পরে আগামী মাঘ মাসে প্রয়াগে কুম্ভযোগ, কুম্ভযোগে ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান করিয়া বাড়ী ফেরা হইবে। আপাততঃ তীর্থগুলি ফিরিয়া কাশীতে আসিয়াই বাস করাই স্থির হইল, কর্ত্তা একখানা ছোটখাট বাড়ীও কয়েক মাসের জন্য ভাড়া করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সাবিত্রী-তীর্থে গিয়া পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে গিন্নী বিদ্রোহ করিয়া উঠিলেন, না বাপু, আমাকে তুমি দেশে রেখে এস। বাতের যন্ত্রণায় মরে গেলাম, বেলের ধর্ম্মরাজতলা আমাকে যেতেই হবে। আর ছেলেদের মুখ মনে পড়ছে না আমার!

কর্ত্তা হাসিলেন, বলিলেন—আজই লিখে দিচ্ছি ধর্ম্মরাজের তেল আর ওষুদের কথা। কাশী গিয়েই পাবে, বসে বসে মালিস যত পার কর না!

গিন্নী বলিলেন—তুমি আমাকে আর ঘরে ফিরতে দেবে না দেখছি।

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন—বেশ তো, 'পুত্র পৌত্র স্বা-মীর কো-লে, একবার কা-শীর গঙ্গা-জলে' সে ত ভালই হবে।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গিন্নী বলিলেন—হ্যাঁঃ, তেমনি ভাগ্যি কি আমার হবে! তেমন পুণ্যি কি-এমন করেছি বল; কখনও তুমি মনের সাধ মিটিয়ে ব্রত-পার্ব্বণ করতে দিয়েছ? আমার আবার ঐ ভাগ্যের মরণ না কি হয়!

কিন্তু আপনার অজ্ঞাতসারে গিন্নী সে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন; মহাকুম্ভযোগে ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নানান্তে গিন্নী কলেরায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

কর্ত্তা বলিলেন—গিন্নী, কাকে দেখতে ইচ্ছে হয় বল, আসতে টেলিগ্রাম ক'রে দিই।

—দেখতে? একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গিন্নী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—পারলে না নিয়ে যেতে?

তার পর আবার বলিলেন—নাঃ থাক! কাউকেই আসতে হবে না। বড় খারাপ রোগ। তুমিই সদ্গতি করবে আমার! সাবধানে থেকো।

টপ টপ করিয়া কয় ফোঁটা জল কর্ত্তার চোখ দিয়া গড়াইয়া পড়িল। এবার গিন্নী হাসিলেন, বলিলেন—বুড়ো বয়সে কেঁদো না ছি! আমার লজ্জা লাগছে!

কর্ত্তা কিন্তু গিন্নীর কথা শুনিলেন না, বড় ছেলেকে তার করিলেন—'শীঘ্র এস—তোমার মায়ের কলেরা।'

তার পাইয়া সমস্ত সংসারটা চমকিয়া উঠিল। বড় ছেলে বলিল—এমন যে হবে, এ আমি জানতাম!

ছোট ভাই বলিল—কি বিপদ বল দেখি?

হাসিয়া বড় বলিল—এখন বিপদের হয়েছে কি? এই

তো সবে প্রথম সন্ধ্যে! এখনও কত হবে—সেখানকার রোগ এখানে আসবে—। তার পর অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল—বারবার তখন আমি বারণ করেছিলাম! কিন্তু বাপ হয়ে ছেলের কথা ত শুনতে নেই—অপমান হয় যে!

সেই দিনই দুই ভাই আরও একজন সঙ্গী সহ রওনা হইয়া গেল। কিন্তু যখন তাহারা সেখানে পৌছিল তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে! বাসার যে ঘরে সরকার-দম্পতি ছিলেন—ঘরখানা শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। বাসার প্রায় সকলেই সরিয়া পড়িয়াছে, যে কয়জন ছিল তাহারা বলিল—বুড়ী মেয়েটি মরেছে কাল সকালে। বুড়ো ভদ্দর-লোকটি চেষ্টাচরিত্র করে তার গতি করে এলেন দুপুর বেলায়, সেই দুপুরবেলা থেকেই তাঁরও আরম্ভ হল। তার পর মশায়, পরে কে কার মুখে জল দেয় বলুন; তবু সেবা-সমিতিতে খবর একটা দেওয়া হয়েছিল। তাও কেউ এল না। তার পর রাত্রে দেখলাম ভলেন্টিয়ার এসে কাঁধে করে নিয়ে গেল।

—কোন্ সমিতির ভলেন্টিয়ার বলতে পারেন?

—কে জানে মশাই—দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম ভলেন্টিয়ার, ঐ পর্য্যন্ত। আমরাও আজ মোটঘাট বেঁধেছি, এই দুপুরের ট্রেনেই ফিরব। তাহারা যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অশ্রুসজল নেত্রে দুই ভাই ত্রিবেণী-সঙ্গমে পিতা-মাতা উভয়ের তর্পণ সারিয়া গলায় কাছা পরিয়া বাড়ী ফিরিল; সঙ্গে রাজ্যের জিনিষপত্র—এলাহাবাদ ও কাশীর বাসায় গিন্নী বিহঙ্গিনীর মত একটি একটি করিয়া সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

* * *

সমারোহ-সহকারেই শ্রাদ্ধশান্তি হইল—ছেলেরা ত্রুটি কিছু করিল না। কিন্তু নিন্দুকে বলিল—করবে না ত কি—এক খরচে দুটো! একটা খরচ ত বেঁচে গেল।

কথাটা শুনিয়া বড় ছেলে বলিল—দুটোই করব. আমরা, বৎসর-কীর্ত্তিতে এই খরচই আমরা করব! বাবা মা ত আমাদের অভাব রেখে যান নি কিছুর!

সত্য কথা, সরকার-কর্ত্তা রাখিয়া গিয়াছেন প্রচুর। এই সেদিনও কর্ত্তা-গিন্নীর ঘরের মেঝে খুঁড়িয়া চার হাজার টাকা ছেলেরা পাইয়াছে। দুই ভাই পরামর্শ করিয়া ব্যবসায়টা বাড়াইবার সঙ্কল্প করিল। তিন দিন ধরিয়া গভীর আলোচনার ফলে ব্যবসায়ের পরিধি-পরিবর্দ্ধনের একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত শেষ করিয়া বড় ভাই বলিল—বেশ হয়েছে বুঝলি—আমার ত মনে হয় এর চেয়ে ভাল আর কিছু হ'তে পারে না!

ছোট ভাই বলিল—বাবা কিন্তু এতে মত দিতেন না। ঐ চেয়ার-টেবিল নিয়ে শহরে আপিস করা—

—তার মানে ইংরিজী জানতেন না তিনি—বড় বড় বিজনেস সার্কলে মেশবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। তার উপর—

তাহার মুখের কথা মুখেই থাকিয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; রাত্রি ও দিনের মধ্যবর্ত্তী যবনিকাটা ছিঁড়িয়া গিয়া যেন একটা অকল্পিত আলোকে পৃথিবীর রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। ছোট ভাই একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল। বাড়ীর সম্মুখের রাস্তার উপর একখানা গরুর গাড়ী হইতে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে নামিতেছেন—কর্ত্তার কঙ্কালসার প্রেতমূর্ত্তি! দুই ভাইকে দেখিয়াই দুরন্ত ক্রোধে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে মূর্ত্তি অস্বাভাবিক চীৎকার করিয়া উঠিল—পাষণ্ড—কুলাঙ্গার—আমি—আমি—।

কথা শেষ হইল না, প্রেতমূর্ত্তি পথের ধূলার উপরেই সশব্দে লুটাইয়া পড়িল।

গাড়োয়ানটা তাড়াতাড়ি সে দেহখানি তুলিয়া বলিল—জল আনেন গো, জল! ভিরমী গেইছেন গো—জল—জল!

এতক্ষণে বড় ছেলের সংজ্ঞা ফিরিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া চীৎকার করিল, জল—জল—। শিগ্‌গির জল আর পাখা-পাখা!

প্রেত নয়, রক্তমাংসের দেহধারী মানুষই। সরকার-কর্ত্তাই দুরন্ত কলেরার আক্রমণ হইতে বাঁচিয়া সশরীরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বলিবার ভুল এবং বুঝিবার ভুলে এমনটা হইয়া গিয়াছে। ভলেন্টিয়ারে তাঁহার শবদেহ লইয়া যায় নাই—রোগাক্রান্ত অবস্থাতেই তাঁহাকে হাসপাতালে

লইয়া গিয়াছিল। কয়েক দিন অচেতন থাকিয়া চৈতন্ত লাভ করিবার পর তিনি সংবাদ লইয়াছিলেন—কেহ আসিয়াছে কি না! কিন্তু কেহ আসে নাই শুনিয়া তিনি আর কোন কথা বলেন নাই—পরিচয় দেন নাই, জিনিষপত্রের খোঁজ করেন নাই, এমন কি আপনার রোগের যন্ত্রণার কথা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলেও বলেন নাই। তবু তিনি বাঁচিলেন। হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া মাটির পৃথিবীর সংস্পর্শে আসিয়া কিন্তু তাঁহার অন্তর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তিনি ত্যাজ্যপুত্র করিবার সংকল্প লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

চেতনা লাভ করিয়া ছেলেদের এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের কথা শুনিয়া কিন্তু কর্ত্তা নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। গ্রামের পাঁচজনে আসিয়া জমিয়াছিল। কর্ত্তার সমবয়সী বৃদ্ধ চাটুজ্জে বলিলেন—যাক—যা হয়েছে তা হয়েছে, এখন ধরাধরি ক'রে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাও! ভাল ক'রে সেবা-যত্ন কর, ডাক্তার-টাক্তার ডাকাও!

কর্ত্তা বলিলেন—নাঃ, বাড়ীর মধ্যে আর আমি যাব না। আমি কাশী যাব। যতক্ষণ আছি এইখানেই বেশ আছি আমি।

—বেশ ত, এই বাইরের ঘরেই বিছানা করে দাও! সে বরং ভালই হবে, ছেলেপিলের গোলমাল কচকচি কিছু থাকবে না। বল, বিছানা ক'রে দিতে বল।

বিছানায় শুইয়া কর্ত্তার চোখে জল আসিল। পাশেই পৌত্রী কমলা তাঁহাকে বাতাস করিতেছিল। কম্পিত কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক করিয়া কর্ত্তা তাহাকে বলিলেন—জানিস কমলা, তোর ঠাকুমায়ের বাড়ী ফিরে আসতে বড় সাধ ছিল। আমিই—

আর তিনি বলিতে পারলেন না, শুধু ঠোঁট দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কমলা পাকা গিন্নীর মত আপনার আঁচল দিয়া কর্ত্তার চোখের জল মুছিয়া দিয়া বলিল—সে আর আপনি কি করবেন বলুন। আপনি ত ভালই করতে গিয়েছিলেন। নিয়তির উপর ত কারু হাত নেই!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কর্ত্তা বলিলেন—তা নইলে আমি ফিরে আসি! শ্রাদ্ধ হয়ে গেল, শান্তি হয়ে গেল—কি লজ্জা বল দেখি ভাই। আমার লজ্জা—ছেলেদের লজ্জা—অথচ ছেলেরা ত আমার সে রকম নয়। কিন্তু লোকে ত বলতে ছাড়বে না!

এ-কথার উত্তর কমলা দিতে পারিল না। কর্ত্তাও নীরব হইয়া ঐ কথাই বোধ করি ভাবিতে আরম্ভ করিলেন। সহসা তাঁহার চোখে পড়িল, ছোট একটি দামাল ছেলে বহির্বাটী ও অন্দরের মধ্যবর্ত্তী দরজাটার উপরে বসিয়া পরম গম্ভীরভাবে একটুকরা মাটি লইয়া ভক্ষণ করিতেছে। লালাসিক্ত মৃত্তিকা-চিত্রিত মুখখানি দেখিয়া তিনি না হাসিয়া পারিলেন না। কিন্তু কে এটি!

কমলাও মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল—বলিল, ও মা গো! কি খাচ্ছ গাঁট্টারাম, এঁ্যা? সন্দেশ খাচ্ছ? কেমন লাগছে বাবু, ঝাল?

সঙ্গে সঙ্গে খোকা মাটিটা ফেলিয়া হু-হু করিতে আরম্ভ করিল।

কমলা হাসিতে হাসিতে বলিল—পাকামো দেখলেন!

—ওটি কার ছেলে?

—ওমা? চিনতে পারছেন না আমাদের গাঁট্টারামকে? ছোটকাকার ছোট খোকা!

—এঁ্যা--ওটা এত বিজ্ঞ হয়েছে এর মধ্যে? আন্—আন্, ওকে দেখি। আমরা যখন যাই তখন এইটুকু ছিল রে!

কর্ত্তা এবার উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন—সব ছেলেদের ডাক্ ত! দেখি সব মশায়রা কে কত বড় হয়েছেন।

নাতিরা ভিড় করিয়া জমিয়া বসিল—তাহাদের পিছন পিছন এতক্ষণে বধূরা আসিতে সাহস পাইল—তার পর আসিল ছেলেরা। অপরাহ্ণে কর্ত্তা লাঠি ধরিয়া ঘর-দোর সব ঘুরিয়া দেখিলেন। তাঁহার নিজের শয়ন-ঘরে ঢুকিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। এ কি? তাঁহার ঘরের মাটির মেঝে তুলিয়া ইট চুন সিমেণ্ট দিয়া বাঁধানো? তাঁহার টাকা?

বড় ছেলে স্বীকার করিল—বলিল, হ্যাঁ—চার হাজার টাকা ছিল।

—সেটা আমাকে দাও।

—আপনি টাকা নিয়ে কি করবেন? যখন যা দরকার হবে আপনি নেবেন!

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কর্ত্তা বলিলেন—এ ঘরে শুচ্ছে কে?

—কমলাকে দিয়েছি ঘরখানা। জামাই আসেন প্রায়ই, ওর নির্দ্দিষ্ট একখানা সাজানো-গোছানো ঘর না থাকলে অসুবিধে হয়!

কর্ত্তা সেই সাজানো-গোছানোই দেখিতেছিলেন, কায়দা-করণ জিনিষপত্র সব নূতন! বেশ ভালই লাগিল। ধীরে ধীরে তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। পা দুইটা কাঁপিতেছিল, তিনি বলিলেন—আমায় ধর্‌তো কমলা!

* * *

দিনকয়েক পর।

ক্ষোভে উত্তেজনায় কর্ত্তা থর থর করিয়া কাঁপিতে-ছিলেন। বেলা দশটা হইয়া গেল, প্রাতঃকাল হইতে এখনও পর্য্যন্ত ঔষধ কি পথ্য কিছুই তিনি পান নাই। তিনি চীৎকার করিয়া বাড়ী মাথায় তুলিয়া ফেলিলেন।

বড় ছেলে একটা জরুরী বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত ছিল—সে আসিয়া একটু কঠিন স্বরেই বলিল—আপনি কি পাগল হলেন না কি? একটু ধৈর্য্য ধরুন, বাড়ীতে জামাই রয়েছে—কমলা সেই জন্যে আসতে পারে নি। মেয়েরাও সব ঐ জন্যে ব্যস্ত।

কাল রাত্রে কমলার স্বামী আসিয়াছে।

ছেলের কথার সুরে কর্ত্তা রক্তচক্ষু হইয়া বলিলেন—কি—কি? কি বলছ তুমি? আমার মুখের উপর তুমি কথা কও!

কমলা লজ্জিতমুখে ঔষধ ও পথ্য লইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসিমুখে বলিল—আমায় বকুন দাদু, আমারই ত দোষ!—যান বাবা আপনি কাজে যান।

কমলার পিতা চলিয়া গেল। কমলা আবার বলিল—রাগ করেছেন দাদু?

কর্ত্তা বললেন—বেলা কতটা হ'ল হিসেব আছে?

তারপর ঔষধ ও পথ্য সেবন করিয়া অকস্মাৎ তিনি লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—খিদে পেয়েছিল রে!

কমলা একটু হাসিল। কর্ত্তা এবার রসিকতা করিয়া বলিলেন—কর্ত্তা বুঝি ছাড়ে নি নতুন গিন্নী? বলিতে ভুলিয়াছি, কর্ত্তা কমলার নামকরণ করিয়াছিলেন 'নতুন গিন্নী'। কমলা লজ্জিত হইয়া বলিল—কি যে বলেন আপনি! সে প্রস্থানের উদ্যোগ করিল।

কর্ত্তা বলিলেন—কাউকে একটু ডেকে দিয়ে যাস তো ভাই, এই খেঁদী পটল কি যে কেউ হোক। বসে একটু গল্পটল্প করি।

কমলা চলিয়া গেল। কর্ত্তা দুয়ারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন, বহুক্ষণ কাটিয়া গেল কিন্তু কেহই আসিল না। ক্লান্ত হইয়া কর্ত্তা শুইয়া পড়িলেন। নানা কল্পনা ও চিন্তার মধ্যে সহসা তাঁহার মনে হইল, ব্যবসায়ের অবস্থাটা একবার নিজে তাঁহার দেখা দরকার।

বড়ছেলেটির মতিগতি বড় ভাল নয়। শহরে আপিস করিবে! তার উপর আজিকার কথাবার্ত্তা তাঁহার ভাল লাগে নাই। একখানা ঘর তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন, বেশ ছোটখাটো ঘর একখানি অবিলম্বেই আরম্ভ করাইতে হইবে। একখানা উইল, কমলাকে কিছু তিনি দিবেনই। ছেলেদের নামে 'পাওয়ার অব এটর্নী' দেওয়া আছে, সেখানা অবিলম্বে বাতিল করিয়া দেওয়া উচিত। ছেলেদের ডাকিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়া লইবার সঙ্কল্প লইয়া উৎসাহের সহিত তিনি আবার উঠিয়া বসিলেন। শরীর? অনেকটা বল তিনি ইহার মধ্যে পাইয়াছেন। ইহার উপর একবার কোন চেঞ্জে গেলেই তিনি পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবেন।

অপরাহ্নে ছেলেরা নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইল। গম্ভীর হইয়া দৃঢ়স্বরে তিনি বলিলেন—এস, বস এইখানে।

বড় ছেলে বলিল, আমরা বলছিলাম কি—যে—মানে আপনার শরীরের অবস্থা—

বাধা দিয়া কর্ত্তা বলিলেন—ও চেঞ্জে গেলেই সেরে যাবে।

—হ্যাঁ। আমরাও সেই কথা বলছিলাম! গঙ্গাতীরে অথবা কোন তীর্থে গেলে—ধরুন আপনার বয়সও হয়েছে—

—তার মানে? কর্ত্তার ভিতরটা যেন কেমন করিয়া

উঠিল, সমস্ত দিনের সঞ্চিত মনের শক্তি এক মুহূর্ত্তে যেন কোন্ বৈদ্যুতিক শক্তি স্পর্শে বিলুপ্ত নিঃশেষিত হইয়া গেল।

বড় ছেলে বলিল—দেখুন ভুল যখন হয়েছেই তখন ত আর উপায় নেই। কিন্তু শ্রাদ্ধশান্তি যখন হয়েই গেছে, তখন—মানে প্রবীণ লোক বলছে সব—আর আপনার বাড়ীতে থাকা ঠিক নয়। কাটোয়ায় গঙ্গাতীরে আমরা একখানা ঘরও ঠিক করেছি। কাটোয়ায় এই কাছেই সপ্তাহে সপ্তাহে আমরা একজন যাব—বামুন একজন থাকবে —

ছেলে বলিয়াই চলিয়াছিল, কর্ত্তা বিহ্বলের মত চারি দিকে একবার চাহিয়া ছেলের কথার মধ্যেই বলিলেন—বেশ।

কথা বলিতে ঠোঁট দুইটি তাঁহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; কথা শেষ হইবার পরও সে কম্পন শান্ত হইল না।

কিন্তু তাহা কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িল না, ঠিক এই সময়টিতেই কমলা সর্ব্বাঙ্গে মসীলিপ্ত চিত্রিত-বদন গাঁট্টারামকে দুই হাতে ঝুলাইয়া লইয়া প্রবেশ করিল,—দেখুন ভূত দেখুন!

দুই ভাই সেই মূর্ত্তি দেখিয়া হাসিয়া আকুল হইয়া গড়াইয়া পড়িল।

প্রজাপতি

শ্রীনিশিকান্ত

প্রজাপতি কার যুগল-পালের তরী সম
কোথা হ'তে এল মুগ্ধ আঁখির তলে মম!
রেশম-চিকণ উজ্জ্বলকায়া,
সোনায় রূপায় চিত্রিত মায়া,
যেন কোন্ ধনী বণিকের ধনরাশি
সাজায়ে চলেছে ভাসি।

সাগরপারের কোন্ সাগরের দোলনাতে
আপন ভুলিয়া দুলিয়া চলেছে কার সাথে;
কোন্ রজনীর কোন্ শশীতারা
ঢালে তার ভালে মাধুরীর ধারা,
কোন্ আকাশের অজানা রবির আভা
তার দুটি পালে কাঁপা।

মোর বাতায়ন-লতার মুকুলে মধু লভি
ওই পতঙ্গ বিহ্বল নিশ্চল ছবি!
তখন কেমনে গতিখানি তার
মন্থিয়া তুলি কোন্ পারাবার
কার মানসের অচল-চলার মত
সাধে স্বপ্নের ব্রত।

কাণ্ডারী তার বসিয়া কোথায় কেবা জানে
কোন্ কূল হ'তে বাহে তারে কোন্ কূল পানে!—
আমি শুধু মোর মুগ্ধ মনের
রঞ্জিত বোঝা তার স্বপনের
সাথে সঞ্চিত করিয়া আপনা ভুলি
নিথর লীলায় দুলি।

আলোচনা

"বাংলার কুটীরশিল্পে ঘি-উৎপাদন"

১

গত বর্ষের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের "বাংলার কুটীর-শিল্পে ঘি-উৎপাদন" প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

টানা দুধ।—ঘি প্রস্তুত করিবার ফলে প্রধান পরোক্ষ উৎপন্ন দ্রব্য (bye-product) হইতেছে টানা দুধ। এই টানা দুধে দুধের মাখন ও ভাইটামিন্ 'এ' থাকে না। সেই জন্য ইহা দুগ্ধপোষ্য শিশুদের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য আদৌ নহে। ডাঃ এক্রয়েড যে মত দিয়াছেন তাহা দুগ্ধপোষ্য শিশুর পক্ষে প্রযোজ্য নহে। টানা দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত কোনও কোনও ঘনীকৃত দুগ্ধের (condensed milk-এর) লেবেলে লেখা থাকে—ইহা শিশুদিগকে খাওয়াইবেন না। অবশ্য ভাল গোদুগ্ধ না পাইলে টানা দুধ চলিতে পারে, কিন্তু এটা 'মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' মন্ত্র-অনুযায়ী কথা। এই টানা দুধ খাঁটি দুধের পরিবর্ত্তে গোয়ালারা বেশ বেচিবে, কারণ মাখন না থাকাতে দুগ্ধমান-যন্ত্রে (lactometer-এ) উহা ধরা প'ড়বে না। আমি একবার দার্জ্জিলিং যাই। সেখানে এক জন গোয়ালা তথাকথিত খাঁটি দুধ দিয়া যাইত। মেয়েরা বলিতেন—এ কি রকম খাঁটি দুধ, সর পড়ে না। আমার সঙ্গে সর্ব্বদাই ল্যাকটোমীটর থাকে, তাহাতে উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব দেখিলাম খাঁটি দুধের চেয়েও ভাল। ক্রমে সন্দেহ বাড়িতে লাগিল। আমার এক জন ছাত্র শ্রীমান্ নিশিকান্ত সান্যাল দার্জ্জিলিং মিউনিসিপালিটির রাসায়নিক পরীক্ষক ছিলেন। তাঁহার মারফৎ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল উহা টানা দুধ। লোকটার জরিমানা হইল। দার্জ্জিলিঙে মাখন তৈয়ারীর কারখানা হইতে টানা দুধ লইয়া আসিয়া ঐ সকল ব্যবসায়ী সব লোককে ঠকায়। বিলাতে বা ইউরোপে অনেক ক্রীমারীতে টানা দুধ হইতে—পনীর (cheese), শুষ্ক কেজিন (dry casein), জমাট দুধ (condensed milk), গুঁড়া দুধ (milk powder), দুগ্ধ শর্করা বা (milk sugar) তৈয়ারী হয়। ঐ জমাট বা গুঁড়া দুধের লেবেল হইতে, সেই দুধ কাহাকে খাওয়াইতে হইবে বুঝা যায়। শিশু খাইয়া মরে না।

আমাদের দেশে এসব জিনিষ বড়-একটা হয় না। কেবল টানা দুধ খাঁটি দুধ বলিয়া লোক ঠকাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। টানা দুধ হইতে যে দই হয়, তাহা উৎকৃষ্ট নহে। তাহা হইতে হড়হড়ে লালাযুক্ত দই হয়—তাহা অখাদ্য বলিলেই হয়।

সতীশবাবু লিখিয়াছেন, 'উহা হইতে ছানা কাটিয়া বা ক্ষীর করিয়া ননীতোলা ছানা বা ক্ষীর বলিয়াও বিক্রয় করা যায়।' কিন্তু টানা দুধ হইতে যে-ছানা হয় তাহা শক্ত হয়, তাহা হইতে রসগোল্লা, সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন তৈয়ারী হয় না। অথচ ছানা প্রধানতঃ ব্যবহার হয় এই সকল মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবার জন্যই। শক্ত ছানা ছানার ডালনার তরকারি করিয়া বা শুধু চিনি মাখাইয়া খাওয়া যায়; কিন্তু উহার ঐরূপ ব্যবহার খুবই কম।

আমার নিজের মনে হয় যে টানা দুধের বিক্রয় আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ কারখানা হইতে কিনিয়া আনিয়া দুগ্ধ ব্যবসায়ীরা খাঁটি দুগ্ধ বলিয়া কেবলই উহা বেচিবে। উহাকে ভোজন, শক্ত ছানা, পনীর, ক্ষীর, জমাট দুগ্ধ বা দুধের গুঁড়াতে পরিবর্ত্তিত না করিয়া যেন কিছুতেই বিক্রয় করা না হয়। গরীব বা সাধারণ গৃহস্থ দুধ কেনে সাধারণতঃ দুগ্ধপোষ্য শিশুদের খাওয়াইবার জন্য। এই সকল শিশু বড়-একটা অন্য কিছু খায় না। টানা দুধ তাহাদের খাদ্য মোটেই নহে।

মহিষ ও মহিষ-ঘৃত।—মহিষ-ঘৃত গব্য ঘৃত হইতে সস্তা। মণ-করা দশ-বার টাকা কম দাম। সতীশবাবুর প্রবন্ধে জানিলাম যে পশ্চিম হইতে সাড়ে তিন লক্ষ মণ মহিষ-ঘৃত বাংলা দেশে চালান আইসে। উহার দাম পৌনে দু-কোটি টাকা। সতীশবাবু লিখিতেছেন, "যে পৌনে দুই কোটি টাকার ভয়সা ঘি বাংলায় আসে তাহার পরিবর্ত্তে অতটা গাওয়া ঘি বাংলাতেই প্রস্তুত হইতে পারে।" আর এক জায়গায় লিখিতেছেন, "বাংলায় আমদানি সাড়ে তিন লক্ষ মণ ঘি ঘরেই তৈয়ার করিয়া লওয়ার অন্তরায় কিছু নাই।" কথাটা একটু তলাইয়া দেখা যাউক। বাংলা দেশে যে সাড়ে তিন লক্ষ মণ মহিষ-ঘৃত আসে তাহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয় লুচি, কচুরি প্রভৃতি নোন্তা খাবার বা পান্তুয়া, মিহিদানা প্রভৃতি মিষ্ট খাবার প্রস্তুত করিবার জন্য। পাতে খাইবার জন্য এই ঘি খুব কমই ব্যবহৃত হয়। এখন কথা হইতেছে যে, ময়রারা মণ-করা দশ-বার টাকা বেশী দাম দিয়া গাওয়া ঘিতে লুচি, কচুরি, পান্তুয়া, মিহিদানা কি কোনদিনই ভাজিবে? তাহারা সস্তার জন্য বরং উল্টা পদ্ধতিই অবলম্বন করে—ভেজিটেবল ঘি, বাদাম তৈল, প্রভৃতি খুব ব্যবহার করে। আমার মনে হয়, সস্তা মহিষ-ঘৃত থাকিতে ময়রা কোনও দিনই খাবার তৈয়ারী করিতে দামী গব্য ঘৃত ব্যবহার করিবে না।

সতীশবাবু খাদি প্রতিষ্ঠানে মহিষ পালন করুন না কেন? গরুর চেয়ে মহিষের তিন-চারি গুণ বেশী দুধ হয়। মহিষ-দুধে মাখনের ভাগও অনেক বেশী আছে। এই জন্যই না মহিষ-ঘৃত দামে সস্তা। সতীশবাবুর প্রবন্ধে দেখি পঞ্জাবে ৩০ লক্ষ এবং যুক্তপ্রদেশে ৪২ লক্ষ স্ত্রী-মহিষ আছে; কিন্তু বাংলা দেশে আছে মাত্র ২ লক্ষ স্ত্রী-মহিষ। আচ্ছা এই ২ লক্ষ স্ত্রী-মহিষ না-পুষিয়া যদি বাংলা দেশে ৫০ লক্ষ স্ত্রী মহিষ পোষা যায়, তাহা হইলে এই ঘৃত-সমস্যার সমাধান হয় না কি? বাংলা দেশে ৮২ লক্ষ গাভী আছে—তাহা হইতে খাবার দুধ সরবরাহ হউক, আর ৫০ লক্ষ বা ততোধিক সংখ্যক স্ত্রী-মহিষ

বাঙালী পুষুক, তাহা হইলে ২ কোটি টাকার ঘৃত বাংলা দেশে উৎপন্ন হইবে এবং বাংলার ঘৃত-সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইবে।

মহিষ পুষিলে আর একটা গৌণ উপকার হইবে যে গোহত্যা কিছু কমিবে। এখন গোয়ালারা গরুর দুধ বন্ধ হইলে গরু কসাইকে বেচিয়া ফেলে, কসাই তাহাকে গোমাংসের জন্য বধ করে। মহিষ-মাংস কোনও সভ্য জাতির খাদ্য নহে বলিয়া স্ত্রী-মহিষের দুধ বন্ধ হইলে উহাকে কসাই কিনিবে না বা হত্যা করিবে না।

বাংলা দেশে মহিষ-দুধের উপর ততটা আস্থা নাই। বাস্তবিক মহিষ-দুগ্ধ ঘন কিন্তু অপেক্ষাকৃত কিছু দুষ্পাচ্য, কিন্তু মহিষ-দুগ্ধে জল দেওয়া চলে। কতক পরিমাণ জল মিশাইলে উহা প্রায় গোদুগ্ধের মত হয়। জলমিশ্রিত মহিষ-দুধ খাঁটি গোদুগ্ধের মত, হয়ত অতটা উপকারী না-হইলেও বেশ পুষ্টিকর জিনিষ অথচ সস্তা। মহিষের খাদ্য ও দাম বেশী বলিয়া বাংলা দেশে মহিষের সংখ্যা কম। কিন্তু দুধের ও ঘৃতের আধিক্যে এ দাম পোষাইয়া যাইবে।

অবশ্য টানা মহিষ-দুধ টানা গোদুগ্ধের মত উপরিউক্ত বিভিন্ন প্রকারে রূপান্তরিত না করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা আইনতঃ বন্ধ করার আমি পক্ষপাতী।

ভারবহনের কথা না-তুলিলেই হয়। মহিষ যে গরুর চেয়ে বেশী ভার বহন করিতে পারে তাহা সকলেই মহিষ-টানা গাড়ীর ভারের বহর দেখিয়া বুঝিতে পারেন।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী

প্রত্যুত্তর

টানা দুধ যদি 'টানা' বলিয়া বিক্রয় হয় তবে তাহা আইন করিয়া বন্ধ করার হেতু পঞ্চানন বাবু দেখান নাই—উহা খাঁটি বলিয়া বিক্রয় দোষাবহ। যদি পারা যায় তবে তাহা আইন দ্বারা বন্ধ করা অবশ্যই কর্তব্য। টানা দুধ হইতে ঘোল তৈরি হয়। উহাও দুধেরই মত জল মিশাইয়া অবাধে বিক্রয় হয়। আইন করিলে ঘোলকেও জল-মিশ্রণ হইতে রক্ষা করা দরকার—দধি ছানাকেও তেমনি টানা ও খাঁটি হইতে প্রস্তুত বলিয়া ভিন্ন ভাবে বিক্রয় করা উচিত এবং ভেজাল আইন দ্বারা দণ্ডনীয় করা ভাল।

এই প্রসঙ্গে বাংলার মহিষের প্রবর্ত্তন করার কথা যাহা পঞ্চানন বাবু বলিয়াছেন, সে-বিষয় 'হরিজন' পত্রিকায় অনেক বার আলোচিত হইয়াছে। আমরা দুইটি পশু, গো ও মহিষ, পুষিতে পারি না। একটাকে রাখিয়া অপরটি প্রজনন অভাবে আস্তে আস্তে লুপ্ত করার প্রস্তাব গান্ধীজী দেন। গরুকেই রক্ষা করা প্রয়োজন। যেমন দুধ আবশ্যক তেমনি কৃষিকার্য্যও আমাদের আবশ্যক। মহিষ দুপুরের রৌদ্রে কাজ করিতে পারে না। তাহার শরীরের ওজন বেশী বলিয়া কাদা-মাঠেও চষিতে পারে না। এই দুই কারণে উহা কৃষকের অনুপযোগী। ঠাণ্ডায় গাড়ী টানিতে পারে ভাল—দুপুরে পারে না। কলিকাতায় গ্রীষ্মকালে দুপুরে মহিষ-গাড়ী চালানো আইন দ্বারা বন্ধ করা হইয়াছে। কৃষকের নিকট চাষের জন্য গরুর আদর, দুধের জন্য স্ত্রী-মহিষের আদর। সেই জন্য উভয়ের উপরই সমান নৃশংসতা চলে। যে-প্রদেশে দুইটি পশুই পালন করা হয় সাধারণতঃ সেখানে পুরুষ-মহিষ প্রায় সমস্তই মারিয়া ফেলা হয়—কেবল স্ত্রী-মহিষ পোষা হয়। গ্রামে দুই একটি মহিষ-ষাঁড় থাকে ছাড়া দেওয়া, আর সব স্ত্রী-মহিষ। আবার সেই প্রদেশে গরুর মধ্যে গাভীগুলিকে সাধারণতঃ মারিয়া ফেলা হয় চামড়ার জন্য, (যেমন বিহারে হয়) আর কেবল বলদ রাখা হয় কৃষিকার্য্যের জন্য। এ-বিষয়ে আমি কিছু দিন পূর্ব্বেও ইংরেজী 'হরিজন' পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি। গো-রক্ষার জন্য মহিষ-দুগ্ধ ও মহিষ-ঘৃত বর্জ্জন করা উচিত। বিষয়টার এত গুরুত্ব গান্ধীজী দিয়াছেন যে তাঁহার অনুষ্ঠান-গুলিতে কেবল গাওয়া দুধ ও গাওয়া ঘিই ব্যবহৃত হয়। গান্ধী-সেবা-সঙ্ঘের বাৎসরিক উৎসব যেখানে বসে, সেখানে অভ্যাগতের জন্য যতটা গাওয়া যায় মাত্র ততটা স্থানীয় গোদুগ্ধ ও গাওয়া ঘি হইতে কাজ চালানো হয়। গো-রক্ষার দৃষ্টিতে ভয়সা ঘি বর্জ্জন করিয়া গাওয়া ঘিই ব্যবহার করা উচিত। আমার প্রবন্ধে এ-কথা বিষয়ান্তর বলিয়া ইচ্ছা করিয়াই উল্লেখ করি নাই। পঞ্চানন বাবু এই বিষয়ে অভিমত জানাইবার অবকাশ দেওয়ার জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। গো-জাতির উৎকর্ষের জন্য যেমন, গো-রক্ষার জন্যও তেমনি বাঙালীর পক্ষে বাংলার গাওয়া ঘি ব্যবস্থা করাই প্রশস্ত।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

২

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন যে, "বাংলার ঘি-ব্যবসা ভয়সা ঘির উপর প্রতিষ্ঠিত।" বাজারে ঘি মাত্রেই ভয়সা ঘি। বস্তুতঃ এই উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। প্রধানতঃ যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজ হইতে বাংলা দেশে ঘৃত বেশী আমদানী হয়। কিন্তু এই সকল প্রদেশের ঘৃতকে ভয়সা বলিয়া অভিহিত করা সঙ্গত নহে। বাংলা দেশে, গাওয়া অথবা ভয়সা, কোন্ ঘি আমদানী হয় জানিতে হইলে প্রথমেই ইহা স্মরণ রাখা চাই, যে, ঘৃত-ব্যবসায় একটি কুটীরশিল্প। কৃষকের গৃহে উৎপন্ন দুধ হইতে ননী সংগ্রহ করিয়া এবং সেই ননী গালাইয়া ঘৃত প্রস্তুত হয়। সে-জন্য যাঁহারা ব্যাপক ভাবে ঘৃতের ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের কাহারও নিজস্ব ডেয়ারী, গোশালা অথবা বাথান নাই। কৃষকের গৃহে গো এবং মহিষ উভয়ই বর্ত্তমান, সেজন্য সে যে কেবল মহিষের দুধেই ঘৃত প্রস্তুত করে এমন নহে, বরং গো এবং মহিষ উভয়ের দুগ্ধই একত্র মিলাইয়া লইয়া তাহা হইতে ঘৃত প্রস্তুত করে। গবর্ণমেন্টের হিসাবে দেখা যায় যে, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজ প্রদেশে উৎপন্ন মহিষের দুধের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৫৬·১, ৫৩·১ এবং ৫১·১ ভাগ। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই তিন প্রদেশে, গো এবং মহিষের দুগ্ধ প্রায় সমপরিমাণেই উৎপন্ন হয়। কেবল মাত্র পঞ্জাবে মহিষ-দুগ্ধ বেশী উৎপন্ন হয় এবং ইহা ব্যতীত অন্য সকল স্থানেই গো-দুগ্ধই প্রধান। সেজন্য এই সকল স্থানের ঘৃতকে কেবল ভয়সা বলা উচিত নয়।

সতীশবাবু 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে যে-সকল ঘৃতের দর উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে মাদ্রাজ হইতে আমদানী দেশলক্ষ্মী ঘৃতের দর কেন বাদ দিয়াছেন, বুঝা গেল না।

মাদ্রাজের ঘৃত যে অধিকাংশই গাওয়া ঘৃত, এবং ইহা যে ব্যাপক ভাবে বাংলা দেশে আমদানী হয়, ইহা হয়ত তিনিও স্বীকার করিবেন, কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে তাঁহার উক্তি ("ব্যাপক ব্যবসায়ে ঘি মাত্রেই ভয়সা ঘি") ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয় বলিয়াই কি তিনি ইহার উল্লেখ করেন নাই? তিনি শ্রীঘৃতকেও ভয়সা নামে অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু হয়ত জানেন না যে ভারত-গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নূতন গ্রেডিং আইনে শ্রীঘৃত যে গো এবং মহিষ উভয়ের মিলিত দুগ্ধেই প্রস্তুত এই মর্ম্মে শীল দেওয়া হইতেছে।

সতীশবাবু লিখিয়াছেন, যে, ১৯৩৪।৩৫ সালের গবর্ণমেণ্টের দেওয়া হিসাবে "বাংলায় ঐ বৎসর ঘি আসিয়াছে ৩৪৪ হাজার মণ, উহা হইতে রপ্তানী ৭২ হাজার মণ বাদে বাংলায় ব্যবহৃত আমদানী ঘির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩০ হাজার মণ।" কিন্তু ৩৪৪ হাজার মণ হইতে ৭২ হাজার মণ বাদ দিলে ২৭২ হাজার মণ থাকে। সেজন্য সতীশবাবুর প্রদত্ত এই হিসাবও মূলতঃ ভুল।

বাংলা দেশে ঘৃত প্রস্তুত করা সম্বন্ধেও কতকগুলি আপত্তি আছে। সতীশবাবু আন্দাজ করিয়াছেন যে, "বাংলা দেশে বৎসরে ২৪৩ লক্ষ মণ দুধ উৎপন্ন হইতে পারে, এবং ইহার অর্দ্ধেকটায় বর্ত্তমান দুধের আবশ্যকতা মিটাইলে বাকী অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১২০ লক্ষ মণ দুধ উদ্বৃত্ত হয়।" দেখা যাউক বাংলা দেশের পক্ষে ১২০ লক্ষ মণ দুধ পর্য্যাপ্ত কি না? ধরা যাউক, বাংলায় ন্যূনপক্ষে লোক-পিছু অর্দ্ধ সের দুধের অবশ্য প্রয়োজন, তাহা হইলে পাঁচ কোটি লোকের বৎসরে ২২৮১ লক্ষ মণ দুধের প্রয়োজন। কিন্তু সতীশবাবুর হিসাব মত বাংলায় ২৪৩ লক্ষ মণ দুধ হইতে পারে। যে-দেশে ২২৮১ লক্ষ মণ দুধে কেবল মাত্র দুধের প্রয়োজনই মেটে না, সে-দেশে ১২০ লক্ষ মণ দুধে সমস্ত প্রয়োজন মিটাইয়া বাকী দুধে দই, ছানা, ঘি ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে যাওয়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

বর্ত্তমানে বাংলা দেশে কৃষকেরা ছানা, সন্দেশ ইত্যাদি প্রস্তুত করাকে শ্রেয় মনে করে, তাহার প্রধান কারণ এই যে ঘৃত তৈয়ারী করা অপেক্ষা এই সকল দ্রব্যপ্রস্তুতে তাহারা বেশী লাভ পায়। বাংলায় ঘৃত প্রস্তুত করিলে তাহাকে অন্য প্রদেশের ঘৃত অপেক্ষা মণ-করা ২৫৲ টাকা বেশী দামে বিক্রয় করিতে হয়। কিন্তু সাধারণের পক্ষে এত অধিক দাম দেওয়া সাধ্যায়ত্ত নহে। সেজন্য চাহিদার অনুরূপ ঘৃত যদি বাহির হইতে আসে এবং সস্তায় সাধারণের লভ্য হয় তবে তাহাতে আপত্তির কি থাকিতে পারে?

সতীশবাবু বলিয়াছেন যে "টানা দুধ হইতে উৎকৃষ্ট দই হয়, উহা ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়যোগ্য। দুধ ব্যবহারের শ্রেষ্ঠ উপায় উহা জমাট করিয়া বিক্রয় করা। কুটীর-আয়োজনেই উহা করা যায়। উহা হইতে ছানা কাটিয়া বা ক্ষীর করিয়া ননীতোলা ছানা বা ক্ষীর বলিয়া বিক্রয় করা যায়।" এই উক্তি যে সম্পূর্ণ অসার তাহা বলাই বাহুল্য। টানা দুধ হইতে প্রস্তুত দ্রব্য পুষ্টিকর নহে বলিয়াই ইহার প্রচলন আইনানুযায়ী নিষিদ্ধ হইয়াছে। যিনি টানা দুধ হইতে ছানা, দধি প্রভৃতি বিক্রয় করিবেন, তাঁহাকেই দণ্ডার্হ হইতে হইবে। সতীশবাবু বোধ হয় এই আইন জানেন না। টানা দুধে যে পুষ্টিকর ভিটামিন "এ" নাই তাহা তিনি নিজেও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, "ডেনমার্কে দুধের ব্যবহার যথেষ্ট হইত, কিন্তু যুদ্ধের চাহিদায় দুধ, মাখন হইয়া বিদেশে রপ্তানী হইতে আরম্ভ করে। উহার ফলে শিশুদের ভিটামিনের অভাব ঘটে, চক্ষু হইতে জল পড়িতে আরম্ভ হয়, শিশুদের অকাল মৃত্যু হইতে থাকে। তখন ডেনমার্কের গবর্ণমেণ্ট মাখন রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেন, সঙ্গে সঙ্গেই শিশুদের রোগ ও অকালমৃত্যু বন্ধ হয়।" কিন্তু ইহা জানা সত্ত্বেও সতীশবাবু যে ভিটামিন "এ"-বিহীন দুধের ব্যবস্থা দিতেছেন তাহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

ডাঃ এক্রয়েডের পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "টানা দুধ শিশুদের একমাত্র খাদ্য হওয়ার যোগ্য নয়, কেন না, উহাতে ভিটামিন "এ" থাকে না। যদি শিশুদিগকে দেওয়া হয়, তবে উহার সহিত ভিটামিন "এ" পূর্ণ কোনও খাদ্য যেমন কডলিভার অয়েল দেওয়া উচিত" অথচ "কত লোকে কষ্ট করিয়া কডলিভার অয়েলের মত দুর্গন্ধ মাছের তেল" খাইয়া থাকেন বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এক দিকে সতীশবাবু টানা দুধের সহিত কডলিভার অয়েল খাইবার ব্যবস্থা দিতেছেন, আবার তিনিই কডলিভার অয়েল খাইতে নিষেধ করিতেছেন, এই যুক্তির সারবত্তা বুঝা যায় না।

জাতির প্রথম প্রয়োজন পুষ্টিকর আহার। যে-জাতি যত বড় শক্তিশালী হউক না কেন, তাহার যদি আহারের সংস্থান না থাকে, তাহা হইলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজের ন্যায় স্বদেশ-বৎসল জাতি পৃথিবীতে অল্পই আছে, নিজের দেশের জিনিষ ছাড়া তাহারা অন্য কিছু সহজে ক্রয় করে না, কিন্তু ইংরেজ যত বেশী খাদ্যদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করে এরূপ আর কেহই করে না। তাহার কারণ বাঁচিবার প্রধান উপকরণ হইতেছে খাদ্যদ্রব্য এবং সেজন্যই তাহারা খাদ্যদ্রব্য আমদানী করা দোষাবহ মনে করে না। বাংলায় দুধের নিতান্ত অভাব, এবং দুগ্ধজাত পদার্থ বাহির হইতে যে আমদানী হয়, তাহা বাংলার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়। যে-দেশের শতকরা ৯০ জন লোক কৃষিজীবী, তাহারা দুধের সার পদার্থটি যদি গ্রহণ না করিয়া বিক্রয় করিয়া দেয়, তাহা হইলে যুদ্ধের সময় ডেনমার্কের যে অবস্থা হইয়াছিল, বাংলাতে কি সেই অবস্থার সৃষ্টি হইবে না? বাংলা দেশে যদি দুগ্ধ উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা হইলে সতীশ-বাবুর পরামর্শ মত বাংলায় ঘৃত প্রস্তুত করা উচিত হইত। যেদিন বাংলা তাহার দুধের প্রয়োজন নিজের দেশেই মিটাইয়া লইতে পারিবে, তখনই সে বাহির হইতে ঘৃত আমদানী বন্ধ করার কথা ভাবিতে পারে, তাহার আগে নহে। ভ্রান্ত প্রাদেশিকতার জন্য বাংলা যেন ঘৃত আমদানী করা বন্ধ না করে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

প্রত্যুত্তর

প্রবন্ধে আমার বক্তব্য যাহা ছিল খুব সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাহা এই যে, বাংলায় যে দুই কোটি টাকার ঘি আমদানী হয় ততটা ঘি বাংলাতেই উৎপন্ন করা যাইতে পারে। উহার জন্য দুধের উৎপাদন বাড়ান চাই। এবং ঘির চাহিদার সঙ্গে সঙ্গেই

দুধের উৎপাদন বাড়িবে। অতএব বাংলাদেশবাসী যেন আমদানী করা ঘির পরিবর্তে বাংলার গাওয়া ঘি গ্রহণ করেন।

ব্রজেন্দ্রবাবু বোধ হয় বলিতে চাহেন যে, বাংলায় ঘি-উৎপাদনের চেষ্টা করা বৃথা। গাওয়া ঘিই যদি চাই, তবে তাহাও বাহির হইতে আসে এবং সস্তায় আসে। ঘি উৎপন্ন করিতে গেলে যে টানা দুধ হইবে সেটা লোককে খাওয়ান চলে না, কেন না উহা পুষ্টিকর নহে। তবুও যদি টানা দুধ, টানা দই ইত্যাদি বিক্রয় করা হয় তবে উহা বন্ধ করার জন্য আইনের উদ্যত দণ্ড রহিয়াছে। বাংলার জন্য বাংলায় ঘি-উৎপাদনের চেষ্টা প্রাদেশিকতা। অপর দেশ হইতে ঘি আমদানী করাতেই বাংলার কল্যাণ।

এই প্রকার আলোচনায় যোগ দিতে আমার ক্লেশ হইতেছে। তথাপি প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয়ে নিতান্ত কুণ্ঠার সহিত আমার বক্তব্য নিবেদন করিব।

ব্রজেন্দ্রবাবুর মতে বাংলা দেশে ঘি উৎপন্ন করা সাধ্যায়ত্ত নহে। এই অবিশ্বাস অনেকের ছিল। আমার সে অবিশ্বাস নাই। কাজে নামিয়াও যুক্তি দ্বারা আমি দেখিয়াছি যে বাংলায় ঘি উৎপন্ন করা যায় এবং কেমন করিয়া করা যায় তাহাই প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

যাহাতে লোকে অল্পমূল্যে প্রচুর পরিমাণে দুধ পাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে ব্রজেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন। ইহাতে বাংলায় অল্প মূল্যে প্রচুর দুধ পাওয়ার সম্ভাবনা তিনি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মতে ঘি তৈরি করার চেষ্টা করিলে দেশের পক্ষে অকল্যাণকর হইয়া দাঁড়াইবে। দুধ যথেষ্ট হইলে বাংলাতেই ঘি প্রস্তুত করিয়া অন্য প্রদেশ হইতে ঘি আমদানী রোধ করার অকল্যাণ কোথায়? কিন্তু কথা ত তাহা নয়। আমি দেখাইয়াছি যে বাংলায় দুধের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে বাংলার গাওয়া ঘির চাহিদা সৃষ্টি করাই প্রয়োজন। কেন প্রয়োজন তাহাও ঐ প্রবন্ধেই দেখাইয়াছি। উহার বিরুদ্ধ যুক্তি এই আলোচনায় পাই নাই।

বাংলায় যে দুই কোটি টাকার ঘি আমদানী হয় তাহা ভয়সা ঘি বলিয়াই কেনা-বেচা হইয়া থাকে। যদি কোন আমদানী ঘিতে গাওয়া ঘির মিশাল থাকে, বা যদিই বা কোন আমদানী ঘি সর্ব্বৈব গাওয়া হয়, ত হইতে পারে। তাহাতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের কিছু আসিয়া যায় না। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে যে বাজার-দরের তালিকা দেওয়া হইয়াছিল তাহা ইহাই দেখাইবার জন্য যে ঘি সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ না থাকিলে উহা ভয়সা ঘি বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। যে নামটি উল্লেখ করা হয় নাই উহা 'গাওয়া' বলিয়া লেখা ছিল, কাজেই উহার সন্নিবেশ অনাবশ্যক ছিল।

"টানা দুধ হইতে উৎকৃষ্ট দই হয়, উহা ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়-যোগ্য। টানা দুধ ব্যবহারের আর একটা শ্রেষ্ঠ উপায় উহা জমাট করিয়া বিক্রয় করা। কুটীর আয়োজনে উহা জমাট করা যায়। উহা হইতে ছানা কাটিয়া বা ক্ষীর করিয়া ননীতোলা ছানা বা ক্ষীর বলিয়া বিক্রয় করা যায়।" আমার এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন যে "এই উক্তি যে সম্পূর্ণ অসার তাহা বলাই বাহুল্য।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "দেহের পক্ষে টানা দুধের দই-ছানা ইত্যাদি পুষ্টিকর নহে।" কথাটা পড়িয়া দুঃখিত হইলাম। পুষ্টিবিজ্ঞানসম্মত উক্তিই ব্রজেন্দ্রবাবুর নিকট পাইতে আশা করি। কিন্তু তিনি পুষ্টি-বিজ্ঞানের ভাষা না তুলিয়া আইনের ভাষা তুলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন। পুষ্টিবিজ্ঞান মাত্র ৩০ বৎসর হইল নূতন ধারায় সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এই ৩০ বৎসরে অনেক নূতন তথ্য জানিয়াছি। অনেক পুরাতন বিশ্বাস আমূল ত্যাগ করিয়াছি। পুষ্টিবিজ্ঞানের এক জন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির উক্তিও তুলিয়া দেখাইয়াছি যে টানা দুধের পুষ্টিমূল্য সম্পর্কে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কি। কোনও আইন পুরাকালের বিশ্বাসের প্রতিবিম্ব হইয়া থাকিতে পারে। পুষ্টিবিজ্ঞান-বিরুদ্ধ আইন যদি থাকে, তবে তাহা উঠাইয়া দিবার জন্য লড়া উচিত। অজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত আইনের দোহাই কোনও বিশেষজ্ঞ দিবেন না। কিন্তু ঐ আইনের অর্থ অন্যরূপ। টানা দুধ ও টানা দুধের দই-ছানাকে খাঁটি দুধ বা খাঁটি দুধের দই-ছানা বলিয়া কেহ না বেচে এই জন্য ঐ আইন। টানা দুধের ব্যবসা বন্ধ করার জন্য উহা নয়। কেন না টানা দুধ আইনসম্মত ভাবেই বহুকাল হইতে বিক্রয় হইতেছে। গরুর মাথা মার্কা বা ঘণ্টা মার্কা বা ঐরূপ জমাট টানা দুধের কথা বলিতেছি। উহা টানা দুধ—"skimmed milk"। প্রতিদিন উহা শত শত টিন বিক্রয় হইতেছে। বিদেশে প্রস্তুত বলিয়া চলিবে আর বাংলায় "জমাট টানা দুধ" হইলেই তাহার উপর আইনের চমকি আসিবে এরূপ মনে করার হেতু নাই। যদি জমাট টানা দুধই চলিতেছে, তবে তরল টানা দুধ, টানা দই, টানা ক্ষীর-ছানা কেন চলিবে না? যদিও বা কোথাও আইনের অপপ্রয়োগ হয়, তবে এই কুটীরশিল্পগুলিকে সেই অপপ্রয়োগ হইতে রক্ষা করাই দেশবাসীর কর্ত্তব্য হইবে। বস্তুতঃ দুধ টানিয়া দেশে যত ঘি হয়, তাহার অবশিষ্ট টানা দুধটা মানুষের খাদ্যের জন্য আবশ্যকমত ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। তবে টানা দুধটার পুষ্টিমূল্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার জন্য উহার দাম কম—আদর কম। ডাক্তার এক্রয়েডের মতে উহাকে অধিক মর্য্যাদা দেওয়া উচিত।

টানা দুধ ন্যায্য দামে বিক্রয় করিতে না-পারিলে বাংলায় ঘি-উৎপাদনে বিঘ্ন হইবে একথা আমি বলিয়াছি। এজন্য টানা দুধের প্রতি অনাদর দূর করার আবশ্যকতা আছে। ব্রজেন্দ্রবাবু এই অনাদরের উপর আইনের ভীতি দেখাইয়াছেন, ইহাতে নূতন ঘি-ব্যবসায়ে ব্রতীরা বিরত হইতে পারেন। এই ভীতি যে অমূলক তাহা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। টানা দুধের পুষ্টিমূল্যের কথাও ভাল করিয়া জানা প্রয়োজন।

দুধ হইতে ননী তুলিয়া লইলে ভিটামিন 'এ' ও চর্বি পদার্থ চলিয়া গেল, বাকী যাহা রহিল তাহা ভিটামিন 'বি', দুগ্ধ প্রোটীন বা ছানা, দুগ্ধ শর্করা বা মিল্ক শুগার, দুধের ক্যালসিয়ম আইওডিন প্রভৃতি খনিজ পদার্থ। শেষোক্ত এই সকল পুষ্টিকর পদার্থের গুণগান স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রত্যেক লেখকই করিয়া থাকেন। সাধারণের নিকটেও এই তথ্য আজ কিছু কিছু পৌঁছিতেছে।

সব শেষে বাংলায় ঘি-উৎপাদনের চেষ্টা দ্বারা অন্য প্রদেশের ঘি আমদানী রোধ করার চেষ্টাকে ব্রজেন্দ্রবাবু ভ্রান্ত প্রাদেশিকতা

বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রকার করাতেই স্বদেশী ব্রতের আদর্শ রক্ষা হয়। নিখিল-ভারত চরখা-সঙ্ঘে এই নিয়ম আছে যে, কোনও প্রদেশে খাদি যদি সস্তায় উৎপন্ন হয় তবে সেই সস্তা খাদি অন্য প্রদেশে গিয়া সেখানকার উচ্চ মূল্যের খাদির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না। যদি খাদি বেচিতে অন্য প্রদেশে যাইতে হয়, তবে সেই প্রদেশের অনুমতি ও আমন্ত্রণ চাই। বাংলার প্রস্তুত ঘি ফেলিয়া বাহিরের ঘি সস্তা বলিয়া কেনা স্বদেশী-মনোবৃত্তির বিরোধী।

স্বদেশী মানে নিজের গ্রামে পাইতে বাহিরের দ্রব্য নয়, প্রদেশে পাইতে অপর প্রদেশের নয়, ভারতে পাইতে ভারতের বাহিরের নয়।

বাংলার গো-সম্পদ বাড়াইবার জন্য বাংলায় প্রস্তুত পাওয়া ঘি ব্যবহার করাই প্রয়োজন। এজন্য বাংলার জনসাধারণের প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ব্যবসা হাতে লওয়া আবশ্যক। বাংলার ঘিই বাঙালীর ব্যবহার করা আবশ্যক। তাহা হইলে বাংলার পুষ্টির সহায়তা হইবে, বাংলার বেকার-সমস্যার কতক সমাধান হইবে এবং নানা প্রকারে বাংলার অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

আমার প্রবন্ধে এক স্থানে ৩৪৪ হইতে ১৪ বাদ দিয়া ৩৩০ লেখার পরিবর্তে ১৪-র স্থানে ৭২ লেখা হইয়াছিল। পরে দেখিতে পাই; উহা তুচ্ছ বলিয়া পরবর্তী সংখ্যা প্রবাসীতে সংশোধন করি নাই। মডার্ণ রিভিয়ুতে অনুবাদে পূর্ব্বেই সংশোধন করিয়া দিয়াছি। ব্রজেন্দ্রবাবুও এ ত্রুটি ধরিয়াছেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

"স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব ও বন্ধন বরণ"

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব ও বন্ধন বরণ এবং তাহার গৌরব ও আনন্দের কথা রবীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'পরিত্রাণ' নাটকে ব্যক্ত করিয়াছেন। ঐ দুই নাটক হইতে কিয়দংশ এই মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিতও হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'গোরা' হইতে কিছু উদ্ধৃত করা যাইত। 'গোরা' বোধ হয় ১৩১৬ সালে লেখা শেষ হয়। নন-কো-অপারেশন যুগের বহু আগে ইংরেজের আদালতে উকীল রাখিয়া উদ্ধার পাইবার চেষ্টার বিপক্ষে যুক্তি এই উপন্যাসে আছে এবং পাঠক মাত্রেই জানেন যে উপন্যাসের নায়ক স্বয়ং বন্ধন বরণ করিয়াছিল। 'গোরা' (তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২১৭-২১৮) হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

গোরা হাজতে থাকিয়া তাহার বন্ধুদের বলিতেছে:—"না, আমি উকীলও রাখব না আমাকে জামিনে খালাসেরও চেষ্টা করতে হবে না।... দৈবাৎ আমার টাকা আছে বন্ধু আছে বলেই হাজত আর হাতকড়ি থেকে আমি খালাস পাব সে আমি চাই নে। আমাদের দেশের যে ধর্ম্মনীতি তাতে আমরা জানি সুবিচার করবার গরজ রাজার, প্রজার প্রতি অবিচার রাজারই অধর্ম্ম। কিন্তু এ রাজ্যে উকীলের কড়ি না যোগাতে পেরে প্রজা যদি হাজতে পচে জেলে মরে, রাজা মাথার উপর থাকতে ন্যায়বিচার পয়সা দিয়ে কিনতে যদি সর্ব্বস্বান্ত হতে হয় তবে এমন বিচারের জন্যে আমি সিকি পয়সা খরচ করতে চাই নে। ... রাজদ্বারে বিচারের জন্য দাঁড়াতে গেলেই বাদী হোক প্রতিবাদী হোক দোষী হোক নির্দ্দোষ হোক প্রজাকে চোখের জল ফেলতেই হবে।...তার পরে রাজা যখন বাদী আর আমার মত লোক প্রতিবাদী তখন তাঁর পক্ষেই উকীল ব্যারিষ্টার—আর আমি যদি জোটাতে পারলুম তো ভাল নৈলে অদৃষ্টে যা থাকে! বিচারে যদি উকীলের সাহায্যের প্রয়োজন না থাকে তো সরকারী উকীল আছে কেন? যদি প্রয়োজন থাকে তো গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধ পক্ষ কেন নিজের উকীল নিজে জোটাতে বাধ্য হবে?"

শ্রীসুকুমার বসু

মাটির বাসা

শ্রীসীতা দেবী

(২১)

বহু বৎসর পরে মৃণাল এবার চিরদিনের মত বোর্ডিং ছাড়িয়া চলিল। এখান হইতে চলিয়া যাইতেও যে এত ব্যথা তাহার মনে বাজিবে তাহা সে কোনও দিন মনে করে নাই। ভাবিত, জেলখানা ছাড়িয়া যাইতে কয়েদীর যে আনন্দ, সেই আনন্দই সে অনুভব করিবে বুঝি। কিন্তু আজ হৃদয়ের প্রত্যেকটা স্নায়ু তাহার বেদনায় টন্‌টন্ করিতেছে কেন? এতকালের সঙ্গিনী যাহারা, আজ তাহারা চিরদিনের মত মৃণালের জীবন হইতে বিদায় লইল। কলিকাতা তাহার ভাল লাগিত না, কিন্তু তাহার তরুণ জীবন এইখানকার মৃত্তিকাতেই সহস্র শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল, এইখান হইতেই রস শোষণ করিয়া সে আলোর দিকে মাথা তুলিতেছিল। ব্যথা তাহার না বাজিবে কেন? আর এইখানেই তাহার সঙ্গে বিমলের পরিচয়। বিমলও কি আজ হইতে বিদায় লইল? পল্লীগ্রামে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া কেমন যেন অসম্ভব মনে হয়। ভাবিতেই মৃণালের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। বিমল তাহার কথা রক্ষা করিয়াছিল, আর এক দিন সে আসিয়াছিল। কিন্তু সেদিন সে বড় গম্ভীর, বড় বিষণ্ণ, বেশী কথাও বলিল না। মৃণাল জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "পরীক্ষা হ'লেই দেশে ফিরবেন ত?"

বিমল বলিল, "ঠিক করতে পারছি না। যেতে খুব ইচ্ছে করছে বটে, কিন্তু বোধ হয় সে ইচ্ছে দমন ক'রে, কলকাতায় থেকে কাজকর্ম্মের চেষ্টা করাই ভাল।"

মৃণাল বলিল, "তবু একবার যাবেন। না গেলে আমি ত আপনার কোনও খবরই পাব না।"

বিমল বলিল, "দেখি পরীক্ষাটা কেমন দিই, তার উপর খানিকটা নির্ভর করবে। খবর আপনাকে দেবই যেমন ক'রে হোক। চিঠিপত্র লেখা অবশ্য চলবে না। কিন্তু আপনি হাল ছাড়বেন না যেন। মেয়েদের নিজেদের দুর্ব্বলতা তাদের অনেক বিপদ্ ডেকে আনে। মনে সর্ব্বদা জোর রাখবেন।"

মৃণাল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "গ্রামে একবার গিয়ে পড়লে আমার যে কি অবস্থা হবে তা আপনি ঠিক বুঝছেন না। সেখানে আমি খেলার পুতুল মাত্র। আমার মতামত কেউ জানতে চাইবেও না, জানালেও তার কোনও মূল্য কেউ দেবে না। আমার মামা-মামী দুজনেই আমাকে খুব ভালবাসেন, কিন্তু তাঁরা পুরাতনপন্থী মানুষ, বিবাহব্যাপারে মেয়ের যে আবার কোনও কথা চলতে পারে এ তাঁরা মনেই করেন না। কাজেই আমাকে থাকতে হবে ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে।"

বিমল অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "তা করলে চলবে না, সব মাটি হবে! নিজেকে বাঁচাতে হ'লে, নিজেকে লড়তে হবে। ভগবান্ দুর্ব্বলের সহায় হন না কোনও দিন।"

মৃণাল বলিল, "দেখি গিয়ে আগে সেখানকার অবস্থা কেমন। এখন পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে দরদস্তুরে পোষায় নি, এই একমাত্র ভরসা।"

বিমল বলিল, "সে ভরসাও খুব বেশী দিন থাকবে না। পঞ্চুমামার যে রকম রোখ চ'ড়ে গিয়েছে, তাতে সে টাকার দাবি কমিয়েও শীগ্‌গির শীগ্‌গির রফা করবার চেষ্টা করবে।"

মৃণাল বলিল, "তার জ্যাঠামশায় বোধ হয় তার কথা শুনবেন না।"

বিমল উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "দেখা যাক, আমি অন্ততঃ দৈবের উপর খুব বেশী নির্ভর করছি না। এখানে কাজকর্ম্মের কিছু সুবিধা হ'তে পারে তার একটু আশা পেয়েছি। আমাকে আপনি কোনও গতিকে খবর একটু যদি দিতে পারেন তার চেষ্টা করবেন। বেশী প্রয়োজন

হ'লে সোজাসুজি ডাকবেন, আমি গিয়ে হাজির হব। লোকমতের ভাবনা ভাবা তখন চলবে না। আচ্ছা, আজ তবে আসি।"

মৃণাল তাহার পর কত রকম করিয়া ব্যাপারটাকে ভাবিয়াছে, কিন্তু পথ কিছু দেখিতে পায় না। সে কেমন করিয়া এই বিবাহে বাধা দিবে? মামীমার কাছে এ-কথার উল্লেখই বা করিবে কি করিয়া? বিমলকে খবর দিবে কেমন করিয়া, বিমলই বা তাহাকে নিজের খবর জানাইবে কি উপায়ে? কিছুই সে যে ভাবিয়া পায় না? যাহা হউক, বিমল যাহাই বলুক, ভগবানের উপর নির্ভর তাহার যায় নাই। তিনি কি এমন করিয়া তাহাকে অকূলে ভাসিয়া যাইতে দিবেন?

আর সে ফিরিয়া আসিবে না, কাজেই সমস্ত জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। জিনিষপত্র জমা হইয়াছে মন্দ নয়। গ্রামের ষ্টেশন-মাষ্টারের সেই ভগিনী আবার বাপের বাড়ী যাইতেছেন, তাঁহারই সঙ্গ মৃণালকে ধরিতে হইবে। সকালে বাহির হইয়া, তাহার বাড়ীতে গিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

ভোরে উঠিয়া সে প্রস্তুত হইতেছিল। দুই চোখ বারবার তাহার জলে ভরিয়া উঠিতেছে। আর সে আসিবে না। তাহার সঙ্গিনীরাও দুই-চারিজন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে, সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা পাস হইলে আবার আসিয়া পড়িবে, ফেল হইলেও এখানে না আসুক, অন্য বোর্ডিঙে যাইতে পারে। সবার বড় কথা, তাহাদের সম্মুখে এমন বলিদানের খড়্গ ঝুলিতেছে না।

চোখের জলে ভাসিয়া, সকলের কাছে বিদায় লইয়া মৃণাল অবশেষে চলিয়া গেল। বোর্ডিঙের দরোয়ান তাহাকে গাড়ী করিয়া এই পথটুকু পার করিয়া দিয়া গেল।

এ বাড়ীতেও মহা কোলাহল, ব্যস্ততার সীমা নাই। এতগুলি ছেলেমেয়ে লইয়া যাওয়া, সে এক প্রলয় কাণ্ড! চীৎকার চেঁচামেচিতে কান পাতা যায় না। এত সকালে খাইয়া যাওয়া যায় না, আবার সেই বেলা তিনটা অবধি না খাইয়াও থাকা যায় না, কাজেই ট্রেনে বসিয়া খাইবার জন্য বেশ ভাল আয়োজন করিয়া লইয়া যাইতে হয়। বাড়ীর গৃহিণীই চলিয়াছেন, কাজেই সব আয়োজন তাঁহাকেই করিতে হইতেছে। ছেলেপিলেদের যেন রামরাজত্ব লাগিয়া গিয়াছে। রান্নাঘরে ঘি-ময়দা, আলু-পটোলের ছড়াছড়ি। আলুর দম রান্না হইয়া গিয়াছে, গৃহিণী পটোল ভাজিতেছেন, আবার এক হাতেই লুচির ময়দা ঠাসিতেছেন। এসব দিকে ছেলেমেয়েদের তত লক্ষ্য নাই। কিন্তু আগের দিন মা মস্ত বড় এক হাঁড়ি পান্তুয়া তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছেন সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য, সেই লোভনীয় হাঁড়িটা ঘরের এক কোণে বিরাজ করিতেছে। মায়ের চোখ এড়াইয়া কি করিয়া তাহার ভিতর একবার হাতটা ঢোকানো যায় এই হইতেছে সমস্যা। মাও তেমনি, এ-বারও মুখ ফিরান না।

মৃণাল খানিকক্ষণ অবস্থাটা দেখিয়া বলিল, "মাসীমা, আমি ময়দাটা মেখে লুচি ক'খানা বেলে দিই না?"

গৃহিণী খুশী হইয়া বলিলেন, "তাই দাও বাছা, একলা হাতে আর পেরে উঠি না। দেখছ ত বজ্জাতগুলোর কাণ্ড? ওখানে নিয়ে যাব ব'লে মিষ্টি ক'টা করেছি, ভাবলাম আহা ভাইপোভাইঝিগুলো আছে, তারাও ত প্রত্যাশা করে? এরা ত বারো মাসই খাচ্ছে? তা কি ক'রে সেগুলো পেটে পুরবে সেই চেষ্টায় আছে কাল থেকে। যা বেরো, আদেখলার দল, মিষ্টি কখনও চোখে দেখিস নি, না?"

মৃণাল ময়দা মাখিতে বসিল। গাল খাইয়াও কচি-কাচার দল নড়ে না, শেষে এক-একটা পান্তুয়া হাতে দিয়া তবে তাহাদের সেখান হইতে সরানো হইল।

আর একজন সাহায্য করিবার লোক আসিয়া জোটাতে, কাজ এক রকম করিয়া হইয়া গেল। পোঁটলা-পুঁটলি হইল অসংখ্য, গৃহিণী যাইতেছেন অনেক দিনের জন্য, ছেলেমেয়েও অনেকগুলি। তাহাদের সামলাইতে, খাওয়াইতে, এবং তাহাদের ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করিতে সময় কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল, তাহা মৃণাল জানিতেও পারিল না।

মল্লিক-মহাশয় ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মৃণালের বুকে যেন একসঙ্গে আনন্দ আর অভিমানের জোয়ার জাকিয়া গেল। সে মুখ

ফিরাইয়া চোখ মুছিতে লাগিল। তাহার সঙ্গিনী ছেলেপিলে লইয়াই ব্যস্ত। তিনি অতটা লক্ষ্য করিলেন না।

মামাবাবু কাছে আসিয়া পড়ার আগেই মৃণাল সামলাইয়া লইল। মল্লিক-মহাশয় তাহার শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বড় যে শুকিয়ে গিয়েছিস্ মা, পড়ার চাপ বড় বেশী পড়েছিল, না?"

মৃণাল বলিল, "না, ঐ জ্বরটা হল কি না টেষ্টের পর, তাইতেই অনেকটা রোগা হয়ে গিয়েছি।"

গরুর গাড়ী উপস্থিতই ছিল। সহযাত্রিণীর কাছে বিদায় লইয়া মৃণাল গাড়ীতে উঠিল। এবার সঙ্গে তাহার অনেক জিনিষ, একটা গাড়ীতে সব ধরিল না, দুইটা মুটের মাথায়ও কিছু কিছু আসিতে লাগিল। মল্লিক-মহাশয়ও সঙ্গে হাঁটিয়া চলিলেন।

সেই পরিচিত মাঠ, বন, পুকুর, সেই নয়নরঞ্জন ছোট গ্রাম, সেই মানুষগুলি। কিন্তু সবকিছুর উপর হইতে সেই মায়াতুলিকার প্রলেপ আজ যেন মুছিয়া গিয়াছে। তাহারা আর হাত বাড়াইয়া মৃণালকে ডাকিতেছে না, যেন ভ্রুকুটি করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে যেন বন্দিনী, কারাগৃহের প্রাচীর যেন তাহাকে চারিদিক্ হইতে বেষ্টন করিয়া ধরিতেছে। তাহার মুক্তি কোথায়? কেমন করিয়া সে এই স্নেহের নাগপাশ হইতে উদ্ধার লাভ করিবে? এই যে তাহার আজন্মের আনন্দের ভালবাসার নিকেতন, ইহা এমন বিভীষিকাময় হইয়া উঠিল কেমন করিয়া? তাহার সহায় কি কেহ নাই? ভগবান্‌ও কি তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন?

চিনি, টিনি তেমনই ঘূর্ণিবায়ুর মত ছুটিয়া আসিল, মামীমা তেমনই খোকাকে কোলে করিয়া আসিয়া, বাহিরের দাওয়ায় দাঁড়াইলেন। কিন্তু সেই আনন্দের রাগিণী আর তেমন করিয়া বাজিল না।

মামীমাও বলিলেন, "বড় রোগা হয়ে গিয়েছিস্ মা।"

মামাবাবু বলিলেন, "নাও, এখন ক'দিন খাওয়াও মাখাও ভাল ক'রে। নইলে কেউ পছন্দ করবে না, যা মেয়ের শ্রী হয়েছে।"

সে যেন বলিদানের পশু! তাহার দেহের শ্রী প্রয়োজনমত না হইলে, বলির খাঁড়া তাহার গলায় পড়িবে না।

কাপড়চোপড় বদলাইয়া, মুখ-হাত ধুইয়া, মৃণাল খাইতে বসিল। সবই আগের মত আছে, শুধু মৃণালের মনের দৃষ্টি আজ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। কিছুই আর তার ভাল লাগে না। ভগবান্ কেন তাহাকে এমন পরীক্ষায় ফেলিলেন? আর দশটা মেয়ের মত সে কেন ভাগ্যের দান শান্তভাবে লইতে পারিল না? কেন পঞ্চানন তাহার ভাগ্যাকাশে ধূমকেতুর মত উদিত হইল? তাহাকে মৃণাল কেন এত ঘৃণা করিল? বিমলই বা এমন করিয়া তাহার সমস্ত হৃদয় হরণ করিল কেন? এই দারুণ সংশয়ের সাগরে মৃণাল কোন্ ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া ভাসিবে? নিজের নারীত্বকে বলি দিয়া স্রোতেই ভাসিয়া যাইবে কি? না, যথাসাধ্য কূলে পৌঁছিবার চেষ্টা করিবে? একবার কি হাতখানা ধরিয়া কেহ তাহাকে তীরে টানিয়া তুলিবে না?

মামীমা বলিলেন, "তুই খাচ্ছিস্ কই? এখনও বুঝি অরুচিটা যায় নি?"

মৃণাল বলিল, "আর খেতে পারি না। খেয়েই বেরিয়েছিলাম, আবার গাড়ীতেও একবার খেয়েছি।"

মামীমা বলিলেন, "সুহাস মানুষটা ভাল, বেশ যত্ন ক'রে এনেছে, না?"

মৃণাল হাসিয়া বলিল, "তাঁর যত্ন করবার অবসর কোথায় মামীমা? নিজের ছেলেমেয়ে নিয়েই তিনি অস্থির। আর সেগুলি হয়েছেও তেমনি দুষ্টু।"

মামীমা বলিলেন, "ছেলেপিলে আবার কোথায় শিষ্ট হয়? যা নিজের জিনিষপত্রগুলো গুছিয়ে রাখ্ গিয়ে। কাঠের বাক্সটা ওঁর ঘরে রাখিস্। আমার ঘরে অত জায়গা হবে না।"

মামীমা নিজের কাজে ভিড়িয়া গেলেন। মৃণাল জিনিষ গুছাইতে বসিল। চিনি, টিনি আর খোকা ত তখনই কাজে বাগ্‌ড়া দিতে আসিয়া জুটিল। কাজেই যে কাজ এক ঘণ্টায় হইতে পারিত, তাহা সারিতে তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার দীপ জ্বলিয়া উঠিলে

পর তাহার ক্ষুদ্র শত্রুগুলি খাদ্যের সন্ধানে রান্নাঘরে চলিয়া গেল। মৃণাল তখন শ্রান্তভাবে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। নিজের অজ্ঞাতসারেই কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

মামীমা খানিক বাদে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া তুলিলেন। বলিলেন, "খাবি চল্ রে, দস্যিগুলোর হয়ে গেছে।" চিনি, টিনি ও খোকা ইহারই ভিতর হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শ্রান্ত শরীর ও নিষ্পাপ মন, ঘুমাইয়া পড়িতে এক মুহূর্ত্তও দেরি হয় না।

মৃণাল বলিল, "আজ আর থাক না মামীমা, মোটেই খিদে নেই।"

মামীমা বলিলেন, "না বাছা, ওসব শহুরে ধরণ এখানে চলবে না। রাত-উপোসী থাকতে নেই। শরীরটাকে একেবারে মাটি ক'রে এনেছিস। এই জন্যেই না লোকে মেয়েছেলের লেখাপড়া দেখতে পারে না? যাদের চিরকালটা গতর খাটিয়ে খেতে হবে, তাদের আগে-ভাগে শরীরের দফা সেরে রাখলে চলে? যেমন হোক দু-গাল খেয়ে এসে শো।"

কথা বাড়াইবার ভয়ে মৃণালকে উঠিতেও হইল, দুই গাল খাইতেও হইল।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙিয়া সে উঠিয়া পড়িল। ক্ষুদ্র দস্যুর দল তখনও নিদ্রামগ্ন, বাড়ী ঠাণ্ডা আছে। মামীমা কাপড় ছাড়িয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিয়াছেন, মামাবাবু বাহির হইয়া গিয়াছেন। মৃণালের এখন কোনও কাজ নাই। সে মুখ-হাত ধুইয়া বাড়ীর পিছনের তরকারির বাগানে গিয়া হাজির হইল।

ইহা শুধু তরকারির বাগান নয়, প্রায় তিন-চার বিঘা জমি, বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা। ইহার ভিতর খিড়কির পুকুর আছে, গোয়াল-ঘর আছে, হাঁসের ঘর আছে, ঢেঁকিশাল আছে। তরকারির বাগানের মাঝে মাঝে বড় বড় ফলের গাছ আছে, ফুলেরও অভাব নাই। মোটের উপর জায়গাটি পরিষ্কার, তবে এখানে ওখানে ঝোপঝাড় যে একটাও নাই তাহা নয়। মৃণাল কেমন যেন আন্‌মনা হইয়া বাগানে ঘুরিতে লাগিল।

তাহাদের বাগানের পিছন দিয়া একটা মেঠো রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। পাড়াগাঁয়ের পায়ে-চলা পথ। মাঠের পর মাঠ পার হইয়া এ-পথ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছে। এই পথে ছয়-সাত মাইল হাঁটিলেই বিমলদের গ্রামে যাওয়া যায়। কিন্তু সে ত এখনও কলিকাতায়, কবে গ্রামে আসিবে কে জানে?

দু-একটি করিয়া মানুষ মাঠে পথে দেখা যাইতে আরম্ভ করিল। পাড়াগাঁয়ের মানুষ সব সকাল সকাল ওঠে। মামাবাবু বাড়ীর দিকে ফিরিয়া আসিতেছেন, দূর হইতে দেখা গেল। হঠাৎ মৃণাল চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চলিল। কিছুদূরে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা দিয়াছে, ইহাকে ভুল করিবার জো নাই। সে পঞ্চানন। এত সকালে এদিকে কি করিতে আসিতেছে?

পঞ্চাননও মৃণালকে দেখিতে পাইয়াছিল। সামনা-সামনি আসিয়া পড়িলে হয়ত দু-একটা কথাও বলিতে পারিত, যদিও তাহা তাহার নিজের মতে নিন্দনীয় হইত। কিন্তু মল্লিক-মহাশয়কে কাছে আসিয়া পড়িতে দেখিয়া সে ইচ্ছা সে ত্যাগ করিল। মৃণালকে বড় যেন রোগা দেখাইতেছে। রোগা ত হইতেই পারে, যা সব কাণ্ড। সে গ্রামে ফিরিয়াছে বিমলের সঙ্গে ঝগড়ার পরদিনই। এখন অবধি সম্বন্ধটা পাকাইয়া তুলিবার ব্যবস্থা বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। জ্যাঠা-মশায়ের কাছে কথাটা পাড়ায় কাহাকে দিয়া? বৌদিদি এ-ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও কাজে লাগিবে না। দাদার সঙ্গে এ-সব কথার আলোচনা করা কি ঠিক হইবে? কিন্তু আর উপায় না মিলিলে অগত্যা তাহাই করিতে হইবে। মোট কথা, পঞ্চানন এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াই আসিয়াছে।

(২২)

মৃণাল রান্নাঘরের দরজার কাছে আসিয়া বলিল, "মামীমা, আমায় কিছু কাজ দাও না? এমনি হাঁ ক'রে কি ব'সে থাকা যায় চব্বিশটা ঘণ্টা?"

মামীমা বলিলেন, "সাত-সকালে এখন কি কাজ দিই তোকে? আগে দুটো কিছু মুখে দে। যা না ছিরি হয়েছে মেয়ের, দুটো দিন জিরিয়ে নে।"

মৃণাল বলিল, "ফিরছি ত সারাক্ষণই। চিনি, টিনি উঠেছে ?"

মামীমা বলিলেন, "উঠল বোধ হয় এতক্ষণে। যা ত, খোকাকে একটু ধর গে যা, গলা শুনছি যেন।"

মৃণাল গিয়া ছেলেমেয়েদের তুলিয়া মুখ ধোয়াইতে বসিল। ইহারা জাগিয়া থাকিলে মানুষকে চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া যাইবার কোনও অবসর দেয় না। তাহাদের দাবি এমন প্রচণ্ড যে তাহা মিটাইতেই মানুষের দেহ-মনের শক্তি ফুরাইয়া যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সকালের খাওয়া চুকিল, এবং রাধী আসিয়া খোকার ভার গ্রহণ করিল, ততক্ষণ আর মৃণালের অন্য কোনও ভাবনা ভাবিবার অবকাশ হইল না।

ইহারই মধ্যে চৈত্র মাসের চন্‌চনে রোদ উঠিয়া চারিদিক্ গরম হইয়া উঠিয়াছে। চিনি, টিনি উবু ঝুঁটি ও গাছকোমর বাঁধিয়া রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে পুকুরঘাটে চলিল, যতক্ষণ সম্ভব সেইখানে কাটাইয়া, জল ঘাঁটিয়া আসিবে। গরমের দিনে পুকুরঘাটের মত আরামের জায়গা আর কোথায় ? খোকাও একেবারে প্রাকৃতিক বেশে সজ্জিত হইয়া, রাধীর কোলে চড়িয়া তাহাদের সঙ্গে চলিল।

মৃণাল জিজ্ঞাসা করিল, "আমিও স্নান ক'রে আসব নাকি ওদের সঙ্গে মামীমা ? বড় গরম লাগছে।"

মামীমা বলিলেন, "কাজ নেই বাপু, কে কোথায় কি ব'লে বসবে। তোর ত আবার কথা সয় না।"

মৃণাল বলিল, "না সইবার মত কথা হ'লে সইবে কি ক'রে ? তা হ'লে কি সরেই তোলা জলে নাইব ?"

মামীমা বলিলেন, "আমার সঙ্গে যাস এখন দুপুর বেলা।"

মল্লিক-মহাশয় বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া বলিলেন, "আজ দুধ অনেকটা হ'ল, পায়েস কর না, মিনু এসেছে।"

মৃণাল হাসিয়া বলিল, "আমি ত মস্ত খানেওয়ালা।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "খানেওয়ালা এখন জোর ক'রে হ'তে হবে। যে মা-বাপের মেয়ে তুমি। মা-টি ত জন্ম দিয়েই বিদায় হলেন, বাপও এই বয়সে ধুঁকুচেন, কতদিন আর টিকবেন জানি না।"

গৃহিণী রান্নাঘরের ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃণাকের চিঠিপত্র আর কিছু পেলে নাকি ?"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "এই ত পেলাম একটা পোষ্টকার্ড। হাঁপানি আরও বেড়েছে ব'লে লিখেছে। বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।"

মৃণাল ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কতদিন হল বাবার এ-রকম হয়েছে ?"

তাহার মামীমা বলিলেন, "ভাল আর সে আছে কবে ? আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে এখন একেবারে শয্যা নিয়েছে। যে অন্নেয়ে গুষ্টি, ভয় করে বাপু। ভালয় ভালয় এদের দুই হাত এক হয়ে গেলে বাঁচি।"

মৃণাল মুখ ফিরাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "গতিক কিছু সুবিধের ঠেকছে না। মিনুর বিয়েই না শেষে আটকায়। আজ আবার বুড়ো ডেকে পাঠিয়েছে, যদি দেখি দু-এক শ-ও নামতে রাজী, তবে একেবারে পাকাপাকি ক'রে আসব, বৈশাখের প্রথম যেদিন শুভদিন আছে সেদিনই বিয়ে দিয়ে দেব। তুমি এত তাড়াতাড়ি সব গোছগাছ করতে পারবে ত ?"

গৃহিণী বলিলেন, "সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না, তুমি সম্বন্ধটা ঠিক কর ত, আর দিন ঠিক কর। আমি কি আর চুপ ক'রে ব'সে আছি নাকি এতদিন ? আস্তে আস্তে গুছিয়ে রাখছি না ? কাপড়চোপড়, গয়নাগাঁটি, বাসনকোশন, সবই ত ঠিক। জানিই মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে, ওখানেই হোক কি অন্য কোনওখানেই হোক। তা দু-এক শ কমালেই যে বিয়ে দেবে বলছ, দেবে কেমন ক'রে ? সম্বল ত ঐ পাঁচশ টাকা ? আর গহনা ক-খানা কি মেয়ে পরবে না ? তাও ঘুচিয়ে হাড়কিপ্পন মিনষেকে দেবে ? আমরা আর কত দিতে পারব ? বিয়ের সব খরচই ত আমাদের করতে হবে এরই মধ্যে কাপড়চোপড় বাসনকোশন করাতে শ-দু খরচ হয়ে গেছে। তা বাদে আইবুড়-ভাতের খরচ, বিয়ের দিনের খরচ, যেমন-তেমন একটা ফুলশয্যার তত্ত্ব

এ-সব ত প'ড়েই আছে। পোষ্ট আপিসের টাকা ক-টা ত শেষই হবে, তা বাদে বাড়ীঘর বাঁধা দিতে চাও না কি? নিজের মেয়ে আছে দুটো, তাও মনে রেখো।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "তা কি আর মনে নেই? সবই মনে আছে। কিন্তু মিনির বয়স যে অনেক হয়ে গেল, আর ত রাখা যায় না? না-হ'লে এ-সম্বন্ধ ছেড়ে অন্য সম্বন্ধ দেখতাম। তার উপর মৃগাঙ্ক অসুখে প'ড়ে বিপদ বাধিয়েছে। কুডাক ডাকতে নেই, তবু ভালমন্দের কথা বলা যায় না। তা হ'লে ত বছর-খানেকের মত বিয়েই বন্ধ। সে-দিক্‌টা দেখতে হবে ত? তাই ভাবছি কি আর হবে অত দরাদরি ক'রে, বিয়েটা দিয়েই দিই। গহনা ত ওরা বেশী চাচ্ছে না, না-হয় গিরির দেওয়া হারলিটা বেচে দিই, তাতে শ-দুই হবে ত? তাতেই কোনও মতে কাজ উদ্ধার করব। অন্য খরচ সব খুব সংক্ষেপে করব।"

গৃহিণী মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "সংক্ষেপে কর বললেই অমনি করা যায় কি না? কোন্‌টা তুমি বাদ দেবে শুনি? যেখানে যা ত্রুটি হবে, অমনি গাঁয়ের লোক খোটা দেবে ত? বলবে, নিজের মেয়ে হ'লে আর এমনটা হ'ত না। নাও, বোসো।"

তিনি পিঁড়ি পাতিয়া স্বামীর জন্য সকালের জলখাবার আনিয়া দিলেন। মল্লিক-মহাশয় খাইতে বসিলেন। গৃহিণী রান্নাঘরের দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, "গহনা বেচায় আমার মত নেই বাপু। মা-মরা মেয়ে, ওর মা সোনারুপো যা দু-চার কুচি রেখে গেছে ওরই থাক্। বড় ঠাকুরঝিও তার দেওয়া জিনিষ বেচে দিলে বিরক্ত হবে। তার চেয়ে বুড়োকে বোঝাও, পাঁচ-শ এখন নিক্, বাকি দু-শ আমরা পূজোর পর দেব। তখন ধান-টান আদায় হবে, খাজনাও কিছু পাওয়া যাবে. মিনিকে কলকাতায় যেমন হোক ক'রে মাসে আট-দশ টাকা দিচ্ছিলে ত, সেটাও এ ক-মাস লাগবে না। তার পর ভগবানের ইচ্ছায় ওর বাপ ভাল হয়ে উঠে যদি কাজে ফের লাগতে পারে, তা হ'লে সেও কিছু দিতে পারে। সেও বারো-চোদ্দ টাকা মাসে মাসে মেয়েকে দিচ্ছিল ত? জুড়ে তেড়ে দু-শ এক রকম ক'রে হয়ে যাবে বাপু।"

মল্লিক-মহাশয় দুধের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে বলিলেন, "তোমার পরামর্শ ত ভাল, এখন বুড়ো বাগ মানলে হয়।"

গৃহিণী বলিলেন, "মানবে আবার না। এর চেয়ে ভাল সম্বন্ধ ও পাচ্ছে কোথায়? পঙ্কুর শুনি মেয়ে খুব পছন্দ।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "তা হ'তে পারে। আমাকে দেখলেই ছোক্‌রা খুব ঘটা ক'রে প্রণাম করে, আশেপাশে ঘুর ঘুর করে, কিছু একটা বলবার ইচ্ছে বোধ হয়। তা শেষ অবধি আর সাহসে কুলোয় না।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের মেয়ে কি মন্দ? বিয়ের পর মিলে মিশে থাকে তবেই বাঁচি বাপু। মিনুর ত এখন দেখি ওকে মনে ধরে না। তা বিয়ে হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। হাজার হোক হিঁদুর মেয়ে ত? মেমসাহেব ত আর সত্যই নয়?"

মল্লিক-মহাশয় আর কথা না বলিয়া উঠিয়া গেলেন। গৃহিণী নিজের কাজে গিয়া ভিড়িয়া গেলেন। মৃণাল মামাবাবুকে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া আবার মামীমার কাছে ফিরিয়া আসিয়া তরকারি কুটিতে বসিল। এখানে তাহার বিবাহের কথাই হইতেছে তাহা সে আন্দাজে বুঝিয়াছিল, তাই এতক্ষণ এদিক্ মাড়ায় নাই। তাহার মামাও এখন আর সে কথা না তুলিয়া তাড়াতাড়ি রান্না সারিতে লাগিলেন।

রৌদ্র ক্রমেই প্রখরতর হইয়া উঠিল, বাহিরের দিকে আর চাওয়া যায় না। গৃহিণীর রান্না শেষ হইয়া গিয়াছে, তিনি বলিলেন, "দেখছিস্ ছুঁড়িদের রকম, এখনও ঘাট থেকে ফিরল না, সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছে। জল ঘেঁটে একটা জ্বরজাড়ি না বাধালে তাদের আর চলছে না। আর রাধীর আক্কেলকে বলিহারি যাই, ছেলেটাকে যে নিয়ে গিয়েছে তার খেয়ালই নেই। রোদে মাথার চাঁদিটা উড়ে যাবে একেবারে।"

মৃণাল উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া বলিল, "আসছে বোধ হয় এইবার। চিনি, টিনির গলা পাচ্ছি যেন।"

তাহাদের মা বলিলেন, "গলা না ত যেন কাঁসর বাজছে, এক ক্রোশ দূর থেকে শোনা যায়। ওগুলো

এলে, ভাত খেতে বসিয়ে দিয়ে আমরা নেয়ে আসতে পারি।"

ছেলেমেয়েরা আসিয়া পড়িল। খোকা স্নান করিয়া আসিয়াছে। রাধী তাহাকে আঁচল চাপা দিয়া আনিয়াছে, তবু রৌদ্রের উত্তাপে তাহার সুন্দর মুখ একেবারে টুক্ টুক্ করিতেছে। গৃহিণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোর কি আক্কেল না? কচি ছেলেটাকে এই কাঠফাটা রোদে এমনি ক'রে আনে?"

রাধী খোকাকে দাওয়ায় নামাইয়া দিয়া বলিল, "কি করি মা-ঠাকুরুন্! ইঁয়ারা কি আসতে চান? কত ব'লে কয়ে তবে আনছি? কেউ এদের সাথে লারবেক্ মা।"

গৃহিণী বকিতে বকিতে চিনি, টিনি, ও খোকার ভাত বাড়িয়া তিনজনকে বসাইয়া দিলেন। তাহার পর রান্নাঘরের সিঁড়ির কাছে রাধীকে পাহারায় বসাইয়া বলিলেন, "চল্ মিনু, যাই এইবার, কাপড় গামছা নে।"

মৃণাল কাপড় চোপড় গুছাইয়া লইয়া বলিল, "খোকা নিজে খেতে পারবে?"

খোকার মা বলিলেন, "ছড়াক বসে খানিকক্ষণ, আবার ত আমার সঙ্গে বসবেই?"

দুই জনে শাড়ী গামছা পুরু করিয়া পাট করিয়া মাথার উপর রাখিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। এত রোদ মাথায় সয় না, অথচ পাড়াগাঁয়ে মেয়েছেলের মাথায় ছাতা দেখিলে তখনই প্রলয় ঘটিয়া যাইবে।

লাল কাঁকরের পথ, রোদের তেজে তাতিয়া আগুন হইয়া আছে, হাঁটাই দুঃসাধ্য। মৃণাল বলিল, "বাবা, পায়ে যেন ফোস্কা প'ড়ে যাচ্ছে। কাল থেকে একেবারে ভোরবেলায় স্নান ক'রে যাব। তোমাদের গাঁয়ে ত পায়ে জুতোও চলবে না, মাথায় ছাতা ত স্বপ্নেরও অতীত।"

মামীমা হাসিয়া বলিলেন, "তাই করিস্। এই গাঁয়েই যখন জীবন কাটবে, তখন আর পাঁচজনের মত না চ'লে উপায় কি?"

যে-কথাটা তাহার কানে সব চেয়ে অসহ্য তাহাই যেন সকলে জেদ করিয়া মৃণালকে শোনায়। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় সে বলিয়া ফেলিল, "তা কে জানে মামীমা, ভগবান্ কার জন্যে কোথায় জায়গা ক'রে রেখেছেন, তা কি আর মানুষ জানে?"

মামীমা বলিলেন, "তা বটে বাছা, তবে সম্ভব অসম্ভবের একটা কথা আছে ত? তাই বললাম আর কি?"

পুকুরঘাট বেশী দূর নয়, কথা বলিতে বলিতে তাহারা আসিয়া পড়িলেন। ঘাট এখন ভরপুর, পল্লীরমণীদের স্নানের এই প্রকৃষ্ট সময়। অনেকেই হাসিয়া নবাগতাদের সম্ভাষণ করিল। মল্লিক-গৃহিণীও হাসিয়া উত্তর দিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে লাগিলেন। মৃণালের মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর, তাহার হাসি ফুটিতে-না-ফুটিতে মিলাইয়া গেল। পিছনে একটি কিশোরী বউ অর্দ্ধস্ফুট স্বরে মন্তব্য করিল, "ইস্ লিখি পড়ির দেমাক দেখ না। আমরা যেন কথা বলার যুগ্যিই নয়।"

চক্রবর্ত্তীদের বড় বউ কুসুম ঘন ঘন ডুব দিয়া স্নান-করিতেছিল। সে মৃণালের দিকে চাহিয়া বলিল, "ভাগ্নী কখন এল গো দিদি?"

মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "এল কাল। তার পর তোদের সব খবর কি?"

কুসুম নিয়মমত ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "খবর ভাল গো, আজ সাঁঝে শুনতেই পাবে।"

মৃণাল কথা না বলিয়া স্নান করিতে লাগিল। তাহার মামীমাও ভাগ্নীর ফিরিবার তাড়া জানিতেন, কাজেই তিনিও আর কথাবার্ত্তায় দেরি না করিয়া তাড়াতাড়িই স্নান সারিয়া উঠিলেন। তাহার পর ভিজা কাপড়ের উপর লাল-গামছা জড়াইয়া দুইজনে ফিরিয়া চলিলেন। পথের উত্তাপে এবার তেমন কষ্ট হইল না।

বাড়ী আসিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, ভিজা কাপড় নিঙ্ড়াইয়া বাঁশের উপর মেলিয়া দিয়া গৃহিণী রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিলেন। চিনি, টিনি একরকম ভাল করিয়া খাইয়া এঁটো হাতে মুখে দাওয়ার ধারে পা ঝুলাইয়া বসিয়া ঝগড়া করিতেছে। খোকা রাধীর কোলে ঘুমাইতেছে।

মল্লিক-গৃহিণী মৃণালকে ডাকিয়া বলিলেন, "মিনু খেয়ে নিবি নাকি?"

মৃণাল নিজের কাপড় মেলিয়া দিতে দিতে বলিল, "তোমাদের সঙ্গে বসলেই ত হয়।"

তাহার মামীমা বলিলেন, "তোর মামাবাবুর ফিরতে এখনও দেরি আছে। তোর পিত্তি চুঁইয়ে যাবে যে? আমার না-হয় অভ্যেস হয়ে গেছে।"

মৃণাল বলিল, "তোমার যা সুবিধা হয় কর।"

গৃহিণী ভাত বাড়িয়া তাহাকে খাইতে বসাইয়া দিলেন। তাহার পর খোকাকে কোলে করিয়া মৃণালের কাছে আসিয়া বসিলেন। রাধী ছাড়া পাইয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

দুপুর বেলা আর কোনও কাজ নাই। মামাবাবু ফিরিবার পর খোকাকে সে খানিকক্ষণ লইয়া বেড়াইল, কারণ ক্ষুদ্র মহারাজ তখন জাগিয়া উঠিয়াছেন। মামীমা সেই অবসরে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া লইলেন। খোকা আবার মায়ের পাতের কাছে গিয়া দু-চার গ্রাস ভাত খাইয়া আসিল।

খাওয়া সারিয়া, রান্নাঘরে শিকল তুলিয়া দিয়া মল্লিক-গৃহিণী শয়নকক্ষে আসিয়া ঢুকিলেন। বলিলেন, "খোকাকে দু-বার চাপড়ে দে, এখনি ঘুমিয়ে পড়বে।"

খোকার পদ্মকোরকের মত চোখ দুটি সত্যই বুজিয়া আসিতেছিল। সে মাকে দেখিয়া, হাত বাড়াইয়া তাহার কোলে গিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল।

বিছানায় ছেলেকে শোয়াইয়া মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "তুইও একটু গড়িয়ে নে না?"

মৃণাল বলিল, "দিনে ঘুমনো অভ্যেস নেই ত? এখন ঘুমুলে রাত্তিরে আর ঘুম হবে না। পরীক্ষাটা হয়ে গিয়ে যেন অথৈ জলে পড়েছি, সময় আর আমার কাটে না।"

মামীমা বলিলেন, "শেলাই-টেলাই করবি? কাপড় ত অনেক কেনা আছে। নিজে ত সময় পাই না, কলও নেই। মনে করেছিলাম ব্লাউস ক'টা জমিদার-বাড়ীর দরজীকে দিয়ে করিয়ে নেব, আর সেমিজ-সায়াগুলো তোতে-আমাতে কোনও মতে ক'রে নেব। সময়ও ত বেশী নেই।"

মৃণাল নিরুৎসাহ ভাবে বলিল, "তা দাও দেখি কি করতে পারি।"

মামীমা একটা নূতন ট্রাঙ্ক খুলিয়া কাপড় বাহির করিতে লাগিলেন। এ-ট্রাঙ্কটি মৃণাল আগে দেখে নাই, বোধ হয় তাহার জন্যই এটা কেনা হইয়াছে। মল্লিক-গৃহিণী গোছানী মানুষ, মৃণালের বিবাহের কথা ওঠা পর্য্যন্তই তিনি অল্পে অল্পে জিনিষপত্র জোগাড় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক দিনে ত সব হইবার নয়?

উপরে কয়েকটা লংক্লথ ও মার্কিনের টুকরা। দুইটি অর্দ্ধসমাপ্ত সেমিজও রহিয়াছে। মামীমা বলিলেন, "এই ত সবে আরম্ভ করেছি। তুই আজ এগুলো শেষ কর্, কাল আর দুটো সেমিজ কাটব। তার পর বডি রয়েছে, সায়া রয়েছে। ভাল ব্লাউস চারটে দরজী দিয়ে করিয়ে দেব। তোর আছেও ত ক'টা? আর কি সুতী ব্লাউসের কাপড় কিনব? অত পরবি কখন? সারাদিন ত হাঁড়ি-হেঁসেল নিয়ে কারবার হবে এর পর, অত জামা পরবার অবসর হবে কখন?"

মৃণাল বলিল, "যা তুমি ভাল বোঝ কর মামীমা। কি লাগে না-লাগে অত শত আমি জানি না।" সে শেলাই করিতে আরম্ভ করিল।

মামীমা যে তাহার উৎসাহের অভাব লক্ষ্য না-করিলেন তাহা নয়, তবে সেটাকে আমল দিলেন না। উপরের কাপড়গুলা টানিয়া নামাইয়া নীচের ব্লাউসের কাপড় শাড়ী প্রভৃতি মৃণালকে দেখাইতে লাগিলেন। মৃণাল ত চোখ বুজিয়া থাকিতে পারে না, তাহাকে দেখিতেই হইল। একখানি লাল বেনারসী শাড়ী, জরির বুটিদার, আর একখানি কমলালেবু রঙের বিষ্ণুপুরী গরদ, তাহার পাড় ও আঁচল জরির। একখানি দামী ঢাকাই শাড়ী, তিন-চারখানা অল্প দামের অথচ বাহারে শাড়ী, কোনওটা বা মান্দ্রাজী, কোনওটা বা দেশী। পাড়াগাঁয়ের মানুষ মামীমা, অত রকমারি কাপড়ের নাম জানেন না। যা জানা ছিল, তাহাই ফরমাশ দিয়া গ্রামের দোকানদারের মারফতে আনাইয়া রাখিয়াছেন।

শাড়ী দেখানো শেষ হইলে, মামীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর পছন্দ হয়েছে?"

মৃণাল সংক্ষেপে বলিল, "ভালই ত হয়েছে।"

(ক্রমশঃ)

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী মুরুং

শ্রীনীহারবিন্দু রুদ্র

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের কথা সভ্য জগতের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত নয় ; চাকমা, মগ, ত্রিপুরা, কুকী, লুসাই প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ের কথা অনেকে জানেন। এ-ছাড়া আরও দু-একটি সম্প্রদায় আছে যাদের কথা আজও ইতিহাসের পাতায় স্থান পায় নি। সেই রকম একটি সম্প্রদায়ের কথা এখানে লিপিবদ্ধ করব, যাদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেকেই জানেন না। তার কারণ সভ্যতার আলোক থেকে এরা আজও অনেক দূরে পিছিয়ে আছে, এদের শিক্ষায় কাজে ব্যবহারে। যাঁরা শহরের অফুরন্ত আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত আছেন তাঁদের চোখে মুরুং জাতির কুসংস্কার, নীতি-পদ্ধতি, আচার-ব্যবহার সবই যে আশ্চর্য্য ঠেকবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

মুরুং বালিক

এদের পারিবারিক আচার-ব্যবহার প্রভৃতি লক্ষ্য করতে গিয়ে ও এদের সমাজের নানা তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দু-এক জায়গায় অল্পবিস্তর বিপদে পড়তে হয়েছে, কিন্তু এরা আমার কোন অনিষ্ট করে নি বা করতে সাহসী হয় নি। কারণ পুলিসের লোককে এরা ভয় করে এবং যখনই এদের দলে গিয়েছি ইউনিফর্ম্ম ছাড়া অরক্ষিত অবস্থায় যাই নি। এরা সরল বটে কিন্তু দুর্দ্দান্তও বড় কম নয়। প্রতিহিংসার নিবৃত্তির জন্য মানুষকে

মুরুং যুবক

মেয়েদের নাচ

করে না। চারি দিকে ঘন নিবিড় বন, এক-একটি পাড়ায় বড়জোর কুড়ি-পঁচিশ ঘর লোকের বাস এবং এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ার দূরত্ব পাঁচ-ছয় মাইলের কম নয়।

পাহাড়ের গায়ে সরু আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে মেয়েরা ঝাঁকা (থুরুং) মাথায় জল সংগ্রহ করতে আসে। জলের দরকার এদের বেশী হয় না, কারণ এরা কখনও স্নান করে না বললেই চলে। নেহাৎ চলার পথে নদী, ঝিরি প্রভৃতি পাওয়া গেলে গলা অবধি ডুবিয়ে উঠে পড়ে, কস্মিন কালেও মাথায় জল দেয় না। উলঙ্গ হয়ে স্ত্রী-পুরুষে স্নান করে, নদী পার হয়ে যায়। মেয়েদের কাপড় পরবার রীতি ছবি দেখলে খানিকটা বোঝা যাবে। এক ফুট চওড়া, দু-হাত কি দেড় হাত লম্বা, নিজেদের তৈরি কাপড়ে মেয়েরা দেহ আবৃত করে। পুঁতির মালা বা মোটা দড়ি দিয়ে কোমরের উপর কাপড়টি বেঁধে রাখে, এ-ছাড়া সারা গায়ে অন্য কোন বস্ত্রাবরণ নেই। কিন্তু গলায় থাকে অসংখ্য পুঁতির মালা, পায়ে মল ; যারা একটু ধনী তাদের গলায় ও কোমরে টাকা, সিকি বা আধুলির মালাও পরতে দেখা যায়। আর এই বেশেই সর্ব্বত্র

নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতেও এরা এতটুকু দ্বিধা করে না। সবচেয়ে বেশী বিপদে পড়েছি ও অপদস্থ হয়েছি এদের ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করতে গিয়ে।

যখন আলি উয়াদঙ্গে আমার বদলির হুকুম পেলাম, জান্‌তে পারলাম যে এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যায় বেশী হচ্ছে মুরুং। সভ্য জগতের সঙ্গে তাদের জানাশুনা নেই। এরা অশিক্ষিত, মাত্র দুটি ছেলের কথা জানি যারা শিক্ষার আলোক পেয়েছিল. টং বে ফোর্থ ক্লাস অবধি পড়েছিল, মেরী বর্ত্তমানে ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ে।

পুরুষদের নাচ

জুম ও চাষ ক'রে এদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। ঘরে বাইরে প্রায় সমস্ত কাজ করে মেয়েরা, পুরুষদের এক কথায় কুঁড়ে বললেই হয়। সাধারণ দৈনন্দিন কাজের মধ্যে মেয়েদের কাজ হচ্ছে রান্না করা, আধ মাইল বা তারও বেশী দূর থেকে জল সংগ্রহ করা, কাঠ চেলাই করা, ধান ভাঙা ও সন্তান পালন করা। অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতিদের মত এরাও মাচান ঘর তৈরি করে। ঘর বেশ মজবুত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রত্যেকটি পাড়া উঁচু পাহাড়ের উপর, সমতল ভূমিতে এরা ঘর তৈরি

একটি মুরুং পরিবার

হলেও কিছু করতে সাহস পায় নি। এক জন মুরুং যুবক সাহস ক'রে ছবি তোলালে।

প্রথমেই বলেছি যে মেয়েদের তুলনায় পুরুষরা বেশী কুড়ে। এরা সৌখীন, মাথায় লম্বা লম্বা চুল রাখে ও মাঝখানে বড় ক'রে খোঁপা বাঁধে, অনেক সময় কৃত্রিম চুল ব্যবহার ক'রে খোঁপা বড় ক'রে নেয়, ফুল ও চিরুণী দিয়ে খোঁপা সাজায়। কান ছিদ্র ক'রে অবস্থানুযায়ী কাঠের, বাঁশের বা রূপার মাকড়ি পরে, হাতে বালা। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য হচ্ছে পরিধেয় বস্ত্র, আট হাত লম্বা প্রায় দেড় হাত চওড়া রঙীন কাপড়—অবশ্য নিজেদের তৈরি—পুরুষরা ব্যবহার করে। কিন্তু এত বড় কাপড়টির মাত্র সামান্য এক প্রান্ত লেংটির মত পরে, অবশিষ্ট অংশ কোমরে জড়িয়ে নেয়, এ রকম করবার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। মাথায় সিল্ক বা সাদা কাপড়ের পাগ্‌ড়ি বাঁধে। মেয়েদের মতই এদের গায়ে অন্য কোন আভরণ নেই।

এ দেশের স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যবান্ ও নিটোল শরীর। শরীরের নীচের অংশ খুব মোটা, সম্ভবতঃ পাহাড়ে ওঠানামা করার দরুন। এরা কথা বলে খুব আস্তে, মনে হয় খুব শান্তপ্রকৃতি; ভাষা নম্র, ঝগড়া করলেও বোঝা যায় না যে ঝগড়া করছে, কারণ হৈচৈ নেই। এক বার এদের একটা ঝগড়া দেখবার সুযোগ হয়েছিল। মদ খেয়ে দু-জন লোক ঝগড়া আরম্ভ করে, বচসা ক্রমে হাতাহাতিতে পরিণত হয়, এক জন ছুটে অন্য জনের চুল টেনে ধরে। এই যুদ্ধে এক জন সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হয় মাথার চুল এক গোছা হারিয়ে। তার পর শুনেছি ওদের দু-জনের ভাব হ'তে বেশী দেরি হয় নি।

এবার এদের একটি কুসংস্কারের কথা বলব। এদের সমস্ত কুসংস্কারের মধ্যে প্রধান হচ্ছে গো-নৃত্য। এরা নৃশংস ভাবে গরু মোষ প্রভৃতি হত্যা করে, তারই নাম গো-নৃত্য।

আসা-যাওয়া করে। অপরিচিত যুবকের সঙ্গে যুবতীদের এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যাতায়াতে কোন বাধা নেই। কিন্তু যুবক মুরুং ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত হ'লে চলবে না।

এদের মধ্যে কুসংস্কার আছে যে ছবি নিলেই এরা মরে যাবে। কাজেই মেয়ে দুটির ছবি নিতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছে। প্রথমে কিছুতেই এরা রাজী হয় নি; শেষে তোষামোদ, লোভ ও ভয় দেখিয়ে মেয়ের অভিভাবককে রাজী করা গেল, কিন্তু কি যে হবে এবং কি যে করতে চাই মেয়ে দুটি তা বোধ হয় সম্পূর্ণ বুঝতে পারে নি। ক্যামেরার বেলো খুলতেই এক বিশ্রী ব্যাপারের অভিনয় হ'ল। একটি ছুটে বেরিয়ে গেল, পিছনে ফিরে তাকায় না; অপর জন তার বৃদ্ধ দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর বুকে মুখ গুঁজে কান্না জুড়ে দিল। ক্যামেরা খুলতে দেখে এদের ভয় হয়েছে যে ঐ যন্ত্র দিয়ে তাদের মেরে ফেলা হবে। তার পর অনেক মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে, সিগারেট ঘুস দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে আমার পিয়নের একটি ছবি নিয়ে এদের বুঝিয়ে দিলাম যে ছবি নিলে মানুষ মরে না। দু-জনকে ধরে এনে বুড়ো বাপ শেষটায় রাজি করালে পর আমি ছবি নিতে পারলাম। আমাকে ঘিরে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন যুবক দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু ক্যামেরা যখন যে-দিকে ঘুরিয়েছি সেই মুহূর্ত্তে সে-দিক পরিষ্কার। দু-চার জন আমার ফটো নেওয়াতে বিরক্ত

প্রথমতঃ খোঁয়াড় তৈরি ক'রে তার মধ্যে একটি বা দুটি গরু বা মোষ বাঁধে—এমন শক্ত ক'রে বাঁধে যে বেচারীরা মোটেই নড়তে চড়তে পারে না, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে মাথা নীচু ক'রে। যেদিন নাচের বন্দোবস্ত হবে তার আগের দিন গরুটিকে তারা খোঁয়াড়ে বাঁধবে। বাঁশের ফুল প্রভৃতি দিয়ে নাচমণ্ডপটি সুন্দর ক'রে সাজিয়ে গ্রামের আত্মীয়দের—বিশেষ ক'রে অবিবাহিত মেয়েদের নিমন্ত্রণ করবে। নাচের দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা সাজগোজ করে। তবে মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের এ-বিষয়ে দৃষ্টি বেশী প্রখর ব'লে মনে হয়, কারণ নাচের সময়ই ছেলেমেয়েরা নিজেদের পছন্দমত পাত্রী বা পাত্র জোগাড় ক'রে নেয়। তবে ছেলেদেরই বেশী চেষ্টা করতে হয় এ-বিষয়ে। বাঁশের তৈরি লম্বা এক প্রকার বাঁশী বাজিয়ে ছেলেমেয়েরা নাচ সুরু করে, একই তালে বাঁশী বাজে, মেয়েরা নূপুর পায়ে নাচে আর মদ খায় প্রচুর। মেয়েদের সামনে পুরুষরা,—মেয়েরা পিছনে আর পুরুষরা সামনে ঘুরে ঘুরে নাচে। এ-নাচের একটি নিয়ম হচ্ছে যে অবিবাহিত মেয়ে বা বন্ধ্যা মেয়ে ছাড়া অন্য কেউ যোগ দিতে পারবে না। পুরুষদের কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। সমস্ত রাত এক দলের পর অন্য দল নাচে। ভোরে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম ও খাওয়া, তার পর আবার নাচ বেলা দুপুর পর্য্যন্ত।

নাচ শেষ হবার পর ধর্ম্মকর্ত্তা বা যিনি নাচের বন্দোবস্ত করেছেন, লোহার সেল্ (বর্শা) দিয়ে গরু বা মোষটিকে নির্ম্মম ভাবে খোঁচা দিতে থাকেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বেচারীরা জিব বের ক'রে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। জিবটি কেটে নিয়ে নৃত্যপর্ব্ব শেষ হয়। এভাবে একটির পর একটি জীবহত্যা ক'রে নাচের শেষ হয় এবং এই নাচ বা গোজাতি হত্যাই হচ্ছে এদের সবচেয়ে বড় ধর্ম্ম বা পুণ্য সঞ্চয়। শেষ নাচে একটি গরু, একটি কুকুর ও একটি মুরগীও বধ করা হয়।

এ-নাচ সম্বন্ধে এদের মধ্যে একটি গল্প প্রচলিত আছে। অতীতের কোন এক সময়ে ভগবান্ মুরুংদের একটি ধর্ম্ম-পুস্তক গোজাতির মারফতে মর্ত্ত্যে মুরুংদের নিকট পাঠান। পথে দারুণ ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে বেচারীরা সেই ধর্ম্মগ্রন্থ খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। সেই অতীত দিনের নির্ম্মম প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা আজও মুরুং জাতির মধ্যে গোহত্যা রূপে বিরাজিত।

জীবিত কালে একটি লোক যতগুলি পশু বা পাখী হত্যা করবে—অবশ্য, গৃহপালিত নয়—তার প্রত্যেকটির মাথার কঙ্কাল সযত্নে ঘরে সাজিয়ে রাখবে, তার মৃত্যুর পর তারই চিতায় তার সঙ্গে ঐ কঙ্কালগুলি দগ্ধ করা হয়। একটি লোকের বাড়ীতে আমি ২৪টি মোষ, ১৭টি গরুর মাথা গুনেছি। লোকটির বয়স বর্ত্তমানে ৩৫ বৎসর, ১৫ বৎসর বয়স থেকে যদি সে পুণ্য সঞ্চয় করতে আরম্ভ ক'রে থাকে তাহলেও বৎসরে তার একবারের অধিক পুণ্য সঞ্চয় করা হয়েছে বলতে হবে।

সমস্ত পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে এরাই বোধ হয় নিকৃষ্ট—ব্যবহারে কাজে, শিক্ষায় দীক্ষায়, ধর্ম্মে কর্ম্মে। পৃথিবীতে এমন কোন জীব সৃষ্টি হয় নি যার মাংস মুরুং জাতির অভক্ষ্য। কুকুরের মাংস এদের প্রিয় খাদ্য, এজন্য এরা খুব কুকুর পোষে।

প্রত্যেক গৃহসংলগ্ন আর একটি ছোট ঘর থাকে তার নাম মণ্ডপ-ঘর। ও ঘরে গৃহকর্ত্তা স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষমানুষের প্রবেশাধিকার নেই। সাধারণতঃ জুম ও চাষ ক'রে এদের অন্নসংস্থান হয়, জুমের কাজেও মেয়েরা প্রায় অর্দ্ধেক সাহায্য করে। স্ত্রীপুরুষ ছেলেমেয়ে প্রায় সকলেই তামাক সেবন করে, এজন্য তামাকের চাষ এদের মধ্যে প্রচুর।

মেয়েরা নিজেরা তকলিতে সুতা কাটে, কাপড় বোনে ও রং করে। রং-বেরঙের ফুল তোলাতেই এদের বাহাদুরি আছে। বাঁশের সূক্ষ্ম কাজেও পার্ব্বত্য জাতিদের বাহাদুরি আছে স্বীকার করতে হবে। সমস্ত পার্ব্বত্য জাতিই স্বাবলম্বী। বিশেষ কিছু কিনবার দরকার এদের হয় না। লবণ ছাড়া গৃহস্থালীর প্রায় অন্য সমস্ত জিনিষ এরা নিজেরাই উৎপাদন করে। এক দিনে তিনবার আহার করে। প্রাতে মুরগী-ডাকার সঙ্গে সঙ্গে বন্দোবস্ত হয় ভাত আর একটি সিদ্ধ বা শাকসবজী। স্ত্রীপুরুষ সকলে একত্রে একই পাতে আহার করে। সন্ধ্যার আগে শেষবার খেয়ে

নিয়ে পুরুষেরা আড্ডা দেয় আর মেয়েরা সুতা কাটে, তুলার বীচি ছাড়ায়। মদ তৈরি করে অনেক রাত পর্য্যন্ত। মেয়েরা কর্ম্মঠ, বৃথা গল্পগুজবে সময় নষ্ট করে না। সময়ের মূল্য না বুঝলেও তার অপব্যয় মেয়েরা কখনও করে না।

আজকালকার সভ্যতার আলোকে যে ভাবে অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতিদের দ্রুত উন্নতি দেখা যাচ্ছে মুরুংদের মধ্যে তার কিছুই নেই। অদূর ভবিষ্যতে এদের নির্ব্বুদ্ধিতা, এদের আচার-পদ্ধতি মানুষের চোখে বিভীষিকার সৃষ্টি করবে সন্দেহ নেই। তবে অতিথিসৎকারকে প্রধান কর্ত্তব্য বলে এরা জানে।

শিল্প ও শিল্পী, এদের মধ্যে আজও যা বর্ত্তমান আছে তা বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য। এক প্রান্তে নির্জ্জনতায় আজও এদের যে শিল্পকলার পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া যায় তা সভ্য সমাজে পৌছয় না, কারণ এরা নিজেদের তৈরি শিল্পসামগ্রী বাইরে বিক্রি করে না নেহাৎ অভাবে না পড়লে। বাইরের জগতে এদের শিল্পকলার নিদর্শন এসে পৌছলে নিশ্চয়ই সমাদর লাভ করবে।

মায়া-কানন

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

"অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেক জাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মেশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য ছিদ্রশূন্য আলোক-প্রবেশের পথমাত্রশূন্য; এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ পবনের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে···।"

বনের মধ্যে কিন্তু অন্ধকার নাই। ছায়া আছে, অন্ধকার নাই। চন্দ্র সূর্য্যের রশ্মি প্রবেশ করে না, তবু বন অপূর্ব্ব আলোকে প্রভাময়। কোথা হইতে এই স্বপ্নাতুর আলোক আসে, কেহ জানে না। হয়ত ইহা সেই আলো যাহা স্বর্গ মর্ত্ত্যে কোথাও নাই—The light that never was on land or sea—

এই বনে একাকী ঘুরিতেছিলাম। মানুষের দেখা এখনও পাই নাই, কিন্তু মনে হইতেছে আশেপাশে অনেক লোক ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। একবার অদৃশ্য অশ্বের দ্রুত ক্ষুরধ্বনি শুনিলাম, কে যেন ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছে। পিছন হইতে রমণীকণ্ঠে গাহিয়া উঠিল—'হড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে—'

অশ্বারোহী ভারী গলায় উত্তর দিল, 'সমরে চলিনু আমি হামে না ফিরাও রে।'

ক্ষুরধ্বনি মিলাইয়া গেল।

বনের মধ্যে পায়ে-হাঁটা পথের অস্পষ্ট চিহ্ন আছে, তাহার শেষে একটা ভাঙা বাড়ী। ইটের স্তূপ, তাহার ভিতর অশথ বাব্‌লা আরও কত আগাছা জন্মিয়াছে বহু দিন আগে হয়ত ইহা কোনও অখ্যাত রাজার অট্টালিকা ছিল। এই ভগ্নস্তূপের সম্মুখে হঠাৎ এক জনের সহিত মুখামুখি দেখা হইয়া গেল। মজবুত দেহ, গালে গালপাট্টা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে মোটা বাঁশের লাঠি।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'এ কি! দাড়ি বাবাজী, আপনি এখানে?'

দাড়ি বাবাজীর চোখে একটা আগ্রহপূর্ণ উৎকণ্ঠা, তিনি বলিলেন, 'দেবীকে খুঁজতে এসেছিলুম। এটা দেবীর পুরান আস্তানা।'

'দেবী চৌধুরাণী?'

'হ্যাঁ। দেবী নেই; দিবা নিশিও কোথায় চলে গেছে।'—রঙ্গরাজের কণ্ঠস্বর ব্যগ্র হইয়া উঠিল—'তুমি

জান দেবী কোথায়? তাঁকে বড় দরকার। ত্রিস্রোতার মোহনায় বজরা নোঙর করা আছে। তাঁকে এখনি যেতে হবে। তুমি জান তিনি কোথায়?'

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, 'দেবী মরেছে; প্রফুল্ল ছিল, সেও ব্রজেশ্বরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে। আর তাকে পাবেন না।'

'পাব না।' রঙ্গরাজের রাঙা তিলকের নীচে চক্ষু দুটা জ্বলিয়া উঠিল—'নিশ্চয় পাব। দেবীকে না-হলে যে চলবে না, তাঁকে চাই-ই। যেমন ক'রে হোক খুঁজে বার করতে হবে। ত্রিস্রোতার মোহনায় বজরা অপেক্ষা করছে। ব্রজেশ্বরের সাধ্য কি আমার মাকে ধরে রাখে।'

রঙ্গরাজ চলিয়া গেল। শুধু নিষ্ঠা এবং একাগ্র বিশ্বাসের বলে দেবীকে সে খুঁজিয়া পাইবে কি না কে বলিতে পারে!

কিশোর কণ্ঠের মিঠে গান শুনিয়া চমক ভাঙিল। দেখিলাম কয়েকটি বালিকা কাঁখে কলসী লইয়া মল বাজাইয়া চলিয়াছে—

চল্ চল্ সই জল আনি গে জল আনি গে চল্—

সকৌতুকে তাহাদের পিছু পিছু চলিলাম। কোন্ জলাশয়ে তাহারা জল আনিতে চলিয়াছে, জানিতে ইচ্ছা হইল।

আঁকিয়া বাঁকিয়া স্বচ্ছন্দ চরণে তাহারা চলিয়াছে; গানও চলিয়াছে—

বাজিয়ে যাব মল্!

অবশেষে তরুবেষ্টিত উচ্চ পাড়ের ক্রোড়ে একটি প্রকাণ্ড সরোবর চোখে পড়িল। নীল জল নিস্তরঙ্গ, দর্পণের মত আলোক প্রতিফলিত করিতেছে। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগিল, এ কোন্ জলাশয়? যে-দীঘির নিকট ইন্দিরার পাল্কীর উপর ডাকাত পড়িয়াছিল সেই দীঘি? রোহিণী যাহার জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল সেই বারুণী জলাশয়? কিংবা শৈবলিনী যাহার জলে দাঁড়াইয়া লরেন্স ফষ্টারকে মজাইয়াছিল সেই ভীমা পুষ্করিণী?

ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া বালিকাদের আর দেখিতে পাইলাম না। বিস্তৃত ঘাটের অগণিত সোপান ধাপে ধাপে নামিয়া জলের মধ্যে ডুবিয়াছে। ঘাটের শেষ সোপানে জলে পা ডুবাইয়া একটি রমণী বসিয়া আছে। পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, রুক্ষ কেশরাশি পৃষ্ঠ আবৃত করিয়া মাটিতে লুটাইতেছে। বর্ম্মাবৃত শিরস্ত্রাণধারী একটি পুরুষ তাহার পাশে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিতেছেন, 'মনোরমা, এই পথে কাহাকেও যাইতে দেখিয়াছ?'

'দেখিয়াছি।'

'কাহাকে দেখিয়াছ? তাহার কিরূপ পোষাক?'

'তুর্কীর পোষাক।'

সবিস্ময়ে হেমচন্দ্র বলিলেন, 'তুমি তুর্কী চেনো? কোথায় দেখিলে?'

মনোরমা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখে বিচিত্র হাসি···

পা টিপিয়া টিপিয়া আমি সরিয়া আসিলাম। তাহাদের কথাবার্ত্তা অধিক শুনিতে ভয় হইল।

সেখান হইতে সরিয়া গিয়া বনের যে-অংশে উপস্থিত হইলাম তাহা উদ্যানের মত সুন্দর। লতায় লতায় ফুল ধরিয়াছে, বৃহৎ বৃক্ষের শাখা হইতে ভাস্বর আলোকলতা ঝুলিতেছে। একটা কোকিল বুক-ফাটা স্বরে ডাকিতেছে—কুহু কুহু কুহু! এ কি সেই কোকিলটা, ঘাটে যাইতে যাইতে বিধবা রোহিণী যাহার ডাক শুনিয়া উন্মনা হইয়াছিল?

এক তরুতলে দুইটি রমণী রহিয়াছে। রূপের তুলনা নাই, তরুমূল যেন আলো হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্রকায়া তন্বী মুকুলিতযৌবনা—ফোটে ফোটে ফোটে না। অন্যটি, বিশালনয়না পরিস্ফুটাঙ্গী রাজেন্দ্রাণী, শান্ত অথচ তেজোময়ী। উভয়েরই বক্ষে জরির কাঁচুলি, মলমলের সূক্ষ্ম ওড়না চন্দ্রকিরণের মত অনিন্দ্যসুন্দর তনুলতা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

আয়েসা বলিলেন, 'ভগিনী, তুমি বিষ পান করিলে কেন? আমিও ত মরিতে পারিতাম, কিন্তু মরি নাই—গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গপরিখার জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম।'

দলনীর গোলাপ-কোরকের মত ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল, সে বলিল, 'আয়েসা, তুমি জানিতে তোমার হৃদয়রত্নকে পাইবে না, কোনও দিন পাইতে

পার না। তোমার কত দুঃখ? কিন্তু আমি যে পাইয়াছিলাম, পাইয়া হারাইয়াছিলাম—'মুক্তাবিন্দুর মত অশ্রু দলনীর গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

এখান হইতেও পা টিপিয়া সরিয়া গেলাম। অনতিদূরে আর একটি বৃক্ষতলে এক রমণী মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছে। রোদনের আবেগে তাহার দেহ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, পৃষ্ঠে বিলম্বিত কৃষ্ণ বেণী কাল ভুজঙ্গিনীর মত তাহাকে দংশন করিতেছে। রমণীর কণ্ঠ হইতে কেবল একটি নাম গুমরিয়া গুমরিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে—'হায় মবারক! মবারক! মবারক!'

—বসুধালিঙ্গন ধূসরস্তনী বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা—

এই বেদনাবিধুর উপবনে শব্দ করিতে ভয় হয়। বাতাস যেন এখানে ব্যথাবিদ্ধ হইয়া নিস্পন্দ হইয়া আছে। আমি এই অশ্রুভারাতুর উদ্যান ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম করিলাম।

পুষ্পোদ্যান প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, একটি লতানিকুঞ্জ হইতে হাসির শব্দে সেই দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। দুইটি স্ত্রীপুরুষ যেন রঙ্গ-তামাশা করিতেছে, হাসিতেছে, মৃদুকণ্ঠে কথা কহিতেছে। চাবির গোছা, চুড়ি-বালা ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছে।

বড় লোভ হইল। চুপি চুপি গিয়া লতার আড়াল হইতে উঁকি মারিলাম। লবঙ্গলতার আঁচল ধরিয়া রামসদয় টানাটানি করিতেছেন। লবঙ্গলতা বলিতেছে, 'আঁচল ছাড়, এখনি ছেলেরা দেখতে পাবে। বুড়ো মানুষের অত রস কেন?'

রামসদয় বলিলেন, 'আমি যদি বুড়ো, তুমিও তবে বুড়ী।'

লবঙ্গ বলিল, 'বুড়োর বউ যদি বুড়ী হয়, ছুঁড়ির বরও ছোঁড়া।'

রামসদয় আঁচল টানিয়া তাহাকে কাছে আনিলেন, বলিলেন, 'সে ভাল, তুমি বুড়ী হওয়ার চেয়ে আমিই ছোঁড়া হলাম। এখন ছোঁড়ার পাওনাগণ্ডা বুঝিয়ে দাও।' বলিয়া ললিত লবঙ্গলতার মুখের দিকে মুখ বাড়াইলেন।

আমার পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল—আ ছি ছি ছি—

লজ্জা পাইয়া সরিয়া আসিলাম। কে ছি ছি বলিল দেখিবার জন্য চারি দিকে চাহিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

দূর হইতে একটা শব্দ আসিল—মিউ!

বিড়াল! এ বনে বিড়ালও আছে? মিউ শব্দ অনুসরণ করিয়া খানিক দূর যাইবার পর দেখিলাম, ঘাসের উপর একটি বৃদ্ধগোছের লোক বসিয়া ঝিমাইতেছে; গলায় উপবীত, গাল দুটি শুষ্ক, চক্ষু প্রায় নিমীলিত। একটি শীর্ণকায় বিড়াল তাহার সম্মুখে বসিয়া মাঝে মাঝে মিউ মিউ করিতেছে।

বৃদ্ধ বলিল, 'মার্জ্জার পণ্ডিতে, তোমার কথাগুলি বড়ই সোশ্যালিষ্টিক। আমি তোমাকে বুঝাইতে পারিব না; তুমি বরং প্রসন্ন গোয়ালিনীর কাছে যাও। সে তোমাকে দুগ্ধ দিতে পারে, কিংবা ঝাঁটাও মারিতে পারে। তা—দুগ্ধ অথবা ঝাঁটা যাহাই খাও, তোমার দিব্য জ্ঞান জন্মিবে। আর যদি তুরীয় সমাধি লাভ করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইতে চাও, আমার কাছে ফিরিয়া আসিও—এক সরিষা-ভর আফিম দিব।—এখন তুমি যাও, আমি মনুষ্য-ফল সম্বন্ধে চিন্তা করিব।'

বিড়াল নড়িল না। তখন কমলাকান্ত বলিলেন, 'দেখ, বঙ্গদেশে সম্পাদক-জাতীয় যে জীব আছে, ফলের মধ্যে তাহারা লঙ্কার সহিত তুলনীয়। দেখিতে বেশ সুন্দর, রাঙা টুকটুক করিতেছে—মনে হয় কতই মিষ্ট রসে ভরা। কিন্তু বড় ঝাল। দেখিও, কদাপি তাহাদের চিবাইবার চেষ্টা করিও না; বিপদে পড়িবে। সম্পাদকের কোপে পড়িলে আর তোমার রক্ষা নাই, বড় বড় ঝাঁজালো লীডার লিখিয়া তোমার দফা রফা করিয়া দিবে।'

অনেকগুলি সম্পাদকের সহিত সদ্ভাব আছে, তাই আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না। কি জানি, তাঁহারা মনে করিতে পারেন, কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর মতামতের সহিত আমারও সহানুভূতি আছে!

এক জন শীর্ণাকৃতি লোক দীর্ঘ পা ফেলিয়া আসিতেছে—যেন কেহ তাহাকে তাড়া করিয়াছে। মাঝে মাঝে পিছন ফিরিয়া তাকাইতেছে। লোকটির বগলে পুঁথি, অদ্ভুত সাজ-পোষাকে—হিন্দু কি মুসলমান সহসা ঠাহর করা যায় না।

আমাকে দেখিয়া সে বলিল, 'খোদা খাঁ বাবুজীকে কুশলে রাখুন।—ঘৃতভাণ্ডকে এদিকে দেখিয়াছেন?'

অবাক হইয়া বলিলাম, 'ঘৃতভাণ্ড?'

সে বলিল, 'বিমলা আমার ঘৃতভাণ্ড। মোচলমান বাবারা যখন গড়ে এলেন, আমাকে বললেন, আয় বামুন তোর জাত মারি—'

'ও—আপনি বিদ্যাদিগ্‌গজ মহাশয়!'

'উপস্থিত শেখ দিগ্‌গজ।' পিছন দিকে তাকাইয়া শেখ সভয়ে বলিলেন, 'ঐ রে, বুড়ীটা আসিতেছে, এখনি রূপকথা শুনাইবে।' সুদীর্ঘ পদযুগলের সাহায্যে গজপতি নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

ক্ষণেক পরে বুড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে জপের মালা. বুড়ী আপন মনে বিড় বিড় করিয়া কথা বলিতেছে, 'সাগর আমার চরকা ভেঙে দিয়েছে—বামুনকে দুটো পৈতে তুলে দিতুম—তা যাক।'—আমাকে দেখিয়া বুড়ীর নিষ্প্রভ চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ উজ্জ্বল হইল—'ব্রজ দাঁড়িয়ে আছিস! প্রফুল্ল ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বুঝি? তোর যেমন বাগ্দিনী না হ'লে মন ওঠে না--বেশ হয়েছে। তা আয়, আমার কাছেই না-হয় শো—'

কি সর্ব্বনাশ! বুড়ী আমাকে ব্রজেশ্বর মনে করিয়াছে! পলাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ব্রহ্ম ঠাকুরাণীর হাত ছাড়ানো কঠিন কাজ।

'রূপকথা শুনবি? তবে বলি শোন; এক বনের মধ্যে শিমুলগাছে—'

শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে হইল। ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্প শুনিয়া কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। এত চমৎকার গল্প গত দশ বৎসরের মধ্যে কেহ লেখে নাই হলফ করিয়া বলিতে পারি।

ব্রহ্ম ঠাকুরাণীর নিকট বিদায় লইয়া আবার চলিয়াছি। বন যেন আরও নিবিড় হইয়া আসিতেছে। এ বনের শেষ কোথায় জানি না; শেষ আছে কি? হয়তো নাই, জগৎব্রহ্মাণ্ডের মত ইহাও অনন্ত অনাদি, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ।

গাছপালায় ঢাকা একটি ক্ষুদ্র কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। মাটির কুঁড়েঘর, কিন্তু তক্‌তক্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। একটি সতের-আঠার বছরের মেয়ে হাসি-মুখে আমার সম্বর্দ্ধনা করিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'নিমাইমণি, জীবানন্দ কোথায়?'

নিমাইমণির হাসি মুখ ম্লান হইয়া গেল, চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল। সে বলিল, 'দাদা নেই; শান্তিও চলে গেছে। সেই যে সিপাহীদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল, তার পর থেকে আর তারা আসে নি। ঐ দ্যাখ না, শান্তির ঘর খালি পড়ে রয়েছে।'

শান্তির ঘর দেখিলাম। পাখী উড়িয়া গিয়াছে, শূন্য পিঞ্জরটা পড়িয়া আছে। বুকের অন্তস্তল হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

নিমাইমণি চোখে আঁচল দিয়া বলিল, 'সেই থেকে রোজ তাদের পথ চেয়ে থাকি। হাঁ গা, আর কি তারা আসবে না?'

আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম। আর আসিবে কি? জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা বঙ্গজননী আর গর্ভে ধরিবে কি?

'জানি না' বলিয়া বিষণ্ণ চিত্তে ফিরিয়া চলিলাম।

পিছন হইতে নিমাইমণির করুণ স্বর আসিল, কিছু খেয়ে গেলে না? গেরস্তর বাড়ী থেকে না খেয়ে যেতে নেই—'

* * *

জীবানন্দ গিয়াছে, শান্তি গিয়াছে; দেবীকে রঙ্গরাজ খুঁজিয়া পাইতেছে না। তবে কি তাহারা কেহই নাই, কেহই ফিরিয়া আসিবে না? সীতারাম রাজসিংহ মৃণ্ময় চন্দ্রচূড় ঠাকুর—ইহারা চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে!

বনের অনৈসর্গিক আলোক ক্রমে নিবিয়া আসিতে লাগিল। প্রথমে ছায়া, তার পর অন্ধকার, তার পর গাঢ়তর অন্ধকার। সূচীভেদ্য তমিস্রায় কিছু দেখিতে পাইতেছি না। মহাপ্রলয়ের কৃষ্ণ জলরাশির মধ্যে আমি ডুবিয়া যাইতেছি। চেতনা লুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

সহসা এই প্রলয় জলধি মথিত করিয়া জীমূতমন্দ্র কণ্ঠে কে গাহিয়া উঠিল—বন্দে মাতরম্!

আছে আছে—কেহ মরে নাই। ঐ বীজমন্ত্রের মধ্যে সকলে লুক্কায়িত আছে। দেবী আছে, জীবানন্দ আছে, সীতারাম আছে—

আবার তাহারা আসিবে—ঐ বীজমন্ত্রের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিতে যেটুকু বিলম্ব। আবার আসিবে।

ক্ষীণ দুর্ব্বল কণ্ঠে সেই অমা-তমস্বিনী রাত্রির মধ্যে আমিও চীৎকার করিয়া উঠিলাম—বন্দে মাতরম্!

"রবিরশ্মি"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু

নিজের অন্তরের জিনিষকে বাহিরের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে দেখতে অদ্ভুত লাগে। তখন সেটাকে পরিচিতের দৃষ্টি থেকে দেখি নে, দেখি কৌতূহলের দৃষ্টিতে। অনেক দিন বেঁচে আছি তাই আমার রচনার আরম্ভ অংশ প্রাগিতিহাসের কোঠায় পড়ে গেছে, বর্ত্তমান ইতিহাসের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। স্বয়ং বিধাতা তাঁর সেকালের সৃষ্টিতে লজ্জিত, নইলে আজ মানুষ জন্মাত না, সঙ্কোচে তিনি আদি জীবসৃষ্টির চিহ্ন চাপা দিয়েছেন মাটির নিচে। বৈজ্ঞানিক গুপ্তচর তাঁর সৃষ্টির আব্রু নষ্ট করতে উদ্যত। আমার কাব্যেরও সেই দশা। দ্রৌপদীর লজ্জা শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করেছিলেন, আমার কবিতার লজ্জা তোমরা রাখলে না। 'বনফুল' বইখানার জন্য ততটা ক্ষোভ নেই, কেন না সেটা সত্যই কাঁচা। কিন্তু 'কবিকাহিনী'তে 'ভগ্নহৃদয়ে' অল্পস্বল্প পাক ধরেছে, এই জন্যেই ওদের কৃত্রিম প্রগল্‌ভতাকেই বলা যায় জ্যাঠামি। সদরে তার প্রদর্শনীটা ভালো নয়। তখনকার কালে এই কাঁচা-পাকার অবস্থা ছিল, বাংলা দেশের সর্বত্রই—এই জন্যেই 'কবিকাহিনী' পড়ে কালীপ্রসন্ন ঘোষ উদীয়মান কবির জয়ধ্বনি করেছিলেন, 'ভগ্নহৃদয়' পড়ে ত্রিপুরার বীরচন্দ্র মাণিক্য বালক কবিকে সম্মান জানাবার জন্যে তাঁর বৃদ্ধ মন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাংলা দেশের সেই বাল্যলীলার পর্ব ঘুচেছে, কিন্তু অনেক খানি আছে স্ত্রৈণতা; মা বলতে সে অজ্ঞান, আর প্রিয়ার তো কথাই নেই। আদুরে সাহিত্য, তাতে মেয়ের প্রশ্রয়ই বেশি, বেশ একটু আর্দ্রভাবের সেন্টিমেন্টালিটি। বাল্যযুগের পরবর্ত্তী আমার সাহিত্যে (বিশেষত 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' আদিতে) সেই স্যাঁৎসেঁতে ভাব রোগের মতো লেগে আছে। আছে তাতে সাধারণের দরদ পাবার ছেলেমানুষি আগ্রহ। সেটা ক্রনিক হয় নি এই আমার রক্ষা, নইলে কোন্‌কালে সেই রুগ্নকাব্যের নাড়ী ছেড়ে যেত। তুমি তার সেই সেকালের সর্দ্দি-ধরা গদগদ বাণীকে যখন কিছু মাত্র খাতির করেছ, তখন আমি কুণ্ঠিত হয়েছি। অনেক চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু তোমাদের ঠেকানো যায় না। যে অবলা প্রাণী ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে বাঁচতে চায়, শিকারীর আনন্দ তাকেই লক্ষ্য করতে। লাগিয়েছ ফাঁস, এনেছ টেনে। যা হোক্ ভাগ্যক্রমে সেই আদ্যযুগই আমার অন্তিম যুগ হয় নি। তাও জোর করে বলা যায় না। আধুনিক যুগীয় জীবের অমানুষিক মোটা মোটা দাঁত উঠেচে, দেখে ভয় লাগে। তাদের পাতে লেহ্য চোষ্য তো চল্‌বেই না, ভদ্ররকম চর্ব্যও নয়—রূঢ়ভাবে তাদের শ্বানীন (?) দন্ত (canine teeth) দিয়ে প্রচণ্ড ভঙ্গীতে ছিঁড়ে খাবার জিনিষ তারা পছন্দ করবে বলে মনে হয়। আমরা যে সুপক্ক জিনিষের ভোজকে সভ্য মানবোচিত মনে করে এসেছি তার প্রতি অবজ্ঞা করে ওরা হাসবে, বলবে অতিসভ্যতা মানুষের দাঁত খারাপ করে দিয়েছে, স্বাদকেও করেছে সৌখীন, বেশি আদর দিয়েছে রসনাকে। ভয় হচ্চে কথাটার মধ্যে হয়ত কিছু সত্য আছে। জীবকে প্রকৃতি প্রশ্রয় দেবার পক্ষপাতী নয়, তৎসত্ত্বেও সন্তানবৎসলা মায়ের মতো মানুষকে প্রকৃতি দুর্বলতাবশত আদুরে করেছে, বেশি হয়তো শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকবার পক্ষে তার ফল ভালো নয়। সদ্যস্ক ভাবী কালের দিক থেকে এই রকম নির্মম কথাই কানে ভেসে আসচে। অবশ্য দূরতম ভাবী কালের কী রায় তা নিশ্চিত জানি নে। মামলায় হাইকোর্টে জিত নিয়ে কিছু কাল হাঁকডাক ক'রে শেষকালে প্রিভিকৌন্সিলের বিচারে জিতের ধন ফেরৎ দিতে হয় এমনো দেখা

গেছে। যেমন ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ তেমনি রুচির আইনেরও। অতএব খ্যাতিটাকে নিয়ে উৎফুল্ল কিম্বা অবসাদগ্রস্ত হবার জরুরি দরকার নেই, ওটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাই ভালো। আমি সে চেষ্টা করে থাকি কিন্তু সিদ্ধপুরুষ হয়েছি জেনে শিবনেত্র হয়ে বসবার সময় এখনো আসে নি। যদি আসে তা হলে পৃথিবীতে খাঁটি ও মেকি মজুরির শেষ ময়লা ঝুলিখানা ফেলে দিয়ে হালকা হয়ে পারের খেয়ায় চড়তে পারব। ভাগ্যের কাছে এই শেষ দরবার। সে সব চরম কথা থাক। তুমি আমার প্রত্যেক কবিতাটি নিয়ে ব্যাখ্যা করে চলেছ, তাতে আমি গৌরব বোধ করি। কিন্তু একটা কথা এই মনে হয়, কাব্যরস-আস্বাদনে পাঠকদের অত্যন্ত বেশি যত্নে পথ দেখিয়ে চলা স্বাস্থ্যকর নয়। নিজে নিজে সন্ধান করা ও আবিষ্কার করায় সত্যকার আনন্দ। তা ছাড়া কাব্যের কেবল একটা মাত্র বাঁধা মানে না থাকতে পারে—তার আসনে এতটা স্থিতিস্থাপকতা থাকে যাতে ভিন্ন আয়তনের মানুষকে সে তার আপন আপন বিশেষ স্থান দিতে পারে। অনেক বিশেষ কাব্যকে বিশেষ প্রকৃতির লোক স্বভাবতই বুঝতে পারে না, সভা থেকে তাদের চলে যাবার দরজা খোলা রেখে তাদের সহজে বিদায় নিতে দেওয়া ভালো। চাদর ধরে টেনে এনে তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার চেষ্টায় সত্য ফল হয় না। ধরে নেওয়া চাই রসের সামগ্রী অনেকের কাছে অনাস্বাদিত থাকবেই—জ্ঞানের সামগ্রীও তাই। এই নিয়ে মনের ক্ষোভ মেটাবার জন্যেই কবি বলেছেন, ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। যে ভিন্নতা স্বাভাবিক তাকে প্রসন্ন মনে সেলাম করে দূরে চলে যাওয়াই ভালো। নিজের রুচি ও শিক্ষা অনুসারে কেউ যে কাব্য বিচার করবে না তা নয়। কিন্তু তাতে অনেকখানি ফাঁক থাকা চাই, নিরেট ঠাসা গাইডবুক সাবালক ভ্রমণকারীর স্বাধীন চেষ্টাকে প্রতিহত করে। উত্তরে বলতে পারো সংসারে নাবালকের সংখ্যা বিস্তর—আমি বলি ওপথে তাদের না চলতে দেওয়াই ভালো।

আমার কথা যদি বলো আমি বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে তোমার বই পড়েছি। অনেক দিন ধরে অনেক লেখা লিখেছি—সকলের প্রতি আমার সমান টান নেই—অনেকের প্রতি আমি নিষ্ঠুর, অনেকের কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। তোমার অনুসরণ করে তাদের সঙ্গে পদে পদে মোলাকাৎ হোলো। কাউকে চিনলুম, কাউকে চিনলুম না, কাউকে নতুন দেখায় দেখলুম। মজা লাগল এই মনে করে যে এদের সবাইকে দূরের থেকে দেখা, যেমন করে দেখা যায় অতীত কালের কবির কবিতাকে। কিন্তু অতীত কালের কবিতার একটি মস্ত সুবিধা আছে, বর্ত্তমান কালের আবরণ থেকে তা মুক্ত। সাহিত্য যা চিরকালের আদর্শেই বিচারযোগ্য, কাছের দৃষ্টিতে সে আত্মরূপকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করে না। হাল আমলের সংস্কারগুলো কাছের বলেই প্রবল, সেই প্রবলতাকেই সত্যের নিদর্শন বলে হালের লোকে বিশ্বাস করে, সে বিশ্বাস নির্ভরযোগ্য নয়, বারে বারে তার প্রমাণ হয়ে গেছে। সেই জন্যেই বলি তোমাকে আর একবার জন্মাতে হবে। সে জন্যে তাড়াতাড়ি করবার কোন দরকার নেই, না করলেই সব দিকে ভালো। পাঠকদের কাছে তোমার বই ঔৎসুক্যজনক হবে বলে মনে করি—নিজের মতের সঙ্গে তোমার মত মিলিয়ে কখনো তারা এদিকে মাথা নাড়বে, কখনো ওদিকে, যাদের কোন মত নেই তারাও যেন বইখানা কেনে, যথাসম্ভব কাজে লাগবে—কিন্তু তাদের কথা চিন্তা করবার দরকার নেই। ইতি ৩০ বৈশাখ ১৩৪৫।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুলগারিয়ার গোলাপের আতর

ডক্টর শ্রীপ্রমথনাথ রায়

গ্রীস দেশের কবি আনাক্রেয়ন বলেন, সমুদ্রগর্ভ হইতে সৌন্দর্য্যের দেবী আফ্রোদিতের উত্থানের সময়েই গোলাপ ফুলের জন্ম হয়। গোলাপের জন্ম সম্বন্ধে আর একটি উপকথা প্রচলিত আছে। দেবী ডায়নার মন্দিরের দেবদাসী রোজালিয়ার রক্ত হইতেই নাকি গোলাপ ফুলের উদ্ভব। এই দেবদাসী সিমেডোরাস নামক এক যুবকের প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাহার নিকট আত্মদান করিয়াছিল বলিয়া, দেবী ডায়নার কোপে তাহাকে প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়; তারই নাম গ্রহণ করিয়া এই ফুল ('রোজ' বা 'রোজা') সেই দেবদাসীকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

ফুলের সুমিষ্ট গন্ধকে নির্য্যাসে ঘনীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

নিষ্যন্দন দ্বারা গোলাপ-নির্য্যাস তৈয়ারের প্রণালী ইউরোপে প্রথম আবিষ্কৃত হয় বলিয়া ধারণা আছে। কিন্তু পারস্যের লোকেরা বলে ভারতের মুঘল-সম্রাট জাহাঙ্গীরের পত্নী নূরজাহানই নাকি সর্ব্বপ্রথম আতর তৈয়ার করিয়াছিলেন। পারস্যের অধিবাসীরা স্বতন্ত্র ভাবে চেষ্টা করিয়া এই আতর প্রস্তুতের প্রণালী বাহির করিয়াছিল অথবা ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে শিখিয়াছিল, তাহা সঠিক বলা কঠিন।
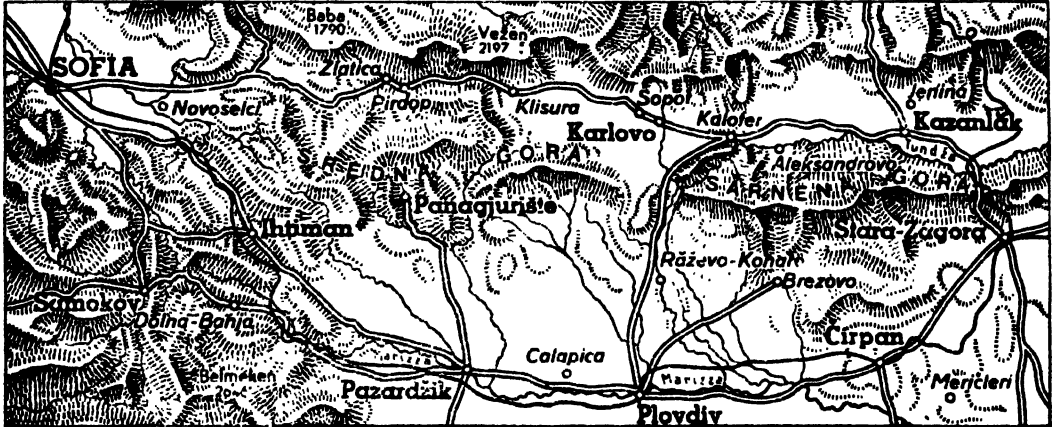
বুলগারিয়ার "গোলাপ-উপত্যকা"

বর্ণের মহিমায় ও গন্ধের গরিমায় এই ফুল অতি প্রাচীন কাল হইতেই লোকের প্রীতি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। লোকে যে ইহা শুধু আভরণ রূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে তাহা নয়, কি করিয়া ইহার সুগন্ধ ধরিয়া রাখা যায় সে বাসনাও মানুষের মনে প্রাচীন কালেই উদিত হইয়াছে। তাহারই ফলে মানুষ এই

বর্ত্তমানে বুলগারিয়াই এই আতর-শিল্পের কেন্দ্রস্থান। বুলগারিয়ার মধ্যভাগে, বলকান গিরিমালা ও ইহার সমান্তরালবর্ত্তী স্রেডনা গোরা (Sredna Gora) পর্ব্বত-শ্রেণীর ক্রোড়শায়িত উপত্যকা আছে। এই উপত্যকার ভূমি যেমন উর্ব্বর, জলবায়ুও তেমনি গোলাপের চাষের পক্ষে অতিশয় অনুকূল। বুলগারিয়ার দুই প্রকার

বুলগারিয়ার গোলাপ

পুষ্প-সংগ্রহকারিণীরা গোলাপ আহরণ করিয়া ফিরিতেছে

পুষ্পিত গোলাপ-উপত্যকা

বৌদ্ধমঠ

একটি 'টিপেরা' পরিবার

কর্ম্মরতা চাকমা

খাচি বোনায় রত মগ

['চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যজাতি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

গোলাপের চাষ হয়—রোজা দামাস্কায়েনা (Rosa damascaena) বা লাল গোলাপ ও রোজা আলবা (Rosa alba) বা সাদা গোলাপ। ইহাদের মধ্যে আবার সাত হাজার প্রকারের শ্রেণীভেদ আছে। আতরের জন্য এই দুই প্রকার গোলাপই ব্যবহৃত হয়।

লাল গোলাপের গাছ এক গজ দেড় গজ উঁচু হয়। ইহার ডালপালা এত বেশী যে মনে হয় যেন একটি ঝোপ। ডালগুলি কণ্টকাকীর্ণ। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহাতে ফুল ফোটে। প্রত্যেক ডালে দুইটি হইতে সাতটি পর্য্যন্ত ফুল হয়। পাপড়িগুলি গোল, লাল ও সুরভি। সাদা গোলাপের গাছ লাল গোলাপের গাছের চেয়ে বেশী উঁচু হয়। ইহার পাতা ছোট ছোট, শাখাও মসৃণ। প্রত্যেক শাখায় পাঁচটি হইতে সাতটি করিয়া ফুল ফোটে। এই দুই প্রকার গোলাপই স্নেহময় পদার্থে সমৃদ্ধ। ইহারাই বুলগারিয়ার জগদ্বিখ্যাত আতরের উপাদান।

পুষ্প-সংগ্রহকারিণী

চাষের প্রণালী এইরূপ: একটি পুরাতন গাছের ডাল কাটিয়া অন্যত্র লাগান হয়, পুরাতন গাছটিকে সাধারণতঃ উঠাইয়া ফেলা হয়। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে অথবা ফাল্গুন-চৈত্র মাসে রোপণের কাজ চলে। রোপণের পূর্ব্বে জমি কর্ষণ করিয়া প্রায় আধ গজ গভীর শিরালা কাটা হয়। সাদা গোলাপের বেলা প্রত্যেকটি শিরালার মধ্যে প্রায় আড়াই গজের ব্যবধান থাকে; লাল গোলাপ রোপণ করিতে হইলে ব্যবধান থাকে দেড় গজ হইতে দুই গজের মধ্যে। প্রত্যেকটি রোপিত ডালের চারি দিকে মাটি উঁচু করিয়া টিলার মত করিয়া তাহা সার দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। বসন্তকালে রোপিত ভূমি খোলা রাখা

কেট্‌লি পূর্ণ করা হইতেছে

হয় ও ডালগুলি যাহাতে সহজে বাড়িতে পারে সেজন্য চারি দিকের মাটি সরাইয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক বার বৃষ্টির পরে জমিতে নূতন করিয়া আট বার পর্য্যন্ত সার দিতে হয়। শীতের কঠোরতায় যাহাতে কোনরূপ ক্ষতি না হইতে পারে, সেজন্য পরবর্ত্তী শরৎকালে চারাগুলিকে আবার ঢাকিয়া দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় বৎসরেও তাই। ফুল-ফোটা সুরু হইলে সার দেওয়া হয় দুই কি তিন বার। প্রত্যেক বার বসন্ত-কালে শুকনো ডালগুলি কাটিয়া ফেলা হয়। এইরূপ যত্ন ও পরিচর্য্যার ফলে একটি গোলাপের বাগান বিশ-পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত ফুল দিতে থাকে।

ফুল ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই চয়ন আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি হইতে আষাঢ়ের মাঝামাঝি, এই এক মাস কাল ফুল ফুটিবার সময়। চয়নকারিণীরা ভোরে প্রায় চারটার সময় বাহির হয় ও সকাল আটটা পর্য্যন্ত কাজ করে। পাপড়ির ও অন্তঃস্তবকের উপর হইতে শিশির-বিন্দু শুকাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই ফুলগুলি চয়ন করিতে হয়, কারণ যতক্ষণ ভিজা থাকে ততক্ষণ ফুলের গন্ধ বাতাসে ছড়াইতে পারে না। মেয়েরা প্রথমে বেতের সাজিতে করিয়া ফুল তুলে, তার পর পাপড়িগুলি বড় বড় থলেতে করিয়া নিষ্যন্দনের জন্য ভাটিতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এক হাজার বর্গগজ ভূমি হইতে প্রায় সাত আট মণ পাপড়ি পাওয়া যায়।

ভাটিগুলি খোলা জায়গায় অবস্থিত। সাধারণতঃ ইহাদের তিনটি দেয়াল থাকে। একটি মাঝখানে, তিন-চার গজ উঁচু। দুইটি পাশে, আকারে কিছু ছোট। সম্মুখের অংশ উন্মুক্ত থাকে ও ইহার দৈর্ঘ্য নির্ভর করে কড়াই বা কেট্‌লির সংখ্যার উপর। কেট্‌লিগুলি প্রায় দুই হাত উঁচু। ইহাদের ব্যাস তলদেশে প্রায় দেড় হাত ও গলদেশে আধ ফুটের কিছু বেশী। এই আকারের একটি কেট্‌লিতে দু-আড়াই মণ জল ধরে। কেট্‌লির উপরে ব্যাঙের ছাতার আকারে একটি ঢাকনা থাকে। এই ঢাকনার সঙ্গে একটি তাপ-প্রশামক টিউব বা পাইপ সংলগ্ন থাকে। এই পাইপটি প্রায় ৪৫° হেলান থাকে ও ঠাণ্ডা জলপূর্ণ একটি পাত্রের ভিতর দিয়া ইহাকে লইয়া যাওয়া

একটি প্রাচীন ভাটিখানা

হয়। পাইপের প্রান্তে বোতলের আকারের একটি কাচের পাত্র লাগান থাকে। এই পাত্রের ব্যাস উপরের অংশে আধ ফুটের কিছু বেশী। ইহাতে প্রায় পাঁচ সেরের মত দ্রব পদার্থ ধরে।

কেট্‌লিতে প্রায় সত্তর সের জল ও চৌদ্দ সের

একটি আধুনিক ভাটিখানা

কেট্‌লিতে ঢালিয়া দ্বিতীয় বার চোয়ানের বন্দোবস্ত করা হয়। দ্বিতীয় বারে মাত্র পাঁচ সেরের মত ক্ষরিত পদার্থ পাওয়া যায়। এই ক্ষরিত পদার্থ এক প্রকার তৈলাক্ত জল। ইহার উপরিভাগে যে স্তর পড়ে, তাহাই বুলগারিয়ার বিখ্যাত আতর।

গোলাপ-চয়নের অব্যবহিত পরেই ক্ষরণকার্য্য আরম্ভ করা হয়। চব্বিশ ঘণ্টার বেশী দেরি কোন ক্রমেই হয় না। ইহার বেশী দেরি হইলে ফুলগুলি গাঁজিয়া উঠে ও টক হইয়া যায়। এইরূপ ফুল হইতে যে আতর পাওয়া যায় তাহা নিকৃষ্ট।

এই আতর ছাড়া গোলাপ হইতে আরও এক প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে মোমের মত। ইহাতেও গোলাপের গন্ধ থাকে। গোলাপের মধ্যে যতগুলি স্নেহময় পদার্থ থাকে সবগুলিকে বেন্‌জিনের সাহায্যে বিশেষ যন্ত্রে ক্ষরিত করিয়া ইহা পাওয়া যায়।

পাপড়ি ঢালিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যাহাতে বিন্দুমাত্র বাষ্প বাহির হইয়া যাইতে না পারে, সেজন্য কেট্‌লির মুখের ফাঁক চারি দিক হইতে মাটি দিয়া আটকাইয়া দেওয়া হয়। প্রথমে উত্তাপ খুব বেশী দেওয়া হয়, কিন্তু ক্ষরণ আরম্ভ হইলেই আগুন কমাইয়া দেওয়া হয়। ক্ষরণের কাজ প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল চলে। তাপ-প্রশামক টিউবের ভিতর দিয়া যে-জল বাহির হইয়া আসে তাহা দুইটি পাত্রে বা বোতলে গ্রহণ করা হয়। প্রথম বোতলের ক্ষরিত জলকে বলে বাস্ক (basc); শব্দটির অর্থ মাথা। দ্বিতীয় বোতলের ক্ষরণকে বলা হয় আইয়াক (aiac), বা পা। এই দুই বোতল (কোন কোন সময় তিন বোতল) ভরিয়া গেলেই ক্ষরণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কেট্‌লিতে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা তখন রেশমের কাপড়ে ছাঁকিয়া ফেলিয়া দিয়া, তপ্ত তরল অংশটুকু আবার কেট্‌লিতে ঢালা হয়। তার পর তাহাতে নূতন করিয়া ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া (যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সত্তর সের হয়) ও পূর্ব্ব পরিমাণ পাপড়ি ঢালিয়া আবার ক্ষরণ করা হয়।

এই ভাবে যখন আটটি বোতল, চারিটি বাস্ক ও চারিটি আইয়াক পূর্ণ হয়, তখন সমস্ত ক্ষরিত অংশ আবার

গোলাপের ভাটিখানায়

'গোলাপ-উপত্যকা'র শেষপ্রান্তে অবস্থিত কারনোভা শহর

মেয়েরা যখন বিচিত্র পোষাক পরিয়া, মাথায় রুমাল বাঁধিয়া, হাতে সাজি ঝুলাইয়া, ভোর-বেলা হইতে দলে দলে গান গাহিয়া গোলাপ-বাগানের দিকে চলে, তখন মনে হয় যেন সমস্ত উপত্যকাটি একটি বিচিত্র মায়া-কানন। ফুলগন্ধমন্থর বাতাসের সঙ্গে তখন আকাশের দিকে যে গান উঠিতে থাকে, তাহা শুনিতে যেমন মিষ্ট, তার ভাবও তেমনি কবিত্বপূর্ণ। বুলগার জাতির জীবনে যে বেদনা লুকান আছে এ গানের ভিতর দিয়া তাহা

নানা প্রকারের শিল্পে কাজে লাগে বলিয়া ইহাও প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হয়।

ভাল গোলাপের ফসল পাইতে হইলে চয়নকালীন জলবায়ুর অবস্থা খুব ভাল হওয়া দরকার। ফুলের সংখ্যাধিক্য অপেক্ষা জলবায়ুর আনুকূল্যের উপরই ফলাফল অধিক নির্ভর করে। চয়নের সময় আর্দ্র বায়ু ও ঘন ঘন বৃষ্টির প্রয়োজন। তাহাতে ফুলের বিকাশ ধীরে ধীরে হয় এবং ফুলগুলিও দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে। ফুলের গন্ধ ও স্নেহময় পদার্থ অটুট রাখিবার পক্ষে তাহা একান্ত আবশ্যক। বায়ু আর্দ্র না হইয়া উষ্ণ হইলে, রৌদ্রে ও গরম বাতাসে ফুলগুলি তাড়াতাড়ি ফোটে বটে, কিন্তু তাহাদের সুগন্ধও তাড়াতাড়ি নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই প্রতি ঋতুতে আতর-উৎপাদনের পরিমাণ এক থাকে না। দেখা গিয়াছে, এক সের আতর পাইতে হইলে গড়ে প্রায় ১০০০-১১০০ সের পাপড়ির প্রয়োজন হয়।

প্রথম যখন গোলাপ ফুটিতে আরম্ভ করে, বাতাসে সৌরভ চারি দিকে ভাসিয়া বেড়ায়, সমস্ত উপত্যকাটিতে তখন যেন নূতন প্রাণের সঞ্চার দেখা যায়।
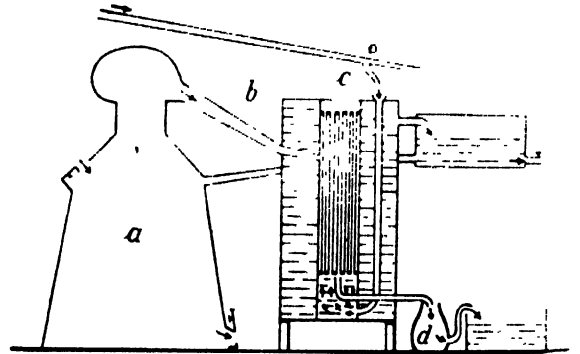
গোলাপজল চোয়ানোর কেট্‌লির নক্সা

আত্মপ্রকাশ করে—তার দীর্ঘকালস্থায়ী দাসত্বে দুঃখ, তার মুক্তির কামনা, তার ভবিষ্যতের আশা সুখস্বপ্ন। কখনও বিষণ্ণ কখনও প্রসন্ন এই গানের ভিত দিয়া বুলগারিয়ার নারী ও পুরুষ তাহাদের প্রতিদিনে শ্রান্তি ভুলিয়া জন্মভূমির সুখোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্ব বিভোর হইতে চেষ্টা করে।

বহির্জগৎ

শ্রীগোপালচন্দ্র হালদার

১

চেকোস্লোভাকিয়াকে লইয়া তখনও সমে টানাটানি করিতেছে, নাৎসিবাহিনী প্রায় তাহার সীমান্তে,—ইতালী, তাহার বন্ধু ফ্রান্সকে স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে ফ্রাঙ্কোর জয়ের পথে বাধা ঘটাইতেছে বলিয়া শাসাইতেছে, এমনি সময়ে ৩০শে মে মুসোলিনি জাতীয়তাবাদী স্পেনের সঙ্গে ইতালীর আত্মীয়তাজ্ঞাপনের উপলক্ষ্যে বক্তৃতায় কহিলেন, 'আমরা আমাদের যুবকবৃন্দকে গড়িতেছি কর্ম্মী ও যোদ্ধারূপে আজিকার ইতালীয় সাম্রাজ্যের জন্য ও আগামী কালের বৃহত্তর ইতালীর জন্য।' তাহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্পেনীয় ফাসিজমের প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল আসত্রে জানাইলেন, বার বৎসর পূর্ব্বে সিনর মুসোলিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, স্পেনের সঙ্কটকালে ইতালী তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে। আজ জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নামে তিনিও বলিতে পারেন, যদি এমন দিন আসে ইতালীর পক্ষে স্পেনের সাহায্য দরকার, স্পেনও সেদিন তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আবার স্পেনীয় নিরপেক্ষতা-কমীটির বৈঠক বসিয়াছে, স্পেন হইতে বিদেশীয়দের অপসারণের উপায় দেখিতে হইবে, স্পেনের গৃহযুদ্ধে অন্যে কেন হস্তার্পণ করিবে?—এক দিকে এই। অন্য দিকে তখন ক্যাণ্টনের উপর জাপানী বিমানপোত উপর্য্যুপরি বোমা নিক্ষেপ করিতেছে, সহস্র সহস্র নরনারী প্রাণ হারাইল, আহত হইল, এলিকাণ্টা, ভালেন্সিয়া, বার্সিলোনায় বহুবারের মত আবার বিদ্রোহী স্পেনের উড়ো-জাহাজ হানা দিল, (জাহাজগুলি ইতালীতে বা জার্ম্মেনীতে তৈয়ারী, তাহার চালকেরাও অবশ্য সেই দুই 'নিরপেক্ষ দেশে'র স্বেচ্ছাসেবক, স্পেনের বুকে হাত পাকাইতেছে মাত্র।) কয়েক শত মানুষ উড়িয়া গেল, পথে ঘাটে পড়িয়া রহিল।—দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় ইংরেজ সাহিত্যিক 'ওয়াই-ওয়াই' (রবার্ট লিণ্ড) প্রস্তাবটা মন্দ করেন নাই—মানুষের অভিধান হইতে 'Pity' বা করুণা শব্দটি ছাঁটিয়া ফেলা দরকার। কিন্তু শুধু ঐ একটা শব্দ বাদ দিলেই অভিধান কতদূর বিশুদ্ধ হইবে? এবার যে ইংরেজী অভিধানে "নন্-ইণ্টারভেন্‌শন্" কথাটারও মানে বদলাইয়া লেখা দরকার।—চিন্তাশীল মনীষীরা দুঃখ করেন, মানুষ বিজ্ঞানের বলে জীবনযাত্রায় উন্নতি করিয়াছে বটে, কিন্তু মানসলোকে যাহা ছিল তাহাই রহিয়া গিয়াছে। সত্যই কি তাই? সেখানে যদি পূর্ব্বাবস্থাই অক্ষুণ্ণ থাকিত, তাহা হইলে 'Pity' কথাটি বাদ দিবার দিন আসিত না, নন্-ইণ্টারভেনশন্ শব্দের নূতন মানে খুঁজিতে হইত না। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে করুণা, বিবেক, প্রভৃতি অনেকগুলি দুর্ব্বলতার হাত এড়াইবার মত নূতন যুক্তি অন্তত আজ মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে,—তাহা মানিতেই হইবে।

২

মুসোলিনির ইতালীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে পৃথিবী পরিচিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাহার 'বৃহত্তর ইতালী'র কথাটির অর্থ কি? জিব্রাল্‌টারের সমীপবর্ত্তী কিউটা ও আল্‌জিকিরস্ ঘাঁটি দুইটি আছে, লিবিয়া তাঁহার করতলগত, ইরিত্রিয়ার সহিত আবিসিনিয়াও যুক্ত হইয়াছে—ভূমধ্যসাগরের তীর ছাড়াইয়া ভারত-মহাসাগরের তীরে ইতালীয় সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে।—এ-বিস্তারে ব্রিটেন্ তাহার আর বিরোধিতাও করে না। স্পেন-যুদ্ধের 'মীমাংসা'র পরে 'আবিসিনিয়া-জয়' ব্রিটেন জাতিসঙ্ঘের মারফৎ স্বীকার করিবে, এই ছিল ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তির সর্ত্ত। স্পেনের মীমাংসা এখনও ঘটে নাই, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই জাতিসঙ্ঘের কাউন্সিলে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

'অতীতের অনুশোচনা' ছাড়িয়া 'বাস্তব'কে মানিয়া লইবার দাবি লইয়া উপস্থিত ছিলেন। খ্রীষ্টানুরক্ত আমাদের এই অধ্যাত্মবাদী ভূতপূর্ব্ব বড়লাটের বাস্তব-নিষ্ঠার অর্থ—ইতালীর আবিসিনিয়া-জয় মানিয়া লওয়া, জাতিসঙ্ঘের পূর্ব্বেকার সিদ্ধান্ত বাতিল করা। পীড়িত হাবসী-সম্রাট্ এই 'বাস্তববাদে'র বিরুদ্ধে বৃথা আপনার দাবি জানাইলেন, আপনার স্বদেশবাসীর দুঃখ-দুর্গতির বর্ণনা করিলেন, অন্ততঃ 'সঙ্ঘে'র আসল সভা, অ্যাসেম্‌ব্লির অধিবেশন পর্য্যন্ত এই নূতন সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা জানাইলেন। বৃথাই তিনি বলিলেন, বাস্তব ঘটনা এই যে, ইতালীর বিরুদ্ধে এখনও হাব্‌সীরা লড়িতেছে। বাস্তবের বিরুদ্ধে বাস্তবের দোহাই;—কিন্তু শক্তিহীনের বাস্তব শক্তিহীন। হ্যালিফ্যাক্সের পরামর্শমত জাতিসঙ্ঘের কাউনসিল আবিসিনিয়ায় ইতালীর অধিকার মানিয়া লইল। কিন্তু স্পেনের সুমীমাংসা তখনও হয় নাই।—কি সেই সুমীমাংসা, ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টে পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের উত্তরেও প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন তাহা বলিতে অস্বীকৃত হইলেন; কিন্তু মুসোলিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন,—সুমীমাংসার অর্থ ফ্রাঙ্কোর জয়। মুসোলিনি ভাবিয়াছিলেন, সে জয় প্রায় সম্পূর্ণ হইতেছে—কিন্তু আবার কে বাদ সাধিল; ফ্রাঙ্কো তেমন অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, স্পেন-সরকার কোথা হইতে নূতন গোলাবারুদ পাইল, যুদ্ধসরঞ্জাম পাইল, ফ্রাঙ্কোর অবাধ গতি অমনি ঠেকিয়া গেল। মুসোলিনি বলিলেন, এইরূপ 'নিরপেক্ষতা' ভঙ্গের জন্য দায়ী ফ্রান্স, পিরীনিজ পর্ব্বতের দ্বার খুলিয়া সে-ই স্পেন-সরকারকে এসব জোগাইতেছে; ফ্রাঙ্কো-পক্ষীয় ইতালীর সৈন্যের ও ইতালীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বিফলতা ঘটাইতেছে। অথচ, এই ফ্রান্সই ইতালীয় বন্ধুত্বের কাঙাল, জার্ম্মেনীর পক্ষ হইতে ইতালীকে নিজের পক্ষে টানিয়া লইতে উদ্‌গ্রীব, ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে একটা ফরাসী-ইতালীয় চুক্তির জন্য আলোচনা করিতে অগ্রসর—হের হিট্‌লারের ইতালীতে শুভাগমনের নামে অবশ্য ইতালীই তখনও সে আলোচনা বন্ধ রাখিয়াছে। সে ফ্রান্সের এত স্পর্দ্ধা কেন? মুসোলিনি হুমুকি দিলেন। ইতালীয়-ফরাসী চুক্তির চেষ্টা আপাতত চুকিয়াছে। এদিকে ব্রিটেনও প্রমাদ গণিল; শেষে কি বন্ধু ফ্রান্সের দোষে চেম্বারলেনের এত সাধের মানসপুত্র যে ইঙ্গ-ইতালীয় বন্ধুত্ব, তাহাও ভাসিয়া যায়? পশ্চাৎ হইতে ইতালীর ইঙ্গিত আসিল কি না কে জানে,—তখন চেক্-সমস্যায় আকাশ মসীবর্ণ,—তাড়াতাড়ি আবার নিরপেক্ষতা-কমীটির বৈঠক বসিল, আবার সেই অভিনয়। আর তত দিন ফ্রান্স আবার রাখিবে পিরীনিজের গিরিসঙ্কট রুদ্ধ। কিন্তু ফ্রাঙ্কো এ সুযোগই বা কতটুকু কাজে লাগাইতে পারিবেন? বিদেশীয় সৈন্য, বিদেশীয় রণসম্ভার, বিদেশীয় বিশেষজ্ঞ—সব সত্ত্বেও ফ্রাঙ্কো—ফ্রাঙ্কো; আর ক্যাটালোনিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশের বুকের উপর দিয়া জলস্রোতের মত বহিয়া যাওয়াও সম্ভব নয়। অতএব, দেরি আরও একটু আছে, তত দিন এই বিমান-আক্রমণই চলুক। ইতালী ও জার্ম্মেনীর কৃপায় তাহার জয় আয়ত্ত হইবেই।

এই জয়ের সম্ভাবনা সেদিন মুসোলিনির মনে নিশ্চয়ই জাগিতেছিল, তাই কি তিনি বৃহত্তর ইতালীর জন্ম-সম্ভাবনাও ঘোষণা না করিয়া পারিলেন না? কিন্তু সেই বৃহত্তর ইতালী কি? স্পেনের উপর তাঁহার রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা নাই, এই ত ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তির কথা;—অবশ্য তাহাই যে মনের কথা হইবে, এবং কার্য্যতঃ পালিত হইবে, এমন কথা নাই। তবে 'বৃহত্তর ইতালী' কি? ফ্রাঙ্কোর বেনামদারীতে ইতালীর দ্বারা স্পেনের জীবন নিয়ন্ত্রণ,—এই কথা বরাবরই আমরা বলিয়াছি, তাহাই কি? স্পেনে 'মাটি কাটি লভি কোহিনূর' মুসোলিনি হিট্‌লার শুধু অঙ্গে মাটি মাখিয়া গৃহে ফিরিবেন, একথা কেহই বিশ্বাস করেন না। এখনি তাঁহারা কিছু কিছু মূল্য আদায়ও করিতেছেন—জার্ম্মেনী লইয়াছেন খনিজ দ্রব্য আহরণের ভার, মুসোলিনি লইবেন শাসন-নিয়ন্ত্রণের। দুর্ব্বল, বিধ্বস্ত স্পেন,—বা বাস্ক ও ক্যাটালোনিয়ার স্বাতন্ত্র্যকামী গণগুলিকে—এক ফ্রাঙ্কো না পারিবেন জয় করিতে, না পারিবেন শাসনে রাখিতে অতএব, ইতালীয় জাহাজ ও বিমানের ঘাঁটি এবং ইতালীয় 'স্বেচ্ছাসেবক'গণ ভূমধ্যসাগরের তীরে যে ভাবেই হোক্ থাকিবে, তাহারাই কি 'বৃহত্তর ইতালী'র ভিত্তি পত্তন করিতেছে?' মাল্টায় ফরাসী-অধিকৃ-

টুনিসিয়ায় হয়ত সেই 'বৃহত্তর ইতালী'র নীরবে জন্ম হইতেছে—ইতালীয় ঔপনিবেশিকদের বংশবৃদ্ধিতে।

কিন্তু তাহা হইলে ব্রিটেনের 'সাম্রাজ্য-পথ', 'ভূমধ্যসাগরের পথ' আর কয় দিন ব্রিটেনের অধিকারে থাকিবে? অধিকারে আর তাহা নাই, তাহা ব্রিটেন জানে; তাই ইতালীর বন্ধুত্ব কামনা করে, যেন পথটা অন্ততঃ নিরাপদ থাকে। ইতালীই এখন ব্রিটেনের পূর্ব্বদ্বারের উপরে শ্যেনদৃষ্টি লইয়া বসিয়া—শুধু ভূমধ্য-সাগর নয়, পূর্ব্ব-আফ্রিকার ইতালীয় সাম্রাজ্যের জন্য ভারত-মহাসাগরের উপকূলে তাহার জাহাজের ঘাঁটি বসিতেছে। 'সুয়েজ প্রণালী'র পথ গিয়াছে, হয়ত একদিন ব্রিটেনের পক্ষে 'উত্তমাশা অন্তরীপের পথও' আর নিরাপদ থাকিবে না।

ভারতবর্ষের পক্ষে তাহার ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে, ব্রিটেন অপেক্ষা ইতালী সাম্রাজ্যবাদী হিসাবে বেশী লোভী; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারতের ভবিষ্যতের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে বাধ্য। আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাপুঞ্জ ও নানা শক্তির পরস্পর বৈরিতা এতই প্রবল যে, সে পথে পৃথিবীর অন্য সাম্রাজবাদীরাই পরস্পরকে বাধা দিতে বাধ্য।

৩

কিছু দিনের মত চেকোস্লোভাকিয়া বাঁচিয়া গেল—নিশ্বাস লইবার অবকাশ পাইল, অবশ্য মাথার উপরে মেঘ তেমনি জমিয়া আছে, কাটিয়া যায় নাই। মুসোলিনির সহিত বন্ধুত্ব-বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া আসিয়া হিটলার গৃহে পৌঁছিতেই চেকোস্লোভাকিয়ার ভাগ্যে দুশ্চিন্তার কারণ জুটিল। নাৎসির অষ্ট্রিয়া-অধিকারের পর হইতে 'সুদেতেন জার্ম্মান' দলের দাবিগুলি যেমন বাড়িয়া গিয়াছে, তেমনি তাহাদের ঔদ্ধত্য হইয়া উঠিয়াছে দেশের অন্যান্য জাতিদের পক্ষে অসহ্য। তাহা ছাড়া শতকরা ২২ জন যখন সংখ্যা-লঘিষ্ঠতার নামে স্বাতন্ত্র্য দাবি করে, তখন সংখ্যালঘিষ্ঠ অন্যান্য দলও এ সুযোগ ত্যাগ করিবে না। ম্যাগিয়াররা (হাঙ্গেরিয়ান) শতকরা ৫ জনের কম, পোলরা এদেশে
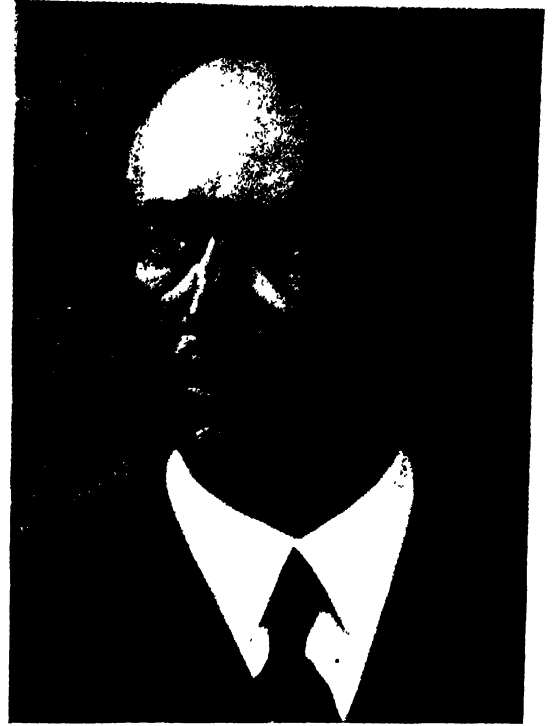
চেকোস্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপতি বেনেশ

শতকরা আধ জন, তবু তাহারাও বাড়াবাড়ি করিতে ছাড়ে না। অবশ্য, জার্ম্মানদের দাবিই ইহাদের সাহস দিয়াছে, আর জার্ম্মানদের দাবি যাহাই হউক তাহার পশ্চাতে যুক্তি কতকটা আছে। এই যুক্তিটা আজ নাকি ব্রিটেনের নিকট খুব প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু বিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহা একটুও চোখে পড়ে নাই—নাৎসি ও ফাসিস্তদের বন্ধুত্ব কাম্য না হইলে এমন দূরদৃষ্টি ব্রিটেনের আজও সহজলভ্য হইত না। তাই, প্রাগের ও বার্লিনের ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত একটা সুমীমাংসার চেষ্টায় ছুটাছুটি করিতেছেন। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ছিল চেকো-স্লোভাকিয়ার মিউনিসিপাল নির্ব্বাচন, আর জুনের প্রারম্ভে সাধারণ নির্ব্বাচন। নির্ব্বাচন জিনিষটা হিটলারের নিকট উপাদেয় নয়, এই কথা না-বুঝিয়াই অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর শুস্‌নিগ মরিলেন। বেনেশ মরিতে মরিতে এ-যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই চেক-জার্ম্মান সীমান্তে জার্ম্মান সৈন্য সমাবেশ হইল,—জার্ম্মেনী

দক্ষিণে: চেকোস্লোভাকিয়ার প্রধান মন্ত্রী হোজা
বামে: রাষ্ট্রপতি বেনেশ

বলিলেন, উহা বরাবরের ব্যাপার, নূতন কিছু নয়। সুদেতেন জার্ম্মান অঞ্চলে জার্ম্মেন-চেক রেষারেষি, হাতাহাতি, মারামারি লাগিয়া গেল; দুই-একটি পিস্তলের গুলিও চলিল—দুই-এক জন হতাহতও হইল। নাৎসিরা যেন ইহার অপেক্ষায়ই ছিল, জার্ম্মান কাগজের মুখে 'মার মার' রব পড়িয়া গেল, রাষ্ট্রবিদেরা তাহারই প্রতিধ্বনি করিতে লাগিলেন—যে-রাজ্য তাহার সংখ্যালঘিষ্ঠদের রক্ষা করিতে পারে না (অষ্ট্রিয়ার বেলাও ঠিক এই যুক্তিই উঠিয়াছিল, এবং শুশ্‌নিগ দেখাইয়াছিলেন যে, যুক্তিটা বর্ণে বর্ণে মিথ্যা) সে-রাজ্যের জার্ম্মান সংখ্যালঘুদের দায়িত্ব নিশ্চয়ই জার্ম্মান রাইখের। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতেরা দুই রাজধানীতে রফানিষ্পত্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ড চেক-সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিতে উদ্যোগী। মনে হইল, নির্ব্বাচন আর হইবে না; কিন্তু হঠাৎ এক সপ্তাহ পরে অবস্থার যেন একটু উন্নতি ঘটিল। নির্ব্বাচন শেষ হইল, সাধারণ-নির্ব্বাচনও হয়ত যথানিয়মে শেষ হইবে।

কি করিয়া তখনকার মত চেকোস্লোভাকিয়া রক্ষা পাইল? ব্রিটিশ কাগজওয়ালারা বলিতেছে—ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিকদেরই কৃতিত্বে। হিট্‌লার হয়ত সত্যই দেখিয়াছিলেন যে, চেক্-রাজ্যের বিষয়ে ব্রিটেন একেবারে উদাসীন নয়। তাহা ছাড়া, অষ্ট্রিয়ার মত উহা কুক্ষিগত করা সহজ হইবে না। কারণ চেকের বন্ধু রুশিয়া বা ফ্রান্স যে অষ্ট্রিয়ার বন্ধু ইতালীর মত তাহার একটি টেলিগ্রামেই মুখ বুজিয়া থাকিবে তাহা নয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা চেক-রাজ্যের কর্ণধারদের বুদ্ধি ও তৎপরতা। বেনেশ্‌ ও হোজা যে দৃঢ়তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এ-যুগের ইউরোপে অনেকের অনুকরণীয়। হোজা বলিলেন, চেকোস্লোভাকিয়া পূর্ব্ব হইতেই সংখ্যালঘুদের দাবি বিচার করিয়া পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, সাধারণতন্ত্রের কাঠাম বজায় রাখিয়া, রাষ্ট্রের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সংখ্যালঘুদের আত্মকর্তৃত্ব দিতে তাঁহারা প্রস্তুত—এই জন্য তাঁহারা সুদেতেন জার্ম্মান দলের নেতা হেন্‌লাইনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন হেন্‌লাইন তখন ব্রিটেনে, ব্রিটিশ-রাষ্ট্রনীতিকদের নিজের সুযুক্তি বুঝাইতেছেন। প্রথম মনে হইল, তাঁহার দল বুঝি চেকোস্লোভাকিয়ার আমন্ত্রণও অস্বীকার করিবে, পরে কিন্তু তাহাদেরও উগ্রতা একটু কমিল। কারণ কি? চেকোস্লোভাকিয়া আপোষের জন্য হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া নাই—চেকোস্লোভাকিয়া দুর্ব্বল রাষ্ট্র নয়. তাহার সৈন্যসামন্ত আছে, যুদ্ধোপকরণও আছে, প্রয়োজনের আহ্বানে তাহার রিজার্ভ দলও দেশরক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে—একেবারে বিনা বাধায় এ-রাজ্য জয় সম্ভব হইবে না। হিটলার বুঝিলেন, 'এখনও সময় নয়।' হেনলাইনও আলোচনায় যোগ দিতে আসিলেন।

এবারকার মত চেকোস্লোভাকিয়ার কি ফাঁড়া কাটিয়া গেল? এখনও বলা যায় না। কারণ, জার্ম্মান কাগজওলা আবার নূতন করিয়া বিদ্বেষের বিষ ছড়াইতেছে

আধুনিক মুসলমান-রাষ্ট্রের নৃপতিদের বিবাহ-উৎসব

ফরিদা জুলফিকার, বর্তমানে ইজিপ্টের রাণী

বিবাহান্তে ইজিপ্টের রাজা ও রাণীর রাজপ্রাসাদে আগমন

বিবাহ-উৎসব উপলক্ষ্যে প্রাসাদের সম্মুখে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ। প্রাসাদের অলিন্দ হইতে রাজা ফারুক সৈন্যদিগকে পরিদর্শন করিতেছেন।

আলবানিয়ার রাণী

বিবাহ-উৎসব উপলক্ষ্যে টিরানা মসজিদের সম্মুখে জনতা

আলবানিয়ার রাণী বিবাহের রেজেষ্ট্রিতে স্বাক্ষর করিতেছেন ; পিছনে আলবানিয়ার রাজা ও কাউণ্ট কিয়ানো দণ্ডায়মান ।

বিবাহ-উপলক্ষ্যে আলবানিয়ার পার্লেমেণ্টের সহকারী সভাপতির সম্ভাষণ

ঈজিপ্টের সম্পদ তুলার ক্ষেত্রে তুলা-আহরণকারীর দল

চেকোস্লোভাকিয়ার একটি গ্রামের পথে বিশ্রামের দৃশ্য

চেকোস্লোভাকিয়ায় বিচিত্র পরিচ্ছদ-নিদর্শন

সুদেতেন অঞ্চলের নির্ব্বাচনে শতকরা ৮০টি ভোটই গিয়াছে হেনলাইনের পক্ষে। নির্ব্বাচন-শেষেও নাকি দুই জাতির প্রজ্জ্বলিত বিরোধের আগুন নিবিয়া যায় নাই। এ-কথা সত্যও হইতে পারে—কারণ, ক্রমাগত যে-বিরোধে ইন্ধন জোগানো হয়, তাহা সহজে নিবে না। হয়ত চেকেরাও আজ সুদেতেন জার্ম্মানদের প্রতি বিদ্বেষে অন্ধ। রেস্তোরাঁতে, পথেঘাটে দুই জাতীয় লোকের মধ্যে মারামারিও চলিতেছে। এই খুরাই জার্ম্মান কাগজগুলির পক্ষে যথেষ্ট—তাই ভবিষ্যতে কি হয় তাহা বলাও দুঃসাধ্য. তবে মনে হয়, হিট্‌লার স্থির করিয়াছেন সৈন্যসামন্ত লইয়া প্রাগের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়া নিষ্প্রয়োজন. হেনলাইনের আত্মকর্তৃত্বের দাবি যদি আপাতত পূর্ণ হয় তাহা হইলেই চেকোশ্লোভাকিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। চেক-রাষ্ট্রের বর্ত্তমান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে শতকরা গোটা কুড়ি আসন মাত্র হেনলাইনের দখলে আসিতেছে, তথাপি তাহার সুদেতেন জার্ম্মানরাই হইবে সংখ্যায় শৃঙ্খলায় অগ্রগণ্য। তদুপরি তাহাদের অন্যতম দাবি হইল, জার্ম্মান রাইখের সঙ্গে সুদেতেন জার্ম্মানদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক আত্মীয়তা রাখিবার অধিকার, ও সেই আদর্শ-অনুযায়ী একনায়ত্বকমূলক (Fuehrer Prinzep) জার্ম্মান জাতীয়তা ও জার্ম্মান রাষ্ট্রদর্শন গ্রহণের স্বাধীনতা। একবার চেকোশ্লোভাকিয়া এই সব দাবি অঙ্গীকার করিলে বহু জাতিতে বিভক্ত সে-দেশ কতদিন টিঁকিবে? সবাই বুঝে, তখন জার্ম্মান সংখ্যালঘিষ্ঠরাই হইবে প্রকৃত কর্ত্তা; আর তখন তাহাদের অধ্যুষিত বোহিমিয়া বেশীদিন আর নাৎসি রাষ্ট্রের বাহিরে থাকিবে না—'প্রাচী-যাত্রা'র পথ তখন উন্মুক্ত। হিট্‌লার কি এই ভাবে অভ্যন্তর হইতে চেকোশ্লোভাকিয়া বিনাশের ব্যবস্থা করিবেন? তাহাতে এই নিমেষে যুদ্ধে নামিতে হয় না। তাঁহার পূর্ব্বতন সমরসচিবেরা ছিলেন আপাতত যুদ্ধের প্রতিকূল, তাঁহার বর্ত্তমান সমরনায়ক ব্রাউশ্‌টিশের সঙ্গে ও গোয়েরিঙের সঙ্গে তাহার এখন প্রতিদিন আলোচনা চলিতেছে। তাঁহাদের মতামত বুঝা যাইবে নায়কের কাজ হইতে।

এ-মুহূর্ত্তে যুদ্ধে নামিলে জার্ম্মেনীর শত্রু হইবে চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স ও রুশিয়া, আর কার্য্যতঃ না-হোক্, কথায় বিরোধী হইবে ব্রিটেন। কিন্তু ফ্রান্স বা রুশিয়া কেহই চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিবেশী নয়। ফ্রান্স ত বহু দূরে, তাহা ছাড়া পূর্ব্বে পশ্চিমে সে নাৎসি-ফাসিস্ত বন্ধুদের দ্বারা বেষ্টিত; তাহার নিজের সত্তা লইয়াই প্রশ্ন;—ফ্রাঁ প্রায় মরিতে বসিয়াছে, মজুরেরা পরিতুষ্ট নয়, আর গুপ্ত ফাসিস্ত ষড়যন্ত্রও গৃহমধ্যে আছে। বাধ্য হইয়াই এই বিরাট শক্তি আজ দালাদিয়ের নেতৃত্বে ব্রিটেনের মুখ চাহিয়া থাকে। তথাপি চেক্‌দের সহায়তায় সে জার্ম্মেনীর পশ্চিম-সীমান্ত হইতেও আক্রমণ করিতে পারে। রুশিয়ার পক্ষে তাহাও সম্ভব নয়—পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়া এই দুই রাষ্ট্র তাহার ও 'চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে অবস্থিত। দুই রাষ্ট্রই এখন ফাসিস্ত—পোল্যাণ্ডের বেক্ প্রকাশ্যতও তাহাই, রুমানিয়ার রাজা কেবল একই কালে রাজা ও একনায়ক। দুই রাজ্যই ফরাসী বন্ধুত্ব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এখন ফাসিস্ত-নাৎসি ভুজবন্ধনে মিলিত। তাই এই দুই রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-বিভাগে এখন নিজেদের বন্ধন দৃঢ়তর করিবার চেষ্টা চলিয়াছে—যেন সোভিয়েটের পশ্চিম প্রান্তে কোনও ফাঁক না থাকে—বাল্‌টিক হইতে পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত এক ফাসিস্ত প্রাচীর সুদৃঢ় করিয়া গাঁথা হয়। বল্কান-রাজ্যগুলির উপর পূর্ব্বেই জার্ম্মান-ছায়া পড়িয়াছে, গ্রীস ত উৎকট ফাসিস্ত, তুর্কীরাও এই বন্ধুসম্মেলনে আসিতেছে—বাল্‌টিক শক্তিপুঞ্জ সোভিয়েট-বিরোধী, এখন পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়া তাহাকে একেবারে ইউরোপের বাহিরে ফেলিতে সচেষ্ট। অতএব, পশ্চিম ইউরোপের দিকে সোভিয়েটের সব দ্বার প্রায় রুদ্ধ। আকাশপথে আর কতটুকু চেকোশ্লোভাকিয়াকে সাহায্য সে করিতে পারে?

৪

ফ্রান্সের মতই সোভিয়েটও প্রায় বিরুদ্ধ শক্তিদের বেড়ায় আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে—তাহার পশ্চিম দ্বারে এই বৃহৎ প্রাচীরের বাহিরে জাগিতেছে নাৎসি, আর তাহার পূর্ব্বপ্রান্তে মাঞ্চুকুওতে, আমুরের পারে, প্রশান্ত-মহাসাগরের তীরে ও মধ্য-মঙ্গোলিয়ায় জাগিতেছে জাপান। নিদ্রাহীন চোখে ষ্টালিন প্রহর গণিতেছেন,

ভরোশিলভের অস্ত্রঝনঝনায় করিবে কি? লিট্‌ভিনভের বাক্‌চাতুর্য্যেই বা কি হইবে?

সোভিয়েট নূতন বন্ধু লাভ করিতে পারে নাই, বরং পুরাতন বন্ধু হারাইতেছে। ব্রিটেন ত তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়াই গিয়াছে—নিকটে আসিবার সম্ভাবনাও নাই। নিতান্ত দায়ে না-পড়িলে আজ কেহ সোভিয়েটের মিত্রতা কামনা করিবে না। তেমনি দায়,—নাৎসি-ত্রাসত্রস্ত চেক্‌দের; তেমনি দায় ফরাসীর, তেমনি দায় স্পেনের ও চীনের। কিন্তু স্পেন তাহার কতটুকু সাহায্য পাইয়াছে তাহা বলা দুঃসাধ্য। সেখানে ট্রট্‌স্কির দলভুক্তদের না তাড়াইতে ষ্টালিন কোনো সাহায্যেই অগ্রসর হন নাই। স্পেন মরুক বাঁচুক সে-চিন্তা ষ্টালিনের নাই—কিন্তু ট্রট্‌স্কির দল যেন অন্ততঃ নির্ম্মূল হয়।—মাথায় তাঁহার ট্রট্‌স্কির ভূত চাপিয়া বসিয়াছে। চীনে কিছু দিন হইতে রুশিয়া অস্ত্রশস্ত্র, বিমান ও বিশেষজ্ঞ কিছু কিছু কাঞ্চনমূল্যে প্রেরণ করিতেছিল; এখন সান-ফুর মারফৎ নূতন চুক্তি হইতেছে, চিয়াং-কাইশেকও সোভিয়েট-বিরোধিতা ছাড়িতেছেন, ষ্টালিনও তাঁহাকে অধিকতর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে চীনের জনসাধারণের মধ্যে আবার সাম্যবাদের প্রভাব বিস্তারের সুবিধা হইল। চীনের যুদ্ধ এবার সুদীর্ঘকাল-স্থায়ী হইবে; রুশিয়াও পূর্ব্বপ্রান্তের এই শক্তিশালী শত্রুর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, চীনও শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা পাইবার আশা পোষণ করিতে পারে।

আসলে সোভিয়েট আজ বিশ্বরাষ্ট্রমঞ্চে আর সেই বৃহৎ প্রতিষ্ঠার আসন জুড়িয়া নাই। তাহার কারণ, তাহার আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা। রণসম্ভার তাহার বিপুল, সৈন্যবলও প্রচুর, কিন্তু তাহা যুদ্ধকালে কতটা কাজে লাগিবে, তাহা বলা কঠিন। হয়ত সেইরূপ যুদ্ধে সোভিয়েট, জারের রুশিয়ার মতই গৃহমধ্যেই ভাঙিয়া পড়িবে। তাহার অনেক লক্ষণই দেখা যায়। তাই, ষ্টালিনের নিজ বিরোধী দল নিঃশেষ করিবার এই নির্ম্মম প্রতিজ্ঞা। দেশত্যাগী বামপন্থী জার্ম্মানদের একখানি পত্রে এক জন লেখক এই দিক হইতে রুশিয়ার আইভান্ দি টেরিবল্-এর সঙ্গে ষ্টালিনের তুলনা করিয়াছেন;—এক জন বাইবেলের নামে রক্তের জোয়ার বহাইয়াছেন, আর জন সেই জোয়ার মার্ক্স-লেনিনের নামে বহাইতেছেন—একনায়কত্বের দশা এমনি। আজ রুশিয়ায় পূর্ব্বতন সাম্যবাদী নেতাদের কেহই অবশিষ্ট নাই।

এ সম্পর্কে 'ফরেন অ্যাফেয়ার্স' পত্রে যে-তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সত্যই চমকপ্রদ। লেনিনের মৃত্যুকালে (২২শে জানুয়ারী, ১৯২৪) যাঁহারা প্রধান প্রধান নেতা ছিলেন, তাঁহাদের ভাগ্য পাঠ করা মন্দ নয়:

লেনিন—মৃত্যু ২২শে জানুয়ারী, ১৯২৪;

ট্রট্‌স্কি—বিতাড়িত ও নির্ব্বাসিত;

কামেনেভ্—বিতাড়িত (১৯২৬), প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত (১৯৩৬);

জিনোভিভ—বিতাড়িত (১৯২৬), প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত (১৯৩৬);

বুখারিন্—বিতাড়িত (১৯২৬), প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত (১৯৩৮);

রায়কভ—বিতাড়িত (১৯৩০), প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত (১৯৩৮);

টম্‌স্কি—বিতাড়িত (১৯৩০), গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে আত্মহত্যা করেন—১৯৩৬;

ষ্টালিন—অব্যাহতশক্তি।

ইঁহারাই ছিলেন তখনকার 'পলিটব্যুরো'র সদস্য। তখনকার প্রধান কমিসার বা সচিবদের মধ্যে ট্রট্‌স্কি, রায়কভ, কামেনেভ ছাড়া আর যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে জারজিন্‌স্কি ক্রাসিন (১৯২৬), লুনাচারস্কি (১৯৩৩) কুইবিশেভ (১৯৩৫, মৃত্যু সন্দেহজনক) মৃত; চিচিরিন পদচ্যুত হন (তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন তাঁহার অধস্তন সহকারী লিট্‌ভিনভ) ও পরে মারা যান, বিওখানোভের আর খবর নাই, স্মিটেরও অবস্থা তাহাই। স্মির্ণভ সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হন (১৯২৮), পরে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন (১৯৩৬) আর সোকোলনিকভ এখন কারাগারে (১৯৩৭)। ইহা ছাড়াও কারারুদ্ধ রেকভস্কি (১৯৩৮) ও ওসিনাস্কি (১৯৩৭); আর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত রাদেক (১৯৩৮), মার্শেল টুকাচেভস্কি (১৯৩৭), সেরিব্রিয়াকভ পিয়াটাকভ (১৯৩৭), যাগোদা (১৯৩৮), প্রভৃতি বহু বহু

নাম রহিয়াছে—আর সহস্র সহস্র অখ্যাত দণ্ডিতদের ত কথাই নাই। এই বিভীষিকার কারণ আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। ষ্টালিনের রুশিয়া সাম্যবাদের আদর্শ হইতে অনেকটাই পিছনে হটিয়া আসিতেছে,—হয়ত বাহিরের বাস্তব অবস্থার চাপে বাধ্য হইয়াই; কিন্তু যাহারা আজীবন সাম্যবাদের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ তাঁহারা ইহা মানিয়া লইতে না-চাহিতে পারেন। তাঁহাদের মতে ষ্টালিনের নীতিই ঘরে বাহিরে সাম্যবাদের পরাজয়ের কারণ, তাই তাঁহারা ষ্টালিন্-নীতি ধ্বংস করিতে চাহেন। কেহ কেহ হয়ত মনে করেন উহার উপায় পুনর্বিপ্লব এবং সেই বিপ্লবের ভূমিকাস্বরূপ ফাসিস্ত-সোভিয়েট যুদ্ধ—তাহার ফলেই ষ্টালিনের পতন অনিবার্য্য। ইহারা হয়ত ফাসিস্তদের এই দিকে প্ররোচিত করিবার জন্য তাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে পারেন। কিন্তু অধ্যাপক ডিউয়ি-প্রমুখ মার্কিন মনস্বীরা বিচার করিয়া ট্রট্স্কিকে এই অভিযোগ হইতে মুক্ত বলিয়াছেন—বিশেষ করিয়া এ অভিযোগ আবার ট্রট্স্কি ও ট্রট্স্কির দলের বিরুদ্ধেই আনীত হয়। অন্যদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আছে—বিপ্লবের নানাবিধ চেষ্টা। কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়ার ট্রট্স্কিই সেরা 'কাফের'। আজ যে অপরাধ সব অপরাধের সেরা, তাহার নাম ট্রট্স্কিইজম।

ষ্টালিন ও ট্রট্স্কির পরস্পরের সম্বন্ধটাই এইরূপ যে, কেহ কাহারও সম্পর্কে স্থিরভাবে ভাবিবে তাহা আশা করাই দুরাশা। লেনিনের জীবিতকালে ষ্টালিন ছিলেন প্রায় মেঘাবৃত নক্ষত্র,—আকাশ জুড়িয়া তখন লেনিন ও ট্রট্স্কি। সে-আকাশে অন্যান্য রক্ততারকাও অনেক ছিল—শিক্ষায় দীক্ষায় এই গোঁয়ার জর্জ্জিয়ান্‌কে তাঁহারা হেয়জ্ঞান করিতেন। কিন্তু সেই জর্জ্জিয়ান দল গড়িতে জানেন, শাসনশক্তি হাতে রাখিতে পারেন, বাস্তব দৃষ্টি রাখেন—আর মনে রাখিয়াছেন সেদিনকার অপমান। মানুষের সমস্ত নীতি ও যুক্তির তলায় কোন্ সহজ মানবীয় বৃত্তিগুলি যে অপ্রতিহত শক্তিতে আপনাদেরই প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, ইতিহাসের পাতায় পাতায় ব্যক্তিগত মৈত্রী-বিরোধ যে ছদ্মবেশে কত বিপুল আন্দোলন ও বিমূঢ় নির্ম্মমতায় ফুটিয়া উঠে—আধুনিক "ঐতিহাসিক বস্তুবাদী" রুশিয়ার এই অধ্যায় কি তাহারই আর এক প্রমাণ?

রুশিয়ার কত দূর সাহায্য চীন পাইবে, তাহার উপর চীনের ভাগ্য কতকাংশে নির্ভর করে। ইতিমধ্যে ক্যাণ্টনে প্রতি দিনই বোমা পড়িতেছে, বোমা ফাটিতেছে, লোক মরিতেছে। অথচ, ইহাও যুদ্ধ নয়। স্পেন, চীন, জার্ম্মানী, রুশিয়া, আবিসিনিয়া দেখিয়া মনে হইয়াছে 'করুণা' কথাটাই অভিধানে নিষ্প্রয়োজন; চীনের ঘটনা দেখিয়া মনে হয়—তবে কি 'যুদ্ধ' কথাটারও অর্থ পরিবর্ত্তন করা দরকার, না ঐ কথাটার আজ আর প্রয়োজন নাই?

হয়। বইখানিতে ছাপার ভুলে অনেক গোলমাল সৃষ্টি হইয়াছে। 'চিঠি' গল্পের নায়িকা প্রতিভা কি প্রমীলা বোঝা যায় না, প্রথমে মনে হয় বুঝি দুই জন, পরে বোঝা যায় মানুষ একটিই।

সপ্তপর্ণ—শ্রীরাখালচন্দ্র সেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

এটি ছোট গল্পের বই। "সহযাত্রী" প্রভৃতি সাতটি ছোট গল্প ইহাতে আছে। বইখানি ২২৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুতরাং গল্পগুলি নিতান্ত ছোট নয়। 'সহযাত্রী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এ ধারায় গল্প আমাদের সাহিত্যে দেখি নি। কেবল যে বিষয়টি য়ুরোপীয় তা নয়, রসের তীব্রতা এবং আখ্যানের চমকলাগানো নাট্যবিকাশের মধ্যে য়ুরোপীয় আধুনিক সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া যায়। আরেঃ যেটা লক্ষ্য করেছিলুম সে হচ্চে ঘটনার যাথার্থ্য, অপরিচয় বশত বাঙালীর হাতে যে ত্রুটি ঘটতে পারত তা এতে কিছু ঘটে নি। পড়ে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম।" 'সারথি' গল্পটি পড়িয়া বোঝা যায় লেখক শুধু য়ুরোপীয় গল্পে হাত পাকান নাই, খাঁটি বাংলা গল্পেও তাঁহার হাত খুলিত। এ রকম পাকা লিখিয়ের অকাল মৃত্যু বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্যের বিষয়। ইনি বাঁচিয়া থাকিলে ইহার কাছে বাংলা সাহিত্য কিছু সম্পদ লাভ করিতে পারিত। লেখকের কোন কোন গল্প আধুনিক রুচি অনুযায়ী সামাজিক সুনীতিকে সদর্পে উপেক্ষা করিয়া লিখিত। বইখানির ভাষা, ছাপা বাঁধাই প্রভৃতি সুন্দর।

শ.

ঘোষালের ত্রিকথা—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ৯৩। মূল্য পাঁচ সিকা।

সংসারে এক একজন ব্যক্তি আছেন যাঁদের বৈশিষ্ট্য তাঁদের নিজস্ব তাঁদের বৈশিষ্ট্যের বিশেষণ একমাত্র তাঁদের প্রাপ্য। শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্যিক রূপও সেই ধরণের বিশিষ্ট। প্রথম গল্প দুটি 'করবারেসী গল্প' এবং 'ঘোষালের হেঁয়ালী'—এ দুটির প্রত্যেকটি পংক্তি রসিকতায় ও তীক্ষ্ণতায় মিহরীর ছুরির মতই মধুর এবং ধারালো; পরিশেষে গল্পদুটি সমগ্রতায় রসবস্তুতে পরিণত। কিন্তু তবুও মনে হয় বিশেষ্যের চেয়ে বিশেষণ বড়; রসবস্তু অপেক্ষা রসিকতাই যেন উজ্জ্বলতর। এ গল্পদুটিকে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র 'বোষ্টমের মেয়ে সখিরাণী'র সঙ্গে তুলনা করে বলা যায়—যে আহারে বিহারে বোষ্টমী কায়দা পুরো বজায় রেখেও রাজবাড়ীর আদব-কায়দা এবং নবাবী আমলের হিন্দীগান হজম করে ভাব-রসময়ী থেকে রঙ্গরসময়ী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু তাঁর সর্বশেষ গল্প 'বীণাবাই'য়ে তাঁর বৈশিষ্ট্য রূপান্তর গ্রহণ করেছে, 'বীণাবাই' সার্থক সৃষ্টি। এখানে রঙ্গরসময়ী রঙ্গরূপের ছদ্মবেশ নিমেষে পরিত্যাগ ক'রে ভাবরসময়ী হয়ে উঠেছে, লীলা-বিলাসিনী অকস্মাৎ পূজারিণীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, আমোদ প্রাণের স্পর্শে আনন্দে পরিণত হয়েছে। এখানে করজারেসী গল্প বলার এবং হেঁয়ালী করার প্রয়োজন অতিক্রম করে অধরের মৃদুহাসি মুছে ফেলে চৌধুরী-মহাশয় অনুভূতির রাজ্যে জল জল চোখে এসে দাঁড়িয়েছেন। সেতারে গতের কসরৎ করতে করতে তিনি ভাবাবেশে প্রাণপূর্ণ গান গেয়ে ফেলেছেন।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ গীতা—শ্রীঅভয়পদ চট্টোপাধ্যায়, এম এ। প্রকাশক —শ্রীকৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমান। মূল্য এক টাকা।

এই পুস্তকখানি গীতার ভূমিকা। এই ভূমিকাতে গ্রন্থকার গীতার সাধনার ক্রম অর্থাৎ জীবের বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থা পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াছেন ও তৎসঙ্গে অন্যান্য সাধনোপযোগী প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির সংক্ষেপে বিচার করিয়াছেন। গীতা শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম ও তত্ত্ব ইহাতে সহজ ও সরলভাবে বুঝান হইয়াছে।

শান্তিপথ—৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীকান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ঢাকা হইতে প্রকাশিত।

এই পুস্তকে অনেক ধর্ম্ম পথ ও মত বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সাংসারিক লোকের ধর্ম্মপথের উপযোগী অনেক উপদেশ দিয়াছেন। তিনি ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলি সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

সচিত্র কলেরা চিকিৎসা—ডাঃ শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-বি প্রণীত। প্রকাশক শ্রীমহিমকুমার মুখোপাধ্যায়, ২৩ বি, বেথুন রো, কলিকাতা। তৃতীয় সংস্করণ ১১৯ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা।

কলেরার আক্রমণে প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক লোক অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়া থাকে। যাঁহারা শহর-অঞ্চলে বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে সুচিকিৎসার সুযোগ লাভ করিতে পারেন। কিন্তু পল্লীগ্রামে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে সুচিকিৎসার একান্ত অভাব হয়। পল্লীগ্রামে যাঁহারা এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন তাঁহারা এই গ্রন্থপাঠে কলেরা রোগের কারণ ও চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আধুনিকতম তত্ত্বসমূহ বিশেষ ভাবে অবগত হইতে পারিবেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসক মহাশয় পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মতে কলেরা রোগের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই সংক্ষেপে এই পুস্তকে প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়টি সকলেরই পাঠ করা উচিত। অজ্ঞানতাবশতঃ বহু লোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ অধ্যায়টি পাঠ করিয়া রাখিলে সে অজ্ঞানতা দূরীভূত হইতে পারে। ঐ অধ্যায়ে কলেরা নিবারণের উপায়, কলেরা-প্রতিষেধক টীকা, ফিজি-ভ্যাক্সিন, গৃহস্থের কর্ত্তব্য, গ্রামবাসিগণের কর্ত্তব্য, গৃহশোধন-প্রণালী, পানীয় জল শোধন প্রণালী প্রভৃতি সাধারণের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। গ্রন্থখানি যে বিশেষভাবে আদৃত হইয়াছে তাহা ইহার তৃতীয় সংস্করণেই প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন

পরলোক—তারকনাথ বিশ্বাস। প্রকাশক শ্রীনলিনীমোহন বিশ্বাস। ২০১, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

লেখকের সম্প্রতি দেহান্ত ঘটিয়াছে। তিনি এক জন সুলেখক ছিলেন, এমন এক দিন ছিল যখন 'তারকনাথ গ্রন্থাবলী' সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিত। আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তাহার পর ইহার অনেকগুলি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। থিওসফি এবং হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী পরলোক সম্বন্ধে বহু তথ্য গল্পচ্ছলে ইহাতে সন্নিবেশিত আছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্রগতি—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিউ বুক ষ্টল, ৯ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি পড়িতে মন্দ নয়; তবে ইংরেজীর ছায়াপাত হয় নাই তো?

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

এই ত জীবন—শ্রীশচীন সেন। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দু টাকা।

উপন্যাস। ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে আজীবন নির্ভীক সংগ্রাম করিয়া জীবন-যুদ্ধে অশোক ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। সে সাংবাদিক এবং দরিদ্র; গৃহের পরিধিতে স্ত্রীকে লইয়া তাহার প্রতিভাদীপ্ত জীবন ভরিতে চাহে না, গৃহে এবং বাহিরে সর্ব্বত্র তাহার অশান্ত জীবন মুক্তির সন্ধানে ছটফট করিয়াছে। বৃহৎ কর্ম্মের সাগরে গা ভাসাইয়া সে সজ্ঞ গড়িয়াছে, কিন্তু বস্তুতন্ত্রের পৃথিবীর নিকট হইতে লাভ করিয়াছে বঞ্চনা। অশোকের শিক্ষিত মন ও বলিষ্ঠ চরিত্র লেখক দরদ দিয়া ফুটাইয়াছেন। উপন্যাসের প্রথম দিকটাতে মতবাদ-প্রচারের আধিক্যে গল্পাংশের গতি কিছু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু শেষভাগে নির্ব্বাচন-ব্যাপার লইয়া কাহিনী জমিয়াছে ভাল। পরিসমাপ্তি সুন্দর। ভাষা স্বচ্ছন্দগতি, প্রকাশভঙ্গীতে সংযম আছে। কথোপকথনের ভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব একটু বেশীই লক্ষ্য করা যায়; যাঁহার লেখনীতে শক্তিসঞ্চার হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে এই মোহটুকু না-থাকাই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

আঁকাবাঁকা—শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল। পি. সি. সরকার এণ্ড কোং, কলিকাতা। ১৫৪ পৃ.। মূল্য ১।।০।

আঁকাবাঁকা একটি বড় গল্প। নন্দরাণী নামক একটি বিধবার অধঃপতনের কাহিনী। গল্পে ঘটনা-অংশ অপেক্ষা মানসিক দ্বন্দ্ব বর্ণনা বেশী। স্থানে স্থানে তাহা সুখপাঠ্য। কিন্তু নায়িকার পরিণতি স্বাভাবিক হয় নাই। ভাষা বিষয়ে লেখক অত্যন্ত অসতর্ক। যেসব শব্দ গদ্যে কদাপি ব্যবহৃত হয় না, তাহার অতি-ব্যবহারে গল্পটি পড়িতে ভয়ানক অসুবিধা হয়। "তুলসীর সাথে নন্দর অন্তরঙ্গতা", "ভায়ের সাথে হাসি গল্প করে", "আশিস্ মাগিল", "মনের মাঝে গুঞ্জনায়ই", "কণ্ঠের মাঝে আসিয়া আটকাইয়া গেল";—তাহা ছাড়া "নরম অন্ধকার", "মুখের ভিতর পানটা ভরিয়া হাসিল" "আধেক রাত্রি" "বেঁটেখেটে" "বিষ্টুকে অধৈর্য্য করিয়া তুলিল", "চুলবুলিয়ে ওঠে", ইত্যাদি। 'সাথে' ও 'মাঝে' প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত হইয়াছে। "থর থর করিয়া কাঁপা" এবং "রী রী করিয়া ওঠা" এই দুইটি কথাও লেখকের বিশেষ প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। প্রকাশ-রূপটি এরূপ ভাবে বিন্যস্ত করিলে শুধু প্লটের উপর গল্প দাঁড়াইতে পারে না, অন্ততঃ তাহা সাহিত্যসৃষ্টির নমুনা হিসাবে কখনই থাকিতে হয় না।

শ্রীপরিমল গোস্বামী

জীবনী-সংগ্রহ, দ্বিতীয় ভাগ—শ্রীগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

যাঁহারা নারীজাতির গৌরবস্বরূপিণী, অতীত যুগের সেইরূপ বহু পূত-চরিত্রা ভারতরমণীর গৌরবময় জীবনকাহিনী এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যবতী ও দানশীলা রমণীগণের জীবনাখ্যান পাঠে মহিলাগণ উপকৃত হইবেন।

অগ্নির লেখা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। পি. সি. সরকার এণ্ড কোং, ২ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

২৪৭ পৃষ্ঠার একখানি সুবৃহৎ উপন্যাস। পুস্তকখানির কয়েক পৃষ্ঠা পড়িতেই মনে হইতে লাগিল, বুঝি শরৎচন্দ্রের দেবদাস পড়িতেছি। ক্রমে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা যখন পড়িতে লাগিলাম, তখন মনে হইতে লাগিল, শুধু দেবদাস নয় শ্রীকান্ত, পরিণীতা, অরক্ষণীয়া সবই যেন পড়িতেছি। পরের উপন্যাসের চরিত্রের ছায়া অবলম্বন করিয়া গ্রন্থরচনায় কোনও সার্থকতা নাই। অধিকাংশ চরিত্রই ঘটনার অস্বাভাবিকতাদোষে দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

বাংলায় যুযুৎসু-শিক্ষা, প্রথম ভাগ—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এম সি. সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

রুশ জাপান যুদ্ধের পর জাপানের শরীরচর্চ্চা-প্রণালী যুযুৎসুর প্রতি বাঙালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সামান্য আলোচনাও হয়। কিন্তু ব্যাপক ভাবে বাংলা দেশে এই প্রণালীর অনুশীলন হয় নাই। যাঁহারা এই প্রণালী অনুশীলন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই পুস্তক হইতে যথেষ্ট সহায়তা পাইবেন। তিনি অতি সহজ ও সরল ভাষায় চিত্রসহযোগে কয়টি কৌশল বর্ণন করিয়াছেন। শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত ঘরে বসিয়া যাহাতে বাঙালী যুবকগণ শরীরচর্চ্চা করিতে পারেন সেজন্য দেশী ও বিদেশী বিবিধ প্রণালী সম্পর্কে বাংলায় এরূপ পুস্তকের রচনা ও প্রকাশে বিশেষজ্ঞগণের ব্রতী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভূপেন্দ্রলাল দত্ত

চণ্ডীদাস-চরিত

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের বাংলার আদি কবি মধুস্রাবী চণ্ডীদাসের জীবনচরিত সম্বন্ধে নানা মতদ্বৈধ ছিল। কিন্তু এই জীবন-চরিতখানি প্রকাশিত হওয়াতে সকল বিতণ্ডার সমাধান হইবে বলিয়া মনে করি। চণ্ডীদাস-চরিতের যে যে স্থানে ফাঁক ছিল, তাহা এই আখ্যায়িকা সুন্দর সুসঙ্গত ভাবে সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

ইং ১৬৫৩ সালে ছাতনার রাজা উত্তরনারাণ তাঁহার কবিরাজ উদয়-সেনকে চণ্ডীদাস-চরিত্র বর্ণিতে আদেশ করেন। উদয়-সেন নানা স্থানে ঘুরিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়া সংস্কৃতে চণ্ডীদাসচরিতামৃতম্ নামে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তদনন্তর ছাতনার রাজা বলাইনারাণ তাঁহার প্রিয়পাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সেনকে চণ্ডিদাসচরিতামৃতম্ গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করিতে বলেন। কৃষ্ণ-সেন উদয় সেনের প্রপৌত্র ছিলেন। ইহার রচনার তারিখ আনুমানিক ইং ১৮১৩-১৪। ইহার নাম তিনি রাখিয়াছিলেন বাসলী ও চণ্ডীদাস। সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হইবে বলিয়া এই সংস্করণের নাম রাখা হইয়াছে চণ্ডীদাস-চরিত।

চণ্ডীদাস-চরিত সামান্য চরিতগ্রন্থ নহে। ইহাতে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, জ্ঞানকর্মভক্তিযোগ, পুরাণ-মহাভারত-রামায়ণের দৃষ্টান্ত, হিন্দুধর্মের সহিত ইস্‌লামের সমন্বয় প্রভৃতি নানা জ্ঞানমার্গের কথা আছে। সংস্কৃত চণ্ডিদাসচরিতামৃতম্ এখন প্রায় লুপ্ত। বাংলা পুঁথিখানির প্রতিপাদ্য গ্রন্থ প্রায় ৪০০ বৎসরের পুরাতন। বাংলা অনুবাদও ১০০ বৎসরের অধিক পুরাতন। যাঁহারা পুঁথির লেখা দেখিয়াছেন তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন যে লেখা পুরাতন। এক শতাব্দীর পূর্বেকার বাংলাদেশের সামাজিক ধার্মিক ঐতিহাসিক নানা তথ্য এই চরিতাখ্যায়িকা হইতে পাওয়া যায়। সেই হিসাবে ইহা মূল্যবান্। রজকিনী রামীর রন্ধনে চৌরাশি ব্রাহ্মণ ভোজন, চণ্ডীদাস কর্তৃক হজরত মহম্মদের গুণকীর্তন, শিবার্চনার ব্যাখ্যা ও মূর্তিপূজার নিন্দা, চতুর্বর্ণ বিভাগ ও বিবাহ-সাঙ্কর্য লোকায়ত মত খণ্ডন, নিরাকার উপাসনার শ্রেষ্ঠতা, মল্লরাজের তাৎকালীন বৃত্তান্ত, ইত্যাদি সামাজিক ও ঐতিহাসিক হিসাবে মূল্যবান্। বিষ্ণুপুর-নিবাসী শঙ্খকারের নিকটে বাসলী-পুখরঘাটে দেবী বাসলীর ছদ্মবেশে শঙ্খ পরিধান, রামেশ্বরের শিবায়নে বর্ণিত যোগাদ্যার শঙ্খ পরিধানের বিবরণ স্মরণ করাইয়া দেয়। রণক্ষেত্রে কল্যাণীর প্রবেশ, ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে কানড়া লখ্যা প্রভৃতি রমণীর সংগ্রাম-নিপুণতা স্মরণ করাইয়া দেয়। কল্যাণীর রূপ বর্ণনা, রামীর রূপ বর্ণনা কবিত্বময়। রামীর নাম রামী, রাই, রামমণি এই ত্রিবিধ প্রকারে লেখা হইয়াছে। মিথিলার রাজা রূপনারায়ণ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলন সম্বন্ধে যে মতদ্বৈধ ছিল তাহা এখানে সুসমাহিত হইয়াছে।

বইখানি নানা ছন্দে লেখা। ইহাতে অনেক ছন্দ ভারতচন্দ্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, যথা—তোটক ছন্দে দেবীর আবির্ভাব বর্ণনা।

নিরাকার উপাসনার শ্রেষ্ঠতা, জন্মভূমির প্রতি ভক্তি, এবং নিধুবাবু ও শ্রীধর কথক প্রভৃতির পূর্বে টপ্পা গানের নমুনা আমরা ইহাতে পাইয়া চমৎকৃত ও আনন্দিত হইয়াছি। রামী যখন চণ্ডীদাসকে প্রণয় করিতে আমন্ত্রণ করিল তখন সে বলিয়াছিল—

আমি চাহি তব সাথে প্রেম বেচা কেনা।
লোকনিন্দা রাজভয় সমাজপীড়ন।
সহিতে হইবে তায় করি প্রাণপণ।
রামী কহে শুন সখা তার পরিণাম।
উভয়ে গাইব মোরা রাধাকৃষ্ণ-নাম।
চণ্ডী কহে জানি না সে প্রেম কিবা হয়।
কেমনে কোথায় মিলে কহ তা নিশ্চয়।
রামী কহে জানি আমি তুমি শুষ্ক মরু।
আমিই শিখাব প্রেম হয়ে শিক্ষাগুরু।
হাসুক জগৎ তবু তুমি আর আমি।
একপ্রাণে পরস্পর হব অনুগামী।
যতদিন না মিলিবে প্রেমের সন্ধান।
পাষাণ বাঁধিয়া বুকে হও আগুয়ান।

* * *

যেই দেখে সেই বলে করি উপহাস।
সমাজের ভয় নাই লজ্জা নাই করে।
রামী-সঙ্গে চণ্ডীদাস থাকে এক ঘরে।
দিবস রজনী তার রামী সঙ্গে খেলা।
রামী ধ্যান রামী জ্ঞান রামী জপমালা।
ছাপিত না রল কিছু সব গেল জানা।
লজ্জা ভয় নাই তবু নাই শুনে মানা।

চণ্ডীদাস সমাজের উৎপীড়নে প্রায়শ্চিত্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে রামী কাশী হইতে আসিয়া বলিয়া উঠিলেন—

চণ্ডী চণ্ডী চণ্ডীদাস পুরুষরতন।
প্রায়শ্চিত্ত কর তুমি একি বিড়ম্বন।
জেতে জাত দিলে তুমি আমি যাব কোথা।
কোন দিন চণ্ডী তুমি ভেবেছ সে কথা।

রমণীর জাতি গেলে জাতি নাহি পায়।
ভাসাইলি শেষে চণ্ডী অকূলে আমায়।
আর আর করি তবে শেষ সম্ভাষণ।
বলি রামী চণ্ডীদাসে দিলা আলিঙ্গন।

প্রাচীন পুস্তকের যাহা দস্তুর, অপ্রাকৃত বর্ণনা দিয়া ঐতিহাসিকত্ব আচ্ছন্ন করা হয়, ইহাতে সেইরূপ চণ্ডীদাসের চতুর্ভুজধারণের বর্ণনা আছে।

সমাজপতিরা সকলে একমত হইয়া স্থির করিলেন
চণ্ডীর জীবনদণ্ড রামী নির্বাসন।
স্বস্তি স্বস্তি বলি সবে দিলা অনুমতি।

ভিন্ন জাতের সংসর্গে থাকিলে যেমন সমাজের নির্যাতন হইত, তেমনি আবার বহু কাল রজকিনী ব্রাহ্মণ-সম্পর্কে থাকাতে ব্রাহ্মণী বলিয়া পরিগণিতা হইয়াছিল ইহারও দৃষ্টান্ত এই পুস্তকে পাই।

একটি টপ্পা গানের নমুনা এখানে উদ্ধৃত করিয়া কবির কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিতেছি—

প্রভাত হইল গভীর রাতি ওই উষা জাগে ধীরে।
আর কেন রবে আঁধার-প্রবাসে, এস প্রিয়তম ফিরে।
আঁখি হতে যদি গেছে ঘুমঘোর,
রাখিব না বাঁধি, করিব না জোর,
প্রেমরণে আজি পরাজয় মোর মাগি লব নতশিরে।
রচেছি মিলন-বাসর তুমার সৃজন-প্রলয় যেথা একাকার,
মায়াময় ভব-পারাবার পার এ মম বক্ষ-নীড়ে।

ব্রজবুলিতে রচিত কয়েকটি সুমধুর গান এই বইয়ে আছে।

চণ্ডীদাস হিন্দুধর্ম ও মুসলমান ধর্ম সমন্বয় করিতে গিয়া বলিতেছেন—

চণ্ডীদাস কহে হাসি শুন রহমন।
সর্বত্র আছয়ে মোর শ্রীরাধারমণ।

* * *

রহমন বলিতেছেন—

হিন্দুর সে আগু বাক্যে শুনি নাই কভু।
আপনার রাধাশ্যাম জগতের প্রভু।
জন্ম-মৃত্যু ছিলা যার রোগ-শোক-জরা।
দুনিয়ার কর্তা প্রভু কিসে হবে তারা।
আপনার যোগ্য হয় ধর্ম ইস্‌লাম।
দুঃখ হয় তব মুখে শুনি রাধাশ্যাম।
আমার যে আল্লা সেই ব্রহ্ম তব হয়।
উভয়ের শাস্ত্রে তার দেখি সমন্বয়।
কহ প্রভু হই আমি অতীব বেহুঁশ।
কেমনে সে হয় ব্রহ্ম একটি মানুষ।

ইহার উত্তরে,

চণ্ডীদাস কহে সকলি মানুষ শুন হে মানুষ ভাই।
সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।

চণ্ডীদাসের এই মহামানব-তত্ত্ব অতি-আধুনিক। তেমনি তাঁহার এই গানটির কবিত্ব ও প্রকাশ-ভঙ্গিমা যদি রবীন্দ্র-রচনাকে স্মরণ করাইয়া দেয় তাহা হইলে আনন্দিত হইব. আধুনিকতার অপবাদ দিয়া ইহাকে দূরে সরাইয়া রাখিব না।

অন্ধ-নয়ন-আলোক আইস, এস অন্তরযামী।
অন্তরতম সুন্দর এস, এস হে জীবনস্বামী।
বস হৃদয় কমলাসনে
এ গহন স্বপন ভাঁগ,
কোটিকল্প-অমানিশা-ঢাকা প্রিয়তম মম জাগ।
রুদ্ধ মরম-আগল খোল, তুমার রূপের আলোক জ্বাল.
তুমার অনাদি সঙ্গীত ঢাল পরাণে দিবস-যামি।

এমনি বহু অংশ আধুনিকতার ছোপ-লাগা। এই জন্য বিস্মিত হইতে হয়, কিন্তু আধুনিকতার অপবাদ দিয়া ইহাকে দূর করা যায় না কিছুতেই।

এই পুস্তকের সংস্কার করিয়া রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা এই পুস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। যিনি ইহা পাঠ করিবেন তিনিই ইহাতে পরম সন্তোষ লাভ করিবেন নিঃসন্দেহ। বইখানি প্রকাণ্ড. প্রবাসীর আকারের ২৩৫ পৃষ্ঠা, মূল্য মাত্র আড়াই টাকা। আকার ও উপাদানের তুলনায় মূল্য সুলভই হইয়াছে বলিতে হইবে।

কবি নারদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

পরিণত সহকার যৌবনের ফল
করিছে শীতল স্নিগ্ধ জলদ সজল ;
ফলভরনম্র জম্বু নিকুঞ্জ চঞ্চল
পাতিয়াছে ভূমিতলে নীল চেলাঞ্চল ;
স্বর্ণবর্ণে কর্ণ অবতংসে লিচুফল
পবনহিল্লোলে দোলে সরস পেশল ;
শতনেত্রে স্বতন্ত্রতা, রাখি আনারস,
কণ্টকে আবৃত দেহ পরুষ কর্কশ,
মরমের ভাষা রাখে করি সঙ্গোপন,
অন্তঃস্পর্শে রসোল্লাসি হৃদয় আপন।

হরিত কপিশ বর্ণ কদম্বকেশর,
জলকণবাহি বায়ু পরশ চঞ্চল,
হরষসরস তনু পরাগধূসর,
পর্ণে পর্ণে নিরন্তর দুলায় অঞ্চল ;
গন্ধরাজ মেলে পাখা সন্ধ্যা-সমাগমে,
চিক্কণ নিবিড় নীল পাতার ভিতরে,
আন্দোলিত হৃদয়ের স্পর্শে, প্রিয়তমে
পেতে চায় আপনার গন্ধের অন্তরে।
উচ্চ তরুশীর্ষে, পীতাভ হরিত স্পর্শে,
মন্দ মন্দ পবন আন্দোলে চম্পা দোলে,
মুকুলিত যৌবনের লাবণ্যের হর্ষে ;
গন্ধ ঢালে আলিঙ্গিত পবনের কোলে।

শুকচঞ্চু চারু আভা অঙ্কুর শিহরে,
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পল্লীপুরে পবন বিহরে,
স্নিগ্ধ জনপদবধূ বিলোল লোচনে
নেহারে জলদদল কাজল রোচনে ;
ঝিলে বিলে ফুটিয়াছে কুমুদ-কহ্লার,
জলধর ধারা গাহে রাগিণী মল্লার ;
নলিনী-নিলীন ভৃঙ্গ গুনগুনি উঠে,
বারিধৌত কিশলয়ে সূর্য্যকর ফুটে,
রূপে রসে গন্ধে ঝরি সৌন্দর্য্যের ধারা,
আনন্দসঙ্গীত মাঝে হয় আত্মহারা।

এ সৌন্দর্য্য কোথা হোতে ওঠে ?
এ নির্ঝর কোথা হোতে ছোটে ?
হে নারদ, তুমি তার জান কি সন্ধান !
তোমার বীণার গূঢ় যন্ত্রে,
কে পূরিত করে নব মন্ত্রে ?
ঝঙ্কারি' কে তোলে, বিশ্বরহস্যের গান ?
ছন্দসাগরের মাঝে তুলি উর্ম্মিতান।

ধ্যানলুপ্ত সমাধির মাঝে,
যে অখণ্ড অনুভূতি রাজে,
যে ছবিতে বিশ্বপুরী নয়ন ভুলায়,
ঋতুতে ঋতুতে পুষ্পদলে,
বনস্পতি লতাগুল্ম ফলে,
পশুপক্ষী পতঙ্গের নব নব রূপে
কে জ্বালায় আনন্দেতে চেতনার ধূপে ?

তুমি কি রহস্য জান তার ?
কি ছন্দেতে প্রভাত সন্ধ্যার
নিত্য নিত্য ফুটে ওঠে বর্ণ-মহোৎসব !
ঘন তমসার অন্ধরাতে
হেরি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাপাতে,
করুণ বিয়োগ দুঃখে কান্ত অনুভব,
হাসিকান্না সুখে দুঃখে চঞ্চল বৈভব।
তরঙ্গিত ছন্দসুরধারা
বিশ্ব তাহে হয়ে আছে হারা,
দেখি' তারে চঞ্চলিত অণুর স্পন্দনে,
তরুর অন্তরে পুষ্প-লিখা,
মেঘগর্ভে বিজলীর শিখা,
সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, জ্যোতিরঙ্গবন্ধনে,
প্রভাতে, সন্ধ্যায়, নিত্য, পাখীর বন্দনে ;

নরনারী প্রেমের অঙ্গনে,
আকর্ষণে ঘন আলিঙ্গনে,
করুণ নেত্রের নব জলধারাপাতে,
ঘন ঘন বক্ষের দোলায়,
আলুলিত বেণীর শোভায়,
দুঃসহ বিচ্ছেদছায়া বিদায়ের প্রান্তে,
বিয়োগের লগ্নকালে মধু জ্যোৎস্নারাতে ;—
যে-নিয়মে গ্রহ-আবর্ত্তন,

অণুমাঝে শক্তি-বিবর্ত্তন,
সে-নিয়মে কায়ামাঝে শিহরিছে প্রাণ ;
হৃদয়ে হৃদয়ে নাচে মায়া,
আলোতে আলোতে বর্ণছায়া,
সেই ছন্দে ওঠে, বিশ্বের শৃঙ্গার-গান
আপনারে বিলাইয়া আপন কল্যাণ ;

কে তুলিল কণ্ঠে তব গান ?
কে জাগাল বীণাতারে তান ?
তুমি ও তোমার বীণা ভিন্ন কভু নহে,
ছন্দোরূপী অশরীরী তুমি !
চেতনার স্পন্দ রহ চুমি,
সৌন্দর্য্যের কলধ্বনি শব্দস্রোতে বহে
কল্পনার নৃত্যমাঝে সুপ্ত শব্দ রহে ;

অনাদি কালের স্রোতে
অনন্তের নিত্যযাত্রা পোতে,
ভেসে আসে চরণ চারণ ধ্বনি তব,
যুগে যুগে কবিচেতনায়,
অর্থে রসে ছন্দ ছুটে যায় ;
বারে বারে তোমারে হেরেছি অভিনব
পুরাতন মাঝে তব নব অনুভব।

করো নি করো নি তুমি দেরী,
বাজিয়েছ নব-যুগ-ভেরী,
কলিরে হেরেছ তার প্রস্ফুটিত দলে,
নব যুগে নব আবির্ভাব,
ছন্দে রসে নব নব ভাব,
অঙ্কুরে করেছ সত্য পত্রে পুষ্পে ফলে,
অখণ্ড সত্যের ব্যাপ্তি দিনে দণ্ডে পলে।
কেমনে বিশ্বের ছন্দ আসি,
তোমারে সমগ্রে ফেলে গ্রাসি ?
দেখি যেন তোমার আদিম স্পন্দ প্রাণ,
বৈকুণ্ঠের ভ্রমর-গুঞ্জনে,
সরস্বতী-নূপুরশিঞ্জনে,
সুরময় ছন্দোময় আতান বিতান,
যা দিয়েছে জগতের আদি জন্মদান।

নন্দনের নৃত্যের ঝঙ্কারে,
কঙ্কণের কণ রণৎকারে,
নেত্রনীল পদ্মবনে, লাবণ্য উথলে,
তারি ছায়া ঝরি' অবিরল
তপ্ত সুরা করিছে তরল,
বাসবের হস্তলগ্ন পাত্র ছলছলে,
বিম্বিত শশাঙ্ক নেত্র লুব্ধ পরিমলে।

বুঝি তারই নৃত্যবিহরণ,
ধমনীতে করি সঞ্চরণ
তৃষ্ণোড্ডীন করে তব সৌন্দর্য্য-পিপাসা,
তাই বুঝি নেচে ছন্দ চলে,
অন্তর্য্যামী চরণ চপলে
জেগে ওঠে অনন্তের দীপ্তিভরা আশা,
অমৃতনির্ঝরে ঝরে লাবণ্যের ভাষা ;

সপ্তর্ষির আশীর্ব্বাদভরে
যে পুষ্করমাল্যখানি ঝরে,
মন্দ মন্দ আন্দোলিত মন্দাকিনী-জলে,
গৌরীর কটাক্ষস্মিত হাসে
অভিষিক্ত হয়ে ভেসে আসে,
ঝরে পড়ে মৃণাল লাঞ্ছিত তব গলে,
কোমল প্রেমের স্পর্শে হৃদয় উথলে,

তাই বুঝি শতদলদলে,
সকলের হৃদয়কমলে,
চঞ্চলিয়া যে ভাবলাবণ্য ওঠে ফুটে,
শিবশিবানীর ধ্যান এসে
তোমার সমাধি সাথে মেশে,
চকিতে প্রকাশ পেয়ে নির্ঝরিয়া ছুটে
জড়তার অন্ধকার ক্ষণে যায় টুটে ;

উমার লাবণ্য তপঃফলে
যে নিগূঢ় অর্থ প্রেমে জ্বলে,
পঙ্কতনুশ্রিত পদ্ম অতনু বিভায়,
দীপ্তি পায় নবীন বৈভবে,
নব হোতে নব অনুভবে ;
তারি এক কণা ফোটে তব তপস্যায়,
পুষ্পদেহে দেহহীন গন্ধ যথা যায়।

হে নারদ, বারে বারে তোমারে করি গো নমস্কার,
তোমার বন্দনা মাঝে হিমালয়ে করি আবিষ্কার ;
হে দেবতা, উচ্চ হোতে উচ্চে তব উঠিয়াছে শির,
তবু তব পাদমূল চুমি আছে ভোগবতী নীর ;
ভক্ত তব ভক্তিভরে অর্ঘ্য ঢালে গন্ধভরা ফুল;
কে জানে সে অর্ঘ্য তব হবে কিনা হবে অনুকূল
মনে মনে কত ভক্ত নিত্য গাঁথে নব পূজাহার,
বাক্যমাঝে মুগ্ধ তুমি, জান কি না জান মূল্য তার ;
হৃদয় আসনে আজি তোমারে করি গো আবাহন,
বাক্য হও ছন্দ হও, প[illegible] অর্ঘ্য কর গো গ্রহণ,
উচ্চতম দিব্যদেশে অশরীরী সূর্য্যকররেখা,
প্রভাত-বিহঙ্গ তারে নিত্য দেয় কূজনের লেখা।

[শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত]

পত্রোত্তর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বন্ধু,

চিরপ্রশ্নের বেদী-সম্মুখে চিরনির্বাক রহে
বিরাট নিরুত্তর,
তাহারি পরশ পায় যবে মন নম্র ললাটে বহে
আপন শ্রেষ্ঠ বর।
খনে খনে তারি বহিরঙ্গন-দ্বারে
পুলকে দাঁড়াই, কত কী যে হয় বলা,
শুধু মনে জানি বাজিল না বীণাতারে
পরমের সুরে চরমের গীতিকলা॥

চকিত আলোকে কখনো সহসা দেখা দেয় সুন্দর,
—দেয় না তবুও ধরা,
মাটির দুয়ার ক্ষণেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর
দেখায় বসুন্ধরা।
আলোকধামের আভাস সেথায় আছে
মর্ত্যের বুকে অমৃত পাত্রে ঢাকা ;
ফাগুন সেথায় মন্ত্র লাগায় গাছে,
অরূপের রূপ পল্লবে পড়ে আঁকা॥

তারি আহ্বানে সাড়া দেয় প্রাণ, জাগে বিস্মিত সুর,
নিজ অর্থ না জানে।
ধূলিময় বাধাবন্ধ এড়ায়ে চলে যাই বহুদূর
আপনারি গানে গানে।
দেখেছি, দেখেছি, এই কথা বলিবারে
সুর বেধে যায়, কথা না জোগায় মুখে,
ধন্য যে আমি সে কথা জানাই কারে
পরশাতীতের হরষ জাগে যে বুকে॥

দুঃখ পেয়েছি, দৈন্য ঘিরেছে, অশ্লীল দিনে রাতে
দেখেছি কুশ্রীতারে,
মানুষের প্রাণে বিষ মিশায়েছে মানুষ আপন হাতে
ঘটেছে তা বারে বারে।
তবু তো বধির করে নি শ্রবণ কভু,
বেসুর ছাপায়ে, কে দিয়েছে সুর আনি,
পরুষ কলুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তবু
চিরদিবসের শান্ত শিবের বাণী।

যাহা জানিবার কোনোকালে তার জেনেছি যে কোনো কিছু
—কে তাহা বলিতে পারে।
সকল পাওয়ার মাঝে না-পাওয়ার চলিয়াছি পিছু পিছু
অচেনার অভিসারে।
তবুও চিত্ত অহেতু আনন্দেতে
বিশ্বনৃত্যলীলায় উঠেছে মেতে।
সেই ছন্দেই মুক্তি আমার পাব,
মৃত্যুর পথে মৃত্যু এড়ায়ে যাব।

ওই শুনি আমি চলেছে আকাশে বাঁধনছেঁড়ার রবে
নিখিল আত্মহারা।
ওই দেখি আমি অন্তবিহীন সত্তার উৎসবে
ছুটেছে প্রাণের ধারা।
সে ধারার বেগ লেগেছে আমার মনে,
এ ধরণী হতে বিদায় নেবার ক্ষণে ;
নিবায়ে ফেলিব ঘরের কোণের বাতি,
যাব অলক্ষ্যে সূর্য্যতারার সাথী॥

কী আছে জানি না দিন-অবসানে মৃত্যুর অবশেষে ;
এ প্রাণের কোনো ছায়া
শেষ আলো দিয়ে ফেলিবে কি রং অস্তরবির দেশে,
রচিবে কি কোনো মায়া ?
জীবনেরে যাহা জেনেছি অনেক তাই,
সীমা থাকে থাক, তবু তার সীমা নাই।
নিবিড় তাহার সত্য আমার প্রাণে
নিখিল ভুবন ব্যাপিয়া নিজেরে জানে॥

মংপু. দার্জ্জিলিং
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

['কবি নারদ' কবিতার উত্তরে অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে লিখিত]
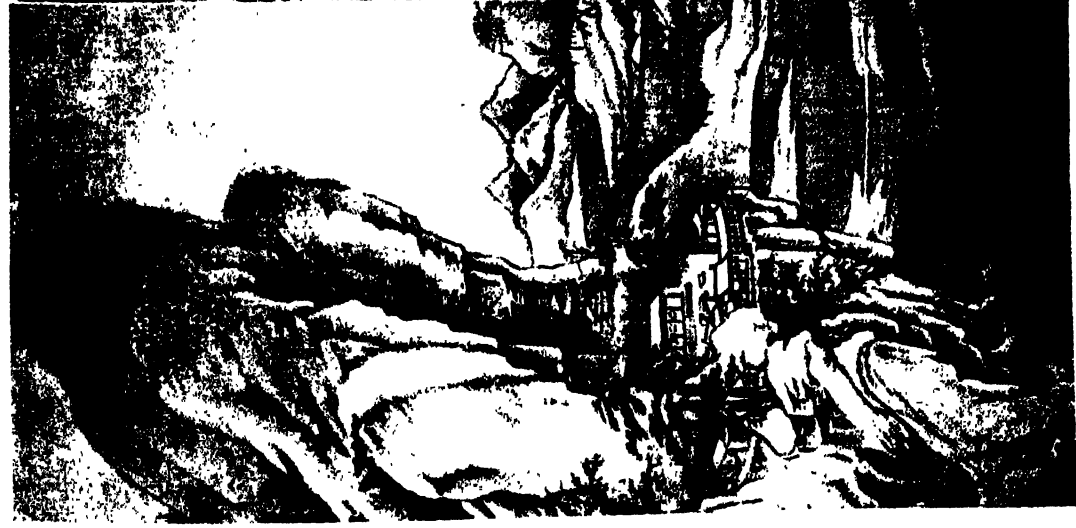
চীনের প্রাকৃতিক দৃশ্যচিত্রাবলী। মিং রাজত্ব হইতে সুং রাজত্বকালে (দশম হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী) অঙ্কিত। পিকিং প্রাসাদ মিউজিয়মের চিত্রসংগ্রহ হইতে।

তাং ঙ্কিত পিকিং প্রাস মিউজিয়মের চিত্রসংগ্র ইতে

চীনের পিকিং প্রাসাদ মিউজিয়ম

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহযাত্রীরূপে চীন ভ্রমণের সময় ১৯২৪ সালে শেষ মাঞ্চু সম্রাট সুয়ান টুঙ কর্ত্তৃক তাঁর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাসাদে আমন্ত্রিত হয়ে পিকিং প্রাসাদ মিউজিয়মে চীনদেশের অপূর্ব্ব কলাসম্পদের সমাবেশ প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। পরে সম্রাটের পলায়নের পর ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে এই প্রাসাদ মিউজিয়ম বিধিমত উদ্বোধিত ও সাধারণের নিকট সর্ব্বপ্রথম উন্মুক্ত হয়, এবং দর্শকদের সুবিধার জন্য এই সংগ্রহের সমস্ত শিল্প-নিদর্শনের একটি পরিচায়ক তালিকা রচিত হয়।

১৯১৪ সাল থেকে চীনের দেশ-বিভাগ (Ministry of the Interior) পিকিং প্রাচীন শিল্প-মিউজিয়মের পরিচালন ও সংরক্ষণ করে আসছিলেন। এখানকার "মহাঐক্যভবন" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমস্ত রাজকীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের এইটিই ছিল প্রধান কেন্দ্র। মুকডেন ও জেহলের পূর্ব্বতন রাজপ্রাসাদ থেকে বহু শিল্প-সম্পদ এইখানে এনে রক্ষা করা হয়। ১৯৩০ সালে এই মিউজিয়মটি জাতীয় প্রাসাদ মিউজিয়মের কর্ত্তৃত্বাধীন হয়। পাঁচটি বিভাগে এই মিউজিয়মটি বিভক্ত, তার মধ্যে "ভাস্বর-ভবন" সর্ব্বপ্রধান; এরই পিছনে রাজ-উদ্বাহ-ভবন এবং সম্রাজ্ঞীর সিংহাসন-কক্ষ (Throne Hall of the Empress); তার পরে শোভন রাজোদ্যান, এইখানেই সম্রাট তাঁর দুই মহিষী সমভিব্যাহারে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযাত্রীদের সম্বর্দ্ধনা করেছিলেন।

প্রাসাদের অনেকগুলি কক্ষ প্রদর্শনী-গৃহে পরিণত হয়েছে, তার মধ্যে কতগুলি সর্ব্বদাই সাধারণের নিকট উন্মুক্ত থাকে, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে উন্মুক্ত রাখা হয়। চীনের বিচিত্র স্থাপত্য, গৃহসজ্জা প্রভৃতির পরিচয় এই প্রাসাদে যেমন পাওয়া যায় অন্যত্র কোথাও তেমন পাওয়া সম্ভব নয়। অসওয়াল্ড সাইরেন তাঁর গ্রন্থে এই সব প্রাসাদের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন।

প্রাচীনতার দিক দিয়ে দেখতে গেলে চউ বংশের সময়কার, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৫০০-১০০০ সালের ব্রোঞ্জের কাজগুলিই এই মিউজিয়মের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শিল্পনিদর্শন। তার পরে জেড (jade) ও অন্যান্য মূল্যবান প্রস্তরনির্ম্মিত শিল্প-নিদর্শনগুলির উল্লেখ করতে হয়। হস্তিদন্ত-প্রস্তুত জিনিষগুলির শিল্পমূল্যও কম নয়।

সুং বংশ থেকে মিং বংশের রাজত্বকালের সময়ের চীনে পোর্সলেনের তৈরি শিল্পদ্রব্যের প্রায় ৬০০০ নিদর্শন এই মিউজিয়মে আছে। গঠননৈপুণ্য, পরিকল্পনা ও বর্ণসুষমায় এগুলি চীন-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। চীনের প্রাচীনতম চিত্র-নিদর্শনাবলী চীনদেশ থেকে চলে গিয়েছে, সেগুলি এখন ব্রিটিশ মিউজিয়মের শোভা বর্দ্ধন করছে। প্রাসাদ মিউজিয়মে সব চেয়ে পুরাতন ছবি যা আছে তা সিন্ যুগের (Tsin dynasty—265-419 A. D.)। টুং যুগের (Tung dynasty) দু-একটি স্কেচ এখানে দেখতে পেলাম, শক্তির ব্যঞ্জনায় সেগুলি অপরূপ। এই সময় ও তৎপরবর্ত্তী কালের বহু চিত্র-নিদর্শন এই মিউজিয়মে দেখতে পেয়েছিলাম—সুং, (Sung), য়ুয়ান (Yuan) ও মিং (Ming) যুগের প্রায় ৮০০০ চিত্রমালা এখানে আছে। মিউজিয়ম-কর্ত্তৃপক্ষ এর মধ্য থেকে নির্ব্বাচিত চিত্রের অনেকগুলি প্রতিলিপি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন।

লঘু শিল্পের অনেক বিচিত্র ও বহুমূল্য নিদর্শনও এই মিউজিয়মের সংগ্রহে আছে—যেমন হস্তিদন্তের পাখা, ছবি আঁকবার, ও লিখবার সরঞ্জাম, খোদাই করা বাঁশের কাজ, সোনারূপোর কাজ করা কাপড়, ইত্যাদি। ভারতশিল্পের তত্ত্বানুসন্ধিৎসুরা ভারতবর্ষ, নেপাল ও তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্মসংশ্লিষ্ট নানা

মূর্ত্তি ও চিত্র প্রভৃতিতে আলোচনার অনেক উপাদান এখানে পাবেন। নাগরী অক্ষরে লেখা কতকগুলি দলিল-পত্র দেখে বিস্মিত হ'তে হ'ল। এগুলি সম্ভবত চীনে নেপালের দূতাবাস থেকে চীন-রাজদরবারে এসেছিল।

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি, বই, ঐতিহাসিক দলিল-পত্রের বিরাট সংগ্রহ প্রাসাদ মিউজিয়মে আছে। ১৯৩১ সালের গণনানুসারে এখানে প্রায় ৩৭০,০০০ খণ্ড পুস্তক ছিল; এবং এর মধ্যে অনেক বইই অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। অনেকগুলির এক খণ্ডও অন্যত্র পাওয়া যায় না। ১৭২৪ সালে মুদ্রিত চীনের বিখ্যাত বিশ্বকোষ (৫০০০ খণ্ড), সুং, য়ুয়ান ও মিং যুগের অনেক প্রথম সংস্করণের পুস্তক ও সম্রাট সিয়েন লুং-এর লাইব্রেরির ৩৬,০০০ হাতে-লেখা পুথি, বহু অপ্রকাশিত ঐতিহাসিক কাগজপত্র ও সম্রাটদের ব্যবহৃত বহু পোষাক, ঢাল, অলঙ্কার ইত্যাদি অনেক মূল্যবান দ্রব্যাদি এখানে আছে।

এই প্রবন্ধের সঙ্গে চীনের প্রাকৃতিক দৃশ্যচিত্রগুলি যা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি পিকিং প্রাসাদ মিউজিয়মের সংগ্রহ থেকে এসেছে (সুং যুগ থেকে মিং যুগের; দশম-চতুর্দ্দশ শতাব্দী)। এই পর্য্যায়ের ছবিই জাপানে সাদরে নিয়ে যাবার ফলে মধ্যযুগে জাপানী চিত্রকলার অপূর্ব্ব বিকাশ হয়। অনেক জাপানী ছবির মূল হচ্ছে এই জাতীয় চীনে ছবি। রঙের আতিশয্য না দেখিয়ে, কোন চড়া রং ব্যবহার না করে শুধু শাদা-কালোর যোজনায় কতটা বৈচিত্র্য ও গভীরতার সঞ্চার করা যায় চীনে ওস্তাদরা সেটা অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে প্রকাশ করেছে।

বিষয়-বস্তুর বিচার করে দেখা যায় এই ধরণের প্রকৃতিরূপ-দর্শন (Nature-study) Zen-Buddhismএর ধ্যানদৃষ্টিতেই সম্ভব হয়েছিল: Zen, 'ধ্যান' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র এবং চীন থেকে জাপান পর্য্যন্ত এই রীতির প্রভাব বহু শতাব্দী ধ'রে চলেছিল। এই যুগের অনেক বড় ছবি "জেন্-কলমে"র বৌদ্ধ-ভিক্ষু চিত্রকরদের শ্রেষ্ঠ অবদান। প্রকৃতির সঙ্গে এমন অপরোক্ষ যোগ, এমন নিবিড় আত্মীয়তা পৃথিবীর কোন চিত্রশিল্পী দেখাতে পারেন নি।

ক. ন.

উপান্তিকা

শ্রীজীবনময় রায়

আঁধারিয়া আসে অকালসন্ধ্যা ঘোর,
ডাকিছে গগনে গুরুগরজনে দেয়া,
ছিঁড়িয়াছি আজ কূলের বাঁধন-ডোর,
অজানার পানে ভাসায়েছি ভাঙা খেয়া;
এসেছি ঘুচায়ে সুখদুখভয়লাজ,
খুলিয়া ফেলেছি সব উৎসব-সাজ,
হৃদয়-শোণিতে চুকায়েছি দেয়ানেয়া।
গভীর রজনী ঘনায়ে আসিছে ধীরে,
মাতাল তরণী উতল মত্ত নীরে;
স্মরণের ধন আঁধারে মিলায় তীরে,
মরণ-সিন্ধু ঘন ঘন ঘন ডাকে।

ক্ষীণ দীপরেখা নিকষের বুক চিরে
হায় কোথা হ'তে নয়নে বাঁধিয়া রাখে!
সমুখে সাগর মহাকাল উতরোল,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে হের জলে মৃত্যুর চিতা;
ওগো কে ডাকিছ! কোথা জুড়াবার কোল!
সুখ-উৎসবে আমি যে অবাঞ্ছিতা।
বিদায় বন্ধু বেদনায় সুখে দুখে,
নীরবে মিলাই বিস্মরণের বুকে,
শুনি দুর্জ্জয় মহামরণের গীতা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভাষা-অনুযায়ী প্রদেশ

বিলাতে ভারতসচিবের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ভারতবর্ষকে আর বেশী প্রদেশে বিভক্ত করিতে চান না। আপাততঃ চান না, না চিরকালের জন্যই চান না, তাহা বলা অনাবশ্যক। কেন না, ভারত-শাসনে হউক বা অন্য কাজেই হউক, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট কোন একটা নীতি অনুসরণ করিয়া চলেন না; যখন যে নীতিটা ব্রিটিশ জাতির পক্ষে সুবিধাজনক মনে হয় তাহারই অনুসরণ করেন। সুতরাং এখন ভারতসচিব একটা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই সেটা আর টলিবে না, মনে করা ভুল।

অন্ধ্রদেশের লোকেরা তাহাদের দেশটিকে একটি পৃথক প্রদেশ করিবার জন্য অনেক দিন হইতে আন্দোলন করিতেছেন। কর্ণাটের লোকেরাও তাঁহাদের দেশকে একটি আলাদা প্রদেশ করাইতে চান। এই দুটি অঞ্চল মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত। তথাকার ব্যবস্থাপক সভা এই দুটি আলাদা প্রদেশ হওয়ার সপক্ষে মত জানাইয়াছেন। ভাষা অনুযায়ী প্রদেশ গঠনে কংগ্রেসের মত আগে হইতেই আছে।

অন্ধ্র ও কর্ণাটের লোকদের আন্দোলনের উদ্দেশেই হয়ত ভারতসচিবের মত জ্ঞাপিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঐ দুই দেশের লোকদের আন্দোলন থামে নাই, বরং প্রবলতর হইয়াছে।

ভাষা-অনুসারে প্রদেশ গঠিত হইলে তাহার অনেক সুবিধা আছে। শিক্ষা ও সরকারী কাজ একটি ভাষাতেই হইতে পারে, প্রাদেশিক কেবল একটি সংস্কৃতির উন্নতির জন্য প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট চেষ্টা করিতে পারেন, একই প্রদেশের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী নানা দলের চাকরী-আদি লইয়া ঝগড়া রেষারেষি হয় না, ইত্যাদি।

কিন্তু ভিন্নভিন্নভাষাভাষী লোকদিগকে লইয়া এক একটি প্রদেশ গঠনের কিছু সুবিধাও আছে। ভারতবর্ষে অনেকগুলি ভাষা প্রচলিত। প্রধান প্রধান যে ভাষাগুলির পুরাতন ও আধুনিক সাহিত্য আছে, তাহাদেরই সংখ্যা বার-তেরটি। সমগ্র ভারতবর্ষে যদি কোন একটি অন্তঃ-প্রাদেশিক সাধারণ ভাষা চলিত হয়, তাহা হইলেও এই প্রধান ভাষাগুলির সমস্তই লোপ পাইবে না। এবং সমগ্র ভারতবর্ষের একটি অখণ্ড রাষ্ট্ররূপে থাকাও স্বাধীনতা লাভ ও রক্ষার পক্ষে আবশ্যক। সুতরাং ভারতবর্ষের লোকদিগকে অনেকগুলি ভাষা লইয়া ঘরকন্না করিতে হইবে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য হেতু ইহাতে লাভ আছে। ইহাতে সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতি প্রাদেশিক সংস্কৃতিসমূহের সহযোগিতায় সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু এত ভাষাভাষী লোক লইয়া সদ্ভাবে ঘরকন্না করা কঠিন, এবং সদ্ভাব না থাকিলে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা হয় না। একাধিকভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া এক একটি প্রদেশ গঠিত হইলে একাধিকভাষাভাষী লোকদের সদ্ভাবে একত্রবাসের শিক্ষানবীশিটা হয়।

কিন্তু সদ্ভাব রক্ষা করা বড় কঠিন। দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইতেছি।

—

বিহার প্রদেশে বিহারপ্রদেশী বাঙালী

বিহার প্রদেশটি বিহার দেশ এবং বাংলা দেশের কয়েকটি টুকরা, ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা লইয়া গঠিত। কিন্তু সমুদয় প্রদেশটির নাম বিহার দেশের নাম অনুসারে রাখা হইয়াছে বলিয়া বিহার দেশের বিহারী লোকেরা এরূপ ব্যবহার করিতেছেন যেন কেবল তাঁহারাই বিহার প্রদেশের বিহারপ্রদেশী লোক ও মালিক, এবং বিহার প্রদেশের অন্তর্গত বাংলা দেশের টুকরাগুলির, ছোটনাগপুরের ও সাঁওতাল পরগণার লোকেরা বিদেশী! কিন্তু বাস্তবিক কথা এই যে, এই শেষোক্ত লোকেরাও ঠিক বিহারপ্রদেশী বিহারীদের মতই বিহারপ্রদেশী। বিহার প্রদেশের বিহারপ্রদেশী বিহারী, বিহারপ্রদেশী

বাঙালী, বিহারপ্রদেশী সাঁওতাল, বিহারপ্রদেশী মুণ্ডা, বিহারপ্রদেশী ওরাঁও, প্রভৃতি প্রত্যেকের রাষ্ট্রিক অধিকার সমান। কিন্তু বিহার প্রদেশটির নাম বিহার হওয়ায় এবং বিহারপ্রদেশী বিহারীরা সংখ্যায় বিহারপ্রদেশী অন্যভাষাভাষী এক একটি সমষ্টি অপেক্ষা বড় হওয়ায়, তাঁহারা এই অন্যদের সমরাষ্ট্রিকতা ও সমপ্রাদেশিকতা স্বীকার করিতেছেন না।

আমরা এরূপ বলিতেছি না, যে, আগন্তুক বাঙালী-দিগকেও বিহারপ্রদেশী বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। আমরা বলিতেছি, বিহার প্রদেশের যে-কোন অংশের যে-কোন স্থায়ী অধিবাসীকে বিহারপ্রদেশী বলিয়া মুখে ও কার্য্যতঃ স্বীকার করিতে হইবে—তাঁহার মাতৃভাষা যাহাই হউক। বিহারপ্রদেশী বিহারী মন্ত্রীরা তাহা করিতেছেন না। একটি দৃষ্টান্ত দি।

মানভূম জেলা বিহার প্রদেশের অন্তর্গত। এই জেলার রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে তথাকার স্থায়ী অধিবাসী তাহার সরকারী অভিজ্ঞানপত্রও (ডোমিসাইল সার্টিফিকেটও) তাঁহার আছে। তিনি বিহার প্রদেশের অরণ্য-সংরক্ষকের আপিসে একটি চাকরীর নিমিত্ত আবেদন করেন। আপিসের ইংরেজ বড় কর্ত্তা রামকৃষ্ণবাবু যোগ্যতম প্রার্থী বলিয়া বিহার-গবর্ন্মেণ্টকে অর্থাৎ বিহারী মন্ত্রিমণ্ডলকে লেখেন। কিন্তু যেহেতু রামকৃষ্ণ বাবুর মাতৃভাষা বাংলা সেই জন্য তাঁহাকে চাকরীটি দেওয়া হইল না! অথচ বিহারপ্রদেশী বিহারী প্রধান মন্ত্রী বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বিহার ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছেন তাঁহারা বিহারপ্রদেশী বিহারী ও বিহারপ্রদেশী বাঙালীতে কোন প্রভেদ করেন না!!

সরকারী চাকরীতে নিয়োগে বিহারপ্রদেশী বাঙালীর বিরুদ্ধে যেরূপ গর্হিত ব্যবহার করা হয়, বিহারের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিহারপ্রদেশী বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্ত্তি হওয়া সম্বন্ধেও এবং পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইলেও বৃত্তি পাওয়া সম্বন্ধেও সেইরূপ অবিচার করা হয়। বিহারপ্রদেশী বাঙালী ছাত্রছাত্রীরা সামর্থ্য ও ইচ্ছা থাকিলেই বিহারে শিক্ষা পাইবেই, এরূপ সম্ভাবনা নাই। অথচ তাহাদের মধ্যে কেহ যদি বিহারে শিক্ষালাভ করিতে না পাইয়া বঙ্গে আসিয়া শিক্ষা পায়, তাহা হইলে, সে যে বিহারপ্রদেশী বাঙালী নহে, বঙ্গের বাঙালী, ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। বিহার প্রদেশে বাংলা ভাষাকে বাঙালী ছাত্রছাত্রীদিগের শিক্ষার্থ মাতৃভাষার ন্যায্য স্থান দেওয়া হইবে কি না, এখনও তাহা অনিশ্চিত।

—

আসাম প্রদেশের আসামী ও বাঙালী

আসাম প্রদেশের বাঙালীদের অবস্থা ও তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা আরও বিচিত্র।

বঙ্গের কয়েকটি টুকরা (অর্থাৎ শ্রীহট্ট জেলা প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চল যেখানকার প্রধান ভাষা বাংলা), খাস আসাম, এবং নাগা কুকি লুশাই প্রভৃতি পার্ব্বত্য ও আরণ্য কয়েকটি জাতির অধ্যুষিত কতকগুলি অঞ্চল লইয়া আসাম প্রদেশ গঠিত। কিন্তু প্রদেশটির নাম আসাম রাখা হইয়াছে বলিয়া আসামীরা আপনাদিগকেই আসাম প্রদেশের আসল অধিবাসী ও মালিক মনে করেন এবং আসামপ্রদেশী বাঙালীদিগকে বিদেশীবৎ মনে করেন। আসাম-গবর্ন্মেণ্টও তথাকার বাঙালীদের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করেন; অথচ আসামপ্রদেশী বাঙালীদের সংখ্যা আসামপ্রদেশী আসামীদের চেয়ে অনেক বেশী।

যাহারা স্থায়ী অধিবাসী এবং সংখ্যায় বেশী তাহাদের প্রতি এইরূপ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বেশী দেখা যায় না। অন্যত্র যেখানে দেখা যায়, সেখানে এরূপ ব্যবহারের কারণ ভিন্ন রকমের। যেমন ধরুন, দক্ষিণ-আফ্রিকায়। সেখানে শাদা বুঅর ও ইংরেজের চেয়ে কাল কাফ্রিদের সংখ্যা বেশী। অথচ লাঞ্ছনা হয় কাফ্রিদের। তাহার কারণ, শাদারা ছলে বলে কৌশলে কাফ্রিদিগকে পদানত করিয়াছে। কিন্তু আসাম প্রদেশের কোন ভাষাভাষী লোকসমষ্টি অপর কোন ভাষাভাষী লোকসমষ্টিকে পদানত করে নাই। সবাইকে পদানত করিয়াছে ইংরেজ। এক দল দাস অন্য এক দল দাসের উপর প্রভুত্ব বা মুরুব্বিয়ানা করিতে চায়। বিহারেও এইরূপ।

আসাম প্রদেশে আসামপ্রদেশী বাঙালীদের চাকরী পাওয়া, শিক্ষা পাওয়া, পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন দ্বারা বৃত্তি

পাওয়া এবং চাষের জন্য জমী পাওয়া সম্বন্ধে অসুবিধা আছে।

—

উড়িষ্যার বাঙালী ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষা

অন্ততঃ শৈশবে ও বাল্যে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার বাহন তাহাদের মাতৃভাষাই হওয়া উচিত, ইহা পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে স্বীকৃত, এবং তথাকার শিক্ষার ব্যবস্থাও তদ্রূপ। ভারতবর্ষেরও সর্ব্বত্র ইহা স্বীকৃত হইতেছে। অথচ শুনা যাইতেছে, উড়িষ্যায় বিদ্যালয়ের বাঙালী ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষাকে তাহাদের শিক্ষার বাহন হইতে দেওয়া হইবে কি না, তাহাতে সন্দেহ রহিয়াছে। এই ছাত্রছাত্রীরা যে-সকল পরিবারের ছেলেমেয়ে তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া উড়িষ্যার বাসিন্দা। প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের আমলের আগে হইতে বাংলা তাহাদের মাতৃভাষা বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। এখন ওড়িয়া ছেলেমেয়েরা যে-যে বিষয়ে ওড়িয়া ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষা পাইবে ও পরীক্ষা দিবে, বাঙালী ছেলেমেয়েদিগকেও সেই সেই বিষয়ে বাংলার মধ্য দিয়া শিক্ষা পাইবার ও পরীক্ষা দিবার সুযোগ দেওয়া উচিত।

—

মান্দ্রাজ প্রদেশে তামিল ও হিন্দী

কংগ্রেস হিন্দীকে ভারতবর্ষের অন্তঃপ্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা মনে করায় মান্দ্রাজ প্রদেশের বিদ্যালয়সকলে উহাকে অবশ্যশিক্ষণীয় একটি ভাষা রূপে ছাত্রছাত্রীদিগকে শিখাইবার চেষ্টা হইতেছে। মান্দ্রাজে তেলুগু, তামিল, মলয়ালম ও কন্নাড, প্রধানতঃ এই কয়টি ভাষা প্রচলিত। ছেলেমেয়েরা বড় হইলে তদ্ভিন্ন ইংরেজীও শিখে। তাহার উপর হিন্দী শিখিতে হইলে তিনটি ভাষা শিখিতে হয়। তাহা হইলেও মান্দ্রাজের অন্য তিনটি ভাষাভাষী অঞ্চলে বিশেষ কোন প্রতিবাদ বা আন্দোলন হয় নাই, কিন্তু তামিলভাষাভাষী অঞ্চলে খুব প্রতিবাদ ও দলবদ্ধ আন্দোলন হইতেছে। শুধু কি তাই? প্রতিবাদে প্রায়োপবেশন হইতেছে—হিন্দীকে যদি অবশ্যশিক্ষণীয় রাখা হয় তাহা হইলে উপবাস দিয়া প্রধান মন্ত্রীর বাড়ীর সম্মুখে ধর্না দিয়া মরিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোকের আবির্ভাবও

মান্দ্রাজের প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গচিত্র

হইয়াছে। আন্দোলনের তোড় এত বাড়িয়াছে, যে, কোন কোন আন্দোলককে গ্রেপ্তার করা হইতেছে। আন্দোলনের এতটা বাড়াবাড়ি এবং প্রায়োপবেশন যেমন ভাল নয়, তেমনি হিন্দীকে অবশ্যশিক্ষণীয় করিবই—আবশ্যক হইলে ফৌজদারী দণ্ডবিধির সাহায্যে তাহা করিব, এরূপ জেদও ভাল নয়।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারি মহাশয়ের উপর হিন্দীবিরোধী তামিলদের বিষম রাগ। তাহাদের একখানি কাগজে এই ব্যঙ্গচিত্র বাহির হইয়াছে যে, রাজাগোপালাচারি মহাশয় তাঁহার মাতৃভাষার বুকে ছুরি বসাইতেছেন! এরূপ ব্যঙ্গচিত্রও নিতান্ত বাড়াবাড়ি। বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা হিন্দী শিখিলেই তামিল ভাষা ও সাহিত্যের সর্ব্বনাশ হইবে, এরূপ মনে করা ভুল। জার্ম্মেনীতে এক রকমের বিদ্যালয়গুলিতে জার্ম্যান ছাড়া ইংরেজী, ইটালীয় ও ফরাসী এই তিন ভাষার মধ্যে কোন দুটি শিখিতে হয়—অন্ততঃ আগে হইত। তাহাতে জার্ম্যান ভাষা ও সাহিত্যের কোন ক্ষতি হয় নাই।

হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হউক বা না-হউক, ইহা জানিলে

ব্যবসাবাণিজ্যের অনেক সুবিধা হয়। সেই জন্য ইহা জানা বাঞ্ছনীয়।

জবরদস্তি না-করিয়া মাদ্রাজে হিন্দীকে বিদ্যালয়সমূহে অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় করিলে ফল ভাল হইত, এবং এত ধরপাকড়ও করিতে হইত না।

—

রাষ্ট্রভাষা চালাইবার জেদ

আমরা বরাবর এই মতাবলম্বী যে, কংগ্রেসের আপাততঃ কেবল পূর্ণস্বরাজ লাভের জন্য শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও গবর্মেণ্টের সহিত বিরোধেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা উচিত—যদিও ইহা সোজা নয়। কারণ, কংগ্রেস শক্তিশালী হইলেও বিশেষ শক্তিশালী নহেন। এখনও কংগ্রেসকে অনেক সময় কাজ আদায়ের জন্য বহুপরিমাণে সম্পূর্ণ-বা-অংশতঃ-বিদ্যাবিমুখ "বিদ্যার্থী"দের উপর নির্ভর করিতে হয়। তজ্জন্য ইহার শক্তিব্যয়ে মিতব্যয়িতা আবশ্যক। কিন্তু অনেক কংগ্রেসনেতা যুগপৎ ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট, দেশী নৃপতিবর্গ, ধনিকসম্প্রদায়, জমিদারবর্গ এবং মধ্যবিত্ত বুর্জোআ—এই পঞ্চশত্রুর সহিত পাঁচমুখো লড়াই চালাইবার জন্য কোমর বাঁধিয়াছেন। অবশ্য, প্রধান নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ সম্প্রতি কিছু হুঁশিয়ার হইয়াছেন। তাঁহারা দেশী রাজ্যের প্রজাদিগকে বলিয়াছেন, তোমরা লড়িতে পার, কিন্তু কংগ্রেসের নাম লইও না।" বিহারে মন্ত্রীরা জমিদারদের সঙ্গে কিছু রফা করিয়া কৃষাণদের বিরাগভাজন হইয়াছেন। বোম্বাই অঞ্চলে ধনিক-ও-বুর্জোআ-বিরোধী সমাজতন্ত্রীদিগকে সর্দার বল্লভভাই পটেল কিঞ্চিৎ স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দিয়াছেন।

আমাদের বক্তব্য ইহা নহে, যে, গণতন্ত্রবিরোধী বিদেশী বা স্বদেশী কাহারও সঙ্গে মিতালি বা রফা করিতে হইবে, বা শ্রমিক ও কৃষকদিগের মনুষ্যোচিত অধিকার অর্জনে সম্পূর্ণ সাহায্য করিতে হইবে না। আমরা বলিতে চাই, অনেকগুলা যুদ্ধ একসঙ্গে চালান উচিত নয়, এবং গণতন্ত্রবিরোধী দেশী লোকদিগকে যথাসম্ভব স্বদলভুক্ত করিবার চেষ্টাই আপাততঃ কংগ্রেসের করা উচিত। কংগ্রেসের প্রাধান্য ও কার্য্যকারিতা তাহাতে বাড়িবে।

যাহা হউক, এখন রাষ্ট্রভাষা প্রচলন চেষ্টার কথাই বলি। উপরে দেখাইয়াছি, কংগ্রেসের যুদ্ধক্ষেত্র বহু-বিস্তৃত এবং বিরোধীও অনেক। তাহার উপর রাষ্ট্রভাষা চালাইবার চেষ্টা করিয়া আবার নূতন ঝগড়া বাধাইবার এবং প্রাদেশিক বিরোধ উস্কাইবার কী আবশ্যক হইয়াছিল?

কংগ্রেস বুলেটিন ও পুস্তিকাগুলি ইংরেজীতেই প্রকাশিত হয়, কংগ্রেস-সভাপতিরা এখনও অভিভাষণ লেখেন ইংরেজীতে, তাহার পর তাহার অনুবাদ হয় হিন্দীতে; কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলীর মুসাবিদা হয় ইংরেজীতে, তাহার পর তাহার অনুবাদ হয় হিন্দীতে; বড় বড় প্রাদেশিক নেতারা আপোষে কথাবার্ত্তা আলোচনা চালান ইংরেজীতে, প্রকাশ্য অধিবেশনে হিন্দী বলিয়া ঠাট বজায় রাখেন। ব্রিটিশ জাতি ও গবর্মেণ্টকে এবং বিদেশীদিগকে আমাদের কথা জানাইতে হয় ইংরেজীতে। হিন্দীভাষী অঞ্চল কয়েকটি ছাড়া অন্য সব প্রদেশে জনগণকে কংগ্রেসের কথা শুনাইতে হইলে তথাকার মাতৃভাষায় বক্তৃতা করিতে হয়, হিন্দীতে নহে; পরেও ঐ মাতৃভাষাতেই করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের অধিকতম সাধারণ লোক পড়ে তথাকার মাতৃভাষার কাগজগুলি, হিন্দী নহে; পরেও হিন্দীভাষী প্রদেশ ছাড়া অন্য কোথাও অধিকতম লোক হিন্দী কাগজ পড়িবে না। এখনও সমুদয় হিন্দীভাষী প্রদেশে এমন একখানি হিন্দী কাগজ নাই যাহার কাটতি বাংলার সকলের চেয়ে বেশী কাটতিওয়ালা দৈনিকের কাছ দিয়া যায়—যদিও ভারতে বাংলার চেয়ে হিন্দী বলে বেশী লোকে, ইহা সবাই জানে।

হিন্দীকে যাহাতে রাষ্ট্রভাষা করা না-হয়, সেরূপ কোন উদ্দেশ্যে আমরা এসব কথা লিখিতেছি না। আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, স্বরাজলাভের জন্য মৌখিক ও লিখিত এমন কি চেষ্টা আছে, একটি কোন দেশী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করায় যাহা করিতে অসুবিধা হইতেছিল, এবং একটি দেশী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা মনে করায় যাহার

সুবিধা হইয়াছে ? বরং এখন একবার ইংরেজীতে লিখিয়া তাহার হিন্দী করিবার পরিশ্রম ও ব্যয় অধিকন্তু করিতে হয়। তাহাতে যদি ভারতের সব প্রদেশের জনগণের সুবিধা হইত, তাহা হইলে কিছু বলিবার ছিল। তাহা হয় না। হিন্দীতে তামিলদের, বাঙালীদের, ওড়িয়াদের কি সুবিধা হয় ? ভবিষ্যতেও, হিন্দী সত্য সত্যই রাষ্ট্রভাষা হইলেও প্রত্যেক প্রদেশের লোকেরা (হিন্দীভাষী প্রদেশ ছাড়া অন্যত্র) নিজ নিজ মাতৃভাষায় লেখা জিনিষই পছন্দ করিবে।

অতএব, আমরা মনে করি, স্বরাজলাভার্থ দেশী একটি রাষ্ট্রভাষা চালাইবার চেষ্টার সদ্য সদ্য কোন আবশ্যক ছিল না। ইহাতে এখন বিশেষ কোন লাভ হয় নাই, বরং শক্তিক্ষয় ও বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে। স্বরাজ লাভের পর বিবেচনাপূর্ব্বক দেশী রাষ্ট্রভাষা একটি নির্ব্বাচন করিলে কোন ক্ষতি হইত না।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দীর মর্য্যাদা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষায় বাংলার যেমন অনার্স কোর্স হইয়াছে, হিন্দীরও সেইরূপ হইয়াছে। ইহা হইতে বিহারী ভায়াদের বাঙালী ও বাংলা ভাষার প্রতি ঔদার্য্য শিক্ষা করা উচিত। কিন্তু ফলে তাহা হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

আসামী ও ওড়িয়াদেরও ইহা হইতে চোখ ফোটা উচিত।

—

ভাষা-অনুযায়ী বাংলা প্রদেশ

ভারতসচিবের পক্ষ হইতে যে বলা হইয়াছে গবর্মেণ্ট আর প্রদেশসংখ্যা বাড়াইবেন না, তাহাতে বাংলা প্রদেশ-টিকে ভাষা-অনুসারে পুনর্গঠনের কোন বাধা হয় না। কারণ, তাহা করিলে নূতন কোন প্রদেশ গঠিত হইবে না, প্রদেশসমূহের সংখ্যা বাড়িবে না ; কেবল বঙ্গের যাহা প্রাপ্য তাহা বঙ্গকে দিতে হইবে মাত্র।

বহুপূর্ব্বে আসাম প্রদেশ বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। আসামকে আলাদা প্রদেশ করায় আমাদের আপত্তি নাই, ছিল না ; কিন্তু তাহার সহিত বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল কতকগুলি জুড়িয়া দেওয়া এবং তাহার পর তথাকার বাঙালীদের প্রতি অবিচার আপত্তির কারণ হইয়াছে।

১৯১২ সালে নূতন বিহার প্রদেশ গঠিত হয়। তাহাতে আমরা আপত্তি করি নাই, এখনও করি না। আপত্তি তাহার সঙ্গে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলগুলি জুড়িয়া দেওয়াতে। বিহারের প্রতি সুবিচার হইয়াছে তাহা ভালই, কিন্তু বঙ্গের প্রতি অবিচার নিন্দনীয়। এই অবিচার এখনও চলিতেছে।

১৯৩৫ সালের নূতন ভারতশাসন-আইন অনুসারে দুটি নূতন প্রদেশ ভাষা-অনুসারে গঠিত হইয়াছে—উড়িষ্যা ও সিন্ধু।

কর্ণাটের ও অন্ধ্রদেশের লোকেরা ভাষা-অনুসারে দুটি নূতন প্রদেশ চাহিতেছে, এবং এই ইচ্ছা কংগ্রেস দ্বারা ও মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে, বাঙালীদের ভাষা-অনুযায়ী প্রদেশ চাওয়া অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক নহে, এবং তাহাতে গবর্মেণ্টের বা কংগ্রেসের আপত্তি হওয়া উচিত নয়। বস্তুতঃ কংগ্রেস বিহার প্রদেশের বাঙালী-প্রধান অঞ্চলগুলি বাংলাকে ফিরাইয়া দিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বঙ্গের কতকগুলি অংশ বিহার ও আসাম প্রদেশে চলিয়া যাওয়ায় নানা দিক্ দিয়া বাঙালীদের ক্ষতি হইয়াছে। বাংলা-গবর্মেণ্টের আয় কমিয়াছে। নানা আরণ্য ও খনিজ দ্রব্যপূর্ণ কয়েকটি অঞ্চল বিহার প্রদেশ ও আসাম প্রদেশে চলিয়া যাওয়ায় বাঙালীদের ও বাংলা-গবর্মেণ্টের তাহা হইতে ধনী হওয়ার বাধা হইয়াছে। স্বাস্থ্যকর ও বিরলবসতি অঞ্চলগুলি বঙ্গের বাহিরে যাওয়ায় কেবল ঘনবসতি রোগজীর্ণ অঞ্চলসমূহে থাকিয়া বাঙালী জাতির বর্দ্ধিষ্ণু ও আরও লোকবহুল হওয়ায় বাধা ঘটিয়াছে। যে-সকল অঞ্চল বঙ্গের মধ্যে থাকিলে বাঙালী তথায় স্বভাবতই চাকরী ও সরকারী ঠিকা-আদি পাইতে পারিত, এখন সেখানে তাহার নিমিত্ত পরমুখাপেক্ষী ও পরানুগ্রহ-কামী হইতে হইয়াছে। যে-সকল অঞ্চল বঙ্গে থাকিলে তথাকার বাঙালী ছেলেমেয়েরা স্বভাবতই অবাধে বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষা পাইতে পারিত এবং গুণানুসারে

যোগ্যতম হইলে বৃত্তি পাইতে পারিত, এখন তাহাদের সেই সব স্যাষ্য সুবিধালাভ পরানুগ্রহসাপেক্ষ হইয়াছে। মোটের উপর, এই সব অঞ্চলে আবালবৃদ্ধবনিতা সব বাঙালীর মনে একটা নিরুদ্ধতার, একটা পরবশতার চাপ পড়িতেছে। ইহা সাতিশয় অকল্যাণকর ও অবাঞ্ছনীয়।

যে-সকল অঞ্চলের অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা বাংলা, যেখানকার প্রধান অধিবাসীরা বাঙালী এবং অন্যেরাও বাংলা বুঝে ও বলে, কোথাও কোথাও তথাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বাংলার পরিবর্তে অন্য ভাষা চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। অনেক জায়গায় বাঙালীরা উদাসীন, কিংবা সচেতন হইলেও কর্তৃপক্ষ অবাঙালী বলিয়া এই অন্যায়ের প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না।

—

সেন্সসের গণনায় বাঙালীর কৃত্রিম হ্রাস

যাঁহারা বাঙালীদের হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ্য করিবার নিমিত্ত দশবার্ষিক সেন্সস রিপোর্টগুলি অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকেন, আগে যে-সকল উপভাষাকে ভাষাবিদেরা বাংলার অপভ্রংশ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, স্থানে স্থানে সেন্সসের খুদ্যে হাকিমরা রাজনৈতিক কারণে সেগুলিকে অন্য কোন ভাষার অপভ্রংশ গণনা করিতেছেন। 'বেহার হেরাল্ড' ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

১৯১১ সালের সেন্সস অনুসারে পূর্ণিয়া জেলার বাংলা-ভাষীদের সংখ্যা ছিল ৭৪৯০১৮। ১৯২১ সালের সেন্সসে তাহা হয় ১০২০০৫। কেবলমাত্র বাঙালীদের মধ্যেই কোন মড়ক হওয়ায় এই সংখ্যাহ্রাস ঘটে নাই। ইহার কারণ অন্তবিধ। পূর্ণিয়া জেলার ছয় লক্ষ মানুষ কিষেনগঞ্জিয়া বা শিরিপুরিয়া নামক একটি উপভাষা ব্যবহার করে। ডক্টর গ্রিয়ার্সনকৃত ভারতীয় সকল ভাষার বৈজ্ঞানিক সমীক্ষণে (Linguistic Surveyতে) এই উপভাষাটিকে উত্তর-বঙ্গের উপভাষার একটি রূপভেদ বলা হইয়াছে। এ-বিষয়ে কাহারও কথা গ্রিয়ার্সনের কথার চেয়ে প্রামাণিক নহে। কিন্তু ১৯২১ সালের সেন্সসে পূর্ণিয়া জেলার কিষেনগঞ্জ মহকুমার হাকিম ফতোয়া জারি করেন, যে, এই উপভাষা হিন্দীরই প্রকারভেদ। সুতরাং কলমের এক খোঁচায় ছয় লক্ষ মানুষ অ-বাংলাভাষী হইয়া গিয়াছে।

পূর্ণিয়ায় ১৯২১ সালের সেন্সসের ১০২০০৫ জন বাংলা-ভাষী বাড়িয়া ১৯৩১ সালের সেন্সসে ১৪৭২৯৯ হয়। তাহার কারণ, আগের সেন্সসে যাহাদিগকে হিন্দীভাষী গণ্য করা হইয়াছিল এরূপ ৩৩০০০ মানুষ ১৯৩১ সালে বাংলাভাষী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয়।

—

স্বাধীন ত্রিপুরার খনিজ-সম্পদ

ভারতবর্ষে দেশী রাজ্য কয়েক শত আছে। তাহাদের সংখ্যা বঙ্গের বাহিরের প্রদেশগুলিতে বেশী, বঙ্গে কেবল দুটি। তাহার মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য বাংলা ভাষার সম্মান বিশেষ ভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। কয়েক পুরুষ ধরিয়া ত্রিপুরাধিপতিরা বাংলা সাহিত্যের ও বঙ্গীয় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। ত্রিপুরাই একমাত্র রাজ্য যাহার বার্ষিক শাসনবিবরণ ও দশবার্ষিক সেন্সস রিপোর্ট বাংলা ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত হয় এবং যাহার সরকারী কাজ বাংলায় হয়। এই জন্য ত্রিপুরাধিপতির নিকট এই আশা করা যাইতে পারে, যে, এই রাজ্যে সকল দিকে ও সব বিষয়ে বঙ্গীয়ত্ব রক্ষিত হইবে।

ত্রিপুরা রাজ্য খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ কয়েক বৎসর আগে হইতেই জানা গিয়াছে, যদিও ভূতত্ত্ববিদদের দ্বারা ইহার জরীপ এখনও ভাল করিয়া হয় নাই। কয়লা, বক্সাইট, লৌহ ও ম্যাঙ্গানীজ মিশ্রিত খনিজ, বেন্টনাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের সন্ধান এখানে পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি স্বাভাবিক গ্যাস ও খনিজ তৈলেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ইতিমধ্যেই অনেক দেশী ও বিদেশী ব্যক্তি ও কোম্পানী এগুলি কোথায় বাণিজ্যযোগ্য পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণের অনুমতি চাহিয়াছে। উদ্যোগী বাঙালীদের খুব সত্বর হওয়া উচিত। তাঁহারা অবিলম্বে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় ভূতত্ত্ব-বিভাগের আফিসে (Office of the Geological Department of Tripura State, Agartala) আবেদন করুন। স্বয়ং

সেখানে যাইতে পারিলে আরও ভাল। খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ বহু স্থান সরকারী হুকুমে বাংলার বহির্ভূত ও অন্যান্য প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ত্রিপুরা বঙ্গীয় দেশীয় রাজ্য। ত্রিপুরাধিপতির সহায়তায় এবং ত্রিপুরার বাঙালীদের উদ্যোগিতায় সকল বিষয়ে এই রাজ্যটির বঙ্গীয়ত্ব রক্ষিত হওয়া আবশ্যক।

—

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের ললিতকলা প্রদর্শনী

গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ কলিকাতার ১০ নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট ভবনে ভাস্কর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায়ের ষ্টুডিয়োতে, তাঁহার সৌজন্যে, শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের ললিতকলা প্রদর্শনী খোলা হয়। ইহার দ্বার মোচন করেন, কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু। এই প্রদর্শনীতে যত রকমের যত ছবি ও কিছু মূর্ত্তি রক্ষিত দেখিয়াছি, তাহার সবগুলি ভাল করিয়া দেখাইতে হইলে বৃহত্তর স্থানের আবশ্যক। আশা করি, আগামী বৎসর হইতে আশ্রমিক সংঘ বৃহত্তর স্থান পাইতে পারিবেন। এ বৎসর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ কর এবং অন্যান্য শিল্পীর এবং আশ্রমিক সংঘের সভ্যদিগের বহু চিত্রাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। এক বার তাড়াতাড়ি চোখ বুলাইয়া লইলে এরূপ প্রদর্শনী হইতে যথোচিত আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করা যায় না। তথাপি ভিড়ের মধ্যে যতটুকু পাওয়া যায়, তাহাই সঞ্চয় করিয়া রাখা ভাল।

সংঘের কর্ম্মকর্ত্তারা স্বভাবতঃ প্রথমেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে অনুরোধ করেন। দৈহিক অসামর্থ্যহেতু তিনি তাহা করিতে না পারায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর দ্বারা এই কাজটি সম্পন্ন হইয়াছে। ইহারও যথাযোগ্যতা আছে।

ভারতবর্ষীয় পুরাণ অনুসারে গণেশ গণের অধিপতি এবং সিদ্ধিদাতা। তাঁহাকে ঠিক্ কি অর্থে ও কারণে শাস্ত্রে গণপতি বলা হইয়াছে, জানি না। তাঁহার বধূকে কলাবধূ বলা হইয়াছে। ইহারও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা খুঁজিয়া বাহির করিবার সুযোগ সম্প্রতি আমার নাই। আজকাল গণতন্ত্র গণ-আন্দোলন প্রভৃতি কথায় "গণ" শব্দের প্রয়োগ জনসমষ্টি অর্থে করা হইয়া থাকে। এবং কলা বলিতে চিত্রাঙ্কনাদি সুকুমার শিল্প (Fine Arts) ও কারুশিল্প (Crafts) বুঝায়। জনসমষ্টি আনন্দ ও সম্পদ্ রূপ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে কলাকে বরণ করিয়া, অর্থাৎ সুকুমার শিল্প ও কারুশিল্পের (Arts and Crafts) সাহায্যে। সুতরাং জনসমষ্টির নেতা সুভাষচন্দ্র কলাপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করায় কোন অসঙ্গতি হয় নাই, অনুষ্ঠানটি সুসঙ্গতই হইয়াছে।

—

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল

এ বৎসর মোটামুটি ত্রিশ হাজার ছাত্র ও ছাত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন অর্থাৎ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রায় চব্বিশ হাজার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই চব্বিশ হাজারের মধ্যে যাহাদের পারিবারিক আয়ে কুলাইবে, তাহারা কলেজে ভর্ত্তি হইবে। কতক ছাত্র গৃহশিক্ষকতা করিয়া বা সচ্ছল অবস্থার জ্ঞাতিকুটুম্বের বাড়ীতে থাকিয়া কলেজে পড়িতে চেষ্টা করিবে। আর্টসে ও বিজ্ঞানে ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষার ফলও গত বৎসর অপেক্ষা মন্দ হয় নাই। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা গত বৎসর অপেক্ষা বেশী থাকায় ছাত্র ছাত্রী উত্তীর্ণও হইয়াছে বেশী।

এই জন্য মনে হইতেছে, কলেজগুলিতে এবার যথেষ্ট ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি হইবে। ক্লাসগুলি বড় হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু অল্প ছাত্র লইয়া কলেজ চালাইতে হইলে ছাত্রবেতন হইতে কলেজ চলে না। এক একটি ক্লাসকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া ছোট ছোট ক্লাস করিতে গেলে অধ্যাপকের সংখ্যা বাড়াইতে হয়। সরকারী সাহায্য বা ধনী লোকদের প্রদত্ত বৃহৎ পুঁজির আয় ভিন্ন তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং শিক্ষার বিস্তার বন্ধ না করিলে বড় বড় ক্লাসের অসুবিধা এখন সহ্য করিতেই হইবে। সরকারী সাহায্য ও ধনী লোকদের সাহায্য পাইলে ক্লাস ছোট করা চলিবে।

যেরূপ বৃত্তি শিক্ষা করিয়া ছাত্রেরা অল্পাধিক পুঁজি লইয়া বা অপরের কারখানায় কাজে নিযুক্ত হইয়া উপার্জ্জক হইতে পারে, সেরূপ বৃত্তির শিক্ষালয় দেশে থাকিলে ও কারখানা যথেষ্ট থাকিলে বহু ছাত্রের পক্ষে সাধারণ কলেজে না গিয়া এই রূপ বৃত্তিশিক্ষালয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয় হইত। তাহা নাই। সুতরাং আলস্যে অর্দ্ধশিক্ষিত অবস্থায় কাল যাপন না করিয়া, যাহাদের সাধ্য আছে তাহাদের কলেজে পড়াই ভাল, যদিও কলেজের শিক্ষা সাঙ্গ করিয়া অনেককে "শিক্ষিত বেকারে"র সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। এরূপ অবস্থা একটি কঠিন সমস্যা। তাহার সমাধান বাৎলাইতে পারিতেছি না।

ম্যাট্রিকুলেশ্যনে উত্তীর্ণ ও কলেজে অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশী দেখিয়া অনেকের আরও কলেজ স্থাপনের ইচ্ছা হইতে পারে। কিন্তু যাঁহাদের একা একা বা সংঘবদ্ধ ভাবে নূতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার সামর্থ্য আছে, তাঁহারা সাধারণ কলেজ স্থাপন না-করিয়া এরূপ বৃত্তিশিক্ষালয় স্থাপন করিতে পারেন কি না ভাবিয়া দেখুন যাহার উত্তীর্ণ ছাত্রেরা চাকরীর উমেদার না হইয়া সহজে উপার্জ্জক হইতে পারিবে।

—

বঙ্গের বাহিরে বাঙালী ছাত্রছাত্রীদের কৃতিত্ব

ব্রহ্মদেশে এবং ভারতবর্ষে বঙ্গের বাহিরে বাঙালী অনেক ছাত্রছাত্রীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্য পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতার সংবাদে প্রীত হইয়াছি।

—

পরীক্ষায় মহিলাদের কৃতিত্ব

প্রতি বৎসরই কয়েক জন বিবাহিতা ও সন্তানবতী বাঙালী মহিলা বাড়ীতে পড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহাদের সকলের সংবাদ কাগজে বাহির হয় না। আমরা রেঙ্গুনের একটি বাঙালী মহিলার কথা জানি যাঁহার স্বামী বড় চাকরী করেন, শ্বশুর বড় ডাক্তার, যিনি এক বৎসর ব্রহ্মদেশে আসিয়া আই-এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন এবং উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার চারিটি সন্তান। তিনি সুগৃহিণী। নানা গৃহকর্ম্মের মধ্যে কোন প্রকারে অল্প অল্প অবসর সময়ে তাঁহাকে বাড়ীতে পড়াশুনা করিতে হইয়াছিল।

এইরূপ মহিলাদের জ্ঞানস্পৃহা অতীব প্রশংসনীয়। অবিবাহিতা বহু ছাত্রী বাড়ীতে বা কলেজে পড়িয়া পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করেন; ইহা বিশেষ সন্তোষের বিষয়।

—

সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় বাঙালী পরীক্ষার্থীদের অকৃতিত্ব

অনেক বৎসর হইতে বাঙালী ছাত্রেরা ভারতবর্ষের ও বিলাতের সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় অন্যান্য প্রদেশের ছাত্রদের চেয়ে কম কৃতিত্ব দেখাইতেছে, কচিৎ কোন বৎসর ২।১টি যুবক প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থান অধিকার করেন। এ বৎসর ভারত-গবর্মেণ্ট বাঙালী পরীক্ষার্থীদের অকৃতিত্বের প্রতি বাংলা-গবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং বাংলা-গবর্মেণ্ট আবার তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাইয়াছেন। গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য এই দরদ-প্রদর্শনেই শেষ হইবে কি?

আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রবাসীতে দেখাইয়াছিলাম, জার্মেনীর ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় ছাত্রদিগকে যত বৃত্তি দেয়, বাঙালী ছাত্রেরা তাহা অনুপাতে অন্যদের চেয়ে বেশী বই কম পায় না, এবং এই বৃত্তিপ্রাপ্ত ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে যাহারা ম্যুনিকের ডক্টর পদবী পায়, তাহাদের মধ্যেও বাঙালীরা অনুপাতে বেশী। আমরা ইহাও দেখাইয়াছি, যে, বিলাতী ভিন্ন ভিন্ন রকমের ডক্টর উপাধি অনুপাতে বাঙালী ছাত্রেরা বেশী পায়, সুতরাং বাঙালী ছাত্রদের সকলেরই বুদ্ধি কমিয়া গিয়াছে, এরূপ মনে করিতে পারা যায় না। জার্মেনীর ও বিলাতের নানাবিধ ডক্টর উপাধি পরীক্ষা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের বাঙালীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিবার কোনই কারণ নাই।

এখন প্রশ্ন এই, এই সব কঠিন পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্রেরা পারদর্শিতা দেখায় অথচ তদপেক্ষা অকঠিন সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় তাহারা কেন অকৃতী হয়? যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফল অনুসারে সব সব ভাল

সরকারী চাকরী পাওয়া যায়, তাহাতে অকৃতী হইতে বাঙালী ছেলেরা কেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ?

যাহাতে বাঙালীদের, বাঙালী যুবকদের, ঘাড়ে দোষ কম পড়ে, এরূপ উত্তর আমরা খুঁজিব না। সেরূপ উত্তর যে একটাও নাই, তাহা নহে। আমরা বাঙালী পরীক্ষার্থীদিগকে অধিকতর পরিশ্রমী, বিদ্যানুরাগী ও চৌকস হইতে অনুরোধ করি। সমুদয় বাঙালী ছাত্রকেই কম হুজুক্যে, কম আরামপ্রিয় ও অধিকতর শ্রমশীল হইতে বলি। একটি বিষয়ে বাঙালী ছেলেদের দক্ষতা কম হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা ইংরেজী বলা। মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে একাধিক দেশভাষা প্রচলিত থাকায় তথাকার সহাধ্যায়ী ছাত্রেরা পরস্পরের সহিত ও অধ্যাপকদের সহিত কথাবার্তায় বঙ্গের বাঙালী ছাত্রদের চেয়ে ইংরেজী খুব বেশী ব্যবহার করে। কলেজ ছাড়িবার পরও তাহাদের এই অভ্যাস থাকে। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে, পঞ্জাবে ও মধ্যপ্রদেশেও এইরূপ অভ্যাস লক্ষ্য করিয়াছি। বাঙালী যে-সব যুবক প্রতিযোগিতামূলক এরূপ পরীক্ষা দিতে চান যাহাতে ইংরেজীতে কথোপ-কথনের ও অন্তবিধ বাচনিক পরীক্ষা দিতে হয়, তাঁহারা ভাল ও স্পষ্ট ইংরেজী অনর্গল বলার অভ্যাস ভাল করিয়া করুন। অধিকন্তু, যে কয়টি বিষয়ে পরীক্ষা দিবেন, তাহার সম্যক্ জ্ঞান লাভ ত চাই-ই।

কেহ কেহ বাঙালীর দোষ কাটাইবার জন্ত বলেন, বাঙালী বুদ্ধিমান্ ভাল ছেলেদের আর চাকরীর প্রতি ঝোঁক নাই। আমাদের অভিজ্ঞতা সে রকম নহে। খুব স্বাধীনতাপ্রিয় অনেক ভাল ছেলেকে সামান্ত গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষেও অযথেষ্ট চাকরীর চেষ্টা করিতে দেখিয়াছি—যাহারা আটকবন্দী ছিল মেধাবী এরূপ ছাত্রদিগকেও।

সরকারী চাকরী করিতে না-চাহিবার প্রবৃত্তি এক সময়ে অনেক ছাত্রের ছিল, এখনও হয়ত অনেকের আছে। কিন্তু দেশে স্বরাজ আসিতেছে। সরকারী চাকরীতে আগেকার মত অপ্রবৃত্তি থাকা উচিত নহে। অবশ্য যাঁহারা স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে বাস্তবিক সমর্থ, তাঁহাদিগকে কেন চাকরী করিতে বলিব ?

বাঙালী ছেলেদের সিবিল সার্ভিসের অকৃতিত্বের একটা অবশ্যম্ভাবী ফলের দিকে আমরা বাঙালী যুবকদের ও রাজনৈতিক নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বাঙালী ছেলেরা ক্রমাগত এইরূপ ফেল হইতে থাকিলে শীঘ্রই এরূপ সময় আসিবে যখন বঙ্গের প্রায় সব জেলা ও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট অ-বাঙালী হইবে। বঙ্গের কোন প্রকার উন্নতির পক্ষে এরূপ অবস্থা অনুকূল নহে। মান অপমানের কথা না-তোলাই ভাল। এখন আমরা অ-বাঙালী পাহারাওয়ালাকে সেলাম করি, অ-বাঙালী হাকিমকে সেলাম করা এমন কি বেশী অপমানের কথা!

—

কংগ্রেসের ও গবর্ন্মেণ্টবন্ধুদের সহিত বিরোধ বা মিলনের চেষ্টা

আমরা এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছি যে, যুগপৎ বহু বিরোধীর সহিত ঝগড়া না-বাধাইয়া স্বরাজ-লাভার্থ কংগ্রেসওয়ালাদের সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ জাতির প্রতিনিধিদের সহিতই আবশ্যকমত অহিংস সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা উচিত। ইহার উত্তরে এইরূপ কথা শুনিয়াছি, যে, দেশী নৃপতি, জমিদার, ধনিক এবং চাকরীপ্রার্থী মধ্যবিত্ত বুর্জোআরা ত গবর্ন্মেণ্টরই অনুগ্রহপ্রার্থী ও বন্ধু; এই হেতু আমরা এই সব লোকদের সহিতও সংগ্রাম করি। যাঁহারা এরূপ কথা বলেন তাঁহারা নিজেও কিন্তু বুর্জোআ, এবং বুর্জোআরাই কংগ্রেস-আন্দোলনের এখনও চালক। সে কথা ছাড়িয়া দিয়া বলিতে চাই, দেশী নৃপতিদের মধ্যে দেশের স্বাধীনতাপ্রয়াসী লোক আছেন, জমিদার ও ধনিকদের মধ্যে ত এরূপ লোক আছেনই, এবং জমিদার ও ধনিকদের মধ্যেকার এইরূপ লোকেরা কংগ্রেসের সাহায্য করেন ও কেহ কেহ তাহার সভ্য। সুতরাং শ্রেণীকে শ্রেণীই খারাপ, এরূপ মনে করিয়া শ্রেণীর সহিত যুদ্ধ ঘোষণা এবং একসঙ্গে একই সময়ে বহু শ্রেণীর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা উচিত মনে করি না। তাহা রণকৌশলসম্মতও নহে।

প্রত্যেক শ্রেণীর যত লোককে সম্ভব দেশের রাষ্ট্রীয়

ও অর্থনৈতিক স্বরাজের অনুকূল দলের মধ্যে আনিবার চেষ্টা করা উচিত।

জনসমষ্টি হিসাবে মুসলমানদের চেয়ে গবর্মেণ্টের অনুগৃহীত, অনুগ্রহপ্রার্থী ও বন্ধুভাবাপন্ন লোকসমষ্টি ভারতবর্ষে আর নাই। গোলটেবিল বৈঠকের সময় তাঁহাদের নেতারাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত মাইনরিটি প্যাক্ট অর্থাৎ সংখ্যালঘিষ্ঠদের চুক্তি করিয়াছিলেন। এখনও মোসলেম লীগের নেতারা মুসলমানদের মধ্যে সকলের চেয়ে গবর্মেণ্টের খয়েরখাঁ। এহেন মুসলমান জনসমষ্টি ও এহেন মোসলেম লীগের সহিত বিরোধ না করিয়া কংগ্রেস তাঁহাদিগকে নিজের দলে আনিতে চেষ্টা করিতেছেন (ভালই করিতেছেন—যদিও চেষ্টার রকমটার আমরা অনুমোদন করি না, বিরুদ্ধতাই করি)। মুসলমান জনসমষ্টি ও মোসলেম লীগের সহিত যদি কংগ্রেসের মিতালির চেষ্টা করা চলে, তাহা হইলে পূর্ব্বকথিত অন্যান্য সমষ্টিগুলি কি দোষ করিল?

—

কংগ্রেসের সহিত মোসলেম লীগের চালবাজি

বোম্বাইয়ে সম্প্রতি মোসলেম লীগের কর্ত্তাদের যে মন্ত্রণাসভা বসিয়াছিল, তাহার সিদ্ধান্ত এখনও (২৪শে জ্যৈষ্ঠ) লীগ কর্ত্তৃক প্রামাণিক ভাবে প্রকাশিত হয় নাই; লীগের সভাপতি কংগ্রেস-সভাপতিকে যে চিঠি লিখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, তাহাও এখনও কাগজে বাহির হয় নাই। কিন্তু য়ুনাইটেড প্রেস ও এসোসিয়েটেড প্রেস লীগের সিদ্ধান্ত ও শ্রীজিন্নার চিঠির তৎপর্য্য যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, তাহা কাগজে বাহির হইয়াছে। সেই বিষয়ে কিছু বলিব।

লীগের দাবী এই, যে, কংগ্রেসকে স্বীকার করিতে হইবে, যে, লীগই সমগ্র মুসলমান সমাজের একমাত্র প্রতিনিধি। কিন্তু মুসলমানদের আরও প্রতিনিধিসমিতি আছে, যেমন অহ্‌রর দল, ইত্তিহাদ-ই-মিল্লত দল, কংগ্রেসভুক্ত মুসলমানদের দল, ইত্যাদি। অতএব, লীগের দাবী সত্য নহে। কংগ্রেস কি প্রকারে অসত্যকে স্বীকার করিবেন? কেমন করিয়া নিজের দলভুক্ত মুসলমানদিগকে বলিবেন কংগ্রেস তাহাদেরও প্রতিনিধি নহে? যদিই বা কংগ্রেস লীগের অসত্য দাবী স্বীকার করেন, তাহা হইলেও লীগ ভিন্ন অন্য মুসলমান দলগুলি এবং কোন মুসলমান সমিতিরই সভ্য নহেন এরূপ মুসলমানেরা তাহা স্বীকার করিবেন না, গবর্মেণ্ট স্বীকার করিতে পারিবেন না, হিন্দু মহাসভা স্বীকার করিবেন না। কংগ্রেস এরূপ অসত্য দাবী মানিলে আত্মঘাতী হইবেন।

লীগের আর এক দাবী, কংগ্রেস লীগকে তাহার বিশ্বাস-উৎপাদক ভাবে জানান যে কংগ্রেস হিন্দুদের পক্ষ হইতে লীগের সহিত চুক্তি-সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা চালাইতে ও চুক্তি করিতে অর্থাৎ হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিত্ব করিতে সমর্থ, এবং কংগ্রেস এরূপ কোন চুক্তি করিলে হিন্দুমহাসভার অনুগত ও দলভুক্ত হিন্দুরা তাহা অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করিবে না। লীগের এই দাবী অনুসারে কাজ করাও কংগ্রেসের সাধ্যাতীত। কংগ্রেস অনেক হিন্দুর রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিনিধি, কিন্তু সকল হিন্দুর নহে। হিন্দু মহাসভা, সনাতন ধর্ম্ম মহামণ্ডল, বর্ণাশ্রম স্বরাজ্যসংঘ, বঙ্গীয় হিন্দুসভা, ব্রাহ্মণসভা প্রভৃতির সম্মতি না লইয়া কংগ্রেস কোন চুক্তি করিলে এই সকল হিন্দু-সমষ্টির তাহা না-মানিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

সুতরাং লীগের এই দাবী অনুযায়ী বিশ্বাস লীগের মনে উৎপাদন করা কংগ্রেসের সাধ্যের অতীত।

লীগ চান, যে, সমগ্র মুসলমান সমাজের সহিত একটি সাধারণ চুক্তি করিতে হইবে, ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান সমিতির সহিত চুক্তি করিলে চলিবে না। সকল মুসলমানের প্রতিনিধি একটি কোন সংঘ বা সমিতি থাকিলে তাহা করা চলিত। কিন্তু তাহা যখন নাই, তখন সাধারণ একটি চুক্তি কেমন করিয়া হইবে?

লীগ পরিষ্কার বুঝাপড়া চান, যে, কংগ্রেস ও মোসলেম লীগ দুটি সমান পক্ষ। এই অবাস্তব কথা কেমন করিয়া কংগ্রেস স্বীকার করিবে? প্রথমতঃ কংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় জাতি প্রভৃতির প্রতিনিধি, এইরূপ দাবী করেন। ইহা আংশিক ভাবে সত্যও বটে; কারণ যে কোন ধর্ম্মের ও জাতির

ভারতবাসী ইহার সভ্য হইতে পারেন, এবং সকল ধর্ম্ম ও বহু জাতির কিছু কিছু লোক ইহার সভ্য আছেনও। মোসলেম লীগের সভ্যত্ব কেবল মুসলমানদের মধ্যে আবদ্ধ। সুতরাং কংগ্রেস ও মোসলেম লীগ সমান পক্ষ নহে। দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেসের বর্ত্তমান ও সম্ভাব্য সভ্যসংখ্যা লীগের চেয়ে অনেক বেশী। কংগ্রেস ৩৫ কোটি লোকের মধ্য হইতে সভ্য পান ও পাইতে পারেন; লীগ ৭.৮ কোটি মুসলমানের একটি অংশ হইতে সামান্য কিছু সভ্য পাইয়াছেন এবং সমগ্র মুসলমান সমাজ ইহার অনুকূল হইলেও ইহা সভ্য পাইবেন কেবল ৭.৮ কোটি লোকের মধ্য হইতে। অতএব, এই সব কথা বিবেচনা করিলেও কংগ্রেস ও লীগ সমান পক্ষ নহে। তৃতীয়তঃ, কংগ্রেসের ও লীগের চেষ্টা ও কৃতিত্বে আকাশপাতাল প্রভেদ। কংগ্রেস দেশের ও ভারতীয় মহাজাতির স্বাধীনতার ও উন্নতির জন্য শক্তিপ্রয়োগ, দুঃখবরণ, স্বার্থত্যাগ, অর্থব্যয় খুব করিয়াছেন; মোসলেম লীগ কিছুই করেন নাই। মুসলমানদের জন্যও মোসলেম লীগ কংগ্রেসের মত কিছু করেন নাই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে লাল কুর্তি খুদা-ই-খিদমদগার শত শত পাঠান যখন গুলিতে মরিল ও আহত হইল, তখন লীগ কোথায় ছিল? কংগ্রেস কিন্তু যথাসাধ্য তাহাদের সহায় ছিল। এই সেদিন যে লবঙ্গ-ব্যবসায়ী জাঞ্জিবারের মুসলমানদের সর্ব্বনাশ হইতে যাইতেছিল, কংগ্রেস-সমর্থিত লবঙ্গ বয়কট দ্বারা তাহা নিবারিত হইয়াছে; কিন্তু ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীজিন্না ও তাঁহার দলের মুসলমানেরা লবঙ্গ-ব্যবসায়ী মুসলমানদের কিছুই সাহায্য করেন নাই। অতএব, চেষ্টা ও কৃতিত্বে কংগ্রেস ও লীগের বিন্দুমাত্রও সমানতা নাই। অধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক।

কথামালায় আছে, একটি ভেক এক বৃষের সমকক্ষতা দাবী করিয়া সমান বৃহৎ হইবার নিমিত্ত দম বন্ধ করিয়া ফাঁপিতে থাকে। ইহার ফল যাহা হইয়াছিল, তাহা পাঠশালার বালক-বালিকারাও জানে।

লীগ কৌন্সিলের একটি কথার আমরা সমর্থন করি। কৌন্সিল বলেন, মুসলমানরা ভারতবর্ষে বৃহত্তম ও বলবত্তম সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়। অতএব, অন্য সব সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে জানাইয়া তবে কংগ্রেসের সহিত মোসলেম লীগের চুক্তি করা উচিত যাহাতে ঐ সব সম্প্রদায়ের অসুবিধা ও ক্ষতি না-হয়। কিন্তু এই কথার পশ্চাতে যদি আর একটা কংগ্রেসবিরোধী মাইনরিটি প্যাক্ট করিবার অভিসন্ধি থাকে, তাহা হইলে তাহা অতীব গর্হিত।

মুসলমানদের সমুদয় ধার্মিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে লীগের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে, ব্যবস্থাপক সভার স্থানীয় বোর্ড-সমূহের মুসলমান সভ্য-পদপ্রার্থী মনোনয়ন, মুসলমান মন্ত্রী নিয়োগ, বাংলা পঞ্জাব সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডলে মুসলমান মন্ত্রী মনোনয়ন লীগের সম্মতি ব্যতিরেকে কংগ্রেস করিতে পারিবেন না, ইত্যাকার দাবীও, লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি, এই দাবীর অন্তর্গত। সুতরাং পুনর্বার ইহার আলাদা বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক। লীগের, অর্থাৎ শ্রীজিন্নার, অভিপ্রায় এই যে, ভারতবর্ষে চিরকাল হিন্দু ও মুসলমান দুটা আলাদা নেশ্যন বলিয়া গণিত হউক, কখনও একটা ভারতীয় মহাজাতি গঠিত না হউক।

য়ুনাইটেড্ প্রেস্ মোসলেম লীগের ১১ দফা দাবীর একটি ফিরিস্তি দিয়াছেন। যথা—(১) 'বন্দে মাতরম্' ত্যাগ করিতে হইবে, (২) যে-সব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহাদের সীমা এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত হইবে না যাহাতে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমে, (৩) মুসলমানদের গোহত্যায় বাধা দেওয়া হইবে না, (৪) তাহাদের আজান দেওয়ায় ও নানা ধর্মানুষ্ঠানে ব্যাঘাত জন্মান হইবে না, (৫) আইন দ্বারা মুসলমান বৈয়ক্তিক ব্যবস্থাবলী (personal law) এবং সংস্কৃতি গ্যারেন্টি বা সংরক্ষণ করিতে হইবে, (৬) মূল রাষ্ট্রবিধিতে মুসলমানদের সরকারী চাকরীর শতকরা ভাগ আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে, (৭) কংগ্রেসকে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধিতা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে এবং ইহাকে স্বাজাতিকতার বিপরীত বলা বন্ধ করিতে হইবে, (৮) আইন দ্বারা গ্যারেন্টি দিতে হইবে যে, উর্দ্দুর ব্যবহার কোন প্রকারে সংকুচিত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা

হইবে না (অর্থাৎ, সোজা কথায়, হিন্দী প্রচার বন্ধ করিতে হইবে), (৯) মিউনিসিপ্যালিটি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড-আদিতে মুসলমানদের সদস্য-সংখ্যা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার নীতি অনুযায়ী করিতে হইবে (অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা পরিবর্ত্তন বা বর্জ্জন দূরে থাক্ উহার প্রয়োগক্ষেত্র যত দূর সম্ভব বিস্তৃত করিতে হইবে) এবং সর্ব্বত্র স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন চালাইতে হইবে, (১০) কংগ্রেস-পতাকা বদলাইতে হইবে কিংবা উহার পাশাপাশি মোসলেম লীগের পতাকাকে সমান মর্য্যাদা দিতে হইবে, (১১) মোসলেম লীগকেই ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র সম্পূর্ণ ক্ষমতাবিশিষ্ট প্রতিনিধিসভা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই এগার দফার বিস্তারিত সমালোচনা অনাবশ্যক।

—

মুসলমানদের সহিত ঐক্যস্থাপন চেষ্টার পূর্ব্বাহ্ণিক কৃত্য

মোসলেম লীগ কংগ্রেসকে বলিয়াছেন, আগে লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান বলিয়া মানুন, পরে অন্যান্য কথা হইবে।

আমাদের বিবেচনায় মুসলমানদের সহিত কংগ্রেসের কোন প্রকার চুক্তির আলোচনার গোড়াতেই কংগ্রেসেরই প্রকাশ্য ভাবে খবরের কাগজের মারফতে সমগ্র মুসলমান-সমাজকে সম্বোধন করিয়া এবং যত দূর জানা আছে সমুদয় মুসলমান-প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানকে আলাদা আলাদা চিঠি লিখিয়া বলা উচিত ছিল, "আপনারা স্থির করুন কোন্ প্রতিষ্ঠানটি বা প্রতিষ্ঠানগুলি আপনাদের প্রতিনিধি এবং সেই প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহের মনোনীত ব্যক্তিদিগকে আপনাদের পক্ষ হইতে কংগ্রেসের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে ক্ষমতা প্রদান করুন।" এইরূপ কিছু গোড়াতেই করা হইলে, মোসলেম লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি ইহা স্বীকার করাইবার জন্য কংগ্রেসের উপর চাপ দিবার সুযোগ কেহ পাইত না। কিন্তু কংগ্রেস তাহা আগে করেন্ নাই। এখনও সময় চলিয়া যায় নাই। শ্রীজিন্নার পত্রের উত্তরে শ্রীবসু এখনও এইরূপ কিছু লিখিতে পারেন—অবশ্য, যদি মহাত্মা গান্ধীর মত হয়।

—

বিপ্লবের পথ ও সংস্কারের পথ

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যক্ষেত্রে, কংগ্রেস যখন অসহযোগ প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন, তাহার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত রাষ্ট্রনীতিকেরা সংস্কারপন্থী ছিলেন। তাঁহারা শাসনবিধির কিছু কিছু ক্রমিক পরিবর্ত্তন ও সংস্কার দ্বারা স্বরাজলাভে ইচ্ছুক ছিলেন। কংগ্রেসের নূতন আমলে এই সংস্কার-পন্থা পরিত্যক্ত হয়। নূতন রাষ্ট্রনীতিকেরা অল্প অল্প সংস্কারের পরিবর্ত্তে একেবারে পূর্ণ স্বরাজ পাইবার প্রয়াসী হন। সংক্ষেপে এই পথকেই আমরা বিপ্লবের পথ বলিতেছি। এই নামকরণ ঠিক্ না-হইতে পারে, কিন্তু আপাততঃ তাহা আমাদের আলোচ্য নহে।

সংস্কারপন্থা ও বিপ্লবপন্থার মধ্যে কোন্‌টি ভাল তাহা আমাদের বিচার্য্য নহে। অবস্থাবিশেষে একটি ভাল, অবস্থান্তরে অন্যটি ভাল হইতে পারে। আমাদের নিজের কথা এই যে, আমরা সংস্কারপন্থার পথঘাট কিছু চিনি, বিপ্লবপন্থার সহিত পরিচিত নহি। কেমন করিয়া বিপ্লব ঘটাইতে হয়, তাহা জানি না। কেতাবে কাগজে পড়িয়াছি, বিপ্লব (revolution) দ্রুত-বিবর্ত্তন (rapid evolution)। ইহা কোন কোন স্থলে সত্য, সর্ব্বত্র বোধ হয় সত্য নহে। ইতিহাসে দেখা যায়, বহু যুগে অনেক দেশে বিপ্লব হইয়াছে, এবং তাহা রক্তারক্তির প্রাচুর্য্য সহকারে হইয়াছে। কিন্তু বিপ্লবের পরেও অবিলম্বে আবার বিপ্লব হইয়াছে, বা সংস্কার করিতে হইয়াছে। আমরা যত শীঘ্র সম্ভব পূর্ণস্বরাজ চাই। সংস্কারের পথেও যে ইহা হইতে পারে, আয়ার্ল্যাণ্ডে তাহা দেখা যাইতেছে; কানাডাতেও অনেকটা দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষের অবস্থা ঠিক্ আয়ার্ল্যাণ্ডের ও কানাডার অবস্থার মত না হইলেও, ঐজন্য এবং সংস্কারের রাস্তাটা কতকটা আমাদের চেনা রাস্তা বলিয়া, আমরা মনে করি ভারতবর্ষ সংস্কারপন্থী হইয়াও পূর্ণস্বরাজ পাইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা বিপ্লবপন্থার সহিত পরিচিত, তাঁহাদিগকে

তাঁহাদের রাস্তা হইতে নিবৃত্ত করিবার অধিকার আমাদের নাই—যদিও তাঁহারা তাঁহাদের পথটা খুলিয়া বাংলাইলে ভাবিয়া দেখিতাম। বিশ্বশক্তির নিকটও আমরা এরূপ কোন আবদার করিতে পারি না, যে, ভারতবর্ষে যেন বিপ্লব না-ঘটে। রক্তারক্তি আমাদের ভাল লাগে না বটে, এবং রক্তপাতবিহীন বিপ্লব অসম্ভবও নহে। কিন্তু জালিয়ানওআলা-বাগে, পেশাওআরে, এবং আরও কোথাও কোথাও রক্তারক্তি হইয়া গিয়াছে—এখনও অল্পস্বল্প কোথাও কোথাও হইতেছে; তাহা আমরা নিবারণ করিতে পারি নাই। অতএব, আমাদের যাহা ভাল লাগে না তাহা বলিয়াই নিবৃত্ত হই। মানুষদের মধ্যে যাহারা আপনাদিগকে ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা মনে করে, তাহাদের নিকট আমাদের কোন আরজি নাই। যিনি মানবজাতির ও ভারতীয়দের প্রকৃত ভাগ্যবিধাতা তাঁহার নিকট এ-বিষয়ে কোন আবদার নিষ্ফল ও অনুচিত।

ফেডারেশ্যন সম্বন্ধে কি করা উচিত, সে বিষয়ে কংগ্রেসওআলাদের মধ্যেও দ্বিমত দেখা যাইতেছে বলিয়া উপরিলিখিতমত নানা চিন্তা আমাদের মনে দেখা দিয়াছে।

—

সরকারী ফেডারেশ্যন

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন-আইনে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলি ও দেশী রাজ্যগুলিকে লইয়া একটি সংযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা আছে। এই রাষ্ট্রকে বলা হইয়াছে ফেডারেটেড্ ভারতবর্ষ। ভারতশাসন-আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব কংগ্রেস প্রথমে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু মন্ত্রীদিগের কতকটা স্বাধীনতা গবন্মেণ্ট স্বীকার করায় কংগ্রেস প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব চালু করিতেছেন। সেই রকম, অনেকে বলিতেছেন, কংগ্রেস সরকারী ফেডারেশ্যনের নক্সা অনুসারেও কাজ করিবেন—অবশ্য, ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট কিছু অদল বদল করিলে।

পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরু, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি প্রধান কোন কোন নেতা, এবং সাধারণতঃ সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিষ্টরা বলিতেছেন, তাঁহারা সরকারী ব্যবস্থা অনুযায়ী ফেডারেশ্যন চান না, কিছু কিছু পরিবর্ত্তনে তাঁহারা রাজী নহেন, উহা সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয়। অন্য দিকে মান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক সভায় এবং আরও দু-একটি কংগ্রেসী প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় আগে হইতেই প্রস্তাব গৃহীত হইয়া আছে, যে, ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সরকারী ফেডারেশ্যনের ব্যবস্থায় এমন কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করুন যাহাতে কংগ্রেস উহা চালু করিতে রাজী হইতে পারে। গান্ধীজী চুপ করিয়া আছেন। কিন্তু গান্ধীচ্ছায়া বা গান্ধীপ্রতিধ্বনি শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারি মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় যেরূপ প্রস্তাব মঞ্জুর করাইয়াছেন তাহাতে মনে হয়, এ-ক্ষেত্রে গান্ধীজী হয়ত সংস্কারপন্থী। তাঁহার সহিত বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর মুলাকাতে এই ধারণার কিছু সমর্থন পাওয়া যায়—যদিও তাঁহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তার কোন বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই।

বড়লাট ছুটি লইয়া স্বদেশে যাইতেছেন, কয়েক জন গবর্ণর গিয়াছেন বা যাইবেন, অন্য প্রধান রাজপুরুষ দু-এক জনও গিয়াছেন বা যাইবেন—ইহাতেও মনে হয় ফেডারেশ্যনের ছোটখাট পরিবর্ত্তন কিছু হইবে যাহার সম্বন্ধে ইঁহাদের সহিত ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের মন্ত্রণা হইবে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাইও বিলাতে বক্তৃতা-আদি করিয়া আসিয়াছেন। রাজপুরুষদের সহিত তাঁহার কি কথাবার্ত্তা হইয়াছে, প্রকাশ পায় নাই। সেইগুলাই কিন্তু প্রকাশিত বক্তৃতার চেয়ে কংগ্রেসের সংস্কারপন্থী দলের অধিকতর প্রকৃত-অভিপ্রায়-জ্ঞাপক। এরূপ গুজবও রটিয়াছে যে লণ্ডনে একটা ছোট গোলটেবিল বৈঠক বসিবে ও তাহাতে গান্ধীজী যাইবেন।

কিছু পরিবর্ত্তন যে হইবে, এরূপ ধারণা লোকের হইয়াছে।

—

ফেডারেশ্যন-ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে ভারতসচিব

সরকারী ফেডারেশ্যন-ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্ত্তন হইবে, ভারতীয়দের মধ্যে এইরূপ ধারণা জন্মায় ভারতসচিব

কালহরণ না-করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন, বিশেষ কিছুই হইবে না—পাছে আমরা বেশী কিছু চাহিয়া বসি! মহাশয়, আমরা ত বুঝি, চাওয়াতে বেশী বা অল্প কিছুই পাওয়া যায় না! এ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট ভারতশাসনের বিধি বা প্রণালীতে যাহা কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা প্রভু সদাশয় দাতার স্বেচ্ছাপ্রসূত এইরূপ ভঙ্গিমা সহকৃত হইলেও, অবস্থার চাপে তাহা ঘটিয়াছে, ইহা আমরা জানি। যে-প্রকার অবস্থাসমাবেশে রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও আবার ঘটিবে, সেই সমাবেশ কখন ভারতীয়দের পুরুষকারসঞ্জাত, কখন বা জাগতিক ঘটনাবলী হইতে উদ্ভূত। সুতরাং ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড নিশ্চিন্ত থাকুন। ভারতীয় নেতারা যদি কোন পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতার উল্লেখ করিয়া থাকেন, ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট বেকায়দায় পড়িলে তাহা, এমন কি, তার চেয়েও বেশী পরিবর্ত্তন, করিতে বাধ্য হইবেন। ভারতীয়দের চাওয়া না-চাওয়া, কিংবা চাওয়ার কমবেশীর উপর তাহা বড়-একটা নির্ভর করিবে না।

ভারতসচিব বলিয়াছেন, ফেডারেশ্যনের কাঠামো (framework) বদলাইবে না। আভাস দিয়াছেন, যদি কিছু পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে কাঠামোটা ঠিক্ রাখিয়া কিছু হইতে পারে। একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন, দেশী রাজ্যগুলির নৃপতিরা ভারতীয় ফেডার‍্যাল ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধিদিগকে স্বয়ং মনোনীত না করিয়া প্রজাদিগকেই উক্ত প্রতিনিধি-দিগকে নির্ব্বাচন করিতে দিলে ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট তাহাতে আপত্তি করিবেন না, বাধা দিবেন না। মহদনুগ্রহ!

সরকারী ফেডারেশ্যন-ব্যবস্থায় কি কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা বহু কংগ্রেস-নেতা অনেক বার বলিয়াছেন, স্বাজাতিক অন্য কোন কোন নেতাও বলিয়াছেন। অনেক সংবাদপত্র-সম্পাদক বলিয়াছেন, আমরাও বলিয়াছি। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সেই সমুদয়ের পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই যে দুটি প্রধান পরিবর্ত্তনের কথা বলেন, তাহার একটির সম্বন্ধে ভারত-সচিবের ইঙ্গিত আগেই উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টি "সাম্রাজ্যত্রাণ" (safeguards)গুলি মূল শাসনবিধি হইতে বাদ দেওয়া। সে-বিষয়ে ভারতসচিব বলেন, ভারতশাসন-আইনের প্রাদেশিক অংশটিতেও ঐরূপ "সাম্রাজ্যত্রাণ" আছে; তাহাতে ত প্রাদেশিক মন্ত্রীদের কাজের কোন ব্যাঘাত হয় নাই; আইনের ফেডার‍্যাল অংশের "সাম্রাজ্য-ত্রাণ"গুলিও ফেডার‍্যাল মন্ত্রীদের কাজে কোন ব্যাঘাত জন্মাইবে না। "সাম্রাজ্যত্রাণ"গুলি কেন রাখা হইয়াছে তাহা অবশ্য ভারতীয়েরা জানে, বুঝে। রৌদ্র, তীক্ষ্ণ-শীতল বাতাস ও বৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য লোকে শোলা ও কাপড়ের ও রবারের শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করে। তীর ও অন্য তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাত হইতে রক্ষার জন্য ইস্পাত ও চর্ম্মের শিরস্ত্রাণ ব্যবহৃত হয়। রূপক ভাষায় যাহাকে রাষ্ট্রনৈতিক রৌদ্র ও ঝড়বৃষ্টি বা রাষ্ট্রনৈতিক অস্ত্রের আঘাত বলা যাইতে পারে, ভারতীয় মন্ত্রীরা ও ব্যবস্থাপক সভায় স্বাজাতিক সদস্যেরা যত ক্ষণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাহার আয়োজন বা প্রয়োগ না করিবেন, তত ক্ষণ গবর্ণর-জেনার‍্যাল ও গবর্ণরেরা "সাম্রাজ্যত্রাণ" রূপ শিরস্ত্রাণ-গুলি ব্যবহার করিবেন না, কিন্তু দরকার হইলেই করিবেন। অতএব, তাঁহাদের মরজির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। তাহা অবাঞ্ছনীয়। কারণ, তাহা পূর্ণস্বরাজ লাভ প্রচেষ্টার পরিপন্থী। অবশ্য, ইহাও সত্য, যে, "সাম্রাজ্যত্রাণ"গুলা থাকা সত্ত্বেও কৌশলী চতুর মন্ত্রীরা পূর্ণস্বরাজ লাভের কিছু কিছু চেষ্টা করিতে পারেন।

—

ভারতের একত্ব ব্রিটেনের দান!

লণ্ডনের "বোম্বাই" ভোজের বক্তৃতায় ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড বলেন, যে, ভারতীয়দিগকে একত্বদান ভারতে ব্রিটেনের একটি মহত্তম কৃতিত্ব বা কীর্ত্তি। যেমন এক জাতি অন্য জাতিকে স্বাধীনতা দিতে পারে না, তাহাদের স্বাধীন হইবার বা থাকিবার বাহ্য বাধা দূর করিতে পারে, তদ্রূপ একত্বও বাহির হইতে এক জাতি অন্য কোন দেশের লোকদিগকে দিতে পারে না।

ভারতবর্ষের একত্ব নানা রকমের। ইহার উত্তর, উত্তর-পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিমের পর্ব্বতমালা এবং পূর্ব্ব, পশ্চিম

ও দক্ষিণের সমুদ্র ইহাকে ভৌগোলিক একত্ব দিয়াছে। ইহা স্বাভাবিক, বিধিদত্ত; মানুষের দান নহে। ব্রিটিশ শাসনকালের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, মুসলমান শাসনেরও বহুপূর্ব্বে, ভারতবর্ষ তাৎকালিক অন্যান্য দেশ ও জাতি অপেক্ষা অধিক সাংস্কৃতিক একত্ব লাভ করিয়াছিল, এবং সেই একত্ব এখনও আছে। ইহা ব্রিটেনের দান নহে। বস্তুতঃ এই সাংস্কৃতিক একত্ব থাকাতেই সমগ্র ব্রিটিশ ভারতকে একটি রাষ্ট্ররূপে শাসন করা ইংরেজদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে। সম্রাট্ অশোকের সময়ে তাঁহার রাষ্ট্রীয়, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বর্ত্তমান ব্রিটিশ-প্রভাবিত ভারতবর্ষ অপেক্ষা বৃহত্তর ভূখণ্ডে অনুভূত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিবার মত ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

সাংস্কৃতিক ঐক্যবিহীন বাহ্য রাষ্ট্রীয় একত্ব যে কিরূপ ঠুনকা, বিশাল অষ্ট্রোহাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের বিলয় তাহার একটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। গত মহাযুদ্ধের আঘাতে ইহার অন্তর্গত হাঙ্গেরীয়, চেক্, স্লোভাক প্রভৃতি জাতি ও তাহাদের দেশ সব পৃথক্ হইয়া যায়। বাকী ছিল ক্ষুদ্র অষ্ট্রিয়া দেশ। তাহার সংস্কৃতি জার্মেনীর সহিত অভিন্ন। জার্মেনীর পক্ষে অষ্ট্রিয়াকে স্বাঙ্গীভূত করা যে সহজ হইয়াছে, এই সাংস্কৃতিক ঐক্য তাহার একটি প্রধান কারণ।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় একত্ব যে বাহ্য নহে, ঠুনকা নহে, তাহার কারণ ইহার সাংস্কৃতিক ঐক্য। তাহা ব্রিটেনের দান নহে।

ব্রিটেন ভারতবর্ষকে যে রাজনৈতিক ও শাসনসম্বন্ধীয় একটা কাঠামোর মধ্যে ফেলিয়াছে; রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতারবার্ত্তা প্রেরণ ব্যবস্থা ও এরোপ্লেন দ্বারা একত্ব-অনুভবে দূরত্বের বাধা দূর করিয়াছে; তাহা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য করিয়াছে। এমন কি, যে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য এবং ইতিহাসের মধ্য দিয়া শিক্ষা পাওয়ায় ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক একত্ব ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিয়াছে, তাহাদের সুপ্ত স্বাজাতিকতা ও বিশ্বমানবের সহিত একত্ববোধ জাগিয়াছে, পরস্পরের সহিত ভাব ও চিন্তার বিনিময় করিতে পারিতেছে, সেই শিক্ষাও ইংরেজ ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত করে স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত।

ইংরেজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য যাহা করিয়াছে, আমরা তাহার সুফল ও সুবিধা অস্বীকার করি না; কিন্তু তাহা সদাশয়তাপ্রসূত দান বলিয়াও মানিতে পারি না।

আমরা মডার্ণ রিভিয়ুতে ও প্রবাসীতে অনেক বার দেখাইয়াছি, নূতন ভারতশাসন-আইন অনুযায়ী শাসন-বিধি কেমন করিয়া ভারতের একত্বকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই বিনাশ যে নূতন শাসনবিধির একটি উদ্দেশ্য তাহা আমরা জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী সিলেক্ট কমীটির রিপোর্ট হইতে ঠিক কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। বহিখানি নিকটে থাকিলে আবার উদ্ধৃত করিতাম। তথাকথিত প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব দান এই বিনাশচেষ্টার একটি অংশ। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেরা এখন নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যাপৃত, সমগ্র ভারতবর্ষের কল্যাণসাধন এবং সকল ভারতীয়ের জন্য স্বরাজলাভ চেষ্টা এখন পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে—বিস্মৃতির তলায় ডুবিয়াছে বলিলেও চলে। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর লোকেরা একত্র তাহাদের সকলের প্রতিনিধিদিগকে নির্ব্বাচন করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাইবার কোন বন্দোবস্ত আইনে নাই। তাহার পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম ও বৃত্তি প্রভৃতি ভেদে আলাদা আলাদা নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। প্রতিনিধিরা যে সমস্ত দেশ ও জাতির প্রতিনিধি, সমস্ত দেশ ও জাতি যে এক, ভারতশাসন-আইন এই বোধের মূলে কুঠার আঘাত করিতেছে।

প্রদেশগুলির অবস্থা এইরূপ। সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা এক মাত্র স্থান যেখানে ভারতীয় মহাজাতি নিজের ঐক্য অনুভব করিতে পারিত। কিন্তু তাহাও এমন ভাবে গঠিত, যে, সেখানেও প্রাদেশিক, সাম্প্রদায়িক, ও শ্রেণীগত পার্থক্য উত্তমরূপে অনুভূত হইবে, অনেকে অন্যের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত থাকিবে, অনেকে নিজের প্রতি অন্যায় ব্যবহারে অসন্তুষ্ট থাকিবে, এবং দেশী নৃপতিদিগকে হাতে রাখিবার অভিপ্রায়ে ব্রিটিশ-ভারতের শক্তি হ্রাস করা হইয়াছে নিত্য অনুভূত হইবে। দেশী রাজ্যের প্রজাদিগকে আইনে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের ক্ষমতা না

দেওয়ায় তাহারা ব্রিটিশ-ভারতের সহিত একত্ব অনুভব করিবে না।

এই প্রকারে নূতন ভারতশাসন-আইন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ও শাসনপ্রণালীগত একত্বকে যথাসাধ্য কমাইয়াছে।

অতএব ভারতসচিবের গর্ব্বের কোন ভিত্তি নাই।

বিদ্যাসাগর ও তাঁহার গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেনকে লিখিয়াছেন :—

"বিদ্যাসাগরের পুণ্যস্মৃতি রক্ষার উদ্দেশে প্রকাশিত 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী'র প্রথম খণ্ড পেয়ে বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। তাঁরই বেদীমূলে নিবেদন করবার উপযুক্ত এই অর্ঘ্য রচনা। অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব যাঁর চরিত্রে দীপ্তিমান হয়ে দেশকে সমুজ্জ্বল করেছিল, যিনি বিধিদত্ত সম্মান পূর্ণভাবে নিজের অন্তরে লাভ করে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমরা সেই ক্ষণজন্মা পুরুষকে শ্রদ্ধা করবার শক্তি দ্বারাই তাঁর স্বদেশবাসীরূপে তাঁর গৌরবের অংশ পাবার অধিকার প্রমাণ করতে পারি। যদি না পারি তাতে নিজেদের শোচনীয় হীনতারই পরিচয় হবে। এই অগৌরব থেকে বিস্মৃতিপরায়ণ বাঙালীকে রক্ষা করবার জন্যে যাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন তাঁদের সকলকে সর্ব্বান্তঃকরণে সাধুবাদ দিই। ৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫।"

"ক্ষণিকা"

বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম, এবং এখনও শুনিতে পাই, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাস গ্রীষ্মকাল। কিন্তু জ্যৈষ্ঠের শেষের দিকে বঙ্গে বর্ষা না আসিলে লোকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়, সাধারণতঃ বর্ষা আসেও।

এখন ঘাটশিলায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মেঘে অম্বর মেদুর, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে। এমন দিনে জ্যৈষ্ঠের ছাব্বিশ তারিখে রবীন্দ্রনাথের "ক্ষণিকা"র নূতন সংস্করণের বহি একখানি ডাকে আসিয়া পৌঁছিল। হঠাৎ মনে হইল, দেখি ইহাতে বর্ষার কথা কি আছে। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে 'সেকাল' কবিতায় দেখি কবি বলিতেছেন, "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে, দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে," তাহা হইলে

> আষাঢ় মাসে মেঘের মতন
> মন্থরতার ভরা
> জীবনটাতে থাকৃত নাকো
> কিছুমাত্র ত্বরা।

কিন্তু এই বৃদ্ধ সম্পাদকের জন্ম কালিদাসের কালে হইলেও তাহার দশম রত্ন বা Xতম রত্ন হওয়া ত ঘটিতই না, তাহাকে নিতান্তই বেকার হইতে হইত। কবির জীবনটি কি হইত এবং সম্পাদকের জীবনটা বাস্তবিক কি, ভাবিতে গিয়া দেখি, আষাঢ় মাসেও জীবনটাতে ঘড়ির কাঁটা কেবলই ত্বরা দিতেছে। বানপ্রস্থের ইচ্ছা খুবই হয়। কিন্তু দেখি, কবি "ক্ষণিকা"রই 'শাস্ত্র' কবিতায় ব্যবস্থা দিয়াছেন,

> পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাবে
> এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
> আমরা বলি বানপ্রস্থ
> যৌবনেতেই ভালো চলে।

কবিকে লোকে ঋষিও বলে, সুতরাং তাঁহার আর্ষ-প্রয়োগও শাস্ত্রোক্ত বিধির মত মান্য। তাহা হইলে "ত্রিসপ্তত্যূর্দ্ধে" সম্পাদকের বনে যাওয়াও ঘটিবে না। যায় কোথা? 'মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া'র যে ব্যবস্থা কবি আর একটি কবিতায় করিয়াছেন, তাহার মাতাল সাধারণ মদ্য পান করে না, কবিতা বা অন্য কোন রকম ভাবের ও রসের নেশা করে। বৃদ্ধ সম্পাদক বাস্তব বা রূপক কোন নেশাই কখনও না-করায় তাহার পাতাল পানে ধাওয়াও ঘটিবে না।

সুতরাং বর্ষার ও আষাঢ়ের সন্ধানে আরও পাতা উল্টানই ভাল।

কবি কালিদাসের কালে জন্মিলে

> বিরহেতে আষাঢ় মাসে
> চেয়ে রৈত বঁধুর আশে,
> একটি করে পূজার পুষ্পে
> দিন গণিত ব'সে।

দিন গণনা এখনও চলিতেছে। কবে ফুরাইবে?

কাল্‌কে রাতে মেঘের গরজনে,
ঝিমিঝিমি বাদল-বরিষনে
ভাব্‌তেছিলাম একা একা—
স্বপ্ন যদি যায় রে দেখা
আসে যেন তাহার মূর্তি ধ'রে
বাদলা রাতে আধেক ঘুমঘোরে।

পাতা উল্টাইয়া দেখি কবি বলিতেছেন,

ওগো আজ তোরা যাস্‌নে গো তোরা
যাস্‌নে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর
নাহিরে।

আর একটি কবিতায় কবি ক্ষমা চাহিতেছেন—

হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে
করিয়ো ক্ষমা।
তোমার দু'খানি কালো আঁখি-পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে,
ঘনকালো তব কুঞ্চিত কেশে
যূথীর মালা।
তোমারি ললাটে নববরষার
বরণডালা।

কবির বাল্যকালের

মনে পড়ে সেই আষাঢ়ে
ছেলেবেলা
নালার জলে ভাসিয়েছিলেম
পাতার ভেলা।

'সুখ দুঃখ' কবিতায় বর্ষাকালেরই রথের তলায় স্নান-যাত্রার মেলায়

সবার চেয়ে আনন্দময়
ঐ মেয়েটির হাসি।
এক পয়সায় কিনেছে ও
তালপাতার এক বাঁশি।

আর,

আজকে দিনের দুঃখ যত
নাইরে দুঃখ উহার মত,
ঐ যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান পানে চাহি;
একটি রাঙা লাঠি কিনবে
একটি পয়সা নাহি।
চেয়ে আছে নিমেষহারা
নয়ন অরুণ।

হাজার লোকের মেলাটিরে
করেছে করুণ।

—

নিরক্ষরতা দূরীকরণ

দেশের কল্যাণকামী লোকেরা বহু বহু বৎসর আগে হইতে ভারতবর্ষের লোকদের ঘোর নিরক্ষরতা দূর করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং অন্য সকলকেও সচেষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আমরাও এ বিষয়ে লেখালেখি ও বক্তৃতা কিছু করিয়াছি।

হাল আমলের কংগ্রেস আগে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু মন দেন নাই। সুখের বিষয় এখন অনেক প্রদেশে মন দিতেছেন—যদিও দুঃখের বিষয় বঙ্গে নহে।

বিহারের প্রতি জেলায় এক-শ দু-শ শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইতেছে, যেখানে নিরক্ষর লোকদিগকে লিখিতে পড়িতে শিখান হইতেছে। বিহারের ছাত্রেরা এই কাজে উৎসাহের সহিত লাগিয়া গিয়াছেন। তথাকার কংগ্রেসী মন্ত্রী ও অন্য কংগ্রেসওআলারা এ বিষয়ে খুব উৎসাহী হইয়াছেন। এই উৎসাহ অধ্যবসায়ে পরিণত হইলে আগামী ১৯৪১ সালের সেন্সসে দেখা যাইবে, বিহার নিরক্ষরতার কলঙ্ক বহু পরিমাণে মুছিয়া ফেলিয়াছে, হয়ত বা বাংলাকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে।

যুক্তপ্রদেশে ও মধ্যপ্রদেশেও উৎসাহ দেখা যাইতেছে।

—

যুব-আন্দোলন ও ছাত্র-আন্দোলন

বঙ্গে ছাত্রেরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতেছেন কখন যুবক বলিয়া, কখনও বা ছাত্র বলিয়া।

কোন্ বয়সের মানুষকে যুবা বলা যায়, তাহা ঠিক্ করিয়া বলা সোজা না-হইলেও, একটা মোটামুটি ধারণা এ-বিষয়ে লোকের আছে, এবং আইনে কোন্ বয়সের মানুষকে সাবালক বলে তাহাও জানা আছে। কিন্তু ছাত্র বলিতে কিণ্ডারগার্টেনের ও নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালার শিশু হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্র্যাজুয়েট শ্রেণীর ও আইন কলেজের ছাত্রছাত্রী সকলকেই বুঝায়। ইঁহারা সকলেই কি ছাত্র-আন্দোলনে যোগ দিবার অধিকারী?

আমরা পরিহাস করিতেছি না। কংগ্রেস-নেতারা পরিষ্কার করিয়া বলুন। যখন বালকদেরও রাজনৈতিক আন্দোলক, কর্ম্মী, চালক, ও নেতা হইবার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ফলে খুনজখম পর্য্যন্ত হইতেছে, তখন কংগ্রেস-নেতারা স্পষ্ট কথা না-বলিলে কর্ত্তব্যে অবহেলার অপরাধ হইবে। তাঁহাদিগকে আমাদের মতের সমর্থন করিতে বলিতেছি না। আমাদের ভ্রম হইলে তাহা যুক্তিসহকারে বুঝাইয়া দিউন। অবশ্য, আমাদের মত বিচারেরও অযোগ্য হইতে পারে, কিন্তু আমাদের অসন্তোষের ভয়ে কেহ কিছু বলিবেন না, বাতুলেও এরূপ ভাবিবে না। সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগেরও এ-বিষয়ে কর্ত্তব্য আছে। আন্দোলন দেশে যত বেশী হয়, বিশেষতঃ গরম গরম রাজনৈতিক আন্দোলন, সংবাদের ততই প্রাচুর্য্য হয়, এবং সকল খবরের কাগজেরই চাহিদা বাড়ে। বড় রকমের যুদ্ধ বাধিলে খবরের কাগজের কাটতি বাড়ে। আমেরিকার কোন কোন ধনশালী ও প্রভাবশালী সংবাদপত্রের মালিক অন্যায় যুদ্ধ বাধাইয়াছে পর্য্যন্ত নিজেদের ব্যবসার সুবিধা হইবে বলিয়া! কিন্তু জন-সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ কল্যাণকামী সম্পাদকেরা এরূপ যুদ্ধের বিরোধিতাই করেন। সেইরূপ আন্দোলন মাত্রেরই সমর্থন করা বা তাহার প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের (সম্পাদকদিগের) কর্ত্তব্য নহে।

ছাত্র-আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের মত একাধিক বার ব্যক্ত করিয়াছি। আবার বলিতেছি।

বর্ত্তমানে যাঁহারা রাজনৈতিক নেতা ও কর্ম্মী আছেন, তাঁহারা এক সময়ে ছাত্র ছিলেন, কেহ কেহ বিশেষ কৃতী ছাত্র ছিলেন, রাজনীতি অত্যাবশ্যক, এবং রাজনীতিক্ষেত্রে শুভ সক্রিয়তা জাতির সজীবতার অন্যতম লক্ষণ, এই জন্য রাজনৈতিক নেতার ও কর্ম্মীর প্রয়োজন সর্ব্বদাই থাকিবে। বর্ত্তমান কর্ম্মী ও নেতারা যেমন অতীতে ছাত্র ছিলেন, তেমনি বর্ত্তমানে যাঁহারা ছাত্র, তাঁহারা ভবিষ্যতে রাজ-নৈতিক কর্ম্মী ও নেতা হইবেন। অন্য সকল প্রকার কাজের জন্য যেমন শিক্ষা দ্বারা প্রস্তুতির প্রয়োজন, রাজনৈতিক কাজের জন্যও তদ্রূপ প্রস্তুতির প্রয়োজন। এই প্রস্তুতির নিমিত্ত বিদ্যালয়ে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণতঃ যে-সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার (এবং রাজনীতিরও) জ্ঞান আবশ্যক। ছাত্রাবস্থায় এই জ্ঞান সঞ্চিত হয়। জ্ঞানলাভেই প্রধানতঃ মনোযোগী না হইলে শিক্ষালাভ করা যায় না। কিন্তু ছাত্রাবস্থাতেই রাজনৈতিক কর্ম্মী ও দলসংগঠক নেতা হইলে শিক্ষালাভে ব্যাঘাত ঘটে। অনেকটা, অধিকাংশ বা সমস্ত সময় রাজনৈতিক কর্ম্মে দিতে হয় বলিয়া ব্যাঘাত ঘটে, কিন্তু শুধু সেই কারণেই যে ব্যাঘাত ঘটে তাহা নহে। রাজ-নৈতিক সক্রিয়তার মধ্যে যে উত্তেজনা ও উন্মাদনা আছে, তাহা সত্ত্বেও চিত্তের স্থৈর্য্য ও শান্তভাব রক্ষা করা অতি কঠিন। অথচ এই স্থৈর্য্য ও শান্তভাব ব্যতিরেকে জ্ঞান-লাভ ও শিক্ষা হয় না। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের পক্ষেও রাজনীতির উত্তেজনা ও উন্মাদনা চিত্তবিক্ষেপ জন্মায়, অনেক সময় তাহা নেশার মত হইয়া দাঁড়ায়। বয়স যখন কম থাকে, তখন সমুদয় চিত্তবৃত্তি প্রবলতম থাকে। তখন রাজনৈতিক উত্তেজনা ও উন্মাদনা যথাসম্ভব পরিহার না-করিলে শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটা অনিবার্য্য।

প্রশ্ন উঠে, যদি ছাত্রদিগকে রাজনীতি পরিহার করিতে হয়, তাহা হইলে যে রাজনৈতিক জ্ঞান জাতীয় জীবনের পক্ষে এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা কিরূপে ছাত্রেরা পাইবে? ইতিহাস পাঠ করিয়া পাইবে এবং যাহার ভাষাজ্ঞান যতটা হইয়াছে, তাহার উপযোগী রাজনীতিবিষয়ক পুস্তক হইতে পাইবে। ভাল সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রের প্রবন্ধ হইতে পাইবে। কেবল পুঁথিগত বিদ্যাতেই যে চলিবে, তাহা নহে। ছাত্রেরা জ্ঞানবান্ রাজনীতিকদের বক্তৃতা শুনিবে; এবং নিজেদের রাজনৈতিক বিতর্কসভায় বক্তৃতাদি করিবে। কংগ্রেসের, প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের ও জেলা কন্‌ফারেন্সের স্বেচ্ছাসেবক হইতে পারে। ইহাতে তাহাদের বৎসরের সামান্য অংশ মাত্র ব্যয়িত হইবে। কিন্তু তাহারা যদি দস্তুরমত রাজনৈতিক কর্ম্মী ও আন্দোলক এবং রাজনৈতিক ছাত্রনেতা হয়, ছাত্রসংঘ, ছাত্র-ফেডারেশ্যন ইত্যাদি গড়ে, তাহা হইলে তাহার আফিস চালান, তাহার অবৈতনিক কর্ম্মচারী হওয়া ও রাখা, চাঁদা তোলা ও হিসাব রাখা, দল বাঁধা ও দলাদলি

বয়া, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ও সাধারণ সমিতির সভ্য এবং সভাপতি ও সম্পাদকাদি অবৈতনিক কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের দ্বন্দ্ব, ইত্যাদি ত থাকিবেই, অধিকন্তু রাজনৈতিক মুরুব্বিয়ানা ও প্রচারকার্য্য-আদিও করিতে হইবে। সুতরাং রাজনীতির সহিত সংস্রব নৈমিত্তিক একটা ব্যাপার না-হইয়া প্রধান একটা নিত্যকর্ম্ম হইয়া উঠিবে। দুঃখের বিষয় ইতিমধ্যেই অনেক ছাত্রের পক্ষে তাহা হইয়াছে। আগে ছিল, ফুটবল প্রভৃতির ম্যাচ দেখা, তাহার পর জুটিয়াছিল সিনেমার নেশা, তদনন্তর আসিয়াছে রাজনৈতিক ছাত্র-আন্দোলন। এই ত্র্যহস্পর্শ সত্ত্বেও যে বাঙালীর ছেলেরা পাস করিতেছে, তাহা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহেতুকী কৃপায়। আমরা ফুটবল খেলার বিরোধী নহি, তাহার সমর্থক; ফুটবলের ম্যাচ দেখিয়া সময় নষ্ট করার বিরোধী। ভাল সিনেমা-চিত্র দেখারও সমর্থক, যৌন-আকর্ষণ-বহুল এবং ডাকাতি-হত্যা-ব্যভিচার-আদি-সমাজদ্রোহিতা-উত্তেজক চিত্রের বিরোধী। ছাত্রদের রাজনীতি শিক্ষার পক্ষে যাহা আবশ্যক, তাহার আমরা সমর্থন করি। কি আবশ্যক, উপরে তাহা বলিয়াছি।

সমাজতন্ত্রবাদ এবং কম্যুনিজ্‌ম্ সম্বন্ধে কৌতূহল স্বাভাবিক। এই এই বিষয়ে জ্ঞানদায়ক বহি পাওয়া গেলে তাহা শিক্ষায় কতকটা অগ্রসর ছাত্রদিগকে পড়িতে দেওয়া যাইতে পারে। প্রপ্যাগ্যাণ্ডার বহি তাহাদের অপাঠ্য। অভিভাবক ও শিক্ষকদিগের রাজনীতির জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ছাত্রদের রাজনৈতিক জিজ্ঞাসুতা চাপা না দিয়া, নিষেধের পথ অবলম্বন না-করিয়া তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে ও সন্দেহ ভঞ্জন করিতে অভিভাবক ও শিক্ষাদাতাদিগের প্রস্তুত হওয়া ও থাকা আবশ্যক। নিষেধের, শাসনের ও শাস্তির বাঁধে রাজনৈতিক প্লাবনের তরঙ্গ রোধ করা যাইবে না।

—

রাজনৈতিক কর্ম্মী-সম্মেলনে মাথাভাঙা লাঠি

যে-সব দেশে অহিংসাবাদ প্রচারিত হয় নাই, অস্ত্র-আইন নাই, এবং যে-সকল প্রতিষ্ঠান অহিংসাবাদ গ্রহণ করে নাই, তাহাদেরও সভার অধিবেশনে লোকেরা অস্ত্রসজ্জা করিয়া যায় না। ভারতবর্ষে অহিংসাবাদ প্রচারিত হইয়াছে, কংগ্রেসের কতক লোক ধর্ম্মবিশ্বাসের অঙ্গেরই মত অহিংসা মানেন বাকী সকলে উহা ঠিক্ পলিসি বলিয়া মানেন, এবং এদেশে অস্ত্র-আইন আছে। সেই জন্য কংগ্রেসওআলাদের কোন দলের সভায় বন্দুক তলোয়ার লইয়া লোকে কেন যায় না, বুঝিতে পারি। সেই কারণেই ত মাথা ভাঙিবার উপযোগী লাঠিও ঐরূপ সভায় কাহারও থাকিবে না এই রূপই ত আশা করা যায়। অথচ যশোহরের কুখ্যাত সভাটাতে তাহা ছিল। এবং পরিতাপের বিষয়, তথাকার লাঠিধারীদিগকে কেহ এ উপদেশ দেয় নাই, যে, ভীড় নিবারণের জন্য মাথা-ভাঙা একান্ত আবশ্যক নহে, পা-ভাঙা আবশ্যক হইতেও পারে।

—

যশোহরের কলঙ্ক

দেশের নানা স্থানেই নানা সম্মেলন হইতেছে—বেশীর ভাগই রাষ্ট্রীয়। এক দিক হইতে দেখিলে মনে হয় ইহা শুভলক্ষণ, লোকে সচেতন হইতেছে, অথবা তাহাদিগকে সচেতন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু সবই যে সুলক্ষণ নয় তাহার প্রমাণও দেখিতেছি যশোহর-খুলনা কর্ম্মী-সম্মেলনে। ২৮শে জুন সেখানে একটি সম্মেলন হইবার কথা ছিল, কিন্তু সম্মেলন হইতে পারে নাই। স্থানীয় যুবক, কৃষক (?), ছাত্র ও কোন কোন কর্ম্মী এই সম্মেলনে যোগ দেন নাই, বা তাহাদিগকে যোগ দিতে দেওয়া হয় নাই। ফলে গোলমাল হয়, মারামারি হয়, উভয় পক্ষেই বহুলোক আহত হয়, এবং নরেশ সেন নামে একটি ১৫ বৎসরবয়স্ক ইস্কুলের ছাত্র এইরূপ আহত হয় যে, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। এই গুরুতর ব্যাপারে নিশ্চয়ই পুলিস অনুসন্ধান করিবে, কংগ্রেস হইতেও অনুসন্ধান-সমিতি নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করিব। কিন্তু ইতিমধ্যে দুই-একটি কথা মনে জাগিতেছে। শুনিয়াছি, দায়িত্ববান্ নেতৃগণের কেহ কেহ ঐখানে উপস্থিত ছিলেন, তথাপি কি করিয়া এমন শোচনীয় ঘটনা ঘটিল? দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেসের অহিংস-নীতি পালিত

হইয়াছে কি? তাহা হইলে কি করিয়া এতগুলি লোক আহত হয়, একটি বালকের মৃত্যু হয়, তাহা বুঝা অসম্ভব। যে কর্ম্মীদল প্রতিষ্ঠা পায় নাই বলিয়া এই ভাবে পনর বৎসরের ছাত্রের কাঁধে বন্দুক রাখিয়া প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিবার কৌশল অবলম্বন করে, এই বালকের মৃত্যুর জন্য তাহারাই কি আংশিক ভাবে দায়ী নয়? যাহারা সমস্ত নীতি বিসর্জ্জন দিতে দ্বিধা করে না, তাহারা এ-দেশের রাজনীতিতেই বা কেন স্থান চাহে? যশোহরের এই ব্যাপারে মনে হয়, কংগ্রেস ও কর্মীদের নিজেদের যাচাই করিবার সময় হইয়াছে;—তাঁহাদের মধ্যে দলাদলির মোহ এত বাড়িয়াছে যে আজ নানা অজুহাতে তাঁহারা সমস্ত মনুষ্যত্বও পদদলিত করিতে কুণ্ঠিত নহেন। সুভাষবাবু কি বাংলার রাজনীতি হইতে এই নীতিহীনতা দূর করিতে পারিবেন?

—

যশোহরের অভিভাষণ

যশোহর-খুলনা কর্ম্মী-সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ। তিনি তিন আইনের বন্দী ছিলেন, সম্প্রতি মুক্তি পাইয়াছেন—পূর্ব্বেও দুইবার বিনা বিচারে এইরূপ দীর্ঘকাল বন্দী ছিলেন। আজকালকার সম্মেলন-গুলির সব অভিভাষণই প্রায় এক ছাঁচে ঢালা—সুরেন্দ্র-বাবুর অভিভাষণ তাহা হইতে অনেকাংশে স্বতন্ত্র। তাই ইহা উল্লেখযোগ্য। সংক্ষেপে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাষা ও ভাব স্পষ্ট। বিশ্ববিপ্লবের বা বিশ্বসঙ্কটের ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। সাধারণ সাম্যবাদীর কল্পিত বিশ্ববিপ্লব ইত্যাদি হইতে তাঁহার কল্পিত বিশ্ববিপ্লব একটু ভিন্ন ধরণের।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা isolated ঘটনা হিসাবে ঘটিবার নহে; ভারতবর্ষের পূর্ণস্বাধীনতার রূপ যখনই মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করি তখনই দেখি, হয় পৃথিবীব্যাপী এক মহাসমরের মধ্যে ভারত তাহার নিজের পরাধীনতার পাশ ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইয়া সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর না হয় পৃথিবীব্যাপী crisis বা বিপ্লবের মধ্যে ভারত স্বাধীন হইয়া এক নবযুগের প্রারম্ভে নূতন জগৎ, নূতন সমাজ, নূতন রাষ্ট্রগঠনের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব লইয়া অগ্রসর হইতেছে।

কংগ্রেসের কর্ম্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করিয়া সুরেন্দ্রবাবু উহার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রোগ্রাম সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য বলিয়াছেন:—

(১) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেসের দাবী:—পূর্ণস্বাধীনতা হইলেও উপস্থিত দাবী Constituent Assembly। আমাদের বিবেচনায় ইহা দোষযুক্ত। আমরা জনসাধারণকে আহ্বান করিতেছি—তাহারা দলে দলে আসিয়া সংগ্রামে যোগ দিক, অথচ আজ তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি না, কী সেই রাষ্ট্রীয় অধিকার যাহা সে পাইবে এবং ভোগ করিবে। সেই Constitution-এর এমন কোনও রূপ আমরা তাহাদের চোখের সম্মুখে ধরিতে পারিতেছি না যাহাতে তাহারা বুঝিতে পারে যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাহাদের স্থান কোথায়, অধিকার কতটুকু, এবং আত্মকর্তৃত্ব স্থাপনের ব্যবস্থাটাই বা কি? (করাচীর ভিত্তিগত অধিকার-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে কিছু নাই কি?—প্রবাসী-সম্পাদক।)

আমাদের বিবেচনায় ভারতের প্রাচীন পঞ্চায়েৎ-রাজের পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের একটা খসড়া কংগ্রেস পক্ষ হইতে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত।

(২) অর্থনৈতিক:—বর্তমান কংগ্রেস চরকা এবং কুটীর-শিল্পের সাহায্যে ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার মীমাংসা উপস্থিত করিতেছে। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে, উহাতে ভারতের পরাধীনতার বন্ধন স্থায়ী ও কায়েম হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ছাড়া গতি নাই। শুধু তাহাই নয়, যত দিন ভারতবর্ষ উপযুক্তরূপে শিল্প-সংযুক্ত না হইবে তত দিন ভারতবর্ষের কৃষকেরও অবস্থার প্রকৃত উন্নতি কিছুতেই সম্ভব হইবে না।... এর সঙ্গে আরও একটা বিষয়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। ভারতবর্ষ যত দিন যথোচিত শিল্পসমৃদ্ধ না হইতেছে তত দিন পৃথিবী হইতে যুদ্ধ-আশঙ্কা সমর-সজ্জা প্রভৃতি দূর হইবার নয়।

(৩) সামাজিক:—হরিজন-আন্দোলন আমাদের বিবেচনায় মোটেই যথেষ্ট নয়; শুধু হিন্দু-সমাজের মধ্যে নয়, মানুষে মানুষে সামাজিক জীবনের সকল প্রকার আদানপ্রদানের মধ্যে সমানাধিকার স্বীকৃত হওয়া আবশ্যক। জানি এক দিনেই ইহা হইবার নহে, কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া থাকারও সময় নাই। এখন হইতেই ইহার জন্য জনমতগঠনের আয়োজন ব্যাপকভাবে হওয়া প্রয়োজন।

সুরেন্দ্রবাবু এই কিষাণসভা, মজদুর সভার দিনেও একমাত্র কংগ্রেসকেই বলশালী করিতে চাহেন:—

সমস্ত কাজের মধ্যে মুখ্য লক্ষ্য ও সদাজাগ্রত উদ্দেশ্য থাকিবে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলা। আমরা কৃষককে সঙ্ঘবদ্ধ করিব, কিন্তু কংগ্রেসের পতাকাতলে; আমরা শ্রমিক ও মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ করিব কংগ্রেস-পতাকাতলে আনিবার জন্য; যুব-শক্তিকে, মহিলাদের, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিব কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিবার জন্য। আমাদের প্রচার-মন্ত্র হইবে—All powers to the Congress.

—

স্বাধীনতাকামী ছাত্রছাত্রীদের শ্রেষ্ঠ কার্য্য

বঙ্গের অনেক ছাত্র রাজনৈতিক কোন প্রচেষ্টা হইতে প্রেরণা না-পাইয়াও অনেক আগে হইতেই দেশের অজ্ঞ ও নিরক্ষর লোকদের জ্ঞানবৃদ্ধির কাজে মন দিয়া আসিতেছেন। বঙ্গের বাহিরে কোন কোন প্রদেশে কংগ্রেসের প্রেরণায় ছাত্রেরা দলে দলে এই কাজে লাগিয়াছেন। বঙ্গেও আশা করি আগেকার চেয়ে বেশী ছাত্রছাত্রীর এই সেবাক্ষেত্রে আবির্ভাব হইয়াছে। বয়স্ক লোকদের অজ্ঞতা দূরীকরণ প্রচেষ্টাতেও আশা করি বহু ছাত্রছাত্রীর সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। এই কাজে হাততালি নাই, বাহবা নাই, উত্তেজনা নাই; এই জন্য ইহা ছাত্রদের পক্ষে খুব উৎকৃষ্ট দেশসেবার পথ। দেশের স্বাধীনতার জন্য যে গণজাগরণ একান্ত আবশ্যক, তাহার নিমিত্তও ইহা একান্ত প্রয়োজনীয়।

—

বঙ্গে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হইতে পারে

পূর্ব্বে বঙ্গে খুব ভাল তুলা জন্মিত, ইহা ঐতিহাসিক তথ্য। এখনও যে বঙ্গের নানা জেলায় ও স্থানে ভাল তুলা হইতে পারে তাহা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, সরকারী কৃষি-বিভাগের অ-বাঙালী এক জন উচ্চ কর্ম্মচারী অন্য এক বিভাগের বাঙালী কোন উচ্চ কর্ম্মচারীকে বলিয়াছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগকে ইহা বলিয়াছিলেন। কিছু কাল পূর্ব্বে ঢাকেশ্বরী মিলের কর্তৃপক্ষ তাহার নিজের জমিতে লম্বা আঁশের তুলার চাষ করিয়া সুফল লাভ করেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা এই, যে, বঙ্গের অনেক স্থানে শ্রেষ্ঠ মিশরীয় তুলাও জন্মিতে পারে। বঙ্গের অন্যান্য মিল-মালিকেরাও এখন উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদন বিষয়ে উৎসাহী হইয়াছেন। সরকারী টাকা আপাততঃ ইহাতে বিশ হাজার ব্যয়িত হইবে। ইহা সামান্য। কিন্তু কাজটি ত আরম্ভ হউক। এবং বেসরকারী সঙ্গতিপন্ন, এমন কি সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকেরাও, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। তাহাতে লোকসান ত হইবেই না। কিছু লাভ নিশ্চয়ই হইবে। বঙ্গে পাটের চাষে বিঘা-প্রতি ৪৸০ লাভ থাকে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে বাংলায় উৎকৃষ্ট তুলার চাষে বিঘা-প্রতি ১২৸০ লাভ হইতে পারে। কাহাকেও পাটের জমি এই কাজে লাগাইয়া অনিশ্চয়ের মধ্যে যাইতে হইবে না। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি জেলার উঁচু জমিতে পাট হয় না—অনেক স্থলে কোন চাষই হয় না। সেই সব জমিতে উৎকৃষ্ট তুলা হইতে পারে, কৃষি-বিভাগ হইতে তাহার বীজ সংগ্রহ করিয়া এবং তাহার চাষের প্রণালী জানিয়া লইয়া অল্প জমির মালিক অল্প আয়ের গৃহস্থও এই কাজে প্রবৃত্ত হউন। শান্তিনিকেতন হইতে সুরুল পর্য্যন্ত বিশ্বভারতী যে বিস্তৃত জমি লইয়াছেন, তাহা তুলার চাষের যোগ্য।

বঙ্গে ভাল তুলা যথেষ্ট জন্মিলে বঙ্গের চাষীদের অন্ন হইবে, অনেক বেকার লোকের কাজ জুটিবে, বঙ্গের বর্ত্তমান মিলগুলি বাংলা হইতেই তুলা পাইবে ও তাহা ক্রয় ও মিলে আনয়নের ব্যয় এখনকার চেয়ে কম হইবে, তুলা ঝাড়াই ও বস্তাবন্দী করিবার কারখানা স্থাপিত হওয়ায় বঙ্গে ধনাগম হইবে ও অনেক বেকার লোক কাজ পাইবে, এবং বঙ্গে মিলের সংখ্যা বাড়িবে। এখন ২৭টি মিল আছে। এক শতটি হইলেও তাহা বঙ্গের পক্ষে অধিক হইবে না।

—

মহারাণা প্রতাপসিংহ জয়ন্তী

ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও চিতোরের মহারাণা প্রতাপসিংহের জয়ন্তী উৎসব হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্রই হওয়া উচিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার আলবার্ট হলে প্রতাপ জয়ন্তী উৎসব হইয়াছিল। এবার বঙ্গে কোথাও হইয়াছে বলিয়া কাগজে চোখে পড়ে নাই।

মনে পড়ে, আমরা যখন বালক ছিলাম, রজনীকান্ত গুপ্তের প্রবন্ধমালায় রাজপুত বীরের হলদিঘাটের অনতিক্রান্ত শৌর্য্যের বর্ণনায় হৃদয়ে কিরূপ স্বদেশভক্তির তরঙ্গাভিঘাত অনুভব করিতাম।

বঙ্গে এমন দিন আসিয়াছিল, যখন লিখনপঠনক্ষম বাঙালী বালকও প্রতাপের হলদিঘাট জানিত, রাজপুত তখন জানিত না, ভুলিয়া গিয়াছিল।

—

নারীশিক্ষা কেন বিশেষ করিয়া চাই

খালিখার মাতৃভবন বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক

মাঘ মাসের শেষ রবিবারে কৃত্তিবাসের স্মৃতিতর্পণ হইয়া থাকে। কিন্তু সমগ্র বঙ্গের প্রতিনিধিস্থানীয় লোকেরা তাহাতে উপস্থিত হইলে স্মৃতিসভা যেরূপ হইতে পারে, ও হওয়া উচিত, সেরূপ হয় না। কলিকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ এই সভাধিবেশনের ভার লইলে সুবন্দোবস্ত হইতে পারে। স্মৃতিস্তম্ভ, কূপ এবং বিদ্যালয়-গৃহ যেখানে অবস্থিত, সেখানে বিস্তৃত খোলা মাঠ আছে, খুব বড় সভা অনায়াসে হইতে পারে। শান্তিপুর হইতে ফুলিয়া যাতায়াত দুঃসাধ্য নহে।

এক জন প্রবাসী কৃতী বাঙালী

সর্দার শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য পঞ্জাবের পাটিয়ালা রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ (Director of Public Instruction) নিযুক্ত হওয়ায় প্রীত হইয়াছি। এই রাজ্যটির বিদ্যালয় ও কলেজের সংখ্যা ব্রিটিশ ভারতের ছোট একটি প্রদেশের সমান। ইহার বর্ত্তমান মহারাজা রাজ্যে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতি চান। শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য সেই উদ্দেশ্যসাধনে যথোচিত সাহায্য করিতে পারিবেন। তাঁহার বাড়ী প্রাচীন মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুরে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর সিটি কলেজে ছয় বৎসর ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। তাহার পর বার বৎসর লাহোরে দয়ানন্দ এংলো-বেদিক কলেজে ইংরেজীর প্রধান অধ্যাপক এবং পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। তদনন্তর পাঁচ বৎসর কানপুরে সনাতন ধর্ম্ম কলেজ ও ল কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাজ করেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট সীণ্ডিকেট প্রভৃতির সভ্য ছিলেন এবং যুক্তপ্রদেশের ইণ্টারমীডিয়েট

শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য

বোর্ডের সভ্য এখনও আছেন। তৎপরে পঞ্জাবের খালস কলেজে কিছুদিন প্রিন্সিপ্যালের কাজ করিয়া এখন পাটিয়ালার শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর হইয়াছেন। শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তিনি বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় সুবক্তা। বাংলা কবিতা তিনি বেশ লিখিতে পারেন। পাটিয়ালার মহারাজা তাঁহাকে সর্দার উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

—

দেশ-বিদেশের কথা

আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা-বিলোপে রাষ্ট্রবর্গের চক্রান্ত

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

আজ দুই বৎসর হইল সম্রাট হাইলে সেলাসী আবিসিনিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। তদবধি সাধারণে ধরিয়া লইয়াছে ইটালী আবিসিনিয়া জয় করিয়াছে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, ইটালী এখনও আবিসিনিয়াকে গ্রাস করিতে পারে নাই। সাম্রাজ্যবাদীদের রীতি অনুসারে কোন রাজ্য সম্যক জয় করিতে হইলে দুইটি সম্পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ, রাজ্যের সর্ব্বত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য রাষ্ট্র ইহার বিজয় স্বীকার করিয়া লইবে। আবিসিনিয়ায় ইহার কোনটিই পুরাপুরি সম্পন্ন হয় নাই। ইটালীর দলভুক্ত রাষ্ট্রদ্বয় জার্ম্মানী ও জাপান এবং কয়েকটি ছোট ছোট রাষ্ট্র তাহার আবিসিনিয়া জয় স্বীকার করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা তাহার কোনই উপকারে আসে নাই। আসল কথা, রাজ্যে শান্তি ও শ্রী প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যে পরিমাণ শক্তি ও অর্থ আবশ্যক ইটালী এখন পর্য্যন্ত তাহা সংগ্রহ করিতে পারে নাই। একারণ সদম্ভ আস্ফালন সত্ত্বেও সর্ব্বাধ্যক্ষ মুসোলিনিকে ইহার জন্য অন্যের দ্বারে ধর্ণা দিতে হইয়াছে। ব্রিটেন এতকাল কিরূপে মুসোলিনিকে বাগ মানাইয়া স্বমতে আনয়ন করা যায় তাহারই তাকে ছিল, এখন সুযোগ বুঝিয়া মুসোলিনির লোকসানের কারবার আবিসিনিয়া-বিজয় নিজে স্বীকার করিতে ও অন্যকে দিয়াও স্বীকার করাইয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে। আবিসিনিয়া মুসোলিনির পক্ষে কতটা লোকসানের ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে তাহার আঁচ করিতে পারিলে সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র বুঝিতে বেগ পাইতে হইবে না।

আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা ইটালীর আধিপত্য কিরূপ সার্থক ভাবে প্রতিরোধ করিতেছে তাহা জানিবার সহজ উপায় আজ রুদ্ধ। কারণ কোন বিদেশীকে, সংবাদপত্র-প্রতিনিধিকে ত নহেই—আবিসিনিয়ায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। তথাপি যে স্বল্পসংখ্যক বিদেশী লোক সেখানে এই দুই বৎসরের মধ্যে গমন করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, কয়েকটি শহর ছাড়া আবিসিনিয়ায় ইটালীর আধিপত্য বিস্তৃত হয় নাই। এইরূপ একজন বৈদেশিক সম্প্রতি লিখিয়াছেন,—

"ইটালী দাবী করে যে, সে আবিসিনিয়া জয় করিয়াছে। ইহা সত্য নহে। ইটালীয়ানরা আবিসিনিয়ার শহর ও শহরতলীগুলি মাত্র আয়ত্ত করিয়াছে ইহা ছাড়া অন্য কোথাও তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয় নাই। দেশী হইতে মাত্র কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত একটি শক্তিশালী হাবসী বাহিনী দেসমারা-আদ্দিসআবাবা রাস্তা দখল করিয়া আছে। কোন ইটালীয়ান গাড়ী এ পথ দিয়া যাতায়াত করিতে পারে না।

"হাবসীরা দলে দলে, কখনও পঞ্চাশ জন করিয়া, বিভক্ত হইয়া সর্ব্বত্র ইটালীয়ানদের উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। যে-সব স্থান পূর্ব্বে বিমানপোতে নিরীক্ষণ করিয়া আসা হইয়াছে সে-সব স্থানেও যাইতে হইলে ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে বৃহৎ ইটালীয়ান সৈন্যবাহিনীকে গমন করিতে হয়। আবিসিনিয়া সমরে যত না ইটালীয়ান সৈন্য নিহত হইয়াছে তাহার বেশী হইয়াছে ইহার পরে।

"নূতন নূতন সৈন্যদল অবিরত আবিসিনিয়ায় আমদানী করা হইতেছে।... প্রত্যেক জাহাজে অন্ততঃ দেড় হাজার করিয়া নূতন সৈন্য আসে। তাহাদের তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে করিয়া রাজধানীর দিকে পাঠান হয়।...সৈন্যতেই গাড়ী ভর্ত্তি হইয়া যায়, মালপত্রের জন্য তিল মাত্র স্থান অবশিষ্ট থাকে না। হাজার হাজার গাড়ী মালপত্র আবিসিনিয়ায় প্রেরিত হইবার জন্য ডকে অপেক্ষা করিতেছে। জিবুতি বন্দরে একজন রেলকর্ম্মচারী আমাকে বলিয়াছেন যে, এই মালপত্র সব আবিসিনিয়ায় পাঠাইতে আট মাস সময় লাগিবে। এই সময়ের মধ্যে সকলই ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া যাইবে।

"বাহিরের জগৎ হইতে ইটালীয়ানরা আলাদা হইয়া আছে। সমগ্র দেশে মন্বন্তর দেখা দিয়াছে। গত দুই বৎসর চাষবাসে অবহেলা করা হইয়াছে। ইটালীয়ানদের অধিকৃত স্থানে কৃষকরা চাষ করিতে অস্বীকৃত। তাহারা ক্ষেত্রজাত জিনিষপত্র শহরের বাজারে আনিতে ভয় পায়। রসদ সংগ্রহের জন্য এক দল সৈন্য দেশাভ্যন্তরে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের একজনও আদ্দিসআবাবায় ফিরিয়া আসিতে পারে নাই, সকলেই নিহত হইয়াছে।

"রসদের মূল্য প্রত্যহই বাড়িয়া যাইতেছে। এমন কি, ইটালীর অপেক্ষাও ইহার মূল্য বেশী হইয়াছে, লোহিত সাগরের তীরবর্ত্তী দেশসমূহে ইটালীর লোকেরা জোর রসদাদি ক্রয় করিতেছে। শত শত নৌকায় বন্দরে মাল পৌঁছিতেছে। কিন্তু ইহা বন্দরেই পচিতেছে। ভিতরে চালান দেওয়ার উপায় নাই।

"ইটালীয়ান সৈন্যদল জিবুতি বন্দর হইয়া ইটালী ফিরিতেছে।

তাহারা গরুর গাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিতেছে, তাহাদের মুখ শুষ্ক, চক্ষু কোটরগত, বদনমণ্ডল শ্মশ্রুপূর্ণ। ষ্টেশনের বাহিরে হাব্‌সীরা রুটি ও শাকসব্জীর জন্য অপেক্ষা করে। তাহাদের কাছে যাহা কিছু পায় ইটালীয়ান সৈন্যেরা কাড়িয়া লয়। তাহারা বলে যে, বহু সপ্তাহ যাবৎ তাহারা অর্দ্ধভুক্ত।

"হাবসীরা সামান্যই খাইতে পায়। ইতিমধ্যেই তাহারা হাজারে হাজারে অনশনে মৃত্যুকে বরণ করিতেছে। শহরে তাহারা ইঁদুর ভক্ষণ করে এবং ভুক্তাবশিষ্ট যাহা কিছু পায় সবই খায়। কখন কখন তাহারা খাদ্যের অন্বেষণে ইউরোপীয়গণের গৃহে সিঁদ কাটে। ইটালীয়ানরাও প্রায়ই বরাদ্দ খাদ্যের চেয়ে কিছু বেশী সংগ্রহের জন্য এই তস্করের দলে যোগ দিয়া চুরি করে। কর্ত্তৃপক্ষ ইহাতে বাধা দিতে অক্ষম।

"আবিসিনিয়ার সরকারী মুদ্রা হইল বর্ত্তমানে লিরা। কিন্তু হাব্‌সীরা তাহা ব্যবহার করে না, তাহারা ব্যবহার করে আগেকার সেই মেরিয়া থেরেস ডলার। ইহার ব্যবহার এখন সরকারী ভাবে নিষিদ্ধ। ব্যাঙ্কগুলি ইহা গ্রহণ করে না। কাজকারবার এখন একেবারে বন্ধ।

"সর্ব্বপ্রকার সরকারী অস্বীকৃতি এবং প্রচার-পত্র সত্ত্বেও একটি বিষয় নিশ্চিত যে, আবিসিনিয়ায় এখন মাৎস্য ন্যায়ের রাজত্ব।"

আবিসিনিয়ায় যে ক্রমশঃই বিশৃঙ্খলা বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা অন্য ভাবেও বেশ বোঝা যাইতেছে। আবিসিনিয়া সংরে ইটালীর মোট ব্যয় হইয়াছে বার শত কোটি লিরা। গত চার মাসে ইটালীয়ানরা উদ্‌ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে সবচেয়ে বেশী। এই সময়ে সেনাসংখ্যা এক লক্ষ ত্রিশ হাজার হইতে বাড়িয়া দুই লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৭ সনের প্রথম নয় মাসে গড়ে সরকারের খরচ হইয়াছে চল্লিশ কোটি লিরা। ইহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া গত জানুয়ারী মাসে পঞ্চাশ কোটিতে দাঁড়ায়। স্মরণ রাখিতে হইবে এত টাকা শুধু আবিসিনিয়া অধীন রাখিতেই ব্যয় হইতেছে, কৃষি শিল্প বা অন্যান্য যে-সব কাজে ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে সে-সব কাজে এই টাকা আদৌ ব্যয় হইতেছে না।*

আবিসিনিয়া লইয়া ইটালী যখন এতই উদ্‌ব্যস্ত তখন হঠাৎ ব্রিটেন কেন সেখানে ইটালীর আধিপত্য মানিয়া লইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে এই প্রশ্ন স্বতই আমাদের মনে উদিত হয়। এই প্রশ্নের জবাবের মধ্যেই হয়ত আমরা বর্ত্তমান ব্রিটেনের ইটালী-প্রীতির মূল খুঁজিয়া পাইব। ইটালী আবিসিনিয়ায় যত সামান্যই আধিপত্য বিস্তার করুক না কেন, পার্শ্বস্থ ভূমধ্যসাগরে তাহার শক্তি অতি মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। উত্তর-আফ্রিকার ও পশ্চিম এশিয়ায় মুসলমান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সত্য মিথ্যা নানারূপ প্রচারকার্য্য চালাইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে তাহাদের মন বিগ্‌ড়াইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। এ-সবও ততটা গ্রাহ্য হইত না যদি স্পেন

---

* 'দি নিউ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান অ্যাণ্ড নেশ্যন,' ৫ই মার্চ্চ, ১৯৩৮। পৃঃ ৩৫৮, ৩৫৯।

লইয়া ইটালীর এত আগ্রহ না দেখা দিত। স্পেন স্বমতে রাখিবার জন্য ব্রিটিশের চেষ্টা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যাপার। ইংরেজের সাম্রাজ্যের পত্তন যত দিন হইতে, স্পেনের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টাও তত দিন হইতেই লক্ষিত হয়। নেপোলিয়ান এই সব বুঝিয়াই ব্রিটিশের শক্তিকেন্দ্র স্পেনের উপর নজর দিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ট্রাফালগারের যুদ্ধে ইংরেজের এই সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়। ইহার পর গত সওয়া শত বৎসরের মধ্যে ব্রিটেন নির্ব্বিবাদে নির্ব্বিঘ্নে এখান হইতে চলাফেরা করিয়াছে, সাম্রাজ্য বাড়াইয়াছে; কেহ টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করে নাই। কিন্তু গত দুই বৎসরের মধ্যে আবার সেই সওয়া শত বৎসর পূর্ব্বেকার সমস্যা মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসের বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় স্পেনের গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। ইটালী যদি একবার স্পেনে ঘাঁটি আগলাইয়া লইতে পারে তাহা হইলে পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগরে তাহার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ তো থাকিবেই, উপরন্তু অতলান্তিক মহাসাগরে পড়িয়া ব্রিটেনকে সাক্ষাৎ ভাবে আক্রমণ করিতে এবং আমেরিকার সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করিতে পর্য্যন্ত সক্ষম হইবে। নেভিল চেম্বারলেন ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া স্পেনের গুরুত্ব অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য তৎপর হইয়াছেন।

ব্রিটেন একদিকে স্পেনে যেমন কম্যুনিজম্-প্রাধান্য চাহে না অন্য দিকে তেমনি ইহা ইটালীর মুঠার মধ্যে চলিয়া যায় তাহাও তাহার কাম্য নয়, কারণ তাহা তো তাহার পক্ষে আত্মহত্যার সামিল। এই জন্য গত দুই বৎসরে স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে ব্রিটিশের মনোভাবের কোনই স্থিরতা ছিল না। কখনও সরকার পক্ষে, কখনও বিপ্লবীদের হইয়া কার্য্য করিয়া চলিয়াছে। তবে একথা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল যে, স্পেন তাহার বিপক্ষে যায় ইহা সে কিছুতেই সহ্য করিবে না। ইদানীং স্পেন সম্বন্ধে ব্রিটেনের মনোভাব বাহ্যতঃও একটা স্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে সে এখন আর দোটানার মধ্যে নাই। গত ইঙ্গ-ইটালী চুক্তি এবং পার্লামেণ্টে মিঃ চেম্বারলেনের ভাষণ উভয়ই ইহার সাক্ষ্য। ইঙ্গ-ইটালী চুক্তিতে ইটালিতে স্পেনের কোন আধিপত্য থাকিবে না বলা হইয়াছে সুযোগ পাইলেই ইটালী তাহার সৈন্যসামন্ত সেখান হইতে সরাইয়া লইবে। ইটালীর নিকট হইতে এই সত্ত আদায় করিবার জন্য ব্রিটেনকে কম ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় নাই। ভূমধ্যসাগর হইতে ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত তাহাকে অনেকগুলি সুযোগ সুবিধা দান করিতেছে। ইহার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান বিষয় হইল ব্রিটেন কর্ত্তৃক ইটালীর আবিসিনিয়া-জয় স্বীকার। প্রবন্ধের প্রথমাংশে আমরা দেখাইয়াছি আবিসিনিয়ার অতি সামান্য অংশের উপরই ইটালীর আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছে। তথাপি কেন ব্রিটেন ইহার বিজয় স্বীকার করিতে চলিয়াছে এখন তাহা বুঝিতে বোধ হয় কাহারও বাকি নাই। ব্যাপক ভাবে ধরিতে গেলে সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে আর সঙ্কীর্ণ ভাবে ধরিতে গেলে স্পেনে ব্রিটেনের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া আবিসিনিয়াকে বিসর্জ্জন দিতে চলিয়াছে। অথচ এই

আবিসিনিয়াকে লইয়া স্বদেশে ও বিদেশে রাষ্ট্রসংঘে কতই না আলাপ-আলোচনা চালাইয়াছিল। এখন বুঝা যাইতেছে, বর্ত্তমান সময়েও সাম্রাজ্যের প্রয়োজনই তাহার পক্ষে সব চেয়ে বড় কথা, কোন দেশের স্বাধীনতা থাকুক আর নাই থাকুক তাহাতে তাহার কিছুই আসিয়া যায় না।

ব্রিটেন ইদানীং ফ্রান্সকেও দলে টানিতে সমর্থ হইয়াছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সে আঁতাত। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা অটুট থাকিবেই। কাজেই স্পেনে ব্রিটেনের আধিপত্য থাকিলে সেও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। একারণ সেখানকার বর্ত্তমান বিপ্লবেও সে বরাবর ব্রিটেনের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। ইঙ্গ-ইটালী চুক্তিতে সুতরাং তাহারও উল্লাস কম হয় নাই। তবে স্পেন-বিপ্লবের সত্বর একটা হেস্ত-নেস্ত হইয়া যায় ইহাই তাহার আন্তরিক কামনা। কিন্তু তাহার পক্ষে অন্য কতকগুলি বিপদ অকস্মাৎ ঘনাইয়া আসিয়াছে, যাহার ফলে সে ব্রিটেনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছে, এবং ইটালীর সঙ্গেও সন্ধিবদ্ধ হইতে মনস্থ করিয়াছে। ইঙ্গ-ইটালী চুক্তির আলোচনা তখনও চলিতেছিল, এই সময়, হের হিটলার অষ্ট্রিয়াকে গ্রাস করিয়া লন। একেই জার্ম্মেনী তাহার পক্ষে জুজু, তদুপরি তাহার এইরূপ শক্তিবৃদ্ধিতে তাহার আতঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক। আবার চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতেন জর্ম্মনরা তথাকার সরকারের উপর বিরূপ হইয়া যেরূপ হিটলারপন্থী হইয়াছে তাহাতে ইহাও, অন্ততঃ ইহার কতকাংশও, জার্ম্মেনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতে পারে। অথচ ফ্রান্স ইহার স্বাধীনতা রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। জার্ম্মেনী ও ইটালী পরস্পরের মধ্যে যেরূপ আঁতাত তাহাতে তাহার আতঙ্ক আরও বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ইটালীর সঙ্গে চুক্তি করিতে হইলে তাহাকেও তো ছাড়কাট করিতে হইবে। ব্রিটেন আবিসিনিয়া-জয়-স্বীকারে তাহার মত করাইয়াছে। সম্প্রতি যে ইঙ্গ-ফরাসী আলাপ হইয়া গেল তাহাতেই ইহার পথ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

আগে বলিয়াছি, সাম্রাজ্যবাদীরা সাম্রাজ্যের প্রয়োজনই বেশী করিয়া দেখে এবং তাহাই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু গত মহাসমরের পর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি রাষ্ট্রসংঘের মারফত এত অধিক গণতন্ত্র, স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা প্রভৃতি বুলি আওড়াইয়াছেন যে, সরলমতি জনসাধারণ তাহাই বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিল, ক্ষুদ্র বা দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলিও তাহাদের স্বাধীনতা-রক্ষার দৃঢ় প্রাচীর রূপে রাষ্ট্রসংঘকে গ্রহণ করিয়াছিল ইহার সভ্যও হইয়াছিল। চতুর্থ দশকের প্রথম হইতেই ইহার বিপরীত ব্যাপার ঘটিতেছে অর্থাৎ

সাম্রাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রসংঘের মূলনীতি বিসর্জ্জন দিয়া কেহ সাম্রাজ্য বাড়াইতে, কেহ বা সাম্রাজ্য আগলাইতে লাগিয়া গিয়াছে। আবিসিনিয়াও যে এই আবর্ত্তে পড়িয়া তাহার স্বাধীনতা হারাইয়াছে তাহা শিক্ষিত জন মাত্রেই জানেন। সে এতকাল তাহার স্বাধীনতা হারাইয়াছিল বটে, কিন্তু ইটালী কর্ত্তৃক তাহার বিজয় ছোট বড় পাঁচটি রাষ্ট্র ছাড়া, অন্যান্য রাষ্ট্র মানিয়া লয় নাই। কিন্তু আজ তাহারা নিছক সাম্রাজ্যের প্রয়োজনেই মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া ইহা স্বীকার করিতে উদ্যত। আর ব্রিটেনই এ বিষয়ে অগ্রণী।

ব্রিটেন নিজেকে রাষ্ট্রসংঘের কর্ণধার বলিয়া মনে করে। কাজেই রাষ্ট্রসংঘকে জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া সরাসরি কিছু করার মুখ তাহার নাই। যদিও মিঃ চেম্বারলেন পার্লামেন্টে বলিয়াছেন যে, ইটালীর আবিসিনিয়া জয় স্বীকার করা না করা প্রতিটি রাষ্ট্রেরই ব্যক্তিগত ব্যাপার তথাপি এই সমস্যার রাষ্ট্রসংঘের মারফতই একটা মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। মিঃ চেম্বারলেন তাঁহার কথায় ফাঁক রাখিয়াছেন, অর্থাৎ ইহাকে ব্যক্তিগত ব্যাপারের মধ্যে গণ্য করিয়া লইতেছেন এইজন্য যে যদি কোন মতে রাষ্ট্রসংঘে ইহার মীমাংসা না হয় তাহা হইলেও তাঁহার ইটালীর আবিসিনিয়া-জয় স্বীকার করিয়া লইতে বাধা থাকিবে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে এই বিষয় প্রস্তাব করিয়া লীগ কাউন্সিলে একখানা পত্র প্রেরিত হইয়াছিল।

গত ৯ই মে রাষ্ট্রসংঘে এবিষয় আলোচনা হয়। ব্রিটেনের তরফে লর্ড হালিফাক্স এই প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন বলিয়া কথা ছিল। ব্রিটেন যেমনটি চাহিয়াছিল ঠিক তেমনটি কিন্তু হয় নাই। অর্থাৎ তাহার অভিপ্রায় সকলে এক বাক্যে মানিয়া লয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত প্রস্তাবের আকারে এ বিষয় উত্থাপিত হয় নাই। তবে স্থির হয় যে এবিষয়ে সভ্য-রাষ্ট্রগুলি স্বীয় অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিবেন।

ব্রিটেন আজ 'রেয়্যাল পলিটিকে'র ভক্ত। নীতি আজ আর তাহার নিকট বড় কথা নয়। সাম্রাজ্য রক্ষা কল্পে সে মরীয়া হইয়া কাজে লাগিয়াছে। রাষ্ট্রসংঘের সভ্যদের, বিশেষ করিয়া যাহারা ইহার চালক তাহাদের চক্রান্তে আবিসিনিয়া স্বাধীনতা হারাইল, তাহার স্বাধীনতা পুনর্লাভের যদি-বা কোন সম্ভাবনা থাকিত সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের আঘাতে তাহাও লোপ পাইতে চলিয়াছে। ইটালীর আশা, বড় রাষ্ট্রগুলি তাহার আবিসিনিয়া-বিজয় স্বীকার করিয়া লইলে বিদ্রোহীরা মুহ্যমান হইয়া পড়িবে। তখন বিদেশীর, বিশেষতঃ ব্রিটিশের, অর্থসাহায্যে আবিসিনিয়ার ধনসম্পদ আহরণে সুবিধা হইবে। আবিসিনিয়া ইদানীং তাহার পক্ষে যেরূপ লোকসানের ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এই সুবিধা সে বর্জ্জন করিবে বলিয়া মনে হয় না। হিটলার সম্প্রতি রোমে রাজোচিত সম্মান লাভ করিয়াছেন। হিটলার মুসোলিনিতে বহুক্ষণব্যাপী আলাপও হইয়াছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন, রোম-বার্লিন কক্ষ যতই পাকা করিবার চেষ্টা হউক না কেন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স আজ যে তাহার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিতেছে তাহা মুসোলিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না। স্পেনেও তাঁহার বিস্তর লোকসান হইয়াছে। স্পেনে পঞ্চাশ-ষাট হাজার সৈন্য তো রহিয়াছে, তাহার উপর ফ্রাঙ্কোকে সাড়ে চার মিলিয়ার্ড লিরা ধার দিয়াছেন। কাজেই দুই কুল নষ্ট না করিয়া একটাকে ধরিয়া থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য ভাবিয়াছেন। ব্রিটিশের স্পেনের উপর লোভ, কাজেই আবিসিনিয়া ইটালীর ভাগ্যে পুরাপুরিই হয়ত জুটিবে। বর্ত্তমানে এত দ্রুত রাষ্ট্রনীতির পট পরিবর্ত্তিত হইতেছে যে, কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ইটালী জার্মেনী খুবই বন্ধু, অথচ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে ইটালীর বেশ মাখামাখি সুরু হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায় বলা কঠিন। তবে একথা ঠিক যে, দুর্ব্বল ও পরাধীন জাতিদের সমূহ বিপদ উপস্থিত। আবিসিনিয়াকে সাম্রাজ্যবাদের মুখে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। দুর্ব্বল জাতিগুলির মধ্যে ইহা প্রতিরোধকল্পে কি সহযোগিতা হইতে পারে না?

পরলোকে কর্ম্মী প্রবাসী বাঙালী যুবক

মসুরীতে বাঙালীর একমাত্র প্রতিষ্ঠান একটি ক্ষুদ্র পুস্তকাগার। এইটি যখন তিন বৎসর পূর্ব্বে প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছিল, তখন কর্ম্মী যুবক শ্রীহরিচরণ মিত্র ইহাকে পুনরায় গড়িয়া তোলেন। এই যুবকটি গত ২৩শে মে মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে স্থানীয় প্রবাসী বঙ্গবাসীদের দুঃখসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য ও তাঁহার পিতার সহিত সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য, যুক্তপ্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত পোষ্টমাষ্টার-জেনারাল শ্রীমহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী মহাশয়ের সভাপতিত্বে মসুরীর বাঙালীদের একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়

বনওয়ারীলাল গোস্বামী

সম্প্রতি পরলোকগত বনওয়ারীলাল গোস্বামী ৫০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাণী স্বর্ণময়ী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" এবং 'লক্ষ্মী-সরস্বতী' নামক সাপ্তাহিকের সহ-সম্পাদক ছিলেন। কিছুদিন 'মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি" সম্পাদন করিয়া ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষীর' সম্পাদক হন। পরে যখন উক্ত সাপ্তাহিক খানি উঠিয়া যাইবার মত হয়, সেই সময় সর্ব্বস্বপণ করিয়া তিনি 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী'কে রক্ষা করেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার সম্পাদক ছিলেন। অর্থের দায়ে দুরবস্থায় পড়িয়া যদি পোষ্টকার্ডের আকারেও সংবাদপত্র বাহির করিতে হয় সেও স্বীকার, তথাপি 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী"র সেবা ত্যাগ করিব না, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনব্যাপী প্রতিজ্ঞা। এই জেদ তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বের বহরমপুরের সাংবাদিক সমিতির তিনি প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার রচিত প্রবন্ধ ও কবিতার ১১খানি গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে "নরোত্তমের আশ্রয় নির্ণয়" ও "সাধক-চিন্তামৃত" প্রধান।

ইতালীর গ্রামে রেডিয়ো

চিত্র-পরিচয়

বুদ্ধের শিরোমুণ্ডন

সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের পর তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্ব বেশ-বিলাস ত্যাগের সময় শিরোমুণ্ডনের চিত্র। কথিত আছে, সিদ্ধার্থ তরবারি দ্বারা স্বীয় মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন। চিত্রে দেখা যাইতেছে, সিদ্ধার্থ স্বীয় শিরোভূষণ মোচন করিতেছেন। ছবির মধ্যভাগে স্বর্গের ক্ষৌরকার, তাহার দক্ষিণে ইন্দ্র করজোড়ে দাঁড়াইয়া। সম্মুখে প্রণত পাঁচজনকে, বুদ্ধের প্রথম পঞ্চ শিষ্য বলিয়া অনুমান করা যায়।

চিত্রখানি নবম শতাব্দীতে অঙ্কিত বলিয়া অনুমিত। বর্ত্তমানে এখানি ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

কুবলাই খাঁ

কুবলাই খাঁ (১২১৪-১২৯৪ খ্রীঃ) কনফুশীয় মন্দিরের এক জন প্রধান সহায়ক ছিলেন। ১২৭৮ সালে তিনি এই মন্দিরের সংস্কার করেন। শানটুঙে কনফুশিয়াসের জন্মস্থানে কনফুশীয় মন্দিরে চিত্রখানি রক্ষিত আছে।

সিংহলে বোধিতরুর শোভাযাত্রা

সম্রাট অশোকের সহিত সিংহলের সম্রাট দেবনাম পিয়তিস্‌সর সখ্য স্থাপিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার মানসে, বুদ্ধ যে-বৃক্ষতলে বোধিলাভ করিয়াছিলেন তাহার একটি শাখা অশোক তাঁহার কন্যা সঙ্ঘমিত্রার সহিত সিংহলে প্রেরণ করেন।

বোধিবৃক্ষশাখার অভ্যর্থনার জন্য তিস্‌স এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া সমুদ্রতীরে বাস করিতেছিলেন। বিরাট শোভাযাত্রা বোধিবৃক্ষের শাখাকে অভ্যর্থনা করে। চিত্রে দেখা যাইতেছে, নৃপতি তিস্‌স বোধিতরুশাখা শিরে বহন করিতেছেন।

কর্ম্মাবসরে

চালের কলের স্ত্রী-শ্রমিকেরা কাজের অবসরে বিশ্রাম ও আলাপে নিরত, চিত্রে ইহাই দেখানো হইয়াছে।

বিজয়সিংহ

বিজয়সিংহের সমুদ্রযাত্রার ছবি। চিত্রকর প্রায় নিজের চেষ্টাতেই চিত্রচর্চ্চা করিয়া থাকেন, কাহারও নিকট বিশেষ শিক্ষালাভ করেন নাই; ছবিখানির প্রসঙ্গে এই কথা উল্লেখযোগ্য যে ইহাতে যে পটের শিল্পরীতি অনুসৃত হইয়াছে তাহা সুশিক্ষিত শিল্পীর সজ্ঞানে পটরীতির অনুসরণ নহে, স্বভাবতই তিনি ইহার অনুবর্ত্তন করিতেছেন।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীনারায়ণ নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নব মেঘ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

আশ্রমিক সংঘ প্রদর্শনী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৮শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৪৫

৪র্থ সংখ্যা

যক্ষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যক্ষের বিরহ চলে অবিশ্রাম অলকার পথে
পবনের ধৈর্যহীন রথে
বর্ষাবাষ্প-ব্যাকুলিত দিগন্তে ইঙ্গিত আমন্ত্রণে
গিরি হতে গিরিশীর্ষে বন হতে বনে।
সমুৎসুক বলাকার ডানার আনন্দ-চঞ্চলতা,
তারি সাথে উড়ে চলে বিরহীর আগ্রহ-বারতা
চিরদূর স্বর্গপুরে,
ছায়াচ্ছন্ন বাদলের বক্ষোদীর্ণ নিঃশ্বাসের সুরে।
নিবিড় ব্যথার সাথে পদে পদে পরমসুন্দর
পথে পথে মেলে নিরন্তর।

কালের মর্মেতে জাগে বিপুল বিচ্ছেদ;
সে যে যাত্রী, পূর্ণতার সাথে ভেদ
মিটাতে সে নিত্য চলে ভবিষ্যের তোরণে তোরণে
নব নব জীবনে মরণে।

এ বিশ্ব তো তারি কাব্য, মন্দাক্রান্তে তারি রচে টিকা
বিরাট দুঃখের পটে আনন্দের সুদূর ভূমিকা।
ধন্য যক্ষ সেই
সৃষ্টির আগুন-জ্বালা এই বিরহেই।

হোথা বিরহিণী ও যে স্তব্ধ প্রতীক্ষায়
দণ্ড পল গণি গণি মন্থর দিবস তার যায়।
সম্মুখে চলার পথ নাই,
রুদ্ধ কক্ষে তাই
আগন্তুক পান্থ লাগি ক্লান্তিভারে ধূলিশায়ী আশা।
কবি তারে দেয় নাই বিরহের তীর্থগামী ভাষা।
তার তরে বাণীহীন যক্ষপুরী ঐশ্বর্যের কারা
অর্থহারা।
নিত্য পুষ্প, নিত্য চন্দ্রালোক,
অস্তিত্বের এত বড়ো শোক
নাই মর্ত্যভূমে.
জাগরণ নাহি যার স্বপ্নমুগ্ধ ঘুমে।
প্রভুবরে যক্ষের বিরহ
আঘাত করিছে ওর দ্বারে অহরহ।
স্তব্ধগতি চরমের স্বর্গ হোতে
ছায়ায় বিচিত্র এই নানাবর্ণ মর্ত্যের আলোতে
জাগায়ে আনিতে চাহে
তরঙ্গিত প্রাণের প্রবাহে।

কালিম্পঙ,
২০।৬।৩৮

মায়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আছ এ মনের কোন্ সীমানায়
যুগান্তরের প্রিয়া।
দূরে উড়ে যাওয়া মেঘের ছিদ্র দিয়া
কখনো আসিছে রৌদ্র কখনো ছায়া,
আমার জীবনে তুমি আজ শুধু মায়া ;
সহজে তোমায় তাই তো মিলাই সুরে,
সহজেই ডাকি, সহজেই রাখি দূরে।
স্বপ্নরূপিণী তুমি
আকুলিয়া আছ পথ-খোওয়া মোর
প্রাণের স্বর্গভূমি।
নাই কোনো ভার, নাই বেদনার তাপ,
ধূলির ধরায় পড়ে না পায়ের ছাপ।
তাই তো আমার ছন্দে
সহসা তোমার চুলের ফুলের গন্ধে
জাগে নির্জন রাতের দীর্ঘশ্বাস,
জাগে প্রভাতের পেলব তারায়
বিদায়ের স্মিত হাস।
তাই পথে যেতে কাশের বনেতে
মর্মর দেয় আনি
পাশ দিয়ে-চলা ধানী রং-করা
সাড়ির পরশ খানি।

যদি জীবনের বর্তমানের তীরে
আস কভু তুমি ফিরে

স্পষ্ট আলোয়, তবে
জানি না তোমার মায়ার সঙ্গে
কায়ার কি মিল হবে।
বিরহ স্বর্গলোকে
সে জাগরণের রূঢ় আলোয়
চিনিব কি চোখে চোখে।
সন্ধ্যাবেলায় যে দ্বারে দিয়েছ
বিরহ-করুণ নাড়া.
মিলনের ঘায়ে সে দ্বার খুলিলে
কাহারো কি পাবে সাড়া।

২২।৬।৩৮
কালিম্পঙ.

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

[শ্রীযুক্তা অবলা বসুকে লিখিত]

ওঁ

কলিকাতা

মাননীয়াসু

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হলুম। আপনারা চলে যাওয়ার পরে অল্প দিনের মধ্যে খুব একটা বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এসেছি। এই বিপ্লবটাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে দেখতে গেলে এটা যত বড় উৎকট আকার ধারণ করে, জীবনের সমগ্রের সঙ্গে মিলে মিশে এটা তত প্রচণ্ড নয়। যে-ব্যাপারটা কল্পনায় নিতান্তই দারুণ এবং অসম্ভব বোধ হয় সেটাও ঘটনায় এমন ভাবে আপনার স্থান গ্রহণ করে যেন তার মধ্যে অপ্রত্যাশিত কিছুই নেই। সেই জন্যে সমস্ত আঘাত কাটিয়ে, জীবনযাত্রা যেমন চল্‌ছিল তেমনিই চল্‌ছে;—হয়ত একটা কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছে—কিন্তু সে পরিবর্ত্তন উপর থেকে দেখা যায় না—সে পরিবর্ত্তন নিজের চোখেও হয়ত সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্যগোচর হতে পারে না।

ভেবেছিলুম ছুটি নেব কিন্তু আমার কাজের ভার আরো বেড়ে গেছে। আমি সম্প্রতি পল্লীসমাজ নিয়ে পড়েছি। আমাদের জমিদারীর মধ্যে পল্লীগঠনকার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখাব বলে স্থির করেছি। কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। কয়েক জন পূর্ব্ববঙ্গের ছেলে আমার কাছে ধরা দিয়েছে। তারা পল্লীর মধ্যে থেকে সেখানকার লোকদের সঙ্গে বাস করে তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য বিচার প্রভৃতি সকল কাজের ব্যবস্থা তাদের নিজেদের দিয়ে করাবার চেষ্টা করচে। তাদের দিয়ে রাস্তাঘাট বাঁধানো, পুকুর খোঁড়ানো, ড্রেন কাটানো, জঙ্গল সাফ করানো, প্রভৃতি সমস্ত কাজের উদ্যোগ হচ্চে। আমাদের পল্লীর ভিতরে সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করে এমন সুগভীর নিরুদ্যম, যে, সে দেখলে স্বরাজ স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি কথাকে পরিহাস বলে মনে হয়—ও সকল কথা মুখে উচ্চারণ করতে লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু যাঁরা সবচেয়ে উচ্চৈঃস্বরে একেবারেই সপ্তমে গলা চড়িয়ে এই সকল শব্দ ঘোষণা করেন তাঁরাই এই বিষয়টাতে সকলের চেয়ে নিশ্চেষ্ট। সুরেন্দ্রবাবুরা পল্লীসমাজ গঠনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত

হয়েছেন—তাঁরা কলকাতার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন—পল্লীগ্রামেও লাগবেন বলে আশা দিয়েছেন। কিন্তু চরমপন্থীরা কেবল চরমের কথাই ভাবচেন, উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁরা একেবারেই নিশ্চেষ্ট। এ পর্য্যন্ত এঁদের দ্বারা একটি অতি ক্ষুদ্র কাজও হয় নি। অথচ এঁরাই মডারেট্ দলকে কর্ম্মহীন বাক্যবিশারদ বলে গাল দিয়ে এসেছেন। এঁরা কেবলই কথা নিয়ে কলহ করচেন কাজেই আমার মত জরাজীর্ণকেও কাজের ক্ষেত্রে নাবতে হয়েছে। আমি সভাস্থলের আহ্বানে আর সাড়া দিচ্চি নে—কিন্তু সেই জন্তেই দেশের যেটা সকলের চেয়ে প্রয়োজন সেটা সাধনের জন্তে আমার যেটুকু সাধ্য তা প্রয়োগ করতেই হবে। আপনারা যখন ফিরে আসবেন—আশা করচি তত দিনে আমাদের শিলাইদহের গ্রামগুলি অনেকটা গঠিত হয়ে উঠতে পারবে।

আপনি লণ্ডনে যেভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করতে চান সেইটেই আপাতত অবলম্বনীয়। এমনি করে পর্য্যায়ক্রমে এক এক জনের বাড়িতে উপাসনাকার্য্য হতে হতে এর পরে স্বতন্ত্র গৃহনির্ম্মাণ করা সম্ভবপর হবে। ওখানে যে উপাসনা-প্রণালী গ্রহণ করেচেন তার মধ্যে অন্তত গুটি দুই তিন উপনিষদের মন্ত্র রাখবেন—ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধটা সে দেশে এই রকম করে বিশেষ ভাবেই স্বীকার করা চাই। এতে ভারতবাসী প্রবাসীরও উপকার হবে, আর সে দেশের লোকের কাছেও ব্যাপারটা শ্রদ্ধেয় ও মনোহর হবে। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

আমরা সবাই কলকাতায় ফিরে এসেছি। এদিকে নিদারুণ গ্রীষ্মে বিদ্যালয়ও বন্ধ করতে হ'ল—আবার কোথায় পালাব তাই ভাবছি—কলকাতায় বাস করা অসম্ভব।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

মাননীয়াসু

অরবিন্দের জন্ত কিছুমাত্র ভাববেন না। এবারে আসবামাত্র তাকে পিসিমার জিম্মা করে দেব—তিনি ওকে মাছ ভাত মাংস, সজ্‌নের ডাঁটা, কুমড়োর ফুল, লাউডগা-সিদ্ধ প্রভৃতি খাইয়ে তাজা করে তুলবেন।

আপনাকে আর একটি কাজ করতে হবে—আমাকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রভৃতি করা একেবারে ছেড়ে দেবেন। তার প্রধান কারণটা আপনাকে বলি। সম্প্রতি আমার বয়স যে যথেষ্ট হয়েছে সে ঢাকবার কোনো উপায় নেই—আমার দেহযন্ত্র এ সম্বন্ধে অধ্যাপক মশায়ের চেয়ে ঢের বেশি সরল। আমার নিজের মাথার পাকা চুল আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এমন অবস্থায় আপনারাও যদি আমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন তাহলে আমার কি উপায় হবে। যদি স্নেহ করেন ত বাঁচি—তাহলে অল্প বয়সের স্মৃতিটাও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। আমার এক বৌঠাকরুণ ছিলেন আমি ছেলেবেলায় তাঁর স্নেহের ভিখারী ছিলেম—তাঁকে হারানর পর আমার দ্রুতপদবিক্ষেপে বয়স বেড়ে উঠেছে এবং আমি সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করে হয়রান্ হয়েছি। কিন্তু আপনার কাছে এ রকম নৃশংসতা প্রত্যাশা করি নি। আপনার বয়স আমার চেয়ে কম কিন্তু ঈশ্বর আপনাদের স্নেহ করবার স্বাভাবিক শক্তি দিয়েছেন—সেজন্তে আপনাদের বয়সের অপেক্ষা করতে হয় না—সকলের দাবী মিটিয়ে সকলের ভাগ চুকিয়ে আমার মত জরাজীর্ণের জন্তও কিঞ্চিৎ বরাদ্দ করে দিলে স্নেহের নিতান্ত অপব্যয় হবে না। আমাকে যদি "আপনি" বলা ছেড়ে দিয়ে "তুমি" বলবার চেষ্টা করে কৃতকার্য্য হতে পারেন ত উত্তম—যদি অসাধ্য বোধ করেন তবে পত্রে শ্রদ্ধাস্পদেষু প্রভৃতি বিভীষিকা প্রচার করবেন না। তার চেয়ে আমাকে আপনি "কবিবরেষু" বলে লিখবেন। আপনাদের কাছ থেকে এ রকম উৎসাহজনক সম্ভাষণ পেলে হয়ত আমার কলমের বেগ আরো বাড়তে পারে—সেটাকে যদি দুর্ঘটনা জ্ঞান না করেন তবে দ্বিধা করবেন না।

দ্বিতীয় নিবেদন, বোলপুরে আসবার জন্তে প্রস্তুত হোন। বিলম্ব করবেন না। ইতি ৩রা শ্রাবণ ১৩১৩।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিহারে বাঙালী

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

বিহারে বাঙালী বিপন্ন হইয়াছে। যোগ্যতা সত্ত্বেও তাহাদের চাকরি মিলিতেছে না, নাম মাত্র অছিলা পাইলেই চাকরি হইতে বরখাস্ত করা হইতেছে, তিন-চার পুরুষ ধরিয়া বিহারে যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও বিহারের অধিবাসী বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে না—এইরূপ নানা উপায়ে প্রবাসী বাঙালী-সম্প্রদায় শুধু বাঙালীত্বের জন্যই আজ অপদস্থ অথবা বিপন্ন হইতেছে। ইহার হেতু সম্বন্ধে বিহারীগণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন, "এত দিন ধরিয়া বিহারের ভাল ভাল চাকরি বাঙালী জাতি ভোগ করিয়াছে। তাহারা বাঙালীত্বের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া আমাদিগকে 'মেড়ো', 'ছাতু' প্রভৃতি আখ্যা দিয়া সর্ব্বদা অপমানিত করিয়াছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ফলে আজ যখন আমরা কিছু ক্ষমতা লাভ করিয়াছি, তখন সেই অপমানের যে প্রতিশোধ লইব ইহাতে আশ্চর্য্য কি? যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার না-করিয়াই শুধু বিহারীকে সরকারী চাকরি দিব ইহাতে আর অস্বাভাবিক কি আছে?"

স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের প্রশ্ন না-হয় ছাড়িয়াই দেওয়া যাক। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে আজ পরাধীনতাই "স্বাভাবিক" হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা ত সে অবস্থাকে ভাল বলি না। স্বাধীনতা আমাদের নিকট অনেকটা "অস্বাভাবিক" হইলেও আমরা তাহারই জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছি, কেন না স্বাধীনতা ভিন্ন যে ভারতের স্থায়ী মঙ্গল সম্ভব নয় ইহা আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। বিহারে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার পর বিহারীর পক্ষে বাঙালী জাতিকে নানা কারণে হীনস্থ করার ইচ্ছা হয়ত স্বাভাবিক এবং তাহার প্রতিক্রিয়ায় বাঙালীর পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিহারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাও হয়ত স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক বলিয়াই যে ইহা ভাল, তাহা ত সত্য নয়। আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ভারতের স্বাধীনতার প্রচেষ্টা আরও অগ্রসর হইতেছে কি না। যদি হয় তবে ভাল, আর যদি না-হয় তবে এ-পথ পরিহার করা কর্ত্তব্য। কেন না, বিহারই হউক আর বাংলা দেশই হউক, শেষ পর্য্যন্ত উভয় প্রদেশের পরিশ্রমী জনগণের কল্যাণ স্বাধীনতালাভের উপরেই নির্ভর করিতেছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহোদর শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন দাশ বিহারে প্রবাসী হইয়া রহিয়াছেন। তিনি বিহারে বাঙালী-সমিতি নামে এক সমিতি গঠনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। ইণ্ডিয়া এক্টের একটি ধারায় লিখিত আছে যে ভারতবর্ষের অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে ধর্ম্মগত, প্রদেশগত কোনও ভেদ স্বীকার করা হইবে না, সকলকে একমাত্র ভারতের অধিবাসী হিসাবেই গণ্য করা হইবে। কংগ্রেস করাচীতে অনুরূপ এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহাশয় এই দুইটি অনুশাসনের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন যে, বিহারে বাঙালীর বিরুদ্ধে বাঙালী হিসাবে কোনও অন্যায় আচরণ হওয়া উচিত নয়, বিশেষ করিয়া আজ যখন কংগ্রেসী দল বিহারে মন্ত্রিত্বের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, দাশ-মহাশয়ের দাবি একান্ত ন্যায়সঙ্গত এবং বিহারে সকল অংশ হইতে বাঙালীগণের সম্মিলিত ভাবে এই দাবি লইয়া আন্দোলন করা কর্ত্তব্য। আচরণের দ্বারা বিহার-গবর্ণমেণ্ট যখন প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দিতেছেন, তখন বাঙালীগণ সম্মিলিত কণ্ঠে তাঁহাদিগকে জাতীয়তার পরিপন্থী পথ হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিবেন, ইহা তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার এবং কর্ত্তব্য এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

কিন্তু ন্যায্য অধিকার হইলেই জগতে কেহ তাহা স্বীকার করিয়া লয় না, শুধু মৌখিক আন্দোলনকে শাসক-

সম্প্রদায় সর্ব্বদা উপেক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করেন। যদি কোনও দাবির পিছনে জোর থাকে, শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, শুধু তখনই শাসকগণ তাহা মানিয়া লন। এ ক্ষেত্রে প্রবাসী বাঙালী-সম্প্রদায় তাহা বুঝিতে পারিয়া শুধু যে করাচী প্রস্তাব এবং ইণ্ডিয়া এক্টের দোহাই দিয়া তাঁহাদের ন্যায্য দাবি পেশ করিতেছেন তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বাঙালীগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া নিজেদের সম্প্রদায়কে আংশিকভাবে আত্মনির্ভরশীল করিবার চেষ্টাও করিতেছেন। বাঙালী-সমিতির দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি সভায় বক্তৃতা শুনিয়া ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হইয়াছে যে, বাঙালীরা নিজেদের ছোটখাট কারখানা খুলিয়া, শুধু বাঙালী দোকানদারের কাছে মাল খরিদ করিয়া, এবং প্রয়োজন হইলে বাংলা দেশে বিহার হইতে আমদানী চালানী মাল বর্জ্জনের চেষ্টা করিয়া সম্প্রদায়ের আর্থিক স্বার্থকে আরও পরিপুষ্ট ও সুদৃঢ় করিতে চান। ফলে বিহারীগণ বাঙালীর শক্তিতে শঙ্কিত হইয়া হয়ত তাহাদের নাগরিকত্বের ন্যায্য দাবি স্বীকার করিয়া লইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভয় দেখাইয়া দাবি আদায়ের চেষ্টা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রথম প্রশ্ন হইল, ইহা মঙ্গলের পথ কি না এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল, যদি ইহা মঙ্গলের পথ না হয় তবে প্রকৃত মঙ্গলের পথ কোথায়? এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর একে একে দিতে চেষ্টা করিব।

প্রথম প্রশ্নের সোজা উত্তর হইল, ইহা মঙ্গলের পথ নয়। বাঙালী যখন বিহারে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছে ভারতীয়ত্বের দাবি করিতেছে, যখন সে বলিতেছে ভারতীয়েরা ত এক জাতি, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাহার পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে বাঙালীর আর্থিক স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা কখনও ভাল দেখায় না। তাহার ন্যায়ের দাবির সহিত আচরণের মধ্যে কি বিরোধ দেখা যায় না? হয়ত বিহারে বাঙালীগণ আজ বিপন্ন হইয়া নিজেদের সর্ব্ববিধ অনৈক্য বিসর্জ্জন দিয়া সবল ঐক্যবিশিষ্ট সম্প্রদায়ে পরিণত হইবেন। কিন্তু ভারতের জাতীয়তা বৃদ্ধির পথে এরূপ আর্থিক স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট সম্প্রদায় থাকা মোটেই কল্যাণকর নহে। নিখিল ভারতের আর্থিক স্বার্থ যখন এক হইবে, এবং সে-ঐক্য যখন আচরিত জীবনে পরিস্ফুট হইবে, তখনই প্রকৃতভাবে ভারতে জাতীয়তার উদয় হইবে। বিভিন্ন আর্থিক স্বার্থবিশিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী কতকগুলি সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে অথবা প্যাক্টের দ্বারা কখনও জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। যদিও বা আপাততঃ হয়, সেরূপ জাতীয়তা ধোপে টিকিবে না, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকালে এরূপ দুর্ব্বল ঐক্যের বন্ধন শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

তবে কি বাঙালী সঙ্ঘবদ্ধ হইবে না? ইহার উত্তরে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। হাঁ, বাঙালীকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে এবং নিজের ন্যায্য অধিকারের দাবিও করিতে হইবে—করাচী প্রস্তাব ও ইণ্ডিয়া এক্ট তাহাকে যে-অধিকার দিয়াছে, তাহা কোনক্রমে ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া উচিত নহে। তবে, সেই অধিকার আদায়ের জন্য আর্থিক স্বাতন্ত্র্য-সাধনের ভয় দেখাইবার প্রয়োজন নাই, বাংলায় বিহারী দ্রব্য বর্জ্জন করিবার চেষ্টারও দরকার নাই, কিন্তু সেই অধিকারের পিছনে অন্যবিধ জোর থাকার প্রয়োজন আছে। সেই জোর সেবার দ্বারা বাঙালী-সম্প্রদায়কে অর্জ্জন করিতে হইবে। কিরূপ সেবার দ্বারা ইহা সম্ভব তাহার কথা আলোচনা করা যাক।

আজ কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্টের হাতে বিহারের শাসন-ভার আসিয়া পড়িয়াছে। কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে এমন অনেক কাজ আছে যাহার ভার বাঙালী সমিতি গ্রহণ করিতে পারে। চরখা, খদ্দর, মাদকদ্রব্য বর্জ্জন, গ্রাম-উদ্যোগের চেষ্টা—সবই বাঙালীর দ্বারা সম্ভব। যদি বাঙালীগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমিতির পক্ষ হইতে সমিতির আর্থিক সাহায্যে এই জাতীয় কর্ম্মনিষ্ঠার সহিত পূর্ণোদ্যমে করেন এবং তাহার পর কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্টের নিকট বলেন, "দেখ, আমরা নিজেদের বিহারী হইতে স্বতন্ত্র ভাবি না, ভারতবর্ষের যে কাজ তাহাকেই আমরা নিজের করিয়া লইয়াছি", তখন বোধ হয় কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট বাঙালীর ন্যায্য অধিকারগুলি অস্বীকার করিতে পারিবে না। ইহাকেই মঙ্গলের পথ বলিয়া মনে হয়। ভয় দেখাইয়া নয়, সেবার দ্বারা শক্তিসঞ্চার করিয়া তাহারই

জোরে অধিকার লাভের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে ভাল। ভয় দেখাইয়া যে আদায় করা যায় না তাহা নহে, তবে সে উপায়ে ভারতবর্ষ আরও এত বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে যে তাহাকে কখনও মঙ্গলের পথ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

বিহারে প্রবাসী বাঙালীগণ হয়ত একটি কথা বলিবেন। তাঁহারা বলিবেন, "বাপু হে, এ পথ ভাল তাহা না-হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু বিহারের বিহারীরাই কোন্ সেবার কাজ করিয়া নাগরিকত্বের অধিকার লাভ করিয়াছে? তাহারা শুধু বিহারী নামধারী বলিয়া, বিহারে জন্মিয়াছে বলিয়াই ত সরকারী চাকরি পাইতেছে, অন্যায় করিলে ক্ষমা লাভও করিতেছে। আমরা তবে অত খাটিয়া ন্যায্য দাবি আদায়ের চেষ্টা করিব কেন?" কথাটা আপাততঃ ঠিক হইলেও বাঙালীর মত বুদ্ধিমান্ জাতির পক্ষে বোধ হয় শোভা পায় না। ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল প্রদেশের চেয়ে বাংলা দেশে রাজনৈতিক চেতনা যে বেশী, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিলেই ইহা অনুভব করা যায়। এহেন অগ্রগামী জাতির পক্ষে উল্লিখিত প্রশ্ন করা কি শোভা পায়? আমরা ত গুটিকয়েক চাকরির সুবিধা লইয়াই বাঁচিয়া থাকিতে চাই না, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সেজন্য যদি কিছু বেগার আমাদের খাটিতেই হয় তাহাতেই বা দোষ কি? যদি সেই পরিশ্রমের ফলে বিহারে আমাদের ন্যায্য অধিকার পর্য্যন্ত স্বীকৃত না হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? যদি এই প্রসঙ্গে আমরা ভারতবর্ষের জনগণকে রাষ্ট্রীয়ভাবে আরও সচেতন করিয়া তুলিতে পারি, তাহাতে ত পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার আন্দোলনকে আরও অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইবে। তাহাই কি কম লাভের কথা? কিন্তু শুধু গীতাপাঠ করিয়া অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করার প্রস্তাব করিতেছি না। ইহার পিছনে একটু রাজনৈতিক ব্যাপারও আছে, তাহা হয়ত খুলিয়া বলা দরকার।

ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশে আজ কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে। যে-সকল ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টে মন্ত্রিত্বের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলের সম্মানিত। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমাদের ধারণা, তাঁহারা যে সকল ক্ষেত্রে ত্যাগ ও দেশসেবার দ্বারাই তাঁহাদের বর্ত্তমান ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাহা নহে। কয়েক ক্ষেত্রে ত্যাগ করিয়াছেন এক জন. মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছেন অপর জন। কোন কোন প্রদেশে কংগ্রেসী দল সামান্য মাত্র সেবার কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু কংগ্রেসের ভারতব্যাপী প্রতিষ্ঠার ফলে আজ তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে হাতে পাইয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষুদ্র সেবার এতখানি ফল ফলে নাই, ইহা সুনিশ্চিত। ইহা কংগ্রেস-অধিকৃত প্রদেশগুলির সম্বন্ধেও যেমন সত্য, বাংলা দেশের আইনসভায় কংগ্রেসী দল সম্বন্ধেও আংশিক ভাবে তেমনই সত্য। নানা কারণে মিশাইয়া কংগ্রেসী সভ্যগণ আজ আইনসভার ক্ষমতার আসন লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষমতা লাভ করিলেই ত চলে না, তাহাকে বজায় রাখার জন্যও খাটুনির প্রয়োজন আছে। সে-পথ হয় সেবার পথ, নয়ত রাজনৈতিক চালবাজির পথ। কংগ্রেসী দল শুধু সেবার দ্বারা হয়ত নিজেদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে পারিতেছেন না, কেন না নূতন শাসনতন্ত্রে সত্য-সত্যই তাঁহাদের খুব বেশী সেবার ক্ষমতা জন্মায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, সকলের মধ্যে জনগণের সেবার ইচ্ছাও যে প্রবল ইহা বলা চলে না। এরূপ অবস্থায় কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল দেশবাসীকে হঠাৎ একটা ভয় দেখাইয়া নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতে পারেন। আমার মনে হয়, বিহারে অকস্মাৎ বাঙালীর বিরুদ্ধে অভিযান এমনই কোনও রাজনৈতিক চালবাজি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বোধ হয় রুশিয়ারই কোনও শাসনকর্ত্তা এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "জনগণকে যদি আর কোনও উপায়ে না পার, অন্ততঃ একটা যুদ্ধ বাধাইয়া কিছুক্ষণের জন্য ভুলাইয়া রাখ।" ব্যক্তিগত ভাবে আমার সময়ে সময়ে মনে হইয়াছে, যে-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের সকলের পিছনে সেবার মূলধন নাই। তাই আজ তাঁহারা স্বীয় প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্য নানাবিধ বিপদের ভান করিতেছেন। বিহারে এবং হয়ত উড়িষ্যাতে বাঙালী-বিদ্বেষের মূলে তাই এবং বোধ হয় বাংলা দেশে মুসলমানপ্রধান শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু-বিদ্বেষের পিছনেও অনুরূপ কোনও প্রেরণা রহিয়াছে।

বিহারে বাঙালী সমিতির কার্য্যসূচী হিসাবে আমরা যে প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার বিষয়ে পুনরায় আলোচনা করা যাক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যদি বাঙালীগণ কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তবে তাঁহারা কিছু প্রতিষ্ঠা ও শক্তি লাভ করিতে পারিবেন। পরে তাহার জোরে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের কাছে নিজেদের ন্যায্য অধিকার চাহিতেও পারেন। ইহাকেই আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী প্রস্তাব বলিয়া মনে করি।

কিন্তু যদি বাঙালী সমিতি বর্ত্তমান কংগ্রেসের গঠন-মূলক কার্য্যপদ্ধতি না লইয়া আরও বিপ্লবাত্মক কার্য্যভার গ্রহণ করে, তাহা হইলে দেশের পক্ষে হয়ত আরও ভাল হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বাঙালী সমিতির পক্ষে সেরূপ কার্য্যভার গ্রহণ করার সম্ভাবনা খুব কম বলিয়া মনে হয়। যাহাই হউক, কার্য্যপদ্ধতিটি কি তাহা আলোচনা করা যাক।

দেশের অধিকাংশ লোক যেখানে চাষী অথবা মজুর, সেখানে দেশ প্রধানতঃ তাহাদেরই স্বার্থরক্ষার জন্য শাসিত হইলে ভাল হয়। যাহারা পরশ্রমজীবী, তাহাদের সুবিধার জন্য রাষ্ট্রশাসন হওয়ার আর কোনও হেতু নাই। তাহারা ত এত দিন সর্ব্ববিধ সুবিধা ভোগ করিয়া আসিয়াছে। যদি বাঙালী সমিতি চাষী ও মজুরদের স্বার্থরক্ষার জন্য এখন হইতে তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করে এবং সুকৌশলে, অধ্যবসায়সহকারে এই কার্য্য পরিচালনা করে, তবে বাঙালী সমিতি ভবিষ্যতে এক বিপুল রাষ্ট্রনৈতিক শক্তির অধিকারী হইবে। বাঙালীকে নিজে খাটিতে হইবে এবং যাহারা খাটে তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহাদেরই স্বাধীনতার জন্য সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

এই কার্য্যের ফলে বাঙালী আজ যে-সকল ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে শুধু যে তাহাই ফিরিয়া পাইবে তাহা নয়, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষকে স্বরাজের পথে সে অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দিবে। যে-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট হাতে পাইয়া কিছু চাকরি বিতরণের সাহায্যে স্বরাজলাভের আনন্দ ভোগ করিতেছে, উপরিউক্ত কর্ম্মধারার ফলে তাহাদের শ্রেণীগত স্বার্থ কোথায় যে ভাসিয়া যাইবে তাহার ঠিক নাই। ইহা যে শুধু বিহারে বাঙালী-সমস্যার সম্বন্ধে সত্য তাহা নহে, বাংলা দেশেও যে-মধ্যবিত্ত দল হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে, বাংলার চাষীদের মধ্যে হিন্দুগণ রাজনৈতিক কার্য্য পরিচালনা করিলে অবশেষে তাহারাও ভাগীরথীর সম্মুখে ঐরাবতের মত ভাসিয়া যাইবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কেবল একটি কথা বলা প্রয়োজন। চাষী এবং মজুরগণের স্বরাজলাভের জন্য যে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা অথবা উভয় পক্ষের রক্তপাতের প্রয়োজন আছে, তাহা নহে। সম্পূর্ণ অহিংস অসহযোগের দ্বারা, মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত সত্যাগ্রহের দ্বারাই যে পরিশ্রমশীল জনগণের স্বরাজ স্থাপিত হইতে পারে ইহা আমরা অতিশয় দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি।

বাঙালী এই ভাবে রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে বাঙালীত্ব বিসর্জ্জন দিয়া বাঙালী হইয়া বাঁচিতে পারে। হিন্দু রাষ্ট্রনীতিতে হিন্দুত্ব বর্জ্জন করিয়াই তবে হিন্দু সংস্কৃতিকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারে।

তবে বিহারে বাঙালী অথবা বাংলায় হিন্দুগণ এরূপ চেষ্টা করিবেন কি না জানি না। সেই জন্য অন্তত বিহারের পক্ষে পূর্ব্বে বলিয়াছি—বর্ত্তমান কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যভার গ্রহণ করাই সমিতির পক্ষে সকলের চেয়ে যুক্তিযুক্ত। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ন্যায্য দাবির জন্য সমিতিকে ব্যাপকভাবে আন্দোলন চালাইতে হইবে। বাঙালী সমিতি গঠনমূলক কার্য্যভার যদি গ্রহণ করেন, তবে বিহারে বাঙালীর স্বার্থ যে স্বতন্ত্র নয় ইহা প্রমাণিত হইবে এবং খদ্দর, গ্রাম-উদ্যোগ সঙ্ঘের কার্য্যাবলী অথবা স্বদেশীপ্রচারের সাহায্যে বেকার বাঙালী যুবকগণেরও কিছু কিছু অন্নসংস্থান হইতে পারে ইহাতে সন্দেহ নাই।

বিয়ের উপহার

শ্রীমনোরমা চৌধুরী

সুরভির বিয়ে উপলক্ষ্যে তাদের বাড়ীতে অনেক লোক-সমাগম। বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে, অর্থেরও অনটন নেই, তাই গরীব বড়লোক অনেক আত্মীয়স্বজন এসেছেন। প্রতিদিন ভীড় বাড়ছে বই কমছে না। সদর রাস্তায় গাড়ীর শব্দ হ'তেই বা মোটরের হর্ণ বাজতেই সবাই ছুটে গিয়ে দেখছে, আবার নূতন কোন অতিথি এল কিনা।

সুরভির বাবা এলাহাবাদে ওকালতি করেন, তিনি সেখানকার এক জন গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি কিন্তু তার মা'র স্বভাবে অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই। তাঁর সুমিষ্ট কথাতে বন্ধুবান্ধব পাড়া-প্রতিবাসী সবাই প্রীত। তিনি নিজে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, সাধারণ গৃহস্থের ঘরেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল, পরে তাঁর স্বামী নিজের চেষ্টায় অবস্থার উন্নতি করেন। তা সত্ত্বেও সুরভিদের মধ্যে নূতন বড়লোক হওয়ার উগ্রতা কোন রকমে প্রকাশ পায় না।

সুরভির মা কুসুমেরা তিন বোন। ছোট বোন প্রভার আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত খারাপ। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে তাঁর, তাদের মধ্যে অনুভা সবার চেয়ে বড়। সুরভি অনুভার চেয়ে বছর দেড়েকের বড় তবু তাদের দু-জনে খুব ভাব। গত দু-বছর থেকে অনুভা মেজ মাসীমার কাছে থেকে এলাহাবাদেই পড়াশুনা করে।

কুসুমের বড় বোন অন্নপূর্ণা এক জন মস্ত বড় জমিদার-গৃহিণী, এবং তিনি যে খুব বড়লোক সে-জ্ঞানটি তাঁর টনটনে। তাঁর নিজের কোন ছেলেপিলে নেই, তবে অনেক গরীব আত্মীয়ের ভরণপোষণ করেন। তাঁর আশ্রিতেরা তাঁর কাছে অভাব-অভিযোগ জানালে মুখে তিনি রাগ প্রকাশ করেন কিন্তু নিজের অনুগ্রহ বিতরণের সুবিধা হয় ব'লে তিনি মনে মনে বেশ খুশী হন। মেজ বোনের উপর দয়া ক'রেই যেন তিনি বোনঝির বিয়ে উপলক্ষ্যে কুসুমের বাড়ীতে পদার্পণ করেছেন। বোনদের তিনি অবশ্য খুব ভালবাসেন, কিন্তু অভ্যাসের দোষে বার বার জাহির করে ফেলছেন যে বোনের ছোট বাড়ীতে এসে অবধি তাঁর শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যের সীমা নেই। মেজ বোনও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ছেন ও বড়লোক বোনের কথায় সায় দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখছেন না। "তা ত হবেই! আহা, তুমি হ'লে সুখী মানুষ—এ-রকম কষ্ট ক'রে থাকা ত আর তোমার অভ্যাস নেই। তুমি যে এসেছ তাই আমাদের কত ভাগ্যি। এ ক'টা দিন কোন রকমে কাটিয়ে দাও।" বড় বোন একটু লজ্জা পেয়ে বলেন "না, কষ্ট আর কি? আমাকে কি কম কষ্ট পেতে হয়েছে প্রথম প্রথম শ্বশুরবাড়ী গিয়ে? কি খাটুনিটাই না খাটতে হ'ত। ক-বছর থেকে বুকের ব্যামো হয়ে এখন আর তেমন চলাফেরা করতে পারি নে। বয়সও ত আর কম হয় নি।"

ওদিকে ছোট বোন প্রভার মরবার সময় নেই। এক রাশ তরকারি কুটে দিয়ে, ধুয়ে, জায়গা পরিষ্কার করে, নিজের ছেলেমেয়েদের নাইয়ে ধুইয়ে, কোলের মেয়েটির কান্না থামাবার বিফল চেষ্টা ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে অন্নপূর্ণার কাছে এসে বসলেন। অন্নপূর্ণা তাঁকে আদর ক'রে কোলের কাছে টেনে আনলেন, "সকাল থেকে কি যে করছিস তার ঠিক নেই। একবার আমার কাছে এসে বসবি, দু-চারটে গল্প করবি—তা না, এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিস।"

প্রভা বললে, "তাই ত! বলে সকাল থেকে নিশ্বেস ফেলবার সময় নেই। এদিক-ওদিক কি আর সাধে ঘুরে বেড়াচ্ছি? অন্য লোকের ছেলেমেয়েরা দেখি কেমন শান্তশিষ্ট, আর আমারই ভাগ্যে এমন দুরন্ত ছেলে! এদের পিছনে কি আর আমার কম জ্বালা, দিদি।"

অন্নপূর্ণা বললেন, "আজকাল তোরা যেন কি

হয়েছিস। একটু কাজ করলেই হাঁপিয়ে পড়িস। আমি তোর মত বয়সে সাত জনের কাজ একা করেছি। ডাক্তারে মানা করেছে তাই আজকাল এ-রকম ব'সে থাকি। আমাকে আগে তোরা কখনও দু-দণ্ড স্থির হয়ে বসতে দেখেছিস? তোর ছেলের ভাতেই ত বুকের অসুখ নিয়ে কি কম কাজ করেছি?" এই ব'লে তিনি প্রভার মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন। প্রভার ঠিক মনে পড়ল না কি কাজ তিনি করেছিলেন, কিন্তু বড়লোক দিদির বিরুদ্ধে কথা কইবার জো নেই। প্রভার মুখে একটা অনিশ্চিত ভাব দেখে তাকে মনে করিয়ে দেবার জন্যে অন্নপূর্ণা বললেন, "ঐ যে গো। যেবার তোর ছেলেকে হীরের আংটি দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলাম। তুই সেবার কত রাগ করেছিলি। মনে পড়ছে না তোর? তুই বললি যে অত ছোট ছেলের জন্যে আবার অত টাকা খরচ কেন? তা তোদের জামাই বাবুর কাছে আর টাকার নাম করবার জো নেই। বললেই উনি বলেন, "তোমার আবার টাকার ভাবনা কিসের? যে জিনিষটা পছন্দ হবে, সেটা তখনই নিয়ে নেবে, আর তার দাম যতই হোক না কেন সে-ভাবনা আমার। যদি জিনিষই পছন্দ না-হ'ল, তা হ'লে টাকা জমিয়ে রেখে কি আমার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হবে? জিনিষ পছন্দসই না-হলে ওঁর আর কিছুতে মন ওঠে না।"

এ-হেন অন্নপূর্ণা যিনি ছোটবোনপোর অন্নপ্রাশনে দামী আংটি দিয়েছেন, তিনি বোনঝির বিয়েতে কি দিচ্ছেন, তা জানতে সবাই উৎসুক হয়ে উঠল, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ আর বলতে পারল না। আশেপাশে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে এক জন প্রভাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি সুরভিকে কি দিচ্ছেন। প্রভা বললে, "কি আর আমার দেবার ক্ষমতা আছে ভাই। গরীব মানুষ আমি। একটা সোনার হার গড়িয়েছি। দিদি, তুমি দেখ নি বুঝি সেটা? আমি এসেই মেজদির হাতে সেটা দিয়ে দিয়েছি বাক্সে তুলে রাখতে। তা না হ'লে গোলমালে কে কোথায় টেনে ফেলে দেবে।" তাঁর দশ বছরের মেয়ে প্রতিভা সে সময় কি কাজে ঘরে এসেছিল। তাকে প্রভা বললে, "একবার মেজদির কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে আয় ত। বল্ আমি চাইছি। দিদিকে এই বেলা দেখিয়ে দিই হারটা কেমন হ'ল।"

অন্নপূর্ণা বললেন, "ওমা তাই ত! আমিও আমার শাড়ীটা বার ক'রে দেখাই। তোরা দশ জনে দেখে বল্ সুরভিকে কেমন মানাবে ওটা প'রে। বাব্বা, আমি কি কম নাকানি-চোবানি খেয়েছি পছন্দসই বেনারসী কিনতে। অনুভারও ত বিয়ের কথা হচ্ছে—আমার তাই ইচ্ছা ছিল এক রকমের দুটি শাড়ী কিনি। সুরভি ও অনুভাকে আলাদা আলাদা জিনিষ দিলে ত আর চলবে না। তা একটা শাড়ী পছন্দ করতেই গলদঘর্ম্ম হয়ে গেছি। দেখ্ তোদের যদি পছন্দ হয়, তা হ'লে অর্ডার দিয়ে অনুভার জন্যেও এখন থেকে ঐ রকম তৈরি করিয়ে রাখি। প্রায় তিন-চার-শ খানা শাড়ী থেকে বাছাই ক'রে যা কিনেছি, তার আর তুলনা নেই। আগে আগে কত ভাল জিনিষ দেখেছি, মাঝে ত আর ওসবের চলন ছিল না। আজকাল আবার ওরিয়েন্টাল ফ্যাশানের নামে ধুয়া উঠেছে, সব আগেকার চলন ফিরে আসছে। জানিস্ সুরভি, তোর জন্যে এমন শাড়ী কিনেছি যে তার চেয়ে বেশী ওরিয়েন্টাল জিনিষ তুই আর পাবি নে—আমি ব'লে রাখছি।"

ট্রাঙ্ক থেকে অপূর্ব্ব শাড়ীটি বার করতে করতে অন্নপূর্ণা বললেন, "বিয়ের রাত্তিরে ঐটাই পরাস্ ওকে। খুব মানাবে সুরভিকে। তোরা বিয়ের যে চেলিটা কিনেছিস সেটার রং যেন কেমন ম্যাড়মেড়ে। কার পছন্দে কেনা হয়েছিল রে অনুভা?"

ও বিষয়ে অনুভা নিজেই অপরাধী। ওর নিজের মনে ভয়ানক গর্ব্ব যে ওর মত সুরুচিসম্পন্না মেয়ে আর হয় না। কুসুমের ও প্রভার ইচ্ছা ছিল যে লাল চেলি পরে সুরভির বিয়ে হোক, কিন্তু অনুভাই জেদ ক'রে চাঁপাফুলের রঙের শাড়ীটা কেনাল। সুরভিরও ইচ্ছা তাই।

অনুভা কিন্তু অপ্রস্তুত হবার মেয়ে নয়। সে বললে, "বেশ সুন্দর ত রংটা। তোমার পছন্দ নয়, বড় মাসীমা?" এই ব'লে সে অন্নপূর্ণার আনা শাড়ীটি প্যাকেট থেকে বার ক'রে খুলে ফেললে।

শাড়ীটা খুব গাঢ় বেগুনী রঙের; আগাগোড়া জরির জংলা কাজ। জমির ভেতর হাতী, উট ও হরিণের বড় বড় বুটি। জানোয়ারের প্রাচুর্য্যের জন্ত এর নাম শিকারী বেনারসী। জমি খুব খাপী ও শাড়ীটা এত ভারী যে তুলতে বেশ পরিশ্রম হয়। দেখলেই মনে হয় খুব সেকেলে জিনিষ।

জমিদার-গিন্নীর সখের উপহারের উপর কে কি মতামত দেবে? মনে মনে যে যাই ভাবুক, সবাই মুখে অন্ততঃ বললে, "বাঃ! কি সুন্দর বেনারসী।" "দামও কম হ'বে না।" ইত্যাদি। অনুভা আজকালকার মেয়ে; তার উপর সে তার বড়লোক মাসীমার কথা-বার্ত্তায় তেমন অভ্যস্ত নয়। তার পেয়েছে ভয়ানক হাসি, অথচ ওখানে জোরে হেসে উঠলে তার কি পরিণাম হ'বে, সে তা ভাল ক'রেই বোঝে। তার মাসীমা যখন শাড়ীর বর্ণনা ও দাম ইত্যাদি বলতে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে সে ছুটে ঘর থেকে পালিয়ে গেল। সুরভির কাছে একলা যত ক্ষণ না সে প্রাণ খুলে হাসতে পারছে, তত ক্ষণ আর তার মনে শান্তি নেই। এমন মজার শাড়ী সুরভিকে পড়তে হবে তার বিয়ের রাতে, একথা কল্পনা করতেও সে পারছে না।

এদিকে প্রভা মনে মনে প্রমাদ গণলেন। যদি অন্নপূর্ণা কোন রকমে টের পান যে ওঁর দেওয়া শাড়ী মেয়েদের পছন্দ হয় নি, তা হ'লে আর রক্ষে থাকবে না। তিনিও তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেলেন মেয়েকে বোঝাতে। অনুভা তার অসভ্য ব্যবহারের জন্ত বকুনি খেল ও শাস্তিস্বরূপ তাকে বড় মাসীমার কাছে এসে বার বার বলতে হ'ল যে শাড়ীটা খুব সুন্দর হয়েছে। অনুভার অভিনয় এত স্বাভাবিক হ'ল যে বড় মাসীমা মনে মনে তার উপর প্রসন্ন হলেন। তিনি বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, দেখিস তোর বিয়েতেও ঠিক অমনি জিনিষই পাবি। যদি ঠিক ঐ রকমটি না পাই তা হ'লে ফরমাস দিয়ে তৈরি করিয়ে দেব। কোন ভাবনা নেই তোর।"

মাঝেরাতে প্রভা, কুসুম, সুরভি ও অনুভা এই চার জনের কন্ফারেন্স বসল। অন্নপূর্ণার শাড়ীটা নিয়ে কি করা যায় এই হয়েছে তাদের মহা ভাবনা। অন্নপূর্ণা খুব আশা ক'রে এসেছেন যে তাঁর শাড়ী ওদের এত পছন্দ হবে যে ঐটা প'রেই সুরভির বিয়ে হবে। যদি সুরভিকে সেদিন অন্ত কোন শাড়ী পরান হয়, তাহ'লে তিনি মনে মনে ক্ষুণ্ণ হবেন। ওদিকে সুরভিও নারাজ অমন বিদঘুটে শাড়ী প'রে বিয়ে করতে। ওর ক্লাসের মেয়েরা আসবে আর ও নাকি অমন সং সেজে থাকবে। সুরভি যদিও বা নিমরাজী ছিল, কিন্তু অনুভার ঘোর আপত্তিতে প্রভা ও কুসুমের মেয়েদের ইচ্ছামত কাজ করতে হ'ল।

সুরভির শেষ পর্য্যন্ত চাঁপাফুলের রঙের শাড়ী প'রেই বিয়ে হ'ল, কিন্তু ও শাড়ীটার হাত থেকে কেমন ক'রে মুক্তি পাওয়া যায় এই হ'ল সুরভি ও অনুভার প্রধান সমস্যা। অষ্টমঙ্গলার পর সুরভি যখন শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরে এল, তখন ওরা দুজনে কেবলই পরামর্শ করতে লাগল কি করা যায়। কুসুম বললেন, "থাক না বাবা শাড়ীটা বাক্সে পড়ে। ওটা কি তোদের কামড়াচ্ছে? পছন্দ হ'ল না ত হ'ল না, তা বলে সব তাতে বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়। অনুভা দমবার পাত্রী নয়, সে বোঝাতে লাগল, "সবাই ত বিয়ের সময়ে একবার দেখে নিয়েছে যে কেমন দামী উপহার সুরভি পেল। এখন আর কে খোঁজ নিতে যাচ্ছে, সেটা ওর কাছে আছে কি না। থাকলে বরং ওর শাশুড়ী হয়ত ওকে পরতে বলবেন। সেকেলে মানুষদের ঐ রকম খুব পছন্দ। তখন সুরভি কি বিপদে পড়বে বল দিকি? ও শাড়ী বাক্সবন্দী ক'রে সার্থকতা কি? ঐ টাকাটা থাকলে কত সুদ পেত।" সুরভিরও ইচ্ছা যে শাড়ীখানা বিক্রি ক'রে ও একটা ভাল ড্রেসিং-টেবিল কেনে। অনুভা ও সুরভিকে শাড়ী বিক্রি ক'রে ফেলতে বদ্ধপরিকর দেখে অবশেষে তাদের মায়েদের আর কোন আপত্তি টিকল না। তাঁরা কেবল বললেন, "দেখিস টাকা যেন লোকসান না দিতে হয়। যা ন্যায্য দাম, তার কমে বিক্রি করিস নে।

দুই বোনে সে-শাড়ী নিয়ে অনেক দোকানে ঘোরাঘুরি করল, কিন্তু কোথাও বিশেষ সুবিধা হ'ল না। কোন ব্যবসাদারই নগদ দাম দিয়ে সে-শাড়ী কিনতে

রাজী নয়, কারণ আজকাল এ জিনিষ বিশেষ চলে না ব'লে ব্যবসাদারকেই ঠকতে হবে। সুরভির বাবার সঙ্গে জগন্নাথ দাস রামমোহন দাসের বেনারসী কাপড়ের দোকানের স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে খুব আলাপ ছিল। অবশেষে তাঁরই হাতে অনুভা শাড়ীটা এই ব'লে গছিয়ে দিয়ে এল যে ওটা যেন তাঁরা নিজের শো-কেসে রাখেন। যদি কারুর চোখে লেগে যায়, তা হ'লে বিক্রি হয়েও যেতে পারে।

*   *   *

কিছু দিন পরে অনুভারও হঠাৎ বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। আবার সেই লোকজনের ভীড় ও কলকোলাহলের পুনরভিনয়। বিয়ে কুসুমের বাড়ীতে এলাহাবাদে হবার কথা। এবারে সদ্যবিবাহিতা সুরভি অনুভাকে সাজাতে, এবং অন্যান্য সব কাজকর্ম্ম করতে ব্যস্ত। ওদের দু-বোনের মধ্যে বড় মাসীমার বিয়ের উপহার নিয়ে এখনও হাসাহাসির অন্ত নেই। অনুভা ওদিকে অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে জানতে যে ওর কপালে কেমন উপহার নাচছে। যত বার সুরভির সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা হয়, ততই সে খিলখিল ক'রে হেসে উঠছে।

বড় মাসীমা এখনও এসে পৌছন নি। তিনি লিখেছেন যে তাঁর আসতে বিলম্ব হচ্ছে, তিনি অনুভার জন্যে মনের মত যৌতুক খুঁজে পাচ্ছেন না ব'লে। সুরভিকে অত ভাল উপহার দিয়েছেন, আর অনুভা ছোট বোন হয়ে যে তার চেয়ে খেলো জিনিষ পাবে, এটা তিনি সহ্য করতে পারবেন না। অথচ বিয়ে এত শীঘ্র ঠিক হয়ে গেল যে তিনি নিজের কথামত সুরভির শাড়ীর জোড়া ফরমাস দিতে সময় পান নি। অন্নপূর্ণা এও লিখেছেন যে সুরভির মত ঠিক অমনটি না-হ'লেও, কতকটা ঐ ধরণের শাড়ী অনুভার জন্যে আনাতে তিনি চেষ্টা করছেন। যদি নেহাৎ অনুভার ভাগ্যে না-থাকে, তা হ'লে তিনি শাড়ীর বদলে টাকাই দেবেন।

চিঠি প'ড়ে অনুভা আর একবার খুব হাসল, অবশ্য মায়ের সামনে নয়। চিঠির শেষ কথা প'ড়ে ও মনে মনে আশ্বস্ত হ'ল বড় মাসীমার সুবুদ্ধি হয়েছে ভেবে, কিন্তু সুরভি ওকে ক্ষেপাতে ছাড়ছে না। সুরভি বললে, "যেমনি তুই আদিখ্যেতা ক'রে বার বার বড় মাসীমার কাছে তাঁকে সুরুচিসম্পন্না ব'লে খোশামোদ করতে গিয়েছিলি, এখন তেমনি তার ফল ভোগ কর্। উনি টাকা দেবেন না। দেখিস তোর অদৃষ্টে একটা বিদঘুটে কিছু আছে—তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। আমাকে তুই শাড়ীর হাত থেকে রেহাই দিলি, কিন্তু শেষে তুই-ই না ফেঁসে যাস। জগন্নাথ দাস রামমোহন দাসেরা বাবার খাতিরে একবার নিজের শো-কেসে আমার শাড়ীটাকে স্থান দিয়েছে, কিন্তু বার বার ত তারা বিদঘুটে জিনিষ জমিয়ে রাখবে না।"

বড় মাসীমা অবশেষে বিয়ের দু-দিন আগে এসে পৌছলেন, অনুভার সৌভাগ্যক্রমে শুধু হাতেই। তিনি খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলেন কোন কিছু দেবার মত পাচ্ছেন না বলে। একটা ছোটখাট গহনার সঙ্গে দেড়-শ টাকা দেওয়া তিনি স্থির করলেন। বিয়ের আগের দিন গহনা কেনবার জন্যে তিনি বাজারে বেরলেন। যখন অনেক বেলায় বাড়ী ফিরলেন, তাঁর হাতে ছিল একটা মস্ত বড় কাগজের প্যাকেট। উৎফুল্ল মুখে তিনি এসেই অনুভাকে বললেন, "আজ আমার বেরনো সার্থক হয়েছে। বাজারের সেরা জিনিষ এনেছি। তোর পছন্দ না হয়েই যায় না।"

তখনি প্যাকেট খোলা হ'ল। দুপুরবেলার রোদে গাঢ় বেগুনী রঙের জংলা শাড়ী ঝলমল করতে লাগল। সেই আগেকার শাড়ী, তাতে সেই হাতী, ঘোড়া, উটের বড় বড় বুটি। অনুভা, সুরভিকে নির্ব্বাক্ দেখে অন্নপূর্ণা বোধ হয় ভাবলেন যে তারা শাড়ীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ।

তাদের নীরবতা ভেদ ক'রে চাকর অনুভার হাতে একটা চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিটা জগন্নাথ দাস রামমোহন দাসের দোকান থেকে এসেছে। যে শাড়ীটা অনুভা তাদের দোকানে রেখে এসেছিল, সেটা বিক্রি হয়ে গেছে। ওরা খুব ভাল ব্যবসায়ী কিনা, তাই তারা সেদিনই কমিশন বাদ দিয়ে শাড়ীর মূল্যস্বরূপ সুরভির বাবাকে একটা মোটা রকমের চেক পাঠিয়েছে।

খামের ওপর দোকানের নাম দেখে বড় মাসীমা

লাফিয়ে উঠলেন, "ওমা! ও কে চেক পাঠাল তোদের? ওদেরই দোকান থেকে আজ শাড়ীটা কিনে আনলাম। কি আশ্চর্য্য কথা কিন্তু। এত খুঁজে কোথাও স্বরভির শাড়ীর জোড়া পেলাম না। কিন্তু ওদের বুঝিয়ে বলতে না-বলতেই ঠিক যেমনটি চাই ওরা এনে হাজির করল। খুব ভাল বন্দোবস্ত কিন্তু, একেবারে বিলিতী দোকানের মত। তোদের আবার কি চিঠি লিখেছে? তোরাও বুঝি কিছু কিনেছিস ওখান থেকে?"

অনুভা তখন প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে এসেছে। তবুও বললে, "ওরা মেসোমশায়ের বন্ধু কি না। একসঙ্গে পড়েছে। আমাকে ছোটবেলা থেকে জানে, খুব ভালবাসে। বিয়েতে আসতে পারবে না ব'লে উপহার-স্বরূপ টাকা পাঠিয়েছে।" পাছে বড় মাসীমা চিঠিটা প'ড়ে কৌতূহল নিবৃত্তি করতে চান, এই ভয়ে অনুভা চেকটা তাঁর হাতে দেখবার জন্যে দিয়ে, চিঠিটা সেখানে তখনি ছিঁড়ে ফেললে।

আদিম কলিকাতার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ

৬

ইংরেজদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়াদির ফলে সে যুগেও কলিকাতা ক্রমশঃ শাস্ত্রজ্ঞানের কেন্দ্র ও বঙ্গের সামাজিক রাজধানী হইয়া উঠিল।

সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিরূপ বিমুখ ছিলেন, বিগত প্রস্তাবে আমরা তাহা দেখিয়াছি। কিন্তু অন্য এক সূত্রে কোম্পানীকে শিক্ষার কার্য্যে হাত দিতেই হইল। নিরুপদ্রবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনের ও রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে কোম্পানীকে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইতেছিল। ক্রমে এ-দেশে কোম্পানী কর্ত্তৃক কয়েকটি বিচারালয় স্থাপিত হইল। বিচারকার্য্যের সাহায্যের জন্য কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের পক্ষে হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্র জানা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল।[৩৪]

১৭৮০ কিংবা ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে[৩৫] "কয়েক জন শিক্ষিত পদস্থ মুসলমানের পরামর্শে" ওয়ারেন হেষ্টিংস্ মুসলমান-দিগের ধর্ম্মশাস্ত্র ও আইন প্রভৃতির চর্চ্চার জন্য কলিকাতায় মাদ্রাসা (Calcutta Madrassa) নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সাহায্যে কাশীর রেসিডেণ্ট জোনাথান ডন্‌কান সাহেব (Jonathan Duncan, যিনি পরে বোম্বাইর গভর্ণর হন্) কর্ত্তৃক সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাহিত্য চর্চ্চার জন্য কাশীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮০০ সালের ১৮ই আগষ্ট[৩৬] লর্ড ওয়েলেস্‌লী ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকে দেশীয় ভাষা, ধর্ম্মশাস্ত্র ও আইন প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করিলেন। এই তিনটি শিক্ষায়তনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, শাসন ও বিচার কার্য্যে ইংরেজ রাজপুরুষগণের সুবিধা করিয়া দেওয়া। প্রথম দুই কলেজে হিন্দু ও মুসলমান আইনে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ও মৌলবীর সংখ্যা বৃদ্ধির দিকেই দৃষ্টি রাখা হইত। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এগুলির কোনটিরই লক্ষ্য ছিল না।

ইহার মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজটি একটি অতি উচ্চ আদর্শের কলেজ হইল

"The curriculum of study included Arabic, Persian, and Sanskrit; Bengali, Marathi, Hindostani or Hindi, Telugoo, Tamil and Kanarese; English, the Company's, Mohammedan and Hindoo

law, civil jurisprudence, and the law of nations; ethics; political economy, history, geography and mathematics; the Greek, Latin and English classics, and the modern languages of Europe; the history and antiquities of India; natural history; botany, chemistry and astronomy".৩৭

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আদিম যুগে কলিকাতাকে প্রধানতঃ ইংরেজদের নগর বলিয়া মনে করিতেন; যাহাতে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ জ্ঞানে ও বিচক্ষণতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল। তাই এই কলেজটিকে তাঁহারা এরূপ উন্নত ভাবে পরিচালিত করিতেছিলেন। তদ্ভিন্ন এই কলেজ স্থাপনের সময় (১৮০০ সাল) হইতে কলিকাতায় ইংরেজদের জীবনের সর্ব্ব বিষয়েই উন্নত হইতে লাগিল; গির্জ্জা, থিয়েটার, ক্লব, সংবাদপত্র এবং সাহিত্যচর্চ্চা, শিল্পচর্চ্চা প্রভৃতি ইংরেজগণের সামাজিক জীবনের সর্ব্ববিধ আয়োজনের দ্বারা কলিকাতা নগরী সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। (১৮৫৪ সালে এই কলেজ তুলিয়া দেওয়া হয়।)

পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিদ্যালয় ব্যতীত, ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে ফোর্ট উইলিয়মের (অর্থাৎ কলিকাতার) চীফ জষ্টিস্ সর্ উইলিয়ম জোন্স্ (Sir William Jones) কর্ত্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটি (Asiatic Society of Bengal) নামক প্রাচ্য-বিদ্যানুশীলনের সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সোসাইটির পুস্তকালয়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য শাস্ত্রগ্রন্থাদি সংগৃহীত হইতে লাগিল।

পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিদ্যালয়ের এবং এসিয়াটিক সোসাইটির দ্বারা ক্রমশঃ বঙ্গদেশে দেশীয় শাস্ত্রচর্চ্চাতে একটি নব যুগের উদ্ভব হইল। ইংরেজ জাতির স্বভাব এই যে, আইনের বিধি অস্পষ্ট রাখিয়া তাঁহারা কখনও সুখী হন না। এজন্য ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ হিন্দু দায়াধিকার সম্বন্ধীয় শাস্ত্রোক্ত সমুদয় মীমাংসা সংগৃহীত করিয়া দেশীয় পণ্ডিতগণের দ্বারা 'বিবাদার্ণব-সেতু' নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ সংকলন করাইলেন। কিন্তু সাহেবদের বুঝিবার জন্য ইহার ইংরেজী অনুবাদ করা আবশ্যক। পাঠকগণ শুনিয়া হয়তো কৌতুক অনুভব করিবেন যে, এই পুস্তক ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে পারে এমন কোন লোক তখন পাওয়া গেল না। অবশেষে পুস্তকখানিকে প্রথমতঃ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করা হইল, এবং ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হাল্‌হেড্ সাহেব (Nathaniel Brassey Halhead) ফারসী হইতে তাহার ইংরেজী অনুবাদ করিলেন। অনুবাদের নাম হইল Code of Gentoo Law। তখন হিন্দু অর্থে Gentoo শব্দ ব্যবহৃত হইত।৩৮

ওয়ারেন হেষ্টিংসের নির্দ্দেশে উইল্‌কিন্স সাহেব (Charles Wilkins) কাশীতে গিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন; এবং ক্রমে ক্রমে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভগবদ্গীতার ইংরেজী অনুবাদ, ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে হিতোপদেশের ইংরেজী অনুবাদ, এবং ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজীতে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত করেন। এই ব্যাকরণ ইংলণ্ডে মুদ্রিত হয়। ইহার পূর্ব্বে ইংলণ্ডে কখনও সংস্কৃত টাইপ ব্যবহৃত হয় নাই। এই ব্যাকরণ প্রকাশের পূর্ব্বেই (১৭৮৯ সালে) সর্ উইলিয়ম্ জোন্স কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত ব্যাকরণ ও শকুন্তলার ইংরেজী অনুবাদ, এই দুই গ্রন্থ য়ুরোপে সংস্কৃত ভাষার প্রতি জনসাধারণের মনে প্রবল কুতূহল জাগরিত করিয়া তোলে; বিশেষতঃ শকুন্তলার ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিয়া য়ুরোপীয়গণ চমৎকৃত হন।

১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্ উইলিয়ম জোন্স্ মনুসংহিতার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কোলব্রুক সাহেব (Henry Thomas Colebrooke) পণ্ডিতগণের দ্বারা চুক্তি (contract) এবং দায়াধিকার (succession) সম্বন্ধীয় হিন্দু আইনের সমুদয় বিধি সঙ্কলিত করাইয়া লন, এবং স্বয়ং এই সংকলন-গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করেন। এই কোলব্রুক সাহেব আবার বিপুল পরিশ্রম সহকারে সমগ্র বৈদিক সাহিত্য ও তাহার ভাষ্য অধ্যয়ন করেন, এবং ১৮০৫ সালে তদ্বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ ("On the Vedas") প্রকাশ করেন।

এই সকল নব-প্রকাশিত গ্রন্থ এবং সে সকলের মূলীভূত সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ সকল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের

এবং এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে সযত্নে রক্ষিত হইত। কোর্ট উইলিয়ম কলেজে এ সকল গ্রন্থ য়ুরোপীয় প্রণালীতে তন্ন তন্ন করিয়া পঠিত ও আলোচিত হইত। ঐ কলেজ প্রধানতঃ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারিগণের শিক্ষার জন্যই স্থাপিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু উহার দেশীয় পণ্ডিতগণও উহার দ্বারা উপকৃত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা ঐ সকল শাস্ত্র য়ুরোপীয় নব্য প্রণালীতে অধ্যয়ন ও বিচার করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন।

দেশীয় সমাজে নানা দিক দিয়া ইহার গুরুতর ফল ফলিতে লাগিল। তন্মধ্যে আমরা দুইটির মাত্র উল্লেখ করিতে পারিব। পূর্ব্বে নবদ্বীপাদি অঞ্চলেই হিন্দুশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিতমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থল ছিল। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, কোম্পানীর বাণিজ্যের প্রথম যুগে ক্রমে ক্রমে কলিকাতায় অনেক ধনী বাঙ্গালীর অভ্যুদয় হইলেও কলিকাতা তৎক্ষণাৎ বঙ্গদেশের সামাজিক রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে নাই। কিন্তু অতঃপর কলিকাতা হিন্দু শাস্ত্র আলোচনার একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে এমন হইল যে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্রের আলোচনা বিষয়ে কলিকাতাস্থ পণ্ডিতগণের সমকক্ষ নবদ্বীপাদি অঞ্চলেও কেহ রহিলেন না। এই সময় হইতে কলিকাতাই সর্ব্ববিষয়ে বাঙালী সমাজের রাজধানী হইয়া উঠিল।

কোম্পানীর চাকরীর গুণে কোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের পণ্ডিতগণ বঙ্গসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। আমরা দেখিতে পাইব, ১৮১৩ সালের পর হইতে অন্যান্য স্থানের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণও কোম্পানী হইতে অর্থসাহায্য লাভ করিতে লাগিলেন। যে রাজসমাদরের অভাবের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,[৩৯] পণ্ডিত ও মৌলবীগণ সম্বন্ধে সে অভাব ক্রমশঃ আর রহিল না।

৭

কলিকাতা পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চ্চারও কেন্দ্র; রামমোহন রায়ের জীবনে তাহার ফল

কলিকাতা যে এইরূপে জ্ঞানচর্চ্চার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল, ইহার আর একটি গুরুতর ফল ফলিল রামমোহন রায়ের জীবনে। তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা অদম্য ছিল, এবং অধিগত সমুদয় জ্ঞানকে নিজ জীবনে ও নিজ দেশে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহার চিত্তে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। এই উভয় বিষয়ে তিনি তৎকালে বঙ্গসমাজে অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। কলিকাতায় জ্ঞান-কেন্দ্র হইতে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ জ্ঞান সাগ্রহে নিজ অন্তরে সঞ্চিত করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায়ের প্রচলিত জীবন-চরিতগুলি হইতে কয়েকটি বিষয়ে আমাদের মনে ভুল ধারণা জন্মে। একটি ধারণা এই যে, তাঁহার বাল্যকালে বঙ্গদেশে জ্ঞান-চর্চ্চা কিছুই ছিল না, দেশ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। এই ধারণা যে ভ্রান্ত, তাহার আংশিক প্রমাণ পাঠক কোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রসঙ্গে এবং গত মাসের শেষ প্রস্তাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক্ষণকাল পরে আমরা কলিকাতার ইংরেজী স্কুলগুলির প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইব; তখন ইহার আরও প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন। দ্বিতীয় ভুল ধারণা এই যে, রামমোহন রায় বাল্য বয়সে ফারসী ও আরবী শিক্ষার জন্য পাটনাতে এবং সংস্কৃত শিক্ষার জন্য কাশীতে প্রেরিত হন। এই ধারণার পরিপোষক অণুমাত্র প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে না। তিনি সংস্কৃত ও ফারসীর প্রথম শিক্ষা বাল্যকালে স্বগ্রাম রাধানগরে থাকিয়াই লাভ করেন।[৪০] উত্তরকালে যখন তিনি ভ্রমণসূত্রে পাটনা ও কাশীতে গমন করেন, তখন বাল্যকালে অর্জ্জিত সেই জ্ঞান বর্দ্ধিত করিয়া লইয়া থাকিবেন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে তিনি বারে বারে কলিকাতায় আসিয়া কোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। তথা হইতেই তিনি নানা সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের এবং বেদ ও উপনিষদের আলোচনা করিবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা প্রাপ্ত হন।[৪১] রামমোহনের নিজের উক্তি হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮২০ সালে প্রকাশিত 'কবিতাকারের সহিত বিচার' নামক গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, "ঐ সকল মূল উপনিষদ্, ও আচার্য্যের ভাষ্য, এবং বেদান্তদর্শন ও তাহার ভাষ্য, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের বাটিতে এবং কালেজে ও অন্য অন্য পণ্ডিতের নিকট এই দেশেই আছে।" ঐ

বাক্যের 'কালেজ' শব্দটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে সূচিত করিতেছে; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ঐ কলেজেরই পণ্ডিত ছিলেন। রামমোহন রায়ের এবং তাঁহার বন্ধু ডিগ্‌বী সাহেবের লিখিত দুখানি পত্রে প্রায় একই ভাষায় বোর্ড অব রেভিনিউর অধীনে চাকরীর জন্য রামমোহন রায়ের যোগ্যতার বিষয় বর্ণিত আছে। ডিগ্‌বী লিখিতেছেন,

"I now beg leave to refer the Board to the Qazi-ul-Quzat in the Sadar Dewani Adalat, to the Head Persian Munshi of the College of Fort William, and to the other principal officers of those Departments for the character and qualifications of the man I have proposed."

ইহা হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে সদর দেওয়ানী আদালতের সহিত ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত রামমোহন রায় ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[৪২]

আর একটি ভুল ধারণা এই যে, রামমোহন রায় একমাত্র ডিগ্‌বী সাহেবের (Digby) নিকট হইতে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন ও য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হন। ডিগ্‌বী এই সময়ে রামমোহনের ইংরেজী লেখা কিছু কিছু মার্জ্জিত করিয়া দিতেন, এবং ডিগ্‌বীর নিকট হইতে ইংলণ্ডে প্রকাশিত পত্রিকাদি লইয়া রামমোহন রায় পাঠ করিতেন, ইহা সত্য। কিন্তু ডিগ্‌বীর সহিত রামমোহনের পরিচয় ঘটে ১৮০৫ সালে। দেখা যায়, তাহার পূর্ব্বেই রামমোহন স্বীয় 'তুহ্‌ফৎ' গ্রন্থে (*Tuhfat-ul-Muwahhidin*, ১৮০৩ কিংবা ১৮০৪ সালে প্রকাশিত) ফরাসী বিপ্লবের নেতৃবর্গের চিন্তার সহিত পরিচিত।[৪৩] এত বিষয়ের জ্ঞান কখনও একটি বিশিষ্ট জ্ঞানকেন্দ্রের সহিত যোগ না থাকিলে লাভ করা সম্ভব নহে।

কলিকাতায় তৎকালে পূর্ব্বোক্ত কলেজ এবং এসিয়াটিক সোসাইটি ব্যতীত, য়ুরোপে প্রকাশিত নব নব পুস্তক পাঠ করিবার সুবিধার জন্য সাধারণ পুস্তকাগার (Public Library) এবং সার্কুলেটিং লাইব্রেরিও (Circulating Library) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[৪৪] বস্তুতঃ যে দিক দিয়াই বিবেচনা করা যাক্‌, তৎকালীন কলিকাতায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নত ভাবে আলোচনা করিবার যত রূপ সুবিধা ছিল, রামমোহন রায় যে সাগ্রহে তাহার সমুদয় সুবিধার সম্পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। সত্য বটে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কেবল নবাগত ইংরেজ রাজপুরুষগণের শিক্ষার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; বাহিরের লোকে সহজে ঐ কলেজের সহিত কোনও সংশ্রবে আসিতে পারিত না। কিন্তু রামমোহন রায় স্বীয় চেষ্টার দ্বারা (সম্ভবতঃ উডফোর্ড, ডিগ্‌বী প্রভৃতি সিভিলিয়ানগণের সাহায্যে) ঐ কলেজের সহিত যোগ রক্ষা করিতেন। যখন তিনি কোম্পানীর কার্য্যসূত্রে কলিকাতার বাহিরে চলিয়া যাইতেন, তখনও ডিগ্‌বী তাঁহাকে এ-বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকিবেন।

পাঠক মনে রাখিবেন যে এই কলেজ প্রভৃতির দ্বারা কলিকাতার বিদ্বজ্জনসমাজে জ্ঞানালোক কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইল বটে; কিন্তু দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে কোম্পানী এ সময়ে কিছুই করেন নাই; করিতে ইচ্ছুকও ছিলেন না।

অতঃপর আমরা কলিকাতার ইংরেজী স্কুলগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সেগুলিও কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নহে; ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল।

৮

কলিকাতায় য়ুরোপীয়গণের দ্বারা স্থাপিত স্কুল

অষ্টাদশ শতাব্দীতে (রামমোহন রায়ের জন্মেরও পূর্ব্ব হইতে) কলিকাতায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ইংরেজী স্কুল বর্ত্তমান ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন কলিকাতা নগরী স্থাপিত হয়, তখন হইতে আরম্ভ করিয়া কিছুকাল পর্য্যন্ত কলিকাতা প্রধানতঃ ইংরেজ, য়ুরেশীয়, পোর্ত্তুগীজ, আর্ম্মেনিয়ান, ইহুদী প্রভৃতির নগর ছিল; অর্থাৎ ইহারা সংখ্যায় হিন্দুগণ অপেক্ষা অধিক না হইলেও ইহারাই কলিকাতার সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ও প্রতিপত্তিশালী অধিবাসী ছিলেন। সে সময় হইতেই এই সকল অধিবাসীর সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য য়ুরোপীয়, য়ুরেশীয় ও আর্ম্মেনিয়ানদিগের দ্বারা পরিচালিত অনেকগুলি ইংরেজী স্কুলের সৃষ্টি হয়।

১৭৫৯ সালে স্থাপিত কিয়ারন্তাণ্ডারের মিশন স্কুলের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তখনও কলিকাতায় সুপ্রীম্ কোর্ট স্থাপিত হয় নাই। এই কোর্ট স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে কোম্পানীর সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার ও কোম্পানীর চাকরী করিবার প্রয়োজনে দেশীয় লোকেরা যে প্রকার ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতেন, তাহা অতি কদর্য্য; এবং তাহা শিখাইবার জন্ত যে সকল স্কুল ছিল, তাহা অতি নিকৃষ্ট। আগামী প্রস্তাবে সে সকল দেশীয় স্কুলের বর্ণনা করা যাইবে। কিন্তু ১৭৭৪ সালে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইবার পর সেই কোর্টের নানা কার্য্যে নিযুক্ত করিবার আশায় অনেক সম্রান্ত দেশীয় ভদ্রলোক নিজ নিজ পুত্রগণকে উন্নত প্রণালীতে ইংরেজী শিক্ষা দিতে উৎসুক হইলেন, এবং য়ুরোপীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে ক্রমে দেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত শ্রেষ্ঠ ইংরেজী স্কুলেরও উদয় হইতে লাগিল।

যাহা হউক, বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা য়ুরোপীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলির বিষয়েই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আনুমানিক ১৭৮০ সালে হজেস্ (Hodges) নামক এক জন ইংরেজ আর্মেনিয়ান চর্চ্চের নিকটে একটি স্কুল স্থাপন করেন। ঐ সময়েই চিৎপুরের পুলের অপর পারে আর একটি বোর্ডিং স্কুল স্থাপিত হয়। তাহাতে কেবল লিখন পঠন ও গণিত শিক্ষা দেওয়া হইত; তাহার জন্তই প্রত্যেক বোর্ডারের নিকট হইতে মাসে ৫০৲ ফি লওয়া হইত। ১৭৮১ সালে গ্রিফিথ (Griffith) নামক এক ব্যক্তি বৈঠকখানা অঞ্চলে ঐরূপ আর একটি বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করেন। ১৮০০ সালে আর্চ্চার (Archer) নামে এক সাহেব একটি স্কুল স্থাপন করিলেন। তত দিনে এইরূপ স্কুলের প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এটিতে এত ছাত্র হইল যে ইহার সফলতা দর্শনে Farrell, Drummond, Halifax, Lindstedt, Draper, Canning, Sherbourne, Aratoon Peters, Hutteman প্রভৃতি আরও অনেক য়ুরোপীয় ও আর্মেনিয়ান এক একটি স্কুল খুলিয়া বসিতে আরম্ভ করিলেন। সবগুলিই বেশ চলিতে লাগিল। ডিরোজিওর চরিতাখ্যায়ক টমাস এডোয়ার্ড্স্ সাহেব (Thomas Edwards) ইহার মধ্যে তিনটি স্কুলের বিশেষ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

এডোয়ার্ডস্-বর্ণিত প্রথম বিদ্যালয়টির নাম 'ধর্ম্মতলা একাডেমী' (Dhurumtala Academy)। ধর্ম্মতলা রোডে (যেখানে অল্পকাল পূর্ব্বেও হার্ট (Hart) সাহেবের আস্তাবল অবস্থিত ছিল, তাহার পশ্চিমে) স্কটলণ্ড-নিবাসী ডেভিড ড্রমণ্ড (David Drummond) নামক এক জন শিক্ষক ঐ একাডেমী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্কুলই এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট স্কুলগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। ইহাতে য়ুরোপীয়, য়ুরেশীয় ও দেশীয়, সকল জাতির ছাত্রই পাঠ করিত। ড্রমণ্ড সাহেব স্বভাব-কবি ও তত্ত্বালোচনা-প্রিয় মানুষ ছিলেন। সম্ভবতঃ মতের স্বাধীনতার জন্ত তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়া দারিদ্র্য বরণ করেন। ছাত্র-বেতনই তাঁহার জীবিকা ছিল। এই ড্রমণ্ডের ছাত্রগণের মধ্যে ডিরোজিওই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ হন। আমরা পরে ডিরোজিওর জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ডিরোজিরও মধ্যে অল্পবয়স হইতেই যে কবিত্বশক্তি, তত্ত্বালোচনাপ্রিয়তা ও স্বাধীনচিন্ততা প্রকাশিত হয়, সম্ভবতঃ ড্রমণ্ড সাহেবের প্রভাবই তাহার মূল কারণ। অনেকের বিশ্বাস যে তিনিই ডিরোজিওকে স্কটলণ্ড-নিবাসী নাস্তিক দার্শনিক ডেভিড্ হিউমের (David Hume) গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে প্রবৃত্ত করেন, এবং এই সূত্রে উত্তর কালে হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে হিউমের নাস্তিক মতাবলী প্রসার লাভ করে।

ড্রমণ্ড সাহেবই তৎকালে কলিকাতায় স্কুলের ছাত্রগণের বার্ষিক পরীক্ষা লওয়ার প্রথাটি প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু তখনকার বার্ষিক পরীক্ষা এখনকার মত ছিল না। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণের, পৃষ্ঠপোষকগণের ও ছাত্রদের অভিভাবকগণের একটি বৃহৎ প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া, তাহার সম্মুখে ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ করা ও তাহাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করা হইত। আমরা রামমোহন রায়ের বিদ্যালয়ের আলোচনা করিবার সময় এই প্রথার পরিচয় প্রাপ্ত হইব।

এডোয়ার্ড্‌স্‌-বর্ণিত দ্বিতীয় বিদ্যালয়, শারবোর্ণ (Sherbourne) সাহেবের স্কুল। চিৎপুর রোডের যে অঞ্চলে রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ এবং যোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের বাড়ী অবস্থিত ছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী একটি গৃহে শারবোর্ণ সাহেবের স্কুলটি বসিত। এই স্কুলটিরও খুব সুনাম হইয়াছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত বংশের অনেক লোক এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। শারবোর্ণ সাহেব য়ুরেশীয় ছিলেন। তাঁহার মাতা ব্রাহ্মণ-কন্যা ছিলেন বলিয়া শারবোর্ণ খুব গর্ব্ব প্রকাশ করিতেন, এবং নিজ ছাত্রদের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য পূজার বার্ষিক পর্য্যন্ত আদায় করিতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর এই স্কুলে এই সকল পুস্তক পাঠ করেন,—Enfield's Spelling, Reading Book, Tooteenama, Universal Letter Writer, Complete Letter Book, এবং Royal English Grammar. উত্তর কালে যখন দ্বারকানাথ প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হন, তখন তিনি বাল্যের গুরু এই শারবোর্ণ সাহেবকে আজীবন পেন্সন প্রদান করিয়াছিলেন।

এডোয়ার্ডস্‌-বর্ণিত তৃতীয় স্কুলটি বৈঠকখানা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। তাহার শিক্ষক ছিলেন হটিম্যান (Hutteman) নামক এক জন ইংরেজ। তিনি নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান ছিলেন; এবং তৎকালে ইংলণ্ডে ভদ্রসন্তানদের মধ্যে যে গ্রীক ও লাটিন ভাষা অধ্যয়ন অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত, তিনি সে সকল ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কিন্তু তিনি এইরূপ গুণসম্পন্ন শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার স্কুল অপেক্ষা বরং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মমতে আস্থাহীন ড্রমণ্ড সাহেবের স্কুলেই অধিক-সংখ্যক ইংরেজ ছাত্র পড়িতে যাইত। ইহার কারণ এই যে, ড্রমণ্ড ছাত্রগণের মধ্যে স্বাধীনচিন্তার শক্তি বিকশিত করিয়া দিতেন, এবং আধুনিক যুগের য়ুরোপীয় চিন্তাশীল লেখকদিগের রচনার সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল; তিনি কেবল শুষ্ক লাটিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষার প্রতি জোর দিতেন না।

এতদ্ব্যতীত, ক্যানিং সাহেবের (Canning) একাডেমীতে হিন্দুসভার প্রতিষ্ঠাতা, সতীদাহ আন্দোলনে রামমোহন রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী, রাজা রাধাকান্ত দেব শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

এই সকল শ্রেষ্ঠ ইংরেজী স্কুলের দ্বারা কলিকাতার ভদ্র হিন্দু সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও ইংরেজী সাহিত্যের চর্চ্চা বেশ প্রসার লাভ করিয়াছিল। সুতরাং রামমোহন রায়ের জীবনী আলোচনা করিবার সময়ে তাঁহার বাল্যকালের কলিকাতাকে জ্ঞানালোকিত নগরী বলিলেই ঠিক হয়; অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত নগরী মনে করিলে অত্যন্ত ভুল হয়।

৯

কলিকাতায় দেশীয়দিগের দ্বারা স্থাপিত ইংরেজী স্কুল; রাজনারায়ণ বসু কৃত বর্ণনা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ১৭৭৪ সালে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপনের পর হইতে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান ভাল করিয়া ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতে আগ্রহান্বিত হইলেন, এবং ক্রমে দেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি ভাল ইংরেজী স্কুলের উদয় হইল। এই ভাল স্কুল-গুলির মধ্যে ১৭৯৩ সালে স্থাপিত ভবানীপুরের 'ইউনিয়ন স্কুল' উল্লেখযোগ্য। এই স্কুলে উত্তর কালে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (Hindoo Patriot) পত্রিকার সম্পাদক প্রসিদ্ধ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ করিয়াছিলেন; এবং বাল্যকালে এক দিন এই স্কুল দেখিতে গিয়াই অক্ষয়কুমার দত্তের মনে ইংরেজী পড়িবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছিল।

কিন্তু দেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত এই শ্রেণীর কোনও ভাল স্কুল স্থাপিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে দেশে অন্য এক প্রকার ইংরেজী স্কুল চলিতেছিল। এই স্কুলগুলিতে প্রধানতঃ কেনাবেচার ক্ষেত্রে ইংরেজদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইতে, এবং ইংরেজ সওদাগরদের অফিসে হিসাব রাখিতে ও চিঠিপত্র লিখিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। সে শিক্ষাদানের প্রণালী অতি অদ্ভুত ছিল। সে সময়ে যে কেহ অনেক ইংরেজী শব্দ জানিত,

সে-ই এক জন মহা শিক্ষক বলিয়া পরিগণিত হইল। আনন্দীরাম দাস নামক এক ব্যক্তি ইংরেজী ভাষা কিছু কিছু জানিতেন। তাঁহার কাছে সারাদিন ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকিয়া ইংরেজী ভাষা-শিক্ষার্থী ছাত্রেরা দিনে পাঁচটি কি ছয়টি মাত্র ইংরেজী শব্দ শিক্ষা করিত; তাহাতেই তাহারা কৃতার্থ বোধ করিত। রামরাম মিশ্র ও তাঁহার শিষ্য রামনারায়ণ মিশ্র তৎকালে ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা ইংরেজী শিখাইবার জন্য একটি স্কুল খুলিলেন, তাহার ছাত্র-বেতন মাসে ৪৲ হইতে ১৬৲ পর্য্যন্ত ছিল!

তৎকালীন নানা কাগজপত্রে এই শ্রেণীর অনেকগুলি স্কুলের নাম পাওয়া যায়; যথা—রামমোহন নাপিতের স্কুল, কৃষ্ণমোহন বসুর স্কুল, ক্ষেম বসুর স্কুল, ভুবন দত্তের স্কুল, শিবু দত্তের স্কুল প্রভৃতি।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ১৮৭৩ সালের ২৩শে মার্চ্চ (১৭৯৪ শকের ১১ই চৈত্র) তারিখে কলিকাতায় "জাতীয় সভার" একটি অধিবেশনে, "সেকাল আর একাল" বিষয়ে একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। পরে সে প্রবন্ধ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। সেই পুস্তকে 'সেকালে'র (অর্থাৎ ইংরেজের আমলের আরম্ভ হইতে হিন্দু কলেজ স্থাপনের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের) শিক্ষার অবস্থার ও সামাজিক রীতিনীতির যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইতেছে।

"সেকালে সাহেবেরা অর্দ্ধেক হিন্দু ছিলেন। তখন বিলাতে যাতায়াতের এমন সুবিধা ছিল না। যাহারা এখানে আসিতেন, তাঁহাদের সর্ব্বদা বাটী যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। তাঁহারা অতি অল্প লোকই এখানে থাকিতেন: সুতরাং এখানকার লোকদিগের সহিত তাঁহারা অনেক পরিমাণে এ-দেশীয় আচার ব্যবহার পালন করিতেন। তখন সকাল বিকাল কাছারি হইত, মধ্যাহ্ন কালে সকলে বিশ্রাম করিত। মধ্যাহ্ন কালে কলিকাতা দ্বিপ্রহরা রজনীর ন্যায় নিস্তব্ধ হইত। তখনকার সাহেবেরা পান খেতেন, আলবোলা ফুঁকতেন, বাইনাচ দিতেন, ও হুলি খেলতেন। ষ্টুয়ার্ট নামে এক জন প্রধান সৈনিক সাহেব ছিলেন (৪৫)। হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ছিল। তজ্জন্য অন্যান্য সাহেবেরা তাঁহাকে 'হিন্দু ষ্টুয়ার্ট' বলিয়া ডাকিত। তাঁহার বাটীতে শালগ্রাম শিলা ছিল। তিনি প্রত্যহ পূজারী ব্রাহ্মণের দ্বারা তাহার পূজা করাইতেন। বাল্যকালে শুনিতাম, কালীঘাটের কালীর মন্দিরে প্রথম কোম্পানীর পূজা হইয়া, তৎপরে অন্যান্য লোকের পূজা হইত। ইহা সত্য না-হইতে পারে (৪৬), কিন্তু ইহা দ্বারা প্রতীত হইত যে তৎকালের সাহেবেরা বাঙ্গালীদের সহিত এত দূর ঘনিষ্ঠতা করিতেন যে তাহাদিগের ধর্ম্মের পর্য্যন্ত অনুমোদন করিতেন। এ-কালেও (৪৭) গবর্ণর-জেনেরল লর্ড এলেনবরা সাহেব বাহাদুর আফগানিস্থানের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় বৃন্দাবন মথুরা প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান দেবালয়ে দান করিয়া আসিয়াছিলেন।...রাজা সর্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর পূজার সময় সাহেবদিগকে আহারের নিমন্ত্রণ করিতেন বলিয়া অন্যান্য হিন্দুগণ তাঁহার উপর বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন।

সেকালের সাহেবেরা আমলাদের উপর এমন সদয় ছিলেন যে, শুনা গিয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের দেওয়ানদের বাটীতে গিয়া তাঁহাদের ছেলেদিগকে গাড়ুর উপরে বসাইয়া আদর করিতেন ও চন্দ্রপুলি খাইতেন। তাঁহারা অন্যান্য আমলাদের বাসায়ও যাইয়া, কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিতেন। এখন সেকাল গিয়াছে।

সেকালের গুরুমহাশয়দিগের শিক্ষাপ্রণালী উন্নত ছিল না, এবং তাঁহাদের অবলম্বিত ছাত্রদিগের দণ্ডের বিধানটি বড় কঠোর ছিল। 'নাড়ুগোপাল' অর্থাৎ গাড়ু গাড়িয়া বসাইয়া হাতে প্রকাণ্ড ইষ্টক অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত রাখানো, বিছুটি গায়ে দেওয়া, ইত্যাদি অনেক প্রকার নির্দ্দয় দণ্ড প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। পাঁচ বৎসর বয়স হইতে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তালপাতে, তার পর পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কলার পাতে তার পর কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাগজে লেখা হইত। সামান্য অঙ্ক কষিতে, সামান্য পত্র লিখিতে ও 'গুরুদক্ষিণা' ও 'দাতা কর্ণ' নামক পুস্তক পড়িতে সমর্থ করা গুরুমহাশয়দিগের শিক্ষার শেষ সীমা ছিল।

গুরুমহাশয়ের পর আখনজীর (৪৮) বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। মনে করুন হিন্দুর বাটীর একটি ঘরে মুসলমান শিক্ষকের বাস। তিনি বৃহদাকার বদনা ও স্তূপাকার পেঁয়াজ লইয়া বসিয়া আছেন। সাগ্‌রেদ্‌রা নিয়ত বশবর্ত্তী। চাকরের দ্বারা জল আনয়ন করিয়া লওয়া আখনজীর মনঃপূত হইত না; তাঁহার সাগ্‌রেদ্‌দিগকে কলসী লইয়া জল আনিয়া দিতে হইত। তখন পারসী পড়ার বড় ধুম। তখন পারসী পড়াই এতদ্দেশীয়দিগের উচ্চতম শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইত। এই পারসী ভাষা সকল আদালতে চলিত ছিল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহার ব্যবহার আদালতে রহিত হয়।

ইংরাজের আমলের প্রথমে আমলাদিগের উপর অনেক কর্ম্মের ভার থাকিত। তাঁহারা অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন। এক এক জন দেওয়ান বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তখন ঐ সকল পদ এক প্রকার বংশপরম্পরাগত ছিল। এক জন দেওয়ানের মৃত্যু হইলে প্রায়ই তাঁহার সন্তান অথবা অন্য কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় লোক দেওয়ান হইত। শুনা আছে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামবাসী এক দেওয়ানের মৃত্যুর পর তাঁহার সপ্তদশ বৎসর বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাণের মাকড়ী ও হাতের বালা(৪৯) খুলিয়া দেওয়ানী করিতে গেলেন।

সে সময়ে উৎকোচ লইবার বাড়াবাড়ি ছিল। শুদ্ধ বাঙালীরা যে উৎকোচ লইতেন এমন নহে, বড় বড় সাহেবেরাও উৎকোচ লইতেন। এখন সেরূপ নাই।

তখন স্কুলমাষ্টারদিগের বেশভূষা অদ্ভুত, ইংরাজী উচ্চারণ কদাকার, শিক্ষাপ্রণালী অপকৃষ্ট ছিল। রাজা সর্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে এক জন ইংরাজী পড়াইতেন। তিনি যখন পড়াইতে আসিতেন, তখন জরির জুতা ও মোতির মালা পরিয়া আসিতেন। এখন একবার মনে ক'রে দেখুন দেখি, প্রেসিডেন্সি কালেজের এক জন বাঙ্গালী অধ্যাপক মোতির মালা গলায় ও জরির জুতা পায় দিয়া বসিয়া পড়াইতেছেন,—কি চমৎকার বোধ হয়!

সর্ব্বপ্রথম লোকের ইংরাজী পড়িতে হইলে টামস্ ডিস্(৫০)প্রণীত 'স্পেলিং বুক', 'স্কুল মাষ্টর' 'কামরূপা' ও 'তুতিনামা' এই সকল পুস্তক পাঠ করিতে হইত। 'স্কুল মাষ্টর' পুস্তকে সকলই ছিল, গ্রামার, স্পেলিং ও রীডর। 'কামরূপা'তে এক রাজপুত্রের গল্প লিখিত ছিল। 'তুতিনামা' ঐ নামের পারসিক পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ। কেহ যদি অত্যন্ত অধিক পড়িতেন, তিনি 'আরবি নাইট্‌' পড়িতেন। যিনি 'রয়াল গ্রামার' পড়িতেন, লোকে মনে করিত, তাঁহার মত বিদ্বান আর কেহ নাই। Grammar, Logic ও Rhetoric, অর্থাৎ ব্যাকরণ, ন্যায় ও অলঙ্কার—এই তিন বিষয়ে তখন কতকগুলি উত্তম পুস্তক রচিত হইয়াছিল; তাহাদের নাম Port Royal Grammar, Port Royal Logic, ইত্যাদি। লোকে বলিত 'রয়াল গ্রামার ময়াল সাপ'; যেমন ময়াল সাপ বৃহৎ সাপ, তেমনি রয়াল গ্রামার পড়া অনেক বিদ্যার কর্ম্ম।

তখন স্পেলিংএর প্রতি লোকের বড় মনোযোগ ছিল। বিবাহ-সভায় এই বিষয়ে বড় পীড়াপীড়ি হইত। কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন, 'How do you spell *Nebuchadnezzar*?' কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন, 'How do you spell *Xerxes*?' ঐ সকল শব্দ, ও *Xenophon*, *Kamtschatka* প্রভৃতি শব্দের বানান জিজ্ঞাসা দ্বারা লোকের বিদ্যার পরীক্ষা হইত।

তখন ঘোষানোর রীতি ছিল। ঘোষানোর অর্থ পয়ার ছন্দে গ্রথিত, কোন দ্রব্যশ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত দ্রব্যের ইংরাজী নাম সুর করিয়া মুখস্থ বলা। আপনি এক স্কুল দেখিতে গেলেন। স্কুলমাষ্টর আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ঘোষাব? গ্যার্ডেন (garden) ঘোষাব, না, স্পাইস্ (spice) ঘোষাব?' ইহার অর্থ, "ছাত্রদের দ্বারা উদ্যানজাত সকল দ্রব্যের নাম মুখস্থ বলাব, না, সকল মসলার নাম মুখস্থ বলাব?' যদি স্থির হইল 'গ্যার্ডেন ঘোষাও,' তবে সর্দ্দার পোড়ো বলিল—'পম্‌কিন্ (pumpkin) লাউকুমড়ো'; অমনি আর সকলে বলিয়া উঠিল 'পম্‌কিন লাউ কুমড়ো'। সর্দ্দার পোড়ো বলিল, 'কোকোম্বর (cucumber) শসা'; আর সকলে অমনি বলিল, 'কোকোম্বর শসা'। সর্দ্দার পোড়ো বলিল, ব্রিঞ্জেল (brinjal) বার্ত্তাকু'; আর সকলে অমনি বলিল, 'ব্রিঞ্জেল বার্ত্তাকু'। সর্দ্দার পোড়ো বলিল, 'প্লোম্যান (ploughman) চাষা'; আর সকলে অমনি বলিল, 'প্লোম্যান চাষা'। এই সকল শব্দগুলি একত্র করিলে একটি কবিতা উৎপন্ন হয়,—

> পম্‌কিন্ লাউ কুমড়ো, কোকোম্বর শসা।
> ব্রিঞ্জেল বার্ত্তাকু, প্লোম্যান চাষা।

কখন কখন সঙ্গীত আকারে ইংরাজী শব্দের বাঙ্গালা অর্থ বসান হইত। যথা,—

> (খাম্বাজ রাগিণী, তাল ঠুংরি)
> নাই (nigh) কাছে, নিয়র (near) কাছে,
> নিয়রেষ্ট (nearest) অতি কাছে।
> কট (cut) কাট, কট (cot) খাট,
> ফলোয়িং (following) পাছে।

এ ছাড়া আবার 'আরবি নাইটের পালা' হইত; অর্থাৎ তবলা ঢোলক মন্দিরা লইয়া ইংরাজী পয়ারে লিখিত আরবিয়ান নাইটের গল্প বাসায় বাসায় গান করিয়া বেড়ান হইত,—

> The chronicles of the Sassanians
> That extended their dominions,

এই রূপ পয়ারে উল্লিখিত 'আরবি নাইটের পালা' রচিত হইত।

ইংরাজদিগের যে সকল সরকার থাকিত, তাহাদের ভাষা ও কথোপকথন আরও চমৎকার ছিল। একজন সাহেব তাঁহার সরকারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সরকার বলিল, 'মাষ্টর ক্যান্ লিব, মাষ্টর ক্যান ডাই', (Master can live, master can die,) অর্থাৎ মনিব আমাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন অথবা মারিয়া ফেলিতে পারেন। সাহেব.—'What! Master can die?' এই কথা বলিয়া সরকারকে মারিবার জন্য লাঠি উঁচাইলেন। সরকারের তখন মনে পড়িল, 'ডাই' শব্দের অন্য অর্থ আছে। তখন অঙ্গুলি দ্বারা আপনাকে দেখাইয়া বলিল 'ডাই মি' (Die me,) অর্থাৎ আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারেন। 'ইফ মাষ্টর ডাই, দেন আই ডাই, মাই কো ডাই, মাই ব্লাক-ষ্টোন্ ডাই, মাই ফোরটীন্ জেনেরশন ডাই।' (If master die, then I die, my cow die, my black stone die, my fourteen generation die,) অর্থাৎ যদ্যপি মনিব মরেন, তবে আমি মরিব, আমার 'কো' অর্থাৎ গরু মরিবে, আমার 'ব্লাক-ষ্টোন' অর্থাৎ বাড়ীর শালগ্রাম ঠাকুর মরিবেন; আমার 'ফোরটীন জেনেরশন' অর্থাৎ চোদ্দপুরুষ মরিবে।

এই দেশে 'কাউ' শব্দের ভাগ্য তিন বার পরিবর্ত্তিত হয়। প্রথমে উহার উচ্চারণ 'কো' ছিল; পরে 'কৌ' হয়; তাহার পর এক্ষণে 'কাউ' হইয়াছে।"

মন্তব্য

৩৪ Cowell, Lecture II.

৩৫ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংবাদপত্রে সেকালের

কথা', প্রথম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ২৭ পৃঃ বলেন, ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। "*The Chronology of Modern India for Four Hundred Years from the close of the Fifteenth Century*, A. D. 1495—1894. James Burgess, C. I. E. LL. D.—John Grant, Edinburgh, 1913" পুস্তকের p. 248এ আছে, ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর। অতঃপর এই শেষোক্ত পুস্তককে 'Burgess' বলিয়া উল্লেখ করা হইবে।

৩৬ Burgess, p. 278.

৩৭ George Smith, p 194.

৩৮ আষাঢ়ের প্রবাসীতে 'ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্ধকার যুগ' প্রবন্ধে ১২ সংখ্যক মন্তব্য দেখুন।

৩৯ ঐ প্রবন্ধের ৫ম প্রস্তাবে।

৪০ *Father of Modern India*. Commemoration Volume of the Rammohun Roy Centenary Celebrations, 1933; Rammohun Roy Centenary Committee, 210-6 Cornwallis St. Calcutta, পুস্তকের Part II, 422, 423 পৃষ্ঠায় Sir Deva Prasad Sarvadhikaryর বক্তৃতা দ্রষ্টব্য। অতঃপর এই পুস্তককে 'F. M. I.' এই ভাবে নির্দেশ করা হইবে।

৪১ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৩৪১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী লইবার পূর্ব্বে রামমোহন রায় বহু বার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সেই সময়েই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা।—F. M. I. পুস্তকের II, 30, 31 পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

৪২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার উক্ত প্রবন্ধ, এবং December 1933 সংখ্যার *Calcutta Review* পত্রিকার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪৩ F. M. I. পুস্তকের II. 99 পৃষ্ঠায় আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের উক্তি দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ('বঙ্গশ্রী' পত্রিকার পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে) রামমোহনের সহিত Digbyর প্রথম পরিচয় ১৮০১ সালেও হইতে পারে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আরও বলেন যে French Revolutionএর নেতৃবর্গের মূল গ্রন্থ বা তাহার অনুবাদ তৎকালে কলিকাতায় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প। আমাদের সেরূপ মনে হয় না। যাহা হউক, যদি ধরিয়া লওয়া যায়, রামমোহন রায় মূল গ্রন্থাদির সহিত পরিচিত হন নাই, অন্যের গ্রন্থ পাঠের দ্বারা মূল গ্রন্থে প্রকাশিত মতাদির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন,—তথাপি বলিতে হয়, এরূপ পরিচয় লাভও কলিকাতার ন্যায় বিশিষ্ট জ্ঞানকেন্দ্রেই সম্ভব।

৪৪ Binay Krishna Deb, p. 120.

৪৫ Major General Charles Stuart; ১৮২৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ ইঁহার মৃত্যু হয়। কলিকাতার South Park Street Cemeteryতে ইঁহার কবর আছে. তাহার আকৃতি হিন্দু মন্দিরের ন্যায়। ইনি এ দেশীয়া একজন নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।—' প্রবন্ধ লেখক]

৪৬ ইহা সত্য। "Last week a deputation from the Government went in procession to Kalighat, and made a thank offering to this goddess of the Hindus, in the name of the Company, for the success which the English have lately obtained in this country. Five thousand Rupees were offered. Several thousand natives witnessed the English presenting their offerings to this idol. We have been much grieved at this act, in which the natives exult over us.—*Life and Times of Carey, Marshman and Ward* by Marshman, Vol. 1; quoted in Raja Binay Krishna Deb's *Early History of Calcutta*, p. 80.—প্রবন্ধ লেখক

৪৭ ১৮৪২ সালে।—প্রবন্ধ লেখক

৪৮ অর্থাৎ, ফারসী শিক্ষকের।—প্রবন্ধ লেখক

৪৯ তখনকার দিনে ছেলেরা অনেক বয়স পর্য্যন্ত হাতে বালা ও কানে মাকড়ি পরিত। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত (২য় সংস্করণ) ৬৮ পৃষ্ঠাতে দেখা যায়, তিনি ঐ সকল পরিয়া বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন।—প্রবন্ধ লেখক

৫০ Thomas Dyche.—প্রবন্ধ লেখক

বীরভূমের সাঁওতাল

শ্রীসাগরময় ঘোষ

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'পালামৌ ভ্রমণে'র এক স্থানে লিখিয়াছেন, 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'। পার্ব্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণকালে এক দল বন্য সাঁওতাল নর-নারীর সহজ সরল আনন্দপূর্ণ জীবনধারায় মুগ্ধ হইয়া তিনি যে-কথা লিখিয়াছিলেন তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলাম শান্তিনিকেতনের প্রতিবেশী সাঁওতালদের জীবনের পরিচয় পাইয়া।

মুক্ত প্রাঙ্গণে নীল আকাশের তলায় আপন সন্তানের মত পৃথিবী যাহাদের কোল দিয়াছেন, সেই সাঁওতাল জাতিকে আমরা অসভ্য বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিতে পারি, কিন্তু আকাশ, বাতাস ও বনস্পতির মধ্যে যেখানে ধরিত্রীর প্রাণের লীলা নানা অপরূপ ভঙ্গীতে দিনে রাত্রে ঋতুতে ঋতুতে রূপ-বৈচিত্র্যে নিরন্তর নূতন হইয়া উঠে সেখানে এই প্রকৃতির প্রাণের সঙ্গে নিজেদের প্রাণকে মিলাইয়া দিয়া যাহারা মানুষ, তাহাদের আড়ম্বরহীন অনাবিল জীবনে সভ্যতার কৃত্রিমতা, হিংসা, দ্বেষ ও কলুষের স্পর্শ লাগে নাই, তাই তাহারা অসভ্য হইয়াও সৌভাগ্যবান। তাহারা যেখানে বাস করে সেখানে বন তাদের ছায়া দেয় ফলফুল দেয়, আকাশ দেয় মুক্ত উদার বায়ু; তাহাদের প্রতিদিনের সমস্ত কর্ম্ম, অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে প্রকৃতির প্রাণময় সম্বন্ধ।

শান্তিনিকেতনের পাশ দিয়া যে রাঙা মাটির রাস্তা পশ্চিম দিগন্তের সাঁওতাল-পল্লীতে গিয়া মিলিয়াছে, সকালবেলা সাঁওতাল মেয়েরা সে-পথ দিয়া দলে দলে কাজ করিতে যায়। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপের মধ্যে যখন গুরুতর পরিশ্রমের কাজে রত থাকে তখনও তাহাদের মুখে প্রসন্নতা ও সরল হাসি ম্লান হয় না। এই হাসির মধ্যে এমন একটি স্নিগ্ধতা আছে যাহা দেখিয়া দর্শকের মনে সহজেই ইহাদের প্রতি বিশ্বাস ও প্রীতির উদ্রেক হয়। সন্ধ্যাবেলায় সহচরীদের গলা জড়াইয়া, হাসি গান আর কলকণ্ঠের কাকলীতে পথ মুখরিত করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসে, প্রাণের দুর্দ্দমনীয় আনন্দবেগ যেন ইহারা ধরিয়া রাখিতে পারে না। সাধারণ দৃষ্টিতে ইহাদের রূপসী বলা চলে না; কিন্তু ইহাদের শ্রমপুষ্ট দেহের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে এমন একটি সংযত শ্রী রহিয়াছে যাহা চক্ষুকে তৃপ্ত করে। ফুল ইহাদের অত্যন্ত প্রিয়, পথের ধারে কোথাও রক্তিম কিংশুক-কলি অথবা প্রস্ফুটিত শালমঞ্জরী দেখিলে চঞ্চল হইয়া ইহারা ফুলের জন্য কাড়াকাড়ি করিতে থাকে। সারাদিনের কঠোর শ্রম, বা দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ কিছুই ইহাদের সহজ-উচ্ছ্বসিত আনন্দধারার গতিরোধ করিতে পারে না।

বাংলা দেশে একমাত্র বীরভূম জেলাতেই সাঁওতালদের আধিক্য দেখা যায়। অধিকাংশেরই আদি বাসস্থান পালামৌ ও রামগড়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষের তাড়নায় বহু সহস্র সাঁওতাল বীরভূমে চলিয়া আসে। ইহাদের প্রকৃতি এই যে ইহারা কোন এক জায়গায় সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বেশী দিন থাকিতে পারে না। ইহারা ঘর বাঁধে, আবার ঘর ভাঙিয়া দিয়া চলিয়া যায়। ইহাদের একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহারা খোলা মাঠে, উঁচু জায়গায় অল্প দুই-এক ঘর প্রতিবেশী লইয়া ছোট ছোট মাটির কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে থাকে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে অন্যত্র গিয়া আবার উপনিবেশ স্থাপন করে। আমাদের বাঙালীদের মত তাহারা বহু লোক অল্প জায়গায় ঘেঁষাঘেষি করিয়া বাস করিতে ভালবাসে না। ইহাদের গ্রামগুলি হাড়ী ডোম ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর অধ্যুষিত গ্রাম অপেক্ষা পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর। বীরভূম জেলার পশ্চিমাংশের মাটি প্রস্তর- ও কঙ্কর- ময়। এই ঢালু ভূমির উঁচু জায়গাগুলি চাষের পক্ষে অনুপযোগী। দুর্ভিক্ষ-

পীড়িত সাঁওতালরা তাহাদের পুরাতন আবাস ছাড়িয়া দু-মুঠা অন্নের অন্বেষণে আসিয়াছে; জমিদারগণ তাহাদের দুরবস্থার সুযোগ লইয়া এই অনাবাদী ও অনুর্ব্বর জমিগুলি চাষ করাইয়া লয়। সেজন্ত যে-পরিমাণ কঠোর পরিশ্রম করিতে হয় তাহার তুলনায় দিনমজুরি ইহারা পায় যৎসামান্ত, জমির উপর কোনও স্বত্ব লাভ করিতে পারে না। চাষের উপযোগী হইলেই জমিদারেরা জমি বেদখল করিয়া খাস করিয়া লয়।

সাঁওতালদের মধ্যে উৎসব-অনুষ্ঠানের অন্ত নাই। জন্মের পর প্রথম সংস্কার দ্বারা সাঁওতাল-শিশু পরিবারভুক্ত হয়। পিতা শিশুর মাথায় হাত রাখিয়া পৈত্রিক দেবতাদিগকে স্মরণ করে। দেবতাদিগের নিকট শিশুকে নিজ ঔরসজাত বলিয়া স্বীকার করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার পরের অনুষ্ঠানের নাম "নার্থা"। কন্তা জন্মিলে ৩ দিনের দিন এবং পুত্র হইলে ৫ দিনের দিন এই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই অনুষ্ঠানে প্রসূতি শুচিতা লাভ করিয়া পুনরায় গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারে। উৎসবে গ্রামের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা একত্র হইলে ক্ষৌরকর্ম্মের দ্বারা সকলে শুচি হয়। তাহার পর স্নান সমাপনান্তে নিমের পাতা ও আতপ চাউল সিদ্ধ করিয়া ফেন-ভাত খায়। উৎসবে তাড়ির আয়োজন না থাকিলে সে-উৎসব সাঁওতালদের কাছে ব্যর্থ। একটি মাটির কলসীতে তাড়ি রাখা হয়, প্রতিবেশীরা শিশুর চারি দিকে বসিয়া তাড়ি ও নিমের জল পান করে।

নবজাত শিশুটি যদি পুত্র হয়, তবে পিতামহের নামের সহিত মিল রাখিয়া এবং মেয়ে হইলে মাতামহীর নামের সহিত মিল রাখিয়া নাম রাখিতে হয়

ইহার পর "ছোটিয়ার উৎসব"। এই উৎসবের সময় সাঁওতাল-শিশু প্রথম তাহার জাতির মধ্যে স্থান লাভ করে। এই অনুষ্ঠান ছাড়া শুধু জন্মের দ্বারা সে সাঁওতাল হইতে পারে না। এই উৎসবের সময় তাহার বাম হাতের কব্জির উপরের দিকে একটি গোল পোড়ায় দাগ দেওয়া হয়। এই দাগ দেওয়ার পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে শিশু দেবতার কোপের পাত্র হয় বলিয়া সাঁওতালরা বিশ্বাস করে।

সব রকম অনুষ্ঠানের মধ্যে সাঁওতালদের বিবাহ-অনুষ্ঠানটি সবচেয়ে বড়। এই উৎসবকে তাহারা আমোদ-আহ্লাদে, জাঁকজমকে, নৃত্যে গানে জীবন্ত করিয়া তোলে। সাধারণতঃ সাঁওতাল যুবকগণের ষোল-সতর বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। বিবাহের বয়স সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। প্রতি গ্রামে একটি করিয়া ঘটক থাকে, তাহারা বরের পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলে, সে তাহার স্ত্রীর অনুমতি লইয়া ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের মধ্যে দেখাশুনার প্রস্তাবে সম্মতি দেয়। সাধারণতঃ কোন মেলা বা উৎসব-অনুষ্ঠানে উভয়ের আলাপ-পরিচয় হয়, এবং পরস্পরের মন জানিবার জন্ত ইহাদের মেলামেশায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ছেলের পছন্দ হইলে তাহার পিতা মেয়েকে কোনও উপহার প্রদান করে। কন্তা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তাহা গ্রহণ করিলে বুঝা যায় যে, সে তাহার পুত্রবধূ হইতে সম্মত আছে। পরে কতকগুলি হলুদে রঙের সূতা একত্র বাঁধিয়া প্রতিবেশীর গৃহে বিতরণ করা হয়। যে-কয় গাছি সূতা একত্রে বাঁধা থাকে তত দিন পরেই বিবাহ হইবে। এই সঙ্কেত বুঝিয়া নিমন্ত্রিতগণ সমাগত হয়। বরযাত্রীরা বিবাহের পূর্ব্বে গ্রামে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহারা নিজেরা চাল ডাল লইয়া যায় ও গ্রামের বাহিরের বৃক্ষমূলে রান্না করে।

গ্রামের বহিরঙ্গণে বরপক্ষীয় সাঁওতাল পুরুষরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। এক হাতে ঢাল, অপর হাতে লাঠি অথবা তরবারি; মাথায় পাগড়ি বাঁধা, তাহাতে ময়ূরপুচ্ছ গোঁজা। উন্মুক্ত দেহের বলিষ্ঠ মাংসপেশীবহুল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দুলাইয়া মাদল ও জগঝম্পর তালে তালে, মাঝে মাঝে হুঙ্কার করিয়া, বীরত্বব্যঞ্জক যুদ্ধের নাচ নাচিতে নাচিতে বরকে লইয়া যখন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন মনে হয় যে আদিম যুগে ইহাদের মধ্যেও কন্তাকে যুদ্ধের দ্বারা জয় করিয়া আনাই প্রথা ছিল। বিবাহ-প্রাঙ্গণে বর ও কন্তাপক্ষের পুরুষদের মধ্যে নানা

সাঁওতাল রমণী সখীকে অলঙ্কার পরাইতেছে
শ্রীশম্ভু সাহা কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ
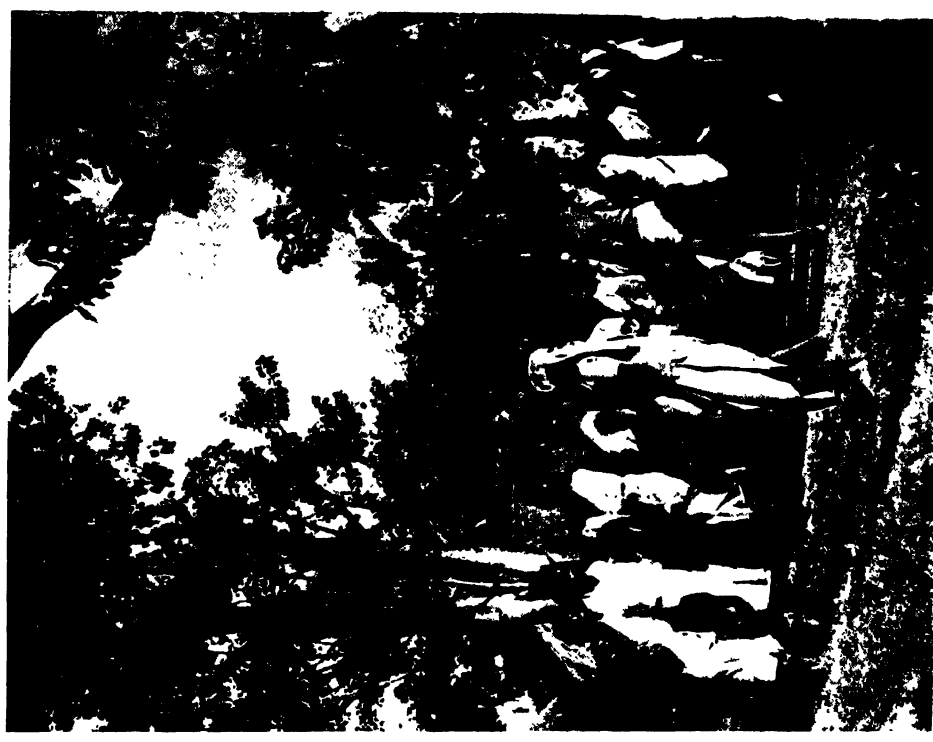
সাঁওতালদের নৃত্যোদ্যম
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ

মেলায় সাঁওতাল রমণী
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ

সাঁওতাল মাতা ও কন্যা
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ

প্রকার শারীরিক শক্তি পরীক্ষার প্রতিযোগিতা চলে এবং কন্যা তাহার সহচরীসহ চারি দিকে গোল হইয়া বসিয়া হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়া এই প্রতিযোগিতায় উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে সকলে সমবেত হইলে বর ও কনেকে সরিষার তেল ও হলুদ মাখান হয় এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের গায়েও হলুদ মাখাইয়া দেওয়া হয়। বর-কনে হলুদ রঙের কাপড় পরিয়া স্নান করে।

বর একটি ডালায় সিঁদুর ও কাপড় লইয়া কনেকে উপহার দেয়, ডালা ঘরে লইয়া গেলে কনে সেই কাপড় পরিয়া তাহাতে বসে। পাত্র তখন কনের ভাইয়ের মাথায় তিন বা পাঁচ হাত কাপড় বাঁধিয়া দেয়; কারণ দুই, চার, ছয় ইত্যাদি জোড় অঙ্ক অমঙ্গলের চিহ্ন। তাহার পর একটি আম্রশাখার দ্বারা কন্যার ভাইয়ের মাথায়

সাঁওতাল রমণী
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত গৃহীত ফোটোগ্রাফ

সাঁওতাল পুরুষ
শ্রীশৈলেশ দেববর্ম্মা কর্ত্তৃক অঙ্কিত

জল ছিটাইয়া দিলে ছোট ভাই কন্যার প্রতিনিধি হইয়া বরের মাথায় জল ছিটাইয়া দেয়। বরপক্ষের পাঁচ জন লোক ডালায় উপবিষ্টা কন্যাকে ডালাসমেত তুলিয়া লইয়া বিবাহ-প্রাঙ্গণে চলিয়া আসে। পূর্ব্বকালে লড়াই করিয়া কন্যাকে কাড়িয়া লইয়া বিবাহ করিত, বর্ত্তমানে এই সব আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেও তাহারই আভাস পাওয়া যায়। কন্যাকে বাহিরে আনা হইলে বর এক জনের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া কন্যার কপালে কনিষ্ঠাঙ্গুলি দিয়া একটি সিঁদুর-টিপ অঙ্কিত করিয়া দেয়; ইহাই তাহাদের বিবাহের প্রধান অঙ্গ।

• বিবাহ-অনুষ্ঠান শেষ হইলে পুনর্ব্বার বর-কনেকে স্নান করাইয়া হাতে হলুদ ও ধানের পুঁটুলি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। শীঘ্র ধানের অঙ্কুর দেখা দিলে কন্যা অচিরে পুত্রবতী হইবে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। আর উহার ভাল অঙ্কুর বাহির না হওয়া বিবাহের পক্ষে অমঙ্গলসূচক। বিবাহের

সাঁওতাল পুরুষ   সাঁওতাল মজুরণী   সাঁওতালদের বাসগৃহ

সময় বরকে ষোল টাকা পণ দিতে হয়; সাঙা করিতে বারো টাকা পণ লাগে। বহুবিবাহের চলন ইহাদের নাই, তবে স্ত্রী পুত্রবতী না হইলে অথবা রুগ্না বা গৃহকর্ম্মে অসমর্থা হইলে কখনও কখনও আবার বিবাহ করিতে দেখা যায়।

সাঁওতালদের সমাজে নারীর অধিকার খর্ব্ব করা হয় নাই। পুরুষদের মত তাহারাও স্বাবলম্বী ও নিজে পরিশ্রম করিয়া রোজগার করে; তাই তাহাদের স্বাধীন চলাফেরার উপর পুরুষের হস্তক্ষেপের অধিকার নাই। স্বামীর চরিত্রে কোন অন্যায় দেখিলে বা তাহার সহিত না বনিলে স্ত্রী অতি সহজেই স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে, কেবল পণের টাকাটা ফিরাইয়া দিতে হয় মাত্র। বিবাহের পূর্ব্বে কোনও সাঁওতাল রমণী চরিত্রভ্রষ্ট হইলে সমাজে তাহা তত দূষণীয় নহে, কিন্তু বিবাহের পর পবিত্রতা রক্ষার প্রতি ইহাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখা যায়।

সাঁওতালরা তাহাদের সমাজের মেয়েদের অতি সম্মানের চক্ষে দেখে। কোন মেয়েকে কোন পুরুষ অপমান বা লাঞ্ছনা করিলে তাহারা হিংস্র ভাবে তাহার প্রতিশোধ লয় এবং তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত। নাচের সময় সাঁওতালেরা মদ্য পান করে বটে, কিন্তু মেয়েদের প্রতি তিলমাত্র অসম্মান প্রকাশ করে না।

সাঁওতাল মেয়েরা অত্যন্ত সৌন্দর্য্যপ্রিয়। ঘরের দেয়াল ও মেঝে, মাটি ও গোবর দিয়া সুন্দর ভাবে লেপন করিয়া তাহাতে আলিপনা অঙ্কিত করিয়া দেয়। নিজেদের পোষাকের মধ্যে লাল রঙের চওড়া পাড় দেওয়া একখানি মোটা শাড়ী; মাথার চুল পিছন দিকে টানিয়া বাঁধা, খোঁপায় নক্সা-করা একটি রূপার গহনা, কানে রূপার দুল। লাল ফুল সাঁওতাল মেয়েদের অত্যন্ত প্রিয়; তাই খোঁপায় রক্তজবা অনেক সময়ই দেখা যায়।

সাঁওতালরা শাল গাছ ভালবাসে বলিয়া শালবনের ধারে বাস করে। বসন্তের আগমনে দক্ষিণ বায়ুর স্পর্শ লাভ করা মাত্র বৃক্ষ পত্রহীন হইয়া পড়ে; আবার সমগ্র বনভূমি নবীন কিশলয়ে সুন্দর হইয়া উঠে। প্রস্ফুটিত শালমঞ্জরীর মৃদু স্নিগ্ধ গন্ধে চারিদিক আমোদিত; নামহীন বনফুলের গন্ধে বাতাস মাতাল; এই সময় শুক্লপক্ষে আকাশে চাঁদ দেখা দিলে চারি দিক হইতে মাদল বাজিয়া উঠে, ইহারা কাজকর্ম্ম ফেলিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত খোলা মাঠে নৃত্য করিয়া কাটায়। অর্দ্ধবৃত্তাকারে গায়ে গায়ে

ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া একত্রে সাঁওতাল তরুণীরা মৃদুমন্দ গতিতে নাচে, কাহারও আলাদা নৃত্যভঙ্গী নাই। মাঝে মাঝে গান করে। সামনে দু-একটি সাঁওতাল পুরুষ বাঁশী ও মাদল বাজাইয়া নৃত্য করিতে থাকে, সে-নৃত্য উচ্ছ্বাসময় মুক্ত ভঙ্গীতে উদ্দাম। মেয়েদের নৃত্যে উন্মত্ততা নাই, আছে সংযত নৃত্যভঙ্গীর শোভন গতিসঞ্চার। প্রেমের ছোটখাট ঘটনা লইয়া ইহাদের গান রচিত,—দুর্ব্বোধ্য তার কথা, একটানা তার সুর। আকাশে চাঁদ, বসন্তের চঞ্চল বাতাস, আর গভীর রাতে দূর হইতে ভাসিয়া-আসা মধুর কণ্ঠের সুরের রেশ মনকে মাতাল করিয়া তোলে।

এক দল সাঁওতাল মজুরণী
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত গৃহীত ফোটোগ্রাফ

বসন্তোৎসবকে সাঁওতালেরা "বাহা" বলে এবং এই উৎসবের কোন নির্দ্দিষ্ট দিন নাই। এই উৎসবের পূর্ব্বে কেহ নবীন ফুল-সাজে সজ্জিত হইতে অথবা ফলমূল ভক্ষণ করিতে পারে না।

সাঁওতালদের ধর্ম্ম বলিতে কিছু নাই, কারণ তাহারা ভগবানে বিশ্বাসী নহে। পৃথিবীর সমগ্র জীবের মঙ্গলের জন্য বিধাতাপুরুষ সকলের অন্তরালে থাকিয়া সকলকে রক্ষা করিতেছেন,—সাঁওতালদের ধারণা ঠিক ইহার বিপরীত। মঙ্গলময় দেবতার পরিবর্ত্তে, তাহারা মনে করে কতকগুলি ধ্বংসকারী ভূত পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়ায়; তাহারা কখনও মানবের উপকার করে না, মানুষের

ক্রীড়ারত এক দল সাঁওতাল শিশু
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত গৃহীত ফোটোগ্রাফ
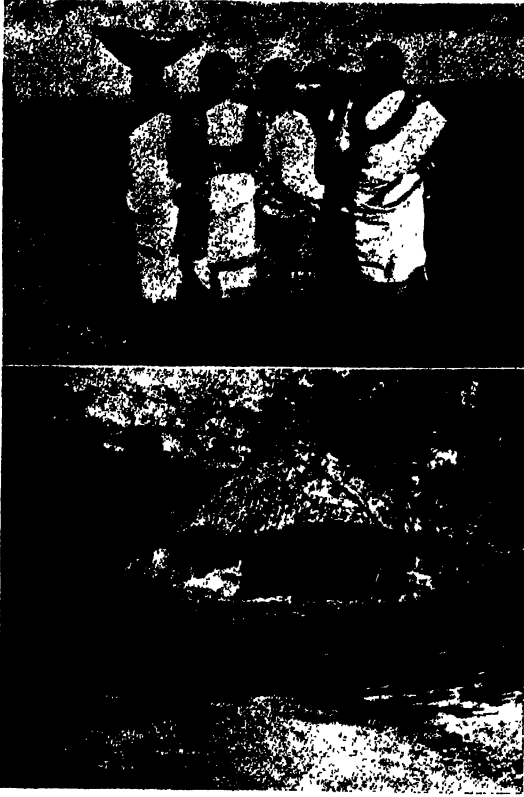
এক দল সাঁওতাল রমণী
সাঁওতালদের কুটির

সর্ব্বনাশ করে। এই ভূতগুলিই শয়তানকে শাস্তি দেয়, রোগ ছড়াইয়া দেয়, দেশে দুর্ভিক্ষ আনে এবং ইহাদের শান্ত করিবার জন্য রক্ত দিয়া পূজা করিতে হয়। ইহাদের উপাস্য ভূতের নাম 'বোঙা'; ভক্তির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া নহে, ভীতিবশতই ইহারা মহাসমারোহে 'বোঙা' পূজা করিয়া থাকে। এই পূজায় ইহারা মুর্গী বলি দেয় এবং পেট ভরিয়া তাড়ি পান করে। অন্য আহার্য্য দ্রব্যের পরিমাণ যথেষ্ট না-হইলেও ইহাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই পেট ভরিয়া তাড়ি খাইতে পারে এমন ব্যবস্থা চাই। উৎসব-শেষে ইহারা বাড়ী গিয়া পরস্পরের গায়ে জল ছিটাইয়া দেয় এবং নিজেদের গ্রামকে আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত করিয়া তোলে।

ভূতের প্রতি ইহাদের যেমন ভয় ওঝার প্রতি ইহাদের তেমনি ভক্তি। অসুখ হইলে ইহারা ডাক্তার ডাকে না, গ্রামের ওঝার হাতে রোগীকে সমর্পণ করে। ওঝা আসিয়া গাছের একখানা পাতায় তেল মাখাইয়া তাহা দেখিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে যে, কোন্ অপদেবতা তাহার রোগীর রক্ত শোষণ করিতেছে। মৃত্যু হইলে হিন্দুদের মতই শব চিতায় আরোহণ করাইয়া মুখাগ্নি করা হয়। পুত্র মাথার খুলির তিনটি টুকরা যত্ন করিয়া রাখিয়া দেয়, এবং পরে দামোদর নদে তাহা নিক্ষেপ করিবার জন্য যাত্রা করে। নিক্ষেপ করিবার সময় হাড়ের টুকরাগুলি মাথায় করিয়া ডুব দেয়, স্রোতের বেগে সেগুলি তলায় চলিয়া যায়। এইরূপেই মৃত ব্যক্তি পূর্ব্বপুরুষের সহিত মিলিত হইতে পারে বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস।

সাঁওতালদের প্রত্যেক পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন ভূত-দেবতা আছে। পরিবারের কর্ত্তা কাহারও নিকট তাহার নাম প্রকাশ করে না। মৃত্যুকালে পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রের কানে কানে গৃহদেবতার নাম বলিয়া যান।

সাঁওতালদের বিশ্বাস যে পূর্ব্বপুরুষদের প্রেতাত্মা মরে না, তাহা গ্রামের নিকটবর্ত্তী শালকুঞ্জে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহাদের দেবতাও শালগাছে বাস করেন। ইহাদের প্রার্থনা সাধারণত সাংসারিক মঙ্গল কামনা করিয়াই হইয়া থাকে, যেমন ঝড়ে যেন চালখানা উড়িয়া না যায়, ছেলেকে যেন বাঘে না খায়, ইত্যাদি। নদীর দেবতার নাম "দা বোঙা", কূপদেবতার নাম "দাদি-বোঙা" পর্ব্বত-দেবতার নাম "বুড়ো বোঙা" এবং বনদেবতার নাম "বীর-বোঙা"। সাঁওতালদের মধ্যে সাতটি কুল (tribe) আছে। তাহাদের নাম—বেসরা, সরেন্, মুর্মু, মার্দ্দি, কিস্কু, চিল্, বিঁধা, হুড্ডু। প্রত্যেক কুলের নিজস্ব একটি 'বোঙা' আছে। এক কুলের লোকের সহিত অন্য কুলের লোকের আহার-বিহারাদি চলিতে পারে—কিন্তু পূজা কখনই চলিতে পারে না।

'মারঙ বুড়ো' অর্থাৎ 'বিরাট পর্ব্বত'ই, তাহাদের জাতি-দেবতা এবং ইহার স্থান সকল দেবতার উর্দ্ধে। সমগ্র জাতির কল্যাণ এই দেবতার উপর নির্ভর করে এবং এই

দেবতাকে অবলম্বন করিয়াই তাহাদের বিভিন্ন কুলের মধ্যে জাতীয় একতা রক্ষিত হয়।

সাঁওতালগণ যখন কোন নূতন জায়গায় উপনিবেশ স্থাপন করে তখন তাহাদের মধ্যে যে সর্ব্বপ্রথম যায় সেই নবপ্রতিষ্ঠিত গ্রামের মোড়ল হয় এবং তাহার মৃত্যুর পর গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মোড়লরূপে নির্ব্বাচন করে। কোন অন্যায়ের বিচারের জন্য ইহারা কখনও আইন-আদালতের দ্বারস্থ হয় না। বিচার-নিষ্পত্তির প্রয়োজন হইলে গ্রাম্য মোড়লের বাড়ীতে দরবার বসে, তাহাতে গ্রামের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যোগ দেয়। অধিকাংশ লোকের মতানুসারে মোড়ল তাহার আদেশ প্রচার করে। কিন্তু সেই বৈঠকে যদি দু-পক্ষই প্রবল হয় তবে মোড়ল বাহির হইতে আরও দুই তিন গ্রামের লোক আহ্বান করে। তাহার পর এই বিচারক মণ্ডলী গ্রামের বাহিরে বৃক্ষতলে সমবেত হয়; সেখানে অধিকাংশের মতে একমত হইয়া মোড়ল যাহা স্থির করিবে তাহাই মানিয়া লইতে ইহারা বাধ্য। সাঁওতালদের গ্রামে চুরি-ডাকাতি নাই বলিলেই হয়। ইহারা সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বাসী। ইহাদের মোড়লেরা নিঃস্বার্থ ন্যায়-বিচারক।

সাঁওতালদের অভাব সামান্যই। অভাব নাই বলিয়াই ইহারা সুখী, জীবনে সরলতাকে ইহারা রক্ষা করিতে পারিয়াছে। ইহারা সঞ্চয় করিতে জানে না, অভাবটুকু মিটাইয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা দিয়া মদ খাইয়া ফূর্ত্তি করে, কিন্তু মাতাল হইয়া উৎপাত করে না। স্বভাবের ক্রোড়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সরলতার মধ্যে বাস করিয়া চরিত্রের এমন কতকগুলি মহত্ত্ব ইহারা রক্ষা করিয়াছে যাহা বর্ত্তমান সভ্যতার জটিল কৃত্রিমতার যুগে উন্নত সমাজে একান্ত বিরল। তাই ইহাদের অনাড়ম্বর আনন্দপূর্ণ জীবন দেখিয়া সুসভ্য মানুষেরও এক-এক বার লোভ হয়।

নিয়তির পথে পথে

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গান শেষ হইয়াছিল। সে-গানের কথা ডেভিডের, তার সুর গ্রাম্য। সরাইখানার টেবিলে সমবেত সকলে প্রচুর বাহবা দিল, কারণ মদের দাম দিয়াছিল তরুণ কবিই। কেবল 'নোটারি'-মহাশয় তাহাতে সায় দিতে পারিলেন না, কারণ তাঁর পেটে বিদ্যা ছিল এবং তিনি অপরাপর সকলের সঙ্গে মদ্য পান করেন নাই।

ডেভিড গ্রামের পথে বাহির হইয়া পড়িল, রাতের বাতাস তার মাথা থেকে মদের বাষ্প উড়াইয়া দিল, এবং তখন তার মনে পড়িল সেদিন প্রণয়িনীর সঙ্গে ঝগড়া হইয়াছে, আর সে সঙ্কল্প করিয়াছে সেই রাত্রে গৃহ ত্যাগ করিয়া বাহিরের বিশাল বিশ্বে খ্যাতি ও সম্মানের সন্ধানে যাইবে।

"যখন লোকের মুখে মুখে ঘুরবে আমার কবিতা", সে সগর্ব্বে নিজেকে বলিল, "তখন হয়ত, তার মনে পড়বে যে-সব কঠিন কথা সে আজ আমাকে বলেছে!"

শুঁড়িখানায় যারা হৈ-হৈ করিতেছিল তারা ছাড়া তখন গ্রামবাসী সকলেই শয্যার আশ্রয় লইয়াছে। পিত্রালয়ে নিজের কুঠরিতে চুপিচুপি ঢুকিয়া সে তার সামান্য কাপড়চোপড় পুঁটলিজাত করিল। একটা লাঠির ডগায় পুঁটলিটি বাঁধিয়া সে ভেরনয় হইতে যে-পথ বাহিরে গিয়াছে সেই দিকে মুখ ফিরাইল।

খোঁয়াড়ে-বদ্ধ পিতার মেষপাল সে অতিক্রম করিয়া গেল। প্রতিদিন এই ভেড়াগুলি সে চরাইত, তাহারা যখন চরিয়া বেড়াইত সে তখন মাঠের উপর বসিয়া টুকরা কাগজের উপর কবিতা লিখিত। চলিতে চলিতে সে দেখিতে পাইল প্রণয়িনীর জানালায় তখনও আলো জ্বলিতেছে, হঠাৎ একটা দুর্ব্বলতায় তার সঙ্কল্প টলিয়া

যাইবার উপক্রম হইল। কে জানে হয়ত ঐ আলোর মানে, মেয়েটি বিনিদ্র বসিয়া তার সঙ্গে বচসা করার জন্য অনুতাপ করিতেছে, হয়ত পরদিন প্রভাতে—না না, তার সম্বন্ধের আর নড়চড় নাই! এই ভের্নয়ে আর নয়! এখানে তার চিন্তার সাথী কোথায়! ঐ বাহিরের পথে আছে তার নিয়তি ও ভবিষ্যৎ।

ম্লান-জ্যোৎস্নাস্নাত মাঠের উপর দিয়া পাঁচ ক্রোশ দীর্ঘ পথ চলিয়া গিয়াছে ঋজু কর্ষণরেখার মত। গ্রামবাসীর বিশ্বাস, পথ গিয়াছে অন্ততঃ পারী শহর পর্য্যন্ত। চলিতে চলিতে কবি নিম্নস্বরে সেই পারীর নামই জপ করিতে লাগিল। ভের্নয় হইতে তত দূরে ডেভিড কখনও পদার্পণ করে নাই।

বাম পথে

পাঁচ-ক্রোশ পর্য্যন্ত সেই পথ গিয়া এক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। উহা একটা বৃহত্তর পথে পড়িয়া রচনা করিয়াছে একটি সমকোণ। ডেভিড ক্ষণকাল দ্বিধাভরে দাঁড়াইল, তার পর বাম দিকের পথ ধরিল।

এই বড় রাস্তার উপর সম্প্রতি কোন গাড়ী গিয়াছে—ধূলার উপর তাহারই চাকার দাগ। আধ ঘণ্টা আন্দাজ পরে এই অনুমান যে যথার্থ, তাহা প্রমাণ করিল মস্ত বড় একখানি ভারী গাড়ী। একটা খাড়া পাহাড়ের তলায় এক স্রোতস্বতীর মধ্যে গাড়ীর চাকা বসিয়া গিয়াছে। চালক ও সহিসেরা চীৎকার চেঁচামেচি করিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল। রাস্তার এক ধারে কালো পোষাকে এক বিপুলকায় ভদ্রলোক এবং লম্বা হাল্কা কোর্ত্তা-ঢাকা এক জন পাতলাগোছের মহিলা দাঁড়াইয়া।

চাকরগুলোর অক্ষম চেষ্টা দেখিয়া ডেভিড বুঝিল তাহারা আনাড়ি, বিনা বাক্যব্যয়ে সে তাহাদের চালনার ভার লইল। অশ্বারূঢ় চালকদ্বয়কে হাঁকডাক থামাইয়া চাকার উপর জোর লাগাইতে বলিল। শকট-চালক কেবল পরিচিত কণ্ঠে ঘোড়াগুলিকে তাগিদ দিতে লাগিল; ডেভিড স্বয়ং গাড়ীর পিছনে তার জোরালো কাঁধ লাগাইল এবং একটি সম্মিলিত ঠেলায় প্রকাণ্ড গাড়ী গড়গড় করিয়া উঠিয়া পড়িল কঠিন ভূমির উপর। অশ্বারূঢ় চালকেরা স্ব স্ব স্থানে গিয়া উঠিল।

মুহূর্ত্তকাল ডেভিড এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল। অতিকায় ভদ্রলোক হাতের ইসারা করিলেন। বলিলেন,—গাড়ীতে ওঠ! তাঁর কণ্ঠস্বর দেহেরই উপযুক্ত, তবে তাহা শিক্ষাসহবতে সংযত। এমন কণ্ঠস্বর অনায়াসে লোকের আনুগত্য আদায় করিয়া লয়। তরুণ কবির ক্ষণস্থায়ী ইতস্ততঃ ভাব কাটিয়া গেল। তার পা উঠিল গাড়ীর পাদানির উপর। অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে সে দেখিতে পাইল পিছনের আসনে সেই নারীমূর্ত্তি। সে উল্টা দিকে বসিতে যাইতেছিল, পূর্ব্বশ্রুত কণ্ঠস্বর আবার আদেশ দিল—মহিলার পাশে বোসো!

ভদ্রলোক তাঁর দেহের গুরুভার সম্মুখের আসনে নিক্ষেপ করিলেন। গাড়ী পাহাড়ের উপর উঠিয়া চলিল। মেয়েটি বসিয়া আছে এক কোণে, গুড়িসুড়ি মারিয়া স্তব্ধ নির্ব্বাক। সে যুবতী না বৃদ্ধা, তাহা ডেভিডের ধারণার অতীত, কিন্তু মেয়েটির পোষাক থেকে স্নিগ্ধ সুরভি বাহির হইয়া কবির কল্পনায় নাড়া দিল, তার বিশ্বাস হইল এই রহস্যের তলে আছে কমনীয়তা। এমনি একটি অ্যাড্‌ভেঞ্চার কতদিন সে কল্পনা করিয়াছে। কিন্তু ইহার অর্থ সে এখনও উদ্ধার করিতে পারিতেছে না, কারণ তার দুর্ব্বোধ্য সঙ্গীদের মুখ থেকে একটি কথাও বাহির হয় নাই।

ঘণ্টাখানেক পরে জানালার ভিতর দিয়া ডেভিড লক্ষ্য করিল, গাড়ী এক শহরের পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। তার পর উহা এক রুদ্ধদ্বার অন্ধকার বাড়ীর সামনে আসিয়া থামিলে এক জন অশ্বারূঢ় চালক নামিয়া দমাদ্দম্ দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল। উপরের একটি জানালা খুলিয়া গেল এবং তাহার ভিতর দিয়া রাতের-টুপি-ঢাকা একটি মাথা বাহির হইল।

"কে হে বাপু এত রাতে ভাল মানুষদের জ্বালাতে এসেছ? আমরা দোকান বন্ধ করেছি। এত রাত্তিরে কোন্ ভদ্রলোক বাইরে থাকে? দরজা ঠেঙিয়ো না বলছি! পথ দেখ!"

"দরজা খোলো!" সহিস চীৎকার করিয়া বলিল, "ম্যাসিয় মার্ক্ইস বোপার্তি এসেছেন!"

"অ!" উপর থেকে শোনা গেল। "ক্ষমা করুন হুজুর! বুঝতে পারি নি—রাত হয়েছে অনেক—এখনি খুলছি দরজা, এ ত হুজুরেরই ঘরবাড়ী!"

ভিতরে শিকল ও হুড়কোর শব্দ হইল, দরজা খুলিয়া গেল। অর্দ্ধ-আবৃত অবস্থায় হাতে মোমবাতি ধরিয়া শীতে ও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহস্বামী চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ডেভিড গাড়ী থেকে নামিল মার্ক্ইসের পিছু পিছু। "মহিলাটিকে নামতে সাহায্য করো" মার্ক্ইস আদেশ করিলেন। কবি সে-আদেশ পালন করিল। মেয়েটিকে

নামাইবার সময় কবি অনুভব করিল তার ছোট হাতখানি কাঁপিতেছে। "বাড়ীর মধ্যে চলো", মার্কুইস আবার আদেশ করিলেন।

ঘরটি পান্থনিবাসের লম্বা ভোজন-কক্ষ। ঘর জুড়িয়া একখানি প্রকাণ্ড 'ওক্'-টেবিল পাতা। অতিকায় ভদ্রলোক এদিককার প্রান্তে একখানি চেয়ার দখল করিয়া বসিলেন। মহিলাটি দেওয়ালের ধারে অপর একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন অবসন্নভাবে। ডেভিড দাঁড়াইয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল কিরূপে এবার বিদায় লইয়া আপনার গন্তব্য পথে যাইতে পারা যায়।

"হুজুর," সরাইয়ের মালিক আভূমি প্রণত হইয়া বলিল, "এ-এই অনুগ্রহ আশা করিনি কি না, নইলে অভ্যর্থনার আয়োজনের ত্রুটি হ'ত না। ত-তবে মদ আর ঠাণ্ডা মুরগী আ-আর হয় ত…"

"মোমবাতি," বাধা দিয়া মার্কুইস বলিলেন সাদা মাংসল হাতের আঙুলগুলো ছড়াইয়া ধরিয়া একটা বিশেষ ভঙ্গীতে।

"যে আজ্ঞে হুজুর।" গৃহস্বামী আধ ডজন মোমবাতি আনিয়া জ্বালাইল। তার পর সেগুলি টেবিলের উপর বসাইয়া দিল।

"হুজুর যদি দয়া ক'রে 'বার্গাণ্ডি' পান করেন… একটা পিপে আছে…"

"মোমবাতি," হুজুর আবার হাঁকিলেন আঙুলগুলো তেমনি করিয়া ছড়াইয়া ধরিয়া।

"নিশ্চয়ই—এই আনছি হুজুর—এখনি!"

আরও এক ডজন মোমবাতি হলঘরে জ্বালিয়া দেওয়া হইল। মার্কুইসের বিশাল বপু চেয়ারে ধরে নাই। তাঁর আপাদমস্তক চমৎকার কালো পোষাকে আবৃত, কেবল হাতের কব্‌জি ও গ্রীবাদেশে তুষারশুভ্র চুনট। এমন কি তাঁর তলোয়ারের বাঁট ও খাপও কালো। মুখে উদ্ধত গর্ব্বিত ভাব এবং তাঁর গোঁফের ঊর্দ্ধমুখ প্রান্ত প্রায় তাঁর বিদ্রূপমাখানো চোখে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

মেয়েটি স্থির হইয়া বসিয়া আছে। এইবার ডেভিড লক্ষ্য করিল, সে যুবতী নারী এবং তার বিষাদ-মাখানো সৌন্দর্য্য মনকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু সে-সৌন্দর্য্য উপভোগে বাধা পড়িল। মার্কুইসের ঘর-কাঁপানো কণ্ঠস্বরে সে চমকাইয়া উঠিল।

"নাম কি হে তোমার? পেশা কি?"

"ডেভিড মিগ্‌নো আমার নাম। আমি কবি।"

মার্কুইসের গোঁফের প্রান্ত কোঁকড়াইয়া চোখের আরও কাছে গিয়া পৌঁছিল।

"উপজীবিকা?"

"আমি মেষপালকও বটে; বাবার মেষপালের খবরদারি করতুম," ডেভিড উত্তর দিল। মাথা তার উঁচু কিন্তু মুখ রক্তিম।

"তবে শোন, মেষপালক ও কবি, আজ রাতে ফাঁকতালে কোন্ ঐশ্বর্য্যের উপর এসে পড়েছ! এই যে মেয়েটি দেখছ, ইনি আমার ভাইঝি কুমারী লুসি। সম্ভ্রান্তবংশের মেয়ে, নিজের অধিকারে ওঁর বছরে দশহাজার ফ্রাঁ * আয়। তা ছাড়া ওঁর সৌন্দর্য্য সে ত দেখতেই পাচ্ছ। এই তালিকায় তোমার মেষপালকের হৃদয় তৃপ্ত হয়ে থাকলে কেবল একটি কথার ওয়াস্তা, তাহলেই ও তোমার পত্নী হ'তে পারে! থামো, আমাকে বলতে দাও! আজ রাতে এঁকে নিয়ে গিয়েছিলুম ভিলেমোরের প্রাসাদে, কাউণ্টের সঙ্গে বিবাহ স্থির ছিল। নিমন্ত্রিত অভ্যাগতেরা উপস্থিত, পুরোহিত হাজির, অর্থে ও পদমর্য্যাদায় সমান এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বিবাহ হয়-হয়। বেদীতে, এই যে মেয়েটি দেখছ এত নম্র ও কর্ত্তব্যপরায়ণা, এই মেয়েটিই চিতাবাঘিনীর মত আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল, আমাকে নিষ্ঠুরতা ও পাপ আচরণের জন্যে অভিযুক্ত করলে, আর অবাক পুরোহিতের সামনে, ওর জন্যে যে-প্রতিজ্ঞায় আমি বদ্ধ ছিলুম, সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে। আমি সেই মুহূর্ত্তে সেইখানে দশ হাজার সয়তান সাক্ষী ক'রে শপথ করেছি যে কাউণ্টের প্রাসাদ ছাড়ার পর প্রথম যে-পুরুষের সঙ্গে দেখা হবে তাকে বিয়ে করতে হবে ওকে—তা সে রাজপুত্রই হোক, আর মুটে-মজুরই হোক বা চোর-বাটপাড়ই হোক। তুমি, মেষপালক, সেই প্রথম লোক! শ্রীমতীর বিয়ে আজ রাতের মধ্যে দিতেই হবে! তোমার সঙ্গে না হ'লে অপর কারও সঙ্গে! দশ মিনিট সময় দিচ্ছি, কর্ত্তব্য স্থির করো। কথা বা প্রশ্নের দ্বারা আমাকে বিরক্ত ক'রো না! মনে রেখ দশ মিনিট, মেষপালক! তার বেশী নয়!"

মার্কুইস তাঁর সাদা আঙুল দিয়া টেবিলের উপর সশব্দে তাল দিতে লাগিলেন। অপেক্ষা করিয়া থাকার একটা প্রচ্ছন্ন ভঙ্গী তাঁর। ভাবটা, যেন একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ করা হইয়াছে লোকের প্রবেশ বন্ধ করার জন্য। ডেভিড কথা বলিত, কিন্তু

* ফরাসী মুদ্রা, এক ফ্রাঁ। এদেশের ।/১০ আনার সমান।

অভিকায় লোকটির রকম দেখিয়া তার মুখ খুলিল না। তৎপরিবর্ত্তে সে মেয়েটির চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া মাথা নোয়াইল।

"মাদ্‌মোয়াসেল্‌," সে বলিল—এত পারিপাট্য ও সৌন্দর্য্যের ভিড়ে কথাগুলো মুখ দিয়া এত সহজে বাহির হইতে দেখিয়া সে নিজেই অবাক হইয়া গেল—"আমারই মুখে শুনেছেন আমি একজন মেষপালক। কখনো কখনো এমনও কল্পনা করেছি যে আমি কবি। সুন্দরকে পূজা করা, সুন্দরকে আকাঙ্ক্ষা করা যদি কবির লক্ষণ হয়, তবে আমার মনে সেই ভাব এখন আরও বেড়ে গেছে। আমি আপনার কোনো কাজে লাগতে পারি কি মহাশয়া?"

শুষ্ক বিষণ্ণ চোখ তুলিয়া মেয়েটি তার পানে চাহিল। ডেভিডের সরল উজ্জ্বল মুখ অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গুরুত্ববোধে গম্ভীর দেখাইতেছে। তার ঋজু দেহ বলিষ্ঠ, তার নীল চোখে সহানুভূতি টলমল করিতেছে। সম্ভবত দীর্ঘকাল যাহা হইতে বঞ্চিত আছে সেই সাহায্য ও দয়ার আসন্ন প্রয়োজন সহসা মেয়েটির চোখ থেকে অশ্রু ঝরাইয়া দিল।

"মহাশয়," সে নিম্নস্বরে কহিল, "আপনাকে অকপট ও সহৃদয় বলেই মনে হচ্ছে। ইনি আমার খুড়ো, আমার একমাত্র আত্মীয়। ইনি ভালবাসতেন আমার মাকে এবং আমি তাঁরই মত দেখতে ব'লে আমাকে ঘৃণা করেন। ইনি আমার জীবনকে একটা সুদীর্ঘ আতঙ্কে পরিণত করেছেন। ওঁর মূর্ত্তি দেখলে পর্য্যন্ত আমি ভয় পাই, ইতিপূর্ব্বে কখনো ওঁর অবাধ্যতা করতে সাহস পাই নি; কিন্তু আজ রাতে আমার চেয়ে বয়সে তিনগুণ বড় একজনের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। আপনাকে এই বিরক্তিকর ব্যাপারে জড়িত করার জন্যে আমাকে ক্ষমা করুন! যে-কাজ করতে আপনাকে বাধ্য করার চেষ্টা হচ্ছে আপনি অবশ্য অমন পাগলামি করতে অস্বীকার করবেন! কিন্তু, অন্তত আপনার সহানুভূতির জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই। এতকাল একটা মিষ্টি কথাও আমায় কেউ বলে নি!"

অতঃপর কবির চোখে যে-ভাব প্রকাশ পাইল তাহা সহৃদয়তার চেয়ে আরও কিছু বেশী। কবি সে নিঃসন্দেহ, কারণ য়োনের কথা সে ভুলিল; এই মনোরম অভিনব সৌন্দর্য্য তার নবীন মাধুরীর দ্বারা তাহাকে অভিভূত করিল। মেয়েটির দেহ থেকে নির্গত মৃদু সৌরভ তার মনে সঞ্চার করিল অপূর্ব্ব মাদকতা। ডেভিডের প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি তাহাকে যেন সস্নেহে জড়াইয়া ধরিল। মেয়েটিও তৃষার্ত্তভাবে সেই দৃষ্টির উপর পড়িল হেলিয়া।

"যে-কাজ সমাধা করতে বছরের পর বছর লাগার কথা, সে-কাজ করতে আমায় সময় দেওয়া হয়েছে দশ মিনিট মাত্র," ডেভিড বলিল। "মহাশয়া, আপনাকে করুণা করি এ-কথা বলব না, কারণ, কথাটা সত্য হবে না—আমি আপনাকে ভালবাসি! আপনার কাছ থেকে ভালবাসা এখনও চাইতে পারি না, কিন্তু এই নিষ্ঠুর লোকটির হাত থেকে আপনাকে উদ্ধার করতে চাই, তার পর সময়ে ভালবাসা হয়ত আসতে পারে! মনে হয় আমার একটা ভবিষ্যৎ আছে; আমি চিরকাল মেষপালক হয়ে থাকব না! আপাতত সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে ভালবাসব, আর আপনার জীবনকে খানিকটা বিষাদমুক্ত করব। আমার হাতে কি আপনার অদৃষ্ট অর্পণ করতে পারেন, মহাশয়া?"

"আমার প্রতি করুণা ক'রে কি নিজেকে বিসর্জ্জন দিতে চান?"

"না, ভালবেসে! সময় প্রায় হয়ে এল মহাশয়া!"

"কিন্তু এর জন্যে আপনি অনুতাপ করবেন এবং আমাকে করবেন ঘৃণা!"

"আমি কেবল আপনাকে সুখী করার জন্যে বেঁচে থাকব, আর নিজেকে আপনার উপযুক্ত করার জন্যে!"

কোর্ত্তার তলা থেকে বাহির হইয়া মেয়েটির ছোট সুন্দর হাতখানি ধীরে ধীরে ডেভিডের হাতের মধ্যে গিয়া পড়িল।

"আমার জীবন তোমারই হাতে সমর্পণ করব," সে মৃদুগুঞ্জনে বলিল। "আর—আর ভালবাসা যত দূরে ভাবছ তত দূরে হয় ত নয়! বলো ওকে। ওর দৃষ্টির প্রভাব থেকে একবার দূরে যেতে পারলে হয়ত ভুলতে পারি!"

ডেভিড মার্কুইসের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। কালো মূর্ত্তিটি নড়িল, তার বিদ্রূপ-মাখানো চোখদুটি প্রশস্ত ঘরের মস্ত ঘড়ির পানে ফিরিল।

"আর দু'মিনিট বাকি। ধনী সুন্দরী কন্যাকে গ্রহণ করবে কি না তা স্থির করতে একটা মেষপালকের লাগে আট মিনিট সময়! বলো হে, মেষপালক, এই মহিলার পতি হতে রাজি আছ কি না?"

"উনি," সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া ডেভিড বলিল, "আমার

পত্নী হবার অনুরোধ গ্রহণ ক'রে আমাকে সম্মানিত করেছেন!"

"সাধু, সাধু!" মার্কুইস বলিলেন, "তোমার মধ্যে এখনো রাজপারিষদ হবার মত গুণ রয়েছে হে মেষপালক! আমাদের কুমারীর ভাগ্যে হয়ত আরও খারাপ পুরস্কারই জুটত, কে জানে! এখন ব্যাপারটা 'চার্চ' আর সয়তানের কৃপায় যত শীঘ্র চোকে ততই মঙ্গল!"

তলোয়ারের বাঁট দিয়া টেবিলের উপর তিনি সজোরে আঘাত করিলেন। হাঁটু ঠকঠকাইয়া গৃহস্বামী আসিল, আরও কতকগুলো মোমবাতি তার হাতে, হুজুরের অভিরুচি আগেভাগেই সে অনুমান করিয়া লইয়াছে। "মোমবাতি নয়, পুরুত নিয়ে এস," মার্কুইস বলিলেন, "পুরুত; বুঝলে হে? দশ মিনিটের মধ্যে হাজির করা চাই, নইলে—"

মোমবাতি ফেলিয়া গৃহস্বামী ছুটিল।

পুরোহিত আসিল নিদ্রাজড়িত চোখে হন্তদন্তভাবে। অবিলম্বে ডেভিড ও লুসিকে সে স্বামীস্ত্রীতে পরিণত করিল। মার্কুইস একটা স্বর্ণমুদ্রা ছুড়িয়া দিলেন, সেটা পকেটস্থ করিয়া রাতের অন্ধকারে সে বাহির হইয়া গেল।

গৃহস্বামীর পানে ভীতিপ্রদ আঙুলগুলো মেলিয়া ধরিয়া মার্কুইস হুকুম করিলেন—নিয়ে এস মদ!

মদ আনা হইলে বলিলেন,—গ্লাস ভর্ত্তি কর! টেবিলের মাথায় মোমবাতির আলোয় তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন, অহঙ্কার ও বিষে-ভরা একটি কালো পাহাড়ের মত! চোখ যখন ভাইঝির উপর পড়িল তখন তার মধ্যে যেন পুরানো প্রেমের স্মৃতি বিষ হইয়া দেখা দিয়াছে।

সুরাপাত্র তুলিয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন, "মিগনো-মহাশয়, আমার কথা শেষ হ'লে তবে পান করবে! এমন মেয়েকে পত্নীত্বে বরণ করেছ তুমি যে তোমার জীবনকে পঙ্কিল ও দুর্ব্বহ করে তুলবে! কারণ ওর শিরায় যে-রক্ত প্রবাহিত, তার মধ্যে ঘৃণ্য মিথ্যাচার ও ধ্বংসের বীজ বর্ত্তমান! ও তোমার দুশ্চিন্তা ও লজ্জার কারণ হবে। যে-সয়তান ওর ওপর ভর করেছে, সে ওর চোখে মুখে দেহে প্রকাশিত, সে একটা চাষাকেও ভোলাবার জন্যে সচেষ্ট। কবি-মহাশয়, তোমার জীবন যে সুখের হবে তাতে আর সন্দেহ কি? এইবার পান কর তোমার মদ! অবশেষে, মাদ্‌মোয়াসেল্ তোমার হাত থেকে আমি নিষ্কৃতি পেলুম!"

মার্কুইস পান করিলেন। মেয়েটির মুখ থেকে একটু আর্ত্ত স্বর বাহির হইল, মানুষ সহসা আহত হইলে যেমন হয়। গ্লাস হাতে লইয়া ডেভিড তিন পা অগ্রসর হইয়া মার্কুইসের মুখোমুখি দাঁড়াইল। তার আচরণে মেষপালকের চিহ্নমাত্রও নাই।

"এইমাত্র" সে ধীরকণ্ঠে বলিল, "আপনি আমাকে 'মহাশয়' ব'লে সম্মানিত করেছেন। সেই জন্যে আশা করা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে, আপনার ভাইঝিকে বিবাহ করার আমি পদমর্য্যাদায় খানিকটা আপনার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছি—মর্য্যাদাটা পরকীয়ই ধরা যাক—আর অধিকার পেয়েছি মহাশয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করার সামান্য একটু ব্যাপারে—এবং আমার অভিরুচিও তা-ই!"

"আশা করতে পার, মেষপালক", বিদ্রূপের সুরে মার্কুইস কহিলেন।

"তাহ'লে", যে-ঘৃণাভরা চোখ তাহাকে বিদ্রূপ করিতেছিল সেই চোখের উপর মদের গ্লাস ছুড়িয়া মারিয়া ডেভিড বলিল, "হয় ত দয়া ক'রে আপনি আমার সঙ্গে লড়তে রাজি হবেন!"

মহামহিম হুজুরের ক্রোধাগ্নি সহসা ভেরীনির্ঘোষের মত ফাটিয়া পড়িল। কালো খাপ থেকে সড়াৎ করিয়া তিনি তলোয়ারখানা বাহির করিয়া ফেলিলেন, গৃহস্বামীকে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "নিয়ে এস একখানা তলোয়ার এই চাষাটার জন্যে!" মেয়েটির দিকে ফিরিয়া তিনি হাসিলেন, সেই হাসিতে তার বুকের ভিতরটা হিম হইয়া গেল। হাসিয়া বলিলেন, "আমাকে দিয়ে বেজায় খাটাচ্ছেন, মহাশয়া! রাতারাতি স্বামীও জোগাড় ক'রে দিতে হবে আবার আপনাকে বিধবাও করতে হবে!"

"তলোয়ার-খেলা আমি জানি না", ডেভিড বলিল। পত্নীর সামনে অক্ষমতা স্বীকার করিতে তার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

"তলোয়ার-খেলা আমি জানি না"—মার্কুইস ভেঙচাইয়া বলিলেন। "চাষাদের মত কাঠের মুগুর নিয়ে লড়ব না কি? ফ্রাঁসোয়া, নিয়ে এস আমার পিস্তল!"

সহিস গাড়ী থেকে দুটো ঝকঝকে প্রকাণ্ড পিস্তল লইয়া আসিল, তার উপর খোদাই-করা রূপার কাজ। টেবিলের উপর ডেভিডের হাতের কাছে মার্কুইস একটা ছুড়িয়া দিলেন। "টেবিলের ওই ওধারে গিয়ে দাঁড়াও", তিনি হাঁকিলেন; "পিস্তলের ঘোড়া একটা মেষপালকও

টানতে পারে। যদিও তাদের মধ্যে কারও বোপার্তির অস্ত্রে মরার সম্মান লাভ হয় না!"

মেষপালক ও মার্কুইস লম্বা টেবিলের দুই প্রান্তে মুখোমুখি দাঁড়াইল। গৃহস্বামী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শূন্যে হাত তুলিয়া তোতলাইতে লাগিল, "দোহাই হুজুর, এ-বাড়ীতে নয়। রক্তপাত করবেন না—আমার ব্যবসা মাটি হবে"—মার্কুইসের ভীতিপ্রদ চাহনি দেখিয়া তার জিভ অসাড় হইয়া গেল।

"কাপুরুষ", বোপার্তির হুজুর হুকার দিলেন, "কিছু ক্ষণ দাঁত-ঠোকাঠুকি থামিয়ে পারিস ত এক-দুই-তিন ব'লে দে!"

গৃহস্বামীর জানু মেঝের উপর নুইয়া পড়িল, মুখে বাক্য জোগাইল না। মুখ দিয়া শব্দ পর্য্যন্ত বাহির করার শক্তি নাই। তবুও, মূক ভঙ্গীর দ্বারা সে তার ব্যবসা ও খরিদ্দারের দোহাই দিয়া শান্তি প্রার্থনা করিতে লাগিল।

"আমি বলব", মেয়েটি স্পষ্টকণ্ঠে বলিল। ডেভিডের পানে অগ্রসর হইয়া তাহাকে মধুর চুম্বন করিল। তার চোখ ঝক্‌ঝক করিতেছে, কপোল রাঙা হইয়া উঠিয়াছে দেওয়ালে ঠেস দিয়া সে দাঁড়াইল। যুযুৎসু দুজনও তার সঙ্কেতের অপেক্ষায় পিস্তল তুলিল।

"এক—দুই—তিন!"

দুইটা আওয়াজই এত কাছাকাছি হইল যে মোম-বাতিগুলোর শিখা কাঁপিল মাত্র এক বার।

মার্কুইস দাঁড়াইয়া আছেন, মুখে মৃদু হাসি, টেবিলের প্রান্তে বাঁ হাতের আঙুলগুলো ছড়ানো। ডেভিড খাড়া দাঁড়াইয়া মাথাটা অতি ধীরে ফিরাইল, তার চোখ পত্নীকে অন্বেষণ করিতেছে। তার পর, একটা টাঙানো পোষাক স্থানভ্রষ্ট হইয়া যেমন করিয়া খসিয়া পড়ে তেমনি করিয়া সে মেঝের উপর তালগোল পাকাইয়া পড়িয়া গেল।

হতাশা ও ভয়ের একটা আর্ত্ত রব করিয়া বিধবা মেয়েটি ছুটিয়া গিয়া পতির উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। আহত স্থানটি খুঁজিয়া বাহির করিল, তার পর মুখ তুলিল, মুখ তার বিষাদে বিবর্ণ। "একেবারে বুক ভেদ করে গেছে", সে ফিসফিস করিয়া বলিল। "ওঃ বুক ভেদ করেছে!"

"যাও", মার্কুইসের কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল, "গাড়ীতে গিয়ে ওঠ! সকাল পর্য্যন্ত আমার হাতে তুমি থাকছ না! আবার তোমার বিয়ে দেব, জ্যান্ত বরের সঙ্গে, এই রাত্রেই! এর পরে যার সঙ্গে দেখা হবে মহাশয়া, চোর ডাকাত বা চাষা যে-ই হোক! নেহাৎ যদি পথে কাউকে পাওয়া না-যায়, যে ছোটলোকটা আমার ফটক খোলে সে ত আছেই! যাও, গাড়ীতে গিয়ে ওঠ!"

অতিকায় ও নির্দ্দয় মার্কুইস, কোর্ত্তার রহস্যে পুনরাবৃত মেয়েটি, অস্ত্রবাহী সহিস—সকলে গিয়া গাড়ীতে উঠিল। নিদ্রিত গ্রামের ভিতরে চলমান গাড়ীর গুরুভার চাকার শব্দ প্রতিধ্বনিত হইল। "রূপার বোতল" নামে পরিচিত পান্থনিবাসের ভোজন-কক্ষে নিহত কবির দেহের উপর ঝুঁকিয়া উদ্‌ভ্রান্ত গৃহস্বামী হাত কচলাইতে লাগিল। টেবিলের উপর তখনও চব্বিশটি মোমবাতির চঞ্চল শিখা কাঁপিতেছে।

দক্ষিণ পথে

পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত সেই পথ গিয়া এক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। উহা একটা বৃহত্তর পথে পড়িয়া রচনা করিয়াছে এক সমকোণ। ডেভিড ক্ষণকাল দ্বিধাভরে দাঁড়াইল, তার পর ডান দিকের পথ ধরিল।

পথ কোথায় গিয়াছে সে জানে না, কিন্তু সে-রাত্রে সে ভেরনয়কে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া যাওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছে। ক্রোশ-দেড়েক পথ অতিক্রম করিয়া সে দেখিতে পাইল এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা, মনে হইল সম্প্রতি সেখানে কোনও উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক জানালা থেকেই আলো দেখা যাইতেছিল। প্রকাণ্ড পাথরের ফটক থেকে বহির্গত পথের ধুলায় গাড়ীর চাকার দাগ—অভ্যাগতেরা সেই সব গাড়ীতে আসিয়াছিল।

আরও পাঁচ ক্রোশ পথ গিয়া ডেভিড পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। পথের ধারে পাইন-গাছের ডালপালায় রচিত শয্যায় সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল ও ঘুমাইল। তার পর আবার উঠিয়া অজানা পথে চলিতে সুরু করিল।

এইরূপে পাঁচ-দিন ধরিয়া সে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া চলিল, প্রকৃতিদত্ত সুরভি ডালপালার শয্যায় অথবা কৃষাণের খড়ের গাদায় শুইয়া, তাহাদের কালো রুটি খাইয়া, নির্ঝর থেকে অথবা রাখালের পাত্র থেকে জলপান করিয়া।

অবশেষে মস্ত এক সেতু পার হইয়া সে এক আনন্দময় শহরের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। সে শহর যত কবিকে ধুলায় বসাইয়াছে বা বিজয়-মুকুট পরাইয়াছে, সারা বিশ্বও তেমন করে নাই। প্যারী যখন মৃদুগুঞ্জনে গাহিতে

লাগিল তার জীবনপ্রদ সাদর-সম্ভাষণ-গীতি মানুষের কণ্ঠের পদশব্দের ও রথচক্রঘর্ঘরের মিশ্রিত আওয়াজের মধ্যে, তখন কবির নিশ্বাস দ্রুত তালে পড়িতে সুরু করিল।

অনেক উঁচুতে এক পুরানো ইমারতের ছাদের কিনারে ডেভিড আস্তানা গাড়িল। অগ্রিম ভাড়া জমা দিয়া একখানি কাঠের চেয়ারে বসিয়া কাব্যরচনায় মন দিল। এই পথের দুই ধারে একদা বিশিষ্ট নাগরিকেরা বসবাস করিত; অধুনা, অবনতির অনুচর যাহারা, তাহারাই এখানকার বাসিন্দা।

বাড়ীগুলা উঁচু উঁচু, এখনও তাদের মধ্যে অতীত মর্য্যাদার আভাস পাওয়া যায়; কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই শূন্যগর্ভ, আছে কেবল ধুলা আর মাকড়সা। রাত্রে সেখানে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শোনা যায় আর সরাই থেকে সরাইয়ে ঘোরাফেরা করে অশান্ত উচ্চরবে কলহে লিপ্ত মানুষের দল। একদা যেখানে বিরাজ করিত শিষ্টতা ও শান্তি সেখানে এখন কেবল শোচনীয় অভব্য অসংযম। কিন্তু এখানে ডেভিড তার সামান্য পুঁজির উপযোগী বাসা পাইয়াছে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে কাগজ-কলম লইয়াই কাটায়।

একদিন অপরাহ্ণে অধোজগৎ হইতে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছিল—রুটি, দৈ ও এক বোতল পাতলা মদ। অন্ধকার সিঁড়ির মাঝামাঝি তার দেখা হইল—বরং বলা উচিত সে দেখিতে পাইল, কারণ মেয়েটি সিঁড়ির উপরই বসিয়া ছিল—এক যুবতী নারীর সঙ্গে, তার সৌন্দর্য্য কবির কল্পনাকেও হার মানায়। পরনে তার একটা ঢিলে কালো কোর্ত্তা, তার তলায় চমৎকার ঘাঘরা। মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের ভাবও দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছিল। এই তাহারা শিশুর চোখের মত গোলাকার ও সরল আবার পরক্ষণেই বেদিয়ার চোখের মত দীর্ঘায়ত ও ছলভরা। একখানি হাতে ঘাঘরা তুলিয়া ধরায় হাই-হীল ছোট জুতো দেখা যাইতেছে, জুতোর খোলা ফিতে ভূলুণ্ঠিত। মেয়েটি যেন অমরাপুরীর—মরজগতের নয়; সে যেন নীচু হইতে জানে না, মুগ্ধ করিতে আর আদেশ করিতেই জানে! হয়ত সে ডেভিডকে আসিতে দেখিয়া তার সাহায্য লাভের জন্যই সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল।

সিঁড়ি জুড়িয়া সে বসিয়া আছে। মহাশয় কি ক্ষমা করিবেন—কিন্তু জুতো! লক্ষীছাড়া জুতো! অবাধ্য ফিতেগুলো বাঁধা থাকিতে চায় না! মহাশয় যদি অনুগ্রহ করেন!

অবাধ্য ফিতে বাঁধার সময় কবির আঙুলগুলো কাঁপিতে লাগিল। সম্ভব হইলে সে মেয়েটির সান্নিধ্যের বিপদ থেকে ছুটিয়া পালাইত, কিন্তু তার চোখদুটি বেদিয়ার চোখের মত দীর্ঘায়ত ও মোহময় হইয়া উঠিল। কাজেই আর পালান হইল না, সিঁড়ির রেলিঙে ঠেস দিয়া সে দাঁড়াইল টক মদের বোতল চাপিয়া ধরিয়া।

মেয়েটি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "যথেষ্ট উপকার করলেন! বোধ করি এই বাড়ীতেই থাকা হয়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মহাশয়া। আমার—আমার তাই মনে হয় মহাশয়া!"

"তবে হয় ত তেতলায় থাকেন, না?"

"না মহাশয়া, আরও উঁচুতে।"

মেয়েটি হাতের আঙুল ঘসিতে লাগিল। মুখে ঈষৎ অসহিষ্ণুতার ভাব প্রকাশ পাইল।

"ক্ষমা করবেন। আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত হয়নি! ক্ষমা করবেন ত মহাশয়? বাস্তবিক, কোথায় থাকেন সে-কথা জিজ্ঞাসা করা শোভন নয়!"

"ওকথা বলবেন না, মহাশয়া! আমি থাকি--"

"না না না, বলবেন না আমাকে! এখন আমি বুঝছি আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু এই বাড়ীর প্রতি এবং এই বাড়ীর মধ্যে যা আছে তার প্রতি আমার অনুরাগ লুপ্ত হবার নয়! একদিন এ-ই ছিল আমার বাসভবন। অনেক সময় আমি এখানে আসি কেবল সেই সব সুখের দিনের স্বপ্ন দেখার জন্যে। ওইটেই আমার কৌতূহলের হেতু ব'লে ধরবেন কি?"

"তবে আপনাকে বলি শুনুন, আপনার কৈফিয়ৎ দেবার দরকার নেই," আমতা-আমতা করিয়া কবি বলিল। "আমি থাকি একেবারে উপরতলায়—সেই ছোট কুঠরিতে সিঁড়ির বাঁকের মাথায়।"

"সামনের ঘরে?" মাথাটি এক পাশে ফিরাইয়া মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল।

"পিছনের ঘরে, মহাশয়া।"

মেয়েটি নিশ্বাস ফেলিল—যেন স্বস্তি বোধ করিল।

"তাহলে আপনাকে আর আটকে রাখব না," সে বলিল, চোখ গোলাকার ও সরল করিয়া। "বাড়ীটার যত্ন করবেন। হায়! এখন কেবল এর স্মৃতিটুকুই আমার! নমস্কার, আসি তবে, আপনার সৌজন্যের জন্যে ধন্যবাদ নিন!"

মেয়েটি চলিয়া গেল, রাখিয়া গেল কেবল একটু স্মিত-হাসি আর মৃদু সৌরভের রেশ। ডেভিড সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেল যেন ঘুমন্ত মানুষ। কিন্তু সে-নিদ্রা হইতে সে জাগরিত হইল, তবে সেই মৃদু হাসি ও সেই মৃদু সৌরভ তার সঙ্গে রহিয়া গেল, তাহারা যেন আর কখনোই তার সঙ্গ একেবারে ত্যাগ করিয়া গেল না। এই সম্পূর্ণ অপরিচিতা মেয়েটি তাহাকে দিয়া রচনা করাইল চোখের লিরিক, আকস্মিক প্রেমের গীতি, কোঁকড়ানো কেশের গাথা আর সুকুমার চরণের চটির সনেট!

কবি সে নিঃসন্দেহ, কারণ য়োনের কথা সে ভুলিল; এই মনোরম অভিনব সৌন্দর্য্য তার নবীন মাধুরীর দ্বারা তাহাকে অভিভূত করিল। তার দেহাশ্রিত মৃদু সৌরভ আনিয়া দিল তার মনে অপূর্ব্ব মাদকতা।

এক দিন রাত্রে সেই বাড়ীরই তেতলার এক ঘরে একটি টেবিলের ধারে বসিয়া ছিল তিন জন লোক। তিন খানি চেয়ার, সেই টেবিল এবং তার উপর একটি জলন্ত মোমবাতি—এই ছিল সে-ঘরের আসবাব। তিন জনের মধ্যে এক জন অতিকায়, পরণে তার কালো পোষাক। তার মুখে অবজ্ঞা ও গর্ব্বের ভাব পরিস্ফুট। উদ্যত গোঁফের ডগা প্রায় তাহার ব্যঙ্গভরা চোখে ঠেকিয়াছে। অপর জন মহিলা—যুবতী ও সুন্দরী; তার চোখ শিশুর চোখের মত গোলাকার ও সরল কিংবা বেদিয়ার চোখের মত দীর্ঘায়ত ও ছলভরা হইতে পারিত, কিন্তু আপাতত যে কোনো চক্রীর মত উজ্জ্বল ও উচ্চাভিলাষী দেখাইতেছিল। তৃতীয় ব্যক্তি কেজো লোক, যোদ্ধা, সাহসী ও অধীর কর্ম্মী, বন্দুক আর তলোয়ার লইয়াই তার কারবার। সকলে তাহাকে ক্যাপটেন দেস্‌রোল বলিয়া সম্বোধন করিতেছিল।

সেই লোকটি টেবিলের উপর ঘুষি মারিয়া অন্তরের প্রচণ্ডতা সংযত করিয়া বলিল—

"এই রাত্রে! এই রাত্রে যখন সে মাঝরাতের উপাসনায় যোগ দিতে যাবে। নিষ্ফল চক্রান্ত আর ভালো লাগে না! সঙ্কেত আর 'সাইফার' আর গুপ্ত মন্ত্রণা অসহ্য! খোলাখুলি বিশ্বাসঘাতক হওয়াই ভাল। ফ্রান্স যদি তাকে বর্জ্জন করতে চায়, তবে প্রকাশ্যে তাকে মারাই ভাল, ফাঁদ পেতে শিকার করতে চাই না। আজই রাত্রে, আমি বলি! প্রতিজ্ঞা আমি রাখব। আমার হাতই ও-কাজ করবে। আজ রাত্তে যখন সে উপাসনায় যাবে, তখন।"

মেয়েটি তার পানে প্রসন্ন দৃষ্টি ফিরাইল। নারী, যতই কেন চক্রান্তে জড়িত হোক না, বেপরোয়া সাহসকে সর্ব্বদা এমন করিয়াই নতি জানায়। অতিকায় লোকটি তার উর্দ্ধমুখ গোঁফে হাত বুলাইতে লাগিল।

"প্রিয় ক্যাপ্‌টেন," অভ্যাসের দ্বারা সংযত দরাজ কণ্ঠে সে বলিল, "এবার তোমার সঙ্গে আমার মত মিলেছে। অপেক্ষা ক'রে থেকে কোনো লাভ নেই। প্রাসাদ-রক্ষীদের মধ্যে এত লোক আমাদের স্বপক্ষে যে আমাদের চেষ্টা নিরাপদ!"

"আজ রাত্তে," আবার টেবিল চাপড়াইয়া ক্যাপ্‌টেন দেস্‌রোল পুনরুক্তি করিল। "আমার কথা শুনেছেন মার্কুইস; আমার হাত এই কাজ করবে!"

অতিকায় লোকটি ধীরভাবে বলিল, "এইবার একটি কথা ভাবা দরকার। প্রাসাদে আমাদের দলের লোকেদের কাছে খবর পাঠাতে হবে, আর স্থির করতে হবে একটা সঙ্কেত। আমাদের দলভুক্ত সবচেয়ে বিশ্বাসী লোকেরা থাকবে রাজশকটের সঙ্গে। আচ্ছা, এ সময়ে এমন কোনো দূত আমাদের আছে যে দক্ষিণের ফটক পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে? ওখানে আছে রিবু; তার হাতে খবর পৌঁছে দিতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আমি খবর পাঠাব," মেয়েটি বলিল।

"আপনি, কাউণ্টেস?" ভুরু তুলিয়া মার্কুইস বলিল। "আপনার আগ্রহ যথেষ্ট, জানি, কিন্তু···"

"শুনুন!" উঠিয়া টেবিলের উপর দুই হাত রাখিয়া মেয়েটি বলিল, "এই বাড়ীরই এক কুঠরিতে এক যুবক বাস করে, এসেছে পল্লীগ্রাম থেকে, সেখানে যে-মেষপালের খবরদারি করত তাদেরই মত সরল ও শান্ত। দু'তিন বার তার সঙ্গে দেখা হয়েছে সিঁড়িতে। আমাদের এই ঘরের খুব কাছে থাকে কি না, সেই ভয়ে তাকে একটু জেরা করেছিলুম। ইচ্ছে করলেই তাকে পেতে পারি। সে তার কুঠরিতে ব'সে ব'সে কবিতা লেখে, আর মনে হয় সে সারাক্ষণ আমারই স্বপ্ন দেখে। আমি যা বলব সে তা করবেই! সে-ই প্রাসাদে খবরটা পৌঁছে দেবে।"

মার্কুইস চেয়ার থেকে উঠিয়া মাথা নোয়াইল। "আপনি আমার বক্তব্য শেষ করতে দেন নি কাউণ্টেস," সে বলিল। "আমি বলছিলুম কি: 'আপনার আগ্রহ

যথেষ্ট, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী আপনার বুদ্ধি ও মোহিনী শক্তি!'"

চক্রীরা যখন এমনি ব্যস্ত, ডেভিড তখন তার প্রেমাস্পদার উদ্দেশে রচিত কবিতা মাজাঘষা করিতেছিল। দরজার উপর সসঙ্কোচ খুট খুট শব্দে ধড়ফড় বুকে দ্বার খুলিয়া দিল। দেখে মেয়েটি দাঁড়াইয়া, বিপদে পড়িলে মানুষ যেমন হাঁপায় তেমনি করিয়া হাঁপাইতেছে, চোখদুটি শিশুর চোখের মত সরল, খোলা মেলা।

"মহাশয়," সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বড় বিপন্ন হয়ে আপনার কাছে এসেছি! আপনাকে সাধুসজ্জন বিশ্বস্ত ব'লে জানি, আর কেউ আমার সহায় নেই। রাস্তা দিয়ে যত অভব্য লোকের ভিড় ঠেলে ছুটতে ছুটতে আসছি! মা আমার মারা যাচ্ছেন! রাজপ্রাসাদে আমার মামা রক্ষীদলের ক্যাপ্‌টেন। তাঁকে আনার জন্যে ছুটে যাওয়া দরকার! আশা কি করতে পারি…"

"মহাশয়া," বাধা দিয়া ডেভিড বলিল,—মেয়েটিকে সাহায্য করার ইচ্ছায় তার চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—"আপনার আশাই হবে আমার পাখা! বলুন কি উপায়ে তাঁর কাছে পৌছতে পারি?"

মেয়েটি তার হাতে একখানি বন্ধ খাম গুঁজিয়া দিল।

"দক্ষিণের ফটকে যাবেন—মনে রাখবেন, দক্ষিণের ফটক—সেখানে গিয়ে রক্ষীদের বলবেন, 'বাজপাখী বাসা ছেড়েছে!' তারা আপনাকে যেতে দেবে, তখন আপনি যাবেন প্রাসাদের দক্ষিণ দরজায়। কথাগুলো আবার বলবেন, লোকটা উত্তর দেবে 'মারুক, যখন তার খুশী,' তখন তার হাতে দেবেন চিঠিখানা। এইটি হ'ল প্রবেশের সঙ্কেত, মামামশাই আমায় ব'লে দিয়েছেন, কারণ এখন দেশের অবস্থা অশান্ত, প্রজারা রাজার প্রাণ নেবার চক্রান্ত করে, তাই আজকাল রাত্রে এই সঙ্কেত-বাক্য না বল্‌লে কেউ আর প্রাসাদের অঙ্গনে ঢুকতে পারে না। আপনি যদি তাঁর কাছে দয়া ক'রে চিঠিখানা নিয়ে যান তাহলে আমার মা চোখ বোজার আগে ভাইকে একবার দেখতে পারেন!"

ডেভিড ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "দিন আমাকে। কিন্তু এত রাতে রাস্তা দিয়ে আপনাকে একলা বাড়ী ফিরতে দিই কেমন ক'রে? বরং আমি…"

"না, না, ছুটে যান! এখন একটি মুহূর্ত্ত মহামূল্য রত্নের মত! একদিন" মেয়েটি বলিল বেদিয়ার মত দীর্ঘায়ত ছলভরা চোখে, "আপনার দয়ার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ দেবার চেষ্টা করব!"

চিঠিখানা বুকের মধ্যে গুঁজিয়া সিঁড়ি দিয়া লাফাইতে লাফাইতে কবি নামিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে মেয়েটি নীচের ঘরে ফিরিয়া আসিল।

মার্কুইসের জিজ্ঞাসু ভ্রূযুগল তার পানে ফিরিল।

"সে চলে গেছে চিঠি দিতে," মেয়েটি বলিল, "লোকটি তার পালিত ভেড়ার মতই নির্ব্বোধ ও দ্রুতগামী!"

ক্যাপ্‌টেন দেসরোলের মুষ্ট্যাঘাতে টেবিল আবার কাঁপিয়া উঠিল।

"সর্ব্বনাশ!" সে বলিয়া উঠিল, "আমার পিস্তল ফেলে এসেছি! আর কোনো অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই!"

"এই নাও," মার্কুইস বলিল, ওভারকোটের তলা থেকে একটা প্রকাণ্ড ঝকঝকে অস্ত্র বাহির করিয়া—তার উপর খোদাই-করা রূপার কাজ। "এর চেয়ে ভাল অস্ত্র আর পাবে না! কিন্তু সাবধানে রেখ, কারণ এর ওপর আমার কুলচিহ্ন খোদাই করা আছে—এমনিতেই ত আমাকে কর্ত্তৃপক্ষ সন্দেহ করে! আজই রাতে পারী ছেড়ে বহুক্রোশ দূরে স'রে যেতে হবে! কাল পল্লীভবনে আমার উপস্থিতি দরকার। চলুন আগে, কাউন্টেস!"

মার্কুইস ফুঁ দিয়া বাতি নিবাইয়া দিল। মহিলাটি ঢাকাঢুকি দিয়া এবং ভদ্রলোক দু'জন নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রাস্তার অপ্রশস্ত ফুটপাথের উপর প্রবাহিত জনস্রোতের মধ্যে মিশিয়া গেল।

ডেভিড দ্রুতগতি চলিল। প্রাসাদের দক্ষিণ তোরণে রক্ষী তলোয়ারের ডগা তার বুকের উপর ঠেকাইল কিন্তু সে সঙ্কেত-বাক্য উচ্চারণ করা মাত্র তলোয়ার সরাইয়া খাপে ভরিয়া ফেলিল।

"যেতে পারো ভাই," রক্ষী বলিল, "শীঘ্র যাও!"

প্রাসাদের দক্ষিণ সোপানে রক্ষীরা তাহাকে ধরার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু আবার সেই সঙ্কেত-বাক্য তাহাদের নিরস্ত করিল। তাদের মধ্যে একজন অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিল: "মারুক সে"—কিন্তু তখনই রক্ষীদের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাওয়ায় বুঝা গেল, অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটিয়াছে। এক ব্যক্তি, তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং পদক্ষেপ সৈনিকের মত, হঠাৎ ভিড় ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়িয়া ডেভিডের হাত থেকে খপ্‌ করিয়া চিঠিখানা কাড়িয়া লইল। "এস আমার সঙ্গে" বলিয়া সে ডেভিডকে প্রকাণ্ড হলের মধ্যে লইয়া গেল। তার পর খামখানা ছিঁড়িয়া

চিঠি বাহির করিয়া পড়িল। সেনানায়কের বেশে এক ব্যক্তি পাশ দিয়া যাইতেছিল, সে তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল। "ক্যাপ্টেন ভেন্তরো, দক্ষিণের ফটক আর দরজার রক্ষীদের গ্রেপ্তার করিয়ে বন্ধ ক'রে রাখ। আর তাদের জায়গায় বিশ্বাসী লোক মোতায়েন করো!" ডেভিডকে বলিল, "এস আমার সঙ্গে।"

বারান্দা পার হইয়া একটা ছোট ঘরের ভিতর দিয়া তাহাকে লইয়া সে একটা প্রশস্ত কক্ষে উপস্থিত হইল। এক জন বিষণ্ণ লোক কালো পোষাক পরিয়া মস্ত একখানি চর্ম্মাবৃত চেয়ারে চিন্তিতমুখে বসিয়াছিল। উক্ত ব্যক্তিকে সে বলিল—

"রাজন্, আমি আপনাকে ইতিপূর্ব্বে বলেছি নর্দ্দামা যেমন ইঁদুরে ভর্ত্তি থাকে আপনার প্রাসাদও তেমনি বিশ্বাসঘাতক ও গুপ্তচরে পরিপূর্ণ। আপনি ভাবতেন এ আমার নিছক কল্পনা। কিন্তু তাদেরই সাহায্যে এই লোকটা আপনার দরজা পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। এর সঙ্গে ছিল একখানা চিঠি সেটা আমি হস্তগত করেছি। কাজটা পাছে বাড়াবাড়ি ভাবেন সেই ভয়ে আমি একে সঙ্গে এনেছি!"

চেয়ারে নড়িয়া বসিয়া রাজা বলিলেন, "আমি ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই।" ফুলো ফুলো ঘোলাটে চোখে তিনি ডেভিডের পানে তাকাইলেন। কবি নতজানু হইল।

"কোথা থেকে তুমি এসেছ?" রাজা প্রশ্ন করিলেন।

"ইউরে-এ-লোয়ার প্রদেশের ভের্নয় গ্রাম থেকে।"

"প্যারীতে তুমি কি কাজ কর?"

"আমি—আমি কবি হবার চেষ্টা করছি, রাজন্!"

"ভের্নয়ে কি করতে?"

"বাবার মেষপালের তদ্বির করতুম!"

রাজা আবার নড়িয়া বসিলেন, তাঁর চোখের ঘোলাটে ভাব কাটিয়া গেল।

"ও! খোলা মাঠের মধ্যে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ!"

"মাঠের মধ্যে তুমি বাস করতে, কেমন? সকালবেলা ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় তুমি বাহির হয়ে যেতে আর ঝোপঝাড়ের পাশে ঘাসের উপর থাকতে শুয়ে; তখন পাহাড়ের ধারে ধারে মেষপাল পড়ত ছড়িয়ে; প্রবাহিণী ঝর্ণাধারা থেকে তুমি জল পান করতে; তোমার সুস্বাদু বাদামী রুটি ছায়ায় ব'সে ব'সে তুমি খেতে, আর নিশ্চয়ই তখন শুনতে পেতে পত্রপুঞ্জের মাঝ থেকে পাখীরা গান গাইছে। কেমন, নয় কি, মেষপালক?"

"ঠিক তাই, রাজন্," দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া ডেভিড উত্তর দিল, "আর শুনতুম ফুলে ফুলে মৌমাছিদের গুঞ্জন, আর হয় ত শুনতুম পাহাড়ের ওপর আঙুর তুলতে তুলতে কারা গান গাইছে!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ", অসহিষ্ণুভাবে রাজা বলিলেন, "হয় ত সে সব শুনতে, কিন্তু নিশ্চয়ই শুনতে পেতে পাখীদের গান! পত্রপুঞ্জের মাঝে সর্ব্বদাই তারা শিষ দিত, কেমন, নয় কি?"

"আমার গ্রামের পাখীরা যেমন মধুর শিষ দিত তেমন আর কোথাও নয়, রাজন্! কবিতায় সেই সব পাখীর গানকে রূপ দেবার চেষ্টা আমি করেছি।"

"আবৃত্তি করতে পার সে-কবিতা?" রাজা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন। "ওঃ কতকাল আগে আমি পাখীর গান শুনেছিলুম! দেখ, তাদের গানের অর্থ যদি কেউ সঠিক উদ্ধার করতে পারত তবে তার কাছে সাম্রাজ্য কোন্ ছার! রাত হ'লে তুমি মেষপালকে খোঁয়াড়ের মধ্যে বন্ধ করতে, তার পর পরম শান্তিতে প্রশান্ত মনে তোমার মিষ্টি রুটি ব'সে ব'সে খেতে, কেমন? সে-কবিতা আবৃত্তি করতে পার, মেষপালক?"

মেষপালক রাজাদেশ পালন করিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া ডিউক বলিল, "আপনার অনুমতি নিয়ে রাজন্ এই ছড়াকারকে দু-একটা প্রশ্ন করতে চাই। সময় আর নেই। আমায় ক্ষমা করবেন, রাজন্, আপনার নির্ব্বিঘ্নতার জন্যে আমার এই উদ্বেগে যদি বিরক্তি বোধ করেন!"

"ডিউক দোমালের রাজভক্তি এতই সুপ্রতিষ্ঠ যে তাতে বিরক্ত হওয়ার উপায় আছে কি?" এই কথা বলিয়া রাজা চেয়ারের উপর নেতাইয়া পড়িলেন, আবার তাঁর দৃষ্টি ঘোলাটে হইয়া উঠিল।

"প্রথমেই", ডিউক বলিল, "ও যে চিঠি এনেছে সেখানা পড়ি"—

'আজ রাত্রে দোফ্যার মৃত্যুর স্মৃতিবার্ষিকী। অভ্যাস-মত, তিনি যদি পুত্রের আত্মার কল্যাণ-কামনায় মাঝরাতের উপাসনায় যোগ দিতে যান তবে রিউএ-এসপ্লানাদের কোণে বাজপাখী আঘাত করিবে। তাঁর এরূপ অভিরুচি থাকিলে প্রাসাদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উপরের ঘরে একটা লাল আলো রাখিয়ো, যাহাতে বাজপাখী বুঝিতে পারে!'

"কৃষাণ", ডিউক কঠোর কণ্ঠে বলিল, "শুনলে ত? বল এখন, কে তোমাকে এই চিঠি দিয়েছে?"

"শুনুন হুজুর", ডেভিড সরল ভাবে বলিল, "বলছি আপনাকে। চিঠি দিয়েছেন এক জন মহিলা। তিনি আমাকে বললেন, তাঁর মা পীড়িত, এবং এই চিঠি তাঁর মামাকে রোগিণীর শয্যার পাশে নিয়ে আসবে। এই চিঠির অর্থ আমি বুঝি না, কিন্তু আমি শপথ ক'রে বলতে পারি যে পত্রলেখিকা সুন্দরী ও নিষ্পাপ।"

"বর্ণনা কর স্ত্রীলোকটিকে", ডিউক আদেশ করিল, "আর বল কি ক'রে তুমি তার খপ্পরে পড়লে।"

"তাঁকে বর্ণনা করব!" ডেভিড বলিল, কোমল মৃদু হাসিয়া। "আপনি শব্দকে অঘটন ঘটাতে বলেন না কি? তিনি আলোছায়ায় গঠিত। দীপশিখার মত তন্বী, তারই ছন্দ তাঁর চলনে। চোখদুটি ক্ষণে ক্ষণে বদলায়; এই মুহূর্তে বৃত্তাকার, পর মুহূর্তে অর্দ্ধমুদ্রিত—দুখানি মেঘের মাঝে অরুণাভাসের মত। যখন আসেন তখন চারি দিকে বিরাজ করে স্বর্গ; বিদায় নিলে সব শূন্য, তখন কেবল কাঁটাফুলের গন্ধ। তিনি আমার কাছে এসেছিলেন উনত্রিশ নম্বর রিউএ-কঁতিতে।"

রাজার পানে ফিরিয়া ডিউক বলিল, "ওই বাড়ীটার উপরই আমরা নজর রেখেছি। কবির বর্ণনাগুণে আমরা কুখ্যাতা কাউন্টেস কিবেদোর ছবি দেখতে পেলুম।"

"রাজন্ এবং হুজুর ডিউক", ডেভিড ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, "আশা করি আমার নগণ্য কথায় কারও অপকার হবে না। আমি মেয়েটির চোখে দৃষ্টিপাত করেছি। জীবন পণ রেখে বলতে পারি, তিনি দেবী—তা চিঠি থাকুক আর নাই থাকুক!"

ডিউক তার পানে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল, "আমি তোমাকে পরখ করব" সে ধীরে ধীরে বলিল। "রাজবেশে রাজশকটে তুমিই যাবে মাঝ রাতের উপাসনায়! কেমন, রাজি?"

ডেভিড ঈষৎ হাসিল। "আমি তাঁর চোখে দৃষ্টিপাত করেছি", সে বলিল। "প্রমাণ পেয়েছি আমি সেখানেই। আপনার প্রমাণ নিন যেমন আপনার অভিরুচি!"

রাত্রি দুই প্রহরের আধঘণ্টা পূর্ব্বে ডিউক দোমাল্ স্বহস্তে প্রাসাদের দক্ষিণ-পশ্চিম জানালায় একটি লাল আলো রাখিয়া দিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট আগে আপাদমস্তক রাজবেশে ঢাকিয়া তার হাতের উপর ভর দিয়া কোর্ত্তার মধ্যে মাথা নত করিয়া ডেভিড রাজকক্ষ থেকে বাহির হইয়া ধীরপদে শকটে গিয়া উঠিল। ডিউক তাহাকে ভিতরে তুলিয়া দিয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। গাড়ী নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া গীর্জ্জা অভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

ওদিকে রিউএ-এসপ্লানাদের কোণে একটা বাড়ীতে ক্যাপ্‌টেন তেতরো কুড়ি জন অনুচরসহ উৎকণ্ঠিত আগ্রহে অপেক্ষা করিয়া ছিল—চক্রীরা আবির্ভূত হইলেই তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

কিন্তু মনে হইল, কোন কারণে, চক্রীরা তাদের কার্য্যক্রম কিছু বদল করিয়াছে। কারণ, রিউএ-এসপ্লানাদের চেয়ে আরও খানিকটা কাছে রিউএ-ক্রিস্তোফে রাজশকট পৌঁছিলে ক্যাপ্‌টেন দেস্‌রোল হব্ রাজহন্ত্রীদলের সঙ্গে চকিতে বাহির হইয়া উহা আক্রমণ করিল। শকটারোহী রক্ষীরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে আক্রান্ত হইয়া বিস্মিত হইলেও গাড়ী হইতে নামিয়া সাহসের সহিত লড়িতে লাগিল। লড়াইয়ের সোরগোলে আকৃষ্ট হইয়া ক্যাপ টেন তেতরোর দলও দ্রুতগতি আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু, ইতিমধ্যে, দুঃসাহসী দেস্‌রোল রাজ-শকটের দরজা ভাঙিয়া ভিতরের কালো কোর্ত্তায় আবৃত মূর্ত্তির উপর পিস্তল ঠেকাইয়া ছুড়িয়া দিয়াছে।

বিশ্বাসী সৈন্যদলের অসির ঝনঝনা ও চীৎকারে পথ যখন সচকিত হইয়া উঠিল তখন গাড়ী লইয়া ভীত ঘোড়াগুলো ছুটিয়া পালাইয়াছে, এবং সেই গাড়ীর ভিতর গদির উপর পড়িয়া আছে নকল রাজা ও কবির গতপ্রাণ দেহ—মার্কুইস দ্য বোপার্তির পিস্তল থেকে নির্গত গুলির ঘায়ে নিহত।

আসল পথে

পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত সেই পথ গিয়া এক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। উহা একটা বৃহত্তর পথে পড়িয়া রচনা করিয়াছে এক সমকোণ। ডেভিড ক্ষণকাল দ্বিধাভরে দাঁড়াইল, তার পর পথের ধারে বিশ্রাম করিতে বসিল।

পথগুলো কোথায় গিয়াছে সে জানে না। তার মনে হইল যে-কোন পথের প্রান্তে আছে সম্ভাবনায় ভরা বিপদ-সঙ্কুল বিশাল জগৎ। তার পর সেখানে বসিয়া বসিয়া তার চোখ পড়িল একটি উজ্জ্বল তারার উপর। এই তারাটি তাহার পরিচিত, ইহাকে সে ও য়োন্ বড় ভালবাসে, ইহাকে কত দিন দুজনে একত্রে বসিয়া লক্ষ্য করিয়াছে। এই চিন্তায় য়োনের কথা মনে পড়িল, সে ভাবিতে

লাগিল এতটা রাগের প্রয়োজন হয়ত ছিল না! সামান্য কথা-কাটাকাটি হইয়াছে মাত্র, তার জন্য গৃহত্যাগী হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে এমন কোন কথা নাই! ভালবাসা কি এতই ভঙ্গুর পদার্থ যে ঈর্ষ্যা, যা প্রেমেরই প্রমাণ, সেই ঈর্ষ্যা ভালবাসাকে নষ্ট করিতে পারে? সন্ধ্যার ছোটখাট মনোবেদনা সকালে নিশ্চিত সারিয়া যায়। বাড়ী ফেরার এখনও সময় আছে, শান্তস্নিগ্ধ ভেবুনয় গ্রামে কেহ জানিতেও পারিবে না! তার হৃদয় অধিকার করিয়া আছে য়োন্। ডেভিডের মনে হইল, এই গ্রাম, যেখানে সে চিরদিন বাস করিয়াছে, এখানে কাব্যও রচনা করা যায় সুখও পাওয়া যায়!

ডেভিড দাঁড়াইল, যে-পাগলামি ও অশান্তি তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল তাহা ঝাড়িয়া ফেলিল। তার পর যে-পথে আসিয়াছিল সেই পথে আবার ফিরিয়া চলিল। অবিচলিত পদে ভেবুনয়ে যখন গিয়া পৌছিল তখন ভ্রমণের সাধ মিটিয়াছে। ভেড়ার খোঁয়াড় অতিক্রম করিয়া সে গেল, এত রাত্রে তার পদশব্দে মেষপাল চঞ্চল হইয়া হুড়োহুড়ি করিতে লাগিল, পরিচিত শব্দে ডেভিডের মন খুশী হইয়া উঠিল। নিঃশব্দে পা টিপিয়া টিপিয়া সে তার ছোট কুঠরিতে ঢুকিয়া শুইয়া পড়িল, সে-রাত্রে নূতন পথ চলার কষ্ট হইতে তার পা দুটো অব্যাহতি পাইয়াছে ভাবিয়া সে আরাম পাইল।

নারীর মন জানিতে তার আর বাকি নাই! পরদিন সন্ধ্যায় পথের ধারের কূপের কাছে য়োন্ উপস্থিত, সেখানেই পাড়ার যুবক-যুবতীরা জমা হয়—নহিলে ধর্ম্মযাজক যে বেকার হইয়া পড়িবেন! য়োনের কঠিন মুখ দেখিয়া তাহাকে নিষ্ঠুর মনে হইলেও সে আড়চোখে ডেভিডকে অন্বেষণ করিতেছিল। ডেভিড সেই দৃষ্টি দেখিল, তার মুখ দেখিয়া ভড়কাইল না। যথাসময়ে সেই মুখ দিয়াই ভর্ৎসনা-প্রত্যাহার-বাণী বাহির করাইল এবং পরে একত্রে বাড়ীমুখো যাইবার পথে প্রণয়িনীর কাছে একটি চুম্বনও আদায় করিয়া লইল।

তিন মাস পরে দুজনের বিবাহ হইল। ডেভিডের পিতা চালাক-চতুর সঙ্গতিপন্ন লোক। এমন ঘটা করিয়া বিবাহ দিল যে সে-কাহিনী আশপাশে পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। বর-বধূ উভয়েই গ্রামবাসীর প্রিয়, সুতরাং সকলেই মাতিল উৎসবে। পথে শোভাযাত্রা, মাঠের উপর নাচ, ক্রীড়া-কসরত, নিমন্ত্রিত অতিথি-অভ্যাগতের চিত্তবিনোদনের জন্ত কতমত আয়োজন!

বছর খানেক পরে ডেভিডের পিতা গেল পরলোকে, মেষপাল ও ঘরবাড়ীর মালিক হইল ডেভিড। গ্রামের সেরা সুন্দরী ত ইতিপূর্ব্বেই তার পত্নী হইয়াছে। য়োনের দুধের ঘড়া আর পিতলের কলসী চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ করে, সে-পথে যাইবার সময় তার উপর থেকে রোদ ঠিকরাইয়া পড়িয়া পথিকের চোখে ধাঁধা লাগায়। পরমুহূর্ত্তে তার উঠানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে পরিচ্ছন্ন রঙীন ফুলের কেয়ারিগুলি তার চোখ জুড়ায়। আর কামারশাল ছাড়াইয়া জোড়া বাদাম গাছ পর্য্যন্ত য়োনের গান সকলে শুনিতে পায়।

কিন্তু একদিন ডেভিড দীর্ঘকাল-বদ্ধ টেবিলের টানা থেকে কাগজ বাহির করিয়া পেন্‌সিলের ডগা কামড়াইতে সুরু করিল। আবার বসন্ত আসিয়া তার হৃদয়ে দোলা দিয়াছে। কবি সে নিঃসন্দেহ, কারণ এখন য়োন্‌কে সে প্রায় ভুলিয়া গেল। প্রকৃতির এই মনোরম অভিনব সৌন্দর্য্য তার যাদুমন্ত্রে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তার কানন ও প্রান্তরের সৌগন্ধ তাহাকে অদ্ভুতভাবে বিচলিত করিল। এ যাবৎ প্রতিদিন মেষপাল লইয়া সে বাহির হইয়াছে, আবার নিশাগমে তাহাদের ঘরে ফিরাইয়া আনিয়াছে। কিন্তু এখন সে ঝোপঝাড়ের তলায় লম্বা হইয়া পড়িয়া কাগজের টুকরার উপর কেবল কথার মালা গাঁথিয়া চলিল। ওদিকে ভেড়াগুলো যথেচ্ছ ভ্রমণের ফলে বিপথে গিয়া পড়ায় নেকড়ের দল বুঝিতে পারিল কঠিন কবিতা সৃষ্টি করে সহজলভ্য মেষমাংস। তাহারা বন হইতে বাহির হইয়া স্বচ্ছন্দে মেষশাবক চুরি করিতে লাগিল।

ডেভিডের কবিতার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেষের সংখ্যা লাগিল কমিতে। য়োনের নাকও ততই ফুলিতে লাগিল, মেজাজ হইল রুক্ষ এবং বচন হইল কঠিন। তার বাসনপত্র আর ঝক্‌ঝক করে না, সে-দীপ্তি পৌছিল তার চোখে। কবিকে সে দেখাইয়া দিল যে তার অমনোযোগের ফলে মেষপাল কমিতেছে এবং সংসারে ঘটিতেছে অনর্থ। তখন মেষপালের তত্ত্বাবধান করার জন্ত ডেভিড এক বালক-ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া বাড়ীর উপরের কুঠরির মধ্যে ঢুকিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কাব্যরচনায় মন দিল। এই বালক-ভৃত্যও জাত-কবি, কিন্তু লিখিয়া মন হালকা করার উপায়ের অভাবে সে নিদ্রার শরণ লইল;

কাব্যরচনা ও নিদ্রা যে সমান ফল দান করে তাহা আবিষ্কার করিতে নেকড়েদের বিলম্ব হইল না, তাই মেষপাল নিয়মিত কমিতে লাগিল এবং সমান তালেই য়োনের মেজাজের রুক্ষতা বাড়িয়া চলিল। অসহ্য বোধ হইলে কখনও কখনও সে উঠানে দাঁড়াইয়া ডেভিডের উঁচু জানালার দিকে মুখ তুলিয়া তাহাকে গালমন্দ করিত। তখন তার কণ্ঠস্বর শোনা যাইত কামারশাল ছাড়াইয়া জোড়া বাদাম গাছ পর্য্যন্ত।

অবশেষে, পাপিনো—সহৃদয়, বিজ্ঞ এবং পরের জন্য যাঁর মাথাব্যথা করিত—প্রাচীন 'নোটারি' মহাশয় ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। যথাসময়ে তিনি ডেভিডের কাছে হইলেন উপস্থিত। খুব খানিকটা নস্য টানিয়া চিত্তে বল সঞ্চয় করিয়া লইয়া কহিলেন—

"বন্ধু মিগ্‌নো, তোমার পিতার বিবাহের সার্টিফিকেটে আমিই 'সীল্' বসাই। এখন তাঁর সন্তানের দেউলিয়া-সার্টিফিকেটে যদি সহি দিতে হয় তবে সেটা বড়ই পরিতাপের কারণ হবে। কিন্তু সেই দিকেই তুমি চলেছ মনে হচ্ছে। কথাটা অবশ্য তোমাদের পরিবারের পুরনো বন্ধু হিসেবেই বলছি। আমার বক্তব্যটা মন দিয়ে শোন। দেখতে পাচ্ছি তোমার মন পড়েছে কাব্য রচনার উপর। দ্রো'তে আমার এক বন্ধু থাকেন, তাঁর নাম ম্যসিয় ব্রিল্। বইয়ের গাদার মধ্যে একটুখানি জায়গা ক'রে নিয়ে তারই মধ্যে তিনি বাস করেন। পণ্ডিত লোক, প্রতি বছর যান পারীতে, নিজেও বই লিখেছেন। তিনি তোমাকে বলতে পারবেন কবে 'ক্যাটাকোম্' তৈরি হয়েছিল, নক্ষত্রের নাম কি ক'রে জানা গেল, পক্ষীবিশেষের চঞ্চু লম্বা কেন। ভেড়ার ব্যা-ব্যা রব তোমার কাছে যেমন স্পষ্ট, কাব্যের অর্থ ও রূপ তাঁর কাছে তেমনি সহজবোধ্য। তাঁর নামে তোমার হাতে চিঠি দিচ্ছি, তোমার কবিতা নিয়ে তাকে পড়তে দাওগে। তাহলে তুমি বুঝতে পারবে কবিতা রচনা করেই চলবে, না পত্নী ও ব্যবসার দিকে মন দেবে!"

"দয়া ক'রে চিঠিখানা লিখে দিন," ডেভিড বলিল, "একথা আগে বলেন নি কেন?"

পরদিন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে কবিতার তাড়া লইয়া দ্রো-র পথ ধরিল। দুপুরে ম্যসিয় ব্রিলের দরজায় সে জুতার ধুলা ঝাড়িয়া ফেলিল। উক্ত পণ্ডিত ব্যক্তি পাপিনোর চিঠি খুলিয়া তাঁর ঝকঝকে চশমার ভিতর দিয়া চিঠির খবর শুষিয়া লইলেন যেমন করিয়া সূর্য্য জলকে শোষণ করে। ডেভিডকে তাঁর পাঠাগারের মধ্যে লইয়া গিয়া তাহাকে একটি ছোট দ্বীপের উপর বসাইলেন, সে দ্বীপের চতুর্দ্দিকে বইয়ের সমুদ্র।

ম্যসিয় ব্রিলের বিবেকবুদ্ধি ছিল। এক গাদা পাকানো পাণ্ডুলিপি দেখিয়াও তিনি ভড়কাইলেন না। কাগজগুলো হাঁটুর উপর চাপ দিয়া সোজা করিয়া লইয়া পড়িতে সুরু করিলেন। কিছুই তিনি তুচ্ছ করিলেন না; পোকা যেরূপে শাঁসের সন্ধানে বাদামের মধ্যে কুরিয়া কুরিয়া ছেঁদা করিয়া ফেলে, তিনিও তেমনি পাণ্ডুলিপির মধ্যে কাব্যের মর্ম্ম উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ওদিকে ডেভিড বসিয়া রহিল যেন কোন জাহাজ থেকে বিজন এক দ্বীপে সে পরিত্যক্ত হইয়াছে! বসিয়া বসিয়া সাহিত্যের শিকরকণায় সে শিহরিতে লাগিল। সাহিত্য-সমুদ্র তার শ্রুতিমূলে গর্জ্জন করিতেছে, সে-সমুদ্রে ভ্রমণ করার জন্য তার কোন নক্‌সাও নাই, কম্পাসও নাই। বইয়ের বহর দেখিয়া সে ভাবিতে লাগিল নিশ্চয়ই আধখানা জগৎ বই লিখিতেছে!

ব্রিল্-মহাশয় কাব্যের শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ছিদ্র করিয়া গেলেন। তার পর চশমা খুলিয়া রুমাল দিয়া তাহা সযত্নে মুছিয়া ফেলিলেন।

"আমার পুরানো বন্ধু পাপিনো কুশলে আছেন ত?" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"খুব ভাল আছেন", ডেভিড বলিল।

"কতগুলো ভেড়া তোমার আছে ম্যসিয় মিগ্‌নো?"

"কাল গুনেছি তিন-শ নয়। পালের বরাত মন্দ, আট-শ পঞ্চাশ থেকে এইতে দাঁড়িয়েছে।"

"তোমার স্ত্রী আছে, ঘরবাড়ী আছে, বেশ স্বচ্ছন্দে ছিলে। ভেড়া থেকে আয় ছিল যথেষ্ট। তাদের নিয়ে খোলা মাঠে যেতে, কনকনে বাতাসে ব'সে তৃপ্তির সুস্বাদু রুটি খেতে। তোমাকে কেবল সতর্ক থাকতে হ'ত; প্রকৃতির বুকে হেলান দিয়ে শুনতে পাখীরা কুঞ্জবনে শিষ দিচ্ছে। কেমন, ঠিক কি না আমার কথা এ পর্য্যন্ত?"

ডেভিড বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

"আমি তোমার সমস্ত কবিতা পড়েছি", ম্যসিয় ব্রিল্ বলিতে লাগিলেন—চোখ দুটি তাঁর গ্রন্থ-সমুদ্রে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল যেন দিগন্তে একখানা পালের সন্ধান করিতেছে। "জানালার ভিতর দিয়ে ওই হোথায় চেয়ে দেখ, ঐ গাছে কী দেখছ বল ত?"

"একটা কাক দেখছি", সেই দিকে চাহিয়া ডেভিড বলিল।

"ঐ একটা পাখী", ম্যাসিয় ব্রিল্ কহিলেন, "কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করার প্রবৃত্তি এলে আমাদের সতর্ক করতে পারে। ও পাখীকে তুমি চেনো, ও হ'ল আকাশের দার্শনিক। নিজের অবস্থা মেনে নিয়ে ও সুখী। ওর খামখেয়ালী চোখ আর নাচুনে চলন নিয়ে ওর মত এত আনন্দ কার, বুকের পাটাই বা কার? সে যা চায় মাঠ থেকেই পায়। তার পালক ময়ূরের মত চিত্রবিচিত্র নয় ব'লে সে কখনও দুঃখ করে না। আর প্রকৃতি তার কণ্ঠে যে সুর দিয়েছে তা তুমি শুনেছ নিশ্চয়? নাইটিংগেল্ কি ওর চেয়ে সুখী তোমার মনে হয়?"

ডেভিড দাঁড়াইয়া উঠিল। গাছ থেকে কাক কর্কশ স্বরে কা-কা রব তুলিল।

"ধন্যবাদ; ম্যাসিয় ব্রিল্", ধীরে ধীরে সে বলিল। "তা হ'লে আমার ঐ সব 'কা-কা ধ্বনি'র মধ্যে একটি নাইটিংগেল-স্বরও বাজে নি?"

"আমার চোখে না-পড়ার কথা নয়", দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া ম্যাসিয় ব্রিল্ কহিলেন। "আমি প্রত্যেক কথা পড়েছি। কবিতার মধ্যে বাস ক'রো হে, কবিতা লেখার চেষ্টা ক'রো না!"

"ধন্যবাদ", ডেভিড আবার বলিল। "উঠি তা হ'লে, মেষপালের কাছে ফিরতে হবে।"

পড়িয়ে-মানুষটি বলিলেন, "আমার সঙ্গে যদি আহার কর আর মনে যদি কষ্ট না-পাও তবে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতে পারি!"

কবি বলিল, "না, আমাকে মাঠে ফিরে ভেড়া তাড়াতে হবে!"

কবিতার পাণ্ডুলিপি হাতে লইয়া আবার সে ভের্নয় অভিমুখে ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ করিয়া চলিল। গ্রামে পৌঁছিয়া সে ইহুদী জ্যেগ্‌লারের দোকানে গিয়া ঢুকিল। লোকটি যা পায় তাই বিক্রি করে।

"ভাই", ডেভিড বলিল, "বন থেকে নেকড়ে এসে পাহাড়ের ওপর আমার ভেড়া ধরছে। তাদের রক্ষার জন্তে অস্ত্র চাই। আছে তোমার কাছে?"

হাতদুটো ছড়াইয়া ধরিয়া জ্যেগ্‌লার বলিল, "বুঝতে পারছি আজ দিন বড় খারাপ বন্ধু, কারণ জলের দরে তোমাকে একটা অস্ত্র বিক্রি করতে হবে! এই গেল হপ্তায় ফিরিওয়ালার কাছ থেকে এক গাড়ী মাল কিনেছি, মালগুলো সে কিনেছিল সরকারী নিলাম থেকে। মস্ত বড় কোনও ওমরাহের প্রাসাদ ও জিনিষপত্রের নিলাম—তাঁর নাম জানি না—রাজদ্রোহ-অপরাধে তাঁকে নির্ব্বাসিত করা হয়েছে। সেই মালের মধ্যে আছে বাছা বাছা কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র। এই পিস্তলটি—রাজপুত্রের হাতেই এ অস্ত্র মানায়!—তোমাকে বন্ধু, চল্লিশ ফ্রাঁতে* দেব—যদিও তাতে ক'রে আমার দশ ফ্রাঁ লোকসান হবে। তবে হয় ত—"

"এতেই হবে", ডেভিড বলিল টাকাটা ফেলিয়া দিয়া। "ভরা আছে ত?"

"দিচ্ছি ভ'রে", জ্যেগ্‌লার বলিল, "আরও দশ ফ্রাঁয়† অতিরিক্ত গুলি বারুদ দিয়ে দিচ্ছি।"

কোটের তলায় পিস্তল লইয়া ডেভিড বাড়ী পৌঁছিল। য়োন্ উপস্থিত ছিল না, ইদানীং সে পাড়া-বেড়ানী হইয়াছে। কিন্তু রান্নাঘরের ষ্টোভে আগুন গনগন করিতেছিল। ডেভিড ষ্টোভের দরজা খুলিয়া জ্বলন্ত কয়লার উপর কবিতার পাণ্ডুলিপি গুঁজিয়া দিল। কাগজগুলো যখন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল তখন একটা কর্কশ একটানা শব্দ উঠিল।

"কাকের গান!" কবি বলিল।

উপরের কুঠরিতে উঠিয়া গিয়া সে দ্বার রুদ্ধ করিল। গ্রাম এমন নিস্তব্ধ [illegible] লোককে শুনিতে পাইল প্রকাণ্ড পিস্তলের গর্জ্জন। দেখিতে দেখিতে ভিড় জমিয়া গেল। তার পর ধোঁয়া বাহির হইতে দেখিয়া সিঁড়ি দিয়া সকলে উপরে উঠিল।

ধরাধরি করিয়া বিছানার উপর কবির দেহ তাহারা তুলিয়া দিল, হতভাগ্য 'দাঁড়কাকের ছিন্নভিন্ন পালকগুলো' গোপন করার জন্য অপটু হাতে ঢাকাঢুকি দিতে লাগিল। অনুকম্পা প্রকাশের সুযোগ পাইয়া সমবেত স্ত্রীলোকেরা সাগ্রহে কলরব জুড়িয়া দিল। আবার তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছুটিল য়োন্‌কে খবর দিবার জন্য।

পাপিনো-মহাশয় ঘ্রাণশক্তির প্রভাবে সেখানে প্রথম দলেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। অস্ত্রটা তুলিয়া লইয়া তার রূপার কারুকার্য্যের উপর চোখ বুলাইতে লাগিলেন—মুখে তাঁর যুগপৎ শোক ও সমঝদারের ভাব প্রকাশ পাইল। তিনি ধর্ম্মযাজককে বুঝাইয়া বলিলেন—এই যে কুলচিহ্ন দেখছেন, এ হচ্ছে মার্কুইস দ্য বোপার্তির!‡

* আন্দাজ ২৪৲ টাকা

† আন্দাজ ৬৲ টাকা।

‡ বিদেশী গল্প।

পালিপিটকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কথা

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য, এম. এ.

বৌদ্ধ ত্রিপিটকে আমরা তৎকালীন ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাই। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী,—এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ প্রায় একমত। পিটকগুলিতে প্রসঙ্গক্রমে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনেক কথাই আলোচিত হইয়াছে; আমরা সেই তথ্যগুলি হইতে বৌদ্ধ যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের একটি ঐতিহাসিক চিত্রের পরিকল্পনা করিতে পারি। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই, ব্রাহ্মণেরা জাতিহিসাবে বা বর্ণহিসাবে অন্য বর্ণের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করিতেছেন। সুত্তপিটকের নিকায়গুলিতে যে ভাবে এই সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কের অবতারণা ও বুদ্ধদেবের প্রতিবাদের বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চ চিন্তা ছাড়িয়া ব্রাহ্মণেরা আভিজাত্যের দ্বন্দ্বে ব্যস্ত ছিলেন, এবং ক্ষত্রিয়েরা ইহার বিরোধিতা করিতেছিলেন; বিশেষতঃ শাক্যবংশীয়েরা ব্রাহ্মণদিগকে বংশের আভিজাত্যে নিজেদের অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করিতেন (অম্বট্ঠসুত্ত দীঘনিকায়)। স্বয়ং বুদ্ধদেবও ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠবর্ণ, ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন দেখিতে পাই; বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ সনৎকুমারের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্রাহ্মণদের মুখ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন :—

খত্তিয়ো সেট্‌ঠো জনে তস্মিম্‌
যে গোত্ত-পতিসারিণো।
বিজ্জাচরণ-সম্পন্নো সো সেট্‌ঠো
দেব-মানুসে' তি। —দীঘনিকায় ৩, ১, ২৮

অর্থাৎ যাহারা বর্ণের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করেন ক্ষত্রিয় তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠবর্ণ; কিন্তু যাহারা জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক তাহারা দেবতা ও মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ব্রাহ্মণেরা ইহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন :—

"ব্রাহ্মণা সেট্‌ঠো বণ্ণো, হীনো অঞ্ঞো বণ্ণো ব্রাহ্মণো ব সুক্কো বণ্ণো; কণ্‌হো অঞ্ঞো বণ্ণো; ব্রাহ্মণা ব সুজ্‌ঝন্তি নো অব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণা ব ব্রহ্মুণো পুত্তা ওরসা মুখতো জাতা ব্রহ্মজা ব্রহ্মনিম্মিতা ব্রহ্মদায়াদা ইতি। (দীঘনিকায় ২১)

অর্থাৎ একমাত্র ব্রাহ্মণেরাই শ্রেষ্ঠবর্ণ, অন্য জাতিরা হীনবর্ণ; ব্রাহ্মণেরা শুক্লবর্ণ, অন্য জাতি কৃষ্ণবর্ণ। ব্রাহ্মণদের মধ্যেই পবিত্রতা (রক্তের) রহিয়াছে, অব্রাহ্মণদের মধ্যে নাই; ব্রাহ্মণেরাই ব্রহ্মার সন্তান, তাঁহার মুখ হইতে জাত; তাঁহারাই বংশ ও ব্রহ্মত্বের উত্তরাধিকারী।

এইরূপ বাদানুবাদ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়—ব্রাহ্মণদিগের শ্রেষ্ঠত্ব তখনও পূর্ণভাবে স্থাপিত হয় নাই এবং ধর্ম্মজগতে অব্রাহ্মণ নেতারও অভাব ছিল না, ইহা আমরা পরে দেখাইব। বিশেষতঃ বুদ্ধদেব যে-ভাবে বেদের বিরুদ্ধ মতানুযায়ী স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিতেছিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি দলবদ্ধভাবে তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে তখনও মাথা তুলিয়া দাঁড়ান নাই। বৌদ্ধপূর্ব্ব যুগে ব্রাহ্মণেরা আদর্শ ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং জনসাধারণ তাঁহাদেরই আদর্শে ধর্ম্মজীবন অনুসরণ করিত, ইহার প্রমাণ বুদ্ধদেবের মুখেই আমরা শুনিতে পাই। এই সম্বন্ধে সুত্তনিপাতে কোশলদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের সহিত বুদ্ধদেবের আলোচনা হইতে অনেক বিষয় জানিতে পারি। বুদ্ধদেব নিজমুখে অজস্র প্রশংসায় প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং তাহা হইতে তাঁহার ধর্ম্মজীবনে ঋষিদিগের প্রভাব অনেকটা আমরা অনুমান করিতে পারি।*

লোকচক্ষে "ব্রাহ্মণ" এই শব্দটি পর্য্যন্ত এক বিশেষ মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল। যদিও বুদ্ধদেব জন্মগত ব্রাহ্মণত্বের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু গুণগত ব্রাহ্মণত্বের প্রশংসাই করিয়াছেন। তিনি নিজ সম্প্রদায়ে, যাহারা "অর্হৎ" অর্থাৎ চরম নির্ব্বাণের

* সুত্তনিপাত ২, ৭.

অধিকারী তাহাদিগকে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; এবং বুদ্ধদেবকেও এই বিশেষণে তদীয় শিষ্যেরা ভূষিত করিয়াছেন (মহাবগ্‌গো ১,১,৩-৭ ধম্মপদ ৪২২)।

বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—

ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো।
যম্‌হি সচ্চম্‌ চ ধম্ম চ সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো।

—ধম্মপদ ৩৯৩

অর্থাৎ জটা, বংশ বা জাতি ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক নহে, যাহার মধ্যে সত্য ও ধর্ম্ম আছে, তিনিই ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণেরা জন্মগত দাবি আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন; সমাজে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের যে জ্ঞানগত প্রাধান্ত ছিল, তাহারই গৌরবে বা প্রভাবে নানাবিধ নিয়ম প্রণয়ন করিয়া তাঁহারা সমাজে সেই দাবি অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। প্রাচীন ঋষিরা জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোচনায় জীবন যাপন করিতেন, সংসারের দিকে তাঁহারা বড় একটা লক্ষ্য করিতেন না, আমরা সুত্তনিপাতেও তাহার বিবরণ পাই। লোকে যাচিয়া যাহা দিত তাহাতেই তাঁহাদের অনাড়ম্বর জীবন কাটাইতেন; ক্ষত্রিয়েরা ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য ছিল যুদ্ধ, অন্‌-আর্য্য শত্রুদিগকে দমন করা এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা। বৈশ্যেরা কৃষিবাণিজ্য লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন; পরাজিত অন্‌-আর্য্যেরা দাসরূপে আর্য্য তিন বর্ণের সেবা করিত। এইস্থলে জাতিভেদের কারণ নির্ণয় করা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে, তথাপি পিটকগুলির বর্ণনা হইতে চারি বর্ণের উল্লেখ আমরা পাই। উপরি-উক্ত তিন বর্ণের মধ্যে বিবাহ অথবা ভোজন সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি সামাজিক নিয়মের উল্লেখ আমরা পিটকে পাই না। মজ্ঝিমনিকায়ে (৯৬) ব্রাহ্মণকৃত চারি বর্ণের কর্ম্মবিভাগের তালিকা পাওয়া যায়। আমরা উপরে চারি বর্ণের কর্ম্মের যে আলোচনা করিয়াছি, মজ্ঝিমনিকায়ের তালিকাও ঠিক তদনুরূপ। আবার, আমরা দেখিতে পাই—ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধদেবের নিকট সেবাধর্ম্ম সম্বন্ধে চারি বর্ণের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতেছেন; তাহাদের মতে অন্য তিন বর্ণ ব্রাহ্মণকে সেবা করিবে, ক্ষত্রিয়েরা অন্য দুই বর্ণের সেবা পাইবে, বৈশ্যেরা শূদ্রের এবং শূদ্রেরা অন্য শূদ্রের সেবা পাইবে। (মজ্ঝিমনিকায় ৯৬)

ব্রাহ্মণেরা সেই সময়ে যে শুধু শাস্ত্র লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন এমন নহে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই গৃহস্থের মত কৃষিকর্ম্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।* রাজসরকারেও ব্রাহ্মণেরা নানারূপ কর্ম্ম করিতেন। দীঘনিকায়ের প্রথম অধ্যায়ে আমরা ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে এইরূপ বিস্তৃত বিবরণ পাই। জাতকের গল্পগুলিতে ও নিকায়গুলির কোন কোনটিতে রাজ-পুরোহিতেরও উল্লেখ আছে। রাজাদের কেহ কেহ ব্রাহ্মণদিগকে গ্রাম ও সম্পত্তি দান করিতেন; কোশল-রাজ প্রসেনজিতের দানে লোহিচ্চ (লৌহিত্য) নামে এক ব্রাহ্মণ শালবাটিকায় রাজার ন্যায় বাস করিতেন (দীঘনিকায় ১২)। মজ্ঝিমনিকায়ে দেখিতে পাই 'জানুসনি' নামে এক ব্রাহ্মণ নেতা শ্বেত অশ্বের যানারোহণে চলিতেছেন। 'ব্রহ্মজালসুত্তান্তে' ব্রাহ্মণেরা যে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য অব্রাহ্মণোচিত বিবিধ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার এক বিস্তৃত তালিকা আমরা বুদ্ধদেবের মুখে শুনিতে পাই। সেই সময়ে ব্রাহ্মণগণের যে বিশেষ নৈতিক অধঃপতনও হইয়াছিল, তাহার বিবিধ প্রমাণ আমরা এই 'সুত্তান্তে' ও জাতকের গল্পগুলি হইতে অনুমান করিতে পারি। ভারতের ধর্ম্মজগতে তখন যেন এক বিপ্লবের যুগ চলিতে-ছিল; ধর্ম্মনেতা হিসাবে ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব অবিসম্বাদিত ছিল না; বুদ্ধদেবের সমকালে অথবা পূর্ব্বেই নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল পিটকে তাহার বর্ণনা আছে। সেই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মাত্র জৈন সম্প্রদায় এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। 'আজীবক' নামে আর একটি প্রতিষ্ঠাশালী ধর্ম্মসম্প্রদায় ছিল; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয় তাঁহার 'আজীবক' নামক গ্রন্থে কি কারণে এতগুলি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল এই সম্বন্ধে অনেক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন; এই স্থলে এই সম্বন্ধে

---

* দীঘনিকায় ৩, মজ্ঝিমনিকায় ৯১, সংযুক্ত নিকায় ১, ৭, ২. ১

বিশেষ আলোচনা করিব না। দীঘনিকায়ের 'ব্রহ্মজাল-সুত্তান্তে' ও পুথপাদ-সুত্তান্তে আত্মা ও কর্ম্মফল সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্যদর্শনের মতবাদের উল্লেখ আছে; লোকে আত্মা ও কর্ম্মফলে বিশ্বাস করিত, কর্ম্মফল অনুযায়ী স্বর্গ ও নরক ভোগ এবং পরজন্মে বিশ্বাসের ফলে লোকের মনে এক ধর্ম্মাতঙ্কের সৃষ্টি হয়।* ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম এই বিষয়ে কোন প্রকৃষ্ট মুক্তিপন্থা দিতে পারে নাই; বিশেষতঃ আড়ম্বরপূর্ণ যাগযজ্ঞের উপরেও লোকে শ্রদ্ধা হারাইতেছিল বলিয়া বোধ হয়, অধিকন্তু যাগযজ্ঞ সম্পাদন করা রাজা-মহারাজা ভিন্ন অন্য লোকের পক্ষে অসম্ভব ছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিই সংসার ত্যাগ করিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতেন; পিটকে ইহার বহুল দৃষ্টান্ত রহিয়াছে; এই সময়ে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি নিজ নিজ মত ও যুক্তি অনুযায়ী মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছিলেন এবং ইঁহাদের অনেকেই নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন না; ইঁহাদের অনেক শিষ্য ছিল; তাঁহারা প্রায় সকলেই কঠোর সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেন। দীঘনিকায়ে দ্বিতীয় সুত্তান্তে আমরা দেখিতে পাই, এই সকল সম্প্রদায় সমভাবে সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভ করিত।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন, তাঁহারা তখন প্রাচীন শাস্ত্রাদিই রক্ষা করিতে ব্যস্ত, ইহাতে স্মৃতিশক্তিই তাহাদের একমাত্র সহায়। অনেকে আশ্রমে বাস করিতেন, তাঁহারা শিষ্যদিগকে শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন ও ব্যাখ্যা করিতেন। শিষ্যপরম্পরায় আবৃত্তি ও স্মৃতিশক্তির সাহায্যে শাস্ত্র রক্ষা হইত। ব্যাকরণ, ইতিহাস প্রভৃতিরও উল্লেখ আমরা পাই। আমরা দেখিতে পাই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণত্বের দাবি বা লক্ষণে জন্মগত বিশুদ্ধতার সঙ্গে বেদ, পুরাণ, ব্যাকরণ, লক্ষণ, লোকায়ত প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শিতাও বিবেচিত হইত; নিকায়গুলিতে বার বারই ব্রাহ্মণদিগের মুখে ইহা ঘোষিত হইয়াছে; (দীঘনিকায়, ৪, ১৩)। ব্রাহ্মণেরা কোন গঠনমূলক কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ পিটকে নাই। বুদ্ধদেবের মুখে 'ব্রহ্মজাল-সুত্তান্তে' ব্রাহ্মণদের আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে ৬২ প্রকার দর্শনবাদের উল্লেখ করিয়াছেন; এই মতগুলি হইতে হিন্দুদর্শন ও উপনিষদের মতবাদের তৎকালীন পরিবেশের বিষয় অনুমান করা যাইতে পারে।

স্পষ্টই দেখা যায়, সন্ন্যাস-জীবনের উপর অপাত্রেরও লোভ হইত, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে যে কেহ সন্ন্যাসী হইলে সাধারণের ভক্তি ও সম্মানের পাত্র হইত, এমন কি রাজার কোন ভৃত্য যদি সন্ন্যাস অবলম্বন করিত, রাজা পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিলে আসন হইতে উঠিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিতেন (দীঘনিকায় ২)।

পালিপিটকে তিন বেদের (ঋক্, যজু ও সাম) উল্লেখ আছে।* অথর্ব্ববেদ সম্বন্ধে মুখ্যভাবে কোন উল্লেখ নাই; কিন্তু পিটকের নিকায়গুলিতে এবং জাতকে আমরা মারণ, বশীকরণ, ও সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য বিবিধ দেবতার ও উপদেবতার পূজার উল্লেখ দেখিতে পাই। আমাদের মনে হয় এইগুলিই পরবর্ত্তী কালে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া অথর্ব্ববেদের সৃষ্টি করিয়াছে। পিটকের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় ব্রাহ্মণেরা তখন জীবিকানির্ব্বাহের জন্য এই সকল দেবতা, উপদেবতা ও ভূতপ্রেতের পূজা গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। দীঘনিকায়ের প্রথম অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত তালিকা আছে; হস্তরেখা বিচারের দ্বারা জীবনের ফলাফল বলিয়া দেওয়া, ফলিত জ্যোতিষের চর্চ্চা, গ্রহদোষ ক্ষালনার্থ শান্তি স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি দ্বারাও ব্রাহ্মণেরা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, যাগযজ্ঞ করা সাধারণের সামর্থ্যের বাহিরে ছিল, কাজেই উপরি-উক্ত সহজ প্রণালীতে ধনপুত্রলাভ ও সঙ্কল্প সিদ্ধির আশায় লোকে ইহা সম্পাদন করিত। ইহা বৈদিক ক্রিয়াকলাপের বিরোধী হইলেও ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হইয়া এই অন্-আর্য্য লৌকিক দেবতা ও উপদেবতাদিগকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বেদোক্ত দেবদেবীর পূজা সম্বন্ধে আমরা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই পাই না; তবে অগ্নি ও সূর্য্যের পূজা বা উপাসনার কথা যথেষ্ট পাওয়া যায়; বিশেষতঃ অগ্নিপূজা ও হোমের উল্লেখ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে

*মজ্ঝিমনিকায় ৪১ ৪২

* দীঘনিকায়, তেবিজ্জ সুত্তান্ত, সোণদন্ড সুত্ত, অম্বট্‌ঠো সুত্ত; অপাদানম্।

(মজ্ঝিম ১২, ৭২, ৯৮, সংযুত্ত ১, ৭, ১, ৮; ধম্মপদ ১০৭; সুত্তনিপাত ৩, ৭, ২১; মহাবগ্‌গো বিনয়, ১, ১৯।) অগ্নিপূজার উদ্দেশ্য ছিল ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি; এই সম্বন্ধে 'অপাদানে' (৩৯৮) পাই—

"অগ্‌গি দারুম্‌ আহরিত্বা উজ্জালেসিম্‌ অহম্‌ তদা
উত্তমত্থম্‌ গবেসন্তো ব্রহ্মলোকুপপত্তিয়া।"

ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেহ কেহ আজীবন অগ্নিহোম করিয়া কাটাইতেন। এই সম্বন্ধে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ উল্লেখ আছে। চন্দ্র ও সূর্য্যের উপাসনার বর্ণনাও আমরা পাই, কিন্তু অন্য বৈদিক দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল কি না সে সম্বন্ধে আমরা পিটকে কিছুই পাই না। বৈদিক 'ইন্দ্র' পিটকে 'সক্ক' রূপে ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, ব্রহ্মাসহম্পতি তেত্রিশ জন দেবতার নেতারূপে বুদ্ধগুণকীর্ত্তন করিতেছেন—আমরা দেখিতে পাই; এতদ্ভিন্ন প্রজাপতি, বরুণ, ঈশান, সোম, বায়ু, বেণহু (বিষ্ণু) এই কয়েকজন দেবতার নাম আমরা পাই, কিন্তু পূজার কোন উল্লেখ নাই। দীঘনিকায়ের 'মহাসময়সুত্তান্তে' এবং অন্য একটি সুত্তান্তে দেবতাদিগের যে একটি দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বৈদিক দেবতার সন্ধান বড় পাওয়া যায় না। জাতকের গল্পগুলিতেও বৈদিক দেবতার সন্ধান আমরা পাই না। দীঘনিকায়ে বুদ্ধদেবের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ দেবসভায় আমরা যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দিকপাল, পর্ব্বতের দেবতা, নদীর দেবতা, গরুড়, নাগদেবতা প্রভৃতি দেখিতে পাই। আমাদের বিশ্বাস সেই সময় তথাকথিত অন্‌-আর্য্যদিগের লৌকিক-দেবতা বৈদিক-দেবতাদিগের আসন দখল করিয়াছিলেন, নতুবা অবৈদিক সর্প-পূজা, বৃক্ষপূজা, নদীপূজা প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, এইরূপ উল্লেখ আমরা পিটকে পাইতাম না। ধন ও পুত্রকামনায় অশ্বত্থবৃক্ষের পূজা ও পশুবলি, চারিটি রাস্তার সংযোগ স্থলে পূজা ও পশুবলি প্রভৃতির উল্লেখও জাতকগুলিতে আছে। (জাতক, ৫, ৫০, ৪৭২, ৪৭৪, ৪৮৮)

দশদিকের উপাসনার উল্লেখও আমরা পাই; নদীস্নানে পুণ্যলাভের বিশ্বাস সেই প্রাচীন যুগেও ছিল; এমন কি ব্রাহ্মণদিগের এক সম্প্রদায় স্নানে অন্তর ও বাহিরের মলিনতা দূর হইয়া ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয় বিশ্বাস করিতেন। গঙ্গাযমুনা প্রভৃতি তীর্থস্নানেরও উল্লেখ আছে, (মজ্ঝিম ৪৫, ৫৫; সংযুত্ত ৭, ২, ১১)। এই স্থলে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, বর্ত্তমানে আমরা তীর্থ বলিতে যাহা বুঝি পূর্ব্বে সেইরূপ কিছু ছিল এমন কোন প্রমাণ আমাদের নাই। কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি বা মন্দিরের উল্লেখ আমরা পিটকে পাই না। পূজা বা উপাসনা উদ্দিষ্ট দেবতাকে বা অপদেবতাকে উদ্দেশ করিয়া কোন বৃক্ষতলে অথবা ময়দানে সম্পন্ন হইত। যাগযজ্ঞের সময়ে ময়দানে বেদী ও মণ্ডপ প্রভৃতি সাময়িক ভাবে প্রস্তুত হইত। আমরা পিটকে মাত্র দুই-একটি যজ্ঞের উল্লেখ দেখিতে পাই। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের লক্ষ্য—ব্রহ্মে বিলয় বা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি; অন্তরে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া পরমাত্মার সঙ্গে আপনার আত্মাকে মিশাইয়া দেওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য—দীঘনিকায়ের তেবিজ্জ সুত্তান্তে আমরা এই কথা পাই। কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণেরা ইহার উপায় সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই; পিটকে এই সম্বন্ধে শুধু বাদানুবাদই দেখিতে পাওয়া যায়; এইরূপ বাদানুবাদে পরাজিত হইয়া অনেক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণনেতাই বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।* অশ্বমেধ, গোমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের উদ্দেশ্য ইহজীবনে পুত্র ও ঐশ্বর্য্য, পরজীবনে স্বর্গসুখ। যজ্ঞের উৎপত্তি সম্বন্ধে বুদ্ধদেব এক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি: সুত্তনিপাতে (২,৭) প্রাচীন ব্রাহ্মণ ঋষিদিগের অনাসক্ত তাপস-জীবনের উচ্চমুখে প্রশংসা করিয়া বুদ্ধদেব অনাচার ও পাপপ্রলোভনে কিরূপে ব্রাহ্মণদিগের অধঃপতন হইল তাহার কথা বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, 'রাজার ঐশ্বর্য্য, সুন্দরী নারী, সুন্দর তেজস্বী অশ্বচালিত সুদৃশ্য রথ, বিচিত্র কার্পেট, প্রাসাদ, সুসজ্জিত কক্ষ, শয্যা, জনসাধারণের শান্তিপূর্ণ গার্হস্থ্য জীবন, দুগ্ধদা গাভী ও রমণীদের কমনীয় মুখকান্তি ব্রাহ্মণদিগের লোভের বস্তু

* মজ্ঝিমনিকায়, পৃঃ ১৭৫; সুত্তনিপাত পৃঃ ২১।

হইল ; তাঁহাদের ধর্ম্মময় তাপস-জীবনে অধঃপতন আরম্ভ হইল। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে বিবিধ মন্ত্র রচনা করিলেন এবং রাজা ইক্ষ্বাকুর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তোমার অনেক ধন ও শস্য আছে, তুমি যজ্ঞ কর।" রাজা ব্রাহ্মণদিগের সহায়তায় ও উপদেশে অশ্বমেধ, গোমেধ, পুরুষমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে ধনরত্ন, গাভী, বসনভূষণ, প্রাসাদ, রথ, অশ্ব, সুন্দরী নারী প্রভৃতি দান করিলেন।' যজ্ঞের উৎপত্তির এইরূপ কোন কারণ ছিল কিনা, তাহা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব, তবে ব্রাহ্মণদিগের যে ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে অধঃপতন হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। বুদ্ধদেব অন্যত্র বলিয়াছেন—

'তণ্ডুলম্, সয়নম্, বত্থম্, সপ্পিতেলন্ চ যাচিয়
ধম্মেন সমুদানেত্বা ততো যঞ্‌ঞম্ অকপ্পয়ুম।
উপট্‌ঠিতস্মিম্ যঞ্‌ঞস্মিম্ নাসুসু গাবো হনিম্সুতে। সুত্তনিপাত

অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা তণ্ডুল, শয্যা পরিচ্ছদ, ঘৃত, তৈল প্রভৃতি ভিক্ষাদ্বারা সংগ্রহ করিয়া যজ্ঞ করিতেন ; যজ্ঞে কোন গোহত্যা (বা পশুহত্যা) হইত না।

ইহাতে বুঝা যায় যে এক সময়ে যজ্ঞের প্রক্রিয়া অত্যন্ত সরল ও আড়ম্বরশূন্য ছিল। যাহাই হউক না কেন, বুদ্ধদেবের সময়ে পশুবলির বিশেষ ভাবে প্রচলন ছিল। রাজা প্রসেনজিতের যজ্ঞের বর্ণনায় সহস্র সহস্র ষাঁড়, বলদ, গাভী, মেষ ও ছাগ বলির উল্লেখ আমরা পাই (সংযুক্ত-নিকায়)।

ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মজীবন যাপনের পাঁচটি পালনীয় পন্থার (Tenets) নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন ; যথা—(১) সত্য, (২) তপঃ, (৩) ব্রহ্মচর্য্য, (৪) অধ্যয়ন, (৫) ত্যাগ।* কিন্তু ব্রাহ্মণেরা নিজেই ইহা যথাযথ পালন করিয়া চলিতেন বলিয়া মনে হয় না। কোন কোন জ্ঞানী ব্রাহ্মণ তপশ্চর্য্যায় ও শাস্ত্রচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিতেন ; এই নিয়মগুলি সম্বন্ধে সমাজে কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল বলিয়া মনে হয় না। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ-যুবককে গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া বেদাধ্যয়ন করিতে হইত ; অধ্যয়ন প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্যরূপে গণ্য ছিল ; এবং অধ্যয়নের সময়েই ব্রহ্মচর্য্যে জীবন পালিত হইত। সত্যপালনই ধর্ম্ম—এই জ্ঞান ভারতের চিরন্তন নীতি। আমরা তপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি ; জন্মমৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অনেকে কঠোর তপ করিত। তপ সম্বন্ধে দীঘনিকায়ে অনেক বীভৎস চিত্র দেখিতে পাই, অনেক তপস্বী কুকুরের মত জীবন যাপন করিতেন।

বুদ্ধদেবের সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কোন সুপ্রতিষ্ঠ ভিত্তি ছিল না। ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত সত্যপ্রিয় ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন ; তাঁহাদের অনেকেই এই জন্য সত্যের অনুরোধে বুদ্ধমত গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা বুদ্ধমত গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারাও বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন নাই। এমন কি অনেকে তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

* মজ্ঝিমনিকায় ৯৯।

সর্বস্ব

শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

নদীর এপার ওপার দুখানি ছোট গাঁ। এক গাঁয়ে থাকে পুঁটুলি, আর অন্য গাঁয়ে থাকে অখ্‌লে। দু-জন দু-জনকে দেখ্‌তে পেলে খুশীর জোয়ারে তাদের মন উপ্‌চে পড়ে। অখ্‌লের সঙ্গে পুঁটুলির বিয়ের কথা হচ্ছে। আনন্দের অবধি নেই। কিন্তু বিয়ে গেল হঠাৎ ভেঙে। পুঁটুলির বাবা মেয়ের বিয়েতে যৌতুক চেয়েছে পৈঁচের উপরে আবার খাড়ু।

পুঁটুলির বাবা স্থির কর্‌লে মেয়ের বিয়ে দেবে তাদেরই পড়শী ক্যাব্‌লার সঙ্গে। ক্যাব্‌লার মন খুশীতে উপ্‌চে উঠ্‌ল। কিন্তু ক্যাব্‌লা পুঁটুলির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে এত দিনের জ্যোৎস্না নিবে গেছে, সেখানে এখন অন্ধকারের ম্লানিমা।

ক্যাব্‌লা পুঁটুলির সঙ্গে দেখা ক'রে বল্‌লে—হ্যাঁ রে পুঁটুলি, তুই কি অখ্‌লেকে পেলে খুশী হোস ?

পুঁটুলি ফোঁস ক'রে তর্জন ক'রে বল্‌লে—যাঃ আর নেকামি ক'রে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে হবে না।

ক্যাব্‌লা কিছুই বল্‌লে না—তার একখানি ছোট কোশা নৌকা ছিল, সেইখানিতে চ'ড়ে দু-হাতে বৈঠা চালিয়ে গান জুড়ে দিলে—কুঁচ-বরণ কন্যা রে, তার মেঘ-বরণ চুল।

ক্যাব্‌লার নৌকা ওপারে গিয়ে অখ্‌লেদের ঘাটে লাগ্‌ল। সে ইসারা ক'রে অখ্‌লেকে ডাক্‌লে। সে আস্‌তেই ক্যাব্‌লা বল্‌লে—যা, ভাল জামা-কাপড় যা আছে নিয়ে আয়। পুঁটুলিকে বিয়ে কর্‌তে হবে।

অখ্‌লে রুষ্ট ব্যথিত স্বরে বল্‌লে—যাঃ আর দগ্দাস নে।

ক্যাব্‌লা বল্‌লে—মাইরি মা-কালীর দিব্যি। তুই আয়।

অখ্‌লে এল। পুঁটুলির মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। সে ছুটে গেল একটু সেজে গুজে নিতে, একটা খয়েরের টিপ প'রে নিতে।

পুঁটুলি অখ্‌লেকে নিয়ে ক্যাব্‌লার নৌকা উচ্ছল স্রোতে চল্‌ল শহরের দিকে। সেখানে চট-কলে ক্যাব্‌লা কাজ করে। সেখানে নিয়ে গিয়ে ক্যাব্‌লা তার বন্ধুদের সঙ্গে অখ্‌লে আর পুঁটুলির পরিচয় করিয়ে দিলে। তার পরে বল্‌লে—দেখ্, চট-কলে আমি তেইশ টাকা মাইনে পাই। সেই কাজ তুই কর্‌বি। আর এই নে আমার কাছে সাতাশটা টাকা জমা ছিল। নিয়ে রাখ্। প্রথম মাসে খরচ চল্‌বে কিসে থেকে ?

অখ্‌লে আর পুঁটুলির মন বিস্ময়ে আর কৃতজ্ঞতায় ভ'রে উঠ্‌ল।

ক্যাব্‌লা গিয়ে তার কোশা নৌকায় চড়্‌ল। হাতে তার বৈঠে নেই। ভাঁটার স্রোতে নৌকা গড়িয়ে চলেছে। নৌকা এঁকে বেঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। অখ্‌লে আর পুঁটুলির চোখে একটি ব্যথিত বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠ্‌ল শোভাঞ্জনের মতন।

যাত্রী

শ্রীসুহাস দে

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ প্রদর্শনী
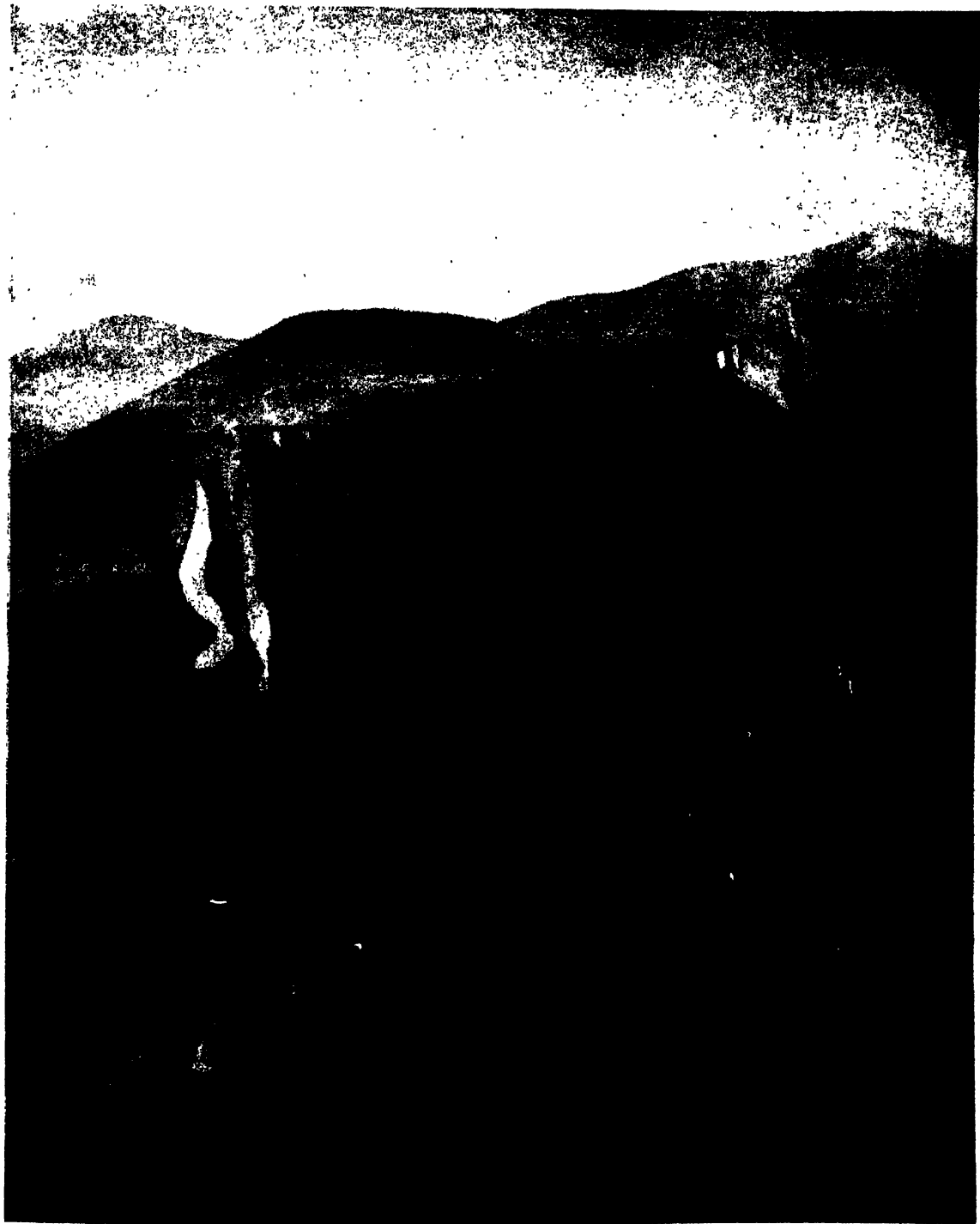
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ভারতে রাসায়নিক গবেষণা

শ্রীপুলিনবিহারী সরকার, ডি. এস্‌সি·

কিছু দিন আগে উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় গবেষণার জন্য পঞ্জাবের অধ্যাপক বীরবল সাহানী বিলাতের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য (এফ. আর. এস.) মনোনীত হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিকের পক্ষে—বিশেষতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের—ইহা অতি উচ্চ সম্মান, নোবেল পুরস্কারের পরই ইহার স্থান। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁহারা উচ্চাঙ্গের গবেষণা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারাই এ-সম্মানের যোগ্য বিবেচিত হন। গত বিশ বৎসরে পাঁচ জন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এফ. আর. এস. হইয়াছেন। ইঁহারা কেহই রাসায়নিক নহেন। অধিকন্তু ভারত-বিখ্যাত কতিপয় রাসায়নিকের নাম এজন্য একাধিক বার প্রস্তাবিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা মনোনীত হন নাই। অথচ ভারতে রাসায়নিক গবেষণা সুরু হইয়াছে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী আগে, এবং বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাস-প্লাবনের ন্যায় ভারতীয় বিজ্ঞান-মহাসভার কার্য্যবিবরণী রাসায়নিক গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলীতে ভরিয়া উঠিয়াছে। সংখ্যা যদি শক্তি-নির্দ্দেশক হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে—ভারতীয় গবেষকদের মধ্যে রাসায়নিকদের স্থান সর্ব্বোচ্চে। ভারতে রাসায়নিক গবে‹ ‹র অভাবনীয় প্রসার, অতুলনীয় উন্নতি এবং আশাতীত খ্যাতির কথা আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই। ফলে, শিক্ষিত জনসাধারণের মনে ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে—বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় যাহাই হউক না কেন, অন্ততঃ রসায়নবিদ্যায় ভারত উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে, হয়ত বা পাশ্চাত্যের সমকক্ষ হইয়াছে। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত এক জন ভারতীয় রাসায়নিকও নোবেল পুরস্কার পাওয়া দূরের কথা, এফ. আর. এস. ও কেন হইতে পারিলেন না—এ-প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। রসায়নশাস্ত্রে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে জার্ম্মানী, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। ১৯০১ সন হইতে আজ পর্য্যন্ত ৩২টা নোবেল পুরস্কারের মধ্যে ১৪টা পাইয়াছে শুধু জার্ম্মান রাসায়নিকগণ। ইহাই স্বাভাবিক। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে, লজ্জা ও বেদনার সহিত, আজ বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হয়—উচ্চাঙ্গের রাসায়নিক গবেষণা এ-পর্য্যন্ত ভারতে হয় নাই; ভারতবিখ্যাত রাসায়নিকগণ বিশ্ববিখ্যাত নহেন। ইহা অপ্রিয় এবং শ্রুতিকটু, কিন্তু নিছক সত্য কথা। কেন এমন হইল?

রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, গোড়ার দিকে ইহার উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ দুইটি—অমর হইবার জন্য অমৃতের অন্বেষণ ও তথা সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হইবার জন্য নানাবিধ ঔষধ আবিষ্কা র, এবং স্বর্ণেতর ধাতুকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিবার জন্য পরশ-পাথরের সন্ধান। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রসায়নবিদ্যার উন্নতি ও প্রসার অতি সামান্যই হইয়াছে। গত শতাব্দীতে এক দল প্রতিভাবান্ ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকের প্রাণপাত সাধনার ফলে রসায়নশাস্ত্র 'বিজ্ঞানে' পরিণত হইয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র-প্রণীত হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে দেখিতে পাই, অতি প্রাচীন কালে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে রসায়নবিদ্যার উন্নতি আশাতীত রকমের হইয়াছিল। বস্তুতঃ তখনকার যুগে হিন্দুদের এতটা উন্নতি বিস্ময়কর। হিন্দুরা 'ধার করা' বিদ্যা হিসাবে ইহার চর্চ্চা করেন নাই—নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তি ও মনীষার দ্বারা ইহা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভারতীয় রাসায়নিকগণও কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই—রসায়নের চর্চ্চা ইউরোপের মতই কলা-হিসাবে হইয়াছে, বিজ্ঞান-হিসাবে নয়। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা চলে। কেমন করিয়া রোগ-বিশেষের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হইল, ঔষধটির রাসায়নিক সংগঠন কিরূপ, কি ভাবে ইহা মানব-দেহে কাজ করিয়া তাহাকে নীরোগ করে—এসব চরক-সুশ্রুত

পড়িয়া জানিবার উপায় নাই। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র হিন্দুর বেদ-চতুষ্টয়ের মত অপৌরুষেয়। এই অপৌরুষেয়ত্ব বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির একান্ত বিরোধী। 'কেন' বা 'কেমন করিয়া' প্রভৃতি প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। অথচ ইহাই সত্যকার বিজ্ঞানের মূলভিত্তি।

হিন্দুদের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইল ঘোর তমসাচ্ছন্ন যুগ। নূতন জ্ঞানের সন্ধান দূরের কথা, পূর্ব্বপুরুষদের অর্জ্জিত জ্ঞানের চর্চ্চাই গেল প্রায় বন্ধ হইয়া। ইত্যবসরে ইউরোপ অল্পকাল মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান-ললিত-কলায় যে অভাবনীয় উন্নতি করিল, ভারত তাহার সন্ধান পর্য্যন্ত রাখিল না। এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে সিপাহী-বিদ্রোহের অব্যবহিত পর হইতে। বলা বাহুল্য, মাত্র মুষ্টিমেয় লোক তখন সে শিক্ষা গ্রহণ করিল। বাঙালী হইল পথপ্রদর্শক। ইংরেজের শিক্ষাদীক্ষা, আদবকায়দা যথাসাধ্য অনুকরণ করিয়া আমরা যখন রীতিমত সাহেব সাজিয়াছি, তখনও কিন্তু এদেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা সুরু হয় নাই। বিজ্ঞান পড়ানো হইত ইতিহাস কিংবা ন্যায়শাস্ত্রের মত। ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করেন এক জন বাঙালী মনীষী, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় Indian Association for the Cultivation of Science স্থাপিত করেন। তখনকার দিনে কলিকাতার কলেজের ছাত্রগণ এখানে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের ব্যাখ্যা শুনিতে পাইতেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রপাতও সর্ব্বপ্রথম বাঙালীই করিয়াছে। ভারতের সর্ব্বপ্রথম রাসায়নিক গবেষক ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (স্বনামধন্যা সরোজিনী নাইডুর পিতা)। ইনি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এডিনবরা হইতে কৃষ্টালোগ্রাফী সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া 'ডক্টর' উপাধি লইয়া আসেন। ইনিই ভারতের সর্ব্বপ্রথম ডি. এস্‌সি। হায়দরাবাদে শিক্ষা-বিভাগে উচ্চপদে আসীন থাকিয়াও তিনি আর গবেষণা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন নাই। তার পর, ১৮৮৫ সনের এক অতি শুভক্ষণে কেম্ব্রিজ হইতে পদার্থবিদ্যায় গবেষণা করিয়া ডি. এস্‌সি হইয়া দেশে ফিরিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া সেখানে তিনি গবেষণা আরম্ভ করিলেন। ইনিই ভারতে সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রপাত করেন। ১৮৯৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে প্রকাশিত তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক প্রথম প্রবন্ধ ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চ্চার ইতিহাসে ভারতের পক্ষে সে এক স্মরণীয় দিন। ১৮৮৮ সালে এডিনবরা হইতে রসায়নশাস্ত্রে 'ডক্টর' উপাধি লইয়া আসিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়—পর বৎসর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। সে আজ ৫০ বৎসরের কথা। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পাশাপাশি দুই বাঙালী বৈজ্ঞানিক পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের গবেষণার জন্য প্রেক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানে গবেষণা সুরু হইল তখন হইতে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ কুসুমাস্তৃত নহে—সাফল্যলাভের কোন সহজ পন্থাও জানা নাই। দুর্গম পথের প্রথম যাত্রীর যা-কিছু আয়াস ও অসুবিধা সবই তাঁহাদিগকে সহ্য করিতে হইয়াছে, যত কিছু বাধাবিপত্তি সবই অতিক্রম করিতে হইয়াছে।

১৯০০ সাল হইতে বাংলা-গবর্ণমেণ্টের কৃপায় রসায়নে গবেষণার জন্য প্রতি বৎসর একটি করিয়া মাসিক ১০০৲ টাকার বৃত্তি (তিন বছরের জন্য) দানের ব্যবস্থা হওয়ায় প্রফুল্লচন্দ্রের কায়িক শ্রমের লাঘব হইল, তিনি অল্প সময়ে বেশী কাজ করিবার সুযোগ পাইলেন ছাত্রদের সহায়তায়। রাসবিহারী ঘোষ ও তারকনাথ পালিতের রাজোচিত দানে এবং সর্ আশুতোষের প্রাণপণ চেষ্টায় ১৯১৫ সনে কলিকাতায় বিরাট্ বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সহিত রাসায়নিক গবেষণা তখন হইতে পুরাদমে চলিতে সুরু করিল। বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতের রাসায়নিক গবেষণার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র কলিকাতার এই বিজ্ঞান কলেজ। গত বাইশ বৎসর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এখানে 'পালিত'-অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শুধু গবেষণা করিয়াছেন। গোড়ার দিকে অর্থাভাবে গবেষণা-কার্য্যের যন্ত্রপাতি, জিনিষপত্রের যে অভাব ছিল তাহা দূর হইয়াছে অনেক

দিন। ইউরোপের আধুনিক প্রেক্ষাগারের সহিত ইহা তুলনীয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঋষিজনোচিত ত্যাগ, পিতৃসুলভ যত্ন ও স্বদেশের হিত-কামনার প্রেরণায় গত আটত্রিশ বৎসরে বাংলা দেশে যে রাসায়নিকের দল ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতীয় রাসায়নিক বলিতে আজ প্রধানতঃ তাঁহাদিগকেই বুঝায়। বাংলার বাহিরে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদে এবং অনেক গবেষণা-কেন্দ্রে রাসায়নিকের আসনে ইঁহারা সগৌরবে অধিষ্ঠিত। আচার্য্যদেবের অনুপ্রেরণায় এবং মুখ্যতঃ অধ্যাপক ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের প্রচেষ্টায় ১৯২৪ সনে বিলাতের কেমিক্যাল সোসাইটির অনুকরণে ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয়। ইহা একটি নিখিল-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান, কিন্তু আচার্য্য রায়ের প্রদত্ত অর্থে কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজে ইহার ভিত্তি সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় রাসায়নিকদিগের গবেষণামূলক প্রবন্ধ ইহার মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার কার্য্যকরী সভায় সর্ব্বসমেত চৌত্রিশ জন সভ্যের মধ্যে একুশ জন বাঙালী—এবং সমগ্র ভারতে প্রতি বৎসর যত গবেষণা হয় তাহার অর্দ্ধেকের বেশী করেন বাঙালী রাসায়নিকগণ। গত সাত বৎসরে এই পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরিত প্রবন্ধের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	মোট	বাঙালীর
১৯৩১	১০২	৬৬
১৯৩২	৯৪	৫৯
১৯৩৩	৯৪	৪৮
১৯৩৪	১২২	৭৬
১৯৩৫	১৫৭	১০৯
১৯৩৬	১৫৯	৮০
১৯৩৭	১০৫	৬৩

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকা ছাড়া বাংলায় ও বাংলার বাহিরে আরও কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকা রহিয়াছে যাহাতে রাসায়নিক গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়। সেগুলিতে এবং বিদেশীয় পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী একত্র ধরিলেও বাঙালীর কাজ অর্দ্ধেকের কম নয়। তাই আজ গত পঞ্চাশ বৎসরের হিসাব-নিকাশ করিতে বসিয়া সর্ব্বপ্রথম মনে পড়ে বাঙালী রাসায়নিকদের কথা। সমগ্র পৃথিবীতে যেমন জার্মানী, সমগ্র ভারতেও তেমন বাংলা, রসায়ন-বিদ্যার চর্চ্চায় অগ্রণী। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে কতই না তফাৎ। কেন এমন হয়?

স্বর্গীয় গোখ্‌লে বলিতেন, "What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow." রসায়ন-বিদ্যা তথা আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও গবেষণায় গোখ্‌লের বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে। সাহিত্য ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেও তাই। বাঙালীর প্রতিভা নাই, ইহা সত্য নহে। সেকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত অনেকে সে সার্টিফিকেট দিয়াছেন। জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, আশুতোষ, ব্রজেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, মেঘনাদ প্রভৃতি বঙ্গমাতার সুসন্তানগণ জগৎ সমক্ষে একাধিক বার তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। পদার্থবিদ্যায় গবেষণাক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র, মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ বাঙালী মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা প্রমাণ করিয়াছেন। সাহিত্যে, পদার্থবিজ্ঞানে, ললিতকলায়, উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় বাঙালী যে-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে, রাসায়নিক গবেষণায় তাহার স্ফুরণ হইতেছে না কেন?

মাদ্রাজের পোর্ট ট্রাষ্ট আপিসের আই-এ ফেল (সব বিষয়ে) কেরাণী রামানুজমের গণিত-প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বিলাতী বৈজ্ঞানিকগণ চমৎকৃত হইয়াছেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় এফ. আর্. এস্.। Raman Effect আবিষ্কার করিয়া সর্ চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরাম রামন্ পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পাইয়া বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন, এবং তৎসঙ্গে জগৎ-সমক্ষে প্রমাণিত হইয়াছে—ভারতের আবহাওয়ায় শুধু কাব্য, দর্শন ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বই পরিপুষ্টি লাভ করে না, বিজ্ঞানের পক্ষেও তাহা যথেষ্ট অনুকূল। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া সর্ উইলিয়ম র‍্যাম্‌জে বলিয়াছিলেন, "One swallow does not bring the summer." আজ জীবিত থাকিলে তিনি হয়ত স্বীকার করিতেন, "Many swallows may follow." কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী-ব্যাপী গবেষণার পরও আজ ভারতীয় রাসায়নিকদের সম্বন্ধে এ-কথা বলা চলে না কেন?

এ-প্রশ্নের উত্তর দিবার দিন আসিয়াছে। গত বাইশ বৎসরে ভারতবর্ষে অনেকগুলি (মোট ১৮টির মধ্যে ১৩টি) নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং প্রায় সর্ব্বত্র যথেষ্ট মোটা বেতনে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দেশী ও বিদেশী আই-ই-এস্‌গণ পূর্ব্ব হইতেই বিরাজ করিতেছিলেন। ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের তুলনায় ইঁহাদের বেতন কিছুমাত্র ন্যূন নয়—যদিও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত দরিদ্রতম। ইঁহারা সাধারণতঃ মাসে হাজার টাকা, কেহ কেহ তাহারও বেশী পাইয়া থাকেন। বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব সায়ান্স সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য। ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রীগণ মাত্র ৫০০৲ বেতন পান। জাপানের প্রধান মন্ত্রীর মাসিক বেতন প্রায় ৬২৪৲ টাকা—ইহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে। কাজেই, প্রতিভাশালী ভারতীয় রাসায়নিকদের অন্নচিন্তায় গবেষণাকার্য্যে ব্যাঘাত জন্মিতেছে বলা চলে না। আদর্শ দেশ হিসাবে জাপানের দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া দিলেও গত মহাযুদ্ধের সময় ও তাহার অব্যবহিত পরে জার্মানীতে অর্থকষ্ট চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। সর্ আশুতোষ চৌধুরী লিখিয়াছিলেন, অধিকাংশ অধ্যাপক তখন দুই বেলা দূরের কথা এক বারও পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেন না। অথচ গবেষণা-কার্য্যে সেজন্য তাঁহাদের এতটুকুও শৈথিল্য লক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সরকারী গবেষণা-কেন্দ্রে গবেষণার জন্য প্রচুর অর্থের ব্যবস্থা রহিয়াছে;

শুনিয়াছি, ডাঃ রামন্ ডিরেক্টর হইয়া যাইবার আগে বাঙ্গালোরে অধ্যাপকগণ ভাবিয়া পাইতেন না অত টাকা কি ভাবে খরচ করিবেন। সুতরাং যন্ত্রপাতি-মালমসলার অভাবে গবেষণাকার্য্য বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না তাহাও সত্য নয়। অধিকন্তু অধ্যাপক Capitza-র যন্ত্রের মত অত দামী যন্ত্রপাতি রাসায়নিক গবেষণায় সাধারণতঃ প্রয়োজন হয় না। সেই জন্যই ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কুমিল্লার অভয়-আশ্রমেও রাসায়নিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে পারিয়াছিলেন। রসায়নবিদ্যার উন্নতি ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীতে যথেষ্ট হইয়াছে। সেখানকার বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপকদের অধীনে দীর্ঘকাল গবেষণা করিয়া সর্ব্বোচ্চ উপাধি এবং উঁচুদরের সার্টিফিকেট লইয়া বহু রাসায়নিক এদেশে ফিরিয়াছেন এবং উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন। অতএব যোগ্য গুরুর দীক্ষা ও অনুপ্রেরণার অভাব হেতু উচ্চাঙ্গের রাসায়নিক গবেষণা এখানে হইতেছে না, তাহাও ঠিক্ নয়। অধ্যাপক রামন্ ও সাহা কোন গুরুর নিকট শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, ইহা উল্লেখযোগ্য। গবেষণামূলক প্রবন্ধ দিয়া এম্. এস্‌সি উপাধি পাইবার সহজ ব্যবস্থা অনেক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ছাড়া, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে। উপরন্তু, এই বেকার-সমস্যার দিনে বহু কৃতী ছাত্র অনন্যোপায় হইয়া বিনা বৃত্তিতে দীর্ঘকাল গবেষণা করিতেছেন ভবিষ্যতের আশায়। বাঙ্গালোর, পুষা, বোম্বাই প্রভৃতি গবেষণা-কেন্দ্রে বহু বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। কাজেই অধ্যাপকদের নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিবার লোকাভাব—এ অজুহাত টিকিবে না। কলেজের অধ্যাপকদের কাজের সময় স্বভাবতই অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মচারীদের অপেক্ষা অনেক কম, তাঁহারা বছরে প্রায় ছয় মাস ছুটি উপভোগ করেন। প্রধান অধ্যাপকের অধ্যাপনার কার্য্যকাল অত্যল্প—সপ্তাহে পাঁচ-ছয় ঘণ্টার বেশী নয়। অতএব, অধ্যয়ন ও চিন্তা করিবার যথেষ্ট অবসরের অভাব বলিয়া তাঁহারা কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না বলিলে ভুল হইবে। প্রায় সকল গবেষণাকেন্দ্রে আধুনিক বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা ও পুস্তকাদি প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, সুতরাং সেদিক্ দিয়াও কোন অভিযোগ করা চলে না। তবে গলদ কোথায়? উচ্চাঙ্গের রাসায়নিক গবেষণা কি জন্য হইতেছে না?

অষ্ট্রেলিয়ার এক রকম পাখী চলে পিছনের দিকে—দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে তার যেখানে ছিল শুধু সেই স্থানটিতে। সম্মুখে কি আছে, কিংবা কোথায় চলিয়াছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রগতির সহিত ইহার চলার সাদৃশ্য রহিয়াছে। আমরা

কি উদ্দেশ্যে, কোথায় চলিয়াছি, সেদিকে লক্ষ্য কম। অতীতে ভারতীয় হিন্দুগণ রসায়নবিদ্যায় কত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, অনেকে সেই ভাবনায় ভরপুর। বলা বাহুল্য, ইহা না যুক্তিযুক্ত না নিরাপদ। রসায়ন ব্যবহারিক বিজ্ঞান—অধ্যাত্মতত্ত্বের সহিত ইহার সাদৃশ্য কম। অথচ ভারতে রসায়নের চর্চ্চা হইতেছে, বলিতে গেলে অধ্যাত্মবিদ্যার মতই। এই সুদীর্ঘ কাল পর আজ ভাবিয়া দেখিতে হইবে, আমাদের কি করা উচিত ছিল এবং কি করিয়াছি, জগতের জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের বিশুদ্ধ রসায়নের গবেষণার ফলে কতটুকু সমৃদ্ধ হইয়াছে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ফলিত-রসায়নের গবেষণায় অধিকতর মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য কি না, ইত্যাদি। রোগনির্ণয়ে এবং চিকিৎসাবিধানে চিকিৎসক অসঙ্কোচে অপ্রিয় কথা বলিয়া থাকেন, অপ্রিয় কাজ করিতেও তাঁহার বাধে না। প্রেয় হইতে শ্রেয়ের স্থান উচ্চে—হউক তাহা অপ্রিয়। তাই অপ্রিয় সত্য কথা আজ বলিতে হইবে।

পনর বছর আগে "জার্ম্মানীতে বাঙালী বৈজ্ঞানিকের আদর" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষে 'প্রবাসী'তে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

কোন রকমে একটা চাকরী পাইলেই ইহারা অধ্যয়ন ও গবেষণা হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, ভুলিয়া যান জীবনসন্ধ্যায় নিউটন বলিয়াছিলেন, "আমি তীরে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র, সম্মুখে বিরাট জ্ঞান-সমুদ্র অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে"।

বাঙালী, তথা ভারতীয় রাসায়নিকগণ মোটা মাহিনার চাকরি পাইয়া 'অধ্যয়ন ও গবেষণা হইতে একেবারে বিদায় গ্রহণ' না করিলেও শ্রমবিমুখ ও আরামপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন কি না—তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের সম্বন্ধে যাঁহাদের সাক্ষাৎ-জ্ঞান আছে, তাঁহারা বলেন—গবেষণা-কার্য্যে ইহারা হারকিউলিস্ সদৃশ। ঢাকা কলেজের অধ্যাপক ওয়াট্‌সন্ সম্বন্ধেও তাহাই শুনা যায়। সুতরাং আমাদের কর্ম্মবিমুখতার জন্য জলবায়ু পুরাপুরি দায়ী নয়। বাঙ্গালোরে ত, শুনিয়াছি, চিরবসন্ত বিরাজমান। ভারতের কোথাও নিদারুণ গ্রীষ্ম চিরস্থায়ী নয়।

নিয়মিত পরিশ্রম দ্বারা ইউরোপীয়গণ জরা ও বার্দ্ধক্য অনেকখানি দূরে ঠেলিয়া রাখেন। যে-বয়সে আমরা বানপ্রস্থ অবলম্বন করি, সেটা তাঁহাদের পক্ষে পূর্ণযৌবন। ফল কি হইয়াছে, আমরা সবাই জানি। অতিবৃদ্ধ রবিন্‌সন্, ভিল্‌স্টাটের্ আজ যে কাজ করিতেছেন তাহা দেখিয়া আমরা আজও বিস্ময়ে অবাক্ হই। উচ্চাঙ্গের গবেষণার প্রসঙ্গে সর্ব্বাগ্রে মনে হয় প্রতিভার কথা। প্রতিভার সংজ্ঞা দিতে গিয়া আচার্য্য কার্লাইল বলিয়াছেন, "দীর্ঘকালব্যাপী অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমের নামই প্রতিভা।" টমাস্ এডিসন্ বলিতেন, "Genius is 99 per cent perspiration and one per cent inspiration." আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়া থাকেন—রাসায়নিককে ভারবাহী জীব-বিশেষের চেয়েও অধিকতর শ্রমশীল ও কষ্টসহিষ্ণু হইতে হইবে—তবে যদি কিছু হয়। সত্যই কি আমরা প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছি এবং তৎসত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য কিছু হইতেছে না?

ভারতীয় রাসায়নিকদের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য—বিদেশীয় বৈজ্ঞানিকদের অনুকরণে অনুরূপ গবেষণা করা। গত ৫০ বৎসর যাবৎ ছোট বড় প্রায় সবাই তাহা করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের চেষ্টায় গবেষণার কোন নূতন ক্ষেত্র আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বলা নিষ্প্রয়োজন—ইহা মনীষার পরিচায়ক নহে। পদার্থবিদ্যায় ডাঃ রামন্ Raman Effect আবিষ্কার করিয়া গবেষণার নূতন পথ খুলিয়া দিয়াছেন। দেশ-বিদেশের শত শত বৈজ্ঞানিক তাঁহার আবিষ্কার লুফিয়া লইয়াছেন। Raman Effect সংক্রান্ত গবেষণামূলক প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক পত্রিকাগুলি ছাইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, অনুরূপ গবেষকদের কৃতিত্ব—তা যত কাজই তাঁহারা করুন না কেন—মূল আবিষ্কারের তুলনায় যৎপরোনাস্তি অকিঞ্চিৎকর। অপরের প্রদর্শিত পথে চলা অপেক্ষাকৃত সহজ, তাহাতে যে শুধু ঝঞ্ঝাট কম তাহা নহে, নিশ্চিন্ততা ও আরামও যথেষ্ট। অল্প সময়ে বেশী কাজ করা যায়। নবীন গবেষকদের পক্ষে ইহা

অতীব লোভনীয় সন্দেহ নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কাজ করা যায় না, নকল করিয়া কেহ বড় হইতে পারে না। এই সহজ অনুকরণস্পৃহা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য অনেকখানি দায়ী নয় কি? প্রশ্ন উঠিতে পারে, নিউটন্, ফ্যারাডে গণ্ডায় গণ্ডায় জন্মায় না—Raman Effect‌ও প্রত্যহ আবিষ্কৃত হয় না। ইহা সত্য কথা; কিন্তু গত ৫০ বৎসরে ইউরোপ ও আমেরিকায় এমন সব উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা আধুনিক বিজ্ঞানের মূল ভিত্তিস্বরূপ—সর্ব্বত্র যাহা সম্ভব হইতেছে, শুধু এই বিশাল ভারতেই তাহা অসম্ভব হইবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। প্রতিভা দেশ-কাল-জাতি-নিরপেক্ষ ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। একাগ্র সাধনার দ্বারাই শুধু যে সিদ্ধিলাভ সম্ভব তাহাতে আমাদের অধিকার আছে কি?

ভারতে রাসায়নিক গবেষণার সবচেয়ে বড় বিঘ্ন—আমাদের পল্লবগ্রাহিতা; কোন একটা কাজে দীর্ঘ কাল লাগিয়া থাকিবার ধৈর্য্য আমাদের কম। অল্প সময়ে প্রচুর নাম করিবার—অর্থাৎ রাতারাতি বড়লোক হইবার—আকাঙ্ক্ষা আমাদের অত্যন্ত প্রবল। কোন বিষয়ে গভীর ভাবে প্রবেশ করিতে গেলে, এইরূপ ভাবে তাহা হইবার সম্ভাবনা বড় অল্প। তাই এদেশে দেখিতে পাই, একই ব্যক্তি অর্দ্ধ-ডজন বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন, ফলে তিনি হন—'Jack of all trades but master of none.' কোন একটা ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান দখল করিতে হইলে ধৈর্য্য-সহকারে জীবনব্যাপী সাধনার প্রয়োজন। ভারতে তাহা দুর্লভ। ইউরোপে এই পল্লবগ্রাহীতা মনোবৃত্তি কদাচিৎ দেখা যায়। যিনি যে-বিষয়ে গবেষণা করেন, বিশেষ কারণ না-ঘটিলে, তিনি সারা জীবন তাহাতে লাগিয়া থাকেন। আধুনিক বিজ্ঞান তাঁহারা এমন করিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছেন। জার্মান বৈজ্ঞানিকগণ উনিশ বৎসর অবিরাম চেষ্টার পর কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন; ছয় শত পাঁচ বার ব্যর্থ প্রয়াসের পর আরলিশ সাল্‌ভার্সান তৈয়ার করিতে সমর্থ হন। এই অসীম ধৈর্য্যই অনেক রাসায়নিক আবিষ্কারের মূলে রহিয়াছে। আমাদের তাহা কই? সাতাশী বৎসরের বৃদ্ধ পীটার ক্লাসন্ সারা জীবন একাকী শুধু পাইনগাছের আঠা-জাতীয় পদার্থ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া কাটাইলেন। উল্লেখযোগ্য ফল সামান্যই পাইয়াছেন, কিন্তু আজও তিনি উহাতেই লাগিয়া আছেন। এ-রকম একটি দৃষ্টান্তও এদেশে মিলিবে কি? আমাদের অনুন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ কোন একটা গবেষণার ফল পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বার-বার পরীক্ষা না-করিয়া তাহা প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিতে আমরা অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া পড়ি। তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া অনেক সময় মূল বিষয়ই উপেক্ষিত হয়—অন্যে তাহা করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হন এবং ভারতীয় গবেষকদের প্রতি তাঁহাদের মন অশ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে। এ-বিষয়ে আমেরিকার রাসায়নিকদের সহিত আমাদের অনেকখানি সাদৃশ্য আছে। কিন্তু জার্মানগণ এই ব্যাপারে একেবারে স্বতন্ত্র—তাঁহারা সকলের আদর্শস্থানীয়। জার্মানদের নিখুঁৎ গবেষণা সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতের ঈর্ষার বস্তু। গত মহাযুদ্ধের সময় একাধিক ইংরেজ বৈজ্ঞানিক তাহা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন, আর এই জন্যই জার্মান বৈজ্ঞানিকদিগের স্থান সর্ব্বশীর্ষে।

এ দেশে লোকের যোগ্যতা নির্ণীত হয় তাহার বেতনের অঙ্ক দিয়া। বৈজ্ঞানিকের খ্যাতি নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা দ্বারা। অমুক '৭০টি প্রবন্ধের লেখক' শুনিয়া আমাদের তাক্ লাগিয়া যায়; ভাবি, না-জানি কত বড় বৈজ্ঞানিক! কষ্টিপাথরে যাচাই করিবার প্রবৃত্তি আমাদের বড় কম। ভুলিয়া যাই পরিমাণ অপেক্ষা গুণ শ্রেষ্ঠ। খ্যাতির জন্য একটি প্রবন্ধই যথেষ্ট যদি প্রকৃতই তাহাতে মূল্যবান্ বস্তু থাকে। আইন্‌ষ্টাইনের আপেক্ষিক-তত্ত্ব তাঁহাকে বিশ্ববিখ্যাত করিয়াছে—আয়তনে বা পরিমাণে তাহা অত্যল্প। কথিত আছে, গোল্ডস্মিথকে এক জন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "How many potatoes will reach to the moon?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "One, if it is long enough." সস্তায় নাম কিনিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় এবং সহজ প্রতি-যোগিতায় অকারণ পিছনে পড়িয়া থাকিবার অমূলক আশঙ্কায় আমরা তাড়াতাড়ি কতকগুলি প্রবন্ধ ছাপাইয়া

দিই—অনেক ক্ষেত্রেই তাহা 'প্রথম ভাগে' পর্য্যবসিত হয়। বিদেশী নামজাদা বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় সে-সব প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা কম। কোন নির্ম্মম সমালোচক বলিয়া বেড়ান, "যখন বিদেশ হইতে ভারতীয়দের রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ ঘন ঘন প্রত্যাখ্যাত হইতে লাগিল, তখনই ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিবার সত্যকার প্রেরণা জাগে।" অপবাদটা একেবারে ভিত্তি-হীন কিনা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ইণ্ডিয়ান সায়ান্স কংগ্রেসের গত কয়েক বৎসরের কার্য্যবিবরণী খুলিলে দেখা যাইবে রসায়ন-শাখার প্রবন্ধের সংখ্যা সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে—ন্যূন ২৫০টি প্রতি বৎসর। অথচ ইহার অর্দ্ধেকেরও সন্ধান পরে মিলে না; ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায়ও সিকি ছাপা হয় না। উচুদরের কোন কিছু করিতে হইলে এই মনোবৃত্তি অবিলম্বে পরিত্যাগ করিতে হইবে। সংক্রামক ব্যাধির মত ইহা তরুণ রাসায়নিকদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে। অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী গবেষণার পরও রসায়নের কোন পাঠ্যপুস্তকে ভারতীয়ের নাম খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। উন্নত গবেষণায় কোন ভারতীয়ের প্রদর্শিত পন্থা আজ পর্য্যন্ত বড়-একটা কেহ অনুসরণ করে না। গোটা রসায়নশাস্ত্রটা গড়িয়া তুলিয়াছে ইউরোপ—পঞ্চাশ বৎসর আগে যেমন ইহা আমাদের নিকট বিদেশীয় ছিল আজও প্রায় তেমনি আছে। আরও কত কাল থাকিবে কে জানে?

আমরা বিলাতে যাই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের নিকট দীক্ষা ও অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া খাঁটি বৈজ্ঞানিক হইতে নয়—সহজে ডি. এসসি., পিএইচ ডি. উপাধি আনিতে, চাকরির সুবিধার জন্য। ফিরিয়া আসিয়া ভাগ্যক্রমে চাকরি জুটিলে, চটপট্ সস্তা ডি. এসসি. তৈয়ারী করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাই। যেহেতু যে অধ্যাপকের যত অধিকসংখ্যক ছাত্র ডি. এসসি. হইবে তিনি তত বড় বিবেচিত হন। সরকারী খেতাবের মত এই উপাধির মোহ আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে—কাজের চেয়ে উপাধি হইয়াছে বড়। আচার্য্য রায়ের ওঝাগিরিতেও এ ভূত ঘাড় হইতে নামিতেছে না। এই সব নানা কারণে গবেষণার মানদণ্ড দ্রুত গতিতে নীচের দিকে নামিতেছে। ফল কি হইবে অনুমান করা শক্ত নয়। ইউরোপে দেখা যায়, অনেক নামজাদা গুরুর শিষ্য নামজাদা হইয়াছেন। যেমন বর-এর ছাত্র হইসেনবের্গ, হফম্যানের ছাত্র পার্কিন্, লিবীগ্-এর ছাত্র কেকুলে-বুনসেন-এর ছাত্র ভিক্টর মায়ার ইত্যাদি। রসায়নে বিদেশী প্রসিদ্ধ গুরুর বহু শিষ্য এদেশে রহিয়াছেন। ভারতের জলবায়ুকে সেজন্য দায়ী করা চলে না—যেহেতু লর্ড র‍্যালের ছাত্র আচার্য্য জগদীশচন্দ্র।

ভারতের অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের এবং রসায়নবিদ্যার সাহায্যে শিল্পোন্নতি করিয়া দেশের আর্থিক দুর্গতি দূর করা সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা ভারতীয় মনীষী ও নেতৃবৃন্দের মুখে প্রায়ই শুনিয়া থাকি। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়াই মহাপ্রাণ জামসেদজী টাটা বহু অর্থব্যয়ে বাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়ান্স প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বহু লক্ষ টাকা যেখানে গত পঁচিশ বছরে ব্যয়িত হইয়াছে, কিন্তু সেখানকার গবেষণার ফলে সমগ্র ভারতে আজ পর্য্যন্ত একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠিয়াছে কি? ইদানীং ডাঃ রামনের আমলে সেখানে "highly theoretical research" পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে—সাত বছর আগে সিউয়েল কমীটির সদস্য রূপে অধ্যাপক সাহার তীব্র প্রতিবাদ কিছুমাত্র কার্য্যকরী হয় নাই। তেমনি পুষা, ডেরাডুন, রাঁচি ও বোম্বাইয়ে অজস্র অর্থব্যয়ে বিরাট সরকারী গবেষণাকেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্যয়ের মোটা অংশ অন্নহীন বস্ত্রহীন ভারতীয় কৃষকদের অনিচ্ছাকৃত দান। দেশের কোটি কোটি মূক চাষীর জন্য আজ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ কিছু করা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। ইহার জবাব দিবে কে? এই জাতীয় দুর্গতির দিনে ভারতীয় রাসায়নিকগণ কি "highly theoretical" গবেষণা লইয়াই ব্যস্ত থাকিবেন—অপরের অনুকরণ করিয়া সুলভে খ্যাতি লাভ করিবার মিথ্যা মোহে? তাঁহাদের অনেক উচ্চ শিক্ষার মোটা অংশ যে চাষী জোগাইয়াছে, এবং বেতনের প্রায় সবটা যাহারা নীরবে যোগাইতেছে, তাহাদের ঋণ, তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য ইহারা কি চিরদিনই ভুলিয়া থাকিবেন? ফলিত-রসায়নের চর্চ্চা দ্বারা দেশের আর্থিক উন্নতি সাধনে জাপান যে নির্ভুল পথ দেখাইয়াছে, সেদিকে কি তাঁহারা কোন দিনই যাইবেন না?

জাপান উন্নতির প্রথম যুগে বিদেশলব্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কাজে লাগাইয়া দেশের আর্থিক দুর্গতি দূর করিয়া ঘর সামলাইয়াছে। ইদানীং অবসরমত Pure Researchএও মন দিয়াছে। আমরা করিয়াছি ঠিক বিপরীত; ফলও তদনুরূপ হইয়াছে।

আরণ্যক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩

এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইল।

মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্টের দক্ষিণে মাইল পনর-কুড়ি দূরে একটা বিস্তৃত শাল ও বিড়ির পাতার জঙ্গল সেবার কালেক্টরীর নীলামে ডাক হইবে খবর পাওয়া গেল। আমাদের হেড আপিসে তাড়াতাড়ি একটা খবর দিতে তারযোগে আদেশ পাইলাম, বিড়ির পাতার জঙ্গল যেন আমি ডাকিয়া লই।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বে জঙ্গলটা একবার আমার নিজের চোখে দেখা আবশ্যক। কি আছে না-আছে না জানিয়া নীলাম ডাকিতে আমি প্রস্তুত নই। এদিকে নীলামের দিনও নিকটবর্ত্তী, তার পাওয়ার পরদিনই সকালে রওনা হইলাম।

আমার সঙ্গের লোকজন খুব ভোরে বাক্স বিছানা ও জিনিষপত্র মাথায় রওনা হইয়াছিল, মোহনপুরা ফরেষ্টের সীমানায় কারো নদী পার হইবার সময়ে তাহাদের সহিত দেখা হইল। সঙ্গে ছিল আমাদের পাটোয়ারী বনোয়ারীলাল।

কারো ক্ষীণকায়া পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী—হাঁটুখানেক জল ঝিরঝির করিয়া উপলরাশির মধ্য দিয়া প্রবাহিত। আমরা দু-জনে ঘোড়া হইতে নামিলাম, নয়ত পিছল পাথরের নুড়িতে ঘোড়া পা হড়কাইয়া পড়িয়া যাইতে পারে। দু-পারে কটা বালির চড়া। সেখানেও ঘোড়ায় চাপা যায় না, হাঁটু পর্য্যন্ত বালিতে এমনিই ডুবিয়া যায়। অপর পারের কড়ারী জমিতে যখন পৌছিলাম, তখন বেলা এগারটা। বনোয়ারী পাটোয়ারী বলিল—এখানে রান্নাবান্না ক'রে নিলে হয় হুজুর, এর পরে জল পাওয়া যায় কি না ঠিক নেই।

নদীর দু-পারেই জনহীন আরণ্যভূমি, তবে বড় জঙ্গল নয়, ছোটখাট কেঁদ পলাশ ও শালের জঙ্গল—খুব ঘন ও প্রস্তরাকীর্ণ, লোকজনের চিহ্ন কোন দিকে নাই।

আহারাদির কাজ খুব সংক্ষেপে সারিলেও সেখান হইতে রওনা হইতে একটা বাজিয়া গেল।

বেলা যখন যায়-যায়, তখনও জঙ্গলের কূলকিনারা নাই, আমার মনে হইল আর বেশী দূর অগ্রসর না-হইয়া একটা বড় গাছের তলায় আশ্রয় লওয়া ভাল। অবশ্য বনের মধ্যে ইহার পূর্ব্বে দুইটি বন্য গ্রাম ছাড়াইয়া আসিয়াছি—একটার নাম কুলপাল, একটার নাম বুরুডি, কিন্তু সে প্রায় বেলা তিনটার সময়। তখন যদি জানা থাকিত যে সন্ধ্যার সময়ও জঙ্গল শেষ হইবে না, তাহা হইলে সেখানেই রাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করা যাইত।

বিশেষ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে জঙ্গল বড় ঘন হইয়া আসিল। আগে ছিল ফাঁকা জঙ্গল, এখন যেন ক্রমেই চারি দিক হইতে বড় বড় বনস্পতির দল ভিড় করিয়া সরু সুঁড়ি পথটা চাপিয়া ধরিতেছে—এখন যেখানে দাঁড়.. আছি, সেখানটাতে তো চারি দিকেই বড় বড় গাছ, আকাশ দেখা যায় না, নৈশ অন্ধকার ইতিমধ্যেই ঘনাইয়া আসিয়াছে।

এক এক জায়গায় ফাঁকা জঙ্গলের দিকে বনের কি অনুপম শোভা! কি এক ধরণের থোকা থোকা সাদা ফুল সারা বনের মাথা আলো করিয়া ফুটিয়া আ[illegible] ছায়াগহন অপরাহ্ণের নীল আকাশের তলে। মানুষের চোখের আড়ালে সভ্য জগতের সীমা হইতে বহু দূরে এত সৌন্দর্য্য কার জন্য যে সাজানো! বনোয়ারী বলিল—ও বুনো তেউড়ির ফুল, এই সময় জঙ্গলে ফোটে, হুজুর। এক রকমের লতা।

যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই গাছের মাথা, ঝোপের মাথা, ঈষৎ নীলাভ শুভ্র বুনো তেউড়ির ফুল ফুটিয়া আলো করিয়া রাখিয়াছে—ঠিক যেন রাশি রাশি পেঁজা নীলাভ

কাপাস তুলা কে ছড়াইয়া রাখিয়াছে বনের গাছের মাথায় সর্ব্বত্র। ঘোড়া থামাইয়া মাঝে মাঝে কতক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি—এক এক জায়গার শোভা এমনই অদ্ভুত যে সেদিকে চাহিয়া যেন একটা ছন্নছাড়া মনের ভাব হইয়া যায়—যেন মনে হয় কত দূরে কোথায় আছি, সভ্য জগৎ হইতে বহু দূরে এক জনহীন, অজ্ঞাত জগতের উদাস, অপরূপ বন্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে—যে-জগতের সঙ্গে মানুষের কোনও সম্পর্ক নাই, প্রবেশের অধিকারও নাই, শুধু বন্য জীবজন্তু, বৃক্ষলতার জগৎ।

বোধ হয় আরও দেরি হইয়া গিয়াছিল আমার এই বার বার জঙ্গলের দৃশ্য হাঁ করিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া দেখিবার ফলে। বেচারী বনোয়ারী পাটোয়ারী আমার তাবে কাজ করে, সে জোর করিয়া আমায় কিছু বলিতে না পারিলেও মনে মনে নিশ্চয়ই ভাবিতেছে—এ বাঙালী বাবুটির মাথায় নিশ্চয় দোষ আছে। একে দিয়া জমিদারীর কাজ আর কত দিন চলিবে? একটি বড় আসান-গাছের তলায় সবাই মিলিয়া আশ্রয় লওয়া গেল। আমরা আছি সবসুদ্ধ আট-দশ জন লোক। বনোয়ারী বলিল—বড় একটা আগুন কর, আর সবাই কাছাকাছি ঘেঁষে থাকো। ছড়িয়ে থেকো না, নানা রকম বিপদ এ-জঙ্গলে রাত্রিকালে।

গাছের নীচে ক্যাম্প-চেয়ার পাতিয়া বসিয়াছি, মাথার উপর অনেক দূর পর্য্যন্ত ফাঁকা আকাশ, এখনও অন্ধকার নামে নাই, দূরে নিকটে জঙ্গলের মাথায় বুনো তেউড়ির সাদা ফুল ফুটিয়া আছে, রাশি রাশি, অজস্র, আমার ক্যাম্প-চেয়ারের পাশেই দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাস, আধ-শুকনো, সোনালী রঙের। রোদ-পোড়া মাটির সোঁদা গন্ধ, শুক্‌নো ঘাসের গন্ধ, কি একটা বন ফুলের গন্ধ যেন দুর্গা-প্রতিমার রাঙতার ডাকের সাজের গন্ধের মত। মনের মধ্যে এই উন্মুক্ত, বন্য জীবন আনিয়া দিয়াছে একটা মুক্তি ও আনন্দের অনুভূতি—যাহা কোথাও কখনও আসে না এই রকম বিরাট্ নির্জ্জন প্রান্তর ও জনহীন অঞ্চল ছাড়া। অভিজ্ঞতা না-থাকিলে বলিয়া বোঝান বড়ই কঠিন সে মুক্ত জীবনের উল্লাস।

এমন সময়ে আমাদের এক কুলি আসিয়া পাটোয়ারীর কাছে বলিল, একটু দূরে জঙ্গলের মধ্যে শুষ্ক ডালপালা কুড়াইতে গিয়া সে একটা কি জিনিষ দেখিয়াছে। জায়গাটা ভাল নয়, ভূত বা পরীর আড্ডা, এখানে না তাঁবু ফেলিলেই হইত।

পাটোয়ারী বলিল—চলুন হুজুর দেখে আসি কি জিনিষটা।

কিছু দূরে জঙ্গলের মধ্যে একটা জায়গা দেখাইয়া কুলিটা বলিল—ঐখানে নিকটে গিয়ে দেখুন হুজুর। আমি আর কাছে যাব না।

বনের মধ্যে কাঁটা লতা ও ঝোপ হইতে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে একটি পাথরের স্তম্ভ, হাত সাত-আট উঁচু। স্তম্ভের মাথায় একটা বিকট মুখ খোদাই করা, সন্ধ্যাবেলা দেখিলে ভয় পাইবার কথা বটে।

মানুষের হাতের তৈরি এ-বিষয়ে ভুল নাই, কিন্তু এ জনহীন জঙ্গলের মধ্যে এ স্তম্ভ কোথা হইতে আসিল বুঝিতে পারিলাম না। জিনিষটা কত দিনের প্রাচীন তাহাও বুঝিতে পারিলাম না।

সে-রাত্রি কাটিয়া গেল। সকালে উঠিয়া বেলা ন-টার মধ্যে আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছি গেলাম।

সেখানে পৌঁছিয়া জঙ্গলের বর্ত্তমান মালিকের জনৈক কর্ম্মচারীর সঙ্গে দেখা হইল। সে আমায় জঙ্গল দেখাইয়া বেড়াইতেছে—হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে একটা শুষ্ক নালার ওপারে ঘন বনের মধ্যে দেখি একটা প্রস্তরস্তম্ভের শীর্ষ জাগিয়া আছে—ঠিক কাল সন্ধ্যাবেলার সেই স্তম্ভটার মত। সেই রকমের বিকট মুখ খোদাই করা।

আমার সঙ্গে বনোয়ারী পাটোয়ারী ছিল, তাহাকেও দেখাইলাম। মালিকের কর্ম্মচারী স্থানীয় লোক, সে বলিল—ও আরও তিন-চারটা আছে এ-অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে। এ-দেশে আগে অসভ্য বুনো জাতির রাজ্য ছিল, ও তাদেরই হাতের তৈরি। ওগুলো সীমানার নিশানদিহি থাম্বা।

বলিলাম—সীমানার থাম্বা কি ক'রে জানলে?

সে বলিল—চিরকাল শুনে আসছি বাবুজী, তা ছাড়া সেই রাজার বংশধর এখনও বর্ত্তমান।

বড় কৌতূহল হইল।

—কোথায়?

লোকটা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—এই জঙ্গলের উত্তর সীমানায় একটা ছোট বস্তি আছে—সেখানে থাকেন। এ-অঞ্চলে তাঁর বড় খাতির। আমরা শুনেছি উত্তরে হিমালয় পাহাড়, আর দক্ষিণে ছোটনাগপুরের সীমানা, পূর্ব্বে কুশী নদী, পশ্চিমে মুঙ্গের—এই সীমানার মধ্যে সমস্ত পাহাড়-জঙ্গলের রাজা ছিল ওঁর পূর্ব্বপুরুষ।

মনে পড়িল পূর্ব্বেও আমার কাছারিতে একবার গণোরী তেওয়ারী স্কুলমাষ্টার গল্প করিয়াছিল বটে যে এ-অঞ্চলের যে আদিম জাতীয় রাজা, তাদের বংশধর এখনও আছে। এ-দিকের যত পাহাড়ী জাতি—তাহাকেই এখনও রাজা বলিয়া মানে। এখন সে-কথা মনে পড়িল। জঙ্গলের মালিকের সেই কর্ম্মচারীর নাম বুদ্ধু সিং, বেশ বুদ্ধিমান, এখানে অনেক কাল চাকুরী করিতেছে, এই সব বন-পাহাড় অঞ্চলের অনেক ইতিহাস সে জানে দেখিলাম।

বুদ্ধু সিং বলিল—মুঘল বাদশাদের আমলে এরা মুঘল-সৈন্যদের সঙ্গে লড়েছে—এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তারা যখন বাংলা দেশে যেত—এরা উপদ্রব করত তীর ধনুক নিয়ে। শেষে রাজমহলে যখন মুঘল সুবাদারেরা থাকতেন, তখন এদের রাজ্য যায়। ভারী বীরের বংশ এরা, এখন আর কিছুই নেই। যা কিছু বাকী ছিল ১৮৬২ সালের সাঁওতাল-বিদ্রোহের পরে সব যায়। সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা এখনও বেঁচে আছেন। তিনিই বর্ত্তমান রাজা। নাম দোবরু পান্না বীরবর্দ্দী। খুব বৃদ্ধ আর খুব গরিব। কিন্তু এ-দেশের সকল আদিম জাতি এখনও তাঁকে রাজার সম্মান দেয়। রাজ্য না-থাকলেও রাজা বলেই মানে।

রাজার সঙ্গে দেখা করিবার বড়ই ইচ্ছা হইল।

রাজসন্দর্শনে যাইতে হইলে কিছু নজর লইয়া যাওয়া উচিত। যার যা প্রাপ্য সম্মান, তাকে তা না-দিলে কর্ত্তব্যের হানি ঘটে।

কিছু ফলমূল, গোটা দুই বড় মুরগী বেলা একটার মধ্যে নিকটবর্ত্তী বস্তি হইতে কিনিয়া আনিলাম। এ-দিকের কাজ শেষ করিয়া বেলা দুইটার পরে বুদ্ধু সিংকে বলিলাম—চল, রাজার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

বুদ্ধু সিং তেমন উৎসাহ দেখাইল না। বলিল—আপনি সেখানে কি যাবেন? আপনাদের সঙ্গে দেখা করবার উপযুক্ত নয়। পাহাড়ী অসভ্য জাতদের রাজা, তাই ব'লে কি আর আপনাদের সমান সমান কথা বলবার যোগ্য, বাবুজী? সে তেমন কিছু নয়।

তাহার কথা না-শুনিয়াই আমি ও বনয়ারীলাল রাজধানীর দিকে গেলাম। তাহাকেও সঙ্গে লইলাম।

রাজধানীটা খুব ছোট, কুড়ি-পঁচিশ ঘর লোকের বাস।

ছোট ছোট মাটির ঘর, খাপ্‌রার চাল—বেশ পরিষ্কার করিয়া লেপাপোঁছা। দেওয়ালের গায়ে মাটির সাপ, পদ্ম, লতা প্রভৃতি গড়া। ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম্ম করিতেছে। কিশোরী ও যুবতী মেয়েদের সুঠাম গড়ন ও নিটোল স্বাস্থ্য, মুখে কেমন সুন্দর একটা লাবণ্য প্রত্যেকেরই। সকলেই আমাদের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

বুদ্ধু সিং এক জন স্ত্রীলোককে বলিল—রাজা ছে রে?

স্ত্রীলোকটি বলিল, সে দেখে নাই। তবে কোথায় আর যাইবে, বাড়ীতেই আছে।

আমরা গ্রামে যেখানে আসিয়া দাঁড়াইলাম, বুদ্ধু সিংয়ের ভাবে মনে হইল এইবার রাজপ্রাসাদের সম্মুখে নীত হইয়াছি। অন্য ঘরগুলির সঙ্গে রাজপ্রাসাদের পার্থক্য এই মাত্র লক্ষ্য করিলাম যে, ইহার চারি পাশে পাথরের পাঁচিলে ঘেরা—বস্তির পিছনেই অনুচ্চ পাহাড়, সেখান হইতেই পাথর আনা হইয়াছে। রাজবাড়ীতে ছেলেমেয়ে অনেকগুলি—কতকগুলি খুব ছোট। তাদের গলায় পুঁতির মালা ও লাল নীল ফলের বীজের মালা। দু-একটি ছেলেমেয়ে দেখিতে বেশ সুশ্রী। ষোল-সতের বছরের একটি মেয়ে বুদ্ধু সিংয়ের ডাকে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়াই আমাদের দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, তাহার চোখের চাহনি দেখিয়া মনে হইল কিছু ভয়ও পাইয়াছে।

বুদ্ধু সিং বলিল—রাজা কোথায়?

মেয়েটি কে? বুদ্ধু সিংকে জিজ্ঞাসা করিলাম। বুদ্ধু সিং বলিল—রাজার নাতির মেয়ে।

রাজা বহুদিন জীবিত থাকিয়া নিশ্চয়ই বহু যুবক ও প্রৌঢ়কে রাজসিংহাসনে বসিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন।

মেয়েটি বলিল—আমার সঙ্গে এস। জ্যাঠা-মশায় পাহাড়ের নীচে পাথরে ব'সে আছেন।

মানি বা নাই মানি, মনে মনে ভাবিলাম যে-মেয়েটি আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছে, সে সত্যই রাজকন্যা—তাহার পূর্ব্বপুরুষেরা এই আরণ্য ভূভাগ বহুদিন ধরিয়া শাসন করিয়াছিল—সেই বংশের সে মেয়ে।

বলিলাম—মেয়েটির নাম কি জিজ্ঞেস্ কর।

বুদ্ধু সিং বলিল—ওর নাম ভানুমতী।

বাঃ বেশ সুন্দর—ভানুমতী! রাজকন্যা ভানুমতী!

ভানুমতী নিটোল স্বাস্থ্যবতী, সুঠাম মেয়ে। লাবণ্য-মাখা মুখশ্রী—তবে পরনের কাপড় সভ্য সমাজের শোভনতা রক্ষা করিবার উপযুক্ত প্রমাণ মাপের নয়। মাথার চুল রুক্ষ, গলায় কড়ি ও পুঁতির দানা। দূর হইতে একটা বড় বকাইন গাছ দেখাইয়া দিয়া ভানুমতী বলিল—তোমরা যাও, জ্যাঠামশায় ওই গাছতলায় ব'সে গরু চরাচ্ছেন।

গরু চরাইতেছেন কি রকম! প্রায় চমকিয়া উঠিয়াছিলাম বোধ হয়। এই সমগ্র অঞ্চলের রাজা সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা দোবরু পান্না বীরবর্দ্দী গরু চরাইতেছেন!

কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই মেয়েটি চলিয়া গেল এবং আমরা আর কিছু অগ্রসর হইয়া বকাইন গাছের তলায় এক বৃদ্ধকে কাঁচা শালপাতায় তামাক জড়াইয়া ধূমপানরত দেখিলাম।

বুদ্ধু সিং বলিল—সেলাম, রাজাসাহেব।

রাজা দোবরু পান্না কানে শুনিতে পাইলেও চোখে খুব ভাল দেখিতে পান বলিয়া মনে হইল না।

বলিলেন—কে? বুদ্ধু সিং? সঙ্গে কে?

বুদ্ধু বলিল—এক জন বাংগালী বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। উনি কিছু নজর এনেছেন··· আপনাকে নিতে হবে।

আমি নিজে গিয়া বৃদ্ধের সামনে মুরগী ও জিনিষ কয়টি নামাইয়া রাখিলাম। বলিলাম—আপনি দেশের রাজা, আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বহুৎ দূর থেকে এসেছি।

বৃদ্ধের দীর্ঘায়ত চেহারার দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল যৌবনে রাজা দোবরু পান্না খুব সুপুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই। মুখশ্রীতে বুদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট। বৃদ্ধ খুব খুশী হইলেন। আমার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন—কোথায় ঘর?

বলিলাম—কল্‌কাতা।

—উঃ অনেক দূর। বড় ভারী জায়গা শুনেচি কল্‌কাতা।

—আপনি কখনও যান্ নি?

—না, আমরা কি শহরে যেতে পারি? এই জঙ্গলেই আমরা থাকি ভাল। বোসো। ভানুমতী কোথায় গেল, ও ভানুমতী?

মেয়েটি ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—কি জ্যাঠা-মশায়?

—এই বাঙালী বাবু ও তাঁর সঙ্গের লোকজন আজ আমার এখানে থাকবেন ও খাওয়া-দাওয়া করবেন।

আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম—না, না, সে কি? আমরা এখুনি চলে যাব, আপনার সঙ্গে দেখা করেই—আমাদের থাকার বিষয়ে—

কিন্তু দোবরু পান্না বলিলেন—না, তা হতেই পারে না। ভানুমতী, এই জিনিষগুলো নিয়ে যা এখান থেকে।

আমার ইঙ্গিতে বনোয়ারীলাল পাটোয়ারী নিজে জিনিষগুলি বহিয়া অদূরবর্ত্তী রাজার বাড়ীতে লইয়া গেল ভানুমতীর পিছু পিছু। বৃদ্ধের কথা অমান্য করিতে পারিলাম না, বৃদ্ধের দিকে চাহিয়াই আমার সম্ভ্রমে মন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা, প্রাচীন অভিজাত-বংশীয় বীর দোবরু পান্না (হইলই বা বন্য আদিম জাতি) আমাকে থাকিতে অনুরোধ করিতেছেন—এ অনুরোধ আদেশেরই সামিল।

রাজা দোবরু পান্না অত্যন্ত দরিদ্র, দেখিয়াই

বুঝিয়াছিলাম। তাঁহাকে গরু চরাইতে দেখিয়া প্রথমটা আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু পরে মনে ভাবিয়া দেখিলাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজা দোবরু পান্নার অপেক্ষা অনেক বড় রাজা অবস্থাবৈগুণ্যে গোচারণ অপেক্ষাও হীনতর বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

রাজা নিজের হাতে শালপাতার একটা চুরুট গড়িয়া আমার হাতে দিলেন। দেশলাই নাই—গাছের তলায় আগুন করাই আছে—তাহা হইতে একটা পাতা জ্বালাইয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন।

বলিলাম—আপনারা এ-দেশের প্রাচীন রাজবংশ, আপনাদের দর্শনে পুণ্য আছে।

দোবরু পান্না বলিলেন—এখন আর কি আছে? আমাদের বংশ সূর্য্যবংশ। এই পাহাড় জঙ্গল, সারা পৃথিবী আমাদের রাজ্য ছিল। আমি যৌবন বয়সে কোম্পানীর সঙ্গে লড়েছি। এখন আমার বয়স অনেক। যুদ্ধে হেরে গেলাম। তার পর আর কিছু নেই।

এই আরণ্য ভূভাগের বহিঃস্থিত অন্য কোনও পৃথিবীর খবর দোবরু পান্না রাখেন বলিয়া মনে হইল না। তাঁহার কথার উত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছি, এমন সময় এক জন যুবক আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

রাজা দোবরু বলিলেন—আমার ছোট নাতি, জগরু পান্না। ওর বাবা এখানে নেই, লছমীপুরের রাণী সাহেবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। ওরে জগরু, বাবুজীর জন্যে খাওয়ার জোগাড় কর।

যুবক যেন নবীন শালতরু, পেশীবহুল সবল নধর দেহ। সে বলিল—বাবুজী, সজারুর মাংস খান?

পরে তাহার পিতামহের দিকে চাহিয়া বলিল—পাহাড়ের ওপারের বনে ফাঁদ পেতে রেখেছিলাম, কাল রাত্রে দুটো সজারু পড়েছে।

শুনিলাম রাজার তিনটি ছেলে, আট-দশটি নাতি-নাতনী, তাদের আবার আট-দশটি ছেলেমেয়ে। এই বৃহৎ রাজপরিবারের সকলেই এই গ্রামে একত্র থাকে। শিকার ও গোচারণ প্রধান উপজীবিকা। এ বাদে বনের পাহাড়ী জাতিদের বিবাদ-বিসংবাদে রাজার কাছে বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিলে কিছু কিছু ভেট্ ও নজরানা দিতে হয়—দুধ, মুরগী, ছাগল, পাখীর মাংস বা ফলমূল।

বলিলাম—আপনার চাষবাস আছে?

দোবরু পান্না গর্ব্বের সুরে বলিলেন—ওসব আমাদের বংশে নিয়ম নেই। শিকার করার মান সকলের চেয়ে বড়, তাও এক সময়ে ছিল বর্শা নিয়ে শিকার সব চেয়ে গৌরবের। তীর ধনুকের শিকার দেবতার কাজে লাগে না। ও বীরের কাজ নয়, তবে এখন সবই চলে। আমার বড় ছেলে মুঙ্গের থেকে একটা বন্দুক কিনে এনেছে। আমি কখনও ছুঁই নি। বর্শা ধ'রে শিকার আসল শিকার।

ভানুমতী আবার আসিয়া একটা পাথরের ভাঁড় আমাদের কাছে রাখিয়া গেল।

রাজা বলিলেন—তেল মাখুন। কাছেই চমৎকার ঝরণা—স্নান ক'রে আসুন সকলে।

আমরা স্নান করিয়া আসিলে রাজা আমাদের রাজবাড়ীর একটা ঘরে লইয়া যাইতে বলিলেন।

ভানুমতী একটা ধামায় চাল ও মেটে আলু আনিয়া দিল। জগরু সজারু ছাড়াইয়া মাংস আনিয়া রাখিল কাঁচা শালপাতার পাত্রে। ভানুমতী আর একবার গিয়া দুধ ও মধু আনিল। আমার সঙ্গে ঠাকুর ছিল না, বনোয়ারী মেটে আলু ছাড়াইতে বসিল, আমি রাঁধিবার চেষ্টায় উনুন ধরাইতে গেলাম। কিন্তু শুধু বড় বড় কাঠের সাহায্যে উনুন ধরানো কষ্টকর। দু-একবার চেষ্টা করিয়া পারিলাম না, তখন ভানুমতী তাড়াতাড়ি একটা পাখীর শুক্‌নো বাসা আনিয়া উনুনের মধ্যে পুরিয়া দিতে আগুন বেশ জ্বলিয়া উঠিল। দিয়াই দূরে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল। ভানুমতী রাজকন্যা বটে; কিন্তু বেশ অমায়িক স্বভাবের রাজকন্যা। অথচ দিব্য সহজ, সরল মর্য্যাদাজ্ঞান।

রাজা দোবরু পান্না সব সময় রান্নাঘরের দুয়ারটির কাছে বসিয়া রহিলেন। আতিথ্যের এতটুকু ত্রুটি না ঘটে। আহারাদির পরে বলিলেন—আমার তেমন বেশী ঘরদোরও নেই, আপনাদের বড় কষ্ট হ'ল। এই বনের মধ্যে পাহাড়ের উপরে আমার বংশের রাজাদের প্রকাণ্ড বাড়ীর চিহ্ন এখনও আছে। আমি বাপ-ঠাকুর্দ্দার কাছে শুনেছি বহু প্রাচীন কালে ওখানে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা

বাস করতেন। সে দিন কি আর এখন আছে! আমাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত দেবতাও এখন সেখানে আছেন।

আমার বড় কৌতূহল হইল, বলিলাম—যদি আমরা একবার দেখতে যাই তাতে কি কোনও আপত্তি আছে, রাজাসাহেব?

—এর আবার আপত্তি কি? তবে দেখবার এখন বিশেষ কিছু নেই। আচ্ছা, চলুন আমি যাব। জগরু আমাদের সঙ্গে এস।

আমি আপত্তি করিলাম—বিরানব্বই বছরের বৃদ্ধকে আর পাহাড়ে উঠাইবার কষ্ট দিতে মন সরিল না। সে আপত্তি টিকিল না, রাজাসাহেব হাসিয়া বলিলেন—ও পাহাড়ে আমায় তো প্রায়ই উঠতে হয়—ওর গায়েই আমার বংশের সমাধিস্থান। প্রত্যেক পূর্ণিমায় আমায় সেখানে যেতে হয়। চলুন, সে-জায়গাও দেখাব। উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে অনুচ্চ শৈলমালা (স্থানীয় নাম ধন্‌ঝরি) এক স্থানে আসিয়া যেন হঠাৎ ঘুরিয়া পূর্ব্বমুখী হওয়ার দরুন একটা খাঁজের সৃষ্টি করিয়াছে, এই খাঁজের নীচে একটা উপত্যকা, শৈলসানুর অরণ্য সারা উপত্যকা ব্যাপিয়া যেন সবুজের ঢেউয়ের মত নামিয়া আসিয়াছে, যেমন ঝরণা নামে পাহাড়ের গা বহিয়া। অরণ্য এখানে ঘন নয়, ফাঁকা ফাঁকা—বনের গাছের মাথায় মাথায় সুদূর চক্রবালরেখায় নীল শৈলমালা, বোধ হয় গয়া কি রামগড়ের দিকের—যত দূর দৃষ্টি চলে শুধুই বনের শীর্ষ, কোথাও উঁচু, বড় বড় বনস্পতিসঙ্কুল, কোথাও নীচু চারা শাল ও চারা পলাশ। জঙ্গলের মধ্যে সরু পথ বহিয়া পাহাড়ের উপর উঠিলাম।

এক জায়গায় খুব বড় পাথরের চাঁই আড়ভাবে পোতা, ঠিক যেন একখানা পাথরের কড়ি বা ঢেঁকির আকারের। তার নীচে কুম্ভকারদের হাঁড়ি কলসী পোড়ানো পণ-এর গর্ত্তের মত কিংবা মাঠের মধ্যে খেঁক্‌শিয়ালী যেমন গর্ত্ত কাটে—ওই ধরণের প্রকাণ্ড একটা বড় গর্ত্তের মুখ। গর্ত্তের মুখে চারা শালের বন।

রাজা দোবরু বলিলেন—এই গর্ত্তের মধ্যে ঢুকতে হবে। আসুন, আমার সঙ্গে। কোনো ভয় নেই। জগরু আগে যাও।

প্রাণ হাতে করিয়া গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিলাম। বাঘ ভালুক তো থাকিতেই পারে, না থাকে সাপ তো আছেই।

গর্ত্তের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়া খানিক দূর গিয়া তবে সোজা হইয়া দাঁড়ানো যায়। ভয়ানক অন্ধকার ভিতরে প্রথমটা মনে হয়, কিন্তু চোখ অন্ধকারে কিছুক্ষণ অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর তত অসুবিধা হয় না। জায়গাটা প্রকাণ্ড একটা গুহা, কুড়ি-বাইশ হাত লম্বা, হাত পনর চওড়া—উত্তর দিকের দেওয়ালের গায়ে আবার একটা খেঁকশিয়ালীর মত গর্ত্ত দিয়া খানিক দূর গেলে দেওয়ালের ওপারে ঠিক এই রকম নাকি আর একটা গুহা আছে—কিন্তু সেটাতে আমরা ঢুকিবার আগ্রহ দেখাইলাম না। গুহার ছাদ বেশী উঁচু নয়, একটা মানুষ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাত উঁচু করিলে ছাদ ছুঁইতে পারে। চাম্‌সে ধরণের গন্ধ গুহার মধ্যে—বাদুড়ের আড্ডা—এ ছাড়া ভাম্, শৃগাল, বনবিড়াল প্রভৃতিও থাকে শোনা গেল। বনোয়ারী পাটোয়ারী চুপি চুপি বলিল—হুজুর চলুন বাহিরে, এখানে আর বেশী দেরি করবেন না।

ইহাই নাকি দোবরু পান্নার পূর্ব্বপুরুষদের দুর্গ-প্রাসাদ! আসলে ইহা একটি বড় প্রাকৃতিক গুহা—প্রাচীন কালে পাহাড়ের উপর দিকে মুখ-ওয়ালা এ গুহায় আশ্রয় লইলে শত্রুর আক্রমণ হইতে সহজে আত্মরক্ষা করা যাইত।

রাজা বলিলেন—এর আর একটা গুপ্ত মুখ আছে—সে কাউকে বলা নিয়ম নয়। সে কেবল আমার বংশের লোক ছাড়া কেউ জানে না। যদিও এখন এখানে কেউ বাস করে না, তবুও এই নিয়ম চলে আসছে বংশে।

গুহাটা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ধড়ে প্রাণ আসিল।

তার পর আরও খানিকটা উঠিয়া এক জায়গায় প্রায় এক বিঘা জমি জুড়িয়া বড় বড় সরু মোটা ঝুরি নামাইয়া, পাহাড়ের মাথার অনেকখানি ব্যাপিয়া এক বিশাল বটগাছ।

রাজা দোবরু পান্না বলিলেন—জুতো খুলে চলুন মেহেরবানি করে।

বটগাছতলায় যেন চারি ধারে বড় বড় বাটনা-বাটা শিলের আকারের পাথর ছড়ানো।

রাজা বলিলেন—ইহাই তাঁহার বংশের সমাধিস্থান। এক একখানা পাথরের তলায় এক একটা রাজবংশীয় লোকের সমাধি। বিশাল বটতলায় সমস্ত স্থান জুড়িয়া সেই রকম বড় বড় শিলাখণ্ড ছড়ানো—কোনো কোনো সমাধি খুবই প্রাচীন, দু-দিক হইতে ঝুরি নামিয়া যেন সেগুলিকে সাঁড়াশির মত আটকাইয়া ধরিয়াছে, সে সব ঝুরি আবার গাছের গুঁড়ির মত মোটা হইয়া গিয়াছে—কোনো কোনো শিলাখণ্ড ঝুরির তলায় একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতেই সেগুলির প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়।

রাজা দোবরু বলিলেন—এই বটগাছ আগে এখানে ছিল না। অন্য অন্য গাছের বন ছিল। একটি ছোট বট চারা ক্রমে বেড়ে অন্য অন্য গাছ মেরে ফেলে দিয়েছে। এই বটগাছটাই এত প্রাচীন যে এর আসল গুঁড়ি নেই। ঝুরি নেমে যে গুঁড়ি হয়েছে, তারাই এখন রয়েছে। গুঁড়ি কেটে উপড়ে ফেললে দেখবেন ওর তলায় কত পাথর চাপা পড়ে আছে। এইবার বুঝুন কত প্রাচীন সমাধিস্থান এটা।

সত্যই বটগাছতলাটায় দাঁড়াইয়া আমার মনে এমন একটা ভাব হইল, যাহা এতক্ষণ কোথাও হয় নাই, রাজাকে দেখিয়াও না, (রাজাকে তো মনে হইয়াছে জনৈক বৃদ্ধ সাঁওতাল কুলীর মত) রাজকন্যাকে দেখিয়াও নয় (এক জন স্বাস্থ্যবতী হো কিংবা মুণ্ডা তরুণীর সহিত রাজকন্যার কোনো প্রভেদ দেখি নাই), রাজপ্রাসাদ দেখিয়া তো নয়ই (সেটাকে একটা সাপখোপের ও ভূতের আড্ডা বলিয়া মনে হইয়াছে) কিন্তু পাহাড়ের উপরে এই সুবিশাল, প্রাচীন বটতরুতলে কত কালের এই সমাধিস্থল আমার মনে এক অননুভূত, অপরূপ অনুভূতি জাগাইল।

স্থানটির গাম্ভীর্য্য, রহস্য ও প্রাচীনত্বের ভাব অবর্ণনীয়। তখন বেলা প্রায় হেলিয়া পড়িয়াছে, হলদে রোদ পত্ররাশির গায়ে, ডাল ও ঝুরির অরণ্যে, ধনুঝরির অন্য চূড়ায় দূর বনের মাথায়। অপরাহ্নের সেই ঘনায়মান ছায়া এই সুপ্রাচীন রাজসমাধিকে যেন আরও গভীর, রহস্যময় সৌন্দর্য্য দান করিল।

মিশরের প্রাচীন সম্রাটদের সমাধিস্থল থিব্‌স নগরের অদূরবর্ত্তী 'ভ্যালি অফ দি কিংস' আজ পৃথিবীর টুরিষ্টদের লীলাভূমি, পাবলিসিটি ও ঢাক পিটানোর অনুগ্রহে সেখানকার বড় বড় হোটেলগুলি মরশুমের সময় লোকে গিজগিজ করে—'ভ্যালি অফ দি কিংস্' অতীত কালের কুয়াশায় যত না অন্ধকার হইয়া ছিল তার অপেক্ষাও অন্ধকার হইয়া যায় দামী সিগারেট ও চুরুটের ধোঁয়ায়—কিন্তু তার চেয়ে কোন অংশে রহস্যে ও স্বপ্রতিষ্ঠ মহিমায় কম নয় এই সুদূর অতীতের অনার্য্য নৃপতিদের সমাধিস্থল, ঘন আরণ্যভূমির ছায়ায় শৈলশ্রেণীর অন্তরালে যা চিরকাল আত্মগোপন করিয়া আছে ও থাকিবে। এদের সমাধিস্থলে আড়ম্বর নাই, পালিশ নাই, ঐশ্বর্য্য নাই মিশরীয় ধনী ফ্যারাওদের কীর্ত্তির মত—কারণ এরা ছিল দরিদ্র, এদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল মানুষের আদিম যুগের অশিক্ষিতপটু সভ্যতা ও সংস্কৃতি, নিতান্ত শিশু-মানবের মন লইয়া ইহারা রচনা করিয়াছে ইহাদের গুহানিহিত রাজপ্রাসাদ, রাজসমাধি, সীমানাজ্ঞাপক খুঁটি। সেই অপরাহ্নের ছায়ায় পাহাড়ের উপরে সে বিশাল তরুতলে দাঁড়াইয়া যেন সর্ব্বব্যাপী শাশ্বত কালের পিছন দিকে বহুদূরে অন্য এক অভিজ্ঞতার জগৎ দেখিতে পাইলাম—পৌরাণিক ও বৈদিক যুগও যার তুলনায় বর্ত্তমানের পর্য্যায়ে পড়িয়া যায়।

দেখিতে পাইলাম যাযাবর আর্য্যগণ উত্তর-পশ্চিম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া স্রোতের মত অনার্য্য আদিম-জাতি-শাসিত প্রাচীন ভারতে প্রবেশ করিতেছেন··· ভারতের পরবর্ত্তী যা কিছু ইতিহাস—এই আর্য্যসভ্যতার ইতিহাস—বিজিত অনার্য্য জাতিদের ইতিহাস কোথাও লেখা নাই—কিংবা সে লেখা আছে এই সব গুপ্ত গিরি-গুহায়, অরণ্যানীর অন্ধকারে, চূর্ণায়মান অস্থিকঙ্কালের রেখায়। সে লিপির পাঠোদ্ধার করিতে বিজয়ী আর্য্য-জাতি কখনও ব্যস্ত হয় নাই। আজও বিজিত হতভাগ্য আদিম জাতিগণ তেমনই অবহেলিত, অবমানিত, উপেক্ষিত। সভ্যতাদর্পী আর্য্যগণ তাহাদের দিকে

কখনও ফিরিয়া চাহে নাই, তাহাদের সভ্যতা বুঝিবার চেষ্টা করে নাই, আজও করে না। আমি, বনোয়ারী সেই বিজয়ী জাতির প্রতিনিধি, বৃদ্ধ দোবরু পান্না, তরুণ যুবক জগরু, তরুণী কুমারী ভানুমতী সেই বিজিত, পদদলিত জাতির প্রতিনিধি—উভয় জাতি আমরা এই সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি—সভ্যতার গর্ব্বে উন্নত-নাসিক আর্য্যকান্তির গর্ব্বে আমি প্রাচীন অভিজাত-বংশীয় দোবরু পান্নাকে বৃদ্ধ সাঁওতাল ভাবিতেছি, রাজকন্যা ভানুমতীকে মুণ্ডা কুলীরমণী ভাবিতেছি—তাদের কত আগ্রহের ও গর্ব্বের সহিত প্রদর্শিত রাজপ্রাসাদকে অনার্য্যসুলভ আলো-বাতাসহীন গুহাবাস, সাপ ও ভূতের আড্ডা বলিয়া ভাবিতেছি। ইতিহাসের এই বিরাট ট্র্যাজেডি যেন আমার চোখের সম্মুখে সেই সন্ধ্যায় অভিনীত হইল—সে নাটকের কুশীলবগণ এক দিকে বিজিত উপেক্ষিত দরিদ্র অনার্য্য নৃপতি দোবরু পান্না, তরুণী অনার্য্য রাজকন্যা ভানুমতী, তরুণ রাজপুত্র জগরু পান্না—এক দিকে আমি, আমার পাটোয়ারী বনোয়ারী-লাল ও আমার পথপ্রদর্শক বুদ্ধু সিং।

ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে রাজসমাধি ও বটতরুতল আবৃত হইবার পূর্ব্বেই আমরা সেদিন পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলাম।

নামিবার পথে এক স্থানে জঙ্গলের মধ্যে একখানা খাড়া সিঁদুরমাখা পাথর। আশে-পাশে মানুষের হস্তরোপিত গাঁদাফুলের ও সন্ধ্যামণি-ফুলের গাছ। সামনে আর একখানা বড় পাথর তাতেও সিঁদুরমাখা। বহুকাল হইতে নাকি এই দেবস্থান এখানে প্রতিষ্ঠিত, রাজবংশের ইনি কুলদেবতা। পূর্ব্বে এখানে নরবলি হইত—সম্মুখের বড় পাথরখানিই যুপ রূপে ব্যবহৃত হইত। এখন পায়রা ও মুরগী বলি প্রদত্ত হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ঠাকুর ইনি?

রাজা দোবরু বলিলেন—টাঁড়বারো, বুনো মহিষের দেবতা।

মনে পড়িল গত শীতকালে গনু মাহাতোর মুখে শোনা সেই গল্প।

রাজা দোবরু বলিলেন—টাঁড়বারো বড় জাগ্রত দেবতা। তিনি না-থাকলে শিকারীরা চামড়া আর শিঙের লোভে বুনো মহিষের বংশ নির্ব্বংশ ক'রে ছেড়ে দিত। উনি রক্ষা করেন। ফাঁদে পড়বার মুখে তিনি মহিষের দলের সামনে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বাধা দেন—কত লোক দেখেছে।

এই অরণ্যচারী আদিম সমাজের দেবতাকে সভ্য জগতে কেউই মানে না, জানেও না—কিন্তু ইহা যে কল্পনা নয়, এবং এই দেবতা যে সত্যই আছেন—তাহা স্বতঃই মনে উদয় হইয়াছিল সেই বিজন বন্যজন্তু-অধ্যুষিত অরণ্য ও পর্ব্বত অঞ্চলের নিবিড় সৌন্দর্য্য ও রহস্যের মধ্যে বসিয়া।

অনেক দিন পরে কলিকাতায় ফিরিয়া একবার দেখিয়াছিলাম বড়বাজারে, জ্যৈষ্ঠ মাসের ভীষণ গরমের দিনে এক পশ্চিমা গাড়োয়ান বিপুল বোঝাই গাড়ীর মহিষ দুটাকে প্রাণপণে চামড়ার পাচন দিয়া নির্ম্মম ভাবে মারিতেছে—সেই দিন মনে হইয়াছিল হায় দেব টাঁড়বারো, এ ত ছোটনাগপুর কি মধ্যপ্রদেশের আরণ্যভূমি নয়, এখানে তোমার দয়ালু হস্ত এই নির্যাতিত পশুকে কি করিয়া রক্ষা করিবে? এ বিংশ শতাব্দীর আর্য্যসভ্যতাদৃপ্ত কলিকাতা। এখানে বিজিত আদিম রাজা দোবরু পান্নার মতই তুমি অসহায়।

আমি নওয়াদা হইতে মোটর বাস ধরিয়া গয়ায় আসিব বলিয়া সন্ধ্যার পরেই রওনা হইলাম। বনোয়ারী আমাদের ঘোড়া লইয়া তাঁবুতে ফিরিল। আসিবার সময় আর একবার রাজকুমারী ভানুমতীর সহিত দেখা হইয়াছিল। সে এক বাটি মহিষের দুধ লইয়া আমাদের জন্য দাঁড়াইয়া ছিল রাজবাড়ীর দ্বারে।

বুদ্ধু সিংয়ের মুখে শুনিলাম রাজপুত মহাজনে দেনার দায়ে রাজা দোবরু পান্নার কয়েকটি মহিষ গত মাসে ক্রোক করিয়া লইয়া গিয়াছে—মহিষ কয়টি রাজপরিবারের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান সম্বল ছিল। এখন মাত্র দুইটি অবশিষ্ট আছে। সে-দেনাও অতি সামান্য—রাজপুত মহাজনের কাছে পাঁচ টাকা ধার করিয়া জগরু ভানুমতীর জন্য খেজুরছড়ি শাড়ী ও নিজের একটা মেরজাই কিনিয়াছিল—সুদে আসলে পাঁচ টাকা দাঁড়ায় পঁচিশ টাকায়, তারই দায়ে মহিষ-ক্রোক।

আরণ্যমহিষের দেবতা টাঁড়বারো—পুরুষানুক্রমে যাঁহার পূজা ইহারা করিয়া আসিতেছে—তিনি কি ইহা ক্ষমা করিবেন?

ক্রমশঃ

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

আজি হইতে শতবর্ষ পূর্ব্বে এক আষাঢ়-দিবসে কলধৌত-বাহিনী গঙ্গার কূলে বাংলার একখানি অতি-সাধারণ পল্লীগ্রামে এক শিশু জন্মগ্রহণ করেন। সেই শিশু-বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মমুহূর্ত্তে যে শুভশঙ্খ ধ্বনিত হয় তাহার মঙ্গল-নির্ঘোষ আজও বিশ্রান্ত হয় নাই। যৌবনে মনোরাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতিরূপে দেশ তাঁহাকে বরণ করে। তাঁহার সৃষ্টি-বিধায়িনী শক্তিপ্রভাবে জাতির অন্তরে অনন্ত আশার সঞ্চার হয়; ভাষা অনুপম শ্রী ধারণ করে; বঙ্গভারতীর সপ্ততন্ত্রী বীণা গভীর ঝঙ্কারে বাজিয়া ওঠে।

বঙ্কিমচন্দ্র যদি শুধু উপন্যাস লিখিতেন, কালের নিকষে তাঁহার ঔপন্যাসিক কীর্ত্তি চিরদিন অম্লান থাকিত; যদি শুধু প্রবন্ধ রচনা করিতেন, তাহা হইলে মনীষী প্রবন্ধকার-রূপে ভবিষ্যৎ বংশ তাঁহাকে স্মরণ করিত; যদি কেবল পুরাবৃত্ত আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে সত্যান্বেষী নিপুণ ঐতিহাসিক বলিয়া তিনি গণ্য হইতেন; যদি শুধু সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিতেন, সমাজ সম্বন্ধে নূতন তথ্য সমাবেশ এবং নূতনতর দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তাঁহার গবেষণার সুখ্যাতি হইত; যদি শুধু ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে তত্ত্ববিদ্‌রূপে তিনি বিখ্যাত হইতেন; যদি শুধু সাহিত্যের আলোচনা করিতেন, শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলিয়া তাঁহার পরিচয় থাকিত; কেবল রঙ্গ এবং রস রচনাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইলে অসাধারণ রসিক রূপে তিনি পরিগণিত হইতেন; যদি শুধু বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করিতেন, বিজ্ঞানকে লোকপ্রিয় করিয়া তুলিতে কেহ তাঁহার সমকক্ষতা লাভ করিত না; কেবল জ্ঞানের নানা দিক্ প্রদর্শনেই তাঁহার শক্তি প্রযুক্ত হইলে, তীক্ষ্ণধী দার্শনিক-রূপে তিনি সম্মানিত হইতেন। তিনি একাধারে এ সকলই কিন্তু আরও কিছু। সর্ব্ব-দেশের এবং সর্ব্বকালের সাহিত্যে এমন বহুমুখী প্রতিভার আবির্ভাব অল্পই ঘটে। তিনি বিচারশীল, পণ্ডিত, তত্ত্বদর্শী, বিজ্ঞানবিৎ, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সমাজ-বৈজ্ঞানিক, সমালোচক, পরিহাসরসিক, ঔপন্যাসিক; সকলের উপর তিনি দেশপ্রেমের প্রেরয়িতা, জন্মভূমির ভক্ত সন্তান; তাঁহারই উদাত্ত কণ্ঠে অতুলনীয় মাতৃবন্দনা প্রথম উচ্চারিত হয়; অসীম বিস্ময়ে এবং অভাবনীয় আনন্দে দেশ জাগিয়া ওঠে; ভারতবর্ষে নূতন উষার উদয় হয়।

২

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান বিশেষত্ব তাঁহার প্রতিভার পৌরুষ। জ্ঞানে ছিলেন তিনি ব্রাহ্মণ; তেজে, গর্ব্বে, মহিমায়, তিনি ছিলেন রাজা, ক্ষত্রিয়।

পাতলা চাপা ঠোঁট, উচ্চ কপাল, উজ্জ্বল চক্ষু, দৃঢ় চিবুক, দীর্ঘ দেহ, দৃপ্ত ভঙ্গী—তিনি ছিলেন পুরুষপ্রধান।

কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেন, সেদিন তাঁহার অন্তরে যে গভীর রেখাপাত হইয়াছিল তাহার ছবি এইরূপ—

"সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল কৌতুকপ্রফুল্ল মুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকান-পরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে সুসাহিত্য রচিত হয় নাই এমন নয়। কাব্যসাহিত্যের কথা ধরিতেছি না, গদ্যসাহিত্যে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে, নীলমণি বসাকের 'নবনারী' রচিত হইয়াছে। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে' গল্প ও গদ্য রচনার এক নূতনতর ভঙ্গী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য লেখা সুরু করিয়াছেন। এখনকার মত না হইলেও

বঙ্কিমচন্দ্র

তখনও যে সাহিত্যক্ষেত্রে ভীড় জমিতে আরম্ভ করে নাই, এমন কথা বলা যায় না। এমন সময় তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া যিনি দাঁড়াইলেন, তিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র। আর সকলকে জনতার অংশ বলিয়া মনে হইল, শুধু যে একাকী-একজনের দিকে সকলে বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিল, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র।

৩

সে সময় বহু দিক্‌পাল পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর সকলে আসিয়াছিলেন, সমাজ ধর্ম্ম নীতি ইতিহাস ভাষা ও সংস্কৃতিকে যুগোপযোগী গঠন দিতে, বঙ্কিমচন্দ্র আসিলেন দেশকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে। এমন করিয়া স্বদেশকে ভাল বাসিতে, এমন করিয়া পরাধীনতার বেদনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে, এমন করিয়া দেশের কলঙ্কে অপমান এবং দেশের গৌরবে গৌরব-বোধ করিতে, এমন করিয়া মুক্তির কামনা করিতে, এমন করিয়া আশার বাণী শুনাইতে, এমন করিয়া জন্মভূমির ধ্যান করিতে, এমন করিয়া সেই ধ্যানরূপ—সেই ধারণা ভাষায় প্রকাশ করিতে, এমন করিয়া একটি সঙ্গীতময় মন্ত্রের মধ্যে তাহা নিবিষ্ট করিতে কেহ পারে নাই।

এমনিই হয়। যুগযুগান্তর ধরিয়া এক জনের অপেক্ষায় জাতি পাষাণ হইয়া পড়িয়া থাকে, তার পর একদিন সেই পুরুষপ্রধানের পুণ্যস্পর্শে পাষাণে প্রাণের সঞ্চার হয়।

৪

দেশের কর্ম্মপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করে কর্ম্মী, কিন্তু ভাবধারা নিয়ন্ত্রিত করে কবি। বঙ্কিমচন্দ্র সেই কবি।

"কবিতা অমৃত আর কবিরা অমর।" বঙ্কিমচন্দ্র অমর। তাঁহার সাহিত্যের অমৃতস্পর্শে দেশের মূর্চ্ছিত মন জাগিয়া উঠিল।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা না হইলে প্রতিমা পুতুল থাকিয়া যায়। দেবতার আবির্ভাবে বাণীর প্রাণের উদ্বোধন হয়। সে-ই শুধু উদ্বোধনের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারে যাহার শক্তি আছে। অন্তরের এই অপরূপ শক্তির নাম প্রতিভা। বঙ্কিমের সেই প্রতিভা ছিল।

৫

ব্যক্তির মত জাতিরও প্রতিভা থাকে। যে-জাতি নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে সে-ই প্রতিষ্ঠালাভ করে। বাক্যে যে আপনাকে ব্যক্ত করিতে পারে না, কার্য্যেও সে অব্যক্ত থাকিয়া যায়। নির্ব্বাক জাতি কৃপার পাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র জাতিকে সেই অসহনীয় দুঃখ হইতে রক্ষা করিলেন। বঙ্কিমের প্রতিভার আগুনে জাতির মনের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল।

সাহিত্য আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়। যাহার সাহিত্য নাই, সে জাতি মূক। রুশ-সাহিত্য আজ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলিয়া পরিচিত। কিন্তু এই সেদিন পর্য্যন্ত কার্লাইলের কাছে রুশিয়া ছিল—dumb monster। এই বিশাল দেশের সদ্যস্ফুট ধ্বনি তখনও তাঁহার কানে আসিয়া পৌছে নাই।

মূক বেদনার মত বেদনা নাই। আত্মপ্রকাশের মত সুখ নাই। যে জাতির সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার ভাবনা নাই।

বাঙালীর হৃদয়ের উৎসমুখে পাষাণ চাপা পড়িয়াছিল, বঙ্কিমের লোকাতীত শক্তি সেই পাষাণভারকে অপসারিত করিল। জাতির রুদ্ধ হৃদয় মুক্ত হইল।

বঙ্কিমের ভাষাতেই বঙ্কিমের কথা বলি।

> সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না বা শুনিবে না।…যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।…পাঠক বা শ্রোতাদের সহিত সহৃদয়তা লেখকের বা পাঠকের স্বতঃসিদ্ধ গুণ।…সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচনাপাঠে বিমুখ; সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনা পাঠে বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ।…যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারই উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না।…যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই পড়িবে না। যাহা উত্তম তাহা সকলেই পড়িতে চাহে, যে না বুঝিতে পারে সে বুঝিতে যত্ন করে।

তিনি 'বঙ্গদর্শন' বাহির করিলেন, বাঙ্গালার কৃষকের ব্যথা বুঝাইলেন, বাঙ্গালার ইতিহাস পুনরুদ্ধার করিতে যত্নবান হইলেন, বাঙ্গালার কলঙ্ক-মোচনে ব্রতী হইলেন,

তিনি দিন গণিলেন ১২০৩ সাল হইতে, তিনি গাহিলেন,

> সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদ-করালে
> দ্বিসপ্তকোটিভুজৈধৃর্ত-খর-করবালে।

তিনি উচ্চারণ করিলেন, "বন্দে মাতরম্।"

প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। দেশ মাতৃবন্দনার গানে মুখর হইয়া উঠিল। সকলে দেখিল, মহেন্দ্রের মত "গায়িতে গায়িতে চক্ষে জল আসে।"

৬

বঙ্কিমচন্দ্রের "জাতিবৈর" নামে একটি প্রবন্ধ আছে। গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া ইহা সাধারণের নিকট অজ্ঞাত। ন্যাশন্যালিজম্ (Nationalism) বলিতে আমরা যাহা বুঝি জাতিবৈর তাহাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন,

> জাতিবৈর স্বভাব-সঙ্গত এবং ইহার দূরীকরণ স্পৃহণীয় নহে। কিন্তু জাতিবৈর স্পৃহণীয় বলিয়া পরস্পরের প্রতি দ্বেষভাব স্পৃহণীয় নহে।...বিপক্ষের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা ঘটে—স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক—উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতিবৈর ঘটিয়াছে।...আমরা প্রাচীন জাতি; অদ্যাপি রামায়ণ-মহাভারত পড়ি, মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা অনুসারে চলি, স্নান করিয়া জগতের অতুল্য ভাষায় ঈশ্বর আরাধনা করি। যত দিন এ সকল বিস্মৃত হইতে না পারি তত দিন বিনীত হইতে পারিব না। মুখে বিনয় করিব, অন্তরে নহে।...জাতিবৈর উচ্ছিন্ন হইলেই নিকৃষ্ট জাতি উৎকৃষ্টের নিকট বিনীত, আজ্ঞাকারী এবং ভক্তিমান হইবে।...অতএব এই জাতিবৈর আমাদিগের প্রকৃত অবস্থার ফল—যতদিন দেশী-বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ সম্বন্ধে থাকিবে, যত দিন আমরা নিকৃষ্ট হইয়াও পূর্ব্বগৌরব মনে রাখিব, তত দিন জাতিবৈরের শমতার সম্ভাবনা নাই। *

রাষ্ট্র- ও অর্থ- নৈতিক শাস্ত্রে যাহাকে প্রতিযোগিতা বা ইংরেজীতে competition বলে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বৈর' শব্দটি প্রায় অনুরূপ ভাবের ব্যঞ্জনা করে। প্রতিযোগিতা জাতীয়তার এক প্রধান অঙ্গ। তাই বঙ্কিমচন্দ্র জাতিবৈরের জয়গান করিয়াছেন। তিনি কোদালকে কোদালই বলিতেন, খনিত্র নামে অভিহিত করিতেন না।

তিনি শুধু সাহিত্যের জন্য সাহিত্যসৃষ্টি করেন নাই, জাতির জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি শুধু সাহিত্য সৃষ্টি করেন নাই, সাহিত্যিক সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিনয়প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়াছেন,

> যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম।...বঙ্গদর্শনের দ্বারায় সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম।

৭

তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধান, তাঁহার গবেষণা, তাঁহার ভাবনা, কামনা, সাহিত্য-সাধনা প্রবল দেশভক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নিজের মনের অনুভূতিকে অন্যের মনে সমভাবে সঞ্চারিত করাই যদি সাহিত্যের সার্থকতা হয়, তাহা হইলে দেশ-ভক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টি সার্থক।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তি দেশমুখী বলিয়া দেশের মধ্যেই তাঁহার প্রীতি সীমাবদ্ধ ছিল না। যে দেশপ্রেম "অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে চায়" সেই পাশ্চাত্য 'পেট্রিয়টিজম্'কে "ঘোরতর পৈশাচিক পাপ" বলিয়া তিনি অভিহিত করিয়াছেন। তিনি জানিতেন, "ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ব্বলোকে প্রীতি এক।" তিনি জানিতেন, "সার্ব্বলৌকিক প্রীতি"র সঙ্গে "স্বদেশপ্রীতির প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই।" তাই তাঁহার কাছে "ঈশ্বরভক্তি ভিন্ন দেশপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।" তাই তিনি একাধারে স্বাদেশিক এবং সার্ব্বভৌমিক।

৮

বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপের দাম্ভিকতা সহ্য করিতে পারিতেন না। তর্কযুদ্ধে হেষ্টি সাহেবকে যে তীব্র বিদ্রূপে জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন, তাহাতে বজ্রাগ্নি ছিল।

> "Mr. Hastie's attempt to storm the inner citadels of the Hindoo religion forcibly reminds us of another heroic achievement—that of the redoubted Knight of La Mancha before the windmill."

খ্রীষ্টান পণ্ডিত হেষ্টি হিন্দুর ধর্ম্মকে আঘাত করিয়াছিল।

---

* ১২৮০, ১৪ই কার্ত্তিক, "সাধারণী" পত্রিকায় "জাতিবৈর" প্রকাশিত হয়। ১৩৪০, ৩রা আষাঢ় সংখ্যার "ছোট গল্পে" শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক প্রবন্ধটি প্রথম সমগ্রভাবে উদ্ধৃত হয়। এই প্রবন্ধ যে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত, "হেমচন্দ্র" গ্রন্থে "সাধারণী"-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র স্বয়ং তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।

৯

বাংলার নব-জাগরণে ভারতের নব-জাগরণ। বাংলার চতুর্দ্দশ শতকের প্রারম্ভ-বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্র পরলোকগমন করেন। তাহারই দ্বাদশ বৎসর পরে বঙ্গের জীবন-সিন্ধু উন্মথিত করিয়া যে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হয় ইতিহাসে তাহা 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। সেদিন কি অকূল সাগরে বঙ্গবাসী মাতৃ-সন্ধানে আসিয়াছিল! "কোথা মা? কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্তপ্রসূতি বঙ্গভূমি? এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথা তুমি?" সেদিন কোটিকণ্ঠনিনাদিত 'বন্দে মাতরমে'র উচ্চারণে সারা ভারতবর্ষের বক্ষ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। আজ যদি জননী জন্মভূমিকে বন্দনা করিতে দেশ কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে, জগৎসভার মাঝে ভারতবর্ষের মস্তক কি সেই দ্বিধার লজ্জায় নত হইয়া পড়িবে না?

১০

আজ দেশের মধ্যে 'প্রাদেশিকতা' কথাটির ধুয়া উঠিয়াছে। যাহারা মুখে সার্ব্বদেশিকতার বড়াই করে তাহারাই কার্য্যে প্রাদেশিক হইয়া উঠে। যাহাদের নিজের প্রদেশের উপর মমতা আছে, সারা দেশের প্রতি মমত্ববোধ তাহাদেরই সর্ব্বাধিক। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভূমিকে ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

আমি বাংলাকে ভালবাসি, তাই ভারতবর্ষকে ভালবাসি। বাংলার প্রান্তর সমতল সুন্দর, তাই উত্তরের পর্ব্বত আমার কাছে মহিমময়। বাংলার মৃত্তিকা সরস উর্ব্বর, তাই সুদূরের কঠিন কাল মাটি আমার কাছে বৈচিত্র্যময়। কখনও শান্ত, কখনও দুর্দ্দান্ত বাংলার নদীগুলি কলনাদিনী, তাই অন্ত স্রোতস্বতীর ভাষাও আমার কাছে অর্থময়, ইঙ্গিতময়।

আমাকে, আপনাকে, সকলকে—সকল বাঙালীকে এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশজননীকে চিনাইতে কে শিখাইল? বঙ্কিমচন্দ্র নহিলে দেশের এই অপরূপ রূপ বুঝি অপরিচিত থাকিয়া যাইত। যে বাংলাকে ভাল বাসিয়াছে সে-ই ভারতবর্ষকে ভালবাসিতে পারিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বিচারনিপুণ, যুক্তিবাদী, ধীশক্তিসম্পন্ন। কিন্তু বঙ্কিম-সাহিত্য শুধু মনীষার ফল নয়, তাহা বুদ্ধি-বিধৃত তীব্র অনুভূতি, অপরিসীম স্বদেশপ্রেম এবং অপূর্ব্ব হৃদয়াবেগে পরিপূর্ণ, প্রাণবান, বেগবান।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি জাতিকে উদ্বুদ্ধ এবং সকল বিষয় বিচার করিয়া গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি ভাবপ্রবণ বাঙালীকে বিচারশীল করিয়া তুলিয়াছে!

বঙ্কিম-যুগ আজও শেষ হয় নাই।

অলব্ধ

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

সুন্দর সন্ধ্যার আলো পড়ে গড়ায়ে
ধেয়ানে নিমগন এ আকাশ ছড়ায়ে।
জলদ সুগম্ভীর ছায়া ফেলে ধরা'পর
গোধূলির রঙে ভরা কম্পিত কলেবর,
বিদায়বেলার রাঙা রবি রেখা লেখা রয়
কিশলয় ফাঁকে ফাঁকে পুষ্পিত শাখাময়
শেষহীন ধ্বনি তোলে ঝিল্লী ও মধুকর
অন্তর মাঝে কোন্ স্বপ্নেরো অগোচর
অপরূপ রূপখানি খোলে তার আবরণ
মেলে কোন্ মায়াজাল স্পন্দিত দেহমন।
স্মৃতি নয় অতীতের, সুদূরের আশা নয়
সন্ধ্যার মায়ামাখা ক্ষণিকের ভাষা নয়।
গোধূলির যে আলোতে ধরণীর হৃদিময়
বাজে নব বীণাধ্বনি অপরূপ সুরলয়

মনে মোর থেকে থেকে লেগে সেই ঝঙ্কার
অকথিত বাণী জাগে কি আশা ও শর্ব্বরি।
চেয়েছি যা পাই নাই কোনো দিনো পাব না
তারি লাগি মনোমাঝে নিশিদিন ভাবনা,
সন্ধ্যার মাধুরীতে নিয়ে আসে কী বেদন
আশাতীত তার যেন ভাষাহীন আবেদন।
যা পেয়েছি তা গিয়েছে কোন্ স্রোতে হারায়ে
ভাণ্ডারে জীবনের ধন কিছু বাড়ায়ে।
পাই নি যা তাই মোর অন্তরে অনুখন
দীপশিখা হয়ে জ্বলে পুলকিত দেহমন।
সেই আলো-শিখা পড়ে সন্ধ্যা ও সকালে
আকাশ ও ধরণীর কপোলে ও কপালে
অলব্ধ সুখ মম মায়া রয় ছড়াতে
আজি এই সন্ধ্যার সুন্দর ধরাতে

মাটির বাসা

শ্রীসীতা দেবী

(২৩)

বীরেনবাবুর মায়ের সকালবেলাটা স্নান-আহ্নিক করিতেই কাটিয়া যাইত, বাড়ীর কাজে হাত দিবার অবসর এগারোটা-বারোটার আগে বড় হইত না। প্রয়োজনও বিশেষ হইত না। বাড়ীতে বউ-ঝি অনেকগুলি, তাহারাই সংসারের কাজ চালাইত। বৃদ্ধার নিজের রান্না, তাও অধিকাংশ দিন বড় নাতনী বা ছোটবউ করিয়া দিত, কখনও কখনও তিনি নিজে করিতেন সখ করিয়া বা ঝগড়া করিয়া। তবে নিজের সংসার, কর্ত্রী তিনিই, একেবারে রাশ ছাড়িয়া দিলে লোকে তাঁহাকে মানিবে কেন? সুতরাং মধ্যে মধ্যে তিনি ঘরকন্নার কাজে যোগ দিতেন, সমালোচনা করিতেন, সকলের দোষত্রুটি ধরাইয়া দিতেন।

সকাল আটটা হইবে, ইহারই মধ্যে রোদ চড়চড় করিতেছে। বৃদ্ধা পুকুর-ঘাট হইতে ফিরিতেছেন। অঙ্গে ভিজা কাপড়, মাথায় পাট-করা ভিজা গামছা, তবু গরমে গা জ্বালা করিতেছে। সঙ্গে একটি নাতনী, সে এক কলসী জল বহিয়া আনিতেছে ঠাকুরমার জন্য। যে সে যেমন তেমন ভাবে জল আনিয়া দিলে তাঁহার কাজ চলে না। তাই স্নান করিতে যাইবার সময় সর্ব্বদা তিনি একজন কাহাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, সে তাঁহার সামনে ভালমতে স্নান করিয়া, ভিজা কাপড়ে জল বহিয়া আনে।

সদর দরজার কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় কে তাঁহার পায়ের কাছে টিপ করিয়া প্রণাম করিল। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন ঠাকুরমা?"

নাতনীটি তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া গেল, কারণ আগন্তুক তাহার অপরিচিত। বৃদ্ধা ভাল করিয়া মানুষটির দিকে তাকাইয়া খুশী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কখন এলে ভাই? বেঁচে থাক, একশ বচ্ছর পরমায়ু হোক। বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এসেছ ত বুড়ীকে, সেই রকমই ত কথা ছিল।"

বিমল বলিল, "নেমন্তন্ন করবার ইচ্ছার ত বিন্দুমাত্র অভাব নেই ঠাকুরমা, তবে ভাগ্যে থাকলে ত? দেখা যাক ভগবান সুদিন দেন কি না।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "হ্যাঁ, ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব। বেটাছেলে বিয়ে করতে চাইলে বিয়ে হবে না, এমন জগতে দেখেছ? তা ভাই, ভিতরে চল, বসবে, আজ দুটো ডালভাত এখানেই খেতে হবে কিন্তু।"

বিমল বলিল, "সে ত অবিশ্যি, আপনার এখানে ছাড়া খেতে যাবই বা কোথায়?"

বৃদ্ধা তাহাকে বৈঠকখানা ঘর দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "বীরু ওখানে আছে, তুমি বসো ভাই, আমি কাপড়টা ছেড়ে আসি।"

বিমল বৈঠকখানায় ঢুকিয়া দেখিল, বীরেনবাবু আরাম করিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছেন। তাহাকে দেখিয়া তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। বিমল তামাক খায় না, কাজেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "চা-টা কিছু আনিয়ে দিই, বাবা? এত সকালে কোন্ ট্রেনে এলে? খেয়ে বেরোও নি নিশ্চয়ই?"

বিমল বলিল, "চা হ'লেও হয়, না হ'লেও দুঃখ নেই। ভোরে এক পেয়ালা খেয়ে বেরিয়েছি। ট্রেন আর কোথায় পাব বলুন? দশটার আগে ত গাড়ী নেই। ক'মাইল বা দূর, হেঁটেই চ'লে এলাম।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "বেশ বেশ, এই ত চাই। তোমাদের বয়সে আমরা এ-বেলা ও-বেলা দশ-বিশ মাইল রোজ হেঁটেছি। তবে তোমরা এখন সব শহরবাসী হয়েছ, রাস্তার এপার থেকে ওপারে যেতে হ'লে ঘোড়ার গাড়ী চেপে যাও। ও খেঁদি, শুনে যা রে।"

লাল শাড়ীর আঁচল কোমরে তিন-চার পাকে জড়াইয়া খেঁদি আসিয়া দাঁড়াইল। বীরেনবাবু বলিলেন, "বল্ গে যা দিদিমাকে, এক জন মামা এসেছে, জলখাবার দিতে কিছু। চা যদি থাকে, চা-ও যেন এক বাটি করে দেয়।"

বিমল বলিল, "ব্যস্ত হ'তে হবে না, ঠাকুরমার সঙ্গে দরজার সামনেই দেখা হয়ে গেছে, খাবার জোগাড় তিনি করছেনই। চা আপনাদের এখানে চলে নাকি?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "রোজই কি আর দু-বেলা খাচ্ছি? তবে সর্দ্দিটর্দ্দি হলে খাই বই কি? একটু আদা দিয়ে চা না খেলে শরীরটা যুৎ হয় না। তা মামার বাড়ী এলে বুঝি? পরীক্ষার খবর বেরচ্ছে কবে? এর পর কি আইন পড়বে?"

বিমল বলিল, "না, মামার বাড়ী ঠিক আসি নি, তবে তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে যাব। পরীক্ষার খবর বেরতে এখনও ঢের দেরি। আইন পড়বার ইচ্ছে নেই, বেকার উকীলে ত কলকাতার রাস্তাঘাট ছেয়ে গেছে, আর তাদের দলবৃদ্ধি করবার প্রয়োজন কি?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "তাহলে কি এম্-এ পড়বে?"

বিমল বলিল, "বোধ হয় না। খরচ দেবে কে? যেরকম পরীক্ষা দিলাম, তাতে স্কলারশিপ পাবার আশা নেই। চাকরী-বাকরীর চেষ্টা করছি।"

এমন সময় খেঁদি ও তাহার একটি বড় ভাই মিলিয়া দুই থালা জলখাবার বহন করিয়া আনিল। বিমল বলিল, "এই সকালে এত খেতে পারব না আমি।"

বৃদ্ধা পিছন পিছন ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কিই বা দিয়েছি, এর চেয়ে কম মানুষকে দেওয়া যায়? তা যা নিখাকী তুমি, জানি ত? যেটুকু পার মুখে দাও, পাড়াগাঁ জায়গা ভাই, এখানে ত হট্ করতে সন্দেশ-রসগোল্লা পাওয়া যায় না, ঘরেই যে যা পারে করে।"

বিমল কথা না বাড়াইয়া খাইতে আরম্ভ করিল। মাঝে একবার জিজ্ঞাসা করিল, "মল্লিক-মশায়ের বাড়ীর তাঁরা সব ভাল আছেন?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "ভালই সব। মিনি পরীক্ষা দিয়ে এখানে এসেছে। পঙ্কুর সঙ্গে বিয়ের কথা প্রায় ঠিক, তবে দর-কষাকষি এখনও শেষ হয় নি।"

বিমল জলের গেলাস তুলিয়া এক চুমুক খাইয়া বলিল, "আর পারলাম না ঠাকুরমা, এ থালাটা আপনার নাতি-নাতনীদের মধ্যে ভাগ করে দিন।"

নাতি-নাতনীরাই আসিয়া থালা ঘটি লইয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধা বলিলেন, "যাই দেখিগে, কি রান্না করছে এ-বেলা। নাতি শেষে খেয়ে গিয়ে নিন্দে করবে। একেই ত চা দিতে পারলাম না। বুড়ো হয়েছি, সব কথা কি মনে থাকে? আর ঘরে যত লোক থাক না, বুড়ী যা না দেখবে, তা আর হবার জো নেই।"

তিনি ভিতরের বাড়ীর পথে প্রস্থান করিলেন। বীরেনবাবু হুঁকোটা ঘরের কোণে ঠেসাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "চল দু-পাক ঘুরে আসা যাক, রান্নাবান্না হ'তে এখনও ঢের দেরি। এখানে মানুষের আর কাজ কি বল? একবার খাওয়া হ'লে, কতক্ষণে আর একবার রান্না হবে তাই খালি ব'সে ব'সে মিনিট গোনে। আগে তোমার মামার বাড়ীর দিকে যাবে নাকি?"

বিমল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আচ্ছা তাই চলুন।"

পঞ্চাননের সঙ্গে সেই ঝগড়ার পর আর তাহার দেখা হয় নাই। দেখা করিবার বিশেষ ইচ্ছাও ছিল না, তবে চিরকাল এক জন আর এক জনকে এড়াইয়া চলিবে, তাহার পরিচিত জগৎ এত বড় নয়।

সৌভাগ্যক্রমে পঞ্চানন তখন বাড়ী ছিল না, সকালে খাইয়াই দেশোদ্ধার ও সমাজ-উদ্ধারের কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে। বিমল ভিতরে ঢুকিয়া যত দিদিমা, মাসীমা ও মামীমার দলকে সম্ভাষণ করিতে লাগিয়া গেল। ঘরের গৃহিণী বড়দিদিমা গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "নাতির ত আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না, বুড়ীরা বেঁচে আছে কি মরেছে তারও খোঁজ নাও না। সব শহরবাসী সাহেব হয়েছ।"

বিমল হাসিয়া বলিল, "তোমরাই বা আমার কোন্ খোঁজ রাখ, দিদিমা। এত যে আম-কাঁঠাল ঘরে, তা

বৎসরান্তে এক বারও ত খেতে ডাক না? মামার বাড়ী, না ডাকলে কি আসতে আছে? মান থাকবে কেন?"

দিদিমা একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "তা বলতে পার, ভাই। কি করি বল? এই বুড়োর অসুখে হাড় ভাজাভাজা হয়ে উঠেছে, আর কি কোন দিক্ দেখবার অবসর আছে? নিত্য তার হাঁপানি। তা এই তোমার মেজমামার বিয়ের সময় ঘনিয়ে এল, মনে করছিলাম, সবাইকে ডেকে একবার একঠাই করব। আমাদেরই কি অসাধ?"

বিমল ন্যাকা সাজিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় বিয়ের ঠিক হ'ল দিদিমা? এই মাসেই বিয়ে নাকি?"

দিদিমা বলিলেন, "দূর, একেবারে মেলেচ্ছ হয়ে গেছিস্ তোরা, চৈত্রমাসে কখনও বিয়ে হয় হিঁদুর ঘরে? বৈশাখে বিয়ে হবে। ঐ মল্লিকের ভাগ্নী মিনির সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছে, তা একেবারে ঠিক হয়নি। মেয়ে আমরা পছন্দ করেছি বটে, কিন্তু মিন্‌ষে হাড়কিপ্পন, পয়সা বার করতে চায় না। এমন কিছু লাখ টাকা আমরা চাই নি, হাজার টাকা পণ, আর গহনা যা না হ'লে নয়, তাই। তাও দিতে চায় না, বলে পাঁচ-শ বিয়ের সময় দেবে, আর বড়জোর তিন-শ পরে পূজোর সময় দেবে। এতে কি পোষায় ভাই, তুমিই বল? আমাদের অমন ছেলে।"

বিমল বলিল, "তা দিদিমা, মামার ওজনে টাকা নিতে চাও নাকি? তাহ'লে ত রাজা-রাজড়া ছাড়া পেরে উঠবে না।"

দিদিমা ঠাট্টাটা বুঝিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন। বলিলেন, "কেন, ওজনদরের কথা কি হল? তোর মামা কি পাত্র হিসাবে মন্দ, না আমাদের ঘর মন্দ? তোর মত বি-এ পাস না হয় নাই করেছে, তা ইংরিজী বেশী জানলেই কি মানুষ বড় হয়?"

বিমল বলিল, "বি-এ পাস ত আমিও এখনও করি নি, আর আমাকে কেউ বিনা পণেও নেবে না। যাক্ গে, আমার অত কথায় কাজ নেই। মামারা সব গেল কোথায়?"

দিদিমা বলিলেন, "তোর বড়মামা ত এখানে নেই, কাজে বেরিয়ে গেছে, দিন পাঁচ পরে ফিরবে। পন্টু সকালে কোথা গেছে, আসবে এখনি। ততক্ষণ বোস্, কিছু খা।"

বিমল বলিল, "ঐটি হবে না দিদিমা, বীরেনবাবুদের বাড়ী একপেট এইমাত্র খেয়ে এলাম, আবার সেখানকার ঠাকুরমা কোমর বেঁধে রাঁধতে বসে গেছেন, দুপুর বেলা খাওয়াবেন ব'লে, তবেই দেখ রাত্তিরের আগে আর তোমার এখানে পাত পাড়তে পারছি না।"

দিদিমা বলিলেন "এই ত, নাতির কত টান মামার বাড়ীর উপর দেখাই যাচ্ছে। আগে ভাগে পেট ভরিয়ে তবে দিদিমার ঘরে এসেছিস। আচ্ছা, আর কিছু না খা, একটু কাঁঠাল খেয়ে যা, বাড়ীর কাঁঠাল, আজ সবে ভেঙেছি।"

কাঁঠাল খাইতে বিমলের যথেষ্ট আপত্তি ছিল, কিন্তু দিদিমাকে বেশী রকম চটাইয়া দিলে তাহা সুযুক্তির কাজ হইবে না। অগত্যা প্রাণের মায়া ছাড়িয়া তাহাকে একটু খাইতেই হইল।

দিদিমা বলিলেন, "এই হয়ে গেল? যত সব শহুরে খোশখোরাকী বাবু। দুদিন আগে আর একটা কাঁঠাল ভেঙেছিলাম, এত বড়ই। তোর দুই মামা মিলে ত তার অর্দ্ধেকটা শেষ করল।"

বিমল উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া বলিল, "তাঁদের সঙ্গে আমার তুলনা হয় কখনও? তাঁদের পেটে ব্রহ্মন্তিতেজ কত? আর আমি, যা বলেছেন, একেবারে মেলেচ্ছ।"

দিদিমার কাজ পড়িয়াছিল, তিনি বলিলেন, "ঐ ঘরে চল্, তোর মামী আছে, কথা বলবি। আমার আবার যত কাজ এই সকালে। বুড়োর পাঁচন সেদ্ধ করতে দিয়ে এসেছি, দেখলে পুড়ে যাবে।"

বিমল বলিল, "আর একটু ঘুরে আসি, দিদিমা। মামী যা গল্প করবে তা ত জানি, কলাবউয়ের মত দেড় হাত ঘোমটা টেনে ব'সে থাকবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "নূতন বউ, লজ্জা ত করবেই? আমাদের বাড়ীতে ত মেমসাহেবীর চলন নেই।"

বিমল বলিল, "তাই ত বলছি। মামী কত লজ্জাশীলা তা দেখতে ত বেশী সময় লাগবে না, এক মিনিটেই বুঝে

নেব। বাকি সময়টা করব কি? তার চেয়ে ঘুরেই আসি। না-হয় বাইরে দাদামশায়ের কাছে বসি।"

দিদিমা বলিলেন, "তা যা, বুড়ো কি আর ঘরে আছে? দেখ্ গে যা।" তিনি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

বিমল বাহিরে চলিল। মামীটি যদি অতখানি কলা-বউ না হইত, ত তাহার কাছে কিছু খবর পাওয়া যাইত। কিন্তু সে আশা নাই। বুড়া দাদামশায়ের কাছে যদি কিছু খোঁজ পাওয়া যায়, এই আশায় সে বাহিরের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সেখানে দাদামশায় নাই, স্বয়ং পঞ্চানন মুখ গোঁজ করিয়া বসিয়া আছে। বিমলের আগমন-সংবাদ সে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের কাছে পাইয়াছে। তাহাতে সকালেই মেজাজটা তাহার সপ্তমে চড়িয়া গিয়াছে।

বিমলও তাহাকে দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল। অতখানি ঝগড়ার পরে হঠাৎ কি বলিয়া কথা আরম্ভ করা যায়? পঞ্চাননই তাহাকে সুবিধা দিল। হাঁড়িপানা মুখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ এখানে কি মনে ক'রে?"

পঞ্চানন তাহাকে বসিতে বলিল না, তথাপি চৌকীর উপর বসিয়া বিমল বলিল, "কি আর মনে ক'রে, ছুটির সময়টা একটু টহল দিয়ে বেড়াচ্ছি।"

পঞ্চানন ভদ্রতা করিবার চেষ্টা করিল, বলিল, "সকালে কিছু খেয়েছ?"

বিমল বলিল, "অনেক বার। আর সারাদিনের মধ্যে কিছু খাবার ইচ্ছা নেই। আচ্ছা বোস, আমি একটু ঘুরে আসি।"

পঞ্চানন তাহার দিকে ক্রুরদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল, "কি উদ্দেশ্যে এসেছ, খুলে বল দেখি।"

বিমল বলিল, "খুলে বলবার প্রয়োজন দেখছি না, আমার উদ্দেশ্য তুমি না জান এমন নয়।"

পঞ্চানন বলিল, "আমি সদুপদেশ দিচ্ছি, এ বৃথা চেষ্টার থেকে ক্ষান্ত হও, দেশে ফিরে যাও। কেন শুধু শুধু একটা আত্মীয়বিচ্ছেদ ঘটাবে?"

বিমল বলিল, "তোমার সদুপদেশের জন্যে ধন্যবাদ। তবে পালন করতে পারলাম না আমার দুর্ভাগ্য। আত্মীয়-বিচ্ছেদ ঘটাই বোধ হয় কলিকালের নিয়ম।" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

রাগে তখন পঞ্চাননের সমস্ত গা কাঁপিতেছে। কিন্তু এখানে রাগ দেখানোর সুযোগ বড় কম। চারিদিকে বুড়াবুড়ী, আত্মীয়স্বজন, বালকবালিকার দল। ইহাদের সামনে মারামারি ত করাই যায় না, গালাগালিও করা যায় না। কলিকাতায় তাহারা দু-জনেই নিরঙ্কুশ, কিন্তু এখানে মৃণালকে উপলক্ষ্য করিয়া ঝগড়া করা যায় না। তাহা হইলে নিন্দার একশেষ হইবে। যে-উদ্দেশ্যে ঝগড়া, প্রথমতঃ তাহাই বিফল হইয়া যাইবে। যে-কন্যাকে লইয়া দুই জন যুবক বিবাদ করিতে পারে, তাহাকে পঞ্চাননের অভিভাবকেরা বধূরূপে ঘরে আনিতে একেবারে অস্বীকার করিবেন। অন্য কোনও বরও পল্লী-সমাজে সহজে তাহার জুটিবে না, তাহা হইলে বিমলেরই হইবে পোয়া বারো। এমন কাজ পঞ্চানন করিতে পারিবে না।

খানিক একলা বসিয়া থাকিয়া পঞ্চানন বাড়ীর ভিতর ঢুকিল। এ-ধার ও-ধারে চাহিয়া মা বা জ্যাঠাইমা কাহাকেও দেখিতে পাইল না। দাওয়ার এক কোণে বসিয়া বৌদিদি তরকারি কুটিতেছে। দেবর হইলেও পঞ্চানন বৌদিদির সঙ্গে হাসি-তামাশা বেশী করিত না, ছ্যাব্লামি জিনিষটাই তাহার ধাতে ছিল না। কিন্তু এবার কলিকাতা হইতে আসিয়া সে বৌদিদির সঙ্গে ভাব জমাইবার চেষ্টাটা যথাশক্তি করিতেছে। বিপদ্‌কালে সাহায্য হয় ত বা ইহাকে দিয়া কিছু হইতেও পারে।

বৌদিদি ঘোমটাটা একটু ফাঁক করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে খুঁজছ, ঠাকুরপো?"

পঞ্চানন বলিল, "তোমাকে ছাড়া আর খুঁজব কাকে?"

কুসুম ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "ইস্, এত সৌভাগ্য আমার সইবে না। সে-সব অন্য ভাগ্যবতীর জন্যে তোলা রইল।"

পঞ্চানন বলিল, "ভাগ্যবতীর আসবার ত কোনও লক্ষণ দেখছি না। তোমরা জোগাড় করছ কৈ?"

কুসুম বলিল, "অত অধৈর্য্য হ'লে চলে কখনও?

কথাবার্তা ত প্রায় পাকা। শ্বশুরমশায় আট-শ অবধি নেমেছেন, তারা সাত-শ অবধি উঠেছে, দেখতে দেখতে পাকা হ'য়ে যাবে। তার পর বোশেখ মাস পড়তেই বিয়ে, ভাবনাটা কি ?"

পঞ্চানন কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় গরীয়সী জ্যাঠাইমাকে রান্নাঘর হইতে বাহির হইতে দেখিয়া সে সরিয়া পড়িল।

(২৪)

খোকাবাবুর ঘুম সকাল সকালই আসিয়া পড়ে, বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মের দিনে। দিদিদের সঙ্গে পুকুরঘাটে গিয়া সমস্ত গায়ে জ্বালা ধরিয়া যায়, বাড়ীতে ছায়ায় আসিয়াই তিনি মায়ের কোলে ঢুলিয়া পড়েন। কোনও দিন রাধী তাহাকে ঘুম পাড়ায়, কোনদিন মল্লিক-গৃহিণী। এখন মৃণাল আসিয়াছে, সে-ই খোকার ভার বেশীর ভাগ বহন করে।

আজও চিনি টিনি স্নানান্তে আসিয়া খাইতে বসিয়াছে, খোকাকে কোলে করিয়া মৃণাল ঘুম পাড়াইতেছে। এমন সময় বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা যেন তাহার হঠাৎ আছাড় খাইয়া পড়িল। এ কাহার গলার স্বর বাহিরে শুনিতে পাওয়া যায় ?

বীরেনবাবু সদর দরজার কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "মল্লিক-দাদা ঘরে আছ ?"

মৃণালের মামীমা রান্নাঘর হইতে বলিলেন, "দেখ্ ত মিনি কে ডাকে বাইরে, বীরু ঠাকুরপো যেন। বল্, উনি এখনও ফেরেন নি, সকালে বেরিয়েছেন।"

মৃণাল খোকাকে কোলে করিয়া সদর দরজার কাছে অগ্রসর হইয়া গেল। বিমলের দৃষ্টির সঙ্গে তাহার দৃষ্টি মিলিত হইতেই সে চোখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "মামা ত এখনও ফেরেন নি, আপনারা বসুন। এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরবেন।"

বৈঠকখানার দরজাটা ঠেলিয়া খুলিয়া সে আগন্তুক দুইজনকে ভিতরে লইয়া গিয়া বসাইল। বিমল বুঝিল, বীরেনবাবুর সামনে তাহার সঙ্গে কথা বলিতে মৃণাল সঙ্কোচ বোধ করিতেছে, যদিও বোর্ডিঙে তাঁহার সামনেই মৃণাল দুই-তিন বার বিমলের সঙ্গে কথা বলিয়াছে। সে নিজেই কথা আরম্ভ করিল, মিথ্যা সঙ্কোচে এমন স্বর্ণ সুযোগ ত নষ্ট করা যায় না ?

জিজ্ঞাসা করিল, "পরীক্ষার রেজাল্টের খবর রাখেন কিছু ?"

মৃণাল মৃদুস্বরে বলিল, "কই শুনি নি ত কিছু ? কাকে দিয়েই বা জানব ? ক্লাসের মেয়েদের দু-চার জনকে বলে এসেছি, তারা যখন নিজেদের খবর নেবে, তখন সেই সঙ্গে আমারও খবর নেবে।"

বিমল বলিল "রোল্ নম্বরটা আমায় দিয়ে দেবেন, আমি শীগ্‌গিরই কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। গোটা দুই-তিন চাকরীর সন্ধান আছে, এখন থেকে গিয়ে তদ্বির না করলে জুটবে না। আপনি ত এখন আর ফিরছেন না ?"

মৃণাল বলিল, "না।" আর দাঁড়াইয়া ইহাদের সঙ্গে কথা বলা উচিত কিনা সে ভাবিতেছিল। মামীমা জানিতে পারিলে হয়ত রাগ করিবেন, বিশেষ করিয়া বিমল আবার পঞ্চাননের আত্মীয়। বীরেনবাবুকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, "আমি আসছি, আপনারা বসুন।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "মল্লিক-দাদার বেশী যদি দেরি থাকে ত ব'সে আর আমরা কি করব ? অন্য দু-চার জায়গায় ঘুরে আসি বরং।"

মৃণাল ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, তিনি বেশী দেরি করবেন না, এই এসে পড়লেন ব'লে। আমি মামীমাকে খবর দিচ্ছি।"

খোকা ততক্ষণ তাহার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিমল তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "খোকাকে শুইয়ে দিন না, ও ত দিব্যি ঘুমচ্ছে। ঘুমন্ত ছেলে বয়ে বেড়ানো, শক্ত ব্যাপার।"

মৃণাল খোকাকে কোলে করিয়া ভিতরে চলিল। মামীমা রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া চিনি টিনির খাওয়ার তদারক করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "ওকে শুইয়ে দে রে, ঘুমে যে নেতিয়ে পড়েছে।"

মৃণাল বলিল, "বাইরে বীরু মামার সঙ্গে এক জন ভদ্রলোক এসেছেন।"

সুজাতা

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রবাসী প্রেস আর্টিষ্ট সংঘ প্রদর্শনী

গৃহিণী বলিলেন, "তাই ত, মুস্কিল হল দেখছি। উনি কত ক্ষণে আসবেন কে জানে? তত ক্ষণ কে ওদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে? নূতন মানুষ, কিছু যদি মনে করে?"

মৃণাল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তুমি চল না, মামীমা?"

মামীমা হাসিয়া বলিলেন, "যা বললে বাছা, আমি তোমার শহরে মেমসাহেব কি না, তাই হট্ হট্ ক'রে বৈঠকখানায় গিয়ে উঠব, অতিথিদের সামনে। ঐ যে ওঁর খড়মের শব্দ পাচ্ছি, বাঁচা গেল বাপু। তুই আর বাইরে যাস্ নে। যা কাণ্ড-কারখানা সব এখানে, কোন দিয়ে কে একটা গুজব তুলে দেবে।"

মৃণাল অগত্যা খোকাকে লইয়া শয়নকক্ষে চলিয়া গেল। বাহিরের ঘরে যাইবার জন্ত তাহার মন ছটফট করিতে লাগিল, কিন্তু সোজাসুজি মামীমার আদেশ অবজ্ঞাই বা করে কি করিয়া?

মল্লিক-মহাশয় অতিথিদের সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। বিশেষ বিমল পঞ্চাননের আত্মীয় শুনিয়া তাঁহার উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। বলিলেন, "বসুন, বসুন, অনুগ্রহ ক'রে যে দেখা করতে এলেন সে আমার সৌভাগ্য। আপনারা কুটুম্ব হ'তে যাচ্ছেন, এখন থেকে একটা সম্প্রীতি হওয়া খুবই দরকার।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "কথাবার্ত্তা সব পাকা হয়ে গেল নাকি?"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "একেবারে পাকা এখনও হয়নি। চক্রবর্ত্তী-মশায় ত জেদ ছাড়তে চান না। বলছেন আট-শ'র কমে কিছুতেই হবে না, তাও যদি সব টাকা একসঙ্গে দিই তাহলে। তা যদি না হয়, দেরি ক'রে অল্পে অল্পে দিই তাহলে পুরো হাজারই দিতে হবে। এখন চট ক'রে হাজার টাকা দিতে আমি ত অপারগ। দেখি, আমি হাল ছাড়ি নি, হয়ে যাবে বোধ হয়। বিয়ের আগে দর-কষাকষি হয়েই থাকে সব জায়গায়।"

বিমল বলিল, "আমাদের দেশেই হয়, আর কোনও দেশে বোধ হয় ভাবী আত্মীয়দের সঙ্গে এমন নির্লজ্জ আচরণ কেউ করে না।"

বিমল বরের পক্ষের লোক, তাহার মুখে এমন কথা শুনিয়া মল্লিক-মহাশয় একটু বিস্মিত হইয়া গেলেন। বলিলেন "তা বাবা আপনারাই ত হবেন ভবিষ্যৎ সমাজের মাথা, তখন যদি এই মতামত বজায় রাখেন, তা হলে সমাজের অনেক উপকার হয়।"

বীরেনবাবু হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তখন সব মত বদলে যাবে দাদা, 'অমন অবস্থাতে পড়লে সবারই মত বদলায়,' গানে আছে না? ছেলের বাপ যখন হবেন সব, তখন আর বিনা পণে বিয়ে দেওয়ার পক্ষে টুঁ শব্দটি করবেন না। এই আমি যে জিব বের ক'রে পড়েছিলাম, মেয়ের বিয়ে দিতে, তা আমিই কি আর ক্যাবলার বিয়েতে দু-পাঁচ-শ টাকা চাইব না? চাইব বই কি? অতগুলো বের ক'রে দিলাম, ফিরে কিছু চাইব না, এ কি ন্যায্য কথা?"

মল্লিক-মহাশয়ও হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, "বাবাজী বলছেন বটে এখন, তা ওঁর বিয়েতেও ওঁর বাপ-মা পণ নেবেনই। বিশেষ ক'রে বি-এ পাস করেছেন যখন।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "ওর পিতা ত জীবিত নেই, মাও সংসারের মায়া এক রকম কাটিয়েছেন, নইলে বিয়ের কথা এতদিনে উঠতই। তা তোমার বড় মেয়েটির জন্তে দে'খে রাখ, গৌরীদান ক'রে দিও। পণও লাগবে না, কি বল বাবাজী?"

বিমলকে খুব বেশী লজ্জিত বোধ হইল না। সে রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "বড় গরম, এক গেলাস খাবার জল হ'লে হত।"

মল্লিক-মহাশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। ভিতর বাড়ীর দরজার কাছে গিয়া চীৎকার করিয়া মৃণালকে ডাকিতে লাগিলেন। মৃণাল আসিতেই নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘরে মিষ্টিটিষ্টি কিছু আছে কি না দেখ দেখি মা। ভদ্রলোকের ছেলে জল চাইছে, তাও ভাবী কুটুম, শুধু জল ত আর দেওয়া যায় না? দুজনের মত আনিস্, বীরেনও রয়েছে।"

মৃণাল মৃদু হাসিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল। বিমলের চালাকিটা একমাত্র সে-ই বুঝিতে পারিল। মামীমাকে

গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মামীমা, ঘরে কিছু মিষ্টি আছে কি না মামাবাবু জিজ্ঞেস করছেন, বাইরের ওঁরা দুজন জল খেতে চাইছেন।"

মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "তা আবার থাকবে না কেন? গেরস্তবাড়ী একটু মিষ্টি থাকবে না? তা দিচ্ছি, কিন্তু নিয়ে যায় কে? এই টিনি, খাওয়া হ'ল ত ওঠ্ না?"

টিনি নাকি-সুরে বলিল, "আঁমার মাঁছের মুঁড়োটা খাঁওয়া হঁয় নি।"

মামীমা বলিলেন, "ও ছুঁড়ির খাওয়া হ'তে বেলা গড়িয়ে যাবে। তবে তুই-ই যা, এর পর কিছু কথা হয় ত তোর মামা বুঝবে। আমি ত আর তাই ব'লে যেতে পারি না?"

ছুটি রেকাবীতে জলখাবার, আর দুই গেলাস জল লইয়া মৃণালই আবার বৈঠকখানা ঘরে চলিল। বীরেন-বাবু বলিলেন, "আমাকে আবার এ-সব কেন মা? এখুনি গিয়ে ভাত খেতে হবে, বিমলকেও মা নেমন্তন্ন ক'রে রেখেছেন, সে যদি এখান থেকে পেট বোঝাই ক'রে যায়, তাহলে মা আর রক্ষে রাখবেন না।"

মৃণাল বলিল, "শুধু জল কি দেওয়া যায়? বেশী ত কিছু দিই নি।"

বিমল মামার বাড়ীতে খাইতে যতই আপত্তি করুক, এখানে কিছুই আপত্তি করিল না, নীরবে মিষ্টির রেকাবীটা শেষ করিয়া ফেলিল। বীরেনবাবু বলিলেন, "বেলা হ'ল, এর পর ওঠা যাক, চানটান করতে হবে।"

মল্লিক-মহাশয়ও তাঁহাদের আগাইয়া দিতে রাস্তা পর্য্যন্ত বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন, "তোমরা পাঁচ জন আমার হয়ে একটু চক্রবর্ত্তীর কাছে বল টল হে? মিনিকে ছোট বেলা থেকে তোমরাও ত দেখছ, এমন মেয়ে গাঁয়ে ক'টা আছে?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "তুমিও যেমন, চক্কোত্তির আমাদের কথা শুনবার জন্তে ব'সে আছে। নইলে মিনুর কথা কি আর আমরা না বলি, ও ত আমাদের ঘরেরই মেয়ে।"

বিমল মনে মনে ভাবিল, "ভাল লোককেই ভদ্রলোক সুপারিশ করার ভারটা দিচ্ছেন।" কথাটা যে তাহাকেই বলা, বীরেনবাবু উপলক্ষ্য মাত্র, তাহা কি আর সে বুঝিতে পারে নাই?

বীরেনবাবুর মা ছেলে এবং অতিথির দেরি দেখিয়া ক্রমাগত ঘর আর বাহির করিতে ছিলেন। তাহাদের ফিরিতে দেখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ রে বীরু, এই আগুনের মত রোদ, এতে এমন ক'রে ঘোরে? আর তুমিই বা ভাই কোথা অন্তর্দ্ধান হলে? রান্না আমার কখন চুকে গেছে।"

বিমল বলিল, "এই দু-চার বাড়ী ঢুঁ মারতে মারতে দেরি হয়ে গেল আর কি? তা এখানে যা আতিথ্যের ঘটা, আপনার রান্না খাবার মত জায়গা যে আর পেটে আছে তা ত বোধ হচ্ছে না।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "সেটি হচ্ছে না ভাই, আমার রান্নার যদি অপমান কর, তা হ'লে তোমার বিয়েতে একেবারেই যাব না, এই দিব্যি ক'রে বললাম।"

বীরেনবাবু ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন, গামছা কাপড়ের সন্ধানে। বিমল বলিল, "তা ঠাকুরমা যদি বিয়ের জোগাড়টা তাড়াতাড়ি ক'রে দিতে পারেন, তা হ'লে আপনার রান্নার নিশ্চয় সদ্ব্যবহার করব. পেট ফেটে গেলেও দমব না।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তা আর আশ্চর্য্য কি? মেয়ের বিয়ে ঠিক করাই শক্ত, ছেলের বিয়ে ত মুখ থেকে কথা খসালেই হয়। এই গাঁয়েই আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি, বোশেখ মাসেই নাতবৌ এসে যাবে।"

বিমল বলিল, "এই গাঁয়ে ত নিশ্চয়, নইলে আপনার হাতে ভার দেব কেন? কিন্তু আমার পছন্দমত হওয়া চাই, ঠাকুরমা।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তা ত বলবেই, আজকালকার শহরে ছেলে তোমরা, তোমরা কি আর বুড়োবুড়ীর পছন্দমত বিয়ে করবে? কি রকম হ'লে পছন্দ হয় বল ত? বেশ ডাগোর-ডোগোরটি, ডানাকাটা পরীর মত চেহারা, এই এক কথায় ঠিক আমার মত আর কি?"

বিমল হাসিয়া বলিল, "অতখানি সৌভাগ্য কপালে সইবে না, ঠাকুরমা। একটি মেয়ে আমি পছন্দ ক'রেই

রেখেছি, এখন দয়া ক'রে আপনি কথাটা যদি পাড়েন, তা হ'লেই হয়। আমার সাংসারিক অবস্থা ত সব আপনার জানাই আছে, তাঁদের কাছে কিছু বাড়িয়ে বলবার দরকার নেই। একটা চাকরী আমার প্রায় ঠিক, তাও বলতে পারেন।"

বৃদ্ধা এতক্ষণ ঠাট্টাতামাশাই করিতেছিলেন, এখন বুঝিলেন ব্যাপারটা ঠাট্টা নয়। এবার একটু গম্ভীর হইয়া গেলেন। বিমলের মনোনীত পাত্রীটি যে কে তাহা তিনি না বুঝিলেন এমন নয়। বলিলেন, "তা ভাই, ওরা ত অন্য জায়গায় মেয়ের সম্বন্ধ করেছে, সেও আবার তোমার নিজেরই আত্মীয়গুষ্টির মধ্যে, এমন জায়গায় কি কথা পাড়া যায়? ওরা দেবেই বা কেন? তুমি হীরের টুকরো ছেলে, কিন্তু শুধু ছেলে দেখে না ত লোকে, অবস্থাও দেখবে ত? ধান-চাল, বাড়ীঘর কিছু থাকত তবে ত মুখ বড় ক'রে বলতে পারতাম?"

বিমল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "ছিল ত সবই ঠাকুরমা, কিন্তু কপালগুণে সবই এখন মহাজনের হাতে। খড়ের ঘর দুখানা মাত্র অবশিষ্ট। কবে যে সে-সব ছাড়াতে পারব তা জানি না। সম্প্রতির মত চাকরীর উপরেই নির্ভর করতে হবে।"

বীরেনবাবু কাপড় হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "চল হে, স্নানটা সেরে আসা যাক।"

বিমল বলিল, "আপনি এগোন, আমি যাচ্ছি মিনিট পাঁচ পরে, পুকুরঘাট সব আমার চেনা আছে।"

বীরেনবাবু অগ্রসর হইয়া চলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ছেলেমেয়েও চলিল। গ্রীষ্মের দিন, পাঁচবার স্নান করিতেও তাহাদের অপ্রবৃত্তি নাই।

বীরেনবাবুর মা বলিলেন, "দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ থাকবে, ভাই? বোসো বৈঠকখানা ঘরে, আমি দেখি ওরা কি করছে।"

বিমল বলিল, "আপনার সঙ্গে কথা বলতেই ত থাকলাম ঠাকুরমা, একলা একলা ব'সে থেকে কি লাভ হবে আমার? আমি ত রাত্রের ট্রেনেই ফিরে যাব, এখন আমার ঘটকালিটা করবেন কি না বলুন।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "তা কথাটা না-হয় পাড়লাম, কিছু দিতেথুতে হবে না এই মনে ক'রে যদি রাজি হয়। চক্কোত্তিবুড়ো বড় চাপ দিচ্ছে কি না?"

বিমল বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লে এবার আমি স্নান ক'রে আসি।" বৃদ্ধা তাহাকে গামছা কাপড় ইত্যাদি গুছাইয়া দিয়া আবার রান্নাঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

বিমলকে বাধ্য হইয়া বৃদ্ধার রান্নার সম্মান রক্ষা করিতে হইল। এই বিপদ্‌সাগরে একমাত্র সহায় যিনি, তাঁহাকে ত চটানো যায় না।

খাওয়ার পর দীর্ঘ দিবানিদ্রা দেওয়া বীরেনবাবুর নিয়ম। বিমলই বা যায় কোথায়? এই দারুণ রৌদ্রে ত মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না? ছেলেমেয়েদের তিনি আদেশ দিলেন, বিমলের জন্য বৈঠকখানা ঘরে ভাল করিয়া বিছানা করিয়া দিতে। বিমল শুইয়া শুইয়া আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিল, দিনে ঘুমানো কোনও দিন তাহার অভ্যাস ছিল না, আজ ত ঘুম আসিলই না।

বীরেনবাবুর মায়ের খাওয়া-দাওয়া সারিতে বেলা প্রায় গড়াইয়া যায়। বৃদ্ধার স্বাস্থ্য ভাল, আহারে রুচিও আছে মন্দ নয়, কিন্তু কপালদোষে একবারের অধিক আহার করিবার উপায় নাই। রাত্রে ফল, দুধ বা মিষ্টি যাহা হউক কিছু একটু খান, সেটাকে আর তিনি আহারের মধ্যে ধরেন না। দুপুরবেলা ভাত ডাল তরকারি, রুটি লুচি, ঘন দুধ, আম প্রভৃতি সহযোগে ঘণ্টা দুই বসিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করেন। মুখ ধুইতে, কাপড় ছাড়িতে, রাত্রিকালীন আহারের ব্যবস্থা করিতেও ঘণ্টা-খানেক কাটিয়া যায়। কাজেই বেলা সাড়ে-তিনটা চারটার আগে তাঁহার আর অবসর মেলে না।

বিমলের জন্য আজ পাঁচ-দশ রকম রান্না করিয়াছিলেন, কাজেই আহার শেষ হইতে আরও দেরি হইল। গুরুভোজনের ফলে একটুখানি না গড়াইয়া লইয়া থাকিতে পারিলেন না। কাজেই যখন ভিজা গামছা মাথায় চাপা দিয়া অবশেষে তিনি মল্লিক-বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইলেন তখন সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। বিমল উঠিয়া বৈঠকখানা ঘরের সামনের দাওয়ায় পায়চারি করিতেছে। তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "চললুম ভাই, তোমার দূতী হয়ে, এখন ঘটকী-বিদায়টা যেন ভাল মতে পাই।"

বিমল হাসিয়া বলিল, "আগে কাজ উদ্ধার ক'রে আসুন ত, তার পর বিদায়ের কথা।"

[আগামী বারে সমাপ্য]

বঙ্কিম-পরিচয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৮। পৃ. সংখ্যা ১৲+১৭০+ক—ব।

বঙ্কিম-জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে যে কয়েকটি স্থায়ী কাজের চেষ্টা হইয়াছে, তন্মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক বঙ্কিমের সম্পূর্ণ রচনাবলীর একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ-চেষ্টা উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এই সুযোগে এই চয়ন-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া প্রথম গ্রাজুয়েটের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদার্হ। তথাপি আমরা বলিব, এই সামান্য চয়নিকা বঙ্কিম-স্মৃতির উপযুক্ত হয় নাই; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আমরা আরও বড় কিছু আশা করিয়াছিলাম। টুক্‌রা টুক্‌রা ভাবে বঙ্কিমের সহিত ছাত্রদের পরিচয়সাধনের এই চেষ্টা আমরা সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতে পারিতেছি না।

এই সঙ্কলনের সহিত ভূমিকা ও পরিশিষ্ট যোজনার কাজ একটু দ্রুত সম্পাদিত হইয়াছে; সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় বঙ্কিমের জীবনের ও সমসাময়িক ঘটনাবলীর বিবরণ যথাযথ ও যথোপযুক্ত ভাবে সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে পারেন নাই; কিছু কিছু ভুল থাকিয়া গিয়াছে। যথা—

পুস্তকের দুই স্থলে (পৃ. ১৲ ও পৃ. ক) বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু-তারিখ "৪ এপ্রিল ১৮৯৪" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে,—হওয়া উচিত ছিল "৮ এপ্রিল ১৮৯৪"। ১৮৫৮ সনে 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রে বঙ্কিমের "Rajmohan's Wife" ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত (পৃ. ।৴০ ও পৃ. ছ) হয় নাই—হইয়াছিল ১৮৬৪ সনে; ইহা ১৯৩৫ সনে প্রবাসী-কার্য্যালয় হইতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ছ ও জ চিহ্নিত পৃষ্ঠায় প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' ও বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাসে'র প্রকাশকাল ১৮৫৭ ও ১৮৬২ সনের পরিবর্তে যথাক্রমে ১৮৫৮ ও ১৮৬০ সন হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' ১৮৬৭ সনে প্রকাশিত (পৃ. ঝ) হয় নাই,—হইয়াছিল ১৮৬৬ সনে। 'কমলাকান্তের দপ্তর' পুস্তকের প্রকাশকাল ১৮৭৬ সন নহে; পুস্তকের আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল "১৮৭৫" সন দেওয়া আছে।

এরূপ ভুলের সংখ্যা যতই হউক, সম্পাদক মহাশয় যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য', 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস', 'বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ', 'সহজ রচনা-শিক্ষা' ও 'সহজ ইংরেজী শিক্ষা'র নামগুলি প্রকাশকালসমেত তালিকায় উল্লেখ করিতে ভুলিবেন, ইহা—বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়াই বলিতেছি—অবিশ্বাস্য। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে এগুলি সংশোধিত হইবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হিমালয়ের হিমতীর্থে—শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত বি. এ. প্রণীত, গোল্ডকুইন কোম্পানী লিমিটেড, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। রয়াল ১৬ পেজি ফর্মার ১৯০ পৃষ্ঠায় শেষ।

ইহাতে হিমালয়ের অন্তর্গত হিন্দুর কাম্য তীর্থ কেদার-বদরীনাথ ভ্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। কোন রকম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা বর্ণনা মনোহর হইয়া উঠে নাই, সম্পূর্ণ গাইড-বুকের মতন ইহাতে বর্ণনার বহুলতা নাই। হাস্যরস সঞ্চারের চেষ্টা মাঝে মাঝে করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা বিফল হইয়াছে।

ছাপা কাগজ ছবি সুন্দর। মূল্য সস্তাই; এক টাকা।

শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় মহাকোষ—দ্বাবিংশ সংখ্যা। প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা। প্রকাশ-কার্য্যালয় ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্‌, ১৭০, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কার্য্যাধ্যক্ষ সম্পাদকীয় কার্য্যালয় ৬৩এ, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বহু যোগ্য সহকারী সম্পাদকের ও লেখকের সাহায্যে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এই বঙ্গীয় মহাকোষ সংকলন ও প্রকাশ করিতেছেন, ইহার দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুষ্টি সাধিত হইবে। ইহা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে তাহার পরিচায়কও বটে।

আলোচ্য সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ 'অঞ্জন-শলাকা' এবং শেষ শব্দ 'অটোমান সাম্রাজ্য'। 'অঞ্জলি' প্রবন্ধে কয়েকটি চিত্র আছে।

ক্ষণিকা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পুনর্মুদ্রণ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০, কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবি যে কবিতাটি লিখিয়া এই পুস্তকটি তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা এই মুদ্রণে সংযোজিত হইয়াছে। ১৩০৭ সালে এই পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয়।

"শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা'রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়,
ফুটে আর টুটে পলকে,
তাহাদেরি গান গা'রে আজি প্রাণ,
ক্ষণিক দিনে আলোকের।"

"ক্ষণিকা"র 'উদ্বোধন' কবি এই প্রকারে আরম্ভ করিয়াছেন।

ইহার ছন্দগুলিও হালকা। কিন্তু ইহার আনন্দের উৎস সাময়িক নহে, আনন্দও ক্ষণস্থায়ী নহে। ইহার অনেক কবিতা ছোট বড় অনেকের মুখস্থ আছে। নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না।

কবি একটি কবিতায় যাহা বলিতেছেন, আর একটিতে তাহার বিপরীত কিছু বলিতেছেন মনে হইতে পারে; কিন্তু বৈপরীত্য যে নাই, সমগ্র কবিতাগুলি পড়িলে বুদ্ধিমান্ পাঠক বুঝিতে পারিবেন। যেমন 'অভিবাদ' কবিতায় বলিতেছেন,

"আজকে আমি কোনো মতেই
বলব নাকো সত্য কথা।"

আবার 'বোঝাপড়া' কবিতায় বলিতেছেন,

"মনেরে আজ কহ, যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।"

'শাস্ত্র' কবিতায় তিনি যাহা বলিতেছেন, 'জন্মান্তর' কবিতায় তাহার বিপরীত কিছু বলেন নাই। কিন্তু দুটিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে সমস্যার উদ্ভব হয়। প্রথমোক্তটিতে বলিতেছেন,

"পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভাল চলে।"

অর্থাৎ কবি যুবকদিগের জন্য বানপ্রস্থের ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা বনে গেলে নব বঙ্গের চালক কে হইবেন? কবি নিজে ত রাজী নহেন। তিনি 'জন্মান্তর' কবিতায় বলিয়াই দিয়াছেন,

"আমি হব না ভাই নব বঙ্গে
নবযুগের চালক।"

রত্নকণিকা—প্রকাশক, বঙ্কিমশতবার্ষিকী-সমিতি, চন্দননগর।

এই সুমুদ্রিত পুস্তকটি চন্দননগরে বঙ্কিমশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সভাস্থলে বিতরিত হইয়াছিল। ইহার গোড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ছবি ও তাহার পরে "বন্দেমাতরম্" গানটি আছে। তাহার পর বর্ণানুক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের নানা গ্রন্থ হইতে নানা বিষয়ে তাঁহার নানা বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাকে বঙ্কিমচন্দ্রের "সুভাষিতসংগ্রহ" বলা যাইতে পারে। প্রথম বাক্যটি 'অর্থ' সম্বন্ধে, শেষটি 'হাকিম' সম্বন্ধে।

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান—দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, ২২-১ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দুই ভাগে বিভক্ত। মোট মূল্য দশ টাকা।

এ পর্যন্ত বাংলা অভিধান সম্পূর্ণ যতগুলি বাহির হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই অভিধানখানি বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ। ইহার পৃষ্ঠার দৈর্ঘ্য ৯ এবং প্রস্থ প্রায় ৭, অর্থাৎ প্রবাসীর পৃষ্ঠা অপেক্ষা ইহার পৃষ্ঠা সামান্য ছোট। অভিধানখানি ২৩১৮ পৃষ্ঠা পরিমিত, তদ্ভিন্ন ভূমিকাদি আরও প্রায় ৫০ পৃষ্ঠা আছে। ইহারই জন্য ছাপা ছোট অথচ সহজপাঠ্য অক্ষরে ইহা মুদ্রিত হওয়ায় ইহাতে গ্রন্থকার এক লক্ষ পনর হাজার শব্দের উচ্চারণ, ব্যুৎপত্তি, অর্থ ও শিষ্ট প্রয়োগ দিতে পারিয়াছেন। বাংলা শব্দের উচ্চারণ জানিবার প্রয়োজন আমরা অনেকে অনুভব করি না, কিন্তু অবাঙালীরা করেন; এবং বঙ্গের সব জেলায় উচ্চারণ এক নহে বলিয়া অভিধানখানির এই বৈশিষ্ট্য বাঙালীদেরও কাজে লাগিবে। বাংলা শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ জ্ঞানেন্দ্রমোহন বাবুই প্রথমে, তাঁহার অভিধানের প্রথম সংস্করণে, করেন।

এই অভিধানখানির প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নীচে লিখিত হইল।

ইহা গতানুগতিকভাবে সংকলিত সংস্কৃত-বাংলা অভিধান নহে, ইহা খাঁটি বাংলা অভিধান।

ইহা স্বত উচ্চার্য্য (self-pronouncing) বাংলা অভিধান। রাজধানী কলিকাতার বিশুদ্ধ উচ্চারণ জানিতে হইলে এই অভিধানের প্রয়োজন হইবে। সন্দেহ-স্থলে প্রতি পৃষ্ঠাতলে মুদ্রিত উচ্চারণ-নির্দেশক ইঙ্গিত ও ভূমিকাংশে বিবৃত উচ্চারণ-কুঞ্চিকা দেখা আবশ্যক।

বর্ণের মূল্য (value or equivalent), উচ্চারণ, প্রতিবর্ণীকরণ (transliteration) ও তাহার নিয়মাবলী ইহার ভূমিকা ও পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে।

ইহাতে বঙ্গীভূত অসংস্কৃত অবঙ্গীয় ও বৈদেশিক শব্দের মূল ও ও সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হইয়াছে।

ইহাতে সংস্কৃত, তৎসম, তদ্ভব শব্দ, বৌদ্ধ-বুদ্ধোত্তর-তান্ত্রিক-পৌরাণিক-বৈষ্ণব-মধ্যাধুনিক ও সর্ব্বাধুনিক সাহিত্য হইতে সংকলিত প্রচলিত, অপ্রচলিত বা লুপ্ত-প্রয়োগ শব্দ, বঙ্গীভূত বৈদেশিক শব্দ (আরবী, ফারসী, তুর্কী, পোর্ত্তুগীজ, ফরাসী, ডচ, জর্ম্মন, ইংরেজী), প্রাদেশিক (Provincial), আইনসঙ্গত আদালতী, জমিদারী, মহাজনী শব্দ, অনুকারাত্মক (Onomatopoetic) শব্দ, জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন-শিল্পের বিবিধ বিভাগীয় পারিভাষিক (Technical) শব্দ, লোকোক্তি (Proverbs), সমস্তপদ (Compound words), পদসমুচ্চয় (Phrases), বাগ্‌ধারা (Idioms), যৌগিক শব্দ (Derivatives), ক্ষুদ্রার্থবাচক শব্দ (Diminutives), সমনাম (Synonym), বিপরীতার্থক শব্দ (Antonyms), অতি-ব্যবহার ও আর্ষপ্রয়োগ-শুদ্ধ শব্দ, উচ্চারণগত বানান-পার্থক্য বা রূপবৈচিত্র্য অর্থাৎ পাঠান্তর (Variants), পৌরাণিক নাম ও ঘটনার পরোক্ষ উল্লেখ (Allusions) প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে এবং সংস্কৃত ও অসংস্কৃত উভয়বিধ শব্দের প্রতি সমান দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

ইহাতে শব্দের মুখ্যার্থ, গৌণার্থ, বিশেষার্থ, পারিভাষিকার্থ বাক্যভেদে অর্থবৈচিত্র্য নানার্থপ্রকাশক উদ্ধার দ্বারা শব্দাবলীর ব্যাখ্যা বেশ পূর্ণতার সহিত ও বিশদভাবেই করা হইয়াছে।

ইহাতে বিদেশী নামের সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ পরিশিষ্টে প্রতিবর্ণীকরণাংশে প্রদত্ত হইয়াছে।

ভূ-পর্য্যটন—ডক্টর শ্রীশরৎচন্দ্র বসাক, এম-এ, ডি-এল, প্রণীত এবং কলিকাতার ২৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৷০ টাকা।

এই সুবৃহৎ এবং সুমুদ্রিত ভ্রমণ-গ্রন্থখানি বহুচিত্রশোভিত। ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন, "আমি বেশ টের পাই, আমার মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন ভবঘুরে আছে।...তাই বার বার পাঁচ বার ইয়োরোপ ভ্রমণ করিয়াও আশা মিটিল না। আবার তোড়জোড় করিয়া বাহির হইয়া পড়িতে হইল।" বাহির হইয়া চীন, জাপান, আমেরিকা ও ইয়োরোপ—এইরূপে সারা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই ঘুরিয়া আসিলেন। গ্রন্থখানি সেই পর্য্যটনের কাহিনী। বাংলায় ইয়োরোপ-যাত্রার বহু বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলির অধিকাংশই ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর পরিচিত বিবরণে পর্য্যবসিত। তুর্কি অথবা রাশিয়া ভ্রমণের কাহিনী বাংলায় যথেষ্ট নাই। অথচ এই দেশগুলির সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলও অল্প নহে এবং জানিবার কথাও আছে যথেষ্ট। মঠ, প্যাগোডা, প্রাসাদ, স্মৃতিস্তম্ভ, প্রাচীন দুর্গ, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের প্রাকৃতিক শোভা, কিওটোর হৃতস্ন জলাবর্ত্ত, আমেরিকার নায়েগ্রা প্রপাত প্রভৃতির বর্ণনা হয়ত সকলেরই ভাল লাগে, কিন্তু নবজাগ্রত এবং নবগঠিত শাসনতন্ত্র ঐ দুই দেশের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ আমাদের মনকে অধিকতর আকর্ষণ করে। বিশেষভাবে বলশেভিক গবর্ণমেন্টের নবপ্রবর্ত্তিত কর্ম্মপদ্ধতি ও তাহার ফলে রুশ রাষ্ট্রে যে সকল নূতন পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধিত হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে গ্রন্থকার তুর্কি হইয়া পোল্যাণ্ড দিয়া রাশিয়ায় গিয়াছিলেন। তিনি রাশিয়ার উন্নতি সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকের সহজ সরল বর্ণনাভঙ্গী, বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এবং সাবলীল লিপিকৌশল প্রশংসনীয়।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শ্রীশ্রীগঙ্গা-মাহাত্ম্য ও পূজাবিধি—এই ধর্ম্মপুস্তিকাখানি ময়মনসিংহ—বৃগা গ্রাম-নিবাসী পণ্ডিত ৺রমানাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং কলিকাতা ২১।১ নং হরীতকী বাগান লেনস্থ শ্রীশ্রীনারায়ণ আশ্রম হইতে শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা মাত্র।

আলোচ্য পুস্তিকায় বিবিধ গঙ্গাস্তব, গঙ্গামাহাত্ম্য বিস্তারিত ভাবে আলোচনা, গঙ্গাপূজা ও বিবিধ স্নানবিধি, গঙ্গায় অস্থি নিক্ষেপ, পিতৃষোড়শী, স্ত্রী-ষোড়শী ও মাতৃষোড়শী, পিণ্ডদানবিধি সমেত যাবতীয় গঙ্গাকৃত্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ব.

চোরাবালি—শ্রীবিষ্ণু দে। শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুখবন্ধ সহ। ভারতী ভবন, কলিকাতা। মূল্য ১৸০।

বিষ্ণু দের কবিতার মধ্যে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় তাঁহার বহুল অসরলতা। তাঁহার কবিতার দোষ বা গুণের ইহাই ভিত্তি। এই অসরলতা অবশ্য তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষার পরিচায়ক। বর্ত্তমান সংস্কৃতির জটিলতা তাঁহার মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। যেখানে এই জটিলতাকে তিনি কাব্যরসায়নে জীর্ণ করিয়াছেন সেখানে তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীর প্রকাশ হইয়াছে সহজ ও মোহন; যেখানে তাহা পারেন নাই, ফল হইয়াছে শুধু অভিনব ও চমকপ্রদ চাতুরী—ভাষার, ছন্দের, চিত্রকল্পের।

কেন না, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে বিষ্ণু দের মত অভিনবত্বের দাবি তাঁহার সমসাময়িক অন্য কোন কবি করিতে পারেন না, 'চোরাবালি'র মুখবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তও না। সুধীন্দ্রনাথের নিকট বিষ্ণু দে ঋণী, এবং তাহার কারণ শুধু এই মুখবন্ধ নহে। 'চোরাবালি'র বহু স্থানে শব্দসমাবেশে এই ঋণের নিদর্শন পাওয়া যায়। অবশ্য, ইহার অপেক্ষাও অনেক বেশী পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের নিকট এই তরুণ কবির ঋণের প্রমাণ। কিন্তু বিষ্ণু দের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি চোরের মত শুধু পরস্ব অপহরণ করেন নাই, দক্ষ লেখনীর অপূর্ব্ব যাদুতে তাহাকে নিজস্বে পরিণত করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'মহাশ্বেতা' কবিতার যে-কোন একটি শ্লোক উদ্ধার করা যাইতে পারে:—

ভাস্বর তব তনুতে অমৃত জ্যোতি।
প্রাণ সূর্য্যের একান্ত সংহতি।
ক্লান্তিবলয়ে শিহরায় ক্রন্দসী।
উত্তর করে মুদ্রিত বরাভয়।
তামসিকে করো খণ্ডন, করো জয়।
স্বপ্ন-সারথি, তোরণ কি যায় দেখা?

এই পংক্তি কয়টি শুধু রবীন্দ্রনাথের ছন্দের ও ভাষার প্রতিধ্বনিতে মুখর নহে, প্রাচীন যুগের সঞ্চিত স্মৃতিভার, ভারতবর্ষের বহু শতাব্দী-বাহিত ঐতিহ্য ইহার মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার ইন্দ্রজাল কবির স্বকীয় সৃষ্টি। এই স্বকীয়তার প্রকৃষ্টতর উদাহরণ 'চোরাবালি'র প্রথম কবিতা ঘোড়সওয়ার। সাধারণ বাঙালী পাঠকের নিকট এই কবিতার ভূমিকা মহাশ্বেতার মত সুস্পষ্ট নহে, কিন্তু ছন্দ ও ভাষার এমন দুর্নিবার গতিবেগ সমসাময়িক অন্য কোন কবির মধ্যে আছে বলিয়া সমালোচকের জানা নাই। অথচ ইহার জন্য লেখক কিছুমাত্র উৎকটতার অবতারণা করেন নাই, কোন অলঙ্কারের সাহায্য লন নাই। তাঁহার রচনা নিরাভরণ, বাহুল্যবর্জ্জিত, সরল; ইহার গতি স্বচ্ছন্দ, সাবলীল, কিন্তু পাঠকের মনের উপর দিয়া শ্রুতিকর লঘু প্রবাহে ইহা বহিয়া যায় না, অর্থের অপেক্ষা না রাখিয়া মনকে ইহা আঘাত করে।

কিন্তু তাঁহার কবিতার অর্থের প্রসঙ্গ এই সমালোচনা হইতে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মুখবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন এবং একাধিক দুর্ব্বোধ্য কবিতার অর্থ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহাতে পাঠকের বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়া যায়। বুদ্ধিমান পাঠক তাই মুখবন্ধ না পড়িয়া বারম্বার 'চোরাবালি'র কবিতাগুলি পাঠ করিয়া রসোপলব্ধির চেষ্টা করিবেন।

প্রশ্ন জাগে বিষ্ণু দের দুর্ব্বোধ্যতার কারণ কি? কবির অক্ষমতা, না পাঠকের? বিষ্ণু দে তাঁহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন জ্ঞান-রাজ্যের বিপুল ক্ষেত্র হইতে। সকল পাঠকের জ্ঞানের প্রসার তাঁহার মত ব্যাপক নহে। কিন্তু তাহা হইলে কি এই কথা স্বীকার

করিতে হইবে যে কবিতা বুঝিবার পক্ষে বিস্তৃত অধ্যয়ন অত্যাবশ্যক? কবির ও পাঠকের হৃদয়ের যোগাযোগ অধীত বিষয়ের সেতুবন্ধ ব্যতীত সম্ভব নহে? যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে রসসৃষ্টি ও উপলব্ধি সম্বন্ধে আমার ধারণা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত।

এই প্রশ্নের বিহিত মীমাংসা কি বলিতে পারি না। তবে একদা রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে এই অভিযোগ খুব ব্যাপকভাবে হইয়াছিল। এই কথা স্মরণ করা যাইতে পারে এবং তাহার কারণ কবির অভাবনীয় অভিনবত্ব। তখনকার পাঠক এই অভিনবত্বের জন্য প্রস্তুত ছিল না। দিনে দিনে রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার, তাঁহার রচনাভঙ্গীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়াছে, তাই রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এই অভিযোগ আর বড় শোনা যায় না। বিষ্ণু দের অভিনবত্ব যখন বাঙালী পাঠকের সহিয়া যাইবে, হয়ত তাঁহাকে আর দুর্বোধ লাগিবে না, আর তখনও যদি তাঁহার ছন্দের ও ভাষার ইন্দ্রজাল পাঠকের মনকে আবিষ্ট করে, সকল কবিদের মধ্যে তাঁহার অচল প্রতিষ্ঠা হইবে। অবশ্য, তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি বা কাছাকাছি কোথাও নহে। রবীন্দ্রনাথ যুগপ্রবর্তক এবং তরুণ রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও ইহার আভাস সুধীজনের নিকট সুস্পষ্ট ছিল। বিষ্ণু দেকে যুগ-প্রবর্তক অবশ্যই বলিতে প্রস্তুত নহি; তাঁহার স্বকীয়তার বিকাশ হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট ভিত্তির উপর। আমি শুধু ছন্দ ও ভাষার উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, যেখানে ছন্দ ও ভাষা শুধু লেখনীর চাতুরী মাত্র, তাহাদের ইন্দ্রজাল দু-দিনে মিলাইয়া যায়। কিংবা কালক্রমে নিজ মনের ও লেখনীর পরিণতির সঙ্গে কবির পরিশীলন ও সংস্কৃতি তাঁহার রচনার সঙ্গে এই ভাবে অঙ্গীকৃত হইবে যে পাঠকের মনে নিবিড় রসোপভোগ ছাড়া আর কোন প্রতিক্রিয়া হইবে না।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

আগুন—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা। পৃ. ১৯৮। মূল্য ১৸০।

যে মূলসূত্রটির অবলম্বনে উপন্যাসখানি রচিত, কথোপকথনচ্ছলে লেখক তাহা পুস্তকের এক জায়গায় দিয়াছেন। সেটি উদ্ধৃত করিয়াই আরম্ভ করিলাম, ইহাতে বইখানির প্রকৃতি ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

"বহ্নি যবে বাঁধা থাকে তরুর মর্মের মাঝখানে
ফুলে ফলে পল্লবে বিরাজে।
যখন উদ্দাম শিখা লজ্জাহীনা, বন্ধন না মানে
মরে যায় ব্যর্থ ভস্ম মাঝে।"

সৃষ্টিতে প্রকাশে এই একই বহ্নি—শুধু প্রকারভেদ। বইখানিতে এই আগুনের খেলাই আমরা দেখিতে পাই, তিনটি জীবনে। উগ্র শিখার দাহনে উল্কার মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনটি জীবন নিঃশেষ হইল ভস্মে। অবশ্য একই অনল নয়। চন্দ্রনাথ যে-অনলে দগ্ধ হইল, তাহা একটা বিরাট সৃষ্টির দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। Growth of the Soil হইতে তাহার প্রেরণা। সে করিলও সৃষ্টি; তাহার কল্পনা এক দিন মূর্তি ধরিল,—অরণ্য সরাইয়া 'চন্দ্রপুরা কাস্রার ব্রিক্স্' কারখানা দাঁড়াইয়া উঠিল সৃষ্টির একটা বিস্ময়ের মত। কিন্তু এই সৃষ্টির মধ্যেই ছিল ধ্বংসের বীজ; চন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষার উগ্রতার মধ্যেই ছিল হতাশার অবসাদ। এক দিন দেখা গেল—"কারখানাটা পরাজিত দৈত্যপুরীর মত স্তব্ধ, যন্ত্রপাতিগুলি বজ্রাহত বৃত্রাসুরের কঙ্কালের মত পড়িয়া আছে।" এবং সেই বৃত্রাসুর যখন পড়িল তখন চন্দ্রনাথকে লইয়াই পড়িল।

আর এক অনলে দগ্ধ হইল কুবেরের দুলাল হীরু। তাহার অনল কাম,—শুধু রক্তমাংসের লালসা। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ শক্তি, কিন্তু সে যখন প্রেমের সঙ্গে যুক্ত। প্রেম-বিচ্ছিন্ন কামনা তাহাকে নাশ করিল। দাহনের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাই বন্ধুর পরামর্শের উত্তরে তাহাকে হাসিয়া বলিতে শুনি—"বুকের বহ্নি জ্বলেছে বন্ধু, লজ্জাহীনা তার শিখা, ভস্ম যে হ'তেই হবে। নেবানো তাকে যাবে না।"

আরও এক অনলে দগ্ধ হইল নিশানাথ। কিন্তু এ-অনল পবিত্র হোমাগ্নি। মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রেরণা, মানুষকে লইয়া চলে অনন্তের পানে। নিশানাথের কথা তুলিয়া দিতে ইচ্ছা হয় "রত্নময়ী বসুন্ধরা, নরেশ, তার মধ্যে পরম রত্ন হলেন ভগবান, তাঁকে যদি না পেলাম তো পেলাম কি বল?"

কিন্তু এই হোমাগ্নিও শিখান্বিত অনল। এর শিখা নিশানাথের আত্মাকে বোধ হয় ঊর্দ্ধমুখী করে, কিন্তু প্রতিদিনের সুখদুঃখ লইয়া যে সৃষ্টি, রত্নময়ী বসুন্ধরার যাহা নিতান্ত আপন জিনিষ, তাহাকে দেয় ঝলসাইয়া। তাই তপস্বী নিশানাথের সৌম্য মৃত্যু (বা বিলয়ে) বেশী বিস্মিত হই, কি তাহার স্ত্রীর মুহ্যমান তপশীর্ণ মূর্তি দেখিয়া বেশী ক্ষুব্ধ হই বলা শক্ত। এক দিকে বোধ হয় বিরাট সার্থকতা সে কিন্তু জীবনের ওপারে। মনে হয় তার চেয়ে ঢের সত্য এই জীবনের নিরুপায় ব্যর্থতা, যার জন্য অভিমানিনী নারীকে বলিতে হয় "না, তার তপস্যার বিঘ্ন হবে; শুধু আজ নয়, যদি আমি মরি, নরু, তবে তাকে আমার মরা মুখও যেন দেখান না হয়।"

স্বয়ং লেখকের পরিচয় কম করিয়া দিলেও চলে, না-দিলেও ক্ষতি হয় না। তারাশঙ্কর বাবু বাংলা পাঠকের হৃদয়ে নিজের স্থান কায়েমী করিয়া লইয়াছেন। বইখানি তাঁহার প্রতিষ্ঠার বনিয়াদ আরও পাকা করিবে, কেন না তাঁহার কলমের যা গুণ তা যেন আরও স্ফূর্ত হইয়া বইখানিতে প্রকাশ পাইয়াছে। বইখানির মধ্যে একটা জ্বালা আছে,—তিনটি চিত্তের অন্তর্বহ্নির প্রদাহ। কিন্তু তাহারই পাশে পাশে কতকগুলি চরিত্রের, বিশেষ করিয়া স্ত্রী-চরিত্রের, স্নিগ্ধতা সেই জ্বালার প্রদাহ কখনই উগ্র হইতে দেয় না। চন্দ্রনাথের পাশে তাহার স্ত্রী মীরা, হীরুর পাশে তাহার "চিত্রাঙ্গদা" যাযাবরী মুক্তকেশী, আর নিশানাথের পাশে "বৌদিদি" বড়ই মধুর। তিনটির মধ্যে, সুখদুঃখের মধ্য দিয়া নারীজীবনের যা কিছু মাধুর্য্য সব যেন লেখক নিঃশেষে ভাগ করিয়া দিয়াছেন।

বন্ধু—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

চারি অঙ্কের নাটক। অশনি ধনীসন্তান হেমন্তের আর্দর্শ বন্ধু। তাহার সংকল্প সে কোন মতেই বন্ধুকে বিপথে যাইতে দিবে না;—এজন্য আপাতদৃষ্টিতে যা অপ্রিয়, এমন আচরণও যদি তাহাকে করিতে হয় তো সে পশ্চাৎপদ নয়।

বাহ্যিক রূঢ়তার ভিতরে অকৃত্রিম বন্ধুর অন্তরের এই দরদ নাটকের মধ্যে বেশ ফুটিয়াছে। তবে নাটকের কয়েকটি চরিত্র অতিরঞ্জিত হইয়াছে। যদিও নাট্যকার ভূমিকায় বলিয়াছেন—"আর্টের ক্ষেত্রে সত্যকে ধরিতে হইলে সম্ভবকে কত দূর অতিক্রম করা যাইতে পারে, তাহার সীমা এখনও নির্দিষ্ট হয় নাই"—তথাপি একটা সীমা আছে বইকি। নাটকের চরিত্র অধ্যাপক জ্ঞানাঞ্জন বাবুর কথা ধরা যাক্। একটি আইডিয়া বা চিন্তাকে অনুসরণ করিতে করিতে এ-ধরণের লোকেরা সংসারে একটু বেখাপ্পা হইয়া পড়ে। কিন্তু জ্ঞানাঞ্জন বাবু একেবারে পাগলের কোঠায় গিয়া পড়িয়াছেন। সংযমের মধ্যে এই ধরণেরই চরিত্র পরশুরামের "প্রফেসর ননী" একেবারে অনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

নাটকের কথাবার্ত্তাগুলি বেশ সজীব এবং ইহার মধ্য দিয়া প্রয়োজন-স্থলে পাত্রপাত্রীদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সব স্থলে মাঝে মাঝে যে হাস্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে তাহাও খুব মনোজ্ঞ।

চিরন্তনী—শ্রীমতিলাল দাশ। দি বুক কোম্পানী, কলেজ স্কোয়ার। মূল্য ।॰।

তিনটি দৃশ্যে সমাপ্ত একটি ক্ষুদ্র নাটিকা। পার্থিব প্রেম নশ্বর, তবুও তাহার সার্থকতা আছে যদি তাহা অবিনশ্বর ভগবৎপ্রেমের দিকে চিত্তকে চালিত করিতে পারে। নাটকটির প্রতিপাদ্য এই। কতক অংশ গদ্যে এবং কতক অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। এই অংশের ভাষা অযথা কঠিন করা হইয়াছে; এক এক জায়গায় বুঝিতে শ্রোতার কপালে ঘাম ঝরিবে। মাঝে মাঝে ছন্দের পতনও ঘটিয়াছে। ছাপাতেও কিছু কিছু দোষ বর্ত্তমান।

গানগুলি ভাল লাগিল; পরিকল্পনাটিও ভাল। মনে হয় ভাষা ও ছন্দের দিকে লক্ষ্য রাখিলে লেখক ভাল জিনিষ দিতে পারিবেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বাংলায় উৎকৃষ্ট কার্পাসের চাষ

শ্রীসারদাচরণ চক্রবর্ত্তী

বাংলা দেশ এক দিন মস্‌লিনের জন্য বিখ্যাত ছিল। মস্‌লিন প্রস্তুতির উপযোগী তুলা যে বাংলাতেই উৎপন্ন হইত, তাহা সুবিদিত। এই শিল্পের অবনতির সহিত গত দেড় শত বৎসরের মধ্যে তাহার যোগ্য তুলার চাষও উঠিয়া গিয়াছে। এমন কি, এখন মস্‌লিনের উপযোগী তুলার বীজ পর্য্যন্ত বাংলা দেশ হইতে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। এখন বাংলাতে যে তুলা হয় তাহা দ্বারা বস্ত্রবয়নোপযোগী সূতা প্রস্তুত হয় না। কাপড়ের কলে যে তুলা ব্যবহৃত হয় তাহার আঁশ অন্ততঃ ⅞ ইঞ্চি লম্বা হওয়া চাই। সুদূর আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হইতে তুলার উৎকৃষ্ট বীজ আনাইয়া বাংলার কৃষি-বিভাগ বহু দিন হইতে প্রতি বৎসরই ইহার উৎপাদন-বিষয়ে চেষ্টা করিয়াও আশাপ্রদ ফল পান নাই। বিড়লা ব্রাদার্স গত কয়েক বৎসর বহু টাকা গবর্ণমেণ্টকে এজন্য দিয়াও এ-বিষয়ে কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই। ঢাকেশ্বরী মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত অখিলবন্ধু গুহ মহাশয় ভারতের কেন্দ্রীয় কার্পাস কমিটির (Central Cotton Committee of Indiaর) এক জন সভ্য। তিনি নিজে উৎকৃষ্ট বীজ আনাইয়া ঢাকেশ্বরী মিলের হাতার মধ্যে আট-দশ বিঘা জমিতে ইহার চাষ আরম্ভ করেন। গত তিন বৎসর যাবৎ আমার উপর ইহা উৎপাদন করিবার ভার দেন। এখানে প্রতিবৎসরই যে তুলা হইতেছে তাহার ফলন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় যেমন তিন গুণ অধিক হইতেছে তেমনই, এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মতে, ইহার উৎকর্ষও যে-দেশের বীজ হইতে তুলা উৎপন্ন হইতেছে, তাহা হইতে অনেক বেশী। তিন বৎসর ক্রমান্বয়ে আশাপ্রদ ফল পাইয়া বাংলার কৃষি-বিভাগকে ইহার চাষ প্রসারের জন্য আবশ্যক-মত অর্থসাহায্য দিবেন জানাইয়া ঢাকেশ্বরী মিলের কর্ত্তৃপক্ষ অনুরোধ করেন। ক্রমে অন্য মিল-মালিকগণও ইহাতে যোগ দেন। পাঁচ বৎসরের জন্য মিল-মালিকগণ ও গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ২০,০০০৲ টাকা দ্বারা ছয়টি জেলাতে

বর্ত্তমান বর্ষ হইতে ইহার চাষ বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণের এ-বিষয়ে উৎসাহ ও চেষ্টা থাকিলে সুফল পাওয়া যাইবে আশা করা যায়।

বর্ষাতে জল দাঁড়ায় না, এ-প্রকার দোআঁশ মাটি তুলা-উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী। বীজ বপন করা হইতে গাছে ফুল ও গুটি না-আসা পর্য্যন্ত তিন-চার মাস জমিতে যথেষ্ট রস থাকা আবশ্যক। বাংলায় নিয়মিত বৃষ্টিপাত এই চাষের বিশেষ উপযোগী। বার-বার চাষ দিয়া জমি প্রস্তুত হইলে যথেষ্ট সার দিয়া বীজ বপন করিতে হয়। গুটি দেখা দিবার পর ক্রমাগত কয়েক দিন বৃষ্টি হইলে নানারূপ পোকার উপদ্রব হয়। এজন্য বর্ষার মাঝামাঝি, কিংবা ঘাস মারিয়া ফেলিতে অথবা বর্ষার জন্য জমি প্রস্তুত করিতে বিলম্ব হইলে বর্ষার শেষ ভাগে, বীজ বপন করিতে হয়। ইহাতে চারা বড় না-হওয়া পর্য্যন্ত জলেরও অভাব হয় না এবং শীতের প্রারম্ভে যখন বর্ষা থাকে না, সে-সময়ে তুলা হয় বলিয়া পোকার উপদ্রবেরও আশঙ্কা থাকে না। চার ফুট অন্তর লাইন করিয়া ঐ লাইনে দেড় ফুট অন্তর দু-তিনটি করিয়া বীজ পুঁতিতে হয়। সাত দিন হইতে পনর দিন মধ্যে বীজগুলি অঙ্কুরিত হইবে। চারা কিছু বড় হইলে একটি করিয়া সতেজ চারা এক স্থানে রাখিয়া বাকী চারা তুলিয়া ফেলিতে হইবে। এ-সময়ে চারাগুলির গোড়াতে বিঘা-প্রতি আধ মণ হাড়ের গুঁড়া দিতে পারিলে ফলন বেশী হইবে। গাছে ফল ও গুটি না-আসা পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে কোপাইয়া নিড়াইয়া দিতে হইবে। জমি ভিজা থাকিলে তাহাতে কোপান ও নিড়ান অনুচিত। গাছে কি ফলে পোকা দেখা দিবা মাত্র মারিয়া ফেলিতে হইবে। অন্যথায় এ-সকল উপদ্রব কোন রকমে বিস্তৃতি লাভ করিলে তাহা পরে নিবারণ করা কঠিন হয়। গুটি ফাটিয়া তুলা সম্পূর্ণ বাহির হইলে তাহা সংগ্রহ করিতে হয়। জমিতে তুলা দেখা দিলে পর দু-এক সপ্তাহ পর পরই তিন-চার মাস পর্য্যন্ত তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের দ্বারাই তুলা সংগ্রহ হইতে পারে। তুলা বেশ পরিষ্কার ভাবে তুলিতে হইবে। যাহাতে তুলার সহিত কোন রকম ময়লা কি শুষ্ক পাতা মিশিয়া না যায় সে-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। বিভিন্ন রকমের তুলা পৃথক্ ভাবে রাখা আবশ্যক। ময়লা ভিজা কিংবা মিশ্রিত তুলার বাজারে আদর নাই। প্রথম মাসের সংগৃহীত তুলা পরবর্ত্তী তুলা হইতে ভাল হয়, এজন্য ইহাও পৃথক্ রাখিলে ভাল হয়। তুলার বীজ গাভীর পক্ষে বেশ পুষ্টিকর ও স্নিগ্ধ খাদ্য। বিঘা-প্রতি ২৪০০ গাছ হয় এবং প্রত্যেক গাছে গড়ে দেড় ছটাক তুলা ফলিয়া থাকে। ইহাতে বিঘা-প্রতি অন্ততঃ সাড়ে চার মণ কার্পাস অথবা দেড় মণ বীজ ছাড়ান তুলা পাওয়া যায়। সাধারণের মধ্যে যাহাতে ইহার চাষ প্রচলন হয়, এজন্য মিল-মালিকগণ তাঁহাদের কিংবা সরকারী কৃষি-বিভাগের প্রদত্ত বীজ হইতে উৎপন্ন তুলার জন্য অন্ততঃ ২৫৲ টাকা মণ দিবেন। এ-সকল তুলা বাজারেও এই দরেই বিক্রীত হয়। কাজেই বিঘা-প্রতি ৩০৲।৩৫৲ টাকা পাওয়া স্বাভাবিক। ইহার উৎপাদন-খরচ ২০৲ টাকার অধিক হয় না।

কাবুকী থিয়েটার। টোকিও　　　　টোকিও ষ্টেশন

জাপান ভ্রমণ

শ্রীশান্তা দেবী

৬ই ফেব্রুয়ারী। আজ আনিও মারু জাহাজ কোবের বন্দর ছেড়ে ওসাকার দিকে যাবে। যাত্রীদের এই ধীর মন্থর-গতির জাহাজে গিয়ে কোনও প্রয়োজন নেই। কাজেই আজ সকলে জাহাজ ছেড়ে ট্রেন কি হোটেলের আশ্রয় নেবে। আমাদের প্রায় এক মাসের এই বাসা আজ ভেঙে গেল। জাহাজ কোম্পানীরই গাড়ী আমাদের সব জিনিষপত্র চুঙ্গি আপিসে (customs office) পাঠিয়ে দিল। এত দিন এক জাহাজে থেকে যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল তারা সব বিদায় নিতে সুরু করলেন। আমার মেয়েটি ত বন্ধুবিচ্ছেদে কেঁদেই আকুল।

জাহাজ ছাড়বার সময় ভৃত্যদের বকশিশ দেওয়ার অলিখিত নিয়ম আছে। আমাদের কেবিনের যে ভৃত্য সে আবার আমাদের খাবার টেবিলেও পরিবেশন করত। তাকে এক পাউণ্ড বকশিশ দেওয়াতে সে কিছুমাত্র খুসী হল না, বল্‌লে অন্য চাকররা ভাগ চাইবে। আমাদের তখন স্নানের ঘরের চাকর, ট্যাক্সি, কুলি ইত্যাদির জন্য টাকা রাখতে হবে, ভাঙানো টাকা বেশী নেই, কাজেই ভৃত্যকে প্রসন্ন করবার মত আর কিছু বার করতে পারলাম না। বল্‌লাম ইয়োকোহামাতে যখন বড় জিনিষ নিতে যাব তখন কিছু দেওয়া যাবে।

জাপানে সারা বছরই অল্প অল্প বৃষ্টি হয় শুনেছি। কিন্তু আমরা এসে পর্য্যন্ত বৃষ্টি পাই নি। আজ জাহাজ ছাড়বার সময় বৃষ্টি সুরু হয়ে গেল। নামবার সিঁড়ি বৃষ্টিতে পিছল। ষ্টুয়ার্ড খুব যত্ন করে আমাদের নামিয়ে দিল। এবং তাকে একটা ভাল সার্টিফিকেট দেবার জন্য অনুরোধ করল। যাত্রীরা ভাল সার্টিফিকেট দিলে তার কাজে উন্নতি হবার সম্ভাবনা। বৃষ্টির মধ্যেই আমরা যাত্রা করলাম। মাঝ পথে চুঙ্গি আপিসের পুলিশরা গাড়ী আটকাল। ডক থেকে যাওয়া আসার সময় রোজই গাড়ী ধরত তারা, কিন্তু তখন আমাদের সঙ্গে কিছু নেই শুনেই ছেড়ে দিত। আজ দুটো একটা জিনিষ আছে, কাজেই তারা সব খুলে পরীক্ষা করবে। আমার মেয়ের হাতে একটা কাগজের থলি ছিল সেটাও পরীক্ষা করতে তাদের মহা উৎসাহ। আমরা হেসে ফেলাতে তারাও একটু হাসল। আপিসে সব বাক্সের চাবি খুলে দেখল। বাক্সের মধ্যে ছোটখাট কাগজের বাক্স দেখলে সেগুলোও খুলে দেখছিল। অভদ্রতা কিছু অবশ্য করে নি। কি কারণে জানি না তারা আমাদের কাছে দেড় ইয়েন অর্থাৎ ১৶০ আন্দাজ আদায় করল।

আমাদের জাহাজের টিকিট ছিল বোম্বাই থেকে ইয়োকোহামা পর্য্যন্ত। কোবেতে নেমে পড়াতে জাহাজ কোম্পানী আমাদের টোকিও পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রেনের

টিকিট দিয়ে দিল। কিন্তু তার উপর আর কিছু দিলে তবে মেল ট্রেনে যাওয়া যায়। আমরা টিকিট আপিসে খোঁজ করে শুনলাম দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান নেই, সব টিকিট হোটেলওয়ালারা তাদের 'অতিথি'দের জন্য আগেই কিনে রেখেছে। অনেক চেষ্টা করেও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট না-পাওয়াতে আড়াই জনের জন্য পাঁচ ইয়েন উপরি খরচ করে তৃতীয় শ্রেণীতেই চড়ে বসলাম।

আমরা সঙ্গে খাবার আনি নি। পথে দেখলাম প্রত্যেক ষ্টেশনেই সুদৃশ্য পোষাক-পরা ফিরিওয়ালারা চা, দুধ, কমলা লেবু ও অন্যান্য খাবার খুব বিক্রী করছে। আমরা ১৫ সেন অর্থাৎ আন্দাজ সাড়ে সাত পয়সা করে এক এক বোতল গরম দুধ কিনে খেলাম। প্রায় আধ-সের দুধ হবে মনে হ'ল; তদুপরি বোতলটা বিনা পয়সায়। যাত্রীরা সবুজ চা ও খাবার কিনছে প্রায় সকলেই। চায়ের টি-পট শুদ্ধই বোধ হয় ৫ সেন অর্থাৎ আড়াই পয়সায় দিচ্ছে। তবে সকলেই খাওয়া শেষ হবার পর দুধের বোতল ও টি-পট গাড়ীতে ফেলে যাচ্ছিল দেখে মনে হচ্ছিল হয় ত এগুলি পরে আবার বিক্রেতারা সংগ্রহ করে। আমরা পানীয় ত পেলাম, খাদ্য হিসাবে কিছু কিনব মনে করে এক জায়গায় ভুল করে এক বাক্স কাসুন্দি ধরণের আচার কিনে বসলাম। জাপানী কাসুন্দি কে আর খাবে? পয়সাটা জলে গেল। দ্বিতীয় বার কপাল ঠুকে বাক্স কিনে ভাত ও স্যাণ্ডউইচ পাওয়া গেল। স্যাণ্ডউইচ কথাটা ফিরিওয়ালারা বুঝতে পারে বলে বোধ হয় এবার আর খাদ্যবিভ্রাট হয় নি। ইংরেজী প্রায় কোন কথাই তাদের বোঝান যায় না জাপানের পথে এই একটা মহা মুস্কিল। তবে এখন মনে হয়, লিখে দেখালে ওরা খানিকটা বোঝে। কিন্তু যেখানে দু-এক মিনিট ট্রেন দাঁড়ায় সেখানে লিখে বোঝাবার সময় কোথায়?

কোবে থেকে টোকিও দীর্ঘ পথ। মেল ট্রেনে দুপুর সাড়ে-বারটায় বেরিয়ে টোকিও পৌঁছতে রাত ন-টা বেজে গেল। গাড়ীতে ভীষণ ভীড়। কোন রকমে বসবার জায়গাটুকু পাওয়া যায়। ইউরোপীয়ান পোষাক পরা এক জাপানী মহিলা আমাদের সামনের সিটে দুটি

গিঞ্জার পথ, টোকিও

ছেলেমেয়েকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এক জনও এক অক্ষর ইংরেজী বোঝে না। আকারে ইঙ্গিতে তারা আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল, টফি ইত্যাদি দিচ্ছিল ছেলেটা খুব মোটা। শীতের দিনে গাড়ী গরম করা থাকে, তবু তারা দুই ভাইবোন এত কাপড় পরেছে যে তা পরে উত্তর-মেরুতেও যাওয়া যায়। খানিক পরে মেয়েটির গরম বোধ হওয়াতে সে একটা একটা করে গরম কাপড় ছাড়তে লাগল। সার্কাসের ক্লাউনরা যেমন ক্রমাগত কাপড় ছাড়তে ছাড়তে রোগা হ'তে থাকে, সেও গোটা তিনেক ছেড়ে তেমনি একটু রোগা হ'ল। তার পর হাত দিয়ে দেখাল তখনও তার পরিধানে পাঁচটা গরম জামা রয়েছে। আমি প্রচণ্ড শীতেও খোলা জায়গায় আমার মেয়েকে পাঁচটার বেশী গরম পরাতাম না। নামবার সময় মেয়েটি আবার আটটা গরম জামা পরে এবং তদুপরি একটা ওভারকোট পরে তবে নামল।

কোবে থেকে টোকিও পর্য্যন্ত পথে আগের মত গ্রাম্য দৃশ্য ছাড়া আরও নূতন অনেক কিছু দেখা যায়। কোথাও

গিঞ্জা পাড়া। টোকিও

পরের ষ্টেশনের নাম ঘোষণা করে, যারা ঘুমোয় তাদের জাগিয়ে দেয় এবং দরকার মত জিনিষও নামিয়ে দেয়। প্রত্যেক বার খাবার সময়ের কিছু আগে ডাইনিং কারের লোকেরা জাপানী ভাষায় বিজ্ঞাপন বিলি ক'রে যাচ্ছিল। তবে থার্ড ক্লাসের যাত্রীরা বেশী সেখানে খেতে গেল না দেখলাম। তারা স্বস্থানে ব'সে যা পাচ্ছিল কিনেই খাচ্ছিল। এতে অনেক সস্তা হয়। আমরা একবার ডাইনিং কারে খেতে গেলাম। প্রত্যেক টেবিলে
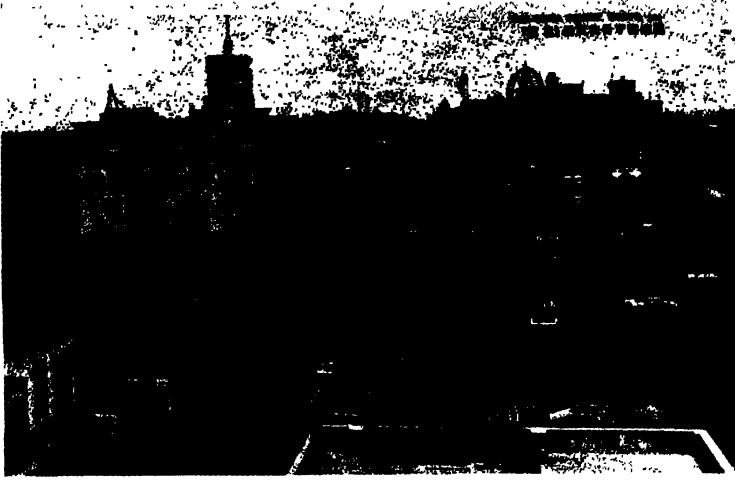
সারি সারি বরফে ঢাকা শাদা পাহাড়, কোথাও গাড়ীর প্রায় গায়ের কাছেই সবুজ পাহাড়ের চূড়ায় সদ্য-পড়া শাদা বরফ, কোথাও সমুদ্র এঁকে বেঁকে জমির ভিতর এসে ঢুকেছে, এমন গোল হয়ে জমি তাকে ঘিরে আছে যে সমুদ্র কি হ্রদ বোঝা যায় না। জলের ধারে ধারে ছবির মত সুন্দর সব বাড়ী, জলের মধ্যে হয়ত একটা পাহাড় জেগে উঠেছে, দূরে নৌকা, জাহাজ ভেসে চলেছে দেখে সমুদ্র ব'লে বোঝা যায়। কোথাও জল এত কাছে যে লাইনের তলা দিয়ে জল দেখা যায়; এখানে সেতুর উপর লাইন। সমুদ্রের ভিতর জমি খোঁচা খোঁচা হয়ে বেরিয়ে আছে, তার উপরেই ঘরবাড়ী, ক্ষেত, বাগান। জলে স্থলে বেশ মেশামিশি, ক্ষেতের উপরের বৃষ্টির জল ও দূর সমুদ্রের জল অনেক জায়গায় মিশে গিয়েছে দেখে মনে হচ্ছে।

এক এক জায়গায় গ্রামে সুতো রং করার কুটিরশিল্প আছে মনে হয়। নানা গ্রামে গোছা গোছা নানা রঙের সুতা দড়িতে শুকোচ্ছে। কোথাও বা অনেক গ্রামে ছবি আঁকা কাগজের ছাতা তৈরী হচ্ছে।

রেল-লাইনের ধারে ধারে অনেক জায়গাতেই গোরস্থান গ্রামের কাছে দেখা যায়। পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ, পাথরের আলো এবং গাছপালা বাগান দিয়ে সাজানো।

গাড়ী যেই একটা ষ্টেশন ছেড়ে যায় অমনি ট্রেনবয়

চার জন বসে। সেখানেও বেশ ভীড়। আমাদের তিন জনের সঙ্গে এক জন জাপানী ভদ্রলোক খেতে বসল। সে পাশ্চাত্য কায়দায় খুব দুরস্ত, কিন্তু ইংরাজী বলে অনেক কষ্টে। আমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি জাপানী পুতুল ভালবাস?" আশেপাশের টেবিলে সুসজ্জিতা আধুনিকা মহিলারা খেতে বসেছিলেন, তাঁদের প্রসাধন খুব বিলাতী ধরণের, লিপষ্টিক, রুজ, পাউডার কিছুর ত্রুটি নেই। তাছাড়া চুল বাঁধা ও চোখ ভুরু আঁকা এমন ক'রে যেন খানিকটা মেমের মত দেখায়। বাস্তবিক আধুনিক সজ্জায় দেখলে মনে হয় জাপানী মেয়েরা অধিকাংশই খুব সুন্দরী। আগে এরা গহনা পরত না, এখন বড় মানুষের মেয়েরা ও স্ত্রীরা হীরার আংটি খুব পরে।

টোকিওর কাছাকাছি এক জন যাত্রী উঠল, সে আমাদের দেখে যেন মহাখুশী! বললে, "তোমরা কলকাতা থেকে আসছ? আমি তোমাদের বোম্বাই, দিল্লী, কলকাতা দেখেছি।" তার পর উঠলেন একজন প্রফেসার, কোন এক শিণ্টো কলেজে পড়ান। তিনি বেশ পরিষ্কার ইংরেজীতে গল্প করতে সুরু করলেন। জাপানীদের এরকম বলতে এক দিনও শুনি নি। তিনি নামবার সময় জিনিষপত্র নামিয়ে দিয়ে আমাদের খুব সাহায্য করলেন।

ষ্টেশনে এসে কাউকে আর দেখতে পাই না। আমরা

বরফে ঢাকা টোকিওর বাড়ী

এসেছি থার্ড ক্লাসে, সকলে আমাদের খুঁজছেন সেকেণ্ড ক্লাসে। শেষে নেমে পড়ে দেখা হ'ল। কয়েক জন দেশের মানুষ ও দুই-এক জন জাপানী বন্ধুর দেখা পেয়ে সকলে নিশ্চিন্ত ও খুশী হলাম।

টোকিও ষ্টেশন, পথঘাট ওসাকার সঙ্গে চাকচিক্যে মোটেই পাল্লা দিতে পারে না। ষ্টেশনটা অনেক কালের মনে হয়। রং-চং কেমন যেন অন্ধকার হয়ে এসেছে। ষ্টেশনের কুলি অর্থাৎ পোর্টাররা কিন্তু এখানেও খুব চট্‌পটে এবং সুসজ্জিত। চামড়ার ফিতায় ক'রে দুটো তিনটা জিনিষ একসঙ্গে বুকে পিঠে ঝুলিয়ে যথাস্থানে নিয়ে চলে গেল। কিছু বলতেও হয় না। কিছু আগ্‌লাতেও হয় না। প্রথম টোকিওতে নেমেই এক দিনের অভিজ্ঞতায় মনে হয় যে টোকিওর তুলনায় ওসাকাতে পাশ্চাত্য জাঁকজমক অনেক বেশী, কিন্তু জাপান দেখতে এলে টোকিওই দেখতে বেশী ভাল লাগে। এখানে জাপানের ছাপ অনেকটা স্পষ্ট।

জাপান-প্রবাসী শ্রীযুক্ত শিশির মজুমদার ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী লীলা মজুমদার আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য ষ্টেশনে এসেছিলেন। জিনিষপত্রের ব্যবস্থা করে দিয়ে তাঁরাই আমাদের ট্যাক্সি ক'রে নিয়ে চল্‌লেন। রাত্রে টোকিও শহর অসংখ্য রঙীন আলোয় দীপান্বিতার উৎসবের মত ঝলমল করছিল। পথের ধারে ধারে অনেকগুলি সদ্য নির্ম্মিত প্রাসাদের মত বাড়ী বাগানের ভিতর নিখুঁৎ করে সাজানো। তাদের স্থাপত্য মন্দিরের ধরণের, তবে অত বড় নয়। শুন্‌লাম এগুলি 'রেস্তোরাঁ' (ভোজনালয়)।

প্রাচীন টোকিও এখন আশেপাশের অনেক শহরতলীকে নিজের এলাকাভুক্ত করে নিয়েছে। 'ওমোরি' সেইরকম একটি জায়গা, এইখানে মজুমদার মহাশয় থাকতেন। তাঁর বাড়ীর কাছেই 'ওমোরি' হোটেল নামের এক হোটেলে তাঁদের সাহায্যে আমরা গিয়ে উঠলাম। মজুমদার মহাশয় সস্ত্রীক আমাদের অনেক আদরযত্ন করলেন এবং যা কিছু প্রয়োজন সবের ব্যবস্থা করে দিলেন। এই হোটেলে আমাদের সকালে ব্রেকফাষ্ট খাবার এবং রাত্রে থাকবার ব্যবস্থা হ'ল। স্নানাদিও এখানে। একখানা খুব মস্ত ঘরে তিন খানা খাট ও বসবার আসবাব, মুখ ধোবার বেসিন কল, পাশে স্নানের ঘর, তাতে মস্ত বড় বাথটব, প্রচুর গরম জল, তোয়ালে সাবান এবং কাপড় রাখবার ও ছাড়বার একটি খুপরি আমরা পেলাম। ঘরটা রাত্রে পাইপ দিয়ে সুন্দর গরম করা হত। সেই পাইপের উপর ভিজা কাপড় রেখে বেশ শুকিয়ে নেওয়া যেত। বিছানাও খুব ভাল, তবে এত নরম যে ঘুম হয় না। হোটেলের টেলিফোনও দু-চার বার আমরা ব্যবহার করেছি। এবং অসুস্থ অবস্থায় কয়েক পেয়ালা দুধ খেয়েছি। এই সবের জন্য পুরা ছয় দিন ও ছয় রাত্রিতে আমাদের দিতে হ'ল ৯১ ইয়েন অর্থাৎ আন্দাজ ৭১৲ কি ৭২৲ টাকা। দুপুরের ও রাত্রের খাবার আমাদের নিজেদের আলাদা খরচ করে খেতে হ'ত। সুতরাং একে সস্তা বলা কিছুতেই যায় না। জাপানের কোন শহরে মাসখানিক থাকতে

হিবিয়া পার্ক। টোকিও

হ'লে নিজেরা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকলে অনেক সস্তা হয়। সেকালের মত জাপানী ঘর নিলে ত খুবই সস্তা হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য ধরণের অ্যাপার্টমেণ্ট নিলেও বেশী পড়ে না। মাসে ৭০।৭৫ ইয়েন দিলে টোকিওর গিঞ্জা অর্থাৎ চৌরঙ্গীতে থাকবার ঘর, টেবিল চেয়ার, খাটবিছানা, রান্নাঘর, গ্যাসের উনান, স্নানের ঘর, বাথটব, গরম জল, বাসনকোশন, টেলিফোন ইত্যাদি সব পাওয়া যায়। একটি ঝি কি চাকর রেখে রান্নাটা নিজেরা করে নেওয়া চলে, অথবা হোটেলে থাকার সময়েও যেমন বাইরে দু-বার খাওয়া সারতে হয়, তেমনি করা যেতে পারে। এক মাসের জন্য এই রকম ঘর নিয়ে যদি পনর-কুড়ি দিন পরেই চলে যেতে হয়, তাহ'লেও সপরিবারে থাকলে ভাল হোটেলের খরচের তুলনায় মোট খরচ অনেক কম হয়।

টোকিও জাপানের রাজধানী। শহরটি একটি বিরাট ব্যাপার, অর্থাৎ একে একটা শহর বলাই ভুল। অনেকগুলি ছোটখাট শহর যেন একসঙ্গে জুটে টোকিও হয়ে উঠেছে। তাই টোকিওর চেহারা বিচিত্র, কোথাও বা আমেরিকান ধরণের আট-দশতলা বাড়ী, চওড়া রাস্তা, সুন্দর আলো, পার্ক, আবার কোথাও গলির পর গলি, এক হাত চওড়া পথ পাহাড় বেয়ে উঠেছে নেমেছে, বর্ষার দিনে চলবার জন্যে তার মাঝখানে এক সারি পাথর ফেলা, বাকিটা কাঁচা। কোথাও মাটির তলায় ড্রেন, আধুনিক সব ব্যবস্থা, কোথাও খোলা প্রকাণ্ড নর্দ্দমা, স্যাঁৎসেঁতে পথ ইত্যাদি। যে সব জায়গায় পথ ভিজে এবং স্যাঁৎসেঁতে সেখানেও কঞ্চির বেড়া দেওয়া দু-ধারের বাড়ীগুলি ছবির মত সাজানো ও পরিষ্কার। নোংরা পথঘাট বড় চোখে পড়ে না, তবে চক্ষুপীড়াদায়ক কিছুই যে কোথাও নেই তা নয়।

টোকিও আগে পনরটি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল, এখন তার সঙ্গে আরও কুড়িটি যোগ দিয়ে হয়েছে পঁয়ত্রিশটি। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তার লোকসংখ্যা ছিল ৫,৪৩২,০০০। পৃথিবীর মধ্যে লণ্ডন ও নিউইয়র্ক এই দুইটি মাত্র শহরে এর চেয়ে বেশী লোক আছে, বার্লিনের লোকসংখ্যা টোকিওর চেয়ে কম।

তিন শত বৎসর ধ'রে জাপানী প্রাচ্য সভ্যতার আদর্শ নিয়ে টোকিও গঠিত। তার পর গত ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর ধরে সম্রাট মেজির চেষ্টায় টোকিওতে পাশ্চাত্য সভ্যতার ছাপ পড়েছে। এই দুই সভ্যতার ধারাই টোকিওতে পাশাপাশি চলেছে। সুতরাং একে পাশ্চাত্য শহর বলব কি প্রাচ্য শহর বলব তা ঠিক করা যায় না। প্রাচ্যের সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য এবং পাশ্চাত্যের সুবিধাবাদ ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা দুই এখানে দেখতে পাওয়া যায়।

তবে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের বিরাট অগ্নিকাণ্ড ও ভূমিকম্পের পর সাত বৎসরের কঠিন পরিশ্রম ও ত্যাগের সাহায্যে লুপ্তপ্রায় টোকিও শহরকে যখন আবার গড়ে তোলা হয়, তখন টোকিওর প্রাচীন পাড়া, পথ, উদ্যান, দোকান বাজার সবই যথাযথ স্থানে রাখবার চেষ্টা যথাসাধ্য করা হয়েছে। সেই জন্য এই নূতন টোকিও চেহারাতে তেমন নূতন হয়ে ওঠে নি। একে একটু ভাল করে দেখলেই বোঝা যায় শহরটি পুরনো। এর এক এক পাড়া এক এক রকম। কতক পাহাড়ের উপর কতক বা সমতল ভূমিতে। আমরা যে 'ওমোরি'তে থাকতাম সেটি পাহাড়ের উপর। প্রাত্যহিক ভ্রমণের পর ওমোরি ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে আমরা সিঁড়ি দিয়ে আমাদের পাড়ায় উঠতাম। মোটরে আসতে হ'লে ঘুরে অন্য পথ দিয়ে আসতে হয়। 'ওমোরি'র পাড়াতে পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে দেখেছি সুদীর্ঘ সরু সরু গলির মত পথ উঠে নেমে অনেক দূর গিয়েছে, তার দুই পাশেই কঞ্চি ও

কাঠের ঘরবাড়ী। আবার 'গিঞ্জা'তে প্রশস্ত সমতল আধুনিক রাজপথের ধারে ব্যাঙ্ক, দোকান, আপিস প্রভৃতির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাশ্চাত্য ধরণের বাড়ী। তাতে লিফ্‌ট, চলন্ত দরজা ইত্যাদি কিছুরই অভাব নেই। আমি টোকিও শহরে কুড়ি দিন থেকেছি, তার ভিতর পাঁচ-ছয় দিন অত্যন্ত অসুস্থতার জন্য ঘর থেকে বাইরে যেতে পারি নি। বাকি চৌদ্দ দিনই প্রত্যহ ট্রেনে ও ট্যাক্সিতে নানা জায়গায় বেড়িয়েছি, কিন্তু তাতেও টোকিও আমার কিছুই দেখা হয় নি মনে হয়। অল্প দিনে টোকিও ভাল করে দেখা শক্ত, তাছাড়া অসুস্থ শরীরে এবং অন্যান্য অসুবিধার মধ্যে দেখা ত প্রায় অসম্ভব।

ওমোরি হোটেলে রাত কাটিয়ে সকাল বেলা উঠে মনে হ'ল না যে কোবের চেয়ে এখানে বেশী শীত, অথচ সেখান থেকে এবং জাহাজেও বরাবরই তাই শুনে এসেছি। হাত মুখ ধুয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে খাবার ঘরে যাবার পথেই চোখে পড়ল হোটেলের সমস্ত উঠান জুড়ে যেন চুণ ছড়ানো। বুঝলাম রাত্রে বরফ পড়েছে, কিন্তু আমাদের ঘর গরম করা ছিল বলে আমরা টের পাই নি। বারাণ্ডা বেশ কনকনে ঠাণ্ডা। খাবার ঘরে ঢুকে একটু আরাম হ'ল। সেখানে ইউরোপীয় পোষাকপরা জাপানী 'ওয়েট্রেস' সযত্নে পরিবেশন করল, কিন্তু কথা 'গুডমর্ণিং'-এর বেশী প্রায় বলতে পারে না। জানলা দিয়ে দেখলাম বাইরে গাছপালায় সবুজ পাতা, কিন্তু একটিও ফুল নেই, পথের ওধারে জাপানী বাড়ীতে কাঠের মেঝেয় জাপানী ঝি মাথায় সাদা ঝাড়ন বেঁধে হাঁটু গেড়ে বসে ভিজে কাপড় দিয়ে ঘর মুচছে। কাপড়ে জল লাগলেও বোধ হয় জাপানী মেয়েরা মেজেতে হাঁটু গেড়ে ছাড়া বসে না।

খেয়ে দেয়ে ফিরে এসে দেখলাম দিনের বেলা রাত্রের চেয়ে ঘর অনেক ঠাণ্ডা, একেবারে কন্‌কন করছে। এখন আর "হিটার" কাজ করছে না। দুপুরবেলা মজুমদার-গৃহিণী তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে যত্ন ক'রে মাছের ঝোল ভাত ও দিশী তরকারি খাওয়ালেন। তাঁর বাড়ীটি ঠিক খাটি জাপানীর বাড়ীর মতই। তেমনই মেঝেতে মাদুরের গদি, ঘরের দেয়াল কাগজের আর তেমনই বাইরের জুতো ঘরে ঢোকা নিষিদ্ধ। বাড়ীতে অনেক জোড়া চটি থাকে,
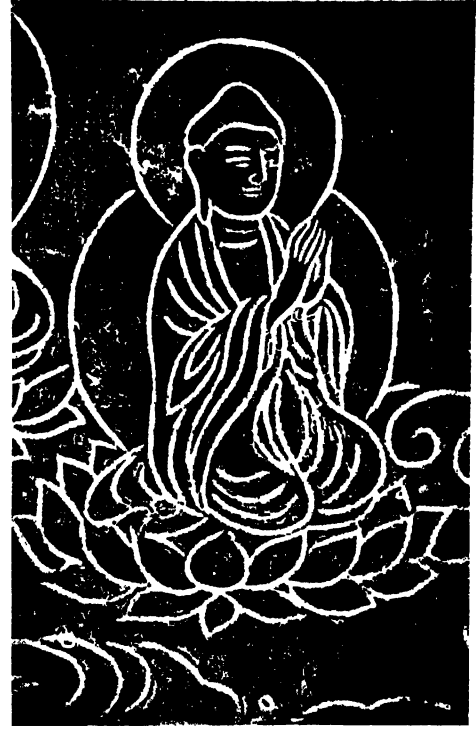
কিয়োটো মন্দিরের রেখাঙ্কন

বাড়ীর লোক বাইরের লোক যে যখন বাড়ীতে ঢোকে বাইরে জুতা খুলে রেখে ঘরের চটি পায়ে দিয়ে ঘরে ঢোকে। বাড়ীতে লোক এলেই জাপানী প্রথায় ঝি ছুটে এসে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর জুতা খুলে দিয়ে পায়ে চটি পরিয়ে অভ্যর্থনা করে। ঘরের লোককেও প্রত্যহ প্রত্যেক বার এমনি করে, আবার বাইরের লোককেও এমনি করে। বাহিরে যাবার সময় প্রতিবার বলে 'ভালয় ভালয় ফিরে আসুন।'

মিসেস মজুমদারের বাড়ীতে ঘর গরম করবার জন্যে বসবার ঘরে লোহার চিম্‌নী দেওয়া একটি ষ্টোভ ছিল। তিনটি চারটি বিড়াল-ছানা সারাক্ষণ সেটি ঘিরে ব'সে থাকত। খাবার ঘরে ছিল খাটি জাপানী প্রথায় 'হিবাচী'তে কাঠ কয়লায় আগুন। হিবাচীগুলি দেখ্‌তে ভারি সুন্দর।

৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১১ই পর্য্যন্ত আমি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ি। এই সময় মজুমদার-গৃহিণী আমার খুব

সেবাযত্ন করেছেন, ঠিক নিজের বোনের মত। আমি যে এত দূরদেশে হোটেলে শুয়ে আছি তা তাঁর হাসি-গল্পে ও যত্নে একদিনের জন্যও মনে হয় নি। তিনি প্রথম দিন থেকেই একজন বিচক্ষণ জাপানী চিকিৎসককে আমার চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন। ডাক্তার দিনে ২।৩ বার আস্‌তেন, ওষুধ ইনজেক্‌সেন্‌ যখন যা দরকার সব নিজেই এনে দিতেন। এমন ভাবে তিনি হেসে প্রতিবার সামনে এসে দাঁড়াতেন ও আমাকে দেখ্‌তেন যে মনে হ'ত যেন তিনিও আমাদের কত দিনের পরিচিত বন্ধু। আমাদের দেশে নামজাদা ডাক্তাররা অনেকে যে-রকম গুরুগম্ভীর মুখ ক'রে রোগীর প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি করেন ইনি সেরকম কোন দিন করেন নি। সবচেয়ে বিস্মিত হলাম আমি ডাক্তারের বিল দেখে। আমাকে ছয় সাত বার দেখে যাওয়া, চারটা ইনজেকশন্‌ দেওয়া এবং কয়েক রকম খাবার ওষুধ দেওয়া সব কিছুর জন্য তিনি নিলেন মাত্র ১৬ ইয়েন অর্থাৎ বড় জোর ১৩৲ টাকা। শুন্‌লাম ইনি জার্ম্মানী-ফেরত বিখ্যাত চিকিৎসক এবং এঁর নিজেরই দুই-তিনটা হাসপাতাল আছে। আমাদের দেশে একজন বিদেশী রোগী ডাক্তার ডাকলে ডাক্তার ত একবারেই ১৬৲টাকা ভিজিট নেবেন, তারপর ওষুধ-বিষুধ সবই স্বতন্ত্র। জাপানী ডাক্তারটি মজুমদার-দম্পতির পুরানো বন্ধু বলে অর্দ্ধেক ফি নিয়েছিলেন অর্থাৎ পুরা নিলে সবসুদ্ধ ২৬৲ টাকা নিতেন। আমাদের দরিদ্র দেশে ডাক্তাররা যদি এই রকম সস্তায় চিকিৎসা-প্রথা চালাতেন তাহলে দেশে এত মানুষ বিনা চিকিৎসায় অকালে প্রাণ হারাত না মনে হয়।

হোটেলে চার দিন আমি একেবারে ঘরে বন্ধ ছিলাম। দিনে শীতে প্রাণ বেরিয়ে আস্‌ত। মজুমদার-গৃহিণী একটা বৈদ্যুতিক 'হিটার' চেয়ে দিয়ে খানিকটা সুবিধা করে দিলেন। কিন্তু অষ্টপ্রহর ত তিনি আমাকে আগলে থাকতে পারতেন না। তাঁর নিজের ঘরসংসার ছিল, তাছাড়া আমার মেয়ে দু-বেলা তাঁর বাড়ীতে খেতে যেত। সেই সময় ঘরে আমি একলাই থাকতাম। ডাক্তার বলেছিলেন এত শীতের দেশে আমি যদি উপবাস করি তাহলে শক্ত অসুখ হ'তে পারে, সুতরাং আমার রোজ সকাল দুপুরে দুধ খাওয়া দরকার।

দুপুর বেলা একদিন ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। বিছানা ছেড়ে ঘরের বাইরে যাওয়া বারণ, ঘণ্টা টিপে হোটেলের ভৃত্যকে ডাকলাম। ভৃত্য এসে দাঁড়াল। শুনেছিলাম সে ইংরাজী বোঝে। বললাম "আমাকে এক পেয়ালা গরম দুধ এনে দাও।" কিছুই বুঝতে পারল না। অগত্যা ইসারা করে দেখালাম—চুমুক দিয়ে খাবার জিনিষ এনে দাও। সে তাড়াতাড়ি একটা মিক্‌শ্চার নিয়ে এল। বললাম, "ওটা নয়, মিল্‌ক্‌।" বেরিয়ে গিয়ে এক বোতল জল নিয়ে এল। বানান ক'রে বললাম, 'মি-ল-ক।' সে ছুটে গিয়ে এক বোতল বিয়ার এনে হাজির। অগত্যা হতাশ হয়ে নিজেই বিছানা ছেড়ে কাগজ কলম এনে ম্যানেজারকে চিঠি লিখলাম, 'অনুগ্রহ ক'রে আমাকে এক পেয়ালা গরম দুধ পাঠাবেন।' অবশেষে এক পেয়ালা দুধ পাওয়া গেল।

জাপানী ডাক্তারটি ইংরাজী বলতে ও বুঝতে বিশেষ পারতেন না। কিন্তু তবু তারই মধ্যে ভদ্রতা করবার চেষ্টা করতেন। এক দিন আমাকে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বললেন, "ইয়োর ডটার বিউটিফুল"। ১১ই ফেব্রুয়ারী আমার শরীর একটু ভাল হলে মজুমদার মহাশয়দের বাড়ী একবার গেলাম। ১২ই থেকে হোটেল ছেড়ে সেখানেই আমাদের থাক্‌বার কথা; কারণ ১২ই আমার স্বামীর হনলুলু চলে যাবার দিন। ফেব্রুয়ারী মাসের বাকি দিন ক'টা তাই আমরা মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতেই ঘর নিয়ে থাক্‌ব।

দুপুরে এক মুসলমান-দম্পতির সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁরা কয়েক বৎসর ব্যবসায় উপলক্ষ্যে জাপানেই আছেন। খুব মিশুক দুজনেই। বিদেশে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রভেদ বিশেষ বোঝা যায় না এটা একটা লক্ষ্য করবার জিনিষ। নাম ব'লে না-দিলে তাঁরা যে মুসলমান তা হয়ত বুঝতেই পারতাম না। জাপানীদের সৌন্দর্য্যবোধের খুব প্রশংসা করলেন, বল্লেন, "প্রত্যেক জাপানীই শিল্পী।"

আমরা ভারতীয় পি. ই. এন. ক্লাবের সভ্য এবং আমার স্বামী বাংলায় তার প্রথম সেক্রেটারী ছিলেন বলে সেদিন সন্ধ্যায় জাপানের পি. ই. এন. আমাদের ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন। বিকালে ভারতীয় ছাত্রেরাও আমাদের জন্য একটা সভা ডেকেছিল, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্যে দেশের লোকের নিমন্ত্রণটা আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে হল। ঠিক করলাম ডিনারের কিছু আগে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব। আমার স্বামী ভারতীয় ছাত্রদের নিমন্ত্রণে আগেই বেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন, সুতরাং আমার সঙ্গে যাবার কোন লোক ছিল না। মজুমদার-গৃহিণী বল্লেন, "ওর জন্যে আপনাকে অত ভাবতে হবে না; আপনি একলাই যেতে পারবেন।"

আমি বল্লাম, "কি করে যাব? আমি পথঘাট চিনি না, জাপানী ভাষা জানি না, ট্যাক্সি-ড্রাইভারও আমার কোন কথা বুঝবে না, তার উপর এদেশে পথে কোথাও একটা ইংরেজী অক্ষর পর্য্যন্ত সহজে চোখে পড়ে না।"

তিনি বললেন, "হোটেল থেকে আপনার গাড়ী ঠিক করে দেওয়া হবে। এদেশের ট্যাক্সিওয়ালারা খুব সৎ, আপনাকে একটা কথা বলতে হবে না, ও আপনাকে ঠিক পৌছে দেবে।"

ম্যানেজার গাড়ী ডাকিয়ে সব ঠিক করে দিলেন। ঠিকানার জন্য আমার নিমন্ত্রণের চিঠিটা ড্রাইভারের হাতে দেওয়া হল। স্থানটা সে নিজেও ঠিক জানে না। একেবারে অজানা দেশে অজানা পথে নীরবে চললাম। তাকে কিছু বলবারও উপায় নেই। কিন্তু ভয় করল না। ড্রাইভার চিঠি হাতে করে মাঝে মাঝে নিজেই নামছিল, চার ধারে দেখছিল, পুলিশকে জিজ্ঞাসা করছিল আবার মোড় ফেরাচ্ছিল। এমনি করে A1. Restaurant-তে এসে পৌছানো গেল। গাড়ীর দরজা খুলে দিতেই এক জন জাপানী ভদ্রলোক ছুটে এলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এখানে কি পি. ই. এন. ক্লাবের ডিনার হচ্ছে?" তিনি বললেন, "হাঁ।" তখন ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে চলে গেল। তাকে ভাড়াও দিলাম না, কারণ কত দিতে হবে ম্যানেজার আমায় বলে দেন নি।

একটি সুদৃশ্য সুসজ্জিত ঘরে সভ্যরা সব বসে আছেন। সকলেই পুরুষ, কেবল একটি মাত্র মহিলা। মহিলা সভ্য আরও আছেন, কিন্তু সেদিন আসতে পারেন নি। আমি এসেছি শুনে এই অনুপস্থিত মহিলা সভ্যাটি (কবি) আমার জন্যে একটা এক হাত লম্বা টুকটুকে লাল বাক্সে চকোলেট পাঠিয়েছেন।

আমি যেতেই আমার জন্যে চিনি ও দুধ বর্জ্জিত এক পেয়ালা সবুজ চা দেওয়া হল। এই দিয়ে অতিথিকে অভ্যর্থনা করতে হয়। সভ্যরা কয়েকজন ইউরোপীয় পোষাক পরেছেন, কয়েক জন জাপানী কালো রেশমের কিমোনো পরেছেন। দুই-এক জনের চেহারা বেশ আর্য্যজনোচিত। তাঁরা ফরাসী ভাষা অনেকে বলতে পারেন, ইংরাজী বলতে কবি নোগুচি ভালই পারেন, আর দুই-এক জন অল্পস্বল্প পারেন। এক জন কবি

Sincerely yours
Yone Noguchi

জাপানে চা পান উৎসব

ঔপন্যাসিক তোসন সিমাজাকি

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি ফারসী ভাষা বলেন ?" আমি বলতে পারি না শুনে তিনি ভাঙা ভাঙা ইংরেজীই সুরু করলেন। ওঁদের দেশের ফুলের অনেক গল্প করলেন। আমি বললাম, "আপনাদের ফুলের দেশে একটাও ত ফুল দেখতে পেলাম না।" তিনি খুব হাসলেন। আমাদের দেশের পদ্মফুলের প্রশংসা করলেন।

কবি নোগুচির একটি ছোট মেয়ের কয়েকদিন আগে মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু তবু তিনি এসেছিলেন।

খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আর একটা ঘরে ডিনারের জন্য সকলে গেলাম। সেখানে পি. ই. এন. ক্লাবের সভাপতি সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও কবি তোসন সিমাজাকির পাশে আমাকে বসতে দেওয়া হল। আমার আর এক পাশে মিসেস সিমাজাকি বসেছিলেন। সিমাজাকি বৃদ্ধ হয়েছেন, ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে প্যারিসে ছিলেন, ১৯৩৬ সালে সস্ত্রীক দক্ষিণ আমেরিকায় পি. ই. এন. কংগ্রেসের অধিবেশনে গিয়েছিলেন। এঁর প্রথমা পত্নী ও ছেলেমেয়েরা কেউ জীবিত নেই। জীবনে ইনি বহু দুঃখ-সংগ্রামের ভিতর দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু বেশ সহাস্য প্রসন্ন মূর্ত্তি। এঁর দ্বিতীয়া পত্নীর বয়স খুবই কম মনে হয়, সম্ভবতঃ ৩০।৩৫ এর মধ্যে। মিসেস সিমাজাকি খুব নম্র ও শান্ত দেখ্‌তে, কথা কম বলেন। তিনি ইউরোপীয় পোষাক পরে এসেছিলেন। আমার খোঁপা বাঁধা দেখে তোসন সিমাজাকি নিজের স্ত্রীকে ঠাট্টা করে বল্‌লেন, "এঁর খুব সুন্দর বড় চুল ছিল, উনি আধুনিকতার হাওয়ায় পড়ে কেটে ছোট করে দিয়েছেন।" তাঁর স্ত্রী সলজ্জভাবে হাস্‌লেন, কোন প্রতিবাদ করলেন না।

আমি অসুস্থ ছিলাম বলে ডিনারের টেবিলে বস্‌লেও খাবার প্রায় কিছুই খাই নি। তোসন সিমাজাকি মনে করলেন আমি নিরামিষাশী বলে খাচ্ছি না। তিনি ও তাঁর স্ত্রী সব বড় বড় ফল গুলি আমার সাম্‌নে এনে জড় করলেন এবং পাতে তুলে দিতে লাগ্‌লেন। আমি না খাওয়াতে তাঁর স্ত্রীও ভদ্রতা করে প্রায় আমারই মত স্বল্পাহার করলেন।

সিমাজাকি ফরাসী ভাষা বল্‌তে পারেন। স্ত্রী কাজ চালানো মত ইংরাজী বলেন। খাওয়া শেষ হ'লে বক্তৃতার পালা সুরু হ'ল। তোসন সিমাজাকি জাপানী ভাষায় বললেন। তিনি ও সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর আরিসিমা দক্ষিণ আমেরিকার পি. ই. এন. কংগ্রেসে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, "আমরা যখন ডাক্তার নাগের সঙ্গে এক জাহাজে দক্ষিণ আমেরিকা যাই, তখন থেকে আমাদের পরিচয়, তখন আমরা কতদিন এক জাহাজে ব'সে জাপান ও ভারতবর্ষ বিষয়ে আলোচনা করেছি। যখন আমি ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে পি. ই. এন. কংগ্রেসকে আমাদের টোকিও শহরে অধিবেশন করবার জন্যে নিমন্ত্রণ করি তখন ডাক্তার নাগ আমার সহায়তা করেন।

আজকে ভারতীয় পি. ই. এন. ক্লাবের এই দুই জন সভ্যকে আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করছি এবং আশা করছি ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁরা অন্যান্য ভারতীয় সভ্যদের নিয়ে এখানে আসবেন।"

"জাপান টাইম্‌স্‌ এণ্ড মেল" পত্রের সম্পাদক সিমাজাকির এবং অন্যান্য জাপানী সভ্যের বক্তৃতা ইংরাজীতে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। "ইয়োমুরি" নামক প্রসিদ্ধ জাপানী পত্রিকার সম্পাদকও সভাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেখানে ফ্ল্যাশলাইটের সাহায্যে ছবি তোলবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

কবি ইয়োন নোগুচি তার পর ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। তিনি যখন ভারতবর্ষে আসেন এবং তারও আগে যখন রবীন্দ্রনাথ কয়েকজন বিখ্যাত বাঙালীকে নিয়ে জাপানে যান সেই সব দিনের কথা নোগুচি স্মরণ করে তাঁর কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ জানালেন। কবি নোগুচিকে কলিকাতায় অনেকে দেখেছেন। ইনি ইংরাজীতেও কবিতা লেখেন।

ডাঃ নাগের উত্তরের পর সভা ভঙ্গ হল। বিদায়ের পূর্ব্বে আর একবার সকলকে সবুজ চা দেওয়া হ'ল। উপস্থিত সকলের সই একটা কার্ডে নিলাম। তোসন সিমাজাকি মহাশয় আমাকে টোকিও শহরের ছবির কতকগুলি কার্ড উপহার দিলেন। ফিরবার সময় প্রাচ্য প্রথায় তাঁরা আমার ট্যাক্সিওয়ালাকে গাড়ীভাড়াও দিয়ে দিলেন। ক্রমশঃ

বঙ্কিমচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে,
সুপ্তিশয্যাপার্শ্বে দীপ বাতাসে নিভিছে বারে বারে।
কালের নির্ম্মম বেগ স্থবির কীর্তিরে চলে নাশি',
নিশ্চলের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন কোথায় যায় ভাসি'।
যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়
সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।
তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি উঠিছে প্রার্থনা
ভাগ্যের যা মুষ্টিভিক্ষা নহে, নহে জীর্ণ শস্যকণা
অঙ্কুর ওঠে না যার, দিনান্তের অবজ্ঞার দান
আরম্ভেই যার অবসান।

সে প্রার্থনা পূরায়েছ, হে বঙ্কিম, কালের যে বর
এনেছ আপন হাতে নহে তাহা নির্জীব স্থাবর।
নবযুগসাহিত্যের উৎস উঠি' মন্ত্রস্পর্শে তব
চিরচলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব
এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলিতেছে সম্মুখের টানে
নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎ পানে।
তাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গ কল্লোলে,
বঙ্কিম, তোমার নাম, তব কীর্তি সেই স্রোতে দোলে।
বঙ্গভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গণি,
তাই তব করি জয়ধ্বনি।*

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বঙ্কিম-জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে ১০ই আষাঢ় ১৩৪৫ তারিখে পঠিত।

ডাহুকের লুকোচুরি

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আমাদের দেশের এঁদো পুকুর বা অন্যান্য জলাভূমির আশেপাশে ঝোপঝাড়ে ডাক পাখী বা ডাহুক হয়ত অনেকেরই নজরে পড়িয়া থাকিবে। পরিণতবয়স্ক ডাহুকের আকৃতি কতকটা মাঝারি আকারের পায়রার মত; কিন্তু গলা ও পা দুটি লম্বা, দেখিতে বেশ সুশ্রী; মস্তক ও গলার নিম্নভাগ এবং বুক ধবধবে সাদা পালকে আবৃত। মস্তকের ঊর্দ্ধভাগ হইতে শরীরের বাকী অংশ

ডাহুকী ডিমে তা' দিতেছে

সমস্তই কালো। অন্যান্য সাধারণ পাখীদের মত ইহাদের ঠোঁট মাঝারি-গোছের লম্বা ও সূচালো। ঠিক মুখের কাছে ঠোঁটের উপরিভাগে একটু লাল রঙের আভা আছে—এই লাল আভাটুকু থাকায় ডাহুকের সৌন্দর্য্য যেন অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। লেজের পালকগুলি দুই কি আড়াই ইঞ্চির বেশী লম্বা হইবে না এবং তাহাতে পালকের সংখ্যাও খুব কম; কিন্তু ছোট হইলেও ইহাদের লেজের নৃত্যভঙ্গী এই জাতীয় পাখীর বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। হাঁটিবার সময় প্রত্যেক পদক্ষেপে ইহারা গলা ও লেজ যুগপৎ উঁচু করিয়া তোলে কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই আবার নামাইয়া লয় এবং প্রত্যেক বারে 'টুক্' করিয়া একটি শব্দ করে। ইহাই ডাহুকের স্বাভাবিক হাঁটিবার ভঙ্গী। দেখিয়া মনে হয় যেন স্প্রিঙের জোরে গলা ও লেজটা হঠাৎ খাড়া হইয়া উঠিয়াই আবার ধপ্ করিয়া পড়িয়া গেল।

ডাহুক বড়ই চঞ্চলপ্রকৃতি এবং সর্ব্বদাই অতিমাত্রায় সতর্ক থাকে। কখনও দু-দণ্ড এক স্থানে স্থির ভাবে থাকিতে পারে না। ঝোপের বাহিরে কোন পরিষ্কার স্থানে ক্ষণেকের জন্য ইহাদিগকে কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই বেমালুম অদৃশ্য হইয়া যায়; এই আছে এই নাই. সর্ব্বদাই যেন লুকোচুরি খেলিয়া বেড়ায়। অনেক সময় আহারান্বেষণে লোকালয়ের অতি নিকটে পরিষ্কার জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু কাহারও নজর পড়িবা-মাত্র আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না—যেন চক্ষের পলকে কোথায় মিলাইয়া যায়। অথচ ইহারা যে খুব ছুটাছুটি করিয়া পলায়ন করে তাহাও নয়; অতি সন্তর্পণে এক পা দুই পা করিয়া, ঝোপের ভিতর ঢুকিয়া আত্মগোপন করে। ডাহুকেরা জলজ ঘাসপাতায় সমাচ্ছন্ন এঁদো পুকুরে বা ঐরূপ কোন অপ্রশস্ত জলাশয়ের উপরেই সারাদিন আহারান্বেষণে ব্যাপৃত থাকে। শান্ত ও ভীরু স্বভাব বশতঃ ইহারা পারতপক্ষে লোকালয়ের কাছে ঘেঁষিতে চাহে না। এরূপ অপ্রশস্ত জলাশয়ের উপর বাস করিবার সুবিধা এই যে শত্রুর আগমন টের পাইবা মাত্রই ইহারা মুহূর্ত্তের মধ্যেই ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকিয়া আত্মগোপন করিতে সমর্থ হয়। গলা ও বুকের দিক ধব্‌ধবে সাদা হওয়ায় স্বভাবতই দূর হইতে ইহাদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; কিন্তু ঝোপের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া ইহারা ডালপালার মধ্যে এমন ভাবে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া থাকে যে কিছুতেই আর নজরে পড়ে না, লতাপাতার সঙ্গে যেন এক হইয়া মিশিয়া থাকে। কাজেই একবার দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে পারিলে ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য। এজন্য ডাহুক-শিকারীরা অনেক কৌশল করিয়া ফাঁদ পাতিয়া ইহাদিগকে ধরিয়া থাকে। খাঁচার মধ্যে পোষা ডাহুক রাখিয়া ইহাদের বিচরণ-ভূমির নিকটেই ফাঁদ পাতিয়া রাখে এবং শিকারীরা নিকটেই লুকাইয়া থাকে। পোষা ডাহুকটি 'টুক' 'টুক' করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেই বন্য ডাহুক খুব সন্তর্পণে আস্তে আস্তে খাঁচার নিকটে আসিয়া ফাঁদে জড়াইয়া ধরা পড়িয়া যায়।

অনেক শিকারী আবার ডাহুকের কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া 'টুক' 'টুক' শব্দ করিতে থাকে। সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া ডাহুকেরা আসিয়া ফাঁদে পা দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডাহুকের বাচ্চারা তাহাদের মায়ের ডাক মনে করিয়া ভুল করে এবং লুক্কায়িত স্থান হইতে বাহিরে আসিয়া শিকারীর হাতে ধরা পড়িয়া যায়। ধরা পড়িলে কখনও কখনও ইহারা মৃতের মত ভান করে, মৃত মনে করিয়া ফেলিয়া রাখিলেই সুযোগ বুঝিয়া উঠিয়া চম্পট দেয়।

ইহারা সারা দিন আহারান্বেষণে ব্যাপৃত থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণেই রাত্রির মত ঝোপের মধ্যে আশ্রয় লয় এবং সন্ধ্যার ঠিক পরক্ষণেই দল বাঁধিয়া ঐকতান সুরু করিয়া দেয়,—অদ্ভুত

ডাহুক বিশল্যকরণীর বীজ খাইবার উদ্যোগ করিতেছে

ডাহুক প্রসাধনে রত

তাহাদের ডাক। প্রথমে একটা ডাহুক 'কোর্-কোর্-কোর্-কোয়ার-কোয়ার' শব্দে ডাক আরম্ভ করে, তার পরে সকলেই একসঙ্গে উঁচু গলায় সুর মিলাইতে থাকে। সুর ক্রমশ: নিম্ন হইতে উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। প্রায় আধ ঘণ্টা বা আরও কিছু বেশী সময় এরূপ চলিবার পর ধীরে ধীরে সকলেই গান বন্ধ করে। আবার ভোর হইবার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই ঐরূপ ঐকতান চলিতে থাকে। রাত্রিতেও প্রহরে প্রহরে খুব অল্প সময়ের জন্য এইরূপ ঐকতান চলে। কিন্তু বিশ্রামের সময় ছাড়া অন্য সময়ে সর্ব্বদাই কেবল 'টক্' 'টক্' শব্দ করে।

ছোট ছোট টোপাপানায় আবৃত পুকুরের উপর ইহারা অনায়াসে হাঁটিয়া বেড়ায়, কখনও ডুবিয়া যায় না। এক একটা পানা ইহাদের শরীরের ভরে ডুবিয়া যাইতে না-যাইতেই ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হয়। জলপিপি প্রভৃতি অন্যান্য জলচারী পাখীদের মত অতি দ্রুত গতিতে ইহারা জলের উপরে ভাসমান পদ্মপত্রের উপর দিয়া অবলীলাক্রমে হাঁটিয়া বেড়ায়। ডাহুকেরা সময়ে সময়ে আবার হাঁসের মত সাঁতার কাটিয়াও থাকে। ইহারা বেশী দূর উড়িতে পারে না, অনেক সময় শত্রুর তাড়া খাইয়া খানিক দূর উড়িয়া গিয়া ঝোপঝাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

ডাহুক বাসা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে না। ঝোপের মধ্যে ডালপালার উপর বসিয়া বসিয়াই রাত কাটায়, কিন্তু ডিম পাড়িবার সময় হইলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া শুক পাতা সংগ্রহ করিয়া বাসা-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়। বাসা-নির্ম্মাণে কোন কৌশলেরই পরিচয় পাওয়া যায় না। কেবল পাতার পর পাতা বিছাইয়া এমন ভাবে সমতল করিয়া খানিকটা জায়গা তৈরি করে যে দেখিয়া কিছুতেই পাখীর বাসা বলিয়া মনে হয় না। কতকগুলি পাতা চেপ্টাভাবে স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখে মাত্র, সর্ব্বত্র সমতল। ধারগুলি কোথাও একটু উঁচু নহে, অন্যান্য পাখীর বাসায় যেমন বাটীর মত গর্ত্ত থাকে, ইহাদের বাসায় সেরূপ কিছুই নাই। এইরূপ সমতল বাসার উপরেই ডাহুকী সাত-আটটি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি সাধারণতঃ ঈষৎ লালচে, গায়ে খয়েরী রঙের ছিট। আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপ সমতল স্থানে থাকা সত্ত্বেও ডিমগুলি গড়াইয়া নীচে পড়িয়া যায় না। কিছু দিন পরে ডিম ফুটিয়া কুচকুচে কালো ভেলভেটের বলের মত বাচ্চা বাহির হয়। পরিণতবয়স্ক ডাহুকের গায়ের রং বা চেহারার সহিত বাচ্চাগুলির কোনই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। কিছু দিন বাসায় থাকিয়া মুরগীর বাচ্চার মত তাহারা মায়ের পিছু পিছু অধিকাংশ সময়ই জলে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায় এবং অনবরত চিক্ চিক্ শব্দ করিতে থাকে। বাচ্চাগুলি যেন মায়ের চেয়েও বেশী সতর্ক; ডাহুককে তবুও কিছুক্ষণের জন্য এখানে-সেখানে আহারান্বেষণে ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু বাচ্চাগুলি কোন শব্দ শুনিলেই চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হইয়া পড়ে, এক স্থানে সকলে মিলিয়া চুপ করিয়া লুকাইয়া থাকে। বিপদের আশঙ্কা দূর হইয়া গেলেই মা আবার 'টক্' 'টক্' করিয়া ডাকিতে

ডাহুকের বাসা ও ডিম। দুটি ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইয়াছে। বাকীগুলা শীঘ্রই ফুটিবে।

থাকে; তাহারাও তখন বাহির হইয়া মায়ের সঙ্গে মিলিত হয়।

গল্প শোনা যায় যে, উটপাখীরা নাকি শিকারীর তাড়া খাইয়া প্রথমে আঁকাবাঁকা ভাবে ছুটিতে থাকে; কিন্তু ছুটিতে ছুটিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে অবশেষে এক স্থানে বালির ভিতর মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া থাকে। তখন ইহারা যেমন অন্যকে দেখিতে পায় না, অন্যেও হয়ত তাহাদিগকে সেরূপ দেখিতে পাইবে না মনে করিয়াই নাকি তাহারা ঐরূপ করিয়া থাকে। হরিণের সম্বন্ধেও এরূপ গল্প শোনা যায়। কাকের খাবার লুকাইয়া রাখিবার সম্বন্ধেও আমাদের দেশে এরূপ গল্প শোনা যায়। এসব কথা সত্য হউক বা না-হউক, ডাহুকের বাচ্চারা কিন্তু শত্রুর কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার অন্য কোন উপায় না দেখিলে ঐরূপ অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। শত্রুর তাড়া খাইয়া ছুটিতে ছুটিতে হয়রান হইয়া পড়িলে ডাহুকের বাচ্চাগুলি উপায়ান্তর না দেখিয়া জলের নীচে মুখ ডুবাইয়া চুপ করিয়া ভাসিতে থাকে। এ অবস্থায় শিকারীরা অনায়াসেই উহাদিগকে ধরিয়া ফেলে।

সাধারণতঃ ইহারা ছোট ছোট পোকামাকড় খাইয়া প্রাণধারণ করে। ময়লা বা আবর্জ্জনার মধ্যে যে-সব পোকা জন্মে সেগুলিকে ইহারা খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইয়া থাকে। নানা প্রকার শস্যকণিকাও ইহারা খাইয়া থাকে; এজন্য সময়ে সময়ে লোকালয়ের আশেপাশেও ইহাদিগকে বিচরণ করিতে দেখা যায়। ছোট ছোট মাছও ইহাদের প্রিয় খাদ্য। মাছ খাইবার লোভে অনেক সময় ইহারা জিয়ল বঁড়শীতে আটকা পড়িয়া প্রাণ হারায়, স্যাঁৎসেঁতে ভূমিতে বিশল্যকরণী-জাতীয় দুই হাত আড়াই হাত লম্বা এক প্রকার বন্য উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়, গাছের ডগায় ধানের ছড়ার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ ধরে। ডাহুকেরা এই বীজ খাইতে ভালবাসে। ভূমি হইতে একটু উঁচু বলিয়া তাহারা লাফাইয়া লাফাইয়া এই বীজ ছিঁড়িয়া খাইয়া থাকে। এই বীজ খাইবার সময় মাঝে মাঝে পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়া যায়, এবং মুরগীর লড়াইয়ের মত একে অন্যের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া ঠোঁটের সাহায্যে তাহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দেয়।

অনেক দিন আগে একটা ডাহুকীকে একটা পরিত্যক্ত পুকুরের পানার উপর তাহার বাচ্চাগুলি লইয়া বেড়াইতে দেখিয়াছিলাম। ডাহুকী এদিক ওদিক শিকার অন্বেষণ করিতেছিল, বাচ্চাগুলিও এখানে-সেখানে কি খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতেছিল। হঠাৎ একটা বাচ্চা প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল। দূর হইতে বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলাম না; কেবল দেখা গেল, বাচ্চাটা যেন পানার নীচে ডুবিয়া যাইতেছে। চীৎকার শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাহুকী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া বাচ্চাটার আশপাশে ঠোঁট দিয়া যেন পাগলের মত দিশাহারা হইয়া ঠোকরাইতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরেই দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড জলঢোঁড়া সাপ বাচ্চাটাকে কামড়াইয়া ধরিয়া জলের নীচে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু জলজ লতা-পাতায় বাধিয়া যাওয়াতে একটু অসুবিধায় পড়িয়াছে। এই সময়েই ডাহুকী আসিয়া প্রাণপণে মাথার উপর কয়েকটা ঠোকর মারিতেই বেচারা শিকারটাকে ছাড়িয়া দিয়া জলের নীচে ডুবিয়া গেল। ডাহুকীও যেন ভয়ে ভয়ে বাচ্চাগুলিকে লইয়া অতি দ্রুতগতিতে একটা ঝোপের মধ্যে গিয়া লুকাইয়া পড়িল।

[প্রবন্ধে প্রকাশিত চিত্রগুলি লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত]

আলোচনা

"চণ্ডীদাস-চরিত" গ্রন্থের 'অন্তরতম'

(চণ্ডীদাস-চরিতের ৭৫ পৃষ্ঠায়) চণ্ডীদাস ধ্যানমগ্ন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। রামী নিকটে বসিয়া এই গীতটি গাহিয়া চণ্ডীদাসকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছিলেন,

'অন্ধ-নয়ন-আলোক আইস এস অন্তরযামী।
অন্তরতম* সুন্দর এস এসহে জীবন-স্বামী।
বস হৃদয় কমলাসনে এ গহন স্বপন ভাঁগ
কোটি-কল্প-অমানিশা-ঢাকা প্রিয়তম মম জাগ।
রুদ্ধ-মরম-আগল খোল তুমার রূপের আলোক জ্বাল
তুমার অনাদি-সঙ্গীত ঢাল পরাণে দিবস-যামি।"

রবীন্দ্রনাথ 'অন্তরতম সুন্দর'কে বহুবার আহবান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আহ্বানের ধ্বনি ও এই গীতের ধ্বনি এক নয়। রামীর গীতের মর্ম্ম যোগীর বোধ্য। এই গীতের সুরও ভিন্ন। বাউল-সম্প্রদায় 'মনের মানুস'কে হৃৎপদ্মাসনে বসাইতে বহুকাল হইতে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

চণ্ডীদাসের "মানুষ"

চণ্ডীদাস-চরিতের ৬৯ পৃষ্ঠায় রহমন চণ্ডীদাসকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

"হিন্দুর সে আপ্তবাক্যে শুনি নাই কভু।
আপনার রাধাশ্যাম জগতের প্রভু।
জন্ম-মৃত্যু ছিলা যার রোগ-শোক-জরা।
দুনিয়ার কর্ত্তা প্রভু কিসে হবে তারা।
*   *   *
কহ প্রভু হই আমি অতীব বেহুঁশ।
কেমনে সে হয় ব্রহ্ম একটি মানুষ।"

উত্তরে চণ্ডীদাস বলিতেছেন—

"চণ্ডীদাস কহে সকলি মানুষ শুনহে মানুষ ভাই।
সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।"

অর্থাৎ তুমি যাহাকে মানুষ বলিতেছ, সে মানুষই পরম সত্য। তবে রাধা কেন?

"পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ মোর শ্রীরাধা প্রকৃতি।
বিরাট ব্রহ্মাণ্ড জুড়ি এ দোহার স্থিতি।"

টীকায় শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন, "পূর্ব্বে পুথীর ১১শ পাতায় এই 'মানুষ' ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাউল ও উত্তর-ভারতের সন্ত সাধু এই মানুষের ধ্যান করেন। পদটি প্রচলিত ছিল, গীতের অংশরূপে মুদ্রিত হইয়াছে'।" বস্তুতঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৮০৯এর পদে (৩৮৫ পৃষ্ঠা) আছে।

"চণ্ডীদাস কহে শুনহে মানুষ ভাই।
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই।"

বাক্যটি পদের সহিত সংলগ্ন নয়। বোধ হয় মানুষ সম্বন্ধে কোন পদ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া পদের শেষে যুক্ত হইয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। মুদ্রিত পদাবলীতে 'মানুষ' সম্বন্ধে পৃথক্ পদ আছে, যথা ২১৯এর পদ।

"মানুষ মানুষ সবাই বলয়ে
মানুষ কেমন জন।
মানুষ রতন মানুষ জীবন
মানুষ পরাণ-ধন।"

মানুষ-তত্ত্ব আধুনিক নয়, প্রাচীন। চণ্ডীদাস-চরিতেও (২৬ পৃষ্ঠা) আছে—

"বাঘও বলিতে মানুষ বুঝায় ছাগও বলিতে তাই।
আকাশ-পাতাল সকলি মানুষ তাছাড়া কিছুত নাই।
স্বর্গ মানুষ নরক মানুষ মানুষ পরম প্রভু।
হচ্ছে মানুষ মর্চ্ছে মানুষ মানুষ নিত্য স্বভু।"

চণ্ডীদাস-চরিতের অনেক স্থানে এই 'মানুসে'র উল্লেখ আছে। যথা, ১০১ পৃষ্ঠায়, সিকন্দর-শাহ রামীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কে তুমি, সুবাদ কিবা চণ্ডীদাস সহ।" রামীর উত্তর,

"আমি কে যে জন জানে, আমি কে, সে জন জানে,
তুমিও সে জন, আমিও সে জন,
কত কব জনে জনে।
রাজা, ভাবি দেখ মনে।
চণ্ডীদাস মোর যেই, তুমিও আমার সেই,
তুমি তিনি আমি একেরি প্রকাশ
কর্ম্মেরি ফের যেই।
সখা, ভেদমাত্র কিছু নেই।"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

---

* 'অন্তরতম' শব্দটি আধুনিক নহে। সংস্কৃত অভিধানে দেখিতেছি, 'অন্তর', 'অন্তরতর', 'অন্তরতম' শব্দগুলির প্রয়োগ বহু প্রাচীন সাহিত্যেও আছে। যেমন, বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই বাক্যটিতে—'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদ্ অয়ম আত্মা,' "সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর যে এই পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়।" এইরূপ আরও বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।—প্রবাসীর সম্পাদক।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী বিভা মজুমদার

কুমারী গৌরীরাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের গণিতের অধ্যাপিকা ও বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের গবেষক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী বিভা মজুমদার এষ্ট্রো-ফিজিক্স সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিয়া এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইয়াছেন। বাঙালী মহিলাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম এই বৃত্তি পাইলেন। ইতিপূর্ব্বে ১৮৯৩ সালে কুমারী মেরী ফ্লোরেন্স হল্যাণ্ড এই বৃত্তি পাইয়াছিলেন। শ্রীমতী বিভা দেবী আই. এ. পরীক্ষায় সপ্তম স্থান ও অঙ্ক ও সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিভিন্ন পুরস্কার ও পদক লাভ করেন। বি. এ. পরীক্ষায় তিনি গণিতশাস্ত্রের অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ও মহিলা পরীক্ষার্থিনীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া "পদ্মাবতী স্বর্ণপদক" লাভ করেন। এম. এ. পরীক্ষায় ফলিত-গণিতে তিনি প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

কুমারী গৌরীরাণী বন্দ্যোপাধ্যায় এই বৎসর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই প্রাইভেট পরীক্ষার্থিনী রূপে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

যে নদী মরুপথে

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

মণীশের ভাল লাগে না। শান্তি না থাকলে বাড়ীটা যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। এই শূন্যতা ও সহ্য করতে পারে না। সাহিত্য-সভায় সে অনায়াসেই থাকতে পারত, ওর স্ত্রী শান্তি চক্রবর্তী আজ সভানেত্রী। সভায় কত যে লোক জমেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সেখানেও ভীড়ের মধ্যে নিঃসঙ্গ মণীশ টিকতে পারে নি। ওর স্ত্রীকে নিয়ে সকলেই ব্যস্ত, ও যেন নিতান্ত শান্তির পার্শ্বচর—তার বেশী আর কিছু নয়। ওর নিজের পরিচয় যেন আজ সকলে ভুলে গিয়েছে। অথচ বেশী দিনের কথা নয়, সাহিত্য-আকাশে নূতনতম গ্রহের আবির্ভাব ব'লে ওকেও এক দিন লোকে সংবর্ধনা জানিয়েছিল।

নূতন ঝকঝকে ফাউণ্টেন পেনটা হাতে নিয়ে ও একটা কিছু লেখায় মন দেবার চেষ্টা করে। এই কলমটা সেদিন শান্তির পাবলিশাররা উপহার দিয়ে গিয়েছে। মনে মনে মণীশ নিজেকে জিজ্ঞাসা ক'রে ফেললে, ও কি শান্তিকে ঈর্ষা করতে সুরু করেছে—শান্তির এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যকে?

নিজের মনে নিজেই অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললে, তা কি হয়? এ যে ওর নিজের হাতে-গড়া লতা। তার গৌরবে ওরই তো গৌরব।

এই তো সেদিনের কথা। মণীশের স্পষ্ট মনে আছে। ছোট্ট একটি প্রেস আর সামান্য একখানি মাসিক পত্রিকা। এই নিয়ে অপরিসর অন্ধকার ঘরে সারাদিন আলো জেলে ও কাজ করে। প্রেসের কাজ আর মাসিকের সম্পাদনা সেরে ওর হাতে প্রচুর অবসর থাকে না, তবু মাসে একখানি ক'রে উপন্যাস ওর লেখা চাই-ই। সংসার-চিত্র, ডিটেকটিভ কাহিনী, রোমাঞ্চকর গল্প কিছুই বাদ যায় না। লোকে বলত, ও বাংলার মোপাসাঁ। ওর মত প্রতিভা নাকি বাংলার উপন্যাস-জগতে আর কখনও দেখা যায় নি।

এক দিন হঠাৎ দুটি মেয়ে এসে বললে—মণীশবাবু আছেন? তাঁর সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই।

মণীশ শশব্যস্ত হয়ে দুখানা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললে—বসুন, আমারই নাম মণীশ।

—নমস্কার। আমরা একটা গল্প নিয়ে এসেছি।

—বেশ। রেখে যান। প'ড়ে আমার মতামত জানাব। শান্তি দেবী,—কই, এর আগে এঁর কোন লেখা কোন কাগজে পড়েছি বলে তো মনে হয় না।

—না, ইনি নূতন লিখছেন। মেয়েটি সপ্রতিভ হয়ে বললে: আজ চার মাস ধরে গল্পটা নানা পত্রিকা থেকে বার বার ফিরে এসেছে। তবু আমরা আশা ছাড়ি নি। আপনার পত্রিকায় দেবার সাহস এত দিন হয় নি। আজ শুধু শেষ চেষ্টা হিসেবে আপনার কাছে এসেছি। আমরা দেখতে চাই, বাংলা দেশে নূতন সৃষ্টির আদর আছে কি না। মেয়েটি উত্তেজনা চাপতে পারে না।

মণীশ বললে—বাংলা কাগজের সম্পাদকদের উপর আপনাদের অভিমান হয়েছে দেখছি। কিন্তু জানেন না তো কত লোকের মন জুগিয়ে আমাদের চলতে হয়। অনেক সময় সত্যিকার প্রতিভার সন্ধান পেয়েও তাঁকে আমরা উৎসাহ দিতে পারি না। কিন্তু এ কথাও ঠিক, দেশের উপর শুধু অভিমান করলে চলবে না। সকলেরই একটা প্রস্তুতির সময় আছে। সেই সময়টা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেই হবে।

মেয়েটি একটুও সঙ্কুচিত না হয়ে বললে—আমাদের ধারণা, লেখিকা সে-স্তর পার হয়ে গেছেন। আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ এই, লেখাটা রেখে যেতে পারব না, আমরা অপেক্ষা করছি। একবার দেখে আপনার মতামত দিলে বাধিত হব।

মেয়েটির মুখে একটা সতেজ বুদ্ধিমত্তার দীপ্তি ছিল। মণীশ বেশী কথা না ব'লে লেখাটার ওপর চোখ বুলিয়ে পড়তে লাগল। পড়া শেষ হ'লে সে বিস্মিত হয়ে গেল—এ যে একেবারে নূতন সৃষ্টি, প্রতিভার ছাপ এতে স্পষ্ট। নূতন আবিষ্কারের আনন্দে ওর মন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

সে-কথা প্রকাশ না ক'রে গম্ভীর মুখে ও বলে—মাপ করবেন, একটা অবান্তর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি। এর লেখিকা কি আপনি নিজে ?

মেয়েটির মুখে চোখে উদ্বেগ ও প্রতীক্ষার ভীরু রেখা। সে বলে—যদি বলি হাঁ, তাহলে কি বিস্মিত হবেন ?

—না মোটেই না। আগেই আমার এ সন্দেহ হয়েছিল। মণীশ নিজের বক্তব্যকে ছোট ক'রে আনে: আর লেখা আছে ?

—হাঁ, অনেক।

—কাল কয়েকটা নিয়ে আসবেন। এমনি সময় আসবেন দেখা হবে।

—তাহলে গল্পটা আপনার কাগজের জন্যে মনোনীত করলেন ? মেয়েদের মন স্পষ্ট ক'রে কিছু না জেনে তৃপ্ত হ'তে পারে না। আভাসে যা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার দাম ওরা পুরো দেয় না।

তার পর কয়েক দিনের আলাপেই ওরা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। বি-এ ক্লাসের ছাত্রী বর্দ্ধমানের কোন এক অখ্যাত পরিবারের মেয়েটিকে মণীশ অসীম উৎসাহে কলকাতার পাঠকসমাজে পরিচিত করলে। অবশ্য, সহজে সে সফল হয় নি। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নূতনের প্রতিষ্ঠার বাধা অনেক। সাধারণ মানুষের গতানুগতিক রুচির বর্ম ভেদ করতে না পেরে দেশে-দেশে কত অসংখ্য ঝরণা—কত অশুনতি তারকার অকাল-মৃত্যু ঘটেছে। শান্তির খ্যাতির প্রাথমিক অধ্যায়ও তেমনি বিঘ্নসঙ্কুল। কিন্তু মণীশের উৎসাহ কিছুতেই নেবে নি।

মণীশের বেশ মনে পড়ে, বিয়ের পরে কত দিন রাত জেগে না তাকে শান্তির বইগুলো কেটে ছেঁটে সাধারণের রুচির মত ক'রে সাজিয়ে দিতে হয়েছে। ওর সেদিনের পরিশ্রম নিষ্ফল হয় নি। বৈজ্ঞানিকের মত শ্রমের ধৈর্য ও আগ্রহের সঙ্গে সেদিন যার প্রতীক্ষা ও করেছিল, এক দিন অকস্মাৎ ও দেখতে পেলে সেই স্বপ্ন বাস্তব হয়ে উঠেছে। তার পরে অবশ্য—

অন্যমনস্কভাবে মণীশ একটা সিগারেট ধরালে। ওর মনের মধ্যে আজ বিগত জীবনের রাজ্যের চিন্তা জেগে উঠেছে। স্মৃতির আগল ভেঙে যেন বহুদিনের বন্দীরা পালিয়ে এসেছে।

চাকর এসে খবর দিলে, এক জন বাবু দেখা করতে এসেছেন। মণীশ খুশী হয়ে উঠল। জীবনের বিলীয়মান ছবিগুলি নিয়ে খেলা করার চেয়ে কারো সঙ্গে গল্প করা ঢের লোভনীয়।

বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতেই ও চমকে ওঠে—আরে বরেন যে! এতদিন ছিলে কোথায় ? ব'সো ব'সো।

—আর ভাই সে-সব কথা বল কেন! কলকাতায় কিছু হ'ল না। কাঁহাতক আর ঘরের টাকা জলে ফেলি। শেষে প্রেসটুকু নিয়ে কাশীতে গেছলুম, পুঁথিপত্তর ছাপতুম। যাহোক ক'রে দিন কেটে যেত। সম্প্রতি একটা কাগজে চাকরি পেয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছি। তোমার সঙ্গে বোধ হয় বছর-কয়েক দেখা হয় নি। কিন্তু তোমার ভোল যে একেবারে বদলে গেছে। দশ জনের মুখে যা গল্প শুনলুম তা দেখছি সবই সত্যি।

—এর মধ্যেই গল্প শুনেছ ?

—হাঁ, তোমার গল্প তো শহরের লোকের মুখে মুখে। বৌদি কোথায় ? তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও।

—শান্তি বাড়ীতে নেই। একটা সভায় গেছে। আলাপের জন্যে ভাবনা কি ? তোমার নেমন্তন্ন রইল, যেদিন খুশী এক দিন চলে এস।

—বেশ বেশ। আচ্ছা, তোমার কাগজখানা হাতছাড়া করলে কেন ? কথাবার্ত্তা অন্য প্রসঙ্গে গড়িয়ে আসে।

—সাধে কি আর বিক্রি করে দিলুম। বিয়ের পরে আমার টাইফয়েড হয়েছিল, প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলুম। শান্তির সেবায় যাহোক সে-যাত্রা রক্ষে পেলুম। মাস-পাঁচেক পরে একটু জোর পেয়ে যখন কাজে মন দেব ভাবছি, শুনলুম প্রেস আর পত্রিকার জন্যে দেনা হয়েছে। তার উপর অসুখের দেনা। নিরুপায় হয়ে দিলুম রমেশকে বিক্রি করে। তা এক পক্ষে ভাল হয়েছে ভাই। তার পর থেকেই শান্তি জোর ক'রে লিখতে আরম্ভ করলে। দুঃখে না পড়লে শিল্পী জাগে না।

—তুমি আর লেখ না কেন ? লিখবে আমাদের কাগজে ?

—না ভাই। টাইফয়েড যাবার সময় কোন-না-কোন অঙ্গে একটা চিহ্ন রেখে যায়। আমার চোখদুটো এখনও ডিফেক্‌টিভ হয়ে আছে। একটু লেখাপড়ার কাজ করলেই কষ্ট হয়। তাই শান্তি আমাকে আর মোটেই লিখতে দেয় না।

বরেন বিদায় নেবার আগেই শান্তি ফিরে আসে। জবাবদিহির সুরে বলে—ওরা ভীষণ দেরি করিয়ে দিলে। তোমার সময়ে আজ খাওয়া হ'ল না।

—তা হোক্ গে। শোন তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি আমার পুরাতন বন্ধু, সাহিত্যিক শ্রীবরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এখন একখানা পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হয়েছেন। আর ইনি বিখ্যাত লেখিকা শ্রীমতী শান্তি দেবী।

—আমি বিখ্যাত লেখিকা শুধু, আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়টা দিতে তুমি ভুলে গেলে? শান্তি হেসে বললে।

—কি? মণীশ মুখ তুলে বিস্ময়ের ভাবে জিজ্ঞেস করলে।

একটু অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টায় বরেন বলে—আমাদের কাছে আপনার সবচেয়ে বড় পরিচয় আপনি আমাদের বৌদি। এক দিন মণীশকে না হ'লে আমাদের চলত না—আমরা ওর এক রকম আশ্রিতই ছিলুম।

বরেনের শেষের কথাগুলো শোনার জন্তে অপেক্ষা না ক'রে শান্তি বলে—আপনি ঠিক বলেছেন, আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়, বিখ্যাত কথাশিল্পী মণীশ চক্রবর্তীর স্ত্রী আমি।

মণীশ হো হো ক'রে হেসে ওঠে। বলে—তাই ভাল, এতক্ষণ তোমার হেঁয়ালিটা মোটেই বুঝতে পারি নি।

—বরেনবাবু, অনেক রাত হয়ে গেছে। আপনিও কেন আমাদের কুঁড়েঘরে দুটি শাক-ভাত খেয়ে যান না। শান্তি বরেনের দিকে ফিরে বললে।

—আপনাদের কুঁড়েঘর নয়, জানি শাক-ভাতও দেবেন না। অতএব আপনার নেমন্তন্ন পেয়ে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করছি।

শোবার সময় মণীশ শান্তিকে বললে—জান, যাবার সময় বরেন কি বললে? বলে, তুই সত্যি ভাগ্যবান। এমন স্ত্রী মানুষ পায় না। এক বর্মা দেশের মেয়েরা শুনতে পাই নিজেরা উপায় ক'রে স্বামীকে এমনি যত্নে রাখে। তুমি নিজের হাতে আমার জন্তে রান্না কর শুনে ও ত অবাক।

—যাও। এসব ওঁর কথা না, তুমি নিজে ওঁকে ব'লে বসেছ।

—না না। ও-ই বলছিল। তোমার যত্নে ও তো একেবারে গলে গেছে।

—দেখ, অত ক'রে প্রশংসা ক'রো না বলছি। লোকে পিছনে তোমায় স্ত্রৈণ ব'লে নিন্দে করে।

—নিন্দে করে, না মনে মনে হিংসে করে?

—হিংসে করবে? কি দুঃখে? কি তুমি ভাগ্যবান পুরুষ!

—আমি ভাগ্যবান নই! লোকে বলে, স্ত্রীভাগ্যে ধন, কিন্তু আমার বরাতে শুধু ধন নয় স্ত্রীভাগ্যে যশও।

—ছিঃ তুমি বড় দুষ্টু। আমায় কেবল লজ্জা দাও। শান্তি স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ লুকোয়। মণীশ স্ত্রীকে আরও নিবিড় করে টেনে নেয়। কিছুক্ষণ ওরা কথা বলতে পারে না। ওদের বুকের মধ্যে স্মৃতির অলকানন্দা মুখর হয়ে ওঠে।

বছরখানেক পরের কথা। মণীশ শান্তিকে বললে—আমি গাড়ীখানা নিয়ে একবার বেরোচ্ছি। ঘণ্টাখানেক দেরি হবে। তোমার কোথাও যাবার দরকার আছে?

—বিশেষ কোথাও না। মিঃ সেন আসবেন। তাঁর সঙ্গে কবির কাছে যাবার কথা দিয়েছিলুম। কবি কলকাতায় এসেছেন।

—কে কবি? রবীন্দ্রনাথ? মণীশের প্রশ্নে উষ্মা প্রকাশ পেল। শান্তি সে-কথার জবাব দিলে না। কিছু দিন হ'তে সে লক্ষ্য ক'রে আসছে, মিঃ সেনের নামে মণীশ অকারণে রুক্ষ হয়ে ওঠে। অথচ মিঃ সেনের মত ভদ্র, শিষ্ট লোক দেখা যায় না—বিলেত থেকে প্রেসের কাজ শিখে এসেছেন। ওঁদের মস্তবড় পৈতৃক কারবার, অত বড় পাবলিশার বাংলা দেশে আর নেই। কলকাতার অভিজাত-সমাজে ওঁর গতিবিধি, অনেকেরই তিনি বিশেষ পরিচিত। আজ ছ-মাস ধরে শান্তির যে বিপুল খ্যাতি গড়ে উঠেছে, তার মূলে আছেন মিঃ সেন। তিনি না-থাকলে কি ওর আয়ের পরিমাণ হঠাৎ এত বেড়ে যেতে পারত!

শান্তি শান্তভাবে বললে—তুমি মোটর নিয়ে যাও। মিঃ সেন যদি এসে পড়েন, না-হয় ট্যাক্সিতে যাব। কিংবা তুমি এলেও আমরা যেতে পারি। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?

—কি? কথাটা না-বললে নয় এমনিভাবে মণীশ জিজ্ঞেস করলে।

—তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এস না কেন? তার পর একসঙ্গে মিলে যাওয়া যাবে। তুমি তো অনেক দিন কবির সঙ্গে দেখা কর নি।

—আমি! আদবকায়দা ভুল করলে বড়লোকের সমাজে তোমার অপমান হবে না? মণীশের মুখে ব্যঙ্গের ক্রুর হাসি।

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে শান্তি নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—হ্যাঁ হবেই ত।

—তাই বল। মণীশ দ্রুতপদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে থাকে।

শান্তি একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ডেকে বলে—শোন।

—এখন শোনবার সময় নেই। আমার দেরি হ'লে তুমি সেনের সঙ্গে ট্যাক্সি ক'রে চলে যেও।

শান্তি সেখান থেকে নড়তে পারে না। সমস্ত দেহমন যেন নিশ্চল হয়ে গেছে। ওর চারি দিকের দুনিয়ার রূপ হঠাৎ কেমন বদলে গেছে—ও যেন কিছু বুঝতে পারে না—ওকে ঘিরে যেন এক দুর্ভেদ্য কুয়াশার আবরণ।

গাড়ীতে ব'সে মণীশ সোফারকে বললে—চল সোজা দত্ত এণ্ড সন্সের দোকানে।

দত্তরা কলকাতার বনেদী পাবলিশার, মণীশের বই ওরাই প্রকাশ করত। ওদের কাছে এক দিন তার কি খাতিরই না ছিল! ওদের লোক বাড়ীতে এসে ব'সে থাকত মণীশের লেখা নিয়ে যাবার জন্য। আজ আর তার সে খাতির নেই। নাই বা থাক। মণীশ ভাবলে। ওর আজ টাকা চাই। যেমন করেই হোক। কাল শান্তির জন্মদিন। শিল্পবাসর-সমিতির উদ্যোগে কলকাতার লোকেরা কাল বিকেলে উৎসব-সভা ক'রে শান্তিকে সম্বর্দ্ধনা করবে—মণীশেরও কাল কিছু উপহার দেওয়া চাই। কিন্তু শান্তির টাকায় শান্তিকে উপহার! না, ও নিজের উপায়-করা টাকা দিয়ে জিনিষ কিনবে। আজও পুরাতন পাবলিশারদের কাছে ওর খাতির কম নেই—যাই হোক, মরা হাতী লাখ টাকা। শান্তিকে নিয়ে আজ সকালে মাতামাতি করছে বটে—বাঙালী হুজুকপ্রিয়। কিন্তু মণীশেরও এক দিন ছিল।

অবিনাশ দত্ত মণীশকে দেখে আসনে বসে বসেই বললে—নমস্কার। আসুন ভিতরে আসুন। ওরে চেয়ারখানা এগিয়ে দে।

এক দিন ভদ্রলোক উঠে এসে নিজে হাতে চেয়ার এগিয়ে দিতেন, মণীশ মনে মনে তুলনা না-করে থাকতে পারলে না।

তবু চৌকিতে ব'সে এক ফালি কৃত্রিম হাসি এনে ও বলে—আপনার খবর ভাল?

—আর ভাই, আমাদের কি আর কোন দিন খবর ভাল হবে? যা হোক ক'রে কেটে যাচ্ছে। আপনাকে যেন একটু শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে।

—আমাকে! কই না তো। দিব্যি আরামে কেটে যাচ্ছে দিন। ওর কণ্ঠস্বরে কৃত্রিমতার আভাস। ও যেন আজ কোন জিনিষ সহজ ক'রে সহজ ভাবে নিতে পারছে না।

—তা কাটবে বইকি ভাই। ভগবানের দয়া। প্রথম জীবনে তো কষ্ট কম করতে হয় নি। সবই তো আমরা জানি। ভাল কথা। ভদ্রলোকের যেন হঠাৎ কি একটা প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়ে গেল এমনি ভাবে জিজ্ঞেস করলেন—সেদিন নাকি সেনেরা দশ হাজার টাকা আপনাকে দিয়েছে? শান্তি দেবীর সব বইয়ের কপিরাইট ওরা কিনে নিলে?

দুয়ে দুয়ে চারই হয়। অবিনাশের ইঙ্গিত মণীশ বুঝতে পারে। এ শুধু কথার পিঠে কথা নয়। ওর মন বিগড়ে যায়। ভাবে, তুমি বড় চালাক, তোমার কথার মানে আমি ধরতে পারি না নয়! কিন্তু আজ রাগারাগি করলে চলবে না। এক দিন সুযোগ পেলে আবার সে দেখে নেবে। ও চুপ করে যায়। এই চুপ ক'রে যাবার একটু ইতিহাস আছে। মাস-দেড়েক ধরে কঠোর পরিশ্রম ক'রে ও অনেক দিন পরে একখানা উপন্যাস লিখেছে, কিছু দিন আগে তাই দত্তদের কাছে শান্তিকে না-জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। দত্তদের দেবার ইচ্ছা ওর বিশেষ ছিল না, কিন্তু সেনেরা ওর স্ত্রীর বই প্রকাশ করে; তাদের কাছে বইখানা দিলে পাছে শান্তি মনে করে, শান্তির খাতিরেই ওরা বইখানা ছাপিয়েছে। আজ আর সেদিন নেই—এক দিন ছিল যেদিন ও ছিল গুরু, শান্তি শিষ্য। আজ শান্তি দেশবিখ্যাত লেখিকা, আর ওর নাম পূর্ববর্তীদের স্মৃতির অন্ধকার কোণে বিলীয়মান হয়ে আছে। ওর মনে শান্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্পৃহা ঘনিয়ে ওঠে। ও দেখাতে চায়, সেদিনকার গুরু আজও গুরু। তা ছাড়া, বুলু সেন—ঐ মেয়ে-ঘেঁষা, মেয়েলি লোকটাকে দেখলেই মণীশের রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

তার খোশামোদ করে ও বই ছাপাবে! শিরসি মা লিখ।

কিন্তু অবিনাশ দত্ত যে কথা পাড়তেই চায় না। ওর অবান্তর প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে একটা ঝগড়ার সূত্রপাত করতে হয়। মণীশ নিজেকে চেপে সংক্ষেপে বলে—সব বইগুলোর কপিরাইট ঠিক নয়—খানকতকের। তার পর একেবারে কাজের কথা পাড়ে, ওর মনের মধ্যে আশা ও আশঙ্কার দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। বলে, আমার বইখানা পড়লেন নাকি?

—হাঁ, আপনার বই হাতে পেলে কি আর রক্ষে আছে। সেই রাত্তিরেই পড়ে ফেলেছি। যাই বলুন মশাই, আমরা পুরাতন যুগের লোক। আজকের ছোকরাদের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে চলতে পারি না ব'লে দুঃখ করি না।

মণীশ ভাবে, মন্তব্যটা আশাপ্রদ, তবু হেঁয়ালিভরা। স্পষ্ট ক'রে জানবার জন্যে বললে—তাহ'লে কি করবেন?

—তাই ত ভাবছি। বইখানা চমৎকার হয়েছে। কিন্তু এ যুগে কি আর সত্যিকারের ভাল বইয়ের কদর আছে। এখন সকলে ছিঁচকাদুনে প্রেম চায়।

মণীশ অধীর হয়ে বলে—রাখুন আপনার বক্তৃতা। তাহলে বইখানা আপনারা ছাপতে পারবেন না?

—আমাদের কি আর ইচ্ছে নেই ভাই? কিন্তু কি করব। কারবারের আর সে অবস্থা নেই। ছোট ভাইটা নাগাড় ভুগছে, রিস্ক নেবার সাহস আর হয় না। কিছু মনে করবেন না। কারবারী মানুষ আমরা, দু-পয়সা পাবার প্রত্যাশায়—কথা সে শেষ না ক'রে অন্য প্রসঙ্গ সুরু করে—আর আপনাকেও বলি। রিস্ক নেবই বা কিসের জোরে? কথায় বলে, আমায় দেখ তো আমি দেখি। স্পষ্ট কথা বলি ভাই, শান্তি দেবীর একখানা বই কি কখনও ডেকে দিয়েছেন আমাদের?

—কই, আপনারা ত কখনও চান নি? রুক্ষস্বর মণীশ চেপে রাখতে পারে না।

—বলবেন না ও কথা। অবশ্য আপনাকে দোষ দিই না। আপনার হাত থাকলে একখানা বই অন্তত কেড়ে নিয়ে আসতুম—এ জোর আমাদের আছে জানি। অন্তরঙ্গতার কৃত্রিম এক টুকরো হাসি হেসে অবিনাশ ব'লে যায়—শুনবেন? মাস-তিনেক আগে রমেনকে পাঠিয়েছিলুম। তা শান্তি দেবী হেসে বলেছিলেন, আমার বইয়ের দাম কি আপনারা দিতে পারবেন, সেনেরা আগে থেকে টাকা দিয়ে রাখেন। শুনে বড় কষ্ট হয়েছিল ভাই, কেন, আমরা কি হেঁজিপেঁজি পাবলিশার। যখন কাট্‌তি ছিল, আপনার বইয়ের দাম দিতে পারি নি? বলি সেনেরা কি ঘর থেকে টাকা বার করছে? অবিনাশ অনেক দিনের পুষে-রাখা রাগ আর চেপে রাখতে পারে না।

রাগে মণীশের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। কিন্তু সব অপমান ছুঁড়ে ফেলেও অন্যমনস্কতার ভান করে বলে—ভাল কথা। আমার পুরোনো হিসেবটা একবার দেখতে বলুন না। কিছু টাকার বড় দরকার। এক কথায় এরা কখনও টাকা বার করে না তাই মণীশ একেবারে বড় দরকারের অজুহাত দিয়ে কথা সুরু করলে।

—হিসেব? আপনার? সে-অদৃষ্ট কি আর আমার আছে। এক বছর ধরে বড় জোর সবসুদ্ধ খান পঁচিশ-ত্রিশ বই বিক্রি হয়েছে। এক দিন বটে ছিল অন্য ধারা। তা যাই হোক, আর এক দিন পায়ের ধুলো দেবেন। ওহে রমেন, মণীশবাবুর খাতাপত্তর ঠিক ক'রে—আসুন, আসুন, ব্রজকিশোর বাবু। আপনার সঙ্গে মণীশবাবুর আলাপ নেই? ইনি হচ্ছেন—আগন্তুককে সসম্মানে আসন এগিয়ে দিয়ে অবিনাশ বললে, ব্রজকিশোর মিত্র "পথ চলিতে" উপন্যাসের লেখক আর ইনি আমাদের শান্তি দেবীর স্বামী বিখ্যাত—

—কারো স্বামী হওয়ার আকস্মিকতাই শুধু আমার পরিচয় নয়। আমার নাম মণীশ চক্রবর্তী। মণীশ রুক্ষস্বরে বললে।

ব্রজকিশোরের সঙ্গে প্রাথমিক শিষ্টাচার সংক্ষেপে সেরে ও উঠে পড়ল। ও বেশ বুঝতে পারে, পুরাতন দিনের দাবি নিয়ে কারো কাছে আসা আর ওর চলে না। ওর অদৃষ্ট-আকাশে যে নূতন গ্রহের প্রভাব পড়েছে সে ওর মিত্রগ্রহ নয়। আজ সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহের কৃপাদৃষ্টি শান্তিকে ঘিরে পুঞ্জীভূত হয়েছে। ঈর্ষার তীব্র বিষে জর্জর মন নিয়ে ও অস্থির হয়ে ওঠে। সোফারকে বলে—চল, বারাকপুর রোড ধরে। খুব জোরে চালাও।

বাড়ী ফিরে যেতে ওর মন যায় না। গতির উত্তেজনা দিয়ে ও আজ নিজেকে ভুলতে চায়—নিজের অদৃষ্টকেও।

গাড়ী থেকে নেমেই শান্তি বুলু সেনকে বিদায় দিলে,

বললে—রাত অনেক হয়েছে, আপনাকে আর নেমে কষ্ট করতে হবে না। আমি যেতে পারব। এখন বিদায়-নমস্কার জানাই।

এত রাত্তিরে বুলু সেনকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বসাবার সাহস আজ আর ওর নেই। কেলেঙ্কারিকে ও স্বভাবতই ভয় পায়। আজ যাবার সময় মণীশের যে মূর্ত্তি দেখে গেছে!

তাছাড়া, ওর আজ একটু অন্যায়ও হয়ে গেছে। যদিও আর নিজে রান্না করার সময় পায় না তবু ও কাছে ব'সে না খাওয়ালে মণীশের খাওয়া হয় না। হয়ত এখনও মণীশ ওর জন্যে অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছে। আজ ও তো দিব্যি সেনেদের বাড়ী খেয়ে এল। বুলু সেনের মা যা ক'রে ধরেন, না যে বলা যায় না। নিজের মনেই ও নিজেকে জবাবদিহি করে।

কিন্তু যা ভেবেছিল তাই। ঠাকুরের মুখে সব কথা শুনে ওর পরিতাপের সীমা থাকে না। নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে। স্ত্রীর কর্ত্তব্যে এত বড় অবহেলা জীবনে আর কখনও তো ও করে নি।

অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে ও মনে মনে শপথ করে, আর নয়, বুলু সেনকে আর প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। বুলু কোন দোষ করুক না-করুক মণীশ যাতে অসুখী হয় ও তা করবে না। কিন্তু কালকের দিনটা যাক। উৎসবের হাঙ্গাম মিটে গেলে ও নিজেই বুলুকে বাড়ীতে আসতে বারণ ক'রে দেবে। কালকে কিছু বলা যায় না, কারণ এত সব আয়োজনের মূলে যে বুলু। কাল তাকে কোন কথা বলা মানে নিদারুণ নির্ম্মমতা।

অতি সন্তর্পণে শোবার ঘরে গিয়ে শান্তি দেখে মণীশ বিছানায় শুয়ে বই পড়ছে। ও আস্তে আস্তে বলে—আমার না-হয় এক দিন অন্যায় হয়ে গেছে। তা ব'লে মুখের ভাত ফেলে উঠে যাবার কি দরকার ছিল?

মণীশ কোন জবাব দেয় না। শান্তি বিছানার পাশে ব'সে জবাবদিহির ভঙ্গিতে বলে—কি করব! কবির ওখান থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গেল। তার পর মাসীমা যেভাবে জোর ক'রে ধরলেন—খেয়ে যেতেই হবে। আমি ছেলেমানুষ,—ওঁরা আমাকে যে রকম করেন যেন একটা দেবদেবী! উঠেও উঠে আসতে পারি না। তা বলছি তো আর কখনও হবে না—হ্যাঁ গা, এতেও মাপ নেই?

—কেন ঘ্যান ঘ্যান করছ, পড়তে দাও। মণীশ রুখে ওঠে; এখন তো অনেকেরই দেবদেবী হবে। বাংলা দেশের বিখ্যাত কথাশিল্পী। নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে ওর মনের জ্বালা অন্তরের মৌনতা ভেঙে বার হয়ে আসে।

—তুমি আমায় বিদ্রূপ করছ, কর। কিন্তু আমি জানি, অপরের কাছে আজ যতই দেবী হই আর যাই হই, তোমার কাছে যা ছিলুম চিরদিন তাই। তুমি মনে কর আমি তোমায় অবহেলা করি, কিন্তু তুমি ছাড়া আমার দাম কি বল তো?

—বাঃ বাঃ, চমৎকার বক্তৃতা দিতে পার তো, এত অভিনয় কবে থেকে শিখলে?

তীক্ষ্ণ হাসির মর্ম্মান্তিক বেদনায় শান্তি আত্মহারা হয়ে যায়। তবু শান্তভাবে বলে—অভিনয়—এ আমার অভিনয়! আচ্ছা থাক্ কথা-কাটাকাটি। চল, কিছু খাবে চল। ঠাকুরের মুখে শুনলুম, ভাতে মুখ দিয়েই উঠে পড়েছ। তুমি যদি এমনিধারা ছেলেমানুষী কর তাহলে চাকর-বামুনের কাছে আমার মান থাকবে কেন?

—আর রাত দুপুরে বেড়িয়ে বাড়ী ফিরলেই বুঝি খুব মান থাকবে?

একসঙ্গে ঘরের ইটগুলো যেন অট্টহাস্য ক'রে ওঠে। ওর পায়ের তলার পৃথিবী যেন আর নেই—কোথাও তলিয়ে মিলিয়ে গেছে।

সকালে উঠে শান্তির মনে হয়, জীবনে ও যেন নিতান্ত একাকী, নিরাত্মীয়। কালকের কেলেঙ্কারির পর সমস্ত রাত ঘুমুতে পারে নি। শিল্পীসুলভ স্পর্শকাতর ওর মন। সহজেই নিদারুণ আঘাতে অভিভূত হয়ে পড়ে। ও স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, মণীশের মনে অকস্মাৎ কেন এত বিষ জমা হয়ে উঠল। এর জন্যে ও মণীশকে দোষ দিতে পারে না। মণীশ শক্তিমান পুরুষ তাই অসফল জীবনের গ্লানি অত তীব্র। প্রথম দিনের সাক্ষাৎ থেকে এক একটি করে ওদের জীবনের সকল কথা শান্তির মনে পড়ে—কেমন ক'রে ক্রমশঃ মণীশের আকাশ থেকে জ্যোতিষ্মান নক্ষত্রপুঞ্জের অবসান হ'ল, আর ওর আকাশে জ্বলে উঠল একটি একটি ক'রে তারার পর তারা। এ ক্ষেত্রে ঈর্ষা তো স্বাভাবিক। অনেক দিন আগেই এর সম্ভাবনার আশঙ্কা ও করেছিল, তাই তো এত সাবধানে ও গোড়া থেকে চলেছে। কিন্তু তবু যা অবশ্যম্ভাবী, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে না।

কিন্তু কেমন ক'রে আজ মণীশের মনের জ্বালা দূর

করবে—সেই সমস্তার কূলকিনারা ও পায় না। অথচ এমনি ক'রে কত দিন ওদের জীবন চলবে। কালকের লজ্জাকর ঘটনার নিয়ত পুনরভিনয়ের মধ্যে দিয়ে কি বাকী জীবন কাটাতে হবে? এমন ক'রে বাঁচা যায় কিন্তু সমাজে বাস করা যায় না।

আজ সকালে আর একটু পরেই নানা বন্ধুবান্ধব দেখা করতে আসবে। সকালটা যাহোক ক'রে নির্বিঘ্নে কাটলে বাঁচি। শান্তি একবার ভাবলে, পড়ার ঘরে গিয়ে মণীশের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ক'রে আসে—এক পক্ষ যদি সব সহ্য করে তাহ'লেই তো চুকে যায়। অত আনুগত্যের আর দরকার নেই—মৃদু হেসে শান্তি নিজেকেই বিদ্রূপ ক'রে ওঠে: কাল আমি একটি কথাও তো বলি নি। তবু কি মর্মান্তিক কথা না ও বলেছে। এমন কথা মানুষ মানুষের স্ত্রীকে বলতে পারে! নারীর রুদ্ধ অপমানের বেদনা ওর কম্পমান বুকের মধ্যে স্পন্দিত হয়ে ওঠে।

পড়ার ঘরে ঢুকে শান্তি দেখলে কেউ নেই। চাকরকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলে, বাবু ভোরবেলা উঠেই চা না খেয়ে বেরিয়ে গেছেন। ওর মন বেদনায় ভরে ওঠে, কেন এমন ক'রে মানুষ নিজের তৈরি দুঃখের কুণ্ডে জলে মরে।

একটু পরেই একে একে বন্ধুবান্ধব, পরিচিত, অনতি-পরিচিতের দল আসতে আরম্ভ করে। শান্তি ওদের সঙ্গে আজ নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। ওর চালচলন, কথাবার্তা সব যেন হঠাৎ স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে।

এক সময়ে বন্ধু মণিকা ওকে একলা পেয়ে জিজ্ঞেস করলে—আজ তোর হয়েছে কি বল্ তো?

—কই কিছু না তো। শান্তি জবাব দিলে।

—শরীরটা খারাপ নাকি? তোর মুখে যেন আগেকার হাসি নেই। কথা যেন গুনে গুনে বলছিস।

—তোমরা যা হুজুক জমিয়ে তুলেছ, বাপ্। যাই বল নিজেকে নিয়ে এত মাতামাতি করা আমি সহ্য করতে পারি না। অথচ তোমাদের এই সব স্তবস্তুতি আর সভা-সমিতিতে যোগ না দিলে বলবে, মেয়েটার দেমাক হয়েছে।

—না, আমাদের স্তবস্তুতি ভাল লাগবে কেন, মণীশ-বাবুর মতন তো আমরা সাহিত্যিক নই। অমন রসাল স্তবস্তুতি আমরা পাব কোথায়? হ্যাঁ রে, মণীশবাবুকে আজ দেখতে পাচ্ছি না, বাড়ীতে নেই?

—না, কোথায় বেরিয়েছেন!

—আজকে বেরিয়েছেন?

শান্তির মনে হ'ল মণিকা অস্বাভাবিক বিস্ময় প্রকাশ করলে। ও বলে, কি জরুরি কাজ আছে। জান তো মণিকাদি, পুরুষদের মতন কাজপাগলা মানুষ আর নেই। ও সংযত হয়ে জবাব দেয়।

বন্ধুবান্ধব বিদায় নিয়ে চলে গেল তবু মণীশের দেখা নেই। দুর্ভাবনায় ও ছট্‌ফট করতে থাকে। এমন সময় বুলু সেনের দরওয়ান একখানা চিঠি দিয়ে গেল। চিঠির মধ্যে ছিল একখানা পাঁচ-শ টাকার চেক।—ওর জন্ম-দিনের উপহার। ক্ষণিকের জন্য একটা খুশীর ঝলক ওর অন্তরাকাশে খেলে যায়। ও জানে, এ দান নয়। একখানা নূতন উপন্যাসের প্রচ্ছন্ন অনুরোধ। যাই হোক, তবু এতগুলো টাকা আগাম পাওয়া বাংলা দেশে একটু অসাধারণ বইকি! মণীশ এলেই ওটা দিয়ে দেবে। কিন্তু এ সংবাদ মণীশের কি প্রীতিকর হবে! ওর ক্ষণিকের আনন্দ মুহূর্তে মিলিয়ে যায়।

দুটো পার হয়ে আড়াইটে বাজতে চলল। প্রতীক্ষমান শান্তি অস্থির হয়ে ওঠে। এদিকে সাড়ে তিনটের সময় সভা আরম্ভ। ও কথা দিয়েছে তার আগেই পৌঁছবে। হয়ত মণীশ আজ দেরি করেই ফিরবে যাতে সভায় যেতে না-হয়। ও না গেলে লোকে বলবে কি—সকাল-বেলাতেই তো মণিকাদি ওর অনুপস্থিতি লক্ষ্য ক'রে গেছেন। শান্তির একবার মনে হ'ল, ওর নিজেরও যাবার দরকার নেই। মহত্ত্ব দিয়েও মণীশের মনের বিষ জয় করবে। অসুস্থতার অজুহাতে সভায় যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব হ'ল না বলে একটা খবর পাঠিয়ে দিলেই চলবে। তার পর আবার ভাবলে, তাতে কেলেঙ্কারি বাড়বে বই কমবে না। কলকাতার কুৎসা-সংগ্রাহকদের নিত্য জাগ্রত দৃষ্টির হাত থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই।

বেলা পাঁচটার সময় মণীশ বাড়ীর বৈঠকখানায় ব'সে একখানা খবরের কাগজ দেখছিল। অবেলায় বাড়ী এসে খাওয়া-দাওয়া ক'রে একলা-একলা তার শরীরটা ভাল লাগছিল না। এমন সময় দরজার বাইরে বন্নেনের আওয়াজ শোনা গেল—খুব চান্সটা নিয়েছি বলতে হবে

তো। ভাবলুম, যাচ্ছি এ পাশ দিয়ে একবার নেমে মণীশকে দেখে যাই। হয়ত থাকবে না, শান্তি দেবীর জন্মোৎসব-সভায় নিশ্চয় গেছে, তবু নিই একটা চান্স। ভাগ্যিস নামলুম।

—ব'স ব'স। মণীশ একখানা একানে সোফা এগিয়ে দিলে।

—তা তুমি যে এখনও বাড়ীতে বসে? সভায় যাও নি স্ত্রীর জন্মোৎসব-সভায়! বুলু সেন নাকি হাজার টাকার একখানা চেক তোমার স্ত্রীকে জন্মদিনের উপহার দিয়েছে!

—কই না তো। মণীশ বিস্মিত হয়ে বলে।

—সে কি হে? ও তো লোককে ডেকে ডেকে কথাটা শোনাচ্ছে। অত বড় মিথ্যেবাদী, হাম্‌বাগ আর দুনিয়ায় আছে? হঠাৎ হাতে কিছু টাকা পেয়ে ধরাকে সরা দেখছে। সেদিন ত খামকা সভার কাজ নিয়ে আমার সঙ্গে এক্সিকিউটিভ কমীটির মিটিঙে এক চোট লেগে গেল। তা যাই বল ভাই, তুমি বন্ধু, তাই একথা বলার সাহস পাচ্ছি। বৌদির যেখানে যাবার দরকার হবে তুমি সঙ্গে যেও। ও ছোঁড়াটা তোমার কে? ও অত বৌদির সঙ্গে দহরম-মহরম করে কেন?

বরেন বুলু সেনের ওপর তার সমস্ত রাগ যত দূর সাধ্য জোরের সঙ্গে প্রকাশ করে। ওর লক্ষ্য ছিল, পুষে-রাখা রাগ প্রকাশ করা একটু স্বস্তি পাওয়া। কিন্তু ওর কথায় আর এক জনের হৃদয়ে যে কি তীব্র জ্বালা দাবানলের মত জ্বলে উঠল—তা যদি ও আগে থেকে বুঝতে পারত তাহলে এ কাজে ওর সঙ্কোচ আসত।

শিল্পীর আনন্দ অপরের কাছে তার প্রতিষ্ঠায়। খ্যাতির উন্মাদনার মধ্যে সে নিজের শক্তিকে উপলব্ধি করে। সভার কার্যতালিকা শেষ ক'রে যখন শান্তি বাড়ী যাবার জন্য উঠল, তখন তার মনের মধ্যে তৃপ্তি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। মিঃ সেন এগিয়ে এসে বললে—আপনাকে বাড়ীতে রেখে আসি।

—না, ধন্যবাদ। আমি একাই যেতে পারব। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। কথাটা রূঢ় শোনাল কিন্তু শান্তি নিরুপায়। আজ ও বাড়ীতে গিয়েই মণীশের সঙ্গে একটা মিটমাট ক'রে নেবে। সারাদিন মণীশের জন্যে খাওয়া হয় নি—তা কি ও জানে।

ঘরে ঢুকে অভিমানের সুরে শান্তি বললে—তুমি আমার সভায় গেলে না। কত লোক জিজ্ঞেস করলে, লজ্জায় মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হলুম।

মণীশ নিরুত্তর। শান্তি ওর চেয়ারের কাছে এগিয়ে এল। আজ ও কিছুতেই পরাজয় মানবে না—এই ওর প্রতিজ্ঞা। মণীশের মনের ভুল আজ ভেঙে দেবেই।

—তুমি আর আমায় দেখতে পার না, না? আমি এখন তোমার চোখের বিষ হয়েছি। দেখ তো, কি চমৎকার ঘড়ি উপহার দিয়েছেন ওঁরা। ও স্বামীর হাতখানা অতি সন্তর্পণে টেনে নিয়ে ঘড়িটা দেয়।

—যাও, আর সোহাগ করতে হবে না। মণীশ ঘড়িটা মেঝের উপর সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

শান্তির মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে কথা বলতে পারে না। তার পর ঘড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে বললে—তুমি এত নীচ তা জানতুম না—মনে-মনে আমার উপর এত হিংসে তোমার!

—কি আমি নীচ, আমি ছোটলোক? উন্মত্ত মণীশ গর্জে উঠল—লুকিয়ে লুকিয়ে বুলুর কাছ থেকে হাজার টাকা পেয়ে বড় গরম যে দেখছি! লজ্জা করে না, যত কিছু বলি না তত বেড়ে চলেছ!

—হ্যাঁ, চলেছিই তো।

—আবার কথা? দেখবে কত মজা—

চাকরটা খাবার সাজিয়ে রাখছিল। হঠাৎ উপরের ঘরে চেঁচামেচি, ধাকাধাক্কি, দিদিমণির করুণ আর্তনাদ শুনে ছুটে গেল। বাবুর পড়ার ঘরে এসে দেখলে, দিদিমণি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে শুয়ে গোঙাচ্ছেন, আর বাবু কুঁজো থেকে তাঁর মুখে চোখে জলের ছিটে দিচ্ছেন। তাকে দেখে মণীশ গম্ভীরভাবে বললে, ফ্যানটা খুলে দে। ওর মুখে চোখে একটা শান্ত নির্লিপ্ততা—তা যেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমের পর প্রশান্ত নিরাসক্তি।

দু-দিন পরে খবরের কাগজে সকলে পড়লে, হঠাৎ কাউকে বিশেষ কিছু না জানিয়ে বিখ্যাত কথাশিল্পী শান্তি দেবী স্বামীকে নিয়ে পশ্চিমে বেড়াতে গেছেন—তাঁর শরীর নাকি সম্প্রতি খুব খারাপ হয়েছিল। মাস-ছয়েক তাঁরা বাইরে বাইরে কাটাবেন।

বাংলা দেশের পাঠক-পাঠিকারা ছ-মাস ছেড়ে বছর-খানেক ধরে প্রকাশকদের কাছে বার বার খোঁজ নিতে

অশ্বখুরধূলায় আচ্ছন্ন হাঙ্গেরীর গ্রামপথ

হাঙ্গেরীর গ্রামের পথে গরুর গাড়ী

বুডাপেষ্টে খ্রীষ্টের মৃত্যুস্মারক ধর্মোৎসবে জাতীয় বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক বেশভূষায় সজ্জিত বালকবালিকাগণ
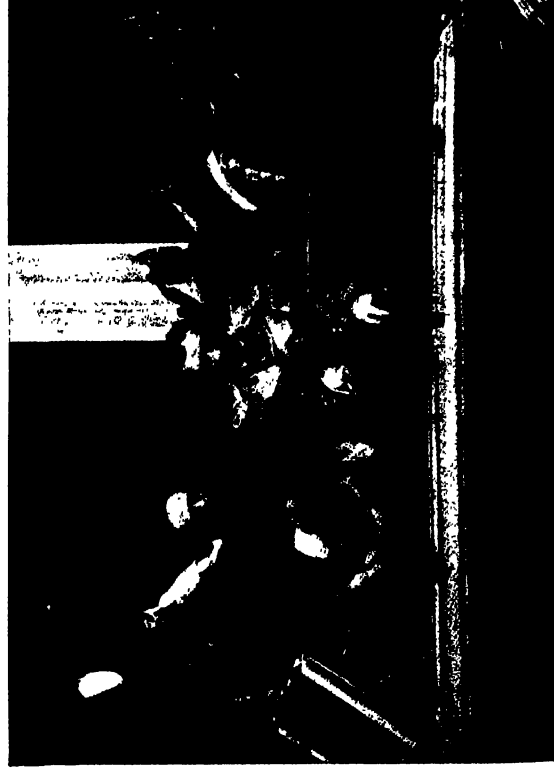
রিজেণ্ট হোর্থি কার্ডিন্যালকে লইয়া গাড়ীতে চড়িতেছেন

উক্ত ধর্মোৎসবে কার্ডিন্যাল ভার্দিয়েরের আগমন

লাগলেন, শান্তি দেবীর নূতন কোন বই বেরলো কি না, কিন্তু সকল প্রকাশকের সেই এক জবাব—না, নূতন কিছু এখনও তিনি পাঠান নি।

হঠাৎ দেওঘরে এক জন পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে শান্তির একবার দেখা। সে ওকে জিজ্ঞেস করে, আর কিছু লিখছ না কেন? তোমার জন্যে দেশের লোক যে পাগল হয়ে গেল।

ও মুচকে হেসে জবাব দিয়েছিল, লেখা আর আমার আসে না ভাই। রবীন্দ্রনাথের ক্ষ্যাপার পরশমণি পাওয়ার মতন হঠাৎ শক্তিটা এক দিন পেয়েছিলুম—হঠাৎ এক দিন তা আবার হারিয়ে ফেলেছি।

তার পর অনেক দিন ওদের আর কোন খোঁজ পাই নি। হতাশ হয়ে এখানেই গল্পটা শেষ ক'রে ফেলব ভাবছি, এমন সময় বছর-তিনেক পরে হঠাৎ কলকাতায় একটা সামান্য দোতলা বাড়ীর সামনে মণীশের সঙ্গে দেখা। এক জন কালো, প্রৌঢ় মতন লোক ওর সামনে হাত নেড়ে বলছিল, আমারই বা সংসার চলে কি ক'রে মশাই, বাবা ত আর জমিদারি রেখে যায় নি।

মণীশ নিতান্ত ভালমানুষটির মতন বললে—তা তো ঠিক। তিন মাস সবুর করেছেন, আর এক মাস সবুর করুন। অন্তত দু-মাসের ভাড়া একেবারে দেব।

—দেব দেবই তো বরাবর বলছেন, কেমন ভদ্রলোক আপনারা! তা যাই হোক, আর এক মাস থাকবেন বলছেন থাকুন, কিন্তু এমাসে ভাড়া না দিতে পারলে আমি অন্য ভাড়াটে দেখব। আমার এক কথা মশাই।

বাড়ীওয়ালার সঙ্গে কথা শেষ ক'রে মণীশ সোজা পাকা রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়।

সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরতে শান্তি চা দিয়ে বললে—সারাদিন কোথায় কাটালে?

মণীশ চায়ের বাটিতে মুখ দিয়ে বললে—ও অনেক জায়গায় ঘুরেছি। শোন খুব ভাল খবর আছে। সেনেরা বলেছে, কাল কিছু টাকা আগাম দেবে। তুমি মাস-খানেকের মধ্যে যাহোক একখানা নভেল লিখে দাও।

—না গো না, ও আমার আর আসে না।

—তাহলে আমাদের সংসার চলবে কি ক'রে বল? আজ বাড়ীওলার মিষ্টি বুলি শুনেছ তো। তখন যদি বইগুলোর কপিরাইট সব বিক্রি ক'রে না দিতে। সেনেরা আজও কম টাকা মারছে!

—তা হোক, ও রকম কথা-বেচা টাকায় আমাদের দরকার নেই।

—কিন্তু মাসে মাসে চল্লিশ টাকায় তো আমাদের চলবে না। বোস কোম্পানীতে গিয়েছিলুম, ওদের সাপ্তাহিক খানার কাজ দেখলে চল্লিশটি টাকা দেবে বলেছে। আমি তাতেই রাজি হয়েছি।

—তবে আবার কি! আমিও আজ একটা স্কুল-মাষ্টারি জোগাড় ক'রে এনেছি। মণিকাদিকে মনে পড়ে? তিনি ক'রে দিয়েছেন। যাহোক ক'রে আমাদের দু-জনের চলে যাবে।

কৃতজ্ঞ আনন্দে মণীশের মন ভরে ওঠে। কূলহারা নাবিক যেন অনেক বিলম্বে একটা আশাতীত আশ্রয় পেয়েছে। নিজের হাতের মধ্যে শান্তিকে টেনে নিয়ে বলে, এক দিনের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত কি এত দিনেও হ'ল না শান্তি? আমার জন্যে তুমি লেখা ছেড়েছিলে। আজ আমি মিনতি করছি, তুমি আবার লেখা সুরু কর। নিজের শক্তিকে এমন ভাবে নষ্ট ক'রো না।

—কি তুমি যে বল! লিখতে আমি আর মোটে পারি না, তাই তো লেখা ছেড়েছি। জোর ক'রে লিখলে এই হবে যে লোকের গালাগাল কুড়োব। এক দিন যাদের কাছে অত সুখ্যাতি পেয়েছিলুম—সেই সুখের স্মৃতিই আমার সম্বল হয়ে থাক। আজ তাদের মুখে গালাগালি শুনলে আমি সহ্য করতে পারব না।

—ছিঃ, আমাকে ঠকাবার চেষ্টা ক'রো না। লেখা তোমার ঠিক আগেকার মতনই আসে, কিন্তু লিখবে না। যাই বল, যখন ভাবি, এবার থেকে সারাজীবন স্কুল-মাষ্টারি ক'রে তোমায় খেতে হবে—এ-কথা যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। কোথায় নূতন নূতন বই লিখে তুমি বাংলা দেশের—

—হ্যাঁ, নূতন নূতন বই লিখতে পারলে কি হ'ত, না আমার মরণের পর তোমার দেশের লোক ঘটা ক'রে আমার প্রশংসা করত—কিন্তু আমার তাতে লাভ হ'ত কি? মৃত্যুর দেশ থেকে তার কতটুকু আমি ভোগ করতে পেতুম। কিন্তু আজ যে তোমাকে এমন ক'রে পেয়েছি—এ-জীবনে দু-জনে মিলে যে আনন্দ ভোগ করে নিলুম, তার লাভ কে হিসেব করবে মশাই?

হাঙ্গেরীর সূচীশিল্প
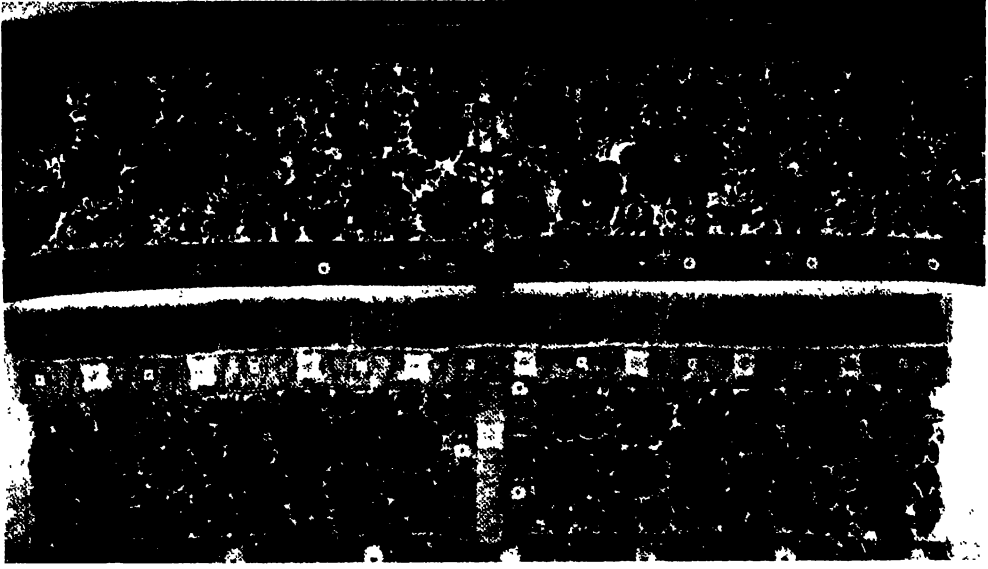
হাঙ্গেরীর লোকশিল্প

ডক্টর শ্রীপ্রমথনাথ রায়

হাঙ্গেরীর লোকশিল্পে উত্তরাঞ্চলের লোকশিল্পের বিরস ধূসরতা, ও দক্ষিণাঞ্চলের রৌদ্রসমৃদ্ধ দেশগুলির বর্ণচ্ছটা ও কল্পনাপ্রিয়তা, এই দুইয়ের মিলন সাধিত হইয়াছে। কারণ এ-দেশে উত্তরাঞ্চলের ন্যায় শীতের প্রকোপ যেমন অধিক, এখানকার বসন্তও তেমনি গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের ন্যায় উজ্জ্বল। হাঙ্গেরীর লোকশিল্পে এট্রুস্কান, রোমান ও রেনেসাঁস আর্টের প্রভাবও দেখা যায়। ইতালীর সার্দ্দিনিয়া ও আব্রুৎসি প্রদেশের লোকশিল্পের সঙ্গে হাঙ্গেরীর লোকশিল্পের তুলনা করিলেই তা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়।

অন্যান্য দেশের লোকশিল্পের ন্যায় হাঙ্গেরীর লোক-শিল্পেও উপাদান, পদ্ধতি ও বর্ণ—এই তিনের সুসমঞ্জস মিলন সাধিত হইয়াছে।

হাঙ্গেরীর লোকশিল্পে ব্যবহারিক দিক্‌টার উপর খুবই জোর দেওয়া হইয়াছে; প্রয়োজনীয়তা ও সৌন্দর্য্য-বোধ এই দুইয়ের একটি বিশেষ সামঞ্জস্য এই শিল্পে সাধিত হইয়াছে।

হাঙ্গেরীর লোকশিল্প ফুলের ছবি বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, ইহা এই শিল্পের একটি বৈশিষ্ট্য। অবশ্য, শিল্পী যে প্রকৃতি হইতে ফুলের ছবি হুবহু অনুকরণ করে তাহা নয়, নিজের ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী তাহার আকার-প্রকার পরিবর্ত্তন করিয়া লয়। টুলিপ, পপি
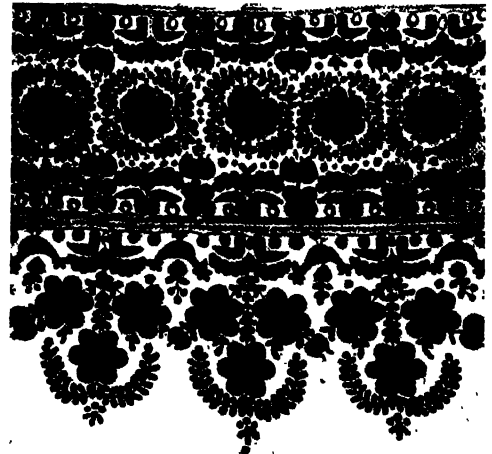
হাঙ্গেরীর লোকশিল্পের অলঙ্করণ
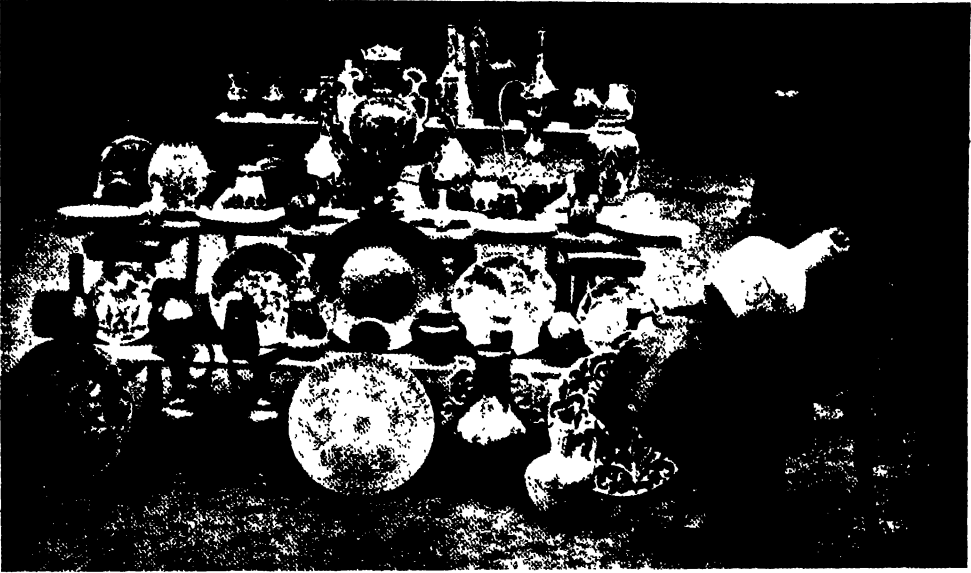
হাঙ্গেরীর লোকশিল্পের নিদর্শন পাত্রাদি

ও লিলি এবং সর্ব্বোপরি গোলাপ ফুলের ছবি এই শিল্পে সমাদৃত। বর্ণচ্ছটার স্থানও এই শিল্পে সমধিক।

হাঙ্গেরীর লোকশিল্পের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, গত শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ভিয়েনার শাসনতন্ত্র হাঙ্গেরীয়দের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করে তখন হাঙ্গেরীয়গণ আপনাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য সাহিত্যে ও শিল্পে যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল তাহাতে লোকশিল্পকে বিশেষ উচ্চে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। তখন যে রোমান্টিক রীতির প্রচলন ছিল, এই শিল্পে তার প্রভাব মোটেই পড়ে নাই।

বর্ত্তমান যন্ত্র-যুগের প্রভাব হইতে হাঙ্গেরীর অধুনাতন লোকশিল্পও মুক্ত নহে, সুতরাং তাহার পূর্ব্বতন বর্ণবাহুল্য ও বিচিত্রতা সব সময়ে যে উহাতে দেখা যায় তাহা নয়। এই জন্য বর্ত্তমানে উহাকে মিশ্র-লোকশিল্প বলাই অধিকতর সঙ্গত।

ইহাতে তিন প্রকারের কাজ দেখা যায়। প্রথমতঃ, সূজুর (szur)। ইহা এক প্রকার আলখাল্লা, সুবার (Suba, পশুলোমের জামা) চেয়ে ইহা পাতলা। দ্বিতীয়তঃ, কার-কোট বা লোমবস্ত্র। তৃতীয়তঃ, ফুলদানি ইত্যাদি মৃন্ময় পাত্র। হাঙ্গেরীর লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য এই তিন প্রকার কাজেই সুস্পষ্ট।

সূজ্যর (szur) ও কার-কোটে বর্ণপ্রয়োগে হাঙ্গেরীয়ানরা খুব ওস্তাদি দেখাইয়া থাকে। সাদা, বাদামী অথবা কালো রঙের কাপড়ের উপর এক বা একাধিক রঙের সাহায্যে চিত্র করা হয়। যেমন সূজ্যরের বেলা সাদার উপর সবুজ, কার-কোটের বেলা বাদামীর উপর কালো। অনেক সময় যতগুলি রং বর্ণচ্ছত্রে থাকে তার প্রায় সবগুলিরই সংমিশ্রণ দেখা যায়। কিন্তু এত রং ব্যবহার করিলেও তাহাতে লোকের চক্ষু বা সৌন্দর্য্যবোধ পীড়িত হয় না, এই বর্ণসমাবেশে সুষমা ও সামঞ্জস্য কখনও নষ্ট হয় না।

এই চিত্র-বিন্যাসে অতীতের আদর্শের সহিত সংযোগ অব্যাহত রাখিবার কোন প্রচেষ্টা নাই। সূজ্যর ও কার-কোটের নির্ম্মাতারা চিত্র-বিন্যাসে নিজ নিজ রুচি অনুসরণ করিয়া থাকে।

হাঙ্গেরীর সূজ্যর ও কার-কোটে যে কলাকৌশল দেখা যায় তা জাতির নিজস্ব, অপরের প্রভাব হইতে মুক্ত। কিন্তু মৃৎশিল্পে স্যাক্সনি ও রেনেসাঁস

বিচিত্র সজ্জায় হাঙ্গেরীর শিশু

সজ্জায়-পরিহিত লোকেরা গীর্জায় উপাসনান্তে ঘরে ফিরিতেছে

যুগের পরবর্ত্তী কালের ইতালীর প্রভাব দেখা যায়। হাঙ্গেরীর আলফোল্ড (Alfold) প্রদেশের শিল্পীরা এই বিদেশী প্রভাব অনেকটা এড়াইয়া চলিতে পারিয়াছে। এই প্রদেশের মৃৎশিল্পে সবুজ, হলদে, কালো ও লাল—এই চার প্রকার রঙের ব্যবহার দেখা যায়। ইহাতে ফুলের প্রাকৃতিক আকৃতির পরিবর্ত্তে, হাঙ্গেরীর লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্যস্বরূপ ফুলের নানা প্রকার কাল্পনিক আকৃতিই বেশী লক্ষিত হয়।

এই মিশ্র-লোকশিল্পে হাঙ্গেরীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ থাকিলেও তাহার ব্যাপক পরিচয় পাইতে হইলে প্রকৃত লোকশিল্পের, অর্থাৎ যে শিল্প চাষীরা ও পশু-পালকেরা প্রস্তুত করে, তার নিদর্শন দেখা প্রয়োজন। এই লোক-শিল্পের উপাদান চামড়া, হাড়, শিং, কেশর ও কাঠ।

সাধারণতঃ খোদাই করিবার জন্য কাঠের ঠিক মাঝখানে একটি মেষের মাথা অঙ্কিত করা হয়। ইহার চারি প্রান্তে বহুল পরিমাণে অন্যান্য অদ্ভুত চিত্র থাকে। দানিয়ুব নদীর দুই পার্শ্বস্থ দেশের লোকশিল্পে ইহার অনুকৃতি দেখা যায় বলিয়া অনেকে অনুমান করেন ইহা রোমান যুগের অথবা তৎপূর্ব্বকালের প্রতীক-প্রধান ধর্ম্ম-শিল্পেরই ধারা।

সূচী-শিল্পে মেজোকোভেসদ্ (Mezokovesd) প্রদেশই হাঙ্গেরীতে সকলের চেয়ে বিখ্যাত। এখানকার মেয়েদের তৈরি ওড়না, টেবিল-ক্লথ প্রভৃতি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সমাদৃত।

গ্রাম্য পুরুষদের তৈরি লোকশিল্পের মধ্যে কাঠের কাজ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কাজ সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়—প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টানদের গোরস্থানের জন্য কাঠের কাজ ও ছাতওয়ালা কাঠের তোরণ। গঠন-সুষমায় ও খোদাই ও চিত্রের দিক্ দিয়া এই কাঠের তোরণগুলি ইউরোপে অতুলনীয়। তোরণের উপরে অনেক সময় নানা রকমের লিপি থাকে, যেমন—

"পথিক! তোমার জন্য এ দ্বার বন্ধ নয়; কোন্ দিক দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে এ তারই নির্দ্দেশক!" "যে প্রবেশ করে তার মঙ্গল হউক, যে বাহির হইয়া যায় ভগবান তার সহায় হউন!"

কাঠের তৈরি আসবাবপত্রগুলিও উল্লেখযোগ্য। এই আসবাবে কখনও কখনও পশ্চিম-ইউরোপের প্রচলিত রীতির প্রভাব দেখা গেলেও, ইহাতে মৌলিকতার নিদর্শন থাকে। গ্রাম্য জীবনের ও সৈনিক জীবনের চিত্র,

বিশেষতঃ শিকারের চিত্রই এই আসবাবে বেশী করিয়া অঙ্কিত ও খোদিত হয়।

নিতান্ত সেকেলে যন্ত্র, অথবা খুব বেশী হইলে একটি সাধারণ ছুরি দিয়া কাঠ ও চামড়ার ন্যায় অতি সাধারণ উপাদানের উপর শিল্পী নিজের কল্পনা ও অনুভূতিকে রূপ দান করে। পশুপালকদের স্ত্রী-কন্যারাও গৃহের শান্তিময় আবেষ্টনে বসিয়া ঘরে-বোনা কাপড়ের উপর নিজেদের রূপ-কল্পনাগুলিকে সূচের সাহায্যে লেসের আকারে ফুটাইয়া তুলে। হাঙ্গেরীর অন্যান্য পল্লীবাসিনীদের মধ্যেও এই সূচের কাজ খুব বেশী প্রচলিত এবং তাহারা এই কাজে বিশেষ নৈপুণ্য অর্জ্জন করিয়াছে।

সজ্জার ও ফার-কোটের ন্যায় বৈচিত্র্যই এই সূচী-শিল্পের বিশেষত্ব। শিল্পী নিজের ইচ্ছানুযায়ী পূর্ব্ব-নমুনার পরিবর্ত্তন করে ও নূতন নূতন নমুনার সৃষ্টি করে। ব্যক্তিগত পোষাক হইতে আরম্ভ করিয়া পরিবারের ব্যবহারের বস্ত্র, উপাসনা-বেদীর সাদা ঝালর হইতে আরম্ভ করিয়া জমকাল রেশমী কাপড়—সব রকমের উপকরণের উপরই সূচের কাজ করা হয়। এই শিল্পে পদ্ধতি, চিত্র ও রঙের বিভিন্নতা এত বেশী যে ইহাকে কোন বিশেষ শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত করা সুকঠিন।

হাঙ্গেরীর স্ত্রীলোকেরা প্রতিদিন অথবা উৎসব উপলক্ষে যে পোষাক পরে তাহাতেও সে দেশের লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এখনও অনেক স্থানে মেয়েরা তাহাদের পিতামহীদের মত বিচিত্র বসন পরিধান করে। পরিধেয় বস্ত্রে এই প্রাচীনতার পরিচয় পাইতে হইলে বুদাপেস্ত হইতে বেশী দূরে যাইবার প্রয়োজন হয় না—হয়ত শহরের প্রান্তেই হলদে, লাল, সবুজ, নীল পোষাক-পরা পল্লীবাসিনী হাঙ্গেরিয়ান রমণীর সহিত দেখা হইয়া যাইতে পারে।

দারুময় তোরণ

প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের পোষাক স্বতন্ত্র। নোগ্রাডের (Nograd) মেয়েদের পোষাক, সারক্যোজের (Sarkoz) মেয়েদের রবিবারের পোষাক বিশেষ জটিল। অনেকগুলি গাউন জোড়া দিয়া একটি গাউন তৈয়ার করা হয় ও নানা রকম চিত্রবিচিত্র একটি বহিরাবরণ ইহার সহিত যুক্ত থাকে। মাথার টুপিও সেদিন থাকে নানা রঙে রঙীন, কাঁধের উপর থাকে শাল। পাতলা সিল্ক অথবা অন্যান্য আধুনিক কাপড়ের ব্যবহার বড় নাই। হাঙ্গেরীর অনেক গ্রামেই এখনও আধুনিকতার ধারা প্রবেশ করে নাই। আজকাল বর্ষার দিনে ইউরোপের বহু মহিলা যে-ধরণের বুট জুতা পরিয়া থাকেন, মাজিয়ার রমণীরা সে-ধরণের জুতা বহুকাল হইতে পরিয়া আসিতেছে। এই জুতার মধ্যেও মাজিয়ার জাতির কলানুশীলনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

বহির্জগৎ

শ্রীগোপাল হালদার

১

চীন-যুদ্ধের প্রথম বৎসর শেষ হইল, আমরাও 'চীনদিবস' পালন করিতেছি। গত বৎসর ৭ই জুলাই লিউকুচিয়াও-এর (Liukuchiao) সামান্য ঘটনায় এই ব্যাপারের সূচনা। এই বৎসর ৭ই জুলাই চীন সে-দিবস স্মরণ করিয়াছে নানা ভাবে নিজেদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া, ভারতবর্ষে আমরা সেই দিন উদ্‌যাপন করিয়াছি কংগ্রেসের নির্দ্দেশমত চীনের প্রতি আমাদের সহানুভূতি জানাইয়া ও যুদ্ধের সাহায্যার্থ সেবাদল ও শুশ্রূষাবাহিনী প্রেরণের উপযোগী চাঁদা তুলিয়া, আর জাপানে জাপানী কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন, যত দিন চীন অবনত না হয়, সেনাপতি চিয়াং-কাই-শেক বিতাড়িত না হন, তত দিন এই 'জেহাদ' চালাইতেই হইবে।

এই এক বৎসরের যুদ্ধের হিসাব এখনও লওয়া সম্ভব নয়—শুধু রণক্ষেত্রে কে কতখানি অধিকার করিয়াছে বা কতখানি পশ্চাৎপদ হইয়াছে তাহাই দেখা যাইতে পারে, কিন্তু দুইটি যুধ্যমান প্রকাণ্ড জাতির ও একটি বিশাল দেশের চরম জয়-পরাজয়ের হিসাবে উহাই শেষ কথা নয়।

'চীনের ব্যাপার' যে এত দূর গড়াইবে তাহা যেমন মার্কো পলো ব্রিজের আক্রান্ত জাপানী সৈন্যেরা জানিত না, তেমন 'ব্যাপারটা' একবার হাতে লইলে চুকাইয়া ফেলিতে যে এত দিন লাগিবে তাহাও জাপানী যুদ্ধ-নায়কেরা বা জাপানী রাষ্ট্রনায়কেরা প্রথমে কল্পনা করেন নাই। তাঁহাদের পরিকল্পনানুযায়ী যুদ্ধ চলে নাই—কেবলই দেরি হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ চীনারা তাঁহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছে প্রাণপণে। কিন্তু দেরি হইলেও জাপানের আক্রমণ-পরিকল্পনা যে কোথাও ব্যর্থ হইয়াছে তাহা বলা চলে না। উত্তর-চীনের উপর তাহার আধিপত্য সুদৃঢ় হইয়াছে; মধ্য-চীনে পীত নদী ও ইয়াংসি নদীর মধ্যস্থ ভূভাগ তাহারা বহুদূর আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে, সাংহাই ও নানকিনের পতনের পর চীনের প্রধান রেলপথগুলিও জাপান করতলগত করিয়াছে—সমস্ত উত্তর ও পূর্ব্ব-মধ্য চীনের সমুদ্রপারের প্রদেশগুলি আজ জাপানের অধিকারে—চীনের সাধারণ আর্থিক জীবনই তাই তাহার মুঠির মধ্যে আসিবে বলা চলে। উত্তর ও পূর্ব্ব-মধ্য চীনের এই বিস্তৃত ভূভাগকে একই জাপানী প্রভাবে বাঁধিয়া ফেলিয়া আপাতত জাপান থামিতেও পারিত। অনেকে শুচাও (Shuchow) জয়ের পরে তাহাই কল্পনাও করিয়াছিল। কিন্তু দেখা গেল, ইয়াংসির বুক বাহিয়া জাপানী রণতরী-বহর চীনের অভ্যন্তরে যাত্রা করিয়াছে, আর জাপানী সৈন্যবাহিনীও নদীর কূলে কূলে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কিছু দিনের মত বাধা দিল পীত নদীর বাঁধ-ভাঙা উত্তাল জলোচ্ছ্বাস ও ইয়াংসির প্লাবন, কিন্তু মোটের উপর হ্যাঙ্কাও (Hankow) জাপানী আক্রমণের অপেক্ষায় কাল গুণিতেছে, তাহাতে সংশয় নাই। ওহু (Wuhu) হইতে যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে—এখন হুকোও (Hukow) অধিকৃত হইল, এই দুই শত মাইলের পথ মাসখানেকে অধিকার সামান্য কথা নয়,—প্রশান্ত মহাসাগরের তীর হইতে আজ চীনের প্রায় পাঁচ শত মাইল ভিতরের দিকে জাপানী বাহিনী আসিয়া গিয়াছে। অবশ্য, এখনও হ্যাঙ্কাও দূর আছে—আরও দেড় শত মাইলেরও বেশী। কিন্তু হুকোওর পতন উল্লেখযোগ্য। ইহার পথে জাপানকে ছয়টি চীনা মাইনের জাল ভেদ করিতে হইয়াছে, মাতুংয়ের (Matun[illegible]) বাধা ভেদ করিতে হইয়াছে, এবং উপকূলের চীনা-কামান মেশিনগানের আক্রমণ বার বার নিরস্ত করিতে হইয়াছে—অবশ্য, ইহার ত্রিশ মাইল উপরে ইয়াংসির ব[illegible] কিউকিয়াংয়ে (Kiukiang) আছে আরও দুস্তর বা[illegible]। রণ-প্রয়োজনের দিক হইতে কিন্তু হুকোও গণনা করি[illegible]র মত স্থান—এখানে পোয়াং (Poyang) হ্রদের দ[illegible] প্রসারিত বক্ষে ইয়াংসি নদীর জলধারা আ[illegible]য়া পৌঁছিয়াছে। হ্রদ পার হইয়া হুকোওর সত্তর মা[illegible] দক্ষিণে নানচাং (Nanchang) দখল করা চ[illegible]। নানচাং জনাকীর্ণ বড় শহর, কিয়াংসি (Kiang[illegible])

জাপানীদের নৃশংসতা—তরবারির সাহায্যে চীনা বন্দীর মুণ্ডচ্ছেদ

প্রদেশের রাজধানী, বিমানের আস্তানা সেখানে আছে, আবার কিউকিয়াঙের সঙ্গে রেলপথেও সংযুক্ত। অতএব, নানচাংয়েরও সামরিক প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। তাহা ছাড়া, ইচ্ছা করিলে সেখান হইতে পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া হ্যাঙ্কাও ও ক্যাণ্টনের রেল-যোগাযোগ চ্যাংসার (Changsha) নিকটে ছিন্ন করিয়া ফেলা যায়, অবশ্য, হুকোও হইতে চ্যাংসার পথ পাহাড়ে পাহাড়ে দুর্গম—নানা বাধায় সেখানে তাই বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনাও আছে। যাহাই হউক, হ্যাঙ্কাওর পতন প্রায় সুনিশ্চিত,—জাপানীরাও সেই সুসংবাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে; একটা জয়বার্ত্তা জাপানবাসীদের কানে না-পৌছাইলে আর চলে না,—তাই বোধ হয় ইয়াংসির স্রোত বাহিয়া হ্যাঙ্কাওর দিকে জাপানীদের এই অভিযান।

প্রথম যখন যুদ্ধ বাধিয়াছিল তখনও সম্ভবত জাপানী রাজনীতিকদের মনে এই ধারণা এত সুস্পষ্ট ছিল না যে, এই যুদ্ধে চীনকে একেবারে পদানত করিয়া ফেলিবেন বা ফেলিতে হইবে। অবশ্য, এক দিক হইতে দেখিলে এই সঙ্কল্প জাপানের বহু পুরাতন, জাপানী মাত্রেরই সুপরিচিত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মেইজি যুগের প্রথম দিকেই জাপান ইউরোপীয় শক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ইউরোপীয় 'রেয়াল পলিটিক' বা 'বাস্তব রাজনীতি'তে আপনার বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ স্থির করিয়া ফেলে।—এই পঞ্চাশ বৎসরে চীন-জাপান যুদ্ধ, রুশ-চীন যুদ্ধ, মহাযুদ্ধে চীনে অধিকার বিস্তার—ফর্ম্মোজা, কোরিয়া, পোর্ট আর্থার প্রভৃতি অধিকার—এইরূপ প্রত্যেকটি পদক্ষেপে সে সেই দিকেই অগ্রসর হইয়াছে,—এক চুলও নড়চড় হয় নাই, একটুও ভুল হয় নাই। যুদ্ধ-শেষে জাপানী রাজনীতিতে যেরন শিশোদরা প্রমুখদের উদারনৈতিক মতবাদ প্রভাব বিস্তার করায় সেই গতি দিনকয়েক একটু বন্ধ ছিল, কিন্তু জাপানী যুদ্ধনায়করা অচিরেই রাজনীতিকদের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যকে আবার জাপানের চোখের সম্মুখে স্পষ্টতর করিয়া স্থাপিত করিলেন। তাহারই ফলে মাঞ্চুকুও অভিযান, উত্তর-চীনে নূতন রাজ্য গড়িবার প্রয়াস, মঙ্গোলিয়ায় প্রভাব বিস্তারের উদ্যোগ, আমুর নদীর তীরে সোভিয়েট-শক্তিকে নিস্তেজিত করার চেষ্টা, আর শেষে এই চীনের পালার প্রারম্ভ। কাজেই, সুদূর-প্রাচ্যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ যে এই ভাবেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে কৃতসঙ্কল্প, ইহা জানা কথা। শুধু সেই সময়, সেই সুযোগ যে এখনি আসিয়াছে, জাপানী রাজনীতিকরা তাহাই কল্পনা করিতে অক্ষম ছিলেন। সেই কাজটি জাপানী যুদ্ধনায়কেরাই সমাধা করিয়াছেন—তাঁহারাই এই যুদ্ধকে পাকাইয়া তুলেন, জাপানী ব্যবসায়ীমণ্ডল ও রাজনীতিকদের সমস্ত সঙ্কোচ-অনিচ্ছা উড়াইয়া দিয়া চীনের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু, তাঁহাদের

বাঁধা-সময় মানিয়া লইয়া জয়লক্ষ্মী তাঁহাদের গলায় বরমাল্য দিলেন না। একটু দেরিতে দেরিতে তাঁহার করুণা জুটিতে লাগিল। ফলে, জাপানের জাপানীরা অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। রাজনীতিকদের সাবধানী কথা-বার্ত্তায় তাহারা চিরদিনই অবিশ্বাসী, যুদ্ধের দিনে যুদ্ধ-নায়কদের পরামর্শ-প্রভাবই বাড়িয়া যায়। এদিকে চিয়াং-কাই-শেকের দৃঢ়তায়, চীনের আত্মরক্ষার ক্ষমতায়, সমগ্র চীনাবাসীর অভূতপূর্ব্ব ঐক্যে ও সর্ব্বশেষে চীন-সোভিয়েট মৈত্রীর সংবাদে জাপানীদের মনে যে সংশয় জাগিয়াছে তাহাতে এক দিকে দরকার হইল প্রিন্স কোনোয়ের (Konoe) মন্ত্রিমণ্ডলকে ঢালিয়া সাজার (হিরোতার স্থানে বৈদেশিক সচিব হইলেন জেনারেল উগাকি, জেনারেল আরাকি হইলেন শিক্ষামন্ত্রী ও জেনারেল ইয়োকী সমর-সচিব), অন্য দিকে দরকার হইল একটি বড় রকমের বিজয়-বার্ত্তার—তাই, ইয়াংসি বাহিয়া জাপানী অভিযান অগ্রসর হইল। আর এই এক বৎসর পরে উদ্‌গ্রীব জাপানবাসী জানিল, কত কত চীনা সৈন্য হতাহত হইয়াছে, কত চীনা কামান ও রণসম্ভার জাপানের হস্তগত হইয়াছে, আর চীনকে সমূলে ধ্বংস না করিয়া জাপান নিরস্ত হইবে না—চাই কি দশ বৎসরই না হয় চলিবে এই যুদ্ধ।

২

সাম্বৎসরিক বক্তৃতায় যেটুকু অতিশয়োক্তি থাকে তাহা বাদ দিয়াই বলা যায়, জাপান এবার দীর্ঘদিন যুদ্ধের জন্য তৈয়ারী হইতেছে, এবং সম্ভবত এই যুদ্ধেই চীনের ভাগ্য চূড়ান্ত রকমে স্থির করিয়া ফেলিতে ইচ্ছুক। অধিক দিন যুদ্ধ চলিবার পূর্ব্বেই জাপানকে যে একটা বোঝাপড়া করিতে হইবে, হয়ত এত বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও চীনের সঙ্গে সন্ধি করিয়া অনেকটা ছাড়িয়া দিয়া আসিতে হইবে, তাহারও প্রচুর কারণ আছে। এক কারণ অবশ্য মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, (এবং, তাহা হইলে, তাহার সহযোগী হিসাবে আসিবে, এশিয়ার অন্যতম প্রভু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য), কিন্তু আসল কারণ সোভিয়েট রুশিয়া।

৩

পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির এক চিন্তা চিরদিনই আছে নিজ-স্বার্থ সংরক্ষণ বা স্বার্থের পরিধি-প্রসার। ইহাই সনাতন রাষ্ট্রনীতি। কিন্তু, বর্ত্তমানে এই সব রাষ্ট্রের দ্বিতীয় এক চিন্তা জুটিয়াছে—সোভিয়েট রুশিয়া। যত দিন বিশ্ব-বিপ্লবে সোভিয়েট উৎসাহী ছিল তত দিন ইহার কারণ বুঝা যাইত; কিন্তু এখন সোভিয়েট 'এক দেশেই সমাজতান্ত্রিকতার' সাফল্য দেখাইতে যত্নপর; এখনও কেন আর পৃথিবীর প্রায় সমগ্র দেশই তাহার পতন চাহে? ষ্টালিনের কথাই কি ঠিক—এক দেশে এই কিষাণ-মজদুরের রাজ্য সার্থক হইলেই পৃথিবীর সকল দেশের কিষাণ-মজদুরেরা নিজেদের মূল্য বুঝিবে? তাই কি পৃথিবীর পুঁজিদার রাষ্ট্রচালকেরা উহার ধ্বংস না দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না? সোভিয়েটের শত্রু চারি দিকেই—ইতালী, জার্ম্মেনী ও জাপান মিলিয়া কোমিণ্টার্ণ-বিরোধী চুক্তি করিয়াছে; চেম্বারলেনের ব্রিটেনও মনে মনে সেই ভাবই পোষণ করে। দায়ে না পড়িলে কেহই সোভিয়েটের বন্ধুত্ব কামনা করে না—প্রমাণ তাহার স্পেন, চীন; প্রমাণ চেকোস্লোভাকিয়া ও ফ্রান্সও। শত্রুজালবেষ্টিত সোভিয়েটও তাই নিজের অভ্যন্তরে কোন কাঁটাই রাখিতে চাহে না, তাই সেখানে এত বিচার ও এত প্রাণদণ্ড। ইহার সবগুলি যে অকারণ নয়, ইহা পূর্ব্বেও দেখিয়াছি। হয়ত পুরাতন মধ্যবিত্ত সমাজের বুদ্ধিজীবী বিপ্লবী নেতারা নবজাগ্রত গণ-সমাজের বাস্তব চাপে পরাভূত হইয়া নানা দ্রোহিতার পথ খুঁজিতেছেন, হয়ত ব্যক্তিগত দ্বেষ ও হিংসা নীতিগত বিরোধিতার সহিত মিশিয়া তাঁহাদিগকে বৈদেশিক চক্রান্তে টানিয়া লইয়া গিয়াছে;—তাই সাইবেরিয়ার সুগঠিত রক্ত-বাহিনীর অনেক নায়ককে ষ্টালিন জাপানী গুপ্তচর সন্দেহে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। মোটের উপর, ষ্টালিনের শ্যেনদৃষ্টি সাইবেরিয়ার দিকে নিবদ্ধ আছে। চীন-যুদ্ধের পূর্ব্বে রুশিয়া জাপানের হাতে বারে বারে অনেক নিগ্রহ এই অঞ্চলে সহিয়াছে, কিন্তু এখন ধীরে ধীরে নিজের প্রতিষ্ঠা আবার সে পুনঃস্থাপিত করিয়া লইতেছে। জাপানের এই সমর-ব্যস্ততা তাই তাহার পক্ষে এক শুভ সুযোগ—এমন কি, জার্ম্মেনীর সহিত চেকোস্লোভাকিয়ার এই মুহূর্ত্তে যুদ্ধ বাধিলেও কোমিণ্টার্ণ-বিরোধী চুক্তির অন্যতম নায়ক জাপান রুশিয়াকে কার্য্যতঃ এই সময়ে পূর্ব্বপ্রান্তে আক্রমণ করিতে পারিবে না—চীনেই বাধা পড়িয়া থাকিবে। তাই, চীনের যুদ্ধ যত দীর্ঘ হয় ততই রুশিয়ার লাভ। সে-যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য চীনকে রণসম্ভার জোগানোও তাহারই নিজের দায়। আর, যদি জার্ম্মেনীর বিভীষিকা বিদূরিত হয়, তাহা হইলে শেষ দিকে সোভিয়েট এই প্রশান্ত সাগরের তীরে যুদ্ধে নামিয়া পড়িয়া সেই চরম নিমেষে এক দুঃসহ আঘাতে
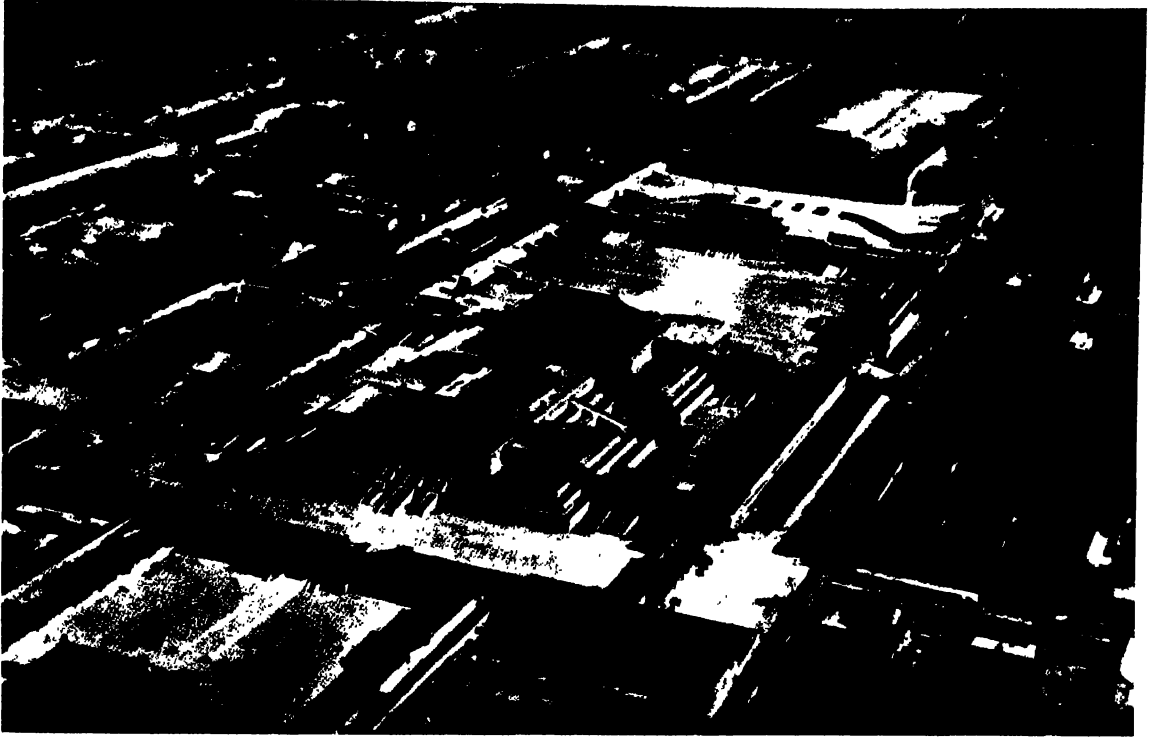
পিকিঙের "নিষিদ্ধ পুরী"। এক সময়ে ইহা চীন-সম্রাটের নিবাস ছিল। ইহার অন্তর্ভুক্ত বহুমূল্য শিল্পনিদর্শনাবলীর কথা গত সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে।
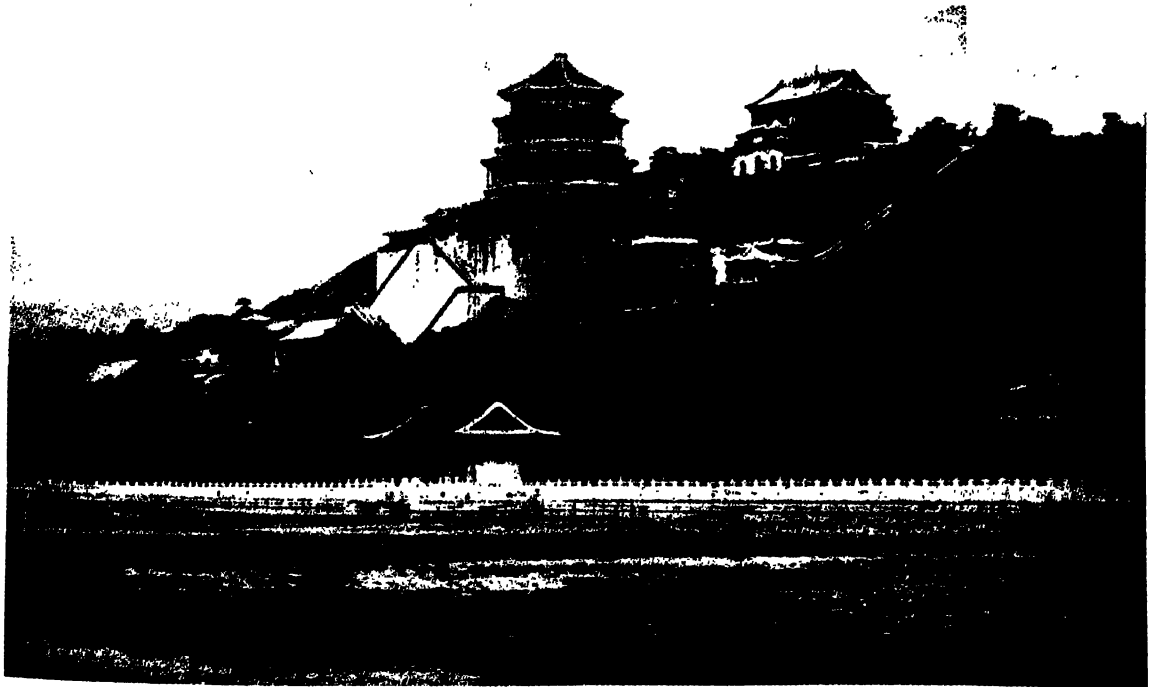
পিকিঙের ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত চীনের "নিদাঘ-প্রাসাদ"
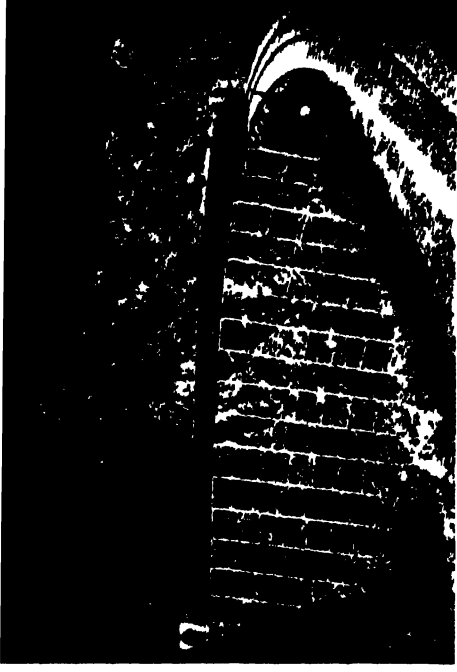
পঞ্চশত উপদেবতার মন্দিরের এক কোণ—য়ুনান-ফু

পূর্ব্বদেশ-মঠের চূড়া—য়ুনান-ফু

চীন-সরকারের দপ্তরে কম্যুনিষ্ট সেনাদলের প্রতিনিধি চু এন-লাই

মিয়া-চিউ জাতীয়া স্ত্রীলোকের বেশভূষা

এণ্টিয়ক হইতে আলেকজাণ্ড্রেটার পথ

সিরিয়া ও তুরস্কের মধ্যবর্ত্তী কিরিক খান গ্রাম

কারা-সু উপত্যকার প্রান্তে সামরিক আড্ডা

কারা-সু উপত্যকার প্রারম্ভ স্থল। দূরে কুর্দ দাঘ গিরিশ্রেণী দেখা যাইতেছে।

জাপানকেও ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিতে পারে। এসব অবশ্যই কল্পনা, কিন্তু অসম্ভব কল্পনা নয়। অন্তত, যুদ্ধে জাপানের বলক্ষয়ে যে রুশিয়ার পরোক্ষে লাভ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। জাপানও তাহা বুঝিতেছে; তাই দশ বৎসর ধরিয়া চীনে সে নিজেকে উজাড় করিবে, এমন মূর্খ জাপান অন্তত নয়। তাহা ছাড়া, কোনোয়ের মন্ত্রিমণ্ডলস্থ উগাকি, আরাকি প্রভৃতি সেনাপতিরা সোভিয়েট রুশিয়ার একেবারে চিরশত্রু—উহার উচ্ছেদই তাঁহাদের বড় লক্ষ্য। কোনোয়ের এই পরিষদ্ চীন-বিরোধীও যেমন, তেমনি আবার সোভিয়েট-বিরোধী। অতএব চীনে যতই যুদ্ধ চলুক, ইঁহারা বিস্মৃত হইবেন না যে, জাপানের প্রধান শত্রু রুশিয়া, সে প্রস্তুত রহিয়াছে শুধু সুযোগের অপেক্ষায়। সে অপেক্ষা কেমন, তাহা অত্যন্ত আধুনিক (৩রা জুলাই) একটি রয়টারের সংবাদেই প্রকাশ—

সোভিয়েট স্বরাষ্ট্র-বিভাগের সুদূর-প্রাচ্য শাখার প্রধান কমিশনার জেনারেল লুসকোভ সোভিয়েট রুশিয়া হইতে পলায়ন করিয়াছেন। তিনি সীমান্ত অতিক্রম করিয়া মাঞ্চুকুয়োতে প্রবেশ করিয়াছেন। ষ্টালিনকে হত্যার এবং সোভিয়েট সরকারকে উৎখাতের একটি ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর উক্ত জেনারেল পলায়ন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। জেনারেল লুসকোভ একটি বিস্ময়কর বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ষ্টালিন জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য গ্যাস প্রস্তুত করিতেছেন। উক্ত বিবৃতি টোকিওতে প্রকাশিত হইয়াছে। বিবৃতিতে ষ্টালিনকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, জাপান যাহাতে ক্ষয়কর যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তজ্জন্য সোভিয়েট সরকার মুক্ত হস্তে চীনকে সাহায্য করিতেছে। সোভিয়েটের উদ্দেশ্য হইতেছে জাপান ক্লান্ত হইয়া পড়িলে এক আঘাতে জাপানকে চূর্ণ করিয়া দেওয়া। জেনারেল লুসকোভ বলেন যে তিনি গত মে মাসে মস্কোতে গেলে সুদূর-প্রাচ্যের লাল ফৌজের অধিনায়ক জেনারেল ব্লুচার তাঁহার বিভাগের কাজ অসন্তোষজনক বলিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করেন। পরে তাঁহার (লুসকোভের) সেক্রেটারীকে মস্কোতে ডাকিয়া পাঠান হয়। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বুঝিয়া তিনি তাঁহার পত্নীকে পোল্যাণ্ড পাঠাইয়া নিজে মাঞ্চুকুয়োতে পলায়ন করিবেন স্থির করেন।

জাপ সমর-বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ৩৬ নং সৈন্যবাহিনীর গোলন্দাজ বাহিনীর মেজর ফ্রানজেভিচ গত ২৯শে মে মোটরকার যোগে বহির্মঙ্গোলিয়া হইতে অন্তঃমঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত উজেচেতে প্রবেশ করিয়াছেন। (যুগান্তর)

যে-টোকিওতে জেনারেল লুসকোভের এই বিবৃতি প্রকাশিত হয়, তাহার সব কথাই সে-টোকিওর সুপরিজ্ঞাত। নিতান্ত ব্যস্ত না-থাকিলে ইতিপূর্বেই চীনে রুশ-সাহায্য পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে মঙ্গোলিয়ায় ও সাইবেরিয়ায় একাধিক 'ইন্‌সিডেণ্ট' ঘটাইতে দ্বিধা করিত না। আর এখন? জাপানী সেনানায়কেরা ব্যস্ত বলিয়াই এত বুদ্ধান্ধ নন যে, সোভিয়েটের উদ্দেশ্য-উদ্যোগ চোখে দেখিতে পান না। তাই চীনের ব্যাপার জাপানের পক্ষে এক সুযোগে মীমাংসা করিয়া ফেলা অসম্ভব নয়—যতই এখন সে-সম্বন্ধে বাগাড়ম্বর চলুক।

৪

একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে চীনে জাপান বাধা পাইয়া ঠেকিয়া থাকিলে শুধু যে-শক্তি সব চেয়ে বেশী লাভবান্ হইবে হয়ত সে যুক্তরাষ্ট্রও নয়—সে ব্রিটেন। অবশ্য, চীন জাগ্রত ও সবল হইয়া উঠিলেও তাহার স্বার্থ-নাশের অনেক সম্ভাবনা; চীন যে-ভাবে সোভিয়েটের বাহুপাশে বদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, তাহাতেও সে খুশী হইবার কথা নয়—দুই-ই পরিণামে প্রাচ্য ভূখণ্ডে ব্রিটিশ স্বার্থের হানি করিবে—তবু পাশ্চাত্য প্রদেশে, ভূমধ্যের পথ ও নিজ-গৃহাঙ্গন লইয়া ব্রিটেনের আজ দুর্ভাবনা এত জুটিয়াছে যে, সে চীন-জাপান কাহাকেও আর নিজ স্বার্থের অনুকূল পথে আনিবার অবসর পায় না। চেকোস্লোভাকিয়ার সমস্যা এখনও ধূমায়িত; এদিকে ফ্রাঙ্কোর জয় পিছাইয়া যাওয়ায় ইঙ্গ-ইতালী চুক্তি কার্য্যকরী করা সম্ভব হইতেছে না—ইতালী স্পেন হইতে সৈন্য অপসারণ করিতেছে না। 'নিরপেক্ষতা-পরিষদে'র প্রতিনিধিগণ অনেক দর-কষাকষি করিয়া এখন ব্রিটেন যে সৈন্য প্রত্যাহারের প্ল্যান দাখিল করিয়াছে তাহা গ্রহণ করিল—এবার হয়ত ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি কাজে আসিবার পথ পরিষ্কার হইল। নিরপেক্ষতা-পরিষদে ব্রিটেনের প্রস্তাবের তাৎপর্য্য ও ফলাফল নিম্নের উদ্ধৃতি হইতেই স্পষ্ট হইবে:

ফাসিস্তরা ইতিমধ্যেই ফরাসী সীমান্ত তদারকের ব্যবস্থা করিয়াছে। ভূমি ও সমুদ্রে আন্তর্জ্জাতিক তত্ত্বাবধানের সঙ্গেসঙ্গেই ঐ ব্যবস্থা বলবৎ হইবে। এদিকে সমুদ্রপথেও গণতন্ত্রী স্পেনে সাহায্য আসিবার উপায় নাই; কারণ একটি বন্দর ছাড়া আর সব বন্দরই বিদ্রোহীরা অবরোধ করিতে পারিবে। অথচ নিরপেক্ষতা-কমিটি সমুদ্রে যে আন্তর্জ্জাতিক তদারকের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে সমুদ্রপথে ফ্রাঙ্কোর নিকট সাহায্য যাওয়া বন্ধ হইবে না।

ফ্রান্সের পক্ষে ইহাতে যে বিপদ তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান। ইংলণ্ডকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সে নিরপেক্ষতা-প্ল্যান অনুযায়ী সীমান্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট কয়েক সপ্তাহ বৃথা অতিবাহিত হইলে

সীমান্ত খুলিয়া দিবার অধিকার তাহার এখনও আছে। কিন্তু এ অধিকার কোন কাজের নয়; কারণ ধরা যাক, এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের শেষে, কিন্তু ফ্রান্স কার্য্যতঃ সীমান্ত খুলিয়া দিবার পূর্ব্বে (এ সাহস ফ্রান্সের কখনও হইবে কি না সন্দেহ) মুসোলিনী 'চেম্বারলেনের মুখরক্ষা'র জন্ত তাঁহার বহু-আলোচিত ১০ হাজার সৈন্ত সরাইয়া লইলেন; তখন ফরাসী-সীমান্তের কর্তৃত্ব আপনা হইতেই নিরপেক্ষতা কমিটির হাতে চলিয়া যাইবে। (আনন্দ বাজার পত্রিকা)

এই 'নিরপেক্ষতা-কমিটি'র সিদ্ধান্তের ফলে কি হইবে তাহা মঃ ব্লুম্ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন (৭ই জুলাই);

মঃ ব্লুম "পপ্যুলেয়র" পত্রিকায় নিরপেক্ষতা কমিটির কার্য্য সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে তিনি স্পেন হইতে বিদেশী সৈন্ত অপসারণের প্ল্যান সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আন্তর্জ্জাতিক তদারক-ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদের সুবিধার জন্ত পর্ত্তুগীজ সীমান্ত এবং সমুদ্রোপকূল খুলিয়া রাখা হইবে কিংবা এই সময় গণতন্ত্রীদের ক্ষতির জন্ত ফরাসী সীমান্ত একেবারে বন্ধ করিয়া রাখা হইবে। তিনি বলিয়াছেন যে, বৃটিশ প্ল্যানে স্পেন গবর্ণমেণ্টের প্রতি এমনই তো অবিচার করা হইয়াছে; এখন যদি আবার আন্তর্জ্জাতিক তদারক পুনঃ প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে বিভিন্ন দেশের তদারক ব্যবস্থা সমান কড়াকড়িভাবে প্রযুক্ত না হয় তাহা হইলে ঐ অবিচার অসহ্য ও মর্ম্মান্তিক হইবে। (যুঃ.)

কিন্তু স্পেনের ব্যাপারে কোন অবিচারই আজ আর অসহ্য নয়—মর্ম্মান্তিকও নয়। উহাই নিয়ম।

৫

বিচার-বিবেচনার একটি ছোট তর্ক তবু উঠিয়াছে চীনে জাপানীদের ও স্পেনে বিদ্রোহী দলের অবাধ বোমা-বর্ষণে। অসামরিক সাধারণ নরনারীদের প্রাণ লইয়া এই যে ছিনিমিনি খেলা, ইহাতে নাকি আমেরিকার বৈদেশিক সচিব কর্ডিল হাল ও ব্রিটেনের সভ্য অধিবাসীরা অসহ্য ও মর্ম্মান্তিক পীড়া পাইতেছেন। কিন্তু কথাটা যখন এই সব দুষ্কৃতকারীর কানে তোলা হইল তখন তাহারা বিদ্রূপ করিতে ছাড়িল না। জার্ম্মান কাগজগুলি ব্যঙ্গভরে মনে করাইয়া দিল, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ব্রিটেন অনেকবার এই কাণ্ড করিয়াছে, প্যালেষ্টাইনে এখনও তাহার পুনরভিনয় করিতে তাহার বাধে না—এই মুহূর্ত্তে প্যালেষ্টাইনে আরবরা যে বিদ্রোহিতা নূতন করিয়া সুরু করিয়াছে, তাহা দমাইবার জন্যও কি বৈমানিক বোমাবৃষ্টির দরকার হইবে?—পার্লিয়ামেণ্টে কিন্তু তর্ক উঠিল; ব্রিটেনের মন হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করিল কি? চেম্বারলেন জানাইলেন—কাজটা অন্যায়, তাহা ছাড়া নিষ্ফলও। অবশ্য, ভারতের সীমান্তে ব্রিটিশ কার্য্যের সঙ্গে উহার তুলনা হয় না। সেখানে ব্রিটেন অধিবাসীদের পূর্ব্বেই সাবধান করে। ব্রিটেনের মন বোধ হয় স্বস্তি পাইল। কিন্তু প্রথম বারের অভিজ্ঞতার পর ক্যাণ্টন, বার্সিলোনা, মাদ্রিদ্‌এর সম্বন্ধেও বলা চলে যে, উহারাও জানিতই এইরূপ বোমাবৃষ্টি আরও হইবে। কার্য্যত, ইহাই তো সাবধান করা। তাহা ছাড়া, ব্রিটেন আজ কৌতুককর সে ক্ষুদ্র তথ্যটি চাপিয়া গেলে চলিবে কেন?—জাতিসঙ্ঘে যখন এই বৈমানিক বোমাবৃষ্টি নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব উঠে, তখন উহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন ব্রিটেন স্বয়ং—ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ইহা ছাড়া কি শান্তি রাখা যায়? আজ যখন অন্য জাতি এই মহা-জাতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছে তখন অবশ্য ব্রিটেনই বলিতেছে—বড় অন্যায়, বড় অন্যায়। কিন্তু দুনিয়ার মুখ চাপা পড়ে না, আমাদের মুখেও ফুটে একটু হাসি—ব্রিটেনের ন্যায়বুদ্ধিতে, সহৃদয়তায়। চীনের অগণিত নরনারীর উদ্দেশ্যে আজ আমরা যখন সহমর্ম্মিতা জ্ঞাপন করি, তখন তাহারাও কি মনে করিবে না—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কথা, মনে করিবে না স্পেনের কথা, প্যালেষ্টাইনের বোমা-বিধ্বস্ত আরবদের কথা, অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মানের অত্যাচরিত য়িহুদীদের কথা, ইথিওপিয়ার কৃষ্ণকায় মানুষগুলির জীবন-নাশের কথা,—মনে করিবে না, স্পেনের মনীষীরা যেমন চীনের ব্যথায় উপলব্ধি করিয়াছেন—সেই অতিগভীর ও বৃহৎ এই সত্যটি—"অখণ্ড এই সংগ্রাম—" "বিশ্বসভ্যতার ভবিষ্যৎই আজ অনিশ্চিত?"

মৌলানা জিয়াউদ্দিন*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজকের দিনে একটা কোনো অনুষ্ঠানের সাহায্যে জিয়াউদ্দিনের অকস্মাৎ মৃত্যুতে আশ্রমবাসীদের কাছে বেদনা প্রকাশ করব, একথা ভাবতেও আমার কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে। যে অনুভূতি নিয়ে আমরা একত্র হয়েছি তার মূলকথা কেবল কর্তব্যপালন নয়, এ অনুভূতি আরও অনেক গভীর।

জিয়াউদ্দিনের মৃত্যুতে যে স্থান শূন্য হ'ল তা পূরণ করা সহজ হবে না, কারণ তিনি সত্য ছিলেন। অনেকেই তো সংসারের পথে যাত্রা করে, কিন্তু মৃত্যুর পরে চিহ্ন রেখে যায় এমন লোক খুব কমই মেলে। অধিকাংশ লোক লঘুভাবে ভেসে যায় হাল্কা মেঘের মত। জিয়াউদ্দিন সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না; আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তিনি যে স্থান পেয়েছেন তা নিশ্চিহ্ন হয়ে এক দিন একেবারে বিলীন হয়ে যাবে একথা ভাবতে পারি নে। কারণ তাঁর সত্তা ছিল সত্যের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। আশ্রম থেকে বাইরে গিয়েছিলেন তিনি ছুটিতে, তাঁর এই ছুটিই যে শেষ ছুটি হবে অদৃষ্টের এই নিষ্ঠুর লীলা মন মেনে নিতে চায় না। তিনি আজ পৃথিবীতে নেই সত্য, কিন্তু তাঁর সত্তা ওতপ্রোত ভাবে আশ্রমের সব কিছুর সঙ্গে মিশে রইল।

তিনি প্রথম আশ্রমে এসেছিলেন বালক বয়সে ছাত্র হিসাবে, তখন হয়তো তিনি ঠিক তেমন ক'রে মিশতে পারেন নি এই আশ্রমিক জীবনের সঙ্গে, যেমন পরিপূর্ণ ভাবে মিশেছিলেন পরবর্তী কালে। কেবল যে আশ্রমের সঙ্গে তাঁর হৃদয় ও কর্মপ্রচেষ্টার সম্পূর্ণ যোগ হয়েছিল তা নয়, তাঁর সমস্ত শক্তি এখানকার আবহাওয়ায় পরিণতি লাভ করেছিল। সকলের তা হয় না। যাঁরা পরিণতির বীজ নিয়ে আসেন তাঁরাই কেবল আলো থেকে হাওয়া থেকে পরিপক্কতা আহরণ করতে পারেন। এই আশ্রমের যা সত্য যা শ্রেষ্ঠ সেটুকু জিয়াউদ্দিন এমনি ক'রেই পেয়েছিলেন। এই শ্রেষ্ঠতা হ'ল মানবিকতার, আর এই সত্য হ'ল আপনাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত ক'রে দেবার শক্তি। ধর্মের দিক্‌ থেকে এবং কর্মের দিকে অনেকের সঙ্গেই হয়তো তাঁর মূলগত প্রভেদ ছিল, কিন্তু হৃদয়ের বিচ্ছেদ ছিল না। তাঁর চলে যাওয়ায় বিশ্বভারতীর কর্মক্ষেত্রে যে বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল, সেটা পূরণ করা যাবে না। আশ্রমের মানবিকতার ক্ষেত্রে তাঁর জায়গায় একটা শূন্যতা চিরকালের জন্যে রয়ে গেল। তাঁর অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতা, তাঁর মত তেমনি ক'রে কাছে আসা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না, সঙ্কোচ এসে পরিপূর্ণ সংযোগকে বাধা দেয়। কর্মের ক্ষেত্রে যিনি কর্মী, হৃদয়ের দিক্‌ থেকে যিনি ছিলেন বন্ধু, আজ তাঁরই অভাবে আশ্রমের দিক্‌ থেকে ও ব্যক্তিগত ভাবে আমরা এক জন পরম সুহৃদকে হারালাম।

প্রথম বয়সে তাঁর মন বুদ্ধি ও সাধনা যখন অপরিণত ছিল, তখন ধীরে ধীরে ক্রমপদক্ষেপে তিনি আশ্রমের জীবনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এখন তাঁর সংযোগের পরিণতি মধ্যাহ্নসূর্য্যের মত দীপ্যমান হয়েছিল, আমরা তাঁর পূর্ণ বিকাশকে শ্রদ্ধা করেছি এবং আশা ছিল আরো অনেক কিছু তিনি দিয়ে যাবেন। তিনি যে বিদ্যার সাধনা গ্রহণ করেছিলেন সেই স্থান তেমন ক'রে আর কে নেবে; আশ্রমের সকলের হৃদয়ে তিনি যে সৌহার্দের আসন পেয়েছেন সে আসন আর কী ক'রে পূর্ণ হবে?

আজকের দিনে আমরা কেবল বৃথা শোক করতে পারি। আমাদের আদর্শকে যিনি রূপ দান করেছিলেন তাঁকে অকালে নিষ্ঠুরভাবে নেপথ্যে সরিয়ে নেওয়ায় মনে একটা অক্ষম বিদ্রোহের ভাব আসতে পারে। কিন্তু আজ মনকে শান্ত করতে হবে এই ভেবে যে তিনি যে অকৃত্রিম মানবিকতার আদর্শ অনুসরণ ক'রে গেছেন সেটা বিশ্বভারতীতে তাঁর শাশ্বত দান হয়ে রইল। তাঁর সুস্থ চরিত্রের সৌন্দর্য, সৌহার্দের মাধুর্য ও হৃদয়ের গভীরতা তিনি আশ্রমকে দান ক'রে গেছেন, এটুকু আমাদের

---

* মৌলানা জিয়াউদ্দিন শান্তিনিকেতনে ইসলামীয় সংস্কৃতির অধ্যাপক ছিলেন। হৃদয়ের ঔদার্য্যে, চরিত্রের মাধুর্য্যে ও বিদ্যার গভীরতায় তিনি পরিচিত সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার অকালমৃত্যু উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে শোকসভায় রবীন্দ্রনাথের ভাষণের শ্রীক্ষিতীশ রায় লিখিত অনুলিপি ও বন্ধু-স্মৃতি উপলক্ষ্যে রচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইল—প্র. স.

পরম সৌভাগ্য। সকলকে তো আমরা আকর্ষণ করতে পারি না। জিয়াউদ্দিনকে কেবল যে আশ্রম আকর্ষণ করেছিল তা নয়, এখানে তিনি তৈরি হয়েছিলেন, এখানকার হাওয়া ও মাটির রসসম্পদে, এখানকার সৌহার্দে তাঁর হৃদয়মন পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। তিনি যে সম্পদ দিয়ে গেলেন তা আমাদের মনে গাঁথা হয়ে রইবে, তাঁর দৃষ্টান্ত আমরা ভুলব না।

আমার নিজের দিক্ থেকে কেবল এই কথাই বলতে পারি যে এ রকম বন্ধু দুর্লভ। এই বন্ধুত্বের অঙ্কুর এক দিন বিরাট মহীরুহ হয়ে তার সুশীতল ছায়ায় আমায় শান্তি দিয়েছে—এ আমার জীবনে একটা চিরস্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকল। অন্তরে তাঁর সন্নিধির উপলব্ধি থাকবে, বাইরের কথায় সে গভীর অনুভূতি প্রকাশ করা যাবে না।

শান্তিনিকেতন ৮।৭।৩৮

মৌলানা জিয়াউদ্দীন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কখনো কখনো কোনো অবসরে
নিকটে দাঁড়াতে এসে,
"এই যে" ব'লেই তাকাতেম মুখে
"বোসো" বলিতাম হেসে—
দু'চারটে হোত সামান্ত কথা,
ঘরের প্রশ্ন কিছু
গভীর হৃদয় নীরবে রহিত
হাসিতামাশার পিছু।
কত সে গভীর প্রেমে সুনিবিড়
অকথিত কত বাণী—
চিরকাল তরে গিয়েছ যখন
আজিকে সে কথা জানি।
প্রতি দিবসের তুচ্ছ খেয়ালে
সামান্ত যাওয়া-আসা
সেটুকু হারালে কতখানি যায়
খুঁজে নাহি পাই ভাষা।
তব জীবনের বহু সাধনার
যে পণ্যভার ভরি'
মধ্যদিনের বাতাসে ভাসালে
তোমার নবীন তরী
যেমনি তা হোক মনে জানি তা :
এতটা মূল্য নাই
যার বিনিময়ে পাবে তব স্মৃতি
আপন নিত্য ঠাঁই,—

সেই কথা স্মরি' বার বার আজ
লাগে ধিক্কার প্রাণে
অজানা জনের পরম মূল্য
নাই কি গো কোনোখানে।
এ অবহেলার বেদনা বোঝাতে
কোথা হতে খুঁজে আনি
ছুরির আঘাত যেমন সহজ
তেমন সহজ বাণী।
কারো কবিত্ব কারো বীরত্ব
কারো অর্থের খ্যাতি,
কেহ বা প্রজার সুহৃদ্ সহায়
কেহ বা রাজার জ্ঞাতি,
তুমি আপনার বন্ধুজনেরে
মাধুর্যে দিতে সাড়া
ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা
সকল খ্যাতির বাড়া।
ভরা আষাঢ়ের যে মালতীগুলি
আনন্দ মহিমায়
আপনার দান নিঃশেষ করি'
ধুলায় মিলায়ে যায়—
আকাশে আকাশে বাতাসে তাহারা
আমাদের চারিপাশে
তোমার বিরহ ছড়ায়ে চলেছে
সৌরভ নিঃশ্বাসে॥

শান্তিনিকেতন ৮।৭।৩৮

বিবিধ প্রসঙ্গ

বঙ্গের সৌভাগ্য, অহঙ্কার-সম্ভাবনা, ও অনিষ্ট-সম্ভাবনা

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন রায় শতবার্ষিকী হইয়াছিল। তাহার পর পরমহংস রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী হয়। বর্ত্তমান বৎসরে হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী ও বঙ্কিম শতবার্ষিকী হইয়া গেল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শতবার্ষিকীও এই বৎসরে হইবে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর তিরোভাব শোকসহকারে-স্মরণীয় গত বৎসরের একটি ঘটনা। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে বহু নগরে ও গ্রামে শোক-সভা হইয়াছিল। বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বার্ষিক স্মৃতিসভা নিয়মিতরূপে হইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভা এ-বৎসর বিশেষ সমারোহে বীরসিংহ গ্রামে ও মেদিনীপুরে হইয়াছিল এবং তাহার ফলে তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ বাহির হইতেছে।

গত বৎসর রবীন্দ্রনাথ কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করায় এই বৎসর তাঁহার জন্মোৎসব বিশেষ উৎসাহ সহকারে অনেক স্থানে হইয়া গিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গে যে-সকল বিখ্যাত লোকের তিরোভাব, বা জন্ম, বা জন্ম ও তিরোভাব হয়, তাঁহাদের সকলের নাম করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে—করা হইলও না। কেবল কয়েক জনের নাম করিলাম। ইঁহারা এক শ্রেণীর, এক রকমের মানুষ নহেন, সমান প্রসিদ্ধও নহেন। সকলের জন্য সব বাঙালী গৌরব বোধ করেন নাই। কিন্তু ইঁহাদের প্রত্যেকের জন্যই অল্প বা অধিকসংখ্যক বাঙালী গৌরব বোধ করিয়াছেন। এবং ইহাও নিশ্চিত, যে, আধুনিক সময়ে এত শক্তিমান ব্যক্তির বঙ্গে জন্মগ্রহণ বাঙালী জাতির পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়। এইরূপ সৌভাগ্য অধুনাতন কালে হয়ত ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের হয় নাই।

শতবার্ষিকী, স্মৃতিসভা, ও বার্ষিক জন্মোৎসব বাঙালীকে মনে পড়াইয়া দেয়, যে, বঙ্গে কত বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বহুবিধ কৃতিত্ব আমাদিগকে তাঁহাদের শক্তি ও প্রতিভা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহাতে আমাদের আনন্দ হয়, আমরা গৌরব বোধ করি।

কিন্তু এই গৌরববোধের সঙ্গে অহঙ্কার আসিবার সম্ভাবনা। হয়ত অনেকের, হয়ত খুব বেশীসংখ্যক বাঙালীর অহঙ্কার জন্মিয়াছে—আমরা কি যে-সে জাতি! আমাদের মধ্যে অমুক অমুক অমুক জন্মিয়াছেন!

বঙ্গে প্রকৃত মহৎ লোক যত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের স্বজাতীয় বলিয়া পরিচয় দিবার মত জীবন আমরা যাপন করিতেছি কি না, তাহা আমাদের চিন্তা করা কর্ত্তব্য। আমাদিগকে তাঁহাদের প্রত্যেকের বা সকলের বা কাহারও সমান হইতে হইবে, একথা বলিতেছি না। আমাদের শক্তি তাঁহাদের সমান নহে। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের বিধিদত্ত শক্তির সুব্যবহার যতটুকু করিয়াছিলেন, আমাদের সামান্য শক্তির অনুপাতে আমরা তাহার সেইরূপ সুব্যবহার করিতেছি কি না, তাহাই ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

আর যাহা ভাবিতে হইবে, তাহা ভাবিলে আমাদের উদ্বিগ্ন হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু উদ্বেগ সত্ত্বেও আশা পোষণ করিয়া আমাদিগকে উদ্যমশীল হইতে হইবে।

বাংলা দেশে অনেক অসাধারণশক্তিসম্পন্ন মানুষ আধুনিক সময়ে জন্মিয়াছিলেন। একে একে অধিকাংশের তিরোভাব ঘটিয়াছে। অল্পসংখ্যক যাঁহারা বাকী আছেন, তাঁহাদেরও বয়স হইয়াছে, যথাসময়ে তাঁহাদেরও তিরোভাব হইবে।

এই সকল মানুষের দ্বারা যে-কাজ হইয়াছে, সেইরূপ কাজ করিবার মানুষ আর আছে কি না, তাহাই চিন্তার বিষয়। এরূপ অবশ্য কোন দেশেই কোন যুগে সচরাচর ঘটে না, যে, এক জন অসাধারণ মানুষের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবার মত আর একটি মানুষ পাওয়া গেল। কিন্তু অসাধারণ মানুষ এক জনের অভাব হইলেই আর এক জন অসাধারণ মানুষ তাঁহার জায়গায় কাজ করিবার জন্য পাওয়া না-গেলেও, এক জনের কাজ যে-রকমের দশ জনের দ্বারা হইতে পারে, সেই রকম দশ জন অকপট আগ্রহশীল চরিত্রবান্ পরিশ্রমী মানুষ পাওয়া যাইতে পারে। অসাধারণ এক জন মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রভাব যে প্রকার, এই রকম দশ জন মানুষের সম্মিলিত প্রভাব সেরূপ না-হইতে পারে।

কিন্তু অসাধারণ মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেও তাঁহার প্রভাব লুপ্ত হয় না; তাঁহার জীবনের স্মৃতি তাঁহার প্রভাবকে জীবিত ও সক্রিয় রাখে। তাহার উপর, যদি শ্রদ্ধাবান্ উল্লিখিত প্রকারের দশ জন মানুষ থাকে, তাহা হইলে সমাজ অচল হয় না, পচে না। এবং কালক্রমে আবার অসাধারণ মানুষেরও আবির্ভাব হয়।

এখন আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, ধর্ম্মে, সমাজহিত-কর্ম্মে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে, শিল্পে,...এক এক জন যাঁহারা গিয়াছেন ও যাইবেন, অন্ততঃ তাঁহাদের ভাবধারা, চিন্তাধারা, কর্ম্মধারা,...বজায় রাখিবার মত ও শ্রদ্ধাবান্ দশ দশ জন মানুষের আবির্ভাব বঙ্গে হইয়াছে, হইতেছে কি না।

অসাধারণ মানুষের আবির্ভাব যে-সব অবস্থার সমবায়ে ঘটে, সেইরূপ অবস্থা ঘটান মানুষের চেষ্টাসাপেক্ষ কি না, তাহার বিচার সহজসাধ্য নহে। কিন্তু যেরূপ দশ দশ জনের কথা বলিলাম, সামাজিক হাওয়ায় শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক আগ্রহ থাকিলে সেই প্রকার দশ দশ জন মানুষ প্রস্তুত হইতে পারে। এই হাওয়া একটা অ-বৈয়ক্তিক (impersonal) জিনিষ নহে, বহু ব্যক্তির শ্রদ্ধা ও আগ্রহ হইতে ইহার উদ্ভব হয়।

—

বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিকী

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের এক শত বৎসর পরে বাংলা দেশের রাজধানীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যথাযোগ্য ভাবে শতবার্ষিক উৎসব সমাপন করিয়াছেন। এই প্রধান উৎসব ব্যতীত কলিকাতায় আরও উৎসব হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বঙ্গের বহু নগরে ও গ্রামে এবং বঙ্গের বাহিরেও নানা স্থানে উৎসব হইয়াছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য, বাংলার ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের জন্য, বাংলা ভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান দর্শন ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে স্বাধীন চিন্তার উন্মেষের জন্য, বাঙালীদের মধ্যে প্রকৃত স্বাজাতিকতা জাগাইবার জন্য, এবং বিশ্বমানবের মনের সহিত বাঙালীর মনের সেতু রচনার জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে অমর করিয়াছে। বাঙালী তাঁহার ঋণ কখনও শোধ করিতে পারিবে না।

উৎসব যে কেবল গান, বক্তৃতা ও প্রবন্ধপাঠেই সমাপ্ত হইল না, তাহা সন্তোষের বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর শতবার্ষিক সংস্করণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বাহির করিতেছেন। পরিষৎ তাঁহার কাঁঠালপাড়ার বাড়ীর অধিকারী হইয়া তাহা মেরামত করাইয়া রক্ষা করিবেন এবং তাহাতে তাঁহার গ্রন্থাবলী ও তাঁহার স্মৃতিবিজড়িত নানা দ্রব্য রাখিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে পরীক্ষা লইয়া তাহাতে উত্তীর্ণ সকলের নাম প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিবেন এবং বিশেষ পারদর্শিতার জন্য পুরস্কার দিবেন।

আর দুটি কাজ করা আবশ্যক বলিয়া এখন আপাততঃ মনে হইতেছে।

কলিকাতায় ও অন্যত্র এই উৎসব উপলক্ষ্যে কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলির মূল পাণ্ডুলিপি, বা স্বতন্ত্র মুদ্রিত প্রতিলিপি, বা সংবাদপত্রে প্রকাশিত মুদ্রিত টুকরা, সংগ্রহ করিয়া তাহার মধ্যে স্থায়ী আকারে রক্ষণযোগ্যগুলি বাছিয়া যদি পরিষৎ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহা শুধু যে এই উৎসবের উপযুক্ত স্মারক হইয়া থাকিবে, তাহা নহে, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর রসগ্রাহীদিগের ও পাঠকদের কাজে লাগিবে।

দ্বিতীয় কাজটি, বঙ্কিমচন্দ্রের যে-যে গ্রন্থ ভারতীয় ও বৈদেশিক যে-যে ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া অনুবাদগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে এবং কাঁঠালপাড়ায় তাঁহার ভবনে রক্ষা করা। নানা ভাষার তর্জ্জমাগুলির পূরা তালিকা বোধ হয় এখনও কেহ প্রস্তুত করেন নাই। সেদিন ইংরেজী তর্জমাগুলির একটি তালিকা চোখে পড়িল। আমরা এ-বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করি নাই। তথাপি আমাদের নিকটই তালিকাটি অসম্পূর্ণ মনে হইল। তাহাতে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কৃত "The Abbey of Bliss" নামক 'আনন্দমঠে'র অনুবাদের, মডার্ণ রিভিয়ুতে (পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত) ডাঃ জে ডি এণ্ডার্সনের ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় প্রভৃতির অনুবাদ, ঐ মাসিকে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র অনুবাদ, এবং ইলাষ্ট্রেটেড্ উঈক্লি অরিয়েণ্টে 'চন্দ্রশেখরে'র অনুবাদের উল্লেখ নাই।

রবীন্দ্রনাথের বহু গ্রন্থ পৃথিবীর অনেক ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এক একখানি অনুবাদ শান্তি-নিকেতনে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে রাখা হইয়াছে। এই সংগ্রহ হাল-নাগাদ সম্পূর্ণ কিনা জানি না। বঙ্কিমচন্দ্রের নানা গ্রন্থের নানা ভাষায় অনুবাদের এইরূপ একটি সংগ্রহ পরিষদ্-মন্দিরে এবং কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমভবনে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

—

ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র

রাজনৈতিক কারণে ইংরেজদের প্রতি আমাদের বিরাগ আছে। কিন্তু এই বিরাগের অধীন হইয়া প্রতীচ্যের সহিত সংস্পর্শে আমাদের যে হিত হইয়াছে ও হইতে পারে, তাহা ভুলিয়া যাওয়া অনুচিত। হিত যে হইয়াছে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা রিভিয়ুতে লিখিত তাঁহার বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে উহা সাতষট্টি বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। উহাতে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "বাংলা সাহিত্যে শক্তিহীন, নীচ ও সম্পূর্ণ মূল্যহীন অনেক কিছু যাহা আছে তাহা সত্ত্বেও ইহার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদিগকে যে আশা পোষণ করিতে উৎসাহিত করে তাহার পরিমাণ অল্প নহে।" "ইহা অধিকাংশ স্থলে অনুকারী" ("Its character is for the most part imitative"), "কিন্তু কবে কোন্ সাহিত্য তাহার যৌবনেই স্বাধীন ও মৌলিক ছিল" (but what literature has ever been independent and original in its youth ?") ? তিনি এই সব কথা প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বলেন নাই, প্রবন্ধটি লিখিবার সময় পর্য্যন্ত আধুনিক যে বাংলা সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন। ইউরোপীয় অনেক অপেক্ষাকৃত আধুনিক সাহিত্য যে প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিনের কাছে ঋণী বা তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত, এবং প্রতীচ্য ভাব ও চিন্তা যে বঙ্গসাহিত্যে স্বাঙ্গীকৃত হইতেছে ও হইবে, তাহা বলিয়া তিনি প্রবন্ধ শেষ করেন।*

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের দ্বারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ও সংমিশ্রণ সংঘটন সম্বন্ধে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে "পূর্ব্ব ও পশ্চিম" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিছু লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ তাঁহার "সমাজ" নামক পুস্তকে আছে। তিনি তাহাতে বলিয়াছেন :

"অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড়ো মনীষী তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্ব্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবনযাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন।...

"দক্ষিণ ভারতে রানাডে পূর্বপশ্চিমের সেতু-বন্ধন কার্যে জীবনযাপন করিয়াছেন। যাহা মানুষকে বাঁধে সমাজকে গড়ে, অসামঞ্জস্যকে দূর করে, জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাশক্তির বাধাগুলিকে নিরস্ত করে, সেই সৃজনশক্তি, সেই মিলনতত্ত্ব, রানাডের প্রকৃতির মধ্যে ছিল।...

"অল্পদিন পূর্বে বাংলা দেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল।...

"একদিন—বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যেদিন অকস্মাৎ পূর্বপশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন—সেই দিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল, সেই দিন হইতে বঙ্গসাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঙ্গসাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ, এ সাহিত্য সেই সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিতেছে, যাহাতে বিশ্বসাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা ক্রমশই এমন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনারই করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড়ো তাহা নহে, তিনিই বাংলা সাহিত্যে পূর্বপশ্চিমের আদানপ্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্পাদিত সদ্যঃপ্রকাশিত "বাংলা

---

* "It may seem improbable that European ideas will ever really be assimilated by the people of India—that all we can effect here is a superficial varnish of sham intelligence. But everything cannot come in a day, and there was a time when it would have seemed almost equally improbable that the little remnant of intelligence preserved in the Latin Church, and the study of classical antiquity, would have grown into what we now see among the Celtic and Teutonic peoples of the West. The Bengalis may not seem to have the fibre for doing much in the way of real thought any more than of vigorous action ; but it was chiefly among the supple and pliant Italians that the revival of learning in Europe began ; and it is possible to imagine that the Bengalis—the Italians of Asia, as the *Spectator* has called them—are now doing a great work, by, so to speak, acclimatizing European ideas and fitting them for reception hereafter by the hardier and more original races of Northern India."

কাব্যপরিচয়” গ্রন্থের যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন :—

“যাঁরা বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস অনুসরণ করেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহ একটা কথা লক্ষ্য করে থাকবেন, যে, এই সাহিত্য দুই ভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এই দুই ধারা দুই উৎস থেকে নিঃসৃত। আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় তাতে সন্দেহ নেই।...

‘বঙ্কিম এক দিন দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা বিষবৃক্ষ নিয়ে নিবেদন করেছিলেন বাংলা ভাষাভারতীকে। বলা বাহুল্য, তার ভাব তার ভঙ্গী তার ছাঁচ ইংরেজী সাহিত্যের অনুবর্ত্তী। পণ্ডিতেরা তার ভাষা-রীতিকে বিদ্রূপ করেছেন, সমাজদরদীরা তাকে নিন্দা করেছেন এই ব'লে যে, সামাজিক রীতি পদ্ধতি থেকে এই সব গল্প দেশের মন ভুলিয়ে নিয়ে তাকে অশুচি ক'রে তুলেছে। কিন্তু দেখা গেল প্রবীণ নিষ্ঠাবতী গৃহিণীরাও পুত্রবধূদের অনুরোধ করতে লাগলেন এই সব বই তাঁদের পড়ে শোনাতে। বটতলার ছাপা পুরাণ-কথা থেকে তাঁদের দড়ি দিয়ে বাঁধা চশমা ক্রমশই পথান্তরিত হয়েছে। এ সমস্ত বিদেশী আমদানী ভালো লাগা উচিত নয় ব'লে এদের প্রতি অরুচি জন্মাতে কেউ পারলে না।”

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটি মন্তব্য “রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লী-চিত্র”* নামক নূতন প্রকাশিত পুস্তকে দেখিলাম। গ্রন্থকার লিখিতেছেন :—

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ‘ছিন্নপত্রে’র একখানি চিঠিতে আছে, “বঙ্কিমবাবু ঊনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র আধুনিক বাঙালীর কথা যেখানে বলেছেন, সেখানে কৃতকার্য্য হয়েছেন, কিন্তু যেখানে পুরাতন বাঙালীর কথা বলতে গিয়েছেন সেখানে তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে; চন্দ্রশেখর প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় মানুষ এঁকেছেন (অর্থাৎ তাঁরা সকল দেশীয় সকল জাতীয় লোক হ'তে পারতেন, তাঁদের মধ্যে জাতির এবং দেশকালের বিশেষ চিহ্ন নেই) কিন্তু বাঙালী আঁকতে পারেন নি। আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্য্যশীল, স্বজনবৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ড-কর্ম্মশীল-পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙালীর কাহিনী কেউ ভালো ক'রে বলে নি।”

—

“রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লী-চিত্র”

উপরে ছোট অক্ষরে মুদ্রিত কথাগুলির পরেই “রবীন্দ্র সাহিত্যে পল্লী-চিত্রে”র লেখক লিখিয়াছেন :—

“এই শান্ত বাঙালীর কাহিনী রবীন্দ্রনাথই প্রথম ভালো ক'রে আঁকলেন আমাদের সাহিত্যে। তাঁর লেখার মধ্যে আমরা সর্ব্বপ্রথম দেখতে পেলাম সেই চিরদিনের বাঙলাকে, যেখানে নদীর ঢালু তটে চাষী চাষ করে, ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরতলে হাঁস উড়ে চলে, যেখানে চোখে জাগে নারকেল পাতার ঝুরঝুর কাঁপুনি, নাকে আসে প্রস্ফুটিত সর্ষেক্ষেতের গন্ধ, কানে শোনা যায় ঘাটের মেয়েদের উচ্চ হাসি, মিষ্ট কণ্ঠস্বর।” ইত্যাদি।

গ্রন্থকার নিপুণ শিল্পীর মত দেখাইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গের পল্লীগ্রামের কেবল যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিই আঁকিয়াছেন তাহা নহে, সেখানকার আবালবৃদ্ধবনিতা নানা শ্রেণীর নানা মানুষের সম্পূর্ণ সহানুভূতি সমবেদনা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ছবিও আঁকিয়াছেন। ইহা দেখানই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

“রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা উঠলে এমন কথা আজও শুনতে পাওয়া যায়—তিনি শহরের বিলাসী কবি, নগরের অভিজাত সম্প্রদায়ের কৃত্রিম জীবনের সঙ্গেই তাঁর লেখনীর কারবার। এই ধারণা ভুল। কতখানি ভুল, তারই পরিচয় দেবার জন্য একদা লেখা হয়েছিল এই প্রবন্ধগুলি, পল্লীর প্রকৃতি আর পল্লীর মানুষের প্রতি যে বিপুল দরদ প্রকাশ পেয়েছে কবির অসংখ্য গল্পে, প্রবন্ধে ও কবিতায়—তার মধ্যে ফুটে উঠেছে একটি বিশাল সত্য। এই সত্যটি হোলো, দুনিয়ার যারা অনাদৃত আর শৃঙ্খলিত তাদের প্রতি তাঁর অন্তহীন সমবেদনা।”

গ্রন্থকার অন্যত্র লিখিয়াছেন :—

“বাঙলাদেশের জনসাধারণের সুখদুঃখের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে রবীন্দ্রনাথকে ভাল ক'রে অধ্যয়ন করবার একান্ত প্রয়োজন আছে। বাঙলা দেশের পল্লীর প্রকৃতি ও মানুষের ছবি তাঁর সাহিত্যে যে-রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে, তার সত্যসত্যই তুলনা নেই। তাঁর সাহিত্য চিরদিন বেঁচে থাকবে—কারণ সেই সাহিত্যের মূল রয়েছে জনসাধারণের জীবনের মধ্যে, বাঙলা দেশের মাটির অভ্যন্তরে। তাঁর সাহিত্য অমর হ'য়ে থাকবে। কারণ তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার পথকে প্রশস্ত করেছেন।”

আমরা গ্রন্থকারের সহিত এ বিষয়ে একমত, যে, “বাংলা সাহিত্যের ললাটে গণতন্ত্রের জয়মাল্য পরিয়েছেন যিনি, এই গণতান্ত্রিক যুগে তাঁর সাহিত্যকে নূতন দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করবার দিন এসেছে।”

—

বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান

বঙ্কিম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনেক লেখক ও বক্তা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, যে, বন্দেমাতরম্ গান, আনন্দমঠ, ও রাজসিংহ মুসলমান-বিদ্বেষ বা ইসলাম-বিদ্বেষের পরিচায়ক নহে। আমরা আট নয় মাস পূর্ব্বে

* রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লী-চিত্র। শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক নবজীবন পাব্লিশিং হাউস, ১৯৫।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গত বৎসর "বন্দে মাতরম্" সম্বন্ধীয় আন্দোলনের সময় মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসীতে এবং মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত চিঠিতে ইহা দেখাইয়াছিলাম। পুনরুক্তির কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না।

বাংলার কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। যিনি হিন্দুমুসলমাননির্বিশেষে সেই কৃষকদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে কেমন করিয়া মুসলমান-বিদ্বেষী মনে করা যাইতে পারে?

তিনি হিন্দুবৎসল ছিলেন, সত্য। কিন্তু যেমন কেহ নিজ পরিবারবর্গকে ভালবাসিলে তাহার দ্বারা প্রমাণ হয় না, যে, অন্য সকলকে তিনি বিদ্বেষ করেন, তেমনই নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি টান অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষের পরিচায়ক নহে।

—

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' শিক্ষিত বাঙালীর মনকে যে এত বেশী আলোড়িত করিতে পারিয়াছিল, তাহার প্রতিভা তাহার কারণ বটে; এবং তখন এরূপ মাসিকপত্রের নূতনত্বও একটি কারণ। কিন্তু অন্য কারণও ছিল। তাহার ম[illegible] এই, যে, কাগজ চালান তাঁহার ব্যবসা ছিল না—তিনি পেশাদার সম্পাদক বা সাংবাদিক ছিলেন না। তাঁহাকে কোন ধনী স্বত্বাধিকারী বা কোম্পানীর মুখের দিকে তাকাইয়া বা তাঁহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া কাগজ চালাইতে হয় নাই; কাগজের কাটতির হ্রাসবৃদ্ধির দিকে, বিজ্ঞাপনের হ্রাসবৃদ্ধির দিকে বিশেষ রকম দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাকে লিখিতে হয় নাই। তাঁহার যাহা ভাল মনে হইয়াছে, তিনি অসঙ্কোচে নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে তাহা লিখিতে পারিয়াছিলেন, এবং অন্যের লেখাও এই ভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন।

—

"রাষ্ট্রপতি" ও কংগ্রেসের "সভাপতি"

পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরু যখন শেষবার কংগ্রেসের সভাপতি হন, তাহার পর হইতেই বোধ করি অনেক খবরের কাগজ এবং কোন কোন সার্বজনিক কর্ম্মীও কংগ্রেসের সভাপতিকে রাষ্ট্রপতি বলিতে আরম্ভ করেন। আরম্ভ যখনই হউক, 'রাষ্ট্রপতি' শব্দের এই প্রয়োগের সমর্থন অভিধানে পাইতেছি না। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর "চলন্তিকা"য় 'রাষ্ট্র' আছে, কিন্তু 'রাষ্ট্রপতি' নাই। সম্প্রতি প্রকাশিত এবং, এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ প্রকাশিত বাংলা অভিধানসমূহের মধ্যে বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ বাংলা অভিধান, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "বাঙ্গালা ভাষার অভিধান" (দ্বিতীয় সংস্করণ)। ইহাতে 'রাষ্ট্রপতি'র অর্থ ও শিষ্ট-প্রয়োগ এইরূপ দেওয়া আছে:

"দেশপতি; রাজা; সম্রাট। 'না মার বাজালে শুন প্রভু রাষ্ট্রপতি।'—কবিকঙ্কণ। 'নাপিতের মেয়ে মুরার দুলাল চন্দ্রগুপ্ত রাষ্ট্রপতি।'—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।"

সুতরাং আভিধানিক অর্থে কংগ্রেসের সভাপতিকে রাষ্ট্রপতি বলা যায় না। দেশপতি অর্থেও তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি বলা চলে না। কারণ রাজাকে এবং সাধারণ-তন্ত্রের নির্ব্বাচিত শাসনকর্ত্তাকে দেশপতি বলা হইয়া থাকে।

আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের (য়ুনাইটেড ষ্টেটসের) নির্ব্বাচিত প্রধান শাসনকর্ত্তাকে ইংরেজীতে প্রেসিডেণ্ট বলা হয়; অন্য বহু সাধারণতন্ত্রের নির্ব্বাচিত প্রধান শাসন-কর্ত্তাকেও প্রেসিডেণ্ট বলা হয়। এই প্রেসিডেণ্ট শব্দের বাংলা করা হয়, রাষ্ট্রপতি; কেহ কেহ দেশপতিও করেন। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা ও অন্যান্য সভা-সমিতির প্রেসিডেণ্টকে রাষ্ট্রপতি বলা হয় না, সভাপতি বলা হয়। কংগ্রেসও একটি সভা বা সমিতি—যদিও খুব বড় সভা বা সমিতি। তাহার প্রধান বা নেতাকে সভাপতি বলাই সঙ্গত। রাষ্ট্রের উপর তাঁহার কোনই ক্ষমতা নাই। এই জন্য তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি বলিলে অনভিপ্রেত উপহাসের মত শুনায়।

অবশ্য, সৌজন্যসহকারে কাহাকেও উচ্চ সম্মান প্রদর্শনে দোষ নাই। পল্লীগ্রামের লোকেরা কনষ্টেবলকেও দারোগা বাবু বা দারোগা সাহেব বলে। তাহার একটা কারণ এই, যে, উক্ত উভয়বিধ কর্ম্মচারীর কাজের ও ক্ষমতার কিছু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু প্রকৃত রাষ্ট্রপতির এবং কংগ্রেস-সভাপতির কাজের ও ক্ষমতার কোন সাদৃশ্য নাই। রাষ্ট্রীয় বা রাষ্ট্রিক এমন কোন ক্ষমতা কংগ্রেসের সভাপতির নাই, যাহা আমেরিকার, চেকোস্লোভাকিয়ার বা অন্য কোন সাধারণতন্ত্রের নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্টের অর্থাৎ প্রকৃত রাষ্ট্রপতির আছে।

—

পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান ও সুভাষ বাবু

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেশী। সুতরাং তথাকার মুসলমানরা বাস্তবিক কংগ্রেস-

বিরোধী হইলে প্রকৃত গণ-আন্দোলন সেখানে চালান সুকঠিন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু পূর্ব্ববঙ্গে নানা স্থানে ভ্রমণের সময় মুসলমানদের রাজনৈতিক মনোভাব যতটা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মনে হইয়াছে, যে, তাহারা দলবলে কংগ্রেসে যোগ দিবে। তাঁহার অনুমান ঠিক হইলে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা থাকা সত্ত্বেও বঙ্গে কখন কখন কংগ্রেসদলভুক্ত মন্ত্রীদের শাসন প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে।

—

পূর্ব্ববঙ্গে "হৌস্ সিস্টেম"

পূর্ব্ববঙ্গে এখনও প্রচলিত "হৌস্ সিস্টেম" নামক রীতির সুভাষ বাবু নিন্দা করিয়াছেন, এবং তাহা উঠাইয়া দিতে গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের সময়ের বাহিরে বাড়ীতে বা অন্যত্র কি করে, কাহার সঙ্গে মিশে, শিক্ষকদিগকে তাহার খবর রাখিতে হয় এবং পুলিসকে তাহা জানাইতে হয়। ইহার নাম "হৌস সিস্টেম"। শিক্ষকদের পক্ষে বিদ্যালয়ের সময়ের বাহিরে ছেলেমেয়েদের কাজকর্ম ও চালচলনের খবর রাখা বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যক, কিন্তু পুলিসকে তাহার খবর দেওয়া বা দিতে বাধ্য থাকা গর্হিত প্রথা। রাজনৈতিক কারণে কখনও পুলিসের এরূপ খবর রাখা দরকার মনে হইলে তাহারা নিজে বা গোয়েন্দা দ্বারা সন্ধান রাখিতে পারে। গবর্মেণ্ট এখন যেরূপ তাহাতে পুলিস এ বিষয়ে জনমতের দ্বারা চালিত হইবে আশা করা যায় না। শিক্ষকদিগকে গোয়েন্দাগিরিতে নিযুক্ত করিলে তাঁহাদের প্রতি ছাত্রদের কোন শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। সুতরাং শিক্ষকদের যে একটি প্রধান কর্ত্তব্য নিজ চরিত্রের প্রভাবে ছাত্রদের হিতসাধন করা, সে-কর্ত্তব্য গোয়েন্দা-শিক্ষকদের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। অতএব হৌস্ সিস্টেম উঠাইয়া দেওয়া উচিত।

—

সুভাষ বাবুর সরকারী-ফেডারেশ্যন-বিরোধিতা

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের অবসরপ্রাপ্ত প্রথম সভাপতি সর্ ফ্রেডারিক হোয়াইট লণ্ডনে পণ্ডিত জওআহরলালের এক বক্তৃতায় সরকারী-ফেডারেশ্যন-বিরোধী মন্তব্যের উত্তরে বলিয়াছেন, যে, কংগ্রেস-ওআর্কিং-কমীটির এক জন প্রভাবশালী সভ্যের সহিত কথাবার্ত্তায় তাঁহার ও অন্য অনেক ইংরেজের এই ধারণা হইয়াছে, যে, কংগ্রেস বলিতেছে বটে যে ফেডারেশ্যনে বাধা দিবে; কিন্তু বস্তুতঃ যথাসময়ে, মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের মত, ফেডারেশ্যনও গ্রহণ করিয়া তাহা চালু করিবে। ইহাতে সুভাষ বাবু এইরূপ বলিয়াছেন বলিয়া কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, তাহা হইলে তিনি খুব সম্ভব অবাধে ফেডারেশ্যন-বিরোধিতা করিবার নিমিত্ত কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করিবেন। তাহা করিলে তাঁহার স্বমতানুযায়ী ও বিবেকানুমোদিত কাজ নিশ্চয়ই করা হইবে, যদিও ইহা ভয়প্রদর্শনের মত শুনায়। কংগ্রেস ফেডারেশ্যন গ্রহণ করিলেও কোন কংগ্রেসওআলা তাহার বিরোধিতা করিলে কংগ্রেসের নিয়মানুগত্য বজায় থাকিবে কিনা, তাহা আমাদের চেয়ে কংগ্রেসের সভাপতি স্বয়ং স্থির করিতে অধিকতর সমর্থ। হইতে পারে, যে, তাঁহার উপর নিয়মানুবর্ত্তিতার হুকুম কেহ জারি করিতে চাহিলে তিনি কংগ্রেসই ত্যাগ করিবেন।

সুভাষ বাবুর উক্তিতে মান্দ্রাজের মিঃ সত্যমূর্ত্তি বিষম চটিয়া বলিয়াছেন, এরূপ ধমক দেওয়া কংগ্রেসের সভাপতির অযোগ্য হইয়াছে, এবং আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। সর্ ফ্রেডারিক হোয়াইট কংগ্রেস-ওআর্কিং-কমীটির যে সভ্যের কথা বলিয়াছেন, তিনি যে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই মিঃ সত্যমূর্ত্তি তাহা বলিয়াছেন এবং কি কি সংশোধন হইলে সরকারী ফেডারেশ্যন গ্রহণ করিতে রাজী (এবং ব্যগ্র) তাহাও বলিয়াছেন। মিঃ সত্যমূর্ত্তি মন্ত্রিত্বগ্রহণের পক্ষপাতীও গোড়া হইতেই ছিলেন। তিনি সুভাষ বাবুর সভাপতি হওয়ার বিরোধিতা যথাসাধ্য করিয়াছিলেন (ব্যক্তিগত কোন কারণে বা প্রাদেশিকতাবশতঃ তাহা জানি না); সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার পক্ষে সুভাষ বাবুকে কড়া কথা শুনান আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু কংগ্রেসের সভাপতি সম্বন্ধে তাহার এক সভ্যের ঐ রকম কথা, সত্য হইলেও, বলা কি শিষ্টাচারসম্মত বা নিয়মানুযায়ী?

কংগ্রেস এ-পর্য্যন্ত সরকারী ফেডারেশ্যন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাহার বিরুদ্ধেই বলিয়াছেন; কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি নেহরু মহাশয় এবং বর্ত্তমান সভাপতি সুভাষ বাবু উহার বিরোধী। তাহা সত্ত্বেও ওআর্কিং কমীটির সভ্য শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাইয়ের লণ্ডনে অপ্রকাশ্য কথাবার্ত্তাতেও সরকারী ফেডারেশ্যন গ্রহণের অনুকূল কথা বলাটা বোধ করি নিয়মানুগত্য নহে। কিন্তু আইন যেমন দুর্ব্বলের জন্য, নিয়মানুগত্যও হয়ত সেইরূপ রামা-শ্যামার জন্য। সে যাহা হউক, শেষ সিদ্ধান্ত বসু-জী বা নেহরু-জীর মত অনুসারে হইবে না—কংগ্রেসের মত অনুসারেও নহে; হইবে গান্ধীজীর মত অনুসারে। এবং গান্ধীজীর মনোভাব জানিবার বুঝিবার বোম্বাইয়া ভুলাভাই

দেশাই মহাশয়ের যতটা সম্ভাবনা নেহরু-জী ও বসু-জীর ততটা নহে। মান্দ্রাজের শ্রী চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারি গান্ধীজীর 'প্রতিধ্বনি', এবং তাঁহার মত মান্দ্রাজী সত্যমূর্ত্তিরই বেশী জানিবার কথা। তদ্ভিন্ন মান্দ্রাজ এবং অন্য দু-একটি ব্যবস্থাপক সভায় ত বহু পূর্ব্বেই ফেডারেশ্যনকে চালু করিবার নিমিত্ত কোন কোন পরিবর্ত্তন করিবার সপক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হইয়া আছে।

এই সব কারণে আমাদের মনে হয়, মন্ত্রিত্বগ্রহণ সম্বন্ধে যেমন নেহরু মহাশয় ও বসু মহাশয়কে স্ব স্ব মত বৈয়ক্তিক ও স্বব্যবহার্য্য করিয়া রাখিতে হইয়াছে, সরকারী ফেডারেশ্যন সম্পর্কেও হয়ত তাহাই করিতে হইবে; নতুবা বেকুব বনিতে হইতেও পারে।

কংগ্রেসীদের গৃহবিবাদ বিরোধীদের ভাল লাগিলেও কংগ্রেসের বলবৃদ্ধি করে না।

—

উড়িষ্যার কারাগার

বঙ্গের ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন ঠাকুর ও শ্রীরাধানাথ দাস সম্প্রতি কটকের জেলা জেল দেখিয়া একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানে কয়েদীদের দ্বারা ঘানি টানাইবার প্রথা বন্ধ করা হইয়াছে। এই প্রথাটা মানুষকে কষ্ট দেয় বলিয়াই যে নিন্দার্হ তাহা নহে, ইহা মানুষকে পশুর কাজ করাইয়া তাহার অমানবীকরণ সম্পাদন করে। ইহা বন্ধ করিয়া উড়িষ্যার মন্ত্রিমণ্ডল মানুষদরদী ও প্রকৃত গণতান্ত্রিকের কাজ করিয়াছেন। তাঁহারা কয়েদীদিগকে ক্ষৌরী করিবার অধিকার দিয়াছেন এবং তেল ব্যবহার করিতে দেন। উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং তাহাদের সহিত খোলাখুলি ভাবে মেশেন এবং ভদ্র ও সদয় ব্যবহার করেন।

—

উড়িষ্যায় ডোমিসাইল সার্টিফিকেট চাই না?

কাগজে দেখিলাম, উড়িষ্যার বাঙালীদিগকে ওড়িয়াদিগের সমান অধিকার পাইবার জন্য ডোমিসাইল সার্টিফিকেট সংগ্রহ ও দাখিল করিতে হইবে না, অর্থাৎ তাঁহারা যে তথাকার স্থায়ী অধিবাসী এই মর্ম্মের সরকারী কোন নিশ্চায়ক-পত্র দেখাইতে হইবে না। তাঁহারা ইহা লিখিয়া দিলেই চলিবে, যে, তাঁহারা উড়িষ্যার স্থায়ী অধিবাসী, ও স্থায়ী অধিবাসী থাকিতে চান। উড়িষ্যার কংগ্রেসী মন্ত্রীরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিলে, ঠিক করিয়াছেন।

—

রাজনীতির সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক

রাজনীতির সহিত ছাত্রদের সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার আলোচনা বহু পূর্ব্বেও হইত, সম্প্রতিও হইতেছে।

কিছু দিন হইল মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' কাগজে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন :

"Students may openly sympathise with any political party they like, but in my opinion they may not have freedom of action whilst they are studying; as a student cannot be an active politician and pursue his studies at the same time.

"ছাত্রেরা যে কোন রাজনৈতিক দলের সহিত ইচ্ছা প্রকাশ্যভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু তাহারা যত দিন ছাত্র আছে তত দিন কার্য্যের স্বাধীনতা পাইতে পারে না; কেন না, এক জন ছাত্র নিজের পড়াশুনা করিতে এবং সেই সঙ্গে সক্রিয় রাজনীতিক হইতে পারে না।"

মান্দ্রাজের কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রী শ্রী চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারি ও উড়িষ্যার কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলও এই রকম মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আগে অনেক বার যে মত প্রকাশ করিয়াছি এবং এই বৎসরের প্রবাসীতেও করিয়াছি, তাহার সহিত মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির মতের কোন বিরোধ নাই। আমাদের মত আমরা খুব খুলিয়াই গত তিন সংখ্যায় বলিয়াছি।

আমাদের ত ভুল হইতেই পারে, এমন কি মহাত্মা গান্ধীরও ভুল হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ মত প্রকাশ দ্বারা মতপ্রকাশকদের কোন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব, মতটা ভ্রান্ত হউক বা না-হউক, উহা যে মতপ্রকাশকদের আন্তরিক বিশ্বাস-অনুযায়ী, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারের সময় মহাত্মা গান্ধী সরকারী, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত, এবং গবর্মেণ্টনির্দ্দিষ্ট রীতিতে পরিচালিত বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি বর্জ্জন করিতে ছাত্রদিগকে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ তাহা উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার আধুনিক মতের সহিত পূর্ব্ব মতের অসঙ্গতি দেখাইয়া তাঁহার আধুনিক মতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি তখন বলিয়াছিলেন :—

"They may go abegging in the streets, they may break stones or go about cleansing the stinking stables of India, but they may not read in these bureaucratic institutions."

'তাহারা রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিতে পারে, তাহারা পাথর ভাঙিতে পারে, কিংবা ভারতবর্ষের পূতিগন্ধময় আস্তাবলগুলা সাফ করিয়া বেড়াইতে পারে, কিন্তু এই সব আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান-সমূহে তাহারা পড়িতে পারে না।

গান্ধীজীর প্রাক্তন ও অধুনাতন মতের মধ্যে আমরা কোন ঐকান্তিক অসামঞ্জস্য দেখিতেছি না। তখন তিনি আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছিলেন। এরূপ বলেন নাই, যে, সেগুলির ছাত্র থাকিবে কিন্তু বাস্তবিক হইবে রাজনৈতিক কর্ম্মী। এমন কথা ত বলেনই নাই, যে, আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্থলাভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রেরা ভর্ত্তি হইবে বটে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারা হইবে সক্রিয় রাজনীতিক। জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা রাজনীতির সহিত সম্পর্ক রাখিবে, কিন্তু প্রধানতঃ তাহারা হইবে বিদ্যার্থী, ইহাই গান্ধীজীর অভিপ্রায় ছিল।

গান্ধীজী যে এখন তাঁহার প্রাক্তন মতটির পুনরাবৃত্তি করিতেছেন না, তাহাতে এই অনুমান করিতে পারা যায়, যে, তিনি তখনকার উপযুক্ত সেই মতটিকে পরিবর্ত্তিত বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী মনে করেন না, সম্প্রতি-প্রকাশিত মতটিকে বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী মনে করেন।

অবশ্য, যদি কেহ শুধু তর্কের খাতিরে তাঁহার দুটি মতকে পাশাপাশি রাখিতেছেন না, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বতন মতটিকেই সত্য মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহার উচিত "আমলাতান্ত্রিক" প্রতিষ্ঠানগুলিকে বর্জ্জন করিতে ছাত্রদিগকে অনুরোধ করা।

আমাদের আগেকার মত ও বর্ত্তমান মত এই, যে, যাঁহারা ছাত্রনামে পরিচিত, তাহাদিগকে সেই নামের যোগ্য থাকিবার এবং কর্ম্মজীবনের জন্য প্রস্তুতির [illegible] যথোপযুক্ত শক্তি ও সময় বিদ্যা-অর্জ্জনে দিতে হইবে—দিনরাত বই হাতে করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে এমন নয়।

অনেকে যুদ্ধে-ব্যাপৃত সঙ্কটাপন্ন দেশসকলের দৃষ্টান্ত দিয়া তর্ক করেন, যে, সেখানকার ছাত্রেরা দীর্ঘকাল পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া থাকে। আমাদের বক্তব্য, তথাকার শুধু বহু ছাত্র নয়, তদপেক্ষাও অধিকসংখ্যক সমর্থ বয়সের নানা বৃত্তির ও শ্রেণীর লোকেরাও নিজ নিজ কাজ ছাড়িয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষা বা পুনর্লাভের চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে হিংস বা অহিংস কোন যুদ্ধই হইতেছে না, অসহযোগও স্থগিত, (গান্ধীজীর কথায়) পার্লেমেণ্টারি মনোভাব আসিয়াছে থাকিবার জন্য ("The Parliamentary mentality has come to stay"); এখন সঙ্কটকাল ছাত্র ছাড়া আর কাহারও জন্য আসে নাই। সরকারী লোকদের কথা ছাড়িয়া দিয়াও দেখিতেছি, সম্পাদকেরা ও সাংবাদিকেরা সঙ্কটত্রাণ চায়ের পেয়ালায় দিব্য চুমুক দিতে দিতে কাগজ লিখিতেছেন বেচিতেছেন, দোকানদার ব্যবসাদারেরা কেনাবেচা করিতেছেন, ধর্ম্মঘটী ছাড়া অন্য মজুরেরা কাজ করিতেছেন, চাষীরা চাষে ব্যস্ত, কেরানী, উকীল মোক্তার ব্যারিষ্টার (যাঁহারা পসারহীন নহেন) মোকদ্দমা করিতেছেন, লেখকেরা কবিতা গল্প উপন্যাস লিখিতেছেন ও বেচিতেছেন, শিক্ষক অধ্যাপকেরা পড়াইতেছেন, আবালবৃদ্ধবনিতা কাতারে কাতারে সিনেমার টিকিট কিনিতেছেন (অবশ্য সঙ্কটাপন্না বিপন্না মাতৃভূমির উদ্ধারার্থ সিনেমা-দুর্গে ব্যূহ রচনার নিমিত্ত)।

যাঁহারা রাজনৈতিক মতিবিশিষ্ট তাঁহারা নিজ নিজ কাজকর্ম্ম অবহেলা না করিয়া অবসরমত রাজনীতির চর্চ্চা করিতেছেন। তবে কি সঙ্কট-কালটা কেবল ছাত্রদের জন্যই আসিয়াছে? তাহা নহে। তাঁহারাও পড়াশুনাতে যথেষ্ট সময় ও শক্তি দিয়া অবসরমত রাজনীতির অনুশীলন করুন না?

—

চীনে ছাত্রেরা যুদ্ধ করিতেছে না

চীনে কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রদিগকে যুদ্ধ করিতে পাঠাইতেছেন না, ছাত্রই রাখিতেছেন। বিশেষ বৃত্তান্ত পরে লিখিব।

—

যুধ্যমান চীনে উৎসব নিষিদ্ধ

চীন-কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নিযুক্ত "চীন সংবাদ-সরবরাহ কমীটি" (China Information Committee) আমাদিগকে চীন সম্বন্ধে বিস্তর সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রেরণ করিতেছেন। মাসিক কাগজে সেগুলির স্থান হয় না। তাহার একটি প্রবন্ধের নাম "No Festivals While China Fights" ("চীন যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে সমুদয় উৎসব আমোদপ্রমোদ নিষিদ্ধ")। ইহা আমরা জুলাই মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে লিখিয়াছি। দেশ সঙ্কটাপন্ন হইলে আমোদপ্রমোদে যে মানুষের রুচি থাকে না, ইহা তাহারই প্রমাণ।

—

নিখিল-বঙ্গ ছাত্রছাত্রী সম্মেলন

কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে সম্প্রতি যে নিখিল-বঙ্গ ছাত্রছাত্রী সম্মেলন হইয়া গেল, তাহাতে

অনেক ভাল ভাল অভিভাষণ পঠিত বা মৌখিক ভাষিত হইয়াছে। তৎসমুদয়ে ছাত্রদের এবং বয়োবৃদ্ধদের শিক্ষণীয় অনেক জিনিষ আছে। বাছিয়া ভালগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের যোগ্য।

যে-সকল ছাত্রছাত্রী এই সমুদয় ভাষণ শুনিয়াছেন, তাঁহারা শিক্ষার সুযোগের সদ্ব্যবহার করিলে তাঁহাদের জ্ঞানবান্ উপদেষ্টাদিগের মত তাঁহারাও যথাসময়ে দেশহিত-কর্ম্মী হইতে পারিবেন, এবং রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ও অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিতে পারিবেন।

সুভাষ-কংগ্রেসভবন নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আশা

পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ ও বর্ত্তমানে তথাকার বিখ্যাত ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ সুভাষ-কংগ্রেসভবনের জন্য দশ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায়, ঐ ভবন নির্ম্মিত হইবার আশা হইয়াছে। কলিকাতায় কংগ্রেসের নিজস্ব একটি ভবনে তাহার কার্য্যালয়, বাচন-আলয় ও পুস্তকালয় থাকা খুবই আবশ্যক। সুভাষ-ভবন নির্ম্মিত হইলে এই সব অভাব দূর হইবে।

—

গান্ধীজীর একটি ফোটোর বিদেশী প্রশংসা

আমেরিকায় "নো ফ্রন্টিয়ার নিউস-সার্ভিস" (No Frontier News Service") নামক একটি সমিতি আছে। তাহার কাজ দলনিরপেক্ষভাবে সত্য সংবাদ সংগ্রহ করা ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র যোগান। তাঁহাদের "ওআর্ল্ড ইভেণ্টস্" ("World Events") নামক একটি পকেট পাক্ষিক পত্র আছে। তা ছাড়া তাঁহারা প্রতি সপ্তাহেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহাদের পরিচিত সম্পাদকদিগকে খাঁটি খবর ও দলাদলিবর্জ্জিত প্রবন্ধ পাঠান। আমরা কিছু কিছু ব্যবহার করি, কিন্তু আমাদের কাগজগুলি দৈনিক নহে বলিয়া খুব দরকারী ও ভাল অনেক জিনিষও ব্যবহার করিতে পারি না। এই সংবাদ-এজেন্সীর প্রধান সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক মিঃ ডিভিয়ার য়্যালেন আমাদিগকে লিখিয়াছেন, "আপনারা মে মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে সত্যেন্দ্রনাথ বিশির তোলা মহাত্মা গান্ধীর একটি ফোটোগ্রাফ ছাপিয়াছেন। আমাদের মনে হয় আমরা যত ফোটো দেখিয়াছি, ইহা তাহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্টের মধ্যে একটি" ("In your issue of May, 1938, you published a photograph of Mahatma Gandhi by Satyendranath Bisi. This seems to us one of the finest we have ever seen")। তিনি তাঁহাদের সমিতির ব্যবহারের জন্য ঐ ফোটো একখানি চান।

—

ভারতীয় অন্য ফোটোর বিদেশে আদর

আমেরিকার বিখ্যাত সচিত্র মাসিক পত্র "এশিয়া" আমাদের কাগজে মুদ্রিত "রবীন্দ্রনাথ ও জওআহরলালের সাক্ষাৎকার" এবং "কলিকাতার বড়বাজারে জওআহরলালের সম্বর্দ্ধনা"র ছবি দুটি দেখিয়া ঐ দুটির ফোটোগ্রাফ আমাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। প্রথমটি শ্রীযুক্ত তারক দাসের ও দ্বিতীয়টি ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিওর তোলা।

—

ব্রাজিল হইতে ভারতীয় শিল্পীর খোঁজ

দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রাজিল দেশের রাজধানী রাইয়ো-ডি-জেনিরো হইতে মডার্ণ রিভিয়ুর এক জন পাঠক আমাদিগকে লিখিয়াছেন, তিনি তাঁহার চিঠিপত্র ও খামের জন্য এমন একটি সীল-মোহর করাইতে চান যাহা ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির কোন উচ্চ আদর্শসূচক হয়; কারণ তিনি ভারতবর্ষ ও তাহার দর্শন ভালবাসেন ("I am in love with India and its philosophy")। এইরূপ সীল-মোহরের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন, এমন কয়েক জন শিল্পীর নাম ও ঠিকানা তিনি আমাদের নিকট হইতে চাহিয়াছেন।

মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত ভারতীয় শিল্পীদের আঁকা ছবি দেখিয়া তাঁহার আমাদের নিকট সন্ধান লইবার ইচ্ছা হইয়াছে, ইহা সহজে অনুমেয়।

—

বন্যা-আদিতে বিপন্ন মধ্য ও পূর্ব্ব বঙ্গ

বন্যা-আদিতে মধ্য ও পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক জেলার হাজার হাজার লোক বিপন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। যে-সকল সমিতি এইরূপ বিপদ ঘটিলে বিপন্ন লোকদের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সাহায্য করেন, তাঁহারা বোধ হয় শীঘ্রই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন।

—

জাপানের কোবে শহরে "ভারত কুটীর"

জাপানের কোবে একটি বড় বন্দর ও বাণিজ্যের স্থান। এখানে কতকগুলি ভারতীয় বণিক ব্যবসা করেন। তাঁহারা একটি "ভারত কুটীর" স্থাপন করিয়াছেন। জমী ও বাড়ী ইহার নিজস্ব। খরচ হইয়াছে অনেক হাজার ইয়েন্। বাড়ীটি দ্বিতল। উপরের ছাদ হইতে সমুদ্রের ও পর্ব্বতমালার দৃশ্য দেখা যায়। শয়ন-কক্ষ আছে চারিটি। তাছাড়া রান্নাঘর, যথেষ্ট স্নানাগারাদি, ভৃত্যদের গৃহ ইত্যাদি আছে। এখানে ভারতীয়দের সভাও, যেমন গান্ধীজীর জন্মোৎসব, হয়। ইহা তাঁহাদের মিলন-স্থানও বটে। এখানে ভারতীয় ছাত্রেরা অল্প বা অধিক সময়ের জন্য অপেক্ষাকৃত কম খরচে থাকিতে পারে। অন্য ভারতীয়দের থাকিবার ব্যয় অপেক্ষাকৃত অধিক। ইহার যে গত বৎসরের রিপোর্ট আমাদের নিকট আসিয়াছে, তাহাতে দেখিতেছি ইহার সভ্যসংখ্যা ৩৯। বাঙালীরা বিদেশে বড়-একটা ব্যবসা করেন না। এই জন্য এই ৩৯ জনের মধ্যে এক জন বাঙালীরও নাম নাই, অন্য অনেক প্রদেশের লোক আছেন। জীবিকার মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্যে বাঙালীদের খুব বেশী মন দেওয়া উচিত।

—

ভারতীয় ইতিহাস-কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন

আগামী ৬ই, ৭ই, ও ৮ই অক্টোবর এলাহাবাদে ভারতীয় ইতিহাস-কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে। ইহার সাধারণ সম্পাদক সর্ শফাৎ আহমদ খাঁ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব কারমাইকেল ইতিহাস-অধ্যাপক ডক্টর দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর এই অধিবেশনের সাধারণ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। চারিটি বিভাগে সভাপতি এ-পর্য্যন্ত মনোনীত হইয়াছেন। তাহার মধ্যে বাঙালী কেহ নাই। অন্য বিভাগ কয়টি হইবে, ও সভাপতি কে কে হইবেন, এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

বঙ্গের বাহিরে কোন্ কোন্ বিষয়ে বাঙালীর বিদ্যার খ্যাতি অখ্যাতি কিরূপ, তাহা বাঙালীদের জানা উচিত।

—

গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খাপার্দে

চুরাশি বৎসর বয়সে অমরাবতীর প্রসিদ্ধ রাজনীতিক গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খাপার্দে মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। কংগ্রেস অসহযোগনীতি অবলম্বন করিবার পর হইতে তিনি কংগ্রেসী ছিলেন না, তার আগে এক জন বিশিষ্ট কংগ্রেসী ছিলেন। কিন্তু বিদর্ভের আধুনিক কংগ্রেসীরাও স্বীকার করেন, যে, সেই দেশের রাজনৈতিক জাগরণ তাঁহার দ্বারাই সাধিত হইয়াছিল। সে কালের কংগ্রেসে তিনি লোকমান্য টিলক মহাশয়ের অন্তরঙ্গদলভুক্ত ছিলেন। সে সময়ে কংগ্রেসের যে কয় জন লোকপ্রিয় বক্তার বক্তৃতা শুনিবার জন্য শ্রোতারা উন্মুখ হইয়া থাকিত, খাপার্দে মহাশয় তাহার মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি খুব রসিক বক্তা ছিলেন। হলদে রঙের প্রকাণ্ড পাগড়ি দেখিয়া দূর হইতেও তাঁহাকে চেনা যাইত। তিনি ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার পাগড়ি, গ্রীবাভঙ্গী ও রসিকতা শ্রোতাদিগের মনোরঞ্জন করিত। সংস্কৃতে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। তিনি প্রথমে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ও পরে কৌন্সিল অব ষ্টেটের সদস্য হন। বিশ্বাসে ও আচারে গোঁড়া হিন্দু থাকিলেও সামাজিক বিষয়ে তাঁহার উদারতা ছিল। ১৮৯১ সালে নাগপুরে ভারতীয় সমাজসংস্কার কন্‌ফারেন্সে তিনি সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৮৯৭ সালে অমরাবতীতে কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং ১৯০৫ সালে মধ্যপ্রদেশ ও বিদর্ভের প্রাদেশিক রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্সের সভাপতি ছিলেন। তিনি প্রথমে সব-জজ ছিলেন। পরে উকীল হন। তাঁহার উপার্জ্জন যেমন খুব বেশী ছিল, দানও তদ্রূপ ছিল।

—

শান্তিনিকেতনের মৌলানা জিয়াউদ্দিন

পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে শান্তিনিকেতনের মৌলানা জিয়াউদ্দিনের মৃত্যুতে কি যে ক্ষতি হইল বলিতে পারি না। তিনি ফারসী ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। আমানুল্লার আমলে কাবুলে অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি বহু বৎসর বিশ্বভারতীতে ইসলামীয় সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপকের কার্য্য যোগ্যতার সহিত করিতেছিলেন। কয়েকখানি সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহি তিনি লিখিয়াছিলেন। তিনি বাংলা জানিতেন এবং বাঙালীদের সহিত বাংলাই বলিতেন। রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতা তিনি উর্দ্দু ও ফারসীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সামাজিকতার ও অসাম্প্রদায়িকতার জন্য শান্তিনিকেতনে লোকপ্রিয় ছিলেন। ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে স্নেহ করিতেন।

তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার

বাড়ী ছিল অমৃতসরে। সেইখানেই টাইফয়েড জ্বরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

তাঁহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও প্রবন্ধ প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল।

—

লেডী টাটা ট্রাস্ট বৃত্তি

লেডী টাটার স্মারক ট্রাষ্ট সম্পত্তি হইতে ১০টি আন্তর্জাতিক বৃত্তি এরূপ গবেষণার জন্ম দেওয়া হয় যাহাতে ব্যাধিজনিত মানবদুঃখ দূর বা হ্রাস করা যায়। এগুলি যে-কোন দেশের যোগ্য লোকেরা পাইতে পারে। এ-বৎসর ডেনিশ, আমেরিকান, ব্রিটিশ, হাঙ্গেরীয়, জার্ম্যান, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্যান, ডেনিশ, ইটালীয় এবং জার্ম্যান জাতির দশ জন গবেষক ইহা পাইয়াছেন। ইহার মধ্যে জার্ম্যান তিন জন, ডেনিশ দু-জন, এবং বাকী এক জন করিয়া অন্য অন্য জাতির লোক।

ঐরূপ পাঁচটি বৃত্তি ভারতবর্ষের গবেষকদিগকেও দেওয়া হয়। এবার পাঁচটিই মান্দ্রাজী গবেষকেরা পাইয়াছেন। আগেকার একবারের কথা আমাদের মনে পড়িতেছে, বাঙালী গবেষকেরাও পাইয়াছিলেন—বোধ হয় বেশীই পাইয়াছিলেন। এবার বাঙালীর উদ্বেগ কেবল এই দেখিলাম, যে, বৃত্তিপ্রাপ্ত এক জন মান্দ্রাজী গবেষক (মিঃ কে. গণপতি) বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব্ সায়েন্সের জৈব রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর পি সি গুহের পরিচালনা অনুসারে গবেষণা করিবেন।

—

মান্দ্রাজীদিগের উদ্যমশীলতা

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ও বঙ্গে মান্দ্রাজীরা যে কেরানীগিরিই করেন, তাহা নহে; বড় চাকরিও করেন। মান্দ্রাজের বাহিরের অনেক অমান্দ্রাজী কাগজের তাঁহারা সম্পাদক। কলিকাতার দুটি ইংরেজী সাপ্তাহিক তাঁহাদের। বড় বড় ব্যবসাও তাঁহাদের আছে। সম্প্রতি তাঁহারা "সিটি কলেজ (মান্দ্রাজ)" নাম দিয়া একটি কলেজ কলিকাতায় খুলিয়াছেন। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত নহে। ইহাতে কেম্ব্রিজ জুনিয়ার সীনিয়ার প্রভৃতি পরীক্ষার জন্ম ছাত্রছাত্রী প্রস্তুত করা হয়।

—

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ভারতীয় ছাত্র

বর্ত্তমান জুলাই মাসে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশ্যনে যত ছাত্র নানা রকম ডিগ্রীর উপাধি পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ভারতীয় ছাত্রেরও নাম পাওয়া যায়। ডি-এস্‌সি যিনি হইয়াছেন নামে অনুমান হয় তিনি গুজরাটী। তিন জন পিএইচ-ডির মধ্যে তিন জনই বাঙালী (শচীকুমার চাটুজ্যে, পুণ্যব্রত ভট্টাচার্য্য, সুশীলকুমার মুখুজ্যে)। দু-জন বি-ইডি এবং দশ জন বি-এসসির মধ্যে বাঙালী নাই। এডুকেশ্যনে অর্থাৎ শিক্ষণে ১৩ জন ডিপ্লোমা পাইয়াছেন। তাহার মধ্যে তিন জন বাঙালী (প্রফুল্লকুমার দাসগুপ্ত, গোপেশ্বর মুখুজ্যে, বিনয়-কৃষ্ণ নিয়োগী)। কৃষিতে ডিপ্লোমা এক জন মুসলমান এবং শৈল্প রসায়নে ডিপ্লোমা এক জন পারসী পাইয়াছেন। আর এক জন পারসী বি-ইডি হইয়াছেন। তিন জন মুসলমান এঞ্জিনীয়ারিংএর বি-এস্‌সি এবং তিন জন কৃষির বি-এস্‌সি হইয়াছেন।

—

লণ্ডনের ডক্টর উপাধি

এডিনবরার মত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্তদের কোন তালিকা এখনও চোখে পড়ে নাই। কেবল একটি বাঙালী ছাত্রের খবর পাইয়াছি। বড়োদা ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল গঙ্গাচরণ দাশগুপ্তের পুত্র নীরজনাথ দাশগুপ্ত পদার্থ-বিজ্ঞানে লণ্ডনের পিএইচ-ডি উপাধি পাইয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এস্‌সিতে প্রথম-স্থানীয় হইয়াছিলেন।

—

কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষদে বঙ্কিম শতবার্ষিকী

বাঙ্গালোরের কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ তথাকার বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিকীর একটি ইংরেজী বিবরণ আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। বাংলায় তাহার চুম্বক দিতেছি। মহীশূরের যুবরাজ এই পরিষদের সভাপতি।

গত ৩০শে জুন শ্রীকৃষ্ণরাজেন্দ্র কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ ভবনে সভার অধিবেশন হয়। উহার উপসভাপতি অধ্যাপক বি এন শ্রীকণ্ঠিয়া, এম্‌-এ, বি-এল, সভাপতিত্ব করেন। "বন্দে মাতরম্‌" গীত হইয়া সভারম্ভ হয়। সুবিদিত কন্নাড লেখক ডি ঈ ভরদ্বাজ বিদ্যাভূষণ বঙ্কিমের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত মস্তি বেঙ্কটেশ আইয়েঙ্গার, এম-এ, মহীশূরের আবগারী কমিশনার, কন্নাড ভাষার বিখ্যাত কবি ও ছোট গল্পলেখক, কন্নাড ভাষায় "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"-

শীর্ষক গ্রন্থের লেখক, অতঃপর "ভারতীয় সাহিত্যে বঙ্কিমের স্থান" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন :—

"বঙ্কিম অবশ্য বাঙালীদের জন্য বাংলাতেই লিখিয়াছিলেন, কিন্তু যে স্বাজাতিকতার প্রাণ তাঁহার রচনাবলীতে মূর্ত্ত হইয়াছিল, তাহা বঙ্গের সীমা অতিক্রম করিয়া দূরে সুদূরে আগুন জ্বালিয়াছে, এবং তিনি আজ আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের পিতা বলিয়া মানিত। বন্দে মাতরম্ গানটি এখন মাতৃভূমির পূজার প্রতীক হইয়াছে।"

ইহার পর মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী-কন্নাড অভিধান কার্য্যালয়ের সাহিত্যিক সহকারী শ্রীযুক্ত এন্ গুণ্ডাপ্পা, এম্-এ, বঙ্কিমের লিখনভঙ্গী, তাঁহার জীবন্ত ও স্বাভাবিক চরিত্রচিত্রণ এবং মহৎ ভাব ও চিন্তার নমুনাস্বরূপ তাঁহার উপন্যাসসমূহের কন্নাড অনুবাদ হইতে কতকগুলি বাক্য পাঠ করেন। বাঙ্গালোরের সেণ্ট্রাল কলেজের কন্নাডের সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এ এন্ কৃষ্ণশাস্ত্রী, এম্-এ, "বঙ্কিমের আধুনিকতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি ভারতবর্ষের আধুনিক সাহিত্যের, বিশেষতঃ গদ্যসাহিত্যের, অগ্রদূত বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখ করেন।

"তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র, একটি তুলভউৎকর্ষশালী গ্রন্থ, যে-মন 'পৌরাণিক' একটি মহামানবের ঐতিহাসিকতা ও মহত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার আধুনিকতা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ করে।"

পরলোকগত বি বেঙ্কটাচার বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি কন্নাড ভাষায় মনোজ্ঞ অনুবাদ করিয়া লোকপ্রিয় করেন। এই সভায় তাঁহারও স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়। শ্রী এস্ শল্লামান্ তাঁহার জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়েন। সভাপতি মহাশয় উপসংহারে বলেন,

বঙ্কিম বঙ্গের যাহা, বেঙ্কটাচার কর্ণাটের তাহা। বঙ্গদেশ সর্ব্বপ্রথমে ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভারতীয় নবজাগরণে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্য সব প্রদেশের নেতৃত্ব করিয়াছে। তিনি বহু ভাগ্যশালী সন্তানের মাতা, ধর্ম্ম সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞানে বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তির জননী। তাঁহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে কর্ণাটের প্রিয় বঙ্কিমচন্দ্র। বেঙ্কটাচার সর্ব্বসাধারণের মধ্যে কন্নাড সাহিত্য পাঠে রুচির জনয়িতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র ও বেঙ্কটাচার উভয়েই মাতৃভাষার সাহায্যে জনগণের উন্নতিবিধানের সমর্থক ছিলেন (কথায় ও কাজে)।

সর্ব্বাঙ্গীণ সংস্কৃতির দিক্ দিয়া বাংলা দেশ ভারতে সকলের আগে জাগিয়া অগ্রণী হইয়াছিল, আমাদের পক্ষে, মিষ্ট এরূপ কথা শুনিয়া আমরা যদি অহঙ্কৃত হই, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বাগ্রে নিদ্রিত হইতে ও সকলের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেও বিলম্ব হইবে না।

—

ব্রিটিশ কমন্‌ওএল্‌থ কন্‌ফারেন্স

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে অষ্ট্রেলিয়ায় ব্রিটিশ কমন্‌ওএল্‌থ রিলেশ্যন্স কন্‌ফারেন্সের (British Commonwealth Relations Conference-এর) অধিবেশন হইবে। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি উপনিবেশগুলিকে কমন্‌ওএল্‌থ বলে। তাহাদের পরস্পর সম্পর্ক বিষয়ে এই কন্‌ফারেন্স। ভারতবর্ষ কমন্‌ওএল্‌থ নহে, অধীন দেশমাত্র। তথাপি গবর্মেণ্ট এখানকার ডেলিগেট এই কন্‌ফারেন্সে পাঠাইবেন। ব্যাপারটা কি, জানিয়া শুনিয়া আসা মন্দ নয়। ভারতবর্ষ হইতে পাঠান হইবে চারি জনকে। সভাপতি হইবেন সার্ভেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সভাপতি মাননীয় পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু। ইঁহার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। সভ্য হইবেন দু-জন; অধ্যাপক কালিদাস নাগ, এবং এম্ ঘিয়াসুদ্দিন, এম্ এল এ (কেন্দ্রীয়)। সেক্রেটরী হইবেন সৈয়দ আমজাদ আলি, এম্ এল এ (পঞ্জাব)। যোগ্যতম বলিয়া সভাপতি ইত্যাদি চারি জনই মুসলমান হইলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু শুধু মাথাগুন্তি হিসাবে মুসলমানদিগকে পাওনা গণ্ডা দিতে হইলে চারিটি পদের মধ্যে একটির বেশী তাঁহাদের প্রাপ্য হয় না, বরং (ভগ্নাংশ) কিঞ্চিৎ কম হয়।

—

রাশিয়ায় কতিপয় ভারতীয় গ্রেপ্তার

কিছু দিন পূর্ব্বে সংবাদ আসে, যে, রাশিয়ায় শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অন্য কয়েক জন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহার পর আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই। এই জন্য,

(শিমলা ১০ জুলাই)

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত ও কংগ্রেস জাতীয় দলের অন্যান্য সদস্যেরা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের নোটিস দিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ রাশিয়াতে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য যে কয়েক জন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক যথাযথ সংবাদ সংগ্রহ ও ভারত-সরকারকে তাহা জ্ঞাপনার্থ ব্রিটিশ সরকারকে অবিলম্বে অনুরোধ করা হউক। ধৃত ব্যক্তিদিগকে আইনসঙ্গত অধিকার প্রদান করিবার নিমিত্ত এবং তাঁহারা যাহাতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন ও তদনন্তর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত ব্রিটিশ সরকার যেন রাশিয়াস্থিত ব্রিটিশ রাজদূতকে আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশ দেন।—ইউনাইটেড প্রেস।

ধৃত অন্যান্য ব্যক্তি কে কে জানি না। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনে কার্জন-ওআইলির হত্যা উপলক্ষ্যে যাহা লিখিয়াছিলেন, গবর্মেণ্ট হয়ত এখনও তাহা ভুলেন নাই। বিচারে কিন্তু বেআইনী বলিয়া তাহা কখনও প্রমাণ হয় নাই।

কারণে ও দেশের সেবা করা অপরাধে—ইহা নহে যে তাঁহার দ্বারা কখন কোন শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা ছিল। নির্ভীক বলিষ্ঠ পুরুষ তিনি ছিলেন, কিন্তু গুরুতর উত্তেজনা সত্ত্বেও কাহারও গায়ে হাত দিবার মানুষ তিনি ছিলেন

সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সতীশ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ৬৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি যেরূপ বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন, তাহাতে পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে তাঁহার মত মানুষের মৃত্যুকে অকালমৃত্যু বলিতে হইবে। তাঁহার দেহ এরূপ সবল ছিল এবং উদ্বেগ দুঃখ অবসাদ উত্তেজনার কারণ সত্ত্বেও তিনি সর্ব্বদা এরূপ শান্ত ও প্রফুল্লচিত্ত থাকিতেন, যে, তাঁহার বয়স কত হইয়াছে বুঝা যাইত না। তাঁহার যে ফোটোগ্রাফটি এখানে ছাপা হইল, তাহা চারি-পাঁচ বৎসর আগে তোলা, কিন্তু তাহা ষাট বৎসরের বৃদ্ধের ছবির মত নহে।

তাঁহার বলিষ্ঠ দেহের অনুরূপ মানসিক শক্তি তাঁহার ছিল। দেশভক্ত মানবপ্রেমিক তিনি ছিলেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পরে যে প্রবল আন্দোলন হয়, বিদেশী পণ্য বর্জ্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহারের নিমিত্ত যে প্রচেষ্টা আরব্ধ হয়, তাহাতে বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের সহকর্ম্মীরূপে তিনি এরূপ কর্ম্মিষ্ঠতা দেখাইয়াছিলেন, যে, তাহার ফলে তিনি ১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেশ্যন অনুসারে কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতির সহিত নির্ব্বাসিত হন। তিনি তখন ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। নির্ব্বাসনদণ্ড হইতে মুক্তিলাভের পর রিপন কলেজ ও সিটি কলেজে অধ্যাপকতা করেন। তাহার পর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বহু বৎসর ব্রজমোহন কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাজ যোগ্যতার সহিত করিতেছিলেন। তিনি সুদক্ষ অধ্যাপক এবং সুবক্তা ছিলেন।

তিনি ভগবদ্ভক্ত এবং দরিদ্র ও উৎপীড়িত মানুষদের দরদী বন্ধু ছিলেন। তাহা তাঁহার বহু গোপন দানে ও অন্য নানাবিধ কার্য্যে প্রকাশ পাইত। পরের জন্য তিনি বহু কষ্ট স্বীকার ও দুঃখভোগ করিতেন। নির্ব্বাসিতও ত হইয়াছিলেন সেই

সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

না। তাঁহার মন বজ্রের মত দৃঢ়, হৃদয় পুষ্পের মত কোমল ছিল। তাঁহার হৃদয়ের ঔদার্য্য ও মৈত্রী এরূপ ছিল, যে, তাঁহার নিন্দুকদেরও তিনি পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদের "দৃষ্টিকোণ" বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন।

এই কর্ম্মবীর প্রেমিক মানুষটির তিরোভাবে বরিশালের, বঙ্গের, কিরূপ ক্ষতি হইল বলিতে পারি না।

—

চীন-জাপান যুদ্ধ

কাগজে যদিও দেখা যাইতেছে, যে, চীনের যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে গিয়া জাপানকে বিব্রত হইতে হইতেছে, তথাপি জাপান জীবন-মরণ পণ করিয়া যুদ্ধ চালাইবেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। অন্য দিকে চীনের সামরিক নেতা চিয়াং কাই শেক বলিয়াছেন, যত দিন এক ইঞ্চি

জমিও চীনের থাকিবে চীন তত দিন লড়িবে। এ অবস্থায় যুদ্ধ শীঘ্র থামিবার সম্ভাবনা কোথায়? প্রথম প্রথম জাপান যেমন কেবল জিতিতেছিল, সে অবস্থা অনেক দিন হইতে নাই। চীনও জিতিতেছে। ১০ই জুলাইয়ের একটি খবরে দেখা যায়, যে, চীনের এরোপ্লেনসমূহ বোমা-বর্ষণ দ্বারা দুটা জাপানী যুদ্ধজাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। আর একটি সংবাদে প্রকাশ, আনকিং এরোপ্লেনের আড্ডায় চীনা এরোপ্লেনের আক্রমণের ফলে ভূমিতে অবস্থিত জাপানীদের ৫০টা এরোপ্লেন নষ্ট হইয়াছে এবং বন্দরের ৫টা জাপানী যুদ্ধজাহাজের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে।

—

প্যালেষ্টাইনে গুরুতর অশান্তিবৃদ্ধি

প্যালেষ্টাইনে আরব ও ইহুদীদের বিরোধ পূর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছে। খুন জখম বাড়িয়া চলিতেছে।

—

শুধু আরবদের সহিত সহানুভূতি উচিত কি না

এইরূপ খবর আসিয়াছে, যে, লণ্ডনে পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরু আরবদিগের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য, ইহার অর্থ এ নয়, যে, যে-সকল আরব ইহুদীদিগকে আক্রমণ করিতেছে পণ্ডিতজী তাহাদের পক্ষে। ইহার অর্থ এই, যে, মোটের উপর, আরবেরা যাহা চায় পণ্ডিতজী তাহার সমর্থন করেন।

আমরা এই বিরোধে এরূপ পরিষ্কার ভাবে কোন একটা পক্ষে মত দিতে পারি না। বিদেশে ভিন্ন ভিন্ন দুই জাতির মধ্যে বিরোধ হইলে ভারতীয় রাজনীতিকেরা কোন একটা পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন, দুইয়ের একটা কারণে বা দুই কারণেই; কোন পক্ষ যাহা বলিতেছে চাহিতেছে তাহা ন্যায্য মনে করিলে তাহা সমর্থিত হইতে পারে, আবার কোন পক্ষের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিলে ভারতের কিছু সুবিধা হইতে পারে, মনে করিয়া।

প্যালেষ্টাইন যেমন আরবদের দেশ, তেমনই ইহুদীদেরও দেশ। অবশ্য, সেখানে বহুসংখ্যক ইহুদী অনেক শতাব্দী ছিল না, কিন্তু কিছু ইহুদী সেখানে বরাবরই ছিল। মহাযুদ্ধের পর হইতে যে বহুসংখ্যক ইহুদী ঐ দেশে বসবাস করিতেছে, তাহা করিতেছে হয় পূর্ব্বে বাসিন্দাশূন্য অঞ্চলে কিংবা টাকা দিয়া জমি কিনিয়া, গায়ের জোরে নহে। তাহাতে আরবদেরও আর্থিক লাভ হইয়াছে, মজুরি বাড়িয়াছে, মোটের উপর প্যালেষ্টাইনের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। আরবদিগকে কেহ উদ্বাস্ত করে নাই। আরবদের সুবৃহৎ বাসভূমি আরব দেশ আছে, ইরাক সীরিয়া লেবানন আছে। ইহুদীদের পৃথিবীতে স্বদেশ বলিতে কেবল ক্ষুদ্র প্যালেষ্টাইন। অন্য প্রায় সর্ব্বত্র (বোধ হয় এখন রাশিয়া ছাড়া) তাহারা নির্যাতিত। জার্মেনী অষ্ট্রিয়া পোল্যাণ্ডে ত নির্যাতন ও বিতাড়ন সীমা ছাড়াইয়াছে। অতএব, সহানুভূতি তাহাদের প্রতিও হওয়া উচিত।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবশ্য আরব বা ইহুদী কেহই ভারতবর্ষকে সাহায্য করিবে না। আরবরা প্রধানতঃ মুসলমান বলিয়া তাহাদের সহিত সহানুভূতি করিলে ভারতীয় মুসলমানরা স্থায়ীভাবে কংগ্রেসে যোগ দিবে, এ আশাও অমূলক। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় কংগ্রেস ত মুসলমান-পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার স্থায়ী ফল এখন কি দাঁড়াইয়াছে?

ইহুদীরা আরবদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষিত এবং আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ও প্রগতিশীল। পৃথিবীর চিন্তানায়কদের মধ্যে ইহুদীদের নাম পাওয়া যায়। বিজ্ঞানে দর্শনে সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর মনীষীদের মধ্যে ইহুদী আছেন। আধুনিক কালে আরবেরা এসব বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া আছেন; তাঁহারা মধ্যযুগীয়। দাসক্রয়বিক্রয় ব্যবসাতে আরবেরা অন্ততঃ এশিয়ার সব জাতির মধ্যে বেশী দোষী। ইহুদী মনীষীরা পৃথিবীর অগ্রসর জনমত, সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অনুকূল জনমতও, গঠিত ও প্রভাবিত করিতে সমর্থ, আরবেরা নহে।

অর্থবল থাকায় ইহুদীরা এখনও পৃথিবীর অনেক সভ্যদেশের বহু সংবাদপত্র অল্পাধিক নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ।

অবশ্য, যদি সব দিক্ দিয়া বা মোটের উপর ইহুদীরাই দোষী হইত, বা অধিকতর দোষী হইত, তাহা হইলে কেবল স্বার্থের খাতিরে আমরা ইহুদীদিগকে না-চটাইতে বলিতাম না। কিন্তু অবস্থা বা পরিস্থিতি সেরূপ নহে। সত্য ও ন্যায় সম্পূর্ণরূপে আরবদিগের দিকে নহে।

অতএব, আমাদের বিবেচনায় আরব-ইহুদী বিরোধে আমাদের কোন পক্ষ অবলম্বন না-করাই কর্ত্তব্য।

—

চীনকে ভারতবর্ষ হইতে সাহায্য প্রেরণ

চীনে ভারতবর্ষ হইতে ডাক্তার, চিকিৎসার নানা সরঞ্জাম এবং অ্যাম্বুল্যান্স (আহত ও রোগীদের যাতায়াতাদির জন্য সজ্জিত মোটরগাড়ী) প্রেরণের জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা সকলের সমর্থন পাইবার যোগ্য। সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে কংগ্রেস কত টাকা তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা পরে জানা যাইতে পারে।

—

মালয়ের ভারতীয়দের চীনকে সাহায্য দান

মালয় উপদ্বীপে অল্প কয়েক লক্ষ মাত্র ভারতীয় বাস করেন। তাহাদের একটি কেন্দ্রীয় সমিতি (Central Indian Association) আছে। এই সমিতির সম্পাদক কে এ নীলকণ্ঠ আইয়ার জুলাই মাসের মডার্ন রিভিয়ুতে লিখিয়াছেন, যে, ঐ সমিতির চেষ্টায় মালয়ের ভারতীয়েরা চীনকে একটি অ্যাম্বুল্যান্স দিতে পারিয়াছেন। তাহার মূল্য এবং হংকং পর্য্যন্ত তাহা পাঠাইবার খরচ ও বীমার খরচ ভারতীয়েরা দিয়াছেন। ঐ গাড়ীটির বাহিরের ও ভিতরের ফোটো এবং তাহার সম্মুখে সংলগ্ন ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা, এই তিনটি ছবিও মডার্ন রিভিয়ুতে মুদ্রিত হইয়াছে।

মালয়ের অল্পসংখ্যক ভারতীয় যাহা করিতে পারিয়াছেন, ভারতবর্ষের অনেক কোটি লোকের তাহা অপেক্ষা বেশী করিতে পারা উচিত।

—

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি ও শিক্ষয়িত্রী-ঘটিত কলঙ্ক

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির শিক্ষা-বিভাগের শিক্ষয়িত্রী-ঘটিত ব্যাপারে শেষ বিচার যেরূপ হইয়াছে, তাহা চূড়ান্ত মনে না করিয়া পুনর্বিবেচনা করিবার অনুকূলে একটি প্রস্তাব কর্পোরেশ্যনের সভায় উপস্থিত করা হয়। সুভাষ বাবু ইহার পক্ষে ছিলেন, এবং ইহার সমর্থক বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। কিন্তু যদিও তিনি কংগ্রেসের সভাপতি এবং কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সদস্যদের কংগ্রেস-সমিতিরও সভাপতি, তথাপি উঁহার অনেক কংগ্রেস-সদস্যও বিরোধিতা করায় প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। ফলে সুভাষ বাবু মিউনিসিপালিটির ও উক্ত সমিতির সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন। তাহাতে কয়েক জন সদস্য তাঁহাকে ইস্তফা প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি দুটি সর্ত্তে সে বিষয়ে বিবেচনা করিতে রাজী হইয়াছেন। প্রথম, শিক্ষা-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী পদচ্যুত শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের প্রতি ন্যায়বিচার; দ্বিতীয়, মিউনিসিপালিটির কংগ্রেসী সদস্যদের নিয়মানুগত্য। সর্ত্ত দুটি পালিত হইবে কি না, পরে জানা যাইবে।

কংগ্রেসের মত, কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতেও এত দলাদলি ও চক্রান্ত আছে, যে, বাহিরের লোকের তাহা জানা অসম্ভব বা সুকঠিন। মিউনিসিপালিটির স্থায়ী শিক্ষাকর্ম্মচারী অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু বিলম্বে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ হইয়াছে কি? ন্যায়বিচার করিতে হইলে তাহার কথাগুলিও বিশেষ বিবেচ্য।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির শিক্ষা-বিভাগ সন্দেহমুক্ত হইলে তাহার ও দেশের হিত হইবে।

—

"ঝাঁসী দিব না ছাড়ি"

ঝাঁসীর মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপ্রথিত। তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি ও সাহস চিরস্মরণীয়। তাঁহার দেহভস্ম গোয়ালিয়রের মাটির সহিত মিশিয়া আছে। গোয়ালিয়রে গত জুন মাসে তাঁহার স্মৃতিপূজা হইয়া গিয়াছে। সভার সভাপতি হইয়াছিলেন হিন্দুমহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনায়ক সাভরকর। কেবল মহিলাদের আর একটি সভা হইয়াছিল। বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ বলিয়াছিলেন, "ঝাঁসী দিব না ছাড়ি।" এখানকার ভারতীয়দিগকেও মাতৃভূমিতে স্বত্ব না ছাড়িয়া তাহা পুনরুদ্ধার ও রক্ষা করিতে হইবে। উপায় অন্যবিধ হইতে পারে, কিন্তু সাহস, স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও স্বদেশপ্রেম সকল দেশের দেশভক্ত সন্তানদিগের মতই চাই।

—

লেবুগাছে আমের কলম

এলাহাবাদে সম্প্রতি নানাবিধ আমের যে প্রদর্শনী হইয়াছিল—যেরূপ প্রদর্শনী বঙ্গেও হওয়া উচিত, তাহাতে অন্যান্য আমের মধ্যে লেবুগাছে আমের কলম করিয়া যে ফল উৎপাদন করা হয়, তাহা প্রদর্শিত হয়। এই কলমটি করা হয় সাহারানপুরের

সরকারী বাগানে যুক্তপ্রদেশের সহকারী কৃষি-ডিরেক্টরের তত্ত্বাবধানে। উৎপন্ন ফলগুলির বিশিষ্টতা এই, যে, ইহার

লেবুগাছে আমের কলমে উৎপন্ন ফল
ডাঃ ললিতমোহন বসু গৃহীত ফোটোগ্রাফ হইতে

খোসাটি খুব পুরু; লেবুর খোসার মত, এবড়ো-খেবড়ো, এবং বহু ছোট ছোট সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট। ভিতরের শাঁস ভাল আমের মত; আঁশ নাই। কিন্তু পাকা অবস্থাতেও উহা খাইতে বড় টক; আম বা টক লেবুর মত গন্ধ উহাতে মোটেই নাই। স্বাদও আম বা লেবুর মত নহে। কলমের গাছের পাতা আমের পাতার মত। আঁটি ছোট। চেষ্টা করিলে এই মিশ্র ফলের অম্লতা দূর হইতে পারে, এবং ফলাহারীদের একটি আহার্য্য বাড়িতে পারে।

—

বঙ্গের শিক্ষকদিগকে হিন্দুস্থানী শিখিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা

কয়েক দিন পূর্ব্বে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সদস্যদের একটি সভায় বেগম সাকিনা ফারুক সুলতান মোয়াইজ্জাদা নিম্নলিখিত মর্ম্মের একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন :—

"কলিকাতা কর্পোরেশ্যনের টাচার্স ট্রেনিং পরীক্ষায় হিন্দুস্থানী (হিন্দী ও উর্দু) অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় করা হউক এবং যাঁহারা উক্ত পরীক্ষা দিতে চান তাঁহাদিগকে ও কর্পোরেশ্যনের সমস্ত শিক্ষককে ট্রেনিং ক্লাসে উক্ত ভাষা (দ্বয়) শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হউক।

"কলিকাতা কর্পোরেশ্যনের সমস্ত শিক্ষককেই উক্ত ভাষায় পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে। বাংলা-গবর্মেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরকে জুনিয়ার ও সীনিয়ার টীচার্স ট্রেনিং পরীক্ষায় হিন্দুস্থানী অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া স্থির করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।"

প্রস্তাবটি সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক হয়। শেষে উহা প্রাইমারী এডুকেশ্যন ষ্টাণ্ডিং কমীটির বিবেচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। ইহাতে আপত্তি করি না। তবে উহা সোজাসুজি অগ্রাহ্য করিলেই ঠিক্ হইত।

হিন্দুস্থানীভাষী ছেলেমেয়েদের জন্য তাহাদিগকে হিন্দুস্থানী ভাষা ও ঐ ভাষার মধ্য দিয়া অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশ্যনের কোন বিদ্যালয় আছে কিনা জানি না। বাংলা দেশের অন্যত্রও সরকারী ঐরূপ বিদ্যালয় আছে কিনা জানি না। না থাকিলে, সব শিক্ষককেই হিন্দুস্থানী শিখিতে ও তাহাতে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা জুলুম। আর, যদি ঐ রকম বিদ্যালয় অল্প-সংখ্যক থাকে, তাহা হইলে তাহাতে হিন্দুস্থানী-জানা শিক্ষক রাখিলেই ত চুকিয়া যায়; সকল শিক্ষকের উপর জবরদস্তির কোন কারণ নাই।

প্রস্তাবিকার মতে শিক্ষকদিগকে হিন্দুস্থানী শিখিতে বাধ্য করিলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের সুবিধা হইবে এবং তা ছাড়া হিন্দুস্থানী জানা খুব দরকার। কোন একটা ভাষা সবাই যদি শিখে তাহা হইলে ঐক্য স্থাপনের সুবিধা হয় বটে, কিন্তু সব প্রদেশের লোক ত হিন্দুস্থানী শিখিতেছে না, শিখিতে ব্যগ্রও নহে। মান্দ্রাজে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কংগ্রেস বলিয়াছেন, হিন্দুস্থানী ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু কংগ্রেস দেশের সকলের চেয়ে বড় রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান হইলেও উহার ফতোআ দেশের সব লোক, অধিকাংশ লোক, মানিয়া লয় নাই। পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে কেবল ত্রিশ লক্ষ লোককে কংগ্রেস নিজ সদস্য বলিয়া দাবী করেন। কংগ্রেসের রাজত্ব দেশের সর্ব্বত্র যদি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তখন যদি কংগ্রেস হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা করিতে চান ও পারেন, তাহা হইলে বাঙালীদের উহা শিখিতে মা[illegible] কয়েক মাস সময় লাগিবে। আগে হইতে তাড়াহুড় ও জবরদস্তির কি প্রয়োজন?

হিন্দুস্থানী জানা দরকার, তাহা জানি। যাহারা দরকা[র] মনে করিবে, যেমন ব্যবসায়ী লোকেরা, তাহারা আপ[নি] হইতেই শিখিবে। কিন্তু সেই কারণে, বাছিয়া বাছি[য়া] শিক্ষকদিগের উপরই আর একটি ভাষা শিখিবার বো[ঝা] চাপান সঙ্গত বা উচিত হইতে পারে না। পৃথিবীর আর কোন কোন ভাষা এবং আরও কোন কোন বিষয় [ও] খুব দরকার। কিন্তু তাই বলিয়া ত শিক্ষকদিগকে জো[র] করিয়া সেগুলি শেখান হয় না।

হিন্দুস্থানীকে অবশ্যশিক্ষণীয় করিলে কতকগুলি হিন্দী-জানা ও উর্দু-জানা লোকের চাকরি জুটে বটে। অবশ্য, অ-বাঙালী সাকিনা বেগম সেরূপ কোন কথা বলেন নাই; তিনি নিঃস্বার্থ বড় বড় কিছু কথা বলিয়াছেন।

এই বিষয়ে তর্কবিতর্কের সময় মেয়র জাকারিয়া মহাশয় ও সৈয়দ জালালুদ্দীন হাশেমী মহাশয় নিজেরা বাঙালী বলিয়া বঙ্গভাষা সম্বন্ধে আপনাদের স্পষ্ট মত ব্যক্ত করিয়া অন্য সকল বাঙালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। হাশেমী মহাশয় বলেন, যে, এমন দিন আসিবে যখন বঙ্গে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা (ইউরোপীয়েরাও) বাংলা শিখিতে ও বলিতে বাধ্য হইবেন। অবশ্য, আমরা কাহাকেও কোন একটা ভাষা শিখিতে ও বলিতে বাধ্য করার পক্ষপাতী নহি, কিন্তু যিনি যে-দেশে স্থায়ী ভাবে বা দীর্ঘকাল বাস করেন, তাঁহার তাহা শিক্ষা করা নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য। তাহাতে তাঁহার সুবিধাও হয়।

এই তর্কবিতর্কের ফলে অনেক অ-বাঙালীর এই ভ্রম দূর হওয়া উচিত, যে, বাঙালী মুসলমানেরা হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা করিতে চায়।

এক জন বক্তা হিন্দীকে ইংরেজী বা তদ্রূপ কোন ভাষারই মত আমাদের পক্ষে বিদেশী ভাষা বলিয়াছেন। তাহা ঠিক্ নয়। হিন্দী ও বাংলা পরস্পরের খুব নিকট। অশিক্ষিত বাঙালীরাও হিন্দী কিছু বুঝে, অশিক্ষিত হিন্দুস্থানীরাও বাংলা কিছু বুঝে।

—

রাষ্ট্রভাষা একটি না বস্তুত দুটি হইবে ?

কংগ্রেসের ব্যবস্থা এই, যে, হিন্দুস্থানী ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হইবে, এবং তাহা ব্যবহর্তার ইচ্ছা অনুসারে নাগরী বা আরবী লিপিতে লিখিতে হইবে। কংগ্রেসের অভিপ্রায় হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া সকল প্রদেশের লোকদের মধ্যে ভাব ও চিন্তার আদানপ্রদান সহজ করা। এই আদানপ্রদান মুখে কথা বলিয়া হইতে পারে, এবং লিপি দ্বারা হইতে পারে। আমার প্রয়োজন আমি মৌখিক জানাইতে পারি, চিঠি লিখিয়া জানাইতে পারি। কাহারও ভাব ও চিন্তা বক্তৃতা দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে, কিংবা লিখিত ও মুদ্রিত সংবাদপত্র, পুস্তিকা ও পুস্তক দ্বারা হইতে পারে। হিন্দী ও উর্দুকে হিন্দুস্থানী বলা হইতেছে। এই দুটি যদি এক ভাষা হয়, তাহা হইলে ইহার মৌখিক রূপ একই হইবে, কিন্তু লিখিত চেহারা দুই—অর্থাৎ নাগরী অক্ষরের ও আরবী অক্ষরের—হইবে; কথিত হিন্দুস্থানী নাগরীওআলা আরবীওআলা উভয়েই বুঝিবে, কিন্তু নাগরী-অক্ষর-প্রিয় ব্যক্তির লিখিত হিন্দুস্থানী ও আরবী-অক্ষর-প্রিয় ব্যক্তির লিখিত হিন্দুস্থানী উভয়ই বুঝিতে হইলে দু-রকম অক্ষরই জানিতে হইবে। ভারতবর্ষের সব সম্প্রদায়ের ও প্রদেশের মধ্যে ভাব ও চিন্তার আদানপ্রদান যখন হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা করার উদ্দেশ্য, তখন যিনি হিন্দু ও মুসলমান, নাগরী-অক্ষর-প্রিয় ও আরবী-অক্ষর-প্রিয়, সব লোকের সঙ্গে ঐরূপ বিনিময় চান তাঁহাকে উভয় লিপিই শিখিতে হইবে।

অতএব যদি হিন্দী ও উর্দু ভিন্ন লিপিতে লেখা এক ভাষাই হয়, তাহা হইলেও কংগ্রেসের ব্যবস্থাকে আশানুরূপ ফলপ্রদ করিতে হইলে লোককে দুটা লিপি পড়িতে ও লিখিতে শিখিতে হইবে। ইহা নিঃসন্দেহ।

হিন্দী ও উর্দু একই ভাষা, না দুটা ভাষা, এ-তর্কের মধ্যে আমি যাইব না। ইহার মীমাংসা করিবার মত জ্ঞান আমার নাই। হিন্দী আমি এখনও পড়িতে ও কিছু বুঝিতে পারি; এলাহাবাদে থাকিতে ছেলেমেয়েদের পাঠ্য খান চার পাঁচ উর্দু বহি পড়িয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমি উর্দুতে নিরক্ষর, উহা পড়িতে পারি না।

কথিত হিন্দুস্থানীতে (হিন্দী ও উর্দুতে) সাধারণ কথাবার্ত্তা ও বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বলিতেছি। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের (এবং অন্য অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের) হিন্দী বক্তৃতা আমি মোটামুটি বুঝিতে পারি, এবং অশুদ্ধ হিন্দীতে তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও চালাইতে পারি। করাচী কংগ্রেসে ডাক্তার আন্সারীর উর্দু বক্তৃতা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এলাহাবাদে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য-বিধায়ক কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল তাহাতে মৌলানা আবুল কলাম আজাদ, ইংরেজী জানিলেও, যাহা কিছু বলিতেন সব উর্দুতে। আমি বুঝিতে (সুতরাং প্রয়োজনমত উত্তর দিতে) পারিতাম না। এবং সালেমের শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘবাচারিয়র, যিনি কন্‌ফারেন্সের সভাপতি ছিলেন, তিনি ত পারিতেনই না। অতএব, উর্দু যদি হিন্দীর সহিত ব্যাকরণের ও কাঠামোর দিক্ দিয়া এক ভাষা হয়ও, তাহা হইলেও শিক্ষিত উর্দুভাষীদের উর্দুর শব্দসমষ্টি এত অধিক পরিমাণে আরবী-ফারসী হইতে গৃহীত, যে, তাহা সাধারণ হিন্দী-জানা লোকদের পক্ষে অবোধ্য বা দুর্বোধ্য। আমি যখন এলাহাবাদে কায়স্থপাঠশালা কলেজে প্রিন্সিপ্যাল ছিলাম, তখন

তথাকার ফারসীর অধ্যাপক মুন্সী শীতলা সহায় কখন কখন কার্য্যোপলক্ষ্যে আমাকে কিছু বলিতে আসিতেন। তিনি খুব ভাল উর্দ্দু বলিতেন, এই জন্য আমি বুঝিতে পারিতাম না।

মান্দ্রাজে ও অন্যত্র ইস্কুলে ব্যবহার্য্য এরূপ হিন্দুস্থানী বহি লেখান হইতেছে, যাহা নাগরী অক্ষরে লিখিলে হিন্দীপদবাচ্য হইবে। আরবী অক্ষরে লিখিলে উর্দ্দু-পদবাচ্য হইবে, ছেলেমেয়েদের জন্য সহজ সহজ বিষয়ে এরূপ বহি লেখা কঠিন নহে; কারণ, এরূপ শব্দ বিস্তর আছে যাহা, সংস্কৃত বা আরবী-ফারসী যাহা হইতেই আসুক, হিন্দী ও উর্দ্দু উভয়েই চলে (বাংলাতেও ত অনেক আরবী-ফারসী কথা চলিয়াছে)। কিন্তু উচ্চ-শিক্ষার্থীদের জন্য বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক,…বহি লিপিতে গেলেই সাধারণ কথাবার্ত্তায় অব্যবহৃত বিস্তর শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, কতক নূতন করিয়া সংগ্রহ করিতে বা গড়িতে হইবে। তাহার জন্য এক পক্ষের সংস্কৃতের, অন্য পক্ষের আরবী-ফারসীর জ্ঞান আবশ্যক হইবে। হিন্দীওআলারা এরূপ শব্দ লইবেন বা গড়িবেন সংস্কৃত হইতে, উর্দ্দুওআলারা আরবী-ফারসী হইতে। এই জন্য, এই সকল বহি কেবল লিপিতে ভিন্ন হইবে না, বিস্তর শব্দসম্বন্ধেও ভিন্ন হইবে। হায়দরাবাদের ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পাঠ্য-পুস্তকগুলি নাগরীতে ছাপিয়া দিলেই কাশীর হিন্দুবিশ্ব-বিদ্যালয়ে বা কাশী বিদ্যাপীঠে চলিবে, কিংবা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বা কাশী বিদ্যাপীঠের পাঠ্যপুস্তকগুলি আরবী অক্ষরে ছাপিয়া দিলেই ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিবে, এরূপ মনে করা ভুল।

উপরে উচ্চশিক্ষার্থীদের ব্যবহার্য্য পাঠ্যপুস্তকের কথাই বলিলাম। কিন্তু উপন্যাসরূপ লঘু সাহিত্যেও হিন্দী ও উর্দ্দুর প্রভেদ লক্ষিত হয়। একটি দৃষ্টান্ত দি। আমার কাছে মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশের জন্য কখন কখন উর্দ্দু উপন্যাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ আসে। এইরূপ একটি প্রবন্ধে বিস্তর উর্দ্দু উপন্যাসের নাম ও সমালোচনা ছিল। কিন্তু এখন আমার যতটা মনে পড়িতেছে, এই নামগুলির একটিরও অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই। অবশ্য, ইহা আমার হিন্দুস্থানীর অজ্ঞতার ফল হইতে পারে। কিন্তু হিন্দী উপন্যাসের আমার অবোধ্য এই রূপ কোন নাম মনে পড়িতেছে না।

উপরে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিলাম, হিন্দুস্থানীকে (হিন্দী ও উর্দ্দুকে) রাষ্ট্রভাষা করিলে দুটি লিপি শিখিতে ও শিখাইতে হইবে, এবং শব্দ সংগ্রহ ও শব্দ গঠনের জন্য, ও হিন্দীতে ও উর্দ্দুতে লিখিত উচ্চাঙ্গের বহির বিস্তর শব্দের অর্থবোধের জন্য, সংস্কৃত ও আরবী-ফারসী উভয়ই জানিতে হইবে।

বাংলা ভাষার একটা সুবিধা এই, যে, ইহার লিপি এক, এবং ইহাতে নূতন শব্দ আনিতে হইলে সংস্কৃত জানাই যথেষ্ট।

—

ভারতীয় ভাষায় সংস্কৃতের ও আরবী-ফারসীর স্থান

হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা করা লইয়া নানা রকম তর্কবিতর্ক হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে এই একটা কথা হিন্দুস্থানী-ওআলারা বলেন, যে, পণ্ডিতরা হিন্দীতে বড় বেশী সংস্কৃত চালাইতে চান, মৌলবীরা বড় বেশী আরবী-ফারসী চালাইতে চান। কোন বিষয়ে আতিশয্যের পক্ষপাতী আমরাও নহি; কিন্তু ভারতীয় কোন ভাষায় নূতন শব্দ আনিতে হইলে সংস্কৃত ও আরবী-ফারসীর উপযোগিতা সমান, ইহা মোটেই সত্য নহে। সংস্কৃত ভারতবর্ষের ভাষা, ইহা হইতে শব্দ সংগ্রহ বা গঠন করা স্বাভাবিক। আরবী-ফারসী ভারতবর্ষের ভাষা নহে, এবং ইহার কোনটিই সংস্কৃত অপেক্ষা সমৃদ্ধ নহে। সংস্কৃত হইতে আহৃত বা গঠিত শব্দ ভারতীয় আধুনিক ভাষা-সমূহের সহিত যেমন খাপ খায়, বিদেশী ভাষা হইতে সংগৃহীত বা গঠিত শব্দ তেমন খাপ খায় না। ইহা যে কেবল উত্তর-ভারতীয় সংস্কৃতমূলক ভাষাসমূহ সম্বন্ধেই সত্য, তাহা নহে, দক্ষিণের দ্রাবিড় তামিল ভাষাতে বিস্তর সংস্কৃত শব্দ আছে এবং নূতন শব্দের প্রয়োজন হইলে তামিলরা সংস্কৃতের আশ্রয় লন।

ভারতীয় ভাষায় গৃহীত বিদেশী শব্দ সাধারণতঃ কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে চলে।

হিন্দুস্থানীতে সংস্কৃত শব্দ ঢুকাইলে উহা ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশের এবং অধিকাংশ সম্প্রদায় ও শ্রেণীর পক্ষে আরবী-ফারসী অপেক্ষা বোধগম্যও হইবে।

সংস্কৃতশব্দবহুলতার জন্য বাংলা ভাষার এইরূপ বোধসৌকর্য্য থাকায়, ভারতবর্ষের সব প্রধান ভাষায় ইহার বহুসংখ্যক পুস্তকের অনুবাদ হইয়াছে—গ্রন্থকারদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে।

—

শান্তিনিকেতনে সঙ্গীত শিক্ষার জন্য বৃত্তি

বাংলা সরকার শান্তিনিকেতনে সংগীত শিক্ষার জন্য ছয়টি বৃত্তি দিয়াছেন। মুসলমান ও তপশীলভুক্ত জাতির ছাত্রের জন্য এক একটি এবং এক জন ছাত্রীর জন্য একটি; বাকী তিনটি সকলের জন্য।

সংগীতের চর্চা বাংলা দেশে বাড়িয়াছে বটে; কিন্তু এখনও মফঃস্বলে অনেক জায়গায় রবীন্দ্রনাথের সুবিদিত কোন কোন গান এবং বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" পর্য্যন্ত অত্যন্ত বিকৃত রকমে গাওয়া হয়। এ অবস্থার প্রতিকার আবশ্যক।

—

"সিংহের লেজ মোচড়ান"

আমাদের নিকট সমালোচনার জন্য "সিংহের লেজ মোচড়ান" ("Twisting the Lion's Tail") নামক একখানি বিলাতী কৌতুকাবহ বহি আসিয়াছে। প্রকাশক ইংরেজ। গ্রন্থকার কোন্ জাতীয় বুঝা গেল না। তিনি ইংরেজদের জাতীয় গুণাগুণ, খেলাধুলা, নারীকুল ও শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে নিজের ধারণা বেপরোয়া ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার মলাটের আবরকে এই ছবিটি আছে।
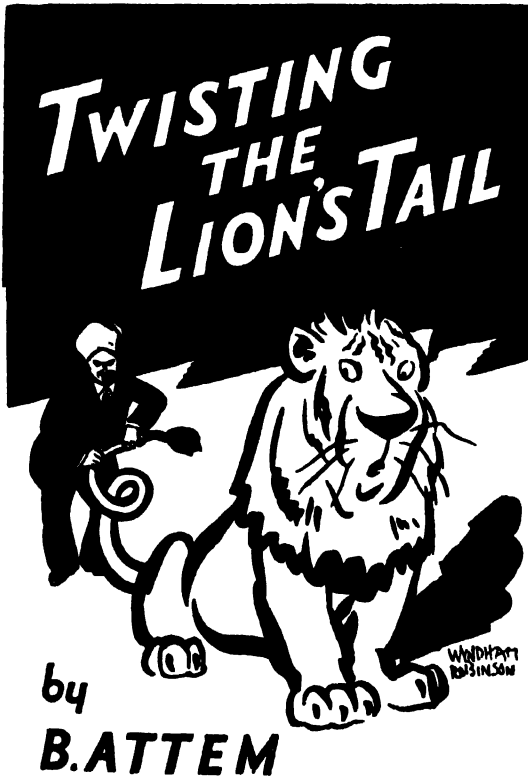
—

চীনে জাপানীদের বিষাক্ত গ্যাস

জাপানীরা চীনে যুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করিবে এইরূপ খবর আসিয়াছিল, ব্যবহার করিতেছে কি না
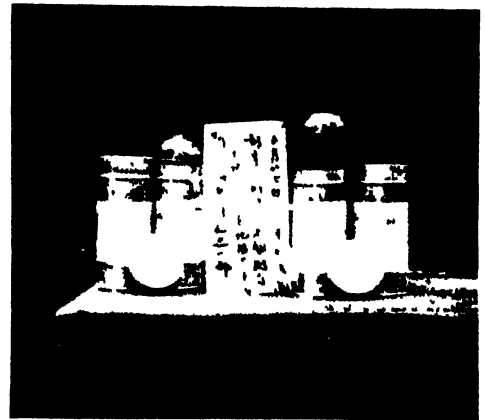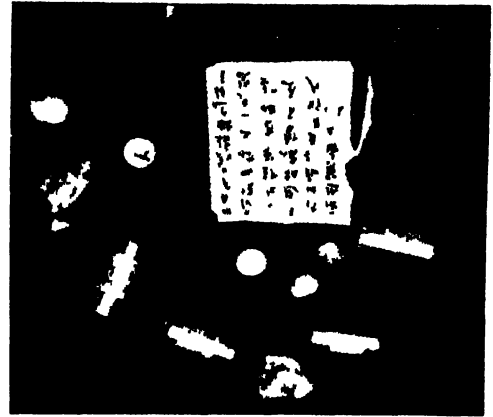
তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু তাহারা যে ব্যবহারের জন্য

চীনে বিষাক্ত গ্যাস আনিয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। লুংঘাই রেলওয়ে লাইনের ধার দিয়া যাইতে যাইতে চৈনিক সৈন্যেরা ঐ গ্যাসের যে-সব আধার হস্তগত করিয়াছে, চীন হইতে আমরা তাহার দুটি ফোটোগ্রাফ পাইয়াছি। এখানে তাহার ছবি দিলাম।

—

কানপুরের ধর্ম্মঘট মিটিল

ইহা সুসংবাদ যে প্রায় দুই মাস ধর্ম্মঘটের পর কানপুরের ধর্ম্মঘট মিটিয়াছে। শ্রমিকদের অন্যান্য দাবীর মধ্যে বেতনবৃদ্ধির দাবী গ্রাহ্য হইয়াছে। ইহা সন্তোষের বিষয়।

এক জন বিশেষজ্ঞ অনুমান করিয়াছেন, যে, শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করায় মজুরি বাবতে তাহাদের মোট আঠার লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। তাহাদের বেতনবৃদ্ধি হওয়াতে ক্ষতিপূরণ হইবে; কিন্তু ক্ষতিপূরণ হইতে মোটামুটি দুই বৎসর লাগিবে। কানপুরের অন্য ক্ষতি যাহা হইল, তাহার পূরণ হইবে না। সেখানে যে-সব নূতন কারখানা হইবার কথা ছিল, তাহা হইবে না।

—

বঙ্গে অন্য প্রদেশের শ্রমিক- ও কৃষক-নেতা

একবার রেলে বাহির হইতে কলিকাতা আসিবার সময় আমাদিগকে এক জন ছোকরা রেলওয়ে কর্ম্মচারীর সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা ট্রেনের এক কামরায় থাকিতে হয়। লোকটি ভারতীয় নহে, পূরা ইউরোপীয়ও নহে। তাঁহার মুখে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের অনেক নিন্দা শুনিলাম। তাহার পর তিনি বলিলেন, "আমি আর রেলের চাকরি করিব না, লেবার-লীডার (শ্রমিক নেতা) হইব।" তাহাতে বোধ হয় আমার মুখে বিস্ময় বা সন্দেহের চিহ্ন দেখিয়া নিজেই তিনি গম্ভীর ভাবে (পরিহাস বা ব্যঙ্গচ্ছলে নহে) বলিলেন, "আমার চাকরির চেয়ে উহাতে উপার্জ্জন বেশী হইবে" ("It is a better career")। শ্রমিক-নেতৃত্ব করিয়া রোজগার কি প্রকারে হইতে পারে জানি না। কিন্তু বঙ্গের বাহির হইতে একাধিক শ্রমিক-নেতা ও কৃষক-নেতার বঙ্গে আগমনে আমাদের মনে হইয়াছে, "হ'বেও বা!" তাঁহারা কেহ কেহ বাঙালী নিমন্ত্রকদের আহ্বানে আসেন, কেহ কেহ বা বাংলা দেশকে অযাচিত কৃপা করিতে আসেন। বাঙালী নিমন্ত্রকদের আহ্বানে আসেন এই জন্য, যে, আজকাল নিকৃষ্টতাবোধগ্রস্ত অনেক বাঙালী বাহিরের লোকদিগকে উদ্ধারকর্ত্তা ভাবেন।

যে-সব প্রদেশ হইতে অ-বাঙালী শ্রমিক-নেতা আসেন, সেই সকল প্রদেশ দেশশাসনে কংগ্রেসের অধীনে প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব (Provincial Autonomy) পাইয়াছে। বাংলা দেশ তাহা পায় নাই। ঐ সকল প্রদেশের মন্ত্রীরা শ্রমিক ও কৃষকদের সমস্যাসমূহের সমাধান নিজেরা করিতেছেন; আবার ঐ সকল প্রদেশ হইতে বঙ্গের শ্রমিকদের ও কৃষকদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া শ্রমিক-নেতা ও কৃষক-নেতাও আসিতেছেন। অর্থাৎ বাংলা দেশ রাষ্ট্রিক বিষয়ে কংগ্রেসী শাসনের সুবিধা পাইল না, আবার শ্রমিকদের ও কৃষকদের ব্যাপারেও বাহিরের লোকেরা আসিয়া নেতৃত্ব করিবেন!

অথচ এই সব লোক প্লাবন দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে বিপন্ন বঙ্গের কৃষকদের কখন ত সাহায্য করেন না। তাঁহাদেরই কোন কোন প্রদেশে বাঙালী-বিতাড়ন নীতি চলিতেছে। সে ক্ষেত্রে ত বাঙালীদের বন্ধু রূপে তাঁহাদের টিকিও দেখা যায় না। তাঁহাদের কাহারও কাহারও হঠাৎ বঙ্গে আবির্ভাবের ঠিক্ কারণও বুঝা যায় না। এক জন পারসী আন্দোলক আগে জামশেদপুরে শ্রমিকদিগকে ক্ষেপাইতেন, এখন সে সৎকর্ম্মটি করেন না। কিছু দিন আগে তিনি আসানসোলের নিকটবর্ত্তী লোহা ইস্পাতের কারখানায় শ্রমিকবন্ধু রূপে আবির্ভূত হন। কি কারণে বা কি প্রকার প্ররোচনায়?

—

বঙ্গে জমিসংক্রান্ত ব্যবস্থা

বঙ্গে জমিসংক্রান্ত ব্যবস্থা এবং তাহা হইতে উদ্ভূত বঙ্গীয় সমাজের গঠন অন্য বহু প্রদেশ হইতে ভিন্ন। ইহা বাঙালী কৃষকবন্ধুদেরই ভাল করিয়া বুঝিবার কথা। এই কারণে বঙ্গের কৃষকদের অবস্থার উন্নতির কাজ বাঙালী কৃষকবন্ধুদের হাতেই থাকা উচিত। বাহিরের কৃষকবন্ধু আমদানীর প্রয়োজন নাই।

এই বিষয়ে বঙ্গের প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব চাই।

—

শ্রমশিল্পঘটিত বিষয়ে বঙ্গের আত্মকর্তৃত্ব চাই

বাংলা দেশে অন্য কোন কোন প্রদেশ অপেক্ষা চিনি বস্ত্র ও লৌহদ্রব্য এবং অন্যবিধ বহু পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের নিমিত্ত কারখানা এ-পর্য্যন্ত কম হইয়াছে। এক কথায়, বাংলা অন্য অনেক প্রদেশের চেয়ে কম ইণ্ডাস্ট্রিয়্যালাইজ্‌ড্ হইয়াছে। এই জন্য বঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা বঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দাদের দ্বারা হইতে পারে।

বঙ্গে কোন কোন রকমের কারখানা বাড়িলে, অন্য কোন কোন প্রদেশের ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া ভিন্নপ্রদেশাগত ভ্রমণকারী শ্রমিকবন্ধুদিগকে বিনা পরখে বঙ্গবন্ধু বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না।

শ্রমিকবন্ধুত্ব কাজ বাঙালী সাঁচ্চা শ্রমিকবন্ধুরাই করুন।

বঙ্গের শ্রমশিল্পঘটিত সমুদয় বিষয়ে বঙ্গের পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব আবশ্যক।

—

বঙ্গদেশে তুলার চাষ

বঙ্গদেশে তুলার চাষ সম্বন্ধে এবার একটি প্রবন্ধ ছাপিলাম। পরে এ-বিষয়ে আরও লেখা বাহির করিব। ১৯২৬ সালের আগষ্ট মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে বিশ্বভারতীর তদানীন্তন কৃষিকর্ম্মাধ্যক্ষ ও বর্ধমানের বর্ত্তমান সরকারী কৃষিকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সন্তোষবিহারী বসু এ-বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি শ্রীনিকেতনে খুব উৎকৃষ্ট তুলা জন্মাইতে পারিয়াছিলেন। বঙ্গে তুলার চাষ সম্বন্ধে তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট পুস্তিকা আছে।

—

বিঠলভাই পটেলের উইল

বিঠলভাই পটেল দেশের কাজের জন্য উইল দ্বারা সুভাষ বাবুকে টাকা দিয়া গিয়াছেন কিনা, সে বিষয়ে আবার তর্কাতর্কি চলিতেছে। কংগ্রেস-সভাপতি সুভাষ বাবু ব্রিটিশ আদালতের বিচার হয়ত চাহিবেন না। এই জন্য, সর্ব্বসাধারণকে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত উইলটি সমগ্র প্রকাশিত হওয়া উচিত। ইহা কোন গোপনীয় বৈয়ক্তিক কাগজ বা গোপনীয় রাষ্ট্রিক দলিল নহে।

—

রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

৫১ বৎসর বয়সে রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের অকালমৃত্যু হইয়াছে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যান তাঁহার চেষ্টায় অপেক্ষাকৃত অধিক সচেতন ও কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। জমিদারদের সঙ্কট-সময় আসিয়াছে। এমন সময়ে তাঁহার মত এক জন জমিদারের মৃত্যুতে তাঁহাদের কিছু বলক্ষয় হইল। তিনি তাঁহার পিতামহ কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের অনেক

রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর

গুণ পাইয়াছিলেন। সাহিত্য ও সুকুমার শিল্পের তিনি উৎসাহদাতা ছিলেন।

—

বঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল

বঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল আইনে পরিণত হইলে শিক্ষা সংকুচিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এই বিল ব্যবস্থাপক-সভার আগামী অধিবেশনে পেশ হইতে পারে। এই আসন্ন বিপদের প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সর্ নীলরতন সরকার, সর্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রিন্সিপ্যাল গিরিশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু প্রভৃতি অনেকে একটি সময়োচিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

—

ভাষিক বঙ্গদেশ পুনর্গঠন

ভাষা অনুসারে কয়েকটি প্রদেশ গঠিত হইয়াছে, আরও কয়েকটি হইবে। বঙ্গদেশও এই প্রকারে পুনর্গঠিত হওয়া উচিত। ইহার অনুকূলে যত প্রকার যুক্তি উপস্থাপিত হইয়াছে ও হইতে পারে, নিখিলবঙ্গ ছাত্রছাত্রী সম্মেলনে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাহা সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। তাহার অভিভাষণটি, কুতর্কীদের কুযুক্তির উত্তর সহ, বাংলা ও ইংরেজীতে পুস্তিকার আকারে পুনর্মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক।

—

ছোটনাগপুর স্বতন্ত্রীকরণ

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমীটি বিহার-প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বাংলাভাষী অঞ্চলগুলি বাংলার সহিত যুক্ত করিবার সপক্ষে মত দিয়াছেন। এইরূপ অঞ্চল ছোটনাগপুরে আছে। সুতরাং ছোটনাগপুরের অন্ততঃ এই অঞ্চলগুলি বাংলাকে দিতে কোন কংগ্রেসীর আপত্তি করা নিয়মানুগত্য নহে। কিন্তু বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল ও কাগজওয়ালারা সমগ্র ছোটনাগপুর স্বায়ত্ত রাখিতে চান। তাঁহাদের দু-রকম দুটা যুক্তি পরস্পরবিরোধী।

তাঁহারা বলেন, ছোটনাগপুরের সরকারী ব্যয় রাজস্ব অপেক্ষা অধিক; অর্থাৎ উহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বিহারকে নিজের টাকা দিতে হয়। তাহা হইলে, উহা ছাড়িয়া দিলেই ত বিহারের লাভ। আবার বলেন, বাঙালীরা স্বাভাবিক সম্পদে সমৃদ্ধ ছোটনাগপুরটি গ্রাস করিতে চায়। তাহার মানে এই, যে, বিহারীরা ঠিক্ ঐ কারণে উহা ছাড়িতে চায় না, ছোটনাগপুরের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া উহার হিতার্থ নহে। ছোটনাগপুর দীর্ঘকাল বিহারের সহিত যুক্ত ছিল বা আছে, এ যুক্তির কোন মূল্য নাই। উহা বঙ্গের সহিতও যুক্ত ছিল। ভাষিক প্রদেশ গঠনের নিমিত্ত ঐতিহাসিক সংযোগ অনেক ভগ্ন হইয়াছে, আরও হইবে; এবং ছোটনাগপুরে বিহারীর চেয়ে বাঙালীর সংখ্যা অনেক বেশী।

—

বিহার-প্রদেশের বাঙালী সমিতি

আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতির জন্য বিহার-প্রদেশের সর্ব্বত্র বাঙালী সমিতি গঠিত হওয়া আবশ্যক। হয় বিহারীদের সহযোগে, নয় শুধু নিজেদের চেষ্টায় সর্ব্বত্র নানা ব্যবসাবাণিজ্যে বাঙালীদের ব্যাপৃত হওয়া আবশ্যক। বিহার-প্রদেশে বাঙালীদের ঠিক সংখ্যাও গণিত হওয়া দরকার।

—

লণ্ডনে নেহরু মহাশয়ের কার্য্য

পণ্ডিত জওআহরলাল নেহরু লণ্ডনে ভারতের বেসরকারী দূতের কাজ করিতেছেন। তিনি যদি শ্রমিক দল পার্লেমেণ্টে বৃহত্তম দল হইলে, তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষের সহিত তাহার স্বাধীনতা মানিয়া লইয়া একটি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে রাজী করিতে পারেন, তা হইলে খুব বড় একটা কাজ হইবে।

আপাততঃ যদি তিনি ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের দ্বারা সরকারী ফেডারেশ্যনে অত্যাবশ্যক প্রধান কয়েকটি পরিবর্ত্তন করাইতে পারেন, তাহাও প্রশংসনীয় কৃতিত্ব হইবে।

দেশ-বিদেশের কথা

দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের য়ুনানপ্রদেশ

বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের পক্ষে যুদ্ধ-রসদ পাওয়া বিচিত্র সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমরক্ষেত্রের সমীপবর্ত্তী বন্দরগুলি সবই জাপানের করতলগত, এবং অন্যান্য সকল বন্দরই জাপানী নৌ বহরের দ্বারা অবরুদ্ধ, শুধু ব্রিটিশ হংকং মুক্ত আছে। প্রকাশ, চীনকে যুদ্ধ-রসদের জন্য তিনটি পথের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে—হংকঙের মারফৎ ব্রিটিশ সাহায্য, দ্বিতীয়তঃ ফরাসী ইন্দোচীনের পথে ইউরোপের সমরসম্ভার দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে পৌঁছিতেছে, এবং সুদূর সাইবিরীয় রেলওয়ে মারফৎ এবং ১৫০০ মাইল মোটর লরীতে এরোপ্লেনে রুশীয় রসদ আসিতেছে। জাপানীদের মতে এই তিন পথের মধ্যে, ফরাসী ইন্দোচীন হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের য়ুনান প্রদেশের রেলপথে যে সমর-রসদ আসে তাহার পরিমাণই সর্ব্বপ্রধান। এই ব্যাপার লইয়া জাপান ও ফ্রান্সে তর্কবিতর্ক হইয়াছে, এবং সম্প্রতি ফ্রান্স ইন্দোচীনের নিকটে চীন-সমুদ্রে একটি দ্বীপ দখল করিয়াছে যেন ইন্দোচীনের কাছে জাপানী নৌ-বহর আড্ডা গাড়িতে না-পারে।

এই ইন্দোচীন-য়ুনান রেলওয়ে ফ্রান্সের বৈদেশিক বাণিজ্য-প্রচারের একটি অভিনব প্রচেষ্টা। ১৮৯৭ সালে চীন ও ফ্রান্সের মধ্যে এক সন্ধি-প্রস্তাবের সঙ্গে এই রেলপথ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হয় এবং ১৯০৩ সালে ফ্রান্স এই রেলপথ নির্ম্মাণ অধিকার পায় এবং জরিপ ইত্যাদির কাজ সুরু হয়। নানা প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়া এই কাজ অগ্রসর হয়। তখন দক্ষিণ-পশ্চিম চীন ও বহির্জ্জগতের মধ্যে যোগাযোগের বিশেষ পথ ছিল না। দুর্ভেদ্য জঙ্গল ও পথহীন পার্ব্বত্য অঞ্চল ও পার্ব্বত্য উপজাতিদের প্রতিবন্ধকতায় বাধা পাইয়া শেষে ১২০০ ইউরোপীয়ের পরিচালনায় ৫০০০০ মজুরের পরিশ্রমে রেলপথ স্থাপনের কাজ চলিতে থাকে। কাজ চলিতে থাকা কালেই য়ুনান অঞ্চলে যুদ্ধবিদ্রোহ হওয়ায় কাজে অনেক বাধা পড়ে, অবশেষে ১২০০০ স্থানীয় লোক ও শতাধিক ইউরোপীয়ের প্রাণনাশের পর ১৯১০ সালের ৩০ জানুয়ারি সর্ব্বপ্রথম য়ুনান প্রদেশের প্রধান নগরী য়ুনান-ফুতে রেলপথে প্রথম যাত্রী ও মাল-গাড়ী চলে। বর্ত্তমানে ইন্দোচীনের সাইগন নগর ৬২ ঘণ্টায় ও
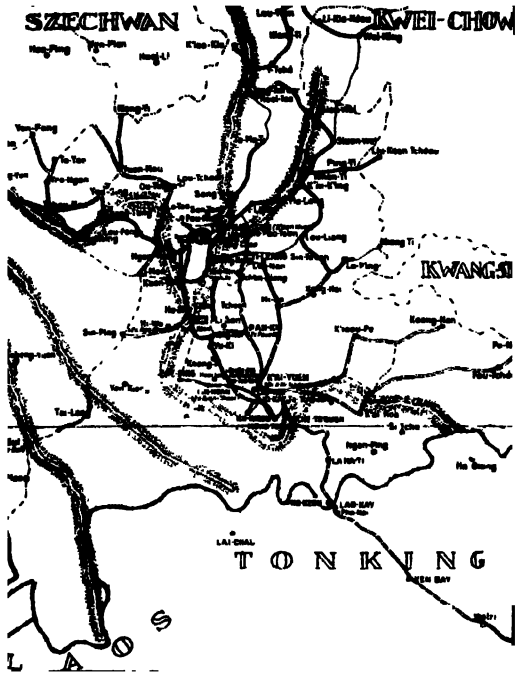
রেলপথের মানচিত্র। ইন্দোচীনের টংকিং অঞ্চল হইতে রেলসীমা (য়ুনানফু) পর্য্যন্ত।
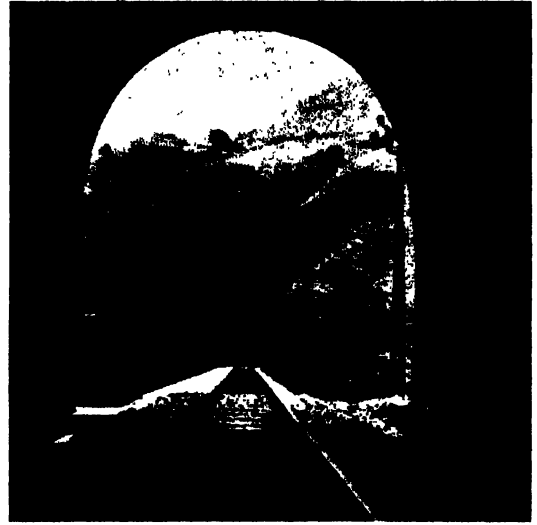
য়ুনান সীমান্তে রেলপথের দৃশ্য

হানোয়া হইতে ২২ ঘণ্টার একটানা রেলপথে এই বিচিত্র য়ুনান অঞ্চলে যাওয়া যায়।

এই য়ুনান প্রদেশের আচার-বিচার পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদ

তিব্বত সীমান্তের "লোলো" জাতীয়া স্ত্রীলোক

শিশুদিগের দেবতা বুদ্ধ

চীনা বালকবালিকারা আহত চীনা সৈনিককে স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক সঙ্গীত শুনাইতেছে। সৈনিক কোণে শয্যায় শায়িত, চিত্রে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

দেখিলে মনে হয় যেন মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ একত্র বিরাজমান। এই দেশের বাড়ীঘর, পথের পাশে কারুশিল্পীর দোকান, মন্দির, স্ত্রীপুরুষের বেশভূষা গত দশ শতাব্দী ধরিয়া সবই যেন একরূপই আছে; আবার সেই দেশের পথেই খাকীপরিহিত পুলিস পাশ্চাত্য প্রথায় আধুনিক মোটর ও লরির গতিবিধি পরিচালনা করিতেছে।

ফরাসী ইঞ্জিনীয়ারগণ কয়েক শত মাইলের মধ্যেই রেলপথ সমুদ্র-সমতল হইতে ৭৫০০ ফুট উচ্চে লইয়াছেন, পথে দুর্ভেদ্য গিরিসঙ্কট, অসংখ্য দুস্তর নদনদী অতিক্রম করিতে হইয়াছে—সহজেই বুঝিতে পারা যায় কেন এই পথ রচনা করিতে এত লোকের প্রাণ দিতে হইয়াছে। পথের শেষে চীন তিব্বত ও ব্রহ্মদেশের লোকদের মিলন স্থানে পৌঁছান যায়।

কলিকাতায় ললিতকলা প্রদর্শনী

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ সম্প্রতি কলকাতায় শান্তিনিকেতনের পূর্ব্বতন ছাত্রছাত্রী, ও অধ্যাপকদের রচিত চিত্রকলা ও মূর্ত্তিশিল্প-নিদর্শনের যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন অন্যান্য প্রদর্শনীর তুলনায় আয়তনে ক্ষীণ হ'লেও নানা কারণে সেটি উল্লেখযোগ্য। শিল্প-রসিকদের পক্ষে এই প্রদর্শনীর একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল, শিল্পীপ্রবর নন্দলাল বসু মহাশয়ের অনেক বহু পুরাতন ও আধুনিক ছবির সমাবেশ। বসু-মহাশয়ের বিভিন্ন সময়ের কাজে প্রাচীন ও আধুনিক বহু শিল্পধারা ও শৈলীর স্পর্শ আছে, কিন্তু, কোনও বিশেষ ধারাকেই একান্ত করে জেনে তারই চারি দিকে আবর্ত্তন ও পুনরাবৃত্তি ক'রে তিনি ফেরেন নি—এবং যখন যে-কোন শিল্পধারার আঙ্গিক তিনি গ্রহণ করুন না, স্বকীয় অনুভূতি ও দৃষ্টি দ্বারা তাকে নিজস্ব স্বাঙ্গীকৃত ক'রে তাকে নূতন রূপ দিয়েছেন ; দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পারা যায়, বাংলার পটের রীতিকে বহু ছবিতে তিনি নিবিড় ভাবে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁর সে-ছবিগুলি মাত্র পুরাতন পটের পুনরাবৃত্তি বা নিখুঁৎ নকল নয় ; এক কথায় বলতে গেলে, সেগুলি নন্দলাল বসুরই ছবি, কালীঘাট বা অন্য কোন স্থানের পটুয়াদের আঁকা পটের কপি বা আধুনিক সংস্করণ নয়। আবার, শুধু পট বা অজন্তার ছবিতেই তিনি আবদ্ধ হয়ে থাকেন নি। আবার দেখি, শুধু রং-তুলিই তাঁর শিল্পের একমাত্র উপজীব্য নয় ; নানা বিচিত্র উপকরণে তাঁর প্রতিভা আনন্দ পেয়েছে—তার নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি কাঠখোদাই ও এচিং প্রিণ্ট প্রদর্শনীতে ছিল, যদিও তাঁর গঠিত কোন মূর্ত্তি প্রদর্শনীতে ছিল না। এ-কথাও অবশ্য বলা চলে না, যে তাঁর শিল্পকলার নিদর্শন যা প্রদর্শনীতে ছিল তা তাঁর প্রতিভার সম্যক পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু তার কিছু প্রয়াস উদ্যোক্তাদের ছিল। শিল্প-পরিচয় আমাদের দেশে কয়েকজন রসিকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ; সাধারণের মধ্যে শিল্পবোধ অত্যন্ত কমই জাগ্রত, এবং সে-বোধ জাগাবার জন্য শিল্পরসিকদের মধ্যে যে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় তাও নয়। তার একটি উপায় সুনির্ব্বাচিত চিত্রের প্রদর্শনী, বিশেষতঃ দেশের প্রধান শিল্পীদের প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচায়ক চিত্রাবলীর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবির এই রকম একটি প্রদর্শনী এক বার হয়েছিল ; আশা করি বিশ্বভারতী, প্রাচ্যকলা-সমিতি বা আশ্রমিক সংঘ নন্দলাল বসুর বিচিত্র ও বহুমুখী শিল্প-নিদর্শনের এইরূপ একটি প্রদর্শনীর আয়োজন শীঘ্রই করবেন।

নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ কর প্রভৃতির শিক্ষাধীনে শান্তিনিকেতন এখন ভারতবর্ষের প্রধান শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সমাগত ছাত্রগণ বিভিন্ন সময়ে এঁদের কাছে শিল্পদীক্ষা গ্রহণ করে গেছেন ও ভারতের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছেন। এঁদের সকলের ছবি যথাসম্ভব সংগ্রহ করার চেষ্টা উদ্যোক্তাদের ছিল, যদিও সে-সংগ্রহকে কোন রকমেই সম্পূর্ণ বলতে পারি না। শান্তিনিকেতনের পূর্ব্বতন ছাত্র অনেক দক্ষ শিল্পীর কাজ সংগৃহীত হ'তে পারে নি, এবং অনেকের শুধু পুরাতন কাজই সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু যতদূর সংগৃহীত হয়েছিল তাতেও এই শিল্পকেন্দ্রের প্রাণবত্তার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল। প্রদর্শনী-ভবনে একজন সুধী দর্শকের মুখে একটা কথা শুনেছিলাম যে ছবিগুলির মধ্যে নাকি একটি গোষ্ঠীগত বিশেষ ধারা লক্ষ্য করা যায় না। তিনি এ-কথাটি অবশ্য প্রশংসাচ্ছলে বলেন নি, এবং কথাটি যে সম্পূর্ণ অকাট্য তাও নয় ; কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পের বর্ত্তমান গতানুগতিকতা ও ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষকের কাজের চরম পুনরাবৃত্তির দিনে এই উক্তিটিকে প্রশংসা ব'লেই গ্রহণ করা যেতে পারে। শিল্পে সাহিত্যে এখন পরীক্ষণের যুগই চলছে মোটামুটি এ-কথা বলা যেতে পারে ; এ-সময়ে শিক্ষক ও শিক্ষালয়ের পক্ষে, শিক্ষার্থীদের মনে স্বাধীনচিত্ততা অব্যাহত রাখতে পারার চেয়ে বড় কৃতিত্ব কিছু হ'তে পারে না। নন্দলাল বসুর পরীক্ষণপ্রিয় মনোবৃত্তি তাঁর অনেক ছাত্রদের মনেও অল্পবিস্তর সঞ্চারিত হয়েছে, যদিও, সুখের বিষয়, সকলে মিলে তাঁরই শিল্প-রীতির পুনরাবৃত্তি করছেন না।

শিল্পরচনার উপকরণ ও উপাদান নির্ব্বাচনেও শিল্পীদের বৈচিত্র্য ও স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক ভারতীয় শিল্পের প্রথম দিকে প্রধানতঃ জল-রংই শিল্পীদের আত্ম-প্রকাশের উপজীব্য ছিল। দু-একখানা বিখ্যাত ছবিতে তেল-রং ব্যবহার করা হয়ে থাকলেও তার ব্যবহার "অ-ভারতীয়" ব'লে এক রকম বর্জ্জিতই ছিল ; সম্ভবতঃ স্বপ্নভারাতুর কোমল "ভারতীয়" ছবি তাতে আঁকা তেমন সুবিধা হয় না ব'লে। শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের কেউ কেউ তেল-রঙের ব্যবহার ছবিতে চালিয়েছেন, তাতে তথাকথিত ভারতীয়তা ক্ষুণ্ন হয়ে থাকতে পারে কিন্তু শিল্পলক্ষ্মী ক্ষুণ্ন হন নি। উডকাট, এচিং, লিথোগ্রাফ প্রভৃতি ছাপের ছবির চর্চ্চা শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা বিস্তৃত ভাবে প্রবর্ত্তন করেছেন। কাঠ-খোদাই প্রভৃতিতে আমাদের দেশের কাজ এখনও বিদেশের বহুকালের চর্চ্চার সমকক্ষ, বিশেষতঃ আঙ্গিকের দিক দিয়ে তেমন বহুমুখী ও

জননী (লথোগ্রাফ) শিল্পী শ্রীহরিহরণ।
চিত্রাধিকারী শ্রীঅজিতমোহন রায়।

বিচিত্র এখন পর্য্যন্ত হয়েছে এমন দাবী না করা গেলেও, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, হরিহরণ, বিশ্বরূপ বসু প্রভৃতির ছাপের ছবি বিশেষ কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের এবং ভবিষ্যতে বিচিত্রতর সম্ভাবনার নিদর্শন। মুকুলচন্দ্র দে এচিঙে ইতিপূর্ব্বেই খ্যাতিলাভ করেছেন, যদিও তাঁর ইদানীন্তন কাজ সাধারণের দেখবার তেমন বিশেষ সুযোগ হয় নি। নন্দলাল বসু মহাশয়ের কয়েকটি এচিং প্রদর্শনীতে ছিল, সেগুলিতে তাঁর বিচিত্র প্রতিভার বিশিষ্ট পরিচয় দেখি। আমাদের দেশে শিল্পবিচারে এখনও বিষয়-গৌরব নিয়ে কলহই প্রধান হয়ে আছে। কাজেই এই প্রদর্শনীতে একই শিল্পীর রচনা "শিবের বিষপান" এবং "ছাগল" (এচিং) দেখে অনেকে বিস্মিত হয়ে থাকবেন, এবং শিল্পের বিষয়-গৌরবের লাঘবে পৌরাণিকপন্থী কেউ কেউ হয়ত আহতও হয়ে থাকবেন। এই এচিংটি সম্বন্ধে এক জন সমালোচক অল্প কথায় লিখছেন যে, এই ছবিটিতে বাস্তবকে অবাস্তবে রূপান্তরিত করা হয় নি; বরং তাকে বাস্তবতর সবস্থিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এচিংকে যে "রেখার সঙ্গীত" বলা হয়েছে, নন্দলাল বসুর "নৃত্য" বিষয়ক এচিংখানি দেখলে তার সার্থকতা বুঝতে পারি।

শান্তিনিকেতনের যে-সব পূর্ব্বতন ছাত্রদের নাম প্রসঙ্গতঃ পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা এবং ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা, অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙালী ঘরের মাতৃরূপ-চিত্রণে দক্ষ সত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (নূতন বিষয়বস্তুর গ্রহণে এঁর কারা-জীবনের চিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য), ক্ষিতীশ রায়, সুধীর খাস্তগীর প্রভৃতি অন্যান্য যাদের কাজ প্রদর্শনীতে ছিল, তাঁরা অনেকেই শিল্পরসিক-সমাজে সুপরিচিত। কিন্তু এই প্রদর্শনীকে বিশিষ্টতা দিয়েছে যাদের রচনা তাঁরা তেমন ভাবে দর্শকদের কাছে সুপরিচিত নন, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিঙ্কর বেইজ এখনও সাধারণের দৃষ্টি থেকে নিজেদের গোপন ক'রেই রেখেছেন। পৌরাণিক চিত্র ছেড়ে দৃশ্যপট আঁকবার একটা রেওয়াজ এখন আমাদের দেশে অনেক শিল্পীর মধ্যে এসেছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বর্ণাতিশয্যে পীড়াদায়ক, কিংবা যাকে বলা যেতে পারে 'ফটোগ্রাফিক'। প্রাকৃতিক দৃশ্য বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মত এমন প্রাণস্পন্দিত করে বেশী কেউ এঁকেছেন কি না, অরণ্য ও বনস্পতির গম্ভীর সুর এমন করে কেউ চিত্রপটে ধরেছেন কি না সন্দেহ। প্রাকৃতিক দৃশ্যচিত্রের কথায় মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের নাম সহজেই মনে হয়। তাঁর ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের দৃশ্যচিত্র-অঙ্কনের ধরণ স্বতন্ত্র। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত আলোকোজ্জ্বল দৃশ্যের ছবিই প্রধানতঃ এঁকেছেন, পর্ব্বতের সবুজের উপর রৌদ্রালোকের খেলাই তাঁর ছবির প্রধান বিশেষত্ব। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর দৃশ্যচিত্রে গাম্ভীর্য্যের ভাবটিই পটুতার সঙ্গে এঁকেছেন, রুক্ষতার অন্তরের মহান্ সৌন্দর্য্যই তিনি প্রধানতঃ আমাদের দেখিয়েছেন। রামকিঙ্কর বেইজের "কোনারকের পথে" ছবিতে শিল্পীর বলিষ্ঠতুলিকাসঞ্চালিত বর্ণসমাবেশ, ও গতিবেগের সংহত রূপ ছবিখানিকে প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ চিত্রের মর্য্যাদা দিয়েছিল, তাঁর "বালিকা ও কুকুর," "চায়ের দোকান" ভারত-শিল্পে নূতন পরীক্ষণের দৃষ্টান্ত রূপে উল্লেখযোগ্য। এই দুই জন শিল্পীর কাছ থেকে আধুনিক ভারতীয় শিল্পের অনেকখানি প্রত্যাশা করবার আছে।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষা

শ্রীবাসুদেব রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
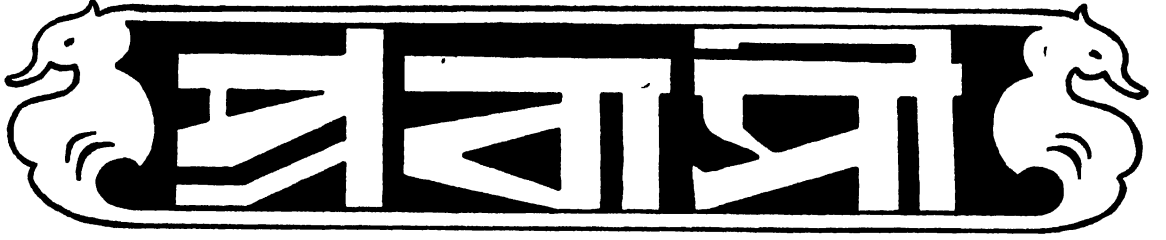
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৮-শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৪৫

৫ম সংখ্যা

চল্‌তি ছবি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রোদ্দুরেতে ঝাপ্‌সা দেখায় ঐ যে দূরের গ্রাম
যেমন ঝাপ্‌সা না-জানা ওর নাম।
পাশ দিয়ে যাই উড়িয়ে ধূলি, শুধু নিমেষভরে
চল্‌তি ছবি পড়ে চোখের 'পরে।
দেখে গেলেম, গ্রামের মেয়ে কল্‌সি-মাথায়-ধরা,
রঙিন-শাড়ি-পরা,
দেখে গেলেম, পথের ধারে ব্যবসা চালায় মুদী;
দেখে গেলেম, নতুন বধূ আধেক দুয়ার রুধি'
ঘোমটা থেকে ফাঁক ক'রে তার কালো চোখের কোণা
দেখছে চেয়ে পথের আনাগোনা।
বাঁধানো বটগাছের তলায় পড়ন্তি রোদের বেলায়
গ্রামের ক'জন মাতব্বরে মগ্ন তাসের খেলায়।
এইটুকুতে চোখ বুলিয়ে আবার চলি ছুটে,
এক মুহূর্তে গ্রামের ছবি ঝাপ্‌সা হয়ে উঠে।

নিশীথ রাতে তারা
ঐ না-জানা গ্রামের 'পরে তাকায় নিমেষহারা।
সেথায় ওরা ওদের আপন দিনের সকল কাজে,
স্বপ্নদেখা রাতের নিদ্রামাঝে,
তারা শুধু ওদের নিজের ঐ ঘরে ঐ মাঠে,
ঐখানে জল-আনার পথে ভিজে পায়ের ঘাটে,
পাখি-ডাকা ঐ গ্রামেরি প্রাতে,
ঐ গ্রামেরি দিনের অন্তে স্তিমিত-দীপ রাতে।
তরঙ্গিত দুঃখসুখের নিত্য ওঠা-নাবা,
কোনোটা বা গোপন মনে, বাইরে কোনোটা বা।
তারা যদি তুলত ধ্বনি, তাদের দীপ্ত শিখা
ঐ আকাশে লিখত যদি লিখা,
রাত্রিদিনকে কাঁদিয়ে তোলা তাদের প্রাণের ব্যথা
পেত যদি ভাষার উদ্বেলতা,
তবে হোথায় দেখা দিত পাথর-ভাঙা স্রোতে
মানব-চিত্ত তুঙ্গ-শিখর হোতে
সাগর-খোঁজা নির্ঝর সেই, গর্জিয়া নর্তিয়া
ছুটছে যাহা নিত্যকালের বক্ষে আবর্তিয়া
কান্নাহাসির পাকে ;
তাহা হোলে তেমনি ক'রেই দেখে নিতেম তাকে
অবাক পথিক দেখে যেমন ক'রে
নায়েগারার জলপ্রপাত দুই চক্ষু ভ'রে।

যুদ্ধ লাগল স্পেনে,
চলছে দারুণ ভ্রাতৃহত্যা শতঘ্নীবাণ হেনে।
সংবাদ তার মুখর হোলো দেশমহাদেশ জুড়ে',
সংবাদ তার বেড়ায় উড়ে উড়ে
দিকে দিকে যন্ত্র-গরুড় রথে
উদয়-রবির পথ পেরিয়ে অস্তরবির পথে।
কিন্তু যাদের নাই কোনো সংবাদ,
কণ্ঠে যাদের নাইকো সিংহনাদ,

সেই যে লক্ষকোটি মানুষ কেউ কালো কেউ ধলো,
তাদের বাণী কে শুনছে আজ বলো।
তাদের চিত্ত-মহাসাগর উদ্দাম উত্তাল
মগ্ন করে অন্তবিহীন কাল ;
ঐ তো তাহা সম্মুখেতেই, চারদিকে বিস্তৃত
পৃথ্বীজোড়া মহাতুফান, তবু দোলায় নি তো
তাহারি মাঝখানে-বসা আমার চিত্তখানি।
এই প্রকাণ্ড জীবন-নাট্যে কে দিয়েছে টানি'
প্রকাণ্ড এক অচল যবনিকা।
ছিন্ন ছিন্ন ওদের আপন ক্ষুদ্র প্রাণের শিখা
যে আলো দেয় একা,
পূর্ণ ইতিহাসের মূর্তি যায় না তাহে দেখা।

এই পৃথিবীর প্রান্ত হতে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি
জেনেছে আজ তারার বক্ষে উজ্জ্বালিত সৃষ্টি
উন্মথিত বহ্নি-সিন্ধু প্লাবন-নির্ঝরে
কোটি যোজন দূরত্বেরে নিত্য লেহন করে ;
কিন্তু এই যে এই মুহূর্তে বেদন হোমানল
আলোড়িছে বিপুল চিত্ততল
বিশ্বধরায় দেশে দেশান্তরে
লক্ষ লক্ষ ঘরে,
আলোক তাহার দাহন তাহার, তাহার প্রদক্ষিণ
যে অদৃশ্য কেন্দ্র ঘিরে' চলছে রাত্রিদিন
তাহা মর্ত্যজনের কাছে
শান্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে।
যেমন শান্ত যেমন স্তব্ধ দেখায় মুগ্ধ চোখে
বিরামহীন জ্যোতির ঝঞ্ঝা নক্ষত্র আলোকে।

আলমোড়া

নব-রত্নমালায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য

নব-রত্নমালার কাব্যারণ্যে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি অমূল্য কাব্যপ্রসূন লোকলোচনের অন্তরালে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া ছিল। সে সকল কাব্য-রত্ন সযত্নে সঞ্চয় করিয়া রবীন্দ্রকাব্যানুরাগী পাঠকবৃন্দকে উপহার দেওয়া হইল।

নব-রত্নমালা রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত একখানি সানুবাদ কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থ।* গ্রন্থখানি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ধর্ম্ম- ও নীতি-বিষয়ক পদাবলী। দ্বিতীয় ভাগে ঋগ্বেদ, উপনিষৎ, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে বচনসংগ্রহ। তৃতীয় ভাগ 'কবি ও কাব্য'; তাহাতে সম্পূর্ণ মেঘদূতের দুইটি অনুবাদ আছে—একটি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, অপরটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের; এতদ্ব্যতীত বারটি বিভিন্ন শ্লোক, অজবিলাপ, মদনভস্ম ও রতিবিলাপেরও অনুবাদ এই অংশে স্থান পাইয়াছে। চতুর্থ ভাগে বিবিধ কবিতা। পঞ্চম ভাগে তুকারাম—মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত-কবির জীবনী ও অভঙ্গমালা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২১৪+১৬১+৫৬।

গ্রন্থের ভূমিকায় সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

"ইহাতে সংস্কৃতের যে সকল অনুবাদ আছে তন্মধ্যে আমার নিজের ছাড়া কতকগুলি শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের কৃত—কতক শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী হইতে—কতক বা পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে সংগৃহীত।"

সমগ্র গ্রন্থখানিতে মাত্র দুইটি কবিতার নীচে 'র' লেখা আছে। অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইহা বুঝাইতেই তাঁহার নামের আদ্যক্ষর 'র' ব্যবহৃত হইয়াছে। নিম্নে উক্ত কবিতা দুইটি উদ্ধৃত করা হইল।

ন্যায়পথ

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং।
অদ্যৈব মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।

নীতিজ্ঞ করুক নিন্দা অথবা স্তবন,
লক্ষ্মী গৃহে আসুন বা ছাড়ুন ভবন,
অদ্য মৃত্যু হোক্ কিম্বা হোক্ যুগান্তরে,
ন্যায় পথ হতে ধীর এক পা না সরে।

[১ম ভাগ, ১৮ পৃষ্ঠা, ১৯ সংখ্যক শ্লোক

শকুন্তলা

ভুবনবিখ্যাত জর্ম্মান কবি গয়টে, কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলা বিষয়ে একটি শ্লোক লিখিয়া যান। ইষ্টউইক্ সাহেব গয়টের সেই শ্লোক ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। পণ্ডিত তারাকুমার তর্করত্ন (কবিরত্ন) এই অনুবাদের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন। এই দুইটি অনুবাদ বাংলা অনুবাদসহ নিম্নে একে একে উদ্ধৃত হইল:—

Wouldst thou the young year's blossoms
and the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed,
enraptur'd, feasted, fed,
Wouldst thou the earth and heaven itself
in one sole name combine ?
I name thee, O' Sakuntala !
and all at once is said.

সংস্কৃত অনুবাদ

বাসন্তং মুকুলং ফলঞ্চ যুগপদ্ গ্রীষ্মস্য সর্ব্বং চ তৎ
যৎ কিঞ্চিন্মনসো রসায়নমথো সন্তর্পণং মোহনম্।
একীভূতমভূতপূর্ব্বমথবা স্বর্লোক-ভূলোকয়োঃ
ঐশ্বর্য্যং যদি কোঽপি কাঙ্ক্ষতি তদা শাকুন্তলং সেব্যতাম্।

নব বৎসরের কুঁড়ি— তারি এক পাতে
বরষ শেষের পক্ক ফল,
প্রাণ করে চুরি আর তারি এক সাথে
প্রাণে এনে দেয় পুষ্টিবল ;

---

* নব-রত্নমালা। | বা | শাস্ত্রীয় প্রবচন, কাব্য ও বিবিধ কবিতা, | এবং | মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত কবি তুকারামের | জীবনী ও অভঙ্গ-সংগ্রহ। | শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক | সঙ্কলিত। | কলিকাতা | ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড। | আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে | শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা | মুদ্রিত ও প্রকাশিত। | ১৩১৪ সাল |

আছে স্বর্গলোক আর সেই এক ঠাঁই
বাঁধা যেথা আছে মহীতল,—
হেন যদি কিছু থাকে, তুমি তবে তাই
ওহে অভিজ্ঞান শকুন্তল।
[৩য় ভাগ, ৮৪-৮৫ পৃষ্ঠা, ১০ সংখ্যক শ্লোক

সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া ইহাতে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বহু অনুবাদের সন্ধান আমি পাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে ঐ অনুবাদগুলি রবীন্দ্রনাথের। অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরও কয়েকটি অনুবাদের পর্ব্ববিন্যাসে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পর্ব্ববিন্যাসরীতি দেখিয়া স্থির করিয়াছিলাম যে সেগুলিও তাঁহারই। মূলত ছন্দের উপর নির্ভর করিয়া, নব-রত্নমালায় কোন্ কোন্ কবিতা রবীন্দ্রনাথের হইতে পারে তৎসম্পর্কে আমি এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি। সেই প্রবন্ধ ও নব-রত্নমালা গ্রন্থখানি আমি বিশ্বভারতীর সহকারী কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সাঁতরা মহাশয়ের হাতে কবির নিকট পাঠাইয়া দিই। আমার পরম সৌভাগ্য যে আমার পুস্তকে কবি নিজে তাঁহার কৃত অনুবাদগুলি চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন। আমার পক্ষে ইহাও একান্ত গৌরবের কথা যে মাত্রাবৃত্ত, ও বিস্রস্ত-পর্ব্ব অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিতা সম্পর্কে আমার অনুমান নির্ভুল হইয়াছে। আশৈশব রবীন্দ্রকাব্যানুরাগের এর চেয়ে বড় পুরস্কার আমার কল্পনাতীত। নব-রত্নমালার কবিতা সম্পর্কে পরে আমি নিজেও কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনা করিয়া ধন্য হইয়াছি।

নিম্নে রবীন্দ্রনাথের অনূদিত কবিতাবলী ছন্দানুসারে সজ্জিত করিয়া দেওয়া হইল।

চাতক

গর্জ্জসি মেঘ ন বর্ষসি তোয়ং
চাতক-পক্ষী ব্যাকুলিতোহং।
দৈবাদিহ যদি দক্ষিণবাতঃ
ক ত্বং কাহং ক চ জলপাতঃ॥

গর্জ্জিছ মেঘ নাহি বর্ষিছ জল,
আমি যে চাতক পাখী চিত্ত বিকল,
দৈবাৎ আসে যদি দক্ষিণ বাত
কোথা তুমি, কোথা আমি, কোথা জলপাত!
[৩য় ভাগ, ১২৭ পৃষ্ঠা, ১০ম শ্লোক

ইহা চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অনূদিত। বলা বাহুল্য যে ধ্বনি ও ছন্দসহ এমন মধুর ও সুন্দর অনুবাদ অনুবাদ-সাহিত্যে দুর্লভ।

সজ্জন-বচন

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্‌বিভাগে
বিকশতি যদি পদ্মঃ পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥

উঠে যদি ভানু পশ্চিম দিকে
পদ্ম বিকাশে গিরিশিরে,
মেরু যদি নড়ে, জুড়ায় বহ্নি,
সাধুর বচন নাহি ফিরে।
১ম ভাগ, ৪৬ পৃষ্ঠা ১৬শ শ্লোক

শিলায় লিখন, জলের লিখন

সদ্ভিস্তু লীলয়া প্রোক্তং শিলালিখিতমক্ষরম্
অসদ্ভিঃ শপথেনাপি জলে লিখিতমক্ষরম্।

সতের বচন লীলায় কথিত
শিলায় খোদিত যেন সে,
অসতের কথা শপথ-জড়িত
জলের লিখন জেনো সে!
[১ম ভাগ, ৪৬ পৃষ্ঠা ১৭শ শ্লোক

"যেন সে"র সঙ্গে "জেনো সে"র মত সুন্দর অন্ত্যমিল রবীন্দ্রপূর্ব্ব যুগে দুর্লভ।

পয়সা কমলং

পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ
পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ।
মণিনা বলয়ং বলয়েন মণি-
র্মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ॥
শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশী
শশিনা নিশয়া চ বিভাতি নভঃ।
কবিনা চ বিভু র্বিভুনা চ কবিঃ
কবিনা বিভুনা চ বিভাতি সভা॥

ইহার দুইটি অনুবাদ আছে। প্রথমটি দ্বিজেন্দ্রনাথের। দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথের; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

জলেতে কমল জল কমলে,
শোভয়ে সরসী কমলে জলে ;
মণিতে বলয় বলয়ে মণি,
মণি বলয়েতে শোভয়ে পাণি ;
নিশিতে শশী শশিতে নিশি,
আকাশের শোভা উভয়ে মিশি ;
কবিতে নৃপতি, নৃপতে কবি,
নৃপ কবি যোগে সভার ছবি।

[৪র্থ ভাগ, পৃষ্ঠা ১৩৮-৩৭, ৩২শ শ্লোক

মূল শ্লোকের ছন্দ-ধ্বনি রক্ষার জন্য অনুবাদেও হ্রস্ব স্বর ব্যতীত অন্যান্য স্বরের দ্বিমাত্রিকতা রক্ষার চেষ্টা করা হইয়াছে।*

তৃতীয় ভাগে অজবিলাপের ৩২ হইতে ৪৩, ৫২ হইতে ৫৬ ও ৬৫ হইতে ৬৮ সংখ্যক শ্লোকগুলির অনুবাদ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩২—৪২ শ্লোকগুলি সাধারণ চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারে অনূদিত। বাকীগুলির অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে করিয়াছেন।

অজ বিলাপ

[রঘুবংশ, অষ্টম সর্গ]

মনসাপি ন বিপ্রিয়ং ময়া
কৃতপূর্ব্বং তব কিং জহাসি মাম্।
নন্থ শব্দপতিঃ ক্ষিতেরহং
ত্বয়ি মে ভাবনিবন্ধনা রতিঃ। ৫২

মনেও আনি নি তব অপ্রিয় কভু,
মোরে ফেলে কেন চলে গেলে তুমি তবু!
পৃথিবীর আমি নামেই মাত্র পতি,
তোমাতেই মোর ভাবে নিবদ্ধ রতি।

কুসুমোৎখচিতান্ বলীভৃত-
শ্চলয়ন্ ভৃঙ্গরুচস্তবালকান্।
করভোরু করোতি মারুত-
স্ত্বদুপাবর্ত্তনশঙ্কি মে মনঃ। ৫৩

কুসুমে খচিত কুঞ্চিত কালো কেশে
মন্দ পবন কাঁপায় যখন এসে,
হে সুতনু তব প্রাণ ফিরে এল বলে'
থেকে থেকে মোর দুরাশায় হিয়া দোলে।

তদপোহিতুমর্হসি প্রিয়ে
প্রতিবোধেন বিষাদমাশু মে।
জ্বলিতেন গুহাগতং তম-
স্তুহিনাদ্রেরিব নক্তমোষধিঃ। ৫৪

হে প্রেয়সি, তবে উচিত তোমার ত্বরা
জাগিয়া আমার বিষাদ বিনাশ করা!
রজনী আসিলে হিমাচলগুহাতলে
আঁধার নাশিয়া ওষধি যেমন জ্বলে।

ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং
তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্।
নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং
বিরতাভ্যন্তরষট্পদস্বনম্। ৫৫

ও মুখে অলক দোলে (যে) মারুতভরে,
তবু কথা নাই বুক ফাটে তারি তরে;
যেমন নিশায় কমল ঘুমায়ে রহে
অন্তরে তার ভ্রমর কথা না কহে।

শশিনং পুনরেতি শর্ব্বরী
দয়িতা দ্বন্দ্বচরং পতত্রিণম্।
ইতি তৌ বিরহান্তরক্ষমৌ
কথমত্যন্তগতা ন মাং দহেঃ। ৫৬

শর্ব্বরী পুন ফিরে পায় শশধরে,
চকাচকি পুন মিলে বিচ্ছেদ পরে,
বিরহ তাহারা মিলনের আশে সহে,
চিরবিচ্ছেদ আমারে যে আজ দহে!

সমদুঃখসুখঃ সখীজনঃ
প্রতিপচ্চন্দ্রনিভোঽয়মাত্মজঃ।
অহমেকরসস্তথাপি তে
ব্যবসায়ঃ প্রতিপত্তিনিষ্ঠুরঃ। ৬৫

সমসুখদুখ তব সখিনীজন,
প্রতিপদচাঁদ তব আত্মজ ধন,
তব রস মোর জীবনে করেছি সার,
নিঠুর, তবুও একি তব ব্যবহার!

---

* এই ছন্দে রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলার একটি শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছেন। নব-বর্ণমালার ৩য় খণ্ডে ৮৬ পৃষ্ঠায় বিদায়-শীর্ষক শ্লোকটির অনুবাদ পয়ার ছন্দে করা হইয়াছে। এই শ্লোকটির রবীন্দ্রকৃতও একটি অনুবাদ আছে। 'প্রাচীন সাহিত্যে' শকুন্তলার রসবিচারে কবি স্ব-কৃত অনুবাদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'প্রাচীন সাহিত্যে' আরও কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ আছে।

ধৃতিরস্তমিতা রতিশ্চ্যুতা
বিরতং গেয়মৃতুর্নিরুৎসবঃ।
গতমাভরণপ্রয়োজনং
পরিশূন্যং শয়নীয়মদ্য মে ।৬৬

ধৃতি হ'ল দূর, রতি শুধু স্মৃতিলীন,
গান হ'ল শেষ, ঋতু উৎসবহীন,
আভরণে মোর প্রয়োজন হ'ল গত,
শয়ন শূন্য চিরদিবসের মত।

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা
হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্ ।৬৭

গৃহিণী, সচিব, রহস্যসখী মম,
ললিতকলায় ছিলে যে শিষ্যাসম,
করুণাবিমুখ মৃত্যু তোমারে নিয়ে
বল গো আমার কি না সে হরিল, প্রিয়ে!

বিভবেঽপি সতি ত্বয়া বিনা
সুখমেতাবদজস্য গণ্যতাম্।
অহৃতস্য বিলোভনান্তরৈ-
র্মম সর্ব্বে বিষয়াস্ত্বদাশ্রয়াঃ ।৬৮

তোমা বিনা আজ রাজসম্পদ্‌ধনে
সুখ বলি অজ গণ্য না করে মনে।
কোনো প্রলোভন রোচে না আমার কাছে
আমার যা-কিছু তোমারে জড়ায়ে আছে।

তৃতীয় ভাগের অন্তে অজবিলাপের এই অনুবাদগুলি সম্পর্কে একটি "টিপ্পনী"তে বলা হইয়াছে,—

"শেষের কতিপয় শ্লোকে (৫২-৬৮) পাঠকগণ ছন্দ পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য করিবেন। যদিও এই শ্লোকগুলি চতুর্দ্দশপদী তথাপি যতিভেদ বশতঃ ৮-৬ না-হইয়া, ৬-৮ করিয়া পাঠবিচ্ছেদ হইবে, নতুবা ছন্দঃপতন দোষ মনে হইতে পারে। যথা—

মনেও আনিনি—তব অপ্রিয় কভু,
মোরে ফেলে কেন—চলে' গেলে তুমি তবু—
ইত্যাদি (৫২)

বলা প্রয়োজন যে এই ছন্দ "চতুর্দ্দশপদী" অর্থাৎ অক্ষরবৃত্ত-পয়ারের অন্তর্গত নহে। প্রতি পংক্তি চৌদ্দ মাত্রার হইলেও এর জাতি পৃথক। এই চৌদ্দ মাত্রার (৬-৮) মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতা রবীন্দ্রকাব্যে প্রথম পাই ১২৯৯ সালে লেখা "সোনার তরী"র 'তোমরা এবং আমরা' কবিতায়—

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলু কুলু কল নদীর স্রোতের মত।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।

১৩০৪ সালে লিখিত, "কল্পনা"র অন্তর্গত, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতাবলীর অন্যতম, 'ভ্রষ্টলগ্ন' কবিতায়ও এই ছন্দ :—

শয়ন শিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে,
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিল রবে।
ইত্যাদি

রবীন্দ্রনাথকৃত অক্ষরবৃত্ত অনুবাদগুলিও পর পর সাজাইয়া দেওয়া হইল।

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-
র্দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।

উদ্যোগী পুরুষসিংহ, তারি পরে জানি
কমলা সদয়;
দৈবে করিবেন দান এ অলস বাণী
কাপুরুষে কয়;
দৈবেরে হানিয়া কর পৌরুষ আশ্রয়
আপন শক্তিতে—
যত্ন করি সিদ্ধি যদি তবু নাহি হয়,
দোষ নাহি ইথে।
[১ম ভাগ, পৃষ্ঠা ৪৯-৫০, ৮৬ম শ্লোক

এক হাতে তালি নাহি বাজে

যথৈকেন ন হস্তেন তালিকা সংপ্রপদ্যতে
তথোদ্যমপরিত্যক্তং কর্ম্মণোৎপাদয়েৎ ফলম্।

এক হাতে তালি নাহি বাজে,
যে কাজ উদ্যমহীন, ফলোদয় না-হয় সে কাজে।
[প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯, ১০৮শ শ্লোক

দান ধন বিদ্যা শৌর্য্য

দানং প্রিয়বাক্যসহিতং জ্ঞানমগর্ব্বং ক্ষমান্বিতং শৌর্য্যং।
বিত্তং ত্যাগসমেতং দুর্ল্লভমেতং চতুর্ব্বিধং ভদ্রম্।

প্রিয়বাক্য সহ দান, জ্ঞান গর্ব্বহীন,
দান সহ ধন,
শৌর্য্য সহ ক্ষমাগুণ, জগতে এ চারি
দুর্লভ মিলন।

[প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ৭০

বাগর্থ।

লৌকিকানাং হি সাধূনামর্থং বাগনুবর্ত্ততে।
ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি॥

[উত্তরচরিত

অর্থ পরে বাক্য সরে, লৌকিক যে সাধুগণ
তাঁদের কথায়।
আদ্য ঋষিদের বাক্যে, বাক্যগুলি আগে যায়,
অর্থ পিছে ধায়॥

[৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা ৮১-৮২

রঘুবংশ

বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ।১
ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতি-
স্তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাঽস্মি সাগরম্।২
মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।৩
অথবা কৃতবাগ্‌দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভি-
র্মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।৪
সোঽহমাজন্মশুদ্ধানাং আফলোদয়কর্ম্মণাম্
আসমুদ্রক্ষিতীশানাং আনাকরথবর্ত্মনাম্।৫
যথাবিধি হুতাগ্নীনাং যথাকামার্চ্চিতার্থিনাং
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকাল-প্রবোধিনাম্।৬
ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাং
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্।৭
শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাং
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্।৮
রঘূনামন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্বিভবোঽপি সন্
তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রচোদিতঃ।৯
তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা।১০

বাক্য আর অর্থসম সম্মিলিত শিবপার্ব্বতীরে
বাগর্থ সিদ্ধির তরে বন্দনা করিনু নতশিরে।১
কোথা সূর্য্যবংশ, কোথা অল্পমতি আমার মতন,
ভেলায় দুস্তর সিন্ধু তরিবারে বৃথা আকিঞ্চন।২
বামন হাসায় লোক হাত বাড়াইয়া উচ্চ ডালে,
মন্দ কবিযশ চায়—সেই দশা তাহারো কপালে।৩
কিম্বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবি রচি গেলা যেথা বাক্যদ্বার
বজ্রবিদ্ধমণিমধ্যে সূত্রসম প্রবেশ আমার।৪
আজন্ম যাঁহারা শুদ্ধ, কর্ম্ম যাঁরা নিয়ে যান ফলে,
সসাগর রাজ্যেশ্বর, ধরা হতে স্বর্গে রথ চলে।৫
যথাবিধি হোমযাগ, যথাকাম অতিথি অর্চ্চিত,
যথাকালে জাগরণ, অপরাধে দণ্ড যথোচিত।৬
দানহেতু ধনার্জ্জন, মিতভাষা সত্যের কারণ,
যশ আসে দিগ্বিজয়, পুত্র লাগি কলত্র বরণ।৭
শৈশবে বিদ্যার চর্চ্চা, যৌবনে বিষয় অভিলাষ,
বার্দ্ধক্যে মুনির ব্রতে, যোগবলে অন্তে দেহনাশ।৮
এহেন বংশের কীর্ত্তি বর্ণিবারে নাহি বাক্যবল,
অতুল সে গুণরাশি কর্ণে আসি করিল চঞ্চল।৯
পণ্ডিতে শুনিবে কথা ভালমন্দ বিচারে নিপুণ,
সোনা খাঁটি কিম্বা ঝুঁটা সে পরীক্ষা করিবে আগুন।১০

[৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা ৯০-৯১

অসম্ভাব্য।

অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে।
শিলা তরতি পানীয়ং গীতং গায়তি বানরঃ॥

অসম্ভাব্য না কহিবে, মনে মনে রাখি দিবে,
প্রত্যক্ষ যদিও তাহা হয়।
"শিলা জলে ভেসে যায়, বানরে সঙ্গীত গায়,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।"

[৪র্থ ভাগ, ১২৫ পৃষ্ঠা

কিমিবহি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।

—শকুন্তলা

কমল শেয়ালা মাখা তবু মনোহর,
চাঁদেতে কলঙ্করেখা তথাপি সুন্দর;

বন্ধলো মনোজ্ঞ অতি রূপসীর গায়,
মধুর মূরতি যেই কি না সাজে তায় ?

| ৪র্থ ভাগ, ১৩৪ পৃষ্ঠা

মৈত্রী

আরম্ভগুর্ব্বী ক্ষয়িণী ক্রমেণ
লঘ্বী পুরা বৃদ্ধিমতী চ পশ্চাৎ
দিনস্য পূর্ব্বার্দ্ধপরার্দ্ধভিন্না
ছায়েব মৈত্রী খল-সজ্জনানাম্ ।

আরম্ভে দেখা গুরু, ক্রমে হয় ক্ষীণকায়া,
দুর্জ্জনের মৈত্রী যেন পূর্ব্বার্দ্ধ দিবস ছায়া ;
সজ্জনের মৈত্রী ভায়, অপরাহ্ণ ছায়া প্রায়,
প্রথমে দেখিতে লঘু, কালবশে বৃদ্ধি পায় ।

| ৪র্থ ভাগ, ১৩৮ পৃষ্ঠা

পঞ্চম ভাগে তুকারাম—মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত-কবির জীবনী ও অভঙ্গমালা। এই অংশ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বোম্বাই চিত্র" হইতে উদ্ধৃত। ইহার সাতটি অভঙ্গ (৫৬৬-৫৭২) রবীন্দ্রনাথ নিজের অনুবাদ বলিয়া চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন। প্রথম বার বিলাত গমনের প্রাক্কালে কবি কয়েক মাস সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আহমদাবাদে ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ষোল বৎসর। কবির এই সময়কার প্রায় সব লেখাই দুষ্প্রাপ্য। সেই হিসাবেও এই অনুবাদগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে।

রবীন্দ্রকাব্য 'অনন্তপার'। তথাপি এই অনাঘ্রাত কাব্যপুষ্পনিচয়ের সন্ধান রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ-সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধিত করিবে, ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য।

বিদ্যার্থী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

নম্রবেশে হে বিদ্যার্থি, পাতিয়া অঞ্জলি তুমি এলে,
রাখি নি হিসেব কিছু, কি নিলে, বা, কিবা দিয়ে গেলে ;
যে অগ্নি আছিল সুপ্ত অন্তরের অরণির মাঝে
ধর্ষে তাহা জ্বলি উঠি, প্রতিভার অগ্নিসম রাজে ;
দিয়েছি যে কণাটুকু, নহে সে ত আমার স্ফুরণ,
সে শুধু মন্থনোদ্দীপ্ত মোর মাঝে তব সঞ্চরণ ;
তোমার ভিক্ষার তেজে শিরামাঝে উঠে শিহরণ,
সমস্ত আত্মার মাঝে জেগে উঠে নবীন স্পন্দন,
কাল কি তোমার হাতে করিব অর্পণ, চিন্তা উঠে,
সমস্ত হৃদয় জুড়ি দীনতার আর্ত্তি যেন ফুটে।
নম্রনত শিষ্যবেশে দাঁড়াই কাঙাল হয়ে আমি,
ধীরে যেন রক্তস্রোত ধমনীর মাঝে যায় থামি,
হৃদয়ের পুণ্ডরীক হ'তে, হয় যেন স্যন্দমান
অলৌকিক জ্যোতিঃকণামাখা মধু নবস্পন্দমান ;
তারি এক কণা লয়ে হে বৎস, তোমার মুখে ধরি,
নব জন্ম, নবদীপ্তি তাহে যেন উচ্ছ্বসে শিহরি ;
হে বৎস, হে শিষ্য মোর, তোমারে করিব আমি দান,
তাই তিল তিল করি গড়িয়া তুলেছি মোর প্রাণ ;
প্রতিক্ষণ ভয়ে কাঁপে মন, বুঝি মোর অনাচার
তোমারে করিবে স্পর্শ, জাগাইবে মলিন বিকার ;
ক্ষুরসম দুর্গপথে তাই মোরে রাখিবারে চাই,
প্রক্ষালিত শুচিতায় মোরে আমি না যেন হারাই ;
আমারে রহিতে হবে সূর্য্যসম সদা দীপ্তিময়
নহিলে কেমনে তুমি মোরে আসি করিবে আশ্রয় !
মোরে প্রদক্ষিণ করি ছুটি চলে তোমার জীবন,
তোমারে করিয়া কেন্দ্র নিত্য মোরে করি বিভাবন ;
তোমাতে আমাতে যেন এক মন্ত্র হয় উজ্জীবিত,
এক অর্থ বেড়ে ওঠে, নবপ্রাণে হয়ে সঞ্জীবিত।

আরণ্যক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪

এক দিন রাজু পাঁড়ে কাছারিতে খবর পাঠাইল যে বুনো শুওরের দল তাহার চীনা ফসলের ক্ষেতে প্রতি রাত্রে উপদ্রব করিতেছে, তাদের মধ্যে কয়েকটি দাঁতওয়ালা ধাড়ী শুওরের ভয়ে সে ক্যানেস্ত্রা পিটানো ছাড়া অন্য কিছু করিতে পারে না—কাছারি হইতে ইহার প্রতীকার না করিলে তাহার সমুদয় ফসল নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

শুনিয়া নিজেই বৈকালের দিকে বন্দুক লইয়া গেলাম। রাজুর কুটীর ও জমি নাঢ়া-বইহারের ঘন জঙ্গলের মধ্যে। সেদিকে এখনও লোকের বসবাস হয় নাই, ফসলের ক্ষেতের পত্তনও খুব কম হইয়াছে, কাজেই বন্য জন্তুর উপদ্রব বেশী।

দেখি রাজু নিজের ক্ষেতে বসিয়া কাজ করিতেছে। আমায় দেখিয়া কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। আমার হাত হইতে ঘোড়ার লাগাম লইয়া নিকটের একটা হরীতকী গাছে ঘোড়া বাঁধিল।

বলিলাম—কই, রাজু তোমায় যে আর দেখি নে, কাছারির দিকে যাও না কেন?

রাজুর খুপড়ীর চারি দিকে দীর্ঘ কাশের জঙ্গল, মাঝে মাঝে কেঁদ ও হরীতকী গাছ। কি করিয়া যে এই জনশূন্য বনে সে একা থাকে! এ জঙ্গলে কাহারও সহিত দিনান্তে একটি কথা বলিবার উপায় নাই—অদ্ভুত লোক বটে!

রাজু বলিল—সময় কই পাই যে কোথাও যাব হুজুর, ক্ষেতের ফসল চৌকি দিতেই প্রাণ বেরিয়ে গেল। তার ওপর মহিষ আছে।

তিনটি মহিষ চড়াইতে ও দেড় বিঘা জমির চাষ করিতে এত কি ব্যস্ত থাকে যে সে লোকালয়ে যাইবার সময় পায় না, একথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম—কিন্তু রাজু আপনা হইতেই তাহার দৈনন্দিন কার্য্যের যে তালিকা দিল, তাহাতে দেখিলাম তাহার নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ না থাকার কথা। ক্ষেত-খামারের কাজ, মহিষ চরানো, দুধ দোয়া, মাখন তোলা, পূজা-অর্চ্চনা, রামায়ণ পাঠ, রান্না খাওয়া—শুনিয়া যেন আমারই হাঁপ লাগিল। কাজের লোক বটে রাজু! ইহার উপর নাকি সারা রাত জাগিয়া ক্যানেস্ত্রা পিটাইতে হয়।

বলিলাম—শুওর কখন বেরোয়?

—তার ত কিছু ঠিক নেই হুজুর। তবে রাত হ'লেই বেরোয় বটে। একটু বসুন, দেখবেন কত আসে।

কিন্তু আমার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলের বিষয় রাজু একা এই জনশূন্য স্থানে কি করিয়া বাস করে। কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম।

রাজু বলিল—অভ্যেস হয়ে গিয়েছে, বাবুজী। বহু দিন এমনি ভাবেই আছি—কষ্ট ত হয়ই না, বরং আপন মনে বেশ আনন্দে থাকি। সারাদিন খাটি, সন্ধ্যাবেলা ভজন গাই, ভগবানের নাম নিই, বেশ দিন কেটে যায়।

রাজু, কি গনু মাহাতো কি জয়পাল—এ ধরণের মানুষ আরও অনেক আছে জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে—ইহাদের মধ্যে একটি নূতন জগৎ দেখিতাম, জগৎটা আমার পরিচিত নয়।

আমি জানি রাজুর একটি সাংসারিক বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তি আছে, সে চা খাইতে অত্যন্ত ভালবাসে। অথচ এই জঙ্গলের মধ্যে চায়ের উপকরণ সে কোথায় পায়, এই ভাবিয়া আমি নিজে চা ও চিনি লইয়া গিয়াছিলাম। বলিলাম—রাজু একটু চা কর ত। আমার কাছে সব আছে।

রাজু মহা আনন্দে একটি তিন-সেরী লোটাতে জল চড়াইয়া দিল। চা প্রস্তুত হইল, কিন্তু একটি মাত্র ছোট কাঁসার বাটি ব্যতীত অন্য পাত্র নাই। তাহাতেই আমায়

চা দিয়া সে নিজে বড় লোটাটি লইয়া চা খাইতে বসিল।

রাজু হিন্দী লেখাপড়া জানে বটে, কিন্তু বহির্জগৎ সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞান নাই। কলিকাতা নামটা শুনিয়াছে, কোন্ দিকে জানে না। বোম্বাই বা দিল্লীর বিষয়ে তার ধারণা চন্দ্রলোকের ধারণার মত সম্পূর্ণ অবাস্তব ও কুয়াশাচ্ছন্ন। শহরের মধ্যে সে দেখিয়াছে পূর্ণিয়া, তাও অনেক বছর আগে এবং মাত্র কয়েক দিনের জন্য সেখানে গিয়াছিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—মোটর গাড়ী দেখেছ রাজু?

—না হুজুর, শুনেছি বিনা গরুতে বা ঘোড়ায় চলে, খুব ধোঁয়া বেরোয়, আজকাল পূর্ণিয়া শহরে অনেক নাকি এসেছে। আমার ত সেখানে অনেক কাল যাওয়া নেই, আমরা গরীব লোক, শহরে গেলেই ত পয়সা চাই।

রাজুকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে কলিকাতা যাইতে চায় কি না। যদি চায়, আমি তাহাকে একবার ঘুরাইয়া আনিব, পয়সা লাগিবে না।

রাজু বলিল—শহর বড় খারাপ জায়গা, চোর গুণ্ডা জুয়াচোরের আড্ডা শুনেছি। সেখানে গেলে শুনেছি যে জাত থাকে না। সব লোক সেখানকার বদমাইস্। আমার এ-দেশের এক জন লোক কোন্ শহরের হাসপাতালে গিয়েছিল, তার পায়ে কি হয়েছিল সেই জন্যে। ডাক্তার ছুরি দিয়ে পা কাটে আর বলে, তুমি আমাকে কত টাকা দেবে? সে বললে—দশ টাকা দেব। তখন ডাক্তার আরও কাটে। আবার বললে—এখনও বল কত টাকা দেবে? সে বললে—আরও পাঁচ টাকা দেব, ডাক্তারসাহেব, আর কেটো না। ডাক্তার বললে—ওতে হবে না—ব'লে আবার পা কাটতে লাগল। সে গরীব লোক যত কাঁদে, ডাক্তার ততই ছুরি দিয়ে কাটে—কাটতে কাটতে গোটা পা খানাই কেটে ফেললে। উঃ কি কাণ্ড ভাবুন ত হুজুর।

রাজুর কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করা দায় হইয়া উঠিল। মনে পড়িল এই রাজুই একবার আকাশে রামধনু উঠিতে দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিল—রামধনু যে দেখছেন বাবুজী, ও ওঠে উইয়ের ঢিবি থেকে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

রাজুর খুপ্ড়ীর সামনের উঠানে একটি বড় খুব উঁচু আসান গাছ আছে, তারই তলায় বসিয়া আমরা চা খাইতেছিলাম—যেদিকে চাই, সেদিকেই ঘন বন, কেঁদ, আমলকী, পুষ্পিত বহেড়া লতার ঝোপ, বহেড়া ফুলের একটি মৃদু সুগন্ধ সান্ধ্য বাতাসকে মিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। আমার মনে হইল এসব স্থানে বসিয়া এমন ভাবে চা খাওয়া জীবনের একটা সৌন্দর্য্যময় অভিজ্ঞতা। কোথায় এমন অরণ্যপ্রান্তর, কোথায় এমন জঙ্গলে-ঘেরা কাশের কুটীর, রাজুর মত মানুষই বা কোথায়? এ অভিজ্ঞতা যেমন বিচিত্র, তেমনি দুষ্প্রাপ্য।

বলিলাম—আচ্ছা রাজু, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এস না কেন? তোমায় আর তা হ'লে কষ্ট ক'রে রেঁধে খেতে হয় না।

রাজু বলিল—সে বেঁচে নেই হুজুর। আজ সতের-আঠার বছর মারা গিয়েছে, তার পর থেকে বাড়ীতে মন বসাতে পারি নে আর।

রাজুর জীবনে রোমান্স্ ঘটিয়াছিল, এ ভাবিতে পারাও কঠিন বটে, কিন্তু অতঃপর রাজু যে গল্প করিল, তাহাকে ও ছাড়া অন্য নামে অভিহিত করা চলে না।

রাজুর স্ত্রীর নাম ছিল সর্জ্জু (অর্থাৎ সরযূ), রাজুর বয়স যখন আঠার ও সরযূর চোদ্দ—তখন উত্তর-ধরমপুর, শ্যামলালটোলাতে সরযূর বাপের টোলে রাজু দিনকতক ব্যাকরণ পড়িতে যায়।

রাজুকে বলিলাম—কত দিন পড়েছিলে?

—কিছু না বাবুজী। বছরখানেক ছিলাম, কিন্তু পরীক্ষা দিই নি। সেখানে আমাদের প্রথম দেখাশুনো এবং ক্রমে ক্রমে—

আমাকে সমীহ করিয়া রাজু অল্প কাশিয়া চুপ করিল।

আমি উৎসাহ দিবার সুরে বলিলাম—তার পর ব'লে যাও—

—কিন্তু, হুজুর, ওর বাবা আমার অধ্যাপক। আমি কি ক'রে তাঁকে এ-কথা বলি? এক দিন কার্ত্তিক মাসে ছট্

পরবের দিন সরযূ ছোপান হলুদে শাড়ী প'রে কুশী নদীতে এক দল মেয়ের সঙ্গে নাইতে যাচ্ছে, আমি—

রাজু কাশিয়া আবার চুপ করিল।

পুনরায় উৎসাহ দিয়া বলিলাম—বল, বল, তাতে কি?

—ওকে দেখবার জন্যে আমি একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। এর কারণ এই যে ইদানীং ওর সঙ্গে আমার আর তত দেখাশুনো হ'ত না—এক জায়গায় ওর বিয়ের কথাবার্ত্তাও চলছিল। যখন দলটি গাইতে গাইতে—আপনি ত জানেন ছট্ পরবের সময় মেয়েরা গান করতে করতে নদীতে ছট্ ভাসাতে যায়?—তার পর যখন ওরা গাইতে গাইতে আমার সামনে এল, ও আমায় দেখতে পেয়েছে গাছের আড়ালে। ও-ও হাসলে, আমিও হাসলাম। আমি হাত নেড়ে ইসারা করলাম একটু পেছিয়ে পড়—ও হাত নেড়ে বললে—এখন নয়, ফিরবার সময়ে।

রাজুর বাহান্ন বছর বয়েসের মুখমণ্ডলে বিংশবর্ষীয় তরুণ প্রেমিকের লাজুকতা ও চোখে একটি স্বপ্নভরা সুদূর দৃষ্টি ফুটিল এ-কথা বলিবার সময়—যেন জীবনের বহু পিছনে প্রথম যৌবনের পুণ্য দিনগুলিতে যে কল্যাণী তরুণী ছিল চতুর্দ্দশ বর্ষদেশে—তাহাকেই খুঁজিতে বাহির হইয়াছে ওর সঙ্গীহারা, প্রৌঢ় প্রাণ। এই ঘন জঙ্গলে একা বাস করিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন যাহার কথা ভাবিতে তাহার ভাল লাগে, যাহার সাহচর্য্যের জন্য তার মন উন্মুখ—সে হইল বহু কালের সেই বালিকা সরযূ, পৃথিবীতে যে কোথাও আজ আর নাই।

বেশ লাগিতেছিল ওর গল্প। আগ্রহের সঙ্গে বলিলাম—তার পর?

—তার পর ফিরবার পথে দেখা হ'ল। ও একটু পিছিয়ে পড়ল দলের থেকে।

আমি বললাম—সরযূ, আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি, তোমার সঙ্গে দেখাশুনাও বন্ধ, আমার লেখাপড়া হবে না জানি, কেন মিছে কষ্ট পাই, ভাবছি টোল ছেড়ে চলে যাব এ মাসের শেষেই। সরযূ কেঁদে ফেললে। বললে—বাবাকে বলো না কেন?

সরযূর কান্না দেখে আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। এমনি হয়ত যে কথা কখনও আমার অধ্যাপককে বলতে পারতাম না, তাই ব'লে ফেললাম এক দিন।

বিয়ে হওয়ায় কোনো বাধা ছিল না, স্বজাতি, স্বঘর। বিয়ে হয়েও গেল।

খুব সহজ ও সাধারণ রোমান্স হয়ত—হয়ত শহরের কোলাহলে বসিয়া শুনিলে এটাকে নিতান্ত ঘরোয়া গ্রাম্য বৈবাহিক ব্যাপার, সামান্য একটু পুতুপুতু ধরণের পূর্ব্বরাগ বলিয়া উড়াইয়া দিতাম। ওখানে ইহার অভিনবত্ব ও সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হইল। দুইটি নরনারী কি করিয়া পরস্পরকে লাভ করিয়াছিল তাহাদের জীবনে, এ-ইতিহাস যে কতখানি রংস্যময়, তাহা বুঝিয়াছিলাম সেদিন।

চা পান শেষ করিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া আকাশে পাতলা জ্যোৎস্না ফুটিল। ষষ্ঠী কি সপ্তমী তিথি।

আমি বন্দুক লইয়া বলিলাম—চল রাজু, দেখি তোমার ক্ষেতে কোথায় শূওর।

একটা বড় তুঁতগাছ ক্ষেতের এক পাশে। রাজু বলিল—এই গাছের ওপর উঠতে হবে হুজুর। আজ সকালে একটা মাচা বেঁধেছি ওর একটা দো-ডালায়।

আমি দেখিলাম বিষম মুস্কিল। গাছে ওঠা অনেক দিন অভ্যাস নাই। তার ওপর এই রাত্রিকালে। কিন্তু রাজু উৎসাহ দিয়া বলিল—কোনো কষ্ট নেই হুজুর। বাঁশ দেওয়া আছে, নীচেই ডালপালা, খুব সহজ ওঠা।

রাজুর হাতে বন্দুক দিয়া ডালে উঠিয়া মাচায় বসিলাম। রাজু অবলীলাক্রমে আমার পিছু পিছু উঠিল। দু-জনে জমির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মাচার উপর বসিয়া রহিলাম পাশাপাশি।

জ্যোৎস্না আরও ফুটিল। তুঁতগাছের দো-ডালা হইতে জ্যোৎস্নালোকে কিছু স্পষ্ট, কিছু অস্পষ্ট জঙ্গলের শীর্ষদেশ ভারি অদ্ভুত ভাব মনে আনিতেছিল। ইহাও জীবনের এক নূতন অভিজ্ঞতা বটে।

একটু পরে চারি পাশের জঙ্গলে শিয়ালের পাল ডাকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কালো মত কি

জানোয়ার দক্ষিণ দিকের ঘন জঙ্গলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া রাজুর ক্ষেতে ঢুকিল।

রাজু বলিল—ঐ দেখুন হুজুর—

আমি বন্দুক বাগাইয়া ধরিলাম কিন্তু আরও কাছে আসিলে জ্যোৎস্নালোকে দেখা গেল সেটা শূকর নয়, একটা নীলগাই।

নীলগাই মারিবার প্রবৃত্তি হইল না, রাজু মুখে 'দূর দূর' বলিতে সেটা ক্ষিপ্রপদে জঙ্গলের দিকে চলিয়া গেল। আমি একটা ফাঁকা আওয়াজ করিলাম।

ঘণ্টা দুই কাটিয়া গেল। দক্ষিণ দিকের সে জঙ্গলটার মধ্যে বনমোরগ ডাকিয়া উঠিল। ভাবিয়াছিলাম দাঁতওয়ালা ধাড়ী শুওরটা মারিব, কিন্তু একটা ক্ষুদ্র শূকর-শাবকেরও টিকি দেখা গেল না। নীলগাইয়ের পিছনে ফাঁকা আওয়াজ করা অত্যন্ত ভুল হইয়াছে।

রাজু বলিল—নেমে চলুন হুজুর, আপনার আবার ভোজনের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি বলিলাম—কিসের ভোজন? আমি কাছারিতে যাব—রাত এখনও দশটা বাজে নি—থাকবার জো নেই। কাল সকালে সাতে ক্যাম্পে কাজ দেখতে বেরুতে হবে।

—খেয়ে যান হুজুর।

—এর পর আর নাঢ়া-বইহারের জঙ্গল দিয়ে একা যাওয়া ঠিক হবে না। এখনই যাই। তুমি কিছু মনে করো না।

ঘোড়ায় উঠিবার সময় বলিলাম—মাঝে মাঝে তোমার এখানে চা খেতে যদি আসি বিরক্ত হবে না তো?

রাজু বলিল—কি যে বলেন? এই জঙ্গলে একা থাকি, গরীব মানুষ, আমায় ভালবাসেন তাই চা চিনি এনে তৈরি করিয়ে একসঙ্গে খান। ও কথা ব'লে আমায় লজ্জা দেবেন না, বাবুজী।

সে সময়ে রাজুকে দেখিয়া মনে হইল রাজু এই বয়সেই বেশ দেখিতে, যৌবনে যে সে খুবই সুপুরুষ ছিল, অধ্যাপক-কন্যা সরযূ পিতার তরুণ, সুন্দর ছাত্রটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া নিজের সুরুচিরই পরিচয় দিয়াছিল।

রাত্রি গভীর। একা প্রান্তর বাহিয়া আসিতেছি। জ্যোৎস্না অস্ত গিয়াছে। কোনো দিকে আলো দেখা যায় না, এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা—এ যেন পৃথিবী হইতে জনহীন কোন্ অজানা গ্রহলোকে নির্ব্বাসিত হইয়াছি—দিগন্ত-রেখায় জলজলে বৃশ্চিকরাশি উদিত হইতেছে, মাথার উপরে অন্ধকার আকাশে অগণিত দ্যুতিলোক, নিয়ে লবটুলিয়া বইহারের নিস্তব্ধ অরণ্য, ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে পাতলা অন্ধকারে বনঝাউয়ের শীর্ষ দেখা যাইতেছে—দূরে কোথায় শিয়ালের দল প্রহর ঘোষণা করিল—আরও দূরে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্টের সীমারেখা অন্ধকারে দীর্ঘ কালো পাহাড়ের মত দেখাইতেছে—অন্য কোন শব্দ নাই কেবল একধরণের পতঙ্গের একঘেয়ে একটানা কি-র্-র্-র্ শব্দ ছাড়া, কান পাতিয়া ভাল করিয়া শুনিলে ঐ শব্দের সঙ্গে মিশানো আরও দু-তিনটি পতঙ্গের আওয়াজ শোনা যাইবে। কি অদ্ভুত রোমান্স এই মুক্ত জীবনে, প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ নিবিড় পরিচয়ের সে কি আনন্দ! সকলের উপর কি একটা অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত রহস্য মাখানো—কি সে রহস্য জানি না—কিন্তু বেশ জানি সেখান হইতে চলিয়া আসিবার পরে আর কখনও কোথাও সে রহস্যের ভাব মনে আসে নাই।

যেন এই নিস্তব্ধ, নির্জ্জন রাত্রে দেবতারা নক্ষত্ররাজির মধ্যে সৃষ্টির কল্পনায় বিভোর, যে কল্পনায় দূর ভবিষ্যতে নব নব বিশ্বের আবির্ভাব, নব সৌন্দর্য্যের জন্ম, নানা নব প্রাণের বিকাশ বীজরূপে নিহিত। শুধু যে আত্মা নিরলস অবকাশ যাপন করে জ্ঞানের আকুল পিপাসায়, যার প্রাণ বিশ্বের বিরাটত্ব ও ক্ষুদ্রত্বের সম্বন্ধে সচেতন আনন্দে উল্লসিত—জন্মজন্মান্তরের পথ বাহিয়া দূর যাত্রার আশায় যার ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বর্ত্তমানের দুঃখ শোক বিন্দুবৎ মিলাইয়া গিয়াছে—সে-ই তাঁদের সে রহস্যরূপ দেখিতে পায়। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ...

এভারেষ্ট শিখরে উঠিয়া যাহারা তুষারপ্রবাহে ও ঝঞ্ঝায় প্রাণ দিয়াছিল, তাহারা বিশ্বদেবতার এই বিরাট্ রূপকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে...কিংবা কলম্বাস্ যখন আজোরেস্ দ্বীপের উপকূলে দিনের পর দিন সমুদ্রবাহিত কাষ্ঠখণ্ডে মহাসমুদ্রপারের অজানা মহাদেশের বার্ত্তা জানিতে চাহিয়াছিলেন—তখন বিশ্বের এই লীলাশক্তি তাঁর মনে ধরা

দিয়াছিল—ঘরে বসিয়া তামাক টানিয়া প্রতিবেশীর কন্তার বিবাহ ও ধোপা নাপিত বন্ধ করিয়া যাহারা আসিতেছে—তাহাদের কর্ম্ম নয় ইহার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা।

মিছি নদীর উত্তর পাড়ে জঙ্গলের ও পাহাড়ের মধ্যে সার্ভে হইতেছিল। এখানে আজ আট-দশ দিন তাঁবু ফেলিয়া আছি। এখনও দশ-বারো দিন হয়ত থাকিতে হইবে।

স্থানটা আমাদের মহাল হইতে অনেক দূরে, রাজা দোবরু পান্নার রাজত্বের কাছাকাছি। রাজত্ব বলিলাম বটে, কিন্তু রাজা দোবরু তো রাজ্যহীন রাজা—তাঁহার আবাসস্থলের খানিকটা নিকটে এই পর্য্যন্ত বলা যায়।

বড় চমৎকার জায়গা। একটা উপত্যকা, মুখের দিকটা বিস্তৃত, পিছনের দিক সংকীর্ণ—পূর্ব্বে পশ্চিমে পাহাড়শ্রেণী—মধ্যে এই অশ্বক্ষুরাকৃতি উপত্যকা - বন্ধুর ও জঙ্গলাকীর্ণ, ছোট বড় পাথর ছড়ানো সর্ব্বত্র, কাঁটা বাঁশের বন, আরও নানা গাছপালার জঙ্গল। অনেকগুলি পাহাড়ী ঝরণা উত্তর দিক হইতে নামিয়া উপত্যকার মুক্ত প্রান্ত দিয়া বাহিরের দিকে চলিয়াছে। এই সব ঝরণার দু-ধারে বন বেশী ঘন, এবং এত দিনের বনবাসের অভিজ্ঞতা হইতে জানি এই সব জায়গাতেই বাঘের ভয়। হরিণ আছে, বন্য মোরগ ডাকিতে শুনিয়াছি দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে। ফেউয়ের ডাক শুনিয়াছি বটে, তবে বাঘ দেখি নাই বা আওয়াজও পাই নাই।

পূবদিকের পাহাড়ের গায়ে একটা প্রকাণ্ড গুহা। গুহার মুখে প্রাচীন একটি ঝাঁপালো বটগাছ—দিনরাত শন্‌শন্ করে। দুপুর রোদে নীল আকাশের তলায় এই জনহীন বন্য উপত্যকা ও গুহা বহু প্রাচীন যুগের ছবি মনে আনে, যে-যুগে আদিম জাতির রাজাদের হয়ত রাজপ্রাসাদ ছিল এই গুহাটা, যেমন রাজা দোবরু পান্নার পূর্ব্বপুরুষের আবাস-গুহা। গুহার দেওয়ালে এক স্থানে কতকগুলো কি খোদাই করা ছিল, সম্ভবতঃ কোনো ছবি—এখন বড়ই অস্পষ্ট, ভাল বোঝা যায় না। কত বন্য আদিম নরনারীর হাস্য কলধ্বনি, কত সুখদুঃখ—বর্ব্বর সমাজের অত্যাচারের কত নয়নজলের অলিখিত ইতিহাস এই গুহার মাটিতে, বাতাসে, পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে লেখা আছে—ভাবিতে বেশ লাগে।

গুহামুখ হইতে রশি দুই দূরে ঝরণার ধারে বনের মধ্যের ফাঁকা জায়গায় একটি গোঁড়-পরিবার বাস করে। দুখানা খুপড়ি, একখানা ছোট, একখানা একটু বড়, বনের ডাল-পালার বেড়া, পাতার ছাউনি। শিলাখণ্ড কুড়াইয়া তাহা দিয়া উনুন তৈয়ারী করিয়াছে আবরণহীন ফাঁকা জায়গায় খুপড়ীর সামনে। বড় একটা বুনো বাদাম-গাছের ছায়ায় এদের কুটীর। বাদামের পাকা পাতা ঝরিয়া পড়িয়া উঠান প্রায় ছাইয়া রাখিয়াছে।

গোঁড়-পরিবারে দুটি মেয়ে আছে, তাদের একটির যোল-সতের বছর বয়েস, অন্যটির বছর চোদ্দ। রং কালো কুচকুচে বটে, কিন্তু মুখশ্রীতে বেশ একটা সরল সৌন্দর্য্য মাখানো—নিটোল স্বাস্থ্য। মেয়ে দুটি রোজ সকালে দেখি দু-তিনটি মহিষ লইয়া পাহাড়ে চরাইতে যায়—আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিয়া আসে। আমি তাঁবুতে ফিরিয়া যখন চা খাই, তখন মেয়ে দুটি আমার তাঁবুর সামনে দিয়া মহিষ লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে।

এক দিন বড় মেয়েটি রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া তার ছোট বোনকে আমার তাঁবুতে পাঠাইয়া দিল। সে আসিয়া বলিল—বাবুজী, সেলাম। বিড়ি আছে, দিদি চাইছে।

—তোমরা বিড়ি খাও?

—আমি খাই নে, দিদি খায়। দাও না বাবুজী, একটা আছে?

—আমার কাছে বিড়ি নেই। চুরুট আছে—কিন্তু সে তোমাদের দেব না। বড় কড়া, খেতে পারবে না।

মেয়েটি চলিয়া গেল।

আমি একটু পরে ওদের বাড়ী গেলাম। আমাকে দেখিয়া গৃহকর্ত্তা খুব বিস্মিত হইল—খাতির করিয়া বসাইল। মেয়ে দুটি শালপাতায় 'ঘাটো' অর্থাৎ মকাই-সিদ্ধ চালিয়া নুন দিয়া খাইতে বসিয়াছে। সম্পূর্ণরূপে নিরুপকরণ মকাই-সিদ্ধ। তাদের মা কি একটা জাল দিতেছে উনুনে। দুটি ছোট ছোট বালকবালিকা খেলা করিতেছে।

গৃহকর্ত্তার বয়স পঞ্চাশের উপর। সুস্থ, সবল চেহারা। আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিল তাদের বাড়ী সিউনি জেলাতে। এখানে এই পাহাড়ে মহিষ চরাইবার ঘাস ও পানীয় জল প্রচুর আছে বলিয়া আজ বছর-খানেক হইতে এখানে আছে। তা ছাড়া এখানকার জঙ্গলের কাঁটা বাঁশে ধামা চুপড়ি ও মাথায় দিবার টোকা তৈরি করিবার খুব সুবিধা। শিবরাত্রির সময় অখিলকুচার মেলায় বিক্রি করিয়া দু-পয়সা হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—এখানে কত দিন থাকবে?

—যত দিন মন যায়, বাবুজী। তবে এ-জায়গাটা বড় ভাল লেগেছে, নইলে এক বছর আমরা কোথাও বড় একটানা থাকি না। এখানে একটা বড় সুবিধা আছে, পাহাড়ের ওপর জঙ্গলে এত আতা ফলে—দু-ঝুড়ি ক'রে গাছ-পাকা আতা আশ্বিন মাসে আমার মেয়েরা মহিষ চরাতে গিয়ে পেড়ে আনতো—শুধু আতা খেয়ে আমরা মাস দুই কাটিয়েছি। আতার লোভেই এখানে থাকা। জিগ্যেস করুন না ওদের?

বড় মেয়েটি খাইতে খাইতে উজ্জ্বল মুখে বলিল—উঃ একটা জায়গা আছে, ওই পুব দিকের পাহাড়ের কোণের দিকে, কত যে বুনো আতা গাছ, ফল পেকে ফেটে কত মাটিতে পড়ে থাকে, কেউ খায় না। আমরা ঝুড়ি ঝুড়ি তুলে আনতাম।

এমন সময়ে কে এক জন ঘন বনের দিক হইতে আসিয়া খুপড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—সীতারাম, সীতারাম, জয় সীতারাম—একটু আগুন দিতে পার?

গৃহকর্ত্তা বলিল—আসুন বাবাজী, বসুন।

দেখিলাম জটাজুটধারী এক জন বৃদ্ধ সাধু। সাধু ইতি-মধ্যে আমায় দেখিতে পাইয়া একটু বিস্ময়ের ও বোধ হয় কথঞ্চিৎ ভয়ের সঙ্গেও, একটু সঙ্কুচিত হইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল।

আমি বলিলাম—প্রণাম সাধু বাবাজী—

সাধু আশীর্ব্বাদ করিল বটে; কিন্তু তখনও যেন তাহার ভয় যায় নাই।

তাহাকে সাহস দিবার জন্য বলিলাম—কোথায় থাকা হয় বাবাজীর?

আমার কথার উত্তর দিল গৃহস্বামী। বলিল—বজ্জ গজাড় জঙ্গলের মধ্যে উনি থাকেন, ওই দুই পাহাড় যেখানে মিশেছে, ওই কোণে। অনেক দিন আছেন এখানে।

বৃদ্ধ সাধু ইতিমধ্যে বসিয়া পড়িয়াছে। আমি সাধুর দিকে চাহিয়া বলিলাম—কত দিন এখানে আছেন?

এবার সাধুর ভয় ভাঙিয়াছে, বলিল—আজ পনর-ষোল বছর বাবুসাহেব।

—একা থাকা হয় তো? বাঘ আছে শুনেছি এখানে, ভয় করে না?

—আর কে থাকবে বাবুসাহেব? পরমাত্মার নাম নিই—ভয়ডর করলে চলবে কেন? আমার বয়স কত বল তো বাবুসাহেব?

ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—সত্তর হবে।

সাধু হাসিয়া বলিল—না বাবুসাহেব, নব্বুইয়ের ওপর হয়েছে। গয়ার কাছে এক জঙ্গলে ছিলাম দশ বছর। তার পর ইজারাদার জঙ্গলের গাছ কাটতে লাগ্‌ল, ক্রমে সেখানে লোকের বাস হয়ে পড়ল। সেখান থেকে পালিয়ে এলাম। লোকালয়ে থাকতে পারি নে। কোনও ভাবনা নেই, পরমাত্মা পাহাড়ে কত গুহা খুদে রেখেছেন যাদের ঘরদোর নেই এমনতর হতভাগা জীবদের জন্যে। আমি তাদের মধ্যে এক জন।

—সাধু বাবাজী, এখানে একটা গুহা আছে, তুমি সেখানে থাক না কেন?

—একটা কেন বাবুসাহেব, কত গুহা আছে এ-পাহাড়ে। আমি ওদিকে যেখানে থাকি, সেটাও ঠিক গুহা না-হ'লেও গুহার মত বটে। মানে তার মাথায় ছাদ ও দু-দিকে দেওয়াল—সামনেটা কেবল খোলা।

—কি খাও? ভিক্ষা কর?

—কোথাও বেরুই নে বাবুসাহেব। পরমাত্মা আহার জুটিয়ে দেন। বাঁশের কোঁড় সেদ্ধ খাই, বনে এক রকম কন্দ হয় তা ভারী মিষ্টি, রাঙা আলুর মত খেতে। তা খাই। পাকা আমলকী ও আতা এ-জঙ্গলে খুব পাওয়া যায়। আমলকী খুব খাই, রোজ আমলকী খেলে মানুষ হঠাৎ বুড়ো হয় না। যৌবন ধরে রাখা

যায় বহু দিন। গাঁয়ের লোকে মাঝে মাঝে দর্শন করতে এসে দুধ, ছাতু, ভুরা দিয়ে যায়। চলে যাচ্ছে এই সবে এক রকম ক'রে।

—বাঘ ভালুকের সামনে পড়েছ কখনও ?

—কখনও না। তবে ভয়ানক এক জাতের অজগর সাপ দেখেছি এই জঙ্গলে—এক জায়গায় অসাড় হয়ে পড়ে ছিল—তালগাছের মত মোটা। মিশ কালো, সবুজ আর রাঙা আঁজি কাটা গায়ে। চোখ আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছে। এখনও সেটা এই জঙ্গলেই আছে। তখন সেটা জলের ধারে পড়ে ছিল বোধ হয় হরিণ ধরবার লোভে। এখন কোনও গুহাগহ্বরে লুকিয়ে আছে। আচ্ছা যাই, বাবুসাহেব রাত হয়ে গেল।

সাধু আগুন লইয়া চলিয়া গেল। শুনিলাম মাঝে মাঝে সাধুটি এদের এখানে আগুন লইতে আসিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া গল্প করিয়া যায়।

অন্ধকার পূর্ব্বেই হইয়াছিল, এখন একটু মেটে মেটে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। উপত্যকার বনানী অদ্ভুত নীরবতায় ভরিয়া গিয়াছে। কেবল পার্শ্বস্থ পাহাড়ী ঝরণার কুলু কুলু স্রোতের ধ্বনি ও ক্বচিৎ দু-একটা বন্য মোরগের ডাক ছাড়া কোনো শব্দ কানে আসে না।

তাঁবুতে ফিরিলাম। পথে বড় একটা শিমুলগাছে ঝাঁক ঝাঁক জোনাকী জ্বলিতেছে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া চক্রাকারে, উপর হইতে নীচু দিকে, নীচু হইতে উপরের দিকে—নানারূপ জ্যামিতির ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া আলো-আঁধারের পটভূমিতে।

এখানেই এক দিন আসিল কবি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ। লম্বা, রোগা চেহারা, কালো সার্জ্জের কোট গায়ে, আধময়লা ধুতি পরনে, মাথার চুল রুক্ষ ও এলোমেলো, বয়স চল্লিশ ছাড়াইয়াছে।

ভাবিলাম চাকুরীর উমেদার। বলিলাম—কি চাই ?

সে বলিল—বাবুজীর (হুজুর বলিয়া সম্বোধন করিল না) দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছি। আমার নাম বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ। বাড়ী বিহার শরীফ, পাটনা জিলা। এখানে চকমকিটোলায় থাকি, তিন মাইল দূর এখান থেকে।

—ও, তা এখানে কি জন্যে ?

—বাবুজী যদি দয়া ক'রে অনুমতি করেন, তবে বলি। আপনার সময় নষ্ট করছি নে ?

তখনও আমি ভাবিতেছি লোকটা চাকুরীর জন্যই আসিয়াছে। কিন্তু 'হুজুর' না-বলাতে সে আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। বলিলাম—বসুন, অনেক দূর থেকে হেঁটে এসেছেন এই গরমে।

আর একটি কথা লক্ষ্য করিলাম লোকটির হিন্দী খুব মার্জ্জিত। সে-রকম হিন্দীতে আমি কথা বলিতে পারি না। সিপাহী পিয়াদা ও গ্রাম্য প্রজা লইয়া আমার কারবার, আমার হিন্দী তাহাদের মুখে শেখা দেহাতি বুলির সহিত বাংলা ইডিয়ম মিশ্রিত একটা জগাখিচুড়ী ব্যাপার। এ-ধরণের ভদ্র ও পরিমার্জ্জিত, ভব্য হিন্দী কখনও শুনিই নাই, তা বলিব কিরূপে ? সুতরাং একটু সাবধানের সহিত বলিলাম—কি আপনার আসার উদ্দেশ্য বলুন।

সে বলিল—আমি আপনাকে কয়েকটি কবিতা শোনাতে এসেছি।

দস্তুরমত বিস্মিত হইলাম। এই জঙ্গলে আমাকে কবিতা শোনাইতে আসিবার এমন কি গরজ পড়িয়াছে লোকটির, হইলই বা কবি ?

বলিলাম—আপনি এক জন কবি ? খুব খুশী হলাম। আপনার কবিতা খুব আনন্দের সঙ্গে শুনব। কিন্তু আপনি কি ক'রে আমার সন্ধান পেলেন ?

এই মাইল তিন দূরে চকমকিটোলায় আমার বাড়ী। পাহাড়ের ঠিক ওপারেই। আমাদের গ্রামে সবাই বলছিল কলকাতা থেকে এক বাঙালি বাবু এসেছেন। আপনাদের কাছে বিদ্যার বড় আদর, কারণ আপনারা নিজে বিদ্বান।

কবি বলেছেন—বিদ্বৎসু সংকবি বাচা লভতে প্রকাশং

ছাত্রেষু কুট্মল সমং তৃণবজ্জড়েষু

বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ আমায় কবিতা শোনাইল। কোনো একটা রেল-লাইনের টিকিট চেকার, বুকিং ক্লার্ক, ষ্টেশন মাষ্টার, গার্ড প্রভৃতির নামের সঙ্গে জড়াইয়া এক সুদীর্ঘ কবিতা। কবিতা খুব উঁচুদরের বলিয়া মনে হইল

না। তবে আমি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের প্রতি অবিচার করিতে চাই না। তাহার ভাষা আমি ভাল বুঝি নাই—সত্য কথা বলিতে গেলে বিশেষ কিছুই বুঝি নাই। তবুও মাঝে মাঝে উৎসাহ ও সমর্থন সূচক শব্দ উচ্চারণ করিয়া গেলাম।

বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ কবিতা-পাঠ থামায় না, উঠিবার নাম করা তো দূরের কথা।

ঘণ্টা দুই পরে সে একটু চুপ করিয়া হাসি হাসি মুখে বলিল—কি রকম লাগলো বাবুজীর?

বলিলাম—চমৎকার। এমন কবিতা খুব কমই শুনেছি। আপনি আপনাদের কোনো পত্রিকায় কবিতা পাঠান না কেন?

বেঙ্কটেশ্বর দুঃখের সহিত বলিল—বাবুজী, এদেশে আমাকে সবাই পাগল বলে। কবিতা বুঝবার মানুষ এ-সব জায়গায় কি আছে ভেবেছেন? আপনাকে শুনিয়ে আমার আজ তৃপ্তি হ'ল। সমজদারকে এ-সব শোনাতে হয়। তাই আপনার কথা শুনেই আমি ভেবেছিলাম এক দিন সময়-মত এসে আপনাকে ধরতে হবে।

সেদিন সে বিদায় লইল কিন্তু পরদিন বৈকালে আসিয়া আমায় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল তাহাদের গ্রামে তাহাদের বাড়ীতে আমায় একবার যাইতে। অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহার সহিত পায়ে হাঁটিয়া চকমকি-টোলা রওনা হইলাম।

বেলা পড়িয়াছে। সম্মুখে গম যবের ক্ষেত্রে বহু দূর জুড়িয়া উত্তর দিকের পাহাড়ের ছায়া পড়িয়াছে। কেমন একটা শান্তি চারি ধারে, সিল্লী পাখীর ঝাঁক কাঁটা বাঁশ ঝাড়ের উপর উড়িয়া আসিয়া বসিতেছে, গ্রাম্য বালকবালিকারা এক জায়গায় ঝরণার জলে ছোট ছোট কি মাছ ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

গ্রামের মধ্যে ঠাসাঠাসি বসতি। চালে চালে বাড়ী, অনেক বাড়ীতেই উঠান বলিয়া জিনিষ নাই। খাপরিগোছের একখানা-খোলা ছাওয়া বাড়ীতে বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ আমায় লইয়া গিয়া তুলিল। রাস্তার ধারেই তাঁর বাড়ীর বাইরের ঘর, সেখানে একখানা কাঠের চৌকিতে বসিলাম। একটু পরে কবিগৃহিণীকেও দেখিলাম—তিনি স্বহস্তে দইবড়া ও মকাই-ভাজা আমার জন্য লইয়া যে চৌকিতে বসিয়াছিলাম তাহারই এক প্রান্তে স্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু কথা কহিলেন না, যদিও তিনি অবগুণ্ঠনবতীও ছিলেন না। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হইবে, রং তত ফর্সা না হইলেও মন্দ নয়, মুখশ্রী বেশ শান্ত, সুন্দরী বলা না গেলেও কবিপত্নী কুরূপা নহেন। ধরণধারণের মধ্যে একটি সরল, অনায়াস শিষ্টতা ও শ্রী।

আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করিলাম কবিগৃহিণীর স্বাস্থ্য। কি জানি কেন এদেশে যেখানেই গিয়াছি, মেয়েদের স্বাস্থ্য সর্ব্বত্র বাংলা দেশের মেয়েদের চেয়ে বহুগুণে ভাল বলিয়া মনে হইয়াছে। মোটা নয়, অথচ বেশ লম্বা, নিটোল, আঁটসাঁট গড়নের মেয়ে এদেশে যত বেশী, বাংলা দেশে তত দেখি নাই। কবিগৃহিণীও ওই ধরণের মেয়েটি।

একটু পরে তিনি এক বাটি মহিষের দুধের দই খাটিয়ার এক পাশে রাখিয়া সরিয়া দরজার কবাটের আড়ালে দাঁড়াইলেন। শিকল-নাড়ার শব্দ শুনিয়া বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ উঠিয়া স্ত্রীর নিকট গেল এবং তখনই হাসিমুখে আসিয়া বলিল—আমার স্ত্রী বলছে আপনি আমাদের বন্ধু হয়েছেন, বন্ধুকে একটু ঠাট্টা করতে হয় কিনা তাই দইয়ের সঙ্গে বেশী ক'রে পিপুল শুঁট ও লঙ্কার গুঁড়ো মেশানো রয়েছে...

আমি হাসিয়া বলিলাম—তা যদি হয় তবে আমার একা কেন, সকলের চোখ দিয়ে যাতে জল বের হয় তার জন্যে আমি প্রস্তাব করছি এই দই আমরা তিন জনেই খাব। আসুন—কবিপত্নী দরজার আড়াল হইতে হাসিলেন। আমি ছাড়িবার পাত্র নই, দই তাঁহাকেও খাওয়াইয়া ছাড়িলাম।

একটু পরে কবিপত্নী বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন এবং একটা থালা হাতে আবার আসিয়া খাটিয়ার প্রান্তে থালাটি রাখিলেন, এবার আমার সামনেই চাপা, কৌতুক-মিশ্রিত সুরে আমাকে শুনাইয়াই বলিলেন—বাবুজীকে বল এইবার ঘরের তৈরি প্যাঁড়া খেয়ে ঝালের জ্বলুনি থামান।

কি সুন্দর মিষ্টি মেয়েলি ঠেঁট হিন্দী বুলি!

বড় ভাল লাগে এ-অঞ্চলের মেয়েদের মুখে এই হিন্দীর টানটি। নিজে ভাল হিন্দী বলিতে পারি না বলিয়া আমার কথ্য হিন্দীর প্রতি বেজায় আকর্ষণ। বইয়ের হিন্দী নয়—এই সব পল্লীপ্রান্তে, পাহাড়তলীতে, বনদেশের মধ্যে, বিস্তীর্ণ শ্যামল যব গম ক্ষেতের পাশে, চলনশীল চামড়ার রহট্ যেখানে মহিষের দ্বারা ঘূর্ণিত হইয়া ক্ষেতে ক্ষেতে জল সেচন করিতেছে, অস্তসূর্য্যের ছায়াভরা অপরাহ্ণে দূরের নীলাভ শৈলশ্রেণীর দিকে উড়ন্ত বালিহাঁস বা সিল্লী বা বকের দল যেখানে একটা দূরবিসর্পী ভূপৃষ্ঠের আভাস বহন করিয়া আনে—সেখানকার যে হঠাৎ শেষ-হইয়া-যাওয়া, কেমন যেন আধ-আধ ভাঙা ভাঙা ক্রিয়াপদ-যুক্ত এক ধরণের ভাষা, যাহা বিশেষ করিয়া মেয়েদের মুখে সাধারণতঃ শোনা যায়—তাহার প্রতি আমার টান খুব বেশী।

হঠাৎ আমি কবিকে বলিলাম—দয়া ক'রে দু-একটা কবিতা পড়ুন না আপনার?

বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের মুখ উৎসাহে উজ্জ্বল দেখাইল। সে একটি গ্রাম্য প্রেমকাহিনী লইয়া কবিতা লিখিয়াছে, সেটি পড়িয়া শোনাইল। ছোট্ট একটি খালের এ-পারের মাঠে এক তরুণ যুবক বসিয়া ভুট্টার ক্ষেত পাহারা দিত, খালের ওপারের ঘাটে একটি মেয়ে আসিত নিত্য কলসী-কাঁকে জল ভরিতে। ছেলেটি ভাবিত মেয়েটি বড় সুন্দর। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া শিস্ দিয়া গান করিত, ছাগল গরু তাড়াইত, মাঝে মাঝে মেয়েটির দিকে চাহিয়া দেখিত। কত সময়ে দু-জনের চোখোচোখি হইয়া গিয়াছে। অমনি লজ্জায় লাল হইয়া কিশোরী চোখ নামাইয়া লইত। ছেলেটি রোজ ভাবিত, কাল সে মেয়েটিকে ডাকিয়া কথা কহিবে। বাড়ী ফিরিয়া সে মেয়েটির কথা ভাবিত। কত কাল কাটিয়া গেল, কত 'কাল' আসিল, কত চলিয়া গেল—মনের কথা আর বলা হইল না। তার পর এক দিন মেয়েটি আসিল না, পরদিনও আসিল না, দিন, সপ্তাহ, মাস কাটিয়া গেল, কোথায় সে প্রতিদিনের সুপরিচিতা কিশোরী? ছেলেটি হতাশ হইয়া রোজ রোজ ফিরিয়া আসে মাঠ হইতে—ভীরু প্রেমিক সাহস করিয়া কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে না।...ক্রমে ছেলেটিকে দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চাকুরী লইতে হইল। বহু কাল কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ছেলেটি সেই নদীর ঘাটের রূপসী বালিকাকে আজও ভুলিতে পারে নাই। কে জানে মেয়েটি কোথায় গেল, যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে সেও কি তাহাকে এমনি করিয়া স্মরণ করে?

দূরের নীল শৈলমালা ও দিগন্তবিস্তারী শস্যক্ষেত্রের দিকে চোখ রাখিয়া প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় এই কবিতাটি শুনিতে শুনিতে মনে কি এক অপূর্ব্ব ভাব হইল তাহা আজ বুঝাইতে পারিব না। কত বার মনে হইল এ কি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদেরই নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা? কবিপ্রিয়ার নাম রুকমা, কারণ ঐ নামে কবি একটি কবিতা লিখিয়াছে পূর্ব্বে আমাকে তাহা শুনাইয়াছিল। ভাবিলাম এমন গুণবতী, সুরূপা রুকমাকে পাইয়াও কি কবির বাল্যের সে দুঃখ আজও দূর হয় নাই?

আমাকে তাঁবুতে পৌঁছিয়া দিবার সময়ে বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ একটি বড় বটগাছ দেখাইয়া বলিল—ঐ যে গাছ দেখছেন বাবুজী, ওর তলায় সেবার সভা হয়েছিল, অনেক কবি মিলে কবিতা পড়েছিল। এদেশে বলে মুসায়েরা। আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। আমার কবিতা শুনে পাটনার ঈশ্বরীপ্রসাদ দুবে—চেনেন ঈশ্বরপ্রসাদকে? ভারী এলেমদার লোক, 'দূত' পত্রিকার সম্পাদক—নিজেও এক জন ভাল কবি—আমার খুব খাতির করেছিলেন।

কথা শুনিয়া মনে হইল বেঙ্কটেশ্বর জীবনে এই একবারই সভাসমিতিতে দাঁড়াইয়া নিজের কবিতা আবৃত্তি করিবার নিমন্ত্রণ পাইয়াছিল এবং সেদিনটি তাহার জীবনে একটা খুব বড় ও স্মরণীয় দিন গিয়াছে: এত বড় সম্মান আর কখনও সে পায় নাই। ক্রমশঃ

অনিত্য জগৎ ও নিত্যধাম

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ

বহু পল, দণ্ড ও প্রহর-পর্য্যায়ে গঠিত, বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ দিনের পর দিন চলে যায়। দিন চলে যায়, অথচ দিনান্তে তার স্মৃতিধারক আমরা অচল থেকে দৈনিক কার্য্যের ফলাফল চিন্তা করি। এতেই আমরা এক দিকে কালস্রোতে প্রবাহিত অনিত্য জগৎ, আর অন্য দিকে কালস্রোতের অতীত নিত্য আত্মার, আভাস পাই। এই আভাস উজ্জ্বল হ'লেই আমরা চির শান্তির আলয় নিত্য-ধামের দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হব, জরা-মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত হয়ে নিত্য নব উৎসাহের সহিত প্রতিদিনের কার্য্যে প্রবৃত্ত হব। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে গেলে আত্মারূপী জ্ঞান-বস্তুটার প্রকৃতি ভাল করে বোঝা চাই। জ্ঞানের ভিতরে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ করা হয়। ভেদ আছে বই কি? কিন্তু ভেদের অর্থ বিভাগ নয়। জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় পরস্পর ভিন্ন (distinct), কিন্তু পরস্পর থেকে বিভক্ত (separate) নয়, পরস্পরে সম্বন্ধ (related)। সম্বন্ধের ভিতরে যেমন ভেদ আছে, তেমনি অভেদও আছে। সম্বন্ধ বস্তুদ্বয় পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে পারে না। অন্ততঃ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ এমন গাঢ়, যে তারা পরস্পরে ভিন্ন, ভেদযুক্ত, হয়েও অবিভাজ্য (indivisible), অ-স্বতন্ত্র (inseparable)। দার্শনিক চিন্তাবিহীন ব্যক্তিরা এবং স্থূলদর্শী দার্শনিকেরা এই তত্ত্বটা বুঝ্‌তে না পেরে মারাত্মক ভ্রমে পতিত হন। ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদের 'মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে' ও 'জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে' শিক্ষা দিয়েছেন যে জ্ঞাতাকে না জেনে জ্ঞেয়কে জানা যায় না। এর দৃষ্টান্ত এই দেওয়া যায় যে বর্ণদ্রষ্টাকে না জেনে দৃষ্ট বর্ণকে জানা যায় না; শব্দের শ্রোতাকে না জেনে শ্রুত শব্দকে জানা যায় না। বস্তুতঃ দ্রষ্টৃহীন বর্ণ ও শ্রোতৃহীন শব্দ অর্থশূন্য। কিন্তু জ্ঞেয়কে ছেড়ে যে জ্ঞাতা অর্থহীন, যেমন দৃষ্টকে ছেড়ে দ্রষ্টা অর্থহীন, শ্রুতকে ছেড়ে শ্রোতা অর্থহীন, যাজ্ঞবল্ক্য তা বুঝ্‌তে পারেন নি। উক্ত 'জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে'ই তিনি বিষয়জ্ঞান-বর্জিত বিষয়ী-জ্ঞান সমর্থন করেছেন এবং মুক্তির অবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে অভেদের অবস্থা ব'লে বর্ণনা করেছেন। অন্য দিকে 'ছান্দোগ্য' উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ে দেবর্ষি প্রজাপতি মোক্ষকে বিচিত্র জ্ঞানভেদ ও কর্ম্মভেদের অবস্থা বলে শিক্ষা দিয়েছেন এবং 'কৌষীতকি' উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে দেবর্ষি ইন্দ্র প্রজাপতির অনুসরণ-পূর্ব্বক দেখিয়েছেন যে, যেমন জ্ঞাতৃ ছাড়া জ্ঞেয় অর্থহীন, তেমনি জ্ঞেয় ছাড়া জ্ঞাতাও অর্থহীন; বস্তুতঃ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় এক অখণ্ড আত্মবস্তু। এই আত্মবস্তুই বিশ্বাত্মা, এই আত্মবস্তুই জীবাত্মা। উক্ত উপনিষদেরই প্রথমাধ্যায়ে রাজর্ষি চিত্র ইন্দ্রের অনুসরণপূর্ব্বক দেবযান পথের অর্থাৎ ব্রহ্মসাধনের, এবং ব্রহ্মলোকের অর্থাৎ সর্ব্বাশ্রয় পরব্রহ্মের, অপূর্ব্ব রূপকাত্মিকা বর্ণনা দিয়েছেন। আমার ইদানীন্তন বক্তৃতাগুলিতে ঔপনিষদ ঋষিদের ঐক্য ও অনৈক্য বিস্তৃত ভাবে দেখান হয়েছে এবং এ কথাও বলা হয়েছে যে আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেলের অনুবর্ত্তীরা অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ (criticism of experience) রূপ দার্শনিক প্রণালীর সাহায্যে আমাদের দেবর্ষি ও রাজর্ষিদিগের প্রতিপাদিত বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত বাদেই উপনীত হয়েছেন। অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ-প্রণালীটা কিরূপ, এবং এর সাহায্যে কিরূপে ভেদাভেদবাদে উপনীত হওয়া যায়, তা আমি এই বেদী ও মঞ্চ থেকে নানা সুযোগে দেখাতে চেষ্টা করেছি। আজকের বিষয় "অনিত্য জগৎ ও নিত্য ধাম" ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি সংক্ষেপে এই প্রণালী ও এর সিদ্ধান্ত দেখাতে চেষ্টা করব।

জ্ঞানক্রিয়াটা এক অখণ্ড ব্যাপার। ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তিদ্বারা আমরা জড়, মানবাত্মা, পরমাত্মা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু জানি, এই

ধারণা অদার্শনিক ব্যক্তিদের ভুল ধারণা। ইন্দ্রিয়বোধ (sensation), বুদ্ধি (understanding) এবং প্রজ্ঞা (reason) এক অখণ্ড জ্ঞানক্রিয়ার অবিভাজ্য উপাদান। এদের কোনও একটিকে ছেড়ে কোনও তত্ত্ব সিদ্ধ হয় না, কোন বস্তু সম্ভব হয় না। দেশ-কালের সীমায় বর্ণ, শব্দ, স্পর্শাদির প্রকাশকে বলা হয় ইন্দ্রিয়বোধ। বোধ যার, যে বোদ্ধা, সে হচ্ছে জীবাত্মা। জীবাত্মা দেশকালে সীমাবদ্ধ জগৎকে জানতে গিয়ে সেই জগতের আশ্রয় ও প্রকাশকরূপে যে অনন্ত আত্মাকে নিজ পরম আত্মা, Higher Self, রূপে জানে, তিনিই হচ্ছেন ব্রহ্ম। এই যে জীবাত্মার নিকট ব্রহ্মের আত্মপ্রকাশরূপ কার্য, এই কার্যের আরম্ভ, স্থায়িত্ব ও বিরাম থেকেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের ধারণা হয়। এই ধারণার জন্তে সৃষ্টির আদিতে যেতে হয় না। একান্ত আদি, যার আগে কিছু নেই, তা ভাবাও যায় না, কার্যবিহীন কাল অচিন্তনীয়। যা কালে আসে, কালে যায়, তাই অনিত্য, তাকেই বলি জগৎ, গতিশীল চঞ্চল ঘটনা। আর যা আসে না, যায় না, আসা-যাওয়া রূপ পরিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তিত থাকে, তাই নিত্য। এই নিত্য বস্তু আত্মা, এই নিত্য বস্তু জীবের আশ্রয়. জীবের ধাম, পরমাত্মা। আমাদের জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক স্পন্দনে, এই ব্রহ্মরূপ ধাম প্রকাশিত হচ্ছে। নিত্যধাম প্রকাশিত হলে যে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়, কাল ও ঘটনা থেমে যায়, তা নয়। সসীম-অসীম, নিত্য-অনিত্য, পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ, অবিচ্ছেদ্য। কাল অনিত্য বটে, কিন্তু মিথ্যা নয়। কাল মিথ্যা হওয়া দূরে থাক্, আমেরিকান্ ব্রহ্মবাদী যোশীয়া রয়সের ভাষায় "Time is the stream of divine love," কাল ভগবৎ-প্রেমের স্রোত। যাহোক্, আরও একটু সূক্ষ্মভাবে, সসীম-অসীমের, নিত্য-অনিত্যের, সম্বন্ধ আলোচনা করা যাক্।

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, এসকল ইন্দ্রিয়বোধকে অদার্শনিক অবৈজ্ঞানিক লোক মনোনিরপেক্ষ স্বাধীন বস্তু বা এরূপ বস্তুর গুণ বলে বিশ্বাস করে। এগুলি যে বোধ, মানসিক ব্যাপার, তা তারা বুঝ্তে পারে না। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জানেন যে এ-সকল ব্যাপার মনঃসাপেক্ষ এবং এরা মানবাত্মার নিকট ক্রমাগত আবির্ভূত হচ্ছে ও তা থেকে তিরোহিত হচ্ছে। জড়বাদী বৈজ্ঞানিক বলেন এগুলির স্থায়ী কারণ জড় পরমাণু। আত্মবাদী দার্শনিক বলেন জড়বস্তু কখনও বিজ্ঞান বা বোধের কারণ হতে পারে না। বিজ্ঞান বা বোধ আত্মা থেকে স্বতন্ত্র বস্তু নয়। প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়াতে প্রকাশিত বস্তু স্বতন্ত্র বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানসমন্বিত আত্মা। প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়াতে আমরা নিজ আত্মাকেই প্রত্যক্ষ করি, এবং নিজ আত্মার সসীমত্ব, নিজ জ্ঞানের আংশিকত্ব, উপলব্ধি ক'রে তাকে সসীম পরমাত্মার অচ্ছেদ্য অংশ ব'লে স্বীকার করি। সুতরাং প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ায় অসীম পরমাত্মাই আপনাকে সসীম জীবাত্মার জ্ঞেয়রূপে প্রকাশিত করেন। অদার্শনিক লোকে মনে করে প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ায় সসীম জীব জ্ঞাতা আর একটা বাহ্য জড়জগৎ তার জ্ঞেয়। কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। জ্ঞেয় জগৎ বাহ্য এই অর্থে যে তা দেশে ও কালে প্রকাশিত। দেশের অংশগুলি পরস্পর থেকে ভিন্ন, পরস্পরের বাইরে। কিন্তু তারা পরস্পরের বাইরে হলেও জ্ঞানের বাইরে নয়, জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র নয়। জগৎ বাহ্য এই আর এক অর্থে, যে বিজ্ঞানের (sensation-এর) আসা-যাওয়া পূর্বে পরে হয়, কালে হয়। কিন্তু কাল আর কালগত ঘটনাও জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। জগৎ বাহ্য আরও এক অর্থে, খুব গভীর অর্থে, যে জগৎ আমাদের সসীম জ্ঞানের বাইরে থেকে আসে আর বাইরে চলে যায়; আমাদের কালগত ক্ষণিক জ্ঞানের উপর জগৎ নির্ভর করে না। কিন্তু জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত জগতের কোনও সত্তা নেই; আর যে জ্ঞান, যে আত্মা, জগতের আশ্রয়, তা আমাদেরই পরমাত্মা, Higher Self, এই অর্থে জগৎ বাহ্য নয়, জগৎ অন্তর, আত্মার অন্তর্ভূত, জগৎ আত্মা থেকে, ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। জীবের নিকট ব্রহ্মের যে আত্মপ্রকাশ, যে আত্মপ্রকাশে কালের ক্রম, কালের প্রবাহ আছে, তাকেই বলা হয় অনিত্য জগৎ। বস্তুতঃ তা জীবের সহিত ব্রহ্মের লীলা, জীব-ব্রহ্মের আদান-প্রদান। যে সকল বস্তুকে আমরা জড়বস্তু বলি, সে-সকল প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মেরই আংশিক প্রকাশ। তিনিই বিশ্বরূপী, বিশ্বাত্মা, এবং তিনিই জীবের পরম আত্মা। এই সত্য

জ্ঞানে, ভাবে, কর্মে উপলব্ধি করাই ব্রহ্মসাধন। এতে, এই সাধনে, প্রকৃত পক্ষে হেয় ব'লে কিছু নেই, সবই উপাদেয়, কারণ সবই ব্রহ্ম। কিন্তু ব্রহ্মের প্রকাশ-তারতম্যে বস্তুর উপাদেয়ত্বেরও তারতম্য হয়। খাওয়া-শোওয়া, সাজ-সজ্জা করা, আমোদ-প্রমোদ, হেয় নয়, উপাদেয়ই বটে, কিন্তু এ-সকলের মূল্যবত্তা এত অল্প যে এ-সকলে অধিক সময় ও মনোযোগ দেওয়া নিশ্চয়ই উচ্চতর জীবনের পক্ষে অনিষ্টকর।

সুতরাং জ্ঞানক্রিয়া, দর্শন-শ্রবণাদি মৌলিক জ্ঞান এবং স্মৃতি-জাগরণাদি অবান্তর জ্ঞান, অর্থাৎ মৌলিক জ্ঞানের পুনঃপ্রকাশ, এমন এক ব্রহ্মের সাক্ষ্য দেয় যিনি নিজ নিত্য জ্ঞানকে বিশেষ দেশে, বিশেষে কালে প্রকাশিত ক'রে জীবাত্মা সৃষ্টি করেন অর্থাৎ সসীম ভাবে প্রকাশিত করেন। আমরা জানি যে, সকল দেশই এক অবিভক্ত দেশের অচ্ছেদ্য অংশ, সকল কালই পূর্ব্বাপর ভাবে এক কাল-প্রবাহের অন্তর্ভূত, এবং এই অবিভক্ত দেশ ও কাল এক অনন্ত নিত্য জ্ঞানময় পরমাত্মার আশ্রিত। কিন্তু আমাদের জ্ঞান বিশেষ বিশেষ দেশকালে সীমাবদ্ধ হয়ে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। অভেদ ব্রহ্মে কিরূপে এই ভেদ হয় তা যে আমরা স্পষ্টরূপে বুঝ্‌তে পারি তা নয়, কিন্তু এই ভেদ যে সত্য, তা স্পষ্ট, নিঃসন্দিগ্ধ। ব্রহ্মের নিজ জ্ঞান নিত্য; তিনি সব জেনেই আছেন, তাঁকে কালে জান্‌তে হয় না, জ্ঞান লাভ করতে হয় না। কিন্তু আমরা অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে যাই, আবার জ্ঞান হারিয়ে অজ্ঞানে পড়ি। আমরা ভুলে যাই, আবার স্মরণ করি; নিদ্রিত হই, আবার জাগি। এ-সকল পরিবর্ত্তনের ভোক্তা অসীম জীব; অসীম ব্রহ্ম এ-সকল পরিবর্ত্তনের ভোক্তা হতে পারেন না। আমাদের অজ্ঞানাবস্থায়ও তিনি জ্ঞানী, তাই আমাদের জ্ঞানক্রিয়ায় তাঁর জ্ঞান আমাদের ভিতর আসে। আমরা যা ভুলি তিনি তা স্মরণ রাখেন, তাই আমাদের স্মৃতির উদয় হয়। আমরা সুষুপ্তিতে সব অর্জিত জ্ঞান হারাই; তিনি সব ধরে থাকেন আর যথাসময়ে আমাদের জাগিয়ে আমাদের হারান জ্ঞান ফিরিয়ে দেন। তিনি আমাদের এসকল পরিবর্ত্তনের ভোক্তা নন, কিন্তু কর্ত্তা। তাঁর সঙ্গে আমাদের অভেদ ও ভেদ দুইই না থাকলে এসকল পরিবর্ত্তন হত না, আমরা সৃষ্টই হতাম না, আর তাঁকে জান্‌তেও পারতাম না। তাঁর জ্ঞান, প্রেম, শক্তি আমাদের জ্ঞান, প্রেম, শক্তিরূপে প্রকাশিত হয় বলেই আমরা তাঁকে জানি, সাক্ষাৎ ভাবে জানি। এই অভেদ-বোধ যাঁদের নেই তাঁরা ঈশ্বরাস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিগ্ধ। অন্য দিকে জীব-ব্রহ্মের ভেদবোধ যাঁদের নেই, যাঁরা কেবল ব্রহ্মকেই দেখেন, জীবকে দেখেন না, যাঁদের কাছে ভেদ অসৎ, মায়িক, বলে মনে হয়, তাদের ক্রমশঃ এই বিশ্বাস দাঁড়ায় যে আধ্যাত্মিক, নৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, অন্তর্জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, অন্তর-রাষ্ট্রীয় সর্ব্বপ্রকার সাধনই, সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াই, অমূলক, অনর্থক। মায়াবাদী বিস্তৃত সাহিত্য, এদেশের সহস্র সহস্র নিশ্চেষ্ট সন্ন্যাসী, আর আমাদের জাতীয় জীবনের সাধারণ পশ্চাদ্‌বর্ত্তিতা এই কথার জলন্ত প্রমাণ।

যা হোক, এই যে জীব-ব্রহ্মের ভেদাভেদ-মূলক দৈনিক ও নৈমিত্তিক আদান-প্রদান রূপ আমাদের জীবন, এ বরাবর চল্‌বে কি না? প্রত্যেক কার্য্যেরই তো আরম্ভ আছে, শেষ আছে; কর্মমাত্রই অনিত্য। বিশেষ বিশেষ কর্ম-প্রবাহেরও আরম্ভ আছে, শেষ আছে। মানব-জীবনরূপ কর্মপ্রবাহেরও আরম্ভ দেখা যায়, এ-জগতে এর শেষও দেখা যায়। অন্য কোনও জগতে যে এ চলতে থাকবে, তার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে কর্মের আরম্ভ আছে, শেষও আছে বটে, কিন্তু কর্মীর আরম্ভও নাই, শেষও নাই। কর্মী জ্ঞানী ও প্রেমিক; সে জানে ও ভালবাসে, আর জানে ও ভালবাসে ব'লেই কাজ করে। তার যে এই জ্ঞান ও প্রেম, এ দুইই কালাতীত, নিত্য; এ দুটির শেষ অসম্ভব, বিনাশ অসম্ভব। এই তত্ত্বটি না বুঝাতেই মৃত্যুভয় হয়, এটি বুঝাতে মৃত্যুভয় যায়। এসম্বন্ধে কঠোপনিষদের প্রসিদ্ধ উক্তি আপনারা অনেকবার শুনেছেন, আর একবার শুন্‌লে ক্ষতি নেই:—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।" (২।১৮)

অর্থাৎ "জ্ঞানবান্ আত্মা জন্মেন না, মরেনও না। তিনি কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হন না, তাঁহা হইতেও কেহ উৎপন্ন হয় না। তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হইলেও তিনি বিনষ্ট হন না।" জ্ঞান ও কর্ম্ম, জ্ঞানরূপী আত্মা ও তৎকর্তৃক উৎপন্ন ঘটনা, এ দুয়ের সম্বন্ধ বুঝতে গিয়েই দেখা যায় কার্য বা ঘটনা কালে হয়, আর জ্ঞানরূপী আত্মা কালের আশ্রয়, অবলম্বন, সুতরাং কালের অতীত। কর্ম জ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়, সুতরাং জ্ঞান কর্মের অধীন নয়, কর্ম থেকে উৎপন্ন নয়। জ্ঞানরূপী জীবাত্মা যে পরমাত্মাদ্বারা সৃষ্ট হয়, সেই সৃষ্টিও উৎপাদন নয়, পরমাত্ম-জ্ঞানের প্রকাশমাত্র। জীবের জ্ঞান প্রসার সম্বন্ধে সসীম বটে, তা কতক জানে, অনেকই জানে না, কিন্তু তা কালাধীন নয়, কালে উৎপন্ন নয়, ব্রহ্মের নিত্য জ্ঞানের আংশিক প্রকাশমাত্র। অদার্শনিক ব্যক্তিরাও তা প্রকারান্তরে স্বীকার করে। আমরা কালের সীমায়, বিশেষ বিশেষ কালে, যা জানি, তা যে নূতন হ'ল তা কেউ মনে করে না; যা ছিল, আমাদের অজানা হয়ে ছিল, তাই আমাদের কাছে প্রকাশিত হ'ল, সব লোকে এই মনে করে। যা জ্ঞানের বিষয় হয়ে প্রকাশিত হ'ল তা যে কেবল জ্ঞানের বিষয়রূপেই থাকতে পারে, সসীম আত্মার জ্ঞানে প্রকাশিত হবার আগে তা যে অসীম আত্মাতে থাকে, তা অদার্শনিক লোক বুঝতে পারে না। যা হোক, জীবাত্মার কালে প্রকাশিত জ্ঞান,—জ্ঞান ও প্রেম দুইই—যখন পরমাত্মার জ্ঞান ও প্রেমের অচ্ছেদ্য অংশ, তখন তা যে অবিনাশী, একথা সহজেই বোঝা যায়। জীবাত্মার জ্ঞান অপ্রকাশিত অবস্থা থেকে প্রকাশিত হয়, বিস্মৃতির অবস্থায় লুকিয়ে যায়, স্মৃতির অবস্থায় পুনঃপ্রকাশিত হয়, নিদ্রাবস্থায় এমন ভাবে পরমাত্মায় ফিরে যায় যে জীবব্রহ্মের ভেদ আমাদের বোধগম্য হয় না, কিন্তু সে অবস্থা থেকে আবার ফিরে এসে আত্মপরিচয় দেয়। এ-সকল ব্যাপার কালে ঘটে, সন্দেহ নেই, কিন্তু এসকল পরিবর্তনে জ্ঞানের জন্মমৃত্যু প্রমাণ হওয়া দূরে থাক্, জ্ঞানের নিত্যত্বই প্রমাণ হয়। যা হোক্, আপত্তি উঠতে পারে যে জ্ঞানময় আত্মা জন্মমৃত্যুর অতীত হ'লেও জীবাত্মা যখন দেহে থাকতেই স্মৃতি-বিস্মৃতির অধীন, নিদ্রা-জাগরণের অধীন, তখন দেহত্যাগে সে আর না জাগতেও তো পারে; দেহধারণের পূর্বে সে যেমন ব্রহ্মে অভিন্ন ভাবে ছিল, দেহান্তেও সে তেমনি ব্রহ্মে অভিন্ন, লীন, হয়ে থাকতে পারে। নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদীরা, মায়াবাদীরা, এই কথাই বলেন বটে; কিন্তু বলেন এই জন্যে যে তাঁরা সসীম ও অসীমের, ভেদ ও অভেদের, সাপেক্ষতা, সম্বন্ধ, বুঝেন না এবং তা বুঝেন না বলে প্রেমবস্তুটাও বুঝেন না। তাঁরা intellectualists, বুদ্ধিমাত্র-সম্বল বা বুদ্ধি-প্রধান, বুদ্ধি থেকে ভিন্ন প্রেম, পুণ্য, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, এসকল বস্তুর কোন খবর রাখেন না। তাঁরা বুঝেন না যে ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষ হতেন, ভেদশূন্য একান্ত অভিন্ন বস্তু হতেন, তবে ভেদ ব্যাপারটা, সসীম জীববস্তুটা, এক মুহূর্তের জন্যেও সম্ভব হ'ত না, কল্পিত হ'তেও পারত না, কারণ ভ্রমের অধীন কল্পনাকারীর অভাবে কল্পনা কে করবে? জীব যখন আছে, অন্ততঃ আছে ব'লে ক্ষণকালের জন্যে বোধ হচ্ছে, আর বহু বিষয় ও বিষয়ী-সমন্বিত বিচিত্র জগৎরূপ 'ভান'ও হচ্ছে, তখন সসীম আত্মা, অজ্ঞান ও ভ্রমের অধীন জীবাত্মা, নিশ্চয়ই আছে। অসীমের আশ্রয়ে যে সসীম আত্মা প্রকৃতরূপেই আছে, তা বিস্মৃতির পর স্মৃতির উদয়ে, সুষুপ্তির পর পুনর্জাগরণে, স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হয়। বিস্মৃতির পর স্মৃতির উদয়ে প্রমাণ হয় যে জীবের বিস্মৃত বিষয় জীবের বিস্মৃতি-কালে ব্রহ্মে বর্তমান থাকে,—জীবে যেমন ভেদাভেদরূপে বর্তমান থাকে, ব্রহ্মেও তেমনি থাকে, নচেৎ তেমন ভাবে পুনঃপ্রকাশিত হ'তে পারত না। সুষুপ্তির পর জাগরণে জীবের জ্ঞানের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা আরও স্পষ্ট। সুষুপ্তিতে জীবের অর্জিত সমস্ত জ্ঞান, জীবের ভ্রমপ্রমাদ পর্যন্ত, ব্রহ্মে লুক্কায়িত হয়ে যায়। এই লুক্কায়িত হওয়া লীন হওয়া নয়, একশা হয়ে যাওয়া নয়। সুষুপ্তিতে যদি জীবের জ্ঞান ব্রহ্মে লীন হ'ত, একশা হয়ে যেত, তবে পুনর্জাগরণে তা পূর্ববৎ প্রকাশিত হ'ত না। পূর্ববৎ ভেদযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হওয়াতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে ব্রহ্মের জ্ঞানেও ভেদ আছে, সসীম আত্মা যে তাঁতে লুক্কায়িত থাকে সেই লুকানটা অভেদ নয়, মিশে

যাওয়া নয়। ব্রহ্মবিদ্‌রা কল্পনা করেন যে জাগ্রৎ ও স্বপ্নের বিচিত্রতা সুষুপ্তিতে একীভূত হয়ে যায়। এই কল্পিত একীভাব থেকেই তাঁরা লয়ের একীভাব, প্রকৃত পক্ষে শূন্যতা, কল্পনা করেন। কিন্তু সুষুপ্তি যখন একীভাব নয়, ভেদশূন্য অভেদ নয়, তখন তাঁদের লয়বাদ, তাঁদের নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ, একান্তই কল্পিত, একান্তই ভ্রান্ত। সুতরাং সুষুপ্তি থেকে যে সদ্যোমুক্তির মত, ব্রহ্মে নির্বিশেষ ভাবে লীন হবার মত, অনুমিত হয়, তা সম্পূর্ণরূপেই ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক। জীবাত্মা ব্রহ্মের অচ্ছেদ্য অংশরূপে কালাতীত, জন্মমৃত্যুর অতীত, ব্রহ্মের সহিত কেবল অভিন্নরূপে নয়, ভিন্নরূপেও, নিত্য, সুতরাং দেহবিচ্ছেদেও অবিনাশী। "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

জীবাত্মার এই অবিনাশিত্ব আরও উজ্জ্বল হয়, স্পষ্টতর হয়, ব্রহ্মের সহিত তার প্রেমসম্বন্ধ আলোচনা করলে। যে প্রেম-বশতঃ জীবাত্মার সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ বিশেষ দেশে, বিশেষ কালে, সসীমরূপে তার প্রকাশ হয়, যে প্রেমবশতঃ ব্রহ্ম দিনে দিনে, নিমেষে নিমেষে, জীবকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তাকে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যে, শক্তি, সৌন্দর্য, মাধুর্যে অগ্রসর করেন, সেই প্রেম দেহবিচ্ছেদের সময় নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে, তাকে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত করবে, এ অসম্ভব। যাঁরা প্রাণভরে অন্ততঃ একটি লোককেও ভালবেসেছেন, আর সেই প্রেমের প্রভাবে তার শুভ চিন্তা ও শুভ সাধন করেছেন, তাঁরা কখনও এই চিরনিদ্রার কল্পনায় সায় দিতে পারবেন না। যাঁদের দর্শনে প্রেমের স্থান নেই, কেবল জ্ঞানের আলোচনাতেই যাঁরা সন্তুষ্ট, কেবল তাঁরাই এই কল্পনায় সায় দিতে পারেন। তাঁদের বুদ্ধি একক প্রেমহীন নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের ধারণাতেই পরিতৃপ্ত। জ্ঞান যে কালাতীত, অজাত, অমর, তা তাঁরা জানেন। কিন্তু অমরত্ব বলতে তাঁরা ব্রহ্মের অমরত্বই বুঝেন। সসীম জীব যখন তাঁদের মতে মায়িক, তখন সে যে দেহান্তে অসীম ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়, অসীমের সহিত তার কোন ভিন্নতা থাকে না, তার ভিন্নতার অভাবে কোন সম্বন্ধও থাকে না, এই চিন্তা তাঁদের মনের কোনও স্থানে আঘাত করে না। কিন্তু আমরা দেখেছি যে জ্ঞানের বিশ্লেষণে একক নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রমাণিত হন না, জীব-বিশিষ্ট, জীবাধার, জীবের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত এমন ব্রহ্মই প্রমাণিত হন যিনি প্রেমিক ও কর্মী, যিনি জীবের কল্যাণের জন্যে চিরব্যস্ত। সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈত ব্রহ্মবাদ, আর সসীম জীবের অমরত্ববাদ, এই দুটি স্বতন্ত্র মত নয়, একটি মতেরই দুটি ব্যাখ্যামাত্র। প্রকৃত ব্রহ্মবাদ অর্থাৎ সর্বজীবের আশ্রয়রূপী এক বৃহৎবস্তুতে বিশ্বাস, জীবের অমরত্ব ও অনন্ত উন্নতি কখনও অস্বীকার করতে পারে না। ব্রহ্মের নিত্যত্ব ও জীবের প্রতি প্রেম এই অস্বীকারকে অসম্ভব করে দেয়। সুতরাং যে নিত্যধামের কথা বলবার ভার নিয়েছিলাম, তার কথা ত বলা হ'ল। এর পরেও কি প্রশ্ন উঠবে 'সেই ধাম কোথায়?' এই প্রশ্নের উত্তরও তো দিয়েছি। সেই ধাম ব্রহ্মধাম, ব্রহ্ম থেকে পৃথক্ কোনও জগৎ বা দেশ নয়, শঙ্করের ভাষায় "ব্রহ্ম এব ধাম", ব্রহ্মই ধাম। সেই ধাম সর্বদেশে, সর্বকালে, অথবা আরও শুদ্ধ ভাষায় বলতে গেলে, সর্বদেশ, সর্বকাল, সকল সসীম ব্যক্তিত্ব, সেই ধামে, সেই ব্যক্তিতে অবস্থিত। সেই ধাম পাবার জন্যে কোন বিশেষ দেশে যেতে হয় না, কোনও বিশেষ কালের অপেক্ষা করতে হয় না; স্থূল দেহ ত্যাগ করাও আবশ্যক হয় না। অনিত্য ঘটনা-স্রোতের মধ্যে, সেই স্রোতকে যে সম্ভব করে, ধারণ করে, সেই নিত্য বস্তু পরমাত্মাই সেই ধাম। সেই ধাম চক্ষুকর্ণাদি সর্বেন্দ্রিয়-গোচর, মনো-বুদ্ধির গোচর, যদি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির প্রকৃত অর্থ বোঝা হয়। ফলতঃ তাঁকে ছাড়া আমরা আর কিছু দেখি না, শুনি না, ভাবি না, বুঝি না। জগতের জড়ত্ববোধ, জীবের স্বতন্ত্রতাবোধ, ছাড়লে তাঁকে অন্তরে বাইরে, সর্বত্র, সর্বদা দেখা যায়। এই দর্শনে মরণ-ভয় দূর হয়, অন্য সকল ভয় দূর হয়, দুঃখ দূর হয়, অন্ততঃ দুঃখ সহ্য করবার শক্তি পাওয়া যায়। সকল দুঃখের চেয়ে বড় দুঃখ হচ্ছে জীবের স্থূল দেহবিচ্ছেদে প্রিয়জন-বিরহ। তারা কোথায় যায়? তাদের জন্যে কি অন্য লোক আছে? অন্য লোক থাকা অসম্ভব নয়। অন্য সাক্ষীর কথা দূরে থাক্, যাঁরা শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, প্রমাণ ছাড়া কিছু মানেন না, এমন চার জন জ্ঞানীর লেখা বই পড়ে দেখ্‌লাম তাঁরা এই স্থূল জগৎ থেকে ভিন্ন একটা সূক্ষ্ম ঐথারিক (ethereal) জগৎ মানেন। আরও

অনেক বৈজ্ঞানিক একথা বলেন। আমি এই কয়জনের বই বিশেষ করে পড়েছি বলে তাঁদের সাক্ষ্যের কথা বলছি। এই চার জন হচ্ছেন লজ্, ওয়ালেস, ক্রুক্‌স্ ও ফ্রেমেরিয়ন্। তাঁরা বলেন আমাদের স্থূল দেহের ভিতরে এরই অনুরূপ একটি সূক্ষ্ম দেহ আছে। আত্মা মৃত্যুকালে সেই দেহ নিয়ে স্থূল দেহ থেকে বের হয় আর সেই দেহ নিয়ে সূক্ষ্ম জগতে বাস করে। কোন কোন আত্মা সেই দেহ নিয়ে এই জগতে আসে এবং সেই দেহকে সময় সময় স্থূল ক'রে আমাদের দর্শন ও স্পর্শগোচর করে। এই অবস্থায় ঐ দেহের অনেক প্রতিরূপ (photo) নেওয়া হয়েছে। এই সাক্ষ্যকে আমি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করি। কিন্তু জীবাত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে কেবল এই প্রমাণের উপর নির্ভর করি না। শ্রেষ্ঠ, সাক্ষাৎ প্রমাণ অন্তরে, আত্মায়। আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি যে যাকে স্থূল জগৎ বলা হয় তা জড় নয়, তা আত্মময়। ঐথারিক জগৎ যদি থাকে তাও আত্মময়ই হবে। জড়-আত্মার দ্বৈত ভাব আমি স্বীকার করি না। এই দ্বৈতভাব দর্শনবিরুদ্ধ। আমরা যেখানেই থাকি, আত্মময় জগতেই থাকি। ভিন্ন ভিন্ন লোক যদি থাকে, সকলেই এক আত্মজগতের অন্তর্গত। স্থূলদেহী, সূক্ষ্মদেহী, সকলেই আত্মজগৎবাসী, সকলেই ব্রহ্মধামবাসী। ব্রহ্মের সহিত জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছায় গভীর ভাবে যুক্ত হ'লে আমরা আমাদের প্রিয় জীবাত্মাদের সঙ্গে শীঘ্র হোক্, বিলম্বে হোক্, যুক্ত হব। এই আত্মযোগ-সাধন সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। এই যোগের আভাস যা পেয়েছি তা এখানে সাধ্যানুসারে বার বার বলেছি। আজও অতি সংক্ষেপে বলে বক্তব্য শেষ করি। ব্রহ্ম বিশ্বরূপী। দর্শন-শ্রবণাদি প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ায় আমরা তাঁকেই জ্ঞাত হই। তিনিই জ্ঞেয়, আমরা জ্ঞানী। জাগতিক প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক জীব, তাঁর সসীম রূপ, আংশিক প্রকাশ। তিনি ছাড়া জ্ঞেয় বস্তু কিছু নেই। চক্ষু-শ্রোত্রাদির ক্রিয়া বন্ধ ক'রে, মননে, চিন্তায়, স্মৃতিতে, বুদ্ধিতে, আত্মবোধে, যা জানি, তাও তিনি। তিনি আত্মার নিগূঢ়তম স্থানে, যেখানে কোন সসীম আত্মা প্রবেশ করতে পারে না, আমাদের নিকটতম, প্রিয়তম ব্যক্তিও নয়। এই রূপে বাইরে, অন্তরে, বহুর মধ্যে, আর নির্জ্জনে, গোপনে, তাঁকে প্রেমিকরূপে, প্রিয়রূপে, দর্শন করতে হবে, তাঁর সঙ্গে নিগূঢ় আত্মযোগ, প্রেমযোগ, উপলব্ধি করতে হবে। এই সাধনেই নিত্যধাম, প্রেমধাম, শান্তিধাম প্রকাশিত হয়ে আত্মাকে সবল করে। আমরা আর যাই করি না কেন, এই সাধন যদি না করি, আর যথাসম্ভব এই সাধনে সিদ্ধিলাভ না করি, তবে জীবনের মূল উদ্দেশ্য অসিদ্ধ রইল। আসুন, সকলে মিলে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি আমাদের সমুদয় আলস্য জড়তা দূর করুন, আর নিত্য নবোৎসাহের সহিত প্রতিদিনের নব সাধনে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করে আমাদের জীবন সার্থক করুন।

[কলিকাতা উপাসক-মণ্ডলীতে প্রদত্ত বক্তৃতা]
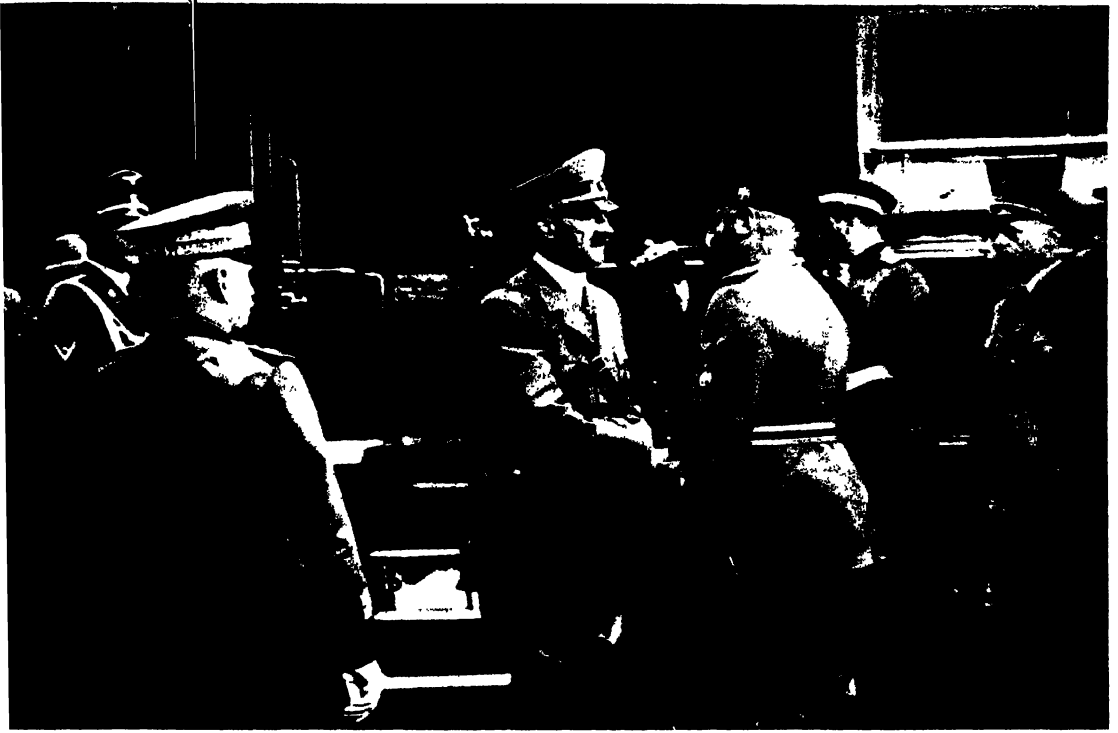
মুসোলিনী রোমের নূতন ষ্টেশনে হিট্‌লারকে অভ্যর্থনা করিতেছেন

হিট্‌লারের ইতালী-ভ্রমণ উপলক্ষে আলোকসজ্জায় ভূষিত রোমের রাজপথ 'ভিয়া দেল্‌ ত্রিয়নফ'
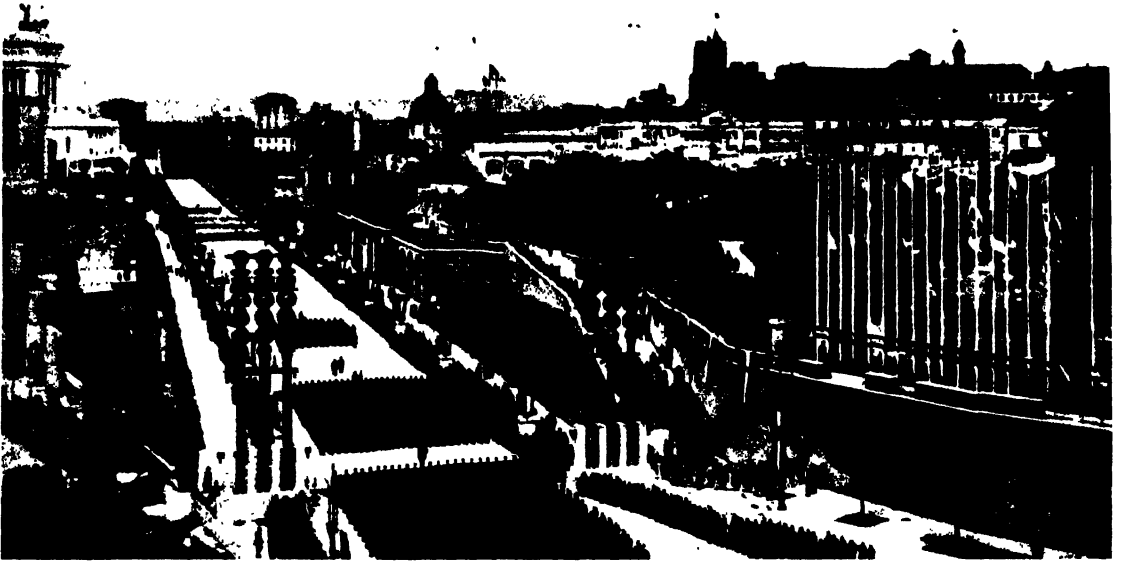
হিট্‌লারের ইতালী-সন্দর্শন উপলক্ষে রোমের সৈন্তবল ও রণসম্ভার প্রদর্শন

ইতালীর এই সৈন্যবল ও রণসম্ভার প্রদর্শনে আধুনিক সর্ব্বপ্রকার সমরায়োজন প্রদর্শিত হইয়াছিল ;
৫০,০০০ লোক ইহাতে অংশ গ্রহণ করে.
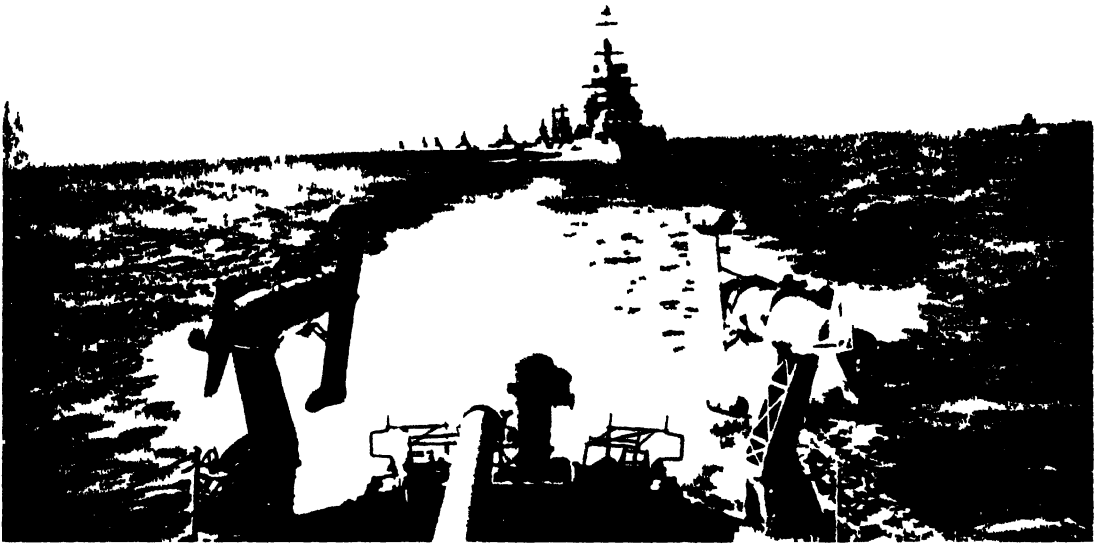
হিট্‌লারের ইতালী-আগমন উপলক্ষে নেপ্‌লসে ইতালীর নৌ-শক্তি প্রদর্শন

রোমে অজ্ঞাত সৈনিকের স্মৃতিস্তম্ভে হিট্‌লারের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ.

হিট্‌লার-সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে আলোকিত স্বাধীনতা-সৌধ, রোম

'ভিলা বর্গেজে' মিউজিয়মে পাওলিনার মর্ম্মর-মূর্ত্তির সম্মুখে হিট্‌লার ও মুসোলিনী

রোমে হিটলারের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে লোকনৃত্য প্রদর্শনের পূর্ব্বে নৃত্যকরদের হিটলারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন

ইতালী ও জার্ম্মানী

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক

১৯৩৮ সনের এপ্রিল মাস, ইতালীর রাজধানী রোম শহরে আসন্ন উৎসবের চাঞ্চল্য। চিরন্তনী নগরীর আকাশে বাতাসে বসন্তের স্পর্শ লেগেছে; অদূরে সাইবিনি পর্ব্বতশ্রেণীর উন্নত শিরোদেশ থেকে বরফ স্খলিত হয়ে গেছে, আর সর্ব্বত্রই ঘাসের উপরে ডেজি ও পপির শোভাযাত্রা। উত্তর-ইউরোপের সূর্য্যোত্তাপবর্জ্জিত জনপদ থেকে এই সময় অতিথি-সমাগম হয়ে থাকে দক্ষিণ-ইতালীর শহরগুলিতে, এদেরই আনন্দ-কোলাহলে রোমের রাস্তা-ঘাট, দোকান-পসার মুখরিত হয়ে উঠেছে। এ সব ত চিরদিনের প্রথা. কিন্তু এবারের বিশেষত্ব হ'ল এখানে যে, শহরের প্রধান প্রধান রাজপথে এক বিরাট মহোৎসবের আয়োজন আরম্ভ হয়েছে। আর দু-তিন সপ্তাহের মধ্যেই জার্ম্মান রাষ্ট্রনেতা আডল্‌ফ্ হিটলার আসবেন ইতালী-ভ্রমণে। তারই অভ্যর্থনা ইতালী এমন ভাবে করতে চায় যাতে ঘটনাটা গিয়ে পৌছতে পারে ইতিহাসের কোঠায়, যাতে ইতালীবাসীর অতিথি-পরায়ণতার সুখ্যাতিতে জার্ম্মান সংবাদপত্রগুলি মুখর হয়ে উঠতে পারে, আর যাতে ইতালো-জার্ম্মান মিতালির বিজয়স্তম্ভ দুঃস্বপ্নের সৃষ্টি করতে পারে কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার আতঙ্কিত প্রাণে। তাই এত সমারোহ। এক মাস আগে যখন নাৎসি-সেনা বিনা যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া অধিকার করল, তখন ইতালীতে একটি ব্যাপক এবং প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ মাথা তুলে উঠেছিল, সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করেছি স্বাধীন অষ্ট্রিয়ার জন্য দরদ, যদিও এই অষ্ট্রিয়াই এক দিন ইতালীকে আংশিক ভাবে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছিল। তখন অনেকে এ কথাও বলেছে যে হের হিটলার হয়ত ইতালী-দর্শনে আর আসবেন না। কিন্তু ইতালীর পররাষ্ট্র-পদ্ধতিতে জার্ম্মান মিতালির তখনও প্রয়োজন ছিল, তাই অষ্ট্রিয়ার লাঞ্ছনা ইতালী বিনা বাক্যব্যয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, তাই আল্‌প্‌সের তীরে আজ

রোমের রাজপথে জনতাকর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিত হিটলার

জার্ম্মানীতে বেনিটো মুসোলিনীর বিশ অভ্যর্থনার কথা। হিটলারের ইতা পরিদর্শন ইতালো-জার্ম্মান রাষ্ট্রীয় মৈত্রী উদাহরণ শুধু নয়, জার্ম্মান সৌজন্যে লাটিন প্রতিদান। আর খুব ঘটা ক'রে আয়োজন হয়েছিল এই সৌজন্যে অনুষ্ঠানগুলির। কিন্তু এই মহোৎসবে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের মধ্যেই জাঁকজম যতটা ছিল, আন্তরিকতা ততটা ছিল কি না সে-সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকা করেছে। সাংবাদিক হিসাবে লেখকের সপ্তাহকালব্যাপী সকল অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করার সুযোগ হয়েছিল; কোথা মধ্যবিত্ত কিংবা প্রজা-সম্প্রদায়কে বিশে উৎসাহ প্রকাশ করতে দেখি নি। হিটলারে আগমন থেকে প্রস্থান পর্য্যন্ত সমস্ত আয়োজনের ভার নিয়েছিল সরকার, আর সরকারী কর্ম্মচারিগণ পদোন্নতির লোভে কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছিল হিটলার-অভ্যর্থনায়।•

জার্ম্মান সীমান্ত এসে পৌঁছেছে ইতালীর সীমান্তের গায়ে। ইতালী ও জার্ম্মানী আজ প্রতিবেশী। জার্ম্মানীকে প্রতিবেশী হিসাবে কেউ চায় না; অন্ততঃ মুসোলিনী কোন দিন চান নি; অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মুসোলিনীর এক কালে যে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল, তারও কারণ ছিল এই। কিন্তু রাজনীতি এমনই রহস্যময় যে স্বয়ং মুসোলিনী অষ্ট্রিয়াতে হিটলার-পদ্ধতির সমর্থন করলেন।

৩রা মে হের্ হিটলার যখন রোমে অবতরণ করলেন, তখন সমস্ত দুনিয়া অষ্ট্রিয়ার লাঞ্ছনা স্বীকার করে নিয়েছে, আর ইতালীও সাত দিনের জন্য অষ্ট্রিয়ার প্রসঙ্গটা ভুলতে মন বেঁধে নিয়েছে। ইতালীবাসীকে খবরের কাগজগুলি ঘন ঘন মনে করিয়ে দিয়েছিল ১৯৩৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে

হিটলার রোমের সাধারণ ষ্টেশনে অবতরণ করেন নি; তাঁর জন্য একটি নূতন ষ্টেশন তৈরি করা হয়েছিল। মুসোলিনী আগেই হিটলারের সঙ্গে ট্রেনে দেখা করেছিলেন, রোম ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন স্বয়ং ইতালীর রাজা ভিক্টর ইমান্যুয়েল, এবং রাজধানীর অন্যান্য প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী। কাউণ্ট চানো, ইতালীর পররাষ্ট্র-সচিব এবং সিন্যোর স্তারাচে (Starace) ফাসিষ্ট পার্টির সেক্রেটরী, পূর্ব্বেই ট্রেনে অতিথিদের অভ্যর্থনা করেছিলেন। ষ্টেশন থেকে রাজপ্রাসাদ প্রায় তিন মাইল পথ; এই সমস্ত পথটি সজ্জিত হয়েছিল অপূর্ব্ব সুন্দর আলোকমালায়, আর বিচিত্রবেশী ইতালীয় নাগরিকদের আনন্দমুখর কোলাহলে এনে দিয়েছিল ছুটির দিনের অকৃত্রিম আনন্দোচ্ছ্বাস। রাজবাড়ীর গাড়িগুলি যখন ষ্টেশন থেকে যাত্রা সুরু করল, জয়ধ্বনির রোল পড়ে গেল

হিটলারের ইতালী-ভ্রমণ-সঙ্গী, জার্ম্মানীর প্রচার-সচিব ডক্টর গোয়েবল্‌স্

হিটলারের ইতালী-ভ্রমণ সঙ্গী, জার্ম্মানীর পররাষ্ট্রসচিব ফন্ রিবেন্‌ট্রপ

সৈনিক এবং অ-সৈনিক দর্শক-সম্প্রদায়ের মধ্যে। প্রথম গাড়ীতে ছিলেন রাজা ভিক্টর ইমান্নুয়েল আর হের হিটলার। মুসোলিনী প্রথম দিনের শোভাযাত্রায় ছিলেন না; রাজপ্রাসাদে অতিথির প্রতীক্ষা করছিলেন। বিশেষতঃ হিটলার ছিলেন রাজার অতিথি, সুতরাং রাজার সঙ্গই ছিল বেশী শোভন।

রোমের দুটি নূতন রাস্তা ভিয়া দেল্ ইম্‌পেরো (Via dell' Impero), আর ভিয়া দেল্ ত্রিয়নফ (Via del Trionfo)। অতি প্রাচীন রোমের সঙ্গে আধুনিক রোমের যোগাযোগ কায়েম করেছে এই দুটি রাস্তা; আর এদের সঙ্গমস্থলে রয়েছে সেই বিরাট প্রাচীন রঙ্গমঞ্চ, কলসিয়ম্। আলোকসজ্জার ঘটা সবচেয়ে মনোহর হয়েছিল এই দুটি রাস্তাতেই।

বৈদ্যুতিক আলোর বদলে প্রাচীন রোমান রীতি অনুসারে রাস্তার দুই ধারে প্রকাণ্ড প্রদীপ তৈরি ক'রে তাতে তেল জ্বালিয়ে আলোর মালা সাজান হয়েছিল। কলসিয়মের অন্ধকার গহ্বর থেকে উঠেছিল রক্তবর্ণ অগ্নিশিখা, আর আশপাশের প্রাচীন রোমের ধ্বংসস্তূপের উপরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সবুজ আলো। তাতে পাইন আর ফার বনে বসন্তের প্রাচুর্য্য মনোরম হয়ে উঠেছিল। এই যে রঙের খেলা এটা ইতালীয়ান শিল্প-প্রতিভার নিজস্ব। বার্লিনে মুসোলিনীর অভ্যর্থনায় হয়ত আলোকের প্রাচুর্য্য হয়েছিল অধিকতর পুষ্ট কিন্তু রঙের অলঙ্কারে প্রকৃষ্ট সুরুচির পরিচয় দিয়েছে ইতালীয়ানরাই। সেদিনকার সেই ফাল্গুন-সন্ধ্যার স্বচ্ছ গোধূলিতে আলোর নৃত্য, রঙের খেলা আর নগরবাসীর জয়ধ্বনির রোলের মধ্যে হের হিট্‌লার নব্য ইতালীর যে-মূর্ত্তি দেখেছিলেন তা তিনি কখনও ভুলবেন না। বস্তুতঃ, পাল্কি-গাড়ী যখন খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে তখনও হের হিট্‌লার বার বার ফিরে তাকিয়ে দেখেছিলেন অতিবৃদ্ধ মান্ধাতার আমলের কলসিয়মের সেই উগ্র উজ্জ্বল মূর্ত্তি। রাজবাড়ীর কাছে যখন গাড়ী পৌছল তখন হিট্‌লারের

হিটলারের রোম সন্দর্শন উপলক্ষ্যে আলোকসজ্জায় ভূষিত বিজয় তোরণ

মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করল মেয়ের দল। হিট্‌লার ভাগ্যবান্‌ পুরুষ বলতে হবে; কারণ এমন অভ্যর্থনা রোমে খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটেছে। শোভাযাত্রা রোমের যে-যে পথ অতিক্রম করেছে, সর্ব্বত্রই ইতালীর ও জার্ম্মানীর বিভিন্ন জাতীয় পতাকার বিপুল সমারোহ দেখতে পেয়েছি। সপ্তাহকালব্যাপী অহোরাত্র এই পতাকাপুঞ্জ ইতালীতে জার্মান অতিথিবরের উপস্থিতির সাক্ষ্য দিয়েছে। আর রোমের সকল প্রকার ঐতিহাসিক স্তম্ভে এবং প্রধান প্রধান সরকারী ও জাতীয় সৌধরাজিতে তীব্র বৈদ্যুতিক আলোকের দীপালি চলেছিল প্রায় পক্ষাধিক কাল পর্য্যন্ত। ইতালীর স্বাধীনতাস্তম্ভে, ভিক্টর ইমান্যুয়েল্‌ মন্যুমেণ্টে সেদিনের দীপালি-সজ্জা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। হিট্‌লারের রোমে আগমনের দিন, প্রথম দিনের অভ্যর্থনায় একটি মাত্র ত্রুটি লক্ষিত হয়েছিল। ভ্যাটিকান শহরের ক্যাথলিক সাম্রাজ্যের মুখপত্র *Osservatore Romano* হিট্‌লারের ইতালী-ভ্রমণকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করেছিল; এ-সম্বন্ধে কোন খবরই প্রকাশ করে নি। আর স্বয়ং পোপ তাঁর গ্রীষ্মাবাসে কয়েকটি নবপরিণীত দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করার প্রসঙ্গে আক্ষেপ করেছিলেন যে "একটি প্রধান ক্যাথলিক উৎসবের দিনে রোমে আজ এমন একটি ক্রুশের নিশান উড়ছে যা ভগবান যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশ নয়" (অর্থাৎ নাৎসি স্বস্তিক নিশান)।

পরের দিন সকালে হের হিটলার মুসোলিনীর সঙ্গে একত্রে রাজপ্রাসাদ থেকে বের হন এবং প্রথমে প্যান্‌থিয়নে ইতালীর রাজাদের সমাধিতে ও পরে স্বাধীনতা-স্তম্ভে অজ্ঞাতনামা সেনার প্রতি পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। তৎপর ফাসিষ্ট পার্টির দপ্তর ও সর্ব্বশেষে পালাৎসি ভেনেৎসিয়া, অর্থাৎ মুসোলিনীর সরকারী দপ্তর পরিদর্শন করেন। অপরাহ্নে চেন্তচেল্লের মাঠে বাহান্ন হাজার ফাসি-যুবকের সামরিক কুচ্‌কাওয়াজ দর্শন করেন। চৌদ্দ থেকে আঠার বৎসর বয়সের যুবাদের ইতালীতে কি ধরণের সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয় তা দেখানই ছিল এই অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য। হের হিটলার দেখে সন্তুষ্ট হয়েছেন সন্দেহ নেই; কিন্তু চেন্তচেল্লের মাঠে একটি হাসির ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। যখন হিটলার ও মুসোলিনী একসঙ্গে পরিদর্শন-মঞ্চের উপরে উপস্থিত হন তখন প্রায় লক্ষাধিক দর্শকের জনতা "দ্যুচে" "দ্যুচে" (Duce) ব'লে বিপুল জয়ধ্বনি শুরু করে। অতিথির দিকে তাদের যেন দৃষ্টিই ছিল না। মুসোলিনী জনতার এই ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হন এবং দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন ক'রে তাদের চুপ করতে ইঙ্গিত করেন। জনতা মুহূর্ত্তমধ্যে চুপ করার ইঙ্গিত গ্রহণ করল কিন্তু "হাইল্‌ হিটলার" জাতীয় উল্লাস-ধ্বনি তখনও আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলল না। অতঃপর মুসোলিনী স্বয়ং হিট্‌লারের হাত ধরে খানিকটা টেনে নিয়ে এসে নিজের সামনে দাঁড় করালেন। জনতা এর অর্থ বুঝতে পেরে "হাইল্‌" ইত্যাদি চীৎকার করতে লাগল। হিটলার সমস্ত অভিনয়টার মানে বুঝতে পারেন নি এমন নয়, কিন্তু লজ্জা পেয়েছিলেন মুসোলিনীই বেশী।

তৃতীয় দিন উৎসবের কেন্দ্র রোম থেকে নেপ্‌ল্‌সে স্থানান্তরিত হ'ল। ইতালীর নৌ-বাহিনীর কুচ্‌কাওয়াজ দেখলেন হিটলার, ভিক্টর ইমান্যুয়েল আর মুসোলিনীর সঙ্গে "কন্তে দি কাভূর" (Conte di Cavour) নামক যুদ্ধ-জাহাজে দাঁড়িয়ে। ইতালীর আটলান্টিকগামী

জাহাজ 'রেক্স'-এর উপরে বিদেশী সাংবাদিক মহলের জন্য স্থান হয়েছিল। লেখকেরও এই জাহাজের উপর থেকে ইতালীর আধুনিক নৌ-সমর-বাহিনীর কুচকাওয়াজ দেখার সুযোগ হয়েছিল। নেপল্‌সের উপ-সাগরের তরঙ্গহীন শান্ত জলরাশির বুকের উপরে, কাপ্রি, ইস্‌বিয়া ইত্যাদি দ্বীপসমূহের তীর ঘেঁষে সারাদিন ধরে চলল নৌ-যুদ্ধের অভিনয়। ইতালী আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক সাব-মেরিনের মালিক ; তাই একানব্বইটি সাব-মেরিন্ দিয়ে যে কুচকাওয়াজ দেখান হ'ল ইতালীয়ান বন্ধুরা গর্ব্ব ক'রে বলল যে অন্য কোন দেশ আজ এ দৃশ্য দেখাতে পারে না, কারণ একানব্বইটি সাব-মেরিন্ অন্য কোন দেশেরই এখন নেই। হিট্‌লার-উৎসব প্রসঙ্গে যতগুলি অনুষ্ঠান দেখেছি, তন্মধ্যে নেপল্‌সের নৌ-যুদ্ধের অভিনয়টিই আমার কাছে সবচেয়ে ভাল লেগেছে।

হিটলার-সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে ওলিম্পিক ষ্টেডিয়ামে ফাসি যুবসংঘের ব্যায়াম-ক্রীড়াদি প্রদর্শন

চতুর্থ দিন হিট্‌লার তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আবার রোমে ফিরে এলেন, এবং ফ্লোরেন্স পরিদর্শন করতে যাবার দিন পর্য্যন্ত রোমেই অবস্থান করেন। এই শেষের তিন দিনের মধ্যে এক দিন সান্তা মারিনেল্লাতে (Santa Marinella) ও ফুরবারাতে (Furbara) কি ক'রে একটি কৃত্রিম গ্রাম এরোপ্লেন থেকে বোমা নিক্ষেপ ক'রে ধ্বংস করতে হয় তার সত্যিকার দৃষ্টান্ত হের হিট্‌লারকে দেখান হয়। দুখানি মালজাহাজকেও বোমার ঘায়ে সাগরের অতল জলে ডুবিয়ে দেয় ইতালীয়ান সামরিক পাইলট্-বৃন্দ। ফুরবারাতে সামরিক এরোপ্লেনের কুচকাওয়াজ দেখে মনে হ'ল, ধ্বংসের আয়োজনে ইতালী অন্য কোন দেশেরই পিছনে পড়ে নেই। এ সব ত গেল সামরিক শক্তি এবং জাতীয় অহঙ্কারের নিদর্শন। ইতালী যে শুধু যুদ্ধই করতে শেখে নি, ইতালীর শিল্পী-সমাজ আজও যে অতীতের শিল্প-গৌরবকে শ্রদ্ধা করে, চাষীদের মধ্যে পর্য্যন্ত আজ যে পরিমাণে প্রাচীন নৃত্যগীতের আদর হয়ে থাকে, অবশিষ্ট দুই দিনে হিটলারকে মুসোলিনী সেটুকু দেখিয়ে দিতেও ত্রুটি করেন নি। রোমের প্রসিদ্ধ "ভিল্লা বর্গেজে" (Villa Borghese) মিউজিয়মে হিটলারকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে কানোভা (Canova) আর বের্নিনির (Bernini) ভাস্কর্য্য দেখে হিট্‌লার বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। এক জন প্রকৃত যোদ্ধা এক জন সত্যিকারের শিল্পীর সম্মুখে এসে যেমন ক'রে নিজের ক্ষুদ্রত্বের বিষয় সচেতন হয়ে ওঠে, হের্ হিট্‌লারের অভিব্যক্তিতে তারই আভাস দেখতে পেয়েছিলাম। বস্তুতঃ কানোভা-নির্ম্মিত পাওলিনার (নেপোলিয়নের ভগ্নী) মর্ম্মরমূর্ত্তির সম্মুখে হিট্‌লারের অভিব্যক্তি এই প্রবন্ধের সঙ্গে প্রকাশিত ছবি দেখলেই খানিকটা আন্দাজ করা যাবে। বের্নিনির এপলো-ডাফনে ও ডেভিড দেখতে হিট্‌লার পুনরায় ঐ মিউজিয়মে ফিরে গিয়েছিলেন শুনে মনে হ'ল জার্ম্মান্ রাষ্ট্রনায়ক শিল্পেরও মর্য্যাদা বোঝেন। রহস্য ক'রে এ কথার প্রতিবাদ করার জন্য এক জন ফরাসী সাংবাদিক বন্ধু আমায় বললে যে, এই ফিরে আসাটা একটা "পোজ" ; হিট্‌লার এ সব ব্যাপারে নাকি তাঁর প্রচার-সচিব চাণক্য গোয়েব্‌ল্‌স্-এর (Goebbels) মন্ত্রণা নিয়ে থাকেন।

হিট্‌লারের সমাগমে রোমে 'ভিয়া দেল্ ইম্পেরো'র আলোকসজ্জা

ইতালীতে সরকারের রাজনীতি আর প্রজার অনুভূতির মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান রয়ে গেছে। ইতালী ও জার্ম্মানী পরস্পরকে ঘৃণা করে, অন্ততঃ উভয়েই উভয়কে সন্দেহের চোখে দেখে। সমস্ত ইউরোপের ইতিহাসে কখনও লাটিন আর টিউটনিক এ দুটি জাত একসঙ্গে উন্নতির পথে চলতে পারে নি, বরং পরস্পরের বিরোধ এবং সংগ্রামেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে দিয়েছিল জার্ম্মানীর অরণ্যবাসী লুণ্ঠনকারী তস্করের দল; তাই আজও ইতালীতে জার্ম্মানদের "ম্লেচ্ছ" বলা হয়ে থাকে। রোমের সাম্রাজ্য অভিযান রাইনের আর ডানিয়ুবের তীরে এসে থেমে গেল। এ অভিযান যদি বল্‌টিক পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারত, তবে হয়ত একটি মাত্র রোমান শাসনের অধীনে সমস্ত ইউরোপের একত্রীভূত হবার সম্ভাবনা থাকত। রোমান সাম্রাজ্য লুপ্ত হবার পরে ইউরোপের ইতিহাসে এই সমন্বয়ের সম্ভাবনা আরও দু-বার দেখা দিয়েছিল, কিন্তু জার্ম্মানরাই সে-স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। প্রথমতঃ, ক্যাথলিক গির্জ্জার মধ্য দিয়ে ইউরোপের একত্ব-সৃষ্টির সাধনা চলতে থাকে। মার্টিন লুথার, এবং তার পিছনের রাজনৈতিক শক্তি ক্যাথলিক চার্চ্চের সার্ব্বভৌম প্রসার খর্ব্ব করে; শুধু তাই নয়, এর ফলে ইউরোপের সর্ব্বত্র ধর্ম্মযুদ্ধের নামে দুই তিন শতাব্দী ধরে অজস্র রক্তপাত হয়। দ্বিতীয়তঃ নেপোলিয়ন। কিন্তু নেপোলিয়নের পরাজয়ে এ-কথা শেষবারের মত প্রমাণ হয়ে যায় যে রোমান আইনশাস্ত্র কিংবা সামাজিক ব্যবস্থার উপরে ইউরোপের ঐক্য সাধিত হ'তে পারবে না। এ-ছাড়া, যাঁরা মনে করেন বিগত মহাযুদ্ধের জন্য দায়ী জার্ম্মানী, তাঁরা এ কথাও ব'লে থাকেন যে গণতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসনের মূলে কুঠারাঘাত করেছে জার্ম্মানী। তাই ইউরোপের

ইতালীর বিভিন্ন জনপদের বেশভূষা ও লোকনৃত্য হিট্‌লারকে দেখাবার জন্য রোমে এক দিন সন্ধ্যায় একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। শেষ দিন সন্ধ্যায় নূতন ফোরো মুসোলিনীর অলিম্পিক ষ্টেডিয়মে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রঙ্গমঞ্চে ভাগনারের লোয়েন্‌গ্রিন্ অভিনীত হয়; অতঃপর আতসবাজী ও নানা রঙের প্রদীপের সাহায্যে ফাসি-যুবার ব্যায়াম-কসরৎ দেখান হয়। হের হিট্‌লারের ইতালী-ভ্রমণের শেষ দিন অর্থাৎ সপ্তম দিন ফ্লোরেন্সে অতিবাহিত হয়।

হিট্‌লার ইতালী থেকে বিদায় গ্রহণ করার দিন ইতালীবাসীদের চোখের জল পড়েছে কি না সে খবর আমার জানা নেই; কিন্তু জার্ম্মান-নেতার অভ্যর্থনায় যে তিন-চার কোটি টাকা ব্যয় হ'ল সেজন্যে অনেককেই আক্ষেপ করতে শুনেছি। পূর্ব্বেই বলেছি যে, হিট্‌লারের অভ্যর্থনা ইতালীর জনসাধারণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নি, হয়েছে ইতালীর সরকারের দ্বারা। ফরাসী প্রেসিডেণ্ট যখন রোমে এসেছিলেন, তখন সমস্ত জনসাধারণ, চাষী-মজুর-প্রজা সকলেই উল্লসিত প্রাণে সেই উৎসবে যোগ দিয়েছিল। তখন কোন প্রচারকার্য্যের প্রয়োজন হয় নি ফরাসী রিপাব্লিকের সভাপতিকে অভিনন্দিত করার জন্যে। বাস্তবিক পক্ষে ইতালো-জার্ম্মান মিতালির ব্যাপারে

বিভিন্ন জনপদে আজ স্বৈরাচারের প্রসার ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

আজ সমস্ত দুনিয়ায় ইতালো-জার্ম্মান মিতালির সারবত্তা নিয়ে গবেষণা চলেছে। মুসোলিনী ও হিট্‌লারের যুগ্মমূর্ত্তিকে ইউরোপের শান্তি-সমস্যার কেন্দ্ররূপে সকলে গ্রহণ করতে শিখেছে। এ-কথা সত্য যে বর্ত্তমানে ইতালী ও জার্ম্মানীতে যে-ধরণের রাজনৈতিক ও সামাজিক মন্ত্র প্রচারিত হচ্ছে, তাতে অনেকখানি সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়; এ-কথা সত্য যে হিট্‌লার এবং মুসোলিনী উভয়েই গণতন্ত্রের শত্রু; উভয়েই যুদ্ধ-বিলাসী সাম্রাজ্যাভিলাষী; কিন্তু যেমন এঁদের ব্যক্তিত্বে তেমন ইতালো-জার্ম্মান রাষ্ট্রীয় মিতালিতে একটি গভীর বৈষম্য নিহিত আছে। ইতালীর সঙ্গে জার্ম্মানীর বন্ধুত্বের ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে এই মিতালি শুধু একটি সাময়িক রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই বিশিষ্ট প্রয়োজনটি যেদিন যে-কোন পক্ষের কাছে মূল্যহীন হয়ে দাঁড়াবে, সেই দিনই শুধু এই মিতালির মিথ্যা মুখোস স্খলিত হবে। জেনিভার রাষ্ট্রসঙ্ঘে যখন আবিসিনিয়ার ব্যাপার নিয়ে ইতালীর বেইজ্জৎ হয় তখন অনন্যোপায় হয়ে ইতালী জার্ম্মানীর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপন করতে ভীরু পদক্ষেপে অগ্রসর । ইংরেজ আজ তার ভুল স্বীকার করেছে; মিঃ ডন আজ পররাষ্ট্র-সচিবের পদ থেকে বিচ্যুত; টেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন ইতালীর সঙ্গে টি নূতন চুক্তিপত্র পর্য্যন্ত স্বাক্ষর করেছেন; কিন্তু ও পুরোপুরি মুসোলিনীর মন পেয়েছেন ব'লে মনে হয় না। আসল কথা এই, যত দিন স্পেনের যুদ্ধ শেষ না-হবে তত দিন পর্য্যন্ত ইতালো-জার্ম্মান বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে। অষ্ট্রিয়া দখলের পর থেকে সমস্ত মধ্য-ইউরোপে জার্ম্মানীর রাষ্ট্রিক এবং আর্থিক প্রসার বেড়ে চলেছে। এই প্রসারে ইতালীও বিশেষ পরিমাণে ক্লিষ্ট। তা ছাড়া ইতালীতে প্রায় দুই লক্ষ জার্ম্মান-ভাষী প্রজা বাস করে। তাদের মুক্তির কথাও হয়ত হিট্‌লারকে এক দিন ভাবতে হ'তে পারে। মুসোলিনীর সেদিকে নজর আছে; তাই এখন থেকেই দক্ষিণ-ইতালীর ও সিসিলির বিভিন্ন জনপদ থেকে চাষীদের এনে বল্‌ৎসানো (Bolzano) ও দক্ষিণ-টীরোলে কৃষির কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মত ইতালীও এ-কথা জানে যে ইউরোপে শান্তিরক্ষার একমাত্র শত্রু জার্ম্মানী। কিন্তু লোভী ব্রিটেন আর "ভগ্নী" ফরাসীর ব্যবহারে ইতালী এখনও কুণ্ঠিত হয়ে আছে। ইতালীয়ানরা খুবই রসিক, তাই রঙ্গরসের মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য কিংবা অপমানকে হেসে উড়িয়ে দিতে জানে; কিন্তু সময় বুঝে আবার চোখ রাঙাতে কিংবা অস্ত্রধারণ করতেও পশ্চাৎপদ নয়। এটা ম্যাকিয়াভেলির দেশ, আর মুসোলিনী তাঁরই শিষ্য। ১৯১৫ সনে জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সামরিক চুক্তি থাকা সত্ত্বেও জার্ম্মেনী ও অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইতালী যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। প্রয়োজন হ'লে ১৯৩৮ কিংবা ১৯৪০ সনেও আবার করতে পারবে। ইতালো-জার্ম্মান মিতালির এইটেই গূঢ় কথা।

রোম
৩০শে জুন ১৯৩৮

মা ফৌন্

মন্দালয়ের রাজ-অন্তঃপুরের ইতিহাসের এক পরিচ্ছেদ

শ্রীবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

মা ফৌনের কথা না বলিলে, মন্দালয় রাজ-অন্তঃপুরের বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকে।

মা ফৌন্ নামটি বড়ই অবজ্ঞাসূচক নাম; কেননা, ফৌন্ শব্দের অর্থ ধূলি—সকলেই যাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া

মা ফৌন্
গ্রাণ্ট-অঙ্কিত চিত্র অবলম্বনে মিঃ ডগ্‌লাস-কৃত চিত্র

দেয়। দরিদ্র পরিবারের মাতা বড়ই দুঃখে তাহার কুরূপা কন্যার নাম মা ফৌন্ রাখিয়াছিল। কিন্তু ভবিতব্য সকল দেশেই মানুষের অজ্ঞাত। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মা ফৌন্ মহারাজ মিন্‌ডনের সুদৃষ্টিতে পড়িয়া অমরপুরের* রাজ-অন্তঃপুরে গল্প-কথকিনীর পদে নিযুক্ত হয়।

রাজ্যের রাজনীতি বা অর্থনীতির সহিত মা ফৌনের কোনই সম্পর্ক ছিল না; রাজ-অন্তঃপুরের রাণী ও রাজ-তনয়াদিগের অনবচ্ছিন্ন কলহদ্বন্দ্বেও মা ফৌন্ কোনও দিন যোগদান করে নাই; রাজপ্রাসাদের অসংখ্য দলাদলিতে মা ফৌন্ নিরপেক্ষ ও নিঃসম্পর্ক ভাবে

নাক্‌সু মিওজা মা খিন্
মহারাণী সুপিয়ালার প্রধান সহচরী

থাকিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া যাইত। সুতরাং ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মা ফৌন্ তাহার অস্তিত্বের কোনও চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই।

অধীত বিদ্যা মা ফৌনের কিছুই ছিল না; কিন্তু প্রখর স্মরণশক্তি প্রভাবে "জাতক" "জনক" "নেমী"

* অমরপুর স্বাধীন ব্রহ্মরাজ্যের পূর্ব্বতন রাজধানী ছিল। ইহার ধ্বংসাবশেষ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণার বিষয়।

প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের রূপক গল্পগুলি মা কৌনের মুখস্থ ছিল। ব্রহ্মদেশীয় ইতিহাসে (মহা-ইয়াজা-উইন্-এ) বর্ণিত ব্রহ্ম-রাজাদিগের গৌরব কাহিনী মা কৌন্ এক নিশ্বাসে আবৃত্তি করিতে পারিত। রূপক গল্প রচনায় ও গল্পে রসসঞ্চারে, বিশেষতঃ গল্প বলিবার অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে, মা কৌনের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। মহারাজ মিন্ডনের পাটরাণী নাম্মাড-ফায়া রত্নমঞ্জলা দেবীর বিশ্রামগৃহে প্রতি সন্ধ্যায় মা কৌন্‌কে উপস্থিত থাকিতে হইত এবং রাণীদিগের মেজাজ অনুসারে প্রতি রাত্রিতে নূতন একটি গল্প বলিতে হইত। মহারাণী অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে সে-রাত্রিতে মা কৌনের ছুটির হুকুম হইত।

বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে মহারাণী রত্নমঞ্জলা বিশেষ কোনও বিষয়ে গল্প বলিবার জন্য মা কৌন্‌কে আদেশ করিতেন। মহারাজ মিন্ডন্ স্বয়ং সে-রাত্রিতে তাঁহার বাছাই রাণী লইয়া, স্ফটিক-প্রাসাদে বসিয়া মা কৌনের কথকতা শ্রবণ করিতেন। অশিক্ষিতা মা কৌন্ সে-রাত্রিতে যে চমৎকার ভাষায় এবং যে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে তাহার গল্প বলিয়া যাইত, তাহা রাজ-অন্তঃপুরে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত।

ভগবান মানুষকে সমান ভাবে সকল সম্পদের অধিকারী করেন না। তিনি মা কৌন্‌কে অতি কুরূপা করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। রাজ-অন্তঃপুরের সুবেশা সুকেশা স্বর্ণকান্তিবিশিষ্টা সুন্দরীদিগের সভাতে মা কৌন্ যখন গল্প করিবার জন্য ঠাট করিয়া বসিত, তখন তাহাকে এত বিশ্রী দেখাইত যে, সে মানুষ কি কুকুর, সাধারণ লোকে হঠাৎ তাহা বুঝিতে পারিত না। অমরপুরের ব্রিটিশ রেসিডেন্সীতে মেজর ফেয়ারের চাকরেরা মা কৌন্‌কে হঠাৎ দেখিয়া তাহাকে কুক্কুরমুণ্ডবিশিষ্ট হনুমান বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল।

মা কৌনের দৈহিক গঠন কুৎসিত ছিল না, বর্ণও সুন্দর ও লাবণ্যপূর্ণ ছিল; কিন্তু মা কৌন্ স্ত্রীলোক হইলেও তাহার দীর্ঘ দাড়ি ও গোঁফ, এবং কর্ণ ও ভ্রূ হইতে নির্গত সুদীর্ঘ রোমগুলি তাহাকে এক অদ্ভুত রকমের আকৃতি প্রদান করিয়াছিল। সুগন্ধি তৈল ও চিরুণীর সাহায্যে মা কৌন্ তাহার লম্বা চুল দাড়ি ও গোঁফ পারিপাট্য করিয়া সাজাইয়া রাখিত। প্রকৃতির এই অশিষ্ট ও অদ্ভুত উপহারকে মা কৌন্ অযত্নে রাখিত না। তাহার পিতা উ-শোয়ে-মাউঙেরও ঐরূপ ঘন ও দীর্ঘ রোমাবৃত মুখমণ্ডল ছিল। উ-শোয়ে-মাউঙের দুইটি সন্তানের মধ্যে কন্যা মা কৌন্‌ই তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অদ্ভুত পিতৃসম্পত্তির পূর্ণ অধিকারিণী হইয়াছিল। ব্রিটিশ দূত ক্রফোর্ড সাহেব যখন ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আভা-রাজসভায় আসিয়াছিলেন, তখন উ-শোয়ে-মাউঙ জীবিত ছিল; কন্যা মা কৌনের বয়স তখন তিন-চার বৎসর মাত্র। ক্রফোর্ড সাহেবের লিখিত "Journal of an Embassy from the Governor-General of India to the Court of Ava" নামক পুস্তকে তিনি উ-শোয়ে-মাউঙের এক প্রতিকৃতি দিয়াছেন এবং মা কৌন্ ও তাহার পিতাকে তিনি Homo hirsutus অর্থাৎ লোমশ নর-জাতীয় মনুষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মা কৌন্ কুরূপা ছিল; কিন্তু রূপে কি করে? যৌবনে মা কৌনেরও হয়ত বিবাহ করিবার সখ হইয়াছিল; অথবা মহারাজ মিন্ডন্ এই অদ্ভুতাকৃতি রমণীর বংশবৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। পরিণয়প্রার্থীকে তিনি যৌতুক-স্বরূপ প্রচুর অর্থদান করিতেও প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু তথাপি এই হতশ্রী কন্যার ভাগ্যে সহজে কোনও পাণিপ্রার্থী জুটিল না। মহারাজ মিন্ডনেরই এক ইটালীয়ান কর্ম্মচারী রাজার প্রতিশ্রুত ঐ বহুমূল্য যৌতুকের আশায় মা কৌন্‌কে বিবাহ করিতে এবং বিবাহের পর তাহাকে ইউরোপে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। হয়ত ইউরোপের কোনও সার্কাসে মা কৌন্‌কে দেখাইয়া পয়সা-উপার্জ্জনের অভিপ্রায় তাহার ছিল। কিন্তু মহারাণীর আপত্তিতে সেই বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় এবং অবশেষে এক ব্রহ্মদেশীয় যুবকই মা কৌন্‌কে বিবাহ করে। বিবাহের পর স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই মহাসুখে দাম্পত্য জীবন যাপন করিতে থাকে। দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পাঁচ-ছয় মাস বয়স হইতেই কনিষ্ঠ পুত্রটির কর্ণে ও মুখমণ্ডলে দীর্ঘ রোমরাজির

আবির্ভাব হয়। রাজ-অন্তঃপুরে মা কৌনের চাতুরিও অক্ষুণ্ণ থাকে।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ মিন্‌ডন্ যখন পূর্ব্বতন রাজধানী অমরপুর পরিত্যাগ করিয়া মন্দালয় নগরে রাজধানী স্থাপন করেন, মা কৌন্‌ও তখন রাজপরিবারের সঙ্গে মন্দালয় আগমন করে। পাটরাণী নান্মাড-ফায়া রতন-মঙ্গলা দেবী মা কৌন্‌কে যথেষ্টই অনুগ্রহ করিতেন। তাঁহার অর্থে ও অন্যান্য রাণীদিগের আনুকূল্যে মা কৌনের কিছুরই অভাব ছিল না। মা কৌন্ উৎকৃষ্ট পট্টবস্ত্র ও বহুমূল্য অলঙ্কার ব্যবহার করিত।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী নান্মাড-ফায়া রতনমঙ্গলা দেবীর স্বর্গলাভ হইলে, মা কৌন্ মহারাজ মিন্‌ডনের নিকট আবেদন করিয়া মাসিক সাড়ে সাত টাকা বেতন পাইবার আদেশ পায়। মা কৌনের জ্যেষ্ঠ পুত্র তখন রাজসরকারে বিনা বেতনে চাকুরী করিতেছিল।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ মিন্‌ডনের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র মহারাজ তীব ব্রহ্মদেশের রাজসিংহাসন লাভ করেন। তিনি ও তাঁহার পাটরাণী সুপিয়ালা মা কৌন্‌কে যথেষ্টই অনুগ্রহ করিতেন। কিন্তু রাজ-অন্তঃপুরের দ্বেষ-বিদ্বেষ তখন চরমে উঠিয়াছিল। মহারাজ তীবর প্রেয়সী ছোট রাণী খিন্‌জীর গৃহে মা কৌন্ নাকি মহারাজারই সম্বন্ধে এমন একটি রূপকথা বলিয়াছিল যাহাতে মহারাণী সুপিয়ালার প্রতি মহারাজার বিদ্বেষ জন্মে। পরদিনই মহারাণীর আদেশে মা কৌন্ রাজ-অন্তঃপুর হইতে নির্ব্বাসিতা হয় এবং তাহার কর্ম্মচ্যুতির আদেশ হয়। মা কৌনের বয়স তখন প্রায় ৫০ বৎসর। ইহার পূর্ব্বেই তাঁহার স্বামী ও পুত্রদ্বয় মা কৌন্‌কে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছিল। মহারাণীর আদিষ্ট এই কঠিন দণ্ড নির্দ্দোষ মা কৌনের চিত্তে এরূপ কঠিন আঘাত করিয়াছিল যে দেড় বৎসরের মধ্যেই হতভাগিনী মা কৌন্ ক্ষয়রোগে ইহলোক হইতে অপসৃত হয়।

রাজধানীতে নূতন কেহ আসিলে বা নূতন কোনও ঘটনা ঘটিলে, মা কৌন্ তাহার গল্পের উপাদান সংগ্রহের জন্য রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইত। হয়ত সেইরূপ অভিপ্রায়েই মা কৌন্ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ মেজর ফেয়ার ও কাপ্তেন ইউলকে দেখিবার জন্য রেসিডেন্সীতে গিয়াছিল। তাঁহারা তখন মহারাজ মিন্‌ডনের সহিত বাণিজ্যসংক্রান্ত সন্ধি স্থাপনের জন্য অমরপুর আসিয়াছিলেন। মা কৌন্ তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্বেত মনুষ্যদিগের বেশভূষা ভাবভঙ্গী অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া আসিয়াছিল এবং কিছু দিন পরে রাজ-অন্তঃপুরে ঐ ব্রিটিশ দূতদিগের সম্বন্ধে এমন এক মজাদার গল্প রচনা করিয়াছিল যে মহারাজ মিন্‌ডন্ পর্য্যন্ত তাহা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

কাপ্তেন ইউল "A Narrative of the Mission to the Court of Ava" নামক পুস্তকে মা কৌনের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫

রেসিডেন্সীতে আজ এক অদ্ভুত রকমের স্ত্রীলোক আসিয়াছিল। তাহার নাম মা কৌন্। * * * আমরা পূর্ব্বে তাহার আগমনের সংবাদ জানিতাম না। সুতরাং মা কৌন্ রেসিডেন্সীতে প্রবেশ করিবামাত্র আমাদের চাকরেরা তাহাকে কুকুরের ন্যায় মস্তক-বিশিষ্ট "অনুবিস্" মনে করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। মা কৌন্‌কে ভাল করিয়া দেখিয়া আমাদের সে-ধারণা দূর হইল। * * * মা কৌনের মুখমণ্ডল দীর্ঘ রোমরাজিদ্বারা আবৃত ছিল। [ইউল সাহেব এই স্থানে মা কৌনের কেশ ও শ্মশ্রুর বর্ণনা দিয়াছেন] * * * সাধারণ ব্যবহারে মা কৌন্‌কে অত্যন্ত বিনীত ও নিরীহ লোক মনে হইল। তাহার কণ্ঠস্বর কোমল ও স্ত্রীজনোচিত ছিল। সুদীর্ঘ শ্মশ্রুসমন্বিত স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমতঃ যে-বিরক্তি জন্মিয়াছিল, তাহার কথায় ও ব্যবহারে সে-বিরক্তি আর রহিল না। মিঃ গ্রাণ্ট তাহার ছবি তুলিয়া লইলেন (প্রবন্ধে তাহারই এক প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে)। তাহার স্বামী ও পুত্র দুইটিও মা কৌনের সঙ্গে আসিয়াছিল। কনিষ্ঠ পুত্রটির বয়স তখন প্রায় ১৪ মাস। এই শৈশব অবস্থাতেই তাহার কর্ণে ও মুখমণ্ডলে দীর্ঘ রোমরাজি আবির্ভূত হইয়াছিল। * * * মা কৌনের মাড়ীর দাঁত ছিল না; অথচ মাড়ী এত শক্ত ছিল যে সুপারির মত শক্ত জিনিষও সে অতি সহজে চিবাইতে পারিত।

টেনিসন জেসী-প্রণীত "ল্যাকার লেডী" নামক পুস্তকে মা কৌনের উল্লেখ আছে (২৪৭ পৃষ্ঠা)। তিনি তাহাকে রাজ-অন্তঃপুরের "রোমাবৃত রমণী" নামে পরিচয় দিয়াছেন। টেনিসন্ জেসী রাজ-অন্তঃপুরের মহারাণী হইতে আরম্ভ করিয়া সকল স্ত্রীলোককেই যথেষ্ট নিন্দা

করিয়াছেন; কিন্তু মা ফৌন্ তাঁহার কশাঘাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে; তিনি মা ফৌনের প্রশংসাই করিয়াছেন।

দুঃখের বিষয়, মা ফৌনের কথিত গল্পগুলি কেহই লিখিয়া রাখে নাই। লিখিলে তাহার ত্রিশ বৎসরের গল্প ব্রহ্মদেশে আরব্য রজনীর মত একখানি সুখপাঠ্য গ্রন্থ হইত।

মন্দালয়ের বর্ত্তমান বৃদ্ধ লোকেরা মা ফৌন্‌কে "রোমশা রমণী" বলিয়াই বর্ণনা করে; তাহার কথকতার কথা কেহই উল্লেখ করে না। ইহার কারণ এই যে, মা ফৌন্ রাজ-অন্তঃপুরের গল্প-কথকিনী ছিল; রাজ-অন্তঃপুর ব্যতীত অন্য স্থানে সে গল্প বলিত না, অন্য স্থানে গল্প বলিতে যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্মানজনক ছিল। শোয়ে-না-ডএর সেবিকা (স্বর্ণ কর্ণের অর্থাৎ মহারাণীর কর্ণে গল্প শুনাইবার জন্য নিযুক্তা) মা ফৌন্ অন্য কোন সাধারণ লোককে তাহার গল্প শুনাইত না। কাজেই রাজপ্রাসাদের লোক ব্যতীত অন্য কেহই তাহার গল্প-কথন-প্রতিভার পরিচয় পায় নাই।

ফিল্ডিং হলের লিখিত "প্যালেস্ টেল্‌স" নামক পুস্তকে মা ফৌনের গল্প-কথনের উল্লেখ আছে।

মৃতা মহারাণী সুপিয়ালার প্রধানা সহচরী নাক্‌মু মিওজা মা খিন্, মা ফৌনের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। ব্রহ্মরাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে মা ফৌন্ অমরত্ব লাভ করে নাই।

আধুনিক সাহিত্যের উৎসমূল

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

বর্ষার সময় যখন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি নামে তখন মাঠগুলো হয় জলাশয়, আর নর্দমাগুলি হয় তন্বী নদীধারার চুটকি সংস্করণ। কলকাতায় ঠন্ঠনে কালীতলা-অঞ্চলে মেঘ ডাকলেই আধ হাঁটু জল দাঁড়ায়। এ-জল জমেও যেমন অচিরে, এর তিরোভাবও তেমনি দ্রুত। জলধারা বা জলাশয়কে স্থায়ী করতে হলে চাই হিমাচলের সঙ্গে নাড়ীর সম্বন্ধ, যার সমুচ্চ তুষারশৃঙ্গে অনবরত মশকে মশকে জল যোগাচ্ছে মেঘের ভিস্তি; অথবা চাই মাটি খুঁড়ে অন্তঃশীলার গুপ্তধারার সঙ্গে যোগস্থাপন। খরার দিনেও তা হ'লে নদী-পুকুর-কুয়োকে দেউলে হ'তে হবে না। পরের ধনে পোদ্দারি করা বেশী দিন চলে না। সে ভিক্ষাবৃত্তি বা চৌর্য্যবৃত্তির মিয়াদ বেশী নয়। তা ধরা পড়ে অবিলম্বে এবং সিংহচর্ম্মের আলখাল্লায় লম্ফমান বৃষভটির প্রকৃত পরিচয় অরণ্যবাসী জীবদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ধূর্ত্ত শৃগাল।

আসল কথাটা এই, সত্য বস্তুটির উপলব্ধি অন্তরে, তার প্রকাশ সাহিত্যে। ফটোগ্রাফারের দোকানে ছবি তুলতে গেলে দামটা বেশী দিতে হয় নেগেটিভ বা খসড়া চিত্র-ফলকটির জন্যে, যার বুকে আছে ছায়া-লোকের লিখাঙ্কন। তার পর সেটার নকল ছাপগুলি সহজ এবং সুলভ। ছবিওয়ালাকে গিয়ে যদি বলি, আমার মূল চিত্রলেখার প্রয়োজন নেই, তার নকল মুদ্রাঙ্কনগুলি দাও, তা হ'লে সে দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বলবে,—রাস্তায় স'রে পড়, এখানে মিলবে না।

আজকালকার বাংলা সাহিত্যে যে জিনিষটা বড় বেশী চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে—ঐ আগে যা বলেছি—সেই অতিবৃষ্টির বন্যা, অন্তরের জলসত্র নয়। অবশ্য, এর ব্যতিক্রম আছে বইকি, কিন্তু সেটা কচিৎ লক্ষিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত বিরল, অসাধারণ যা, তা আপনার

স্বাতন্ত্র্য দিয়েই চলৃত্তি নিয়মের আধিপত্য প্রমাণ করে। জানি, 'মৌক্তিকং ন গজে গজে'। কিন্তু ফুল ফোটে গাছে গাছে, যদি তার মূল শিকড়টি পায় সরস মাটির আশ্রয়। সাহিত্য রত্নখনিও বটে, বালুকাও বটে। রত্নপ্রসূর সংখ্যা সর্ব্বত্রই বিরল, কিন্তু উপলব্ধ সত্যের আনন্দময় প্রকাশ প্রাণবান্ জাতির সাহিত্যে ত দুর্লভ নয়। গদ্যে পদ্যে উপন্যাসে নাটকে তার বিচিত্র নিদর্শন। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে এই আন্তরিকতার অভাব লক্ষিত হয়। এই প্রাণসম্পদকে অর্জ্জন করতে হবে প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে নিবিড়তর যোগসাধনায়। তবেই সাহিত্য হবে প্রাণস্পন্দে বেপথুময়।

মৌলিক মানুষটি সব দেশেই এক। তার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন তাকে বিশিষ্ট রূপ দেয়, জীবনের আপাতলক্ষ্য ও গতিকে বিভিন্নমুখী করে। এ বৈচিত্র্য ও পার্থক্যের অন্ত নেই। আমাদের এই প্রাচ্যের কর্ম্মশৈথিল্যের আবহাওয়া, সামাজিক সঙ্কীর্ণ বিধিনিষেধ, নষ্ট সংস্কৃতির ধ্বংসস্তূপের প্রাচীর, বহু যুগ ধরে আমাদের অনেকটা অচল-প্রতিষ্ঠ করে রেখেছিল। হঠাৎ এল সুদূর পশ্চিম থেকে একটা প্রবল শক্তির প্লাবন। ইংরেজের অধিকার যে কেবল আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে আবদ্ধ তা নয়, অন্তর্লোকেও পাশ্চাত্য প্রভাব আমাদের চিন্তা ভাব ও আকাঙ্ক্ষায় যুগান্তর এনেছে। আমাদের ভাবনা ও বাসনাকে যা অভিভূত করেছে, তার সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রাকে যদি খাপ খাইয়ে না নিতে পারি, তবে আমাদের প্রাণে হয় দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি। এ-বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ যদি আমাদের অন্তরের আদর্শে সমাজ-সংসারকে গড়ে তোলবার জন্য চেষ্টাবান্ করে, তবেই হয় জাতীয় জীবনে নবপ্রারম্ভের সূত্রপাত। আমাদের প্রাচীন ইতিহাস একটু আলোচনা করলেই দেখতে পাই, যুগে যুগে নানা বিধিনিষেধের ব্যবস্থা পূর্ব্বাচার্য্যেরা করেছেন তাঁদের সমসাময়িক অবস্থার সঙ্গে সমাজের সামঞ্জস্যবিধানের জন্য। প্রাণবান্ ব্যক্তি বা জাতিমাত্রই আত্মরক্ষার জন্য চারি দিকের অনুকূল-প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে একটা রফা ক'রে নেয়। এই আপোষে-নিষ্পত্তি সহজ ও আয়ত্তাধীন হয় তখন, যখন বাহিরের বিরুদ্ধতার চেয়ে অন্তরের প্রতিবন্ধকতা তুলনায় কম প্রবল। কিন্তু যেখানে আমরা অন্তরের গুরুভারে নিপীড়িত, সেখানে বাহিরের সঙ্গে বোঝাপড়ার একটা প্রচেষ্টা আমাদের সামর্থ্যে আর কুলোয় না। এই সংগ্রামে ক্রমাগত হার মানতে মানতে হারাই জীবনের সত্যাশ্রয়। যেটা মন বলে ভাল, প্রতিদিনের আচারে আচরণে করি তাকে অস্বীকার। জীবনে আসে বৈরাজ্য, কপটতা, ছদ্মাবরণ। উচ্চ আদর্শ না-থাকাও বরং শ্রেয়, যদি সে-আদর্শকে জীবনে সাফল্য দেবার সঙ্কল্প ও চেষ্টা অন্ততঃ বেদনাটুকুও না জাগে। যে সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়ানো যাবে সেটাকেই ভূতগ্রস্ত করে তুলি। বাইবেলে একটা কথা আছে—If the salt loses its savour, wherewith the earth to be salted ?

লবণ যদি হারায় তাহার লবণত্ব, পৃথিবী কেমন করে পাবে লবণের আস্বাদন ? সবই যে আলুনী ও স্বাদহীন হয়ে পড়বে !

যে-সব চিরাচরিত সংস্কারের উপর বর্ত্তমান যুগ আস্থাহীন হয়ে পড়েছে তাদের বর্জ্জন ক'রে নূতন আদর্শে জীবনকে গড়ে তোলবার জন্য একটা প্রয়াস আজকালকার লেখায় অল্পাধিক পরিমাণে পরিস্ফুট। কিন্তু যে-সত্য-নিষ্ঠা অন্তরের আলোকে অজানা পথের অন্ধকারে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, সে অকুতোভয় প্রবর্ত্তনা আমাদের পরমুখাপেক্ষী জীবনে এখনও তেমন জাগ্রত হয় নি। তাই রচনা যখন ভাজে উচ্ছে, বলে ভাজছি পটোল, কিংবা নিরঙ্কুশ ভাবালুতা অবাধে পায় প্রশ্রয়, যেহেতু কথার সঙ্গে অবশ্যকর্ত্তব্যের দায়িত্ববোধ নেই। সত্যের উপর যাঁর অচল প্রতিষ্ঠা এবং সে-সত্যকে জীবনের দৈনিক আচারকে শত বিরুদ্ধতা ও বিদ্রূপের মধ্যেও যিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন, তিনিই সাহিত্যের ক্ষেত্রে অধিনায়ক। যাঁরা তাঁর নিন্দাবাদ করেন, তাঁরাও অন্তরে তাঁকে শ্রদ্ধা না ক'রে থাকতে পারেন না। গুপ্ত নারায়ণ ত সকলেরই মধ্যেই বিদ্যমান।

সাহিত্যে নবযুগ নবধারা আনতে হ'লে যত ক্ষুদ্র হোক, তবু একটি অনুকূল আত্মীয়-গোষ্ঠীর প্রয়োজন, যাঁদের

জীবনে কথার সঙ্গে কার্য্যের সামঞ্জস্য আছে। লেখক-বর্গের রচনাবলীর আলোচনার জন্য বাংলার গ্রামে গ্রামে মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হোক। সৎসাহিত্য হবে অরণ্যে রোদন মাত্র, যদি রসগ্রাহী পাঠকের অভাব হয় এবং দূষিত সাহিত্যের আক্রমণ থেকে সৎসাহিত্যকে রক্ষা করবার জন্য শিষ্ট জনমতের অভ্যুদয় না হয়।

আমরা দুর্ব্বল, তাই চরিত্রহীন হয়ে পড়েছি, অর্থাৎ অন্তরে যা সত্য বুঝি জীবনে তা অধিগত করবার জন্য সঙ্কল্প ও শক্তি আমাদের নেই। মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝি যা অন্যায়, তার প্রতিবাদ করবার দায়িত্ববোধ বা বুকের পাটা নেই আমাদের। এ-সম্পদ যাঁদের আছে, তাঁরা নমস্য, আমার এ-আলোচনা তাঁদের স্পর্শ করবে না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখি, আমাদের মেরুদণ্ডটি হয়ে গেছে রবারের, ভর সয় না। কলকাতার ঘরে ঘরে, বিজলী-বাতি জলে, পাখা ঘোরে। এই বিরাট বিপুল বৈদ্যুতিক যন্ত্র-প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বত্র দেখি তড়িৎপ্রবাহকে ধরে রাখবার জন্যে চীনামাটি বা ঐরূপ কোন বিদ্যুৎ-স্রোতরোধক আগল দেওয়া থাকে। এই ছোট ছোট টুক্‌রাগুলির মধ্যে রয়েছে ধৃতিশক্তি। ওরাই বিপুল বৈদ্যুতিক তেজসম্ভারকে তারে তারে প্রবাহিত করবার আনুকূল্য দান করে। ওরা যদি ঘাঁটি আগলে না থাকত, তাহলে লক্ষ লক্ষ ডাইনামোতেও একটি বাতি জলত না, একটি পাখাও ঘুরত না। এই বিধৃতি যাঁর আছে তিনি চরিত্রবান। জাতীয় চারিত্র্যের বনেদ যেখানে, সাহিত্যের অন্তঃশীলা উৎসারিত হয় সেখান থেকে।

বাঙালীর জীবনে যদি সত্যাশ্রয় আসে তবে সাহিত্যের শিবসুন্দর রূপটি স্বতই ফুটে উঠবে এবং আমাদের সমাজে সংসারে আনবে নবরবির অরুণরাগ।

বর্ত্তমানের ভিতর অনন্তজন্মা চিরন্তন যে মূর্ত্তিতে ভূমিষ্ঠ হয়, তাকে বলি আধুনিক। চিরপুরাতন এই রকম করেই তরুণ রূপ ধারণ করে। এ-রূপ স্বতঃস্ফূর্ত্ত, স্বয়ম্ভূ। কালসমুদ্রের মন্থন পুরাকালেই শেষ হয় নি। নিত্যকাল ধরেই চলেছে। সুধাভাণ্ড হাতে নিয়ে কাব্যলক্ষ্মী নানা দেশে নানা কালে সমুত্থিতা হন। উচ্চৈঃশ্রবা পক্ষ বিস্তার ক'রে আকাশে উড্ডীন হয়। সেই সঙ্গে গরল ওঠে। সে হলাহল পান করবার জন্য মহাদেব আবির্ভূত হন, সৃষ্টিরক্ষার্থে। এ আধুনিকত্ব প্রাণোচ্ছল জাতীয় যৌবন, "তা জ যে তা জ যে নৌ যে নৌ" এ চির নবীন, চির সুন্দর।

কষ্টকল্পনা ক'রে, প্রাণহীন কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে, দাঁড়কাককে ময়ূরপুচ্ছে শোভিত ক'রে, ঝুঁটি-ফোলা কাকাতুয়ার প্রগল্‌ভ রূপ চানিতে, পরবাণী-বিজৃম্ভিত গ্রামোফোনের কাংস্যনিনাদে টেনে আনবার নয়। এর জন্য চাই একাগ্র সাধনা, এবং সেই সাধনালব্ধ সিদ্ধি।

যে কোন একটা বিলাতী গ্রামার হাতে নিলেই দেখতে পাওয়া যাবে, আগে verb "to be"র conjugation, তার পর verb "to do"। পাঠশালায় "ভূ" ধাতুর রূপটি আগে আয়ত্ত করতে হয়েছিল, তার পরে 'কৃ' ধাতুর সঙ্গে পরিচয়। আগে হ'তে হয়, করবার পালা আসে পরে। এই হওয়াই হচ্ছে একটা মস্ত বড় করা, জীবনের উদ্যোগ-পর্ব্ব। যে বলিষ্ঠ সুস্থ জীবনে অতীত ও পারিপার্শ্বিক নিগূঢ় রাসায়নিক যোগে একীভূত হয়েছে, চিন্তায় ভাবে কর্ম্মোদ্যমে উদ্বেল হয়ে উঠেছে, সেই জীবনবেদ যে ঋক্‌মন্ত্রে উচ্চারিত হয়, তারই নাম আধুনিক সাহিত্য।*

* কোন্নগর পাঠচক্রের অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ। ৩।১০।৩৭

শ্রীমান্ মথুরেশ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

আপনারা কি শ্রীমান্ মথুরেশকে জানেন? উঁহু, হাত দিয়া মাথা চুলকাইবেন না, চক্ষুর দৃষ্টিকে বিস্ময়বিহ্বল করিয়া তুলিবেন না, এবং খানিক নিস্তব্ধ থাকিয়া প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া ফেলিবেন না। ভয় নাই, শ্রীমান্ মথুরেশের চেহারার বর্ণনা পাইলেও যে আপনাদের মনের অন্ধকার কাটিবে না, জানি। ভাবিতেছেন, স্বল্পপরিচিত লোককে চিনিবার পক্ষে দৈহিক বর্ণনাই ত যথেষ্ট। কোন কোন ক্ষেত্রে যথেষ্ট হইলেও, সর্ব্বক্ষেত্রে একই নিয়ম খাটে না। চোখের সম্মুখে অনেক সুন্দর শোভন চেহারাই ত প্রতিনিয়ত পথে, ঘাটে, কর্ম্মস্থলে, ষ্টেশনে, গাড়ীতে বা সিনেমাগৃহে ভাসিয়া উঠে, কিন্তু বুদ্বুদের মত ক্ষণকাল স্থায়ী সেইগুলিকে মনের পরিচয়-পৃষ্ঠার অক্ষরের ছাঁদে বাঁধিয়া রাখা চলে কি? চক্ষু, বাক্য, এবং মন তিনের সহযোগেই ত পরিচয়ের পাঠ। সুতরাং, আমি যদি বলি, শ্রীমান্ মথুরেশের আকৃতি আর্য্যসুলভ, অর্থাৎ বাঙালীর পক্ষে একটু বেশীই লম্বা ত আপনার মুখের অজ্ঞতাজনিত রেখাকয়টির বিলোপ সাধন ঘটিবে কি? যদি বলি, রংটি তার ফর্সা, চুলগুলি কোঁকড়া, মুখখানি সদ্যপ্রস্ফুটিত পদ্মফুলের মত ঢলঢলে, চক্ষু দুটি আকর্ণবিস্তৃত এবং মুখের হাসিটি সর্ব্বসময়ের তথাপি জ্ঞানের আলোয় মুখের রেখা আপনার মিলাইবে না। এমন অনেক ছবিই আপনার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিবে, বর্ণনার সঙ্গে যাহার যথেষ্ট সামঞ্জস্য, কিন্তু পরিচয়ের ক্ষেত্রে সেগুলি যথেষ্ট নহে। অথচ শ্রীমান্ মথুরেশকে আমি যত গভীর ভাবে জানি, আপনারাও সেইরূপ গভীর ভাবে জানেন। শুনুন তবে।

প্রথম এক দিন বৈকালে, বৎসর কয়েক পূর্ব্বেই হইবে, আমার ভাড়াটিয়া বাড়ীর ছাদের উপর মাটির টবে বসানো ফুলের চারাগুলিতে জল ঢালিতেছিলাম। দেখিলাম, ঠিক আমার পাশের ছাদেই একটি সুদর্শন ছেলে অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে আমার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছে। অপরাহ্নের বিদায়রশ্মিতে মুখখানি তার অপরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছে; রং ফর্সা, কোঁকড়া চুল, আয়ত চক্ষু, সারা দেহে একটি কমনীয়তা, নারীজনোচিত বলিয়াই সেই সৌন্দর্য্য দর্শন মাত্রই মনকে টানে। সুতরাং, আমিও মুগ্ধ হইলাম।

জানি, পাশের বাড়ীতে কয়েকটি বিদ্যার্থী থাকেন। এক জন প্রৌঢ় শিক্ষকের অভিভাবকত্বে ক্ষুদ্র বোর্ডিংটি সুশৃঙ্খলাতেই চলে।

ছেলেগুলির কান-ফাটানো কোলাহল প্রায়ই আমরা শুনি। কিশোর বয়সের অপরিমিত হাসি-আনন্দে সংসারী আমরা মাঝে মাঝে পীড়িত হইয়া উঠিলেও বিরক্তি প্রকাশ করিবার সুযোগ পাই না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবি, এমন দিন ত আমাদেরও এক দিন ছিল। ফুলের একটি বেলার বিকাশলাভ পুষ্পজন্মের চরম সার্থকতা; কিন্তু অতীত রাত্রিতে তার কুঁড়িজন্মের সাধনা ও ভবিষ্যৎ অপরাহ্ণে বৃন্তচ্যুতির আশঙ্কা কোনক্রমেই যে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। আমরা অপরাহ্নের কোমল সূর্য্যকিরণের সঙ্গে হেলিয়া পড়িয়াছি বলিয়া, মধ্যাহ্নের উহাদের মুখে ছায়া নামিবে কোন্ দুঃখে?

ছেলেটিকে দেখিয়া মনে হইল অত্যন্ত কোমল সে মুখ, দুরন্তপনার কোন চিহ্নই সে চঞ্চল চোখের তারায় নাই। বয়সের স্নিগ্ধতা আছে, চাঞ্চল্য কম; কৌতুক আছে সারা মুখে—অজানাকে জানিবার কৌতুক। আমার রজনীগন্ধার কোমল বৃন্তের প্রতি সে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া আছে, গোলাপবৃন্তের ঘোর লাল ফুল কয়টিও হয়ত তার বিস্ময় বাড়াইয়া দিতেছে, রাইবেলের গন্ধ ও চন্দ্রমল্লিকার বিচিত্র বর্ণবিন্যাসও তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। ইচ্ছা হইল, কয়েকটি ফুল তুলিয়া

উহাকে উপহার দিই। কিন্তু বাগানে যে-ফুল ফুটিয়া শোভা বাড়ায় ও গন্ধ বিলায়, সেই ফুলকে তুলিয়া তোড়া বাঁধিতে আমার কষ্ট বোধ হয়। বিস্তীর্ণ বাহাদের বাগান, অসংখ্য গাছে রাশি রাশি নানা রকমের ফুল ফুটিয়া থাকে, মাহিনা-করা মালীরা কাঁচি চালাইয়া সেই নানা জাতীয় ফুলের তোড়া বাঁধিয়া বাগানকে হয়ত কিছু ভারমুক্ত করিয়া থাকে, এবং তাহাদের ফুল তোড়া-জন্ম গ্রহণ করিলে হয়ত আনন্দে হাত বাড়াইয়া সে-তোড়া গ্রহণও করিব, তথাপি আমার স্বল্পপরিমিত ছাদ-উদ্যানে কয়েকটি গোনা ফুলকে প্রাণ ধরিয়া কোন দিন তুলিতে পারিব না। এ কি রকম জানেন, নিজের ঘরে খাইতে বসিয়া এক মুঠা অন্ন অপচিত হইলে সংসারী লোকের প্রাণটি যেমন বেদনায় টনটন করিয়া উঠে, অথচ নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে এক পাতা সুভোজ্য নষ্ট করিয়াও মনে বিকার জন্মায় না।

যাহা হউক, ছেলেটি খানিক পরে নামিয়া গেল, আমিও নীচে নামিলাম। মোট কথা, ছেলেটি আমার মনের এক পাশে একটুখানি স্থান সংগ্রহ করিয়া লইল।

এমনই কয়েক দিন দেখাশোনার পর আলাপের আগ্রহ আমার প্রবল হইল। জলের ঝারি ছাদের আলিসায় বসাইয়া তাহাকে ডাকিলাম, 'খোকা, শোন।'

ছেলেটি ও-ছাদের আলিসার কাছে সরিয়া আসিল। দুটি ছাদের ব্যবধান মাত্র আড়াই কি তিন হাত। আলিসায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে বলিল, 'আমায় ডাকলেন?'

—হ্যাঁ, তুমি খুব ফুল ভালবাস, নয়?

ছেলেটির মুখে খুশীর রঙ ধরিল, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল ফুল সে খুবই ভালবাসে।

বলিলাম, 'তোমাদের ছাদে একটা বাগান কর না কেন, আমি তোমায় চারা এনে দেব।'

—দেবেন! কোত্থেকে আনবেন!

—কেন, নার্সারী থেকে কিনে আনব।

—ওঃ, ও-সবগুলি তা হ'লে আপনার কেনা?

হাসিয়া বলিলাম, 'এই গোলাপগাছের নাম জান? সার ওয়াল্টার স্কট। এই যে ব্ল্যাক প্রিন্স, এই পলনীরো—

—বাঃ চমৎকার নাম ত!

—আট আনা, এক টাকা ক'রে এক-একটি কলম কিনতে হয়েছে। দোআঁসলা মাটি আনাতে হয়েছে কত দূর থেকে—

ছেলেটি খুশীভরা কণ্ঠে বলিল, 'মাষ্টার মশায়কে বলব। রোজ বিকেলে ত বসেই থাকি, ছাদের উপর একটা বাগান তৈরি করা যাক্ না। কিন্তু অত পয়সা পাব কোথায়?'

—কত আর পয়সা। কিছু চারা আমি দেব, কিছু কিনবে।

—ফুলগাছ কেনা হ'লে সিনেমা দেখা হবে না যে।

—তুমি বুঝি খুব সিনেমায় যাও?

—না, সপ্তাহে মাত্র এক দিন। তাও মাষ্টার-মশায়ের অনুমতি নিয়ে। আর যেদিন মাষ্টার-মশায় থাকেন না, কেউ খুব ধরাধরি করে—

—না, না, স্কুলের ছেলে তোমরা, তোমাদের সিনেমার নেশা ভাল নয়।

ছেলেটি মাথা নামাইয়া বলিল, 'মাষ্টাররা ত বলেন সিনেমায় অনেক শেখবার বিষয় আছে।'

—তা আছে, নেশাটা ওর ভাল নয়।

ছেলেটি মাথা তুলিয়া অল্প একটু হাসিল। অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বলিল, 'আপনি কোন্ স্কুলের টিচার, স্যর্?'

বিদ্রূপ নাকি? পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিলাম। না, প্রশ্নোন্মুখ কচি কিশোর মুখে একটিও বক্ররেখা নাই, সরল বালকের সরল প্রশ্ন।

হাসিয়া বলিলাম, 'আমি টিচারী করি বুঝলে কিসে?'

ছেলেটি মুখ না-নামাইয়াই বলিল, 'কেন, ঠিক মাষ্টার-মশায়ের মত বুঝিয়ে বলতে পারেন যে!'

প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিলাম, 'তা হ'লে বুঝতে পেরেছ? আচ্ছা কাল ঐ পলনীরোর মত বড় একটা ফুল ফুটবে, ওটা তোমার জন্য রইল।' একটু থামিয়া বলিলাম, 'তোমার নামটি কি খোকা?'

ছেলেটি ফিক্ করিয়া একটু দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল: 'শ্রীমান্ মথুরেশ—'

প্রাণ ধরিয়া যে-ফুল গৃহদেবতাকে কোনদিন দিতে পারি নাই, স্ত্রীর অলকপ্রসাধনে বা কন্তার আব্দারে যাহা ভালবাসা বা স্নেহের দুর্ব্বলতম মুহূর্ত্তে কোনদিন বৃন্তচ্যুত করি নাই, অনায়াসে ঐ কিশোর মথুরেশকে তাহা উপহার দিব প্রতিজ্ঞা করিলাম। সৌন্দর্য্য কি এমনই একটি স্বর্গীয় জিনিষ, মর্ত্ত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সখকে যাহার পাদমূলে অনায়াসে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া চলে? অথবা সৌন্দর্য্যের পূজায় সুন্দরকে না বিলাইয়া মনের তৃপ্তি নাই। ছেলেটির হাসি সরল, কথাবার্ত্তা অকপট। কিশোর মনে সবেমাত্র পৃথিবীর উত্তাপ ও রং ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। যেমন করিয়া হউক, সিনেমার নেশা উহার ছাড়াইব, এবং এই ফুলের নেশা দিয়াই।

প্রভাতে ছাদে উঠিবার অবসর পাই না, সংসারের তাড়না আছে। সংসার গুছাইয়া আপিসে হাজিরা দিতে হয়। সন্ধ্যার মুখে হাত পা মেলিয়া শ্রান্তি দূর না করিয়া ছাদে গিয়া উঠি। টবে বসান গোলাপ, বেলা, রজনীগন্ধার পরিচর্য্যা করিয়াই শ্রান্তি দূর করি। প্রতিদিনকার মত আজও জলের ঝারি হাতে করিয়া ছাদে উঠিলাম। মনে বড় আনন্দ, বহুদিন-প্রতীক্ষিত পলনীরোর আজ সর্ব্বপ্রথম ফুল ফুটিবে এবং আমার নূতন আলাপিতকে সেই মধুগন্ধী ফুলটি উপহার দিয়া মধুরতর একটি সম্পর্কের সৃষ্টি করিব!

ওপারের ছাদে আলিসা ঘেঁষিয়া আমার কিশোর বন্ধু দাঁড়াইয়া আছে; ব্যগ্র মুখ, উৎসুক চোখ, অধীরভাবে আমারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে হয়ত। আর এ-পারে? সশব্দে হাত হইতে জলের ঝারিটা পড়িয়া গেল। জলপতনের শব্দের সঙ্গে আমার কিশোর বন্ধুর হাসির শব্দ মিশিল কি না, জানি না, যেখানে ভাঙা টবগুলির পাশে শিকড় বাহির-করা পলনীরোর সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া আমার সাধের ব্ল্যাক প্রিন্স, সার ওয়াল্টার স্কট, রজনীগন্ধা, রাইবেল প্রভৃতি অর্দ্ধমৃত অবস্থায় গড়াগড়ি যাইতেছিল তাহারই মাঝখানে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ যেহঁসের মত বসিয়াছিলাম মনে নাই, সহসা এক সময় মনে হইল আকাশে কৃষ্ণাচতুর্থীর চাঁদ উঠিয়াছে ও পাশের বোর্ডিং হইতে সম্মিলিত ছাত্রকণ্ঠের পাঠধ্বনি তীব্র ভাবেই কর্ণে প্রবেশ করিতেছে।

আর এক দিন শীতকালের মধ্যরাত্রিতে ভীষণ শব্দে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল।

শহরে 'ব্ল্যাক আউট' পরীক্ষা সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। অন্ধকার নগরীর বুকে বিমান হইতে ময়দার প্যাকেট পড়া দেখিবার প্রত্যাশায় যাঁহারা দলে দলে ময়দানে বা রাজপথে পায়চারি করিয়া ও সাহস সঞ্চয় পূর্ব্বক ছাদে উঠিয়া কৌতুক অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কৌতুক সেদিন গভীর হতাশায় ডুবিয়া গিয়াছিল। আশাজনক ভাবে বিমানবাহিনী দেখা দেয় নাই, ময়দার প্যাকেটও পড়ে নাই।

হঠাৎ ঘুম ভাঙিতেই যে চড়বড় প্রচণ্ড শব্দ কানে গেল তাহাতে মনে ভয় হইল, অতর্কিতে বিমান-আক্রমণই বা সুরু হইল! সেদিনকার নিষ্ফল কৌতুক আজ মধ্য-রাত্রিতে বুঝি বা প্রাণহরণের আয়োজনের মধ্য দিয়া সফল হইতে চলিয়াছে?

পাশের কুমোর-বাড়ীর করোগেটেড চালের উপরই ত চড়বড় শব্দে ময়দার প্যাকেট পড়িতেছে। চারি দিকে কোলাহল, অথচ জানালা খুলিয়া মাথা বাহির করিয়া ব্যাপার কি দেখিবার সাহস কাহারও নাই। যদি বোমা মাথায় পড়িয়া পৃথিবী অন্ধকার করিয়া দেয়? যেন ঘরের ছাদ ভাঙিয়া বোমা পড়িতে পারে না! সে যাহা হউক, পাঁচ মিনিট কাল কর্ণভেদী শব্দের পর বোমাপতন থামিল, আরও মিনিট দুই নীরব থাকিবার পর কেহ ও-বাড়ীর জানালা হইতে গলা বাড়াইলেন, কেহ ত্রিতলের বারান্দায় বাহির হইয়া গলাখাঁকারি দিলেন, কেহ বা সাহস সঞ্চয়-পূর্ব্বক একতলার ছাদে উঠিলেন। শুধু অন্ধকার বোর্ডিঙের ছাদে জনপ্রাণীকেও দেখা গেল না, সে-বাড়ীর কোন কক্ষেই আলো জলিতেছিল না। পাঠ-ক্লান্ত ছাত্রদল গভীর নিদ্রামগ্ন। ছেলেবেলার ঘুম, বোমা পড়িলেও সে-নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু যেখানে বোমা পড়িতেছিল সেখানকার অবস্থা সত্যই শেল-বিধ্বস্ত ভার্দুন কেল্লার মতই

ত্রয়ী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র রায়

শোচনীয় বোধ হইতেছিল। বাড়ীটি ছিল কুমোরদের, মাটির ঠাকুর তৈয়ারী করিয়া তাহারা দিনগুজরান করে। সরস্বতীপূজা উপলক্ষে ছোট বড় মাঝারি নানা ছাঁদের ও নানা ভঙ্গীর প্রতিমা গড়িয়া উঁচু করোগেটেড চালে শুকাইতে দিয়াছিল। নীচু উঠানে তেমন রৌদ্রের দেখা মিলে না বলিয়া করোগেটের টিন দিয়া একতলা-সমান উঁচু করিয়া তাহারই উপর প্রতিমাগুলি শুকাইতে দেয়। বৃষ্টি হইলে তাড়াতাড়ি সেগুলি নামাইয়া চালার নীচে রাখে। পরশু পূজা, আর রাত্রিতে এই বিভ্রাট! শতাবধি প্রতিমার মধ্যে একখানিও অটুট নাই। বোমার আঘাতে নির্মম ভাবেই সেগুলি মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত হইয়াছে। বিদ্যাদায়িনীর এমন লাঞ্ছনা কে করিল? হিন্দুসন্তান, অক্ষর-পরিচয় না হইলেও, পুরোহিতের মুখে মন্ত্রোচ্চারণ শুনিয়া এই একটি দিন বিদ্যাদায়িনীর পদে অঞ্জলি প্রদান করে, ভক্তিভরে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানায়। গোমূর্খ হইলেও কোন হিন্দুর হাতই এমন কার্য্যে উত্তোলিত হইবে না। অথচ বাড়ীর চতুঃসীমায় হিন্দু ছাড়া অন্য জাতির বসতি নাই। কুমোরেরা কয় ভাই মাথায় হাত দিয়া বাড়ীর উঠানে বসিল না বটে, আস্ফালন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কুমোর-বধূরা কপাল চাপড়াইতে চাপড়াইতে এ-হেন দুষ্কৃতকারীদিগকে অচিরাৎ যমভবনে যাইবার জন্য তারস্বরে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতে লাগিল।

বড় কুমোর এক সময়ে উচ্চকণ্ঠে হুঙ্কার দিয়া উঠিল, 'এ-কাজ ওদের, ওই ছেলেদের—'

বলে কি বড় কুমোর! প্রতিমা নষ্ট হওয়াতে মাথা উহার নিশ্চয়ই খারাপ হইয়াছে, নতুবা, যাহাদের জন্য বিশেষ করিয়া প্রতিবৎসর এই পূজার সমারোহময় আয়োজন হইয়া থাকে, তাহারা করিবে প্রতিমা-ধ্বংস? হয়ত বা অতর্কিত বিমান-আক্রমণেই—

ঘটনার পূর্ণচ্ছেদ এইখানেই টানিতে পারিতাম, কিন্তু শ্রীমান মথুরেশকে কয়েক বৎসর পরে আবার দেখিলাম।

বাসা ছাড়িয়া মেস আশ্রয় করিয়াছি। কয়েকটি মেস চাখিয়া মনোমত না হওয়ায় একটি ভাল মেসে ভাগ্যক্রমে স্থান পাইলাম। এখানে খরচ বেশী, কিন্তু ঝঞ্ঝাট কম। মাত্র দশটি লোক ত্রিতলের ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়া মেস বসাইয়াছেন। মেসটির আভিজাত্য-গর্ব্ব কিছু আছে। দক্ষিণ খোলা, জানালার ধারে ফুলের টব, বারান্দার টবে ঝোলানো লতা গাছ, পাখা, আলো সবই আছে।

মেম্বারগুলি দেখিতে সুশ্রী এবং বয়সে তরুণ। বেশ-ভূষার প্রত্যেকেরই অল্পবিস্তর পারিপাট্য দেখা যায়। প্রথম যেদিন এখানে প্রবেশ করি সেইদিন এক সুবেশধারী যুবকের সঙ্গে নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

—আপনাদের এখানে সীট খালি আছে?

—এই মাসের শেষে একটা সীট খালি হ'তে পারে। আপনি কোন্ আপিসে কাজ করেন?

—পোষ্ট আপিসে।

—ভাল। আমরা গবর্ণমেণ্ট সার্ভেণ্ট ছাড়া নিই না কি না! এ-মেসের খরচ একটু বেশীই—

—কত?

—এই মাসে ধরুন বাইশ-তেইশ টাকা।

—বলেন কি। এই বাজারে অন্য সব মেসে ত যোল-সতেরর বেশী পড়ে না!

ঈষৎ হাসিয়া যুবক বলিয়াছিল, 'আমরা একটু এ্যারিষ্টোক্র্যাট; যা-তা খাই না, যেমন-তেমন ভাবে থাকি না। এই জন্যই মাইনে যাঁদের নিয়মিত এবং মোটা তাঁরাই এখানে থাকতে পারেন।'

আমি রাজি হইলাম। একটু বেশী খরচ হইলেও ক্ষতি নাই, নির্ঝঞ্ঝাটে ত থাকিতে পাইব!

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'ম্যানেজার কোথায়?'

—তিনি বেরিয়েছেন। কাজের মানুষ, সময় খুব অল্প। খাবার শোবার সময় ছাড়া তাঁর দেখা পাওয়া যায় না।

যেদিন মেম্বার হইলাম সেই দিনই বৈকালে ম্যানেজার মহাশয়কে দেখিলাম। সুন্দর চেহারা। গায়ের রং হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত কোথাও খুঁত ধরিবার কিছু নাই। পায়ে টকটকে লাল রঙের বিদ্যাসাগরী চটি জুতা, পকাশ ইঞ্চি সূক্ষ্ম ফুলপাড় ধুতির কোঁচা মাটিতে

লুটাইতেছে, গায়ে সদ্যভাঙা চাঁপা রঙের একটি সিল্কের পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবীর বুক-পকেটে একটি টর্পেডো-আকৃতি শেফার্স ও একটি পার্কারের সিনিয়র ফাউন্টেন পেন, জামায় সোনার বোতাম তিনটি আঁটা, গলায় কাছেরটি সোনার চেনের সঙ্গে ঈষৎ উল্টাইয়া অধুনালব্ধ ফ্যাশানটিকে প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। পান খান না বলিয়া দাঁতগুলি বিজ্ঞাপিত বিদেশিনী মহিলার মতই মুক্তা-শুভ্র, কথাগুলি সুমিষ্ট।

সুষ্ঠু ভঙ্গীতে নমস্কার করিয়া বলিলেন, 'আপনার কোন কষ্ট হয় নি ত ?'

'না' বলিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ে যুবকের পানে চাহিলাম। এ-মুখ কোথায় যেন দেখিয়াছি, অথচ স্মৃতির আয়ত্তে আসিতেছে না।

সসঙ্কোচে তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম।

তিনি ঈষৎ হাসিয়া গ্রীবাভঙ্গী করিয়া উত্তর দিলেন, 'শ্রীযুক্ত—'

হাসিতে ও গ্রীবাভঙ্গীতে অকস্মাৎ মনের অন্ধকারে পরিচয়ের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল, বাকিটুকু না শুনিয়াই মনে মনে উচ্চারণ করিলাম,—'মথুরেশ।'

ক্রমে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইল। মথুরেশ সদালাপী ত বটেই, আলাপ জমাইবার কৌশলটুকু বেশ আয়ত্ত করিয়াছে, সেই কিশোর বালক আজ কেতাদুরস্ত সামাজিক যুবক হইয়াছে। বিদ্যার ক্ষেত্রে তাহার কৃতিত্ব কতখানি জানিবার আগ্রহে একটি প্রশ্ন করিলাম, 'আপনি কোন্ কলেজ থেকে বি-এ দিয়েছেন ?'

মথুরেশ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'সে আর নাম করবার মত কলেজ নয়। হ'ত স্কটিশ কি প্রেসিডেন্সী ত মাথা উঁচু ক'রে বলতে পারতাম। অর্ডিনারী মেরিটের ছেলের আবার কলেজ !'

বলিলাম, 'চাকরি করেন কোথায় ?'

মথুরেশ তেমনই হাসিয়া বলিল, 'দিনরাতই গাধার খাটুনি। আপনারা বেশ আছেন, দশটা-পাঁচটা ! আমার সারাদিন বালিগঞ্জ, চৌরঙ্গী, এই সব নিয়েই থাকতে হয়। মেয়েদের মর‍্যাল টিচিং দিয়ে দিয়ে নিজেও কেমন যেন মর‍্যালিষ্ট হয়ে পড়েছি। মনে করছি, এ-সব ছেড়ে দিয়ে চাকরিই কোথাও একটা নিই। কিন্তু পারব কি, বাঁধাধরা রুটিন-ওয়ার্ক করতে !'

বলিলাম, 'এ-ও ত বাঁধা ধরা। সকাল থেকে রাত দশটা।'

মথুরেশ সুমিষ্ট হাসির দ্বারা কয়েক সেকেণ্ড আমায় অভিভূত করিয়া কহিল—মোটেই বাঁধাধরা নয়। যে-কোন মুহূর্ত্তে ইচ্ছা করলেই ছেড়ে দিতে পারি। মঞ্জুশ্রীর বাবা—বালিগঞ্জের অত বড় এক জন ব্যারিষ্টার আর. সেন—এক দিন কি বলেছিলেন জানেন ? বলেছিলেন, 'মঞ্জু বলছিল আর দশ মিনিট আগে এলে ওর গানের মাষ্টারটি একটু সময় পান।' মুখের উপর বললুম, 'আমার এক মিনিট এ-দিক ও-দিক হবার জো নেই। সপ্তাহে তিন দিনের বেশী আসতে পারব না, এবং এক মিনিট আগেও না। ত্রিশ-চল্লিশ টাকার মায়া আমি বড় একটা করি না।

একটু থামিয়া বলিল, 'এক এক সময় মনে হয় বটে বাঁধাধরা একটা কিছু করি। জানেন ত,

> বদ্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি
> মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

আমারও হয়েছে তাই। খুব কম ক'রে শ-দুই টাকার একটা চাকরি পেলে নিতে পারি।'

গ্র্যাজুয়েট এবং চাল-দুরস্ত হইলেই যে অনায়াসে শ-দুই টাকার চাকরি মেলে না, এ-কথা মথুরেশকে বলিয়া লাভ কি ? আলোকপ্রাপ্ত সমাজে মিশিয়া অর্থপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তাহার আলোকরশ্মিও কিঞ্চিৎ প্রখরতর বলিয়াই বোধ হইল।

মথুরেশ বলিল, 'কিন্তু চাকরি আমি ভালবাসি না। জীবনে ইচ্ছা করলে আজ তিন-শ টাকা মাইনের একটি চাকরি অনায়াসে লাভ করতে পারতুম, কিন্তু তিন দিন আপিস যাওয়ার পর সটান সেখান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলুম। আচ্ছা নমস্কার, চৌরঙ্গীর রিটায়ার্ড সিবিলিয়ান রায় চৌধুরীর মেয়ে গীতা দেবীকে আজ মেঘদূত পড়াবার কথা, ছ-টা পাঁচ মিনিট।'

সকালে মথুরেশ বেশ বদল করিয়াছে। পায়ে নিউকাট গ্রেজ কিডের জুতা, পরনে শান্তিপুরের জরিপাড়

ধুতি ও গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, হাতে সোনার রিষ্টওয়াচ, পকেটে হেনাগন্ধী রুমাল। মাথার কোঁকড়া চুলগুলি কিছু উস্কখুস্ক, হয়ত মেঘদূত পড়াইবার কালে বিরহী যক্ষের ভাবানুকরণ না-করিলে ভাষার গোল হওয়াও বিচিত্র নহে।

আর এক দিন মধ্যাহ্নে পুরা খদ্দরের স্যুট পরিয়া স্যাণ্ডাল পায়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে শ্রীমান্ মথুরেশ আমার সীটে আসিয়া বসিল।

হাতপাখাখানি টানিয়া লইয়া বলিল, 'বেশ আছেন। হাফ-হলিডেতে শুয়ে শুয়ে কাটাচ্ছেন! আর দেখুন না এই মাত্র কর্পোরেশন কাউন্সিলার অবনী বোসের বাড়ী থেকে আসছি। ভদ্রলোক পুরাদস্তুর খদ্দরিষ্ট, ল্যান্সডাউন রোডে প্যালেসিয়াল বিল্ডিং, অথচ ছেলেমেয়েগুলি খদ্দর ছাড়া ছোঁয় না। চার তলার উপর দেখুন গে কংগ্রেস-পতাকা উড়ছে। ওঁর ছোট মেয়ে উর্ম্মিলাকে মুগ্ধবোধ পড়াই কি না!'

বলিলাম, 'বেশ আপনিই আছেন। প্রজাপতির মত রঙীন হালকা জীবন, বড় বড় সার্কেলে যাতায়াত, আমাদের মত কেওড়া কাঠের তক্তপোষে শুয়ে ত কড়িকাঠ গুনে দিন কাটান না।'

মথুরেশ অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'বেশ আছেন। ভাল কথা, কোন মোটর গাড়ী আসে নি! ক্রাইসলার কি প্লিমাথ? আট সিলিণ্ডারের নূতন ঝকঝকে গাড়ী?'

—কই দেখি নি ত।

—আরে আমি যে তাড়াতাড়ি আসছি ভবানীপুর থেকে। জাষ্টিস্ মিত্রের বাড়ী থেকে বেলা তিনটে দশের সময় গাড়ী পাঠাবার কথা। ওদের নিয়ে প্রথম বোটানিক্যাল গার্ডেন, তার পর দক্ষিণেশ্বর টুর দেবার কথা।

বলিতে বলিতে নীচের মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল।

মথুরেশ আমার হাতে টান দিয়া বলিল, 'একটু কষ্ট করে বারান্দায় ব'সে একবার দেখুন, নিউ মডেলের রেডিয়ো ফিট করা কি চমৎকার গাড়ী!'

অগত্যা বারান্দায় আসিলাম, এবং শ্রীমান্ মথুরেশ সেই গাড়ীতে না-চড়া পর্য্যন্ত হাঁ করিয়া চক্‌চকে নূতন মডেলের গাড়ীখানার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

একটি কথা শ্রীমান্ মথুরেশকে আজ পর্য্যন্ত বলি নাই। সেই ছাদের বিধ্বস্ত ফুলবাগানের কথা, পলস্তারা দিবার প্রতিশ্রুতি। ভাগ্যে দশটি বৎসর ব্যবধানে শ্রীমান্ অনেক কিছুই ভুলিয়া গিয়াছে!

এক দিন শ্রীমান্ মথুরেশ আমায় ছাদে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল, 'শুনেছেন মেসের ব্যাপার? রমেনবাবু ছিলেন সেসি, এক বছরের ভাড়া আমাদের কাছ থেকে আদায় করেছেন, অথচ বাড়ীওয়ালাকে এক পয়সা দেন নি। সে নালিশ করেছে।'

একটু থামিয়া বলিল, 'বোধ হয় এ-মেস আমাদের ছাড়তে হবে।'

আমিও একটু চিন্তিত হইয়া বলিলাম, 'তাই ত!'

শ্রীমান মথুরেশ বলিল, 'ক-দিন থেকেই ভাবছি, কি উপায় করা যায়? জায়গাটি আমার ভারি মনোমত, ছাড়তে মন চায় না। অথচ সেসি যে এমন ভাবে আমাদের মুখ পুড়োবেন!'

একটু থামিয়া সহসা আগ্রহভরা কণ্ঠে বলিল, 'আপনি পারবেন, আপনার নামে লীজ নিতে? মাস-মাস ভাড়া আদায়ের জন্য কোন ভাবনা নেই।'

বিব্রত হইয়া বলিলাম, 'আমার কথা বাদ দিন, ফ্যামিলি বাড়ী থেকে এলেই বাসা করতে হবে।'

মথুরেশের মুখ ঈষৎ ম্লান হইয়া পরক্ষণেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, 'তা'হলে এক উপায় আছে, আপনারা যদি আমায় ব্যাক্ করেন ত আমার নামেই লীজ নিতে পারি।'

সোৎসাহে বলিলাম, 'বেশ ত!'

মথুরেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'চলুন আজ বিদ্যাপতি দেখে আসা যাক।'

সহসা বলিয়া ফেলিলাম, 'এখনও আপনার সিনেমা দেখার ঝোঁক কমে নি?'

'ঝোঁক?' বলিয়া মথুরেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল। ক্ষণিক কি ভাবিয়া বলিল, 'এ-ঝোঁক

আমার চিরকালের। যখন স্কুলে পড়ি তখন এক বোর্ডিঙে থাকতুম। বাবা পাঠাতেন মাসে পঞ্চাশ টাকা, মা লুকিয়ে দিতেন ত্রিশ। তাতেও কুলুত না; দিন দুটো 'শো'ও কখনও কখনও দেখেছি।'

বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলাম, 'বলেন কি!'

মথুরেশ অন্তর খুলিয়া দিল, 'টাকা হাতে এলে কতক্ষণে টাকা খরচ করব এই হয় আমার চিন্তা। এই ত এখানে দেখছেন, সকালে বাদাম, পেস্তা, আর দুটি সন্দেশ খেয়ে বেরুই, বেলা দশটায় এসে দুটি ভাতে বসি মাত্র, তার পর তিনটে বাজতে না-বাজতে খিদে। হালুয়া, লুচি, পাঁপড় ভাজা, আইসক্রীম সন্দেশ, আমের সময় গোটাচারেক বড় বোম্বাই বা ল্যাংড়া আম; আর কমলা-লেবুর সময় এক এক দিন পনর-ষোলটা লেবুও খেয়ে থাকি। আবার রাত আটটায় সেই আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। একটু দুধ না হ'লে মনে হয় খাওয়াই হ'ল না। তা কলকাতায় আধ সেরের বেশী ত খেতে পাই না, পয়সা কোথায়, বলুন?'

সেই মথুরেশ, চোখে মুখে অকপট সারল্য, শিশু-সুলভ কৌতুকে হাত নাড়িয়া গল্প করিয়া চলিয়াছে। সামান্য কেরানীর সম্মুখে রাজভোগ খাওয়ার গল্প কেমন অনায়াসে করিয়া যাইতেছে, এতটুকু বড়মানুষিত্ব নাই! হাঁ করিয়া মথুরেশের গল্প শুনিতেছিলাম।

সে বলিল, 'বাড়ীতে মা বাবার কাছে এই হাত-দরাজের জন্য কতবার বকুনি খেয়েছি। তাঁরা বলেন, 'তুই এত দিন যদি জমাবার চেষ্টা করতিস ত কলকাতায় একখানা বাড়ী কিনতে পারতিস!'

এমন সময় ঠাকুর আসিয়া দরজার গোড়ায় দাঁড়াইল। মথুরেশ চকিতে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, 'কি চাই! ও খরচের টাকা? দেখ ঠাকুর, আমার কাছে ত খুচরো টাকা নেই, একখানা চেক দিচ্ছি ভাঙিয়ে আন।'

ঠাকুর ঈষৎ আপত্তি করিতেই মথুরেশ বলিল, 'আরে, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের কাছেই চেক ভাঙিয়ে বাজার ক'রে আনবে। ভয় নেই, তোমায় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের চেক দিয়ে বড়বাজার পাঠাব না।'

আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'তিনটে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউণ্ট খোলা আছে, একটাতে রাখার অনেক অসুবিধা কি না। এক দিন অমলবাবু এসে একখানা পঁচিশ টাকার চেক দিয়ে আমায় বললেন, 'এটা ক্যাশ করিয়ে দেবেন, মথুরেশদা?' বললুম, 'ভারি ত পঁচিশ টাকা, চারটে অঙ্কের চেকও ইচ্ছা করলে আমার কাছে ভাঙিয়ে নিতে পারেন।' বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে এক দিনের কথা মনে পড়িল। সেদিন ঝড়ের কথা হইতেছিল।

পূর্ব্ববঙ্গের এক জন অধিবাসী বলিল, 'এদিকে আর কি ঝড় হয়! ঝড় হয় আমাদের ঈষ্ট বেঙ্গলে। গ্রামকে গ্রাম উজাড়, একখানি ঘরেরও করোগেটের চালা থাকে না।'

মথুরেশ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, 'তারা করোগেট দিয়ে ঘর ছায় কেন? কোঠা তুললেই ত পারে।'

কে এক জন বলিল, 'তা বটে! আপনি রাজা নন কেন? রাজা হ'লেই ত পারেন!'

মথুরেশ আরক্ত মুখে জবাব দিল, 'রাজা হওয়াটা এমন কিছু শক্ত নয়, ইচ্ছা করলেই হওয়া যায়।'

সেই রাজা হওয়ার সাধনায় কি মথুরেশ মনোনিবেশ করিয়াছে?

পয়সার অভাবে কিশোর মথুরেশ সিনেমা দেখিতে পাইত না, অথচ তিনখানা ব্যাঙ্কের খাতায় আজ যুবক মথুরেশের হিসাবনিকাশ চলিতেছে!

এ-ঘরে ফিরিয়া আসিতেই আমি সহসা প্রশ্ন করিলাম, 'আচ্ছা মথুরেশ বাবু, আপনি ত অনেক ছাত্রকে মর‍্যাল টিচিং দেন, আজকালকার দিনে সে-শিক্ষা তাঁরা কি রকম ক'রে নেন?'

মথুরেশ হাসিয়া বলিল, 'আপনি নীতিশিক্ষা মানে যে-কথা বোঝেন, আজকালকার ছাত্রদের কাছে তা অচল।'

—অর্থাৎ নীতিশিক্ষার আবার প্রকারভেদ আছে নাকি?

—নেই? স্বামীর জন্য বনবাস রামায়ণের যুগে সম্ভব

হ'ত, এ-যুগে সে-ষ্ট্যাণ্ডার্ড অচল। মোট কথা, মর‍্যালিটির ষ্ট্যাণ্ডার্ড নেই।

ঈষৎ উষ্ণ হইয়া বলিলাম, 'অনর্গল মিথ্যা ব'লেও মর‍্যালিটি প্রিচ করা চলে, কি বলুন?'

মথুরেশের গৌর মুখে রক্তের উচ্ছ্বাস ফুটিয়া উঠিল, ঈষৎ বেগের সহিত সে বলিল, 'নিশ্চয়ই চলে। ধন, মান, প্রতিপত্তি যাঁরা অপর্য্যাপ্ত লাভ ক'রে এ-যুগের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ব'লে পরিচিত, তাঁদের জীবনী আলোচনা করলেই দেখতে পাবেন, মর‍্যালিটির ষ্ট্যাণ্ডার্ড নেই।

এই দেশেই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বা বুনো রামনাথ ছিলেন! কিন্তু সে আর এক যুগের কথা। নীতির মাপকাঠি হয়ত যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, সংস্কৃতির এ একটা প্রধান অঙ্গ!

প্রসঙ্গান্তরে আসিলাম। বলিলাম, 'আচ্ছা মথুরেশ বাবু, আপনার বাবা এখন কি করেন?'

—ব'সে ব'সে পেন্সন ভোগ করছেন। মোটা টাকা পান, আমাদের কারও তোয়াক্কা রাখেন না।

—দেশের বাড়ীতে ত আপনাদের অসুবিধা বিস্তর?

—কোন অসুবিধা নেই। কলকাতা থেকে মিনিট কুড়ি ট্রেনে যেতে হয়। আর দু-দিন পরে ক্যালকাটা কর্পোরেশনের কণ্ট্রোলে হয়ত ওখানকার মিউনি-সিপ্যালিটি যাবে। জল, আলো, পিচের রাস্তা সবই ত একে একে হয়েছে।

—বটে!

—একটা অসুবিধা কি জানেন, ট্যাক্স দিন দিন বেড়েই চলেছে। কোয়ার্টারে আট থেকে দাঁড়িয়েছে পনর। বাবাকে কত বার বললুম, তেতলা আর তুলবেন না, উনি পুজো-পাঠের জন্য নির্জ্জন ঘর চান ব'লে সে-কথা কানেই তুললেন না। একতলা দোতলায় চোদ্দখানা ঘর ছিল, তার মধ্যে একখানা বেছে নিলে কি চলত না?'

—আচ্ছা মথুরেশ বাবু, আপনাদের ওটা পাড়াগাঁ হ'লেও ধানের জমি নেই বোধ হয়?

—ক্ষেপেছেন আপনি! এক ছটাক জমির দাম এক-শ টাকা। বলব কি আর, ছাদে ছাদে পা দিয়ে অনায়াসে এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় যাওয়া যায়। ফুলগাছ বসাই তাও টবে, শাকের ক্ষেত করি ছাদের উপর মাটি বিছিয়ে!

বলিলাম, 'আমরা পাড়াগাঁর লোক, মানে সত্যিই পাড়াগাঁ, আমরা ভাবি যাঁদের ধেনো জমি নেই তাঁরা কি অসহায়! শহরে একটা কিছু বিপর্য্যয় ঘটলে তাঁদের হাতের অন্ন আর মুখে উঠবে না। যে-গৃহস্থের কিছুই নেই তাঁরও অন্তত পাঁচ বিঘে জমি আছে।'

মথুরেশ হাসিয়া বলিল, 'জমির হাঙ্গামা না থাকাই ভাল। রক্ষে করুন মশায়, কোথায় রাঢ়দেশে বাবা জমি কিনেছিলেন, দেড়-শ বিঘে। এক গাদা টাকা, থাকলে কলকাতায় একখানা প্রকাণ্ড বাড়ী হ'ত। নিজের পকেট থেকে এবারও খাজনা মিটিয়েছি, অথচ, একমুঠো ধানও ত আসে না সেখান থেকে। আমি বলি বেচে দিন—'

দেখিলাম শ্রীমান মথুরেশ কোন দিক দিয়াই ঘায়েল হইবার ছেলে নন। বউবাজারে বেড়াইয়া আসিয়া যিনি বালিগঞ্জ ও লেকের গল্পে শতমুখ হন, বীডন ষ্ট্রীটের বাস্ হইতে নামিয়া ঠাকুরবাড়ীর ঐশ্বর্য্য বর্ণনা আরম্ভ করেন, চার আনার সীটে বসিয়া সিনেমা দেখিয়া এক টাকা দামের একখানি টিকেট কুড়াইয়া আনিয়া মেসবাসীদের সামনে সেখানা ফেলিয়া দিয়া প্রচার করেন, বইটা মোটেই ভাল হয় নাই, অথচ একটা টাকা জলে গেল, তাহাকে আয়ত্তে আনা সত্যই কি এত সহজ! শ্রীমান্ পাকা আর্টিষ্ট, প্রচার-দক্ষতা না-থাকিলে এ-যুগে আর্টের সমাদর যে লাভ হয় না এ-কথা ভাল করিয়াই জানে।

এমনই করিয়া মেস-জীবন মন্দ কাটিতেছিল না। মথুরেশের উপার্জ্জন, তাহার ঐশ্বর্য্য, রাজভোগ ও বেশ-পারিপাট্যে, সত্য বলিতে কি আমার মনে ঈর্ষার উদ্রেক হইতেছিল। সত্যই কি জগতে নীতির আদর কমিয়া যাইতেছে?

মনে যখন ঐশ্বর্য্য অপ্রাপ্তির অস্বস্তি ভোগ করিতেছি, তেমনই সময়ে এক দিন অপরাহ্ণে এক বৃদ্ধ আসিয়া আমাকে মথুরেশের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাকে চৌকির উপর বসাইয়া বলিলাম, 'তিনি ত সাড়ে ন-টার

কম বাসায় আসেন না। আপনার কি দরকার বলুন, তাঁকে জানাব।'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'সে-কথা আমিই বলব তাকে। কলকাতার বাইরে থেকে আসছি, এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন? জল খাইয়া হাতপাখা লইয়া বৃদ্ধ বাতাস খাইতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট পরে শ্রান্তি দূর হইলে বলিলেন, 'রোজই কি সে সকাল থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত কাজ করে? কত টাকা রোজগার করে, জানেন?'

—কি ক'রে বলব। কি তাঁর কাজ, কি তিনি উপার্জ্জন করেন কিছুই জানি না।

—হুঁ, আমরা বাবা হয়ে জানতে পারি না, আর আপনি! আচ্ছা এত টাকা যে রোজগার করে অথচ—

বৃদ্ধ হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন। বুঝিলাম, কোন কথা চাপিয়া গেলেন।

একটু পরে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন 'কলকাতায় বাড়ী কিনবে একখানা, নয়?'

সাশ্চর্য্যে বলিলাম, 'কই শুনি নি ত!'

—হ্যাঁ কিনবে। বালিগঞ্জের দিকে—পুনরায় একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'ঐ বালিগঞ্জই ওকে খাবে। গরিবের ছেলের ঘোড়া রোগ হ'লে যা হয়।'

চুপ করিয়া রহিলাম।

বৃদ্ধ বলিলেন, 'আপনার কাছে লুকুবো না মশায়, শুনি উপায় করে দু-হাতে, অথচ বাড়ীতে এক মাস খরচ দেয় ত তিন মাস দেয় না। ছোট ভাইগুলিকে পড়ান ত তার কর্ত্তব্যের মধ্যে; বোনের বিয়ে দেওয়াও কি উচিত নয়! পয়সা-অভাবে দেশের বাড়ীতে অশথ-গাছ গজাচ্ছে, আর উনি কিনবেন—বালিগঞ্জে বাড়ী! হা রে কপাল!'

বৃদ্ধ আরও বহুক্ষণ ধরিয়া আক্ষেপ করিলেন, সে-সবের বিস্তৃত ব্যাখ্যান আর করিব না। মোট কথা, বৃদ্ধ জমিদারী সেরেস্তায় সামান্য মাহিনায় মুহুরিগিরি কাজ করিতেন; কয়েক বৎসর হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ছেলেমেয়ে অনেকগুলি; ইহাদের লেখাপড়া শিখানো ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য এ-যাবৎ সংসারে সাচ্ছল্য আনিতে পারেন নাই। তা সাচ্ছল্য না আসুক, শ্রীমান্ মথুরেশের উপর তিনি অনেকখানি ভরসা করিয়াছিলেন। অথচ শহরের আবহাওয়ায় মথুরেশের এমন অর্থসংগ্রহের নেশা যে চাপিবে, স্বপ্নেও তিনি ভাবিতে পারেন নাই!

দশটার সময় মথুরেশ বাসায় আসিল এবং আমার ঘরে বৃদ্ধকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সহসা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি একটু রুক্ষ স্বরেই বলিল, 'আপনি আবার কষ্ট ক'রে এত দূর এলেন কেন?'

বৃদ্ধ ঈষৎ থতমত খাইয়া বলিলেন, 'তুই অনেক দিন বাড়ী যাস নি, তাই দেখতে এলাম।'

মথুরেশের মুখে প্রসন্নতা ফিরিয়া আসিল। হেঁট হইয়া বৃদ্ধের পায়ের ধূলা লইয়া কোমল স্বরে বলিল, 'আমার ঘরে আসুন।'

পরদিন জন-ছয়েক আহারে বসিয়াছিলাম। মথুরেশ হাসিতে হাসিতে আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, 'কাল বাবার কথা শুনেছেন? আমার বকবার জন্য এত দূর ধাওয়া ক'রে এসেছিলেন। উনি কার কাছে শুনেছেন যে, আমি নাকি বালিগঞ্জে বাড়ী কিনছি, তাই ছুটে এসেছিলেন জানতে সত্যি কি না! ওঁর ধারণা দেশের বাড়ীর উপর তা হ'লে আমার টান থাকবে না, আমরা শহরবাসী হয়ে যাব!'

কালীকিঙ্কর বাবু বলিলেন, 'সে ত সত্যি কথাই, শহরের সুখের স্বাদ একবার পেলে কে আর সাধ ক'রে পাড়াগাঁয়ে যায় বলুন?'

মথুরেশ দীপ্ত মুখে বলিল, 'কি দুঃখে পাড়াগাঁয়ে যাবে? শহরে যখন জীবনের শ্রেষ্ঠ ক্ষণগুলি কাটে, তখন শহরের মত পরমাত্মীয় আমাদের কেউ নেই। মাত্র জন্মেছি ব'লে সেই ভূমিতে অন্ধের মত আসক্তি থাকা আমার ত পাপ ব'লেই মনে হয়। যার অর্থ আছে, প্রতিভা আছে, সম্মান আছে, শহরই তার যোগ্য বাসস্থান।'

সত্য বলিতে কি, অনায়াসে ভাতের গ্রাস মুখে তুলিলাম, একটুও বিস্মিত বা ক্রুদ্ধ হইলাম না। ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে অহরহ প্রাণপণ চেষ্টায় শ্রীমান্ মথুরেশ যাহা

তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, তথাকথিত প্রগতিপরায়ণ সমাজের এক জন 'নামী' লোক হইয়া যশের তণ্ডুল যে-কোন উপায়ে আহরণ করিয়া কৃতিত্ব-গৌরবে উৎফুল্ল হইতেছে, চির-বঞ্চিত ক্ষুধিত অন্তর যাহার রোলস-রয়েস-মিনার্ভার সুখাসনে বসিয়া থাকিবার জন্য ও অভিজাত-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে টানিয়া বিস্ফারিত হইবার জন্য লালায়িত হইয়া মরিতেছে। একটু ভাবিয়া দেখিলে তাহার মিথ্যা ভাষণের ও মিথ্যা আচরণের অন্তরালে চিরদুঃখী অন্তরখানিই কদর্য্য নগ্নতায় বার বার প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। সত্যকার দারিদ্র্য ও দুঃখ বহন করিবার মধ্যে যে চারিত্রিক শক্তি ও ঐশ্বর্য্য অন্য সকলকে শ্রদ্ধান্বিত করিয়া তুলে, সেই মহৎ সম্মানের স্বাদ শ্রীমান্ মথুরেশের চির অজ্ঞাতই রহিয়া গেল।

শ্রীমান্ মথুরেশের বিস্তৃত পরিচয় আর দিব না। আশা করি, স্কুল-কলেজ, অথবা কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে পাঠক তাহাকে বহুবারই দেখিয়াছেন, এবং দেখিবামাত্রই চিনিয়াছেন।

বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে কোম্পানীর প্রবেশ

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ

১০

বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষাদান বিষয়ে খ্রীষ্টীয় মিশনরীগণের চেষ্টার সুফল ; ১৮১৩ সালের চার্টার

খ্রীষ্টীয় মিশনরীগণের পূর্ব্বাপর এই ইচ্ছা ছিল যে ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা ও খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার এই উভয় কার্য্যের ব্যবস্থা হউক। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম প্রথম তাহাতে বাধা দিতেছিলেন। বাধা দিবার দুইটি কারণ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় আর একটি আপত্তিও মধ্যে মধ্যে উত্থিত হইতে লাগিল। তাহা এই যে, মিশনরীগণ ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানদিগের ভিতরে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে প্রজাকুলের মধ্যে অসন্তোষ উৎপন্ন হইয়া বিদ্রোহ ও বাণিজ্যের ক্ষতি, উভয়ই ঘটিতে পারে। ভারতবর্ষস্থ কর্ম্মচারিগণের এইরূপ নানা আপত্তি শুনিয়া ইংলণ্ডে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণও মিশনরীদিগের ভারতে আগমনের বিরোধী হইলেন। তৎসত্ত্বেও কেরী, মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড (Carey, Marshman, Ward) এই তিন জন ইংরেজ মিশনরী বঙ্গদেশে আগমন করিলেন। তাঁহারা ১৭৯৩ সালের ১১ই নভেম্বর জাহাজ হইতে অবতরণ করেন। কিন্তু ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকৃত স্থানে বসিলে পাছে কোম্পানী তাঁহাদিগকে বন্দী করেন ও জাহাজে করিয়া ইংলণ্ডে ফিরাইয়া পাঠান, এ-ভয় তাঁহাদের মনে ছিল। তখন কোন ইংরেজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইলে তাঁহার সম্বন্ধে এই ব্যবস্থাই হইত। ঐ তিন জন মিশনরী (তৎকালে ডেন্‌মার্ক রাজ্যের অধিকৃত) শ্রীরামপুর নগরে বসিলেন। কিন্তু সেখানে বসিয়াও যে তাঁহারা স্বেচ্ছামত সব কাজ করিতে পারিতেন তাহা নয়; তাহার কারণ এই যে, শ্রীরামপুর কয়েকবার ডেন্‌মার্ক ও ইংলণ্ড এই দুই রাজ্যের মধ্যে হস্তান্তরিত হয়। একবার ১৮০৭ সালে (যে সময়ে শ্রীরামপুর ইংলণ্ডের অধীন ছিল) কেরী প্রভৃতি এদেশের হিন্দু ও মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া ধর্ম্মবিষয়ক এক ক্ষুদ্র পত্রী মুদ্রিত করেন ও বিতরণ করেন। তাহাতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগকে ভয় দেখান যে তাঁহাদের প্রেস বাজেয়াপ্ত করিবেন। মিশনরীগণ

সে যাত্রা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিস্তার পান। পর বৎসর (১৮০৮ সালে) যখন কোম্পানীর ইংলণ্ডস্থ ডিরেক্টরগণের নিকটে মিশনরীদের প্রতি কোম্পানীর এই প্রকার ব্যবহারের সংবাদ গেল, তখন ডিরেক্টরগণ কর্ম্মচারীদিগের এই কঠোর ব্যবহারেরই সমর্থন করিলেন!

১৭৯৩ সালে যখন কোম্পানীকে কুড়ি বৎসরের জন্য নূতন চার্টার দেওয়া হয়, তখন চার্লস্ গ্রান্ট নামক কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর এবং প্রসিদ্ধ জনহিতৈষী উইলবারফোর্স পার্লেমেণ্টের সদস্য ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, কোম্পানীর এলাকার ভিতরে শিক্ষাবিস্তারের সাহায্য করাও কোম্পানীর কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হউক। কিন্তু এরূপ করিলে পাছে প্রকারান্তরে মিশনরীগণের কার্য্যের সাহায্য করা হয়, এই আশঙ্কায় পার্লেমেণ্ট তখন এ-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন না।

এই চার্টারের কুড়ি বৎসর যখন শেষ হইতে চলিল, তখন মিশনরীদিগের বন্ধুগণ ও কোম্পানী কর্ত্তৃক ভারতে শিক্ষা-বিস্তার কার্য্যের পক্ষীয়গণ পুনরায় পার্লেমেণ্টে আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। বহু তর্কবিতর্কের পর এইরূপ একটি নির্দ্ধারণ গৃহীত হইল যে, "ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবাসি-গণের সাংসারিক সমৃদ্ধি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, জ্ঞান ধর্ম্ম ও নীতি,—সর্ব্ববিষয়ের উন্নতির জন্য ইংলণ্ড দায়ী। যাঁহারা সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া ভারতবাসীদিগকে এই সকল বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য ভারতবর্ষে গমন করিতে ও বাস করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহাদিগকে আইন-সঙ্গত সমুদয় সুবিধা করিয়া দিতে হইবে।" স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে মিশনরীগণের বাধা দূর করা, অন্ততঃ পরোক্ষভাবে দূর করা, এই নির্দ্ধারণের একটি উদ্দেশ্য ছিল।

এই নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধবাদিগণ তখন এইরূপ একটি সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন:—"কিন্তু খ্রীষ্টীয় মিশনগুলির হস্তে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যের ভার দেওয়া হইবে না।" তত্ত্বকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় খ্রীষ্টীয় মিশনরীগণের কার্য্যের বিরুদ্ধে যাহা যাহা বলিতেন, তাহার অনেক কথা পার্লেমেণ্টের এই বিরুদ্ধবাদিগণ এ সময়ে বলিয়াছিলেন। স্যার টি. সটন্ (Sir T. Sutton) বলিয়াছিলেন, "মিশনরীগণকে শিক্ষাদানের অধিকার দিলে ভারতবাসীরা বলিবে,—তোমরা আমাদের দেশ কাড়িয়া লইয়াছ, রাজস্ব গ্রাস করিয়াছ; এখন তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আমাদিগকে আমাদের ধর্ম্ম হইতেও বঞ্চিত করিবার উদ্যোগ করিতেছ।" মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব ব্যারিষ্টার চার্লস্ মার্শ (Charles Marsh, তখন পার্লেমেণ্টের সভ্য) বলিয়াছিলেন, "ভারতে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য করা ইংলণ্ডের পক্ষে কোনও ক্রমেই কর্ত্তব্য নয় বা প্রয়োজন নয়। প্রথমতঃ, ইহা করিলে অশান্তি, রক্তপাত ও বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবাসিগণ নীতি ও ধর্ম্ম সম্পন্ন জাতি; জীবনধারণের জন্য যে শিল্পদক্ষতার প্রয়োজন, এবং মৃত্যুর সম্মুখীন হইবার জন্য যে ধর্ম্ম-জ্ঞানের প্রয়োজন, উভয়ই তাহাদের আছে।" যাহা হউক, বিরুদ্ধবাদীদিগের এই সংশোধন প্রস্তাব টিঁকিল না; পার্লেমেণ্টে মূল নির্দ্ধারণটিই গৃহীত হইল।

এই নির্দ্ধারণের ফলে ১৮১৩ সালের ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অ্যাক্টে (East India Company Act) নিম্নে মুদ্রিত ধারাটি যোজিত হইল। উক্ত অ্যাক্টের এই ধারাটিকে ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ভিত্তি-প্রস্তর বলা যাইতে পারে।

53 Georg iii 3, Cap. 155, Sec. 43. "And be it further enacted that it shall be lawful for the Governor-General in Council to direct that out of any surplus which may remain of the rents, revenues and profits arising from the said territorial acquisitions, after defraying the expenses of the military, civil and commercial establishments, paying the interest of the debt, in manner hereinafter provided, a sum of not less than one lac of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of India, and for the introduction and promotion of a knowledge of the sciences among the inhabitants of the British territories in India; and that any schools, public lectures, or other institutions for the purposes aforesaid, which shall be founded at the Presidencies of Fort William, Fort St. George, or Bombay, or in any other part of

the British territories in India in virtue of this Act, shall be governed by such regulations as may from time to time be made by the said Governor-General in Council; subject nevertheless to such powers as are herein vested in the said Board of Commissioners for the affairs of India, respecting Colleges and seminaries: Provided always that all appointments to offices in such schools, lectureships and other institutions shall be made by or under the authority of the Governments within which the same shall be situated."[৫১]

১৮১৩ সালের এই চার্টারে মিশনরীগণকে এই অধিকারও প্রদত্ত হইল যে কোম্পানীর আদেশের বিরুদ্ধে তাঁহারা বোর্ড অব্ ডিরেক্টর্‌সের নিকটে আপীল করিতে পারিবেন।[৫২]

১১

নূতন চার্টারের প্রথম ফল; কোম্পানী কর্ত্তৃক শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য দান; সাহায্যপ্রাপ্ত বহু সংখ্যক বেসরকারী ইংরেজী স্কুলের ও 'ইংরেজী পাঠশালা'র উদয়; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ক বাদানুবাদের সূত্রপাত (১৮১৩—১৮১৬); পরবর্ত্তী যুগে (১৮২৩) রামমোহন রায়ের প্রসিদ্ধ পত্র, ও ১৮৩৫ সালের মেকলের প্রসিদ্ধ সরকারী পত্র বা 'মিনিট'

দুই কারণে এই নবধারা যুক্ত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অ্যাক্ট পাস হইবার পরেও কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ হইতে পারিল না; কোম্পানী এদেশে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। প্রথম কারণ এই যে, কোম্পানী কয়েক বৎসর গুর্খা, পিণ্ডারী ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিলেন। এই সময়ে বার্ষিক ঐ এক লক্ষ টাকা হইতে কেবল বিশিষ্ট পণ্ডিত ও মৌলবীগণকে পুরস্কার দান ও বেসরকারী কয়েকটি স্কুলে সাহায্য দান হইতে লাগিল। ইহাতে এক লক্ষ টাকাও সম্পূর্ণ ব্যয়িত না হইয়া গভর্ণমেণ্টের হস্তে কিছু কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত।

কিন্তু এ সময়ে বঙ্গদেশে ইংরেজী শিখিবার আগ্রহ এত প্রবল হইয়াছে যে, গভর্ণমেণ্ট স্বহস্তে শিক্ষাবিস্তারের ভার গ্রহণ না করিলেও, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সাহায্য দানের ফলেই দেশময় অতি দ্রুত অনেক 'ইংরেজী পাঠশালা' স্থাপিত হইয়া গেল। তাহার কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

১৮১৪ ও ১৮১৫ সালে রেভারেণ্ড রবার্ট মে (Robert May) নামক 'লণ্ডন মিশনরী সোসাইটি' ভুক্ত এক জন সদাশয় মিশনরী সাহেব চুঁচুড়ার আশে-পাশে ১৬টি স্কুল স্থাপন করেন; পরে ঐ স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ৩৬টি হয়। এই স্কুলগুলির মোট ছাত্রসংখ্যা প্রায় এক সহস্র ছিল।

মে সাহেব দরিদ্র হইয়াও এতগুলি স্কুল কিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন? ইহার মধ্যে একটু কৌতূহলজনক বৃত্তান্ত আছে। ইংরেজেরা সহজে বুঝিতে পারেন না যে এ দেশে শিক্ষাদান কত স্বল্প অর্থ ব্যয়ে সম্ভব হয়। মাদ্রাজের ইউরোপীয় সামরিক অনাথাশ্রমের (Military Orphan Asylum) অধ্যক্ষ ডাঃ বেল (Dr. Bell) অর্থাভাবে নিজ অনাথাশ্রমের বালকদের শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা করিতে পারিতেছিলেন না। যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ কিংবা যন্ত্রপাতি ক্রয়, কিছুরই টাকা জুটিতেছিল না। তিনি যখন এ জন্য বড়ই চিন্তিত, এমন সময়ে এক দিন দেখিতে পাইলেন, মালাবার অঞ্চলের একটি দেশীয় ছাত্র ঘরের মেজেতে এক স্তর বালুকা ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর আঙুল চালাইয়া লিখিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি নিজ অনাথাশ্রমের স্কুলে এই প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী এই প্রণালীতে শিক্ষা দান করাকে হীনতা বলিয়া বোধ করিলেন ও এ-প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তখন ডাক্তার বেল্ এ-দেশীয় পাঠশালার আর একটি প্রণালীর শরণাপন্ন হইলেন। তাহা এই যে, উচ্চ শ্রেণীর পড়ুয়াগণই নিম্নশ্রেণীর বালকদিগকে পড়াইবে। ১৭৯১ সালে তিনি নিজ স্কুলে এই দ্বিবিধ দেশীয় প্রণালী অবলম্বন করেন। তাহাতে তাঁহার অনাথাশ্রমের স্কুলটি বেশ চলিতে লাগিল।

১৮১৪ সালে বঙ্গদেশে মে সাহেবও ডাক্তার বেল্ সাহেবের অবলম্বিত প্রণালী অনুসরণ করিয়া এত সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। চুঁচুড়ার কমিশনর ফর্বস্ (Forbes) সাহেব তাঁহার কৃতকার্য্যতা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে মাসিক ৬০০৲ সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইংরেজী শিখাইবার জন্যও যে দেশীয় পাঠশালার প্রণালী চলিতে পারে, ইহা মে সাহেবই বঙ্গদেশে প্রথম দেখাইলেন।

ক্রমে মে সাহেবের দেখাদেখি সম্ভ্রান্ত দেশীয় ভদ্রলোকেরাও এই প্রণালী অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর তাঁহার পাঠশালাটিকে ইংরেজী পাঠশালায় পরিণত করিলেন। ক্রমে অন্যান্য জমিদারগণও নিজ নিজ পাঠশালাকে ঐ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন।

পাঠশালার প্রণালীর সহিত ইংরেজী শিক্ষা মিশ্রিত করিয়া 'ইংরেজী পাঠশালা' যতই স্থাপিত হইতে লাগিল, রাজনারায়ণ বসু ও টমাস্ এডোয়ার্ড্স্ বর্ণিত উভয় শ্রেণীর স্কুলের সংখ্যা ততই হ্রাস হইতে লাগিল। গত মাসের প্রবাসীতে অষ্টম ও নবম প্রস্তাবে আমরা দেখাইয়াছি যে ঐ স্কুলগুলিতে বেশ ছাত্রবেতন লওয়া হইত; এই বেতন কোনও স্কুলে মাসিক তিন টাকা, কোনও স্কুলে পাঁচ টাকা, কোনও স্কুলে আরও অধিক ছিল। ধনীরা ভিন্ন কেহ এত অধিক বেতন দিয়া উঠিতে পারিত না। যখন পাঠশালার ভাবে ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, তখন স্কুলগুলিকে প্রায়ই 'পাঠশালা' বলা হইত। ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজের স্কুল ডিপার্টমেন্টের নামও প্রথমে 'পাঠশালা' ছিল; ঐ কলেজের বিষয় আলোচনা করিবার সময় আমরা এই নাম দেখিতে পাইব।

এই ভাবের 'ইংরেজী পাঠশালা'গুলিতে প্রথম প্রথম বেঞ্চিতে বসা লইয়া বিশেষ গোল বাধিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে দেশীয় প্রণালীতে পরিচালিত পাঠশালাগুলিতে বেঞ্চি থাকিত না; উচ্চ বর্ণের ও নিম্ন বর্ণের ছাত্রেরা ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে মাটিতে বসিতে পারিত। কিন্তু প্রথম প্রথম উচ্চ বর্ণের বালকেরা নিম্ন জাতীয় বালকদের সহিত (এমন কি, সদ্গোপ, কৈবর্ত্ত আদি জাতির সহিতও) এক বেঞ্চিতে বসিতে চাহিত না। কালক্রমে এখন হিন্দুসমাজের জটিল জাতিসমস্যার অন্তর্গত অনেকগুলি জাতি সম্বন্ধে এই বাধা দূর হইয়াছে বটে; কিন্তু বেঞ্চিতে বসার প্রথার ফলে অতি নিম্ন (অর্থাৎ তথা-কথিত অস্পৃশ্য) জাতির ছাত্রগণের শিক্ষালাভের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইয়াছে। পূর্ব্বে তাহারা পাঠশালাতে স্পর্শ বাঁচাইয়া দূরে বসিয়া গুরুমহাশয়ের নিকটে কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারিত। বেঞ্চির প্রথার ফলে তাহারা স্কুলে ঢুকিতেই সাহস পায় না।[৫৩]

মে সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রণালী অনুসরণে খুলনা, শ্যামনগর ও পাটনায় আরও কতকগুলি স্কুল স্থাপিত হয়। শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ মিশনরীগণ কলিকাতার আশে পাশে কুড়িটি স্কুল স্থাপন করেন। চর্চ্চ মিশনরী সোসাইটি (Church Missionary Society) বর্দ্ধমানের আশে পাশে দশটি বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন; তাহার মোট ছাত্রসংখ্যা এক হাজার পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ডেভিড্ হেয়ার সাহেব কলিকাতায় আরপুলিতে দুইটি স্কুল স্থাপন করেন, একটি ইংরেজী ও একটি বাঙ্গলা; পঞ্চদশ প্রস্তাবে তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে। তন্মধ্যে বাঙ্গলাটি সকালে বিকালে বসিত, ইংরেজীটি দুপুরে বসিত। ডেভিড্ হেয়ার ভাবিয়াছিলেন, যদি কোন ছাত্র বাংলা ও ইংরেজী দুইই পড়িতে চায়, তাহাকে তদ্রূপ সুবিধা করিয়া দেওয়া যাক্। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল, সকলেই ইংরেজী পড়িতে চায়। মিশনরীগণের স্কুলগুলির অভিজ্ঞতাও ঐরূপ,—সকলেই ইংরেজী পড়িতে চায়।—এই প্যারায় বর্ণিত সমুদয় স্কুলই গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভ করিত।[৫৪] এদেশে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে ডেভিড্ হেয়ার আরও অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন; তাহা পরে বিবৃত হইবে।

দ্বিতীয় যে কারণে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ১৮১৩ সালের নবধারা বিশেষ ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই, তাহা এই যে, ঐ ধারাটিতে শিক্ষাদান সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা ছিল না। গবর্ণমেণ্ট নিজেই শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন, না, কেবল সাহায্য

দানের দ্বারা শিক্ষাবৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন? যদি গভর্ণমেণ্টকে নিজের উদ্যোগে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়, তবে কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন? ইংরেজী শিক্ষা দান করিবেন, না, প্রচলিত সংস্কৃত ও আরবী ফারসী শিক্ষা দান করিবেন? এই প্রশ্নের মীমাংসা হইতে বহু বিলম্ব হইতে লাগিল।

ইহার পূর্ব্বেই (১৮১১ সালের ৬ই মার্চ্চ) গভর্ণর-জেনারেল লর্ড মিণ্টো, কোম্পানীর আমলে বঙ্গদেশে শিক্ষার যে অবনতি ঘটিয়াছে (আষাঢ়ের প্রবাসীতে পঞ্চম প্রস্তাব দ্রষ্টব্য), সে বিষয়ে একটি সরকারী পত্র বা মিনিট (minute) লিখিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে কাশীর সংস্কৃত কলেজের ও কলিকাতার মাদ্রাসার অতিরিক্ত নবদ্বীপে ও ত্রিহুতে আরও দুইটি সংস্কৃত কলেজ এবং ভাগলপুরে ও জৌনপুরে দুইটি মাদ্রাসা স্থাপিত হউক। বঙ্গদেশের লোকেরা তখন ইংরেজী শিক্ষার মূল্য অনুভব করিতেছিল; তৎসত্ত্বেও ইংলণ্ডস্থ কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ লর্ড মিণ্টোর এই প্রস্তাবই সমর্থন করিলেন। তাঁহারা এ প্রস্তাব সমর্থনের এই কারণ প্রদর্শন করিলেন যে, ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতিতে যেমন প্রাচীন (অর্থাৎ সংস্কৃত ও আরবী) সাহিত্যের প্রাধান্য রহিয়াছে, তৎকালে প্রচলিত ইংলণ্ডীয় শিক্ষাপদ্ধতিতেও তেমনই প্রাচীন (অর্থাৎ গ্রীক ও লাটিন) সাহিত্যের প্রাধান্য বর্ত্তমান; অতএব ভারতবর্ষে আবার নূতন করিয়া একটি বিজাতীয় প্রাচীন সাহিত্য পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া কি হইবে?

কোর্ট অব ডিরেক্টরসের এই আপত্তি নিশ্চয়ই যুক্তি-সঙ্গত। কিন্তু তাঁহারা তখনও ইহা অনুমান করিতে পারেন নাই যে, রামমোহন রায় প্রমুখ উন্নতিশীল ভারতবাসিগণ কেবল তৎকালীন গ্রীক ও লাটিনের প্রাধান্যযুক্ত ইংরেজী সাহিত্য মাত্র ভারতে প্রবর্ত্তিত করিতে আকাঙ্ক্ষিত হইবেন না; ভারতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং নব্য গবেষণা-প্রণালী-সম্মত ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত করিতেই তাঁহারা অধিক আকাঙ্ক্ষিত হইবেন।

যাহা হউক, লর্ড মিণ্টোর ঐ মিনিটের কুফল নানা ভাবে ফলিতে লাগিল। প্রথম ফল এই হইল যে, উক্ত ১৮১৩ সালের চার্টারের পর কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ (১৮১৪ সালের ৩রা জুন তারিখে) গভর্ণর-জেনারেলকে যে আদেশপত্র (despatch) প্রেরণ করিলেন, তাহাতে তাঁহারা কোম্পানীকে ভারতীয় প্রাচীন দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষ ও গণিতের জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অর্থব্যয় করিতে পরামর্শ দিলেন।

এ দেশে ভারতীয় কি ইউরোপীয়, কোন্ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হইবে, এ-প্রশ্নের চরম মীমাংসা হইতে অনেক কালবিলম্ব হয়; বর্ত্তমানে প্রস্তাবের নির্দ্দিষ্ট কালের বহু পরে সে প্রশ্নের শেষ মীমাংসা হয়। তথাপি এখানেই এক বার সংক্ষেপে সেই পরবর্ত্তী ইতিহাসের উল্লেখ করা ভাল মনে হইতেছে।

১৮২৩ সালে অস্থায়ী (acting) গভর্ণর-জেনারেল এডাম (Adam) সাহেব একটি 'সাধারণ শিক্ষাসমিতি' (General Committee of Public Instruction) প্রতিষ্ঠিত করেন; তাহাকেই গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান শিক্ষা-বিভাগের (Education Department) জননী বলা যাইতে পারে। এই কমিটিতে দশ জন সভ্য ছিলেন,[৫৫] সকলেই ইংরেজ। প্রথম হইতেই তাঁহাদের মধ্যে ঐ পদ্ধতি বিষয়ে ঘোরতর মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল।

লর্ড মিণ্টোর পূর্ব্বোক্ত সরকারী পত্র বা মিনিটের দ্বিতীয় ও গুরুতর কুফল আমরা এই বার দেখিতে পাইব। এ সময়ে গভর্ণমেণ্ট ভাবিলেন, "কাশীর সংস্কৃত কলেজ দূরে অবস্থিত বলিয়া আমাদের পক্ষে তাহার তত্ত্বাবধান করা কঠিন হইতেছে; অতএব নবদ্বীপে ও ত্রিহুতে নয়, কলিকাতাতেই আর একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করা যাক্।" এই ভাবিয়া নব-প্রতিষ্ঠিত সাধারণ শিক্ষাসমিতির (General Committee of Public Instruction) হস্তে গভর্ণমেণ্ট এই কলেজ স্থাপনের ভার দিলেন; "এবং ১৮১৩ সাল হইতে যে বার্ষিক এক লক্ষ করিয়া টাকা জমিতেছিল, তাহা তাঁহাদের হস্তে অর্পিত হইল। তাঁহারা মহোৎসাহে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন, ছাত্রদিগকে বৃত্তিদান ও প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থ সকল মুদ্রাঙ্কণ-কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। এই সকল কার্য্যের জন্য কিরূপ ব্যয় হইতে লাগিল; তাহার নিদর্শনস্বরূপ এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আরবী 'আবিসেন্না' নামক গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত

করিতে প্রায় ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল; এবং ছাত্রদিগের পাঠার্থ পারসী ভাষাতে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ করা হইয়াছিল, হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠাতে প্রায় ১৬৲ টাকা করিয়া ব্যয় পড়িয়াছিল। সেই অনুবাদিত গ্রন্থসকল আবার ছাত্রেরা বুঝিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহাদের ব্যাখ্যা করিবার জন্য স্বয়ং অনুবাদককে মাসিক ৩০০৲ তিন শত টাকা বেতন দিয়া রাখিতে হইয়াছিল। অপর দিকে মুদ্রিত ও অনুবাদিত গ্রন্থসকল ক্রেতার অভাবে স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া রহিতে লাগিল। বহুকাল পরে কীটের মুখ হইতে যাহা বাঁচিল, তাহা কাগজের দরে বিক্রয় করিতে হইল। এই সকল কারণে অল্প কাল মধ্যেই কমিটির সভ্যদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল, তাঁহারা দুই দল হইয়া পড়িলেন।"[৫৬]

ইতিমধ্যে রামমোহন রায় জানিতে পারিলেন যে লর্ড মিণ্টোর ১৮১১ সালের প্রস্তাবের সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া নবদ্বীপ ও ত্রিহুতে নয়, কিন্তু কলিকাতাতেই একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব চলিতেছে। এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্ট নূতন চার্টার অনুসারে যে অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য, তাহার এরূপ ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া, এবং ইউরোপীয় প্রণালীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সমর্থন করিয়া রামমোহন রায় স্থায়ী গবর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টকে ১১ই ডিসেম্বর ১৮২৩ তারিখে এক পত্র[৫৭], লিখেন। সে পত্র এখন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা এখানে আর তাহা মুদ্রিত করিতেছি না। কিন্তু লর্ড আমহার্ষ্ট উহা সাধারণ শিক্ষা-সমিতির (General Committee of Public Instruction) কাছে প্রেরণ করিলেন; এবং ঐ সমিতির প্রেসিডেণ্ট জষ্টিস্ হ্যারিংটন "উহা এক জন মাত্র লোকের ব্যক্তিগত মত, এবং সেই ব্যক্তিটিও জনসাধারণের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী," এই কারণ প্রদর্শন করিয়া পত্রখানিতে মনোযোগ প্রদান করিলেন না।

ইংলণ্ডস্থ কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ তখন ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তেই শিক্ষাপদ্ধতি-বিষয়ক প্রশ্নের চরম মীমাংসার ভার দিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে তাঁহাদের নিজের মত ছিল পাশ্চাত্য পদ্ধতি অবলম্বন। এমন কি, তাঁহাদের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮২৪ তারিখের একটি আদেশপত্রে (despatch) নিম্নোক্ত কথাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। এই আদেশপত্রটি (despatch) জেম্‌স্ মিলের (James Mill) রচিত। রামমোহন রায়ের ১১ই ডিসেম্বর ১৮২৩ তারিখের পত্রের সহিত ইহার সাদৃশ্য আশ্চর্য্য।

"With respect to sciences, it was worse than a waste of time to employ persons to teach or learn them in the state in which they were found in the oriental books. Our great end should be not to teach Hindu learning, but sound learning."[৫৮]

কিন্তু এই আদেশপত্রের কোন ফল হইল না। চরম মীমাংসার ভার তখন যাঁহাদের হস্তে অর্পিত, সেই জেনারেল কমিটি অব্ পব্লিক ইন্‌ষ্ট্রক্‌শনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শিক্ষাদানপ্রণালীর পক্ষীয় লোকদের ঠিক সমান সমান ভোট হওয়াতে, বারো বৎসর পর্য্যন্ত কেবল বাদানুবাদই চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ১৮২৪ সালে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

অবশেষে ১৮৩৪ সালে মেকলে (Macaulay) কলিকাতার সুপ্রীম কাউন্সিলের আইন সদস্য (Legal Member) হইয়া আসিলেন। তৎকালীন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মেকলেকেই উক্ত কমিটির প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিলেন। মেকলে উভয় পক্ষের সমুদয় যুক্তিতর্কের আলোচনা করিয়া ১৮৩৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহার প্রসিদ্ধ সুদীর্ঘ সরকারী পত্রে ('মিনিটে') পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালীর পক্ষেই মত প্রদান করিলেন।

এইরূপে রামমোহন রায়ের চেষ্টা দীর্ঘকাল ব্যবধানের পর জয়যুক্ত হইল। এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনে যে রামমোহন রায়ের হাত কতখানি ছিল, তাহার বিস্তৃত আলোচনা আমরা করিব না। অনেক গ্রন্থে তাহা আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা এখন শুধু রামমোহন রায়ের এ-দেশীয় ভক্তগণই স্বীকার করেন না, বিদেশীয় রাজপুরুষগণও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন।[৫৯]

ইহার পর জেলায় জেলায় ইংরেজী পড়াইবার জন্য 'জেলা

স্কুল' (Zillah School) সকল স্থাপিত হইতে লাগিল। কিন্তু যাহাতে কেবল ইংরেজী শিক্ষারই উন্নতি না হয়, দেশীয় ভাষায় প্রদত্ত প্রাথমিক শিক্ষারও প্রসার হয়, এই উদ্দেশ্যে ১৮৩৫ সালে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক রামমোহন রায়ের সহযোগী রেভারেণ্ড উইলিয়ম এডাম (William Adam) সাহেবকে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত করেন। (এই এডাম সাহেবই রামমোহন রায়ের সংস্পর্শে আসিয়া ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া য়ুনিটেরিয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঠক যেন অস্থায়ী গভর্ণর-জেনারেল এডাম সাহেবের সঙ্গে ইঁহাকে মিলাইয়া না ফেলেন।) রেভারেণ্ড এডাম তিন বৎসর বিপুল পরিশ্রম করিয়া এক অতি মূল্যবান রিপোর্ট লিখিয়া দেন। কিন্তু তাহা ইংরেজী শিক্ষা-সংক্রান্ত নহে বলিয়া আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত নয়।

মেকলের প্রসিদ্ধ 'মিনিট' অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইবার বহু দিন পরেও ঐ মতভেদ ও আন্দোলন নিরস্ত হয় নাই। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের পরবর্ত্তী গভর্ণর-জেনারেল লর্ড অক্ল্যাণ্ড, (যিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমসাময়িক ও বন্ধু ছিলেন, যাঁহার ভগিনীকে দ্বারকানাথ স্বীয় বেলগাছিয়া ভিলায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন) এ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ শান্তিস্থাপনের অভিপ্রায়ে রেভারেণ্ড এডামের রিপোর্ট পাঠ করিয়া দিল্লী হইতে ২৪শে নভেম্বর ১৮৩৯ তারিখের একটি পত্রে এই আদেশ প্রচার করিলেন যে, যত দিন দেশীয় ভাষায় উত্তম পাঠ্যপুস্তক সকল লিখিত না হয় তত দিন উচ্চ বিদ্যালয়-গুলিতে ইংরেজী ভাষা ও দেশীয় ভাষা উভয়ের সাহায্যে শিক্ষাদান করিতে হইবে, এবং বিশেষ বিশেষ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর জন্য আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকিবে। কলিকাতায় (বিশেষতঃ মিশনরী আলেগজাণ্ডার ডফের পক্ষ হইতে) এ-আদেশের প্রতিকূল সমালোচনা হইতে লাগিল।

অবশেষে ১৮৫৪ সালের একটি শিক্ষাবিষয়ক সরকারী আদেশপত্রে (Education Despatch) এ বিষয়ের চরম মীমাংসা প্রচার করা হইল। তাহা এই যে, গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাদান কার্য্যের উদ্দেশ্য থাকিবে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তার; কিন্তু প্রণালী হইবে দ্বিবিধ:— উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষার সাহায্যে এবং গ্রামে দেশীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দান হইবে।

এইরূপে বহু কাল পরে এই বাদানুবাদ নিরস্ত হইল। যাহা হউক, বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় কালের মধ্যে এই মতপার্থক্য যে কেবল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতবর্ষস্থ কর্ম্মচারিগণের ভিতরেই আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। মিশনরীগণকে কোম্পানীর অধিকৃত স্থানে বসিতে দেওয়া হইবে কি না, এই প্রশ্ন লইয়া পার্লেমেণ্টে যখন হইতে বাদানুবাদ চলিতেছিল, তখন হইতেই আনুষঙ্গিক এই বাদানুবাদও চলিতেছিল যে কোম্পানী কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে কি না। বস্তুতঃ, ইংলণ্ডের একই দলভুক্ত কতকগুলি লোক এই সময়ে ভারতে মিশনরীগণের আগমন, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার, ও ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার, এই ত্রিবিধ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতেছিলেন।

মন্তব্য

(৫১) B. D. Basu, p. 6. Also, *History of Elementary Education in India* by J. M. Sen, M. Ed., B. Sc., F. R. G. S. The Book Company Ltd., College Square, Calcutta, 1933. Pp. 50-59. এই শেষোক্ত পুস্তক হইতে এই পরিচ্ছেদের অনেক কথা সঙ্কলিত হইয়াছে; ভবিষ্যতে এই পুস্তক 'J. M. Sen' এই ভাবে উল্লিখিত হইবে। কিন্তু এই পুস্তকে ১৮১৩ সালের চার্টারের ধারাটি উদ্ধৃত করিতে গিয়া কতকগুলি শব্দ বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

(৫২) *The Education of India, a Study of British Educational Policy in India, 1835–1900, and of its bearing on National Life and Problems in India to-day.* By Arthur Mayhew, C. I. E., late Director of Public Instruction, C. P.—Faber and Gwyer, London, MCMXXVI. P. 290. অতঃপর এই পুস্তককে কেবল 'Mayhew' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইবে।

(৫৩) ১৯০৩ সালে বর্ত্তমান লেখক যখন বেহার প্রদেশে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার ছিলেন, তখন তিনি একটি মেথরের ছেলেকে নিজ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু উচ্চ বর্ণের ছেলেদের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসা লইয়া এমন গোল বাধিল যে, হেড মাষ্টারের বিশেষ আশ্বাস, আগ্রহ ও সহায়তা সত্ত্বেও ছেলেটি কয়েক মাস পরে ভয়ে স্কুল পরিত্যাগ করিয়া গেল।

(৫৪) J. M. Sen, pp. 66, 67. Also *David Hare* by Peary Chand Mitra,—Appendix, pp. x, xi ; শেষোক্ত পুস্তককে অতঃপর 'David Hare' এই ভাবে উল্লেখ করা যাইবে।

(৫৫) General Committee of Public Instruction-এর সভ্যগণের নাম :—Hon'ble H. Shakespeare (*President*), James Prinsep, Thoby Prinsep, W. H. Macnaughten, Mr. Sutherland (*Secretary*) ; এই পাঁচ জন ছিলেন Orientalist. Messrs. Bird, Saunders, Bushby, Charles (পরে Sir Charles) Trevelyan, এবং J. R. Colvin ; এই পাঁচ জন Anglicist. ইহাদের মধ্যে শেষ জনকে বাঙ্গালীরা এক সময়ে প্রাতঃস্মরণীয় মনে করিতেন। তৎকালে একটি শ্লোক রচিত হইয়াছিল,—

হেয়ার্ কল্‌বিন্ পামরশ্চ কেরী মার্শমেন স্তথা।
পঞ্চ গোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্।

(৫৬) রামতনু, ৮৪ পৃঃ। Rev. Lal Bihari Day's *Recollections of Alexander Duff*, pp. 54, 55 দ্রষ্টব্য।

(৫৭) *David Hare* পুস্তকের 4—12 পৃষ্ঠায় সমগ্র পত্রখানি মুদ্রিত আছে। F. M. I., Part II, 23, 45 পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(৫৮) *David Hare*, p. 36.

(৫৯) "How completely, however, was Rammohun vindicated in his advocacy of Western education along modern lines will be borne out by the very deserved tribute that was paid to him in the Report of the Education Commission appointed by Lord Ripon in 1882, which said—'It took twelve years of controversy, the advocacy of Macaulay, and the decisive action of a new Governor-General, before the Committee could, as a body, acquiesce in the policy urged by him' [Rammohun.]"—Mr. Amal Home in F. M. I., Part II., pp. 45, 46.

"Let it be remembered here that he [Macaulay] was not the prime mover.…Far more important than that 'master of superlatives' was Rammohun Roy."—*Mayhew*, pp. 12, 13.

মেঘদূত

শ্রীকাল্পনী মুখোপাধ্যায়

শত সহস্র বিরহিণী জাগে—কান্না তাদের বাতাসে মিশে,
চোখের উপর উজ্জয়িনীর জনপদবধূ চাহিয়া থাকে,
বুকে ভেসে যায় বলাকার হার—
শৃঙ্খল যেন ভরা সে বিষে—
আমি মেঘ—আমি আষাঢ়ের মেঘ,
বিরহী যক্ষ পাঠাল যাকে !

কত যুগান্ত পার হয়ে গেল, এখনো কাঁদিছে যক্ষবালা,
আমি মেঘ—আমি উড়িয়া চলেছি কত জনপদ নিয়ে রাখি
দু-চোখে দেখিয়া চলিতেছি আমি ধরার বধূর বিরহজ্বালা,
আমার পানে যে তুলে ধরে তা'রা
অশ্রু-ভিজানো যুগল আঁখি।

উজ্জয়িনীর প্রাসাদ টুটেছে, উঠেছে নূতন উজ্জয়িনী,
তাহারও প্রাসাদ-শিখরে তেমনি ধূপের ধোঁয়ার গন্ধ জাগে,
বিশীর্ণা রেবা এখনো তেমনি উপলে উপলে কল্লোলিনী,
বিলাসিনী নারী এখনো তেমনি বিলাসী নরের সঙ্গ মাগে।
আমি মেঘ—আমি উড়িয়া চলেছি নবমালতীর গন্ধ মাখি
সন্দেশ লয়ে এক যক্ষের বিরহিণী তার প্রিয়ার কাছে—
বিশ্বের যত বিরহিণীদের সজল করিয়া তুলেছি আঁখি,
আমি আষাঢ়ের সেই নব মেঘ—
আমায় চিনিতে বাকি কি আছে ?

এক যক্ষের বার্ত্তা লইয়া চলিয়াছি আমি সুদূর দেশে,
শত সহস্র মানব-বধূ যে এই ধরণীর ধূলায় কাঁদে
তাদের দীর্ঘ-নিশ্বাস মোর গমনপথের বাতাসে মেশে,
তাদের আকুল আকুতি যে মোরে
কঠিন মায়ার শিকলে বাঁধে !

অলকায় যাওয়া হ'ল না বন্ধু, জনপদবধূ-চোখের জলে,
আমি যক্ষের সেই মেঘদূত, ব্যথায় পড়িনু হেথায় গলে।

ভাতে না ভর্তা?

শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাতে না ভর্তা? ভর্তা যখন বলেছেন যে ভর্তা, তখন ভর্তা না হয়ে কিছুতেই ভাতে হ'তে পারে না।

সাঁওতাল ছোক্‌রা তীরন। তীরের মতনই তীক্ষ্ণ, ঋজু। শালের কোঁড়ার মতন তার দেহের শ্যামল কোমল লাবণ্য, আর মহুয়া-ফুলের মাদকতার মতন তার চোখের চাহনি।

কাজ হ'তে বাড়ীতে এসে তীরন তার স্ত্রী ফুলেলাকে বল্‌লে—শুন্‌ছিস, বড় ভুখ লেগেছে, ভর্তা বানিয়ে দে, ভাত খাব।

ফুলেলা পুষ্পস্তবকাবনম্রা লতার মতন সমস্ত শরীর দুলিয়ে রান্না-চালায় চ'লে গেল স্বল্প উপকরণের ভাত বাড়্‌তে।

ফুলেলা এনে তীরনের সাম্‌নে ভাতের থালা রাখ্‌লে। ভাতের থালার উপরে চোখ ফেলেই তীরন তীক্ষ্ণ স্বরে ব'লে উঠ্‌ল—ইটা কী বটে, হেঁ?

ফুলেলা বল্‌লে—কেনে, চিন্‌তে লারিছিস নাকি। ওটা বেগুন-ভাতে।

তীরন উগ্রভাবে বল্‌লে—তোকে না আমি বলেছিলাম ভর্তা বানাতে, কেমন ক'রে বানাতে হয় তাও তো তোকে শিখিয়ে দিয়েছি, তবে?

ফুলেলা বল্‌লে—তবে আবার কী? আজ ঐ খা না।

তীরন ভাতের থালা টেনে ফেলে দিতে উদ্যত হলো। তখন ফুলেলা বাধা দিয়ে বল্‌লে—লে লে হয়েছে, আর রাগ দেখাতে হবেক নাই। ভর্তা বানিয়ে দিচ্ছি।

এক মিনিটের মধ্যে বেগুন-ভাতে প্রচুর তৈলসিক্ত ও লঙ্কারঞ্জিত হয়ে এসে তীরনের থালায় উপস্থিত হলো। তীরনের চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল।

শুক্লা চতুর্দশী। ফুলেলার যৌবন-শ্রীর মতনই আকাশ-পাত্রে জ্যোৎস্নার লাবণ্য আর ধর্‌ছিল না, উপ্‌ছে পড়্‌ছে। একখানা চাটাই পেতে তীরন আর ফুলেলা অনেক রাত্রি পর্যন্ত বাঁশি বাজালে আর গান কর্‌লে। তাদের প্রাণের আনন্দ আর প্রেম আজ সীমা ছাড়িয়ে বয়ে চলেছে অনন্তেরই পানে। একটা চোখ-গেল পাখী সারা রাত ডেকে ডেকে সারা হ'তে লাগ্‌ল।

পরের দিন কাজে যাওয়ার সময় তীরন ফুলেলাকে বল্‌লে—দেখ্‌, আজও ভর্তা ক'রে রাখ্‌বি।

ফুলেলা ভর্তা বানিয়ে স্বামীর জন্যে পথ চেয়ে দাওয়ার উপরে খুঁটিতে মাথা দিয়ে মুহূর্ত গুন্‌ছে। বেলা গড়িয়ে অপরাহ্ণ হয়ে গেল। তীরনের দেখা নেই। ফুলেলা ভাব্‌ছিল যে, সে কোথায় পচাই খেয়ে বেহুঁশ হয়ে প'ড়ে আছে। কখন জাগ্‌বে কে জানে?

বেলা সন্ধ্যার কোল ঘেঁষে গড়িয়ে এলো। অস্ত-সূর্যের লালিমা ফুলেলার চোখে মুখে বড় বেশি হয়ে ফুটে উঠ্‌ল। পাশের বাড়ীর লটকনিয়া ফুলেলাকে ঐ ভাবে ব'সে থাকতে দেখে ডেকে বল্‌লে—এই মিতিন, জলকে যাবি নাই?

ফুলেলা ক্ষুণ্ণ স্বরে বললে—না ভাই, মরদটা কুথায় রইছে, এলে খেতে দিতে হবেক। আমি এখন বাড়ী ছেড়ে যেতে লারব।

তীরন তখন দ্রুতগামী ট্রেনে চ'ড়ে কলকাতার দিকে হুহু ক'রে ছুটে চলেছিল, তার চোখে লেগেছিল অধিক উপার্জনের নেশা, আর মন জুড়ে ছিল ফুলেলাকে সুখী কর্‌বার আশা। কিন্তু সে চা-বাগানের আড়কাটির প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে চলেছে চা-বাগানে দাসত্ব কর্‌তে। তার মুক্তি আর মিলন যে কত দূরে, তা কে জানে?

ফুলেলা আন্‌মনে দাওয়ায় ব'সে থাকে। তার বুকের উপর তীরনের দেওয়া একটা ধুক্‌ধুকি তীরনের প্রেম-চুম্বনের মতন চাঁদের আলোতে জলজল করে। সেই চোখ-গেল পাখীটার আর এখন পাত্তাই পাওয়া যায় না।

যাত্রী

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

> একদা পরম মূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়
> আগন্তুক। রূপের দুর্লভ সত্তা লভিয়া বসেছ
> সূর্যনক্ষত্রের সাথে। দূর আকাশের ছায়াপথে
> যে আলোক আসে নামি ধরণীর শ্যামল ললাটে
> সে তোমার চক্ষু চুমি তোমারে বেঁধেছে অনুক্ষণ
> সখ্যডোরে দ্যুলোকের সাথে; দূর যুগান্তর হতে
> মহাকাল-যাত্রী মহাবাণী পুণ্য মুহূর্তেরে তব
> শুভক্ষণে দিয়েছে সম্মান; তোমার সম্মুখ দিকে
> আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে
> সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।
>
> —রবীন্দ্রনাথ, প্রান্তিক

আত্মার অনন্ত সেই যাত্রাপথে হে মহা একাকী
চিরযাত্রী তুমি নিশিদিন,—তুমি পান্থ ক্লান্তিহীন
অমর্ত্ত্য সৌন্দর্য্যলোকে চিরসুন্দরের; চলিয়াছ
বিচিত্ররূপিণী যেথা হৃদয়দিগন্তরালে বসি
নিভৃতে ডাকেন নিত্য মৌন ভাবে কৌতুক-ইঙ্গিতে।
জীবন-নিশীথে নভে সপ্তর্ষিসভার যে আহ্বান
সুগম্ভীর, দীর্ঘ সে পথের পান্থ চিরসঙ্গীহারা।
জীবনের প্রান্তলগ্নে প্রদোষচ্ছায়ান্ধকার হতে
মুক্তবন্ধ পথিকের কণ্ঠে এ কি নিরাসক্ত বাণী!
সুনির্দ্দয় এ সত্যের প্রাণপণ ভোলার আগ্রহে
মৌন ম্লান বক্ষে জাগে দীর্ঘশ্বাস ব্যথিত কম্পন,
অলক্ষিতে অশ্রুবাষ্পে দুনয়ন ওঠে আজি ভরি।

এ মরজগতে তবু যে ক-দিন ধূলার ধরায়
জীবনের পান্থশালে পেতেছ আসনখানি তব
আমরা তোমারে ঘেরি সুদুর্লভ স্নেহসঙ্গটুকু
লুণ্ঠন করেছি নিত্য লুব্ধচিত্তে তৃষার্ত্তের মত।
ধরণীর অবিরাম আতিথ্যের সর্ব্ব আয়োজনে
পত্রে পুষ্পে তৃণদলে বিচিত্র সৌরভে বর্ণে গানে,
প্রভাতের স্নিগ্ধ লগ্নে আলোকের প্রথম স্পর্শনে,
সন্ধ্যার প্রশান্তি মাঝে সেই হতে রেখেছি মিশায়ে
সকৃতজ্ঞ হৃদয়ের আনন্দ-উদ্বেল ভালবাসা,
নয়নের অশ্রুহাসি। বসুধার সুধাপাত্র ভরি
আকণ্ঠ করেছ পান যে অমৃত স্বপ্নে জাগরণে
প্রতিদিন প্রহরে প্রহরে, প্রেমের দ্রাবকে গালি
মনের মুকুতাটিরে তারি মাঝে করেছি অর্পণ
একান্ত গোপনে। সাথীহারা হে পান্থ একাকী
পৃথিবীর ক্লান্ত পথে শ্রান্ত যত পথিকের পায়ে
তোমার চরণ-ছন্দ বাজে আজি নবীন উৎসাহে
দৃঢ় পদক্ষেপে। আমরা লয়েছি সবে সঙ্গ তব
অখণ্ড যাত্রার ইহজীবনের খণ্ডিত সীমায়
অনন্ত বিস্ময় মূর্ত্ত মুহূর্ত্তের মহাসন্ধিক্ষণে।
তপের কঠোর লগ্নে অন্তরের হোমাগ্নি-আলোকে
দীপ্ত তব জীবনের সুনিভৃত নিরালা প্রাঙ্গণে
আমরা প্রবেশ-ধন্য শিষ্যদল গুরুর কৃপায়।
বসেছি সন্ধ্যায় প্রাতে পাদপ্রান্তে নিস্তব্ধ শ্রদ্ধায়
তপোবন-তরুচ্ছায়ে, কভু মুক্ত আকাশের তলে,
লভিয়াছি দিব্যসঙ্গ ধরিত্রীর এ অন্ধ কারায়।

হে চিরনিঃসঙ্গ কবি, হে একাকী, তব সঙ্গ স্মরি
নিত্য নব আকাঙ্ক্ষায় আজো চিরকৃপণের মত
জাগি নিষ্পলক নেত্রে। সীমাঘেরা খণ্ডিত প্রাণের
ব্যাকুল বন্ধনে বাঁধি স্মরণের যা কিছু মধুর,
মর্ত্ত্যের মোহিনী মায়া। পশ্চাতের মোহে পলে পলে
সম্মুখ পথের পান্থে দূর হতে যেন বহুদূরে
হারায়েছি প্রতিদিন; ব্যবধান বিস্তৃত বিরাট।
সে বহুদূরের পান্থ দিনান্তের ধূসর মায়ায়
প্রসারি সুদীর্ঘ ছায়া জীবনের চরম লগনে
ঊর্দ্ধাকাশে মেলিয়াছে বাহু এ অন্ধকারের পারে
মুগ্ধনেত্রে হেরি জ্যোতির্ম্ময়ে। পিছনে ডাকি না তারে,
যুক্তকরে তারি সাথে ঊর্দ্ধপানে মেলি দুই বাহু
অনন্ত আকাশপটে আঁকিলাম বিমুগ্ধ প্রণাম।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চ্চার ফল

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

বর্ত্তমান সনের শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে আদিম কলিকাতার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতকারগণের এবং স্বয়ং রাজার উপর যে সুবিচার করিয়াছেন এমন মনে হয় না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন,

"রামমোহন রায়ের প্রচলিত জীবনচরিতগুলি হইতে কয়েকটি বিষয়ে আমাদের মনে ভুল ধারণা জন্মে। একটি ধারণা এই যে, তাঁহার বাল্যকালে বঙ্গদেশে জ্ঞানচর্চ্চা কিছুই ছিল না; দেশ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।

*   *   *

"দ্বিতীয় ভুল ধারণা এই যে, রামমোহন রায় বাল্যবয়সে ফারসী ও আরবী শিক্ষার জন্য পাটনাতে এবং সংস্কৃত শিক্ষার জন্য কাশীতে প্রেরিত হন। এই ধারণার পরিপোষক অণুমাত্র প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে না" (৪৭৮ পৃ.)।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত পাঠ করিলে তাঁহার বাল্যকালে যে বঙ্গদেশে জ্ঞানচর্চ্চা কিছুই ছিল না এই ধারণা সকলের মনে হয় না। দুই জন বাঙ্গালী পণ্ডিত, নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, তাঁহার সহযোগী ছিলেন, এবং অনেক বাঙ্গালী পণ্ডিত তাঁহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ধারণা,—বাল্যবয়সে রামমোহন রায়ের আরবী ফার্সী শিখিবার জন্য পাটনা যাওয়া, এবং সংস্কৃত শিখিবার জন্য কাশী যাওয়া সম্বন্ধে সতীশবাবু যে লিখিয়াছেন, "এই ধারণার পরিপোষক অণুমাত্র প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে না," এই অভিমত সমর্থন করা যায় না।

এখন দেখা যাউক রামমোহন রায়ের শিক্ষার জন্য পাটনা এবং কাশী যাওয়ার বিবরণের মূল আকর কি। এই আকর রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর অল্পকাল পরে ডাক্তার ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার কর্ত্তৃক প্রকাশিত রাজার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। এই জীবন-চরিতে ডাক্তার কার্পেণ্টার লিখিয়াছেন

"There Rammohun Roy was born most probably about 1774. Under his father's roof he received the elements of native education, and also acquired the Persian language. He was afterwards sent to Patna to learn Arabic; and lastly to Benares to obtain a knowledge of Sanskrit, the sacred language of the Hindoos. His masters at Patna set him to study Arabic translations of some of the writings of Aristotle and Euclid."*

অর্থাৎ রামমোহন পিতার গৃহে দেশীয় রীতিতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, এবং ফার্সী ভাষা শিখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে (afterwards) আরবী শিক্ষার জন্য পাটনা প্রেরিত হইয়াছিলেন; এবং অবশেষে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বারাণসীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বোধ হয় এই বিবরণীকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না, তাই লিখিয়াছেন, "শিক্ষার জন্য রামমোহন রায়ের পাটনা এবং কাশী যাওয়া সম্বন্ধে অণুমাত্র প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে না।" কার্পেণ্টারের বিবরণ কি এমন সরাসরি ভাবে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে? অবশ্যই রামমোহন রায় যখন আরবী পড়িতে লাঙ্গুরপাড়া হইতে পাটনা যান বা সংস্কৃত পড়িতে বারাণসী যান তখন ডাক্তার কার্পেণ্টার পাটনা বা কাশী বা লাঙ্গুরপাড়ায় উপস্থিত ছিলেন না। তবে তিনি এই সংবাদ কোথায় পাইয়াছিলেন? মিস মেরী কার্পেণ্টার তাঁহার রচিত "ইংলণ্ডে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের শেষ কয়েক বৎসরের বিবরণ" বিষয়ক পুস্তকের গোড়ায় ডাক্তার কার্পেণ্টারের রচিত রাজার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত (Biographical Sketch) পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। এই জীবন-চরিতের প্রারম্ভে, ডাক্তার কার্পেণ্টার কোথা হইতে জীবন-চরিতের উপাদান আহরণ করিয়াছিলেন মিস্ কার্পেণ্টার তাহা লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, ডাক্তার কার্পেণ্টার প্রামাণ্য আকর (authentic sources of information) হইতে উপাদান আহরণ করিয়াছেন। যেমন, Monthly Repository of Theology and Literature ত্রয়োদশ হইতে বিংশ খণ্ড; ডাক্তার রীস (Dr. T. Rees) কৃত Precepts of Jesus-এর সহিত সংযোজিত জীবন-চরিত, এবং "From communications from the family with whom the Rajah resided in London, and from the Rajah personally." ডাক্তার রীসের সংক্ষিপ্ত বিবরণে রামমোহন রায়ের জীবনকথা বিশেষ কিছু নাই। এই বিবরণ ১৮২৪ সালে লণ্ডনে লিখিত হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় লণ্ডনে গিয়া বেডফোর্ড স্কোয়ারে ডেভিড হেয়ারের ভ্রাতৃগণের সহিত বাস করিয়াছিলেন। আমার অনুমান হয়, ডাক্তার কার্পেণ্টার তাঁহার পাটনা-বারাণসী যাওয়ার সংবাদ হয় রাজার মুখ হইতে নিজে শুনিয়াছিলেন, আর না-হয় হেয়ার-পরিবারের

---

*Mary Carpenter, *The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy*, Calcutta, 1915, p. 2.

কাহারও নিকট শুনিয়াছিলেন। তিনি যেখান হইতেই এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়া থাকুন, ইহার মূল যে রাজা রামমোহন রায়ের নিজের উক্তি এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন বিচার্য্য,— রাজার এই প্রকার বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য কি না? এই বিবরণে অলৌকিক বা অসম্ভব কিছু নাই, এবং সমসময়ের কোন লোক ইহার বিরোধী কোন বিবরণও রাখিয়া যান নাই। তবে কেন আমরা কার্পেণ্টারের বিবরণ অবিশ্বাস করিব? অবশ্যই স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করিয়া কথিত এবং লিখিত বিবরণ একেবারে নির্ভুল নাও হইতে পারে। সুতরাং ইহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, ভুলচুক কিছু পাওয়া যায় কি না। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর বার বৎসর পরে, ১৮৪৫ সালের কলিকাতা রিভিয়ু পত্রে, কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁহার একটি জীবন-চরিত প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সেই সময় রামমোহন রায়ের অনেক শিষ্য জীবিত ছিলেন। ইঁহাদের নিকট হইতে তিনি অবশ্যই কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। রামমোহন রায়ের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন -

"Having received the elements of Bengali education, Rammohun Roy was sent to Patna to study Arabic and Persian···Rammohun Roy, after finishing his course of study at Patna, went to Benares for the purpose of mastering the aristocratic language of his country."*

এই বিবরণের সহিত ডাক্তার কার্পেণ্টারের বিবরণের সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। ডাক্তার কার্পেণ্টার লিখিয়াছেন, রামমোহন পিতৃগৃহে থাকিয়া ফার্সী শিখিয়াছিলেন। ইহাই অধিকতর সম্ভব। কারণ তৎকালে ফার্সী সরকারী সেরেস্তার ভাষা ছিল। অনেক দলিল-দস্তাবেজ ফার্সীতে লিখিত হইত। রামমোহন রায়ের পিতা, পিতামহ সরকারী এবং জমীদারী কার্য্যে রত বিষয়ী লোক ছিলেন। তৎকালে তাঁহাদের ঘরের ছেলের গোড়ায় ফার্সী পড়াই সম্ভব। বাঙ্গালা দেশে অবশ্য তখন আরবী এবং সংস্কৃত উভয় ভাষা এবং সাহিত্য অনুশীলনের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। তবে কেন রামমোহন আরবী পড়িতে পাটনা এবং সংস্কৃত পড়িতে কাশী প্রেরিত হইয়াছিলেন? ইহার কারণ বোধ হয় তাঁহার নিজের অভিরুচি। রামমোহন রায়ের প্রথম যৌবনের অন্যান্য ঘটনার সহিত এই ঘটনার সামঞ্জস্য করিতে গেলে এইরূপ সিদ্ধান্তই সঙ্গত মনে হয়।

উপরে উল্লিখিত জীবনবৃত্তান্তে ডাক্তার কার্পেণ্টার লিখিয়াছেন, বাল্যকালেই রামমোহন হিন্দু পৌত্তলিকতার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন। তিনি অনেক সময় তাঁহার পিতাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। এই সকল প্রশ্নের যে উত্তর পাইতেন তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, অন্য দেশের ধর্ম্ম পরীক্ষা করিবার জন্য, তাঁহার বয়স যখন মাত্র ১৫ বৎসর তখন তিনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া তিব্বত যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি দু-তিন বৎসর তিব্বতে বাস করিয়াছিলেন। তিব্বতীয়েরা এক জন জীবিত মানুষ, লামাকে জগতের সৃজন এবং পালন কর্ত্তা রূপে পূজা করে। রামমোহন রায় এই মত অঙ্গীকার করিতেন না বলিয়া তিব্বতীয় লামা-উপাসকগণ তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইতেন। সেই সময় তিব্বতীয় পরিবারের মহিলাগণ তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। ডাক্তার কার্পেণ্টার লিখিয়াছিলেন –

"And his gentle, feeling heart dwelt, with deep interest, at the distance of more than forty years, on the recollection of that period ; these, he said, had made him always feel respect and gratitude towards the female sex, and they doubtless contributed to that unvarying and refined courtesy which marked his intercourse with them in this country."

এখানে দেখা যায়, ডাক্তার কার্পেণ্টার রামমোহন রায়ের তিব্বত-ভ্রমণের বিবরণ তাঁহার নিজ মুখে শুনিয়াছিলেন। রামমোহন রায় ইংলণ্ডে প্রবাস কালে বিশেষ আগ্রহের সহিত (with deep interest) তিব্বতীয় মহিলাগণের সদয় ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিতেন। ডাঃ কার্পেণ্টার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, রামমোহন রায় ইংলণ্ডে সর্ব্বদা মহিলাগণের প্রতি যে শিষ্টতা এবং সৌজন্য প্রদর্শন করিতেন তাহা নিঃসন্দেহে কতক পরিমাণ তিব্বতীয় মহিলাগণের প্রতি ভক্তির ফল। তার পর ডাক্তার কার্পেণ্টার লিখিয়াছেন, রামমোহন রায় যখন তিব্বত হইতে হিন্দুস্থানে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে লোক পাঠাইয়া আনিয়া বিশেষ সমাদরে গ্রহণ করিলেন। তার পর লিখিয়াছেন –

"He appears, from that time, to have devoted himself to the study of Sanskrit and other languages, and of the ancient books of the Hindus."

মনে হয় তার পর হইতে রামমোহন রায় সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভাষার অনুশীলনে এবং হিন্দুদিগের প্রাচীন শাস্ত্র অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

ডাক্তার কার্পেণ্টার রামমোহন রায়ের জীবনের প্রথম ভাগের এই যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, ইহার সমস্তটা এক সূত্রে গাঁথা। হয় ইহার সমস্তটা গ্রহণ করিতে হইবে, না-হয় সমস্তটা অগ্রাহ্য করিয়া রামমোহন রায়ের জীবনের প্রথম ভাগকে অন্ধকারে আচ্ছাদিত করিতে হইবে। এই বিবরণোক্ত প্রধান ঘটনা তিনটি—

(১) চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে থাকিয়া বাঙ্গালা, ফার্সী এবং হয়ত কিছু সংস্কৃত পঠন।

(২) পনর বৎসর বয়সের সময় পিতার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় গৃহত্যাগ এবং তিব্বতযাত্রা। রামমোহন রায়ের তিব্বত-ভ্রমণ অসম্ভব বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তিব্বতে হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থ, কৈলাস পর্ব্বত অবস্থিত। হিন্দু-তীর্থযাত্রীরা বরাবরই হরিদ্বারের পথে এই তীর্থ দর্শন করিতে গিয়া থাকেন।

*Calcutta Review, Vol IV, p. 359.

(৩) আঠার বৎসর বয়সে তিব্বত হইতে ফিরিয়া আসিয়াই বোধ হয় পিতার অনুমতি লইয়া রামমোহন পাটনায় গিয়া আরবী এবং কাশীতে হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিব্বতে যাইবার সময় রামমোহন হয়ত পাটনার মৌলবীদিগের এবং কাশীর পণ্ডিতদিগের পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় তাঁহাদিগের নিকট অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় যদি ধর্ম্মবিষয়ে পিতার সহিত মতভেদের ফলে বিদেশ, এবং বিশেষতঃ তিব্বত, যাত্রা না করিতেন, তবে আরবী এবং সংস্কৃত পড়িবার জন্য তাঁহার খুব সম্ভব পাটনা এবং কাশী যাওয়া হইত না, দেশে থাকিয়াই পড়িতেন। রামমোহনের যখন ১৫ বৎসর বয়স, অর্থাৎ ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কলিকাতা আসিয়া বসবাস করিবার বিলম্ব ছিল। তার পূর্ব্বে বোধ হয় এদেশের চতুষ্পাঠীতে উপনিষৎ এবং বেদান্ত দর্শনের পঠন-পাঠন ছিল না। রামমোহন রায় এ দেশে থাকিয়া সংস্কৃত পড়া শেষ করিলে তিনি খুব সম্ভব নব্য ন্যায় পড়িতেন, এবং বড় এক জন নৈয়ায়িক হইতেন; কিন্তু রঘুনাথের দীধিতির আলোকে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণির চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলে উপনিষদমূলক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিবার অবসর পাইতেন কি না সন্দেহ। কিশোরবয়স্ক রামমোহনের গৃহত্যাগ এবং তিব্বতযাত্রা তাঁহার জীবনের ধারা পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিল। ১৮০৩ কিংবা ১৮০৪ সনে প্রকাশিত "তুফাতুল মুহ্‌হিদ্দীন" পুস্তিকার আরবী ভূমিকায় তিনি তিব্বত-ভ্রমণের আভাস দিয়াছেন—

"I have travelled in the remotest parts of the world, in plains as well as in hilly lands."

"আমি পৃথিবীর বহুদূরবর্ত্তী ভাগসমূহে, সমতল দেশে এবং পার্ব্বত্য দেশে, ভ্রমণ করিয়াছি।"

কিরূপ অবস্থায় কিশোর রামমোহন এই দূরদেশ ভ্রমণ সম্পন্ন করিয়াছিলেন অন্যত্র তাহারও কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। রামমোহন রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায় খুড়ার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দাবী করিয়া সুপ্রীম কোর্টে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন, এই মোকদ্দমায় নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার রামমোহন রায়ের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। এই সাক্ষ্যে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার বলিয়াছিলেন, রামমোহন যখন চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, (attained the age of fourteen years) তখন তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল, এবং তদবধি আমাদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে (been on the most intimate terms)। নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার কুলাবধূত বা তান্ত্রিক-কুলাচারী সন্ন্যাসী ছিলেন। ১৫ বৎসর বয়সে রামমোহনের তীর্থ-যাত্রায় এই কুলাবধূতের প্রভাব থাকিতে পারে। রামমোহন রায়ের শিষ্য এবং বন্ধু পাদ্রি উইলিয়ম আডাম (William Adam) ১৮২৬ সালে লিখিয়াছেন

"He seems to have been religiously disposed from his early life; having proposed to seclude himself from the world as a *Sannyasi*, or devotee, at the age of fourteen, from which he was only dissuaded by the entreaties of his mother."*

অর্থাৎ আশৈশব রামমোহন রায়ের ধর্ম্মানুরাগ ছিল বলিয়া মনে হয়। যখন তাঁহার বয়স ১৪ বৎসর তখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং মাতার অনুরোধে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এই সংবাদ আডাম সাহেব কোথায় পাইয়াছিলেন তাহার আভাস দেন নাই। ইহার মূলেও রামমোহন রায়ের উক্তি মনে হয়। নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের উক্তির সহিত এই উক্তির সহজেই সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে। নন্দকুমারের সংসর্গের ফলেই বোধ হয় রামমোহনের সন্ন্যাস গ্রহণের প্রবৃত্তি হইয়াছিল এবং পিতার সহিত মতভেদের ফলে পর বৎসর গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। উইলিয়ম আডাম এই ১৮২৬ সালেই লিখিয়া গিয়াছেন, রামমোহন দশ বার বৎসর কাশীতে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৭৯৬ সালের ১লা ডিসেম্বর যখন রামমোহন রায়ের পিতা রামকান্ত রায় নিজের সম্পত্তি তিন পুত্রের মধ্যে বণ্টনের পত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন, তখন রামমোহন লাঙ্গুরপাড়ায় উপস্থিত ছিলেন এবং বণ্টনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এই সময় রামমোহনের বয়স ২৫ বৎসরের বেশী হইতে পারে না। সুতরাং তিব্বত হইতে ফিরিবার আনুমানিক সময় হইতে বণ্টনপত্র সম্পাদনের তারিখ পর্য্যন্ত দশ-বার বৎসরের পরিবর্ত্তে ছয়-সাত বৎসরের বেশী অবকাশ পাওয়া যায় না। এই অবকাশে রামমোহন রায় পাটনায় আরবী এবং বারাণসীতে সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন অনুমান করিতে হইবে।

অন্যতর প্রমাণ না পাইয়া শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় রামমোহন রায়ের পাটনায় আরবী এবং কাশীতে ফার্সী পড়ার সংবাদ অগ্রা· করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তিনি বারে বারে কলিকাতায় আসিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইয়া সেই সুযোগে আরবী এবং সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আমরা গোবিন্দপ্রসাদের মোকদ্দমার নথীপত্র হইতে জানিতে পারি, পূর্ব্বোক্ত বাঁটোয়ারার নয় মাস পরে, ১৭৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন রায় আসিয়া কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছিলেন। তার পর, ১৮০০ সালের গোড়ায় বোধ হয় তিনি পুনরায় পাটনা, কাশী এবং অন্যান্য দূরদেশ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। ঠিক্ কখন ফিরিয়াছিলেন জানা যায় না। তার পর, ১৮০৩ সালের গোড়ায় উডফোর্ড সাহেবের সহিত ঢাকা জালালপুরে চাকরি করিতে যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি বেশীর ভাগ সময় কলিকাতায় বাস করিয়া বিষয়কর্ম্ম পরিচালন করিয়াছিলেন। তিনি যখন বিদেশে, তখন, ১৮০০ সালের আগষ্ট মাসে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রামমোহন রায় কলিকাতায় ফিরিয়াই "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন" এই পর্য্যন্ত না-হয় অনুমান করিলাম। কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই সেখানে উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন, ইউক্লিডের এবং আরিষ্টোটোলের

*Miss S. D. Collet, *Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, edited by Hem Chandra Sarker, Calcutta.

আরবী অনুবাদ সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং এই সকল শাস্ত্র পড়াইবার জন্য যোগ্য অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিল, ইহাও স্বীকার করিলাম। এ-যাবৎ কাল, ২৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, রামমোহন এই সকল শাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন ইহাও না হয় স্বীকার করিলাম। কিন্তু তিনি যে ১৮০০ বা ১৮০১ সাল হইতে কোর্ট উইলিয়ম কলেজের কোন পণ্ডিতের এবং মৌলবীর নিকট উপনিষৎ বেদান্ত আরবী দর্শন ও গণিত রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহার কি প্রমাণ আছে? প্রমাণস্বরূপ সতীশবাবু, ডিগবী সাহেব ১৮১০ সালের ৩১শে জানুয়ারী রামমোহন রায়কে রংপুরের কালেক্টরীর দেওয়ান পদের জন্য সুপারিশ করিয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই কয়টি ছত্রে উক্ত হইয়াছে, রামমোহন রায়ের চরিত্র এবং যোগ্যতা (qualification) সম্বন্ধে বোর্ড সদর দেওয়ানী আদালতের কাজি উল-কুজাতকে, কোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড মুন্সীকে, এবং এ সকল আপিসের (those departments) অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারীকে তাঁহাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন (refer)। এখনকার দিনেও চাকরি সম্বন্ধে হামেশাই আবেদনকারীকে রেফারেন্স দিতে হয়। কিন্তু কাহারও রেফারেন্স দিলেই কি রেফারির নিকট রীতিমত অধ্যয়ন সূচিত করে? রামমোহন রায়ের বিদ্যাবত্তা যে মূলতঃ কোর্ট উইলিয়ম কলেজের বা কলিকাতার অন্য কোন শিক্ষাগারের নিয়মিত শিক্ষার ফল এই ধারণার পরিপোষক অণুমাত্র প্রমাণও পাওয়া যায় না। কিন্তু রামমোহন রায়ের বিদেশে বেদান্ত অনুশীলন সম্বন্ধে আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৭৬৬ শকের ২০শে ফাল্গুন (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তী ১৭৬৭ শকের ১লা বৈশাখের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় "মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জীবনবৃত্তান্ত" (১৬৫—১৬৭ পৃ.) প্রকাশিত হইয়াছিল। এই জীবনবৃত্তান্তে কথিত হইয়াছে, রামমোহন রায় যখন রংপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন তখন হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী (নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার) তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে আনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়াছিলেন। তার পর—

"বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অতি বুদ্ধিমান, এবং সংস্কৃত ভাষাতে শব্দালঙ্কারাদি ব্যুৎপত্তি শাস্ত্রে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন প্রযুক্ত রাজা তাঁহাকে মহা সম্ভ্রমপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ রাজার ইচ্ছানুসারে তাঁহার সমভিব্যাহারী শিবপ্রসাদ মিশ্র নামক এক জন ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতের নিকটে উপনিষৎ ও বেদান্ত দর্শনাদি মোক্ষ প্রয়োজক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।"

মিশ্র উপাধি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সুলভ নহে, সুতরাং শিবপ্রসাদ মিশ্র অবাঙ্গালী হওয়া অসম্ভব নহে। শিবপ্রসাদ মিশ্রকে বাঙ্গালী পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত কোন উপাধিতে ভূষিত দেখা যায় না। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে উপনিষৎ ও বেদান্ত পড়াইবার উপযুক্ত উপাধিহীন বাঙ্গালী পণ্ডিত কল্পনা করা অসম্ভব। রামমোহন রায় যেখানে স্বয়ং উপনিষৎ ও বেদান্তদর্শন পাঠ করিয়াছিলেন সেইখান হইতেই তাঁহার সমভিব্যাহারী এই সকল শাস্ত্রের পণ্ডিত আনয়ন করা সম্ভব। ১৭৭৯ শকের (১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের) আশ্বিন মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার বিবরণে শিবপ্রসাদ মিশ্রকে "রাজার অধ্যাপক" বলা হইয়াছে। কলিকাতায় রামমোহন রায়ের সভায় শিবপ্রসাদ মিশ্রের উপস্থিতি তাঁহার কাশীতে উপনিষৎ এবং বেদান্ত পড়ার সংবাদ সমর্থন করে।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তার পর লেখেন,—"আর একটি ভুল ধারণা রামমোহন রায় এক মাত্র ডিগবী সাহেবের নিকট হইতে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন ও য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হন।" এই প্রকার ভুল ধারণার পরিচয় যে চক্রবর্ত্তী মহাশয় কোথায় পাইয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ডিগবী সাহেব লণ্ডনে রামমোহন রায়ের ইংরেজী বেদান্তসার (Abridgment of the Vedanta) প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই পুস্তিকার ভূমিকায় তিনি রামমোহন রায়ের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ইংরেজী শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। এই বিবরণটি রামমোহন রায়ের অনেক জীবন-চরিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই বিবরণে ১৮১৭ সালে রামমোহন রায়ের বয়স ধরা হইয়াছে প্রায় (about) ৪৩ বৎসর, অর্থাৎ তাঁহার জন্ম আনুমানিক ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে। ডিগবী লিখিয়াছেন, ২২ বৎসর বয়সে, তাঁহার হিসাব মত ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে, রামমোহন রায় ইংরেজী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে, ১৮০১ সালে, রামমোহন রায়ের সহিত যখন ডিগবীর প্রথম আলাপ হয় তখন তিনি সামান্য ইংরেজী জানিতেন, এবং অতি সাধারণ বিষয়ে (most common topics of discourse) ইংরেজী ভাষায় আলাপ করিতে পারিতেন, কিন্তু শুদ্ধ করিয়া ইংরেজী লিখিতে পারিতেন না। তার পর ১৮০৯ হইতে ১৮১৪ সাল পর্য্যন্ত রামমোহন রায় যখন রংপুরে ছিলেন তখন মনোযোগের সহিত সরকারী চিঠিপত্র পড়িয়া, ইউরোপীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত আলাপ করিয়া এবং পত্র ব্যবহার করিয়া, এবং ইংরেজী খবরের কাগজ পড়িয়া ভাল করিয়া ইংরেজী বলিতে ও লিখিতে শিখিয়াছিলেন। রামমোহন রায় কখনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ডিগবী সাহেবের নিকট হইতে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এমন কথা ডিগবী সাহেব বলেন নাই, এবং কখন কি উপায়ে যে রামমোহন রায় ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন এই সম্বন্ধে ডিগবী নীরব। তবে ডিগবীর উক্তি হইতে একটি কথা পরিষ্কার বুঝা যায়। সেই কথাটি হইতেছে, রামমোহন রায় ভাল করিয়া ইংরেজী শিখিয়াছিলেন ১৮০৯ হইতে ১৮১৪ সালের মধ্যে রংপুরে। কিন্তু সতীশ বাবু এই কথা স্বীকার করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—

"কিন্তু ডিগবীর সহিত রামমোহনের পরিচয় ঘটে ১৮০৫ সালে। দেখা যায়, তাহার পূর্ব্বেই রামমোহন স্বীয় 'তুহফৎ' গ্রন্থে (Tuhfat-ul-Muhhiddin, ১৮০৩ কিংবা ১৮০৪ সালে প্রকাশিত) ফরাসী বিপ্লবের নেতৃবর্গের চিন্তার সহিত পরিচিত।"

রামমোহন রায় কিন্তু নিজের ইংরেজী শিক্ষার অন্য প্রকার ইতিহাস দিয়া গিয়াছেন। ১৮২০ সালে তাঁহার সঙ্কলিত Precepts of Jesus, যীশুখৃষ্টের উপদেশমালা, প্রকাশিত হইবার পর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে তীব্র প্রতিবাদ মুদ্রিত হইয়াছিল। Precepts of Jesus গ্রন্থে সঙ্কলনকর্ত্তার নাম না থাকিলেও প্রতিবাদকারী জানিতে পারিয়াছিলেন রামমোহন রায় এই পুস্তকের সঙ্কলন করিয়াছেন, এবং প্রতিবাদে তাঁহাকে heathen বলিয়াছিলেন। রামমোহন রায়

ছিলেন শব্দটি পৌত্তলিক অর্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ঐ বৎসরই An Appeal to the Christian Public, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রতি নিবেদন নামক প্রতিবাদের উত্তর পুস্তকে এই জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—

"He is safe in ascribing the collection of these Precepts to Rammohun Roy; who, although he was born a Brahmun, not only renounced idolatry at a very early period of his life, but published at that time a treatise in Arabic and Persian against that system; and no sooner acquired a tolerable knowledge of English, than he made his desertion of idol worship known to the Christian world by his English publication."*

"এই উপদেশমালার সঙ্কলন যে রামমোহন রায়ের কৃত এই কথা প্রতিবাদকারী ঠিকই বলিয়াছেন। রামমোহন রায় ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও তিনি জীবনের প্রথম ভাগেই কেবল পৌত্তলিকতা ত্যাগ করেন নাই, আরবী এবং ফার্সী ভাষায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একটি সন্দর্ভ প্রকাশিত করিয়াছিলেন; এবং যে মুহূর্ত্তে তিনি ইংরেজী ভাষায় চলনসহি জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্তে ইংরেজীতে পুস্তক প্রকাশ করিয়া পৌত্তলিকতা বর্জ্জনের সংবাদ খৃষ্টান সমাজে প্রচারিত করিয়াছিলেন।"

এখানে রামমোহন রায় তাঁহার যে ইংরেজী পুস্তকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অবশ্য ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় প্রকাশিত ইংরাজী বেদান্তসার (Abridgment of the Vedanta)। রামমোহন রায় এখানে তাঁহার ইংরেজী ভাষা-জ্ঞানের বিকাশের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার সহিত ১৮১৭ সালে প্রকাশিত ডিগবী সাহেবের বিবরণের বিরোধ নাই। এই উভয় বিবরণ মিলাইয়া পড়িলে দৃঢ় ধারণা হয়, 'তুফাৎ' রচনার সময়, (১৮০৩ বা ১৮০৪ সালে) ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের নেতৃবর্গের রচনায় দূরে থাকুক, ইংরেজী অনুবাদ বা ইংরেজী সার সঙ্কলন বুঝিবার মত ইংরেজী ভাষা-জ্ঞান রামমোহন রায়ের ছিল না। তবে তাঁহার সম্বল কি ছিল? তাঁহার সম্বল ছিল আশ্চর্য্য প্রতিভা—অসাধারণ পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, অসাধারণ মৌলিক চিন্তাশক্তি। আরিষ্টটোলের (Aristotle) রচিত তর্কশাস্ত্রের আরবী অনুবাদ পাঠ করিয়া তিনি সেই চিন্তা-শক্তিকে মার্জ্জিত করিয়াছিলেন। তুফাতে ব্যাখ্যাত ধর্ম্মমত রামমোহন রায়ের নিজের উদ্ভাবিত। অনেক পূর্ব্বেই ইংরেজ ডীইগণ (Deists) এই মত প্রচার করিয়াছিলেন, এবং হিউম (Hume) এবং কাণ্ট (Kant) তাহা খণ্ডন করিয়াছিলেন। তৎকালে ইউরোপীয় দার্শনিকগণের রচনার সহিত অপরিচিত রামমোহন রায় মৌলিক পর্য্যবেক্ষণের বলে এবং মৌলিক চিন্তার ফলে তুফাতের মত উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন। তুফাতের আরবী প্রস্তাবনায় গোড়ায় তিনি ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা এখানে এই উক্তির ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিব—

"I travelled in the remotest parts of the world, in plains as well as in the hilly lands, and found the inhabitants thereof agreeing generally in believing in the existence of One Being Who is the source of creation and the governor of it, and disagreeing in giving peculiar attributes to that Being and in holding different creeds consisting of the doctrines of religion and precepts of *Haram* (forbidden) and *Halal* (legal). From this Induction it has been known to me that turning generally towards One Eternal Being, is like a natural tendency in human beings and is common to all mankind equally." *

তাৎপর্য্য—আমি পৃথিবীর দূরবর্ত্তী অংশে ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি সেখানকার অধিবাসীরা একমত হইয়া জগতের সৃজন এবং পালন কর্ত্তা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, কিন্তু সেই ঈশ্বরের কি কি লক্ষণ, এবং কোন্ কর্ম্ম পবিত্র, কোন্ কর্ম্ম পাপজনক এই বিষয়ের উপদেশ-মালায় তাহাদের মধ্যে মতভেদ আছে। এই প্রমাণ হইতে আমি বুঝিয়াছি, এক ঈশ্বরে বিশ্বাস মানুষের মনের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের প্রথম যুগের বিদ্যার দৌড় বাড়াইতে গিয়া তাঁহার বুদ্ধির দৌড়কে কমান কর্ত্তব্য নহে। রামমোহন রায়কে জানিতে চিনিতে হইলে তাঁহার নিজের জীবনের ঘটনায় তিনি নিজে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে যে বিবরণ দিয়া গিয়াছেন তাহা উপেক্ষা করা যাইতে পারে না। তাঁহার সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং বা তাঁহার বন্ধুগণ যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে অলৌকিক বা অসম্ভব কিছু নাই। তবে কেন এই উপেক্ষা? রামমোহন রায় যদি নিজের সম্বন্ধে কোন অলৌকিক ঘটনা বলিয়া যাইতেন—যেমন ঈশ্বর আমাকে এই উপদেশ দিলেন, ঈশ্বর আমার মধ্যে এই সত্য প্রকাশিত করিলেন, ঈশ্বরের আদেশে আমি এইরূপ করিলাম ইত্যাদি, তবে বোধ হয় এদেশের লোক তাঁহার কথা এমন ভাবে উপেক্ষা করিতে সাহস পাইত না।

The English Works of Raja Rammohun Roy, edited by Jogendra Chandra Ghose, Calcutta, 1901, Vol. III, p. 89.

* *Tufatul Muwahhiddin*, or *A Gift to Deists*, by the Late Rajah Rammohun Roy, translated in English by Moulavi Obaidullah El Obaide, Calcutta, 1884, Introduction.

পিউ কাঁহা

শ্রীসুশীল জানা

নিজের অসুস্থ শরীর আর নিজের সুখদুঃখ নিয়ে সুদূর প্রবাসের দিনগুলি আমার বৈচিত্র্যহীনতায় ভরে উঠেছিল। অস্তমুখ সূর্য্যের শেষ রশ্মি যখন নীলগিরির শিখরদেশ থেকে ধীরে ধীরে সরে যেত আর তরঙ্গায়িত পর্ব্বতমালা দিগন্তে ধূম্রাভ হয়ে উঠত, অদূরের ঝাউগাছটার অশ্রান্ত গোঙানি যখন দিনশেষে ক্রমশ স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে উঠত তখন আর বেড়াতে বেরতাম না। নিজেকে কেমন বড় নিঃসঙ্গ মনে হ'ত। গোধূলিধূসর ম্লান ছায়ায় চারি দিক ঘিরে যে উদাসীনতা বিরাজ করত তা আমার অন্তরকেও স্পর্শ ক'রত। কাঠকুড়ানী জংলী মেয়েগুলো কাঠের বোঝা নিয়ে পাহাড়ের কোলঘেঁষা আঁকাবাঁকা রাঙা মাটির পথটি ধরে একে একে ঘরে ফিরত—তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখে আমার নেমে আসত কোন্ ঘনায়মান স্বপ্নসন্ধ্যার একটি গৃহকোণ। মন বড় ব্যাকুল হয়ে উঠত ঘরের জন্য।

মাঝে মাঝে প্রবাসী বন্ধুদের দু-এক জন আসতেন—তাঁরা আমার চেয়ে বয়োবৃদ্ধ। আমার শরীর সম্বন্ধে সামান্য একটু তত্ত্ব-তল্লাশ নিয়ে চলে যেতেন। কার শরীরে কতখানি উন্নতি হ'ল—এই ছিল তাঁদের একমাত্র আলোচ্য বিষয়বস্তু। রামবাবুর নাতির রক্তহীনতা এবং পিলে। দিনের মধ্যে কম্‌সে-কম্ হাজারো বার পেট টিপে এবং চোখ চিরে দেখতেন রামবাবু—কতখানি তার উন্নতি হ'ল। শেষকালে এমনি হ'ল যে রামবাবুকে দেখলেই ছেলেটা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠত। তার পর চন্দ্রবাবু।...ঠাণ্ডার ধাত তাঁর। কবে কোন্ সন্ধ্যায় ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ ক'রে মাত্র দুটি হাঁচি হবার পর আর তাঁর হাঁচি হয় নি—এমনি জায়গার গুণ,—এই নিয়ে তিনি লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতেন। তার পর কান্তবাবু—ডিস্‌পেপটিক রুগী; কারণে অকারণে চক্ চক্ ক'রে গেলাস গেলাস জল খেতেন হজম-শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্যে। তার পর রায় মশায়...ঐ সব এক রকম। ভাল লাগত না।

সেদিন কি মনে হ'ল, বেড়াতে বেরলাম। কিছুক্ষণ হাঁটার পর আর ভাল লাগল না, ফিরে এলাম। বাসায় এসে মাথার কাছের জানালাটা খুলে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ মেঝের ওপরে চোখ পড়তে আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম—একখানা চিঠি পড়ে আছে জলে ভেজা মেঝের উপর। খামের চিঠি—খাম থেকে জলটুকু মুছে গোধূলির স্বল্পালোকে শিরোনামাটা পড়বার চেষ্টা করলাম, কিন্তু জলে ভিজে এমনি হয়ে গিয়েছে যে কোন রকমেই পড়তে পারলাম না। তার উপরে অনেকগুলি ডাক-ঘরের ছাপ। মনে হ'ল মালিকের সন্ধান ক'রে চিঠি-খানি অনেক জায়গায় ঘুরেছে। সন্দেহ হ'ল, চিঠিখানি আমার কি না। কিন্তু আমার না হ'লে এখানে আসবেই বা কেন! সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা বিপুল আনন্দে মন ভরে গেল—মনে হ'ল, এই চিঠিখানির জন্যে যেন আমি এই সুদূর প্রবাসে রাত্রি-দিন অপেক্ষা করছি; কোন অজ্ঞাত দরদী বন্ধু হয়ত একটু স্নেহ-সতর্ক বাণী, একটু ভালবাসা, একটু দরদ এই চিঠিটির অঙ্গে অঙ্গে মাখিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। খাম ছিঁড়ে পত্রপ্রেরকের নাম অনুসন্ধান করতে গিয়ে কিন্তু আশ্চর্য্য হলাম—নামটা কোন রকমেই পরিচিত ব'লে মনে হ'ল না। অথচ ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্যে কত অনুরোধই না এই চিঠিটিতে আছে। আনন্দের পরিবর্ত্তে কেমন একটা দুঃসহ বেদনায় মনপ্রাণ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। আমি যেন বহু দূরে পড়ে আছি। ইচ্ছে হ'ল, আমার এই চারি দিকের ধূসর-উষর দূরবিস্তৃত প্রান্তর পেরিয়ে সন্ধ্যাচ্ছন্ন পশ্চিম দিগন্তের ঐ স্বপ্নছায়ার মত গিরিশ্রেণী পেরিয়ে, শালবনের মাঝখান দিয়ে যে আঁকাবাঁকা সরু রাঙা মাটির পথটি চলে গিয়েছে সেই পথরেখা ধরে আমার সুদূর প্রবাসের

নিঃসঙ্গ গৃহকোণ ছেড়ে এখনি ছুটে যাই আম্র-পনস-ছায়াচ্ছন্ন কোন এক শ্যামল পল্লীপ্রান্তের নিঝুম প্রাঙ্গণ-পানে।

স্বপ্নরোমাঞ্চিত জন্মান্তর-স্মৃতির মতন ধীরে ধীরে বহু দূর পল্লীপ্রান্তের একটি মায়াময় জীবন আমার চোখের সম্মুখে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

…সিন্ধু বললে—হ্যাঁ ঠাকুমা, তুই যার সঙ্গে এখুনি কথা কইলি ও কালকে যাত্রায় কি সেজেছিল না?

ঠাকুরমা বললেন—খুব চিনে রেখেছিস ত। বলি, মনে ধরেছে নাকি রে! আমি চিনতে পারলাম না—আর তুই দিব্যি…

সিন্ধু সলজ্জে বললে—যাঃ-ও। তুই-ই বা চিনলি কি ক'রে?

—ওমা, আমি চিনব না! আমার বাপের দেশের চেনা লোকের ছেলে—চিনব না? তোর পছন্দ হয় ত বল্ ভাই, সম্বন্ধ করি।

—দূর বুড়ী। সিন্ধু লজ্জায় ছুটে পালাল।

ঠাকুরমাকে ফের এক সময়ে নির্জ্জনে পেয়ে সিন্ধু জিজ্ঞেস করলে—সেই ছেলেটির নাম কি ঠাকুমা? এই ইয়ে…মানে জিজ্ঞেস করছিল কি না।…

—অত বোঝাতে হবে না গো, বুঝেছি। নাম তার মদন—যা, ঐ এখন জপ কর গে যা। রাতটা পোয়াতে দে, কাল সকালেই আমি মথুরকে ব'লে…

মথুর সিন্ধুর বাপ—ভারী কড়া মেজাজের লোক। বুড়ী ঠাকুমা বাবাকে কি বলবে কে জানে! ভয়ে সিন্ধু কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে—তোর পায়ে পড়ি ঠাকুমা—বাবাকে কিচ্ছু বলিস নি, কেটে ফেলবে—তোর পায়ে পায়ে পড়ি ঠাকুমা।…

তার পর…

কিছু দিন পরে ঠাকুরমার উদ্যোগে সিন্ধুর বিয়ে হ'ল সেই মদনের সঙ্গেই। মদন যাত্রার দলের ছেলে, আখড়ায় যাওয়া-আসা করে, শোনা যায় নেশাও করে, বদমেজাজী লোক। তার ওপরে ছেলেটি আবার একা—ঘরে তার বাপ-মা, ভাই-বোন কেউ নেই। সিন্ধুর মা সাবিত্রী ঘোরতর আপত্তি তুলে বলেছিল, সিন্ধুর বিয়ে ওখানে দেব না। কিন্তু সিন্ধুর ঠাকুরমা তাতে হেসে বলেছিল, তোমার মেয়ে তা-হ'লে সুখী হ'তে পারবে না বৌমা। তার পর বৃদ্ধা হেসে হেসে মদন সম্বন্ধে সিন্ধুর কৌতূহলের কাহিনীগুলি একে একে প্রকাশ ক'রে বলেছিল। বলেছিল, ওখানে ওর বিয়ে না দিলে মেয়ের অভিশাপ লাগবে বৌমা। এক দিন তোমার মেয়ে বললে কি জান? বললে, সেই মদন না কে, সেই তুই যাকে আসতে বলেছিলি—সে ত কই আর এল না ঠাকুমা! বেশ কিন্তু গান গায়—ব'লে এর-ওর-তার নাম দিয়ে কাটিয়ে দিলে। তাই ত মদনকে মাঝে অকারণে ক-বার ডেকে আনালাম—তাতে তোমার মেয়ে কি খুশীই যে হ'ত বৌমা। সেই চিনিবাসের সঙ্গে যখন বিয়ের সম্বন্ধ চলছে তখন ওর ভাবভঙ্গি কি যে হয়ে গেল—এক দিন জিজ্ঞেস করতে ত কেঁদেই ফেললে। সাবিত্রী হেসে বলেছিল, অত ত জানতাম না মা…বেশ, তাই হোক।

যাত্রার দলে যারা যায় তাদের কীর্ত্তি অনেক—কবে কার কার চড়ে কার কার বৌ ঠকাস ক'রে মরে গিয়েছিল, তার উপরে মদনের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, তার উপরে মদনের ঘরের একাকিত্ব—ইত্যাদি সমস্ত ঘরে-বাইরের আলোচনা একযোগে সিন্ধুর কাছে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করল বিয়ের পর। ভয়ে ভয়ে সে বিয়ের পর ক-টা রাত্রি-দিন উৎসবের হট্টগোলে কাটিয়ে দিয়ে যখন সাগরগ্রাম থেকে কমলপুরে ফিরে এল তখন সে যেন নিষ্কৃতির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। মদনের কোন আকর্ষণ আর লোভনীয় রইল না।

তার পর…

এক দিন মদন এল সিন্ধুকে নিয়ে যাওয়ার দিন স্থির করতে। সিন্ধুর যাওয়ার দিন স্থির হয়ে গেল। কিন্তু সকলে আশ্চর্য্য হ'ল সিন্ধুর কান্না দেখে। ঠাকুরমা জিজ্ঞেস করলেন, সিন্ধু, কাঁদ কেন দিদি?

—আমি যাব না ঠাকুমা।

—ছি দিদি…

—তোমরা যদি আমাকে পাঠিয়ে দাও তাহ'লে জলে ডুবে মরব…দেখো।…

সকলে শুনে আশ্চর্য্য হ'ল; সিন্ধুর কাছ থেকে এরকমটা কেউ আশা করে নি। মদনও আশ্চর্য্য হয়ে ফিরে গেল। মথুর ক্রুদ্ধ হয়ে অনেক বকাবকি করলে, সাবিত্রী অনেক বোঝালে, কিন্তু সিন্ধু কেবল কেঁদে অস্থির। কিছুতেই সে যাবে না। বিয়ের পরেই সেই যে ক-দিন সাগরগ্রামে গিয়েছিল—কত ভয়েই যে কেটেছে তার। তবু ছোট ছোট দুটি ভাই-বোন তখন তার কাছে ছিল। কমলপুরের এই পরিচিত ভরা সংসারটি ছেড়ে সেখানে তার কোন রকমেই মন টেকে নি। সাগরগ্রামের অপরিচিত আতঙ্কিত আবহাওয়ার মধ্যে কমলপুরের পরিচিত পথ-ঘাট, আশৈশব স্মৃতিজড়িত গৃহকোণ, কত দিনের কত কাহিনী যেন একসঙ্গে গলা মিলিয়ে ডাকত, সিন্…ধু…উ…

তার পর…

মদন আবার এক দিন এল। ইতিমধ্যে অনেক বার সে সিন্ধুকে আনতে এসে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছে। সিন্ধুর সেই এক গোঁ—কিছুতেই যাবে না। আশায় আশায় তবু আবার সে এসেছে। ডান হাতটা গলায় ঝোলান—এবং দুটো হাতেই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। পড়ল একেবারে সিন্ধুর সামনে। সিন্ধু ভয়ে কাঠ। মদন মৃদু গলায় বললে, এবার দেখব, কেমন যাবে না—কথা না আদায় ক'রে আজ আর ছাড়ছি নে। দেখছ ত দুটি হাতই আমার খোঁড়া, দুটি খেতেও জোটে না।

বেচারী এই ক-টা কথা বলবারও সুযোগ পায় নি এত দিন—সিন্ধু এমনি এড়িয়ে গিয়েছে। আজও সিন্ধু বিশেষ সুযোগ দিল না—ভয়ে সে ছুটে পালাল। আর একটি কথা বলবারও সুযোগ দিল না মদনকে। তার ছুটের বহর দেখে এবং কোন উত্তর না-পেয়ে ঠাকুরমা বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলে, মদন বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে। আদর ক'রে তাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরমা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাতে কি হ'ল মদন?

মদন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—বাঁ হাতটা আগুনে পুড়ে গিয়েছে। আবার এমনি সময়, সেদিন জল আনতে গিয়ে পড়ে যাই—ডান হাতটাও ভেঙে গেল। ক-দিন এক রকম উপবাসেই…বলে ম্লান হাসল সে।

শুনে সকলে দোষ দিল সিন্ধুকে। মথুর হাঁক-ডাক ক'রে বললে, এবার যদি ও 'যাব না' বলে তাহ'লে রক্ষে রাখব না আমি আর…দেখি, কেমন বজ্জাত মেয়ে।

সকলের অনুযোগের তাড়নায় সিন্ধু শেষকালে কেঁদে ফেলে বললে—আচ্ছা যাব। এর পর সব আমার মরা মুখ দেখতে পাবে।

খবর শুনে মদন মুখ শুকনো ক'রে উঠে দাঁড়াল। বললে, আমি আজ যাই তা হ'লে।

এমনি ক'রেই মদন অনেক বার ফিরে গিয়েছে। তাকে থাকতে বলার মত মুখও সিন্ধু রাখে নি। তবুও ঠাকুরমা বললে, এ-পর্য্যন্ত ত শ্বশুরবাড়ীতে একটা রাতও কখনো কাটল না—সেই যা বিয়ের দিনটি ছাড়া। বৌ পেলে না ব'লে কি থাক্‌তে নেই দাদা—সন্ধ্যেও হয়ে গিয়েছে, আজকে থাক মদন। দুটি হাতই তোমার আবার খোঁড়া—না সারা পর্য্যন্ত থাক না এইখানে ক-দিন?

অন্য দিন হ'লে মদন এই কথায় কত আপত্তিই যে তুলত তার ঠিক নাই। আজ কিন্তু ব'লে বসল, তোমার কথা ঠেলব না ঠাক্‌মা—আজকের রাতটি কেবল থাক্‌তে পারি। কাল ভোরে কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে।

মদন কিন্তু তার পর দিনও রইল—তার পর দিনও। তার যাওয়ার দিন সকালে সিন্ধু ঠাকুরমার কানে কানে সলজ্জে বললে, বাবাকে একটা নৌকা ঠিক করতে ব'লে দাও ঠাক্‌মা…

—সে আবার কি হবে?

—আমি যাব।

—কোথায় যাবি?

—জানি নে যাঃ।

বৃদ্ধা ভাঙা গলায় হেসে বললে—শ্বশুরবাড়ী যাবি? সত্যি? ও সৌমা…ও মথুর…হ্যা ভাই, দুটি দিন তার ছায়াই মাড়ালি না—হঠাৎ শেষের একটা রাত্রিতে এমনি ক'রে দিলে? দেখি তোর মাথা—শিঙ বেরিয়েছে নাকি? মদন নিশ্চয়ই গুণ-বিদ্যে জানে।

হয়ত তাই। কেবল একটি রাত্রিতেই সিন্ধু বুঝেছে—এ-লোকটিকে ভয় করবার কোথাও কিছু নেই। এমন আমুদে, এমন হালকা স্বভাবের লোক জীবনে আর সে দুটি দেখে নি।

বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন—মদনের হাত এখন কেমন আছে সিন্ধু?—ভাল ত?

সিন্ধু হেসে লুটিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে—দূ—র, হাতে কিছু হয় নি। যাত্রার দলের ছেলে বটে! খালি আমাকে কোন রকমে নিয়ে যাওয়ার জন্তে··· তোর পায়ে পড়ি ঠাক্‌মা, কারুকে বলিস নি—বলতে মানা ক'রে দিয়েছে।

—বটে! তাই হাত ধোয়ার কথা বললে বল্‌ত, ডাক্তার খুলতে মানা ক'রে দিয়েছে। শেষ কালে আমাকে গিয়ে খাইয়ে দিয়ে আসতে হ'ত। তার পর···ছুটিতে কি মতলব হ'ল?

—জানি নে যাঃ। আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে···

—সে ত পাবেই গো। সারা রাত কি আর ঘুম···

সিন্ধু বৃদ্ধার মুখ চেপে ধরল। মথুর দরজার সুমুখে দাঁড়িয়ে বললে, আমাকে ডেকেছিলে মা?

—হ্যাঁ রে, ডেকেছিলাম বই কি। তোর মেয়ে-জামাই যাবে—একটা নৌকা ঠিক কর।

তার পর···

এমন এক দিন এল যখন কমলপুরের সমস্ত স্মৃতি সিন্ধুর বিস্মৃতি-সাগরের গভীর তলায় তলিয়ে গেল। নির্জন গৃহকোণে স্বপ্নাতুর মন যখন দূর বনান্তের ডাহুকের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে কমলপুরের পথ খুঁজে খুঁজে ছুটত, ঘনবর্ষার মেঘলা দিনে শিশুদের কোলাহলমুখর একটি অতিপরিচিত প্রাঙ্গণে ঘুরে ঘুরে বেড়াত, দূর শৈশবের কত ছেঁড়া টুকরো স্মৃতি চোখে স্বপ্নের মত ঘনিয়ে আসত তখন মদন ঘন শ্রাবণের ভরা চাষের সমস্ত কাজ ফেলে ঘরে এসে তার লোভনীয় দুর্দান্ত স্বভাব দিয়ে সিন্ধুকে টেনে আনত তার স্বপ্নাচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে আর এক নূতন পরিবেশে।

প্রতিবেশীদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি বর্ষার জলে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে, কাগজের নৌকা তৈরি ক'রে জলে ভাসিয়ে আনন্দে হেসে উঠছে—সেই দিকে তাকিয়ে সিন্ধু কেমন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায়।

···সিন্ধুদি, আমাকে একটা নৌকা তৈরি ক'রে দাও না।

—দিদি, আমাকে একটা।

—দিদি আমাকে···

—ইস্, এক একটা নৌকায় পাঁচটা ক'রে জামরুল—দিবি এনে?

—হঁ দেব। উঃ অনেক জামরুল হয়েছে দিদি—চল্ আনি। যাবি?—

—ও সিন্—ধু—উ, ওরে ভিজিস্‌নে জলে···ও সিন্ধু—উ···

—যাই মা···

কিন্তু কমলপুরের সমস্ত স্বপ্ন মদনের প্রশস্ত বক্ষের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়, মদনের বক্ষের দ্রুত স্পন্দন বহু দূরের একটি প্রাঙ্গণের সমস্ত শিশুচপল কোলাহলকে স্তব্ধ ক'রে দেয়। সেখান থেকে কমলপুরের সেই ছায়াম্লান কুটীরটি বহু দূরে···বহু দূরে।

মাঝে মাঝে সিন্ধুর ভাইরা আসে। একবার বললে, দিদি, কবে যাবি বল্—নৌকা সেই মত ঠিক করব। ঠাক্‌মা তোকে দেখবার জন্তে এমন হয়েছে···আসবার সময় মা-ও কেঁদেকেটে অস্থির।

সিন্ধু বহুবার ভাইদের হতাশ ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছে কিন্তু এবার ভাইটি নাছোড়বান্দা। বললে, কবে যাবি তা হ'লে দিদি?

—তোর জামাইবাবু কি বলে?

—বললে, যাবে ত যাক।

সিন্ধু কেমন দমে গেল—বলল, এই কথা বললে! আর সে নিজে?

—যেতে পারবে না। বললে—সবাই গেলে চলবে কি ক'রে। অনেক ক'রে বললাম —কিছুতেই না।

এখন কোন রকমেই যাওয়া হ'তে পারে না, ব'লে সিন্ধু ভাইটিকে পাঠিয়ে দিলে। স্বামীর উপরে ভারি অভিমান হ'ল তার। যার অনুপস্থিতির কল্পনায় সে যেতে চায় না—মর্মে মর্মে যার অভাব অনুভব

ক'রে এই ভীরু নির্ব্বোধ পল্লীবাসিনীটির অন্তর খাঁ খাঁ করে—সেই লোকটা তাকে এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে!

এমন সময় মদন এসে জিজ্ঞেস করলে—ভাইটিকে কবে আসতে বললি?

কোন উত্তর নেই।

মদন ফের বলল—ভাই বা—অনেক দিন যাস্ নি। তা কবে আসতে বললি?

কোন উত্তর এবারেও নেই! সিন্ধু সেই যে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে আছে, একটা কথারও জবাব দিলে না। বরং মনে হ'ল সে যেন কাঁদছে। আশ্চর্য্য হয়ে মদন বললে—কি হ'ল আবার! জোর ক'রে সিন্ধুর মুখ ঘুরিয়ে বললে—শোন কথা—তোর ভাইকে ত আমি 'না' বলি নি। বরং খুশী হয়ে বললাম—যেতে চায় যাক।

সিন্ধু ফুঁপিয়ে বললে—জানি—তাড়াতে পারলেই বাঁচো।

নূতন রকম কথা। অথচ এই সিন্ধু এক দিন এখানে আসবার নাম শুনে কেঁদে অস্থির হয়েছিল। কিন্তু মদন ত জানে না, সে তার অজ্ঞাতে কোন এক মায়ামন্ত্রে সিন্ধুর সমস্ত স্বপ্নময় অতীতকে ভুলিয়ে এক নূতন মায়াময় জগৎ তার চোখের সুমুখে প্রতিদিন প্রতিক্ষণে সৃষ্টি ক'রে চলেছে। মদন সিন্ধুর মুখের উপরে ঝুঁকে বললে, তোকে কোথাও যেতে দেবো না—আর নিজে ত যাত্রা আখড়া···কাজকর্ম্ম সব ছেড়েছি। এবার তোর ভাই এলে তার যদি না ঠ্যাং ভাঙি···

সিন্ধু সহজ ভাবে তবু কথা কইল না। শেষকালে মদন বললে, চললাম এক্ষুনি কমলপুর—আজই তোর ভাইকে ডেকে আনব, কালই তুই বিদেয় হ। অমন বোবা বৌয়ে আমার দরকার নেই।

মদন বেরিয়ে গেল ছাতা-লাঠি নিয়ে।

সন্ধ্যের দিকে বাইরের উঠানে কোমল কণ্ঠে কে ডাকল, দিদি···

কর্ম্মব্যস্ত সিন্ধু চমকে উঠল। স্বামী সত্যিই কমলপুরে গিয়ে ভাইকে ডেকে আনলে নাকি!

ফের ডাক এল—দিদি···

—কে রে···ব'লে সিন্ধু বাইরে এসেই হেসে ফেললে। মদন গলা সরু ক'রে ফের ডাকছে।

—কেমন, হাসলি ত! আরে···আমি হলাম, যাত্রার দলের ছেলে—পারবি আমার সঙ্গে? বাকী কথাটা তো?—তাও দেখ···

—উ হু হু···বলব বলব—কথা বলব···

—দেখ, কথাও বললি।

অল্পবয়সী উচ্ছল হাসি দু-জনের—অন্তরের সমস্ত নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতা উদ্দাম যৌবনের পূর্ণ মিলনানন্দে হাসি হয়ে বেরিয়ে এল যেন।

তার পর সিন্ধু শান্ত কণ্ঠে বললে, যাই এবার—অনেক কাজ পড়ে আছে।

ওদের পরিপূর্ণ শান্তির কুটীরটি ঘিরে নির্জ্জন পল্লীর নিঝুম রাত্রি নেমে এল।

মদন একটু আলসে প্রকৃতির মানুষ—কাজে তার মন লাগে না। কাজের কথা বললেই সে চটে ওঠে। সিন্ধু তা বোঝে—কিন্তু সে হঠাৎ সেদিন মদনের সেই দুর্ব্বল স্থানটায় আঘাত দিয়ে বসল, এবং যখন মদন গম্ভীর হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল তখন তীব্র অনুশোচনায় তার অন্তর ও মন একেবারে রসলেশহীন হয়ে গেল। মদন তার ইচ্ছেমত যা খুশী করে—সিন্ধু পূর্ব্বে কোনদিনই তা নিয়ে অনুযোগ করে নি।

সারা দিন গেল, মদন বাড়ী এল না—নানান দুশ্চিন্তায় সিন্ধুর মন ভরে গেল। শেষকালে সন্ধ্যেও হ'ল—তবু মদনের দেখা নেই। ক্ষমার অযোগ্য ভীরু অপরাধীর মত সারাটা দিন অপেক্ষায় অপেক্ষায় কাটল, নিজের অসংযত উদ্ধত স্বভাবকে শতবার গালাগালি দিয়েও মন তার শান্তি পেল না। চোখে জলের ধারা নামল। এমন সময় মদনের দীর্ঘ মূর্ত্তি প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল। চোখের জল মুছে সিন্ধু উঠে দাঁড়াল—স্বামীর পরিশ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল কিন্তু মদন সে-সব যেন লক্ষ্যেই আনল না। সে একটি কথাও কইলে না—ট্যাঁক থেকে সেদিনের রোজগার সিন্ধুর পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাত-পা ধুতে চলে গেল। সিন্ধুর সারা দেহ-মন প্লাবিত ক'রে সারা

দিনের পর যে আনন্দের জোয়ার এসেছিল তা কোথায় হারিয়ে গেল যেন। ভীরু সিন্ধুর চোখ-দুটি ভয়ে কেমন এক রকম ম্লান হয়ে গেল।

মদন কোন দিকে চাইলে না—নীরবে খাওয়া শেষ ক'রে উঠল। সে জানলে না যে ভাতের থালা দিয়ে যাওয়ার সময় সিন্ধুর চোখ জলে ঝাপসা হয়ে উঠেছিল, ভীরু মেয়েটির অবরুদ্ধ দুঃখের ক্রন্দন উথলে উঠেছিল। উঠানে এসেই সে কিন্তু থমকে দাঁড়াল এবং এইটারই এতক্ষণ যেন প্রতীক্ষা করছিল। সিন্ধু ঠিক তার পায়ের নীচেই ফুলে ফুলে কাঁদছে। মদন বললে—কি হ'ল—কান্না কিসের?

সিন্ধু ভেঙে পড়ল। অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বললে—আমাকে দূর ক'রে দাও···মার···আমি আর এমন কথা বলব না।

—তুই তো খারাপ কথা কিছু বলিস নি। সত্যিই তো—না খাটলে কি হাওয়া খেয়ে চলবে?

—হ্যাঁ চলবে···তুমি আর যেও না···আমি একলা···

—আচ্ছা আচ্ছা—তাই হবে। ওঠ্ দেখি···ও-বেলা খেয়েছিস?

ছোট্ট মেয়ের মত সিন্ধু ফুঁপিয়ে অস্থির। কম্প্র কণ্ঠে বললে, না···

—সে জানি। চল্ খাবি চল্···

কিছুক্ষণ পরে সিন্ধু শান্ত হ'ল।

সিন্ধু খাওয়া শেষ ক'রে বাইরে এসে দেখলে মদন সেই রাত্রে দিব্যি কোদাল নিয়ে মাটি কোপানোয় লেগে গিয়েছে।

সিন্ধু এবার হেসে ফেললে। বললে, কি রাগ! থমকে বললে, এই রাত্রে ফের ঐ সব—উঠে এস বলছি।

মদন গম্ভীর কণ্ঠে বললে, বর্ষা নামতে আর দেরি নেই রে—বেগুন শাক পাত কিছু কিছু দিতে হবে তো? না, আর বছরের মত···

—তা আজই তার কি?

—বাঃ! একটু একটু ক'রে কাজ এগিয়ে রাখা ভাল।

সিন্ধু এগিয়ে গিয়ে মদনের হাত থেকে কোদালটা কেড়ে নিলে—বললে, আমি কোপাব—সরো। তার পর কোমরে কাপড় জড়িয়ে লেগে গেল কোপাতে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে হেসে কোদালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, দূ-র, রাত হয়েছে—চল।

মদন কোন কথা কইলে না—কোন রকমে হাসি চেপে কোদালটা আবার কুড়িয়ে এনে নীরবে নিজের কাজে লেগে গেল। সিন্ধু সেটুকু লক্ষ্য ক'রে চলে যেতে যেতে ব'লে গেল, কবাটে খিল দিয়ে আমি শুলাম।

সিন্ধু ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল—তবে খিল বন্ধ করবার কোন শব্দ পাওয়া গেল না। মদন বিদ্রূপভরা কণ্ঠে জোরে হেসে উঠল।

দিব্যি ফুটফুটে জ্যোৎস্না—কাজের কোন অসুবিধে হচ্ছিল না মদনের। কিছুক্ষণ একমনে কাজ ক'রে যাওয়ার পর হঠাৎ কি একটা শব্দে চমকে উঠল সে। পিছন ফিরে তাকিয়ে ভয়ে সে কাঠ মেরে গেল। ভারি সুন্দর জ্যোৎস্না—বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, শিউলি গাছটার তলায় কে এক জন দাঁড়িয়ে আছে; দীর্ঘ আলখাল্লা—মাথায় মস্ত পাগড়ি, এক হাতে কমণ্ডলু—অন্য হাতে চিমটা, নির্ঘাৎ সন্ন্যাসী। কিন্তু এত রাতে কোথা থেকে! নির্জ্জন পল্লীর জ্যোৎস্নাবিধৌত রাত্রি ঝিম্ ঝিম্ করছে—কোথাও একটু সাড়া-শব্দ নেই। সন্ন্যাসী কথাও বলে না, নড়েও না, এক ভাবে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মদনেরও সেই অবস্থা—ভয়ে তার সমস্ত বুদ্ধি লোপ পেয়ে গিয়েছে।

সন্ন্যাসী হঠাৎ হেসে উঠল—তার পর মদনকে তার দিকে এগোতে দেখে ছুটল, পিছনে পিছনে মদনও। তাদের দুজনের হালকা হাসিতে সেই নির্জ্জন রাত্রির গভীর মৌন ভেঙে যেন টুকরো টুকরো হয়ে গেল। মদনের যাত্রার পোষাক নিয়ে সিন্ধু সন্ন্যাসী সেজে অমন ভয় দেখাবে—এ মদনের ধারণাতীত, বেচারার ভয়ের সীমা ছিল না।

ছুটতে ছুটতে দু-জনেই এক সময়ে থমকে দাঁড়াল—পাগলা হাসিও থামল। সুমুখে অন্য এক তৃতীয় ব্যক্তি, হাতে দীর্ঘ লাঠি।

সিন্ধু লজ্জায় ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

তৃতীয় ব্যক্তি মথুর। হতভম্বের মত বললে—কে, মদন নাকি! সন্ন্যাসীর মত কে একটা ছুটে পালাল না? চোর-টোর···

—না, মানে···ইয়ে···কিছু না··· মদন স্বভাব-মত মাথা চুলকে অস্থির। খানিকটা সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, তার পর? হঠাৎ এত রাতে?

—আর বাবা—সিন্ধুর ঠাকুমার বড় খারাপ অবস্থা। কাল সকালেই সিন্ধুকে একবার পাঠাতে হবে মদন—আর তুমিও···

—আসুন···

মথুরকে বসিয়ে মদন ঘরে ঢুকল। সিন্ধু মৃদু কণ্ঠে বললে—ছি ছি বাবা চিনতে পারে নি তো?

—বোধ হয় পেরেছে। বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস করলেন না তো।

—ছি ছি—তোমার জন্যে···

—কেন, আমি আবার কি করলাম?

—আমি ভাল ভাবে ডাকলাম যখন—তখন উঠে এলে না কেন? সেই তো এলে—না আসতে, বুঝতাম—পুরুষ বটে!···

—ফের চটিয়ে দিচ্ছিস্। রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না ব'লে দিচ্ছি।

—আহা, কি রাগী মানুষ আমার—সাধে কি লোকে যা-তা বলে! মিথ্যে আমাকে শুদ্ধ জড়ায়।

—হ্যাঃ, তারা বলবে না কেন। ওরা আমাদের দেখে হিংসে করে যে!···

—যাক্ গে—বাবা হঠাৎ এত রাতে কেন?

—তোর ঠাকুমার অবস্থা বড় খারাপ···বাইরে আয়···

মথুর সেই রাত্রেই বিদায় নিলে—বাড়ীতে অসুখ, থাকতে পারলে না। ব'লে গেল, কাল সকালে ডাক্তারের কাছে আসতে হবে—তোরা সব তৈরি হয়ে থাকিস্ সিন্ধু। আমিই হয়ত আসব। এখুনি একবার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে আমায়।

তার পরদিন আবার মথুর এল।

সিন্ধুর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে মদন হেসে ফেলতে সে জিজ্ঞেস ক'রল, হাসলে যে!

—দেখি, এবার তুই যাস কি না। হুঁ হুঁ—আমি যাচ্ছি নে···

—তা যাবে কেন। যে তোমার বিয়ে দিলে তার শেষ সময়ে···

—সে আমার নয়—তোর; তুই-ই তো···

—আমি কি?

মদন হেসে ফেললে—বললে, যাক, অত কথায় দরকার কি! তোকে পাঠিয়ে দিয়ে এবার দিব্যি থাকব—যাত্রা···আখড়া।···কে তোকে খেটে খাওয়ায় বাপু! এবার যা—দেখি কেমন ছেড়ে থাকতে পারিস্ নে।

নানান কারণে সিন্ধুর আজ মন খারাপ ছিল। মদনের কথায় চোখ তার ছলছল্ ক'রে উঠল—ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কেবল বললে, আচ্ছা।

তার পর মদন সেই যে ছুটি খেয়ে বেরিয়ে গেল—আর তার দেখাসাক্ষাৎ নেই। মথুর অপেক্ষা ক'রে ক'রে শেষকালে সিন্ধুকে নিয়ে নৌকায় গিয়ে উঠ্‌ল। ঘাটে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখা গেল—মদন ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে ছুটে আস্‌ছে। ডেকে বললে, ঘরের চাবিটা—চাবি।···

সিন্ধু ছইয়ের ভিতর থেকে বললে, ওকে নিয়ে যেতে বলে দাও বাবা।

অগত্যা মদন নৌকায় উঠল—ছইয়ের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে বললে, বারে—ঘরের চাবিটা দিয়ে যা।

—বোস, দিচ্ছি।

—না না, আর বসে কাজ নেই। বেলা কি আর আছে—পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। ব'লে ছইয়ের মধ্যে ঢুকে বসে পড়ল।

তার পর···

বড্ড মাথা ধরেছে—ব'লে মদনের প্রসারিত কোলের উপর টুপ ক'রে শুয়ে পড়ল সিন্ধু। মদন বিব্রত হয়ে বললে, আর দেরি করিস নে, ওঠ্, নৌকা এবার ছেড়ে দিক। আমি যাই—চাবিটা দে।

সিন্ধু আর নড়েও না, কথাও বলে না। মদনের কোমর হাত দিয়ে জড়িয়ে কোলে মুখ গুঁজে পড়ে আছে—মাঝে মাঝে ফোঁস ফোঁস করছে—মনে হ'ল, কাঁদছে।

মদন বিব্রত হয়ে বললে—কি পাগলামি করিস—অমনি করলেই কি আমি তোর সঙ্গে যাব না কি! জামা-কাপড় সব ঘরে রয়ে গেল—আমি কি এমনি যাব? হ্যাঁ—বুঝতাম, জামা-কাপড়টা বুদ্ধি ক'রে এনেছিস—তা হ'লে যেতাম।

সিন্ধু মুখ তুলে এবার খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠল। বললে, জামা-কাপড় তোমার এনেছি গো—ছুঁয়ে কথা দিয়েছ, চুপ ক'রে অমনি বসে থাক। সত্যি আমার বড্ড মাথা ধরেছে।

এমন সময় বাইরে থেকে মথুর বললে, মদন···তাহ'লে আমরা নৌকা ছেড়ে দিই···জোয়ার এল বলে।

সিন্ধু আর মদন মুখোমুখি চাইলে—সিন্ধু সলজ্জ হেসে মদনের কোলে মুখ ঢাকল। মদন আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললে—মানে ইয়ে···তা হ'লে···আমিও যাব। মানে··· মদন মাথা চুলকাল।

ক্রন্দনরতা সিন্ধু অমন ভাবে হেসে উঠে মদনকে এমন অবস্থায় ফেলবে—এ তার ধারণাতীত। সিন্ধুর চুলগুলি নাড়তে নাড়তে বললে, সেদিন মন্মথ বলছিল, শহরের কোন একটা থিয়েটার পার্টিতে ঢুকতে পারলে নামও আছে—পয়সাও আছে। যাওয়ার আমার খুব ইচ্ছে। আমি যদি সত্যিই চলে যাই—তুই কি করবি বল্‌ত?

—আমি যেতে দেব না।

তার পর···

কিন্তু হতভাগিনী সিন্ধু শেষ পর্য্যন্ত অভিনয়প্রিয় স্বামীটিকে কোন বন্ধন দিয়েই ধরে রাখতে পারি নি। বহুদিন পূর্ব্বে আমার কোন এক দূরাত্মীয়া পল্লীবাসিনীর কাছ থেকে আমি এই রকম একটি কাহিনী শুনেছিলাম এবং আমার দৃঢ় ধারণা হ'ল, এই চিঠির সঙ্গে কাহিনীটির একটা মস্ত যোগসূত্র আছে। পত্রপ্রেরকের নামটাও আমার কাহিনীর 'সিন্ধু' নামটির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। চিঠিটিও পড়ে বুঝলাম, চিঠির নায়ক মস্ত একটা অভিনেতা হবার আশা পোষণ ক'রে তার কুটীর এবং কুটীর-বাসিনীটিকে ত্যাগ ক'রে কোথায় চলে গিয়েছেন—কুটীরবাসিনীটি কোন একটি ছেলেকে দিয়ে লিখিয়ে স্বামীর নামে এ-চিঠিখানি পাঠিয়েছে।

অজ্ঞাত এক পল্লীবাসিনীর বেদনায় প্রান্তর-স্পন্দিত শালবনের ক্ষ্যাপা বাতাসের মত অন্তর আমার হু হু ক'রে উঠল। এ কোন্ হতভাগিনীর পত্রদূত আমার বিস্মৃতির সাগর সন্তরণ ক'রে কার স্বপ্নরোমাঞ্চিত দিনগুলি আমার চোখের সম্মুখে ছেড়ে দিয়ে গেল! কত দিনের দেশদেশান্তরের সন্ধান আমার নিঃসঙ্গ এই প্রবাসের সন্ধ্যাটিতে শেষ হ'ল—এ-চিঠি আমি কাকে দেব—কোথায় পাঠাব। কত দীর্ঘ রাত্রি আর কত দীর্ঘ দিন ধরে কোথায় কে তার সমস্ত জাগ্রত চেতনা দিয়ে অপেক্ষা ক'রে রইবে! মনে মনে তারই একটি উদাসী পাণ্ডুর ছবি ধীরে ধীরে গড়ে তুললাম। সহসা আমার মনে হ'ল, আমার এই দূরন্ত প্রবাসের ঘনায়মান নিঃসঙ্গ নির্জ্জন সন্ধ্যাটি, চোখের সুমুখের ওই ছায়ার মত দিগন্তলীন গিরিশ্রেণী আর ধূ ধূ প্রান্তর, ওই স্তব্ধ নীল নভতল··· চতুর্দ্দিকের সন্ধ্যাস্তব্ধ পৃথিবী কার অপেক্ষায় যেন থম্ থম্ করছে; কে যেন আসবে।

সমস্ত দৃষ্টিশক্তি নিয়োজিত ক'রে সন্ধ্যার ম্লানালোকে চিঠির শেষাংশটুকু আর একবার পড়বার চেষ্টা করলাম—"ওগো, এ হতভাগিনীকে ভুলিও না। তুমি কবে আসিবে। তুমি চিঠি পাইয়াই চলিয়া আসিও—আমি আর পারি না"···

জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল—আর কিছু দেখা গেল না।

বঙ্কিম-স্মৃতি

শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

তখন আমি ফিফ্‌থ্‌ ক্লাসে পড়ি। বয়স ১১।১২ বৎসর। বঙ্কিম-বাবু যে গলিতে থাকতেন তারই একটা বাড়ীতে আমরা কিছু দিনের জন্ম ভাড়াটিয়া হয়ে ছিলাম। রোজ দেখতাম সকালে দশটার সময়ে এক জন সুপুরুষ চোগা-চাপকান প'রে বঙ্কিম ভঙ্গীতে আপিসে যান ও বিকালে ফিরে আসেন। আমাদের গলিটা ছিল কাণা, ভিতরে গাড়ী ঢুকত না; গলির মোড়ে কলেজ ষ্ট্রীটে গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকত। এই লোকটির দুটি বিশিষ্টতা আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল। প্রথম, তাঁর পাগড়ি মাথায় দিবার ভঙ্গী। সাধারণ লোকের ন্যায় তিনি সামনের সব চুল ঢেকে পাগড়ি পরতেন না; সামনের চুল কিছু বাহির ক'রে মাথার মধ্যস্থলে পাগড়ি পরতেন। দ্বিতীয়, এক জন চাকর এক কুঁজা জল রূপার গেলাস ঢাকা দিয়ে পিছনে পিছনে নিয়ে যেত ও আসত। জানলাম ইনি বঙ্কিম-বাবু। চিনতে একটুও বিলম্ব হ'ল না। আমি ঐ বয়সেই তাঁর সমস্ত উপন্যাস দু-তিন বার প'ড়ে ফেলেছিলাম। এবং বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রের বাড়ীর বর্ণনার অনুকরণ ক'রে আমি একখানি উপন্যাসও লিখতে আরম্ভ করেছিলাম।

বঙ্কিম-বাবু রোজ দেখেন রবি-বাবুর ডাকঘরের অমলের মতো একটি ছেলে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে। এক দিন তিনি আপিস হ'তে ফিরবার সময়ে হাসিমুখে আমার কাছে এসে মাথায় হাত দিয়ে বললেন—তুমি খেলা করো না? আমি বললাম—না। তিনি বললেন—তুমি রোজ বিকেলে আমাদের বাড়ী যেয়ো, আমার নাতিদের সঙ্গে খেলবে।

আমি ছেলেবেলায় বড় মুখচোরা ছিলাম। এই সুযোগ যদি নিতাম তা হ'লে এই মহাপুরুষের কত পরিচয় পেতাম। আমার দুর্ভাগ্য!

এর কিছু দিন পরে সীতারাম বার হ'ল। পড়বার জন্ম মন ছট্‌ফট্‌ করছিল। তিনটি টাকা সংগ্রহ ক'রে বই কিনতে গেলাম বঙ্কিম-বাবুর কাছে। গিয়ে দেখি প্রশস্ত উঠানের উপরে দালানে একখানি মার্ব্বেল-পাথরের চৌকী পেতে ফতুয়া গায়ে দিয়ে বঙ্কিম-বাবু আলবোলায় তামাক খাচ্ছেন। আমাকে দেখেই সাদরে আহ্বান করলেন—খেলতে এসেছ? এস। আমি বললাম—না, আমি খেলতে আসি নি। একখানা সীতারাম কিনতে এসেছি। অমনি বঙ্কিম-বাবু রুষ্ট হয়ে কড়া স্বরে বললেন—আমি তো বই বেচি না। বই বেচে লাইব্রেরিতে। আমি অপ্রতিভ হয়ে পালাবার উপক্রম করছিলাম। তিনি আবার বললেন—তুমি ও-বই কী করবে? ও-বই তো তোমার পড়বার নয়। ভয় পেয়ে মিথ্যা কথা বললাম—আমার জন্যে নয়, বাবার জন্যে। অথচ বাবা এসব খবরের বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। তখন তিনি বললেন—তাঁকে বোলো—আমি বই বিক্রি করি না। বই লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। আমি পালিয়ে এসে লাইব্রেরি থেকে একখানা বই সংগ্রহ করলাম আর স্কুল কামাই ক'রে সমস্ত দিনে বইখানা প'ড়ে শেষ করলাম। শিশুমনে দুটি বর্ণনা বড় বেশী চেপে বসেছিল, তাই এখনো মনে আছে। গঙ্গারাম প্রভৃতি কয়েদীরা জোড়া জোড়া পায়ের লাথি মেরে জেলখানার ফটক ভেঙে ফেলছে; আর শ্রী গাছের ডালে দাঁড়িয়ে আঁচল উড়িয়ে কেবলি বলছে—মার মার শত্রু মার, মার মার দেশের শত্রু মার।*

* ঢাকার বঙ্কিম-শতবার্ষিকী সভায় পঠিত।

জাপান ভ্রমণ

শ্রীশান্তা দেবী

১২ই ফেব্রুয়ারী "চিচিবুমারু" জাহাজে আমার স্বামীর ইয়োকোহামা থেকে হনলুলু অভিমুখে যাত্রা করবার কথা। সেই দিনই দুপুরবেলা আমরা "ওমোরি হোটেল" ছেড়ে যাব। একটি গ্যাট্টাগোট্টা জাপানী ঝি আমাদের জিনিষপত্র গুছিয়ে হোটেল থেকে মজুমদার মহাশয়ের বাড়ী নিয়ে চলে গেল। তার পরই আমরা সকলে একটা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে ইয়োকোহামা চললাম। মজুমদার-দম্পতিও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমেরিকার পথে যাওয়া-আসার প্রকাণ্ড বন্দর ইয়োকোহামা। টোকিও ষ্টেশন থেকে এই ষ্টেশনটি আঠার মাইল মাত্র দূরে। কিন্তু টোকিওতে মাঝে মাঝে নানা দিকের নানা ষ্টেশন আছে, ইয়োকোহামাতেও তাই। সুতরাং একটির বিশেষ এক পাড়া থেকে অন্যটির বিশেষ কোন পাড়া কত দূর বলা শক্ত। আমরা ওমোরি ষ্টেশন থেকে যখন ট্রেনে যাওয়া-আসা করতাম, তখন মাঝখানে চার-পাঁচটি ষ্টেশন পড়ত। টোকিও এবং ইয়োকোহামার মধ্যের রেল-লাইন বোধ হয় জাপানে প্রাচীনতম রেলপথ। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই পথ তৈয়ারী হয়। এখন এই পথে সাধারণ ট্রেন ছাড়া কয়েক মিনিট অন্তর বৈদ্যুতিক ট্রেন সারাদিনই চলে। আমরা প্রাত্যহিক ভ্রমণে বৈদ্যুতিক ট্রেনেই যেতাম। অধিকাংশ মানুষই ওখানে তাই করে।

ইয়োকোহামা টোকিওর এত কাছে ব'লে বেশীর ভাগ ভ্রমণকারী জাহাজ থেকে নেমেই টোকিও দেখতে চলে আসে, এবং যারা এ-পথে ফেরে তারা শুধু জাহাজে চড়বার জন্যে এখানে যায়, কাজেই ইয়োকোহামা দেখা কারও ভাল ক'রে হয় না। আমারও অনেকটা এই কারণে ভাল ক'রে দেখা হয় নি। এখানে যে-সব ভারতবাসী থাকেন তাঁদের বাড়ী আমি অনেকবার গিয়েছি, কিন্তু এত বড় শহরটার প্রায় কিছুই দেখি নি।

এখনকার ইয়োকোহামা একেবারে নূতন শহর। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পের সময় পুরান শহরটি একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। ভূমিকম্পের ধাক্কা কাটিয়েও যে-কয়েকটি বাড়ী টিঁকে ছিল তিনদিনব্যাপী প্রলয় অগ্নিকাণ্ডে সেগুলি ভস্মস্তূপে পরিণত হয়। ২১,৩৮৪টি মানুষ এই ব্যাপারে প্রাণ হারায় এবং প্রায় ১০০,০০০,০০০ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। কিন্তু জাপানীদের অধ্যবসায়, স্বদেশপ্রীতি ও পরিশ্রমে সেই ধ্বংসলীলাক্ষেত্রে আজ আগের চেয়েও অনেক বড় আর সুন্দর একটি শহর আবার গড়ে উঠেছে।

এখানে জাহাজের বন্দর ব'লে কোন কোন পাড়ায় টিনঢাকা গুদাম মানুষের চোখকে একটু পীড়া দেয় বটে, কিন্তু সুদৃশ্য বাগান, রাজপথ ইত্যাদির অভাব নাই।

আমরা সেদিন ইয়োকোহামা পৌছে প্রথমে জাহাজ-ঘাটের কাছেই একটা রেস্তোরাঁতে খেতে গেলাম, তাড়াহুড়োতে টোকিও থেকে খেয়ে আসা হয় নি। বাড়ীটা বেশ সুন্দর দেখতে। সদ্য আমেরিকা থেকে আগত এক দল সাহেব মেম অতি-আধুনিক পোষাক-আসাক প'রে নানা দিকে খেতে বসেছে। বাড়ীটার স্থাপত্য বেশ দেখবার মত। প্রকাণ্ড একটা হলের মাঝে মাঝে চৌকো কোণ কাটা কাটা মোটা মোটা থাম। কতকগুলি বসবার জায়গা একটু উঁচুতে, কতকগুলি নীচুতে। আমরা একটা উঁচু দেখে জায়গায় খেতে বসলাম। আমার মেয়েটি কিছুই খেল না। একটা চেয়ারে মাথা দিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে পড়ে রইল। এই বিদেশে শুধু মাকে সম্বল ক'রে থাকতে হবে মনে ক'রে তার মন একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। তাকে এক পেয়ালা জলও খাওয়ান গেল না।

খাবার সব তৈরি হ'তে যত সময় লাগছিল, জাহাজটা ততক্ষণ অপেক্ষা করবে মনে হ'ল না। কাজেই কিছু খেয়ে এবং কিছু সঙ্গে নিয়ে আমাদের উঠতে হ'ল।

'চিচিবুমারু' জাহাজ ঘাটে দাঁড়িয়ে ছিল। জাহাজঘাট লোকে লোকারণ্য। এত বড় প্রকাণ্ড জাহাজ আমি কখনও দেখি নি। যেমন উঁচু, তেমনই বড়। যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে আকাশ আর দেখা যায় না। আমরা জাহাজে উঠতেই আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা কয়েক জন আমেরিকান মহিলা আমাদের নূতন জাহাজ দেখাতে নিয়ে গেলেন। হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা হয়ে যায় তবু জাহাজের এ-মোড় থেকে ও-মোড় শেষ হয় না। ঠিক রাজপ্রাসাদের মত সাজানো বস্‌বার ঘর। জন-কয়েক নূতন লোকের সঙ্গে আলাপও হ'ল। কিন্তু আমার মেয়েটির তখন চোখের জলে এমন অবস্থা যে অন্য দিকে মন দেবার উপায় ছিল না। আমরা তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। জাপানীদের দেশে ছেলেপিলে কাঁদে না। তারা একটি বিদেশী মেয়েকে কাঁদতে দেখে অত্যন্ত অবাক্ হয়ে সবাই তাকাতে লাগল।

জাহাজ ছাড়বার আগেই আমরা জাহাজঘাট ছেড়ে চলে এলাম। দূরে বন্দর ও সমুদ্রতীরের সুন্দর বাগান দেখা যাচ্ছিল। আমাদের ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। তাতে ক'রে আমরা গেলাম ইয়োকোহামার জন-কয়েক ভারতীয়ের বাড়ী। মজুমদার-গৃহিণী তাঁদের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলেন।

কোবেতে যেমন এক-দল ভারতবাসী ব্যবসায়-উপলক্ষ্যে বসবাস করেন, এখানেও তেমনি এক দল আছেন। 'এখানে যাঁদের আমরা দেখলাম তাঁরা সকলেই সিন্ধী, সপরিবারে থাকেন। স্ত্রীকে ভারতবর্ষে রেখে জাপানে গিয়ে বসবাস করা শুনেছি জাপান-সরকার সম্প্রতি বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। এর কারণ সেখানে লোকমুখে যা শুনেছি, তা ভারতবাসীদের পক্ষে গৌরবের কথা নয়।

আমরা প্রথমে যাঁর বাড়ী গেলাম তাঁর নাম কেশব, পদবীটা মনে নাই। এই ভদ্রলোক এক সময়ে শান্তি-নিকেতনের ছাত্র ছিলেন। মাস-ছয়েক আগে ভারতবর্ষে ফিরে আশ্চর্য্য সুন্দরী একটি সতের বছরের মেয়েকে বিবাহ ক'রে নিয়ে গিয়েছেন। বিদেশে আমাদের দেশের মেয়ের এত সুন্দর চেহারা দেখলে আনন্দ হয়, কারণ ইউরোপের মত জাপানেরও অনেকের ধারণা ভারত-বাসীরা অত্যন্ত কুৎসিত জাতি। মেয়েটি হিন্দীতে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁর স্বামী বাংলা এবং ইংরেজী দু-ই বলেন। শান্তিনিকেতনে শিক্ষা লাভ করার জন্য তাঁর গৃহসজ্জা অন্যান্য সিন্ধিদের চেয়ে নয়নানন্দকর বোধ হ'ল। ঘরে গান্ধীজীর একটি ছবি আছে। নববধূর এই দূর দেশে নিঃসঙ্গ জীবন কষ্টকর হবে ব'লে তার দুই-তিনটি সাত-আট বৎসর বয়সের বোনও দিদির সঙ্গে জাপানে গিয়েছে। তারা সেখানেই স্কুলে পড়া-শুনা করে। বউটি বললে, "এখানে কি অদ্ভুত ভূমিকম্প হয় আপনি জানেন না। আমি দু-মাস এসেছি, এর মধ্যে সাতাশ বার ভূমিকম্প হয়েছে। প্রথম প্রথম আমি ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তাম, এখন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।"

এঁরা আমাদের চা বাদাম পেস্তা কমলালেবু বিস্কুট ইত্যাদি অনেক খাবার দিলেন। চায়ে জলের চেয়ে দুধের ভাগ অনেক বেশী।

তার পর আর এক ভদ্রলোকের বাড়ী গেলাম। তাঁর স্ত্রী বয়স্কা, হিন্দী কিংবা ইংরেজী জানেন না, জাপানী বলতে পারেন। তাঁর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে—একটির নাম ভগবান, একটির নাম সতী। সতী সেখানে কনভেন্টে পড়ে, জাপানী মেয়েদের মত সুন্দর স্বাস্থ্য, রক্ত যেন ফেটে পড়ছে, মেয়েটি খুব প্রফুল্লও। এঁরা ইয়োকোহামাতে জমি কিনে নিজেরা পাকা বাড়ী করেছেন। ঘরে আমাদের দেশের মত ভারী ভারী আসবাব। জুতা খোলার বালাই নেই, মাদুর নেই, গদি নেই। বাড়ীর মেয়েরা সর্ব্বাঙ্গে হীরার গহনা প'রে ব'সে আছেন। বিকাল হলেই জরি-পেড়ে শাড়ীর উপর ফার্-কোট প'রে পাড়ার অন্য স্বদেশীয়াদের সঙ্গে গল্প করতে বেরোন। বিশেষ কোন কাজকর্ম্ম নেই। ইয়োকোহামাতে গত এক মাসে পাঁচটি না ছয়টি ভারতীয় শিশুর জন্ম হয়েছে এক জন খবর দিলেন। এখানকার ভারতীয়ারা ইংরেজী কথা কেউ বলতে পারেন না দেখলাম, কিন্তু নমস্কার করলে সকলেই হ্যাণ্ডশেক্ করেন, এক জনও প্রতিনমস্কার করেন না। জাপানে—বিশেষত

[illegible]

শোয়া সুরু হ'ল। কাঠের ঘরের প্রত্যেকটি ফুটো বন্ধ ক'রে মাদুরের মেঝেয় জাপানী পদ্ধতিতে আমাদের বিছানা হ'ত। ভিতরে গরম জলের বোতল দিয়ে বিছানা গরম ক'রে রাখা হ'ত, এবং উপরে থাকত সাতটি লেপ। রাত্রে শোবার সময় গরম কাপড় প'রে এবং সেই সাতটি লেপের তলায় ঢুকে নিজেকে সমাধিস্থ মনে হ'ত, কিন্তু তার .কমে শীত যেত না। খাঁটি জাপানী বাড়ীতে বাক্সে ক'রে তুষের আগুন দিয়ে বিছানা গরম করা নিয়ম।

মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে কয়েকটি বাঙালী ছাত্রকে আসা-যাওয়া করতে দেখতাম। একটি ছেলে ওঁদের বাড়ীতেই থাকতেন। তার নাম কেশব মিত্র। এঁরা কেউ লোহার কাজ, কেউ খেলনা তৈরির কাজ, কেউ কাঠের কাজ শিখতেন। চিত্রবিদ্যা শিখবার জন্য শান্তি-নিকেতনের বিনোদবাবু টোকিওতে ছিলেন, কিন্তু তাঁকে আমরা দেখি নি। অন্য ছাত্রদের মুখে জাপান বিষয়ে অনেক গল্প শুনতাম। তাঁদের কারুর কারুর মতে জাপানে সত্তর-আশী ইয়েনে এক জন ছাত্রের
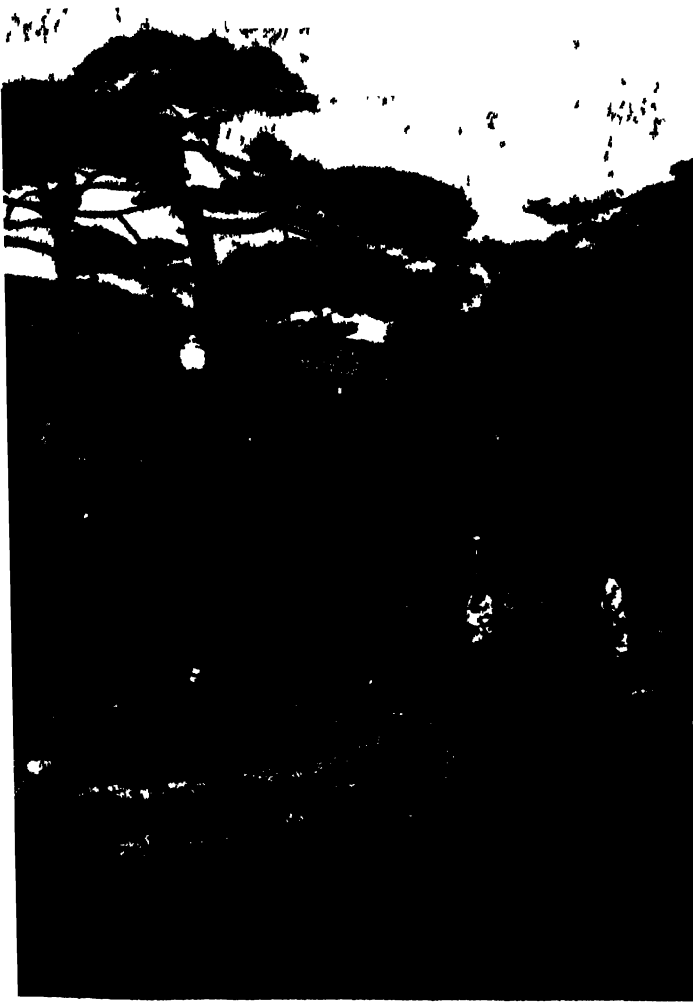
ইয়োকোহামাতে সুশিক্ষিতা ভারত-নারীর একান্ত অভাব, এটি বড় লজ্জার বিষয়।

সারাদিন ইয়োকোহামায় বেড়িয়ে আমরা সন্ধ্যায় ওমোরিতে ফিরে এলাম। ট্যাক্সিচালককে সাড়ে আট ইয়েন অর্থাৎ ছয় টাকা দশ আনা আন্দাজ দিতে হ'ল। লোকটা চল্লিশ মাইলের বেশী ঘুরেছিল এবং ঘণ্টা পাঁচ-ছয় সময় নিশ্চয় দিয়েছিল।

হোটেলে আমরা খাটে এবং গরম-করা ঘরে শুতাম। আজ থেকে আরম্ভ জাপানী ঘরে ও জাপানী বিছানায়

থাওয়া থাকা, কাপড়চোপড়, যাতায়াত ও শিক্ষার সব খরচ চলে যায়। অবশ্য সকলের মত এক নয়। যাঁরা যে ধরণে থাকেন তাঁদের খরচ সেই অনুপাতে কিছু কমবেশী হয়। এঁরা সকলেই জাপানীদের পরিশ্রম করবার ক্ষমতার প্রশংসা করতেন। যে-সব ফ্যাক্টরীতে এঁরা কাজ করেন সেখানে বিছানা থেকে 'উঠে মুখ ধুয়ে সামান্য প্রাতরাশ খেয়েই ছুটতে হয়। দুপুর বেলা এক ঘণ্টা খাবার ও বিশ্রামের

মেজি-সমাধিমন্দির

ছুটি। সে সময় কেউ বাড়ী ফেরে না, কাছাকাছি কোথাও খেয়ে নেয়। সন্ধ্যায় বোধ হয় সাতটায় ছুটি হয়। এই সময় কেউ বাড়ী ফিরে খাওয়া-দাওয়া করে, কেউ অন্য কোথাও খেয়ে সিনেমা কি আর কিছু দেখতে ছোটে।

ওমোরির থেকে কিছু দূরে হোমোন-জি মন্দির। আমরা মজুমদার-গৃহিণীকে সঙ্গে নিয়ে বাসে ক'রে ১৪ই মন্দির দেখতে বেরলাম। কোবের মত এখানেও মেয়েরাই বাসের টিকিট কাটে, দেখা শোনা করে। জায়গাটা বোধ হয় পাড়াগাঁ, শহরের মত অত ফিটফাট পথঘাট নয়, পথের পাশে পাশে ছোট নদীর মত চওড়া খোলা নর্দ্দমা, খাঁটি জাপানী ধরণের কাঠের ফটকওয়ালা কাঠের বাড়ী, পাড়াটা একটু বেশী ভিজে স্যাঁৎস্তেতে ধরণের। মন্দিরটি অথবা মন্দিরগুলি পাহাড়ের উপরে, চার-পাঁচ তলার চেয়েও বেশী সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হয়। অসুস্থ শরীর নিয়ে আমার ত উঠতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল। পাহাড়ের মাথাটা বেশ সমতল, প্রকাণ্ড এলাকা, অনেকগুলি মন্দির। একটি মন্দিরে সোনার গিল্টি করা ঝাড়লণ্ঠন ঝলমল করছে, কিন্তু কোনও মূর্ত্তি দেখতে পেলাম না। সেই মন্দিরটি থেকে বেরিয়ে অনেকখানি হেঁটে পিছনে আর একটি আগের মতই প্রকাণ্ড মন্দির, পাশে একটি তার চেয়ে ছোট মন্দিরে পুরোহিতরা জাপানী ফানুস ও নিশান দিয়ে মন্দির সাজাতে ব্যস্ত। তার পরদিনে বুদ্ধের নির্ব্বাণলাভের দিন, তাই বোধ হয় মন্দিরে কিছু একটা উৎসব ছিল।

তীর্থস্থানে ভিখারী যে এদেশে একেবারেই নেই তা নয়, পথের ধারে বাজনা বাজিয়ে ভিখারী গান করছে, কেউ বা কুকুর নিয়ে ব'সে আঁচল পেতে ভিক্ষা করছে। কিন্তু সব জড়িয়ে দুই-তিনটি মাত্র মানুষ, আমাদের দেশের মত দলে দলে ভিখারী নেই। কোবের মত এখানেও মন্দিরের সামনে পায়রার ঝাঁক, মেয়েরা খাবার ছড়িয়ে দিচ্ছে। মন্দিরের গায়ের কাছেই সমাধিস্থান; বোধ হয় এই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধু (saint) নিচিরেন ও তাঁর শিষ্যদের সমাধি এখানে আছে। শুনেছি 'সেণ্ট' নিচিরেনের চিতাভস্মের কিছু অংশ একটি মন্দিরের তলায় আছে। কাছেই জাপানী পোষাক পরা একজনের মূর্ত্তি। একটি আধুনিক মূর্ত্তিও আছে, সেটি ইউরোপীয় পোষাক পরা।

মন্দিরে পায়রার ভোজ

জাপানে মেয়েদের খালি পায়ে থাকা অত্যন্ত অসভ্যতা, মোজা ত সর্ব্বদাই প'রে থাকতে হয়। এই পাড়াতে একটা জলের কলের কাছে খালি পায়ে ছুটি একটি জাপানী মেয়েকে দেখলাম।

১৬ই বেলা সাড়ে এগারটার সময় ট্যাক্সি ক'রে টোকিওর দিকে যাওয়া গেল। এই সময় বাড়ীতে পুরুষরা কেউ থাকতেন না, আমরা তাই প্রত্যহই কোথাও না কোথাও বেড়াবার উদ্দেশ্যে তিন জনে বেরিয়ে পড়তাম। মিসেস মজুমদার পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর জাপানে থেকে কথা বলেন জাপানীদের মত এবং সর্ব্বত্র নির্ভয়ে বেড়াতেও পারেন, তাই আমরা মা মেয়েতে তাঁকেই নিয়ে ঘুরতাম। ওমোরির দিকের সরু সরু পথ, স্যাঁৎস্যেঁতে জমি পার হয়ে ক্রমে ভাল পাড়ায় এসে পড়লাম। পথে রাজপ্রাসাদের চূড়া ও চারি ধারের পরিখা চোখে পড়ল। ফ্যাশনেবল পাড়ার বাড়ীগুলি সুন্দর, চওড়া চওড়া রাস্তার দু-ধারে গাছ লাগানো, শীতে চেরি-জাতীয় গাছগুলি কঙ্কালসার, ফুলপাতা কুঁড়ি কিছুই নেই। বাড়ীগুলি কংক্রিটের, তার গায়ে শুক্‌নো লতা জড়িয়ে উঠেছে। রোদের দিনে ভাড়াটেরা বিছানা কাপড় শুকোতে দিয়েছে আমাদের দেশেরই মত, কিন্তু সে-গুলি ঠিক নূতন জিনিষের মত পরিষ্কার।

এই পাড়াতেই জাপানের সুপ্রসিদ্ধ রাজা মেজির জীবনের ঘটনাবলী একটি বাড়ীতে এঁকে সাজিয়ে রেখেছে। মেজি রাজাই নব্য জাপানের স্রষ্টা, তিনিই পৃথিবীতে জাপানের আসন এতখানি উঁচুতে তুলতে ভরসা ক'রে প্রথম কাজে নেমেছিলেন। এত অল্প সময়েই তাঁর সে চেষ্টা ফলবতী হয়েছে যে চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে মন ইতস্ততঃ করে। ইনি মাত্র ষাট বৎসর বেঁচেছিলেন। বর্ত্তমান সম্রাট্‌ এঁর পৌত্র।

বাড়ীটি প্রকাণ্ড আধুনিক ধরণে তৈয়ারী, সামনে মস্ত ময়দান, ময়দানের সামনে পুকুর, তার সামনে গেট। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চারিধার ঝকঝক করছে, পথগুলি কাঁকর-বিছানো। লোকেরা দল বেঁধে ভীড় ক'রে দেখতে যাচ্ছে। টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। জাপানে পথের জুতো প'রে কোথাও বাড়ীর মধ্যে সহজে ঢুকতে দেয় না। অধিকাংশ জায়গাতেই জুতো ছেড়ে যেতে হয়, এখানে দেখলাম আর এক রকম ব্যবস্থা। দর্শকদের জুতার উপর একজোড়া ক'রে কাপড়ের জুতা প'রে ভিতরে ঢুকতে হয়। তাতে পথের ধুলোটা আর ঘরে পড়ে না। দোতলায় ছবিঘর। ঘরের ভিতরের সমস্ত পথ দুই পাশে দড়ি দিয়ে ঘেরা, তাতে লোকে এলোমেলো ভাবে ঘোরাফেরা করতে পারে না। পথের গোড়া থেকে ছবি যেমন এক দুই তিন ক'রে সাজানো, দর্শকদেরও তেমনি পরে পরে যেতে হয়। সমস্ত পথ শেষ ক'রে সব ছবির সামনে দিয়ে ঘুরে তবে বেরিয়ে আসা যায়। রাজার জন্ম, পালন, নামকরণ, যৌবরাজ্যে অভিষেক, সিংহাসনপ্রাপ্তি, শগুনের নিকট হইতে রাজ্যভারগ্রহণ, নবপদ্ধতিতে রাজ্যগঠন ইত্যাদি থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত আশীখানি বড় বড় ছবি আছে। অধিকাংশ ছবিই জাপানী ধরণে রেশমের উপর জলরং দিয়ে আঁকা। বিখ্যাত চিত্রকরেরা এগুলি এঁকেছেন।
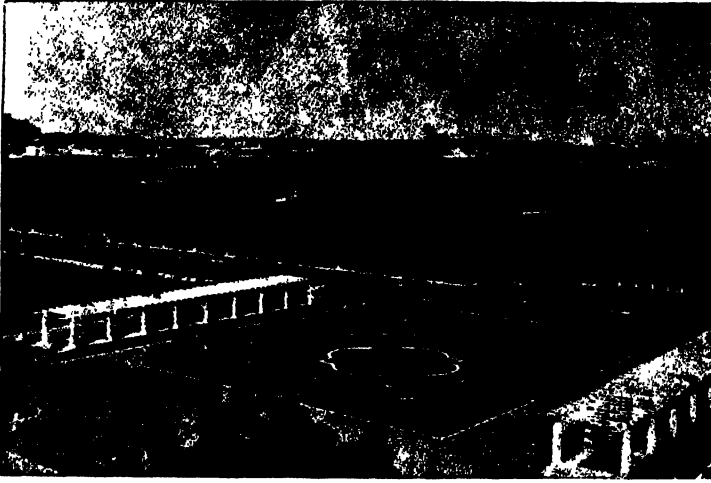
ইয়োকোহামা—সমুদ্রতীরে বাগান

চৌকিওতে যত দিন ছিলাম, প্রায়ই চারি ধারে সমরসজ্জা দেখতাম। ষ্টেশনেও মাঞ্চুকুয়োযাত্রী সৈন্যদল যখন-তখন চোখে পড়ত।

এখান থেকে আমরা মেজি-সমাধিমন্দির দেখতে গেলাম। প্রকাণ্ড বাগান, হেঁটে শেষ করা যায় না, কিন্তু তার ভিতর গাড়ী যাওয়া বারণ, কাজেই হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। প্রথম ফটকের পর দু-ধারে বড় বড় পাইন প্রভৃতি গাছের বাগান, অত দীর্ঘ পথ সমস্তটাই খুব পুরু ক'রে কাঁকর বিছানো,

ছবি হিসাবে সবগুলি খুব সুন্দর নয়, কিন্তু অনেকগুলি আশ্চর্য্য সুন্দর; তাছাড়া যে-দেশে জাতীয়তাবোধ ও রাজভক্তি একটা বড় ধর্ম্ম এবং যেখানে এই রাজার জন্যই বর্ত্তমান জাপানের উন্নতি এতখানি হয়েছে, সেখানে এই ছবিগুলির সাহায্যে রাজা কি ভাবে জীবনযাপন, দেশের উন্নতিসাধন ও প্রজাদের সঙ্গে যোগরক্ষা করতেন তা সহজেই বোঝা যায়। প্রজাদের চোখের সামনে এই আদর্শ রাজার জীবনের চিত্রমালা সর্ব্বদা উজ্জ্বল হয়ে থাকলে তাঁদের সেই আদর্শপথে চলার সাহায্য হয়। যুবরাজ মেজির চূড়াকরণ—রাজা ধান্য দান করছেন, রাণী ধান্য রোপণ দেখছেন, রাজা মন্দিরদর্শনে পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন, রাজা অভিনয় দেখছেন, মহিষী রাজাকে কবিতালিপি পাঠাচ্ছেন, রাজা তাঁর সভাসদের বাতায়ন থেকে পুষ্পোদ্যান দেখছেন, মুমূর্ষু রাজার জন্য প্রজারা প্রার্থনা করছে, ইত্যাদি ছবিগুলি তাদের বিষয়বস্তু ও শিল্পচাতুর্য্যের জন্য মনে রাখবার মত। রাজার জন্মের ছবিটি ভারী সুন্দর, ফুলের বাগানের ভিতর একটি বন্ধ ঘর দেখা যাচ্ছে, জনমানব কোথাও নেই। চীন-জাপান যুদ্ধ, রুশজাপ-যুদ্ধ প্রভৃতির অনেক ছবি আছে, তবে সেগুলি আমাদের চোখে ভাল লাগে না।

ফিরবার সময় পথে দেখলাম কিছু দূরে প্রকাণ্ড মাঠে স্কুলের ছেলেরা সৈন্যদের মত পোষাক প'রে ড্রিল করছে।

যাতে বৃষ্টিতে কিংবা তুষারপাতেও জলকাদা না হয়। একটি ধূলিকণাও কোথাও নেই, উপরের বিরাট আকাশ যেমন প্রশান্ত নির্ম্মল, নীচে সুবৃহৎ উদ্যানটিও তেমনি নিষ্কলঙ্ক। পথের দুই ধারে দুই সারি আলোকস্তম্ভ, গাছপালার সঙ্গে মানিয়ে দীপাধারের মাথাগুলি কাঠের ছাউনি ও শ্যাওলা দিয়ে ঢাকা। বড় পথের ধার দিয়ে মাঝে মাঝে ছোট পথ নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। সাত-আট মিনিট ধরে পথ হাঁটবার পর দেখা গেল কাঠের আর একটি প্রকাণ্ড গেট প্রাচীন জাপানী ধরণের। এই তোরণ-দ্বারগুলি যেন বর্হুতের তোরণ-দ্বারের অলঙ্কারবর্জ্জিত সংস্করণ। মাথার উপরের কাঠটি দু-ধারে শিঙের মত বেঁকে আছে, তার নীচে কাঠে খোদাই অজন্তার পদ্মের মত তিনটি প্রকাণ্ড ফুল সোনার গিল্টি করা। কিন্তু এগুলি বোধ হয় ক্রিসান্থিমম ফুল, কারণ রাজপরিবারের প্রতীক হিসাবে এই ফুলের ছবিই ব্যবহার হয়। অতখানি উঁচু গেটের থাম একটি একটি কাঠে তৈরি, এত মোটা যে দুই জন মানুষেও হাতে হাতে জুড়ে ঘিরে ধরতে পারে না। বহুদূর থেকে—বোধ হয় ফর্মোসা দ্বীপ থেকে এই গাছ আনা হয়েছে। গেট পার হয়ে আরও অনেকখানি হাঁটতে হয়। আমরা যেতে যেতে দেখলাম প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক পুরোহিতদের

মত সাদা পোষাক প'রে নীরবে সৈন্যদের মত পা ফেলে আর এক দিক দিয়ে আসছে। তাদের হাতে কোদাল, এই বাগান পরিষ্কার রাখার ভার তাদের হাতে। শেষে আমরা একটা প্রকাণ্ড জলাধারের কাছে এলাম। তাতে অনেকগুলি কাঠের হাতা ডোবান রয়েছে, কাঠের হাতায় জল তুলে হাত মুখ ধুয়ে তবে দর্শকেরা ভিতরে ঢোকে, এটা মৃত সম্রাটকে ভক্তি দেখাবার একটা জাপানী প্রথা, অনেকটা নমাজের পূর্ব্বে হাত পা ধোওয়ার মত। আমরা হাত একটু ধুলাম, মুখ আর ধুলাম না। এর পর মন্দিরের তোরণদ্বারে জরির পর্দ্দা দেওয়া, পুরু খড়ের চালের ধরণে মন্দিরের ছাতটি কংক্রিটে ঢালাই করা, তার উপরে ঘন শ্যাওলা বসানো। সামনে পয়সা ফেলবার জায়গা। দর্শকেরা কেউ এক পয়সা কেউ দশ পয়সা কেউ আট আনা এক টাকা ফেলে। গেটের ভিতর দুই পাশে কোণার্কের পথের মত ঢাকা দেওয়া লম্বা দালান, তাতে মাঝে মাঝে বাতি দেওয়া। এই ঢাকা পথে সাধারণ লোকে অবশ্য হাঁটে না, তারা গেট থেকে নেমে মাঝের উঠান পার হয়ে ওপাশে মন্দিরে গিয়ে ওঠে। মন্দিরের ভিতরে বিশেষ কিছু নেই, একটি পালিশ-করা কৃষ্ণফলকে স্বর্ণাক্ষরে কি লেখা আছে আর সুন্দর একটি পর্দ্দায় একটি বড় মল্লিকা ফুল আঁকা। এর শান্তশ্রী ও গাম্ভীর্য্য দেখলে মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব আসে। এখানে দাঁড়িয়ে রাজার উদ্দেশে নমস্কার করতে হয়। ফিরবার পথে দেখলাম পথের এক ধারে একটি ঘরে সাদা পোষাকপরা পুরোহিত জমকালো উঁচু টুপি প'রে বসে আছেন। তাঁর পাশে সোনালী জরি ও রেশমের ফুল আঁকা সুন্দর একটি ছবি।

বেড়ানো শেষ ক'রে একটা খাবার জায়গার সন্ধান করতে হ'ল। কারণ এর পর আরও কিছু দেখবারও ইচ্ছা ছিল। যে রেস্তোরাঁতে খেতে গেলাম সেখানে অনেক সাহেব মেম খেতে বসেছে। খাওয়া সেরে ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিয়ে জাপানী সিনেমা দেখতে গেলাম। কারণ আমার মেয়ের টোকিওর সিনেমা দেখবার বেজায় সখ। ট্যাক্সিওয়ালা আমাদের তিন ঘণ্টা ঘুরিয়ে ভাড়া নিল তিন টাকা।

সিনেমাগৃহে পথ দেখাচ্ছে ইউনিফর্ম-পরা সারি সারি মেয়ে। বাড়ীটা প্রকাণ্ড, আমাদের অনেক উঁচুতে উঠতে হ'ল। মনে হ'ল, এত বড় বিরাট বাড়ীতে যদি আগুন

সেকালের জাপানী যোদ্ধা

লেগে যায় ত এতগুলো মানুষ বেরোবে কি ক'রে? হয়ত ব্যবস্থা আছে, কিন্তু আমার চোখে পড়ে নি। প্রথম একটা প্রাচীন জাপানী গল্প, তার পর একটা ইউরোপীয় গল্প দেখাল। জাপানী ছবিটিতে প্রাচীন জাপানের আদর্শমত কেবল যুদ্ধ আর মারামারি, সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রেমের গল্পেরও ধারা আছে। তবে জাপানে সিনেমায় প্রেমের চিত্রে চুম্বন ইত্যাদি দেখান বারণ। ছবিটিতে সেকালের অশ্বারোহী যোদ্ধা, জাপানী পোষাক, চুল কাটা, ঝুঁটিবাঁধা, ঘরবাড়ী, গ্রাম্য পথ, হাটবাজার, সরাই, ইত্যাদি আমাদের চোখে খুব নূতন ও চিত্তাকর্ষক লাগে।

আমরা ম্লান ট্রেনে ওমোরি ফিরলাম। বাড়ীতে একটি বাঙালী ছেলে বসেছিলেন। তিনি টিনের খেলনা তৈরি শেখেন। বললেন, "মাসে ৫০ ইয়েনে খাওয়া-

হাওয়া থাকা সব আমার হয়ে যায়। বাকি কাপড়চোপড় যাতায়াত ইত্যাদি নিয়ে বড়-জোর আর ৩০ ইয়েন লাগে, অর্থাৎ মোট খরচ মাসে ৮০ ইয়েন।"

ইনি বললেন, "ফ্যাক্টরীতে আমাদের মাইনে লাগে না, ব্যবহার খুব ভালই পাই। তবে কোন কোন জায়গায় ফ্যাক্টরীতে ভাল কাজ দেখতে দেয় না, বাজে কাজ দেখায়। আমাদেরটা সে রকম নয়। এখানে মুস্কিল এই যে কেউ এক অক্ষর বিদেশী ভাষা বোঝে না।"

বাড়ীতে দুই-এক জন দেশের সঙ্গে তুলনায় জাপানের প্রশংসা করাতে এই যুবকটি অত্যন্ত চটে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাদের দারিদ্র্য ও অশিক্ষার কথা সর্ব্বদা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিলেন। জাপানের মত শিক্ষা ও সুযোগ পেলে আমাদের পথঘাটও ওই রকম পরিষ্কার, ছেলেপিলে ওই রকম সুস্থ সবল, এবং দোকান বাজার ওই রকম ভাল হবে ব'লে তাঁর বিশ্বাস।

টোকিওতে আমরা ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে স্নান বেশী করতে পেতাম না। যেদিন যেদিন করতাম, ঠিক ঘুমোতে যাবার আগে রাত্রে করবার কথা ছিল। প্রকাণ্ড একটা কাঠের টবে জল গরম করা জাপানী প্রথা। টবের তলায় থাকত আগুন, উপরে কাঠের ঢাকনা আঁটা। একসঙ্গে দশ-বার বালতি জল তাতে গরম হয়ে উঠত। স্নানের পরেই ঘুমোনো নিয়ম হলেও আমরা প্রায় স্নানের পর খেয়ে দেয়ে বসবার ঘরে গরম ষ্টোভের পাশে বসে গল্প করতাম। আমাদের জাপান-প্রবাসী বন্ধুরা দেশের গল্প করতে খুব ভালবাসতেন, কাজেই গল্প জমতও খুব।

(ক্রমশঃ)

সারথি

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কোথায় সারথি, রথ-ঘর্ঘর জাগে :
ঘাঘরার মত ধূলিকণা যেন মেঘ—
চক্রবালেরে আঁধারিয়া বার বার
কার কাছে যেন কোন্ প্রার্থনা মাগে।

বন্ধ বাতাসে কুসুমের হোলিখেলা
বন্ধ বাতাসে নিপীড়িয়া ওঠে প্রাণ ;
শকুন্তলার ধ্যান মিশে যায় দেহে
স্তব্ধতা মাঝে মিলিছে মুখর গান।

স্বর্গ-লঙ্কা অঙ্কের হিসাবেতে
ছারখার হ'ল ; মূক হ'ল স্পন্দ
গোলাপী কোমল বক্ষের স্নায়ু নীচে ;
চক্ষের জলে মুছে গেল চন্দন।

কোথায় সারথি ! বল্গা ধর গো এসে
আজি ফাল্গুনে আলুগোছা দিনগুলি
পাপড়ির মত এলোমেলো উড়ে যায়,
পাপড়ির মত ধুলায় আসিয়া মেশে,
পাপড়ির মত শুকায়ে ব্যর্থ হয় !

এসো গো সারথি ধুলার ঘাঘরা ফুঁড়ে
চক্রবালের নীলাভ স্বপ্ন খুলি !

আলোচনা

কবি রবীন্দ্রনাথের "মুক্তি"

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তাতে কবিরূপে রবীন্দ্রনাথ নানা বিষয়ে তাঁর চিন্তা- ও ভাব- ধারা কিরূপে ব্যক্ত করেছেন তার ব্যাখা দেওয়া হয়েছে।

একটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত যথাযথরূপে প্রকাশ করা হয়েছে বলে মনে হ'ল না। লেখক তাঁর প্রবন্ধে এক স্থানে বলেছেন—

"কেবল মাত্র মুক্তি তো অর্থশূন্য, বন্ধন যদি নাই থাকে তবে মুক্তি হইবে কিসের হইতে। বন্ধন স্বীকার করিলেই তো মুক্তি পাওয়া যাইবে।"

লেখক রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তি' নামক কবিতাটি থেকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করেছেন:

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।" —নৈবেদ্য

ভগবান মানুষকে এই সংসারে রেখে নানা বন্ধনে তাকে বেঁধেছেন—মানুষের সঙ্গে স্নেহপ্রীতির বন্ধনে এবং সেই স্নেহপ্রীতি থেকে উদ্ভূত নানা কর্ত্তব্যের বন্ধনে। এই বন্ধনকে আগে স্বীকার ক'রে নিয়ে তার পর সেই বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হবে; রবীন্দ্রনাথের মত তা নয়। লেখক রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তি' কবিতাটির থেকে যে কয়টি ছত্র উদ্ধৃত করেছেন তাতে কবি মুক্তি বলতে কি বোঝেন তা খুব পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে। কবি বলেছেন, "অসংখ্য বন্ধন 'মাঝে' মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।" অসংখ্য বন্ধন 'হ'তে' মুক্তি লাভ করতে হবে একথা তিনি বলেন নি। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে স্নেহপ্রীতির বন্ধন এবং কর্ত্তব্যের বন্ধন রয়েছে, সে-বন্ধন ভগবানেরই বন্ধন; বন্ধন-ডোর তিনি স্বয়ং। তাঁকে ছেড়ে, মানুষের সঙ্গে স্নেহপ্রীতির বন্ধন ছিন্ন ক'রে, মুক্তি পাওয়া যায় না—রবীন্দ্রনাথের মত এই। "প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরমধন হে" এই সঙ্গীতটিতে রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে বলেছেন, "তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মোর, মুক্তি আমার, বন্ধন-ডোর।"

লেখক বলেছেন, "কবি সকলের সহিত অনাসক্ত হইয়া মুক্ত থাকিতে চাহেন পদ্মপত্রম্ ইবাম্ভসা।" জলযুক্ত পদ্মপত্রের মত অনাসক্ত হয়ে সকলের সঙ্গে যুক্ত থাকাটা কি রকম ঠিক বোঝা গেল না। মানুষের প্রতি এবং প্রিয়জনদের প্রতি আমাদের যে স্নেহ-ভালবাসা (যাকে আমাদের দেশে মোহ, আসক্তি প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়), তা যদি পদ্মপত্রে জলের মত ঐ রকম টলমলে জিনিষ হয়, যা কখন ঝরে পড়বে তার কোনই স্থিরতা নাই, তাহ'লে সেরকম স্নেহ-ভালবাসা থাকার চেয়ে না-থাকাই ভাল। রবীন্দ্রনাথ মানবীয় প্রেমকে অতি সত্য বস্তু বলে মনে করেন। মানুষের সঙ্গে, প্রিয়জনদের সঙ্গে গভীর প্রেমযোগে যুক্ত না হয়ে এবং সেই প্রেম থেকে উদ্ভূত কর্ত্তব্যসকল ভাল ক'রে পালন না ক'রে, ভগবানের সঙ্গে ভক্তিযোগে যুক্ত হওয়া যায় না এবং মুক্তি লাভও হয় না—এই রবীন্দ্রনাথের মত। 'মুক্তি' নামক কবিতাটির শেষ দুটি ছত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।"

শ্রীধ্রুব গুপ্ত

—

মহেন্দ্রনাথ করণ

গত বৈশাখ সংখ্যা "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়-লিখিত "নদীয়ার ইতিহাসের কয়েকটি সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধের পাদটীকা দেখিলাম। তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয়ের নদীয়া-কাহিনী এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ প্রণীত হিজলির মসনদ-ই-আলা লা। এই ক্ষেত্রে দুইখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।" মহেন্দ্রবাবু দশ বৎসর পূর্ব্বে, ১৩৩৫ সালের ১লা শ্রাবণ পরলোকগমন করিয়াছেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

তাঁতী-বৌ মাকড়সার জীবনকথা

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গল্পে আছে পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গেরা একবার সকলে মিলিয়া সৃষ্টি-কর্ত্তার কাছে মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিয়াছিল। সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণকালে একমাত্র মাকড়সাই নাকি বলিয়াছিল—মানুষের মত এমন নিরীহ প্রাণী আর নাই, আমি এত বড় জাল পাতিয়া রাখি, কই, কখনও ত একটা মানুষকে আমার জালে পড়িতে দেখি নাই।
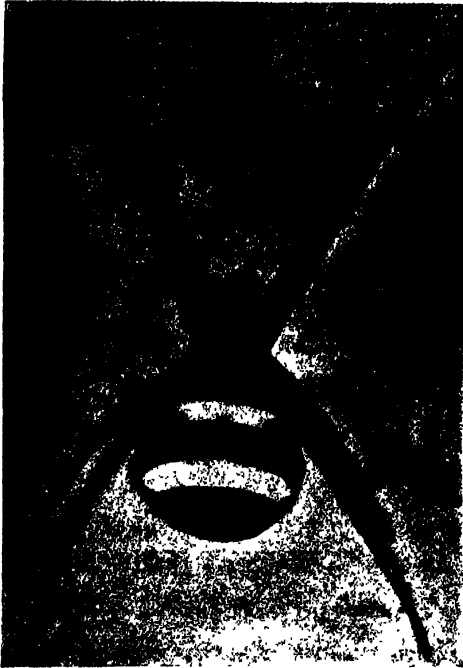
তাঁতী-বৌ মাকড়সা

গল্পে যাহাই থাকুক, দুই-এক জাতীয় বিষাক্ত মাকড়সা ছাড়া সাধারণতঃ ইহারা মানুষের অপকার ত করেই না, বরং মশা, মাছি প্রভৃতি অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ধরিয়া খাইয়া মানুষের উপকারই করিয়া থাকে। তাছাড়া মাকড়সা সম্বন্ধে এমন অনেক কাহিনী শোনা যায় যাহাতে স্বভাবতঃই এই ইতর প্রাণীদের প্রতি একটা সহৃদয় মনোভাব জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক।

শোনা যায়, সিপাহী-বিদ্রোহের সময় নাকি কানপুরে কয়েক জন ইংরেজ পলাতক অবস্থায় সিপাহীদের ভয়ে অতিকষ্টে দেয়াল টপকাইয়া অপর পার্শ্বস্থ একটা পরিত্যক্ত শস্য-গোলায় আশ্রয় গ্রহণ করে। গোলাটি অনেক দিন অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল বলিয়া তাহারা অতিকষ্টে একখানা মাত্র কপাট অল্প এক একটু ফাঁক করিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিয়াছিল। ভুলেই হউক, বা বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই বলিয়াই হউক, কপাট আধখোলা অবস্থাতেই ছিল। উন্মত্ত সিপাহীরা পলাতকদের সন্ধানে সেই স্থানে আসিয়া একখানা তক্তার সাহায্যে দেয়ালের উপর উঠিয়া দেখিতে পাইল, গোলাঘরের দরজা আধখোলা রহিয়াছে। ইহাতে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল—পলাতকেরা নিশ্চয়ই ওখানে আশ্রয় লইয়াছে। কিন্তু তথায় অবতরণ করা কষ্টকর বলিয়া সিপাহীরা নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা করিতেছিল। এমন সময় এক জন সিপাহীর নজরে পড়িল—সেই অর্দ্ধোন্মুক্ত কপাটের ফাঁকে একটা মাকড়সার জাল বিস্তৃত রহিয়াছে। কপাটের ফাঁকে মাকড়সার অক্ষত জাল দেখিয়া তাহারা স্থির করিল যে, দুই-এক দিনের মধ্যে এখানে কোন লোক প্রবেশ করে নাই, কাজেই তাহারা আর অগ্রসর না হইয়া ফিরিয়া গেল। মাকড়সার জালই সেই যাত্রায় এতগুলি বিপন্ন লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল।

শোনা যায় হজরত মোহম্মদ যখন মদিনায় এক গুহার মধ্যে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শত্রুরা তাঁহার সন্ধানে সেই গুহাদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পায়, গুহার প্রবেশপথে মাকড়সার জাল আস্তৃত রহিয়াছে। দুই-এক দিনের মধ্যে কেহ এই গুহায় প্রবেশ করিয়া থাকিলে মাকড়সার জাল থাকিতে পারিত না—ইহা ভাবিয়া আততায়ীরা তাঁহার সন্ধানে অন্য দিকে চলিয়া গেল। মাকড়সার জালই সেই যাত্রায় মহাপুরুষের প্রাণ রক্ষার কারণ হইয়াছিল।

পিপীলিকার মত পরিশ্রমী ও মৌমাছির মত সঞ্চয়ী হওয়ার উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে মাকড়সার মত অধ্যবসায়ী হওয়ার উপদেশও অহরহই শুনিতে পাওয়া যায়। অধ্যবসায় সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে প্রথমেই রবার্ট ব্রুস ও মাকড়সার অধ্যবসায়ের গল্পটি মনে পড়ে। স্কটল্যাণ্ডের অধিপতি রবার্ট ব্রুস শত্রুহস্তে বার বার পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। এই সময়ে ক্ষুদ্র একটি মাকড়সার অধ্যবসায় দৃষ্টে অনুপ্রাণিত হইয়া সর্ব্বশেষে শত্রুর কবল হইতে দেশকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এসব কথা বাদ দিলেও জীবতত্ত্ব ও ব্যবহারিক জীবনের কোন কোন দিক হইতে মাকড়সা-জীবন আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের দেশে শত শত বিভিন্ন জাতীয় মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের দৈহিক গঠন ও জীবনযাত্রাপ্রণালী বৈচিত্র্যময়। ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত

তাঁতী-বৌ মাকড়সা ডিম পাড়িয়া জালে বসিয়া রহিয়াছে,
নীচে ডিমের থলিটি দেখা যাইতেছে।
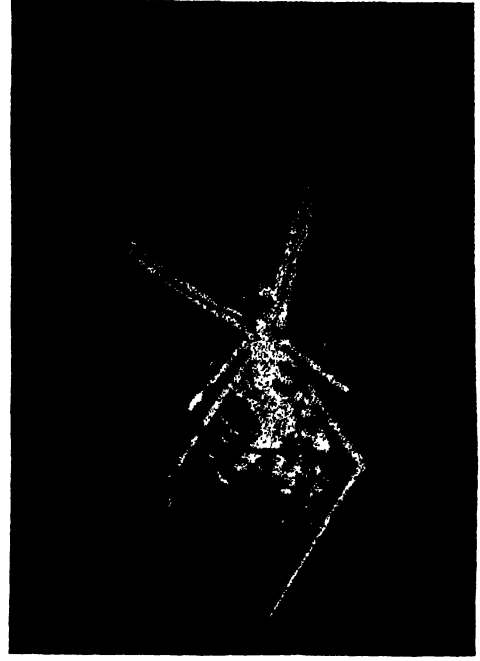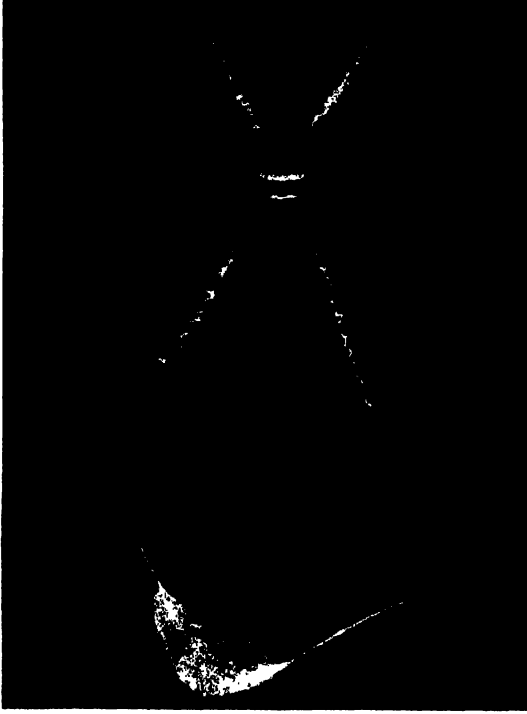
তাঁতী-বৌ মাকড়সা সুতা ছাড়িয়া নূতন জাল পত্তন করিতেছে।

বৃহদাকারের কয়েক জাতীয় মাকড়সা মাত্র আমাদের নজরে পড়িয়া থাকে—বাকী অধিকসংখ্যক মাকড়সাকেই যত্ন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সাধারণের পরিচিত তাঁতী-বৌ নামক এদেশীয় এক প্রকার বিচিত্র বর্ণের মাকড়সার জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিব।

আমাদের দেশে কোন ঝোপ-ঝাড়ের আশেপাশে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় মাটি হইতে প্রায় দুই-তিন হাত উঁচুতে এক প্রকার বড় বড় মাকড়সার জাল দেখিতে পাওয়া যায়। জালের মধ্যস্থলে খুব মোটা সাদা সুতায় বোনা 'x' চিহ্নের মত প্রায় দুই-আড়াই ইঞ্চি লম্বা একটা স্থান থাকে। আড়াই ইঞ্চি তিন ইঞ্চি লম্বা এক প্রকার কালো মাকড়সাকে দুই দুই পা জোড়া করিয়া সেই 'x' চিহ্নিত স্থানের উপর বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। মাকড়সাটি কালো হইলেও তাহার পিঠের উপরের মোটা মোটা হলদে রঙের পাশাপাশি দাগ দুটির দরুন ইহাকে বড়ই সুন্দর দেখায়। দিনের বেলায় প্রায় অধিকাংশ সময়ই ইহারা জালের মধ্যস্থলে ঐরূপ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া কাটায়। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই ইহাদের কর্ম্মব্যস্ততা সুরু হয়। রাত্রিচর কীটপতঙ্গই বেশীর ভাগ ইহাদের জালে পড়িয়া থাকে, অবশ্য দিনের বেলায়ও ফড়িং প্রজাপতি প্রভৃতি যে দুই-একটা জালে না-পড়ে এমন নহে। স্ত্রী-মাকড়সা হইতেই সাধারণতঃ মাকড়সার জাতি নির্ণীত হইয়া থাকে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুং-মাকড়সা অতি ক্ষুদ্রকায় হইয়া থাকে এবং প্রায়ই নজরে পড়ে না। এই মাকড়সারও সেই অবস্থা। ইহাদের স্ত্রী-মাকড়সাদিগকেই আমরা দেখিয়া থাকি। জালই ইহাদের খাদ্য-আহরণের প্রধান উপায়। কীটপতঙ্গের রস চুষিয়া খাইয়া ইহারা প্রাণধারণ করে; কিন্তু আবার মৃত প্রাণীর দেহ স্পর্শও করে না। কীটপতঙ্গ ধরিবার জন্ত ইহারা উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া এমন অদ্ভুত দক্ষতার সহিত জাল বোনে যে দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। ইহাদের জাল বোনার কৌশল দেখিয়াই হয়ত কেহ কেহ এই জাতীয় মাকড়সাকে তাঁতী-বৌ মাকড়সা নাম দিয়াছে। আমরাও ইহাকে এই নামেই অভিহিত করিব।

তাঁতী-বৌ ঝোপ-ঝাড় বা বড় বড় গাছপালার উপর হাঁটিয়া চলিবার সময় গাছের নীচে শিকার ধরিবার উপযোগী কোন নির্জ্জন ফাঁকা জায়গা পাইলেই, গাছের পাতার অগ্রভাগে আসিয়া শরীরের পশ্চাদ্দেশ পাতার গায়ে ঠেকাইয়া সুতা আটকাইয়া লয় এবং মাথা নীচু করিয়া হাত-পা ছড়াইয়া ক্রমশঃ সুতা ছাড়িতে ছাড়িতে নীচে নামিতে থাকে। নীচে নামিবার সময় পিছনের এক পা দিয়া সুতাটিকে ধরিয়া থাকে এবং প্রয়োজন-মত যে-কোন স্থানে ঝুলিয়া থাকিতে পারে। পায়ের ডগায় আঁকসির মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম
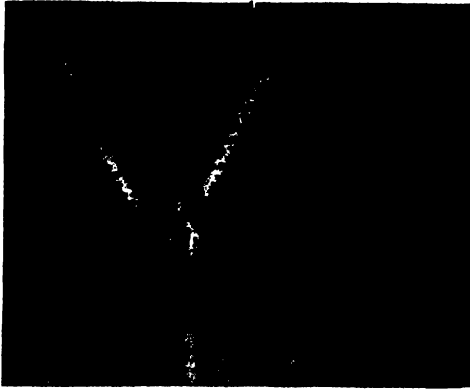
তাঁতী-বৌ মাকড়সা একটা পোকা জালে জড়াইয়া তাহার সঙ্গে সুতা বাঁধিয়া জালের মধ্যস্থলে বিশ্রাম করিতেছে।

বাঁকান নখ আছে—তাহার সাহায্যেই হাতের আঙুলের মত সুতা ধরিয়া উঠা-নামা করিতে পারে।

মাকড়সাটি নীচু গাছের উপর থাকিলে কোন ডাল বা পাতার প্রান্তভাগে আসিয়া বসে এবং শরীরের পশ্চাদ্ভাগ উঁচু করিয়া হাওয়ার মধ্যে সুতা ছাড়িতে থাকে। অতি-মৃদু বাতাসের মধ্যেই সুতার মুক্ত প্রান্ত উড়িতে উড়িতে উপরের বা আশেপাশের কোন লতাপাতার গায়ে ঠেকিয়া আটকাইয়া যায়। তখন মাকড়সা পিছনের পা দিয়া সুতা টানিয়া দেখে—কিছুতে আটকাইল কি না। ঢিলা থাকিলে মধ্যের দুই পা দিয়া সুতা গুটাইতে গুটাইতে তাহাকে টান করিয়া শরীরের পশ্চাদ্ভাগের সাহায্যে পাতা বা অন্যান্য কিছুর সঙ্গে আঁটিয়া দেয় এবং সেই সুতার উপর অতি দ্রুতগতিতে হাঁটিয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং সেই প্রান্তের বাঁধন শক্ত করিয়া দিয়া আবার সুতা বাহিয়া নামিতে থাকে। এবার সুতার মাঝামাঝি নামিয়াই থামিয়া যায় এবং শরীরের পশ্চাদ্ভাগ উঁচু করিয়া পুনরায় সুতা ছাড়িতে থাকে। খুব কাছাকাছি কোন অবলম্বন না-থাকিলে কখনও কখনও দশ-বার হাত বা তাহারও বেশী লম্বা সুতা বাহির করিয়া দেয়। সুতার মুক্ত প্রান্ত বাতাসে উড়িতে উড়িতে যে-কোন একটা গাছপালার সঙ্গে আটকাইয়া যায়। এইরূপে ঘুরিয়া ফিরিয়া চতুর্দ্দিকেই সুতা চালাইতে থাকে। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই ছাতার শলার মত চতুর্দ্দিকে টানা দিয়া জালের একটা মোটামুটি কাঠামো তৈয়ারী হইয়া যায়, উঁচু গাছে থাকিলে, নীচের গাছের সঙ্গে টানা দেওয়ার প্রয়োজন। যত দিন মাকড়সার জাল বুনিবার কৌশল প্রত্যক্ষ করি নাই, তত দিন ভাবিয়াই পাই নাই—দশ-বার হাত ব্যবধানে অবস্থিত দুইটি গাছের সঙ্গে প্রথমে কি উপায়ে ইহারা সুতা সংলগ্ন করিয়া দেয়। পর্য্যবেক্ষণের ফলে পরে দেখিতে পাইলাম—উঁচু গাছে অবস্থিত মাকড়সাটি পাতার প্রান্তভাগে আসিয়া প্রথমে দেহের পশ্চাদ্ভাগ পাতায় ঠেকাইয়া দিতেই সুতার মুখটি তাহার সঙ্গে সিমেন্টের মত আঁটিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে হাত পা প্রসারিত করিয়া সুতা ছাড়িতে ছাড়িতে ধীরে ধীরে নীচে নামিতে লাগিল। নীচে নামিবার সময় পিছনের একটা পা দিয়া বরাবরই সুতাটাকে আলতো ভাবে ধরিয়া থাকে। নামিতে নামিতে আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া উচিত কি না, বোধ হয় তাহা ভাবিয়া দেখিবার জন্য মাঝে মাঝে কিছু ক্ষণের জন্য থামিয়া থাকে। অবশেষে যে কোন একটা লতাপাতার উপর অবতরণ করিয়া সুতার প্রান্তভাগ তাহাতে জুড়িয়া দেয় কিছুক্ষণ পরেই আবার সেই সুতা বাহিয়া মাঝামাঝি স্থানে উঠে এবং বাতাসের মধ্যে চতুর্দ্দিকে সুতা ছাড়িয়া জালের কাঠামো তৈয়ার করে। যদি কোন টানা অসমতল ভাবে পড়িয়া থাকে তবে তাহা কাটিয়া দেয়। তবে সাধারণতঃ এরূপ বড়-একটা ঘটে না। টানাগুলি সামান্য অসমতল হইলে পড়েনের টানে পরে ঠিক হইয়া যায়। চতুর্দ্দিকের টানাগুলি ঠিক হইয়া গেলে, যে-কোন একটি টানা বাহিয়া উপরে উঠে এবং সেই টানার প্রান্তদেশে নূতন সুতা আটকাইয়া পিছনের পা দিয়া তাহা উঁচু করিয়া ধরিয়া জালের কেন্দ্রস্থলে নামিয়া আসে। তৎপরে নিকটবর্ত্তী আর একটি টানা বাহিয়া উপরে উঠে এবং পায়ের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত সুতাটিকে এই টানার প্রান্তভাগে আঁটিয়া দেয়। এইরূপে পর পর প্রত্যেকটি টানার প্রান্তভাগে বৃত্তাকারে একটানা সুতা জুড়িয়া কেন্দ্রাভিমুখে ক্রমশঃ বৃত্তের পরিধি ছোট করিতে থাকে। বাহিরের দিকের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বৃত্তটি বুনিতে একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; কিন্তু সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ জিলিপীর প্যাঁচের মত ভিতরের দিকে সুতা বুনিতে আর কোনই অসুবিধা পরিলক্ষিত হয় না। যাঁহারা পাড়াগাঁয়ে তাঁতীদের কাপড় বোনা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন তাঁত বুনিবার পূর্ব্বে সুতা পাট করিবার সময় চারি কোণে চারিটি খুঁটি পুঁতিয়া তাঁতী-বৌয়েরা বাঁ-হাতের একটা বড় চরকী হইতে ডান হাতে একটা লম্বা লাঠির সাহায্যে কিরূপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সুতা জড়াইয়া দেয়। টানার উপর দিয়া জাল বুনিবার সময় মাকড়সারা পিছনের একটি পায়ের সাহায্যে ঠিক তাঁতী-বৌদের মতই ক্ষিপ্রগতিতে সুতা জড়াইতে থাকে। জাল বুনিবার সময় তাহার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়। জাল বোনা হইয়া গেলে, প্রত্যেক কোণের দুইটি পাশাপাশি টানাকে একত্র করিয়া জালের মধ্যস্থলে ফিতার মত চওড়া সুতার সাহায্যে করাতের দাঁতের মত আঁকাবাঁকা ভাবে জুড়িয়া দেয়। মোটা সুতায় বোনা জালের মধ্যস্থিত এই চওড়া স্থানটিকে প্রায় আড়াই ইঞ্চি তিন ইঞ্চি লম্বা একটা 'X' চিহ্নের মত দেখায়। মাকড়সা জোড়া জোড়া পা করিয়া উক্ত চিহ্নের সঙ্গে দেহের আকৃতি মিলাইয়া ঐ স্থানেই সর্ব্বদা ওৎ পাতিয়া নীচের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া থাকে। একখানি জাল বুনিয়া শেষ করিতে তাহার আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। ইহারা ইচ্ছামত মোটা, সাদা বা আঠালো সুতা বাহির করিতে পারে। জাল বুনিতে সাধারণতঃ এই তিন

তাঁতী-বৌ মাকড়সা সুতা জড়াইয়া শিকারের রস চুষিয়া খাইতেছে।

তাঁতী-বৌর জালের সন্ধান পাইয়া অন্য একটা মাকড়সা তাহাকে তাড়াইয়া জাল দখল করিতে আসিতেছে।
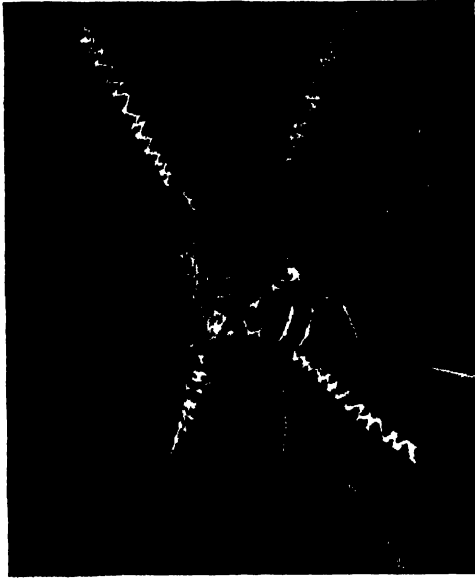
প্রকারের সুতারই প্রয়োজন হয়। টানাগুলি ও বাহিরের কয়েকটি বৃত্তের সুতা সাদা, তাহাতে আঠালো পদার্থ থাকে না। তার পর হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত সমস্ত সুতাই আঠালো। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে সুতার গায়ে বিন্দ বিন্দু অসংখ্য আঠালো পদার্থ রহিয়াছে; কীটপতঙ্গ তাহাতে পড়িলেই আটকাইয়া যায়। মধ্যস্থলে আসন তৈরি করিবার জন্য একসঙ্গে পাশাপাশি ভাবে অনেকগুলি সুতা বাহির করে—সেইগুলিই মোটা সুতা; এ-গুলিও ভয়ানক চটচটে, শিকার জালে পড়িলে প্রথমেই তাহাকে এই মোটা সুতার সাহায্যে জড়াইয়া থাকে।

ফড়িং বা অন্য কোন বৃহদাকার পতঙ্গ জালে পড়িবামাত্রই আটকাইয়া যায় এবং মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকে। তাহার ফলে জালখানি ভয়ানক আন্দোলিত হইতে থাকে। সেই আন্দোলনের প্রকৃতি দেখিয়া মাকড়সা বুঝিতে পারে—শিকার দুর্ব্বল কি সবল। দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র শিকার জালে পড়িবামাত্রই সে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে সুতা জড়াইয়া মুখে করিয়া লইয়া আসিয়া মধ্যস্থলে বসিয়া তৎক্ষণাৎ খাইতে আরম্ভ করিয়া দেয়। শিকার বড় হইলে—মাকড়সা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করে—অথবা সময় সময় জালের মধ্যস্থিত আসন পরিত্যাগ করিয়া জালের এক কোণে গিয়া গুটিসুটি হইয়া বসিয়া থাকে। কিছুক্ষণ আস্ফালনের পর শিকার হয়রান হইয়া একটু চুপ করিবামাত্রই সে এক পা দুই পা করিয়া অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া হঠাৎ তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া পিছনের দুই পায়ের সাহায্যে চওড়া সুতার ফালিগুলি যেন ছুড়িয়া মারিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে শিকারের শরীরের চতুর্দ্দিকে সাদা সুতায় ভরিয়া যায়, তখন তাহার আর বেশী আস্ফালন করিবার সামর্থ্য থাকে না। তখন মধ্যের দুই পা ও পিছনের দুই পায়ের সাহায্যে শিকারটিকে চরকির মত ঘুরাইতে ঘুরাইতে ফিতার মত চওড়া সুতায় আগাগোড়া ঠিক পুঁটুলির মত মুড়িয়া ফেলে। শিকার তখনও সুতার পুঁটুলির মধ্যে কাঁপিতে থাকে; কাজেই তাহাকে জালের সেই স্থানেই ঝুলাইয়া রাখিয়া একটি সুতার লাইন গাঁথিয়া নিজ স্থানে আসিয়া এমন অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করিতে থাকে যে, সমগ্র জালখানি সামনে পিছনে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ভয়ানক ভাবে দুলিতে থাকে। আট পায়ের উপর শরীরটাকে উঁচু করিয়া আবার তৎক্ষণাৎই নামাইয়া লয়। পাঁচ-সাত বার এইরূপ করিয়া শেষে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ইহা যুদ্ধ-বিজয়ের উল্লাস বলিয়াই মনে হয়। পনর-বিশ মিনিট পরে পুঁটুলিটি জালের মধ্যস্থলে নামাইয়া আনিয়া সূত্রাবরণের মধ্য দিয়া তীক্ষ্ণ দাঁত ফুটাইয়া রস চুষিয়া খাইতে থাকে। শরীরের রস নিঃশেষিত হইলে খোলসটাকে জাল হইতে নীচে ফেলিয়া দেয় এবং চুপ করিয়া বিশ্রাম করিতে থাকে। আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে জালের ছিন্ন অংশ মেরামত করিয়া নূতন শিকারের আশায় ওৎ পাতিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয়, মৃত কীটপতঙ্গ জালে ফেলিয়া দিলে তাহা খাওয়া দূরে থাকুক, মোটেই গ্রাহ্য করে না। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া মৃত পতঙ্গটাকে জাল হইতে নীচে ফেলিয়া দেয়। সময়ে সময়ে ছোট ছোট টিক্‌টিকি, গিরগিটি ইহাদের জালে আটকা পড়িয়া যায় এবং তাহাদের রস চুষিয়া খাইয়া থাকে।

মাকড়সারা অনেক দিন পর্য্যন্ত অনাহারে কাটাইয়া দিতে পারে। রোজই যে ইহাদের জালে শিকার পড়ে তা নয়। শিকারের আশায় হয়ত একাদিক্রমে কয়েক দিন জাল পাতিয়া বসিয়া থাকে। একটা জাল তিন-চার দিনের বেশী শিকার ধরিবার উপযুক্ত থাকে না, কারণ ধুলাবালি উড়িয়া আসিয়া অথবা রৌদ্রে শুকাইয়া জালের আঠা শক্ত হইয়া যায়, তখন বাধ্য হইয়াই নূতন জাল বুনিতে হয়। কোন স্থানে দুই-চারি দিন শিকার না জুটিলে, টানাগুলি কাটিয়া সম্পূর্ণ জালটাকে গুটাইয়া লইয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। হয়ত জালের সুতাগুলিকে খাইয়া ফেলে। সময়ে সময়ে কোন প্রবল মাকড়সা আসিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল মাকড়সার জালে পড়ে এবং জালের মালিককে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসে। মারামারির ফলে উভয়েরই হয়ত দুই একখানা ঠ্যাং ছিঁড়িয়া যায়; কিন্তু কালক্রমে সেই স্থলে আবার নূতন ঠ্যাং গজাইয়া থাকে।

ইহারা জালের যে কোন এক স্থলে ছোট একটি থলি গাঁথিয়া তাহার মধ্যে শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম পাড়িয়া রাখে। থলির মধ্যেই ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইয়া এলোমেলো ভাবে একসঙ্গে তাহাদের দেহনিঃসৃত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্রের সহিত ঝুলিতে থাকে। দুই-তিন দিনের মধ্যেই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া নানা স্থানে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়ে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, তাহারা যে-কোন একটু উঁচু স্থানে উঠিয়া শরীরের পশ্চাদ্ভাগ বাতাসে উঁচু করিয়া সুতা ছাড়িতে থাকে। অনেক সময় বাতাসের টানে সেই সূত্রে ভর করিয়াই তাহারা বহু দূরে উড়িয়া গিয়া নূতন নূতন জালের পত্তন করে। খাইতে খাইতে শরীর একটু বৃদ্ধি পাইলেই খোলস পরিত্যাগ করে। এইরূপে ছয়-সাত বার খোলস বদলাইয়া ইহারা পরিণতি লাভ করে। পূর্ণ পরিণতির পর আর খোলস পরিত্যাগ করে না।

পরিণত বয়সে তাঁতী-বৌ মাকড়সা বেশ পোষ মানে এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানেই জাল পাতিয়া অবস্থান করে। জাল ছিঁড়িয়া দিলেও পুনরায় সেই স্থানেই জাল পাতিয়া রাখে।

শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

১। শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

বিগত পঁচিশ বৎসর যাবৎ জীবনসংগ্রামে পরাভূত আত্ম-বিস্মৃত এই বাঙ্গালী জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। কি করিয়া দিন দিন আমার নিজ দেশবাসিগণ সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়ক্ষেত্র হইতে হটিয়া আসিয়াছে এবং কি করিয়া অবাঙ্গালীগণ ব্যবসার সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়াছি এবং আজও করিতেছি। জানি না কবে এ জাতির চৈতন্যোদয় হইবে!

আমার জীবনসন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে জীর্ণ ও দুর্ব্বল শরীরে এই দুর্ভাগা দেশের ঘরে ঘরে যে দারিদ্র্য ও বিষাদের ছবি দেখিতেছি তাহা আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে; তাই বাঙ্গালী ব্যবসা করিতেছে শুনিলেই প্রাণে আনন্দ হয়—আশার সঞ্চার হয়। আমি অনেক বার বলিয়াছি যে বাঙ্গালীর শ্রমবিমুখতা, নিশ্চেষ্টতা এবং অলসতাই ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাহার এই শোচনীয় পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ।

ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর এ দুর্দ্দশা ছিল না, বাণিজ্যলক্ষ্মী বঙ্গবাসীর গৃহকোণ হইতে তখনও বিতাড়িতা হন নাই। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে বঙ্গজননীর বহু ক্ষণজন্মা কৃতী সন্তান ব্যবসায়ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। মতিলাল শীল, রামদুলাল দে, প্রাণকৃষ্ণ লাহা প্রভৃতি ইহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। বর্ত্তমান যুগেও পরলোকগত সর্ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরব। এই পতিত জাতির অন্তরে যাহাতে ব্যবসায়ে প্রেরণা সঞ্চারিত হইতে পারে এই আশায় আমি ইতিপূর্ব্বে বহুবার তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দিয়াছি এবং দেখাইয়াছি

যে কি করিয়া ইঁহারা লক্ষীর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, কি করিয়া অতি সামান্য অবস্থা হইতে ইঁহারা উন্নতির উচ্চতম শিখরে উঠিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর মহৎ দৃষ্টান্ত আজকাল বিরল। বর্ত্তমানে আমি কয়েক জন সাধারণ শ্রেণীর লোকের কৃতিত্বের কথা বলিব যাহাতে অতি সাধারণ লোকও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারে। অদ্য তাহার মধ্যে এক জনের জীবনকাহিনী বিবৃত করিতেছি।

১২৯৩ সালের ২৪শে মাঘ, বিক্রমপুর পরগণার অন্তঃপাতী নশঙ্কর নামক একটি গণ্ডগ্রামে প্রসিদ্ধ কাষ্ঠব্যবসায়ী যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দারিদ্র্যব্রতী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, সংসারের প্রতি দৃক্‌পাতহীন—দিন চলিয়া গেলেই হইল। তের বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে বিধবা মাতা পাঁচটি পুত্রকন্যা লইয়া অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। অবর্ণনীয় দুঃখের মধ্যে দিন কাটিতে লাগিল। শ্বশুরের বিষয়সম্পত্তি স্বামীর নির্লিপ্ততার সুযোগে জ্ঞাতিরা বঞ্চনা করিল। গৃহহীনা হইয়া পুত্রকন্যা লইয়া আশ্রয় লইতে হইল প্রতিবেশীর গৃহে। লজ্জানিবারণের জন্য প্রতিবেশীর পুরানো কাপড় যাচ্ঞা করিতে হইত। এই বিসদৃশ অবস্থায় শৈশব হইতেই যোগেশ বাবু শিখিয়াছিলেন সহনশীলতা ও অধ্যবসায়। ইহারই ফল-স্বরূপ পরবর্ত্তী কালে কলিকাতায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

শৈশবে বিদ্যালাভ যোগেশ বাবুর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। গ্রাম্য পাঠশালায় বিনা বেতনে নিম্নপ্রাথমিক পর্য্যন্ত পড়িয়া মাত্র দশ বৎসর বয়সেই তাঁহাকে পাঠ সমাপ্ত করিতে হইল। এই সময় তাঁহার পিতার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ায় তাঁহার সহিত যোগেশ বাবুকে যজমান-বাড়ীতে যাইতে হইত। তের বৎসর মাত্র বয়সে পিতৃহীন হইলে এই নাবালক পুরোহিতকে কেহই আমল দিত না। তাই অপর এক জন পুরোহিতের সাহায্যে যজমান রক্ষা করিয়া যাজনিক প্রাপ্যের অর্দ্ধাংশ দ্বারা কায়ক্লেশে মা এবং ভাইবোনদের ভরণপোষণ করিতে হইত। এই ভাবে যোগেশ বাবু ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিলেন। ছোটবেলা হইতেই ভাগ্যান্বেষণে বিদেশে যাইবার তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। এদিকে পৌরোহিত্যও ভাল লাগে না! বাহিরে যাইবার ভদ্রবেশ অর্থাৎ জামা জুতা সংগ্রহ করিবার সুযোগও এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই। কোন রকমে শনিপূজা, সত্যনারায়ণের সেবা ইত্যাদির দক্ষিণা হইতে সাড়ে তিন টাকা মাত্র সঞ্চয় করিয়া তদ্দ্বারা একটি কোট ও এক জোড়া জুতা কিনিলেন এবং সতর বৎসর বয়সে নারায়ণগঞ্জের অন্তর্গত ঘোড়াশাল নামক স্থানে এক পাটের আপিসের খরিদ্দার বাবুর পাচকের কার্য্য জুটাইয়া প্রথম বিদেশ যাত্রা করিলেন। বিদেশে যাইবার আনন্দে নবলব্ধ চাকুরীতে বেতন কত মিলিবে তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন না! পরে জানিতে পারিলেন যে বেতন কিছু নাই—তবে ব্যাপারীরা পাট বিক্রয় করিতে আসিয়া প্রত্যেকে ঠাকুর ও চাকরের জন্য এক নাছি করিয়া পাট দেয় এবং তাহা বিক্রয় করিয়া মাসিক দশ বার টাকা হইতে পারে। যোগেশ বাবুর হাতের লেখা সুন্দর ছিল বলিয়া অবসর-সময়ে বড় বাবু তাঁহাকে পাটের দর কষিতে দিতেন। তাঁহার ভদ্র ব্যবহারে বাবুরা সকলেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন।

সকল সময়েই নূতন কিছু শিখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল। এই সময়ে (১৯০৫ সালে) দেশে নূতন প্রাণের সঞ্চার হয় এবং বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থানে অনেক নূতন শিল্প-শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখিয়া যোগেশচন্দ্র শিলাইদহে ঠাকুরবাবুদের প্রতিষ্ঠিত জাপানী ফ্লাই শাট্‌লে বয়ন-বিদ্যা শিক্ষা করিতে গেলেন। যে তাঁতী তাঁহাদের কাজ শিখাইত সে বেতন পাইত মাত্র ২৫৲ টাকা। সুতরাং এই কাজে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্বন্ধে তাঁহার ভরসা হইল না বলিয়া তিনি এ চেষ্টা ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পর ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি পুনরায় সিরাজগঞ্জে জনৈক পাটের আপিসের বড়বাবুর নিকট ভাত রাঁধিতে গেলেন এবং অবসর-মত এই ভদ্রলোকের নিকট পাট ক্রয় সংক্রান্ত অপরাপর কার্য্য শিখিতে লাগিলেন। এইরূপে দেড় বৎসরের পর তিনি ২০৲ বেতনে মুহুরী বা কেরানীর পদ পাইলেন এবং তৃতীয় বৎসরে

বড়বাবু বা purchaser হইলেন। কিন্তু ইহাতে একটি বিশেষ অসুবিধা হইল। বড়বাবু হইয়া পাট খরিদে চুরি না-করা ব্যতিক্রম। সুতরাং চুরি করিতে না পারায় তাঁহাকে চাকুরী ছাড়িতে হইল।

১৯০৯ সালে বরিশালের ভোলা মহকুমায় ১৫৲ বেতনে তিনি এক কণ্ট্রাকটারের সরকার নিযুক্ত হইলেন এবং ১৯১১ সালে বরিশাল শহরে এক আত্মীয়ের সহিত অংশীদারীতে একটি কাঠ, লোহা ও কয়লার কারবার আরম্ভ করিলেন। এই সময় কঠোর পরিশ্রম করিয়া তিনি নিয়মিত ভাবে তিন বৎসর ছুতার-মিস্ত্রির কার্য্য শিক্ষা করিলেন। বরিশালের অনেকের সঙ্গেই তাঁহার বন্ধুত্ব হইল এবং ওখানকার আবহাওয়ার গুণে তিনি লেখা-পড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন। বরিশালে থাকিতেই তিনি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর সংস্রবে আসিলেন। স্বামীজীই সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, এই সংসারে তাঁহার অবজ্ঞাত জীবনেরও প্রয়োজন আছে—এই বিশাল পৃথিবীতে তাঁহারও দিবার কিছু আছে। এই সময় যোগেশ বাবু তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। পরে স্বামীজী শঙ্কর-মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া যোগেশ বাবুর হস্তেই মঠের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করেন।

যোগেশচন্দ্রের পরিচালনায় ব্যবসায়ে আশানুরূপ লাভ হইতে লাগিল। স্বনামধন্য স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের কৃপায় বরিশালের ব্যবসায়ী এবং সুধী সমাজে তিনি সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। এই কারণে তাঁহার অংশীদারের মনে ঈর্ষ্যার উদ্রেক হইল।—আত্মীয় বলিয়া কারবার স্থাপনের সময় তাঁহাদের মধ্যে কোন দলিল বা লেখাপড়া হয় নাই। তাই সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার অংশীদার তাঁহার সহিত এমন ব্যবহার করিলেন যে সমস্ত ফেলিয়া একেবারে রিক্তহস্তে যোগেশ বাবুকে পুনরায় ভাগ্যান্বেষণে কলিকাতায় আসিতে হইল।

বরিশাল হইতে রওনা হইয়া ১৯১৪ সালের ৬ই জুন দু-পয়সা মাত্র হাতে লইয়া যোগেশ বাবু শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। কোথায় যাইবেন, কি করিবেন স্থিরতা নাই। অনেক বাল্যবন্ধুর নিকট গিয়া দেখিলেন যে তাঁহার আশ্রয়ে মাথা গুঁজিবার স্থান নাই। এই সময় ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়া গেল—লোহার বাজারে এ-বেলা ও-বেলা দরের পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। এই সুযোগে বিনা মূলধনে দালালি করিয়া যোগেশ বাবু মাসিক পঁচিশ-ত্রিশ টাকা পাইতে লাগিলেন। গোপী বসু লেনে একখানি খোলার ঘর ভাড়া করিয়া দুই-তিন জন কারিগর রাখিয়া এবং নিজেও অবসর-মত খাটিয়া ছোট ছোট কাঠের জিনিষ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং নিজেই তাহা ফেরী করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে মফস্বলের দু-চারটি অর্ডার সরবরাহের কার্য্যও করিতে লাগিলেন। মূলধনের অভাবে বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল, কিন্তু যুদ্ধের বাজারে লোহার দর ক্রমেই বাড়িতেছিল বলিয়া দালালি করিয়া মাসে ক্রমশঃ পঞ্চাশ-ষাট টাকা আয় হইতেছিল। তাহা দ্বারাই ক্রমে ক্রমে কাঠের ও অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

এক বৎসর পরে ১৯১৫ সালে যোগেশ বাবু লাভ-লোকসানের হিসাব করিয়া দেখিলেন যে কাঠের কারখানা, লোহার দালালি ও অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজে এক বৎসরে মোট এক হাজার আট শত টাকা লাভ হইয়াছে। অতঃপর ৬৩।১, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে খানিকটা জমি পঁচিশ টাকায় ভাড়া লইয়া একটি কাঠগোলা স্থাপন করিলেন—মূলধন হইল এক হাজার টাকা। মিস্ত্রির কাজ ও ভাল নক্সা আঁকিতে এবং নিজে হাতে-কলমে কাজ করিতে জানিতেন বলিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি কলিকাতার কণ্ট্রাক্টার-মহলে পরিচিত হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর ১৯১৬ সালে ইটালীতে পাঁচ কাঠা জমি নিজে লইয়া খোলার ঘর বাঁধিয়া কারখানা খুলিলেন। এই কাজে বৎসরে দুই হইতে আড়াই হাজার টাকা লাভ হইতে লাগিল। যুদ্ধের পর ১৯১৮ সালে বাজারের অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখা গেল এবং কাজও অনেক বাড়িয়া গেল। সস্তায় মিস্ত্রি পাওয়া যায় বলিয়া বেহালার দক্ষিণে বড়িশাতে যোগেশ বাবু একটি নূতন কারখানা খুলিলেন।

১৯২০ সালে কলিকাতার চারি পাশে মিল ও ফ্যাক্টরী গড়িয়া উঠিতেছিল। এই সময় যোগেশ বাবুর কাজ এত বাড়িতে লাগিল যে, তাঁহার স্থান ও মূলধন সবই অপ্রচুর বোধ হইতে লাগিল। কাজেই তিনি ক্যালকাটা বিল্ডার্স ষ্টোর্ নাম দিয়া একটি কোম্পানী রেজেষ্ট্রী করিলেন। পরে ১৯২২ সালে বৌবাজার ষ্ট্রীটে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্যাবিনেট কোম্পানী নাম দিয়া একটি আসবাবের দোকান খুলিলেন। নিজের কোন পৃথক্ স্বার্থ থাকা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া যোগেশ বাবু এই কারবারও ক্যালকাটা বিল্ডার্স ষ্টোর্-এর সম্পত্তিভুক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কণ্ট্রাক্টার মহলে ক্যালকাটা বিল্ডার্স ষ্টোর-এর নাম সুপরিচিত। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্যাবিনেট কোম্পানীর প্রস্তুত আসবাব সুদৃশ্য ও টেঁকসই বলিয়া বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ১৯২৯ সালে কলিকাতার কারখানার পত্তন হয়। উহাতে উপযুক্ত বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করিয়া উন্নত ধরণের মেশিন প্রভৃতি বসানো হইয়াছে। যোগেশ বাবুর আহ্বানে আমি ১৯৩০ সালের মার্চ্চ মাসে বোটানিক্যাল গার্ডেনের নিকটবর্ত্তী শালিমারে এই কারখানার উদ্বোধন করি।

ব্যবসায়ের প্রসার যতই বাড়িতে লাগিল, যোগেশ বাবু ততই ইংরেজী জ্ঞানের অভাব বোধ করিতে লাগিলেন। এই অভাব মিটাইবার জন্য স্বর্গগত আচার্য্য ললিতমোহন দাসের নিকট ১৯২২।২৩ সালে তিনি নিয়মিতভাবে ইংরেজী সাহিত্য পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত দিন কাজের চিন্তা, তার পর অযথেষ্ট মূলধনের অসংখ্য অসুবিধা—এসব সত্ত্বেও তিনি ধৈর্য্যের সহিত ইংরেজী ব্যাকরণের দুরূহ সূত্র কণ্ঠস্থ করিতে লাগিলেন। কাজের চাপে তাঁহার ইংরেজী পড়া খুব বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই সত্য, তবুও আজ তিনি ব্যবসায় চালাইবার মত ইংরেজী জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন।

ক্যালকাটা বিল্ডার্স ষ্টোর ১৯২০ সাল অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার বৎসর হইতেই অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইয়াছে। মাঝে মন্দার জন্য ইহা ১৯৩১ হইতে ১৯৩৪ সাল, এই চারি বৎসর কোন লভ্যাংশ দিতে পারে নাই। অন্যান্য বৎসর অন্যূন শতকরা সওয়া ছয় টাকা এবং অনধিক শতকরা সাড়ে-বার টাকা পর্য্যন্ত লভ্যাংশ বিতরিত হইয়াছে।

১৯৩১ সালে ক্যালকাটা ল্যাণ্ড ট্রষ্ট নামে আর একটি কোম্পানী যোগেশ বাবু প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা শহরে জমি বাড়ী ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ে, মালিকের অকস্মাৎ অবস্থা-বিপর্য্যয়ে অথবা মৃত্যুতে বিধবা এবং নাবালকদের বিষয়সম্পত্তি রক্ষার পক্ষে নানাপ্রকার জটিল অবস্থা ও বিবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন কলিকাতায় বহু বাড়ী ও জমি হস্তান্তরিত হইতেছে। এই সব ব্যাপারে জনসাধারণের সাহায্য করাই ট্রষ্টের উদ্দেশ্য। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত উহার কার্য্য তেমন প্রসার লাভ করে নাই। ১৯৩২ সাল হইতেই ট্রষ্ট অংশীদারদের শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ বিতরণ করিতেছে। ইহা যোগেশ বাবুর সুদক্ষ পরিচালনা গুণেই সম্ভব হইয়াছে বলিতে হইবে।

১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে ব্রহ্মদেশের সুপ্রসিদ্ধ সেগুন-বনের মালিক বি. বি. টি. সি. লিমিটেড্ (বোম্বে-বর্ম্মা ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড্) তাহাদের কলিকাতার মুৎসুদ্দি বা বেনিয়ানের পদ খালি হওয়াতে যোগেশ বাবুকে ডাকিয়া লইয়া এই পদে নিযুক্ত করেন। বাস্তবিক পক্ষে সেগুন কাঠের ব্যবসায়ে বোম্বে-বর্ম্মার বেনিয়ান নিযুক্ত হওয়া অপেক্ষা কাম্য আর কিছুই নাই। বেনিয়ন নিযুক্ত হইতে হইলে যে টাকা আমানত দিতে হয়, তাহা সংগ্রহ করা যোগেশ বাবুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাজারে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার যোগ্যতা ও সততার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া বি বি. টি. সি. তাঁহাকে এই পদে নিযুক্ত করেন এবং আবশ্যক আমানতের অর্থ ক্রমশঃ জমা দিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

১৯১৪ সালে যোগেশ বাবুকে আলুনা প্রস্তুত করিয়া ফেরী করিতে হইয়াছে—আর ১৯৩৪ সালে তাঁহার কাঠের ব্যবসায় পূর্ব্বে চট্টগ্রাম, পশ্চিমে রাজপুতানা, পঞ্জাব, উত্তরে গোরক্ষপুর ও দক্ষিণে গঞ্জাম পর্য্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যোগেশচন্দ্রের জীবন-চরিত বিশ্লেষণ করিলে ইহা
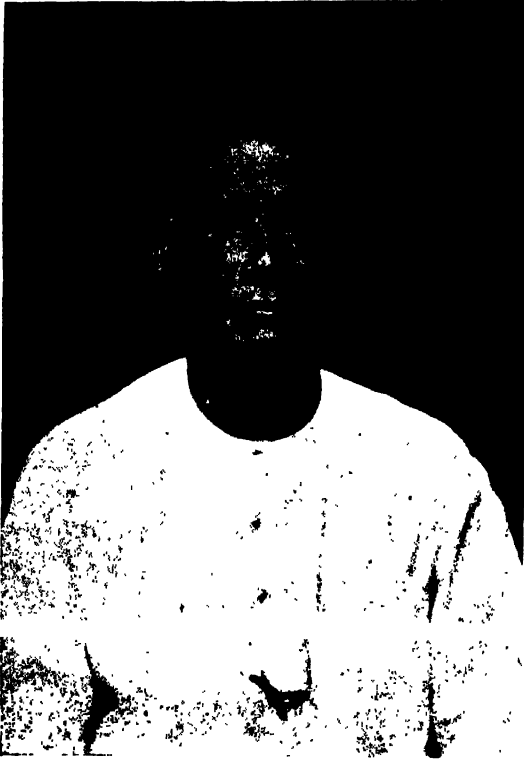
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সাধারণতঃ বাঙালীর মধ্যে কষ্ট-সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, সঙ্কল্পে দৃঢ়তা প্রভৃতি যে কয়েকটি গুণের একেবারেই অভাব দেখা যায় তাহার অনেক-গুলিরই তাঁহার মধ্যে সমাবেশ আছে। বাঙালী চরিত্রের আর একটি বিশেষ দোষ এই যে, তাঁহারা প্রথম হইতেই চাল বা ভড়ং বাড়াইয়া ফেলেন। সামান্য মোটা কাপড়, গায়ে মাত্র একখানি গামছা এবং নিজে রান্না করিয়া খাওয়া, ইহা কল্পনা করিতেও তাঁহারা অস্বস্তি বোধ করেন—অথচ তাঁহারা চোখের উপর নিত্য দেখিতেছেন সুদূর রাজপুতানার মরুপ্রান্তর হইতে আগত মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা কিরূপ কষ্টসহিষ্ণু। কত সামান্য ব্যয়ে জীবন ধারণ করিয়া তাঁহারা নিজ নিজ ব্যবসায়ের গোড়া পত্তন করেন। পিঠে বা মাথায় এক মণ দেড় মণ মাল বহিয়া ঝড়-বাদল উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা জিনিষ ফেরী করিতে থাকেন এবং দিনান্তে বৃক্ষতলে বসিয়া মাত্র লঙ্কা-সহযোগে একটু ছাতু উদরস্থ করিয়া লোটা হইতে জল পান করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করেন। দিনান্তে বিক্রয়লব্ধ মুনাফা হইতে সহজে তিনি একটি পয়সাও ব্যয় করিতে চাহেন না। অন্য দিকে বাঙ্গালী যুবকগণ ব্যবসা আরম্ভ করিলে প্রথম হইতেই জেলা বা মহকুমা শহরে অথবা জনাকীর্ণ পল্লীতে দোকান খুলিয়া বসিবেন এবং ঘর ভাড়া, চাকরের বেতন, মিউনিসিপ্যাল বা অন্য প্রকার ট্যাক্স দিয়া ও বিবিধপ্রকারের সরঞ্জামী খরচ জোগাইয়া ব্যয়বাহুল্য করিতে বাধ্য হইবেন। আমি অনেক বাঙ্গালী যুবকের মুখে শুনিয়াছি যে, বাঙ্গালী বাঙ্গালীর দোকান হইতে জিনিষ না-কিনিয়া অনেক সময়ই পার্শ্ববর্ত্তী মাড়োয়ারীর দোকানে জিনিষ কিনিতে যায়। প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে মাড়োয়ারীরা অল্প খরচে মাল আমদানী করিতে পারে বলিয়া অপেক্ষাকৃত কম দরে বিক্রয় করিতে পারে। সুতরাং সাধারণ দরিদ্র খরিদ্দার যে তাহাদের নিকট মাল লইতে যাইবে তাহাতে অনুযোগ করা চলে কি?

কোন কোন বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে অসাফল্যের আরও দুইটি প্রধান কারণ—সততা ও সঙ্কল্পে দৃঢ়তার অভাব। চুরি ও চাকুরীত্যাগের মধ্যে যোগেশ বাবু চাকুরীত্যাগই বাছিয়া লইয়াছিলেন! কিন্তু চিরাচরিত পথে আশু লাভের সম্ভাবনাকে ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে কয়জন এইরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারিতেন? সাধারণ বাঙ্গালী যুবক ব্যবসা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই আ..ল ফুলিয়া কলাগাছ হইতে চান, এবং প্রথম অবস্থায় আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে না পারিলে হতাশ হইয়া ব্যবসা গুটাইবার কথা চিন্তা করিতে থাকেন—দৈবক্রমে সে সময় একটা সামান্য বেতনের কেরানীগিরি মিলিলেই নিজেকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া গড্ডলিকা-প্রবাহে মিশিয়া যান—কোথায় বা থাকে তাঁহার ব্যবসায়, কোথায় বা থাকে তখন "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" প্রভৃতি মুখরোচক বাণী।

বর

শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত

সকালবেলা। কাম্যক বনের ঘন গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে সোনালী রৌদ্র মাটিতে পড়িয়া চিত্র-বিচিত্র নক্সার সৃষ্টি করিয়াছে। পাখীরা কলরব করিতেছে, মশাদের কোলাহল থামিয়াছে।

সারারাত হোম হইয়াছে, ভোরবেলাই হারীতের ক্ষুধা পাইয়াছিল। গৃহমধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিল জননী গৃহে নাই। হারীত দ্বার পড়িয়াছিল, গৃহকোণে কলসটিও নাই দেখিয়া বুঝিল মা জল আনিতে গিয়াছেন।

হোম আজও চলিবে, সমিধ-আহরণে যাওয়া দরকার। অথচ সারা রাত জাগরণের পর খালি পেটে কুড়াল চালানোও আরামের কথা নয়। হারীত অধীর হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল; তাহার ব্যগ্র চক্ষু পথের পানে এবং শঙ্কিত কর্ণ যজ্ঞশালার দিকে উদ্যত রহিল।

সকল দুঃসময়েরই কালে অবসান হয়। শুচিস্মিতাও জল লইয়া ফিরিলেন। হারীতকে দেখিয়া কহিলেন, এ কি, তুই এখনও সমিধ আহরণ করিতে গেলি না যে?

হারীত কহিল—ক্ষুধায় আমার অন্তর জ্বলিয়া যাইতেছে। খাইয়া যাইব বলিয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম।

শুচিস্মিতা কহিলেন—কিন্তু ওদিকে সমিধ অভাবে যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটিলে উনি ক্রুদ্ধ হইবেন। লক্ষ্মী বাবা আমার, তুমি চট্‌পট্‌ কিছু কাষ্ঠ লইয়া আইস, আমি ততক্ষণ তোমার জন্য অতি উৎকৃষ্ট আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছি।

হারীত কহিল—লক্ষ্মী বাবা আমার ডাকিলেই যদি পেট ভরিত, তবে আর লোকে এত কষ্ট করিয়া কৃষিকর্ম প্রভৃতি করিত না। আমি না-খাইয়া যাইতে পারিব না।

শুচিস্মিতা কহিলেন—কিন্তু যজ্ঞের বিঘ্ন যদি হয়? তুমি ঋষিপুত্র, এ কি অন্যায় জেদ তোমার!

হারীত কহিল—আমিও ত তাহাই বলিতেছি, আমি ঋষিপুত্র, মল্লপুত্র নহি। শূন্য উদরে কুঠার চালনা করিবার মত শক্তি আমার নাই।

শুচিস্মিতা রোষ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন—তবে ঘটুক যজ্ঞের বাধা, কেমন? এহেন পাপবুদ্ধি তোমার জন্মিল কোথা হইতে? তোমার মত গণ্ডমূর্খকে গর্ভে ধরিয়াছি মনে করিয়াও আমার চিত্তে ধিক্কার আসিতেছে। কাষ্ঠ না-আনিলে আজ তুমি খাইতে পাইবে না। এই আমি বসিলাম। দেখি কে তোমাকে খাইতে দেয়।

হারীত উঠিয়া কুঠার স্কন্ধে লইল। কহিল—বেশ, আমার ক্ষুধা অপেক্ষা যখন কাষ্ঠের প্রতিই তোমার নজর বেশী, আমি চলিলাম। কিন্তু দুর্ব্বল দেহে শ্রম করিতে গিয়া যদি হাত পা কাটিয়া ফেলি বা গাছ চাপা পড়িয়া মারা পড়ি, পুত্রহীন আমি হইব না, তোমরাই হইবে, সেই কথাটা মনে রাখিও।

হারীত গরগর করিতে করিতে প্রাঙ্গণে নামিয়া পড়িল। বাহিরে যাইবার পথে একখানি বংশ-নির্ম্মিত আগড় লাগান ছিল, রাগের মাথায় সেটাকে ঠেলিয়া যাইতে তাহার পায়ে সামান্য আঘাত লাগিল। ক্রোধোন্মত্ত হারীত ভ্রূক্ষেপও করিল না, বেড়াটা দুম্‌ করিয়া ঠেলিয়া দিয়া হন্‌হন্‌ করিয়া আগাইয়া চলিল।

শুচিস্মিতা দেখিলেন, হারীতের পায়ে আঘাত লাগিয়াছে। নিমেষে তাঁহার ক্রোধ উবিয়া গেল। উঠিয়া আসিয়া ডাকিলেন—এই, ফিরিয়া আয়, খাইয়া যা।

হারীত থামিয়া দাঁড়াইল, মুখ ফিরাইল না।

শুচিস্মিতা কহিলেন—কাছে আয়, দেখি তোর পায়ে আঘাত লাগিল নাকি।

হারীত মুখ ভার করিয়া কহিল—থাক্‌ দেখিতে হইবে না।

শুচিস্মিতা আগাইয়া আসিলেন, হারীতের হাত ধরিয়া কহিলেন—লক্ষ্মী বাবা আমার, রাগ করিস না। আর খাইয়া যা।

হারীত কহিল—হাত ছাড়িয়া দাও বলিতেছি।

শুচিস্মিতা হাতটাকে নিজের মস্তকে স্থাপন করিয়া কহিলেন—আমার মাথা খাস্। না-খাইয়া তুই যাইতে পারিবি না।

হারীত কহিল—আমি মাথাটাথা খাইতে পারিব না।

শুচিস্মিতা কহিলেন—বালাই, সত্যই মাথা খাইবি কেন। ঘরে কি আহার্য্যের অভাব ঘটিয়াছে? দেখি তোর পায়ে কতটা লাগিয়াছে।

হারীত কহিল—লাগে নাই।

—নিশ্চয় লাগিয়াছে।

শুচিস্মিতা নুইয়া বসিয়া তাহার পা দেখিলেন। কহিলেন—না, কাটে নাই বটে। বল্কলের পাড়টা খানিক ছিঁড়িয়া গিয়াছে—দুপুরবেলা ছাড়িয়া দিস্ আমি শেলাই করিয়া দিব এখন। চল খাইবি—পরশ যে চাঁপাকলা কাটিয়া আনিয়াছিলি তাহা পাকিয়াছে। নন্দিনীর দুধ দিয়া চমৎকার দধি পাতিয়া রাখিয়াছি।

হারীত ফিরিল। আসনে বসিয়া পড়িয়া কহিল—শীঘ্র লইয়া আইস।

শুচিস্মিতা ঝটিতি দধি ও কলা লইয়া আসিলেন, কহিলেন—চিঁড়া ধুইয়া দিতেছি, ভিজিল্ বলিয়া।

হারীত কহিল—তুমি জল লইয়া ফিরিতে এত দেরি করিলে কেন? দেরি না হইলে ত আমার রাগ হইত না।

শুচিস্মিতা চিঁড়া মাখিতে মাখিতে কহিলেন—দেরি হইল কি আর সাধে। আজ ঘাটে গিয়া দেখি ভগিনী অরুন্ধতীও জল লইতে আসিয়াছে। আমাকে দেখিয়া কত দুঃখের কথা বলিতে লাগিল…

—আর তুমি অমনি দাঁড়াইয়া গেলে, না? গল্প পাইলে আর কিছু মনে থাকে না। এদিকে যে আমি ক্ষুধায় মরিতেছি…

শুচিস্মিতা কহিলেন—রাগ করিস না বাবা, সত্যিই ভারি দুঃখের কথা। এত সাধ করিয়া বেচারী পুত্রটির বিবাহ দিয়াছে, এখন বধূর ঠেলায় তাহার প্রাণ যায়। নামেই প্রিয়ংবদা—অমন বদমেজাজী অপ্রিয়ভাষিণী বধূ কাম্যক বনে কেহ কখনও দেখে নাই। অরুন্ধতীর যা কান্না যদি দেখিস…

হারীত কহিল—আমার বহিয়া গিয়াছে তোমার বন্ধুর কান্না দেখিতে যাইতে। তোমার চিঁড়া ধোওয়া কি এ-বৎসর সারা হইবে না?

শুচিস্মিতা তাড়াতাড়ি চিঁড়ায় জল ঢালিয়া দিয়া কহিলেন—এই যে হইল। বাবা রে বাবা, কি মেজাজ ছেলের—ওই রকম একটি বধূর পাল্লায় পড়িলেই রাজজোটক হইত।

হারীত মুঠা মুঠা চিঁড়া দধিপূর্ণ পাত্রে ফেলিতে ফেলিতে কহিল—হুঁ! চুলের ঝুঁটি ধরিয়া দুই কিলে শায়েস্তা করিয়া দিতাম না?

শুচিস্মিতা কহিলেন—তা বটে। তপোবনকে শবরপল্লী করিয়া না-তুলিলে চলিবে কেন।

হারীত চিঁড়া মাখিয়া মুখে তুলিল।

শুচিস্মিতা আপন মনে কহিলেন—আর বিচিত্রই বা কি। হয়ত আমারও গৃহে এমন বধূই আসিবে—আমারও শেষে চোখের জলেই জীবন কাটিয়া যাইবে। দগ্ধ দেশাচারের জ্বালায়, নিজে যে দেখিয়া-শুনিয়া মনের মত বাছিয়া বধূ ঘরে আনিব তাহার ত আর জো নাই।

দধিটা ভাল জমিয়াছিল, এবং কাম্যক বনের চিঁড়া ও চাঁপাকলার সু-তার বিখ্যাত। অতএব হারীত কহিল—তুমি চিন্তা করিও না মা। বধূ হইতেই যদি তোমার ভয়, আমি বিবাহই করিব না।

শুচিস্মিতা সস্নেহে হাসিয়া কহিলেন—পাগ্‌লা ছেলে। সে-কথা তোকে কে বলিয়াছে?

হারীত গম্ভীর হইয়া কহিল—না, মা, রহস্য নয়। আমার মা তুমি, আমি তোমাকে দু-টা রুক্ষ কথা বলিলেও বা বলিতে পারি। তাই বলিয়া কে-না-কে একটা পরের মেয়ে আসিয়া বলিবে? আমি সত্যই বিবাহ করিব না।

শুচিস্মিতার মুখে ম্লান ছায়া পড়িল। কহিলেন—ছিঃ বাবা, অমন কথা বলিতে নাই। তুমি ঋষিপুত্র, একবার সত্য করিয়া ফেলিলে আর ভাঙিতে পারিবে না। আমার

কাছে যা বলিয়াছ বলিয়াছ, আর কখনও এমন কথা মুখে কেন মনেও আনিও না।

হারীত কহিল—সত্য তোমার কাছে করিলেও সত্য, আর কাহারও কাছে করিলেও সত্য, নির্জ্জনে উচ্চারণ করিলেও সত্য। আমি ঋষিপুত্র…

শুচিস্মিতা কহিলেন—হারীত!

হারীত কহিল—হ্যাঁ, আমি ঋষিপুত্র, যে-কথা একবার উচ্চারণ করিয়াছি…

—হারীত!!

—যে-কথা একবার মুখে উচ্চারণ করিয়াছি তাহার অন্যথা করিতে…

—হারীত!!!

—অন্যথা করিতে পারিব না। আমি বিবাহ করিব না।

অন্তরীক্ষে দেবগণ সাধু সাধু বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, কিন্তু শুচিস্মিতার কানে সে ধ্বনি পশিল না। তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

হারীত ডাকিল—মা।

মা উত্তর দিলেন না।

হারীত ভীতস্বরে ডাকিল—সুশী।

সুশ্বেতা ওদিক হইতে সাড়া দিল—কেন?

—শীঘ্র আয়।

সুশ্বেতা ছুটিয়া আসিয়া, থমকিয়া দাঁড়াইল। কহিল—কি হইয়াছে দাদা? মা কি মরিয়া গিয়াছেন?

হারীত কহিল—মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন। তুই এক পাত্র জল লইয়া আয়।

দুই ভাইবোনে মিলিয়া অনেক জল অনেক বাতাস দিতে, ক্রমে শুচিস্মিতার সংজ্ঞা ফিরিল। চক্ষু অর্দ্ধ-উন্মীলিত করিয়া অস্ফুট ক্ষীণস্বরে কহিলেন—হারীত!

হারীত তাঁহার মুখের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল—মা।

শুচিস্মিতা কহিলেন—হারীত, তুই আমার…

হারীত কহিল—হ্যাঁ মা, এই ত আমি তোমার কাছেই রহিয়াছি। তুমি একটু ঘুমাও।

শুচিস্মিতা ঘুমাইয়া পড়িলেন।

হারীত কহিল—সুশী, তুই এইখানেই থাক। মা ঘুম ভাঙিয়া সুস্থ না হইলে অন্যত্র যাস না।

সুশ্বেতা কহিল—আমি রান্না চাপাইয়া আসিয়াছি যে।

হারীত কহিল—তা হউক। আমি সমিধ-আহরণে চলিলাম। এই পাত্রগুলি সরাইয়া রাখ, খাইতে বসিয়া সমিধ আনিতে যাইতে দেরি করিয়াছি জানিলে পিতা ক্রুদ্ধ হইবেন।

দণ্ড দুই পরে শুচিস্মিতার তন্দ্রা ভাঙিল। মৃদুস্বরে কহিলেন—হারীত!

সুশ্বেতা কহিল—দাদা সমিধ আনিতে গিয়াছে। শুচিস্মিতা উঠিয়া বসিলেন। নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—দুটি খাইয়াও যাইতে পারিল না!

সুশ্বেতা কহিল—তুমি ব্যস্ত হইও না মা, উত্তরীয়ে বাঁধিয়া গোটা-পচিশেক কলা লইয়া গিয়াছে।

•

হারীতের মনটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, ক্ষুধার কথা বিস্মৃত হইয়া সে অন্যমনে আগাইয়া চলিল। কিন্তু কিছু দূর গিয়াই যে মনোহর দৃশ্য তাহার চক্ষে পড়িল তাহাতে চমৎকৃত চিত্ত তাহার চকিতে চাঙ্গা হইয়া উঠিল।

গোদাবরীর একেবারে কিনারায় প্রকাণ্ড এক শুষ্ক দেবদারু বহুকাল যাবৎ খাড়া দাঁড়াইয়া ছিল। সেই গাছটা গোড়া হইতে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, এবং শুধু তাই নয়, পড়ার ধাক্কায় আপনা হইতেই টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া রহিয়াছে। কাটিবার পরিশ্রম ত বাঁচিয়াছেই, মাথায় করিয়া আর বহিয়াও এটাকে লইয়া যাইতে হইবে না—একটা ভাল দেখিয়া লতা জোগাড় করিয়া গাছটাকে নদীর জলে ভাসাইয়া একেবারে আশ্রমের ঘাটেই তোলা যাইবে। তার উপর আবার আনন্দের ত্র্যহস্পর্শ—গোদাবরীতেও তখন ভাঁটা। এখন একবার কোনমতে কাঠকে জলে নামাইতে পারিলেই হইল। হারীত ভারি উৎফুল্ল মনে লতা কাটিতে চলিল।

শুভক্ষণ যখন আসে চতুর্দ্দিক হইতেই ঝাঁপিয়া আসে। লতার সন্ধান করিতে হারীতকে বেশী বেগ পাইতে হইল না। নিকটেই একটা বড় পাকুড় গাছ কে কাটিয়া

লইয়া গিয়াছে, তাহার পরিত্যক্ত ডালপালার মধ্যে একটা বৃহৎকায় শ্যাম-লতা জড়াইয়া রহিয়াছে। অতি অল্প আয়াসেই সেটাকে সাফ করিয়া লওয়া যাইবে।

হারীত কুঠারটাকে একটা গাছের গোড়ায় রাখিল, উত্তরীয় খুলিয়া পুঁটুলি করিয়া কুঠারের পাশে রাখিল, তার পর বল্কল মালকোঁচা মারিয়া পরিয়া লতা ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল।

—হং হো!

হারীত মুখ ফিরাইয়া দেখিল, জটাজুটসমন্বিত এক ঋষি।

লতা-টানা থামাইয়া কহিল—আমাকে বলিতেছেন?

ঋষি কহিলেন—বালক, বর্ষীয়ান্‌কে সম্মান করিতে হয়।

হারীতের মন আপাতত প্রসন্ন ছিল, আসিয়া ঋষিকে প্রণাম করিল। ঋষি কহিলেন—কল্যাণ হউক। বৎস, তুমি কে? ইহাই বা কোন্ স্থান?

হারীত কহিল—দেব, আমি ঋষিবর শ্রীমহাতপার পুত্র, নাম হারীত। ইহা কাম্যক বন।

ঋষি কহিলেন—আমি ঋষি ক্রতু।

হারীত আর একবার প্রণাম করিল।

ক্রতু কহিলেন—দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিয়াছিলাম। এই অঞ্চল আমার অপরিচিত বলিয়া দিগ্‌ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি।

হারীত কহিল—দেব, অনতিদূরে আমাদের আশ্রম। যদি অনুগ্রহ করিয়া একবার পদার্পণ করেন, আশ্রম ধন্য হইবে, পিতাও অত্যন্ত খুশী হইবেন।

ক্রতু কহিলেন—তোমার শ্রদ্ধের জনে ভক্তি আমার স্মরণ থাকিবে। কিন্তু ইদানীং আমার সময় অতি অল্প। আমি ঋষিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসার আহ্বানে যাইতেছি, বিলম্ব হইলে ঋষি ক্রুদ্ধ হইবেন। না হইলে এমনিই আমি ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত, আতিথ্যগ্রহণের আমন্ত্রণ কদাচ উপেক্ষা করিতাম না—আমার সে স্বভাবই নহে। তোমার উপরোধ রাখিতে পারিলাম না, সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

হারীত কহিল—সে বুঝিতেছি। কিন্তু আপনাকে ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত অবস্থায় চলিয়া যাইতে দিয়াছি শুনিলে পিতা নিরতিশয় দুঃখিত হইবেন।

ক্রতু কহিলেন—তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিও। এখন আশ্রমে গেলেই আটকা পড়িয়া যাইব, আমার পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে।

হারীত কহিল—তবে অন্তত এইখানেই যতটুকু সম্ভব ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া যাইতে হইবে। আমার উত্তরীয়ে আমাদের স্বীয় উদ্যানজাত সুপক্ব কদলী বাঁধা আছে...

ক্রতু শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করিয়া কহিলেন—তুমি তোমার পিতার পুত্রের যোগ্য কথাই বলিয়াছ। কিন্তু তুমি নিজে খাইবে বলিয়া কদলী লইয়া আসিয়াছ। বালকের মুখের গ্রাস খাওয়া বৃদ্ধের শোভা পায় না।

হারীত কহিল—আমি এখনও বালক নহি—তরুণ, সবলকায়। আপনি বৃদ্ধ, পরিশ্রান্ত। বিশেষত আমার গৃহ নিকটে, তথায় আরও প্রচুর কদলী আছে এবং সর্ব্বোপরি আপনি অতিথি। যদি না খান তবে আমি...

ক্রতু সহর্ষে কহিলেন—তুমি যখন একান্তই ছাড়িবে না, তখন আর কি করি। থাক থাক তোমার আর কষ্ট করিতে হইবে না, আমিই নিজেই লইতেছি। তুমি তোমার কর্ত্তব্য করিতে থাক।

হারীত কহিল—কিন্তু এখানে ত জলপাত্র নাই। আমি বরং গৃহ হইতে একটা...

ক্রতু কহিলেন—চিন্তা করিও না, আমি নদীতে নামিয়াই জল পান করিব। মুনি-ঋষির সর্ব্বদা বিলাসিতা করিলে চলে না, বিশেষ বিদেশে। তুমি কিন্তু আমাকে পথটা বলিয়া দিবে।

হারীত আবার লতা ছাড়াইতে লাগিল। ঋষি পরিতৃপ্তিসহকারে সব ক'টি কদলী ভক্ষণ করিয়া জল পান করিলেন, তার পর একটি সুগম্ভীর ঢেঁকুর তুলিয়া কহিলেন—বড় আনন্দ পাইলাম। আশীর্ব্বাদ করি তোমার রাঙা খোকা হউক। এইবার তাহা হইলে পথটা আমাকে একটু দেখাইয়া দাও।

হারীত পথ দেখাইয়া দিল। ঋষি আর একবার আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া বনপথে অন্তর্হিত হইলেন।

আশ্রমে পৌছিতেই সুশ্বেতা ছুটিয়া আসিয়া কহিল—দাদা এত দেরি করিয়া আসিলে কেন?

হারীত উত্তরীয়ে ঘাম মুছিয়া কহিল—দেরি কোথায় দেখিলি? অন্য দিন হইতে ত অনেক শীঘ্র ফিরিয়াছি। মা কেমন আছেন?

সুশ্বেতা কহিল—ভাল আছেন। কিন্তু তুমি আর দেরি করিও না, শীঘ্র খাইতে আইস। মা তোমার থালা কোলে করিয়া সেই কখন হইতে বসিয়া রহিয়াছেন। তুমি না খাইলে তিনি কিছু মুখে তুলিবেন না।

হারীত কহিল—আমি চট্ করিয়া গোদাবরীতে একটা ডুব দিয়া আসিতেছি। তুই আমার বল্কলটা আনিয়া দে। আর উত্তরীয়টা—আচ্ছা থাক···

বলিয়া হারীত হঠাৎ একটুখানি হাসিল।

সুশ্বেতা কহিল—দাও উত্তরীয়। হাসিলে কেন?

হারীত কহিল—না, উত্তরীয়ে বাঁধিয়া কলা লইয়া গিয়াছিলাম, এটা ধুইয়াই আনি।

সুশ্বেতা কহিল—কিন্তু হাসিলে কেন? কলা গলায় বাধিয়া গিয়াছিল বুঝি? না খোসার উপরে চরণক্ষেপণ করিয়া···বলিয়া সে দুই বাহু ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া দেহ পশ্চাতে হেলাইয়া, কলার খোসায় অসতর্ক পদক্ষেপজনিত ভারকেন্দ্রের অসমতার অভিনয় করিল—উ?

হারীত কহিল—তাহা নয়। আজ একটা ভারি মজার কাণ্ড ঘটিল।

—কি, বল না দাদা লক্ষ্মীটি।

—এখন নহে, পরে বলিব। আমার বল্কল আনিলি না?

শুচিস্মিতা কিন্তু কন্যার মুখে সকল কথা শুনিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন। হারীতকে একান্তে ডাকিয়া কহিলেন—হ্যাঁ রে, সত্য?

হারীত কহিল—আমি আলগা কথা বলিতে পারি, বানানো কথা বলি না।

শুচিস্মিতা কহিলেন—কিন্তু এখন উপায়?

—কিসের উপায়?

—তিন দিন আগেকার কথা এরই মধ্যে ভুলিয়া গেলি? কি ভূত তোর ঘাড়ে চাপিল, খামকা ত্রিসত্য করিয়া বসিলি বিবাহ করিব না। এদিকে ঋষি গেলেন তোকে পুত্র-বর দিয়া। তার পর?

হারীত নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। শুচিস্মিতা কহিলেন—তোকে সত্য ভাঙিতেই বা বলি কেমন করিয়া, ওদিকে ঋষিবাক্যই বা রক্ষা হয় কি করিয়া। এ ত মহা সমস্যা বাধাইয়া বসিলি দেখিতেছি।

হারীত কহিল—তুমি কি করিতে বল?

শুচিস্মিতা অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তার পর ব্যাকুলভাবে হারীতের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন—লক্ষ্মী বাবা আমার, কথা শোন্। তুই বিবাহ কর্।

হারীত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

শুচিস্মিতা বলিতে লাগিলেন—সেদিন যা বলিয়াছিস বলিয়াছিস, আর কেহ সে কথা জানে না।···

হারীত হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল—ছি মা, তুমি আমাকে সত্য ভঙ্গ করিতে বল!

শুচিস্মিতা কহিলেন—এছাড়া যে আর উপায় নাই। আমি বলিতেছি তুই বিবাহ কর। আমার আদেশে যত দোষ তোর খণ্ডিয়া যাইবে—তবু যদি পাপ হয় সে পাপ সমস্ত আমার।

হারীত ধীরস্বরে কহিল—তাহা হয় না।

শুচিস্মিতা কহিলেন—হইতেই হইবে। তুই আমার একমাত্র পুত্র, তুই বিবাহ না করিলে বংশ লোপ পাইবে। কিন্তু সেই জন্যও ত আমি তোকে সত্যভঙ্গ করিতে বলি নাই। কিন্তু এখন, এই যে ঋষি তোকে পুত্র-বর দিয়া গেলেন, তোর পুত্র না হইলে তাঁহার সত্যভঙ্গ হইবে। তুই নিজের জেদ বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাকে সত্যভ্রষ্ট করিবি? এই তোর ধর্ম্মজ্ঞান?

হারীত গোঁজ হইয়া কহিল—আমি কি করিব?

—বিবাহ কর্। আমি জানি সত্যভঙ্গ করা পাপ। কিন্তু অপরকে সত্যভঙ্গ-পাপে টানিয়া আনা আরও বড় পাপ। বিশেষত ঋষি ক্রতুর মত লোককে এত বড় পাপের ভাগী যদি করিস, আমার অশান্তির যে আর সীমা থাকিবে না।

হারীত চটিয়া কহিল—তোমার ঋষি ক্রতুর মত

লোকই বা এমন কাণ্ড করিলেন কোন্ বুদ্ধিতে শুনি? নিজে না খাইয়া তাঁহাকে কলা খাওয়াইয়াছিলাম, খাইয়া চুপচাপ কাটিয়া পড়িলেই ত পারিতেন। আবার আদিখ্যেতা করিয়া 'রাঙা খোকা হোক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে তাঁকে কে বলিয়াছিল? না-হক্ এক বাক্য ঝাড়িয়া আস্তা ফ্যাসাদ বাধাইয়া দিয়া গেলেন। আমি তাঁহার কাছে পুত্র-বরের জন্ম কাঁদিয়া পড়িয়াছিলাম কি না। যত সব···

শুচিস্মিতা কঠিন কণ্ঠে কহিলেন—হা ঈশ্বর, তোকে আমি আঁতুড়েই সৈন্ধব-চূর্ণ খাওয়াইলাম না কেন! হতভাগ্য দুর্বিনীত ছেলে—যে ত্রিকালজ্ঞ ঋষি সর্ব্বলোকের নমস্ত তাঁহাকে তুই এমন কথা বলিস!

হারীত কহিল—বলি। এতই যদি তিনি মহাপুরুষ, আমি যে সত্য করিয়াছিলাম সেটা তিনি খেয়াল করেন নাই কেন? ত্রিকালজ্ঞ না কচু।

ক্রোধে শুচিস্মিতার মুখ শ্বেতবর্ণ ধারণ করিল। তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না, হস্ত প্রসারণ করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন, আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।

হারীত উঠি-উঠি করিতেছে এমন সময় সুশ্বেতা আসিয়া পড়িল। সুশ্বেতা মেয়েটির বয়স কম, কিন্তু বুদ্ধি ছিল। ঘরের মধ্যে পা দিয়াই সে মোটামুটি অবস্থা অনুমান করিয়া লইল; চকিতে বাহির হইয়া গিয়া একটু দূর হইতে হাঁকিয়া কহিল—মা, বাবা আসিতেছেন।

হারীত আর তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া প্রস্থান করিল।

এত বড় একটা সমস্যা নিজের দায়িত্বে চাপা দিয়া রাখিতে শুচিস্মিতা ভরসা করিলেন না। স্বামীর মেজাজটা যখন বেশ একটু ভাল আছে এমন সময় বুঝিয়া তাঁহার কাছে কথাটা পাড়িলেন।

মহাতপা ধীরপ্রজ্ঞ লোক। হারীত বিবাহ করিবে না শুনিয়া তিনি কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। কহিলেন—প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, বেশ শুনিয়া রাখিলাম।

শুচিস্মিতা কহিলেন—শুধু আধখানা কথা শুনিয়া রাখিলেই কর্ত্তব্য সমাপন হইল?

মহাতপা কহিলেন—আর কি করিব শুনি? নাচিব? না তাহাকে সত্যভঙ্গ করিতে বলিব?

শুচিস্মিতা রাগ করিয়া কহিলেন—আমি কি তাই বলিতেছি নাকি? আর বলিলেই যেন কত হইত—যে বাধ্য পুত্র তোমার। আমিই কি বলিতে কসুর করিয়াছি?

মহাতপা চক্ষু চাহিয়া কহিলেন—কি বলিয়াছ? সত্যভঙ্গ করিতে?

শুচিস্মিতা সহসা স্পষ্ট উত্তর দিতে পারিলেন না।

মহাতপা কহিলেন—খুব ভাল। ছেলে বিবাহ করিবে না বলিয়াছে—বলিয়াছে ব্যস্। অমন অনেক ছেলেই বলে। চুপ করিয়া থাকিলেই হইল। আর যদি সে সত্যই বিবাহ করিতে না-চায়, না-ই করিল। তুমি তাই বলিয়া কোন্ বুদ্ধিতে তাহাকে সত্যভঙ্গ করিতে অনুরোধ করিতে গেলে? বেশ করিয়াছে সে তোমার কথা রাখে নাই,—আমার পুত্রের যোগ্য কাজই করিয়াছে। এখন আবার আমার কাছে তাই লইয়া কাঁদুনি গাহিতে আসিয়াছ কোন লজ্জায়?

—হ্যাঁ, আমার কথা কানে না তোলাটা যে তোমার পুত্রত্বেরই পরিচায়ক, সে কথা আর এত দিন পরে আমাকে নূতন করিয়া তোমায় বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু আমি তাই লইয়া কাঁদুনি গাহিতেই তোমার কাছে আসি নাই, বিশ্বসংসারে লোকের আরও কাজ আছে। এদিকে যে জটিল সমস্যা পাকাইয়া উঠিয়াছে···

—কি আবার জটিল সমস্যা এর মধ্যে আসিল? সে বিবাহ না করিলেই বংশ লোপ হইবে, এ চিন্তা এখনই না করিলেও চলিবে। আর যদি বিবাহ না করিলে পরে সে ইন্দ্রিয়-দমন করিতে পারিবে কিনা, এই-ই তোমার সমস্যা হয়···

শুচিস্মিতা ঝাঁঝিয়া উঠিলেন—ঘাট হইয়াছে তোমাকে বলিতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান যদি নাও থাকে, শালীনতাজ্ঞানও কি একেবারেই থাকিতে নাই? কি সব যা-তা কথা এক জন মহিলার সম্মুখে এমন অনায়াসে উচ্চারণ করিতে তোমার বাধিতেছে না?

মহাতপা বিস্মিত হইয়া কহিলেন—কি হইল! কিসের সম্মুখে বলিলে?

—মহিলা। বলি কথাটাও শোন নাই নাকি কোনদিন।

—ও, হ্যাঁ। কিন্তু এখানে আছি ত আমি আর তুমি, এর মধ্যে মহিলা আবার আসিল কোথা হইতে?

—আমার মাথা হইতে। বলি কথাটা শেষ পর্য্যন্ত শুনিবে, না, না?

—আহা আমি কি বলিয়াছি শুনিব না? একটু সুস্থ হইয়া বলিলেই ত হয়।

—বলিতে দিলে ত বলিব।

—বেশ, বল।

তখন শুচিস্মিতা ক্রতু-সংবাদ স্বামীর গোচর করিলেন। তিনি ধৈর্য্য ধরিয়া শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া কহিলেন—তা এর মধ্যে তোমার জটিল সমস্যাটা উপজিল কোথায়?

—সে জ্ঞান থাকিলে আর এ দশা হইবে কেন। ছেলে বলিল বিবাহ করিব না, ঋষি দিলেন তাহাকে পুত্র-বর। বিবাহ না করিলে পুত্র হইবে কি করিয়া?

মহাতপা ইহাতেও বিচলিত হইলেন না। কহিলেন—এই কথা? তা তিনি যখন বর দিয়া গিয়াছেন, ফলিবার হয় ত এক দিক না এক দিক দিয়া ফলিয়া যাইবেই। তুমি লাফালাফি না করিলেও ফলিবে।

—ফলিবে কি উপায়ে শুনি না।

—উপায় ত কতই আছে। ধর যদি সে বিবাহ না করে এবং তপস্যা আরম্ভ করে, দেবতারা হয়ত তাহার তপোভঙ্গ করিবার জন্ম কোনো অপ্সরাকে প্রেরণ করিবেন···

শুচিস্মিতা কানে আঙুল দিয়া কহিলেন—হইয়াছে থাম। নিজের পুত্রের সম্বন্ধে এমন কথা উচ্চারণ করিতে মুখে একটু আটকাইল না! পুরুষমানুষের ধরণই এক অদ্ভুত।

মহাতপা কহিলেন—পুরুষমানুষের ধরণ মেয়েমানুষের মত নয়, তার কি করা যাইবে। তোমার জটিল সমস্যা বাধিয়াছিল, তাহার একটা সমাধান বাতলাইয়া দিলাম—কোথায় সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইবে, না আবার এক ফ্যাকড়া বাহির করিয়া বকাবকি সুরু করিয়া দিলে। তোমাকে দোষ দিই না, ওটা মেয়েমানুষের স্বভাব। কিন্তু কথাটা তোমার পছন্দ হইল না কেন শুনি? পুরাণে ইতিহাসে··

—জ্বালাইও না বলিতেছি। কেন পছন্দ হইল না তাও আবার বলিয়া দিতে হইবে নাকি।

—না বলিতে চাও আমার গরজ নাই। এবারে সরিয়া পড়, আমার বিস্তর কাজ আছে। কোশলে অনাবৃষ্টি হইয়াছে, সে-জন্ম যজ্ঞের আয়োজন করিতে হইবে, দক্ষিণাপথে··

—এমন না হইলে আর··নিজের ঘরবাড়ী রসাতলে যাক, ওদিকে তুমি দুই চক্ষু বুজিয়া ত্রিলোকের মঙ্গল-চিন্তায় মত্ত থাক, তাহা হইলেই সব হইবে। ভাল লোক লইয়াই পড়িয়াছি যা হোক। সত্য বলিতেছি, তোমার ব্যবহারে এক-এক সময় গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করে।

মহাতপা চক্ষু মুদিয়া কহিলেন—অয়ি শুদ্ধি, তোমার পদভরে ঘরবাড়ী রসাতলে যাইবে কি না ঠিক বলিতে পারিলাম না, কিন্তু ঐ কর্ম্মটি করিতে যাইও না। দড়ি ছিঁড়িয়া যাইবে—মিথ্যা গলায় ব্যথার উদ্ভব এবং মালিশার্থে ইঙ্গুদী তৈলের অপব্যয় হইবে। আমি এমনিই ব্যস্ত মানুষ, যন্ত্রণা আর বাড়াইও না।

শুচিস্মিতা এবারে উপায়ান্তর গ্রহণ করিলেন। অগত্যা মহাতপার গাম্ভীর্য্য টুটিল, কহিলেন--আহা কর কি। ছিঃ, চক্ষু মুছিয়া ফেল। মেয়েটা হঠাৎ আসিয়া পড়িলে কি ভাবিবে?

শুচিস্মিতা কহিলেন—যা সত্য, আমার কপাল তার বেশী কিছু আর ভাবিবে না।

—আঃ, তোমাদের দক্ষিণদেশী মেয়েদের দোষই ঐ, ঠাট্টা বুঝিতে পার .না। আচ্ছা এবারে বল কি বলিবে। অভয় দিলাম আর গণ্ডগোল করিব না।

শুচিস্মিতা চক্ষু মুছিয়া কহিলেন—কত বার ত বলিলাম। একটা বিহিত কর।

—কি বিহিত করিব? আমি একটা বিবাহ করিলে ত আর এর সমাধান হইবে না। তাহাকে সত্যভঙ্গ করিতেও আমি বলিতে পারিব না।

—কিন্তু তাহার পুত্র না হইলে যে ঋষি সত্যে পতিত হইবেন।

—হওয়াই উচিত। পথেঘাটে অমন সস্তা বর ছড়াইলে সে বর বন্ধ্যই হয়। আরে বাপু কুড়িখানেক কলা খাওয়াইলেই যদি পুত্র-বর মিলিত, তবে আর লোকে কষ্ট করিয়া পুত্রেষ্টিও করিত না, অপুত্রকস্য বলিয়াও কোন কথা জগতে থাকিত না। ওসব সস্তা বর ফলে না। আর যখন ফলে, আমি যে উপায় বলিলাম ঐ রকম বক্র গতিতেই ফলে। কথাটা ভাবিয়াই বলিয়াছিলাম, চাপল্য আমি করি না।

—ওসব আমি বুঝি না। ঋষি যখন বর দিয়াছেন, সে বর যাহাতে ফলে এবং শোভনভাবেই ফলে, তাহার

ব্যবস্থা তোমাকে করিতে হইবে। আমি নাতির মুখ দেখিব।

—তাই বল, এটা তোমার গরজ। কিন্তু নাতির মুখ দেখিবার উপায় ত আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। আচ্ছা, তোমার বুদ্ধিতে কি উপায় জোগাইল সেইটাই বল শুনি।

শুচিস্মিত পতির প্রতি চকিত বক্রদৃষ্টি হানিয়া কহিলেন,—কে বলিল তোমাকে আমি কোন উপায় স্থির করিয়াছি। আমি কিছু জানিটানি না।

—হুঁ হুঁ, মাঝে মাঝে বুঝি। কিছু একটা মতলব মাথায় না থাকিলে বৃথা এতক্ষণ বসিয়া কলরব করিবার পাত্রী তুমি নহ। কেন আর দর বাড়াইতেছ, নাও বলিয়া ফেল।

—বলিয়া লাভ কি। কথা রাখিবে না ত।

—ভাল জ্বালা। আচ্ছা যদি রাখা সম্ভব হয় ত রাখিব। কিন্তু বলিয়া রাখিতেছি তাহাকে সত্যভঙ্গ করিতে বলিতে পারিব না।

—আচ্ছা, আচ্ছা।

এই বারে শুচিস্মিতা আসল কথা পাড়িলেন, কহিলেন, যোগবলে পুত্র আনিয়া দাও।

মহাতপা অনেকক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে পত্নীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। শেষে কহিলেন—কি বলিলে?

—ঐ ত বলিলাম, যোগবলে···

—হুঁ। এমন না হইলে আর স্ত্রীবুদ্ধি বলিয়াছে কেন।

—কেন, স্ত্রীবুদ্ধির অপরাধটা কি হইল শুনি?

—যোগবল ত যত্রতত্র ফলিয়া থাকে কিনা, ঝুড়ি ভরিয়া কুড়াইয়া আনিলেই হইল। যাও যাও ছেলেমানুষি করিও না।

—ছেলেমানুষি!

—নয় ত কি। আজ তোমার নাতির মুখ দেখিবার সখ হইবে, কাল তোমার নাতি জুজু দেখিবার বায়না ধরিবে,—আর আমি বসিয়া বসিয়া যোগবল দিয়া খেলনা তৈরি করিব, কেমন?

—আহা মরি মরি, কি মধুর উপমাই দিলেন। নাতি আর জুজু এক হইল?

—এক না হইলেও একই শ্রেণীর ত—অনাবশ্যক বস্তু। তাহার জন্য যোগবলের অপচয় করা চলে না।

—বুদ্ধির দৌড় দেখিলে অঙ্গ জ্বলিয়া যায়। নাতির মুখ দেখাটা অনাবশ্যক বস্তু হইয়া গেল!

—নিশ্চয়। পুৎ নরকের দায় এড়াইয়াছি। নাতি আমার ঐহিক পারত্রিক কোন কাজে আসিবে না। আসিবে যার, সে যদি পুত্রের প্রয়োজন আছে মনে করে, নিজেই তার ব্যবস্থা দেখিবে। আমার অত নষ্ট করার সময় নাই। তা ছাড়া যোগবল আমাদের গচ্ছিত ধন, বিশ্বের হিতার্থেই তাহার ব্যবহার। নিজের খেয়ালে তাহার অপচয় করার অধিকার আমাদের থাকে না।

শুচিস্মিতা আর একবার চক্ষে অঞ্চল দিতে যাইতেছেন, হেনকালে অন্তরীক্ষে ভীম গম্ভীর ধ্বনি শ্রুত হইল।

মহাতপা কহিলেন—গৃহচ্ছদের উপরে কোন্ উল্লুক আরোহণ করিয়াছে?

শুনিলেন দৈববাণী হইল—হে ঋষি, শুচিস্মিতার বাক্য অবহেলা করিও না। যোগবলে তোমার পুত্রের সন্তান সৃষ্টি কর।

মহাতপা ঝানু লোক। কহিলেন—কোন্ দেব আমাকে সম্বোধন করিলেন আগে শুনি।

উত্তর হইল, আমি অশ্বিনীকুমার দস্র। শ্রবণ কর।

মহাতপা কহিলেন, আদেশ করুন।

বাণী কহিল—কলিযুগে মনুষ্যজাতি বিজ্ঞানবলে রসায়নাগারে কৃত্রিম মনুষ্য সৃষ্টির প্রয়াস পাইবে। তুমি যজ্ঞবলে আগে-ভাগেই মনুষ্যসৃষ্টি করিয়া যাও, যেন উত্তরকালে ম্লেচ্ছ জাতি মনুষ্যসৃষ্টির সাধনায় প্রথম সাফল্যের গৌরব না-করিতে পারে। হে মহাতপা, তুমি নিঃসংশয়চিত্তে যজ্ঞায়োজন কর। ঊনপঞ্চাশ পবন তোমার সহায় থাকিবেন, আমরা দুই ভ্রাতা তোমাকে জ্ঞান জোগাইব।

দৈববাণী ক্ষান্ত হইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ গৃহ যেন থম্‌থম্ করিতে লাগিল। অবশেষে মহাতপা কহিলেন—তবে আর কি, এখন ত নিশ্চিন্ত হইলে।

শুচিস্মিতা মনে মনে কহিলেন, মরণ, দেবতারা কি নিভৃত গৃহেও আড়ি পাতিয়া থাকে না কি!

মহাতপা কহিলেন—সে বরাহ কোথায়?

শুচিস্মিতা কহিলেন—আশ্রমেই আছে। ডাকিব?

—ডাক। আয়োজন আমি করিতে পারি, সঙ্কল্প হোম আহুতি সব তাহাকেই করিতে হইবে। যজ্ঞোৎপন্ন

পুত্র যজ্ঞকারীর নামেই পরিচিত হয়। যজ্ঞ কি এখনই করা তোমার মত ?

শুচিস্মিতা তাড়াতাড়ি কহিলেন—হ্যাঁ। ফাঁড়া যত শীঘ্র কাটিয়া যায় ততই মঙ্গল। আমি তাহাকে ডাকিয়া দিতেছি।

শুচিস্মিতা উঠিয়া গেলেন।

অনতিবিলম্বে হারীত আসিয়া পিতার সম্মুখে দাঁড়াইল।

তিনি তাহাকে একবার আপাদমস্তক অবলোকন করিয়া কহিলেন—এ আবার কি জঞ্জাল বাধাইয়াছ ?

হারীত নিঃশব্দে ঘামিতে লাগিল।

মহাতপা কহিলেন—পুত্রমুখ দেখিবার বড় বেশী সখ হইয়াছে, না ? হতভাগা মর্কট !

হারীত করুণ কণ্ঠে কহিল—আমি কি করিব। আমি ত বর চাহি নাই। ঋষি বলিলেন…

—ঋষি বলিলেন ! তুমি সর্দ্দারি করিয়া তাঁহাকে কলা খাওয়াইতে গিয়াছিলে কেন শুনি ? জান এটা সত্যযুগ নয়, বিনা স্বার্থে কেহ কাহাকেও কিছু দেয় না। তুমি কলা খাওয়াইতেই তিনি ধরিয়া লইয়াছেন তুমি কিছু চাও। আর ও বয়সে সকলেই চায় পত্নীবর, সেটাকে উচ্চারণ করে পুৎনরকের দোহাই দিয়া। তার পর যদি তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি কেন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জানাইলে না, তুমি দ্বিতীয় ভীষ্ম বনিয়া গিয়াছ ?

হারীত আরও কাতর স্বরে কহিল—তিনি বলিয়াই চলিয়া গেলেন যে।

—আবার তর্ক করে ! চলিয়া গেলেন—ডাকিলে আর ফিরিতেন না, কেমন ? তোমার ইচ্ছা থাকিলে ছুটিয়া গিয়াও ত তাঁহাকে ধরিতে পারিতে। সে যাক্। আর এই মহান্ সত্যটা করিয়া বসিলে কি উপলক্ষ্যে ?

হারীত নীরব।

মহাতপা কহিলেন—নাম চাও, নাম, না ? ভীষ্ম চিরকুমার-ব্রত লইয়া ত্রিভুবনে নাম কিনিয়াছেন, কাজেই তোমারও একটা প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, এই ত ? ভীষ্মের নাম শুধু এই প্রতিজ্ঞার জন্য নয়—অবিবাহিত অনেকেই থাকে। তোমার মত হতভাগারা মেয়ে জোটে না বলিয়াই থাকে, তাহাতে নাম হয় না। ভীষ্মের আরও অনেক গুণ আছে যার জন্য তাঁর নাম—সে তোমার আছে ? আর দেখ, এই কথাটা কোনও দিন ভুলিও না—যে প্রথম কোনও বড় কাজ করে তাহারই নাম হয়। আর যে তাহাকে শুধু অহেতুক অনুকরণ করে তাকে বলে মর্কট— তুমি যা। বুঝিয়াছ ?

হারীত মাথা হেলাইয়া জানাইল, বুঝিয়াছে।

মহাতপা কহিলেন—তবু ভাল। যাও, কাল উপবাস ও সংযম করিবে—পরশ্ব যজ্ঞারম্ভ হইবে। আর কোনও প্রয়োজন থাকে বলিতে পার, না থাকে…

হারীত কম্পিত পদে প্রস্থান করিল।

যজ্ঞস্থল। যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেওয়া হইয়াছে, এবারে প্রাণ-আবাহন হইতেছে। অদূরে বসিয়া শুচিস্মিতা অপলক নেত্রে দেখিতেছেন।

হারীত হোতার আসনে উপবিষ্ট। পার্শ্বে মহাতপা তন্ত্রধার। হারীতের সম্মুখে অর্দ্ধনির্ব্বাপিত হোমকুণ্ডের উপরে রক্ষিত মন্ত্রপূত বারিপূর্ণ স্বর্ণকলস।

মহাতপার নির্দ্দেশ অনুসারে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হারীত সেই কলসে শিশুর দেহসৃষ্টির উপকরণ বস্তুচয় নিক্ষেপ করিতেছে। প্রতি অঙ্গের জন্য অনুরূপ দ্রব্যচয় একে একে কলসে নিক্ষিপ্ত হইল : অস্থির জন্য হস্তীদন্ত, দন্তের জন্য মুক্তা, মাংসের জন্য গৈরিক মৃত্তিকা, রক্তের জন্য দ্রাক্ষাসার, চর্ম্মের জন্য ভূর্জ্জপত্র, বর্ণের জন্য হরিতাল, বাহুর জন্য বংশকোরক, উরুর জন্য কদলীকাণ্ড, চক্ষের জন্য বেত্রফল, ওষ্ঠের জন্য লাক্ষারস, কেশের জন্য কৃষ্ণরেশম।

দশ মাস দশ দিন কলস মন্ত্ররুদ্ধ কক্ষে সংগুপ্ত রহিল। তার পর কক্ষের ভিতর হইতে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল।

মহাতপা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দ্বার উন্মোচন করিলেন, শুচিস্মিতা আস্তে ব্যস্তে ছুটিয়া গিয়া শিশুকে কলস হইতে বাহির করিলেন…

শিশুকে কোলে লইয়া বাহিরে আসিতেই মহাতপা কহিলেন—এ কি, যজ্ঞের সঙ্কল্পানুরূপ ত হয় নাই।

শিশুর সর্ব্বশরীর মায় মাথার চুল পর্য্যন্ত ঘোর উজ্জ্বল রক্তবর্ণ।

মহাতপা কহিলেন—হতভাগাটা কতখানি লাক্ষারস ঢালিয়াছিল !

শুচিস্মিতা কহিলেন—তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কোনও কালেই হইবে না। ঋষির বর ছিল রাঙা খোকা হইবে, মনে আছে ?

বলিয়া অজস্র চুম্বনে রাঙা খোকাকে আরও রাঙা করিয়া তুলিলেন।

মাটির বাসা

শ্রীসীতা দেবী

২৫

মল্লিক-গৃহিণী সবে একটুখানি গড়াইয়া লইয়া, উঠিয়া দ্বিতীয়বার রান্নাঘরের পর্ব্ব আরম্ভ করিতে যাইতেছেন এমন সময় বীরেনবাবুর মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মল্লিক-গৃহিণী তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দাওয়ায় একখানা কম্বলের আসন বিছাইয়া দিয়া বলিলেন, "আসুন মাসীমা, বসুন। কি ভাগ্যি যে দেখা পেলাম।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তা বাছা, তুমিই বা কোন্ মাসীকে মনে ক'রে একবার যাও। বুড়ো হাড়, কবে আছি কবে নেই।"

মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "মরবারই সময় পাই না মা, যাব কোথায়? তার উপর এই ভাগ্নীর বিয়ে এগিয়ে আসছে, একলা হাতে তারও জোগাড় করতে হচ্ছে ত?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "সময় আর কারই বা আছে বাছা? তুমি বললে বটে নিজের কথা, ভাবছ যে বুড়ীর কি-ই বা কাজ, ইচ্ছাসুখে বেড়িয়ে বেড়াতে পারে। তা কিন্তু নয়, একদিন গিয়েই দেখ। এই বুড়ী যে দিক্ না-তাকাচ্ছে, সেই দিক্‌ই পণ্ড। থাক্ না দশটা বৌ-ঝি, তবু দে'খে শুনে রাখতে হয় আমাকেই সব। তাই বলি 'ওরে বুড়ী যে ক-দিন আছে সুখ ক'রে নে, তার পর বুঝবি কত ধানে কত চাল'।"

মল্লিক-গৃহিণী দেখিলেন বৃদ্ধার মেজাজ বেশ কিছু গরম হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার চেয়ে কোনও মানুষে বেশী কাজ করে এমন ইঙ্গিত মাত্র হইলেই তিনি চটিয়া যান। বুড়ী মানুষকে চটাইয়া লাভ নাই, কাজেই মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "তা ত বটেই মাসীমা, আপনারা সব আগের কালের মানুষ, আপনাদের হাড় শক্ত কত! আমরা এই বয়সেই আপনাদের অর্দ্ধেক খাটতে পারি না, আপনাদের বয়সে হয়ত জড়পিণ্ডি হয়ে যাব। তা বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? এতটা রোদে হেঁটে এসেছেন।"

বৃদ্ধা বসিয়া বলিলেন, "তা ত তুমি বলবেই মা, ভালমানষের বেটী যে হবে সে হক্ কথা বলবে। দেখতে পায় না কিছু আমার ঘরের চোক্‌খাগীরা, তারা আমাকে শুধু ব'সে থাকতেই দেখে। যেদিন চোখ বুজব একেবারে, সেদিন ভালমতে বুঝবে। তা ভাগ্নীর বিয়ে একেবারে ঠিক হয়ে গেল নাকি?"

গৃহিণী বলিলেন, "দরকষাকষি এখনও চলছে, উনি ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, যেমন ক'রে হোক কাজ চুকিয়ে দেবার জন্যে। আমিই বাধা দিচ্ছি। ঘটি-বাটি বেচে যদি একটা মেয়ের বিয়ে দিই, তাহলে আর দুটোর হবে কি? পুরুষ মানুষ অত বোঝে না মা, গলায় কাঁটা বিঁধলে যেমন করে হোক নামাতে চায়। আমরা ছেলেপিলের মা, আমাদের সব দিক্ দেখতে হয় ত?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "ঠিকই ত, ভাগ্নীর বিয়ে দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হ'লে চলবে কেন বাছা? নিজেরও দুটো মেয়ে রয়েছে ত? তারাও ত বেটের কোলে ডাগর হয়ে উঠছে, তাদের কথাও ভাবতে হয় ত? তা ওরা বেশী দর হাঁকে ত তোমরাও অন্য পাত্র দেখ না? তোমাদের মেয়ে কিছু মন্দ নয়, শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে।"

মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "মেয়ে কি আর আমাদের পোড়া সমাজে কেউ দেখে মাসীমা? যেমন তেমন হোক্ হাত পা থাকলেই হল। সবাই টাকার জন্যে হাঙ্গরের মত হাঁ ক'রে আছে। আর কোথায় খুঁজতে যাব বল? গাঁয়ে ত আর বিয়ের যুগ্যি ভাল ছেলে দেখি না। সাত গাঁ খুঁজে বেড়াবার সময় বা কার আছে? বাপ নিজে ত ক'টা টাকা দিয়ে খালাস, যত দায় পড়েছে আমাদের ঘাড়ে। তার উপর তারও

আবার এখন-তখন অবস্থা, সেও হয়েছে এক অশান্তি। কোন মতে দুই হাত এক ক'রে দিতে পারলে বাঁচি, কখন বা বাগ্ড়া পড়ে।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "একটি ছেলে আছে মা, সে বিনা পয়সাতেই বিয়ে করতে রাজী, তা তোদের পছন্দ হবে কিনা জানি না, বিষয়-আশয় তেমন কিছুই নেই।"

মল্লিক-গৃহিণী একটু সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, "ওমা, কাদের ছেলে গা? আমরা ত আর কারও কাছে বিয়ের কথা পাড়ি নি? আমাদের মেয়ে দেখল কোথায়? গাঁয়েরই মানুষ নাকি?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "এ গাঁয়ের না মা, কদমপুরের। ঐ যে ছেলেটি আজ বীরুর সঙ্গে তোমাদের বাড়ী দুপুর বেলা এসেছিল। এবার বি-এ পাস দিয়েছে। ঘর ভাল, বাপের এক সন্তান। জমিজমা বাড়ীঘর সবই আছে, নেই যে তা নয়, তবে বাপ মারা যাবার পর বাঁধাছাঁদা পড়েছে আর কি? তা এবার ভাল চাকরীতে ঢুকলেই ছাড়িয়ে নেবে সব। দেখতে দিব্যি, তোমার পঞ্চার চেয়ে অনেক ভাল। কথাবার্ত্তা ভারি মিষ্টি।"

মল্লিক-গৃহিণী বিমলের রূপগুণের বর্ণনায় খুব যে মোহিত হইয়া গেলেন, তাহা বোধ হইল না। বলিলেন, "সম্বন্ধটা আনলে কে?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "মাথার উপর তার তেমন কেউ নেই বাছা, নিজেই আমার কাছে বলেছে। তোমরা যদি গা কর, তাহলে তার মাকে পত্তর দিয়ে সব খবর জানতে পার, কথাবার্ত্তাও পাকা হতে পারে; আজ রাতের গাড়ীতেই সে ফিরে যাচ্ছে। মেয়েকে কলকাতায় দে'খে পছন্দ হয়েছে তাই, না হলে বেটাছেলে বি-এ পাস, ওর বিয়ের ভাবনা কি?"

বৃদ্ধা ঘটকীগিরিতে খুব পাকা না হইলেও নিতান্ত মন্দ নহেন। তবে মল্লিক-গৃহিণীও বুদ্ধিমতী, শুধু কথায় ভুলিবার মেয়ে নহেন। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা দেখি ওঁর সঙ্গে কথা ব'লে। এখানকার সম্বন্ধটা সকল দিকে ভাল, এক খাঁই বড় বেশী। মেয়ে আমাদের চোখের উপর থাকবে, বেশী দূরে বিয়ে দিতে মন চায় না। এখানকারটা যদি দরে ব'নে যায় ত হয়েই গেল, নইলে ঐ ছেলেটির খোঁজ করতে বলব। জমিজমা, ঘরবাড়ী সবই বাঁধা বলছ কি না, ঐটাই ভাল ঠেকছে না। চাকরী কবে হবে তা কে জানে মা? তার উপর ভরসা কি?"

বৃদ্ধার আর বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না। আরও দুই-চার বাড়ী ঘুরিয়া যাইতে হইবে, অন্ধকার হইয়া যাইবার আগে। বলিলেন, "তা হলে ব'সো মা, আমি উঠি; সব কাজ প'ড়ে রয়েছে। যদি মত হয়, আমায় বললেই আমি পত্তর দিয়ে ছেলেকে আনাব। একেবারে কিচ্ছুটি দিতে হবে না, সেটাও মনে রেখ। ফুলের মালা গলায়, হাতে শাঁখা দিয়ে মেয়ে বিদায় ক'রে দিলেও সে কিছু বলবে না।"

মল্লিক-গৃহিণী একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "অমন ক'রে কেন আমরা দিতে যাব মাসীমা? আমাদেরও ত একটা মানসম্ভ্রম আছে? আমাদের সাধ্যিমত আমরা মেয়েকে দেব। তবে অবস্থার অতিরিক্ত চাইছে তাই না পাঁচটা কথা হচ্ছে? তা আমি ওঁকে বলব এখন, আজই সন্ধ্যেবেলা।"

বৃদ্ধা আবার গামছা পাট করিয়া মাথায় চাপা দিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। এখনই বাড়ী যাইবেন না, আরও পাঁচটা বন্ধুবান্ধব আছে, সব জায়গায় একটু ঘুরিয়া যাইবেন। তেমন কোন সুখবর ত লইয়া যাইতে পারিলেন না, কাজেই বিমলের সঙ্গে শীঘ্র দেখা করিতে কোনও উৎসাহ বোধ করিতেছিলেন না। নিতান্ত ছেলেটা ছাড়ে না, তাই তিনি আসিয়াছিলেন, নহিলে পঞ্চানন যে পাত্র হিসাবে অনেক ভাল, তাহা কি আর তিনি বোঝেন না? কচি খুকীটি ত আর নন?

তিনি চলিয়া যাইবার পরও মল্লিক-গৃহিণী খানিক ক্ষণ দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কাজের কথা তখন যেন তাঁহার আর মনে রহিল না। কে এ ছেলেটি? মৃণালকে কলিকাতায় দেখিয়াছে বলিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, মৃণালও তাহা হইলে ইহাকে দেখিয়াছে। কিন্তু দুপুরে যখন ছেলেটি বীরেনবাবুর সঙ্গে আসিয়াছিল, তখন মিনি ত সে কথা কিছুই বলিল না? ইহাদের আলাপ-পরিচয় হইয়াছে নাকি কে জানে?

বড় মেয়ে, বছরের দশটা মাস চোখের আড়ালেই থাকিত, এ-বয়সে মন এদিক্ ওদিক্ যাইতে ত সময় লাগে না। ইহারই জন্ত পঞ্চাননকে বিবাহ করিতে চায় না নাকি, কে জানে? তাহা হইলে ত বিপদ্। মল্লিক-গৃহিণী পল্লীবাসিনী হিন্দুগৃহিণী হইলে কি হইবে? অনেকখানি স্বাভাবিক বুদ্ধি লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন স্থলে বিবাহ দিয়া কিছু যে সুবিধা হইবে না, তাহা তিনি মনে বুঝিতেই পারিতেছিলেন।

ভাতের হাঁড়িটা তাক হইতে নামাইয়া তিনি উনানের উপর বসাইয়া দিলেন। ঘটি করিয়া তাহাতে জল ঢালিতে ঢালিতে ডাকিয়া বলিলেন, "মিনু, শুনে যা ত একবার।"

মৃণাল ঘরে বসিয়া শেলাই করিতেছিল, মামীর ডাক শুনিয়া শেলাইটা পাট্ করিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ডাকছ মামীমা, তরকারি কুটে দেব?"

মামীমা পিতলের গামলায়, ছোট বেতের পাই ভর্ত্তি করিয়া চাল ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, "না, সে হবে এখন পরে। শোন্, আজ দুপুরে যে ছেলেটি এসেছিল বীরু ঠাকুরপোর সঙ্গে, তার নামটা কি রে?"

মৃণালের মুখ যেন রক্তগোলাপের মত রাঙা হইয়া উঠিল। মামীমা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। মৃণাল বলিল, "তাঁর নাম বিমলকুমার রায়।"

"ওকে চিনিস নাকি তুই? ও বাড়ীর মাসীমা বলছিলেন, কলকাতায় তোদের চেনাশোনা হয়েছে?"

মৃণাল চেষ্টা করিয়া গলাটা স্বাভাবিক করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ঠাকুরমার বোনঝির বাড়ীতে আলাপ হয়েছিল।"

মামীমার আর বেশী জেরা করিবার ইচ্ছা ছিল না। বলিলেন, "চিঁড়ে ক'টা কুলোয় ক'রে নিয়ে যা, ওঘরেই ব'সে বেছে দে। খোকাটার দিকে একটু চোখ রাখিস, যেন ঘুমের ঘোরে খাটের উপর থেকে উল্টে না পড়ে।"

মৃণাল কুলায় চিঁড়া ঢালিয়া লইয়া চলিয়া গেল। বিমল তাহা হইলে বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্তই ঠাকুরমাকে পাঠাইয়াছিল? তাঁহার সাড়া পাইয়া মৃণালের একবার ইচ্ছা করিয়াছিল এইদিকে আসিবার, কিন্তু আসে নাই এই সম্ভাবনার কথা মনে করিয়াই। মামীমা তাঁহাকে কি উত্তর দিলেন কে জানে? খুব সম্ভব সোজাসুজি বিদায় করিয়া দিয়াছেন। হিন্দুর সংসারে সর্ব্বপ্রথম ত টাকাকড়ি দেখা হয়, তাহার পর অন্ত কথা। বিমল দরিদ্র, সুতরাং সেই অপরাধেই প্রথম তাহার কথা কেহ কানে তুলিবে না।

মল্লিক-গৃহিণী রান্নার ফাঁকে ফাঁকে কত কথাই যে ভাবিতে লাগিলেন তাহার ঠিকানা নাই। ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হইয়াছে তাহা মৃণাল স্বীকার করিল বটে, কিন্তু হইতে পারে যে শুধু আলাপই হইয়াছে, তাহার বেশী কিছু নয়। তবে মুখখানা মেয়ের অমন লাল হইয়া উঠিল কেন? সেটা মামীমার প্রশ্নে লজ্জাবশতঃও হইতে পারে। মল্লিক-গৃহিণীর বিবাহ হইয়াছিল এগারো বৎসরে, শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছিলেন তিনি বারো বৎসর বয়সে। ভালবাসিবার বৃত্তির উন্মেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীকে তিনি পাইয়াছিলেন, তাঁহাকেই একান্ত ভাবে ভালবাসিয়াছিলেন। তাই কুমারী-জীবনের এই দারুণ সংগ্রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার কোনও পরিচয় ছিল না। বুদ্ধি দ্বারা খানিকটা বুঝিতেন বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে শুধু বুদ্ধি শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে না। এই কণ্টক-কুসুমাবৃত পথে রক্তাক্ত চরণে নিজে যে না চলিয়াছে, সে ত এ-পথের কি আকর্ষণ তাহা বুঝিতে পারিবে না?

বাহিরে কর্ত্তার সাড়া পাইয়া তিনি তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। মল্লিক-মহাশয় দিবানিদ্রা সারিয়া এক পাক ঘুরিয়া আসেন, কোনদিন একেবারে সন্ধ্যার আঁধারের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফেরেন, কোনদিন বা একটু আগে। আজ গৃহিণী মনে মনে তাঁহার জন্ত অতিশয় আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই আকুলতাই ইহাকে অকালে ঘরে টানিয়া আনিল নাকি কে জানে?

গৃহিণী বলিলেন, "ওগো শোন, এখুনি যেন আবার কোথাও ঘুরতে চলে যেও না। ঘরে ব'স একটু, আমি আসছি চাল ক'টা ঢেলে দিয়ে।"

মল্লিক-মহাশয় ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া নিজের

তক্তপোষের উপর বসিলেন। গ্রীষ্মকালের রাত্রে এইখানেই মশারি খাটাইয়া তিনি শুইয়া থাকেন, পারতপক্ষে ঘরে ঢোকেন না। দিনের বেলা অবশ্য দারুণ রৌদ্রের তাড়নায় তাঁহাকে ঘরের ভিতর আশ্রয় লইতে হয়।

গৃহিণী তাড়াতাড়ি চাল হাঁড়িতে দিয়া হাত আঁচলে মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিলেন। স্বামীর কাছে গিয়া এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "ওগো, ওবাড়ীর বুড়ো মাসীমা ত আজ মিনির জন্যে এক সম্বন্ধ এনে হাজির।"

কর্ত্তা একটু বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "তাই নাকি? কোথাকার পাত্র?"

গৃহিণী বলিলেন, "ঐ যে গো দুপুরে যে ছেলেটি এসেছিল। তুমি ঘটা ক'রে জল খাওয়ালে পঞ্চুদের কে হয় ব'লে। এদিকে এসেছিল সে অন্য মতলবে। কলকাতায় কোথায় মিনিকে দে'খে পছন্দ করেছে, ব্যস্ তার পর সোজা প্রস্তাব মাসীমাকে দিয়ে। ছেলে নিজেই নিজের কর্ত্তা, বাপমায়ের ধার ধারে না।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "তা ছেলেটি ভাল। বেশ সুশ্রী দেখতে, কথাবার্ত্তায় বেশ বুদ্ধিমান্ বলে বোধ হ'ল। তারই মামার সঙ্গে এদিকে ঠিক হয়ে গেল যে, না হ'লে পাত্র মন্দ নয়। ছোক্‌রা পঞ্চাননের সঙ্গে বিয়ের কথা জানে না বোধ হয়, তা হলে কি আর এ-বিয়ের প্রস্তাব করত?"

গৃহিণী কর্ত্তার শেষের কথা কয়টা উপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "ওমা ঠিক হয়ে গেছে নাকি। কই আমাকে ত কিছুই বল নি? দেনাপাওনার কি স্থির হল? ওদেরই জেদ বজায় রইল নাকি?"

কর্ত্তা বলিলেন, "বলবার সময় পেলাম কই? আজই একটু আগে ত পাকা কথা হ'ল কিনা? বুড়ো সাড়ে সাত শ'তে রাজী, তবে টাকা একসঙ্গেই দিতে হবে। এই ক'মাসের জন্যে টাকা ধার করতে হবে আর কি? আস্তে আস্তে বুড়োকে দিতাম, না-হয় মহাজনকে দেব। তবে গোটা বারো-চোদ্দ টাকা সুদে যাবে আর কি?"

গৃহিণী ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "আর পঞ্চাশটা টাকা পণেও বেশী যাবে, সেটা বুঝি আর টাকা না? একেবারে পাকা কথা দিয়ে এসেছ?"

কর্ত্তা বলিলেন, "ঐ দেওয়াই হ'ল আর কি? মুখে অবশ্য বলেছি, বাড়ীতে পরামর্শ ক'রে কাল জানাব। আর এ ঝামেলা পোয়াতে পারি না বাপু। এদিকে মৃগাঙ্কর খবরও কিছু ভাল নয়। একদিন ভাল থাকে ত তার পরদিন যাই-যাই অবস্থা হয়। সামনের মঙ্গলবারটা দিন ভাল আছে, সেই দিন আশীর্ব্বাদের ব্যবস্থা করতে হবে। জোগাড় হয়ে উঠবে ত? মাঝে ত তিন দিন সময়।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা হ'তেই হবে। বিয়ে ত দিচ্ছ বাপু ঘটা ক'রে, এখন মেয়ে সুখী হলেই হয়। কলকাতায় ছিল অত বড় মেয়ে, মন কোথায় আছে কে জানে? এই সম্বন্ধর নামে ত মুখ শুকিয়ে যায় তার। ঐ ছেলেটিকে পছন্দ ছিল নাকি কে জানে?"

মল্লিক-মহাশয় কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন, "আরে না, না, ও-সব আবার কি কথা? একদিন চোখে দেখলেই অমনি তার উপর মন প'ড়ে যায় নাকি? থাকত ত বোর্ডিঙে, সেখানে ও-সব মেলামেশার সুবিধে নেই। বিয়ে দিয়ে দিলে ঠিক মন ব'সে যাবে। পঞ্চুর স্বভাবচরিত্র ভাল, মেয়েকেও খুব পছন্দ, ওখানে ও আদরে থাকবে, তুমি দেখো। কেন তোমার এমন কথা মনে হচ্ছে?"

গৃহিণী বলিলেন, "কে জানে বাপু, কেমন যেন ঠেকছে। এখন শেখরকে হয় তবেই। মা-মরা মেয়ে, মন ভেঙে যায়, এটা একেবারেই চাই না; অবিশ্যি এসব শহুরে স্বয়ম্বরের আমি একেবারেই পক্ষপাতী নই। মা-বাপের চেয়ে কি আর মেয়ে-ছেলে বেশী বোঝে নাকি? তবে এত বড় ক'রে রাখা হয়েছে, এখন তাই হাতের চেয়ে আম বড় হয়ে গেছে।"

কর্ত্তা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "অনর্থক কেন ভাবছ? আমাদের গুষ্টিতে সাতজন্মে ওসব নেই। তুমি দেখো, মেয়ে আমাদের দিব্যি সুখে ঘরকরণা করবে।"

মৃণাল কোথায় ছিল কে জানে? মামীমা অত খোঁজ করেন নাই। কিন্তু সে যে মামাবাবুর ঘরেই খই বাছিতে বসিয়াছিল, ইচ্ছা করিয়াই হয়ত।

মামা-মামী ত নিজের নিজের কাজে চলিয়া গেলেন। চোখের জলে মৃণালের দুই চোখ ঝাপসা হইয়া উঠিল। খই, কুলা সব যেন চোখের সম্মুখ হইতে মুছিয়া গেল। জগৎ-সংসারও যেন অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। এই অসীম বিপদ্-সাগরে সে কোথাও কূল দেখিতে পাইল না।

২৬

সারারাত মৃণালের ঘুম হয় নাই, ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, তাও দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভাঙিয়া গেল। আর ঘুমাইতে সে পারিবে না। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, অন্ধকারও তরল হইয়া উঠিতেছে। মৃণাল খাট ছাড়িয়া নামিয়া ঘড়ি দেখিল। চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। ঘুম আর আসিবে না, কিন্তু এখনও বাহিরে যাইবার উপায় নাই। একটু আলো না-ফুটিলে সে কোথায় যাইবে?

তাহার নড়াচড়ার শব্দে মল্লিক-গৃহিণীরও ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এমন সময় উঠেছিস্ কেন রে?"

মৃণাল বলিল, "ঘুম হচ্ছে না তাই।"

মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "তুই আমাকেও ছাড়ালি বাছা। দেখিস্, আলো না-নিয়ে বাইরে যাস্ না যেন, শেষে সাপখোপের ঘাড়ে পা দিবি।"

মৃণাল লণ্ঠনটা জ্বালিয়া বাহির হইয়া গেল। ঘরের চারিটা দেওয়াল যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিতেছিল। খিড়কির পুকুরের ধারে আসিয়া দেখিল, পূর্ব্বদিকে যেন আলোর পতাকা দুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার জীবনে কি আর রাত্রির অবসান ঘটিবে না?

সেই মেঠো রাস্তাটার দিকে তাকাইয়া খানিক সে দাঁড়াইয়া রহিল। এই পথই ত বিমলের গ্রামের দিকে গিয়াছে। চোখে দেখিতে ত কোনও বাধা নাই, মৃণাল ত অনায়াসে এই পথ ধরিয়া হাঁটিয়া সেখানে চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু অদৃশ্য বাধা ত পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিয়াছে, মৃণাল কি পারিবে সে-সব লঙ্ঘন করিয়া যাইতে? কিন্তু না-পারিলে তাহার বাঁচিয়া থাকিয়াই বা কি হইবে?

হঠাৎ পিছন দিক্ হইতে কে ডাকিল, "মৃণাল-দি?"

মৃণাল চমকিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল, বীরেনবাবুর মেয়ে খেঁদী দাঁড়াইয়া। তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই এখানে কেন রে? এত সকালে আসতে ভয় করে না?"

খেঁদী একখানা চিঠি তাহার হাতে দিয়াই পলায়ন করিল, বলিয়া গেল, "সেই কলকাতার বাবু দিয়ে গেছে।"

বিমলের চিঠি! বাতির আলোটায় কোনওমতে পড়া যায়। তাড়াতাড়ি পড়া দরকার, এখনই হয়ত তাহার সন্ধানে মামা-মামী কেহ বাহির হইয়া আসিবেন। বিমল লিখিয়াছে—

'মৃণাল, আমি কলকাতায় চললাম। ঠাকুরমার কাছে যা শুনলাম, তাতে বুঝেছি যে সোজাসুজি তোমাকে পাবার উপায় নেই। কিন্তু যত কঠিন বাধাই মাঝে থাক, মনে রেখ, আমাদের তা পার হতেই হবে। হাল ছাড়লে চলবে না, মনের বল হারালে চলবে না। আমাদের জীবনে সব চেয়ে কাম্য যা, সব চেয়ে বেশী দাম না দিয়ে আমরা তা পাব না, এই বিধাতার বিধান। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি ফিরব, সে ক'দিন তুমি নিজেকে যেমন ক'রে হোক রক্ষা করবে। লোকলজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ কিছু যেন তোমাকে পরাস্ত না করে।

বিমল।'

ভিতর-বাড়ী হইতে সাড়া পাওয়া গেল যেন। মামীমা হয়ত উঠিয়াছেন। চিঠিখানা বুকের কাপড়ে লুকাইয়া মৃণাল ফিরিয়া চলিল। মনে হইল বুক তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। সে যেন পারিবে নিজেকে এই দুস্তর বিপদ্-সাগরে রক্ষা করিতে।

মামীমা ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে কি করছিস্ এই ভোর রাতে বনে-বাদাড়ে? দেখ দেখি মেয়ের কাণ্ড!"

মৃণাল ভিতরে ফিরিয়া গেল। দিনের আলো দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠিল, সুরু হইল গৃহস্থের দৈনন্দিন কাজের পালা। পাড়াগাঁয়ে খাটিতে হইবে সকলকেই, বসিয়া থাকিবার উপায় কাহারও নাই।

ছেলেমেয়েদের জলখাবার খাইতে বসাইয়া, গৃহিণী

বলিলেন, "ওরে মিনু, সেমিজ ক'টা আজ শেষ করিস না, সময় ত আর বেশী নেই।"

মৃণাল বলিল, "ঢের সময় পাবে মামীমা, এত কিছু তাড়া নেই।" মামীমা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে তাকাইলেন, তবে কিছু বলিলেন না।

কলিকাতায় বন্ধুবান্ধব বা শিক্ষয়িত্রীদের কাছে মৃণাল প্রায়ই চিঠি লেখে। আজও সে রাধীর হাতে দুপুরে যখন একখানা খাম দিল ডাকঘরে দিবার জন্য, তখন মল্লিক-গৃহিণীও কিছু মনে করিলেন না।

মাঝের দুই-তিনটা দিন আস্তে আস্তে কাটিয়া গেল। চক্রবর্ত্তীদের আজ পাকা দেখা দেখিতে আসিবার কথা। বেশী কিছু ঘটা হইবে না, তিন-চার জন লোক আসিবে মাত্র। তবু একলা হাতে কাজ করিতে হয় ত? মৃণালের মামীমা তাই আজ বড় বেশী ব্যস্ত। মৃণালের মুখ ম্লান, শুষ্ক, তবে সে নীরবে মামীমাকে সাহায্য করিতেছে। চিনি, টিনি, খোকা অনেক রকম খাবার তৈয়ারী হইতে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। মল্লিক-মহাশয়ও আজ আর খাইয়া দাইয়া বাহির হইয়া যান নাই, বৈঠকখানা ঘরেই বসিয়া আছেন। হাতে কাগজ-পেন্সিল, গ্রামের বাহিরে কোথায় কোথায় বিবাহের চিঠি পাঠাইতে হইবে তাহারই ফর্দ্দ করিতেছেন।

রোদ পড়িয়া আসিল। মৃণালকে ডাকিয়া মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "থাক মা, আর কাজ করতে হবে না। চুল বেঁধে গা ধুয়ে নে, একখানা ভাল কাপড় বের ক'রে পর্। আর চাবি নিয়ে যা, সিন্দুক খুলে তোর বড় হার-ছড়া বার ক'রে নে।"

মৃণাল কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। দিদি কি রকম সাজ করে দেখিবার জন্য চিনি মহোৎসাহে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। খানিক বাদে গাল ফুলাইয়া বাহির হইয়া আসিল, বলিল, "দেখ মা, দিদি কথা শুনছে না, বিচ্ছিরি কাপড় পরছে।"

মা তখন কাজে ব্যস্ত, তাড়া দিয়া বলিলেন, "পালা এখান থেকে, বিরক্ত করিস না।"

কিন্তু মৃণাল যখন তাঁহার সামনে পড়িল, তখন তিনিও বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তাহার পরনে কালোপাড়ের শাড়ী, চুল হাত-খোঁপা করিয়া বাঁধা, হাতে যে কয়গাছি চুড়ি থাকিত তাহা ভিন্ন গহনাগাঁটির চিহ্নমাত্র নাই। মামীমা বলিলেন, "একি ছিরি ক'রে এলে বাছা, লোকে আমাদের ভাববে কি? তোমার মতিগতি কিছু বুঝি না।"

মৃণাল শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "এতেই হবে মামীমা, আমার আর বেশী কিছুর দরকার নেই।"

মামীমা বলিলেন, "যত সব অনাছিষ্টি। ইস্কুলে পড়েছ ব'লে সবই তুমি বেশী বোঝ নাকি? শুভ কাজে কেউ কালাপেড়ে কাপড় পরে না, যাও ওটা বদলে এস।"

মৃণালকে হয়ত আবার বেশ পরিবর্ত্তন করিতে হইত, কিন্তু আর সময় পাওয়া গেল না। বৈঠকখানায় লোকজন সব আসিয়া পড়িয়াছে। কর্ত্তা জলখাবারের জন্য ডাকাডাকি করিতেছেন। অগত্যা মৃণালকে মামীমার সঙ্গে জলখাবার সাজাইতে বসিয়া যাইতে হইল। পাশের বাড়ীর একটি দশ-বারো বৎসরের মেয়ে আসিয়া জুটিল। চিনি, টিনি এবং সেই মেয়েটি খাবার বহন করিয়া বসিবার ঘরে লইয়া যাইতে লাগিল, মৃণাল এবং তাহার মামীমা বাহির হইতে জোগাড় দিতে লাগিলেন। যেমন পাড়া-গাঁয়ের নিয়ম, চারি জন বলিয়া আট জন আসিয়াছে, এবং খাওয়া কিছুতেই শেষ হইতেছে না। মামীমা ব্যস্ত হইতে লাগিলেন, ইহাদের জল খাইতে খাইতে শুভ সময়টা বুঝি উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

যাহা হউক, অবশেষে মৃণালের ডাক আসিল। সে অকম্পিত-পদে মল্লিক-মহাশয়ের সহিত বসিবার ঘরে গিয়া ঢুকিল। কে যে আসিয়াছে তাহা চাহিয়াও দেখিল না। মামাবাবু যেখানে বসিতে বলিলেন, সেখানে বসিয়া রহিল। যাহাকে যাহাকে প্রণাম করিতে বলিলেন, তাহাকে প্রণাম করিল। কে যেন তাহার ডান হাতে একটা গিনি গুঁজিয়া দিল। তাহার পর মামার অনুমতি লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। ধানদুর্ব্বা সব মাথা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া, গিনিটা মামীমার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া নিজের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

মল্লিক-গৃহিণী হাজার ডাকাডাকি করিয়াও তাহাকে আর তুলিতে পারিলেন না। অবশেষে হতাশ হইয়া ছেলে-মেয়েদের খাবার সাজাইয়া দিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

মল্লিক-মহাশয় অতিথিদের বিদায় করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমন ক'রে ব'সে আছ কেন গো?"

চিনি, টিনি ও ছেলে-দুইটি দূরে বসিয়া হারিকেনের আলোয় খাবার খাইতেছে। গৃহিণী তাহাদের কান বাঁচাইয়া বলিলেন, "আমার আর হাত-পা চলছে না বাপু। কাণ্ড দেখ গিয়ে মিনির। সে একেবারে শয্যা নিয়েছে। কি ছিরি ক'রে ওদের সামনে বেরল তা ত দেখলেই। এখন কি আছে অদৃষ্টে তাও জানি না। এ-সব মেয়ে ধেড়ে ক'রে রাখার ফল।"

কর্ত্তাও দেখিয়া শুনিয়া যেন দমিয়া গেলেন। নীরবে গিয়া তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িলেন।

তবে মল্লিক-গৃহিণী বেশীক্ষণ দমিয়া থাকিবার পাত্রী নহেন। খানিক পরে তিনি উঠিয়া পড়িয়া আবার কাজে ভিড়িয়া গেলেন। কর্ত্তাকে জলখাবার আনিয়া দিয়া বলিলেন, "ঘরে এত রকম হ'ল, দুটো মুখে দাও। ভেবো না, ভেবে আর কি হবে? পাকা দেখা হয়ে গেল, এখন ত আর সম্বন্ধ ফেরানো যায় না? এখন মেয়ের কপালে যা আছে তা হবে। মা মরল যখন কচিটা রেখে, তখনই জানি ও মেয়ের অদৃষ্টে সুখ নেই। মানুষ হাজার করুক, অদৃষ্টের সঙ্গে ত লড়াই করতে পারে না?"

মল্লিক-মহাশয় ভালটা মন্দটা খাইতে বেশ ভালই বাসেন, কিন্তু আজ যেন তাঁহার মুখে সবই বিস্বাদ লাগিতেছিল। তিনি বলিলেন, "মিনু কিছু খেল না?"

তাঁহার গৃহিণী বলিলেন, "তাকে টেনে তুলতেই পারলাম না। এখন ভদ্রলোকদের কাছে অপমান না হ'তে হয়। বিয়ের দিন আবার ও মেয়ে কি করবে কে জানে? বাবাঃ, যার যার দায়, তার তার থাকলেই ভাল।"

মল্লিক-মহাশয় খাওয়া শেষ করিয়া, তামাকের সন্ধানে ঘরে ঢুকিলেন।

মৃণালের এই রাত্রিও জাগিয়া কাটিল। তাহার বলিদানের সময় আসন্ন হইয়া আসিল, কিন্তু সে ত হাড়িকাঠে গলা দিবে না। মামা-মামী হয়ত ইহজন্মে তাহার মুখ আর দেখিবেন না। কিন্তু তাহাও সহ্য করিতে হইবে। নিজেকে যদি সে পঞ্চাননের হাত হইতে রক্ষা না করিতে পারে, তাহা হইলে সে মানুষ নামের অযোগ্য। নিজের জীবনের ভার তাহাকে এবার নিজেই বহন করিতে হইবে ইহা নিশ্চয়, কিন্তু উপায় কেন সে খুঁজিয়া পায় না? কোথায় পলাইয়া সে বাঁচিবে? বিমলের আর কোনও সংবাদ এখনও কেন সে পাইল না? কিন্তু বিমল আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াক বা নাই দাঁড়াক, পঞ্চানন মৃণালকে পাইবে না।

পাকা দেখার পরদিন বিবাহের চিঠিপত্র ছাপিতে চলিয়া গেল। মৃণাল মামা-মামীকে এড়াইয়া চলে, তাঁহারাও ভাল করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকান না, একটু দূরে দূরে থাকেন। চিনি টিনিও একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গিয়াছে, এত সুন্দর সুন্দর জামা কাপড়, এত গহনা পাইয়াও দিদি যে কেন এমন গম্ভীর হইয়া আছে তাহা উহারা বুঝিতে পারে না। বাড়ীতে আনন্দের সুর একেবারেই লাগে নাই, উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে বটে, কিন্তু সব যেন স্তিমিত ভাবে।

দিন-দুই পরে বিকাল বেলা মৃণাল পুকুরঘাট হইতে গা ধুইয়া আসিতেছে, সঙ্গে চিনি, টিনি, তাহারা অবশ্য আগে আগে দৌড়িয়া চলিতেছে। হঠাৎ কোথা হইতে বিমল আসিয়া মৃণালের সামনে দাঁড়াইল। বলিল, "দেখ, তোমায় চিঠিপত্র আমি লিখতে পারি নি, কলকাতায় কাজের সন্ধানে বড় ব্যস্ত ছিলাম। যা হোক সামান্য একটা কাজ পেয়েছি। এখন জানতে চাই, তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি না? প্রথমে অবশ্য আমার মায়ের কাছে যাব, সেইখানেই বিয়েটা হবে। তার পর সোজা কলকাতা।"

মৃণাল বলিল, "যাব তা ত আপনি জানেনই। কিন্তু এখানকার বাধা কাটাবেন কি ক'রে? এঁরা ত সহজে আমায় যেতে দেবেন না?"

বিমল বলিল, "তাঁদের কাছে সব কথা আমি খুলে
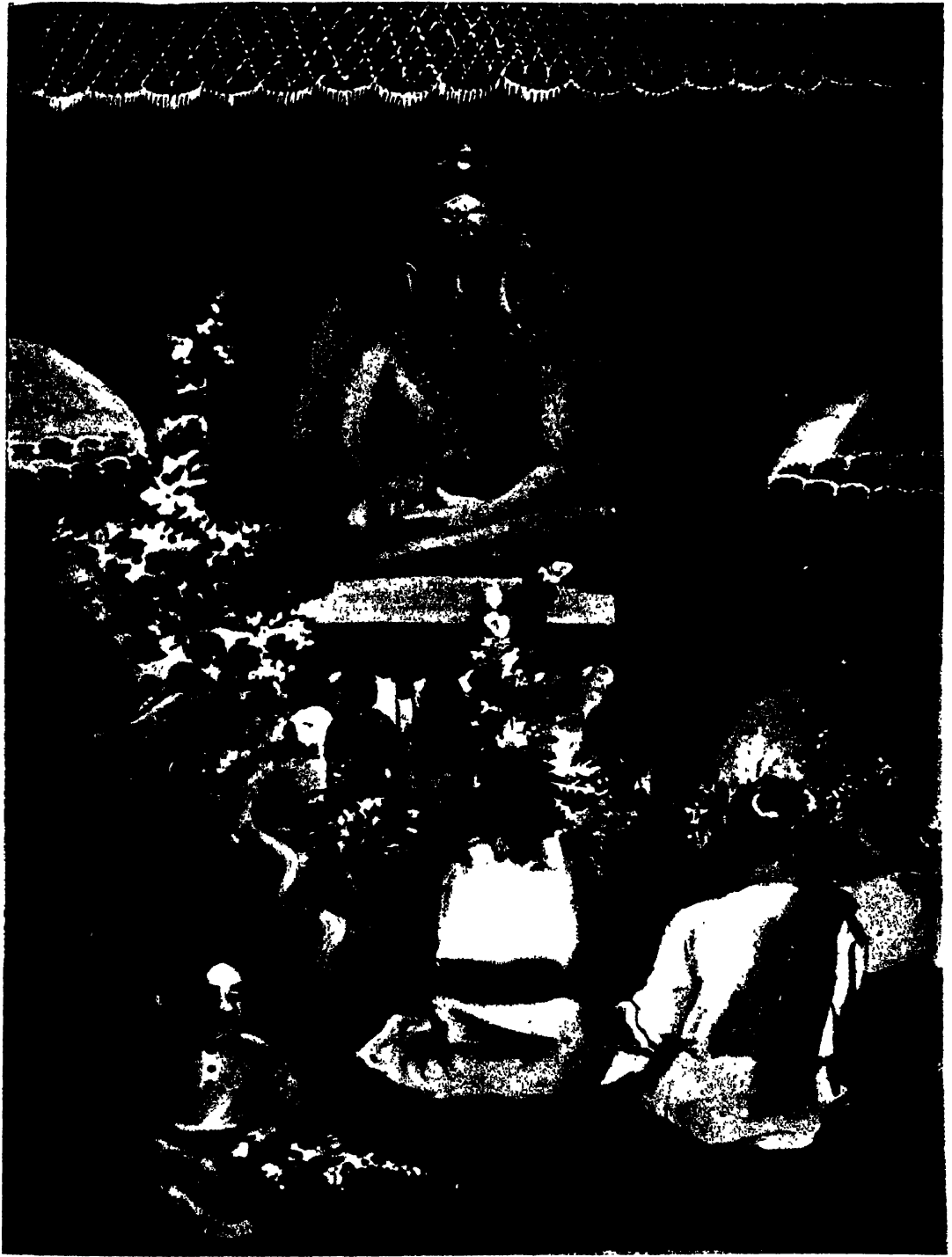
বলছি চল। তোমার আঠারো বছর বয়স হয়ে গেছে, তোমাকে তাঁরা জোর ক'রে আটকাবেন কি ক'রে? মামাবাবু বা মামীমা একটা হট্টগোল কেলেঙ্কারী করবেন ব'লে আমার মনে হয় না।"

দূর হইতে মৃণালদের বাড়ী দেখা যায়। চিনি, টিনি গিয়া মাকে কি খবর দিয়াছিল জানা নাই, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল সদর দরজা খুলিয়া মৃণালের মামীমা দ্রুতপদে তাহাদের দিকে আসিতেছেন। মৃণালের বুকের কাছটা একবার কাঁপিয়া উঠিল, তাহার পর বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া আবার শান্ত হইয়া গেল।

মামীমা কাছে আসিয়া মৃণালের হাত ধরিয়া বলিলেন, "মিনি, বাড়ী আয়।"

বিমলকে তিনি কোনও প্রকার সম্ভাষণ করিলেন না। সে নিজেই অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমার অনেক কথা বলবার আছে আপনাদের কাছে, চলুন আমিও যাচ্ছি।"

মল্লিক-গৃহিণী তখন রাস্তা ছাড়িয়া কোনওমতে ঘরে ঢুকিতে পারিলে বাঁচেন, তিনি যথাসাধ্য দ্রুতপদে মৃণালকে লইয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন। বিমলকে ডাকিলেন না, আসিতে বারণও করিলেন না। বিমল কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়িল না।

সদর দরজার ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া মল্লিক-গৃহিণী মৃণালকে ছাড়িয়া দিয়া, ক্রুদ্ধ ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বিমল ঘরে ঢুকিতেই বলিলেন, "তুমি কি রকম ভদ্রলোকের ছেলে বাপু? আমাদের মেয়ে, আমরা যেখানে ইচ্ছে বিয়ে দেব, তোমাদের কি? এ-সব চলবে না।"

বিমল বলিল, "আপনারা মেয়েকে যথেষ্ট বড় ক'রে রেখেছেন, এখন এ-বিষয়ে তাঁরও একটা মতামত হয়েছে। তাঁর নিজের যেখানে বিবাহ করবার ইচ্ছে, সেখানে দেওয়াই উচিত।"

মল্লিক-গৃহিণী চীৎকার করিয়া চিনিকে ডাকিতে লাগিলেন। বলিলেন, "যা ত রে, কাছারি-বাড়ী থেকে তোর বাবাকে ডেকে আন্, বল ভয়ানক দরকার।" চিনি হাঁ করিয়া বিমলকে দেখিতেছিল, মায়ের তাড়ায় ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া চলিয়া গেল।

মল্লিক-গৃহিণী তখন অত্যন্ত চটিয়াছেন, মৃণালের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি বাছা হিন্দুর ঘরে মানুষ হয়েছ, তোমার এসব মেমসাহেবী কেন? সাতজন্মে আমাদের পরিবারে যা হয় নি, আজ কি তা তোমাকে দিয়ে হবে? তোমাকে মানুষ করেছি আমি, মেয়ের মতই দেখি, তবু বড় দুঃখে বলছি, নিজের পেটের মেয়ে হ'লে আমাকে এমন দাগা দিত না। এখন এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে শুনে যদি চক্রবর্ত্তীদের ঘরের সম্বন্ধটা ভেঙে যায়, তাহলে আমরা আর গাঁয়ে মুখ দেখাতে পারব?"

মৃণাল এতক্ষণে কথা বলিল, "মামীমা, তোমাদের আগে জানাবার ত আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যে ওখানে আমার বিয়ের ঠিক ক'রো না, ও বিয়ে আমি কিছুতেই করব না। তোমরা আমার কথায় কান দিলে না কেন? আমি একটা মানুষ ত? গরু-ভেড়ার মত যাকে খুশী আমাকে কি বিলিয়ে দেওয়া যায়? আমার কি মন ব'লে একটা জিনিষও নেই?"

এই সময় মল্লিক-মহাশয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে চিনির সঙ্গে আসিয়া ঢুকিলেন। গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্যাপার?"

গৃহিণী বলিলেন, "বোঝ ব্যাপার, আমি ত দে'খে শুনে থ হয়ে গেছি। তোমার ভাগ্নী পঞ্চাননকে বিয়ে করবেন না, এখানের এই ভদ্রলোকের ছেলেকে করবেন। তাঁরা নিজেরাই সব ঠিক করেছেন, এখন আমাদের মুখ থাকে কোথায়?"

মল্লিক-মহাশয় বিমলকে বলিলেন, "আপনার এমন ব্যবহার শোভা পায় না, আপনি তাঁদের আত্মীয়। বিয়ে স্থির, পাকা দেখা হয়ে গেছে। এখন ভেঙে দিলে সমাজে অত্যন্ত নিন্দা হবে। পাত্র-হিসাবেও আপনি তার চেয়ে নিকৃষ্ট তা বলতেই হচ্ছে।"

বিমল বলিল, "তা হ'তে পারি। সমাজে নিন্দা হবে সেটাও হয়ত ঠিক। কিন্তু এর চেয়েও বড় জিনিষ একটা আছে, তার খাতিরে এ-সব সহ্য করতে হবে।"

মল্লিক-গৃহিণী তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে বিয়ে আমরা দেব না।"

বিমল বলিল, "দেখেন যে সে আশা আমি করিনি। মৃণালকে আমার সঙ্গে যেতে দিন, বিয়ের ব্যবস্থা আমার বাড়ীতেই ক'রে রেখেছি।"

মল্লিক-গৃহিণী এমন ব্যাপার কখনও দেখেন নাই। এমন অবস্থায় কি যে করা যায়, তাহাও তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। বলিলেন, "হ্যাঁ গা, জোর ক'রে মেয়ে নিয়ে যাবে, তুমি দাঁড়িয়ে দেখবে ?"

মৃণাল বলিল, "উনি জোর ক'রে নিয়ে যাবেন কেন মামীমা ? আমি স্ব-ইচ্ছায় ওঁর সঙ্গে যাচ্ছি। ওঁকে না-হয় তোমরা জোর ক'রে ফিরিয়ে দিতে পার, কিন্তু আমার বিয়ে চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে দিতে পারবে না, আমি বেঁচে থাকতে না।"

মল্লিক-গৃহিণী দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িলেন। বিমল বলিল, "আমি গরুর গাড়ী ঠিক ক'রে রেখেছি। আপনিও চলুন আমার সঙ্গে, বিয়ের সময় উপস্থিত থাকবেন।"

মল্লিক-মহাশয় উত্তর দিলেন না। গৃহিণী বলিলেন, "কি যে জ্বালা হল, এ রাখাও যায় না, ফেলাও যায় না। কুমারী মেয়েটাকে কি ব'লে একটা হা-ঘরের সঙ্গে ছেড়ে দিই ? আর এ-সব কথা রটতে কতক্ষণ ? পাড়াগাঁ ব'লে জায়গা। এক বার এ-কথা ছড়ালে, আর কোনও ভদ্র গেরস্ত এ মেয়েকে ঘরে নেবে !"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "বেশ, নিজেদের সব ভার নিজেরাই নাও, আমাদের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রইল না।" গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "গুছিয়ে নাও, কাশী প্রয়াগ ঘুরে আসি, এখানে আর মন টিঁকছে না।" গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন, মল্লিক-মহাশয় বাগানের দিকে চলিয়া গেলেন।

বিমল ডাকিল, "এস মৃণাল।"

মৃণাল উঠিয়া দাঁড়াইল, সজল চক্ষে তাহার আজন্মের পরিচিত ঘরখানির চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর বিমলের পিছন পিছন বাহির হইয়া গেল।

গরুর গাড়ী অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকারের সহিত ম্লান জ্যোৎস্নার মিলন ঘটিয়া কেমন যেন স্বপ্নলোকের মত দেখাইতেছে। দূরে কোন ঘরে সন্ধ্যার শাঁখ বাজিয়া উঠিল।

বিমল বলিল, "মৃণাল, পল্লীলক্ষ্মী আমাদের আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছেন।"

মৃণালের অশ্রুপূর্ণ চোখদুটিতে আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল।

সমাপ্ত

আনন্দ

শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ

আচার্য্য শঙ্কর, জ্ঞানের সোপান বাহি
হেরিয়াছ সবিতার দ্যুতিবিম্ব প্রায়
উৎসারিত বিশ্বসৃষ্টি নিযুত ধারায়
পরব্রহ্ম হ'তে ; তিনি ছাড়া কিছু নাহি।
তুমি বলিয়াছ, রূপমুগ্ধ মানবের
দুঃখই পরমা গতি, ধরণীর রূপে
মুগ্ধ তারা নিমজ্জিত মোহ-অন্ধকূপে,
নিত্য পিষ্ট চক্রতলে রুদ্র মরণের।

মর-ধরণীর রূপে মুগ্ধ কবি আমি
নীরবে দাঁড়াই যবে প্রিয়মুখ চাহি
চন্দ্রকর-রোমাঞ্চিত শুভ্রাকাশতলে
তত্ত্বচিন্তা ডুবে যায় আনন্দ-অতলে ;
মনে হয়, মৃত্যু কোথা ! দুঃখ কিছু নাহি
বিশ্বের আকাশ ভরি মুক্তি আসে নামি।

পথে ও পথের প্রান্তে—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম সংস্করণ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০নং কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

রবীন্দ্রনাথের পত্রধারার 'ছিন্নপত্র' পর্য্যায়ে যে চিঠির টুকরাগুলি ছাপান হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে লিখিত চিঠি হইতে লওয়া। তখন কবি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন বাংলার পল্লীতে পল্লীতে। তাঁহার পথচলা মনে সেই সকল গ্রাম্য দৃশ্যের নানা নূতন পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগাইতেছিল, এবং তখনই তখনই তাহাই প্রতিফলিত হইতেছিল চিঠিতে।

পত্রধারার দ্বিতীয় পর্য্যায়ের চিঠিগুলি লেখা হইয়াছিল একটি বালিকাকে এবং প্রকাশিত হইয়াছিল "ভানুসিংহের পত্রাবলী" নামে। সেগুলি বেশীর ভাগ লেখা শান্তিনিকেতন থেকে। তাই সেগুলির মধ্য দিয়া স্বতই প্রবাহিত হইয়াছিল শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার চলচ্ছবি। "এগুলিতে মোটা সংবাদ বেশি কিছু নেই, হাসিতামাসায় মিশিয়ে আছে সেখানকার আবহাওয়া, জড়িয়ে আছে সাংসারিক ব্যাপারে আনাড়ি মেয়েটির ছেলেমানুষির আভাস: আর তারি সঙ্গে লেখকের সকৌতুক স্নেহ।"

পত্রধারার তৃতীয় পর্য্যায়ের নাম দেওয়া হইয়াছে "পথে ও পথের প্রান্তে"। তাহার একটু ইতিহাস পুস্তকখানির ভূমিকায় কবি দিয়াছেন।

"সেবার যখন ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপে ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম সেখানকার নানা দেশে আমার ডাক পড়েছিল। তখন অসুস্থদশায় রথীন্দ্রনাথ বন্দী ছিলেন বার্লিনে আরোগ্যশালায়। তাই আমার সাহচর্যের ভার পড়েছিল প্রশান্ত মহলানবিশের পরে, তাঁর স্ত্রী রাণী ছিলেন তাঁর সঙ্গে। সমস্ত ভার বিনাবাক্যে কখনো বা প্রবল বাক্যব্যয়ে তিনিই নিয়েছিলেন নিজের হাতে। ভ্রমণকালীন ব্যবস্থার কাজে পুরুষ দুজনের অঘটন ঘটানো অপটুতা সংশোধন করে চলতে হয়েছিল তাঁকে। জিনিষপত্র বাঁধাছাদা, গোছগাছ করা, বস্তুপুঞ্জ হিসাব করে রাখা, সামলিয়ে নিয়ে বেড়ানো, বিদেশী কর্ত্তৃমণ্ডলে নিষ্পরোয়ায় অযথা বা যথোচিত দাবিদাওয়া করায় ঐ কয়েক মাসে রাণীর অসামান্যতার পরিচয় পাওয়া গেছে। নতুন নতুন রেলের কামরায়, জাহাজের ক্যাবিনে, হোটেলের প্রকোষ্ঠে, বারবার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন লোকের সঙ্গে ব্যবহার করে চলেছি; তার নানা প্রকার অভাবনীয় সমস্যা-সমাধানের ভার তাঁর হাতে দিয়ে নির্লজ্জ নিশ্চিন্ত মনে অজস্র সেবাশুশ্রূষায় দিন কাটিয়েছিলেম। অবশেষে য়ুরোপে ভ্রমণের পালা শেষ করে যখন আমরা গ্রীসের বন্দর থেকে ঘরমুখো জাহাজে চড়ে বেরিয়ে পড়লুম তাঁরা রয়ে গেলেন বিদেশে। তখন তাঁদের সাহচর্য্য-গাঁথা পথযাত্রার ছিন্নসূত্রকে যে সব চিঠির দ্বারা জুড়তে জুড়তে চলেছিলুম দেশের দিকে, সেইগুলি ও তারই পরবর্তী কালের চিঠিগুলি পত্রধারার তৃতীয় পর্যায়ে সংকলিত হোলো। কিছুকাল ধরে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নিরন্তর যে তর্কবিতর্ক আলোচনা চলেছিল তারই বাক্যালাপের বেগ এই চিঠিগুলির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু য়ুরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্ত যা কোথাও প্রকাশ পেল না তার দাম খুব বেশি।"

মিশর দেশে কোন জায়গা থেকে লেখা একটি চিঠিতে কবি লিখিয়াছেন—"এ জায়গায় অনেক দেখবার আছে। আমি তেমন দেখনেওয়ালা নই এই দুঃখ। কিন্তু তবু ম্যুজিয়মে যাবার লোভ সামলাতে পারি নি। দেখবার এত জিনিষ খুব অল্প জায়গায় পাওয়া যায়। একটা ব্যাপার এখানে খুব সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে—গ্রীসের যে পার্থেনন গ্রীসের স্বকীয় কীর্ত্তি ব'লে এতদিন চ'লে এসেছে সেই পার্থেননের মূল প্রতিরূপ ইজিপ্টের ভূগর্ভে পাওয়া গেছে।"

চিঠিগুলিতে ভ্রমণবৃত্তান্ত খবর দিবার চেষ্টা প্রায় নাই, কি কোন কোন জায়গায় কি ঘটিয়াছিল তাহার খবরের আভাস আছে। যেমন কায়রোর এই খবরটি:—

"বৈকালেই সেখানকার সর্ব্বোত্তম আরবী কবির বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ। কবির নিমন্ত্রণ ছাড়া এই নিমন্ত্রণের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, সেখানে ইজিপ্টের সমস্ত রাষ্ট্রনায়কের দল উপস্থিত ছিলেন। পাঁচটার সময় পার্লামেন্ট বসবার সময়। আমার খাতিরে এক ঘণ্টা সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাকে জানানো হোলো এমন ব্যবস্থা বিপর্যয় আর কখনো আর কারো জন্যে হোতে পারত না। বস্তুত এটা আমাকে সম্মান দেখাবার একটা অসামান্য প্রণালী উদ্ভাবন করা। আমি বললেম, এ হচ্ছে বিদ্যার কাছে রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রণতি এ কেবলমাত্র প্রাচ্য দেশেই সম্ভবপর। ওখানে কানুন ও বেহালা যন্ত্র-যোগে আরবী গান শোনা গেল—স্পষ্টই বোঝা গেল ভারতের সঙ্গে আরব পারস্যের রাগ-রাগিণীর লেন্ দেন্ এক সময় খুবই চলেছিল।"

বাংলা দেশে, দুর্ভাগ্যক্রমে, রবীন্দ্রনাথের নিন্দুকের অভাব নাই। সুতরাং উপরে উদ্ধৃত কথাগুলি কাহারও কাহারও চোখে আত্ম-প্রচারের মত ঠেকিতে পারে—যদিও এসব চিঠি মুদ্রিত হইবার জন্য লিখিত হয় নাই। বহু বিদেশে তাঁহাকে এবং এ পর্য্যন্ত কেবল তাঁহাকেই যে সব অপূর্ব্ব সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা তিনি ও তাঁহার ভ্রমণকালীন সঙ্গীরাই জানেন, অন্যেরা জানেন না। যাহা হউক, উদ্ধৃত বাক্যগুলির বিপরীত কথাও স্থানে স্থানে রহিয়াছে। ২ নং চিঠিতে দেখিতেছি কবি লিখিতেছেন, "নিজেকে বিশেষ কোনো একজন মনে করতে আজও পারি নে—এ সম্বন্ধে আমার স্বদেশের অনেক লোকের সঙ্গেই আমার মতের মিল হয়।"

৯ নং চিঠিতে তিনি লিখিতেছেন, "চিন্তাকে আমি তাড়াতাড়ি রূপ দিয়ে ফেলি—সব সময়েই যে সেটা অবথা হয় তা নয়—কিন্তু জীবনযাত্রায় পদে পদে এই রকম রূপকারের কাজের চেয়ে চুপকারের কাজ অনেক ভালো। আমি প্রগল্‌ভ, কিন্তু যারা চুপ করতে জানে তাদের শ্রদ্ধা করি। যে-মনটা কথায় কথায় চেঁচিয়ে কথা কয় তাকে আমি এখানকার (শান্তিনিকেতনের) নির্মল আকাশের নিচে গাছতলায় বসে চুপ করাতে চেষ্টা করছি। এই চুপের মধ্যে শান্তি পাওয়া যায়, সত্যও পাওয়া যায়।"

আজকাল চুপকারের কাজের চেয়ে চীৎকারের চাহিদা বেশী। সেই জন্ত বাঙালী ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত শান্তি পাইতেছে না, সত্যও পাইতেছে কম।

অনায়াস-উৎসারিত সাহিত্যরসে আপ্লুত এই মনোজ্ঞ পত্রগুলিতে আমরা উদ্ধৃত করিবার জন্য অনেক বাক্য চিহ্নিত করিয়াছিলাম। কিন্তু আপাততঃ স্থানাভাব। "ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস। সেই রস পাওয়া এবং দেওয়া অল্প লোকের শক্তিতেই আছে।" রবীন্দ্রনাথের বর্ণিত এই শক্তি তাঁহার আছে।

সাম্যবাদের মর্ম্মকথা—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। নবজীবন পাব্লিশিং হাউস্‌, ১৯৫।২ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

সাম্যবাদের পক্ষে যাহা বলা যাইতে পারে, লেখক তাহা এই পুস্তিকাটিতে বিশদভাবে সংক্ষেপে তোড়ওআলা জোরাল ভাষায় বলিয়াছেন।

যাহাতে পৃথিবীর সব মানুষ সুখী হইতে পারে, সমাজের ও রাষ্ট্রের ব্যবস্থা এরূপ হওয়া আবশ্যক, এ বিষয়ে সাম্যবাদীদের সঙ্গে আমরা একমত—যদিও ওরকম ব্যবস্থা হইলেও সকল মানুষ সুখী হইতে পারিবে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ করা যাইতে পারে। হয়ত অ-সুখ জিনিষটার, দুঃখ জিনিষটারও কোন রকম দরকার পৃথিবীতে আছে। তাহা হইলেও সকলের সুখেরই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা আবশ্যক ও উচিত। সাম্যবাদীরা উপায় ও পন্থা যাহা বলেন, সে-বিষয়ে আমরা সব দফায় তাঁহাদের কথায় সায় দিতে পারি না; লেখকও দেন নাই—"সশস্ত্র বিপ্লব ব্যতীত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অসম্ভব", কম্যুনিষ্টদের এই মত তিনি মানেন না।

দুপক্ষে যখন যুদ্ধ হয় তখন উভয় পক্ষেই এমন লোক থাকে, থাকিতে পারে, যাহারা অপর পক্ষের সব মানুষকেই বিরোধী বা শত্রু মনে করে না। এমন জাপানী আছে যাহারা সব চৈনিককে শত্রু মনে করে না, চীনজাতিকেই শত্রু মনে করে না; আবার এমন চৈনিকও আছে, যাহারা সব জাপানীকে, জাপানী জাতিকে শত্রু মনে করে না। কিন্তু যুদ্ধের সময় জাপানীরা সুবিধা পাইলেই নির্বিচারে আবালবৃদ্ধবনিতা সব চৈনিককে মারিতেছে, চৈনিকরাও সুবিধা পাইলে তাহা করিতে পারে। এই যে বিচারবিহীন বৈর, পাশ্চাত্য শ্রেণীসংগ্রামবাদীরা ইহা প্রকৃত সশস্ত্র যুদ্ধ হইতে শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতি আন্দোলনে আমদানী করিয়াছেন। তাহা হইতে উদ্ভূত মনোভাবপ্রসূত অতিব্যাপক মন্তব্য (sweeping remark) এই পুস্তিকার একাধিক স্থানে দৃষ্ট হয়। যথা—

"সাম্যবাদী মানুষকে বলে, তুমি আর আমি। তোমার সুখে আমার সুখ, তোমার দুঃখে আমার দুঃখ। ক্যাপিট্যালিষ্টের কথা এর উল্টো। সে বলে হয় তুমি—নয় আমি। বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী—ক্যাপিট্যালিষ্টের কণ্ঠে এই বিরোধের কোলাহল।"

যথাসম্ভব সাম্যবাদী মত অনুসারে গঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত আধুনিক রাশিয়ায় পাওয়া যায়। সেখানে সাম্যবাদীরাই প্রভুত্ব পাইয়া ক্যাপিট্যালিষ্টদিগকে বধ করিয়াছে বা দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, একথা ভাবেও নাই, বলেও নাই, "তুমি আর আমি। তোমার সুখে আমার সুখ, তোমার দুঃখে আমার দুঃখ।" অন্য দিকে পৃথিবীর সকল দেশেই—ভারতবর্ষেও, কোন কোন ক্যাপিট্যালিষ্ট শ্রমিকদিগকে যথেষ্ট বেতনের উপর কারবারের লাভের অংশ দেয় এবং তাহাদের স্বাস্থ্য, আমোদ, শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থাও করিয়াছে। শুনিয়াছি, আমেরিকার কোথাও কোথাও কারখানার মালিকেরা কারখানা চালাইবার নীতিপ্রণালী প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণেও শ্রমিকদের অধিকার কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়াছে। বলা যাইতে পারে, ধনিকরা ইহা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি রূপ অশ্রেষ্ঠ অভিসন্ধি হইতে করিয়াছে। রাশিয়ায় প্রভুপদে অধিষ্ঠিত সাম্যবাদীরা কিন্তু সেরূপ অভিপ্রায় হইতেও ত ধনিকদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করে নাই।

অগণিত ক্যাপিট্যালিষ্টের নিশ্চয়ই খুব দোষ ত্রুটি আছে। ধনবাদ (capitalism) দোষবহুল। কিন্তু তাহা হইলেও ধনিক মাত্রেই নিন্দার্হ নহে।

লেখক বলেন, "স্বাধীনতার অভিধানে 'ক্রমশঃ' বলে কোন শব্দ নেই।" কিন্তু ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে 'ক্রমশঃ' ছিল, আয়ার্লে (আয়ার্ল্যাণ্ডে) 'ক্রমশঃ' চলিতেছে, এমন কি রাশিয়ার বিপ্লবের আরম্ভ গত শতাব্দীতে হইয়াছিল এবং এখনও ক্রমশঃ চলিতেছে। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বিপ্লবকে দ্রুত বিবর্ত্তন বলা যাইতে পারে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি (private property) ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে নিঃস্বত্বীকরণ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে লেখকের সহিত আমাদের কিছু মতভেদ আছে। রাশিয়াতে "সবহারাদের প্রভুত্ব" (dictatorship of the proletariat) আসিয়াছে মনে করি না; আসিয়াছে তাহাদের প্রভুর প্রভুত্ব। এ-সব বিষয়ে অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু এখানে স্থান নাই।

লেখকের সহিত এ-বিষয়ে আমরা এক মত, যে, "অনাসক্ত মানুষ যখন দলে দলে আসবে সাহস আর স্বাস্থ্য, প্রেম আর জ্ঞান নিয়ে—তখনই আসবে ইতিহাসে যুগান্তর।" অনাসক্তি, সাহস, দৈহিক ও আত্মিক স্বাস্থ্য, প্রেম ও জ্ঞান—কোনটিই একটুও অনাবশ্যক নহে।

ড.

রেডিও ডাকাতি—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। প্রাপ্তিস্থান জি সি ব্যানার্জ্জি, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা। সচিত্র।

'রেডিও ডাকাত', 'ভূতুড়ে এরোপ্লেন' ও 'বৈজ্ঞানিক বোম্বেটে' এই তিনটি গল্পে 'ক্যাপ্টেন মারে'ও পাইলট অজয় দত্তের অ্যাডভেঞ্চার

বর্ণিত হইয়াছে। এই দুঃসাহসিকতার গল্পগুলি ছেলেদের মনে ধরিবে; সম্ভব-অসম্ভবের কথা মনে না-পড়িলে সকলেরই ভাল লাগিবে।

নীলনদের দেশে—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা। বহু চিত্র-সংবলিত।

উইলিয়ম চার্লস বল্‌ডুইন আফ্রিকার নানা স্থানে শিকার করিতে গিয়া (১৮৫২) নানা বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাহার কাহিনী *African Hunting* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। সেই গ্রন্থ অবলম্বনে বালক-বালিকাদের জন্য এই বহিখানি লেখা হইয়াছে। বিষয়বস্তুর গুণে ও লেখকের সহজ রচনার জন্য বইখানি ছেলেমেয়েদের এবং অধিকবয়স্কদেরও পড়িতে খুব ভাল লাগিবে। বইখানি সস্তা অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী, অ্যাডভেঞ্চারের নামে নানা অসম্ভব গল্পে পূর্ণ লোমহর্ষক উপন্যাস নয়।

সাহারার বুকে—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা। বহু চিত্র-সংবলিত।

বিভিন্ন ইংরেজী বইয়ের সাহায্যে, একটি গল্পের সূত্রে, সাহারার কথা গ্রন্থকার ছেলেমেয়েদের চিত্তাকর্ষক ও তথ্যপূর্ণ করিয়া লিখিয়াছেন। অভিযাত্রীদের বাঙালী নাম না দিলেও বইখানির আকর্ষণ কমিত না।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

মণিদীপ—নছরু প্রণীত। ওসমানিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা। ৬৭ পৃষ্ঠা। আট আনা।

গল্পের ও কথিকার সমষ্টি। লেখকের পর্যবেক্ষণ-শক্তি, অভিজ্ঞতা, মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় প্রত্যেক গল্পে পাওয়া যায়। প্রাদেশিক idiom বা বাক্‌ভঙ্গী অচল—যিনি লেখক তাঁহাকে standard বাংলাতে—লেখ্য বা কথ্যতে—লিখিতে হইবে। আর 'স' ধ্বনি উচ্চারণের জন্য 'ছ' ব্যবহার বর্বরতা। ছ-এর একটা নিজস্ব ধ্বনি আছে—আছে, গাছ, ছাগল ইত্যাদি শব্দের ছ-ধ্বনি নছরু শব্দের ছ-ধ্বনির সঙ্গে এক নহে। নছরু দেখিলেই বাছুরের কথা মনে পড়ে। সেটা বিশেষ প্রশংসনীয় নহে। এই ছিছিক্কার হইতে মুসলমান লেখকেরা বাংলা ভাষাকে অব্যাহতি দিয়া নিজেরা শুদ্ধ হোন ও মাতৃভাষাকে শুচি রাখুন এই বিনীত নিবেদন।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হোমিওপ্যাথিক সহজ গৃহ-চিকিৎসা—প্রকাশক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, এস. এন. রায় এণ্ড কোং, ৮৫এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ২৪৩। মূল্য বার আনা।

একই ঔষধের বহু লক্ষণ বর্ত্তমান থাকাতে সময়ে সময়ে সঠিক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্ব্বাচন দুরূহ হইয়া পড়ে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে প্রধান রোগলক্ষণগুলি ও তাহার ঔষধসমূহ সহজ, প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকাতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসানুরাগীদের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। কার্টিস্-প্রমুখ অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের লিখিত ইংরেজী ভাষায় এই প্রকারের কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে; বাংলা ভাষায় এই প্রকার পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। ভাষা সরল হওয়াতে অল্পশিক্ষিতা মহিলারাও পুস্তকখানি দেখিয়া সাধারণ রোগের ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে

সব মেয়েই সমান—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল। ডি. এম. লাইব্রেরী। ৪৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০।

আলোচ্য গ্রন্থে সাতটি মেয়ের অধঃপতনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সাতটি মেয়ে যখন খারাপ, তখন সব মেয়েই সমান। গ্রন্থকারের লজিক ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। চরিত্রগুলির একটিও ফোটে নাই। এ ধরণের বই লিখিবার সার্থকতা কি বোঝা কঠিন।

পান্থপাদপ—শ্রীজ্যোতি সেন। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। প্রথম গল্পটির নাম 'পান্থপাদপ', ইহার নামেই পুস্তকের নামকরণ করা হইয়াছে।

এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনারা কেহ পান্থপাদপ দেখিয়াছেন কি? না যদি দেখিয়া থাকেন, ইডেন গার্ডেনে গিয়া দেখিয়া আসিবেন। পাতাগুলি কলাগাছের মত, গুঁড়ি অন্য রকম। সম্পূর্ণ বিদেশী বৃক্ষ। প্রথম-দর্শনে অনেকখানি আশা জাগায়—শেষ পর্য্যন্ত সে আশা ফলবতী হয় না। 'পান্থপাদপ' গল্পটি সেই রকম। এক হোটেলে বাঙালী, শিখ, মাদ্রাজী, উড়িয়া, মুসলমান—সব রকম লোক থাকিত। একটি ভারতীয় মেয়ে হোটেল দেখাশুনা করিত। মেয়েটির নাম নাকি সিসিল। খরিদ্দারদের মধ্যে কারো নাম সিঙ্গী, কারো নাম চ্যাকারভার্টি, কারো নাম বেডসওয়ার্থ, কারো নাম শুভঙ্কর।

পান্থপাদপ নাম সার্থক বটে। এর মধ্যে কেবল 'রিক্ত রাহী' গল্পটি নিতান্ত মন্দ লাগিল না।

স্বর্গ—শ্রীসুবোধ বসু। চিত্রাঙ্গদা পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

আলোচ্য বইখানি উপন্যাস—Phantasy'র অত্যন্ত কাছ ঘেঁষিয়া গিয়াছে—অবশ্য লেখকের উদ্দেশ্যও তাই। রচনাটি কৌতূহলোদ্দীপক। ভাষা মনোরম ও প্রাঞ্জল। বইখানি ভাল লাগিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজের আদি চিত্র ও পরলোকতত্ত্ব—শ্রীরাজলক্ষ্মী দেব্যা। প্রকাশক, শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি। রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়, ১৪।১ বি, ভুবনমোহন সরকার লেন। দাম বার আনা।

কয়েক পাতা ডায়েরী, কয়েকখানি চিঠি ও কয়েক জন সাধু মহাত্মাদের উপদেশ লইয়া এই বই। ধর্ম্মান্বেষী পাঠকদের ভাল লাগিতে পারে।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বহির্জ্জগৎ

শ্রীগোপাল হালদার

১

ইংরেজী জুলাই মাসটা যুদ্ধবার্ষিকী 'উৎসবের'ই মাস ছিল—৭ই জুলাই গিয়াছে চীন-যুদ্ধের সাম্বৎসরিক, ১৮ই জুলাই ছিল স্পেনের গৃহ-যুদ্ধের (?) দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক। স্বভাবতই এই সময়ে এই দুই যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে নানা কথা মনে জাগে। কিন্তু আপাতত যাহারা বিজয়ী, কাল যে তাহারাই পরাজিত হইবে না তাহার স্থিরতা কি? আবার হারিতে হারিতেও অনেক জাতি জিতিয়া যাইতে পারে। তেমনি জিতিয়াও শেষ পর্য্যন্ত কাহারও কাহারও আসলে হার হয়। ফ্রাঙ্কোর স্পেনে জিতিবারই সম্ভাবনা; কিন্তু এ-জয় কি তাঁহার না মুসোলিনীর? পরাজয়ের অপেক্ষাও এ-জয় কি বেশী লজ্জার নয়? বোমার ধোঁয়া ও রক্ত-বৃষ্টির মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইয়া যেদিন সত্যই ফ্রাঙ্কো ছিন্নবিচ্ছিন্ন স্পেনের উপর আপনার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইবেন, সেদিন কি তাঁহার সাধ্য হইবে—বিদেশীয় সহায়তা না পাইলে—স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী কাটিলোনিয়া কিংবা স্বাধীনতাপ্রিয় বাস্ক জাতিকে আপনার পতাকাচ্ছায়ায় একত্র করিবার? সাধ্য হইবে ফ্রাঙ্কোর পক্ষে মুসোলিনী-হিটলারের অভিভাবকত্ব কাটাইয়া উঠিবার? তাহাই যদি না হয়, তবে এই 'জাতীয়তাবাদে'র মূল্য কি? অর্থ কি?

স্পেনের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ চিত্তে মানিতে হয়, জাতীয়তাবাদ কথাটা অন্তত কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের ভাঁওতা! ফ্রাঙ্কোর জাতীয়তাবাদের অর্থ—একদিকে স্পেনের অভিজাত শ্রেণীর অর্থাৎ ভৌমিক ও যোদ্ধনেতৃবর্গের, এবং অন্য দিকে ক্যাথলিক চর্চ্চের হাতে মধ্যযুগ হইতে যে ক্ষমতা জমিয়াছে তাহা সংরক্ষণ করা—সেই চাপে যদি জনসাধারণ পিষ্ট হইয়া যায় তাহাতেও ক্ষতি নাই, উহার দায়ে যদি পরশক্তির নিকট দেশের বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ বিকাইয়াও দিতে হয়, তাহাতেও যায় আসে না।

একবার এই কথাটা উপলব্ধি করিলে সঙ্গে সঙ্গে এই সূত্রে যে-কথাগুলি ক্রমশই স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে, আমাদের ভিক্টোরীয় যুগের অনুগামী এই সুপরিচিত সভ্যতা আর তাহার পরে মোটেই মনকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। স্পেন-যুদ্ধের সেই কঠিন নিদারুণ দুই-একটি প্রশ্ন ও শিক্ষা এইখানে শুধুমাত্র সূত্রাকারে নির্দ্দেশ করা যায়:—শ্রেণীস্বার্থের চাপে দেশের অন্তর্বিপ্লব আজ আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লবের সূচনা রূপে দেখা দেয়; গৃহযুদ্ধ পৃথিবীর যুধ্যমান বিরোধী ভাবধারার নির্ম্মম দ্বন্দ্ব-ক্ষেত্রে পরিণত হয়,—স্বাদেশিকতা, মানবিকতা প্রভৃতি বহুকীর্ত্তিত মানব-সম্পদ সেই শ্রেণীগত স্বার্থের সংঘাতের মধ্যে একেবারে তলাইয়া যায়। স্পেন-যুদ্ধের প্রধান দান—জাতীয়তাবাদের এই স্বপ্নভঙ্গ; প্রথম ফল—লিবারল্ চিন্তার এই অপমৃত্যু; স্পষ্ট লক্ষণ—পৃথিবীর সম্মুখে ফাসিজম্ ও অগ্রণী গণতান্ত্রিকতা এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবধারার বিরোধকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা। ইতালী জার্ম্মানী অপেক্ষা ইংরেজের কৃতিত্ব এই সব ব্যাপারে কম নয়—'লিবারল্ থট্'-এর এই বিনাশে তাহার প্রতারণাই নাকি একটি বড় জিনিষ। বহু বৎসরেও কম্যুনিষ্টরা যাহা বলিয়া উঠিতে পারেন নাই, এইরূপ তাহাই ইহারা প্রমাণ করিল—গণতন্ত্র ধনিকের একটা সাময়িক কৌশল, জাতীয়তাবাদ শ্রেণী-স্বার্থের একটা আবরণমাত্র।

নীতির দিক ছাড়া এই দুই বৎসরের যুদ্ধপ্রণালীতে আর যাহা যাহা স্পষ্ট হইয়াছে তাহা এই—সকল জাতির পক্ষে 'সমুদ্রের স্বাধীনতা' আজ আর নাই; যে কোন ব্যবসায়ী জাহাজকেও আজ বোমা বা কামানের দ্বারা ডুবাইয়া দেওয়া চলে; দেশের আভ্যন্তরীণ যে-কোন শহরের

অ-সামরিক অধিবাসীরাও আর শত্রুপক্ষের বিমানের বোমা-বৃষ্টি হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। সত্যসত্যই যদি কোনো বড় যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে এই তিনটি কথার অর্থই আরও স্পষ্ট হইবে—বিশেষ করিয়া স্পষ্ট হইবে ব্রিটেনের নিকট—সমুদ্রের স্বাধীনতা যাহার আপন স্বাধীনতার সমতুল্য, ব্যবসায়ী জাহাজে খাদ্যদ্রব্য না আসিলে যাহার অধিবাসীরা অনাহারে থাকিবে, আর যাহার অরক্ষিত জনাকীর্ণ শহরগুলি শত্রুর যদৃচ্ছা বোমাবর্ষণে অতি অল্পকালেই ধূলিসাৎ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। অথচ, এই প্রত্যেকটি নিষিদ্ধ প্রণালীই প্রায় চলিয়া গেল ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেনের অন্ধতায়—বা শ্রেণীগত স্বার্থান্ধতায়—ব্রিটিশ ব্যবসায়ী জাহাজের ধ্বংস, সাধারণ নরনারীর বিমান-বোমায় বিনাশ—কিছুই যেন তিনি চোখ মেলিয়া দেখিতে চাহেন না।

২

স্পেনে ফ্রাঙ্কোর জিতিয়াও হারিবার সম্ভাবনা। চীনেও হয়ত জাপান জিতিয়াও হারিয়া যাইতে পারে—দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলিলে এত অবসন্ন হইয়া পড়িতে পারে, কিংবা তাহার বোমাবর্ষণে, নারী-ধর্ষণে ও নানাবিধ ক্রূর নির্যাতনে চীনাদের এমন শত্রু করিয়া তুলিতে পারে, যে, সেই বিশাল দেশে জাপান আর শিল্প-বাণিজ্য বা শাসন সুসংহত করিয়া পাকা সাম্রাজ্য পত্তন করিতে পারিবে না। তৎপূর্ব্বেই পরিশ্রান্ত জাপানকে অন্য কোনো পরাক্রান্ত শত্রুর হয়ত সম্মুখীন হইতে হইবে। এই এক সম্ভাবনা। অন্য সম্ভাবনাও আছে :—হয়ত চীন জিতিয়াও হারিবে, বাঁচিয়াও মরিবে। ইহার কয়েকটি কারণ অনুমান করা যায় 'দি চায়না উইক্‌লি রিভিয়ু' পত্র হইতে। অধিকৃত অঞ্চল হইতে জাপান এক দিকে চীনা ও অন্য বিদেশীর ব্যবসাবাণিজ্য বিতাড়িত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতেছে জাপানী ব্যবসাদার ও পুঁজিদারের একচ্ছত্র অধিকার, অন্য দিকে আইন করিয়া কিংবা গোপনে আফিম চালাইয়া ঐ সব অঞ্চলের চীনাদের মেরুদণ্ড একেবারে ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। চীনারা জিতিয়াও তাই হারিতে পারে। তৃতীয় কারণ, উল্লেখ করিয়াছেন মিঃ ভার্ণন বার্টলেট্, 'নিউজ ক্রনিকেল্' পত্রের প্রবন্ধে।—টিকিতে হইলে চীন গরিলা-যুদ্ধই করিবে। গরিলা-যুদ্ধে টিকিয়া গেলে চীনের খণ্ড খণ্ড সেই বাহিনীগুলির সেনাপতিরা যুদ্ধশেষে আবার নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি সুরু করিতে পারেন। তাহা হইলে জাপান হারিবে বটে, কিন্তু চীনও যুদ্ধে জয়লাভ করিবে না, আবার ভাঙিয়া পড়িবে। কিন্তু সত্যসত্যই জাপানের বিরুদ্ধে চীনের টিকিয়া থাকিবার সম্ভাবনা আছে কি? মিঃ ভার্ণন বার্টলেট্ বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেন, আছে।

কিন্তু কতটুকু আছে তাহা নির্ভর করে চীনের প্রতিরোধ-শক্তির উপর,—চীনের ঐক্য, সাহস, রণসম্ভার, জনবল, অর্থ-বল, ও সর্ব্বশেষে, তাহার মিত্রবলের উপর; আর নির্ভর করে জাপানেরও ঐসব আয়োজন ও শক্তির উপর। সম্ভবত চীনের বন্ধু হিসাবে চীনের শক্তিকে বাড়াইয়াই আমরা দেখি। তথাপি এই কথা সত্য যে চীন একেবারে দুর্ব্বল নয়—অন্তত জাপানী আক্রমণে তাহার আভ্যন্তরীণ ভেদ এবার সে মুছিয়া ফেলিতে পারিয়াছে। সাম্যবাদী চু চে প্রমুখ সেনাপতিরা এবং কোয়াংসির (Kwangsi) ফাসিস্ত সেনাপতি পাই (Pai), চুং সি (Chung Hsi) প্রভৃতি সকল চীনা সেনাপতিই চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াছেন। এদিক হইতেই বহু, নিপীড়িত চীনা সাম্যবাদীদের প্রশংসা করিতে হয়—চিয়াংএর হাতে তাহারা এমন অত্যাচার নাই যাহা সহে নাই। আজ যখন বৃহত্তর বিপদের প্লাবনে সব ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছে তখন সেই চিয়াংএর নিকটে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া চীনা রক্তবাহিনী নিজেদের সুবুদ্ধির ও উদারতার পরিচয়ই দিয়াছে। চিয়াংএর তাড়নায় আত্মরক্ষার দায়ে এই রক্তবাহিনীকে দ্রুত গতায়াত ও গরিলা-যুদ্ধ অভ্যাস করিতে হইয়াছে। এখন জাপানের বহুবিস্তৃত সৈন্যবাহিনীরও ইহাদের দ্বারাই বেশী উপদ্রুত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে বড় বড় রণক্ষেত্রে চীনের সাধ্য নাই জাপানের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে—চিয়াংএর নিজ বাহিনী জার্ম্মানদের দ্বারা শিক্ষিত, অস্ত্রশস্ত্রেও সুসজ্জিত, তবু

তাহাও প্রায় প্রথম দিকের বড় বড় যুদ্ধে এই কারণে ধ্বংস হইতেছিল। বর্ত্তমানে হ্যাঙ্কাউয়ের নিকটে জাপানীদের প্রতিরোধের জন্ত বিপুল সৈন্তসমাবেশ করিয়া চীন সম্ভবত আবার ভুল করিতেছে। চীনের ভরসা রাখিতে হইবে খণ্ড গরিলা যুদ্ধের উপর—জাপান যতই ভিতরের দিকে অগ্রসর হইবে, ততই চীনের পক্ষে এদিক হইতে সুযোগ বেশী। হয়ত ইহাতে নান্‌কিং সাহাংইয়ের মত হ্যাঙ্কাউও হস্তচ্যুত হইবে। কিন্তু চীনের তাহাতে বিচলিত না হওয়াই উচিত। আসলে চীনের প্রধান অসুবিধা—যুদ্ধসম্ভারে সে দুর্ব্বল। সত্য বটে, হংকংএর পথে সে বরাবরই তাহা ক্রয় করিতে পারিতেছে; য়ুনানফু (Yunnanfu) এবং বর্ম্মার পথও প্রায় সমাপ্ত হইতেছে; এই পথেও সাহায্য লাভ হয়ত পরে সম্ভব হইবে। তাহা ছাড়া চীন এখনও ইন্দোচীনের পথে ফরাসী মাল পাইতেছে, রুশিয়া হইতেও ভবিষ্যতে আরও বেশী পরিমাণে গোলাবারুদ কামান-বিমান আসিবে। কিন্তু তবু এই দুর্ব্বলতা দূর করা দরকার—যদি দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইতে হয়। তেমনি দরকার নূতন শিক্ষায় নূতন নূতন সৈনিক গঠন। চীনারা বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রের অন্তরালে নাকি এই দুই কাজই দ্রুতবেগে চলিয়াছে—নূতন রণসম্ভারের কারখানা বসিয়াছে, যুদ্ধবিমান তৈয়ারীরও চেষ্টা চলিয়াছে, বড় বড় কামানও প্রস্তুত হইতেছে; আর স্বদেশ-রক্ষার উন্মাদনায় চীনা নারীপুরুষ সামরিক শিক্ষাও গ্রহণ করিতেছে। এই প্রসঙ্গেই এই কথা মনে রাখা দরকার, চীনের মত পথঘাটশূন্য বিশাল দেশে জাপানী কিম্বা পথবাহিত আধুনিক যুদ্ধোপকরণ, কামান, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি অনেকাংশে অচল হইবে ইহাও চীনের সুবিধা। অন্য দিকে আবার চীনের সমস্ত আয়োজন কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য যুদ্ধকালীন মন্ত্রিকেন্দ্রও গঠিত হইয়াছে—চিয়াং কাই-শেক তাহার সর্ব্বাধ্যক্ষ, কুং (H. H. Kung) প্রধান মন্ত্রী, ডাক্তার ওয়াং (Wang-Ching-Hai) ও আর অন্য তিন জন বিভিন্ন কর্ম্মে নিয়োজিত। চীনের অন্যতম আশার কথা এই যে, কুংএর ১৯৩৫-এর মুদ্রা-সংস্কার, বৈদেশিক বিনিময় আইন বর্ত্তমানে ৫০কোটি ডলারের ঋণ-আহ্বান সার্থক হইতে চলিয়াছে, চীনের আর্থিক ভিত্তি তাই টলে নাই। সংযুক্ত রাষ্ট্রের 'ফরেন্ পলিসি রিপোর্ট' এই সব বিচার করিয়া বলেন, "অন্তত অর্থাভাবে চীনের প্রতিরোধ বন্ধ হইবে না।"

চীনের আশার কারণ তাই দেখা যায়—তাহার ঐক্য, তাহার বিশালতা, তাহার কেন্দ্রীভূত সরকারী ব্যবস্থা, তাহার জনবল, তাহার অস্ত্রায়োজন ও শেষ পর্য্যন্ত সোভিয়েট্ সাহায্য।

৩

কিন্তু জাপানের দুর্ব্বলতা-সবলতার উপরও এই যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করে, সেই হিসাবও তাই গ্রহণ করা দরকার। মোটামুটি সবাই জানে, জাপান দুর্দ্ধর্ষ শক্তি। তবু এই যুদ্ধে জাপানের শক্তি সম্বন্ধে এত মতভেদ যে সে শক্তি সত্যই কিরূপ তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ নয়। যেমন, জাপানী সরকারী হিসাব বলিতে চায়—জাপানের আর্থিক বনিয়াদ যুদ্ধকালে দৃঢ়তর হইয়াছে। কথাটা বিশ্বাস্য নয়। যুদ্ধকালীন আর্থিক সংহতি আইন সত্ত্বেও টাইমস্, ইকনমিষ্ট, নিউজ ক্রনিক্‌ল প্রভৃতি বিদেশী কাগজের মারফতে যে সব জাপানী সংবাদ এবং নিচিনিচি, আশাহি প্রভৃতি জাপানী পত্র হইতে যে সব উদ্ধৃতি দেখি, তাহাতে মনে হয় যুদ্ধে জাপানের আমদানি-রপ্তানি আমেরিকা ও ব্রিটেনের সঙ্গে বহুল পরিমাণে কমিয়াছে; অথচ ব্যয় বড়িয়াছে বহুগুণে। ইহাই স্বাভাবিকও। জুনের শেষে জাপানী অর্থবিভাগ ১৯৩৮-৩৯ সনের বজেট বাহির করেন—তাহাতে ৩৭ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড আয় ধরা হইয়াছে, ব্যয় ৩৫ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আয় কমিয়াছে ২ কোটি পাউণ্ড, ব্যয় বাড়িয়াছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। এই হিসাবে ঘাট্‌তির চিহ্ন নাই;—তাহার কারণ, ২৮ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড যে সামরিক বাজেট এই হিসাবে তাহার উল্লেখ নাই। মনে রাখিতে হইবে, ঘাটতি বাজেটই যদি দেশের পতনের একমাত্র কারণ হইত, তাহা হইলে জাপান, ইতালী প্রভৃতি দেশ অনেক

চার্লস ব্রিজ ও রাষ্ট্রপতির নিবাস, প্রাগ

প্রাগের সেতুমালা

বোহেমিয়ার স্বর্গ—ড্রাগন রক্‌স্
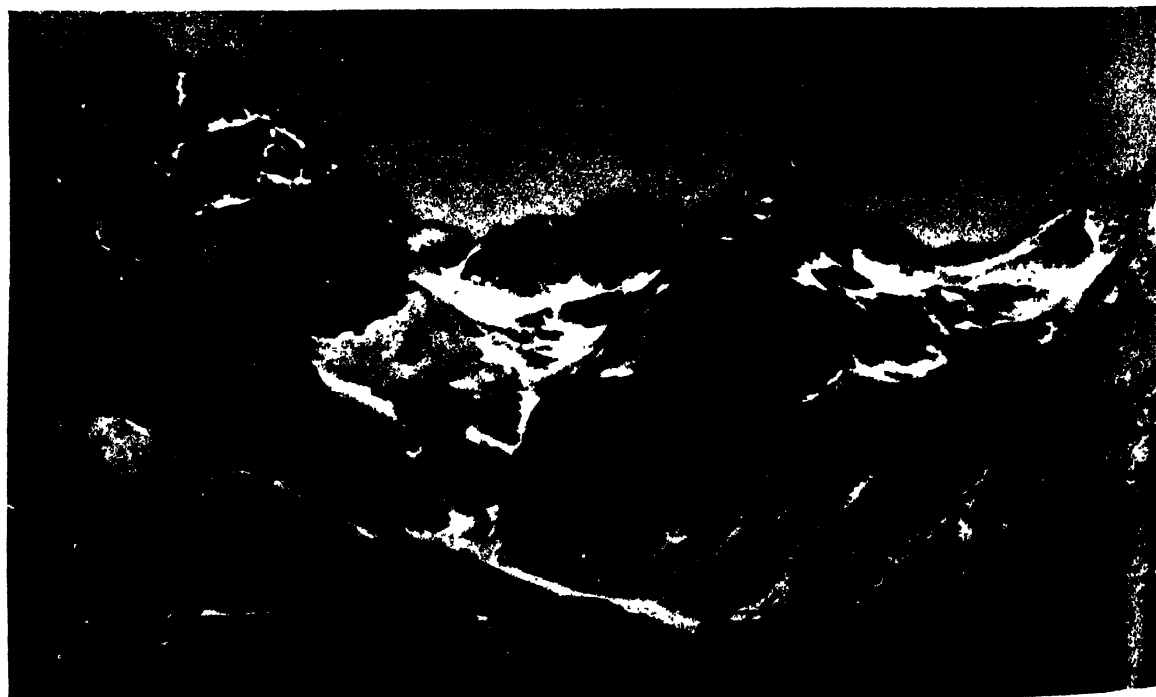
গ্রীন লেক

পূর্ব্বেই লোপ পাইত। কাজেই শুধু মাত্র এই অভাবেও যে জাপান ভাঙিবে না, এই কথা বারেবারেই আমরা স্মরণ করাইয়া দিয়াছি।

অবশ্য, জাপানের দিক হইতে তাহার জনবল কম নয়; সেই পরিবর্দ্ধমান জনবলই বরং জাপানের সাম্রাজ্য-বিস্তারে একটা যুক্তি—আরও বড় স্থান না হইলে জাপানের আর চলে না। তাহার অগণিত কৃষিজীবীর স্থানাভাবে চরম দুরবস্থা। এই সাধারণ কৃষক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে জাপানী সৈনিকদলের সম্পর্ক নিকটতর—সাধারণ সৈন্যেরা কৃষকশ্রেণীর লোক, সেনানায়কেরা ভূম্যধিকারী শ্রেণীর;—দুই দলের মধ্যে ভূমির মধ্যস্থতায় সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও সুদীর্ঘ দিনের। কৃষকেরা বরং জাপানী ধনিক ও শিল্পপতিদেরই প্রতিপক্ষ জ্ঞান করে। মিৎসু ও মিৎসুবিশি এই দুই পুঁজিদারের হাতে-ধরা জাপানী রাজনীতিতেও তাহারা তাই বীতশ্রদ্ধ। জাপানের সেনাবাহিনী ও তরুণ সেনানায়কেরা কৃষকের স্বার্থকেই বড় বলিয়া মনে করে। তাহারাই সাম্রাজ্য-প্রসার চায়, এই যুদ্ধও আরম্ভ করিয়াছে তাহারাই। তাই, খুব দীর্ঘ দিন কামানের মুখে বলি যাইতে না হইলে ইহারা যুদ্ধবিরাম কামনা করিবে না। অন্য দিকে শিল্পোন্নত জাপানী সমাজে শ্রমিকের মধ্যেও শ্রেণী-চেতনা তেমন বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই। তাই সামন্ত-তান্ত্রিক বাধ্যবাধকতার নীতি লুপ্ত হইবে, শৃঙ্খলাপ্রবণ জাপানী জীবন ঘোলাইয়া উঠিবে, শ্রমিক-দ্রোহিতায় তার যুদ্ধায়োজন পণ্ড হইবে—এমন সম্ভাবনা এখনও সুদূর। এই ধরণের অসন্তোষ যাহারা বিস্তার করিবে তাহারাও বহুদিন (১৯২৮) হইতেই কারাবদ্ধ। তাই মনে হয়, দীর্ঘ দিনের যুদ্ধে জাপানী সমাজে বিদ্রোহ যদি কেহ করে——সে শ্রমিক-কৃষক প্রথম করিবে না; তৎপূর্ব্বেই করিবে জাপানী ব্যবসায়ীরা, ধনিকেরা।

পূর্ব্বাপর জাপানী ব্যবসায়ীরাই যুদ্ধ-নায়কদের প্রতিপক্ষ। প্রথমত, উহাদের সমরবিলাসে তাঁহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হয়, তাঁহাদের ব্যবসায়ের উপর করভার বাড়ে। তাহা ছাড়া তাঁহাদের হাতে যেটুকু রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল তাহাও এই সেনানায়কেরা ইতিপূর্ব্বে কাড়িয়া লইয়াছেন,—তাঁহাদের শুধু রাখিয়াছেন কল চালাইয়া যুদ্ধোপকরণ জোগাইবার জন্য আর ব্যবসা ও শিল্পের মুনাফা কাটিয়া যুদ্ধের খরচ দিবার জন্য। মনে হয়, একটা ধূমায়িত অসন্তোষ এই শ্রেণীর মধ্যে চাপা পড়িয়া আছে। ধনিক দল এখনো নীরব, তাঁহারা তলাইয়া বুঝিতে চাহেন, সত্যসত্যই মাঞ্চুকুতে, উত্তর-চীনে ও উপকূলবর্ত্তী প্রদেশে জাপানী শক্তি বিদেশীয় বাণিজ্যে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের উচ্ছেদ করিয়া জাপানী পুঁজিদারের কতটা সুবিধা করিয়া দিতে পারে। উত্তর-চীন ও মধ্য-চীনে জাপানী-অধিকৃত অঞ্চলে জাপানী সেনানায়কেরা এইরূপ ব্যবস্থার চেষ্টাও দেখিতেছেন। সত্যই সে-সুবিধা হইলে জাপানী ধনিকদেরও এ-যুদ্ধে আর আপত্তি থাকিবে না, এমন কি চীনের যুদ্ধটা জাপান চীনা-বাণিজ্যের লাভেই চালাইতে পারিবে। কিন্তু পুঁজি খাটাইয়া মুনাফা পাওয়াই সময়-সাপেক্ষ, একটা যুদ্ধ-চালনার মত মুনাফা লাভ তো প্রায় স্বপ্নের সমান। অতএব মনে হয়, জাপানী ব্যবসায়ীরা এক দিন এই জাপানী বিজয়-যাত্রায় দেউলিয়া হইয়া বসিতে পারে। সে-দিনের পূর্ব্বেই তাঁহারা যুদ্ধ- ও সেনা- নায়কদের কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে। ইহা অবশ্য দূরের কথা; কিন্তু যুদ্ধজয়ও যে জাপানের পক্ষে আজ দূরের কথা হইয়া উঠিয়াছে। তৎপূর্ব্বেই জাপান অন্য বিপদের সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইতে পারে। দীর্ঘ দিন যুদ্ধ চলিলে জাপানে গণবিপ্লব বা পুঁজিপতির বিদ্রোহ হইবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু আরও আছে বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা। এখনি কি কোরিয়া ও মাঞ্চুকুর সীমান্তে সেই ঘনায়মান ঝটিকার সূচনা দেখা যাইতেছে না?

৪

সোভিয়েট রুশিয়া ও জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দীর্ঘ দিনের,—তাহার প্রধান কারণ অবশ্য প্রশান্ত মহাসাগরে ও পূর্ব্ব-এশিয়ায় উভয়ের প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা এবং সোভিয়েট সাম্যবাদ ও স্বাধীনতা মন্ত্রের সঙ্গে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বৈরিতা। এই বৈরিতা প্রকাশ পায় মাঞ্চুকু-সাইবেরিয়ার

সীমান্ত-কলহে, কিংবা জাপানী প্রভাবাচ্ছন্ন মধ্য মঙ্গোলিয়ার ও সোভিয়েট প্রভাবান্বিত বহির্মঙ্গোলিয়ার বিরোধে। গত কয়েক বৎসর এই দুই রাষ্ট্রের সীমান্ত-রক্ষীদের মধ্যে ছোটখাট সংঘর্ষ বহু বার ঘটিয়াছে, মোটের উপর তাহাতে সোভিয়েটই বারে বারে জাপানী ঔদ্ধত্যের নিকট নতি স্বীকার করিয়াছে। আমুর নদীর দুইটি দ্বীপ জাপানীরা দখল করিয়া বসিল, একখানা সোভিয়েট গান্‌-বোট ডুবাইয়া দিল, সোভিয়েট তথাপি রহিল নিস্তব্ধ। উপায় ছিল না,—পূর্ব্বে-পশ্চিমে তো তাহার প্রবল শত্রু আছেই, আবার এই সময়েই গৃহমধ্যেও ক্রূরতর ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেল; দেখা গেল টুকাচেভস্কি প্রমুখ সেনাপতিরা পর্য্যন্ত সোভিয়েট-শত্রুর সহিত চক্রান্তে লিপ্ত, বিশেষ করিয়া আবার সাইবেরিয়ারই অনেক সেনাপতি গোপনে গোপনে জাপানের গুপ্তচররূপে বর্ত্তমান সোভিয়েট রাষ্ট্র হইতে সাইবেরিয়াকে ছিন্ন করিতে সচেষ্ট। ইহাদের সরাসরি বলি দিয়া সোভিয়েট তখন নূতন করিয়া নিজ গৃহ, নিজ সৈন্য, বিশেষ করিয়া সাইবেরিয়ার রক্তবাহিনীকে পুনর্গঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছে, তাই জাপানের উগ্রতা তখনকার মত তাহার না সহ্য করিয়া পথ ছিল না।

এদিকে আসিয়া পড়িল 'চীনের ব্যাপার', জাপান তাহা দুই দিনে চুকাইয়া দিতেও পারিল না। বৎসর কাটিয়া গেল—হয় তো এমনি আরও কাটিবে। ইতিমধ্যে সোভিয়েট সাইবেরীয় বাহিনীও শত্রু-ষড়যন্ত্রের বিষমুক্ত হইয়া সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিয়াছে। 'প্রাভ্‌দা' অবশ্য ইহাকে ব্রিটিশ শক্তির বিকৃত চিত্তের সৃষ্টি বলেন, কিন্তু সত্য কথা এই যে, এখানে সোভিয়েট সমরায়োজন প্রভূত—চারি লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য, দুই হাজার ট্যাঙ্ক, নয় শত বিমান, অজস্র গ্যাসের মুখোস ও গ্যাসের কারখানা, ব্লাডিভষ্টক পর্য্যন্ত ডবল রেলপথ ও কংক্রিটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ষীগৃহ—এমনি অনেক জিনিষ সেখানে আছে। তাহা হইলে, এই অবসরে কি সোভিয়েট আপনার হৃত মান ও হৃত বল আবার উদ্ধার করিয়া লইবে না? ইহা সহজেই অনুমেয়—সেই সুযোগের অপেক্ষাই সে করিতেছে। কিন্তু পূর্ব্ব-সীমান্তে হিট্‌লার রহিয়াছেন, অতএব ষ্টালিনের এক চক্ষু সেখানে নিবদ্ধ। অন্য চক্ষু দেখিতেছিল চীনে জাপান কখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে। দীর্ঘ দিন যুদ্ধ চলিলে ক্লান্তি আসিবেই, আর তখনই আসিবে পূর্ব্ব-এশিয়ায় সোভিয়েটের সুযোগ। সেই মুহূর্ত্ত কি সমাগত?

টোকিও হইতে প্রায় মাসখানেক যাবৎ ক্রমাগতই সংবাদ আসিতেছে সোভিয়েট-মাঞ্চুকু সীমান্তে সেই বিপদ ঘনায়মান। হুন্‌চুনের (Hunchun) দক্ষিণে চাং কুফেং ও সাওৎসাও-পিং নামক পাহাড় দুইটি সোভিয়েট রক্ষীদল অধিকার করিয়াছে, সোভিয়েট-জাপান সম্পর্ক ঐসব সীমান্ত-অঞ্চলে ক্রমশই ঘোরাল হইয়া উঠিতেছে। জাপান অবশ্য পূর্ব্বোল্লিখিত সীমান্ত পাহাড় দুইটি পুনরধিকার করিয়াছে তাহাও জানা যাইতেছে। সেখানে দুই দুই বারের সঙ্ঘর্ষে উভয়ের কি লাভ-ক্ষতি হইয়াছে উভয় পক্ষই তাহার বিভিন্ন হিসাব দিতেছেন, শুধু বুঝা যাইতেছে না কে আক্রান্ত আর কে আক্রমণকারী। এই সব স্থানে সীমান্ত-রেখা সুনির্দ্দিষ্ট নয়; অতএব, যে-কেহ যুদ্ধ বাধাইতে চাহিলে সহজেই বাধাইতে পারে। কিন্তু এখনি যুদ্ধ কে চায়—সোভিয়েট্ না জাপান? দেখা যাইতেছে যে, জাপানের জেনারেল ষ্টাফের প্রধান সদস্য প্রিন্স কানিন ছুটি বাতিল করিয়া টোকিও ফিরিতেছেন, সেনানায়কেরা পরামর্শ করিতেছেন। অথচ জাপান চীন যুদ্ধে ব্যাপৃত; এ সময়ে নিতান্ত বাধ্য না হইলে সে সোভিয়েট্‌কে ঘাঁটাইতে যাইবে কেন? সেইরূপ বাধ্য সে হইতে পারে শুধু এক কারণে—চীনে সোভিয়েট সাহায্য যদি অবিলম্বে বন্ধ করা তেমন প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তাহা হইলে প্রতিরোধের ক্ষেত্র হইবে মধ্য ও বহির্মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত পথ। অন্য দিকে সোভিয়েটেরই বর্ত্তমানে যে সুযোগ বেশী তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু, সেই শুভদিনের জন্যও তাহার আরও কিছুকাল অপেক্ষা করা দরকার—চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানের আরও শক্তিক্ষয় হওয়া চাই। তাহা ছাড়া, সোভিয়েটের ইউরোপের কথাও ভাবিতে হয়; ইউরোপেও ত হিটলার-মুসোলিনী আছেন। সত্যসত্যই

জাপানের পরাজয় কিছুতেই কি তাহার এই মিত্রদ্বয়, জার্মানী বা ইতালী, নীরবে দেখিতে পারে—পূর্ব্ব-সীমায় নিষ্কণ্টক হইলে সোভিয়েট যে পশ্চিমের ফাসিস্তদের আর তত ভয় করিবে না ইহা সহজবোধ্য। এই তিন শক্তি সোভিয়েটকে এক সঙ্গেই তাই আক্রমণ করিবে—যখন হয়। দেখা যাইতেছে, ইউরোপে হিট্‌লার এখনও পূর্ণবল, প্রায় পশ্চিমে পূর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রস্তুত; চেকোস্লোভাকিয়া বা পূর্ব্বে ইউরোপের গুরুতর বিপদ একটুও কাটিয়া যায় নাই;—এই সময়ে এমন নিশ্চিন্ত মনে কি কুমিণ্টার্ণ-বিরোধী ত্রিশক্তির অন্যতম মিত্র জাপানকে পায়ে পড়িয়া সোভিয়েট আক্রমণ করিবে?

৫

কয়েক সপ্তাহ যাবৎ স্পেন ও চেকোস্লোভাকিয়া সম্বন্ধে উদ্বেগ-আকুল ইউরোপের দুর্ভাবনা একটু কমিয়াছে। স্পেন হইতে বিদেশীয় যোদ্ধৃবর্গের অপসারণ স্বীকৃত হওয়ায় নাকি সে যুদ্ধ এবার সত্যই সেই দেশের গৃহযুদ্ধে পরিণত হইবে, আর ইউরোপীয় কুরুক্ষেত্র থাকিবে না,—এই হইল চেম্বারলেনের প্রধান ভরসা। এই ভরসা যে আত্মছলনা মাত্র তাহা পূর্ব্বের বিচার হইতেই প্রত্যক্ষ হইয়া গিয়াছে। চেম্বারলেনদের দ্বিতীয় ভরসা এই যে, চেকোস্লোভাকিয়ায় বেনেশ-হোজা সংখ্যাল্পদের আত্মকর্তৃত্ব দিবার জন্য আইনের খসড়া রচনা করিয়াছেন,—সুদেতেন-ডয়েট্‌শ সমস্যা আপাতত তাই শান্ত, হয়ত এই ভাবেই শেষ পর্য্যন্ত নির্বিঘ্নে উহার সমাধান হইবে। সেই খসড়াকে এখন জার্ম্মানদের গ্রহণ যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য প্রাগের অনুরোধে চেম্বারলেন ব্রিটিশ মন্ত্রী লর্ড রান্‌সিম্যানকে মধ্যস্থ করিয়া প্রাগে পাঠাইতেছেন। ইতিমধ্যে হিট্‌লারের শুভেচ্ছা লইয়া তাঁহার দূত বেডেম্যান্ ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব লর্ড হ্যালিফ্যাক্‌সের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছেন। প্রাগের অপেক্ষা ব্রিটেন এবার আবার বার্লিনের কথায়ই কর্ণপাত করিবে বেশী—এমনি অনেকের বিশ্বাস। লর্ড রান্‌সিম্যানের উপদেশ যদি চেক্‌রা গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে এবার হিট্‌লার সদলবলেই প্রাগে অগ্রসর হইবেন, ব্রিটেনও তখন আর তেমন বাধা দিবে না—ইহাই তাঁহাদের মত। তখন ব্রিটেনের যুক্তি হইবে—চেকরা অবুঝ, অতএব—।

ইতিমধ্যে চেক-সংখ্যালঘিষ্ঠ আইনের যে আভাস পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কিন্তু জার্ম্মানদের উষ্মা বৃদ্ধি পাইতেছে:—

> উক্ত প্রস্তাবে বোহেমিয়া, স্লোভাকিয়া, মোরাভিয়া, সাইলেসিয়া সাব-কার্পাথিয়ন রুশিয়া—এই চারিটি অঞ্চলে স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট স্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। প্রত্যেক পার্লামেণ্টই সংশ্লিষ্ট জাতিদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইবে। প্রত্যেক প্রদেশেই বিভিন্ন সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিদের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধি লইয়া একটি কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি গঠিত হইবে। প্রত্যক্ষ ভোটের দ্বারা উক্ত প্রাদেশিক পার্লামেণ্টগুলির সদস্য নির্ব্বাচিত হইবে। প্রাদেশিক শাসনকার্য্যের সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারই সদস্যেরা নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং কোন আইন তাঁহাদের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করিলে ঐ প্রকার আইনের বিরুদ্ধে তাঁহাদের আপত্তি জ্ঞাপনের অধিকার থাকিবে। দেশরক্ষা, রাজস্ব ও পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কিত ব্যাপার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিবে। সুদেতেন জার্ম্মানরা উক্ত পরিকল্পনায় সন্তুষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয় না, কেননা বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া সাইলেসিয়ায় তাহারা সংখ্যাল্পিষ্ঠ রহিয়া যাইবে। অবশ্য, এখন মনে হইতেছে যে, ঐ সকল আলাপ-আলোচনার গুরুত্ব অনেক হ্রাস পাইবে এবং লর্ড রান্‌সিম্যানের রিপোর্টের উপরেই সমস্যার সমাধান নির্ভর করিবে।

লর্ড রান্‌সিম্যানের 'সমাধান' যে কোন্ দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে তাহা অনুমান করা যায়। চেক্‌দের পক্ষেও তাহা গ্রহণ না করিলে এইবারে ধ্রুব জার্ম্মান আক্রমণ; আর গ্রহণ করিলে? হিট্‌লারের কল্পনানুযায়ী—সজ্ঞানে নাৎসি-লোক-প্রাপ্তি?

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা কেন চাই

যাহারা স্বাধীন দেশের মানুষ, "স্বাধীনতা কেন চাই ?" প্রশ্ন শুনিলে তাহারা অবাক্ হইতে পারে। কিন্তু আমাদের এই পরাধীন দেশের অনেক মানুষ হয়ত এখনও মনে মনে এইরূপ প্রশ্ন করে ও ভাবে, "আমরা মন্দ কি আছি ? তারা কি আহাম্মক যারা স্বাধীনতার জন্যে সর্ব্বস্ব, প্রাণ পর্য্যন্ত, ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, বা ত্যাগ করেছে !" আমাদের পরাধীন থাকাটা যাহাদের পক্ষে লাভজনক ও সুবিধাজনক, তাহারাও পাকে প্রকারে প্রশ্ন করে, "তোমরা কেন স্বাধীন হ'তে চাও ? বেশ ত আছ ; এর চেয়ে ভাল ত কোনো কালে ছিলে না !"

এ রকম কোন কোন প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব কখন কখন আগে দিয়াছি। এখন দু-একটা কথা মাত্র বলিব।

মানুষের যখন বুদ্ধি আছে, সৃজনী শক্তি আছে, ভাল-মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা আছে, নিজের কাজ নিজে করিবার শক্তি আছে, বড় হইবার ও ভাল হইবার আকাঙ্ক্ষা আছে, তখন তাহার বুদ্ধির প্রয়োগের, সকল রকম শক্তির বিকাশের, এবং বড় ও ভাল হইবার আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতার সুযোগ চাই। স্বাধীন অবস্থা ভিন্ন কোন দেশের মানুষের এইরূপ সুযোগ ভাল করিয়া হইতে পারে না। এই জন্য আমরা স্বাধীনতা চাই।

এ রকম বস্তুবিচ্ছিন্ন (abstract) কথায় অনেকেই সন্তুষ্ট হইবেন না। সেই জন্য, ধরাছোঁয়া যায়, এমন কিছু বলাও দরকার। তাই বলি, আমরা স্বাস্থ্য চাই, দীর্ঘ আয়ু চাই, জীবনধারণের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তাহার অর্থাৎ নানাবিধ সম্পত্তির প্রাচুর্য্য চাই, জ্ঞান বিদ্যা চাই, যথেষ্ট অবসর ও শুচিতার সহিত অবসর-বিনোদনের নানা উপায় চাই, ইত্যাদি। স্বাধীন দেশ ভিন্ন অন্যত্র এগুলি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না।

ইউরোপ আমেরিকার স্বাধীন দেশগুলির এবং এসিয়ার প্রবলতম স্বাধীন দেশ জাপানের লোকদের অবস্থা এ বিষয়ে আমাদের চেয়ে ঢের ভাল। অতএব আমরাও স্বাধীন হইতে চাই।

প্রথমে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ আয়ুর কথাই ধরা যাক্।

—

ভিন্ন ভিন্ন দেশে আয়ুর দৈর্ঘ্যের আশা

এক একটি দেশে যে বয়সের যত পুরুষ ও যত নারীর মৃত্যু হয়, তাহা হইতে হিসাব করিয়া এই বিষয়ের গবেষকগণ স্থির করিয়াছেন, কোন্ দেশে কোন্ বয়সের পুরুষ বা নারীরা আরও কত বৎসর বাঁচিবার আশা করিতে পারেন। ইহা গড়পড়তা হিসাব। ইহা হইতে প্রত্যেক মানুষের আয়ুর সম্ভাবিত দৈর্ঘ্য গণনা করা যায় না, এক একটা দেশে মোটের উপর ভিন্ন ভিন্ন বয়সের মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুর দৈর্ঘ্য বুঝা যায়। যে-সকল দেশে মানুষের জন্ম ও মৃত্যু রেজিষ্টারী করা হয়, বৈজ্ঞানিকেরা সেই সকল দেশ সম্বন্ধেই এইরূপ হিসাব করিতে পারিয়াছেন।

লীগ অব্ নেশুন্স্ (রাষ্ট্রসংঘ) প্রতিবৎসর নানা-বিষয়ক পরিসংখ্যানের (ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের) একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। বর্ত্তমান ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই, বাংলা ২৪ আষাঢ়, ১৯৩৭।৩৮ খ্রীষ্টাব্দের পরিসংখ্যান-বার্ষিক-পুস্তক বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে পুরুষশিশু ও নারীশিশু তাহাদের জন্মদিনে গড়ে কত বৎসর বাঁচিবার আশা করিতে পারে, তাহার অঙ্কগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিব।

জন্মদিবসে প্রত্যাশিত আয়ু কত বৎসর
তাহার তালিকা

দেশ।	পুং শিশু	স্ত্রী শিশু
মিশর	৩১	৩৬
দক্ষিণ আফ্রিকা	৫৭·৭৮ (শ্বেত)	৬১·৪৮ (শ্বেত)
কানাডা	৫৮·৯৬	৬০·৭৩
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৬০·৭২ (শ্বেত)	৬৪·৭২
,, ,,	৫০·৮২ (অশ্বেত)	৫৩·৭৪ (অশ্বেত)
ভারতবর্ষ	২৬·৯১	২৬·৫৬
জাপান	৪৪·৮২	৪৬·৫৪
জার্মেনী	৫৯·৮৬	৬২·৮১
অষ্ট্রিয়া	৫৪·৪৭	৫৮·৫৩
বেলজিয়ম	৫৬·০০	৫৯·৬৩
বুলগেরিয়া	৪৫·৯২	৪৬·৬৪
ডেনমার্ক	৬২·০	৬৩·৮
এস্টোনিয়া	৫৩·১২	৫৯·৬০
ফিনল্যাণ্ড	৫০·৬৮	৫৫·১৪
ফ্রান্স	৫৪·৩০	৫৯·০২
আয়ার্ল্যাণ্ড	৫৭·৩৭	৫৭·৯৩
ইটালী	৫৩·৭৬	৫৬·০০
লাটভিয়া	৫৫·৩৯	৬০·৯৩
নরওয়ে	৬০·৯৮	৬৩·৮৪
হল্যাণ্ড	৬১·৯	৬৩·৫
ইংলণ্ড-ওয়েল্‌স্‌	৬০·১৩	৬৪·৩৯
স্কটল্যাণ্ড	৫৬·০	৫৯·৫
উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড	৫৫·৪২	৫৬·১১
সুইডেন	৬১·১৯	৬৩·৩৩
সুইজার্ল্যাণ্ড	৫৯·২৫	৬৩·০৫
চেকোস্লোভাকিয়া	৫১·৯২	৫৫·১৮
সোভিয়েট রাশিয়া	৪১·৯৩	৪৬·৭৯
অষ্ট্রেলিয়া	৬৩·৪৮	৬৭·১৪
নিউ জীল্যাণ্ড	৬৫·০৪	৬৭·৮৮

রাষ্ট্রসংঘের পরিসংখ্যান-বর্ষপুস্তকে যতগুলি দেশের অঙ্ক মুদ্রিত আছে, আমরা ততগুলি দেশের দিলাম। জন্মদিবসে ছাড়া ১, ১০, ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, এবং ৭০ বৎসর বয়সে কোন্ দেশে কত বৎসর বাঁচিবার আশা লোকে গড়ে করিতে পারে, তাহাও ঐ পুস্তকে দেওয়া আছে। স্থানাভাবে, অনাবশ্যকবোধে, ও বাহুল্যভয়ে সেগুলি উদ্ধৃত হইল না। যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যাইবে, ভারতবর্ষেই লোকে সকলের চেয়ে কম বৎসর বাঁচিবার আশা করিতে পারে। জন্মদিবসের পরে এক হইতে সত্তর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকে আরও কত বৎসর বাঁচিতে পারে, তাহার তালিকাতেও ভারতবর্ষের স্থান সকলের নীচে—এখানেই মানুষ সকলের চেয়ে কম বৎসর গড়ে বাঁচিবার আশা করিতে পারে।

ভারতবর্ষের অবস্থা এরূপ কেন?

মানুষের আয়ুর দীর্ঘতা অনেকগুলি জিনিষের উপর নির্ভর করে। যথা—পুষ্টিকর খাদ্যের যথেষ্টতা, স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার নিয়ম জানা, নিয়ম পালন করিবার মত আর্থিক সামর্থ্য, রোগ হইলে যথোচিত চিকিৎসা, ইত্যাদি। দারিদ্র্য বশতঃ ভারতীয়েরা যথেষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্য পায় না; শিক্ষার অভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সম্বন্ধে তাহাদের অধিকাংশের যথেষ্ট জ্ঞান নাই, এবং যাহাদের আছে তাহারাও অনেক স্থলে দারিদ্র্যবশতঃ তাহা পালন করিতে পারে না; অধিকাংশ লোকেরই রোগে যথোচিত চিকিৎসা হয় না; ইত্যাদি। ইহার উপর প্রায় সমুদয় প্রদেশেই গ্রাম- ও শহরগুলিকে স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখিবার ব্যবস্থা নাই, এবং তাহাও দারিদ্র্যের জন্য।

ভারতবর্ষ যে স্বভাবতই অস্বাস্থ্যকর দেশ, তাহা নহে। আমাদেরই অনেকের জীবিত কালে পূর্ব্বে যে-সকল স্থান স্বাস্থ্যকর ছিল তাহা এখন ম্যালেরিয়া প্রভৃতিতে অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে। দেশের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া দৃষ্টি না রাখিয়া বিলাতী বাণিজ্য বিস্তারার্থ রেলপথ নির্ম্মাণে ম্যালেরিয়া বাড়িয়াছে। দেশ স্বাধীন থাকিলে এরূপ হইতে পারিত না। দেশ স্বাধীন থাকিলে দেশী শিল্প বিনষ্ট হইয়া দেশ দরিদ্র হইত না। দেশ স্বাধীন থাকিলে সকলেরই শিক্ষার ও জ্ঞানবৃদ্ধির ব্যবস্থা হইত।

আয়ুর দীর্ঘতা সম্বন্ধে যতগুলি দেশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সবগুলিই হয় সম্পূর্ণ স্বাধীন বা প্রায় স্বাধীন।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অস্বাস্থ্যকর অবস্থাতেও এই দেশের বাসিন্দা বা প্রবাসী ইউরোপীয়দের স্বাস্থ্য আমাদের চেয়ে ভাল ও তাহারা অধিকতর দীর্ঘায়ু। তাহার

কারণ তাহারা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম জানে ও তাহা পালন করিবার আর্থিক সামর্থ্য তাহাদের আছে।

ভারতবর্ষকে দীর্ঘজীবীদের দেশ করিতে হইলে উহাকে স্বাধীন করা চাই।

—

শিশুদের ও বয়স্কদের মৃত্যুর হার

আমরা রাষ্ট্রসঙ্ঘের বার্ষিক পরিসংখ্যান-পুস্তক হইতে অধিক অঙ্ক তুলিয়া আমাদের লেখার নীরসতা বাড়াইতে চাই না। সেই জন্য সংক্ষেপে বলিতেছি, ভারতবর্ষে মৃত্যুর হার দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, আরগেণ্টাইন, কোলোম্বিয়া, কোষ্টারিকা, গোয়াটিমালা, জামেকা, সালভাডর, উরুগোয়ে, ভেনিজুয়েলা, সিংহল, সাইপ্রাস, কোরিয়া, ফর্মোসা, জাপান, ফেডারেটেড্ মালয় ষ্টেট্‌স, প্যালেষ্টাইন, ফিলিপাইন্স, জার্মেনী, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়ম, বুলগেরিয়া, ডেন্মার্ক, এস্‌টোনিয়া, ফিনল্যাণ্ড, ফ্রান্স, গ্রীস, হাঙ্গেরী, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইটালী, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, মাল্টা, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, পোর্টুগ্যাল, রুমানিয়া, ব্রিটেন, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড অপেক্ষা বেশী। শিশুমৃত্যুর হার রুমানিয়া ছাড়া ইউরোপের প্রত্যেক দেশের চেয়ে "ব্রিটিশ" ভারতবর্ষে বেশী (ভারতবর্ষের দেশী রাজ্যগুলির অঙ্ক দেওয়া হয় নাই)। কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকার চিলি ছাড়া আর সব দেশ, জাপান, প্যালেষ্টাইন, ফিলিপাইন্স, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডে শিশুমৃত্যুর হার ভারতবর্ষ অপেক্ষা কম। তাহার কারণ সেই সব দেশের লোকে সচ্ছল অবস্থা, শিক্ষার অধিকতর বিস্তার এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বা আত্মকর্তৃত্ব প্রযুক্ত উত্তম সূতিকাগার, শিক্ষিতা ধাত্রী, এবং প্রসূতি ও শিশুর পথ্য ও পরিচর্য্যার সুব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে।

শিশুদের ও বয়স্কদের মৃত্যুর হার কমাইবার জন্য স্বাধীনতা চাই।

—

দেশের স্বাধীনতা ভিন্ন ধন বাড়ে না

আমরা আগে আগে প্রবাসীতে দেখাইয়াছি, ভারতীয়দের মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয় এবং ভারতবর্ষের বার্ষিক জাতীয় আয় ("ন্যাশন্যাল ইন্‌কম্") স্বাধীন দেশসমূহের লোকদের মাথাপিছু আয় এবং জাতীয় আয় অপেক্ষা কত কম। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট হইতে এবং জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমীটির রিপোর্ট হইতে সরকারী মত উদ্ধৃত করিয়াও আমরা দেখাইয়াছি ভারতবর্ষ সরকারী ইংরেজদের মতেও অতি দরিদ্র।

ভারতবর্ষের দারিদ্র্য কমাইবার জন্য ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা আবশ্যক।

—

দেশের ধনবৃদ্ধির জন্য পণ্যশিল্পের বিস্তার চাই

দেশের ধনবৃদ্ধির জন্য কৃষির বিস্তার ও উন্নতি চাই কিন্তু শুধু তাহাতেই হইবে না। পণ্যশিল্পের বিস্তারও চাই। পণ্যশিল্পের বিস্তার মানে শুধু কুটীর-শিল্পের বিস্তার নহে। পণ্যশিল্পে অগ্রসর পাশ্চাত্য দেশসমূহে এবং প্রাচ্য জাপানে কুটীর-শিল্প আছে; কিন্তু বড় বড় কারখানাতেই তথাকার নানা পণ্যদ্রব্যের অধিক অংশ উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষেও তাহা হওয়া আবশ্যক।

—

পণ্যশিল্প বিস্তারের জন্য স্বাধীনতা চাই

জাপান স্বাধীন দেশ বলিয়া ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে নিজের পণ্যশিল্প এরূপ বিস্তৃত ও উন্নত করিতে পারিয়াছে যে, এখন ইউরোপ ও আমেরিকার এ-বিষয়ে অগ্রসরতম দেশসকলের সহিতও প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে। স্বাধীন জাপানের জাতীয় গবর্মেণ্ট যত প্রকারে সম্ভব দেশের পণ্যশিল্পের বিস্তারে ও উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে।

ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ বলিয়া তাহার বিদেশী গবর্মেণ্টের নিকট হইতে প্রকৃত সাহায্য ত পায়ই নাই, অধিকন্তু দেশের বিস্তর পণ্যশিল্প নষ্ট বা প্রায় নষ্ট হইয়াছে, এবং আইন এরূপ হইয়াছে যাহাতে গবর্মেণ্ট সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে দেশী পণ্যশিল্পের বিস্তার ও উন্নতিতে বাধা জন্মাইতে পারে। কিছু প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব

প্রদেশগুলি পাইয়াছে বটে, কিন্তু পণ্যশিল্পের বাস্তবিক বাঁচন-মরণ নির্ভর করে কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের উপর। সেই গবর্ন্মেণ্টে দেশের লোকদের সম্পূর্ণ অধিকার চাই।

অর্থাৎ পণ্যশিল্প বিস্তারের জন্য দেশকে স্বাধীন করিতে হইবে।

—

পণ্যশিল্পবিস্তারার্থ শিক্ষার বিস্তার চাই

জাপানে যে পণ্যশিল্পের এত বিস্তার ও উন্নতি হইয়াছে, তাহা আকাশ হইতে পড়ে নাই। তথাকার গবর্ন্মেণ্টের চেষ্টায় জাপানী পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা ৯৯ (নিরানব্বই) জন লিখিতে পড়িতে পারে। তদ্ভিন্ন, সেখানে উচ্চ শিক্ষার বিস্তারও খুব হইয়াছে—বিশেষতঃ শুদ্ধ ও ফলিত (pure and applied) বিজ্ঞানে, যন্ত্রনির্মাণ-শিল্পে এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিষয়সমূহে (economics, banking and commercial subjects)। ভারতবর্ষে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার—বিশেষতঃ পণ্যশিল্প ও বাণিজ্যের অনুকূল শিক্ষার—বিস্তার ও উন্নতির জন্য দেশকে স্বাধীন করা চাই।

আবার দেশকে স্বাধীন করিতে হইলেও সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোককে লিখনপঠনক্ষম করা চাই। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট যে সার্ব্বজনীন শিক্ষার প্রবর্ত্তন না-করিয়া বরং তাহাতে বাধাই দিয়াছে, তাহার কারণ দেশে সকলে শিক্ষিত হইলে দেশ স্বাধীন হইবে।

পাশ্চাত্য সমুদয় দেশ, জাপান ও ফিলিপাইন্স প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ শিক্ষায় ভারতবর্ষ অপেক্ষা অগ্রসর।

—

স্বাধীন রাশিয়া কি করিতেছে

প্রধানতঃ পতাকা উড়াইয়া এবং নানাবিধ "জয়" ও "জিন্দাবাদ" চীৎকারিয়া রাশিয়া স্বাধীন হয় নাই। যে-সব উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে লোকশিক্ষা অন্যতম। লোকশিক্ষা-ক্ষেত্রে রাশিয়ার ছাত্রেরা বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিল। বর্ত্তমানে স্বাধীনতাকে স্থায়ী করিবার নিমিত্ত, রাশিয়া শিক্ষা-বিস্তার পণ্যশিল্প-বিস্তার প্রভৃতিতে মন দিয়াছে। রাশিয়াতে লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা খুব বাড়িয়াছে, ইহা আমরা অনেক বার বলিয়াছি ও দেখাইয়াছি। সেই রাষ্ট্রে যে উচ্চশিক্ষারও খুব বিস্তার হইয়াছে, তাহা অনেকের জানা নাই। ব্রিটেন, জার্মেনী, ইটালী, ফ্রান্স ও জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ও উচ্চশিক্ষালয়গুলিতে মোট চারি লক্ষের কিছু অধিক ছাত্রছাত্রী পড়ে। কিন্তু একা সোভিয়েট রাশিয়াতেই তাহাদের সংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষ। রাশিয়াতে উচ্চশিক্ষার এত বিস্তার সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে কেহ বেকার নাই। রাশিয়া এরূপ ধরণের উচ্চশিক্ষা দেয়, এবং তাহার রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, পণ্যশিল্পসম্বন্ধীয়, বাণিজ্যিক এবং শিক্ষাবিভাগীয় ব্যবস্থা এরূপ, যে, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত সকলেরই কাজ জুটে।

আর একটি কথা জানা ও মনে রাখা দরকার, যে, রাশিয়ায় প্রাথমিক হইতে উচ্চতম পর্য্যন্ত সমুদয় শিক্ষার ব্যয় বহন করে রাষ্ট্র।

—

ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার সামান্য বিস্তার

গত ২৫শে জুনের "চায়না উইক্লি রিভিয়ু" পত্রিকার ১১৭ পৃষ্ঠায় এই তালিকাটি দেওয়া হইয়াছে।

মোট অধিবাসী-সংখ্যার প্রতি কত জনে এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও কলেজ-ছাত্র আছে :—

ব্রিটেনে	প্রতি	৮৮৫	জনে	এক জন।
ইটালীতে	,,	৮০৮	,,	,,
জার্মেনীতে	,,	৬০৪	,,	,,
হল্যাণ্ডে	,,	৫৭৯	,,	,,
সুইজারল্যাণ্ডে	,,	২৭১	,,	,,
ফ্রান্সে	,,	২৪০	,,	,,
আমেরিকায়	,,	৬২	,,	,,
রাশিয়ায় (পণ্যশিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্রসমেত)	,,	৩৫	,,	,,
চীনে	,,	১০,০০০		,,

শিক্ষা সম্বন্ধে চীনের এই দুরবস্থার কারণ, ডাঃ সান্ য়ট-সেনের নেতৃত্বে বিপ্লবের পূর্ব্বে চীনের মাঞ্চু সম্রাটদের আমলে লোক-শিক্ষার চেষ্টা হয় নাই; এবং বিপ্লবের পর

চীনে অন্তর্দ্বন্দ্ব, বৈদেশিক শক্তিসমূহের চক্রান্ত, এবং জাপানের সহিত যুদ্ধ চলিতে থাকায় শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট মন দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই।

শিক্ষা সম্বন্ধে চীনের এই দুরবস্থায় চীনের ছাত্রেরা গত মার্চ মাসে কন্‌ফারেন্সে সমবেত হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে এবং প্রতিকার-চেষ্টা করিতেছে।

উপরের তালিকায় রাশিয়া ভিন্ন অন্য পাশ্চাত্য দেশ-গুলির উচ্চ পণ্যশিল্প-বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসমষ্টি ধরা হয় নাই। তাহা ধরিলে সে-সব দেশেও উচ্চশিক্ষার অধিকতর বিস্তারের প্রমাণ পাওয়া যাইত।

ভারতবর্ষে সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আর্টস্ বিজ্ঞান ও বৃত্তিশিক্ষার কলেজগুলিতে মোট ১,১৫,২২৪ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়ে; অর্থাৎ মোট অধিবাসী ৩৫,২৮,৩৭,৭৭৪ জনের প্রতি ৩০৬৩ জনের মধ্যে এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে পড়ে। উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ খুব অনগ্রসর, চীন তাহা অপেক্ষাও অনগ্রসর।

—

স্বাধীনতা লাভ ও রক্ষার জন্য আর্থিক স্বাধানতা চাই

কোন দেশের যদি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থাকে কিন্তু যদি সে-দেশ টাকাকড়ি সম্বন্ধে অন্য দেশের কাছে ঋণী থাকে, তাহা হইলে তাহার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লোপ পাইতে বা কমিয়া যাইতে পারে। যদি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাশালী কোন দেশে বিদেশীদের বিস্তর মূলধন শিল্পবাণিজ্যে খাটে, তাহা হইলেও তাহার স্বাধীনতার বিঘ্ন ঘটে। চীনের আধুনিক ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ আছে।

কোন পরাধীন দেশ যদি তাহার মনিব দেশের লোকদের কাছে সরকারী ঋণ গ্রহণ করে, কিংবা যদি মনিব দেশের লোকদের মূলধন এই পরাধীন দেশে তাহাদের কারখানা বাণিজ্য ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে খাটে, তাহা হইলে এরূপ অবস্থা পরাধীন দেশটির স্বাধীনতালাভে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মায়। ভারতবর্ষে সরকারী ঋণের (public debt-এর) খুব বেশী অংশের মহাজন ইংরেজরা। ভারতবর্ষে তাহাদের ব্যাঙ্ক কারখানা ব্যবসাও অনেক। সেই জন্য ইংরেজরা সর্ব্বদাই ভাবে, ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হয়, তাহা হইলে তাহাদের এত টাকা ত যাইতে পারে। বিপ্লবের পর রাশিয়া তাহার সমুদয় বিদেশী মহাজনকে হাঁকাইয়া দিয়াছে। স্বাধীন ভারতবর্ষের এতটা পরাক্রম না হইতে পারে। কিন্তু বলাও ত যায় না। এই সব ভাবিয়া ইংরেজ ধনিক বণিক সম্প্রদায় বরাবর ভারতবর্ষের লোকদের অল্পস্বল্প প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভেও বাধা দিয়া আসিতেছে, এবং ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে আপনাদের আর্থিক স্বার্থরক্ষার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়াছে।

গতানুশোচনায় কোন লাভ নাই। প্রতিকার-চিন্তা ও প্রতিকারের উপায় অবলম্বনে লাভ আছে। ভারত-বর্ষের সরকারী ঋণ যাহাতে না বাড়ে, তাহার চেষ্টা যথাশক্তি ভারতীয়দের করা উচিত—যদিও সরকারী ঋণবৃদ্ধিতে বাধা দিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান আইন অনুসারে আমাদের নাই বলিলেও চলে। সরকারী ঋণ লওয়া হইলে, তাহা টাকায় লওয়া হইবে (পাউণ্ডে নহে), এরূপ নিয়ম হওয়া উচিত এবং ভারতীয়দিগকেই সেই ঋণ দিবার সুযোগ আগে দেওয়া উচিত।

ভারতবর্ষে নানা প্রকার পণ্যদ্রব্যের কারখানা এখনও খুব বেশী হইতে পারে ও হইবে। নূতন সকল রকম কারখানা যাহাতে ভারতবর্ষের লোক দ্বারা ভারতীয়দের টাকায় স্থাপিত ও ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেদিকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি থাকা একান্ত আবশ্যক। এরূপ দৃষ্টি থাকিলে স্বাধীনতা লাভ ও রক্ষার পথে নূতন বাধার সৃষ্টি হইবে না।

বাংলা দেশে বাঙালীদের এ বিষয়ে মনোযোগ অন্য প্রায় সকল প্রদেশের চেয়ে কম। এই জন্য বাঙালীদেরই এদিকে বেশী মন দেওয়া উচিত।

বঙ্গে এখন যাঁহারা ছাত্র, ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের অনেককে শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রেও নেতৃত্ব করিতে হইবে। অতএব, এই সকল বিষয়েও তাঁহাদের জ্ঞান ও চিন্তা আবশ্যক।

—

বঙ্গে শ্রমিক সংগ্রহ

বাংলা দেশে যত কারখানা আছে, তাহার শ্রমিকদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা কম। অথচ শিক্ষিত বাঙালীদের

মধ্যে যেমন বেকার লোকের সংখ্যা কম নয়, তেমনই চাষী মজুর শ্রেণীর বাঙালীদের মধ্যেও বেকার লোক খুব বেশী। ইহাদিগকে কারখানার কাজে আনিবার বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক। এই চেষ্টা ঢাকেশ্বরী মিল প্রথম হইতে করায় তাহার সব শ্রমিক বাঙালী। হয়ত বাঙালী শ্রমিকদের দ্বারা চালিত এরূপ কারখানা আরও আছে, যাহাদের নাম আমরা জানি না।

পূর্ব্ববঙ্গে যাহা হইতে পারিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে তাহা অসম্ভব নহে। পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা অধিকতর দরিদ্র।

বঙ্গের কারখানাসমূহে বাংলা দেশ হইতে শ্রমিক লইলে তাহার একটা আনুষঙ্গিক সুবিধা এই হইবে, যে, বাঙালী শ্রমিকনেতারা বঙ্গের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের পরিচালনা করিতে পারিবেন। কারখানাসমূহের বিদেশী মালিকদের বিরুদ্ধে ভারতের সব প্রদেশের স্বার্থ এক। কিন্তু প্রত্যেক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের প্রতিযোগিতা থাকায়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে স্বার্থসংঘাত আছে। এই জন্য প্রত্যেক প্রদেশের সজাগ থাকা চাই।

—

বাংলা দেশ হইতে কনষ্টেবল সংগ্রহ

বাংলা দেশের জন্য এ যাবৎ অস্ত্রধারী ও অস্ত্রবিহীন কনষ্টেবল খুব বেশী সংখ্যায় বঙ্গের বাহির হইতে লওয়া হইয়া আসতেছে। সম্প্রতি মন্ত্রীরা বলিয়াছেন, অস্ত্রবিহীন কনষ্টেবল সমস্তই বাংলা দেশ হইতে লওয়া হইবে।

আর যায় কোথা! অমনই বিহারের একটি কাগজ লিখিল, বাঙালীরা দেখ কেমন প্রাদেশিকতাগ্রস্ত, অথচ কেবল বিহারীদিগকেই দোষ দেয়!

একটু প্রভেদ আছে। বাঙালীনামধারী অনেক পরিবার কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বিহারে বাস করিতেছে। তাহাদের অনেকে বাড়ীতেও বাংলা বলে না—বাংলা ভুলিয়া গিয়াছে। আজ নয়, বহু বৎসর আগে হইতে (ন্যূনকল্পে ২৬ বৎসর আগে হইতে) এই সব বাঙালীকে ও অন্য বাঙালীনামধারী স্থায়ী বাসিন্দাকে চাকরীর জন্য ও শিক্ষার জন্য ডোমিসাইল সার্টিফিকেট লইতে হয়। বাংলাভাষী যে-সব অঞ্চল বিহারপ্রদেশের সামিল করা হইয়াছে, তাহাদেরও বাঙালীনামধারী বাসিন্দাদিগকে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট লইতে হয়। অবাঙালীনামধারী অন্য যাহারা বিহারের বাহির হইতে আসিয়া স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বিহারে বাস করে, তাহাদের কাহাকেও ডোমিসাইল সার্টিফিকেট লইতে হয় না, কখনও হয় নাই।

বাংলা দেশে বঙ্গের বাহির হইতে আগত কাহাকেও ডোমিসাইল সার্টিফিকেট লইতে হয় না, কখনও হয় নাই। বাংলা দেশ যদি সম্প্রতি কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল বঙ্গদেশ হইতে লোক লইতে চাহিয়া থাকে, তাহা বিহার-আসাম-উড়িষ্যার বহু বৎসরের পুরাতন বর্ত্তমান নীতির অনুসরণ মাত্র; এবং তাহাও পুরা অনুসরণ নহে—আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু।

বাংলা হইতে কনষ্টেবল লওয়ার অর্থও ভাল করিয়া বুঝা দরকার। ব্রাহ্মণাদি অনেক জাতির ওড়িয়া, ব্রাহ্মণ রাজপুত প্রভৃতি জাতির কনৌজিয়া ও ভূমিহার বাংলা দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া গিয়াছেন। বিহারে যেমন বাঙালীনামধারী স্থায়ী বাসিন্দা লোকদিগকেও বাদ দিবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে, বাংলা দেশের বাসিন্দা এই সকল ভিন্নপ্রদেশাগত লোকদিগকে কোন দিক্ দিয়া বঞ্চিত করিবার কোন চেষ্টা কখনও হয় নাই, এখন বা ভবিষ্যতেও হইবে না।

—

বিহার-ভূমি কোন্‌টি

বিহারের মন্ত্রীদের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, যে, ছোটনাগপুর বরাবরই বিহারের অন্তর্গত। মানভূম ছোটনাগপুরের মধ্যে, অতএব তাঁহাদের মতে মানভূমও বরাবর বিহারের অন্তর্গত। বিহারী খবরের কাগজগুলি বলিতেছে, বর্ত্তমানে যে-সব জায়গাকে পূর্ণিয়া জেলা ও সাঁওতাল পরগণা জেলা বলা হয়, সেগুলিও বরাবর বিহারের অন্তর্গত।

কোন্ ভূখণ্ড বাস্তবিক বিহার-ভূমি, পাটনার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্ট-জজ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ এই প্রশ্নের ঐতিহাসিক আলোচনা আগষ্ট মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে করিয়াছেন। যাঁহারা এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য জানিতে চান, তাঁহাদের এই প্রবন্ধটি পড়া উচিত।

—

প্রবাসীর পাঠক-পাঠিকাদিগের প্রতি

প্রবাসীর যে-সকল পাঠকপাঠিকা ইংরেজী পড়েন, তাঁহারা গত কয়েক মাসের প্রবাসীতে মডার্ণ রিভিয়ু মাসিক পত্রের বিজ্ঞাপন দেখিয়া থাকিবেন। তাহা পড়িলে বুঝিতে পারিবেন, আমরা প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে যাহা জানাইয়া থাকি, তাহার অতিরিক্ত অন্য বহু বিষয়ে মডার্ণ রিভিয়ুতে মত ব্যক্ত করি। যে-সব বিষয়ে উভয় মাসিকেই কিছু লিখি, তাহার কোন কোনটি সম্বন্ধে একটিতে হয়ত সংক্ষেপে ও অন্যটিতে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করি। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের ও ভারতবর্ষের বাহিরের অনেক লেখকের প্রবন্ধ মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়া

থাকে। এইগুলিতে যাহা থাকে, প্রবাসীতে তাহা থাকে না—কচিৎ কখনও কোনটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

—

বিদেশে ভারতীয় ফোটোগ্রাফের আদর

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী কর্তৃক গৃহীত এবং প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত মহাত্মা গান্ধীর ফোটোগ্রাফের বিদেশে আদর সম্বন্ধে আমরা গত সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম। তাহার পর আমেরিকার সুবিখ্যাত সচিত্র "এশিয়া" মাসিক পত্রের নিকট হইতে ছাপিবার জন্য ঐ ছবিখানি চাহিয়া টেলিগ্রাম আমরা পাইয়াছি। "এশিয়া" পত্রিকা "মডার্ণ রিভিয়ু"তে প্রকাশিত শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ও শ্রীপ্রভাত নিয়োগীর অঙ্কিত ছবি দেখিয়া তাঁহাদের নিকটও ছবি চাহিয়া চিঠি লিখিয়াছেন।

"মডার্ণ রিভিয়ু"র গত জুন সংখ্যায় শ্রীশম্ভু সাহা কর্তৃক গৃহীত রবীন্দ্রনাথের যে-ছবি মুদ্রিত হয়, সেখানি লণ্ডনের একটি সুবিখ্যাত ফোটোগ্রাফীর পত্রিকা কর্তৃক ঘোষিত আন্তর্জাতিক ফোটোগ্রাফ-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছিল।

আরও অনেক ভারতীয়ের তোলা ফোটোগ্রাফ বিদেশে পুরস্কৃত হইয়াছে। ভারতীয় চিত্রের বিদেশে সমাদরের কথা অনেকেই জানেন—আমাদের কাগজেও তাহার অনেক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে শুধু আমাদের পত্রিকার সূত্রে ও আমাদের জ্ঞাতসারে সম্প্রতি যাহা হইয়াছে, তাহারই কথা লিখিলাম।

—

গন্ধক-দ্রাবক উৎপাদন ও ব্যবহার পণ্যশিল্পে অগ্রসরত্বের একটি প্রমাণ

বর্তমান ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত রাষ্ট্রসংঘের বার্ষিক পরিসংখ্যান-পুস্তকে দেখিতেছি :—

"Sulphuric acid…is employed in nearly all branches of the chemical industry, more particularly in the manufacture of fertilisers, acids, explosives, dyestuffs ; also in the textile and electrical industries, in metallurgy, petroleum refining, etc."

তাৎপর্য্য। রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতির প্রায় সকল শাখাতেই সালফিউরিক য়্যাসিড অর্থাৎ গন্ধক-দ্রাবক ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ জমীর সার, নানাবিধ য়্যাসিড, বিস্ফোরক পদার্থ ও রঙ উৎপাদনে; বস্ত্র উৎপাদন ও বয়নে, বৈদ্যুতিক শিল্পে এবং ধাতুশোধনে ও খনিজ তৈল শোধনেও।

তাহা হইলে কোন দেশ যত গন্ধক-দ্রাবক উৎপাদন ও ব্যবহার করে, তাহার দ্বারা সেই দেশের পণ্যশিল্প বিষয়ে অগ্রসরত্ব বা পশ্চাদ্বর্ত্তিতা স্থির করিতে পারা যায়।

—

ভিন্ন ভিন্ন দেশে উৎপন্ন গন্ধক-দ্রাবকের পরিমাণ

রাষ্ট্রসংঘের পরিসংখ্যান-পুস্তকে কয়েকটি দেশে উৎপন্ন গন্ধক-দ্রাবকের পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে। ১৯২৭ হইতে ১৯৩৭ পর্য্যন্ত ১১ বৎসরের অঙ্কগুলি দেওয়া হইয়াছে। কানাডা, জাপান, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড আয়ার্ল্যাণ্ড, ইটালী, পোল্যাণ্ড ও ব্রিটেনের প্রতি বৎসরের অঙ্ক আছে। এই সব দেশ দেখিতেছি রাষ্ট্রসংঘে পরিসংখ্যান প্রেরণ বিষয়ে নিয়মিত ক্ষিপ্রকর্মা। আমেরিকার য়ুনাইটেড ষ্টেটসের প্রতি বৎসরে ব্যবহৃত গন্ধক-দ্রাবকের পরিমাণ দেওয়া আছে, উৎপন্নের কেবল চারি বৎসরের আছে। যে-দেশের শেষ যে-বৎসরের অঙ্ক দেওয়া আছে, তাহার নামের পাশে মেট্রিক টনে উৎপন্ন গন্ধক-দ্রাবকের পরিমাণ এবং তাহার পর বন্ধনীর মধ্যে বৎসর দিতেছি।

বেল্‌জিয়ান কঙ্গো ৭ (১৯৩৬), কানাডা ২৫৬ (১৯৩৭), য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ ৩৬৪৭ (১৯৩৫), ভারতবর্ষ ৩০ (১৯২৮), জাপান ২৫০০ (১৯৩৭), সোভিয়েট রাশিয়া ১২০৮ (১৯৩৬), জার্মেনী ১৭৬৫ (১৯৩৬), বেলজিয়ম ৬২৫ (১৯৩?), ডেনমার্ক ৫ (১৯৩৭), স্পেন ১৩০ (১৯৩৪), ফিনল্যাণ্ড ২৩ (১৯৩০), ফ্রান্স ১১০০ (১৯৩৭), আয়ার্ল্যাণ্ড ৫৪ (১৯৩৭), ইটালী ১০৫১ (১৯৩৭), পোল্যাণ্ড ১৮৯ (১৯৩৭), পোর্টুগাল ৮১ (১৯৩৭), রুমানিয়া ৩৯ (১৯৩৭), ব্রিটেন ১০৬৩ (১৯৩৭), সুইডেন ১৪৮ (১৯৩৬), অষ্ট্রেলিয়া ১৩০ (১৯৩৬)। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স ১৯৩৭ সালে ৪৯৬৯ মেট্রিক টন গন্ধক-দ্রাবক ব্যবহৃত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ উক্ত সব দেশেই উৎপন্ন যত হয়, ব্যবহৃত তাহা অপেক্ষা বেশী হয়, এবং এই অতিরিক্ত অংশ অন্য দেশ হইতে আমদানী করা হয়।

উল্লিখিত সব দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা খুব বেশী। কিন্তু এদেশে গন্ধক-দ্রাবক উৎপন্ন হয় খুব কম। আমদানীও যে বেশী হয়, তা নয়। ইহাতেই বুঝা যায়, ভারতবর্ষ পণ্যশিল্পে কত পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

—

"বাংলা কাব্য-পরিচয়"

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুনির্ব্বাচিত কাব্য-সংগ্রহে পূর্ণ ও সুমুদ্রিত তাঁহার সম্পাদিত "বাংলা কাব্য-পরিচয়" গ্রন্থে নিম্নলিখিত "নিবেদন"টি মুদ্রিত করিয়াছেন :—

"কোনো একটি মাত্র সংস্করণে এ-রকম কাব্য-সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হোতেই পারে না। বাংলা কাব্য-পরিচয়ের এই প্রথম সংস্করণে নিঃসন্দেহই অনেক অভাব রয়ে গেছে। অনেক কবিতা চোখে পড়ে নি। অনেক নির্ব্বাচন যোগ্যতর হোতে

যে সংকলনে রচয়িতারা স্বয়ং তৃপ্ত হন নি তাঁদের নির্দেশ পালন করলে হয়তো তা সন্তোষজনক হবার সম্ভাবনা থাকত।

"আধুনিক কবিতার ধারা অবিরাম বয়ে চলেছে, সুতরাং তার সংগ্রহ ভাবী সংস্করণে পূর্ণতা ও উৎকর্ষ লাভ করবে, এই প্রত্যাশা সংকলনকর্তার মনে রইল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

এই সংগ্রহ-পুস্তকখানির ভূমিকা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

—

যুক্তপ্রদেশে বাঙালী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অসুবিধা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের সাংবাদিক মাসিক পত্রিকা "প্রবাসী সম্মেলনী" লিখিয়াছেন :—

সম্প্রতি এ-প্রদেশের হাই স্কুল ও ইণ্টারমীডিয়েট এডুকেশন বোর্ড হাইস্কুল পরীক্ষার্থিগণের জন্য যে নূতন বিধান প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা এ-প্রদেশের প্রবাসী বাঙ্গালীগণের পক্ষে অতিশয় কঠোর হইয়াছে। আমরা এ যাবৎ নানা রূপে গভর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের অসুবিধা জানাইয়া আসিতেছি। ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের উত্তর দিবার জন্য যখন হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষার প্রবর্ত্তন হয় তখন হইতে আমরা প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি যে বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে বাঙ্গালাতে উত্তর প্রদানের সুবিধা দেওয়া হউক। কারণ এ-প্রদেশে প্রবাসীদিগের মধ্যে বাঙ্গালীরাই সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং তাঁহাদের অনেকে এই প্রদেশকে নিজেদের স্থায়ী বাসস্থানে পরিণত করিয়াছেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারীতে ইঁহাদের সংখ্যা ২৭ হাজারের অধিক দেখা যায়; কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা এতদপেক্ষা অধিক বলিয়া অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, বোর্ড আমাদের এ প্রার্থনা ত মঞ্জুর করেনই নাই, অধিকন্তু বাঙ্গালী ছাত্রগণের ইংরেজীতে উত্তর দিবার যে অধিকার ছিল তাহাও খর্ব্ব করিয়াছেন। এক্ষণে ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ের উত্তর হিন্দী বা উর্দ্দুতে লিখিতে হইবে। বোর্ডের সভাপতি ইচ্ছা করিলে ইংরেজীতে উত্তর লিখিবার অনুমতি দিতে পারেন। বাঙ্গালী ছাত্রগণের ইংরেজীতে উত্তর দিবারও অধিকার আর থাকিবে না; হয় তাহাদিগকে ব্যক্তিবিশেষের (অর্থাৎ বোর্ডের সভাপতির) মর্জ্জির উপর নির্ভর করিতে হইবে, নচেৎ হিন্দী বা উর্দ্দুতে পরীক্ষার উত্তর লিখিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে। যাহার উপর অনুমতি প্রদানের ভার দেওয়া হইতেছে তাঁহার নিকট যে অনুমতি সব সময়েই পাওয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা কি? সুতরাং এক্ষণে বাঙ্গালী ছাত্রগণকে হিন্দী বা উর্দ্দু ভাল রকম শিখিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, হয় বাঙ্গালীদিগকে ইংরেজী, বাঙ্গালা এবং হিন্দী বা উর্দ্দু এই তিন ভাষায় সমান জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে, অথবা বাঙ্গালা ভাষা ছাড়িয়া দিয়া হিন্দী বা উর্দ্দুকেই মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ বিধানের অন্তর্নিহিত নীতি আমরা মোটেই অনুমোদন করি না। যে কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ ভাষাভাষীকে জোর করিয়া নিজের মাতৃভাষা ত্যাগ করাইবার চেষ্টা (প্রত্যক্ষ না হউক পরোক্ষভাবেও) অতীব গর্হিত। কংগ্রেসের মূলনীতির ইহা সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়াই আমরা জানি। পণ্ডিত জওআহরলাল একাধিক বার এ কথা নানাভাবে বলিয়াছেন যে, ছাত্রগণের শিক্ষার বাহন তাহাদের মাতৃভাষা হওয়াই যুক্তিযুক্ত এবং যে প্রদেশে অন্য ভাষাভাষী বাস করে তাহাদেরও শিক্ষা তাহাদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় প্রদত্ত হউক, এইরূপ দাবী করিবার তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী আছে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাবিধান জোর করিয়াই এ কথা বলিতেছে যে, কোন জাতিকে তাহার মাতৃভাষা ত্যাগ করাইয়া অন্য ভাষা গ্রহণ করাইলে তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য লোপ পাইয়া যায়। বালক-বালিকাগণের মনে জাতীয় বৈশিষ্ট্য তাহাদের মাতৃভাষার মধ্য দিয়াই বাল্যকাল হইতে সঞ্চারিত হয়। এই প্রদেশে আমাদের সেই পথ রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে। বোর্ডের উপরিলিখিত বিধান এখনও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দ্বারা অনুমোদিত হয় নাই। এলাহাবাদ, কাশী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রভৃতি স্থানেই অধিকসংখ্যক বাঙ্গালীর বাস। ঐ সকল স্থান হইতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট আবেদন-পত্র প্রেরিত হইতেছে বলিয়া আমরা সংবাদ পাইয়াছি। আমাদের প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনীর পক্ষ হইতেও চেষ্টা চলিতেছে। এ প্রদেশের সমগ্র বাঙ্গালীর মন-প্রাণে এই আন্দোলনে যোগ দিয়া মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।

যদি হিন্দী-উর্দ্দু ভাষা (বা ভাষাদ্বয়), তাহার আধুনিক সাহিত্য এবং তাহার মজ্জাগত সংস্কৃতি বাংলা ভাষা, তাহার আধুনিক সাহিত্য এবং তাহার মজ্জাগত সংস্কৃতির সমান বা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলেও বঙ্গের বাহিরের বাঙালী ছেলেমেয়েদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বঙ্গীয় সংস্কৃতির জ্ঞান ও তাহার সহিত যোগরক্ষা একান্ত আবশ্যক। কারণ, বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদিগকে বঙ্গের বাঙালীদের সহিত বিবাহাদি অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ক রাখিতে হইবে। যদি ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোক কোন সময়ে সামাজিক ভাবেও একজাতি হয়, তখন সর্ব্বত্র বাঙালী-অবাঙালীর বিবাহ প্রচলিত সাধারণ ব্যাপার হইতে পারিবে। তখন বঙ্গের বাহিরের বাঙালী ছেলেমেয়েরা বাংলা না জানিলেও তাহাদের সামাজিক অসুবিধা হইবে না—তাহাদের অন্য ক্ষতি যত বেশীই হউক। যত দিন সে-দিন না আসিতেছে, তত দিন কোন বাঙালীর বাংলা না-জানা বিশেষ অসুবিধার কারণ হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য ও বঙ্গীয় সংস্কৃতির আনন্দ, কল্যাণ ও সুবিধা হইতে বঞ্চিত হওয়া অতি-বড় বঞ্চিতত্ব, তাহা ত বলাই বাহুল্য।

অতএব যদি যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রীরা সুবিবেচনা ও ন্যায্য ব্যবস্থা না-ই করেন, তাহা হইলেও তথাকার

বাঙালী নেতাদিগকে সব ছেলেমেয়ের ভাল করিয়া বাংলা শিখিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

বোর্ড যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহার সভাপতি ইচ্ছা করিলে ইংরেজীতে উত্তর লিখিবার অনুমতি দিতে পারিবেন, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে বরাবরই কতকগুলি ছাত্রছাত্রী (যেমন যুক্তপ্রদেশের বাসিন্দা য়ুরোপীয় ও এংলো-ইণ্ডিয়ানদের ছেলেমেয়েরা) ইংরেজীতে উত্তর লিখিতে পাইবে এবং সেই ইংরেজী উত্তর পরীক্ষা করিবার পরীক্ষকও থাকিবে। তাহা হইলে, বোর্ড যদি একান্তই বাঙালী ছেলেমেয়েদিগকে বাংলায় উত্তর লিখিবার অনুমতি না দেন, তবে তাহাদিগকে ইংরেজীতে উত্তর লিখিবার অধিকার দিতে অলঙ্ঘ্য কোন বাধা দেখিতেছি না। অবশ্য বাংলাতে উত্তর লিখিতে দেওয়াই উচিত। বঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত যাহাদের মাতৃভাষা হিন্দী-উর্দ্দু তাহাদিগকে কোন অসুবিধায় ফেলেন নাই।

যে-সকল চাকরীর বা ওকালতীর মত বৃত্তির নিমিত্ত হিন্দী-উর্দ্দু জানা আবশ্যক, তাহা যে-সব বাঙালী করিতে চায়, তাহারা ত আপনা হইতেই তাহা শিখিবে। সে জন্য বাঙালী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাঘাত জন্মান অকর্ত্তব্য। অন্যেরা যেখানে হিন্দী বা উর্দ্দু এবং ইংরেজী, এই দুটা ভাষা শিখিবে, সেখানে বাঙালী ছেলেমেয়েদিগকে হিন্দী বা উর্দ্দু, ইংরেজী, এবং বাংলা, এই তিনটা ভাষা শিখিতে বাধ্য করা ন্যায়সঙ্গত হইবে না। কিন্তু এরূপ অবিচার হইলেও বাঙালী ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিকে পরাজয় মানিতে হইবে না।

বঙ্গের বাহিরে কৃতী বাঙালী ছাত্রছাত্রী

বঙ্গের বাহিরে বাঙালী ছাত্রদের কৃতিত্বের সংবাদ বহু বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসীতে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করা হয়। বহু বৎসর তাহা করা হইয়া আসিতেছে। আজকাল বাংলা দেশের অনেক দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজে এই সকল সংবাদ অবিলম্বে বাহির হওয়ায় প্রবাসীতে পুনর্ব্বার সেই সমস্ত সংবাদের প্রত্যেকটি মুদ্রিত করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। এইরূপ সংবাদ এ-বৎসর ব্রহ্মদেশ, বিহার এবং সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশে বাঙালী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অসুবিধা প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছি, যদি তাহাদিগকে হিন্দী বা উর্দ্দু, ইংরেজী, ও বাংলা এই তিনটি ভাষা শিখিতে হয়, তাহা হইলেও তাহাদের বুদ্ধি পরাজয় মানিবে না। তাহাদের বুদ্ধি ও কৃতিত্বের প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই বৎসর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলি পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্র ও ছাত্রীদের উচ্চস্থান লাভের সংবাদ দিতেছি।

(১) প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রী সকলের মধ্যে প্রথম স্থান—শ্রীঅজিতকুমার ভট্টাচার্য্য।

(২) প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান—কুমারী অণিমা ভট্টাচার্য্য।

(৩) প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান—কুমারী রেণু সুর।

(৪) আর্টসে ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষায় ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম ও ছাত্রছাত্রী সকলের মধ্যে সপ্তম স্থান—কুমারী অণিমা মুখোপাধ্যায়।

(৫) বিজ্ঞানে ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষায় সকলের মধ্যে তৃতীয় স্থান—শ্রীঅজিতকুমার সাহা।

(৬) বিজ্ঞানে ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষায় সকলের মধ্যে সপ্তম স্থান—শ্রীসুধাংশুশেখর বসু।

(৭) বিজ্ঞানে ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষায় সকলের মধ্যে দ্বাদশ স্থান—শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

(৮) কৃষিতে ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষায় সকলের মধ্যে সপ্তম স্থান—শ্রীসুকুমার সেন।

(৯) বি-এ পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রী সকলের মধ্যে প্রথম স্থান—কুমারী প্রীতিলতা মুখোপাধ্যায়।

(১০) বি-এসসী পরীক্ষায় সকলের মধ্যে প্রথম স্থান—শ্রীক্ষুদিরাম সাহা।

(১১) পদার্থ-বিজ্ঞানে এম্-এসসী পরীক্ষায় প্রথম স্থান—শ্রীবিশ্বনাথ সেন।

(১২) পদার্থ-বিজ্ঞানে এম্-এসসী পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান—শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

(১৩) দর্শনশাস্ত্রে প্রাথমিক এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান—শ্রীশক্তিপদ বিশ্বাস।

ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের কেলেঙ্কারী

ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রীদের পক্ষ হইতে উহার ডাক্তার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নামে জঘন্য কাজের অভিযোগ হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টাইসন তাহার বহুদিনব্যাপী তদন্ত করেন ও রিপোর্ট দেন। সে অনেক দিনের কথা। রিপোর্টটা এত দিন চাপা ছিল। এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলিয়াছেন, সেটা প্রকাশ করা "পব্লিক ইণ্টারেষ্টে" (সর্ব্বসাধারণের কল্যাণার্থ) অবাঞ্ছনীয়! তাহার মানে যা তাই।

সরকারী অন্নে পুষ্ট সংবাদপত্র

বাংলার মন্ত্রীরা তাঁহাদের ঢাক পিটাইবার জন্য কোন কোন কাগজকে টাকা দিবেন, এবং তাহার জন্য লাখ টাকা খরচ করিবেন স্থির করিয়াছেন—এইরূপ খবর বাহির হইয়াছে। কিন্তু ঢাক ও ঢাকী যে তাঁহাদের, সে-কথাটা যে অবিলম্বে জানা পড়িবে!

কংগ্রেস কমীটির "মাকড় মারিলে ধোকড় হয়"

গল্পে আছে, ব্রাহ্মণ নয় এমন এক জাতির এক জন গ্রাম্য লোক এক স্মার্ত্ত পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করে, "মাকড় (মাকড়সা) মারলে কি হয়?" পণ্ডিত উত্তর করিলেন, "মহাপাতক হয়।" জিজ্ঞাসু আবার প্রশ্ন করিল, "তার প্রায়শ্চিত্ত কি?" পণ্ডিত বহুব্যয়সাধ্য একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিলেন। তখন সেই গ্রাম্য লোকটি বলিল, "আপনার ছেলেই মাকড় মেরেছে। তা হ'লে আপনিই তার প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন করুন।" স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আরে না না, বামুনের ছেলে মাকড় মারলে ধোকড় হয়", অর্থাৎ কোন পাপ ত হয়ই না, অধিকন্তু যে মাকড়সা মারিয়াছে তাহার একটা ধোকড় অর্থাৎ একটা মোটা কাপড় পাওনা হয়।

মধ্যপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী না-কি কংগ্রেসের নিয়ম মানেন নাই, ডিসিপ্লিন মানেন নাই, সেই জন্য তাঁহার প্রধান-মন্ত্রিত্ব ত গেলই, অধিকন্তু তিনি কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ সব কাজেরই অযোগ্য থাকিবেন কিছু কাল, এই ফতোআ জারি হইল।

অন্য দিকে কংগ্রেসেরই এক কমীটি বলিয়াছিলেন, বিহার-প্রদেশভুক্ত বাংলাভাষী জায়গাগুলি বাংলা প্রদেশকে ফিরাইয়া দিতে হইবে; কিন্তু বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা তাহার সপক্ষে মত প্রকাশ পর্য্যন্ত করেন নাই। অধিকন্তু তাঁহাদেরই খবরের কাগজে বলা হইতেছে, বিহার-প্রদেশে বাংলাভাষী কোন জেলা বা অঞ্চলই নাই—ওটা একেবারে মিথ্ (myth), কাল্পনিক ব্যাপার! অর্থাৎ বিহারী মন্ত্রীরা যে কংগ্রেস কমীটির কথা মানিলেন না, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে কোন প্রায়শ্চিত্ত ত করিতে হইলই না, অধিকন্তু তাঁহারা বাংলাভাষী জায়গাগুলিকে যে গাপ করিতে চাহিতেছেন, কংগ্রেস কমীটি মৌনদ্বারা তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন। আর একটা "ধোকড়"ও বিহারী মন্ত্রীরা বিহারীদের জন্য লইতেছেন—তাঁহারা বিহার-প্রদেশের বাঙালীদের প্রাপ্য চাকরী ঠিকা ইত্যাদি সব বিহারীদিগকে দিতেছেন।

—

অন্ধ বিদ্বান্

অন্ধ বাঙালী বিদ্বান্ সুবোধচন্দ্র রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ ও বি-এল্ এবং আমেরিকা গিয়া কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পাস করিয়াছেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন গিয়া তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ-ডি পদবীর জন্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ পেশ করিবেন। ধন্য তাঁহার অধ্যবসায় ও বুদ্ধি।

—

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাল গঙ্গাধর টিলক

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু কীর্ত্তির মধ্যে প্রধান কীর্ত্তি এই, যে, তিনি দেশকে স্বাজাতিকতায় ও ভারতবর্ষের ঐক্যবোধে সচেতন করিয়াছিলেন।—বাল গঙ্গাধর টিলকেরও বহু কীর্ত্তি আছে। এই বিদ্বান্, দৃঢ়চেতা, সাহসী, দেশভক্তের কথা ভাবিলে আমাদের এই একটি কথা সর্ব্বদাই মনে হয়, যে, তিনি কখনও ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি ভক্তি কথায় বা কাজে দেখান নাই।

—

চীনে যুদ্ধ ও চৈনিক ছাত্রসমাজ

ছাত্রদের সহিত রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের (active politicsএর, রাজনীতিক্ষেত্রে সক্রিয়ত্বের) সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা প্রবাসীর গত কয়েক সংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় নেতাদের মুখে একটা কথা খুব শোনা যাইত, এখনও অনেক সময় শোনা যায়—"দেশ যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন কি পড়াশুনার সময়?" কথাটা শুনিলে হঠাৎ খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ব্যাপারটা একটু তলাইয়া বুঝিতে সকলকে অনুরোধ করি।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় অবস্থাকে ঠিক যুদ্ধের অবস্থা বলিতে পারা যায় না। চীনে এখন সত্যকার যুদ্ধ চলিতেছে; তথাকার লোকেরা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যেরূপ ত্যাগ ও দুঃখ স্বীকার করিতেছে, আমাদের দেশের লোকসমষ্টির সামান্য এক ভগ্নাংশও তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে কি না, জানি না। চীনের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে চীনের হিতৈষিণী, "গুড আর্থ" ("Good Earth") নামক বিখ্যাত উপন্যাসের লেখিকা, মার্কিণ মহিলা শ্রীমতী পার্ল বাক্, আমেরিকা হইতে প্রকাশিত চীনের পৃষ্ঠপোষক "এশিয়া" পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লিখিতেছেন:*

* "For the national government of China is pursuing in the midst of its distress an extraordinarily sane and farsighted policy. Unlike the Western nations, who hurried their young educated men into war and praised them when they died, the government of China is commanding her students to go on with their education and not waste their lives in foolish warfare. Let the Japanese bomb and kill the ignorant if some must die. Let them even seize territory and plunder, because China is too big for them and they cannot get it all. They cannot possibly conquer the inner provinces. And into these inner provinces let the brave young minds go. **Not for refuge or escape,** but that they may be made ready to serve China, to rebuild and plan again, and make her a greater country than she has ever been before."—*Asia* Magazine for May, 1938, page 279.

"চীনের জাতীয় গবর্মেণ্ট এই দুর্দ্দিনেও যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা বিশেষ দূরদর্শিতা ও ধীর বুদ্ধির পরিচায়ক। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ন্যায় সুশিক্ষিত যুবকদিগকে ত্বরায় রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়া, পরে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহাদের প্রশংসাগান করিবার পরিবর্ত্তে, চীন সরকার ছাত্রদিগকে জ্ঞান অর্জ্জনে রত থাকিতেই আদেশ করিতেছেন, নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক যুদ্ধবিগ্রহে জীবন নষ্ট করিতে নয়। যদি জাপানীদের বোমায় কতক লোককে প্রাণ দিতেই হয়, তবে অশিক্ষিতদেরই প্রাণ যাক। জাপানীরা যদি কোন স্থান অধিকার ও লুট করে, করুক—চীন এত বিস্তৃত দেশ যে জাপানীদের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অধিকার করা সম্ভব নহে।" [অনুবাদ]

ছাত্রেরা কি তবে কাপুরুষের মত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নন্দলালের মত বাঁচিবার নিমিত্ত, কেবল বই হাতে গৃহকোণে লুকাইয়া থাকিবে? চীন-সরকারের অবলম্বিত নীতি সম্বন্ধে লেখিকা বলেন :—

"জাপানীরা চীনের অন্তঃপ্রদেশগুলি কোনক্রমেই অধিকার করিতে পারিবে না (চীন-সরকার মনে করেন)। সাহসী তরুণেরা এই অন্তঃপ্রদেশবর্ত্তী স্থানে যাক্, আশ্রয় লাভ বা আত্মরক্ষার জন্য নহে, তাহারা যাহাতে চীনকে পূর্ব্বতন যে-কোন যুগ হইতে মহত্তর করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে চীনকে সেবা করিতে প্রস্তুত হইতে পারে, সেই জন্য।" [অনুবাদ]

যুদ্ধ নিরক্ষর সৈনিকদিগের দ্বারাও হইতে পারে, কিন্তু নূতন ও বৃহত্তর চীন গড়িয়া তোলা কেবল শিক্ষিতদিগের দ্বারাই হইতে পারে। অতএব, যে-কাজ যাহাদের দ্বারা হইতে পারে, তাহাদিগকে সেই কাজে চীন-কর্ত্তৃপক্ষ লাগাইতে চান।

দেশের জন্য অশিক্ষিত লোকেরাই প্রাণপণ করুক, এ-কথা আমরা বলিতেছি না, চীন-সরকারও অবশ্য এরূপ মনোভাব পোষণ করেন না। চীনে সকল যুবককেই এখন সামরিক শিক্ষা লইতে হইতেছে এবং দেশরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইতেছে। কিন্তু দেশের সেবার জন্যও যে অধ্যয়ন ও শিক্ষালাভ দ্বারা প্রস্তুতি-পর্ব্বের প্রয়োজন আছে, এই দুর্দ্দিনেও চীনের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা বিস্মৃত হন নাই; আমাদের দেশে সে-কথা আমরা অনেক সময়ই বিস্মৃত হই। চীন-যুদ্ধ-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে চীনের শিক্ষামন্ত্রী চীনে যুদ্ধকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা লিখিতে গিয়া মন্তব্য করিতেছেন—

"যুদ্ধের সময় চাষীরা যেমন ভূমিকর্ষণ ত্যাগ করিতে পারে না, এই সঙ্কটকালে ছাত্রেরাও তেমনই অধ্যয়ন ও শিক্ষা ত্যাগ করিতে পারে না।"

চীনের কর্ত্তৃপক্ষ জানেন, অশিক্ষিতপটুত্ব দ্বারা কোনরূপ দেশসেবাই সম্ভব নহে। একটা ইংরেজী কথা আছে যাহার মর্ম্মার্থ এই যে, আর সব কাজের জন্যই প্রস্তুত হইতে ও শিক্ষালাভ করিতে হয়, কেবল পলিটিক্সের বেলায়ই তাহার দরকার নাই। এইরূপ অশিক্ষিতপটু রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের ভার হইতে আমাদের দেশের ছাত্রগণ রক্ষা পাইলেই মঙ্গল।

চীনে ছাত্রদিগকে যে অন্তঃপ্রদেশবর্ত্তী স্থানে যাইতে বলা হইতেছে, চীনের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলি জাপানী বোমার আঘাতে উদ্বাস্ত হইয়া ঐ সব স্থানে উঠিয়া গিয়াছে। ঐ সব অন্তঃপ্রদেশে পূর্ব্বে শিক্ষার ব্যবস্থা তেমন সন্তোষজনক ছিল না, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার সে-সব স্থানে তেমন হয় নাই শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ঐ সব স্থানে উঠিয়া যাওয়ায়, শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী তরুণেরা ঐ সব প্রদেশে গিয়া বাস করিলে তথায় শিক্ষার আলোক প্রবেশ করিয়া ও আধুনিকতার সঞ্চার হইয়া, প্রাচীন ও আধুনিকের মিলনে "মহত্তর চীনে"র সৃষ্টি হইবে, প্রবন্ধ-লেখিকা এইরূপ আশা পোষণ করেন। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে ইহার বিস্তৃততর বিবরণ আগষ্ট মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমাদের দেশের ছাত্রদের নিরক্ষরতা-দূরীকরণ প্রচেষ্টা ইহার সহিত তুলনীয়। (চীনে পূর্ব্ব হইতেই নিরক্ষরতা-দূরীকরণের যে চেষ্টা চলিতেছিল, যুদ্ধের সময় তাহা ক্ষান্ত রাখা হয় নাই, সে চেষ্টা আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। কারণ শিক্ষাদ্বারা গণশক্তি সম্যক্ জাগ্রত হইলে তবেই জনগণ দেশরক্ষার প্রয়োজন সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারিবে এবং দেশরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে, চীনের শিক্ষামন্ত্রী এইরূপ লিখিতেছেন)। যুদ্ধের সময় বলিয়া এবং বোমার আক্রমণেও শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে তুলিয়া দেওয়া হয় নাই; যুদ্ধের প্রয়োজনে সেগুলিকে অংশতঃ কাজে লাগানো হইতেছে বটে, এবং চীনা ছাত্রেরাও কেহ যুদ্ধে যোগ দিতেছেন না তাহাও নিশ্চয় নয়। কিন্তু যুদ্ধের সময়েও ছাত্রদের পক্ষে অধ্যয়নে মনোনিবেশ ও শিক্ষালাভের একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা চীনের নেতারা ভুলিয়া যান নাই ও অস্বীকার করেন নাই।

অবশ্য, ছাত্রসমাজের মধ্যে এমন মানুষ সর্ব্বদাই কেহ কেহ থাকিবেন যাঁহারা স্বদেশের দুঃখদুর্দ্দশায় পীড়িত হইয়া ছাত্রত্ব পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব পণ করিয়া রাষ্ট্রীয় কার্য্যক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিবেন। কিন্তু তাহা সমগ্র ছাত্রসমাজের পক্ষে, বিশেষতঃ অযুধ্যমান দেশে, প্রযোজ্য হইতে পারে না। তাছাড়া, দেখা গিয়াছে, রাজনীতির নাম করিয়া আমাদের যে-সব ছাত্র হুজুকে মাতেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই উৎসাহ হুজুকে নষ্ট হয়, নীরস দেশগঠন-কার্য্যে ব্যয়িত হয় না। অসহযোগ আন্দোলনের সময় হাজার হাজার ছাত্র নেতাদের অনুরোধের প্রথম অংশ মানিয়া ইস্কুল-কলেজ ছাড়িয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়

অংশ মানিয়া দেশ-পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক।

চীন দেশ হইতে খবরের কাগজ এদেশে আসিতে মোটামুটি এক মাস লাগে। গত ২৫শে জুনের "চায়না উঈক্‌লি রিভিয়ু" নামক প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিকে একটি প্রবন্ধ আছে। তাহার নাম "চীনের ছাত্রেরা যুদ্ধ করিবে!" ("China's Students will fight"!)। কখন্ করিবে? তাহার উত্তর প্রবন্ধের মধ্যে আছে। ছাত্রেরা বলিতেছেন:—

"We are all student youths, and we can all understand the real significance of the conscription system. When the government mobilisation order comes, we shall join the army at once."

'আমরা সবাই বিদ্যার্থী যুবক, এবং আবশ্যিক সৈন্যদলভুক্তির প্রকৃত অর্থ সকলেই বুঝিতে পারি। যখন সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবার হুকুম আসিবে, আমরা তখন সৈন্যদলে তৎক্ষণাৎ যোগ দিব।"

এইরূপ আরও অনেক কথা চৈনিক কাগজটির প্রবন্ধে আছে।

—

বিপিনচন্দ্র পালের স্মৃতিরক্ষাকল্পে রাস্তার নামকরণ প্রস্তাবের বিরোধিতা

কলিকাতায় ল্যান্সডাউন রোড এক্সটেন্‌শ্যন অংশের নাম বিপিনচন্দ্র পালের স্মৃতিরক্ষাকল্পে তাঁহার নামে রাখা হউক, এইরূপ প্রস্তাব কর্পোরেশ্যনের বিবেচনাধীন আছে। এই এক্সটেন্‌শ্যনের অধিবাসী এক দল লোক অত্যন্ত বিচিত্র কারণ দেখাইয়া এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন। ইহাদের আপত্তিগুলি সম্পূর্ণ আমরা দেখি নাই, 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' কাগজে মোটামুটি যে কারণগুলি উল্লিখিত দেখিয়াছি তাহা অত্যন্ত দুঃখকর ও লজ্জাজনক মনোভাবের পরিচায়ক বলিয়া মনে করি। ল্যান্সডাউনের নামে চিহ্নিত না করিয়া বিপিনচন্দ্র পালের নামে চিহ্নিত করিলে পথটির "আভিজাত্য" নাকি নষ্ট হইয়া যাইবে! আপত্তিকারীদের ভাষায়,

"its aristocratic name was a guarantee of the maintenance of high valuation, sanitary conditions and provision of the requisite amenities of civic life."—

—এই আশায় বুক বাঁধিয়াই নাকি তাঁহারা ঐ অঞ্চলে জমি কিনিয়াছিলেন ও বাড়ী তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। ইহা বলিয়া তাঁহারা কর্পোরেশ্যনকেও খুব ভাল সার্টিফিকেট দিয়াছেন। এখন কর্পোরেশ্যন ঐ নাম না রাখিলে তাঁহারা বোধ করি ধনপ্রাণ লইয়া সমূহ বিপদে পড়িবেন! ল্যান্সডাউনের নামে আভিজাত্য আছে, অথচ বঙ্গের জনগণের এক জন প্রধান নায়কের ও স্বদেশসেবীর নামে আভিজাত্য নষ্ট হইয়া যাইবে (বিপিনচন্দ্র পালের কৃতিত্ব ও স্বদেশসেবাকে যদি ইঁহারা যথেষ্ট মূল্যবান না মনে করিতেন, তবে আপত্তির একটা যাহোক্ মানে বোঝা যাইত; তাঁহারা তাহা করেন নাই, এবং বিপিনচন্দ্রের দাবী নাকি তাঁহারা মানেন)—এখনও এরূপ মনোভাবসম্পন্ন ভারতীয় আছেন তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি নাই। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম আপত্তিকারিগণ বোধ হয় সকলেই অ-ভারতীয়; কিন্তু 'ষ্টেটসম্যান' লিখিতে ভুলেন নাই যে আপত্তির আবেদনে "স্বাক্ষরকারিগণ সকলেই ভারতীয়"। নামের বদলের সঙ্গে সঙ্গে জমি ও বাড়ীর দাম কমিতে থাকিবে কেন, স্বাস্থ্যের অবস্থা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা হীন হইয়া পড়িবে কেন এবং পৌর স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা অমনি মন্দ হইয়া যাইবে কেন, তাহা বুঝা কঠিন। "আভিজাত্যপূর্ণ" নামওয়ালা এইরূপ রাস্তা কলিকাতায় বিরল না হইতে পারে যেখানে ঐ ঐ ব্যবস্থা খুব ভাল নয়। আপত্তিকারিগণ বলিয়াছেন, ঐ আভিজাত্যপূর্ণ নাম খারিজ করা ত চলিবেই না বরং ঐ রাস্তার চারি দিকের আভিজাত্যও যাহাতে বেশ বাড়িতে পারে, এজন্য পাশের রাস্তাগুলিকেও ল্যান্সডাউন প্লেস, ল্যান্সডাউন টেরস্, ল্যান্সডাউন কর্ণার, ল্যান্সডাউন ক্রেসেণ্ট,* এইরূপ সব নাম দেওয়া হউক! ইঁহারা যে লণ্ডন শহরের "আভিজাত্যপূর্ণ" নামগুলি কলিকাতায় আমদানী করিতে অনুরোধ করেন নাই, ইহাই তাঁহাদের যথেষ্ট অনুগ্রহ ও ভারতীয়তা বলিতে হইবে। সেরূপ আমদানী করার পক্ষে তাঁহারা এই মূল্যবান্ অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারিতেন যে, তাহা হইলে নামাভিজাত্যের জোরেই ল্যান্সডাউন রোড এক্সটেন্‌শ্যন, লণ্ডনের ঐসব অঞ্চলের মত বহুমূল্য ও পৌর স্বাচ্ছন্দ্যে পূর্ণ হইয়া যাইবে।

আপত্তিকারিগণ বিপিনচন্দ্রের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন বলিলে অন্যায় হইবে; অন্য একটি রাস্তার বিস্তারের নামকে বিপিনচন্দ্রের নামে চিহ্নিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ভাবখানা এইরূপ—আমাদের এখানে কেন, ঐ টিলক রোডের সঙ্গে যে নূতন রাস্তাটা হইতেছে, তাহার নাম দাও গে না! ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরাও ত বলিতে পারেন, সে হইবে না, আমাদের রাস্তার নামও টম-ডিক-হ্যারি রোড বা জনবুল রোড, এই ধাঁচের একটা কিছু দিয়া আভিজাত্য বাঁচাইতে হইবে।

—

* আপত্তিকারী আবেদকেরা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন, ক্রেসেণ্ট অর্থাৎ চন্দ্রকলা মুসলমানদিগের এক প্রকার প্রতীক। তাঁহারা যদি দাঙ্গা করেন —!

মান্দ্রাজীদের জয়

লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস-দলের 'ন্যাশন্যাল হেরাল্ড' নামে একটি দৈনিক কাগজ শীঘ্র বাহির হইবে। এক জন মান্দ্রাজী তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। যুক্ত-প্রদেশ, বিহার, বাংলা, ও উড়িষ্যা ডিঙাইয়া মান্দ্রাজ হইতে সম্পাদক আমদানী দ্বারা মান্দ্রাজের জয় সূচিত হইতেছে। এলাহাবাদে ও পাটনাতেও এক একটি দৈনিকের সম্পাদক আছেন মান্দ্রাজী। করাচী ও দিল্লীতেও তাই। কলিকাতায় মান্দ্রাজীদের দুটি সাপ্তাহিক কাগজ আছে।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে যে বৃহৎ প্রদর্শনী হয় তাহাতে বিস্তর টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। সেই উদ্বৃত্ত টাকা হইতে বরাবর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নানা অংশের শ্বেতকায়েরা বিস্তর বৈজ্ঞানিক-গবেষণা-বৃত্তি পাইয়া আসিতেছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত অনেকে পরে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হইয়াছেন। ভারতবর্ষ ঐ প্রদর্শনীতে বিস্তর টাকা দিয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৭ সালের পূর্ব্বে কোন ভারতীয়কে ঐ বৃত্তি দেওয়া হয় নাই। ডাঃ মেঘনাদ সাহা প্রভৃতির চেষ্টায় ঐ বৎসর হইতে ভারতীয়দের প্রতিও কৃপা হয়। সে বৎসর এক জন মান্দ্রাজী একটি বৃত্তি পান। এ বৎসর দু-জন মান্দ্রাজী ঐ বৃত্তি পাইয়াছেন।

—

বাঙালীর প্রাধান্য

সকল প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন প্রবল হইয়াছিল। তাহার ফলে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অনেক লক্ষপতি মিল-মালিক ক্রোড়পতি হইয়াছেন।

সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাঙালী যুবকেরা স্বরাজলাভার্থ প্রবল আন্দোলন প্রভৃতি করিয়াছিলেন। তাহার ফলে অন্য অনেক প্রদেশ কংগ্রেসী গবর্মেণ্ট পাইয়াছে। বঙ্গে অধিকতমসংখ্যক যুবক ও যুবতী বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী থাকিবার পর এবং অনেকের আত্মহত্যা ও যক্ষ্মা প্রভৃতিতে মৃত্যু হইবার ও কাহারও কাহারও চিররুগ্ন ও অক্ষম হইবার পর অবশিষ্ট ব্যক্তিরা ক্রমশঃ খালাস পাইতেছেন।

স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা প্রাণপণ করিয়াছিলেন, বা করিয়াছিলেন বলিয়া পুলিস অনুমান করিয়াছিল, বঙ্গেই এরূপ অধিকতমসংখ্যক ব্যক্তি কেবল গ্রাসাচ্ছাদনপ্রার্থী হইয়াছেন।

বাঙালীর প্রাধান্য এই সকল বিষয়ে।

—

সুভাষচন্দ্র ও গণতান্ত্রিক খুঁটিনাটি

কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষ বাবু একটি বক্তৃতায় এই মর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, যে, "গণতান্ত্রিক ও-সব খুঁটিনাটি বিলাস-দ্রব্য; সেগুলা এখন অনাবশ্যক।" তিনি চিরকুমার ও সন্ন্যাসী, সুতরাং সকল রকম বিলাস-দ্রব্য তাঁহার বর্জ্জনীয় বটে।

যে-মই দিয়া উপরে উঠা যায়, উপরে উঠিবার পর তাহাকে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দেওয়াও প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছে।

বিদেশী পণ্যবর্জ্জন দিবস

বহু বৎসর পূর্ব্বে বাঙালী ৭ই আগষ্ট বিদেশী বর্জ্জনের পণ করিয়াছিল। সেই পণের স্মৃতি গত ২২শে শ্রাবণ কথঞ্চিৎ জাগান হইয়াছে। এ-বিষয়ে, এবং তদপেক্ষাও অধিক মাত্রায় স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহারে, বাঙালীদেরই বেশী উৎসাহী হওয়া উচিত। প্রথম পণের আর্থিক লাভটা অ-বাঙালীরাই পাইয়াছিল। তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু বাঙালীদেরও লাভবান হওয়া চাই।

—

পুরাতন ও নূতন ভাইস্-চ্যান্সেলর

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চারি বৎসর ধরিয়া যোগ্যতা, দক্ষতা, পরিশ্রম ও অভিজ্ঞজনোচিত বিচক্ষণতার সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারের কাজ করিয়াছেন। তাঁহাকে অন্ততঃ আরও দু-বৎসর এই কাজে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু সে-আশা অবশ্য কেহ করে নাই।

নূতন ভাইস্-চ্যান্সেলর মৌলবী আজিজুল হক্ কেবল শিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে সীণ্ডিকেট ও সেনেটের সহযোগিতা পাইতে পারিবেন।

—

ভাষিক বাংলা প্রদেশ ও সাংস্কৃতিক বঙ্গদেশ

ভারতবর্ষের অন্য যে-কোন ভাষা অনুসারেই প্রদেশ গঠিত হউক না কেন, বাংলা ভাষা অনুসারে প্রদেশ গঠিত হইবার অন্তরায় অনেক। কিন্তু বাঙালী যিনি যেখানেই থাকুন, কাহারও দ্বারা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বন্ধন দৃঢ় রাখিবার চেষ্টা এক দিনের জন্যও যেন পরিত্যক্ত না হয়।

—

জাপানে ও চীনে ইংরেজীর চর্চ্চা

ভারতবর্ষ ইংরেজদের অধীন। এই কারণে আজকাল এদেশে ইংরেজী ভাষার প্রতিও বিরাগ বাড়িতেছে এবং বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু, ইংরেজরা যদিও আমাদের উপকারের জন্য ভারতে ইংরেজী শিক্ষা চালায়

নাই, তথাপি ইংরেজী পড়িয়া আমাদের যে লাভ হইয়াছে ও হইতে পারে তাহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। অনিষ্টও হইয়াছে ও হইতে পারে, কিন্তু তাহা অনিবার্য্য নহে।

জাপান ও চীন ইংলণ্ডের অধীন নহে, কোন কালে ছিল না। কিন্তু জাপানের মধ্য বিদ্যালয় (middle schools)গুলিতে ইংরেজী, জার্মেন, ফ্রেঞ্চ বা চৈনিক ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক। চীনে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ইংরেজীর প্রচলন খুব বেশী। আমরা চীন হইতে চীনাদের লেখা ভাল ভাল ইংরেজী খবরের কাগজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বুলেটিন পাই। লণ্ডন হইতে প্রকাশিত জুলাই মাসের এশিয়াটিক রিভিয়ুতে রোজ কুয়োং নাম্নী আমেরিকাপ্রত্যাগতা একটি চৈনিক মহিলা চীন সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা লিখিয়াছেন। তাঁহার দুটি বাক্য এই :—

"In the hotel where I stayed I had a regular procession of boys coming to my room offering to fill up my tea-pot or water-jug, all in the hope of learning a word of English. Everywhere I found this eagerness to learn what is, as you know, the secondary language in China."

"আমি যে হোটেলে ছিলাম তাহাতে অনেক বালক সারিবন্দী করিয়া আমার কামরায় আসিতেছিল আমার চা-দানী বা জলের জাগ ভরিয়া দিবার জন্য—কেবল একটা ইংরেজী কথা শিখিবার আশায়। আপনারা জানেন ইংরেজী চীনের দ্বিতীয় ভাষা; চীনের সর্ব্বত্র আমি ইহা শিখিবার এই আগ্রহ দেখিতে পাইলাম।"

হিন্দুস্থানী ভাষা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী

যে-সভায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষে তিনি কেন হিন্দুস্থানী চালাইবার পক্ষপাতী তাহা বলেন, সেই সভায় মহাত্মা গান্ধী ঐ ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার একটি "বাণী" প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি বলেন, "ভারতবর্ষে ইংরেজী যে-স্থান অধিকার করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছে, কংগ্রেস হিন্দুস্থানীকে সেই স্থানটি দিবার চেষ্টা করিতেছে।" ইংরেজী দ্বারা এখন ভারতবর্ষে চারি রকম কাজ হয়। (১) ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ও দেশী রাজ্যের ইংরেজী-জানা লোকেরা ইহার মধ্য দিয়া পরস্পরের ভাব ও চিন্তার বিনিময় করে। (২) ইহার সাহায্যে অন্তঃপ্রাদেশিক ব্যবসাবাণিজ্য চলে। (৩) ইহার সাহায্যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলে। (৪) হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং বোম্বাইয়ের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন অন্য সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী পুস্তক এবং ইংরেজীতে বক্তৃতা ও ব্যাখ্যার সাহায্যে জ্ঞান বিস্তার ও সাংস্কৃতিক অনুশীলন হয়। উক্ত দুটি বিশ্ববিদ্যালয়েও ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষারূপে অধীত হয়। কংগ্রেসী শাসন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে হিন্দুস্থানী দ্বারা এই চারি রকম কাজই করান হইবে। চতুর্থ কাজটি, যে-সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ইংরেজী প্রধান ভাষা ও ইংরেজী প্রধান সাহিত্য, তথায় হিন্দুস্থানী ভাষা ও সাহিত্য প্রধান ভাষা ও সাহিত্য হইবে। পঞ্জাবে পঞ্জাবী ভাষা ও সাহিত্য প্রধান হইবে না, যুক্ত-প্রদেশের মাতৃভাষা হিন্দুস্থানীই প্রধান হইবে, রাজপুতানায় রাজস্থানী প্রধান হইবে না, বিহারে বিহারী ও মৈথিলী প্রধান হইবে না, বঙ্গে বাংলা প্রধান হইবে না, আসামে অসমীয়া ও বাংলা প্রধান হইবে না, উড়িষ্যায় ওড়িয়া প্রধান হইবে না, মধ্য-প্রদেশ ও বিদর্ভের মহারাষ্ট্রীয় অংশে মরাঠী প্রধান হইবে না, মহাকোশলের মাতৃভাষা হিন্দুস্থানীই প্রধান হইবে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে মরাঠী, গুজরাটী ও কন্নড় প্রধান হইবে না, সিন্ধুতে সিন্ধী প্রধান হইবে না, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে তামিল, তেলুগু ও মলয়ালম প্রধান হইবে না। অতএব এই সকল প্রাদেশিক ভাষায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনার চেষ্টা পরিত্যক্ত হওয়া উচিত।

সমৃদ্ধিতে হিন্দুস্থানী ভাষা ও সাহিত্য ইংরেজীর সহিত তুলনীয় নহে, এবং কোন কোন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য অপেক্ষাও ইহা সমৃদ্ধতর নহে। তবে, ইহা যে একটি ভারতীয় ভাষা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আসামে আবশ্যিক হিন্দুস্থানী শিক্ষা

অমৃতবাজার পত্রিকায় দেখিলাম আসামের শিক্ষণীয় বিষয়-নির্দ্ধারক কমীটি (Assam Curriculum Committee) স্থির করিয়াছেন, যে, ঐ প্রদেশের সমুদয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (in all secondary schools) ছাত্রছাত্রীদিগকে হিন্দুস্থানী শিখিতে বাধ্য করা হইবে।

আসামীয়েরা অনেকে এই অভিযোগ করিয়া থাকেন যে, বাঙালীরা তাঁহাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নষ্ট করিতেছে, যদিও কোন আসামীয় বালক-বালিকাকে বাংলা শিখিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা বাঙালীদের নাই, এবং তাহাদের সেরূপ ইচ্ছাও নাই। হিন্দুস্থানীর আবশ্যিক শিক্ষা দিয়া আসামীয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির কিরূপ পুষ্টি হইবে, তাহা অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝা যাইবে।

তামিল দেশে আবশ্যিক হিন্দুস্থানীর বিরুদ্ধে যেরূপ আন্দোলন হইতেছে, আসামে সেরূপ না হইলে কংগ্রেসের পক্ষে ভাল হইবে।

—

বৈজ্ঞানিক উচ্চশিক্ষা, ও পণ্যশিল্পের উন্নতি

বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও জ্ঞানে অনগ্রসর ভারতবর্ষে পণ্য-শিল্পের বিস্তার করিতে হইলে ভারতীয়েরা বিদেশ হইতে যন্ত্র আমদানী করেন এবং পণ্যদ্রব্য-প্রস্তুতির প্রক্রিয়াও বিদেশ হইতে আমদানী করেন। কারখানাগুলি চালান হয় বিদেশী বিশেষজ্ঞের দ্বারা কিংবা বিদেশীদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা। প্রথম অবস্থায় এরূপ করা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে অগ্রসর দেশসকলে কারখানার যন্ত্রসমূহের ক্রমাগত উন্নতি হইতেছে, নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবিত হইতেছে, এবং নূতন নূতন প্রক্রিয়াও উদ্ভাবিত হইতেছে। আমাদের দেশেও বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া এবং যান্ত্রিক ও প্রক্রিয়াগত উন্নতি ও উদ্ভাবন না হইলে আমরা বিদেশীদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিব না।

কিন্তু এরূপ আবিষ্ক্রিয়া, উন্নতি, ও উদ্ভাবন বৈজ্ঞানিক-উচ্চশিক্ষা-সাপেক্ষ। ইহা ভুলিলে চলিবে না।

পণ্যশিল্পের কারখানা বৃদ্ধি ও দুর্নীতি

পাশ্চাত্য দেশসমূহে, এবং ভারতবর্ষেও অনেক স্থানে, দেখা গিয়াছে যে, বহু শ্রমিকচালিত কারখানাসমূহের বৃদ্ধিতে দুর্নীতিও বাড়িয়াছে। কিন্তু এই দুর্নীতি বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী নহে। ইহার নানাবিধ প্রতিকারের চেষ্টাও হইতেছে। শ্রমিক নেতারা যে শ্রমিকদের মজুরি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা প্রশংসনীয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা, যে-সকল কারণে দুর্নীতি বাড়ে, যদি তাহাও দূর করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে অধিকতর কল্যাণ সাধিত হইবে।

ছাত্রমহলে ১ নং "বৈদ্যসঙ্কট"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ-কমীটি (Student Welfare Committee) কয়েক হাজার ছাত্রের দেহ পরীক্ষা করিয়া, অধিকাংশ ছাত্র যে সম্পূর্ণ সুস্থ নহে, এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যে বৈদ্যসঙ্কটের কথা এখানে বলিতেছি, তাহা ছাত্রদের অসুস্থ অবস্থা সম্পর্কে নহে। তাহাদের দৈহিক অবস্থা দেশের অন্য সকল শ্রেণীর লোকদের চেয়ে মন্দ নহে—বরং ভাল। তাহাদের দৈহিক শক্তি ও মানসিক শক্তি অন্যদের চেয়ে কম নয়। সাহস ও উৎসাহ তাহাদের অন্যদের চেয়ে বরং বেশীই আছে। আমরা বৈদ্যসঙ্কট শব্দটি আলঙ্কারিক (figurative) অর্থে প্রয়োগ করিতেছি।

বহু বৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসা করানর ফলে কখন কখন রোগবৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাহাকে বৈদ্যসঙ্কট বলা হয়। বহু উপদেষ্টা বা পরামর্শদাতার উপদেশ বা পরামর্শের ফলে যে সঙ্কট অবস্থা, সমস্যা, বা সংশয়ের উৎপত্তি হয়, তাহাকে বৈদ্যসঙ্কট বলা যাইতে পারে।

রাজনীতির সহিত ছাত্রদের সম্পর্ক সম্বন্ধে নানা প্রকার মত প্রকাশিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে—পরেও হইবে। ইহা ১ নং বৈদ্যসঙ্কট।

সরকারী মত একটা আছে; তাহা রাজপুরুষেরা, তাঁহাদের তাঁবেদারেরা এবং অনুগৃহীত ও অনুগ্রহপ্রার্থীরা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা ছাত্রদিগকে রাজনীতির সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কশূন্য থাকিতে বলেন। তাঁহারা এরূপ পরামর্শ, উপদেশ বা আদেশের একটি কারণও দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, জ্ঞানলাভের নিমিত্ত ছাত্রদের চাই পিওর ষ্ট্যাটুমফীয়্যার অব্ ষ্টাডি বা ষ্ট্যাটুমফীয়্যার অব্ পিওর ষ্টাডি। অর্থাৎ কিনা, ছাত্রেরা এমন পরিবেষ্টন ও অবস্থার মধ্যে থাকিবে যাহাতে পড়াশুনা হইতে অন্য কোন দিকে তাহাদের চিত্তবিক্ষেপ না হয়। পরাধীন দেশের বিদেশী গবর্মেণ্ট আপনার স্থায়িত্বের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। যাহারা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আর পড়াশুনা করিতেছে না, যাহারা প্রাপ্তবয়স্ক, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ, রাজনীতির সহিত তাহাদেরও সম্পর্ক এরূপ গবর্মেণ্ট পছন্দ করে না। সুতরাং ছাত্রদের রাজনীতির সহিত সংস্পর্শ যে সরকারী মনুষ্যেরা সত্যের আমেজযুক্ত একটা কারণ দেখাইয়া নিবারণ করিতে চাহিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে—আজ যাহারা ছাত্র তাহারাই ত ভবিষ্যতের পৌরজন হইবে।

স্বার্থদুষ্ট বলিয়া সরকারী লোকদের এ-বিষয়ে পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণীয় বিবেচিত হয় না। বেসরকারী লোকদের মধ্যে এ-বিষয়ে প্রধানতঃ দু-রকম মত দেখা যায়। এক দল বলেন লেখেন, অন্য লোকেরা রাজনীতির চর্চা ও রাজনৈতিক কার্য্য করিতে যেরূপ ও যতটা অধিকারী, ছাত্রেরাও ততটাই—একটুও কম নহে। অন্য দল বলেন, ছাত্রেরা রাজনৈতিক লেখা পড়িবেন, বক্তৃতা শুনিবেন, আপনাদের বিতর্ক-সভা প্রভৃতিতে রাজনৈতিক বিষয়ে বক্তৃতা ও তর্কবিতর্ক করিবেন, রাজনৈতিক কন্‌ফারেন্সের ও কংগ্রেসের অধিবেশনে ভলাণ্টিয়্যার বা স্বেচ্ছাসেবক হইবেন, কিন্তু তাঁহারা আপনাদের রাজনৈতিক সমিতিসংঘ গঠন করিয়া কর্মী রাজনীতিক হইবেন না; কেন না, তাহা হইলে তাঁহারা ছাত্রজীবনের অবশ্যকৃত্য যথাযথ করিতে পারিবেন না। যাঁহাদের মত এইরূপ, তাঁহারা যে ছাত্রদিগকে বুদ্ধি-বিবেচনাহীন মনে করেন তাহা নহে, ছাত্রেরা দেশের

সেবক হউন ইহা যে তাঁহারা চাহেন না এমন নহে। ছাত্রেরা ছাত্রজীবনের প্রস্তুতির সময় প্রস্তুতিতে নিয়োগ করিলে ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠ সেবক হইতে পারিবেন, এই বিশ্বাসে ও আশাতেই তাঁহারা এরূপ মত প্রকাশ করেন। বিদ্রোহী ও বিপ্লবী ক্রমওয়েলের সমর্থক মহাকবি মিল্টন বলিয়াছেন, "They also serve who only stand and wait," "তাহারাও সেবা করে যাহারা কেবল দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করে।" ভবিষ্যতে দেশসেবক হইতে ইচ্ছুক ছাত্রেরা শুধু দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করেন না, অপেক্ষার সময়ে রাজনীতির আবশ্যক জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া এবং সংযত ধৈর্য্যশীল নিয়মনিষ্ঠ চরিত্র গঠন করিয়া ভবিষ্যৎ সেবার জন্য প্রস্তুত হন।

যাঁহারা ছাত্রদের কর্ম্মী রাজনৈতিক হওয়ার বিরোধী মহাত্মা গান্ধী তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। গান্ধীজী বলিয়াছেন :—

"Students may openly sympathise with any political party they like, but in my opinion they may not have freedom of action whilst they are studying; as a student cannot be an active politician and pursue his studies at the same time"

"ছাত্রেরা যে-কোন রাজনৈতিক দলের সহিত ইচ্ছা প্রকাশ্য ভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু তাঁহারা যত দিন ছাত্র থাকেন তত দিন [রাজনীতি-বিষয়ে] কার্য্যের স্বাধীনতা পাইতে পারেন না ; কেন না, এক জন ছাত্র নিজের পড়াশুনা করিতে এবং সেই সঙ্গে সক্রিয় রাজনৈতিক হইতে পারেন না।"

আমরা তর্কের খাতিরেও মহাত্মাজীর দোহাই দিবার নিমিত্ত তাঁহার মত উদ্ধৃত করিতেছি না ; তাঁহার মত ঠিক্ মনে করি বলিয়া উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি যখন ছাত্রদিগকে সরকারী ও সরকারের অনুমোদিত বেসরকারী সব শিক্ষালয় বর্জ্জন করিতে বলিয়াছিলেন, আমরা তখন তাঁহার সে মত ঠিক্ মনে না করায় তাহার বিরুদ্ধতা করিয়াছিলাম।

কেহ কেহ বলেন, জলে না নামিলে যেমন সাঁতার শেখা যায় না, তেমনই রাজনৈতিক আন্দোলনে একেবারে ঝাঁপাইয়া না পড়িলে ছাত্রেরা ভবিষ্যতেও কর্ম্মী রাজনৈতিক হইতে পারিবেন না। আমরা ইহা সত্য মনে করি না। অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া বাংলা দেশেই অতীত ও বর্ত্তমান বড় এমন রাজনীতিকদের নাম করা যায় যাঁহারা স্কুল কলেজের ছাত্র থাকিতেই কর্ম্মী রাজনৈতিক হন নাই।

মেকলের একটি বহুবার উদ্ধৃত বচন আছে, "It is not easy to make a simile go on all fours," "এরূপ উপমা দেওয়া সোজা নয় যাহার উপমান-উপমেয়ে ঠিক্ সব দিক্ দিয়া সাদৃশ্য আছে।" চাঁদ-মুখ বলিলেই যে বাস্তবিক যাহাদের মুখ চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-বিহীন চক্রাকার পূর্ণচন্দ্রের মত হয়, তা হয় না। অল্প বয়সে সাঁতার দিতে না শিখিয়া যদি পরে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া কেহ গভীর জলে পড়েন বা ঝাঁপ দেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণ যাইতে পারে বটে ; কিন্তু কিণ্ডারগার্টেন হইতে কলেজ পর্য্যন্ত ছাত্রাবস্থায় কর্ম্মী রাজনৈতিক না থাকিয়া ভবিষ্যতে রাজনীতি-ক্ষেত্রে নামিয়া হাবুডুবু খাইয়া মরিতে হইয়াছে, করোনারের আদালতের রিপোর্টে এ রকম কোন দুর্ঘটনার কথা পড়ি নাই।

সাম্রাজ্যবাদীরা পরাধীন দেশের লোকদিগকে বলেন, "আমরা হাজার বৎসর ধরিয়া রাষ্ট্রীয় কাজ চালাইয়া তবে এখন কৃতী স্বশাসক হইয়াছি, আর তোমরা দু-দশ বৎসরেই স্বরাজ পাইয়া স্বশাসক হইতে চাও?" ইহার সমুচিত উত্তর দিয়াছে গত মহাযুদ্ধের মধ্যেই বা পরে বহু-শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার পর পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশের লোক স্বাধীনতা পাইয়াই খুব উত্তমরূপে রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ যারা। তাহারা ত হাজার বৎসর এপ্রেণ্টিসী করে নাই। আমাদের সাতটা প্রদেশের মন্ত্রীরাও ত কোন কালে শাসক না-থাকিয়াও দেশের কাজ বেশ চালাইতেছেন।

ইংলণ্ডের অভিজাত ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরাই বহু শতাব্দী ধরিয়া দেশ শাসন করিয়া আসিয়াছে। তাহারা মনে করিত ও বলিত, অনভিজ্ঞতাবশতঃ শ্রমিকরা রাষ্ট্রের কাজ চালাইতে পারিবে না। কিন্তু তাহারা অন্যদের মতই চালাইয়াছে।

এই সব দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়, যে, রাজনৈতিক আন্দোলনও এমন কিছু একটা জিনিষ নয়, যে, ছেলেবেলা থেকেই আরম্ভ না-করিলে বড় হইয়া তাহা উত্তমরূপে চালান যায় না।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, গান্ধীজী বৃদ্ধ হইয়াছেন, সেকেলে হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার কথা শুনিবার যোগ্য নহে। কিন্তু কংগ্রেস-নেতারা এখনও ত সমুদয় সমস্যার সমাধানের জন্য এবং সঙ্কটে ত্রাণ পাইবার জন্য এই সেকেলে বৃদ্ধেরই শরণ লইয়া থাকেন।

বাঙালী ছাত্রেরা অন্যান্য প্রদেশের ছাত্রদের সহিত প্রতিযোগিতায় হারিয়া গেলে বঙ্গের শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষাদাতাদের ঘাড়েই সব দোষ চাপান হয়। কিন্তু শিক্ষাদাতা বেচারারা শিক্ষা দিবার সুযোগ কতটুকু পান, তাহার খোঁজ কয় জন সমালোচক রাখেন জানি না, এবং শিক্ষকশ্রেণীর কৈফিয়ৎও কেহ চাহেন না।

—

ছাত্রমহলে "বৈদ্যসঙ্কট" নং ২

শিক্ষাক্ষেত্রেও ছাত্রেরা বহু উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতার নানা মতে বিপন্ন। আমরা মুস্কিল আসানের আশা দিতে পারি না, কেবল সঙ্কটের কিছু আভাস দিতে পারি।

কেহ বলিতেছেন, উচ্চশিক্ষাতে বেকার-সমস্যা সঙীন হইয়াছে। হইতে পারে। কিন্তু নিম্নশিক্ষা দ্বারা বা সম্পূর্ণ অ-শিক্ষা দ্বারা কাজ কি প্রকারে জুটিবে, তাহার হদিস ত কেহ দিতেছেন না।

কেহ বলিতেছেন, কেবল সাহিত্য ইতিহাস দর্শন আইন পড়িয়া কি হইবে? ওগুলা ত ভবিষ্যতে কোন কাজে লাগে না। কিন্তু কাহারও কাহারও ত কাজে লাগে। শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী, সাংবাদিক প্রভৃতির কাজে লাগে, এবং অন্য যাহাদের "কাজে" লাগে না, তাহারাও এ সব ভাল করিয়া বুঝিয়া পড়িয়া থাকিলে তাহাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত ও মন উদার হইতে পারে। শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী ও সাংবাদিকের কাজ অল্প লোকেরই জুটে বটে। কিন্তু কতক লোকের ত শিক্ষাদি হওয়া চাই। নতুবা ঐ সব কাজ পরে করিবে কে? কিন্তু এই সব বৃত্তির উপযোগী শিক্ষা ঠিক্ কতগুলি ছাত্রের পাওয়া উচিত, তাহা স্থির করা অবশ্য কঠিন বা অসম্ভব।

কেহ বলেন, আর্টসের শিক্ষা অকেজো; বিজ্ঞান শেখাই ভাল। কিন্তু সকলের বা অধিকাংশের বিজ্ঞান-শিক্ষার জায়গা কোথায়? ব্যবস্থা কোথায়? আর, যাঁহারা বিজ্ঞান শিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কি বেকার-সমস্যা নাই? তথাপি বিজ্ঞান অবশ্যই শিক্ষণীয়।

কেহ বলেন, কেতাবী বিজ্ঞান শিখিয়া কি হইবে? যাহার জোরে কিছু জিনিষ তৈরি করিতে পারা যায় এই রকম বিজ্ঞান শিক্ষা কর। কিন্তু সে রকম বিজ্ঞান শিখিবার যথেষ্ট জায়গা কোথায়? এবং শিখিলেই যে নিজের ছোট বড় কারখানা স্থায়ীভাবে লাভের সহিত চালান যাইবে, বা অন্যের ছোট বড় কারখানায় কাজ জুটিবে, তাহার স্থিরতা নাই। তাহা হইলেও কেজো বিজ্ঞান অবশ্যই শিক্ষার যোগ্য।

কেহ বলেন, লেখাপড়া করিয়া কি হইবে? চাষ কর। কিন্তু বঙ্গের চাষীদেরই ত ঘরপিছু যথেষ্ট জমী নাই, এবং তাহাদেরও অবস্থা ভাল নয়। অধিকন্তু চাষও শিখিতে হয়। চাষীর ঘরের ছেলেরা দেখিয়া শিখে। অন্যেরা বিদ্যালয়ে শিখিতে পারে; কিন্তু কৃষিবিদ্যালয় আছে কয়টি? বরং চাষ করিতে যে দৈহিক শ্রম করিতে ও কষ্ট সহিতে হয়, তাহাও আগে হইতে বিবেচনা করা উচিত। তাহার পর কেহ যদি বৈজ্ঞানিক উন্নত প্রণালীতে চাষে লাগেন, ভালই।

কেহ বলেন, লেখাপড়ায় কিছু হইবে না, ব্যবসা কর ব্যবসাও কিন্তু শিখিতে হয়। ব্যবসাদারের ছেলেরা তাহা দেখিয়া শিখে। অন্যদের শিখিবার যথেষ্ট স্থান ও সুযোগ নাই। কিন্তু তাহারাও অবশ্য উদ্যোগী হইলে কালক্রমে বড় ব্যবসাদার হইতে পারে; তাহার অনেক দৃষ্টান্ত এই বাংলা দেশেও আছে।

আমরা নৈরাশ্য জন্মাইবার বা বাড়াইবার জন্য এই সব কথা লিখিলাম না—যদিও হাতুড়িয়া চিকিৎসকদের মত কোন একটা মুষ্টিযোগও বাৎলাইতে পারিলাম না।

যিনি যাহা শিখিতেছেন, তদপেক্ষা নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ ও নিজের সাধ্যায়ত্ত অন্য কিছুর সন্ধান না পাইয়া তাহা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়।

মানুষের বুদ্ধিতে যে অবস্থা নৈরাশ্যজনক, তাহার মধ্যেও কোন উপায় হইতে পারে।

পরিশ্রমী, আটপিটে, ধৈর্য্যশীল, মান অভিমান পরিত্যাগ করিয়া রোজগারের যে-কোন সদুপায় অবলম্বন করিতে প্রস্তুত—এরূপ মানুষের একটা না একটা গতি হইয়া যাইবারই সম্ভাবনা।

—

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীদের ব্যাপার

মধ্যপ্রদেশ ও বিদর্ভের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার খারে ও অন্য কয়েক জন মন্ত্রীর পদত্যাগ এবং আবার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ, পরে আবার পদত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়া বা অপসৃত হওয়া—এই সকল ব্যাপার লইয়া উভয় পক্ষে অনেক কথা-কাটাকাটি হইয়াছে। কংগ্রেসের পার্লেমেণ্টারী সব-কমীটি ও ওআর্কিং কমীটি এবং মহাত্মা গান্ধী এক পক্ষ। সুতরাং গান্ধীজীকেও আসরে নামিতে হইয়াছে। তিনি "হরিজন" কাগজে যাহা লিখিয়াছেন, ডাক্তার খারে তাহার জবাব দিয়াছেন। ডাক্তার খারেকে অভিনন্দিত করিয়া কিংবা তাঁহার সমর্থন করিয়া অনেক সভা হইয়াছে, তাহাতে কংগ্রেস-পক্ষের নিন্দা করা হইয়াছে। কংগ্রেস-পক্ষ হইতে এ-সকলের জবাব দেওয়া হইয়াছে। এই সকল উত্তর-প্রত্যুত্তর কখন থামিবে, বলা যায় না।

যদি কোন দৈনিক কাগজের সম্পাদকের যথেষ্ট অবসর ও ধৈর্য্য থাকে এবং যদি এ-বিষয়ে রায় দিতে তিনি ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে কোন এক দিন পর্য্যন্ত প্রকাশিত সব উত্তর-প্রত্যুত্তর পড়িয়া তিনি নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন। তাহার পর আবার কিছু নূতন তথ্য বা নূতন যুক্তি কোন পক্ষ বা উভয় পক্ষ প্রকাশ করিলে আবার সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারেন, কিংবা কেবল তাহা মুদ্রিত করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন। মাসিক কাগজে কোন বিষয়ে একবার কিছু লিখিয়া আবার কিছু

লিখিতে চাহিলে এক মাস পরে লিখিতে হয়। চলতি অনেক ব্যাপার এক মাস পরে পুরাতন ইতিহাস হইয়া যায়। এইরূপ কারণে আমরা আলোচ্য ব্যাপারটি সম্পর্কে কোন্ পক্ষের দোষগুণ কি কি ও কত তাহা নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিব না। প্রাদেশিক মন্ত্রীদের নির্ব্বাচন, নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ ও অপসারণ সম্পর্কে কংগ্রেসের কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিব।

—

কংগ্রেসে গণতন্ত্র ও একনায়কত্ব

কংগ্রেস গণতান্ত্রিক রীতিতে যাহা করেন, মোটের উপর আমরা তাহার সমর্থক। গণতান্ত্রিক রীতির কোন ব্যতিক্রম হইলে তাহার সমর্থন করিতে পারি না।

ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট বলিয়া থাকেন, ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন দ্বারা ভারতবর্ষকে প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছে। আগেকার ভারতশাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের যতটুকু ক্ষমতা ছিল, বর্ত্তমান আইনে তাহা কিছু বাড়িয়াছে সত্য, এবং ইহাও সত্য, যে, এখন গবর্মেণ্টের হাতে কোন বিষয় "সংরক্ষিত" নাই, সব বিষয়ই মন্ত্রীদের হাতে "হস্তান্তরিত" হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রীদের ক্ষমতা এরূপ সীমাবদ্ধ, গবর্ণরের এত বিশেষ ক্ষমতা ও বিশেষ দায়িত্ব, সঙ্কটত্রাণের ব্যবস্থা ("safeguards") এত, এবং আইন প্রণয়ন বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা আগেকার চেয়েও এরূপ খর্ব্বীকৃত, যে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট প্রদেশগুলিকে প্রকৃত আত্মকর্তৃত্ব দিয়াছেন বলিলে ভুল বলা হয়।

এই যে সামান্য প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব, কংগ্রেসনির্দ্দিষ্ট মন্ত্রীনিয়োগাদির প্রণালী দ্বারা তাহা আরও কিছু কমিয়াছে। গণতান্ত্রিক রীতি এই যে, ব্যবস্থাপক সভায় যে-দলের সদস্যসংখ্যা অধিকতম, তাহার নেতাকে প্রধান মন্ত্রী হইতে বলা হয় এবং তাঁহাকে অপরাপর মন্ত্রী বাছিয়া লইতে বলা হয়। কংগ্রেসের নিয়ম কিন্তু এই যে, যে-সব প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী সদস্যেরা সংখ্যায় অধিকতম, তথাকার প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের নির্ব্বাচন ও নিয়োগ কংগ্রেস পার্লেমেণ্টারী সব-কমীটির দ্বারা অনু-মোদিত হওয়া চাই। বস্তুতঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব-কমীটি বা তাহার কোন সভ্য খুঁজিয়া বাছিয়া মন্ত্রী ঠিক করিয়া দেন; যেমন মধ্যপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম মন্ত্রী মিঃ শরীফকে মৌলানা আবুল কলাম আজাদ আবিষ্কার ও মনোনয়ন করেন, এবং কাগজে বাহির হইয়াছে যে, মৌলানা সাহেব মধ্যপ্রদেশের ষষ্ঠ মন্ত্রী এক জন অন্বেষণ করিতেছেন—তিনি মুসলমান এবং মিঃ শরীফই হইতেও পারেন।

কংগ্রেসী প্রদেশগুলির মন্ত্রীরা গণতান্ত্রিক রীতি অনুসারে অবশ্য তথাকার ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী। কিন্তু তাঁহারা আবার কংগ্রেসের পার্লেমেণ্টারী সব-কমীটি ও ওয়ার্কিং কমীটির নিকট এবং, শেষ পর্য্যন্ত, মহাত্মা গান্ধীর নিকটও দায়ী। কোন্ পক্ষের নিকট তাঁহাদের দায়িত্ব অধিকতর, বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত বলিয়া মনে হয়, যে, কোন প্রধান মন্ত্রী, অন্য মন্ত্রী, বা মন্ত্রিমণ্ডল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার বিশ্বাসভাজন থাকিলেও যদি কংগ্রেসের কোন কমীটির বা মহাত্মা গান্ধীর অ-বিশ্বাসভাজন হন, তাহা হইলে তিনি বা তাঁহারা টিকিয়া থাকিতে পারেন না। কোন প্রধান মন্ত্রী বা অন্য কোন মন্ত্রী ব্যবস্থাপক সভার বিশ্বাসভাজন আছেন কি না, তাহা নির্দ্ধারণের পথ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমীটি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে বন্ধ করিয়া দিতেও পারেন। যেমন—ডাঃ খারেকে মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী দলের নেতা নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব ঐ দলের সভায় উপস্থিত করিতে দিতে সভাপতি সুভাষ বাবু রাজী আছেন বলিয়া-ছিলেন। কিন্তু ডাঃ খারের বিরুদ্ধে তাহার পূর্ব্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমীটি যে তীব্র নিন্দাসূচক প্রস্তাব পাস করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নির্ব্বাচিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সেই জন্য তাঁহাকে নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমীটি মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রিত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শ ও অনুমোদন অনুসারে করা হইয়াছে।

যে-সব প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলের আবির্ভাব তিরোভাব দুটি কংগ্রেস কমীটির এবং গান্ধীজীর প্রভাবের ও মরজির উপর নির্ভর করে, সেই সকল প্রদেশের ভোটারদের ও ব্যবস্থাপক সভাগুলির নিকট কিন্তু কমীটিদ্বয় ও গান্ধীজী মোটেই দায়ী নহেন। এইরূপ দায়িত্বহীন ক্ষমতা কাহারও থাকা অ-গণতান্ত্রিক।

কংগ্রেসের এবংবিধ কার্য্যপ্রণালী ও রীতিকে অনেক কংগ্রেসসমর্থক কাগজও ফাসিষ্ট রীতি বলিয়াছেন। গান্ধীজী তাহার উত্তরে বলিয়াছেন, ফাসিষ্টরা হিংস্র, কংগ্রেস অহিংস, কংগ্রেস ফাসিষ্ট হইলে ডাঃ খারের মাথা কাটা যাইত, অতএব কংগ্রেসী প্রণালীকে ফাসিষ্ট প্রণালী বলা যায় না। হইতে পারে যে, হিংসা ফাসিষ্ট মতের একটি অপরিহার্য্য অংশ; কিন্তু ফাসিষ্ট মতের ইহাও একটি সার অংশ, যে, দলের নেতা যাহাদের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তাহাদের নিকট তিনি দায়ী নহেন। এই যে অদায়িত্ব, এ বিষয়ে আলোচ্য কংগ্রেস-প্রণালী ফাসিষ্ট-প্রণালী হইতে একটুও ভিন্ন নহে। বাস্তব মাথাকাটা খুব খারাপ বটে, কিন্তু মানুষকে অপদস্থ এবং

চিরকালের জন্য বা দীর্ঘকালের জন্য অকেজো করিয়া দেওয়া কতকটা তাহাকে মারিয়া ফেলার সমতুল্য।

গান্ধীজী এই মর্ম্মের কথা বলিয়াছেন যে, এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত 'যুদ্ধ' চলিতেছে বলিয়া, প্রকৃত যুদ্ধের সময় যেমন সেনাপতিদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়, তদ্রূপ এখন কংগ্রেস-দলপতির বা দলপতিদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া আবশ্যক। হইতে পারে, যে, তাহা আবশ্যক; সে-সম্বন্ধে এখন তর্ক করিতেছি না। কিন্তু ক্ষমতার এই কেন্দ্রীভবন বা কেন্দ্রীকরণ চাহিব, এবং তাহাকে গণতান্ত্রিকতাও বলিব—এ-রকমের দুটা বিপরীত দাবী একসঙ্গে চলিতে পারে না।

দুটা পরস্পরবিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকিলেই তাহাকে যুদ্ধের অবস্থা (state of war) বলিয়া ঘোষণা করিয়া তার একনায়কত্বের সমর্থন করিলে এই একনায়কত্ব চিরকালই চলিবে; কারণ, একাধিক দল বরাবর থাকিবে (যদি রুশীয় রীতি অবলম্বিত না-হয়!)। আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে 'যুদ্ধ' চলিতেছে বলিতেছেন, সেটা বড় 'যুদ্ধ' বটে; কিন্তু তাহার অবসান হইলে মুস্লিম লীগের সঙ্গে, হিন্দু মহাসভার সঙ্গে, উদারনৈতিক সংঘের সঙ্গে, আরও হয়ত কোন ভবিষ্যতে উদ্ভূত দলের সঙ্গে "যুদ্ধ" চলিবে। তখনও একনায়কত্বের দরকার হইবে ত? দরকার যে হইবে, তাহার একটা প্রমাণ এই যে, কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সদস্য-নির্ব্বাচন আসন্ন বলিয়া সুভাষবাবু এই নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বকে "যুদ্ধ" নাম দিয়া একনায়কত্ব দাবী করিয়াছেন ও পাইয়াছেন!

কখনও কোন অবস্থাতেই একনায়কত্বের দরকার নাই বলিতেছি না। কিন্তু একনায়কত্ব নায়ক ভিন্ন অন্য সব মানুষের মনুষ্যত্বের ন্যূনতা সূচনা করে। যে-জাতি যত বার ও যত দীর্ঘকাল একনায়কত্ব মানিয়া লয়, সে জাতি ততই আপনার মনুষ্যত্ব কমায়। আরও দু-একটা বিবেচ্য কথা আছে।

মানুষের উপর কাজের ভার না পড়িলে তাহার ক্ষমতার বিকাশ হয় না। একনায়কত্ব দ্বারা, ভাল মন্দ ভাবে, শীঘ্র শীঘ্র কাজ শেষ হয়, সত্য। কিন্তু যিনি নায়ক তিনি ছাড়া আর কাহারও বুদ্ধিবিবেচনা-প্রয়োগের ও ক্ষমতা-বিকাশের সুযোগ হয় না। অতএব, একনায়কত্ব প্রথা নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ করিতে সমর্থ মানুষের সংখ্যা বাড়ায় না বলিয়া ইহা জাতির অধিকাংশ মানুষের মনুষ্যত্ব-বিকাশের, জাতীয় স্বার্থের বিরোধী।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গিয়াছে, হিতৈষী ও হিতসাধক রাজা নৃপতি এরূপ মধ্যে মধ্যে জন্মিয়াছেন যিনি দেশের উপকার করিয়াছেন; কিন্তু এরূপ নৃপতিপরম্পরা কোথাও দেখা যায় নাই। অন্য দিকে গণতন্ত্র অল্প সময়ে চমকপ্রদ কিছু করিতে না পারিলেও (কখনও যে পারে না বা করে না তাহা নহে), গণতন্ত্রের গড়পড়তা কৃতিত্বের ধারা অপেক্ষাকৃত অধিক সন্তোষজনক ও আশাপ্রদ।

মহাত্মা গান্ধী বা অন্য যে-কোন নেতাকে অভ্রান্ত হিতসাধক বলিয়া মানিয়া লইলেও, ইহা মানিয়া লওয়া যায় না, যে, তাঁহার অব্যবহিত পরে আর এক জন ঐরূপ নেতা, তৎপর আর এক জন, তদনন্তর অন্য এক জন—এইরূপ নেতৃপরম্পরা পাওয়া যাইবে।

কালীকৃষ্ণ সেন

দৈনিক "এডভান্সে"র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সেনের মৃত্যুতে বাংলা দেশ এক জন সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ সাংবাদিক হারাইয়াছে। তিনি স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকতার সময়ে দৈনিক "বেঙ্গলী"র অন্যতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি পরে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস্' দৈনিক কাগজের সহকারী সম্পাদক হইয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার মিঃ গ্রেহাম যখন এই দৈনিকের মালিক, তখন তিনি ইহার সম্পাদক হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক কর্ম্ম তিনি, আমরা যত দূর জানি, এই সময়েই করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় স্বাজাতিকের নীতি অনুসারে কাগজ চালাইতেন। অন্ততঃ বাহিরের লোকেরা এইরূপই জানে যে, গ্রেহাম সাহেব, একবার ছাড়া, তাহাতে বাধা দেন নাই। সম্পাদকের এইরূপ স্বাধীনতা থাকায় ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউসের কাটতি খুব বাড়িয়াছিল। কালীকৃষ্ণ বাবুর লেখার বিশেষত্ব এই ছিল, যে, তিনি লম্বা লম্বা প্রবন্ধ লিখিতেন না। তাঁহার বাক্যগুলিও ছিল ছোট ছোট, ভাষা ইডিয়ম্যাটিক্; পড়িলে ইংরেজের লেখাই মনে হইত। ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসের পর তিনি 'ক্যাপিটালে'র সহকারী সম্পাদকতা করেন। তাহার পর কিছু দিন দুটি সচিত্র সাপ্তাহিকের সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদকীয় কাজ তাঁহার পেশা ও নেশা দুই-ই ছিল।

পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ

মৈমনসিংহের প্রাচীন পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের ৮৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি যত দিন কাজ করিয়াছেন, তথাকার জেলা-স্কুলের হেড পণ্ডিতের চেয়ে উচ্চ কোন কাজ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার সাধু চরিত্র, বুদ্ধিমত্তা, কর্ম্মিষ্ঠতা, এবং সর্ব্ববিধ সার্ব্বজনিক কর্ম্মে অনুরাগ ও উৎসাহের গুণে মৈমনসিংহের বহু হিত সাধন

করিয়া গিয়াছেন, এবং সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুকালে ব্রাহ্ম সমাজের প্রাচীনতম নেতা ছিলেন। মৈমনসিংহে সিটি স্কুলের শাখা, সিটি কলেজের শাখা (বর্ত্তমান আনন্দমোহন কলেজ যাহার স্থলাভিষিক্ত), প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি আযৌবন উৎসাহী সমাজসংস্কারক ছিলেন। স্বয়ং একটি বিধবা মহিলার পাণিগ্রহণ করেন, এবং অনেক বিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনি বাংলা বেশ জানিতেন ও লিখিতে পারিতেন। সদ্ভাবকুসুম, কাব্যকৌমুদী, সুখবোধ ব্যাকরণ, ভাষাবোধ প্রভৃতি কয়েকখানি বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক তিনি লিখিয়াছিলেন। সেগুলি বাংলা দেশের অনেক বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইত বলিয়া তাহা হইতে তাঁহার বেশ আয় হইত। এই পুস্তকগুলি ভিন্ন তিনি 'ভক্তিযোগ' এবং 'ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর' নামক দুটি গ্রন্থের লেখক। শেষোক্তটিতে তাঁহার জীবনকাহিনী বর্ণিত আছে।

তাঁহার শিক্ষাদান-প্রণালীর গুণে তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইত। তাঁহার চরিত্রের প্রভাবও তাহারা বিশেষ ভাবে অনুভব করিত।

নারীশিক্ষার প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। কন্যাদিগকে শিক্ষার সুযোগ পুত্রদের সমানই দিয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয়া কন্যা কুমারী ভক্তিলতা চন্দ, এম্‌-এ, কটকে অধ্যাপিকার কাজ করেন। অন্য এক কন্যা, কুমারী লাবণ্যলতা চন্দ, বি-এ, অসহযোগ আন্দোলনের সময় সরকারী উচ্চ চাকরি ছাড়িয়া দিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন এবং এখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমীটির সহকারী সভানেত্রীর কাজ করিতেছেন।

জাতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি ভারতমিহিরের অন্যতম লেখক ছিলেন। কলিকাতার সঞ্জীবনী হইতে পৃথক্ সঞ্জীবনী নামে মৈমনসিংহে একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় ইহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৭৭ সালে মৈমনসিংহ-সভা নামে যে রাজনৈতিক সভাটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তাহার সভ্য ছিলেন।

বঙ্গে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের ব্যর্থ চেষ্টা

"প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব" প্রবর্ত্তিত হইবার পর বঙ্গে যে মন্ত্রীরা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অপসৃত করিয়া অন্য মন্ত্রিমণ্ডল নিয়োগের যে চেষ্টা হইয়াছিল, সাতিশয় দুঃখের বিষয় সে চেষ্টা সফল হয় নাই। এই চেষ্টার ফলাফল যদি শুধু বঙ্গের স্থায়ী ও ভারতীয় বাসিন্দাদের প্রতিনিধিদিগের মতের উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে বর্ত্তমান মন্ত্রীরা নিশ্চয়ই পদচ্যুত হইতেন। কারণ, ঐ সকল প্রতিনিধির অধিকাংশ তাঁহাদের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। ইউরোপীয়দের প্রতিনিধিরা মন্ত্রীদের সপক্ষে দলবলে ভোট দেওয়াতেই তাঁহারা বাঁচিয়া গিয়াছেন। এই ইউরোপীয়েরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দলের ও তাঁহাদের জা'তভাই, এবং ভারতশোষণ তাঁহাদের কাজ। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল তাঁহাদের অনুগ্রহভাজন। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে যত কথা বলা যাইতে পারে, ইহা তাহার একটি। ব্যবস্থাপরিষদ্‌-গৃহের চারি দিকে হল্লা করিয়া বিরোধীদিগকে ভীত করিবার জন্য যে মিছিলের আয়োজন হয়, তাহাতে যোগ দিবার নিমিত্ত ইউরোপীয়দের কয়েকটা চটকল বন্ধ রাখিয়া মজুরদিগকে ছুটি দেওয়া হয়। ইহা বিদেশী শোষকদের ও বর্ত্তমান মন্ত্রীদের মিতালির অন্যতম প্রমাণ।

মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত সরকারী গুণাগুণ বর্ণনা করিলে যে কাহারও যোগ্যতার ভাগই বেশী বলিয়া প্রমাণ হইবেই এমন নহে। কিন্তু তাহা অনাবশ্যক। তাঁহাদের দায়িত্ব সম্মিলিত দায়িত্ব। মন্ত্রিমণ্ডল যে-সকল কর্ত্তব্য করেন নাই, যে-সব অকাজ করিয়াছেন, যে অবহেলার জন্য তাঁহারা দায়ী, এবং যে আবহাওয়ার সৃষ্টি তাঁহাদের আমলে হইয়াছে, তাহার সবিস্তার বর্ণনা পরিষদগৃহে হইয়া গিয়াছে; পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

মন্ত্রীদের বিরুদ্ধপক্ষীয় কাহাকেও কাহাকেও প্রকাশ্য মারপিট এবং গুণ্ডামির ভয়ে ভীত প্রায় এক শত পরিষদ-সদস্যের পরিষদগৃহে রাত্রিযাপন মন্ত্রীদের মুখের কালিমা আরও বাড়াইয়াছে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ শোষকদের কৃপায় সমস্তই চূণকাম হইয়া গিয়াছে—অবশ্য, মন্ত্রীদের ও তাঁহাদের সমর্থকদের মতে!

গুণ্ডারাজের প্রবলতা বাড়িবে কিনা, তাহাই এখন অনুমান ও আশঙ্কার বিষয়।

সাম্প্রদায়িক-বাঁটোয়ারা-বিরোধ দিবস

১৮ই আগষ্ট সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। সেই কু-দিন ও দুর্দ্দিনের সাম্বৎসরিক স্মৃতিদিবস এ-বৎসর ১লা ভাদ্র (১৮ই আগষ্ট) পড়িয়াছে। সেই দিন সভা মিছিল প্রভৃতি করিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতের ও দলের কয়েক জন প্রধান ব্যক্তি, এবং প্রাদেশিক হিন্দুসভার সভাপতিও, বাঁটোয়ারা-বিরোধী জনসাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন।

আমরা এই বাঁটোয়ারার প্রথম ঘোষণার দিন হইতে অকাট্য যুক্তি সহকারে বিরোধিতা করিয়া আসিতেছি, বরাবর করিব।

প্রবলতম দল যে কংগ্রেস, তাহারও ইহার বিরুদ্ধে

ঘোরতর আন্দোলন করা উচিত—বিশেষতঃ বঙ্গে। তাঁহারা ত মন্ত্রী-অপসারণের চেষ্টা করিয়া দেখিলেন, বাঁটোয়ারাটা থাকিতে গণতান্ত্রিক কোন কিছু প্রবর্ত্তিত করা অসম্ভব বা প্রায় অসম্ভব।

—

নানা প্রদেশে প্লাবন

ভারতবর্ষের বহুপ্রদেশ বন্যায় বিপন্ন। আমরা বিপন্ন লোকদিগের দুঃখে ব্যথিত।

—

ব্রহ্মদেশে মুসলমানদের, ও ভারতীয়দের, উপর আক্রমণ

ব্রহ্মদেশে এক জন মুসলমান বৌদ্ধধর্ম্মের ও বুদ্ধদেবের নিন্দা করিয়া একখানা বাহি লেখে। তাহাতে বৌদ্ধ ব্রহ্মদেশীয়েরা উত্তেজিত হইয়া মুসলমানদিগকে, এবং আনুষঙ্গিক ভাবে হিন্দু ভারতীয় কাহাকেও কাহাকেও, আক্রমণ করে, এবং অনেক মসজিদ নষ্ট করে। মুসলমানই বেশী মরিয়াছে; বৌদ্ধও মরিয়াছে, এবং কিছু হিন্দুও মরিয়াছে। সকল শ্রেণীর আহতের সংখ্যা আরও বেশী। এক জন মানুষের অপকর্ম্মে এই হত্যাকাণ্ড ও অরাজকতা ঘটিল। ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মান্ধ তাহারা তাহাদের ধর্ম্মের ও পয়গম্বরের সত্য বা কল্পিত নিন্দার জন্য খড়্গহস্ত হয়। সেই জন্য তাহাদেরই পরধর্ম্মের নিন্দা বিষয়ে অধিকতম সাবধান হওয়া উচিত। স্বধর্ম্মের নিন্দায় মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্ম্মের লোকদেরও যে রক্ত গরম হইতে পারে, তাহা দেখিয়া মুসলমানদের এই ধর্ম্মান্ধ অংশের চেতনা হইলে মঙ্গল।

—

রাশিয়ায় ও জাপানে সংগ্রামের সম্ভাবনা

জাপানের সহিত রাশিয়ার খণ্ডযুদ্ধ কয়েকটা হইয়াছে। তাহা হইতে ব্যাপক সংগ্রাম হইতে পারে। জাপান একা চীন ও রাশিয়ার সহিত লড়িতে পারিবে না। জার্ম্মেনী জাপানের পক্ষ অবলম্বন করিতে পারে এরূপ আভাস পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে রাশিয়ার সহিতও অন্য কোন বা কোন কোন শক্তি যোগ দিতে পারে।

—

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সামরিক বিল

হবু সৈনিকদিগকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোন সম্ভাবিত যুদ্ধে যোগদান হইতে কেহ নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলে তাহার সে কাজ দণ্ডনীয় হইবে, সমর-বিভাগের সেক্রেটরী মিঃ ওগিলবী এই মর্ম্মের একটি বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছেন। কংগ্রেস-নেতারা অনেকেই বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ ব্রিটেনের কোন সাম্রাজ্যিক যুদ্ধে যোগ দিবে না। কিন্তু কানাডা প্রভৃতি ডোমীনিয়নগুলির ব্রিটেনের কোন যুদ্ধে যোগ দেওয়া না-দেওয়ার স্বাধীনতা আছে। ভারতবর্ষ সেই স্বাধীনতা দখল করিয়া তাহা ব্যবহার করিলে শাস্তি পাইবে! "মাকড় মারলে ধোকড় হয়!"

—

রবীন্দ্রনাথকে চিয়াং কাই-শেকের চিঠি

রবীন্দ্রনাথ চীন জাতির সহিত সমবেদনা ও একাত্মতা প্রকাশ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার উত্তরে চীনের প্রধান সেনাপতি চিয়াং কাই-শেক তাঁহাকে "গুরুদেব" সম্বোধন করিয়া চীন যে তাঁহার বাণী হইতে কত উৎসাহ পাইয়াছে, তাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন।—প্রাচীনতম-সভ্যতা-বিশিষ্ট চীন ও ভারতবর্ষের প্রাক্তন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ চীনে গিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, এবং সেই সম্পর্ক বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

—

রবীন্দ্র-সাহিত্যের 'চোরাই' হিন্দী অনুবাদ

বিশ্বভারতীর বার্ষিক রিপোর্টে দেখিলাম, বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের চব্বিশটি 'চোরাই' হিন্দী অনুবাদের খোঁজ পাইয়াছেন। তাঁহার, এবং অন্য বাঙালী লেখকদের লেখারও, এরূপ অনুবাদ ভারতের নানা ভাষায় হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বাংলা রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে না।

—

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী' ভাদ্র মাসের তৃতীয় সপ্তাহে, এবং কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী' আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহে বাহির হইবে। অতএব নূতন বিজ্ঞাপনের কপি আশ্বিন সংখ্যার জন্য ১২ই ভাদ্রের মধ্যে এবং কার্ত্তিক সংখ্যার জন্য ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের আপিসে পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব।

বিজ্ঞাপন-কার্য্যাধ্যক্ষ

—

সংশোধন

৬৪৬ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে ২৪ পংক্তিতে "মহারাণীর আদেশে" এবং ২৮ পংক্তিতে "মহারাণীর আদিষ্ট" কথাগুলি বাদ যাইবে।
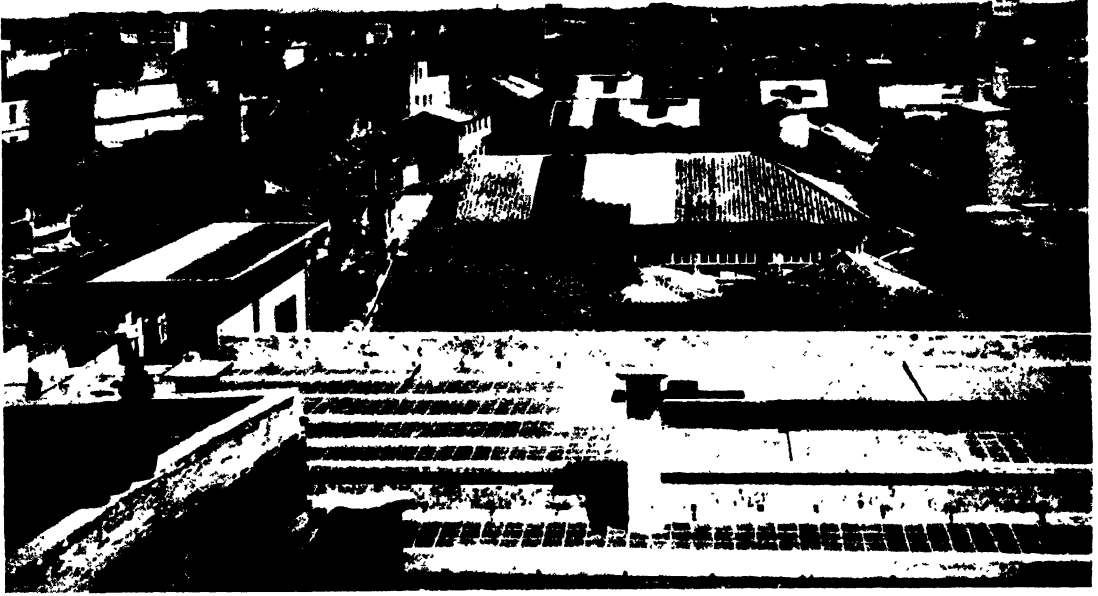
ক্যাণ্টনের এই ফরাসী হাসপাতাল জাপানী বোমায় বিধ্বস্ত হইয়াছে। হাসপাতালের ছাদে বৃহৎ ফরাসী পতাকা ও রক্তবর্ণ ক্রুশ-চিহ্নও বোমার আক্রমণ নিবৃত্ত করিতে পারে নাই।

সুইডেনের অশীতিপর নৃপতি পঞ্চম গুস্তাভের জয়ন্তী-উৎসবে রাজকীয় শোভাযাত্রা—রাজা শকটে উপবিষ্ট

মৃন্ময় বুদ্ধমূর্ত্তি, খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দী, আফগানিস্থান

মৃন্ময় দেবমূর্ত্তি, খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দী, আফগানিস্থান

আফগানিস্থানে ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিকদের খননকার্য্যের ফলে প্যারিসের 'ম্যুজি গিমে'তে বহু মূল্যবান্ শিল্প-নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে

দেশ-বিদেশের কথা

"হ্রদ হইতে নাগরাজদ্বয়ের উদ্ভব", মৃন্ময় মূর্ত্তি, খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দী, আফগানিস্থান

ইন্দো-চীন ও আফগানিস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের খনন-কার্য্য ও গবেষণার ফলে বহু নূতন শিল্প-নিদর্শন আবিষ্কৃত ইয়া প্যারিসের "ম্যুজি গিমে"তে সংরক্ষিত হইতেছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে মসিয় ও মাদাম হাকা, মসিয় জাঁ কার্ল, ও মসিয় জ্যাক ময়নির ধ্যক্ষতায় আফগানিস্থানে শিস্তা, ফন্দুকিস্তান, শোতোরাকের বৌদ্ধবিহারাবশেষ ইত্যাদি নানা অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্য্য আরম্ভ হয়। তাহার ফলে অনেক প্রাচীন তথ্য ও মূর্ত্তি ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়। তাহারই তিনটি মৃন্ময় মূর্ত্তি নিদর্শন এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল।

চিত্র-পরিচয়

মাণ্ডালের আরাকান প্যাগোডায় বুদ্ধ মূর্ত্তি

শুক্ত ভূনাথ মুখোপাধ্যায়ের আঁকা যে বুদ্ধমূর্ত্তিটির পূজার ছবি বাসীর এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রবাসী"র কোন ব্রহ্মপ্রবাসী হিতৈষী সৌজন্য সহকারে আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে চন্দ সূরিয় (সূর্য্য) আরাকানের রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে "মহামুনি মূর্ত্তি" নামে রিচিত এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। বহু শতাব্দী ধরিয়া ইহার খ্যাতি এরূপ ছিল যে, ইহার অনেক অলৌকিক ক্ষমতার কথা রটিয়াছিল। আজ পর্য্যন্তও ইহার সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে তিন খণ্ডে ঢালা এই মূর্ত্তিটির শিরোভাগ যখন নীচের অংশটির সহিত খাপ খাইতেছিল না, তখন বুদ্ধদেব ইহা স্পর্শ করিয়া দিলে তবে জোড়টি ঠিক হয়।

এই মূর্ত্তিটির প্রতি ব্রহ্মদেশের রাজা অনওরহতের (Annwrahta) লোভ ছিল এবং তিনি ইহার জন্য আরাকান আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা বোদওপায়াই (Bodawpaya) আরাকান জয় করিয়া ইহা মন্দালয়ে আনেন। ইহা ব্রঞ্জ নির্ম্মিত

ও সুবর্ণখচিত। ইহা ১২ ফুট সাত ইঞ্চি উঁচু। যে প্যাগোডা বা বৌদ্ধমন্দিরে ইহা অবস্থিত, তাহার প্রবেশদ্বার চারিটি। প্রত্যেকটির দরদালান দিয়া যাইবার পথে নানা রকমের জিনিষের ও ফুলের দোকান। অধিকাংশ দোকানী নারী। দরদালানগুলির প্রাচীরগাত্র বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনীর বহু চিত্র দ্বারা শোভিত। আরাকান বা শাঙ্ প্যাগোডা মন্দালয়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মন্দির।

—

মাওরিদের দেশ

শ্রীপ্রমথনাথ রায়

নিউজিল্যাণ্ডে আগে মোরিয়ারি নামে যে আদিম জাতি বাস করিত, এখন তাহা লোপ পাইয়াছে। এই বিলুপ্ত জাতি সম্বন্ধে যাহা কিছু খবর আমরা পাই তাহা মাওরিদের নিকট হইতে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে যে সকল জাতি বাস করে, তাহাদের কোন লিখিত ভাষা নাই। তাহাদের যাহা কিছু ইতিহাস, ঐতিহ্য কিম্বদন্তী, সমস্তই পিতা হইতে পুত্রে মুখে মুখে বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। এই সকল জাতি নানা উপজাতিতে বিভক্ত। প্রত্যেক উপজাতির সর্দ্দার ও টাহঙ্গা বা পুরোহিতরা সেই উপজাতির ইতিহাস সাগ্রহে রক্ষা করিয়া থাকে। মাওরিরা যখন প্রথম তাহিতি (Tahiti) হইতে নিউজিল্যাণ্ডের তীরে আসিয়া উপনীত হয়, তখন সেখানে এক কৃষ্ণকায়, অসভ্য জাতি বাস করিত। তাহাদের নাক ছিল চ্যাপ্টা, গালের হাড় উঁচু, চুল তুলার মত নরম। ইহারাই মোরিয়ারি। এই জাতির উদ্ভব রহস্যাবৃত, বোধ হয় চিরদিনই রহস্যাবৃত থাকিবে। এই জাতি অষ্ট্রেলিয়া হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের মধ্যে হাজার মাইল ব্যাপী যে বাত্যাবিক্ষুব্ধ তাসমান (Tasman) সমুদ্রের ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা উত্তীর্ণ হইতে যেরূপ নৌকার প্রয়োজন, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা তখন সেরূপ নৌকার ব্যবহার জানিত না, এখনও জানে না। অধিকতর শক্তিশালী ও সমরপ্রিয় মাওরিদের পক্ষে মোরিয়ারিদের জয় করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হয় নাই। বিজিত জাতির স্ত্রীলোকদিগকে বিবাহ করিয়া ও পুরুষদিগকে হত্যা করিয়া তাহারা জাতিটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল।

মাওরি গৃহের কারুকার্য্য

মাওরিদের এই নূতন দেশ আবিষ্কারের সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে ওয়াটঙ্গা নামে তাহিতির এক যুবক তাহার কয়েকজন সঙ্গীর সহিত নৌকাবিহারে বাহির হইয়া বাতাসের বেগে লক্ষ্যহীন হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরে আসিয়া হাজির হয়। যুবকের ঠাকুরদাদা তোই ছিল একটি উপজাতির সর্দ্দার। সে একটি ডিঙ্গি করিয়া ওয়াটঙ্গার খোঁজে বাহির হয়। এদিকে ওয়াটঙ্গা তাহিতিতে ফিরিয়া আসিয়া জানিতে পারে তাহার ঠাকুরদাদা তাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছে। সে তখন পুনরায় তাহার ঠাকুরদাদার খোঁজে বাহির হয়। ইতিমধ্যে তোই সামোয়া ও অন্যান্য দ্বীপ ছাড়াইয়া একেবারে নিউজিল্যাণ্ডের উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হয়। উষার ক্ষীণালোকে দূর হইতে সেখানকার বরফাবৃত উচ্চ পর্ব্বতমালা দেখিয়া তাহার মনে হইল যেন দীর্ঘ এক খণ্ড সাদা মেঘ। দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল—আওতেয়া-রোয়া। মাওরিদিগের মিষ্ট ভাষায় আজও নিউজিল্যাণ্ডের নাম আওতেয়া-রোয়া।

অমিশ্র মাওরির সংখ্যা বর্ত্তমানে যাট হাজারের বেশী হইবে না। ইহারা ইউরোপীয় আদবকায়দা অনেকটা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। ইহাদের চাষের প্রণালীও ইউরোপীয়। অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বপুরুষদের ধর্ম্মবিশ্বাস একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। মাওরিদের ভাষায় পরমপুরুষের নাম ইও। তিনি শূন্য হইতে পিতা আকাশ ও মাতা বসুন্ধরার সৃষ্টি করেন। উভয়ের মিলনে, অনন্ত রাত্রির অন্ধকারে, মানুষের জন্ম। অন্ধকারের চাপে পীড়িত হইয়া মানুষ একদিন আলোকের সন্ধানে বাহির হইল। ইও তখন আকাশ ও পৃথিবীকে পৃথক করিয়া দিনের সৃষ্টি করিলেন। মানুষ আলোক পাইল। কিন্তু আকাশ ও পৃথিবী সর্ব্বদাই পুনর্ম্মিলনের জন্য ব্যগ্র। এই বিচ্ছেদের দুঃখে আকাশ যখন কাঁদে তখনই বৃষ্টি হয়, আর পৃথিবী ভোরের কুয়াসায় নিজেকে আবৃত করিয়া রাখে।

মাওরিদের চেহারা অনেকটা বর্ত্তমান তাহিতি- ও হাওয়াই-বাসীদের মত—বলিষ্ঠ দেহ, চওড়া বুক, হাত-পা পেশী-বহুল। গায়ের রং চকলেটের ন্যায়, নাক খুব চওড়া, ঠোঁট মাঝারি রকমের,

চুল কালো ও মসৃণ, দাঁত চমৎকার। শক্তি ও বুদ্ধির দিক দিয়া মাওরি পুরুষরা প্রশংসার্হ।

মাওরি ভাষায় গ্রামের নাম পা (Pah)। পূর্ব্ব দ্বীপের উত্তরাঞ্চলে যথেষ্টসংখ্যক মাওরি গ্রাম ছিল। এই গ্রাম সাধারণতঃ পাহাড়ের চূড়ায় তৈয়ার করা হইত। বাড়ীর দেয়াল থাকিত কাঠের আর চাল থাকিত শণের ছোবড়ার। গ্রামের সর্দ্দার ও পুরোহিতের বাড়ীতে কাঠের উপরে নানা রকমের খোদাইয়ের কাজ থাকিত ও তাহাতে মাদার-অব-পার্ল এবং কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি খচিত করা হইত। গ্রাম ঘিরিয়া থাকিত খুঁটার বেড়া আর বেড়ার চারি দিকে খাত। বিভিন্ন উপজাতিতে সর্ব্বদাই লড়াই লাগিয়া থাকিত বলিয়া এইরূপ করা হইত। উত্তর দ্বীপে এখনও এরূপ পা বা গ্রাম দেখা যায়।

মাওরিরা পূর্ব্বে ধাতুর ব্যবহার জানিত না। প্রধান খাদ্য ছিল আলু। শিকারও বিশেষ কিছু ছিল না। ইউরোপীয়েরা যখন নিউজিল্যাণ্ডে বাস করিতে আরম্ভ করে তখন তাহারা গৃহপালিত জন্তুর সঙ্গে খরগোস, ফেজাণ্ট, হরিণ, শ্যাময় মৃগ প্রভৃতি আমদানী করে। মাওরিরা শিকার করিত মোয়া নামক জন্তু। ইহা এক প্রকার অতিকায় উট পাখী—আট গজের চেয়েও বেশী উঁচু। গত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ইহা লোপ পাইয়াছে। তাহাদের আর এক প্রকার শিকার ছিল কিউই (Kiwi)। ইহা মুরগীর ন্যায় বড় এক প্রকার পাখী; কিন্তু পাখা নাই। ঠোঁট পাতলা ও খুব লম্বা শরীর লম্বা নরম পালকে ঢাকা। দ্বীপের অভ্যন্তরস্থ ঝোপ-ঝাড়ে ইহা এখনও ছুটিয়া বেড়ায়।

সমুদ্রে, হ্রদে, নদীতে মাছের অভাব নাই। কাজেই মাওরিরা খুব মাছ খায়। ব্রিটিশ অধিকারের পূর্ব্বে নরমাংসের প্রতিও তাহাদের অপ্রীতি ছিল না। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা ফরাসী নাবিক মারিয় ডুফ্রেন (Marion Dufresne) ও তাহার সঙ্গীদের হত্যা করিয়া তাহাদের মাংস খাইয়াছিল।

কুক প্রণালী হইতে দক্ষিণ দ্বীপের উত্তর-প্রান্তস্থিত পিক্‌টন (Picton) শহর পর্য্যন্ত যে আঁকাবাঁকা সমুদ্রাংশ বিদ্যমান, ইহার নাম পেলোরাস সাউণ্ড (Pelorus Sound)। পূর্ব্বে সমুদ্রের এই অংশে একটা প্রকাণ্ড শুশুক ঘুরিয়া বেড়াইত। যখনই কোন জাহাজ এই জটিল পথে যাত্রার আয়োজন করিত এই শুশুক জাহাজের আগে আগে চলিয়া পিক্‌টন পর্য্যন্ত দেখাইয়া লইয়া যাইত। নাবিকেরা ইহার নাম রাখিয়াছিল পেলোরাস জ্যাক (Pelorus Jack) এই পথপ্রদর্শক মাছটিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য নিউজিল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট হইতে আইন পাস করান হইয়াছিল। বহু বৎসর যাবত এই মাছটি নাবিকদিগকে পথ দেখাইয়া আসিতেছিল। কিন্তু এক দিন এক আমেরিকান টুরিষ্ট ইহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালায়। সেই দিন হইতে নাবিক-বন্ধু পেলোরাস জ্যাকের আর দেখা পাওয়া যায় নাই।

নিউজিল্যাণ্ডের দেশীয় জানোয়ারের সংখ্যা অত্যন্ত কম। স্তন্যপায়ী জীব মোটেই নাই। পাখীর মধ্যে জংলী-পায়রা, তোতা,

ড্রাগন মাউথের উষ্ণ প্রস্রবণ

উষ্ণ প্রস্রবণের জলে রন্ধনরতা স্ত্রীলোক

মাওরি তরুণী

জংলী-হাঁস। মোয়া ত এক শত বৎসর হইল একেবারেই লোপ পাইয়াছে। কিউইর নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা ছাড়া কেয়া (Kea) নামে কৃষ্ণ-সবুজ রঙের আর এক প্রকার তোতা-জাতীয় পাখী আছে। ইহারা ভেড়ার পিঠে বসিয়া, শক্ত ঠোঁট দ্বারা চামড়া ছিঁড়িয়া, নীচে যে মেদ পায় তাহা খাইতে ভালবাসে। তোতেয়ারোয়া (Totearoa) নামে আর এক প্রকার জীব আছে। ইহা এক প্রকার টিকটিকি। গা কাঁটায় ও ফুস্কুড়িতে ভরা কিন্তু নিরীহ প্রাণী। গতি অত্যন্ত ধীর। দুই চোখের মাঝখানে আর একটি নষ্ট চোখ আছে। এরূপ অদ্ভুত জীব কল্পনা করাও কঠিন। নিউজিল্যাণ্ডের উত্তর দিকে, কয়েকটি ছোট ছোট বসতিহীন দ্বীপে ইহাদের দেখা যায়।

এক রকম অতি ক্ষুদ্রকায় মাকড়সা ছাড়া, নিউজিল্যাণ্ডে অন্ত কোন বিষাক্ত পোকামাকড় বা সরীসৃপ নাই। এই মাকড়সার পিঠের উপর আড়াআড়ি ভাবে লাল রঙের দাগ কাটা। সমুদ্রের ধারে, শুকনা সামুদ্রিক ঘাসের মধ্যে মাঝে মাঝে ইহা দেখা যায়। কিন্তু ইহার কামড় বিষাক্ত হইলেও মারাত্মক নয়।

হ্যামিল্টন হইতে যে রাস্তা ওয়ানগান্থুইএর দিকে গিয়াছে সেই রাস্তার পশ্চিমে কিছু দূরে একটি আশ্চর্য্য গুহা আছে। এই গুহার খিলান হাজার হাজার জোনাকী দ্বারা ঢাকা। ইহা দেখিতে অনেকটা গ্যালারীর ন্যায়। প্রায় আধ মাইল লম্বা। একটি উচ্চ পর্ব্বতের পাদদেশে ইহা অবস্থিত। গুহার ভিতর দিয়া একটি স্রোতস্বিনী প্রবাহিত।

এই গুহা একটি দেখিবার মত জিনিষ। ছোট নৌকা করিয়া ধীরে ধীরে ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। গুহামুখ হইতে ভিতরে যে-আলোক আসে, কিছু দূর না-যাইতেই তাহা ক্ষীণ হইয়া আসে ও ক্রমে একেবারে লোপ পাইয়া যায়। সহসা নৌকার গতি ফিরিতেই এক অবর্ণনীয় অবাস্তব সৌন্দর্য্যের চিত্র চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। মাথার তিন-চার গজ উপরে খিলান হইতে অসংখ্য জোনাকীর নীলাভ আলো জলের উপরে পড়িয়া ঝিকমিক করিতে থাকে। মনে হয় যেন স্বপ্নলোকে আসিয়াছি।

খিলান হইতে অসংখ্য সূক্ষ্ম সুতার ন্যায় জিনিষ বিলম্বিত। গুহার নীলাভ আলোকে এগুলি দেখিয়া মনে হয় যেন মসলিনের কাপড় ঝুলিয়া রহিয়াছে। এই সূত্রগুলি জোনাকীদের মুখ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। ইহাতে এক প্রকার আঠাল পদার্থ থাকে। প্রজাপতি মাছি প্রভৃতি জীব যখন বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে গুহার ভিতরে প্রবেশ করে, তখন তাহারা ইহাতে আটকাইয়া যায়। কোন পতঙ্গ আটকাইবা মাত্র জোনাকী ইহা নিজের দিকে টানিয়া লয় ও খাইতে আরম্ভ করে।

ওয়াইতোমোর এই আশ্চর্য্য গুহা হইতে বাহিরে আসিলে মন যেন স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র জোনাকীর এই অপূর্ব্ব নীলাভ আলোক দেখিবার পরে সূর্য্যালোক দেখিয়া মনে হয় যেন অতি সাধারণ বস্তু।

দক্ষিণ দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ অত্যন্ত গিরিসঙ্কুল। মাঝে মাঝে গিরিসঙ্কুল প্রদেশে সমুদ্র প্রায় পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত ভিতরে ঢুকিয়া ফিয়র্ডের (fiord) সৃষ্টি করিয়াছে। এই ফিয়র্ডগুলির মধ্যে মিলফোর্ড সাউণ্ড (Milford Sound) বিখ্যাত। পৃথিবীর সকল দেশ হইতে বহু পর্য্যটক ইহা দেখিতে আসে। এই মিলফোর্ড সাউণ্ড সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া নরওয়ের ফিয়র্ডগুলিকেও ছাড়াইয়া যায়। আসমান সমুদ্রের নীল জল ফিয়র্ডে প্রবেশ করিয়া চুনী-পান্নার ন্যায় সবুজ হইয়া যায়। শুধু যেখানে জলের উপর পাহাড়ের ছায়া পড়ে, সেখানকার রং কালো।

মাওরি স্ত্রীলোকেরা উষ্ণ প্রস্রবণের জলে খাদ্য পাক করিতেছে

ওয়াইতোমোর গুহা

পেলোরাস সাউণ্ড

মাওরিদের দেশে সকলের চেয়ে বেশী আকর্ষণের বস্তু রটোরুয়ো ও ওয়াইরাকেই অঞ্চল। এখানে মাটি এমন নরম যে মনে হয় যেন ভিতরকার চাপে এখানে-সেখানে মাটি ফাটিয়া বাষ্প ও গরম জল বাহির হইয়া আসে।

রটোরুয়োর উষ্ণ প্রস্রবণগুলি দেখিবার জিনিষ। এই উষ্ণ প্রস্রবণগুলি হইতে, সময়ের ঠিক নিয়মিত ব্যবধানের সহিত, তপ্ত জলধারা বাহির হইয়া অনেক উচ্চ পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। ওয়াই-রাকেই অঞ্চলে কয়েক বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া বিচিত্র রকমের উষ্ণ প্রস্রবণ দেখা যায়। ইহাদের কোনটা হইতে জলধারা একটি সুউচ্চ স্তম্ভের আকারে অত্যন্ত বেগের সহিত বাহির হইয়া আসে; কোনটার জলধারা দেখিতে পালকগুচ্ছের ন্যায়; আবার কোনটা দেখিতে ঠিক খোলা পাখার মত।

আশ্চর্য্যের বিষয় যে প্রস্রবণগুলি ক্রমাগত জলধারা নিক্ষেপ

করে না। কোনটা প্রতি পনর মিনিট অন্তর, কোনটা কুড়ি মিনিট অন্তর, কোনটা আট মিনিট অন্তর ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে। জলস্তম্ভ কয়েক সেকেণ্ড থাকিয়া প্রস্রবণের মুখের কাছে নামিয়া আসে ও সেখানে একটু সময় টগবগ করিয়া মাটির নীচে অদৃশ্য হইয়া যায়।

ওয়াইরাকেই অঞ্চলে বাতাস গন্ধকের বাষ্পে পূর্ণ। এ অঞ্চল ধাতব পদার্থে অতিশয় সমৃদ্ধ। এই সকল ধাতব পদার্থ এখানকার কর্দমাক্ত জলাশয়গুলিকে লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি রঙে রঞ্জিত করিয়া রাখে।

ব্রিটিশদের সঙ্গে মাওরিদের অনেক দিন যুদ্ধ হইয়াছিল। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধ শেষ হয়। মাওরিদের এই সাহসের প্রতিদানস্বরূপ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে শ্বেতকায় প্রজাদের সমান অধিকার দিয়াছেন। অধিকাংশ মাওরিই চাষের কাজ করে, কিন্তু তাহাদের চাষের প্রণালী আধুনিক। দেশে অনেক কৃষি-বিদ্যালয় আছে সেখানে তাহারা আধুনিক প্রণালীর কৃষিকাজ শেখে। অনেকে নানা রকমের ব্যবসাও করিয়া থাকে। অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত মাওরির সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। নিউজিল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে মাওরিদের প্রতিনিধি আছে। কোন কোন মাওরির ভাগ্যে দেশের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিবার সৌভাগ্যও হইয়াছে।

তে আনাও হ্রদের তীরে

পরলোকে লোকহিতব্রতী

সম্প্রতি পরলোকগত রায় সাহেব নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিজ অধ্যবসায়বলে সাধারণ অবস্থা হইতে ব্রহ্মদেশের সরকারী পূর্ত্তবিভাগের এঞ্জিনিয়ার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমায় নিজের জন্মগ্রাম বড়াতে নিজ ব্যয়ে বহু জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার সঞ্চিত টাকা হইতে উক্ত গ্রামে ত্রিশ বিঘা জমি বন্দোবস্ত করিয়া বাগান তৈরি করিয়াছিলেন এবং ঐ বাগানের এক ধারে ষাট হাজার টাকা

নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ব্যয়ে পিতার নামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষার আয়োজনও করা হইয়াছে। এইরূপ বৃহৎ দোতলা বিদ্যালয় সমস্ত বর্দ্ধমান বিভাগের মফস্বলে খুব কমই আছে। এই বিদ্যালয় ভিন্ন তিনি উক্ত বাগানের অন্য স্থানে বার হাজার টাকার অধিক ব্যয়ে মাতার নামে দাতব্য চিকিৎসালয় করিয়া দিয়াছেন। স্থানীয় পশুদিগের চিকিৎসার জন্যও তিনি গৃহ নির্ম্মাণ এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। নিকটবর্ত্তী রেলষ্টেশন হইতে গ্রামে যাইবার উপযোগী রাস্তাও তাঁহার একটি কীর্ত্তি।

শ্রীযুক্ত মণি রায়

শ্রীযুক্ত মণি রায় ব্যায়ামকুশলতার জন্য ব্যায়ামদক্ষ-সমাজে ও সাধারণের নিকট সুপরিচিত। তিনি বর্ত্তমানে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ব্যায়ামচর্চ্চার তত্ত্বাবধায়কপদে নিযুক্ত আছেন। যাঁহারা ঘরে সাধারণভাবে শরীর-চর্চ্চা করিয়া কর্ম্মপটুতা ও স্বাস্থ্য লাভ করিতে চাহেন তাঁহাদের উপকারার্থ তিনি সম্প্রতি একটি চার্ট প্রকাশ করিয়াছেন। স্বাস্থ্যান্বেষীদের পালনের জন্য তিনি এই চার্টে দশটি মূল্যবান বিধিনিষেধ এবং শরীরের বিভিন্ন অংশের কর্ম্মকুশলতা ও সুস্থতার জন্য এগারটি ব্যায়াম-প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্যায়াম-প্রণালীগুলি ছবির সাহায্যে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।
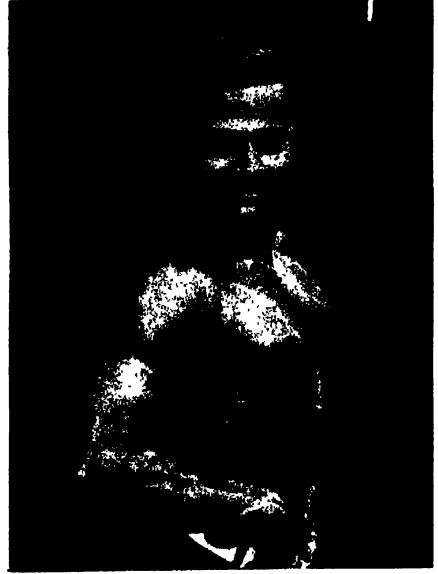
শ্রীযুক্ত মণি রায়

পুত্র-পৌত্রসহ সুইডেন-রাজ পঞ্চম গুস্তাভ, তাঁহার অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার জয়ন্তী উৎসবের শোভাযাত্রায়। পঞ্চম গুস্তাভের রাজত্বে সুইডেনের শান্তি কখনও ব্যাহত হয় নাই। নরওয়ে-সুইডেন বিচ্ছিন্ন হইবার সময় ইঁহারই ধীরবুদ্ধি ও সুপরিচালনার ফলে প্রজাদের রক্তপাতের আশঙ্কা দূর হয় ও শান্তিপূর্ণভাবে দুই দেশ ভিন্ন হয়।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গীতরূপী

নন্দলাল বসু
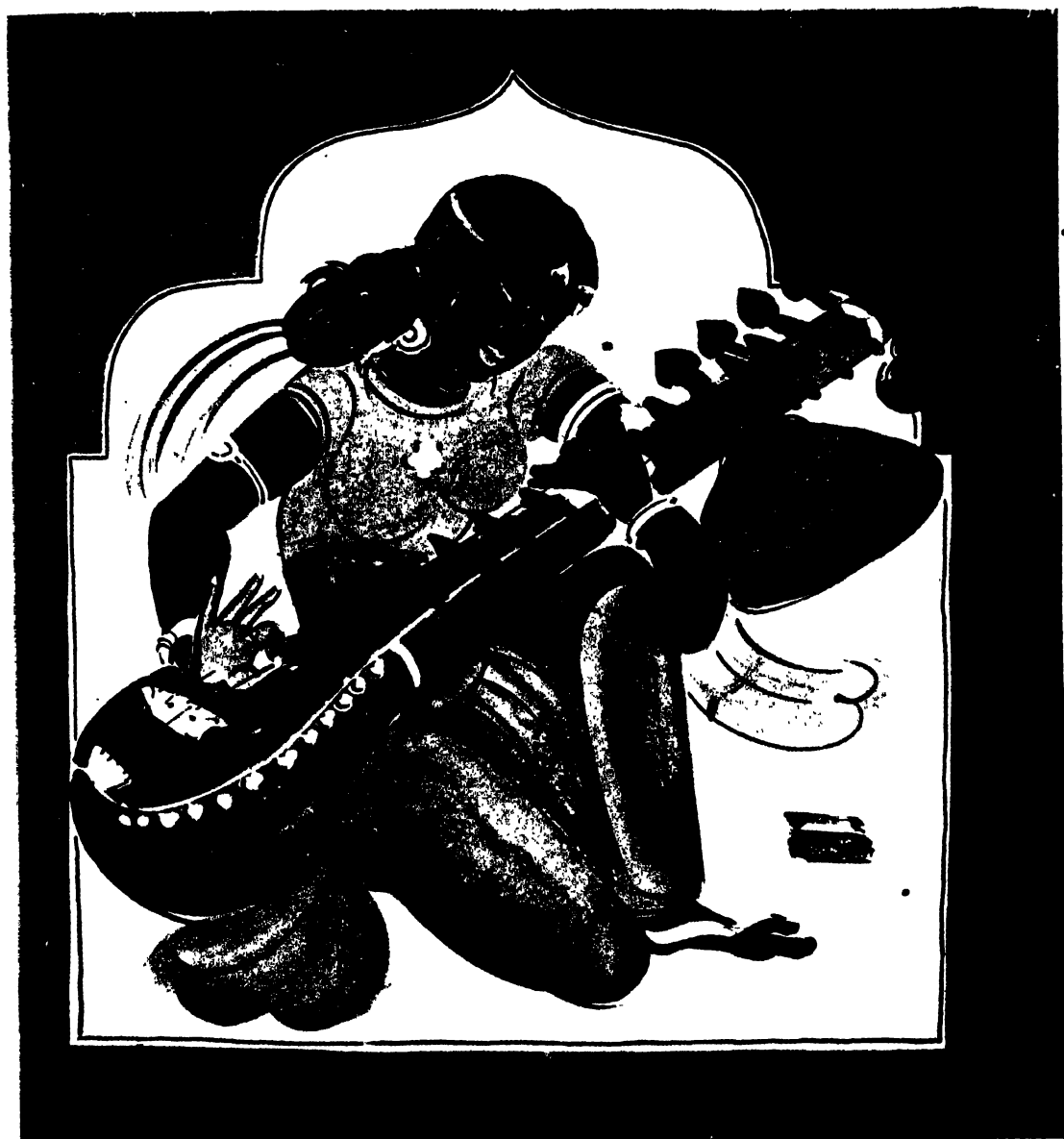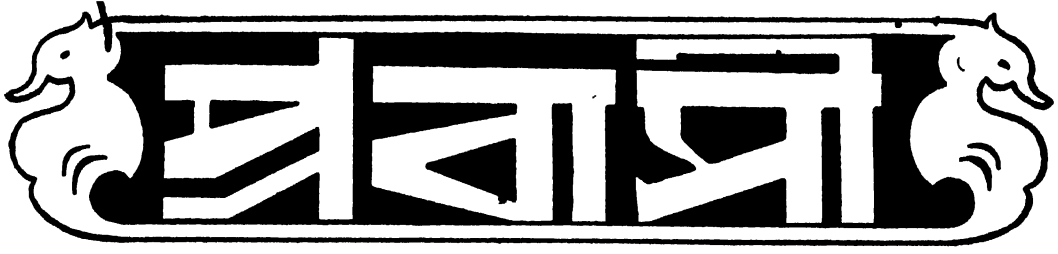
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৮শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৪৫

৬ষ্ঠ সংখ্যা

স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মা

পুরন্দর, তোমাদের অত্যন্ত কৃশ দেখাচ্ছে, যেন অনাবৃষ্টি দিনের পাতা-ঝরা বনস্পতির মতো। স্বর্গে কি অমৃত-সঞ্চয়ে দৈন্য ঘটেছে।

ইন্দ্র

পিতামহ, অনাবৃষ্টিই তো বটে। স্বর্গীয় বনস্পতির শিকড় আছে মর্ত্যের মাটিতে—দিনে দিনে সেখানে শ্রদ্ধার রস শুকিয়ে এসেছে। নরলোকে কানাকানি চলছে, যে, সৃষ্টিব্যাপারটা আকস্মিক মহামারীর মতো, বসন্তের গুটি যেন, আপনা হতেই আপনাকে হঠাৎ ফুটিয়ে তোলে ;—এটা দেবতার হাতের কারুকার্য নয়। অর্থাৎ এটা এমন একটা রোগ, যা চলছে মৃত্যুর অনিবার্য পরিণামে। এমন কি, ওখানকার পণ্ডিতরা চরম চিতানলের দিনক্ষণ পর্যন্ত অঙ্ক কষে স্থির করে দিয়েছে।

ব্রহ্মা

সর্বনাশ। এ যে অনাদিকালের ভূতভাবনের বেকার-সমস্যা।

ইন্দ্র

তাই তো বটে। ওরা বলছে, দেবতারা কোনোদিন কোনো কাজই করে নি অতএব— ওদের মজুরি বন্ধ।

ব্রহ্মা

বলো কী, হোমানলের ঘৃতটুকুও মিলবে না ?

ইন্দ্র

না পিতামহ। সেটা ভালোই হয়েছে— যে ঘৃতের এখন চলতি সেটাতে অগ্নিদেবের অগ্নিমান্দ্য হবার আশঙ্কা।

বৃহস্পতি

আদিদেব, এতদিন ছিলুম মানুষের অসংশয় বিশ্বাসে—অত্যন্তই নিশ্চিন্ত ছিলুম। এখন পণ্ডিতের দল মনোবিজ্ঞানের এক্কা গাড়িতে চাপিয়ে মানুষের মাথার খুলির একটা অকিঞ্চিৎকর কোটরে আমাদের ঠেলে দিয়েছে; সেখানে মগজের গন্ধ আছে অমৃতের স্বাদ নেই; বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বেড়ার মধ্যে আমাদের ঘের দিয়ে দিয়ে রেখেছে—যাকে ম্লেচ্ছ ভাষায় বলে কন্‌সেন্‌ট্রেশন্ ক্যাম্প—কড়া পাহারা। অবতারের যে পুরাতত্ত্ব বের করেছে, তাতে নৃসিংহের কোনো চিহ্ন নেই আছে নৃবানরের মাথার খু

মরুৎ

আমার পুত্র মারুতিকে ওরা অগ্রজ ব'লে স্বীকার করেছে এতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু লজ্জার বিষয় এই যে দেবতারা ভুক্ত হয়েছে এন্থ্রপলজি নামক অর্বাচীন ম্লেচ্ছশাস্ত্রের বাল্য-লীলা পর্বে। দেব, আশা দিয়েছিলে আমরা অমর, আজ দেখছি ওদের পরীক্ষাগারে ব্যাঙের একটা কাটা পাও ইন্দ্রপদের চেয়ে বেশী সজীব। সেদিন সুরবালকেরা সুরগুরুকে ধরে পড়েছিল, "প্রমাণ ক'রে দিন আমরা আছি।" গুরুর সন্দেহে দোলা লাগল—আছি কি নেই এই ড়ালে তাঁর মাথা নড়তে লাগল, মুখ দিয়ে কথা বেরল না। পিতামহ যদি সন্দেহ ভঞ্জন ক'রে দেন তাহলে দেবলোক সুস্থ হোতে পারে।

ব্রহ্মা

পিতামহের চার মাথা হেঁট হয়ে গেছে। মনে ভাবছি মরলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের আচার্য হয়ে যদি জন্মাতে পারি তাহলে অন্তত কোনো এক চৌমাথার ট্রাম লাইনের ধারে একটা পাথরের মূর্তি দাবি করতে পারব। আজ আমার মূর্তির ভাঙা টুকরো নিয়ে প্রফেসর তারিখ হিসাব করছে অথচ এতদিন এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে আমি সকল তারিখের অতীত।

প্রজাপতি

ভগবন, সকলেই জানেন ধরাধামে আমি আর কন্দর্পদেব অবতীর্ণ হয়েছিলুম শুভ এবং অশুভ বিবাহের ঘটকালিতে। সেজন্যে আমাদের কোনো রকমের নিয়মিত বা অনিয়মিত পাওনা ছিল না, কেবল নিমন্ত্রণপত্রের মাথার উপরে ছাপার অক্ষরে আমার উদ্দেশে একটা নমস্কার স্বীকৃত ছিল। কিন্তু কৌতুক ছিল ভূরিপরিমাণে। বাসর ঘরে অনেক কানমলা দেখেছি পরিহাস-রসিকাদের হাতে, আর দেখেছি অদৃশ্য পরিহাস-রসিকের হাতে চিরজীবনের কানমলা। আমি প্রজাপতি আজ লজ্জিত, কন্দর্প আজ নির্জীব—তিনি পঞ্চশর নিয়ে যখন আস্ফালন করতে যান তখন তীরগুলো ঠিকরে যায় কোম্পানির কাগজ-নির্মিত বর্মের পরে। অতএব উক্ত বিভাগের সনাতনী খাতা থেকে আমাদের নাম কেটে নিয়ে টঙ্কেশ্বরী দেবীর নাম বহাল হোক।

সকলে

তথাস্তু।

বায়ু

পৃথিবীতে আজকাল পাগলা হাওয়া পলিটিক্সের ঈশান কোণ থেকে সৃষ্টি ছারখার করতে প্রবৃত্ত। আমি আজ চন্দ্রলোকে সমস্ত বিরহিণীদের দীর্ঘনিশ্বাস বহন ক'রে ফিরে যেতে ইচ্ছা করি।

অশ্বিনীকুমার

সুবিধা হবে না দেব। মর্ত্যের পণ্ডিতেরা ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, চন্দ্র বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি করেন বটে কিন্তু স্বয়ং তিনি বায়ুহারা।

বায়ু

না হয় সেখানে গিয়ে আত্মহত্যা করব।

ভোলানাথ

(অর্ধনিমীলিত নেত্রে) আমার চেয়ে গাঁজার মৌতাৎ অনেক প্রবল, পৃথিবীতে এমন সর্বনেশে ওস্তাদের অভাব নেই—সেই সব সংস্কারকদের উপর প্রলয়কার্যের ভার দিয়ে আমি গঙ্গা-ধারাভিষেকে মাথা ঠাণ্ডা করতে পারি। আমার ভূতগুলোর ভার তাঁরাই নিতে পারবেন।

চিত্রগুপ্ত

মনঃক্ষোভে দেবগণের অভিযোগে অত্যুক্তি প্রকাশ পেয়েছে। যথাযথ তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন বোধ করি। সুরগুরু কোনোদিন সংখ্যাতত্ত্বের আলোচনা করেন নি। সেইজন্যে দেবতাদের গণিত স্বেচ্ছাগণিত। মর্ত্যে দেবগণের অধিকারে কী পরিমাণে খর্বতা ঘটেছে তার নির্ভুল সীমা নির্ণয়ের জন্য স্বপ্নাদেশ দেওয়া হোক কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংখ্যিক প্রমাণ-বিশারদের মাথায়; এ কাজে বৈজ্ঞানিক প্রশান্তি অত্যাবশ্যক।

বায়ু

এ প্রস্তাবের সমর্থন করি। দেবতাদের হতাশ হবার কারণ নেই। মানুষের বুদ্ধিতে অকস্মাৎ হাওয়াবদল বারবারই দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষত দুর্দিনে। দেউলে হবার দিনে মানতের খরচ বেড়ে ওঠে। মানুষের বুদ্ধিতে সব সময় জোয়ার আসে না—একদা তলার পাঁক বেরিয়ে পড়ে। তখন পাণ্ডার পদপঙ্কের দাম চড়ে যায়, দেবতারাও তার অংশ পান।

বৃহস্পতি

আশ্বস্ত হলুম। (সরস্বতীর প্রতি) মুখ ম্লান করবেন না দেবি, মানুষের আত্মবুদ্ধির উপর শ্রদ্ধা কমবার সঙ্গে সঙ্গেই দেবীর ভোগের বরাদ্দ বাড়তে থাকে। বুদ্ধিতে ভাঁটার টান প্রবল, ভূমণ্ডলে এমন দেশ আছে। শীতলা ঠাকরুণও সেই ভরসাতেই মন্দির ত্যাগের আশঙ্কা ছেড়ে দিয়েছেন।

নাৎনির পত্র

শ্রীঅপরাজিতা দেবী

শ্রীচরণকমলেষু

দৈনিক কাগজেতে পড়লাম বার্তা
ছিল কবি দুর্বল, ন'ন তিনি আর তা'।
দুর্বল ন'ন আর কবি ? এ যে অপমান,
এ খবরে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে কান।
বিনা প্রতিবাদে এটা মেনে নেওয়া শক্ত।
রাগে দুখে ক্ষোভে দেহে চঞ্চল রক্ত।
তরুণীরা হয় নি তো উবে আজো কর্পূর !
কণ্ঠে উতলা সুর এখনো তো ভরপুর।
পাহাড়িয়া ঝর্ণারো চপলতা মানে হার
উচ্ছল হাসি গানে-কল্লোল-ঝংকার।
নেই ঘিরে চাঁদমুখে মেঘ-ঘন কালো কেশ ?
চক্ষের বিদ্যুৎ হয়েছে কি নিঃশেষ ?
মহাবলী কবি, তবু দুর্বল নিশ্চয়,
যুগে যুগে আমাদেরি কাছে তাঁর পরাজয়।

পারেন চিনতে দাদু ?—কে আমি বলুন তো !
চিনেছেন ?—তবু ভালো। বাইরে চলুন তো !
—বহুদিন আসি নি কো, কারণটা শুনবেন ?
—রাখুন লেখনী তবে,—পরে ভাব বুনবেন।
খাতা পুঁথি নোট্‌বই দূরে সব ভাগিয়ে
আরাম-চেয়ারে এসে বসুন তো বাগিয়ে।
পা-দুখানি ঢেকে নিয়ে পশমের শালেতে
ভালো চকোলেট্ কিছু ভরে নিন গালেতে।
গোলাপের জলে ভেজা অম্বুরী ধোঁয়া তো
হোলো নাকো মশায়ের এ-জীবনে ছোঁয়া তো !
তবে আর কিসে দাদু জমবে এ গল্প ?
অকাজের কথা এ যে ভার যায় অল্প।
কাজেই অনেক ভেবে (ভোলাতে বা ভবিকে,)
চকোলেট্ ব্যবস্থা করলেম কবিকে।
রসনা সরস ক'রে যত তা'রা গলবে,—
নাৎনি-ঠাকুর্দাতে আলাপন চলবে।

যে ভীড়ের কোলাহলে রয়েছেন বারমাস,
আমি হোলে সব ফেলে পালাতেম বনবাস
গুলিয়ে উঠত মাথা, পেয়ে যত কান্না,
সকাতরে বলতুম—"ক্ষমা করো আর না।"
কিংবা হয়তো সেই মেহের আলির প্রায়
চেঁচাতুম পথে পথে 'সব কুছ্ ঝুটা হায়্।'
মানি বটে আপনার প্রতিভা যথার্থ,
নইলে কি যে-সে লোক সইতে এ পারত ?
অগণিত প্রার্থনা যার-তার বার-বার
শোনা সে কি সাধারণ-ধৈর্য্যের কারবার ?
বিশ্বের কত কী যে উদ্ভট ভিক্ষা,—
গান চাই দান চাই, দাও লোকশিক্ষা।
অনুখন নানা জন ভিজিটার্স আসছেই,
অহরহ ঘিরে বসে দেঁতো হাসি হাসছেই।
আসছেই ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি পর-পর,
মূর্খ ও পণ্ডিত ভদ্র বা বর্বর।
কবি লাগি' ভাবনায় বেশি যারা চিন্তিত্
বলেন বেকার আছি, চাই দয়া কিঞ্চিৎ।
ফরমাস্ করে কেউ প্রশংসা-পত্র,
কেউ চায় বিবাহের আশিস্ ক'ছত্র।
"নাম দিন্ নবজাত শিশুটির জন্য।"
এই ব'লে কেউ করে কবিকেই ধন্য।
বলে কেউ "লিখে দিন্ ভূমিকা এ-বইটার,
উঠেছি কয়টা ধাপ কাব্যের পৈঁঠার।"
কেউ বলে—"গেছে খুলে ছন্দের কানটা,
শুনুন্ নতুন ঢঙে গাওয়া এই গানটা,
ক্লাসিক্যাল্ সংগীতে কীর্তন চড়িয়ে
বাট্ মেরে বাউলেতে, গিট্‌কিরি ছড়িয়ে
তাল লয় তানে মেখে আখরের রোলারে
শিলা করে তুলেছি হে যত লঘু শোলারে।"
"আমাদের কাগজের নাম দিন্"—বলে কেউ।
কোনো দলে বলে—"দেশে চলে মুক্তির ঢেউ—

"পোর্টারও ডিউটি যে এ ব্যাপারে রয়েছে,
কবিকেই সভাপতি করা তাই হয়েছে ;
সেদিন যেতেই হবে, না গেলে তো হবে না।"
কেউ বলে—"আমাদের ইজ্জতও র'বে না
সভ্যজগতে আর। অতএব গোটা কয়
কড়া কথা আপনাকে বলতে যেতেই হয়।"
এসে কেউ সবিনয়ে কয় ক'রে জোড়কর,—
"লিখেছি থিসিস্ এক লিটারেচারের পর
দয়া ক'রে দেখে শুনে দিলে বড়ো ভালো হয়।"
কেউ কয়,—"আমার এ বইখানি মহাশয়
পড়ে দেখে জানাবেন আপনার মতামত ;
সমস্যা নিয়ে নানা, ধরেছি নূতন পথ।"
"আমরা ষ্টুডেণ্ট স্যার, দাবি আছে বেশি তাই,
আমাদের ম্যাগাজিনে শুভাশিস্ আগে চাই।"
কুমারী তরুণী আনে অটোগ্রাফ্ পুঞ্জে—
কবির নিকটে জানে মাফ্ সাত খুন যে।
"ম্যঁয় ভূখা—" সদা বলে—শ্রীবিশ্বভারতী—
"দানা দাও—সামলাও ওহে মোর সারথি!"
যা-কিছু নিজের ছিল সবি তাঁরে ক'রে দান,
পূরিল না ক্ষুধা,—শেষে ভিক্ষায় অভিযান।
রাজার দুলাল ওগো, কোন্ গ্রহ-নিদেশে—
বাউলের বেশে পথে ফেরো দেশ-বিদেশে।
জানে লোকে অবারিত রবিকর-ছত্র
দলে দলে এসে চায় সুপারিশ-পত্র।
সাহিত্য ছাড়া কত শিল্প ও সিনামা
মায় স্নো, কেশতৈল, দধি, কালি, বিনামা!
দরজায় হরদম্ প্রার্থীর হৈ-চৈ—
রাজবন্দীর কাজে ক'রে দিন্ নাম সই।
চাক্‌রির উমেদার নেই তার সংখ্যা,
দুর্গতি দেখে দাদু মনে জাগে শঙ্কা।

ভাবি আমি, শাড়ি যদি পারতেন পরতে
পারত না চট্ ক'রে কেউ আর ধরতে।
দিব্যি আড়ালে থেকে অন্দরে লুকিয়ে
দিতেন ঝামেলা সব সহজেই চুকিয়ে।
পারতেন মোরই মতো গোপনেই থাকতে,
দুনিয়ার আব্‌দার হোত নাকো রাখতে।

প্রার্থীর সংখ্যা তো বাড়ছেই দিন দিন,
মন জোগাবার দায়ে স্বাস্থ্য যে হোলো ক্ষীণ।
স্বার্থ কি মানে কবি কারো রোগশয্যা,
ভুলে যায় ভদ্রতা চক্ষুর লজ্জা।
চার কুড়ি হয়ে এল চান্ যদি রক্ষে
কঠোরতা নিন্ ভরে দুর্বল বক্ষে।
কবির খাতির আর ভক্তির দেখে রূপ
করুণায় তাই আমি আড়ালেই থাকি চুপ!
জ্বালাই না চিঠি লিখে, অসুখে করি না "তার"
সামনে আসি নে দাদু অকারণে বার-বার।
ফটোগ্রাফ—অটোগ্রাফ—দ্বিপদীও চাই না,—
প্রয়োজনে মিঠে হেসে কাছে ঘেঁষে যাই না।

চিত্তের চিত্রেই বৈশাখী পচিশে
অন্তর জন লাগি' আয়োজন রুচি সে।
গাঁথি শুধু সেই দিন এক ছড়া ফুলহার
সুরভি মদির ধূপ গুটিকয় জ্বালি,—আর
নিরজন নিজগৃহে নিয়ে তব নব বই
কবির ভাবের সনে ভাবনা মিশায়ে রই।
জন্মদিনের সভা-ভীড়ে পাব দেখা কি?
গেহে গীতবিতানেতে হেরি তোমা একাকী।

সাড়া পেয়ে আষাঢ়ের মন আজি চঞ্চল,
কবরী খসিতে চায় উড়ে যায় অঞ্চল।
শৃঙ্খল বাঁধা আছি, চিত্ত-কেকা কাঁদে তাই,
হে নবীন মেঘ! তব মন্দ্র শুনিতে চাই।
চাই তব বরষার জলভরা গুরুগান।
এ গোপনচারিণীর যে-রসে জীবিত প্রাণ।

চিঠি লিখি দুনিয়াতে দাদু ছাড়া কারে নয়।
অপরাজিতার হেথা গৌরবে পরাজয়।
রবিরাগ জানি কবি বাদলেও ফিকা না
তাই চাই উত্তর। (না জানিয়ে ঠিকানা।)
খেয়াল খুশিতে যদি দিতে চিঠি মনে হয়
তা হ'লেই লিখবেন। মিনতি,—নইলে নয়॥

প্রণতা অপরাজিতা

১৬ই জুন, ১৯৩৮

পত্রদূতী

শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর প্রতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পর-ঠিকানিয়া বন্ধু তোমার
ছন্দে লিখেছে পত্র,
ছন্দেই তা'র ইনিয়ে-বিনিয়ে
জবাব লিখেছি অত্র।
যন্ত্রের যুগে মেঘদূত তার
পদ করিয়াছে নষ্ট,
তাই মাঝে প'ড়ে খামাখা অকাজে
তোমারে দিলেম কষ্ট।
আজি আষাঢ়ের মেঘলা আকাশে
মন যেন উড়ো পক্ষী,
বাদলা হাওয়ায় কোথা উড়ে যায়
অজানা কাদেরে লক্ষ্যি'।
ঠিকানা তাদের রঙীন মেঘেতে
লিখে দেয় দূর শূন্য,
খামে ভরা চিঠি না যদি পাঠাই
হয় না তাহারা ক্ষুণ্ণ।
তাহাদের চিঠি আনমনাদের
আসে জানালার পার্শ্বে
যে পড়িতে জানে সেই বোঝে মানে,
চিঠিখানি সবাকার সে।
উত্তর তার কখনো কখনো
পেয়েছি আমারি ছন্দে,
গুঞ্জন তারি ছড়িয়ে গিয়েছে
সিক্ত মাটির গন্ধে।

অচিন মিতার সাথে কারবার
সে তো কবিদেরই জন্ত,
সে অধরা দেয় সংগীতে ধরা,
কিন্তু তা'রা যে অন্ত।
জানা অজানার মাঝখানটাতে
নাংনি করেছে সন্ধি,
কবির সাধ্য নাই তারে করে
পোষ্টাফিসের বন্দী।
মর্ত্যের দেহে মেনে যে নিয়েছে
বাঁধন পাঞ্চভৌত্যে,
তুমি ছাড়া কারে লাগাব তাহার
চার পয়সার দৌত্যে?
জানি এ সুযোগে চাও কিছু কিছু
হাল খবরের অংশ,
হায়রে আয়ুতে খবরের কোঠা
প্রায় হয়ে এল ধ্বংস।
সেদিন ছিলাম সাতাশ আটাশ
আশী আজি সমাসন্ন,
আমার জীবনে এই সংবাদ
সবার অগ্রগণ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গৌরীপুর ভবন
কালিম্পং
৫ আষাঢ়, ১৩৪৫

গর্‌-ঠিকানী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বে-ঠিকানা তব
আলাপ শব্দভেদী
দিল এ বিজনে
আমার মৌন ছেদি' ;
দাছুর পদবী
পেয়েছি, তাহার দায়
কোনো ছুতো ক'রে
কভু কি ঠেকানো যায়।
স্পর্ধা করিয়া
ছন্দে লিখেছ চিঠি ;
ছন্দেই তার
জবাবটা যাক্ মিটি'।
নিশ্চিত তুমি
জানিতে মনের মধ্যে—
গর্ব আমার
খর্ব হবে না গদ্যে।
লেখনীটা ছিল
শক্ত জাতেরি ঘোড়া,
বয়সের দোষে
কিছু তো হয়েছে খোঁড়া ;
তোমাদের কাছে
সেই লজ্জাটা ঢেকে
মনে সাধ যেন
যেতে পারি মান রেখে।
তোমার কলম
চলে যে হালকা চালে,
আমারো কলম
চালাব সে ঝাঁপতালে ;
হাঁক ধরে, তবু
এই সংকল্পটা
টেনে রাখি, পাছে
দাও বয়সের খোঁটা।
ভিতরে ভিতরে
তবু জাগ্রত রয়
দর্প হরণ
মধুসূদনের ভয়।
বয়স হোলেই
বৃদ্ধ হয়ে যে মরে
বড় ঘৃণা মোর
সেই অভাগার 'পরে।
প্রাণ বেরোলেও
তোমাদের কাছে তবু
তাই তো ক্লান্তি
প্রকাশ করি নে কভু।

কিন্তু একটা
কথায় লেগেছে ধোঁকা—
কবি ব'লেই কি
আমারে পেয়েছ বোকা।
নানা উৎপাত
করে বটে নানা লোকে
সহ্য তো করি
পষ্ট দেখেছ চোখে,
সেই কারণেই
তুমি থাকো দূরে দূরে ;
বলেছ সে কথা
অতি সকরুণ সুরে।
বেশ জানি তুমি
জানো এটা নিশ্চয়

উৎপাত সে যে
নানা রকমের হয়।
কবিদের 'পরে
দয়া করেছেন বিধি,—
মিষ্টি মুখের
উৎপাত আনে দিদি।
চাটুবচনের
মিষ্টি রচন জানে,
ক্ষীরে সরে কেউ
মিষ্টি বানিয়ে আনে।
কোকিল কণ্ঠে
কেউ বা কলহ করে,
কেউ বা তোলায়
গানের তানের স্বরে;
তাই ভাবি, বিধি
যদি দরদের ভুলে
এ উৎপাতের
বরাদ্দ দেন তুলে,
শুকনো প্রাণটা
মহা উৎপাত হবে,
উপমা লাগিয়ে
কথাটা বোঝাই তবে।
সামনে দেখো না
পাহাড়, সাবল ঠুকে
ইলেক্‌ট্রিকের
খোঁটা পোঁতে তার বুকে;
সন্ধ্যেবেলার
মস্থণ অন্ধকারে
এখানে সেখানে
চোখে আলো খোঁচা মারে।
তা দেখে চাঁদের
ব্যথা যদি লাগে প্রাণে,
বার্তা পাঠায়
শৈল-শিখর পানে—
বলে "আজ হ'তে
জ্যোৎস্নার উৎপাতে
আলোর আঘাত
লাগাব না আর রাতে,"
ভেবে দেখো, তবে
কথাটা কি হবে ভালো,
তাপের জ্বলন
আনে কি সবারি আলো?

এখানেই চিঠি
শেষ ক'রে যাই চলে
ভেবো না যে তাহা
শক্তি কমেছে ব'লে;
বুদ্ধি বেড়েছে
তাহারি প্রমাণ এটা,
বুঝেছি, যেমন
বাণীর হাতুড়ি পেটা
কথারে চওড়া
করে বকুনির জোরে,
তেমনি যে তাকে
দেয় চ্যাপটাও ক'রে।
বেশি বাহা তাই
কম, এ কথাটা মানি,
চেঁচিয়ে বলার
চেয়ে ভালো কানাকানি;
বাঙালি এ কথা
জানে না ব'লেই ঠকে,
দাম যায় আর
দম যায়, যত বকে।
চেঁচানির চোটে
তাই বাংলার হাওয়া
রাতদিন যেন
হিস্‌টিরিয়ার পাওয়া।

তারে বলে আর্ট
না-বলা যাহার কথা,
ঢাকা খুলে বলা
সে কেবল বাচালতা।
এই তো দেখো না
নাম-ঢাকা তব নাম ;
নামজাদা খ্যাতি
ছাপিয়ে যে ওর দাম।

এই দেখো দেখি
ভারতীর ছল কী এ !
বকা ভালো নয়
এ কথা বোঝাতে গিয়ে
খাতাখানা জুড়ে
বকুনি যা হোলো জমা
আর্টের দেবী
করিবে কি তারে ক্ষমা।
সত্য কথাটা
উচিত কবুল করা ;
রব যে উঠেছে
রবিরে ধরেছে জরা,
তারি প্রতিবাদ
করি এই তাল ঠুকে ;
তাই ব'কে যাই
যত কথা আসে মুখে।
এ যেন কলপ
চুলে লাগাবার কাজ,
ভিতরেতে পাকা
বাহিরে কাঁচার সাজ।
ক্ষীণ কণ্ঠেতে
জোর দিয়ে তাই দেখাই
বক্‌বে কি শুধু
নাৎনি জনেরা একাই !
মান্‌ব না হার
কোনো মুখরার কাছে,
সেই গুমোরের
আজো ঢের বাকি আছে॥

অপরাজিত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালিম্পং
৬ই আষাঢ় ১৩৪৫

শিল্প ও ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

২। কর্ম্মবীর আলামোহন দাস

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

অবতরণিকা

দীর্ঘকাল হইতে আমি নানা প্রবন্ধ, পুস্তিকা বক্তৃতা ও অভিভাষণে একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া আসিতেছি যে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ না করিলে বাঙ্গালী যুবকগণের এই নিদারুণ অন্নসমস্যার কোন সমাধান হইতে পারে না। ইহার কোন ফল আদৌ হইয়াছে কি না জানি না। তবে আজও দেখিতেছি বাঙ্গালা দেশের ১৩০০ বা ততোধিক স্কুল হইতে ৩০ হাজার ছাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতেছে এবং প্রায় ২৫।২৬ হাজার ছাত্র পাস করিতেছে। ইহাদের অধিকাংশই আবার সনাতন প্রথায় কলেজে

ঢুকিতেছে এবং যথাসময়ে, গ্র্যাজুয়েট হইয়া হা-চাকুরী হা-চাকুরী করিয়া ফিরিতেছে। এখনও কামার কুমার বারুজীবী অথবা সাধারণ গৃহস্থের ছেলেরা এই সকল বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, এমন কি এই সকল উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াই পিতৃপিতামহের ব্যবসাবৃত্তিকে কৃপার চক্ষে দেখিতে শুরু করিতেছে। কলেজের ত কথাই নাই—স্কুল হইতে বাহির হইয়া অভিভাবকগণের গলগ্রহস্বরূপ, একটি ফতুয়া বা গেঞ্জি গায়ে ও স্যাণ্ডেল পায়ে আড্ডা দিয়া নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে দিন কাটাইয়া দিতেছে। এই সময় সামান্য দশ-পনর টাকার একটি চাকুরী পাইলেও তাহারা নিজেদের ধন্য মনে করে। আমি এই সব চাকুরী-অন্বেষী যুবকগণকে প্রায়ই বলি, "আচ্ছা! সমগ্র বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশের দূরতম প্রান্তেও অবাঙ্গালী, বিশেষতঃ মাড়োয়ারী, ব্যবসায়ীরা যখন ব্যবসা করিয়া কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিতেছে দেখিতে পাইতেছ, তখন এই প্রকার চাকুরী না খুঁজিয়া ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ কর না কেন?" বলা বাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই উত্তর শুনিতে পাই, "ব্যবসা করিব, মূলধন পাইব কোথায়?" আমি বলি, "তোমরা কি চাও যে আকাশ হইতে মূলধন ঝুপ ঝুপ করিয়া তোমাদের হাতে আসিয়া পড়িবে? ব্যবসায়ে কি শিক্ষানবীশীর কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া তোমরা মনে কর?" বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারা ভুলিয়া যান যে রেলওয়ে হইবার পূর্ব্বে মাড়োয়ারীরা সুদূর রাজপুতানার মরুপ্রান্তর হইতে পদব্রজে বাঙ্গালায় আসিয়াছে এবং সত্য সত্যই লোটাকম্বল-মাত্র-সম্বল এই সমস্ত ভাগ্যান্বেষী দিনান্তে এক পয়সার ছাতু খাইয়া পিঠে এক মণ দেড় মণ ভার বহিয়া ফেরী করিয়া বেড়াইয়াছে। কায়িক পরিশ্রমলব্ধ অর্থ দিনের পর দিন সঞ্চয় করিয়া ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ এবং বৃহৎ হইতে বৃহত্তর ব্যবসায়ের পত্তন করিয়াছে এবং পূর্ব্বলব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে দিন-দিন ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। ১৯০৫ সালে স্বদেশী-আন্দোলনের সময় হইতে দেখিতেছি অনেক ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোক টাকা তুলিয়া দিয়াছেন, আর আমাদের নন্দদুলাল যুবকগণ সেই টাকায় ঘরদুয়ার সাজাইয়া, টেবিল-চেয়ার গুছাইয়া মহা আড়ম্বরে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে,—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুই-এক বৎসরের মধ্যেই লোকসান দিয়া এই সব অনভিজ্ঞ, আরামপ্রিয় যুবক ব্যবসা গুটাইয়া ফেলিয়াছেন এবং গড্ডলিকা-প্রবাহে আপনাকে মিশাইয়া দিয়া চিরাচরিত প্রথায় পুনরায় চাকুরী-অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম হইতেই অর্থাৎ বিগত ১৭৫ বৎসরে ক্রমাগত ছয়-সাত পুরুষ ধরিয়া বাঙ্গালী কেবল চাকুরী ওকালতি অথবা ডাক্তারি করিতে শিখিয়াছে, তাই চাকুরী করিবার প্রেরণা তাহার অস্থিমজ্জায় একটা সহজ সংস্কারের মত মিশিয়া গিয়াছে! এই সংস্কারের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যে নিশ্চিত ধ্বংস, স্বপ্নাবিষ্ট এ জাতি তাহা কবে বুঝিবে—মোটে বুঝিবে কি না কে জানে? রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার প্রমুখ মহাত্মাগণের অক্লান্ত চেষ্টায় যখন হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়, তখন হইতেই বাঙ্গালা দেশে ইংরেজী শিক্ষার একটা নূতন উদ্দীপনা বাঙ্গালীর চিত্ত জয় করিয়া ফেলিল।* প্রথম অবস্থায় এদিকে একটা বিশেষ প্রলোভনও ছিল যে ইংরেজী শিখিলেই বড় চাকুরী মিলিবে। যখন বাঙ্গালায় এই জাগরণের সূত্রপাত হয় তখনও সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অনেক অংশই ব্রিটিশ-শাসনের বাহিরে। ক্রমে ক্রমে নূতন নূতন প্রদেশ ইংরেজ করতলস্থ হইতে লাগিল আর প্রত্যেক স্থানেই আদালত সেক্রেটারিয়েট প্রভৃতি গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই ভাবে ক্রমশঃ যখন উকীল, মোক্তার, জজ, মুন্সেফ, ডেপুটি, ডাক্তার এবং উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীর চাহিদা বাড়িতে লাগিল, তখন বাঙ্গালীরা ইংরেজীশিক্ষিত হইয়া ওঠায় সহজেই চাকুরী পাইতে লাগিল। ইহার ফলে বাঙ্গালী বুঝিল ইংরেজীতে উচ্চশিক্ষিত হওয়াই জীবনোপায় অবলম্বনের প্রথম এবং প্রধান পথ। প্রাচীন হিন্দু কলেজের জুনিয়র ও সীনিয়র স্কলারশিপ উঠিয়া গিয়া ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন

* ইংরেজী শিখিবার প্রয়োজন তখন ছিল, এখনও আছে। তাহার বিরুদ্ধে অভিযান এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য নহে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল তখন বিহার, যুক্ত-প্রদেশ, পঞ্জাব প্রভৃতি সমগ্র উত্তর-ভারত এবং ব্রহ্মদেশ ও সিংহল পর্য্যন্ত ইহার অধীনে ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরও কিছু দিন পর্য্যন্ত ইহার বিভিন্ন ফ্যাকাল্‌টি হইতে শিক্ষিত ব্যবহারজীবী, ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি চাকুরী পাইতে লাগিলেন। বর্ত্তমানে বিভিন্ন প্রদেশে এক বা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকেই যেন পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করিতেছে। সুতরাং বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষেত্র স্বাভাবিক নিয়মে সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। এমন কি বাঙ্গালা দেশেই ৩০।৪০ টাকা বেতনেরও একটা সরকারী চাকুরীর জন্য পনর-ষোল শত প্রার্থী দেখা যায়! চাকুরীর এই অবস্থায় চাকুরীজীবী বাঙ্গালী জাতি ক্রমশঃ অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে, ইহা সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

এই উদ্যমহীন আশাহত মসীজীবী বাঙ্গালী জীবনেও দৈবক্রমে মাঝে মাঝে এমন এক-একটি পুরুষের আবির্ভাব হয় যে তাঁহার জীবনী ও কার্য্যাবলী আলোচনা করিলেও হতাশ বাঙ্গালী যুবকগণের মনে কথঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইতে পারে। আজ এইরূপ এক জনের জীবনকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিয়া এই ভূমিকা করিতে বাধ্য হইলাম। বস্তুতঃ এমন একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বাঙ্গালার নভোমণ্ডলে উদিত হইয়াছে যে, যদিও তাহার প্রভা এত দিন মেঘের আড়ালে প্রচ্ছন্ন ছিল, আজ তাহার স্নিগ্ধ কিরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে।

গত দুই বৎসর ধরিয়া অনেকে আমার নিকট আনাগোনা করিয়া আমাকে বলিয়াছেন যে, আলামোহন দাস নামে এক ভদ্রলোক হাওড়ার পশ্চিমে ব্যাঁটরা নামক স্থানে একটি কারখানা স্থাপন করিয়া পাটকলের ও ছাপাখানার ইত্যাদির যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট এ-কথাও শুনিয়াছি যে, এই কারখানার সকল কর্ম্মীই বাঙ্গালী এবং কেবলমাত্র বাঙ্গালীর দ্বারা এই কারখানা পরিচালিত হইবে, ইহাই কর্ম্মকর্ত্তার উদ্দেশ্য। এই দেশে এইখানকার কলকারখানায় পাটকলের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইবে—আর তাহারই দ্বারা সত্য সত্যই কোন পাটকল চলিবে, ইহা আমার মনে তখন নিতান্তই অলীক স্বপ্নবৎ মনে হইয়াছে। আমার মনে ইহা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয় বলিয়াই ধারণা জন্মিয়াছে।

বস্তুতঃ আমি অনেক সময়েই বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছি যে, "এই ক্ষ্যাপা লোকটিকে ধরিয়া পাগলা-গারদে পাঠাইয়া দাও!" তখন আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে 'নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি' শীর্ষক পুস্তিকায় আমি নিজেই লিখিয়াছিলাম যে, জগতে যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু বৃহৎ, তাহা ক্ষ্যাপা মাথা-পাগলা লোকদের দ্বারাই সাধিত হইয়াছে ইত্যাদি। যাহারা লাভ-লোকসান, হারজিৎ নিক্তিতে ওজন করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে চায়, তাহারা কখনও কোনও বৃহত্তর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে না এবং এই কারণেই বাঙ্গালী কখনও ব্যবসা করিতে পারিল না! ব্যবসা করিতে হইলেই অনিশ্চিতের পথে পা খানিকটা বাড়াইতে হইবে—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা কোম্পানীর কাগজের শতকরা ২৸০ বা ৩ টাকা নিশ্চিত আয়ের মোহ না কাটিলে ব্যবসা করিবার উপায় কোথায়?

গত পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় বস্ত্রশিল্পের কথঞ্চিৎ উন্নতি ও প্রসার লাভ হইয়াছে এবং ইহার অনেকগুলি কলকারখানার সহিত আমি জড়িত আছি। ইহা ব্যতীত কলিকাতার সন্নিকটে হুগলী নদীর দুই পাশে বজবজ হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত ইউরোপীয়-পরিচালিত ৬৫।৭০টি বড় বড় পাটের কল আছে এবং কয়েক বৎসর হইল ভারতীয়গণেরও ১০।১১টি (মাড়োয়ারী বা অবাঙ্গালী-গণের ৭।৮টি, ও বাঙ্গালীগণের ২।৩টি) পাটকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইদানীং বিহারে ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অনেকগুলি চিনির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে (বাঙ্গালায়ও অবাঙ্গালীগণ-প্রতিষ্ঠিত ৩।৪টি কার-খানা আছে)। সমগ্র ভারতবর্ষে ছোট-বড় আরও অনেক কারখানা আছে।

আমাদের দেশে যে-কোন কারখানা স্থাপন করিতে হইলেই কারখানা-প্রতি গড়ে ১০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। নিম্নে উদ্ধৃত

তালিকা* হইতে সহজেই বোঝা যাইবে কলকারখানা স্থাপন করিতে হইলে আমাদিগকে কি পরিমাণ অর্থ ভারতের বাহিরে পাঠাইতে হয়।

বিগত ৫ বৎসরে ভারতের মোট আমদানী যন্ত্রপাতির মূল্য

১৯৩৩-৩৪	১২৭৬৯৩০০০৲
১৯৩৪-৩৫	১২৬৩২০০০০৲
১৯৩৫-৩৬	১৩৮৭১০০৮০৲
১৯৩৬-৩৭	১৪৩০৯৭৪৫৮৲
১৯৩৭-৩৮	১৭৩৪২৯৪৮০৲

আমদানী প্রধান প্রধান কলকব্জাসমূহের
তুলনামূলক তালিকা :
লক্ষ টাকায়

কলকব্জার শ্রেণী	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৫-৩৬	১৯৩৬-৩৭	১৯৩৭-৩৮
অবৈদ্যুতিক মোটর	১২১	১৪৪	১৫৭	১৬৫	১৬৯
বৈদ্যুতিক কলকব্জা	১২৭	১৬৯	২০৫	২৫৫	২৬৯
বয়লার	৬৬	৪৪	৭৬	৮৭	১১৬
ধাতুদ্রব্যের যন্ত্রাদি	১৬	১৪	১৮	৩০	৩৬
খনিতে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি	৩২	৫২	৪১	৭৪	১৭
তৈল নিষ্কাষণ ও পরিশোধক যন্ত্র	২৭	২১	২২	২৮	২৩
কাগজের কল	১১	৯	৮	৮	৪৫
রেফ্রিজারেটার	৯	১১	১৫	১৬	২৮
চাউল ও ময়দার কল	৭	১০	৯	৮	৯
করাত ও কাঠের কল	৩	৩	৫	৫	৪
সীবন যন্ত্র	৫০	৮৩	৭৪	৬১	৮২
চিনির কল	৩৩৬	১০৫	৬৬	৯৫	৭০
চায়ের কল	১২	২২	১৩	১৫	২১
কাপড়ের কল	২০৩	২৪১	২০০	১৮১	২৯২
পাটকল	৩২	৫৪	১১৫	৭৪	১০৬
টাইপরাইটার ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি	১০	১৮	১৯	১৯	২২
পশমের কল	৩	২	৪	৩	৫২
ছাপাখানার কল	১৫	১৫	১৭	১৮	১৮

উপরি উদ্ধৃত তালিকা হইতে সহজেই বোঝা যাইবে প্রথম সূচনাতেই লক্ষ লক্ষ টাকা ভারতের বাহিরে না পাঠাইয়া কোন কলকারখানা স্থাপন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কলকব্জার জন্য এই প্রকারে ষোল আনা পরনির্ভরশীল থাকিলে যে দেশীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। দেশে কলকব্জা যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা থাকিলে প্রথমতঃ ঐগুলি সুলভ হইতে পারিত বলিয়া এক দিকে যেমন কলকারখানার প্রসার লাভ হইত, অন্য দিকে তেমনই বহুসংখ্যক লোক এই সব কলকব্জা-নির্ম্মাণকারী কারখানাগুলিতে কাজ করিয়া অন্নসমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান করিতে পারিত। জাপান তাহার নব জাগরণের সূচনাতেই এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই মাত্র ৬০।৬৫ বৎসরের মধ্যে নিজের বিরাট্ শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে এবং বিবিধ যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, ও শিল্পসম্ভার দেশ-বিদেশে রপ্তানি করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিতেছে। বৃহৎ রণতরী, কামান, বিস্ফোরক, উড়ো-জাহাজ ইউরোপ ও আমেরিকার সহিত প্রতিযোগিতায় সবই আজ জাপান নিজে প্রস্তুত করিতেছে। মাত্র অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সোভিয়েট রুশিয়া কলকব্জার—তথা শিল্প ব্যাপারে বহুল পরিমাণে পরনির্ভরশীল ছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশে কলকব্জা উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া রুশিয়া যে শিল্পজগতে এক অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা সর্ব্বজনস্বীকৃত। মূলতঃ দেশে যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা প্রস্তুত করা যে মৌলিক শিল্পের অন্তর্গত তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

ভারতবর্ষকেও শিল্পোন্নতির চেষ্টা করিতে হইলে আজ হউক কাল হউক যন্ত্র ও কলকব্জা নির্মাণে মনোনিবেশ করিতে হইবে, সুতরাং যত সত্বর সম্ভব এই দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয় ততই মঙ্গল। এখানে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করিতে না পারিলে এই ভীষণ প্রতিযোগিতার যুগে যে বিদেশীর সঙ্গে আঁটিয়া উঠা যাইবে না, এই তত্ত্ব স্বকীয় সহজ বুদ্ধি বলে ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আলামোহন দাস এদিকে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আগামী সংখ্যায় আলামোহন বাবুর যে জীবন-আলেখ্য প্রকাশিত হইবে, তাহা হইতেই দেখা যাইবে তিনি শিক্ষিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নন—মাত্র ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। নানাবিধ উত্থানপতনের মধ্য দিয়া তাঁহাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে। তাঁহার ঘটনাবহুল জীবনকাহিনী প্রত্যেক বাঙালীর হৃদয় গৌরবে পূর্ণ করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আলামোহন নীরব কর্ম্মী, তিনি তাঁহার কার্য্যকলাপ ঢাক পিটাইয়া জনসমাজে প্রচার করিতে চান না; তাই অনেকেই আজ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বা তাঁহার শিল্পপ্রচেষ্টার কথা জানেন না। তাঁহার বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র ও বিরাট্ কর্ম্মপ্রচেষ্টা এত দিন "অগ্নিঃশুং যেন পাংশু জালে" আবৃত ছিল। তিনি কথাচ্ছলে এক দিন আমাকে বলিলেন, "এক কথায় বাঙালী জাতি ও তাহার উন্নতি আমার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।" এই জন্যই কিসে বাঙালী কাজ শিখিয়া উপযুক্ত হইবে ও বিশ্বের দরবারে ন্যায্য স্থান লাভ করিবে, ইহাই তাঁহার চিন্তা ও লক্ষ্য। এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই তাঁহার কারখানা পরিচালিত হয়।

*আলোচ্য তালিকাটি সাপ্তাহিক 'আর্থিক জগৎ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

আরণ্যক

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫

প্রায় তিন মাস পরে নিজের মহালে ফিরিব। সার্ভের কাজ এত দিনে শেষ হইল।

এগার ক্রোশ রাস্তা। এই পথেই সে-বার সেই পৌষ-সংক্রান্তির মেলায় আসিয়াছিলাম—সেই শাল-পলাশের বন, শিলাখণ্ড-ছড়ানো মুক্ত প্রান্তর, উঁচুনীচু শৈলমালা। ঘণ্টা-দুই চলিয়া আসিবার পরে দূরে দিগ্বলয়ের কোলে একটি ধূসর রেখা দেখা গেল—মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্ট।

এই পরিচিত দিক্‌জ্ঞাপক দৃশ্যটি আজ তিন মাস দেখি নাই। এত দিন এখানে আসিয়া আমাদের লবটুলিয়া ও নাঢ়া-বইহারের উপর এমন একটা টান জন্মিয়া গিয়াছে যেন ইহাদের ছাড়িয়া বেশী দিন কোথাও থাকিলে কষ্ট হয়, মনে হয় দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আছি। আজ তিন মাস পরে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেষ্টের সীমা-রেখা দেখিয়া প্রবাসীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আনন্দ অনুভব করিলাম। যদিও এখনও লবটুলিয়ার সীমানা এখান হইতে সাত-আট মাইল হইবে।

ছোট একটা পাহাড়ের নীচে এক জায়গায় অনেকখানি জুড়িয়া জঙ্গল কাটিয়া কুসুম-ফুলের আবাদ করিয়াছিল—এখন পাকিবার সময়, কাটুনি জনেরা ক্ষেতে কাজ করিতেছে।

আমি ক্ষেতের পাশের রাস্তা দিয়া যাইতেছি, হঠাৎ ক্ষেতের দিক্ হইতে কে আমাকে ডাকিল—বাবুজী, ও বাবুজী—বাবুজী—

চাহিয়া দেখি আর বছরের সেই মঞ্চী।

বিস্মিত হইলাম, আনন্দিতও হইলাম। ঘোড়া থামাইতেই মঞ্চী হাসিমুখে কাস্তে-হাতে ছুটিয়া আসিয়া ঘোড়ার পাশে দাঁড়াইল। বলিল—আমি দূর থেকেই ঘোড়া দেখে মালুম করেছি। কোথায় গিয়েছিলেন বাবুজী?

মঞ্চী ঠিক তেমনই আছে দেখিতে—বরং আরও একটু স্বাস্থ্যবতী হইয়াছে। কুসুম-ফুলের পাপড়ির গুঁড়া লাগিয়া তাহার হাত দু-খানা ও পরনের শাড়ীর সামনের দিক্‌টা রাঙা।

বলিলাম—বহরাবুরু পাহাড়ের নীচে কাজ পড়েছিল, সেখানে তিন মাস ছিলাম। সেখান থেকে ফিরছি। তোরা এখানে কি করছিস্?

—কুসুম-ফুল কাটছি, বাবুজী। বেলা হয়ে গিয়েছে, এবেলা নামুন এখানে। ঐ ত কাছেই খুপড়ী।

আমার কোন আপত্তি টিকিল না। মঞ্চী কাজ ফেলিয়া আমাকে তাহাদের খুপড়ীতে লইয়া চলিল। মঞ্চীর স্বামী নক্‌ছেদী ভকৎ আমার আসার সংবাদ শুনিয়া ক্ষেত হইতে আসিল।

নক্‌ছেদী ভকতের প্রথম-পক্ষের স্ত্রী খুপড়ীর মধ্যে রান্নার কাজ করিতেছিল, সেও আমাকে দেখিয়া খুশী হইল।

তবে মঞ্চী সকল কাজে অগ্রণী। সে আমার জন্য গমের খড় পাতিয়া পুরু করিয়া বসিবার আসন করিল। একটি ছোট বাটিতে মহুয়ার তৈল আনিয়া আমাকে স্নান করিয়া আসিতে বলিল।

বলিল—চলুন আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি। টোলার দক্ষিণে একটা ছোট্ট কুণ্ডী আছে। বেশ জল।

বলিলাম—সে জলে আমি নাইবো না মঞ্চী। টোলা-সুদ্ধু লোক সেই জলে কাপড় কাচে, মুখ ধোয়, স্নান করে, বাসনও মাজে। সে জল বড্ড খারাপ হবে। তোমরা কি এখানে সেই জলই খাচ্ছ? তা হ'লে আমি উঠি। ও জল আমি খাব না।

মঞ্চী ভাবনায় পড়িয়া গেল। বোঝা গেল ইহারাও সেই জল ছাড়া অন্য জল পাইবে কোথায় যে খাইবে না? না খাইয়া উপায় কি?

মঙ্গীর বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া আমার কষ্ট হইল। এই দূষিত জল ইহারা মনের আনন্দে পান করিয়া আসিতেছে, কখনও ভাবে নাই এ-জলে আবার কি থাকিতে পারে, আজ আমি যদি জলের অজুহাতে ইহাদের আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া চলিয়া যাই, সরলপ্রাণ মেয়েটি মনে বড় আঘাত পাইবে।

মঙ্গীকে বলিলাম—বেশ, ঐ জল খুব ক'রে ফুটিয়ে নাও—তবে খাব। স্নান করা থাক্ গে।

মঙ্গী বলিল—কেন বাবুজী, আমি আপনাকে এক টিন জল ফুটিয়ে দিচ্ছি, তাতেই আপনি স্নান করুন। এখনও তেমন বেলা হয় নি। আমি জল নিয়ে আসছি, বসুন।

মঙ্গী জল আনিয়া রান্নার জোগাড় করিয়া দিল। বলিল—আমার হাতে ত খাবেন না বাবুজী, আপনি নিজেই রাঁধুন তবে?

—কেন খাব না? তুমি যা পার তাই রাঁধ।

—তা হবে না বাবুজী, আপনিই রাঁধুন। এক দিনের জন্যে আপনার জাত কেন মারব? আমার পাপ হবে।

—কিছু হবে না। আমি তোমাকে বলছি, এতে কোন দোষ হবে না।

অগত্যা মঙ্গী রাঁধিতে বসিল। রাঁধিবার আয়োজন বিশেষ কিছু নয়—খানকতক মোটা মোটা হাতে-গড়া রুটি ও বুনো ধুঁধুঁলের তরকারি। নক্‌ছেদী কোথা হইতে এক ভাঁড় মহিষের দুধ জোগাড় করিয়া আনিল।

রাঁধিতে বসিয়া মঙ্গী এত দিন কোথায় কোথায় ঘুরিয়াছে সে গল্প করিতে লাগিল। পাহাড়ের জঙ্গলে কলাই কাটিতে গিয়া একটা রামছাগলের বাচ্চা পুষিয়াছিল, সেটা কি করিয়া হারাইয়া গেল সে-গল্পও আমাকে ঠায় বসিয়া শুনিতে হইল।

আমায় বলিল—বাবুজী, কাকোয়াড়া-রাজের জমিদারীতে যে গরম জলের কুণ্ড আছে জানেন? আপনি ত কাছাকাছি গিয়েছিলেন, সেখানে যান নি?

আমি বলিলাম—কুণ্ডের কথা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু সেখানে যাওয়া আমার ঘটে নাই।

মঙ্গী বলিল—জানেন বাবুজী, আমি সেখানে নাইতে গিয়ে মার খেয়েছিলাম। আমাকে নাইতে দেয় নি।

মঙ্গীর স্বামী বলিল—হাঁ, সে এক কাণ্ড বাবুজী ভারী বদমাইস্ সেখানকার পাণ্ডার দল।

বলিলাম—ব্যাপারখানা কি?

মঙ্গী স্বামীকে বলিল—তুমি বল না বাবুজীকে বাবুজী কলকাতায় থাকেন, উনি লিখে দেবেন। তখন বদমাইস গুণ্ডারা মজা টের পাবে।

নক্‌ছেদী বলিল—বাবুজী, ওর মধ্যে সুরয কুণ্ড খুব ভাল জায়গা। যাত্রীরা সেখানে স্নান করে। আমরা আম্‌লাতলীর পাহাড়ের নীচে কলাই কাটছিলাম, পূর্ণিমার যোগ পড়লো কি না? মঙ্গী নাইতে গেল ক্ষেতের কাজ বন্ধ রেখে। আমার সেদিন জ্বর, আমি নাইবো না। বড়বৌ তুলসীও গেল না, ওর তত ধর্ম্মের বাতিক নেই। মঙ্গী সুরয কুণ্ডে নামতে যাচ্ছে, পাণ্ডারা বলেছে—এই ওখানে কেন নামচিস্? ও বলছে—জলে নাইবো। তারা বলেছে—তুই কি জাত? ও বলেছে—গাঙ্গোতা। তখন তারা বলেছে—গাঙ্গোতীনকে আমরা নাইতে দিই নে কুণ্ডের জলে, চলে যা। ও তো জানেন তেজী মেয়ে। ও বলেছে—এ তো পাহাড়ী ঝরণা, যে-সে নাইতে পারে। ঐ ত কত লোক নাইছে। ওরা কি সকলে ব্রাহ্মণ আর ছত্রী? ব'লে যেমন নামতে গিয়েছে, দু-জন ছুটে এসে ওকে টেনে হিঁচড়ে মারতে মারতে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলে। ও কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল।

—তার পর কি হ'ল?

—কি হবে বাবুজী? আমরা গরীব গাঙ্গোতা কাটুনি মজুর। আমাদের ফরিয়াদ কে শুনবে? আমি বলি, কাঁদিস্ নে, তোকে আমি মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে নাইয়ে আনবো।

মঙ্গী বলিল—বাবুজী, আপনি একটু লিখে দেবেন তো কথাটা? আপনাদের—বাঙালী বাবুদের—কলমের খুব জোর। পাজিগুলো জব্দ হয়ে যাবে।

উৎসাহের সহিত বলিলাম—নিশ্চয়ই লিখবো।

তাহার পর মঙ্গী পরম যত্নে আমায় খাওয়াইল। বড় ভাল লাগিল তাহার আগ্রহ ও সেবাযত্ন।

বিদায় লইবার সময় তাহাকে বার-বার বলিলাম—সামনের বৈশাখ মাসে যব গম কাটুনির সময় তারা যেন নিশ্চয়ই আমাদের লবটুলিয়া-বইহারে যায়।

মঞ্চী বলিল—ঠিক যাব বাবুজী। সে কি আপনাকে বলতে হবে?

মঞ্চীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিবার সময় মনে হইল আনন্দ, স্বাস্থ্য ও সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি যেন সে। এই বনভূমির সে যেন বনলক্ষ্মী, পরিপূর্ণযৌবনা, প্রাণময়ী, তেজস্বিনী অথচ মুগ্ধা, অনভিজ্ঞা, বালিকাস্বভাবা।

বাঙালীর কলমের উপর অসীম নির্ভরশীলা এই বন্য মেয়েটির নিকট সেদিন যে অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছিলাম, আজ তাহা পালন করিলাম—জানি না ইহাতে এত কাল পরে তাহার কি উপকার হইবে…এত দিন সে কোথায়, কি ভাবে আছে, বাঁচিয়া আছে কি না, তাহাই বা কে জানে?

শ্রাবণ মাস। নবীন মেঘে ঢল নামিয়াছে অনেক দিন, নাঢ়া ও লবটুলিয়া-বইহারে কিংবা গ্রাণ্ট সাহেবের বটতলায় দাঁড়াইয়া চারি দিকে চাও, শুধুই দেখ সবুজের সমুদ্রের মত নবীন, কচি কাশবন!

এক দিন রাজা দোবরু পান্নার চিঠি পাইয়া শ্রাবণ-পূর্ণিমায় তাঁর ওখানে ঝুলনোৎসবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিলাম। রাজু ও মটুকনাথ ছাড়িল না, আমার সঙ্গে তাহারাও চলিল। হাঁটিয়া যাইবে বলিয়া উহারা রওনা হইল আমার আগেই।

বেলা দেড়টার সময় ডোঙার মিছি নদী পার হইলাম। দলের সকলের পার হইতে আড়াইটা বাজিয়া গেল। দলটি পিছনে ফেলিয়া তখন ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম। ঘন মেঘ করিয়া আসিল পশ্চিমে। তার পরেই নামিল ঝম্ ঝম্ বর্ষা।

কি অপূর্ব্ব বর্ষার দৃশ্য দেখিলাম সেই অরণ্য-প্রান্তরে! মেঘে মেঘে দিগন্তের শৈলমালা নীল, থমকানো কালো বিদ্যুৎগর্ভ মেঘে আকাশ ছাইয়া আছে, কচিৎ পথের পাশের শাল কি কেঁদ শাখায় ময়ূর পেখম মেলিয়া নৃত্য-পরায়ণ, পাহাড়ী ঝরণার জলে গ্রাম্য বালক-বালিকা মহা উৎসাহে শাল-কাটির ও বস্ত বাঁশের ঘুনি পাতিয়া কুচো মাছ ধরিতেছে, ধূসর শিলাখণ্ড ভিজিয়া কালো দেখাইতেছে, তাহার উপর মহিষের রাখাল কাঁচা শাল-পাতার লম্বা বিড়ি টানিতেছে। শান্তস্নিগ্ধ দেশ—অরণ্যের পর অরণ্য, প্রান্তরের পর প্রান্তর, শুধুই ঝরণা, পাহাড়ী গ্রাম, মকম-ছড়ানো রাঙা মাটির জমি, কচিৎ কোথাও পুষ্পিত কদম্ব বা পিয়াল বৃক্ষ।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি রাজা দোবরু পান্নার রাজধানীতে পৌঁছিয়া গেলাম।

সেবারকার সেই খড়ের ঘরখানা অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্ত চমৎকার করিয়া লেপিয়া পুঁছিয়া রাখা হইয়াছে। দেওয়ালে গিরিমাটির রং, পদ্ম গাছ ও ময়ূর আঁকা, শাল কাঠের খুঁটির গায়ে লতা ও ফুল জড়ানো। আমার বিছানা এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই, আমি ঘোড়ায় আগেই পৌঁছিয়াছিলাম—কিন্তু তাহাতে কোনো অসুবিধা হইল না। ঘরে নূতন মাদুর পাতাই ছিল, গোটা দুই ফর্সা তাকিয়াও দিয়া গেল।

একটু পরে ভানুমতী একখানা বড় পিতলের পরাতে ফলমূল কাটা ও এক বাটি জাল-দেওয়া দুধ লইয়া ঘরে ঢুকিল, তাহার পিছু পিছু আসিল একখানা কাঁচা শালপাতায় গোটা পান, গোটা সুপারি ও অন্তান্ত পানের মসলা সাজাইয়া লইয়া আর একটি তাহার বয়সী মেয়ে।

ভানুমতীর পরনে একখানা জাম-রঙের খাটো শাড়ী, হাঁটুর উপর উঠিয়াছে, গলায় সবুজ ও লাল হিংলাজের মালা, খোঁপায় জলজ স্পাইডার লিলি গোঁজা। আরও স্বাস্থ্যবতী ও লাবণ্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে ভানুমতী—নিটোল দেহে যৌবনের উচ্ছলিত লাবণ্য ডাকিয়াছে, চোখের ভাবে কিন্তু যে সরলা বালিকা দেখিয়াছিলাম, সেই সরলা বালিকাই আছে।

বলিলাম—কি ভানুমতী ভাল আছ?

ভানুমতী নমস্কার করিতে জানে না—আমার কথার উত্তরে সরল হাসি হাসিয়া বলিল—আপনি, বাবুজী?

—আমি ভাল আছি।

—কিছু খান। সারাদিন ঘোড়ায় এসে খিদে পেয়েছে খুব।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না-করিয়া সে আমার সামনে মাটির মেজেতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল ও পেতলের থালাখানা হইতে দু-খানা পেঁপের টুকরা আমার হাতে তুলিয়া দিল।

আমার ভাল লাগিল—ইহার নিঃসঙ্কোচ বন্ধুত্ব। বাংলা দেশের মানুষের কাছে ইহা কি অদ্ভুত ধরণের, অপ্রত্যাশিত ধরণের নূতন, সুন্দর, মধুর। কোনো বাঙালী কুমারী অনাত্মীয়া ষোড়শী এমন ব্যবহার করিত? মেয়েদের সম্পর্কে আমাদের মন কোথায় যেন গুটাইয়া পাকাইয়া জড়সড় হইয়া আছে সর্ব্বদা। তাহাদের সম্বন্ধে না-পারি প্রাণ খুলিয়া ভাবিতে, না-পারি তাহাদের সঙ্গে মন খুলিয়া মিশিতে।

আরও দেখিয়াছি এ-দেশের প্রান্তর যেমন উদার, অরণ্যানী, মেঘমালা, শৈলশ্রেণী যেমন মুক্ত ও দূরচ্ছন্দা—ভানুমতীর ব্যবহার তেমনি সঙ্কোচহীন, সরল, বাধাহীন। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের মত স্বাভাবিক। এমনি পাইয়াছি মঞ্চীর কাছে ও বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের স্ত্রীর কাছে। অরণ্য ও পাহাড় এদের মনকে মুক্তি দিয়াছে, দৃষ্টিকে উদার করিয়াছে—এদের ভালবাসাও সে অনুপাতে মুক্ত, দৃঢ়, উদার। মন বড় বলিয়া এদের ভালবাসাও বড়।

কিন্তু ভানুমতীর কাছে বসিয়া হাতে তুলিয়া দিয়া খাওয়ানোর তুলনা হয় না! জীবনে সেদিন সর্ব্বপ্রথম আমি অনুভব করিলাম নারীর নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারের মাধুর্য্য। সে যখন স্নেহ করে, তখন সে কি স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দেয় পৃথিবীতে!

ভানুমতীর মধ্যে যে আদিম নারী আছে, সভ্য সমাজে সে-নারীর আত্মা সংস্কারের ও বন্ধনের চাপে মূর্চ্ছিত।

সে-বার যে-রকম ব্যবহার পাইয়াছিলাম, এবারকার ব্যবহার তার চেয়েও আপন, ভানুমতী বুঝিতে পারিয়াছে এ বাঙালী বাবু তাদের পরিবারের বন্ধু, তাদেরই শুভাকাঙ্ক্ষী আপনার লোকদের মধ্যে গণ্য—সুতরাং যে-ব্যবহার তাহার নিকট পাইলাম তাহা নিজের স্নেহময়ী ভগ্নীর মতই।

অনেক কাল হইয়া গিয়াছে—কিন্তু ভানুমতীর এই সুন্দর প্রীতি ও বন্ধুত্বের কথা আমার স্মৃতিপটে তেমনি সমুজ্জ্বল—বন্য অসভ্যতার এই দানের নিকট সভ্য সমাজের বহু সম্পদ্ আমার মনে নিষ্প্রভ হইয়া আছে।

রাজা দোবরু উৎসবের জন্য আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন, এইবার আসিয়া আমার ঘরে বসিলেন।

আমি বলিলাম—ঝুলন কি আপনাদের এখানে বরাবর হয়?

রাজা দোবরু বলিলেন—আমাদের বংশে বহু দিনের উৎসব এইটি। এ সময় অনেক দূর থেকে আত্মীয়স্বজন আসে ঝুলনে নাচতে। আড়াই মণ চাল রান্না হবে কাল।

মটুকনাথ আসিয়াছে পণ্ডিত-বিদায়ের লোভে—ভাবিয়াছিল কত বড় রাজবাড়ী, কি কাণ্ডই আসিয়া দেখিবে! তাহার মুখের ভাবে মনে হইল সে বেশ একটু নিরাশ হইয়াছে। এ রাজবাড়ী অপেক্ষা তাহার টোলগৃহ যে অনেক ভাল।

রাজু তো মনের কথা চাপিতে না পারিয়া স্পষ্টই বলিল—রাজা কোথায় হুজুর, এ তো এক সাঁওতাল-সর্দ্দার! আমার যে ক'টা মহিষ আছে, রাজার শুনলাম তাও নেই, হুজুর। সে ইহারই মধ্যে রাজার পার্থিব সম্পদের বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছে,—গরু মহিষ এদেশে সে সম্পদের বড় মাপকাঠি। যার যত মহিষ, সে তত বড়লোক।

কিন্তু পরদিনের ঝুলনোৎসব দেখিয়া মটুকনাথ, রাজু এমন কি যুগেশ্বর সিং পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল।

যাহা দেখিলাম—তাহার আবেদন এত সূক্ষ্ম ও মর্ম্মস্পর্শী, তাহার সৌন্দর্য্য এত সুকুমার, জানি না ভাষা দ্বারা তাহা বুঝাইতে পারিব কি না।

গভীর রাত্রে চতুর্দ্দশীর জ্যোৎস্না বনের বড় বড় গাছপালার আড়ালে উঠিয়া যখন সেই বন্য গ্রামের গৃহস্থ-বাড়ীর প্রাঙ্গণে আলো-আঁধারের জাল বুনিয়াছে, তখন শুনিলাম রাজবাড়ীতে বহু নারীকণ্ঠের সম্মিলিত এক অদ্ভুত ধরণের গান। কাল ঝুলন-পূর্ণিমা, রাজ-বাড়ীতে নবাগত কুটুম্বিনী ও রাজকন্যার সহচরীগণ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ত্রয়ী

শ্রীচিন্তামণি কর

কন্যকার নাচগানের মহলা দিতেছে। সারারাত ধরিয়া তাহাদের গান ও মাদল বাজনা থামিল না।

শুনিতে শুনিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, ঘুমের মধ্যেও ওদের সেই গান কতবার যেন শুনিতে পাইতেছিলাম।

পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি ভানুমতীর বয়সী কুমারী মেয়েই অন্ততঃ ত্রিশ জন চারি পাশের বহু টোলা ও পাহাড়ী বস্তি হইতে উৎসব উপলক্ষে আসিয়া জুটিয়াছে। একটি ভাল প্রথা দেখিলাম এত নাচগানের মধ্যে ইহাদের কেহই মহুয়ার মদ খায় নাই। রাজা দোবরুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি হাসিয়া গর্ব্বের সুরে বলিলেন—আমাদের বংশে মেয়েদের মধ্যে ও নিয়ম নেই। আমরা খাই, কিন্তু ঝুলনের সময় নয়। তা ছাড়া আমি হুকুম না দিলে, কারো সাধ্যি নেই আমার বা আমার ছেলেমেয়ের সামনে মদ খায়। সে বেয়াদবি কেউ করবে না বাবুজী।

মটুকনাথ দুপুর বেলা আমায় চুপি চুপি বলিল—যা ভেবে এসেছিলাম হুজুর, তার কোনো আশাই নেই। ভেবেছিলাম টোলের জন্যে কিছু সাহায্য চাইব। রাজা দেখছি আমার চেয়েও গরীব। রাঁধবার জন্যে দিয়েছে মোটা রাঙা চাল, আর পাকা চাল-কুমড়ো, আর বুনো ধুঁধুল। এতগুলো লোকের জন্যে কি রাঁধি বলুন তো? তা আবার সর্ষের তেল জোটে নি, দিয়েছে মহুয়ার তেল।

সারা সকাল ভানুমতীর দেখা পাই নাই—খাইতে বসিয়াছি সে এক বাটি দুধ আনিয়া আমার সামনে বসিল।

বলিলাম—তোমাদের গান কাল রাত্রে বেশ লাগছিল।

ভানুমতী হাসিমুখে বলিল—আমাদের গান বুঝতে পারেন?

বলিলাম—কেন পারব না? এত দিন তোমাদের সঙ্গে আছি, তোমাদের গান বুঝব না কেন?

—আজ ও-বেলা আপনি ঝুলন দেখতে যাবেন ত?

—সে জন্যেই ত এসেছি। কত দূর যেতে হবে?

ভানুমতী উত্তর দিকের ধন্‌ঝরি পাহাড়শ্রেণীর দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—আপনি ত গিয়েছেন ও পাহাড়ে। আমাদের সেই মন্দির দেখেন নি?

এই সময় ভানুমতীর বয়সী এক দল কিশোরী মেয়ে আমার খাবার ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বাঙালী বাবুর ভোজন পরম কৌতূহলের সহিত দেখিতে এবং পরস্পরে কি বলাবলি করিতে লাগিল।

ভানুমতী বলিল—যা সব এখান থেকে, এখানে কি?

একটি মেয়ের সাহস অন্য মেয়েদের চেয়ে বেশী, সে একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল—বাবুজীকে ঝুলনের দিন নুন করমচা খেতে দিস্ নি ত?

তাহার এ কথায় পিছনের সব মেয়ে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া এ উহার গায়ে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ভানুমতীকে বলিলাম—ওরা হাসছে কেন?

ভানুমতী সলজ্জ মুখে বলিল—ওদের জিজ্ঞেস করুন। আমি কি জানি?

ইতিমধ্যে একটি মেয়ে বড় একটা পাকা কামরাঙা লঙ্কা আনিয়া আমার পাতে দিয়া হাসিয়া বলিল—খান বাবুজী একটু লঙ্কার আচার। ভানুমতী শুধু আপনাকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে, তা ত হবে না। আমরা একটু ঝাল খাওয়াই।

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল। এতগুলি তরুণীর মুখের সরল হাসিতে দিনমানেই যেন পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-স্রোত ফুটিয়া উঠিয়াছে!

সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক দল তরুণ তরুণী পাহাড়ের দিকে রওনা হইল—তাহাদের পিছু পিছু আমরাও গেলাম—সে এক প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা! পূর্ব্বদিকে নওয়াদা লছমীপুরার সীমানায় ধন্‌ঝরি পাহাড়, যে-পাহাড়ের নীচে মিছি নদী উত্তরবাহিনী হইয়াছে সে-পাহাড়ের বনশীর্ষে পূর্ণচন্দ্র উঠিতেছে, এক দিকে নীচু উপত্যকা, বনে বনে সবুজ, অন্য দিকে ধন্‌ঝরি শৈলমালা। মাইল-খানেক হাঁটিয়া আমরা পাহাড়ের পাদদেশে আসিয়া পৌছিলাম। কিছু দূর উঠিতে একটা সমতল স্থান পাহাড়ের মাথায়। জায়গাটার ঠিক মাঝখানে একটা প্রাচীন পিয়াল-গাছ—গাছের গুঁড়ি ফুলে ও লতায় জড়ান। রাজা দোবরু

বলিলেন—এই গাছ অনেক কালের পুরনো—আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি এই গাছের তলায় ঝুলনের সময় মেয়েরা নাচে।

আমরা এক পাশে তালপাতার চেটাই পাতিয়া বসিলাম আর সেই পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনান্তস্থলীতে প্রায় ত্রিশটি কিশোরী তরুণী গাছটিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল—আর পাশে পাশে মাদল বাজাইয়া এক দল যুবক তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। ভানুমতীকে দেখিলাম এই দলের পুরোভাগে। মেয়েদের খোঁপায় ফুলের মালা, গায়ে ফুলের গহনা।...

কত রাত পর্য্যন্ত সমান ভাবে নাচ ও গান চলিল...মাঝে মাঝে দলটি একটু বিশ্রাম করিয়া লয় আবার আরম্ভ করে... মাদলের বোল, জ্যোৎস্না, বর্ষাস্নিগ্ধ বনভূমি, সুঠাম শ্যামা, নৃত্যপরায়ণা তরুণীর দল—সব মিলিয়া কোনো বড় শিল্পীর অঙ্কিত একখানি ছবির মত তা সুশ্রী—একটি মধুর সঙ্গীতের মত তার আকুল আবেদন। মনে পড়ে দূর ইতিহাসের সোলাঙ্কি-রাজকন্যা ও তার সহচরীগণের এমনি ঝুলন নাচ ও গানের কথা, মনে পড়ে রাখাল বালক বাপ্পাদিত্যকে খেলার ছলে মাল্যদানের কথা।

আজু কি আনন্দ, আজু কি আনন্দ
ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ,

তার চেয়েও বহু দূরের অতীতে, প্রাচীন যুগের প্রস্তর-যুগের ভারতের রহস্যাচ্ছন্ন ইতিহাসের সকল ঘটনা যেন আবার সম্মুখে অভিনীত হইতে দেখিলাম... আদিম [illegible] সে সংস্কৃতি যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে সরলা পর্ব্বতবালা, ভানুমতী ও তাহার সখীগণের নৃত্যে... হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বের সে ভারতে এমনি কত বন, কত শৈলমালা, এমনিতর কত জ্যোৎস্নারাত্রি, ভানুমতীর মত কত বালিকার নৃত্যচঞ্চল চরণের ছন্দে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তাদের মুখের সে সব হাসি আজও মরে নাই—এই সব গুপ্ত অরণ্য ও শৈলমালার আড়ালে তারা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণের রক্তে আজও আনন্দ ও উৎসাহের বাণী পাঠাইয়া দিতেছে।

গভীর রাত্রি। চাঁদ চলিয়া পড়িয়াছে পশ্চিম দিকের দূর বনের পিছনে। আমরা সবাই পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলাম। সুখের বিষয় আজ আকাশে মেঘ নাই, কিন্তু আর্দ্র বাতাস শেষরাত্রে অত্যন্ত শীতল হইয়া উঠিয়াছে। অত রাত্রেও আমি খাইতে বসিলে ভানুমতী দুধ ও পেঁড়া আনিল।

আমি বলিলাম—বড় চমৎকার নাচ দেখলাম তোমাদের।

সে সলজ্জ হাসিমুখে বলিল—আপনার কি আর ভাল লাগবে বাবুজী—আপনাদের কলকাতায় ওসব কি কেউ দ্যাখে?

পরদিন ভানুমতী ও তাহার প্রপিতামহ রাজা দোবরু আমায় কিছুতেই আসিতে দিবে না। অথচ আমার কাজ ফেলিয়া থাকিলে চলে না, বাধ্য হইয়া চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় ভানুমতী বলিল—বাবুজী, কলকাতা থেকে আমার জন্যে একখানা আয়না এনে দেবেন? আমার আয়না একখানা ছিল, অনেক দিন ভেঙে গিয়েছে।

ষোল বছর বয়সের সুশ্রী নবযৌবনা কিশোরীর আয়নার অভাব? তবে আয়নার সৃষ্টি হইয়াছে কাদের জন্যে? এক সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ণিয়া হইতে একখানা ভাল আয়না আনাইয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। ক্রমশঃ

চণ্ডালিকা

শ্রীপ্রতিমা দেবী

শান্তিনিকেতনে নৃত্য-প্রেক্ষণালয়ে চণ্ডালিকার নূতন চেহারা দেখা গেল। রসপিপাসুদের সাগ্রহচিত্ত আর একবার অনুভব করল নৃত্যজগতের সৃষ্টি কাকে বলে। এবার আর চিত্রাঙ্গদার সাঙ্গীতিক আবেদন নয়। মনঃপ্রকৃতির দ্বন্দ্বকে সুর ও তালের ছন্দে দেহের ভঙ্গিমায় প্রকাশ করবার যে আঙ্গিক তারই অপূর্ব দয়বেশ-মূর্ত্তি রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল। প্রাচীন দক্ষিণী নৃত্যের নাট্যকলাকে অঙ্গীভূত ক'রে ভারতের বর্তমান নৃত্যকলায় আমরা কী চেহারা ফোটাতে পারি তারই আভাস চণ্ডালিকায় পাওয়া গেছে। নৃত্যনাট্য জিনিষটা চিত্রাঙ্গদার সময় থেকে আমাদের দেশে বোধ হয় প্রথম শুরু হ'ল। যদিও দক্ষিণে মহাভারত- ও রামায়ণ- কথা নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে অভিনীত হয়ে থাকে কিন্তু তার পদ্ধতি অন্যরূপ। এক জায়গায় তার সৃষ্টির সীমা টানা আছে। প্রথাগত বন্ধনের মধ্যে পড়ে নৃত্যকলার সৃষ্টিশক্তি সেখানে সংকীর্ণ। নূতন সৃষ্টির কাজে আর্টিষ্টদের অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতা থাকা চাই, যাতে তাঁরা অবাধে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। নাটকীয় রস নিবিড় করে তুলতে গেলে বাঁধা ভঙ্গীর নিয়মাবলী মেনে চলা যায় না। সেই জন্য চণ্ডালিকায় অধিকাংশ জায়গাতে স্বাভাবিক ভঙ্গীগুলিকে তালের কোঠায় ফেলা হয়েছে। কথাকলির প্রাচীন মুদ্রাগুলি ঐতিহাসিক দিক থেকে ঔৎসুক্যজনক হলেও বর্তমান যুগে তার সংবেদন অত্যন্ত পরিমিত এবং তার অনেকগুলি মুদ্রা ব্যাখ্যা ছাড়া আমাদের বোধগম্য হয় না। কাজেই দক্ষিণী মুদ্রার একান্ত প্রাধান্য নিয়ে বর্তমান যুগে নৃত্যনাট্য রচনা করলে সে যে দুর্বোধ হবে শুধু তাই নয়, অনেক জায়গায় ব্যঙ্গাভিনয় হয়ে উঠতে পারে। কথাকলিতে মুদ্রার অংশই হ'ল অভিনয়, নৃত্যের অংশ আসে তার পরে। ছোট ছোট খণ্ডতালের অংশকে দক্ষিণে "কলসম" বলে এবং সেই খণ্ড পদগুলিকে অবলম্বন ক'রে এক-একটি সম্পূর্ণ নৃত্য গড়ে ওঠে। নৃত্য তারই মাঝে মাঝে আসে। সেখানে সুরের বিশেষ কোনো চেহারা দেখা যায় না। কিন্তু চণ্ডালিকায় সংগীতই হ'ল একটি বিশেষ সৃষ্টি। দক্ষিণী নাচের বিচিত্র তাল ও ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে সুর সেখানে একটি অভিনব প্রহেলিকার রচনা করেছে। নৃত্য অভিনয় না হয়ে যদি কেবল সুরের ধ্বনি দর্শকের কানে পৌঁছয় তাহলেও তাঁরা বুঝতে পারবেন যে সুর নিজেই একটি আন্তর তরঙ্গের প্রযোজনা তৈরি ক'রে তুলেছে। চণ্ডালিকার কথোপকথনের ছন্দের মধ্যে সুরের সেই কারুকার্য মনকে টানে। কীর্তন, বাউল থেকে আরম্ভ ক'রে পূরবী, সাহানা, পরজ, ভৈরবী, বাগেশ্রী পর্য্যন্ত নানা প্রকারের সুর কথার অনুসরণে প্রতিপদে পরিবর্তিত হয়েছে। সংগীতে যেমন মিশ্রণ ঘটেছে নৃত্যেও হয়েছে ঠিক তাই। চতুর্বিধ তালনৃত্যই বিবিধ ভঙ্গীর মধ্যে মিলিত হয়ে গল্পের ভূমিকাকে ফুটিয়ে তুলেছে। এই যে সংমিশ্রণ এতে ঐক্য নষ্ট না হয়ে নৃত্যকলা ও সংগীত সমভাবেই বৈচিত্র্য লাভ করেছে। এই রকমারি না থাকলে নাটক তৈরি হ'ত না। বিচিত্র সুরসমাবেশের জোরে কথোপকথনের ছন্দ সচল ও জোরালো হয়ে উঠেছে, তাল ও প্রথাগত নিয়ম থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের আবেগকে অবাধে প্রকাশ করেছে। কোথাও কোথাও আধুনিক সাহিত্যের গদ্য কবিতার মতো ভাব আপনাকে ছন্দের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে। নৃত্যের সেই বন্ধনহীন রূপ নূতন আকৃতি নিয়ে নাটকীয় সংঘাতের মধ্যে এক অকৃত্রিম রস ও শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে। অনেকেই জানেন বোধ হয়, শান্তিনিকেতনের নৃত্য কোনো বিশেষ বিধিবদ্ধ সর্বাঙ্গীন প্রাচীন নৃত্যকলার আঙ্গিককে অনুসরণ করে না। মিশ্র সুরের মতো মিশ্র তাল ও ভঙ্গীর যোগে বর্তমান নৃত্যকলা সংগঠিত হয়ে থাকে। এই মিশ্রণ যত সহজ ভাবে হয়, দেখা গেছে নাচের

বৈচিত্র্য ও প্রকাশ ততই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। চণ্ডালিকা ও চিত্রাঙ্গদার মধ্যে এই আঙ্গিকের অনুশীলন আমরা পুনঃপুনঃ দেখতে পাই। যদিচ মণিপুরের নৃত্যের আঙ্গিকের উপর চিত্রাঙ্গদার ভিত্ তৈরি হয়েছে তবুও দর্শক সমস্ত মণিপুর ঘুরেও চিত্রাঙ্গদা-নৃত্যের অনুরূপ জিনিষ দেখবেন না। তেমনি দক্ষিণী আঙ্গিকে তৈরি চণ্ডালিকাকেও দক্ষিণী নৃত্যের মধ্যে চেনা যাবে না, সংমিশ্রণের এমনি গুণ। এ যেন রাসায়নিক মিশ্রণ। এই তো গেল নৃত্যের কথা। কিন্তু সংগীত! যার ভিত্তির উপর ভর ক'রে সমস্ত নৃত্যের প্রযোজনা তৈরি হয়ে উঠেছে. সেইটেই হ'ল শান্তিনিকেতনের নূতন দান। এই সংগীতযোগে নৃত্যের পূর্ণবিকাশ আমাদের প্রাচীন নৃত্যে দেখা যায় না। বিচিত্র সুরসংযোগে একটি নাটক তৈরি হয়ে উঠল এবং এই বিবিধ সুর সম্মিলিত হয়ে একটি বিরাট সুরের রূপ নিল, সুরলোকে এরূপ পরিপ্রেক্ষণ এই প্রথম। পুরাতন কালে টুকরো টুকরো গানের সঙ্গে নৃত্যের রেওয়াজ ছিল, সেখানে গান ছিল গৌণ, মৃদঙ্গ বা মাদলের তালের উপরেই নৃত্যকলার প্রকাশ নির্ভর করত। কীর্তনে অবশ্য একটি টানা লম্বা সুরের ভূমিকার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সে একই ধরণের জিনিষ, তাতে এত বিবিধ সুরের সমাবেশ নেই। বর্তমানে চণ্ডালিকায় সুরের একটি নাটকীয় চেহারা দেখা গেছে, যদিও তাতে সাহিত্যের খাতিরে কথা দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই কথার অংশ ছেড়ে দিলেও সুরের বার্তা মানুষের কানে পৌঁছবে।

— কোনো গুণবন্ত যন্ত্রীর সাহায্য পেলে সুরসংগতি নিয়ে একটি খাঁটি বিশিষ্টতা পূর্ণ ঐকতান তৈরি ক'রে তোলবার ভবিষ্যৎ খোলা হয়েছে।

বহুকাল পূর্বে ১৯১২ সালে যখন লণ্ডনে রাশিয়ান নৃত্যনাট্য দেখেছিলাম, সে সন্ধ্যা ভোলবার নয়। প্যাভলোভার পেলব দেহলতা উল্লসিত হয়ে উঠেছিল নায়িকার পূর্বরাগের বিচিত্র মাধুর্যের আবেগে, তারই সঙ্গে রূপায়নীর ভঙ্গীর উচ্ছ্বাস মিলে সুরের পর্দায় পর্দায় মায়ালোক রচনা করেছিল। আর্টিষ্টের সে এক অপূর্ব কীর্তি। সামান্যকে মহৎ ক'রে, নগণ্যকে অপূর্ব ক'রে তোলার পরিচয় সেদিন তিনি দিয়েছিলেন। সে ছিল সামান্য বিষয়। একটি রাশিয়ান বিবাহের দৃশ্য। তার ভূমিকা ছিল গৌণ। রূপায়নী তাকে নিজের ক্ষমতায় রূপান্বিত ক'রে তুলেছিলেন দিব্যলোকে।

কিন্তু চণ্ডালিকার ভূমিকা হ'ল খাঁটি সাহিত্য; একটি মানুষের মানসিক ক্রমবিকাশের পটভূমির উপর তার রচনা। মানুষের মধ্যে যা আদিম আকর্ষণ তারই আবেগ দিয়ে শুরু হয়েছে চণ্ডালিকার নৃত্যকলা। দেহের যে আকর্ষণী মন্ত্র যা শিবের তপস্যাকেও টলাতে পেরেছিল প্রকৃতি-পুরুষের অন্তরের সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব পৌঁছল চণ্ডালিকার প্রাণে, তারই আঘাতে দোল-খাওয়া মন নৃত্যসংগীতের তালে আপনাকে বিচ্ছুরিত ক'রে দিল অবসাদ বিষাদ করুণার আতিশয্যে। তালের ছন্দ ও সুরের প্রেরণায় মূক হৃদয়ের বাণী মুখরিত হয়েছিল সুরের বিচিত্র কারুকার্যে।

যেখানে অবসাদক্লান্ত মন, পূরবী এল তার আমেজ নিয়ে,—যেখানে দৃঢ়তায় দর্পিত চিত্তের ঝংকার—বাউল উঠল বেজে গৌরবে। এইরূপে, অধৈর্যের ঐকতানের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল বিচিত্র সুরের ব্যঞ্জনা।

সুর যেন চলেছে নদীর স্রোতের মতো—কখনও তার উদ্দাম মূর্তি, কখনও বা তার অবসাদের বিরাম, আর কোথাও বা সে অধৈর্যের ছন্দে ত্রস্ত। তার পরে সে স্রোত পৌঁছল গিয়ে অগাধ সমুদ্রে। বাসনা তলিয়ে গেল প্রেমের অকূল পাথারে। ঝড় থামল, এল শান্তি। দেহের কামনা চিত্তের অন্তরতম তলায় প্রেমের মহিমাকে খুঁজে পেয়ে তৃপ্ত হ'ল, পূর্ণ হ'ল।

মূল আখ্যানের সঙ্গে এই নৃত্যনাট্যের আখ্যান-অংশ কিছু তফাৎ হয়ে গেছে। নাটকীয় সংঘাতকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে এবং রঙ্গমঞ্চের আঙ্গিককে উৎকর্ষ দেবার নিমিত্ত কবি এরূপ করতে বাধ্য হয়েছেন, যদিও সাহিত্যের দিক থেকে মনস্তাত্ত্বিক পরিচালনায় কোনোরূপ পরিবর্তন হয় নি।

প্রথম দৃশ্যে চণ্ডালিকা সাধারণ মেয়েদের দৈনন্দিন কাজের এবং পথের গতানুগতিক স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। সেখানে তার সখী আছে, মা আছে, কর্ম আছে, সেই পথের জীবনের মধ্যে এক দিন তার

প্রাণে এসে পৌঁছল কোন্ প্রেমের ডাক, প্রথম সাড়া দিয়ে উঠল তার দেহ, তার কামনা, তার পর অসীম ছন্দের মধ্যে দিয়ে টানা-ছেঁড়ার অপরিমেয় অভিজ্ঞতার সাধনায় তার মন বিকশিত হ'ল প্রেমের গভীর আনন্দে। মূল উপাখ্যানের মধ্যে যদিও আনন্দ স্বপ্রকাশ নয় চণ্ডালিকার মুখের বাণী থেকেই তাঁর দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু নাটকীয় রসকে জমিয়ে তোলবার জন্যে এবং চণ্ডালিকার দুরূহ মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে দর্শকের চিত্তকে বিরাম দেবার জন্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দের মনোজগতের দ্বন্দ্বকে ছায়ানৃত্যে দেখানো হয়েছে। চণ্ডালিকার মায়াদর্পণে সন্ন্যাসীর যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল তারই ছায়া জেগে উঠল দর্শকের চোখে। আনন্দের যে দ্বন্দ্ব সে চণ্ডালিকার চেয়ে কিছু কম নয়। এক দিকে তার সুগভীর জ্ঞানের সাধনা, এক দিকে তার দেহের কামনা, এই বস্তুজগতের আকর্ষণ জ্ঞানীকেও টেনে আনলে মাটির পৃথিবীতে, কিন্তু অবশেষে মানুষই জিতল। জীবধর্মের আদিমতাকে ছাপিয়ে উঠল তার আত্মার শক্তি, দিশাহারা উন্মাদনায় বাঁধা পড়ল না সে সংসারের মায়াজালে। চিরবৈরাগী পুরুষ, যার প্রেরণায় সে ছুটেছে উত্তর মেরুতে, উড়েছে আকাশপথে, ডুবেছে অতল সমুদ্রে, সেই দুর্দাম শক্তির পুরুষকার দেহের আকর্ষণ থেকে আনন্দকে পৌঁছে দিল পৌরুষের অসাধারণ গৌরবে।

এই উভয়ের বেদনাময় দ্বন্দ্বের ভূমিকার মধ্য দিয়ে যেখানে তারা চরম সার্থকতা লাভ করল, সুরও সেখানে মহীয়ান হয়ে উঠল ভৈরবী, বাগেশ্রীর রহস্যালোকে।

এই যে প্রকৃতি-পুরুষের স্বভাবের মধ্যে মূলগত বিরুদ্ধতা, চণ্ডালিকার সাহিত্য ও নৃত্যনাট্য সেই মানসিক জটিলতাকে সুর ও তালের ছন্দে প্রকাশ করতে চেয়েছে। দেহের অনুপম ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে মনোজগতের ইতিকথাকে নয়নগোচর ক'রে তোলাই ছিল চণ্ডালিকার আদর্শ। চণ্ডালিকা তার দেহভঙ্গিমায় উৎকর্ষ লাভ করেছিল। সুর ও নৃত্য অভিনয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ণতর হয়েছিল। বিচিত্র সুর বিচিত্র মানসিক আবেগের মতোই একটি ঐকতানকে গড়ে তুলেছিল। চণ্ডালিকার সুর যেন একটি বিরাট সৌরজগত। আপনার পূর্ণতার আনন্দে সে গতিশীল এবং নিজের ঐশ্বর্যের মধ্যেই তার পূর্ণ প্রকাশ। সম্মিলিত সুরের মধ্যে দিয়ে নাটকীয় সৃষ্টির চেষ্টা বোধ হয় এই প্রথম। চণ্ডালিকার ধারণা সার্থক হয়েছে সুরকর্তা এবং রূপায়নীর পরিপূর্ণ সহযোগিতায়। মনস্তত্ত্বের স্তরে স্তরে যে বিচিত্র ভাব খেলে যায়, যে স্বপ্নলোকের রং কাব্য-সাহিত্যের ধ্যানের মধ্যে কবির চিত্ত অনুভব করে, তারই আনন্দ সুরপর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে নর্তকীর দেহের গতিভঙ্গিমাতে ঐকান্তিক অনুরাগের তীব্রতাকে জাগিয়ে তুলতে পেরেছিল। রূপায়নীর চোখের দীপ্তি তালের নৈসর্গিক প্ররোচনায় ছন্দের স্পন্দনে স্পন্দনে অগ্নিশিখার ন্যায় বিচিত্র আবেগের খাপখোলা তলোয়ারের মতো আস্ফালিত হয়ে উঠেছিল। এখানে শিল্পী-দেহের প্রতি অঙ্গ তাল ও সুরের সহযোগে সৃষ্টির আনন্দকে অনুভব করেছিল, তারই ঝলকে দর্শকের চিত্ত হয়েছিল স্তব্ধ। অভিনেত্রীর অমোঘ শক্তি কোথাও বাধা পায় নি দুর্বলতার হার-মানা অবসাদে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মিলনের আনন্দে কলারস উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

না

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আট বৎসর পূর্ব্বের হত্যাকাণ্ডের বিচার। নৃশংস হত্যাকাণ্ড। দীর্ঘ আট বৎসর পরে দায়রা আদালতে তাহারই বিচার হইবে।

ব্রজরাণী সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরের মধ্যে ধ্যানস্তিমিতার মত বসিয়া ছিল; হরদাসবাবু কোর্ট হইতে ফিরিয়া একেবারে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন—এই যে ব্রজ।

ব্রজ মুখে কোন উত্তর দিল না, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দাদার মুখের দিকে চাহিল মাত্র। হরদাসবাবু বলিলেন—কাল তোর সাক্ষীর দিন। মনকে একটু শক্ত ক'রে নিবি। শেখাবার তো কিছু নেই, কেবল ঘটনাগুলো স্মরণ ক'রে নে ভাল ক'রে। আমি বরং কাল সকালে তোকে তোর প্রথম এজাহারটা ভাল ক'রে শুনিয়ে দেব।

হরদাস আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ভাল করিয়া শুনাইয়া দিবে! মনে করাইয়া দিবে! ব্রজরাণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া এক বিচিত্র হাসি হাসিল। নিঃশব্দ ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ রেখায় পরিস্ফুট হাসি, হাসির সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় চোখ দুইটি স্তিমিত হইয়া আসে, উত্তেজনাহীন স্থির হিমশীতল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বিচিত্র সে হাসি!

ব্রজরাণীর মনে বাটালীর আঘাতে কাটিয়া গড়া পাথরের মূর্ত্তির মত সে ছবি অঙ্কিত হইয়া আছে, সে কি মুছিবার, না মুছিয়া যায়!

হতভাগ্য নিহত কালীনাথের বিধবা স্ত্রী ব্রজরাণী।

উঃ সেই ভীষণ শব্দ যেন সে মৃত্যুর হুঙ্কার-ধ্বনি! বার-বার! হাতটা প্রথম ভাঙিয়া গেল, তার পর আবার, তার পর আবার, বার-বার। রক্তাপ্লুত দেহে স্বামী তাহার লুটাইয়া পড়িল তাহার চোখের সম্মুখে।

ব্রজরাণী সে-মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, সে সভয়ে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া নীচে নামিয়া গেল। স্বামীর সেই রক্তাক্ত মূর্ত্তি আজও তাহাকে আতঙ্কিত করিয়া অস্থির করিয়া তোলে। প্রায় রাত্রেই স্বপ্নে সেই মূর্ত্তি দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠে, তাহার মা তাহার পাশে শুইয়া গায়ে হাত দিয়া থাকেন, সেই অভয়-স্পর্শ নিদ্রার মধ্যেও সে অনুভব করে। সে-হাত কিছুক্ষণ সরিয়া গেলেই আতঙ্কে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়।

ব্রজরাণী ত্রস্ত পদক্ষেপে আসিয়া দাঁড়াইতেই মা প্রশ্ন করিলেন—কি রে? এমন ক'রে—?

প্রশ্নের আধখানা বলিয়াই তিনি চুপ করিয়া গেলেন, তাঁহার নিজের মনই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে।

ওদিকের বারান্দায় এক ভ্রাতৃবধূ যেন শুনাইয়া শুনাইয়াই বলিল—বাপের জন্মে এমন ভয় দেখি নি কিন্তু। আজ আট বছর হয়ে গেল—।

মা শাসন-কঠোর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—বৌমা! বধূ মুখ বিকৃত করিয়া একটা ভঙ্গী করিয়া নীরবে ইঙ্গিতে বাকী মনোভাবটা প্রকাশ করিয়া তবে ছাড়িল। মা ব্রজরাণীকে কাছে বসাইয়া তাহার রুক্ষ চুলের বোঝা লইয়া বসিলেন, পিঙ্গল রুক্ষ চুলে জটিলতার আর অন্ত নাই। স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রজরাণী আজও তেল ব্যবহার করে নাই।

ব্রজরাণীর বড় ভাই হরদাসবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন—মা!

মা মুখ তুলিয়া হরদাসের দিকে চাহিলেন; হরদাস বলিলেন—একটা কথা ছিল মা।

—কি বল।

—একটু উঠে এস।

—এইখানেই বল না।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া হরদাস বলিলেন—সেই ভাল। ব্রজরই শোনা দরকার বিশেষ ক'রে। আবার একটু

ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—মানে, ব্রজরাণীর ছোট মামা-শ্বশুর আর ওদের বেয়াই এসেছেন, দেখা করতে।

মামাশ্বশুর? ব্রজরাণীর স্বামীহন্তার পিতা আর তাহার শ্বশুর? ব্রজরাণীর মায়ের চোখ দুইটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। ব্রজরাণী চঞ্চল হইয়া মাথার কাপড়টা তুলিয়া দিল, যেন মামাশ্বশুর সান্নিধ্যেই কোথাও রহিয়াছেন। মা বলিলেন—কেন? কি জন্যে? কি দরকার তাঁর? কেন তিনি বার-বার আসেন? উত্তরোত্তর তাঁহার কণ্ঠস্বর উচ্চ হইয়া উঠিতেছিল।

হরদাস বলিলেন—বলবেন আর কি? সেই কথা—ক্ষমা! যা হয়েছে তার উপর আর হাত নেই। এখন ভিক্ষা, ক্ষমা, কোন রকমে ক্ষমা—।

—ক্ষমা? মা কঠিন হাসি হাসিলেন। তার পর তিনি বলিলেন—তাঁকে বাইরে বাইরে বিদেয় ক'রে দেওয়াই তোমার উচিত ছিল বাবা।

—সে কি আর আমি বলি নি মা। বলেছি—বার বার বলেছি। কিন্তু আমার হাতে ধরে ভদ্রলোক ছাড়েন না। শেষ পায়ে ধরতে উদ্যত।

—তা হ'লে তাঁকে বল গে, ব্রজ আমার আজ আট বৎসর তেল মাখে নি, এই দিনটির জন্যে। ক্ষমা কি ক'রে করবে?

হরদাস নীরব হইয়া রহিলেন, আবার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—আর একটা কথা মা। আমাকে যেন ভুল বুঝো না। আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলতে। অনন্তের শ্বশুর বললেন, আমার মেয়ের প্রতি দয়া করতে হবে। যে ক্ষতি হয়ে গেছে, তার পূরণ আজ ভগবানও করতে পারেন না। তবে মানুষের দ্বারা যেটুকু সম্ভব, যতটুকু পারা যায়—ব্রজর ভবিষ্যৎ আছে—তার ছেলেকে মানুষ করতে হবে—।

বাধা দিয়া মা বলিলেন—মানে টাকা দিতে চান—এই ত?

জ্যা-মুক্ত শরের মত মুহূর্তে ব্রজরাণী উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইয়া গেল, সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—না। তার পর দৃঢ়পদক্ষেপে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

অনন্ত মামাতো ভাই, কালীনাথ তাহার পিতৃষসাপুত্র। কালীনাথ বয়সে কিছু বড়। কিন্তু যৌবনের একটা কোঠায় বিশ-ত্রিশের ব্যবধান বন্ধুত্বের সেতুবন্ধনে স্বচ্ছন্দে বাঁধা যায়, এ তো বৎসর-চারেকের ব্যবধান। সেই সেতুবন্ধনে অনন্ত এবং কালীনাথ পরস্পর প্রীতিবদ্ধ হইয়া একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়াছিল। ভোর না হইতেই অনন্ত আসিয়া ডাকিত—কালী-দা! বাপ্‌স্ কি ঘুম তোমার! তাহার কাঁধে এক 'রিপীটার' বন্দুক, পকেটে পকেট-বোঝাই কার্তুজ।

কালীনাথ উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিবামাত্র সে উনানের ধারে উনান জ্বালিতে বসিয়া যাইত। কালীনাথ তখন অবিবাহিত, সংসারে বাপ-মা ভাই-ভগ্নী কেহ নাই, বাড়ীটা দুইটি তরুণের খেয়াল ও খুশী মত চলিবার একটি কল্পরাজ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কালীনাথ মুখ হাত ধুইতে ধুইতে অনন্ত চা তৈয়ারী করিয়া দুইটি পেয়ালায় পরিবেশন করিয়া ফেলিত। তার পর গত রাত্রের উদ্বৃত্ত পাখীর মাংস সহযোগে প্রাতরাশ সারিয়া গ্রাম-গ্রামান্তরের বন-জঙ্গল অভিমুখে রওনা হইত। গ্রাম পার হইয়াই কালীনাথ পকেট হইতে ছোট কল্কে, সিগারেটের মিক্‌শ্চার, আরও দুই-একটা সরঞ্জাম বাহির করিয়া বসিত। অনন্ত দারুণ তৃষ্ণার্তের মত বলিত—হ্যাঁ—নাও, নইলে জমছে না। চোখের টিপ, বুঝেছ কি না—ও না হ'লে ঠিক আসে না।

অনন্ত নিতান্তই অল্পশিক্ষিত মূর্খ বলিলেও চলে। কালীনাথ শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিধারী, কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, সেও ঐ নেশায় আসক্ত! শুধু আসক্তই নয় এ-বিষয়ে অনন্তের গুরু সে-ই। তাহাদের দুই জনের মিলনের সেতুবন্ধনে এই বস্তুটিই ছিল কাঠামো।

একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া অনন্ত রিপীটারটা খুলিয়া একেবারে ছয়টা কার্তুজ ভর্ত্তি করিয়া বলিত—ব্যস! চল এইবার। হাত কিন্তু আমার নিস্‌পিস্ করছে, কি মারি বল ত?

—দে, একটা মানুষই মেরে দে।

—বেশ, দাঁড়াও তুমি, এখানে মানুষের মধ্যে তুমি। অনন্ত বন্দুকটা তুলিয়া ধরিত। কালীনাথ সভয়ে সরিয়া গিয়া বলিত—এই, এই অন্ত, ও-সব ভাল নয় কিন্তু।

বাবা! ও হ'ল যমদ্বার, চাবি টিপলেই দোর খুলে যাবে।

অনু হি হি করিয়া হাসিয়া বন্দুকটা ফিরাইয়া লইত। কালীনাথ একটা গ্রামান্তরযাত্রী কুকুরকে অথবা আকাশ-চারী কোন পাখীকে দেখাইয়া দিত—ওই মার না, মারবার জানোয়ারের আবার অভাব! অনন্ত মুহূর্ত্তে বন্দুকটা তুলিয়া ধরিত। প্রান্তরের অনভ্যস্ত আবেষ্টনীর মধ্যে অপরিচিত দুই জন মানুষের হাতে লাঠির মত অস্ত্রটাকে দেখিয়া ভীত কুকুরটার লেজ আপনি নত হইয়া আসে, সে ভীত মৃদু শব্দ করিয়া ছুটিয়া পালায়, কিন্তু অনন্তের লক্ষ্য অব্যর্থ। গতিশীল জীবটা কোন-না-কোন অঙ্গে আহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া লুটাইয়া পড়িত, কখন মরিত, কখনও মরিত না। না মরিলে কালীনাথ বলিত—দে, আমাকে দে তো বন্দুকটা, বড় জানোয়ার—হাতের টিপ ক'রে নি।

কিছু দূরে দাঁড়াইয়া গুলির পর গুলি ছুড়িয়া সেটাকে সে বধ করিয়া হাসিয়া বলিত—একেই বলে কুকুর-মারা, এ্যাঁ!

—চুপ!

—কি?

—মাথার ওপর পাখার শব্দ শুনছ না! হরিয়ালের পাখার শব্দ। ব'সে পড়, গুঁড়ি মেরে ব'সে পড়।

তার পর বন্দুকের শব্দে শব্দে পাখীর ভয়ার্ত্ত কলরবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি চকিত আলোড়িত হইয়া উঠিত। পিছনে জুটিত ছেলের দল, তাহারা হত্যার আনন্দ উপভোগ করিত, আর সংগ্রহ করিত কার্ত্তুজের খালি খোল।

* * *

একসঙ্গেই দুইটি বিবাহের উদ্যোগ হইয়াছিল। ব্রজরাণীর পিতার বংশ চাকুরের বংশ—দুই পুরুষ সরকারী চাকরি করিয়া বিত্তশালী হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা খুঁজিতেছিলেন—প্রতিষ্ঠিতনামা ধনীর ঘরের ছেলে। ওদিকে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী এক প্রাচীন জমিদার-বাড়ী আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত হইয়া খুঁজিতেছিলেন—বিদ্যাগৌরবে গৌরবান্বিত একটি সম্ভ্রান্ত ঘরের পাত্র। ঘটক দুইটি বিভিন্ন স্থান হইতে এই দুইটি সম্বন্ধ আনিয়া হাজির করিল। এক পক্ষের জন্য অনন্ত ও অন্য পক্ষের জন্য কালীনাথকে সে খুঁজিয়া বাহির করিল। অনন্ত খুশী হইয়া বলিল—দাদা, তোমার পাত্রী দেখতে যাব আমি, আর আমার পাত্রী দেখতে যাবে তুমি।

কালীনাথ অনন্তর পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল—একসেলেণ্ট আইডিয়া! বহুৎ আচ্ছা ব্রাদার আমার রে!

ব্রজরাণীকে দেখিয়া কালীনাথ মুগ্ধ হইয়া গেল। তার পর সে যাহা করিল, সে কেবল ভদ্রতা-বিগর্হিতই নয়, বিশ্বাসঘাতকতা। সে দুইখানা বেনামী পত্র লিখিয়া বসিল। ব্রজরাণীর পিতাকে লিখিল, বড়লোকের ছেলে অনন্ত তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে নেশাখোর দুর্দ্দান্ত গোঁয়ার, সকল রকম নেশাতেই সে অভ্যস্ত, তাহার উপর চরিত্রহীন।

আর তাহার যেখানে সম্বন্ধ চলিতেছিল, সেখানে লিখিল, কালীনাথ এম-এ পাস করিয়াছে সত্য কিন্তু নিতান্ত হাঘরে বংশের ছেলে। তাহার পিতা সরকারী চাকরি করিয়া যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা মধ্যবিত্ত ঘরের পক্ষেও অকিঞ্চিৎকর। আরও একটি কথা—ছেলেটি বড় হীনস্বভাবসম্পন্ন। হীনতাটা তাহাদের বংশানুক্রমিক। পাঠ্যজীবনে কয়েক বার সহপাঠীদের বই চুরি করিয়া সে ধরা পড়িয়াছে। জ্ঞাতার্থে জানাইলাম, যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবেন।

তার পর ঘটকের চেষ্টায় ঘটিল অঘটন। সম্বন্ধ অদল-বদল হইয়া গেল। ঘটক বর্ণনা করিল কালীনাথের অবস্থা বেশ ভালই, অর্থাৎ সূর্য্য থাকিলে যেমন চন্দ্রকে দেখা যায় না, তেমনি মাতুলবংশ বিদ্যমান থাকাতে ভাগিনেয় চোখে পড়ে না—অন্যথায় চন্দ্রই তমোনাশ করিতে পারিত। আর অনন্ত পাস না করিলেও লেখাপড়া বেশ ভালই করিয়াছে, তাঁহাদের ডিগ্রীর প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন বিদ্যার। অতঃপর বিদ্বান্ কাহাকে বলে সে বিষয়ে বক্তৃতাও সে খানিকটা করিল। ফলে পাত্রী ও পাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দুইটি বিবাহই হইয়া গেল।

* * *

মাটির নীচে অন্ধকার রাজ্যের অধিবাসী উই; মধ্যে

মধ্যে আলোক-কামনায় তাহাদের পক্ষোদগম হয়। সে পক্ষোদগম হইলে আর রক্ষা থাকে না—তাহারা পিচকারির মুখের জলের মত গহ্বর পরিত্যাগ করিয়া বাহির হয়। পাখার শক্তি অপেক্ষা অহঙ্কারই হয় অধিক। অনন্তের শ্বশুরদের অনেকটা সেই অবস্থা। রক্ষণশীল জমিদার-বাড়ীর অকস্মাৎ অবরোধ ঘুচাইয়া আলোকের নেশায় সকলে ঐ পতঙ্গগুলির মতই ফর ফর করিয়া উড়িতেছে।

ফুলশয্যার রাত্রেই বধূটি প্রশ্ন করিল—তোমার পড়ার ঘর বুঝি বাইরে?

অনন্ত প্রশ্নটা বেশ বুঝিতে পারিল না, বধূর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—পড়ার ঘর?

বধূটি সলজ্জভাবে নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়া বলিল—তোমার লাইব্রেরির কথা জিজ্ঞেস করছি আমি।

—লাইব্রেরি! তার পর সোজাসুজি ঘাড় নাড়িয়া সে বলিয়া দিল—ওসব লাইব্রেরি-মাইব্রেরির ধার-টার ধারি নে আমি। বছরে সরস্বতীর পূজো এক দিন—পাঠা কাটি, কিষ্টি করি ব্যস।

বধূ স্তম্ভিত হইয়া অনন্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর সে যে সেই শুইল, আর সাড়াও দিল না, উঠিলও না। সাধ্যসাধনার মধ্যে অনন্ত আবিষ্কার করিল সে কাঁদিতেছে।

—কাঁদছ কেন? হ'ল কি? শুনছ?

বধূ নিরুত্তর। অনন্ত আবার প্রশ্ন করিল—কি হ'ল বলবে না? লক্ষ্মী।—শোন কথার উত্তর দাও!

—ওগো আমাকে আর জ্বালিয়ো না, তোমার পায়ে পড়ি। কাতর কণ্ঠস্বরের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন বিরক্তির স্বর গোপন ছিল না। অনন্ত একটু আহত না-হইয়া পারিল না। তবুও সে আবার প্রশ্ন করিল—কি হ'ল সেইটে বল না!

—আমার মাথা ধরেছে। এবার বেশ পরিস্ফুট বিরক্তির সহিতই বধূ জবাব দিয়া বসিল। অনন্তও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। নিস্তব্ধ রাত্রি—শুধু তাহাদের বাড়ীর পাশের সারিবদ্ধ নারিকেলগাছগুলির কোন একটির মাথায় বসিয়া একটা পেচক কর্কশ স্বরে

ডাকিতেছে। অনন্ত বিরক্ত হইয়া সরিয়া আসিল—তার পর অকস্মাৎ তাহার খেয়াল হইল কালীদাদা কি করিতেছে দেখিয়া আসিলে হয় না!

কালীনাথের বিবাহও এই বাড়ী হইতেই অনুষ্ঠিত হইতেছিল। বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান শেষ হইলে বর-বধূ আপনাদের বাড়ীতে গিয়া সংসার পাতিবে। অনন্ত কালীনাথের ফুলশয্যাগৃহের দরজায় আসিয়াই শুনিল ভিতরে স্বামী-স্ত্রীতে আলাপ চলিতেছে। সে কৌতুক-পরবশ হইয়া কান পাতিল।

কালীনাথ বলিতেছিল—তোমায় আমি রাণী বলেই ডাকব। আমার হৃদয়-রাজ্যের রাণী তুমি।

—দূর, সে আমার লজ্জা করবে। তার চেয়ে সবাই যা বলে তাই বলবে—ওগো।

—সে ত সকলের সামনে বলতেই হবে। কিন্তু তুমি আর আমি যেখানে শুধু, সেখানে বলব রাণী।

অনন্ত কালীনাথকে আর ডাকিল না, আপনার ঘরে আসিয়া আবার জানালার ধারে দাঁড়াইল। তাহার ভাগ্য! নতুবা এই মেয়ে ত তাহার স্কন্ধে পড়িবার কথা নয়!

নারিকেলগাছের মাথায় পেচকটা কর্কশ স্বরে আবার ডাকিয়া উঠিল অকস্মাৎ অনন্তের সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়িল ঐ কর্কশকণ্ঠ নিশাচর পাখীটার উপর। সে ঘরের কোণ হইতে তাহার রিপীটারটা লইয়া স্থির-ভাবে কিছুক্ষণ শব্দ লক্ষ্য করিয়া ঘোড়াটা টানিয়া দিল। আকস্মিক ভীষণ শব্দগর্জ্জনে রাত্রিটা কাঁপিয়া উঠিল, নারিকেলগাছের মাথাটায় একটা আলোড়ন বহিয়া গেল, কি একটা নীচে সশব্দে খসিয়াও পড়িল।

পিত্রালয়ে আসিয়া বধূটির পুঞ্জিত ক্ষোভ ফাটিয়া পড়িল। তাহার মুখ দেখিয়াই মা একটা আশঙ্কা করিয়াছিলেন। তিনি একান্তে ডাকিয়া মেয়েকে প্রশ্ন করিলেন—হ্যাঁরে, তোর মুখ এমন ভার কেন রে?

মুহূর্ত্তে কন্যা জ্বলিয়া উঠিল অগ্নিস্পৃষ্ট বারুদের মত—শেষকালে অশিক্ষিত মূর্খের হাতে আমাকে সঁপে দিলে তোমরা! একটা ফোর্থ ক্লাসের ছেলে যা লেখাপড়া জানে, ও তা জানে না।

মা স্তম্ভিত হইয়া মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; মেয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—সকাল থেকে ব্যাধের মত পাখী মেরে মেরে বেড়ায়। গুণ্ডার মত একে মেরে, ওকে চাবকে শাসন করা হ'ল গৌরবের কাজ।

অনন্ত বাহিরে বেশ গম্ভীর ভাবেই বসিয়া ছিল, সহসা তাহার এক শ্যালক একখানা ইংরেজী বই আনিয়া বলিল—এই জায়গাটা বুঝিয়ে দিন না জামাইবাবু!

অনন্ত রহস্য-যবনিকার বহির্ভাগেই ছিল; কিন্তু একটি ছোট শ্যালিকা আসিয়া একখানা ইংরেজী খবরের কাগজ ফেলিয়া দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া সে যবনিকা ছিন্ন করিয়া দিল। বলিল—পড়ুন জামাই-বাবু।

মুহূর্তে সমস্ত বিষয়টা অনন্তের চোখের সম্মুখে আলোকিত পৃথিবীর মত পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। মাথার মধ্যে ক্রোধ আগুনের শিখার মত জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু কোন উপায় ছিল না, সে নীরবে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

দিনে খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করিবার জন্য একটি ঘর দেখাইয়া দিয়া শাশুড়ী বলিলেন—একটা কথা বলছিলাম বাবা—মানে তোমার শ্বশুরের ইচ্ছে—আমারও ইচ্ছে—তুমি এখন কলকাতায় থাক। আমার বড় ছেলে থাকে কলকাতায়, বাসাও রয়েছে—সেখানে থেকে পড়াশুনো কর।

অনন্তের ইচ্ছা হইল দৃপ্ত হুঙ্কারে সে বলিয়া উঠে—না, না, না! কিন্তু তাহা সে পারিল না। চুপ করিয়া দৃষ্টি নত করিয়া বসিয়া রহিল। শাশুড়ী অনন্তের নীরবতায় সন্তুষ্ট হইয়াই চলিয়া গেলেন। 'হাঁ' না-বলিলেও বলাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।

অপরাহ্নে শ্বশুর তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—সেই কথাই লিখে দিলাম তোমার বাবাকে। সেই ভাল, এত অল্পবয়সে চুপচাপ ব'সে থাকা ভাল নয়। An idle brain is the devil's workshop—কলকাতায় থেকে পড়াশুনো কর।

অনন্ত কোন কথা না-বলিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া একেবারে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার জিনিষপত্র সব পড়িয়া রহিল—সে ট্রেনে চাপিয়া বসিল এবং বাড়ী ফিরিয়া যেন আক্রোশভরেই নেশা আরম্ভ করিল।

*　　*　　*

অকস্মাৎ এক দিন অনন্তের পিতা ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে স্ত্রীকে বলিলেন—অনন্তের বিয়ে দেব আমি আবার। ছোটলোকের মেয়ে—মেয়ের বাপ হয়ে চিঠি লিখেছে দেখ না! আস্পর্দ্ধা দেখ দিখি—লিখেছে আমরা না কি মূর্খ ছেলের বিবাহ দেবার জন্যে কালীনাথের নামে অপবাদ দিয়ে বেনামী চিঠি দিয়েছি। তুমি চিঠি লিখে দাও বেয়ানকে—মেয়ে যদি না পাঠিয়ে দেয়, ছেলের বিয়ে দেব আমি। চিঠিখানা স্ত্রীর হাতে দিয়া তিনি ক্রোধভরেই বাহির হইয়া গেলেন।

অনন্ত ছিল পাশের ঘরেই—সমস্তই সে শুনিয়াছিল বাপ বাহির হইয়া যাইতেই সে মায়ের ঘরে ঢুকিয়া মায়ের হাত হইতে ছোঁ মারিয়া চিঠিখানা কাড়িয়া লইল।

নিতান্ত কটু ভাষায় ঐ অভিযোগ করিয়া পত্রখানা লেখা। পরিশেষে লেখা—প্রমাণস্বরূপ বেনামী পত্রখানাও এই সঙ্গে পাঠাইলাম—আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ-পত্র আপনাদের ইঙ্গিতক্রমেই লেখা হইয়াছিল।

বেনামী পত্রখানা উল্টাইয়াই অনন্ত চমকিয়া উঠিল, এ কি! এ যে অত্যন্ত পরিচিত হাতের লেখা। এ যে, এ যে—শ্বশুরের পত্রখানা মায়ের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া সে বেনামী পত্রখানা হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল। একেবারে কালীনাথের বাড়ী আসিয়া ডাকিল—কালী-দা!

—কে, অনু? আয় আয়।

অনন্ত আসিতেই ব্রজরাণী ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া গেল। অনন্ত লক্ষ্য করিল, বাড়ীর চারি দিকে একটি লক্ষ্মীশ্রী সুপ্রসন্ন শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতায় যেন উচ্ছলিয়া পড়িতেছে।

কালীনাথ বলিল—আর তুই আসিসই না!

—এলে খুশী হও কি না সত্য বল দেখি?

হা-হা করিয়া হাসিয়া কালীনাথ সে-কথার উত্তরটা আর দিলই না।

অনন্ত প্রশ্ন করিল—বৌ খুব ভাল হয়েছে না?

অকপট প্রসন্ন মুখে কালীনাথ বলিল—রাণীর গুণ একমুখে ব'লে শেষ করতে পারব না অনু। দেখছিস না ঘরদোরের অবস্থা। তুইও বৌকে এইবার নিয়ে আয়, বুঝলি!

অনন্ত চুপ করিয়া রহিল। কালীনাথ বলিল—তার পর হঠাৎ কি মনে ক'রে এমন অসময়ে এলি বল ত?

অনন্ত বেনামী চিঠিখানা কালীনাথের হাতে দিয়া বলিল—চিঠিখানা দেখাতে এসেছি তোমাকে। দেখাতে কেন, দিতেই এসেছি। চিঠিখানা তুমি রাখ—আমার শ্বশুর পাঠিয়েছেন বাবার কাছে।

কালীনাথের মুখ মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। অনন্ত আর অপেক্ষা করিল না—উঠিয়া বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু দরজা হইতে বাহির হইবার মুখেই পিছন হইতে কে ডাকিল—ঠাকুরপো!

অনন্ত পিছন ফিরিয়া দেখিল ব্রজরাণী জলখাবারের থালা হাতে তাহাকে ডাকিতেছে। অনন্তের আর যাওয়া হইল না, সে ফিরিল—বৌদির হাতের খাবার তো ফেলে যাওয়া হ'তে পারে না! কি বল কালী-দা? বৌদি আমার স্বর্গের দেবী—তার হাতের জিনিষ, এ যে অমৃত!

কালীনাথ শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—নিশ্চয়।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই অনন্তের স্ত্রী এক দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তের পিতা চরম-পত্রই পাঠাইয়াছিলেন, সেই পত্রের ফলে, আলোকপ্রাপ্ত হইয়াও বধূর পিতা আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া মেয়েকে পাঠাইয়া দিলেন।

ফুটবল টীম লইয়া অনন্তের সেদিন ম্যাচ খেলিতে যাইবার কথা। সকালবেলাতেই বধূকে এমন অযাচিত-ভাবে আসিতে দেখিয়া মনটা তাহার উল্লাসে ভরিয়া উঠিল। সে স্থির করিল, সে আজ আর যাইবে না। কিন্তু সে-ই টীমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাফব্যাক, তাহার উপর সে-ই ক্যাপ্টেন···মনটা তাহার খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। অবশেষে ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিল খেলা শেষ হওয়ার পরই সে ট্যাক্সি করিয়া ফিরিয়া আসিবে—ত্রিশ মাইল রাস্তা বইত নয়! ট্যাক্সি না পাওয়া গেলে তাহার বাইসিক্ল আছে। রাত্রির অন্ধকারকে সে ভয় করে না।

সে পুলকিত চিত্তেই বাড়ীর ভিতর আপনার শয়ন-কক্ষে গিয়া উঠিল। বধূটি পিছন ফিরিয়া কি যেন করিতেছিল, অনন্ত সন্তর্পিত পদক্ষেপে আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল। চকিত হইয়াই মুখ তুলিয়া অনন্তকে দেখিয়া সে সবলে আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—ছাড়।

হাসিয়া অনন্ত বলিল—এত রাগ কেন?

—রাগ নয়; ছাড় তুমি।

—রীতিমত রাগ। কিন্তু আমি তো আবার বিয়ে করব লিখি নি। বাবা লিখেছিলেন বিয়ে দেব।

—ছাড়, বলছি—ছাড়। নইলে আমি চীৎকার করব বলছি।

অনন্ত স্ত্রীকে মুক্ত করিয়া দিয়া বলিল—কিন্তু তোমার এমন ব্যবহার কেন?

বধূ সে-কথার কোন উত্তর দিল না, ক্রুদ্ধ নেত্রে স্বামীর মুখের দিকেই শুধু চাহিয়া রহিল। অনন্ত আবার বলিল—ওই তো কালীদাদার বৌ, তার ব্যবহার দেখে এস—স্বামীকে সে কত ভক্তি—।

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বধূ বলিয়া উঠিল—কার সঙ্গে নিজেকে তুমি তুলনা করছ? শিবে আর বাঁদরে! সে বিদ্বান্—

অনন্ত আর দাঁড়াইল না; হন হন করিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল। একেবারে আস্তাবলে গিয়া ডাকিল—নেত্য!

নিত্য সহিস কয়েক জন বন্ধুবান্ধব জুটাইয়া গোপনে-চোলাই-করা মদ খাইতেছিল, অসহিষ্ণু অনন্ত একেবারে দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া বলিল—হাণ্টার কই?

হাণ্টারগাছটা লইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে সে আবার ফিরিল,—দেখি রে!

নিত্য বুঝিতে না পারিয়া বলিল—আজ্ঞে!

—ওই বোতলটা! বলিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া বোতলটা তুলিয়া লইয়া খানিকটা গিলিয়া ফেলিল।

নির্জ্জলা হলাহল বুকের মধ্যে অগ্নিশিখার মত জ্বালা ধরাইয়া দিল—মাথার মধ্যে ক্রোধ হু-হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে আবার দ্রুতপদে অন্দরে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—কি বলছিলে, বল এইবার।

সে-মূর্ত্তি দেখিয়া বধূটি স্তম্ভিত হইয়া গেল—পরক্ষণেই সুরার গন্ধে ক্ষোভে আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল—তুমি মদ খাও? মাতাল তুমি?

—হ্যা, খাই; মদ খাই গাঁজা খাই সব খাই। তোমার বাপের পয়সায় খাই?

আত্মবিস্মৃতা বধূ বর্দ্ধিততর ক্ষোভে বলিয়া ফেলিল—মাতাল মুখ্যু বেরোও⋯। কথা তাহার অসমাপ্তই থাকিয়া গেল, হাণ্টারের আঘাতে তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। হাণ্টারের পাকান কশাখানির তীক্ষ্ণ আঘাতে বাহুমূল হইতে সমস্ত হাতখানা দীর্ঘরেখায় কাটিয়া গিয়াছে। অনন্ত হাণ্টার হাতে করিয়াই তর তর করিয়া নামিয়া গেল।

ফুটবল টীম লইয়া যাত্রার পথে ক্ষুধা অনুভব করিয়া সে আসিয়া উঠিল কালীনাথের বাড়ী—কালী-দা!

কালীনাথও বাহির হইতেছিল, সে বলিল—এই যে, আমি যে যাচ্ছিলাম তোর কাছে।

অনন্ত বলিল—সে-সব পরে শুনব। বৌদি কই? বৌদি।

—তোমার বৌদির হুকুমেই যাচ্ছিলাম; তার ব্রত আছে, তোমায় তার ব্রাহ্মণ করেছে।

—সে হবে। কিন্তু এখন কিছু খেতে দাও তো বৌদি?

ব্রজরাণী অদূরে আসিয়াই দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল—সে কি, আজ তোমার বৌ এসেছে—।

—আঃ বৌদি, থাক না ও-কথা। এখন তুমি খেতে দেবে কিছু? বল, না তো অন্যত্র চেষ্টা দেখি। আমার সময় নেই, তোমার বাপের বাড়ীর শহরে যাচ্ছি—ম্যাচ খেলতে।

ব্রজরাণী ব্যস্ত হইয়া থালায় জলখাবার সাজাইয়া আনিয়া নামাইয়া দিল। কালীনাথ প্রশ্ন করিল—ফিরবি কবে? পরশু সে তোর বৌদির ব্রত।

ক্ষুধার শান্তিতে প্রসন্ন ভাবেই অনন্ত বলিল—কাল সকালে। পরশুর জন্যে ভাবনা কি? কিন্তু ব্রতটা কি?

লজ্জিত হইয়া ব্রজরাণী নতমুখী হইয়া রহিল, উত্তর দিল কালীনাথ—অবৈধব্য-ব্রত; অর্থাৎ আমার আগে মরবার পাসপোর্টের ব্যবস্থা করছেন আর কি!

—বাঃ। মেয়েদের এই ধরণটা আমার ভারি ভাল লাগে কালী-দা। তার পর ব্রজরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল—বৌদি স্বর্গের দেবী তুমি!

লজ্জিতা ব্রজরাণী প্রসঙ্গান্তর আনিয়া বলিল—আমার বাপের বাড়ীতে গিয়ে কিন্তু তুমি যেন উঠো ঠাকুরপো! নইলে ঝগড়া হবে। আমারও উপকার হবে, ওঁদের খবর পাব। ক'দিন খবর পাই নি।

* * *

ম্যাচ জিতিয়াও অনন্তের মনটা ভাল ছিল না। প্রভাতের সে তিক্ত স্মৃতি তাহার মনকে অহরহ পীড়া দিতেছিল। সে অবসন্ন ভাবেই ব্রজরাণীর পিত্রালয়ের বাহিরের ঘরে নির্জ্জীবের মত শুইয়া ছিল। ব্রজরাণীর অনুরোধ-মত সে এইখানেই আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে। দলের সকলে দারুণ আপত্তি করিয়াছিল—না-না, সে হবে না ভাই। জিতলাম ম্যাচে, সমস্ত রাত আজ হৈ হৈ করব, ফুর্ত্তি করব। তুমি ক্যাপ্টেন—তুমি না থাকলে চলবে না।

সবিনয়ে হাতজোড় করিয়া অনন্ত বলিয়াছিল—সে হয় না ভাই। আমি কথা দিয়ে এসেছি বৌদিকে।

—বেশ। তবে একটু খেয়ে যাও। তাহারা বোতল গ্লাস বাহির করিয়া বসিল। কিন্তু জিব কাটিয়া অনন্ত বলিল—ছি, তাই হয়? কুটুম্বলোক!

বার-বার অনন্তের চোখ ভরিয়া জল আসিতেছিল। মনটা যেন উদাস হইয়া গিয়াছে। ব্রজরাণীর মা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—ব্রজ আমার ভাল আছে বাবা?

তাড়াতাড়ি অনন্ত উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—হ্যা, মাউই-মা, বৌদি ভালই আছেন।

—ব্রজ আমার সুখ্যাতি নিয়েছে তো বাবা? তোমাদের যত্ন-আত্তি করে তো?

উচ্ছ্বসিত হইয়া অনন্ত বলিল—এ যুগে এমন মেয়ে হয় না মাউই-মা! সতী-সাবিত্রী বইয়ে পড়েছি—বৌদির মধ্যে চোখে দেখলাম!

ব্রজরাণীর মা পরম তৃপ্ত হইয়া বলিলেন—বেঁচে থাক বাবা, দীর্ঘায়ু হও। তোমরা নিজেরা ভাল—তাই সেই দৃষ্টান্তে ব্রজ আমার ভাল হ'তে পেরেছে। অতঃপর বেয়াই-বেয়ানদের প্রণাম জানাইতে অনুরোধ জানাইয়া তিনি বিদায় লইলেন। কিছুক্ষণ পর আবার তিনি একটা বাটিতে দুধ লইয়া প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—বাবা!

অনন্তের মন তখন আপনার শ্বশুরবাড়ীর সহিত এই বাড়ীটির তুলনা করিতে ব্যস্ত ছিল, সে কোন সাড়া দিল না। ভাল লাগিল না তাহার। ব্রজরাণীর মা তাহার নিস্তব্ধতা দেখিয়া আপন মনেই বলিলেন—খেলাধুলো ক'রে নিথরে ঘুমিয়ে পড়েছে বাছা।

তিনি আবার বাহির হইয়া গেলেন। বাড়ীর ভিতরে হরদাস প্রশ্ন করিলেন—ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি?

—হ্যাঁ। ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে, আর ডাকলাম না।

—ওঃ, খুব খেলেছে ছোকরা। ভাল খেলে; স্বাস্থ্যও ভাল—বেশ ছেলে।

মা বলিলেন—ভারী মিষ্টি কথা; ব্রজর কথা বলতে একবারে পঞ্চমুখ। ভাল বংশের ছেলে! সেই চিঠিটা কিন্তু তা হ'লে কেউ হিংসে ক'রে দিয়েছিল। মাতাল, নেশাখোর, চরিত্রহীন, গোঁয়ার। দেখে তো তা মনে হয় না। তুই হাসছিস যে?

—হাসছি!

—কেন, তাই তো জিজ্ঞেস করছি।

—সে-চিঠিখানা কিন্তু কালীনাথের হাতের লেখা। কালীনাথের এখনকার চিঠির লেখার সঙ্গে সে-চিঠি মিলিয়ে দেখেছি আমি। ব্রজকে ও দেখতে এসেছিল তো—খুব পছন্দ হওয়ায় এই কাণ্ড সে করেছিল।

—তা ব্রজর আমার তপস্যা ভাল। কালীনাথ আমার রূপে গুণে জামাইয়ের মত জামাই। ব্রজ বলতে পাগল।

অনন্তের মাথার ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল। শেষরাত্রে উত্তপ্ত মস্তিষ্কে সে স্থির করিল—না—সে পড়াশুনাই করিবে। জীবনে প্রশংসা শান্তি এ তাহার চাই—তাহার জন্য তপস্যার প্রয়োজন হয়, সে তপস্যাই করিবে। সর্ব্বান্তঃকরণে সে কালীনাথকে মার্জ্জনা করিল, ব্রজরাণীকে বার-বার মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিল—চিরসুখী হও চিরায়ুষ্মতী হও।

বাড়ীতে আসিয়াই কিন্তু তাহার সব গোলমাল হইয়া গেল। দারুণ ক্রোধে তাহার পিতা বলিলেন—তোর মুখ দেখতে চাই নে আমি। তুই আমাদের বংশের কলঙ্ক! তোর থেকে এত বড় বাড়ীর মান গেল, মর্য্যাদা গেল, তুই মরলি না কেন?

কালই অনন্তের বধূ, যে-লোকের সঙ্গে আসিয়াছিল, সেই লোকের সঙ্গেই পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে। অনুনয়-উপরোধ সমস্ত উপেক্ষা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পুলিসের সাহায্য লইতে উদ্যত হইলে, এ-পক্ষ নীরবে পথ মুক্ত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে কটু কথাগুলি বলিয়া গিয়াছে, তাহার তীক্ষ্ণতায় মর্ম্মাহত অনন্তের জননীর চোখের জল এখনও শুষ্ক হয় নাই। অনন্তের সব গোলমাল হইয়া যাইতেছিল। তবুও সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিল—আমি চললাম।

—কোথায়?

—শ্বশুরবাড়ী।

মা আর্ত্তস্বরে বলিলেন—না না!

—ভয় নেই মা। আমি শ্বশুরের পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইব। সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল, সেই বস্ত্রে সেই অভুক্ত অবস্থায়। মা পিছন পিছন আসিয়াও পিছন-ডাকায় অমঙ্গলের ভয়ে আর ডাকিতে পারিলেন না।

শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়াই সে সত্যসত্যই শ্বশুরের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিল। শ্বশুর মুহূর্ত্তে পা দুইটা টানিয়া লইয়া দ্রুতগতিতে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনন্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অকস্মাৎ তীব্র যাতনায় অস্থির হইয়া লাফ দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—সম্মুখে হাণ্টার উদ্যত করিয়া শ্বশুর। অনন্ত এবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল—হাণ্টারের আস্ফালিত রজ্জুশিখা বার-বার

তাহার দেহখানাকে জর্জ্জরিত করিয়া দিল। জামা ছিঁড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইয়া উঠিল।

—বেরোও আমার বাড়ী থেকে। বেরোও।

অনন্ত স্তব্ধ হইয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

হাতের হাণ্টারগাছটা ফেলিয়া দিয়া গৃহকর্ত্তা হাঁকিলেন—দারোয়ান! নিকাল দো ইস্‌কো। তিনি স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

দারোয়ান আসিতেই অনন্ত দ্রুতপদেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

মাথার মধ্যে তাহার আগুন জ্বলিয়া উঠিল—সমস্ত সঙ্কল্প ভাসিয়া গেল। সে স্থির করিল, বাড়ী হইতে রিভলভারটা লইয়া ফিরিয়া ঐ দাম্ভিক জানোয়ারটাকে হত্যা করিবে, তার পর' সে নিজে আত্মহত্যা করিবে। বাড়ীর ষ্টেশনে নামিয়া দেখিল ষ্টেশনে তাহাদের লোকজন পাল্কী লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। বধূ লইয়াই সে ফিরিবে, এমন প্রত্যাশাই সকলে করিয়াছিল। বাড়ীর সরকার অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—বৌমা—?

—আসেন নি।

—এ কি ছোটবাবু—? সর্ব্বাঙ্গে—। সরকার শিহরিয়া উঠিল।

অনন্ত দ্রুত ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া মাঠের রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

সকলের অলক্ষিতে একটা অব্যবহার্য্য সিঁড়ি দিয়া সে উপরে আসিয়া উঠিল। রিভলভারটা কোথায়? মুহূর্ত্তে অব্যবস্থিত চিত্তে তাহার খেয়াল হইল, শ্বশুরকে হত্যা করিয়া কি হইবে? কন্যার বৈধব্যের যাতনা ভোগ করিবে কে? বার-বার তাহার মন বলিল—সেই ভাল। সে আপনার পরম প্রিয় রিপীটারটা তুলিয়া লইল। খুলিয়া দেখিল কয়টা কার্ত্তুজ ভরাই আছে।

ঘরে—এই ঘরে? না, একবার কোনক্রমে ব্যর্থ হইলে তখন আর উপায় থাকিবে না। কোন নির্জ্জন প্রান্তরে! আত্মহত্যার সঙ্কল্প লইয়া রিপীটারটা হাতে করিয়াই অলক্ষিতে সে আবার বাহির হইয়া পড়িল। বিহ্বলের মত কোন্ দিকে কোন পথে সে চলিয়াছিল—খেয়াল ছিল না।

—অনু! অনু!

কালীনাথের বাড়ীর জানালায় অনন্তের প্রতীক্ষায় ব্রতচারিণী ব্রজরাণী দাঁড়াইয়া ছিল। কালীনাথ জল খাইতে বসিয়াছে—জল খাইয়াই অনন্তকে সে ডাকিয়া আনিবে! ওপাশে ব্রতের আয়োজন সাজানো। ব্রজরাণীর চোখে পড়িল—অনন্ত বন্দুক-হাতে চলিয়াছে। সে বলিল—ওগো অনুঠাকুরপো পথ দিয়ে যাচ্ছে।

কালীনাথ ডাকিল—অনু—অনু!

—কে? কালীনাথ? অনন্তের মস্তিষ্কের অগ্নিশিখার উপর যেন ঘৃতাহুতি পড়িয়া গেল; সহস্র শিখায় লেলিহান হইয়া সে জ্বলিয়া উঠিল। কালীনাথ! তাহার জীবনের কুগ্রহ—তাহার সুখে পরমসুখী কালীনাথ! কালীনাথ! কালীনাথ—তাহার জীবনের সাথী কালীনাথ! একা সে কোথায় যাইবে!

অনন্ত বাড়ীর মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া বলিল—এই যে!

হা-হা করিয়া হাসিয়া কালীনাথ বলিল—এসেই বন্দুক হাতে?

—কুকুরমারা মনে পড়ে? তেমনি ক'রে মারব তোমাকে।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটা সে তুলিয়া ধরিল। ব্রজরাণী আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল; কালীনাথ সভয়ে বন্দুকের নলটা চাপিয়া ধরিয়া অন্য দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—অনু, ক্ষমা—ক্ষমা!

ভীষণ গর্জ্জনে মৃত্যু তখন হুঙ্কার দিয়াছে। কালীনাথের যে-হাতখানা নলটা চাপিয়া ধরিয়াছিল সেটা ভাঙিয়া গেল। ব্রজরাণী কালীনাথকে সবলে আকর্ষণ করিয়া চীৎকার করিল—ঠাকুরপো! আবার বন্দুকটা গর্জ্জিয়া উঠিল, কালীনাথ পড়িয়া গেল, কিন্তু তখনও সে জীবিত। আবার! কালীনাথের রক্তাপ্লুত দেহ নিস্পন্দ নিথর।

অনন্ত দ্রুত বাহির হইয়া গ্রাম পার হইয়া প্রান্তরে পড়িল, তার পর এক স্থানে দাঁড়াইয়া বন্দুকের নলটা মুখে

পুরিয়া পা দিয়া ঘোড়াটা টানিয়া দিল। খট্ করিয়া একটা আওয়াজই হইল শুধু। এ কি? বন্দুকটা তুলিয়া কার্তুজের ঘর খুলিয়া অনন্ত দেখিল শূন্য! নাই, আর নাই, তিনটি কার্তুজই ছিল, ফুরাইয়া গিয়াছে! বাক্ দড়ি তো আছে! কাপড় ছিঁড়িয়া দড়ি যে সহজেই হইবে!

পর ক্ষণেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বন্দুকটা ফেলিয়া দিয়া সভয়ে সে ছুটিতে আরম্ভ করিল। মৃত্যুর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি—ঐ যে রক্তাক্ত বিকৃতমূর্ত্তি কালীনাথ ভাঙা হাতে ফাঁসির দড়ি লইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে! প্রাণপণে সে ছুটিল।

ধরা পড়িল সে দশ দিন পর, বাংলার বাহিরে একটা দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে। সে তখন ঘোর উন্মাদ। আট বৎসর পাগলা-গারদে থাকার পর প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, দায়রা-আদালতে সেই বিচার হইতেছে। কাল ব্রজরাণীর সাক্ষ্য দিবার দিন।

* * *

আজ আট বৎসর ব্রজরাণী অশৌচ পালন করিয়া আসিতেছে। তৈলহীন স্নান, আপন হাতে হবিষ্যান্ন আহার, মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া সে এই দিনটির প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

হরদাসকে মা বলিলেন—বুঝলাম সব বাবা। এই রাত্রি তিন প্রহর হয়ে গেল; একে একে অনন্তের মা বৌ সকলে এলেন। কিন্তু উপায় কই? সে তো কথা শুনলে না। দেখে আয়, চোখ বুজে ব'সে আছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে, মধ্যে মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে; চোখ খুলে সে তাকালে না পর্য্যন্ত। নইলে যা হবে হোক, ছেলেটার তো একটা ভবিষ্যৎ হ'ত!

বলিতে ভুলিয়াছি কালীনাথের মৃত্যুর সময় ব্রজরাণী ছিল অন্তঃসত্ত্বা। একটি পুত্র সে এই দুর্ভাগ্যের মধ্যেও পাইয়াছে।

হরদাস বাবু নিজে গিয়া ডাকিলেন—ব্রজ!

চোখ না খুলিয়াই সে উত্তর দিল—না!

—কথাটাই শোন!

—না!

মা আসিয়া বলিলেন—এইবার একটু ঘুমিয়ে নে ব্রজ!

শিহরিয়া উঠিয়া ব্রজ বলিল—না!

ঘুমাইলেই সেই মূর্ত্তি ব্রজর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে! মা বলিলেন—আমি গায়ে হাত দিয়ে থাকব রে!

—না।

আদালত লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। ব্রজরাণীর সাক্ষ্য শুনিবার জন্য আজ লোক যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ব্রজরাণী কঠিন দৃঢ় পদক্ষেপে আসিয়া সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠিল।

সম্মুখের কাঠগড়াতেই একটা লোক—শুভ্রকেশ শীর্ণ ন্যুব্জদেহ, স্তিমিত বিহ্বল দৃষ্টি, হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে বিহ্বল দৃষ্টিতে ব্রজরাণীর দিকে চাহিয়া সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করিতে লাগিল। উত্তর যেন অতি পরিচিত স্থানে অতি নিকটে রহিয়াছে, তবু সে খুঁজিয়া পাইতেছে না!

ব্রজরাণী স্তম্ভিত হইয়া খুঁজিতেছিল, কোথায় সেই দৃপ্ত দাম্ভিক বলশালী যুবা? কই সে কোথায়? এ কি সেই মানুষ? — না না, এ সে নয়, হইতে পারে না! তাহার অন্তরের মধ্যে একটা প্রবল আবেগ আসিয়া অকস্মাৎ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। চোখদুটি জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অকস্মাৎ ঐ শীর্ণ জীর্ণ হতভাগ্য যেন স্মৃতিকে খুঁজিয়া পাইল—সে পরম মুগ্ধ দৃষ্টিতে গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাহার দিকে চাহিয়া বার-বার ঘাড় নাড়িয়া যেন নিজেকেই সমর্থন করিতে বলিল—দেবী, দেবী, স্বর্গের দেবী তুমি বৌদি!

ব্রজরাণীর চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। করুণায় মমতায় সে যেন দেবীই হইয়া উঠিয়াছে।

সরকারী উকীল ব্রজরাণীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—কেঁদে কি করবেন মা, এখন বিচার প্রার্থনা করুন। সুবিচার যাতে হয় তাতে সাহায্য করুন।

পৃথিবীর দীনতা—পুঞ্জীভূত হীনতায় জীর্ণ ঘৃণাহত ঐ

হতভাগ্য, হায় রে, গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে ঝুলাইয়া দিবে! এ কি বিচার! এ কাহার বিরুদ্ধে বিচার! ব্রজরাণীর সমস্ত যেন গোলমাল হইয়া গেল!

সরকারী উকীল প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন। ওদিকে জনতার মধ্য হইতে অস্ফুট গুঞ্জনে উচ্চারিত দুই-চারিটা কথা ভাসিয়া আসিতেছিল।

—ফাঁসী নয়, বন্দুকের গুলি দিয়ে মারুক ওকে।

ব্রজরাণীর চোখে আবার জল দেখা দিল। সে চারি দিকে চাহিয়া দেখিল—সমস্ত লোক নিষ্করুণ নেত্রে আক্রোশভরে চাহিয়া আছে ঐ হতভাগ্যের দিকে। গম্ভীরমুখ জজ সাহেব ইংরেজীতে কি মন্তব্য করিলেন। অর্থ না বুঝিলেও ব্রজরাণী সে শব্দের কাঠিন্য অনুভব করিল।

আদালতের পিওন বার-বার হাঁকিতেছিল— চুপ—চুপ আস্তে।

—এই লোকটিকে দেখুন। অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে অবশ্য। এই অনন্ত কি আপনার স্বামীকে খুন করেছে? সরকারী উকীল প্রশ্ন করিলেন।

ব্রজরাণীর অন্তরাত্মা তারস্বরে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—তাহারই প্রতিধ্বনি জনতা স্তম্ভিত হইয়া শুনিল—না!

তার পর সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা।

ব্রজরাণী ফিরিল যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত—হৃদয়ে একটা প্রগাঢ় প্রশান্তি—হৃদয়-মন যেন কত লঘু হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে ছিলেন হরদাসবাবু। তিনি তাহাকে বলিলেন—তোর মামাশ্বশুরের সঙ্গে একবার দেখা কর্ ব্রজ। যা দিতে চেয়েছিলেন—চেয়ে নে! ভবিষ্যতে—

ব্রজ বলিল—না।

বাড়ীতে ব্যাপারটার সমালোচনার আর অন্ত ছিল না। ব্রজর মা পর্য্যন্ত কন্যার বুদ্ধিহীনতার সমালোচনা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন—তুমিই একবার যাও হরদাস, ওর নাম ক'রে। সে গেল কোথায়?

সন্ধ্যার অন্ধকারে ব্রজরাণী ক্লান্ত হইয়া ঘরের মধ্যে পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মা আসিয়া দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আবার এখুনি স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে একটা কাণ্ড ক'রে বসবে। ব্রজ—ও ব্রজ! চল নীচে শুবি, এখানে একা তোর আবার ভয় করবে।

ব্রজ নিদ্রারক্ত চোখ মেলিয়া বলিল—না।

সে আবার নিশ্চিন্ত নিদ্রায় নয়ন নিমীলিত করিল।

পূজার উৎসব

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

আবার আসিল পূজা জীর্ণচূড়া মায়ের মন্দিরে!
ক্লেশজীর্ণ বঙ্গবাসী বৎসরান্তে কোন মতে ধীরে
উঠিয়া বসিল ফিরে' রোগশয্যা ছাড়িয়া তাহার;
—দশ ভুজা দশ হাতে কি যে দুঃখ দিবেন আবার,
ভয়ে-ভয়ে ভাবে মনে; দুশ্চিন্তায় স্তম্ভিত হৃদয়;
—ভদ্রাসনখানা বুঝি এবারে বা বাঁধা দিতে হয়!
যাট বৎসরের পূজা—দেবোত্তর—এত দিন চ'লে
আসিছে ত কোনরূপে--আজ তারে ফেলি বা কি ব'লে!

—তিনদিনকার পূজা! আয়োজন অল্প নয় বড়;
আত্মীয়স্বজন আসি' গৃহে যাঁরা হয়েছেন জড়ো,
ব্যয়ের উপরে ব্যয়—নূতন বসন দিতে হবে!
নিষ্কৃতি নাহিক তার—এগৃহের রীতি এই,—তবে?

শিরে হাত দিয়া গৃহী হেঁটমুখে মৌন হয়ে রয়;
গৃহিণী কহেন আসি'—ভাবনার এই কি সময়?
কাহারে ফেলিবে বল—ঠাকুর, না, আপনার জন?
আবার আসিবে জর, দিনরাত ভাবিলে এমন,
বলিয়া রাখিনু কিন্তু; ভেবে দেখ—
তোমারি তো সব-
এ সময়ে আসিবে না? বৎসরের এই তো উৎসব'

—কি আর উত্তর আছে? বাহিরায় শুধু দীর্ঘশ্বাস।
বোধনের বাদ্য বাজে—শিশুকণ্ঠে কাটিছে আকাশ!

ডেভিড হেয়ার, রামমোহন রায় ও হিন্দু কলেজ

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্‌-এ

১২

রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ারের বন্ধুতা; ডেভিড হেয়ারের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

যখন মিশনরীগণের দ্বারা শিক্ষাবিস্তারের বাধা অপসারিত হইয়াছে, শিক্ষাবিস্তার কার্য্যও কোম্পানীর কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, এবং শিক্ষাদান কার্য্যটি নব্য য়ুরোপীয় ধারায় কি প্রাচীন ভারতীয় ধারায় পরিচালিত করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে, সেই যুগসন্ধিকালে (১৮১৪ সালের দ্বিতীয়ার্দ্ধে) রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া বসিলেন। রামমোহন রায় যে কিরূপ সতেজে এ-দেশে পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষাদানের সমর্থন করিয়াছিলেন, এবং গভর্ণমেণ্ট যে অবশেষে ইংরেজী শিক্ষার পক্ষেই মত প্রদান করিলেন, এ-সকল কথা বিগত প্রস্তাবের শেষ ভাগেই উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা সেখানে ইহাও দেখাইয়াছি যে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনে রামমোহন রায়ের হাত কতখানি ছিল, তাহা এখন কেবল রামমোহন রায়ের স্বদেশীয়গণই বলেন না; বিদেশীয় রাজপুরুষগণও মুক্ত কণ্ঠে তাহা স্বীকার করেন।

রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়াই ডেভিড হেয়ারের সহিত প্রগাঢ় বন্ধুতায় আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। দুই জন মহামনা মানুষের বন্ধুতার ন্যায় এমন মনোজ্ঞ ব্যাপার বোধ হয় মানব-ইতিবৃত্তে আর কিছু নাই। এই দুইটি মানুষের বন্ধুতা তৎকালীন বঙ্গসমাজের ইতিহাসের এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। এই বন্ধুতা কতদূর প্রগাঢ় হইয়াছিল তাহার কয়েকটি নিদর্শন এই যে, রামমোহন রায়ের ধর্ম্মসংসৃষ্ট কার্য্য ভিন্ন আর সমুদয় কার্য্যে ডেভিড হেয়ার তাঁহার সঙ্গী ও সহায় হইয়াছিলেন; রামমোহন রায় যখন ইংলণ্ডে গেলেন, ডেভিড হেয়ার তখন তাঁহার ভ্রাতাদিগকে রামমোহন রায়ের সর্ব্ববিধ সাহায্য করিতে, এবং নিরন্তর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ইংলণ্ডের ক্ষুদ্রাশয় লোকদের প্রতারণা হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে অনুরোধ করেন; সেই ভ্রাতাদের লণ্ডনস্থ বেড্‌ফোর্ড স্কোয়ারের বাড়ীতে রামমোহন রায় বাস করিতেন, এবং এক ভ্রাতার কন্যা গাড়ীতে গাড়ীতে সর্ব্বদা রামমোহন রায়ের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; এক ভ্রাতা রামমোহন রায়ের সহচর হইয়া ফ্রান্সে গমন করেন; এবং পূর্ব্বোক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রীটি রামমোহন রায়ের অন্তিম শয্যায় তাঁহার শুশ্রূষা করেন এবং তাঁহার দেহত্যাগে নিরাশ্বাস হইয়া ক্রন্দন করেন।

ডেভিড হেয়ার ১৭৭৫ সালে (অর্থাৎ রামমোহন রায়ের তিন বৎসর পরে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আদি নিবাস ছিল স্কটলণ্ডে; কিন্তু তাঁহার ভ্রাতাগণ লণ্ডনে বাস করিতেন। তিনি ১৮০০ সালে কলিকাতায় আগমন করেন এবং ১৫।১৬ বৎসর ঘড়ির ব্যবসায় করিয়া ক্রমে ক্রমে কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করেন। রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া বসিবার অল্প কাল পরেই ডেভিড হেয়ার ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। উপার্জ্জিত ধনের অধিকাংশই তিনি এদেশের মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয় করিতেন। বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসের সহিত তাঁহার নাম অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। কিন্তু স্বয়ং তিনি বিশেষ শিক্ষিত মানুষ ছিলেন না, আপনাকে শিক্ষিত লোক বলিয়া মনেও করিতেন না। উচ্চপদে আরূঢ় হইবার কোন আকাঙ্ক্ষাও তাঁহার অন্তরে ছিল না। তিনি রামমোহন রায়ের অকৃত্রিম বন্ধু হইলেও, পদমর্য্যাদা বিষয়ে এবং ধর্ম্মভাব বিষয়ে রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার বিশেষ পার্থক্য ছিল। রামমোহন রায় দেশীয় ও য়ুরোপীয় উভয় শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ লোকদের সঙ্গে সমকক্ষের ন্যায় বিচরণ করিতেন। প্রধানতঃ তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ধনসম্পদের বলে

তিনি এরূপ করিতেন। কিন্তু ডেভিড হেয়ারের অবস্থা অন্যরূপ ছিল। তিনি সামান্য ব্যবসায়ী মানুষ ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব জনহিতৈষণার ও ছাত্রপ্রীতির পরিচয় পাইয়াই ক্রমে ক্রমে দরিদ্রতম ভারতবাসী হইতে উচ্চতম রাজপুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সম্মান দান করিতে ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু তিনি কখনও আপনাকে মানবান্ মানুষ বলিয়া অনুভব করিতেন না; সামান্য অ-মানী মানুষের মত সকলের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেন। তিনি দরিদ্রের দুঃখ দূর করিবার জন্য যাচিয়া তাহাদের বাড়ীতে যাইতেন; আবার প্রয়োজন মত উচ্চতম রাজকর্ম্মচারী-দের সঙ্গেও দেখাসাক্ষাৎ করিতেন। এই আশ্চর্য্য মানুষটি যেন বাঙ্গালীর উপকারের জন্যই বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর মত সাদাসিধা আহার করিতেন; মাগুর মাছের ঝোল খাইতে ভাল-বাসিতেন**; তক্তপোষের উপর বসিয়া লোকের সঙ্গে আলাপ করিতেন; কলিকাতার তৎকালীন কদর্য্য গলিতে গলিতে ঘুরিয়া দরিদ্রদের খবর লইয়া বেড়াইতেন। এদেশের এমন হিতৈষী মানুষের সঙ্গে রামমোহন রায়ের প্রগাঢ় বন্ধুতা হওয়া অতি স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় একটি বিষয়ে রামমোহন রায়ের সঙ্গে ডেভিড হেয়ারের পার্থক্য ছিল। তাহা প্রকৃতিগত পার্থক্য। রামমোহন রায় ধর্ম্মের ভিত্তিতে সমুদয় কল্যাণ কর্ম্ম করিতে চাহিতেন। ধর্ম্মমতের বিশুদ্ধতার প্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল, এবং সে জন্য তাঁহাকে বহু সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে এবং বহু প্রকারে লোকের অপ্রিয় হইতে হইয়াছিল। ডেভিড হেয়ার ধর্ম্ম বিষয়ে কিঞ্চিৎ নির্লিপ্ত ছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কার কার্য্য দূরে থাকুক, সাধারণ ধর্ম্মকর্ম্ম (যেমন রীতিমত গির্জ্জায় গমন প্রভৃতি) বিষয়েও তিনি উদাসীন ছিলেন। এই কারণেই তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ কোনও খ্রীষ্টীয় গোরস্থানে সমাহিত করা যায় নাই; কলেজ স্কোয়ারের অর্থাৎ গোলদীঘির দক্ষিণাংশে সমাহিত করা হয়। তাহাতে বাঙ্গালী সমাজের পক্ষে বর্ষে বর্ষে তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করা সহজ হইয়াছে। যাহা হউক, প্রকৃতিগত এই পার্থক্য সত্ত্বেও ডেভিড হেয়ারের হৃদয়ের কোমলতা এবং পরহিতৈষণার আত্মোৎসর্গের ভাব রামমোহন রায়কে মুগ্ধ করিয়াছিল। উভয়েই ছিলেন মহামনা মানুষ; উভয়েই নিজের যথাসর্ব্বস্ব কল্যাণকর্ম্মে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; উভয়েই অপরের মঙ্গলের জন্য আপনার মর্য্যাদার হানিকে একান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। এইরূপ দুই জন মহামনা মানুষের বন্ধুতা ধর্ম্মভাব বিষয়ক অনৈক্য হেতু কখনও ক্ষুণ্ণ হয় না।

কিন্তু উভয়ের প্রকৃতির এই পার্থক্যের একটি ফল আমরা অচিরেই দেখিতে পাইব। রামমোহন রায়কে আচারনিষ্ঠ হিন্দুগণ আপনাদের যে-সকল শিক্ষায়তনে কার্য্য করিতে দেন নাই, সে-সকলের কার্য্যে ডেভিড হেয়ারের সাহায্য লইতে তাঁহারা কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু সেই সকল প্রতিষ্ঠানের কোন জটিল সমস্যা উপস্থিত হইলেই ডেভিড হেয়ার স্বীয় বন্ধু রামমোহনের নিকটে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

কলিকাতায় বর্ত্তমান হেয়ার ষ্ট্রীট ডেভিড হেয়ারের নাম বহন করিতেছে। সেই রাস্তায় তাঁহার একখানি বাড়ী ছিল। তাঁহার আর্থিক অবস্থা শেষ কালে ভাল ছিল না; তিনি কিছু ঋণগ্রস্তও হইয়াছিলেন। অর্থের অভাবে নিজের সেই বাড়ীখানি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। সেই বাড়ীতে তাঁহার বন্ধু গ্রে (Grey) সাহেবের সঙ্গে তিনি বাস করিতেন। ঘড়ির ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি গ্রে সাহেবকেই সেই ব্যবসায়টি হস্তান্তরিত করিয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে একটি গাছের তলায় একটি মুদীর দোকান ছিল; সেই মুদীর নিকট হইতে কলাপাতা চাহিয়া লইয়া হেয়ার সাহেবের দর্শনার্থিগণ তাঁহার কাছে নিজের নিজের নাম লিখিয়া পাঠাইতেন। ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য খেলনা ও ছবির বইয়ে হেয়ার সাহেবের ঘর সর্ব্বদা বোঝাই থাকিত; তাহারা সেই সকল লইবার জন্য তাঁহার ঘরে ও প্রাঙ্গণে সর্ব্বদাই ভিড় করিত ও ছুটা-ছুটি করিত। প্রত্যহ দশটার সময়ে হেয়ার সাহেব পালকী করিয়া কলিকাতার তৎকালীন পাঠশালা, স্কুল ও কলেজগুলির পরিদর্শনে বাহির হইতেন। পঞ্চদশ প্রস্তাবে আমরা দেখিতে পাইব যে, 'আরপুলি স্কুলে' গিয়া তিনি

অনেকক্ষণ একখানি তক্তপোষের উপর বসিয়া ছাত্রদের সর্ব্ববিধ খবর লইতেন। তাঁহার পালকীতে সঞ্চিত খেলনা ছবির বই ও ঔষধগুলি এই সময়েই অধিকাংশ বিতরিত হইয়া যাইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি বিদ্বান্ লোক ছিলেন না; কিন্তু অসাধারণ হৃদয়বত্তা ও সহজ বুদ্ধির গুণে তিনি ছাত্রদের যত উপকার করিতে পারিয়াছিলেন, এবং বিদ্যালয়গুলিতে তাঁহার যেরূপ প্রতিপত্তি দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

সহজ বুদ্ধির দ্বারা তিনি বুঝিতে পারিতেন যে সচ্চরিত্রতা, স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, এবং অন্ততঃ হাতের লেখাটি ভাল করা,—এই সকল গুণ উপার্জ্জন করিতে পারিলেই ছাত্রদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল হইবে; এই জন্য তিনি এই সকলের উপরেই অধিক জোর দিতেন। তিনি নিজে ক্লাসে ক্লাসে গিয়া ছাত্রদের হাতের লেখা দেখিতেন। হয়তো স্কুলের পাঠ্য অন্যান্য বিষয়গুলির পরীক্ষা লইতে তিনি পারিতেন না। তাঁহার পরিচালনাধীন 'স্কুল সোসাইটির স্কুলে' কোনও ছাত্রকে ভর্ত্তি করিবার সময় তিনি সচ্চরিত্রতার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন।

পঞ্চদশ প্রস্তাবে ইহাও বর্ণিত হইবে যে 'ডেভিড হেয়ারের স্কুল' হইতে ত্রিশটি ছাত্র হিন্দু কলেজে অবৈতনিক ছাত্ররূপে ভর্ত্তি হইবার অধিকার লাভ করিত, এবং তাহারা বিশেষ ভাবে হেয়ার সাহেবের ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইত। কিন্তু হেয়ার সাহেব কেবল এই কয়টি ছাত্রের নহে, তৎকালীন কলিকাতার পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু কলেজ পর্য্যন্ত সর্ব্ব শ্রেণীর বিদ্যালয়-গুলির সমুদয় ছাত্রেরই খবর রাখিতেন; কোন ছাত্র অসুস্থ হইয়া বা দুষ্টামি করিয়া বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হইলে তাহাদের খোঁজ লইতে তিনি তাহাদের বাড়ী বাড়ী যাইতেন; যাহাতে শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে বেত্রদণ্ড প্রয়োগ না করেন, তাহার চেষ্টা করিতেন; তোয়ালে লইয়া ছেলেদের গা ঘষিয়া দেখিতেন, তাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে কি না। তিনি যেন সমুদয় কলিকাতাবাসী ছাত্রগণের মা-বাপ ছিলেন। বঙ্গদেশে শিক্ষার ইতিহাসে দেশীয় বা য়ুরোপীয় কোন শ্রেণীর কোন মানুষের দ্বারা আর কখনও তাঁহার স্থান পূর্ণ হয় নাই।

আমরা দেখিতে পাইব, লোকে হিংসা করিয়া হেয়ার সাহেবের পূর্ব্বোক্ত ত্রিশটি ছাত্রকে তাঁহার 'পোষ্যপুত্র' বলিত, এবং এরূপ অভিযোগও করিত যে ঐ 'পোষ্যপুত্রগণে'র প্রতি তাঁহার কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব ছিল। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। শিবচন্দ্র দেব মহাশয় বলিয়াছেন[৩১], "একদিন হেয়ার সাহেব আমাকে একখানি তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত নব প্রকাশিত ইংরেজী ও বাংলা অভিধান উপহার দিলেন। আমি ইহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম, কারণ আমি তাঁহার স্কুল হইতে প্রেরিত অবৈতনিক ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলাম না; হিন্দু কলেজে আমি বেতন দিয়াই পড়িতাম। তিনি আমাকে কেন ঐ পুস্তক উপহার দিতেছেন, ইহা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর করিলেন যে, কয়েক দিন পূর্ব্বে এক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আমাদের ক্লাসের পরীক্ষা লইয়াছিলেন; তাঁহার মুখে তিনি শুনিয়াছেন যে আমি পরীক্ষাতে খুব ভাল করিয়াছি। ইহার পর হইতে তিনি আমার সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লইতে লাগিলেন, এবং আমাকে হিন্দু কলেজের একটি বৃত্তির জন্য আবেদন করিতে বলিলেন। আমি পরে পরীক্ষা দিয়া সে বৃত্তি লাভ করি।" এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে হেয়ার সাহেব কত দূর তন্ন তন্ন করিয়া কলিকাতার সব ছাত্রের ভাল ও মন্দ উভয়ের সংবাদ লইতেন।

শেষ বয়সে তিনি কলিকাতার স্মল কজ কোর্টের এক জন কমিশনর নিযুক্ত হন। ১৮৪২° সালের ১লা জুন তারিখে বিসূচিকা রোগে তিনি দেহত্যাগ করেন।

ডেভিড হেয়ারের জীবনবৃত্তান্ত এমন চমৎকার যে অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত আপাততঃ আমাদিগকে সেই প্রসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হইতে হইতেছে। পঞ্চদশ প্রস্তাবে স্কুল সোসাইটির বর্ণনাসূত্রে পুনরায় আমাদিগকে এই পবিত্র প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এখানেই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে; তাহা এই যে, বাঙ্গালীর হৃদয়ে যদি অণুমাত্রও কৃতজ্ঞতা ও উদারতার ভাব থাকে, তবে বাঙ্গালী কখনই এই মহাপুরুষকে বিস্মৃত হইতে পারিবে না। আমরা যে এখনও তাঁহার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর

জীবনচরিত সঙ্কলন করিতে পারি নাই, ইহা আমাদের পক্ষে অতিশয় লজ্জার বিষয়।

অতঃপর হিন্দু কলেজ স্থাপনের প্রসঙ্গে আমরা রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ারের পরস্পরের সহকারিতার পরিচয় পাইব।

১৩

হিন্দু কলেজ স্থাপনের প্রারম্ভিক পরামর্শ

শিক্ষাবিস্তারের প্রণালী বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মত স্থির হইতে যখন বিলম্ব হইতেছে, সেই সময়ে এ দেশের কল্যাণকামিগণ, বিশেষতঃ রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার, নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছুক হইলেন না। উভয়ের মধ্যে এই পরামর্শ হইল যে এদেশে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তারের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। ডেভিড হেয়ারের চরিতাখ্যায়ক প্যারীচাঁদ মিত্র বলিতেছেন,[৩২] এক দিন ডেভিড হেয়ার অনাহূত হইয়া রামমোহন রায়ের বাটীতে একটি সভায় আগমন করিয়া তাঁহাকে এই পরামর্শ দেন যে, একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিলেই পৌত্তলিকতা নিরসনের শ্রেষ্ঠ উপায় হয়; কিন্তু রামমোহন রায় সে পরামর্শ না শুনিয়া ধর্ম্মালোচনা ও ঈশ্বরোপাসনার জন্য 'আত্মীয় সভা' স্থাপনেই প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু প্যারীচাঁদ মিত্রের লিখিত ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তকের ভূমিকায় প্যারীচাঁদ মিত্র স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এজন্য আমাদের নিকটে ১৮৫৩ সালে হাউস অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে ডাঃ আলেগজাণ্ডার ডফ যে সাক্ষ্য প্রদান করেন, তাহা অধিক প্রামাণ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহা এইরূপ :—

"The system of English education commenced in the following very simple way in Bengal. There were two persons who had to do with it—one was Mr. David Hare, and the other was a native, Rammohun Roy. In the year 1815 they were in consultation one evening with a few friends as to what should be done with a view to the elevation of the native mind and character. Rammohun Roy's position was that they should establish an assembly or convocation, in which what are called the higher or purer dogmas of Vedanta or ancient Hinduism might be taught,—in short, the Pantheism of the Vedas and their Upanishads,—but what Rammohun Roy delighted to call by the more genial title of Monotheism. Mr. David Hare was a watch-maker in Calcutta, an ordinary illiterate man himself; but being a man of great energy and strong practical sense, he said, the plan should be to institute an English School or College for the instruction of native youths. Accordingly he soon drew up and issued a circular on the subject, which gradully attracted the attention of the leading Europeans, and among others, of the Chief Justice Sir Hyde East. Being led to consider the proposed measure, he heartily entered into it, and got a meeting of European gentlemen assembled in May 1816. He invited also some of the influential natives to attend. Then it was unanimously agreed that they should commence an institution for the teaching of English to the children of higher classes, to be designated the Hindu College of Calcutta."[৩৩]

দেখা যাইতেছে যে প্রস্তাবিত কলেজ সম্বন্ধে রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ারের মধ্যে প্রথম পরামর্শ হয় ১৮১৫ সালে; এবং সার্ হাইড্ ঈষ্টের (Sir Hyde East) ভবনে প্রথম সভার অধিবেশন হয় ১৮১৬ সালের মে মাসের ১৪ই তারিখে। এ উভয়ের ব্যবধান কালের মধ্যে রামমোহন রায় যে সার্ হাইড্ ঈষ্টের ভবনের সমুদয় প্রারম্ভিক পরামর্শের ভিতরে ছিলেন, সে বিষয়ে আমাদের মনে সন্দেহ নাই। এরূপ মনে করিবার দুইটি বিশিষ্ট হেতু আছে। প্রথমতঃ, রামমোহন রায়ের সাহায্য ব্যতীত ডেভিড হেয়ার একাকী সার্ হাইড্ ঈষ্টের ন্যায় এক জন শিক্ষিত ও পদস্থ মানুষের সঙ্গে একটি কলেজ স্থাপনের বিষয়ে পরামর্শ করিতে যাইতে সমর্থ হইতেন না। ডেভিড হেয়ারের চরিতাখ্যায়ক লিখিতেছেন,[৩৪] "Hare ... had kept himself in the background", অর্থাৎ হেয়ার সে সময়ে আপনাকে পশ্চাতে রাখিয়া আসিতেছিলেন। পশ্চাতে থাকিবার কারণ এই যে হেয়ার জানিতেন, "আমি শিক্ষিত মানুষ নই, অতএব এরূপ বিষয়ের পরামর্শে

অগ্রণী হইবার যোগ্য নই।" দ্বিতীয়তঃ, সার্ হাইডের ১৮১৬ সালের ১৮ই মে তারিখের এক পত্রে দেখা যায়, যখন ১৪ই মে তারিখের সভাতে রামমোহন রায়ের সাহায্য গ্রহণ বিষয়ে আপত্তি উঠিল, তখন তাহাতে সার্ হাইড্ ঈষ্ট অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন।[৬৫]

সেই সময়ে দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় নামক পাথুরিয়াঘাটার এক সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্রাহ্মণ[৬৬] ইংরেজ রাজপুরুষগণের নিকটে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। সার্ হাইড্ ঈষ্ট তাঁহার দ্বারা অনুসন্ধান করাইয়া অবগত হইলেন যে, দেশীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা সকলেই ইংরেজী শিক্ষাদানের জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে উৎসাহিত। ইহা জানিয়া সার্ হাইড্ ঈষ্ট অঙ্গীকার করিলেন যে, তিনি নিজ নামে ও নিজের ভবনে সম্ভ্রান্ত দেশীয় ভদ্রলোকদিগকে আহ্বান করিয়া একটি সভা করিবেন, এবং তৎপরে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টির সংস্থাপন ও পরিচালন বিষয়ে স্বয়ং যথাশক্তি সাহায্য করিবেন।

১৮১৩ সালের চার্টারের নূতন ধারাতে (ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে দশম প্রস্তাব দ্রষ্টব্য) একটি এই সর্ত্ত ছিল যে সমুদয় শিক্ষায়তনকেই সপরিষদ গবর্ণর-জেনারেলের আদেশ অনুসারে পরিচালিত করিতে হইবে। অতএব সার্ হাইড্ ঈষ্ট প্রস্তাবিত কলেজ সম্পর্কে সর্ব্বাগ্রে গবর্ণর-জেনারেল মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস্ ও তাঁহার কাউন্সিলের সম্মতি গ্রহণ করিলেন। তৎপরে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে[৬৭] তারিখে নিজ ভবনে[৬৮] প্রস্তাবিত পরামর্শ সভা আহ্বান করিলেন। সভাতে ৫০ জনের অধিক সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোক ও পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল। সেই সভাস্থলেই এ কার্য্যের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দান স্বাক্ষরিত হয়। পরে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল।

এই প্রথম সভার বিবরণ সূত্রে সার্ হাইড্ ঈষ্ট তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পত্রে লিখিতেছেন, কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই এক জন ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ সার্ হাইড্ ঈষ্টকে বলিলেন যে তিনি আশা করেন, প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে রামমোহন রায়ের নিকট হইতে কোন অর্থসাহায্য গ্রহণ করা হইবে না। ইহাতে সার্ হাইড্ ঈষ্ট অতিশয় বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন, "রামমোহন রায় আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ও স্বয়ং হিন্দু হইয়াও বিধর্ম্মীর ন্যায় হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিতেছেন।" রামমোহনের বিরুদ্ধে গোঁড়া হিন্দুদিগের এরূপ ক্রুদ্ধ হইবার কারণ এই যে, তৎপূর্ব্বে এক বৎসর কালের মধ্যে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা দ্বারা এবং সভাসমিতির দ্বারা নানা ভাবে পৌত্তলিকতার নিন্দা করিয়াছিলেন, এবং তদুপরি তিনি মুসলমানগণের সহিত অতিশয় ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতেন। কিন্তু সার্ হাইড্ ঈষ্ট লিখিতেছেন, অন্যান্য হিন্দুগণ রামমোহন রায়ের টাকা লইতে আপত্তি করেন নাই।[৬৯]

ডেভিড হেয়ার তাড়াতাড়ি গিয়া বন্ধু রামমোহন রায়কে এই সঙ্কটের সংবাদ দিলেন। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে তাঁহার সংস্রব থাকিলে অন্ততঃ একজন মানুষও এই কার্য্য হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন, এই সংবাদ জানিবামাত্র রামমোহন নিজেই ইহার উদ্যোক্তাগণের তালিকা হইতে নিজ নাম তুলিয়া লইলেন। তাঁহার বন্ধুগণ, বিশেষতঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর, ইহার পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে রহিলেন; কিন্তু রামমোহন স্বয়ং প্রথম উদ্যোক্তাদিগের মধ্যে এক জন হইয়াও আপনাকে বিলুপ্ত করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। এই আত্মবিলোপে রামমোহন রায়ের প্রকৃতির যে মহত্ত্ব প্রকাশিত হইল, তাহা দেশীয় ও য়ুরোপীয় উভয় সমাজের উন্নতমনা লোকদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিল।[৭০]

১৪

হিন্দু কলেজ স্থাপন; তাহার প্রথম ৮ বৎসর (১৮১৭—১৮২৫), এবং শেষ কয়েক বৎসরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হিন্দু কলেজই ভারতবর্ষে সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইংরেজী বিদ্যালয়। "হিন্দু কলেজই এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল; এবং বঙ্গদেশ আজ যাহাদিগকে লইয়া গৌরবান্বিত, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই এই হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রসিককৃষ্ণ

মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, দ্বারকানাথ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়,··· দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামতনু লাহিড়ী, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি ··· এই হিন্দু কলেজকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।··· মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, এবং বঙ্গীয় লেখক-কুলগৌরব অক্ষয়কুমার দত্ত, এই তিন জনের কার্য্য ছাড়িয়া দেখিলে বঙ্গের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং সাহিত্যবিষয়ক যে-কোন প্রকার উন্নতিই হউক, প্রধানতঃ হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।"৭১

এই জন্য এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ও ইহার প্রভাবের বিষয়ে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে প্রসঙ্গ করিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে রামমোহন রায়ের সহিত এই বিদ্যালয়ের সম্পর্কচ্ছেদের ফল, রামমোহন রায় কর্ত্তৃক স্বায়ত্ত একটি স্কুল স্থাপন, এবং ডিরোজিওর শিক্ষার ফলে এই বিদ্যালয় হইতে হিন্দু সমাজে বিক্ষোভের উদয়,— প্রভৃতি বিষয়েও আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে।

বিগত প্রস্তাবে বর্ণিত প্রথম সভার পর ১৮১৬ সালের ২১শে মে তারিখে হিন্দুকলেজ স্থাপন বিষয়ে আর একটি সভা আহূত হইল। তাহাতে নির্দ্ধারিত হইল যে হিন্দু বালকদের শিক্ষার জন্য একটি 'মহাবিদ্যালয়' অথবা কলেজ স্থাপিত হউক, এবং গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলারদিগকে বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক (Patrons), সার্ হাইড্ ঈষ্টকে সভাপতি (President), এবং সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের প্রধান বিচারপতি জে এইচ হ্যারিংটন সাহেবকে সহকারী সভাপতি (Vice-President) হইতে অনুরোধ করা হউক। ৮ জন য়ুরোপীয় ও ২০ জন দেশীয় ভদ্রলোক ভাবী কলেজের কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর সেই কমিটির এক জন সভ্য হইলেন। লেফ্‌টেনাণ্ট আরভিন্ সাহেবকে (Lieutenant Irvine) মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতনে কলেজের য়ুরোপীয় সেক্রেটারী এবং বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে মাসিক ১০০৲ বেতনে দেশীয় সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হইল।

প্রস্তাবিত কলেজ হইতে এই ভাবে রামমোহন রায়কে দূরে রাখার ফল ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা তখন কেহ অনুমানও করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মলোপের ভয়ে রামমোহনকে সরান হইল বটে; কিন্তু ফলে "হিতে বিপরীত" ঘটিল। যে-সকল হিন্দু ভদ্রলোক কলেজের কমিটিতে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি কয়েক জন ব্যতীত অপর সকলের মনে দারুণ ভয় ছিল যে, কলেজে ধর্ম্মশিক্ষা দানের ব্যবস্থা রাখিলেই অবশেষে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দুধর্ম্ম বিপন্ন হইবে; অতএব উহাতে ধর্ম্মশিক্ষা দানের প্রয়োজন নাই। কিন্তু রামমোহন রায়ের মনে পূর্ব্বাপর এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যেন দেশীয় যুবকগণ ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা লাভ করেন। রামমোহন রায় হিন্দু কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে থাকিলে হয়তো হিন্দু কলেজ ধর্ম্মস্পর্শবর্জ্জিত হইয়া যাইতে পারিত না, হিন্দু কলেজের প্রথম ছাত্রদলও উচ্ছৃঙ্খল এবং বিপ্লবপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারিতেন না।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট তারিখে কলেজ সম্বন্ধে একটি 'সাধারণ সভা' হইল; তাহাতে কলেজের নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। নিয়মাবলীতে কলেজের 'উদ্দেশ্যে'র মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষার কোনও স্থান রাখা হইল না।৭২ এই কারণে এই নিয়মাবলী রামমোহন রায়ের চক্ষে অতিশয় অসন্তোষজনক বোধ হইল। তিনি নিজের পৃথক্ বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী সোমবার আপার চিৎপুর রোডের পশ্চিম দিকে গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে (ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর নূতন বাড়ীর ভূমিস্থিত গৃহে) হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইল। ইহার পর কলেজটি একবার চিৎপুরে রূপচরণ রায়ের বাটীতে এবং পরে (১৮৩০ সালের ১৪ই জুলাই তারিখে), বর্ত্তমান চিৎপুর রোডের ৪৮ নম্বর ভবনে, অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের পরিত্যক্ত 'রামকমল বসু'র বাটী'তে, উঠিয়া যায়।

হিন্দু কলেজের ভাবী ইতিহাসও এখানে বলিয়া ফেলাই ভাল। ১৮১৯ সাল হইতেই উহার আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ঐ বৎসর হইতে ১৮২২ সাল পর্য্যন্ত ছাত্র-বেতন লওয়া হইত না। ৭৩ ডেভিড হেয়ার তখন এই যুক্তি দান করিলেন যে বেতন দিয়া সেক্রেটারী রাখা বন্ধ করা হউক। তাঁহার এই পরামর্শ গৃহীত হওয়াতে ১৮১৯ সাল হইতে লেফ্‌টেনান্ট আরভিন পদত্যাগ করিলেন, বৈদ্যনাথ বাবু অবৈতনিক সেক্রেটারী হইয়া রহিলেন। ১৮২৩ সাল পর্য্যন্ত কলেজের আর্থিক অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইয়াই চলিল। অবশেষে ১৮২৪ সালে জোসেফ ব্যারেটো এণ্ড সনস্ (Joseph Barretto & Sons, যাহাদের কাছে হিন্দু কলেজের টাকাকড়ি গচ্ছিত থাকিত), ফেল হইয়া গেল। তখন কলেজ কমিটি কলেজ চালাইতে অসমর্থ হইয়া গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন। "গভর্ণমেণ্ট প্রার্থিত অর্থসাহায্য অবশেষে এই নিয়মে দিতে স্বীকৃত হইলেন যে, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মধ্যে মধ্যে প্রদত্ত টাকার সদ্ব্যয় হইতেছে কি না দেখিবার জন্য সরকারী সাধারণ শিক্ষাসমিতির৭৪ পক্ষ হইতে কলেজের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন। এই বন্দোবস্ত অনুসারে ডাক্তার এইচ. এইচ উইলসন্ শেষোক্ত সমিতির এক জন পদহেতুক (*ex officio*) সভ্য ও সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। হেয়ার সাহেবের সম্মানার্থ তাঁহাকেও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক জন সভ্য নির্ব্বাচিত করা হইল; তিনি প্রতিদিন কলেজ পরিদর্শন করিতেন।" "গভর্ণমেণ্ট কলেজের সাহায্যকল্পে নিজ ব্যয়ে এক জন পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে, এবং অবস্থানোপযোগী একখানি বাটী নির্ম্মাণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। অবশেষে সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের একত্রাবস্থানই স্থির হইল, এবং গোলদীঘির উত্তরাংশে হেয়ার সাহেব প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপর গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকায় নির্ম্মিত নূতন বাটীতে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে উভয় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল।"

ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিতে৭৫ হিন্দু কলেজের আর্থিক অবস্থা ও পরিচালন বিষয়ক মতভেদ প্রভৃতির বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ১৮৪৪ সালে উহার কমিটির দেশীয় সভ্যগণ কলেজটি গভর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করাই ভাল মনে করিলেন। তদবধি উহার কলেজ বিভাগ প্রেসিডেন্সী কলেজের সহিত মিশিয়া গেল, স্কুল বিভাগ 'হিন্দু স্কুল' নামে চলিতে লাগিল।

হিন্দু কলেজ কি নামে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? প্রথম সভার সময় 'মহাবিদ্যালয়' বা 'মহাপাঠশালা' নাম দেখিতে পাওয়া যায়। 'শিবচন্দ্র দেব' পুস্তকের ৪৮ পৃষ্ঠায় হিন্দু কলেজ হইতে শিবচন্দ্র দেবকে ১৮৩২ সালে প্রদত্ত সার্টিফিকেটের যে ফটোগ্রাফ মুদ্রিত আছে, তাহাতে এংলো-ইণ্ডিয়ান কলেজ ('Anglo-Indian College') এই নাম আছে; দ্বিতীয় কোন নাম নাই। সম্ভবতঃ উহাই ঐ কলেজের প্রামাণ্য নাম ছিল। কিন্তু সাধারণ লোকে 'হিন্দু কলেজ' বলিত। রামমোহন রায়ের স্কুলের নাম ছিল 'এংলো-হিন্দু স্কুল' (Anglo-Hindu School), কিন্তু সাধারণ লোকে তাহার ঐ নাম ব্যবহার করিত না। সাধারণ লোকের মুখে মুখে প্রথমতঃ 'রামমোহন রায়ের স্কুল' ও পরে 'পূর্ণ মিত্রের স্কুল' নামই শোনা যাইত। সেকালে প্রায় প্রত্যেক প্রসিদ্ধ লোকের ও প্রসিদ্ধ অনুষ্ঠানের লোকমুখে প্রচলিত নানা বিকৃত নাম থাকিত।

হিন্দু কলেজের শ্রেণী-বিভাগ, পাঠ্য পুস্তক, ছাত্রদল, প্রভৃতি বিষয় উনবিংশ প্রস্তাবে বর্ণিত হইবে। অতঃপর আমরা ডেভিড হেয়ার প্রতিষ্ঠিত নানা বিদ্যায়তনের এবং রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত দুইটি বিদ্যালয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

মন্তব্য

(৭০) শোনা যায় রামমোহন রায় ডেভিড হেয়ারকে মাগুর মাছের ঝোল খাইতে শিখাইয়াছিলেন। *David Hare*, p. 130.

(৭১) *David Hare*, p. 122.

(৭২) *David Hare*, p. 5.

(৭৩) Quoted in *Life and Letters of Raja Rammohun Roy by* S. D. Collet, edited by H. C. Sarkar, Calcutta, 1913, p. xl.

(৭৪) *David Hare*, p. 6.

(৬৫) *Journal of the Bihar and Orissa Research Society*, June 1930. *Rammohun Roy as an Educational Pioneer* (based on State Records) by Brajendra Nath Banerji ; এই প্রবন্ধের pp. 150-160তে সার্ হাইড ঈষ্টের লিখিত ১৮১৬ সালের ১৮ই মে তারিখের পত্র. বিশেষত p. 155এর শেষ তিন পংক্তি. দ্রষ্টব্য।

(৬৬) বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র জষ্টিস অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উত্তরকালে হাইকোর্টের বিচারপতি রূপে প্রসিদ্ধ হন। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮২২ সালের ১০ই নভেম্বর তারিখে পরলোকগত হন।

(৬৭) Binay Krishna Deb (p. 99) লিখিতেছেন যে তিনি রাজা সার্ রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারে ঐ সভার কার্য্য-বিবরণীতে দেখিয়াছেন, সভার তারিখ '4th May' লিখিত আছে। কিন্তু Sir Hyde Eastএর পত্রে 14th May রহিয়াছে। সভার কার্য্যবিবরণীতে হস্তলিপির অস্পষ্টতা হেতু 14th স্থানে 4th হইয়া যাওয়া আশ্চর্য্য নয়। অধিকাংশ মুদ্রিত পুস্তকে 14th May তারিখ রহিয়াছে। *David Hare* পুস্তকের ৩১ পৃষ্ঠায় রাজা রাধাকান্ত দেবের পত্রে 4th May তারিখ লিখিত আছে বটে ; কিন্তু স্বয়ং গ্রন্থকার প্যারীচাঁদ মিত্র রাজা রাধাকান্ত দেবকে হিন্দু কলেজ স্থাপনের মূলীভূত ঘটনা সকল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

(৬৮) সার্ হাইড্ ঈষ্টের বাড়ী তখন ওল্ড্ পোষ্ট অফিস্ ষ্ট্রীটে ছিল।—*David Hare*, App. xiii.

(৬৯) ৬৫ সংখ্যক মন্তব্যে উল্লিখিত journalএর p. 158 দ্রষ্টব্য।

(৭০) "There was no difficulty in getting Ram Mohun Roy to renounce his connection, as he valued the education of his countrymen more than the empty flourish of his name as a committee-man."—*David Hare*, p. 6.

"Rammohun Roy, accordingly, with a magnanimity worthy of his noble character, retired from the management of the proposed institution. Self-denial such as this is almost unknown in Calcutta, for he was the earliest advocate of the establishment of the College.…He was willing nevertheless to be laid aside, if by suffering rather than by acting he could benefit his country." *Sketches of Some Distinguished Anglo-Indians, Second Series,* by Colonel W. F. B. Laurie. W. H. Allen & Co., London, 1888, p. 163.

(৭১) মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি-এ প্রণীত। চতুর্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০৭। ২৭,২৮ পৃষ্ঠা। অতঃপর এই পুস্তককে 'মাইকেল' শব্দে উল্লেখ করা হইবে।

(৭২) "Rules of the Hindu College…1. The primary object of this Institution is the tuition of the sons of the respectable Hindoos in the English and Indian language and in the literature and science of Europe and Asia. 2. The admission of Pupils shall be left to the discretion of the Manager of the Institution. 3. The College shall include a School (Patshalla), and an Academy (Maha Patshalla). The former to be established immediately, the latter as soon as may be practicable"—*David Hare*, Appendix, p. i.

"The College was founded for the purpose of supplying the growing demand for English education. Sanskrit was discontinued at an early period. The Persian class was abolished in 1841. The only languages which have since been taught are English and Bengalee."—Kissory Chand Mitra's speech at the Hare Anniversary, 2nd June, 1861, (in *David Hare*, App., p. xiv.)

(৭৩) *David Hare*, App. p. xxii.

(৭৪) 'সরকারী সাধারণ শিক্ষাসমিতি' বলিতে General Committee of Public Instruction বুঝিতে হইবে। প্রবন্ধের এই অংশে কোটেশন চিহ্নের অন্তর্গত অংশদ্বয় "শিবচন্দ্র দেব ও তৎসহধর্ম্মিণীর আদর্শ জীবনালেখ্য (শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম-এ, বি-এল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, ১৯১৮)" পুস্তকের ৩৩, ৩৪ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত। অতঃপর এই পুস্তক 'শিবচন্দ্র' এই নামে উল্লিখিত হইবে। কিন্তু উক্ত পুস্তকের এই সকল বৃত্তান্ত *David Hare* গ্রন্থ হইতেই সঙ্কলিত হইয়াছে। *David Hare* গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় হিন্দু কলেজের বাড়ীর ভিত্তিপ্রস্তরের inscription মুদ্রিত আছে।

(৭৫) *David Hare*, App. pp. xx-xxiv.

বধূবরণ

শ্রীসত্যরঞ্জন মজুমদার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

উপবাসী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

রূপচাঁদ রাস্তার ধারে একটা শুকনো গুঁড়ির উপর পা দুইটা গুটাইয়া বসিয়া চিন্তিতভাবে একটা চোরকাঁটার শীষ দাঁতে খুঁটিতেছিল। আজ সকাল হইতেই তাহার মনটা বড় অপ্রসন্ন। তাহার কারণ বোসেদের মেয়ে নেড়ীর আজ বিবাহ। পাকাদেখার দিন হইতেই সে সমস্ত ভণ্ডুল করিবার মতলব আঁটিতেছে, কিন্তু কিছুই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। কাল গায়ে-হলুদটা হইয়াই গেল। আজ রাত্রে বিবাহ, একটু পরেই এই সাড়ে দশটার গাড়ীতে বর আসিবে; এই পথ দিয়া বাজনাবাদ্য করিয়া যাইবে। নিতান্ত অপ্রীতিকর বস্তুর যে একটা নিগূঢ় মোহ থাকে তাহারই টানে রূপচাঁদ পথের উপরটিতে আসিয়া বসিয়া আছে।

মোল্লাপাড়ার রহমৎ আসিয়া পাশটিতে বসিল। চুপ করিয়া খানিকটা পা দুলাইল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—কিছু উপায় ঠাওরাতে পারলি রে রূপো?

রূপচাঁদ ঠোঁট আর নাক একত্র করিয়া মাথা নাড়িল,—না পারে নাই। রহমৎও—বোধ হয় সহানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ—একটা চোরকাঁটার শীষ তুলিয়া লইয়া দাঁতে খুঁটিতে লাগিল। খানিকক্ষণ নীরবেই গেল, তাহার পর ফোঁস করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—আচ্ছা তোদের দু-জনের মধ্যে কি খুব বেশী ভালবাসা হয়েছিল?

রূপচাঁদ এবারেও কথা কহিল না, মাথা নাড়িয়া জানাইল—হ্যাঁ।

রহমৎ কথাটাতে একটু টান দিয়া গভীর দুশ্চিন্তার সহিত বলিল, "তবেই ত!" আবার শীষ চিবাইতে লাগিল।

একটু পরে গুঁড়িটার উপর গুটাইয়া-দুলাইয়া বসিয়া প্রশ্ন করিল—আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করুন বলতে আপত্তি আছে?—মানে, বিয়ের কথা হবার পর তোকে কিছু বলেছিল কি?—যেমন ধর, বিষ খেয়ে মরব, কি গলায় দড়ি দোব?...তা যদি ব'লে থাকে ত...

রূপচাঁদ বলিল—কিছুই বলে নি।

রহমৎ কপালে চোখ তুলিয়া বলিল—কিছুই বলে নি!—তবে ত আরও ভাবনার কথা। তোর ঘাড়ে শেষ পর্য্যন্ত একটা স্ত্রীহত্যার পাপ না চাপে!...

রূপচাঁদ চোরকাঁটার শীষটা সরাইয়া লইয়া খানিকটা উদ্বেগের সহিতই প্রশ্ন করিল—কেন?

রহমৎ এখানে ছোকরা-মহলে প্রেম-সম্বন্ধে এক জন বিশেষজ্ঞ। বয়সের অনুপাতে বাংলা নভেলে তাহার জ্ঞান খুব সুগভীর, তাহা ভিন্ন বাড়ীতে ফারসী ভাষার একটু-আধটু চর্চ্চা থাকায় বুলবুল, বাগিচা থেকে আরম্ভ করিয়া লয়লা-মজনু প্রভৃতি পশ্চিম-সীমান্তের ওদিককার ব্যাপারের সঙ্গে তাহার এক রকম সাক্ষাৎ-পরিচয় আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। বলিল—যদি সত্যিকার ভালবাসা হয়—মানে, সে যদি সত্যিই লয়লা হয় আর তুই যদি সত্যিই মজনু হোস ত যে-মুহূর্ত্তে তোদের প্রথম চোখোচোখি হয়েছিল সেই মুহূর্ত্তেই চোখের রাস্তা দিয়ে তোর দিল্ ওর দিলের কাছে গিয়ে তার গার্জেন হয়েছিল—যাকে পার্সীতে বলে ফিরস্তা। তা হ'লে হ'ল না?—তোকে না পেয়ে ও যদি সত্যি একটা কিছু ক'রে বসে ত তোর গুনাহ্ অর্থাৎ পাপ লাগল না?

রূপচাঁদ বলিল—বয়ে গেল।

রহমৎ এত বড় একটা তত্ত্বকথার পর নায়কের মুখে এরূপ গ্রাম্যতাদুষ্ট মন্তব্য শুনিয়া নিশ্চয় খুবই ক্ষুণ্ণ হইল। বিরক্তির সহিত বলিল—তাহলে তোর ইশ্ক্ খাঁটি নয়, শুধু ফক্কুড় করছিল, বাঃ।

রূপচাঁদ প্রশ্ন করিল—ইশ্ক্ কি?

রহমৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঘাড়টা তাহার দিকে ঝুঁকাইয়া

অনেকটা ব্যঙ্গের স্বরে বলিল—ইশ্‌ক্‌ হচ্ছে—প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা—আশীকের জন্যে নিজেকে মিটিয়ে দেওয়া,—যা ছিল লয়লা আর মজনুর মধ্যে—যা ছিল জাহাঙ্গীর আর নূরজাহানের মধ্যে—যার মাঝখানে দাঁড়াতে গিয়ে শের আফগানের প্রাণ গেল,—যা ছিল আয়েষা আর জগৎসিংহের মধ্যে—যার হাহাকার দেখতে পাবি শরৎবাবুর দেবদাসে···তুই ঘাস চিবো ব'সে ব'সে।—

হন্‌ হন্‌ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। খানিকটা অগ্রসর হইতে রূপচাঁদ ডাক দিল—রহমৎ, শোন্‌।

অনেকটা অনিচ্ছার, সহিত রহমৎ ফিরিয়া আসিল। তখনও রাগটা লাগিয়া আছে, বলিল—তোর এসবে হাত দেওয়া ঠিক হয় নি। হুটোহুটি মারামারি ক'রে বেড়াস, ঐ নিয়েই থাকা উচিত ছিল।···কেন ডাকছিলি ?

"একটা গাধা জোগাড় করতে পারিস ?"

রহমৎ একদৃষ্টে রূপচাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বোধ হয় ভিতরে ভিতরে আশা করিয়াছিল হতাশ প্রেমের ধাক্কায় বেচারী পাগল হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার আর কোন নিদর্শন না পাইয়া সহজ বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন করিল—কেন, গাধা কি হবে ? হঠাৎ গাধা ?

"বর শুনছি রমজানের গাড়ী ক'রে আসবে। কাল নূতন করে রং করছিল, জিগ্যেস করলাম ত বললে···"

"গাড়ীতে ঘোড়ার বদলে গাধা জুড়ে দিবি নাকি ?"

"গাধা জুড়ে দেওয়া নয়।···রমজানের সাদা ঘোড়াটার একটা মস্ত দোষ আছে জানিস ত ?—গাধার ডাকে ভয়ানক ভড়কে যায়···

রহমৎ আরও বিস্ময়ের সহিত বলিল—যাক, তাতে কি ?

"বরটাকে যদি ঘায়েল করা যেত,—বরের বাপকেও, পুরুতকেও—সবগুলোই নিশ্চয় এক গাড়ীতেই থাকবে।"

রহমৎ আরও দুই পা আগাইয়া আসিয়া অপলক দৃষ্টিতে রূপচাঁদের দিকে একটু চাহিয়া রহিল, তাহার পর আসিয়া আবার গুঁড়িটার উপর বসিল। মনে হইল যেন একটু খুশী হইয়াছে,—বোধ হয় এই জন্য যে, হতাশ প্রেমিক নিতান্তই চুপচাপ বসিয়া নাই, কিছু একটা করিতেছে। উন্মাদ হইয়া যাওয়া কিংবা আত্মহত্যা করা অবশ্য বেশী শাস্ত্রসঙ্গত হইত, অভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী-বিনাশও নিতান্ত নিন্দার নয়। জিনিষটাতে উন্মাদলক্ষণও বর্ত্তমান। বলিল—কাজটা ভাল হয় না, যদিও জাহাঙ্গীরের নজির আছে···কিন্তু গাধা পাবি কোথায় ?

"তাই ত ভাবছি।···আমিও অবশ্য গাধা ডাকতে পারি···"

"দুৎ, সে কি হয় ? টের পেয়ে গেলে শেষকালে গাধা হোস আর নাই হোস ধোবার মত বাড়ি হাঁকড়াবে। তার চেয়ে এ বাবা, ইংরেজের রাজত্ব,—গাধা নিজের খুশীতে, নিজের মনে ডেকেছে আমরা কি করব ?"

রূপচাঁদ হাঁটুতে চিবুকটা চাপিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল - ঠিক তো ;—বনে চরতে চরতে রংচঙে গাড়ী, সাজগোজ-করা লোক দেখে ওর মনে যদি ভাব এসে থাকে···আমরা কি ওকে উস্‌কে দিতে গিয়েছিলাম ? তোমরা অত জুলুস ক'রে না এলেই পারতে। কিন্তু পাওয়া যায় কোথায় ? সমস্যে তো সেই ; আর গাড়ীর সময়ও হয়ে আসছে···"

রহমৎ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—আচ্ছা তুই ব'স্‌, আমি দেখছি একবার। আর দেখ—যদি আমার দেরিই হয় আর বর এর মধ্যে এসেই পড়ে ত তুই এই গুঁড়ির আড়ালে ব'সে দিস না-হয় ডেকে খোদার নাম নিয়ে।···বাঃ, আমার মর্জ্জি হয়েছে আমি ডেকেছি গাধার ডাক মশায়, তাতে আপনাদের ঘোড়া যে ঘাবড়ে বসবে কে জানে ! ··ব'সে থাক্‌, দেখি একবার চেষ্টা।

২

খানিকক্ষণ গেল। গুঁড়ির উপর থেকে ষ্টেশনের ওদিকে ডিষ্ট্যাণ্ট সিগনালটা দেখা যায় ; রূপচাঁদ সেই দিকে চাহিয়া ছিল, দেখিল সিগনেলটা মাথা হেঁট করিল। গাড়ী আসিতেছে। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া, রহমৎ যেদিকটায় গিয়াছে—তীব্র উৎকণ্ঠায় সেদিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। না, রহমতের কোন চিহ্ন নাই। তাহা হইলে বোধ হয় তাহা'র নিজের গলাই শেষ পর্য্যন্ত ভরসা।

ছোট ষ্টেশন, রাস্তায় বিশেষ লোকচলাচল নাই।

বরযাত্রীদের যাহারা অভ্যাগমন করিবে তাহারা অনেকক্ষণ ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছে। রতন মণ্ডল তাহার ছোট মেয়েটিকে লইয়া ষ্টেশন অভিমুখে যাইতেছিল—মেয়ের মামার বাড়ী যাইবে; জিজ্ঞাসা করিল—ঘোষজা এখানে ব'সে যে?

কিন্তু বেশী কৌতূহল দেখাইল না; কেন না রূপচাঁদকে ডোবার ধারে, কি জঙ্গলের মধ্যে, কি গাছের মগডালে, কি গুঁড়ির উপর দেখা এমন কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়।

রতন চলিয়া গেলে রূপচাঁদ আর একবার রহমতের পথের দিকে চাহিল, তাহার পর গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া খুব নিম্নকণ্ঠে—'হাঁকা—' করিয়া একটা টানা আওয়াজ করিল। রাসভ-ধ্বনির রিহার্সেল। দ্বিতীয় বার আর একটু জোরে। না, বেশ চলিবে। গলাখাঁকারি দিয়া আরও একটু জোরে আরম্ভ করিতে যাইবে, দেখিল রায়েদের পোড়ো বাড়ীর পাশ দিয়া যে সরু রাস্তাটা চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া, গাধার উপর, পাকা ঘোড়সওয়ারের ভঙ্গিতে পা ছড়াইয়া রামু ধোবার ছেলে সাতকড়ে গট্ গট্ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। সামনে আসিয়া তড়াক করিয়া লাফাইয়া পড়িল, তাহার পর গাধাটার পিঠে দুইটা সাবাসীর চাপড় কষিয়া রূপচাঁদকে বলিল—রহমৎ ডেকে নিয়ে এল। সে আসছে। তোমরা চড়বে নাকি দা'ঠাউর? চড় না, ঘোড়া ছেড়ে চড়বে লোকে আমার মাতঙ্গীর ওপর,—ওর নাম মাতঙ্গী রেখেছি।...পড়ার ভয় নেই, মাটিতে দুটো পা ঠেকিয়ে দাও, নীচে দিয়ে গ'লে বেরিয়ে যাবে; মায়ের যেমনকার ছেলে ঠিক তেমনটি রইলে, আঁচড় পর্য্যন্ত লাগল না।

রূপচাঁদ প্রশ্ন করিল—ডাকে কেমন?

সাতকড়ে খুব সম্ভবতঃ স্নেহের আধিক্যেই বলিল—খুব মিষ্টি ডাক।

রহমৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। একটু বিজয়ের ভঙ্গিতে রূপচাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"কি রে, হ'ল যোগাড়, না, হ'ল না? বাবা, এ ব্যর নাম রহমৎ শেখ!...কাজটা কিন্তু অন্যায় হচ্ছে, ব'লে দিলাম; আমি এর মধ্যে নেই। নাও, সাতকড়েকে বল এখন 'তোমার কি দরকার গাধায়।"—বলিয়া হাত পা গুটাইয়া নির্লিপ্ত ভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

রূপচাঁদ বলিল—সেই কথাই তো বলছিলাম, ও বলছে খুব মিষ্টি ডাক ওর গাধার—মিষ্টি ডাকে কি হবে?

রহমৎ মুখ না ফিরাইয়াই বলিল—রেখে দে, গাধার আবার মিষ্টি ডাক। আমাদের মোরগটা তাহলে মিঞা তানসেন।...এখন ঠিক তালের মাথায় ডাকবে কি না-ডাকবে সেই কথা দেখ।...কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না, ব'লে রাখছি; না-হক্ ক'জন বে-কসুর লোককে...

রূপচাঁদ সাতকড়ের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বলিস রে, ডাকবে ফরমাস মতন?...ব্যাপারটা তোকে বুঝিয়ে দিই; মানে হচ্ছে...

সাতকড়ে কোমরে একটা হাত দিয়া সিধা হইয়া বলিল—মাতঙ্গী ডাকে নিজের খেয়ালের উপর। কারুর তো রেয়েৎ নয়?—দাসখৎ ও লিখে দেয় নি—বল না কেন রহমৎ ভাই?

এমন সময় গাধাটা হঠাৎ তর তর করিয়া কয়েক পা আগাইয়া গেল এবং ঘাড় পিঠ আর লেজ সোজা করিয়া বিকট রব করিয়া চীৎকার জুড়িয়া দিল এবং নিজস্ব ভঙ্গিতে আওয়াজটাকে ধাপে ধাপে নামাইয়া থামিয়া গেল। সাতকড়ে দৃপ্তভাবে তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল—ঐ লেন্, একখানি নমুনা ঝেড়ে দিলে। ভাবছেন বুঝি আমাদের কথা কিছু বুঝছে না ও? আর কিন্তু ঘণ্টা-দুত্তিন এখন ঠাণ্ডা। সারা দিনে পাঁচ-ছটি বার আওয়াজ দেয়, ব্যস্।

রহমৎ ফিরিয়া বসিয়াছিল। ষ্টেশনের ওদিকে চাহিয়া বলিল—তোর গাড়ী ওদিকে এসে গেল কিন্তু রূপো; ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।

রূপচাঁদ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। দাঁড়াইয়া পড়িয়া চারি দিকে চাহিয়া বলিল—তাই তো! কোন উপায় নেই রে সাতকড়ে? তুই ওকে বলেছিস, রহমৎ, কেন ডাকাতে হবে?...বলিস নি?...মানে হচ্ছে, একটা বরযাত্রী আমাদের গ্রামে আসছে, সাতকড়ে; তাদের একটু ঠাট্টা করা দরকার তো, নইলে ভাববে এদের দেশে ঠাট্টা করবার লোকই নেই, তাই ওরা যেই এখান দিয়ে

যাবে আমরা শাঁক বাজিয়ে দোব…বিয়ে-বাড়ীর হাজারটা শাঁকেও এমন বাজখেঁয়ে আওয়াজ হবে না বাবা, হুঁ!

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, সাতকড়েও হাসিয়া হাততালি দিয়া' উঠিল, বলিল—খাসা মতলব, দা'ঠাউর, খাসা মতলব এঁটেছ বটে!

রূপচাঁদ বলিল—কিন্তু, তুই বলছিস যে আর ঘণ্টা দু-এক ডাকবে না ও।

সাতকড়ে বলিল—দু-রকম ডাক আছে দাঠা'উর। এ যা লমুনোটা দিলে এটা হচ্ছে আহ্লাদের ডাক—মনটা খুব খুশী রইল, ডেকে দিলে একবার। আমরা যেমন হাসলাম না এইমাত্তোর সেই রকম আর কি। আর এক রকম ডাক আছে মাতব্বীর, সে কিন্তু এ-রকম মিষ্টি লাগবে না, তা ব'লে দিচ্ছি। সে ওর কান্নার ডাক।

রহমৎ ঘুরিয়া প্রশ্ন করিল—ঠেঙিয়ে ডাকান নাকি?

সাতকড়ে আগাইয়া গিয়া গাধার খুঁটি ধরিয়া তাহার পিঠে হেলান দিয়া রহমতের সহিত মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল; বলিল—তোমাদের মত ইস্কুলের পোড়ো নয় যে একটা বেতের ঘায়ে 'ভ্যা' ক'রে উঠবে, আস্ত একখানি বাঁশ পিঠে ভাঙলেও মাতব্বী টুঁ শব্দ করবে নি। ওকে কাঁদাবার অন্য হদিস্ আছে। কিন্তু ঐ যে কইনু,—শাঁক যা বাজবে তাতে কানে তালা লাগিয়ে দোবে।

দু-জনেই আগ্রহের সহিত বলিল—কি, কি হদিস্, বল না শীগগির, ওদিকে গাড়ী যে প্রায় ষ্টেশনে এসে প'ড়ল।

সাতকড়ে বড় রাস্তার এ-মোড় ও-মোড় একবার দেখিয়া লইল, তাহার পর—"দাঁড়াও, দেখছি একবার" বলিয়া যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। রূপচাঁদ হাঁকিয়া বলিল—দেরি করিস্ নে সাতকড়ে, গাড়ী ওদিকে এসে গেল!

একটুখানির মধ্যেই সাতকড়ে আবার ঘুরিয়া আসিল। একটু নিরাশভাবে বলিল—না, পাওয়া গেল না।

রহমৎ জিজ্ঞাসা করিল—কি খুঁজছিলি তুই?

সাতকড়ে বলিল—কুকুরের গায়ের মাছি। গাধাকে ডাকাতে একেবারে ধন্বন্তরি, তবে আর বলছি কি? দুটি মাছি একটু ধূলোর মধ্যে ক'রে ছেড়ে দাও গায়ে, তার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পহর ধরে শোন না কত ডাক শুনবে। তা দিন বুঝে একটাও পাওয়া গেল না কুকুর—দরকার কি না…সব বেটা ভাবলে উপ্‌গার হবে।

ষ্টেশনটা গোটাকতক গাছের আড়ালে পড়ে, দেখা যায় না, তবু হাঁকডাক, ব্যস্ততার আওয়াজ কানে আসিল। রহমৎ আবার নির্লিপ্তভাবে ঘুরিয়া বসিয়াছিল, সেই ভাবেই বলিল—মাছির কামড়ে যদি ডাকে তো বিছুটি ছোঁয়ালে ডাকবে না কেন? আমি কিন্তু এর মধ্যে নেই বাবা; তোমাদের যা মনে হয় কর। একটা কথা বললি, তার উত্তর দিতে হ'ল; ব্যস।

সাতকড়ে বিস্ময় এবং প্রশংসায় চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া এমন ভাবে চাহিল যেন সে রহমতের মধ্যে স্বয়ং মক্কার পীরকে প্রত্যক্ষ করিতেছে।

বরযাত্রীর দল ষ্টেশনের প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া রাস্তায় নামিয়াছে। প্রায় জন-ত্রিশেক লোক। গ্রামে তিনখানি গাড়ী। যত দূর সঙ্কুলান হইয়াছে তাহাতে বরপক্ষীয়দের বসান হইয়াছে। বাকী আর সকলেই পায়ে হাঁটিয়া আসিতেছে। রূপচাঁদের খবর ঠিকই ছিল, বর, নিতবর, বরের বাপ, এবং পুরুত রমজানের গাড়ীতে চড়িয়াছে। সেটা সর্ব্বাগ্রে রাখা হইয়াছে।

সমস্ত দলটা ধীরে ধীরে চলিয়াছে। বুড়া রমজান কিন্তু তাহার পেটমোটা ঘোড়া দুইটার রাস এমন কায়দা করিয়া কষিয়া ধরিয়া আছে, মনে হইতেছে যেন অন্যমনস্ক হইয়া রাস একটু ঢিলা করিলেই তাহারা একেবারে তীরবেগে ছুটিয়া যাইবে।

দলটা সামনে আসিতেই রূপচাঁদ গুঁড়ি হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—সেলাম রমজান-চাচা।

তীব্র উৎকণ্ঠায় মুখটা একটু শুকাইয়া গিয়াছে।

রহমতেরও মনে একটা শঙ্কা এবং উদ্বেগ লাগিয়া ছিল। অনেকটা পূর্ব্বাহ্নেই ভাব জমাইয়া রাখিবার জন্য বলিল—সেলাম-আলেকুম।

রমজান কোন উত্তর দিল না, শুধু গাধাটার পানে

একবার আড়চোখে চাহিয়া রাসটা আরও সতর্ক হইয়া ধরিল।

সাদা ঘোড়াটাও একবার ঘাড়টা ঘুরাইয়া দেখিয়া অস্বস্তির সহিত কান দুইটা সঞ্চালিত করিতে লাগিল। রূপচাঁদ আর রহমৎ দু-জনেই সজ লইল। রূপচাঁদ একবার গাড়ীর ভিতরটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। তাহার পর রমজানের সঙ্গে গল্প জমাইবার জন্য প্রশ্ন করিল—রং ধরাতে কত খরচ পড়ল রমজান-চাচা ?

কোন উত্তর হইল না। রহমতের বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল, চকিতে ঘুরিয়া একবার শুঁড়িটা যেখানে আছে সেইখানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহার পর নির্লিপ্ত ভাবে বলিল—আচ্ছা রং ধরাতে যাই খরচ পড়ুক, তুমি একটু সরে থেক তো যদি জানের ডর থাকে ; রমজানী খালার ঘোড়া একটি যদি লাথি ঝাড়ে তো উঠে আর তোমায় জল খেতে হবে না।···এ তোমার বাংলা দেশের পিলেরোগা ঘোড়া নয় যে মনে করেছ···

এমন সময় "হাঁকো—" করিয়া একটা অতি উগ্র আওয়াজ পিছনে শোনা গেল এবং পর মুহূর্তেই দেখা গেল আকাশ-পাতাল হাঁ করিয়া, লেজ সিধা করিয়া চীৎকার করিতে করিতে একটা গাধা বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। পিছনের লোকেরা ত্রস্তভাবে রাস্তা ছাড়িয়া দিতেছে। নানা রকম সন্ত্রস্ত রব উঠিয়াছে—"সাবধান! গাধারা কামড়ায়ও আবার··· দেখো, যেন ছুঁয়ে ফেল না, কি বিপদ···ও মাড়িয়ে চলেছে মশাই, আর আপনি ছোঁবার ভয় করছেন।"

রমজানের গাড়ীর সাদা ঘোড়াটা দাঁড়াইয়া পড়িল। রাসটাতে একটা তীব্র ঝাঁকানি দিয়া পিছনে ঘুরিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর রমজান নামিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিবার পূর্ব্বেই পাশের ঘোড়াটাকে এক রকম টানিতে টানিতেই মত্ত গতিতে ছুট দিল। একটা "সামাল সামাল" রব পড়িয়া গেল। গাড়ীটা খানিকটা সিধাই ছুটিল, তাহার পর সাদা ঘোড়াটা রাস ছিঁড়িয়া পলায়ন করায়, একটা ঘোড়ার টানে খানিকটা একপেশে হইয়া ছুটিতে ছুটিতে রাস্তার ধারে একটা সেগুন-গাছের শুঁড়িতে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগিয়া হেলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

এর পরের দৃশ্য রূপচাঁদদের বাড়ীর চিলেকোঠার অভ্যন্তর। সন্ধ্যার প্রাক্কাল। রূপচাঁদ ধূলিশয্যায় শয়ান ; কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া বোধ হয় এইমাত্র নিদ্রা গিয়াছে। চোখের কোলে, গালে শুষ্ক অশ্রুর কলঙ্ক-রেখা।

নেড়ীর সঙ্গে আসন্ন বিরহের অশ্রু নয় ; অবশ্য পরোক্ষ হেতু এইটাই বটে। আসলে রূপচাঁদের পিঠে আজ একটি আস্ত কঞ্চি ভাঙিয়াছে।

মাতঙ্গী-ঘটিত ব্যাপারটা প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইল না।—ডাকের মুখে বিচুটি,—বিচুটি থেকে সাতকড়ে, সাতকড়ে থেকে রহমৎ, তাহার পর রহমৎ থেকে রূপচাঁদে বেশ সহজেই পৌঁছান গেল। রূপচাঁদের পিতা দুর্ভাগ্যক্রমে দলের মধ্যেই ছিলেন। কান ধরিয়া বাড়ী লইয়া গেলেন, তাহার পর চোরের মত মার দিয়া চিলেকোঠায় পুরিয়া বাহির হইতে তালা আঁটিয়া দিয়া বলিলেন—সমস্ত দিন সমস্ত রাত আজ শুকো, রাস্কেল কোথাকার···নেমন্তন্ন বাড়ী যাওয়া একেবারে বন্ধ!···

বিয়ে-বাড়ী।

দুইটা বাড়ী বাদে রায়েদের বৈঠকখানায় বরযাত্রীদের তোলা হইয়াছে। কতকগুলা ছোকরা আসিয়া অবধিই গণ্ডগোল বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের গাড়ী করিয়া আনা হয় নাই, তাহাদের অপমান হইয়াছে। যাহারা গাড়ীতে আসিয়াছিল তাহাদের অনেককেও তাহারা দলে টানিয়াছে—বলিয়াছে গাড়ী চড়াইয়া জখম করিবার মতলব ছিল এদের, তাহাদের গুরুবল ছিল তাই তাহারা চড়ে নাই। অবশ্য, বরের গাড়ীতে কাহারও বিশেষ আঘাত লাগে নাই, অন্যান্য গাড়ীগুলা একেবারে নিরাপদ ছিল, কিন্তু কি সর্ব্বনাশটাই না হইতে পারিত, সেই দুশ্চিন্তায় সকলে স্তম্ভিত হইয়া আছে। সর্ব্বনাশের চেয়ে তার কল্পনাই আরও ভয়ঙ্কর, কারণ

সে কল্পনার তো কোন সীমা বাঁধা থাকে না। তাই, কিছু না-হওয়ার চেয়ে বড় বিপদ আর কিছুই হইতে পারে না। স্নানে, আহারে, চায়ে, পানে—যত রকম ভাবে পারিল ইহারা কন্যাপক্ষীয়দের সমস্ত দিন বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিজের দিকের পুরুতকেও ইহারা দলে টানিল।

পুরুতঠাকুরের চা আসিলে এক জন কাছে গিয়া দাঁড়াইল এবং চায়ে চুমুক দিয়া পুরুতঠাকুর মুখটা কুঞ্চিত করিয়া উঠিতেই, নিরীহের মত প্রশ্ন করিল—খুব মিষ্টি দিয়েছে বুঝি? তা বেচারীরা ত জানে না যে আপনি কম মিষ্টি খান···

পুরুতঠাকুর ঠোঁটে জিবটা অস্বস্তির সহিত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—মিষ্টি কোথায় হে, এ যে নুন!

—নুন!! না পুরুত-মশায় আপনি নিশ্চয় ভুল করেছেন। অবশ্য, বা ছোটলোক এরা···কিন্তু আপনি বরপক্ষের পুরুত, আজকের কাজে আপনি দেবতার তুল্য, তায় সমস্ত দিন উপোস ক'রে আছেন, আপনার সঙ্গেও কি এ-রকম ঠাট্টা-প্রবঞ্চনা করতে সাহস করবে·· বোধ হয় ভুল করেছেন,—দেখুন ত আর একটা চুমুক···

পুরুতঠাকুর একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন, চায়ের বাটিটা আছড়াইয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—আমি পুরোহিত, তিন কুড়ি বয়স হ'তে চলল, আমার সঙ্গে তঞ্চকতা! আমি যদি আজ এ-বিবাহে পৌরোহিত্য করি তো···

সকলে আসিয়া পড়িল—কি ব্যাপার!···একটি ছোকরা বলিল—থাক্, পুরুত-মশাই, এই উপোসের মুখে যদি একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে বসেন সে তো আর স্বয়ং বিধাতা এলেও রদ হবে না; থাক্, সরে যান···

এক জন সামনে ঠেলিয়া আসিয়া বরের পিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—তার চেয়ে বরং বর আসনে বসবার আগে, কাকা, একবার গয়নাপত্র, দানসামগ্রী-গুলো দেখে নিন্···

কন্যাপক্ষের দিক থেকে এক জন বেশ ষণ্ডাগোছের লোক উগ্র দৃষ্টিতে ছোকরার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—জিজ্ঞেস করি—কেন?

ছোকরা রোগাগোছের, থতমত খাইয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, এম্নি বলছিলাম—সবাই তাহলে একবার দেখতাম।" তাহার পর পাশের একটি সঙ্গীকে প্রশ্ন করিল—"তুই বলছিলি না রে—এখানকার সেকরারা চমৎকার গড়ন ক'রে গয়নার?"

সে ছোকরা এসব ফ্যাসাদের কথায় একেবারেই না-থাকিবার জন্য বলিল—যাঃ, আমি কি জানি এখানকার সেকরাদের কথা, দেখ তো!

প্রথম ছোকরা একটু ছুতা করিয়া সরিয়া পড়িল।

গোলমাল কিন্তু থামিল না। বরের পিতা একটু সন্দিগ্ধ-প্রকৃতির লোক, বলিল—ছেলেমানুষ যদি তুলেই থাকে কথাটা, আপত্তির কারণও তো দেখি না আপনাদের। বিয়ের আগে গয়নাপত্র দেখে নেওয়া, এ-রকম তো আখছারই হচ্ছে আজকাল।

কন্যাপক্ষের লোকটির রাগে তখন শরীরটা কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছে, কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া বলিল—এ-বাড়ীতে হয় নি।

অপর এক জন বলিল—এ তল্লাটে নয়।

বরকর্ত্তার হাতে এক জন সুবিবেচনার সহিত নিজের হুঁকাটা তুলিয়া দিল। সে দু-তিনটা টান দিয়া শান্তস্বরে বলিল—নাই বা হ'ল, আজ হোক। দোষ কি? পুরুতের চায়ে যখন নুন রয়েছে, তখন...কি যে বলে বেশ···

যে হুঁকা জোগাইয়া দিয়াছিল তাহার আবার সুযোগের মাথায় কথা জোগাইয়া দেওয়াও অভ্যাস আছে, বলিল—তখন কনের গয়নায় খাদ থাকবে না, কে বলতে পারে।

"মুখ সামলে"—বলিয়া কয়েক জন একসঙ্গে হুঙ্কার করিয়া উঠিল।

বরকর্ত্তা বলিল—তা সামলাচ্ছে, কিন্তু গয়না যাচাই না-হলে বর পিঁড়িতে উঠবে না।

—আলবৎ উঠবে।

কন্যাপক্ষীয়েরা সকলেই সমস্ত দিন নানা রকম আবদার-অত্যাচার সহ্য করিয়া অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হইয়াছিল। প্রতিশোধের আঁচ পাইয়া উল্লসিত হইয়া

। এক জন ভিড়ের মধ্যে থেকে বলিয়া উঠিল —তাকে কান ধরে টেনে এনে বসান হবে।

"কোথায় গেল বর?"

"পাকড়ো উস্‌কো।"

অবরুদ্ধ আক্রোশের বাঁধ ভাঙিয়া একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। এ-পক্ষের দল যেমন দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া গেল, ও-পক্ষের দল সেই অনুপাতে কমিয়া আসিতে লাগিল; যে যেখানে পারিল সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বরের কিন্তু খোঁজ পাওয়া গেল না। আনাচে কানাচে, অন্ধকারে, গলি-ঘুঁজিতে, বন-বাদাড়ে যে কয় জনকে ধরা গেল তাহাদের কেহই বর নয়।...

গেল কোথায় বর!

প্রশ্ন উঠিল—ষ্টেশনে যায় নি ত?

এক জন উত্তর করিল—তাদের বাড়ীর দিকে এখন গাড়ী নেই তো; কলকাতার গাড়ী আছে একটা।

একটা দল ষ্টেশনের দিকে ছুটিল।

* * *

তখন কলিকাতার গাড়ী আসিয়া গিয়াছে। পাতলা অন্ধকারে দূর হইতে দেখা গেল টিকিট-ঘরের দিক থেকে খুব ঢিলাঢালা জামা-কাপড়-পরা একটি ছোকরা গাড়ীর দিকে ছুটিয়াছে।...গার্ড হুইস্‌ল্ দিল।

দলের তিন-চার জন ছোকরা ছুটিল। প্লাটফরমে যখন পঁহুছিল তখন গাড়ী বেশ একটু জোর দিয়াছে। তবুও বোধ হয় টানিয়া নামাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু সাহেব-গার্ডের ধমক খাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

এক জন বলিল—হজব্যাণ্ড স্যার, হজব্যাণ্ড রানিং এওয়ে।

বিবাহ না করিয়াই যে পলাইতেছে সেইটে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য অপর এক জন হাত তুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—আন্‌-ম্যারেড্ হাজব্যাণ্ড অফ আন্‌-ম্যারেড্ ওয়াইফ, স্যার!

গাড়ী কিন্তু চলিয়া গেল্।

তখন দুর্ভাবনা জুটিল;—জাত-কুল বাঁচে কি করিয়া?

সদ্য বর কাড়িয়া বিয়ে দিতে হইবে। প্রথমে মিত্তিরদের শম্ভুর কথা মনে পড়িল সকলের। বিয়ে-বাড়ী তোলপাড় করিয়াও শম্ভুর সন্ধান পাওয়া গেল না। শম্ভু নিমন্ত্রণে আসে নাই—একটা অভাবনীয় ব্যাপার! কয়েক জন উৎসাহী ছোকরা তাহার বাড়ী ছুটিল।

বাড়ীতে আর কেহই ছিল না, মেয়ে-পুরুষ সবাই বিয়ে-বাড়ী। বৈঠকখানার তক্তপোষে শম্ভু ঘুমাইয়া আছে। পাশে ত্রৈলোক্য কবিরাজের ছেলে মাখন। তক্তপোষের এক ধারে কতকগুলা শিশি আর একটা ওষুধ মাড়িবার খল।

আজ দিনের বেলায় মেয়ে খাওয়ান ছিল। টের পাওয়া গেল শম্ভু কোন সুযোগে এক জায়গায় বসিয় পড়িয়াছিল। আহারটা অত্যধিক হইয়া গিয়াছে। মাখন এখন বাপের যত রকম হজমি বড়ি, চূর্ণ, আরক আছে সবগুলা পরীক্ষা করিতেছে।

বিয়ের কথা শুনিয়া মাখন কবিরাজোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রশ্ন করিল—লগ্ন কখন?

—সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে।

মাখন শম্ভুর পেটে দুইটা টোকা মারিয়া চক্ষু ঊর্দ্ধে তুলিয়া একটু হিসাব করিল; তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল—তাহলে হ'ল না, এগারটার আগে উঠে বসতে পারবে না। এগারটা পর্য্যন্ত খেতে যাবে—সেই চেষ্টা করছি; সে-সময় হ'লে হয় তো দেখ।"

আর তাহা হইলে ছেলে কই?

এক জন বলিল—কেন আমাদের ফেলু কেমন্ হয়? রমানাথের ভাগ্‌নে ফেলারাম···

রমানাথ কাছেই ছিল। একটু লোভী লোক। ভাগ্‌নেকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করিয়াছে এবং তজ্জনিত খরচের একটা হিসাব রাখিয়া গিয়াছে, আশা ছিল বিয়েতে সেটা পুষাইয়া লইবে। সৌভাগ্যটা এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আসায় উল্লসিত হইয়া উঠিল। মোচড় দিয়া আরও কিছু আদায় করিবার জন্য বলিল—ওর মা কি রাজী হবে? ওই একটি ছেলে। আর কেউ তো নেই···

গরজের বালাই, দর আর একটু উঠিল। কেদাররায়ের ডাক পড়িয়া গেল। তাহাকে পাওয়া গেল না। রমানাথের ছেলে কানাই বরযাত্রীদের টিটকারি দিতে দিতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া সব শুনিয়া বলিল—"সে তো আজ বিয়ে করতে পারবে না।" রমানাথ একেবারে খিঁচাইয়া উঠিল—"আজ পারবে না মানে?—এ কি পরানে মণ্ডলের কর্জ্জ শোধ দেওয়া নাকি?—আজ পারব না কাল—কাল নয় পরশু!...ডাক সে হারামজাদাকে। দেখি, কেমন না করে..."

কানাই বলিল—ডাকলে আসবে কি ক'রে?—নেমন্তন্নর জন্তে জোলাপ নিয়ে ব'সে আছে—মাখনের কাছ থেকে। মাখনা ভুল ক'রে কি একটা দিয়েছিল—এখনও জের কাটে নি। সে আসতে চাইলেও বরং রোকা উচিত।

কন্তাকর্ত্তা আর সমাজের মাতব্বরেরা মাথায় হাত দিয়া বসিল। গ্রামে আর ছেলে নাই। এদিকে লগ্ন বুঝি বহিয়া যায়।

কানাই-ই প্রশ্ন করিল—রূপচাঁদকে হ'লে কাজ চলবে না? রমানাথ কাকা তো ওকে সমস্ত দিন উপোস করিয়ে রেখেছে—পেটফাঁপার হাঙ্গামও নেই, জোলাপের হাঙ্গামও নেই।

এ হেন পাজি বরযাত্রীর দলকে গাড়ী চাপা দেওয়ার চেষ্টা করায় সকলেই রূপচাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকেই একসঙ্গে চেঁচাইয়া উঠিল—ঠিক তো! হ্যাঁ ওর সঙ্গেই দিয়ে দাও বিয়ে।

এক জন সন্দেহ প্রকাশ করিল—কিন্তু ঠিক মিল হবে কি? প্রায় এক বয়সই যে ছুটোতে।

—আরে বেশ হবে নাও; আগে জাত তো বাঁচুক, তার পর মিল আর টিল।

একটি ছোকরা আবেগের মাথায় একেবারে গুরু লঘু ভুলিয়া সামনে আসিয়া বলিল—আর ওদের দু-জনের মধ্যে যে লব্‌ রয়েছে।

"বেয়ো" বলিয়া কে এক জন তাহার গালে ঠাস করিয়া একটা চড় বসাইয়া পিছনে ঠেলিয়া দিল।

কনের মা মূর্চ্ছা গিয়াছে, রমানাথ সেইখানেই ছিল। কয়েক জন তাহাকে ডাকিতে ছুটিল। ওদিকে কানাই আর রূপচাঁদের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কয়েক জন তাহার বাড়ী ছুটিল।

বাড়ীতে শুধু রূপচাঁদের ঠাকুরমা আর একটা বুড়ী ঝি। সকলে খোঁজ লইয়া চিলেকোঠার সামনে গিয়া দাঁড়াইল। বাহির হইতে তালা বন্ধ, ভিতরে কোন সাড়াশব্দ নাই। সকলে একবার সভয়ে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিল। তাহার পর ভূতো দোরে একটা ধাক্কা দিয়া ডাকিল—রূপো।

কোন উত্তর হইল না।

আরও জোরে ধাক্কা দিয়া ডাকিল—রূপো, এই রূপচাঁদ।

অতি ক্ষীণ একটা আওয়াজ ছিদ্রপথে বাহির হইল। একেবারে তিন-চার জন একসঙ্গে প্রশ্ন করিল—বিয়ে করবি?

রূপচাঁদ শরীরটাকে টানিয়া দুয়ারের কাছে সরিয়া আসিল। দুইটা কপাটের মাঝে ঠোঁট দিয়া প্রশ্ন করিল—কিছু খাবার আছে রে?...ভূতো নাকি?

—হ্যাঁ,...ওদের বর পালিয়েছে। তোর সঙ্গে নেড়ীর যে ঠিক হয়েছে।

রূপচাঁদ চিঁচিঁ করিয়া বলিল—দোরটা খুলে দে; কিছু খাবার এনেছিস তোরা? কেনো কোথায়?

—কানাই চাবি আনতে গেছে, ভুলে গিয়েছিল... একেবারে বিয়ের পর খাবি রূপো, ঘণ্টা-দুয়েক একটু সবুর ক'রে থাক না।

—ওরে বাপ রে। দু-ঘণ্টা!...তবে থাক।

—তুই অত ভালবাসতিস নেড়ীকে রূপো, একবার অন্য জায়গায় হয়ে গেলে বিয়ে...

রূপচাঁদ ভিতর হইতে একেবারে খিঁচাইয়া উঠিল—মেলা ক্যাচ ক্যাচ করিস নে ভূতো...সমস্ত দিন পেটে অন্ন নেই, বলে এরও ওপর দু-ঘণ্টা চাপিয়ে বিয়ে করগে।... দোর খুলে কিছু খেতে দিবি তো দে, নইলে বেরো...সব উপ্‌গার করতে এসেছেন... কণ্ঠস্বর ক্রমেই ক্ষীণতর হইয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

কানাই চাবি লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুয়ার খুলিয়া যতক্ষণ তাহারা নীচে নামিয়া আসিল ততক্ষণে রূপোর বাপ নেড়ীর বাপ আরও সব অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এ-রকম অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বিবাহ হয় না। এক জনকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, সে ছুটিয়া গিয়া একটু দুধ আর সন্দেশ লইয়া আসিল। রূপচাঁদ চাঙ্গা হইয়া উঠিতে উঠিতে বাড়ীটা মেয়েপুরুষের কলরবে, হঠাৎ বিবাহের জন্য আয়োজনে গম্‌গম্ করিতে লাগিল।

* * *

কন্যাকর্ত্তা স্নেহ-দ্রব কণ্ঠে রূপচাঁদের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—বাবা রূপচাঁদ, তোমার যদি কিছু সাধ থাকে তো বল...বল না, লজ্জা কি?...রূপোর আমার লজ্জা হয়েছে গো, তোমরা দেখ।"

পিঠে কঞ্চির দাগে, আঙুল ক-টা আটকাইয়া যাইতেছে।

পুরুত, আরও কয়েক জন বয়স্থ ব্যক্তি বলিল—হ্যাঁ, চাইবে বইকি, লজ্জা কি, পা-গাড়ী, হারমোনিয়াম, যা ইচ্ছে হয় বল।

কোন উত্তর নাই।

—বল, বল, ওদিকে আবার লগ্ন সময় হয়ে এল ..

রূপচাঁদ একবার সমবয়সীদের পানে চকিতে চাহিয়া মাথাটা গুঁজিয়া লইয়া অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—রহমৎ আর সাতকড়েকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে?

বয়স্কদের বর্ণপরিচয়

শ্রীঅনাথনাথ বসু

এদেশের নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষাসম্বন্ধে সম্প্রতি আমরা সচেতন হয়ে উঠেছি। বাংলার বাহিরে অন্য কয়েকটি প্রদেশের নিরক্ষরতা দূর করার জন্য বয়স্কশিক্ষা-অভিযানও সুরু হয়েছে। সেখানে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট নানাভাবে এই আন্দোলনের সহায়তা করছেন। বাংলা দেশে এই আন্দোলন এখনও মুষ্টিমেয় কয়েক জন উৎসাহী ও অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ আছে। তবে আশা করা যায় যে এই প্রদেশের গবর্ণমেণ্টও কিছু দিনের মধ্যেই এই আন্দোলনে সাহায্য করবেন।

বয়স্কশিক্ষা আন্দোলনের জন্য প্রধান প্রয়োজন কর্ম্মীর ও উপযোগী সাহিত্যের। অবশ্য এর জন্য অর্থ চাই। কিন্তু অর্থের প্রয়োজন প্রধানতঃ কর্ম্মীর ও সাহিত্যের জন্যই; সুতরাং তাদেরই প্রথম স্থান দিয়েছি। বাংলা দেশে এই আন্দোলন এত দিন যেভাবে চলেছে (এখানে বলে রাখা ভাল, ব্যাপকভাবে বয়স্কশিক্ষার চেষ্টা নূতন হলেও এই প্রদেশে অন্তত এ আন্দোলন নূতন নয়;) ও অন্যান্য প্রদেশে এটা যেভাবে সুরু হয়েছে তাতে মনে হয় আপাতত এর জন্য কর্ম্মীর বিশেষ অভাব হবে না। অন্তত এখন কিছু দিনের জন্য ছাত্রদের এই কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে এবং সে-রকম করাও হয়েছে। অবশ্য, ভবিষ্যতে বেতনভুক্ কর্ম্মীর যে দরকার হবে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু বর্ত্তমানে ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকদের দিয়ে কাজ চালান যেতে পারে। সুতরাং এখন চাই বয়স্কশিক্ষার উপযোগী সাহিত্য। এই সাহিত্যের দুইটি গুণ থাকা চাই; প্রথমত, এটা বিশেষভাবে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হবে; দ্বিতীয়ত, এই সাহিত্য সুলভ হবে ও এর মূল্য হবে অল্প।

যাঁরা এদেশে বয়স্কশিক্ষা নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরাই জানেন বাংলা ভাষায় এরূপ সাহিত্যের বিশেষ অভাব রয়েছে। বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ সন্দেহ নেই, কিন্তু

এ-সাহিত্যের রসাস্বাদ ও ব্যবহার তারাই করতে পারে যারা ছোটবেলা থেকে দীর্ঘকাল ধরে লেখাপড়া করেছে। বয়স্কশিক্ষা আন্দোলন যাদের জন্ম তাদের জন্য এ-সাহিত্য রচিত হয় নি।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার নানা ব্যবস্থাসত্ত্বেও নিরক্ষতা যে দূর হচ্ছে না, শিক্ষার যে প্রসার হচ্ছে না তার অন্যতম কারণও উপযোগী সাহিত্যের অভাব। যে-ছেলে তিন-চার বছর ধরে পাঠশালায় লেখাপড়া শিখল এবং উচ্চতর শিক্ষা পেল না—নবলব্ধ অক্ষরজ্ঞানের চর্চার কোন সুযোগই সে পরে আর পেল না। তার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তার অবস্থাও নিরক্ষর লোকেরই মত হল; অর্থাৎ তাকে কষ্ট ক'রে তার সময় নষ্ট ক'রে দেশের অর্থ ব্যয় ক'রে যে-শিক্ষা দেওয়া হল—সে-শিক্ষা ব্যর্থ হল। সুতরাং সময় ও অর্থ দুয়েরই অপব্যয় হল। এ অবস্থার প্রতিকার শুধু প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ভাল করলে হবে না; এর জন্য চাই লোকশিক্ষার ব্যবস্থা; এর জন্য চাই উপযোগী সাহিত্য, যে-সাহিত্যের সাহায্যে অক্ষরজ্ঞান হবার পর লোকে নিজের শিক্ষার ভার কতক পরিমাণে নিজেই নিতে পারবে। এই সাহিত্যে জীবনের নানা সমস্যা অবলম্বন ক'রে সহজভাবে বই লেখা হবে; তাতে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা থাকবে। আবার তাতে সাধারণত সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি তাও থাকবে। বস্তুত এক দিন তো আমাদের এ-রকম সাহিত্য ছিল; যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হ'ত। সেগুলি ক্রমশ নষ্ট হয়ে গেছে ও যাচ্ছে। আজ সেগুলির পুনরুদ্ধার করতে হবে, আবার নূতন যুগোপযোগী লোকসাহিত্যও রচনা করতে হবে।

এই সাহিত্যের আর একটি বিশেষত্ব হবে; এর মধ্যে একটি ক্রম থাকবে। আমাদের উদ্দেশ্য জনসাধারণকে ধাপে ধাপে এই সাহিত্যের ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে এক দিন তাদের দেশের সাধারণ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। কিন্তু সে-পরিচয় ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে হবে; তাই লোকসাহিত্যের মধ্যেও ধাপ বা ক্রম থাকবে। তা ছাড়া এর উপযোগী এবং এই জন্য বিশেষ ভাবে লেখা "সংবাদপত্রও প্রকাশ করা দরকার হবে; কারণ প্রচলিত সংবাদপত্রগুলি ঠিক লোকশিক্ষার প্রথম অবস্থার উপযোগী নয়।

লোকসাহিত্যের এই যে ধাপগুলির কথা বললাম তাদের প্রথম ধাপ হ'ল বর্ণপরিচয়। নিরক্ষরকে অক্ষর শেখাবার জন্য যে বইগুলি ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্ণপরিচয় সুপরিচিত। এই দুইটির মধ্যে রামানন্দবাবুর বইটিই নানা কারণে বেশী উপযোগী। এই দুইটি বই ছাড়া নূতন-প্রণালীতে লেখা আরও যে অনেকগুলি বই লেখা হয়েছে; সেগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'সহজপাঠ' ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'লেখাপড়া' বই দুইটিই ভাল। পুরাতন প্রণালীর বর্ণপরিচয়ের কতকগুলি ত্রুটি এই দুখানি বইয়ে নেই। কিন্তু এই সবগুলি বইই ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা। তাদের শব্দ-সঞ্চয়ন ও ভাবধারা ছোটদেরই উপযোগী। সুতরাং বেশী বয়সে যারা লেখাপড়া শিখবে তাদের জন্য এই বইগুলি ব্যবহার করা চলে না। বড়দের জন্য শব্দ-সঞ্চয়ন ও ভাববিন্যাস বড়দেরই উপযোগী হওয়া চাই। "জল পড়ে, পাতা নড়ে" এই শব্দগুলির ছবি শিশুদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক; কিন্তু বয়স্ক পাঠকের কাছে সেটা ছেলেমানুষী বলেই মনে হবে। "সদা সত্য কথা বলিবে," "গোপাল অতি সুবোধ বালক" এগুলি ছেলেদের জন্য চলে, কিন্তু বড়দের পাঠ হিসাবে একেবারে অচল। তা ছাড়া অনেকদিন ধরে শুধু স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ শিখিয়ে তার অনেক দিন পরে শব্দ এবং তারও কিছুদিন পরে বাক্য রচনা করাবার পদ্ধতিও আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। আবার প্রথমে 'ক' তার পরে 'খ' এইভাবে অক্ষরগুলি শেখাবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আর কেন আগে স্বরবর্ণ ও পরে ব্যঞ্জনবর্ণ শেখাব? এক শত বৎসর আগে আমাদের দেশে বর্ণপরিচয় শেখাবার এরূপ প্রথা তো ছিল না। স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের এমন ভাগ ও ব্যঞ্জন বর্ণের এমন ক্রম শেখাবার সময় ব্যবহার করা হ'ত না।

অক্ষরের সহিত পরিচয় এবং শব্দ ও বাক্যের মধ্যে পরিচিত অক্ষরের ব্যবহার যত কাছাকাছি হয় ততই ভাল, ততই শেখা সহজ হয়, আনন্দদায়ক হয়। আর যে-অক্ষরের বিশেষ কোন ব্যবহার নেই সে-অক্ষর প্রথম শেখাবার কি প্রয়োজন থাকতে পারে? ৯ বাংলায় অচল, জোর করে ৯চু এনে কি হবে? আমরা লিখতে হলে লিচুই লিখি। যুক্তাক্ষরের মধ্যেও অনেকগুলি প্রথমে না শেখালে বেশ চলে। নূতনভাবে বয়স্কদের উপযোগী বর্ণপরিচয় লেখবার সময় এই কথাগুলি মনে রাখা বিশেষ দরকার।

তার পর প্রশ্ন ওঠে বাংলা ভাষা শেখবার প্রথম ধাপে বইয়ের ভাষা কি রকম হবে? আমার মনে হয় এখানে যে-ভাষা শিক্ষার্থী প্রতিদিনকার জীবনে ব্যবহার করে সেই ভাষাতেই বই লেখা উচিত। এই ধাপে ভাষা-শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য পরিচিত শব্দের ধ্বনির সঙ্গে তার লিখিত রূপের ঐক্যসাধন। 'মা' শব্দটি আমরা শুনি, ব্যবহার করি, লেখায় সেটার চেহারা কি রকম হয় সেইটাই শেখবার বিষয়। এখন যদি অপরিচিত শব্দ প্রয়োগ করা যায় তা হলে শেখাটা আরও কঠিন হয়ে পড়ে; কারণ সে-ক্ষেত্রে প্রথমে ধ্বনি ও অর্থগ্রহ হবে, পরে লিখিত রূপ আয়ত্ত করতে হবে। কিন্তু পরিচিত (কথ্য ভাষায়) শব্দ প্রয়োগ করলে ধ্বনি ও অর্থগ্রহের সমস্যা থাকে না, সুতরাং শেখা সহজ হয়ে ওঠে। লিখিত অক্ষরের সঙ্গে একবার পরিচয় হয়ে গেলে তখন কঠিন, অপরিচিত শব্দপ্রয়োগ করলেও কোন অসুবিধা হয় না। তখন ধ্বনি ও অর্থগ্রহ শেখার বিষয় হয়, লিখিত রূপের পরিচয় তো আগেই হয়ে থাকে। এখানে যে কথাগুলি বললাম সেগুলি বয়স্ক ও শিশু উভয়েরই বর্ণপরিচয় ব্যাপারে প্রয়োজ্য।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত জে. কে. সাহা ও শ্রীযুক্ত বিলাসচন্দ্র মুখার্জি তাঁর (সহধর্মিণীর সহযোগিতায়) পঠনশিক্ষা ও পড়ার বই নামে দুখানি বই লিখেছেন। তাঁরা উভয়েই ফ্রাঙ্ক লাওবাক্ (Dr. Frank C. Laubach) কর্তৃক আবিষ্কৃত keyword-পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। আর দুখানি বইই মুখ্যত বয়স্কদের শেখাবার জন্য লেখা হয়েছে। ফ্রাঙ্ক লাওবাক্ keyword-পদ্ধতির সাহায্যে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের নিরক্ষর অধিবাসীদের খুব সহজেই লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তাঁর পদ্ধতি বাংলায় কি ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তার দু-একটা উদাহরণ দিলে প্রণালীটা বোঝা যাবে।

এই প্রণালীতে প্রথমে একটা মূলশব্দ (keyword) বেছে নিতে হয়। তার পরে সেই শব্দের অন্তর্ভূত বিভিন্ন ধ্বনি বা অক্ষরের সংকলনে ও বিকলনে নূতন নূতন শব্দ ও বাক্য রচিত হয়। তার পরে আর একটা মূল-শব্দ নেওয়া হয়। এই ভাবে নূতন নূতন অক্ষর, শব্দ ও বাক্যের সঙ্গে পরিচয় হয়। শ্রীযুক্ত সাহা 'বালা' শব্দটি প্রথমে নিয়েছেন; পরে সেটি ভেঙে এই শব্দ ও বাক্যগুলি পাওয়া গেছে:—

বালা লব।
বাবা বালা লব।
বাবা বাবা বল।
লাল বালা লব।
বাবা বল লব।
লাল বল লব।

তাঁর বইয়ে দ্বিতীয় মূলশব্দ 'দা', তৃতীয়টি 'ওল'। এইভাবে তিনি নূতন নূতন অক্ষর ও শব্দ শিখিয়েছেন। বিলাসবাবু তাঁর পড়ার বই মূল শব্দ 'পাতাল' দিয়ে আরম্ভ করেছেন; তাঁর দ্বিতীয় মূলশব্দ 'মশাল'। 'পাতাল' শব্দটি নিলেও বিলাসবাবু বই সুরু করেছেন 'তাল' দিয়ে। তাঁর বইয়ে বাক্য আরম্ভ হয় আরও দুটি মূলশব্দ, 'দালান' ও 'চাকর' ব্যবহার করার পর। বিলাসবাবু মূলশব্দ-পদ্ধতি অবলম্বন করে লিখলেও ঐ পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করেন নি। তার কারণ তিনি ভূমিকায় নির্দেশ করেছেন। বইখানি একসঙ্গে নিরক্ষর বয়স্ক ও শিশুদের জন্য লেখা; সেই জন্য "শিশুদের প্রয়োজন কি তার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে আর সেইজন্যই স্বরবর্ণ-গুলি ক্রমে ক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে।" তাঁর বইয়ের শব্দ-সঞ্চয়ন ও ভাবধারা শিশুদের উপযোগী।

আগেই বলেছি মনস্তত্ত্বমতে শিশুদের ও বয়স্কদের এক বই চলতে পারে না। তাছাড়া সমগ্রভাবে মূলশব্দ-পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় কিনা তাও সন্দেহ। বিলাস-বাবুরও কতকটা সেই মত। সুতরাং, অন্য কি ভাবে

বয়স্কদের উপযোগী ক'রে বর্ণপরিচয় রচনা করা যায় সেটা আমাদের চিন্তা করা দরকার।

প্রসঙ্গক্রমে এইখানে আর একটা কথা ব'লে রাখি। পূর্বেই বলেছি বয়স্কদের জন্ম রচিত বই সুলভ ও স্বল্পমূল্য হওয়া দরকার; কিন্তু বিলাসবাবু ও শ্রীযুক্ত সাহা দু-জনেরই বইয়ের মূল্য বেশী; এত দাম দিয়ে বই কেনা গরীব লোকের পক্ষে কঠিন। বয়স্কদের জন্ম বই লেখার একটা সুবিধা আছে। তাদের বইয়ে ছবির বিশেষ দরকার হয় না; কিন্তু যেহেতু বিলাসবাবু ও শ্রীযুক্ত সাহা তাঁদের বইয়ে অনেক ছবি দিয়েছেন তাই তাঁদের বইয়ের দাম বেশী হয়েছে। 'তাল' বা 'ওল' বড়রা চেনে তার জন্ম ছবি দরকার হয় না। আর বড়দের জন্ম খুব বড় অক্ষরেরও দরকার নেই।

তা ছাড়া বড়দের এক সঙ্গে একই পাঠে একাধিক নূতন অক্ষর বা শব্দ ব্যবহার করা চলে; কারণ আগেই বলেছি যে যদি ধ্বনির দ্বারা পরিচিত প্রচলিত সহজ কথা ব্যবহার করা যায় তাহলে শুধু লিখিত রূপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এক্ষেত্রে একমাত্র শিক্ষণীয় কাজ হয়।

আমি এইভাবে একটি বই রচনা করেছি; তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে আমার প্রবন্ধ শেষ করব। বইখানি ছোট। তাতে মাত্র ষোলটি পৃষ্ঠা আছে। সাধারণ বই যেমন হয় তার চেহারাও তেমন। আর ছবি নেই ও ছোট ব'লে এর দাম দু-পয়সা করা সম্ভবপর হবে।

বইটিতে দশটি পাঠ আছে। এই দশটি পাঠে 'অ' থেকে সুরু করে 'ৎ' পর্যন্ত পঞ্চাশটি অক্ষর ও 'আকার' 'ইকার' প্রভৃতি দশটি স্বরযোগ শেখান হয়েছে। যুক্তাক্ষরের ব্যবহার প্রথম ভাগে করা হয় নি; দ্বিতীয় ভাগে করা হবে। প্রত্যেক পাঠে মোটামুটি পাঁচটি ক'রে নূতন অক্ষর ও একটি স্বর যোগ করা হয়েছে। প্রথম পাঠের উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

ম, আ, ন, ও, দ, া,

মা, না, দা

মা

মামা

আম

মামা, আম আন।

ও মা, আম নাও।

দাদা, দাম দাও।

মদন, দাম নাও।

প্রথমে 'মা' কথাটি লিখে শিক্ষার্থীকে তার উচ্চারণ বলে দিতে হবে। প্রথমেই 'ম'য়ে আকার 'মা' এটা বলার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় ধাপে শিক্ষক বোর্ডে 'মামা' শব্দটি লিখে শব্দটি ছাত্রদের পড়তে বলবেন। এর পর 'মা' কথাটি বিশ্লেষণ করে 'ম' ও 'আকার' আলাদা করে দেখাতে হবে। এইবার 'আ' এই নূতন অক্ষরটির উচ্চারণ ব'লে দিতে হবে। এই 'আ'-ই যে আকার এটা না ব'লে দিলে ক্ষতি নেই। চতুর্থ ধাপে 'ন' অক্ষরটির উচ্চারণ ব'লে দিতে হবে, এবং সেই সঙ্গে 'পাশে দাঁড়ি দিলে' ন যে 'না' হয় এটা দেখিয়ে দিতে হবে।

এই ভাবে যখন যেখানে নূতন অক্ষর আসবে তখন সেটি শিখান চলবে এবং সেই সঙ্গে পরিচিত স্বর যোগ শেখান হবে। তবে প্রত্যেক পদেই পরিচিত শব্দের সাহায্যেই অক্ষর ও স্বরযুক্ত অক্ষর শেখাতে হবে। লেখা ও পড়া এক সঙ্গে চলবে ও ছাত্রেরা যাতে নিজে নিজেই শেখে ও আবিষ্কার করে সে-বিষয়ে উৎসাহ দিতে হবে।

এই ভাবে লেখা আর দুটি পাঠ এখানে দিলাম; তাতে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হবে।

তৃতীয় পাঠ।

চ, র, খ, স, ধ, ে

চি, মি, দি, কে, সে, তে, দে

চাচি কই? কে? আমি নিতাই। আর কে? আমি মাখন। মাখন, কি চাও? চাচি, আমি তামাক চাই। নিতাই, কি দরকার? কাসেম চাচা কই? কেন? ধান নিতে চাই। ওইখানে দেখ দেখি। মাখন, এই দিকে এস। আমিনা, মাখনকে তামাক এনে দে। ধামাটা এইখানে রাখ। কতটা তামাক মা? মাখন, কতখানি তামাক চাই? আধ সের। আমিনা, আধ সের তামাক এনে দে। মাখন, এই সের তামাক।

দশম পাঠ।

ড, ৎ, ক্ষ, ঞ, :, ৈ

হৈ, চৈ, সৈ

বাজার হয়ে একবার ডাকঘরে যেতে হবে। ডাকঘরটা এতদিন ঠিক নদীর উপরে ছিল। এখন দূরে সরে গেছে। হাঁ, ওখানটায় বাঁকের মুখে নদী ভাঙছে কিনা। তাই সরে গেছে। ওখানটায় নদী বড় খারাপ। জলও খুব বেশী। হঠাৎ পড়ে যাবার ভয় আছে। সেদিন হাটে আসতে দেখি ঐখানে খুব হৈ চৈ লেগে গেছে। শুনলাম একটা ছেলে নাকি জলে ডুবে গিয়েছিল। সবাই মিলে তাকে তুলেছে। কাদের ছেলে? ডোমেদের ফটিকের ছোট ছেলে। একা গিয়ে সাঁতার শিখছিল। খুব বুকের পাটা তো! ভয়ডর নেই? তার পর? তার পর হঠাৎ পা পিছলে গভীর জলে গিয়ে পড়ে। তখন ডোবে আর কি। এমন সময় সৈয়দ সাহেব তাকে দেখতে পান। তিনিই লোকজন ডেকে তাকে বাঁচান। সৈয়দ সাহেব লোকটি বড় ভাল। এখন তাঁর সময়ও ভাল চলেছে। বড় চাষী; ঘরে চারখানা হাল আছে। ধান পাটের চাষ আছে। চৈতালি ফসলও ভাল পান। বয়স হয়েছে, এখনও নিজেই চাষ দেখেন। বাগান করেছেন বড়, অনেক ফুল ফলের গাছ লাগিয়েছেন। ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন। এক ছেলে ডেপুটি, আর এক ছেলে উকিল। ছোট তো বাপের কাছেই থাকে। সৈয়দ সাহেবের এক ভাই আছে, না? হাঁ, তাঁকে সবাই করিম মিঞা বলে ডাকে। করিম মিঞা লোকটি অতি সৎ। তবে তিনি জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। সেবার তাঁর বড় বড় দুই ছেলে হঠাৎ মারা গেল। সেদিন আবার একটি মেয়েও গেল। দেখলে তো মনে হয় না। মুখে হাসি লেগেই আছে। হাঁ, মহৎ লোকের এমনই হয়।

এইখানে যে উদাহরণগুলি দিলাম তাতে বোঝা যাবে যে আমি কিভাবে গ্রামবাসীদের প্রতিদিনকার জীবনসম্পর্কিত আলাপ-আলোচনার সাহায্যে বর্ণপরিচয় করাবার চেষ্টা করেছি। বইটির শেষে রবীন্দ্রনাথের রচিত যুক্তাক্ষরবর্জিত একটি কবিতাও দেওয়া হয়েছে।

বইটির মধ্যে ৯এর ব্যবহার করা হয় নি। সাধারণত প্রতিদিন ব্যবহৃত সহজ পরিচিত কথাগুলি নিয়ে বাক্য রচনা করা হয়েছে; তবে বাধ্য হয়ে ঔষধ, ঋণ, মহৎ প্রভৃতি অল্প কয়েকটি শক্ত কথা ব্যবহার করেছি। কিন্তু এগুলিও অপ্রচলিত নয়; আর এদের অর্থও সহজবোধ্য।

একটা কথা বলা দরকার মনে করি। পাঠগুলি বাংলা দেশে চাষীদের মনে রেখে তৈয়ারি করা হয়েছে। মেয়েদের জন্তে উপযোগী ভাবধারা দিয়ে ও শব্দচয়ন ক'রে লিখতে হবে এবং স্থানভেদে ভাষার কিছু ইতর-বিশেষ করা দরকার হবে। তবে মোটামুটি প্রণালীটা এই ভাবেরই হবে।

এই প্রণালী সম্বন্ধে একটি সন্দেহ মনে হ'তে পারে যে একসঙ্গে এতগুলি নূতন অক্ষর শেখান সম্ভব হবে কি না? আমার মনে হয় বড়দের পক্ষে এটা অসম্ভব নয়। কারণ বার-বার নানা ভাবে নূতন অক্ষরগুলি প্রয়োগ করা হয়েছে ব'লে শেখা সুগম হবে; আর একটি পাঠ এক দিনে তো শেষ হবে না, শেষ হবার দরকারও নেই। অবশ্য, এ-বিষয়ে পরীক্ষা না-করলে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যায় না। কিন্তু আমার মনে হয় এই ভাবে শেখালে এক মাসের মধ্যে ছাত্রেরা অনেকখানি লিখতে ও পড়তে শিখবে। আমি পরীক্ষাধীন ভাবেই বইটি লিখেছি; এর সংস্কার ও মার্জনার বারবার প্রয়োজন হবে এ-কথা আমি জানি এবং সে-বিষয়ে আমি সকলের সাহায্য চাই; আমার উদ্দেশ্য এইদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। যদি দেশের লোক এ-বিষয়ে দৃষ্টি দেন তবেই আমার উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প

মধুসুন্দরী দেবীর আবির্ভাব

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তারানাথ তান্ত্রিকের প্রথম গল্প আপনারা শুনিয়াছেন কিছু দিন আগে, হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করেন নাই। সুতরাং তাহার দ্বিতীয় গল্পটি যে বিশ্বাস করিবেন এমন আশা করিতে পারি না। কিন্তু এই দ্বিতীয় গল্পটি এমন অদ্ভুত যে সেটি আপনাদের শুনাইবার লোভ সম্বরণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

জগতে কি ঘটে না-ঘটে তাহার কতটুকুই বা আমরা খবর রাখি? "There are more things in Heaven and Earth, Horatio" ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব এই গল্পটি শুনিয়া যান এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া ডিস্‌মিস্ করিবার পূর্ব্বে মহাকবির ঐ বহুবার উদ্ধৃত, সর্ব্বজন-পরিচিত, অথচ গভীর উক্তিটি স্মরণ করিবেন এই আমার অনুরোধ।

তবে যিনি প্রত্যক্ষদৃষ্ট এই স্থূল জগতের বাহিরে অন্য কোন সূক্ষ্ম জগৎ, কিংবা ভূতপ্রেত কিংবা অন্য কোন অশরীরী জীব কিংবা অপদেবতা-উপদেবতার অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাসবান নহেন, তাঁরা এ-গল্প না-হয় না-ই পড়িলেন?

ভূমিকা রাখিয়া এখন গল্পটা বলি।

সেদিন হাতে কোন কাজকর্ম্ম ছিল না, সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাঠ হইতে ফুটবল খেলা দেখিয়া ধর্ম্মতলা দিয়া ফিরিতেছিলাম। মোহনবাগান হারিয়া যাওয়াতে মনও প্রফুল্ল ছিল না—কি আর করি, ধর্ম্মতলার মোড়ের কাছেই মট্‌স্ লেনে (নম্বরটা মনে নাই তবে বাড়ীটা চিনি) তারানাথ জ্যোতিষীর বাড়ী গেলাম।

তারানাথ একাই ছিল। আমায় বলিল—এস এস হে, দেখা নেই বহুকাল, কি ব্যাপার?

কিছুক্ষণ গল্পগুজবের পরে উঠিতে যাইতেছি এমন সময়ে ঘোর বৃষ্টি নামিল। তারানাথ আমায় এ অবস্থায় উঠিতে দিল না। আমি দেখিলাম বৃষ্টি হঠাৎ থামিবে না, তারানাথের বৈঠকখানায় বসিয়া আমরা দু-জনে। বৃষ্টির সময়ে মনে কেমন এক ধরণের নির্জ্জনতার ভাব আসে—বৃষ্টি না থাকিলে মনে হয় শহরসুদ্ধ লোক বুঝি আমার ঘরে আসিয়া ভিড় করিবে, কেহ না আসিলেও মনের ভাব এইরূপ থাকে, কিন্তু বৃষ্টি নামিলে মনে হয় এ বৃষ্টি মাথায় কেহই আসিবে না। সুতরাং আমার ঘরে আমি একেবারে একা। তারানাথের ঘরে বসিয়াও সেদিন মনে হইল আমরা দু-জনে ছাড়া সারা কলিকাতা শহরে যেন কোথাও কোন লোক নাই।

সুতরাং মনের ভাব বদলাইয়া গেল। এদিকে সন্ধ্যাও নামিল। জীবনের অদ্ভুত ধরণের অভিজ্ঞতার কাহিনী বলিবার ও শুনিবার প্রবৃত্তি উভয়েরই জাগিল। ঘোর বৃষ্টিমুখর আষাঢ়-সন্ধ্যায় আমরা মোহনবাগানের শোচনীয় পরাজয়, ল্যাংড়া আম অতিরিক্ত সস্তা হওয়ার ব্যাপার, চৌরঙ্গীর মোড়ে ওবেলাকার বাস্-দুর্ঘটনা প্রভৃতি নানারূপ কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ কোন্ সময় নারীপ্রেমের প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িলাম।

তারানাথ বেশ বড় জ্যোতিষী ও তান্ত্রিক হইলেও শুকদেব যে নয় বা কোন কালে ছিল না, এ-কথা পূর্ব্বের গল্পটিতে বলিয়াছি। আশা করি তাহা আপনারা ভোলেন নাই। নারীর সঙ্গে সে যে বহু মেলামেশা করিয়াছে, এ-কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং তাহার মুখ হইতে এ বিষয়ে কিছু রসাল অভিজ্ঞতার কথা শুনিব, এরূপ আশা করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই ছিল, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সে এ সম্পর্কে যে অসাধারণ ধরণের অভিজ্ঞতার কাহিনীটি বর্ণনা করিল, তাহার জন্য, সত্যই বলিতেছি, আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না।

আর একটা কথা, তারানাথকে দেখিয়া বা তাহার

মুখে কথা শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল একটা কি ঘোর দুঃখ মনে সে চাপিয়া রাখিয়াছে, অনেকবার তন্ত্রশাস্ত্রের কথাবার্তা বলিতে গিয়া যেন কি একটা বলি বলি করিয়াও বলে নাই। আজ বুঝিলাম তারানাথের তান্ত্রিক জীবনের অনেক কাহিনীই সে আমার কাছে কেন, কাহারও কাছে বলে নাই, হয়তো সেগুলি ঠিক বলিবার কথাও নহে—কারণ সে-কথা বলা তাহার পক্ষে কষ্টকর স্মৃতির পুনরুদ্বোধন মাত্র। তা ছাড়া আমার মনে হয়, লোককে সে-সব গল্প বিশ্বাস করানোও শক্ত।

বলিলাম—জ্যোতিষী মশায়ের এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে অনেক—কি বলেন ?

তারানাথ বলিল—অভিজ্ঞতা একটাই আছে এবং সেটা বড় মারাত্মক রকমের অদ্ভুত। প্রেম কাকে বলে বুঝেছিলুম সেবার। এখন কিন্তু সেটা স্বপ্ন ব'লে মনে হয়—শোনো তবে—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—কোন ট্র্যাজিক গল্প বলবেন না, প্রথম প্রেম হ'ল একটি মেয়ের সঙ্গে, সে মারা গেল—এই তো? ও ঢের শুনেছি। তারানাথ হাসিয়া বলিল—ঢের শোন নি। শোন—কিন্তু বিশ্বাস যদি না কর তাও আমায় বলবে। এ রকম গল্প বানিয়ে বলতে পারলে এক জন গল্পলেখক হয়ে যেতুম হে!··· দু-এক জন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া এ কথা কারও কাছে বলি নি।

ঠিক এই সময় বাড়ীর ভিতর হইতে তারানাথের বড় মেয়ে চারু ওরফে চারি দু-পেয়ালা গরম চা ও দুখানি করিয়া পরোটা ও আলুভাজা আনিল। চারি দশ বছরের মেয়ে, তারানাথের মতই গায়ের রং বেশ উজ্জ্বল, মুখ-চোখ মন্দ নয়। আমায় বলিল—কাকাবাবু, লেসের কাপড়ের ছবিটা আনলেন না? চারির কাছে কথা দিয়া রাখিয়াছিলাম, ধর্মতলার দোকান হইতে তাহার উল-বোনার জন্য একটা ছবির ও প্যাটার্নের নক্সা কিনিয়া দিব। বলিলাম—আজ ফুটবলের ভিড় ছিল, কাল এনে দেবো রে ঠিক।

চারি দাঁড়াইয়া ছিল, তারানাথ বলিল—যা তুই চলে যা, দুটো পান নিয়ে আয়—

মেয়ে চলিয়া গেলে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ছেলেপিলের সামনে সে-সব গল্প—চা-টা খেয়ে নাও পরোটাখানা—না না ফেলতে পারবে না, ইয়ং ম্যান তোমরা এখন—খাওয়ার বেলা অমন—ওই বৃষ্টির জলেই হাত ধুয়ে ফেলো—

চা পানের পরে তারানাথ বলিতে আরম্ভ করিল।

তান্ত্রিক তারানাথের দ্বিতীয় গল্প।

মধুসুন্দরী দেবীর আবির্ভাব।

বীরভূমের শ্মশানের যে পাগলীর অদ্ভুত কাণ্ড সেবার গল্প করেছিলাম, তার ওখান থেকে তো চলে এলাম সেই কাণ্ডের পরেই।*

কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি আমার একটা অত্যন্ত শ্রদ্ধা হয়ে গেল তার পর থেকে। নিজের চোখে যা দেখলুম, তা তো আর বিশ্বাস না ক'রে পারি না। এটা পাগলীর কথা থেকে বুঝেছিলাম পাগলী আমায় ইন্দ্রজাল দেখিয়েছিল নিম্নতন্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু সে তো ব্ল্যাক ম্যাজিক ছাড়া উচ্চতন্ত্রের কথাও বলেছিল। ভাবলাম দেখি না কি আছে এর মধ্যে। গুরু খুঁজতে লাগলুম।

খুঁজলে কি হবে, ও-পথের পথিকের দর্শন পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ।

এই সময়ে বহু স্থান ঘুরে বেড়িয়ে আমার দুটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা হ'ল। প্রথম, ধুনি-জ্বালানো সাধুদের মধ্যে শতকরা নিরেনব্বুই জন ব্যবসাদার, ধর্ম জিনিসটা এদের কাছে একটা বেচাকেনার বস্তু, ক্রেতাকে ঠকাবার বিপুল কৌশল ও আয়োজন এদের আয়ত্তাধীনে। দ্বিতীয়, সাধারণ মানুষ অত্যন্ত বোকা, এদের ঠকানো খুব সহজ, বিশেষতঃ ধর্মের ব্যাপারে।

যাক্ ও-সব কথা। আমি ধুনি-জ্বালানো ব্যবসাদার সাধু অনেক দেখলুম, ইনসিওরেন্সের দালাল দেখলুম, দৈবী ঔষধের মাদুলি-বিক্রেতাকে দেখলুম, সাধুবেশী ভিক্ষুক দেখলুম—সত্যিকার তান্ত্রিক সাধু একটাও দেখলুম না।

এ অবস্থায় বরাকর নদীর ধারে শালবনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের সীমায় এক মন্দিরে এক দিন আশ্রয়

* তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প, জন্ম ও মৃত্যু।

নিয়েছি, শীতকাল,' আমি বনের ডালপালা কুড়িয়ে আগুন করবার যোগাড় করতে যাচ্ছি, এমন সময়ে একজন শ্যামবর্ণ, ঋজু ও দীর্ঘাকৃতি, প্রৌঢ় সাধু দেখি একটা পুঁটুলি বগলে মন্দিরে ঢুকছেন। আমি গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলুম।

সাধুটি বেশ মিষ্টভাষী, বললেন—তুই যে দেখছি বড় ভক্ত! কি চাস এখানে? বাড়ী ছেড়ে দেখছি রাগ ক'রে বেরিয়েছ।

আমি বিনীত প্রতিবাদের সুরে বলতে গেলুম - রাগ নয় বাবাজী, বৈরাগ্য—

সাধুজী হেসে বললেন, যে-কথাটি, পাগলীও সে-কথা বলেছিল।

—ওহে ছোকরা, সাধু হব বললেই হওয়া যায় না। তোর মধ্যে ভোগের বাসনা এখনও পুরো মাত্রায় রয়েছে। সংসার ধর্ম্ম কর্ গে যা।

মন্দিরের থেকে কিছু দূরে ছাতিম-গাছের তলায় সাধুর পঞ্চমুণ্ডির আসন—পাঁচটি নরমুণ্ড পেতে তৈরী। সাধু রাত্রে সেখানে নির্জ্জনে সাধনা করেন তাও দেখলুম। মনে ভারী শ্রদ্ধা হ'ল, সংকল্প করলুম এ মহাপুরুষকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি নে এবার।

কিছুদিন লেগে রইলাম তাঁর পেছনে। তাঁর হোমের কাঠ ভেঙে এনে দিই, তিন মাইল দূরের কুসুমবনী ব'লে গ্রাম থেকে তাঁর চাল-ডাল কিনে আনি। গ্রামের সকল লোকের মুখেও শুনলুম সাধুটি বড় একজন তান্ত্রিক। অনেক অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ তাঁর আছে। তবে পাগলীর কাছে যেতে লোকে যেমন আমায় ভয় দেখিয়েছিল—এখানেও তেমনি ভয় দেখালে। বললে—তান্ত্রিক সাধু-সন্নিসিদের বিশ্বাস ক'রো না বেশী। ওরা সব পারে, একটু সাবধান হয়ে চ'লো। বিপদে পড়ে যাবে।

শীঘ্রই ওদের কথার সত্যতা এক দিন বুঝলাম।

গভীর রাত্রিতে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছে সেদিন, শুক্লপক্ষের রাত্রি, বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্না। মন্দির থেকে ছাতিম গাছের দিকে চেয়ে দেখি সাধু বাবাজী কার সঙ্গে পঞ্চমুণ্ডির আসনে ব'সে কথা বলছেন। কৌতূহল হ'ল—এত রাত্রে কে এল এই নির্জ্জন নদীতীরের জঙ্গলের মধ্যে?

কৌতূহল সামলাতে না পেরে এগিয়ে গেলুম। অল্প দূর গিয়েই যা দেখলুম তাতে আর এগিয়ে যেতে সঙ্কোচ বোধ হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত আশ্চর্য্যও হয়ে গেলুম।

সাধু বাবাজী এত রাত্রে এক জন মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা বলছেন—গাছের আড়াল থেকে মেয়েমানুষটিকে আমি খানিকটা স্পষ্ট খানিকটা অস্পষ্ট ভাবে দেখে আমার মনে হ'ল মেয়েটি যুবতী এবং পরমা সুন্দরী।

এত রাত্রে গুরুদেব কোন্ মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন, সে মেয়েটি এলই বা কেমন ক'রে একা এই নির্জ্জন জায়গায়?

যাই হোক, আর বেশী দূর অগ্রসর হ'লেই ওরা আমায় টের পাবে। মনে কেমন ভয়ও হ'ল, সেদিন চলে এলুম। তার পর দিন রাত্রে আমি ঘুমুলাম না। গভীর রাত্রে উঠে পা টিপে টিপে বাইরে গিয়ে গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখি কাল রাতের সে-মেয়েমানুষটি আজও এসেছে। ভোর হবার কিছু আগে পর্য্যন্ত আমি সেদিন গাছের আড়ালে রইলাম দাঁড়িয়ে। ফরসা হবার লক্ষণ হচ্ছে দেখে আর থাকতে সাহস হ'ল না—মন্দিরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন রাত্রেও আবার অবিকল তাই।

এদিন আর একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম। যে-মেয়েমানুষটির সঙ্গে কথা হচ্ছে তার পরনের বস্ত্রাদি বড় অদ্ভুত ধরণের। সে যে কোন্ দেশের বস্ত্র পরেছে, সেটা না শাড়ী, না ঘাঘরা, না জাপানী কিমোনো, না মেমেদের গাউন!—অজানা যদিও, ভারী চমৎকার মানিয়েছেও বটে।

সেদিন আরও একটা কথা আমার মনে হ'ল।

মেয়েমানুষটি যেই হোক, সে জানে আমি রোজ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকি। কি ক'রে আমার একথা মনে হ'ল তা আমি বলতে পারব না, কিন্তু এই কথা আবছা ভাবে আমার মনের মধ্যে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে কেমন একটু ভয়ও হ'ল।

সরে পড়ি বাবা, দরকার কি আমার এ-সবের মধ্যে থেকে?

কিন্তু পরদিন রাত্রে ঠিক সময়ে আর শুয়ে থাকতে পারলাম না নিশ্চিন্ত মনে—উঠে যেতেই হ'ল। সেদিন আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করলাম—মেয়েমানুষটি যখন থাকে, তখন এক ধরণের খুব মৃদু সুগন্ধ যেন বাতাসে পাওয়া যায়—এ ক'দিনও এই গন্ধটা পেয়েছি, কিন্তু ভেবেছিলুম কোনও বন্য ফুলের গন্ধ হয়তো। আজ বেশ মনে হ'ল এ গন্ধের সঙ্গে ওই মেয়েটির উপস্থিতির একটা সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

এই রকম চলল আরও দিন দশ-বারো। তার পরে সাধুর ডাক এল বরাকর না কোডর্মার এক গাড়োয়ালী জমিদার বাড়ীতে কি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করার জন্যে। সাধুজী প্রথমে যেতে রাজি হন নি, দু-দিন তাদের লোক ফিরে গিয়েছিল কিন্তু তৃতীয় বারে জমিদারের ছোট ভাই নিজে পাল্কী নিয়ে এসে সাধুকে অনেক খোসামোদ করে নিয়ে গেলেন।

মনে ভাবলাম, এ আর কিছু নয় সাধুজী সেই মেয়েটিকে ছেড়ে একটি রাত্রিও বাইরে কাটাতে রাজি নন।

কিন্তু নিকটে কোথাও বস্তি নেই, মেয়েটি আসেই বা কোথা থেকে? আর সে তো সাধারণ সাঁওতাল বা বিহারী মেয়ে নয়—আমি অনেক বার দেখেছি সেটিকে এবং প্রত্যেক বারই আমার দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে এ কোন বড়ঘরের মেয়ে, যেমনি রূপসী, তেমনি তার অদ্ভুত ধরণের অতি চমৎকার এবং দামী পরন-পরিচ্ছদ।

হঠাৎ আমার মনে একটা দুষ্টবুদ্ধি জাগল। আমার মনে হয়েছিল মেয়েটিকে সাধুজীর হয়তো খবর দেওয়ার সুযোগ হয় নি—দেখাই যাক না আজ রাত্রে সে আসে কি না? তখন ছিল অল্প বয়েস, তোমরা যাকে বল রোমান্স, তার ঝোঁক তখন যে আমার যথেষ্টই ছিল, এতে তুমি আমাকে দোষ দিতে পার না।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে রাত্রে সেদিন আমি নিজেই গিয়ে পঞ্চমুণ্ডির আসনে ব'সে রইলাম। মনে ভয়ানক কৌতূহল, দেখি আজ মেয়েটি আসে কি না। কেউ কোন দিকে নেই, নির্জ্জন রাত্রি, মনে একটু ভয়ও হ'ল—এ ধরণের কাজ কখনও করি নি, কোন হাঙ্গামায় আবার না পড়ে যাই!

তখন আমি অপরিণতবুদ্ধি নির্ব্বোধ যুবক মাত্র, তখন ঘুণাক্ষরেও যদি জানতাম অজ্ঞাতসারে কি ব্যাপারের সম্মুখীন হতে চলেছি, তবে কি আর ছাতিমতলায় একা পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসতে যাই?

তাও নয়, ও আমার অদৃষ্টের লিপি। সে-রাত্রির জের আমার জীবনে আজও মেটে নি। আমার মনের শান্তি চিরদিনের জন্যে হারানোর সূত্রপাতটি ঘটেছিল সেই কালরাত্রে—তা কি আর তখন বুঝেছিলাম!

যাক ও-কথা।

রাত ক্রমে গভীর হ'ল। পূব দিকের গাছপালার আড়াল থেকে চাঁদ উঠতে লাগল একটু একটু ক'রে। আমার ডাইনেই বরাকর নদী, দুই পাড়েই শিলাখণ্ড ছড়ানো, তার ওপর জ্যোৎস্না এসে পড়ল। সেই নদীর পাড়েই ছাতিমতলা ও পঞ্চমুণ্ডির আসন—আমি যেখানে ব'সে আছি। আমার বাঁ দিকে খানিকটা ফাঁকা ঘাসের মাঠ—তার পর শালবন সুরু হয়েছে।

হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠলুম। আমার সামনে সেই মেয়েটি কখন এসে দাঁড়িয়েছে এমন নিঃশব্দে, এমন অতর্কিত ভাবে যে আমি একেবারেই কিছু টের পাই নি! অথচ আগেই বলেছি আমার এক দিকে বরাকর নদীর জ্যোৎস্না-ওঠা শিলাস্তৃত পাড় আর এক দিকে ফাঁকা মাঠ। আসনে ব'সে পর্য্যন্ত আমি সতর্ক দৃষ্টিও রেখেছি—মাঠের দিকে। নদীর দিক থেকে আমার কাছে কারো আসা সম্ভব নয়—মাঠের দিক থেকে কেউ এলে আমার দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়। মেয়েটি যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে আধ সেকেণ্ড আগেও কেউ ছিল না আমি জানি, আধ সেকেণ্ড পরেই সেখানে জলজ্যান্ত একটি রূপসী মেয়ের আবির্ভাব আমার কাছে সম্পূর্ণ ইন্দ্রজালের মত ঠেকল ব'লেই আমি চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই মৃদু, মধুর সুগন্ধ! আমার সারা দেহমন অবশ আচ্ছন্ন হয়ে উঠল!...আমার জ্ঞানও বোধ হয় ছিল তার পর আর এক সেকেণ্ড। তার পরে কি ঘটল আমি আর কিছুই জানি না।

যখন আমার আবার জ্ঞান ফিরে এল তখন ভোর হয়েছে। উঠে দেখি সারা রাত সেই পঞ্চমুণ্ডির আসনেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম! নৈশ শীতল বায়ুতে বাইরে সারা রাত পড়ে থাকার দরুন গায়ে ব্যথা হয়েছে, গলা ভার হয়েছে। উঠে ধীরে ধীরে মন্দিরে চলে এলাম। এসে আবার শুয়ে পড়লাম। আমার মনে হ'ল আমার জ্বর হবে, শরীর এত খারাপ।

পরদিন সারাদিন কিছু না খেয়ে শুয়েই রইলাম আর কেবলই কাল রাত্রের কথাটা ভাবি।

মেয়েটি কে? কি ক'রে অমন নিঃশব্দে অতর্কিতে ওখানে এল? এ তো একেবারেই অসম্ভব। অসামান্যা রূপসী যে মেয়েটি, অজ্ঞান হয়ে পড়বার পূর্ব্বে ওই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তা আমি দেখে নিয়েছিলুম। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লামই বা কেন, এরও তো কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেলাম না! অথচ সেই কথা নিয়ে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করাও সারাদিন আমার ঘুচল না। বিকেলের দিকে সাধুবাবাজী গাড়োয়ালী জমিদার বাড়ী থেকে ফিরলেন। আমার জন্যে লাড্ডু কচৌড়ি এবং একটা মোটা সুতি চাদর এনেছেন—তাঁর নিজের জন্যে জমিদার-বাড়ী থেকে ভাল একখানা পশমী আলোয়ান দিয়েছে।

আমায় বললেন—শুয়ে কেন? ওঠ—জিনিষগুলো রেখে দাও—

অতিকষ্টে উঠে সাধুর হাত থেকে পুঁটুলিটা নিলাম। তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন—কি হয়েছে?··· অসুখবিসুখ নাকি?···

কিছু জবাব দিলাম না।

সাধু স্নান করতে গেলেন এবং এসে জমিদার-বাড়ীর কাণ্ড কি রকম তারই সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগলেন। আমায় বললেন—তোমার কি হয়েছে বল তো? অমন মন-মরা ভাব কেন? বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে বুঝি? বলেছি তো বাবা, তোমরা ছেলেছোকরা, এ-পথে কি নামলেই নামা যায় রে বাপু! বড় কঠিন পথ।

সেই রাত্রে আমার খুব জ্বর এল। কত দিন ঠিক জানি না—অজ্ঞান অচৈতন্য রইলাম। জ্ঞান হ'লেই দেখতাম সাধু শিয়রে বসে আছেন। বোধ হয় তাঁরই সেবাযত্নে এবং দয়ায় সেবার ক্রমে সেরে উঠলাম।

সেরে উঠে একদিন গাছতলায় বসেছি দুপুরের পরে, সাধু বললেন—ছেলেছোকরা কি না, কি কাণ্ডটা বাধিয়ে বসেছিলে বাপু? এবার তো বাঁচতে না—অতিকষ্টে বাঁচাতে হয়েছে। আচ্ছা বাপু, পঞ্চমুণ্ডির আসনে কি জন্যে গিয়েছিলে সেদিন রাত্রে?

আমি তো অবাক। কি ক'রে জানলেন ইনি? আমি তো কোন কথাই বলি নি। হঠাৎ আমার সন্দেহ হ'ল, সেই অদ্ভুত মেয়েটির সঙ্গে নিশ্চয়ই সাধুর ফিরে এসে দেখা হয়েছে, সে-ই বলেছে।

আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে বললেন—ভাবছ আমি কি ক'রে জানলাম, না?···আরে বাপু, কতটুকুই বা তোমরা বোঝ, আর কতটুকুই বা তোমরা জান। তোমাদের দেখে দয়া হয়।

ভয়ে ভয়ে বললাম—আপনি জানলেন কি ক'রে?

সাধু হেসে বললেন—আরে পাগল, তুমিই তো জ্বরের ঘোরে বলছিলে ঐ সব কথা—নইলে জানব কি ক'রে? যাক, প্রাণে বেঁচে গিয়েছ এই ঢের। আর কখনও অমন পাগলামি করতে যেও না।

আমি চুপ ক'রে রইলাম। তা হ'লে আমিই বিকারের ঘোরে সব ফাঁস ক'রে দিয়েছি!...সেইদিন মনে মনে সংকল্প করলাম দু-এক দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাব—শরীরটা একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই।

কিন্তু আমার ভাগ্যলিপি অন্য রকম। সাধুবাবাজীকে তার পর দিন পাহাড়ী বিছুতে কামড়াল—তিনি তো যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আমি পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী মিহিজাম থেকে ডাক্তার ডেকে আনি, তাঁর সেবা করি, দিনরাত জেগে তিন দিন পরে তাঁকে সারিয়ে তুলি।

দিন-দশেক পরে আমি এক দিন বললুম—সাধুজী, আমি আজ চলে যেতে চাই।

সাধু বিস্মিত হয়ে বললেন—চলে যাবে? কোথায়?

—এখানে থেকেই বা কি হবে? আমার তো কিছু হচ্ছে না—মিছে ব'সে থাকা আর মন্দিরের প্রসাদে ভাগ

বসানো। দুটি পেটের ভাতের লোভে আমি তো এখানে ব'সে নেই?

সাধুজী চুপ ক'রে গেলেন, তখন কোন কথা বললেন না।

সন্ধ্যার কিছু আগে আমায় ডেকে তিনি কাছে বসালেন। বললেন—ভেবেছিলাম এ-পথে নামাব না তোমায়। কিন্তু তুমি দুঃখিত হয়ে চলে যাচ্ছ, সেটা বড় কষ্টের বিষয় হবে আমার পক্ষে। তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করেছ, নিজের ছেলের মত সেবা করেছ। তোমাকে কিছু দিতে চাই। একটা কথা তার আগে বলি, তোমার সাহস বেশ আছে তো?

বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ। এর আগেও আমি বীরভূমের এক শ্মশানে তন্ত্র-সাধনা করেছি।

তার পর আমি সেই শ্মশানের পাগলী ও তার অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের কথা বললাম—এত দিন পরে আজ প্রথম সাধুকে পাগলীর কথা বললাম।

সাধু অবাক হয়ে বললেন—সে পাগলীকে তুমি চেন? আর সে যে অতি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ! তুমি তার হাত থেকে যে অত সহজে উদ্ধার পেয়ে এসেছ, সে কেবল তোমার পূর্ব্বজন্মের পুণ্য। ওর নাম মাতু পাগলী, মাতঙ্গিনী। ও নিম্নশ্রেণীর তন্ত্রে ভয়ানক ভাবে সিদ্ধ। ওর সংস্পর্শে গিয়ে পড়েছিলে, কি সর্ব্বনাশ! ওকে আমরা পর্য্যন্ত ভয় করে চলি—কি রকম জান? যেমন লোকে ক্ষ্যাপা শেয়াল-কুকুর কি গোখুরা সাপকে ভয় করে তেমনি। ও সেই জাতীয়। অসাধারণ ক্ষমতা ওর নিম্নতন্ত্রের। ওর ইতিহাস বড় অদ্ভুত, সে এক দিন বলব। কত দিন ওর সঙ্গে ছিলে?

—প্রায় দু-মাস।

সাধুজী ভেবে বললেন—যখন ওর সঙ্গে ছিলে, তখন কিছু কিছু অধিকার হয়েছে তোমার। তোমাকে আমি মন্ত্র দেব। কিন্তু তুমি যুবক, তোমার মনের ভাব আমি জানি। তুমি কি জন্যে রাত্রে পঞ্চমুণ্ডির আসনে গিয়েছিলে বল তো?

আমি লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলাম। মনের গোপন পাপ নেই, যদি পঞ্চমুণ্ডির আসনে ব'সে থাকি—তবে সেই অপরিচিতা নিশাবিহারিণী রূপসীর টানে যে, এ-কথা গুরুস্থানীয় ব্যক্তির কাছে স্বীকার করব কেমন করে?

সেই দিন সাধু অতি অদ্ভুত ও গোপনীয় কথা আমায় বললেন।

বললেন—কিন্তু একটা কথা তুমি জান না, সেটা আগে বলি। তুমি সেদিন যাঁকে রাত্রে ছাতিমতলায় ব'সে দেখেছিলে, তিনি তোমার-আমার মত দেহধারী মানুষ নন।

শুনে ত মশাই আমার গা শিউরে উঠল—দেহধারী জীব নয়, বলে কি রে বাবা! তবে কি ভূত-পেত্নী না কি?

সাধুজী বললেন—তোমায় এ-কথা বলতাম না, যদি না শুনতাম যে তুমি মাতু পাগলীর সঙ্গে ছিলে। আচ্ছা শুনে যাও। আমার গুরুদেব ছিলেন ৺কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী, হুগলী জেলায় জেজুড় গ্রামে তাঁর মঠ ছিল। মস্ত বড় সাধক ছিলেন, কুলার্ণব আর মহাডামর এই দুই শ্রেষ্ঠ তন্ত্রে তাঁর সমান অধিকার ছিল। মহাডামর তন্ত্রের একটি নিম্ন শাখার নাম ভূতডামর। আমি তখন যুবক, তোমারই মত বয়েস, স্বভাবতই আমার ঝোঁক গিয়ে পড়ল ভূতডামরের উপর। গুরুদেব আমার মনের গতি বুঝতে পেরে ও-পথ থেকে ফেরাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু তাই কি হয়? অদৃষ্টলিপি তবে আর বলেছে কাকে? এই তোমার যেমন—।

আমি বললাম—ও-পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করেছিলেন কেন?

—ও-পথ প্রলোভনের পথ, বিপদের পথ। ভূতডামর তন্ত্র নানা প্রকার অশরীরী উপদেবীদের নিয়ে কারবার করে—তন্ত্রের ভাষায় এদের সাধারণ নাম যোগিনী। জপে ও সাধনায় বশীভূত হয়ে এদের মধ্যে যে-কেউ—যার সাধনা তুমি করবে—সে তোমার আপন হয়ে থাকতে পারে। নানা ভাবে এদের সাধনা করা যায়, কিঙ্কিণী দেবীকে মাতৃভাবে পেতে হয়, কনকবতী দেবীকে পাওয়া যায় কন্যাভাবে—কিন্তু বাকী সব যোগিনীদের যে-কোন ভাবে সাধনা করা যায় এবং যে-কোন ভাবে

পেতে পারা যায়। এই সব যোগিনীদের কেউ ভাল, কেউ মন্দ। এঁদের জাতি নেই; বিচার নেই, ধর্ম্ম নেই, অধর্ম্ম নেই, কোন গণ্ডি বা বাধ্যবাধকতার মধ্যে এঁরা আবদ্ধ নন। ভূতডামরে এই সাধনার ব্যাপার ব'লে দেওয়া আছে। ভূতডামরের প্রথম শ্লোকই হ'ল—

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যোগিনী সাধনোত্তমম্
সর্ব্বার্থসাধনং নাম দেহিনাং সর্ব্বসিদ্ধিদম্।
অতিগুহ্যা মহাবিদ্যা দেবানামপি দুর্ল্লভা।

তুমি সেদিন যাকে দেখেছিলে, তিনি এই রকম এক জন জীব। তোমার সাহস থাকে সে-মন্ত্র আমি তোমায় দেব। কিন্তু আমার যদি নিষেধ শোন, তবে এ-পথে নেমো না।

এতটা ব'লে সাধুজী ভাল করেন নি, আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়ে তিনি আমায় আর কি সামলে রাখতে পারেন? আমি নাছোড়বান্দা হয়ে পড়লাম, মন্ত্র নেবই।

সাধুজী বললেন—তবে কনকবতী দেবী সাধনার মন্ত্র নাও—কন্যাভাবে পাবে দেবীকে—

আমি চুপ করে রইলুম।

তিনি আবার বললেন—তবে কিঙ্কিণী-সাধনার মন্ত্র?

আঃ কি বিপদেই পড়েছি বুড়ো সাধুটাকে নিয়ে। অন্য যোগিনীদের দেখতে দোষ কি?

সাধু আমায় চুপ করে থাকতে দেখে বললেন—বেশ। আমি তোমাকে মধুসুন্দরী দেবী সাধনার মন্ত্র দিচ্ছি। এঁকে, কন্যা ভাবে, ভগ্নী ভাবে বা ভার্য্যা ভাবে পেতে পার। তবে আমার যদি কথা শোন, কখনও ভার্য্যা ভাবে পেতে যেও না। এর বিপদের দিক বলি। ভার্য্যা ভাবে সাধন করলে তিনি তোমাকে প্রণয়ীর মত দেখবেন—কিন্তু এরা মহাশক্তিশালিনী যোগিনী, সাধারণ মানবী নয়, এদের আয়ত্তের মধ্যে রাখা বড় শক্ত। হয় তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী মানুষ করে রাখবে নয় তো একেবারে উন্মাদ করে ছেড়ে দেবে। সামলাতে পারা বড় কঠিন।

সাধুজী আমায় মন্ত্র দিলেন এবং বললেন—বাবা, এ জায়গা থেকে তোমায় চলে যেতে হবে। তোমায় এখানে আমি আর রাখতে পারি নে। এক জায়গায় দু-জন সাধকের সাধনা হয় না।

বেশ ভাল। আমিও তা চাই না। আমার ভয় ছিল হয়তো সাধুজীও মাতু পাগলীর মত হিপ্‌নটিজম্ জানে, এবং খানিকটা অভিভূত ক'রে যা-তা দেখাবে আমায়। তার পর—

আমি তারানাথের কথায় বাধা দিয়া বলিলাম—কে আপনি যে স্বচক্ষে পঞ্চমুণ্ডির আসনে কি মূর্ত্তি দেখেছিলেন তখন তো সাধু সেখানে ছিল না?

—তার পর আমার টাইফয়েড্ জর হয় বলি নি? হয়তো পঞ্চমুণ্ডির আসনে যখন বসে, তখনই জর আসছে, সে-সময় জরের পূর্ব্বাবস্থায় অসুস্থ মস্তিষ্কে কি বিকার দেখে থাকব—হয়তো চোখের ধাঁধা। জর ছেড়ে সেরে উঠে এ সন্দেহ আমার হয়েছিল, সত্যি বলছি।

যাক্ সে কথা। তার পরে ওখান থেকে চলে গেলাম বরাকর নদীরই ধারে আর একটা নির্জ্জন জায়গায়। ওখান থেকে পাঁচ-ছ' মাইল দূরে। একটা গ্রাম ছিল কিছু দূরে, থাকতাম গ্রামের বারোয়ারী-ঘরে। গ্রামের লোকে যে যা দিত তাই খেতাম আর সন্ধ্যার পরে নদীর ধারে নির্জ্জন স্থানে ব'সে মন্ত্রজপ করতাম।

এই রকমে এক মাস গেল, দু-মাস গেল, তিন মাস গেল। কিছুই দেখি নে। মন্ত্রের উপর বিশ্বাস ক্রমেই যেন কমে যাচ্ছে। তবুও মনকে বোঝালুম ছ-মাস পরে পূর্ণাহুতি ও হোম করার নিয়ম ব'লে দিয়েছিল সাধুজী। তার আগে কিছু হবে না। ছ-মাসও পূর্ণ হ'ল। সাধুজী যেমন ব'লে দিয়েছিল, ঠিক সেই সব নিয়ম পালন করলাম।

পদ্মাসনং সমাস্থায় মৎস্যেন্দ্রনাথ সম্মতম্
আমিষাদ্যৈঃ পুষ্পধূপৈঃ সংপূজ্য মধুসুন্দরীম্

বরাকর নদীর তীরে বসে ভাত রাঁধলুম, কই মাছ পোড়ালুম, আওটু কলার পাতায় ভাত ও পোড়ামাছের নৈবিদ্যি দিলাম। ডুমুরের সমিধ্ দিয়ে বালির উপর হোম করে ওঁ ঠং ঠং ঋং ঈং ক্রং মধুসুন্দর্য্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে আহুতি দিলাম। জাতিফুলের মালা নিতান্ত দরকার, কত দূর থেকে খুঁজে জাতিফুল এনেছিলাম—তার মালা

ও চন্দন আলাদা কলার পাতায় রেখে দেবীর উদ্দেশে নিবেদন করে ধ্যানে বসলুম—সারা রাত কেটে গেল।

বলিলাম—কিছু দেখলেন ?

—কা কস্য পরিবেদনা। ঘি চন্দন মিষ্টি কিনতে কেবল কতকগুলো পয়সার শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। ধ্যান জপ হোমে কিছুই ফল ফলল না। রাগ করে টান মেরে সব নৈবিদ্যি ফেলে দিলাম নদীর জলে। বেটা সাধু বিষম ঠকিয়েছে। কোন ব্যাটার কোন ক্ষমতা নেই—যেমন মাতু পাগলী, তেমনি এ সাধু। তন্ত্রটন্ত্র সব বাজে, খানিকটা হিপনটিজম্ জানে—তার বলে মূর্খ গ্রাম্য লোক ঠকিয়ে খায়।

এ-সব ভাবি বটে, জপটা কিন্তু ছাড়তে পারি নে, অভ্যেস মত ক'রেই যাই, ওটা একটা যেন বদ অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

এ-ভাবে আরও মাস চার-পাঁচ কেটে গেল।

এক দিন সন্ধ্যার পরেই। রাত তখন হয়েছে সবে, আধ ঘণ্টাও হয় নি। আমি একটা গাছের তলায় বসে জপ করছি, অন্ধকার হ'লেও খুব ঘন হয় নি তখনও—হঠাৎ তীব্র কস্তুরীর গন্ধ অনুভব করলাম বাতাসে। বেশ মন দিয়ে শুনে যাও। এক বর্ণও মিথ্যে বলি নি। যা যা হ'ল একটার পর আর একটা বলছি, মন দিয়ে শোন। কস্তুরীর গন্ধটা যখন সেকেণ্ড চার-পাঁচ পেয়েছি, তখন আমার সেদিকে মন গেল। ভাবলুম এ দেখছি অবিকল কস্তুরীর গন্ধ! বাঃ, পাহাড়ে জঙ্গলে কত সুন্দর অজানা বনফুলই আছে!

তার পরেই আমার মনে হ'ল আমার পেছনে অর্থাৎ যে-গাছটার তলায় ব'সে ছিলাম, তার গুঁড়ির আড়ালে কে একজন এসে দাঁড়িয়েছে। আমি পেছন দিকে দেখতে পাচ্ছি নে বটে, কিন্তু অনেক সময় লোকের উপস্থিতি চোখে না-দেখেও এভাবে ধরা যায়। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন যেন অতিমাত্রায় সজাগ ও সতর্ক হয়ে উঠেছে।

বাতাস যেন বন্ধ হয়ে গেল, সমস্ত শরীর দিয়ে যেন গরম আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে মনে হ'ল। আবার অজ্ঞান হয়ে যাব নাকি? ভয় হ'ল মনে। ঠিক সেই সময় আমার সামনে দেখলাম একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। আধ সেকেণ্ড আগেও তিনি সেখানে ছিলেন না। ঠিক সেই পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসার রাত্রের সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু এবার মনে মনে দৃঢ়সংকল্প করলাম জ্ঞান হারাব না কখনই।

মেয়েটি দেখি ঈষৎ ভ্রূকুটির সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—নিজের চোখে এমনি এক মূর্তি দেখলেন আপনি?

আমার কথার মধ্যে হয়তো একটু অবিশ্বাসের গন্ধ পাইয়া তারানাথ উগ্র প্রতিবাদের সুরে বলিল—নিজের চোখে। সুস্থ শরীরে। বিশ্বাস কর না-কর সে আলাদা কথা—কিন্তু যা দেখেছি, তাকে মিথ্যে বলতে পারব না।

—কি রকম দেখলেন? কেমন চেহারা?

—ভারী রূপসী যদি বলি, কিছুই বলা হোল না। মধুসুন্দরী দেবীর ধ্যান আছে:

> উদ্যদ্ ভানু প্রতীকাশা বিদ্যুৎপুঞ্জনিভা সতী
> নীলাম্বর পরিধানা মদবিহ্বললোচনা
> নানালঙ্কার শোভাঢ্যা কস্তুরীগন্ধমোদিতা
> কোমলাঙ্গীং স্মেরমুখীং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্

অবিকল সেই মূর্তি। তখন বুঝলাম দেবদেবীর ধ্যান মনগড়া কথা নয়, সাধকে প্রত্যক্ষ না করলে এমন বর্ণনা দেওয়া যায় না।

—আপনি কোন কথা বললেন?

—কথা! আমার চেতনা তখন লোপ পাবার মত হয়েছে—তো কথা বলছি! পাগল তুমি? সে-তেজ সহ্য করা আমার কর্ম? সাধারণ মানবীর মত তার কোন জায়গাই নয়। ঐ যে বলেচে মদবিহ্বললোচনা—ওরে বাবা সে-চোখের কি ভাব! ত্রিভুবন জয় হয় সে-চোখের চাউনিতে।...

আমি অধীর হইয়া বলিলাম—বর্ণনা রাখুন। কি কথা হ'ল বলুন।

—কথাবার্তা যা হয়েছিল, সব বলার দরকার নেই। মোটের উপর সেই থেকে মধুসুন্দরী দেবী প্রতি রাত্রে

আমায় দেখা দিতেন নদীতীরের সেই নির্জ্জন জায়গায়। তাঁকে চেয়েছিলাম প্রিয়ারূপে—বলাই বাহুল্য, সাধুর কথা কে শোনে? তখন শীতকাল, বরাকর নদীর জল কম হয়েছে অনেক, জলের ধারে জলজ লিলিগাছ শুকিয়ে হলদে হয়ে এসেছে, আগে যেখানে জল ছিল, এখন সেখানে বালির উপর অভ্রকণা জ্যোৎস্নারাত্রে চকচক্ করে, বরাকর নদীর দুপারের শালবন পাতা ঝরিয়ে দিচ্ছে। আকাশ রোজ নীল, রাত্রে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নার বড় মনোরম শোভা—সেই সময় থেকে তিনটি মাস দেবী প্রতিরাত্রে দেখা দিতেন—সত্যিকার বাঁচা বেঁচেছিলাম ঐ তিন মাস। এ-সব কথাও বলা এখন আমার পক্ষে বেদনাদায়ক। কত বেদনাদায়ক তুমি জান না, আমার জীবনের যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ তা পেয়েছিলুম ঐ তিন মাসে। দেবীই বটে, মানুষের সাধ্য নেই অমন ভালবাসা, অমন নিবিড় বন্ধুত্ব দান করা—সে এক স্বর্গীয় দান ··সে তুমি বুঝবে না তোমায় কি বোঝাব, তুমি আমায় অবিশ্বাস করবে, মিথ্যেবাদী না হয় পাগল ভাববে। হয়ত ভাবছ এত ক্ষণ। তুমি কেন, আমার স্ত্রীই আমার কথা বিশ্বাস করে না, বলে, আমায় তান্ত্রিক সাধু পাগল করে দিয়েছিল গুণজ্ঞান করে।

তিন মাস পরে আমার বাড়ী থেকে লোকজন সন্ধানে সন্ধানে সেখানে গিয়ে হাজির। গ্রামের লোক তাদের বলেছে কে একজন পাগল, বোধ হয় বাঙালীই হবে, অল্প বয়েস, বরাকর নদীর ধারে শালবনে একা সন্ধ্যাবেলা ব'সে থাকে—আর আপন মনে বিড় বিড় ক'রে বকে। আমায় এ অবস্থায় গাঁয়ের অনেকেই নাকি দেখেছে।

তাই শুনে বাড়ীর লোক আমায় গিয়ে খুঁজে বার করলে। ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরনে, মাথায় জট, গায়ে খড়ি উড়ছে—এই অবস্থায় নাকি আমায় ধরে। বাড়ী ধরে আনবার জন্যে টানাটানি. আমি কিছুতেই আসব না, ওরাও ছাড়বে না। আমার তখন সত্যিই জ্ঞান নেই, সত্যিই আমি ক্ষিপ্ত, উন্মাদ, ওরা হয়ত আমায় আনতে পারত না—কিন্তু যে-দেবীকে পেয়েছিলাম প্রণয়িনী রূপে, তিনি নিরুৎসাহ করলেন।

—কি রকম?

—ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে নিকটবর্ত্তী গ্রামের একটি গোয়ালঘরে আমায় বেঁধে রেখেছিল। গভীর রাত্রে বাঁধন ছিঁড়ে ওদের হাত থেকে লুকিয়ে পালিয়ে সেই একটি রাত মধুসুন্দরী দেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। দেবীকে বললাম—আমি এই নদীতীরের তীর্থস্থান ছেড়ে কোথাও যাব না। তিনি নিষ্ঠুর হাসি হেসে বললেন—যেতে হবেই এই আমার অদৃষ্টলিপি। অদৃষ্টের বিরুদ্ধে তিনি অত বড় শক্তিশালিনী যোগিনী হয়েও যেতে পারেন ন তিনি জানেন, এই রাতের পরে জীবনে তাঁর সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না।

দেবী ত্রিকালজ্ঞা, তাঁকে জিগ্যেস করিনি কি ক'রে তিনি একথা জানলেন। হ'লও তাই, বাড়ী আসার পরে সবাই বললে কে কি খাইয়ে পাগল করে দিয়েছে। দিনকতক উন্মাদের চিকিৎসা চলল—বছর খানেক পরে আমার বিয়ে দেওয়া হ'ল। সেই থেকেই আমি সংসারী।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আর কখনো মন্ত্রজপ করে তাঁকে আহ্বান করেন নি কেন?

—না। দেবীর নিষেধ ছিল। অন্য নারী জীবনে এলে তিনি আর কখনও দেখা দেবেন না। সে-চেষ্টাও কখনো করি নি। সে কত কাল হ'য়ে গেল, সে কি আজকার কথা?

—আচ্ছা, এখন আর তাঁকে দেখতে ইচ্ছে হয় না?

বৃদ্ধ তারানাথ উৎসাহে, উত্তেজনায় বালিশ বুকে দিয়া খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিল।

—ইচ্ছে হয় না কে বলেছে? বললুম তো ঐ তিন মাসই বেঁচে ছিলাম। দেবী এসেছিলেন মানুষী হয়ে। এদিকে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী শক্তিরূপিণী যোগিনী, তেজে কাছে ঘেঁসা যায় না—অথচ কি মানবীই হয়ে যেতেন, যখন ধরা দিতেন আমায়! প্রিয়ার মত আসতেন কাছে, অমনিই মিষ্টি অমনিই ঠোঁট ফুলিয়ে মাঝে মাঝে অভিমান, বরাকর নদীর ধারের শালবন রাত্রির পর রাত্রি তাঁর মধুর হাসিতে জ্যোৎস্নার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠত—এমনি কত রাত ধরে। এক-এক সময় ভ্রম হ'ত তিনি সত্যিই মানুষীই হবেন।

বিদায় নিয়ে যাবার সেই রাত্তিতে বললেন—নদী-

তীরের এই তিন মাসের জীবন আমিও কি ভুলব ভেবেছ? আমাদের পক্ষেও এ সুলভ নয়, ভেব না আমরা খুব সুখী। আমাদের মত সঙ্গীহারা বন্ধুহারা জীব কোথায় আছে? প্রেমের কাঙাল আমরাও। কত দিন পরে এক জন মানুষে আমাদের সত্যিকার চাওয়া চায়, তার জন্তে আমাদের মন সর্ব্বদা তৃষিত হয়ে থাকে। কিন্তু তাই ব'লে নিজেকে সহজলভ্য করতে পারি নে, আগ্রহ ক'রে যে না চায় তার কাছে যাই নে, সে আমার প্রেমের মূল্য দেবে না, নিজেও আনন্দ পাবে না যা কিনা পাওয়া যায় বহু চেয়ে পাওয়ার পরে। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টলিপি, কোথাও চিরদিন থাকতে পারি নে—কি-না-কি ঘটে যায়, ছেড়ে চলে যেতে হয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও। ক'জন আমাদের ডাকে? ক'জন বিশ্বাস করে? সুখী ভেব না আমাকে।

বলিলাম—এত যদি সুখের ব্যাপার তবে আপনি ভয়ঙ্কর বলছিলেন কেন একে আগে?

—ব্যাপার ভয়ঙ্কর এই জন্তে যে আমার সারা জীবনটা মাটি হয়ে গেল ঐ তিন মাসের সুখভোগে। কোন দিকে মনই দিতে পারি নে—মধ্যে তো দিন-কতক উন্মাদ হয়েই গিয়েছিলাম বিয়ের পরেও। তার পর সেরে সামলে উঠে এই জ্যোতিষের ব্যবসা আরম্ভ ক'রে যা হয় এক রকম—সেও দেবীরই দয়া। তিনি বলেছিলেন, জীবনে কখনও অন্নকষ্টে আমায় পড়তে হবে না। পড়তে কখনও হয় নি—কিন্তু ওতেই কি আর আনন্দ দেয় জীবনে?

তারানাথ গল্প শেষ করিয়া বাড়ীর ভিতরে যাইবার জন্ত উঠিল। আমিও বাহির হইয়া ধর্ম্মতলার মোড়ে আসিলাম। এক অদ্ভুত, অবাস্তব জগৎ হইতে বিংশ শতাব্দীর বাস্তব সভ্যতার জগতে আসিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। যতক্ষণ তারানাথ গল্প বলিয়াছিল ততক্ষণ ওর চোখমুখের ভাবে ও গলার স্বরে গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস জাগে নাই—কিন্তু ট্রামে উঠিয়াই মনে হইল—

কি মনে হইল তাহা আর না-ই বা বলিলাম?

শবরী

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

দিন যায়,
শবরী রয়েছে প্রতীক্ষায়
শূন্য তপোবনে।
ক্ষণে ক্ষণে
বনান্তের পল্লবমর্ম্মরে
পুলকে শিহরি উঠি কৌতূহলভরে
বাহিরেতে ছুটে যায়; দিগন্তের পানে তুলি আঁখি
চেয়ে থাকে,—যেথা দূর ঋষ্যমূক গিরিসানু ঢাকি
ঘননীল অরণ্যানীপম্পাজলে ফেলিয়াছে ছায়া।
অপলক দৃষ্টি তার খোঁজে দুটি সুকুমার কায়া
দিব্য রাজতপস্বীর তনু
সে গহন বনতলে; পৃষ্ঠে তূণ, করে শরধনু।
ব্যর্থ আঁখি ফিরে আসে। সর্পিল বঙ্কিম গিরিপথ
চলে গেছে কত দূর! তার পরে অজ্ঞাত জগৎ,
দৃষ্টি সেথা নাহি চলে, চিন্তা সেথা নাহি পায় দ্বার।
এত বড় এ ধরণী,—পরিচিত কতটুকু তার?
বনাঙ্গনা কী বা জানে? বনের বাহিরে যে-জগৎ
স্বপ্নেরো সে অগোচর; চেয়ে চেয়ে চিত্রার্পিতবৎ
তবু স্বপ্ন দেখে নারী। পশ্চিমের দিগ্বলয় হ'তে
সূর্য্যের আহ্বান আসে; অন্ধকার কাননে পর্ব্বতে
সুপ্তির প্রশান্তি নামে; মাথার উপরে জলে তারা।
তপস্বিনী রহে চাহি-মুখে হাসি, চোখে অশ্রুধারা
স্পন্দহীন বদ্ধদৃষ্টি অতিদূর উত্তরের পানে;
অনিমেষ চেয়ে চেয়ে কি প্রার্থনা জানায় কে জানে?

ক্লান্ত দেহমন তার খোঁজে কোন পরম আশ্বাস
সেথা কার স্নেহচ্ছায়ে ? অবশেষে চাপি দীর্ঘশ্বাস
ধীরে ধীরে
মধ্যরাত্রে ঘরে আসে ফিরে।
অন্ধকারে ব'সে থাকে দ্বারপ্রান্তে নিদ্রাহীন রাতে।
উষায় আবার নিজহাতে
অঙ্গন মার্জ্জনা করি, নিত্য নব রচি আলিম্পন,—
স্নানশেষে সিক্তবাসে ফলপুষ্প করি আহরণ,—
সাজায় মাঙ্গল্য-ডালি তার।
দেবতার
কখন সময় হবে কে বলিতে পারে ?
বারেক ঘটিলে ত্রুটি শবরীর পূজা লইবারে
সে তো আর ফিরে আসিবে না।
ভালবাসিবে না।
তাই নাই ছুটি।
ক্লান্ত দেহ ভেঙে পড়ে, মুদে আসে শ্রান্ত আঁখি দুটি।
কৈশোর যৌবন গেছে, জরা আসে সারা অঙ্গ ছেয়ে;
শ্রান্তিহীনা, সঙ্গীহীনা, জ্ঞানহীনা, দীনহীনা মেয়ে
উত্তরের পথ চেয়ে আছে।
এক দিন ঐ পথে অতিথি আসিবে তার কাছে
আজন্মবাঞ্ছিত। তার পরে
থাক প্রাণ, যাক প্রাণ, শবরী তা গ্রাহ্য নাহি করে।

এক দিন কত বর্ষ আগে
মহর্ষি মতঙ্গ তারে কহিলেন ডাকি পুরোভাগে,
"ফুরায়েছে এ দেহের কাজ।
অনলে ত্যজিয়া তনু দিব্যধামে চলিলাম আজ
মোরা বৎসে। এক কাজ শুধু আছে বাকী;
মোদের সময় নাই, তব 'পরে এ বিশ্বাস রাখি
তুমি তা করিবে সাজ। শুভক্ষণে ধ্যানে জানিলাম,
আসিবেন এ আশ্রমে ভগবান রঘুপতি রাম
সোদর লক্ষ্মণ সাথে; তাঁহাদের আতিথ্যের ভার
রহিল তোমার 'পরে আশীর্ব্বাদ সহ মা আমার!"
সেদিন ভাসিয়া আঁখিনীরে
শবরী কহিয়াছিল, "অল্পবুদ্ধি দীনা অধীনীরে
কেন দিলে গুরুভার গুরুদেব ? যদি ঘটে ত্রুটি,
আমার কি গতি হবে ?" কারুণ্যে ভরিয়া আঁখি দুটি
হাসি কহিলেন ঋষি, "অয়ি মূঢ়ে, নাহি কোনো ভয়।
দেবতা ছাড়িবে স্বর্গ তোরি পুণ্যে, মোর পুণ্যে নয়।
সে বুঝে প্রাণের ভাষা,—শোনে না সে মুখের প্রার্থনা;
বনচারী রাজপুত্রে স্বচ্ছন্দে করিয়ো অভ্যর্থনা
বনজাত ফলফুলে, যেই দিন ক্লান্ত পথশ্রমে
নররূপী নারায়ণ আসিবেন এ তব আশ্রমে ?"

"কে আসিবে, কি কহিলে ?" আর্ত্তকণ্ঠে শুধাল যুবতী।
ঋষি কহিলেন হাসি, "ভয় নাই, ওরে ভাগ্যবতী,
সত্য কহিলাম,
আসিবেন তোর খোঁজে স্বর্গ ত্যজি তোর প্রাণারাম।
জন্ম-জন্মান্তরে যারে মুনিগণ ধ্যানে নাহি পায়
নিজে সে আসিবে যারে, রহ বৎসে তারি প্রতীক্ষায়।
তোর তীব্র তপস্যায় এ আশ্রম পুণ্যতীর্থ হবে।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে তোর কীর্ত্তি রবে।"

বিদায় লইলা ঋষি। সেই দিন তরুণী কিশোরী
তরুণ তপনসম রাজপুত্রে কল্পনায় বরি
কাননে তুলিল ফল, বনফুলে সাজাইল ডালা,
নির্ঝরে ধরিল বারি। কুটীরের প্রান্তে সে নিরালা
বসিল সাজায়ে অর্ঘ্য উৎকণ্ঠিত আকুল অন্তর।
তার পর
দিন গেছে, মাস গেছে, বর্ষ গেছে, যুগ গেছে চলি।
লোলচর্ম্ম বৃদ্ধা নারী ললাটে অঙ্কিত রেখাবলী
সঘন কম্পিত দেহ পথ চাহি আজো আছে বসি।
কত আষাঢ়ের মেঘ, কত শত পূর্ণিমার শশী,—
কত মধ্যাহ্নের সূর্য্য,—তাহারে দেখেছে ফিরে ফিরে
গহন অরণ্যপ্রান্তে জনশূন্য পল্লবকুটীরে,—
রাত্রে, দিনে, সন্ধ্যায়, প্রভাতে,—
পর্ণপুটে বনফল, বরণের অর্ঘ্যপাত্র হাতে,—
শুচিস্মিতা মূর্ত্তি প্রতীক্ষার!
আজো তার
পথ চাওয়া হয় নাই শেষ।
আজো তার কানে বাজে সিদ্ধবাক্ ঋষির আদেশ,
"রাজ্যহীন মহারাজ আসিবেন তোর এ আশ্রমে
ক্ষণিক বিশ্রাম লাগি,—শোকাতুর, ক্লান্ত পথশ্রমে,—
পরম অতিথি তোর; প্রস্তুত রহিবি তার তরে।"
শবরী প্রস্তুত আছে; দণ্ডে দণ্ডে, বৎসরে বৎসরে
ভরি নিজ আতিথ্যের ডালি।
নিমেষে আহ্বান এলে রিক্ত করি সব দিবে ঢালি,—
আজন্মসঞ্চিত অর্ঘ্য অন্তহীন আশা আশঙ্কার,—
মুহূর্ত্তের তৃপ্তি লাগি দেবতার পাদপদ্মে তার।
শবরী প্রস্তুত আছে গ্রীষ্ম বর্ষা শরতে শিশিরে,—
পরম প্রার্থিত তার অনর্চ্চিত পাছে যায় ফিরে,—
উৎকণ্ঠিত উদ্গ্রীব সদাই।
শুধু তার প্রাণারাম রামচন্দ্র আজো আসে নাই।

যুগ-যুগান্তর ধরি কত জন আসে, কত যায়।
শবরী রয়েছে প্রতীক্ষায়।

উপরে : স্লোভাকিয়ার প্রধান নগর, ব্রাটিস্লাভা। মধ্যে : আলোকসজ্জায় ভূষিত চার্লস্ ব্রিজ, প্রাগ

রুথেনিয়ার গ্রামে দেশীয় সজ্জায় বালিকা

মোরাভিয়ার দেশী পোষাকে নরনারী

মোরাভিয়া অঞ্চলের বিবাহ-পরিচ্ছদে ভূষিতা তরুণী

সমর-স্মৃতিস্তম্ভ, প্রাগ

ন্যাশনাল থিয়েটার, প্রাগ

বোহেমিয়ার মোহ

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক

গরম তখনও পড়ে নি, কিন্তু শীত কেটে গেছে। মধ্য-ইউরোপের গ্রামে গ্রামে বসন্তোৎসবের চাঞ্চল্য তখনও শেষ হয়ে যায় নি, কিন্তু রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার আতিশয্যে শহরবাসীরা শঙ্কাকুল।

মে মাসের শেষ; দিন-দশেক আগে জার্মানী ও চেকোস্লোভাকিয়ার সীমান্তে এগার্ শহরে দুই জন জার্মানভাষী চেক্ প্রজার হত্যা উপলক্ষ্যে যে-বিরোধের সূত্রপাত হয়েছে তার সমাধান তখনও হয় নি। ইউরোপে রব উঠেছে জার্মানী চেকোস্লোভাকিয়াকে শাসন করবে, তাই নিয়ে সমস্ত মহাদেশব্যাপী গোপন মন্ত্রণা এবং প্রকাশ্য বাদানুবাদ চলছে। এমনি সময়ে সুযোগ জুটল ইউরোপের নূতন আগ্নেয়গিরি, চেক্-জার্মান সীমান্ত দর্শনের। ন্যুরেমবের্গে গাড়ী বদলে ক'ৱে প্যারিস্ থেকে প্রাগের একস্‌প্রেস্ ধরলাম। ঝড়-বাদলে আকাশ কালো হয়ে এল; অজস্র বৃষ্টিধারার মধ্যে জার্মান-বনস্পতির উন্নত সবুজ তরুণ মূর্ত্তি ঝাপসা হয়ে দেখা দিল।

গাড়ী যখন এগারে (জার্মানরা যে শহরকে Eger বলে, চেক্‌রা তাকে সেব্ (Cheb) ব'লে থাকে) পৌছল, তখন সন্ধ্যা হয়েছে কিন্তু অন্ধকার হয় নি। গোধূলির অস্পষ্ট আলোয় শহরের অনেকটা দেখতে পেলাম; অস্বাভাবিক রকম নিস্তব্ধ মনে হ'ল। দশ দিন আগে যে জায়গাটি একটি দ্বিতীয় সেরাজেভোতে পরিণত হ'তে পারত সেখানকার এরূপ শান্ত বৈরাগ্য দেখে মনে হ'ল হয়ত প্রাগের কঠিন শাসন সীমান্ত পর্য্যন্ত এসে পৌছেছে। গাড়ী যখন সেব্ থেকে ছাড়ল তখন থেকে ক্রমাগত স্পষ্টই দেখতে পেলাম আকস্মিক জার্মান-আক্রমণের বিরুদ্ধে চেক্‌দের আত্মরক্ষার সামরিক আয়োজন। চেকোস্লোভাকিয়ার অধিবাসিগণ আজ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত

প্রাগে 'সোকোল্' ব্যায়াম-প্রদর্শনী

আজ চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে অন্যতম বৃহৎ স্নান-চিকিৎসার পীঠস্থান ; কিন্তু এ স্থান অতিক্রম করবার সময় জার্মান কবি গোয়েটের শেষ জীবনের সেই ট্রাজেডিটির কথা মনে পড়ল— বৃদ্ধ গোয়েটে বাহাত্তর বছর বয়সে এখানে সপ্তদশী উলরিকার প্রেমে পড়েছিলেন, মারিয়েনবাড্ ছিল কবির অবসর-বিনোদনের একটি প্রধান তীর্থ। পিল্‌সেন্ পৌছাতে রাত্রি হয়ে গেল. স্কোডার কারখানা আর অসংখ্য বীয়ারের কারখানার চিম্‌নি থেকে উঠছিল বর্ষার মেঘের মত ঘন কালো ধোঁয়া আর কোথাও আগুনের লাল আভা ;
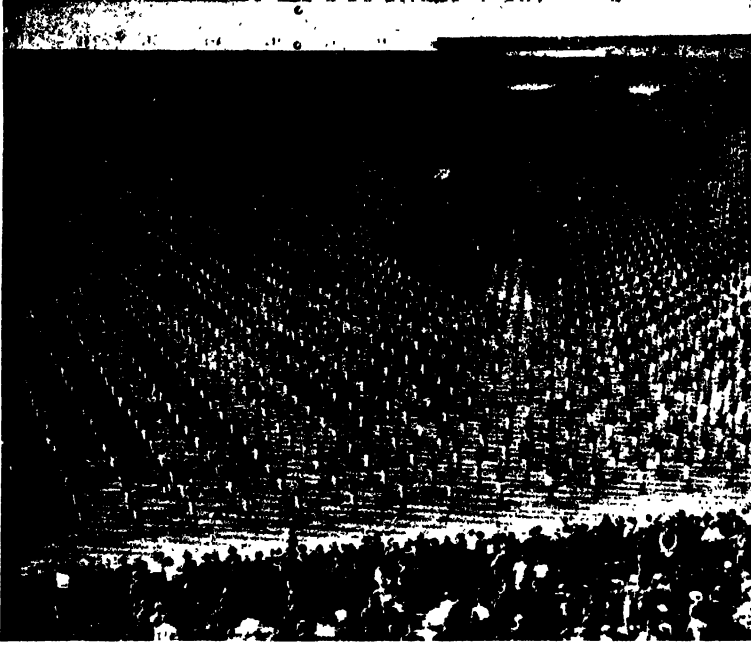
আছে, তাদের স্বাধীনতা-আক্রমণকারী শত্রু যে-ই হোক না কেন ; তাই রেলপথের ধারে ধারে চেক্-যুবকদের উল্লাস দেখে মনে হ'ল চেক্-সেনা সংখ্যায় নিকৃষ্ট হলেও আত্মনির্ভরতায় তাদের প্রতিবেশীদের চেয়ে কোন অংশেই হীন নয়। সোকোল্-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আজ সমগ্র স্লাভিক্ যুবশক্তির যে জাগরণ উদ্বুদ্ধ হয়েছে, চেকোস্লোভাকিয়ার যুবকদের বীরত্ববিলাসী ভাবপ্রবণতার অন্তরালে তার সত্যিকারের রূপ ধরা পড়বে ?

গাড়ী যতই উত্তরে অগ্রসর হ'তে লাগল, পাইনের বন ততই ঘন হয়ে উঠল, আর কখনও কখনও মনে হ'ল যে গভীর অরণ্যের বক্ষ ভেদ ক'রে চলেছি। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই বোহেমিয়ার বিখ্যাত বনানীবেষ্টিত প্রান্তরের দেখা মিলল, পাহাড় আর নদীর সহযোগিতায় উত্তর-বোহেমিয়ার উন্মুক্ত প্রান্তরের সৌন্দর্য্য মনোরম হয়ে উঠল। আমরা ক্রমশঃ মারিয়েনবাড্ (Marienbad) ও পিল্‌সেন (Pilsen) ছাড়িয়ে চললাম। মারিয়েনবাড্

স্কোডার কারখানায় যুদ্ধের মালমসলা তৈরি হয়, শুনেছি জার্মানদের নাকি এই কারখানাটির উপরে নজর আছে ; কিন্তু জার্মান-সীমানার এত কাছে ব'লে চেকরা কারখানাটির অনেক অংশ সরিয়ে ফেলছে প্রাগের পূবে, মোরাভিয়ায় ও স্লোভাকিয়ায়।

প্রাগে যখন পৌছান গেল, রাত তখন অনেক। প্রাগের প্রধান রেলওয়ে ষ্টেশনটি আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের নাম ধারণ করে। মহাযুদ্ধাবসানে চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা-উদ্ধারে উইল্‌সন্ যে অমূল্য সহায়তা করেছিলেন এই ষ্টেশনের নামের মধ্যে চেক্‌দের সেই কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি। ষ্টেশনের বাইরে উইল্‌সনের বিশাল প্রস্তরমূর্ত্তি। প্রাগের অন্য দুইটি ষ্টেশনের নামকরণ হয়েছে প্রেসিডেণ্ট মাসারিক্ ও ফরাসী ঐতিহাসিক ডেনিসের নামানুসারে। ডেনিসের চেক সভ্যতার ইতিহাস চেক্ জাতির সত্যিকারের মর্য্যাদা দুনিয়ার সমক্ষে তুলে ধরেছে সবচেয়ে প্রথমে।

প্রাগে রাজনীতির আলোচনা হয়েছে অনেক বিশিষ্ট

চেকোস্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রদূতাবাস

প্রাগের নিকটবর্ত্তী কাল্‌ষ্টেন্‌ প্রাসাদ
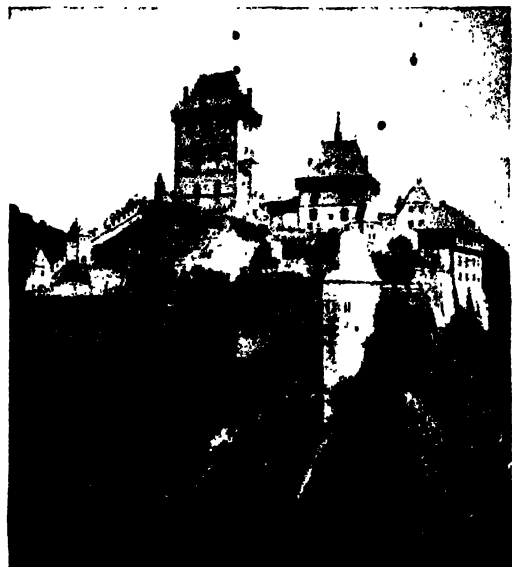
সরকারী কর্ম্মচারী এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে; কিন্তু এই শহরে অল্পকাল মধ্যেই রাজনীতি ভুলে গেলাম; প্রাগের মত সুন্দর শহর সমগ্র ইউরোপে খুব কম দেখেছি। মল্‌ডাভা নদীর দু-পার ধ'রে প্রকৃতির অপূর্ব্ব রূপসম্ভার; এক দিকে চির-সবুজ উদ্যানমালা-পরিবেষ্টিত উঁচু-নীচু পাহাড়; তার নীচে "মালা স্ত্রাণা"র গম্ভীর নিস্তব্ধ বৈরাগ্য, করুণ ইতিহাসের স্মৃতি বুকে ক'রে আছে; আর তার উপরে রাজপ্রাসাদ, যেটা বোহেমিয়ার প্রথম রাজাদের দ্বারা তৈরি হয়েছিল এবং সেখানে আজকাল রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্টরা বাস ক'রে থাকেন। অন্য দিকে প্রাগের বর্ত্তমান শহর, আধুনিক জীবনযাত্রার চঞ্চল ছন্দে মুখরিত। প্রাগের আকাশ-রেখায় অসংখ্য বারোক্‌ গীর্জ্জার সুদর্শন চূড়া-চুম্বন এই শহরের একটি স্বপ্নময় অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বারোক্‌ স্থাপত্য শুধু প্রাগের বিশেষত্বই নয়, বোহেমিয়ানদের ধর্ম্মযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে এমনি ভাবে জড়িত যে প্রাগ-বারোকের ইতিহাস আসলে চেক্‌-স্বাধীনতার ইতিহাস বললেও অত্যুক্তি হবে না। মধ্যযুগে প্রাগ ছিল বোহেমিয়ান রাজাদের রাজধানী। আদিম প্রেমিস্লিডদের (Premy-slides) কথা বাদ দিলে ভাক্লাভ (Vaclav I, ইহার অন্য নাম Wenceslas)-কেই বোহেমিয়ার প্রথম রাজা ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়া যায়। আধুনিক চেকোস্লোভাকিয়ায় তাই ভাক্লাভের পূজা দেখতে পাওয়া যায়। প্রাগের প্রথম রাজপ্রাসাদ, প্রথম গীর্জ্জা এবং প্রথম রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইনি। পশ্চিম-ইউরোপের সঙ্গে স্লাভিক জাতির আত্মিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন ইনিই প্রথম। তাই প্রাগের সবচেয়ে বড় রাস্তার নাম ভাক্লাভ ষ্ট্রীট, তাই ন্যাশনাল মিউজিয়মের সামনে আজ তাঁরই প্রস্তরমূর্ত্তি এবং তাঁরই স্মৃতিতে আধুনিক চেক্‌ স্বদেশপ্রেমিকরা প্রাগে একটি নূতন গীর্জ্জা প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্বাধীন বোহেমিয়ার ইতিহাসে যাঁর নাম সবচেয়ে বেশী স্মরণীয় তিনি ছিলেন লুক্‌সেমবুর্গ-বংশের রাজা চার্লস্‌ দি ফোর্থ। তিনি তদানীন্তন বোহেমিয়ার আয়তন বৃদ্ধি করেন, মোরাভিয়াকে তাঁর রাজ্যের অধীনে আনেন, আর প্রাগের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

মধ্য-মোরাভিয়ার পোষাক; কাপড়ে ফুলতোলা ও লেসের কাজ দ্রষ্টব্য

স্লোভাক্-পরিচ্ছদে গ্রাম্য রমণী

করেন। আজও প্রাগের বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর নাম ধারণ করে, আর ইউরোপের মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত সেতু—প্রাগে মল্‌ডাভার উপরে চার্লস্ সেতু, তাঁরই কীর্ত্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এঁর রাজত্বের সময় (১৩৪৬-১৩৭৮ খ্রীঃ) সমগ্র বোহেমিয়ার একটি জাতীয় শিল্প, স্থাপত্য এবং সংস্কৃতির উদ্বোধন হয়। রোম থেকে ক্যাথলিক পুরোহিত এবং পণ্ডিতের দল এসে প্রাগের রাজসভা অলঙ্কৃত করে; ফ্লোরেন্স থেকে চিত্র-, ভাস্কর্য্য- ও স্থাপত্য- শিল্পীর দল এসে বোহেমিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে রেখে যায় লাটিন্ সভ্যতার অমর স্মৃতি। আজ বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার সর্ব্বত্র যে ঐতিহাসিক রাজপ্রাসাদগুলি বর্ত্তমান তাদের স্থাপত্যে দেখতে পাওয়া যায় গথিকের সঙ্গে রেনেসাঁসের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য; প্রাসাদগুলির অনেক কক্ষে দেখেছি ভেনিস্ আর তাস্কানীর শিল্পীদের তুলির আঁচড়। বস্তুতঃ চার্লসের রাজত্বের আগে বোহেমিয়ানদের কোন বিশিষ্ট শিল্পাদর্শ ছিল কিনা জানা যায় না; লাটিন সভ্যতার সংস্পর্শে যে বোহেমিয়ার প্রথম শিল্পাদর্শের খানিকটা উন্মেষ হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ক্যাথলিক্ গির্জ্জার শাসনের ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রাগে যে-বিদ্রোহ সুরু হয় জন্ হুস্ নামক সংস্কারকের নেতৃত্বে, বিশ বছর ধরে যে-সংগ্রাম চলতে থাকে বোহেমিয়ার সকল অঞ্চলে (the Hussite Wars 1415-1436), এবং যে-বিদ্রোহের প্রেরণায় ক্রমশঃ সমস্ত উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের রিফরমেশান আন্দোলন সুরু হয় মার্টিন্ লুথারের বাণীকে কেন্দ্র ক'রে,—সেই থেকেই বোহেমিয়ার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অধঃপতন সুরু হয়। হোয়াইট্ হীলের (White Hill) যুদ্ধে বোহেমিয়ানরা যখন শেষ বারের মত হেরে যায়, তখন প্রাগের সিংহাসন হাব্‌সবুর্গের রাজবংশের হস্তগত হয়। তখন থেকেই ক্রমশঃ বোহেমিয়ায় জার্মান সভ্যতার যে-প্রসার রাজশক্তিকে আশ্রয় ক'রে ব্যাপ্ত হ'তে থাকে, তারই ফলে পরবর্ত্তী দুই শতাব্দী কাল বোহেমিয়ানরা জার্মান সভ্যতার

দাসত্ব করতে বাধ্য হয়। উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলন সুরু হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বোহেমিয়া শুধু একটি জার্মান জনপদে পরিণত হয়, আর স্লোভাকিয়া তেমনি হাঙ্গেরীর শাসনে নিজেদের জাতীয় ব্যক্তিত্ব এবং জাতীয় সংস্কৃতির আদর্শ হারিয়ে ফেলে। বোহেমিয়ার স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিগত এক-শ বছরের ইতিহাস আমাদের নিজেদের জাতীয় সংগ্রামে অসীম প্রেরণা জোগাতে পারত।

বেনেস ও তাঁহার পত্নী

এক শতাব্দীর পূর্ব্বে চেক্ জাতীয় জাগরণের যে-বন্যা বোহেমিয়ার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে একটি সর্ব্বতোমুখী প্লাবন এনে দিয়েছিল, তারই সার্থকতা দেখা দিল শুধু বিশ বছর আগে বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে বর্ত্তমান চেকোস্লোভাক্ রিপাব্লিকের প্রতিষ্ঠায়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাগ তার চিরাচরিত বোহেমিয়ান্ চরিত্র হারিয়ে ফেলে, প্রাগ একটি জার্ম্মান শহরে পরিণত হয়। শুধু শিল্পে এবং স্থাপত্যে, সাহিত্যে ও সঙ্গীতে নয়, সর্ব্বত্রই জার্ম্মান্ সভ্যতার দাসত্বে বোহেমিয়ার জাতীয় জীবন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই সময়ে ফরাসী বিপ্লব, ইংলণ্ডের রিপাব্লিকান আন্দোলন ও ইতালীতে স্বাধীনতা-যুদ্ধের সূত্রপাত দেখে চেক্-নেতাদের মধ্যে একটি জাতীয় জাগরণের প্রেরণা উদ্বুদ্ধ হয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে চেক্-স্বদেশপ্রেমিকেরা প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে, কিন্তু ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনার কঠিন দমননীতির সামরিক শাসনে চেক্ স্বাধীনতার পথ কিছু কালের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু রাজনৈতিক অসাফল্যের পিছনে সমগ্র জাতীয় জীবনে একটি প্রচ্ছন্ন স্বাদেশিকতা ক্রমশঃ মাথা তুলে দাঁড়ায়। বোহেমিয়ার অতীত গৌরবের উপর ভবিষ্যতের অপূর্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইয়ান্ কলার্ (Ian Kollar, 1793-1852) নামক স্লোভাক্ কবির প্রেরণায় যে সমগ্র স্লাভ জাতির সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার আন্দোলন সুরু হয়, তাও চেক্ স্বাধীনতা-ইতিহাসের একটি বৃহৎ অধ্যায়। এই প্যান্-স্লাভিক আন্দোলনই এক দিন সমগ্র টিউটনিক সভ্যতার দাসত্বকে আক্রমণ করে, এবং মহাযুদ্ধের অবসরে ভিয়েনার কঠিন শৃঙ্খল থেকে বোহেমিয়াকে মুক্ত করে।

আজ জার্ম্মানী ও রাশিয়া যে পরস্পরের প্রতি এত বিরুদ্ধতা করছে তা শুধু একটি রাজনৈতিক মতবাদের দ্বন্দ্ব নিয়ে নয়; এই বিরুদ্ধতার অন্তরে একটি প্রচ্ছন্ন জাতীয় কুসংস্কার রয়েছে; রাশিয়া দুনিয়ার সবচেয়ে বৃহৎ ও শক্তিমান স্লাভিক রাষ্ট্র; এবং অন্যান্য ছোটখাট স্লাভিক গণতন্ত্রের রক্ষক। বিগত মহাযুদ্ধে স্লাভদের হাতে টিউটনিকদের যে অপমান হয়েছে, জার্ম্মানী তার প্রতিশোধ চায়; তাই চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতি জার্ম্মানীর আজ এত আক্রোশ; ত্রিশ লক্ষ জার্ম্মান প্রজার উদ্ধারের জন্য আজ যে সামরিক মাদকতা জার্ম্মানীতে ছড়িয়ে পড়েছে তার উদ্দেশ্যও একটি প্রতিবেশী স্লাভিক জাগরণকে খর্ব্ব করা।

বোহেমিয়ার এক শতাব্দীব্যাপী জাতীয় জাগরণের আন্দোলনকে চেক্ রেনেসাঁস বলা চলে। এই রেনেসাঁসের ইতিহাসে কয়েকটি নাম স্মরণীয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

স্লোভাক্ কৃষক-বালিকা গাছে জল দিতেছে

কিন্তু আধুনিক বোহেমিয়াকে বুঝতে হ'লে গত এক-শ বছরের স্লাভিক রেনেসাঁসের ইতিহাসকে উপেক্ষা করা চলে না। বর্ত্তমানে বোহেমিয়া যদিও ক্যাথলিক, তথাপি জন হুস্ আজ বোহেমিয়ার জাতীয় বীর, আর সকল স্লাভদের নমস্য। জন হুসের আদর্শ সমগ্র চেক্ জাতির বিদ্রোহী প্রাণের প্রতীক। তাই প্রাগের একটি বিশিষ্ট পুরনো স্কোয়ারে উঠেছে জন্ হুসের প্রাণোদ্দীপক স্মৃতিস্তম্ভ। আধুনিক সোকোল্-আন্দোলনের অন্তরেও রয়েছে একটি ব্যাপক প্যান্-স্লাভিক আদর্শ; সোকোল্-আন্দোলন শুধু ব্যায়াম-ক্রীড়ার প্রদর্শনী নয়। ব্যায়াম-প্রদর্শনীতে আজ্ঞা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই; সঙ্গীতের তালে তালে সোকোল্ যুবা অঙ্গচালনা ক'রে থাকে; আর এই সঙ্গীতের পরিকল্পনা করেছেন ডোরাক্, চেক্ স্বাধীনতার উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখের স্মৃতিকে কেন্দ্র ক'রে। চেক্ যুবা ফাসি কিংবা নাৎসি যুবার মত বন্দুক নিয়ে শোভাযাত্রা করে না; সোকোল পোষাক প'রে মুষ্টি উত্তোলন ক'রে "নাজ্দার" ধ্বনি করতে করতে চেক্-যুবা মুক্তির বাণী প্রচার ক'রে থাকে। প্রাগের একটি শোভাযাত্রায় চেক যুবতীদের দেখেছিলাম প্রকাণ্ড ডেইজি-ফুলের ছত্র ধরে গান করতে করতে অগ্রসর হচ্ছিল প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে। যৌবন ও সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্যের প্রতীক ডেইজি; বন্দুকের চেয়ে কম ভয়ানক হ'তে পারে, কিন্তু কম শক্তিশালী নয়।

পালাকী, রীগার ও বোরোভ্স্কী; সাহিত্য ও কাব্যকলার ক্ষেত্রে সাফারিক্, চেলাকোভ্স্কী ও মাখা; নাট্যশিল্পে জোসেফ কাপেক্, হিল্বার্ট ও স্রামেক্; এবং সঙ্গীতে স্মেতানা ও ডোরাক্, চেক্ জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে যে মহামূল্য দান করে গেছেন তার স্মৃতি কখনও লুপ্ত হবার নয়। এঁদের গৌরব সমগ্র স্লাভ জাতির পরম সম্পদ; তাই প্রাগের ও অন্যান্য শহরের বড় বড় রাস্তা ও স্কোয়ার-গুলিতে দেখেছি এঁদের নাম অঙ্কিত। আধুনিক চেকোস্লোভাকিয়ার নির্ভীকতার পিছনে রয়েছে একটি প্রকাণ্ড আধ্যাত্মিক শক্তি; নিজেদের জাতীয় ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা; মধ্য ইউরোপে চিরকাল বোহেমিয়া যে উন্নত স্থান অধিকার ক'রে এসেছে সেই অতীতের প্রতি অনুরাগ। এইখানেই প্রথম সুরু হয় ইউরোপের সবচেয়ে করুণ ধর্ম্মযুদ্ধগুলি; প্রাগেই সূত্রপাত হয় রিফরমেশন্ ও কাউণ্টার-রিফরমেশন্ আন্দোলনের। হোয়াইট হীলের পরাজয়ের পরে গথিক্ গির্জ্জাগুলি ভেঙ্গে তাকে যে দক্ষিণের ক্যাথলিক্ আদর্শের ছাপ দেন জেসুইট্ প্রভুরা, তার থেকেই জন্ম হয় বারোক্ স্থাপত্যের। আজ পৃথিবীর মধ্যে বারোক্ স্থাপত্যের সবচেয়ে প্রধান তীর্থ প্রাগ।

ইতিহাসের কথা দিয়েই প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত করলাম।

চেকোস্লোভাকিয়ায় অবস্থানের শেষের ক'দিন কেটেছে মোরাভিয়া ও স্লোভাকিয়ার গ্রামে গ্রামে। স্লোভাকিয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং নরনারী দুই-ই বোহেমিয়ার চেয়ে অনেক বিভিন্ন ব'লে মনে হ'ল। চেক্রা যদিও আজ খুব জার্ম্মানবিদ্বেষী, তবুও তারা অন্তরে এবং চরিত্রে জার্ম্মান প্রভাব এতটা গ্রহণ করেছে যে দশ বছরের রাজনৈতিক বিরোধে তাকে বর্জ্জন করতে

প্রাগের নিকটবর্ত্তী মাসারিক-ভবন

পারেনি। প্রাগের একটি কলেজের মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যদি একটি জার্মান ছেলের প্রেমে সে পড়ে তবে কি করবে। তার উত্তরে সে বলেছিল যে তার পক্ষে এক জন জার্মান ছেলেকে ভালবাসা অসম্ভব; সে ওকথা কল্পনাই করতে পারে না। একটি জার্মান মেয়ে চেক্ ছেলেদের সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলেছিল। এটা জার্মান মেজাজ। কিন্তু স্লোভাকিয়ায় রাজনীতিটাকে এত বড় ক'রে দেখা হয় না; তার কারণ প্রথমতঃ স্লোভাকিয়া ছিল হাঙ্গেরীর অধীনে; হাঙ্গেরিয়ানরা স্লোভাকদের সঙ্গে ততটা সামাজিক সংমিশ্রণ কখনও করে নি যতটা জার্মানরা করেছিল চেক্‌দের সঙ্গে; তাদের মধ্যে ছিল শুধু রাজা-প্রজার সম্বন্ধ। দ্বিতীয়তঃ স্লোভাকিয়া কৃষিপ্রধান জনপদ; জার্মান শিল্প সে অঞ্চলটা স্পর্শ করতে পারে নি; তাই গ্রামের রূপ বেশী বদলায় নি, যদিও স্লোভাকিয়ায় চাষীদের বেশভূষায় হাঙ্গেরিয়ান প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছি। স্লোভাকরা খুব অতিথিপরায়ণ, মিষ্টভাষী এবং বন্ধুত্বে অকপট সারল্যের পরিচয় দেয়। চেক্‌রা খুব ভাবপ্রবণ সত্য, কিন্তু একটু অভিমানীও বটে। বিদেশীর কাছে চেক্ চরিত্রের চেয়ে স্লোভাক্ চরিত্রই বন্ধুত্বের সম্বন্ধে বেশী হৃদয়গ্রাহী মনে হবে, সন্দেহ নেই।

বর্ত্তমান চেকোস্লোভাকিয়ার মূর্ত্তি দেখে মনে হয় "বোহেমিয়ান্" কথাটার উপরে শিল্পীদের যে পক্ষপাত ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে এসেছি তার কোন সার্থকতা নেই। বোহেমিয়ার গ্রামে গ্রামে কম বেড়াই নি, কিন্তু কোথাও জিপ্‌সীদের দেখা মেলে নি; ও-সম্প্রদায়টা ক্রমশঃ বোহেমিয়ার গভীর অরণ্য-প্রদেশে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে; আর খানিকটা স্থানিয়েও যাচ্ছে ব'লে মনে হয় রুমানিয়া ও কৃষ্ণসাগর অভিমুখে। কিন্তু কখনও কখনও স্লাভিক্ গ্রাম্য সঙ্গীতে জিপ্‌সীদের প্রভাব লক্ষ্য করেছি, এবং হাঙ্গেরীর "পুস্তা"র কথা মনে হয়েছে। জিপ্‌সীরা মধ্য-ইউরোপের লোক-সঙ্গীতে যে প্রভাব রেখে গেছে তা আজও লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণে অসীম প্রেরণা জাগায়; এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গীতের মধ্যে সেতু রচনা করেছে এই চিরভ্রাম্যমাণ ভাববিলাসী জিপ্‌সী-সম্প্রদায়। আসলে "লা বোয়েম্" কথাটা প্যারিসের একটি বিশিষ্ট শিল্প-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি; ভূগোলের সঙ্গে তার বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে ব'লে মনে হয় না।

আধুনিক চেকোস্লোভাকিয়া এই বিশ বছরের স্বাধীনতার অবকাশেই আর্থিক ও সামাজিক পদ্ধতিতে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতিদের সমকক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পে, বাণিজ্যে এবং কৃষিতে চেকোস্লোভাকিয়া আজ ইউরোপের মধ্যে অন্যতম প্রগতিশীল দেশ। চেকোস্লোভাকিয়ার সর্ব্বত্র "মাসারিক হোম" নামে যে প্রতিষ্ঠানগুলি দেখেছি, তাতে বিশ্বাস হয়েছে সামাজিক পদ্ধতিতে এই দেশ অতিশয় উন্নতিশীল। অসহায় শিশুদের, রুগ্ন স্ত্রী-পুরুষের এবং বৃদ্ধদের যত্ন নেওয়া হয়ে থাকে এই সব মাসারিক হোমে।

চেকোস্লোভাকিয়াকে কেন্দ্র ক'রে আজ ইউরোপে যুদ্ধ-

পূর্ব্ব-মোরাভিয়া অঞ্চলের বিচিত্র সাজসজ্জায় শোভিত নরনারী

শান্তির পরিকল্পনা চলেছে। সুডেটেন্ জার্ম্মানরা উপলক্ষ্য মাত্র। জার্ম্মানী তার আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সমস্ত বলকান্ জনপদ ও ডানিয়ুব অঞ্চলটির উপরে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়, যাতে রাইন থেকে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের কৃষিজাত দ্রব্য জার্ম্মান কারখানায় শিল্পজাত দ্রব্যে রূপান্তরিত হয়ে মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপের বাজারে বিক্রি হ'তে পারে। জার্ম্মানীর বর্ত্তমান আর্থিক পদ্ধতির এইটেই প্রধান সমস্যা, কারণ আফ্রিকাতে গিয়ে উপনিবেশ উদ্ধারের প্রচেষ্টা জার্ম্মানী এখন আর লাভজনক মনে করে না। কিন্তু এই পদ্ধতির প্রধান অন্তরায় চেকোস্লোভাকিয়া, ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক উভয় কারণেই। তাই জার্ম্মানী চায় চেকো-স্লোভাকিয়াকে শাসন করতে, যাতে জার্ম্মানীর পূর্ব্ব-অভিযান (*Drang nach Osten*) নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হ'তে পারে। চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা রক্ষায় অন্যান্য দেশেরও স্বার্থ জড়িত আছে; তন্মধ্যে প্রধান ফ্রান্স ও রাশিয়া। তাই এক কোটি স্লাভ আজ প্রায় আট কোটি জার্ম্মানের গ্রাস থেকে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা ক'রে চলেছে। জার্ম্মানী যদি চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করে, তবে ইউরোপে যুদ্ধ অনিবার্য্য—যাতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইতালী যোগদান করতে বাধ্য হবে। সে-যুদ্ধে হয়ত বর্ত্তমান চেকোস্লোভাকিয়ান্ রিপাব্লিকের ধ্বংস হয়ে যাবে, হয়ত ওর রাষ্ট্রীয় সীমানা পরিবর্ত্তিত হয়ে যাবে, কিন্তু বোহেমিয়ার ধ্বংস হ'তে পারবে না। বোহেমিয়ার জাতীয় প্রতিভা অন্য যে-কোন জাতীয় প্রতিভার মতই অমর; তার বিবর্ত্তন হ'তে পারে কিন্তু বিলোপ কখনও ঘটবে না।

কুটীর—শ্রীকামাই সামন্ত
শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ সেনের সৌজন্যে

মজা নদীর কথা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

ভাগ্য ভাল, তাই হাজার কয়েক আবেদনকারীর মধ্যে কর্তৃপক্ষের দ্বারা অমিয়র যোগ্যতা নিরূপিত হইল। অমিয় রেল-আপিসে চাকরি পাইল।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শোনা যাইত এই বিভাগ পথের লোককে ডাকিয়া ডাকিয়া চাকরি দিত। তখন এত আবেদন-নিবেদনের বালাই ছিল না, ডিগ্রীবাছার হাঙ্গামা ছিল না, বয়স-জাতির প্রশ্নও সঙ্গীন হইয়া উঠে নাই। একাদিক্রমে ৫০ বৎসর চাকরি করিয়াও অবসর লইবার কল্পনা কেহ করিতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লইয়া হাজার হাজার যুবক কলে ছাঁটাই ধান্যের মত বাজার-দরকে মৃত্তিকার সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দেয় নাই। বৃদ্ধেরা বলিবেন, সে সব দিন ছিল সোনার দিন, এখনকার লোকেরা আজিকার দিনকে বলেন সঙ্গীন। সে যাহা হউক, জগৎ-সভ্যতার হরেক রকমের প্রগতিবাহী ধ্বজার মধ্যে বেকার-সমস্যার ধ্বজাটিও প্রায় সব দেশে সবেগে আন্দোলিত হইতেছে। জগৎ সভ্য হইতেছে, ভারতবর্ষকেও সেই সভ্যতার তাল বজায় রাখিতে হইতেছে।

রেল-আপিসের অনেক বিভাগ, তন্মধ্যে যে-বিভাগে অমিয় স্থান পাইল তাহার কথাই ধরা যাক।

বিভাগটি ছোট; মাত্র ত্রিশ জন কেরানী দশটা পাঁচটায় কলম চালনা করিয়া দিনগত পাপক্ষয় করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে এক জন কর্ম্মীর পরলোকপ্রাপ্তির সুযোগে অমিয়র সৌভাগ্য সূচিত হইয়াছে। তাহারই শূন্য চেয়ারে গিয়া অমিয় বসিল।

চেয়ারের বিপরীত দিকে বসিয়া যিনি কাজ করিতেছিলেন তিনি চশমার ফাঁক দিয়া অমিয়র পানে চাহিলেন। লোকটির বয়স অধুনা রেল-বিভাগীয় নিয়মানুসারে অবসরমুখী। চেহারাটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে মশাসই এবং রংটি কালো। মাথার চুল একটিও পাকে নাই, টাকের ক্ষেত্রটি মাত্র প্রসার লাভ করিয়াছে। কালো ফ্রেমের বৃহৎ চশমার অভ্যন্তরে সুবৃহৎ চক্ষু দুইটি কখনও বিস্ফারিত, কখনও ধ্যানস্তিমিত। মুখে ঊর্দ্ধওষ্ঠ ঢাকিয়া এক জোড়া স্বাস্থ্যসম্পন্ন গোঁফ এবং সদাহাস্য কুঞ্চনে সে-গোঁফ নৃত্যচঞ্চল।

প্রায় মিনিট-খানেক তিনি নিঃশব্দ দৃষ্টির দ্বারা অমিয়র আপাদমস্তক উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন ও আপন স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট স্বরে বলিলেন, "আপনার নামটি কি ভাই?"

অমিয় নাম বলিল।

"বাড়ী?"

"হরিপুর।"

"কোন জেলায়?"

"নদীয়া।"

অমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, "সেকথা আমারই ধরে নেওয়া উচিত ছিল। কথায় যখন টান নেই তখন ফরিদপুর জেলা হ'তে যাবে কেন! তা বরাত আপনার ভাল, এই তো ত্রিশ টাকার পোষ্ট তার জন্যে কম্‌সে কম দরখাস্ত পড়েছিল হাজার পাঁচেক।"

অমিয় মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল।

অমলবাবু বলিলেন, "ছিল আমাদের দিন! হট্ বললেই চাকরি। যা করতেন ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবু। এখন ওঁরা হয়েছেন জগন্নাথ, যা করেন সিলেক্‌সান্ বোর্ড। তা আপনাকে ইণ্টারভিউ দিয়ে কি কি জিজ্ঞেস করলে?"

অমিয় বলিল, "প্রথমে বললে, বোম্বে যাবার সংক্ষিপ্ত রাস্তা কোন্‌টা?"

অমলবাবু চশমার মধ্যে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আশ্চর্য্য কণ্ঠে বলিলেন, "বম্বে যাবার সোজা রাস্তা! শোন

একবার কথা! আমরা এত দিন রেল-আপিসে চাকরি করি, পাস নিয়েছি কত দিকে, বম্বে গিয়েছিও বার-কতক, আমরাই কি বলতে পারি ছাই! বললে তুমি?"

"বললাম বইকি। সদ্য রেলওয়ে ম্যাপখানা দেখে এসেছিলাম। জিওগ্রাফি, হিষ্ট্রি, কয়েক দিনের খবরের কাগজ এমন কি আপনাদের কোচিং টেরিফের খানিকটা মুখস্থ ক'রে ফেলেছি যে।"

"বটে! তার পর কি জিজ্ঞেস করলে?"

"মাদ্রাজ গবর্ণরের গ্রীষ্মাবাস কোন্‌টা?"

সবিস্ময়ে অমলবাবু বলিলেন, "বললে, বললে তুমি!"

"বললাম বইকি। বললাম 'উটি'! কিনা ওটাকামণ্ড।"

"তার পর?"

"তার পর জিজ্ঞেস করলে, "এ বছরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় হকি টীমের নাম কর।"

অমলবাবু বিস্ময় আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, উচ্চৈঃস্বরে অপরেক সহকর্মীকে আহ্বান করিলেন, "ওহে শম্ভু, ও ভাই, শোন, শোন। ওঁকে, এই অমিয়-ভায়াকে, তোমাদের সিলেক্‌শান্‌ বোর্ডের প্রভুরা কি কি জিজ্ঞাসা করেছেন, শোন। শুনে হেসে আর বাঁচি না।" বলিয়া পরম খুশীভরে তিনি টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন।

শম্ভুচন্দ্র অমলবাবুর পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়াও অমলবাবুর মাথা-সমান হইলেন। রঙে রং মিলিল। আর কিছুরই সাদৃশ্য দেখা গেল না। বয়সের বহু প্রভেদ; চোখে চশমা, মুখে গোঁফ, মাথায় টাক, কোনটারই মিল নাই।

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "দাদা যে হেসেই অস্থির। বলি ব্যাপারখানা কি?"

অমলবাবু বলিলেন, "শোন, ঐ ভায়ার মুখেই শোন। বলুন ত ভায়া।"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "দাদা, এ আপনার বড় অন্যায়। ওঁকে ভায়া বলছেন, আবার আপনিও বলছেন!" পরে অমিয়র পানে চাহিয়া বলিলেন, "বুঝেছেন অমিয়বাবু, ইনি আমাদের সার্ব্বজনীন দাদা। সাহেব বড়বাবু থেকে বাচ্চা চাপরাশী পর্য্যন্ত এঁকে দাদা ব'লেই জানে। আপনিও—"

অমলবাবু হো হো করিয়া হাসিলেন, "শোন, শম্ভু-ভায়ার কথা শোন। আমি নাকি সবারই দাদা!"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "যে-কোন একটা সম্পর্ক পাতিয়ে আমরা বাঙালীরা বড় তৃপ্তি পাই, তার মধ্যে দাদা-সম্পর্কটি বড় মিষ্টি। বাবু বলাটা সব সময়ে আমাদের ধাতুসহ নয়। আপনি কি বলেন, অমিয়বাবু?"

অমিয় বলিল, "তা সত্যি। কিন্তু এইমাত্র আপনি সে নিয়ম লঙ্ঘন করলেন।"

শম্ভুচন্দ্র হাসিলেন, "পরিচয় ঘনিষ্ঠ হ'লে নিয়ম মেনেই চলব। আমরা না চাইলেও আমাদের ভদ্রতার বালাই বড় বেশী। সাহেবরা দিনরাত বাবু ব'লে ব'লে আমাদের কান দুটিতেও ঐ মধু ভরে দিয়েছে। 'বাবু' ব'লে সম্বোধিত না হ'লে, তাই, আমাদের কান ও মন দুই-ই গরম হয়ে ওঠে।"

অমলবাবু হাসিলেন, "ঠিক বলেছ ভায়া, ঠিক বলেছ। আমরা বামুনের ছেলে, হিন্দুর ছেলে, আমাদের এসব ম্লেচ্ছপনা চলে না। কি করি, বাপপিতামহ কিছু রেখে গেলেন না, বিদ্যাস্থানে নৈবচ, পৈতে দেখিয়ে যজমান তোলানর দিন আর নেই, কাজেই এই গোলামগিরি।"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন "ভাবতে গেলে অনেক কিছুই ভাবতে হয়। ও বামুন কায়েত বণিক সকলের দশাই সমান, অথচ জাত জাত ক'রে আমাদের বড়াই আজও গেল না।"

অমলবাবু চশমার ফাঁকে এদিক-ওদিক চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, "জাতিতত্ত্ব থাক ভায়া, বড়বাবু এদিকে আসছেন।" পরে অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "এঁর কাজকর্ম্ম তুমিই না-হয় একটু দেখিয়ে দাও, ভায়া। আমার আবার উইণ্ডিন রেজেষ্টিখানা আজ সারতে হবে।" বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গভীর মনোযোগ-ভরে খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

বড়বাবু ততক্ষণে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। একটু থামিয়া তিনি শম্ভুবাবুকে উদ্দেশ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "আপনার বুঝি কাজ নেই?"

শম্ভুচন্দ্র শুষ্ক মুখে বলিলেন, "না তা নয়, এই দাদা ডাকলেন—"

টপ করিয়া খাতা হইতে মুখ তুলিয়া অমলবাবু বলিলেন, "ইনি নূতন লোক কি না, কাজ বুঝিয়ে দিতে হবে। আমার কাজের তাড়া না থাকলে—"

বড়বাবু গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "কাজ বোঝাবার নাম ক'রে তো দিব্যি গল্প জুড়ে দিয়েছেন আপনারা। প্রায় পনর মিনিট হ'ল লক্ষ্য করছি, আপনাদের হাসি গল্প আর থামেই না। তাই তো উঠে আসতে হ'ল।"

অমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, "হাসছিলাম কি আর সাধে। শুনুন না আপনাদের সিলেকসান বোর্ডের আজগুবি আজগুবি কোশ্চেন! বম্বে যাবার সোজা রাস্তা কোন্‌টা? বলে পঁচিশ বছর রেলে কাজ ক'রে বম্বে গিয়ে আমরাই—"

বড়বাবু বলিলেন, "আরও পঁচিশ বছর কাজ করলেও আপনার জ্ঞান কিছুমাত্র বাড়বে না দাদা। ডি. টি. এস. সৈয়দপুরের কাগজপত্র সব ডি. টি. এস. পাকসীকে পাঠিয়েছেন, সাহেব তো রেগে আগুন।"

অমলবাবুর চক্ষুর জ্যোতি সহসা চশমার মধ্যেও স্তিমিত হইয়া গেল, অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "কোন্ ষ্টেশন দাদা?"

"রংপুর। রংপুর কোন্ ডি. টি. এস.-এর আণ্ডারে?"

অমলবাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে সহসা খপ করিয়া বড়বাবুর ডানহাতখানি ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "এইবার বাঁচা দাদা, আর এমন ভুল হবে না। যে সব টেবিলের চার দিকে জটলা করে ওতে কখনও মাথা ঠিক থাকে।"

বড়বাবু বলিলেন, "আর কারও টেবিলে জটলা হয় না আপনার এইখানেই যত গল্প, আড্ডা। যদি বাঁচতে চান আজ থেকে আড্ডাটা—"

"আবার! এই নাক মলছি, কান মলছি, আজ থেকে টুঁ শব্দটি নয়। রংপুর কিনা গেল ডি. টি. এস. পাকসীতে! পঁচিশ বছর কাজ ক'রে এমন ভুল তো কোন দিন হয় নি।"

বড়বাবু সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া শম্ভুচন্দ্রের পানে ফিরিয়া কহিলেন, "তা, ওঁকে এখানে কি কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছ? নতুন লোক, রেট-চেক করার সুবিধা হবে কি?"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "তবে কি কাজ দেবেন?"

"আমি বলি কি রেট-চেকের তার তুমি নাও, এঁকে তোমার জায়গায় লেজারে দাও। সাদা কাজ, পারবেন।"

শম্ভুচন্দ্র ম্লান মুখে বলিলেন, "কিন্তু রেট-চেকারের পোষ্টেই ত ওঁকে নেওয়া হ'ল, শিখিয়ে দিলে কেন পারবেন না।"

বড়বাবু বলিলেন, "দশ-পঁচিশ বছর কাজ ক'রে তোমাদেরই সেজন জ্ঞান হ'ল না, উনি নূতন এসে সে-সব পারবেন?"

অমলবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তা পারবেন উনি। ইণ্টারভিউ দিতে এসে আস্ত্রেক কোচিং টেরিফখানা নাকি মুখস্থ ক'রে এসেছিলেন।"

বড়বাবু অমলবাবুর কথায় কর্ণপাত না-করিয়া শম্ভুচন্দ্রকে বলিলেন, "যাও, ওঁকে কাজ বুঝিয়ে দাওগে।"

গম্ভীর ভাবে আদেশ দিয়া তিনি স্থানত্যাগ করিতেছিলেন। অমল বাবু ওরফে দাদা তাঁহাকে ডাকিলেন, "আরে দাদা চললেন যে! একটা পান মুখে দিয়ে যান।" বলিয়া ঘটাং করিয়া ড্রয়ারটা টানিয়া পানের ডিবা বাহির করিলেন।

দাদা পান খান প্রচুর। দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত অনবরত পানের জাবর না-কাটিলে কাজে নাকি তিনি উৎসাহ পান না। কাজেই কাশী বেড়াইতে গিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই জার্ম্মান সিলভারের বৃহৎ ডিবা ওরফে টিফিন-বাক্সটি কিনিয়া আনিয়াছেন। পণ-দুই পান উহার গর্ভজাত করিয়া বাক্সটিকে উত্তমরূপে ঝাড়নে মুড়িয়া ডেলী প্যাসেঞ্জার দাদা ন-টা একত্রিশের ট্রেনখানিতে চাপেন। পান তিনি খাইতেও যেমন ভালবাসেন, বিলাইতেও ততোধিক। ট্রেনে এবং আপিসে কেহ চাহিয়া লয়, কাহাকেও ডাকিয়া দেন। এইরূপে ডজন-দুই পান নিত্য দান-খয়রাতে যায়।

বড়বাবু ফিরিলেন এবং গোটা-চারেক পান কৌটা হইতে তুলিয়া লইয়া মুখে পুরিলেন। বলিলেন, "দোক্তা!"

দাদা মাথা নাড়িলেন, "ঐটির অভাব দাদা, তোমাদের

বৌদিদির ঠেলায় পড়ে ওটি ত্যাগ করতে হ'ল। সেদিন হঠাৎ একটা কলিক্ পেন উঠল রাত্তিরে, প্রাণ যায় আর কি, ডাক্তার এসে নানা প্রশ্ন ক'রে বললেন, অবল। দোক্তা খাওয়াটি আপনাকে ছাড়তে হবে। এই আর যায় কোথা। ডাক্তার চলে যেতে না-যেতে দোক্তার কৌটো গেল পুকুরে, তার জায়গায় এল তামা, তুলসী, গঙ্গাজল।"

বড়বাবু হাসিলেন, "তুমি তাই ছুঁয়ে দিব্যি গাললে?"

দাদা করুণ কণ্ঠে কহিলেন, "গাললাম বইকি, ভাই।"

বড়বাবু বলিলেন "না:, তুমি একেবারে শুড বয় হয়ে গেলে শেষে। তোমার ত এমন স্ত্রী-ভক্তির কথা কোন কালে শুনি নি।"

"বয়স যে বড় বালাই ভাই। একমাত্র স্ত্রী, ছেলে নেই, মেয়ে নেই, কাজেই ওর মনে কষ্টটা দিলাম না। কি জান দাদা, বাড়ীতে যা একটু কষ্ট, দোক্তা না মুখে দিলে মনে হয় ঘাস চিবুচ্ছি, কিন্তু আপিসে তোমরা পাঁচ জন আছ, তোমাদের দৌলতে আমার ভাবনা কি!"

বড়বাবু উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "সাধু, সাধু! আমি দোক্তা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"শম্ভু-ভায়ার কাছে এই মাত্র পেলাম। টিফিন পর্য্যন্ত এতেই দিব্যি চলবে।"

বড়বাবু স্বগত-উক্তি করিলেন, "আমি ভাবলাম বুঝি দাদা সত্যি সত্যিই প্রতিজ্ঞা করলেন।"

দাদা হাসিয়া বলিলেন, "রাম বল। চিরকাল যেমন প্রতিজ্ঞা ক'রে আসছি, এও তেমনি। কাউকে কষ্ট না-দিয়ে যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি তাতে কার কি ক্ষতি বল তো শম্ভু-ভাই। হ্যাঁ, দেহের মধ্যে আত্মাপুরুষ এক জন আছেন, অন্তের মুখ চেয়ে তাঁকেও তো অবহেলা করা যায় না। যায় কি?"

শম্ভুচন্দ্র প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কক্ষনো না। আর আত্মাকে যদি তুষ্ট করতে না পারলুম তো খেটে ম'রে আমার লাভ?"

দাদা উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, "শোন তবে একটা গল্প। একবার বেনারস বেড়াতে গিয়ে—"

বড়বাবু বললেন, "গল্পটা বরং টিফিনের সময় বলবেন, এখন কাজ করুন।"

দাদার উৎসাহ-বহ্নিতে এইরূপে এক কলসী জল ঢালিয়া দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

চশমার মধ্যে স্তিমিতপ্রায় নয়ন ছুটি বড়বাবুর স্থানত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। দাদা চাপা গলায় বলিলেন, "ঐ ওঁর বড় দোষ, বড় একরোখা। যখনই তুমি ছেড়ে আপনি বলেন তখনই বুঝতে পারি গতিক সুবিধের নয়। অথচ গল্প বলবার ইচ্ছে হ'লে কাজ কি ছাই ভাল লাগে? এই একটানা, একঘেয়ে কাজ? বল না শম্ভুচন্দ্র?"

শম্ভুচন্দ্র বলিলেন, "কাজ যদি একঘেয়ে মনে হয় আসুন না বদলা-বদলি করি। আপনি রেটে যান—"

দাদা চশমার ফাঁক দিয়া বৃহৎ চক্ষু ছুটি ঠেলিয়া তুলিয়া বলিলেন, "রেট! ঐ জ্যান্ত কাজ! মাপ কর দাদা! এ তবু যাহোক নেড়ে চেড়ে খাচ্ছি, ওখানে গেলে আর নড়ে পথ্যি করতে হবে না। তোমরা বল মরা কাজ, এই আমার ভাল দাদা।"

শম্ভুচন্দ্রও দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পাইয়া স্বস্থ বোধ করিতেছিলেন না। কিন্তু অলঙ্ঘ্য আদেশ বড়বাবুর, উপায় নাই।

২

ঘণ্টা বাজাইয়া টিফিন হইল।

ও-ধারে মেশিন-রুমে খটাখট আওয়াজ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। বিশ্রামের মুহূর্ত্তটিতে ইহাদের সময়ানুবর্ত্তিতার প্রশংসা না-করিয়া উপায় নাই। প্রায় জন-ত্রিশেক লোক হাত মুছিতে মুছিতে ও গল্প করিতে করিতে ও-ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সম্মুখে খোলা মাঠ। সেখানে কেহ কাগজ পাতিয়া শুইয়া পড়িল, কেহবা খবরের কাগজ পড়িয়া শুনাইতে লাগিল, কেহ বিড়ি টানিতে টানিতে সঙ্গীর সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল, কোথাও বা কয়েক জন মিলিয়া ময়লা ছেঁড়া তাস বাহির করিয়া "বিন্তি" খেলিতে লাগিল। আধ ঘণ্টা মাত্র বিরাম, এই অর্দ্ধ-ঘণ্টার মধ্যে তাসখেলা, নিদ্রা, সংবাদপত্র

পাঠ ও নানা প্রকারের সমস্যা লইয়া আলোচনা চলে। হয়ত কোনটাই সম্পূর্ণ হয় না; সম্পূর্ণ না-হইলেও অসন্তোষ উহাদের কাহারও নাই। যে-জীবনপুষ্প অকাল বসন্তের দিনে সহসা প্রস্ফুটিত হইয়াছে, শোভা ও সুগন্ধ তাহার পক্ষে অনাবশ্যক, দক্ষিণের বাতাস না পাইলেও বৃন্তে তাহারা দুলিয়া থাকে এবং নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বেই ঝরিয়া পড়ে। সেজন্য কাহারও মাথাব্যথা নাই, না ফুলের, না দক্ষিণা বাতাসের। আলগা বৃন্তে বসিয়া তাহারা ক্ষণিকের দৃষ্টিতে যতটুকু নীল আকাশ দেখিতে পায়, যতটুকু সূর্য্যকিরণ পান করিতে পারে, রৌদ্রে এবং ছায়ায়, বাতাসে এবং বাদলে, যে অসম্পূর্ণ দাক্ষিণ্য তাহাদের ভাগ্যে মেলে তাহাতেই তাহারা ধন্য হইয়া যায়। যাহাদের আরম্ভের ইতিহাস নাই, উত্তরকাণ্ড-রচনায় তাহাদের মন স্বভাবতঃই বিমুখ।

দাদার টেবিলের চারি পাশে গল্পের আসর জমিয়া উঠিয়াছে। ছোকরা দলের অভয়, বিপিন, অমূল্য আসিয়াছে, বয়োবৃদ্ধদের মধ্যে সুরেন, শান্তি, খগেন ও নিত্যহরি জুটিয়াছেন। পান, দোক্তা, বিড়ি, সিগারেট মুহুর্মুহু চলিতেছে; দাদাকে কেন্দ্র করিয়া নিত্য এই আসর জমিয়া উঠে।

নবাগত অমিয় চুপি চুপি উঠিয়া গিয়াছে। গল্প এবং ধোঁয়া দুইটাই সে সহ্য করিতে পারে না। সে স্বভাবতঃ লাজুক-প্রকৃতির, জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও তার নাই। কলেজ-জীবনের পর চাকুরী জীবন ঠিক বিস্তীর্ণ রৌদ্রালোকিত প্রান্তর-ভ্রমণের পরক্ষণেই আলো-বায়ুহীন রুদ্ধ ঘরের মধ্যে আত্মসমর্পণের মত। অন্ততঃ একটি দিনের অভিজ্ঞতায় অমিয়র তাই মনে হইল।

মাঠের ধারে লৌহবৃতির উপর পা রাখিয়া সে উপর পানে চাহিল।

মধ্যাহ্নের আকাশ। রৌদ্রদীপ্তি আছে ও চক্রাকারে চিল উড়িতেছে। মুক্ত আকাশে উঠিয়াও চিল চক্রাকারে ঘুরিতেছে কেন? প্রকৃতি যেখানে কৃপণ, জীবজগতের কার্পণ্য সেখানে সমধিক। মুক্ত আকাশ পাইয়াও খানিকটা জায়গায় চক্র রচনা করিয়া চিল উড়িতেছে, টিফিনের ছুটিতে খোলা মাঠে বৃত্তাকারে বসিয়া ইহারাও তেমনই গল্প করিতেছে, তাস খেলিতেছে।

ঢং-ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজিতেই অসম্পূর্ণ খেলা, গল্প বা ঘুম ফেলিয়া লোকগুলি ত্বরান্বিত হইল। ক্ষুদ্র গৃহে আবার জনস্রোত প্রবেশ করিল, মেশিনের ঘটাং ঘটাং আওয়াজ উঠিল।

দাদার টেবিলের ধারে গল্পের স্রোত তখনও উদ্দাম।

অমিয় একটু দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরেন বলিল, "ঘণ্টা পড়ল।"

দাদা বলিলেন, "বড়বাবু কোথায়?"

অমূল্য উঁকি মারিয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল, "বোধ হয় সাহেবের ঘরে।"

দাদা সোৎসাহে বলিলেন, "সারাদিন গো-খাটুনি খেটে মানুষ বাঁচে? একটু গল্পও যদি না করব—"

খগেনবাবু আপন স্বভাবসুলভ কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন, "ভয় করগে তোরা, আমরা ওসব কেয়ার করি না। বলে ডুবেছি না ডুবতে আছি।"

দাদা বলিলেন, "ওরে ভাই, জগন্নাথ ঠুঁটো শুধু ভাল করবার বেলায়, মন্দতে ওরা কম মজবুত নয়।"

খগেনবাবু বলিলেন, "ভেড়ার পাল চালান আর শক্তটা কি? আমাদের অবস্থা ওপরের প্রভুরা কেউ জানেন? কচু। যা বোঝাচ্ছে, তাই।"

শান্তি সহসা অমিয়র পানে চাহিয়া খগেনবাবুকে চোখ টিপিলেন। অমিয়কে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন।"

খগেনবাবু শান্তির দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বলিলেন, "উনি কে? বড়বাবুর আত্মীয় বুঝি?"

নিত্যহরি বলিলেন, "তুমি যে দেখি জগৎসুদ্ধ বড়বাবুর আত্মীয় দেখ।"

খগেনবাবু বলিলেন "না, তো কি! জামাই, বেয়াই, ভাই, সম্বন্ধী, নাতজামাই, মেসমশাই, পিসেমশাই কোন্ সম্পর্কটা বাদ আছে এখানে শুনি। আমি স্পষ্ট কথা বলি, তাই মন্দ। তাই এক গ্রেডে আজ দশ বছর পড়ে আছি।"

দাদা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যারা মন্দ কথা বলে না, বাটি বাটি তেল মাথায়, তাদের অবস্থাও ত বিশেষ ভাল দেখি না, খগেন।"

খগেনবাবু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আজও টেবিলের তলা দেখ ; ঐ কুমড়ো, ডাব, মানকচু, পেঁপে, কলা। গ্রেড না-বাড়ুক, চাকরি বজায় থাকে তো।"

এই মাত্র টিফিন না-হইলে অমিয় পুনরায় মাঠে চলিয়া যাইত। গাঢ় ধূমের চেয়ে এই আলোচনা শ্বাসরোধকর। শুধু কি শ্বাসরোধকর আলোচনা, সঙ্গে সঙ্গে অভিধান-বহির্ভূত অশ্লীল কথার বর্ষণ। আশ্চর্য্য, কথায় কথায় উত্তেজনা যাহাদের শোভা পায় সেই যুবক দলের ক্ষোভ ততটা মারাত্মক নহে, কিন্তু ঐসব শুভ্র কেশ, বয়োবৃদ্ধদের মুখে শ্রুতিকটু আলোচনা ও অভিধান-বহির্ভূত সম্বোধন অমিয়র অন্তরে তীব্র ভাবেই আঘাত করিল। ইহাদের সান্নিধ্যে ভক্তি-শ্রদ্ধাকে বাঁচাইয়া রাখা অত্যন্ত সুকঠিন সন্দেহ নাই। আধবেলার মধ্যেই চাকরি-জীবন যাপনের একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া সদ্য-বিশ্ববিদ্যালয়-প্রত্যাগত অমিয়কে অস্থির করিয়া তুলিল।

বাকী তিন ঘণ্টার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটিল না। অমিয়কে শম্ভুচন্দ্র কাজ বুঝাইয়া দিলেন, অমিয়ও খাতা-কলম লইয়া কাজে মনোনিবেশ করিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, কাজ ছাড়া কোন কিছুতে সে মনঃসংযোগ করিবে না। আর্থিক সচ্ছলতার জন্য সে চাকরি লইয়াছে, চাকরি গ্রহণ না-করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না বলিয়াই হয়ত চাকরি লইয়াছে, কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে বসিয়া প্রবল ভাবে স্বার্থচর্চ্চা নাই বা করিল। কে কি করিতেছে না-করিতেছে সে সন্ধান রাখিয়া তাহার লাভ কতটুকু।

ছুটি হইলে বড়বাবুকে একটি নমস্কার করিয়া সে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

পথে পা দিয়াই মনে হইল কে যেন তাহাকে পিছন হইতে ডাকিতেছে।

অমিয় মুখ ফিরাইতে দেখিল, একটি সুদর্শন যুবক তাহাকে ডাকিতেছে। অমিয় থামিতেই সে তাহার নিকটবর্ত্তী হইল ও হাসিমুখে প্রশ্ন করিল, "আজ প্রথম দিন বুঝি?"

অমিয় ঘাড় নাড়িল।

"তা আমি মুখ দেখেই বুঝেছি।"

যুবকের বর্ণ যেমন উজ্জ্বল, মুখের হাসি, কণ্ঠের স্বরে তেমনই হৃদয়বত্তার আভাস পাওয়া যায়। অমিয়র চেয়ে বড়-জোর বছর-চারেকের বড়।

অমিয়র দৃষ্টিতে প্রসন্নতা ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "কি ক'রে বুঝলেন?"

যুবক হাসিয়া বলিল, "আরও কি বুঝলাম জানেন, চাকরি পাবা মাত্রই যারা হাতে স্বর্গ পায়, আপনি সে-দলের নন। আপনার মধ্যে শক্তি আছে, তাই ক্ষেত্র মাত্রকেই সুযোগ ব'লে গ্রহণ ক'রে ধন্য হন নি।"

অমিয় মুগ্ধ হইল। এমন ধরণের কথা এই আপিসের কর্ম্মীর মুখে শুনিবে আশা করে নাই। খুশীভরা কণ্ঠে সে কহিল, "কিন্তু ধন্য না-হওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই, এই ত্রিশ টাকার জন্য—"

যুবক বলিল, "পাঁচ হাজার দরখাস্ত, তার মধ্যে ইউনিভার্সিটির উজ্জ্বল রত্নেরও অভাব ছিল না, এই তো? সে হিসাবে ভাগ্য আপনার ভাল। হয়ত চাকরি পেয়ে দু-মুঠো খেয়ে বাঁচবেন—মাথা গোঁজবার একখানা চালাও জুটবে! কিন্তু তার পর? সারা জীবন এই নিয়ে কাটবে তো? এত অল্পমূল্যে অত বড় জীবনটাকে চিরটাকাল বিকিয়ে রাখবেন?"

অমিয় বলিল, "যাই হোক, দাঁড়াবার একটা আশ্রয় পেলাম। চেষ্টা ক'রে এর থেকে ভাল একটা কিছু জুটিয়ে নেওয়া যেতে পারে।"

যুবক হাসিল এবং হাসিতে হাসিতেই বলিল, "ঐটি ভুল কথা। একটা কিছু পাবা মাত্রই উদ্যম আমাদের একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ভাবি, মন্দ কি, এই তো বেশ। আর আরও কিছু বাড়বে—একটা সংসার পাতা যাক্ না। এখন ছোট সংসার খুব শীঘ্র বেড়ে ওঠে—আর আয়ের আলস্যও সেই অনুপাতে বেড়ে যায়, মুস্কিল বাধে তখনই। তখন একটি মাত্র জিনিষের আমরা

অত্যন্ত ভক্ত হয়ে উঠি। এই যুবা বয়সে সে ভক্তিচর্চ্চা আমাদের বিষবৎ জ্ঞান করা উচিত।"

অমিয় বলিল, "কি সে জিনিষ?"

"অদৃষ্ট। যা চিরকাল অ-দৃষ্ট, তাকে আমরা অত্যন্ত ভক্তিভরে গ'ড়ে তুলি। আমাদের পরম সান্ত্বনার অমন জিনিষ যে আর নেই।"

"বড় বড় মনীষীরাও তো অদৃষ্টবাদ মেনেছেন।"

"তাঁরা আগে বড় হয়েছেন—মনীষী হয়েছেন, পরে অদৃষ্টবাদ স্বীকার করেছেন। মনীষী হবার আগে যদি অদৃষ্টবাদ মেনে হাত-পা ছেড়ে দিতেন তা হ'লে তাঁরা আমরাই হতেন। আসল কথা কি জানেন, উপরে উঠে যা খুশী করুন বেমানান হবে না; চাই কি থুথু ফেললেও নিজের দেহটি শুদ্ধই থাকবে, নীচে থেকে থুথু ফেলতে গেলেই নিজেকে তার ফলভাগী হ'তে হবে।" একটু থামিয়া বলিল, "আর কি জানেন, বড়রা আমাদের অনেক অনিষ্ট করেছেন—ঐ মনীষী, মহাপুরুষ, ঋষি, ওঁরা আমাদের জীবনকে বাণী দিয়ে দিয়ে পঙ্গু ক'রে রেখেছেন। আমরা দোষ করি—আর ওঁদের বিধান নিয়ে সে দোষ স্খালন করি। যখন সংসারে আমাদের অক্ষমতা প্রকাশ পায়, তখন বৈরাগ্যকে জড়িয়ে ধরি। উপায় কম হ'লে অদৃষ্ট মানি। সামাজিকতা বজায় রাখতে গিয়ে দরিদ্র-বেশে দেশমাতৃকার স্তবে গদগদচিত্ত হই। ঐ খদ্দরকেও আমি পাপ ব'লে মনে করি।"

"কেন?"

"কেন? সত্যকে সামনে রেখে যে চলতে শিখি নি তাই তো আমাদের ভয় পদে পদে। আমরা কি সত্যই দুঃস্থ নরনারীর কথা স্মরণ ক'রে খদ্দর কিনি, না অল্পমূল্যে নিজেকে শোভন ও লোকচক্ষে মহৎ ক'রে প্রচার করবার চেষ্টা আমাদের মনে প্রবল হয়ে ওঠে? একখানা খদ্দরের ধুতি কিনে আমরা অনেকগুলি মানুষকে অনায়াসে ঠকাতে পারি।"

অমিয় এবার হাসিল, বলিল, "আপনার যুক্তি অদ্ভুত! প্রত্যেক ভাল কাজের মন্দ দিক্ আছে; তাই ব'লে ভাল কাজকে ঘৃণা করা—"

যুবক হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনি আমার যুক্তিকে স্পর্শ করতে পারলেন না। হয়ত আমার বলবার দোষ। দোষ মহৎ প্রচেষ্টার নয়, দোষ তো আমাদেরই। নিজের প্রবল স্বার্থের অনুকূলে যখন ঐগুলিকে আমরা লাগাই—ঐ খদ্দরের খোলস, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, মহাত্মার ত্যাগ, তখনই তা সমাজ এবং দেশকে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করে।"

অমিয় বলিল, "তা হ'লে বলতে চান ওগুলি না থাকাই ভাল?"

যুবক বলিল, "তা আমি জানি না। যেখানে পাপ সেইটুকু শুধু আমার চোখে পড়েছে, প্রতিকার কিসে, কোন দিন তা ভাবি নি।"

অমিয় বলিল, "তা হ'লে খদ্দর পরাকে পাপ বলবেন না। প্রকৃত সাধুর ভান ক'রে জালিয়াতও সাধু হয়েছেন এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে। খদ্দর পরাকে আপনি পাপ বলবেন না।"

যুবক হাসিয়া বলিল, "না, বলব না। বরং আমরা দরিদ্ররা কৃতজ্ঞই থাকব। কেন না, ওর সামাজিক মূল্য আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গেই পেয়ে থাকি।"

কথা বলিতে বলিতে তাহারা হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে আসিয়া পড়িয়াছিল। অমিয় যুবকের প্রত্যুত্তরে কি বলিতে গিয়াই দেখিল, সে হাত তুলিয়া নমস্কারের ভঙ্গীতে বলিতেছে, "আমার বাঁ-দিকের পথ—তা হ'লে আসি।"

অমিয় সসঙ্কোচে সহসা প্রশ্ন করিল, "আপনার নামটি—"

যুবক মৃদু হাসিয়া বলিল, "নাম আমার বিশ্বজিৎ। একটু অদ্ভুত, নয় কি?"

অমিয় হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

বিশ্বজিৎ বলিল, "বাপ-মা ছেলের যশ, বিদ্যা, ধন, ইত্যাদির কামনা ক'রেই নাম রাখেন। বিশ্বজয়ের বদলে ছেলে যে নগণ্য রেল-আপিসের ত্রিশ টাকার একটি চাকরি জয় করেছেন—এই আনন্দেই তাঁরা নিজেদের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির প্রশংসা করতেন। সে-আনন্দের কল্পনা করতে পারেন কি, অমিয় বাবু?"

"আপনি আমার নাম জানলেন কি ক'রে?"

"পাঁচ হাজার বেকার যুবকের মধ্যে যিনি মহা ভাগ্যবান্ তাঁর নাম এবং কার্য্যাবলী জানা বিশেষ কিছু আশ্চর্য্যের নয়। আপনি থাকেন শ্যামবাজারে, তাও জানি। আর যা জানি, পরে বলব। নমস্কার।" বিশ্বজিৎ দ্রুতপদে বাম দিকের গলির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিশ্বজিৎকে অমিয়র অদ্ভুতই ঠেকিল। অনায়াসে সে আলাপ জমাইতে পারে, অনায়াসেই সে আলাপের সূত্র ছিঁড়িয়া পথের ভিড়ে মিশিয়া যায়। কে জানে, মনের মধ্যে তার শক্তি আছে কতটুকু? তাহার দারিদ্র্যই তাহাকে হয়ত তীব্র সমালোচক সাজাইয়াছে। তাহার মধ্যে তাই সে মন্দটাকে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে ভালবাসে এবং অদ্ভুত যুক্তি-সাহায্যে নিজের মতবাদ-প্রতিষ্ঠারও অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছে।

ক্রমশঃ

অকৃতজ্ঞ

শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার আপিস-ঘরের মধ্যে আমারই টেবিলের পাশে দেয়ালের গায়ে একটা তাকের উপরে কত কেজো-অকেজো কাগজ-পত্র স্তূপাকৃতি করা ছিল। সেই সব স্তূপের পিছনে আড়ালে ছিল এক জোড়া ধুতুরাফুলি আর ধুতুরা-বৃন্তি বেলোয়ারি ফুলদানী। তারই একটার মুখে একটা টুনটুনি পাখী বাসা করেছিল, বাচ্চাও হয়েছিল। বাচ্চাটি সদ্য ডিম থেকে ফুটে বেরিয়েছে।

এক দিন হঠাৎ কোথা থেকে একটা হলো বেরাল এসে এক লাফে টুনটুনি পাখীটিকে মুখে ক'রে লাফিয়ে পড়্‌ল। আমার প্রকাণ্ড কুকুর লোহাটা হাউ ক'রে তেড়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে হলো জানালার গরাদে গ'লে অদৃশ্য। গরাদের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড শরীর রোমাঞ্চিত ক'রে লোহাটা দু-বার ডাক্‌লে—ঘেউ ঘেউ!

লোহাটা চেষ্টা কর্‌তে লাগল তাকের উপরে টুনটুনির বাসার কাছে যাবে। কিন্তু তার পায়ের স্থিতি না পেয়ে কাতর স্বরে ডাক্‌লে—কেঁউ কেঁউ।

খানসামা যেনো একটা টেবিল এনে তাকের সাম্‌নে পেতে দিয়ে গেল। লোহাটা অমনি তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে ঘাড় কাত ক'রে টুনটুনির বাচ্চাটিকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, তার দৃষ্টিতে বিস্ময় আর মমতা। লালাসিক্ত লম্বা জিভ বার ক'রে লোহাটা ধীরে সন্তর্পণে বাচ্চাটির সর্বাঙ্গে বুলিয়ে বুলিয়ে দিতে লাগল। একবার ক'রে লোহাটার চাটা শেষ হয়ে যায় আর বাচ্চাটা সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কাঁপিয়ে তোলে।

লোহাটা লালাসিক্ত জিভের উপর অনেক খাবার মাখিয়ে নিয়ে পাখীর ঠোঁটের সাম্‌নে ধর্‌লে। পাখী নেহাৎ কচি। ঠোক্‌রাতে শেখে নি। লোহাটাই তার জিভ পাখীর ঠোঁটের ডগায় বুলিয়ে বুলিয়ে রসসিক্ত ক'রে দিতে লাগ্‌ল।

এমনি আদর-যত্নে পাখী এখন উড্ডুক্ হয়েছে। পাখী এদিক ওদিক ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে আর লোহাটার দুই ডাগর চোখ আনন্দে আর বিস্ময়ে ভ'রে ওঠে।

এখন পাখী ওড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গা দুলিয়ে লোহাটাও নাচে। তার লেজের সে কী আন্দোলন!

এক দিন পাখী উড়ে এসে মেঝের উপরে নেমেছিল। লোহাটা পরম আনন্দে ঘেউ ঘেউ শব্দ ক'রে লাফ দিয়ে গেল তার বৎসকে ধর্‌তে। পাখীটা ফুড়ুৎ ক'রে গরাদের ফাঁক দিয়ে উড়ে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই গরাদের ফাঁক দিয়েই এক দিন হলো বেরাল তার মাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিল, আর আজ সে হ'ল নিরুদ্দেশ।

লোহাটা খানিকক্ষণ একেবারে অবাক্ হয়ে চুপ ক'রে রইল। বিস্মিত কৌতূহলী দৃষ্টিতে বারংবার বাইরে দেখতে লাগল, কোথাও যদি তার বাছার কোনো উদ্দেশ পায়। ডেকে উঠল ঘাঁউ—কেউ সাড়া দিলে না। সারাদিন উৎসুক প্রতীক্ষায় কাট্‌ল। তখন লোহাটা ডেকে উঠল কেঁউ কেঁউ—বড় করুণ ব্যথিত বিস্মিত সেই কাতরানি।
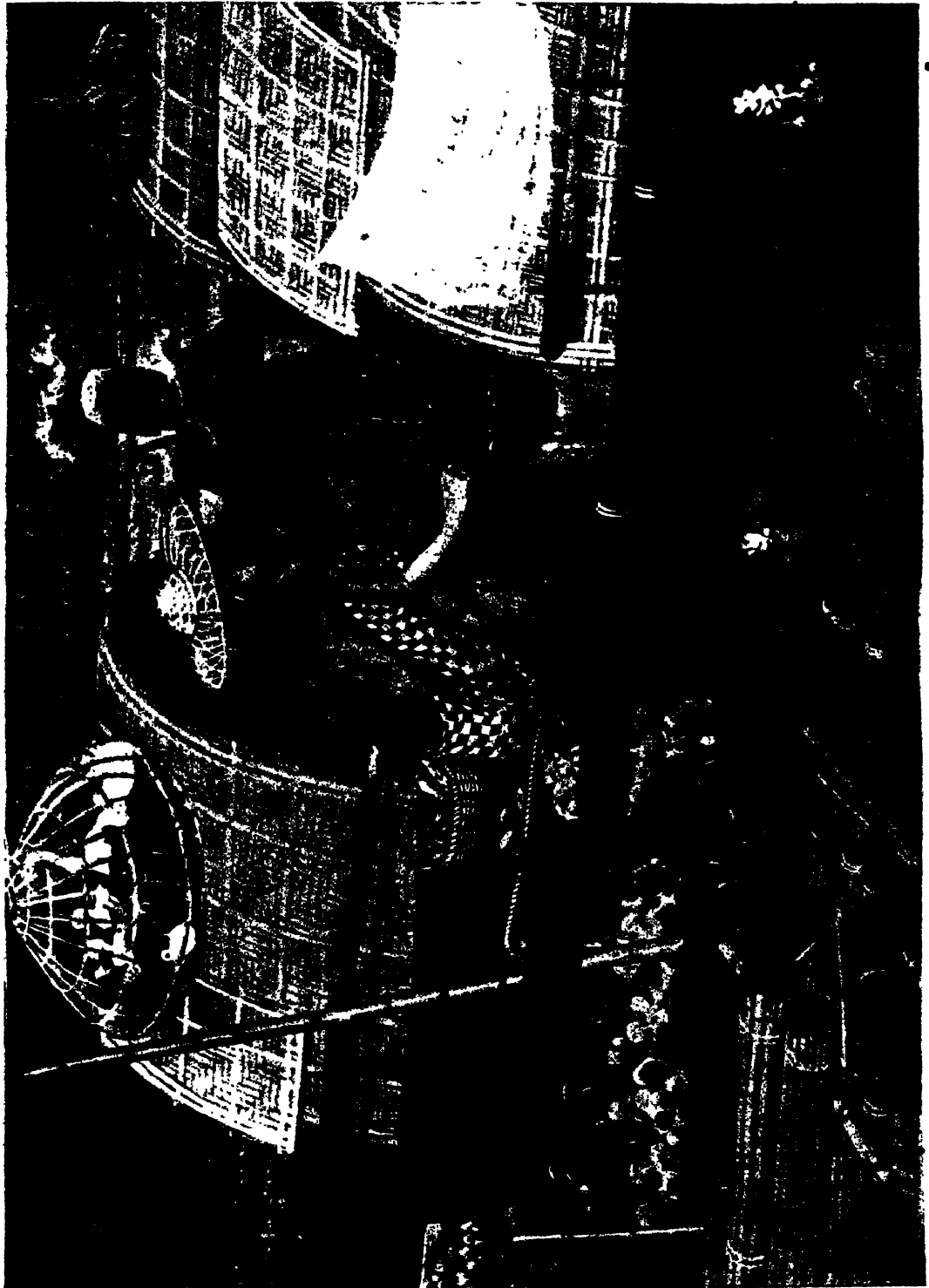
মশকভুক্ মাছ

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ম্যালেরিয়া-রোগোৎপত্তির প্রকৃত কারণ নির্ণয়কে উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলা যাইতে পারে। এই আবিষ্কারের ফলে জানা গেল, কোন দূষিত বায়ু হইতে এই রোগ উৎপন্ন হয় না, পরন্তু মশক-দংশনেই এই রোগ এক ব্যক্তির শরীর হইতে অন্য ব্যক্তির শরীরে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন জাতীয় মশক দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের দংশন পীড়াদায়ক হইলেও সবগুলিই এ-রোগ সংক্রমণের জন্য দায়ী নহে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার মশকের অন্ততঃ তিনটি বিভিন্ন শ্রেণী ম্যালেরিয়া ও তদনুরূপ অন্যান্য রোগের বীজাণু বহন করিয়া থাকে। মশক-বংশ উচ্ছেদ করাই ম্যালেরিয়া-নিবারণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। কয়েকটি উপায়ে এই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। যে-সকল জলাশয়ে মশক জন্মগ্রহণ করে সেগুলি বুজাইয়া দেওয়া, অন্যথায় জলের উপর তেল ঢালিয়া দেওয়া। তেল ঢালিয়া দিলে তাহা জলের উপর একটা পাতলা পর্দ্দার মত ছড়াইয়া পড়ে। মশার বাচ্চাগুলি জলের নীচে থাকে এবং কিছুক্ষণ পরেপরেই শ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য শরীরটাকে অদ্ভুত উপায়ে আঁকাবাঁকা করিয়া কিলবিল করিতে করিতে উপরে উঠিয়া আসে। কিন্তু তেলের পর্দ্দার জন্য বাতাস লইতে পারে না এবং অতি সহজেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এতদ্ব্যতীত ইহাদের স্বাভাবিক শত্রুসংখ্যাও অনেক। মশক-অধ্যুষিত স্থানে এইরূপ কোন শত্রু বৃদ্ধি পাইবার সুবিধা করিয়া দিলে তাহাতেও আশানুরূপ ফল লাভ করা যাইতে পারে। কোন কোন জাতের বাদুড় নাকি মশকভোজী, এই জন্য টেক্সাস প্রভৃতি অঞ্চলে বাদুড়ের আবাসস্থল নির্ম্মাণ করিয়া মশক-ধ্বংসের চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতে কোন ব্যাপক ফললাভের সম্ভাবনা নাই। বিভিন্ন জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য মশার বাচ্চা খাইয়া থাকে। যে-সকল বদ্ধ জলাশয়ে মশককুল বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা সে-সব স্থানে এই জাতীয় মাছ ছাড়িয়া আশানুরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে।

১। লাল চাঁদামাছ ২। পুঁটিমাছ ৩। জলবিছু ৪। খলসে ৫। সাদা চাঁদা ৬। ডানকুনি ৭। খলসে ৮। লাল চাঁদা ৯। ডানকুনি

আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতীয় মশকভুক্ মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বদ্ধ জলাশয়, নালা-ডোবায় বিচরণ করিয়া মশককুলকে যথেচ্ছ বিনষ্ট করিয়া থাকে। এস্থলে এই জাতীয় কয়েকটি মাছের বিষয় আলোচনা করিতেছি।

বিস্তৃতই হউক বা অপরিসরই হউক, বদ্ধ জল পাইলেই মশকেরা সেখানে ডিম পাড়িয়া থাকে। আমাদের দেশে ডোবা, নর্দ্দমা হইতে আরম্ভ করিয়া খাল, বিল, নালা ও বদ্ধ জলাশয়ে একসঙ্গে কতকগুলি করিয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মশার ডিম ভাসিতে দেখা যায়। দুই তিন-দিনের মধ্যেই ডিম ফুটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুঁয়োপোকার মত বাচ্চা বাহির হয়। ডিম হইতে বাহির হইয়াই তাহারা কিলবিল করিয়া আহারান্বেষণে জলের নীচে চলিয়া যায় এবং মাঝে মাঝে উপরে উঠিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে।

কই মাছ
ছোট তেচোখো মাছ
শোল মাছের বাচ্চা

অভিজ্ঞতা ও নানা প্রকার পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে,
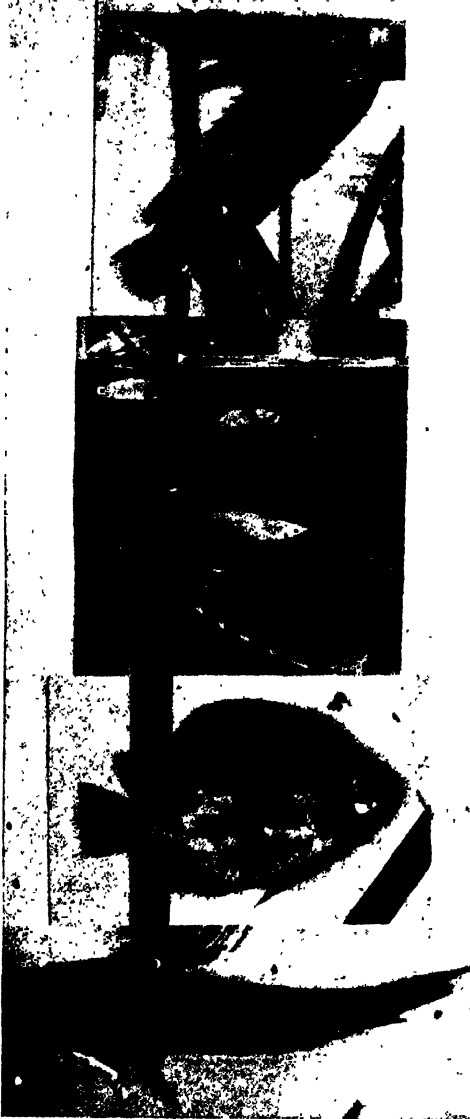
উপরে : বড় তেচোখো মাছ
মধ্যে : ল্যাঠা মাছ
নীচে : লাল মাছ

তেচোখো নামক এক প্রকার ভাসমান মৎস্যই প্রচুর পরিমাণে মশার বাচ্চা ধ্বংস করিয়া থাকে। আমাদের দেশের বদ্ধ জলাশয় ও নালা ডোবা প্রভৃতির মধ্যে সাধারণতঃ দুই জাতীয় তেচোখো মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। বড়গুলির পৃষ্ঠদেশের রং ধূসর এবং মস্তকের দিক উপরে নীচে চেপ্টা. ইহারা এক ইঞ্চিরও কিছু বেশী লম্বা হইয়া থাকে। ইহারা সর্ব্বদাই জলের উপরিভাগে ভাসিয়া বেড়ায়; জলের নীচে ডুবিয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না বড় বড় মাছের ভয়ে কখনও জলাশয়ের মধ্যস্থলে যাইতে চাহে না, পুকুরের ধারে ধারে [illegible] লতাপাতার কাছে কাছেই অবস্থান করে। ইহাদের মস্তকের উপরিভাগে উজ্জ্বল রূপালি রঙের একটি ফোঁটা থাকে, এই জন্যই বোধ হয় ইহাদের নাম 'তেচোখো' হইয়াছে। বড় তেচোখো মাছেরা কদাচিৎ দলবদ্ধ ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রায়ই ইহাদিগকে একাকী ভাসিয়া থাকিতে দেখা যায়। মশার বাচ্চাগুলি কিলবিল করিয়া জলের উপরে উঠিয়া আসিবার সময় নজরে পড়িলেই ছুটিয়া গিয়া তাহাদিগকে গিলিয়া ফেলে। ইহারা যে কেবল মশার বাচ্চা

উপরে: পারসে মাছ
নীচে: কলুই মাছ

১। বাতাসী মাছ ২। মৌরলা ৩। আমলেট ৪। কেশা

খাইয়াই জীবনধারণ করে তাহা নহে, জলে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ ও শেওলা প্রভৃতিই ইহাদের প্রধান আহার।

ছোট তেচোখো মাছগুলি কদাচিৎ ইঞ্চি-খানেক লম্বা হয়। বড়গুলির শরীর কতকটা গোলাকার, কিন্তু ছোটগুলির দেহের দুই পার্শ্ব অপেক্ষাকৃত চেপ্টা। দেহের রং ঈষৎ নীলাভ সাদা এবং শরীর সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। এই মাছগুলি সর্ব্বদাই দলবদ্ধ ভাবে জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়, আবছা কিছু দেখিলেই অথবা কোন কারণে একটু ভয় পাইলেই তৎক্ষণাৎ জলের নীচে ডুবিয়া লুকাইয়া থাকে। ভয় কাটিয়া গেলেই আবার ভাসিয়া উঠিয়া দলে ভিড়িতে থাকে। ইহারাও বড় মাছের ভয়ে জলাশয়ের মধ্যস্থলে পরিষ্কার স্থানে থাকিতে চাহে না। সর্ব্বদাই জলজ লতাপাতার আড়ালে অতি সন্তর্পণে শিকারান্বেষণে ব্যাপৃত থাকে। মশার বাচ্চা দেখিতে পাইলেই ইহারা ছুটিয়া গিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া খাইয়া ফেলে।

কিন্তু নানাবিধ পরীক্ষার ফলে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয়, তেচোখো মাছ অপেক্ষা বিভিন্ন জাতীয় চাঁদামাছ বদ্ধজলাশয়োৎপন্ন মশক-শিশুদের অধিকতর শত্রুতা সাধন করিয়া থাকে। এই মাছগুলি দেখিতে গোলাকার এবং শরীরের দুই পার্শ্ব একেবারে চেপ্টা। মাছগুলি সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছ এবং দেহের রং সাদা। পিঠের উপরে ও পেটের নীচে পাখনার কাঁটাগুলি শক্ত ও ধারালো। জল হইতে ধরিয়া তুলিলেই পাখনাগুলি ছড়াইয়া অজস্র লালা নিঃস্রাব করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন এক প্রকার অব্যক্ত ঝিন ঝিন শব্দ করিতে থাকে। দেহের গঠন সম্পূর্ণ চেপ্টা হওয়ার ফলে ইহারা অন্যান্য মাছ অপেক্ষা জলের প্রতিবন্ধকতা কাটাইয়া অধিকতর দ্রুতগতিতে ছুটাছুটি করিতে পারে, এবং শরীর স্বচ্ছ বলিয়া জলের নীচে সহজে ইহাদিগকে নজরে পড়ে না। ইহারা যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত মশক-শিশুগুলিকে ধরিয়া ধরিয়া খায় তাহা প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়। কোন স্থানে একবার মশার বাচ্চার সন্ধান পাইলেই হইল; অতি সতর্ক দৃষ্টিতে চতুর্দিক খোঁজাখুঁজি করিয়া তাহাদিগকে একেবারে নির্ম্মূল না-করিয়া সে-স্থান পরিত্যাগ করে না। আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতীয় কয়েক রকমের চাঁদা-মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। পরিণতবয়স্ক সাদা চাঁদা ও বাচ্চা লাল চাঁদারাই মশক-ভক্ষণে অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকে। পায়রা-চাঁদার বাচ্চাকেও মশক-শিশু উদরস্থ করিতে দেখা যায়; কিন্তু বড় হইলে বোধ হয় ইহারা আর এত ক্ষুদ্র জিনিষের উপর নজর দেয় না। এই মাছগুলিও দুই পাশে চেপ্টা, গায়ের রং পিঠের দিকে কালো ও পেটের দিকে হরিদ্রাভ সাদা। গায়ে কতকগুলি কালো কালো ফোঁটা দেখিতে পাওয়া যায়। এই মাছ সাধারণতঃ অপরিসর জলাশয়ে বাঁচে না।

ডানকুণি নামে প্রায় দেড় ইঞ্চি দুই ইঞ্চি লম্বা এক প্রকার ছোট ছোট মাছ আমাদের দেশে বদ্ধ জলাশয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরের উপরিভাগ কাল্‌চে সবুজ ও নীচের দিক্ সাদা। কান্‌কো হইতে লেজ পর্য্যন্ত পেটের উভয় পার্শ্বে লম্বালম্বি ভাবে একটা কালো রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাও প্রায়ই দলবদ্ধ ভাবে জলের নীচে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় এবং নানা রকম জিনিষ খাইয়া জীবনধারণ করে, কিন্তু মশার বাচ্চা দেখিতে পাইলে তাহাদিগকে ধরিয়া টপ্ টপ্ করিয়া গিলিয়া ফেলে।

আমাদের দেশের কই ও খলসে মাছ প্রচুর পরিমাণে মশক-শিশু উদরস্থ করিয়া থাকে। ইহারা প্রায়ই জলজ লতাপাতা-পরিপূর্ণ অপরিষ্কৃত বদ্ধ জলাশয়ে বিচরণ করিয়া থাকে। এই সব স্থলে প্রচুর পরিমাণে মশার বাচ্চা জন্মিলেও তাহাদের অধিকাংশই এই মাছের কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়া থাকে। কই ও খলসে মাছ বড় হইয়া উঠিলে অবশ্য কেবলই মশার বাচ্চার উপর নির্ভর করে না; কিন্তু অপরিণত অবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মশক-শিশু উদরস্থ করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জিয়ল মাছের মধ্যে কই ও

খলসে মাছ ছাড়াও ল্যাঠা, শোল প্রভৃতি মাছেরা প্রচুর পরিমাণে মশার বাচ্চা খাইয়া থাকে। ল্যাঠা মাছ পরিণত ও অপরিণত সকল অবস্থাতেই মশার বাচ্চা উদরস্থ করে কিন্তু শোল মাছের ছোট ছোট বাচ্চাগুলি যেরূপ মশার বাচ্চা খাইবার জন্ত ওৎ পাতিয়া থাকে, বড় হইলে আর ততটা করে না। বোধ হয় পরিণত বয়সে যথেষ্ট বড় শিকার জুটাইবার ক্ষমতা জন্মে বলিয়া ক্ষুদ্র জিনিষের উপর ততটা নজর দেয় না।

কাচের টবের মধ্যে যে-সকল বিভিন্ন রকমের লাল মাছ পুষিতে দেখা যায় তাহাদের অনেকেই মশার বাচ্চা অতি উপাদেয় বোধে ভক্ষণ করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে চেলা-জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েক রকমের মাছ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের মধ্যে বাতাসী ও খুক-চেলী মাছেরা মশার বাচ্চা খাইতে ভালবাসে। ইহারা সকলেই দলবদ্ধ ভাবে আহারান্বেষণে বদ্ধ পুকুরের জলে ঘোরাফেরা করিয়া থাকে। বাতাসী মাছ দেখিতে খুব সাদা ও চেপ্টা। পিঠের উপরের রং কালচে সবুজ। এই মাছের শরীর উপরের দিকটা ধনুকের আকারে ঈষৎ বাঁকা হইয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত চলাফেরা করে। সময়ে সময়ে জলের উপর উড়ন্ত মশা-মাছিকেও লাফাইয়া শিকার করিয়া থাকে।

বিভিন্ন জাতীয় পুঁটি, মৌরলা, ফেশা আমলেট, কলুই, পারসে প্রভৃতি মাছ অপরিণত অবস্থায় মশার বাচ্চা খাইয়া থাকে। যে-সব বদ্ধ জলাশয়ে ইহারা জন্মায় সে-স্থলে মশার বাচ্চাই বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য খাদ্য বলিয়া ছোটবেলায় তাহাদিগকে বেশীর ভাগই ইহাদের উপর নির্ভর করিতে হয়।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন জাতীয় অন্যান্য মাছেরাও কমবেশী মশককুল ধ্বংস করিয়া থাকে। মাছের কথা ছাড়িয়া দিলেও বিভিন্ন জাতীয় জলপোকা, ব্যাঙাচি প্রভৃতি মশক-শিশু উদরস্থ করিয়া থাকে।

ম্যালেরিয়ার বীজাণুবাহী মশককুল নির্মূল করিতে হইলে তাহাদের উৎপত্তিস্থলে এই সব বিভিন্ন জাতীয় মাছ ছাড়িয়া দিলে অনেকটা সুফল পাওয়া যাইতে পারে সত্য, কিন্তু মশকেরা কেবল বদ্ধ জলাশয়, নালা-ডোবাতেই ডিম পাড়ে না, যে-কোন রকম অপরিসর স্থানে জল জমিয়া দুই-চার দিন থাকিলেই সেখানে মশার বাচ্চা কিলবিল করিতে দেখা যায়, ইহাদিগকে তো আর মাছের সাহায্যে বিনষ্ট করা যায় না। বিশেষতঃ এসব মাছের কোনটাই অপরিসর নালা-ডোবার মধ্যে বাঁচে না। কোনগতিকে বাঁচিয়া গেলেও নালা-ডোবায় প্রচুর পরিমাণে ব্যাঙাচি ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের জলপোকা জন্মে। এই মাছেরা সেখানে ডিম পাড়িলেও এ-সব অনিষ্টকারী প্রাণীরা তাহাদের ডিম খাইয়া ফেলে, কাজেই কোন রকমেই বংশবৃদ্ধি হয় না। এ-সব ক্ষেত্রে একমাত্র কোলা-ব্যাঙের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। ইহাদের ব্যাঙাচিগুলি প্রচুর পরিমাণে মশার বাচ্চা খাইয়া থাকে। কিন্তু কালো রঙের ব্যাঙাচিরা মশার বাচ্চা খায় না। মশকভুক্ ব্যাঙাচিরা অপরিসর স্থানে ডোবা, নর্দমা এমন কি কর্দমাক্ত অল্প জলেও বেশ আরামে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কাজেই ইহাদিগকে ঐ সব স্থানে ছাড়িয়া দিলে মশককুল বিনষ্ট হইতে পারে। এমন কি, এই ব্যাঙাচিগুলিকে অপরিষ্কৃত জলের ট্যাঙ্কের মধ্যে ছাড়িয়া দিলেও সেখানে মশার বাচ্চা খাইয়া অতি আনন্দে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

[প্রবন্ধের ছবিগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত]

শিশুদের পথ চলিবার শিক্ষা

পথে বাহির হইলে আজকাল প্রাণ হাতে লইয়া বাহির হইতে হয়—কখন গাড়ী-চাপা পড়ি ঠিক নাই। শিশুদের পক্ষে তো রাজপথ আজ মৃত্যুর পথ। গ্রাম্য লোকদেরও শহরে সেই অবস্থা,—একটু একটু করিয়া দেখিয়া-দেখিয়া তাহারা শহরে পথ-চলার নিয়ম বুঝিয়া উঠে, তখন কতকটা নিরাপদ হয়। কিন্তু শিশুদের কি কোন ব্যবস্থা করা যায় না? তাহাদেরও প্রথমাবধি এই পথ-চলা শিক্ষা দিলে কেমন হয়?

ইংলণ্ডে সেই ব্যবস্থাই হইয়াছে। বৎসরে বিলাতের রাজপথে অপমৃত্যু হয় ৬৫০০ লোকের; দুর্ঘটনা ঘটে ২ লক্ষ ২৫ হাজারের।

ছোটদের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ। শিশুরা "পুলিসের" সাহায্যে রাস্তা পার হইতেছে

ইহার মধ্যে হাজার-খানেক যাহারা মরে তাহারা ১১ বৎসরেরও কম বয়স্ক; আর যাহারা আহত হয় তাহাদের প্রায় ৪০ হাজার বালক-বালিকা। এই সংখ্যা দেখিয়াই পথের নিয়ম ও যানবাহনের দস্তুর শিশুদিগকে শিখানোর চেষ্টা চলিয়াছে। লণ্ডনের কোন কোন স্কুলে এইরূপ ছোট পথ, ক্ষুদে গাড়ী, ট্রাফিক্ পুলিস, পথচারী, এমন কি ডাক্তার, নার্স ও আহতের আত্মীয়-পরিজন পর্যন্ত পথের দুর্ঘটনায় কি কি করে, তাহা শিশুদের দেখাইবার ও বুঝাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। শিশুরা নিজেরাই সাজে পুলিস, নিজেরাই সাজে পথচারী, ভিড়ও করে তারা; আবার নার্স সাজিয়া সেবা করা বা শোকাকুলা মাতা সাজিয়া চাপা-পড়া ছেলের জন্য ক্রন্দন করা—এই সব অভিনয়ও তারাই করে। এমনি দুখানা চিত্র এখানে দেওয়া হইল। একটিতে ছেলেমেয়েরাই নিরাপদ (safety) অক্ষর হইয়া দাড়াইয়াছে আরটিতে এক দুর্ঘটনার অভিনয়।

এক জন বালক "পুলিস" আহতের সাহায্য করিতেছে

ইংলণ্ডের শিক্ষাব্রতীরা এই শিক্ষার উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া সকল শহরের বিদ্যালয়েই ইহা প্রবর্তিত করিতে চান।

আমাদের কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা-বিভাগ কি এইরূপ একটি বাস্তব শিশু-শিক্ষা প্রণালী গ্রহণ করিতে পারেন? ইহা বহুব্যয়সাধ্য হইবার কথা নয়।

সুরদাস

শ্রীজীবনময় রায়

চোখের আঁধার আঁধার ঘুচেছে অন্ধ নয়নে আজি,
মুছে গেছে আজ ছায়া-আলোকের মায়া-মরীচিকা লিখা;
আলোক-সিন্ধু উথলিছে কোথা নবীন ভুবন কূলে,
এখনো কি তব হয় নি সময়! এখনো রবে কি দূর?

নয়নের আলো বিশ্বজগতে এনেছিল ভিড় করি,
আড়াল করিয়া রেখেছিল ঘেরি তোমারে সবার আড়ে;
তারি মাঝে মাঝে ক্ষণিক দীপ্তি হানি তব রূপশিখা,
চিত্ত করেছ উন্মুখ মোর অরূপের আহ্বানে।

আজিকে আমার চোখের ভুবন নিবে গেছে আঁধিয়ারে,
অরূপের জ্যোতি চিত্ত ভরিল উদয়-অচল-শিরে;
রেখা-রঞ্জন বঞ্চনা আজ ফুৎকারে কোথা লীন,
আধেক দেখার দৃষ্টি নিবিল রূপের অস্তাচলে।

চোখের আঁধার আঁধার ঘুচিল আজিকে অন্ধ আঁখি,
এখনো কি হায় হয় নি সময় এখনো কি রবে দূর?

জাপান ভ্রমণ

শ্রীশান্তা দেবী

জাপানে রোদের চেয়ে বৃষ্টিই বেশী হয়। আমাদের ভাগ্য-ক্রমে আমরা বৃষ্টি বেশী ভোগ করি নি, তবে টোকিওতে এসে পর্য্যন্ত খালি মেঘই দেখতাম। একে ত শীতের দেশ ব'লে সমস্ত ঘর কাঠ দিয়ে বন্ধ ক'রে ঘুমোতে হয়, তার উপর সকালে তেমন রোদ ওঠে না; বন্ধ ঘরে ভোর বেলা দিন কি রাত সহজে বোঝা যায় না। কাজেই আমাদের মত নূতন মানুষদের সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠতে ন'টা বেজে যেত। ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে হঠাৎ রোদ হ'তে সুরু করল। কাঠের বেড়ার জোড়ের ফাঁক দিয়ে দিয়ে সকালে রোদ এসে মুখে পড়তে লাগল। কাজেই ঘুমও ভেঙে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে কাঠের বেড়া সরিয়ে দিয়ে শাসি টেনে দিলাম। আলোয় আলোয় ঘর ভরে গেল। এত আলো এ-দেশে সর্ব্বদা হয় না।

কামাকুরার করুণা দেবী

জাপানে যারা আপিসে কারখানায় যায় তারা সকালে উঠে খেয়ে দেয়েই বেরিয়ে পড়ে। কাজেই সকালবেলা সকলের বাড়ীতেই খুব হুড়োহুড়ি থাকে। সেইজন্যে বাড়ীর পুরুষরা বেরিয়ে না গেলে আমরা নীচে নামতাম না। বাড়ীর গৃহিণীর ও ঝিদের যেন আমাদের জন্য বিব্রত হ'তে না-হয় এটা আমাদের দেখা কর্ত্তব্য। পুরুষরা বেরিয়ে গেলে আমরা মুখ ধোওয়া ব্রেকফাষ্ট খাওয়া সুরু করতাম। তার আগে উপরে শোবার ঘরে বসে বসে কিছু লেখাপড়া করা যেত, কারণ সারাদিনে বেড়ানোর হ্যাঙ্গামে এবং গল্পগাছায় পড়াশুনার সময় আর পাওয়া যেত না।

১৭ই আমরা কামাকুরার জগদ্বিখ্যাত বুদ্ধমূর্ত্তি দেখতে যাব ঠিক করলাম। সকালে খাওয়া দাওয়ার পর মজুমদার-গৃহিণীর কাজ হয়ে যেতেই তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। পথে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মাদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিল। এদেশে এসে এই ক'দিনে যত খোকাখুকী দেখেছিলাম দেশে এক বছরেও তা দেখি না। বাঙালী মায়েরাও ঘরে বন্দী, শিশুরাও তাই। এখানকার খোকাখুকীরা এমন সুন্দর! মোটা-সোটা হাসিখুশী, গাল দিয়ে যেন রক্ত ফেটে পড়ছে। ভারী গালের চাপে খ্যাদা নাক আর ছোট চোখ প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। দেখলেই লুফে নিতে ইচ্ছে করে। আমাদের পাড়াটা ছিল একটা পাহাড়ের উপরে।

বাড়ীর থেকে বেরিয়ে দুটো একটা বাঁক ফিরেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাওয়া যায় ওমোরি ষ্টেশনে। কয়েক মিনিট অন্তর সেখান থেকে বৈদ্যুতিক ট্রেন ছাড়ে। থার্ড ক্লাসের টিকিট কেটে ইয়োকোহামা চললাম। ওদেশের থার্ড ক্লাসই এ-দেশের সেকেণ্ড ক্লাসের চেয়ে ভাল এবং ও-দেশের সেকেণ্ড ক্লাসেরই মত, খালি ভীড় একটু বেশী।

করুণা দেবীর মন্দিরে পূজা অর্ঘ্য

আজ আকাশ পরিষ্কার, উজ্জ্বল আলো, ট্রেন থেকে দু-ধার স্পষ্ট দেখা যায়; দূরে বরফের রেখায় ঢাকা পাহাড়ের সারি নীল আকাশের গায়ে ঝক্ ঝক্ করছে, ঠিক যেন পালিশ-করা ইস্পাত; তার মাথার উপর উঁচু হয়ে চিরতুষারাবৃত শুভ্র ফুজি পাহাড়ের চূড়া ধ্যানসমাহিতের মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে। চূড়ার কাছে এক টুকরা সাদা মেঘ জড়িয়ে আছে। এত দিন ধ'রে ছবি দেখেছি, বর্ণনা শুনেছি, আজ নিজের চোখে ফুজি দেখলাম। বাস্তবিক কি নিখুঁৎ গড়ন। যেন কোন্ মহাশিল্পী আকাশের ও দিক্‌চক্রবালের রেখা ও গড়নের সঙ্গে মিলিয়ে একে সাজিয়ে রেখে গিয়েছেন।

ফুজি পাহাড়ের চূড়াটি খাজকাটা বাটির মত গোল গর্ত্ত করা, এক সময় আগ্নেয়গিরির মুখ ছিল, এখন নির্ব্বাণ লাভ করেছে। গ্রীষ্মের দিনে পাহাড়ের নীচের দিকের বরফ গলে যায়, মাথাটি শীত গ্রীষ্ম সর্ব্বদাই শুভ্র তুষারে ঢাকা। ফুজি পাহাড়ের ঢালটি খুব দীর্ঘ এবং অত্যন্ত অল্প অল্প ক'রে উঠেছে। হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠলে এর এ সৌন্দর্য্য থাকৃত না।
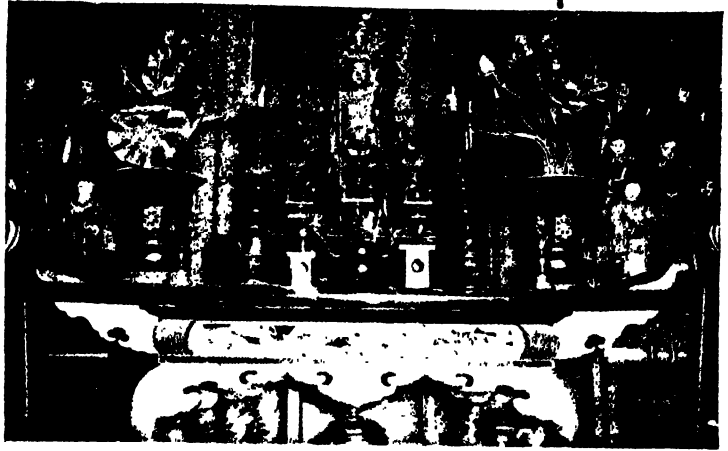
ফুজি পাহাড়ের সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার জন্য দর্শকেরা সচরাচর হাকোনে নামক একটি সুন্দর জায়গায় গিয়ে থাকেন। জাপানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, হ্রদের শ্রী ও গরম ফোয়ারার জন্যও এটি বিখ্যাত।

কামাকুরার করুণা দেবীর ঘণ্টা

ইয়োকোহামা ষ্টেশনে ট্রেন বদলে কামাকুরার ট্রেন ধরতে হয়। ষ্টেশনগুলিতে ইংরেজী অক্ষরেও নাম লেখা আছে, বোধ হয় এসব দিকে অনেক টুরিষ্ট আসে ব'লে এই ব্যবস্থা। অনেক ছোট ষ্টেশনে ইংরেজী অক্ষর মোটেই চোখে পড়ে না। ষ্টেশনের কাছেই অনেক ট্যাক্সি ও বস্ দাঁড়িয়েছিল যাত্রী নেবার জন্য। আমরা তিন জন বস্ ধরতে ছুটলাম। বস্‌টা চলে যাচ্ছিল, তিন জন বিদেশী মেয়েকে দেখে দাঁড়াল। টিকিট-বিক্রেত্রী মেয়েটি হেসে আপনী

করুণা দেবীর মন্দিরে অন্যান্য দেবদেবী

রঙের লাল কাঠের তোরণ-দ্বার, তার মাথা জাপানী কালো টালি দিয়ে ছাওয়া। তোরণের ভিতর দুই ধারে লোহার জালের খাঁচায় তিন-চার মানুষ উঁচু মস্ত বড় দুই দ্বাররক্ষী ভৈরবমূর্ত্তি। এই বিকটাকার মূর্ত্তিগুলি জাপানের মন্দিরে খুব দেখা যায়। এরকম ক্রুদ্ধ বলদর্পিত মুখ ও অঙ্গভঙ্গী জাপানী শিল্পীরা ছাড়া আর কেউ করতে পারে কি না জানি না। তোরণের পর ভিতরের পথ, তার দুই ধারে সুন্দর বাগান, তীর্থযাত্রীরা নীরবে চলেছেন। বাগানে শীতে একটিও ফুল নেই। পথের শেষে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে পাথরের বিরাট বেদীর উপর ব্রঞ্জের বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি উপবিষ্ট। সম্মুখে ভক্তরা ধূপ জ্বালিয়ে দিয়ে যান, দু-পাশে দুটি প্রকাণ্ড দীপাধার, আর কোনও সাজ-সরঞ্জাম পূজোপকরণ কি ফুলদানি নেই। মাথার উপর মন্দিরের আবরণ নেই, উন্মুক্ত নীল আকাশের চন্দ্রাতপের তলে ঘন অরণ্যানীশোভিত সবুজ পাহাড়ের সম্মুখে দু-পাশে দুটি প্রকাণ্ড সুদীর্ঘ পাইন গাছের মাঝে উপবিষ্ট বিরাট ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি। বহু বৎসরের ঝড়ে জলে রোদে মূর্ত্তিটি সবুজ কলঙ্করেখা-অঙ্কিত, কিন্তু কি অপূর্ব্ব প্রসন্ন শ্রী। বুদ্ধের শান্ত সমাহিত অচঞ্চল সকরুণ গভীর স্থৈর্য্য শিল্পীর হাতে কি আশ্চর্য্য ফুটেছে। মনে হয় না ব্রঞ্জের মূর্ত্তির দিকে চেয়ে আছি। যেন বুদ্ধের অনন্ত করুণা ও নিঃসীম শান্তি মূর্ত্ত হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। নারার বিরাট বুদ্ধের মূর্ত্তির তুলনায় এই মূর্ত্তি শতগুণ আশ্চর্য্য ভাবোদ্দীপক!

মূর্ত্তিটির মুখে সরু গোঁফের রেখা। আমাদের দেশে এই মূর্ত্তির ছোট সংস্করণ অনেক দেখা যায়, কিন্তু তাতে গোঁফ বোঝা যায় না। কপালে উঁচু একটি ফোঁটা। বহু পুরাকালে এখানে একটি কাঠের মূর্ত্তি ছিল। পাঁচ বৎসর ধ'রে খেটে শিল্পীরা সেটি ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দে শেষ করেন। ১২৫২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রোঞ্জ ঢালাই কাজ শেষ হয়।

আমাদের অভ্যর্থনা করল। এমন ক'রে কথা বলে যেন কতকাল আমাদের চেনে।

কামাকুরা দেখতে খানিকটা পল্লীগ্রামের মত, কিন্তু ভারি সুন্দর পরিষ্কার পথঘাট। কিছু পথ খুব বড় বড় গাছ রাস্তার দুধারে। মাঝে মাঝে খোলা নর্দ্দমা আছে, কিন্তু বিশেষ দুর্গন্ধ নেই।

বস্ আমাদের দায়াবুৎসু অর্থাৎ বিরাট বুদ্ধের উদ্যানের কাছে নামিয়ে দিল। বহু তীর্থযাত্রী এখানে আসেন, অনেকে কেবল দর্শনার্থী, অনেকে দেবতার কৃপা ভিক্ষা করতে আসেন। আমাদের দেশের মত এ-দেশেও দেবমন্দিরে বৃদ্ধদের ভীড় খুব। প্রায়ই দেখা যায় মন্দিরের সম্মুখে বৃদ্ধারা মাথা নত ক'রে দাঁড়িয়ে কি বসে আছেন। এ-দেশে স্ত্রীলোকদের কেউ কোনও কাজে সাহায্য করছে, প্রায় দেখা যায় না। কেবল মাঝে মাঝে দেখা যায় কোনও বৃদ্ধা মহিলাকে কোনও যুবক কি যুবতী ধ'রে মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছেন।

সেদিন মন্দির-প্রাঙ্গণে বেশী ভীড় ছিল না, শীতের দিনে বোধহয় বেশী লোক আসে না। সেদিন ব্যারোমিটার ২৮ ডিগ্রি পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছিল, তবে রোদ ছিল এই সুবিধা। প্রথম তোরণের সামনে পথের ধারে কতকগুলি খাড়া খাড়া পাথর, দুই-তিনটি পাথরে উঁচু ক'রে ছোট ছোট মূর্ত্তি খোদাই করা। তার পর সুন্দর সিঁদুরে-

কামাকুরার বুদ্ধের মুখশ্রী

করুণা দেবীর মন্দির, কামাকুরা

করুণা দেবীর মন্দিরে দেবমূর্তি

কামাকুরার বিরাট বুদ্ধ

প্রথমে বুদ্ধমূর্ত্তির জন্ত জাপানের প্রথামত এখানে একটি প্রকাণ্ড মন্দির ছিল; ১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রের বন্যার আক্রমণে মন্দির ভেসে চলে যায়। তখন থেকে মন্দিরহীন উদ্যানের মধ্যেই বুদ্ধ উপবিষ্ট। মন্দির না-থাকাতে এর সৌন্দর্য্য মানুষ এত ভাল করে উপভোগ করতে পারে। যে-সমস্ত পাথরের সাহায্যে মন্দিরের থামগুলি সুরক্ষিত ছিল তার অনেকগুলিই এখনও স্ব-স্ব স্থানে মজুদ আছে। আমরা যে খোদাইকরা পাথরগুলি দেখলাম সেগুলি ওইগুলিই হতে পারে।

এই অমিতাভ বুদ্ধ মূর্ত্তিটি পঞ্চাশ ফুট উঁচু, এর বেড় আটানব্বুই ফুট, মুখখানি সাড়ে-আট ফুট লম্বা।

মূর্ত্তির চোখ দুটি খাঁটি সোনায় তৈরি, যদিও দেখে তা বোঝা গেল না, ফোঁটাটি রূপার। লোকে বলে বন্যায় বুদ্ধমূর্ত্তির অনেক ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু আমাদের চোখে কিছু ধরা পড়ল না।

মূর্ত্তিটির ভিতরটি ফাঁপা, ভিতরে ঢোকবার পথ আছে। মূর্ত্তির পদ্মাসনের ডান দিকে একটি দরজার মত। সেখানে এক জন পুরোহিত পাহারায় থাকেন। তিনি আমাদের তিন জনের জন্ত ৬ সেন চাইলেন। ৬ সেন অর্থাৎ তিন পয়সা দিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকলাম। সিঁড়ি বেয়ে উপর দিকে প্রায় গলার কাছ পর্য্যন্ত ওঠা গেল। সেখানে একটি ছোট বারান্দার মত মাচা আর দুটি ছোট জানালা বুদ্ধের পিঠের দিকে। জানালা দুটি দিয়ে বাহিরের দৃশ্য ভারী সুন্দর লাগছিল। ভিতরে ছোট তাকে সোনার কিংবা গিল্টিকরা ছোট অমিতাভ বুদ্ধ মূর্ত্তি আছে। সেই মাচাটিতে পাশাপাশি জন-পঁচিশ বেশ দাঁড়িয়ে থাকা যায়। এতটা জায়গা যে জাপানী ধরণের একটা সংসার অনায়াসে পেতে বসা যায়। পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীদের যেখানে সেখানে নাম লেখা ও পিকনিক করার একটা বাতিক আছে, তা ছাড়া পূজামন্দির কি দেবমূর্ত্তিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌তে তারা ব্যস্ত নয়। সেই জন্ত বোধ হয় জাপানীরা এ-বিষয়ে তাদের সর্ব্বদা সতর্ক ক'রে দেয়। বুদ্ধমূর্ত্তির ভিতর এদেরই জন্ত ইংরেজী ভাষায় দুটি বিজ্ঞাপন লেখা আছে: "তুমি যে জাতি কিংবা ধর্মের লোক হও, এই বুদ্ধমূর্ত্তির ভিতর শ্রদ্ধাভরে প্রবেশ করিও, ইহাকে পঙ্কিল কি অপবিত্র করিও না।" এখানে জুতা খোলার অনুরোধ নাই, কিন্তু বিজ্ঞাপনটি সুন্দর।

বাইরে বেরিয়ে আমরা কার্ড কিনলাম এবং স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ খুব ছোট একটি বুদ্ধমূর্ত্তি কিনলাম। পিঠে বোঝা ও হাতে বই একটি ছোট মূর্ত্তি জাপানে অনেক জায়গায় দোকানে মন্দিরে হোটেলে দেখেছি, তাও একটি কিনলাম। এটি নাকি জাপানী বিদ্যালয়ের ছেলেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মত বিশেষ পূজার পাত্র। বোধ হয় কোনও অধ্যবসায়শীল দরিদ্র পণ্ডিতের মূর্ত্তি।

বুদ্ধমূর্ত্তি দেখে ফিরবার সময় পিছন ফিরে বার বার বুদ্ধের ধ্যানস্তিমিত চোখ ও প্রসন্ন উজ্জ্বল মুখের দিকে চাইছিলাম। ঘন সবুজ বনরাজির সম্মুখে ধ্যানরত মূর্ত্তি মহাতপস্যায় নিমগ্ন দেখে মন মুগ্ধ হয়, মনের সমস্ত অশান্তি সেই সময়ের মত কোথায় মিলিয়ে যায়। বাইরে এসে দেখলাম তোরণেও ইংরেজীতে লেখা: "হে অপরিচিত পথিক, তোমার জাতিধর্ম্ম যাহাই হউক, এই বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে শ্রদ্ধাভরে আসিও।"

মন্দিরের বাইরে ছোট ছোট দোকান সাজিয়ে সব বসে আছে। আমাদের দেখেই হেসে অভ্যর্থনা করল। দোকানে ঝিনুকের ও কাঠের খেলনা, বুদ্ধমূর্ত্তি, বাসনকোসন ইত্যাদি নানা জিনিষ বিক্রি হচ্ছে। যাত্রীরা হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে, কেউ কিছু বলে না। অনেক সময় দোকানদার সামনে থাকেই না। আমার মেয়ে ত সব খেলনাই একবার ক'রে তুলে তুলে দেখল। সামান্ত কিছু কিনতেই তারা খুব খুশী। যত্ন ক'রে কাগজের বাক্সে প্যাক ক'রে দিল, যেন পথে নষ্ট না হয়ে যায়। সব দোকানেই দেখলাম পুরুষ থাকলেও একটি ক'রে মেয়ে আছে; বোধ হয় দোকানের পিছনেই ওদের থাকবার ঘর, স্ত্রীপুরুষে মিলে দোকান চালায়।

কিছু খেলনা কিনে আমরা আহারের সন্ধানে বেরলাম। মজুমদার-গৃহিণী ভাল জাপানী জানেন; কাজেই তিনি পথচারিণীদের জিজ্ঞাসা করাতে তারা পথ ব'লে দিতে লাগল। আমাদের সঙ্গে গাড়ী কি পথপ্রদর্শক কিছুই ছিল না। একটা মন্দিরের কাছে ছোট একটি দোতলা বাড়ীতে হোটেল। আমরা গিয়ে ঢোকবামাত্র

একটি বৃদ্ধা ও একটি তরুণী হাস্যমুখে ছুটে এসে অভিবাদন করলে। তারা আমাদের জুতো খুলে দিতে ব্যগ্র হয়ে এল। আমার জুতার বোতাম নূতন রকম ছিল, মেয়েটি খুলতে না পারায় মহা বিব্রত হচ্ছিল। আমি নিজেই খুলে সিঁড়িতে উঠলাম। বৃদ্ধা বেশী যত্ন দেখিয়ে আমার হাত ধরে টেনে তুলতে লাগল। দোতলায় সুন্দর সুন্দর মাদুরের গদি ও কাগজের পরদা ও দেয়াল-দেওয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুন্দর ঘর। দেয়ালে জাপানী কালির আঁকা ছবি, ও তুলির লেখা অক্ষর টাঙিয়ে ঘর সাজান। পিঠে বোঝা পাঠরত একটি বড় মূর্ত্তি রয়েছে। সামনের দিকের একটি ঘর উঁচু, অন্যগুলি নীচু। উঁচু ঘরটিতে খাঁচায় রঙীন পাখী, চৌবাচ্চায় রঙীন হাঁস খেলা করছে। বদলে তাদের পায়ের রং।

মেয়েটি জাপানী মেন্থ নিয়ে এল। আমাদের সঙ্গে ভাষা বোঝবার মানুষ ছিলেন তাই রক্ষা, না হ'লে কিছুই বুঝতে কিংবা বোঝাতে পারতাম না। মেন্থ আনবার আগেই দুটি হিবাচিতে ক'রে ঘরে কাঠকয়লার আগুন দিয়ে গিয়েছিল হাত পা গরম করবার জন্ত। এবার মাঝখানে উঁচু চৌকি দিয়ে তার তিন দিকে জোড়া জোড়া ছোট গদি পেতে দিল বসবার জন্ত। তার পর এল হাত মুখ মোছবার গরম তোয়ালে। তোয়ালের পর জাপানী সবুজ চা অভ্যর্থনার প্রতীকস্বরূপ। সর্ব্বশেষে এল জাপানী রান্নাবান্না, ভাত ও কিছু মাছভাজা। আমরা কাঁটাচামচ চাইলাম, মেয়েটি তাও নিয়ে এল। খেতে বসে দেখলাম সব মাছগুলি টাটকা নয়। ক্ষুধা পেয়েছিল, অথচ শুধু ভাত ছাড়া আমাদের খাবার যোগ্য আর কিছু তাদের নেই। তরকারি চাইলাম, নেই। আলু সেদ্ধ চাইলাম, নেই। অগত্যা এক পেয়ালা ক'রে দুধ চেয়ে ভাত মেখে খাওয়া গেল। জাপানী ভাষায় বিল এল। তিন জনের খাওয়া, বিল ৪ ইয়েন। তার উপর কিছু বখ্‌শিশ আছে। খাবার যা দিয়েছিল, দাম তার তুলনায় বেশী। কিন্তু সব দেশের হোটেলেই তাই। আমাদের দেশেও যথেষ্ট নেয়। খাবারের চেয়ে ঘর, পরিবেশন, রাঁধুনী আর চাকরের জন্তই যেন বেশী দিতে হয়।

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার তারা জুতো পরিয়ে অনেক নমস্কার ক'রে হাঁটু পেতে ব'সে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় দিল। ভদ্রতা যেন তাদের শেষই হয় না। আমরা জাপানী ভাষায় ধন্যবাদ "আরিগেতো"টুকু কোন রকমে ব'লে প্রতিনমস্কার করলাম।

বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তির কাছেই আর একটি বিখ্যাত মন্দির আছে, মিসেস মজুমদার সেখানেও নিয়ে যাবেন বললেন। খাওয়া-দাওয়ার পরেই হেঁটে সেদিকে গেলাম। দূর থেকে মনে হচ্ছিল অনেক উঁচু পাহাড়ের উপর বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘেরা প্রকাণ্ড একটি "হট-হাউস" রয়েছে। কাছে গিয়ে বুঝলাম সেইটিই মন্দির, অনেক সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ের উপর উঠ্‌তে হয়।

পথের ধারে খানিকটা খোলা জায়গায় পত্রহীন কয়েকটি গাছে লাল সাদা প্লামফুল ফুটে আছে অনেক। তারই তলায় অনেকগুলি শ্রান্ত তীর্থযাত্রী বেঞ্চিতে ব'সে আছে। সিঁড়ির মাঝে মাঝে জন তিন চার ভিখারী কুকুর কোলে ক'রে বসে ভিক্ষা করছে। অর্দ্ধেক পথ উঠেই ছোট্ট একটি মন্দির, যেন মানুষের শ্রান্তি দূর করবার জন্তেই এইখানে স্থাপনা করা হয়েছে। একটু দাঁড়ালাম। মন্দিরে উপবিষ্ট একটি কাঠের বুদ্ধমূর্ত্তি। তার উপর গিল্টিকরা; মাঝে মাঝে কাঠ ফেটে ও রং উঠে গিয়েছে।

আবার উপর দিকে উঠ্‌তে লাগলাম। পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় প্রকাণ্ড মন্দির, দেখ্‌তে কিন্তু একেবারেই মন্দিরের মত নয়। বিয়ে-বাড়ীতে কিংবা কংগ্রেস-মণ্ডপে যেমন বড় বড় খুঁটি পুঁতে ছাউনি ক'রে সভা হয়, এ অনেকটা সেই রকম ছাউনি। জানি না মেরামত হচ্ছিল কি এই-রকমই তার সনাতন চেহারা। ছবিতেও অনেকটা এমনই দেখাচ্ছে। দেবমূর্ত্তির বেদী আরও অনেকটা উঁচু জায়গায়। ইনি দেবী, করুণার দেবী। দণ্ডায়মানা বিরাট দেবীমূর্ত্তির হাতে মালা ফুল ও কমণ্ডলু। মূর্ত্তিটি কর্পূর কাঠের তৈয়ারী, তার এগারটি মাথা, এবং বোধ হয় চারটি হাত। আধ অন্ধকারে প্রধান মাথাটিই চোখে পড়ে, বাকী দশটি ছোট ছোট মাথাকে মুকুটের অলঙ্কার মনে হয়। দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে নকল ফুল ও বাতি

সাজানো, ধূপ ধুনা সবই যথাবিধি আছে। পাশে চৌদ্দপনরটি অষ্ট দেবমূর্ত্তি। বাতি হাতে ক'রে একজন পুরোহিত আমাদের পাশের পথে ডাকলেন। সেখান দিয়ে ঘুরে পিছন দিকে গেলাম, অন্ধকার গর্ভগৃহের মত, অবশ্য একই সমভূমিতে। অনেক মোমের বাতি জলছে, কিন্তু তাতে অন্ধকার বেশী দূর হচ্ছে না। দেবীকে প্রদক্ষিণ করা বোধ হয় নিয়ম। দেবীর দীর্ঘায়ত মূর্ত্তির সামনে মাথা তুলে চালের দিকে তাকালেও মুখ ভাল করে দেখা যায় না। লম্বায় ৩০ ফুট তিন ইঞ্চি অর্থাৎ পাঁচ ছয় মানুষের সমান। ১২১৬ বৎসর আগে একটি মাত্র কর্পূর কাঠে মূর্ত্তিটি খোদাই করা হয়, তার পর আরও ছয় শত বৎসর পরে কাঠের উপর সোনার গিল্টি করা হয়েছিল। এখন দেখ্‌লে সোনার মূর্ত্তি বলে মনে হয়। বেদীর থেকে নীচে দরজার কাছে ছবির কার্ড বিক্রী হচ্ছে, কিছু আমরা কিনলাম। কিন্তু সবই জাপানী ভাষায় লেখা বলে বুঝতে কিছু পারলাম না। এদের মন্দিরে পাণ্ডার অত্যাচার ব'লে কিছু নেই। পয়সা কেউ একটাও চায় না।

পাহাড় থেকে নেমে ফিরবার পথে দেখ্‌লাম কাঠের ছোট ছোট ফলকে অসংখ্য জাপানী নাম লিখে উঁচু উঁচু ফ্রেমে কাঠের দেয়ালের মত সাজিয়ে রেখেছে। বোধ হয় দেবমন্দিরে পুণ্যার্থীরা পয়সা দিয়ে নাম লিখে রেখে গিয়েছে।

কামাকুরা জাপানের ইতিহাসে সুবিখ্যাত। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে এখানে সোগুন গবর্ণমেণ্টের রাজধানী ছিল। দুই শত বৎসর ধ'রে বিভিন্ন সোগুন বংশের হাতে কামাকুরার রাজধানীর কাজ চলেছিল। তার পরও বার বার এর ভাগ্যবিপর্য্যয় ও সৌভাগ্য লাভ ঘটেছে, কিন্তু পূর্ব্বগৌরব সে আর কোন দিন ফিরে পায় নি। এক সময় ত সামান্য জেলেদের গ্রামে পরিণত হয়েছিল। মেজি রাজার রাজত্বকাল থেকে কামাকুরার দিকে আবার জাপানের চোখ পড়ে। টোকিওতে নূতন রাজধানী হওয়ায় কামাকুরার সৌন্দর্য্য, ঐতিহাসিক খ্যাতি ও সুন্দর আবহাওয়া শহরের লোকদের এদিকে আকর্ষণ করতে লাগল। তখন থেকে এখানকার আবার অনেক উন্নতি হয়েছে।

এবার আর আমরা বাসের সন্ধানে গেলাম না। ঠিক করলাম হেঁটেই ষ্টেশনে যাব, তাহলে বেড়ানও হবে, দেখাও হবে। রাস্তার দু-পাশে সবই প্রায় নীচু নীচু বাড়ী। পথ কিন্তু খুব পরিষ্কার। মাঝে মাঝে খোলা ড্রেন দেখা যায়। মন্দিরের মত চূড়াওয়ালা দুই-একটা ভারী সুন্দর আধুনিক বাড়ী দেখা যায়, বোধ হয় এগুলি দোকান, মন্দিরের মত ক'রে গড়েছে। পথে সারি দিয়ে অসংখ্য মোটর চলেছে, এখানে যে লোক চলাচল খুব তা সহজেই বোঝা যায়। কিছু দূরে দুই ধারেই জুতা, খাবার, মিষ্টি ইত্যাদির দোকান। আমরা একটা দোকানে সওদা করতে ঢুকলাম। ওজন ক'রে মস্ত বড় বড় মুরগীর ডিম কেনা হল। দোকানদারদের সাজসজ্জা ব্যবস্থা সব ইউরোপীয় ধরণের। কাগজের মধ্যে ধানের তুঁষ দিয়ে ডিমগুলি প্যাক ক'রে দিল যাতে ভেঙে না যায়। রাস্তার একটা দোকানে দেখলাম মরা সাপ, বেঙ, গিরগিটি ইত্যাদি জীব শিশিতে আরকে ভরে বিক্রী হচ্ছে। জাপানীরা এই সব দিয়ে নাকি তুকতাক করে।

ষ্টেশনে এসে ট্রেনে উঠলাম। তখন স্কুল ছুটির সময়। পালে পালে ছোট ছেলেমেয়ে ট্রেনে ক'রে বাড়ী যাচ্ছে, সঙ্গে লোক নেই, জন নেই। এরা কখনও হারায় না, ওদের নাকি গলায় নাম ও ঠিকানা লেখা থাকে, বিপদ আপদ দৈবাৎ হলে তাতেই সব কাজ উদ্ধার হয়।

ট্রেনে আমাদের সবাই মহা কৌতূহলের সঙ্গে দেখতে লাগল। একে ত বিদেশী, তাতে তিন জনই মেয়ে। যাত্রীরা পরস্পরকে ঠেলে আমাদের পোষাক জাতি দেশ বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল। মিসেস মজুমদার যে তাদের কথা সব বুঝতে পারছিলেন তা তারা জানলে হয়ত এত কথা বলত না। একটি বৃদ্ধ দম্পতি আমাদের সঙ্গে ভাব করবারও চেষ্টা করল।

বাড়ী ফিরবার কিছু পরে জাপানে নবাগত এক মুসলমান দম্পতি মজুমদারদের সঙ্গে আলাপ করতে এলেন। সঙ্গে ছোট্ট একটি মেয়ে। উঁদের দিন তার জন্মদিন, সেই উপলক্ষ্যে এ-বাড়ীর সকলকে তাঁরা নিমন্ত্রণ করলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি জাপানে সমস্ত

শিন্টো মন্দিরে রাজপরিবারের মঙ্গল কামনা করে ও ভাল ফসল কামনা ক'রে প্রার্থনা হয়।

তার পরদিন মিসেস মজুমদার আবার আমাদের তাঁর সিন্ধী বন্ধুদের বাড়ী নিয়ে গেলেন। ওমোরি থেকে ট্রেনে উঠে সকুরাগাচি ষ্টেশনে নামলাম। ত্রিশ সেন (পনর পয়সা) ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে এক সিন্ধী ভদ্রলোকের দরজায় গিয়ে নামলাম। বাড়ীর গিন্নি এক ঘর রোদের মধ্যে প্রচুর আগুন জ্বেলে মাথা ধরে বসে আছেন, শরীর খারাপ। আমি একলা মেয়ে নিয়ে দেশে ফিরব শুনে অত্যন্ত অবাক হলেন, বললেন, "আমি হ'লে কখনো পারতাম না।" খানিক পরে এক গা ক'রে হীরের গহনা পরে আর দুটি সিন্ধী মহিলা বেড়াতে এলেন। পাঁচটা বাজলে গৃহস্বামিনীর জাপানী ঝি তেল জল চিরুণী আয়না দিয়ে গেল। স্বদেশী প্রথায় মাথায় অনেক জল থাবড়ে চুল বাঁধা হ'ল। তার পর হ'ল আরও নানারকম সাজসজ্জা ও প্রসাধন। ইনিও হীরের গহনা ইত্যাদি পরে সবাই দল বেঁধে আর এক ভদ্রলোকের বাড়ী যাওয়া গেল। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি কলকাতার সভরামদাস গহনাওয়ালাদের বাড়ীর ছেলে, নূতন বিয়ে ক'রে জাপানে ব্যবসায় করতে গিয়েছেন। ছেলেটি বিকলাঙ্গ, তার পক্ষে সাহস খুব। সব বাড়ীতেই আতিথ্যের ধুম, না খাইয়ে কেউ ছাড়তে চায় না। যদি না খাও ত রুমালে বেঁধে নিয়ে যাও।

এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরে পরস্পরের নিন্দা এবং জাপানী মেয়েদের নিন্দাও প্রচুর শুনলাম। সিন্ধী মেয়েরা করে জাপানী মেয়েদের নিন্দা, অন্যেরা করে সিন্ধী পুরুষদের নিন্দা। ব্যাপারটা যাই হোক সিন্ধী পুরুষদের প্রশংসার বিষয় নয়।

ইয়োকোহামা ও কামাকুরায় অনেক টিনের চালের বাড়ী দেখলাম। টিনের দেয়ালও মাঝে মাঝে আছে। জাপানীদের অন্য ঘরবাড়ী কেমন ছবির মত, তার পাশে এই বাড়ীগুলিকে বড় কদর্য্য দেখায়।

১১শে একজন জাপানী ভদ্রমহিলার বাড়ীতে আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁর নাম মিসেস্ শিমিজু। আগের দিনে সিন্ধীদের আতিথ্যের ফলে সেদিন শরীরটা খারাপ ছিল। তবু খাঁটি জাপানীর বাড়ীর আতিথ্য ব'লে গেলাম। হেঁটেই চললাম, কারণ শুনেছিলাম বাড়ীটা বেশী দূরে নয়। পাহাড়ের পথে নামতে নামতে চললাম। টোকিওর ওমোরিতে এত যে গলিঘুঁজি আছে তা জানতাম না। গলিগুলির মাঝখানটা পাথরের চাঁই দিয়ে দিয়ে বাঁধান যাতে বর্ষায় কাদা না-হয়। দু-পাশে স্যাঁৎসেঁতে মাটি, এত রোদেও শুকোয় নি। সাধারণ ছোট ছোট বাড়ীর এলাকা সব বাঁশের কঞ্চির ঘন বেড়া দিয়ে ঘেরা, মাঝে মাঝে কাঠের বেড়াও আছে। এক জায়গায় দেখ্‌লাম জাপানী মাদুরের পুরু গদি তৈরি হচ্ছে।

অনেক গলি ঘুরে মিসেস শিমিজুর বাড়ী পৌছান গেল। গেটের ভিতর ছোট্ট সবুজ বাগান, লাল প্লাম ফুল ফুটে রয়েছে একটি গাছে। বাড়ীর গেট ছাড়িয়ে দরজায় আস্‌তেই একটি সুন্দরী দীর্ঘাকৃতি সুসজ্জিতা মেয়ে হাসিমুখে ছুটে এসে হাঁটু গেড়ে ব'সে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে আমাদের অভ্যর্থনা করল। সে-বাড়ীর পরিচারিকা, দেখতে খুব ভদ্র ও বুদ্ধিমতী। ঘরগুলি ঘিরে কাঠ ও কাঠের বেড়া দেওয়া বারান্দা, বারান্দাতেও মাদুর বিছান। আমরা জুতো ছেড়ে বারান্দায় উঠ্‌তে যাচ্ছি, পরিচারিকা তাড়াতাড়ি জুতো খুলে দিতে এল। বারান্দায় উঠতেই গৃহিণী স্বহস্তে পরিষ্কার ঝকঝকে তিন জোড়া চটি নিয়ে আমাদের পায়ের কাছে দিয়ে হেঁট হয়ে নমস্কার করলেন। এত ভদ্রতা দেখে আমরা অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। ছোট্ট একটি ড্রয়িংরুম, ছবির মত সুন্দর ও আয়নার মত পরিষ্কার, একটু বিলাতী ধরণে সাজানো। গৃহিণীর ছেলেমেয়ে নেই, মস্ত একটি ডল গৃহিণীর হাতে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই চেয়ার দেওয়া বসবার ঘরটির পাশে জাপানী প্রথায় সজ্জিত বসবার ঘর। সে-ঘরে চটি পরেও কেউ ঢোকে না, চটি জোড়া আগের ঘরে রেখে মোজা প'রে এ-ঘরে ঢুকলাম। ঘরটি যেন একটি নূতন গড়ানো গহনার মত ঝলমল করছে। ঘরের মাঝখানে লাল গালার কাজ করা নীচু জাপানী গোল টেবিলে কাপড় পেতে খাবার সাজানো। চার পাশে জোড়াজোড়া বড় গদি বসবার জন্য। গদির পাশে পাশে

সুদৃশ্য হিবাচিতে প্রত্যেকের জন্ত আলাদা কাঠকয়লার আগুন। পিছন দিকে বৈদ্যুতিক 'হীটার'। দেয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো জাপানী তুলির লিখন। ঘরের দেয়াল সবটাই সরু সরু কাঠের ফ্রেমে পাতলা কাগজ বসানো, মাঝে মাঝে দেখবার জন্যে ঝকঝকে স্বচ্ছ কাচ। বিলাতী ও জাপানী দুই রকম খাবারই দেওয়া হয়েছিল। বাড়ীর গৃহিণী ও অতিথিরা বসবার পর ঝি যতবার ঘরে ঢুকল, ততবারই হাঁটু গেড়ে ঢুকল এবং বেরোল। বাইরে গিয়ে তবে সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

ঘরের কোণে কোণে সুদৃশ্য কাঠের আসবাব ও তার উপর জাপানী ব্রঞ্জের মূর্ত্তি। প্রাচীন জাপানী ঢঙের ও সাজসজ্জার নানা রকম পুতুলও কাচের আবরণের ভিতর সাজানো আছে। জাপানী গৃহসজ্জায় ও উৎসব ব্যাপারে এই পুতুল সাজানোর খুব ঘটা।

এক ধারে ছোট সুন্দর টবে বেঁটে এক হাত উঁচু একটি প্লাম গাছ ফুলে ফুলে ছেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোণে একটি ব্রঞ্জের বিড়াল ধূপকাঠি বুকে নিয়ে সুগন্ধ বিতরণ করছে।

গৃহিণীর কাঠের ও গালার বাসনকোসনগুলি মূল্যবান ও ভারী সুন্দর। জাপানী মেয়েরা গহনা পরে না, তিনিও পরেন নি। ওবি অর্থাৎ বক্ষবন্ধনীই জাপানী মেয়েদের গহনার কাজ করে, এগুলি পোষাকের সব চেয়ে মূল্যবান অংশ। গৃহিণীর ওবিটিতে জরির কাজ করা। শুধু জরির কাজেই ১৫০ ইয়েন লেগেছে। এর চেয়ে অনেক দামীও হয়। ওবির উপরে একটি মুক্তা ও হীরার বন্ধনী। ইনি মধ্যবয়স্কা, সাজপোষাকের বাহুল্য নেই, কখনও কালো পরেন, কখনও ঘন বেগুনী। অল্পবয়স্কা মেয়েদের পোষাকেই অজস্র রঙের ঘটা।

সর্ব্বপ্রথমে সবুজ চা দিতে হয়। ছোট একটি পেয়ালার মত জোড়া ঢাকনি দেওয়া টি-পটে প্রত্যেকের জন্য আলাদা করে ভিজিয়ে পরিচারিকা ঢেলে দিচ্ছিল। যিনি যতবার চা খাচ্ছিলেন তাঁকে ততবারই নূতন ক'রে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। হিবাচির উপর গরম জল মজুদ ছিল। ভাতগুলি কেক ও পিঠের মত নানা গড়নে নানা ছাঁচে সাজানো। তার ফাঁকে ফাঁকে নানা ধরণে পাতা কেটে বাসনটিকে সুসজ্জিত করা হয়েছে। আমাদের দেশেও জামাই কি সম্মানিত অতিথির জন্যে পাতা কেটে খাবার সাজানোর প্রথা আছে; তবে এত পরিষ্কার ক'রে আমাদের দেশে কাটে না।

গৃহিণীর অন্যান্য ঘরও দেখলাম। সর্ব্বদা খাবার ঘরে বিলাতী ধরণের টেবিল চেয়ার। শোবার ঘরে মাটিতে বিছানা পাতা। বিছানার মাঝখানে বড় টিনের বাক্সে গরম ছাই দিয়ে তার উপর অনেকগুলি লেপ চাপানো। এতে বিছানা গরম থাকে। এই ঘরে গৃহদেবতার কুলুঙ্গি, ছোট আলমারির মত দেয়ালের গায়ে লাগানো। ভিতরে বুদ্ধমূর্ত্তি ও পূজার উপকরণ। মৃত পূর্ব্বপুরুষদের ছবি ও অন্যান্য স্মৃতিচিহ্ন এই আলমারিতে সাজানো।

ফিরবার সময় আবার সেই জুতা পরানো ও বার-বার নমস্কার করার ঘটা।

ক্রমশঃ

ব্যায়ামভক্ত মোড়ল

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

১

থাভেরার লোকটি ফিলজফার-গোছের। কিন্তু ডন-বৈঠক-কুস্তির উপর তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। এই ব্যায়ামভক্তি নিয়ে আমরা সেদিন তাঁকে ঠাট্টা করছিলাম। এদিকে লোকটি কিন্তু নিতান্ত ক্ষীণকায়, সমস্ত শক্তি যেন তাঁর দেহ ছেড়ে মগজে আশ্রয় নিয়েছে। বুদ্ধিমান প্রবীণ লোক। মল্লযুদ্ধ, অসিদ্বন্দ্ব, ঘুষোঘুষি যে কোন প্রকারের বলবীর্য্যের প্রদর্শনীতে তাঁকে দেখতে পাবে। যত রকমের দৈহিক অনুশীলনের পত্রিকার গ্রাহক তিনি। ফ্রান্সে ইংলণ্ডে সেরা মুষ্টিযোদ্ধা বা অসিদক্ষের নাম তাঁর জিহ্বাগ্রে। স্পেনের মহিষ-মর্দ্দনরাও বাদ যায় না। আমাদের ঠাট্টাতামাশা প্রশমিত হ'লে তিনি বললেন—শোন তবে, কেন আমি গ্রন্থকীট ও ক্ষীণজীবী হয়েও শক্তির উপাসক।

আমার বাবা গরিব ছিলেন। বিপত্নীক হওয়ার পরে একটি গণ্ডগ্রামে রাসায়নিক যন্ত্রশালায় সামান্য বেতনে কেরানীর পদে বাহাল হলেন। অনেক উমেদারি ক'রে চাকরিটি জোগাড় করেছিলেন। মাহিনা কম, তবে খাটুনিও বেশী নয়। সুতরাং কাজটি খুবই মনঃপূত হয়েছিল। তাঁর উচ্চাভিলাষের বালাই ছিল না। বরং সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকতেন পাছে কাজটা হাত ফসকে যায়। আমাদের পল্লীটি অস্বাস্থ্যকর, জনবিরল, চারি দিকে পোড়ো মাঠ আর জলাভূমি। গ্রামের লোকগুলো ইতর নোংরা ঝগড়াটে, আমাদের মত বিদেশীর উপর নারাজ। আমার বাবার উপর তাদের বিদ্বেষের কারণ, তিনি চাষাদের সমাজেরও নন আবার মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের দলেও পড়েন না। সুতরাং কতকটা 'ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ' গোছের অবস্থা। প্রথম থেকেই কথাটা বুঝেছিলেন, তাই নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, কারুর সঙ্গে মিশতেন না। গ্রামের ছেলেরাও আমাকে নেকনজরে দেখে নি। আমিও তাদের এড়িয়ে চলতাম। আমাদের বাড়ীর আশেপাশের ঝাউবনের সীমানা অতিক্রম করতাম না। কয়েক মাস এই রকম তফাতে তফাতেই কাটল; বাবার অমায়িকতা ও সততার গুণে গাঁয়ের লোকদের বিরুদ্ধতা আস্তে আস্তে কমে এল। আমি মিশুক প্রকৃতির ছেলেই ছিলাম, আমারও ক্রমে দু-চারটি খেলার সাথী জুটল। আমাদের বিশেষ কোন সুখ না থাকলেও আমরা দুঃখী ছিলাম না। বাবার বাগানের সখ ছিল, আমিও আপন মনে ঘুরে বেড়াতাম। কখনও বনের ধারে, কখনও বা রাস্তার পাশে ব'সে দিবাস্বপ্নে আনন্দে দিন কাটত। সপ্তাহে দু-তিন দিন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতাম, মাঝে মাঝে চড়-চাপড়টাও খেতাম, তবে মাত্রার বেশী নয়।

তার পর দুর্ভাগ্যক্রমে এমন দিন এল যখন জীবন হ'ল দুঃসহ। এই গ্রামে উত্তরাধিকারসূত্রে কয়েক বিঘা জমির মালিক হয়ে দেখা দিল এক দুর্বৃত্ত। তার ছেলেরা আমাদের সঙ্গে খেলতে আসত। এদেরই এক জন, বয়স আন্দাজ বার হবে, গাঁট্টাগোট্টা চটপটে কুৎকুতে ধারালো চোখ, মূর্ত্তিমান অত্যাচারের মত দেখা দিল। সেদিন আমাদের বল খেলা হচ্ছে। সে নিজের দিক টেনে বলল, বলটা ঠিক জায়গায় আছে। কিন্তু আমাদের সকলের মতে তার কথা সত্য নয়। এক জন রেগে প্রতিবাদ করতে গিয়ে নাকে এক ঘুষি খেয়ে পড়ল উল্টে। তার পর আমাদের সকলকে ছুয়ো দিয়ে রুখে দাঁড়িয়ে আমাদের করল যুদ্ধে আহ্বান। আমরা গেলুম ভড়কে। আমাদের দলের জোয়ান যারা এ ওর মুখে চায়, কে লড়বে? যাহোক, আমাদের সর্দ্দার ছিল রবার্ট, সবচেয়ে তার গায়ে জোর বেশী। সে গেল এগিয়ে। হায়, এক নিমেষেই যবনিকার পতন! সেই

ডানপিটে ছেলেটা আমাদের প্রধানকে ত ধুলো-ধোনা ক'রে ছেড়ে দিল। তার পর থেকে সেই হ'ল মোড়ল, অত্যাচার-উপদ্রবের আর অন্ত নেই। শেষকালে ব্যাপারটা গড়াল অনেক দূর। আমাদের দলে ছিল এক পালোয়ানের পো। সে ঐ ছোঁড়াটার হাতে মার খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে যখন বাড়ী ফিরল, তখন তার বাবা ছুটলেন ওই খুদে ডাকাতের বাড়ী তার বাপের কাছে, নালিশ করতে।

অক্টোবর মাসের মেঘলা সকাল বেলা—এখনও সব যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—পালোয়ানজী ত ওদের বাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দিলেন হুঙ্কার, তার পর দরজায় ভীষণ ধাক্কা। তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে বাহির হয়ে এল উগ্রমূর্ত্তি এক চাষা—ঐ ছেলেটার মত চোখালো চোখ, ষণ্ডামার্ক, বুনো মোষের মত চেহারা।

রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন—'কি চাই তোমার ?'

'তোমার ছেলেকে কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম দিতে চাই, আমার ছেলেকে সে যেমন দিয়েছে।'

'তোমার ছেলেকেই সে ব্যবস্থা করতে বল গে।'

'তোমার ছেলেকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাব।'

'কি বললে ? আবার বল ত—'

দাভেয়ের ভীষণ মুখখানা সাপের ফণার মত ফরিয়াদীর মুখের কাছে তেড়ে এল। কিন্তু সে ভয় পাবার পাত্র নয়। তার গায়ে যেমন জোর তেমনি বুকের পাটা।

'বলছি তোমার ব্যাটাকে ফাঁসিকাঠে লট্‌কাবো।' কথাটা শেষ হ'তে না-হ'তে পড়ল তার রগে দাভেয়ের প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত।

দাভেয়ের হুঙ্কার—'গেল, ঝোগাটা গেল।'

ঘুষি খেয়ে পালোয়ান এক পা পিছলো। তার পর লোহার ডাঁটার মত মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে মোষের মত ঘাড় বেঁকিয়ে করল আক্রমণ। দাভেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত্ত। তার পর এক লম্ফে পড়ল তার কাঁধে, বাঘের মত। জোয়ান লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে।

'ওঠ্‌, শালা, এবার তোকে গুঁড়িয়ে ছাতু করব।'

পালোয়ানজী ত গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। এবার খুব হুঁসিয়ার, ভয়ের লেশ নেই। বার-দুতিন কৌশলে আগুপিছু করে দম্‌কা হাওয়ার মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। দাভেয়ে অটল, মারল কেবল ঘুষির পর ঘুষি ওর চোখে মুখে নাকে। রক্তাক্ত মুখে পড়ল সে চিৎ হয়ে। জনা-পঞ্চাশ গাঁয়ের লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। দাভেয়ে ভিড় ঠেলে পালোয়ানের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার পর অতি ধীর ভাবে পরাজিত শত্রুর উপর ঝুঁকে পড়ে দিল তার মুখে থুথু। সকলের দিকে একবার মুখ ঘুরিয়ে বলল—'যে-বেটা আমার সঙ্গে লাগতে আসবে তার এই দশা করব।'

তার ভীষণ গায়ের জোরের পরিচয় পেয়ে, ছোট ছোট চোখ দুটির বহ্নি-দীপ্তি লক্ষ্য ক'রে গাঁয়ের চাষারা ত ভয়ে হতভম্ব। ঠিক সেই সময়ে আমার বাবা এসে উপস্থিত। রাগে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ থরথর ক'রে কাঁপছে। তিনি দাভেয়েকে বললেন, 'তুমি পিশাচ !'

'বটে, কারখানাটার ইঁদুর বলে কি !'

'বলি, অতি জঘন্য তোমার আচরণ।'

কথাটা উচ্চারিত হওয়া মাত্র সে বাবাকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে একটা গোলাঘরের গায়ে ঠেসে ধরল। বাবা আত্মরক্ষার জন্য যেই হাত তুলতে যাবেন, অমনি এক চড়ে হলেন ধরাশায়ী। তাঁর বুকের উপর হাঁটু গেড়ে ব'সে সে বললে, 'ক্ষমা চাও।'

'না।'

অমনি দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে বাবাকে সাহায্য করবার জন্যে ছুটে গেলাম। রাক্ষসটার পিঠে মারলাম ঘুষির পর ঘুষি। চকিতে সে ছোঁ-মেরে আমাকে টেনে নিয়ে চেপে ধরল তার হাঁটুর তলে।

আমরা পিতাপুত্রে নিরুপায়, ধুলোয় পড়ে কেবল হাঁপাচ্ছি। অপরাধ এই যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলাম। পঞ্চাশ-পঞ্চাশটা লোক অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। নির্ব্বিকার, কারু মুখে রা নেই, আমাদের উদ্ধার করবার জন্যে ক'ড়ে আঙুলটি পর্য্যন্ত কেউ নাড়ল না। জীবনে এই প্রথম দেখলাম দুর্জ্জয় পাশবিক বলের কাছে দুর্ব্বলের ভীরুতা। বলীর ভ্রূকুটির সম্মুখে ওরা দাসানুদাস। কেবল বাবা পড়ে পড়ে মার খেয়েও আত্মরক্ষা ও আমাকে

রক্ষা করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। অতি কষ্টে উঠে যেই দু-পা এগিয়েছেন, অমনি আবার ওর পদাঘাতে হলেন ভূতলশায়ী।

তার পর দাভেন্তে বার-বার আমার বাবার মুখে দিল থুথু। আর তাঁর ঐ ক্ষীণ দেহের উপর পড়ল বজ্রের মত ঘুঁষির পর কিল। আমি ত পাগলের মত ছুটে গেলাম বাবাকে রক্ষা করতে, তার ছেলেটার হাতে মার খেয়ে কেবল নাকমুখ দিয়ে ঝরল রক্তধারা, কোন ব্যথাই লাগল না সে উন্মত্ত অবস্থায়।

যা হোক, সব জিনিষেরই শেষ আছে। এ ভীষণ ব্যাপারটারও অবসান হ'ল। বাবার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন, কালশিরা, রক্ত। রাগে দুঃখে অপমানে আমার যেন দম বন্ধ হ'ল। 'কাপুরুষ!' 'কাপুরুষ!' 'কাপুরুষ!' ব'লে বাবা কেবল চীৎকার করতে লাগলেন।

লোকটা বিদ্রূপের হাসি হেসে আবার তেড়ে এল, বাবা পুনশ্চ দিলেন ধুলায় গড়াগড়ি। লোকটা তার পর গদাইলস্করি চালে আপনার ঘরে ফিরে গেল। কতকগুলি স্ত্রীলোক আমার বাবাকে নিকটের এক সরাইখানাতে কোনো মতে তুলে নিয়ে গেল। একটি পুরুষও সাহায্য করতে অগ্রসর হ'ল না।

২

কি ভাবে ক'দিন বাবার কাটল তা তোমরা কল্পনায় বুঝতে পার। মানুষের নির্য্যাতিত আত্মমর্য্যাদার কি দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা, যখন সে দেখে অত্যাচারের কোনো প্রতীকার নেই এ সংসারে! নিদ্রাহীন রাত্রে এই অপমানের স্মৃতি নরকাগ্নির মত তাঁকে দগ্ধ করত। খেতে পারতেন না, খেলেই বমি হয়ে যেত। পৃথিবীতে সব যেন ওলটপালট হয়ে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে একলাটি চুপ ক'রে ব'সে থাকতেন। শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ, আড়ষ্ট শরীর, দৈন্য-মনে দিন দিন শুকিয়ে গেলেন।

সর্ব্বদা চলতেন লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে। আপিসের ছুটির পর বাগানে একলা ব'সে থাকতেন। পথেঘাটে চলবার সময় সঙ্গে থাকত একটা ছোরা। অহর্নিশি আপনার দুর্গতির দুশ্চিন্তায় মগ্ন রইতেন। আমার খেলা-ধুলা সব শেষ হ'ল। আমাদের ছোট কুঁড়েঘর আর বাগানের বাহিরে এক পাও যেতাম না। মনে হ'ত আমাদের গ্রামের উপর একটা অমঙ্গলের কুয়াশা জমাট হয়ে আছে। এই অজ্ঞাতবাসেও পরিত্রাণ পাওয়া গেল না। অদৃষ্টে ছিল আরও লাঞ্ছনা।

সেদিন রবিবার। বাবা যদিও বিশেষ আচারনিষ্ঠ ছিলেন না, তবু মাঝে মাঝে গির্জ্জায় যেতেন, প্রবীণ অমায়িক পাদ্রী সাহেবের খাতিরে। গির্জ্জা থেকে বাড়ীর পথে হঠাৎ পড়লাম দাভেন্তে আর তার ছেলের সামনে। বাবা পাশ কাটিয়ে সরে যাচ্ছিলেন। আবার গণ্ডগোল বাধলে ছোরা ব্যবহার করবেন এই ছিল তাঁর সঙ্কল্প। কিন্তু, 'আনার বাবারে পাইলে বাঘেরে, কিরাত কি কভু ছাড়ে রে তারে?' দাভেন্তের পুত্ররত্নটি আমার সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়াল এবং আমার মুখে দিল থুথু। আমি যেই মুখ ফিরিয়ে সরে যাচ্ছিলাম, অমনি একটু হেসে বলল, 'শূয়ার কা বাচ্চা!' কোন উত্তর দিলাম না, কিছু বলব না এই ছিল আমার প্রতিজ্ঞা। আমাকে নীরব দেখে তার মেজাজ গরম হ'ল। আমার কান ধরে চলল সে আমাকে টেনে নিয়ে। অত্যন্ত ব্যথা পেলাম, তবু রইলাম চুপ ক'রে। কেবল কান ছাড়িয়ে নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলাম।

বাবা আগে আগে চলেছিলেন। পিছন ফিরে আমার ওই দশা দেখে কাছে ছুটে এলেন। তাঁর মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখে জ্বলছে আগুন।

'ওকে ছেড়ে দাও!'

ছোঁড়াটা অবজ্ঞার হাসি হেসে আরও জোরে আমার কানে মোচড় দিল। বাবা তার হাতে থেকে আমার কান ছাড়িয়ে নিলেন। এই সময়ে গর্জ্জন শুনলাম, 'আমার ছেলের গায়ে হাত দিলে?'

'তোমার ছেলে আমার ছেলের উপর অত্যাচার করছিল।'

সে ভীষণ দৃশ্য এ জীবনে ভুলব না। নিজের শক্তির দর্পে স্ফীত হয়ে সে আমার বাবাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হ'ল। আপনার অক্ষমতা জেনেও বাবা তার দিকে কটমট ক'রে চাইলেন।
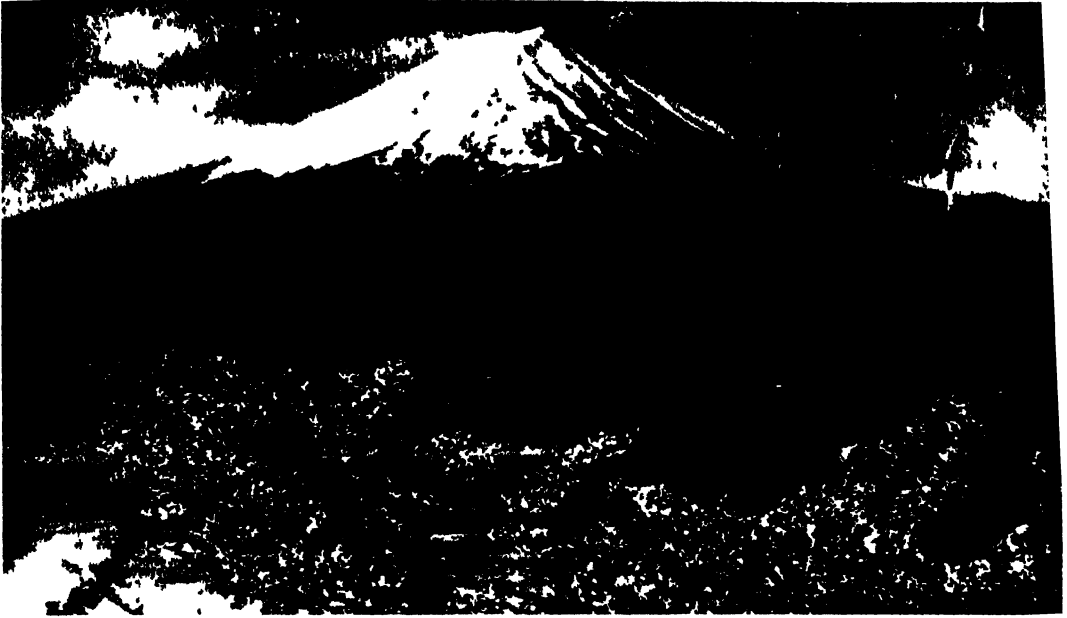
কাকো হ্রদ হইতে ফুজি পর্ব্বতের দৃশ্য

[দ্রষ্টব্য "জাপান ভ্রমণ", পৃ. ৮৪৫]

পদ্মদীঘি

ঊষা
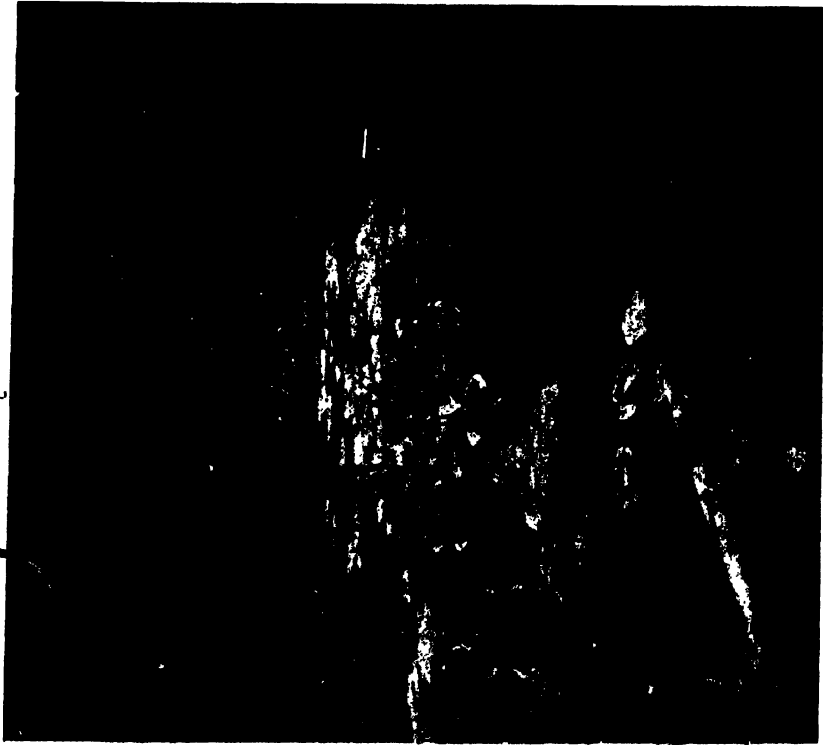
শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ হইতে

'আমার ছেলেকে স্পর্শ ক'রো না। ওর কাছে মাপ চাও।'

'না।'

অমনি পড়ল বাবার মুখে তার প্রচণ্ড ঘুষি। সঙ্গে সঙ্গে বাবার হাতে ছোরাখানা উঠল ঝিক্‌মিকিয়ে।

'বটে, আমার সঙ্গে খেলবার সাধ হয়েছে!' এই বলে দাভেস্নে এক পা স'রে দাঁড়াল। তার পর পকেট থেকে বাহির করল একটা খাপে ঢাকা ছোরা। তিন-কোণা মুখ, মরচে পড়া, তেল চকচক্ করছে।

সে অগ্রসর হওয়ামাত্র বাবা ছোরা মারবার জন্য হাত তুললেন। এক ধাক্কায় বাবার হাত সরিয়ে তাঁর কাঁধে বসিয়ে দিল সেই তেকলা ছোরা। বাবার ছোরাখানা হাত থেকে ছিনিয়ে নিল।

'নেংটি ইঁদুর! পেলি ত যা চাচ্ছিলি!'

বাবা ত পাশের বাড়ীর দেয়ালে টলে পড়লেন। কতকগুলো গাঁয়ের লোক দৌড়ে এসে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। দাভেস্নে তার ড্যাগার আর আমার বাবার ছোরাখানা তাদের দেখিয়ে বলল, 'তোদেরও এই হাল হবে, ভীরু ভেড়ার পাল!'

৩

এই ঘটনার পর থেকে গ্রামসুদ্ধ লোক হ'ল ওই গুণ্ডাটার ক্রীতদাস। আদালতে গিয়ে দাভেস্নের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে এমন একটি লোকও পাওয়া গেল না। নর-পিশাচ হ'ল গাঁয়ের মোড়ল। পথে ঘাটে ভাঁটিখানায় তার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, নিরঙ্কুশ অত্যাচার। পল্লীবাসীরা হ'ল কেনা গোলাম। কেউ কেউ যেত একচ্ছত্র রাজার কাছে কুর্ণিশ করতে। ছেলের দলে দাভেস্নের পুত্রও সর্ব্বেসর্ব্বা। যা খুশী করে, যাকে ইচ্ছে ধ'রে ঠেঙায়। আমি আর বাবা অপমান, আতঙ্ক, বিদ্রোহ আর অসামর্থ্যের রুদ্ধ বাতাসে এক কোণে রইলাম পড়ে, জঙ্গলের আদিম বর্ব্বরের মত। ন্যায়ান্যায়ের বিচারবুদ্ধি লুপ্ত হ'ল যেন জগৎ থেকে। পৃথিবীটা এমন ভীষণ স্থান ব'লে বোধ হ'ত যে, অহরহ মৃত্যুকামনা করতাম।

এমনি ক'রে কাটল একটি বৎসর। বসন্তকাল, ঝকঝকে রোদ উঠেছে সকাল বেলা। আমি বনের পথ দিয়ে খানিকটা ঘুরে এসে বাড়ী ফিরছি এমন সময়ে পড়লাম সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়। কারখানার আগে এক দল ছেলের সঙ্গে দেখা মাঠের মাঝখানে। পাশ দিয়ে একটি ছোট্ট নদী বয়ে গেছে। ডান দিকে নিকটেই একটা বাড়ী। আগের দিন সেখানে এক ছুতোর এসে বাসা নিয়েছে কিছুকালের জন্য কারখানায় নিযুক্ত হয়ে। বন থেকে বাহির হয়েই গুটি বারো ছেলের সামনে পড়লাম, দাভেস্নের পো সেই পালের গোদা।

—ওরে শূয়োরের বাচ্চা,...এদিকে আয়!

আমি যেন কিছু শুনতে পেলাম না এই ভাবে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিলাম।

—কালা নাকি? আয় বলছি!

আমার বুকের ভিতরটা দুব্ দুব্ ক'রে উঠল, তবু একটি কথাও বললাম না। ছোট দাভেস্নে এক লাফে এসে আমার চুলের মুঠি ধরল।

—কি রে, জন্তু, কথার জবাব দিবি না? বড় সেয়ানা হয়েছিস, না?

আমি বুঝলাম বাধা দেওয়া বৃথা, উল্‌টে আরও ফ্যাসাদে পড়ব। চুলের মুঠি ধরে সে আমাকে টেনে নিয়ে চলল। আর তার মোসায়েবের দল চলল আমাদের সঙ্গে হাসতে হাসতে নদীর তীর পর্য্যন্ত।

'ওকে চুবুনি দিলে কেমন হয়?' এক জন বলল। দাভেস্নের বাচ্চা ব'লে উঠল, 'চমৎকার! দেখি, জলের স্বাদটা ওর কেমন লাগে।'

তখনও সে সজোরে আমার চুলের মুঠি ধরে রয়েছে। আর রক্ষে নেই। একবার জলে ফেলতে পারলে যতক্ষণ খুশী আমাকে ডুবিয়ে রাখবে। প্রাণপণে ঝুলোঝুলি ক'রে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

'বেড়ালটা মাটি আঁকড়ে আছে, না? দেখাচ্ছি মজা এবার!' সে আমাকে ঠেলতে ঠেলতে জলের ধারে নিয়ে গেল। আর একটু হ'লেই উল্টে পড়ি নদীর জলে। এমন সময় তীব্র অথচ মধুর স্বরে কে হাঁকল, 'কি করছ তোমরা ওখানে?'

দাভেস্নে থমকে দাঁড়াল। দেখি সামনের কুটীর থেকে

একটি ছেলে দৌড়ে এল. কোঁকড়া কোঁকড়া তার চুল, ধবধবে রং, চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে। এক লাফে সে আমাদের মাঝখানে প'ড়ে দাভেন্নেকে মারল এক ধাক্কা। এক অপূর্ব্ব ভাবাবেগে আমার মন আকুল হ'ল। এক দিকে বিস্ময়, কৃতজ্ঞতা এবং ওই অজানা ছেলেটির জন্য মমতা, অন্য দিকে আতঙ্ক ও দুঃখ। আমার যা হয় হোক, আমার জন্যে ও যেন বর্ব্বরের হাতে লাঞ্ছিত না হয়।

'তোমার বুঝি ওর বদলে চুবুনি খেতে সাধ হয়েছে ?'—হাসতে হাসতে ঠাট্টার সুরে বলল দাভেন্নে। আমি ছেলেটিকে আগলে সামনে দাঁড়াতেই খেলাম দাভেন্নের এক ঘুষি। অজানা ছেলেটি আমাকে বলল, 'তুমি সরে দাঁড়াও। এখন আমার পালা।'

আমি সে নিষেধ মানতাম না। কিন্তু ইত্যবসরে দাভেন্নের চেলারা তিন-চার জনে মিলে আমাকে জাপটে ধরল। দেখি আমাদের গ্রামের গুণ্ডার বাচ্চাটা মাথা নীচু ক'রে তাল ঠুকছে, এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে ওই ছেলেটির উপর। সে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে ওর আক্রমণের ভঙ্গীটা লক্ষ্য করছে। ফল যে কি হবে আমার বুঝতে বাকী ছিল না। দু-জনে মাথায় সমান হ'লে কি হয়, দাভেন্নের যে লোহার শরীর, ওর সঙ্গে পারবে কেমন করে ?

দু-জনে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হতেই আমি চোখ বুজলাম, আমার উদ্ধারকর্ত্তার পরাজয় যাতে না চোখে দেখতে হয়। চোখ খুলে দেখি দাভেন্নে হটে যাচ্ছে, আর সেই সঙ্গে ছেলেটি যেন তালে তালে জয়োদ্দীপ্ত হয়ে উঠছে। একবার মনে হ'ল বুঝি দাভেন্নেই জিতবে, তার পরক্ষণেই পড়ল চিৎ হয়ে। কামড়াতে গিয়ে খেলে মুখে এক ঘুষি। আমি ত আনন্দে হলাম আত্মহারা, আপাদমস্তক কাঁপছিলাম থর থর ক'রে। কেবল ভয় হ'ল দাভেন্নে বোধ হয় ভীষণ প্রতিশোধ নেবে। ভক্তিগদগদ চক্ষে তাকিয়ে রইলাম ছেলেটির মুখের পানে, যেন সে প্রত্যক্ষ দেবতা।

ইতিমধ্যে আপনার জয়লাভটিকে নিঃসংশয় ক'রে এবং দাভেন্নেকে ঘা-কতক দিয়ে ছেলেটি উঠে দাঁড়াল। রাক্ষসের বাচ্চাও লাফিয়ে উঠে আবার যুদ্ধে নামল। আমি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে বললাম, 'সাবধান ভাই !' এগিয়ে গিয়ে মাঝখানে পড়ব এমন সময় আমার বন্ধু বলল, 'সরে দাঁড়াও, আমি একাই সামলাব।'

দাভেন্নে যেমনি লাফ দিয়ে ওর ঘাড়ে পড়বে, আমার অজানা বন্ধু অমনি এক লাফে পিছিয়ে গেল। পরক্ষণেই পড়ল তীরবেগে শত্রুর উপর, সে পুনশ্চ হ'ল ধূলিসাৎ।

এবার নিশ্চিন্ত হলাম। নিরুদ্বেগ শান্তিতে মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু এ আনন্দ ক্ষণভঙ্গুর। বিকট চীৎকার শুনে পিছন ফিরে দেখি, বড় দাভেন্নে ছুটে আসছে। ওদিকে কারখানার থেকে আমার বাবাও আসছেন এই দিকে। আর দেখি, যে-কুটীর থেকে ওই ছেলেটি বাহির হয়ে এসেছিল, তার দরজায় এক জন লোক দাঁড়িয়ে। বলিষ্ঠ দেহ, হাসি হাসি মুখ, কোঁকড়ান দাড়ি তার মিশমেশে কালো।

'ওরে হারামজাদা, তুই ফাঁকি দিয়ে জিতেছিস' দাভেন্নে চীৎকার ক'রে বলল।

আমার বাবা বল্লেন, 'কোন অন্যায় করে নি।'

'আবার তুমিও এসে হাজির হয়েছ ?'

নবাগত—'আমার ছেলে ফাঁকি দিয়ে জেতে নি। তোমার ছেলে কাপুরুষ।'

'বাঃ, কে হে তুমি ? কোত্থেকে এসে জুটলে ? তোমারও বুঝি পালক গজিয়েছে ? ওদের মত তোমাকেও শিক্ষা দেব।'

আমাদের কারখানার এই সূত্রধর বলিষ্ঠ বটে, কিন্তু দাভেন্নে সাক্ষাৎ যমদূত, যেমন জোয়ান তেমনি পেশাদার পাকা গুণ্ডা। ওর সঙ্গে লড়ে জিতবে কে ? ছুতোরের ছেলের জয়লাভে আমরা সকলেই আশ্চর্য্য ও খুশী হয়েছিলাম, কিন্তু তার বাপের সম্বন্ধে কোনো ভরসাই ছিল না। বাবা ওদের কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন, গাঁয়ের লোকেরা দূরে ভিড় ক'রে দাঁড়াল। সাধ্য নেই কোনো কথা বলে, গুণ্ডার ভয়ে তটস্থ।

'কী চাও তুমি ? আমাকে আক্রমণ করতে চাও কেন ?' যদিও ছুতোর নির্ভয়ে কথাগুলি বলল, তবু কেমন একটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাব তার মুখে ছিল। আমার

বাবা ইসারা ক'রে তাকে ঘরে ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু বৃথা সে আশা। দাভেস্নে খপ ক'রে তার টুঁটি চেপে ধরল। দু-তিন মুহূর্ত্তে কাটল আতঙ্কে। ছুতোর মিস্ত্রি দাভেস্নের বজ্রমুষ্টি এড়িয়ে একটু সরে গিয়ে আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছে। দাভেস্নে আবার আক্রমণ করল। কেবল ঘুষির পর ঘুষি। মিস্ত্রি সব আঘাতগুলিই সামলে নিয়ে এবার পাল্টা-আক্রমণের জন্য দাঁড়াল রুখে। প্রথম ধাক্কাটা দাভেস্নে দিব্যি সামলাল। এইবার দু-জনে মুখোমুখি সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, কেউ পিছ্‌পা হবার নয়। দাভেস্নে বুঝল মিস্ত্রিকে সহজে ঘায়েল করা চলবে না। খুনীর মত বিকট হ'ল তার চোখমুখের ভাব। আমার বাবা ত প্রাণের ভয় ত্যাগ ক'রে ছুটে গেলেন মিস্ত্রির পাশে। "আপনি স'রে দাঁড়ান" বাবাকে এই বলে সে বিদ্যুৎ-বেগে দাভেস্নের মুখে মারল এক ঘুষি। সেও প্রত্যুত্তরে মারল পটাপট ঘুষির পর ঘুষি, একটা ভীষণ জোরে লাগল মিস্ত্রির পেটে। পড়তে পড়তে মিস্ত্রি আপনাকে সামলে নিলে। আমি ত ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠলাম। পরক্ষণেই দেখি, দাভেস্নের বাঁ-হাতের আগল টপকে মিস্ত্রির তিনটে ঘুষি উপরি-উপরি পড়ল তার মুখে। দাভেস্নে চিৎ হয়ে পড়ল মাটিতে, নাকে মুখে রক্তস্রোত। বাবা আর আমি পরস্পরের মুখের পানে চেয়ে রইলাম, চোখে পলক পড়ে না। এ যেন এক অলৌকিক ব্যাপার! বুঝি প্রত্যক্ষ দেবাবির্ভাবেও এর চেয়ে বেশী বিস্ময় ও আনন্দ পুরাকালে কোনো মর্ত্ত্যবাসীর প্রাণে জাগে নি। আমার ইচ্ছা হ'ল মিস্ত্রি আর মিস্ত্রির ছেলের পায়ে লুটিয়ে পড়ি। সেই মুহূর্ত্ত হ'তে তারা হ'ল আমার চোখে পৌরুষ-বিক্রমের অবতার।

কিন্তু এখনও যুদ্ধের শেষ হয় নি। আমাদের আশা এখনও সংশয়াতীত নয়। মিস্ত্রি তফাতে দাঁড়িয়ে, দাভেস্নে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। রাক্ষসটা বোধ হয় মনে মনে ঠিক করল, মুষ্টিযুদ্ধ ত্যাগ ক'রে এবার নামবে মল্লযুদ্ধে। অপরিসীম শক্তি তার বজ্রদেহে। ঠোঁট কামড়ে মুখ বুজে কটমট করে চাইল একবার মিস্ত্রির দিকে, বাঘের মত ক্রুর দৃষ্টি। তার পর একলম্ফে সে জাপটে ধরল মিস্ত্রিকে। দু-জনে নিমেষে কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল জড়াজড়ি ক'রে। কিছুক্ষণ ধরে এই রকম জাপ্‌টা-জাপ্‌টি চলল, উভয় পক্ষই নাছোড়বান্দা। অনেক কষ্টে দাভেস্নে তার পা-দুটো খালাস করে নিল। ভাবলাম এই শেষ হ'ল। এবার মিস্ত্রি পড়ল হুমড়ি খেয়ে মুহূর্ত্তের জন্য। তার পরেই এক মোচড়ে দাভেস্নেকে দিল উল্টে। সে চিৎ হয়ে পড়বামাত্র তার কাঁধটা মাটিতে চেপে ধরল।

'বল, হার মানলে?'

দাভেস্নে প্রাণপণে উঠবার চেষ্টা করতেই মিস্ত্রি তার বুকে হাঁটু চেপে বসল।

'বল, হার?'

ভাঙা গলায় সে বলল, 'হার'।

দু-জনেই উঠে দাঁড়াল। দাভেস্নে একটু ইতস্তত ক'রে, পরাজয় বরণ ক'রে ঘাড় গুঁজে চলে গেল। আমার বাবা ত আনন্দে আটখানা হয়ে মিস্ত্রিকে জড়িয়ে ধরলেন। আমিও তার ছেলেকে, আমার উদ্ধারকর্ত্তাকে, বার-বার ধন্যবাদ দিলাম। এইবার চাষারা আমাদের চারি দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বিজেতার জয়ধ্বনি তুললে।

আমার জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিরস্মরণীয় ঘটনা এই। এখনও মনে করলে সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে ভাবাবেগে। বাপে বাপে হ'ল বন্ধুত্ব, আর ছেলেতে ছেলেতে মিতালি। এই যুগল সৌহার্দ্দ উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট সুখ-সৌভাগ্যের কারণ হয়েছিল। আমাদের বাবারা মিলে নামলেন পল্লীসংস্কারের ব্যবস্থায়। সে গ্রামের চেহারা এখন বদলে গেছে। মিস্ত্রির ছেলে আর আমি অভিন্নহৃদয় বন্ধু। ধার্ম্মিকের ঐকান্তিক ধর্ম্মনিষ্ঠার মত আমার এই বন্ধুপ্রীতি? আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন সেইগুলি যখন আমরা ছুটির সময় প্যারিসে একত্রে কাটাই অথবা দেশে ফিরে গিয়ে পল্লী-বনশ্রীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করি।

[জে. এইচ. রোশ্‌নির "The Champion" গল্পের ইংরেজী তর্জ্জমা হইতে]

পুস্তক পরিচয়

বঙ্গীয় শব্দকোষ—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান শান্তিনিকেতন, শান্তিনিকেতন ডাকঘর; বিশ্বভারতী পুস্তকালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রতি খণ্ডের মূল্য আট আনা, ডাকমাশুল এক আনা। বার্ষিক, ষাণ্মাসিক, ও ত্রৈমাসিক মূল্যও এই হিসাবে লওয়া হয়।

এই বৃহৎ অভিধানখানির বিস্তারিত পরিচয় পূর্ব্বে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী'তে দিয়াছেন। আমরাও ইহার বিষয় মধ্যে মধ্যে লিখিয়াছি। সম্পূর্ণ হইলে ইহা বৃহত্তম বাংলা অভিধান হইবে আশা করা যায়। ইহার ৫২ খণ্ড বাহির হইয়াছে। যত দূর বাহির হইয়াছে তাহার শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ১৬৫২, শেষ শব্দ "নিছ"। আনুমানিক ৪০০০ পৃষ্ঠায় ইহা সমাপ্ত হইবে। ইহাতে কি আছে ও থাকিবে তাহা সংক্ষেপে নীচে লিখিত হইল।

"বৌদ্ধগান ও দোহা", "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন", "শূন্যপুরাণ" মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণবসাহিত্য প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সাহিত্য পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা পদ্য-গদ্যপুস্তক-সমূহ ও নাটক প্রভৃতি হইতে আবশ্যক বা উল্লেখযোগ্য প্রায় সমস্ত শব্দ ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

তদ্ভব বাংলাশব্দসমূহের বিশদভাবে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করার নিমিত্ত, যত দূর সম্ভব, মূল সংস্কৃত ও তাহা হইতে ক্রমিক পালি প্রাকৃতের রূপ এবং তদনুযায়ী হিন্দী মরাঠী গুজরাটী সিন্ধী পঞ্জাবী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত শব্দসমূহের রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

বাংলায় প্রচলিত আরবী ফারসী ইংরেজী পোর্টুগীজ প্রভৃতি ভাষান্তরের শব্দসমূহের বিশুদ্ধ মূলরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

শব্দসমূহের লিখিত অর্থসমর্থনের নিমিত্ত, যত দূর সম্ভব, প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থ হইতে প্রচুর প্রয়োগ উদ্ধৃত হইয়াছে।

বাংলার প্রচলিত সমস্ত সংস্কৃত শব্দের পাণিনি-অনুসারে ব্যুৎপত্তি ও সমাস বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে।

সংস্কৃত ধাতুসমূহের অর্থ গণ প্রভৃতি এবং ভাষান্তরের ধাতুর সহিত তুলনা করিয়া বাংলার ধাতুসমূহের অর্থ ও প্রয়োগ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বাংলায় প্রচলিত শব্দসমূহ ভিন্ন, সাধারণ সংস্কৃত সাহিত্যে প্রযুক্ত শব্দাবলীর বিচারপূর্ব্বক অর্থ নির্ণয় করিয়া প্রয়োগসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, এই অভিধানে সংস্কৃত-পাঠার্থীরও বিশেষ উপকার হইবে এবং এই উদ্দেশ্যেই ঐ সকল সংস্কৃত শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে।

ছিন্নপত্র। ভানুসিংহের পত্রাবলী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য যথাক্রমে ২৲, ও ১৲ টাকা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাধারণ নাম "পত্রধারা" দিয়া ভিন্ন ভিন্ন মানুষকে লেখা রবীন্দ্রনাথের বহু পত্র প্রকাশিত হইতেছে। তাহার মধ্যে ছিন্নপত্র ও ভানুসিংহের পত্রাবলী আগেই প্রকাশিত হইয়াছিল, এখন পুনর্মুদ্রিত হইল। পত্রধারার তৃতীয় খণ্ড "পথে ও পথের প্রান্তে" সম্প্রতি ছাপা হইয়াছে। তাহার পরিচয় ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে দিয়াছি।

ছিন্নপত্রে যে সব চিঠির টুকরা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে তিনি লিখিয়াছেন, কতকগুলি পরলোকগত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে লিখিত। তাহারই একখানিতে দেখিতেছি বহু পূর্ব্বে পড়া কবির সেই কবিতা যাহাতে আছে,

> শামলা আঁটিয়া নিত্য
> তুমি করো ডেপুটিত্ব,
> একা প'ড়ে মোর চিত্ত
> করে ছটফট।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে অধিকাংশ (সব নহে) চিঠি যখন তিনি লিখিয়াছিলেন, তখন তিনি বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন; তাঁহার 'পথচলা মনে' সেই সকল গ্রাম্য-দৃশ্যের নানা নূতন পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগাইতেছিল, এবং তখনই তখনই তাহা চিঠিতে প্রতিফলিত হইতেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনেক ছোট গল্পে কবিতায় উপন্যাসে গ্রামের দৃশ্য, গ্রামের মানুষদের জীবনযাত্রা ও স্বভাব সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার যে পরিচয় দিয়াছেন, এই চিঠিগুলিতেও তাহা পাওয়া যায়।

ভানুসিংহের পত্রাবলী একটি ছোট মেয়েকে লেখা—তিনি এখনও অবশ্য যে ছোটই আছেন তাহা নহে। কবি নিজের অল্প বয়সে ছদ্মনাম লইয়া "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" লিখিয়াছিলেন। রবি-অর্থবাচক সেই "ভানু" ছদ্মনাম এই চিঠিগুলিতেও ব্যবহৃত হইয়াছে। বালিকাটিকে লিখিত এই চিঠিগুলির বেশীর ভাগ শান্তিনিকেতন হইতে লিখিত। সেই জন্য সেগুলির মধ্য দিয়া স্বতই শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার চলচ্ছবি বহিয়া চলিয়াছে। এগুলিতে 'মোটা সংবাদ' বেশী কিছু নাই; হাসিতামাশায় মিশাইয়া আছে শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া, "জড়িয়ে আছে সাংসারিক ব্যাপারে আনাড়ি মেয়েটির ছেলেমানুষির আভাস; আর তারি সঙ্গে লেখকের সকৌতুক স্নেহ।"

পত্রধারার এই তিন খণ্ড হইতে রবীন্দ্রনাথের বাহ্য জীবনের বিশেষ কোন উপকরণ পাওয়া যায় না। সামান্য কিছু সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার ভিতরের মানুষটির সাক্ষাৎ খুব পাওয়া যায়; তিনি যে নিজেকে ছেলেবুড়ো সকলেরই সমবয়স্ক বলিয়া দাবি করেন, সে দাবির প্রমাণ পত্রগুলিতে যথেষ্ট আছে। নির্ম্মল হাস্যকৌতুক পরিহাস, গভীর বিষয়ের গভীর অথচ সহজ সাবলীল আলোচনা, ভিন্ন ভিন্ন চিঠিতে আছে। কেহ যদি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত

জীবনচরিত লিখিতে চান তাহা হইলে তাঁহাদের যেমন তাঁহার অন্য গ্রন্থাবলী পড়িতে হইবে, তেমনই এই সকল চিঠিও পড়িতে হইবে। এক হিসাবে চিঠিগুলিতে তাঁহার অনভিপ্রেত আত্মপ্রকাশ গ্রন্থাবলী অপেক্ষা অধিক। কারণ, পুস্তকগুলি তিনি সকল পাঠকের জন্য লিখিয়া ছাপাইয়াছিলেন, চিঠিগুলি ছাপাইবার জন্য লেখেন নাই, এক দু জন তাঁহারই হস্তাক্ষরে পড়িবে ইহা ভাবিয়া লিখিয়াছিলেন।

ইংরেজ কবি গ্রে "বহু মূক অখ্যাত মিলটনের" কথা লিখিয়াছেন। যাঁহাদের কবিতা প্রকাশিত হয় নাই কিংবা যাঁহারা কবি হইলেও হইতে পারিতেন কিন্তু হন নাই, এরূপ "কবি" থাকা যেমন অসম্ভব নয়, তেমনই অখ্যাত অথচ খুব খ্যাতির যোগ্য চিঠি-লিখিয়েও অনেক থাকিতে পারেন। কিন্তু বঙ্গে যাঁহাদের ছাপা বা হাতের লেখা চিঠি পড়িয়াছি, রবীন্দ্রনাথের সহিত একসঙ্গে নাম করিবার মত তাঁহারা কেহই নহেন। তাঁহার মত এত বেশী ও এত সাহিত্যরসপূর্ণ চিঠি আমাদের জানা কোন বাঙালী লেখেন নাই। দুঃখের বিষয় তাঁহার অনেক বড় চিঠি নষ্ট হইয়াছে - যেমন চন্দ্রনাথ বসুকে লিখিত বহু পত্র। আরও কত লোককে লেখা কত চিঠি যে নষ্ট হইয়াছে, বা 'প্রাপক' 'প্রাপিকা'গণ ছাপিতে এখনও দেন নাই, তাহার লেখাজোখা নাই। যাহা হউক, যাহা প্রকাশিত হইয়াছে এবং পরে ক্রমশ হইবে, তাহা পড়িয়া দৈনিক পাঁচ মিনিট ফুরসৎওআলা বাঙালী পাঠিকা ও পাঠকেরাও যে আনন্দিত হইতে পারিবেন, ইহা সৌভাগ্যের কথা।

"ছিন্নপত্র," "ভানুসিংহের পত্রাবলী," ও "পথে ও পথের প্রান্তে" একত্র বাঁধানও পাওয়া যায়। একত্র বাঁধান তিনখানি বহির মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

শ্যামলী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০, কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

এই কবিতা-গ্রন্থ ১৩৪৩ সালের ভাদ্রে বাহির হয়, ১৩৪৫এর শ্রাবণে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। বাঙালীরা আপনাদের সাহিত্যের বড়াই করেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠ বহি পড়েন কম, কিনিয়া পড়েন আরও কম। সুতরাং দুই বৎসরের মধ্যে একখানি কবিতার বহির পুনর্মুদ্রণ তাহার লোকপ্রিয়তার পরিচায়ক বলিতে হইবে।

এই গ্রন্থখানির সব কবিতা গদ্য কবিতা, কিন্তু গদ্য বলিয়া কাব্যাংশে নিকৃষ্ট নহে; শ্রেষ্ঠ ও সরস। কয়েকটি কবিতা ছোট ছোট গল্পের মত, যেমন 'কণি', "অমৃত"। বলিয়াছি সব কবিতা গদ্যে লেখা, একটি ছাড়া, সেটি গোড়াকার "উৎসর্গ"। কবি বরানগরের যে-বাড়ীতে কিছু দিন অতিথি ছিলেন তাহার ও তাহার কল্যাণীয়া গৃহিণীর "শ্যামল শুশ্রূষা"র মনোজ্ঞ ছবি পদ্যে এই কবিতাটিতে আঁকা হইয়াছে।

লোকশিক্ষা সংসদ—যাহাদের জ্ঞানলাভের ইচ্ছা আছে, কিন্তু বিদ্যালয়ে গিয়া তাহা করিবার সুবিধা নাই, তাঁহাদের জ্ঞানলাভ সুগম করিবার নিমিত্ত এবং পরীক্ষা দিয়া তাহার প্রমাণ দিবার সুযোগ দিবার নিমিত্ত রবীন্দ্রনাথ লোকশিক্ষা সংসদ স্থাপন করিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। এ-বৎসর কয়েকটি ছেলে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণও হইয়াছে। ইহার পাঠ্য-তালিকা ও অপর সমুদয় নিয়ম একটি পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা বিশ্বভারতীর ২৩ নং বুলেটিন। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য দুই আনা। ডাকমাশুল আলাদা। বাংলা দেশে বা বাংলার বাহিরে যে-কোন স্থানে পরীক্ষার কেন্দ্র হইতে পারে। বালকবালিকা পুরুষ-নারী সবাই পরীক্ষা দিতে পারেন।

শিশুভারতী।—প্রথম হইতে অষ্টম আট খণ্ড। সম্পাদক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্, ২২।১ কর্ণওআলিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৪৲।

ছোট ছেলেমেয়েদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্ শিশুভারতী প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়া বাঙালী বালক-বালিকাদের ও বাঙালী সমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাতিশয় উদ্যোগিতা সহকারে নানা বিষয়ে বহু বিদ্বানের লিখিত প্রবন্ধ ও কবিতা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া পাঠক-পাঠিকাদের মানসিক ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধন ও মনোরঞ্জনে দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। এই আট খণ্ডে 'প্রবাসী'র মত পৃষ্ঠার ৩২০০ পৃষ্ঠা আছে। আরও দুই খণ্ডে এই প্রকাণ্ড বাল্যপাঠ্য বৃহৎ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবে। ইহা বেশ বড় অক্ষরে ছাপা, যাহারা পড়িবে তাহাদের চোখ খারাপ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। ছবি এত বেশী যে গুনিবার সময় হইল না। কাল রঙে, অন্যান্য এক রঙে, ও বহু রঙে ছাপা সব ছবি বিচিত্র। সেগুলি দেখিতে যেমন ভাল লাগে, তাহা হইতে তেমনই শিক্ষাও হয়। বিদ্যালয়পাঠ্য বহি ছাড়া বাড়ীতে পড়িবার এত বড় গ্রন্থের আয়োজন ছেলেমেয়েদের জন্য বাঙালী অন্য কোন প্রকাশক করেন নাই। ইহা বিলাতী বাল্যপাঠ্য এই রকম জিনিষগুলির সহিত তুলনীয়, এবং তুলনায় ইহার পরাজয় হইবে না।

ইহাতে কত কি বিষয়ের লেখা যে আছে, তাহা সংক্ষেপে বলিবার নয়। এক একটি খণ্ডেরই বিস্তারিত সূচী কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী। শুধু বিষয়-বিভাগই প্রথম খণ্ডের এইরূপ—অ... জীবন, আকাশের কথা, আদি মানব, আমাদের দেশ ভারতবর্ষ, আলো, আলোকচিত্র, ইতিহাস, উদ্ভিদ-জীবন, কবিতা-চয়ন, খাদ্যশস্য, গল্প ও কাহিনী, জল, জাতীয় সঙ্গীত, জীবজগৎ, জীবন শুধু রাসায়নিক প্রক্রিয়া, দেশ-বিদেশ, পৃথিবীর আকার ও অবস্থান, পৃথিবীর যুগ-বিভাগ, বায়ু, বিজ্ঞান-পরিচয়, বিশ্বসাহিত্য, মানবের জীবনধারা, শব্দ, শিল্প-প্রতিভা, শিল্পের ধারা, সঙ্গীত ও শিল্প, সঞ্চয়ন, সাহিত্য।

একটি খণ্ডের যে বিষয়-বিভাগ দিলাম, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, এই গ্রন্থে এমন অনেক বিষয়ে প্রবন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছে যে-সকল বিষয়ে বাংলায় আলোচনা অল্পই হইয়াছে বা হয়নি সেই জন্য লেখকদিগকে বালক-বালিকাদের উপযোগী করিয়া লিখিতে কোথাও কোথাও কষ্ট পাইতে হইয়াছে। অবশ্য, সর্ব্বত্র তাহা হয় নাই, ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজই হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ হইলে আগাগোড়াই আরও সহজ করা চলিবে। ইহাতে অল্প এমন কিছু কিছু কথা আছে, যাহা বালক-বালিকাদিগকে জানাইবার চেষ্টা না করিলে ক্ষতি হইত না। পরিশেষে আমরা, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়, "শিশুভারতীর শুভ উদ্দেশ্য সার্থক হউক এই কামনা করি।"

রা.

আধুনিক শ্রেষ্ঠ গল্প—শ্রীরমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। ভারতী ভবন, ১১. কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য পুস্তকটিতে নয় জন বিভিন্ন লেখকের নয়টি গল্প আছে। লেখকদের নাম শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনোজ বসু, শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী ও শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য। ইঁহাদের মধ্যে শুধু প্রথম দুই জন প্রবীণ ও প্রথিতযশা, কিন্তু ছোট গল্প রচনায় সকলেই সিদ্ধহস্ত ও কমবেশী লব্ধপ্রতিষ্ঠ। আধুনিকতম বাংলা সাহিত্যের প্রধান কীর্ত্তি ছোট গল্প; তাহারই নয়টি সেরা দৃষ্টান্ত যে-পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার উপভোগ্যতা সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

ধূসর পাণ্ডুলিপি—শ্রীজীবনানন্দ দাশ রচিত ও প্রকাশিত। দাম দুই টাকা।

অন্তরের কবি-প্রেরণার সঙ্গে এই কবির প্রণয়, যাকে সম্বোধন ক'রে তিনি বলছেন, "আমি প্রণয়িনী, তুমি হে অধীর, আমার প্রণয়ী" (অনেক আকাশ) এই প্রণয়ী তাঁর অস্থির।

"সে এসে পাখীর মত স্থির হয়ে বাঁধে নাই নীড়,
তাহার পাখায় শুধু লেগে আছে তীর,—অস্থিরতা।"

(অনেক আকাশ)

এই প্রেরণা তাঁকে আত্মপ্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই এ বইয়ের প্রত্যেকটি কবিতাই সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত।

এই কবিতাগুলোতে প্রকৃতির যে বিস্তার দেখলুম, মনে হয় না সহসা অপর কোন বাঙালী কবির লেখায় এমনটি দেখেছি। কুন্‌-কুঁড়ো প্যাঁচা ইঁদুর হেমন্তের রোদ থেকে সুরু করে, ব্লিজার্ড, টাইফুন পেরিয়ে এশিয়ার আকাশের সমগ্রতার আস্বাদ, অভিনব লাগল। এই খুঁটিনাটির বৈচিত্র্যকে যে শক্তি উপভোগ্য কবিতায় পরিণত করেছে, তাকে শ্রদ্ধা করতে হয়।

জীবনানন্দের প্রকৃতি মানুষের জীবন ও জগতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। মানুষের মনের আনন্দ বেদনার ছোঁয়াচে তার রূপায়ন, অমুগ্ধ সে মোহহীনা।

"যে নক্ষত্র মরে যায়, তাহার বুকের শীত
লাগিতেছে আমার শরীরে,—
যেই তারা জেগে আছে তার দিকে ফিরে
তুমি আছ জেগে,—

* * * *

কতবার বর্ত্তমান হয়ে গেছে ব্যথিত অতীত,—
তবুও তোমার বুকে লাগে নাই শীত
যে নক্ষত্র ঝরে যায় তার।
যে পৃথিবী জেগে আছে—তাঁর ঘাস, আকাশ তোমার।"

(নির্জ্জন স্বাক্ষর)

অথবা

"চাহিয়াছে অন্তর যে ভাষা
যেই ইচ্ছা—যেই ভালোবাসা
খুঁজিয়াছে পৃথিবীর পারে পারে গিয়া,—
স্বপ্নে তাহা সত্য হয়ে উঠেছে ফলিয়া।"

(স্বপ্নের হাতে)

এই স্বপ্ন ছাড়া কবির কাছে বিপুলা প্রকৃতি অর্থহীনা।

কিন্তু জীবনানন্দের প্রকৃতি শেষ পর্য্যন্ত উদাসিনী। বইয়ের মাঝেই মূল সুরের আভাস। প্রায় সমস্ত কবিতারই শেষ সুর বিরতির, বৈরাগ্যের। বইখানা শেষ করবার পর মন বিষণ্ণ হয়ে থাকে। যখন পড়ি,

"পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের
শরীর"

(মৃত্যুর আগে)

খুব যে উল্লসিত বোধ করি, তা বলতে পারি না। অথবা,

"আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানি না কি
আহা

সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মত এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ,—একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল, সোনা ছিল যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায়,—যেন কোন মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।
কি বুঝিতে চাই আর? রৌদ্র নিভে গেলে পাখী পাখালীর
ডাক
শুনি নি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখি নি কি উড়ে গেছে
কাক?"

(মৃত্যুর আগে)

মন উদাস হয়ে উঠে। বই বন্ধ ক'রে, মুমূর্ষু বিকেলের আবছায়া যেখানে কালো রাত্রির আঁচলে আশ্রয় নিচ্ছে, সেই দূর দিগন্তে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

আপাতসামান্য দু-একটি কথায় সুন্দর ছবি তৈরি করবার ক্ষমতা কবির অসাধারণ,—

"পৃথিবীর অন্ধকার অধীর বাতাসে গেছে ভরে,—
শস্য ফলে গেছে মাঠে, কেটে নিয়ে চলে গেছে চাষা;
নদীর পারের বন মানুষের মত শব্দ ক'রে,
নির্জ্জন ঢেউয়ের কানে মানুষের মনের পিপাসা"

(জীবন)

চলিত কথায় যাকে প্রেমের কবিতা বলে, এ কাব্যে তা নেই, কারণ কবির মন বার-বার ভালবেসে জীবনের বন্ধনে ধরা দিলেও জীবনের সুষমার দিক্ থেকে মহিমার দিকেই তার আগ্রহ। তার দৃষ্টি কালাতীত মহিমার সন্ধানী। তাঁর বেদনা জীবনের আলোড়নে জড়িত হয়ে জীবনকে চাওয়ার বেদনা নয়, জীবনের পার থেকে পিছন ফিরে তাকানোর। জীবনও প্রকৃতি, তাঁর কাছে এক সমগ্র সৃষ্টির অজানা প্রকাশ।

একই কথার পুনরাবৃত্তি ও হঠাৎ অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার, এই রকমের সামান্য দু-একটি ত্রুটিদোষ সত্ত্বেও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র

প্রত্যেকটি কবিতাই সমান উপভোগ্য। জীবনানন্দবাবু যে এ দেশের কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট ও শক্তিশালী এক জন, এ কথা মানতে দ্বিধাবোধ করি না।

বইয়ের প্রচ্ছদ কে এঁকেছেন জানি না, কিন্তু তাঁর নামোল্লেখ উচিত ছিল। প্রচ্ছদপটে বইয়ের মূল সুর মূর্ত্তি নিয়েছে, শিল্পীর পক্ষে এ কম প্রশংসার কথা নয়।

শ্রীমণীশ ঘটক

বিশ্বপরিচয়—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ (সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত)। মূল্য এক টাকা।

এই পুস্তকখানি ১৩৪৪ সালের আশ্বিনে প্রথম প্রকাশিত হয়। সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ তাহার পর ঐ বৎসর পৌষে প্রকাশিত হয়। তাহা পুনর্মুদ্রিত হয় এক মাস পরে মাঘ মাসে। এখন গত শ্রাবণ মাসে সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে ইহা চারি বার ছাপা হইল। আলোচ্য সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—

"যে বয়সে শরীরের অপটুতা ও মনোযোগশক্তির স্বাভাবিক শৈথিল্যবশত সাধারণ সুপরিচিত বিষয়ের আলোচনাতেও স্খলন ঘটে সেই বয়সেই অল্পপরিচিত বিষয়ের রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেম। তার একমাত্র কারণ সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার ছাঁচ গড়ে দেবার ইচ্ছা আমার মনে ছিল। আশা ছিল বিষয়বস্তুর ত্রুটিগুলির সংশোধন হোতে পারবে বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে। কিছু দিন অপেক্ষার পর আমার সে আশা পূর্ণ হয়েছে। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সেন এবং বোম্বাই থেকে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রমোহন সোম বিশেষ যত্ন করে ভুলগুলি দেখিয়ে দেওয়াতে সেগুলি সংশোধন করবার সুযোগ হোলো। তাঁরা অযাচিত ভাবে এই উপকার করলেন সে জন্যে আমি তাঁদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আছি। এই সঙ্গে পূর্ব্বসংস্করণের পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

আগেকার সংস্করণগুলির চেয়েও বর্ত্তমান সংস্করণটি আদৃত হইবার যোগ্য হইয়াছে। পুস্তকখানির বিষয়বস্তুর পরিচয় পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। এখন ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, ইহাতে পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক ও ভূলোকের পরিচয় আছে এবং শেষে উপসংহার আছে।

ড.

অন্ধের দৃষ্টি—শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। বাণী ভবন। ১১।১, শম্ভুদাস লেন, বহুবাজার, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা। পৃঃ ১৩৪।

আলোচ্য গ্রন্থখানি ব্রহ্মদেশের ঘটনা ও নরনারীর চরিত্র লইয়া একখানি উপন্যাস। বইখানি সুপাঠ্য বটে, তবে চীনা ছুতারের পত্নী ছাড়া অন্যান্য চরিত্রগুলির প্রতি সুবিচার করা হয় নাই।

মাষ্টার সাহেব—শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক, গ্রন্থকার, জামবাবুর ঘাট চুঁচুড়া। মূল্য দেড় টাকা। পৃঃ ১৬১।

একখানি উপন্যাস। ভাষা মন্দ নয়। মিনতির বিবাহ ও পরবর্ত্তী ট্র্যাজেডি বেশ মর্ম্মস্পর্শী। লেখকের লিখিবার হাত আছে। উপরের ছবিটি না দিলেই ভাল হইত।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছুক্ষণ—শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০ টাকা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১২৩।

আকস্মিক ভাবে রেলগাড়ী লাইনচ্যুত হওয়ায় ছোট ষ্টেশনটিতে কিছুক্ষণের জন্য যাত্রিগণের একটা আবর্ত্ত সৃষ্টি হইল। একটি হট্টগোল। কিন্তু এই ক্ষণিক হট্টগোলের মধ্যেও বহুমুখীন জীবনের একটি রূপ আছে; অবশ্য ভিড়ের মধ্য হইতে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার অন্তর্দৃষ্টি চাই।

এই অনিশ্চিত প্রবাসের মধ্যে কেহ শান্ত হইয়া বসিয়া জীবন-রহস্যের পাতা উল্টায়; কোথাও এক অচ্ছুৎ কন্যার বুকে অবহেলার ব্যথা টনটনাইয়া উঠে, কোথাও আবার কলতলায় কাবুলীওয়ালা লইয়া নিষ্ফল আক্রোশ। ওরই মধ্যে আবার ষ্টেশনের ময়রা 'বনশি হালুয়াই' জোঁকের মত ফুলিয়া উঠিতেছে, আর কোন মাড়োয়ারী ষ্টেশনের বাবুদের ঘুস দিবার জন্য মধ্যস্থ খুঁজিতেছে, উদ্দেশ্য সবার প্রবাসের মেয়াদ বাড়াইয়া, বনশি হালুয়াইকে হাওলাত দিয়া কিছু পিটিয়া লওয়া।

অনেকগুলি ঘটনা—ক্ষুদ্র অথচ সুস্পষ্ট—স্বল্পপরিসরের মধ্যে সংঘটিত হইয়া "কিছুক্ষণ"টুকুকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। অনেকগুলি চরিত্র অথচ বইখানি বড় নয়। কিন্তু লেখকের তুলির টান এমন অমোঘ যে দু-এক আঁচড়েই চরিত্রগুলি জাগিয়া উঠিয়াছে। ভাষা খুব ঝরঝরে। ট্রেন চলা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ষ্টেশনটিতে জীবনের যে চঞ্চলতা জাগিল, কোথাও ভাষা বা পরিকল্পনার আড়ষ্টতায় তাহা ব্যাহত হয় নাই।

এক কথায় বলিতে গেলে বইখানি অনেক সুরের একখানি চমৎকার সিম্ফনি। শেষ হইলে নানান সুরের হালকা-ভারি রেশ কানে যেন রণরণ করিতে থাকে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সহজ গীতা—শ্রীকেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ, বি-টি। বৈঁচি (হুগলি) হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃ. ৩০৪। মূল্য দুই টাকা।

এই বইখানি লেখকের 'Geeta Made Easy' নামক ইংরেজী গ্রন্থের বর্দ্ধিত সংস্করণ। বইখানির নাম দেখিয়া পাঠকবর্গের ভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা আছে; কারণ পুস্তকখানিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল বা তাহার সরল ব্যাখ্যার কিছুই নাই। বইখানির প্রথম দিকে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য উপদেশ গল্পচ্ছলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পগুলি এতই মনোরম যে বইখানি পড়িতে বসিলে শেষ না-করিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয় না। শেষের দিকে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের সারমর্ম দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল; কোথাও জড়তা নাই।

পুস্তকোদ্ধৃত অধিকাংশ শ্লোকেরই আকরের উল্লেখ নাই। আকরের নির্দ্দেশ থাকিলে ভাল হইত।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

বহির্জগৎ

শ্রীগোপাল হালদার

১

স্পেন হইতে বিদেশীয় সৈন্য অপসারণের প্রস্তাব সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আলোচনা চলিতেছিল, এক জন সদস্য বলিয়া উঠিলেন, "স্পেনবাসীদের ঐ দেশ হইতে সরাইয়া লইয়া বিদেশীদেরই সেখানে যুদ্ধটা শেষ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াই ভাল।" শেষ পর্য্যন্ত আজ স্পেন নিরপেক্ষতা-কমিটির বিদেশীয়-বিদায়ের প্রস্তাবের যে দশা ঘটিয়াছে তাহাতে মনে হয়, সরাইতে হইলে সে দেশ হইতে স্পেনবাসীদের সরানো যাইবে, কিন্তু বিদেশীয় সৈনিকদের অপসারণ সহজ হইবে না।

অনেক দরদস্তুরের পর সকল পক্ষই বিদেশীয়দের বিদায়ের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু যখন সত্যই প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিবার কথা আসিল তখন বাধা জুটিতে লাগিল একে একে। বার্সিলোনা-সরকার অবশ্য প্রস্তাবমত কাজ করিতে প্রস্তুত—যদিও এই প্রস্তাবে তাহাদের সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধাই থাকিয়া যাইবে বেশী। কারণ, ফ্রাঙ্কোর দল তখনও বিদেশীয় যুদ্ধোপকরণ ও অস্ত্রে বলীয়ান রহিবে, সরকারী বন্দর কার্থেজেনা, অ্যালিকান্টে, ভ্যালেন্সিয়ার উপর নিরপেক্ষতা-সমিতির পরিদর্শক বসিবে, কিন্তু বিদ্রোহীদের অধিকৃত বন্দর সান্ সেবাষ্টিয়ান্, সন্ তানদার, সেবিল, অলজিকিরাস্, কিউটা ও মেজর্কায় কেহই খবর্দারি করিবে না; আর উড়ো পথের সাহায্যে কোন্ নিষেধই স্বীকৃত না হওয়ায় শুধু স্থলপথের সরকারী পথগুলিই বন্ধ হইবে—আকাশ-পথ রহিবে অবাধ। এই সব কারণ সত্বেও যে স্পেন-সরকার বিদেশীয় অপসারণের চুক্তিতে স্বীকৃত হয় তাহার কারণ, বিদ্রোহী ফ্রাঙ্কোর পক্ষে সাহায্য আসিতেছিল বেশী অথচ সরকারী পক্ষ সাহায্য পায় সে তুলনায় অল্প। তাহা ছাড়া এই নিরপেক্ষতা-কমিটির কথাটা না-মানিয়া তাহাদের উপায় নাই।

কিন্তু বাধা আসিল তবু বিদ্রোহীদের নিকট হইতেই। প্রথম তো কয়েক দিন ফ্রাঙ্কোর উত্তর মিলিল না, শেষে উত্তর জানা গেল ২১শে আগষ্ট। মোটামুটি তাহার নূতন দাবি এই :—

১। "প্রাথমিক সর্ত্ত" হিসাবে বিনাসর্ত্তে যুদ্ধরত জাতির অধিকার (Belligerent Rights) বিদ্রোহীদের দিতে হইবে।

২। অবিলম্বে যে-সব বৈদেশিককে স্পেন হইতে অপসারিত করা হইবে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দশ সহস্র করা হইবে; তবে সর্ত্ত থাকিবে যে স্পেনের গণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন তৎপূর্ব্বে "যুদ্ধরত জাতির অধিকার" ফ্রাঙ্কো-পক্ষকে দিতে হইবে। উভয় পক্ষ হইতে একই সংখ্যক বৈদেশিককে অপসারণ করাই একমাত্র বাস্তব পন্থা।

৩। অতিরিক্ত সুবিধাদান হিসাবে ক্যাটালোনিয়া এবং পূর্ব্ব অঞ্চলে দুইটি নিরাপদ বন্দর প্রতিষ্ঠা করিতে ফ্রাঙ্কো রাজী আছেন এবং খাদ্যসম্ভারবাহী জাহাজ-সমূহ উপরোক্ত বন্দর দুইটিতে প্রবেশ করিতে পারিবে। বিমান-আক্রমণের কি কি লক্ষ্যবস্তু হইবে, যত দূর সম্ভব তাহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করার জন্য এবং নিরপেক্ষ জাতি-সমূহের ও স্পেনীয় অসামরিক জনসাধারণের যাহাতে সামান্য মাত্রও ক্ষতি সাধিত না হয় তজ্জন্য সহযোগিতা করা হইবে।

এই নূতন সর্ত্তের সঙ্গে পূর্ব্বেকার গৃহীত সর্ত্ত কয়টির প্রধান তফাৎ এই যে, পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল বিদেশীয়রা চলিয়া গেলেই ফ্রাঙ্কো যুদ্ধরত শক্তির অধিকার পাইবেন, তৎপূর্ব্বে নয়। তাহার পক্ষীয় দশ হাজার বৈদেশিক অবিলম্বে বিদায় লইবে এবং তত্তুলনায় নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সরকার-পক্ষীয় বৈদেশিকও প্রস্থান করিবে। অর্থাৎ ফ্রাঙ্কোর পক্ষীয় বিদেশীয়দের তুলনায় অন্যপক্ষীয় বিদেশীয়রা যখন সংখ্যায় কম, তখন তাহারা তেমনি কম সংখ্যায়ই অপসারিত হইবে। উভয় পক্ষীয় বৈদেশিকদের অপসারণ বরাবর সংখ্যানুপাতেই চলিবে, ফ্রাঙ্কোর দাবি মত সমান-সমান সংখ্যায় হইবে না,—ইহাই ছিল কথা।

কিন্তু ফ্রাঙ্কো এইরূপ মত পরিবর্ত্তন করিলেন কেন? ইহার কারণ, যখন চুক্তি তিনি অঙ্গীকার করেন তখন মনে
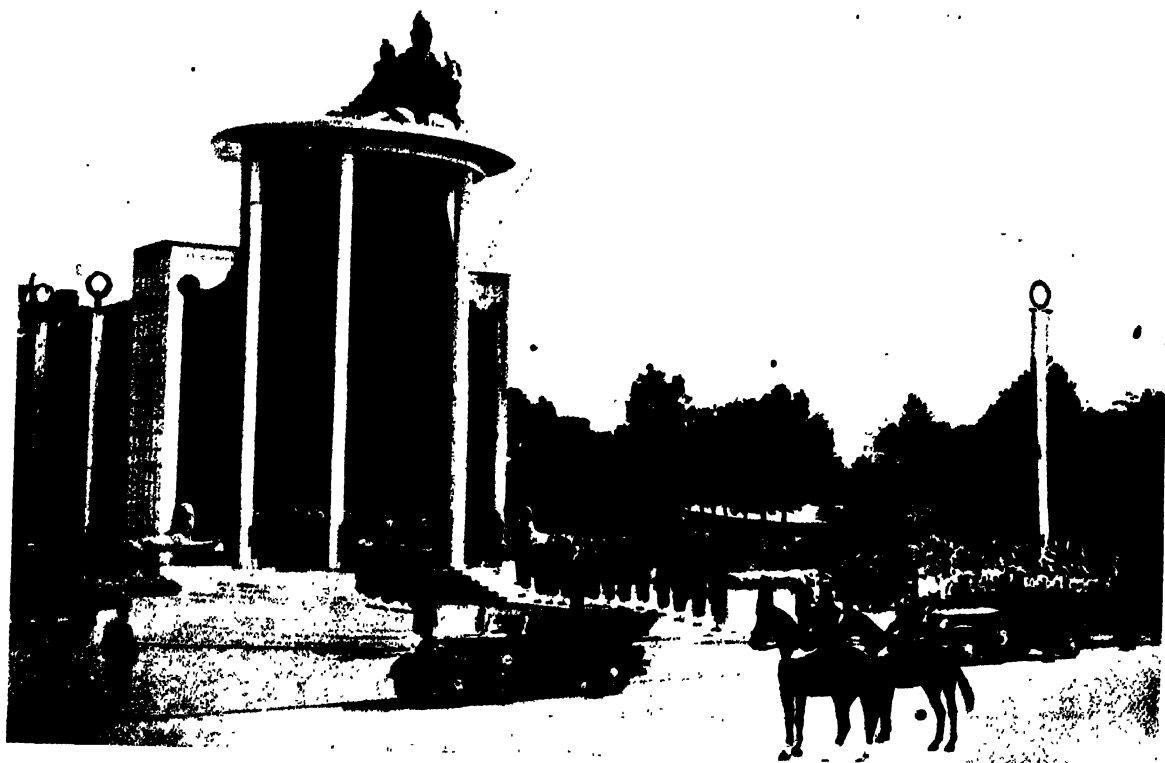
প্যারিসে ব্রিটেনের রাজদম্পতির আগমনে বোয়া দ্য বুলইন ষ্টেশনের সজ্জা
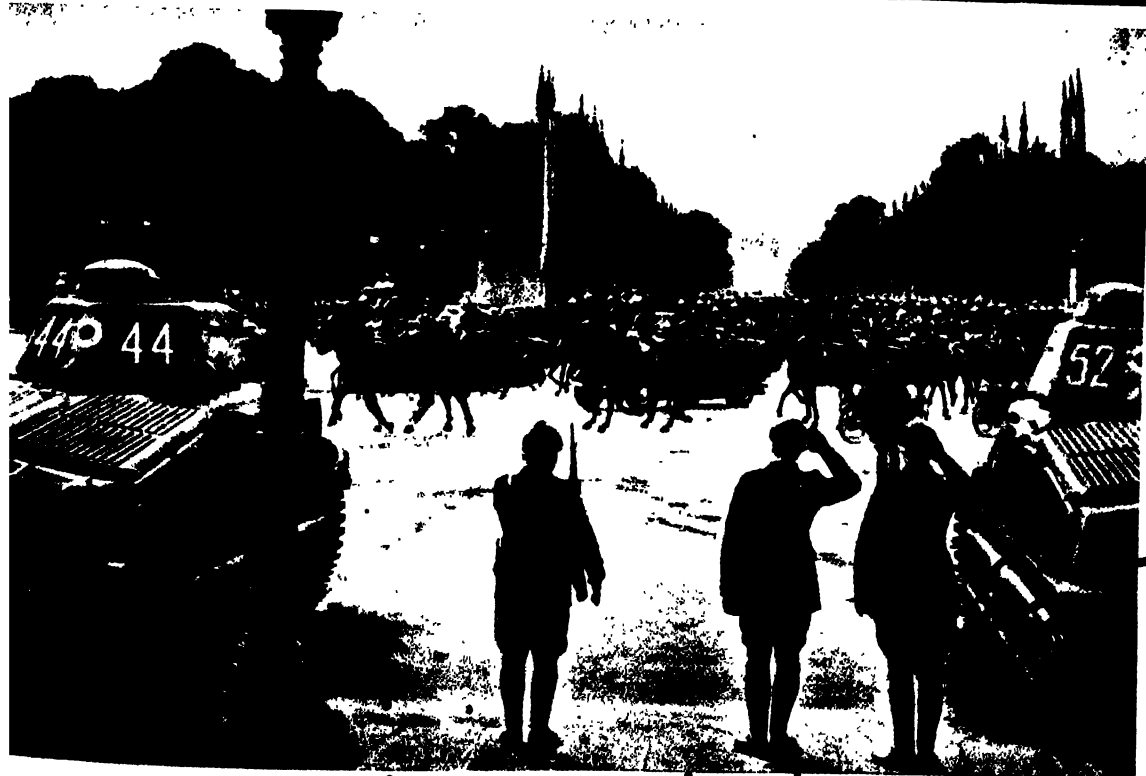
ব্রিটিশ রাজদম্পতিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের শোভাযাত্রা
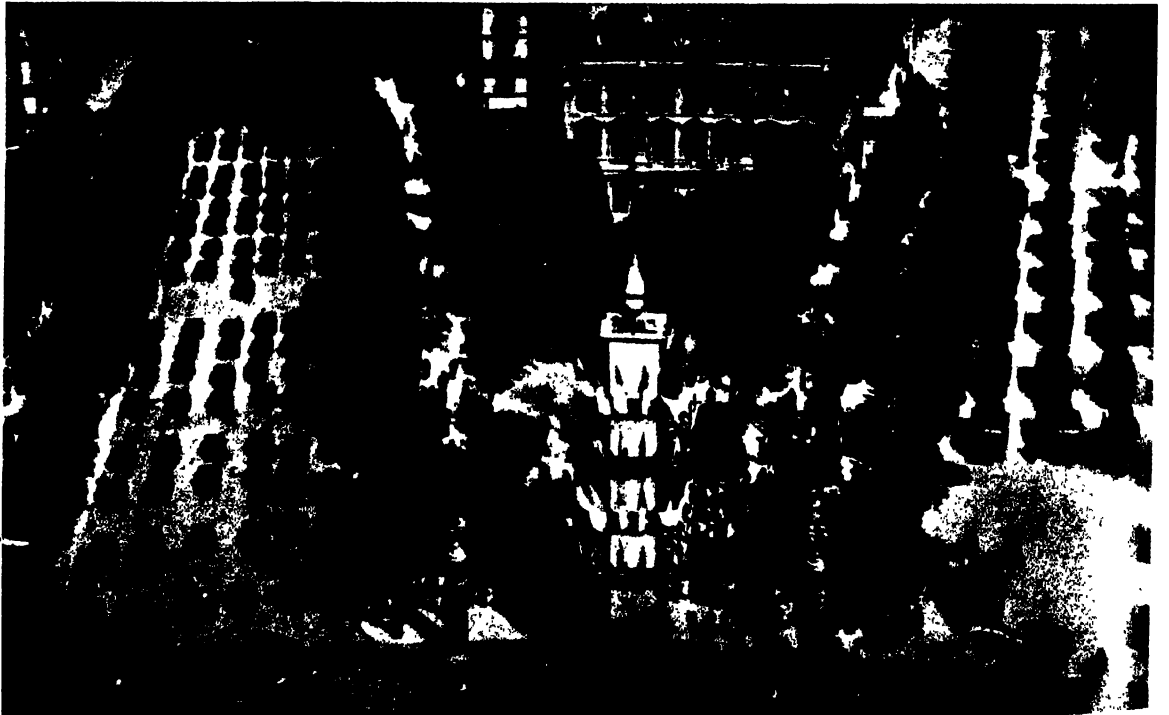
ব্রিটেনের রাজ-সমাগমে ফরাসী মোটর-আরূঢ় সৈন্যবাহিনীর প্রদর্শনী

প্যারিস। এভিনিউ শাঁজএলিজে।
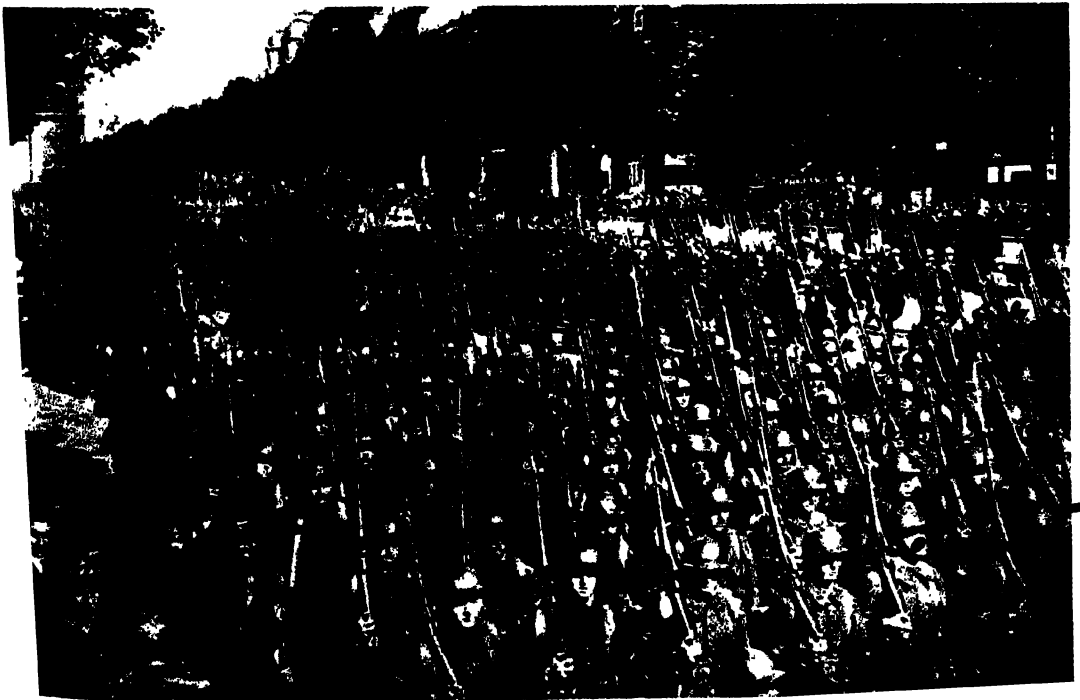
ইংলণ্ডের রাজারাণীর ফ্রান্সে আগমন উপলক্ষ্যে ফরাসী সমরসজ্জা প্রদর্শন

প্যালেষ্টাইনে এবাল পর্ব্বতের সন্নিকটে ব্রিটিশ সৈন্যের ছাউনি

আকাশপথে বোমায় আক্রান্ত বার্সিলোনা

হইয়াছিল তাঁহার জয় সন্নিকট—বিদ্রোহী-বাহিনী দক্ষিণে সমুদ্র-তীরে সমুত্তীর্ণ হইল, গণতান্ত্রিক দল ক্যাষ্টিলন নগর হারাইল, দুর্গম পথে বিদ্রোহী দল এবার অগ্রসর হইয়া চলিবে। ইতালীয় ও জার্মান সৈন্যেরা চলিয়া গেলেও ঐসব দেশের প্রেরিত উন্নততর যুদ্ধোপকরণ তখনও সেখানে থাকিবে; তাহার সাহায্যে চিরদিনের সমর-ব্যবসায়ী ফ্রাঙ্কোর দলের পক্ষে সরকার পক্ষের 'সখের সৈনিক'দের সহজেই ধ্বংস করা সম্ভব। তাহা ছাড়া, ইতালীয় সৈনিকরা স্পেনে এমনি স্থায়ী হইয়া বসিতেছে, তাহাদের আচার-আচরণে এমনি ঔদ্ধত্যের ও প্রভুত্বের ভাব দিনে দিনে স্পষ্টতর যে ফ্রাঙ্কোর অধস্তন সেনাধ্যক্ষদের কেহ কেহ তাহাদের আগমনকে স্পেনের পক্ষে একটা দুর্ভাগ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছিলেন। এবার বিদেশীয়েরা স্বগৃহে ফিরিলেই ইহারা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। কিন্তু সব ওলট-পালট হইয়া গেল। এব্রো নদীর তীরে অকস্মাৎ গণতান্ত্রিকদের আক্রমণ সুরু হইল—বিদ্রোহী দল পরাজিত হইল, কিছুদিনের মত আবার ঘটনাস্রোত মোড় ঘুরিল। বীরবর ফ্রাঙ্কো করিবেন কি? এ সময়ে তো আর ইতালীয় বাহিনীকে বিদায় দেওয়া চলে না। অবস্থাটাই যখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তখন চুক্তি কি করিয়া অপরিবর্ত্তিত রহিবে? তাঁহার জয়লাভ যদি সুনিশ্চিত ও সুসম্পূর্ণ হয় তবেই তো তিনি চুক্তি পালন করিবেন। অতএব, ফ্রাঙ্কোর আর পূর্ব্ব-চুক্তিতে সম্মতি নাই।

বলিতে গেলে আপাততঃ বিদেশীয় অপসারণের প্রস্তাব এই পর্য্যন্তই। ইংলণ্ডের পত্রিকাগুলি তাহা স্পষ্টই বলিতেছে।

২

কিন্তু ব্যাপার এই, এই চুক্তিটার উপর কি ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতিও অনেকাংশে নির্ভর করে। তিন-চার মাস ধরিয়া ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু স্পেনে একটা সুমীমাংসা না হইলে তাহা কাজে প্রয়োগ করা চলিতেছে না। যদি বিদেশীয়রা ওখান হইতে সরিয়া আসে তাহা হইলেও ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তির প্রয়োগকাল নিকটবর্ত্তী হয়। এই আশাতেই ব্রিটেন নিরপেক্ষতা-কমিটির মারফৎ এদিকে এত চেষ্টা করিয়াছে। এখন তাহা যখন ব্যর্থ হইতে চলিল, তখন ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তিও আরও দূরে পড়িয়া গেল। মার্কিন কাগজগুলা বলিতেছে—এবার ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি অনিশ্চিত কালের মত শিকায় তোলা থাকুক। ফ্রাঙ্কোর উত্তরের ফল ইহাই—এই হইল ব্রিটেনের ভয়। জিজ্ঞাসা করা যায়, ছয় মাস পূর্ব্বে যেদিন ইডেন ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডল হইতে বিদায় লন সেদিন কি তিনি এইরূপ আশঙ্কাই করেন নাই? ব্রিটেনের অদৃষ্ট দেবতা বোধ হয় তখন নেপথ্যে হাসিতেছিলেন।

আমেরিকার কাগজওয়ালারা এই উপলক্ষে মনে করেন, হয় ফ্রাঙ্কো ইতালীর এত হাতে-ধরা নয়, না হয় ইতালী ব্রিটেনের বন্ধুত্ব অপেক্ষাও ফ্রাঙ্কোর জয় বেশী প্রয়োজনীয়

মনে করে। শেষ কথাটাই কতকাংশে ঠিক। তাহা যে ঠিক, এই কথা মুসোলিনী গোপনও করেন নাই। এই বিদেশীয়-অপসারণের কথা যখন সর্ব্ব-স্বীকৃত হইল তখনও ইতালীয় সৈন্য, ইতালীয় যুদ্ধসরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র তিনি স্পেনে পাঠাইয়াছেন, ইতালীয় সরকারী ইস্তাহারে তাহার হিসাবও বাহির হইয়াছে। কিন্তু ইতালী যে ব্রিটেনের বন্ধুত্ব একেবারে চায় না—ইহা ভাবাও ভুল। ইতালীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের ও রাষ্ট্রকর্ত্তাদের পক্ষে ব্রিটিশ পুঁজির সহায়তা দরকার, ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে একটা সহজ সম্পর্ক প্রয়োজন, সেই সূত্রে ব্রিটেনের সঙ্গে ফ্রান্সের বন্ধুত্বও একটু শিথিল করিয়া তোলা তাহার আবশ্যক। তাই কাউন্ট সিয়ানো স্পেনে সাহায্য প্রেরণের কথা সম্প্রতি স্পষ্ট স্বীকার করিতে চাহেন না;—ব্রিটেনের কিন্তু এই কথাটা মানিয়া লইতে কষ্ট হইতেছে। এদিকে সিনর গয়দা ফ্রান্সকে ইতালীর অসুবিধার জন্য দায়ী করিতেছেন।

কিন্তু, চেম্বারলেনই কি স্পেনে ফ্রাঙ্কোর পরাজয় চাহেন? পূর্ব্বাপর ঘটনাবলীর সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা অসংখ্য দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন, প্রকৃত পক্ষে ফ্রাঙ্কোর স্বপক্ষে চেম্বারলেন যত দূর সাধ্য চেষ্টা করিবার করিয়াছেন। যাঁহারা ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতির মর্ম্মকথা জানেন তাঁহারা বুঝিবেন, সে রাষ্ট্রনীতি এখন ফাসিস্ত ইতালীর বন্ধুত্ব বরণ না করিয়া পারে না। ব্রিটিশ পুঁজিবাদীর মুখপাত্র হিসাবে ব্রিটিশ শাসক-সম্প্রদায় সেই দিকেই পা বাড়াইতে বাধ্য,—তাহার পক্ষে গণতান্ত্রিক ও উদার স্বগোত্র সমাজতান্ত্রিক শক্তির সমস্ত ক্ষমতা খর্ব্ব না করিলেই নয়। তাই, চেম্বারলেন-হ্যালিফ্যাক্সের স্বগোত্র আজ মুসোলিনী-হিট্‌লার-ফ্রাঙ্কো। অবশ্য, এই কথাটা হয়তো চিরদিনের গণতান্ত্রিক ব্রিটিশ জাতির নিকট ঠিক স্পষ্ট করিয়া বলাও চলে না, বলিলেও সে পরিপাক করিতে পারিবে না, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা রাষ্ট্রজ্ঞগণের অজ্ঞাত নয়। এই মূল কথাটি বুঝিলে বুঝিতে দেরি হয় না যে, ব্রিটেন সত্যই ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তিকে জীয়াইয়া রাখিবে, আর এই স্পেনের বিদেশীয়-অপসারণ প্রস্তাবটিও আবার জীয়াইয়া তুলিবে। নিরপেক্ষতা-কমিটির নেতা লর্ড প্লিমাউথ্ সেই দিকে অগ্রসরও

ব্রিটেনের সমরায়োজন। গ্যাস-আক্রমণ-প্রতিরোধক বর্ম্মে সজ্জিত সান্ত্রী

হইয়াছেন—আবার সমস্ত 'নিরপেক্ষ'গণ আলোচনা-প্রত্যালোচনা করুন, একটা পথ বাহির করা যাইবে নিশ্চয়ই। তত দিন যদি ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যবর্ত্তী পিরেনীজ-পথ এমনি বন্ধ থাকে, তাহা হইলে ফ্রাঙ্কো অবশ্য ইতালীর শুভেচ্ছায় আপনার পথ করিয়া লইতে পারিবেন। ইতিমধ্যেই সাধারণতন্ত্রীরা এব্রো ও অন্য ক্ষেত্রে প্রতিহত হইয়াছে, পিরেনীজের পথ না-খুলিলে যুদ্ধাস্ত্রের অভাবে তাহাদের হারিতেই হইবে। তত ক্ষণ পর্য্যন্ত নিরপেক্ষতা-কমিটির ঠাটটা বজায় রাখাই দরকার।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির অন্তর্নিহিত কারণ যাঁহাদের অপরিচিত তাঁহারাই শুধু মনে করেন ইহা চেম্বারলেনের ভীরুতা ও মূঢ়তা। তাঁহারা দেখেন, স্পেনে ফ্রাঙ্কোর প্রতিষ্ঠায়

ফ্রান্সে ব্রিটিশ রাজদম্পতীর অভ্যর্থনা—বালক-বালিকারা ফরাসী ও ব্রিটিশ পতাকা উড়াইতেছে

ফরাসী বৈদেশিক দৌত্য-বিভাগের আপিসের সিঁড়িতে ব্রিটিশ রাজদম্পতী। এইখানে ইঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তো অসুবিধাই হইবার কথা। তৎপর মেজর্কা হইতে ইতালীয় উড়ো-জাহাজের ঘাঁটি উঠিবে কি না, জিব্রাল্টারের ওপারে জার্মান প্রভাব সত্যই লোপ পাইবে কি না, মোটের উপর এখন হইতে ভূমধ্যসাগরের সাম্রাজ্যপথ আর ব্রিটেনের পক্ষে নিষ্কণ্টক রহিবে কি না, সন্দেহ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে ইহার অর্থও পরিষ্কার। তবে কেন ব্রিটেন ফ্রাঙ্কোর প্রতিষ্ঠা চাহিবে? এই প্রশ্নটি স্বভাবতই মনে জাগে। ইহার উত্তরও আজ সুবিদিত—ব্রিটেনের উপায় নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মূলতঃ ব্রিটিশ বণিক-শ্রেণীরই স্বার্থের দায়ে গঠিত, তজ্জন্যই সংরক্ষিত। সেই মূল স্বার্থের দিক হইতে মুসোলিনীই যখন বিপদের বন্ধু, তখন সাম্রাজ্যপথ বা ঐরূপ দুই-চারিটি জিনিষ বিসর্জন দিতেই হইবে। আর সমরায়োজনে ব্রিটেন তখনও দুর্ব্বল। তাই যে-মূল্য বলদৃপ্ত মুসোলিনী আদায় করিবেনই—করিতেছেনও—সে-মূল্য লইয়া বিতর্ক না-করিয়া তাঁহার বন্ধুত্ব লাভ করিলে বরং সেই ভূমধ্য-সাগরের পথে এখনও কতকটা অংশীদারী করা চলে, নিজের অধিকার খানিকটা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব। ইতিমধ্যে বিপুল সমরশক্তি আয়ত্ত করা চলুক। ইহাই সম্প্রতিকার চেম্বারলেন-নীতি—ইডেন যাহা মানিতে চাহেন নাই।

কিন্তু এই নীতি বড় মারাত্মক হইতেছে ফ্রান্সের পক্ষে। সত্য বটে, মঃ ফ্লাঁদা প্রমুখ রাষ্ট্রবিদ্‌গণ ফাসিস্তদের সঙ্গে বুঝাপড়া চায়, কিন্তু ফ্রান্সের জনসাধারণ স্পেনে ফ্রাঙ্কোর বিজয়-সম্ভাবনায় প্রমাদ গণিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী দলাদিয়ে অর্থনৈতিক বনিয়াদ সংস্কার করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত আর পরিষদ্ ডাকিতে চাহেন নাই—স্পেনের প্রশ্নে তাঁহার পরাজয় ঘটিতে পারে এই ভয়ে। এদিকে নিরপেক্ষতা-কমিটির কথামত পিরেনীজ-পথ বন্ধ করিয়াও তিনি সাধারণ-তন্ত্রী স্পেনকে একেবারে সহায়হীন করিয়া রাখিয়াছেন—দেশে তাহাতেও অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া আছে।

তাহার পর এখন ফ্রাঙ্কো বিদেশীর অপসারণে হইলেন অস্বীকৃত—পিরেনীজের ওপারে জার্মান সমর-বিশেষজ্ঞগণ, জার্মান বৈমানিকগণ স্থায়ী হইয়া বসিতেছে, ইতালীয়গণ তো আছেই। এদিকে রাইনল্যাণ্ডে জার্মান দুর্গমালা ও সুসজ্জিত সৈনিক প্রস্তুত। ব্রিটিশ-বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে রাখিতে ফ্রান্স যে ফাসিস্তের জালে প্রায় বেষ্টিত হইয়া পড়িল—তাহার উপায় কি?

৩

সত্যই বিপদটা ফ্রান্সের পক্ষেই সমধিক। তাহার চির-বিভীষিকা জার্মানী। সেই জার্মান-আক্রমণের বিরুদ্ধে তাহার ভরসা ব্রিটেন। এখানে ব্রিটেনেরও স্বার্থ ইহাই। ফ্রান্স পরাধিকারে গেলে ব্রিটেন নিরাপদ নয়—বিশেষত এই উড়ো-জাহাজের যুগে। অর্থাৎ "ব্রিটেনের সীমান্ত আজ ডোভারের পাহাড় নয়, রাইন নদীর তীরে।" কিন্তু মধ্য-ইয়ুরোপে ফ্রান্সের যত দৃষ্টি ব্রিটেনের তত দৃষ্টি না দিলেও চলে। তথাপি, ব্রিটেনের সঙ্গ ফ্রান্স কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে ব্রিটেনের রাজারাণী এই দুই দেশের সম্পর্কটি আরও নিকটতর করিবার জন্যই ফ্রান্সে গেলেন। প্যারিসে তাঁহাদের যে বিপুল সমাদর ও সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হয় তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজা স্বয়ং বলিলেন—দুই জাতির মধ্যে মিল কত বেশী। দুই জাতিই গণতান্ত্রিক নীতিতে ও ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সেই সময়ে দুই দেশের রাষ্ট্রনীতিকদের মধ্যেও অনেক আলোচনা হইয়াছে। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সম্পর্কটা বেশ ঘনিষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জার্মান অভ্যুত্থানের পরে মধ্য-ইউরোপের জার্মান-বিভীষিকাগ্রস্ত জাতিদের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হওয়াও ফ্রান্সের পক্ষে স্বাভাবিক। তেমনি সহায়তার চুক্তি আছে ফ্রান্স, চেকোস্লোভাকিয়া ও রুশিয়ার এই চুক্তি ফ্রান্স অবজ্ঞা করিলে শুধু চেকো-স্লোভাকিয়াকেই মরিতে হইবে না, জার্মানীর হাতে তৎপরেই ফ্রান্সের নিজের প্রাণ-সংশয় হইবে। কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ায় ব্রিটেনের স্বার্থ গৌণ:—চেকোস্লোভাকিয়াকে সে রক্ষা করিতে চায় কতকটা জাতিসঙ্ঘের পুরাতন প্রতিশ্রুতির দায়ে, কতকটা পূর্ব্ব-ইউরোপে হিট্‌লারী একচ্ছত্রাধিকারকে ঠেকাইবার প্রয়োজনে, আর শেষ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের বন্ধুত্বের তাগিদে। ইহার অপেক্ষাও হিট্‌লারের সহিত একটা বুঝাপড়া করা ব্রিটেনের বেশী দরকারী। ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী ও জার্মানীকে লইয়া একটা চতুঃশক্তির সন্ধি স্থাপন করিতে পারিলে সে ইউরোপে নিশ্চিন্ত হয়। তাহা হইলে ফ্রান্সকেও রাশিয়ার সম্পর্ক হইতে দূরে রাখা যায়, ফাসিস্ত শক্তিদের দ্বারা ব্রিটেনেরও কোন স্বার্থহানি ঘটে না,—অর্থাৎ ব্রিটেনের পুঁজিবাদী মূল স্বার্থ নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কিন্তু এদিকে ফ্রান্সের দায়েও চেকদের অন্তত রক্ষার পথ তাহার দেখিতে হয়। এই কারণেই গত ২১শে মে যখন সসৈন্য হিট্‌লার প্রাগের অভিযানে উদ্যত হইয়াছিলেন তখন ব্রিটিশ-সরকার তাঁহাকে বলপ্রয়োগে নিরস্ত হইতে বলিয়া তখনকার মত চেকোস্লোভাকিয়াকে সেই আক্রমণ হইতে কতকাংশে রক্ষা করে। ইউরোপ ফ্রাঙ্কো-রুশীয়-চেক এবং জার্মান (জাপান-ইতালীয়-পোলিশ?) মহাযুদ্ধ হইতে তখনকার মত নিষ্কৃতি পায়। অবশ্য, জার্মান মহানায়ক ইহাতে খুশী হন নাই—আর ব্রিটেন তাঁহাকে

পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়ার সীমান্ত-দ্বার উন্মোচন

কখনও কষ্ট করিতে চায় না। তাঁহার সদিচ্ছা বহন করিয়া দূত ভিদম্যান আসিলেন লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের নিকটে। ব্রিটিশ-সরকার চেক্-সরকারকে জানাইতে দেরি করে নাই যে, সে-দেশের জার্ম্মান সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমস্যাটা যুক্তিযুক্তরূপে মিটাইয়া ফেলা এবার চেক্‌দের দায়িত্ব, সুদেতেন নায়ক হেনলাইনের দলের সঙ্গে একটা সুমীমাংসায় এবার পৌঁছানো উচিত। চেক্-মন্ত্রীরা বরাবরই তাহার পক্ষে। কিন্তু সুদেতেন জার্ম্মানরা আজ নিজেদের কথাই শুধু ভাবে না, তাহাদের পিছনে 'তৃতীয় রাইখের' কর্ণধার হিট্‌লারের আশ্বাসবাণী রহিয়াছে, জার্ম্মান জাতির নেতা আজ হিট্‌লার। যেখানকার যত জার্ম্মানকে আজ এক জার্ম্মান রাষ্ট্রে একত্র করা তাহার উদ্দেশ্য। অতএব, এই জার্ম্মান সংখ্যালঘিষ্ঠরা প্রথমত দাবি করিতেছে জাতিগত আত্মকর্ত্তৃত্ব আর নাৎসি চিন্তা ও নাৎসি কর্ম্মধারা গ্রহণ করিবার অধিকার। ইহার অর্থ সুদেতেন অঞ্চলে একটি ক্ষুদে 'সামগ্রিক' (টোটেলিটেরিয়ান্) রাষ্ট্র স্থাপন—অবশ্য এখনও চেক্ সাধারণতন্ত্রের অভ্যন্তরে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য দেশের স্লোভাক্, মজিয়ার প্রভৃতি অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠরাও এরূপ দাবি তুলিয়াছে। অতএব, চেক্-রাষ্ট্রের অখণ্ডতা মানিলে এই দাবি পূরণ সম্ভব নয়। উহার এই অখণ্ডতা-রক্ষা হিট্‌লারের ইচ্ছাও নয়—কিন্তু ইহাই আবার ফ্রান্সের ও রাশিয়ার স্বার্থ। এমন সময়ে ব্রিটেনের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী লর্ড রান্‌সিম্যান্ গিয়াছেন সে-দেশে—চেক্ ও অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠদের মধ্যে মধ্যস্থরূপে সুমীমাংসা করিতে। ফরাসী লেখক 'পার্টিনাক্স' বলিতেছেন—এত দিন চেক্ ব্যাপারে ফরাসীই ছিল বেশী উদ্যোগী, এবার সে-উদ্যোগ ব্রিটেনের হাতে গেল। বুঝা যাইতেছে, এ-উদ্যোগের ফল কি হইবে। 'ফ্যুয়েররে'র আর বিরক্তি উদ্রেক করিবার ইচ্ছা নিশ্চয়ই ব্রিটেনের নাই—অতএব মধ্যস্থের রায়ে চেক্‌দের ক্রমাগতই অধিকার ছাড়িতে হইবে। এইরূপে চেক্-রাষ্ট্র এমনি শিথিলগ্রন্থি হইয়া পড়িবে যে, ইহার পরে এক দিন অষ্ট্রিয়ার মত তাহার মৃত্যু ঘটিবেই। আর যদি রান্‌সিম্যানের প্রস্তাবে সে রাজী না-হয়, তাহা হইলে ব্রিটেন বলিবে, সে যুক্তি শোনে না। তখন আর তাহার পক্ষে ব্রিটিশ সহানুভূতির প্রত্যাশা করা চলিবে না। সে অবস্থায় ব্রিটিশ-বন্ধুত্বাবদ্ধ ফ্রান্স কি শুধু রাশিয়ার ভরসায় আর চেক্‌দের সহায়তায় অগ্রসর হইতে সাহসী হইবে? রান্‌সিম্যানের দৌত্যে ফ্রান্সের এই সঙ্কটই সম্ভবত ফরাসী সাংবাদিক 'পার্টিনাক্স' লক্ষ্য করিয়াছেন। তাই ফ্রান্সের পক্ষে এখন চারি দিকেই বিপদ।

৪

চেক্ ও ফরাসীর পক্ষে ব্যাপারটা বিশেষ শঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে এবারকার মধ্য-আগষ্টের জার্ম্মান সৈনিকদের কুচকাওয়াজে। ফ্রান্সের সীমান্তে ও চেক্-সীমান্তেই ইহার ঘটা বেশী—রাইন্‌ল্যাণ্ড সুরক্ষিত, যুদ্ধোদ্যোগ যেন সম্পূর্ণ। ঠিক এই নিমেষেই তবু পূর্ব্ব-ইউরোপের ক্ষুদ্র শক্তিদের মধ্যে একটি নূতন ও শুভ প্রয়াসের লক্ষণ দেখা গেল। ভাবা স্বাভাবিক, সে-রাষ্ট্রগুলির পক্ষে আর হিট্‌লারী স্বস্তিক-ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। চেক্‌রা ত বিপন্নই; মঃ টিটেলস্কুকে বিদায় দিয়া রুমানিয়ার রাজা কেরল দেশে নাৎসি প্রভাব বাড়াইতেছেন; যুগোস্লাভিয়া বরাবরই প্রায় মুসোলিনীর আজ্ঞাবহ। এদিকে হাঙ্গেরীর

চেকোস্লোভাকিয়ার সমরায়োজন—ট্যাঙ্কের সারি

চেকোস্লোভাকিয়ার সমরসজ্জা—পদাতিক-বাহিনী

প্রতিনিধি হোর্থি সপরিবারে জার্মানীতে আতিথ্য উপভোগ করিতেছেন—সম্ভবত হাঙ্গেরীর মজিয়ার জাতি পুরাতন অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারী এই নূতন জার্মান সাম্রাজ্যের বন্ধুত্বই আবার গ্রহণ করিতেছে—ইহাই মনে হইয়াছিল। এমন সময়ে দেখা গেল হাঙ্গেরীয়দের সঙ্গে 'লিটল আঁতাত' বা ক্ষুদ্র বন্ধুগোষ্ঠীর ঐ রাজ্যগুলি যুদ্ধকালে পরস্পর সহায়তার সর্ত্তে সন্ধি করিয়াছে। এই বন্ধুগোষ্ঠীতে আছে চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও রুমানিয়া। জার্মানীর অষ্ট্রিয়া অধিকারের পর দানিয়ুব অঞ্চলের এই দেশগুলি তাহারই আওতায় গিয়া পড়িবে এই সম্ভাবনা প্রায় সত্য হইতে চলে—দানিয়ুব বাহিয়া জার্মানীর বিপুল শিল্পজাত যাইবে উহাদের ঘরে আর উহাদের প্রচুর কৃষিজাত আসিবে জনসমৃদ্ধ জার্মানীর পল্লীতে নগরে—জার্মান সাম্রাজ্যের প্রসারে উহারা হইবে পার্শ্বরক্ষী, কাঁচা মালের উৎপাদন কেন্দ্র। মনে হইয়াছিল, ইহাই উহাদের অদৃষ্টলিপি। কিন্তু এইবারকার এই সন্ধিতে প্রমাণিত হইতেছে যে, নিজেদের স্বাধীন জীবন উহারা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য সচেষ্ট। দানিয়ুব অঞ্চলে এই রাষ্ট্রমিলনে হাঙ্গেরী বিশেষ করিয়া যোগ দেওয়ায় নিশ্চয়ই হিট্‌লার রুষ্ট হইতেছেন—তাঁহার পরিকল্পনায় বাধা ঘটিল। অপরপক্ষে চেকোস্লোভাকিয়া যে এই দুঃসময়ে কথঞ্চিৎ শক্তি পাইল, তাহাও নিঃসন্দেহ।

কিন্তু হিট্‌লার কি এই দানিয়ুবীয়দের মিলন নিশ্চেষ্ট ভাবে দেখিবেন? লক্ষ লক্ষ সৈন্য সাজাইয়া তিনি বসিয়া আছেন—তথাপি, তাঁহারই চক্ষুর সম্মুখে এত বড় একটা অসহনীয় স্পর্দ্ধা এই নগণ্য রাজ্যগুলির! অবশ্য, রুশ-জাপানের যুদ্ধটা যদি সত্যই পাকিয়া উঠিত তাহা হইলে আজ তাঁহার হয়তো দ্বিধা থাকিত না। কিন্তু সে-যুদ্ধ বাধিল না, চেকোস্লোভাকিয়ার সাহায্য আসিতে এখন ফরাসী বিলম্ব করিলেও রাশিয়া বিলম্ব করিবে না। তাহা হইলে তো মহাসঙ্কট। ইউরোপ তো রুদ্ধশ্বাসে এই মুহূর্ত্তে প্রতীক্ষা করিতেছে—সেই কম্যুনিষ্ট-নিসূদন মহাহবে কল্কি-দেবতা এখনি বাহির হইবেন, না কাল পূর্ণ হয় নাই?

প্রেসিডেণ্ট পদে সাহিত্যিক

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

দেশ বা জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে হইলে রাজনীতি-চর্চ্চা ছাড়াও অন্য বহু কাজে হাত দিতে হয়। ভাষা সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত চর্চ্চা করা প্রয়োজন। নিপীড়িত পরাধীন জাতির পক্ষে ইহা ত আরও আবশ্যক। এইরূপ প্রয়োজনীয়তার কথা আয়ার্লণ্ডের এক ব্যক্তি মনে-প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম সাধনায় আইরিশ জাতির প্রাণে অভিনব প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। তাহারা এ-কথা কখনও ভুলিতে পারে নাই। সম্প্রতি আয়ার্লণ্ডে ডি ভ্যালেরার নেতৃত্বে গণতন্ত্রমূলক একটি নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আয়ার্লণ্ড এখন 'আয়ার' নামে পরিচিত। সম্প্রতি ইহার প্রেসিডেণ্ট-নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। আয়ারের সর্ব্বদল মিলিত হইয়া আইরিশ সংস্কৃতির এই একনিষ্ঠ সাধককে তথাকার 'প্রেসিডেণ্ট' বা রাষ্ট্রনায়কের পদে বরণ করিয়াছেন। 'প্রেসিডেণ্ট' ডক্টর ডগলাস হাইড এখন অশীতিপর বৃদ্ধ। তিনি স্বগ্রাম কনাক্টে অবসর-জীবন যাপন করিতেছিলেন। আইরিশ জাতির আহ্বানে তিনি সাড়া না দিয়া পারেন নাই।

কনাক্টেই ডক্টর হাইডের জন্ম। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন প্রোটেষ্টাণ্ট পাদ্রী। আয়ারে রোমান ক্যাথলিকদের প্রাধান্য। তথাপি এক জন প্রোটেষ্টাণ্টকেই এই সর্ব্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হইয়াছে! হাইড-পরিবার আয়ারেরই বাসিন্দা। ইহার সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদের তাহারা সাথী। হাইডের শৈশব সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। তবে সেই নিভৃত পল্লীর খালবিল, তরুলতা, পশুপক্ষী, কথা-কাহিনী তাঁহাকে একান্তই আইরিশ করিয়া তোলে। এখানকার ছোট ছোট পাহাড় অরণ্য তাঁহাকে কোন এক অজানা দেশের সন্ধান দিত। তাঁহার কবি-মনের খোরাক এইখানে প্রচুর জুটিতে থাকে।

শৈশব ও কৈশোর স্বগ্রামে কাটাইয়া হাইড ১৮৮০ সনে ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি পাদ্রী হন পিতার এই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কনাক্টের স্মৃতি তাঁহাকে ধর্ম্মযাজকের পবিত্র কার্য্য অপেক্ষাও পবিত্রতর দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করে। তিনি ক্রমে ইংরেজী, জার্ম্মান, হিব্রু, গ্রীক, লাটিন ও ফরাসী ভাষা শেখেন। কিন্তু প্রাণাপেক্ষা প্রিয় গেলিক ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে

ডক্টর ডগলাস হাইড

তিনি অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। তখন আয়ার্লণ্ডে ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির রেওয়াজ। যাহারা আয়ার্লণ্ডের উন্নতিকল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন তাঁহারাও ইংরেজীর মোহ ছাড়িতে পারেন নাই। স্কুল-কলেজে শিক্ষার বাহন ইংরেজী। বই, পুঁথিপত্র, কথাবার্ত্তা, আলাপ-আলোচনা-বক্তৃতা, আইন-আদালত, সরকারী দপ্তরখানা—সর্ব্বত্র এই

ইংরেজী ভাষার দাপট। গেলিক সাহিত্যের মাধুর্য্য ও রসবৈচিত্র্য তথাকথিত শিক্ষিত জনের অনুভূতির বাহিরে। ডগলাস হাইড এই বিসদৃশ ব্যাপার মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন। তাঁহার শৈশব এমন এক স্থানে অতিবাহিত হইয়াছে যেখানে জাতির প্রাণরস ছিল তাজা ও অটুট, বাহিরের ভেজাল তাহার সহিত মিশিয়া শুচিতা নষ্ট করিতে পারে নাই। হাইড বুঝিতে পারিলেন, পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের যতই চেষ্টা হউক না কেন, জাতির একান্ত নিজস্ব এই প্রাণরসের পুষ্টিসাধন না হইলে ইহার মুক্তি দুর্ঘট। হাইড তাই জাতীয় গেলিক ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চায় মন দেন। অন্য সকলে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হয়।

হাইড মেধাবী ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি বি-এ পরীক্ষায় আধুনিক সাহিত্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং পুরস্কার-স্বরূপ স্বর্ণপদক লাভ করেন। আইনের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডক্টর উপাধি প্রাপ্ত হন। ধর্ম্মতত্ত্ব-বিষয়ক পরীক্ষায়ও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। তিনি বক্তৃতা করিতে পটু, এ-বিষয়েও তিনি একটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। কৌলিক যাজক-বৃত্তি গ্রহণ করিতে কিন্তু তাঁহার মন সরিল না।

অতঃপর তিনি নিউ ব্রান্সউইক বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকের চাকরি লইয়া যান। সেখানে তিনি অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই। কানাডায় পান-ভোজনের নিয়ন্ত্রণের এরূপ কড়া ব্যবস্থা যে, তাঁহার মন ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিলোপ-আশঙ্কায় বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ১৮৯১ সনে কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া আয়ার্লণ্ডে তিনি ফিরিয়া আসেন।

ইহার দুই বৎসর পরে ১৮৯৩ সনে তিনি 'গেলিক লীগ' নামে একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। নাম হইতে অনেকের হয়ত ধারণা হইবে যে, গেলিক ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনই এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। নামে অবশ্য ইহাই বুঝায়। কিন্তু এই সমিতি আইরিশ জাতির পুনর্জ্জাগরণ-প্রচেষ্টার মূর্ত্ত প্রতীক। ভাষা সাহিত্য ছাড়াও আইরিশ সংস্কৃতির যাহা কিছু পরিপোষক সকলই ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। গল্প-গাথা, গীত-বাদ্য, চারু ও কারু শিল্প, লোকনৃত্য, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির বিবরণ ইহার আনুকূল্যে সংগৃহীত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার চাপে এ সকলই তখন জীবন্মৃত। শহরে পল্লীতে গেলিক লীগের শাখা গড়িয়া উঠে। যুবকগণ দলে দলে ইহাতে যোগদান করে। কিন্তু এই আন্দোলনের প্রাণশক্তি জোগাইতেন ডগলাস হাইড স্বয়ং। তিনি লীগের সভাপতি, ইহার উদ্দেশ্য তাঁহাতেই যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। তাঁহার নির্দ্দেশে ও প্রেরণায় যুবকদল আইরিশ জাতির নিজস্ব প্রতিভার নিদর্শনসমূহের পরিচয় পাইতে লাগিল। হাইড নিজে কবি, রস আহরণ ও পরিবেশন তাঁহার স্বাভাবিক বৃত্তি। তিনি যেখানে যাহা কিছু সুন্দর দেখিতে পান তাহা যুগোপযোগী করিয়া জাতিকে পরিবেশন করেন। অন্যেরাও বিভিন্ন অঞ্চল হইতে রসবস্তু সংগ্রহ করিয়া লীগকে উপহার দেন। এইরূপে আইরিশ জাতি ক্রমশঃ আত্মস্থ হইল, আত্ম-পরিচয় লাভ করিল। তাহারাও যে একটি প্রাচীন শ্রেষ্ঠ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী তাহা এই প্রথম বুঝিতে পারিল।

সাধারণের মনে আত্মসম্বিৎ জাগাইবার পক্ষে সাহিত্য-প্রচার একটি উপায় মাত্র। কিন্তু মাত্র এই উপায়েই তাহা সাধ্য নয়। সাধারণের চোখের সম্মুখে সব বিষয় ধরিয়া দিতে পারিলে তবে তাহারা ইহা বুঝিতে পারিবে। কথকতা, বক্তৃতা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে আয়ার্লণ্ডের নানা স্থানে অভিনয়ও সুরু হইল। হাইড এইরূপ উদ্দেশ্যমূলক নাটক লিখিয়া স্বয়ং অভিনয়ে নামেন। জাতির মধ্য হইতে হাসি-আনন্দ চলিয়া গিয়াছিল, তিনি অভিনয় দ্বারা আইরিশ জাতিকে আবার তাহা ফিরাইয়া দিলেন। তাহারা হাসিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বস্তুও তাহাদের মনে বাসা বাঁধিবার অবকাশ পাইল। তাহারা আত্মপরিচয় লাভ করিল, আয়ার্লণ্ডও যে সাহসী যোদ্ধা, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিল্পী প্রভৃতির আবাসভূমি ছিল তাহাও তাহারা জানিল,—স্বার্থান্ধ বিদেশীর মিথ্যা প্রচারে তাহারা আর প্রতারিত হইল না।

প্যারিস। মঁমার অঞ্চলের দৃশ্য

প্যারিস। এরোপ্লেন হইতে ল্যুভ্র্ ও কারুসেলের দৃশ্য

প্যারিস। বুলেভার লেফরিয়ে পল্লীর নূতন বসতবাড়ীর দৃশ্য।

লীগ আয়ার্লণ্ডের নানা স্থানে বৎসরের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মেলা-উৎসবের আয়োজন করিতেন। চারু ও কারু শিল্পের প্রদর্শনী হইত, উহার সঙ্গে অভিনয়, নৃত্য, কথকতা ও গীতবাদ্যের অনুষ্ঠান চলিত। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে বাংলা দেশে হিন্দুমেলা নামে এইরূপ জাতীয় মেলা আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু তাহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। আইরিশগণ বহুদিন এই মেলা-উৎসব চালান। জাতীয় ঐক্যবোধও সেখানে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

গেলিক লীগ প্রতিষ্ঠার বার বৎসর পরে আর একটি সঙ্ঘ বা দল আয়ার্লণ্ডে স্থাপিত হয়। ইহার নাম 'সিনফিন' অর্থাৎ 'আমরা'। এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আর্থার গ্রিফিথ। অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি সকলই আইরিশ জাতির নিজস্ব রীতি ও পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত করাইবার উদ্দেশ্যে এই দল গঠিত হয়। ইহার মূল মন্ত্র ছিল—আইরিশ জাতির মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ফিরাইয়া আনা। গেলিক লীগ ও সিনফিন দল এই দুইয়ের চেষ্টায় আইরিশ যুবকদল নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে সকল সমস্যা দেখিতে লাগিল। শহর পল্লী সর্ব্বত্র স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠিত হইল। আইরিশ নেতা ঈমন ডি ভ্যালেরা এই সময় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে যোগদান করেন। ইহাদের সঙ্কল্প—হিংসাত্মক পথে ব্রিটিশ আধিপত্যের বিলোপ-সাধন। গেলিক লীগ বিপ্লবী প্রচার-কার্য্য হাতে লউন ইহাই হইল এই নূতন দলের দাবি। হাইড এ-পথের পথিক নহেন। তিনি ইহাতে সম্মতি দিলেন না। নূতন দলের প্রাধান্য হওয়ায় তিনি ১৯১৬ সনে লীগের সংস্রব ত্যাগ করেন।

ইহার পর বহু বৎসর কাটিয়াছে। আয়ার্লণ্ডের ইতিহাসের ক্রমশঃ পট-পরিবর্ত্তন হইয়া ইদানীং সেখানে একটি রিপাব্লিক বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গেলিক লীগের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগের পর হাইড ডাব্লিন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলিক ভাষার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইলেন। মাত্র ছয় বৎসর পূর্ব্বে অবসর গ্রহণ করিয়া নিজ গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি তাঁহার বড় সাধের গেলিক সংস্কৃতির চর্চ্চা কিন্তু কখনও ছাড়েন নাই। অবসরকালেও তিনি ইহাতে ব্যাপৃত ছিলেন। একদা মতানৈক্য হওয়ায় তিনি গেলিক লীগ ছাড়িয়া যান বটে, কিন্তু জাতির পুনর্জাগরণে তাঁহার অতুলনীয় দান উগ্রপন্থীরাও ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার পূর্ব্বকীর্ত্তি স্মরণ করিয়া আইরিশ জাতি তাঁহার স্বগ্রামে একটি বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। আজ আবার তাঁহার আহ্বান আসিয়াছে। যিনি এক দিন সমগ্র জাতিকে আত্মস্থ হইবার পথ দেখাইয়াছেন, আজ বিজয়ের মুহূর্ত্তেও তাহারা তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন। জাতি ইহা দ্বারা কম মহত্ত্ব দেখায় নাই। ডক্টর ডগলাস হাইড সর্ব্ব দলের শুভেচ্ছা লইয়া আয়ারের প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্র-নায়ক পদের গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন—সমগ্র আইরিশ জাতির আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা তাঁহার সাধ্যের অতীত।

ডগলাস হাইড কবি। আয়ারে বহু প্রতিভাপন্ন কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু জাতির মর্ম্মকথা হাইড ছন্দে যেমন রূপায়িত করিয়াছেন এমনটি অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভব হইত না। তাঁহার "Songs of Connacht" পুস্তক বহু আইরিশ যুবকের মনে মুক্তির প্রেরণা দিয়াছে। তাঁহার একটি কবিতার মর্ম্ম এই,—

> ও'নিলগণ এখন নির্ব্বাসনে,
> উৎপীড়িত আয়ার্লণ্ড ফুঁপাইয়া কাঁদে,
> ঈগল পাখীর ডিমে ঈগলই হইবে,
> যেখানেই এরা জুটুক না কেন এরা ঈগলই।

ঈগল পাখীর সন্তানেরা তাঁহাকে আজ জয়মুকুট পরাইয়াছে। হাইড ডাবলিনে এই পদে সম্প্রতি বৃত হইয়াছেন। আয়ারের তিনিই হইয়াছেন প্রথম প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রনায়ক। সমগ্র আইরিশ জাতির দৃষ্টি আজ তাঁহারি দিকে।

এস্‌বেষ্টস্‌ বা মৃৎকার্পাস

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে এক প্রকার পাথরের কথা প্রচলিত ছিল যাহাতে আগুন লাগিলে জলে নিবানো যায় না। কেহ কেহ বলেন, ইহা পাথুরে চুণ সম্পর্কে রূপক মাত্র, কেন না পাথুরে চূণ আগুন লাগাইয়া পোড়ানো হয় এবং পোড়াইবার পর জল ঢালিলে তাহা হইতে আরও উত্তাপ বাহির হয়। পাথুরে চুণ বা অন্য যাহাই হউক, ঐরূপ পাথরের গ্রীক নাম ছিল এস্‌বেষ্টস্‌। প্রাচীন গ্রীক এস্‌বেষ্টস্‌ রূপকথার আশ্চর্য্য সামগ্রী ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু আধুনিকদের ভাষায় যে খনিজ-পদার্থটিকে এস্‌বেষ্টস্‌ নামে এখন পরিচয় দেওয়া হয় তাহাও অসাধারণ বস্তু। এই কঠিন পাথরকে মাটির গর্ভ হইতে তুলিয়া হাতুড়ির আঘাতে পিষিলে ধুলা-বালুর পরিবর্ত্তে শিমুল তূলার মত উজ্জ্বল রেশমী রোমগুচ্ছে পরিণত হয়। ইহাই এক অদ্ভুত ব্যাপার, কেন না আমাদের সাধারণ জ্ঞানে সুতা-তন্তু-জাতীয় সকল জিনিষই হয় উদ্ভিদ, নয় জৈব পদার্থ—এমন কি কৃত্রিম রেশমও প্রথমতঃ উদ্ভিজ্জ পদার্থ বলিয়া পরিচিত।

তাহার পর এই খনিজ কার্পাসে প্রায় সাধারণ কার্পাসেরই মত সুতা পাকানো, বয়ন ইত্যাদি চলে। ইহা সাধারণ মাটি পাথর বা অন্য খনিজের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ব্যাপার। সুতা-পাকানো দূরের কথা, 'বালুকায় রজ্জু নির্ম্মাণ'ও যাদুকরের ইন্দ্রজালের কার্য্য বলিয়াই ত বিখ্যাত। কিন্তু এই মৃৎকার্পাস সম্পর্কে সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, উহার সুতায় বোনা কাপড় আগুনে পোড়ানো বা সাধারণ রাসায়নিক দ্রাবকে গলানো যায় না।

এস্‌বেষ্টসের দস্তানার উপর জ্বলন্ত অঙ্গার

এস্‌বেষ্টস্‌ সুতার ও বস্ত্রের এই অদ্ভুত উত্তাপরোধের পরিচয় প্রাচীন কালের লোকেও পাইয়াছিল, কিন্তু তখনকার দিনে ইহা অলৌকিক বা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের মধ্যে গণ্য ছিল। প্লুটার্কের ইতিহাসে গ্রীক "ভেষ্টাল" কুমারীদের 'মন্দিরের প্রদীপের কথা আছে
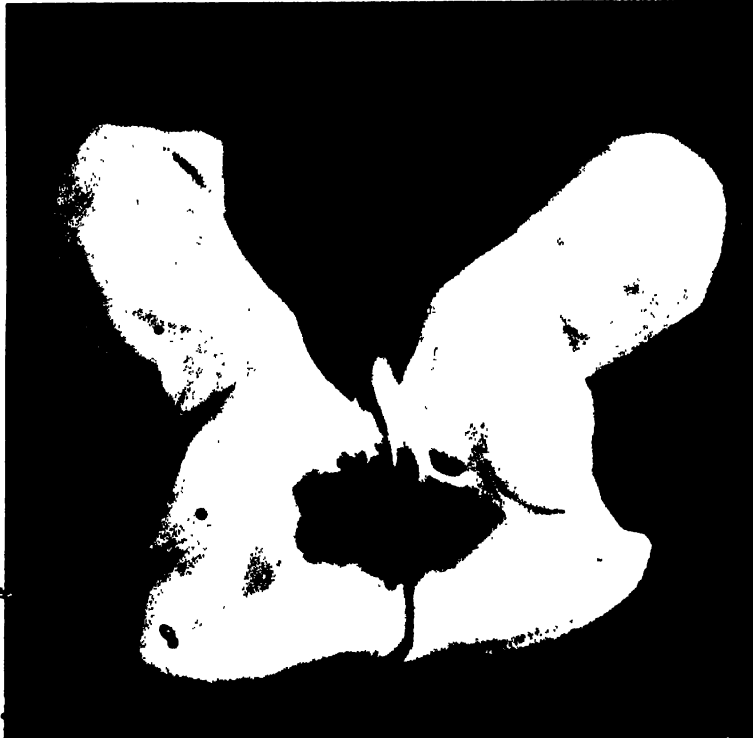
যাহার পলিতা কখনও পুড়িয়া যাইত না। পওসানিয়ানের ইতিবৃত্তে ঐরূপ এক দীপের কথা আছে যাহা "কার্পাসীয়" (সাইপ্রস দ্বীপের এক অঞ্চলের নাম কার্পাসিয়স) অলৌকিক তন্তু নির্ম্মিত হওয়ায় চিরস্থায়ী ছিল। প্লিনির ইতিবৃত্তে কোন কোন প্রাচীন নৃপতির সৎকার-বস্ত্রের যে বর্ণনা পাওয়া যায় (*linum virum*) তাহা হইতে মনে হয় সে-বস্ত্রও এস্‌বেষ্টস্‌-তন্তু-নির্ম্মিত হইত।

মধ্যযুগে নৃপতি শার্লামেনের ভোজন-টেবিল আবরণের কথা খুবই প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, এক সময়ে শার্লামেনের সঙ্গে খলিফ হারুণ-অল-রসীদের মনান্তর হওয়ায় যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল। নৃপতি শার্লামেন সে-সময় ঐরূপ প্রবল শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি মুস্‌লিম দূতদিগকে সাদরে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া, টেবিলে ঐ চাদর বিছাইয়া পান-ভোজন শেষ করিবার পর সেই বস্ত্রখণ্ড আগুনে নিক্ষেপ করিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে টেবিলের চাদর আগুনে পরিষ্কার হইলে পরে তাহা অক্ষত অবস্থায় ঝাড়িয়া রাখা হইল। মুস্‌লিম দূতেরা শার্লামেনের এই অলৌকিক ক্ষমতার চাক্ষুষ পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, যুদ্ধ বাধে নাই।

এস্‌বেষ্টসের পরিচ্ছদে অগ্নিনিবারক

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভিনিসীয় পর্য্যটক মার্কো পোলো মধ্য-এশিয়ায় এক তাতার জাতির নিকট ঐরূপ এক খণ্ড বস্ত্রের অগ্নিরোধক্ষমতা দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাতারেরা তাঁহাকে বলে যে ঐ বস্ত্র "সালামাণ্ডার" নামে এক অগ্নিবিহারী জীবের চর্ম্মে নির্ম্মিত। প্রাচীন কালের এইরূপ অনেক গল্প ও কিম্বদন্তী আমাদের কাছে পৌঁছিয়াছে। আধুনিক সময়ে কানাডা (উত্তর-আমেরিকা) দেশের এক ফরাসী কানাডীয় কাঠুরের গল্প ঐ দেশে খুবই চলিত আছে। এই কাঠুরে গত শতাব্দীর মধ্যভাগে কানাডার বিরাট জঙ্গলে বিভিন্ন কোম্পানীর তরফে গাছ-কাটার মজুরি

এস্‌বেষ্টসের বৃহৎ খনি

এস্‌বেষ্টসের নেয়ার প্রস্তুত হইতেছে

খবরের কাগজে ইতালীতে এই জিনিষ লইয়া যে চেষ্টা চলিতেছে তাহার কথা পড়িয়া, তাহার খানিকটা সংগ্রহ করিয়া তাহাতে একজোড়া মোটা দস্তানা তৈয়ার করে। তাহার পর তাহার দোকানে লোকজন আসিলে সকলের সামনে ঐ দস্তানা পরিয়া জলন্ত কয়লা হাতে লইয়া এই পদার্থের অগ্নিরোধক্ষমতা দেখানো হইত। ক্রমে এই ব্যাপারের কথা চারি দিকে রাষ্ট্র হইতেই অনেক বিশেষজ্ঞ এই বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। এখন যে কোন ব্যাপারে অগ্নি-রোধ বা উত্তাপ-সহনের যে কোন কার্য্যেরই প্রয়োজন হয়, সকলের আগে লোকের মনে হয় এস্‌বেষ্টসের কথা। থিয়েটার-বায়োস্কোপের প্রেক্ষাগৃহের অগ্নি-যবনিকা হইতে মোটরকারের ব্রেকের লাইনিং
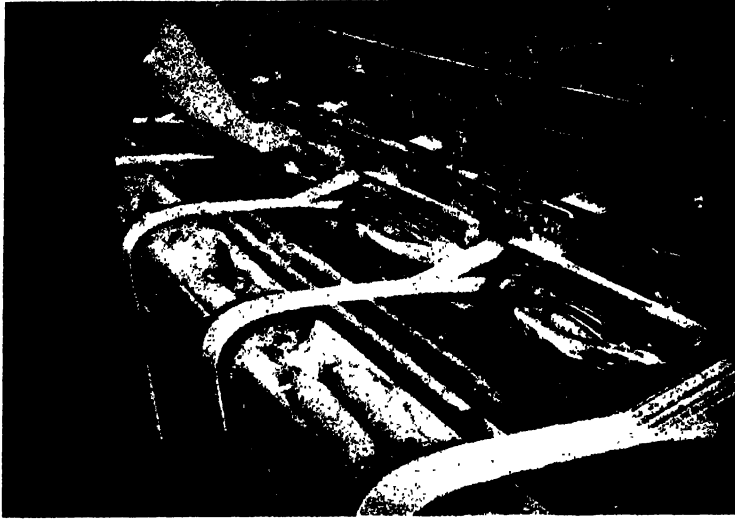
করিয়া খাইত। এক বার এক দারুণ শীতের দিনে অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে সে ছাউনিতে ফিরিয়া আসে। গলন্ত বরফে সকলেরই জুতা-মোজা ভিজিয়া গিয়াছিল, এবং সকলেই তাহা আগুনের চুল্লীর উত্তাপে শুকাইতেছিল। এই কাঠুরে অন্যদের মত জুতা মোজা খুলিল। কিন্তু মোজাগুলি আগুনের সামনে না-ধরিয়া সে চুল্লীর মধ্যে নিক্ষেপ করে এবং অল্পক্ষণ পরে সেই "ম্যাজিক"-মোজা চিমটা দিয়া বাহির করিয়া পরিবার উপক্রম করে। মোজা আগুনে পুড়িল না দেখিয়া তাহার সঙ্গীরা তাহাকে শয়তানের অনুচর ভাবিয়া পলাইয়া যায় এবং তাহাকে বিদায় না করিলে তাহারা কাজ করিবে না এই কথা কোম্পানীকে জানায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মানুষ এস্‌বেষ্টসের গুণের পরিচয় শত-সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও পাইয়াছে, কিন্তু এই পদার্থটির প্রকৃত পরিচয় এবং ইহাকে মানুষের সাধারণ কাজে আনিবার চেষ্টা মাত্র সত্তর-পচাত্তর বৎসর যাবৎ হইতেছে। এই চেষ্টায় ইতালীয়েরা অগ্রগণ্য, কেন-না ঐ দেশেই সর্ব্বপ্রথমে এই খনিজাত তন্তুতে সুতাকাটা ও বোনার চেষ্টা হয়। এই চেষ্টার বিকাশ এবং তাহাতে নূতন উদ্যমের যোগ হয় জন্স (H. W. Johns) নামে নিউ ইয়র্কের এক আড়তদারের উৎসাহে। এই ব্যবসায়ী

বারুদদ্বারা এস্‌বেষ্টসপূর্ণ প্রস্তরস্তর বিস্ফোরণ

পর্য্যন্ত অসংখ্য প্রকার কাজে এখন এস্‌বেষ্টসের ব্যবহার হয়। উত্তাপ সহ্য ছাড়া ইহার আর একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহা জলবৃষ্টি রৌদ্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক ধ্বংস শক্তির হিসাবে প্রায় অক্ষয়। সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়াও ইহার উপর হয় না বলিলেই চলে, সুতরাং যেখানে উত্তাপ, বিদ্যুৎ বা আবহাওয়ার প্রকোপরোধের প্রয়োজন সেখানেই ইহার সমাদর। উত্তাপরোধ ও উত্তাপরক্ষা (যথা এঞ্জিনে বয়লারের তাপ রক্ষার জন্য এস্‌বেষ্টসের প্রলেপ), মোটরের ব্রেক ইত্যাদিতে ঘর্ষণ প্রতিরোধ, শব্দরোধ ইত্যাদি ব্যাপারে এস্‌বেষ্টসের ব্যবহার এখন নিত্য-নৈমিত্তিক হইয়া পড়িয়াছে। ইহা পচে না, জলে গলে না, রৌদ্র-বাতাসে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, ক্ষার বা দ্রাবকে বিকৃত হয় না, অথচ ইহা নমনীয়, সুতাকাটা ও বয়নের উপযুক্ত এবং সিমেন্ট ইত্যাদির যোগে কাঠের তক্তার মত কার্য্যকরী। সুতরাং এহেন দ্রব্যের সমাদর আজকালকার যন্ত্রশক্তিময় জগতে অবশ্যম্ভাবী।

বিস্ফোরণের পর প্রস্তর-স্তর হইতে হাতে এস্‌বেষ্টস্‌ আহরণ

এই অদ্ভুত বস্তুটি খনিতে ঠিক পাথরেরই মত থাকে। সেখানে পারিপার্শ্বিক প্রস্তররাজ্যের সঙ্গে ইহার বিশেষ প্রভেদ নাই—অন্য পাথরেরই মত গাঁইতি, শাবল, ডিনামাইট-বিস্ফোরকের সাহায্যে ইহাকে খনিবক্ষ হইতে আদায় করিতে হয়। এক-কথায় এই খনিজটি একটি অধাতব প্রস্তরবিশেষ। কিন্তু খনির বাহিরে ইহাকে ক[illegible] সাহায্যে ধুনিয়া ও পিজিয়া ঠিক তুলার আকারেই পাওয়া যায়। মুগুরের আঘাতের পর ধুনিবার সঙ্গে সঙ্গে কঠিন প্রস্তরখণ্ড দেখিতে দেখিতে পেঁজা তুলায় পরিণত হইয়া ক্রমে সুতা ও মোটা কাপড়ে পরিণত হয়।

খনিজতত্ত্ববিদ ও রাসায়নিকের হিসাবে এস্‌বেষ্টস্‌ নামটি বিভিন্ন খনিজকে দেওয়া হয়। প্রধানতঃ হর্ণব্লেণ্ড ও সর্পেণ্টাইন নামক প্রস্তরজাতিদ্বয়ের মধ্যেই এই অপরূপ প্রাকৃতিক সৃষ্টি দেখা যায়। হর্ণব্লেণ্ড প্রস্তর "এম্ফিবোল" এস্‌বেষ্টস্‌ ও সর্পেণ্টাইন প্রস্তর "ক্রাইসোটাইল" এস্‌বেষ্টসের আকর। "ক্রাইসোটাইল" গ্রীক শব্দ, ইহার অর্থ "স্বর্ণময় তন্তু" এবং কার্য্যতঃ ক্রাইসোটাইল এস্‌বেষ্টসের খনি সোনার খনিরই মত মহাধনের উৎস।

এই দুই শ্রেণীর এস্‌বেষ্টসের মধ্যেই কতকগুলি গুণ সাধারণভাবে বর্ত্তমান। দুইটিই তাপসহ, বিকারশূন্য এবং শব্দরোধকারী। কিন্তু এম্ফিবোল এস্‌বেষ্টসের আঁশ মোটা ও ভঙ্গুর, সুতরাং তাহাতে সূতাকাটা বা বোনা সম্ভব নহে এবং তাহার ঘর্ষণরোধের ক্ষমতাও নাই। এই সকল গুণ ক্রাইসোটাইল এস্‌বেষ্টসেই পাওয়া যায়। ক্রাইসোটাইল এস্‌বেষ্টস লৌহ, ম্যাগ্নেসীয়ম্‌, বালুসার ও জলের রাসায়নিক যোগে উৎপন্ন হয়। অবশ্য, "উৎপন্ন হয়" এই কথাগুলি ব্যবহারের অর্থ ইহা নয় যে সাধারণভাবে

বৈদ্যুতিক কোদালে এস্‌বেষ্টস্‌ গাড়ি বোঝাই হইতেছে

ঐ কয়টি পদার্থের যোগে ইহা কারখানায় বা রাসায়নিক পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করা যায়। প্রকৃতিদেবীর কারুছত্রাগারে আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড উত্তাপ, ভূস্তর-বিকারের বিষম চাপ এবং অত্যুষ্ণ খনিজদ্রবময় জলের স্রোতের প্রক্রিয়ায় এই আশ্চর্য্য পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ঐরূপ অগ্নি-পরীক্ষায় জন্মগ্রহণ করার জন্যই ইহা অজর অক্ষয় স্বভাব পাইয়াছে।

খনিজ অবস্থায় এস্‌বেষ্টস্‌

পৃথিবীর নানা দেশে এস্‌বেষ্টস্‌ অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। উত্তর - আমেরিকা, রুশিয়া, রোডেসিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা, সাইপ্রস দ্বীপ, ইতালী —এই কয়টি দেশে ইহা প্রধানতঃ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে উত্তর - আমেরিকার কানাডা দেশেই প্রায় সমস্ত পৃথিবীর এস্‌বেষ্টসের শতকরা আশী ভাগ সংগৃহীত হয়।

আমাদের দেশেও উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, কুমাউন ইত্যাদি নানা অঞ্চলে এবং সেরাইকলা ও ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে ইহা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এদেশের খনিজ বিদেশীর তুল্য গুণযুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই, সে যে কারণেই হউক!

কানাডার কুইবেক অঞ্চল এখনও এই খনিজে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। এখন প্রতি বৎসর ঐ অঞ্চলে প্রায় ৪ লক্ষ টন এস্‌বেষ্টস্—যাহার মূল্য প্রায় ৩½ কোটি টাকা—খনি হইতে আহৃত ও পরিষ্কৃত হয়। অথচ মাত্র ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ঐখানে দু-চারটি ছোট ক্ষেত-খামার, ঝাড়-জঙ্গল ও পাহাড়ে পতিত জমি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ঐ খানের যে জেফ্রী খনি (এখন জন্‌স-ম্যানভিল নাম) হইতে প্রায় ১২ কোটি টাকার এস্‌বেষ্টস্ পাওয়া গিয়াছে তাহা ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ওয়েব নামে এক সামান্য কৃষকের ফলমূলের বাগান ও ঝোপঝাড়ভরা পাহাড় ছিল। এক দিন ওয়েব-পত্নী তাঁহার ছোট ছেলেকে লইয়া ঐ পাহাড়ে ঢিপিটির নীচে গাছের ছায়ায় বসিয়া মোজা বুনিতেছিলেন। ছোট ছেলেটি পাহাড়ের গায়ে এক জায়গায় খানিকটা নূতন গোছের পাথর দেখিয়া খোঁচাখুঁচি করিয়া খানিকটা তুলার মত আঁশ পায়। সে তাহার মাকে ঐ জিনিষ দেখাইলে ওয়েব-গৃহিণী তাহা কি জিনিষ তাহার বিচারে সময় নষ্ট না করিয়া তাহাতে সুতা পাকাইয়া দেখেন যে তাহা পশমের মত বোনা যায়। তিনি আরও কিছু ঐরূপ আঁশ সংগ্রহ করিয়া একজোড়া মোজা বুনিয়া ফেলেন। তাহার পর ঐখানের ছোট ছেলেমেয়েরা খেলার ছলে ঐ আঁশ লইয়া চিবাইত বা সুতা তৈয়ারী করিত।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ঐ অঞ্চলে এক প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডে আশেপাশের যত গাছপালা, ঝোপ-জঙ্গল পুড়িয়া যায়। ফলে ওখানের পাহাড় ও পাহাড়-তলার গায়ে এস্‌বেষ্টস্-পূর্ণ সারপেণ্টাইন প্রস্তরস্তর পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়। ঐ সময়েই প্রথম এস্‌বেষ্টসের খনির কাজ ওখানে সুরু হয়। এখন এই এস্‌বেষ্টসের দৌলতে সারা অঞ্চল সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে।

* * *

ডিনামাইট বা বারুদ দ্বারা পাথরের স্তর ফাটাইয়া উড়াইয়া দিবার পর নিপুণ খনকেরা ছোট গাঁইতির সাহায্যে বড় বড় এস্‌বেষ্টসের টুকরা সংগ্রহ করে। হাতে ছাঁটাই এস্‌বেষ্টস্ মহামূল্য, ইহা ৭০।৮০ টাকা পর্য্যন্ত মণ-দরে ঐ অবস্থাতেই বিক্রয় হইতে পারে। এইরূপ ছাঁটাই হইবার পর অতিকায় বৈদ্যুতিক কোদালে সমস্ত পাথর তুলিয়া ফেলা হয়। এই পাথর কারখানায় ছাঁটাই, চূর্ণ ইত্যাদি করিবার পর তাহা হইতে নানা প্রকার এস্‌বেষ্টস্-আঁশ পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট আঁশ হইতে সুতা, কাপড় ইত্যাদি হয়, অন্য অংশ হইতে তাপরোধ-কারী কাগজ, টালি, ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারের জিনিষ উৎপন্ন হয়।

আগ্নেয়গিরির আগুনে যাহার জন্ম, এখন তাহারই সাহায্যে মানুষের ঘরবাড়ীর অগ্নিনির্ব্বাপক ফায়ার-ব্রিগেডের লোকের কাপড় হইতে আরম্ভ করিয়া অসংখ্য উত্তাপরোধের কার্য্য চলিতেছে।

"পদ্মা", রঙীন কাঠখোদাই হইতে—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

এক জন আধুনিক বাঙালী শিল্পীর কথা

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার প্রথম যুগে আমাদের শিল্পীরা প্রধানতঃ পুরাণ-কথার মধ্যে আপনাদের শিল্পের উপজীব্যের সন্ধান করিয়াছিলেন ও পাইয়াছিলেন। গঞ্জনা সেজন্য তাঁহাদের প্রাপ্যের কিছু অতিরিক্ত মাত্রাতেই ভোগ করিতে হইয়াছে। বাস্তব-বিচ্ছিন্ন, অতীন্দ্রিয়, অধ্যাত্মতাচ্ছন্ন এই শিল্পকলার সঙ্গে আধুনিকদের প্রাণের কোন যোগ নাই, সুতরাং দেশের পক্ষে ইহা নিরর্থক ও নিষ্ফল তাঁহারা এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু কোন চেষ্টাকেই দেশ ও কাল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা চলে না। বাংলার নূতন চিত্রচর্চ্চার যে-সময় প্রথম আরম্ভ হয় তখন প্রকৃত শিল্পবোধের বিশেষ কোন চিহ্ন দেশে ছিল না। এই নৈরাশ্যের সময়ে

বর্ষা

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

নৃত্য

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

কলাচর্চ্চার ক্ষেত্রে নূতন জাগরণের স্বপ্ন যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, একটি স্থিরভূমির সন্ধান লইবার প্রয়োজন তাঁহাদের ছিল, এবং দেশের পুরাতনী কথার মধ্যেই তাঁহারা সেই প্রারম্ভ-প্রান্ত খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। তাহাই বঙ্কেরীয়ানা বলিয়া আধুনিকদের নিকট অবজ্ঞেয় হইয়াছে।

কিন্তু পরাণ-কাহিনী, রামায়ণী কথা সত্যই কি

গীতসভা
শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

বুদ্ধের জন্ম
শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

জননী
শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সাঁওতাল
শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

পদ্মা
শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

বাঙালীর কাছে, ভারতীয়ের জীবনে এমন অবাস্তব, অতীন্দ্রিয় ? বিস্তৃততর সংস্কৃতির সংস্পর্শের ফলে আমাদের মন এখন জটিলতর বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রাণবস্তু আহরণ করিতেছে ; এ-মনকে রামায়ণ-কাহিনী আর তেমন ভাবে আনন্দ না-দিতে পারে, তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণ বাঙালীর কাছে রাম-সীতার কথা কি চিরকালই এমন সুরলোকের, সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম-জগতের বিষয় ? পুরুষ-পরম্পরায় শ্রুত এই সকল পুরাণ-কাহিনীর পাত্রপাত্রীর সুখদুঃখের কথা আমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়া কি আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের কাছে একান্ত আত্মীয়জনের সুখদুঃখের মত হইয়া উঠে নাই ? তাহাকে ঠিক অবাস্তব, বা সূক্ষ্ম কল্পনা-বিলাস বলা চলে না। নন্দলাল বসুর "শবরীর প্রতীক্ষা" বা "উমার দুঃখ" সংবেদনশীল আধুনিক মনকেও গভীরভাবে আন্দোলিত করিবার ক্ষমতা রাখে। শিল্পচেষ্টা সার্থক হইয়া উঠিবে কি না, তাহা বিষয়বস্তু অপেক্ষা শিল্পীর ক্ষমতা, অঙ্কন-পদ্ধতির উপর অধিক নির্ভর করে ; ভারতীয় শিল্পকে বিশেষ ভাবে "আধ্যাত্মিক" আখ্যা দিয়া শ্রেণীবিভাগ করিয়া যাঁহারা রাখিয়াছেন, এবং সেই "ফরমূলা" আধুনিক ছবিতে চালাইতে গিয়া, এবং আধ্যাত্মিকতা ও "প্রাচ্যতা"র রসে বিহ্বল সমজদার ও ক্রেতার মন জোগাইতে গিয়া যে-সব শিল্পী অঙ্গসংস্থানকে অকারণে—শিল্পের কোন সার্থক প্রয়োজনে নয়—অত্যন্ত হাস্যকর, নিরর্থক ও দৃষ্টিকটু ভাবে বিসর্জ্জন দিয়াছেন ; পদ্মপলাশলোচন আঁকিতে গিয়া গোটা পদ্ম ও পলাশ আঁকিয়া না-ফেলিতে পারা পর্য্যন্ত পরিতুষ্ট হন নাই ; লঘু ও খেলো বর্ণসম্পাতে অসংস্কৃত দর্শকের মনকে সহজে ভুলাইবার আয়োজন করিয়াছেন ; ছবিকে কাব্যরসে সিক্ত করিয়া, ছবিকে কাব্যের ভাষ্যমাত্র করিয়া তুলিয়াছেন ; বঙ্গীয় শিল্পের অপখ্যাতির জন্য দায়ী তাঁহারাই।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিল্পের ধারা যতই ক্ষীণ হউক না, ক্রমশ তাহা বিস্তৃততর, বিচিত্রতর ও ঘনিষ্ঠতর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলে চোখে পড়ে। নন্দলাল বসু পৌরাণিক চিত্রও অনেক স্থলেই এমন অন্তরঙ্গ করিয়া আঁকিয়াছেন যাহাতে দেবতাও আমাদের মানুষের অনেকখানি কাছাকাছি হইয়া আসিয়াছেন। যেমন "উমার দুঃখ" ছবিতে। সাধারণ বাঙালী মায়ের কাছে উমা যেমন আর ধ্যানের বিষয়ীভূত দেবতা নন, নিজের কন্যার প্রতিরূপ ; তেমনি নন্দলাল বসুর এই ছবিটিতে উমার দুঃখ যেন স্বামীপরিত্যক্তা কোন বাঙালী কন্যার দুঃখ, তাঁহার মুখে যে রুদ্ধ বেদনার করুণ আভাস তাহা আমাদের অপরিচিত অলৌকিক কোন বেদনা নয়। নন্দলাল বসুর "সুজাতা" ছবিতে, ছবির গুণাগুণ বিস্মরণ করাইয়া ভক্তিবৃত্তিকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য প্রথা-মত ধ্যানাসনে বুদ্ধের অবতারণা নাই, বুদ্ধের পায়স প্রস্তুত করিবার দুগ্ধ সুজাতা দোহন করিতেছে শুধু এই দৃশ্য দেখান হইয়াছে—শিল্পীর গুণে, উপাখ্যান-চিত্রণ না-বলিয়া এই ছবির সুজাতাকে মানব-দুহিতা বলিয়া ভাবিলে দোষ হইবে না।

এমনি করিয়া, কোন থিয়োরির জন্য নয়, স্বভাবের অনুবর্ত্তন করিয়াই নন্দলাল বসু দেবতা হইতে মানুষে আসিয়াছেন, ভারতবর্ষের শিবের মহান্ বিরাট্ কল্পনাকে যিনি আধুনিক কালে আবার লোকোত্তর নবরূপ দিয়াছেন, তাঁহার তুলিই সামান্য সাঁওতাল আঁকিতে আনন্দ পাইয়াছে। চিত্রে বিষয়বস্তু সম্ভবতঃ গৌণ কথা, রস-পরিবেশনই বড়, তাহা যে-পাত্রেই হউক না কেন। কিন্তু আমাদের শিল্পীদের মন যেখানে একমাত্র প্রাচীনের মধ্যেই রসের সন্ধান লইয়া ফিরিতেছিল সেখানে দৃশ্যমান চলমান জগতের তুচ্ছতার মধ্যে, অত্যন্ত বর্ত্তমানের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে রসসঞ্চার করিতে পারা আমাদের শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থায় লক্ষ্য করিবার বিষয়।

২

আমাদের চারিপাশের প্রাত্যহিক জগতের ছবি আঁকিয়া আনন্দ পাইবার ক্ষমতা, সামান্যের প্রতি প্রীতি, নন্দলাল বসুর নিকট হইতে তাঁহার কৃতী ছাত্রদের মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়াছে। এখানে রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর কথা বলিতেছি। শিল্পানুরাগীদের নিকট, এবং প্রবাসীর পাঠকদের নিকট, রমেন্দ্রবাবুর নাম ও ছবি সুপরিচিত।

সেতু, কাঠখোদাই

তাঁহার আঁকা বিভিন্ন প্রণালীর ছবি ও তাহার সম্বন্ধে আলোচনা পূর্ব্বে প্রবাসীতে অনেক বার প্রকাশিত হইয়াছে ; সম্প্রতি লণ্ডনে ইণ্ডিয়া হাউসে অনুষ্ঠিত তাঁহার ছবির প্রদর্শনী বিদেশী শিল্পী ও শিল্পানুরাগীদের দৃষ্টি আধুনিক ভারতীয় চিত্রের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে, সেই সংবাদ উপলক্ষ্যে এই সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ।

পৌরাণিক চিত্র আঁকিয়া রমেন্দ্রবাবু খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার "শিবের বিবাহ" সুপরিচিত ছবি। বুদ্ধ-জীবনেরও এগারখানি ছবি আঁকিয়াও তিনি শিল্প-সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন ; ছবিগুলি আমেরিকার বহু স্থানে আমেরিকার একটি প্রসিদ্ধ শিল্প-সংসদের তত্ত্বাবধানে প্রদর্শিত হয়, এবং পরে ত্রিবাঙ্কুর-রাজ সেগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে রামায়ণ-চিত্রও তিনি কতকগুলি রচনা করিয়াছেন।

শিল্প-সমালোচনায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে এই ছবিগুলি যতই প্রশংসা পাইয়া থাকুক, অ-বিশেষজ্ঞ সাধারণ দর্শক আমাদের নিকট মনে হয়, রমেন্দ্রবাবুর এই বুদ্ধকথা ও রামায়ণী কথার চিত্রগুলি 'ইলাষ্ট্রেশন' হিসাবে দক্ষতার পরিচায়ক, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু তাহার অনেকগুলির মধ্যেই কোনও মহিমার স্পর্শ তিনি দিতে পারেন নাই। ইহার অধিকাংশ ছবির মধ্যেই তাই একটা গতিহীন দারুপুত্তলির ভাব আছে। তাহার কারণ অঙ্কন-বিষয়ের ত্রুটি নয়, শিল্পীর ত্রুটিও নয়। প্রথানুযায়ী তিনি ঐ বিষয়গুলি আঁকিয়াছেন, তাঁহার দক্ষ তুলি তাহাতে কৌশলও দেখাইয়াছে, কিন্তু বিষয়গুলি তাঁহার প্রাণকে যেন গভীরভাবে স্পর্শ করিতে পারেন নাই, কাজেই ছবিগুলিতে তেমন করিয়া প্রাণসঞ্চারও করিতে পারেন নাই।

কিন্তু দেবলোক ছাড়িয়া রমেন্দ্রবাবু যখন মানবলোকে আমাদের ঘরের পাশে নামিয়া আসিয়াছেন, তখনই তাঁহার তুলি অপরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। পদ্মার তীর, পদ্মার বুকে নৌকা, গ্রামের পুরাতন সেতু, বন্যার দুর্দ্দিন, জলের ধারে হাঁস, শহরের মাছের বাজার, গ্রামের ঘাটে বধূবরণের উৎসব, বীরভূম অঞ্চলের সাঁওতালদের জীবনের নানা অন্তরঙ্গ দৃশ্য, তাল-পুকুর—এই সব চিত্রে তিনি অপূর্ব্ব মায়া বিস্তার করিয়াছেন, একটি স্নিগ্ধ মাধুর্য্যের সঞ্চার করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলি ছবিই প্রবাসীতে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে তাঁহার আঁকা দুইটি জননী-মূর্ত্তি মুদ্রিত হইল ; এ দুইটি তুলনা করিয়া দেখিবার উপযুক্ত। তাঁহার "বুদ্ধের জন্ম" ছবিখানি সুপরিচিত ছবি ; অলঙ্কারবহুল এই ছবিখানিতে অঙ্কন-দক্ষতার পরিচয় আছে, বর্ণসুষমা আছে ; কিন্তু মাতৃমূর্ত্তির সহজ গৌরব এই ছবিতে তেমন করিয়া আমাদের মনকে আকর্ষণ করে না। কিন্তু বাঙালী মায়ের যে-ছবিখানি আছে, তাহা অলঙ্কারবিরল ; অশিক্ষিত চক্ষুকে প্রথম দৃষ্টিতেই ভুলাইবার মত বিচিত্র বর্ণ ও মণ্ডনের আয়োজন তাহাতে নাই, কিন্তু জননীর স্নেহ-উদ্বেগ-কাতর

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

বাস্তব জগৎ লইয়া ছবি আঁকিলেও রমেন্দ্রবাবু অবশ্য বাস্তবের রূঢ় রূপটাকে ফুটান নাই, বা ফুটাইতে চান নাই। তাঁহার ছবি সম্পূর্ণই মাধুর্য্যধর্মী। পারিপার্শ্বিকের তুচ্ছতার অন্তরে যে-সৌন্দর্য্য সর্ব্বদা আমাদের সাধারণ-দৃষ্টির গোচর হয় না, তাহারই উপর তিনি আলোকপাত করিয়াছেন—কিন্তু তাহার দুঃখের দিক, তাহার কুশ্রীতার দিক যাহা আছে তাহা তিনি উন্মোচন করেন নাই।

কাঠখোদাই ছবিতে রমেন্দ্রবাবু কৃতিত্বের সহিত প্রবাসীর পাঠকগণ সুপরিচিত। এদেশে কাঠখোদাই ছবির প্রবর্ত্তক রমেন্দ্রবাবুকে বলা না-গেলেও, এবং আমাদের দেশে কাঠখোদাই ছবিতে আরও বিচিত্রতার অবকাশ এখনও থাকিলেও এবং এই বিভাগে আরও বহু শিল্পীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেও প্রধানতঃ রমেন্দ্রবাবুর উৎসাহে ও দৃষ্টান্তেই আমাদের দেশে কাঠখোদাই পদ্ধতির দিকে আমাদের দেশের শিল্পীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে। রমেন্দ্রবাবুর ছাত্রগণ যদি কেবল শিক্ষাদাতারই অনুবর্ত্তন না করিতে থাকেন তবে এই পদ্ধতি লইয়া অনেক বিচিত্র পরীক্ষা চলিতে পারে ও শিল্পের এই বিভাগটি আমাদের দেশে বিশেষ সমৃদ্ধ হইতে পারে।

মূর্ত্তি তাহাতে ফুটিয়াছে। মাতৃমূর্ত্তির প্রসঙ্গে তাঁহার একখানি কাঠখোদাই ছবির কথা বলা যাইতে পারে; মা ঈষৎ নত হইয়া শিশুর মুখে দেখিতেছেন, পাশে কৌতূহলী আর একটি সন্তান তাকাইয়া দেখিতেছে; ছোট এতটুকু ছবিতে মায়ের মুখভাবে, চোখের সতৃষ্ণ চাহনিতে, সকরুণ স্নেহের দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে।

এমনি করিয়া আমাদের নানা সুপরিচিত দৃশ্যে তিনি রঙ ধরাইয়াছেন এবং দর্শকের মনেও রঙ ধরাইয়া দিতে পারিয়াছেন। যেমন তাঁহার "ঘরকন্না" ছবিখানা। বাঙালীর বাড়ীর রন্ধনশালার এক প্রান্তে বালিকার খেলাঘর, সেখানে সে রন্ধনে বড়ই ব্যস্ত, দু-দিকে দুটি শিশু ভাই, এক জন পুতুল লইয়া খেলিতেছে, আর এক জন দিদির রান্না দেখিতেছে; ইতস্ততঃ তরকারির ডালা বিক্ষিপ্ত, তাকের উপর পুতুল সাজানো। লণ্ডনে রমেন্দ্রবাবুর প্রদর্শনীতে এই ছবিখানি দেখিয়া প্রসিদ্ধ এচার (Etcher) সর্ ম্যুরহেড বোন্ প্রদর্শনীর উদ্বোধন-উৎসবে বলিয়াছেন, যে রান্নাঘরের দৃশ্য লইয়া এমন ছবি আঁকা কোন বিলাতী চিত্রকরের পক্ষে সম্ভব হইত না।

মায়াময়ী

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

রাজার ছেলে ডাকিল, শোন, পাতালপুর-রাজার মেয়ে!
ঊর্মিমালা মর্মরিয়া চতুর্দ্দিকে উঠিল গেয়ে।
ব্যাকুল সুর আকাশে ওঠে, বাতাসে কাঁপে, পাতালে নামে,
মাতাল বাঁশী বিরামহারা বাজিয়া চলে, নাহিক থামে।

সোনালী সাঁঝে গোলাপী আলো, মেঘেতে রাঙা
লেগেছে ঘোর,
অপরিচিতা এ-ধরা কেন পড়ে নি ধরা নয়নে মোর?
কাননে মধু, কুসুমে মধু, ভুবন মধু-মাধুরীময়,
মানসমধু খুঁজিয়া ফিরি, কোন্ গুহাতে গোপন রয়?

আমার ধরা অনিন্দ্য সে, আনন্দ যে ধরে না আর,
তুমি না এলে কেমনে বল বহিবে হেন পুলকভার?
সুরের জ্বালা সহিতে নারি সকল তনু দহন করে,
গহন বনে বহ্নি-শিখা, গোপন মনে আগুন ধরে।

সাগর-নীল স্বপন চোখে, দিঠির তলে অলোক ছায়া,
তারকা-মণি-খচিত কেশ রচিছে কালো রজনী-মায়া,
কুমুদ-কম গৌর তনু, মরালী-সম গরবী গ্রীবা,
মুকুতা-সম সুষমা-স্পন্দ অঙ্গে ঝরে জ্যোৎস্না-বিভা।

আঙুল চাঁপা, মৃণাল বাহু, বিম্বাধরে মোহন হাসি,
উরসে আসি মূরছি পড়ে লীলার ভরে সলিলরাশি,
সবুজ-সোনা বসন বোনা কোমল-শ্যাম শৈবালেতে
তরঙ্গেরা বিলুণ্ঠিত অঙ্গসুধা-স্পর্শ পেতে।

অশ্রুজলে মুকুতা ঝলে, হাসিতে ঝরে মাণিক-রাশি,
সমীর-শ্বাসে আসে কি দেহ-কমল-মধু-সুরভি ভাসি?
আকাশে চাঁদ উঠিল হাসি, সাগরে বুঝি জোয়ার এল,
ভাসিল বেলা, মনের ভুমি, সকল কূল ভাসিয়া গেল।

পাতালপুরবাসিনী বালা, ডাকিছে বাঁশী ব্যাকুল স্বরে,
আমার বাঁশী বাজিলে, বল, কেমনে তুমি রহিবে ঘরে?
গহন-তলে গভীর জলে স্বপন-সম সহসা মেশো,
হে সাগররাজ-কন্যা তুমি অতল হ'তে উঠিয়া এস।

সুখ-আকুল বেদনা কাঁদে উচ্ছ্বসিত বুকের মাঝে,
জলের ছল-ছল-ধ্বনি কনকগীত বেলায় বাজে।
হিল্লোলিত সলিল-গায়ে লাবণ্যেরি বন্যা জাগে,
সাগররাজ-কন্যা জাগো, ব্যাকুল বাঁশী কাতরে মাগে।

স্তব্ধ—নীরে মীনের সারী, ফণিনী ফণা তুলিয়া ধরে,
সুরের ঘোরে স্বপ্নাতুরা দু-চোখে নাহি পলক পড়ে।
শীতল-মণি-শয়ন হ'তে—ডাকিছে বাঁশী—কন্যা জাগো,
কেমনে তুমি তন্দ্রাময়ী, চেতনাহারা ঘুমায়ে থাকো?

আমার দেশে আসিতে শেষে সহসা ফিরি চলিয়া গেলে,
তোমার লাগি পৃথিবী কাঁদে, কাঁদি যে আমি রাজার
ছেলে।

আকাশে আলো-প্লাবন আসে, সাগরজলে জোয়ার এল,
পেলে না সাড়া, এলে না তুমি, মধুর তিথি বহিয়া গেল।

সিন্ধু জাগে, সে কারে মাগে, উর্দ্ধবাহু, আত্মহারা,
তীরের কাছে তমাল বনে পাই যে জাগরণীর সাড়া!
সাগর-বারি রুষিয়া ওঠে, ফুঁসিয়া ওঠে, ফুলিয়া ওঠে,
আবেশ-সুখে ঢুলিয়া পড়ে, আবেগ-ভরে দুলিয়া ওঠে।

সুনীল-মণি-শয্যা ছাড়ি অতল হ'তে উঠিয়া এস,
উল্লসিত ঢেউয়ের পরে পারের পানে ছুটিয়া এস,
সাগররাজ-কন্যা জাগো! এমন শশী অস্তে গেলে
ধরণী হবে মাধুরীহীনা—বাজায় বাঁশী রাজার ছেলে।

রবে না বাঁশি, রব না আমি, রবে না হেন বসুন্ধরা,
রবে না জলে আলোক-মায়া, রবে না বায়ু গন্ধভরা,
আমার বাঁশী বাজিয়া যাবে, বাজিবে শুধু তোমার তরে
জন্ম হ'তে জন্মে পুন, যুগ হ'তে যে যুগান্তরে।

হে ঈপ্সিতা, ধরণীভীতা, চকিতা-চির দয়িতা অয়ি,
অতল হ'তে উঠিয়া এস হে সুন্দরী, স্বপ্নময়ী!
জন্ম হ'তে জন্ম পরে আবার আমি আসিব ফিরি,
আমার বাঁশী বাজিবে নিতি স্বপন-গীতে তোমায় ঘিরি!

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাঙালীর অধিকতম চরিত্রবত্তা, চিন্তাশীলতা, ও কর্ম্মিষ্ঠতা আবশ্যক

সমালোচনার নিমিত্ত আমরা সম্প্রতি বিলাত হইতে প্রাপ্ত অন্যান্য বহির মধ্যে "Masaryk on Thought and Life" নামক একটি পুস্তক পাইয়াছি। ইহাতে চেকোস্লোভাকিয়া সাধারণতন্ত্রের পরলোকগত প্রথম রাষ্ট্রপতি মাসারিকের "চিন্তা ও জীবন" সম্বন্ধে কারেল কাপেকের সহিত কথোপকথন লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে তত্ত্ববিদ্যা ধর্ম্ম সংস্কৃতি গণতন্ত্র স্বাজাতিকতা রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে মাসারিকের নানা মত সরলভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। মাসারিক কৃতী পুরুষ ছিলেন। অতীত কাল হইতেই স্বাধীন কোন দেশের রাষ্ট্রপতি তিনি হন নাই। স্বদেশ ও স্বজাতিকে স্বাধীন করিবার জন্য সংগ্রাম তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। স্বাধীনতা লব্ধ হইবার পর তিনি প্রেসিডেন্ট (রাষ্ট্রপতি) নির্ব্বাচিত হন এবং সাধারণতন্ত্রটিকে তিনিই প্রধানতঃ গড়িয়া তুলেন। তিনি ছিলেন এক কোচোয়ানের পুত্র এবং কামারের কাজ শিখিবার জন্য প্রথম বয়সে এক কামারের কামারশালায় শিক্ষানবীশি করিতেন। নিজের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও তিনি পাইয়াছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকতা বহু বৎসর করিয়াছিলেন।

এই রকম কৃতী, কেজো, মননশীল দার্শনিক অধ্যাপক ও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ রাষ্ট্রপতি যাহা বলেন, তাহা শুনিবার ও ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য।

যে বহিটির কথা প্রথমেই বলিয়াছি, তাহার "নেশ্যন" (জাতি) নামক পরিচ্ছেদে তিনি বলিতেছেন,

"We must always bear in mind that we are a small nation in an unfavourable geographical position ; in effect it imposes upon us the obligation to be more alert, to think more, to achieve more than the others ; or according to Palacky : every self-respecting Czech and Slovak must do three times as much as the members of big and more favourably situated nations. Only bear in mind that every educated fellow countryman of ours needs to learn at least two foreign languages—how much time it takes, and work, but also what a gain it is not only for education but also for practical intercourse with nations ! And so it is in everything : if we have to hold our own with honour we must thoroughly intensify all our political and cultural endeavour. Yes, it is a painstaking job ; but who does not want to take trouble, don't let him talk of nation and patriotism.

"Real love for one's nation is a very beautiful thing ; with a decent and honest man it comes as a matter of course ; therefore he does not talk much about it just like a decent man does not go trumpeting abroad his love for his wife, family, and so on. A real love protects, bears sacrifices—and chiefly works. And for that work for the nation and state, a clear, sensible political and cultural programme is necessary—mere day-dreaming and getting excited is not enough."

"আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র জাতি; তাহার ফলে অন্যদের চেয়ে বেশী সতর্ক হইবার, বেশী চিন্তা করিবার এবং বেশী কৃতী হইবার বাধ্যতা আমাদের উপর পড়িয়াছে; অথবা, পালাকির মত অনুসারে, প্রত্যেক আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন চেক্ ও স্লোভাককে বৃহৎ ও অধিকতর অনুকূল অবস্থায় অবস্থিত জাতিদের লোকদের চেয়ে তিনগুণ বেশী কৃতী হইতে হইবে।"

এই কথাটি বলিতেছেন কে এবং কাহাদিগকে বলিতেছেন? যিনি কোচোয়ানের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া দর্শনাধ্যাপক হইয়াছিলেন, আবার স্বদেশের জন্য স্বাধীনতা অর্জ্জনের প্রধান কর্ম্মী এবং স্বদেশকে সাধারণতন্ত্র রূপ দানের প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক শিল্পী ছিলেন, তিনি তাঁহার স্বজাতির লোকদিগকে অন্য জাতির লোকদের

চেয়ে তিন গুণ কর্মিষ্ঠ ও মননশীল হইতে বলিতেছেন। এত বড় কাজ করিয়াও তিনি সন্তুষ্ট হন নাই।

যাঁহারা তাঁহার ও তাঁহার সহকর্মী অন্য নেতাদের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই চেক্ ও স্লোভাকদের সংখ্যা কত? চেক্‌দের মোট সংখ্যা ৭৩,৪০,০০০ এবং স্লোভাকদের ২৩,৫০,০০০—উভয়ে মিলাইয়া এক কোটির কিছু কম। এই এক কোটিরও কমসংখ্যক মানুষের উল্লিখিত কৃতিত্ব মাসারিক যথেষ্ট মনে করেন নাই; তাহাদিগকে বৃহৎ জাতিদের মানুষদের চেয়ে তিন গুণ চিন্তাপরায়ণ ও কর্মিষ্ঠ হইতে বলিয়াছেন। আমরা পাঁচ কোটির উপর বাঙালী। স্বাধীনতা অর্জ্জন করা দূরে থাক, অন্য কোন কোন প্রদেশের সমান উৎকৃষ্ট প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রও আমরা পাই নাই; অধিকাংশ নরনারীকে লিখনপঠনক্ষম পর্য্যন্ত করিতে পারি নাই।

এইরূপ আপত্তি উঠিতে পারে যে, বঙ্গের মুসলমানেরা বঙ্গের উন্নতিকল্পে হিন্দুদের সহিত একযোগে কাজ করিতে প্রস্তুত নহেন; সুতরাং বাঙালী পাঁচ কোটি হইয়াও অকৃতী, এরূপ বলা উচিত নয়। এই আপত্তির যুক্তিযুক্ততার বিচার না করিয়া বলিতেছি, শুধু বাঙালী হিন্দুরাই ত সংখ্যায় দুই কোটির অধিক, চেক্ ও স্লোভাকদের দ্বিগুণ। চেক্ ও স্লোভাকদের কৃতিত্বের সহিত এই দু-কোটি বাঙালীর কৃতিত্বের তুলনা করা যায় কি? সেই জন্য বলি, মাসারিকের মত কৃতী মনীষী যখন চেক্ ও স্লোভাকদের মত মানুষদিগকে অন্য জাতিসকলের লোকদের চেয়ে তিন গুণ সজাগ চিন্তাপরায়ণ ও কর্মিষ্ঠ হইতে বলিয়াছেন তাঁহাদের স্বজাতি প্রতিষ্ঠার জন্য, তখন আমাদিগকে বাঙালীদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে আমাদিগকে স্বাধীন অন্য জাতিদের তুলনায় কত বেশী সজাগ চিন্তাপরায়ণ ও কর্মিষ্ঠ হইতে হইবে।

অতঃপর মাসারিক বলিতেছেন,

"মনে রাখিবেন, আমাদের প্রত্যেক শিক্ষিত স্বদেশবাসীকে [মাতৃভাষা ছাড়া] দুটা বিদেশী ভাষা শিখিতে হয়, এবং তাহা শেখা ছাড়া কাজও করিতে হয়। অনেকটা সময় দুটা বিদেশী ভাষা শিখিতে যায় বটে, কিন্তু শিক্ষার দিক্ দিয়া তাহাতে কত লাভ এবং তাহাতে নানা জাতির সঙ্গে দেওয়া ব্যবহারের কত সুবিধা; এবং আর সব বিষয়েও ঠিক এই রকম; যদি আমরা সমাজের সহিত অন্য জাতিদের সঙ্গে সমকক্ষতা রাখিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে আমাদের সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে প্রবল ও প্রখর করিতে হইবে। হাঁ, এটা পরিশ্রমের ব্যাপার বটে; কিন্তু যে কষ্টস্বীকার করিতে রাজী নহে সে যেন জাতি (নেশ্যন) ও স্বদেশপ্রেমের কথা মুখে না আনে।

"নিজের জাতির (নেশ্যনের) প্রতি প্রকৃত প্রেম বড় সুন্দর জিনিষ; ভদ্রগোছের সংলোকের পক্ষে ইহা স্বভাবসিদ্ধ; সেই জন্য সে রকম মানুষ এ বিষয়ে ঢাক পিটাইয়া বেড়ায় না, যেমন ভদ্রগোছের কোন মানুষ নিজের স্ত্রী পরিবারবর্গ প্রভৃতির প্রতি ভালবাসার ঢাক পিটায় না। প্রকৃত প্রেম রক্ষা করে, স্বার্থ বলি দেয়—এবং প্রধানতঃ কাজের দ্বারা তাহার পরিচয় দেয়।"

মাসারিক নিজের স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষদিগকে অন্য স্বাধীন দেশের লোকদের সঙ্গে সমকক্ষতা রক্ষার জন্য তাহাদিগকে তিন গুণ সজাগ, চিন্তাপরায়ণ, কর্মশীল হইতে বলিয়াছেন—যদিও তাঁহার দেশের শিক্ষিত লোকদিগকে দুটা বিদেশী ভাষা শিক্ষায় অনেক সময় দিতে হয়। আমাদের পরাধীন দেশের পরাধীন মানুষদিগের তাহা হইলে কত সজাগ, কত চিন্তাশীল, কত কর্মিষ্ঠ হওয়া উচিত! আমাদের শিক্ষিত লোকেরা সাধারণতঃ একটার বেশী বিদেশী ভাষা শিখেন না—বাঙালীরা আধুনিক দেশী ভাষাও মাতৃভাষা ছাড়া প্রায়ই অন্য কিছু শিখেন না। ভাষা শিক্ষার সময় কতকটা তাঁহাদের বাঁচে। সেই সময়টা অন্য রকম প্রচেষ্টায় নিয়োগ করা যাইতে পারে। এবং সেই প্রচেষ্টা মাসারিক বার-বার বলিয়াছেন, হওয়া চাই রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক। শুধু রাজনৈতিক হইলে চলিবে না—তাহা হইলে আমরা অন্য অগ্রগামী জাতিদের সমকক্ষ হইতে পারিব না। প্রচেষ্টা সাংস্কৃতিকও হওয়া আবশ্যক, সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান আদি সমুদয় বিদ্যার অনুশীলন ও ললিতকলাসমূহের অনুশীলন করা চাই।

স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে দুটি বড় খাঁটি কথা স্পষ্ট ভাষায় মাসারিক বলিয়াছেন। একটি—যে দেশের জন্য খাটিতে, কষ্ট স্বীকার করিতে, চায় না, সে যেন স্বজাতি ও স্বজাতিপ্রেম সম্বন্ধে বক্‌বক্ না করে। অন্যটি—ভদ্রগোছের মানুষ যেমন নিজের স্ত্রী-পরিবার আদির প্রতি ভালবাসার ঢাক পিটায় না, তেমনই স্বদেশপ্রেমেরও ঢাক পিটায় না,

কেন না উভয়ই এ-রকম মানুষের ত থাকিবেই; তাহার পক্ষে উভয়ই স্বভাবসিদ্ধ।

মাসারিক বলিয়াছেন, স্বদেশপ্রেম রক্ষা করিতে, স্বার্থ বলি দিতে এবং প্রধানতঃ খাটিতে মানুষকে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু মানুষ যে খাটিবে, তাহার জন্ত কৃত্য-তালিকা, কার্য্যের ক্রম, প্রোগ্রাম চাই। তাই তিনি বলিয়াছেন,

"And for that work for the nation and state, a clear, sensible, political and cultural programme is necessary—mere daydreaming and getting excited is not enough."

"জাতি ও রাষ্ট্রের নিমিত্ত সেই খাটুনির জন্য আবশুক একটি বিশদ সুবিবেচিত রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কৃত্য-তালিকা—কেবল দিবাস্বপ্ন দেখা ও উত্তেজিত হওয়া যথেষ্ট নহে।"

মাসারিক জাতি (নেশ্যন) ও রাষ্ট্রের (ষ্টেটের) জন্ম খাটুনির কথা বলিয়াছেন। স্বাধীন দেশের লোকে জাতি ও রাষ্ট্র উভয়ের জন্তই স্বেচ্ছায় এবং নিজের মত অনুসারে খাটিতে পারে; পরাধীন দেশের লোকেরা জাতির জন্ত স্বেচ্ছায় খাটিতে পারে, কিন্তু পূর্ণ মাত্রায় নিজের মত অনুসারে খাটিতে পারে না; এবং রাষ্ট্রের জন্ত খাটিতে চাহিলে রাষ্ট্রের মালিক প্রভুজাতির মত অনুসারে খাটিতে হয়, সুতরাং তাহা প্রভুজাতির জন্তই খাটা হয়। ভারতবর্ষের কতকগুলি প্রদেশে কংগ্রেসী শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় তথাকার লোকেরা জাতির জন্ত স্বেচ্ছায় ও অনেকটা নিজেদের মত অনুসারে খাটিবার সুযোগ পাইয়াছে, রাষ্ট্রের জন্তও কতকটা স্বেচ্ছায় ও নিজেদের মত অনুসারে খাটিতে পারিতেছে। বঙ্গে কংগ্রেসী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; কারণ কংগ্রেসের যাঁহারা অস্থি মজ্জা মেরুদণ্ড ও প্রাণশক্তির মত, সেই হিন্দুদিগকে—বিশেষতঃ "সবর্ণ" ("কাষ্ট") হিন্দুদিগকে সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা দ্বারা ব্যবস্থাপক সভায় সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন সমষ্টিতে পরিণত করা হইয়াছে। যাহারা সার্ব্বজনিক কাজে সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহী ও ত্যাগী, তাহাদিগকে রাষ্ট্রের কাজে ক্ষমতাহীন করায় বঙ্গে স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রের কাজ খুব কমই হইতেছে। জাতির কাজও কম হইতেছে।

মাসারিক স্বদেশপ্রেমের প্রথম কাজ বলিয়াছেন রক্ষা। রক্ষা অনেক রকমের হইতে পারে। বাংলা দেশে সকলের চেয়ে বড় ও একান্ত আবশুক রক্ষার কাজ নারীদের রক্ষা। সে বিষয় পরে কিছু লিখিব।

বাঙালীদিগকে যে স্বাধীন জাতিসমূহের লোকদের চেয়ে অনেক গুণ বেশী চিন্তা করিতে ও সুবিবেচিত কৃত্য-তালিকা অনুসারে খাটিতে হইবে, তাহা ত অত্যন্ত সহজবোধ্য। ভারতবর্ষের অন্ত সব বৃহৎ প্রদেশের চেয়েও যে আমাদিগকে বেশী খাটিতে হইবে, তাহা বঙ্গের নানা দুরবস্থা হইতে সুস্পষ্ট। ইহা ভাবিয়া নিরুৎসাহ বা নিরাশ হওয়া উচিত নয়—নিরাশ হইলে চলিবে না। বাধাবিঘ্নগুলা মানুষকে নিরুৎসাহ বা নিরাশ করিবার জন্ত নয়, মানুষের পৌরুষ পরীক্ষার জন্ত—তাহার ঘুমন্ত পৌরুষকে জাগাইয়া তুলিবার জন্ত।

এখন বাংলার অবস্থার কথা কিছু আভাস দিব।

—

বাংলার সরকারী আর্থিক অবস্থা

সবচেয়ে বেশী মাথাপিছু রাজস্ব আদায় হয় বাংলা দেশে। কিন্তু বাংলা দেশের উন্নতির জন্ত "জাতিগঠন" ও জাতিরক্ষণের সরকারী বিভাগগুলিতে অন্ত সব বড় প্রদেশের চেয়ে বাংলা দেশে মাথাপিছু খরচ করা হয় কম। অর্থাৎ বাংলা দেশ বিদেশী গবন্মেণ্টকে সবচেয়ে বেশী রাজস্ব দেয়, কিন্তু তাহার খুব বেশী অংশ ভারত-গবন্মেণ্ট অন্ত রকমে ব্যয়ের জন্ত লইয়া বাংলা দেশের নিজের ব্যয়ের জন্ত খুব কম টাকা দেন। ফলে, বঙ্গে মাথাপিছু শিক্ষার জন্ত, স্বাস্থ্যসংরক্ষণ জন্ত, কৃষির জন্ত, পণ্যশিল্পের জন্ত,......অন্ত এরূপ বহু প্রদেশ অপেক্ষা কম খরচ হয় যে-সব প্রদেশ হইতে গবন্মেণ্ট বঙ্গের তুলনায় রাজস্ব কমই পান।

তাহার ফল এই হইয়াছে, যে, বঙ্গে শিক্ষার উন্নতি যত দূর হইতে পারিত তাহা হয় নাই; বঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত যথোচিত না হওয়ায় লোক রুগ্ন হয় বেশী, দুর্ব্বল বেশী, মরে বেশী, বাঁচে কম বৎসর; কৃষিপ্রধান বঙ্গে চাষের উন্নতি হয় নাই; জলসেচনের জন্ত খাল আদির ব্যবস্থা না থাকার মধ্যে; পণ্যশিল্পের উন্নতি কম হইয়াছে; ইত্যাদি।

জলসেচন সম্বন্ধে একটা কথা বলি। বঙ্গের অনেক অঞ্চলে—বিশেষ করিয়া পশ্চিম-বঙ্গে ও অন্য কোন কোন অংশেও—জলসেচনের কৃত্রিম ব্যবস্থার, যেমন খাল প্রভৃতির, খুব আবশ্যক। কিন্তু পঞ্জাব, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতিতে যেখানে তেত্রিশ কোটি কুড়ি পঁচিশ কোটি মেকদারে খাল খননে খরচ হইয়াছে, সেস্থলে বঙ্গে দুই-তিন কোটিও খরচ হইয়াছে কিনা তাহার ঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না।

শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে যদি সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি জোগান যায়, তাহা হইলে নানা রকমের কুটীরশিল্প (যেমন বস্ত্রবয়ন) যেমন সংরক্ষিত ও বিস্তৃত হইতে পারে, সেইরূপ চাষেরও নানা রকম সুবিধা হইতে পারে। যুক্তপ্রদেশে ও বিহারে এইরূপ বৈদ্যুতিক শক্তি জোগাইবার সরকারী উদ্যোগ হইতেছে, বঙ্গে হইতেছে না।

অনেক শিক্ষিত ডাক্তারের শহরে পসার না হওয়ায় তাঁহাদের গ্রামে যাওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং গ্রামের লোকদের চিকিৎসক ও চিকিৎসার প্রয়োজনও আছে। কিন্তু অনেক গ্রামেই অনেক লোকেরই ডাক্তারদের পারিশ্রমিক দিবার ও ঔষধের মূল্য দিবার সামর্থ্য নাই বা অল্পই আছে, অথচ ডাক্তারেরা বায়ু আহার করিয়া থাকিতে পারেন না। ডাক্তারদের সাংসারিক ব্যয় চলিবার মত ভাতার বন্দোবস্ত এবং ঔষধের পাইকারী মূল্য অনুসারে দাম লইবার ও অসমর্থ-পক্ষে বিনামূল্যে ঔষধ দিবার ব্যবস্থা করিয়া এক-একটি কেন্দ্রীয় গ্রামে ডাক্তার বসাইলে বঙ্গে রোগের প্রাদুর্ভাব, মৃত্যুসংখ্যা, অল্পায়ুতা ও দুর্বলতা কমিতে পারে। কিন্তু ইহার দেশব্যাপী ব্যবস্থা কোন বেসরকারী সমিতির দ্বারা হইবার নয়, সরকারী বন্দোবস্ত চাই। বিশ্বভারতী কয়েকটি গ্রামের জন্য এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার বেশী করিবার সামর্থ্য নাই।

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কমাইতে হইলে যাহা যাহা করা আবশ্যক, তাহা অল্পসংখ্যক স্থানে বেসরকারী উদ্যোগে হইয়াছে; কিন্তু দেশব্যাপী ব্যবস্থা চাই, এবং তাহা সরকারী ভিন্ন হইতে পারে না।

শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারের জন্য অন্য অনেক প্রদেশে অনেক চেষ্টা হইতেছে যাহা বঙ্গে হইতেছে না। বিদ্যালয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোন কোন উপায়ে জ্ঞান বিস্তারের আয়োজন অন্যত্র যাহা হইতেছে, বঙ্গে তাহা হইতেছে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে, যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী গবর্ন্মেণ্ট তথাকার নানা স্থানে তিন হাজার লাইব্রেরী স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

রেডিও দ্বারা লোকে যে ঘরে বসিয়া কেবল গান বাজনা ও অভিনয় শুনিতে পারে তাহা নয়, অনেক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাও শুনিতে পারে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে দেড় শতটি রেডিও-কেন্দ্র খোলা হইবে, যেখানে লোকে গানবাজনা অভিনয় ছাড়া জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাও শুনিতে পাইবে। বাংলা দেশে একমাত্র মেদিনীপুরে এইরূপ একটি কেন্দ্র আছে। তাহাতে প্রথম প্রথম সরকারী লোকদের নীরস সরকারী-কেতা-দুরস্ত বক্তৃতাই শোনা যাইত বলিয়া শুনিয়াছি। এখন সে বিষয়ে উন্নতি হইয়া থাকিবে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল প্রদেশ বঙ্গে একটি মাত্র মফঃসল-কেন্দ্র যথেষ্ট নহে। যাঁহারা বাস্তবিক জ্ঞানগর্ভ কথা সহজ ভাষায় শুনাইতে পারেন, বেসরকারী এ রকম বক্তাও অধিক সংখ্যায় সংগ্রহ করা আবশ্যক।

ভারত-গবর্ন্মেণ্ট বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্বের অধিকাংশ টাকা যে বাংলা-গবর্ন্মেণ্টকে বঙ্গের প্রয়োজন ও ব্যবহারের জন্য দেন না, তাহাতে যে বঙ্গের সরকারী বিভাগগুলির কার্য্যকারিতাই কমে তাহা নয়, পরোক্ষভাবে বঙ্গের অধিবাসীদিগকেও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র রাখা হয়। বঙ্গের রাজস্বের অধিক অংশ বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট পাইলে তাহা বঙ্গেই ব্যয়িত হইত, এবং সেই টাকার অনেকটা অংশ বঙ্গের সরকারী ও বেসরকারী লোকেরা পাইত; এখন তাহা পায় না।

—

বঙ্গে সরকারী শিক্ষাব্যয়

আমরা আগে আগে মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসীতে অনেকবার দেখাইয়াছি ও বলিয়াছি, যে, বঙ্গের সরকারী ও গবর্ন্মেণ্টসাহায্যপ্রাপ্ত সমুদয় শিক্ষালয় (পাঠশালা হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত) ধর্ম্মসম্প্রদায়নির্বিশেষে সকল বঙ্গবাসীর জন্য অভিপ্রেত; তাহা ভিন্ন কেবল মুসলমানদের

জন্ত অভিপ্রেত অনেকগুলি সরকারী শিক্ষালয় আছে। কেবল হিন্দুদের জন্ত অভিপ্রেত সরকারী শিক্ষালয়, আমরা যত দূর জানি, ছুটি আছে। সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সরকারী শিক্ষাব্যয় ছাড়া কেবল মুসলমানদের জন্ত শিক্ষাব্যয় বার্ষিক ১৫।১৬ লক্ষ টাকা বলিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অনুমিত হইয়াছিল, কেবল হিন্দুদের জন্ত সম্ভবতঃ এক বা জোর দু-লাখ টাকা।

সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভায় ঘোষিত হইয়াছে, যে, মুসলমানদের শিক্ষার জন্ত পঁচিশ লক্ষ টাকা খরচ করা হইবে। তপশিলভুক্ত হিন্দু জাতিদের জন্ত হইবে পাঁচ লক্ষ টাকা। এরূপ বিশেষ খরচের কারণ এই বলা হয়, যে, মুসলমানেরা ও তপশিলভুক্ত হিন্দুরা দরিদ্র এবং শিক্ষায় অনগ্রসর। যাহারা গরীব ও লেখাপড়ায় অনগ্রসর, তাহাদের শিক্ষার জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা উচিত। কিন্তু বিস্তর মুসলমান ও তপশিলভুক্ত হিন্দু আছেন যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন, যাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক খুবই ধনী। এমন অনেক মুসলমান ও তপশিলভুক্ত হিন্দু আছেন যাঁহাদের ও যাঁহাদের জ্ঞাতিকুটুম্ব ও বন্ধুদের বংশে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত লোক অনেক আছেন, এবং শিক্ষার বিস্তার খুব হইয়াছে। অন্য দিকে বিস্তর আদিম জাতির মানুষ, ব্রাহ্মণাদি "সবর্ণ" হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ প্রভৃতি আছেন যাঁহারা দরিদ্র; এবং তাঁহাদের মধ্যে অগণিত এরূপ লোক আছেন যাঁহারা নিরক্ষর। মুসলমান শব্দের অর্থ দরিদ্র ও নিরক্ষর নহে, তপশিলভুক্ত হিন্দু শব্দের অর্থও দরিদ্র ও নিরক্ষর নহে। অন্য দিকে "সবর্ণ" হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান ও বৌদ্ধ প্রভৃতি ধনী ও বিদ্বানের সমার্থক নহে। সবর্ণ হিন্দুরাও ট্যাক্স দিয়া থাকে, বেশী বেশী ট্যাক্স তাহারাই দেয়। এই সকল কথা বিচার করিলে বুঝা যাইবে, যে, সম্প্রদায়নির্বিশেষে সরকারী শিক্ষাব্যয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের ব্যবস্থা কেবল মুসলমান ও তপশিলভুক্ত হিন্দুদের জন্ত করা নিতান্ত অন্যায় ও পক্ষপাতদুষ্ট। বিশেষ ব্যবস্থা গরীব ও নিরক্ষরদের জন্ত অবশ্যই করা উচিত; কিন্তু তাহা করা উচিত সব সম্প্রদায় ও জা'তের দরিদ্র ও নিরক্ষরদের জন্ত। এই বিশেষ ব্যবস্থার সুবিধা দরিদ্র ও অশিক্ষিত আদিম 'জাতির লোক, মুসলমান, তপশিলভুক্ত হিন্দু, "সবর্ণ" হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকলেরই পাওয়া উচিত।

নানা দিকে নানা বিষয়ে অন্যায় ও পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবস্থা হওয়ায় তাহার দ্বারা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে শ্রেণীতে শ্রেণীতে জা'তে জা'তে ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ ও অসন্তোষ বাড়িতেছে।

—

প্রাথমিক-শিক্ষা-কর

এইরূপ বলা হইয়াছে, যে, বঙ্গে পাঠশালায় যাইবার বয়সের সকল ছেলেমেয়ের জন্ত পাঠশালা খুলিয়া সেখানে অবৈতনিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইলে যত টাকার আবশ্যক, তত টাকা খরচ করিবার আর্থিক সামর্থ্য বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের নাই। তর্কের খাতিরে ইহা মানিয়া লইলাম—যদিও বঙ্গের মন্ত্রীরা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের মত মাথাপিছু ৫০০৲ টাকা বেতন লইয়া এবং লোআন-কমীটির নির্দ্দিষ্ট সমুদয় ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া এই কথা বলিলে তবে তাহা শোভা পাইত। সরকারের যথেষ্ট টাকা নাই মানিয়া লইলে ইহাও মানিয়া লইতে হইবে, যে, অবৈতনিক ও ও আবশ্যিক সার্ব্বজনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে নূতন ট্যাক্স বসাইতে হইবে। এইরূপ ট্যাক্স বসাইতে হইলে, যে-কোন ব্যক্তির ট্যাক্স দিবার আর্থিক সামার্থ্য আছে, তাহার উপর ট্যাক্স বসান উচিত, এবং যাহাদের অবস্থা সেরূপ নহে তাহাদের অব্যাহতি পাওয়া উচিত। কিন্তু নিয়ম হইতে যাইতেছে যে, কৃষক ও শ্রমিকদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে, এবং কেবলমাত্র জমিদার ও "মধ্যবিত্ত" গৃহস্থ এবং ব্যবসাদার-দিগকে ট্যাক্স দিতে হইবে। বিস্তর কৃষক ও শ্রমিকের ট্যাক্স দিবার সামর্থ্য নাই, ইহা সত্য কথা। তাঁহাদের অব্যাহতি পাওয়া অবশ্যই উচিত। কিন্তু এমন নামে-মাত্র জমিদার আছেন, যাঁহারা ঋণগ্রস্ত দেউলিয়া ও নিঃস্ব এবং যাঁহারা খাজনা দিতে না পারায় জমিজমা প্রায় সব নিলাম হইয়া গিয়াছে। বিত্তহীন "মধ্যবিত্ত" বেকারের সংখ্যা এত বেশী যে গণনা করা কঠিন। অন্য দিকে এমন চাষীও আছেন, যাঁহাদের আয় ছোট ছোট তথাকথিত জমিদারের চেয়ে বেশী; এমন কারখানা-শ্রমিকও আছেন যাঁহাদের আয় বেকার "মধ্যবিত্ত" গৃহস্থদের এবং "মধ্যবিত্ত"

সাধারণ কেরানী গুরুমহাশয় ও শিক্ষকদের চেয়ে বেশী।

অতএব, কোন মানুষের ট্যাক্স দিতে বাধ্য হওয়া বা ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি পাওয়া তাহার আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করা উচিত, সামাজিক নাম বা শ্রেণীর উপর নহে।

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সুবিধা প্রধানতঃ কৃষক ও শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরাই পাইবে। অথচ তাহাদের অভিভাবকদের সামর্থ্য থাকিলেও তাহাদিগকে ট্যাক্স দিতে হইবে না, এবং ট্যাক্স দিবে তাহারা যাহাদের ছেলেমেয়েরা প্রধানতঃ এই ব্যবস্থা দ্বারা উপকৃত হইবে না। এ-রকম নিয়ম ন্যায়সঙ্গত নহে। এরূপ ব্যবস্থার একটা দুঃখকর অথচ কৌতুকাবহ দিক্ এই আছে, যে, পরগাছা-নামে অভিহিত জমিদার এবং বুর্জোআ নামে অভিহিত মধ্যবিত্ত লোকদের প্রদত্ত ট্যাক্সে যে কৃষক- ও শ্রমিক-সন্তানদের শিক্ষা হইবে, তাহাদিগকে পরগাছা ও বুর্জোআদের উচ্ছেদ সাধন করিতে বলা হয়। "যার শিল যার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া।"

বঙ্গের কৃষকদের অধিকাংশ মুসলমান, বঙ্গের জমিদারদের অধিকাংশ হিন্দু; সুতরাং শিক্ষা-কর সম্বন্ধীয় নিয়ম কতকটা সাম্প্রদায়িক-বাঁটোআরা-সঙ্গত হইবে—যদিও এই 'সঙ্গতি' আকস্মিক হইতে পারে।

—

সরকারী চাকরীর বাঁটোআরা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী চাকরীর বাঁটোআরা সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব গৃহীত হইয়া গিয়াছে। প্রস্তাবটা মন্ত্রীদের নহে। তথাপি সেটা ভোটের আধিক্যে গৃহীত হইয়া গিয়াছে—ঠিক্ যেন গবন্মেণ্ট অর্থাৎ মন্ত্রীরা হারিয়া গিয়াছেন। ব্যাপারটা বুঝিতে হইলে আমাদের দেশের অনেক ভোজে ভোজনে-দড় বা ঔদরিক লোকদের ভোজনকালীন ব্যবহারটা স্মরণ করিতে হইবে। তাহারা অন্য লোকদের চেয়ে বেশী খাইয়া থাকিলেও যদি পরিবেষকেরা আরও কিছু পাতে ঢালিয়া দেয় তখন তাহারা বলে বটে, "হাঁ হাঁ, করেন কি, আর দেবেন না," কিন্তু বাস্তবিক মনে মনে খুশি হয় ও পাতের নূতন আগন্তুক সব কিছু খুব সাবাড় করে। সেইরূপ চাকরীর এই নূতন ভাগাভাগির প্রস্তাবটা মুসলমান ও তপশিলভুক্ত জাতির মন্ত্রীরা বা তাঁহাদের পক্ষের সদস্যেরা মুখ ফুটিয়া না চাহিলেও "অন্যেরা" তাঁহাদিগকে চাকরীর এত বড় ভাগ দেওয়াতে তাঁহারা আহ্লাদে আটখানাই হইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী পরিহাস (?) পূর্ব্বক বলিয়াছেন, আমরা আছি ১২৩ জন আর তপশিলভুক্ত জাতিদের সদস্য আছেন ৩১, মোট ১৫৪; ২৫০'র মধ্যে ১৫৪ এক দিকে হইলে সমস্ত লুটই আমরাই লইতে পারি, আর কাহাকেও কোন ভাগ দিবার আবশ্যক করে না। অর্থাৎ কি না, "ভায়ারা সব আমার দলে ভিড়ে যাও"।

বাঁটোআরাটার প্রস্তাব এইরূপ। সরকারী সব রকম চাকরীর (অর্থাৎ প্রাদেশিক সব চাকরীর, সমগ্রভারতীয়গুলার নহে) শতকরা ৬০টা পাইবে মুসলমানেরা, ২০টা পাইবে তপশিলভুক্ত হিন্দুরা, বাকী ২০টা পাইবে অবশিষ্ট সকলে, অর্থাৎ "সবর্ণ" হিন্দু, আদিম জাতি, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি। এই প্রকার বাঁটোআরা যে-রকম মনোবৃত্তির ফল, তাহার একটা নমুনা এক জন মুসলমান সদস্যের কথা হইতে পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে তাঁহার জাতভাইরা এত দিন পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ না লওয়ায় সরকারী চাকরী যথেষ্ট পান নাই, এখন চক্রবৃদ্ধি অনুসারে সুদ কষিয়া সুদে আসলে সব পোষাইয়া লইতে হইবে। এই রকম কথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের কথা হইতেই বুঝা যায়, তাঁহাদের জাতভাইরা যে এ যাবৎ যথেষ্ট চাকরী পান নাই, তাহার জন্য দায়ী তাঁহারাই; অথচ এখন সুদে আসলে পোষাইয়া লইতে চান অন্যদিগকে ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিয়া।

সরকারী চাকরীতে মানুষ নিয়োগ কেবলমাত্র যোগ্যতা অনুসারে, জাতিধর্মনির্বিশেষে করা উচিত; নতুবা ন্যায়বিরুদ্ধ কাজ হয়, সরকারী কাজ যত উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন হওয়া উচিত ও হইতে পারে তাহা হয় না, এবং তাহার ফলে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, শ্রেণীর ও জা'তের অনিষ্ট হয়। কিন্তু এই সুনীতি উপেক্ষা করিয়া যদি ধর্ম্মসম্প্রদায় ও জা'ত অনুসারেই ভাগ করিতে হয়, তাহা হইলে বাঁটোআরাটা কিরূপ দাঁড়ায় দেখা যাক।

কেবল মুসলমানদের কথাই প্রধানতঃ বলিব। বাহুল্যভয়ে, হিন্দুদিগকে, যে অন্যায় করিয়া দুটা ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে তাহার হিসাব বা আদিম জাতি বৌদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতিদের হিসাব, দিব না।

বঙ্গে মুসলমানরা মোট অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৫৪·৮ জন। সুতরাং যদি ধরা যায় যে, শিশু পর্য্যন্ত নাবালকেরাও চাকরী করিবার অধিকারী ও করে, তাহা হইলেও মুসলমানদের অধিকার হয় শতকরা ৫৪·৮ টা চাকরীতে, ৬০ টাতে হয় না। কিন্তু নাবালকেরা চাকরী পায় না, করে না; করে সাবালকেরা। সুতরাং সাবালকদের সংখ্যাই ধরা উচিত। কিন্তু বঙ্গে সাবালক মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৫১·৩ জন। অতএব শতকরা ৬০টা চাকরী তাহাদের পাওনা হয় না। তাহার পর, আর একটা কথা। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা সরকারী চাকরী করে না ও পায় না, পুরুষেরাই করে ও পায়। অতএব, বঙ্গের পুরুষদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান পুরুষ শতকরা যত জন, সরকারী শতকরা ততটা চাকরী তাহাদের প্রাপ্য হয়। কিন্তু এত সূক্ষ্ম হিসাব কিসের জন্য করিব? ন্যায়, তথ্য, যুক্তি—এ-সকল ত এখন আমল পায় না; ভোটের জোরে লুটের ভাগের দিন আসিয়াছে।

চাকরী সাধারণতঃ লিখনপঠনক্ষম লোকেরাই করে। অতএব বঙ্গের লিখনপঠনক্ষম লোকদের শতকরা কয় জন মুসলমান দেখা যাক। লিখনপঠনক্ষমদের মধ্যে শতকরা ৩৩.৬ জন মুসলমান। তাহাদের ন্যূনকল্পে অক্ষর-পরিচয় আছে, তাহারা নাম দস্তখত করিতে পারে ও সোজা বহি বা চিঠি পড়িতে পারে, এই প্রকার যোগ্যতাবিশিষ্ট লোকদিগকেই চাকরী দিলে মুসলমানদের পাওনা হয় শতকরা ৩৩.৬টা। কিন্তু লেখাপড়া-জানা লোকদের প্রাপ্য প্রায় সব চাকরীই আজকাল অন্ততঃ কিছু-ইংরেজী-জানা লোকদিগকে দেওয়া হয়। বঙ্গে ইংরেজী-জানাদের মধ্যে শতকরা ২৪.৭ জন মুসলমান। সুতরাং সে-হিসাবে মুসলমানদের পাওনা হয় শতকরা ২৪.৭টা চাকরী। ইংরেজী এ বি সি জানিলেই তাহাকে ইংরেজী-লিখনপঠনক্ষম মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক যদি অন্ততঃ উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়ে বা পড়িয়াছে এ-রকম লোকদিগকেই চাকরী দেওয়া হয়, তাহা হইলে শতকরা ১৭·৭টা চাকরী মাত্র মুসলমানদের পাওনা হয়; কারণ উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে কেবল শতকরা ১৭·৭ জন মুসলমান।

আরও উচ্চ যোগ্যতা বিবেচনা করা আবশ্যক। কলেজের ইণ্টারমীডিয়েট শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ১৩·৬ জন মুসলমান। এই রকম যোগ্যতা ধরিলে মুসলমানদের পাওনা হয় শতকরা ১৩·৬টা চাকরী। বি-এ, বি-এসসি পড়িতেছে এইরূপ যোগ্যতার লোক চাহিলে মুসলমানদের পাওনা হয় শতকরা ১৪·২টা চাকরী। পোষ্টগ্রাডুয়েট ক্লাসের ছাত্র ও গবেষক ছাত্রদের মধ্যে মুসলমান ছাত্র শতকরা ১৩ জন। ইহা হইতে মোটামুটি বলা যায়, যে, বি-এ বি-এসসি পাসকে ন্যূনতম যোগ্যতা ধরিলে তাহারা পায় শতকরা ১৩টি চাকরী। হিন্দুদের মধ্যে বি-এ বি-এসসি পাস মানুষ এত আছে, যে, উহাকেই ন্যূনতম যোগ্যতা ধরিলেও হাজার হাজার চাকরীতে নিযুক্ত করিবার যোগ্য হিন্দু পাওয়া যাইবে।

যে-সকল কাজের জন্য সাধারণ জ্ঞান যথেষ্ট নহে, বিশেষ বিশেষ বৃত্তির (যেমন ডাক্তারী, এঞ্জিনিয়ারী, ও ওকালতীর) জ্ঞান আবশ্যক, সেই সকল কাজের জন্য মুসলমান কিরূপ পাওয়া যাইতে পারে, তাহার দু-একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

চিকিৎসা-ব্যবসায়ে ব্যাপৃত লোকদের মধ্যে শতকরা ১৭ জন মাত্র মুসলমান। সুতরাং চিকিৎসা-বিভাগের শতকরা ৬০টা চাকরী মুসলমানদিগকে দিতে হইলে বহুসংখ্যক "গোবদ্দি" বা তাহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট "যোগ্যতা" বিশিষ্ট লোককে চাকরী দিতে হইবে। অবস্থা এইরূপ। কিন্তু বর্ত্তমানে কোন কোন স্বদেশপ্রেমমজ্জী ব্যক্তির 'হীরো' মৌলবী নওশের আলী চিকিৎসা-বিভাগের খালি শতকরা ১০০টি কাজেই মুসলমান ঢুকাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং পাসকরা এরূপ মুসলমান না-পাইলে কবে কোন্ মুসলমান পাস করিবে তাহার অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন।

আইন-ব্যবসায়ে নিযুক্ত লোকদের মধ্যে শতকরা

১১'৬ জন মুসলমান; তথাপি কিন্তু মুন্সেফ, সবজ্‌জ, জজ শতকরা ৬০ জন হওয়া চাই মুসলমান!

উপরে যে-সকল সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা ভারত-গবর্মেণ্টের আইন-সচিব সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের "বক্তৃতা ও পুস্তিকা" ("Speeches and Pamphlets") বহি হইতে লওয়া হইয়াছে। উহা ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়।

—

সাম্প্রদায়িক "শ্রমবিভাগে" হিন্দুর প্রতি সুবিচার!

বাংলা-গবর্মেণ্টের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিবার ভার প্রধানতঃ হিন্দুদের উপর দেওয়া হইয়াছে। সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার তাঁহার "বক্তৃতা ও পুস্তিকা" বহির ২৩ পৃষ্ঠায় বঙ্গের প্রাদেশিক রাজস্বের কত অংশ কোন্ সম্প্রদায়ের লোকেরা দেয়, তাহার বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, "মুসলমানেরা শতকরা কুড়ি টাকা দেয়, এইরূপ এস্টিমেট করিলে মুসলমানদের প্রতি সদাশয়তা করা হইবে" ("an estimate of 20 per cent will err on the side of generosity to Mahomedans")। বাকী শতকরা ৮০ টাকার প্রায় সমস্তটা হিন্দুরা দিয়া থাকে। দেওয়ার কাজটা তাহারা করে। শতকরা ৬০টি সরকারী চাকরী গ্রহণ করিয়া সরকারী টাকা লওয়ার কাজটি প্রধানতঃ মুসলমানেরা করিবেন। শিক্ষা-কর জমিদার ও মধ্যবিত্ত লোকদের নিকট হইতেই আদায় করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতেও রাজস্ব দেওয়ার কাজটা কার্য্যতঃ প্রধানতঃ হিন্দুদের ভাগেই পড়িবে। শিক্ষক নিযুক্ত হইবে বেশীর ভাগ মুসলমান, অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রও হইবে বেশীর ভাগ মুসলমান। অতএব, এক্ষেত্রেও দিবার কাজ করিবে হিন্দু, লইবার কাজ করিবে মুসলমান।

এইরূপ শ্রমবিভাগ সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার মতই ন্যায়সঙ্গত।

বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দুদের শক্তিহীনতা

সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার প্রধান উদ্দেশ্য হিন্দুদিগকে শক্তিহীন করা—বিশেষতঃ বঙ্গের হিন্দুদিগকে শক্তিহীন করা। সেই জন্য ব্রিটিশ-ভারতে হিন্দুরা শতকরা ৭০ জনের অধিক হইলেও, তাঁহাদিগকে সমগ্র-ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শতকরা ৪২টি আসন দেওয়া হইয়াছে; এবং অন্য সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্য প্রতিনিধির চেয়ে বেশী প্রতিনিধি দেওয়া হইয়া থাকিলেও, বঙ্গের অন্যতম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিন্দুদিগকে তাহাদের সংখ্যা অনুসারে প্রাপ্য প্রতিনিধি সংখ্যা অপেক্ষাও কম প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে। তাহাতেও যদি তাহাদের কিছু শক্তি থাকে সেই জন্য কতক হিন্দুকে "তপশিলভুক্ত" করিয়া আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দুরা এরূপ শক্তিহীন ও পৌরুষ-বর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছে, যে, সাম্প্রদায়িক চাকরী ভাগের মত ঘোরতর অন্যায় প্রস্তাবটার বিরুদ্ধেও কোন হিন্দু প্রতিবাদ করেন নাই—করিয়াছেন এক জন ইংরেজ, এবং বদান্যতা ন্যায়পরায়ণতা ও পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত এক জন বাঙালী খ্রীষ্টিয়ান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আড়াই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, ইহা বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে সুবিদিত।

তপশিলভুক্ত হিন্দুদের কোন প্রতিনিধি প্রতিবাদ করেন নাই, কারণ তাঁহারা শতকরা ২০টা চাকরী পাইবেন; অন্য হিন্দুদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কেহ প্রতিবাদ করেন নাই, কেন-না তাঁহারা কংগ্রেসওয়ালা, এবং প্রতিবাদ করিলে কংগ্রেসদলভুক্ত মুসলমানদের কংগ্রেস ছাড়িয়া দিবার আশঙ্কা আছে। সেই জন্য ইহারা প্রতিবাদ না করিয়া নিরপেক্ষ ছিলেন। কিরূপ নিরপেক্ষ তাহা পরে বলিব। কংগ্রেস জাতীয় দল প্রস্তাবটার ও কংগ্রেসী প্রতিনিধিদের নিরপেক্ষতার নিন্দা করিয়াছেন। হিন্দুসভাও তাহা করিয়াছেন।

—

ছাত্রসমাজ এবং চাকরীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা

বাংলা দেশে ইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধিকাংশ ছাত্র হিন্দু। কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকাংশ ছাত্র "সবর্ণ" হিন্দু। উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়েও সম্ভবত তাহাই। এই সকল ছাত্র যত কৃতিত্বের সহিতই পাস করুন না, আগে শতকরা ৮০টি কাজ মুসলমান ও তপশিলভুক্ত হিন্দুদিগকে দিয়া পরে তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করা হইবে। যোগ্যতার বলে যোগ্যতম "সবর্ণ" হিন্দু ছাত্রও সর্ব্বাগ্রে কাজ পাইতে অধিকারী হইবেন না। ছাত্রেরা তাঁহাদের নিখিলভারতীয় ফেডারেশনে এ বিষয়ে কি মত প্রকাশ করেন, পরে জ্ঞাতব্য।

অনেক ছাত্র অবশ্য বলিতে পারেন, "আমরা চাকরীর জন্য পড়াশুনা করিতেছি না, জ্ঞানলাভের জন্য এবং স্বাধীন কোন বৃত্তি অবলম্বনের জন্য করিতেছি।" যাঁহাদের মনের ভাব ও প্রতিজ্ঞা এইরূপ তাঁহাদিগকে আমরা জীবিকা উপার্জ্জনের দিক্ দিয়া কিছু বলিতে চাই না; কেবল আশা করি, সরকারী চাকরীতে অধিকার বলি দিবার পর ভবিষ্যতে শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের-জন্তই-যথেষ্ট বেতনের সামান্ত চাকরীর জন্য তাঁহাদিগকে মাড়োয়ারী বা অন্য ব্যবসাদারদের দ্বারস্থ হইতে হইবে না।

সরকারী চাকরী উপার্জ্জনের পথ একটা হইলেও, দেশের কাজ করিবার পথও উহা একটা বটে, এবং স্বরাজ যতটুকু পাওয়া যাইতে থাকিবে, সরকারী চাকরী ততই অধিক পরিমাণে দেশসেবার একটা উপায় হইবে। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে এখনই কতকটা এরূপ হইয়াছে, বঙ্গে যে হইতে পারেই না এমন নয়।

সরকারী কর্ম্মচারীরা যিনি যে-কাজ করেন, তাহা যথাসম্ভব দক্ষতা ও নিষ্ঠার সহিত নির্ব্বাহিত হওয়া না-হওয়ার উপর দেশের মঙ্গলামঙ্গল অনেকটা নির্ভর করে। অতএব, যোগ্যতম লোকদিগকেই, জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে, নিযুক্ত করা উচিত। যোগ্যতার বিচার মোটামুটি দুই দিক্ দিয়া করা আবশ্যক—বুদ্ধিবিদ্যার দিক্ দিয়া এবং চরিত্রের দিক্ দিয়া। বুদ্ধিবিদ্যা সম্বন্ধে ঠিক্ বিচার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বা তত্তুল্য কোন পরীক্ষা দ্বারা যে অভ্রান্ত রূপে নির্ণীত হয়ই, এমন নয়; কিন্তু মোটের উপর ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় এ-পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। চরিত্র বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, তাহা সুবিদিত; সে-বিষয়ে কিছু বলা অনাবশ্যক। কেবল, নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান, সতীত্বের আদর, চরিত্রবত্তার একটি লক্ষণ, ইহা স্মরণ করাইয়া দি। নির্ভীক ন্যায়পরায়ণতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা যে চরিত্রের একটি বড় উপাদান তাহা মনে রাখা আবশ্যক। জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে যোগ্যতমের নিয়োগের নিয়ম এবং কেবল যোগ্যতার জন্যই পদোন্নতির নিয়ম যেরূপ নির্ভীক ন্যায়পরায়ণতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা জাগাইবার, উৎসাহ দিবার ও রক্ষা করিবার অনুকূল, অন্য কোন নিয়ম সেরূপ নহে। এই কারণে সরকারী চাকরী সম্বন্ধে এই প্রকার নিয়ম বাঞ্ছনীয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠের ওজন বাড়ান !

দেশের অধিবাসীদের মধ্যে যে-যে শ্রেণী বা সম্প্রদায় সংখ্যালঘু, যাহাতে তাহাদের স্বার্থ ও অধিকার উপেক্ষিত না হয়, এই জন্য সংখ্যা অনুসারে তাহাদের প্রাপ্য অপেক্ষাও কিছু বেশী তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, এইরূপ বলা হয়। কিন্তু বঙ্গে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও সংখ্যা অনুসারে তাহাদের প্রাপ্য অপেক্ষাও অধিক চাকরী তাহাদের জন্য বরাদ্দ হইল! ইহার দ্বারা প্রমাণ হইল যে, যোগ্যতার গুরুত্ব মুসলমান সম্প্রদায়ের নাই, কৃত্রিম উপায়ে তাহাদের ওজন বাড়াইতে হইতেছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য সংরক্ষণ একটা তাজ্জব ব্যাপার!

চাকরীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা ও সরকারী কাজের সুনির্ব্বাহ

সরকারী চাকরীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা দ্বারা আরও অধিক সংখ্যায় মুসলমান সরকারী কাজে নিযুক্ত হইলে ঐ সকল কাজ সুনির্ব্বাহিত হইবে কি না, এই প্রশ্ন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঁটোআরার প্রস্তাব উপলক্ষে উত্থাপিত হইয়াছিল। সরকারী চাকরীতে মুসলমানের সংখ্যা বাড়িলেই ঐ সব কাজ সুনির্ব্বাহিত হইবে না, কিংবা সুনির্ব্বাহে বাধা জন্মিবে না—এ-দুটার মধ্যে কোন মতই ঠিক নয়। সকল উমেদারদের মধ্যে যদি মুসলমানেরা যোগ্যতম হন, তাহা হইলে তাহাদের

নিয়োগে কাজের সুনির্ব্বাহে কোন বাধা নিশ্চয়ই হইবে না; কিন্তু যোগ্যতর অ-মুসলমান থাকিতেও যদি মুসলমান বলিয়াই মুসলমানদের নিয়োগ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই যোগ্যতর অ-মুসলমান নিয়োগ করিলে কাজ যত ভাল হইতে পারিত, তত ভাল হইবে না। যদি হিন্দুদের প্রতিও এইরূপ পক্ষপাত করা হয়, যোগ্যতর অ-হিন্দু থাকিতে হিন্দু বলিয়াই হিন্দুকে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে এরূপ নিয়োগও কাজের সুষ্ঠুতম নির্ব্বাহে নিশ্চয়ই অন্তরায় হইবে। মুসলমান হইলেই কর্ম্মচারী কম দক্ষ বা বেশী দক্ষ হইবে, কিংবা হিন্দু হইলেই বেশী দক্ষ বা কম দক্ষ হইবে, এরূপ কোন মত ভ্রান্ত।

—

শিক্ষা-বিভাগের অবনতি

যোগ্যতমের নিয়োগ না-করিয়া কতকগুলি মুসলমান নিয়োগ করিতেই হইবে, এই নিয়ম ও রীতি অনুসৃত হওয়ায় বঙ্গের একটি সরকারী বিভাগের অবনতি হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। শিক্ষা-বিভাগ এই বিভাগ। কয়েক বৎসর হইতে এই অভিযোগ চলিতেছে যে, বাঙালী ছেলেরা সমগ্রভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাসমূহে উচ্চ স্থান পাইতেছে না ও চাকরীর জন্য মনোনীত হইতেছে না। এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থার অনেক কারণ আছে। অন্য কারণ যাহাই থাকুক, একটা কারণ, অনেক বৎসর হইতে বাঙালী ছেলেদের শিক্ষার বনিয়াদ কাঁচা হইয়া আসিতেছে। বঙ্গের ইস্কুলগুলিতে অন্য অনেক প্রদেশের ইস্কুলগুলির মত ভাল শিক্ষা হয় না। তাহার একটা কারণ, সরকারী পরিদর্শন (inspection) কার্য্যে মুসলমান বলিয়াই মুসলমান পরিদর্শকদের সংখ্যাধিক্য ও প্রাধান্য, এবং শিক্ষণ (teaching) কার্য্যেও মুসলমান বলিয়াই মুসলমান শিক্ষকদের সংখ্যাধিক্য। এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করায় মুসলমানেরা চটিতে পারেন। কিন্তু আমরা যোগ্য কর্ম্মচারীদের নিন্দা করিতেছি না; মুসলমানদের মধ্যে সেরূপ পরিদর্শক ও শিক্ষক ছিলেন ও আছেন স্বীকার করি। কিন্তু ইহা ত সকল শিক্ষিত লোকে দেখিতেছেন ও জানেন, যে, কি বঙ্গে কি বিদেশে সংখ্যায় বা উৎকর্ষে মুসলমান ছাত্রসমষ্টি ও পরীক্ষোত্তীর্ণ-সমষ্টি হিন্দু ছাত্রসমষ্টি ও পরীক্ষোত্তীর্ণ-সমষ্টির চেয়ে উচ্চস্থানীয় নহেন, নিম্নস্থানীয়ই। সুতরাং শিক্ষামন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষা-বিভাগের অধিকাংশ কাজ, পরিদর্শকের ও শিক্ষকের অধিকাংশ কাজ, যে যোগ্যতার জোরে মুসলমানেরা পাইয়াছেন, ইহা বলা চলে না। এখানে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির কথা বলিলাম না। তাহাও মুসলমানেরা মুসলমান ও সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়াই দখল করিবার চেষ্টায় আছেন, কিন্তু এখনও সফলকাম হন নাই।

শিক্ষা-বিভাগ ছাড়া অন্য কোন কোন বিভাগেও মুসলমান বলিয়াই মুসলমানের সংখ্যাধিক্য বা প্রাধান্য ঘটিয়াছে। সেগুলির উন্নতি-অবনতির প্রমাণ শিক্ষা-বিভাগের মত স্পষ্ট নহে। সুতরাং সেগুলি সম্বন্ধে কিছু বলিব না।

—

বঙ্গে বেআইনী বলিয়া ঘোষিত পুস্তক

সেদিন খবরের কাগজে দেখিতেছিলাম, ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী খাজা সর্ নাজিমুদ্দিন বলিয়াছেন, বঙ্গে যে-সকল পুস্তক বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের বিরুদ্ধে নিষেধ সাধারণ ভাবে প্রত্যাহৃত হইবে না (যেমন বোম্বাই যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতিতে অনেক পুস্তক সম্বন্ধে হইয়াছে), কিন্তু এরূপ কোন পুস্তকের প্রকাশক বা লেখক নিষেধ-প্রত্যাহার প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করিলে তাহা বিবেচিত হইবে। আমাদের প্রকাশিত সাণ্ডার্ল্যাণ্ড সাহেবের লেখা "ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ" ভারত-গবর্মেণ্ট কর্তৃক বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হয়; সুতরাং বাংলা-গবর্মেণ্ট তাহার সম্বন্ধে কিছুই করিতে পারেন না।

বেআইনী বলিয়া ঘোষিত বাংলা পুস্তকসমূহের কথা লিখিতে গিয়া কলিকাতার এক দৈনিক লিখিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের একখানি বহি বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এ সংবাদ ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিত একখানি বহি নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে। তাহা বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের "বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ"। এই বহিখানির নামেই বোধ হয় কোন প্রভু আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া

ইহা নিষিদ্ধ বহির তালিকাভুক্ত করেন। কবি স্বয়ং কিন্তু ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ নাজিমুদ্দিনের উদ্দেশে কোন বাংলা বহি সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্ফল। কেন-না, শুনিয়াছি তিনি বাংলা বুঝেন না, পড়েন না! তবে বাঙালী অন্য কোন মন্ত্রী যদি পড়িয়া দেখেন, তাহা হইলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিবেন। বিদেশীরা বলেন, রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ দিয়া তাঁহারাই প্রথমে তাঁহার আদর করেন ও গুণগ্রাহিতা প্রদর্শন করেন। বাংলা-গবন্মেণ্ট বলিতে পারেন, প্রথমেই না-হউক, বিলম্বেও ত তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত একখানা বহি বেআইনী ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে সম্মান করা হইয়াছে!

রবীন্দ্রনাথের কোন বহি নিষিদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে গুজবটার মধ্যে সত্য কেবল এইটুকু আছে, যে, তাঁহার "রাশিয়ার চিঠি"র একটি অংশের ইংরেজী অনুবাদ মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হওয়ায় গবন্মেণ্ট হুকুম করেন মডার্ণ রিভিয়ু যেন অন্য কোন অংশের অনুবাদ প্রকাশ না করে। ইহাও কবির একটা সম্মান বটে!

—

বঙ্গে নারী-নির্যাতন

গত ২৪শে আগষ্ট মৌলবী মনিরুদ্দিন আখন্দ চাওয়ায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার টেবিলে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী খ্‌াজা সর্ নাজিমুদ্দিন বঙ্গে নারীহরণ-অপরাধের একটা তালিকা স্থাপন করেন। উহাতে ১৯৩৭-এর এপ্রিল হইতে ১৯৩৮ সালের মার্চ পর্য্যন্ত সব ধর্মসম্প্রদায়ের নারীর নির্যাতনের অভিযোগের সংখ্যা ও হিন্দুনারী নির্যাতনের অভিযোগের সংখ্যা প্রত্যেক জেলার জন্য দেখান হইয়াছে। কতকগুলি মোকদ্দমায় আসামীরা দণ্ডিত হইয়াছে, কতকগুলিতে খালাস পাইয়াছে, কতকগুলির এখনও বিচার শেষ হয় নাই বা অন্তবিধ ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাও দেখান হইয়াছে।

সকল সম্প্রদায়ের নারীর নির্যাতনের মোট অভিযোগ-সংখ্যা ৪১০ (চারি শত দশ), হিন্দুনারীর নির্যাতনের মোট অভিযোগ-সংখ্যা ১৪০। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অ-হিন্দু (খুব সম্ভব, প্রায় সবই মুসলমান) নারীদের নির্যাতন হইয়াছিল অধিক; তাহাদের অভিযোগের সংখ্যা নির্য্যাতিতা হিন্দুনারীর অভিযোগের সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ। অবশ্য, সংখ্যাগুলি ঠিক কিনা পরীক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন; কিন্তু বেশী ভুল আছে মনে হয় না। দেখা যাইতেছে, মুসলমান নারীরা হিন্দুনারীদের চেয়েও বেশী সংখ্যায় নির্যাতিতা হন। কিন্তু মুসলমান সমাজে এজন্য ত কোন চাঞ্চল্য দেখা যায় না, যদিও অনেক মুসলমান বক্তা ও লেখক বলেন, মুসলমান শাস্ত্র অনুসারে ব্যভিচারীর দণ্ড লোষ্ট্রনিক্ষেপে তাহার প্রাণবধ। জজ সৈয়দ আমীর আলী নারীধর্ষক দলের লোকদের প্রাণদণ্ড দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মুসলমান সমাজে এখন কি তাঁহার মত লোক নাই?

লোকলজ্জাভয়ে ও গুণ্ডাদের ভয়ে নারীহরণের বিস্তর ঘটনা আদালত পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হয় না, খবরের কাগজেও প্রকাশ পায় না। সুতরাং সংখ্যাগুলার দ্বারা এই সব পাশবিক ও পৈশাচিক অপরাধের প্রাদুর্ভাব ঠিক্ বুঝা যায় না।

অভিযোগের সংখ্যার পর বিচার্য্য, শাস্তি কতগুলা মোকদ্দমায় হইয়াছে। মোট ৪১০টা মোকদ্দমার মধ্যে শাস্তি হইয়াছে কেবল ১২৭টাতে; খালাস তাহা অপেক্ষা বেশী, ১৪৮টাতে। বাকীগুলা এখনও বিচারাধীন বা অন্য কিছু। হিন্দু নারীদের অভিযোগ ছিল ১৪০টা; তাহাতে সাজা হয় ৫২টাতে, আসামীরা খালাস পায় ৫৩টাতে।

আমাদের দেশে দরিদ্র ধনী কি হিন্দু কি মুসলমান কেহ নারী বেইজ্জৎ হওয়ার খবর সহজে প্রকাশ করিতে চায় না। সুতরাং অর্দ্ধেকের উপর মোকদ্দমা ছিল মিথ্যা, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। প্রশ্ন এই, তাহা হইলে এত আসামী খালাস পায় কেন? এ বিষয়ে কি পুলিসের, গবন্মেণ্টের, খুব গুরুতর কর্ত্তব্য নাই? আরও প্রশ্ন এই যে, মোকদ্দমাগুলা যদি রাজনৈতিক হইত, তাহা হইলে, গবন্মেণ্ট কি এত আসামীর খালাস পাওয়ায় চুপ করিয়া থাকিতেন? পুলিসের উপর, বিচারকদের উপর তম্বী হইত, আইন কড়াকড়া হইত, বিশেষ আদালত ও সরাসরি বিচারের এবং বহু স্থলে বিনা-বিচারে শাস্তির

ব্যবস্থা হইত (যেমন গত বহু বৎসর ধরিয়া হইয়াছে)। নারীরা কি বানে ভাসিয়া আসিয়াছে যে তাহাদের মান ইজ্জৎ প্রাণ রক্ষার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করা অনাবশ্যক?

মোট অভিযোগ-সংখ্যা কোথায় কত, নীচে দিতেছি। প্রত্যেক বাঙালীর নিজের নিজের জেলাকে ও সমগ্র বঙ্গকে কলঙ্কমুক্ত করিবার চেষ্টা করা উচিত। ঢাকা ১৯, ময়মনসিং ২৮, ফরিদপুর ২৯, বাখরগঞ্জ ৩৭, চট্টগ্রাম ১৯, ত্রিপুরা ১৬, নোয়াখালি ২, রাজসাহী ৪৫, দিনাজপুর ১৭, জলপাইগুড়ি ৪, রঙ্গপুর ২২, বগুড়া ৬, পাবনা ৪৭, মালদহ ৮, দার্জিলিং ২, সৈদপুর ১, বর্দ্ধমান ৩, বীরভূম ১, বাঁকুড়া ৩, মেদিনীপুর ৪, হুগলী ৪, হাবড়া ৬, ২৪-পরগণা ২২, নদীয়া ১০, মুর্শিদাবাদ ৬, যশোর ১৭, খুলনা ৯, শিয়ালদহ ৪, কলিকাতা ১৯।

নির্যাতিতা নারীদের অভিযোগের সংখ্যা যে আমাদের কম বোধ হইয়াছে, তাহার একটা কারণ এই হইতে পারে, যে, সর্ নাজিমুদ্দিনের তালিকা য়্যাব্‌ডাক্‌শনের অর্থাৎ বলপূর্ব্বক বা অন্য উপায়ে নারীকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়ার, নারীহরণের, তালিকা। কোন নারী স্বগৃহে বা অন্য যেখানে ছিলেন সেখানেই অত্যাচরিতা হইয়া থাকিলে (এ রকম অভিযোগও খবরের কাগজে অনেক প্রকাশিত হয়), তাহা য়্যাবডাক্‌শ্যন্ নহে, অন্য অপরাধ। সর্ নাজিমুদ্দিন যদি শুধু নারীহরণেরই তালিকা দিয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্তবিধ নারী-নির্যাতনের তালিকা ব্যবস্থাপক-সভার কোন সভ্যের যথাসময়ে চাওয়া উচিত হইবে। সেরূপ তালিকা পাওয়া গেলে নারী-নির্যাতনের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে ধারণা আরও যথাযথ হইবে।

—

নারী-নির্য্যাতন সম্বন্ধে কলিকাতায় সভা

গত ২রা ভাদ্র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে কলিকাতার আলবার্ট হলে বঙ্গে নারী-নির্যাতনের আতিশয্য সম্বন্ধে একটি সভার অধিবেশন হয়। সভায় খুব ভীড় হইয়াছিল। অল্পসংখ্যক মহিলাও হলে উপস্থিত ছিলেন। এই সভাটির কয়েকটি বিশেষত্ব উল্লেখ-যোগ্য। কংগ্রেসের সভাপতি ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাস্থলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র কংগ্রেসওয়ালা ছিলেন না। শ্রোতা ও বক্তাদের মধ্যে মুসলমানও ছিলেন। শ্রোতা ও বক্তাদের মধ্যে উদারনৈতিক ("Liberal") দলের লোক ছিলেন, কোন রাজনৈতিক দলের লোক নহেন এমন লোকও ছিলেন। শ্রোতা ও বক্তাদের মধ্যে এখনও সরকারী কাজ করেন এরূপ লোক এবং সরকারী পেন্স্যনভোগী লোক ছিলেন। শ্রোতা ও বক্তাদের মধ্যে মহিলা ছিলেন। সভাটি হইয়াছিল নারীরক্ষা-সমিতি নামক অসাম্প্রদায়িক সমিতির দ্বারা। আমাদের দেশে অন্য নানা রকম জাতিভেদ ও শ্রেণীভেদের উপর রাজনৈতিক জাতিভেদও বর্ত্তমান। তাহার ফলে ভিন্ন ভিন্ন দলের রাজনীতিকেরা সকলেরই অনুমোদিত কোন হিতকর সার্বজনিক কাজের জন্যও খুব বেশী যে মিলিত হন, তাহা নহে। নারীরক্ষারূপ একান্ত আবশ্যক কাজের জন্য উল্লিখিত রূপ নানা প্রকারের মহিলা ও পুরুষগণ যে সমবেত হইয়াছিলেন, তাহা সন্তোষের বিষয় ও উৎসাহজনক। অন্য যে-সকল দেশহিতকরে অনুষ্ঠিত কাজ সম্বন্ধে মতভেদ নাই, তাহাতেও সকলে দলনির্বিশেষে যোগ দিলে কল্যাণ হইবে।

আমরা সকল বক্তৃতার তাৎপর্য্য দিতে পারিব না, উল্লেখও করিতে পারিব না। কেবল সুভাষ বাবুর মর্ম্মস্পর্শী ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতাটি সম্বন্ধে কিছু বলিব। তিনি অবশ্য বাংলাতেই বলিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার যতটুকু প্রতিবেদকেরা বাংলায় ও ইংরেজীতে ছাপাইয়াছেন তাহা ভাল। কিন্তু উহার সমস্তটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। কোন প্রতিবেদক বা অন্য কেহ উহা আগাগোড়া লিখিয়া লইয়া থাকিলে লেখাটি সুভাষ বাবুর দ্বারা সংশোধন করাইয়া পুস্তিকার আকারে ছাপাইলে ভাল হয়। নারীরক্ষা-সমিতি এই কাজটির ভার লউন।

সুভাষ বাবুর কেবল কয়েকটি কথার উল্লেখ এখানে করিব। আগে তাঁহার ধারণা ছিল, নারী-নির্যাতন ও তদ্বিষয়ক আন্দোলন একটা সাম্প্রদায়িক ব্যাপার। দশ বৎসর পূর্ব্বে মান্দালয় জেলে আবদ্ধ থাকিবার সময়

"সঞ্জীবনী" পড়িয়া পড়িয়া তিনি বুঝিতে পারেন, যে, ইহা সাম্প্রদায়িক ব্যাপার নহে। (নিশ্চয়ই সেই কারণে তিনি নারীনির্যাতন সম্বন্ধীয় সভার সভাপতির কাজ করিতে রাজী হইয়াছিলেন)। নারীরক্ষার জন্য যে সমিতি গড়িতে হয়, ইহা দেশের কলঙ্ক—অন্য কোন দেশে এরূপ সমিতি নাই। (কারণ সে-সব দেশে এ-দেশের মত নারীনির্যাতন হয় না)। আমরা আধ্যাত্মিকত্বের বড়াই করিলেও পাশবিকতা এ-দেশে যত বেশী অন্য কোন দেশে তত নয়। গ্যাং-রেপ্ ("Gang rape"), অর্থাৎ অনেকগুলা নরপিশাচ মিলিয়া একটি নারীকে ধর্ষণ, অন্য কোন দেশে নাই। ইহা এ-দেশের ঘোর কলঙ্ক। ট্রামে, 'বাসে যে মহিলাদের জন্য বেঞ্চি আলাদা করিয়া রাখিতে হইয়াছে, তাহার দ্বারাই এদেশে নারীজাতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের অভাব সূচিত হয়। যুবকদের দেখা উচিত পথে ঘাটে সর্ব্বত্র যাহাতে মহিলারা নিরুদ্বেগে অসংকোচে চলাফিরা করিতে পারেন। কেহ তাঁহাদের প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করিলে যুবকদের তাহাকে তখনই সমুচিত শিক্ষা দেওয়া উচিত। মহিলাদেরও সবল সাহসী ও সপ্রতিভ হওয়া আবশ্যক, যাহাতে দুর্বৃত্ত লোকে বুঝিতে পারে যে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করা বা কাবু করা কঠিন; পথে ঘাটে দেড় হাত ঘোমটা টানিয়া জড়সড়ভাবে চলাফিরা করিলে তাঁহাদের সম্বন্ধে দুর্বৃত্তদের ইহার উল্টা ধারণা হয়। ছোরাখেলা, লাঠিখেলা, জিউজুৎসু প্রভৃতি আত্মরক্ষার উপায় সর্ব্বত্র মেয়েদের শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। মেয়েদের বেশভূষা—বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলে—পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক—কি প্রকারে তাহা শহরের মহিলারা বুঝিতে ও বলিতে পারিবেন। বিপ্লবপ্রয়াসীরা কেবল রাষ্ট্রনৈতিক আমূল পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে চলিবে না; সামাজিক বিপ্লব দ্বারা সমুদয় দাসত্বশৃঙ্খল ভাঙিয়া ফেলিয়া নূতন এরূপ সমাজ গড়িতে হইবে যেখানে নারীর অধিকার মর্য্যাদা সম্মান প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। আইনের এবং শাস্তির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। সুভাষবাবু সাধারণতঃ বেত্রাঘাত-দণ্ডের বিরোধী; কিন্তু নারীনির্যাতকদের অন্তবিধ দণ্ডের উপর বেত্রাঘাতদণ্ড হওয়া উচিত বলিয়া তিনি মনে করেন। দেশের স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক আন্দোলকদিগকে শাস্তি দিবার জন্য গবর্ন্মেণ্ট কত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু নারীনির্যাতন বন্ধ করিবার নিমিত্ত বিশেষ উপায় কিছুই গবর্ন্মেণ্ট অবলম্বন করেন নাই। এদেশের সমাজে যাহারা নারীনির্য্যাতক তাহারা ভদ্র সমাজে মিশিতে পায়, প্রশ্রয় পায়, অথচ নির্যাতিতা নারীরা বর্জ্জিতা হন, ইহা ঘোর কলঙ্ক। তাঁহাদের জন্য একটি নয়, বহুসংখ্যক নারী-কল্যাণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত হওয়া আবশ্যক।

এখন আমাদের কথা কিছু বলি। অনেক বার বলিয়াছি।

গত শতাব্দীতে, বোধ হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, হাইকোর্টের জজ সৈয়দ আমীর আলী প্রস্তাব করেন যে, দলবদ্ধভাবে যাহারা নারীধর্ষণ করে তাহাদের ফাঁসি হওয়া উচিত, নতুবা এই পৈশাচিক দুর্বৃত্ততার উচ্ছেদ হইবে না। তখন রাজশাহী জেলায় এইরূপ কতকগুলা ঘটনা ঘটায় তিনি এইরূপ প্রস্তাব করেন। একটি নজীরও তিনি দিয়াছিলেন। আমরা এদেশে যাহাদিগকে গুণ্ডা ও বদমায়েস বলি, অষ্ট্রেলিয়ায় সেই রকম লোকদিগকে ল্যারিকিন (Larrikin) বলে। এই বদমায়েসরা এক সময়ে দল বাঁধিয়া নারীদের উপর অত্যাচার করিত। তাহা দমন করিবার জন্য অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত ল্যারিকিনদের প্রাণদণ্ড দিবার আইন হয় এবং প্রাণদণ্ড হয়ও। ফলে, ঐ রকম পৈশাচিক অপরাধ অষ্ট্রেলিয়ায় চিরতরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সৈয়দ আমীর আলী মহাশয়ের প্রস্তাব অন্য জজেরা সমর্থন না করায় গবর্ন্মেণ্ট সে বিষয়ে কোন বিবেচনা করেন নাই। এখন যে এ-রকম প্রস্তাব বিবেচিত হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই—যদিও ব্যভিচারীকে সকলে মিলিয়া ঢিল ছুঁড়িয়া মারিবার ইস্লামিক ব্যবস্থার সহিত ইহার কোন গরমিল নাই।

নারীধর্ষকদের বেত্রাঘাত-দণ্ডের অনুমোদন আমরাও করি। তাহার উপর, যে-সব মোকদ্দমায় ধর্ষিতা নারী-দিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, সেই সকল মোকদ্দমায় অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত লোকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়া আবশ্যক।

পুলিস কর্ম্মচারীদের মধ্যে সৎ ও দক্ষ লোক যে নাই

তাহা নহে। কিন্তু সকলেই যাহাতে এই সকল মোকদ্দমায় প্রথম হইতেই প্রমাণ সংগ্রহ ও তদ্বির ভাল করিয়া করেন, গবর্মেণ্টের তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। বেশী এরূপ মোকদ্দমায় আসামী খালাস পাইলে এলাকার কর্ম্মচারীর তাহা অকর্ম্মণ্যতার প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত। ভূতপূর্ব্ব ইন্সপেক্টর জেনেরাল লোম্যান (?) সাহেবের নারীনির্যাতন দমনের দিকে খর দৃষ্টি ছিল। এখন কাহারও আছে বলিয়া অবগত নহি।

কোনও অত্যাচরিতা নারীর বয়স ১৬ বা তদধিক হইলে, যদি কোন প্রকারে প্রমাণ হইয়া যায় যে, অপরাধটাতে তাহার সম্মতি ছিল, তাহা হইলে আসামী খালাস পায়। কোন নারীর বয়স ১৮ পূর্ণ না হইলে তাহার সামান্য কোন সম্পত্তিও হস্তান্তর করিবার আইন-সঙ্গত ক্ষমতা থাকে না, অথচ নারীর অমূল্য সম্পত্তি বিসর্জ্জনে সে ষোল বৎসরের হইলেই আইনসঙ্গত সম্মতি দিতে পারে, ইহা অতি অদ্ভুত ও অসঙ্গত আইন। কোন বালিকা ১৪ বৎসরের হইলেই তাহার আইনানুমোদিত বিবাহ ও দাম্পত্য-সম্বন্ধ হইতে পারে। তাহার কথা এখানে হইতেছে না। যেখানে পতিপত্নী সম্বন্ধ নাই, সেরূপ সকল স্থলেই সম্মতির বয়স আঠার হওয়া একান্ত আবশ্যক—২০।২১ হইলেই ঠিক হয়।

জুরীকে ভুল বুঝান বা এরূপ কোন আইনঘটিত খুঁটিনাটিতে বিচার-প্রক্রিয়ায় দোষ ঘটিলে আসামীদের মুক্তি না-হইয়া যাহাতে পুনর্বিচারই নিশ্চয় হয়, আইন এই ভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত।

সকল বালিকা ও নারীকেই লিখনপঠনক্ষম করা আরও নানা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আবশ্যক; কিন্তু অভাগা বাংলা দেশে আবশ্যক এই কারণেও যে লেখা-পড়া-জানা মেয়েরা অন্ততঃ খবরের কাগজ পড়িয়া জানিতে পারিবে, যে, দুর্বৃত্ত লোকে কত ছলে, কত কৌশলে, কত উপায়ে নারীর সর্ব্বনাশ করে; তাহা হইলে তাহারা সাবধান হইতে পারিবে। দৈহিক শিক্ষার দ্বারা যেমন নারীদের আত্মরক্ষার দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি আবশ্যক, তেমনি সাধারণ মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা দ্বারা তাহাদের হৃদয়মনের বল ও সাহস বাড়ান আবশ্যক।

নৃত্য যত রকম আছে, তাহার সকলগুলিরই বিরোধী আমরা নহি, কতকগুলার নিশ্চয়ই বিরোধী; এবং যত্রতত্র নৃত্যের বা নৃত্যনামে অভিহিত অঙ্গসঞ্চালনেরও আমরা বিরোধী। এখানে নৃত্যের সমালোচনা করিতেছি না। তাহার উল্লেখ করিলাম এই জন্য, যে, যে-যেখানে নৃত্য শিখান হয়, সেই সকল স্থানে জিউজিৎসু এবং ছোরা ও লাঠিখেলা শিখান উচিত; এবং যে-সকল উপলক্ষ্যে মেয়েদের নৃত্য প্রদর্শিত হয় তথায় তাহাদের এই সকল আত্মরক্ষাদক্ষতার সামর্থ্যও প্রদর্শিত হওয়া উচিত। আমাদের মনে পড়ে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শান্তিনিকেতনে ছোরাখেলা প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে হইতে দেখিয়াছি, পুরুলিয়ার হরিপদ সাহিত্য-মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবের সময়ও দেখিয়াছি।

বঙ্গের অস্থায়ী গবর্ণর সর্ রবার্ট রীড্ স্বরাষ্ট্র-সচিব রূপে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নারী-নির্যাতন সম্বন্ধে যে তালিকা ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন, তাহাতে দেখা গিয়াছিল যে, নির্যাতিতা মুসলমান নারীর সংখ্যা খুব বেশী। খাজা সর্ নাজিমুদ্দিনের তালিকাতেও তাহাই দেখা যাইতেছে। অতএব, মুসলমান পুরুষেরা যাহাই করুন বা না-করুন, মুসলমান নারীরা নিজের কর্ত্তব্য করুন, নারীরক্ষার ব্রত গ্রহণ করুন। তাঁহাদের শিক্ষা ও জাগৃতির উপর সামাজিক কল্যাণ বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

হিন্দুনারীদের মধ্যে অনেকে অসহযোগ-আন্দোলন উপলক্ষ্যে দেশপ্রীতি ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। নানা কারণে তাঁহারা নারীরক্ষার দিকে ঝুঁকেন নাই। সুভাষ বাবুর যেরূপ ধারণা ছিল যে, ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক, হয়ত তাঁহাদেরও অনেকের সেইরূপ ধারণা থাকায় নারীরক্ষার কাজটাকে তাঁহারা কংগ্রেসের কার্য্যতালিকার বিরোধীই মনে করিতেন। এখন তাঁহারা, আশা করি, কংগ্রেস-সভাপতির ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত ও বক্তৃতা হইতে ভুল বুঝিতে পারিবেন এবং অতি ঘনিষ্ঠভাবে যাঁহারা স্ব-জাতি তাঁহাদের রক্ষা ও দুঃখদুর্দশা-মোচন কার্য্যে মনোযোগী হইবেন।

যে-সকল পুরুষ কংগ্রেসওআলার ভ্রান্ত ধারণা

ছিল, আশা করি তাঁহারাও সভাপতির অনুসরণ করিবেন।

—

সাম্রাজ্যবাদের জয় ও স্বাজাতিকতার পরাজয় ?

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এই মতের ভিত্তির উপর নূতন ভারতশাসন-আইনের ইমারৎ গড়িয়া তুলিয়াছেন, যে, এদেশে ভারতীয় মহাজাতি (নেশ্যন) বলিয়া কিছু নাই; আছে আদিম-জাতি হিন্দু জৈন বৌদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান মুসলমান শিখ প্রভৃতি, আছে জমিদার বণিক কৃষক শ্রমিক প্রভৃতি, আছে ব্রিটিশ-ভারতের মনুষ্যেরা ও দেশী ভারতের নৃপতিরা (তথাকার অন্য মনুষ্যেরা নহে), আছে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিকেরা।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই যে ভারতীয়দের এক-জাতিত্ব অস্বীকার, ইহা কংগ্রেসকে মানিয়া লইতে হইয়াছে সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার অ-গ্রহণ অ-বর্জ্জন ঘোষণার দ্বারা।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সিবিল সার্ভিস হইতে আরম্ভ করিয়া সব সরকারী চাকরী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ভাগ করিয়া আসিতেছেন। কংগ্রেস সরকারী চাকরীর এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরাটাও মানিয়া লইতেছেন দেখিতেছি।

এই দ্বিবিধ মানিয়া-লওয়ার জন্য কংগ্রেসকে দোষ দিতেছি না; কোন দুরভিসন্ধির আরোপও করিতেছি না। ইহা বিশ্বাসযোগ্য যে, তাঁহারা নাচার হইয়া সাময়িক ভাবে দুটা জিনিষ মানিয়া লইয়াছেন, এবং এই মানিয়া-লওয়ার ভিতর কোন সদভিপ্রায় আছে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রনীতি-আলোচনা কেবল বলা ও লেখাতে আবদ্ধ থাকিলেও আমাদের এই সন্দেহ-প্রকাশ ক্ষমা পাইতে পারে, যে, এই দুটা মানিয়া-লওয়া হয়ত অনিবার্য্য ছিল না, হয়ত অন্য কোন পন্থা ছিল ও আছে, এবং হয়ত সেই পন্থা সুফলপ্রদ হইত বা হইতে পারে।

—

চাকরীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা

আগেই বলিয়া রাখি, আমরা সকল সম্প্রদায়ের লোকদেরই সরকারী চাকরী পাওয়ার পক্ষপাতী; কিন্তু তাহা একত্র প্রতিযোগিতা যাঁরা যোগ্যতা দেখাইয়া পাওয়া আবশ্যক মনে করি।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী চাকরী সম্বন্ধে যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তদ্বিষয়ক তর্কবিতর্কে কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যোগ দিয়াছিলেন, বক্তৃতা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভোট দিবার সময় কংগ্রেসী দল প্রস্তাবটার সপক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেন নাই, নিরপেক্ষ ছিলেন। বসু মহাশয়ের বক্তৃতা হইতে এই নিরপেক্ষতার অর্থ ও পরিমাণ অনেকটা বুঝা যায়। উহা হইতে বুঝা যায়, কংগ্রেসী দল সম্প্রদায় অনুসারে চাকরী ভাগাভাগিতে রাজী আছেন, গবর্ন্মেণ্ট যে মুসলমানদিগকে শতকরা ৪৫টা চাকরী দিতে প্রতিশ্রুত তাঁহারা তদপেক্ষাও বেশী দিতে প্রস্তুত আছেন। তপশিলভুক্ত হিন্দুদিগকেও শতকরা কতকগুলি চাকরী দিতে তাঁহারা প্রস্তুত, কিন্তু কতগুলি তাহা বলেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে চাকরীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরা দ্বারা গবর্ন্মেণ্ট যে ভারতীয় মহাজাতির একত্ব অস্বীকার করিয়াছেন ও ভাঙিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কংগ্রেসী দল তাহাতে আপত্তি করিতে বা বাধা দিতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ। তাঁহারা তপশিল-ভুক্ত জাতিদিগকে চাকরীগুলার একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ দিতে চাওয়ায় ঐরূপ অনিচ্ছা বা অসামর্থ্য আরও প্রমাণিত হইতেছে। অধিকন্তু হিন্দুরা যে গবর্ন্মেণ্টকৃত দুটা স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা তাহাও প্রকারান্তরে কংগ্রেসী দল মানিয়া লইতেছেন।

গবর্ন্মেণ্ট যত দূর অগ্রসর হইয়াছেন, অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য শতকরা ৪৫টা চাকরী, বসু মহাশয় বলেন নাই তাহা অপেক্ষা আরও কত দূর কংগ্রেসীরা অগ্রসর হইতে প্রস্তুত, এবং তপশিলভুক্ত হিন্দুদিগকেই বা কত দিবেন। সুতরাং 'সবর্ণ' হিন্দুদের ভাগে কংগ্রেসীদের মতে কত চাকরী থাকিবে বুঝা যাইতেছে না। তবে চাকরীর সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগিতে যে কংগ্রেসী দলের পাকা মত আছে তাহা বুঝা যাইতেছে। মুসলমানী, তপশিলভুক্ত হিন্দু ও "অন্য"দের জন্য আলাদা আলাদা

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার শরৎ বাবুর কৃত প্রস্তাব হইতে।

তিনি প্রধান মন্ত্রীর কিছু দিন আগেকার কতকগুলি কথা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে দেখা যাইতেছে, যে, প্রধান মন্ত্রীর কাছে সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত লোকদের চাকরীর দাবী শতকরা দেড় শতটা পর্য্যন্ত হইতে পারে তিনি বলিয়াছিলেন ("The claims that had been put forward could go up to 150 per cent.")! শতকরা দেড় শতটা চাকরী পরিহাসাত্মক প্রহেলিকার মত শুনাইলেও এই ঘোর কলিকালে উহার গভীর ও গম্ভীর অর্থও থাকিতে পারে। যথা—যতগুলি চাকরী খালি হইবে ও যতগুলি নূতন চাকরীর *সৃষ্টি* হইবে, তাহার সবগুলিই মুসলমানেরা পাইবে। ইহা শতকরা এক শতটি। বাকী শতকরা পঞ্চাশটি মুসলমানদিগকে দেওয়া হইবে হিন্দু কর্ম্মচারীদিগের শতকরা পঞ্চাশ জনকে বরখাস্ত করিয়া!

সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত লোকদের আনুগত্য বা সহযোগিতা লাভের নিমিত্ত নিলামের ডাকে কেহ গবর্ন্মেণ্টের সহিত পাল্লা দিতে পারিবে না। ইহা আগে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। গবর্ন্মেণ্ট "নগদ-বিদায়" করিতে সমর্থ, অন্যেরা কেবল কথা দিতে পারেন।

সরকারী চাকরী সম্বন্ধে হিন্দুদের "ব্যক্তিগত স্বার্থ" ত্যাগ

চাকরীর বাঁটোআরা সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর বক্তৃতাতে 'সবর্ণ' হিন্দুদিগকে, তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ("personal interests") বলি দেওয়া আবশ্যক, বলা হইয়াছে। এই বলি মুসলমান ও তপশিল-ভুক্ত হিন্দু উভয়ের জন্যই দিতে হইবে, যদিও তিনি শেষোক্তদেরই উল্লেখ করিয়াছেন। সরকারী চাকরী সম্বন্ধে স্বার্থত্যাগ বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক।

সরকারী যে-বিভাগেরই চাকরী হউক, কর্ম্মচারীরা তাহা করিয়া উপার্জ্জন করেন এবং দেশের কাজও করেন। শিক্ষা, বিচার, স্বাস্থ্য, কৃষি, রেজিষ্ট্রেশন, পুলিস প্রভৃতি সব বিভাগের কাজের দ্বারা দেশের উপকার হয় যদি তাহা দক্ষতা ও ন্যায়পরতা সহকারে সুসম্পন্ন হয়। এই সকল বিভাগের যোগ্য চাকর্যেরা কেবল যে বেতনটি উপার্জ্জন করেন তাহা নহে, দেশের সেবাও করেন। উপার্জ্জনটা অযোগ্য বা কম যোগ্য চাকর্যে দ্বারাও হইতে পারে; কিন্তু দেশের সেবা যোগ্য লোকদের দ্বারাই হয়, অযোগ্যের বা কম যোগ্যের দ্বারা হয় না বা তেমন হয় না। যোগ্যতমদিগের নাম দেওয়া হউক "ক খ গ", অযোগ্য বা কম যোগ্যদের নাম দেওয়া হউক "প ফ ব"। "ক খ গ"কে স্বার্থত্যাগ করিতে বলিয়া যদি নিরস্ত করা হয় এবং চাকরীগুলি "প ফ ব"কে দেওয়া হয়, তাহা হইলে "প ফ ব" বেতন উপার্জ্জন করিতে পারিবে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা দেশের কাজ "ক খ গ"র মত হইবে না, সুতরাং দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অতএব যোগ্যতমদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া নিরস্ত করিয়া তাহাদের চেয়ে অযোগ্য লোকদিগকে চাকরী দেওয়া দেশের পক্ষে অনিষ্টকর। কেহ মুসলমান বা তপশিলভুক্ত হিন্দু হইলেই অযোগ্য, এরূপ কথা আমরা বলিতেছি না; তিনি যোগ্যতম হইতে পারেন এবং যোগ্যতম হইলে তাঁহার নিয়োগে কেহ আপত্তি করিতেছে না। কিন্তু শতকরা এতগুলি লোক মুসলমান, বা "সবর্ণ" হিন্দু, বা তপশিলভুক্ত হিন্দু হওয়াই চাই, এরূপ নিয়ম করিলে তাঁহারা সবাই সেরা লোক হইবেন না, অনেকে বা অন্ততঃ কেহ কেহ অযোগ্যতা বা কম যোগ্যতা সত্বেও নিয়মটার জোরে কাজ পাইবেন এবং যোগ্যতর ব্যক্তিরা কাজ না-পাওয়ায় দেশ তাঁহাদের সেবা হইতে বঞ্চিত হইবে।

যোগ্যতম ব্যক্তিদিগকে বিনা বেতনে বা কম বেতনে কোন চাকরী করিতে বলিলে তাঁহাদিগকে "ব্যক্তিগত স্বার্থ" বলি দিতে বলা হয়। কিন্তু অন্য কোন কোন, অযোগ্য বা কম যোগ্য, লোকদিগকে চাকরী দিবার জন্য যদি তাঁহাদিগকে একেবারে চাকরী না-করিতেই বলা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের "ব্যক্তিগত স্বার্থের" সঙ্গে সঙ্গে দেশের স্বার্থও বলি দেওয়া হয়। দেশের স্বার্থ বলি দিবার বা দিতে বলিবার ন্যায্য অধিকার কাহারও নাই।

একটা দৃষ্টান্ত লউন। ডক্টর পণ্ডিত কৈলাসনাথ কাটজু যুক্তপ্রদেশের এক জন মন্ত্রী। তিনি ছিলেন এলাহাবাদ

হাইকোর্টের অন্যতম প্রধান অ্যাডভোকেট, মাসে অনেক হাজার টাকা রোজগার করিতেন। তিনি যে মাসে পাঁচ শত টাকা বেতনে মন্ত্রীগিরি করিতেছেন, ইহা ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাঁহাকে কি বলা হইবে, আপনি স্বার্থত্যাগ করিয়া মন্ত্রীর পদটাই ছাড়িয়া দিন এবং বিদ্যাবুদ্ধি-চরিত্র ও সার্বজনিক কর্ম্মোৎসাহে আপনার চেয়ে হীন হইলেও মুসলমান বা তপশিলভুক্ত কোন হিন্দুকে ঐ পদটি প্রদান করুন? তাহাতে ত তাঁহার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ টাকা রোজগার ভাল করিয়াই হইবে—ঐ স্বার্থ বলি দিতে হইবে না, কিন্তু দেশের স্বার্থ নষ্ট করা হইবে।

বঙ্গের ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ও বিজ্ঞান-জগৎ হইতে অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বাহুল্য-ভয়ে দিলাম না।

স্বার্থত্যাগের উপদেশ শুনাইয়া যোগ্য, যোগ্যতর ও যোগ্যতমদিগকে নিরস্ত ও বঞ্চিত করিলে দেশের আর একটা ক্ষতি এই হইবে, যে, যে "সবর্ণ" হিন্দুরা জ্ঞান উপার্জ্জন ও গবেষণা দ্বারা ও সাহিত্য শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় দিয়া দেশের নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রেণীকে প্রকারান্তরে অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও মানসিক উন্নতি সাধনে নিরুৎসাহ করা হইবে।

যদি মুসলমান বা তপশিলভুক্ত হিন্দুরা জানেন যে, প্রতিযোগিতা দ্বারাই ছোট বড় সব চাকরী পাইতে হইবে, তাহা হইলে তাঁহাদের শ্রমশীলতা ও বিদ্যার্জ্জনে মনোযোগ বাড়িবে; কিন্তু অনুগ্রহ ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোআরার ফল অন্য প্রকার হইবে।

যে-সব জা'তের হিন্দুদিগকে স্বার্থত্যাগী হইতে বলা হইতেছে, তাহাদের অনেকের ত্যাগের প্রমাণ বঙ্গের প্রায় গত চল্লিশ বৎসরের পথ ঘাট রেল ষ্টীমার স্কুল কলেজ থানা হাজত বিচারালয় জেল আটক-শিবির ও আণ্ডামানের ইতিহাসে পাওয়া যায়। দেশের উপকারের জন্য এই সমস্ত জাতির হিন্দুরা চিরকালই স্বার্থত্যাগ করিবে, কিন্তু দেশের অকল্যাণ যাহাতে হইবে তাহাকে স্বার্থত্যাগ নাম দিলেও তাহা করা তাহাদের উচিত হইবে না।

কংগ্রেসী দলের পরামর্শ অনুসারে যাহারা স্বার্থত্যাগ-পূর্ব্বক সরকারী চাকরী করিবে না, উক্ত দল তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কি উপায় করিয়া দিবেন, তাহাও বিবেচ্য।

—

সাম্প্রদায়িক "নিষ্পত্তি"র বিরুদ্ধে আন্দোলন

সাম্প্রদায়িক "নিষ্পত্তি"র ("Communal Award"এর) বিরুদ্ধে আন্দোলন আবার চালাইবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা ও বঙ্গের অন্য কোন কোন স্থানে এবং সিমলাতে ইহার বিরুদ্ধে সভা হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে ভাল ভাল বক্তৃতা ও পুস্তিকা আবার মুদ্রিত ও প্রচারিত হওয়া উচিত। কংগ্রেস বাংলা দেশের কংগ্রেস-ওআলাদিগকে ইহার বিরুদ্ধে স্বাজাতিকতার দিক্ দিয়া (from the point of view of nationalism) আন্দোলন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, সাম্প্রদায়িক ক্ষতিলাভের দিক্ দিয়া নহে। স্বাজাতিকতার পক্ষ হইতেও খুব প্রবল যুক্তি সহকারে এই আন্দোলন চালান যাইতে পারে। বঙ্গের কংগ্রেসওআলারা তাহাই করুন। অন্য বাঙ্গালীরা অনুরূপ ন্যায়সঙ্গত যুক্তিও দেখাইতে পারিবেন।

এই "নিষ্পত্তি"টা সালিসী নিষ্পত্তি নহে, কারণ তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডনাল্ডকে ভারতীয় সব দল সালিস মানে নাই।

এটার সপক্ষে পরলোকগত বিখ্যাত মৌলানা মোহম্মদ আলী এই রকম যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, যে, যেমন প্রত্যেক মক্কেলের নিজের পছন্দসই উকীল নিযুক্ত করিবার অধিকার আছে, সেইরূপ প্রত্যেক ভোটদাতার নিজ প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার থাকা উচিত। তিনি ইহা মুসলমান ভোটদাতাদের মুসলমান প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে অধিকার ত কেহ অস্বীকার করে নাই। বস্তুতঃ সাম্প্রদায়িক "নিষ্পত্তি" অনুসারে প্রণীত ভারতশাসন-আইনটা প্রত্যেকের স্বেচ্ছানুসারে স্বাধীনভাবে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের অধিকার নষ্ট করিয়াছে। মুসলমান মক্কেল মুসলমান হিন্দু খ্রীষ্টিয়ান পারসী নানা রকম উকীল নিযুক্ত করে; হিন্দু প্রভৃতি

মক্কেলরাও তাহা করে। কিন্তু প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের বেলায় আইন হিন্দুকে কেবল হিন্দু, মুসলমানকে কেবল মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ানকে কেবল খ্রীষ্টিয়ান,...প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে বাধ্য করে। ইহা স্বাভাবিকতা নহে, আইনের জবরদস্তি-প্রসূত সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা।

—

কংগ্রেস জাতীয় দল

সাম্প্রদায়িক "নিষ্পত্তি" বঙ্গেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি করায় উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য বঙ্গে প্রবলতম কংগ্রেস ন্যাশন্যালিষ্ট বা জাতীয় দল গঠিত হয়। উহা এরূপ প্রবল ছিল, যে, কেবল ঐ দলের প্রার্থীরাই ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ঐ দলকে আবার চাঙ্গা করিয়া তোলা হইতেছে। তাহা করা খুব দরকার। এই দলের কংগ্রেসওআলারা সাম্প্রদায়িক "নিষ্পত্তি"টার বিরুদ্ধে নিশ্চয় লড়িবেন আশা করা যায়। অন্য কংগ্রেসওআলাদের সম্বন্ধে ঠিক্ করিয়া কিছু বলা যায় না। কিন্তু মতভেদ থাকিলেও কংগ্রেসকে ভাঙিয়া দিবার বা হীনবল করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়।

—

"সবর্ণ" হিন্দুরা দমিবেন না

যদি সরকারী চাকরী একটাও "সবর্ণ" হিন্দুরা না পান, তাহা হইলেও তাঁহারা দমিবেন না। অধিকার ও দাবী তাঁহারা ছাড়িবেন না; কিন্তু বঙ্গে যেমন মাড়োয়ারী, শিখ, ভাটিয়া, কচ্ছী প্রভৃতি সরকারী চাকরী না করিয়া কৃতী হন, "সবর্ণ" হিন্দুদিগকে সেইরূপ হইতে হইবে।

—

বিলাতে বাঙালী ছাত্রদের কৃতিত্ব

কোন মুসলমান ছাত্র বাঙালী কিনা তাহা তাঁহার নামের দ্বারা বুঝা যায় না। এই জন্য আমরা বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে কেবল হিন্দু বাঙালীদের কৃতিত্বের উল্লেখ এখানে করিব।

বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য একটি শিক্ষা-বিভাগ আছে, তাহার সদ্যঃপ্রাপ্ত রিপোর্ট হইতে নীচের তথ্যগুলি সঙ্কলিত হইল। ইহা ১৯৩৬-৩৭ সালের রিপোর্ট, ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছে।

সমগ্র ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ৩৫ কোটির উপর। হিন্দু বাঙালীদের লোকসংখ্যা ২ কোটির কিছু উপর। ভারতীয় মুসলমান প্রায় আট কোটি। এই সংখ্যাগুলি মনে রাখিতে হইবে।

আলোচ্য বৎসরে বিলাতে পাঁচ জন ভারতীয় ছাত্র ডি-এসসি পদবী পাইয়াছে। তাহার মধ্যে এক জন বাঙালী; ভারতীয় মুসলমান কেহ নাই। পাঁচ জন ভারতীয় ডি-ফিলের মধ্যে দু-জন বাঙালী; দু-জন ভারতীয় মুসলমান। চল্লিশ জন পিএইচ-ডির মধ্যে তের জন বাঙালী, তিন জন ভারতীয় মুসলমান। কুড়ি জন এম্-এস্‌সির মধ্যে তিন জন বাঙালী, এক জন ভারতীয় মুসলমান। সাত জন এম-এর মধ্যে এক জন বাঙালী, এক জন ভারতীয় মুসলমান। দু-জন এম্-কমের মধ্যে এক জন বাঙালী। লীডসের তিন জন এম্-এড্-এর মধ্যে দু-জন ভারতীয় মুসলমান; বাঙালী নাই। এল্‌এল্-এম কেবল এক জন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, এবং দু-জন এল্‌এল্-বি রাজপুতানা ও পঞ্জাবের।

এগার জন ইংলণ্ডের এফ-আর-সি-এসের মধ্যে দু-জন বাঙালী; ভারতীয় মুসলমান নাই। বার জন লণ্ডনের এম্-আর-সি-পির মধ্যে পাঁচ জন বাঙালী; ভারতীয় মুসলমান নাই। দু-জন এডিনবরার এফ-আর-সি-এসের মধ্যে এক জন বাঙালী; ভারতীয় মুসলমান নাই। সাত জন এডিনবরার এম্-আর-সি-পির মধ্যে দু-জন বাঙালী, ভারতীয় মুসলমান নাই; আর দু-জন, ডি এন্ রায় ও এম পি সিন্‌হ, পঞ্জাবের ও বিহারের বলিয়া লিখিত আছে। তাঁহারা প্রবাসী বাঙালী হইতে পারেন, না-ও হইতেও পারেন।

উপরে লিখিত সংখ্যাগুলি হইতে দেখা যাইতেছে, যে, ভারতবর্ষের সমগ্র অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু বাঙালীরা শতকরা যত জন, বিলাতে হিন্দু বাঙালী ছাত্রদের কৃতিত্ব সে-হিসাবে নিন্দনীয় হয় নাই, প্রশংসনীয় হইয়াছে।

সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দু বাঙালীদের সংখ্যার প্রায় চারি গুণ, কিন্তু কৃতিত্ব চারি গুণ নহে।

বন্যায় বিপন্ন অঞ্চলসমূহ

আসাম, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের অনেক স্থান বন্যায় বিপন্ন হইয়াছে। মান্দ্রাজেরও কোথাও কোথাও জলপ্লাবন হইয়াছে। বঙ্গের প্রায় অর্দ্ধেক জেলা প্লাবনপীড়িত। কোথাও কোথাও আবার অনাবৃষ্টি হেতু অজন্মা হইবার আশঙ্কা হইয়াছে।

দেশের লোক কোন কারণে বিপন্ন হইলে ছাত্রেরা দুর্গতদের সাহায্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। এবারও করিতেছেন। তাঁহাদের অনেকের এ-কথা মনে হইয়া থাকিবে, যে, ছাত্রেরা অন্যদের নিকট হইতে যত চাঁদা সংগ্রহ করেন, তদ্ভিন্ন পূজার ছুটির আগে তাঁহারা নিজেদের সামাজিক সম্মেলনে চিত্তবিনোদনের জন্য যত টাকা সংগ্রহ ও ব্যয় করেন, এবার তাহা সেই উদ্দেশ্যে ব্যয় না-করিয়া দুর্গতদের সাহায্যের জন্য দিলে ভাল হয়।

ত্রিপুরা জেলার কুণ্ডা গ্রামে একটি শিল্প-বিদ্যালয় অনেক বৎসর হইল চলিতেছে। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ দত্তের পরিচালনায় এই বিদ্যালয়ে অনেকে নানাবিধ কুটীর-শিল্প শিখিয়া উপার্জনক্ষম হইয়াছে। অনেক জেলায় বন্যায় বিপন্ন লোকদের সাহায্যের নিমিত্ত তিনি আমাদিগকে একটি উপায়ের বিষয় লিখিয়াছেন। তাহা যেখানে অবলম্বিত হইতে পারিবে, সেখানে সুফলপ্রদ হইবে। তাঁহার চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

এ-বৎসর বন্যার দরুন বাঙ্গালার নানা স্থানের ফসল ধ্বংস হইয়া পল্লীবাসীদের অশেষবিধ প্রকারে বিপন্ন করিয়াছে। এমনও কোন কোন স্থানে দেখা যায় বহু দুঃস্থ পরিবারের মুখে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই। রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই. কেবল হাহাকার! হাহাকার! দৈনিক কাগজে প্রতিনিয়ত এই সংবাদ দেখা যায়। কিন্তু এমন শত শত কর্ম্মক্ষম বিপন্ন লোকও আছে যাহাদের কর্ম্ম-শক্তি থাকা সত্ত্বেও কাজ করিতে পারিতেছে না। তাহাদের মধ্যে অনেকে হয়ত মাটিকাটা অথবা অন্য কায়িক পরিশ্রম অধিক করিতে অনভ্যস্ত। এমন সব লোককে শুধু দানের উপর বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা না করিয়া, তাহাদিগকে নানা প্রকার কুটীরশিল্প-কার্য্য শিক্ষা দিয়া তাহাদের বর্ত্তমান ও ভাবী জীবনের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিলেই যথেষ্ট উপকার করা হইবে। শিশুপাঠ্য পুস্তকে একটি উপদেশ আছে—"দান চায় মান যায়।" তাহা সকলকেই স্মরণ রাখিতে হইবে।

চরকায় পাটের ও তুলার সুতা কাটা, তোয়ালে বুনা, উলের কাজ, বেত-বাঁশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পদ্রব্য ইত্যাদি প্রস্তুত করার প্রণালী শিক্ষা দিলে এবং তাহাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিলেই এই সর্ব্ববিপন্ন নরনারীদিগকে প্রকৃত সাহায্য করা হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বঙ্গের ছাত্র-ছাত্রী ভ্রাতা-ভগিনীগণ পূজার ছুটিতে ও তৎপূর্ব্বে এই কার্য্যভার গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই বিপন্ন পল্লীবাসীদের কল্যাণ হইবে। অবশ্য, তাঁহাদের পশ্চাতে দেশের নেতৃবর্গ, চাকুরে, ব্যবসায়ী, প্রবাসী ও গ্রামবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহানুভূতি থাকিবে।

কলিকাতা অনাথ-আশ্রমের আবেদন

দুর্গোৎসব উপলক্ষে, নিতান্ত অসমর্থ পরিবার ভিন্ন অন্য সব হিন্দু পরিবারের ছেলেমেয়েরা নূতন কাপড় পাইয়া আনন্দিত হয়। কলিকাতা অনাথ-আশ্রমের ছেলেমেয়েগুলিকেও নূতন কাপড় দিবার নিমিত্ত তাহার সম্পাদকদ্বয় সর্ব্বসাধারণের নিকট আবেদন উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহাদের আবেদন পূর্ণ হওয়া উচিত। এই আশ্রমে এখন ৯৭টি বালক ও ৪৮টি বালিকা বাস করে। তাহাদের জন্য সম্পাদকেরা নীচের ফর্দ অনুযায়ী কাপড় চান।

ধুতি		সাটি	
১০ হাত	২৫ খানি	১০ হাত	১৬ খানি।
৯ ,,	১৩ ,,	৯ ,,	১০ ,,
৮ ,,	২৭ ,,	৮ ,,	৮ ,,
৭ ,,	২৭ ,,	৭ ,,	৮ ,,
৬ ,,	৫ ,,	৬ ,,	৬ ,,

বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তে আর্থিক সাহায্যও সাদরে গৃহীত হইবে।

কংগ্রেস পূজা প্রদর্শনী

দুর্গাপূজার পূর্ব্বে কাপড় ছাড়া অন্য নানা রকম জিনিষও খুব বিক্রী হয়। বলা বাহুল্য, অন্য সময়ের মত এই সময়েও খাঁটি দেশী জিনিষই কেনা উচিত। দেশী জিনিষের মধ্যে আগে বাংলা দেশের জিনিষই বাংলা দেশের লোকদের ক্রেয়। এ-কথা অনেকে, বঙ্গের বাহিরের অবাঙালী অনেক গান্ধীভক্তও, সংকীর্ণতাপ্রসূত মনে করেন ও বলেন। তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যে, মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, তিনি যখন যে গ্রামের বাসিন্দা সেই গ্রামে উৎপন্ন জিনিষ তাঁহার পক্ষে প্রথমস্থানীয় স্বদেশী দ্রব্য।

কংগ্রেস এখন কলিকাতায় একটি বহুবিধ স্বদেশী জিনিষের প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করিয়া সর্ব্বসাধারণের জানিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন যে, দেশী কত রকম জিনিষ পাওয়া যায়। জানিতে পারিলে ও দেখিতে পাইলে কিনিতেও অনেকে পারিবেন।

এ সময়ে রেশমী ধুতি শাড়ী ও রেশমী কাপড়ের জামা অনেক বিক্রী হয়। একেবারে জাপান হইতে আমদানী কাপড় ত বিস্তর আছে; তা ছাড়া দেশী নামে পরিচায়িত

কিন্তু জাপানী রেশমী সুতার বোনা কাপড়ও বিস্তর আছে। এসব জিনিষ কেনা উচিত নয়। নিখিলভারত কাটুনী-সংঘ ভারতীয় রেশমী সুতায় কাপড় বুনাইয়া কলিকাতা, ঢাকা ও মালদহে বিক্রী করিতেছেন। বিষ্ণুপুরে দেশী সুতায় তাঁহাদের নির্ব্বাচিত তাঁতী দ্বারা সুন্দর সুন্দর কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে। এই রকম সব বঙ্গীয় জিনিষই বঙ্গের রেশমী-ক্রেতাদের কেনা উচিত।

কংগ্রেস পূজা প্রদর্শনীর স্থান কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের কমার্শাল মিউজিয়মের নিকট। উহা ২রা হইতে ১১ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। প্রবেশ-মূল্য দুই পয়সা মাত্র।

—

চিকিৎসাশিক্ষার্থী দরিদ্র মুসলমান ও তপশিলভুক্ত হিন্দুর জন্য বৃত্তি

চিকিৎসাশিক্ষার্থী দরিদ্র মুসলমান ছাত্রদের জন্য অনেকগুলি বৃত্তির সরকারী ব্যবস্থা হইয়াছে। "পিত্তি রক্ষা" হিসাবে তপশিলভুক্ত হিন্দুদের জন্যও কিঞ্চিৎ দেওয়া হইয়াছে। যাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু "সবর্ণ" হিন্দুদের মধ্যেও হাজার হাজার অতি দরিদ্র ও বুদ্ধিমান ছাত্র আছে, এবং তাহাদের জা'তভাইয়েরাও ট্যাক্স দিয়া থাকে—পরিমাণে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ট্যাক্স তাহারাই দেয়। এই সব দরিদ্র ছাত্রদের জন্য কেন কিছু করা হইল না?

—

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল (Secondary Education Bill) কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে নব কলেবর ধারণ করিয়াছে বলিয়া গুজব। ইহার খসড়া একটা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে' প্রকাশিতও হইয়াছে। তাহাই "আদি ও অকৃত্রিম" হক্-মার্কা চীজ কিনা, অজ্ঞাত। সে যাহা হউক, তাহাও শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মানুগত (যাহার মানে সহজবোধ্য) করিবার জন্য প্রণীত হইয়াছে, শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারের নিমিত্ত পরিকল্পিত হয় নাই। একটি বোর্ড সেকণ্ডরী সব বিদ্যালয় ও শিক্ষাপদ্ধতির উপর কর্তৃত্ব করিবে। ইহার সদস্য-সংখ্যা ৪৭। এই সংখ্যাটি যে-রকম মেজাজের আভাস দেয়, এই বোর্ডের ব্যবহার তদনুরূপ হইবে কিনা বলা যায় না। কিন্তু মুসলমান সদস্য, সরকারী ও সরকার-মনোনীত সদস্য এবং ইংরেজ সদস্যদিগের মিলিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা সর্ব্বদাই থাকিবে, এবং তাহার ফল যাহা হইবার তাহা হইবে। প্রধানতঃ "সবর্ণ" হিন্দুরাই বঙ্গের অধিকাংশ ইস্কুল স্থাপন করিয়াছে ও চালাইয়া আসিতেছে। কিন্তু বোর্ডে তাহাদিগকে শক্তিহীন করা হইয়াছে।

—

বঙ্গের সীমা

সিন্ধু আলাদা হইয়াছে; উড়িষ্যা এবং বিহার (বঙ্গের কতক অংশ সমেত) আলাদা হইয়াছে; অন্ধ্র, কর্ণাটক, ও কেরলের আলাদা হওয়ায় কংগ্রেসের মত হইয়াছে। বঙ্গের বিহারপ্রদেশভুক্ত অংশগুলি বাংলাকে দিবার জন্য নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটি অনুরোধ করিয়াছেন। বিহারের মন্ত্রীরা সে অনুরোধরক্ষার অনুকূল কিছু বলেন করেন নাই। কিন্তু ভাষা অনুসারে প্রদেশ-গঠন যখন সাধারণভাবে কংগ্রেসের অনুমোদিত নীতি এবং ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টও তদনুসারে কয়েকটি প্রদেশ গঠন করিয়াছেন, তখন বাংলা ভাষা অনুসারে বাংলা-প্রদেশ কেন গঠিত হইবে না, তাহার কোন ন্যায্য কারণ নাই। বিহার-প্রদেশ ও আসাম-প্রদেশের কোন্ কোন্ অংশ বাংলাভাষী ও তাহাদের বাঙালী অধিবাসী সেন্সস অনুসারে কত, তাহা শ্রীযুক্ত অমিয় বসু সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে একটি যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধে মানচিত্র সহকারে দেখাইয়াছেন।

—

খাস্ বিহারের বাঙালীদের হিন্দী শিক্ষা

একটা কথা উঠিয়াছে যে, যে-সব বাঙালী খাস্ বিহারের স্থায়ী বাসিন্দা বা স্থায়ী বাসিন্দা হইতে চান ও সেখানে সরকারী চাকরী বা অন্য বিষয়কর্ম্ম করিতে চান, তাঁহাদিগকে হিন্দী শিখিতে জানিতে হইবে। হিন্দী জানা যে তাঁহাদের পক্ষে সুবিধাজনক তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এই হিন্দী-জানাটাকে যদি আইনানুসারে অবশ্যকর্ত্তব্য করা হয়, তাহা হইলে এই রকম আইন সব প্রদেশেই হওয়া চাই। নিয়ম হওয়া চাই, যে, বঙ্গের বাসিন্দা সব অবাঙালীকে বাংলা জানিতে হইবে, উড়িষ্যার সব অনুৎকলীয়কে ওড়িয়া জানিতে হইবে, মহারাষ্ট্রের অমহারাষ্ট্রীয় বাসিন্দাদিগকে মরাঠী জানিতে হইবে, ইত্যাদি। বিহার-প্রদেশের সকল অংশের মাতৃভাষা বিহারী-হিন্দী নহে। ঐ প্রদেশের কোন কোন অংশে বাংলা, সাঁওতালী, ওড়িয়া, মুণ্ডা, ওরাঁও,… মাতৃভাষা। ঐ সকল অংশে যদি খাস্ বিহারীরা থাকিতে ও বিষয়কর্ম্ম করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও বাংলা, সাঁওতালী, ওড়িয় বা মুণ্ডা,… জানিতে হইবে।
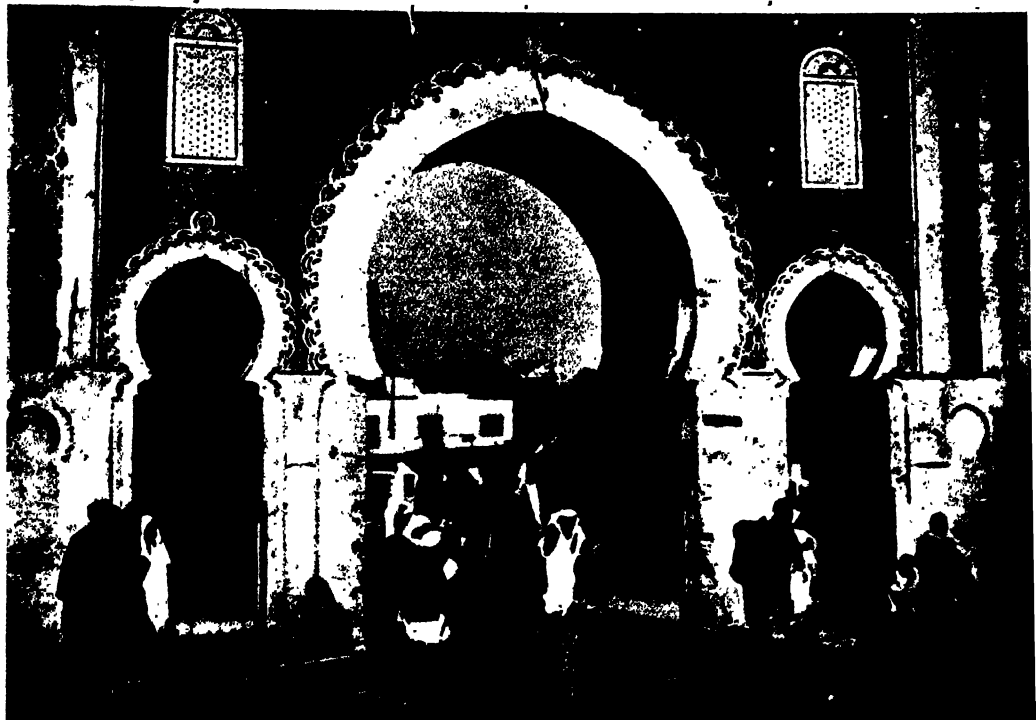
মরক্কো, ফেজ নগরের তোরণ

নগর-প্রাচীরের বহির্ভাগ হইতে ফেজ নগরের দৃশ্য

লোকার্ণোতে নৃত্য-উৎসব

এস্টোনিয়ার বিশিষ্ট বেশভূষা

যেহেতু প্রদেশটির নাম বিহার অতএব তাঁহারা শ্রেষ্ঠ জীব এবং অন্যেরা তাঁহাদের ভাষা শিখিতে বাধ্য হইবে কিন্তু তাঁহারা বিহার-প্রদেশবাসী অন্যদের ভাষা শিখিবেন না—তাঁহাদের কাহারও এরূপ চিন্তা মনে স্থান দেওয়া অকর্তব্য।

—

প্রতিবেশী আদিম জাতিদিগকে বাংলা শিখান

বাংলা দেশের মধ্যে ও বঙ্গের বাহিরে যেখানে যেখানে সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা, খাশিয়া, গারো, কুকি প্রভৃতি জাতি বাঙালীদের প্রতিবেশী, সেখানে তাহাদিগকে বাংলা শিখান উচিত। তাহাদের অনেকে বাংলা বলে। ব্রাহ্মসমাজ এইরূপ কাজ দু-এক জায়গায় করিয়াছেন, রামকৃষ্ণ মিশনও করিয়াছেন। ইহা ব্যাপক ভাবে হওয়া চাই। আদিম জাতিরা বাংলা শিখিলে তাহাদের জ্ঞান যত বাড়িবে, অন্য কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিখিলে তত বাড়িবে না। তা ছাড়া, তাহারা বাংলা জানিলে প্রতিবেশী বাঙালীদের সহিত তাহাদের নানা কাজকর্ম কারবারেরও সুবিধা হইবে।

জমশেদপুর হইতে শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহ লিখিয়াছেন :—

আদিম অধিবাসীরা—যেমন সাঁওতাল, কোল, মাহাত প্রভৃতি জাতি—বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলে ও সুবিধা পাইলে বাংলা পাঠশালায় পড়া শুনা করে। কিন্তু ইহাদের জন্য যথেষ্ট পাঠশালার অভাব আছে। কয়েক জায়গায় ৭।৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। ধলভূম পরগণায় ১৪টি তরফে আরও অন্ততঃ ১৪টি এইরূপ বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইহাতে আনুমানিক মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে বৎসরে ৮৪০৲ টাকা ব্যয় হইবে। বাংলা দেশ হইতে যদি কিছু সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের কাজের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।

বাংলা ভাষা শিখিলে উহাদের সুবিধা হইবে। কেননা বাংলা ভাষা ও বাংলার সভ্যতা ইহাদের মধ্যে অনেকটা প্রবেশ করিয়াছে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের আন্দোলন যখন চলিতেছে তখন বাংলা ভাষার প্রচারকার্য্য বাঙালীদের কি আশুকর্তব্য নহে?

—

ইনসিওরেন্স সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদে অ-ভারতীয় নিয়োগ

বীমা-সম্বন্ধীয় নূতন আইন অনুসারে বীমা কোম্পানীগুলির কাজ তদারকের জন্য এক জন ইনসিওরেন্স সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিয়োগের নিয়ম হইয়াছে। এই পদে এক জন অভারতীয়কে নিয়োগ করায় মান্দ্রাজের শ্রীঅবিনাশীলিঙ্গম্ চেট্টিয়ার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই নিয়োগের নিন্দাজ্ঞাপক একটি "মুলতুবি" প্রস্তাব করেন। ব্যবস্থাপক সভায় এই বীমা-আইন যখন আলোচিত হয় তখনই ইউরোপীয় সদস্যগণ এমন একটি ধারা জুড়িয়া দিতে চাহিয়াছিলেন যাহার ফলে এই পদে মাত্র ইউরোপীয়দিগকেই নিয়োগ করা যায়। এখন কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছে।

মুলতুবি প্রস্তাবটি এক ভোটে পরিত্যক্ত হইয়াছে। মিঃ জিন্না ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে নূতন মুসলিম লীগ দল গঠন করিয়াছেন তাহার সব সদস্য প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে ভোট দেন। এই প্রস্তাবে মুসলমানদের স্বার্থহানিকর কিছু ছিল না—তৎসত্ত্বেও মিঃ জিন্নার দল যে ইহার বিরুদ্ধে ভোট দিলেন তাহা, বোধ হয়, মুসলিম লীগের চুক্তি-প্রস্তাব কংগ্রেস যে গ্রহণ করে নাই তাহার একটা শোধ তুলিবার জন্য। ইহাকেই বলে নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ। আর একটা কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। বিতর্কের সময় বাণিজ্য-সচিব বলেন যে মাত্র ৬ জন ভারতীয় নাকি আছেন যাঁহাদের কাহাকেও এই পদে নিয়োগ করিবার কথা উঠিতে পারে। সম্ভবতঃ এই ৬ জনের মধ্যে মুসলমান কেহ ছিলেন না।

—

"বঙ্গীয় সরকারী দলিলপত্র আইন"

সরকারী কলিকাতা গেজেটে "বঙ্গীয় সরকারী দলিলপত্র আইনে"র খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে। কোন খবরের কাগজ অপ্রকাশিত সরকারী কাগজপত্র সরকারী অনুমতি ব্যতিরেকে প্রকাশ করিলে তাহার সম্পাদক ও প্রেসরক্ষক এই আইন অনুসারে দণ্ডিত হইতে পারিবে। কারাদণ্ড এবং প্রেস বাজেয়াপ্ত পর্য্যন্ত হইতে পারিবে। কেহ কোন গুপ্ত সরকারী কাগজপত্র মৌখিক প্রকাশ করিলে তাহারও শাস্তি হইতে পারিবে। বর্তমান সংখ্যায় এই দমনেচ্ছামূলক বিলের আলোচনার স্থান ও সময় নাই।

—

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীকে য়োনে নোগুচির চিঠি

জাপানী কবি য়োনে নোগুচি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধীকে জাপানের যুদ্ধের সমর্থক আলাদা আলাদা যে দুইটি চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা তিনি অনেক সম্পাদককেও পাঠাইয়াছেন। আমাদিগকে প্রেরিত ঐ চিঠি দু-খানার এবং তাহার সঙ্গে আমাদিগকে লিখিত চিঠিটার কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি না। কবি ও গান্ধীজী জবাব দিলেই যথেষ্ট হইবে। তবে, দরকার হইলে পরে আমরাও কিছু লিখিব।

ভারতে আরও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির আতঙ্ক

সমগ্র ভারতের স্বাস্থ্য-কমিশ্যনার বলিতেছেন, ১৯৪১ সালে যে সেন্সস হইবে তাহাতে দেখা যাইবে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ৪০ কোটি হইয়াছে। তবে একথাও বলা হইয়াছে যে, ৪০ কোটি লোককে খাওয়াইয়া-পরাইয়া বাঁচাইয়া রাখিবার ক্ষমতা ভারতবর্ষের আছে। অবশ্য তাহার জন্ম কৃষি শিল্প উভয় দিক্ দিয়াই দেশের উন্নতি করিতে হইবে, এবং তাহা একটি সুবিবেচিত পদ্ধতি অনুসারে করিতে হইবে। ইহাই একমাত্র উপায় যাহাতে অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

—

মধ্যপ্রদেশের "হরিজন"দের গুরুমারা বিদ্যা

মধ্যপ্রদেশ ও বিদর্ভের সাবেক মন্ত্রিমণ্ডলে এক জন মুসলমান মন্ত্রী ছিলেন। এবার এখনও মুসলমান মন্ত্রীর নিয়োগ হয় নাই, লোকের খোঁজ হইতেছে। ইতিমধ্যে তথাকার "হরিজন"রা আন্দোলন জুড়িয়াছেন যে, এক জন মন্ত্রী তাঁহাদের মধ্য হইতে লওয়া চাই। এই দাবী সঙ্গত। তাঁহাদের প্রতিনিধিরা সেগাঁওয়ে মহাত্মা গান্ধীর কুটীরের নিকট উপবাসী থাকিয়া ধরণা দিতেছেন। গান্ধীজী বলিতেছেন, এ বিষয়ে তাঁহার কোন ক্ষমতা নাই। তাঁহারা তাহা সত্ত্বেও উপবাস দ্বারা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির চেষ্টায় আছেন। মহাত্মাজীর উপবাস-অস্ত্র তাঁহারই বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতেছে। কিন্তু উপবাসে "হরিজন"গণ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না।

—

আসাম রাষ্ট্র-পরিষদে "ডোমিসাইল" অধিকার

বিহারের মত আসামেও বাঙালীদিগকে, তাহারা যে তথাকার বাসিন্দা, তাহার সরকারী সার্টিফিকেট লইতে হয়। এ বিষয়ে যে নিয়ম আছে, তাহা পরিবর্তন করিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ আইনের নীতি (correct legal principle) অনুযায়ী করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন লাহিড়ী আসাম রাষ্ট্র-পরিষদে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। প্রধান মন্ত্রীর ও তাঁহার দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও উহা ভোট-গণনা ব্যতিরেকেই গৃহীত হইয়াছে। বঙ্গে কোন অবাঙালীকে প্রমাণ করিতে হয় না, যে, তিনি বঙ্গের বাসিন্দা। বাঙালীদিগকেও ভারতবর্ষের কোথাও নিবাসিত্ব-পরিচায়ক সার্টিফিকেট (domicile certificate) লইতে ও দেখাইতে বাধ্য করা উচিত নহে।

—

কলিকাতায় বৈমানিক আক্রমণে আহতদের চিকিৎসাব্যবস্থা

আকাশ-পথে এরোপ্লেনযোগে সদ্য সদ্য কলিকাতা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা না থাকিলেও, উহা অসম্ভব নহে। এই জন্ম ঐরূপ আক্রমণে আহতদিগের অবিলম্বে সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। সত্তরটি সাহায্য-কেন্দ্রের স্থান অন্বেষণ করা হইতেছে, এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

—

বৈমানিক আক্রমণে গ্রাম নিরাপদ

শত্রুরা যখন আকাশ-পথে কোন জাতিকে আক্রমণ করে, তখন যে-যেখানে বোমা ফেলিলে খুব বেশী মানুষ মারিতে ও সম্পত্তি নষ্ট করিতে পারে, সেই সব স্থানই আক্রমণ করে। এই জন্ম ঘনবসতি শহরগুলাই সাধারণতঃ আক্রান্ত হয়, গ্রাম নহে। সেই হেতু মুসোলিনি রোমের লোকদিগকে সর্ব্বদা সঙ্কেত পাইবামাত্র গ্রামে পলাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। কত অল্প সময়ের মধ্যে কত লোক গ্রামে চালান করা যায়, লণ্ডনে তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতার লোকদেরও গ্রামে ও ছোট ছোট শহরে এমন সব ঘরবাড়ী বাসযোগ্য রাখা উচিত, যেখানে দরকার হইলেই যাওয়া যায়।

১৬ই ভাদ্র, ১৩৪৫।

দেশ-বিদেশের কথা

কৃতী প্রবাসী বাঙালী যুবক

শ্রীসন্তোষকুমার মজুমদার সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের প্রথম শ্রেণীর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মের অডিট্ ও একাউন্টস বিভাগে সহকারী একাউন্টেন্ট-জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীসন্তোষকুমার মজুমদার

ব্রহ্মদেশে এই বৎসরেই এই কাজের জন্য প্রথম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রবর্ত্তন হইল এবং সন্তোষবাবু প্রথম বাঙালী এই কাজে

শ্রীবিশ্বনাথ সেন গুপ্ত

নিযুক্ত হইলেন। গত বৎসর গণিতশাস্ত্রে বি-এস্‌সি অনার্স পরীক্ষায় ইনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

শ্রীবিশ্বনাথ সেন গুপ্ত এবার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এসসি পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যার প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৬ সালে বি-এসসি পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং গণিতে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাইয়া স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন।

চীন-জাপান যুদ্ধের চিত্র

গেরিলা-যোদ্ধাদের আক্রমণ জাপানীদের বিশেষ বিব্রত করিয়াছে। চীনা যুবকদের গেরিলা-যুদ্ধ শিক্ষার জন্য সুচাওতে একটি প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হইয়াছে। দুই মাস কঠোর শিক্ষা ও অভ্যাসের পর যুবকগণ উত্তরাঞ্চলে গিয়া সৈন্য সংগ্রহ করে ও তাহাদের গেরিলা-যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করে।

চীনের কম্যুনিষ্টগণ চীনের অন্যান্য দেশরক্ষী দলের সহিত মিলিত হইয়া জাপানের আক্রমণকে বাধা দিতেছে। চীনের গ্রামাঞ্চলে গিয়া ইহারা কৃষকদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া "স্থানীয় আত্মরক্ষা সমিতি" গঠন করিতেছে।

চীনের সৈন্যাধ্যক্ষ বিপক্ষের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করিতেছেন
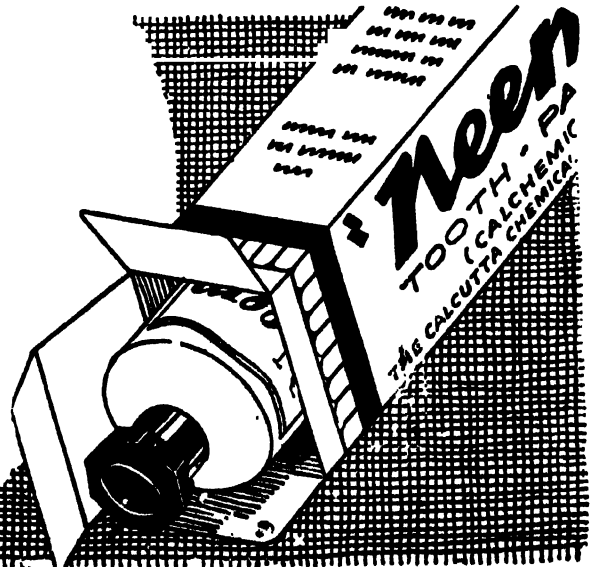
চীনের 'গেরিলা' যোদ্ধারা তরবারি-চালনা অভ্যাস করিতেছে।

চীনের কম্যুনিষ্ট-অধ্যুষিত গ্রামে কৃষক-দেশরক্ষী নবাগতের ছাড়পত্র দেখিতেছে।

কুমারী রেণু শূর

কুমারী অণিমা ভট্টাচার্য্য

এলাহাবাদের জগত্তারণ উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয় হইতে নিম্নোক্ত পরীক্ষার্থিনীগণ যুক্তপ্রদেশের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমতী অণিমা ভট্টাচার্য্য পরীক্ষার্থিনীদের মধ্যে প্রথম স্থান, শ্রীমতী রেণু শূর পরীক্ষার্থিনীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান, এবং শ্রীমতী বেলা শূর ছাত্রছাত্রী সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে একাদশ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই গণিতে বিশেষ উচ্চ নম্বর পাইয়াছেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমতী রেণু শূর সংস্কৃতেও বিশেষ উচ্চ নম্বর পাইয়াছেন।

শ্রীমতী প্রভা সেনগুপ্তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত এম-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত অনার্সে'ও তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্তা শোভা মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্তা শোভা মুখোপাধ্যায় কিষণগঞ্জ মিউনিসিপালিটির সদস্য ও কিষণগঞ্জ মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা। তাঁহার উদ্যোগে কিছুকাল পূর্ব্বে উক্ত মহিলা সমিতির সাহায্যকল্পে কিষণগঞ্জে রবীন্দ্রনাথের নটীর পূজা স্থানীয় বালিকাগণ কর্ত্তৃক সৌষ্ঠবের সহিত অভিনীত হয়।

লোকার্ণোর উৎসব—ফুলরাণী

পার্ব্বত্যপথে জাপানের ট্যাঙ্ক

রাজা ফারুক তাঁহার সমরাধ্যক্ষদের সহিত আলোচনায় ব্যাপৃত।

মধ্যপ্রদেশে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও লোকহিতৈষিণী বাঙ্গালী মহিলা

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী সুদূর মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদ জিলার অন্তঃপাতী পাতারওয়ারা নামক শহরের স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে গত তিন বৎসর ধরিয়া মনোনীতা সদস্যা আছেন। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষেই গৌরবের বিষয়। তিনি কোন দিনই স্কুল বা কলেজের শিক্ষা পান নাই, তিনি বাংলা ভাষা ও কথ্য হিন্দী ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা জানেন না। কিন্তু চরিত্রগুণে তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।

স্থানীয় মহিলাদের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য তাঁহারই উদ্যোগে স্থানীয় মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বয়স্কা নারীদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য তিনি সর্ব্বদা বিশেষ চেষ্টিত। সুচিকিৎসা ও জ্ঞানের অভাবে কত নারী যে অকালে প্রাণ হারাইতেছেন ইহা উপলব্ধি করিয়া তিনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ও জন-সাধারণের অর্থসাহায্যে "শিশুমঙ্গল-কেন্দ্র" এবং প্রসূতি-সদন প্রতিষ্ঠা করেন।

চিত্রপরিচয়

গত হরিপুরা কংগ্রেসে প্রদর্শনী সজ্জার জন্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় স্বয়ং বহুসংখ্যক চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিলেন। ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন দৈনন্দিন দৃশ্য, বাউল, চাষী প্রভৃতির চিত্র, তিনি এই উপলক্ষ্যে আঁকিয়াছিলেন। কিন্তু হরিপুরা কংগ্রেসে যাঁহারা যান নাই তাঁহারা ব্যতীত অল্প লোকেরই এই অপূর্ব্ব চিত্রগুলি দেখিবার সুযোগ হইয়াছে, উহা হইতে মাত্র দুইখানি ছবি কিছুদিন পূর্ব্বে একটি প্রদর্শনীতে দেখানো হইয়াছিল। সম্প্রতি বসু মহাশয়ের সৌজন্যে আমরা তাহার কতকগুলি মুদ্রিত করিবার আয়োজন করিয়াছি। তাহারই একটি ছবি "শ্রীঅঙ্গনী" বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীনারায়ণ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত